প্রবাসী

৫৫শ ভাগ, প্রথম খণ্ড, ১৩৬২

সূচীপত্র

বৈশাখ—আশ্বিন

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

বিষয়-সূচী

পল্লীশ্রী [ফোটো : শ্রীরামাশঙ্কর সিংহ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৫শ ভাগ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৬২

১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

নববর্ষ

পুরাতনের শেষ, নবীনের উষালোকে আগমন। বাঙালীর জীবনের এক পরিচ্ছেদের শেষ হইয়া অন্য পরিচ্ছেদের লিখন আরম্ভ হইল এই নববর্ষে। বিগত বৎসরের সালতামামীর কৈফিয়ত হিসাবে ইতিহাসের খাতায় যাহা উঠিবে বা উঠিয়াছে, তাহাতে বাংলা ও বাঙালীর নামে জমা-খরচের উল্লেখমাত্র থাকিবে কিনা সন্দেহ। যদিও ভারতের অঙ্ক থাকিবে উজ্জ্বল অক্ষরে, কেননা ভারত আজ জগতের মহাজাতি সমষ্টিতে আসন পাইয়াছে, সে আর পূর্ব্বের ন্যায় অবহেলিত নহে।

নববর্ষ আনন্দের দিন, উৎসবের দিন। সুতরাং প্রথমে আশার সন্দেশ, আনন্দের কারণ বর্ণিত করা প্রয়োজন, পরে ইতিহাসের খাওয়ান বিচার ও ভবিষ্যতের নির্দ্দেশ—সে যতই নীরস ও কঠোর হউক—দেওয়া প্রয়োজন।

প্রথমেই বলি বাংলার প্রজাচাষীদের কথা। বহুদিন পরে তাহাদের দাসত্ব মোচন হইল। জমি ও চাষীর মধ্যে ভিন্ন অধিকারী আর রহিল না ইহাই আনন্দের প্রধান কারণ। যদি চাষী উহাতে নূতন জীবন গঠনে নবীন প্রেরণা লাভ করে তবে তাহার ভবিষ্যৎ আশাময় হইবে। অন্যদিকে বাংলায় যে নানা স্থলে ব্যাপক জলসেচের ব্যবস্থা হইতেছে তাহারও অধিকাংশই নূতন বৎসরে (১৩৬২) সম্পূর্ণ হইবে। চাষীর আনন্দের ও আশার সন্দেশ এই নববর্ষ আনিতেছে ইহাই নিশ্চিত।

বাকী সবকিছুই অনিশ্চিতের মধ্যে। বিশেষে বাংলার মধ্যবিত্তের ভবিষ্যৎ। তবে একথাও ঠিক যে এই নূতন বৎসরেই তাহার অস্তিত্বের বোঝাপড়া একপ্রকার শেষই হইয়া যাইবে। অস্তিত্ব লোপ হইলেও যন্ত্রণার শেষ এবং যন্ত্রণার উপশম হইলেও মঙ্গল। যে চরম দুর্গতির মধ্যে বাঙালী গৃহস্থ তাহার জীবনযাপন করিতেছে তাহার বর্ণনাও হৃদয়বিদারক। অথচ এই শ্রেণীই বাংলার তথা ভারতের সকল গৌরবের ও সকল উন্নতির আকর।

বাংলার তরুণ আজ মতিভ্রান্ত ও ছত্রভঙ্গ, উদ্দামগতিতে বিপথগামী। তাহাকে সৎপথে আনার ক্ষমতা কাহারও আয়ত্তে আছে মনে হয় না। তাহাকে বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত করিতে অনেকেরই উৎসাহ দেখা যায়। বাংলার প্রবীণ ও প্রৌঢ়জন আজ অন্ন-বস্ত্র ও জীবিকানির্ব্বাহের চেষ্টায় অবসন্ন এবং চিন্তাজর্জ্জরিত। কোন প্রকারে ক্লীবের বিফলজীবনের দিনগত পাপক্ষয়েই তাঁহাদের সকল দৈহিক ও মানসিক শক্তি নিঃশেষিত।

এই জন্যই আজ ভারত অগ্রসর হইলেও বাঙালী পশ্চাদ্‌গামী। তাহার কারণ এই যে নিস্তেজ ও আত্মঘাতী ক্লীবদের সহিত কাহারও আত্মীয়তা সম্ভব নহে। সকলেই তাহাকে অবহেলায় বর্জ্জন করে। তাহার অধিকার কিছুই নাই, যাহার ক্রন্দন ও অভিযোগ মাত্র শক্তিসামর্থ্যের একমাত্র পরিচয়।

আজ আসামে যাহা ঘটিতেছে ও অল্পদিনে পূর্ব্বে বিহারে যাহার উপক্রম হইয়াছিল, তাহার জন্য আসাম ও বিহারের অধিবাসীদিগকে সম্পূর্ণ দোষী প্রমাণ করিলেও তাহাদের শাস্তিবিধান হইলেও এ অবস্থার প্রতিকার হইতে পারে না। কারণ প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসা প্রয়োজন বাঙালীর বিকারগ্রস্ত দেহমনের রোগের। যদি সে রোগের উপশম হয় তবে বাঙালীর ভবিষ্যৎ নিষ্কণ্টক। বঙ্গভঙ্গ রদ করিয়াছিল এই বাঙালীই, একলা পথে সঙ্গীহীন অবস্থায়।

নববর্ষে কি সেই চিকিৎসক, সেই মহাগুরুর আগমনীর সুর শোনা যাইবে ও যিনি এই অভিশপ্ত জাতিকে "স্লোগান", পার্টি "আপ্তবাক্য" ইত্যাদি সকল প্রাচীন ও নবীন কুসংস্কার এবং মানসিক গ্রন্থি হইতে মুক্ত করিবেন?

ইতিহাসের খতিয়ানে গত বৎসর গিয়াছে বিষম ঝড়ঝঞ্ঝাটের আশঙ্কায়। নববর্ষে যেন নূতন আশার আলোক দেখা দিয়াছে। অস্ত্রবলে বলীয়ান যে দুই জাতিপুঞ্জ আণবিক মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতায় জগৎকে ও সমস্ত মানবজাতিকে আসন্নমৃত্যুর পথে লইয়া যাইতেছে, মনে হয় তাহাদের মস্তিষ্কে চেতনার সঞ্চার হইয়াছে। হয় ত-বা সেই কারণেও এই নববর্ষ হর্ষের বায়ুহিল্লোল আনিতে পারে।

যদি তাহা হয় তবে এই বাঙালী জাতির জীবন-সন্ধ্যা অপেক্ষাকৃত শান্তিতে শেষ হইতে পারে। যে পথে আমরা চলিতেছি নূতন জীবনের সঞ্চার তাহাতে যখন অসম্ভব তখন সে অন্তিম শান্তিসংবাদও সুসংবাদ।

সর্ব্বশেষে নববর্ষে মনের সকল গ্লানি নিবেদন করি তাঁহাকে যাঁহার নিকট কবিগুরু কাতর আবেদন করিয়াছিলেন—

"ছায়াভয় চকিত মূঢ় করহ পরিত্রাণ হে"।

জমিদারী উচ্ছেদ

জমিদারী উচ্ছেদের ঘোষণা সরকারী দপ্তর হইতে নিম্নরূপে দেওয়া হইয়াছে :

"১৩৬২ সালের ১লা বৈশাখ ভারতের রাজ্যসমূহের মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই বিরাট ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পন্ন করা হচ্ছে।

এই দিনটি উৎসবানুষ্ঠান হিসাবে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে উদ্‌যাপন করা হবে। রাজ্যের চৌদ্দটি জেলার সদরে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে এক একজন মন্ত্রী বা উপমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন এবং এতদুপলক্ষে প্রদত্ত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং ভূমি রাজস্বমন্ত্রী শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসুর বাণী পাঠ করা হবে। ভূমি রাজস্বমন্ত্রী শ্রীবসু মুর্শিদাবাদের নবাব মঞ্জিলে শাহী তখতে উপবেশন করে জমিদারী উচ্ছেদের ফরমান ঘোষণা করবেন।"

ঐ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যাহা বলিয়াছেন তাহার সারাংশ এইরূপ :

"১৩৬২ সালের ১লা বৈশাখ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকার কর্তৃক জমিদারী গ্রহণ উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এক বাণীতে বলিয়াছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে ১৩৬২ সালের ১লা বৈশাখ স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে। মধ্যস্বত্ব বা জমিদারী বিলোপ এই রাজ্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এমন এক আমূল পরিবর্তনের সূচনা করিয়াছে, যাহার উপযুক্ত আখ্যা হইল শান্তিপূর্ণ বিপ্লব। আজ হইতে প্রায় ১৬২ বৎসর পূর্ব্বে তৎকালীন ইংরেজ শাসক লর্ড কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করিয়াছিলেন পল্লীপ্রাণ বাংলা দেশের ভূমি ব্যবস্থা এবং তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে বিদেশী শাসকের পছন্দমত ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে। পরাধীনতার এই শেষ নিদর্শন আজ অবলুপ্ত হইবে নূতন যুগধর্মের বিবর্তনে।

"কংগ্রেস বিবর্তনে বিশ্বাসী, বিপ্লবে নহে। বিপ্লব ঐতিহ্যকে অবহেলা করিয়া নূতনের সন্ধানে মানুষকে লইয়া যায় অনিশ্চিতের পথে। কিন্তু বিবর্তন বা অভ্যুদয় সমাজ ব্যবস্থায় আনে নিশ্চিত পূর্ব্ব পরিকল্পিত পরিবর্তন। জমিদারী বিলোপে কংগ্রেস প্রতিশ্রুত থাকিলেও এইজন্যই স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া আমরা এ বিষয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া আইন প্রণয়নে ব্রতী হই নাই। বিগত সাত বৎসরে একদিকে আমরা যেমন অর্জ্জন করিয়াছি ভূমিনীতি সংস্কার সম্বন্ধে বিস্তৃত অভিজ্ঞতা, অন্যদিকে অনায়াসলব্ধ আয় হইতে বঞ্চিত জমিদাররাও পাইয়াছেন যুগধর্মের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইবার উপযুক্ত সুযোগ।

"জমিদারী বিলোপ আমাদের উদ্দেশ্য নয়, উপায় মাত্র। পশ্চিমবঙ্গের মৃতপ্রায় পল্লীসমাজকে পুনরুজ্জীবিত করিতে এবং কৃষি-উন্নয়ন কার্য্যসূচীকে ফলপ্রসূ করিতে রাজ্য সরকার ও প্রকৃত চাষীর মধ্যে কোন মধ্যবর্ত্তী স্বত্বের অস্তিত্ব বাঞ্ছনীয় নহে। আজ হইতে 'লাঙ্গল যার, জমি তার'। মধ্যস্বত্ব-ভোগীরাও আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোরে অঙ্গ। ভূমি হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইলে তাঁহাদের জীবিকার সমস্যা নূতন করিয়া দেখা দিবে। তাই তাঁহাদের স্বাধিকারে রাখিতে দেওয়া হইয়াছে বসতবাটির জমি, ১৫ একর পর্য্যন্ত খাস অকৃষি জমি, ২৫ একর পর্য্যন্ত খাস কৃষি জমি, মৎস্য চাষের জন্য পুষ্করিণী, চা-বাগানের জমি ইত্যাদি। জমির যাঁহারা মালিক, তাঁহাদিগকে আমরা নির্দ্দিষ্ট হারে ক্ষতিপূরণ দিতেছি। এই অর্থ দ্বারা তাঁহারা শিল্প-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। সরকার জমিদারী গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১২ লক্ষ বর্গাদার ও ভূমিহীন চাষী পরিবারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি সুপরিকল্পিত নীতি গ্রহণ করার প্রয়োজন হইবে। পৃথক পৃথক ভাবে ইহাদের প্রয়োজন মিটাইবার মত জমি আমাদের নাই। সেইজন্য ভূমি ব্যবস্থা সংস্কারের প্রস্তাবিত আইনে আমরা সমবায় কৃষি ও জোতের একত্রীকরণ সম্পর্কে ব্যবস্থা করিয়াছি।"

নূতন উদ্বাস্তু আগমন

পাকিস্থানের ভিতর নূতন ভাবে কোনও বিপদের আশঙ্কায় সেখানের হিন্দু অস্থির হইয়া পুনর্ব্বার দলে দলে এদিকে আসিতেছে। তাহাদের আসার ফলে ভারতের, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের, সামাজিক অবস্থায় নূতন বিপর্য্যয়ের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। সুতরাং উহার প্রতিকারে পাকিস্থান সরকারকে এ বিষয়ে অবহিত করাইবার চেষ্টা করা হয়। তাহার ফলে এতাবৎ যাহা হইয়াছে তাহা নিম্নের সংবাদে আছে :

"করাচী, ৮ই এপ্রিল—ভারতীয় পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না অদ্য এখানে পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলির সহিত এক ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা করিয়াছেন। জানা গিয়াছে যে, তাঁহারা পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে হিন্দুদের ব্যাপকভাবে বাস্তুত্যাগ করিয়া ভারত আগমনের ফলে যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করেন।

পরে শ্রীখান্না পাকিস্থানের উদ্বাস্তু ও পুনর্ব্বাসন রাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দ্দার আমির আজম খাঁয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা উদ্বাস্তু সম্পত্তি সম্পর্কিত অমীমাংসিত বিষয়সমূহ সম্পর্কেও আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

সর্দ্দার আমির আজম খাঁ শ্রীখান্নার সহিত আলোচনার জন্য তাঁহার পাকিস্থান পঞ্জাব ভ্রমণ অসমাপ্ত রাখিয়া আসিয়াছেন।

জানা গিয়াছে যে, পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রীর সহিত আলোচনায় শ্রীখান্না তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে, প্রতি মাসে প্রায় ২৫ হাজার লোকের আগমনের ফলে ভারতের পক্ষে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে এবং ক্রমাগত উদ্বাস্তু সমাগমের ফলে ভারতে গুরুতর অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে।

মিঃ মহম্মদ আলি শ্রীখান্নাকে এই সমস্যার সমাধানে পাকিস্থানের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

আরও প্রকাশ যে, শ্রীপান্না মিঃ মহম্মদ আলির সহিত আলোচনায় উদ্বাস্তুদের অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে দুই দেশের মধ্যে অমীমাংসিত বিষয়সমূহেরও উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ভারত ও পাকিস্থান উভয় দেশে হাজার হাজার উদ্বাস্তুর অযথা কষ্ট ও আর্থিক দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।"

পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে দলে দলে হিন্দুদের উদ্বাস্তু হইয়া ভারতে আগমনের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তৎসম্পর্কে আলোচনার্থ গত ১২ই এপ্রিল কলিকাতায় রাজ্য সরকারের সেক্রেটারিয়েটে ভারত ও পাকিস্থানের সংখ্যালঘু মন্ত্রীদের এক সম্মেলন হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষে অনুষ্ঠিত ঐ সম্মেলনে ভারতের সংখ্যালঘু মন্ত্রী শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস, পাকিস্থানের সংখ্যালঘু মন্ত্রী গিয়াসুদ্দীন পাঠান, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের সহকারী মন্ত্রী শ্রীঅনিলকুমার চন্দ যোগদান করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী তাঁহার ভাষণে যাহা বলেন তাহার সারাংশ এইরূপ :

"শুক্রবার সকালে কলিকাতা—খিদিরপুরে নবম বার্ষিক বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের তিন দিবসব্যাপী অধিবেশনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারগুলিকে একত্রিত হইয়া একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন জানান। তিনি বলেন, এইরূপ হইলে কেন্দ্রীয় সংস্থার সহিত পরামর্শক্রমে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে গ্রন্থাগারগুলিতে সাহাযদানের ব্যাপারে সুবিধা হইতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, গ্রন্থাগারকে শুধু মৃতের আগার হইয়া থাকিলে চলিবে না। জাতীয় জীবন গঠনই গ্রন্থাগারের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। গ্রন্থাগার যাহাতে মানুষের মনকে উচ্চ পর্য্যায়ে লইয়া যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

গ্রন্থাগার সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়িত্ব যাহা তাহার স্বীকৃতি উক্ত ভাষণে আমরা পাই নাই। ডাঃ রায় যাহা বলিয়াছেন তাহা খুবই ঠিক, কিন্তু আজ গ্রন্থাগার মৃতের আগার নয়। গ্রন্থাগারে কি প্রকার বইয়ের চাহিদা বেশী সে সম্বন্ধে ডাঃ রায় বোধ হয় সঠিক অবগত নহেন, নহিলে তিনি "মৃতের আগারে"র সহিত "মাদকের আগার" শব্দও যোগ করিতেন। বাঙালী পাঠক-পাঠিকার অবস্থা এখন নিতান্তই অপরূপ।

আসামে বঙ্গাল খেদা

আসামে যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে আসাম সরকারের মনস্তত্ত্বের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ ঘটনা যে ঘটিবে তাহার আভাস বহু পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছিল। আসাম সরকারের বাঙালীর উপর বিদ্বেষ ও অতি ঘৃণ্য মনোভাব নানাপ্রকারেই অভিব্যক্ত হয়। তাহারই প্রতিক্রিয়ায় কয়েকটি কংগ্রেসবাদী দুর্বৃত্ত গুণ্ডাদের উস্কানি দিয়া অমানুষিক অত্যাচারে বাঙালীকে বিতাড়িত করার নির্দ্দেশ দেয়। বলা বাহুল্য, পুলিস নিষ্ক্রিয় ছিল, কেননা আসাম, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি স্থলে পুলিস সর্ব্বত্রই সেই পুরাতন পুলিসই আছে, যাহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য অধিকারীবর্গের মনস্তুষ্টিসাধন।

আসাম সরকার কিছু প্রতিকার করিবেন না ইহাও ত জানাই ছিল। ভারতের তিন-চারটি প্রদেশে শাসনতন্ত্র অতি হীন মনোবৃত্তিযুক্ত অধিকারীবর্গের হস্তে আছে, তাহার মধ্যে আসাম অন্যতম। কিন্তু আমরা আশ্চর্য্য হই যে, বাংলার কংগ্রেস ও অন্য দলের তথাকথিত নেতৃবর্গ এবং বাংলা সরকার কি এ বিষয়ে অবহিত হওয়ার কোনও কারণ দেখেন নাই।

সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষোভ ও গ্লানির কারণ রহিয়াছে বাঙালীর নিষ্ক্রিয়তায়। সর্দ্দার প্যাটেল যে বলিয়াছিলেন "বাঙালী শুধু কাঁদিতেই জানে", এবং তাহারও বহুপূর্ব্বে লর্ড মেকলে যে বাংলার পরিচয় দিয়াছিলেন "Where Land is Water and Men are Women", গোয়ালপাড়া ইত্যাদি অঞ্চলে কি তাহারই এক নূতন প্রমাণ মিলিল?

অথচ যোগ্য নেতৃত্ব পাইলে বাঙালী যে পৌরুষের পূর্ণ পরিচয় দিতে পারে তাহার সাক্ষ্য ত ইতিহাস দেয়। অতীত গৌরবের কথা আনিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া মূর্খের কাজ, সুতরাং এই কলঙ্কময় বিবরণে তাহার অবতারণা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই সেদিন, ১৯৪৬ সনের লীগ সরকারের অনুষ্ঠিত "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" কালে, কলিকাতা হইতে হিন্দু বিতাড়নে যে সশস্ত্র শক্তি প্রযুক্ত হইয়াছিল, যাহাতে ৯২৫ জন অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র-সজ্জিত বেলুচ সৈন্য নিযুক্ত ও ১০,০০০ গুণ্ডা অংশ লয়, তাহাও ত ২,০০০ বাঙালী যুবক প্রতিরোধ করে। সে শক্তি ও সাহস আজ গেল কোথায়? আমাদের অযোগ্য অধিকারী ও নেতৃবর্গই তাহা জানেন।

গত ৫ই এপ্রিল কলিকাতার এক সাংবাদিক সম্মেলনে ধুবড়ি নাগরিক সমিতির সম্পাদক শ্রীরমণীকান্ত বসু অভিযোগ করেন যে, রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের আসাম পরিদর্শনের প্রাক্কালে গোয়ালপাড়া জেলার উপর পশ্চিমবঙ্গের দাবির প্রতিরোধে সুপরিকল্পিত আন্দোলন পরিচালিত হইতেছে।

ধুবড়ীর বাঙালী বাসিন্দাদের উপর আক্রমণাত্মক অভিযানের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ দিয়া শ্রীবসু আরও অভিযোগ করেন যে, উপরোক্ত প্রতিরোধ 'আন্দোলন স্থানীয় একদল কংগ্রেসী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে' এবং উহাতে এইরূপ জিগীর তোলা হইয়াছে যে, গোয়ালপাড়ার মুষ্টিমেয় বাঙালী অধিবাসিগণ জেলায় বসবাস করিয়া ঐ জেলাকে আসাম রাজ্যের বাহিরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। তিনি দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, এ আন্দোলন 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলন ছাড়া আর কিছুই নহে।

শ্রীবসু এই সম্পর্কে পুলিসের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং বলেন যে, পুলিস দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বিরত থাকিতেছে এবং নিপীড়িত ব্যক্তিদের রক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন

রহিয়াছে। উপরোক্ত আন্দোলনের সহিত জেলা কংগ্রেসের কোন কোন নেতা জড়িত থাকায় ধুবড়ীর সাম্প্রতিক ঘটনা সম্পর্কে পুলিস ও অপরাপর জেলা কর্তৃপক্ষ নিস্ক্রিয় থাকেন বলিয়া তিনি মনে করেন।

আসামে বাঙালীর উপর আক্রমণ এবং সে বিষয়ে অভিযোগ ও প্রতিরোধ সম্পর্কে দৈনিক সংবাদপত্রে এতাবৎ যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রধান সংবাদগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল :

"কোচবিহার, ৬ই এপ্রিল—আসামের ধুবড়ী, বড়পেটা এবং গোয়ালপাড়া জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে ভীত সন্ত্রস্ত বাঙালীরা আলিপুর দুয়ার এবং কোচবিহারে জীবনরক্ষার্থ আশ্রয় লইতেছে।

কোচবিহার কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে প্রেরিত তারবার্তায় বলা হইয়াছে যে, আপত্তিকর শ্লোগান তুলিয়া বাঙালীদের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ সৃষ্টি করা হইতেছে। অহম, মুসলমান ও পণ্ডজাতীয় গুণ্ডাপ্রকৃতির লোকদের কাজে লাগান হইয়াছে এবং তাহারা হিংসাত্মক আচরণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ এমনকি পাশবিক অত্যাচার পর্য্যন্ত চালাইতেছে। পুলিস নিস্ক্রিয় রহিয়াছে।

বুধবার ৬ই এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এক প্রশ্নের উত্তরে জানান যে, ধুবড়ী এলাকার প্রকাশিত ঘটনা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আসামের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট পত্র লিখিয়াছেন এবং এতৎসম্পর্কে তথ্য জানিতে চাহিতেছেন। ইতিমধ্যে অনেকেই তাঁহার নিকট প্রকৃত ঘটনায় বিবরণ দিতে চাহিয়াছেন ; পাওয়া গেলে তিনি ঐ সব বিবরণ ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বিবেচনার্থ পাঠাইবেন।

১২ এপ্রিল—আনন্দবাজার পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া এখানে আসিয়া লিখিয়াছেন : 'গোয়ালপাড়ায় শোচনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। কয়েকটি গ্রাম পরিদর্শন করিতে যাইয়া যে কল্পনাতীত ভয়াবহ দৃশ্য দেখিলাম, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। আসামের ইতিহাসে এরূপ ব্যাপক হাঙ্গামার নজীর অতীব বিরল। গোয়ালপাড়ার সমাজবিরোধী লোকেরা আসামের সুনামে যে কলঙ্ক ক্ষেপণ করিয়াছে, তাহা মোচন করিতে বহু বৎসর লাগিবে। সপ্তাহকাল ধরিয়া গোয়ালপাড়ায় যে তাণ্ডব চলিয়াছিল, তাহা আসামের ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে কলঙ্কিত করিয়াছে। এই হাঙ্গামার পূর্ণ বিবরণ পাইতে সময় লাগিবে। সর্ব্বত্র গুণ্ডাদের অবাধ প্রতিপত্তি দেখা দিয়াছিল, জেলার স্বাভাবিক শাসনব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। উপদ্রুত অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রাথমিক বিবরণে প্রকাশ, হাঙ্গামার সময় ন্যূনাধিক ৭০টি গ্রামে উপদ্রবের ফলে প্রায় তিন শত গৃহ লুণ্ঠিত হইয়াছে ; প্রায় চার হাজার লোক গৃহত্যাগ করিয়া শিবিরে কিংবা রেল-কলোনীতে আশ্রয় লইয়াছে।

'দেশ-খণ্ডনের পূর্ব্বে যে সব মুসলিম আন্দোলনকারী কুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহারাই গোয়ালপাড়ার হাঙ্গামায় প্রধান অংশ গ্রহণ করে। হাঙ্গামার ব্যাপ্তি ও কারণ অনুসন্ধানের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করা সরকারের উচিত—ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এই দাবি আজ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।'

শিলং, ১২ই এপ্রিল—অদ্য আসাম সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, গোয়ালাপাড়া জেলায় পুলিশকে সাহায্য করার জন্য সৈন্যবাহিনীকে আহ্বান করা হইয়াছে। গত সপ্তাহে সেখানে বাঙালীবিরোধী হাঙ্গামা হয়।

ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে যে, গ্রামাঞ্চলে দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে পুলিসের ব্যাপক তৎপরতা সুরু হইয়াছে। গত ৮ই এপ্রিল বঙ্গাইগাঁও-এ নয় জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ৮ই ও ৯ই এপ্রিল সিদলী ও বিজনী থানার অন্তর্গত গ্রামাঞ্চলে ২৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গৌহাটী, ১৩ই এপ্রিল—আসাম সরকারের চীফ সেক্রেটারী শ্রী এস. কে. দত্তের নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, পুলিস বাহিনীকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে গোয়ালপাড়া জেলার উপদ্রুত অঞ্চলে যাইবার জন্য গতকল্য সৈন্য দলকে আদেশ দেওয়া হইলেও এখনও তাহারা সে সব স্থানে যায় নাই। শ্রীদত্ত পি. টি. আই-এর প্রতিনিধিকে বলেন যে, আজ বেলা ২-৪৫ মিনিট পর্য্যন্ত তিনি সৈন্যবাহিনীর উপদ্রুত অঞ্চলে যাওয়ার সংবাদ পান নাই। তিনি আরও বলেন যে, বর্ত্তমানে গোয়ালপাড়ায় অবস্থানকারী আসামের পুলিস ইন্সপেক্টর-জেনারেল সৈন্যবাহিনীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন।

শিলং হইতে প্রাপ্ত ১২ই এপ্রিল তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, বাঙালী অধিবাসীদের মনে আস্থার ভাব ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত সৈন্যদল গোয়ালপাড়া জেলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছে।

সংবাদে প্রকাশ যে, ১লা এপ্রিল হইতে পশ্চিমবঙ্গে গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্ভুক্তির দাবির বিরুদ্ধে নয়দিন আন্দোলনের পর আতঙ্কগ্রস্ত বাঙালী অধিবাসীরা গৃহত্যাগ করিয়া জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারের সংলগ্ন জেলাগুলিতে চলিয়া যাইতেছে। মে মাসের প্রথম দিকে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের এই অঞ্চল পরিদর্শনের কথা আছে।

গোয়ালপাড়া জেলার সাম্প্রতিক হাঙ্গামার জন্য আসাম সরকারকে দায়ী করিয়া পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ বুধবার এক বিবৃতি দিয়াছেন।

গত কয়েক বৎসর যাবৎ আসাম সরকারের কার্য্যকলাপের ফলেই আসামে বাংলাভাষী অধিবাসীদের বিরুদ্ধে সেখানকার এক শ্রেণীর অধিবাসীদের মনে বিদ্বেষভাব জাগ্রত হইয়াছে, আসাম সরকারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিয়া তিনি কংগ্রেস সভাপতিকে এই বিষয়ে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

তিনি দাবি করিয়াছেন যে, অপমান, শারীরিক নির্যাতন ও নারীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের সকল ঘটনা সম্পর্কে পূর্ণ তদন্ত করিয়া অপরাধীর শাস্তিবিধান করিতে হইবে ও যে সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে।"

আসাম সরকারের বৈষম্যনীতি

আসাম রাজ্য বিধানসভায় বাজেট আলোচনার সময় কাছাড় জেলায় সরকারী প্রচার বিভাগের নীতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীরণেন্দ্রমোহন দাস (প্রজাসমাজতন্ত্রী) অভিযোগ করিয়া বলেন যে, কাছাড় জেলায় প্রচার দপ্তর কর্তৃক অসমীয়া ভাষায় কাগজপত্র পাঠান হয়—যদিও কাছাড় বঙ্গভাষাভাষী এলাকা।

"শ্রীদাস এক ছাঁটাই প্রস্তাব আনয়ন করিয়া বলেন যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সঙ্গে প্রচার বিভাগের কাজ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বিভাগের দ্বারা কাছাড়ের কোন কল্যাণ সাধিত হয় নাই। তিনি বলেন যে কাছাড়ের দশ লক্ষ বঙ্গভাষাভাষীদের জন্য অসমীয়া ভাষায় কাগজপত্রাদি পাঠান হইতেছে। তাঁহার মতে তাহাতে অর্থের অপব্যয়ই হইতেছে।"

কংগ্রেসী সদস্য শ্রীলালমণি ফুকন শ্রীযুক্ত দাসের ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া বলেন যে কাছাড়ের লোক কখনও বাঙালী ছিলেন না, তাঁহারা সকলেই অসমীয়া ছিলেন। তাঁহার অভিমতে কাছাড় চিরকাল আসামেরই অঙ্গ ছিল—শ্রীহট্ট ও অন্যান্য স্থান হইতে বহিরাগত বাঙালীদের দ্বারা কাছাড়ের অধিবাসীদিগের উপর বাংলা ভাষা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

বিতর্কের উত্তরদান প্রসঙ্গে প্রচারমন্ত্রী শ্রীঅমিয়কুমার দাস বলেন যে, আসাম সরকার আসামে বসবাসকারী কোন অনিচ্ছুক দলের উপর অসমীয়া ভাষা জোর করিয়া চাপাইয়া দিবার পক্ষপাতী নহেন। তিনি আরও বলেন যে কাছাড় জেলায় সাধারণতঃ বাংলা ভাষায়ই প্রচার দপ্তর কর্তৃক কাগজপত্র প্রেরিত হইতেছে।

"যুগশক্তি" পত্রিকায় ১১ই চৈত্র তারিখে প্রকাশিত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, 'ধুবড়ীর গোসাই গাঁও ও বিজনী থানা এলাকা হইতে বাঙালীদের অন্যত্র চলিয়া যাওয়া সম্পর্কে বিরোধী পক্ষের সদস্য শ্রীরণেন্দ্রমোহন দাস এক জরুরী প্রশ্ন উত্থাপন করিলে মুখ্যমন্ত্রী কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া দেখান যে, স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের আন্দোলন উহার পশ্চাতে ছিল।

"রাজ্য বিধানসভার সদস্যগণ কর্তৃক 'বংগাল খেদা'র ন্যায় আপত্তিকর কথা ব্যবহারের তিনি তীব্র নিন্দা করেন।

"স্থানীয় অধিবাসিগণ কর্তৃক 'বংগাল খেদা' আন্দোলনের ফলে ধুবড়ী হইতে বাঙালীরা ব্যাপকভাবে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলে মুখ্যমন্ত্রী উত্তরে 'না' বলেন। এই সম্পর্কে গত ৬ই মার্চ তারিখে গোয়ালপাড়ার ডেপুটী কমিশনারের নিকট লিখিত এক পত্রের নকল মুখ্যমন্ত্রী পাইয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উত্তরে 'না' বলেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন যে, বর্তমান বৎসরের পঞ্জিকায় ১১ই মার্চ রাত্রে আসামে গুরুতর ঘটনা ঘটিবে বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে। কলিকাতার কোন দৈনিক পত্রিকায় ইহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে পঞ্জিকায় বিশ্বাসী লোকেরা তাহাদের সুবিধামত উহার ব্যাখ্যা করিয়া লয়।

"মুখ্যমন্ত্রী অতঃপর বলেন, গবর্ণমেণ্ট এই মর্মে এক টেলিগ্রাম পাইয়াছিলেন যে, ১১ই মার্চ রাত্রে গোয়ালপাড়ায় মুসলমানদের উপর আক্রমণের সম্ভাবনা আছে বলিয়া গুজব রটিয়াছে।

"ধুবড়ীর ডেপুটি কমিশনারকে যাহাতে কোন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা না বাধে তাহার জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। যে সকল স্থানে ঐরূপ গুজব রটিয়াছিল, ডেপুটি কমিশনার সেই সকল অঞ্চল পরিদর্শন করেন এবং সতর্কতামূলক সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। এবং অবস্থা স্বাভাবিক দেখা যায়। তিনি বলেন, পরে আর একটি টেলিগ্রাম পাওয়া যায়। তাহাতে জানান হইয়াছিল যে, বহু বাঙালী ও মুসলমান আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ আতঙ্কের কারণ জানা যায় নাই। স্থানীয় অফিসারগণ সর্ব্বত্র সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং এ পর্য্যন্ত কোন ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বর্ত্তমানে সর্ব্বত্রই অবস্থা স্বাভাবিক।

"মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, তাঁহার মনে হয়, রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের আসন্ন পরিদর্শন উপলক্ষে একশ্রেণীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট লোক এইরূপ প্রচারকার্য্য চালাইতেছে। কোন একটি নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায় যে তাহাদের আক্রমণের বিষয়বস্তু তাহা তাঁহার মনে হয় না।

"শ্রীরণেন্দ্রমোহন দাস—গোয়ালপাড়ার ডেপুটি কমিশনারের নিকট লিখিত একটি পত্রের নকল আমি পাইয়াছি। আশা করি মুখ্যমন্ত্রীও একটি নকল পাইয়াছেন এবং আমাকে অনুমতি দেওয়া হইলে আমি উহা পাঠ করিব।

"শ্রীমেধী—আমি পাই নাই।"

আসাম রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে শ্রীরণেন্দ্রমোহন দাসের উপরি-উক্ত বক্তৃতা এবং তাহার উত্তরে সরকারী বিবৃতির আলোচনা করিয়া ১১ই চৈত্র সাপ্তাহিক "যুগশক্তি" এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন যে, প্রচারমন্ত্রী শ্রীঅমিয়কুমার দাস মহাশয় মাত্র অল্পদিন পূর্ব্বে প্রচারদপ্তরের ভার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়। বলিয়াছেন যে কাছাড় জেলায় সাধারণতঃ বাংলা ভাষায়ই সরকারী প্রচারপত্রাদি প্রেরিত হইয়া থাকে ; কারণ উহার বিপরীতই বাস্তব সত্য।

পত্রিকাটি লিখিতেছেন,"প্রচারমন্ত্রী মহোদয় প্রচারদপ্তরে একটু অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবেন যে প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে বাংলাভাষায় মাত্র একখানা প্রেসনোট প্রকাশিত হইয়াছিল এবং এই জন্য সঙ্গে সঙ্গেই আমরা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদও জানাইয়াছিলাম। কিন্তু ইহা ছাড়া আসাম সরকারের আর কোন প্রচারপত্র আমাদের চোখে পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না।"

কাছাড়ের অধিবাসীবৃন্দ সকলেই অসমীয়া বলিয়া শ্রীলালমণি

ফুকন যে উক্তি করিয়াছিলেন "তাহা সত্যের অপলাপ মাত্র। ১৯৫১ সালের আদমসুমারীতে সমগ্র আসামে একজনও বাঙালী ইলেকশন অফিসার নিয়োগ করা হয় নাই এবং এই আদমসুমারীর তথ্যাদি আসাম সরকার ও অসমীয়াভাষী নেতৃবৃন্দ অভ্রান্ত বলিয়া দাবী করেন। কাছাড় জেলায় অসমীয়াভাষী ইলেকশন অফিসার-দের পরিচালিত ১৯৫১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায় কাছাড়ের মোট জনসংখ্যা ১১,১৫,৮৬৫ জনের মধ্যে বাঙালী ৮,৬০,৭৭২ এবং অসমীয়া মাত্র ৩,৪৬২ জন। অবশিষ্টাংশ মণিপুরী, হিন্দুস্থানী ও উপজাতীয় প্রভৃতি। শ্রীফুকন অনুগ্রহপূর্ব্বক কাছারবাসীকে জানাইবেন কি শিলচর, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জের কে কে অসম-সাহিত্যসভায় বাংলাভাষা ত্যাগ করিয়া অসমীয়া গ্রহণের দাবী করিয়াছিলেন ?"

ইতিপূর্ব্বে বাজেটপ্রসঙ্গে অপর এক বক্তৃতায় শ্রীরণেন্দ্রমোহন দাস কাছাড় জেলার অধিবাসীদের প্রতি সরকারী বৈষম্যনীতির কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেন। ভারতশাসনতন্ত্রের অনেক মৌলিক অধিকার হইতে রাজ্য-সরকার কাছাড়ের অধিবাসীদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন। "সর্ব্বত্রই বৈষম্যমূলক ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে। সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ, জমি বন্দোবস্ত দেওয়া, ছাত্রদের বৃত্তি-দান, সরকারী প্রতিষ্ঠানে আসনদান প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৈষম্য লক্ষিত হয়। কাছাড়ে বরাক নদীর পুলের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরি-কল্পনায় ২২ লক্ষ হইতে ২৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়—কিন্তু পরি-কল্পনার চারি বৎসর চলিয়া যাওয়া সত্ত্বেও প্রাথমিক কাজই হয় নাই। অর্থমন্ত্রী এখন বলিতেছেন যে, এই কাজ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরি-কল্পনায় নেওয়া হইবে। যখন এই টাকা মঞ্জুর হইয়াছিল তখন আমি পূর্তমন্ত্রীর সাক্ষাতেই তদানীন্তন চীফ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীগুণ দত্তকে বলিয়াছিলাম যে, যদি সময়ে এই কাজ শেষ করিতে পারেন তবে সূর্য্য পশ্চিম দিকে উঠিবে (হাস্য)। তাহা শেষ হইতে দশ-পনরো বৎসর লাগিবে—কারণ তাহা কাছাড়ে। কাছাড় জেলায় ইহাই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একমাত্র বৃহৎ বরাদ্দ।"

শ্রীদাস আরও বলেন, "তৃতীয়মান শ্রেণী উঠিয়া যাওয়ায় কাছাড় জেলার এডেড (সাহায্যপ্রাপ্ত) হাইস্কুলসমূহে সরকারী সাহায্য হইতে ২৫৲ টাকা কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমাদের ধারণা ছিল সমগ্র আসামের জন্যই এই ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু শেষে জানা যায় যে, ইহা শুধু কাছাড় জেলায়ই হইতেছে। তাহা কি বৈষম্যমূলক নহে ?"

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত বাঙালী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ব্যাপারে আসাম সরকারের চরম অবহেলার উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত দাস বলেন, কিছুদিন পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন বিভাগীয় সেক্রেটারী শ্রীচন্দ্র করিমগঞ্জে বলেন যে, কয়েকটি পরিকল্পনা রাজ্য ও কেন্দ্র-সরকার যুক্তভাবে অর্থদ্বারা পরিচালনা করেন। এই ব্যয়ের অনু-পাত ৪০ : ৬০ অথবা ৫০ : ৫০। "কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে আসাম সরকার এই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিতেছেন না। উদ্বাস্তুদের প্রতি এইরূপ অবহেলা ভারতের আর কোন রাজ্যে দেখা যায় না।..."

তিনি আরও বলেন, দেখা যাইতেছে যে নাগারা রাজ্য-সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতেছেন না; খাসিয়ারাও স্বতন্ত্র রাজ্য চাহিতেছেন। লুসাই, গারোরাও তাহা চাহিতেছেন। কাছাড়ের জনসাধারণও স্বতন্ত্র রাজ্য চাহেন। "কেন? তাহারা কি সকলেই পাগল হইয়া গিয়াছে ?"—শ্রীদাস প্রশ্ন করেন।

আসাম সরকার ও শ্রীহট্টের গণভোট-প্রসঙ্গ

ভারত বিভাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারত বা পাকিস্থানে যোগদান সম্পর্কে শ্রীহট্টের অধিবাসীদের এক গণভোট গৃহীত হয়। গণভোটের ফলাফলে শ্রীহট্ট জেলা পাকিস্থানের সহিত যুক্ত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীহট্টের গণভোটের বৈধতা সম্পর্কে সেই সময় হইতেই নানারূপ প্রশ্ন উঠিয়াছে। কিন্তু গণভোট পরিচালক আসাম সরকারের উদাসীনতায় সেই সকল প্রতিবাদ বিশেষ ফলপ্রসূ হইতে পারে নাই। এই সম্পর্কে আলোচনায় সকল সময়েই আসাম সরকারের বিশেষ অনিচ্ছা ও ঔদাসীন্য পরিলক্ষিত হইয়াছে।

সম্প্রতি "আনন্দবাজার পত্রিকা"য় শ্রীহট্টের গণভোট সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে যে সকল মন্তব্য করা হয় তাহার উত্তরে আসাম সরকারের প্রচার অধিকর্ত্তা যে বিবৃতি দেন সেই সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে "যুগশক্তি" লিখিতেছেন যে, শ্রীহট্টের গণভোট বৈধ হইয়াছে এমন সরাসরি দাবি আসাম সরকারের প্রচার অধিকর্ত্তা করিতে পারেন নাই।

"যুগশক্তি" লিখিতেছেন, "বৈধতা ও অবৈধতার দাবি মধ্যপথে অমীমাংসিত রাখিয়া দিয়া আসাম সরকারের প্রচার অধিকর্ত্তা শ্রীহট্টের গণভোট সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহা গণভোটের সিদ্ধান্তে বিক্ষুব্ধ নর-নারীকে প্রবোধ দেওয়ার প্রয়াস মাত্র।"

শ্রীহট্ট মুসলমান প্রধান জেলা, অতএব গণভোটের সিদ্ধান্ত পাকিস্থানের প্রতিকূল হইবার সম্ভাবনা ছিল না বলিয়া সরকারী বিবৃতিতে যে যুক্তি দেখান হইয়াছে তাহার অসারতার উল্লেখ করিয়া সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে যে, সেই অবস্থায় গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থার কি-ই বা প্রয়োজন ছিল? মুসলমানপ্রধান জেলা হইলেও জেলার সিদ্ধান্ত ভারতের অনুকূল হইতে পারে বলিয়াই ত গণভোট গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়। সেই অবস্থায় গণ-ভোট সর্ব্বপ্রকারে নিখুঁত, নিরপেক্ষ এবং সন্দেহাতীত হওয়া আবশ্যক ছিল। "কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই; অনিয়ম এবং অনাচার ঘটিয়াছে, একথা আসাম সরকারের প্রচার অধিকর্ত্তার বিবৃতিতেই পরোক্ষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে।"

"আসাম সরকারের ছাপাখানায় গণভোটের ব্যালটপেপার মুদ্রিত হইয়াছিল। বেআইনী ব্যালটপেপার মুদ্রিত ও বিতরিত না হইলে কোন কোন কেন্দ্রে ভোটার অপেক্ষা প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা

অধিক হইতে পারিত না, ইহা অতি পরিষ্কার। এই সম্পর্কে যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার সত্যাসত্যের নির্দ্ধারণের উপযোগী দলিল দস্তাবেজ আসাম সরকারেরই হেফাজতে রহিয়াছে।"

শ্রীহট্টের গণভোটে ভারতরাষ্ট্রের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক হইতে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। "সর্ব্বোপরি বর্ত্তমান ভারতীয় এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার বিপুল বিঘ্ন দেখা দিয়াছে। এই সমস্ত ক্ষতি ও অসুবিধার প্রতিকার নির্ভর করিতেছে শ্রীহট্টের গণ-ভোটের সিদ্ধান্ত বাতিলের উপর। একমাত্র অবৈধতার জন্যই গণ-ভোট এখনও অসিদ্ধ হইতে পারে।"

সরকারী প্রেসনোটের প্রতিবাদ করিয়া কাছাড় রাজ্য পুনর্গঠন কমিটির পক্ষ হইতে এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে শ্রীহট্ট জেলা হস্তচ্যুত হওয়ায় সরকার "প্রচুর কুম্ভীরাশ্রু মোচন" করিয়াছেন, "কিন্তু প্রেসনোট এই বিষয়গুলির প্রতি নীরব কেন? যথা: (১) আসামের সরকারী প্রেসে সত্যসত্যই জাল ব্যালটপেপার ছাপা হইয়াছিল কিনা এবং ঐগুলি শ্রীহট্ট গণভোটের সময় ব্যবহার করা হইয়াছিল কিনা? (২) গণভোটের সময় শ্রীহট্টকে রক্ষা করিবার জন্য আসাম সরকারের মনোভাব কি ছিল? প্রথম প্রশ্নের জবাবে আমরা প্রমাণ করিয়া দিতে পারি যে, কোন কোন ভোট-কেন্দ্রে ভোটপত্রের সংখ্যা ভোটদাতার তালিকাভুক্ত সংখ্যাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ আসামের তৎকালীন শাসনকর্ত্তা সর আকবর হায়দারী লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে জানাইয়াছিলেন কি যে তাঁহার মন্ত্রি-সভায় অসমীয়া-বাঙালী প্রশ্নে দ্বিমতের সৃষ্টি হইয়াছে এবং অসমীয়া প্রধানমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলুই মহাশয় শ্রীহট্টকে আসামের সহিত যুক্ত রাখিতে চান না? আমাদের পুস্তিকার পরিশিষ্ট (১)-এ এই উক্তির সমর্থনে প্রচুর প্রমাণ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। আসাম সরকার যদি 'আসাম ট্রিবিউন' অথবা অসম জাতীয় মহাসভার যে সকল উক্তি আমরা পরিশিষ্টে উল্লেখ করিয়াছি তাহার দায়িত্ব অস্বীকার করিতে চাহেন, তাহা হইলে আমরা জানিতে চাহি আসাম সরকার ঐ সকল দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তির কি প্রতিবাদ করিয়াছেন? অথবা বাংলাবিরোধী অভিযান ও বাঙালীদের বিরুদ্ধে ঐ সকল কাগজে যেভাবে ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচার করা হইয়াছে, যাহার ফলে গৌহাটীতে বাঙালীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা সংঘটিত করায় সাহায্য হয়, সেগুলির বিরুদ্ধে সরকার কি পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন? ইহা কি সত্য নহে যে, সরকার মহাসভাকে সাহায্য ও আসাম ট্রিবিউনকে শিল্প-ঋণ বাবদ ১৯৫৩ সনেও ৫৫০০০৲ টাকা দিয়াছেন? অসম সাহিত্য সভা পত্রিকার গত কার্ত্তিক সংখ্যায় (১৮৭৪ শকাব্দ ৩য় সংখ্যা) অসম জাতীয় মহাসভার সম্পাদক শ্রীঅম্বিকা-গিরি রায়চৌধুরীর তিন পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি কবিতায় (পৃঃ ১৩৮-৪১) ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ও আমাদের প্রধান-মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুকে নিন্দা করা হইয়াছে—কারণ এই জাতীয় সঙ্গীতে আসামের নাম উল্লেখ নাই। লেখক অতি তীব্র ভাষায় সমগ্র বাঙালী জাতি ও ভারতের অপরাপর অংশের অধিবাসী-দিগকে 'গো-মাংস ভক্ষণকারী' 'মোগলের দাস' ইত্যাকার ভাষায় বিভূষিত করিয়াছেন। উক্ত কবিতার ধুয়াতে 'ওঠ জাগো, আহত মস্তকে রক্তের ঢেউ তোল' বলিয়া অসমীয়া যুবক সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করার চেষ্টা করিয়াছেন। এ সকল কি সত্য নহে? আসাম সরকার এই সম্পর্কে কি করিয়াছেন? যদি কিছু না করিয়া থাকেন তবে আসাম সরকারের এই নিষ্ক্রিয়তা কি প্রমাণ করে না যে, সরকার তাহাদের নীতির ও মতবাদের পরিপোষক? অধিকন্তু শ্রীঅম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী কি সরকারী বৃত্তি পাইতেছেন না?"

ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রগতি

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রসার জাতীয় সমৃদ্ধির পরিচায়ক। অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যান্য শক্তিশালী জাতিগুলির সমকক্ষ হইবার আশা রাখে, কারণ তাহার ইস্পাত শিল্পের প্রগতি এই বিষয়ের সহায়ক হইবে। ভারতবর্ষে বৎসরে বর্ত্তমানে দশ বার লক্ষ টন ইস্পাত দ্রব্য তৈয়ার হয়, কিন্তু তাহার প্রয়োজন বৎসরে প্রায় পঁচিশ লক্ষ টন। রুরকেলায় প্রায় দশ লক্ষ টন ইস্পাত দ্রব্য প্রস্তুত হইবে। মধ্যপ্রদেশের ভিলহাইয়ে রাশিয়ান-দের সহযোগিতায় যে ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাতেও প্রায় দশ লক্ষ টন ইস্পাত দ্রব্য প্রস্তুত হইবে। রুরকেলার উৎপাদন ক্ষমতা পরে বিশ লক্ষ টনে বৃদ্ধি করা হইবে এবং ভিলহাই কারখানার উৎপাদন ক্ষমতাও পরে দ্বিগুণ হারে বর্দ্ধিত হইতে পারিবে।

আর একটি লৌহ প্রস্তুতি শিল্প-কারখানা এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইবে ব্রিটিশের সহযোগিতায়। এই উদ্দেশ্যে একটি ইস্পাত মিশন সম্প্রতি এদেশে আসিয়াছে। বাংলা দেশের দুর্গাপুরে এই কারখানাটি প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা আছে। ইহার প্রতিষ্ঠায় খরচ পড়িবে প্রায় পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকার মত। এই সকল আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি অনুসারে ভারতের লৌহশিল্প দ্রুত প্রসার লাভ করিবে এবং সেই অনুসারে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতীয় ইস্পাত শিল্পের বাৎসরিক উৎপাদন ষাট লক্ষ টনে দাঁড়াইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কলম্বো-প্ল্যান এবং জাতিপুঞ্জের সাহায্য পরিকল্পনায় ভারতবর্ষ শিল্প প্রসার ক্ষেত্রে উপকৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ গত দুই বৎসরে ভারতবর্ষ আন্তর্জ্জাতিক সাহায্য যথেষ্ট পরিমাণে পাইয়াছে। জার্ম্মানী, সোভিয়েট রাশিয়া এবং ব্রিটেনের সাহায্যে ভারতের লৌহশিল্পের বিরাট প্রগতি সাধিত হইবে। ভারতে উচ্চশ্রেণীর কাঁচা লোহ আছে এবং ইহার পরিমাণও প্রায় অফুরন্ত। বৃহৎশিল্প প্রতিষ্ঠা দ্বারা দেশের বেকার সমস্যার সমাধান বহুলাংশে হইবে।

ঘাটতি খরচার পরিমাণ

ভারতে ঘাটতি খরচার পরিমাণ সম্বন্ধে বহু অমূলক ধারণা

আছে এবং কর্তৃপক্ষও এ বিষয়ে সঠিক করিয়া কিছু বলেন না। গত বৎসর ভারতীয় অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছিলেন যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য অর্থের ঘাটতি পড়ায় প্রায় পাঁচ বা ছয় শত কোটি টাকার মত ঘাটতি খরচার পরিমাণ দাঁড়াইবে। কি পরিমাণ ঘাটতি খরচা হইতেছে তাহা রিজার্ভব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক হিসাব হইতে ধরিতে হয় এবং তাহাও খানিকটা আন্দাজের উপর। ভারতে নোট বাহির করার প্রথা এমন যে, মাসে যদি বিশ পঁচিশ কোটি টাকা অতিরিক্ত ভাবে সৃষ্টি করা হয় তাহা হইলে বুঝার উপায় নাই—কি খাতে এই টাকা সৃষ্টি হইতেছে।

ভারতে প্রতি একশত টাকার নোটের জন্য শতকরা ৪০ ভাগ সোনা কিংবা বিদেশী সরকারের কাগজ জমা রাখিতে হয় এবং বাকী ৬০ ভাগ ভারত সরকারের ঋণপত্রের বদলে বাহির করা হয়। এইরূপ ঋণপত্রকে বলা হয় "এড হক্" ট্রেজারী বিল এবং ইহা রিজার্ভব্যাঙ্কের সপক্ষে বাহির করা হয়। অতিরিক্ত নোট বাহির করার প্রয়োজন হইলে ভারত সরকার ঋণপত্র রিজার্ভব্যাঙ্ককে দেন এবং রিজার্ভব্যাঙ্ক তাহার জন্য প্রয়োজনীয় নোট ছাপান। ব্যাপারটি খুবই সোজা। যে চল্লিশ ভাগ সোনা কিংবা বিদেশী সরকারের কাগজ রাখিবার প্রয়োজন হয় তাহার জন্য ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের নিকট যে ষ্টার্লিং ব্যালান্স জমা আছে তাহা হইতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ষ্টার্লিং লওয়া হয়। অর্থাৎ সোনার পরিমাণ বাড়ানো হয় না, কিন্তু ষ্টার্লিং কাগজের পরিমাণ রিজার্ভব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কিং ডিপার্টমেণ্ট হইতে ইস্যু ডিপার্টমেণ্টে বদলী করিয়া দেওয়া হয়।

১৯৫৪ সনের ৩১শে ডিসেম্বর রিজার্ভব্যাঙ্কের ইস্যু ডিপার্টমেণ্টে ভারত সরকারের ঋণপত্রের পরিমাণ ছিল ৪১৭·৭৫ কোটি টাকার। এ বৎসর ১লা এপ্রিল ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৩৩·৭৫ কোটি টাকাতে। ইহা অনুমান করা যায় যে এই নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি ভারত সরকারের ঋণপত্রের বিরুদ্ধে করা হইয়াছে। ১৯৫৪-৫৫ সনে ১১৬ কোটি টাকার মত ঘাটতি খরচা করা হইয়াছে। ১৯৫৪-৫৫ সনের বাজেটে ঘাটতি খরচার পরিমাণ অনুমান করা হইয়াছিল ২৫০ কোটি টাকার মত। সংশোধিত বাজেটে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ২২০ কোটি টাকায় এবং প্রকৃত ঘাটতি খরচা হয় ১১৬ কোটি টাকার। ১৯৫৩-৫৪ সনের বাজেটে ১১০ কোটি টাকার মত ঘাটতি খরচা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মোটে ২০ কোটি টাকার মত ঘাটতি খরচা হইয়াছে। সুতরাং ১৯৫৩-৫৪ এবং ১৯৫৪-৫৫ সনে মোট ১৩৬ কোটি টাকার ঘাটতি খরচা করা হইয়াছে এবং প্রস্তাবিত অনুমান হইতে ২২০ কোটি টাকা কম নোট বাহির করা হইয়াছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসরে ঘাটতি খরচার পরিমান বৃদ্ধি পাইলেও ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোয় বিপর্যয় হইবার সম্ভাবনা কিছু নাই।

রাষ্ট্রীয় খরচের ধারা

রাষ্ট্রের রাজস্ব আদায় যেমন একটি বৃহৎ সমস্যা, রাষ্ট্রের খরচও কম সমস্যার ব্যাপার নয়। খরচের তাগিদে রাজস্ব আদায় করিতে হয় এবং খরচ যদি নিয়ন্ত্রিত না হয় তাহা হইলে রাজস্ব আদায়ের বেড়াজাল ব্যাপকতর হইতে বাধ্য। ভারতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার রাজস্ব খাতে যে খরচ করেন, তাহার প্রতি টাকার সম্মিলিত খরচ নিম্নলিখিত ভাবে হয়: অর্থনৈতিক উন্নয়ন খাতে খরচ হয় ৩ আনা ৪ পাই; সমাজসেবী কাজে খরচ হয় ৩ আনা ২ পাই এবং দেশ শাসন বাবদ খরচ হয় ৯ আনা ৬ পাই। এই খরচের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল—

	টা	আ	পা
রাজস্ব বাবদ	০	০	৯
ঋণের জন্য সুদ ইত্যাদি	০	০	১০
ঋণের আসল টাকা শোধ	০	০	৩
দেশরক্ষা	০	৩	৫
বৈদেশিক সম্পর্কের জন্য	০	০	১
দেশ শাসন	০	১	০
বিচার বিভাগ	০	০	২
জেলখানা	০	০	২
পুলিস	০	১	০
অন্যান্য	০	০	৯
বিবিধ	০	১	২
	০	৯	৬
শিক্ষা	০	১	৫
জনস্বাস্থ্য	০	০	৩
চিকিৎসা	০	০	৬
অন্যান্য	০	০	১১
	০	৩	২
কৃষি	০	০	৬
পশুচিকিৎসা	০	০	১
সমবায়	০	০	১
কমিউনিটি প্রজেক্ট	০	০	২
সেচ এবং বন	০	০	৫
শিল্প	০	০	৫
সিভিল ওয়ার্কস	০	১	৫
অন্যান্য	০	০	২
	০	৩	৪

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার সমূহের সম্মিলিত খরচ জাতীয় আয়ের প্রায় শতকরা ১১ ভাগ। ১৯৩৮-৩৯ সনে দেশরক্ষা খাতে

খরচ হইত মোট কেন্দ্রীয় খরচের শতকরা ৫৪ ভাগ ; ১৯৫৩-৫৪ সনের বাজেটে ইহার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া শতকরা ৪৮ ভাগে দাঁড়াইয়াছে। শাসন ব্যবস্থার জন্য পূর্ব্বে মোট ব্যয়ের শতকরা ১৩ ভাগ খরচ হইত ; বর্ত্তমানে শতকরা ৯ ভাগ খরচ হয়। ১৯৩৮-৩৯ সনে উন্নয়ন খাতে ১৩ কোটি টাকা খরচ হইয়াছিল ; আর ১৯৫৪-৫৫ সনে ৩২০ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে।

নূতন আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে দেশরক্ষা খাতে খরচ কম হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। সমাজসেবার কার্য্যে খরচের পরিমাণ অত্যল্প। ঋণের সুদ এবং আসল টাকা শোধ দেওয়ার জন্য টাকা প্রতি ১৩ পাই খরচ হয়, ভারতবর্ষের মত গরীব দেশের পক্ষে ইহা অত্যধিক। ভারতবর্ষেও জাতীয় ঋণের প্রথা তুলিয়া দেওয়া উচিত।

পৃথিবীর গো-মহিষাদির এক-তৃতীয়াংশ ভারতবর্ষে আছে, কিন্তু তাহাদের মঙ্গলের জন্য ব্যয় [illegible] হয় না বলিলেই চলে। তাহাদের মঙ্গলের দিকে নজর না দিলে কৃষিকার্য্য ব্যাহত হইতে বাধ্য। সিভিল ওয়ার্কস খাতে ব্যয় অত্যধিক—এই ব্যয়ের হিসাবনিকাশ সঠিকভাবে পাওয়া যায় না। জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতে খরচ হয় মোট ৯ পাই—তাই আমাদের স্বাস্থ্যের এই দুরবস্থা।

কৃষি-গবেষণা

ভারতীয় কৃষি-গবেষণার পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ত্তি উপলক্ষে বিগত ১লা হইতে ৪ঠা এপ্রিল উক্ত প্রতিষ্ঠানের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব প্রতিপালিত হয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ১৯০৫ সালে বিহার রাজ্যের অন্তর্গত দ্বারভাঙ্গা জেলায় পুসা নামক স্থানে উক্ত গবেষণা ভবনটি স্থাপিত হয়। প্রধানতঃ একজন মার্কিন নাগরিক মিঃ হেনরী ফিপসের অর্থানুকূল্যে এবং লর্ড কার্জ্জনের উদ্যোগেই উহার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। ১৯৩৪ সালে বিহারে যে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয় তাহাতে ঐ গবেষণা ভবনটির যন্ত্রপাতি এবং অট্টালিকার সবিশেষ ক্ষতি হয়। ফলে ১৯৩৬ সালে উহাকে বিহার হইতে স্থানান্তরিত করিয়া নয়াদিল্লীস্থিত বর্ত্তমান বাসস্থানে আনয়ন করা হয়।

ভারতীয় কৃষি-গবেষণা কার্য্যের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে নাগপুরের "হিতবাদ" পত্রিকা লিখিতেছেন যে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি গত পঞ্চাশ বৎসরে কৃষি-গবেষণার ক্ষেত্রে বহু মূল্যবান কাজ করিয়াছে। দীর্ঘকালব্যাপী ধৈর্য্যসহ গবেষণার ফলে বিখ্যাত পুসা গমের উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। ঐ গম হইতে অধিকতর পরিমাণ উৎকৃষ্ট ফললাভ সম্ভব হইয়াছে ; কীটের উপদ্রব এবং বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে উহার প্রতিরোধ ক্ষমতাও অপেক্ষাকৃত অধিক। উক্ত কৃষিভবনে গবেষণার ফলে ভারতে চিনি এবং সিগারেটের উপযোগী তামাক উৎপাদনে বিশেষ সাহায্য হইয়াছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান তিসি, মটর, আলু, টম্যাটো এবং অন্যান্য শস্যের উন্নততর বীজের উদ্ভাবন করিয়াছে। কীটপতঙ্গ এবং নানাবিধ রোগের নিয়ন্ত্রণে ও সারদানের উন্নততর পদ্ধতি এবং কৃষির উপযোগী যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনে ভারতীয় কৃষি-গবেষণা মন্দির বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ কার্য্য করিয়াছেন। উহার গবেষণার ফলে সহিওয়াল এবং থরপরকারের ন্যায় সুন্দর গো-মহিষাদির সৃষ্টি হইয়াছে।

ভারতীয় কৃষি-গবেষণা ভবনের কাজ প্রধানতঃ দুই প্রকারের : (১) সর্ব্বভারতীয় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান কার্য্য পরিচালনা করা এবং (২) কৃষিবিদ্যার ছাত্রদিগকে কৃষিবিজ্ঞান সম্পর্কিত বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলা। উভয় ক্ষেত্রেই গবেষণা মন্দিরের কাজ উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমানে ভারতীয় কৃষি-গবেষণা মন্দিরের খ্যাতি কেবলমাত্র ভারতেই সীমাবদ্ধ নহে ; সমগ্র এশিয়াতেই উহা আজ কৃষি-গবেষণা এবং কৃষি-শিক্ষালাভের একটি মুখ্য প্রতিষ্ঠান।

সম্প্রতি দিল্লী ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে গবেষণা মন্দির কৃষি সম্প্রসারণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া "হিতবাদ" লিখিতেছেন যে, ঐরূপ কার্য্য গবেষণা মন্দিরের প্রধান কর্ম্মসূচীর অন্তর্গত নহে। গবেষণা মন্দিরের এই উদ্যোগ সর্ব্বভারতীয় ক্ষেত্রে সে জন্যই একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে কাজ করিতে পারে। পত্রিকাটির অভিমতে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ত্রুটি এই যে, যদিও বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় গবেষণা মন্দিরের দপ্তরে বহু মূল্যবান তথ্যাদি সংগৃহীত হইয়া রহিয়াছে তথাপি সেই সঞ্চিত জ্ঞানকে কৃষকের নিকট পৌঁছাইবার কোন প্রচেষ্টাই এতদিন করা হয় নাই। বিগত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ কৃষি-গবেষণা প্রতিষ্ঠান যে মূল্যবান কাজ করিয়াছেন তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে হইলে আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হইবে ঐ মূল্যবান জ্ঞানরাশি কৃষকের নিকট উহার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাহাদিগকে অবহিত করা এবং প্রয়োজনমত যাহাতে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ চালান যায় সে বিষয়ে তাহাদিগকে সাহায্য করা।

রেলের শ্রেণীবিন্যাস

১লা এপ্রিল রেল-কর্ত্তৃপক্ষ রেলের যে নূতন শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন সেই সম্পর্কে "ইহা যথেষ্ট নহে" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ২রা এপ্রিল "বম্বে ক্রনিকল" লিখিতেছে যে, রেলের শ্রেণী হ্রাসের প্রচেষ্টা ইতিপূর্ব্বেও একবার করা হইয়াছিল। চার বৎসর পূর্ব্বে "মধ্যম" শ্রেণী তুলিয়া দিয়া তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তাহা বিশেষ অর্থক্ষয়ী ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয় এবং রেল-কর্ত্তৃপক্ষ পুরাতন শ্রেণীবিন্যাসের পুনঃপ্রবর্ত্তনে বাধ্য হন। তারপর হইতে আজ পর্য্যন্ত রেল-ব্যবস্থার পুনর্গঠন কার্য্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং রেলে অত্যধিক ভিড়ের চাপও কমিয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণকারী যাত্রীদের সুবিধার জন্য যে সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার মধ্যে জনতা এক্সপ্রেসের প্রবর্ত্তন এবং দূরপাল্লার যাত্রীদের রাত্রিতে বার্থ রিজার্ভের ব্যবস্থার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

"ক্রনিকল" লিখিতেছেন যে, বর্ত্তমানে যে পরিবর্ত্তন ঘটান হইয়াছে তাহা জনসাধারণের নিকট দুর্ব্বোধ্য থাকিবে। কেন্দ্রীয়

এবং পশ্চিম-রেলওয়ের যে যুক্ত বিবৃতিতে শ্রেণীর পুনর্বিন্যাস এবং যাত্রীদের ভাড়ার সংশোধন ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহাতে পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে কেবলমাত্র এয়ার কণ্ডিশন এবং প্রথম শ্রেণীতেই বার্থ রিজার্ভ করা চলিবে। অর্থাৎ পত্রিকাটি লিখিতেছেন, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের রাত্রিতে বার্থ রিজার্ভের সীমাবদ্ধ সুবিধাটুকুও কাড়িয়া লওয়া হইল; বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনে রেল-ভ্রমণের উন্নতির কোন চেষ্টা করা হয় নাই। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া মোটামুটিভাবে যথাক্রমে পুরাতন দ্বিতীয়, মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়ার অনুরূপ হইবে। হয়ত এই পরিবর্ত্তনের ফলে পূর্ব্বের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাগুলির তুলনায় বর্ত্তমানের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাগুলিতে অধিকতর যাত্রীসঙ্কুলান হইবে—কারণ বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত অবস্থায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোক দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে বার্থ রিজার্ভের ব্যবস্থা না থাকিবার ফলে ঐসকল শ্রেণীর দূরপাল্লার যাত্রীদিগকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। পত্রিকাটি আশা প্রকাশ করিয়াছেন—শীঘ্রই হয়ত কর্তৃপক্ষ ঐ দুই শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য বার্থ রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

রেলবোর্ডের সভাপতি বলিয়াছেন যে, রেলমন্ত্রী দপ্তরের নীতি হইল ভারতে দুই শ্রেণীর রেলভ্রমণের প্রবর্ত্তন করা। পত্রিকাটি এই সম্পর্কে ধীরভাবে চলিবার পরামর্শ দিয়া বলিতেছেন যে, বোম্বাইনগরীর শহরতলীতে দুই শ্রেণীর ভ্রমণের ব্যবস্থা রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে জনসাধারণের প্রয়োজনের দিক হইতে অবস্থার কোন ইতরবিশেষ ঘটে নাই। পরিবর্ত্তনসাধনই কখনও মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে পারে না। জনসাধারণের ভ্রমণব্যবস্থার উন্নতিসাধন করাই যে-কোনরূপ পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

পশ্চিমবঙ্গে ভবঘুরেদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা

১৬ই মার্চ্চ "কথাবার্ত্তা"য় এক প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ভবঘুরে নিয়ামক শ্রীশুভেন্দু ঘোষ লিখিতেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ ভবঘুরে অধিকার বর্ত্তমানে সাতটি ভবঘুরে সদন ও একটি নূতন ভবঘুরে গ্রহণ কেন্দ্র পরিচালনা করিতেছেন। ১৯৫৪ সনে ভবঘুরেদের সম্পর্কে অবলম্বিত ব্যবস্থার শ্রেণীভাগ, শিক্ষণ ও বসবাসের স্থান সংকুলানের উদ্দেশ্যে চারটি নূতন সদন সংগঠিত হইয়াছে।

সাময়িক ভবঘুরে সদন সম্প্রতি কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমান শহরে গোলাপবাগে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। তথায় (কুষ্ঠরোগগ্রস্ত নহে এরূপ) ১৪ ও তদূর্দ্ধ বয়স্ক ৫০০ জন ভবঘুরে থাকিতে পারে। কুষ্ঠরোগ নাই এরূপ ৫ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক ৩০০ জন বালক-ভবঘুরে সদনে থাকিতে পারে। ঐ বালক-ভবনটি ১৯৫৪ সনে বর্দ্ধমানের প্রাসাদের তোষাখানা ভবনে স্থানান্তরিত হয়।

কলিকাতায় ক্যানেল ষ্ট্রীটে নারী ভবঘুরে সদনে পাঁচ বৎসর ও তাহার নিম্নবয়স্ক শিশু এবং নারীদের থাকিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। ঐ স্থানে ২০০ জনের বসবাসের ব্যবস্থা আছে।

কুষ্ঠরোগগ্রস্ত নহে এরূপ অক্ষম পুরুষ ভবঘুরেদের জন্য চব্বিশ পরগণার ঢাকুরিয়াতে ১৯৫৪ সনের জুন মাসে একটি বিশেষ সদন স্থাপিত হয়। ঐ সদনে বৃদ্ধ, অকর্ম্মণ্য ও রোগগ্রস্ত ভবঘুরেদের রাখা হয়। উক্ত বৎসর অক্টোবর মাসে কলিকাতায় একটি পুরুষ ভবঘুরে সদন স্থাপিত হয়, সেখানে ২৫০ জন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত নহে এরূপ বয়স্ক পুরুষ ও কিশোর থাকিতে পারে। ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসে চব্বিশ পরগণার আড়িয়াদহ গার্ডেন হাউসে নারীদের বিশেষ একটি সদন স্থাপিত হইয়াছে—তথায় ১০০ জনের থাকিবার বন্দোবস্ত রহিয়াছে।

কলিকতায় বেলেঘাটাতে ২৫০ জন নারী ও পুরুষ কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত ভবঘুরের জন্য একটি ভবঘুরে সদন রহিয়াছে।

১৯৫৪ সনের ৩১শে ডিসেম্বর ভবঘুরে সদনগুলিতে ১৭০০ জন ভবঘুরে ছিল।

ভবঘুরেদের স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়া পাইবার সুযোগ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সদনের ভিতরে উপার্জ্জনের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সদনবাসীদের সম্পর্কে ব্যাপকভাবে সামাজিক অনুসন্ধান কার্য্য চালাইবার উদ্দেশ্যে তিনটি সদনে তিন জন নিয়তম সমাজকর্ম্মী নিয়োগ করা হইয়াছে।

শ্রীঘোষ লিখিতেছেন, "এ ছাড়া সদনে প্রাথমিক পর্য্যায় পর্য্যন্ত শিক্ষাদান এবং তাঁতবোনা, সুতাকাটা, দর্জ্জীর কাজ, কামারের কাজ, ছুতোরের কাজ, ধোপার কাজ, রান্নার কাজ, বাগান-করা, পরিসেবা প্রভৃতি অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষাদানের কর্ম্মসূচী অনুসারেও কাজ চলছে। বস্ত্রের ক্ষেত্রে সদনগুলি স্বাবলম্বী হয়ে গেছে এবং আলোচ্য বৎসরে সদন থেকে সরকারের ত্রাণ ও চিকিৎসা বিভাগে কাপড় ও ব্যাণ্ডেজের কাপড় সরবরাহ করা হয়েছিল। ভবঘুরে বালকরা দরজীর কাজে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। সদনগুলির চাহিদা মিটিয়েও তারা বাইরে ১৫ হাজার টাকা মূল্যের দ্রব্যাদির চাহিদা মেটায়।

"সদনগুলির সুযোগ সুবিধা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ত্তমানে প্রত্যেক সদনে একটি করে বেতার যন্ত্র, হারমোনিয়াম এবং একটি সদনে একটি গ্রামোফোনও আছে। সদনবাসীদের ব্যাডমিণ্টন, ভলিবল, ক্যারাম, লুডো, হাডুডু প্রভৃতি খেলাতে উৎসাহিত করা হয়। এ ছাড়া সিনেমা দেখানো, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, কলিকাতা বেতার কেন্দ্র প্রভৃতি নগরের দেখার মত স্থানে ঘুরিয়ে দেখিয়ে নিয়ে আসার কাজও আলোচ্য বৎসরে যথারীতি চলে। ভবঘুরে সদনে জীবনে বৈচিত্র্য আনার জন্য এ ছাড়াও পার্ব্বণাদি উপলক্ষে ভবঘুরেদের বিশেষ খাদ্য দেবার ব্যবস্থা করা হয়।"

আমাদের বিশ্বাস যে, অধিকাংশ ভবঘুরেই ভিন্নপ্রদেশীয়। ঐরূপ অবাঞ্ছিত লোক যাহাতে নিজ প্রদেশে যাইতে বাধ্য হয় ও বাংলায় পুনঃপ্রবেশ করিতে না পারে তাহার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

শব্দ-রচনার হেঁয়ালী ও ভবিষ্যদ্বাণী

২৬শে মার্চ "ভিজিল" পত্রিকায় শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিভিন্ন দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকায় শব্দ-রচনা শৃঙ্খল এবং লগ্ন ও রাশির ভিত্তিতে জ্যোতিষ সম্পর্কীয় ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশের যে সাম্প্রতিক প্রচলন হইয়াছে সেই সম্পর্কে এক সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

শব্দ-রচনা প্রতিযোগিতার সমালোচনা করিয়া শ্রীভট্টাচার্য্য লিখিতেছেন যে, দুরবস্থায় পতিত ব্যক্তিবিশেষকে সহজে টাকা পাইবার লোভ দেখাইয়া এই সকল প্রতিযোগিতা চালান হয়। কিন্তু কয়জনের পক্ষে টাকা পাওয়া সম্ভব ?

প্রথমতঃ প্রতিযোগীদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান তিনিই যে পুরস্কার পাইবেন তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কারণ নির্দ্ধারিত সমাধানগুলি (যাহারা নির্দ্ধারণ করেন তাহা অজ্ঞাত) প্রায়ই অলৌকিক, অসম্ভব এবং হাস্যকর হয়। শব্দ-রচনা প্রতিযোগিতা বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের সহায়ক বলিয়া যাঁহারা যুক্তি দেখান উক্ত বিষয় হইতেই বুঝা যায় তাঁহাদের যুক্তি কত দূর অসার। শ্রীভট্টাচার্য্য বলিতেছেন যে, যদি কোন প্রতিযোগিতায় তিন লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয় তবে উদ্যোক্তাদিগের অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ টাকা তুলিতে হইবে। প্রতিযোগীর সংখ্যা ২০ গুণ ধরা হইলে তাহাদের মোট সংখ্যা হইবে এক কোটি। এক কোটি লোকের মধ্যে সফলতা অর্জ্জন করা দৈব-ঘটনার ন্যায়। আজকাল বহু বাঙালী মধ্যবিত্ত এই খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া প্রচুর সময় ও অর্থের অপচয় করিতেছেন। দক্ষিণ-ভারতে এই সকল প্রতিযোগিতার প্রচার খুব বেশী, সেখানে বহু পরিবারের মাসিক বাজেটে এই সকল প্রতিযোগিতার বাবদ নির্দ্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ থাকে। এই অবস্থায় শ্রীভট্টাচার্য্য বলিতেছেন, ঐ সকল প্রতিযোগিতা আনন্দদানের উদ্দেশ্যে সংগঠিত হইলেও এবং উহাদের উদ্যোক্তারা নির্ভরযোগ্য হইলেও উহার ফলে জুয়ার মনোবৃত্তি সৃষ্টি হইয়াছে।

শ্রীভট্টাচার্য্য লিখিতেছেন—অপর একটি ক্ষতিকর বিষয় সম্প্রতি জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। আজকাল দেখা যায় যে প্রায় অধিকাংশ ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র এবং কোন কোন ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রেও নিয়মিতরূপে রাশি ও লগ্নের ভিত্তিতে জ্যোতিষ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করা হইয়া থাকে। ইহাতে পত্রিকাগুলির প্রচার বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। লেখক বলিতেছেন, জ্যোতিষী ভাল কি মন্দ সেই প্রশ্ন বাদ দিয়াও এই কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে কেবলমাত্র রাশি ও লগ্নের ভিত্তিতে কখনই জ্যোতিষিক নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নহে। লেখক এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর হাস্যকর দিক উদঘাটন করিয়া বলিতেছেন যে, শ্রীচৈতন্য যে রাশি ও লগ্নে জন্মিয়াছিলেন লেখকের ভ্রাতার জন্মও সেই রাশি ও লগ্নে, কিন্তু সেজন্য লেখকের ভ্রাতা দ্বিতীয় শ্রীচৈতন্য হইতে পারেন নাই। অন্যান্য দিক বাদ দিয়া কেবল রাশি ও লগ্নের ভিত্তিতে বিচার যে কিরূপ উদ্ভট হইতে পারে তাহা প্রতিদিনই বহু পাঠক বুঝিতে পারেন। কিন্তু তবুও অনেকের মধ্যেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ভবিষ্যদ্বাণী পড়িবার এক প্রচণ্ড দুর্ব্বলতার সৃষ্টি হয়। বর্ত্তমানে রাজধানীর শ্রেষ্ঠ পত্র-পত্রিকাসমূহ এইরূপ মেকী জ্যোতিষিক প্রচারে সাহায্য করায় বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনে ইহার ক্ষতিকর প্রভাব ব্যাপকতর হইয়াছে। যদিও প্রেস কমিশন এই সম্পর্কে কিছু বলেন নাই, তথাপি ইহাকে আর অবহেলা করা অনুচিত হইবে বলিয়া লেখক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে জনচিত্তে শব্দ-রচনা প্রতিযোগিতা এবং জ্যোতিষের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধির কারণ আলোচনা করিয়া শ্রীভট্টাচার্য্য লিখিতেছেন যে বর্ত্তমান সময়ে যখন জনসাধারণের আর্থিক দুর্গতি এবং সামাজিক অনিশ্চয়তা চরম পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছে এবং উহা হইতে পরিত্রাণের আশা যখন ক্রমশঃই সুদূরপরাহত হইতেছে তখন জনসাধারণের এক বিরাট অংশের মধ্যে বাস্তব-বিমুখতার প্রবল ঝোঁক দেখা দিয়াছে, যাহার ফলে তাহাদের মধ্যে ভাগ্যনির্ভরতা এবং নানাবিধ ঝোঁকের প্রাধান্য দেখা দিয়াছে।

উপসংহারে লেখক সরকারকে অবিলম্বে শব্দ-রচনা প্রতিযোগিতা রহিত করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রসমূহে দায়িত্বজ্ঞানহীন জ্যোতিষিক ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারের উপরও উপযুক্ত নিষেধাজ্ঞা জারী করিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

বর্দ্ধমানে বেকার সমস্যার রূপ

১৭ই চৈত্র "আর্য্য" পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ যে বর্দ্ধমান কালেক্টরীতে ১০টি পদের জন্য প্রার্থী আহ্বান করা হইলে ১১৭০টি আবেদন পত্র পৌঁছে। তন্মধ্যে ১৫০ জনকে ইণ্টারভিউর জন্য ডাকা হইয়াছিল।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে স্থানীয় কর্ম্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে ১২৪০ জন চাকুরী প্রার্থী নাম রেজেষ্ট্রী করেন, তন্মধ্যে দুই জন চাকুরী পান।

স্পেশাল ক্যাডার শিক্ষক

সরকার বেকার সমস্যার সমাধানকল্পে স্পেশাল ক্যাডার শিক্ষক নিয়োগের পরিকল্পনা চালু করিয়াছেন এবং তদনুযায়ী ম্যাট্রিক হইতে এম-এ পাস কিছুসংখ্যক শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

স্পেশাল ক্যাডার শিক্ষক নিয়োগ ব্যাপারে সরকারী ব্যবস্থা এবং কোন সুস্পষ্ট নীতির অভাবের সমালোচনা করিয়া ১৭ই চৈত্র এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "ভারতী" লিখিতেছেন যে কর্ম্ম সংস্থান ঐ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য তাহা স্বীকার করিয়া লইলেও যখন শিক্ষকতার বিনিময়ে তাহাদিগকে বেতন দেওয়া হইতেছে তখন সেদিকেও সরকারের নজর থাকা দরকার। স্পেশাল ক্যাডার শিক্ষকদিগকে সাধারণতঃ পল্লীগ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বহুস্থলেই শিক্ষকদিগকে পদব্রজে ৫।৬ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত বিদ্যালয়ে যাইয়া পড়াইতে হয়। নানা কারণেই তাঁহাদের পক্ষে কর্ম্মস্থলে পৃথক বাসাভাড়া করিয়া থাকা সম্ভব নহে। এরূপ অবস্থায় পরিশ্রান্ত শিক্ষকের পক্ষে যথাযথ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করা সাধারণতঃ সহজসাধ্য নহে।

ভারতী লিখিতেছেন : "উচ্চশিক্ষিত স্পেশাল ক্যাডার শিক্ষকগণকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ করিবার পক্ষে হয়ত যুক্তি থাকিতে পারে এবং হয়ত ইহাতে শিশুশিক্ষার মানও উন্নততর হইতে পারে কিন্তু উপযুক্ত পরিকল্পনা না থাকিলে এভাবে শিক্ষকগণকে হয়রানি করিয়া শুভ ফলপ্রাপ্তির কোন আশাই নাই ইহা একরকম সুনিশ্চিত। দেশের প্রাথমিক শিক্ষার পুরাতন রীতি ও পদ্ধতি বজায় রাখিয়া মাত্র এক বিশেষ শ্রেণীর শিক্ষক নিয়োগের দ্বারা অবস্থার উন্নতি হওয়ার বদলে খানিকটা অবনতি ঘটিলেও বিস্মিত হইবার কিছু নাই। চাকুরীর কৌলীন্য, বেতনের হার ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার তারতম্যহেতু উক্ত বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকগণের সহিত ইহাদের সংঘর্ষ অনিবার্য এবং বিশেষ করিয়া বিদ্যালয় পরিচালন সংক্রান্ত বিষয়ে ইহাদের কোন হাত না থাকায় প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থারও কোন সুনিয়ন্ত্রণের আশা সুদূরপরাহত।"

সরকারী অর্থের এই নিষ্ফল অপব্যয় বন্ধ করিতে হইলে সরকারকে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। এই সম্পর্কে "ভারতী" লিখিতেছেন যে, হয় স্পেশাল ক্যাডার শিক্ষকগণকে স্থায়ীভাবে প্রাথমিক শিক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত করা হউক নতুবা পল্লীঅঞ্চলে আপাততঃ কয়েকটি আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঐরূপ শিক্ষকদের একাংশের কর্ম্মসংস্থান করিয়া অবশিষ্ট শিক্ষকদিগকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত করা হউক।

"বর্ত্তমানে অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক নাই। তা ছাড়া নানা কারণে প্রতিদিন গড়ে দুই-এক জন শিক্ষক অনুপস্থিত থাকেনই। এ অবস্থায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে প্রায়ই প্রতিদিন সাত ঘণ্টা করিয়া কাজ করিতে হয় এবং ছাত্রগণের পড়াশুনারও বিশেষ ক্ষতি হয়। একদিকে পল্লী অঞ্চলের অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্পেশাল ক্যাডার শিক্ষকগণের পর্য্যাপ্ত কাজ থাকে না। অপরদিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি শিক্ষক অভাবে অচল—এই অবস্থা চলিতে দেওয়া কোনরূপেই যুক্তিসঙ্গত নহে। আশা করি, আমাদের সরকার সমগ্র বিষয়টি সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অধিকতর সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন।"

বাংলা দেশের মিউনিসিপ্যালিটি

বাংলা দেশের মিউনিসিপ্যালিটিগুলি আজ চরম দুরবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। মেদিনীপুর শহরে মিউনিসিপ্যালিটি আছে বলিয়া মনে হয় না। রাস্তাঘাট অপরিষ্কার, ভাঙাচোরা সারাইবার বালাই নাই। অধিকাংশ মিউনিসিপ্যালিটি সম্বন্ধেই আজ এই কথা প্রযোজ্য। একমাত্র জলপাইগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটির অবস্থা বোধ হয় কিছু ভাল। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃপক্ষের অযোগ্যতা এই দুরবস্থার জন্য অনেকাংশে দায়ী। কিন্তু প্রধানতঃ দায়ী হইতেছে ইহাদের অর্থাভাব। যুদ্ধোত্তর যুগে খরচের পরিমাণ প্রায় পাঁচ-ছয় গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু আয় সেই তুলনায় বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯৪৮-৪৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের মিউনিসিপ্যালিটিগুলির মোট আয় হইয়াছিল ১·৫২ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে কর হইতে ১·০৩ কোটি টাকা, অর্থাৎ শতকরা ৬৮ ভাগ আয় হইয়াছিল। ২৭·৩৪ লক্ষ টাকা প্রাদেশিক সরকার সাহায্য হিসাবে দিয়াছিলেন। ইহা মোট আয়ের শতকরা ১৮ ভাগ। কর এবং সাহায্য ব্যতীত অন্যান্য আয়ের পরিমাণ ছিল ২১·৪৬ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট আয়ের শতকরা ১৪ ভাগ। ১৯৪৮-৪৯ সালে বাংলাদেশে ৮৬টি মিউনিসিপ্যালিটি ছিল। ইহাদের প্রত্যেকের গড়পড়তা বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ছিল ১.৭৭ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১·৭৬ লক্ষ টাকা। ইহা অবশ্য গড়পড়তা হিসাব, ইহাতে প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটির নিজস্ব আর্থিক অবস্থার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না।

মিউনিসিপ্যালিটিগুলির প্রধান প্রধান আয়ের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :

১। সম্পত্তি কর : জমি এবং বাড়ীর উপর কর ও ইহাদের উপর সেবা-কর ; সম্পত্তি হস্তান্তরের কর।

২। দ্রব্যকর : চুংগী (octroi) এবং সীমা-কর।

৩। ব্যক্তিগত কর : বৃত্তি-কর, ব্যাপার-কর, আজীবিকা-কর, নৌকরী-কর, অবস্থান এবং সম্পত্তি-কর, যাত্রীদের উপর সীমা-কর ইত্যাদি।

৪। যানবাহন এবং পশুপক্ষীর উপর কর।

৫। নাটক কিংবা ছবি দেখানোর উপর কর।

পশ্চিমবঙ্গের চুংগী এবং সীমা-কর ধার্য্য করা হয় নাই। মাদ্রাজ, অন্ধ্র এবং মহীশূরে প্রমোদ-কর মিউনিসিপ্যালিটিগুলির একটি প্রধান আয়ের পথ। বাংলা দেশে দ্রব্য এবং সম্পত্তির উপর সীমা-কর নাই। নাটক কিংবা ছবি দেখানোর উপর কর নাই। উন্নয়ন ও বিবর্দ্ধন কর নাই এবং ধর্ম্মস্থানে পরিভ্রমণকারী যাত্রীদের উপর কোন কর নাই। পশ্চিমবঙ্গের মিউনিসিপ্যালিটিগুলির মোট কর হইতে যে আয় হয় তাহার ৫·৪ শতাংশ বৃত্তি-কর হইতে আয় হয়। ১·৭ শতাংশ যানবাহন এবং পশুদের উপর কর হইতে আদায় হয় এবং অন্যান্য কর হইতে ১·৬ শতাংশ আয় হয়। বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে চুংগী এবং সীমা-কর ওখানকার মিউনিসিপ্যালিটিগুলির প্রধান আয়ের পথ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গের মিউনিসিপ্যালিটিগুলির যথেষ্ট সুযোগ এবং অব্যবহৃত আয়ের পথ আছে। চুংগী এবং সীমা-কর কেন যে এতদিন ধার্য্য হয় নাই তাহা আমাদের বোধগম্য নয়। এ সম্বন্ধে প্রাদেশিক সরকারের সজাগ হওয়া প্রয়োজন এবং অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে যাহাতে মিউনিসিপ্যালিটির আয় ঐ পথে বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষাপ্রসারে চা-শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যম

শিলচর হইতে প্রকাশিত কাছাড় চা-শ্রমিক ইউনিয়নের মুখপত্র পাক্ষিক "শ্রমিক" পত্রিকায় ১লা এপ্রিল প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে কাছাড় চা-শ্রমিক ইউনিয়নের সভ্যদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ায় উৎসাহ দিবার জন্য উক্ত ইউনিয়নের পক্ষ

হইতে দশ হাজার টাকার বৃত্তি এবং অন্যান্য সাহায্যদানের এক পরিকল্পনা করা হইয়াছে। সেই সম্পর্কে ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত সকল বাগান-পঞ্চায়েতের মতামত চাওয়া হইয়াছে। ঐ বৃত্তি এবং সাহায্য নিম্নলিখিত হারে হইবে বলিয়া বলা হইয়াছে :

(ক) মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক ৭৲ টাকা হারে ৩০টা বৃত্তি। (খ) হাইস্কুলের ক্লাস সেভেন হইতে ক্লাস টেন পর্য্যন্ত মাসিক ১০৲ টাকা হারে কুড়িটা বৃত্তি। (গ) কলেজের ইন্টার-মিডিয়েট কোর্সে মাসিক ২০৲ টাকা হারে দশটা বৃত্তি। (ঘ) কলেজের ডিগ্রি কোর্সে মাসিক ২৫৲ টাকা হারে তিনটা বৃত্তি। (ঙ) ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল অথবা কলেজে মাসিক ৫০৲ টাকা হারে ১টি বৃত্তি। (চ) মেডিকেল স্কুল অথবা কলেজে মাসিক ৭৫৲ টাকা হারে ১টি বৃত্তি। (ছ) কম্পাউণ্ডারী, নার্সিং, মিডওয়াইফারী ইত্যাদি অথবা অন্যান্য বিষয়ে অসাধারণ মেধাবী ছাত্রদিগকে এক-কালীন কিংবা মাসিক বৃত্তির জন্য আরও অতিরিক্ত ২৮০৲ টাকার বরাদ্দ থাকিবে। উক্ত (ক) দফায় ১০টি, (খ) দফায় ৩টি এবং (গ) দফায় ১টি বৃত্তি মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।

বীরভূমে ময়ূরাক্ষীর সেতু পারাপারে কর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক বিজ্ঞপ্তি মারফত জানাইয়াছেন যে ১লা এপ্রিল হইতে তিলপাড়া ব্যারেজের উপর দিয়া চলিতে গেলে বিভিন্ন হারে সকলকেই ট্যাক্স দিতে হইবে। এই কর প্রবর্ত্তনের ফলে বীরভূমের জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া সাপ্তাহিক "ময়ূরাক্ষী" সংবাদ দিতেছেন। বীরভূমের জেলা-বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ, ইউনিয়ন বোর্ডগুলি এবং কোন প্রতি-নিধিস্থানীয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানই ঐরূপ ট্যাক্স প্রবর্ত্তন সমর্থন করে নাই বলিয়া উক্ত সংবাদে বলা হইয়াছে। এমন কি কোন কংগ্রেস কমিটিও উহা অনুমোদন করেন নাই। অনেকেই ঐ কর প্রবর্ত্তনের প্রকাশ্য বিরোধিতা করিয়াছেন।

পত্রিকাটি লিখিতেছেন : "এই আদেশ চরম স্বেচ্ছাচারিতা, জুলুম ও অত্যাচারের তুলনাহীন প্রতিমূর্ত্তি। স্বাভাবিকভাবে নদী পারাপারের এতকালের সকল সুবিধা বন্ধ করিয়া বীরভূমের একাংশের লোককে অন্য কোন অংশে যাইবার দ্বিতীয় কোন সুযোগ হইতে বঞ্চিত করতঃ পয়সা আদায়ের এই কৌশল বাংলার ইতিহাসে বিরল। বারমাস প্রবহমাণ নদীর উপর পুল পারাপারের কোন ট্যাক্স দিতে হয় না—এমন দৃষ্টান্ত বাংলা দেশে ও ভারতে বহু আছে। সঙ্কীর্ণ এবং বৎসরের মধ্যে দশ মাস শুষ্ক নদীর উপর কোন পাকা রাস্তা দিয়া যাতায়াত করিতে ট্যাক্স দিতে হয় এমন দৃষ্টান্ত ভারতে বিরল। ছাত্রদের এখন হইতে স্কুলকলেজে আসিতে পুলের রাস্তাটুকুর জন্য পয়সা লাগিবে, রোগীর হাসপাতালে আসিতে পয়সা লাগিবে, সিউড়ী শহরে আসিতে পুলের পয়সা ছাড়া আসা যাইবে না ; বাস, মটর, রিক্সার ভাড়া লাগিবে, মালচলাচলের এত দিনের ব্যবস্থা ট্যাক্সের ফলে ওলটপালট হইবে।..." করের পরিমাণ—পদচারী ৫৲, বোঝাসহ পদচারী ১০, সাইকেল আরোহী /০, খালি গরুর গাড়ী /০, বোঝাই গরুর গাড়ী ।/০, মটর সাইকেল ।০, মটরকার ১৲, খালি বাস (কেবল ড্রাইভার থাকিবে) ১৲, যাত্রী বোঝাই বাস ২৲, খালি লরী ১৲, বোঝাই লরী ২৲, পশু ৫৲, রিক্সা /১০, ঘোড়ার গাড়ী ৵০।

আমরা এ বিষয়ে সাপ্তাহিক ময়ূরাক্ষীর সহিত সম্পূর্ণ একমত হইতে পারিতাম যদি বুঝিতাম যে স্থানীয় জেলাবোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড ইত্যাদিময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় কিছুমাত্র সাহায্য বা তৎপরতা দেখাইয়াছেন। টাকার কথা ভিন্ন, সে ত কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু ১৫,০০০ শ্রমিকের মধ্যে শতকরা পাঁচ জনও স্থানীয় লোক ছিল কি? অন্য কি ভাবে স্থানীয় ব্যারেজ নির্ম্মাণ ইত্যাদিতে লোকে সাহায্য করিয়াছে তাহা জানিবার জন্য আমরা উৎসুক। কর্ম্ম বিনা ফলভোগ কোন্ শাস্ত্রে আছে?

পাবলিক সার্বিস কমিশন ও হিন্দী

২৮শে মার্চ্চ মাদ্রাজ বিধানসভায় এক বিবৃতিতে মন্ত্রীবর শ্রী সি. সুব্রাহ্মণ্যম্ জানান যে কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্বিস কমিশনের প্রতি-যোগিতামূলক পরীক্ষা কেবলমাত্র হিন্দী ভাষার মাধ্যমে গ্রহণের পদ্ধতিতে মাদ্রাজ সরকার সম্মত হইবেন না।

মাদ্রাজ সরকারের অভিমতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলি হিন্দী এবং আঞ্চলিক ভাষাগুলির মাধ্যমে হওয়া উচিত।

শ্রী সুব্রাহ্মণ্যম্ জানান যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরুকে সংশ্লিষ্ট সকল সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করা হইয়াছে। শ্রীসুব্রাহ্মণ্যম্ এই আশা ব্যক্ত করিয়াছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির গৃহীত প্রস্তাব মানিয়া চলিবেন।

বর্দ্ধমান-কালনা রোড

১৮ই চৈত্র "দামোদর" লিখিতেছেন :

"বর্দ্ধমান-কালনা রোড সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত হইবার পর উহা বহু অর্থ ব্যয়ে সংস্কার হইতেছে। বর্দ্ধমান শহর হইতে প্রথম অংশটির কাজ বহু দিন হইল শেষ হইয়াছে কিন্তু রেলওয়ে ক্রসিঙের সমস্যার কোন সমাধান হইল না। বর্দ্ধমানের মত সুবৃহৎ জংসন ষ্টেশনের অদূরবর্ত্তী এই ক্রসিঙের ফটক প্রায়ই বন্ধ থাকায় সমস্ত প্রকারের যানবাহনকে আধ ঘণ্টা হইতে কোন কোন সময় পৌনে এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। বিশেষ করিয়া বাসযাত্রীদের দুর্দ্দশার অন্ত থাকে না। উন্নয়ন বিভাগ একটু চেষ্টা করিলেই উহার নিম্ন দিয়া একটি 'সাবওয়ে' নির্ম্মাণ করিয়া এই সমস্যার সমাধান করিতে পারেন। যদি তাহা নিতান্তই সম্ভব না হয়, তাহা হইলে কালনা রোডকে সহরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সাধনপুর রাস্তা দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বাংলোর পার্শ্ব দিয়া বর্ত্তমান ওভার ব্রীজের সহিত সংযোগ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে ও বর্ত্তমান রেলওয়ে ক্রসিঙের উপর দিয়া মাত্র লোক চলাচলের জন্য একটি হাল্কা ওভার ব্রীজ করিয়া দিলেই ইহার সমাধান হইয়া যায়। সহরের একাংশের

লোক ঐ দিক দিয়াও কালনা বাস ধরিতে পারিবে। আমরা এই জরুরী বিষয়টির প্রতি বর্দ্ধমান জেলা উন্নয়ন সমিতি ও সরকারের উন্নয়ন বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

চন্দননগরে মহিলা কলেজ

চন্দননগরে একটি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য চন্দননগরের এক বিশিষ্ট নাগরিক সম্প্রতি সংবাদপত্রে একটি প্রস্তাব তুলিয়াছিলেন। তাহাতে বলা হইয়াছিল যেন চন্দননগর কলেজের জন্য ধার্য্য জনৈক দাতার পঞ্চাশ হাজার টাকা মহিলা কলেজের জন্য ব্যয় করা হয়। তিনি এইরূপ অভিযোগও করিয়াছিলেন যে চন্দননগর কলেজের বর্ত্তমান অধ্যাপকদের মধ্যে অনেকেই মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা হউক তাহা চাহেন না।

উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে "সমাচার" ৭ই এপ্রিল লিখিতেছেন: "সরকারী অর্থে এবং দাতাদের দানে মহিলা কলেজ চন্দননগরে যদি হয় তাহাতে কেহই বাধা দিবেন না—আপত্তিও করিবেন না। কিন্তু যে চন্দননগর কলেজে ছেলেদের কমনরুমের ভাল ব্যবস্থা নাই, ঘরের সংখ্যা অপ্রতুল, তাহার জন্য ধার্য্য টাকা মহিলা কলেজে ব্যয় করা হউক—ইহা আমাদের কাছে মোটেই সমর্থন লাভ করে না। চন্দননগর কলেজের বহুল উন্নতিপ্রয়োজন এবং তাহার উন্নতিকে ব্যাহত করিয়া ও তাহার জন্য নির্দ্ধারিত টাকায় মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করার বিলাসিতা অনেকের কাছেই সমর্থনযোগ্য না হইতে পারে এবং আমরাও তাহা সমর্থন করি না। মহিলা কলেজ যদি হয় তাহা ভালই কিন্তু তাহার প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করিয়া চন্দননগর কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে কাহাকেও আক্রমণ করাও আমাদের বিশেষ ভাল লাগে নাই।"

মালদহে হাজার বছরের গণেশমূর্ত্তি

সাপ্তাহিক "ওয়েষ্ট বেঙ্গল" পত্রিকার ২৪শে মার্চ্চ সংখ্যায় এক সংবাদে প্রকাশ যে সম্প্রতি মালদহ জেলার অন্তর্গত গাজোল থানার অধীন বাঘদীঘি গ্রামে একটি পুষ্করিণীর সংস্কারের জন্য খনন করিবার সময় একটি হাজার বৎসরের পুরাতন পাথরের গণেশমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, উহা মালদহের যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে।

গণেশের এই প্রতিমূর্ত্তিটি অষ্টভুজরূপে গঠিত। গণেশের অষ্টভুজরূপ সচরাচর দেখা যায় না। সাধারণতঃ গণেশকে চতুর্ভুজরূপেই কল্পনা করা হয়। মূর্ত্তির সকল বাহুগুলিই কব্জির নিকট অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত। উহার বয়স নিরূপণ সহজসাধ্য নহে; কিন্তু মূর্ত্তিগঠনের প্রকৃতি দেখিয়া অনুমান করা যায় যে উহা খ্রীষ্টীয় নবম বা দশম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মহীশূরে অফিসারদের মহার্ঘভাতা বন্ধ

"প্রেস ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া"র সংবাদে প্রকাশ যে, গত ৩০শে মার্চ্চ মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী কে. হনুমনথাইয়া রাজ্য বিধানসভায় ঘোষণা করেন, মাসিক পাঁচ শত বা ততোধিক টাকা মাহিনা পান এইরূপ সরকারী অফিসারদিগকে মহার্ঘভাতা ৩১শে মার্চ্চ হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া রাজ্যসরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে সরকারের বার্ষিক ব্যয় আনুমানিক দশ হইতে পনর লক্ষ টাকা হ্রাস পাইবে।

সিঙ্গাপুরে প্রথম নির্ব্বাচন

বিগত ২রা এপ্রিল সিঙ্গাপুরের নূতন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী যে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে বামপন্থী দলগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ১৯৫৪ সনে সর জর্জ্জ রেণ্ডেল পরিচালিত কমিশন কর্ত্তৃক উক্ত শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রস্তুত হয়। বর্ত্তমান বৎসরের ৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে ঐ শাসনতন্ত্র চালু হইয়াছে।

সিঙ্গাপুরের পুরাতন আইনসভা ২৫ জন সভ্য লইয়া গঠিত ছিল। তাহাদের মধ্যে মাত্র ১২ জন নির্দ্ধারিত হইতেন এবং গবর্ণর ঐ সভার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বর্ত্তমান পরিষদের সভ্যসংখ্যা ৩২, উহাদের মধ্যে ২৫ জন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন; তিন জন সরকারী সদস্য এবং চারি জন মনোনীত। পরিষদের স্পীকার হইবেন এক জন বেসরকারী লোক। তবে পরিষদের সিদ্ধান্তের উপর গবর্ণরের ভেটো থাকিবে। পরিষদের মেয়াদ চার বৎসর।

১৯৪৮ সনেও সিঙ্গাপুরে একটি নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমান নির্ব্বাচনে ভোটদাতার সংখ্যা পূর্ব্বের প্রায় চারি গুণ।

বর্ত্তমান নির্ব্বাচনে দ্বীপের তিন লক্ষ ভোটদাতাকে ২৫টি নির্ব্বাচকমণ্ডলীতে ভাগ করা হয়। ছয়টি দলের ৭৫ জনেরও অধিক প্রার্থী ২৫টি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগুলি হইল যথাক্রমে প্রোগ্রেসিভ পার্টি (রক্ষণশীল)—২২ জন প্রার্থী, ডেমোক্রাটিক পার্টি (রক্ষণশীল)—২০ জন প্রার্থী, লেবর ফ্রণ্ট মধ্য বামপন্থী—১৭ জন প্রার্থী, মালয় চীনা সমিতির মৈত্রী (Malayan Chinese Association Alliance)—৫ জন প্রার্থী, পিপলস একশন পার্টি—৪জন এবং লেবর পার্টি ১ জন। তাহা ছাড়া দশ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন। কমিউনিষ্ট দল বেআইনী থাকায় তাহাদের কোন প্রার্থী প্রতিযোগিতা করে নাই।

নির্ব্বাচনের ফলে লেবর ফ্রণ্ট ১০টি আসন এবং শ্রমিক, ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবী সমর্থিত পিপলস একশন পার্টি তিনটি, প্রোগ্রেসিভ পার্টি ৪টি, চীনা সমিতি মৈত্রী তিনটি, ডেমোক্র্যাটিক পার্টি দুইটি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা তিনটি আসন দখল করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

প্রোগ্রেসিভ পার্টির এইরূপ শোচনীয় পরাজয়ে সকলেই বিস্মিত হইয়াছেন। বিগত পরিষদে উহাদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল এবং ঐ পার্টিই সর্ব্বাপেক্ষা সুসংহত পার্টি বলিয়া পরিচিত ছিল।

সিঙ্গাপুরস্থিত লণ্ডন "টাইমস" পত্রিকার সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে, নির্ব্বাচনের ফলাফলে দুইটি বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ কেবলমাত্র চীনাদের লইয়া সংগঠন করিলেও তাহা চীনাদের সমর্থন লাভ করিতে পারে না, যদি দলের নীতি সহানুভূতিশীল না হয়। দ্বিতীয়তঃ পিপলস একশন পার্টি অতি দ্রুত প্রভূত সমর্থন লাভ করিয়াছে।

লেবর ফ্রন্টের নেতা মিঃ ডেভিড মার্শালের নেতৃত্বে সিঙ্গাপুরে একটি সম্মিলিত মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে। মন্ত্রিসভায় নয় জন সদস্য থাকিবেন। তাঁহাদের মধ্যে তিন জন পদাধিকারবলে মন্ত্রীসভার সদস্য থাকিবেন—তাঁহারা হইলেন চীফ সেক্রেটারী (এতদিন পর্য্যন্ত ঔপনিবেশিক সেক্রেটারী নামে পরিচিত ছিলেন), ফাইন্যান্স সেক্রেটারী এবং এটর্ণী-জেনারেল। এই তিন জন কর্ম্মচারীর হাতে প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্রনীতি, পাসপোর্ট, বেতার, পুলিস, জেল, অর্থ, আইন প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিষয়গুলি থাকিবে। মুখ্যমন্ত্রী বাণিজ্য দপ্তরের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। একজন ভারতীয় শ্রী জে. এম্. জুমাভয় মুখ্যমন্ত্রীর সহকারী বাণিজ্য-মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। বিগত ৭ই এপ্রিল সিঙ্গাপুরের গবর্ণর সব জন নিকল মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণ করেন। এই মন্ত্রীসভার সকল কাজের উপরই চূড়ান্ত ক্ষমতা গবর্ণরের হাতে রাখা হইয়াছে।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ১৯২০ সনে ভারতের যতটুকু স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ছিল, বর্ত্তমান শাসনব্যবস্থায় ততটুকু স্বাধীনতাও সিঙ্গাপুরকে দেওয়া হয় নাই।

লণ্ডন "টাইমস" পত্রিকার সিঙ্গাপুরস্থিত সংবাদদাতা লিখিতেছেন : মালয়ের অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। সরকার হইতে মালয় বিদ্রোহীদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যে পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল তাহাতে জনসাধারণের নিকট হইতে বিশেষ কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। মালয়স্থিত ব্রিটিশ প্ল্যাণ্টার্স এসোসিয়েশন্ ২৮শে মার্চ্চ এক বিবৃতিতে বলে যে, মালয়ের জরুরী অবস্থার ত কোন পরিবর্ত্তনই হয় নাই, উপরন্তু কোন কোন স্থানে কমিউনিষ্টদের তৎপরতা বৃদ্ধিই পাইয়াছে।

ব্রিটেনে সংবাদপত্র ধর্ম্মঘট

বিগত ২৫শে মার্চ্চ হইতে ইংলণ্ডের সংবাদপত্রগুলির প্রকাশ বন্ধ রহিয়াছে। প্রায় ছয় শত যন্ত্রীদের মাহিনাবৃদ্ধি সম্পর্কে দাবির মিটমাট না হওয়ার ফলেই ধর্ম্মঘটের সৃষ্টি। অনুমান করা হইয়াছে যে, ঐ ধর্ম্মঘটের ফলে সংবাদপত্রগুলির দৈনিক ৮০,০০০ পাউণ্ড ষ্টার্লিং ক্ষতি হইয়াছে। এই ধর্ম্মঘট সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য ব্রিটিশ সরকার একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন। এই কমিশনের সভাপতি হইলেন ৬৫ বৎসর বয়স্ক খ্যাতনামা আইনজীবী সর জন করসটার। তিনি ব্রিটেনের জাতীয় সালিশী বোর্ড এবং শিল্প-কোর্টের চেয়ারম্যান। কমিশনের অপর দুই জন সদস্য হইতেছেন মিঃ এস. এম্ কাফীন, ব্রিটিশ মোটর ট্রেড ফেডারেশনের প্রেসিডেণ্ট এবং মিঃ ডব্লু. জে. পি. ওয়েবার, ট্রান্সপোর্ট স্যালারিড ষ্টাফ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক।

এই ধর্ম্মঘটের ফলে সর্ব্বপ্রথম লণ্ডন "টাইমস" পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ রহিয়াছে। বর্ত্তমানে কেবলমাত্র কমিউনিষ্ট ডেলী ওয়ার্কার পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

আণবিক বিস্ফোরণের প্রভাব

আণবিক এবং হাইড্রোজেন বোমায় আহত ব্যক্তিরা বেশীর ভাগই যকৃৎ ও কিডনীর অসুখে আক্রান্ত হয়—নাগাসাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মতরচিরা ইওকোটা জাপান মেডিক্যাল কংগ্রেসে বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই তথ্য বিবৃত করেন। ১৯৪৫ সনে হিরোশিমাতে আণবিক বোমায় আহত পঞ্চাশ জন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিয়া উক্ত তথ্য পাওয়া যায়; আণবিক বোমা যখন পড়ে তখন ঐ ব্যক্তিরা দুই কিলোমিটারের (অর্থাৎ প্রায় সওয়া মাইল) মধ্যে ছিল এবং তাহাদের কোন বাহ্যিক আঘাত লাগে নাই। (জাপান মেডিক্যাল কংগ্রেসে ৩,০০০ জাপানী চিকিৎসক এবং ত্রিশ জন বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন।)

জাপানে অবস্থিত মার্কিন আণবিক বোমা দ্বারা আহতদের সম্পর্কিত কমিশনের ডিরেক্টর ডাঃ রবার্ট এইচ. হোম্স্ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক টেলিভিশন বক্তৃতায় বলেন যে হিরোশিমায় আহত নরনারীদিগকে দশ বৎসর যাবৎ চিকিৎসা করিয়া পরে দেখা গিয়াছে যে তাহাদের রক্তে ক্যান্সার হয় এবং চোখে ছোট ছানি পড়ে। আণবিক বোমা পড়িবার সময় সন্তান-সম্ভবা রমণীদের সন্তানদের শতকরা পাঁচ ভাগের মাথা সাধারণ শিশু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হয় এবং তাহাদের মানসিক শক্তির অবনতি পরিলক্ষিত হয়।

অপরদিকে, আহত রমণীদের মধ্যে প্রথমে বন্ধ্যাত্বের যে লক্ষণ দেখা গিয়াছিল, পরে দেখা যায় যে তাহা সাময়িক মাত্র, তাহাদের বংশধরদের উপর বিকীরণের কোন প্রভাব পড়িবে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। আহতদের বংশধরগণ এখনও বেশ সুস্থ, সবল এবং স্বাভাবিকই রহিয়াছে; অবশ্য ভবিষ্যতে উহাদের কি পরিবর্ত্তন ঘটিবে তাহা গবেষণা-সাপেক্ষ।

যে সকল ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা হইয়াছে তাহারা বিস্ফোরণের স্থান হইতে সওয়া এক মাইলের মধ্যে ছিল। ঐ দূরত্বের মধ্যে ৩৩ হাজার লোক ছিল। তাহাদের অনেকের মধ্যেই বিকীরণের প্রভাব দেখা যায়। উহাদের মধ্যে ৬০০০ জনকে প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণাধীনে রাখা হয়। পর্য্যবেক্ষণাধীন ব্যক্তিদের শতকরা ৪১ জনের চক্ষুতে ক্ষুদ্রাকার ছানি পড়িয়াছিল। যাহারা আণবিক রশ্মির দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই এরূপ ব্যক্তিদের মধ্যে মাত্র শতকরা আট জনের চক্ষুতে ছানি পড়িয়াছিল। ১০,০০০ নবজাত শিশুকে পরীক্ষা করিয়া পুরুষ-শিশুর সংখ্যাল্পতা পরিলক্ষিত হইয়াছে; তবে রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, উহা অন্যান্য কারণেও ঘটিতে পারে।

এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত অক্টোবর মাসে কাতস্থ ইয়ামানে নামক ৬৮ বৎসর বয়স্কা এক জাপানী রমণী হিরোশিমায় আণবিক বোমা বিস্ফোরণের নয় বৎসর পর উহার পরোক্ষ বিকীরণশীলতার প্রভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বোমা বিস্ফোরণকালে ইয়ামানে হিরোশিমা হইতে ২৫ মাইল দূরে ছিলেন।

২৪শে মার্চ মার্কিন কংগ্রেসের এক কমিটির নিকট মার্কিন আণবিক শক্তি কমিশনের সভাপতি মিঃ লুইষ্ট্রস বলেন যে, হাইড্রোজেন বোমার বিকীরণের ফলাফল সম্পর্কে রিপোর্টের প্রকাশ আড়াই মাস পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কারণ তাহাতে বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের সহিত মনোমালিন্যের সম্ভাবনা ছিল।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে শ্রমিক দলের সদস্য ড. এডিথ সামারস্কিল সহ ছয় জন মহিলা সদস্য রেডিও-একটিভিটি সংক্রান্ত পর্য্যালোচনার জন্য একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রের প্রস্তাব আনয়ন করেন। কিন্তু ২২শে মার্চ তাহা ২৯০-২৫০ ভোটে অগ্রাহ্য হয়।

ব্রিটিশ স্বাস্থ্যমন্ত্রী মিঃ আয়ান ম্যাকলিওড স্বীকার করেন যে, বিকীরণ বংশানুক্রমিক প্রভাব বিস্তার করে এবং আণবিক বিস্ফোরণের ফলে পৃথিবীতে রেডিও-একটিভিটি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সতীন্দ্রনাথ সেন

ভারতের একনিষ্ঠ মুক্তিসাধক সতীন্দ্রনাথ সেন বিগত ১১ই চৈত্র ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে বন্দীদশায় দীর্ঘকাল রোগভোগের পর দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল।

সতীন্দ্রনাথ ১৮৯৫ সনে ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। বরিশাল জেলায় পটুয়াখালিতে তাঁহার শৈশব ও কৈশোর কাটিয়াছিল। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। বরিশালের শঙ্করমঠের স্বামী প্রজ্ঞানন্দের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তিনি বি-এ অধ্যয়নকালে কৃষ্ণনগর ডাকাতি সম্পর্কে সন্দেহবশে পুলিস-কর্তৃক ধৃত হন। সতীন্দ্রনাথ কৈশোরেই বাঘা যতীন, এম্. এন. রায় প্রভৃতি বিখ্যাত বিপ্লবীদের সঙ্গেও যুক্ত হইয়া পড়েন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারত-রক্ষা আইনবলে সতীন্দ্রনাথ আটক হন। ১৯১৯ সনে তিনি মুক্তি পাইলেন। ইহার পরে মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে যোগ দিয়াছিলেন। এই সময় বরিশালে তিনি কারারুদ্ধ হন এবং সরকারী অনাচারের প্রতিবাদে একাদিক্রমে তের্ষট্টি দিন অনশন করিয়াছিলেন। তিনি ইহার ফলে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশেরও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিলেন। পটুয়াখালী সত্যাগ্রহ আন্দোলনও তাঁহারই পরিচালিত। এই সময় পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করেন।

১৯৩০ সনের সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং ১৯৪২ সনের আগষ্ট বিপ্লবেও সতীন্দ্রনাথ যোগদান করিয়া কারাবরণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধাবসানে তিনি অবিভক্ত বাংলার আইনসভার সদস্য হইয়াছিলেন। ১৯৪৭ সনে দেশবিভাগের পর সতীন্দ্রনাথ পূর্ব্ববঙ্গেই রহিয়া গেলেন এবং স্বাধীনতা লাভের পর নূতন পরিবেশে পূর্ব্ববঙ্গবাসী হিন্দুদের সম্বন্ধে স্বীয় জাতীয়তার আদর্শ অনুযায়ী কর্ম্ম পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করেন। স্বাধীনতালাভের পর গত সাত-আট বৎসরের মধ্যে তিনি অতি অল্প সময়েই কারাগারের বাহিরে ছিলেন। কিন্তু যখনই তিনি স্বদেশবাসীদের সঙ্গে মিলিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন তখনই তিনি তাঁহাদের আত্মস্থ হইতে সবিশেষ অনুরোধ করিতেন এবং উপদেশ দিতেন। 'আপনি আচরি ধর্ম্মে জীবেরে শিখায়'—মহাপ্রভুর এই অমূল্য আদর্শ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। অশেষ লাঞ্ছনা, দুঃখকষ্ট, নির্যাতন-উৎপীড়নের কথা জানিয়াও তিনি নিজের লক্ষ্য হইতে এতটুকু বিচলিত হন নাই। অবশেষে উচ্চ আদর্শের যূপকাষ্ঠেই নিজেকে আহুতি দিয়া তবে তাঁহার আত্মা তৃপ্তি লাভ করিল। সতীন্দ্রনাথের মত তেজস্বী, নির্ভীক, আদর্শপরায়ণ একনিষ্ঠ কর্ম্মী ও দেশসেবকের বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাঁহার আদর্শনিষ্ঠা আমাদিগকে অধিকতর আকৃষ্ট করিলেই তবে তাঁহার মৃত্যুবরণ সত্যিকার সার্থকতা লাভ করিবে।

মোহিনী দেবী

অসহযোগ আন্দোলন এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অক্লান্তকর্ম্মী দেশসেবিকা মোহিনী দেবী গত ১১ই চৈত্র বিরানব্বই বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার পিতা ছিলেন সেকালের বিখ্যাত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রায়বাহাদুর রামশঙ্কর সেন। রামশঙ্কর সেন স্বদেশের বিবিধ জনহিতকর কার্য্যে, বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে বিশেষ তৎপর ছিলেন। স্বদেশসেবার প্রেরণা পিতৃদেবের নিকট হইতে শৈশবেই মোহিনী দেবী পাইয়াছিলেন। এ কারণে বার্দ্ধক্যে যখন দেশসেবার আহ্বান আসিল তখন অতি সহজ ভাবেই তিনি ইহাতে সাড়া দিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী ছিলেন রায়-বাহাদুর তারকচন্দ্র দাস। অসহযোগ আন্দোলনকালে তিনি বৈধব্য-দশাগ্রস্ত, প্রায় ষাট বৎসর বয়সে উপনীত হইয়াছিলেন। কলিকাতায় সম্ভ্রান্ত পরিবারে নগ্নপদে শুভ্রথান পরিধান করিয়া খদ্দর ফেরী করিতে মোহিনী দেবী অগ্রসর হন। তাঁহার মত সম্ভ্রান্ত নারীর এতাদৃশ কার্য্যে হস্তক্ষেপে খদ্দরের প্রচার ও ব্যবহার অতি দ্রুত জনসমর্থন লাভ করে। মোহিনী দেবী রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে যোগ দিতেন। সুদূর মফস্বলেও রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে তাঁহাকে যোগদান করিতে আমরা দেখিয়াছি। তাঁহার অনাড়ম্বর চালচলন, অমায়িক ব্যবহার এবং মধুর প্রীতিপ্রদ ভাষণ সকলকে মুগ্ধ না করিয়া পারিত না। ১৯৩০ সনের সত্যাগ্রহ আন্দোলনেও তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে যোগ দিয়াছিলেন। কলিকাতায় নারী সত্যাগ্রহ সমিতির তিনি অন্যতমা সহকারী সভানেত্রী পদে বৃত হন এবং যথারীতি কারাবরণ করেন। সত্তর বৎসর বয়সেও তাঁহার দুঃখবরণ তৎকালীন যুবক-যুবতীদের প্রাণে বিশেষ উৎসাহ ও প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছিল। তিনি আমরণ স্বাধীনতার একনিষ্ঠ পূজারিণী ছিলেন। স্বাধীনতালাভের পরেও তিনি প্রতিনিয়ত স্বদেশের কল্যাণ কামনা করিতেন এবং যখনই শরীরে কুলাইত তখনই জাতির সেবাকার্য্যে তৎপর হইতেন। গত দুই বৎসর যাবৎ তিনি একরূপ শয্যাশায়ী ছিলেন। পরিণত বয়সে মোহিনী দেবী পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নির্ভীক ও একান্ত দেশহিতৈষণা স্বদেশবাসীর স্মৃতিতে উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

রবীন্দ্রকাব্যে রূপকল্প

ডক্টর শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

রূপকল্প শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হ'ল 'ইমেজারি'। 'ইমেজারি' সর্বযুগের রসসাহিত্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। গভীর ভাব, সুউচ্চ ধারণা, আকাশ-ছোঁয়া আদর্শ—রূপকল্প এগুলো মানুষকে বুঝিয়েছে অত্যন্ত সহজ ভঙ্গীতে, একেবারে আপনজনার কথায়। যেখানে মানুষের ধারণা বাষ্পায়িত, এলোমেলো, অসংযত, সেখানে রূপকল্পের প্রয়োগ করা হয়েছে—পাঠক বুঝেছে কবিমনের নিগূঢ় অনুভূতি, বুঝেছে ভাষান্তর্গত সুগভীর তাৎপর্য। যেখানে শিল্পী বুঝেছেন যে একটি রূপকল্পের ব্যবহারে অর্থ সুপরিস্ফুট হ'ল না, কবির মনের কথা পাঠকের কাছে পৌঁছল না, সেখানে কবি একের পরে এক ইমেজারি ব্যবহার করেছেন। সে ভাষাচিত্রে রেখা ও রঙের সমন্বয় মূল ভাবের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত। ইংরেজী সাহিত্য থেকে অনেক নজীর দেওয়া যায় এই ধরণের রূপকল্পের অনায়াস ও স্বচ্ছন্দ প্রয়োগের। সংস্কৃত সাহিত্যেও এর অসদ্ভাব নেই।

ইংরেজী সাহিত্যের পাঠকেরা সকলেই শেলীর অতি-পরিচিত, যুগে যুগে বহুকণ্ঠে উচ্চারিত 'স্কাইলার্ক' কবিতাটি পড়েছেন। সুরমুগ্ধ কবি স্কাইলার্কের স্বরূপ বুঝতে চান—জানতে চান আনন্দময় অমৃতলোকের এই শরীরী প্রতিনিধিটির কথা। তাঁর কণ্ঠে শুনি—"What thou art we know not"; তার পর সুরু হয় কবিমনের অনুভূতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। কল্পলোকের কথা ব্যক্ত হয় এই জীবনে পাওয়া নানা রসানুভূতির মধুর আলেখ্যের মাধ্যমে। শেলী কখনও স্কাইলার্ককে দুর্নিরীক্ষ্য চিন্তার প্রখর আলোকে আচ্ছন্ন কবির সঙ্গে তুলনা করেছেন আবার কখনও-বা তাকে উচ্চকুলোদ্ভবা বিরহাতুরা সুন্দরী তরুণীর সহিত তুলিত করেছেন, যে সুন্দরী আপনার হৃদয়কে তার গানে নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছে। কবি তার পরে বলছেন যে, স্কাইলার্কটি যেন একটি স্বর্ণপ্রভ জোনাকী পোকা যে আপনাকে পাতার আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে। জোনাকীর প্রজ্জলন্ত সুবর্ণ-প্রভা সন্ধ্যাশিশিরে প্রতিফলিত হয়েছে আর তার স্বর্ণাভা ঘাসে-পাতায় ছড়িয়ে পড়েছে অনন্ত রূপমাধুর্যে। সেখানেও রূপকল্পের শেষ নয়। কবির মনে হয় সবটা বুঝি বলা হ'ল না। পাঠক বোধ হয় কবির মনের ভাবটুকু নিজের মনের পত্রপুটে গ্রহণ করতে পারল না। তাই আবার তিনি কথার ছবি আঁকেন—টুকরো টুকরো রেখাচিত্র। এবার বলা হ'ল যে স্কাইলার্কটি যেন সবুজ পাতায় প্রচ্ছন্ন একটি গোলাপ ফুল। চোখের দৃষ্টি তার নাগাল পায় না তবু তার গন্ধের সমারোহ আপনাকে ঘোষণা করে। তার প্রকাশ আছে, তবুও সে প্রচ্ছন্ন।

এমনিধারা হাজার হাজার মনোজ্ঞ চিত্র এঁকেছেন বহু কবি যুগে যুগে। সে চিত্রণের উদ্দেশ্য হ'ল পাঠককে আপনার রসানুভূতির শরিক করে তোলা। রূপকল্পের মাধ্যমে কবি-মন বারে বারে চেয়েছে আপনার রসের বোধকে অন্য মনে প্রতিষ্ঠিত করতে। আত্মপ্রকাশের জন্যে যে সূক্ষ্ম পরিতৃপ্তির আনন্দ রয়েছে তাকে শিল্পী ষোল আনা ভোগ করেন এই সৃষ্টিকার্যে। গভীর অনুভূতি যখন অগভীর ভাষাকে আশ্রয় করে তখন সে তার আধারের অকিঞ্চনতা উপলব্ধি করে পদে পদে; তাই কবিমন রূপকল্পেও আশ্রয় নেয়। এই কারণে সাহিত্যের দরবারে রূপকল্পের সর্বজনমান্য প্রতিষ্ঠা। কোন কোন সমালোচক আবার এই ছবি-আঁকাকেই কাব্য-কবিতার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করেছেন। রূপকল্প যে ভাব বা আইডিয়াকে প্রকাশ করে সে আইডিয়া পিছিয়ে পড়েছে। ছবি এগিয়ে এসে সবটুকু আসন অধিকার করেছে। ল্যাম্বোর্ণ বললেন, কাব্য 'ইমেজ' বা ভাষাচিত্র নিয়েই কারবার করে; ভাব সেখানে অত্যন্ত গৌণ, মুখ্য হ'ল ঐ ভাষাচিত্র। তাঁর কথা উদ্ধৃত করে দিই:

"It deals with images and not with ideas."

অবশ্য আমাদের মতে ল্যাম্বোর্ণের এই কথা অতিশয়োক্তি দোষদুষ্ট। ষ্টিফেন এবং ব্রাউনের তাঁদের "Realm of Poetry গ্রন্থে আমাদের মতের সমর্থন আছে। ল্যাম্বোর্ণ যে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন সে সত্যটির প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁরা লিখছেন:

"Is it not truer to say that it bodies forth the ideas, even the most abstract through the medium of images?"

ওঁরা ঠিকই বলেছেন যে, কাব্য আইডিয়া বা ভাবকে প্রকাশ করে ছবির মাধ্যমে। সে ছবি সত্য হয়, সে ছবি সুন্দর হয় কবির ভাবনার আলোয় আলোকিত হয়ে। কাব্য-সৃষ্টি করতে হলে বা কবিতার সঠিক মর্মকথাটি বুঝতে হলে মানুষের কল্পনাশক্তিকে সংহত ও সুসংযত করে তুলতে হয়। সর্ এ. টি. কুইলার কাউচ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "The Art of Writing"-এ দেশের যুবক-যুবতীদের কবিতা লেখার"

উপদেশ দিয়েছেন। কবিতা লেখার ফলে মানুষের কল্পনা উদ্দীপিত হয়। কল্পনার এই উদ্দীপন ঘটে মানুষের রূপ-সৃষ্টি-প্রয়াসে—সে কবিতাই হোক, উপন্যাসই হোক আর গল্পই হোক। এই ধরণের সাহিত্য-সৃজনের প্রচেষ্টা মানুষের আন্তরশক্তিকে সক্রিয় করে দেয়; তার মনে কল্পনাশক্তির বিস্তার ঘটে অভাবনীয় রূপে। বিশেষজ্ঞদের মতে রূপকল্পের প্রয়োগসাধনের ফলে কবির কল্পনা সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। সে তার পথ পায় যেখানে আপনাকে প্রকাশ করবার সীমাহীন অবকাশ আছে ঃ

'And in almost any exercise in composition such training can be given. Particularly valuable, it seems to me, are exereises in the expression of ideas and the description of things through imagery—the very warp and woof of poetry.'—*The Realm of Poetry*, p. 145.

ভাবের প্রকাশ ও রূপকল্পের ব্যবহার—এরা যেন টানা-পোড়েনের সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। যেমন করে তাঁতের টানা-পোড়েনে কাপড় বোনা হয় ঠিক তেমনি করেই কবিমনের ভাবনার প্রকাশে ও যথাযথ রূপকল্পের ব্যবহারে কাব্য সৃষ্ট হয়। এ কথা অতি সত্য যে, রূপকল্প কাব্যমাধুর্যকে গাঢ়তর করে। এ সত্যের প্রকাশ আমরা দেখেছি পশ্চিমে। প্রাচ্যেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। রবীন্দ্রনাথ এই রূপকল্প-রীতিকে গ্রহণ করেছেন অন্য দেশের কবিদের মতই। তাঁর কাব্যে আমরা রূপকল্পের বহুল প্রয়োগ দেখতে পাই।

রবীন্দ্রকাব্যে রূপকল্পের মাধ্যমে ভাবরূপ চিত্ররূপ গ্রহণ করেছে। তাকে চোখ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছি যাকে মন দিয়ে বোঝাও দুরূহ। 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে'—সেখানে রেখা আর রং, বচন আর বাচনভঙ্গি দিয়ে পূর্ণ চিত্র আঁকার প্রয়াস করেছেন কবি। আমরা এই নিবন্ধে বিচার করব রবীন্দ্রনাথের এই রূপকল্প প্রয়োগের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা। কবিতার উৎস হ'ল কল্পনা। সে কবি-কল্পনার বহুমুখী স্রোতপথে পলিমাটি পড়েছে দিনের পর দিন আর সেখানে কাব্যকুসুমের অজস্রতা গৌড়জনকে মুগ্ধ করেছে তার রূপে এবং গন্ধে। রবীন্দ্রনাথের কল্পনার স্বরূপ বিচার করতে গিয়ে এ কথা আমরা বুঝি—কবির কল্পনা যে বিচিত্র সুবিশাল প্রচ্ছদপট সৃষ্টি করেছে তা সীমা ও অসীমের, শান্ত ও অনন্তের টানা-পোড়েনে গ্রথিত।

কবি-কল্পনা অনন্তের দিকে ধেয়ে গেছে। প্রতি মুহূর্তে কবি অনুভব করেন পাওয়াকে ছাড়িয়ে না-পাওয়ার দিকে অভিসারের দুর্নিবার আকর্ষণ। তাই কবিমন সদা চঞ্চল। সুদূরের আহ্বান কবিকে উন্মনা করে দেয়, তিনি বলেন, 'আমি সুদূরের পিয়াসি'। তার পরশের লোভে বিমুগ্ধ কবি-মন বারে বারে অপরিচিত জগতে ছুটে চলে যায়। সে জগৎ অনাস্বাদিতপূর্ব। সে 'অন্য কোথা'র মায়া কবিকে নিরন্তর আহ্বান করে। তাই ত কবির অন্তহীন অভিসার। সে চলার বেগ কবির চোখে সর্বত্র বিরাজমান। কবি দেখেন সারা বিশ্ব চলমান। উপনিষদের ভাবধারার উত্তরসাধক, 'চরৈবেতি' মন্ত্রে দীক্ষিত কবি দেখেন যে স্থাণু, স্থাবর পর্বতও বৈশাখের মেঘের মতই উড়ে চলে যেতে চায়। নিরুদ্দেশের পথে তারও বুঝি অভিসার। তরুশ্রেণী উধাও হয়ে যায় অমর্ত্যের প্রত্যন্তসীমায়। সীমা চায় অসীমের ক্ষণিক স্পর্শ। তাই ত বিশ্ব জুড়ে এই গতির সাধনা। দেহের তটে সীমায়িত মানুষের অসীমের সম্ভোগের তৃষ্ণা অহোরাত্র জেগে থাকে। কবির ভাষায় সে আকুতি হাজারো তন্ত্রীর মূর্চ্ছনায় সহস্র সঙ্গীতধারায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। কবিকণ্ঠে শুনি ঃ

"আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসি,
দিন চলে যায়, আমি আনমনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে,
ওগো প্রাণে মনে আমি যে তাহার পরশ পাবার প্রয়াসী।"

['আমি চঞ্চল হে'—উৎসর্গ]

এই স্পর্শলাভের ব্যাকুলতা, মিলনাকাঙ্ক্ষা কবিকে কোন্ এক রহস্যলোকের দিকে নিরন্তর আকর্ষণ করে। এ ডাকে হয় ত সব সময় সাড়া দেওয়া সম্ভব হয় না। কবির মর্ত্যবন্ধন তাঁর চলার পরিপন্থী। তাই কখনও কখনও কবি একান্তে বসে মানুষের পথ-চলা দেখেন। তাতেও তাঁর তৃপ্তি, তাতেও তাঁর আনন্দ। চলতি পথের ধারে বসে কবি অগণিত মানুষের মিছিল দেখেন। তাদের চলার ছন্দ কবিকে আনন্দ দেয়। এ হ'ল তাঁর বাসনার বিকল্প পরিতৃপ্তি। তাদের আনন্দের ভোজে তিনিও অংশভাগী হন। অন্য মানুষের জীবনপাত্রে যখন মাধুরীর প্রাচুর্য, তখন কবির জীবনেও ত ফসল ফলবে—যে ফসলে আনন্দলোকের অমৃত-স্পর্শ আছে। তাই তাদের আনন্দ দেখে কবিও মনের আনন্দে বলে ওঠেন ঃ

'আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ।
খেলে যায় রৌদ্র ছায়া, বর্ষা আসে বসন্ত।
কারা এই সমুখ দিয়ে, আসে যায় খবর নিয়ে—
খুশি রই আপন মনে, বাতাস বহে সুমন্দ।

['পথ-চাওয়া'—গীতিমাল্য]

এ ত গেল বিকল্প পরিতৃপ্তির কথা। অনন্তের পথে কবির নিত্য অভিসার সফল হয় নি, ধন্য হয় নি মিলনের নিবিড়তায়। সীমাকে ছেড়ে অসীমকে ধরার ব্যর্থ প্রয়াস কবিকে দুঃখ দিয়েছে। তবু প্রথম জীবনে কবি অনন্তের হাতছানিকে উপেক্ষা করতে পারেন নি; বারে বারে ছুটে

গেছেন এই অ-ধরা মরীচিকার পিছনে। এই পরম পরিণতি-বিহীন চলার আবেগটাকে কবি যথাযথ ব্যক্ত করেছেন তাঁর "সিন্ধুপারে" কবিতায় ঃ

"বিদ্যুৎ বেগে ছুটে যায় ঘোড়া বারেক চাহিনু পিছে।
ঘরদ্বার মোর বাষ্পসমান মনে হল সব মিছে।
কাতর রোদন জাগিয়া উঠিল সকল হৃদয় ব্যেপে,
কণ্ঠের কাছে সুকঠিন বলে কে তারে ধরিল চেপে।"

জীবনদেবতাকে কাছাকাছি পাবার, তাঁর সন্নিধিলাভের প্রয়াস কবিকে অনেক দুঃখ বরণ করিয়েছে। সে বেদনায় হয় ত নিবিড়তর আনন্দের সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি ছিল। তবু কবি সে বেদনাকে পরিহার করতে চেয়েছেন। না-পাওয়ার ব্যর্থতাকে সত্য হতে দেন নি তাঁর জীবনে। অনন্তের আনন্দ মিথ্যা নয়। সে চিরসত্য কবির সমস্ত ক্ষতিকে মিথ্যা করে দিয়ে অম্লান গৌরবে আপনাকে ঘোষণা করেছে। কবি ফিরে এসেছেন আবার তাঁর অতিপরিচিত জগতে, যেখানে শিশুরা খেলা করে, যেখানে মানুষেরা আজও মানুষকে ভালবাসে। সেখানেই তাঁর বাকী জীবনের সাধনা চলল। তিনি সীমা অসীমের মিলন দেখতে চাইলেন এইখানে, অতিপরিচয়ের দৌরাত্ম্যে মলিন তাঁর পারিপার্শ্বিকে। বিপুল সুদূরের প্রাণ-মাতানো বাঁশীর সুর আর কবিকে উন্মনা করে দেয় না। আর নিরুদ্দেশ যাত্রার মোহ কবির জীবনে নেই। তাই তিনি 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থে জীবনদেবতার উদ্দেশে বলেন ঃ •

"আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী ;
বল কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী ?"

কবি আর দূর থেকে সুদূরে যাত্রা করতে অনিচ্ছুক। এখন তাঁর ঘরে ফেরার পালা। তাঁর ঘর তাঁকে ডাক পাঠিয়েছে ; সে অদৃশ্য বিপুল টানে কবিমন গৃহাভিমুখী। তাই সে জীবনদেবতার মনের অভিপ্রায়টুকু জানতে চায়, বুঝতে চায় তার নিগূঢ় উদ্দেশ্য। এ বোধ তখন তাঁর হয়েছে যে, চলাই একমাত্র সত্য নয় ; স্থিতিরও প্রয়োজন আছে মানুষের জীবনে। শুধু উধাও হয়ে যাওয়াই সত্য নয়, চলে আসা, প্রত্যাবর্তন করা সেও সত্য। তাঁর কাছে সত্যের আর এক দিক উদ্ঘাটিত হ'ল। তাই ত রবীন্দ্রনাথ বারে বারে ফিরে আসেন তাঁর অতিপরিচিত অতি আপন ছোট্ট আবাসভূমিতে। এই কারণে অনেকে বলেন রবীন্দ্রনাথ মিষ্টিক নন। অতীন্দ্রিয় লোকে অভিসারই যদি কবির জীবনে একমাত্র সত্য হ'ত তা হলে আমরা অসঙ্কোচে রবীন্দ্রনাথকে মিষ্টিক আখ্যায় ভূষিত করতে পারতাম। কিন্তু সম্মুখপথে গতিই ত রবীন্দ্রমানসের একমাত্র সত্য ধর্ম নয়। যাওয়া-আসার টানা-পোড়েনে রবীন্দ্র-জীবন ও দর্শন গ্রন্থিত। এই ফিরে আসার জন্যই রবীন্দ্রনাথ মিষ্টিক হয়ে ওঠেন নি।

এ সত্য কবিগুরু বারে বারে উপলব্ধি করেছেন যে, দুরন্ত গতিই মানুষকে অনন্তের প্রতিবেশী করে না। তাকে পাওয়ার অন্য পথ আছে। তার সান্নিধ্য ঘরে বসেও পাওয়া যায়, শুধু সে বোধের প্রয়োজন যে বোধ মানুষকে সীমার মধ্যেই অসীমকে দেখায়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই বোধের অধিকারী ছিলেন বলেই ফাটলধরা প্রাচীরে ফোটা নামগোত্র-হীন ফুলের কথা বলতে গিয়ে বিশ্ববিধানের কথা বলেন। সারা সৃষ্টি যে একই সূত্রে গ্রথিত। একের অর্থ ঠিকমত বুঝতে হলে বিশ্বভুবনের সৃষ্টিরহস্যটি আয়ত্ত করতে হবে। ছোটবড় সবার মধ্যেই সেই অনন্তের স্বাক্ষর রয়েছে। তাই ত কবি ছোট, বড়, দীন, দরিদ্র সকলের মধ্যেই চিত্তের স্থাপনা করার সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর ঘর, তাঁর পরিবেশ, তাঁর ভুবন নূতন অর্থে ব্যঞ্জনাময় হয়ে তাঁর কাছে প্রতিভাত হ'ল। শেষবয়সে জ্ঞানবৃদ্ধ কবির কণ্ঠে তাই শুনি ঃ

"এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি,
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
এই মহামন্ত্র খানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের
যা কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।
তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে—
সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে।"
['মধুময় পৃথিবীর ধূলি'—আরোগ্য]

এ হ'ল কবির পরিণত বয়সের সত্য-দর্শন। জীবনের ও জগতের সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির মধ্যেও অনন্তের স্পর্শ আছে। মৃন্ময়ী ধরণীর প্রতিটি ধূলিকণায় অক্ষয় অমৃতভাণ্ডের আভাস পান কবি। যৌবনের সেই চঞ্চলতা, মধ্যবয়সের সেই পলায়নী মনোবৃত্তি আর নেই। কবি আর তাঁর পরিচিত পরিবেশকে অস্বীকার করে 'অন্য কোথা'র খোঁজে বার হন না। স্বীকার করে নেন তিনি তাঁর অতিপরিচিত ক্ষুদ্র পরিবেশটিকে—তার মধ্যেই আবিষ্কার করেন মধুরসের অনন্ত উৎস। স্বর্গের আনন্দ নেমে আসে মর্ত্যের ধূলিতে। এই মহাসত্যের উপলব্ধিই কবির চরিতার্থ জীবনের মহাসম্পদ। সে সত্য কবিকে পূর্ণ করেছে। অন্তরে তাঁর আনন্দের সম্পদ, মধুরসের অফুরন্ত ঐশ্বর্য। তাই ত কবি বিদায় নেবার আগে এই মাটির তিলক পরেন তাঁর কপালে, দুর্যোগের মায়ার আড়ালে সত্যের নিত্য জ্যোতিকে প্রত্যক্ষ করেন

তাঁর ঘরের বাতায়ন থেকে। অনন্ত অভিসারিকার স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন সত্য হয়েছে নূতন জীবন-দর্শনের পটভূমিতে। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় রবীন্দ্রমানসে সীমা-অসীমের নিত্য-লীলাটিকে সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তাঁর কথায় বলি ঃ

"অসীম আকাশ আঙিনার ক্ষুদ্র আকাশের মধ্যে ধরা দেয়, ততটুকুর মধ্যেই তাহার বিচিত্র রূপ ফুটিয়া উঠে; আবার এই খণ্ড বিচ্ছিন্ন আকাশই সুবিস্তৃত আকাশের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করে। বিশ্বজীবন আমার ব্যক্তি-জীবনের মধ্যে ধরা দিয়া তবে তাহার বিশেষ অভিব্যক্তি লাভ করে। সেই আমার ব্যক্তিজীবনই আবার বিশ্বজীবনের মধ্যে নিজেকে বিসর্পিত করিয়া নিজের সার্থকতা খুঁজিয়া পাইতে চায়। এমনি করিয়াই সীমায় অসীমে, খণ্ডে পূর্ণে, ব্যক্তিজীবনে বিশ্বজীবনে একটি অশেষ অপরূপ চিরন্তন লীলা চলিয়াছে; এই লীলাই সৃষ্টির সৌন্দর্য্য, ইহাই আনন্দ। এই সৌন্দর্য্য, এই আনন্দ, ইহার পরিপূর্ণ রসটিকে রবীন্দ্রনাথ আকণ্ঠ পান করিয়াছেন, ভোগ করিয়াছেন। একটি অপূর্ব সুগভীর রহস্যরূপ অনুভব করিয়াছেন।"

[রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, পৃঃ ৮]

এই সুগভীর রহস্যরূপের অনুভব সম্ভব হয়েছে সীমায়িতের মধ্যে অসীমের নিত্য অবস্থিতির ফলে। প্রথম যৌবনে কবি হয়ত এই সীমা-অসীমের মিলনকে জ্ঞানের বস্তু হিসাবে জানতেন। সে মহাসত্যের উপলব্ধি তাঁর হয় নি পরিণত বয়সের মানসিক পূর্ণতা না আসা পর্যন্ত। তাই দেখি বারে বারে সম্মুখের পথে অগ্রসরণ, আবার ফিরে আসা—এ দুয়ের নিরন্তর আবর্তন। কবির এ কথা মনে হয়েছে বারে বারে যে সমুখের পথে অশান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলা নিরর্থক। অনন্তের জন্য এই গোপন অভিসার একান্তই অর্থহীন। তাঁর চিরজীবনের যে তৃষ্ণা সে তৃষ্ণা বুঝি আর মিটল না। যে জীবন শাশ্বত, মুক্ত ও সীমাহীন, সে জীবনের অধিকার কবি বুঝি পেলেন না। তাই 'মানসী'তে কবির কণ্ঠে হতাশার কথা ধ্বনিত হয়ে ওঠে ঃ

"শুধু আমারি জীবন মরিল ঝুরিয়া
চির জীবনের তিয়াষে।
এই দগ্ধ হৃদয় এতোদিন আছে কী আশে?"

কবি সেই অশেষকে আপনার মধ্যে পরিপূর্ণ করে পেতে চান। এই অশেষের উপলব্ধিই হ'ল চিরজীবনের উপলব্ধি। অশেষ কবিকে ধরা দেন না। উল্কার মত দুর্ব্বার গতিতে কবি যখন ছুটেছেন তাঁকে পাবার জন্য, তখন তিনি দূর-থেকে সুদূরে চলে গেছেন আপনার প্রজ্জলন্ত কক্ষপথে আরও দূরে যাবার আমন্ত্রণ রেখে। কবির সমস্ত ব্যাকুলতা, তাঁর সব আকুতি ব্যর্থ হয়েছে। মিলন হয় নি তাঁর জীবনদেবতার সঙ্গে। তিনি তাঁর কাছে গেছেন, তাঁর আভাস পেয়েছেন, তবু সন্ধান ত পেলেন না। এই আভাস পাওয়ারও আনন্দ আছে। কবি এই আনন্দটুকুকে সম্বল করেই ফিরে আসেন। ফিরতি পথে তাঁর কণ্ঠে গান শুনি, সে গানে ঐ আভাস পাওয়ার আনন্দের প্রকাশ। সে আনন্দ বর্ণে বর্ণে রেখায় রেখায় অপরূপ রূপমাধুর্যের সৃষ্টি করেছে। তাঁর গান, তাঁর কবিতা চিত্রধর্মী হয়েছে। রূপকল্পের অসঙ্কোচ ও স্বচ্ছন্দ প্রয়োগে কবি বিদেহী আনন্দের বার্তাকে রূপময় করে তুলেছেন আমাদের জন্য। রূপকল্প ইন্দ্রধনুর বর্ণবিন্যাসে অনন্ত রূপমাধুরী বিস্তার করেছে। তবে এখানে একথা মনে রাখতে হবে যে, এই ফিরতি পথের গানে পূর্ণের পরশের প্রসাদ গুণটুকু তত দিন ছিল না যত দিন না কবি সীমার মধ্যেই অসীমকে প্রত্যক্ষ করে তাঁর এই অনন্তের জন্য নিরন্তর অভিসারকে পরিহার করেছিলেন। যেদিন তিনি স্পর্শের মধ্যে স্পর্শাতীতের সন্ধান পেলেন, দৃশ্যের মধ্যে দৃশ্যাতীতকে দেখলেন দুটি নয়ন ভরে সেদিন তাঁর জীবন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি বুঝলেন যে, তাঁর দেবতা তাঁর মাটির ঘরে নেমে আসবেন অমরার ঐশ্বর্য ত্যাগ করে। তাই তাঁর কণ্ঠে শুনি গভীর প্রত্যয়ভরা পরম আশ্বাসের কথা ঃ

"সকাল সাঁঝে সুর যে বাজে ভুবনজোড়া তোমার নাটে
আলোর জোয়ার বেয়ে তোমার তরী আসে আমার ঘাটে।
শুনব কী আর বুঝব কী বা, এই ত দেখি রাত্রি দিন
ঘরেই তোমার আনাগোনা, পথে কী আর তোমায় খুঁজি।"

['নিঃসংশয়'— গীতিমাল্য]

এই সত্যটির উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিমনের পথে পথে সংক্রমণ স্তিমিত হয়ে আসে। কবি ঘরে ফেরেন। এবার তাঁর প্রত্যাবর্তনের পালা। যেদিন থেকে তাঁর ফিরতি পথে চলা সুরু হ'ল, সেদিন থেকে তাঁর উপভোগের সুরু। ফেরার পথে এখানে-ওখানে মহীরুহের শ্যামচ্ছায়ায় দু'দণ্ড বিশ্রামের অবসর আছে। তখন কবি দু'চোখ ভরে পরিবেশের শোভাটুকু দেখে নেন। এবার তিনি পত্রে, পুষ্পে, শ্যামশস্পে সমৃদ্ধ অনন্তযৌবনা ধরণীকে দেখে নেবার অবকাশ পেলেন—সে সৌন্দর্য আকণ্ঠ পান করলেন। অনন্তের পথে নিরন্তর ধাবমানতার নিরর্থক অবসাদ কেটে গেল। তাঁর আনন্দ গান হয়ে, সুর হয়ে ফুটে উঠল। কথায় কথায় বর্ণাঢ্য আলিম্পন আঁকলেন কবি। বাণীচিত্র অপূর্বসুন্দর হয়ে উঠেছে কবির অহেতুক আনন্দের পরশ পেয়ে। খণ্ডচিত্র ও পূর্ণাঙ্গ চিত্রের সহায়তায় কবি গভীর তত্ত্বকে, দুরূহ ভাবকে, অন্তহীন আনন্দকে আমাদের মনের ঘাটে ঘাটে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর আনন্দের প্রসাদ আমরা পেয়েছি। ঘটে ঘটে

সে প্রসাদ অক্ষয় হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ অনলস প্রয়াসে ছবির পর ছবি এঁকেছেন এই ফিরতি পথচলায়। অনন্তের পথে রবীন্দ্র-মানসের অভিসার ব্যর্থ না হলে, তিনি আবার সীমার মাঝে ফিরতেন না। তাঁর অভিসার চিরদিনই সেই অশেষের পলায়ন-পথের দিকে চলত। আমরাও রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম সৌন্দর্যের আকর রূপকল্পের অনুপম সৌন্দর্যরস থেকে বঞ্চিত হতাম। কেননা কবি যখন অনন্তের পথে যাত্রী তখন তাঁর আনন্দ-উপলব্ধি বা আনন্দ-পরিবেশনের অবসর কোথায়? জীবনদেবতার ছলনাময় আহ্বানে কবি যখন ছুটেছেন তখন তাঁর বিভ্রান্ত মনের চিত্র আমরা পাই 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থে :

"মাঝে মাঝে যেন চেনা চেনা মতো
মনে হয় থেকে থেকে।
নিমেষ ফেলিতে দেখিতে না পাই
কোথা পথ যায় বেঁকে।
মনে হ'ল মেঘ, মনে হ'ল পাখি,
মনে হ'ল কিশলয়
ভালো ক'রে যেই দেখিবারে যাই
মনে হ'ল কিছু নয়।"

এই হ'ল চলতি পথের বাস্তব চিত্র। সেখানে সবই অনির্দিষ্ট, রূপহীন, রসহীন। এই আবছা, অসম্পূর্ণ জগৎ ত কাব্যের বিষয়বস্তু হতে পারে না। এই রূপহীন জগতের প্রকাশ যদি কাব্যে ঘটে তবে সে কাব্য প্রকৃত কাব্যপদবাচ্য হতে পারে না। তাই বলছিলাম যে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্য হ'ল ফিরতি পথের গান। সে গানে ফুটে উঠেছে অনন্তকে আভাসে একটু দেখে নেওয়ার অপরিসীম আনন্দ। এর থেকেও বড় আনন্দ, মহত্তর আনন্দ অবশ্য কবি লাভ করেছেন তখন যখন তিনি সীমার মধ্যে দেখেছেন সেই বিশ্ব-দেবতার আসন পাতা। সে কথা এখন থাক্। ফিরতি পথে কবি যে গান গাইলেন মনের আনন্দে, সে গানে আনন্দ-লোকের জাদু, নিত্যলোকের মায়া। সে গান রূপ-সমৃদ্ধ, রসময় ও অপূর্ব ব্যঞ্জনামণ্ডিত। সে গানেই রূপকল্পের প্রতিষ্ঠা ও পরিণতি। রূপকল্পের সৃষ্টিতে কবির নিজের ভোগ সমৃদ্ধ হ'ল, মাধুর্যমণ্ডিত হ'ল আর অপরের উপভোগের ক্ষেত্র বিস্তৃত হ'ল। এই হ'ল রবীন্দ্রকাব্যে রূপকল্পের জন্মকথা। বৈরাগ্য-সাধন মন্ত্র যাঁর জীবনমন্ত্র ছিল না সেই রবীন্দ্রনাথ ভোগের ক্ষেত্রকে রসময় করার জন্য রূপকল্পের প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁর কাব্যে ও গানে।

কবি যে আনন্দরস আকণ্ঠ পান করেছেন তার স্বাদ তিনি অপরকেও দিতে চেয়েছেন পরিপূর্ণ রূপে। কিন্তু কবি-মানসের অশরীরী সে আনন্দের যথাযথ প্রকাশের ভাষা নেই' কবির সে অনুভূতি কবির কাছেই সত্য। ভাষায় তার রূপায়ণ সম্ভব নয়। তাই ত সে আনন্দানুভূতিকে চিত্রের ভাষায় রূপায়িত করতে হয়। এমন করেই রূপকল্পের সৃষ্টি হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও গানে। আমরা এখন এই রূপকল্পের চরিত্র বিচার করব।

কবিগুরুর কল্পনায় নানা ভাবনা রূপ পরিগ্রহ করেছে—তার বেশবাস, তার বর্ণবিন্যাস অপূর্ব। নির্বিশেষ বা অ্যাবস্-ট্রাক্টকে বিশিষ্ট রূপে প্রকাশ করা হ'ল কবি-মানসের রীতি। রবীন্দ্রনাথ এই রীতির ব্যতিক্রম নন। কলমের আঁচড় কেটে কেটে ছবি তিনি অনেক এঁকেছেন—তাদের কোনটি লিরিকধর্মী, আবার কোনটি-বা হয়েছে এপিকের সগোত্রীয়। কোথাও-বা ব্যঞ্জনার ক্ষেত্র সামান্য এবং সীমাবদ্ধ আবার কোথাও-বা সে ব্যঞ্জনা পাঠককে এক নতুন কল্পলোকের প্রাণকেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করেছে। কোথাও অল্প কথায় ছোট প্রচ্ছদপটে ছোট কথাচিত্র ফুটেছে আবার কোথাও-বা অনেক কথায় একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্রের সৃষ্টি করেছেন কবি। ছোট ছোট আঁচড়ে, অল্প কথায় যে খণ্ডচিত্র রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন তার রূপমাধুর্য কম নয়। উদাহরণ দিই। রূপহীন মৃত্যুকে রূপময় করেছেন, সহজ করেছেন, দুর্জ্ঞেয় মৃত্যুরহস্যকে আমাদের বোধের কাছে স্বচ্ছ করে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বর্ণাঢ্য রূপকল্পের সহায়তায়। যে রূপে মৃত্যুকে দেখি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, সে রূপ ত ভীষণ নয়। মৃত্যুর সে মোহন রূপ দেখে আমরা মুগ্ধ হই। মনে হয় মৃত্যু আমাদের অতি প্রিয়; সে প্রাণের অতি আপনার জন—আত্মার আত্মীয়। ঋষি কবির দৃষ্টিতে যে রূপটি ধরা পড়েছে, সে রূপ ত আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। কবির চোখে যা সত্য হয়েছে সে রূপ ত আমাদের চোখে সত্য হতে পারে না। কারণ আমাদের চোখ ত তৈরি নয়। ঋষির ধ্যাননেত্রে যে রূপ ধরা পড়ে, সে রূপ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সে নিবিড়তম উপলব্ধির ভাষা নেই। তাই কবি রূপকের আশ্রয় নেন। কবি ছবি আঁকেন—সে হ'ল কথা দিয়ে আঁকা ছবি। তিনি মৃত্যুকে বররূপে কল্পনা করেন; পথশ্রান্ত মানুষের প্রাণ যেন নববধূ। বর আসছে তার নববধূকে বরণ করে নেবার জন্য। প্রাণ শিহরিত, কম্পমান। নববধূর মিলনের প্রত্যাশা তার দেহে মনে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর লিপিকুশল লেখনীর টানে মধুর রসঘন কথাচিত্রের সৃষ্টি করলেন :

"ওগো মৃত্যু সেই লগ্নে নির্জন শয়নপ্রান্তে এসো বরবেশে,
আমার পরাণবধূ ক্লান্ত হস্ত প্রসারিয়া বহু ভালোবেসে
ধরিবে তোমার বাহু, তখন তাহারে তুমি মন্ত্র পড়ি নিয়ো,
রক্তিম অধর তার নিবিড় চুম্বন দানে পাণ্ডু করি দিয়ো।"

কবি মনন-সাধনের দুর্লভ মুহূর্তে যে সত্যটি উপলব্ধি করে-ছিলেন তাকে তিনি সর্বজনবোধ্য ভাষায় পরিবেশন করলেন। যে ছবি তিনি আঁকলেন তার আবেদন সর্বকালের সর্বদেশের মানুষের কাছে সত্য। অতি দুরূহ তত্ত্বকে ঘরোয়া কথায় পরিবেশন করলেন। সকলের মনের কাছে কবির অনুভূতি সত্য হয়ে উঠল বর্ণনার প্রসাদগুণে। এই ধরণের রূপকল্পের উদাহরণ রবীন্দ্রকাব্যের সর্ব্বত্র রয়েছে। মৃত্যু সম্বন্ধেই রবীন্দ্র-নাথের আর একখানি অনবদ্য কথাচিত্রের কথা বলি। মৃত্যুকে কবি জীবনের জন্মদাত্রী মাতা হিসাবে দেখেছেন। সে আর এক মহনীয় রূপ—কবিমনের সে আর এক নিবিড় উপলব্ধির কথা। জীবন ও মৃত্যু যেন দিন আর রাত্রিকে অবিচ্ছিন্ন ধারায় একে অপরের অনুগমন করে। মৃত্যুর কোলেই জীবন আবার নূতন করে জন্ম নেয় পুরাতনের জীর্ণ জরাকে ঝরিয়ে দিয়ে। মৃত্যু হ'ল জীবনের উৎস—নবীন প্রাণধারার গঙ্গোত্রী। এ সত্য কবি-সৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। কবি তাকে পরিবেশন করলেন আমাদের কাছে একটি সুন্দর ছবি এঁকে :

"দিনান্তের মুখ চুম্বি' রাত্রি ধীরে কয়
আমি মৃত্যু তোর মাতা নাহি মোরে ভয়।
নব নব জন্ম দানে পুরাতন দিন,
আমি তোরে করে দিই প্রত্যহ নবীন।"

এ ত গেল জীবন-মৃত্যুর রহস্যের কথা। লোকায়ত ও লোকাতীতের সম্বন্ধের কথা। আর একটি সম্বন্ধের কথা বলি। প্রেমের পটভূমিতে নরনারীর মধুর সম্পর্ক যুগে যুগে কবি ও সাহিত্যিকদের প্রেরণা যুগিয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যে প্রেমের বহু বিচিত্র রূপ ফুটে উঠেছে নানা চিত্রের মাধ্যমে। নারীর চিরন্তনী [illegible] মানুষের জীবনের প্রেম-আখ্যানকে নিত্য নূতন রূপ এবং রঙে সুন্দর করেছে। পুরুষ পাছে সহজে নারীর প্রেম-লীলার ছলটুকু ধরে ফেলে তাই ত তার প্রেমলীলায় অন্তহীন ছলাকলা। পুরুষ পাছে সহজে নারীকে বোঝে তাই ত কত না ছলে নারী তার সহজ রূপটিকে প্রচ্ছন্ন করে রেখেছে। এ ছলাকলাপূর্ণ প্রেম-লীলার পরিণতি আত্মনিবেদনে। নারীর সেই চরম আত্ম-নিবেদনের ধারা অনুপম রূপকের সাহায্যে কবি নিবেদন করেছেন রসিকজনের কাছে তাঁর 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থে। আমি 'অপরাজিত' কবিতাটির কথা বলছি :

"বিমুখ মেঘ ফিরিয়া যায় বৈশাখের দিনে
অরণ্যেরে যেন সে নাহি চিনে ;
ধরে না কুঁড়ি কানন জুড়ি, ফোটে না বটে ফুল।
মাটির তলে তৃষিত তরুমূল ;
ঝরিয়া পড়ে পাতা,
বনস্পতি তবুও তুলি মাথা
নিঠুর তপে মন্ত্র জপে নীরব অনিমেষে
দহনজয়ী সন্ন্যাসীর বেশে।
দিনের পরে যায় রে দিন রাতের পরে রাত্তি—
শ্রবণ রহে পাতি।
কঠিনতর যবে সে পণ দারুণ উপবাসে
এমন কালে হঠাৎ কবে আসে
উদার অকৃপণ

আষাঢ় মাসে সজল শুভক্ষণ ;
পূর্বগিরি আড়াল হ'তে বাড়ায় তার পাণি ;
করিয়ো ক্ষমা, করিয়ো ক্ষমা, গুমরি উঠে বাণী ;
নমিয়া পড়ে নিবিড় মেঘরাশি ;
অশ্রুবারি বন্যা নামে, ধরণী যায় ভাসি।
ফিরালে মোরে মুখ,
এ শুধু মোর ভাগ্য করে ক্ষণিক কৌতুক।"

নারীর প্রেমলীলার বৈচিত্র্যটুকু, তার আত্মনিবেদনের রীতিটুকু অতি সুন্দর করে কবি আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন মেঘ ও বনস্পতির রসঘন একটি চিত্র-সৃষ্টি করে। সহজ কথায় সোজা করে বললে বক্রোক্তির রসটুকু আর আমরা পাই না। তাই প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা কেউ কেউ বক্রোক্তিকে কাব্যপ্রাণ আখ্যা দিয়েছেন। নারীর আত্ম-নিবেদনের সামান্য ঘটনাটুকুকে কি বলিষ্ঠ রেখায়, কি বর্ণাঢ্য ব্যঞ্জনায় কবি অনন্য করে তুলেছেন। এটুকু হ'ল কবি-কৃতি। নিপুণ শব্দচয়নের দ্বারা কবি কথা সাজিয়ে সাজিয়ে ছবি এঁকেছেন—কথার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছেন। অনুপম রূপকল্পের যোজনায় রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ। এবার শেষের দিকের রবীন্দ্রকাব্য থেকে একটি উদাহরণ দিই। রবীন্দ্র-নাথের একেবারে শেষজীবনের কাব্যে রং হয়ত ফিকে হয়ে এসেছে ; কিন্তু কথার অভিনব ব্যবহারে ব্যঞ্জনা গভীরতর হয়েছে। তাঁর কবিতা তাঁর ছবির মতই রংচঙে সাজপোশাক বদল করে আসরে নেমেছে অতি সহজ আটপৌরে পোশাকে। তাতে তার সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ হয় নি। বরং সে স্বাভাবিক সৌন্দর্যের দ্যুতি শতগুণ বর্দ্ধিত হয়েছে। শেষজীবনের কাব্যে বর্ণনার তেমন বাহাদুরি নেই, শেষজীবনের ছবিতে রঙের কারিগরির একান্ত অভাব। তাই ত তারা এত সুন্দর হতে পেরেছে, তাই ত তারা বরণীয় হয়েছে বিশ্বের রসিকজনের সভায়। অনেক কথা সাজিয়ে ছন্দের রং দিয়ে আর তিনি কথাচিত্র আঁকেন নি। এখানে-ওখানে সামান্য কয়টি আঁচড় টেনে যেমন করে ছবিকে ফুটিয়েছেন ঠিক তেমনি করেই সামান্য কয়েকটি কথার ব্যবহার করে তিনি অপূর্বসুন্দর ছবি তুলে

ধরেছেন আমাদের মনের সামনে। এখানে অনেক কথার ভিড় নেই। অল্প কথায় তিনি যে জগতের প্রবেশপথে আমাদের নিয়ে গেলেন সেখানে আমাদের কল্পনা মুক্তি পেল সৃষ্টির আনন্দকে পুরোপুরি আস্বাদন করার জন্য। তাই সেটাই হ'ল শিল্পীর সার্থকতর সৃষ্টি। আমরা 'হঠাৎ দেখা' কবিতাটির কথা বলছি। এককালে যাদের ভালবাসা ছিল এমন দুটি নরনারীর হঠাৎ দেখা হয়েছে রেলের কামরায়। ভাবপ্রবণ পুরুষের স্মৃতি-রোমন্থন দ্রুতগামী। তাই সে হঠাৎ আবেগনিবিড় কণ্ঠে মেয়েটিকে প্রশ্ন করে যে তাদের প্রেম কি একেবারেই মরে গেছে ? মেয়েটি এই আকস্মিক প্রশ্নে একটু বিব্রত হয়ে জবাব দেয় 'রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে'। এক অতীন্দ্রিয় সত্যের অপূর্ব প্রকাশ ঘটল রূপকের সাহায্যে। প্রেম মৃত্যুঞ্জয়ী। যেমন করে দিনের আলোর অন্তরালে রাতের সব তারাই লুকিয়ে থাকে ঠিক তেমনি করেই বর্তমানের প্রত্যক্ষ আলোর অন্তরালে অপ্রত্যক্ষ অতীতের প্রেম শুধু আত্মগোপন করেছে। তার মৃত্যু হয় নি। এমনিতর রূপকল্পের ব্যবহারে কবির আশ্চর্য্য নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অসংখ্য কবিতায় এবং গানে। আমরা হৃদয় যমুনা, সমুদ্রের প্রতি, মানস সুন্দরী, [illegible], বিজয়িনী প্রভৃতি কয়েকটি কবিতার কথা বিশেষ করে উল্লেখ করছি। এই রূপকের ব্যবহারে বাস্তবিকই রবীন্দ্রনাথের জুড়ি নেই, রূপকল্পের ব্যবহারে কবিগুরু অনন্যসাধারণ।

আগে আমরা বলেছি যে রবীন্দ্রনাথের রূপকল্প কোথাও-বা গীতিকাব্যধর্মী আবার কোথাও-বা রূপকল্পে মহাকাব্যের মহৎ ধর্মের ব্যঞ্জনা আছে। এ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্য থেকে আমরা যে কয়টি উদ্ধৃতি আহরণ করেছি তা মূলতঃ লিরিকধর্মী। এবার আমরা এপিকধর্মী রূপকল্পের একটি উদাহরণ দিচ্ছি। একথা মনে রাখতে হবে যে, আমরা তাকেই মহাকাব্যধর্মী বলছি যে রূপকল্পের আধার পূর্ণতর ও ব্যাপকতর হয়েছে। এখানে কবি শুধুমাত্র কয়েকটি কথার সাহায্যে একখানি খণ্ডচিত্র রচনা করে গভীরতর অর্থটুকু ব্যঞ্জিত করেন না। এই ধরণের রূপকল্পে মূল বিষয়বস্তুকে পরিস্ফুট করার জন্য কবি আনুষঙ্গিক বিষয়গুলিরও অবতারণা করেন। এপিকধর্মী রূপকল্পে তাই বড় ক্যানভাসের দরকার। সেখানে অনেক কথা, অনেক ছবি ভিড় করে। মহাকাব্যের আখ্যানবস্তু যেমন সুবৃহৎ পটভূমিকাকে আশ্রয় করে ঠিক তেমনিধারাই এপিকধর্মী রূপকল্পে অনেক কথায়, নানান রঙে একটি পূর্ণাঙ্গ কথাচিত্র আঁকার প্রয়াস আছে। শুধুমাত্র ইঙ্গিতে-আভাসে মূল ভাবটিকে রূপায়িত করার কথা কবি ভাবেন না। কবি তাঁর গভীর অনুভবকে পরিপূর্ণরূপে ফুটিয়ে তোলার জন্য কথার পর কথা সাজিয়ে ছবির পরে ছবি এঁকে চলেন। সবটা মিলিয়ে যে আবেদন রসিকজনের কাছে গিয়ে পৌঁছয় তা অপূর্ব মাধুর্যরসে পরিপূর্ণ। 'হৃদয় যমুনা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই ধরণের এপিকধর্মী রূপকল্পের ব্যবহার করেছেন। মানুষের হৃদয়কে কবি যমুনার সঙ্গে তুলনা করেছেন। হৃদয়-যমুনার দুই তটের, তার নীল জলের সে কি বাস্তবানুগ বর্ণনা। নদীতীরের সবটুকু সৌন্দর্য কবিমন আহরণ করেছে নিখুঁতভাবে, তার পরে সে সৌন্দর্যকে হৃদয়-যমুনার দুই তীরে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বর্ষার যমুনা প্রাণাবেগে উচ্ছল। তার দুই তীরে মেঘ নেমেছে—নদীর জল বর্ষণের প্রত্যাশায় অধীর। শ্যামদূর্বাদলে উভয় তীর সমাচ্ছন্ন—বনস্থলী পুষ্পগন্ধে আমোদিত। সে শোভায় মানুষ মুগ্ধ হয় ; নারী কলস ভাসিয়ে দেয় জল নিয়ে ঘরে ফেরার কথা ভুলে গিয়ে। তার মনে মনে স্মৃতি-রোমন্থন চলে—বঞ্জুলবনের মায়া তাকে মোহগ্রস্ত করে। যদি সে নারী স্নানার্থিনী হয় তবে তারও রসঘন চিত্র আছে এইকবিতাটিতে। যমুনার জলে মানুষ ত শুধু গাগরী ভরে নিতেই যায় না ; স্নানার্থিনীদের ভিড়ও ত সেখানে হয়।

তাই কবি তাঁর মানসীকে উদ্দেশ করে বলছেন যে তাঁর হৃদয়-যমুনাতে তাঁর মানসী অবগাহন-স্নানও সেরে নিতে পারেন। সে সুনীল জলের সোহাগ বড়ই মধুর। তার ভাষাহীন স্পর্শে অকথিত অনেক কথাই বলা হবে। কবির মানসী তাঁর হৃদয়ের মর্মবাণীটুকু গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন। সবশেষে হৃদয়-যমুনার নীল জলে আত্মবিলুপ্তি ঘটাবার জন্য কবি তাঁর মানসীকে আহ্বান করছেন। পরিপূর্ণ মিলন হয় এই আত্মবিলুপ্তির মধ্য দিয়ে। আত্মনিবেদনের ধারা সার্থক হয় দয়িতার পরিপূর্ণ আত্মদানে। কবির হৃদয়-যমুনার অতলান্ত গভীরতা ; পরিপূর্ণ নৈঃশব্দ্য সেখানে। কবি তাঁর মানসীকে জীবনের সমস্ত জালজঞ্জাল তীরে ফেলে রেখে সেই নিস্তব্ধ অতলে অবগাহনের জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। সেখানে সকল কর্মের অবচ্ছেদ, সমস্ত ভাবনার শান্তি। সেই মহাশান্তিকে কবি মৃত্যু আখ্যা দিয়েছেন। এই পূর্ণাঙ্গ কথাচিত্রটির সঙ্গে পূর্ব-উদ্ধৃত খণ্ডচিত্রগুলির একটা বর্ণগত প্রভেদ রয়েছে। শেলীর স্কাইলার্ক কবিতাটিতে কয়েকটি লিরিকধর্মী রূপকল্পের সমাবেশ হয়েছে। তাকে আমরা এপিকধর্মী বলব না কারণ সব কয়টি চিত্রই খণ্ডচিত্র—টুকরো টুকরো করে পৃথক পটভূমিতে আঁকা হয়েছে। আর রবীন্দ্রনাথ একখানি সুপরিসর ক্যানভাসে সুবৃহৎ চিত্রের অবতারণা করেছেন তাঁর 'হৃদয়-যমুনা' কবিতায়। শেলীর চিত্রগুলি স্বয়ংপ্রধান, পৃথক এবং অসংলগ্ন। তারা পৃথকভাবে একই ভাবকে দ্যোতিত করেছে। আর 'হৃদয়-যমুনা' কবিতায়

অনেকগুলি ভাব একসঙ্গে দ্যোতিত হয়েছে একটি মূল ভাবের উদ্দীপনের জন্ম এবং এই সমস্ত ভাবচিত্র একটি বৃহৎ পটভূমিকায় বিধৃত। একেই আমরা এপিক্‌ধর্মী রূপকল্প বলছি। এই ধরণের এপিকধর্মী রূপকল্প সকল সাহিত্যেই আছে। রবীন্দ্র-কাব্যে উভয়বিধ রূপকল্পের প্রাচুর্য বিস্ময়কর। এই ভাবগম্ভীর খণ্ডচিত্র ও পূর্ণচিত্রগুলি রবীন্দ্র-কাব্যেকে প্রভাতসূর্যের অপূর্ব রূপচ্ছটায় সুষমামণ্ডিত করছে।

রবীন্দ্রনাথ ও বৃহত্তর বঙ্গ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

সাইমন কমিশনের অন্যতম সুপারিশ ছিল উড়িয়া-ভাষা-ভাষী অঞ্চলসমূহ লইয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন। মুসলিম লীগের দাবি—সিন্ধুকে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী হইতে আলাদা করিয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ সৃষ্টি। এই দাবি যখন দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস স্বীকার করিয়া লইলেন, তখন উড়িষ্যারও স্বতন্ত্র সৃষ্টি স্বীকৃত হইল। কোন্ কোন্ জেলা বা স্থান লইয়া উড়িষ্যা নূতন ভাবে সৃষ্ট হইবে তজ্জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। এস্. পি. ওডোনেল এই কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন; আসামের নেতা তরুণরাম ফুকন ও বোম্বাইয়ের জননায়ক এইচ. এম্. মেহতা সদস্য নিযুক্ত হন। পারলাকামিদির রাজা উড়িষ্যার স্বার্থ, সচ্চিদানন্দ সিংহ বিহারের এবং রাও বাহাদুর নরসিংহ রাজু গারু মাদ্রাজের স্বার্থ দেখিবার জন্য সহায়ক-সদস্য নিযুক্ত হন। বাংলার স্বার্থ দেখিবার জন্য কেহ নিযুক্ত হন নাই।

উড়িয়ারা মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়ার কিয়দংশ দাবি করেন। সমগ্র সিংভূম জেলা যাহাতে উড়িষ্যার অন্তর্গত হয় তজ্জন্য আন্দোলন চালান। বঙ্গের স্বার্থ যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তন্নিমিত্ত ক্যালকাটা উইক্‌লি নোটসে'র সম্পাদক ব্যারিষ্টার পরলোক-গত যোগেশ চৌধুরী (যিনি সাধারণের নিকট জে. চৌধুরী বলিয়া পরিচিত) তাঁহার আপিসে কয়েক জনকে লইয়া একটি প্রাথমিক সভা ডাকেন। পরে একটি কনফারেন্স হয়। সমিতির নাম হয় 'Bengal Re-distribution of Boundaries Committee'।

—রবীন্দ্রনাথ এই কমিটির সভাপতি হন এবং জে. চৌধুরীকে কি কি করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে পরামর্শ দেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি হইলেও আসলে বাংলার ও বাঙালীর কবি। যখনই বাংলার কোন সঙ্কট দেখা দিয়াছে তখনই তিনি আগাইয়া আসিয়াছেন। স্বদেশীযুগে পাবনার প্রাদেশিক কনফারেন্সে সভাপতিত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি বহুবার এইরূপ করিয়াছেন উদাহরণ বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। সেবারেও তিনি সভাপতিত্ব স্বীকার করিলেন। কমিটি মেদিনীপুরের কোনও অংশ যাহাতে উড়িষ্যায় না যায় সে বিষয়ে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের সহিত একমত হইয়া তাঁহাকে সমর্থন করেন এবং সিংভূম জেলা যাহাতে বাংলায় ফিরিয়া আসে সে সম্বন্ধে একটি স্মারকলিপি কমিটির নিকটে প্রেরণ করেন। তৎপরে মেদিনীপুর যাহাতে উড়িষ্যায় না যায় সে বিষয়ে আর একটি স্মারকলিপি প্রেরিত হয়। নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত বঙ্গবিচ্ছেদ প্রতিবাদ সম্মেলনের তরফে জামসেদপুর হইতে আর একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। ইহা ইংরেজী ১৯৩১ সনের ডিসেম্বর মাসের ঘটনা। বর্তমান লেখক এই কমিটির সহকারী সম্পাদক ছিলেন বলিয়া কমিটির কার্য্যাবলী জানেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের জীবনের কর্ম্মপঞ্জীর মধ্যে তাঁহার এই সভাপতিত্বের ও চেষ্টার অনুল্লেখ দেখা যায়।

গৌতম ও অহল্যা

শ্রীকৃষ্ণধন দে

[রামায়ণ-বর্ণিত কাহিনী। ঋষি গৌতমের স্ত্রী অহল্যা স্বামীর অনুপস্থিতিতে গৌতমবেশধারী দেবরাজ ইন্দ্রের ছলনা বুঝিতে না পারিয়া স্বামীজ্ঞানে তাঁহার পরিচর্য্যা করেন। গৌতম ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত জানিতে পারিয়া তপঃপ্রভাবে অহল্যাকে পাষাণে পরিণত করেন। পাষাণে রূপান্তরিত হইবার পূর্ব্বে অহল্যার কাতর প্রার্থনায় দয়ার্দ্রচিত্ত গৌতম বিষ্ণু-অবতার শ্রীরামচন্দ্রের পদস্পর্শে তাঁহার অভিশাপ-মোচন হইবে এই নির্দ্দেশ দেন। উক্ত ঘটনার বহুযুগ পরে শ্রীরামচন্দ্রের পদস্পর্শে অহল্যার মুক্তি-লাভের পর বর্ত্তমান কাব্য-নাট্যের সূচনা। গৌতম তখন অতিবৃদ্ধ হইয়া আশ্রমেই আছেন, অহল্যা-পুত্র শতানন্দও বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু পাষাণে রূপান্তরিতা থাকায় অহল্যার রূপযৌবনের উপর কালস্রোত কোন চিহ্নই আঁকিতে পারে নাই। সময় প্রভাত, গৌতম একাকী। আশ্রমকুটীরে শাপমুক্তা অহল্যা আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন।]

গৌতম

শুনি যেন কার মৃদু পদধ্বনি! কুটীর প্রাঙ্গণ
সদ্যঃস্নাত বালার্ক-কিরণে। আসে বুঝি শিষ্যগণ
বেদপাঠ তরে। নেত্র প্রায়-দৃষ্টিহীন, ন্যুব্জ দেহ
বার্দ্ধক্যের ভারে। আসি এ আশ্রমে কখন্ যে কেহ
প্রবেশে, নাহিক জানি। কেবা তুমি, কি তব জিজ্ঞাসা?

অহল্যা

পরিচয় কিবা দিব? বক্ষে বহি দুরন্ত দুরাশা
বহু যুগযুগান্তের প্রান্ত হতে আসিয়াছি ফিরে
একটি প্রণাম তরে। তব পদ-পুণ্যতীর্থ-নীরে
করে যাব মুক্তিস্নান। সর্ব্ব গ্লানি, সর্ব্ব অপরাধ
চিরবিস্মৃতির বুকে লভিবে তোমার আশীর্ব্বাদ
শুধু এ আকাঙ্ক্ষা মোর। তাই, তব পাশে আসিলাম
শেষ বিদায়ের পথে রেখে যেতে একটি প্রণাম।

গৌতম

নারীকণ্ঠ? কে তুমি কল্যাণি, বীণাবিনিন্দিত স্বরে
প্রণাম জানাতে চাহ? যেন কত দূরদূরান্তরে
কে আজ ফিরাল মোরে! কত যেন পরিচিত সুর!
ঊষর মরুর বক্ষে কোথা হতে সৌরভ মধুর
এল দেব-নির্ম্মাল্যের। বল ভদ্রে, তব পরিচয়।

অহল্যা

সুদূর অতীত-বুকে যাহা আজ পেয়েছে বিলয়,
কিবা হবে সেই পরিচয়ে? হে দেবতা, ক্ষম মোরে,
অতীতের পরিচয় সব আজি লুপ্ত আঁখিলোরে!

গৌতম

তবু চাহি পরিচয়। আমারে দেবতা বলি ডাকে
কে সে নারী? দৃষ্টি মোর আজি যেন কুয়াসায় ঢাকে,
সকলি অস্পষ্ট হেরি। তারি মাঝে কে তুমি কল্যাণি,
একটি বিস্মৃত স্বপ্ন তব স্বরে দিলে যেন আনি।

অহল্যা

প্রণমি চরণে তব। কিবা হবে শুনি মোর নাম?
উপহাসে, অট্টহাস্যে, ধিক্কারে, ঘৃণায় অবিরাম
স্মরণ করেছ যারে, আমি সেই অভিশপ্তা নারী,
তোমার চরণতীর্থে আসিয়াছে দিতে অশ্রুবারি!

গৌতম

অভিশপ্তা? ছিল বটে একজন! তারে কোনদিন
ভুলি নাই। দীর্ঘ কালস্রোতে স্মৃতি হয় নি মলিন
এ দীর্ণ বক্ষের তলে। নাম তার স্বপ্নে জাগরণে
আনন্দে ব্যথায় জাগে! প্রতিদিন যে নাম স্মরণে
এক সাথে নেমে আসে আশীর্ব্বাদ আর অভিশাপ.
সে ত নহে তুমি ভদ্রে। সংবর ও প্রগল্‌ভ প্রলাপ,
কহ সত্যবাণী, কোন্ ঋষিবর পতি তব? কার
গৃহাঙ্গন তব স্বর্গভূমি? বহি নিত্য স্রুক্-হবিঃ-ভার
কর কার যজ্ঞ-আয়োজন? বল ভদ্রে, এ চারু উষায়
আসিয়াছ দ্বারে মোর, কি আশায়, কোন্ জিজ্ঞাসায়?

অহল্যা

জানি প্রভো, চিনিবে না আজি মোরে। এই পাপীয়সী
তব স্মৃতি-স্বর্গ হতে উল্কাসম পড়ে গেছে খসি,
আর সেথা নাহি স্থান। জীবনের সায়াহ্ন বেলায়
ফেলে-আসা অতীতের দীর্ঘপথে কোথায় ধুলায়
ঝরে গেছে কোন্ ফুল কবেকার ছিন্ন মালা হ'তে
কে রাখে সন্ধান তার? বরষার খর নদীস্রোতে
কোন্ পত্র গেল ভাসি অরণ্য কি ভাবে কথা তার?
ভাল, শতানন্দ কোথা?

গৌতম

শতানন্দ ? এখনি তাহার
দর্শন লভিবে তুমি। পুত্র মোর নিত্য এই ক্ষণে
প্রণাম জানাতে আসে উষালোকে আমার চরণে।
দীর্ঘশ্মশ্রু, জটাধারী, বার্দ্ধক্যের পূত সৌম্যবেশে
ঋষিত্বের মহিমায়। নানা শাস্ত্র আলোচনা শেষে
ফিরে যায় ছাত্র-অধ্যাপনে।

অহল্যা

আশ্রম-বালিকা স্বাহা ?

গৌতম

বৃদ্ধা বুঝি লিপ্তা আছে আশ্রমের কাজে, অন্যে যাহা
নাহি পারে শ্রমসাধ্য বলি, স্বাহা তাহা হাসিমুখে
নীরবে সম্পন্ন করে। গোদোহন শেষে সকৌতুকে
করে দুগ্ধ-বিতরণ প্রত্যহ প্রত্যূষে শিশুদলে।

অহল্যা

অঞ্জনা, সে আশ্রম-হরিণী ?

গৌতম

ঐ সপ্তপর্ণতরুতলে
শ্যামশষ্পচ্ছায়ে তার মরদেহ লভেছে বিশ্রাম
বহু বর্ষ আগে। হে কল্যাণি, সত্য কহ, কিবা নাম ?
এত কথা জানিলে কিরূপে ?

অহল্যা

পূর্ব্বজন্মস্মৃতিসম
যেন কোন্ দুরান্তের যবনিকা ঠেলি আসে মম
ছিন্ন ম্লান ছায়াস্বপ্ন। আজ আমি যেন কত দূরে!
যাদের বেসেছি ভাল যাদের ঘিরিয়া কতসুরে
বেজেছে জীবন বীণা, কোথা তারা ? রিক্তা একাকিনী
পথপ্রান্তে পড়ে আছি, কালস্রোতে অতীত কাহিনী
কোথায় মুছিয়া গেছে! যেন ভগ্ন দেউলের তলে
শূন্য দেবতার পীঠে আঁকা শুধু শিলাশতদলে
বিশুষ্ক চন্দন-রেখা! ধারাহারা উষর সৈকতে
অতীতের পদচিহ্ন পড়ে আছে শুষ্ক নদীপথে!

গৌতম

সেই কণ্ঠ, আকুলতা, সেই আবেদনভরা সুর
কত যুগ পরে যেন কানে আজ বাজে সুমধুর!
কিন্তু সে পাষাণময়ী, অনাদৃতা ঘনবনচ্ছায়,
নিশ্চলা, জীবনহীনা, পড়ে আছে মুক্তি-প্রতীক্ষায়!
এ ত নহে সেই নারী। শুনি যেন পদশব্দ কার ?
এসেছ কি শতানন্দ ?

(শতানন্দ প্রবেশ করিলেন)

শতানন্দ

লহ পিতা, প্রণাম আমার।

গৌতম

শতানন্দ, দেখ দেখি কে এসেছে আমার কুটীরে,
আমি বৃদ্ধ, ম্লান-দৃষ্টি, তুমি যদি চেন এ নারীরে!

শতানন্দ

একি! মা ? মা ? পিতা, পিতা, চেয়ে দেখ মা এসেছে আজ
কত যুগান্তের পরে। সেই মূর্ত্তি, সেই তার সাজ
আজিও ভুলিনি আমি! অতীতের কোন্ সে কৈশোরে
যেই মাতৃমূর্ত্তি মোরে বেঁধেছিল চির স্নেহডোরে
তারে কি ভুলিতে পারি ? কহ পিতা, তপোবনচ্ছায়ে
তব যোগবলে আজি পুনরায় এনেছ ফিরায়ে
হারানো অতীত দিন, লুপ্ত যাহা অনন্তের বুকে ?

গৌতম

কার কথা কহ বৎস ? একি বাণী শুনি তব মুখে ?

শতানন্দ

নহে ভ্রম, নহে স্বপ্ন, এ যে মাতা—

অহল্যা

আশিস্ আমার
লহ বৎস শতানন্দ, এর চেয়ে আনন্দ অপার
কোথা আর ? শ্রীরামের পাদস্পর্শে শিলা হতে আজি
মুক্ত আজি, কেটে গেছে অন্ধকার অভিশাপযামী।

গৌতম

কে ? কে ? অহল্যা ? অহল্যা ? অহল্যা এসেছ আজ ফিরে
[illegible] ন ? অন্ধকার কালরাত্রিটিরে
এসেছ পশ্চাতে ফেলি ? পুরাতন পথ নাহি ভুলি
ফিরেছ কি চিনে চিনে আপনার পদচিহ্নগুলি ?
শতানন্দ, শতানন্দ, রটি দাও আশ্রমের মাঝে
অহল্যা এসেছে ফিরে! যে যেথায় লিপ্ত আছে কাজে
অবিলম্বে আসে যেন সব ফেলি।

শতানন্দ

যথা আজ্ঞা পিতা।

(প্রস্থান করিলেন)

গৌতম

অভিশাপ-মুক্তিশেষে নবরূপে চির-আকাঙ্ক্ষিতা
এলে কি আশ্রমে ফিরে ? জীবনের সায়াহ্নবেলায়
ম্লানদৃষ্টি, শ্লথদেহ, শুভ্রকেশ, পীড়িত জরায়
কি দিব তোমারে অর্ঘ্য ? শুধু আছে রিক্ত আশীর্ব্বাদ,
তাই লহ হে কল্যাণি!

অহল্যা

নারীত্বের ঘৃণ্য অপবাদ
বাসিয়াছি শিরে বহি', তুমি দিলে আশীর্ব্বাদ মোরে ?
করিলে না প্রত্যাখ্যান ? কুলপাংশুলায় স্নেহডোরে
আবার বাঁধিলে তুমি ? বল, বল, করেছ কি ক্ষমা
তব অহল্যায় ?

গৌতম

আজি কেটে গেছে বিস্মৃতির অমা,
ক্ষমা করিয়াছি প্রিয়ে, বহু বর্ষ, বহু যুগ আগে
পাষাণী হয়েছ যবে। ধীরে ধীরে মোর পুরোভাগে
রক্ত, মাংস, কেশ, ত্বক, বেদনায় ভরা আঁখি দুটি
পাষাণে গঠিত হ'ল। রক্তাধরে বাণী অর্দ্ধ ফুটি'
আর ফুটিল না! তব শেষ নিঃশ্বাস-স্পন্দনে
অতৃপ্ত কামনাগুলি মূর্চ্ছা গেল আকুল ক্রন্দনে
পাষাণের রেখায় রেখায়। দুই বিন্দু শেষ অশ্রুজল
পাষাণ আঁখির কোণে করিয়া উঠিল টলমল্‌
বুকে ধরি মোর ছায়া! তখনি তোমারে চিনিলাম,
দূরে গেল সব গ্লানি। সেই দিন হতে অবিরাম
তোমারে চেয়েছি ফিরে। মোর সর্ব্ব ধ্যান জপ নতি
নারায়ণপদে নিত্য জানায়েছে কাতর মিনতি
অভিশাপমুক্তি লাগি' তব। শ্রীরামের রূপ ধরি
কবে আসিবেন তিনি, ভাবিতাম দিবা বিভাবরী।

অহল্যা

প্রভো, তব পূরেছে প্রার্থনা। শ্রীরামের রাতুল চরণ
এ দেহ করেছে স্পর্শ, ফিরে আমি পেয়েছি জীবন।

গৌতম

পাষাণ পেয়েছে প্রাণ, শ্রীরামের করুণা অপার!
জানি, তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ বিষ্ণু-অবতার
পতিত-উদ্ধার লাগি। স্পর্শে তাঁর পূত ধরাতল।
তবু জান এ যে কার অন্তরের তপস্যার ফল ?
সুদূর অতীতে কবে ঝঞ্ঝা-ক্ষিপ্ত কালসিন্ধু-নীরে
যে ফুল গিয়াছে ভাসি, তারে কোনদিন পাব ফিরে
মনে নাহি ছিল আশা। আজ তুমি আসিয়াছ প্রিয়ে,
জীর্ণ দেহ, জীর্ণ স্মৃতি লয়ে মোর, বরিব কি দিয়ে ?

অহল্যা

বল প্রভো, কিবা দিতে চাহ তুমি ? ধিক্কার ? লাঞ্ছনা ?
পদাঘাতে দেবে শাস্তি মোরে ? রূঢ় বাক্যে অসহ গঞ্জনা,
তাই দিতে চাহ তুমি ? এ আশ্রমে শুচিশুদ্ধচিতে
অশুচিরে করে দেবে দূর ? ফেলে-আসা দীর্ঘ পথটিতে
আবার ফিরিতে হবে ? যে পক্ষিণী এল ক্লান্তগতি
দিগন্তর হতে, সে কি হেরি দাবদগ্ধ বনস্পতি
কাঁদিবে না নীড়হারা ? অতীতের কলঙ্ককালিমা
এখনো মোছে নি মোর ? জীবনের সব অরুণিমা
এখনো তিমিরে লুপ্ত ? এতটুকু নাই আর আশা
লভিতে চরণে স্থান ? ব্যর্থ তার সব ভালবাসা ?
অথবা নির্ব্বাক্‌ মৌন উপেক্ষার তীব্র কশাঘাতে
ছিন্নভিন্ন অন্তরের শ্রান্তিহীন গূঢ় বেদনাতে
আমারে দহিবে নিত্য ? শুচিতার গণ্ডী টানি মোরে
এক পার্শ্বে দেবে রাখি' বাঁধি চির কলঙ্কের ডোরে ?

গৌতম

এ আশ্রম নহে রুদ্ধ তব তরে প্রিয়ে। তবু এত দিন
কি তপস্যা করেছিনু পাষাণ হইতে অমলিন
তোমারে ফিরায়ে নিতে, জানি আমি আর অন্তর্যামী।

অহল্যা

কেন সে তপস্যা তব ? কেন চেয়েছিলে বল স্বামী,
ফিরাতে এ পাপিনীরে প্রাণোজ্জ্বল দীপ্ত ধরণীতে ?

গৌতম

আপনার অভিশাপ আপনারে দহিতে দহিতে
নিঃশেষ করিয়া গেল! পড়ে আছে শুধু যে অঙ্গার
জরাক্লিষ্ট বার্দ্ধক্যের। নিশিদিন যন্ত্রণা অপার
সহিয়াছি শান্তমুখে তোমার বিরহ লয়ে বুকে।
কতদিন স্বপ্নমাঝে শুধায়েছি তোমারে কৌতুকে—
"কোথা ছিলে এতকাল প্রিয়তমে ? কবে এলে ফিরে ?"
স্বপ্নভঙ্গে চেয়ে দেখি একা আমি শূন্য সে কুটিরে!
কত বর্ষ, কত যুগ ডুবে গেছে কালস্রোত তলে
তবুও ভুলি নি আজো সে বিদায় শেষ অশ্রুজলে!

অহল্যা

কোথা হতে কত যুগ এল, গেল, তার পদধ্বনি
শুনি নাই। আজি দেখি নবরূপস্নাতা এ ধরণী!
তবু মনে হয় যেন তুমি-আমি আছি চিরকাল
প্রেমস্মৃতি বুকে নিয়ে। অতীতের সব ইন্দ্রজাল
দূরে গেছে সরি', আজি অনন্তরাত্রির মৃত্যু-শেষে
নব উষালোক মাখি দাঁড়ায়েছি নববেশে এসে!
পশ্চাতে দুঃস্বপ্ন যেন প্রসারিয়া শতবাহু তার
আমারে ধরিতে চাহে, শুনি তার বীভৎস চিৎকার!
তবু এ সুন্দর প্রাতে লভি আমি মুক্তির আস্বাদ,
সারা অঙ্গ ভরি' পাই ধরণীর স্নিগ্ধ আশীর্ব্বাদ!

গৌতম

আমি ছিনু এত কাল শীর্ণ দেহে তব প্রতীক্ষায়
যুগান্ত-মিলনস্বপ্নে ভাষাহীন গূঢ় বেদনায়।
আশ্রমবাসীরা যবে নিদ্রাক্রোড়ে লভিত বিশ্রাম,
আমি রহিতাম জাগি। বার বার যেন শুনিতাম
তোমারি চরণধ্বনি। শুষ্কপত্রে সঞ্চরিত বায়ু
যেন তব অন্বেষণে। নিভাইয়া প্রদীপের আয়ু
ধীরে সে আসিত কাছে গন্ধ বহি তব কবরীর
কত দূরান্তর হতে। অন্ধকারে নবমালতীর
মদির সুবাসটুকু মনে হ'ত তোমারি নিঃশ্বাস!
অদূরে ভূর্জ্জের বনে ক্রীড়াচ্ছলে অশান্ত বাতাস
তুলিত কম্পিত সুর। যেন তব আকুল মিনতি
পত্রের মর্ম্মরে মিশি ক্রমে হ'ত সকরুণ অতি!
শিয়রের বাতায়নে দেখা যেত দুটি ম্লান তারা
কালো আকাশের গায়ে, মনে হ'ত তুমি নিদ্রাহারা
মোর মুখপানে চেয়ে মেলি আছ স্তব্ধ আঁখি দুটি!
তারপর অর্দ্ধরাতে ধীরে ধীরে শয্যা হতে উঠি
যাইতাম বনমাঝে, যেথা তুমি পাষাণরূপিণী
ন্যগ্রোধতরুর তলে অভিশপ্তা চির-একাকিনী।

অহল্যা

অতীতের শত স্মৃতি দংশে যেন বৃশ্চিকের মত
সহিতে পারি না. তবু শুনিবারে অধীর জাগ্রত
সর্ব্বেন্দ্রিয় মোর। প্রভো, তারপর?

গৌতম

কত বিভাবরী
কেটে যেত তব পার্শ্বে। আমিও পাষাণরূপ ধরি
অনিমেষ নেত্রে চেয়ে রহিতাম তব মুখপানে।
কত অমা-অন্ধকারে, পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-বিতানে
তব সাথে কহিতাম কথা। তুমি নিশ্চলা পাষাণী
শত ব্যর্থ আবেদনে শুনাতে না মোরে কোন বাণী
তারপর দ্বিধাভরে প্রসারিয়া শ্লথ বাহুডোর
স্পর্শিতাম তব দেহ, তাপহীন, কঠিন, কঠোর!
সে উত্তাপ কোথা গেল? সেই স্পর্শ কোমল মধুর
আর নাহি কেন? অস্থি, মাংস, শিরা, ত্বক্ ও স্নায়ুর
এ কি হ'ল পরিণাম? জীবনের চঞ্চল প্রকাশ
কোথায় লুকায়ে গেল? রুক্ষ শিলা করে উপহাস
এ ত নহে সে অহল্যা! কোথা তীব্র পেচক চিৎকারে
সহসা চমকি উঠি, মনে হয় সে অভিশপ্তারে
তুমি নহ। তারপর ধীরে ধীরে ফিরিয়া কুটীরে
শয্যায় লুটায়ে পড়ি বেদনায়, ভাসি আঁখিনীরে
বক্ষে চাপি ধরিতাম তব ত্যক্ত বসন উত্তরী
তোমারি তনুর স্পর্শমাখা। যেন তোমার কবরী
এখনো ভরিয়া আছে মোর ক্ষুদ্র উপাধানতল
ইঙ্গুদী তৈলের গন্ধে! যেন তব কাষায়-অঞ্চল
শ্রমক্লান্ত তনু হতে মুছি লয়ে স্বেদকণাগুলি
এখনো রয়েছে স্নিগ্ধ! শয্যা মোর তব করাঙ্গুলি
এখনি করেছে স্পর্শ! নিত্যরাতে কোন্ মোহঘোরে
উপাধানে ভাবি তুমি, বাঁধিয়াছি দৃঢ় বাহুডোরে,
কল্পনায় দান করি তোমারে যা কিছু মোর আছে
নিঃশেষিয়া আশ্লেষে চুম্বনে.—তুমি চলে যাও পাছে!
নিষ্প্রদীপ গৃহতলে আবরণ আভরণ তব
মোহাচ্ছন্ন চিত্তে মোর এনে দিত অনন্ত বৈভব!

অহল্যা

এত প্রেম ছিল তব? চিরদিন আমি অভাগিনী
করিয়াছি পূজার্চ্চনা, প্রেম তব বুঝিতে পারি নি।
শান্ত সৌম্য ও-আননে জ্ঞানশিখা উঠিত যে জ্বলি
তারে প্রেমশিখা বলি ক্ষণতরে দিই নি অঞ্জলি
কোন দিন। স্নিগ্ধ নেত্রে ফুটিত যে করুণার ভাষা
ভাবি নাই কোন দিন তারে প্রভো, তব ভালবাসা!

গৌতম

পাষাণরূপিণী তুমি, আমি প্রিয়ে নিত্য তব লাগি
দেবতা-চরণতলে কাঁদিতাম শাপমুক্তি মাগি!
আশ্রমবালিকা স্বাহা আসি যবে সোমবল্লীমূলে
সাজাত কবরী তার দিনশেষে কুটজমুকুলে,
বিভ্রম হইত মোর বনচ্ছায়ে সান্ধ্য অন্ধকারে,
ভাবিতাম তুমি এলে! উচ্চকণ্ঠে কহিতাম তারে—
"এসেছ অহল্যে ফিরে?" ভীতা ত্রস্তা হরিণীর প্রায়
করিত সে পলায়ন। আপনারে ধিক্কারি লজ্জায়
যাইতাম বনমাঝে। ক্রমে হ'ত গভীরা যামিনী
তব স্মৃতি-তপস্যায়। জ্যোৎস্নাধারা আকাশ-প্লাবিনী
নামিত কাননতলে পত্র-অবকাশে ধীরে ধীরে।
প্রকম্পিত সেই ম্লান ম্রিয়মাণ ক্ষণ-রশ্মিটিরে
তোমার আননে হেরি মনে হ'ত তুমি প্রাণময়ী,
মোর পাশে বনমাঝে আছ বসি কি উদ্বেগ বহি
অপলক স্থিরনেত্রে! মুহূর্ত্তে তোমারে বক্ষে নিয়া
কর্ণান্তিকে কহিতাম—"জাগরণ-ক্লান্তা তুমি প্রিয়া
এবার বিশ্রাম লভ, ওই হের চন্দ্র অস্তগামী।"
তোমারে স্পর্শের মোহে প্রসারিত কর যেত থামি
শীতল পাষাণগাত্রে, শুষ্কপত্র স্পন্দন-মুখর,
আতঙ্ক-দুঃস্বপ্ন মাঝে কেটে যেত শেষ সে প্রহর।

অহল্যা

এত সহিয়াছ ব্যথা? এতখানি ছিল আবেদন?
ও-দুটি প্রশান্ত নেত্রে ভরা ছিল আমারি স্বপন
জানি নাই কোনদিন! প্রাণময়ী অহল্যার চেয়ে
পাষাণী অহল্যা আরো ধন্যা হ'ত তব স্নেহ পেয়ে!
কেন রেখেছিলে ঢাকি যৌবনের মোহ-অরুণিমা
যজ্ঞধূমাচ্ছন্ন দেহে? রূপোজ্জ্বল বসন্ত-পূর্ণিমা
কেন করেছিলে ব্যর্থ রুধি তব আতপ্ত যৌবন,
পুষ্পমাল্য ফেলি কেন নিলে বক্ষে রুদ্রাক্ষভূষণ?

গৌতম

রিক্তা নিঃস্বা বনানীর হিমসিক্ত ধূসর পল্লবে
দুর্মদ উত্তরবায়ু কশাঘাত হানে রূঢ় করে,
শিথিল কম্পিত-অঙ্গে দাঁড়ায় সে সর্ব্ব-আশাহতা,
সেই তার শেষ রূপ? সেই তার সর্ব্বশেষ কথা?
ভুল করিয়াছ প্রিয়ে, বসন্তের গোপন সঞ্চার
সেদিনো ছিল সে বক্ষে, অনাগত কুসুম-সম্ভার
সেদিনো লুকায়ে ছিল নবপ্রকাশের স্বপ্নলীন!
মুমূর্ষু বনানীচক্ষে দিকচক্রে বসন্ত নবীন
সেদিনো দিয়েছে ধরা! হায়, প্রিয়ে ঘনকৃষ্ণ মেঘে
বজ্রাগ্নি দেখেছ শুধু? ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আবর্ত্তন বেগে
শুনেছ হুঙ্কার তার? দেখ নাই, অন্তরালে রহি
স্নিগ্ধ জলকণারাশি বিধাতার আশীর্ব্বাদ বহি
নামে ধরিত্রীর বুকে? অভিশপ্ত অতীত কাহিনী
জীবনের ভগ্নবীণে আজি যেন বিস্মৃত রাগিনী!
থাক্ পুরাতন কথা, তুমি প্রিয়ে আসিয়াছ ফিরে
এই যে পরম তৃপ্তি! শুধু এই শুভ লগ্নটিরে
জীবনস্বপ্নের মাঝে ভয় হয় হারাতে আবার!
তব অভিশাপ শেষ, এই মোর সান্ত্বনা অপার!

অহল্যা

আর কিছু নহে? শুধু মুক্তি তরে করেছ সাধনা?
স্থান দিতে ও-চরণে এতটুকু নাই কি কামনা?
প্রতিদিন যেই মত বহু বর্ষ বহু যুগ আগে
করিতাম সেবা তব যৌবনের নব অনুরাগে
পাব না কি ফিরে তারে? যেই মত সকলের সাথে
রহিতাম গৃহকর্ম্মে, পুষ্প তুলি সায়াহ্ন-প্রভাতে
সাজাতাম যজ্ঞবেদী আনি বহি সমিধের ভার
জ্বালিতাম হোমানল, তাহারো দেবে না অধিকার
আবার আমায় প্রভো? নিত্যকার কল্যাণে উৎসবে
আশ্রমবাসিনীদলে ফিরিতাম মাঙ্গল্য-গৌরবে
আমারে দেবে না স্থান? প্রতিদিন বেদপাঠশেষে
প্রসারিত-করে মোর গ্রন্থগুলি তুলি' মৃদু হেসে
আদেশ দেবে না তুমি রাখিবারে পবিত্র আধারে?
আমারি দোহিত দুগ্ধ সাজাবে না পূজা উপচারে?
পাপিনী এ অহল্যায় লইবে কি পূর্ব্বের মতন
তোমার সকল কর্ম্মে? ব্রত, যজ্ঞ, সর্ব্ব আচরণ
দূষিত হবে না স্পর্শে? অতীতের মত ভালবাসা
দেবে কি এ অহল্যায়? তৃপ্ত হবে তার সব আশা?

গৌতম

শান্ত হও হে কল্যাণি, পাবে তুমি সর্ব্ব অধিকার,
এই পুণ্য তপোবনে হবে তুমি বরেণ্যা সবার
নিঃসন্দেহে। সাথে লয়ে বৃদ্ধ পুত্র, অতি বৃদ্ধ স্বামী
অতীতের মত তুমি আশ্রমে রহিবে দিবাযামী
স্থবিরা স্বাহার পাশে। আশ্রমের প্রাঙ্গণ-সরণি
মুখরিত হবে লভি যৌবন-চপল পদধ্বনি
আজি বহু বর্ষ পরে। নিশ্চল সে পাষাণ-অন্তরে
যেই কালস্রোত ছিল রুদ্ধ, আজি কত যুগ পরে
মুক্ত তাহা। অতীতের কোন্ লুপ্ত মৃত ইতিহাসে
জীবন আসিবে ফিরে। সম্ভাষণে, কল্লোলে, উল্লাসে
আশ্রম উঠিবে ভরি। কিন্তু এ জীবন ছন্দহীন
ধূসর সায়াহ্নতলে লভিবে কি আর কোন দিন
সে আবেগ, সে উত্তাপ, সে আনন্দ, সেই উচ্ছলতা,
সমিধ-বহনছলে তরুচ্ছায়ে দুটি প্রেমকথা?
সে মদির প্রাণশক্তি কোথা পাব কামনার রথে?
তুমি একাকিনী শুধু শুষ্কপত্রসমাচ্ছন্ন পথে
অতীত বসন্তে স্মরি গাঁথিবে কি ছিন্ন পুষ্পে মালা?
হে কল্যাণি, চিরদিন বুকে বহি' তুষানল জ্বালা
কেমনে রহিবে হেথা? এ আশ্রম নহে তব তরে,
ফিরে যাও পিতৃগৃহে, চিরসাধ্বী তুমি মোর বরে।

অহল্যা

পাষাণে বন্দিনী রহি ধরিত্রীর নিঃসাড় অতলে
কিছু জানি নাই প্রভো, কালস্রোত কোথা দিয়ে চলে!
মুক্তি লভি হেরিলাম আকাশ তেমনি আছে নীল,
তেমনি শ্যামল বন, নৃত্যছন্দে তটিনী-সলিল
তেমনি বহিয়া চলে। বিহঙ্গের কণ্ঠ-কাকলীতে
তেমনি বাতাস ভরে। উদয়াচলের পথটিতে
তেমনি তপন হাসে। নিদ্রাভঙ্গে বলাকার সারি
আকাশে উড়িয়া চলে শ্বেতপক্ষ তেমনি প্রসারি।
বিস্মৃতির তল হতে কুড়াইয়া ছিন্ন পুষ্পগুলি
আবার গাঁথিনু মালা, ঝাড় ঝাড় ধরিত্রীর ধূলি

স্পর্শি শিরে কহিলাম,—ওগো মাতা, ওগো স্নেহময়ি,
আমারে লুকায়ে বক্ষে রৌদ্রবৃষ্টি অকাতরে সহি
দীর্ঘকাল করেছ যাপন। তারপর পশ্চাৎ ফিরিতে
হেরিনু শ্রীরামচন্দ্রে! নবদুর্ব্বাশ্যামতনুটিতে
দ্রবীভূত করুণার উৎস যেন ওঠে বিচ্ছুরিয়া!
বিস্মিতা, স্তম্ভিতা আমি, ভক্তিতে ক্রন্দনে উচ্ছুসিয়া
পড়িনু চরণপ্রান্তে। প্রণাম করিতে, শুধু তাঁর
শুনিনু মধুর কণ্ঠ,—"যাও সাধ্বি, আশ্রমে তোমার।"

গৌতম

পতিত-পাবন তিনি, কিন্তু কিবা ছিল প্রয়োজন
এ পাষাণ উদ্ধারের? অতীতের লুপ্ত সে জীবন
আবার করিল স্পর্শ কেন ধরণীর এ আলোক?
পরমবিস্মৃতিক্রোড়ে ভুলেছে যে জরাব্যাধিশোক
আবার সে ফিরে পাবে ধরণীর সহস্র বন্ধন?
এ ত নহে কৃপা, এ যে আরো শাস্তি, আরো নির্য্যাতন
মুক্তির ছলনা মাঝে! অয়ি সাধ্বি, অয়ি শুচিস্মিতে
এ ত তব মুক্তি নয়, এলে তুমি অভিশাপ নিতে!

অহল্যা

অভিশপ্তা অহল্যার জানি প্রভো, কোন মুক্তি নাই,
তবু বলে দাও মোরে কোথা পথ, কোথা শান্তি পাই?
যদি পুণ্য-আশ্রমের শুচিতায় স্পর্শে কলুষতা
আমি সরে যাব দূরে বুকে বহি অন্তহীন ব্যথা,
ফিরিব না কোনদিন। যদি মোর অম্লান যৌবন
এ আশ্রমে নাহি সাজে, অভিশাপ কোরো না মোচন।
দাও মোরে মুক্তিহীন পাষাণের রুদ্ধ কারাগার,
ক্ষণিকের দৃষ্টিদানে জন্মান্ধে কোরো না অবিচার!

গৌতম

হে কল্যাণি, ত্যজ ক্ষোভ, নারায়ণ শ্রীরামের রূপে
জীবন সঞ্চার করি জড়ীভূত পাষাণের স্তূপে
দিয়াছেন মুক্তি তব। আমি পুনঃ অভিশাপদানে
বিদ্রূপ করিব তাঁরে? আবার কি বাঁধিব পাষাণে
উগ্র তপস্যার তেজে? তুমি মোর চির-আকাঙ্ক্ষিতা
অভিশাপমুক্তা সাধ্বী, নিখিলের পূজিতা বন্দিতা।

অহল্যা

দাও পুনঃ অভিশাপ। দাও মোরে বার্দ্ধক্যের জরা
লয়ে এ যৌবন নব। দাও মোরে এই দেহভরা
ব্যাধি, গ্লানি যাহা চাও। শুধু আজ বল একবার
তাতে তৃপ্ত হবে তুমি? আমার এ যৌবন-সম্ভার
দেবে না'ক কোন ব্যথা? বার্দ্ধক্যের ম্লান দৃষ্টি দিয়া
আমারে হেরিবে যত, উঠিবে না অন্তর কাঁদিয়া

নির্ব্বাক্ নৈরাশ্যে ক্ষোভে? লয়ে তব আশ্রমের ভার
বহ্নি-শিখা সম আমি তোমারে দহিব শতবার
এই ভীতি তব? মোর নিত্য সজ্জা, নিত্যপ্রসাধন,
তোমারে সম্মুখে রাখি যত মোর পূজা আরাধন
জাগাবে বেদনা প্রাণে? মোরে হেরি দেবে অভিশাপ
অকরুণ বিধাতায়? তৃষাতুর কামনার তাপ
পাবে না কি অঙ্গে মোর প্রতিদিন স্পর্শে সেবাব্রতে?
কি হবে পূর্ণিমা-নিশা ধারাহারা বিশুষ্ক সৈকতে?
চাহ তুমি এ আশ্রমে মম ফুল্ল যৌবন-মঞ্জরী
আতপ্ত নিঃশ্বাসে তব শুষ্ক হয়ে পড়ে যাক্ ঝরি?

গৌতম

বিদ্রূপ কোরো না প্রিয়ে, মোর অন্তরের পরিচয়
তোমার অজ্ঞাত নহে। করিতে পারি নি চিত্তজয়
কোনদিন। তাই যে তোমারে আমি অভিশাপ দিয়া
চির-অভিশাপ বোঝা নিজ শিরে বহিয়া বহিয়া
এসেছি মৃত্যুর দ্বারে। তুমি মুক্তা, আমি মুক্ত নহি।
জানি, কিবা হারায়েছি। তুমি আজ এলে রূপময়ী,
আমি আজ জরাতুর, প্রকৃতির অভিশাপ শিরে
এই শেষ সন্ধ্যামাঝে বসে আছি বৈতরণী-তীরে।

অহল্যা

এই তব মনোব্যথা? জীবনের অসহ কাহিনী
হয়ে যাক্ শেষ তবে। অন্ধকার অনন্ত যামিনী
আবার আসুক নামি। যদি কভু ক্ষণিকের তরে
অহল্যারে বেসে থাক ভালো, তার বিশীর্ণ অধরে
দেখে থাক ম্লান হাসি, ক্ষণিকের আত্মনিবেদন,
—ভুলে যেও তার কথা। অতীতের দুঃসহ স্বপন
যদি কভু পড়ে মনে, ঘৃণা কোরো তাহারে ধিক্কারি।
কোনদিন এ আশ্রমে অহল্যারূপিণী কোন নারী
ছিল না'ক, এই ভেবো মনে। এ জীবনে ক্ষণতরে
তোমার প্রেমের স্বর্গে যে পেয়েছে স্থান, ঘৃণাভরে
তাহারে করিও দূর তোমার স্মৃতির মালা হ'তে
কীটাশ্রয়ী পুষ্পসম। তব পুণ্য জীবনের স্রোতে
যে পঙ্কিল জলধারা কবে মিশেছিল, তার কথা
ভাবিও না কোনদিন। কবে কোন্ কণ্টকিনী লতা
মহামহীরুহপদ জড়ায়েছে বল্লরীতে তার,
সে স্মৃতিতে কিবা প্রয়োজন? চির মৌন বেদনার
সে অঞ্জলি ভুলে যেও। যত সাধ, যত আকিঞ্চন
সঞ্চয় করেছি বুকে, সে যে মোর পরমতম ধন।
আজি আমি দাঁড়ায়েছি জীবনের ধূসর সৈকতে,
আবার ফিরিতে হবে অন্তহীন রুক্ষ মরুপথে!

...দেব, প্রণাম লহ, জীবনের শত অপরাধ
মার্জনা করেছ তুমি, অভিশাপ তব আশীর্ব্বাদ।
চিরবিদায়ের পথে এইটুকু শুধু শেষ বার
বলে যাই, ভুলে যেও সব স্মৃতি হীনা অহল্যার।

(প্রণামান্তে প্রস্থানোদ্যম)

গৌতম

অহল্যা, অহল্যা, শোন, বেঁধো না'ক কলঙ্কের ডোরে,
কোরো না'ক অপরাধী,—যেও না'ক—

অহল্যা

যেতে দাও মোরে।

(শতানন্দ প্রবেশ করিল)

শতানন্দ

কোথা যাও মাতা? আজি বহু-বর্ষ, বহু যুগ পরে
তুমি আসিয়াছ শুনি সর্ব্বজন আনন্দ-সাগরে
নিমজ্জিত। তব লাগি দিকে দিকে শোন শঙ্খধ্বনি,
শোন কল-কোলাহল। অর্ঘ্য লয়ে সকলে এখনি
করিবে তোমার পূজা। ধন্য আজি হ'ল তপোবন
তোমার চরণস্পর্শে। ধন্য রামরূপী নারায়ণ!
আসে জনপদবাসী সমুৎসুক, আসে ঋষিদল,
এ সময়ে কোথা যাও, কেন মা নয়নে অশ্রুজল?

অহল্যা

আশীর্ব্বাদ করি বৎস, এ জীবনে সুখী হও তুমি,
আমি চলিলাম ফিরে। তপঃপূত এই পুণ্যভূমি
নহে ত আমার স্থান।

শতানন্দ

কেন মাতা?

অহল্যা

অদৃষ্ট আমার!

শতানন্দ

বাক্যহীন কেন পিতা? তোমারো নয়নে জলধার!
বুঝিয়াছি সব কথা, তবু আজি জননী আমার
যদি যায় চলি পিতা, আমিও যাইব তার সাথে,
ধন্য হবে এ জীবন জননীর আশিস্ সম্পাতে।
আমারে বিদায় দাও—

গৌতম

শতানন্দ, এ কি কহ তুমি?
জননী-বিচ্ছেদে তব এ জীবন ছিল মরুভূমি,
তুমি তার ছিলে মরূদ্যান। ওরে অন্তরের ধন,
তব মুখপানে চেয়ে কত যুগ করেছি যাপন
তোর অহল্যার স্বপ্নে। ওই মুখে শুনিয়াছি ভাষা
তব জননীর। স্পর্শে পেয়েছিনু তারি ভালবাসা।
যে সঞ্চয় তিলে তিলে রাখিয়াছি চিত্ত-মাঝে ভরি
তাহারে হারাব আজ? নির্ব্বাক্ তপস্যা ব্যর্থ করি
বরি' লব পরাজয়? জীবনের স্নেহান্ধ সাধনা
নিস্ফল হইবে আজ তুচ্ছ করি-সর্ব্ব আরাধনা?
শতানন্দ, ওরে ও নির্ম্মম, আমি শুধু এত দিন
সহেছি এ দাবানল, বনস্পতি আজি ভস্মলীন
সকল মহিমাহারা। তব আশা ছিল মোর আশা,
তব স্বপ্ন ছিল স্বপ্ন মোর। তব জ্ঞানের পিপাসা
আমারি-ধ্যানের পথে ধীরে ধীরে উঠেছিল জাগি।
কল্যাণে আশিসে নিত্য দেবতার কাছে বর মাগি
নির্ব্বিঘ্ন করেছি তোরে। তোর ভাষা, তোর পদধ্বনি
হৃদয়ে জাগাত হর্ষ। তোর হাসি, অঙ্গের লাবণি
আমারে দেখাত স্বর্গ। ওরে, তোরে দেবো কি বিদায়
জীবনের শেষক্ষণে সর্ব্বহারা সায়াহ্ন-বেলায়!
পুত্র মোর, বুঝিলি না পিতার অন্তর বহ্নিশিখা
ধরণীরে করেছে নিঃশেষ! আছে শূন্য মরীচিকা
এ হৃদয়-মরু মাঝে! শতানন্দ—

শতানন্দ

করি এ মিনতি,
কর ক্ষমা, তুমি স্বর্গ, তুমি ধর্ম্ম, তপজপনতি
এ জীবনে সব কিছু। তবু নিত্য শিখায়েছ তুমি
স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতা আর পুণ্য জন্মভূমি।
জননী পুত্রের ত্যজ্যা, এ শিক্ষা পাই নি কোন দিন
কোন বেদ-সংহিতায়। এতকাল চিত্ত ছিল লীন
পাষাণী জননীপদে। আমারে ফিরাতে শক্তি কার
যদি মাতা না দেন সম্মতি? এ আশ্রম কেবা চাহে আর
যদি মাতা না রহেন হেথা? আজি এ পুণ্যপ্রভাতে
স্বর্গচ্যুত কোরো না'ক।

গৌতম

ম্লানদৃষ্টি নয়নের পাতে
শুধু ভাসে অপরূপ চিত্র দুটি, মাতা ও সন্তান!
অভিন্ন যুগল দেহ, অবিভাজ্য বিধাতার দান।
হে অভিমানিনী প্রিয়ে, এ আশ্রমে রহ পার্শ্বে মোর,
তোমার বিচ্ছেদ হানে যে আঘাত নির্ম্মম কঠোর,
কেমনে সহিব তাহা? অয়ি সতি, সম্মুখে দাঁড়াও,
আমারে করুণা কর, দাও মোরে পুত্র ফিরে দাও!
সর্ব্বগ্লানিমুক্তা তুমি, তুমি যে আশ্রম-মনোরমা,
অপরাধী আমি দেবি, আমারে করিও তুমি ক্ষমা।
সতী-নাম মাল্যে বিশ্বে তব নাম সর্ব্বাগ্রে পূজিতা,
মোর আশীর্ব্বাদে তুমি হও চির নিখিলবন্দিতা।

(অহল্যা ও শতানন্দ ভূমিষ্ঠ হইয়া গৌতমকে প্রণাম করিলেন

গুরুদক্ষিণা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ইংরেজী ১৯১৫ সনের মার্চ্চ মাস।

আমের মুকুল ঝরে গুটি দেখা দিয়েছে। এবার এরই মধ্যে বেশ একটু খরা দেখা দিয়েছে। হাওয়া এলোমেলো হয়ে উঠেছে, মাঠের মাটি ধুলো হয়ে উড়ছে এরই মধ্যে। ধান-কাটা শস্যহীন মাঠখানি বিস্তীর্ণ প্রায় মাইলখানেক হবে, তার উপর পণ্ডিতমশায়ের দেহখানি ভারী। রামজয় পণ্ডিত নিজেই বলেন—দেহ নয় বপু। ঘৃত দুগ্ধ এবং ভিটামিন-বহুল আতপান্নের ফল যাবে কোথা? তা ভারী হোক—দেহ কিন্তু অসমর্থ নয়, বেশ শক্ত; শুধু উদরখানি কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে স্ফীত। পণ্ডিতমশায় বলেন 'ও আমার দামোদরের প্রসাদ'; কখনও শ্লোক তৈরি করে বলেন—'দামোদর প্রসাদেন উদর গিরিগোবর্দ্ধন।' পণ্ডিতমশায়ের গৃহদেবতা হলেন দামোদর। বলেন—যাঁর প্রসাদে উদর তাঁর প্রসাদেই ভরে এবং তাঁর কৃপাতেই সহজেই ওকে বহন করি। ওতে আমার কষ্ট হয় না। শুধু একটু দোলে। বেশ সাধুভাষা করে বলেন—ভূকম্পকম্পিত পর্ব্বতোপম। তাতেও অসুবিধা অনুভব করেন না। কিন্তু পেটের মধ্যে জলরাশি কব্‌কব্‌ করে।

পণ্ডিত ইস্কুলে যাচ্ছিলেন। আজ কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়ে গিয়েছে। প্রায় দশটা বাজে। বাবুদের বাড়ীতে গিন্নী-মায়ের মানসিক তুলসী দেওয়ার কাজ ছিল। সে কাজ করে, বাড়ীর পূজা সেরে, দামোদরের প্রসাদ ভক্ষণান্তে যখন বাড়ী থেকে বের হয়েছেন তখনই তাঁর ছায়াঘড়িতে পৌনে দশটা। সামনে মাঠ ভেঙে গেলে রাস্তা প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ—ওয়ান মাইল। মাঠের প্রান্তদেশে একবার থমকে দাঁড়ালেন। মাঠখানার পূর্ব্বসীমানা বরাবর পাকা রাস্তাটা গ্রামের ভিতর হয়ে ত্রিভুজের দুটি বাহুর মত ভঙ্গিতে ইস্কুলের পাশ দিয়ে চলে গেছে। মাঠের ভিতর দিয়ে পায়েচলা পথটা ত্রিভুজের কর্ণরেখার মত ইস্কুলের অনতিদূরে পৌঁছেছে। পথের মাপে অনেকটা কম। কিন্তু পথ কম হলেও পথকষ্ট কম হবে না, কারণ এবারে বসন্তের মাঝামাঝি অকালগ্রীষ্ম উঠেছে; মাঠে ধুলোর প্রাবল্য। সর্ব্বাঙ্গ ধুলোয় ভরে যাবে। তার উপরে ভরা উদর, গোবর্দ্ধনগিরি ভারী হয়েছে।

তা যাক। নেমে পড়লেন তিনি মাঠে। না হলে দেরি হয়ে যাবে। এতকাল পর্য্যন্ত কতদিন দেরি হয়েছে। এত কালের ধারাধরণ ছিল আলাদা। নতুন কাল আসছে নতুন ধারাধরণ নতুন নিয়ম নির্দ্দেশ নিয়ে। আজ বাবুদের বাড়ী তুলসী দিতে গিয়ে তিনি যা শুনে এসেছেন তাতে তিনি কিছু বিচলিত হয়ে পড়েছেন। ইস্কুলের নবকলেবর হবে। কলেবর অর্থে বাড়ীঘরের সংস্কার নয়—আগাগোড়া নিয়ম-কানুন এবং তার সঙ্গে মাষ্টার পণ্ডিত সব বদল হবে।

এ সংসারে একপ্রকার বিদ্যা আছে যাকে বলে গুরুমারা বিদ্যা। গুরুরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বিদ্যাতেই কুরুক্ষেত্রের দ্রোণের মত ধরাশায়ী হন। সেই গুরুমারা বিদ্যাই এক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে। চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশনের ম্যানেজিং কমিটি যখন কিছুদিন আগে হঠাৎ পালটে গিয়েছিল তখনই এই ধরণের একটা সন্দেহ তাঁর মনে উঁকি মেরেছিল। ম্যানেজিং কমিটির পুরনো মেম্বরেরা প্রবীণ মানুষ ভারিক্কি লোক—তাঁরা সরে দাঁড়ালেন এবং চৈতন্যবাবুদের বাড়ীর জনতিনেক সদ্য বি-এ, এম-এ পাসকরা তরুণ ছেলে কমিটির মেম্বর হ'ল। তারা সব হাল আমলের বিদ্যোৎসাহী ছেলে—তাদের নাকি অনেক কল্পনা। তাদের হাতে ইস্কুলের উন্নতি হবে। তারা প্রয়োজনে টাকাকড়ি সংগ্রহ করবে—নিজেরা দেবে! অনেক শিক্ষক বেশ একটুখানি খুশী হয়েছিলেন। হাজার হলেও ছাত্র, অনেক স্নেহ করেছেন, তাদের হাতে গুরুদের অভাব-অভিযোগ অবশ্যই দূর হবে।

পণ্ডিত মাঠে নেমে গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়ে বার-দুই ঘাড় নেড়ে উঠলেন আপনমনে। মনে মনেই বললেন—হবে। অবশ্যই দূর হবে। গোপনন্দন মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণ নয়। এরা হিসেবী গোপনন্দন। লগুড়াঘাতে বুড়ো গরুগুলিকে গোগৃহ থেকে বনে বিচরণ করতে পাঠাবে। চরে খাওগে। অথবা বনের বাঘের উদরে যাও গে।

অবশ্য—; একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি। অবশ্য জনকতক শিক্ষকের উপর অভিযোগ অনেকদিন থেকেই আছে। কিন্তু তাই বলে আগাগোড়া বদল! ওই হেডমাষ্টার চন্দ্রবাবু পর্য্যন্ত! নিজের জন্যে তিনি ভাবেন না। দামোদর আছেন। তার উপর ব্রাহ্মণের ছেলে। কানে ফুঁ—শাঁখে ফুঁ—উনোনে ফুঁ তিন মহলা বৃত্তির পাকা বন্দোবস্ত। টোল ছেড়ে ইস্কুলে হেডপণ্ডিতি এ এক ধরণের কানে ফুঁ, এ যদি যায় তবে শাঁখে ফুঁ অর্থাৎ পুরোহিতগিরি আছে—তাও যদি যায় ত উনোনে ফুঁ অর্থাৎ রাঁধুনী বামুনের বৃত্তি আছে। তাও যদি যায়—যদি দেশসুদ্ধ লোকের হেঁসেলে মুরগী ঢোকে—বাবুর্চ্চি আসে তখন হরি-আল্লা-গড বলে লোকের দোরে দোরে ভিক্ষা মেগে বেড়াবেন। যে যে-নামে ভিক্ষা দেয়!

আকাশ হইতে টোকিওতে সম্রাটের প্রাসাদের দৃশ্য

হোটেল দ্য ইয়ামা হইতে তুষারাবৃত মাউণ্ট ফুজির দৃশ্য

চীনের শিল্পী জু-পাই-শি ভিক্টর ত্রিমাশিন অঙ্কিত

দেরাদুন সিলেকশন বোর্ডে যন্ত্র-সাহায্যে জনৈক আই-এ-এফ শিক্ষার্থীর পরীক্ষা

তাও না মেলে তখন দামোদররূপী গোলালো শালগ্রাম-শিলাটি গলায় ফেলে এক ঘটি জল খেয়ে ফেলবেন। গলায় আটকে দম বন্ধ হয়ে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হলে খতম; না হয়—যদি গোল মসৃণ দামোদর নালীতে না আটকে চুপ করে গিয়ে উদরে আসন গ্রহণ করেন তবে নিশ্চিন্ত। সে ক্ষেত্রে আর যে জীবনে ক্ষিদে লাগবে না এ বিষয়ে তিনি নিঃসংশয়। তিনি ভাবছেন তাঁর সতীর্থদের জন্য।

সেকেণ্ড মাষ্টার মৃগাঙ্কবাবু বিরাট পণ্ডিত—যেমন সংস্কৃত তেমনি ইংরেজী তেমনি অঙ্কে দখল; ছোটখাটো মানুষটি বিদ্যের একটি জাহাজ। ওঁর অবশ্য ভাবনা নাই, এমন লোককে যে ইস্কুল পাবে সে-ই সমাদর করে নিয়ে যাবে। শুধু উনি সাহস করে গেলে হয়। ওই সাহসের জন্যই উনি এখানে হেডমাষ্টারী নেন নি। সায়েবের ভয়, ছেলেদের ভয়, ভূতের ভয়, সাপের ভয়, পোকামাকড় আধিব্যাধি সবকিছুর ভয় তাঁর, ভয়ে অস্থির। শুধু ভয় করেন না ভগবানকে—কারণ তিনি নাস্তিক—ভগবান মানেন না। বিদেশে যান নি ওই ভয়ের জন্য। নইলে উনি কলেজে অধ্যাপক হতে পারতেন। পড়ানোর ধরণটাও তাঁর নাকি কলেজী ধাঁচের। দর্শনের অধ্যাপক হওয়াই তাঁর উচিত ছিল। তবে এবার নিশ্চয় যাবেন। না গিয়ে উপায় কি? তিনিও ব্রাহ্মণ কিন্তু তিনি ত তাঁর মত তিন ফুঁয়ে সমান পোক্ত নন। মৃগাঙ্ক-বাবুর পক্ষে এটা হয় ত ভালই হবে।

থার্ড মাষ্টার রতনবাবু মহৎ ব্যক্তি। আত্মভোলা পাগল মানুষ। জীবনে হারবার মানুষ নন। ওঁর জন্যেও ভাবনা নাই। বাড়ীতে কিছু জমিজেরাতও আছে।

ফোর্থ মাষ্টার কেষ্টবাবু রতনবাবুরই ভাইপো। কেষ্টবাবু শিক্ষক হিসাবে দুর্লভ শিক্ষক। তার উপর লোকটি পদ্য লেখে—ইস্কুলের ছেলেদের জন্য বই লেখে। বই থেকেই কেষ্টবাবু মাসে দেড়শো-দুশো টাকা রোজগার করেন। মাষ্টারী করেন বোধ হয় মাষ্টারী করবার জন্যে। বাড়ীতেও তাঁর ভাল জমিজমা।

ফিফ্থ মাষ্টার যামিনী—হেডমাষ্টার চন্দ্রবাবুর ভাগ্নে। যামিনী আবার এই ইস্কুলের ছাত্র। রোগা শরীর, স্নান করে না, প্রচণ্ড তামাকখোর, দুর্ব্বল মানুষ; ভয় যামিনীর জন্য আছে। যামিনীর কথা মনে হলেই পণ্ডিতের শরীরটা ঘিন ঘিন করে ওঠে। দাঁতে করে অনবরত গোঁফ চিবোয়। গোঁফ ছিঁড়ে তার গোড়াটা চুষে খায়। আর গায়ে যা গন্ধ! নারায়ণ হে। কিন্তু বেচারা যাবে কোথায়?

সিক্স্থ মাষ্টার গোপাল—এই গাঁয়েরই ছেলে। মাষ্টার ভাল। তা ছাড়া খেলতে পারে। জবরদস্ত শর; বীর ল খেলে না কি খুব ভাল। লাথি মেরে—কিক্ না কি বলে, তাই, মানে ওই কিক্ মেরে বলটাকে একবারে মুল্লুক পার করে দেয়; একেবারে 'গেরাউণ্ড' পার—ছেলেরা বলে—পগার পার অর্থাৎ সীমানা পার। গোপালও এই ইস্কুলের ছাত্র। ভাল ছেলে, ওর অনেক গুণ; হাতের লেখা ছাপা হরফের মত। দূর থেকে হাতের লেখা বলে চেনা যায় না পর্য্যন্ত। গোপালটাও বড় ভালমানুষ। শোনা যায় টেনে কল্কে ফাটিয়ে দেয়। আর ওর বাড়ীতে নাকি তামাকের একটা আড্ডা আছে। ইস্কুলের ছেলেরাই নাকি সেখানে গিয়ে তামাক খায়; প্রতি কল্কের জন্যে দু'পয়সা দিতে হয়। ওই পয়সার জন্যেই গোপালের সব গুণ মাটি। ছেলেদের বইয়ে ছাপার হরফের মত হরফে নাম লিখে দিয়ে পয়সা নেয়। ক্লাসে জলছবি বিক্রী করে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে বিনামূল্যে নমুনা আনিয়ে সেগুলো চড়া দামে বিক্রী করে। কেউ কেউ বলে, টাকা পেলে গোপাল দু' চারটে কোশ্চেন বলে দেয়। হতভাগা; নেহাত হতভাগা। দারিদ্র্যদোষ গুণরাশিনাশী বটে, কিন্তু পৃথিবীতে দরিদ্রেরা যত লোভ সংবরণ করে ধনীরা তা পারে না। ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে এ কি প্রবৃত্তি! আরে ব্রাহ্মণ ইচ্ছে করেই ধনসম্পদ নেয় নি, কিন্তু দারিদ্র্যের কালিমা কোন দিন তার অঙ্গ স্পর্শ করতে পারে নি। দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও দারিদ্র্যকালিমা-মুক্ত। দারিদ্র্যের অন্ধকার পটে সূর্য্যের মত তার অবস্থান ও অস্তিত্ব। তবে গোপ্লা শক্ত ছেলে—নানান কাজে দক্ষ যুবক ও, মাথায় বুদ্ধি আছে, হাতে কৌশল আছে, দক্ষতা আছে, গায়ে ষণ্ডের মত শক্তি আছে—ও আপনার পথ করে নেবে। গোপ্লার বুদ্ধির দৌড় বিলাত পর্য্যন্ত খেলে বেড়ায়। বিলাত থেকে গোপাল বিনামূল্যের নমুনা আনায়। ছেলেরা ওর নাম দিয়েছে বিলিতী মাষ্টার। মাঝখানে বিজ্ঞাপন দেখে জরমানী থেকে কোষ্ঠী করিয়ে এনেছে। কোষ্ঠীতে কি আছে কে জানে? পদচ্যুতি? কর্ম্মান্তর? চাকুরি থেকে ব্যবসায়ে ভাগ্যোন্নতি? তাই থাকবে।

মাষ্টার গুনতে এইখানেই শেষ। এর পর পণ্ডিতের পালা। হেডপণ্ডিত তিনি—গোবিন্দপুর-নিবাসী শ্রীরামজয় দেবশর্ম্মা—উপাধি চট্টরাজ। শ্রীমান্ দামোদর প্রভুর চরণাশ্রিত। কাব্যবেদান্ততীর্থ। নিজের জন্য তিনি আদৌ চিন্তিত নন। পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম তাঁর অবশ্যই কাম্য, কিন্তু চণ্ডমতি পুত্র বা শিষ্যের লগুড়াঘাতে ভীত হয়ে তিনি পলায়ন করবেন না। হাতজোড়ও করবেন না।

সেকেণ্ড পণ্ডিত—ড্রয়িং-মাষ্টার শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়—নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক বঙ্গভাষায় সুপণ্ডিত—সংস্কৃতও জানেন—অঙ্কশাস্ত্র পড়াতে পারেন, চিত্রবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ এবং চট্টো-

পাধ্যায়ও তাঁরই মত ত্রি-ফুৎকার-শাস্ত্রে পারঙ্গম, সুতরাং তাঁর সম্পর্কেও মাভৈঃ। শুধু একটি চিন্তা আছে—চট্টোপাধ্যায়ের তাঁর মত গিরিগোবর্দ্ধনসদৃশ উদর না থাকা সত্ত্বেও তিনি ঔদরিক। খান বেশী। তা হোক—কাশ্যপগোত্রীয় বিপ্রনন্দন লোভকে সংবরণ করতে পারবেন। হ্যাঁ তা পারবেন।

থার্ড পণ্ডিত—সদ্‌গোপ ঘোষ কুলোদ্ভব—শ্রীমান যতীন্দ্র। যতীন্দ্রও এই ইস্কুলের ছাত্র। এর আগে যতীন্দ্রের দাদা গোপেন্দ্র ছিলেন এখানকার থার্ড পণ্ডিত এবং ড্রিল মাষ্টার। ওই চট্টোপাধ্যায়ের মতই নর্মাল ত্রৈবার্ষিক। অঙ্কশাস্ত্রে নাকি পণ্ডিতব্যক্তি ছিলেন। ফাষ্টো কেলাসে পরীক্ষার্থীদের অঙ্ক কষাতেন তিনি। তাঁর আমলেই যতীন্দ্র এখানে এসেছিল ছাত্র হিসাবে। কিন্তু এনট্রান্স পাস যতীন করতে পারে নি। শেষ ওর দাদা পাঠিয়েছিল হুগলী নর্মাল ইস্কুলে। নর্মাল পাস করে দাদার শূন্য পদে বহাল হয়েছে। গোপেন্দ্র ঘোষ চলে গেলেন নিজ গ্রামের কাছের এক মাইনর ইস্কুলে হেডপণ্ডিত হয়ে। যতীন্দ্র সম্পর্কে কি বলবেন? তাঁদেরই হাতের অক্ষমতায় এই দীর্ঘ দশ বৎসরে যতগুলি শিবমূর্ত্তি গড়তে গিয়ে নন্দী ভৃঙ্গী তৈরি হয়েছে যতীন্দ্র তাদেরই অন্যতম। এই ইস্কুলের বোর্ডিং থেকে কিশোর বয়সে এখানকার অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ বাবুমহাশয়দের কুলকজ্জল তনয়দের কাছ থেকে জামা-কাপড় সিগারেট চুলকাটা টেরির পাঠ নিয়ে একটি বাবু মাষ্টারে পরিণত হয়েছে। ছাত্রজীবনে কোন শিক্ষক ওর মাথার মধ্যে ঢুকতে পারত না—এখন শিক্ষকজীবনে কোন ছাত্রের মস্তিষ্কে যতীন ঢুকতে পারে না। গুণের মধ্যে নিরীহ এবং সৎ। বোধ করি সকলের চেয়ে বিপদ হবে যতীনের। ভরসা অবশ্য ওর দাদা। এ অঞ্চলে মাষ্টার পণ্ডিত হিসাবে গোপেন্দ্রের নাম খুব। সম্মানও খুব। দাদা অবশ্যই ভাইয়ের একটা ব্যবস্থা করবে।

ফোর্থ পণ্ডিত—লাষ্ট পণ্ডিত পঞ্চকপর্দ্দক মিশ্র অর্থাৎ পাঁচকড়ি ওরফে পাঁচন মিশ্র। মাভৈঃ। পাঁচন পাঁচন নয় খুঁটি। শক্ত ব্যক্তি, কঠিন ব্যক্তি। ভোরবেলা উঠে জমি দেখে আসে। বাড়ী ফিরে গ্রামের জমিদারী সেরেস্তার কাগজ নিয়ে বসে। তার পর স্নান করে গ্রামদেবতার পূজা করে। তৎপর ইস্কুলে আসে। আপাল গোপালদের নিয়ে পড়ে। ইনফ্যাণ্টো কেলাসের শিশুগুলিকে বলে—আপাল গোপাল। মাষ্টারগিরির এষ্টার বাদ দিয়ে বলে—মাষ্টারগিরি নয় আমার মা-গিরি। ব্রজলীলার মা যশোদার কাছে পাঠ নিয়েছি। হুঁচোট খেয়ে পড়লে ধুলো ঝেড়ে তুলতে হয়। দুষ্টুমি করলে উদূখলে বন্ধনভয় দেখাতে হয়। সবচেয়ে মুশকিল হয় ক্ষিদেয় ওদের মুখ শুকোলে। দেখলেই বুঝতে পারি। কিন্তু করি কি? তাও পকেটে পুজোর প্রসাদী দু'চারখানা বাতাসা থাকে; শেষ ঘণ্টায় সব থেকে কচি যারা তাদের ডেকে হাতে দিয়ে বলি—যা খেয়ে ঢকঢক করে পেট ভরে জল খেয়ে নে। ইস্কুল শেষ করে আর এক দফা জমিদারী সেরেস্তার কাজ; তার পর সন্ধ্যাবেলা হরিনামের দলে খোল বাজানো। কাজ গেলে পাঁচন গ্রামে প্রাইভেট পাঠশালা খুলে বসবে। পঞ্চকপর্দ্দকের সামনে বৃত্তির পাঁচ মহলার পঞ্চ সিংহদ্বার খোলা।

আর আছে—।

রামজয় পণ্ডিত আপনমনে মাঠের মধ্যে সশব্দে হেসে উঠলেন। আর আছে দাড়িয়াল জেয়াউদ্দিন আহমদ। পণ্ডিত বলে—দাড়িয়াল আহম্মক। জেয়াউদ্দিন পণ্ডিতকে বলে—চৈতনওয়ালা তিলকবাজ—উঁপ আপ। দু'জনেই সমবয়সী এবং বাল্যকালের খেলার সঙ্গী। দু'জনের বাড়ীও এক গ্রামে। জেয়াউদ্দিনের বাপ তাঁর বাপের বন্ধু ছিলেন। হজ সেরে এসেছিলেন। আবার মহাভারতে পণ্ডিতলোক ছিলেন। সংস্কৃত জানতেন। আহাম্মকও সংস্কৃত কিছু পড়েছে। আহম্মদের জন্য কোন ভাবনা নাই। সকলের চেয়ে সক্ষম সে। মসজিদে আজান পড়ে জীবন কাটিয়ে দেবে সে। ওদের সমাজ ভাল। নিজেদের সমাজের নিন্দে করেন না রামজয় পণ্ডিত, এ সমাজে—এই বিশ্বগ্রামের মত হালফ্যাশনের গ্রাম দু'চারখানা ছাড়া অন্য সকল গ্রামেই হরি বলে কি কালী বলে দাঁড়ালে সকল ঘর থেকেই একমুঠো করে চাল মেলে। তা মেলে। আল্লা বলে, 'খোদা মঙ্গল করবেন' বলে দাঁড়ালেও বিমুখ করে না। এটা ঠিক। তবুও আহম্মদদের সমাজে অনুরাগ আরও বেশী। তা ছাড়া আহম্মদ আর একটা জিনিস পারে। উপোস করে থাকলে তাঁরও ঠোঁট শুকোয়—ধরা পড়েন। আহম্মদের তাও পড়ে না, উপোস করে থাকলে আহম্মদ পান খেয়ে ঠোঁট রাঙিয়ে রাখে; আহম্মদের ঘরে চাল আছে কি নাই ধরা যায় না। ওঃ—দাড়িয়াল আহম্মক—মৌলভী জিয়াউদ্দিন আহম্মদ—ইয়ার বুজরুক। আহা-হা ভাল ভাল আরবী-ফারসী কথাগুলো সব মনে পড়ছে না! কিন্তু আহম্মক এতক্ষণ তামাকের ভাণ্ডার শেষ করে রেখে দেবে।

খাওয়ার পর বাড়ীতে সোয়াস্তির সঙ্গে তামাক কোনদিনই খাওয়া হয় না। আজ ত হয়ই নাই। বাবুদের বাড়ী তুলসী দিয়ে বাড়ীর পুজো সেরে দামোদরের প্রসাদ পেয়ে উঠেই দেখেছেন—উঠোনে রোদের দাগে পৌনে দশটা। তামাক সাজা ছিল—মেয়ে বীণা তামাক সেজে রেখেছিল, কিন্তু টানতে গিয়ে ধোঁয়া পান নি। বীণা বোধ হয় সাজবার সময় কল্কের ঠিকরে ঝেড়ে বের করে নি। কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ির ঠেলায় তামাকসমেত উলটে পড়েছে।

হাত খানিকটা পুড়েও গিয়েছে, টুকরো আগুন হাতের উপর পড়েছিল। পণ্ডিত রাগ করে হুঁকো কল্কে নামিয়ে দিয়ে উড়নি চাদরখানা টেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। রেক্টোরুমে কেষ্টধনের হাতে সাজা তামাক খাবেন। ইস্কুলের চাকর কেষ্টধন। চৈতন্য ইনষ্টিটিউশনের আদিকাল থেকে আছে। বোর্ডিঙেও চাকরি করে। কেষ্টধন তাঁর জন্যে এবং ওই দাড়িয়াল আহাম্মকের জন্যে এক ছিলিম করে ভাল তামাক জোগাড় করে রাখে। খাস কাষ্টগড়ার সুগন্ধিযুক্ত তাম্রকুট। জোগাড় করে বোর্ডিঙের বাবুনন্দনদের কাছে। ওঁরা দু'দশ জন চিরকালই আছেন। এক যান—অন্য আসেন। কেউ চার বছরের পাঠ আট বছরেও শেষ করতে পারেন না। কেউ চার-পাঁচ বছর থেকেই চলে যান। কেউ ইস্কুল বদল করেন কেউ ছেড়ে ছুড়ে বাড়ী ফেরেন; অবশ্য তার আগেই হয় বিবাহ। কেষ্ট তাদের তামাক সেজে ফাইফরমাস খেটে বাড়তি কিছু উপার্জ্জন করে—ফাউ পায় দু'তিন ছিলিম তামাক। তাই সে তাঁদের খাওয়ায়। তামাক সেজে টিকে ভেঙে উপরে চাপিয়ে রেখেছে কেষ্ট। গেলেই অগ্নিসংযোগ করে দেবে। আঃ, মাঠটা আর ফুরোয় না। গায়ের উড়নিটা ভিজে গেছে। পায়ের চটির মধ্যে ধুলো কাঁকর ঢুকেছে এক রাশ। বগলের ছাতাটা বগলেই আছে খোলেন নি। ছাতায় বাতাস টানবে—জোরে হাঁটা যাবে না।

আঃ—এইবার মাঠের শেষ। এতক্ষণে কোণাকুনি মাঠ ভেঙে পাকা রাস্তায় উঠে পণ্ডিত হাঁফ ছাড়লেন। পাকা রাস্তার এইখান থেকেই দু'পাশে চৈতন্যচরণ বাবুর কীর্ত্তি। কাজলকালো জলে টলমল বাঁধা ঘাট শ্যামসাগর দীঘি, বাগান, কাছারি, বোর্ডিং-ইস্কুল, গেষ্ট হাউস, থিয়েটারবাড়ী, তার ওদিকে রাধাসায়র—তার ওপাশে দাতব্য চিকিৎসালয়। কীর্ত্তিমান চৈতন্যবাবু চিরঞ্জীবী। কিন্তু তাঁর সকল কীর্ত্তির মূল কীর্ত্তি এবং প্রথম কীর্ত্তি এই ইস্কুল। চৈতন্য ইনষ্টিটিউশন। চৈতন্য ইনষ্টিটিউশনের গোড়া থেকে আছেন চন্দ্রবাবু।

পণ্ডিত গিয়ে নামলেন—শ্যামসাগরের বাঁধাঘাটে। হাত পা মুখ ধোবেন। প্রকাণ্ড প্রশস্ত ঘাট; ঘাটে আজ লোক-জন নাই। অন্যদিন চীৎকারে-বঙ্কারে-উল্লাসে-কলরবে-[illegible] দাপাদাপিতে শ্যামসায়রের জলে যেন সমুদ্রমন্থন চলে। বোর্ডিঙের ছেলেরা স্নান করে। আজ ছেলেদের স্নান হয়ে গিয়েছে।

ওঃ, তা হলে অনেক দেরি হয়ে গেছে। মার্চ মাস—ফাগুনের শেষ। মকরসংক্রান্তি থেকে সূর্য্য ফিরে চলেছেন বিষুবরেখার দিকে; সপ্তাশ্ববাহন বেশ জোরে ছুটেছেন; আন্দাজে ভুল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাজল ক'টা? কেষ্টধনের তাম্রকূট সেবন এবং হেডমাষ্টার চন্দ্রভূষণের সঙ্গে দেখা করে নিরিবিলিতে কথা ক'টা বলা হবে ত? চন্দ্রভূষণকে প্রস্তুত করে রাখতে হবে। সে হয় ত শুনেছে জেনেছে, কিন্তু তাঁর কর্ত্তব্য তাঁকে করতে হবে। বলতে হবে যা শুনেছেন।

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তাটা চলে গেছে পশ্চিম থেকে পূর্বে। বিশ্বগ্রামের বাজার হয়ে চলে গেছে। রাস্তার দক্ষিণ গায়ে চৈতন্য ইনষ্টিটিউশন; ইস্কুল বোর্ডিং একসঙ্গে—একটা চতুষ্কোণ বিশাল উঠোনের চারিদিকে গড়ে উঠেছে। রাস্তার দিকটায় মাঝখানে একটা কাঠের ফটক—তার এক পাশে ইস্কুল, এক পাশে বোর্ডিং। বোর্ডিঙের সামনের ঘরটিতে পীঠ-রক্ষক ভৈরবের আটনের মত হেডমাষ্টার চন্দ্রভূষণের ঘর। আজ ন' বছর এই ঘরটিতে তিনি আছেন। ঘরখানির সামনে এক ফালি বারান্দা, তার উপর একখানি তক্তপোষ, খানদুই চেয়ার। আজও পর্য্যন্ত প্রত্যহ রামজয় পণ্ডিত ঢুকবার সময় দেখেছেন চন্দ্রভূষণ ঘরের মধ্যে পোশাক পরছেন বা পোশাকপরা শেষ করে বেরিয়ে আসছেন। কোন দিন দরজাটা ভেজানো থাকে, কোন দিন ভেজানো দরজা খুলে চন্দ্রভূষণ বেরিয়ে আসেন। চোখোচোখি হলেই একটু হেসে মৃদুস্বরে বলেন—তাম্রকূট?

রামজয় হেসে বলেন—গুরবে নমঃ। তাঁর নির্দ্দেশ করি কি বল?

পিছনে বাল্যস্মৃতি আছে। রামজয় আর চন্দ্রভূষণ পাশাপাশি গ্রামের বাসিন্দা। বয়সে এক—বাল্যসাথী তাঁরা। একসঙ্গে পড়েছেন একই পাঠশালায়। সে পাঠশালার গুরু ছিলেন চন্দ্রভূষণের বাবা ভুজঙ্গভূষণ দত্ত। রামজয়ের বাবা বিশ্বজয় চট্টরাজের ছিল পৈতৃক টোল। টোল তখন সদ্য সদ্য ইংরেজীর চলন হওয়ায় টাল খেতে সুরু করেছে। বিশ্বজয় পণ্ডিত টোল ছাড়েন নি, কিন্তু টোলের চেয়ে ভাগবত কথকতা এবং গুরুগিরিতে বেশী নজর দিয়েছেন। সেই কারণেই ছেলেকে বন্ধু ভুজঙ্গের পাঠশালায় দিয়ে বলেছিলেন—ভুজঙ্গ তুমিই ওর প্রথম গুরু হও। তার পর যা হয় করা যাবে।

হঠাৎ একদিন জেয়াউদ্দিন পাঠশালায় এল। মখমলের টুপি—বুটিদার পাঞ্জাবী আর পাজামা পরে আহাম্মকের সে কি শোভা! তার উপর গায়ে তামাকের খোশবু। পাঠশালার ছেলেরা ভেবেছিল—গন্ধটা আতরের। আহম্মক বলেছিল—এতরের না, তামকুলের খোশবু। পাকিটে একছিলম তামকুল নিয়ে এসেছি। পণ্ডিতের ছিলম নিয়া খাব। তিন ওয়াক্ত তামকুল না খেলে মেজাজ দিল ঠিক থাকে না। আমার নানার হুকুম আছে।

নানার ভিটেতেই আহম্মকের বাস ছিল। আহম্মকের মা-বাপের এক মেয়ে। নানা ছিলেন সে আমলের আমীর মানুষ। এককালে না কি এ অঞ্চলের নবাব ছিলেন ওঁরা।

তখন অবশ্য সর্ব্বস্বান্ত। থাকবার মধ্যে ভাঙা বাড়ী, মসজেদ আর কিছু সামান্য নিষ্কর। জেয়াউদ্দিনের বাপ ছিলেন সাধু-মানুষ। আরবী ফারসীতে এলেম—সংস্কৃতে জ্ঞান; তেমনি রসিক মানুষ। আহম্মকের নানাদের প্রতিষ্ঠিত মক্তব ছিল—সেই মক্তবের মৌলবী সাহেবের ছেলে। ছেলে দেখে আহম্মকের নানা জামাই করেছিলেন। সে অনেক কথা। সে কথা থাক। তামাকের কথায় মন যে কোথায় চলে গেছে! মহাভারত মনে পড়ে গেল পণ্ডিতের।—'মনঃ শীঘ্রতরং বাতা', বায়ুর চেয়েও মন শীঘ্রতরগতি!

কিন্তু থাক মহাভারত! বায়ুর চেয়ে শীঘ্রতর গতি মন আবার তাঁর ফিরে এল ওই চন্দ্রভূষণের সঙ্গে বিজড়িত বাল্য-স্মৃতিতে। 'ওই গুরবে নমঃ' প্রসঙ্গে। জেয়াউদ্দিন সেদিন খোশবু মাখানো তামাক এনেছিল এবং সেই লোভেই চন্দ্রভূষণ ও রামজয় উভয়ে জেয়াউদ্দিনের সঙ্গে সেই প্রথম তামাক খেয়েছিলেন। তামাক খেয়ে তারপর হয়েছিল ভয়। ভুজঙ্গ দত্ত কঠোর লোক ছিলেন। তামাক ত তামাক পান পর্য্যন্ত খেতেন না। বৈষ্ণবমানুষ গলায় মালা, কপালে তিলক, টাকপড়া মাথাতেও টিকি ছিল তাঁর, বিনয়ের অবতার কিন্তু পাঠশালাতে সাক্ষাৎ রুদ্র। তাই তামাক খেয়ে নেবুর পাতা কলার পাতা চিবিয়েও শুকনো মুখে পাঠশালায় এসে ভয়ে কাঁপছিলেন। ভুজঙ্গ দত্ত ছিলেন ট্যারা। কোন্ দিকে যে তাকিয়ে থাকতেন সে বুঝবার শক্তি দেবতারও ছিল না—কুতো মনুষ্য। সেই ট্যারা চোখের দৃষ্টিতে চন্দ্র এবং রামজয়ের ইশারা-করা ধরে ফেলে—তিনি সন্দিগ্ধ হয়ে তাঁদের ডেকেছিলেন।

—এদিকে এস। তোমরা। রাম আর চন্দ্র।

অতঃপর আর কি!— দুই কানে ধরে চন্দ্রকে টেনে আকাশে তুলে আছড়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলেন। তার পর রামজয়ের কানের দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন। রামজয় ধাঁ করে দুই হাতে কান ঢেকে বলে উঠেছিলেন—গুরুর কান। মা-পিসী-মাসীদের কাছে শেখা কথাটা কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। ভুজঙ্গ পণ্ডিত যিনি নাকি পাঠশালায় সাক্ষাৎ রুদ্র—তিনিও কথাটা শুনে হেসে ফেলেছিলেন। হাতও সরিয়ে নিয়েছিলেন। মাথার চুল ধরে টেনে বলেছিলেন—কান গুরুর। তা তামাকও কিন্তু গুরুর প্রসাদ? তামাক খেতে নির্দ্দেশ দিয়েছেন গুরু? সেই অবধি চন্দ্র তামাকের ত্রিসীমানায় আর যান নি। কিন্তু রামজয় আর তামাক ছাড়তে পারেন নি। এই কারণেই চন্দ্রবাবু যখন মৃদু হেসে তাঁকে প্রশ্ন করেন—তাম্রকূট?

পণ্ডিত মৃদু হেসে বলেন—গুরবে নমঃ।

বলেই হন্‌হন্ করে চলে গিয়ে ওঠেন মাষ্টারদের রেষ্টো রুমে।

ভিতরে বিশাল প্রাঙ্গণ—তার উত্তর দিকে ইস্কুল এবং পুরনো বোর্ডিং; পুব দিকে পাকশাল—দক্ষিণ দিকটায় অর্দ্ধেকটা ফাঁকা, অর্দ্ধেকটায় নতুন বোর্ডিং। পশ্চিম দিকটায় ছোট দু'কুঠরি একটা রাণীগঞ্জের টালিছাওয়া ঘর। বিরাট উঠানটা মাপে বোধ করি কাঠা পনের জমি হবে। তার মাঝখানে বড় কুয়ো, শান-বাঁধানো চত্বর, তার পাশে পশ্চিম দিকে ছেলেগুলোর কসরতের আখড়া, ছেলেগুলো দোল খায়, নানা রকমের দোলন। পণ্ডিত বলেন মল্লভূমি। পণ্ডিত এ সবের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে চলেন নতুন বোর্ডিঙের একেবারে পূর্ব্বদিকের ঘরে। এই ঘরেই মাষ্টারদের রেষ্টো রুম। ও ঘরে থাকে বোর্ডিঙের এসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। ঘোষবংশজ শালপ্রাংশু মহাভুজ বৃষস্কন্ধ প্রশস্তটাক চকচকে মস্তক গজদন্ত ব্যাঘ্রবিক্রম শ্রীনকুলচন্দ্র ঘোষ। ছেলেরা বলে ডেভিড হেয়ার। নকুলচন্দ্রের চেহারার সঙ্গে ওই ডেভিড হেয়ার নামক ইংরেজ শিক্ষাবিদের চেহারার আশ্চর্য্য মিল আছে। সে মিল তিনি নিজে মিলিয়ে দেখেছেন এবং ছেলে-গুলোর দৃষ্টিশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। চন্দ্রবাবুর মত গম্ভীর ব্যক্তিও মুচকি হেসে বলেছেন—ডেভিলস! কিন্তু মিল ঠিক বের করেছে। ওদের চোখে পড়ে কি করে? ওই ডেভিড হেয়ার নকুল ঘোষের ঘরের এক কোণে সারি সারি হুঁকো-কল্কে এবং তামাক-টিকে সাজানো থাকে। কেষ্টোধন তামাক সেজে দেয়। এ ঘরে বসেন পঞ্চকপর্দ্দক, শম্ভু চাটুজ্জে, আহম্মক আর তিনি। যামিনী, যতীন, গোপাল এরা তিন জনে এই স্কুলের ছাত্র, তাদের আড্ডা যামিনী এবং যতীনের ঘরে। থার্ড মাষ্টার রতনবাবু তামাক খান না, তামাক দূরে থাক পানও খান না, তিনি এসে সটান গিয়ে বসেন লাইব্রেরীতে অথবা আপন খেয়ালে পায়চারি করেন কিংবা বোর্ডিং কম্পাউণ্ডের নৈর্ঋত কোণে মুচকুন্দ চাঁপা গাছটার তলায় আসন পেতে বসেন। ফোর্থ মাষ্টার কেষ্ট পাল নিজের ঘরেই থাকে—কেষ্ট পালও তামাক খায় না কিন্তু সে তামাক আনিয়ে রাখে—ওর ওখানেই সেকেণ্ড মাষ্টার মৃগাঙ্কবাবুর আড্ডা। মৃগাঙ্কবাবু তামাকখোর হিসাবে —ভেটারন না কি বলে—তাই। চোখ বুজে তামাক খান আর কেষ্ট পালের সঙ্গে বাজা তর্ক করেন; পাল বলে—ভগবান নাই এ কথা আপনি কি করে বলেন?

মৃগাঙ্কবাবু মৃদু মৃদু হাসেন, তার বাঁ পাখানি নাচতে সুরু করে, তিনি বলেন—আমি তাঁর জন্য দুঃখিত হতে পারলেও খুশী হতাম কেষ্টবাবু, কিন্তু তাও হবার উপায় নাই—কারণ আদপেই যা নাই তার জন্য দুঃখিত হই কি করে?

ইংরেজী বাংলা সংস্কৃত তিন ভাষাতে মৃগাঙ্কবাবু ফোয়ারা ছুটিয়ে দেন। মৃগাঙ্কবাবুর রঙ কাঁচা সোনার মত—সে

ওঠে উদ্ভাস হয়ে ওঠে যেন কাঁচা সোনায় আগুনের আঁচ লাগে।

পণ্ডিত মধ্যে মধ্যে দাঁড়ান, মৃগাঙ্কবাবু যেদিন সেই মুহূর্তে সংস্কৃত শ্লোক আওড়ান সেই দিন দাঁড়ান। নইলে সটান চলে যান নকুল ঘোষের গুহায়। বাইরে থেকেই হাঁকতে থাকেন—কৃষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণাসাগর।

কেষ্ট ঘর থেকে সাড়া দেয়—আজ্ঞে পণ্ডিতমশায় তামাক রেডি।

—রেডি! জয়জয়কার হোক কেষ্টধন, ওরে তোর জয়জয়কার হোক। বধূমাতার পুত্রসন্তান হোক, শ্যামলী-ধবলীর একনা বাছুর হোক, পুকুরে মৎস্যকুল বৃদ্ধি পাক। তোর জমির উপর পুষ্কর মেঘের আবির্ভাব হোক। ওদিকে রান্নাশালে কলরব করে ছেলেরা।—ভাত—ভাত আন ঠাকুর। ভাত!

—ডাল দাও। ভাত না ভিজলে খাব কি করে?

—তরকারি। খাব কি দিয়ে?

— নুন, নুন।

ছেলেগুলোর মধ্যে একটা দুর্দ্ধর্ষের দল আছে। চন্দ্রবাবু হাসেন এবং বলেন—ডেকইটস! পণ্ডিত বলেন—পবননন্দনের খুড়তুতো ভাই। মানে হনুমান আর ভীমের। ওরা চিরকাল আছে এবং চিরকাল থাকবে। ওই বাবুনন্দনদের মত এক দল যাবে এক দল আসবে। ওদের স্থান খালি নাহি রবে। ষাট-পঁয়ষট্টি জনের মধ্যে ওরা কখনও দলে ছয়-সাত, কখনও দশ-বারো এর বেশী নয়। ওরা পাশাপাশি বসে বালতি দরুনে ভাত খাবে। এক-এক জনে তিন-চার বালতি; এবং ঠাকুরকে হাতজোড় করিয়ে বলাবে—আর ভাত নাই। ওদিকে তখনও দশ-বারো জন খেতে বাকী। বিশ-ত্রিশ জন—আরও দু'মুঠো ভাত নেবার জন্যে বসে আছে। ওরা তখন হৈ চৈ করবে—না খেয়ে ইস্কুল যাব কি করে? নকুল ঘোষ ছুটবে।—চাপাও, আবার হাঁড়ি চাপাও! ঠাকুর! চাপিয়ে দাও হাঁড়ি! দুর্দ্ধর্ষেরা বসেই থাকবে। ভাত হবে—সেই ভাত খেয়ে তবে উঠবে। বকরাক্ষসের কিল চড় লাঠি ঠেঙা খেয়েও ভীম পায়েসের গামলা ছাড়ে নি —ভীমের খুড়তুতো ভাইয়েরাও শূন্য পাতা ছেড়ে ওঠে না। চন্দ্রবাবু এসে তখন দাঁড়াতে বাধ্য হন, বলেন—গেট আপ উঠে ওঠ! তাড়াতাড়ি কর! নো মোর ভাত। আর না!

ওদিকে তখন রেষ্টোরুমে আহম্মদ এবং তাঁর মধ্যে সুরু হয় বাগ্‌যুদ্ধ। কে আগে কল্কে পাবে। কেষ্ট ধূম্রায়িত মুখে হাতে হাসে। অন্য পণ্ডিতেরাও হাসেন।

আহম্মদ পণ্ডিতকে বলে—তিলকধারী টিকিবালা ব্রহ্মচার্য্যাচার্য্য। বামুনা।

পণ্ডিত ওকে বলে—দাড়িয়ালো কচ্ছহীনো—আহাম্মক মামদো খা।

ও বলে—তুই আগে তামাক খাবি কি? ওরে বামুনা! আমার কাছে তুই খেতে শিখলি।

পণ্ডিত বলে—ওরে মামদো সেইজন্যেই ত। তামাক খাবার গুরু তুই। দাড়িয়াল হতভাগা তোর মঙ্গলের জন্যেই ত বলি—আগে আর পরে নয়—তুই তামাক খাস নে। একেবারেই খাসনে!

—ক্যানেরে বেহ্মদৈত্যি? ক্যানে?

—ওরে মামদো, রোজ রোজ কত বলব? তুই মরে কবরে যাবি কিনা?

—যাব।

—আমি মরে চিতেয় পুড়ব কিনা?

—পুড়বি। ওরে বামনা তোর চিতে রাবণের চিতার মতুন চিরকাল জ্বলবে। নিববে না।

—না নিবুক। সেই আগুনে আমি তামাক সাজব আর খাব। বুঝলিরে দাড়িয়াল। কিন্তু তুই যাবি কবরে। বল মামদো মাটির ভিতর আগুন কোথা পাবি? ওরে মামদো তোর পেট ফুলে ঢোল হবে। মাটির ভিতর থেকে তামাক তামাক একটান তামাক বলে চেল্লাবি!

প্রথম প্রথম আহম্মদ দমে যেত। উত্তর খুঁজে পেত না। আজকাল উত্তর খুঁজে পেয়েছে। ফোর্থমাষ্টার কেষ্ট পাল ভূগোল পড়ায়—তার উপর লোকটা লিখতে পারে—বই লেখে; কেষ্ট পাল বলে দিয়েছে—মৌলবী সাহেব মাটির ভিতর আগুন আছে। আগ্নেয়গিরি তার প্রমাণ। আপনি সেখান থেকে আগুন নিয়ে তামাক খাবেন। ভয় কি?

পণ্ডিত হেসে বলেন—তবে খা।

পঞ্চকপর্দ্দক, শম্ভু পণ্ডিত, নকুল ঘোষ হাসে। নকুল ঘোষের বড় বড় দাঁত দুটি সম্পূর্ণ রূপে বেরিয়ে পড়ে,—ঘোষ টাকে হাত বুলোয় এবং জুতসই একটি কথার ফোড়ন খোঁজে।

আজ পণ্ডিত ফটকের ভিতর ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন। কৈ? চন্দ্রভূষণ কৈ? বারান্দায় কেউ নাই। ঘরের দরজায় তালা বন্ধ। কোথায় গেল চন্দ্র?

ঠিক এই মুহূর্ত্তটিতেই ডান দিকে পশ্চিম পাশে ইস্কুল বাড়ীর পূর্ব্ব প্রান্তের একখানা ঘরের ভিতর থেকে একটি কিশোর-কণ্ঠের কয়েকটি কথা তাঁর কানে এল।

—না স্যর, এ কথা শুনি নি স্যর!

—শুনিস নি? সত্যি বলছিস শুনিস নি? না,

আমাকে সে কথা বলতে তোর লজ্জা হচ্ছে? আমাকে ছাড়িয়ে দেবে।

—না স্যর। শুনলে নিশ্চয় বলতাম।

এই ত, এইটেই ত হেডমাষ্টারের আপিসঘর, পাশে দক্ষিণ দিকে লাইব্রেরী। লাইব্রেরীর জানালাগুলো খোলা রয়েছে। খোলাই থাকে। ন'টার সময় কেষ্ট ঝেড়ে-মুছে জানালা খুলে রেখে যায়। হেডমাষ্টারের আপিসের জানালাও খোলা থাকে। আজও বন্ধ নেই—তবে আধখোলা, না—তার চেয়েও কম খোলা। চন্দ্র জানালাটা ভেজিয়ে দিয়ে কোন ছেলের সঙ্গে কথা বলছে। গলার স্বর শুনে মনে হ'ল—সেকেণ্ড ক্লাসের শিবনাথ। এই গ্রামেরই বাঁড়ুজ্জে বাবুদের বাড়ীর ছেলে। ছেলেটি পড়াশুনায় অমনোযোগী কিন্তু বুদ্ধিমান—মর্য্যাদাবান ছেলে। এ ছাড়াও আরও একটা কি আছে ছেলেটার মধ্যে। ধরা যায় না ঠিক বোঝা যায়, কিন্তু একটা কেমন বিচিত্র স্পর্শ লাগে। ঘুমের ঘোরের মধ্যে স্পর্শের মত—কার স্পর্শ, কিসের স্পর্শ বোঝা যায় না কিন্তু ঘুমের মধ্যেও চেতনা সজাগ হয়। গ্রামের ছেলে, চৈতন্যবাবুদের বাড়ীর প্রায় পাশের বাড়ীর ছেলে—বোধ করি সেইজন্যে তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে কথাটা জেনে নিচ্ছে। জানালা ভেজিয়ে দিয়েছে, কেউ যেন না দেখতে পায়। রামজয় পণ্ডিত ভুলে গেলেন স্থানকালপাত্রের বিচার। ভুলে গেলেন ইস্কুলের আপিসে চন্দ্রভূষণ হেডমাষ্টার—তিনি হেড পণ্ডিত। ভুলে গেলেন ঘরে শিবনাথ ছেলেটি রয়েছে। ভুলে গেলেন তামাক খাওয়া হয় নি। তিনি ডাকলেন—চন্দ্রভূষণ চন্দর।

বগলের ছাতাটার ডগাটা দিয়ে ভেজানো জানালাটা খুলে দিলেন।

চন্দ্রভূষণ তাকালেন। উঃ চন্দ্রের মুখের কি চেহারা হয়েছে! মাত্র এক দিনে! শনিবার যাবার সময়ও চন্দ্রভূষণ সহজ মানুষ ছিল। গম্ভীর সতেজ দৃঢ়। আজ মুখে রেখা পড়েছে। চুলগুলিও কি বেশী পেকে গেছে?

চন্দ্রভূষণ হাতের ইশারায় শিবনাথকে যেতে বললেন। রামজয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন—রামজয় এখানে এস। একটি ম্লান হাস্যরেখা তাঁর পাতলা ঠোঁটে ফুটে উঠল। ক্রমশ

চেরাপুঞ্জী

আ. ন. ম. বজলুর রশীদ

আকাশের নীলে আর তরঙ্গিত সবুজের সাথে
কুয়াশা-মেঘের দল সচকিত—শিশির-সম্পাতে
স্তব্ধতার সমারোহ। আঁকা বাঁকা পাহাড়িয়া পথ
উঁচু নীচু ঢালু সোজা পীচ-ঢালা। বনজ সম্পদ
পাইনের তরুশ্রেণী পীচ ফল, রাঙা পাকা প্লাম
শিখরে চূড়ায় ঘন হিজিবিজি খাসিদের গ্রাম।
পাষাণের বক্ষ ভেদি' অবিশ্রান্ত জল-কলরব,
নৃত্যশীলা লাস্যময়ী ঝরণার বিপুল গৌরব।
চারিদিক সীমাহীন। প্রাচুর্য্যের বিপুল প্রসাদ
অপার দাক্ষিণ্য ভারে জীবনের পরম আস্বাদ।

দু'হাজার খাসিয়ার সুমধুর চেরাপুঞ্জী গ্রাম,
এক দিন বেলা শেষে দিক্‌প্রান্তে আমি দেখিলাম।
পাথরের বাড়ী ঘর—ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অধীর,
পাহাড়ী মৌসুমী ফুল খাসি ছেলে-মেয়েদের ভিড়,
অকারণ হাসি গান—বিচিত্র ভাষায় কথা বলা,
সুন্দর সুডৌল রাঙা পদক্ষেপে একা পথচলা,
তরুণীর অকস্মাৎ ফেটে-পড়া প্রাণের উচ্ছ্বাস,
ভিতরে বাহিরে যেন কলস্বনা নদীর উল্লাস।
পৃথিবীর কত পথ জনপদ বিশাল প্রান্তর—
চেরাপুঞ্জী তার বুকে সবুজের একটি স্বাক্ষর।

সৌরাষ্ট্রের গোযান [শিল্পী : শ্রীভানু স্মার্ত

বোম্বাইয়ে ভারতীয় চিত্রকলা

শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

কয়েক বছর ধরে বোম্বাইয়ে চিত্র-প্রদর্শনী লক্ষ্য করছি। এসব চিত্র-প্রদর্শনীতে এক শ্রেণীর চিত্র প্রদর্শিত হয়, যাদের নাম দেওয়া হয়ে থাকে ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি। এ পদ্ধতি ভারতীয় চিত্রকলার ঐতিহ্য সত্যই বহন করে কিনা, সে সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ আছে। আর এ পদ্ধতি যে শিল্পীগুরু অবনীন্দ্র-প্রবর্তিত ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি অনুসরণ করে চলছে না, একথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে।

নিরীক্ষা-পরীক্ষা দ্বারা শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্রকলার রূপ ও আঙ্গিকে কয়েকটি বিশেষ বস্তু এবং লক্ষণ সংযোজনা করে নিয়েছিলেন। ভারতীয় চিত্রবিদ্যা-শাস্ত্রের ষড়ঙ্গে দেহ ও রূপলক্ষণের যেসব রীতি বা নিয়ম লিপিবদ্ধ আছে তা ছাড়াও অবনীন্দ্র-প্রবর্তিত চিত্রকলায় ভারতের ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ বৌদ্ধ, চৈনিক ও নিপ্পনী চিত্রসমূহের প্রভাব অতিশয় স্পষ্ট। অবশ্য, সূচনায় অবনীন্দ্র-চিত্রকলায় পাশ্চাত্যের অনুকরণ এবং প্রভাবও ছিল, কিন্তু তা বেশী দিন স্থায়ী হয় নি অবনীন্দ্রনাথের স্বকীয়তালাভের পর। রাজপুত তথা মোগল চিত্রেরও সূক্ষ্ম কারিগরি এবং আলংকারিকটা বিন্যাসও এসে এই মৌলিকতায় মিশে গিয়েছিল, একটু পরখ করে দেখলেই তার আভাস স্পষ্টীকৃত হবে। প্রথম দিকে শিষ্য নন্দলালের মধ্যেও অবনীন্দ্র-চিত্ররচনার প্রভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই নন্দলাল খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর আঙ্গিকের নিজস্বতা, যা একান্তভাবেই ভারতীয় শিল্প-ঐতিহ্য-পুষ্ট।

জলরঙের বিন্যাস ছাড়াও নন্দলালের চিত্রে প্রকাশ পেল রেখার সাবলীলতা ও বলিষ্ঠতা। এই রেখাচিত্রও ভারতীয় শিল্পের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতাকে মেনে চলেছে। এর ভিতর কোথাও অস্পষ্টতা নেই।

তারপর শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ ও আচার্য নন্দলালের শিষ্যদের ভারতীয় শিল্পকলার রীতি ও রচনাশৈলীর নির্বিচার অনুসরণ করতে দেখা গেছে, যদিও অনেকেই পরে নিজ নিজ পথের সন্ধান খুঁজে পেয়েছিলেন। অসিত হালদার, সমরেন্দ্র গুপ্ত, মুকুল দে, ক্ষিতীন্দ্র মজুমদার, ভেঙ্কটাপ্পা, সাকিউজ্জমা, রমেন্দ্র চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্র দেববর্মা, দুর্গাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, রাণী চন্দ, হীরাচাঁদ দুগার, বিনায়ক মাসোজী প্রভৃতি নব্য-ভারতীয় চিত্রকলার একনিষ্ঠ সেবক এবং বলতে গেলে এঁদেরই উদ্যম ও প্রচেষ্টার ফলে এই চিত্রকলা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রসারলাভ করে।

নয়া দিল্লীতে সারদা উকিল, রণদা উকিল প্রমুখ শিল্পিগণ যে কলাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, তা অবনীন্দ্র-চিত্রকলার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত বলা চলে। এঁদের রচনাশৈলীতে

অতিরিক্ত যে বস্তুটি পাওয়া যায়, তা হচ্ছে অত্যধিক বর্ণসংযম ও দেহাবয়বকে অলঙ্করণ করার চেষ্টা। কাব্য ও ছন্দ এ দুটি লক্ষণ এঁদের ছবিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

সঙ্ঘমিত্রা
[শিল্পী : শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র রায়

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ভারতীয় চিত্রকলার মাধ্যমে পাশ্চাত্য পদ্ধতির বিন্যাস করেছেন। তাঁর পাশ্চাত্য চিত্রকলার রীতি ও প্রয়োগ-কৌশল অনেকটা সার্থক। তাঁর ভাস্কর্যেও কোন কোন ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য শিল্পরীতি অনুসৃত হয়েছে।

বাংলার বাইরে ভারতীয় চিত্রকলার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যে ক'জন শিল্পী এর প্রচার ও প্রসারে সহায়তা করেছেন, তাঁদের মধ্যে বীরেশ্বর সেন ও আবদুর রহমান চাঘতাই-এর নাম উল্লেখযোগ্য। চাঘতাইয়ের রচনা লিরিকধর্মী ও বর্ণবিলাসী—তা হলেও তার সুরটি ভারতীয় চিত্রাদর্শের নব্যধারায় অনুপ্রাণিত। বীরেশ্বর সেনের চিত্রে নিষ্ঠা ও পরিচ্ছন্নতা নব্যধারার মর্যাদা রক্ষা করেছে।

বিদায় শিল্পী : ডি, এফ, ...

অসিত হালদার ও বীরেশ্বর সেনের অনুপ্রেরণায় লক্ষ্ণৌ স্কুল থেকে যে সব ছাত্র ভারতীয় চিত্রকলায় দক্ষতা লাভ করেন, তাঁদের মধ্যে জিজ্ঞা, প্রণয় রায়, ঈশ্বর দাস, কিরণধর ও রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে করা যেতে পারে। কলাভবনে শিক্ষাপ্রাপ্ত সুধীর খাস্তগীর দেরাদুনে ঐকান্তিক চেষ্টা দ্বারা ভারতীয় চিত্রের রূপকে নানা ভাবে নিরীক্ষা পরীক্ষা করে চলেছেন। ভারতীয় চিত্রকলার মূল ভাবটি নিয়ে জয়পুরে শিক্ষকতা করছেন শিল্পী শৈলেন দে।

অন্ধ্রদেশে ভারতীয় ভাবধারার যে মৌলিক রূপটি আজও টিঁকে আছে, তা সর্বাংশে প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় ও মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের প্রবর্তিত-অবস্থাবৈগুণ্য এখানকার শিল্পীরা ব্যবহারিক চিত্রকলার দিকে এতটা ঝুঁকে পড়েছেন যে মনে হয় কিছুকাল পরে ভারতীয় চিত্র বলতে হয়ত এদিকে কিছু থাকবে না। বর্তমানে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য ব্যবহারিক চিত্রকলার মাধ্যমে এমন একটি শিল্পবস্তু গড়ে উঠেছে যে

া থেকে কোন আঙ্গিক বা ভাবগত আবেদনই এসে এখন পৌঁছয় না।

বোম্বাইয়ের শিল্পীমহলে ও স্কুলগুলোতে ঠিক এমনি একটা সংমিশ্রণের ব্যাপার চলেছে। বোম্বাই ব্যবসা ও শিল্পপ্রধান অঞ্চলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এখানকার যাবতীয় আর্টের পিছনে একটা সুপরিকল্পিত ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গী থাকে। এ কারণ এখানে যে ব্যবহারিক চিত্রকলা প্রাধান্যলাভ করবে, তাতে আর সন্দেহ কি! তবু একদা নব্য-ভারতীয় চিত্রকলার যথার্থ আবেদনটি এসেছিল এখানে বিশ্বভারতীর কল্যাণে। এখানকার গুজরাটী মহল এ আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন বেশী। এ হেতু শান্তিনিকেতনের কলাভবনে যে সমস্ত অবাঙালী ছাত্রছাত্রী আছে, তার বেশীর ভাগই হচ্ছে গুজরাটী। এখানে এমন দুই শতের ওপর ছাত্রছাত্রী রয়েছে, যারা বিশ্বভারতীর কোন-না-কোন একটি ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত। কলাভবনের ডিপ্লোমা নিয়ে যাঁরা এখানে আছেন, তাঁরা ভারতীয় চিত্রকলার উন্নতির জন্যে বিশেষ কিছু করতে পারছেন বলে মনে হচ্ছে না। তার হেতু বোধ হয় এই যে, পাশ্চাত্ত্যের ব্যবহারিক চিত্রকলার প্রভাবের সামনে দাঁড়াতে পারেন এমন ক্ষমতা তাঁদের নেই। এঁরা শুধু ছবি আঁকতে জানেন, কিন্তু কি করে এই ছবি জনসাধারণের দরবারে উপস্থাপিত করতে হয় তা ঠিকমত জানেন না। এ বিষয়ে

বিহগ-স্বর্গ [শিল্পী : শ্রীএ. এ. আলমেলকা

শ্রীপুলিন দত্ত ও তাঁর ভ্রাতা শ্রীরবি দত্ত চেষ্টা করছেন যাতে অবনীন্দ্র-প্রবর্তিত চিত্রধারার সারমর্মটি এখানকার বুদ্ধিজীবী মহল গ্রহণ করতে পারে।

জ্যোতিরিন্দ্র রায় ভারতীয় শিল্পধর্মের প্রচারের আদর্শ নিয়েই ভারতীয় কলাভবন নামে একটি কলাবিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন চার্নি রোডের কাছে; কিন্তু নানা বিপত্তিতে পড়ে তাঁকে বিদ্যালয়টি বন্ধ করে দিতে হয়েছে সম্প্রতি। তবু তাঁর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বোম্বাইয়ে অবাঙালীদের মধ্যে যাঁরা অবনীন্দ্র-শিল্পধর্মকে ঐকান্তিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে জে. এম. আহিবাসী, আর. ডি. ধোপেশ্বরকারের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা ছাড়াও বাঙালী-অবাঙালী আরও যাঁরা ভারতীয় শিল্পকে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন বা করছেন, তাঁরা হলেন রবিশঙ্কর রাবল, রসিকলাল পারেখ, কনু দেশাই, মনীষী দে, আলমেলকার, সোমালাল

পাল্কী চলে [শিল্পী : শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত
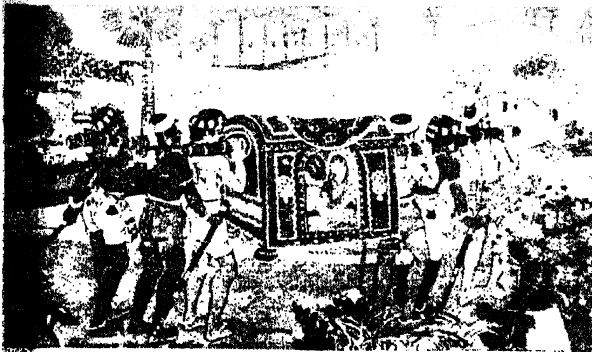
শা, ভানু স্মার্ত্ত, চাওড়া প্রভৃতি। কিন্তু এঁদের রচনা এমন প্রভাবসম্পন্ন নয়, যদ্দারা এখানকার জনগণের ব্যবসায়ীসুলভ মনোবৃত্তির পরিবর্তনসাধন হতে পারে। এখানকার জনগণের মন এখনও বেশ পাশ্চাত্ত্য শিল্পের পক্ষপাতী, একারণ এখানকার শিল্পীরা পাশ্চাত্ত্য শিল্পেরই অনুকরণ করে চলেছেন, যদিও তার মধ্যে চলেছে নানাপ্রকার ইজমের নিরীক্ষা-পরীক্ষা ও বলতে গেলে এ সব ইজমের মূলমন্ত্র বিদেশ

আমার পিতাজী [শিল্পী: শ্রীজে. এম আহিবাসী

হতেই আগত। এখানকার এক দল শিল্পী একজাতীয় শিল্প-রচনা প্রকাশ ও প্রচার করছেন যাদের নাম দেওয়া যেতে পারে ব্যবহারিক ভারতীয় চিত্রকলা। অর্থাৎ, ফর্মটা ভারতীয় রেখে জোরালোর পোস্টার কালার চাপিয়ে রচনাটিকে কমার্শিয়াল করে তোলা। বিজ্ঞাপন ও প্রচারের কাজে এ জাতীয় চিত্র বোম্বাইয়ের বাজারে প্রাধান্যলাভ করে আছে। বোম্বাইয়ের বর্তমান বৎসরের চিত্র-প্রদর্শনীতে এমন কোন ছবি দেখলাম না, যাকে পরিপূর্ণ ভাবে নব্যভারতীয় চিত্র-কলার অঙ্গীভূত বলা চলে। যাঁরা এক দিন অবনীন্দ্র-শিল্পাদর্শের বাণী বহন করে এসেছিলেন, তাঁদের কোথাও কোন প্রদর্শনীতে দেখতে পাওয়া যায় না আজকাল।

অধুনা ভারতীয় চিত্রকলা নামে এখানে যা প্রদর্শিত হয়ে থাকে, অবনীন্দ্র-অনুসৃত ভাবাদর্শের নীতি যে তাতে নেই তা পূর্বেই বলেছি। তবে কোন্ আদর্শের উপর এমনিতর ভারতীয় চিত্রকলা অঙ্কিত ও প্রদর্শিত হচ্ছে, প্রসঙ্গতঃ এখানে সে কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এক কথায় তার রূপের ব্যাখ্যায় বলা চলে যে, পাশ্চাত্ত্যের সাম্প্রতিক ভাবাদর্শের পটভূমিকায় খানিকটা দিশী জয়পুরী বা রাজস্থানী চিত্রের ঢঙ মিশিয়ে এই নব্য চিত্র-পদ্ধতিটিকে হাজির করা হয়েছে জনসাধারণের দরবারে। আর অজ্ঞ জনসাধারণও নির্বাক বিস্ময়ে এই নব্যতন্ত্রের ইঙ্গ-ভারতীয় রূপশিল্প প্রত্যক্ষ করে কি বুঝছে কে জানে।

কথা হচ্ছে এই, বিদেশী ষ্টীলফ্রেমে ও কনস্ট্রাকশনের উপর ভাল ইমারত তৈরি হতে পারে সত্য এবং তাতে ভাল ভাবে বসবাসও চলে, কিন্তু স্বকীয় বস্তু বলে তাতে কিছু থাকে না, এবং বংশপরম্পরাগত ঐতিহ্যকেও সেখানে অস্বীকার করা হয়। এ বুকেই অবনীন্দ্রনাথ প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে ঐতিহ্যপূর্ণ দেশী কাঠামোর উপর নব্যভারতীয় চিত্রকলার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবং সে প্রতিষ্ঠা নানা বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে বিশ্বের দরবারে যাচাইও হয়ে গিয়েছে। নব্যভারতীয় চিত্রকলা স্বীকৃতি পেয়েছে সারা বিশ্বে। এর বিষয়বস্তু নির্বাচনে, কম্পোজিশনের বাঁধুনিতে, বর্ণবিন্যাসের সংযমে এবং এর মাধুর্যপূর্ণ ভাবগম্ভীরতায় যে রূপ প্রকাশ পেয়েছে, তা পৃথিবীর যে-কোন ললিতকলা থেকে হীন নয়।

দেশীয় শিল্পীরাই বা কেন ভারতীয় চিত্রকলার ভাবাদর্শ গ্রহণ করতে পারছেন না, তা ভাবতেও অবাক লাগে। অথচ প্রত্যেক দেশেই দেখা যায় স্ব-স্ব দেশের ঐতিহ্য ও জাতীয়তাবোধের নিষ্ঠা নিয়ে শিল্পসৃষ্টি হয়ে থাকে। ফরাসী দেশ সাম্প্রতিক চিত্রকলার পাদপীঠ হলেও সেখানকার শৈল্পিক ট্রাডিশন বা ঐতিহ্য কোনরূপ বর্জিত হয় নি। জাপান ও চীনের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

বিরাট ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হয়ে আর নব্যভারতীয় চিত্রকলার ভাবাদর্শ হাতের কাছে পেয়েও কেন যে অধিকাংশ ভারতীয় শিল্পী পরদেশী চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির অনুকরণ ও অনুসরণ করে চলেছেন, তা বুঝতে পারা যায় না।

ব্রজরাণী

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

অমন ভক্তিমতী আচার-পরায়ণা গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে—কিন্তু পথে যদি বিয়ের বাজনা বেজে উঠল তো রক্ষা নাই। রইল পড়ে ঘর-গৃহস্থালির কাজ, জপ তপ পূজা পাঠ—যেমন অবস্থাতেই থাকুক না কেন, ছুটে পথের ধারে এসে দাঁড়াবেই। নতুন বর-কনে দেখবার কৌতূহল কমবেশী সব মেয়েরই থাকে, কিন্তু ব্রজরাণীর আতিশয্য সবার চোখেই ঠেকে। এ নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ ঝাঁজালো আলোচনাও চলে। আলোচনার তাপটুকু ব্রজরাণীর গায়ে এসে যে লাগে না তা নয়, কিন্তু সমুদ্র যেমন বেলাভূমি অতিক্রম করতে পারে না তেমনি স্বভাব ব্রজরাণীরও। এক বার শুনলেই হ'ল বরকনে যাচ্ছে পথ দিয়ে—ব্যস, ছুটে সে আসবেই পথের ধারে। অধীর আগ্রহে চেয়ে থাকবে গরদ-বেনারসীজোড়-পরা চন্দনচর্চ্চিত-মুখ বরবধূর পানে। চেয়ে চেয়ে ব্রজরাণীর আশা যেন মেটে না; ওরা এগিয়ে গেলেও খানিকক্ষণ অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে থাকে, বেশ বোঝা যায় মনটা ওর শোভাযাত্রার পিছু পিছু চলেছে।

পাশের বাড়ীর ফুল-কাকীমা হয়তো কোনদিন রহস্য করে বলেন, বাড়ী চল ব্রজ, বরকনে আর আসবে না এ পথে।

ব্রজর সম্বিৎ ফিরে আসে। একটু হেসে আঁচলটা মাথায় টেনে দিয়ে বলে, আসবে বৈ কি কাকীমা, এটা যে বোশেখ মাস।

ফুল-কাকীমা অবাক হন ওর কথায়, কোন উত্তর করেন না। পাড়ার সমবয়সীরা এক জায়গায় মিললে বলেন, বর দেখবার জন্ম এমন কাঙালপনা কোথাও দেখি নি ভাই—পাঁচ বছরের মেয়েরও বেহদ্দ! একটু থেমে বলেন, তা হবে না-ইবা কেন, গাঙ্গুলী-বাড়ীর আদিঅন্ত অনেক কথাই জানি। আজ তো দেখছি না ব্রজকে—তিরিশ বছরের ওপর হ'ল, সেকি আজকের কথা? প্রথম ঘরবসত করতে এসেছি—পাশের গাঙ্গুলী-বাড়ী থেকে একটি দশ-এগার বছরের ফুটফুটে মেয়ে আমার আশে-পাশে ঘুর ঘুর করে বেড়ায়। লাজুক মেয়ে, কিছু জিজ্ঞাসা করলে কথার উত্তর দেয় না, একটু হেসে মুখ নামিয়ে নেয়। ঘর-গেরস্থালির কথাও বোঝে, বোকা নয় মোটেই। এক দিন বেড়াতে গেছি ওদের বাড়ী—দেখি মেয়েটি সাজি ভরে ফুল তুলে নিয়ে এল। পাড়া-বেড়ানো পায়ে কিন্তু ঠাকুর ঘরে ঢুকল না, রোয়াকের এক ধারে জলের বালতি ছিল—তাই থেকে জল নিয়ে পা ধুয়ে তবে ঢুকল ঠাকুর ঘরে। ভাবলাম, উকি মেরে দেখিই না—কি করছে মেয়ে? ও মা, দেখি কিনা পাকা গিন্নীর মত ফুল গুছিয়ে তামার টাটে রাখল, সাদা কালো দু'রকম চন্দন ঘষে রাখল কলার পাতে, কোশাকুশি আর পানিশঙ্খে ভরল গঙ্গাজল, পেতলের পিদীমে তেল সলতে দিয়ে পিলসুজটা রাখল এক পাশে আর ধুমুচিতে রাখল নারকোল ছোবড়া। পূজো বসলে পিদীম জ্বালবে—ধুনো দেবে। তার পর কম্বলের আসন পাতল, আর বাঁ ধারে শাঁখ আর ঘণ্টা। ঘরে মদনগোপাল ঠাকুর আছেন—নিত্যি পূজো হয় কিনা। ওই মেয়েই আমাদের ব্রজ। ওর মাকে বললাম, কাকীমা, আপনার মেয়ের আচার-বিচার তো বেশ—কেমন পরিপাটি করে পূজোর জিনিষ গুছিয়ে রাখলে।

কাকীমা বললেন, বামুনের ঘর, ঠাকুর রয়েছেন, নিত্য সেবা ভোগ হচ্ছে—এসব না করলে চলবে কেন মা।...তার পর এক দিন শুনি ব্রজর বিয়ে। তেরই ফাল্গুন—পূর্ণিমার দু'দিন আগে। কোথায় বিয়ে? কেমন পাত্র? এই তো দু' তিনখানা গাঁ পেরিয়ে বাগাঁচড়া, যেখানে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে মা বাগ্‌দেবী রয়েছেন। ভারি জাগ্রত দেবী; মাঘ-ফাল্গুনের শুক্লপক্ষের শনি-মঙ্গলবারে দশ-বিশ ক্রোশ দূরের মানুষ ছুটে আসে ওঁর পূজো দিতে। ডাব চিনি মানত করে—পাঁঠা মানত করে—ষোলআনা পূজো দিয়ে মানত শোধ করে। সেই গাঁয়ের বাঁড়ুজ্জে-বাড়ীর ছেলে। তা মেয়ের বয়স যেমন কম, ছেলেও ষোল-সতেরোর বেশী হবে না। রংটি অবশ্য কালো, কৃষ্ণ কালো নন? সুন্দর গড়নপেটন, টানা চোখ—টিকলো নাক—চমৎকার ছেলেটি। সেইবারই ইস্কুলের পড়া শেষ হবে—একটা পাস দেবে। জমি-জমা, তালুক-মুলুক নেই, নগদ টাকা-কড়িও নয়, তবে পাস করলে চাকরি মিলবে। বাপ নেই, মা আছেন—বড়ভাই আছেন। ব্রজর মা বললেন, ছেলে আমার দেখা, কত বার এ বাড়ীতে এসেছে—ব্রজর সঙ্গে খেলাধুলো করেছে, দুটিতে ভারি ভাব। মিলবে ভাল। কিন্তু ভাই, ছেলেবেলায় ভাব জমলেই যে বড় হলে তা ভাঙবে না—এমন কথা কেউ বলতে পারে না। সবই অদৃষ্ট! এই দেখ না, ব্রজর বিয়ে হয়ে গেল, শ্বশুরবাড়ীও গেল দু' বার, কিন্তু ওর বর যখন কলকাতায় গেল কলেজে পড়তে—তখনই ওর কপাল ভাঙল। থাক বাপু, সে দুঃখের কাহিনী আর শুনে কাজ নেই।

না—না বলুন? মেয়েরা ওঁকে ঘিরে ধরল। সবটা না শুনলে আধকপালে হয়ে মরি আর কি!

এত আর রূপকথা নয় যে শেষটুকু না শুনলে কপাল ব্যথা কি বুক ধড়ফড় করবে! বরং শুনলেই...আঃ কি যে জালাতন করিস? দে তবে আর দুটো পান—এক চিমটি দোক্তা।

পান দোক্তা গালে পুরে জাঁকিয়ে বসলেন ফুল-কাকীমা। বললেন, এঁদেরই হিসেবে হ'ল ভুল। একটা পাস দিয়ে যখন চাকরি মিলছে—তখন আরও পাস দিইয়ে আরও ভাল চাকরি পাবার লোভ কেন জাগিয়ে দেওয়া? জামাই তো বলেছিল—কি হবে আর পড়ে? জামাইয়ের মাও বলেছিলেন, বেশী পড়াতে

পারি সে অবস্থা আমাদের নয়। ব্রজর বাবা জিদ ধরলেন, তা হবে না, ওর পড়ার খরচ না হয় আমিই দেব। চাকরি যদি করতেই হয়—ভাল চাকরি করুক, দশের একজন হোক। তাই হ'ল। দু'মাস খরচ নেবার পর ছেলে লিখে জানালে, আর টাকা পাঠাবার দরকার নাই, একজনের বাড়ীতে থেকে—তাঁর এক ছেলে আর এক মেয়েকে পড়িয়ে—আমার থাকা খাওয়া, কলেজের খরচ সব চলে যাচ্ছে।...সেই বাড়ীতে থেকে লেখাপড়া শেখাই হ'ল কাল। টপ টপ করে পাস করল, ভাল চাকরিও পেল, ছেলে কিন্তু পর হয়ে গেল। যে মেয়েটিকে পড়াত—সেইটিকে বিয়ে করে পশ্চিমে চলে গেল।

সব জেনে শুনে সেই মেয়েটির বাপ-মা সতীনের ওপর মেয়ে দিলে?

একি তোমার আমার ঘরের বিয়ে যে ঠিকুজী কোষ্ঠী তন্ন তন্ন করে গণ পণ মিলিয়ে—বেয়াই-বেয়ানের সাধ-আহ্লাদ পুরিয়ে... শুভকাজটি হবে? এ হ'ল গিয়ে ভালবাসার ব্যাপার। মেয়ে স্বাধীন—ছেলেও স্বাধীন—

মেয়েদের ফিসফিসানি থেমে গেল। প্রায় চল্লিশ বছর আগে-কার একটি কিশোরী মেয়ে বেদনা-বিহ্বল ছল-ছল চোখে ওদের হৃদয়-সান্নিধ্যে এসে দাঁড়াল। সে মেয়ে কথা বলে না, চোখের জল ফেলে না, দীর্ঘনিশ্বাসও চাপে না, শুধু তার মৌন অভিযোগ পাষাণের ভার নিয়ে সব ক'টি হৃদয়ের উপর চেপে বসে।

আহা!

তার পর জামাই ব্রজকে নিতে আসেন নি?

এসেছিল। স্বীকার করেছিল নিজের দোষ। বলেছিল, ক্ষমা কর। ব্রজ যায় নি।

কেন যায় নি কাকীমা?

তোরা হলে পারতিস যেতে? পারতিস সতীন নিয়ে ঘর করতে?

সতীনের কথা আমরা ভাবি না, কিন্তু ওভাবে ফিরে যেতে হয় ত পারতাম না। একটি মেয়ে বলল।

কেন পারতিস না? সম্মানে বাধতো?

বাধে নাকি কাকীমা? 'পতি পরম গুরু'—আপনাদের কালের নীতিকথা, কিন্তু একালের মেয়ে আমরা ভুলতে পারি না—পত্নীও মানুষ—তারও আত্মমর্য্যাদা আছে।

ব্রজ ত এ কালের মেয়ে নয়। কাকীমা আত্মগতভাবে বল-লেন। তবু কেন গেল না স্বামীর ঘরে, কে জানে!...হতে পারে অভিমান। প্রথম বারে না হয় মানলাম সতীন নিয়ে ঘর করবার ইচ্ছে ওর ছিল না। কিন্তু সেই সতীন মারা গেলে—পনেরো বছর বাদে, ফের যখন ওর স্বামী চেষ্টা করল নিয়ে যেতে—তখন ত অনায়াসে যেতে পারত। ততদিনে অভিমান থাকবারও কথা নয়। বাপের বাড়ীর ত এই অবস্থা, কোন রকমে চলে সংসার। আর পশ্চিমে ওর স্বামী থাকে রাজার হালে; বাড়ী গাড়ী—সম্মান-সম্পত্তি—সোনায় মুড়ে রাখত ব্রজকে।

মেয়েরা পরস্পরের পানে চাইল। সত্য, তখন ত মান সম্মানের কথাই ছিল না। অভিমান ছিল কি? বড় আঘাত মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে, কালের প্রলেপে মুছে যায় সে ক্ষত। চিরকাল অভিমান পুষে ক্ষতবিক্ষত হয়ে দিন যাপন করতে পারে কি কোন মেয়ে?

অথচ ব্রজকে দেখলে মোটেই মনে হয় না—সে দিনের এতটুকু উত্তাপ ওর মনে সঞ্চিত হয়ে আছে। চল্লিশ বছরের পারে ঠেলেও মুখে ওর প্রসন্নতা অটুট রয়েছে। যে মেয়ের বুকে অভিমানের তুষ জ্বলে ধিকিধিকি সে কি এমন সহজে চলাফেরা, হাসি-আহ্লাদ করতে পারে? না, সে মেয়ে কৌতূহলী বালিকার মত সব কাজ ফেলে ছুটে যায় বরকনে দেখতে? সে কেমন করে হাসিমুখে বাসর ঘরে উঁকি মারে, কোন্ সাধে নিমন্ত্রণ করে আনে অষ্টবর্দ্ধনে-আসা বরবধূকে, নিজের হাতে নানান জিনিষ রান্না করে খাওয়ায়? স্মৃতি যদি উত্তপ্ত করেই মনকে—সাধ-আহ্লাদের শত-দল সে অস্বচ্ছ সরোবরে ফোটে কেমন করে?

এই সব প্রশ্ন মেয়েদের মনে জাগেই, এবং এ নিয়ে কদর্থও করে কেউ কেউ। সেই অপযশের বাতাস ব্রজর গায়ে যে লাগে নি তা নয়—ব্রজ তা গ্রাহ্য করে নি। কিন্তু ব্রজর বাপ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। তিনি শেষ চেষ্টা করলেন ব্রজকে স্বামীর ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

এক দিন বললেন, রাণী, চ আমার সঙ্গে—দিনকতক তীর্থে ঘুরে আসি।

না বাবা, আমরা গেলে বোশেখ মাসে মদনগোপালের শেতল দেবে কে? বউ একা সব দিক সামলাতে পারবে না।

জ্যৈষ্ঠ মাসে ব্রজর বাপ কোন আপত্তি শুনলেন না—মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বাড়ী থেকে।

প্রথমে গেলেন কাশী। দশাশ্বমেধে স্নান, বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা দর্শন—দোকান-পসার লোকজন—হৈ-হল্লায় ব্রজ হাঁপিয়ে উঠল। বলল, বাবা, অন্য কোথাও চল, এত গোলমালে মানুষ পুজোপাঠ করে কি করে!

যার মন ঠিক হয়েছে—বাইরের গোলমালে তার কি যায় আসে?

এদের কারুরই মন ঠিক হয় নি বাবা, সবাই গোলমাল করে।

ব্রজর বাবা হেসে বললেন, আচ্ছা—প্রয়াগে চল। বেশ ফাঁকা আর নির্জ্জন।

ত্রিবেণী-সঙ্গমে যা অল্প ভীড়, কিছু কোলাহল—নতুবা ধূ-ধূ-করা বালির চরে মন বিক্ষিপ্ত হবার উপকরণ বিন্দুমাত্র নাই।

ব্রজ বলল, বড্ড ফাঁকা, এখানে মন ভরে না।

আসলে মেয়ের মনই ধূ-ধূ করছে এই চরের মত, মনকে ফাঁকি দেওয়া ত সহজ নয়।

আগ্রায় এলেন ব্রজর বাবা। বললেন, এখানে একটি জিনিষ দেখাব তোমায়—পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্যের এক আশ্চর্য্য।

তাজমহল দেখে ব্রজ অবাক হ'ল, কিন্তু পাথর দিয়ে এমন সাজিয়ে সমাধি রচনা করার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হ'ল না তার, এত জাঁকজমক করে ভালবাসার কথা জানানোর কি প্রয়োজন ছিল বাদশার? জগতের সবাই বলবে 'প্রেমিক'—এই বাহাদুরিটুকু নিতে?

ব্রজর বাবা বললেন, পৃথিবীতে অমর কীর্ত্তি রেখে গেছেন সম্রাট।

নিজেকে ভালবাসতেন বলেই—নিজেকে অমর করতে চেয়েছেন।

বাবা বুঝলেন—তাজমহলও মেয়ের মন ভরাতে পারল না।

ওকে নিয়ে গেলেন বৃন্দাবনে। বললেন, এখানে জাহির করার মত কিছু আছে কি মা? দেখ—ভাল করে।

কি দেখবে ব্রজ? বৃন্দাবন আজ নতুন দেখল না ও। মদনগোপালের কত গল্প শুনেছে ছেলেবেলায়। জ্ঞান হয়ে ভাগবতের আসরে, কীর্ত্তনে, যাত্রায় ব্রজলীলা আস্বাদ করেছে বহুবার। এখানে চির কিশোর কৃষ্ণ, চির কিশোরী রাধা, লীলাও নিত্যকালের।

মনে পড়ল—এক দিন যেন বাবাকে প্রশ্ন করেছিল, আচ্ছা বাবা, শ্রীকৃষ্ণ রাধার বয়স কি বাড়ে না?

কেমন করে বাড়বে মা। ওঁদের বয়সের হিসাব ত জড় দেহে নয়—হিসাব যে চিন্ময় অন্তরে।

বুঝতে পারে নি ব্রজ—অবোধের মত ফের শুধিয়েছিল, মথুরায় গিয়ে—দ্বারকায় গিয়েও উনি বুড়ো হন নি?

বাবা হেসে বলেছিলেন, মথুরায় ত মাত্র ছ'মাস। আর দ্বারকায় গিয়ে উনি যে বুড়ো হয়েছেন—সে কথা ত কোথাও লেখা নেই।

কথাটা মনঃপূত হয় নি ব্রজর। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান হলেও মানুষের দেহ ধরে এসেছিলেন। মানুষের দেহ যখন জরাব্যাধির অধীন—তখন ওঁর দেহ কেন—

ছি মা, ও কথা বলতে নেই। সব রসের সেরা রস হ'ল মধুর রস—সেই মধুর রসের আস্বাদন রাধামূর্ত্তিতে। বয়সের কথা এখানে আসেই না। এখানে শুধু মন; প্রেমে পূর্ণ হয় যদি মন—বয়সের বিচার কে করবে মা? বিচার ত মনে।

সেই বৃন্দাবন! বাইরে নয়—মনের চোখ মেলে দেখল ব্রজ। এখানে চিরকিশোর কৃষ্ণ; নিত্যলীলা তাঁর চলছেই; এক যুগ নয়—যুগযুগান্তর ধরে। যা দেখে তাতেই মগ্ন হয়। গোবিন্দজীর মন্দিরে আরতি দেখবার সময় বিগ্রহের প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে সম্মোহ আসে, নিধুবন—নিকুঞ্জবনে কোন্ চিরকিশোরের পদচিহ্ন অন্বেষণ করে। বঙ্কুবিহারীর ওখানে বড় ভিড়, কিন্তু গোপীনাথকে বড় ভাল লাগে। কিশোর মূর্ত্তি কৃষ্ণের—জরা বার্দ্ধক্য নাই, রোগ শোক তাপে মলিন নয় দেহকান্তি। বৃন্দাবন ছাড়তে মন চাইছিল না—তবু বাবা নিয়ে এলেন মথুরায়। প্রাসাদ আর মানুষের ভিড়, আর কোলাহল। একটি প্রাসাদে এসেই উঠলেন বাবা। কেন এখানে উঠলেন? ওদের পরিচর্য্যার জন্য এ বাড়ীর মানুষজন এত উৎসুক কেন?

এক মহার্ঘ্য-বেশী প্রৌঢ় এসে বাবাকে প্রণাম করল। ভাল আসনে বসিয়ে বিনীত ভাবে নীচু গলায় কথা বলতে লাগল। একটু দূরে বসে ব্রজ দেখল মানুষটিকে। ও কি বাঙালী? পোশাকে ও কথাবার্ত্তায় তাই মনে হয়। চওড়া বুক—লম্বা দেহ আর কাল রঙ দেখে মনে হয় শক্তিশালী মল্ল। গলার স্বর গম্ভীর এবং চালচলনও প্রভুত্বব্যঞ্জক।

ওর সঙ্গে কথা শেষ করে ব্রজর কাছে এসে বসলেন ব্রজর বাবা। বললেন, ওর ইচ্ছা তুমি এখানে থাক।

ওঁর ইচ্ছা হলেই কি আমি থাকতে পারি?

পার, খুব পার। এক দিন এই অধিকার আমি ওকে দিয়েছিলাম। তোমার ভাল-মন্দের ভার—রক্ষণাবেক্ষণের ভার।

বাবা! ব্রজর আর্ত্তস্বরে চমকে উঠলেন উনি।

কেন মা, স্বামীর ঘরই কি মেয়েমানুষের শ্রেষ্ঠ ঘর নয়?

প্রাণপণে চোখের জল চাপতে চাপতে মাথা নাড়ল ব্রজ। না, না, না। এ যে মথুরা—কৃষ্ণ রাজা হয়ে বসেছেন এখানে। এই অট্টালিকা, ঐশ্বর্য্য, মানুষজন, প্রভুত্বের অহমিকা…বৃন্দাবন এখানে মিলিয়ে যায়, ধোঁয়া হয়ে যায়, বাষ্প হয়ে যায়—

…দেশে ফেরবার মুখে ব্রজর বাবা বললেন, ভাল করলে না মা। আমার অবর্ত্তমানে কে তোমায় দেখবে জানি না।

সেই ক্ষোভ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ওঁর মনে লেগে রইল। বললেন, তোর জন্য মরেও শান্তি পাচ্ছি না রে! কেন তুই নিজের ঘর চিনে নিলি না, মা?

নিজের ঘর? অধোবদনে চুপ করে রইল ব্রজ। বাইরের মানুষকে কেমন করে জানাবে—মথুরার ঐশ্বর্য্যস্তূপে ঘর বাঁধার কল্পনা কোনদিন ও করে নি।…প্রভুত্ব-লোভী অপ্রেমী মানুষের আশ্রয়ে থাকার চিন্তাও যে সইতে পারে না ও। কেমন করে বোঝাবে এঁদের—

বাবার মৃত্যুর পর মদনগোপালের ঘরে বেশী করে সময় কাটাতে লাগল ব্রজর। আচার-বিচারের উগ্রতা বাড়ল, সংসার থেকে ক্রমে দূরে সরে এল। ঠাকুরের জলচৌকির উপর কিশোর কৃষ্ণের পট রাখল সাজিয়ে—একটি নয় কয়েকটি। ধূপ-ধুনো প্রদীপ জ্বালিয়ে চলল আরতি, ফুল-চন্দন দিয়ে পূজা—চোখের জল মিশিয়ে প্রণাম; সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন। কিন্তু মুশকিল হয় পথ দিয়ে বাজনা বাজিয়ে বরকনে গেলে। তখন অর্দ্ধসমাপ্ত পূজা ফেলে, আধখানা কাজ ভাসিয়ে দিয়ে, চুলটা ভাল করে না জড়িয়ে, মাথায় কাপড়খানা তুলে না দিয়েই ছুটে আসে পথের ধারে—উন্মাদ-বিহ্বল

অপলক দৃষ্টি মেলে চেয়ে চেয়ে দেখে শোভাযাত্রা—দেখে চেলি চন্দন সজ্জিত বরবধূকে। হয়তো বা দেখে দূর বৃন্দাবনের স্বপ্ন—চির-কিশোর কৃষ্ণ, চিরকিশোরী শ্রীরাধিকা আর নিত্যকালের লীলাপ্রবাহ-ধারা।

মথুরার ঘটনাটা কিছুদিন পরে কেমন করে জানাজানি হয়ে গেল। স্বামী নিতে এলেন নিজে থেকে—গেল না ব্রজ; স্বামী অভ্যর্থনা করলেন ঐশ্বর্য্য অট্টালিকার মাঝে, মনঃপূত হ'ল না ব্রজর; এত সৌভাগ্য কোন সীমন্তিনী কোন সাধ্বীই কি কল্পনা করতে পারে? এর মূলে নিশ্চয় রহস্য আছে, নিশ্চয় আছে মধু—যার লোভে মন-মধুপ বিশ্বের কামাসম্পদ হেলাভরে দূরে ঠেলে ফেলে দেয়। কৌতূহলী হয়েও প্রতিবেশিনীদের কৌতূহল মিটল না। সন্দেহ ভঞ্জন হ'ল না বলেই সন্দেহের ধোঁয়ায় কালো হয়ে উঠল গ্রামের আকাশ।

এক দিন ভ্রাতৃবধূ সুলোচনা কেঁদে বলল, তোমার জন্ম আমি কি মাথা খুঁড়ে মরব?

কেন, হ'ল কি?

জান না কিছু? স্বামীর চেয়ে মেয়েমানুষের আপনজন নেই, তাঁকে তুমি দূরে ঠেলে রাখলে? মানি—টাকা-কড়ি, বাড়ী-গাড়ী এসবে তোমার রুচি নেই, তবে কেন থাকতে পার না একলাটি ঠাকুর দেবতা নিয়ে? কেন বরকনে দেখবার জন্ম আদেখলার মত ছুটে ছুটে পথে যাও, কেন নতুন বর কনেকে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ কর—

ওর চোখের জল মুছিয়ে হেসে বলল ব্রজ, মানুষের মধ্যে যে ভগবান আছেন তাঁকে দেখতে ভাল লাগে বৌদি। নতুন বর-কনের মুখের দিকে চেয়ে দেখো ভাল করে—দেখবে খুসী-ঝলমলে মুখখানিতে কেমন মায়া মাখানো, কেমন লজ্জা-লজ্জা অনুরাগের ছোপ, কেমন খানিক জানা খানিক না-জানা কৌতুক। যেন বৃন্দাবন—

বেশ তো, যাবে বৃন্দাবন? চারুদি-রা যাচ্ছেন, দিনকতক না হয় ঘুরে এসো।

না বৌদি, বয়স বাড়ছে দুধে-দুধে পোষাবে না।

তা নয়, পাছে মথুরায় যেতে হয়, সেই ভয়ে ওদিকে যেতে চাও না। আমি বুঝি না বুঝি কিছু?

এর জন্ম মুখ ভার করছ কেন বৌদি, সত্যিই তো ভাল লাগে না মথুরা।

কিন্তু মথুরায় না গিয়ে খালি কলঙ্ক বাড়াচ্ছ ঠাকুরঝি।

ব্রজ হেসে উঠল। কলঙ্ক—না ছাই। মানুষ যেমন ভাবে, যেমন বোঝে, তেমনি বলে। এই তো ঘর-সংসার; রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্ট, ঝঞ্ঝাট পোহাতে পোহাতে দিন কেটে যায়। তার পর খুব বুড়ো থুথুড়ো হয়ে পরের সেবা নেওয়া—ও আমার ভাল লাগে না বৌদি।

সেইজন্মই তোমার কলঙ্কে গাঁয়ে কান পাতা যায় না ঠাকুর-ঝি। তবু হাসছ? বলি তোমার বয়সও যে বাড়ছে—সে কি আরসীর সামনে দাঁড়িয়ে টের পাও না? কচি বরকনে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করবার বয়স তোমার নেই।

সুলোচনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত গায়ে মাখল না ব্রজ। আহা, ওর কি দোষ? একটি মনের ভাব-তরঙ্গ আর একটি হৃদয়ের তটভূমিতে যে একই সুর তুলবে, এ তো দুরাশাই। বস্তুর উপরটা নিয়েই তো বিচার চলে, ভাবের ভিত্তিমূল থাকে অপরিচয়ের অন্ধকারে।

অনটনের সংসার—একটা মানুষের দায় সেখানে কম নয়। তবু দুঃখের মধ্য দিয়ে দিন কোনরকমে কেটে যায়, কিন্তু দুঃখ-মোচনের আশ্বাস যে ঠেলে ফেলে তার অপরাধের মার্জ্জনা অতি বড় সহিষ্ণুরও অকল্পিত। এমনি একটা ঘটনা ঘটল। ব্রজর স্বামী কর্ত্তব্যপালন হিসাবে একটা মোটা টাকার চেক পাঠিয়ে দিলেন ব্রজর নামে।

সুলোচনা হাসিমুখে বলল, ঠাকুরঝি দেখ, ঠাকুরজামাই তোমায় কত ভালবাসেন।

ভালবাসার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করল না ব্রজ, চেক ফিরে গেল।

এর পরেও কি সন্দেহ জাগে না ওর চরিত্রে? হাতে হাতে প্রমাণ নাই মিলুক, ব্রজর ছলনা ধরে ফেলল সবাই। অন্তাস্ত চতুর না হলে সমস্ত প্রমাণ লুকিয়ে সমাজে সাধু সেজে বেড়ায়?

ঘরে-বাইরে এই কলঙ্ক-কথা শুনতে শুনতে ক্রোধোন্মত্ত হরি-চরণ এক দিন ব্রজকে উত্তম-মধ্যম প্রহার দিয়ে বলল, এখান থেকে দূর হয়ে যা কালামুখী, ও মুখ আর দেখাস নে।

এতদিনে সত্যসত্যই কাঁদল ব্রজ। সারারাত চোখের জলে উপাধান সিক্ত করল। মদনগোপালের বেদী থেকে ফ্রেমে-বাঁধানো একখানি ছবি তুলে এনে বুকের উপর রাখল, দু'হাত দিয়ে ফ্রেম-খানা চেপে ধরে আকুল কণ্ঠে বলল, ওগো বলে দাও আমায়—কোথায় যাব?

কাঁদতে কাঁদতে শেষরাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়ল ব্রজ।

খুব ভোরবেলায় হরিচরণের ঘুম ভেঙে গেল। সারারাত ভাল করে ঘুম হয় নি ওর। ব্রজর গায়ে হাত তুলে অবধি অনুশোচনায় জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে মন। তন্দ্রা ভাঙতেই মনে হ'ল বাড়ীখানা অসম্ভব রকমে নিস্তব্ধ। প্রতিদিন বাইরে বাসি পাট সারার শব্দ আর ফুল তুলতে তুলতে স্তবপাঠের মধুক্ষরা গুঞ্জন তন্দ্রাচ্ছন্ন শ্রবণে সেই মিলিত সুর জানিয়ে দেয় সুন্দর একটি সকাল পৌঁছল এই সংসারে। আজ কোথায় গেল সে সুর? কিছু অঘটন ঘটল না তো?

সুলোচনাকে ঠেলে তুলে হরিচরণ বলল, ওগো—দেখ তো ব্রজ কোথায় গেল। আজ তার সাড়া পাচ্ছি না তো।

সকালে ঘুম ভাঙাতে সুলোচনা বিরক্ত হ'ল, কিন্তু ব্রজর অমঙ্গল আশঙ্কা করে ওর মনও ব্যাকুল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি দুয়ার খুলে বাইরে এল সুলোচনা।

ব্রজর ঘরের দুয়োর ভেজান ছিল, কপাটে হাত দিতে দুয়ার

ল গেল। আশ্চর্য্য তো! দুয়োর জানালার ফাক দিয়ে বেশ লো আসছে—আর বিছানায় পাশ ফিরে শুয়ে দিব্য নিশ্চিন্তে চ্ছে ব্রজ! দুটি হাত বুকের কাছে জড়ো করা—ঠোঁটের কোণে সন্ন একটু বাঁকা রেখা—এই মাত্র কোন সুখ স্বপ্ন দেখে হেসেছিল য় তো।

আরও এগিয়ে এল সুলোচনা। চেয়ে দেখল বুকের কাছে থিল দুটি হাতের বন্ধনে কি একটি জিনিস ধরা রয়েছে। একখানি বি। চন্দনের গন্ধ বার হচ্ছে ভুর ভুর করে। ঠাকুরের পটই ব, যেটি নিত্য চন্দনচর্চ্চিত হয়ে ব্রজর সানুরাগ ভক্তি-উপচার ণ করে—সেই ব্রজরাজের ছবি। শিথিল মুঠি থেকে স্খলিত য় পড়েছে ছবি, এমনি পাশ ফিরতে গেলে মেঝেয় পড়ে শতখান য় গুঁড়িয়ে যাবে।

বুকের গোড়া থেকে সন্তর্পণে ছবিখানি তুলে নিল সুলোচনা। বিটা জল আর চন্দনের ছিটা লেগে অস্পষ্ট হয়েছে—ফ্রেমের টুকু পর্য্যন্ত মুছে গেছে! সন্তর্পণে দুয়োর ভেজিয়ে বাইরে এল লোচনা। তারপর অত্যন্ত যত্নে আঁচল দিয়ে জল-চন্দনের দাগ ঘষে মুছে ফেলল। সকালের রোদে চক চক করে উঠল ফ্রেম র কাঁচ—আর ভিতরকার ছবি।

ছবির পানে চেয়ে ভীষণভাবে চমকে উঠল সুলোচনা। এ বংশীধারী মাধবের ছবি নয়—এ যে দাঁড়িয়ে এক কিশোর লে—মাজা মাজা কপাল—ভাসা ভাসা চোখ, মুখে মিষ্টি মিষ্টি সি···সবে সকাল হয়েছে জীবনের, সবে বুঝতে শিখেছে রূপরসের —আধ-জানা রহস্যময় নব অনুরাগের অঞ্জনে স্নিগ্ধ দৃষ্টি—কৌতুকভরা একখানি মুখ, এই মুখ ধ্যান করেই কি কলঙ্কিনী ব্রজ স্বামীর ঘর করতে পারল না? মথুরার ঐশ্বর্য্য লুটিয়ে বৃন্দাবনের ধুলো মাখল গায়ে?

হাঁপাতে হাঁপাতে নিজের ঘরে এসে ছবিখানা হরিচরণের বিছানায় ছুড়ে ফেলে সুলোচনা বলল, এই দেখ তোমার বোনের কীর্ত্তি! কেন ও স্বামীর ঘর করতে পারল না বোঝ।

ছবিখানা তুলে নিল হরিচরণ। বলল, জানালাটা খুলে দাও—ভাল করে দেখি।

জানালা খুলে দিয়ে সুলোচনাও ঝুঁকে পড়ল ছবিখানার উপর। আগ্রহভরা স্বরে বলল, কার ছবি এখানা? চিনতে পারছ মানুষটাকে?

হাঁ, চিনতে পারলাম। মাধবের ফটো এটা।

মাধব কে? রুদ্ধ কৌতূহলে ফেটে পড়ল সুলোচনা।

মাধব? তোমার ঠাকুরজামাই। তখন সবে কলেজে ভর্ত্তি হয়েছে। একবার গ্রীষ্মের বন্ধে এসেছিল এখানে। সেই প্রথম বার—শেষ বারও। কলকাতার কোন নামী ষ্টুডিও থেকে তুলিয়েছিল যেন ফটোখানা, ফেলে গিয়েছিল ভুলে। পরে চিঠি লিখেছিল পাঠিয়ে দেবার জন্য, ওটা বড় করাবে বলে। কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নি ওটা। এখন বুঝছি কেন খুঁজে পাওয়া যায় নি।

সুলোচনার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ব্রজ তবে কলঙ্কিনী নয়, ও স্বামীকেই ভালবেসেছে। ওর ভালবাসা যেমন ধ্রুব—তেমনি ওর কিশোর স্বামীও নিত্যকালের পরিমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত। আলোর জগৎ থেকে ওকে আর ধুলোর জগতে নামিয়ে আনা যাবে না।

সেণ্ট এলায়াস পর্ব্বতমালা

অজানা দেশের ডাক

শ্রীনরেন্দ্র দেব

এদেশে এমন লোক অনেকেই আছেন যাঁরা সারা ভারতবর্ষ আজও ভাল করে ঘুরে দেখেন নি। অথচ ইউরোপ আমেরিকায় হয়ত একাধিকবার বেড়িয়ে এসেছেন। ভারতবর্ষ আমাদের এশিয়ারই মধ্যে, কিন্তু এশিয়ার সব দেশের সম্যক্ পরিচয় জানবার আগেই ভারতবাসীরা সাত-সমুদ্র-তেরো-নদীর পারে ছুটে যান অজানা দেশের ডাক শুনে। অজানা দেশের যে একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে একথা অনস্বীকার্য্য। অনেক বার অনেকের মুখে শোনা যেসব দেশের ভ্রমণকাহিনী নানা কাগজে বহুবার প্রকাশিত হয়ে গেছে তারই পুনরাবৃত্তি না করে উত্তর আমেরিকার এমন একটি দেশের কথা আজ লিখছি যার নাম অবশ্য আমরা সকলেই শুনেছি, কিন্তু সবিশেষ পরিচয় পাবার সুযোগ হয় নি, কারণ এদেশের খুব অল্পসংখ্যক লোকই আমেরিকার উত্তরাঞ্চলের এই বিচিত্র দেশ আলাস্কায় ঘুরে এসেছেন।

উত্তর আমেরিকার এই বিশাল ভূখণ্ড, বিশেষ করে এর দক্ষিণ প্রান্তটি পূব-পশ্চিমে এতদূর বিস্তৃত যে আমেরিকা যুক্তরাজ্যের গোটা মানচিত্রটাকেই ঢেকে ফেলতে পারে যদি পূব-পশ্চিম থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে দেশটাকে উত্তর-দক্ষিণে সাজানো হয়। আর উত্তর আমেরিকা থেকে আলাস্কাকে বিচ্ছিন্ন করে এনে যদি ইউরোপে বসানো হয় তা হলে এ ইউরোপের মাদ্রিদ থেকে মস্কো পর্য্যন্ত সবটা অংশ চাপা দিতে পারে। এই থেকেই আশা করি এদেশের বিশালতা সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হবে। প্রায় ষাট লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত এই দেশ। একে মহাদেশ বললে অত্যুক্তি হবে না, অথচ এখানে লোকসংখ্যা মাত্র পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর হাজারের মধ্যে।

এত বড় দেশে এত কম লোক থাকে শুনে আশ্চর্য্য হবার ক বটে, কিন্তু আলাস্কার বহু অংশ মনুষ্যবাসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত জানা এ বিস্ময়ের আর কারণ থাকবে না। এই একই দেশের ি দিকে দেখা যায় তিন রকম ভূসংস্থান এবং ত্রিবিধ বিপরীত হাওয়া! আলাস্কার দক্ষিণ অংশের নাম 'pan-handle'—বাং বলা যেতে পারে 'তাওয়ার হাতোল'। এরকম অদ্ভুত নাম হ কারণ মূল ভূখণ্ডের দক্ষিণ থেকে এ অংশটি ঠিক লম্বা হাতো মত বেরিয়ে উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে একেবারে ব্রিটিশ কলম্বিয়ার কান ঘেঁসে। এ অঞ্চলের ভূ যেমনি কঠিন তেমনি কর্কশ এবং আবহাওয়াও বিশ্রী রকম এ মেলো। এখান থেকে আলাস্কা উপদ্বীপ এবং আলিউশি দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত ভূসংস্থানের অবস্থা প্রায় একই রকম। তার দারুণ বৃষ্টি হয় এখানে। আমরা লণ্ডনকে 'ভিজে পুরী' বলি, কা লণ্ডনে বৃষ্টি লেগেই আছে। নিউইয়র্কেও বৃষ্টি বড় কম হয় না কিন্তু আলাস্কার এ অঞ্চলে বৃষ্টি হয় লণ্ডনের চেয়ে প্রায় ছ'গুণ বেশ নিউইয়র্কের চেয়েও চার গুণ বেশী। সুতরাং বুঝতেই পার এখানে অবস্থাটা দিবারাত্রি যেন 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ে যায়!'

আলাস্কার কতক অংশে আবার প্রচণ্ড তুষারপাত হয়। শুন হয়ত বিশ্বাসই করতে পারা যাবে না যে, আলাস্কার সমতল ভূ 'ভালদেজ' অঞ্চলে বারো-তেরো ফুট পর্য্যন্ত বরফ জমে ওঠে পাহাড়ের দিকে জমে ওঠে পঁচিশ-তিরিশ ফুট পর্য্যন্ত। ক বরাবর এরকম বরফ জমে থাকে মনে করলে ভুল করা হ

[প্র]ত্যেক বার পেঁজা তুলোর মত হাল্কা বরফ যখন ঝুর্ ঝুর্ করে [প]ড়ে তার মাপ নিয়ে রাখলে দেখা যাবে সারা বছরে মোট বরফ [প]ড়েছে ঠিক অতটাই। অথচ আলাস্কার সমুদ্রতীরে গেলে দেখা [যা]বে শীতকালে সেখানে শীত নেই একটুও, গ্রীষ্মকালেও গরম বোধ [হ]বে না। কিন্তু সমুদ্রতীরের উঁচু উঁচু [প]াহাড়গুলো একেবারে খাড়াভাবে সাগর [জ]লের মধ্যে নেমে আসায় এবং গ্রীষ্মের প্রখর [সূর্য]তাপের অভাবে এই সব পর্ব্বতপৃষ্ঠে প্রকাণ্ড [প্র]কাণ্ড তুষারস্তূপ চিরহিমাশ্রিত হয়ে জমে [থা]কার সুযোগ পায় এবং সেগুলি প্রায়ই ঢালু [উপ]ত্যকা বয়ে পিছলে গড়িয়ে এসে সমুদ্রজলে [না]মে ও সাগরবক্ষে তুষারশৈলরূপে বিরাজ [ক]রে। আলাস্কার এ দিকটায় [যাঁ]রা বেড়াতে [আ]সবেন তাঁদের মনে হবে যেন তাঁরা [সু]দূর মেরু-প্রান্তের গ্রীনল্যাণ্ড বা দক্ষিণ মেরু [প্রা]ন্তের হিমাবৃত ভূখণ্ডে এসে পড়েছেন! [অ]বশ্য যেসব ভূপর্যটক পৃথিবীর ঊর্দ্ধ-অধঃ [দু]ই সীমান্তের হিমপ্রান্ত ঘুরে এসেছেন [তাঁ]দের এ বিভ্রম ঘটবে না। কারণ [তুষ]ারস্তূপের বাহ্যরূপ ও দৃশ্যের কতকটা সাদৃশ্য [থা]কলেও আকারের দিক দিয়ে পার্থক্য অনেক। আলাস্কার [সি]ন্ধুকুলের দৃশ্য মনে হবে শান্ত সংযত ও সীমিত। তার মধ্যে [বি]রাটের প্রকাশ চোখে পড়বে না। কিন্তু সুমেরু ও কুমেরু অঞ্চলে [গে]লে প্রসারিত দৃষ্টির সমুখে যেন অসীমের এক অনন্ত রূপ উদ্ভাসিত [হ]য়ে উঠবে। সে বিরাট তুষারস্তূপ আর তাণ্ডবের অট্টহাসির মত [জ]মাট বিপুল হিমশিলা সেখানে বিশাল সাগরকেও যেন [স্ত]ম্ভিত করে রেখেছে! ভূ-বিজ্ঞানীরা বলেন এ তুষারের অস্তিত্ব [থা]কি অনাদ্যন্ত কাল। আলাস্কায় যা দেখা যায় তা এই [মে]রুপ্রান্তের দৃশ্যেরই কতকটা ক্ষুদ্র সংস্করণ!

সমুদ্রোপকূলের সর্ব্বত্র কিন্তু একরকম দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় [না]। আলাস্কার নিসর্গ দৃশ্যের আকর্ষণ তার এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই। [আ]কাশছোঁয়া পাহাড় অঞ্চলটা যেমন চিরতুষারস্তর অধিকার করে [রে]খেছে, তেমনি শৈলসানুর অসমতল নিম্নভূমি দখল করে আছে [সু]বিস্তীর্ণ অফুরন্ত অরণ্য। বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে পৃথিবীর [মধ্যে] আফ্রিকার গভীর জঙ্গলের পরই নাকি এই আলাস্কার অরণ্যের [স্থা]ন! ইংরেজেরা কিন্তু এটা মানতে রাজী নন। তাঁরা বলেন [ব্রি]টিশ কলম্বিয়ার জঙ্গল আলাস্কার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। [ব্রি]টিশ কলম্বিয়ার জঙ্গল থেকে আসবাবের উপযোগী যে রকম দামী [কা]ঠ পাওয়া যায় আলাস্কার সমস্ত বন উজাড় করে ফেললেও সে [রক]ম কাঠ খুঁজে পাওয়া যাবে না। এর জবাবে আবার আলাস্কার [বি]শেষজ্ঞেরা বলেন, আমাদের অরণ্যে কাগজ তৈরি করবার দারু-[উপ]যোগী যে প্রচুর কাঠ পাওয়া যায় তার দাম কলম্বিয়ার [দা]মী কাঠের চেয়ে অনেক বেশি।

আলাস্কার সিন্ধুহস্তী—"ওয়াল্‌রস" এক একটি দশ-বারো ফুট লম্বা হয়। যৌবনে এদের মুখের ওপরের মাড়ী থেকে এক জোড়া দীর্ঘ গজদন্ত উদ্গত হয়।

শুধু বনজসম্পদই নয়, আলাস্কার এ অঞ্চল বিবিধ ধাতু ও নানা খনিজ সম্পদেও বিশেষভাবে ঐশ্বর্য্যশালী। সোনা, রূপা, তামা ও কয়লার খনির বিরাট কারবার চলে এখানে। কৃষি-শিল্পেও আলাস্কার আলস্য নেই, তবে এখানে সর্ব্বত্র ফসল ফলানো সম্ভব নয়। কেবলমাত্র যেখানে আবহাওয়া কৃষির অনুকূল সেখানেই চাষবাস হয়।

আলাস্কার যেটাকে মধ্যপ্রদেশ বা আভ্যন্তরীণ ভূভাগ বলা হয় সে অংশে মনে হয় প্রকৃতি যেন খামখেয়ালী ভাবে তিন ভাগে এ অঞ্চলটিকে বিভক্ত করেছে। প্রধান অংশ বলা চলে য়ুকোন নদীর পরিবাহ ক্ষেত্র। এ নদীটির অববাহিকা আলাস্কার দীর্ঘতম নদীগুলির অববাহিকার মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করে আছে। অবশ্য আলাস্কার দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী 'কুস্কোকুইম' এবং 'কোবুক' ও 'নোয়াটাক' প্রবাহের পরিবাহ ক্ষেত্রও এখানে সম্মিলিত হয়েছে। এর উত্তর ও দক্ষিণ সীমান্তের গিরিশ্রেণী, যা সমুদ্রের উত্তর ও দক্ষিণ উপকূলের প্রায় সমান্তরালে রয়েছে তার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগকে যদিও ঠিক পার্ব্বত্য প্রদেশ বলা চলে না, তবে ভূমি এখানে বেশ রুক্ষ ও কর্কশ। তা সত্ত্বেও কিন্তু চিরসবুজ ঘনবন ও স্নিগ্ধশ্যামল অরণ্যানী এর সকল রুক্ষতাকে যেন সস্নেহে ঢেকে রেখেছে।

কিন্তু এখানকার আবহাওয়া মানুষের বসবাসের পক্ষে মোটেই সুবিধাজনক নয়। কারণ শীতের সময়—যতটা ঠাণ্ডা পড়লে জল জমে ওঠে, তার চেয়েও ষাট-সত্তর ডিগ্রী উত্তাপ কমে যায়। গরমের সময় গরমও বড় কম নয়, ৯০ থেকে ১০০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত বেড়ে ওঠে। সুখের মধ্যে এই যে, এখানে দিনরাত ঘ্যানঘেনে বৃষ্টি হয় না।

আলাস্কার শস্যসমৃদ্ধ উর্ব্বর অংশ বলতে বেরিং সাগরাভিমুখী পৃষ্ঠদেশটুকুই বোঝায়। এই সরু অপরিসর তটভূমিটুকু উত্তর দিকে ক্রমশঃ প্রসারিত হয়ে শেষে সুমেরু সীমান্ত পর্য্যন্ত এক বিশাল বৃক্ষলতাশূন্য ঊষর প্রান্তরে পরিণত হয়েছে। এই বিশাল মাঠ-

গুলোকে মার্কিনরা বলে 'Prairie'। বৃক্ষলতাশূন্য হলেও এ মাঠে একরকম বড় বড় লম্বা ঘাস হয়। নদীর তীরে তীরে ঝোপঝাড়ের একটু সরু হালকা পাড়ের মত দেখা যায়। এর ভিতর আমাদের পরিচিত 'উইলো' গাছও ভীড় করে আছে। এ গাছগুলো বিশ-পঁচিশ হাত দীর্ঘ। সাত-আট ফুট হবে প্রায় এক-একটি গাছের বেড়। এরকম অসংখ্য গাছ এখানে প্রায় একশ' মাইল জুড়ে বিস্তারলাভ করেছে।
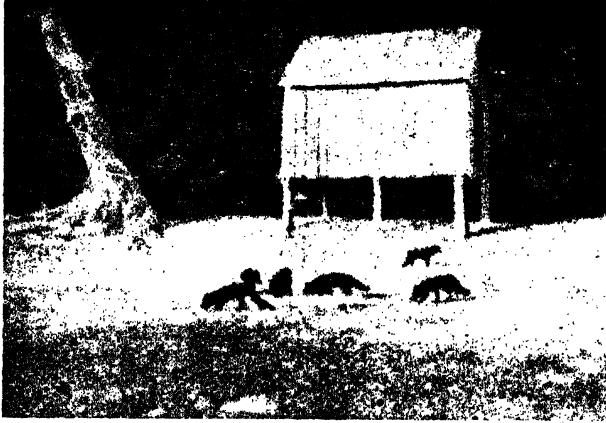
আলাস্কার নীলবর্ণ শৃগাল

বেরিং সাগরাভিমুখী বৃক্ষলতাশূন্য এই 'প্রেরী' প্রান্তরে বৃষ্টি ও তুষারপাতজনিত অবক্ষেপ আলাস্কার অভ্যন্তর প্রদেশের তুলনায় অনেক বেশি, অথচ উত্তরমেরুতে এ উৎপাত অনেক কম দেখে ভাবি আশ্চর্য্য মনে হয়। আলাস্কার দক্ষিণাঞ্চলের অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশে ঘন কুয়াশা আর ভিজে ভারী আবহাওয়া প্রায় বারো মাসই থাকে। আলাস্কার মধ্যপ্রদেশে কিন্তু সকল ঋতুতেই বেশ পরিষ্কার আকাশ এবং স্বচ্ছন্দ আবহাওয়া। বিশেষ করে শীতের সময় এমন সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটানো যায় মেঘবিরল নির্ম্মল নীল আকাশের নীচে বেশ নিরুদ্বেগ আনন্দে। এখানে বেড়াতে আসার পক্ষে এই সময়টাই সবচেয়ে ভাল।

আলাস্কার স্থানে স্থানে মাটি খুব উর্ব্বর। এখানে মাত্র তিন বিঘে জমিতে যা ফসল হয় তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে-কোনও অঞ্চলের চেয়ে তিন গুণ বেশি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যে-সব ফুলগাছ কোথাও আমাদের হাঁটু ছাড়িয়ে-ওঠে না এখানে সেগুলো মানুষের মাথা ছাড়িয়ে ওঠে। ফুলের আকারও এখানে দ্বিগুণ বড়। এখানকার কপি, কড়াইশুঁটিও রাক্ষুসে আকারের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এবং স্বাদেও উৎকৃষ্টতর। আরও একটা বিশেষত্ব হচ্ছে যে, ফসল আর ফলফুল সুপরিণত হয়ে উঠতে অন্যত্র প্রায় ছ'মাস সময় লাগে এখানে তা মাত্র তিন মাসেই তৈরি হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, আকারেও অনেক বড় এবং পরিমাণেও বেশি উৎপন্ন হয়।

আলাস্কার যে অংশটুকু উত্তরমেরু চক্রের সীমানার অন্তর্ভুক্ত সেখানে কোন দিনই দিনান্ত ঘটে না। সূর্য্য যেন অস্তাচলের আকর্ষণ ভুলে চব্বিশ ঘণ্টাই এই মেরু-লোকে তাঁর স্নিগ্ধ স্নেহ কিরণ বিকীরণ করেন। এ রাজ্যে তামসী রজনীর প্রবেশ নিষেধ। নিশীথ রাত্রের নিস্তব্ধ ঘন অন্ধকারের রহস্যময় রূপ থেকে এরা বঞ্চিত। ছায়াবগুণ্ঠিতা সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে দীপ জ্বালবার কোনও সুযোগ পায় না বেচারারা। এখানে খ্রীষ্টের উপাসনার প্রার্থনা মন্দিরের অভাব নেই। কিন্তু সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টা এখানে দিনান্ত সম্বন্ধে সকলকে সচকিত করে বেজে ওঠে না। দেশটি সন্ধ্যাহীন হলেও কিন্তু বন্ধ্যা নয়। প্রচুর ফসল ফলে।

এখানে সূর্য্য অস্ত যায় না বলে এদেশের নর-নারী রজনীতে সুখনিদ্রার কোলে ঢলে পড়বার অবকাশ পায় না এটা মনে করাই আমাদের মত সুনিয়ন্ত্রিত দিবা-রজনীযুক্ত দেশের লোকের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু শুনে আশ্চর্য্য হবেন যে, এদেশের মানুষেরাও ঘুমোন। কি করে জানেন? শোবার ঘরের জানালায় মোটা মোটা ভারী পর্দা ঝুলিয়ে সূর্য্যের আলোটুকুকে আড়াল দিয়ে কৃত্রিম অন্ধকার সৃষ্টি করে নিদ্রা যান। এখানে দিনরাত নির্ণয় করেন এঁরা ঘড়ির কাঁটায় সময়ের নির্দেশ দেখে। সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের অপরূপ শোভা সন্দর্শন এদেশের উত্তরাঞ্চলের লোকের ভাগ্যে ঘটে না।

ভারতের এক মহাকবি এমন একটি দেশের কল্পনা করেছিলেন:

"যত্রোন্মত্ত ভ্রমরমুখরাঃ পাদপা নিত্যপুষ্পা।
হংসশ্রেণীরচিতরসনা নিত্যপদ্মা নলিনাঃ॥
কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্যভাস্বৎকলাপা।
নিত্যজ্যোৎস্নাঃ প্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ॥

অর্থাৎ,

পুষ্প যেথা নিত্য হাসে লক্ষ তরুর তরুণ শাখে
মত্তমধুপ গুঞ্জরিয়া কুঞ্জ যেথায় মুখর রাখে
স্বচ্ছ সুনীল পদ্মসরে কমল যেথায় নিত্য ফোটে,
নিতম্বে যার মরালমালা চন্দ্রহারের তুল্য লোটে,
মুক্ত কলাপ ভবনশিখির কেকার কাঁদন উদাস করা,
রাত্রি যেথা জ্যোৎস্নালোকে নিত্য উজল আঁধার হরা।

যেখানে চাঁদ কখনও অস্ত যায় না, এমন এক নিত্য জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রির স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি হয়ত সেদিন জানতেন না যে, এই বাস্তব জগতেই এমন দেশ আছে যেখানে রাত্রি বলে কিছু নেই, শুধুই অফুরন্ত দিন! স্নিগ্ধশীতল এই

াত্তাসে চিরদিনই সদানন্দময় চারিদিক। আলাস্কার সেই াতিশীতোষ্ণ প্রদেশ এই অংশটুকু।

দক্ষিণ-আলাস্কার যে অংশটুকু বাদুলে-মণ্ডল লে খ্যাত, অর্থাৎ বারমাসই বৃষ্টিতে ভিজে াকে, সেখানে অরণ্য সম্পদের বাড়বাড়ন্ত চুর। বেশী পরিমাণে জন্মায় 'হেমলক' ামে গাঢ় সবুজ রঙের গুল্ম জাতীয় বিষাক্ত াছ। বাংলায় বলা চলে—'গরল-গুল্ম।' া ছাড়া আছে Sitka Spruce. এ হ'ল ক রকম কালো রঙের সরল গাছ, তার ঙ্গে পাশাপাশি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে াঙা দেবদারু আর হলদে দেবদারুর ঝাড়। ুতরাং কল্পনা করে দেখুন এখানে এই ীন অরণ্যের কি বর্ণাঢ্য শোভা ও সৌন্দর্য্য!

আলাস্কার মধ্য প্রদেশের অরণ্যে যত বা রল গাছ তত বড় বড় শিমূল গাছ। এ দু' কমের গাছ আলাস্কার প্রায় সর্ব্বত্রই চোখে ড়বে। স্থানে স্থানে এই সরল ও শিমূলের কেবারে ঘন জঙ্গল হয়ে আছে। বশেষজ্ঞেরা বলেন এখানকার 'প্রেরী' বা বস্তীর্ণ প্রান্তরে যে রকম বড় বড় ঘাস হয়ে াছে তাতে মনে হয় ভূমি একেবারে অনুর্ব্বরা নয়। বিজ্ঞান-ম্মত কর্ষণের ফলে এখানেও ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। মির অনুপাতে এখানে লোকসংখ্যা অনেক কম বলে প্রতি-াগিতার দ্বন্দ্ব নেই। প্রকৃতির সহজাত দাক্ষিণ্য এখানে ত প্রচুর যে তাইতেই এ অঞ্চলের প্রকৃতিপুঞ্জ পরম পরিতুষ্ট।

আলাস্কার বল্‌গা হরিণের পাল

ানকার অবারিত অকুরন্ত মাঠগুলোর রকমারি নীলবর্ণ ঘাস আর ভোজ্য সবুজ তৃণও যথেষ্ট জন্মায়। এই নীল ঘাস এদেশের শুধু দই নয়, রীতিমত গর্ব্বের ধন এদের। কারণ পৃথিবীর আর কোথাও নাকি এমন আশমানী রঙের বর্ণমাধুর্য্য-ভরা নীলাকাশের ছায়া-মাখা 'ব্লু-ঘাস' দেখতে পাওয়া যায় না।
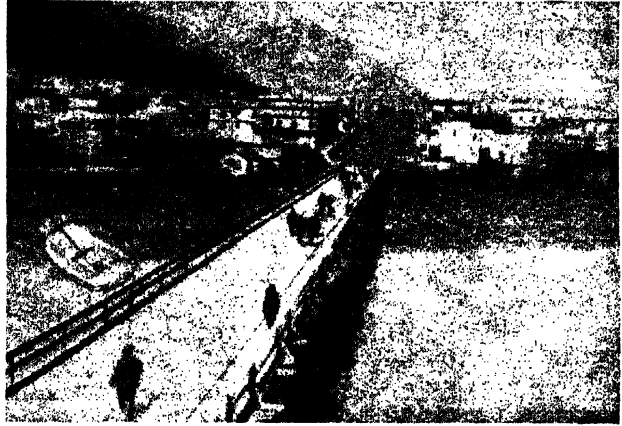
খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ 'সিউয়ার্ড' নগর

চাষবাসের দিক দিয়েও আলাস্কা কোনও দেশের চেয়ে পশ্চাৎপদ নয়। গম, যব, ছোলা আর 'রাই-শস্য' এখানে যথেষ্ট পরিমাণে হয়। এই রাইশস্য আমাদের দেশের রবিশস্য শ্রেণীর দাল জাতীয় ফসল। জার্ম্মানী আর রাশিয়ায় এই রাইবীজ একটা প্রধান খাদ্য হিসাবে ব্যবহার হয়। শাকসব্জী, তরিতরকারি ও ফলমূলের বাগানও আলাস্কায় প্রচুর।

পৃথিবীর সঙ্গে আলাস্কার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে প্রকৃতপক্ষে এর অপরিমেয় খনিজসম্পদ। উত্তর-পশ্চিম আমেরিকার এই আলাস্কা প্রদেশ একদা ছিল রাশিয়ার অধিকৃত সম্পত্তি। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার কাছ থেকে মাত্র বাহাত্তর লক্ষ ডলার দিয়ে এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ কিনে নিয়েছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ সিউওয়ার্ড এক-রকম জোর করেই নিজের ঝুঁকিতে এদেশটা কিনেছিলেন। এ অঞ্চলটি যে খনিজসম্পদে এত বেশী ঐশ্বর্য্যশালী এ খবর তখন আমেরিকা বা রাশিয়া কেউই জানত না। জানলে রাশিয়া নিশ্চয়ই এ মূল্যবান সম্পত্তি হস্তান্তর করত না। দূরদর্শী মিঃ সিউওয়ার্ড এটা কিনে ছিলেন রাষ্ট্রনীতির যুক্তি দিয়ে। আমেরিকার মধ্যেই বিদেশী শক্তির অধিকারে এতখানি ভূভাগ থাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক বুঝে তিনি এ প্রদেশ বহু মূল্য দিয়েই কিনে নিয়েছিলেন। আর, আস্ত ভারতবর্ষকে আমরা কেটে দু'টুকরো করে দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে পাকিস্থান সৃষ্টি করে স্যাণ্ড-উইচ হয়ে বসে আছি!

আলাস্কা কেনার জন্ত সেদিন সিউওয়ার্ডকে বহু লাঞ্ছনাও ভোগ

করতে হয়েছিল। কারণ, আলাস্কা কিনে নেবার পরও সুদীর্ঘ তিরিশ বছর এ দেশ নিষ্ফলাই পড়ে ছিল। আমেরিকানদের ধারণা হয়েছিল এ দেশ থেকে তাদের কোনও কালে এক কাণাকড়িও আয় হবে না। কিন্তু পরে অনুসন্ধানের ফলে এখানে ভূগর্ভস্থ বিবিধ মূল্যবান সম্পদের সন্ধান পাওয়া যায় এবং তার উদ্ধারকার্যও সুরু হয়। একমাত্র সোনার খনি থেকেই আমেরিকা চার বছরের মধ্যে পেয়েছে বত্রিশ কোটি একাশী লক্ষ ডলার। তার পর তামার খনির আয়, রূপার খনির আয়, টিন, জিপসাম, পেট্রোলিয়ম, সীসা, কয়লা, মর্ম্মর প্রস্তর ইত্যাদি থেকে আমেরিকা পেলে এক বছরেই পনের কোটি তিন লক্ষ চুরাশী হাজার ডলার।

এ হ'ল ১৯২১ সালের হিসেব। সাম্প্রতিক বিবরণ সংগ্রহ করতে পারি নি। তার পর থেকে আলাস্কার খনিজ সম্পদের আয় উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এখানকার মাছের কারবারও একটা উল্লেখযোগ্য ব্যবসা। কেবল একরকম মাছ বেচেই আমেরিকা তেইশ কোটি পাঁচ লক্ষ ডলার পেয়েছিল ত্রিশ বছর আগে। সুতরাং আজ সে মাছের কারবার যে একেবারে সোনার ব্যবসা হয়ে উঠেছে একথা বলাই বাহুল্য। একেই বলে লক্ষ্মী যখন প্রসন্ন হন তখন ধুলোমুঠো ধরলেও সোনা হয়ে ওঠে। আমেরিকার ঐশ্বর্য আজ বিশ্বের ঈর্ষা উদ্রেক করে।
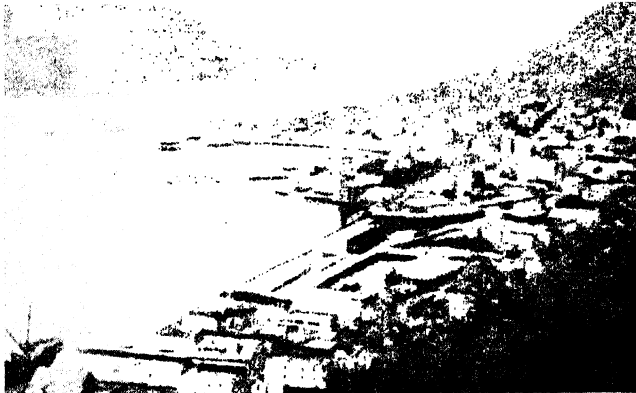
আলাস্কার রাজধানী—"জুনো"

তার পর এখানকার গৃহপালিত পশুর ইতিহাসও চিত্তাকর্ষক। প্রথমটা ইউরোপের গৃহপালিত জীবজন্তু আমদানী করে নিয়ে এসে এরা এখানে পশুপালন সুরু করেন। কিন্তু দেখা গেল এখানকার আবহাওয়ায় তারা সুস্থ থাকছে না। তাদের মধ্যে মড়ক লাগছে। তখন মেরুপ্রদেশের জীবজন্তু নিয়েই তাঁরা গৃহপালিত করতে সুরু করলেন। মেরু-প্রদেশে বল্‌গা হরিণ অসংখ্য পাওয়া যায়। এরা দেশবাসীর অনেক কাজে লাগে। গাড়ী টানে, মাল বয়, দুধ দেয়,

য়ুকোন নদীকূলে জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি
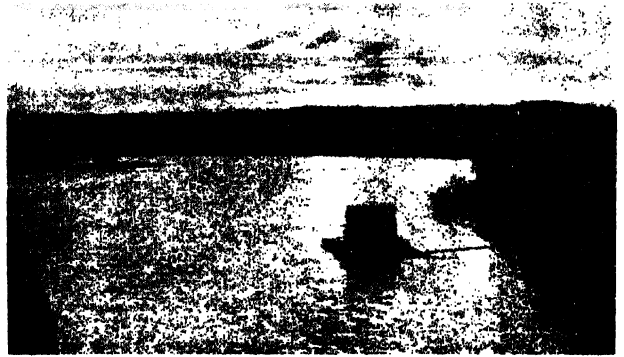
এদের মাংসও খেতে খুব সুস্বাদু। ফলে ঘোড়া, গরু, ছাগল, ভেড়ার বদলে বল্‌গা হরিণ নিয়েই এরা কারবার সুরু করেছে। এখানেই একমাত্র নীলবর্ণ শৃগাল পাওয়া যায়। এ ছাড়া 'ওয়াল-রস' বলে সিন্ধু-হস্তী জাতীয় দু'টি বৃহৎ গজদন্ত বিশিষ্ট একরকম দশ বার ফুট লম্বা মেরু-মৎস্য পাওয়া যায়। আলাস্কায় এ সবকিছুরই কারবার চলে। পৃথিবীর লোককে সুস্বাদু হরিণ-মাংস সরবরাহ করে আলাস্কা। এ ছাড়া নীলবর্ণ শৃগালের চামড়া বিলাসিনীরা 'ফার' হিসাবে ব্যবহার করেন বলে এর চাহিদাও বিশ্বের বাজারে নেহাৎ কম নয়। 'ওয়ল্‌রসের' তেল তিমি মাছের তেলের মতই পুষ্টিকর। চামড়াও কাজে লাগে।

আলাস্কার লোকসংখ্যা, ব্যবসা উপলক্ষে বহিরাগত শ্বেতাঙ্গ আদিম অধিবাসী রেড-ইণ্ডিয়ান এবং এস্কিমোদেরশুদ্ধ ধরে পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর হাজারের বেশী হবে না। অথচ আলাস্কায় জমির পরিমাপ প্রায় ছয় লক্ষ বর্গমাইল। রেড-ইণ্ডিয়ান আর এস্কিমো আলাস্কার লোকসংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেক হলেও এরা আজ আর এ দেশের কেউ নয়। শ্বেতাঙ্গরাই সমস্ত জমির মালিক। রেড-ইণ্ডিয়ান আর এস্কিমোদের উপজীবিকা আজও সেই মাছ-ধরা, বন্য পশু শিকার, আর লোমশ প্রাণীদের কোমল চামড়া এনে বাজারে শ্বেতাঙ্গ মহাজনদের কাছে বেচা। মূল্য এরা অতি সামান্যই পায়,

ন্তু বিদেশী বণিকেরা এদের কাছে সস্তায় কেনা সেই সব জিনিসই দেশের বাজারে বহুমূল্যে রপ্তানী করে প্রচুর লাভবান হয়। এখান-কার আদিম অধিবাসীরা অনেকেই মার্কিনদের স্থাপিত বড় বড় কলকারখানা আর খনিতে দিনমজুরী করে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এদের মধ্যে এস্কিমোরা একটু স্বাধীনচে । এরা নিতান্ত নিরুপায় হয়ে না পড়লে সহজে বিদেশীর দাসত্ব করতে চায় না। তবে এদের একটা জাতিগত দোষ হ'ল এরা ভবিষ্যতের কথা ভাবে না। দুর্দ্দিনের জন্য সঞ্চয় করা কাকে বলে তা এরা বোঝে না। এদের সখের প্রাণ! যে যা উপার্জ্জন করে দোকানে ঢুকে যা খুশী কিনে তা খরচ করে ফেলে। অবশ্য খাদ্যবস্ত্র সর্ব্বাগ্রে সংগ্রহ করে, তারপর বাকি টাকাটা ... আর ঘরে নিয়ে যায় না। পশু-শিকারের জন্যে গুলাগুলি বন্দুক ত কেনেই, তা ছাড়া কেউ কেনে বাঁশী, কেউ বেহালা, কেউ-বা কিনে ফেলে একটা গ্রামোফোন। ফোটো তোলাবার সখও খুব। রেশম পশম ভেলভেট সাটিনের বড় খরিদ্দার এরা। প্রসাধন সামগ্রী এবং এসেন্স ইত্যাদি গন্ধদ্রব্যও এরা প্রচুর কেনে।

এদের বিপদ যে ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসছে সে সম্বন্ধে এরা মোটেই সচেতন নয়। বিদেশীরা ধীরে ধীরে এদের ব্যবসার মধ্যেও প্রবেশ করছে। বল্‌গা হরিণ ও লোমশ পশু-চর্ম্ম সংগ্রহ করাই এদের প্রধান কাজ ছিল। এখন অনেক আমেরিকান এসব কাজে হাত দিয়েছে। কাজেই এই সব আদিম অধিবাসী যে ক্রমশঃ বেকার হয়ে পড়ে বিদেশীদের দাসত্ব করতে বাধ্য হবে এতে কোনও সন্দেহ নাই।

মার্কিনরা আলাস্কায় রেল-লাইন পেতে এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে যাতায়াতের জন্য ট্রেন চলাচল ছাড়াও নদীপথে ষ্টীমার ও মোটর-বোটেরও ব্যবস্থা রেখেছে। শীতের সময় যে যে অঞ্চল বরফে ঢাকা পড়ে যায়, সেখানে চলাফেরার একমাত্র উপায় তখন কুকুর-কুকুর আর বলগা-হরিণে টানা চক্রহীন স্লেজ-গাড়ী। এ সময় আলাস্কার এ অঞ্চলে মোটর চলে না, কারণ ইঞ্জিন জমে যায়।

য়ুকোন নদীর দক্ষিণ তীরে আলাস্কার সবগুলি শহরের এবং বেয়ারিং সাগরকূলের প্রসিদ্ধ খনি-প্রধান জনপদ 'নোম' পর্যন্ত তার ও বেতারে পৃথিবীর যে কোনও দেশের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। ডাক চলাচলও নিয়মিত হয়। লণ্ডন থেকে একখানা চিঠি আলাস্কার 'নোমে' আসতে যে সময় লাগে অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণে পৌঁছতেও সেই সময় লাগে। কিন্তু আজকাল সর্ব্বত্র বিমানে ডাক চলাচল সুরু হওয়ায় পৃথিবীর সব দেশই পরস্পরের খুব কাছাকাছি হয়ে পড়েছে।

আলাস্কার রাজধানী 'জুনো' খাস আমেরিকার প্রসিদ্ধ মফস্বল শহরগুলির চেয়ে বিশেষ ছোট নয়। পাকা বাড়ী-ঘরও অসংখ্য আছে। স্কুল, চার্চ্চ, পোষ্টাপিস, আদালত, টাউনহল, মিউনিসি-প্যাল ও সরকারী ভবন, সিনেমা, থিয়েটার, নাচঘর কিছুরই অভাব নেই। বিজলী-বাতি সারা রাত পথ আলো করে থাকে। এখানকার ছোট-বড়-মাঝারি সব বাড়ীই শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত। স্বাস্থ্যের দিক

দারুনির্ম্মিত চিত্রোৎকীর্ণ বিচিত্র ধ্বজা
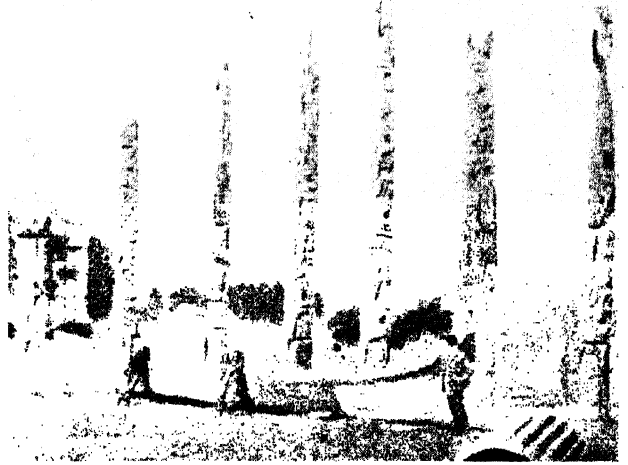
দিয়ে আলাস্কার নর-নারী, শিশু, সবাই পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর স্থানের চেয়ে থাকে ভাল। এদেশে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই সুন্দরী, রূপবান ও সুগঠিত-তনু।

জুনো শহরটি পাহাড়ের কোলে সমুদ্রের খাড়ির ধারে অতি সুন্দর ও মনোরম পরিবেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। আলাস্কার প্রধান বন্দরও এই নগরীর কিনারায়। পাথরে বাঁধানো পথ-ঘাট বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দু'ধারে বিদ্যুৎ দীপ। ছোট্ট শহরটি দেখায় যেন ছবির মত! হবে নাই বা কেন? শহরের স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা পাঁচ ছ' হাজারের বেশী নয়। বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে নানা লোক এখানে আসে কিন্তু তারা এখানকার অধিবাসী নয়। অধিবাসীরা অধিকাংশই সোনার খনি আর মাছের ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। শিল্পী ও সাহিত্যিকের সন্ধান মেলা ভার।

আমাদের কলিকাতা শহর যেমন ভারতের পূর্ব্বপ্রান্ত ঘেঁসে অবস্থিত, আলাস্কার রাজধানী এই জুনো শহরটিও তেমনি আলাস্কার একেবারে দক্ষিণ-পূর্ব্বপ্রান্ত ঘেঁসে গড়ে উঠেছে। এ শহরটির সঙ্গে সুইজারল্যাণ্ডের আল্পস পর্ব্বতের কোলে হ্রদতীরবর্ত্তী শহরগুলির অনেকটা সাদৃশ্য আছে বলে মনে হয়।

বসন্তে সারা আলাস্কা একেবারে ফুলে ফুলে ফুলময় হয়ে উঠে। যেন মে মাসের কাশ্মীর তার সালেমারবাগ, নিশাত বাগগুলোকে

এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে বলে মনে হবে। পথের দু'ধারে একেবারে অজস্র রঙীন ফুলের বন। টেপারি, কুল, ফল্সা, বঁইচ, আঙুর ইত্যাদি নানা ছোট ছোট ফলের গাছও এখানে অসংখ্য।

একদা বহু নিন্দিত মার্কিন সেক্রেটারী সিউওয়ার্ডের স্মৃতি পরবর্তীকালে অক্ষয় করে রাখবার জন্ত অনুতপ্ত মার্কিনবাসীরা তাদের কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ 'কেনাই' উপদ্বীপের খনিজসম্পদে ঐশ্বর্যশালী ভূখণ্ডের প্রধান শহরটির নামকরণ করেছে "সিউওয়ার্ড নগর"। সিউওয়ার্ড নগর ধনসম্পদে ও জনসম্পদে ক্রমেই বড় হয়ে উঠেছে।

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

তৃতীয় পর্ব্ব

১

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের সংক্ষিপ্ত নাম 'অনুবাদক সমাজ'। আমরা এই নামেই অতঃপর ইহাকে অভিহিত করিব। পূর্ব্ব প্রবন্ধে ১৮৫৭, ৩১শে মে পর্য্যন্ত অনুবাদক সমাজের কার্য্য-কলাপের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। ১৮৬২ সনের প্রথমে ইহা কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হয়। তদবধি ইহার কার্য্যকলাপ বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য। তবে ইহার পরিপূরক বা পরিশিষ্ট হিসাবে পরবর্ত্তী কৃতি যতটুকু জানিতে পারিয়াছি তাহা প্রদত্ত হইবে।

গতবারে যেখানে আমরা ছেদ টানিয়াছি তাহার পূর্ব্বে এমন কিছু কিছু কাজ আরম্ভ হয় যাহার জের ইহার পরেও টানা হইয়াছিল। এই বিষয়ের কথাই আগে বলিব। ১৮৫৬ সনের ২৮শে আগষ্ট অনুবাদক সমাজের কর্ম্মকর্ত্তৃ-সভার যে অধিবেশন হয় তাহাতে দেখি, তাঁহারা দুইখানি পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশের ভার কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটিকে গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতেছেন, ইহার অব্যবহিত পরে সোসাইটির অধ্যক্ষ-সভার কোন অধিবেশনে এ বিষয় আলোচনার পর নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়া থাকিবে। কারণ ১৮৫৬ সনের কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির বাৎসরিক রিপোর্টে এ বিষয়টির এইরূপ উল্লেখ আছে :

"... it was resolved that the School-Book Society would undertake to print and publish the manuscripts furnished by the Vernacular Translation Society, provided they come within the scope of the School-Book Society's operations, and were otherwise approved. The first result of this arrangement has been the production of four works, since put to press, *viz.*, a Bengali version, by Pandit Ramnarayan Vidyaratna, of the Victories of Alexander, the Life of Jenghis Khan, the Life of Timur Lung, from Peter Parley's Wonders of History, and a translation of the Life of Columbus by Babu Rangalal Banerjee"*

এই উদ্ধৃতিতে অনুবাদক সমাজ এবং কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির মধ্যে পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশ সম্পর্কে নূতন বন্দোবস্তের কথা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। সোসাইটি স্থির করেন, উদ্দেশ্য এবং কার্য্যপ্রণালীর অনুগ হইলে তাঁহারা অনুবাদক সমাজ প্রদত্ত পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করিয়া প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন। বস্তুতঃ আলোচ্য বৎসরে—১৮৫৬ সনে—এইরূপ চারিখানি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সোসাইটি গ্রহণ করেন। ইহার তিনখানি পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃত, এবং অপরখানি কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এই চারিখানি ঐ সময়ে মুদ্রণের ব্যবস্থা হয়।

মুদ্রণ-কার্য্যও যে দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। স্কুল-বুক সোসাইটির বিংশতি রিপোর্টে (১৮৫৭) দেখিতেছি, পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের ছয়খানি পুস্তক তাঁহারা অনুবাদক সমাজের পক্ষে প্রকাশিত করিয়াছেন। এ ছয়খানি পুস্তকই আকারে ক্ষুদ্র, পিটার পার্লে'র *Wonders of History* গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ের অনুবাদ। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, কবি রঙ্গলাল কৃত কলম্বসের জীবনীর পাণ্ডুলিপিও মুদ্রণের ব্যবস্থা হয়, পূর্ব্ব রিপোর্টে এইরূপ কথা ছিল। কিন্তু আলোচ্য রিপোর্টে এই পুস্তকখানি প্রকাশ ত দূরে থাকুক, এ সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্য করা হয় নাই। এখানি শেষ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই বলিয়াই ধারণা। রঙ্গলাল-জীবনীতেও এ পুস্তকের উল্লেখ দেখিতেছি না। রঙ্গলাল শেষ পর্য্যন্ত এখানি বর্জ্জন করিয়া থাকিবেন। পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন

---

* The School-Book Society, *19th Report* (1856) pp. 2, 3.

অনূদিত ছয়খানি পুস্তকের পরিচয় স্কুল-বুক সোসাইটির রিপোর্টে (পৃ ৪) এইরূপ আছে :

Victories of Alexander the Great	26 pp.	2000 copies
Life of Jenghis Khan	34 pp.	2000 ,,
Life of Timur Lung	62 pp.	2000 ,,
Life of William Tell	36 pp.	2000 ,,
Life of Peter the Great	16 pp.	2000 ,,
Discovery of America and Conquest of Mexico	36 pp.	2000 ,,

এখানে আর একটি কথাও আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। এ পুস্তকসমূহ অনুবাদক সমাজের পক্ষে প্রকাশিত হইলেও, এগুলির সম্পূর্ণ দায়িত্ব কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনুবাদক সমাজের পুস্তকাবলীর যে তালিকা মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইত তাহাতে এই পুস্তকগুলির নাম থাকিত না।

২

অনুবাদক সমাজ ১৮৫৬ সনের মাঝামাঝি সময় হইতে প্রত্যেকখানি সুলিখিত পুস্তকের জন্য গ্রন্থকারকে দুই শত টাকা পুরস্কার দিবেন এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। শুধু অনুবাদ-পুস্তক নয়, মৌলিক গ্রন্থরচনায়ও তাঁহারা লেখকদের উৎসাহিত করিতে থাকেন। উক্ত পুরস্কার-প্রার্থী হইয়া প্রথমে দশ জন লেখক সমাজ-কর্তৃপক্ষের নিকট পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পেশ করেন। এই দশখানির মধ্যে মাত্র দুইখানি পুস্তক পারিতোষিক লাভের উপযোগী বিবেচিত হয়। পাদরি লঙের ভাষায় :

"Out of the 10 MSS. submitted for prizes, only two obtained it, *viz.*:—*The Sushil-Upakhyan* by Madhu Sudan Mukherjee, a moral tale pointing out the defects and requisities for native girls and the *Padmini-Upakhyan* by Runga Lal Banerjee, a tale of Rajputana in verses—both are admirable models.' *

পুরস্কৃত বই দুইখানির একখানা হইল—মধুসূদন মুখোপাধ্যায় বিরচিত সুশীলার উপাখ্যান এবং অপরখানি কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মিনী-উপাখ্যান। 'সুশীলার উপাখ্যান' অনুবাদক সমাজ কর্তৃক পরে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ডও মধুসূদন মুখোপাধ্যায় রচনা করিয়াছিলেন—এ বিষয় একটু পরেই জানা যাইবে। রঙ্গলাল 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' স্বয়ং প্রকাশিত করেন ১৮৫৮ সনে। এই কাব্যগ্রন্থখানির ভূমিকায় উক্ত পারিতোষিকপ্রাপ্তির উল্লেখ নাই বটে, তবে রচয়িতা যে অন্যান্যের মধ্যে অনুবাদক সমাজ কর্তৃকও সবিশেষ উৎসাহিত হইয়াছিলেন তাহার এই [illegible] উল্লেখ আছে, "...তথা বর্নাকুলার লিটারেচর সোসাইটি নামক প্রসিদ্ধ সমাজের অধ্যক্ষবর্গ তৎপ্রকাশার্থ বিশেষ উৎসাহ প্রদানপূর্ব্বক অনুরোধ করাতে আমি সেই কাব্য প্রকাশ করিতেছি।"*

লঙ তাঁহার বাংলা পুস্তকাদির 'রিটার্নে' (১৮৫৯) ১লা জুন ১৮৫৭ হইতে ৩১শে মে ১৮৫৮—এই এক বৎসরের প্রকাশিত মধ্যে অনুবাদক সমাজ কর্তৃক নূতন এবং পুরাতন পুস্তকেরও একটি ফিরিস্তি দিয়াছেন। এই বৎসরে রামচন্দ্র মিত্রের 'মনোরম্য পাঠ' এবং পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের 'বৃহৎ কথা'—১ম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়। নূতন প্রকাশিত পুস্তকসমূহের বিবরণ এইরূপ :

পুস্তকের নাম	অনুবাদক	প্রকাশকাল	মূল্য	মুদ্রণ-সংখ্যা
চকমকির বাক্স	মধুসূদন মুখোপাধ্যায়	জুন ১৮৫৭	৶০	৫,০০০
ছোট কৈলাশ ও বড় কৈলাশ	"	জুলাই ১৮৫৭	/০	২,৫০০
মরমেত। অর্থাৎ মংস্য-নারীর উপাখ্যান	"	আগষ্ট ১৮৫৭	/০	২,০০০
চীনদেশীয় বুলবুল পক্ষীর বিষয়	"	সেপ্টেম্বর ১৮৫৭	/০	২,০০০
অহল্যা হড্ডিকার	"	মার্চ ১৮৫৮	৶৫	২,০০০
নূরজাহান রাজ্ঞীর জীবনবৃত্তান্ত	"	মার্চ ১৮৫৮	।/০	২,০০০
বায়ু চতুষ্টয়ের আখ্যায়িকা	"	এপ্রিল ১৮৫৮	/১০	২,০০০
কুৎসিত হংসশাবকের উপাখ্যান	"	মে ১৮৫৮	৵০	২,০০০
সাইবেরিয়া দেশে দূরীকৃতদিগের বৃত্তান্ত	রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন	মে ১৮৫৮	।।/০	১,০০০

এই তালিকায় দেখা যাইতেছে, এ বৎসরে প্রকাশিত নূতন পুস্তকগুলির মধ্যে একখানি ব্যতীত সমুদয়ই অনুবাদক সমাজের সহকারী সম্পাদক মধুসূদন মুখোপাধ্যায় লিখিত। লেখকের "হংসরূপী রাজপুত্র" পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা (১ জুলাই ১৮৫৯) হইতে ইহার হেতু খানিকটা আঁচ করা যায়। ভূমিকায় অন্যান্য কথার মধ্যে মধুসূদন বলেন :

"অনুবাদক সমাজের পূর্ব্ব সম্পাদক বিজ্ঞবর শ্রীযুত আর, বি, চ্যাপ্‌মান সাহেবের আদেশে, আমি ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের মে মাসে এই অদ্ভুত উপাখ্যানটি ইংরেজী গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়া সমাজে সমর্পণ করিয়াছিলাম। আমি যে কয়েকখানি গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছি, তন্মধ্যে ইহাই আমার প্রথম অনুবাদ। সম্পাদক মহাশয় পুস্তকখানি গ্রহণ করিয়া দুই সহস্র খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশ করেন। যে

* Long's *Returns* . . . etc. (1859), p. xix.

* রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ২য় সং) —ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৮-১৯।

মাসে ইহা প্রকাশিত হয় সেই মাসেই প্রায় তিনশত খণ্ড বিক্রয় হইয়া যায়। গ্রাহকবর্গের এইরূপ আগ্রহ দেখিয়া সম্পাদক মহাশয় সন্তুষ্টচিত্তে ঐরূপ আর কয়েকখানি গ্রন্থ অনুবাদ করিতে আমাকে অনুমতি করেন।...কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ ক্রমে ক্রমে অনুবাদ করিয়াছি। এই সমুদয় পুস্তকই দুই দুই সহস্র করিয়া মুদ্রিত হয়। দুঃখিনী মাতা অতি অল্পকাল মধ্যেই নিঃশেষিত হওয়াতে পুনর্ব্বার দুই সহস্র মুদ্রিত হইয়াছে। আর আর গুলির অধিকাংশই শেষ হইয়াছে, শীঘ্র পুনর্মুদ্রিত করিতে হইবে।"

এখানে আর একটি বিষয়ও নূতন জানা যাইতেছে। ১৮৫৯ সনে আর. বি. চ্যাপম্যান সমাজের সম্পাদক পদে বৃত ছিলেন না। এই সময় সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বা অধ্যক্ষ ই. বি. কাউয়েলকে সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাই। ১৮৫৮, নবেম্বর মাসে কাউয়েল সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়া আসেন। এ সময়েই তিনি অনুবাদক সমাজের সম্পাদকের পদও গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। কারণ অনুবাদক সমাজের ১৮৫৮ সনের শেষদিকের কোন কোন বিজ্ঞপ্তিতে তাঁহার স্বাক্ষর বাহির হয়। সমাজের পুস্তক-বিক্রয়ের নিজস্ব কেন্দ্রও এ সময় স্থাপিত হইলঃ গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সংগ্রহ, গরাণহাটা চৌরাস্তাস্থিত ২৭৬।১নং; দ্বিতীয় কেন্দ্র সহকারী সম্পাদক মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের আবাসস্থল—৯৪নং শিবতলা লেন, মাণিকতলা। ইহা ছাড়া মফস্বল অঞ্চলে সমাজ-প্রকাশিত পুস্তকসমূহের বিক্রয়ের ব্যাপক ব্যবস্থা হয়। মফস্বলস্থ স্কুল-পাঠশালার ডেপুটি ইন্সপেক্টরদের উপর কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির পুস্তক সরবরাহের ভার অর্পিত ছিল। তাঁহারা স্বেচ্ছায় অনুবাদক সমাজের পুস্তক সরবরাহেরও ভার লইলেন। তখন বঙ্গপ্রদেশে বাইশটি মফস্বল কেন্দ্রে ডেপুটি ইন্সপেক্টর ছিলেন একুনে বাইশ জন। বিভিন্ন স্থানের আরও ছয় ব্যক্তির উপর অনুবাদক সমাজের পুস্তক বিক্রয়ের ভার ন্যস্ত হইল। এইরূপে সমগ্র বাংলা-দেশেই অনুবাদক সমাজের পুস্তকাবলী ছড়াইয়া পড়িবার সুযোগ পায়। পুরাতন পুস্তকের নূতন সংস্করণ এবং নূতন নূতন পুস্তক প্রকাশও যথারীতি হইতে লাগিল।

সমাজ-কর্তৃক প্রকাশিত 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। পত্রিকাখানি সচিত্র বারোমাসি, অনুবাদক সমাজের মুখপত্র। এখানি তিন বৎসর বন্ধ থাকিবার পর পূর্ব্ববৎ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় ১৭৭৯ শক, বৈশাখ মাস (১৮৫৭, এপ্রিল-মে) হইতে ইহার চতুর্থ পর্ব্ব প্রকাশিত হইতে থাকে। রাজেন্দ্রলাল ষষ্ঠ পর্ব্ব পর্য্যন্ত 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' সম্পাদনা করেন। কিন্তু অসুস্থতানিবন্ধন তিনি ইহার কার্য্য নিয়মিত ভাবে সম্পাদন করিতে না পারায় অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। পত্রিকাখানি প্রকাশে বিলম্ব হইতে লাগিল। ইহার ৭ম পর্ব্ব বাহির হয় ১৭৮৩ শকের সবৈশাখ মা (১৮৬১, এপ্রিল-মে) হইতে। রাজেন্দ্রলালের স্থলে সম্পাদক হইলেন অপেক্ষাকৃত তরুণবয়স্ক অথচ বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক ও অনুরাগী স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ। অনুবাদক সমাজের সহকারী সম্পাদক মধুসূদন মুখোপাধ্যায় 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে'রও সহকারী সম্পাদক হইলেন। ১৮৬১ সনের মধ্যভাগে দীনবন্ধু মিত্র-কৃত 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশে এ দেশের ইউরোপীয় মহলে তুমুল আন্দোলনের সূচনা হয়। 'নীলদর্পণে'র ইংরেজী অনুবাদ-পুস্তকের প্রকাশক বলিয়া পাদরি লঙ কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের বিচারে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৭৮৩ শক, আষাঢ় সংখ্যা (১৮৬১, জুন-জুলাই) 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে' সম্পাদক কালীপ্রসন্ন 'নীলদর্পণ' নাটকখানির একটি বিস্তারিত আলোচনা প্রকাশ করেন। সরকারী অর্থে পরিচালিত পত্রিকায় এরূপ রচনা প্রকাশিত হওয়ায় বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট নিরতিশয় রুষ্ট হন। ফলে উক্ত সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশের পর সমাজ-কর্তৃপক্ষ এখানি বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন।*

৩

'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' প্রকাশে বিপর্য্যয় উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু সমাজ কর্তৃক পুস্তক প্রকাশ একরূপ অব্যাহত ভাবে চলিতে লাগিল। ১৮৫৮ সনের ৩১শে মে পর্য্যন্ত প্রকাশিত অনুবাদক সমাজের পুস্তকাবলীর বিবরণ আমরা একটু আগেই পাইয়াছি। ইহার পরে, ১৮৬১ সন পর্য্যন্ত সমাজ বিস্তর জ্ঞানগর্ভ অনুবাদ এবং মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সময়ে পূর্ব্ব-প্রকাশিত বহু পুস্তকের নূতন সংস্করণও বাহির হইল। এই তিন বৎসরের মধ্যে যে সকল বই প্রকাশিত হয় তাহারও অনেকগুলির নূতন সংস্করণ হয়। এ কয় বৎসরে নূতন প্রকাশিত পুস্তকগুলির প্রথম সংস্করণের বিবরণ মাত্র এখানে দেওয়া গেল। এই বিবরণে পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃত অনুবাদ-পুস্তকগুলি যাহা অনুবাদক সমাজের পক্ষে কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি প্রকাশ করেন —ধরা হয় নাই। নিম্নের তালিকায় পুস্তকসমূহের মুদ্রণ-সংখ্যাও দেওয়া সম্ভব হইল নাঃ

---

* বাংলা সাময়িক পত্র—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. [illegible] দ্রষ্টব্য।

ক	গ্রন্থকার	প্রকাশকাল	মূল্য
ং কথা, ২য় খণ্ড	আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ	১৮৫৮	।/০
হানিয়ার চরিত্র	মধুসূদন মুখোপাধ্যায়	জুলাই ১৮৫৮	।/০
চার। অর্থাৎ বিত্তালয়ের বালকদিগের দোষ পরীক্ষা	"	১৮৫৮	/৫
জাবেধ	রামনারায়ণ বিত্তারত্ন	১৮৫৮	।।/০
লার উপাখ্যান, ১ম ভাগ	মধুসূদন মুখোপাধ্যায়	ফেব্রুয়ারী (?) ১৮৫৯	৵০
কথাবলী*	রামনারায়ণ বিত্তারত্ন	১৮৫৯(?)	।৵০
াহিদ-শা	মধুসূদন মুখোপাধ্যায়	১৮৫৯	।১০
াল বিবরণ	কালিদাস মৈত্র	ডিসেম্বর ১৮৫৯	।/০
লার উপাখ্যান, ২য় ভাগ	মধুসূদন মু .পাধ্যায়	ডিসেম্বর ১৮৫৯	।০
ঐ, ৩য় ভাগ	"	সেপ্টেম্বর ১৮৬০	।/০
ক দর্শন (১৫খানা চিত্র)	রাজেন্দ্রলাল মিত্র	অক্টোবর ১৮৬০	।৵০
জীর চরিত্র†	"	নবেম্বর ১৮৬০	৵০
াধ (বালকদিগের পাঠার্থ)	মধুসূদন মুখোপাধ্যায়	ডিসেম্বর ১৮৬০	/০
ারের রাজেতিবৃত্ত	রাজেন্দ্রলাল মিত্র	১৮৬১ (?)	...
রহস্য, ১ম ভাগ; ঐ, ৩য় ভাগ	?	১৮৬১ (?)	...

ইংরেজী ১৮৬১ সনটি অনুবাদক সমাজের পক্ষে খুবই ারাত্মক হয়। রাজরোষে সমাজ-কর্ত্তৃপক্ষ 'বিবিধার্থ ংগ্রহ' বন্ধ করিয়া দেন। পূর্ব্বে, ১৮৫৬ সনের প্রারম্ভেও অনুবাদক সমাজের এক সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল। ন কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির সঙ্গে ইহার সংযোগের উঠে। কিন্তু পরে সমাজের আর্থিক অবস্থা কথঞ্চিৎ হওয়ায় এই প্রস্তাব কার্য্যকরী হইতে পারে নাই। পুস্তক মুদ্রণে ও প্রকাশে সোসাইটি যে অনুবাদক সমাজের সহযোগিতা করিতেছিলেন তাহা এখানে বলাই বাহুল্য। এই বারে, ১৮৬১ সনে দ্বিতীয় বার সঙ্কট উপস্থিত হইলে পুনরায় এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের সংযোগের কথা উঠিল। উভয় পক্ষে আলাপ-আলোচনার পর কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি এবং বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ ১৮৬২ সনের প্রারম্ভে সম্মিলিত হইয়া যায়। ১৮৬২, ২৪শে ফেব্রুয়ারী দিবসীয় 'হিন্দু পেট্রিয়টে' এই সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল।

উভয় প্রতিষ্ঠান সম্মিলিত হইবার পরবর্ত্তী একটি ঘটনা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি এবং বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ—যুগ্ম প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সেক্রেটারী জে. লিণ্ডলে ১৮৬২, ১১ই নবেম্বর তারিখে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর (বর্ত্তমান ন্যাশনাল লাইব্রেরী'র পূর্ব্বজ) কর্ত্তৃপক্ষকে জানান যে, অনুবাদক সমাজ উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত সমুদয় বাংলা পুস্তক তাঁহাদিগকে দিবার বাসনা করিয়াছেন। গ্রন্থাগার-কর্ত্তৃপক্ষ সাদরে এই দান গ্রহণ করেন। কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক প্যারীচাঁদ মিত্র এই যুগ্ম সমাজের একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। পুস্তক-সংগ্রহ স্থানান্তরিতকরণে প্যারীচাঁদের সহায়তা বিশেষ লক্ষণীয়। কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর ১৮৬২ সনের বার্ষিক বিবরণে এই ব্যাপারটির বিস্তৃত উল্লেখ পাই। ইহা হইতে আরও জানা যায়, ভাষানুবাদক সমাজ প্রথম প্রথম কতকটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াই চলিতেন :

"Mr. J. Lindley, the Secretary to the School-Book Society, with which the Vernacular Literature Society has been incorporated, has in his letter dated 11th November, 1862, communicated copy of the following resolution passed by the Vernacular Literature Society on the 9th May last. 'That the Library of Vernacular publications presented to the Society by Baboo Joykissen Mokerjea be offered for the acceptance of the Curators of the Calcutta Public Library, established in the Metcalfe Hall.' The Curators feel also obliged for this gift."†

উভয় প্রতিষ্ঠানের সংযোগের পর, অনুবাদক সমাজের আর একটি প্রধান উল্লেখযোগ্য কার্য্য ১৮৬৩ সনের প্রারম্ভ হইতে পূর্ব্বেকার 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে'র আদর্শে ইহারই অনুক্রম স্বরূপ "রহস্য-সন্দর্ভ" নামক সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশ। এবারেও রাজেন্দ্রলাল মিত্র পত্রিকাখানির সম্পাদক-পদে বৃত হইলেন। ইহার প্রথম সংখ্যা বাহির হয় মাঘ, সংবৎ ১৯১৯ বা জানুয়ারী ১৮৬৩-এ। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্যও এই সংখ্যায় সম্পাদক বিশদরূপে বিবৃত করেন।

* এই পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল আগষ্ট ১৮৬১, ংখ্যা ১৬৮। ইহার এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে াছি। প্রথম সংস্করণ এক খণ্ড ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে আছে। প্রকাশকাল ১৯১৫ সংবৎ।

† এই পুস্তকখানি একা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের রচনা নহে। ায় প্রকাশ : "বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ কর্ত্তৃক যে সকল পুস্তকের া করা প্রথম সঙ্কল্পিত হয়, তন্মধ্যে শিবজীর চরিত্র লিখিত তৎকালে বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রের সম্পাদক ঐ পুস্তক নের ভার লইয়াছিলেন, কিন্তু অবকাশাভাব প্রযুক্ত তিনি অতি াত্র লিখিয়াই বিরত হন। পরে কতিপয় সল্লেখকের সাহায্যে অবশিষ্ট লিখিত হইয়া বিবিধার্থ সংগ্রহে ক্রমশঃ প্রকটিত হে। অধুনা সেই আদর্শ হইতে এই ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রিত

† *Report of the Calcutta Public Library for 1862 with Appendix*. Pp. 7-8.

ইহার শেষাংশ হইতে অনুবাদক সমাজই যে ইহার 'প্রযোচক' বা পরিচালক তাহা বিশেষ ভাবে উল্লিখিত আছে। সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন :

"সময়ে সময়ে উত্তম চিত্রদ্বারা চিত্তানুরঞ্জন করাও ইহার উদ্দেশ্য : তদর্থে এই পত্রের প্রযোচক বঙ্গানুবাদ সমাজের আদেশে বহু শত ছবি বিলাত হইতে আনীত হইয়াছে, তাহার প্রকাশে বোধ হয় অনেকেই পরিতৃপ্ত হইবেন।"

রাজেন্দ্রলাল 'রহস্য-সন্দর্ভ' সম্পাদনা করেন ষষ্ঠ পর্ব্ব ষষ্ঠ সংখ্যা (বাংলা আশ্বিন ১২৭৮ সংখ্যা) পর্য্যন্ত। অসুস্থতা-নিবন্ধন তিনি এখানি নিয়মিত প্রকাশ করিতে অসমর্থ হন। উক্ত সংখ্যা প্রকাশের পর তিনি সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পর "রহস্য-সন্দর্ভ" সম্পাদনার ভার পড়ে প্রাণনাথ দত্তের উপর। পত্রিকাখানি চৈত্র (১২৮০) সংখ্যা প্রকাশের পর একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।*

৫

সে যুগে পাঠ্য পুস্তক রচনা বা নির্ব্বাচনে কোনরূপ সরকারী ব্যবস্থা ছিল না। কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটিই তাঁহাদের পক্ষে এই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন। সরকার এ নিমিত্ত সোসাইটিকে মাসিক অর্থসাহায্য দিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন। ইহার সঙ্গে অনুবাদক সমাজ যুক্ত হইলে পাঠ্যাতিরিক্ত পুস্তক যুগ্ম-প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। সমাজের পুস্তক ও পত্রিকাগুলি প্রকাশের জন্য প্রতি মাসে সামান্য মাত্র সরকারী সাহায্য পাইতেন। ১৮৬৩-৬৪ সনের শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী বার্ষিক রিপোর্টে এই যুগ্ম প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নিম্নরূপ উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে :

"There is no direct Government Agency in Bengal for the preparation and distribution of educational books, but the object is effected through the instrumentality of the School-Book and Vernacular Literature Society, an educational institution conducted by a Committee of gentlemen associated for the purpose of printing and disseminating through the country a supply of suitable school books and school apparatus, together with general vernacular publications for general reading as a means of advancing the education of the people. The Society receives a grant-in-aid of Rs. 650 a month from Government, Rs. 500 being assigned to the School-Book Department and Rs. 150 to the department of Vernacular Literature."†

উদ্ধৃতিটি পূর্ব্বকথাই সমর্থন করিতেছে। পাঠ্য পুস্তক রচনা, এবং এই সকল ও স্কুলের ব্যবহারোপযোগী যন্ত্রপাতি বিলির ভার ছিল স্কুল-বুক সোসাইটির উপর। এইজন্য সরকার পাঁচ শত টাকা প্রতি মাসে সাহায্য স্বরূপ দিতেন। অনুবাদক সমাজের খাতে দেওয়া হইত প্রতি মাসে দেড় শত টাকা। এই যুগ্ম প্রতিষ্ঠানের কার্য্য যে আরও কয়েক বৎসর চলিয়াছিল, "রহস্য-সন্দর্ভে"র প্রকাশ হইতে তাহা বুঝা গিয়াছে। আমরা অনুবাদক সমাজ সম্বন্ধেই এখানে বিশেষ ভাবে বলিতেছি। এই সমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাবলী এবং কার্য্যপ্রণালীর নিন্দা-প্রশংসা দুই-ই হইয়াছিল। তবে ইহা যে মহৎ উদ্দেশ্যে গঠিত সে বিষয়ে দ্বিমত ছিল না। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ইহার প্রকাশিত পত্রিকার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। তবে ইহার পুস্তকগুলির তিনি প্রশংসা করিতে পারেন নাই। ১৮৭০ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী "A Popular Literature for Bengal" বা বাংলার সর্ব্বসাধারণের সাহিত্য সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞান সভায় তিনি একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাহার এক স্থলে সমাজের পত্রিকাখানির প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকগুলি সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন। তবে পূর্ব্ব প্রবন্ধেই বলিয়াছি, ভাষার সরলতা এবং সাবলীল গতি দানে এই সকল পুস্তকের কৃতিত্ব খুব বেশী। অনুবাদক সমাজের পুস্তকগুলির বহুল প্রচারেরও সুব্যবস্থা হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত বক্তৃতায় এই সুব্যবস্থার সুযোগ লইতে নব্য বঙ্গের প্রতি আবেদন জানাইয়াছিলেন। তাঁহার ভাষায়—

"The Vernacular Literature Society has special agencies of its own at many places; and these agencies are, I believe, available on certain conditions to the general public on the sale of books not published by the Society, but I am not aware that the public make use of them to any considerable extent. Cannot the system be utilised to a great extent?"

অনুবাদক সমাজ কতদিন চলিয়াছিল, তাহা এখনও অনুসন্ধান সাপেক্ষ। তবে ইহার প্রকাশিত পুস্তকগুলির কোন কোনটির অষ্টম দশকেও যে সংস্করণ হইয়াছিল তাহার প্রমাণ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, "সুশীলার উপাখ্যান"-এর উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য পরবর্ত্তীকালে নানারূপ উদ্যোগ-আয়োজন চলিয়াছিল। এই সকল প্রয়াসের সার্থক পরিণতি ঘটে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠায়। কিন্তু গত শতাব্দীর মধ্যভাগে, যখন এরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের কল্পনাও হয় নাই তখন বঙ্গ-ভাষানুবাদক সমাজের মত একটি সার্থক প্রতিষ্ঠান-গঠন কম দূরদর্শিতার পরিচায়ক নহে।

---

* "রহস্য-সন্দর্ভ" সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্কলিত বাংলা সাময়িকপত্র, পৃ. ১৮-৮০ দ্রষ্টব্য।

† *Report on Public Instruction, Etc., for 1863-64*, p.90: "Book Department' School-Book and Vernacular Literature Society."

সে তিন আখর

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

[বনের মধ্য দিয়ে একটা সরু পায়ে চলার পথ। সকালবেলা, ঘন পাতার আড়াল দিয়ে কাঁচা রোদ এখানে-ওখানে এসে পড়েছে। পথের পাশে পলাশ গাছ ফুলে ফুলে লাল হয়ে আছে, ডালে বসে একটা পাখী শিস দিচ্ছে, বনের অন্তরাল হতে অচেনা ফুলের মিঠে গন্ধ ভেসে আসছে। ক্লান্ত পায় মলয় চলেছে সেই পথে। রুক্ষ চুলগুলো এসে পড়েছে চোখেমুখে, পাগলের মত বিভ্রান্ত তার দৃষ্টি। হঠাৎ সে শুনতে পায় গুন্‌গুনিয়ে গান গেয়ে কে যেন সেই পথ ধরে এগিয়ে আসে। মলয় থমকে দাঁড়ায়, আগন্তুককে পাশকাটানোর জন্যে পথ ছেড়ে বনে ঢুকতে যায়, এমন সময় দেখতে পায় গায়ককে—গেরুয়াধারী শীর্ণকায় বাউল, হাতে তার একটা একতারা। মলয় পাশকাটাবার প্রয়োজন বোধ করে না, গুন্ গুন্ করে গান গাইতে গাইতে বাউল এগিয়ে আসে, সামনে মলয়কে দেখে দাঁড়ায়।]

বাউল (হেসে) আহা—কি সুন্দর সকাল।

মলয়—(বাউলের দিকে তাকিয়ে থাকে, জবাব দেয় না)

বাউল—(হাসতে হাসতে) আনন্দ যেন ঝরে পড়ছে।

মলয়—(জবাব দেয় না চোখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকায়)

বাউল—(হাসতে হাসতে) অকবিও কবি হয়ে ওঠে।

মলয়—(চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে)

বাউল—বুক থেকে গান টেনে বার করে।

মলয়—(অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে)

বাউল—(এতক্ষণে মলয়ের মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে) অসুখ করেছে বাবুর।

মলয়—(অন্যমনস্ক ভাবে) না

বাউল—তবে চেহারাটা এমন কেন—বড় শুকনো দেখাচ্ছে।

মলয়—(অন্যমনস্ক ভাবে) বেশ দেখাচ্ছে।

বাউল—(মাথা নাড়ে) আজ্ঞে না—বেশ দেখাচ্ছে না।

মলয়—(বিরক্ত ভাবে) পথ দেখ—আমাকে বিরক্ত করো না।

বাউল—(হেসে) আমাকে দেখে ভয় করবেন না বাবু—চুরি, ডাকাতি, খুন, যাই করে আসুন না কেন, আমি আপনার ক্ষতি করব না।

মলয়—চুরি ডাকাতি খুন কিছুই করি নি বাপু।

বাউল—তবে ভাবটা এমন কেন, ঘর ছেড়ে বিবাগী হয়ে পথে বেরিয়েছেন বুঝি? গুরু চাই?

মলয়—আহা, বিরক্ত করো না, আমার গুরুর দরকার নাই (চলে যাবার উদ্যোগ করে)

বাউল—আরে দাঁড়ান দাঁড়ান—কেমন যেন দেখাচ্ছে আপনাকে, লক্ষণগুলো যেন জানা মনে হচ্ছে।

মলয়—(বিরক্ত হয়ে) থাম।

বাউল—(মাথা নেড়ে) হ্যাঁ—সেই সব লক্ষণ। অসুখ করে নি তবু চোখ বসে গেছে, মুখ শুকনো; চোর নয়, ডাকাত নয়, খুনে নয়, সাধুও নয়—তবু বনে জঙ্গলে একা একা ঘুরে বেড়ায়—এ অবশ্যই তাই।

মলয়—আমার পথ ছাড়, আমাকে যেতে দাও।

বাউল—আর একটু দাঁড়ান, দুটো কথা জিজ্ঞাসা করব। আচ্ছা

বাউল। (একতারায় ঘা মেরে গান ধরে)

শিশুদের লেগেছে মেলা—
সেথা ভালবাসার খেলা।

মলয়। (গান থামিয়ে দিয়ে) খেলা! ভালবাসা খেলা!

বাউল। (হেসে) আজ্ঞে হাঁ, খেলা বৈকি! কেমন চলেছে দেখুন তো! আজ উষা ভালবাসল প্রভাতকে, কাল প্রভাত ভালবাসল সন্ধ্যাকে, পরশু আবার সন্ধ্যা ভালবাসল আলোককে। পুরো মনের বেসাতী নিয়ে মেলায় কেউ আসে নি, তাই শিশুদের মত এরা একটা পুতুল হারিয়ে গেলে একমুহূর্ত্তে কেঁদে ফেলে, আবার আর একটা হাতে পেলে পরমুহূর্ত্তে হেসে ওঠে—ভারি মজা!

মলয়। (মাথা নেড়ে) না—না।

আমার কাছে মন্ত্র নিন···

বাউল। চেয়ে দেখুন, চেয়ে দেখুন বাবু, চোখবুজে মাথা নাড়বেন না। আধখানা মনের দেওয়া-নেওয়া চলছে বলেই সংসারের খেলাটা জমেছে, তা না হলে কি হ'ত কল্পনা করতে পারছেন?

মলয়। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে)

বাউল। ঠিক, ঠিক, ঐ রকম অগণিত দীর্ঘনিঃশ্বাসে বিরাট ঝড় উঠত, অগণিত বুকের ব্যথায় আকাশ অন্ধকার হয়ে যেত, ফুল ফুটত না, পাখী গাইত না, পৃথিবীটা মরুভূমি হয়ে যেত। কিন্তু কোথায় সে মরুভূমি, কি দেখছেন?

মলয়। (অবাক হয়ে বাউলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে)

বাউল। কি দেখছেন? আপনার দীর্ঘনিঃশ্বাসে গাছের একটা শুকনো পাতাও খসে পড়ল না। ফুলও ফুটছে, পাখীও গাইছে; আর শুনতে পাচ্ছেন গ্রাম থেকে ভেসে আসছে গানের সুর আর মাদলের আওয়াজ। বসন্তের হাওয়ায় উড়ছে রঙীন শাড়ি, ভাসছে অগুরুর গন্ধ—শিশুরা খেলা করছে। এই কাঁদছে আবার এই হেসে উঠছে—ভারি মজা!

মলয়। তুমি ভুল করেছ, আমি শিশু নই, আমি সাবালক।

বাউল। (উৎসাহের সঙ্গে) বটে, বটে, সাবালক তো সচরাচর চোখে পড়ে না! আহা কি ভাগ্য যে আজ আপনার সঙ্গে দেখা হ'ল বাবু। পুরোমনের বেসাতি নিয়ে যে মেলায় আসে সে যে মহাজন! তা হলে দুঃখ করবেন না—মনের আনন্দে হাসুন।

মলয়। হাসি যে আসছে না বন্ধু।

বাউল। আসবে বাবু আসবে। আমার কাছে মন্ত্র নিন, আনন্দে মন ভরে যাবে।

মলয়। (আশ্চর্য্য হয়ে) তুমি মন্তর দেবে কি হে, তুমি ভালবাসার কি জান?

বাউল। (একতারায় ঘা মেরে গান ধরে)

সই, পিরিতি না জানে যারা
এ তিন ভুবনে জনমে জনমে—
কি সুখ জানয়ে তারা।

(গান থামিয়ে—হেসে) একদিন আপনারই মত এই পথ দিয়ে পাগলের মত আমিও বনের দিকে ছুটে গিয়েছিলাম।

মলয়। তাই নাকি! তুমিও ভালবেসেছিলে?

বাউল। আজ্ঞে আমিও ভালবেসেছিলাম এখনও ভালবাসি।

মলয়। (আগ্রহের সঙ্গে) বলো, বলো তোমার ইতিহাসটা।

বাউল। ইতিহাস সবারই প্রায় এক রকম। নাম তার বকুল। কালো চুল দুলিয়ে সে যখন চলত, কালো চোখদুটি মেলে সে যখন চাইত তখন বুকের একতারাটা আমার ঝনঝন করে বেজে উঠত।

মলয়। তার পরে, তার পরে।

বাউল। এ পাড়া থেকে ওপাড়া যাবার যে পথ সেই পথের ধারে ছিল আমার ঘর। সন্ধ্যাসকাল পথ চেয়ে বসে থাকতাম সে কখন আসবে। সে যখন আসত তখন পথে এসে দাঁড়াতাম আমি। পাশ দিয়ে চলে যেতে হঠাৎ মুখ তুলে বকুল তাকাত আমার দিকে, কেঁপে উঠত আমার দেহমনপ্রাণ, মনে হ'ত ধন্য আমি, ধন্য আমি।

মলয়। তার পর?

বাউল। এমনি করে স্বপ্নের মত কেটে যায় মাসের পর মাস, গ্রীষ্ম-বর্ষা, শীত-বসন্ত।

মলয়। (মাথা নেড়ে) আহা।

বাউল। যেদিন বকুল আমার সঙ্গে কথা কইত সেদিন মনে হ'ত আমি সম্রাট, আমি বিজয়ী বীর।

মলয়। তার পর।

বাউল। তার পরে আকাশে জমতে লাগল মেঘ। পথ দিয়ে রোজকার মত সে আর আসে না, একদিন যায়, দু'দিন যায়—তবু সে আসে না। গেলাম তার বাড়ীর দরজায়, দেখলাম ঘরের কাজে ব্যস্ত সে, দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ, ফিরেও একবার তাকাল না।

মলয়। বুঝতে পেরেছি।

জলে পা ডুবিয়ে বকুল বসে আছে

বাউল। (হেসে) ঠিকই বুঝতে পেরেছেন। আপনাকে বঞ্চিত করেছেন অশোকবাবু, আমাকে বঞ্চিত করলো পঙ্কু।

মলয়। এই তো মেয়েদের ভালবাসা।

বাউল। দাঁড়ান, এখনও সবটা বলা হয় নি।

মলয়। আর আবার বলবে কি?

বাউল। অনেক বলব—শুনুন। বকুলকে না দেখে না দেখে বুকের মধ্যেটা হুহু করে উঠত তখন ছুটতাম ওদের বাড়ী। কোনদিন বকুলকে দেখতে পেতাম, কোনদিন পেতাম না—কিন্তু রোজই দেখতাম পঙ্কুকে।

মলয়। হু।

বাউল। রথযাত্রায় ভারি ধুম আমাদের দেশে। মাণিকপুর সোনাই নদীর ধারে মস্ত মেলা বসে। গাঁয়ের লোক ভোর হতেই মাণিকপুরের পথে দলে দলে চলতে সুরু করে। বকুলদের বাড়ী এসে দেখি তারাও চলে গেছে। তাড়াতাড়ি আমিও চলি ক্রোশ দুই পথ দেখতে দেখতে চলে যাই—মেলা জমে উঠেছে তখনই। ভিড় ঠেলে খুঁজে বেড়াই বকুলকে, কিন্তু কোথাও দেখতে পাই নে। বেলা ক্রমে পড়ে আসে, মেলার হৈ চৈ ভাল লাগে না—নদীর ধারে যাই। মস্ত একটা বটগাছ—ভরা নদীর জল এসে ঠেকেছে তার গোড়ায়। সেই দিকে এগিয়ে যাই। হঠাৎ শুনতে পাই একটা হাসি, ভারি মিঠে হাসি, বুকের ভিতর রক্ত ধক্ করে উঠে—এ যে আমার চেনা হাসি। আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়াই বটগাছের পাশে, চেয়ে দেখি গুড়িতে বাঁধা একখানা নৌকো, তার একপাশে বসে আছে বকুল, আর একপাশে কে বসে আছে দেখা যায় না। জলে পা ডুবিয়ে বকুল বসে আছে—খর স্রোত তার সুন্দর পা দুখানা নিয়ে খেলা করছে। বকুল হাসছে, খুশীর আলোয় মুখখানা উজ্জ্বল, চোখ দুটো যেন কথা কইছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম—এমন সুন্দর বকুলকে কখনও দেখি নি। হঠাৎ চমক ভাঙল আর এক জনের কথায়। মাথার মধ্যে রক্ত দপ করে আগুনের মত জ্বলে উঠল, মনে হ'ল ছুটে গিয়ে গলাটা চেপে ধরি পঙ্কুর, কথা বন্ধ করে দি তার চিরদিনের জন্যে। কিন্তু বকুলের মুখের দিকে তাকিয়ে পা উঠল না—সেইখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

মলয়। হয় তো ভুল করলে।

বাউল। আজ্ঞে না—ভুল করি নি—তার পরে শুনুন।

মলয়। আর শুনে কি হবে, বুঝেছি, তুমিও আমার মত পালিয়ে এসেছ।

বাউল। (হাসতে হাসতে) ঠিক এই পথ দিয়েই। আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, বিষ্টি পড়ছিল অবিরাম, তারই মধ্যে আমি চলেছিলাম দিনরাত—ভিতরটা যেন পুড়ে যাচ্ছিল।

মলয়। (মাথা নাড়ে)

বাউল। ভাবছিলাম ভগবান এত দুঃখ যেন আর কাউকে না দেন। বারে বারে মনে পড়ছিল বকুলের আনন্দ-উজ্জ্বল মুখখানা। ভগবান যদি এই আগুন তার মনে জ্বালিয়ে দিতেন! না—না, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলাম বকুল যেন দুঃখ না পায়।

মলয়। পাওয়াই উচিত।

বাউল। (কানে আঙুল দিয়ে) ছি, ছি, অমন কথা বলবেন না: আমি বকুলকে ভালবাসি! ঘুরে ঘুরে একটা কথা মনের মধ্যে আসতে লাগল, এই দুঃখ বকুল পায় নি, আমি পেয়েছি, সেই ভাল, সেই ভাল। মনটা যেন অনেক হালকা হয়ে গেল। গভীর রাত, আকাশে মেঘ নাই, অসংখ্য তারা জ্বল জ্বল করছে, কোথায়

যেন কাছাকাছি একটা জলস্রোতের ছল ছল আওয়াজ আসছে—কয়েকদিন অবিশ্রাম চলার পর একটা গাছের নীচে শান্ত হয়ে বসলাম। নিস্তব্ধ রাত্রির সেই প্রহরটা কোন দিন ভুলতে পারব না, মন যেন বাইরে এসে আমার সামনে দাঁড়াল। তাকে প্রশ্ন করলাম "ওরে মন, ভালবাসা মানে কি?" উত্তর এল, "ভালবাসা মানে দেওয়া।" আবার প্রশ্ন করলাম, "তবে চাই কেন?" উত্তর এল, "ও তো আধখানা মনের হিসেবী ভালবাসা, ও ভালবাসাই নয়। পুরো মন দিয়ে ভালবাসার মধ্যে চাওয়া নাই। চাওয়াতেই দুঃখ—দেওয়াতেই আনন্দ। যে ভালবাসতে পেরেছে সে তো ভাগ্যবান, সে তো আনন্দের অধিকারী।" সত্য যেন সমস্ত হৃদয়কে আলোকিত করে প্রকাশ পেল। যখন ভোর হ'ল তখন দেখলাম পৃথিবী সুন্দর; নীল আকাশ, শ্যামল তরু, পুষ্পিত লতা, চঞ্চল জলধারা, সব সব সুন্দর, আর সবার চেয়ে সুন্দর বকুল। আমি এক অপূর্ব আনন্দলোকে জেগে উঠলাম।

মলয়। তোমার মাথা খারাপ।

বাউল। (গুন্ গুন্ করে গান ধরে, তার পরে হঠাৎ থেমে) সত্যিই আমার মাথা খারাপ—সত্যিই আমি পাগল হয়ে গেছি। এক দিন এ রকম পাগল হয়ে বকুলের কাছ থেকে ছুটে দূরে চলে গিয়েছিলাম, আজ আর এক রকম পাগল হয়ে বকুলের কাছে ফিরে চলেছি। আজ আমি তাকে দেখে সুখী হব। তা ছাড়া, তা ছাড়া, পঙ্কুর উপর আর আমার রাগ নাই—সেই তো বকুলকে সুখী করেছে।

মলয়। (মাথা নাড়ে) অসম্ভব।

বাউল। সম্ভব বাবু সম্ভব। এই পাগলামির মন্ত্র নিলে সব সম্ভব। পুরো মন দিয়ে যদি ভালবেসে থাকেন তা হলে আসুন, এই মন্ত্র আমি আপনাকে দি।

মলয়। না বাপু, তোমার ওসব মন্তরটন্তরে আমার বুকের আগুন নিভবে না। সে যে দাউ দাউ করে জ্বলছে।

বাউল। তা হলে জল ঢালুন, আগুন নিভে যাবে, ভিতরটা আবার ঠাণ্ডা হবে।

মলয়। তামাশা করো না, এটা কি তামাশার বিষয়?

বাউল। আজ্ঞে না—তামাশা করব কেন! আমি ভেবেই বলেছি, জল ঢালুন, অর্থাৎ আর কাউকে ভালবাসুন।

মলয়। (গম্ভীর ভাবে) আমার মনে অন্য কারও স্থান হবে না বন্ধু।

বাউল। ভারি খুশী হলাম বাবু, শুনে ভারি খুশী হলাম। বেশীর ভাগ লোকেই ভালবাসা নিয়ে খেলা করে—তাই প্রেমের কথা শুনলেই সন্দেহ হয়।

মলয়। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) ঐ তুমি যা বললে, আমি পুরো মন দিয়ে ভালবেসেছি।

বাউল। তাই তো বাবু—আপনি সকলের মত নন, আপনি সত্যিই প্রেমিক। ভাবনায় পড়লাম আপনার জন্যে—ঐ ব্যথাটা দূর করি কেমন করে।

মলয়। না বন্ধু, আমার এ ব্যথা এ জীবনে দূর হবে না।

বাউল। তাই তো বাবু, আপনাকে নিয়ে করি কি। (গুন্ গুন্ করে গান ধরে)

মলয়। আহা, কি মিষ্টি তোমার গলা। আমি একটা গান লিখেছি তুমি সেটা গাইবে?

বাউল। (উৎসাহের সঙ্গে) গান লেখেন নাকি আপনি? আপনি কবি?

মলয়। তা একটু আধটু লিখি।

বাউল। (হেসে) তা হলেই হয়েছে, এইবার লিখতে সুরু করুন, সত্যিকার কবি হতে পারবেন।

মলয়। (আশ্চর্য্য হয়ে) পারব?

বাউল। পারবেন বৈকি। আঘাত না পেলে, দুঃখ না পেলে কবি হওয়া যায় না। আর ভালবাসার আঘাতটাই সবচেয়ে বড় আঘাত। আপনি সেই আঘাত পেয়েছেন। আপনার ঐ দুঃখটা থাক, ঐখান থেকে গান বেরুবে।

মলয়। তাই নাকি!

বাউল। আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই। তা হলে আসুন বাবু আমরা দু'জনে আবার ঘরে ফিরে যাই—বনের দরকার আমারও ফুরিয়েছে, আপনারও ফুরিয়েছে।

মলয়। (বাউলের হাত ধরে) তাই চল বন্ধু।

পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের দাবি

শ্রীসনৎকুমার রায় চৌধুরী

রতরাষ্ট্রের যে দশটি "ক" শ্রেণীর রাজ্য আছে, পশ্চিমবঙ্গ তাহাদের ধ্যে ক্ষুদ্রতম। পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ৩০,৭৭৫ বর্গমাইল; আর তিবেশী বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের আয়তন যথাক্রমে ০,৩৩০; ৬০,১৩৬ ও ৮৫,০১২ বর্গমাইল। রাজ্য-পুনর্গঠন মিশনের কাছে বিহার দাবি করিয়াছে পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি জেলা— লদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি; দার্জিলিং ও কুচবিহার। পাঁচটি জেলার আয়তন ও বর্তমান লোকসংখ্যা ও উদ্বাস্তু সংখ্যা ম্নে দেওয়া হইল। যথা :

		১৯৫১ সনে	(১৯৫১ পর্য্যন্ত)
	আয়তন	লোকসংখ্যা	উদ্বাস্তু সংখ্যা
লদহ	১,৪৫৮	৯,৩৭,৫৮০	৬০,১৯৮
দিনাজপুর	১,৩৮৫	৭,২০,৫৭৩	১,১৫,৫১০
পাইগুড়ি	২,৩৭৮	৯,১৪,৫৩৮	৯৮,৫৭২
জিলিং	১,১৬০	৪,৪৫,২৬০	১৫,৭৩৮
বিহার	১,৩৩৪	৬,৭১,১৫৮	৯৯,৯১৭
মোট	৭,৬৬৫	৩৬,৮৯,১০৯	৩,৮৯,৯৩৫

এককথায় বিহার সিকি পরিমাণ ভূভাগ ও লোকসংখ্যার করা ১৫ ভাগ দাবি করিয়াছে। বিহার আরও বলিয়াছে যে, দি এই সমস্ত জেলা বিহারকে না দেওয়া হয় তাহা হইলে র্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার এই ৩টি জেলা লইয়া একটি তন্ত্র রাজ্য গঠন করা হউক বা ইহাদের আসামকে দেওয়া হউক। হারের দাবি যে কতদূর অসঙ্গত তাহা এই দাবির রকমফের তেই বুঝা যায়। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের বিহার-পরিভ্রমণকালে লীদের উপর যে অত্যাচার, অনাচারের ঝড় বহিয়া গেল র তুলনা সম্প্রতি দেখা যায় নাই। ইহার ফলে বিহার হইতে কোন জেলা পশ্চিমবঙ্গভুক্ত হউক বা না হউক ইহা বাঙালীর ভারতরাষ্ট্রের সংহতি নষ্টকারী একটি ছাপ দাগিয়া দিয়াছে। লীর হইয়া 'আহা!' বলিবার লোক ভারতরাষ্ট্রে আছে কি হ করিবার যথেষ্ট অবকাশ ঘটিয়াছে।

ন দেখা যাউক, বিহারের এই দাবি কতটা সমীচীন। ঐতিহাসিক যুক্তি ধরা যাউক। বাদশাহ আকবরের সুবে বাংলা ও সুবে বিহার ছিল। এই পাঁচটি জেলা র কোনও অংশ কস্মিন্‌কালে সুবে বিহারের অন্তর্গত না। ইংরেজ আমলেও ছিল না। ইংরেজী ১৮৭৬ ১৯০৫ সন পর্য্যন্ত মালদহ জেলা ও ১৯০৫ সন হইতে ১৯১২ সন পর্য্যন্ত দার্জ্জিলিং জেলা ভাগলপুরের বাহাদুরের অধীন ছিল—ইহাই হইল বিহারের ক দাবির ভিত্তি। এই কথা ড. সচ্চিদানন্দ সিংহ, মুরলীমনোহর প্রভৃতি বারে বারে বলিয়াছেন। কিন্তু তখন ত সমস্ত বিহার প্রদেশই বঙ্গের সামিল ছিল। বঙ্গের রাজধানী গৌড় মালদহ জেলায়। বঙ্গের অপর একটি নাম গৌড়—এই মালদহ জেলা কি করিয়া বিহারের হইতে পারে তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর। দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা বাংলারই একাংশ। আসামে যেমন আহোমদিগের আক্রমণে মূল অধিবাসীরা স্থানচ্যুত হইয়াছিল, তেমনি এই সব জেলায় ভুটিয়া, লেপচা, মেচ প্রভৃতিদের আগমন খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে ঘটিয়াছিল। দার্জ্জিলিঙের দুর্জ্জয়লিঙ্গ শিব ও জলপাইগুড়ির জল্পেশ্বর শিবের বিবরণ বাঙালীর নিজস্ব লিঙ্গার্চ্চন-তন্ত্রে পাওয়া যায়। শক্তি-সঙ্গমতন্ত্রের মতে লৌহিত্য নদ (বর্তমানকালের ব্রহ্মপুত্র) হইতে বঙ্গদেশের আরম্ভ। বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণের মতে কুশীনদের পশ্চিম অবধি মিথিলা।

> কৌশিকন্ত সমারভ্য গণ্ডকীমধিগম্য বৈ।
> যোজনানি চতুর্বিংশদ্ ব্যায়ামঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
> গঙ্গাপ্রবাহমারভ্য যাবদ্ হৈমবত বনম্।
> বিস্তার যোড়শঃ প্রোক্ত দেশস্য কুলনন্দন।
> মিথিলা নামো নগরী তত্রাস্তে লোকবিশ্রুতা।

তাহার পরেই বাংলার আরম্ভ।

মৈথিল কবি বিদ্যাপতির এক সংস্করণে অন্যতম মৈথিল কবি চণ্ড ঝা মিথিলার সীমা সম্বন্ধে এক ছড়া উদ্ধার করিয়াছেন। ছড়াটি এই :

> গঙ্গা বহতি জনিক দক্ষিণ দিশি
> পূর্ব কৌশিকী ধারা।
> পশ্চিম বহতি গণ্ডকী
> উত্তর হিমবত বলবিস্তারা।
> কমলা ত্রিযুগা অমৃতা ধেমুড়া
> বাগমতী কৃত সারা।
> মধ্য বহতি লক্ষণা প্রভৃতি
> সে মিথিলা বিদ্যাসারা।

ইহাতে কৌশিকী (কুশী) মিথিলার পূর্ব্বসীমা স্বীকৃত হইয়াছে।

যোগিনীতন্ত্রেও যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় এই সব অঞ্চল বাংলার নিজস্ব অঞ্চল।

এইবার ভাষাভিত্তিক যুক্তি বিচার করিয়া দেখা যাউক। এই পাঁচটি জেলায় বঙ্গভাষা-ভাষী ও হিন্দী ও উর্দ্দুভাষা-ভাষী কত? নিম্নে আমরা জেলা-ওয়ারি তথ্যগুলি দিলাম। যথা :

জেলা		বঙ্গভাষা-ভাষী	হিন্দীভাষাভাষী	উর্দ্দু ভাষাভাষী
মালদহ	পুঃ	৪,২০,১১৬	১৪,৯৩৩	২,৩২৫
	স্ত্রী	৪,০৭,৬৯৩	১০,৪৯৫	৩,০৫১
	মোট	৮,২৭,৮০৯	২৫,৪২৮	৫,৩৭৬
পঃ দিনাজপুর	পুঃ	২,৯৯,৭১৮	২৪,৯১৩	২৮৬
	স্ত্রী	২,৬১,৭০৫	১৫,৫১০	৩৫৯
	মোট	৫,৬১,৪২৩	৪০,৪২৩	৬৪৫
জলপাইগুড়ি	পুঃ	২,৮৪,২৯৭	৭৮,৫০৯	১,৮৩৬
	স্ত্রী	২,৩৮,৫৯৪	৪৯,০৭০	৬৭৫
	মোট	৫,২২,৮৯১	১,২৭,৫৭৯	২,৫১১
দার্জ্জিলিং	পুঃ	৩৭,১৩১	১৯,৭৭৪	২,৫৫৪
	স্ত্রী	২৭,৩১৫	১০,৪৬৬	৪২৭
	মোট	৬৪,৪৪৬	৩০,২৪০	২,৯৮০
কুচবিহার	পুঃ	৩,৪৮,১১১	১০,৩৯৯	৪০১
	স্ত্রী	৩,০৪,৮৪৯	৩,০৮৬	২০
	মোট	৬,৫২,৯৬০	১৩,৪৮৫	৪২১
	সর্ব্বমোট	২৬,২৯,৫২৯	২,৩৭,১৫৫	১১,৯৩৩

অর্থাৎ, সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৭১·৩ জন বাংলাভাষা-ভাষী : শতকরা ৬·৪ জন হিন্দীভাষা-ভাষী এবং শতকরা ০·৩ জন উর্দ্দুভাষা-ভাষী। হিন্দী ও উর্দ্দুভাষা-ভাষীদের একত্র করিলেও তাহাদের শতকরা হিসাব ৮·৭ জনের বেশী হয় না। কেবলমাত্র বাংলা-ভাষা-ভাষীদের সংখ্যা তাঁহাদের অপেক্ষা ১১ গুণ বেশী।

আর এই সব হিন্দীভাষা-ভাষী যে এই সব অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা নহেন, কেবলমাত্র রুজি-রোজগারের জন্য আসিয়াছেন তাহার একটি প্রমাণ হইতেছে—স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত তাঁহাদের মধ্যে স্থানীয় বাংলাভাষা-ভাষী অপেক্ষা অনেক কম। নিম্নে আমরা জেলা-ওয়ারি ভাবে প্রতি ১,০০০ পুরুষে কয়জন করিয়া স্ত্রীলোক তাহার হিসাব দিলাম। হিসাবটি এই :

প্রতি এক হাজার পুরুষে স্ত্রীলোকের অনুপাত :

	বাংলা	হিন্দী	উর্দ্দু	বাংলার তুলনায় হিন্দী-ভাষীদের মধ্যে কম অনুপাত
মালদহ	৯৭০	৭০৩	১৩১২	২৬৭
পঃ দিনাজপুর	৮৭৩	৬২২	১২৫৫	২৫১
জলপাইগুড়ি	৮৪২	৬২০	৩৩০	২২২
দার্জ্জিলিং	৭৩০	৫০০	১০৪	২৩০
কুচবিহার	৮৭৬	৩০০	৫০	৫৭৬

আর এই সব হিন্দীভাষা-ভাষীরা যে বহুদিন পূর্ব্বে এই সব অঞ্চলে আসেন নাই তাহার একটি প্রমাণ হইতেছে যে তাঁহারা বাংলায় কথা বলিতে পারেন না। যাঁহারা বাংলায় কথা বলিতে পারেন তাঁহাদের সংখ্যা— মোট হিন্দীভাষীদের সংখ্যা জেলা-ওয়ারি ভাবে নিম্নে দেওয়া গেল। যথা :

জেলা	মোট হিন্দীভাষীর সংখ্যা	তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বাংলা বলিতে পারেন
মালদহ	২৫,৪২৮	৪,৮৭৩
পঃ দিনাজপুর	৪০,৪২৩	১৮,৪৬৪
জলপাইগুড়ি	১,২৭,৫৭৯	১৮,৬৫৭
দার্জিলিং	৩০,২৪০	১,৭১১
কুচবিহার	১৩,৪৮৫	৩,৩৭৯
মোট	২,৩৭,১৫৫	৪৭,০৮৪

অর্থাৎ, হিন্দীভাষা-ভাষী যাঁহারা এই পাঁচটি জেলায় আছেন তাঁহাদের মধ্যে শতকরা ১৯·৮ জন বাংলা বলিতে পারেন। বাকী ৮০·২ জন বাংলা বলিতে পারেন না। ইঁহারা বাংলায় নূতন আসিয়াছেন ধরিয়া লইতে পারা যায়।

নিম্নে আমরা এই কয়টি জেলায় যাহারা বিহার হইতে আগত তাহাদের সংখ্যা দিলাম। ইহাদের মধ্যে অনেকেই হিন্দীভাষী ইহা আমরা সহজেই ধরিয়া লইতে পারি। কিছু কিছু সাঁওতালীভাষী বা অন্য ভাষাভাষী থাকিতে পারেন।

	বিহার হইতে আগত পুরুষ	বিহার হইতে আগত স্ত্রী	প্রতি হাজার পুরুষে স্ত্রীলোকের অনুপাত
মালদহ	৮,৬৬২	৭,৭৯৭	৯০০
পঃ দিনাজপুর	১৪,০৭৬	৬,৬৪৭	৪৭১
জলপাইগুড়ি	৫৫,৭৭১	৩৪,৭০৩	৬২২
দার্জিলিং	১৪,৩১০	৯,২৮৪	৬৪৯
কুচবিহার	৮,৬৪৮	১,৭৭১	২০৪
মোট	১,০১,৪৬৭	৬০,২০২	৫৯৩

সমগ্র অঞ্চলের অর্থাৎ এই পাঁচটি জেলার হিন্দীভাষা-ভাষীদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত প্রতি এক হাজার পুরুষে ৫৯৫ জন আর বিহার হইতে আগতদের মধ্যে ৫৯৩ জন—হিন্দীভাষা-ভাষীদের অপেক্ষা সামান্য কম।

সব হিন্দীভাষীই বিহারী নহেন। বিহার হইতে যাহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের সকলকে হিন্দীভাষা-ভাষী ধরিয়া লইলে মোট হিন্দীভাষীদের মধ্যে বিহারীদের সংখ্যা শতকরা [illegible] হইতেছে। অথচ এই হিন্দীভাষা-ভাষীদের সংখ্যা ধরিয়াই বিহারের যতকিছু দাবি। উত্তরপ্রদেশ বা অন্য অঞ্চলের হিন্দীভাষীদের ধরিয়া বিহার কি করিয়া দাবি করিতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

এইবার আমরা এই সব জেলার গত ৭০ বৎসরে বঙ্গভাষা-ভাষীদের অনুপাত ও হিন্দীভাষীদের অনুপাত দিব। এই অনুপাত বিহারের ন্যায় সেন্সাসের অঙ্ক গোঁজামিল দিয়া বা জবরদস্তি করিয়া

নহে। যখন হইতে ভাষার হিসাব সেন্সাসে লওয়া হইতেছে তখন হইতে এই হিসাব দিব।

দার্জ্জিলিং

শতকরা অনুপাত

	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৫১
বাং	৩৩·০	২১·২	১৭·৯	১৭·৩	১৩·৪	১১·৯	১৪·৪
হিঃ	৪·৯	৯·৩	৮·৯	৬·৫	৭·৫	৭·৮	৬·৭

বাংলার অনুপাত কমিতেছে অন্য ভাষাভাষীরা অধিক সংখ্যায় এই জেলায় আসিতেছে বলিয়া। হিন্দীভাষা-ভাষীদের অনুপাত একবার বাড়িতেছে পরে কমিতেছে আবার বাড়িতেছে আবার কমিতেছে ইহার কারণ ইঁহারা স্থায়ী ভাবে এই জেলায় বাস করেন না।

জলপাইগুড়ি

এই জেলার কিয়দংশ বর্ত্তমানে পাকিস্থানে পড়িয়াছে। সেজন্য পূর্ব্বেকার সেন্সাসের অঙ্কের সহিত বর্ত্তমানের অঙ্কের তুলনা করা সমীচীন হইবে না। এজন্য আমরা তথ্যগুলি শুধু দিলাম :

	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৫১
মোট লোকসংখ্যা	৫,৮১,৫৬২	৬,৮১,৩৫২	৭,৮৭,৩৮০	৯,০২,৬৬০	৯,৩৬,২৬৯	৯,৮৩,৩৫৭	৯,১৪,৫৩৮
বাংলা	৫,৫৫,৯০৩	৫,৬৯,৫৯২	৬,০৪,১০০	৬,১০,১৯৯	৬,০৪,৬৬০	৬,৩৮,৬৫৮	৫,২২,৮৯১
হিন্দী } উর্দ্দু	৯,৩৯৩	৩৪,৩৭৯	৪৮,৪৯১	১,১০,৮২৫	৮৬,৭৯৫	{ ১,১৪,৭৬২	১,২৭,৫৭৯
						৫,৯২৯	২,৫১১
শতকরা বাংলা	৯৫·৫	৮৩·৮	৭৬·৮	৬৭·৬	৬৪·৬	৬৫·০	৫৭·২
হিন্দী, উর্দ্দু	১·৬	৫·০	৬·১	১২·৩	৯·২	১২·৩	১৪·২

কুচবিহার

কুচবিহারে বাঙালীর অনুপাত বরাবর এত বেশী যে অন্য ভাষা-ভাষীদের সংখ্যা দিবার প্রয়োজন হয় না। আমরা নিম্নে কুচবিহারের মোট লোকসংখ্যা ও বাংলাভাষা-ভাষীদের সংখ্যা ও অনুপাত নিম্নে দিলাম। যথা :

	মোট লোকসংখ্যা	বাংলাভাষী	শতকরা অনুপাত
১৮৮১	৬,০২,৬২৪	৫,৯৫,৩৪৯	৯৮·৭
১৮৯১	৫,৭৮,৮৬৮	৫,৬৭,০৬৭	৯৭·৯
১৯০১	৫,৬৬,৯৭৪	৫,৪৭,৮৪৫	৯৬·৬
১৯১১	৫,৯২,৯৫২	৫,[illegible]৮,৭৬০	৯৫·৯
১৯২১	৫,৯২,৪৮৯	৫,৬৯,৬৩৭	৯৬·১
১৯৩১	৫,৯০,৮৮৬	৫,৭৪,৫৫৬	৯৭·২
১৯৫১	৬,৭১,১৫৮	৬,৫২,৯৬০	৯৭·২

হিন্দীভাষা-ভাষীরা সংখ্যায় ও অনুপাতে নগণ্য। এজন্য তাঁহাদের আলাদা হিসাব দিলাম না।

জলপাইগুড়ি, মালদহ ও দিনাজপুর জেলা ১৯৪৭ সালে পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে খণ্ডিত হইয়াছে। সেজন্য পূর্ব্বেকার অনুপাতের সহিত বর্ত্তমানের অনুপাত তুলনীয় নহে। মালদহ জেলার হিন্দী, হিন্দুস্থানী ও উর্দ্দু ভাষা-ভাষীদের শতকরা অনুপাত নিম্নে দিলাম। যথা :

১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৫১
১২·৯	২২·১	২১·৩	২১·৭	২২·৬	১৯·১	৩·৭

হিন্দীভাষা-ভাষীদের মধ্যে অনেকেই বাহির হইতে আসিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের হঠাৎ সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেই বুঝা যায়। আবার পাকিস্থানের ভাগে মালদহের যে অংশ পড়িয়াছে তথায় বহু হিন্দী ও উর্দ্দুভাষা-ভাষী থাকায় ও দেশ বিভাগের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা নষ্ট হওয়ায় বহু হিন্দী ও উর্দ্দুভাষী জেলা ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের অনুপাত—যাহা ১৯২১ সাল হইতে কমিতে আরম্ভ করিয়াছিল, আরও কমিয়া যায়। যাঁহারা স্থানীয় হিন্দীভাষা-ভাষী বহু পুরুষ ধরিয়া আছে তাহারা বাংলা হরপে মৈথিলী হিন্দী বলে ও লিখে।

পশ্চিম দিনাজপুর পূর্ব্বেকার দিনাজপুরের একটি ক্ষুদ্র অংশ। এক-তৃতীয়াংশ পশ্চিম দিনাজপুর ১৩৮৫ বর্গ মাইল ; সমগ্র দিনাজপুর ৩৯৪৮ বর্গ মাইল। বাংলা ও হিন্দীভাষীদের অনুপাত তুলনীয় নহে। তথাপি আমরা কয়েক বৎসরের সংখ্যা নিম্নে দিলাম :

	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৫১
বাংলা	৯২·১	৮৭·৩	৮৬·৯	৮৭·২	৭৭·৮
হিন্দী	৩·১	৪·৫	৪·২	৩·৮	৫·৭

পশ্চিম বাংলার পক্ষ হইতে বিহারের যে কতকগুলি অঞ্চল দাবি করা হইয়াছে তাহার পাল্টা আক্রমণ হিসাবে বিহারের এই দাবি করা হইয়াছে। অথচ যুক্তির দারুণ অভাব। পাঠশালার দুষ্ট ছেলে যেমন নিজে লিখিতে না পারিলে অপর ছেলের কলম ভাঙিয়া দেয় যাহাতে সে লিখিতে না পারে তদ্রূপ বিহার বলিতেছে যে, এই পাঁচটি জেলা যদি বিহারভুক্ত না হয় তাহা হইলে এই তিনটি জেলা লইয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ বা রাজ্য গঠন করা হউক। প্রথমেই প্রশ্ন করিতে হয় ইহাতে বিহারের কি লাভ হইবে ? লাভ হউক বা না হউক বিহারের ইহাতে ক্ষতি নাই, পশ্চিম বাংলার ক্ষতি হইবে। ক্ষুদ্র পশ্চিমবঙ্গ আরও ক্ষুদ্রতর হইবে। ভারতরাষ্ট্রের সংহতি ব্যাহত করিয়া আরও একটি রাষ্ট্র হইবে। আর আলাদা রাজ্য গঠিত হইলে শাসনব্যয়ভার বাড়িয়া যাইবে। একেই ত

দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার ঘাটতি (deficit) জেলা। এই সব জেলার আয় হইতে এগুলির শাসনব্যয়ভার বা জনহিতকর কার্য্যের সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান হয় না। তাহার উপর আলাদা রাজ্য গঠনের ফলে আলাদা রাজ্যপাল, আলাদা হাইকোর্ট প্রভৃতির ব্যয় বাড়িবে। এই টাকা কোথা হইতে পাওয়া যাইবে? এই সব স্থানের অধিবাসীদের স্বার্থ—সমভাষী বাঙালীদের সঙ্গে একত্রে থাকা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত থাকা। কলিকাতা অঞ্চলের টাকা এই সব অঞ্চলে ব্যয়িত হইতেছে; জনকল্যাণ-কার্য্য দ্রুত অনুষ্ঠিত হইতেছে। আলাদা রাষ্ট্র হইলে এই সব সুযোগ-সুবিধা নষ্ট হইবে।

বিহার ইহাতেও সন্তুষ্ট নহে। যদি এই তিনটি জেলা লইয়া স্বতন্ত্র রাজ্য সৃষ্টি করা সম্ভব না হয় তবে এগুলি আসামকে দেওয়া হউক। আমরা যতদূর জানি আসাম রাজ্য-সরকার বা অসমীয়ারা কেহই এইরূপ দাবি করেন নাই। তথাপি বিহার বলিতেছে দেওয়া হউক। ইহাকেই বলে, "মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী।"

এই কয়টি জেলা লইয়া একটি স্বতন্ত্র রাজ্য গঠন করা ব্যয়সাধ্য। কিছুকাল আগে সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম যে, দার্জিলিং, জলপাই-গুড়ি ও কুচবিহার হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে আয় হয় তদপেক্ষা ব্যয় বেশী। নিম্নে আমরা জেলা-ওয়ারি হিসাবে আয়-ব্যয়ের অঙ্কগুলি দিলাম। যথা:

	মোট আয় হাজারে	মোট ব্যয় হাজারে
দার্জিলিং	৪৬,৯৩	৯৫,১৫
জলপাইগুড়ি	৭৩,১৭	৬৭,৫৯
মোট:	১,২০,১০	১,৬২,৭৪
ঘাটতি:	৪২,৬৪,০০০৲ টাকা	
কুচবিহার	৪৬,৩৩	৫৯,৬৩
ঘাটতি:	১৩,৩০,০০০৲ টাকা	
সর্ব্বমোট:	১,৬৬,৪৩	২,২২,৩৭
মোট ঘাটতি:	৫৫,৯৪,০০০৲ টাকা	

এই ব্যয়ের মধ্যে রাজ্যপালের মাহিনা, মন্ত্রীদের বেতন, হাইকোর্টের ব্যয় ইত্যাদির কোন অংশ ধরা হয় নাই। ক্যাপিটাল খাতেও কোন ব্যয় ধরা হয় নাই। দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অংশের টাকা লইয়া এই তিন জেলায় বৎসরে মাথাপিছু দুই টাকা বারো আনা করিয়া ব্যয় করা হইতেছে।

মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার অনুরূপ আয় ও ব্যয় আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যতদূর জানি এই দুইটি জেলায় আয় অপেক্ষা ব্যয়ের মাত্রা বেশী। স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিলে ইহার উপর রাজ্যপালের বেতনাদি, মন্ত্রীদের বেতন, হাইকোর্টের ব্যয় ইত্যাদি চাপিবে। এই টাকা দিবে কে? বিহার না ভারত গবর্ণমেন্ট? দিলেও এই সব স্থানের জনসাধারণের কি উপকার হইবে? জনকল্যাণকর কার্য্যের জন্য যে ব্যয় হইবে বা যে ব্যয় করা উচিত তাহা এই সব অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণ কোথা হইতে পাইবে?

যে সময়ে সকল বাংলাভাষা-ভাষী অঞ্চল একত্র হইবার চেষ্টা করিতেছে সেই সময়ে এই প্রস্তাব!

এই তিনটি জেলা লইয়া যদি একটি স্বতন্ত্র রাজ্য গঠন করা উচিত হয় তাহা হইলে মিথিলাকে বর্ত্তমান বিহার হইতে আলাদা করিয়া, ছোট নাগপুর বিভাগকে পৃথকভাবে ঝাড়খণ্ড করিয়া, সাহাবাদ প্রভৃতি ভোজপুরীভাষী জেলাকে উত্তরপ্রদেশের ভোজপুরী-ভাষী জেলার সহিত একত্র করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য গঠন করাও উচিত। এবিষয়ে মৈথিলীদের আন্দোলন সত্ত্বেও বিহারের বড় বড় নেতারা বিরুদ্ধবাদী কেন? বিহার ছোট হইয়া যাইবে বলিয়া? ঝাড়খণ্ড সৃষ্টির বিরুদ্ধে এত লম্ফঝম্ফ কেন? তাও কি বিহার ছোট হইয়া যাইবে বলিয়া?

বিহারী নেতাদের মতের কোন স্থিরতা নাই। আজ যে কথা বলিলেন কাল তাহার ঠিক উল্টা বলিলেন। ড. সচ্চিদানন্দ সিংহ প্রমুখ পাঁচ জন বিহারী নেতা ১৯১২ সালে বেঙ্গলী কাগজে লিখেন যে, সমস্ত বাংলাভাষী অঞ্চল বাংলার লাটের অধীন একত্রিত হউক। আবার এই ড. সচ্চিদানন্দ সিংহই পরে বাংলার দাবির বিরোধিতা করিয়াছেন। ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ ১৯৪৮ সনের ২১শে জুন কুমুদবন্ধু বাগচি মহাশয়কে লিখিলেন:

"In the district of Manbhum most of the Congress workers who have carried the burden and gone through the sacrifices involved in the freedom movement are Bengalees, I have been intimately associated with them and know their worth. They have naturally kept a dominant position in the District Congress Committee and a very high position in the Councils of the Provincial Congress Committee. The other day there was a meeting of the District Congress Committee where a resolution in favour of amalgamation of Manbhum with Bengal was proposed but was defeated by a majority of the D.C.C."

অর্থাৎ, 'মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটিতে মানভূমের বঙ্গভুক্তি সম্বন্ধে প্রস্তাব বাঙালীদের কংগ্রেসে প্রভাবসত্ত্বেও নাকচ হইয়া যায়। জনমত মানিতে হইবে ইহাই যুক্তি।'—আর আজ সমগ্র মানভূম জেলা পুনর্গঠন কমিশনের সম্মুখে বঙ্গভুক্তির জন্য চেষ্টা করিতেছে—কেবল কমিটির কয়জন মেম্বর নহে। যাহাতে তাহারা আন্দোলন চালাইতে না পারে, যাহাতে সাক্ষ্য না দিতে পারে তাহার জন্য বিহার সরকারের মায় মন্ত্রী হইতে ক্ষুদে চৌকীদারের পর্য্যন্ত কি অপচেষ্টা।

ধানবাদ মহকুমাটি যাহাতে বিহারে থাকিয়া যায় তাহার জন্য কত গোপন চিঠি চলিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মানভূম জেলাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া যদি ধানবাদ বিহারে রাখা যায় তাহার জন্য ফরমায়েসী যুক্তি তৈয়ারী হইতেছে।

বিহারের অন্যতম নেতা, ভূতপূর্ব মন্ত্রী ডাঃ বিনোদানন্দ ঝা বাঙালীদলন আন্দোলনে প্রধান সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। ...ন মশানজোড় বাঁধ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সঙ্গে চুক্তি ... তখন তিনি দিল্লীর মন্ত্রী গ্যাডগিলের সম্মুখে প্রকাশ্য বক্তৃতায় ...কার করিয়াছিলেন যে, সাঁওতাল পরগণার এই অংশ পশ্চিমবঙ্গ-... হওয়া উচিত। আর আজ তিনি "বিনা যুদ্ধে নাহি দিব ...গ্র ভূমি" বলিয়া আন্দোলন করিতেছেন!

বর্ত্তমানে রাষ্ট্রের স্বরূপ বদলাইয়া গিয়াছে ও আরও বদলাই-... চেষ্টা চলিতেছে। পুলিসী রাষ্ট্রের পরিবর্ত্তে জন-কল্যাণ-... গঠনের চেষ্টা চলিতেছে—বিশেষ করিয়া সমাজতান্ত্রিক ...ব্যবস্থার আদর্শে পূর্ণোদ্যমে কাজ হইতেছে। রাষ্ট্র নানারূপ ...য়নমূলক ও জনকল্যাণকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে। এ ...য়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আর যে ...ম দোষই থাকুক না কেন, জনকল্যাণকর কার্য্যের জন্য বহু ...কল্পনা তিনি করিয়াছেন ও সেগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার ... করিতেছেন। এই সকল কার্য্যের জন্য ব্যয়কে তিনি ব্যয় ...য়াই ধরেন না। ফলে বাজেটে বৎসরের পর বৎসরে ঘাটতি ...তেছে ও ঘাটতির পরিমাণ বাড়িয়া যাইতেছে।

...বাংলাদেশ, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্যকর স্থান নহে। ...লেরিয়ার লীলাভূমি এই পশ্চিমবঙ্গ; তাহার উপর আমদানী ...রাছে যক্ষ্মা। পূর্ব্বেকার সমাজব্যবস্থা উল্টাইয়া যাওয়ায় ...বের সময় উপযুক্ত দাই পাওয়া যায় না; বাড়ীর লোকও ...রা করিবার থাকে না। এজন্য ডাঃ রায়ের সহকারী স্বাস্থ্য-...ী ডাঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় জেলায় জেলায়, মহকুমায় ...কুমায়, থানায় থানায়, ইউনিয়নে ইউনিয়নে "স্বাস্থ্যকেন্দ্র" ও ...তৃমঙ্গল সদন" স্থাপন করিতেছেন; হাসপাতালে হাসপাতালে ...ী ভর্ত্তি করিবার স্থান বাড়াইতেছেন; গ্রামে গ্রামে ম্যালেরিয়া ...ড়াইবার জন্য ডি-ডি-টি'র গুঁড়া ছড়াইতেছেন। ইহার জন্য ...রের পর বৎসরে ব্যয় বাড়িয়া যাইতেছে।

...অন্যান্য নিকটবর্ত্তী রাজ্যে জনহিতকর কার্য্যের জন্য এইরূপ ...ক প্রচেষ্টা দেখা যায় না। পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্থানের ... সুদীর্ঘ সীমা রক্ষা করিবার জন্য বহু ব্যয় করিতে হয়। উদ্বাস্তু ... জন্যও বহু শক্তি ও অর্থ ব্যয় হয়। তথাপি পশ্চিমবঙ্গের ...ল্যাণকর কার্য্যের ব্যয়ও বেশী বাড়িয়া চলিতেছে।

...৫২ সনের ফাইনান্স কমিশনের মতে বিভিন্ন রাজ্যের স্থানীয় ...ষ্ট্রকর (অর্থাৎ সর্ব্বভারতীয় ট্যাক্স বাদে—যেমন আয়কর ...সামুদ্রিক শুল্ক বাদে, ডাকের আয় বাদে) মাথাপিছু এইরূপ :

১৯৫২-৫১

...চমবঙ্গ	৯·৪	টাকা
...র	৩·৬	,,
...িষ্যা	৩·৮	,,
উত্তরপ্রদেশ	৪·৩	টাকা
মধ্যপ্রদেশ	৫·৬	,,
পঞ্জাব	৬·৪	,,
আসাম	৬·৪	,,
মাদ্রাজ	৬·৭	,,
বোম্বাই	৯·৪	,,

বিহারে মাথাপিছু রাষ্ট্রকর সর্ব্বাপেক্ষা কম। পশ্চিমবঙ্গকে কোন রাজ্য ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই। বোম্বাই সমান সমান। এই ৫টি জেলা বিহারভুক্ত হইলে কি বিহার এইখানকার আদায়ী টাকা খাস বিহারে ব্যয় করিবে? না নিজ বিহার হইতে টাকা আমদানী করিয়া এই সব অঞ্চলে ব্যয় করিবে। পশ্চিম বাংলা, বিহার ও আসামের মাথাপিছু করভারের উপর্য্যুপরি ৩ বৎসরের পরিমাণ আমরা নিম্নে দিলাম। যথা :

মাথাপিছু করভার (টাকায়)

	১৯৫০-৫১	১৯৫১-৫২	১৯৫২-৫৩
পশ্চিমবঙ্গ	৮·৭	৯·৪	৯·১
বিহার	৩·৯	৩·৬	৩·৮
আসাম	৫·৬	৬·৪	৫·১

এই বার আমরা এই তিনটি রাজ্যের মাথাপিছু ব্যয়ের হিসাব দিতেছি :

সন	পশ্চিমবঙ্গ	বিহার	আসাম
১৯৫০-৫১	১৫·১	৬·৫	১০·৩
১৯৫১-৫২	১৫·১	৮·১	১২·১
১৯৫২-৫৩	১৫·৭	৭·০	১৪·০
১৯৫৩-৫৪	২০·৪	৮·৮	১৬·৬
১৯৫৪-৫৫	২১·৫	৯·৮	১৮·৫

এই ব্যয় কেবলমাত্র বাৎসরিক রাজস্ব খাতে। যদি আমরা ক্যাপিটাল খাতের ব্যয়সুদ্ধ ধরি তাহা হইলে এই ব্যয় নিম্নলিখিতমত দাঁড়ায় :

মাথাপিছু মোট ব্যয় (টাকায়)

সন	পশ্চিমবঙ্গ	বিহার	আসাম
১৯৫১-৫২	১৯·৬	১১·২	১২·৮
১৯৫২-৫৩	২০·৯	৬·৮	১৬·৮
১৯৫৩-৫৪	২৭·৯	১০·৫	১৭·৩
১৯৫৪-৫৫	২৯·৯	১২·৫	২২·০

পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ এ বাবদ ব্যয় করিয়াছে ৫২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা; বিহার ৪৯ কোটি ২২ লক্ষ টাকা; আর আসাম খরচ করিয়াছে ১২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্টে বিভিন্ন রাজ্যসরকার ১৯৫২-৫৩ সনের খরচের রকমের একটি বিভাগ করা হইয়াছে—সিকিউরিটি সার্ভিসেস বা পুলিসী রাষ্ট্রের ব্যয় আর সোশ্যাল সার্ভিসেস বা জনকল্যাণের জন্য ব্যয়। নিম্নে আমরা বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের জনকল্যাণ খাতের ব্যয় দিলাম :

পশ্চিমবঙ্গ	৪'৯৯ কোটি টাকা
বিহার	২'২০ ,,

মাথাপিছু হিসাবে এই ব্যয় :

পশ্চিমবঙ্গ	২ ৲২ পাই
বিহারে	।৯ পাই

এই ৫টি জেলা বিহারভুক্ত হইলে কি বিহার এতদিনকার আদায়ী টাকা লইয়া গিয়া বিহারে ব্যয় করিবেন? না নিজ বিহার হইতে টাকা আমদানী করিয়া এই সব অঞ্চলে ব্যয় করিবেন? বিহারের এই ব্যয় করিবার সঙ্গতি ও প্রবৃত্তি কোথা হইতে আসিবে? বাংলার মাথাপিছু মোট ব্যয় গত ৪ বৎসরে দ্বিগুণ হইয়াছে; কিন্তু বিহারের ব্যয় সমান সমান আছে।

সেরাইকেলা

শ্রীঅতীশচন্দ্র সিংহ

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি সেরাইকেলা রাজ্যের পূর্ব্বাংশের পশ্চিমবঙ্গ-ভুক্তি দাবি করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ হইতে যে স্মারকলিপি পেশ হইয়াছে তাহাতে তাঁহারা এই রাজ্যের কোনও অংশ দাবি করেন নাই। এজন্য কেহ কেহ বলিতেছেন যে, এই দাবি অযৌক্তিক—খামকা বেশী দাবি করা হইয়াছে। ইহা বিহার হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও নব-উড়িষ্যায় যাওয়া উচিত।

সেরাইকেলা ও খরসওয়ান ইংরেজ আমলে দুইটি ক্ষুদ্র করদ রাজ্য ছিল। রাজারা উড়িয়াভাষী, এজন্য রাজকার্য্যে উড়িয়া ভাষা ব্যবহৃত হইত। ধলভূম পরগণার পশ্চিমে খরকাই নদী, নদীর অপর পার হইতে সেরাইকেলা রাজ্য আরম্ভ। সেরাইকেলা রাজ্যের দুইটি অংশ :—(১) নিজ সেরাইকেলা; আর নিজ সেরাইকেলা হইতে বিচ্ছিন্ন, পার্শ্ববর্ত্তী খরসওয়ান রাজ্য পার হইয়া সিংভূম জেলার কোলহান পরগণার মধ্যে কোরাইকলা। নিজ সেরাইকেলার আয়তন ৩৯৭ বর্গমাইল; আর কোরাইকলার আয়তন ৫২ বর্গ-মাইল। আয়তনে কোরাইকলা সমগ্র রাজ্যের একের নয় ভাগ; লোকসংখ্যায় ১০ ভাগের এক ভাগ।

সেরাইকেলার লোকসংখ্যা কিরূপ বাড়িয়াছে তাহা নিম্নের কোঠা হইতে বুঝা যাইবে। যথা :

লোকসংখ্যা	প্রতি দশকে শতকরা বৃদ্ধি
১৮৭২— ৬৬,৩৪৭	...
১৮৮১— ৭৭,০৬২	+১৬'১
১৮৯১— ৯৩,৮৩৯	+২১'৮
১৯০১—১,০৪,৫৩৯	+১১'৪
১৯১১—১,০৯,৭৯৪	+ ৫'৯
১৯২১—১,১৫,১৯২	+ ৫'০
১৯৩১—১,৪৩,৫২৫	+২৪'৫
১৯৪১—১,৫৪,৮৪৪	+ ৭'৮
১৯৫১—১,৯১,৭০৭	+২৩'৮

সেরাইকেলার লোক-বৃদ্ধির তারতম্য হইতে বুঝা যায়, বাহির হইতে লোক আসিতেছে এবং যাইতেছে তজ্জন্য এইরূপ হইতেছে। সেন্সাস রিপোর্টে ভাষা সম্বন্ধে যেসব তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশ এই দুইটি রাজ্যকে একত্র করিয়া। এই দুইটি রাজ্যের বিভিন্ন ভাষা-ভাষীর অনুপাত সেন্সাস রিপোর্টে এইরূপ দেওয়া আছে। যথা :

বিভিন্ন ভাষা-ভাষীদের শতকরা অনুপাত

	বাংলা	হিন্দী	উড়িয়া	হো
১৯১১	২৭'০	৬'৩	২৮'৮	২৫'০
১৯২১	২৫'৯	৩'৫	২৬'৩	২৪'৬
১৯৩১	২৪'২	৫'৪	[illegible]	১৮'৪

কেবলমাত্র সেরাইকেলায়—

	বাংলা	হিন্দী	উড়িয়া	হো
১৯৫১*	২২'৯	১২'৩	২৫'৭	২২'৮

খরসওয়ান রাজ্যে বা সেরাইকেলা রাজ্যের কোরাইকলা অঞ্চলে বড় একটা বাঙালী নাই—ইহা আমরা ঐ অঞ্চলের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন বহু বাঙালীর মুখে শুনিয়াছি। ১৯২১ সালের বিহার ও উড়িষ্যার সেন্সাস রিপোর্টে সেরাইকেলা ও খরসওয়ান রাজ্যের বাংলাভাষী ও উড়িয়াভাষীর সংখ্যা আলাদা করিয়া দেওয়া আছে। সেরাইকেলায় বাংলাভাষী ও উড়িয়াভাষীর সংখ্যা ১৯২১ সালে যথাক্রমে ৩৯,৩৬৯ ও ৪০,০৭৪ জন করিয়া। কেবলমাত্র সেরাইকেলায় বাঙালীর অনুপাত ঐ সালে শতকরা ৩৪'২ জন। খরসওয়ানে বাংলাভাষীর সংখ্যা মাত্র

* ১৯৫১ সালের তথ্য বিহার গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও কল্যাণী কংগ্রেসের অধিবেশনে বিতরিত "Bihar Facts and Figures" নামক পুস্তিকা হইতে গৃহীত। এই পুস্তিকার তথ্য বা ১৯৫১ সালের বিহার সেন্সাসের তথ্য প্রামাণ্য নহে। বাংলাকে কমানো ও হিন্দীকে বাড়াইবার প্রাণপণ চেষ্টা হইয়াছে ও বহু স্থানে গোঁজামিল দেওয়া হইয়াছে।

ম। আর কোরাইকলার লোকসংখ্যা বাদ দিয়া ধরিলে অনুপাত বাড়িয়া শতকরা ৪০-এ দাঁড়ায় পার্শ্ববর্ত্তী ধলভূম ায় বাংলাভাষীর অনুপাতের সমান। বহু উড়িয়াভাষী াইকলায় আছে। খাস সেরাইকেলায় উড়িয়ার অনুপাত ২৪.৩ বাংলাভাষীদের অপেক্ষা ১০ কম।

আদিবাসীরা বাংলা বলিতে শিখিয়াছে ও শিখিতেছে বহু দিন য়া। তাহারা বাংলা অন্যান্য ভাষা অপেক্ষা অতি সহজেই শিক্ষা । সাঁওতালরা ত করেই; অন্যান্য উপজাতিরাও করে। এ ১৯২১ সালের বিহার ও উড়িষ্যা সেন্সাস রিপোর্টে লিখিত আছে:

"In the Chota Nagpur States it is reported that the Kurmi caste in Seraikala are now using Bengali to a large extent."

অর্থাৎ, কুর্মিরা এক্ষণে অধিক সংখ্যায় বাংলা বলিতে সুরু করিয়াছে সেরাইকেলায়। সেরাইকেলায় কুর্মিরা সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা ১৪ ভাগ।

উড়িয়াভাষীদের সংখ্যা কতকটা স্ফীত হইয়াছে উড়িয়া ও ওরাওঁ ভাষার মধ্যে গোলমালে। ১৯২১ সালের সেন্সাস রিপোর্টের ২০৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে:

"Confusion is again often apt to arise between Oriya and Oraon."

১৯৩১ সনের সেন্সাস রিপোর্টে আছে যে,

"The use of unauthorised adbreviations, such as O, which may frequently stand either for Oriya or Oraon, is another obstacle to correct classification."

সেরাইকেলার দরবারের ভাষা উড়িয়া। রাজা উড়িয়াভাষী। এজন্য রাজসরকারের কাগজপত্র উড়িয়াতে রাখা হয় এবং রাজকর্মচারীরাও উড়িয়াভাষী। দরবারের ভাষা বা আদালতের ভাষার প্রভাব সম্বন্ধে ১৯২১ সনের সেন্সাস রিপোর্টে একটি বেশ উদাহরণ দেওয়া আছে। সম্বলপুর জেলা পূর্ব্বে মধ্যপ্রদেশে ছিল—এজন্য আদালতের ভাষা ছিল হিন্দী। ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গের সময় লর্ড কার্জ্জন সম্বলপুর জেলাটি মধ্যপ্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তৎকালীন বঙ্গভুক্ত করিয়া দেন। আদালতের ভাষা হিন্দীর পরিবর্ত্তে হয় উড়িয়া। পূর্ব্বেই এই জেলায় হিন্দী-ভাষীদের অনুপাত ছিল শতকরা ৯.৫ জন। পরিবর্ত্তনের ফলে তাহাদের অনুপাত কমিয়া ৫.২-এ দাঁড়ায়।

সেরাইকেলা দরবারের ভাষা উড়িয়া থাকায় উড়িয়াভাষীদের সংখ্যা ও অনুপাত বেশ কিছু স্ফীত, বিশেষ করিয়া এই ছোট জায়গায় ও অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে। ১৯৪৯ সনে সেরাইকেলা বিহারভুক্ত হইবার পর সরকারী ভাষা হয় হিন্দী। ১৯৩১ সনের তুলনায় ১৯৫১ সনে যে উড়িয়া-ভাষীদের অনুপাত কমিয়া গিয়াছে—ইহা তাহার অন্যতম কারণ; আর হিন্দীর প্রসারেরও অন্যতম কারণ।

১৯১১ সনে বাংলার অনুপাত দেখানো হইয়াছে ২৭.০। এই বৎসরে কয়েকটি উপভাষা বা dialectকে সেন্সাসে জোর করিয়া হিন্দী বলিয়া দেখানো হইয়াছিল। এইগুলিকে বাংলা বলিয়া ধরিলে—যাহা বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলা বলিয়া ধরা উচিত, বাংলার অনুপাত বাড়িয়া ৩০-এ দাঁড়াইবে। আর কেবলমাত্র খাস সেরাইকেলা ধরিলে এই অনুপাত বাড়িয়া ৪৫-এর কাছাকাছি যাইবে।

১৯৩১ সনে এই দুইটি রাজ্যে বাংলাভাষীদের সংখ্যা ছিল ৪৫,৩৬৪। খাস সেরাইকেলায় ইহাদের সংখ্যা ৪৫,০০০ ধরিলে অন্যায় হয় না। বাংলাভাষীদের অনুপাত হয় শতকরা ৩৫।

ভাষার দিক দিয়া দেখিলে এই রাজ্যটি বিহারভুক্ত হইয়া থাকিতে পারে না। সেরাইকেলা ও খরসওয়ানের রাজারা যখন রাজ্য দুইটিকে ভারতের অঙ্গীভূত করিয়া দেন তখন ইহারা প্রথমে উড়িষ্যাভুক্ত হয়। তখন ময়ূরভঞ্জ রাজ্য উড়িষ্যাভুক্ত হয় নাই—এজন্য উড়িষ্যার সহিত কোনরূপ সংযোগ না থাকায় পরে বিহারের অঙ্গীভূত করিয়া দেওয়া হয়।

শাসনকার্য্যের সুবিধার দিক হইতে দেখিলে সেরাইকেলার পশ্চিমবঙ্গভুক্ত হওয়াই সুবিধাজনক ও বাঞ্ছনীয়।

বর্ত্তমানে ময়ূরভঞ্জ উড়িষ্যাভুক্ত হওয়ায় সেরাইকেলাকে উড়িষ্যার লাগাও করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেও উড়িষ্যাকে সহজ যোগা-যোগ রক্ষা করিতে হইবে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া। রেল লাইন-গুলির পশ্চিমবঙ্গ তথা কলিকাতার সহিত সংযোগ।

এখন ভাষার দিক দিয়া দেখা যাউক সেরাইকেলার পশ্চিমবঙ্গ-ভুক্ত হওয়া উচিত না উড়িষ্যাভুক্ত হওয়া উচিত। ড. স্যর জর্জ্জ গ্রিয়ারসন তাঁহার "Linguistic Survey of India"তে যে ভাষাভিত্তিক ম্যাপ দিয়াছেন তাহাতে সমগ্র সেরাইকেলা রাজ্যটিকে বঙ্গভাষা-ভাষী অঞ্চল বলিয়া দেখাইয়াছেন। আমরা দেখাইয়াছি, নিজ সেরাইকেলায় বঙ্গভাষা-ভাষীর সংখ্যা উড়িয়াদের অপেক্ষা বেশী। সুতরাং এই রাজ্যটির পশ্চিম-বঙ্গভুক্তি সমীচীন।

জামসেদপুর শহর দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। জামসেদপুরের লোকসংখ্যা কিরূপ দ্রুত বাড়িতেছে তাহা নিম্নের অঙ্ক হইতে বুঝা যাইবে। ১৯০১ সালে এই অঞ্চল বন-জঙ্গলপূর্ণ ছিল। যথা:

১৯১১—	৫,৬৭২
১৯২১—	৫৭,৩৬০
১৯৩১—	৮৩,৭৩৮
১৯৪১—	১,৪৮,৭১১
১৯৫১—	২,১৮,১৬২

যাঁহারা জামসেদপুরে কাজ করেন, তাঁহারা টাটা কোম্পানীর জমিতে licensee হিসাবে কোম্পানীর অনুমতি সাপেক্ষে বাস করেন। কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর যাঁহারা তথায় বাস করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা জমি পাইবেন না। কোম্পানী অবশ্য দয়াপরবশ

হইয়া ভদ্র ব্যবহার করেন ও কোম্পানীর জমিতে বাস করিতে দেন। কিন্তু তাঁহারা পরের জমিতে বাস করিতেছেন, নিজের "মাথা গুঁজিবার" স্থান সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, এ কথা ভুলিতে পারেন না। অনেকে এজন্য খরকাই নদী পার হইয়া সেরাইকেলায় জমি সংগ্রহ করিয়া বাস করিতেছেন। সেরাইকেলার অনেক বাঙালী জামসেদপুরে কাজ করে। যেমন ভবানীপুর বাদ দিয়া কলিকাতার কথা ভাবিতে পারা যায় না, তেমনই খরকাইয়ের অপর পার বাদ দিয়া জামসেদপুরের কথা ভাবিতে পারা যায় না। জামসেদপুর বাংলায় আসিলে সেরাইকেলারও আসা চাই। নচেৎ একটি শহরের একাংশ থাকিবে পশ্চিমবঙ্গে, অপর অংশ থাকিবে উড়িষ্যায়। কাজের ও শাসনব্যবস্থার বহু অসুবিধা হইবে। যদি খরকাই নদীতে বাঁধ দিবার প্রয়োজন হয় তবে বাঁধের একটি দিক থাকিবে পশ্চিমবঙ্গে অপর দিক থাকিবে উড়িষ্যায়।

যদি প্রয়োজন হয় বরং সেরাইকেলা রাজ্যটিকে দ্বি-খণ্ডিত করিয়া ইহার উত্তর ও পূর্ব্ব অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া হউক। আপত্তি উঠিতে পারে যে, বহুকাল হইতে সেরাইকেলা একটি স্বতন্ত্র unit রূপে আছে,ইহা unit রূপেই হয় বিহার, না হয় পশ্চিমবঙ্গ, না হয় উড়িষ্যাভুক্ত হইবে। ইহাকে দ্বিখণ্ডিত করা সমীচীন হইবে না। প্রথমেই দেখা যাউক সেরাইকেলার ঐতিহাসিক সত্তা কতদিনের? দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে পোড়াহাটের রাজার ছোট ছেলে বলিয়া বিক্রম সিংহ সেরাইকেলা রাজ্য জায়গীর স্বরূপ পান। বিক্রম সিংহ ১৮২৩ সালে মারা যান। পরে ইংরেজের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া করদ রাজার পদে উন্নীত হন। ইহারা ১৮৫৬ সালে রাজা উপাধি পান; তৎপূর্ব্বে কুঁয়ার বলিয়া পরিচিত হইতেন। রাজার বিচার ক্ষমতা সম্বন্ধে সিংভূম ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে এইরূপ লিখিত আছে:

"The chief gradually gave up exercising his judicial powers, and sent even the most trifling cases to the Assistant at Chaibasa, so that in 1853 there was not a single person in confinement under his orders."

অর্থাৎ, রাজা ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিচারক্ষমতা ত্যাগ করিলেন। চাইবাসার ইংরেজ কর্ম্মচারী সামান্য অপরাধেরও বিচার করিতেন। ১৮৫৩ সালে রাজার হুকুমে কেহই কয়েদ ছিল না।

সেই হইতে রাজার বিচারক্ষমতা লোপ পাইয়াছিল। রাজার দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা। রাজার রায়ের বিরুদ্ধে চাইবাসায় আপীল শুনানি হইত। আপীল শুনিতেন চাইবাসার ডেপুটি কমিশনার সাহেব। রাজার বিচারক্ষমতা ১৮৬২ সালের ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হুকুম অনুযায়ী হয়। রাজ্যের আয় সাড়ে তিন লাখ টাকা। ইংরেজের অনুকরণে সেরাইকেলা শহরে একটি দলিল রেজেষ্ট্রী আপিস হয়। রাজার ছেলে দলিল রেজেষ্টারী করিতেন। বাংলায় দলিল রেজেষ্টারী হইত; রাজার অনুকূলে কবুলতি উড়িয়ায় লিখিত হইত ও উড়িয়ায় রেজেষ্টারী হইত। ৫০ বৎসর আগে শতকরা প্রায় ৮০ খানি দলিল বাংলায় রেজেষ্টারী হইত। এখন নানা কারণে, বিশেষ করিয়া বাংলায় রেজেষ্টারী করাইতে অনেক হাঙ্গামা পোহাইতে হয় বলিয়া সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। ইহার তখন শক্তি ও সীমা অল্প ছিল। সিপাহীবিদ্রোহকালে ইংরেজকে সাহায্য করায় সেরাইকেলা রাজ্য "Sunnud State" রূপে পরিগণিত হয় ও কোরাইকলা পুরস্কার পান।

রাজপুতানার সিরোহী রাজ্য অন্ততঃ পক্ষে হাজার বৎসরের। সিরোহীর মহারাওয়ের সম্মানের জন্য ১৫টি তোপের ব্যবস্থা ছিল। সিরোহীকে ভাষা-ভিত্তিক ভাগ করিয়া কতক বোম্বাইয়ে ও কতক রাজপুতানার রাখা হইয়াছে। সিরোহী আয়তনে ১৯৫৮ বর্গ মাইল—সেরাইকেলার বহুগুণ বড়, ১৯৩১ সালে ইহার লোকসংখ্যা ছিল ২,১৭,০০০। দাতিয়া, ওর্চা, চরখাড়ী প্রভৃতি উত্তর প্রদেশ ও বিন্ধ্যপ্রদেশের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের ইতিহাস ও গুরুত্ব সেরাইকেলার তুলনায় বেশী। ওর্চা ও দাতিয়া ইংরেজ আমলে "Salute State" ছিল; রাজা আসিলে তোপধ্বনি করা হইত।

	বর্গমাইল	লোকসংখ্যা (১৯৩১)	তোপ-সং
ওর্চা	২,০৮৯	৩,১৪,৬৬১	১৭ মহ
দাতিয়া	৯১২	১,৫৮,৮৩৪	১৫ ,,
চরখাড়ী	৮৮০	১,২০,৩৩১	১১

ইহাদের আবার সৈন্য রাখিবার ক্ষমতা ছিল। এই সব পুরানো রাজ্য যদি বিভক্ত হইতে পারে সেরাইকেলা কেন হইবে না।

'গড়বা' পঞ্চায়েতের একটি বৈঠক। মোড়ল মাঝখানে শিলাসনে উপবিষ্ট

আবার অন্ধ্রদেশে

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

[illegible] জানুয়ারী, ১৯৫৫

আবার যাত্রা সুরু হ'ল দক্ষিণ ভারতের পথে। বেলা চারটা দশ মিনিটের সময় হাওড়া ষ্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়লে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি সুনীল আকাশের বহু উর্দ্ধে ডানা মেলে সারি সারি চিল উড়ে বেড়াচ্ছে। আমার মনও যেন মহানগরীর ইট-কাঠের [illegible] থেকে মুক্তি পেয়ে অনন্ত আকাশে পক্ষ বিস্তার করল।

শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার বার্ষিক উৎসবে যোগদান করবার জন্যে [illegible] কভুরে। উৎসব সুরু হয়ে গেছে ১১ই জানুয়ারী থেকে, [illegible] ১৭ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত। শর্ম্মাজীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধসত্ত্বেও [illegible]র্য্য কারণে সুরু থেকে উৎসবে যোগদান করা সম্ভবপর হ'ল না, [illegible]ক্ষিত হতে হ'ল সপ্তাহব্যাপী উৎসবের বহু বিচিত্র অনুষ্ঠানে [illegible]গী হওয়ার সৌভাগ্য থেকে।

[illegible]র্ম্মাজী লিখেছিলেন, তৈরী হয়ে আসবেন, প্রচারকার্য্যের জন্যে [illegible] বেজওয়াদা, হায়দরাবাদ, বোম্বাই ও নাগপুর যাওয়ার [illegible]ন হতে পারে।

[illegible]রী হয়েই চলেছি, আপিস থেকে নিয়েছি লম্বা ছুটি। সেবার [illegible]দে গিয়ে এক সপ্তাহ অবস্থান করা সত্ত্বেও অজন্তা ইলোরা [illegible] নি বলে আপসোসের অন্ত ছিল না। তিনটি বছর ধরে [illegible] অন্তরতম স্থলে এ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে রেখেছি যে, [illegible]দি হায়দরাবাদে যাবার সুযোগ আসে তো ভারতের রূপ-[illegible] এই পাদপীঠদ্বয়ে গিয়ে চোখ দুটিকে সার্থক করতে ভুলব [illegible] সে সুযোগ যে এত শীঘ্র উপস্থিত হবে তা ভাবতে [illegible]।

মাদ্রাজ মেল বিদ্যুদ্‌গতিতে ছুটে চলেছে নব নব বৈচিত্র্যপূর্ণ দৃশ্যপট পেছনে ফেলে। এ পথ দিয়ে এই চতুর্থ বার যাওয়া। কিন্তু প্রতি বারেই দেখি প্রকৃতির অভিনব মনোহারিণী রূপসজ্জা— তৃণাস্তীর্ণ প্রান্তরের ঈষৎ উপর দিয়ে পাখা মেলে উড়ে চলেছে সাদা বলাকাপংক্তি—দেখে মনে হয়, সবুজের উপর দিয়ে যেন রূপালি স্রোত বয়ে চলেছে। এই অনুপম রূপচ্ছবিটি চিরতরে আঁকা হয়ে যায় মানসপটে। ক্রমে দূর বনশ্রেণীর ওপারে সূর্য্য অস্ত যায়—কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রির অভ্যাগমে গাছপালা মাঠ বন সব হয়ে যায় একাকার। মাঘের প্রচণ্ড শীত হাড়ের ভেতরে পর্য্যন্ত যেন কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়—জানালা বন্ধ করে বিছানা পেতে শুয়ে পড়ি।

সারা রাত কাটল আধ ঘুমে আধ জাগরণে। শেষ রাত্রে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। ঘুম যখন ভাঙল তখন বেশ খানিকটা বেলা হয়ে গেছে—সূর্য্য পূর্ব্বদিকচক্রবাল ছাড়িয়ে আকাশের অনেকখানি উপরে উঠে এসেছে। নূতন দিনের আলোয় ভূ-প্রকৃতির অভিনব রূপবৈচিত্র্য দেখে বুঝতে পারলাম—বাংলার সমতলভূমি পার হয়ে এসে পৌঁছেছি সবুজ পাহাড় লাল মাটি আর তালবনের দেশ দক্ষিণ ভারতে—দূরে দিগন্তলীন পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালার নীল কলেবর দৃশ্যমান।

দক্ষিণ ভারতের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য আমার চোখে মায়া-অঞ্জন বুলিয়ে দিয়েছে, বার বার দেখেও আশ মেটে না। ছোটবেলায় যখন ভূগোলে পড়েছিলাম—দাক্ষিণাত্যের নর্ম্মদা গোদাবরী কৃষ্ণা কাবেরী তাপ্তী প্রভৃতি নদী আর পূর্ব্বঘাট পশ্চিমঘাট বিন্ধ্য

সাতপুরা মহাদেব মহাকাল প্রভৃতি পর্ব্বতের কথা তখন থেকেই এই নামগুলির ধ্বনিমাধুর্য্য আমার মনে কেমন যেন একটা মোহজাল বিস্তার করেছিল। কল্পনায় এ সকলের একটা ছবিও এঁকে রেখেছিলাম মনের পটে। কিন্তু এদেশের সঙ্গে যে এমন ঘনিষ্ঠ মানসিক ও আত্মিক যোগ স্থাপিত হবে, ধন্য হব দাক্ষিণাত্যের দাক্ষিণ্যলাভে, সে যে ছিল কল্পনারও অতীত।

মণ্ডেশ্বর শর্ম্মার ভবনে মাড়ুগোলার কতিপয় আদিবাসী। উপবিষ্ট (ডান দিকে প্রথম) কে. মংস্থালু

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে মাঝে মাঝে এক একটি ষ্টেশনে থেমে ট্রেন ছুটে চলেছে প্রচণ্ড বেগে. তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে আমার মুক্তগতি মন। আনকাপল্লী, শ্যামলকোট, ইয়াল্লামঞ্চিলি, গোদাবরী প্রভৃতি অনেকগুলি ষ্টেশন ছাড়িয়ে বেলা চারটা নাগাদ ট্রেন এসে থামল কববুর ষ্টেশনে, নেমেই অনেকগুলি পরিচিত মুখ দেখে মনটা খুশী হয়ে উঠল।

শর্ম্মাজীর বাড়ীতে পৌঁছে দেখি সে এক এলাহি কাণ্ড। উৎসব উপলক্ষে নানা জায়গা থেকে আগত লোকজনের সমাবেশে প্রকাণ্ড ভবনে ন স্থানং তিলধারণং। বৈঠকখানার যে ঘরটিতে আমি একেবারে কায়েমি ব্যবস্থা করে নিয়াছিলাম সেখানেও দেখি চার-পাঁচখানা খাট পাতা। বারান্দায় আস্তানা গেড়েছেন মাড়ুগোলা এবং অনন্তগিরির এজেন্সী অঞ্চল থেকে আগত আদিবাসী ভায়েরা।

আদিবাসী-উন্নয়ন-শাখার সভাপতি, বিশাখাপত্তন জেলার বেল্লীপুরের বাসিন্দা শ্রী এ. কে. পাত্রকে দেখে খুশী হলাম। গেল বছর বিশাখা-পত্তনে শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত সাংস্কৃতিক সম্মেলনে—যার উদ্বোধনকার্য্য সম্পন্ন করেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণন—পাত্রের সঙ্গে আমার পরিচয়। আদিবাসীদের তরফ থেকে ইনিই ড. রাধাকৃষ্ণনকে হাতে-কাটা সুতায় তৈরী একটি চাদর উপহার দেন। পাত্র মহাশয় ভালো লেখাপড়া জানেন, উত্তমরূপে ইংরেজীও বলতে পারেন। শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার আদিবাসী-উন্নয়ন-কার্য্যের সাফল্যের মূলে রয়েছে এঁর সংগঠনশক্তি এবং অক্লান্ত পরিশ্রম।

আমার পূর্ব্বপরিচিত আর একটি উৎসাহী আদিবাসী যুবকও এসেছে উৎসবে যোগ দিতে—সে মাড়ুগোলা এজেন্সী অঞ্চলের আদিবাসী-উন্নয়ন-কেন্দ্রের সম্পাদক। নাম কাস্তা মংস্থালু। বয়সে তরুণ হলেও কাস্তা মংস্থালু আদিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চলে শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার আদর্শ প্রচারে যে কর্ম্মক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে তা বিস্ময়কর। অন্ধ্র ও উড়িষ্যার সীমানায় অবস্থিত ভানাভু[illegible] পল্লীর বাসিন্দা সে—নিজের জন্মপল্লীতে ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলসমূহে ঘরে ঘরে সুতাকাটা ও তাঁতবোনা প্রবর্ত্তন, স্বজাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, মদ্যপান নিবারণ ও মুট্টাদারী প্রথার উচ্ছেদসাধন এই সমস্ত কল্যাণকর্ম্মকে সে অবিচলিত নিষ্ঠায় জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করে নিয়েছে। এখানকার উৎসব শেষ হলে পর আদিবাসীদের তরফ থেকে একটি স্মারকপত্র নিয়ে মংস্থালু যাবে অন্ধ্র প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রী বি. গোপাল রেড্ডির কাছে। যোগ্য ব্যক্তিকেই যে আদিবাসীরা তাদের মুখপাত্র হিসাবে নির্বাচিত করেছে তাতে সন্দেহ নেই। অর্দ্ধ শতাব্দীরও ঊর্দ্ধকাল পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দ 'পাহাড়-জঙ্গল ভেদ করে' যে নূতন ভারতের আবির্ভাব মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন কাস্তা মংস্থালু যেন তার প্রতীক।

শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার দু'জন নূতন সদস্যের সঙ্গে শর্ম্মাজী পরিচয় করিয়ে দিলেন—একজন বেজওয়াদার এস-আর-আর এণ্ড সি[illegible] আর কলেজের উপাধ্যক্ষ শ্রীএম. রাঘবাচারিয়ুলু এবং অপর গুণ্টুরের এডভোকেট শ্রী ভি. ভি. রমন। শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য[illegible] কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাদি পাঠ করে এঁরা এর আদর্শের [illegible] আকৃষ্ট এবং সভ্যশ্রেণীভুক্ত হয়েছেন। শ্রমিকধর্ম্মে নূতন দী[illegible] গ্রহণকারী আর একজন হলেন—উত্তরপ্রদেশের শ্রীনিরঙ্কর দেব সাহিত্যরত্ন। উৎসবের প্রারম্ভেই তিনি কববুরে এসেছিলেন, [illegible] এখানে থেকে তাঁর কর্ম্মস্থলে ফিরে গেছেন।

আদর-আপ্যায়ন আলাপ-পরিচয় জলযোগ ইত্যাদির পালা হলে আমি স্নান করবার জন্যে রওনা হলাম গোদাবরীর উদ্দেশে[illegible] শর্ম্মাজী গোদাবরীর উপর আমার টানের কথা জানেন, হেসে একটি আদিবাসী ছোকরাকে আমার সঙ্গে যেতে বল[illegible] নদীর ঘাটে পৌঁছে সোপানাবলী অতিক্রম করে ঝাঁপিয়ে

গোদাবরীর নীল জলে। চিরকল্যাণময়ী জননী গঙ্গা গৌতমী যেন শত উর্ম্মি-বাহু বিস্তার করে আমাকে নিবিড়ভাবে আপন স্নেহশীতল বক্ষে জড়িয়ে ধরলেন। শরীর জুড়িয়ে গেল—সকল ক্লান্তি, দেহের সকল গ্লানি যেন এক নিমিষে দূর হয়ে গেল।

স্নানান্তে নদীর ঘাটে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে যখন আস্তানায় ফিরে এলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি রাত্রি-কার ভোজনপর্ব্ব শেষ করে শুয়ে পড়লাম।

নেল্লোরের তিন জন এনাদি পুরুষ

পরদিন স্থির হ'ল বেলা আটটার সময় সংস্কৃত কলেজে সুরু হবে আদিবাসীদের সূত্রযজ্ঞ বা সুতাকাটার প্রতিযোগিতা। শর্ম্মাজী, শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার ওয়ার্কিং সেক্রেটারী পি. সর্ব্বেশ্বর শর্ম্মা, শ্রীরাঘবাচারিয়ুলু, শ্রীভি. ভি. রমন এবং আমি পৌনে আটটার সময় গিয়ে উপস্থিত হলাম সংস্কৃত কলেজে।

পশ্চিম গোদাবরী জেলার একটি বিখ্যাত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এই গীর্ব্বাণ বিদ্যাপীঠ বা সংস্কৃত কলেজ। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত। যৌবনে শ্রীমণ্ডেশ্বর শর্ম্মা ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর মন্ত্রশিষ্য এবং স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক। তাঁর আমন্ত্রণে আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে মহাত্মাজী এসেছিলেন কববুরে। তখন এই সংস্কৃত কলেজের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণেই আয়োজন হয়েছিল বিরাট জনসভার।

সেদিন সংস্কৃত কলেজের সভায় কববুরের যে কয়জন দেশকর্ম্মী মহাত্মা গান্ধীর উদ্দীপনাময়ী বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশাত্মবোধের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করেন তাঁরাই শেষে তাঁর গঠনমূলক কর্ম্মের আদর্শ প্রচারের জন্যে প্রচারক সমিতির প্রতিষ্ঠা করলেন। ব্যাপক-ভাবে চরকায় সুতাকাটা প্রবর্তন হ'ল এই সমিতির অন্যতম লক্ষ্য। এই প্রচারক সমিতির মধ্যেই লুকিয়ে ছিল বীরমন্দিরের ভাবী সম্ভাবনা। প্রচারক সমিতির সহকর্ম্মীদের সহযোগিতায় ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীমণ্ডেশ্বর শর্ম্মা বীরমন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন। এই বীরমন্দির আজ শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র।

শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভা মহাত্মা গান্ধীর কোন কোন গঠনমূলক কার্য্যকে তার কর্ম্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে—চরকায় সুতা-কাটা এর যাবতীয় অনুষ্ঠানের অপরিহার্য্য প্রারম্ভিক অঙ্গ। সভার কর্ম্মীদের চেষ্টায় অন্ধ্রদেশের পূর্ব্ব ও পশ্চিম গোদাবরী, বিশাখা-

শিশু সন্তানসহ কুর্নুলের একটি চেঞ্চু জাতীয়া স্ত্রীলোক

পত্তন, শ্রীকাকুলাম প্রভৃতি জেলার আদিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চলে ব্যাপকভাবে সুতাকাটার প্রচলন হয়েছে। এই বার্ষিক অনুষ্ঠানেও দূরদূরান্ত থেকে কড়ু, বাল্মীকি, ভক্তার, জটাপু, শবর, এনাদি

প্রভৃতি কত বিভিন্ন শ্রেণীর আদিবাসী স্ত্রী-পুরুষ এসে যে সমবেত হয়েছে তার আর অন্ত নেই।

যথাসময়ে সুরু হ'ল সুতাকাটার প্রতিযোগিতা। প্রশংসনীয় ক্ষিপ্রকারিতার সঙ্গে শত শত আদিবাসী স্ত্রী-পুরুষকর্ত্তৃক তকলীতে একসঙ্গে সুতাকাটার দৃশ্যটি হ'ল পরম উপভোগ্য। একটি আদিবাসী যুবক নিজের হাতে তৈরী চরকায় অত্যন্ত মিহি সুতা কেটে সকলের বিস্ময় উৎপাদন করতে সক্ষম হ'ল।

শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীআর. মণ্ডেশ্বর শর্ম্মা

বক্তৃতাদি এবং পুরস্কার-বিতরণের পর বেলা দশটার সময় এই অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হ'ল।

বিকেলবেলা বীরমন্দিরে জনসভায় হ'ল বিপুল ভিড়। আজকের সভা-ই এবারকার শেষ অনুষ্ঠান। সভাপতির আসনে বৃত হলেন শ্রী ভি. ভি. রমন।

প্রথমেই বক্তৃতা দিতে উঠলেন বীরমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীআর. মণ্ডেশ্বর শর্ম্মা। আবেগকম্পিত কণ্ঠে তিনি বললেন—"আজ মনে পড়ে তের বৎসর আগেকার সেই স্মরণীয় দিনটির কথা যখন মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁর মন্ত্রশিষ্য রাজেন্দ্রপ্রসাদের আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে অন্ধ্রের দেশহিতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ শহীদদের স্মৃতিরক্ষাকল্পে আমরা গোদাবরীতীরস্থ শান্ত নির্জ্জন পরিবেশে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করি। সেদিন এর উদ্বোধন-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছিলেন দেশভক্ত কোণ্ডা ভেঙ্কটাপ্পাইয়া পান্তলু—আদিবাসীদের শ্রেষ্ঠ সেবক কর্ম্মযোগী ঠক্কর বাপা সেদিনকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আমাদের দিয়েছিলেন গঠনমূলক কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশ। ভূদান যজ্ঞের প্রবর্ত্তন করে আজকের দিনে মানুষের মনোজগতে বিপ্লব আনয়ন করেছেন যিনি সেই মহাত্যাগী কর্ম্মীশ্রেষ্ঠ আচার্য্য বিনোবা ভাবে যখন মহাত্মা গান্ধী এবং অন্ধ্ররত্ন গোপালকৃষ্ণাইয়ার প্রতিকৃতি-উন্মোচনের জন্যে অনুরুদ্ধ হয়ে বীরমন্দিরে আসেন তখন এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মী তাঁর ভাষণ শুনে নূতন আলোকের সন্ধান পান। এই সন্ত মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদে বলীয়ান্ হয়ে বীরমন্দির অবিচলিত নিষ্ঠা এগিয়ে চলেছে আপন লক্ষ্যপথে।"

শর্ম্মাজীর বক্তৃতার পর সভাপতি মহাশয় আমাকে ভাষণ দিতে অনুরোধ করলেন। আমি বিশদভাবে আলোচনা করলাম শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার আদিবাসী-উন্নয়ন-প্রচেষ্টা সম্পর্কে। পূর্ব্বগোদাবরী পশ্চিম গোদাবরী, বিশাখাপত্তন এবং শ্রীকাকুলাম এই চারি জেলায় আদিবাসীদের মধ্যে সংগঠন-প্রচেষ্টা, ভারতীয় আদিম জাতি সেবক সঙ্ঘের সঙ্গে শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয় ছিল আমার বক্তব্যের প্রধান অঙ্গ। শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভা সাংস্কৃতিক মিশনের কথা উল্লেখ করে আমি বললাম যে, সমগ্র ভারতবর্ষকে আধ্যাত্মিকতা ও সেবামূলক কর্ম্মের ভিত্তিতে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করা এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য—গত বৎসর উক্ত রাধা... কর্ত্তৃক উদ্বোধিত, শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার সাংস্কৃতিক সম্মেলনের অধিবেশনে সেই মহামিলনের পাদপীঠ রচিত হয়েছে।

সভা ভঙ্গ হলে পর বীরমন্দিরের প্রাঙ্গণে আমাদের পরামর্শ বৈঠক বসল এবং আলাপ-আলোচনাক্রমে ভাবী কর্ম্মপন্থা স্থিরীকৃত হ'ল।

পরদিন সকালে রাঘবাচারিয়ুলু এবং ওয়াকিং সেক্রেটারী সর্ব্বেশ্বর শর্ম্মা—ইনি কিছুকাল হ'ল বেজওয়াদায় ওরিয়েণ্টাল কলেজে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছেন, বিদায় নিয়ে নিজেদের কর্ম্মস্থলে চলে গেলেন। কথা রইল, আমি ১৯শে তারিখ বেজওয়াদায় গিয়ে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হব এবং ওখানকার কাজ সেরে যাব বোম্বাই। সেখানে শ্রী কে. এম. মুন্সী প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বিদ্যাভবন এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করাই হবে আমার মুখ্য কর্ত্তব্য।

সর্ব্বেশ্বর শর্ম্মা এবং রাঘবাচারিয়ুলু চলে যাওয়ার পর আমি একা পড়ে গেলাম। কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকতে লাগল। সারাটা দিন বীরমন্দিরের গ্রন্থাগারের পুঁথিপত্র নাড়াচাড়া ক'রে কুঁড়েমি করে কাটিয়ে দিলাম। সূর্য্যাস্তের প্রাক্কালে পড়ন্ত বেলার আভায় মায়াময় গোদাবরীর তটভূমি আমাকে নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করল। একাই পথে বেরিয়ে পড়ে নদীর ঘাটের এক পাশে গিয়ে বসলাম। কত কালের পুরনো, ঋষি গৌতমের তপস্যার কবরুরের পূর্ব্বপ্রান্তবাহিনী গঙ্গা গৌতমীর এই বাঁধানো ঘাটের সঙ্গে বিজড়িত রয়েছে চৈতন্যের পুণ্য স্মৃতি। এই ঘাট এক ধন্য হয়েছিল মহাপ্রভুর পাদস্পর্শে।

প্রায় সার্দ্ধ চারি শতাব্দী আগেকার কথা। জগন্নাথক্ষেত্র সমুদ্রতীরবর্ত্তী আলালনাথের পথ ধরে তীর্থপর্য্যটন আর নাম প্রচার-মানসে সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যদেব যাত্রা করলেন দক্ষিণ উদ্দেশ্যে। কৃষ্ণপ্রেমামৃত বন্যায় বিভিন্ন জনপদ প্লাবিত ক'রে তীর্থ দর্শনান্তে তিনি এসে উপনীত হলেন গোদাবরীর পশ্চিম

বিত্তানগর বা বর্তমান রাজমহেন্দ্রীতে। এই বিত্তানগরেরই শাসনকর্তা ছিলেন রায় রামানন্দ।

বিত্তানগরে এসে সেদিন গদ্‌গদনাদিনী গোদাবরীর নীল বারিরাশি দেখে মহাপ্রভুর মনে পড়েছিল নীলসলিলা যমুনার কথা। নদীতীরবর্তী বন তাঁর মনে জাগিয়ে তুলেছিল বৃন্দাবনের উপবনের অপূর্ব্ব শোভার স্মৃতি:

> "পূর্ব্ববং বৈষ্ণব করি সর্ব্বলোকগণে
> গোদাবরী তীরে প্রভু আইলা কথোদিনে ॥
> গোদাবরী দেখি হৈল যমুনা স্মরণ।
> তীরে বন দেখি স্মৃতি হৈল বৃন্দাবন।"

কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে মহাপ্রভু বনমধ্যে কিছুক্ষণ নৃত্য করলেন, তার পর নদী পার হয়ে নির্মল সলিলে অবগাহন করে হলেন পরিতৃপ্ত। স্নানান্তে ঘাট ছেড়ে কিছু দূরে জল-সন্নিধানে তটভূমিতে বসে কৃষ্ণনাম-সংকীর্তনে একেবারে তন্ময় হয়ে গেছেন মহাপ্রভু, এমন সময় নদীতে স্নানতর্পণ করবার উদ্দেশ্যে দোলায় চড়ে গায়ক বাদক ও বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ পরিবৃত হয়ে নদীতীরে এসে উপনীত হলেন ভক্তশ্রেষ্ঠ, শূদ্র রামানন্দ রায়। বিস্মিত হয়ে ভাবতে থাকেন রায় রামানন্দ—কে এই নবীন সন্ন্যাসী, গাত্রবাসে যাঁর প্রাতঃসূর্যের অরুণিমা, শত সূর্য্যের দীপ্তি হার মেনে যায় যাঁর অঙ্গের আভার নিকট, বিশালদেহ, কমলাক্ষ কে ইনি? দেখতে দেখতে বিপুল ভাববন্যায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে রায় রামানন্দের অন্তর। দণ্ডবং নমস্কার করে নিজেকে তিনি নিঃশেষে সঁপে দিলেন মহাপ্রভুর চরণতলে—মহাপ্রভু তাঁকে কৃতার্থ করলেন নিবিড় প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করে। দুই মহাপুরুষের প্রেমাশ্রুধারায় সেদিন অভিসিঞ্চিত হ'ল তালীবনশোভিত গোদাবরীর তীরভূমি।

এই ঘটনার স্মারক হিসাবে বাঙালী বৈষ্ণব সূর্য্যসিদ্ধান্ত সরস্বতী কিছু বংসর পূর্ব্বে কববুরের উপকণ্ঠে গোদবরী-তটে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব মঠ—সম্প্রতি ওখানকার মঠাধীশ হচ্ছেন উড়িষ্যাদেশীয় একজন বৈষ্ণব। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে একদা যে কববুরে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের অপরূপ লীলামাধুরী প্রকটিত হয়েছিল, আত্মবিস্মৃত বাঙালী আজ তা ভুলে গেছে।

নদীতীরে বনচ্ছায়াতলে বসে বসে ভাবছিলাম মহাপ্রভুর সেই লোকোত্তরী প্রেমধর্মের অতুলনীয় মাহাত্ম্যের কথা যার বিপুল বন্যায় একদা সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ ভারত প্লাবিত হয়েছিল—বৈষ্ণবধর্মের সেই অমৃতধারা সমগ্র দেশের চিত্তভূমিকে প্লাবিত করে আজও প্রবহমাণ। শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত এই বৈষ্ণবধর্মের মাধ্যমেই ঋষি গৌতমের তপস্যাপূত, গোপাদক্ষেত্র কববুর পরিণত হয়েছে বাংলা উড়িষ্যা ও অন্ধ্রের আধ্যাত্মিক মিলনের মহাতীর্থে—সেই মহামিলনের উদাত্ত সুরই যেন উদ্গীত হচ্ছে প্রবহমানা গোদাবরীর তটপ্রতিহত জলতরঙ্গে।

ঘাট থেকে নজরে পড়ে, গোদাবরীর তটভূমির সঙ্গে সমান্তরাল একটা উঁচু রাস্তা উত্তরপশ্চিম দিকে বহুদূর অবধি চলে গিয়ে অবশেষে বাঁকের মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। দিগন্তের কাছে হারিয়ে-যাওয়া ঐ দূরবিসর্পিত পথরেখা আমার কল্পনাকে গভীর ভাবে নাড়া দেয়—ঘাট ছেড়ে রাস্তায় উঠে লক্ষ্যহীনভাবে সুমুখের পানে চলতে থাকি।

জনৈকা তেলুগু মহিলা

খানিকদূর এগিয়ে দেখি, বাঁদিকে রাস্তার অনতিদূরে এক পত্রনিবিড় আম্রবনে আসন্ন বসন্তের বিপুল সমারোহ—অজস্র চূত-মুকুলের সৌগন্ধ্যে বাতাস হয়ে উঠেছে ভারাক্রান্ত। মাঝে মাঝে তাল ও খেজুর গাছের শীর্ষদেশ যেন আমবনের মাথার উপরে মরকতের স্তম্ভের মত শোভা পাচ্ছে। রাস্তার এপারে বনের সবুজ, ওপারে নদীর নীলিমা। উত্তর দিকে দিগন্তলীন নীল পাহাড়ের পানে তাকিয়ে মনে হয় যেন আকাশ ও পাহাড়ের ঐ নীলাবগুণ্ঠের পেছনে লুকানো রয়েছে আর এক নিরুপম রহস্যলোক।

বনচ্ছায়াতলে কিছুক্ষণ বসে থেকে আবার এগোতে থাকি। মাথার উপর নিঃসীম নীলাকাশ আর নীচে উন্মুক্ত প্রান্তরের অনন্ত প্রসার। আগুনের ভাঁটার মত প্রকাণ্ড সূর্য্য ধীরে ধীরে মাটির পৃথিবীর একেবারে কাছে নেমে এসে তালীবনশোভিত সবুজ প্রান্তরের বুকে মুঠি মুঠি সোনা ছড়িয়ে দিয়ে অস্ত গেল। মনে যেন সৌন্দর্য্যের নেশা ধরে যায়—ইচ্ছা হয় এমনি ভাবে অচেনা দেশে এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্ত পার হয়ে লক্ষ্যহীনভাবে অবিশ্রান্ত চলতে থাকি নব নব সৌন্দর্য্যলোক আবিষ্কারের আশায়।

ক্রমে জনহীন নদীতীরে সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে আসে—কেমন একটা সকরুণ বিষণ্ণতা যেন চরাচর আচ্ছন্ন করে ফেলে। পাখীরা ধীরে ধীরে নিজ নিজ কুলায়ে প্রত্যাবর্তন করতে থাকে—বনের ভিতর সুরু হয় বিহগকণ্ঠের বিচিত্র কাকলি। দূরের থেকে কানে আসে বৈষ্ণবমঠের সন্ধ্যারতির ঘণ্টাধ্বনি। খেয়াল হয় যে, এবার ঘরে ফিরতে হবে।

ফেরবার পথে দেখি অন্ধকার আকাশে সন্ধ্যাতারাটি স্নিগ্ধ আলো বিকিরণ করছে। নির্জন নদীতীরে নিঃসঙ্গ পথচারী আমি। অনন্ত আকাশের ঐ একক তারাটির সঙ্গে আমার অন্তরের

যেন একটা নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হয়ে যায়—ঐ নীলাভ নক্ষত্রটি যেন অন্ধকারের পারে কোন্ জ্যোতির্লোকের অভিমুখে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। নীরবে পথ চলতে থাকি।

শর্ম্মাজীর আস্তানায় যখন পৌঁছলাম তখন রাত আন্দাজ নয়টা। আমার অদর্শনে সবাই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন এবং আমি কোথায় ডুব মেরেছি তাই নিয়ে সবাই নানা জল্পনা-কল্পনা করছিলেন।

পরদিন ১৯শে জানুয়ারী সাড়ে বারোটার ট্রেনে শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার কয়েকজন কর্ম্মীসহ আমি বেজওয়াদা রওনা হলাম—আদিবাসী-উন্নয়ন-শাখার সভাপতি এ. কে. পাত্রও আমাদের সহযাত্রী হলেন। ট্রেন বেজওয়াদা পৌঁছল সন্ধ্যার প্রাক্কালে। ষ্টেশন থেকে সরাসরি চলে এলাম শ্রীরাঘবাচারিয়ুলুর আস্তানায়। সেখানেই থাকবার ব্যবস্থা হ'ল।

বিশাখাপত্তনে সাংস্কৃতিক সম্মেলন : (ডান দিক হইতে) প্রথম—ডক্টর রাধাকৃষ্ণন, তৃতীয়—শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র, ষষ্ঠ—শ্রীএ. কে. পাত্র

রাত্রিকার ভোজনপর্ব্ব সম্পন্ন হ'ল অন্ধ্রদেশীয় রসম সম্বরম্ চুটনী (চাটনী) ইত্যাদির সঙ্গে প্রচুর পাঁপড় আর ঘি সংযোগে। আহারের পর কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালবেলা সর্ব্বেশ্বর শর্ম্মা যথাসময়ে এসে হাজির হলেন, আর এলেন স্থানীয় প্রবাসী বাঙালী ইন্দুকুমার রায়—আই. কে. রায় নামেই বেজওয়াদায় সর্ব্বত্র তিনি পরিচিত। এঁরা তিন জনে পরামর্শক্রমে স্থির করলেন যে, বিকেলে স্থানীয় মেডিক্যাল এসোসিয়েশন হলে সভা হবে এবং তাতে আমাকে অন্ধ্র ও বঙ্গের সাংস্কৃতিক মিলন সম্বন্ধে ভাষণ দিতে হবে।

ইন্দুবাবু পরদিন দুপুরবেলা তাঁর ওখানে আমাকে আহারের আমন্ত্রণ জানিয়ে চলে গেলে পর আমরা তিন জনে গেলাম স্থানীয় শিল্পপতি শ্রী সি. ভি রেড্ডির মর্ম্মর-প্রাসাদ দেখতে। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সৌম্যমূর্ত্তি রেড্ডি মহাশয় প্রসন্ন হাস্যে স্বাগত করে আমাদের দোতলায় নিয়ে গেলেন। ভবনটির কক্ষ, প্রাচীর, অলিন্দ, ব্যালকনি সবকিছুই মর্ম্মর-প্রস্তরে নির্ম্মিত। শুভ্র মর্ম্মরের অংশ খুব কম, বেশীর ভাগই সবুজ গোলাপী, বেগনী ইত্যাদি হরেক রঙের এবং সেগুলোতে প্রকৃতির নিপুণ তুলিকায় আঁকা চমৎকার সব ডিজাইন। এই সকল মর্ম্মর-প্রস্তরে বর্ণসমাবেশের বিচিত্র মাধুরী দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। এই প্রাসাদের পরিকল্পনা রেড্ডি মহাশয়ের। বিভিন্ন কক্ষে কাচের আধারে গজদন্তশিল্প ও দারুশিল্পের যে সকল নিদর্শন সযত্নে রক্ষিত সেগুলোরও রূপভাবনা রেড্ডি মহাশয়ের—শিল্পী রূপায়িত করেছেন তাঁরই কল্পনাকে।

রেড্ডি মহাশয় একদা ছিলেন বেজওয়াদা থেকে ষাট মাইল দূরবর্ত্তী বেন্টাচিন্টালা নামক স্থানের এক মর্ম্মর-প্রস্তরের খনির মালিক। মর্ম্মর প্রস্তরের কারবার করে লক্ষ লক্ষ টাকা তিনি রোজগার করেছেন। কিন্তু অর্থের মোহ তাঁর ভেতরকার রূপরসিক মানুষটিকে স্বধর্ম্মচ্যুত করতে পারে নি। বেন্টাচিন্টালার মর্ম্মরপ্রস্তরের রূপ এবং রং এই বিত্তশালী ব্যক্তিটির শিল্পী-সত্তাকে মুগ্ধ করে এবং বিচিত্র ডিজাইন সমন্বিত মর্ম্মর প্রস্তর সংগ্রহ করা তাঁর বাতিক হয়ে দাঁড়ায়। রেড্ডি মহাশয়ের মর্ম্মর-স্বপ্ন রূপায়িত হয়েছে বেজওয়াদাস্থিত তাঁর এই সুরম্য ভবনে—এর প্রতিটি মর্ম্মর-পট্ট তাঁর নিজস্ব খনি থেকে সংগৃহীত।

প্রাণ ভরে সব দেখে শুনে রেড্ডি মহাশয়ের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে আমরা পথে বেরিয়ে পড়লাম। ফেরবার পথে কেবলি মনে হতে লাগল বেজওয়াদায় এই রূপলোকে এসে যা দেখলাম বাস্তবিকই তার তুলনা নেই।

বিকেল পাঁচটার কিছু আগে ট্যাক্সিতে করে রাঘবাচারিয়ুলু মহাশয়ের সঙ্গে মেডিক্যাল এসোসিয়েশন হলে গিয়ে পৌঁছনো গেল। সভায় শহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগম হয়েছিল, স্থানীয় বিখ্যাত আইনজীবী শ্রী কে. নাগভূষণ রাও সভাপতির আসনে বৃত হলেন। শ্রীরাঘবাচারিয়ুলুর প্রাথমিক বক্তৃতার পর আমি "বাংলা ও অন্ধ্রের সাংস্কৃতিক" মিলন সম্পর্কে ইংরেজী ভাষায় লিখিত আমার ভাষণ পাঠ সুরু করলাম। গোদাবরীতীরস্থ কববুরে শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার উদ্যোগে বাংলা ও অন্ধ্রের সাংস্কৃতিক মিলনের পাদপীঠ রচনার যে প্রচেষ্টা চলছে, প্রথমে তারই কথা উল্লেখ করে আমি যা বললাম তার সারাংশ হচ্ছে এই :

অনেকেরই হয় তো জানা নেই যে, ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে (১৫১০ সনের এপ্রিল থেকে ১৫১২ সনের জানুয়ারী মাসের মধ্যে) দাক্ষিণাত্যে শ্রীচৈতন্যদেবের তীর্থপরিক্রমা

কালে এই কববুরেই প্রথম রচিত হয়েছিল বাংলা এবং অনধ্রের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক মিলনের পাদপীঠ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অষ্টম পরিচ্ছেদে গোদাবরী-তীর্থে শ্রীচৈতন্যদেব এবং রায় রামানন্দের মিলনের কথা বলা হয়েছে, সেটি যে উক্ত নদীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী কববুর তা প্রমাণ করা যেতে পারে। চৈতন্যদেব প্রথমে গোদাবরীর পূর্ব্বতীরস্থ বিদ্যানগর নামক যে স্থানে আসেন তা যে রাজমহেন্দ্রীরই নামান্তর, তার প্রমাণ বিদ্যমান।১ চৈতন্যচরিতামৃতের অষ্টম অধ্যায়ের গোড়ায় আছে—(বিদ্যানগর থেকে নদী পার হয়ে) মহাপ্রভু গঙ্গাগোতমীতে অবগাহন করেন। গোদাবরীর এপারে রাজমহেন্দ্রী, ওপারে কববুর। গঙ্গাগোতমী নামেই কববুরের পূর্ব্বপ্রান্তবাহিনী গোদাবরীর পরিচিতি।২

রায় রামানন্দ ও শ্রীচৈতন্যদেবের মিলনক্ষেত্র কববুর যে বাঙালী ও তেলুগু উভয় জাতির নিকটই এক মহাতীর্থ সেকথা উল্লেখ করে আমি ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনধ্রের নবজাগরণের (Renaissance) এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ঐ দেশের রাষ্ট্রচেতনার উদ্বোধনের মূলে বাংলার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব কতখানি এ সকল বিষয়ে আমার বক্তব্য বলে ভাষণ শেষ করলাম।

সভা শেষ হলে পর আমরা আস্তানায় ফিরে এলাম। রাত্রে এক ঘরোয়া বৈঠকে শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র কববুর থেকে বেজওয়াদায় স্থানান্তরিত করা সম্পর্কে আলোচনা হ'ল।

অনধ্রদেশের জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাদপীঠরূপে অসহযোগের সময় থেকেই বেজওয়াদার প্রসিদ্ধি আছে। বিশেষতঃ অনধ্ররাজ্য গঠনের পর কৃষ্ণানদীতীরস্থ বাণিজ্যপ্রধান বেজওয়াদাই হয়ে উঠেছে অনধ্রদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। অনধ্রের পোলিটিকাল ক্যাপিটালরূপে এখন বেজওয়াদার পরিচিতি। বেজওয়াদায় পৌঁছেই আভাস পেয়েছিলাম যে, অনধ্র বিধানসভার আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনের তোড়জোড়ে এখানকার রাজনৈতিক আসর সরগরম হয়ে উঠেছে; শুনলাম কংগ্রেস-সভাপতি ইউ. এন. ধেবর শীঘ্রই এখানে আসছেন একথাও প্রচারিত হয়েছে এবং কংগ্রেস ও তার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের পূর্ণোদ্যমে শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার প্রস্তুতি চলছে এখানেই। কাজেই সমগ্র দেশের দৃষ্টি বেজওয়াদায় কেন্দ্রীভূত। কিন্তু বেজওয়াদা অনধ্রের শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনের নয়, সাংস্কৃতিক জীবনেরও কেন্দ্র—কাজেই আমরা সাব্যস্ত করলাম যে, আমাদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে এখানে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করতে হবে।

পরদিন বিকেলবেলা আমি, রাঘবাচারিয়লু এবং সর্ব্বেশ্বর শর্ম্মা ট্যাক্সি করে বেজওয়াদার প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান দুর্গাবাড়ী দেখতে রওনা হলাম। শহর ছাড়িয়ে কৃষ্ণানদীর বাঁধের উপর দিয়ে ট্যাক্সি ছুটল এবং আন্দাজ ঘণ্টাখানেকের মধ্যে একটি পাহাড়ের পাদদেশে এসে থামল। সেখানে বেশীর ভাগ মেয়েরাই দোকানপাট সাজিয়ে বসেছে—একটা দোকান থেকে নারকেল আর কলা কিনে নিয়ে সোপান-

বেজওয়াদায় কৃষ্ণা নদীর বাঁধ (ষাট বৎসর আগেকার কাঠখোদাই চিত্রের প্রতিলিপি হইতে)

পথ ভেঙে আমরা পাহাড়ের উপর উঠতে লাগলাম। পাহাড়টি খাড়াভাবে উঠে গেছে, কাজেই আরোহণে বিশেষ কষ্ট হতে লাগল। পাথুরে পাহাড়ের শীর্ষস্থানে বহুকালের পুরনো এই মন্দির। সেদিন কি একটা পূজা উপলক্ষে মন্দিরে বিপুল ভিড়। মন্দিরের সামনে দুই সারিতে পুলিসের পাহারায় দেবদর্শনার্থী স্ত্রী-পুরুষ 'কিউ' করে দাঁড়িয়ে আছে, মেয়েদের সাড়ীর বর্ণবৈচিত্র্য এবং খোপায় গোঁজা ফুলের মালা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রায় সকলেরই পায়ে হলুদের গুড়ো মাখানো। ডানদিকে আপিস—বারান্দায় মাইকের সামনে বসে মুণ্ডিতমস্তক, ত্রিপুণ্ড্রশোভিত ললাট পুরোহিত শাস্ত্রপাঠ করছেন। এই সকল আধুনিক ব্যবস্থা দেখে শুনে মনে হ'ল সবই যেন যান্ত্রিক ভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। পরশুরাম-রচিত গল্পের শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারীর দি অটোম্যাটিক শ্রীদুর্গাগ্রাফ আবিষ্কারের দিনও বোধ হয় আসন্ন এবং ভবিষ্যতে মন্দিরে এসে চরণামৃতের জন্যে সম্ভবতঃ পুরোহিতের সামনে হাত পেতে দাঁড়াতে হবে না, কল টিপলেই পুষ্পবাসিত চরণামৃত স্বতঃনিসৃত হয়ে ভক্তের অঞ্জলি পূর্ণ করবে।

আমাকে সেদিনই রাত দশটার ট্রেনে হায়দরাবাদ রওনা হতে

1. Vidya-nagar.—Evidently Rajmahendri, now on the left bank of the Godavari. *Chaitanya's Life and Teachings* by Jadunath Sarkar, u. 49.

2. Ganga Gotami.—The Godavari river. At Kovur, opposite Rajmahendri, was the hermitage of the sage Gautama, from whom this river is named.—*Chaitanya's Life and Teachings*, p. 93.

হবে। কাজেই তাড়াতাড়ি দর্শনাদি শেষ করে নীচে নামতে লাগলাম। কতকগুলো সোপান অতিক্রম করে রেলিং দিয়ে ঘেরা একটি চত্বরে এসে বসা গেল। পেছনে পাহাড়ের পাঁচিল, সামনে বহু নিম্নে কাননকুন্তলা সমতলভূমির বুকে কৃষ্ণানদীর স্থির অচঞ্চল বারিরাশি যেন সবুজ ফ্রেমে বাঁধা স্বচ্ছ কাচের মত দৃশ্যমান। বহু দূরে গাছপালার ফাঁকে বাকিংহাম খালে ভাসমান সাদা পালতোলা নৌকাগুলো নজরে পড়ছে—ঐ খাল চলে গেছে সরাসরি মাদ্রাজ পর্য্যন্ত। কৃষ্ণানদীর ব্রিজের ওপারে একটা খাড়া কৃষ্ণাভ পাথুরে পাহাড় যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় প্রাণীর মত আবছা অন্ধকারে থাবা মেলে শিকারের প্রতীক্ষা করছে।

সন্ধ্যার পর পাহাড়ের উপরকার মন্দিরে চত্বরে উদ্যানে সর্ব্বত্র বৈদ্যুতিক আলোর মালা জ্বলে উঠল। অজস্র আলোর মালা গলায় পরে পাহাড় দীপ্যমান হয়ে উঠল অপূর্ব্ব শোভায়—মন্দিরশীর্ষে নীল বৈদ্যুতিক আলোটি শোভা পেতে লাগল পাহাড়ের শিরোভূষণে শোভমান মস্ত বড় একটি দ্যুতিমণ্ডিত নিটোল নীলকান্তমণির মত। প্রতিদিনই সন্ধ্যার পর এই পাহাড় ও গিরিমন্দির এমনি আলোর মালায় প্রদীপ্ত হয়—এমন আলোকসজ্জার ব্যবস্থা আর কোন তীর্থস্থানে নেই। খানিকক্ষণ আলোক-স... অবলোকন করে আমরা দ্রুত পদে সোপানাবলী অতিক্রম ক... নীচে নেমে এসে ট্যাক্সিতে উঠলাম।

আস্তানায় পৌঁছে তাড়াতাড়ি ভোজন-পর্ব্ব শেষ করে ... গেল—তার পর জিনিষপত্র বাঁধা-ছাদার পালা। কথা ... সর্ব্বেশ্বর শর্ম্মা আর রাঘবাচারিয়ুলু এরা দু'জনে আমার সঙ্গে বো... যাবেন, কিন্তু অনিবার্য্য কারণে এদের দু'জনকেই বেজওয়... আটকা পড়তে হ'ল। কাজেই কাজের গুরু দায়িত্ব চাপল ... উপর। স্থির করলাম দু'এক দিন হায়দরাবাদে থেকে তার প... বোম্বাই রওনা হব।

সর্ব্বেশ্বর শর্ম্মা এবং অন্যান্য তেলুগু বন্ধুরা আমার সঙ্গে ... এলেন। যথাসময়ে ট্রেন ছেড়ে দিলে। সপ্তাহখানেক পরে সহক... সাহচর্য্য থেকে বঞ্চিত হলাম—এবার আমার একলা চলার পালা।

ভারতে বৈদেশিক ভাগ্যান্বেষী সৈনিক

অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্যাপ্টেন জোসেফ হার্ভি বেলাসী জাতিতে ইংরেজ। তৎপরবর্ত্তী দিনে এই বংশের আরও অনেককে বোম্বাই প্রদেশে চাকরি উপলক্ষে সমাগত দেখিতে পাওয়া যায়। পেশবার তোপখানার অধ্যক্ষ আর একজন ভাগ্যান্বেষী বেলাসীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

জোসেফ অক্সফোর্ডে কুইন্স কলেজে শিক্ষালাভ করেন এবং কোম্পানীর মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে এনসাইন বা আধুনিক কালের সেকেণ্ড লেফটেনাণ্টের পদ প্রাপ্ত হইয়া এদেশে আসেন। অর্থের অপ্রাচুর্য্যহেতু তাঁহার মনে শান্তি ছিল না। দেশে প্রকাণ্ড সংসার; বিধবা জননী, অবিবাহিতা ভগিনী অনেকগুলি, উপার্জ্জিত অর্থের প্রায় সমস্তই উহাদের জন্য পাঠাইতে হইত, তথাপি উহাদের অনটনের সীমা ছিল না। কোম্পানীর বাঁধাধরা নিয়মে আশু কোন উন্নতি বা বেতনবৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া বেলাসী ভাগ্যান্বেষী-সৈনিক-বৃত্তি গ্রহণে অভিলাষী হইয়াছিলেন। দেশীয় দরবারে বহু ইউরোপীয় সৈনিকের কাহিনী তিনি শুনিয়াছিলেন, যাহারা অসিমাত্র সম্বলে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া প্রভাব-প্রতিপত্তির এবং সম্পদের শীর্ষদেশে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহাদের ভিতর অনেকে যে তাঁহা অপেক্ষা বিদ্যা-বুদ্ধি, সাহস বীরত্ব অথবা চরিত্রগুণে শ্রেষ্ঠ ছিল তাহা নহে। উহাদের পক্ষে যাহা করা সম্ভবপর হইয়াছিল তিনিই বা তাহা না পারিবেন কেন?

অনুমান ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বেলাসী কমিশন পরিত্যাগ করিয়া মরাঠাসর্দার অম্বাজী ইঙ্গলের সেনাবিভাগে প্রবেশ করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি তাঁহার জন্য পাশ্চাত্ত্য ধরণে শিক্ষিত চারিটি ব্যাটালিয়ন গঠন করিলেন। অম্বাজীর সম্বন্ধে সকল কথা ইতিপূর্ব্বে ... প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে। তাঁহার শিক্ষিত সৈন্যদল-স... আকাঙ্ক্ষা ছিল, অথচ তজ্জন্য আবশ্যক অর্থব্যয় করিতে ... কুণ্ঠিত ছিলেন। ইংরেজ লেখকেরা বেলাসীর অনেক প্রশং... অম্বাজীর যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিয়া থাকেন; কর্ম্মচের ... বেলাসীর প্রভুনির্ব্বাচন ঠিক হয় নাই; তিনি অচিরে নিজে... বুঝিয়াছিলেন। মেজর লুই স্মিথের পুস্তক ইঁহাদের সকলকার ... উপাদান। তিনি বলেন—'অম্বাজীর মধ্যে জঘন্যতম এশিয়া... নিকৃষ্টতম দোষসমূহ বর্ত্তমান ছিল, এরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট ... অধীনে উন্নতি করিবার জন্য আবশ্যকমত চক্রান্ত, শাঠ্য ও ... করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। তথাপি বেলাসী প্রাণপণে ... কর্ত্তব্য পালনে যত্নবান ছিলেন এবং অম্বাজীর সিপাহীরা হিন্দু... যে-কোন দলের মত কার্য্যকরী হইয়া উঠিতে পারিত, যদি না ... কার্পণ্য অধ্যক্ষের সকল পরিশ্রম এবং নৈপুণ্যকে ব্যর্থ করিয়া ...

১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্মুখ আক্রমণে লোহরগড় নামক দুর্গ অধিকা... বেলাসী যথেষ্ট সামরিক কৃতিত্ব এবং সাহস ও বীরত্বের পরিচ... ছিলেন। এই যুদ্ধে তাঁহার অনেক লোক হতাহত হয়, সঙ্গে ... মৃতদেহসমূহ সংকারের অথবা আহতগণের চিকিৎসায় কোন ... ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বেই, শ্রান্ত ক্লান্ত সৈনিকগণসহ আট ক্রোশ দূরে সুদৃঢ় গোপালপুর নামক দুর্গ আক্রমণে অগ্রসর হইতে তিনি আ... হন। অনিবার্য্য কারণ ভিন্ন এ ধরণের আদেশ সমর্থন ... না। সৈনিকের সহানুভূতিপূর্ণ মনোবৃত্তি এবং অধ... মাত্রাজ্ঞান লইয়া বেলাসী এ আদেশ পালনে সম্মত হইলেন ন...

[illegible]জীও ইহাই চাহিতেছিলেন। অবাধ্যতার অজুহাতে তিনি [illegible]ণাৎ বেলাসীকে বরখাস্ত করিয়া দল ভাঙিয়া দিলেন। সিপাহী-[illegible]কে প্রাপ্য অর্থ দেওয়া দূরে থাক, তাঁহার আদেশে উহাদের যথা-[illegible] লুণ্ঠিত হইল।

দুই বৎসর পরে বিষম অভাব এবং অনটনের জ্বালায় উত্যক্ত [illegible]াসী পুনরায় অম্বাজীর দ্বারস্থ হইয়াছিলেন এবং কর্নেল জেমস-[illegible]হেড সেফার্ডের দলে দুই ব্যাটালিয়ন সেনার অধ্যক্ষতালাভও [illegible]। স্বগুয়ার যুদ্ধে উহাদের পরিচালনা-কালে তিনি নিহত হন। [illegible]লেখকেরা সকলেই বেলাসীর সুখ্যাতি করিয়াছেন। তিনি [illegible] ও অসমসাহসী বীরপুরুষ ছিলেন। সামরিক-বিজ্ঞানে [illegible]র যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। তাঁহার সততা, জ্ঞান, দয়াদাক্ষিণ্য, [illegible]ন ব্যক্তিবৃন্দের প্রতি সহানুভূতি সত্যই প্রশংসনীয় ছিল। [illegible] বিদ্বান এবং পাঠানুরাগী ছিলেন। প্রথম যৌবনে অক্স-[illegible]ডে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের ফলে গ্রীক এবং ল্যাটিন সাহিত্যে [illegible] প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। তদ্ভিন্ন চিত্রকলা ও সঙ্গীত-[illegible]ও তাঁহার অনুরাগ ছিল। দৈহিক এবং মানসিক উভয়বিধ [illegible]মে তিনি অকাতর ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য সুন্দরকান্তি, [illegible]তরুচি, লোকচিত্তানুরঞ্জনে সমর্থ, সহৃদয় এই যুবক ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপা হইতে নিতান্তই বঞ্চিত। তাঁহার শোচনীয় পরিণামের জন্য তিনি সকলকারই সহানুভূতির পাত্র।

কর্নেল জেমস রেডহেড

অম্বাজী ইঙ্গলিয়ার ব্রিগেডের অধ্যক্ষ কর্নেল জেমস রেডহেড 'সেফার্ড' বা দেশীয় সিপাহীগণের 'জামুস সাহেব'-এর পিতৃপরিচয় বা বাল্যজীবন সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই। নিতান্ত অল্প বয়সে এক জাহাজের সামান্য কর্ম্ম লইয়া সেফার্ড ইংলণ্ড হইতে এদেশে আসে এবং কলিকাতায় পৌঁছিয়া গোপনে জাহাজ হইতে পলায়ন করে। [illegible] উহাকে 'কেবিন-বয়' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উহাই [illegible] সম্ভব, কেননা অত্যল্প কালমধ্যেই উহাকে দি বইন-[illegible] জনৈক অফিসরের ভৃত্যরূপে আর্য্যাবর্ত্তের অভ্যন্তরভাগে [illegible]তে দেখা যায়। এই সময় হইতেই দেশীয় দরবারে ইহার [illegible] সৈনিক-জীবনের আরম্ভ হইলেও উহাকে আরও কিছু [illegible] বৃত্তিতে কাটাইতে হয়। কিছুকাল পরে ফতেপুরে জনৈক [illegible]ফিসারের পরিচারক রূপে উহার সাক্ষাৎ মিলে। ১৭৯৯ [illegible]ফার্ড অম্বাজীর কর্ম্মে প্রবেশ করে এবং তাঁহার জন্য নূতন [illegible]শিক্ষিত একটি সেনাদল গঠন করে। ঐ দলে পাঁচ [illegible] পদাতিক, পাঁচ শত অশ্বারোহী এবং পঁচিশটি তোপ [illegible]ণ গৃহ-ভৃত্য এবং ব্রিগেডের কর্নেল এতদুভয়ের মধ্যেকার [illegible]নিশ্চয়ই সহসা পরিবর্ত্তিত হয় নাই। সকল কথা সঠিক [illegible] না গেলেও ঐ ব্যক্তি যে প্রথমতঃ কোথাও নিম্নপদে [illegible]বন আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে উন্নতির সোপানে আরো-[illegible]ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। অম্বাজী যে হীন পরিচারকবৃত্তিতে নিরত কোনপ্রকার সামরিক শিক্ষাবিহীন ব্যক্তিকে একেবারে সৈন্যদল সংগঠনের ভার অর্পণ করেন নাই একথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন করে না।

অম্বাজীর ব্যয়কুণ্ঠতার উল্লেখ ইতঃপূর্ব্বেই করিয়াছি। সৈন্য-দলের জন্য নিতান্ত আবশ্যক অর্থ ব্যয় করিতেও তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন। ফলে ব্রিগেডের শিক্ষাদীক্ষা বা অস্ত্রশস্ত্রের উৎকর্ষের জন্য তাঁর আদৌ সুনাম ছিল না। সমসাময়িক কেহ কেহ পরিহাস করিয়া উহাদের নামকরণ করিয়াছিল—"Ragamuffin Battalions"! কিন্তু সেজন্য আসল দোষ প্রভুর, তাঁর সেনাপতির নয়। সেফার্ডের সৈনিকগণ তখনকার দিনের বহু অভিযানে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু মুণ্ডার যুদ্ধই তাহাদের প্রথম বড় যুদ্ধ। এই যুদ্ধে বেলাসিপ্রমুখ চারি জন ইউরোপীয় অফিসার প্রাণ হারাইয়াছিলেন। যুদ্ধের পর পলাতক লকবা দাদার পশ্চাদনুসরণে উহারা প্রেরিত হইয়াছিল এবং জর্জ্জ টমাসের সহিত পেরঁর সমরকালে লকবা দাদাকে নানাভাবে বিব্রত রাখিয়া উভয়ের যোগসাধন সম্ভব হইতে দেয় নাই। কিন্তু এই সকল অভিযান সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছুই জানা যায় না।

লুই স্মিথ সেফার্ডের বহু প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি প্রিয়দর্শন সুপুরুষ ছিলেন এবং সকল অবস্থায়ই সকলকার সঙ্গে মানাইয়া চলিতে পারিতেন। স্মিথের মতে এ কারণ তিনি দেশীয় দরবারে কাজ করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত ব্যক্তি। শুধু সাহস ও বীরত্ব, উদ্যম এবং বিশ্বস্ততার বলেই তিনি অত্যন্ত হীন অবস্থা হইতে উন্নতি করিতে সমর্থ হন। বংশমর্য্যাদা, শিক্ষা এবং মুরুব্বি ইহার কোনটিই তাঁর ছিল না। অক্লান্ত পরিশ্রম এবং উদ্যমপূর্ণ প্রচেষ্টার জন্য ঐ লোকটির অর্জ্জিত সাফল্য সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয়।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের সমরকালে অপরাপর ব্রিটিশ অফিসারের মত সেফার্ডও মরাঠাপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজ সরকারের আশ্রয় লন। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে মাসিক সহস্র মুদ্রা বেতনসহ কর্ম্মদান করেন। এ পরিমাণ বেতন দুই-এক জন ভিন্ন অপর কাহাকেও প্রদত্ত হয় নাই। তাঁহার সিপাহীরাও কোম্পানীর ফৌজে গৃহীত হয়। পর বৎসর যশোবন্তরাও হোলকরের সহিত সংগ্রামে সেফার্ড সবিশেষ কৃতিত্ব দেখান। বুন্দেলখণ্ড প্রদেশে মালতাওঁ ঘাটের যুদ্ধে তিনি পিণ্ডারী সর্দ্দার আমীর খাঁকে পরাজিত করেন এবং ২৪শে জুন তারিখে পুনরায় আর একটি যুদ্ধে তাঁহার সেনাদলকে সম্পূর্ণরূপেই পর্য্যুদস্ত ও বিধ্বস্ত করিয়া দেন। এই সময় সেফার্ডের ব্রিগেডে ৩১৮০ জন সৈনিক ছিল। ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ লর্ড লেক ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে পরিদর্শনকালে উহাদের যথেষ্ট প্রশংসা করেন।

সমরাবসানের পর সেফার্ডের সেনাদল ভাঙিয়া দেওয়া হয় এবং ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ উহার বেতনের সমপরিমাণ অর্থ পেন্সন হিসাবে দিতে থাকেন। তাহা ভিন্ন সেফার্ডকে কোম্পানীর সেনাবিভাগে কর্নেল পদ কতকটা সম্মান দেখাইবার জন্যই দেওয়া হইয়াছিল। এ ধরণের সম্মান অতি অল্প লোককেই প্রদত্ত হইত। অতঃপর

সেফার্ড কানপুরে গিয়া বাস করে। তথায় ২৩শে ডিসেম্বর ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

সেফার্ডের উইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে কানপুরে প্রণীত হয়। কীটদষ্ট উইলে তাঁহার নাম Shippard অথবা Sheppard এইভাবে লিখিত; উহা যাহাই হউক না কেন, Sheppard বানান ঠিক নহে। কিন্তু সকলে তাঁহাকে সেফার্ড বলিয়া উল্লেখ করায় বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রচলিত নাম পরিবর্ত্তিত হইল না। সেফার্ড নিজেকে "এলিজাবেথ রেডহেড"-এর পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। পিতৃনাম অনুল্লেখের কারণ কি? ইহাতে যাহা মনে হওয়া স্বাভাবিক তাহা তাঁহার পক্ষে সম্মানজনক নয়। উইলে দুই ভগিনী রেডহেড এবং পেভেরেল ও বিশ্বস্ত বন্ধু সুঙ্গি খানুমের নাম দেখা যায়। শেষোক্ত মুসলমান রমণীটি যে কে তাহা না বলিলেও চলে। মেজর জন ওয়াপষ্ট নামক জনৈক সুহৃদকে উইলের অন্যতম অছি নিযুক্ত করা হয়। ইনিও এককালে মরাঠাবাহিনীভুক্ত ছিলেন। উইলে স্বাক্ষরের পরিবর্ত্তে সেফার্ডকে চিহ্ন দিয়া ঢেরাসই করিতে দেখা যায়। সুতরাং মনে হয়, ঐ ব্যক্তি নিরক্ষর ছিল। বলা বাহুল্য, উইলটি মৃত্যুশয্যায় বিরচিত সুতরাং নাম স্বাক্ষর করিবার মত অবস্থা তখন মুমূর্ষুর ছিল একথা বলা চলে না।

সেফার্ডের বংশধরগণ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় নাই। অযোধ্যার নবাবের সেনাদলে সেফার্ড নামে দুই জনের সন্ধান পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ উহারা একই ব্যক্তি। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে লক্ষ্ণৌ নগরে অযোধ্যাধিপতির ২য় সংখ্যক পদাতিক রেজিমেণ্টের লেফটে-নাণ্ট এবং এডজুটাণ্ট উইলিয়ম সেফার্ডের দেহান্ত হয়। দ্বিতীয় ব্যক্তি, লেফটেনাণ্ট এবং এডজুটাণ্ট জেমস সেফার্ডের পরিচয় পাওয়া যায় আগ্রায় অবস্থিত ইহার বিধবা পত্নী এবং পুত্রের সমাধিসংলগ্ন স্মারকলিপি হইতে। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ৪৬ বৎসর বয়সে প্রথমোক্তের এবং তাহার এক মাস পূর্ব্বে উনিশ বৎসর তিন মাস বয়স্ক পুত্রের মৃত্যু হইয়াছিল। এই দুই জন সেফার্ড দুই বিভিন্ন ব্যক্তি হইতে পারে। সে ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ ইহারা ভ্রাতৃদ্বয় হওয়া সম্ভব। আবার জেমস উইলিয়ম অথবা উইলিয়ম জেমস নামে একই লোক হইতে পারে। অন্ততঃ সন তারিখের দিক দিয়া ইহাতে অসঙ্গতি কিছুই নাই। কর্নেল সেফার্ডের পুত্র বা পুত্রগণের পক্ষে দেশীয় দরবারের বাহিনীতে প্রবেশের কারণ সুস্পষ্টরূপেই বুঝা যায়। দেশীয় রমণীর গর্ভজাত বর্ণসঙ্কর ব্যক্তির পক্ষে কোম্পানীর সেনাবিভাগে প্রবেশলাভ সম্ভব ছিল না।

সিপাহীবিদ্রোহের সময় কানপুরে W. J. Shepherd (উইলিয়ম জেমস) নামক এক ব্যক্তি কমিসারিয়েট বিভাগের হেড ক্লার্ক নিযুক্ত ছিল। নানাসাহেব কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত শোচনীয় হত্যাকাণ্ড হইতে অল্প যে কয়জন ইংরেজ ও ফিরিঙ্গী রক্ষা পাইয়াছিল, ঐ ব্যক্তি তাহাদের অন্যতম। কানপুরের ঘটনাবলী সম্বন্ধে ঐ ব্যক্তি পরে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিল; ইহার নাম: "A Personal Narrative of the Outbreak and Massacre at Cawnpore during the Sepoy Revolt of 1857" (Lucknow, 1879)। অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শীবিরচিত বলিয়া উহার যথেষ্ট মূল্য আছে। গ্রন্থমধ্যে সেফার্ড নিজেকে জনৈক সৈনিক পুরুষের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। বিদ্রোহ-প্রশমনের পর সরকার হইতে সেফার্ড দুইখানি গ্রাম জায়গীর পাইয়াছিল। ১৮... খ্রীষ্টাব্দে উহার মৃত্যু হয়। সি. ই. ব্যাকল্যাণ্ড তাঁহার "Dictionary of Indian Biography" গ্রন্থে উহাকে সেফার্ডের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উহার পক্ষে কর্নেলের পৌত্র এবং পূর্ব্বোক্ত লেফটেনাণ্টের পুত্র হওয়াই অধিকতর সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

কর্নেল জেমস স্কিনার

কর্নেল জেমস স্কিনার অন্যান্য অনেক ভাগ্যান্বেষী সৈনিক অপেক্ষা ভাগ্যবান। তাঁহার একখানি জীবনচরিত আছে। নিজ স্মৃতি-কথা তিনি যেমনটি বলিয়াছিলেন, তদীয় সুহৃদ্বর মিঃ বেলী ফ্রেজার তেমনই ভাবে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। গ্রন্থখানি ১৮... খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পরিণত বয়সে দীর্ঘকাল পূর্ব্বেকার কথা বলিতে গিয়া স্কিনার সকল ক্ষেত্রে সন, তারিখ, যুদ্ধে নিযুক্ত সৈন্য বা হতাহতের সংখ্যা এবং ঘটনাপরম্পরার পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। সুতরাং গ্রন্থখানি কতকটা সাবধানতার সহিত ব্যবহার করা প্রয়োজন হইলেও উহা ভাগ্যান্বেষী সৈনিকদের ইতিহাসতত্ত্বজ্ঞের নিকট অপরিহার্য্য।

উক্ত গ্রন্থে স্কিনারের জন্মকাহিনী এবং মাতৃপরিচয় সম্বন্ধে যাহা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। বারাণসীরাজ চৈতসিংহের বিদ্রোহকালে বিজয়গড় যুদ্ধের পর ইংরেজ সেনা কর্ত্তৃক একটি দুর্গ লুণ্ঠন কালে জনৈক রাজপুত সৈনিক ভূম্যধিকারীর পরমা সুন্দরী নন্দিনী লুঠের মাল হিসাবে কোম্পানী এনসাইন্ স্কিনারের হাতে পড়ে। কালক্রমে উহার গর্ভে তিনটি পুত্র এবং তিনটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। কন্যাগুলির সব কয়টিরই কোম্পানীর সামরিক অফিসারগণের সহিত বিবাহ হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র ডেভিড নাবিকের এবং অপর দুই জন জেমস (জন্ম ১৭৭৮ খ্রীঃ) এবং রবার্ট দেশীয় দরবারে ভাগ্যান্বেষী সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করে। ইহাদের জননী উক্ত রাজপুতানীর মৃত্যুর এক করুণ কাহিনীও উহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। কন্যাত্রয়কে ফিরিঙ্গিদের স্কুলে বিদ্যালাভের জন্য পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতে দেখিয়া পর্দ্দানাশ এবং রাজপুত-রমণীর সম্মান ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কায় স্কিনার-ঘরণী নাকি প্রাচীন যুগের রাজপুত বীরাঙ্গনাদের মতই স্বেচ্ছায় আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন (১৭৯০ খ্রীঃ)। অনলে অবশ্য ঝাঁপ দেন নাই, তদপেক্ষা সহজ-সাধ্য গরল ভক্ষণ করিয়াছিলেন। এ কাহিনী যে অবিশ্বাস্য তাহা না বলিলেও চলে। ইহা ব্যতীত চৈতসিংহের বিদ্রোহ এবং বিজয়গড় যুদ্ধ ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসের ঘটনা। কিন্তু আত্মকাহিনীতে স্কিনার বলিয়াছেন যে, ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার

হইয়াছিল, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডেভিড ভিন্ন ভগিনীগণের মধ্যে কেহ কেহ তাহার বয়োজ্যেষ্ঠা ছিলেন এবং ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধিয়ার বাহিনীতে সৈনিকবৃত্তি অবলম্বনকালে তাঁহার বয়স সতের বৎসর ছিল। রূপসী রাজপুতবালার কাহিনী সত্য হইলে ১৭৮৪ বা ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে জন্ম হইতে পারে না। সুতরাং ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে দশ বা এগার বৎসরবয়স্ক ফিরিঙ্গী বালকের সিন্ধিয়ার অধীনে সামরিক বৃত্তি গ্রহণ সম্ভবপর নহে। তিনি যে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধিয়ার কার্য্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। আরও এক দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখা যাক।

সুদীর্ঘকাল ফিরিঙ্গীর গৃহে বাস করিয়া এবং তাহার ছয়টি সন্তানের জননী হইয়াও যে কন্যাদের স্কুলে-গমনজনিত পর্দ্দা ও মর্য্যাদানাশের আশঙ্কায় রাজপুতানীর সুপ্ত গরিমা সহসাই জাগরূক হইয়া উঠিল এ কাহিনী কাহারও পক্ষে,বিশেষতঃ হিন্দু এবং রাজপুত ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে যাহারই সামান্যমাত্রও জ্ঞান আছে, তাহার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। তখনকার দিনে এদেশে সমাগত অনেক ইউরোপীয় দেশীয় রমণী লইয়া বাস করিতেন। দেশীয় দরবারে ভাগ্যান্বেষী সৈনিকবৃন্দের মধ্যে অনেকেই ঐরূপ রমণীর গর্ভজাত ছিল তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। দি বইন, পের, পলমবান প্রভৃতি অনেকেরই হারেমবাসিনীগণের পরিচয় আমরা পাইয়াছি, কিন্তু ইহাদের অধিকাংশই ছিল নিম্নশ্রেণীর মুসলমান স্ত্রীলোক; বেগম সমরু বা দি বইনের মতি বেগমের মত কেহ-বা ছিল পেশাদার নর্ত্তকীশ্রেণী হইতে উদ্ভূত। উচ্চবর্ণের রাজপুত ভূস্বামী-নন্দিনীর এ পরিণামের পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে, উক্তবিধ অবস্থায় পড়িলে তাদৃশ রাজপুতবালা বহু পূর্ব্বেই আত্মহত্যা করিতেন।

আর এক দিক দিয়া বিচার করিলে জেমস স্কিনারের যে চিত্র দেখা যায় তাহা হইতে তিনি রূপবান অথবা বিশেষ সুপুরুষ ছিলেন বলিয়া মনে হয় না, বরং তাহার বিপরীতই বলা চলে। তাঁহার জননীকে রূপসী রাজপুতবালার পরিবর্ত্তে স্থূলাঙ্গী কুদর্শনা কোন নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক বলিয়াই সন্দেহ হয়। আখ্যানে কতকটা চটক দিবার জন্যই 'রূপসী রাজপুতবালা'র সৃষ্টি বলিয়া মনে হয়।

মাতৃবিয়োগের পর জেমস এবং রবার্ট একটি অবৈতনিক বিদ্যালয়ে প্রেরিত হয়। উহাদের পিতা তখন লেফটেনান্ট পদে প্রতিষ্ঠিত, বর্ণসঙ্কর অবৈধ পুত্রগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করিতে তাঁহার সামর্থ্য অথবা প্রবৃত্তি ছিল না। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হইয়া তিনি উহাদিগকে অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরণের একটি বোর্ডিং স্কুলে দিয়াছিলেন। তথায় প্রত্যেকের জন্য মাসিক ৩০৲ টাকা খরচ লাগিত। দুই বৎসর পরে একটি ছাপাখানায় শিক্ষা-নবিশরূপে সাত বৎসরের চুক্তিতে জেমসকে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, তখনকার দিনে কলিকাতায় মুদ্রাযন্ত্র সুলভ ছিল না। তিন দিনের অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট হইল, তৃতীয় রাত্রে বালক সেখান হইতে গোপনে পলায়ন করিল, উদ্দেশ্য সাগরযাত্রা। পকেটে মাত্র ছয় আনা পয়সা সম্বল, তাহাতে আর সমুদ্রযাত্রা সম্ভব হয় না। উহাতে ছয় দিন কোনমতে খাওয়া চলিয়াছিল। পুঁজি ফুরাইলে জঠরজ্বালা-নিবৃত্তির জন্য বালককে চিন্তিত হইতে হইল। পথে পথে ঘুরিয়া কখনও-বা মুটের কাজ করিয়া, কখনও-বা পাঁচজনের ফাইফরমায়েস খাটিয়া, কখনও বা দৈনিক তিন আনা মজুরিতে এদেশীয় ছুতারমিস্ত্রীর শাগরেদি করিয়া দিনকতক কাটিল। এই অবস্থায় দৈবক্রমে একদিন জেমস তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী মিসেস টেম্পলটনের এক ভৃত্যের সম্মুখে পড়িয়া যায়। ঐ ব্যক্তি তাহাকে নিজের প্রভুর নিকট ধরিয়া লইয়া গেল, সমুচিত তিরস্কারাদির পর ভগিনীপতি উহাকে একটি চাকরি জুটাইয়া দিলেন। এবার জেমসের কাজ হইল আইনের কাগজপত্র নকল করা। এ কার্য্যে তিন মাস অতিবাহিত হইল, এমন সময়ে কর্ণেল ব্রাউন নামে তাহার এক পিতৃবন্ধু উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে কলিকাতায় আসিলেন। বালকের সৈনিকবৃত্তি অবলম্বনের প্রবল বাসনা দেখিয়া তিনি উহাকে নিজ তহবিল হইতে তিন শত টাকা পাথেয় দিয়া কানপুর পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার সেখানে পৌঁছিবার (এপ্রিল ১৭৯৫) স্বল্পকাল পরে নিজেও তিনি তথায় আসেন। এখানে বলা যাইতে পারে যে, বর্ণসঙ্কর ইউরেশীয় বলিয়া কোম্পানীর কার্য্যে জেমসের প্রবেশাধিকার ছিল না।

অতঃপর যথোচিত সুপারিশ পত্রাদিসহ তিনি জেমসকে কোয়েলে দি বইনের নিকট পাঠাইয়া দেন। দি বইন তাহাকে মথুরায় অবস্থিত একটি নজিব ব্যাটালিয়নে মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতনে এনসাইন পদ প্রদান করিয়াছিলেন। ক্যাপ্টেন এণ্টনি পলম্যান নামক জনৈক জার্ম্মান-জাতীয় সৈনিক ঐ দলের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং উহা কর্ণেল রবার্ট সাদারলণ্ডের দ্বিতীয় ব্রিগেডের অন্তর্ভুক্ত।

স্কিনারের সামরিক অভিজ্ঞতা লাভে বিশেষ বিলম্ব ঘটে নাই। এই সময়ের, বিশেষতঃ ১৭৯৫ হইতে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে সংঘটিত অনেক যুদ্ধাভিযানে তিনি উপস্থিত ছিলেন। সে সকলের দীর্ঘ বিবরণ প্রদান অনাবশ্যক এবং অসম্ভব। পর বৎসর অর্থাৎ ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সাদারলণ্ড এবং লকবা দাদা বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবাধ্য সর্দ্দার এবং রাজাকে দমনকার্য্যে নিরত থাকেন। স্কিনারের ব্যাটালিয়নও এই দলে ছিল। দুইটি খণ্ডযুদ্ধ এবং পাঁচ-ছয়টি পার্ব্বত্য দুর্গ অধিকারে তিনি উপস্থিত ছিলেন। এই সকল যুদ্ধের ফলে স্কিনারের সামরিক অভিজ্ঞতা বর্দ্ধিত হইল। তিনি অতঃপর সর্ব্বপ্রকার দেশীয় যুদ্ধপদ্ধতি আয়ত্ত-করণে এবং দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারে পারদর্শিতা লাভ করিতে যত্নবান হইলেন।

বাইদিগের বিদ্রোহজনিত অভিযানে স্কিনার উপস্থিত ছিলেন। চাঁদঘোরী যুদ্ধে ক্যাপ্টেন বটারফিল্ড যখন পরাজিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পশ্চাৎপদ হইতেছিলেন তখন স্কিনার অসম সাহসের সহিত প্রবল শত্রুসেনার বিরুদ্ধে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করেন।

প্রধানতঃ সেই কারণেই পলাতকগণ মেরুড়ের দুর্গে আসিয়া আশ্রয় লইতে পারিয়াছিল এবং তাহাদের কামানসমূহ শত্রুহস্তে পতিত হওয়া হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। বটারফিল্ডের উচ্চ প্রশংসা এবং সুপারিশে পের্ঁ এই কৃতিত্বের জন্য তাঁহাকে অতঃপর মাসিক ২০০ টাকা বেতনে লেফটেনাণ্ট পদে উন্নীত করিয়াছিলেন।

লকবার বিরুদ্ধে চিতোরগড় অভিযানে স্কিনার দুই ব্যাটালিয়ন সৈনিকের অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। এই সময়ে জর্জ্জ টমাসকে সাহায্য করার জন্য বেতন দিয়া অস্থায়ীভাবে ভাড়া করা হইয়াছিল। এই সময়ে সংঘটিত অভিযান, মার্চ্চ, খণ্ডযুদ্ধ, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র সাদারলণ্ডের বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাহার সহিত শত্রুতাচরণ ইত্যাদির সুদীর্ঘ বিবরণ স্কিনার নিজ জীবনীতে প্রদান করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে জর্জ্জ টমাস, পের্ঁ, সাদারলণ্ড-প্রসঙ্গে প্রায় সকল কথাই বলা হইয়া গিয়াছে, পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

সাদারলণ্ডের পদচ্যুতির পর মেজর পলম্যান তাঁহার ব্রিগেডের অধ্যক্ষতা লাভ করিলে তাঁহার অধীনেও স্কিনার বহু অভিযানে উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে জাজপুরের যুদ্ধ সমধিক উল্লেখযোগ্য। স্কিনার বলিতেন যে, সারাজীবনে তিনি যে সকল কঠোর সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন, ইহাকে তাহাদের অন্যতম বলিয়া তিনি বিবেচনা করিতেন। দিল্লী এবং আগ্রা অবরোধেও স্কিনার উপস্থিত ছিলেন। কি কারণে সিন্ধিয়ার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ পের্ঁকে উক্ত দুই মোগল রাজধানী অবরোধ করিতে হইয়াছিল সেকথা পূর্ব্বে তাঁহার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

স্কিনার মালপুরার সমরক্ষেত্রে (১৭৯৪।১৮০০) উপস্থিত ছিলেন। এই যুদ্ধে অল্পের জন্য তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন। সিন্ধিয়ার চতুষ্কোণাকারে সংবদ্ধ বাহিনীকে পুনঃ পুনঃ চার্জ করিয়া রাঠোররা যখন পর্য্যুদস্ত করিয়া তুলিয়াছে সেই সময় উহার শেষ আক্রমণে জনৈক রাঠোর অশ্বারোহী স্কিনারের বাহন অশ্বকে নিহত করে। তিনি নিজের দল ছাড়িয়া একটি গোলাবারুদের গাড়ীর তলায় লুকাইয়া প্রাণ বাঁচান। এই যুদ্ধের সুদীর্ঘ বিবরণ স্কিনার প্রদান করিয়াছেন।* কিন্তু নিজের কথা সালঙ্কারে বিবৃত বা প্রচার করার তিনি আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। উত্তরকালে বন্ধুর নিকট নিজ স্মৃতিকথা বিবৃত করিবার সময় তিনি নিজের কৃতিত্ব সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। সেকথা আমরা অন্য সূত্র হইতে জানিতে পারি। দীর্ঘকাল পরে গবর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষের নিকট স্কিনারকে C. B. অর্থাৎ Companionship of the Order of the Bath উপাধি দিবার সুপারিশ করিবার সময় অন্যান্য নানা কথার মধ্যে লিখিয়াছিলেন: "জয়পুরাধিপতির কর্ম্মনিরত জনৈক বৃদ্ধ সর্দ্দার আমাকে যে কাহিনীটি বলিয়াছিল এস্থলে তাহার উল্লেখ না করিয়া আমি থাকিতে পারিতেছি না। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গারের যুদ্ধে ঐ ব্যক্তি একদল সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিল, সুতরাং সে প্রায় শতবর্ষবয়স্ক; কিন্তু তথাপি সে যৌবনের দৃপ্ততা, সুন্দর যোদ্ধব্যঞ্জক আকৃতি এবং অটুট ইন্দ্রিয়বৃত্তিসম্পন্ন ছিল। জয়পুর অর্থাৎ মালপুরার যুদ্ধে তরুণ কর্ণেল জেমস স্কিনার কেমন করিয়া একদল অশ্বারোহী সৈন্যের নেতৃত্ব করেন এবং উক্ত সর্দ্দার-পরিচালিত একটি ফিল্ড ব্যাটারী অধিকার করেন ও তাহার পর স্বীয় সদয় ও সুনির্দ্দিষ্ট হস্তক্ষেপের দ্বারা তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন কৃতজ্ঞতায় উচ্ছসিত ভাবে সেই বর্ণনা তিনি আমার নিকট করিলেন।" এ বিষয়ে স্কিনারের নীরবতা ও নিজেকে ঢাকিয়া রাখা তাঁহার নিরহঙ্কারেরই পরিচায়ক।

সংগ্রাম নিবৃত্ত হইলে পরে স্কিনারই সর্ব্বপ্রথম পরিত্যক্ত শত্রু-শিবিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সাহস করিয়া তথায় গিয়া তিনি দেখেন, চারিদিক নির্জ্জন নিস্তব্ধ কোথাও কেহ নাই। জয়পুররাজের শিবির হইতে তিনি বহু মূল্যবান সম্পত্তি হস্তগত করিয়াছিলেন। রাজার উপাস্য দুইটি স্বর্ণ-নির্ম্মিত দেববিগ্রহ—উহাদের অক্ষিগোলক হীরক-নির্ম্মিত ছিল, মোগল বাদশাহ কর্ত্তৃক প্রতাপসিংহকে প্রদত্ত বিখ্যাত সম্মান (Order) "মহি-মরতিব"-এর পিত্তল-নির্ম্মিত মৎস্য এবং অপরাপর বহু দ্রব্যসমূহও তিনি পাইয়াছিলেন।* স্কিনার মরাঠা-সেনাপতিকে এই মৎস্যটি উপহার দিয়া পরিবর্ত্তে তাঁহার নিকট হইতে নানাবিধ মূল্যবান পুরস্কার লাভ করেন।

জয়পুর হইতে স্কিনার তিন ব্যাটেলিয়ন সৈন্যসহ রামপাল সিং নামক জনৈক রাজপুত-সর্দ্দারের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। ইহা তাঁহার প্রথম স্বাধীন যুদ্ধাভিযান। চম্বলনদের তটে প্রতিপক্ষের সুদৃঢ় দুর্গপ্রাচীরের কতক অংশ বারুদসংযোগে উড়াইয়া দিয়া তুমুল যুদ্ধের পর তাঁহার সৈনিকগণ দুর্গ অধিকার করিয়াছিল। প্রথমবার শত্রুসেনা উহাদের প্রতিহত করিলেও স্কিনার উহাদিগকে পুনঃসজ্জিত করিয়া দ্বিতীয় আক্রমণে বিজয়লাভ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে কেরৌলির রাজার উনিয়ারার রাজার সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল। শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁহার হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য কেরৌলিরাজ পের্ঁর নিকট হইতে অর্থ-বিনিময়ে কিছু সৈন্য ভাড়া করেন। এই দলে ছয় ব্যাটেলিয়ান পদাতিক, দুই হাজার অশ্বারোহী এবং বিশটি কামান থাকিলেও প্রকৃত কার্য্যক্ষম ছিল শুধু স্কিনারের সিপাহীগণ। উৎকৃষ্ট ব্রিগেডগুলি ভাড়া খাটাইয়া নষ্ট করিবার পক্ষ...

---

* এতদিন তাহাই ঐতিহাসিকগণের ভরসাস্থল ছিল। বিভিন্ন সূত্র হইতে স্যার যদুনাথ সরকার এই যুদ্ধের একটি মূল্যবান বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছেন, The Modern Review, July 1943. 18-26

* Garter, Bath, Star of India বা Indian Empire ইত্যাদি সম্মানচিহ্নের (orders) মত মোগল সম্রাটগণও বিশেষ বিশেষ রাজানুগ্রহভাজন ব্যক্তিবৃন্দকে সম্মান প্রদান করতেন। পার্থক্যের মধ্যে গলায় বা বুকে পরিবার ইউরোপীয় পদক অর্থ বা তারকা-চিহ্নাদির পরিবর্ত্তে সে যুগে লাঞ্ছনগুলি বাদ্যভাণ্ডসহ সম্মানিত ব্যক্তিগণের সম্মুখে শোভাযাত্রা সহকারে বাহির হইত।

...পেব ছিলেন না। কেরৌলির রাজা অত্যন্ত কাপুরুষ এবং ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন—ভাড়াকরা সৈন্যগণকে বেতনদানে তাঁহার কার্পণ্যের জন্য তাহাদের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ দেখা দিল। স্কিনার বুঝিলেন এই কাপুরুষ নৃপতির নিকট হইতে আপৎকালে কোন প্রকৃত সাহায্য-প্রাপ্তি সম্ভব হইবে না। অসন্তুষ্ট সৈনিকগণসহ প্রতিপক্ষের সহিত বলপরীক্ষায় অগ্রসর হওয়া অনুচিত বিবেচনায় তিনি পলম্যানের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু সুচতুর উনিয়ারারাজ এই সুযোগ ছাড়িয়া দিবার পাত্র নহেন। তাঁহার চক্রান্তে কেরৌলির সিপাহীরা ইতিপূর্ব্বেই ভিতরে ভিতরে দলত্যাগে প্রস্তুত হইতেছিল। তিনি অদূরে আসিবামাত্র উহারা একযোগে স্কিনারকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পক্ষে যোগদান করিল। তখনও পলম্যানের দেখা নাই।

অদূরের একটি পরিত্যক্ত গ্রাম, তথায় আশ্রয় লইবার উদ্দেশ্যে স্কিনার পশ্চাৎপদ হইলেন। উদ্দেশ্য বুঝিয়া বিপক্ষের দুই ব্যাটেলিয়ন সেনা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি উহাদের কোনমতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈনিকগণ উক্ত গ্রামে আশ্রয়গ্রহণের পূর্ব্বেই শত্রুর সমগ্র বাহিনী (সংখ্যায় প্রায় ছয় সহস্রেরও অধিক) তাঁহাকে আক্রমণে অগ্রসর হইল। অসামান্য সৈন্যবলে উহাদের বাধাপ্রদানে চেষ্টা বৃথা বুঝিয়া তিনি গ্রামের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া তিন ক্রোশ দূরবর্তী টঙ্ক নগরের প্রাকারের অন্তরালে আশ্রয়লাভের জন্য পশ্চাৎপদ হইতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই শত্রুর সমগ্র অশ্বারোহী সেনা এবং পূর্ব্ববর্ণিত পদাতিক দল দুইটি তাঁহাকে আক্রমণে আগুয়ান হইল। এবারও তিনি শেষোক্ত দল দুইটিকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু একার্য্যে তাঁহার পাঁচটি কামানের মধ্যে একটি নষ্ট হইয়া গেল এবং তাঁহার অশ্বটি নিহত হইল। ততক্ষণে অশ্বারোহীদল নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আর অগ্রগমন অসম্ভব বুঝিয়া স্কিনার একটি উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করিয়া প্রতিপক্ষকে সাধ্যমত বাধাদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

উহারা কতকটা নিকটে আসিবামাত্র স্কিনার তাঁহার সৈনিকগণকে বন্দুক হইতে একবার একযোগে গুলিবৃষ্টি করিয়া চার্জ করিবার আদেশ দিলেন। ইহাতে রাজপুতদের পুরোবর্ত্তী দল হটিয়া গেল এবং উহাদের কামানগুলি তাঁহার হস্তগত হইল। কিন্তু পার্শ্বদ্বয়ের সিপাহীগণ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। উহাদের প্রবল গুলিবৃষ্টিতে বিব্রত হইয়া তিনি নিজ সৈনিকগণসহ প্রায় এক মাইল দূরবর্তী একটি পার্ব্বত্য দরিপথে আশ্রয় লইবার চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে পশ্চাৎপদ হইতে দেখিয়া শত্রুপক্ষের আনন্দ-উৎসাহের অবধি রহিল না। উহাদের বারংবার প্রবল আক্রমণে তাঁহার সেনাদল বিধ্বস্ত হইয়া গেল। কামানগুলি শত্রুর হস্তগত হইল। হতাবশিষ্ট তিন শত সৈনিকসহ তিনি মরিয়া ভর করিয়া শেষ চেষ্টাস্বরূপ বিপক্ষের ব্যূহভেদ করিয়া পলায়নে প্রয়াস পাইলেন। সহসা কুক্ষিদেশে একটি বন্দুকের গুলির নিদারুণ আঘাতে ভূতলে নিপতিত হইয়া তিনি সংজ্ঞাহারা হইলেন। সঙ্গে সঙ্গেই শত্রুসেনার প্রচণ্ড আক্রমণে তাঁহার ক্ষুদ্র দলটি একেবারে বিধ্বস্ত ও বিমথিত হইয়া গেল।

বৈকালে তিনটার সময় এই ব্যাপার ঘটিলেও পরদিন প্রভাতের পূর্ব্বে স্কিনারের চৈতন্যের উদ্রেক হয় নাই। সংজ্ঞাপ্রাপ্তির পর স্কিনার দেখিলেন চতুষ্পার্শ্বে স্তূপাকারে হতাহত সিপাহী এবং দেশীয় অফিসারগণের মধ্যে তিনি পড়িয়া আছেন, প্যাণ্টালুনটি ব্যতীত তাঁহার যাবতীয় পরিধেয়াদি লুণ্ঠিত হইয়াছে। তস্কর যখন তাঁহার বস্ত্র অপহরণ করিতেছিল তখন তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। আহতগণের মধ্যে একজন উচ্চবর্ণের সুবেদার এবং একজন জমাদার ছিল। প্রথম ব্যক্তির হাঁটুর নীচে হইতে একখানা পা উড়িয়া গিয়াছিল, দ্বিতীয়ের গাত্র ভেদ করিয়া বর্শা বিদ্ধ হইয়াছিল। আহত হইলে জলপিপাসা বাড়ে, সকলেই তৃষ্ণায় কাতর, কিন্তু কাহারও নড়াচড়া করিবার সামর্থ্য নাই। মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিয়া রৌদ্রতপ্ত দীর্ঘ দিবস কাটিয়া গেল। ক্রমে রাত্রি আসিল। তথাপি হতভাগ্যগণের ক্লেশ অপনয়নের জন্য কেহ দেখা দিল না। আকাশে চন্দ্রোদয় হইল; নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্র। মধ্যরাত্রে দারুণ শীত। রাজপুতানায় দিনে যেমন গরম, রাত্রে তেমনই ঠাণ্ডা পড়ে। চারিদিকে 'জল জল' কাতরধ্বনি। শিবাকুল মৃতদেহ ভক্ষণ করিতে করিতে ক্রমে সাহসী হইয়া মুমূর্ষু আহতগণের সন্নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। দুর্ব্বল ক্ষীণ হস্তে মাটি বা পাথরে ঢেলা ছুড়িয়া এবং ক্ষীণ কণ্ঠে যথাসম্ভব জোরে চীৎকার করিয়া উহারা তাহাদের বিতাড়িত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিল। কষ্টের অবধি নাই। যন্ত্রণাকাতর স্কিনার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যদি ভগবানের অশেষ করুণায় তিনি কোনমতে এ যাত্রায় রক্ষা পান তবে জীবনে আর কখনও সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিবেন না এবং যদি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেন তাহা হইলে করুণাময় পরমপিতার নামে একটা গীর্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন।

পরদিন সকালে একটি বৃদ্ধ এবং একটি বৃদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিল। উহাদের নিকট একটি ঝুড়ি এবং এক পাত্র জল ছিল। বৃদ্ধা ঝুড়ি হইতে সকল আহত ব্যক্তিকে একখানি করিয়া জোয়ারী রুটি এবং পানীয় দিয়াছিল। জলপান ও আহারের পর স্কিনার কতকটা স্বস্তি অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গী আহত সুবেদারটি উচ্চবর্ণের রাজপুত ছিল। তাঁহার বহু অনুরোধসত্ত্বেও সে ব্যক্তি কিছুই লইল না; জানাইল সে মৃত্যুপথের যাত্রী, ঘণ্টাকয়েকের জন্য যন্ত্রণার অত্যধিক উপশমে কিছু যায় আসে না, অন্তিম সময়ে অন্ত্যজ-জাতীয়ার স্পৃষ্ট খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করিয়া সে জাত বা পরলোক খোয়াইতে প্রস্তুত নহে।

সে যাহা হউক, উনিয়ারার রাজার লোকজনেরা পরে শবসমূহের সৎকার এবং আহতগণকে শিবিরে লইয়া যাইতে আসিয়া স্কিনারকে উদ্ধার করিয়াছিল। এক মাস পরে তিনি মুক্তি গ্রহণ করিয়া-

ছিলেন। এখানে বলা প্রয়োজন তেজস্বী আচারনিষ্ঠ রাজপুত সৈনিকটিও রক্ষা পাইয়াছিল। মুক্তিলাভের পর স্কিনার সেই অন্ত্যজজাতীয়া স্ত্রীলোকটিকে মাতৃসম্বোধন করিয়া কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ এক সহস্র টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

অনন্তর স্কিনার স্বীয় আঘাতজনিত ক্ষতের চিকিৎসার জন্য ছুটি লইয়া কলিকাতায় ভগিনী মিসেস টেম্পলটনের নিকট আগমন করেন (ফেব্রুয়ারী ১৮০০ খ্রীঃ) এবং সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিয়া পর বৎসরের প্রারম্ভে কর্মক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করেন।

ইহার পর তিনি কর্নেল পেবঁর তৃতীয় ব্রিগেডের সহিত বিখ্যাত সুস্থার যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন। স্কিনার বলেন ঐ যুদ্ধে তাঁহাদের তিন জন ব্রিটিশ অফিসার নিহত এবং এক সহস্র সিপাহী হতাহত হইয়াছিল। কথাটি অত্যুক্তিদোষদুষ্ট। কমটনের মতে স্কিনারপ্রদত্ত সৈন্যসংখ্যা তিন অথবা চার দিয়া ভাগ করিয়া লওয়া প্রয়োজন।

অতঃপর জর্জ টমাসের সহিত সংগ্রামে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। টমাসের পতনের পর পরাজিত বিপন্ন শত্রুর চরম দুর্দিনে তাঁহার সহিত বীরোচিত শান্ত ভদ্র আচরণের জন্য স্কিনারকে সত্যই প্রশংসা করিতে হয়।

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি পেব র সহিত উত্তর ভারত হইতে উজ্জয়িনী গমন করেন এবং সিন্ধিয়া ও তাঁহার ফরাসী সেনাপতির সেই বিখ্যাত ঐতিহাসিক দরবারেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতেই ঐ ঘটনাটি জানিতে পারা যায়।

ক্যাপ্টেন রবার্ট ওয়াল্টার ডুবিগনন দি টালবট

ক্যাপ্টেন রবার্ট ওয়া র ডুবিগনন জাতিতে ফরাসী ছিলেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে একবিংশতি বর্ষ বয়সে তিনি মরিশস হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন। সরধানা-বাহিনীতে তিনি এক ব্যাটালিয়ন সিপাহী-সেনার নেতৃত্ব এবং বেগমের শরীররক্ষীদলের অধ্যক্ষতা লাভ করেন। মোসেস নামক বেগমের একজন ফরাসী ইহুদী কর্মচারীর কন্যা এলেনকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী আনা রণজিৎ সিংহের বিখ্যাত সেনাপতি জেনারেল ভেঞ্চুরার পত্নী ছিলেন। ভেঞ্চুরার নিকট হইতে প্রশস্ততর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশলাভের আশ্বাস পাইয়া ডুবিগনন বেগমের কার্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত লাহোর গমন করেন (১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ)। অতঃপর ডুবিগনন মহারাজা রণজিৎ সিংহের সেনাবিভাগে প্রবিষ্ট হন; তবে, কখন এবং কি উপলক্ষ্যে যে তিনি সেই পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা সঠিক জানা যায় না বলিয়া কেহ কেহ লিখিলেও* তাহা সত্য নহে। শিখ সৈন্যদলে প্রবেশ-চেষ্টা তাঁহার সফল হয় নাই, যেহেতু রণজিৎ সিংহ নিকটতম আত্মীয়দিগকে একত্রে কর্মপ্রদান করিতেন না। এদিকে বেগমের দেহান্তে তদীয় জায়গীর ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। তখন উপায়ান্তরের অভাবে ডুবিগনন লাহোর নগরে ব্যবসায়কার্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন। মধ্যে ১৮.. খ্রীষ্টাব্দে একবার কিছুদিনের জন্য নবপ্রতিষ্ঠিত "ইণ্ডাস ট্রেডিং কোম্পানী"র কর্মগ্রহণ ব্যতিরেকে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি শিখ রাজধানীতে অবস্থান করিয়া ইউরোপে শাল তাফতা এবং কাশ্মীরজাত অন্যান্য দ্রব্যাদি রপ্তানিকার্যে নিয়োজিত ছিলেন। সেরসিংহের হত্যার পর পঞ্চনদ প্রদেশে ক্রমশঃ অরাজকতাবৃদ্ধিহেতু ব্যবসায়ে মন্দা পড়িয়া যায়, তখন তিনি (১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে) লাহোর পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা আগমন করেন। কিন্তু স্বল্পকাল মধ্যেই পুনরায় ইংরেজ-অধিকৃত লুধিয়ানায় ফিরিয়া গিয়া ব্যবসাকার্য আরম্ভ করেন। এইখানে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পত্নী এলেনের এবং ১৮.. খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার নিজেরও দেহান্ত হইয়াছিল। তথায় উভয়ের এবং আনা ভেঞ্চুরার সমাধি আছে। মৃত্যুকালে ডুবিগনন দুই কন্যা এবং একটি পুত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন।

* Miles Irving:—*List of Inscriptions on Christian Tombs and Monuments in the Punjab*, Vol. II, p. ..

বিনোবা

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

(আশ্রমে)

১

বিনোবা মহাত্মাজীর আশ্রমে গেলেন। সুরাট হইতে মা ও বাবাকে সংক্ষেপে গৃহত্যাগের খবর দিয়াছিলেন। তাহা বাদে আর কোন সংবাদ বিনোবা তাঁহাদের দেন নাই। একথা জানিয়া গান্ধী ব্যথিত হইলেন। মা-বাবা বাড়ীতে চিন্তায় আছেন। তাঁহাদের কুশল জ্ঞাপন করা ধর্ম্ম। তাঁহাদের চিন্তায় রাখা হিংসা। অহিংসার [illegible]াধা স্বয়ং তাঁহাদের পত্র দি[illegible]।—পোষ্ট-কার্ডে চারিটি লাইন :

"আপনাদের পুত্র আমার কাছে এসেছে। আপনাদের পুত্রে এত অল্প বয়সে যে তেজস্বিতার স্ফূর্ত্তি ও বৈরাগ্যের উদয় হয়েছে, তেমনিতর বৈরাগ্যের সাধনায় আমার অনেক দিন লেগেছে, অনেক কষ্ট আমায় করতে হয়েছে।"

সবরমতী আশ্রমের তখন সবেমাত্র পত্তন হইয়াছে। আশ্রম ছিল সংলগ্ন গ্রাম কোচরাবে—এক ভাড়াটে বাড়ীতে। সারাদিন বিনোবা তাঁত বুনিতেন। আর সকাল-সন্ধ্যা বাপুর প্রার্থনা-প্রবচন শুনিতেন। এই ছিল তাঁহার দ্বিতীয় কাজ। কিন্তু বিনোবার স্বরূপ নির্দ্ধারণে গান্ধীর বিলম্বও হয় নাই আর ভুলও হয় নাই। মহাদেব ভাইয়ের কথায় :

"১৯১৭ সাল। এণ্ডরুজ তখন আশ্রমে ছিলেন। বিনোবা সম্বন্ধে গান্ধী তাঁকে বলেন, 'আশ্রমে দু'চারটি রত্ন আছে। বিনোবা তাঁদের একজন। কৃতার্থ হতে এঁরা আশ্রমে আসেন না, আসেন আশ্রমকে কৃতার্থ করতে। নিতে এঁরা আসেন না, আসেন দিতে।"

আশ্রমকে তো বিনোবা দিতে গিয়াছিলেন, দিয়াছিলেন। আশ্রম হইতে প্রতিদানে কি তিনি কিছু পান নাই? মহাদেব ভাইয়ের কথা উদ্ধৃত করিতেছি :

"গান্ধীজী তো বলেছেন তিনি (বিনোবা) আশ্রম থেকে নিতে আসেন নি, এসেছেন দিতে। কিন্তু কোন বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বিনোবা বলেছেন, 'আশ্রম থেকে যে কি পেয়েছি তা এক আমিই জানি। দেশের কাজে হিংসাত্মক কিছু করে জীবন সার্থক করব এ ছিল ছোটবেলা থেকে আমার মনের ঐকান্তিক আগ্রহ। বাপুর আশীর্বাদে সে প্রকৃতি আমার দূর হয়েছে। আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরের মত আমার অভ্যন্তরে ক্রোধ ও অপর রিপুর আগুন ধকধক জ্বলেছিল। বাপু তা নির্ব্বাণ করেছেন। আশ্রমে প্রতিদিন আমি এগিয়ে গিয়েছি। প্রতি বছর এক একটি মহাব্রত আমি আয়ত্ত করেছি।"

ভারতবাসীর কাছে, জগদ্বাসীর কাছে বিনোবার পরিচয় দিতে [illegible] (১৯৪০) গান্ধী বলেন :

"...সংস্কৃতে তিনি সুপণ্ডিত। আশ্রমের প্রায় সুরুতে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। আশ্রমের প্রাথমিক সদস্যদের তিনি অন্যতম ছিলেন। আরও বেশী সংস্কৃত অধ্যয়ন করে সমধিক যোগ্যতা অর্জ্জনের নিমিত্ত তিনি এক বছরের ছুটি নেন। এক বছর পূর্ব্বে যেদিন যে ক্ষণে তিনি আশ্রম থেকে গিয়েছিলেন এক বছর পরে প্রায় সে মুহূর্ত্তে তিনি চুপচাপ ফিরে আসেন। মলমূত্র অপসারণ করা থেকে রান্নাবান্না সব কাজই তিনি করতেন। তাঁহার স্মরণশক্তি বিস্ময়কর। আর অধ্যয়ন তাঁর সহজাত বৃত্তি। তা হলেও দিনের অধিকাংশ সময় তিনি সুতা কাটতেন। সুতাকাটায় তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁহার সমকক্ষ কচিৎ দু'এক জন আছেন। অধ্যাপনা তাঁর শীল। তাই হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদান-পদ্ধতির উদ্ভাবনে আশা দেবীকে তিনি অসামান্য সহায়তা করেছেন। ...তাঁর হাতে-গড়া এক যুবক তাঁর নির্দ্দেশে কুষ্ঠসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন।"

আর এক দিক দেখুন। ধুলিয়া জেলে এক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে (১৯৩২) বিনোবা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হইতে এই দেনা-পাওনার ঠিক আন্দাজ করা যাইবে :

"আজকালের রেওয়াজ হচ্ছে রামায়ণের ভাষায় কথা বলা। ইংরেজ সরকার হচ্ছে রাবণ। মহাত্মাজী হচ্ছেন রাম। বল্লভভাই হনুমান। জবাহরলাল অঙ্গদ। বক্তারা এ ভাষায় কথা বলেন। আমি ভাবি রামায়ণের এই পাত্র-পাত্রীর তালিকায় আমার স্থান কোথায়? খুঁজে খুঁজে পেলাম অহল্যা-শিলা! আহা! সে শিলা যদি হতে পারি তো আমি ধন্য, কৃতকৃতার্থ।"

২

শরীর ভাল যাইতেছিল না। বিনোবা তিন মাসের ছুটি লইলেন। ওয়াঈতে গেলেন। ওয়াঈতেও ভাবেদের আর এক বাড়ী ছিল। ওয়াঈ মহাবালেশ্বর গিরির পাদদেশে কৃষ্ণা নদীর তীরে অবস্থিত—স্বাস্থ্যনিবাস, তীর্থস্থান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে রমণীয়। প্রজ্ঞা পাঠশালা নামে তখন সেখানে এক চতুষ্পাঠী ছিল। চতুষ্পাঠীর আচার্য্য ছিলেন নারায়ণ শাস্ত্রী মারাঠে। বিনোবার অনেক দিনের বাসনা ছিল ঐ আজন্ম ব্রহ্মচারীর কাছে ব্রহ্মসূত্র ও শাঙ্করভাষ্য অধ্যয়ন করিবেন। সে বাসনা পূর্ণ হইল। স্বাস্থ্যোদ্ধার ও জ্ঞান-চর্চ্চা সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। নিজে তিনি শাস্ত্রীর কাছে জ্ঞান আহরণ করেন, আর সুযোগমত অন্যকে জ্ঞান দান করেন। যে তিন মুখ্য সূত্র তিনি জীবনের ধ্যেয় রূপে

গ্রহণ করিয়াছিলেন এভাবে তাহার তৃতীয়টির* আচরণ করিতেছিলেন।

ওয়াঈতে যতদিন থাকিবেন মনে করিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা অধিক দিন থাকিলেন। জ্ঞান আহরণের আগ্রহ তাঁহাকে বাঁধিল। পাঠান্তে সুরু হইল পদব্রজে মহারাষ্ট্রে যাত্রা। এ ভাবে তিন মাসের জায়গায় এক বছর অতীত হইল, আশ্রমের বাহিরে কাটিল। এই এক বছরের কার্য্যকলাপ ও ঘোরাফেরার সম্পর্কে সে সময়ে গান্ধীকে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্মার্থ মহাদেব ভাইয়ের ডায়েরি হইতে নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

১০. ২. ১৮

পূজ্য বাপুজী,

অসুস্থতার দরুন এক বছর আগে আশ্রম থেকে বেরিয়ে পড়ি। মনে করেছিলাম মাস দুই ওয়াঈতে থেকে আশ্রমে ফিরে যাব। কিন্তু চলে গেছে এক বছর, তবুও আমার দেখা নেই। তাই আশ্রমে ফিরব কিনা, বেঁচেই আছি কিনা এরূপ শঙ্কা ওখানে যদি জেগে থাকে তো আশ্চর্য্যের নয়। এ ক্ষেত্রে দোষ যে সবটাই আমার এ কথা আমায় স্বীকার করতেই হবে। সাধারণভাবে মামাকে (মামা ফড়কেকে) দু'একখানি পত্র লিখেছিলাম। সে পত্রে লিখেছিলাম—'সত্যাগ্রহ' আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা হলে আমায় জানাবেন। সবকিছু ফেলে তখনই আশ্রমে ফিরে যাব। অন্যথায় যে লোভে এতদিন আশ্রমের বাইরে থেকে গেছি সে কাজ শেষ করে ফিরব। আশ্রম ছেড়ে চলে গেছে একথা যদি কেউ মনে করে থাকেন তো সে দোষ আমারই। পত্র লেখার অভ্যাস আমার নেই। কিন্তু একথা না বললে নয় যে, আশ্রম আমার মনে আসন পেতেছে। ততোধিক, আশ্রমের নিমিত্তেই আমার জন্ম—এ প্রতীতি আমার জন্মেছে। অতএব প্রশ্ন উঠবে, তা যদি হবে তবে এক বছর আমি বাইরে রয়েছি কেন ?

দশ বছর যখন বয়স তখন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—ব্রহ্মচর্য্য পালন করে দেশসেবা করব। তার পরে হাই ইস্কুলে ভর্তি হই। সে সময়ে গীতা পড়ার আগ্রহ হয়। কিন্তু বাবা আদেশ করলেন দ্বিতীয় ভাষা রূপে আমায় ফ্রেঞ্চ পড়তে হবে। তা হলেও গীতার আকর্ষণ কমল না। গৃহে নিজে নিজে সংস্কৃত পড়তে লাগলাম। বেদান্ত এবং তত্ত্ববিদ্যা অধ্যয়ন করবার সঙ্কল্পও আমার ছিল। আপনার অনুমতি নিয়ে আমি আশ্রমে যোগ দিই। কিন্তু বেদান্ত অধ্যয়নের উত্তম সুযোগ তখন উপস্থিত হয়। ওয়াঈতে নারায়ণশাস্ত্রী মারাঠে নামক একজন আজন্ম ব্রহ্মচারী পণ্ডিত বেদান্ত ও অন্য শাস্ত্র ছাত্রদের পড়াতেন। তাঁর কাছে উপনিষদ পড়ার লোভ আমার হ'ল। সেই লোভ হেতু ওয়াঈতে আমি অধিক দিন থেকেছি। ইতিমধ্যে আমি যা যা করেছি তা জানাচ্ছি।

যে লোভে এতদিন আশ্রমের বাইরে থেকেছি আর তদনুসারে যে কাজ করেছি তা এই :

(১) উপনিষদ, (২) গীতা, (৩) ব্রহ্মসূত্র ও শাঙ্কর-ভাষ্য (৪) মনুস্মৃতি ও (৫) পাতঞ্জল যোগদর্শন—এ গ্রন্থগুলি পড়েছি। তা ছাড়া (১) ন্যায়সূত্র, (২) বৈশেষিক সূত্র, (৩) যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি ইত্যাদিও অধ্যয়ন করা হয়েছে। অধিক শেখার মোহ নেই। আর যা পড়বার নিজে নিজেই পড়ে নেব। আর এক কাজ ছিল স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান, আর তার জন্যেই ওয়াঈতে আগমন। সে সম্বন্ধে :

স্বাস্থ্যলাভের নিমিত্ত প্রথমে আমি দশ-বারো মাইল ভ্রমণ করতাম। পরে ছ' সের থেকে আট সের গম পিষতাম। বর্তমানে তিন শ' সূর্য্য নমস্কার ও ভ্রমণ—এ হচ্ছে আমার ব্যায়াম। এর ফলে স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে।

আহারের কথা। প্রথম ছ' মাস লবণ খেয়েছি। পরে ছেড়ে দিয়েছি। মসলা টসলা মোটে খাই নি। প্রতিজ্ঞা করেছি মসলা আর লবণ জীবনে খাব না। দুধ খেতে আরম্ভ করেছি। বহু পরীক্ষার পরে দেখতে পেয়েছি যে দুধ ছাড়া বেশী দিন চলে না। তবুও, ছাড়া সম্ভব হলে ছাড়ব বাসনা আছে। এক মাস কেবল কলা, দুধ ও কমলালেবু খেয়ে থেকেছি। ফলে দুর্ব্বল হয়ে গিয়েছিলাম। এখনকার আহার এইরূপ :

দুধ দেড় সের (৬০ তোলা), ভাখরী দুই খানা (২০ তোলা জোয়ারের), চার-পাঁচটি কলা ও লেবু একটি (পাওয়া গেলে)। স্থির করেছি আশ্রমে ফিরে আপনার পরামর্শ অনুসারে খাদ্য ঠিক করব। স্বাদের জন্য কোন জিনিস খাওয়ার ইচ্ছাই হয় না। তা সত্ত্বেও উপরে যে খাদ্যের উল্লেখ করা গেল তা নেহাতই আমিরী, এ কথা অনুভব করি। দৈনিক খরচ মোটামুটি এইরূপ :

কলা ও লেবু	/০
জোয়ার	৻১০
দুধ	/৫
একুনে	৶১৫

এতে কি অদল-বদল করা দরকার তা আপনার কাছ হতে জানতে বাসনা। পত্রে জানাবেন।

কার্য্য :

১। গীতার ক্লাস নিয়েছি। বিনা পারিশ্রমিকে ছ'জনকে অর্থসমেত গীতা শিখিয়েছি।

২। জ্ঞানেশ্বরী ছয় অধ্যায়। চার জনকে পড়িয়েছি।

৩। উপনিষদ—নয়। ক্লাসে দুই জন ছাত্র ছিল।

৪। হিন্দীপ্রচার—হিন্দী সংবাদপত্র পড়তে দিয়েছি পড়িয়েছি।

---

* বিনোবার মতে জীবনের তিন মুখ্য বস্তু হইতেছে—(১) উদ্যোগ, (২) ভক্তি ও (৩) পঠন-পাঠন—যত পার আহরণ কর আর যত পার দাও।

৫। ইংরেজী—দু'জনকে শিখিয়েছি।

৬। ভ্রমণ করেছি প্রায় ৪০০ মাইল—পায়ে হেঁটে। [illegible]গড়, সিংহগড়, তোরণগড় আদি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দুর্গ [illegible]খেছি।

৭। প্রবাসকালে গীতার উপর প্রবচন। (ব্যাখ্যা) [illegible]মার কাজ বিনা ব্যতিক্রমে চলেছে। আজ পর্যন্ত পঞ্চাশটি [illegible]ছি। এখন এখান থেকে হেঁটে বোম্বাই যাব আর সেখান [illegible] রেলে আশ্রমে। পঁচিশ বছরের একটি ছাত্র আমার সঙ্গে [illegible]। আমার কাছে গীতা শিখবে এ তার আগ্রহ। খুব দেরি [illegible] চৈত্র শুক্লপক্ষের প্রথম দিনে আশ্রমে পৌছব।

৮। ওয়াঈতে 'বিদ্যার্থী মণ্ডল' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা [illegible]ছি। 'বিদ্যার্থী মণ্ডলে' একটি গ্রন্থাগার খোলা হয়েছে। বই [illegible] জন্ত জাতায় গম পিষে অর্থ সংগ্রহ করা গেছে। [illegible]ত্তায় ক্লাসে আমাকে নিয়ে পনর জন গম পিষতাম। সেরে দু' [illegible] হারে নিতাম। ফলে যারা গম পিষায় তাদের গমই আমরা [illegible] নিতাম। আয় যা পেতাম গ্রন্থাগারে দিয়েছি। ধনীর [illegible]ও ক্লাসে ছিল। একে ওয়াঈ পুরাতনপন্থী জায়গা তাতে [illegible]ই আমরা ইস্কুল-পড়ো ব্রাহ্মণতনয়। অতএব সকলে [illegible]দের পুরা মূর্খ ঠাওরেছে। তা হলেও ঐ ক্লাস দু'মাস চলেছে [illegible] গ্রন্থাগারে চার শ' বই সংগ্রহ হয়েছে।

৯। সত্যাগ্রহ আশ্রমের তত্ত্ব লোকের কাছে ধরায় বিশেষ [illegible]করেছি।

[illegible]। বরোদায় আট দশ জন বন্ধু আছেন। জনসেবার [illegible] তাঁদের আছে। তা দেখে, মাতৃভাষার প্রচারের জন্ত তিন [illegible] আগে সেখানে এক প্রতিষ্ঠান গড়েছিলাম। ঐ সংস্থার বার্ষিক [illegible] গিয়েছিলাম (উৎসব মানে, কি করা হয়েছে আর ভবিষ্যতে [illegible] হবে সে বিষয়ে আলোচনা করার জন্ত সদস্যদের একত্র [illegible])। হিন্দীপ্রচারের কার্য গ্রহণ করার কথা বলি। [illegible] বিশ্বাস এ প্রতিষ্ঠান এ কাজে মন দেবে। আপনি [illegible]চারের চেষ্টা করছেন। সে কাজে এ সংস্থা সাহায্য [illegible]

[illegible]শেষে, সত্যাগ্রহ আশ্রমের সদস্য হিসাবে আমার আচরণ [illegible]ছিল তা বলা প্রয়োজন।

[illegible]দব্রত—আহারের কথায় সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে—তা [illegible] জিনিষটা বোঝা যাবে।

[illegible]রিগ্রহ—কাঠের থালা, বাটি, আশ্রমের একটি ঘটি, ধুতি, [illegible]ই—পরিগ্রহের মধ্যে এ আছে। ঠিক করেছি ফতুয়া, [illegible]দি ব্যবহার করব না। গাত্র আচ্ছাদন ধুতি দিয়ে করি। [illegible]া কাপড় ব্যবহার করি।

[illegible] স্বদেশী বিদেশীর প্রশ্ন আমার বেলায় ওঠে না (আপনি মাদ্রাজে যে ব্যাখ্যা* দিয়েছেন যত ব্যাপকই তা হোক না কেন)।

সত্য, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য—আমার বিশ্বাস এই তিন ব্রতের পালনে জ্ঞানকৃত কোন ত্রুটি আমায় হয় নাই। অধিক কি লিখব। স্বপ্নে ও মনে যে কথা জাগে তা এই—ঈশ্বর আমা হতে কোন সেবা নেবেন কি? একটি ছাড়া সর্বক্ষেত্রে আমি আমার আচরণ আশ্রমের নিয়মানুযায়ী নিয়মিত করেছি। অর্থাৎ, আমি আশ্রমেরই একজন এ কথা আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি। আশ্রমই আমার সাধ্য। যে ত্রুটির কথা উপরে বলেছি তা হচ্ছে নিজ খাদ্য (ভাখরী) নিজে তৈরি করে নেওয়া সম্বন্ধে। চেষ্টা করেছি। কিন্তু প্রবাসে তা সম্ভব হয় নাই।

সত্যাগ্রহের প্রশ্ন (দেশ-সত্যাগ্রহের কথাই অবশ্য বলছি।) বা অন্ত কোন প্রশ্ন উপস্থিত হয় ত অবিলম্বে চলে যাব। নয় ত উপরে যে তারিখের কথা বলেছি সেদিন নিশ্চিত পৌছব।

ইতিমধ্যে আশ্রমে কি কি পরিবর্তন হয়েছে? ছাত্রসংখ্যা কত? জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে কি? আমার খাজে কি

---

* ১৯১৩ সালে ১৪ই ফেব্রুয়ারী মিশনরি কনফারেন্সের মাদ্রাজ অধিবেশনে গান্ধী স্বদেশীর একটি সংজ্ঞা দেন। বিনোবা এখানে সেই সংজ্ঞার কথা বলছেন। গান্ধীর উক্তির প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে:

"অপেক্ষাকৃত দূরের লোকের তৈরী জিনিস ব্যবহার করার কথা মনে স্থান না দিয়ে, অপেক্ষাকৃত দূরের লোকের সেবা করার কথা না ভেবে নিকটতম প্রতিবেশীর তৈরী জিনিস ব্যবহার করার, নিকটতম প্রতিবেশীর সেবা করার যে মনোবৃত্তি তাকে স্বদেশী বলে। অতএব এ সংজ্ঞানুসারে ধর্ম ব্যাপারে আমার কর্তব্য হচ্ছে আমার পূর্বজনগণের অর্থাৎ আমার নিকটতম লোকেদের অনুসৃত ধর্মের অনুসরণ করা। ত্রুটি থাকে ত সে ত্রুটি দূর করে তার সেবা করা আমার কর্তব্য। অর্থনীতি ক্ষেত্রে আমার কর্তব্য হচ্ছে আমার নিকটতম প্রতিবেশীর প্রস্তুত জিনিস ব্যবহার করা,—সে সকল শিল্পের উত্তরোত্তর উন্নতিবিধান করা আমার ধর্ম,- ত্রুটি-রহিত করে তাদের নিখুঁত সুন্দর বানানো আমার ধর্ম।

"আর যাই হোক অর্থনীতি ব্যাপারে স্বদেশী ব্রত-গ্রহণ করা ভারতের পক্ষে সম্ভব নয় একথা হামেশা শোনা যায়। এরূপ যাঁরা বলেন, স্বদেশীকে তাঁরা জীবন-ব্রত বলে মনে করেন না। আত্মত্যাগের প্রশ্ন উঠলেই তাঁদের দেশ-প্রেমে ভাটা পড়ে। এ সংজ্ঞা গ্রাহ্য হলে ব্রতের মতই স্বদেশী অলঙ্ঘনীয়, শারীরিক শত অসুবিধা সত্ত্বেও তাহা পালনীয়। এ ভাব যদি মনে আসে তা হলে 'পিন্' মিলবে না। সূচ পাওয়া যাবে না এ শঙ্কায় মন খিন্ন হবে না। যা হলে কাজ চলে না এরূপ সব জিনিস ছাড়াই স্বদেশ ব্রতীকে চলতে হবে···

"স্বদেশী বিনয়-পন্থার, প্রেম-পন্থার একমাত্র পাথেয়।"

পরিবর্তন করা দরকার তা জানার একান্ত বাসনা। আপনি নিজ হাতে পত্র লিখবেন এ বিনোবার—আপনাকে পিতার তুল্য মনে করে এরূপ যে আপনার পুত্র—তার নিবেদন। দু'চার দিন মধ্যে এ গ্রাম ছেড়ে যাব।

প্রণত বিনোবা

এই পত্র পড়িয়া, "গোরখনে মছন্দর কো হরায়"*। ভীম আর ভীম"—গোরখ মছন্দরকে হারিয়েছে। ভীমই বটে, ভীম—এই উক্তি বাপুর মুখ হইতে নিঃসৃত হইল। পরদিন সকালবেলা প্রত্যুত্তরে তিনি লিখিলেন :

"তোমার সম্বন্ধে কি বিশেষণ ব্যবহার করব ঠাওর করতে পারছি না। তোমার ভালবাসা ও তোমার চরিত্র আমায় অভিভূত করে ফেলে। তোমাকে পরীক্ষা করতে আমি অক্ষম। তুমি নিজে নিজের যে পরীক্ষা করেছ তা আমি স্বীকার করে নিচ্ছি আর তোমায় পিতার পদ গ্রহণ করছি। আমার আকাঙ্ক্ষা তুমি প্রায় পূর্ণ করেছ। আমি বিশ্বাস করি যে, খাঁটি পিতা নিজের অপেক্ষা অধিক চরিত্রবান পুত্র উৎপন্ন করে থাকে। যে পুত্র পিতার কর্ম আরও অধিক অগ্রসর করে দেয় সে-ই যথার্থ পুত্র। পিতা সত্যবাদী, দৃঢ়, দয়াময় হলে পুত্রে এ সব গুণ সমধিক পরিস্ফুট হয়ে থাকে। তোমাতে তা দেখতে পাচ্ছি। আমার প্রযত্নে তা তুমি পেয়েছ একথা আমি মনে করি না। অতএব তুমি যে আমায় পিতৃপদ দিয়েছ তা আমি তোমার ভালবাসার দান বলে গ্রহণ করছি। এ পদের যোগ্য হওয়ার প্রযত্ন করব। আর আমি যখন হিরণ্যকশিপু হব তখন ভক্ত প্রহ্লাদের মত আমার আদর-অনাদর করো।

আশ্রমের বাইরে থেকেও আশ্রমের নিয়ম ভালভাবে পালন করেছ—তোমার একথা ঠিক। তোমার আশ্রমে ফিরে আসার সম্বন্ধে আমার কোন সংশয় ছিল না। মামা (ফড়কে) তোমার দেওয়া খবর আমায় পড়ে শুনিয়েছিলেন। ঈশ্বর তোমায় দীর্ঘজীবী করুন আর তোমার দ্বারা ভারতের উন্নতি হোক এ কামনা করি।

তোমার আহারে কোন পরিবর্তন করার মত কিছু এখন আমি দেখতে পাচ্ছি না। দুধ এখন যেন ছাড়বে না। উল্টো প্রয়োজন-বোধে আরও বেশী খাবে।

রেল সত্যাগ্রহের আবশ্যকতা এখনও উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু তার জন্য জ্ঞানী প্রচারকের দরকার আছে। পেড়াতে সত্যাগ্রহ করার দরকার হয়তো হবে। এখন তো আমি বিহারে [illegible] দু'একদিন মধ্যে দিল্লী যাব।

সবিশেষ সাক্ষাৎমত। সকলে তোমার পথ চেয়ে আছে।

বাপুর আশীর্বাদ"

পরে এক সময় বাপু বলিলেন :

"মস্ত বড় মানুষ। বরাবরই আমি মনে করে [illegible] রাষ্ট্রীয় ও মারাঠীদের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। [illegible] নাই। কিন্তু মহারাষ্ট্রীদের কেহ আমাকে কখনও [illegible] নাই। তাঁহাদের মধ্যে বিনোবা ত ঢের করেছে।"

উপরে বলা হইয়াছে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বিনোবা আশ্রম হইতে বাহির হইলেন, ওয়াঈতে গেলেন। ১. ৩. ১৭ তারিখে [illegible] সুহৃদ ডাঃ দাতারকে (পুণার বিখ্যাত সার্জন) লিখিত [illegible] পত্র হইতে দেখা যাইতেছে তিনি সরাসরি ওয়াঈতে যান নাই। কিছুদিন এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করেন। আহমদাবাদ হইতে বোম্বাই যান। আর বোম্বাই হইতে যান পুণায় তিলক [illegible] সেই সাক্ষাৎকারের বিবরণ একদিকে যেমন মনোরম [illegible] তেমনি ঐ বাইশ বছরের যুবকের জ্ঞানপরিধির প্রসারের পরিচায়ক। ঐ বিবরণ পড়িতে পড়িতে মনে পড়িয়া যায় বিনোবার পিতামাতাকে লিখিত গান্ধীর সেই ক্ষুদ্র পত্রের কথা। [illegible] কাছে বন্ধুদের কিভাবে তিনি চিনিতেন তার সাক্ষ্য [illegible] হইতে মিলে। পত্রখানি এই :

সুহৃদবরেষু,

আপনার অনুগ্রহলিপি পেয়েছি। দেরিতে উত্তর [illegible] আমার রেওয়াজ হয়ে গেছে। আজ পেয়াল হ'ল। [illegible] চৌদ্দই জানুয়ারী রবিবার আশ্রম থেকে বেরিয়েছি। [illegible] আজ পর্যন্ত যা যা করেছি আনুপূর্বিক বলছি। আহমদাবাদে গাড়ীতে চেপেছি তো এক শাস্ত্রীর সঙ্গে দেখা। তাঁর সঙ্গে [illegible] আলোচনা চলল বরোদা পর্যন্ত। বেশ কাটল সময়টা। [illegible] পরে হ'ল আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ। পরে সুরাটের এক [illegible] শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলে। তাঁর সঙ্গে [illegible] বলতে বলতে গাড়ী বোম্বাই পৌঁছে গেল। গৃহ্যসূত্র সম্বন্ধে [illegible] লিখেছেন। সে বিষয়ের আলোচনার জন্য বোম্বাই যাচ্ছিলেন [illegible] গেল তাঁর সঙ্গে পূর্বেই পরিচয় হয়েছিল। তাঁকে বললাম, [illegible] তিলকের সঙ্গে দেখা করে আসি। রাজী করানো গেল না। [illegible] দিন বোম্বাইয়ে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ালাম। বোম্বাই থেকে [illegible] আসা গেল। উঠলাম অনাথ বিদ্যার্থী গৃহে। গায়কোয়াড় [illegible] গেলাম। নরসোপন্থের কাছে তিলকের খোঁজ করে [illegible] দু'এক দিন মধ্যে তিনি আসবেন।

তৎক্ষণাৎ লোকশিক্ষাবিদ গুকের সঙ্গে দেখা করার জন্য [illegible] পড়লাম। দু' ঘণ্টায়ও হদিস মিলল না। ততক্ষণে [illegible] লোককে জিজ্ঞাসা করা হয়ে গেছে। 'লোকশিক্ষা' বলে যে এক মাসিক আছে, দেখলাম সে সংবাদ খুব কম লোকে রাখে।

---

* গোরখনাথ ও মছন্দরনাথ যোগী-সম্প্রদায়ের গুরু। গোরখনাথের নাম হইতে গোরখপুরের নাম হইয়াছে। গোরখনাথ মছন্দরনাথের শিষ্য। একবার মছন্দরনাথ মায়াজালে আবদ্ধ হন। গোরখনাথ নিজ যোগবলে মছন্দরনাথের উদ্ধার করেন। এই কাহিনী হইতে "গোরখনে মছন্দরনাথ কো হরায়া"—এই লোকোক্তির উদ্ভব। যে স্থলে শিষ্যের প্রতিভা গুরুর প্রতিভাকে ছাড়াইয়া যায় সে স্থলে এই লোকোক্তির প্রয়োগ হইয়া থাকে।

...ও নয়, আর ছাত্রও নয় এমন লোককে জিজ্ঞাসা করেছি। ...খ্যাতি যে কতটা ঝুটা তার পরিচয় পেলাম। শ্রেষ্ঠ গল্প। ...মি নি, দমবার পাত্র আমি নাই। দু'দিন পরে তিলকের ...কার লাভ হ'ল। বলব কি যে সাক্ষাৎকার ছিল, "গুরোস্তু ব্যাখ্যানাং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়ঃ"-এর মত। সংক্ষেপে বলি। সবিস্তারে লেখা সম্ভব নয়। তা হলেও এক মুমুক্ষু বেদান্তী প্রশ্নগুলি করেছিল, এ দৃষ্টিতে দেখেন তো কিছু মজা পাবেনই।

প্রশ্ন ১ : সত্যোপলব্ধি আপনার হয়েছে কি ?

উত্তর : না।

তিলকের একথা থেকে এ, ও এবং অন্য সকলের যোগ্যতার ...র পরিমাপ হয়ে যাচ্ছে। যে অর্থে প্রশ্ন করেছিলাম উত্তর ...সে অর্থেই পেয়েছি।

প্রশ্ন ২ : জন্মমৃত্যুর ভয় আপনার দূর হয়েছে কি ?

উত্তর : তেমন কিছু বলার নেই।

প্রশ্ন ৩ : অমৃতের অনুভব আপনার হয়েছে কি ?

উত্তর : না।

প্রশ্ন ৪ : বীজক গ্রন্থ (কবীরের ইহা একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ) আপনি পড়েছেন কি ?

উত্তর : না। প্রাকৃত গ্রন্থ আমি বেশী পড়ি নাই। জ্ঞানেশ্বরী কেবল একটু দেখেছি। বাল্যকাল থেকে সংস্কৃতের দিকেই আমার ঝোঁক। তার প্রায় সবকিছু আমি পড়েছি। গীতার সাত শ' শ্লোকের কোথাও খটকা থাকে তো জিজ্ঞাসা করতে পার।

অপর সব প্রশ্ন ও উত্তর দিচ্ছি না। ঐ মহাত্মাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে ঘরে ফিরে আসি। তার পরের চার-পাঁচ দিন যে কি ভাবে কেটেছে তার যদৃচ্ছ চিত্র, যতদিন না আমরা দুয়ে মিলছি আঁকতে থাকুন।

*　　*　　*

মোঘেজী, ধোত্রেজী ও আপনি—আপনারা নিজ নিজ জীবনের লক্ষ্য স্থির করেছেন কি ? কথাটা আর একবার ভেবে দেখবেন। জীবনান্তের পূর্ব্বে স্থির করা ভাল। আপনাদের দোষ দেখছি না। সে যোগ্যতা আমার আদৌ নেই। নিজ মনের কাছে আমি প্রথম প্রশ্নটি করে থাকি। দ্বিতীয়টি জানতে চেয়েছিলাম তিলকের কাছে। আমার ঐ প্রশ্নের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আমার কিছু বলার অধিকার নেই। তা সত্ত্বেও নিজ কার্য্যের উপর অনুক্ষণ দৃষ্টি রাখবেন একথা না বলে পারছি না। আপনার ও আমার মত তরুণেরা তপশ্চর্যা সুরু করি তো ভারতমাতার বন্ধনমোচনে দেরি কতক্ষণ ?

১. ৩. ১৯১৭

কথাটি মোর রাখিয়ো শুধু মনে

সুমিত্রা

কথাটি মোর রাখিয়ো শুধু মনে,
　　কবরী হতে খসিয়া পড়া ফুল
　　কুড়ায়ে লয়ে পরিয়ো সযতনে।

কি জানি আর আসিব কি না ফিরে
　　ভরিল জল কেন যে আঁখি-কোণে ;
আঁধার রাতে একেলা জাগো যদি
　　বিরহগীতি গাহিয়ো আনমনে।

কত যে কথা বেদনা-রসে ভরা
　　হ'ল না বলা, রহিল বুকে জমা ;
দিয়েছি দুখ পেয়েছি ব্যথা যত
　　আজিকে সব করিয়ো শুধু ক্ষমা।

শ্রাবণরাতে বাতাস এসে যদি
　　দুয়ারে হানে আঘাত বারে বারে,
নিভে না হয় গেলই তব বাতি
　　দুয়ার খুলে ডাকিয়ো তবু তারে !

আমার কথা কহিয়ো তারে ধীরে
　　সে যদি এসে শুধায় কানে কানে
আমারে যদি চায় সে পাবে খুঁজে
　　বাদলদিনে রোদনভরা গানে।

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ

শ্রীঅমিয়কুমার সেন

রবীন্দ্রনাথের শৈশবের অনেক ঘটনা পরবর্তী কালে লিখিত তাঁর অনেক ছোটগল্পের মধ্যে ছায়াপাত করেছে। 'জীবনস্মৃতি' বা 'ছেলেবেলা'র সঙ্গে 'গল্পগুচ্ছ' মিলিয়ে পড়লে তার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যাবে। আর পরবর্তী জীবনে পদ্মার তীরে তীরে তাঁর গল্প-গুচ্ছের অধিকাংশ উপকরণ সংগৃহীত হয়েছিল এ কথা তো সর্ব্বজন-বিদিত। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা সকলেই এ রকম ছায়াপাতের নানা উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন। আর একটি উদাহরণ সম্প্রতি চোখে পড়েছে। এক হিসাবে এটি রবীন্দ্র-জীবনের একটি মূল্যবান্ তথ্য। অনুরাগী পাঠকের জন্য এটি সঙ্কলন করে দিচ্ছি।

'ছেলেবেলা' গ্রন্থে তাঁর শৈশবজীবন পরিক্রমা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ শখের যাত্রা শোনার একটি বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন :

'আমাদের সময়কার কিছু পূর্ব্বে ধনীঘরে ছিল শখের যাত্রার চলন, মিহি গলাওয়ালা ছেলেদের বাছাই করে নিয়ে দল বাঁধার ধুম ছিল। আমার মেজকাকা (গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ছিলেন এই রকম একটি দলের দলপতি।···আমাদের বাড়িতে যাত্রাগান হয়েছে মাঝে মাঝে। কিন্তু রাস্তা নেই, ছিলুম ছেলেমানুষ। আমি দেখতে পেয়েছি তাঁর গোড়াকার জোগাড়যন্তর। বারান্দা জুড়ে বসে গেছে দলবল, চারিদিকে উঠছে তামাকের ধোঁয়া। ছেলে-গুলো লম্বা-চুলওয়ালা, চোখে কালি-পড়া, অল্প বয়সে তাদের মুখ গিয়েছে পেকে। পান খেয়ে খেয়ে ঠোঁট গিয়েছে কালো হয়ে।···' (ছেলেবেলা, পৃ ৫)।

এই অল্পবয়সের চোখে কালি-পড়া ছেলেগুলো নীলকান্ত নামে একটি অসহায় ছেলের রূপ ধরে তাঁর 'আপদ' গল্পে ফিরে এসেছে। ওই গল্প থেকে একটু উদ্ধৃত করলেই এ কথার সত্যতা বোঝা যাবে।

'নীলকান্তের ঠিক কত বয়স নির্ণয় করিয়া বলা কঠিন; যদি চৌদ্দ-পনের হয় তবে বয়সের অপেক্ষা মুখ অনেক পাকিয়াছে বলিতে হইবে···।

'আসল কথা এই, অতি অল্প বয়সে যাত্রার দলে ঢুকিয়া রাধিকা, দময়ন্তী, সীতা এবং বিদ্যার সখী সাজিত।···স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক কারণপ্রভাবে সতের বৎসর বয়সের সময় তাহাকে অনতিপক্ক সতেরোর অপেক্ষা অতিপরিপক্ক চৌদ্দর মত দেখাইত।··· তামাকের ধোঁয়া লাগিয়াই হউক বা বয়সানুচিত ভাষা প্রয়োগ বশতই হউক, নীলকান্তের ঠোঁটের কাছটা কিছু বেশী পাকা বোধ হইত···। অনুমান করি, নীলকান্তের ভিতরটা স্বভাবত কাঁচা, কিন্তু যাত্রার দলের তা লাগিয়া উপরিভাগে পক্কতার লক্ষণ দে[খা] দিয়াছে।'

কিন্তু নীলকান্ত যে রবীন্দ্রনাথের শৈশবের শখের যাত্রাদ[লের] স্মৃতি হইতে সংগৃহীত তার আরও বড় প্রমাণ আছে এর পরে 'ছেলেবেলা'র উপরি-উদ্ধৃত অংশের একটু পরেই আছে :

'সবতাতে মানা করাটাই বড়দের ধর্ম্ম। কিন্তু একব[ার] কি কারণে তাঁদের মন নরম হয়েছিল, হুকুম বেরল ছেলেরাও যা[ত্রা] শুনতে পাবে। ছিল নলদময়ন্তীর পালা। আরম্ভ হবার আ[গে] রাত এগারোটা পর্যন্ত বিছানায় ছিলুম ঘুমিয়ে।··· এক স[ময়] ঘুম থেকে উঠিয়ে আমাকে নিয়ে আসা হ'ল বাইরে, চোখে ধাঁ[ধা] লেগে গেল। একতলায় দোতলায় রঙিন ঝাড়লণ্ঠন থে[কে] ঝিলিমিলি আলো ঠিকরে পড়ছে চারদিকে, সাদা বিছানো চাদ[রে] চাদরে উঠানটা ঢেকেছে মস্ত।···রাত ফুরত কিন্তু যাত্রা ফুরো[তে] চাইত না।···ঘুম যখন ভাঙল দেখি মায়ের তক্তপোষে শুয়ে আ[ছি] বেলা হয়েছে বিস্তর, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। সূর্য্য উ[ঠে] গেছে অথচ আমি উঠি নি, এ ঘটে নি আর কোন দিন (ছেলেবেলা, পৃ. ৫)।

সেদিনের নলদময়ন্তীর পালা নানা কারণে শিশু-রবীন্দ্রনাথে[র] মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। বর্ণনা থেকে বোঝা গিয়ে[ছে] যে, এটাই রবীন্দ্রনাথের শিশুবয়সে দেখা একমাত্র যাত্রা। তা ছা[ড়া] মাঝরাতে জেগে উঠে ঘুমজড়ানো চোখে দেখেছিলেন বলে যাত্রা[র] আসর এবং অভিনয় তাঁর কাছে অপরূপ রহস্যময় বলে ম[নে] হয়েছিল, কোনদিন বেলা করে উঠতেন না বলে পরদিন বে[লা] করে ওঠার স্মৃতিও তাঁর মনে জাগরূক ছিল।

নলদময়ন্তীর এই পালাটি 'আপদ' গল্পের নীলকান্তের স[ঙ্গে] অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত।

'কিরণ সহাস্য মুখে পানের বাটা পাশে রাখিয়া খাটের উপ[র] বসিতেন, দাসী তাঁহার ভিজে এলোচুল চিরিয়া চিরিয়া [ধরি]য়া শুকাইয়া দিত এবং নীলকান্ত নিচে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া নল-দময়ন্তীর পালা অভিনয় করিত।'

লক্ষ্য করার বিষয় সারা গল্পটিতে নীলকান্ত নলদময়ন্তী ছা[ড়া] আর কোন পালার অংশ অভিনয় করে নি। অথচ যাত্রা[র] দ[লে] 'সে···রাধিকা, দময়ন্তী, সীতা এবং বিদ্যার সখী সাজিত।' য[দি]ও 'ছেলেবেলা' বা 'জীবনস্মৃতি' কোথাও উল্লেখ নেই, তবু আমা[দের] দৃঢ় বিশ্বাস প্রথম যাত্রা দেখার রাত্রিতে শোনা কোন একটি গা[ন] পরিণত বয়স পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল। সেটিই নীল-কান্তের মুখে বসানো হয়েছে।

> 'ওরে রাজহংস, জন্মি দ্বিজবংশে
> এমন নৃশংস কেন হলি রে—
> বল কী জন্যে, এ অরণ্যে
> রাজকন্যের প্রাণ সংশয় করিলি রে—'

সে যাত্রার অভিনয় দেখে এবং গান শুনে রবীন্দ্রনাথ যে মুগ্ধ হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। 'লম্বা-চুল-ওয়ালা, চোপে-ভাঙা' ছেলেরা কি করে এ রকম অভিনয় ও গান করতে পারে সেটা নিশ্চয়ই তাঁর কাছে রহস্যময় বলে মনে হয়েছিল। সে রহস্যজড়িত মুগ্ধতা তিনি নীলকান্তের চরিত্রে পাত্রান্তরিত করেছেন।

'চারিদিকের অভ্যস্ত জগৎটা এবং তাহার তুচ্ছ জীবনটা গানে তর্জমা হইয়া একটা নূতন চেহারা ধারণ করিত।…গানের মধ্যে এই যাত্রার দলের ছেলেটি আপনাকে এবং আপনার জগৎটিকে একটি নবীন আকারে সৃজন করিয়া তুলিত।…আবার এক সময় এই গীতমরীচিকা কোথায় অপসারিত হইত, যাত্রার দলের নীলকান্ত ঝাঁকড়া চুল লইয়া প্রকাশ পাইত…।' এই বর্ণনা পড়ে মনে হয় 'ছেলেবেলা'য় বর্ণিত রাত্রিতে দময়ন্তীর সখীর মুখে 'ওরে রাজহংস' গানটি রবীন্দ্রনাথের খুব ভাল লেগেছিল। তাই নীলকান্তের মুখে তিনি ওই গানটিই বসিয়েছেন। নীলকান্তের লম্বা চুলের কথার উল্লেখ গল্পটির প্রথম দিকে নেই। এখানে তার উল্লেখ 'ছেলেবেলা'য় বর্ণিত 'লম্বা-চুল-ওয়ালা' পাকা ছেলেদের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আরও স্পষ্ট করে তুলেছে।

'আপদ' গল্পটির সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় নিশ্চয়ই পূর্ববর্তী সমালোচকদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। তথাপি ও-কথাটারও উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই গল্পটির পটভূমি হ'ল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চন্দননগরের বাগানবাড়ী। 'ছেলেবেলা'য় আছে :

'মাঝে মাঝে জ্যোতিদাদা যেতেন হাওয়া বদল করতে গঙ্গার ধারের বাগানে।…গঙ্গার ধারে সুর দিয়ে মিনে-করা এই বাদল-দিন আজও রয়ে গেছে আমার বর্ষাগানের সিন্দুকটাতে। মনে পড়ে, থেকে থেকে বাতাসের ঝাপটা লাগছে গাছগুলোর মাথায়, জটাজুটি বেধে গেছে ডালে পালায়, ডিঙি নৌকাগুলো সাদা পাল তুলে হাওয়ার-মুখে ঝুঁকে পড়ে ছুটেছে, ঢেউগুলো ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ পড়ছে ঘাটের উপর। (ছেলেবেলা, পৃ. ৬২)।

শুধু গানে নয়, গল্পের সিন্দুকেও ঐ বাগানবাড়ীর ঝড়ের দিনগুলি রয়ে গিয়েছে। উপরের অংশটির সঙ্গে 'আপদ' গল্পটির তুলনীয়।

'সন্ধ্যার দিকে ঝড় ক্রমশঃ প্রবল হইতে লাগিল। বৃষ্টির ঝাপট, বজ্রের শব্দ এবং বিদ্যুতের ঝিকিমিকিতে আকাশে যেন সুরাসুরের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কালো কালো মেঘগুলো মহাপ্রলয়ের জয়পতাকার মত দিগ্‌বিদিকে উড়িতে আরম্ভ করিল, গঙ্গার এপারে ওপারে বিদ্রোহী ঢেউগুলি কলশব্দে নৃত্য জুড়িয়া দিল, এবং বাগানের বড় বড় গাছগুলি সমস্ত শাখা ঝটপট করিয়া হাহুতাশ সহকারে দক্ষিণে বামে লুটোপুটি করিতে লাগিল।

তখন চন্দননগরের বাগানবাড়িতে একটি দীপালোকিত কক্ষে…।'

চন্দননগরের বাগানবাড়িতে হাওয়া বদল উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ এসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কিছুকাল ছিলেন।

'বৌঠাকরুণ ফিরে এলেন ; গান শোনালুম তাঁকে ; ভাল লাগল বলেন নি, চুপ করে শুনলেন ; তখন আমার বয়েস হবে ষোল কি সতের, যা-তা তর্ক নিয়ে কথা কাটাকাটি তখন চলে, কিন্তু ঝাঁজ কমে গিয়েছে।' (ছেলেবেলা, পৃ. ১২)।

বৌঠাকরুণের সঙ্গে কথাকাটাকাটি এবং তর্কের এতটুকু বর্ণনাই 'ছেলেবেলা'তে আছে। কিন্তু 'আপদ' গল্পটিতে আছে আরও অনেকখানি। শরতের ভাই সতীশকে রবীন্দ্রনাথ বলে চিনে নিতে কষ্ট হয় না।

'ইতিমধ্যে শরতের ভাই সতীশ কলিকাতা কলেজের ছুটিতে বাগানে আসিয়া আশ্রয় লইল, কিরণ ভারি খুশি হইলেন, তাঁহার হাতে আর একটি কাজ জুটিল ; উপবেশনে আহারে আচ্ছাদনে সমবয়স্ক ঠাকুরপোর প্রতি পরিহাসপাশ বিস্তার করিতে লাগিলেন। কখনও হাতে সিঁদুর মাখিয়া তাহার চোখ টিপিয়া ধরেন, কখনও তাহার জামার পিঠে বাঁদর লিখিয়া রাখেন, কখনও ঝনাৎ করিয়া বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সুললিত উচ্চ হাস্যে পলায়ন করেন। সতীশও ছাড়িবার পাত্র নহে ; সে তাঁহার চাবি চুরি করিয়া, তাঁহার পানের মধ্যে লঙ্কা পুরিয়া, অলক্ষিতে খাটের খুরার সহিত তাঁহার আঁচল বাঁধিয়া প্রতিশোধ তুলিতে থাকে। এইরূপে উভয়ে সমস্ত দিন তর্জন ধাবন হাস্য, এমন কি মাঝে মাঝে কলহ, ক্রন্দন, সাধাসাধি এবং পুনরায় শান্তিস্থাপন চলিতে থাকে।'

এটি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনের অংশ। চাবিচুরির আর একটি কাহিনী জীবনস্মৃতিতে আছে। (জীবনস্মৃতি, ঘরের পড়া)। দ্বিতীয় বার বিলাতযাত্রার পথ থেকে ফিরে এসেও (১৮৮১) তিনি কিছুকাল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে চন্দননগরের বাগানবাড়িতে ছিলেন (জীবনস্মৃতি, গঙ্গাতীর)। নানা সময়ে রবীন্দ্রনাথের অপ্রত্যক্ষ এই বাড়ীটিই 'আপদ' গল্পের পটভূমি রচনা করেছে সন্দেহ নেই।

বর্ত্তমান বৎসরের রবীন্দ্র-পুরস্কার

শ্রীরাজশেখর বসু

রাজশেখর বসু (পরশুরাম) এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ত্তমান বাংলার এই দুই জন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসেবী, তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পুরস্কারস্বরূপ রবীন্দ্র-পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। রাজশেখরবাবুকে তাঁহার 'কৃষ্ণকলি ও অন্যান্য গল্পে'র জন্য রবীন্দ্র-পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।
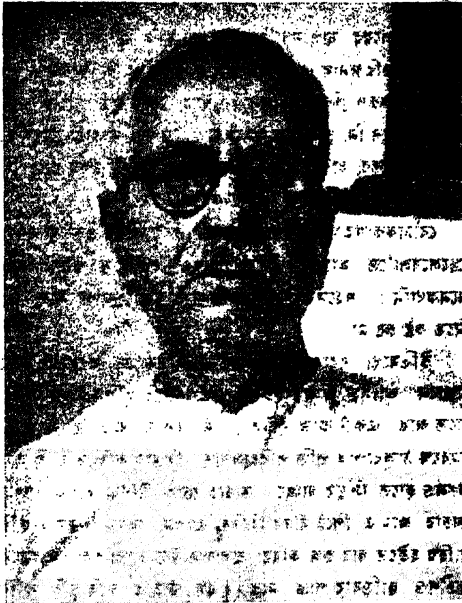
১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই মার্চ বর্দ্ধমান জেলার শক্তিগড়ের সন্নিকটস্থ বামুনপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে রাজশেখর বসুর জন্ম হয়। তাঁহার পৈতৃক নিবাস নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী উলা-বীরনগর। রাজশেখর বাবুর পিতা চন্দ্রশেখর বসু সংস্কৃত এবং দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথকে কিছুকাল পড়াইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বেদান্তপ্রবেশ, বেদান্তদর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ একদা সুধীবৃন্দের প্রশংসা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। চন্দ্রশেখরের চার পুত্র—শশিশেখর, রাজশেখর, ... ও গিরীন্দ্রশেখর।

রাজশেখরের বাল্যকাল পিতার সঙ্গে বাংলার বাহিরেই কাটিয়াছে। প্রথম সাত বৎসর তিনি মুঙ্গের জেলার খড়্গপুরে কাটান। তারপর ১৮৮৭ হইতে ১৮৯৫ পর্য্যন্ত দ্বারভাঙ্গায় রাজস্কুলে অধ্যয়ন করিয়া এন্ট্রান্স পাস করেন।

১৮৯৫-৯৭ সন পর্য্যন্ত রাজশেখর পাটনা কলেজে ফার্ষ্ট আর্টস পড়েন। এখানে তাঁহার সহপাঠী ছিলেন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্রপ্রসাদ।

১৮৯৭ সনে রাজশেখর বি-এ পড়িবার জন্য পাটনা হইতে কলিকাতায় আসেন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। এই বৎসরেই শ্যামাচরণ দে'র কন্যা মৃণালিনী'র সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। লোকান্তরিতা প্রতিমা রাজশেখরবাবুর একমাত্র সন্তান। ... সনে কেমিষ্ট্রি এবং ফিজিক্সে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স সহ রাজশেখর বি-এ পাস করেন। পর বৎসর রসায়ন শাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তার পর তিনি বি-এল পরীক্ষাটিও পাস করিলেন।

১৯০৩ সনে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে রাজশেখর বসুর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। প্রফুল্লচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যালের কার্য্যালয় তখন ছিল সারকুলার রোডে। রাজশেখর এই প্রতিষ্ঠানে রাসায়নিকের পদে নিযুক্ত হইলেন। এক বৎসরের মধ্যেই তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারের পদে উন্নীত হন। ১৯০৬ সনে রাজশেখর ইহার সর্ব্বময় কর্তৃত্বের ভার গ্রহণ করেন। ... পর্য্যন্ত তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালের কার্য্য প্রত্যক্ষ ভাবে ... ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মদক্ষতায় এই প্রতিষ্ঠানটির প্রভূত ... সাধিত হয়।

১৯২২ সনে বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে রাজশেখর 'পরশুরাম' ছদ্মনামে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার প্রথম রসরচনা। তারপর তিনি পর পর অনেকগুলি গল্প রচনা করেন এবং সেগুলি 'ভারতবর্ষ' ও 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। ১৩৩১ সালে তাঁহার প্রথম গল্পের বই 'গড্ডলিকা' প্রকাশিত হইল। পরশুরামের অনুপম রচনার সঙ্গে শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেনের ব্যঙ্গচিত্রের অপূর্ব্ব সংযোগ বাংলা সাহিত্যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী'তে ইহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেন।

ইহার চারি বৎসর পরে ১৩৩৫ সালে 'কজ্জলী' প্রকাশিত হইবার পর বাংলা সাহিত্যে তাঁহার আসন আরও দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইল।

সাহিত্য-রচনা ছাড়াও বাংলা সাহিত্য ও বাংলা ভাষার প্রসঙ্গে দুইটি সংস্কারমূলক কার্য্যের জন্য রাজশেখরবাবু স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন

প্রথমতঃ বাংলা লাইনো টাইপের প্রবর্তন আর দ্বিতীয়তঃ বাংলা বানান-সমস্যার সমাধান-কল্পে তাঁহার অক্লান্ত প্রয়াস। চলন্তিকা অভিধান সঙ্কলনে এবং রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদে তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহারও তুলনা নাই।

হিন্দী, তামিল, তেলুগু এবং কানাড়ী ভাষায় রাজশেখরের রচনা অনূদিত হইয়াছে। সাহিত্য-সাধনার পুরস্কার স্বরূপ রাজশেখর বাবু ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জগত্তারিণী পদক লাভ করেন।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, অদ্বিতীয় রসস্রষ্টা রাজশেখর বসু মহাশয় বিচিত্র রচনাসম্ভারে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। আশার কথা এই যে, এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার নিপুণ লেখনী বিরাম গ্রহণ করে নাই। নিম্নে প্রকাশকালসহ রাজশেখর বসুর গ্রন্থসমূহের নাম প্রদত্ত হইল :

গড্ডলিকা (গল্পসংগ্রহ), ১৩৩১; কজ্জলী (গল্পসংগ্রহ), ১৩৩৫; চলন্তিকা (অভিধান), ১৩৩৭; হনুমানের স্বপ্ন (গল্পসংগ্রহ) ১৩৪৪; লঘুগুরু (প্রবন্ধসংগ্রহ), ১৩৪৬; মেঘদূত (সটীক বাংলা অনুবাদ) ১৩৫০; বাল্মীকি রামায়ণ (সারানুবাদ), ১৩৫৩; মহাভারত (সারানুবাদ) ১৩৫৬; ভারতের খনিজ (প্রবন্ধ), ১৩৫০; কুটীরশিল্প (প্রবন্ধ), ১৩৫০; হিতোপদেশের গল্প (চুম্বকানুবাদ) ১৩৫৭; গল্পকল্প ১৩৫৭; ধুস্তরী মায়া (গল্পসংগ্রহ) ১৩৫৯; এবং কৃষ্ণকলি ও অন্যান্য গল্প।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ইংরেজী ১৮৯৮ সনের ২৪শে জুলাই বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে শ্রীযুত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। ১৯১৫ সনে গ্রামের স্কুল হইতে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। তারপর কলিকাতায় সেন্ট-জেভিয়ার্স কলেজে আই-এ পড়ার সময় বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসিয়া লেখাপড়া ত্যাগ করেন এবং স্বগ্রামে অন্তরীণ হন। সেই সময় হইতে দেশসেবার কর্ম্মে তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত হন। ছাত্রাবস্থা হইতেই কবিতা, গল্প, নাটক লেখার অভ্যাস তাঁহার ছিল। ১৯৩০ সনের পূর্ব্ব পর্যন্ত এক দিকে দেশসেবা অন্য দিকে সাহিত্যচর্চা এই দুইয়ে জীবন যেন দ্বিখণ্ডিত ছিল। তারপর ১৯৩০ সনে আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়া কারাবরণ করেন।

জেল হইতে বাহির হইবার পরই রাজনীতি পরিত্যাগ করিয়া পরিপূর্ণভাবে সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ইহার পূর্ব্বে ১৯২৮-২৯ সনে তাঁহার কিছু গল্প 'কল্লোলে' প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯৩০ সালের পর হইতে সাহিত্যই তাঁহার একমাত্র কর্ম্ম ও জীবিকা। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'রাইকমল'। 'ধাত্রীদেবতা' নামক উপন্যাস লিখিয়া তিনি প্রথম বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তার পর পর্য্যায়ক্রমে 'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'কবি', 'পঞ্চগ্রাম' প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে কীর্তিমান ঔপন্যাসিকের সম্মান অর্জ্জন করেন। তাঁহার রচিত 'দুইপুরুষ', 'কালিন্দী' প্রভৃতি নাটক সার্থকতার সহিত রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়।
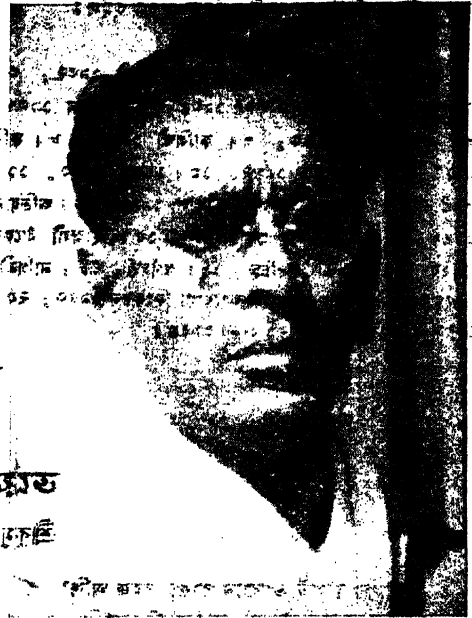
তিনি ১৯৪৭ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত 'শরৎস্মৃতি-পুরস্কার' ও পদক প্রাপ্ত হন তাঁহার রচিত 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' নামক উপন্যাসের জন্য। ১৯৫৫ সালে তাঁহার 'আরোগ্য নিকেতন' নামক উপন্যাসের নিমিত্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক 'রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার' লাভ করিয়াছেন। ১৯৪৪ সনে তিনি কানপুরে অনুষ্ঠিত ও ১৯৪৮ সনে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের সাধারণ ও রজতজয়ন্তী অধিবেশনে সাহিত্য-শাখায় সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪৭ সনে নিখিল আসাম বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলনে সাহিত্য-শাখায় সভাপতিত্ব করেন এবং ১৯৪৭ সনে কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। ১৯৫২ সন হইতে বাঙালী সাহিত্যিক

হিসাবে তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হন। তাঁহার গ্রন্থসমূহের একটি তালিকা দেওয়া হইল:—

উপন্যাস

১। চৈতালী ঘূর্ণি ১৩৩২; ২। পাষাণপুরী ১৩৩২; ৩। রাইকমল ১৩৩৩; ৪। নীলকণ্ঠ ১৩৩৪; ৫। আগুন ১৩৩৭; ৬। ধাত্রীদেবতা ১৩৪০; ৭। কালিন্দী ১৩৪১; ৮। কবি ১৩৪২; ৯। গণদেবতা ১৩৪২; ১০। মন্বন্তর ১৩৪৩; ১১। পঞ্চগ্রাম ১৩৪৩; ১২। সন্দীপন পাঠশালা ১৩৪৪; ১৩। অভিযান ১৩৪৬; ১৪। তামসতপস্যা ১৩৪৫; ১৫। হাঁসুলী বাঁকের উপকথা ১৩৪৭; ১৬। পদচিহ্ন; ১৭। স্বর্গমর্ত্য; ১৮। নাগিনী-কন্যার কাহিনী ১৩৫২; ১৯। আরোগ্য নিকেতন ১৩৫৩; ২০। চাঁপাডাঙার বউ ১৩৫৪; ২১। না ১৩৫৪।

গল্প

১। জলসাঘর ১৩৩৬; ২। রসকলি ১৩৩৭; ৩। ১৩৪০; ৪। মাটি; ৫। তিনশূন্য; ৬। হারানো সুর; ৭। কামধেনু; ৮। শিলাসন; ৯। স্থলপদ্ম; ১০। ইমারত; ১১। বেদেনী; ১২। ছলনাময়ী; ১৩। দিল্লীকা লাড্ডু; ১৪। শ্রীপঞ্চমী; ১৫। প্রসাদমালা; ১৬। বাহুকরী; ১৭। প্রতিধ্বনি।

নাটক

১। কালিন্দী ১৩৪১; ২। দুইপুরুষ ১৩৪২; ৩। দীপান্তর ১৩৪৩; ৪। বিংশ শতাব্দী ১৩৪৪; ৫। যুগবিপ্লব।

বিবিধ

১। আমার কালের কথা; ২। আমার সাহিত্যজীবন; ৩। বিচিত্র।

ভয়ের কথা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

'পাপের দ্বারাই ভগবানে পাওয়া সহজ অতি'
বলিছে অনেকে এলো মানুষের কি দুর্মতি!
'গয়াসুর' হরি-চরণ লভেছে জানে তা সবে,
হরিকে পেতে কি কেবল অসুর হলেই হবে?
যীশুর করুণা রোগী 'ল্যাজারাস' যেহেতু পেলে,
কুষ্ঠী হলেই যুক্তি কৃপা কি মেলেই মেলে?
যুক্তি যে বড় বিষম লাগে—
হতে মহর্ষি চোর হওয়া চাই সবার আগে।

২

যেহেতু সর্প শিবের অঙ্গ বেড়িয়া আছে
সর্প হলেই যাবে শিবলোকে—শিবের কাছে?
সাধনা চাহি নে? হত্যা ডাকাতি করিলে খালি,
শুধু কসুরে কৈবল্য কি দিবেন কালী?
উদ্‌যান-বোমা, অণু-বোমা সে তো অনেক ভাল;
তারা শাশ্বত সত্যকে নারে করিতে কালো।
দেখায় এ সব তত্ত্বকথা—
মানব মনের দুষ্টক্ষতের বীভৎসতা।

৩

কি ক্ষতি নরক জনপ্রিয় হয় আজিকে যদি?
চিরদিন ছিল ভয়াবহ হয়ে সে নিরবধি।
হোক খেয়ালীর প্রমোদ-ভবন রোধিবে কে তা?
রুগ্ন মনের স্বাস্থ্যনিবাস উঠুক সেথা।
শ্রদ্ধেয় হয় হউক,—কিন্তু সঙ্গোপনে—
বসতি সে যেন, না-পাতায় প্রতি মানব-মনে।
রাম নামে ভূত পলাত শুনি
ভূতনামে রাম পলাবেন চান দেখিতে গুণী।

৪

বিষলতাকেই বলা যায় যদি কল্পলতা,
অবদান তার, অভয়ের নয়, ভয়ের কথা।
কি সংক্রামক মনের মড়ক বিষায় ধরা,
বিড়ম্বনার কি ভয়াল বোমা হতেছে গড়া।
ভয়ঙ্কর এই ভাবের ভস্ম তেজস্ক্রিয়,—
হয় তো হরিবে মানব-মনের বিমল শ্রীও।
হেন অভিশাপ কে চায় পেতে?
পাপই এবার পাসপোর্ট দেবে স্বর্গে যেতে।

৫

শ্রীভগবানকে বিদ্রূপ করা নূতন নহে,
মানুষ তাঁহাকে গড়েছে এ কথা অনেকে কহে।
বলে ভগবান যদি নাহি দেন তাঁহার দেয়—
দরবার না দিয়—তাঁরে বাদ দেওয়াই শ্রেয়।
রূপকথার তো "এক থাকে রাজা" মহেশ তিনি,
মূঢ় চাপল্য কি লইয়া খেলে কি ছিনিমিনি?
তিনিই আছেন—বল না নাহি—
সে বিশ্বরূপ দেখায় কেবল ভাগ্য চাহি।

বিজ্ঞানসাধক শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসু

গুপ্ত

[আচা]র্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর সাধনাক্ষেত্র বসুবিজ্ঞান মন্দিরের [অ]ধিনায়ক বিজ্ঞানসাধক শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসুর (জন্ম ২৬ [নভে]ম্বর ১৮৮৫) সপ্ততিবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। এই [উপ]লক্ষ্যে তাঁহার ছাত্র, সহকর্ম্মী ও সুহৃদ্বর্গ গত ৫ই মার্চ [বসু]বিজ্ঞান মন্দিরে তাঁহাকে শ্রদ্ধাভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্য [একটি] উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছেন।

[শ্রী]দেবেন্দ্রমোহনের পৈতৃক নিবাস মৈমনসিংহ জেলার জয়-[সি]দ্ধিতে। তাঁহার পিতা মোহিনীমোহন আমেরিকায় [হো]মিওপ্যাথি বিদ্যায় শিক্ষালাভ করিয়া কলিকাতায় চিকিৎসা-[বৃত্তি] গ্রহণ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠতাত আনন্দমোহন বসুর [জীবন] নবযুগের বাংলার ইতিহাসে চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া [থা]কিবে। তিনি কেম্‌ব্রিজের প্রথম ভারতীয় র‍্যাংলার। তিনি [ব্য]রিষ্টারি ব্যবসায়ে প্রাধান্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু [ই]হাতে তাঁহার সামান্য পরিচয়—তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিচয় সম-[সাম]য়িক বাংলার ধর্ম্ম শিক্ষা ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তাঁহার অকুণ্ঠ [সে]বায় বিধৃত হইয়া আছে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র দেবেন্দ্র-মোহনের মাতুল—শৈশবকাল হইতে তাঁহারই নির্দ্দেশে দেবেন্দ্রমোহনের শিক্ষাদীক্ষা, স্বভাবতই পরবর্ত্তী জীবনে তিনি জগদীশচন্দ্রের প্রারব্ধ সাধনার উত্তর-সাধকরূপে বৃত হইয়াছেন।

জগদীশচন্দ্র এক সময়ে দেবেন্দ্রমোহনের পিতার সঙ্গে এক বাড়ীতেই (৬৪।১ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট) দীর্ঘকাল বাস করিয়াছেন ; জগদীশচন্দ্রের প্রিয় সুহৃৎ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বিলাত হইতে ফিরিয়া এই বাড়িতেই বন্ধুগোষ্ঠী রচনা করিয়া-ছিলেন।

১৯০১ সালে বসু-পরিবার বর্ত্তমান নিবাসে (৯২।৩ আপার সার্কুলার রোডে) উঠিয়া আসেন। এই পরিবারের পরি-[মণ্ডলে] সেকালে নানা গুণীর সমাবেশে, তাঁহাদের সান্নিধ্যে [দেবেন্দ্র]মোহনের কৈশোর জীবন কাটিয়াছে—আচার্য্য প্রফুল্ল-[চন্দ্র] ৯১ নম্বর আপার সার্কুলার রোডে থাকিতেন, তিনি ত [প্রতি]বেশী ; পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ডাঃ নীলরতন সরকার [প্রভৃতি] আসিতেন, জগদীশচন্দ্রের আকর্ষণে আসিতেন রবীন্দ্র-নাথ, লোকেন পালিত, নিবেদিতা। সুদূর সুইডেন হইতে [রামমো]হনের জীবন-কাহিনীতে আকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছিলেন [হ্যামার]গ্রেন—যাঁহার দীপ্তিমান চরিত্র ও দৃঢ়নিষ্ঠ ভারত-[প্রেমের] কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "বিদেশীয় অতিথি—দেশীয় [আতিথ্য]" প্রবন্ধে গভীর শ্রদ্ধায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

[সে]ই সময়ের কথা স্মরণ করিয়া দেবেন্দ্রমোহন সংবর্দ্ধনার [উত্তরে তাঁ]হার ভাষণে বলিয়াছেন :

"ময়মনসিংহ ও বিক্রমপুর হইতে আসিয়া কলিকাতায় আমার পিতৃদেবও যে-অঞ্চলে বাসা বাঁধিলেন তাহার দক্ষিণ সীমায় কেশবচন্দ্রের নিবাস কমল কুটীর, পশ্চিম সীমায় ঈশ্বর-

ডঃ শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসু

চন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাটী, উত্তরসীমায় রামমোহন রায়ের বাগান-বাড়ী। এই সীমানাকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা সমাজ বিজ্ঞান কারুশিল্পে নানা প্রতিষ্ঠানে বাংলা ও ভারতের নবজাগরণের পুরোধাবর্গের কত ভাবনা-কামনা মূর্ত্ত হইয়া উঠিতে আমার জীবনে আমি দেখিয়াছি—১৯০৭ সালে আমি ইংলণ্ড যাই, শৈশব হইতে সে-সময় পর্য্যন্ত কত দিন আমার সৌভাগ্য হইয়াছে আমাদের বাড়ীতে মিলিত হইয়া ইঁহারা দেশের ভবিষ্যৎ লইয়া কত কল্পনা করিতেছেন, কর্ম্মের সূচনা করিতে-ছেন সে সকল প্রত্যক্ষ করবার। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া স্বায়ত্তশাসন লাভ, ইহাই সেকালে আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য ছিল ; রাশিয়ার সহিত যুদ্ধে জাপানের জয়লাভ আমাদের জাতীয় আত্মবোধকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদে যে আন্দোলন উপস্থিত হয় তাহারই ফল—রাষ্ট্রে স্বরাজের কথা, শিক্ষায় শিল্পে স্বদেশীর বাণী। আনন্দ-মোহন রোগশয্যা হইতেও এই আন্দোলন যাহাতে সংগঠনের পথে সুপরিচালিত হইতে পারে তাহার উদ্‌যোগ করিয়া গিয়াছেন ; এই রোগশয্যা হইতেই ষ্ট্রেচারে বাহিত হইয়া

তিনি মিলন মন্দিরের (ফেডারেশন হল) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিতে গিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন এই আন্দোলনে নিবিড় ভাবে যুক্ত ; মনে পড়ে এই সময়ে রচিত তাঁহার স্বদেশী গানের কথা, দু' এক দিন পর-পর জগদীশচন্দ্রের বাড়ীতে আসিয়া তিনি লেখা গান শুনাইয়া যাইতেন।''

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রও এই সময় জড় ও চেতন প্রসঙ্গে তাঁহার আশ্চর্য্য গবেষণায় ব্রতী ; এই সাধনার যোগ্য উত্তর-সাধক ত প্রয়োজন, তাই প্রথমে ইঞ্জিনিয়ারীং পড়িবার কথা হইলেও দেবেন্দ্রমোহন বিজ্ঞানের চর্চ্চাতেই আত্মনিয়োগ করিবেন মাতুল জগদীশচন্দ্রের নির্দ্দেশে ইহাই স্থির হয় ; তাহারই ফলে দেবেন্দ্রমোহন ইঞ্জিনিয়ার না হইয়া পদার্থ-বিজ্ঞানী হইলেন। ১৯০৬ সনে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পদার্থবিজ্ঞানের এম-এ পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। এক বৎসর মাতুলের গবেষণায় সহায়তা করিয়া ১৯০৭ সনে তিনি কেম্‌ব্রিজে ক্রাইষ্ট চার্চ্চ কলেজে প্রবেশ করেন। এখানে তিনি ক্যাভেণ্ডিশ পরীক্ষাগারে সুবিখ্যাত মনীষী সার্ জে. জে. টমসনের অধীনে কাজ করিবার সুযোগ লাভ করেন। ১৯১২ সালে তিনি লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধীন রয়াল কলেজ অব সায়ান্স হইতে সসম্মানে বি-এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দেশে ফিরিয়া এক বৎসর সিটি কলেজে অধ্যাপনা করিবার পর তিনি কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে সার রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক পদে বৃত হন। ১৯১৪ সালে তিনি গবেষণার মানসে জার্ম্মানী যান ; যুদ্ধ বাধিয়া গেলে জার্ম্মানীতে তিনি অন্তরায়িত হইয়া থাকেন। কিছুকাল পরে তিনি অধ্যয়নের সুযোগ পান, কিন্তু যুদ্ধ-বিরতির পূর্ব্বে আর ডক্টরেট পরীক্ষা দিবার সুযোগ লাভ করেন নাই। জার্ম্মানীতে প্রবাসকালে তিনি বিশ্ববিখ্যাত জর্ম্মন পদার্থ-বিজ্ঞানীদের সংস্পর্শে আসিয়া স্বীয় মনীষাকে বিকশিত করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট লাভ করিয়া জুলাই মাসে লণ্ডন হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৎপর ১৯৩৫ সন পর্য্যন্ত তিনি পদার্থবিজ্ঞানে রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপকপদে নিযুক্ত ছিলেন ; ঐ সনে তিনি পালিত অধ্যাপক সার্ সি. ভি. রমনের স্থলাভিষিক্ত হন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের পরলোকগমনের পর তিনি বসুবিজ্ঞান-মন্দিরের সর্ব্বাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন (এপ্রিল ১৯৩৮)। এই পদে তিনি এখনও অধিষ্ঠিত আছেন।

দীর্ঘ জীবনে দেবেন্দ্রমোহন কেবল যে বিজ্ঞানেরই সেবা করিয়াছেন এমন নহে। উত্তরকালের বিজ্ঞান-সাধক দেবেন্দ্র-মোহন যে তরুণ বয়সে সুদক্ষ ক্রীড়ামোদী ছিলেন অনেকেরই সে কথা অপরিজ্ঞাত। স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তিনি—১৯০৫-০৬ সালে ক্লাবের হকি ক্যাপ্টেন ছিলেন ; ফুটবল-ক্রিকেট প্রভৃতি খেলায় পারদর্শিতার নিদর্শনস্বরূপে তিনি অনেক পুরস্কার পাই[illegible]

কেম্‌ব্রিজ-প্রবাসকালে তিনি যে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতে[illegible] আকৃষ্ট হইয়াছিলেন আজিও তাহা বলবৎ। সাধার[illegible] সমাজ, বিশ্বভারতী, সিটি কলেজ প্রভৃতি দেশের [illegible] প্রতিষ্ঠানকে নানা কর্ম্মসূত্রে তিনি সেবা করিয়াছেন ; [illegible] ফিজিক্যাল সোসাইটির তিনি একজন প্রধান উ[illegible] ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব [illegible] তিনি সহকারী সভাপতি ছিলেন। ইণ্ডিয়ান সায়ান্স এসোসিয়েশনের বর্ত্তমানে তিনি সভাপতি—ইহা[illegible] 'সায়ান্স এণ্ড কালচার' পত্রিকার তিনি একজন [illegible] ছিলেন। 'ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়ান্সেস অব [illegible] তিনি একজন প্রতিষ্ঠাকালীন 'ফেলো'। কলিকা[illegible] বিদ্যালয়ের সহিত তিনি 'ফেলো' রূপে যুক্ত [illegible] বিভিন্ন সময়ে 'এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলে'[illegible] সম্পাদক ও সহকারী সভাপতি ছিলেন—বর্ত্তমা[illegible] ইহার সভাপতি। ১৯২৭ সনে তিনি ভারতী[illegible] কংগ্রেসের পদার্থ বিজ্ঞান শাখার সভাপতি হন ; [illegible] আগষ্ট মাসে ভোল্টা শতবার্ষিকী উপলক্ষে ইটাল[illegible] র্জাতিক পদার্থবিজ্ঞান মহাসভায় তিনি যোগদা[illegible] ১৯৫৩ সনে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের [illegible] পতির পদে বৃত হন।

এখানে আর একটি কথা বিশেষ ভাবে উ[illegible] প্রয়োজন। গত সতর-আঠার বৎসরের মধ্যে [illegible] মন্দিরে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রদর্শিত পথে [illegible] বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়ো[illegible] সমাজ-উন্নয়নে এবং আর্থিক সংস্থা বিবর্ত্তনে বি[illegible] করিয়াছেন। ভারত-সরকার প্রতিষ্ঠানটির এ[illegible] কার্য্যকরী উপকারিতা সম্যক উপলব্ধি করিয়া[illegible] কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁহারা ইহাকে প্রচুর [illegible] করিয়া আসিতেছেন। এমনকি বৈজ্ঞানিক গ[illegible] প্রকৃত সংস্কৃতি বিষয়ে পশ্চাৎপদ পশ্চিমবঙ্গ [illegible] বিজ্ঞান-মন্দিরের এতাদৃশ কর্ম্মিষ্ঠতা দেখিয়া বর্ত্তমা[illegible] অর্থসাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

প্রবীণ বয়সেও দেবেন্দ্রমোহনের কর্ম্মক্ষমতা অপ[illegible] মনঃশক্তি অক্ষুণ্ণ ; তাঁহার অগণিত ছাত্র ও [illegible] একান্ত কামনা, দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি [illegible] সমাজসেবায় রত থাকুন, তাঁহার অনিন্দ্য [illegible] সাধকোচিত জীবন বর্ত্তমান কালের তরুণসমা[illegible] করুক।

মুক্তিপথে

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

১

[illegible] পিতার নিকট এক মাসের উপর হইল লিখিয়াছিল—

"[illegible]বা, কবে তুমি বাড়ী আসবে? খবরের কাগজে লিখেছে [illegible] হুকুম দিয়েছেন তোমাদের সবাইকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। [illegible] কেউ বাড়ী ফিরে এসেছেনও। তুমি আসবে বলে আমরা [illegible] পথ চেয়ে আছি। আমাদের জন্য কোন চিন্তা করো না— [illegible] সবাই ভাল আছি।" আরও কত কি লিখেছিল।

[illegible]ই পত্রের উত্তর এতদিন [illegible]র এই মাত্র আসিয়াছে। জেল কর্তৃ[illegible] একবার, তারপর গোয়েন্দা পুলিস আর একবার পত্র পরীক্ষা [illegible] দেয়, তাই যে পত্র দুই দিনে পৌঁছিতে পারে তা পৌঁছাইতে [illegible] মাসের উপর লাগিয়া যায়। যাও আসে তার কতক থাকে [illegible] দিয়া লেপা, আর কতক থাকে কাঁচি দিয়া কাটা। নীলরতনের [illegible]ও এই অবস্থায়ই আসিয়াছে।

[illegible]কপিয়ন পত্র দিয়া যাওয়া মাত্র সুষমার মা সরমা দেবী [illegible] ফেলিয়া হাত না ধুইয়াই আসিয়া বলিলেন—"সুষি, চিঠিখানা পড়ে ফেল, আমার আবার অনেক কাজ পড়ে আছে।"

সুষমার পিতা নীলরতন পত্রে লিখিয়াছেন—"মা সুষমা, কবে যে বাড়ী ফিরে আসব বলতে পারি নে। আমরা ত কোন আদালতের বিচারে দণ্ডিত কয়েদী নই। তাই আমাদের কারা-বাসের কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ও নেই। একদিন হঠাৎ হয়ত কোন জেল কর্মচারী এসে বলবেন—তুমি মুক্ত; তোমার জিনিষপত্র নিয়ে জেল গেটে চলে এস। মুক্তিলাভের আধঘণ্টা আগেও আমরা [illegible] পারি নে।

[illegible]বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে এই মর্ম্মে রাজার ঘোষণার কথা [illegible]ও শুনেছি। তাই মুক্তি পাওয়ার আশা মনে একটু [illegible] মাত্র। কিন্তু কবে, কখন তা বলতে পারছি নে। রাজার ঘোষণার উপর আবার গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করে দেখছেন [illegible] ছাড়া তাঁদের পক্ষে নিরাপদ। কেউ শীঘ্র, কেউ বিলম্বে [illegible] পাবে, কারও হয়ত অনেক দেরি হবে। যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট [illegible]দিন ইচ্ছা করবেন সেদিনই মুক্তিলাভ করব। তোমরা আমার [illegible] ব্যস্ত হইও না। আমিও এ বিষয়ে না ভাবতে চেষ্টা করছি। [illegible]কারামুক্তির যখন কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখ নেই, যখন শীঘ্র [illegible]র কোন সম্ভাবনা নেই তখন তত ভাবনা থাকে না, দিন [illegible] কেটে যায়। কিন্তু শীঘ্র মুক্তির আশা মনে জাগলেই মন [illegible] সুরু করে।

[illegible]টা কথা—গোরা লেখাপড়া শিখছে কিনা, স্বভাব-[illegible]ছে এ সম্বন্ধে তোমরা কিছুই লেখ না। শুধু লেখ [illegible]ছে। আমি শুধু তোমাদের শারীরিক মঙ্গল সংবাদে সুখী হই নে। তোমরা সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠছ শুনলে সম্পূর্ণ সুখী হব।

"আমার জন্য কোন চিন্তা করো না। আমি ভাল আছি।"

সরমা বিষাদপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন—"প্রতি পত্রেই ত তিনি জিজ্ঞাসা করছেন গোরার খবর। কিই-বা লিখি!"

গোরা কতকগুলি বখাটে হতভাগা যুবকের সহিত মিশিয়া অধঃপাতে গিয়াছে, তাহার ছেলে এমন হইবে তাহা যেমন সরমা দেবী নিজে ভাবিতে পারেন নাই, তেমন সেই কথা জেলের মধ্যে নীলরতনকে জানাইয়া তাঁহার দিনগুলি আরও অশান্তিময় করিয়া তুলিতে চাহেন নাই। তাই গোরার শারীরিক সুস্থতার সংবাদ ছাড়া আর কিছুই তিনি লেখেন না।

সুষমা মাকে যেন প্রবোধ দেওয়ার জন্য বলিল—"তুমি কিছু ভেব না মা। বাবা বাড়ী এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। দাদা চিরদিন এমন থাকবেন না।" কথা শেষ করিয়া চিঠিটা সূর্য্যের দিকে তুলিয়া ধরিল।

"কি দেখছিস সুষি।"

"ঐ কাটা জায়গাটা পড়তে চেষ্টা করছি মা।"

"তা পড়বার কি আর যো রেখেছে। কালি মেখে কাঁচি দিয়ে কেটে ছোট কয়েক টুকরা কাগজ মাত্র পাঠিয়ে দেয়! আর দু'দিনের চিঠি দু'মাস লাগে পৌঁছতে।"

সরমা দেবী আরও কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু গোরা হন্তদন্ত হইয়া বাড়ীতে ঢুকিয়া প্রথমেই বলিল—"মা, শীগগির একটা টাকা বের করে দাও ত; বিশেষ দরকার আছে।"

"টাকা, টাকা কোথায় পাব। তা হলে কি আর ধার দেনায় এমনি করে ডুবে থাকতাম বোকা ছেলে!"

"কালই ত কিছু টাকা তোমার হাতে এসেছে। আমার বড্ড দরকার! দাও না মা!"

সুষমা বলিল—"কি করে কোথা থেকে এসেছে তা কি তুমি জান না দাদা? মার গহনা বাঁধা দিতে হয়েছে! তুমি আমাদের দুঃখ কি একটুও বুঝবে না!"

গোরা ধমক দিয়া বলিল, "তুই থাম সুচি! তোকে আর বক্তৃতা করতে হবে না।" তার পর সরমার দিকে তাকাইয়া বলিল, "মা শীগগীর দাও। কালই টাকাটা ফিরিয়ে দেব। তা না দাও ত আমার পথ আমি দেখ।"

সরমা শঙ্কিত হইলেন। একবার রাগ করিয়া গোরা তিন দিন বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র ছিল। খোঁজখবরই ছিল না। তিনি গোরাকে একটা টাকা দিলেন। টাকা পাইয়া গোরা বাহির হইয়া যাইতে উদ্যত হইল। কিন্তু তখন এক দল লোক 'বন্দেমাতরম'

ধ্বনি করিতে করিতে তাহাদের বাড়ীর দরজার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় গোরা বাধা পাইল।

ঐ দলের সম্মুখে যে দুইটি ছেলে একটা চাদর ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহাদের একজন বলিল, "আমরা অন্তরীনদের দুঃস্থ পরিবারের সাহায্যের জন্ম ভিক্ষায় বেরিয়েছি মা।" তাহাদের আর কিছু বলিবার প্রয়োজন হইল না। সরমা ভুক্তভোগী। সুষমা তাহার মায়ের ইঙ্গিতে একটা টাকা আনিয়া ছেলেদের হাতে দিতেই তাহারা একটু অবাক হইয়া মহানন্দে বন্দেমাতরম ধ্বনি করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল। সারা সকাল ঘুরিয়াও তাহারা পাঁচটা টাকা সংগ্রহ করিতে পারে নাই। এক বাড়ীতেই একটা টাকা পাইলে মনে আনন্দ হয় বৈকি। তখনকার দিনে অন্তরীণদের কথা বলতেও লোকে পুলিসের লাঞ্ছনার ভয় করিত। অর্থসাহায্য দূরে থাক, মৌখিক সহানুভূতি দেখাইতেও ভয় পাইত।

"এই বেলা তোমাদের টাকার অভাব হয় না দেখছি। আমার বেলায়ই কেবল নেই, নেই শুনতে পাই।"

"হায়, মা কালী তুমি ওর সুবুদ্ধি দাও মা।" তাহার পর গোরার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কিসে আর কিসে! দেখ দেখি নি ওরা কেমন ভাল ছেলে। কেমন পরের দুঃখ দূর করবার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করছে, আর তুই"—

গোরা ঠোঁট উল্টাইয়া কহিল, "ভাল, না হাতি। রাস্তায় রাস্তায় চেঁচিয়ে বেড়ালেই যদি ভাল হওয়া যেত তা হলে আর কথা ছিল না।"

তাহাকে থামাইয়া দিয়া সুষমা কহিল, "থাক্, থাক্, তোমার মুখ থেকে আর এদের নিন্দের কথা শুনতে চাইনে দাদা। কারুর কোন উৎসাহ আর সহানুভূতি না পেয়েও যে এরা চেষ্টা করে যাচ্ছে তা যে কত বড় গৌরবের কথা তা যদি তুমি বুঝতে।"

এই কথার জবাব দেওয়া, কিংবা ভাবিয়া দেখার মত মনের অবস্থা গোরার নাই। সুতরাং সুষমার প্রতি মুখ ভেঙচাইয়া বাহির হইতে উদ্যত হইয়া বাধা পাইল। প্রতিবেশিনী বৃদ্ধা হরমোহিনী দেবী বাড়ী ঢুকিয়াই সবাইকে একসঙ্গে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "এই যে, ভালই হ'ল। তোমরা সবাই একসঙ্গে আছ। আজ ক'দিন আর তোমাদের কোন খবর নিতে পারি নি। তোমরা সব ভাল আছ ত?"

বৃদ্ধাকে বসিবার আসন দিয়া সরমা কহিল, "ভাল আছি মাসীমা। আপনার এত বয়েস হ'ল, তবুও ত আপনি পাড়ার সবার সুখ দুঃখের খোঁজখবর করেন। বলতে গেলে আপনিই আমাদের ভরসা।"

হরমোহিনী দেবী হাত জোড় করিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "সবই মা কালীর দয়া মা, আমি আর কি করতে পারি। আমার ত জ্ঞান তোমরা, ঐ নাতী ভিন্ন আর কেউ নেই! কিন্তু তোমরা পাড়াপড়শীরা পূরণ করেছ আমার ছেলেমেয়ের অভাব।"

ইহার প্রত্যুত্তরে সরমা হরমোহিনী দেবীকে প্রণাম করিয়া গোরাকে কহিলেন দিদিমাকে প্রণাম করিবার জন্ম। বাহির হইতে দেরী হওয়ায় গোরা বিরক্ত হইতেছিল। ইহাদের হাত হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্ম ঢিপ করিয়া একটি প্রণাম করিয়া হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

তাহার গতিপথের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ব্যথিত হৃদয়ে সরমা কহিল, "ওকে আশীর্ব্বাদ করুন মাসীমা, যেন ওর সুবুদ্ধি আসে।"

"নীলরতন বাড়ী এলেই ও সব ঠিক হয়ে যাবে। পুরুষমানুষের শাসন ছাড়া কি আর ব্যাটাছেলে ভাল হয় বাছা।"

"কি জানি গো মাসীমা, আমাদের যা অদেষ্ট, তিনি যে কবে ফিরবেন তা কে জানে।"

"ও পাড়ার শ্যামা কবরেজের ছেলে ছাড়া পেয়ে আজ বাড়ী ফিরে এসেছে। ওর কাছেই শুনতে পেলাম নাকি আরও অনেক লোক ছাড়া পেয়েছে। তাই ত বউ ভাবতে ভাবতে এলাম হয়ত এসে দেখতে পাব নীলরতনকে। ওর কি কোন চিঠিপত্র এসেছে—কিছু লিখেছে তাতে?

"আজ এইমাত্র তাঁর চিঠি পেয়েছি, মাসীমা। কবে যে ছাড়া পাবেন তার কিছুই ত তাঁর জানা নেই।"

"হ্যাঁ বউ, তার একটা খোঁজখবর নেও না কেন কলকাতার সেই ব্যারিষ্টারকে চিঠি লিখে। বড্ড ভাল মানুষ। আমি ও কথা আমার নাতিকেই আজ আপিস যাওয়ার মুখে বলেছি। ঐ যে গো, 'বন্দেমাতরওয়ালাদের নাকি একটা আপিস খুলেছে সেখানে খোঁজ নিতে।"

"বেঁচে থাক আপনার নাতি। ব্যারিষ্টার চাটুজ্জে মশায়ের কাছে কয়েক দিন আগে লোক পাঠিয়েছিলাম। তিনি একই কথা বলে পাঠিয়েছেন যে রাজার যখন হুকুম হয়েছে দু'একদিন দেরী হতে পারে, ছাড়া সবাই নিশ্চয় পাবে। আমাদের চিন্তা করতে নিষেধ করেছেন।"

"তাজ্জব ব্যাপার বউ, তাজ্জব ব্যাপার! হাইকোর্টের হুকুমে লোক ছাড়া পেলে সরকার তাকে আটকে রাখতে পারে এমন কথা আমি বাপের জন্মে শুনি নি। এমন রাজ্যেও আমরা বাস করি।"

কথা শুনিয়া সুষমার মুখ পরিহাসের ভঙ্গিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হাসিমুখে কহিল, "তুমি শুনতে না পেলেও তোমার অনেক আগেই কিন্তু, অনেকদিন আগে—সেই ১৮১৮ সনে, এমন আইন হয়েছে যার বলে সরকার যে কোনও লোককে বিনা বিচারে আটক করে রাখতে পারে!"

ইহারা প্রাচীনপন্থী। ছোটবেলা হইতে শুনিয়া আসিয়াছে রাণীর রাজত্বে অবিচার হইতে পারে না, কাজেই আজিকার দিনে শত ঘাতপ্রতিঘাত নিজের উপর আসিয়া পড়িলেও সহসা রাজাকে দোষী করিতে মন ততটা ভরসা পায় না। নিজের ঘর-সংসার আত্মীয়-স্বজন আর পাড়া-প্রতিবেশীর বাহিরে ইহাদের জগৎ সামান্য। কাশীরাম দাসের মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ আর ভাগবতের বাহিরের পুস্তক পাঠ ইহারা বিবিয়ানী বলিয়া জানে।

সুষমার জন্ম আধুনিক কালে। বেশ কিছুদিন স্কুলে পড়িয়াছে, খবরের কাগজ পাঠ তাহার নিয়মের মধ্যে, সময় সুযোগ মত বইও পড়িয়া থাকে। সুতরাং এই গতিহীন মনের বিস্ময় তাহার মনে কৌতুক সঞ্চার করে। সুষমা হাসি চাপিয়া রাখিতে পারে নাই।

সরমা কিংবা হরমোহিনী কাহারও নিকটই এই হাসির অর্থ অস্পষ্ট নয়। সুতরাং সরমা স্নেহের তিরস্কারের সুরে মেয়েকে থামিতে বলিলেন, "আঃ মরণ আর কি! তুই অত হাসছিস কেন বল ত?"

"তোমাদের কথা শুনলে কেউ না হেসে থাকতে পারে! তোমরা এখনও একেবারে সেকেলে। সেই যে বাপের বাড়ীতে টোলে সংস্কৃত পড়ে এসেছ তার পর এক পাও এগোও নি। কিছু কিছু ইংরিজী পড়লে জানতে পারতে কত পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে!"

"হাঁ, ইংরিজী পড়ে পড়ে লোকগুলি উচ্ছন্ন গেছে তা, মানি! আজকাল না আছে ধর্ম্ম, না আছে কিছু! দুখানা কেতাব পড়ে সবার ওপর টেক্কা দিতে চায়!"

হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ পাইয়া সকলে সচকিত হইয়া উঠিল। "সুষমা, সুষমা দরজা খোল···, আমি এসেছি।"

গলার আওয়াজ শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে সরমার মুখে যেন সমস্ত শরীরের রক্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। উত্তেজনা বশে হঠাৎ উঠিতে গিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। সুষমা এতক্ষণ দাঁড়াইয়াই ছিল। তাহার মায়ের এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইল এবং তাড়াতাড়ি মাতাকে ধরিয়া ফেলিল—"তোমার কি হয়েছে মা?"

ততক্ষণে সরমা নিজেকে সম্বরণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে আনন্দ, বিষাদ, ভয় ও বিস্ময় একে একে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "না, কিছু হয় নি মা, তুই তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দে মা।"

হরমোহিনী দেবীরও গলার আওয়াজ শুনিতে ভুল হয় নাই, "মা, শীগগির যা মা, বোধ হয় নীলরতন বাড়ী এল।"

"হ্যাঁ, বাবা এসেছে, বাবা বলিতে বলিতে সুষমা দৌড়াইয়া ছুটিল দরজার দিকে। দরজা খুলিয়া প্রথমটা থমকিয়া দাঁড়াইল, বাবাকে দেখিল সে পিতা হইলেও অপরিচিত! নীলরতনও মেয়েকে সাত বৎসরের বালিকা দেখিয়া গিয়াছেন। আজ নয় বৎসর পর তাহাকে দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু এই নয় বৎসর ধরিয়া যাহাকে মনে মনে ভাবিয়া রাখিয়াছেন তাহার সহিত সুষমার চেহারার মিল না থাকিলেও নীলরতনের এই মেয়েকেই সুষমা বলিয়া মানিয়া লইতে কুণ্ঠিত হয় নাই। তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইবার কথা ভুলিয়া গিয়া কন্যাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "সুষমা, মা আমার!"

হরমোহিনী প্রতিবেশী হইলেও আন্তরিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। নীলরতনকে ইনি ছোটবয়স হইতে জানেন এবং পরমাত্মীয়ের মত স্নেহ করেন। তিনি উচ্ছসিত আনন্দে কম্পিতকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "আরে তোরা কে আছিস, নীলু এসেছে, নীলু। শাখ বাজা, শাখ; হাঁ, উলু দে উলু। আমাদের নীলু এসেছে।" বলিয়া নিজেই হুলুধ্বনি দিতে লাগিলেন।

নীলরতন সুষমাকে ছাড়িয়া দিয়া হরমোহিনী দেবীর পদধূলি লইলেন। এইমাত্র যাহার চিঠি পাইয়া আগমন সম্পর্কে ইহারা নিতান্ত নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল তাহার এই অপ্রত্যাশিত আগমন যে অপার আনন্দের বান ডাকিয়া আনিয়াছে তাহাতে যেন সকলের কথা ভাসিয়া গিয়াছে।

২

নয়টি বৎসর! হাঁ, অনেকগুলি দিন কাটিয়া গিয়াছে! সুদীর্ঘ দুই বৎসর হাজতবাসের পর রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বার বৎসরের দ্বীপান্তর বাসের আদেশ। হাইকোর্টের আপীল, সর লরেন্স জেঙ্কিন্স ও সর আশুতোষের বিচারে তাহার মুক্তি আদেশ! কিন্তু ১৮১৮ সালের তিন রেগুলেশন তাহার পথ আরও সাতটি বৎসর রুদ্ধ করিল।

ঘরে ঢুকিয়া নীলরতন ঘরের এদিক-ওদিক তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন। দারিদ্র্যের চিহ্ন আগাছার মত ঘরের শ্রী ব্যাহত করিয়াছে। মুক্তির আনন্দ মিলাইয়া গেল এক অজানা আতঙ্কে। তাঁহার অভাবে এত দিন তাঁহার স্ত্রীপুত্র পরিবারের চলিয়াছে কি করিয়া! যে কথা তিনি এত দিন জানিতে পারেন নাই, যাহা তাঁহার স্ত্রী সযত্নে গোপন করিয়া আসিয়াছেন তাহা অনুমান করিতে পারিলেও আর এই মুহূর্ত্তে খোচাইতে মন চাহিল না। যে ভাবেই হউক আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া ইহারা দিন কাটাইয়াছে ইহাই তাহার বিশ্বাস। আর বেশী কি চাহিবার আছে!

গোরাকে দেখিবার জন্য তাহার মন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। "গোরা কোথায় রে মা, সুষি!"

যাহার কথা সযত্নে এত দিন স্বামীর নিকটে গোপন করিয়া আসিয়াছেন তাহার প্রশ্ন এই মুহূর্ত্তে উঠা একান্ত স্বাভাবিক হইলেও অস্বস্তিকর। সরমা প্রশ্ন শুনিয়া একটু থতমত খাইলেন। এখনই এই প্রশ্ন কেন? আমতা আমতা করিয়া সুষমা জবাব দিল, "দাদা, দাদা একটু বাইরে কোথায় গেছে, এখখুনি হয়ত এসে পড়বে।"

পাড়াপ্রতিবেশীর খবরাখবর নীলরতন খুটিনাটি করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ এক ঝলক দমকা হাওয়ার মত গোরা আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। নীলরতন তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া চমকাইয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য সকলে নীরব হইল।

হরমোহিনী বলিলেন, "গোরা, বাপকে প্রণাম কর দাদা!" গোরা পিতাকে প্রণাম করিয়া মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাতের নখ খুটিতে লাগিল।

গোরার মুখ হইতে নীলরতন চোখ ফিরাইতে পারিলেন না। এই তাঁহার ছেলে গোরা। চুলের ছাট, পোশাক-পরিচ্ছদের ফ্যাশান, মুখে চোখে অসংযমীর সুপরিস্ফুট রেখা। তদুপরি এই মাত্র রাস্তার যে কাহিনীর নেতাকে মনে মনে ধিক্কার দিয়া আসিয়াছেন বর্ত্তমানকালের ছেলেদের অধঃপতনের নিদর্শনরূপে সে আর যেই হইয়া থাকুক না কেন, গোরা যে হইতে পারে তাহা তাঁহার স্বপ্নের অতীত ছিল। ইহার জন্য তিনি শত ভাবিয়াও কাহাকেও দোষী সাব্যস্ত করিতে পারিলেন না। চোরের কিল খাওয়ার মত সমস্তটা ব্যাপার তাঁহার মনকে গোপনে দগ্ধ করিতে লাগিল।

গলির মুখে ঢুকিয়া নীলরতন তাঁহার বহু পরিচিত বাড়ীগুলির দিকে তাকাইতে তাকাইতে আসিতেছিলেন। হঠাৎ একটি কিশোর হন্তদন্ত হইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে একেবারে তাঁহার গায়ের উপরে আসিয়া পড়িল। হাত দিয়া জামার ইস্ত্রীর পাট ঠিক করিতে করিতে রুক্ষকণ্ঠে কিশোর কহিয়াছিল, "সামনের দিকে তাকিয়ে চলতে পার না মশাই, না চোখেই দেখতে পাও না। বড় যে নবাবের মত চলেছ।" শেষ পর্য্যন্ত নীলরতন ভাবিলেন যাই হোক এর বেশী যে আর গড়ায় নি!

গোরা অন্যমনস্কভাবে একরকম লাফাইতে লাফাইতে চলিয়াছিল, সে ভাল করিয়া নীলরতনের মুখের দিকে চাহিয়াও দেখে নাই। দেখিলেও কেহ কাহাকে চিনিতে পারিত না।

সরমা আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। দ্রুতপদে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। খাবারের আয়োজনে যথেষ্ট অদলবদল করিতে হইবে। হয়ত শরীর বেশ ক্লান্ত, বেশী দেরী করাও ঠিক হইবে না।

স্নানাহারের পর সরমাকে আড়ালে পাইয়া নীলরতন কহিল, "এতদিন জেলে আমার ভূরিভোজনের অভাব হয় নি, আজও দেখলাম তার কোন ব্যতিক্রম হয় নি; কিন্তু কি করে, কোন পথে এসব এলো তার কোন খোঁজই এখন পর্য্যন্ত করলাম না।"

সরমা লজ্জিত হইল। "তুমি অমন কথা বলো না। তোমার আশীর্ব্বাদে আর ভগবানের দয়ায় আমাদের কোনই কষ্ট হয় নি। এই ত সবে এখন এলে, দু'দিন একটু জিড়িয়ে নাও, তার পর সব দায়িত্ব ত তোমারই থাকবে।"

কিন্তু নীলরতনের অদৃষ্ট ভিন্ন রকমের। তাঁহার মুক্তির সংবাদ পাওনাদারদের কাছে ছড়াইয়া পড়িতে বেশী সময় লাগে নাই। আর দশজন বান্ধবের মত তাহারাও আসিয়াছে সহানুভূতি ও মুক্তির জন্য অভিনন্দন জানাইতে। কিন্তু যাওয়ার মুখে ইঙ্গিতে আপন আপন মনের কথা প্রকাশ করিয়া যাইতে ভুলে নাই।

রান্নাঘর হইতে শুনিতে পাইতেছেন ঝিয়ের গলার আওয়াজ, "মুদি মিন্সে আজ সাফ জবাব দিয়ে দিয়েছে গো। আগের পাওনাগণ্ডা না মিটিয়ে দিলে আর সে এক কাণাকড়ির জিনিষও দেবে না।"

সরমা বলিলেন—"এসব কথা বলার কি আর সময় অসময় নেই ঝি? উনি শুনতে পায় এমন করে না বললেই নয়। আমার কাছে বললেই ত পারিস।"

আরও কি কথা হইয়াছিল তাহা তিনি শুনিতে না পাইলেও ঝিকে গজর গজর করিতে করিতে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। ইহাও যেমন তেমন; বাড়ীওয়ালা যখন আসিয়া আভাসে বুঝাইয়া দিয়া গেল যে ভাড়া বেশীদিন না দিয়া অপরের বাড়ীতে বাস করা মোটেই সম্মানজনক নয়, তখন তাহার লজ্জার আর অবধি রহিল না। মনে হইল তাহার মাথা যেন কে সহসা মাটির সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছে!

রাজদণ্ডের শত আঘাতেও যাহার শির সদা উন্নত রহিয়াছে, জেলখানার শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও, রাজকর্ম্মচারীর অনেক প্রকার অবমাননার চেষ্টাকে বুক ফুলাইয়া পদদলিত করিয়াছেন সেই নীলরতন আজ বাড়ীওয়ালার সামান্যতম ইঙ্গিতে মরমে মরিয়া গেলেন। মনে হইল এই মুহূর্ত্তে স্ত্রীপুত্রের হাত ধরিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া যান। কিন্তু তাহাও একান্ত অসম্ভব। সরকারী অপমানের প্রতিবাদে দুই মাস অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু পাওনাদারের অবমাননা! তাহার আর প্রতিবাদ কোথায়! এই দরুন তাহাকে নীরবেই সহ্য করিতে হইতেছে স্ত্রীপুত্র কন্যার মুখ চাহিয়া।

মনে মনে ঠিক করিলেন এখনই বাহির হইয়া কিছু একটা ব্যবস্থার চেষ্টা করিতে হইবে। কি চেষ্টা তাহার সম্পর্কে কোন ধারণা নাই—শুধু যাই হোক একটা কিছু! কিন্তু তাঁহার আর বাহির হওয়া হইল না। 'নীলুদা', 'নীলুদা', করিয়া জয়ন্ত ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

মুখের চেহারা যথাসম্ভব স্বাভাবিক করিবার চেষ্টা করে কহিলেন—"আরে, এস এস জয়ন্ত! জেল থেকে কবে বেরুলে? আজ বেশ কয়েক বছর পর তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল! সেই যে মনে পড়ে, চার বছর আগে, প্রেসিডেন্সী জেলের চুয়াল্লিশ ডিগ্রীতে পাশাপাশি ছিলাম! হঠাৎ এক দিন তোমাকে বদলি করে নিয়ে গেল! তারপর তোমার আর কোন খবরই পেলাম না!" কথাগুলি এক নিশ্বাসে বলিয়া নীলরতন মনের ভার অনেক লাঘব করিয়া ফেলিল।

"বদলি করার সময় আমিও জানতে পারি নি! প্রহরীদের মুখও এ বিষয়ে একেবারে বন্ধ। শেষ পর্য্যন্ত হাজির হলাম গিয়ে ত্রিচিনোপল্লী জেলে।"

"তারপর আমিও আর বেশী দিন প্রেসিডেন্সী জেলে থাকি নি। আমায় নিয়ে গেল নাগপুর জেলে!"

"নাগপুরের এক কয়েদী বদলী হয়ে আসে মাদ্রাজের ত্রিচিনোপল্লী জেলে। তাকেই অনেক জেরা করে আপনার খবর পাই। ওর মুখ থেকেই জানতে পেরেছিলাম ওরা আপনাকে শুধু দিনরাত্রি চব্বিশ ঘণ্টা সেলে বন্ধ করে রাখত তা নয়, এক ট

অত্যাচারও করেছে অনেক রকমে, শেষ পর্য্যন্ত নাকি কি একটা বড়রকমের গোলমাল হয়েছিল !"

"সে এক আজব ব্যাপার ! নিয়ম হ'ল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যখন আসবে তখন দু'পা একত্র করে হাত তুলে দাঁড়াতে হবে। হাতের [illegible]টো খোলা রেখে সাহেবকে বলেছিলাম—'ধরে এনে জন্তু-জানোয়ারের মত খাঁচায় পুরেও সাধ মিটছে না ! তার উপর সং সাজাবার শখটা অন্য কোথাও গিয়ে মেটাও সাহেব।' ইচ্ছে করে সং সাজতে পারব না আমি। সাহেব জবাবে বলেছিল, 'যেন [illegible]হার কথার প্রতিবাদ না করে বিনা বাক্যব্যয়ে আদেশ পালন [illegible]।'

"দেখলাম কথা কাটাকাটি নিরর্থক ; কাজেই নীরবে নিশ্চেষ্ট [illegible]লাম। সাহেবের তর স[illegible] না ; আদেশ হ'ল জোর করে হুকুম তামিল করা শিখিয়ে দিতে !

"সেলের দরজা খুলে এল জনচারেক সিপাই। তারা আমার হাত তুলে ধরল। সুপার সাহেবের মান রক্ষা হ'ল। তার পরদিনই হ'ল বাড়াবাড়ি। সেদিন আর উঠেই দাঁড়ালাম না। সাহেব চেঁচিয়ে বলল, দাঁড়াও ! জবাবে বললাম, 'ভেবেছিলাম সাহেব তুমি ভদ্রলোক, আর সেই খাতিরে অন্ততঃ উঠে দাঁড়াতাম কিন্তু জোর করে যারা সম্মান আদায় করতে চায়, মনে রেখো সাহেব, তাদের শুধু অভদ্র বললে খুব কম বলা হয় !

"সুপারের ইঙ্গিতে জেলার আবার জনাচারেক সিপাই সেলের ভিতরে পাঠাল, তারা জোর করে দাঁড় করাবার চেষ্টা করল। জেলার বিরক্ত হয়ে জুতোর ডগা গায়ে ঠেকিয়ে বলল—'এই শালা ওঠ।' তড়াক করে উঠেই জেলারকে এক লাথি মেরে দু'হাত দূরে ফেলে দিলাম। তারপর কিল, চড়, লাথি পড়তে লাগল আমার উপর মুষলধারে। কিছুক্ষণ বাদে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললাম। [illegible] বুঝতে পারি নি সিপাহী জমাদাররা কতক্ষণ ধরে এই [illegible] চালিয়েছিল। সংজ্ঞা ফিরে এলে দেখতে পেলাম আমি হাসপাতালে, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক ডাক্তার।"

কাহিনী শুনিতে শুনিতে জয়ন্ত উত্তেজিত হইয়া গিয়াছিল। [illegible] সমস্ত শরীর থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। নীলরতন থামিলে সে [illegible]—"তারপর !"

"তারপর, তারপর যা হয়, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে আমার আর আপোষ হ'ল না। যাক, ওসব ত ভাই হ'ল জেল-জীবনের প্রতি-দিনকার কথা। এখন বল কবে বেরুলে !"

"প্রায় দু'মাস হয়ে এলো।" একটু থামিয়া আবার বলিল, "কিন্তু বাইরের অবস্থা এবার যেন ততটা আশাপ্রদ মনে হচ্ছে না। কেউ বড় সাড়া দিচ্ছে না। পুরনো যারা ফিরেছে তারা অনেকেই জানাল রাশি রাশি অসুবিধার কথা। তাই আপনার ছাড়া পাওয়ার খবর পেয়ে ছুটে এলাম। আপনার পরিচালনায় গড়ে তুলতে পারব আবার সব।"

জয়ন্তের কথা শুনিয়া নীলরতনের হাসি পাইল, মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। গভীর নৈরাশ্য ও দুঃখের মধ্যেও মুখে এক রকমের বিবর্ণ হাসি ফুটিয়া উঠে। তাহা হাসি না কান্না বুঝা যায় না।

আজ পনর বৎসর আগে, হাঁ, পনর বৎসরই বটে ! যে মশাল হাতে করিয়া পথে বাহির হইয়াছিল, শত বিপদ-আপদ ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও যাহাকে কখনও এক মিনিটের জন্য পরিত্যাগ করিবার কল্পনাও করে নাই, সেই বর্ত্তিকা আজ পথের ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে। জেলে গিয়া শত লাঞ্ছনার মধ্যেও যে আদর্শ উজ্জ্বল রাখিয়াছিল তাহা এই দুই দিন স্ত্রীপুত্র কন্যার দুঃখ দেখিয়া নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে। নীলরতন ভাবিল সরমা, সুষমা, গোরা কেহই ত তার কাছে যাচিয়া আসে নাই। সে বিবাহ করিয়া পরের মেয়ে সরমাকে কাছে আনিয়াছে, ঘর বাঁধিয়াছে, সুষমা ও গোরাকে সেই ত তার সংসারে আহ্বান করিয়া আনিয়াছে।

নিজের মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিতে করিতে হঠাৎ নীলরতন উঠিয়া দাঁড়াইয়া জয়ন্তকে কহিল,"চল জয়ন্ত, এখুনি বেরিয়ে দেখি একবার খোঁজখবর করে। কাজ ত আমাদের করতেই হবে।" কথাগুলি শেষ করিয়াই জয়ন্তের হাত ধরিয়া একরকম তাহাকে টানিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

সরমা তাহার পথের দিকে কিছুক্ষণ নীরবে তাকাইয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নিজের কাজে মন দিলেন।

ক্রমশঃ

জাগে বৈশাখ জাগে

শ্রীগোপাললাল দে

জাগে বৈশাখ জাগে,
গগনাঙ্গনে পূর্ব্বদেহলী রাঙিছে রক্তরাগে ,
শুকতারা উঠে শুভ সূচনায়,
আলোর পতাকা দিকে দিকে ধায়,
অরুণের রথে হয়-সপ্তকে উদ্ধত বেগ লাগে,
জাগে বৈশাখ জাগে ।

নব বৈশাখ জাগে,
নিবিড় নিশার তিমিরান্তক আলোক-শিখর ভাগে,
দেববালা দলে সাজায়ে দীপালী,
সহস্র-শিখা দিয়ে গেল জ্বালি'
পরী অপ্সরী খেলে রঙ-হোরি কুঙ্কুমে রাঙা ফাগে ।
নব বৈশাখ জাগে ।

মধু বৈশাখ জাগে,
শ্যামা ধরণীর ফুলে পল্লবে শিশিরের ছিটা লাগে ;
কুঞ্জে ভ্রমর, পাখী গায় বনে,
পঙ্কজ ফুটে, আঁখি গৃহ-কোণে,
শিমুল-পলাশ-রঞ্জিল পথে, শঙ্কিত শুভ শাঁখে,
মধু বৈশাখ জাগে ।

ভরা বৈশাখ জাগে,
আম-কাঁঠালের ভাণ্ডার ভরে ফলবান অনুরাগে,
ক্ষেত ছেয়ে আছে সরস ফসলে,
শফরীর সারি সরোপল্বলে,
পথে প্রান্তরে রাখালিয়া বাঁশী সঙ্কেতে কারে মাগে,
ভরা বৈশাখ জাগে ।

খর বৈশাখ জাগে,
শ্যাম বন-গায় দহন-সাক্ষ্য আঁকিয়া রুক্ষ দাগে ;
নিম নিকুঞ্জে ডুবি' পিক গায়,
নিমীলিত আঁখি ধেনু বটছায়,
দূরে প্রান্তরে আলোয় ছায়ায় মায়া মরীচিকা লাগে,
খর বৈশাখ জাগে ।

জাগর বোশেখ জাগে,
পৃথ্বী-প্রান্তে দিক্ দিগন্তে নারায়ণ নরে ডাকে ;
জাগে নিপীড়িত আশঙ্কা নাহি,
পণ্ডিচেরীতে, কারিকল, মাহি,
সিংহল, গোয়া, ঈজিপ্ট, সুদান, আফ্রিকান্ত ভাগে,
জাগর বোশেখ জাগে ।

রুদ্র বোশেখ জাগে,
কোরিয়ায় সারি' শোণিত-সিনান, চীনের জড়িমা ভাঙ্গে ,
জাপানের গণ-মানস জাগায়,
বর্ম্মা আনাম রক্তে রাঙ্গায়,
পূর্ব্ববঙ্গে, সিং-মানভূমে, পাখতুনে ঝড় লাগে,
ভৈরবী বোশেখ জাগে ।

মহা বৈশাখ জাগে,
প্রাচী'র প্রাচীর-অবরোধ টুটি' কারা ছুটে আসে আগে ?
জাগে পীতদল জাগিছে শ্যামল,
কালো মহাদেশে মহা কল কল,
পশ্চিম আর পাতালের চোখে রূঢ় বিস্ময় লাগে,
মহা বৈশাখ জাগে ।

শুভ বৈশাখ জাগে,
বুদ্ধ উদিছে মায়া মা'র কোলে, 'এশিয়ায় আলো' লাগে ;
জাগে রবীন্দ্র শ্রীরাম-মোহন,
দেশে দেশে ছায় প্রাণস্পন্দন,
নরদ্রোহীদের ক্ষোভ বেড়ে যায় প্রেমীদের অনুরাগে,
শুভ বৈশাখ জাগে ।

আলোক-পন্থা

নীরা কার্ভে

[illegible] আমাদের সঙ্গে খুব কমই থেকেছেন। তিনি যে [illegible]র্শ বিশ্বাস করতেন তাঁর জীবন তারই জন্য উৎসর্গীকৃত [illegible]ন। তাঁর অনন্ত সংগ্রামময় জীবনে সন্তান-সন্ততি এবং নাতী-নাতনীদের সঙ্গে কাটাবার মত অবসর খুব কমই [illegible]। তথাপি সময় সময় আমার মনে হয় যে, আমি আমার দাদামশাইকে আমার 'করতলামলকবৎ' জানি, কেন-না আমাদের পরিবারে আমরা কখনো তাঁকে জানবার জন্যে, কখনো বা তাঁকে বুঝবার জন্যে তাঁর সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করেছি, কিন্তু সকল সময়েই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভ।

আন্নার জীবনের সূচনা বোম্বাই রাজ্যের রত্নগিরি জেলার ক্ষুদ্র পল্লী মুরুদে। কার্ভেরা সেখানে বাস করতেন, একটু [illegible]ই তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষা আরম্ভ হয়। মুরুদের বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করা হ'ত বটে, কিন্তু পরীক্ষা গৃহীত হ'ত বোম্বাই অথবা সাতারায়। যাতায়াতের ব্যবস্থা তখন সহজ-সাধ্য ছিল না। অবশ্য ফেরী ষ্টীমারে করে বোম্বাই যাওয়া যেত। আন্না তৃতীয় শ্রেণীর পাবলিক সার্ভিস পরীক্ষা—যা এখন ভার্নাকুলার ফাইন্যাল নামে অভিহিত—দেওয়া স্থির করলেন। তাঁর বোম্বাই রওনা হওয়ার ঠিক চার দিন আগে বৃষ্টি সুরু হ'ল। খুব জোর বৃষ্টিপাত হতে লাগল—বস্তুতঃ, এমন প্রচণ্ড বর্ষণ সুরু হ'ল যে, বোম্বাইয়ের ষ্টিমার সার্ভিস বন্ধ হয়ে গেল। আন্না পরীক্ষা দিতে যেতে পারলেন না। সেই মুহূর্ত্তে মনে হ'ল যে, তাঁর পরিশ্রম ব্যর্থ হতে চলেছে। তাঁর পক্ষে বোম্বাইয়ে গিয়ে এই পরীক্ষা দেওয়া তো সম্ভবপর হ'ল না, কিন্তু তাঁকে যে পরীক্ষা দিতে এবং পাস করতেই হবে। পরীক্ষা না দাও, ত কলেজে পড়াও বন্ধ। আর কলেজে না পড়লে চাকরির আশাও নেই—কার্ভেরা আবার বিত্তশালীও ছিলেন না। একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা ছিল একশ' দশ মাইল দূরবর্তী সাতারায় যাওয়া। তখনকার দিনে সাতারা পর্য্যন্ত কোনো রেল লাইনের যোগাযোগও ছিল না। এ ক্ষেত্রে হয় হেঁটে যাওয়া, নয় তো বাড়ীতে থাকা—এ ছাড়া আর কিছু করবার ছিল না। সতর বছরের তরুণ আন্না চার দিনে দীর্ঘ একশ' দশ মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে অতিক্রম করলেন।

[illegible]ং তল্পী-তল্পার বোঝায় পরিশ্রান্ত আন্না যখন সাতারায় পৌঁছলেন তখন রাত হয়েছে। বৃষ্টিতে ভিজে [illegible]কে কাটাতে হ'ল খোলা জায়গায়। পরীক্ষা [illegible] তখনকার দিনে পরীক্ষার্থীকে কেবল বইয়ের শেখানো বুলি কপচালেই চলত না, তাকে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হ'ত এবং উত্তর-পত্রগুলি যথাযথভাবে লিখবারও যোগ্যতা অর্জ্জন করতে হ'ত।

এখন আন্নার নিকট রইল আর একটি রাত্রির মাত্র ব্যবধান, তার পরেই পরীক্ষা।

পরদিন এল আশাদীপ্ত এবং আলোকোজ্জ্বল প্রভাত। আন্না স্কুলে গিয়ে পৌছলেন। অবশেষে বাস্তবিকই তিনি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছেন। এখন তিনি দ্বার অতিক্রম করে সেই 'হলে' প্রবেশ করতে উদ্যত যেখানে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা হবে চরিতার্থ, স্বপ্ন হবে বাস্তবে রূপায়িত। আত্ম-বিশ্বাসে বলীয়ান্ আন্না সবে কক্ষাভ্যন্তরে পদক্ষেপ করেছেন এমন সময় হঠাৎ একটি কণ্ঠস্বর তাঁর কানে এল, "বালক, তোমার নাম কি?"

"ধোণ্ডো কেশব কার্ভে, মুরুদ থেকে আসছি আমি।"

"ভেতরে গিয়ে পরীক্ষা দেবার অনুমতি পেতে হলে বয়েস সতের বৎসর হওয়া চাই, এ কথা কি জানা নেই? তোমার?"

"আমি জানি। আমার বয়স সতেরো বৎসর। এখানে এই পরীক্ষা দেবার জন্যে একশো দশ মাইল হেঁটে এসেছি আমি।"

ওঁরা তাঁর কথা বিশ্বাস করলেন না, এমনকি তিনি যখন তাঁদের বয়সের নিদর্শন-পত্র (birth certificate) দেখতে চাইলেন তখনো নয়। তাঁর পানে তাকিয়ে ওঁরা মাথা নাড়লেন, বোঝা গেল কথাটা বিশ্বাস করছেন না কেউই। একটি নাবালককে পরীক্ষা দেবার অনুমতি দিয়ে চাকরি খোয়ানোর ইচ্ছা তাঁদের কারুরই ছিল না। তাঁরা সকলেই তাঁর জন্যে দুঃখানুভব করলেন।

না, অসীম কষ্ট স্বীকার করা সত্ত্বেও আন্না পরীক্ষা দিতে পারলেন না। ভগ্নমনোরথ হয়ে তিনি ফিরে এলেন বাড়ীতে। ওখানকার কর্ত্তৃপক্ষ তার শরীরের গড়ন দেখে তাঁর বয়স সম্বন্ধে ভুল সিদ্ধান্ত করেছিলেন। আন্না ছিলেন ছোটখাটো মানুষটি।

পরের বছর তিনি পরীক্ষা দিলেন এবং কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেন। এর পর মুরুদে তাঁর বিদ্যাশিক্ষা পালার অবসান হ'ল।

আন্নার বাবা খুব সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন না এবং তাঁর পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ পেশোয়াদের নিকট

উপাধ্যায়রূপে কাজ করতেন। আন্নার পিতৃদেব মুরুদে কেরানীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন এবং বৎসরে মাত্র সাড়ে পঁচিশ টাকা মাইনে হিসেবে পেতেন। এই আয়ের উপর নির্ভর করে তাঁকে পাঁচ জন পোষ্যসমন্বিত একটি পরিবার প্রতিপালন করতে হ'ত। আন্নার উপর তাঁর বাবা এবং বড় ভাইয়ের খুব আশাভরসা ছিল; তাঁরা স্থির করলেন যে, তিনি যাতে উৎকৃষ্ট শিক্ষালাভ করতে পারেন সেজন্যে তাঁরা সবকিছু ত্যাগ করবেন। পড়াশুনা চালিয়ে যাবার জন্যে তাঁকে রত্নগিরিতে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। কিন্তু তা যে তখন হবার নয়। তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলেন এবং ছয় মাসের মধ্যেই তাঁকে ফিরে আসতে হ'ল বাড়ীতে। পরবর্তী সেসন আরম্ভ হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করে তিনি মুরুদে কঠোর পরিশ্রম করতে লাগলেন। তিনি বোম্বাইয়ে যাওয়াই স্থির করেছিলেন এবং তখনকার দিনেও বোম্বাইয়ে অবস্থান করা ছিল বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ।

তিনি কঠোর পরিশ্রম করতে লাগলেন। পড়াশুনো চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর একটি বৃত্তিলাভের প্রয়োজন ছিল, তাঁর খারাপ হস্তাক্ষর ছিল সবচেয়ে বড় বাধা। এখন বৃত্তিলাভের যোগ্য হতে হলে তাঁকে হাতের লেখা ভালো করতেই হবে। তিনি চেষ্টা ও অভ্যাস করতে লাগলেন এবং অবশেষে একদিন হস্তাক্ষরের উন্নতিতে সন্তুষ্ট হলেন। তিনি তাঁর উত্তরপত্র দাখিল করলেন; বৃত্তি যে পাবেনই এ বিষয়ে তিনি ছিলেন স্থিরনিশ্চয়, কিন্তু বাগড়া দিলেন শিক্ষক মিঃ জ্যাকসন। আর কেউ তাঁর হয়ে লিখে দিয়েছে এই অপরাধে তাঁকে অপরাধী করা হ'ল। আন্না নির্ব্বাক। রাগের বশে মিঃ জ্যাকসন আন্নাকে তাঁর সামনে লিখতে বললেন। দুটি নমুনা যদি না মেলে তো আন্নাকে ফাঁকিবাজের জন্য কয়েক ঘা বেত মারা হবে। আন্না লিখলেন। দেখা গেল দুটি হস্তাক্ষর হুবহু একই রূপ এবং অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, শিক্ষক ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করার জন্যে দুঃখপ্রকাশ করলেন। আন্নাকে অব্যাহতি দেওয়া হ'ল অভিযোগ থেকে। শেষে প্রমাণিত হ'ল যে, আন্নার উপর ঈর্ষাপরায়ণ তাঁর কোন সহপাঠী তাঁর সম্বন্ধে শিক্ষকের মনে এই মিথ্যা ধারণা সৃষ্টির জন্য দায়ী।

এই ঘটনার পরে আন্নার সৌভাগ্যোদয় হ'ল, তিনি একটি বৃত্তিলাভ করলেন এবং প্রথম ষোল জনের মধ্যে স্থান লাভ করে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। এতে নিজের যোগ্যতাবলে তিনি প্রতি মাসে আট টাকা করে আরো একটি বৃত্তিলাভ করলেন। স্বার্থত্যাগ এবং চূড়ান্ত কৃচ্ছ্রসাধন অভ্যাস করে তিনি কিছু অর্থসঞ্চয় করলেন। ছোট শিশুদের শিক্ষা দিয়ে তিনি যা পেতেন তা এর সঙ্গে যোগ করে তিনি মুরুদের সংসার চালানোর দায়িত্বের অংশ গ্রহণ করলেন। আটাশ বৎসর বয়সে তিনি বি-এ ডিগ্রি লাভ করতে সমর্থ হন। তখনকার দিনে এটা ছিল খুব কৃতিত্বের বিষয়, এখনকার মত তখন ঘরে ঘরে এত গ্রাজুয়েট ছিল না।

তখন একটা কিন্তু ভালো দিক ছিল। গ্রাজুয়েটদিগকে কখনো বেকার থাকতে হ'ত না। আন্না শিক্ষকতার একটি চাকরি পেয়ে সংসারজীবনে প্রতিষ্ঠিত হলেন। এখানকার চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়েছিল, তাঁর স্ত্রীর বয়স ছিল তখন আট বৎসর মাত্র। আশপাশের সকলেই তাঁকে পছন্দ করতেন। বিয়ের দশ বৎসর পরে তাঁদের একটি পুত্রসন্তান হ'ল। সব দিক দিয়েই তখন সুরাহা হয়েছিল, ভালো যাচ্ছিল না শুধু তাঁর স্ত্রীর স্বাস্থ্য। ঘন ঘন জ্বর হ'ত। তাঁর এই অসুখের দিকে কেউই বড় একটা খেয়াল করে নি। আন্না বোম্বাইয়ে বাসা করলেন, তিনি তাঁর স্ত্রীপুত্রকে সেখানে নিয়ে গেলেন।

বোম্বাইয়ে তিনি তাঁর বন্ধু যোশী এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে যৌথভাবে বাস করতে লাগলেন। এখানে বিপত্তি দেখা দিল শ্রীমতী যোশীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। তখন যৌথ পরিবারের সকল বোঝা এসে পড়ল আন্নার স্ত্রীর ঘাড়ে। প্রবল জ্বরের মধ্যেও যখন তাঁকে গৃহস্থালির প্রয়োজনে ময়দা পিষতে হ'ত তখনো তিনি কোনো অনুযোগ করতেন না। অবশেষে মিঃ যোশী অবশ্য সাহায্যের জন্যে তাঁর বিধবা বোনকে নিয়ে এলেন, কিন্তু হায়, তখন কাজের চাপে আন্নার স্ত্রীর রুগ্ন দেহ একেবারে ভেঙে পড়েছে। তিনি গুরুতররূপে অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তাঁকে মুরুদে নিয়ে যেতে হ'ল। আন্নার পক্ষে তাঁর কাছে থাকা সম্ভবপর হ'ল না, কেননা তাঁকে চাকরি বজায় রাখতে হবে। শেষে রোগ এমন জটিল আকার ধারণ করল যে, একজন ডাক্তার ডাকতে হ'ল। তিনি এসে রোগনির্ণয় করে [illegible] স্ত্রী নিদারুণ যক্ষ্মা ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন। আজকের দিনে যে সকল আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ সহজলভ্য, তখন ডাক্তারদের পক্ষে সেগুলো পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তাঁর ব্যাধি সাধ্যের বাইরে চলে গেল এবং ভগবান তাঁকে তাঁর কোলে ফিরিয়ে নিলেন। বোম্বাইয়ে থেকে আন্না এই নিদারুণ দুঃসংবাদ শুনলেন।

হাঁ, আমার দাদামশাই আবার বিয়ে করলেন। কিন্তু সেই বিবাহ দ্বারা তিনি এক বিপ্লব আনয়ন করলেন। তিনি সংগ্রাম করলেন—তাঁর জীবনাদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করবার নিমিত্ত এবং সেই আদর্শেরই জন্য আজও তিনি বেঁচে আছেন।

প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পরেই তাঁর দ্বিতীয় বার বিবাহের কথা উঠল। কিন্তু আন্না পুনবিবাহের বিরুদ্ধে এই যুক্তি দেখালেন যে, তিনি যদি মারা যেতেন তা হলে তাঁর স্ত্রীর পক্ষে আবার বিবাহ করা সম্ভবপর হ'ত না। তিনি কুলক্ষণা বলে গণ্য হতেন এবং তাঁকে হীনতা ও অত্যাচার সহ্য করে পৃথকভাবে থাকতে হ'ত। কাজেই পতিহীনা নারীর প্রতি যে ধরণের আচরণ করা হয় বিপত্নীক পুরুষ কেন তা থেকে নিষ্কৃতি পাবে। উভয়েই মানুষ, সুতরাং উভয়ের প্রতিই সমান ব্যবহার করা উচিত। তিনি বিবাহ করতে অসম্মতি জানালেন। ইতিমধ্যে গোপালকৃষ্ণ গোখলে কর্তৃক পুণার ফার্গুসন কলেজে গণিতের শিক্ষকরূপে কাজ করতে আহূত হয়ে তিনি বোম্বাই ছাড়লেন।

পুণাতে পণ্ডিতা রমাবাঈ নাম্নী সেই সময়কার একজন মহীয়সী মহিলা 'সারদা সদন' নামে একটি নারীকল্যাণ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে এক মহান সমাজসেবাকার্য্যের অনুষ্ঠান করছিলেন; আন্নার বোম্বাইয়ের বন্ধু যোশীর বিধবা ভগ্নী সেখানে থাকতেন। তাঁর পিতা পুণাতে আসতেন তাঁকে দেখবার জন্যে। আন্না যোশীর বন্ধু এ কথা জেনে তাঁর পিতা আন্নার গৃহে অবস্থান করতেন, সেখানে কন্যা মাঝে মাঝে আসতেন পিতাকে দেখতে। শোনা যায় যে, যোশী চেয়েছিলেন কুমারী বলে চালিয়ে দিয়ে তাঁর পুনবিবাহ দিতে, কিন্তু এরূপ প্রতারণামূলক আচরণ করতে তিনি রাজী হন নি। তিনি জোর গলায় বললেন, যদি একান্তই তাঁকে বিবাহ করতে হয় তা হলে বিধবা এই পরিচয়েই তিনি পরিণীতা হবেন—আর কোনো রূপেই নয়। এতে তাঁর বিয়ের কথাবার্তায় ছেদ পড়ল। এক দিন তাঁর বাবা আন্নাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি আর বিয়ে করতে চান কি না। আন্না বললেন, তিনি অরাজী নন, তবে এ কথাও জানালেন যে, যদি কোনো বিধবা পুনবিবাহ করতে সম্মত হন তা হলে তাঁর সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে পারেন। যোশী মহাশয় অত্যন্ত খুশী হয়ে নিজের মেয়ের কথা পাড়লেন। তাঁর মেয়ে সম্মতি প্রদান করলে আন্না বললেন—"আমি গরীব। পণ্ডিতা রমাবাঈ তোমাকে যা দিতে পারেন তা দেবার শক্তি আমার নেই। তা ছাড়া আমাদের যৌথ পরিবারে খাটুনিও বেজায়। কাজেই চূড়ান্ত সম্মতি দেবার আগে এ সম্বন্ধে ভালো করে ভেবে দেখো।"

পুণায় প্রথম বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হ'ল ১৮৯৩ সালের ১১ই মার্চ্চ এবং এই পরিণয়ের ফলে গঙ্গুবাঈ হলেন শ্রীমতী কার্ভে। সাম্প্রতিক কালে এই ধরণের বিবাহ তো নিত্যকার ঘটনা, কিন্তু ষাট বৎসর পূর্ব্বে এ ছিল রীতিমত প্রকাশ্য বিদ্রোহের সামিল। সমাজ কোনো অবস্থায়ই এই অপরাধকে (?) ক্ষমা করত না। আন্নাকে পুণায়, এমনকি তিনি নিজে যে বিধবা নিকেতন (Widows' Home) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেখানে পর্য্যন্ত সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হতে হ'ল। আন্না তাঁর নবপরিণীতা পত্নীর সঙ্গে মুরুদে গিয়ে দেখেন, সেখান লোকেরা তাঁর আচরণের নিন্দাবাদ করছে। মুরুদের মাতব্বরেরা একজোট হয়ে স্থির করলেন, আন্নার পরিবারের লোকেরা যদি তাঁর সঙ্গে দেখা করেন তা হলে তাঁদের সবাইকে বয়কট করা হবে। এটাও স্থিরীকৃত হ'ল যে, যে কেউ তার সঙ্গে কোন প্রকার সংস্পর্শ রাখবে তাকেই বয়কট করা হবে। ফলে মন্দভাগ্য আন্না নিজের গৃহে পর্য্যন্ত প্রবেশ করতে পারলেন না, অবস্থান করতে হ'ল তাঁকে একটা গোশালায়।

আন্নার দ্বিতীয় বার বিবাহের পর তাঁর পোষ্য বৃদ্ধি হ'ল, পর পর জন্মাল চারটি ছেলে। পুনর্ভূ নারীদের গর্ভজাত অন্য কয়েকটি শিশু এবং তাঁর গৃহে আশ্রিত অনাথ শিশুদের দেখাশুনাও তাঁকে করতে হ'ত। তাদের সকলকেই লেখা-পড়া শেখানো হ'ত। ঘরের যাবতীয় কাজকর্ম্ম করতে হ'ত 'আজি'-কে, তা ছাড়া আশ্রমের জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টায়ও তাঁকে ব্যাপৃত থাকতে হ'ত। ছেলেদের শিক্ষার দিকে আন্নার বিশেষ লক্ষ্য ছিল এবং নিজের মিতব্যয়িতা ও বুদ্ধিকৌশলে তিনি তাদের সকলের জন্যই বিদেশে উচ্চ-শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হলেন। এইটেকেই তিনি পুত্রদের প্রতি তাঁর শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলে মনে করতেন, তাদের ভবিষ্যৎ সংস্থান সম্বন্ধে মাথা ঘামাতেন না। একবার আন্না তাঁর পাঁচ হাজার টাকার জীবনবীমার 'পলিসি' আশ্রমের নামে বদলি করে নিয়েছিলেন, নিজের সন্তানদের কথা না ভেবে আর দশ জনের কথাই ভেবেছিলেন। ঐ সময়ে আন্না তাঁর স্ত্রীকে স্কুলে পাঠান। শেষে এক বৎসরের জন্য ধাত্রী-বিদ্যার কোর্স শেখবার নিমিত্ত তাঁকে নাগপুরে প্রেরণ করেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে ঘর সংসারের কাজকর্ম্ম তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

আন্নার দ্বিতীয় বিবাহ তাঁর বিধবা বিবাহের আদর্শের অগ্রগতির পক্ষে সহায়ক হ'ল। বিয়ের পর তিনি একটি বিধবা বিবাহ সমিতি সংগঠন করেন। ১৮৯৬ সালে বিধবাদের স্বাবলম্বিনী করবার উদ্দেশ্যে তাদের শিক্ষার জন্যে এই সমিতি থেকে পৃথক ভাবে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। হঠাৎ প্লেগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় একজন মাত্র ছাত্রী নিয়ে প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রমটিকে হিঙ্গুতে স্থানান্তরিত করা হয় তখন এখান-কার অন্তেবাসিনী ছিলেন পাঁচ জন এবং মেট্রন এক জন। তাঁরা বাস করতেন একটি কুঁড়েঘরে। তখন কোন 'বাস সার্ভিস' ছিল না, প্রতি সন্ধ্যায় আন্নাকে প্রায়ই প্রয়োজনীয়

ভারী দ্রব্যাদি নিয়ে পায়ে হেঁটে হিঙ্গু যেতে হ'ত। এমনি ভাবে দুই বৎসরকাল তাঁকে আশ্রমে শিক্ষাদান করতে হ'ত এবং সেখানে রাত কাটিয়ে রোজ সকালে ফিরে আসতে হ'ত পুণায়। তার পর বিদ্যালয় গৃহ ও একটি ছাত্রীনিবাস নির্ম্মিত হ'ল এবং কর্ম্মীও নিযুক্ত করা হ'ল। আজ আশ্রমের ছাত্রী নিবাস এবং বিদ্যালয়-গৃহের সংখ্যা অনেকগুলি—নার্শারি স্কুল, প্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয় এবং শিক্ষণ-বিভাগ এর অন্তর্ভুক্ত। এতে প্রায় পাঁচ শত ছাত্রীর শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। সকল জাতি ও বয়সের বালিকা এবং নারীগণ—যেমন বিবাহিতা ও অবিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা তেমনি বিধবারাও এখানে শিক্ষালাভের অধিকারিণী। দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালকদের এখানে ভর্ত্তি করা হয়।

আন্না উপলব্ধি করলেন যে, মেয়েদের নানা দুর্গতির হাত থেকে বাঁচাতে গেলে তাদের বিবাহের বয়স বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন। নারীদিগকে মাতৃভাষার মাধ্যমে তাদের ভাবী জীবনের পক্ষে উপযোগী শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে তিনি একটি মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এটিই শ্রীমতী নাথী-বাঈ দামোদর ঠাকরসী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে এবং বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমপর্য্যায়ের বলে বোম্বাই সরকারের স্বীকৃতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। 'ভারত সেবক সমিতি' এবং 'ডেকান এডুকেশন সোসাইটি'র কৃতিসমূহ আন্নাকে নারী কল্যাণ-কর্ম্মে অনুরাগী লোকদিগকে একত্র মেলাবার উদ্দেশ্যে একটি নিষ্কাম কর্ম্ম-মঠ সংগঠনে প্রবৃত্ত করে। সভ্যদিগকে স্বল্প বেতনে আজীবন এই মঠের (মিশন) সেবা করবার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হয়। ১৯৩৬ সালে আটাত্তর বৎসর বয়সে আন্না 'মহারাষ্ট্র, গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষা সমিতি' সংগঠিত করেন। এই সংস্থা এগার বৎসরের প্রচেষ্টায় চল্লিশটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে চুরাশী বৎসর বয়সে আন্না মানবীয় সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে 'সমতা সঙ্ঘ' স্থাপন করেন। পরবর্ত্তী কালে এই সংস্থা থেকেই উদ্ভব হয় 'জাতি নিরমূলন সঙ্ঘে'র। এই প্রতিষ্ঠান অস্পৃশ্যতা এবং জাতিগত পার্থক্য দূর করবার জন্যে পূর্ণোদ্যমে চেষ্টা করছে।

এখন আন্না সময় সময় যখন অবসর পান তখন ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত শুনতে ভালবাসেন। সতের বৎসর বয়সে অধ্যয়নের নিমিত্ত আমাকে যখন নিউ ইয়র্কে যেতে হয় তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন—"সকল সময় লক্ষ্য যেন তোমার এক পা আগে থাকে। দুর্ভাবনা করো না, সবচেয়ে ভালোর জন্যে আশা করবে এবং তৈরি থাকবে অপকৃষ্টতম অবস্থার জন্যে। যখনই সময় পান তখনই তাস খেলতেও তিনি ভালবাসেন। চুরানব্বই বৎসর বয়সেও তিনি বহালতবিয়তে আছেন এবং যথারীতি কাজকর্ম্ম করে থাকেন। বেঁচে থাকতেই জীবনের অধিকাংশ আদর্শ এবং স্বপ্নের চরিতার্থতা দেখে যাওয়া দুর্লভ সৌভাগ্য। আন্না হয়েছেন সেই পরম সৌভাগ্যের অধিকারী।

সভা-সমিতিতে আন্না যখনই সংবর্দ্ধিত হন, তখনই তিনি বলেন—"আমি যা করতে পেরেছি তার অর্দ্ধেক, অথবা তারও বেশী কৃতিত্ব আমার স্ত্রীর। তিনি সংসার না চালালে এবং আমাকে সাহায্য না করলে আমি কতটুকু করে উঠতে পারতাম তাই ভাবি।" আমার ঠাকুরমা ১৯৫১ সালে হিঙ্গুতে পরলোকগমন করেন, তাঁর মৃতদেহ যেখানে দাহ করা হয় সেখানে একটি তুলসী-বৃন্দাবন নির্ম্মাণ করিয়ে দেওয়া হয়। আন্না যখনই হিঙ্গুতে যান, তখনই পত্নীর নশ্বর দেহ যেখানকার মাটিতে মিশে আছে সেই স্থানে গিয়ে ঐ তুলসী-বৃন্দাবন দর্শন করতে ভোলেন না।

ভারতে আইনের চোখে নারী ও শিশুদের স্থান

শ্রীদুর্গাবাঈ দেশমুখ

ভারতের শাসনতন্ত্রে পুরুষ ও নারীর সাম্যের কথা ঘোষিত এবং উভয়ের মধ্যে ভেদবৈষম্য নিষিদ্ধ হয়। শাসনতন্ত্র কর্ত্তৃক প্রতিশ্রুত মৌলিক অধিকারসমূহ নারী এবং পুরুষের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য। ভারতে প্রাপ্তবয়স্কের সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার বিদ্যমান, কাজেই নারীদেরও ভোট দিবার অধিকার আছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বহুসংখ্যক নারী ব্যবস্থাপক সভা, পৌরপ্রতিষ্ঠান এবং লোকাল বোর্ড-গুলিতে প্রবেশ করিয়াছেন। সরকারী চাকরিতেও যোগদানকারিণী নারীদের সংখ্যা যে ক্রমশঃ বাড়তির পথে তাহার পরিচয় বিদ্যমান। আমাদের কেন্দ্র এবং রাজ্য বিধান পরিষদ উভয়ত্রই মহিলামন্ত্রী রহিয়াছেন এবং কতিপয় নারী জনকল্যাণ কর্ম্মের অন্যান্য ক্ষেত্রেও কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কারখানা, খনি এবং চাষবাসের ক্ষেত্র ইত্যাদিতেও দীর্ঘকাল যাবৎ স্ত্রীলোকদিগকে কর্ম্মে নিয়োগ

করা হইতেছে। গার্হস্থ্য-কর্ম্মেও তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করা হয়। অধিকাংশ বৃত্তি এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে আমাদের নারীরা রহিয়াছেন।

নারীসমাজের বৃহত্তম অংশ

ভারতে হিন্দুনারীরা হইতেছেন নারীসমাজের বৃহত্তম অংশ। ভারতের লোকসমষ্টি তাহাদের সামাজিক ও ধর্ম্মীয় মর্য্যাদা এবং সম্পত্তির অধিকারের ব্যাপারে দীর্ঘকাল যাবৎ নিজেদের ব্যক্তিগত বিধি দ্বারা অনুশাসিত হইয়া আসিতেছে। দেশের বিধান পরিষদসমূহ কর্ত্তৃক অদলবদল না হওয়া পর্য্যন্ত এই সমস্ত বিধি প্রযুক্ত হইতে থাকে। নারীর অধীনতা প্রত্যক্ষীভূত হয় এই ক্ষেত্রেই। কড়া হিন্দু আইন অনুসারে হিন্দুনারী সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে না। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমও আছে, কিন্তু উহাই হইতেছে সাধারণ নিয়ম। যে ক্ষেত্রে সে উত্তরাধিকার লাভ করে সে ক্ষেত্রেও তাহার অদৃষ্টে জোটে সারাজীবনের জন্য সীমাবদ্ধ সম্পত্তির অংশমাত্র এবং তাহাও হস্তান্তরিত করিবার ক্ষমতা তাহার থাকে না।

হিন্দু আইনে বিবাহ-বিচ্ছেদ বলিয়া কিছু নাই। এ ক্ষেত্রেও ইহা অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে, দেশাচার হিন্দুদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকেদের বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং পুনর্ব্বিবাহ এতদুভয়েরই অধিকার প্রদান করিয়াছে। স্বামীর জীবিতাবস্থায় হিন্দুনারীর পত্যন্তর গ্রহণের অধিকার নাই, পক্ষান্তরে পুরুষ যত বার ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে। উপেক্ষিতা এবং উৎপীড়িতা হিন্দু নারীর প্রতিকারলাভেরও কোন পন্থা ছিল না। স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলে অথবা নিষ্ঠুর আচরণে জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিলে স্ত্রীর একটিমাত্র অধিকার ছিল—তাহা স্বামীর নিকট হইতে খোরপোষ পাইবার অধিকার। এই সমুদয় ব্যাপারে হিন্দুদের ব্যক্তিগত বিধি অনুসারে স্ত্রীলোকেরা নিকৃষ্ট স্তরের বলিয়া গণ্য হইত। ইহা স্বতঃই শাসনতন্ত্রে ঘোষিত সাম্যনীতির বিরোধী এবং এই শ্রেণীর যাবতীয় ব্যাপারেই আইন পুনঃপ্রণয়ন হওয়া প্রয়োজন।

বিধানপরিষদে সাম্প্রতিক কর্ম্মপ্রচেষ্টা

সম্প্রতি বিধানপরিষদে নারী-পুরুষের বৈষম্য এবং নারীর হীনতা দূর করিবার জন্য কর্ম্মপ্রচেষ্টা অবলম্বিত হইয়াছে। ১৮৫৩ সনের একটি বিধি হিন্দু বিধবাদের বিবাহের অনুমতি দিয়াছে এবং বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ১৯৩৭ সালের একটি আইন হিন্দু বিধবাকে এমন কতকগুলি অধিকার দিয়াছে যাহার বলে পুত্রসন্তান না থাকিলে সে স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করিতে পারে এবং স্বামী পুত্রসন্তান রাখিয়া মারা গেলেও সে তাহাদের সঙ্গে সমভাবে ভাগ করিয়া স্বামীর সম্পত্তি সারাজীবন ভোগ করিতে পারে। ১৯৪৬ সালের একটি আইনে, কোন কোন বিশেষ অবস্থায় স্বামীর নিকট হইতে স্ত্রীর পৃথকভাবে বাস করিবার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে এবং উক্ত আইন দাবি করিয়াছে যে, এমতাবস্থায় স্বামীকে স্ত্রীর ভরণপোষণ এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সমস্ত বিধি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে প্রযোজ্য :—স্বামীর কোন কুৎসিত ব্যাধি, স্বামী কর্ত্তৃক স্ত্রীর উপর নিষ্ঠুর আচরণ অথবা স্ত্রীকে পরিত্যাগ, তাহার পুনর্বিবাহ, তাহার ধর্ম্মান্তরিত হওয়া অথবা গৃহে প্রণয়িনীকে স্থান দেওয়া।

বিবাহ ব্যাপারে হিন্দু আইনের বিধান ছিল যে, পাত্রপাত্রী উভয়েই হইবে স্বজাতি। বাল্যবিবাহ ছিল অতি সাধারণ ব্যাপার। ১৯২৯ সালের একটি আইন আঠার বৎসরের নিম্নবয়স্ক ছেলেদের এবং ১৫ বৎসরের নিম্নবয়স্ক মেয়েদের বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়াছে। সাম্প্রতিক বিধি অনুসারে হিন্দুর সকল জাতি ও বর্ণের মধ্যে আন্তর্বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে এবং বৌদ্ধ, শিখ ও জৈন এই তিনটিকেও এ ক্ষেত্রে হিন্দু সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বিশেষ বিবাহ-বিধি অনুসারে এমন এক পদ্ধতির বিবাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে যাহাতে যে-কোন পাত্রপাত্রী পরস্পরে জাতি ধর্ম্ম এবং বর্ণনিরপেক্ষ ভাবে পরস্পরের সহিত পরিণীত হইতে পারে।

কোন কোন রাজ্যে সাম্প্রতিক বিধান হিন্দুদের উপর একবিবাহের অনুশাসন জারি এবং বিবাহবিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহের ব্যবস্থাও করিয়াছে। সমগ্র দেশের প্রতি প্রযোজ্য অনুরূপ আইন পাস করাইবার সঙ্কল্পও সরকারের আছে। অবশ্য বিলগুলি এখনও পার্লামেন্টের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। কোন কোন অঞ্চলে স্ত্রীলোকদিগকে দেবতা অথবা দেববিগ্রহের নিকট উৎসর্গ করিবার প্রথা আছে। এই সকল স্ত্রীলোকের পক্ষে বিবাহ নিষিদ্ধ এবং ইহা পরিণামে তাহাদিগকে পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য করিয়াছে। মাদ্রাজ ও বোম্বাই এই প্রথা নিষিদ্ধ করিয়া এবং এই ভাবে উৎসর্গীকৃত নারীদিগকে বিবাহ ও পরিবারগঠনের অধিকার প্রদান করিয়া আইন প্রণয়ন করিয়াছে।

শ্রমজীবিনী নারীদের সম্পর্কিত আইন

কারখানা, খনি এবং চা বাগান সজীবাগান ইত্যাদিতে স্ত্রীলোকদের বিনিয়োগ-নিয়ন্ত্রণ-সম্পর্কিত আইনসমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে। কাজের নির্দিষ্ট সময় এবং স্ত্রীলোকদিগকে যে ধরণের কাজ করিতে অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে তাহা ঐ সকল আইন কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। মালিকদের পক্ষে পুরুষ এবং নারী কর্ম্মীদের জন্য পৃথক পৃথক সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধায়ক দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। যে সকল কারখানায়

পঞ্চাশ জনের অধিক নারী কর্ম্মে নিযুক্ত আছে সেগুলির পক্ষে শিশুরক্ষণাগারের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। শিশু-সন্তানের জননীদিগকে শিশুর সেবা করিবার জন্য মাঝে মাঝে কর্ম্মবিরতি ও বিশ্রামের সুযোগ-সুবিধা করিয়া দেওয়াও অবশ্যকর্ত্তব্য।

কতিপয় রাজ্যে নারী-কর্ম্মীদের জন্য "মেটার্নিটি বেনিফিটে"র ব্যবস্থা করিয়াও আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। সন্তানজন্মের অব্যবহিত পরবর্ত্তী চার সপ্তাহকালের মধ্যে কোন স্ত্রীলোককে কর্ম্মে নিয়োগ করাও নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"সমান কাজের জন্য সমান মজুরি" এই আদর্শ এখনও বাস্তবে রূপায়িত হয় নাই। ভারতবর্ষ এই বিষয়ে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির অনুমোদন না করিলেও নীতির দিক দিয়া ইহাতে সম্মতি প্রদান করিয়াছে এবং কার্য্যকরীকরণযোগ্য বিষয়-সমূহের অন্যতম বলিয়া আমাদের শাসনতন্ত্রের মূলনীতিসমূহ ইহার সমর্থন করিয়াছে।

শিশুদের কর্ম্মে নিয়োগ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ

শাসনতন্ত্রে পনের বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালক এবং শিশুদের কোন কারখানায়, খনিতে অথবা অন্য কোন বিপজ্জনক কর্ম্মে নিয়োগ নিষিদ্ধ হইয়াছে। কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পিতামাতার সম্মতি ব্যতিরেকে কোন প্রকার ধর্ম্ম-শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারিবে না। উপেক্ষা ও শোষণের হাত হইতে শিশুদের রক্ষণ এবং চৌদ্দ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত সকল শিশুর জন্য সার্ব্বজনীন অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ শাসনতন্ত্রের নির্দ্দেশকসমূহের অঙ্গীভূত।

১৮৫০ সালের একটি আইনে সাধারণ দাতব্য প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক প্রতিপালিত অনাথ এবং দরিদ্র শিশুদিগকে ব্যবসা, কারুশিল্প এবং কাজকর্ম্ম শিখিবার জন্য চুক্তিপত্র দ্বারা আবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১৯৩৩এর একটি আইনে কাজের জন্য অল্পবয়স্ক বালকদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই ধরণের যে-কোন চুক্তি বাতিল বলিয়া ঘোষিত হয় এবং চুক্তিকারীরা শাস্তি প্রাপ্ত হয়।

ভারতীয় দণ্ডবিধি কর্ত্তৃক শিশু ক্রয় ও বিক্রয় নিষিদ্ধ এবং পাপ ব্যবসায় চালাইবার উদ্দেশ্যে কোন নাবালিকাকে ক্রয় অথবা বিক্রয় করিলেও তাহা উক্ত দণ্ডবিধি অনুসারে অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। উভয় ক্ষেত্রেই গুরুতর শাস্তিবিধান করা হয়।

১৯৩৮ সালের একটি আইনে মালপত্রাদি চালান দেওয়া এবং কোন বন্দরে মালপত্রাদি বহন সম্পর্কিত কাজে পনের বৎসরের অনধিক-বয়স্ক শিশুর বিনিয়োগ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে এবং ইহাও স্থির হইয়াছে যে, বারো বৎসরের অনধিক-বয়স্ক কোন শিশু কোন কারখানায় কতকগুলি শিল্পের উৎপাদন পদ্ধতিসংশ্লিষ্ট কাজে নিযুক্ত হইতে পারিবে না—বিড়ি তৈরি, গালিচা বোনা, সিমেণ্ট, দিয়াশলাই এবং বিস্ফোরক দ্রব্য-সমূহ, লাক্ষা গালাইয়া প্রস্তুত পাতলা পাত, সাবান, টিনের কাজ, কাঠ পরিষ্করণ প্রভৃতি ঐ সকল নিষিদ্ধ শিল্পের অন্তর্গত।

ফ্যাক্টরী আইন অনুসারে কোন কারখানায় কর্ম্মে নিযুক্ত শিশু ও কিশোরের সুস্থতা সম্পর্কে একজন মেডিকাল অফিসারের সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হয় এবং তাহাদের কাজের সময় ও কাজের ধরণ উক্ত আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

শিশুর ভরণপোষণের কর্ত্তব্য মুখ্যতঃ পিতার উপর ন্যস্ত। সাধারণতঃ পিতাই শিশুকে নিজের হেপাজতে রাখিবার অধিকারী, ইহার ব্যতিক্রম হয় শিশু খুব কচি হইলে। সে ক্ষেত্রে কোর্ট সাধারণতঃ তাহাকে মায়ের সহিত থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেয়। কোন পিতামাতা বারো বৎসরের নিম্ন-বয়স্ক শিশুকে পরিত্যাগ করিলে তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। অবৈধ শিশুসন্তানের মাতা তাহার খোরপোষের দাবি করিতে পারে এবং অবৈধ সন্তানের পিতাকেও ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইন অনুসারে অভিযুক্ত করা যাইতে পারে।

বিধিসমূহ কার্য্যকরীকরণের সমস্যা

কোন কোন রাজ্যে শিশু-আইন পাস হইয়াছে, কিন্তু তন্মধ্যে সবগুলিতেই এই সকল আইন কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এই সমস্ত আইনের উদ্দেশ্য মুখ্যতঃ দ্বিবিধ। প্রথমতঃ যে সকল অপরাধপ্রবণ শিশু আইন-অনুসারে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তাহাদের শিক্ষা এবং মানসিক বিকৃতির চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। ইহাদের বিচারের আদালত আলাদা এবং বিচারপদ্ধতিও অপেক্ষাকৃত কম কেতাদুরস্ত—শিশুর অপরাধের বিচার করিয়া দণ্ডবিধান করা অপেক্ষা তাহার চরিত্র সংশোধন করাই ইহার অধিকতর কাম্য।

যে সকল অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে বা নির্ব্বাসনদণ্ড ভোগ করিতে হয় না, সেই ধরণের অপরাধকারী পনের বৎসরের নিম্নবয়স্কদের জন্য সংশোধনাগার প্রতিষ্ঠা ১৮৯৭ সালের একটি আইনের বলে করা যাইতে পারে। এই আইন কিন্তু সকল শ্রেণীর শিশু অপরাধীর প্রতি প্রযুক্ত হইত না। অবশ্য শিশু-আইনের বিধান এই যে, কোন শিশুই—তা সে যতই গুরুতর অপরাধ করুক না কেন, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, নির্ব্বাসিত বা কারারুদ্ধ হইবে না। দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে শিশুদিগকে শিক্ষণের জন্য 'সার্টিফাইড স্কুল', শিল্প-বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে। ষোল হইতে একুশের মধ্যে যাহাদের বয়স সেই সকল তরুণ অপরাধীদের সংশোধন এবং শিক্ষণের জন্য কোন কোন রাজ্যে

'বোরস্টাল ইনসটিটিউশন' সমূহ রহিয়াছে। শিশু আইনের আর একটি উদ্দেশ্য হইতেছে—অনাথ, উপেক্ষিত এবং নিঃস্ব শিশুদের জন্য সযত্ন তত্ত্বাবধান এবং রক্ষণের ব্যবস্থা করা। এই সকল আইন পিতামাতার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দেয় এবং অযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন পিতামাতার হেফাজত হইতে শিশুগণকে সরাইয়া লইয়া যাইবার অধিকার শিশু আদালতকে প্রদান করে।

রাজ্যসমূহে সেবামূলক কর্ম্ম

সাম্প্রতিক কালে নারী এবং শিশুদের অধিকাংশ সেবামূলক কর্ম্মের ভারই স্বেচ্ছাসেবক সংস্থাসমূহের হস্তে। রাজ্যসমূহ এখনও এই সকল সংস্থাকে চালু রাখার ব্যবস্থা করিবার ভার গ্রহণ করে নাই। শাসনতন্ত্রে সম্প্রতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, রাজ্যকে ক্রমবর্দ্ধমাণ পরিমাণে এই সকল সংস্থার দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে হইবে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ইহা উপলব্ধ হইয়াছে যে, রাজ্যের পক্ষে পুরোপুরি ইহার ভার লইতে আরও কিছু সময় লাগিবে। ইহা বর্ত্তমান স্বেচ্ছামূলক সংস্থাসমূহের দৃঢ়ীকরণ এবং সম্প্রসারণের ভার লইয়াছে এই উদ্দেশ্যে যেন অধিক হইতে অধিকতর সংখ্যক শিশু তাহাদের কল্যাণকর্ম্মের দ্বারা উপকৃত হয় এবং এই সকল সংস্থার মাধ্যমে যেন তাহাদের প্রয়োজন মিটিতে পারে। পরিকল্পনা অনুযায়ী যথারীতি চার কোটি টাকার 'ফণ্ড' বা অর্থভাণ্ডারের সংস্থান হইয়াছে এবং এই অর্থভাণ্ডারের বিহিত ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক এমন সব বেসরকারী লোক লইয়া একটি কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ গঠিত হইয়াছে, স্বেচ্ছামূলক কল্যাণ-প্রচেষ্টাসমূহের উন্নয়নের ব্যাপারে ক্ষেত্র-কর্ম্মের যথাযথ অভিজ্ঞতা যাহাদের আছে। এক বৎসরের অনধিককাল যাবৎ পর্ষদ চালু হইয়াছে এবং ইহা ইতিমধ্যেই উপকরণ আহরণ এবং কতিপয় সংস্থাকে সাহায্যদানের ব্যাপারে ভাল কাজ করিয়াছে। ইহা কেবল সূচনামাত্র এবং আশা করা যায় যে, সেদিন আর বেশী দূরে নয় যখন অসংখ্য কল্যাণ-সংস্থা উদ্ভূত হইয়া দেশের সকল অংশে বাগুরাজালের মত প্রসারিত হইবে এবং সমাজের দুর্গতদের যাবতীয় প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম হইবে।

শিশু রক্ষণে আইনের দায়িত্ব

ভি. ভি. শাস্ত্রী

রাষ্ট্রই শিশুর সর্ব্বপ্রধান পিতৃমাতৃস্থানীয়। শিশু-কল্যাণই যে-কোন সভ্য রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কৃত্য হওয়া উচিত। প্রত্যেক বিবেচক এবং উপযুক্ত পিতামাতা তাঁহার নিজের শিশুর জন্য যাহা আকাঙ্ক্ষা করেন এবং যেরূপ সংস্থান করেন রাষ্ট্রেরও অনুরূপ আকাঙ্ক্ষা পোষণ এবং সংস্থান করা কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশে পিতামাতাদের মধ্যে দরিদ্র এবং অজ্ঞের সংখ্যাই বিপুল। যদিও এখন কিছুকালের জন্য বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে তথাপি কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শিশুদের পিতামাতারা নিজেরাই অপরের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে এবং এমন সময়ে সন্তানের জন্ম হয় যখন তাহাদের খাওয়া-পরা লালন-পালন ও শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার যোগ্যতা এই সকল পিতামাতার হয় না। যাই হোক্ পরিবারই—ইহার রূপ যাহাই হোক্ না কেন—বর্ত্তমান সামাজিক সংগঠনে সমাজের একক বলিয়া গণ্য হয়। পরিবারই একমাত্র ক্ষেত্র, সকল শিশুর যথাযথ প্রতিপালনের জন্য রাষ্ট্র যাহার দিকে ন্যায়সঙ্গত ভাবেই তাকাইয়া আছে। কিন্তু রাষ্ট্রের এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন যে, শিশুর প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিবার সামর্থ্য পরিবারের আছে এবং পরিবার প্রকৃতপক্ষে তাহা পালন করিতেছে। একটি সুস্থ এবং স্বাভাবিক শিশুর পক্ষে তাহার পিতামাতার অনুকল্প কোনকিছুই হইতে পারে না এবং সুখী পারিবারিক পরিবেশই তাহার দেহ-মনের বিকাশের পথে সকলের চেয়ে বেশী সহায়ক হইয়া থাকে। উপেক্ষা ও অবজ্ঞার হাত হইতে শিশুকে রক্ষা করিতে হইবে এবং পারিবারিক দারিদ্র্য যে ক্ষেত্রে উপেক্ষার হেতু সেই ক্ষেত্রে শিশুকে যথোচিত ভাবে প্রতিপালনের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষে

আনুকূল্য এবং সেবামূলক কর্ম্মের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

শিশুদের কর্ম্মে নিয়োগ

শাসনতন্ত্রের ২৪ ধারায় কেবলমাত্র কারখানায়, খনিতে ও অন্যান্য বিপজ্জনক কর্ম্মে শিশুদের বিনিয়োগ নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, শাসনতন্ত্রের এই ধারায় শিশুদিগকে অন্যত্র কর্ম্মে নিযুক্ত করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। চৌদ্দ বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশুদের কর্ম্মে নিয়োগ একেবারে নিষিদ্ধ করিয়া দিবার জন্য এই ধারার কতটুকু সংশোধন আবশ্যক তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা প্রয়োজন। যদি চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত একটা সীমাবদ্ধ স্বল্পসময়ের মধ্যে আবশ্যিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং যদি সেই শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ ও সুসম্পূর্ণ করিতে হয় তবে ইহার জন্যই শিশুর সবটুকু সময় ব্যয়িত হইবে। এমতাবস্থায় ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, শিশুর স্বাস্থ্যের ক্ষতি না করিয়া এবং শিক্ষাপদ্ধতির অপকারসাধন না করিয়া তাহাকে কর্ম্মে নিয়োগ করা অসম্ভব। দরিদ্র পিতামাতারা অনুযোগ করিতে পারে এবং এই যুক্তিও উত্থাপিত হইতে পারে। লঘু, আংশিক সময়ের কর্ম্ম পরিবারের পক্ষে বস্তুতঃই সহায়ক হইবে, কিন্তু এরূপ অনুমতিপ্রদান হইবে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম এবং কড়া সর্ত্তাবলী ও সতর্ক তত্ত্বাবধানেই এরূপ অনুমতি প্রদত্ত হইতে পারে। অভাবী পিতামাতাদের উচিত 'সাধারণ আনুকূল্য প্রোগ্রামে'র উপকারলাভের জন্য নিজেদের উপযুক্ত করিয়া লওয়া। নিজেদের উপার্জনের অনুপূরক রূপে যাহাতে ছোটদের মজুরির উপর তাহাদিগকে চাহিয়া থাকিতে না হয় সেদিকেও অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

শিশুদের নিকট প্রদর্শনযোগ্য ফিল্মের অনুমোদন এবং অভিনয়ের জন্য তাহাদের ষ্টুডিওতে উপস্থিতির অনুমতি-প্রদান-সম্পর্কিত প্রশ্নটিও আইনের বিচার্য্য বিষয়। অবাঞ্ছিত অস্বাস্থ্যকর প্রভাবে যাহাতে শিশুরা শোষিত এবং বিপথগামী না হইতে পারে সেজন্য শিশুদের অভিনয়ানুষ্ঠানাদি নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন।

তার পর আসে অনাথ অনাশ্রিত, উপেক্ষিত, পরিত্যক্ত ও নিঃস্ব শিশুদের কথা। আইনের দ্বারা তাহাদিগকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা সহজলভ্য হওয়া উচিত, অন্যথা ঐ সকল শিশু দলে দলে পথে-ঘাটে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং পাপ ও অপরাধমূলক জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়। বর্ত্তমানে যে সকল স্বেচ্ছামূলক সংস্থা স্বল্পমাত্রায় এই ধরণের শিশুদের খবরদারি করিতেছে তাহাদের অভিজ্ঞতা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, উহাদিগকে সমাজের কাঠামোতে জুড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। এমন আরও অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন যেগুলিতে জনবহুল শহরের রাস্তায় রাস্তায় বিচরণশীল এইসকল চালচুলাহীন বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো শিশুদের থাকা ও খাওয়া-পরার ব্যবস্থা হইতে পারে এবং যথাসময়ে তাহারা যাহাতে নিজেদের জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হয় সে ব্যবস্থাও ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে থাকা উচিত। যে রাষ্ট্র সর্ব্বনাশা আবর্ত্তে নিপতিত শিশুদের সমস্যার সমাধানকল্পে গর্ভপাত, শিশু-হত্যা এবং দাসত্বের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে সেই রাষ্ট্রকেই তাহাদের থাকা খাওয়া এবং খবরদারির জন্য অনুরূপ কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে।

কুমারী মাতা

যে পর্য্যন্ত সমাজ সন্তানবতী অবিবাহিতা স্ত্রীলোকদিগকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিবে সেই পর্য্যন্ত ঐ সকল অবাঞ্ছিত শিশুর খবরদারিও হইবে আইন এবং সমাজের দায়িত্ব। এমন সব শিশুনিকেতন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে যেখানে ঐ সকল কুড়াইয়া-পাওয়া শিশুদিগকে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করা হইবে এবং শিশুর যথোচিত রক্ষণ-ব্যবস্থা হইবে এই ভরসায় নিশ্চিন্ত হইয়া মা তাহাকে সেখানে রাখিয়া যাইতে পারিবেন। ইহাতে কেবল যে শিশুর প্রতিই সুবিচার করা হইবে তেমন নয়; স্ত্রীলোকটিও হতাশার কবল হইতে রক্ষা পাইবে। এ ক্ষেত্রেও আবার যথাস্থানেই —অর্থাৎ, অবৈধ সন্তানের পিতা কে তাহা যদি স্থিরীকৃত হয় তবে তাহার ঘাড়েই—দায়িত্ব চাপাইবার জন্য রাষ্ট্রের বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অন্তর্ব্বর্ত্তী কালের জন্য শিশু এবং মাতার রক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে রাষ্ট্রকে।

জাপানের প্রাথমিক বিদ্যালয়

একথা সকলের নিকটই সুবিদিত আছে যে, সভ্যতার পথে জাপানের দ্রুত উন্নতির মূলে রহিয়াছে মেইজী রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরে আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির বিকিরণ। তৎপূর্ব্বে শিক্ষা-বিষয়ক ব্যাপারে সাহিত্য এবং নীতিশিক্ষার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হইত। বস্তুতঃ প্রায় তিন শত বৎসর ব্যাপী জাতীয় পৃথককরণ নীতির ফলে জাপানের সাধারণ লোকের কোন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভের সুযোগ ছিল না। বিজ্ঞান সম্পর্কে তাহাদের কোন ধারণা ছিল না বলিলেই চলে। ইহা বাস্তবিকই লক্ষণীয় যে, মেইজী রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরে জাপান বৈজ্ঞানিক গবেষণা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছোট মেয়েদের নৃত্যশিক্ষাদান

এবং শিক্ষার ব্যাপারে যে-কোন প্রথম শ্রেণীর পাশ্চাত্য জাতির সমকক্ষতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। প্রাথমিক শিক্ষার বিকিরণের দরুন প্রাগযুদ্ধকালেও জাপানের পক্ষে সমগ্র পৃথিবীতে শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চতম স্তরে পৌছানো সম্ভবপর হইয়াছিল। জাপানের কোন জেলাতেই নিরক্ষর পুরুষ অথবা নারী ছিল না বলিলেই চলে।

যুদ্ধশেষে এই দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাবিষয়ে একটি মূলগত সংস্কার সাধিত হয়। শুধু যে উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং সামরিক নীতির কুফল দূরীকরণের উদ্দেশ্যে চেষ্টা করা হয় তেমন নহে, গণতান্ত্রিক আদর্শের অনুশীলনের জন্যও যাবতীয় কর্ম্মপন্থা অবলম্বিত হইয়াছিল।

শিশুদের কুস্তি লড়া

তখন নূতন জাতীয় শাসনতন্ত্রের আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষার মূলনীতি সম্পর্ক আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইনের বলে

দুই-তৃতীয়াংশের শিল্প এবং আর্থিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন আনয়ন করিবার পক্ষে যথেষ্ট। সম্প্রতি চারটি কূপ খনন করা হইয়াছে এবং ২,২৮০,০০০ লক্ষ কিউবিক ফুট গ্যাস পাওয়া যাইবে বলিয়া যে প্রাথমিক হিসাব ধরা হইয়াছিল তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। সুইয়ের প্রাত্যহিক ১০০ লক্ষ কিউবিক ফুট গ্যাস সরবরাহ 'থার্ম্মেল পাওয়ারে'র বা তাপীয় শক্তির দিক দিয়া বার্ষিক ১৬,০০,০০০ টন কয়লার সমান।

পাকিস্থানে উহার প্রয়োজনীয় তেল এবং কয়লার এক-ষষ্ঠমাংশ মাত্র উৎপন্ন হয়। এই নবাবিষ্কৃত শক্তি-উৎসের দৌলতে উক্ত রাষ্ট্রে বৎসরে আমদানী-খরচের ৭৮ লক্ষ টাকা বাঁচিতে পারে।

'বর্ম্মা অয়েল কোম্পানি'র সহযোগিতায় এবং পাকিস্থান সরকারের অনুমোদনক্রমে পাকিস্থান ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন কর্ত্তৃক সুই-প্রজেক্টের উন্নয়নকার্য্য পরিচালিত হইতেছে। প্রাথমিক মূলধনের নয় লক্ষ পাউণ্ড ষ্টার্লিঙের মধ্যে ১ লক্ষ পাউণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছে সম্প্রতি গঠিত কমনওয়েলথ ফাইনান্স কর্পোরেশন, পুনর্গঠন এবং উন্নয়নকার্য্যের আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড ধারস্বরূপ দিতেছে এবং বাকী তিন লক্ষের ব্যবস্থা হইয়াছে বর্ম্মা অয়েল কোম্পানি, পাকিস্থানের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন ও ব্যক্তিগতভাবে পাকিস্থানের মূলধন বিনিয়োগকারিগণ কর্ত্তৃক। একমাত্র কানাডা ছাড়া কমনওয়েলথে যত 'পাইপলাইন' স্থাপিত হইয়াছে তন্মধ্যে ইহাই হইবে সকলের চেয়ে বড় স্বাভাবিক গ্যাস লাইন এবং সমগ্র দূর এবং মধ্য প্রাচ্যে ইহাই বৃহত্তম বলিয়া গণ্য হইবে। ৪০,০০০ টন পরিমাণ ষোল ইঞ্চি 'ষ্টীলপাইপ' সরবরাহ করিবার জন্য ইউরোপের বৃহত্তম ইস্পাত-নল নির্ম্মাণের প্রতিষ্ঠান ষ্টুয়ার্টস এণ্ড লয়েডসের সঙ্গে চুক্তি হইয়াছে—ইহাতে খরচ পড়িবে প্রায় দুই লক্ষ পাউণ্ড।

সুই গ্যাসক্ষেত্র হইতে একটি বিশোধন প্ল্যাণ্টের ভিতর দিয়া গ্যাস চালান দেওয়া হইবে। এই প্ল্যাণ্ট কার্য্যোপযোগী হইবে ১৯৫৫ সালের গোড়ার দিকে। গ্যাস-নালীটি যাহা প্রত্যহ ৫৪ লক্ষ কিউবিক ফুটেরও অধিক পরিমাণ গ্যাস চালান করিতে সমর্থ, সুই পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে প্রায় ৭৫০ ফুট নীচে মরুপ্রান্তরে নামিবে এবং জলসিঞ্চিত ও কর্ষিত ভূমির ভিতর দিয়া চলিয়া যাইবে সুক্কুরে। সেখানে উহা সিন্ধুর পশ্চিম তীর হইতে, উক্ত নদ পার হইয়া পূর্ব্বতীরে উপনীত হইবে। অতঃপর খাইরপুর মরুভূমির প্রান্ত দিয়া চলিয়া গিয়া অবশেষে নবাবশাহ এবং সিন্ধুপ্রদেশের হায়দরাবাদ জেলার তুলা এবং গমক্ষেত্র অতিক্রম করিবে।

কোটরিতে সিন্ধুনদ পুনরতিক্রমণ করিয়া এই লাইন সিন্ধুদেশের মরুভূমির উপর দিয়া করাচিতে গিয়া পৌঁছিবে। এই পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য হইবে সাড়ে তিন শত মাইল। পাকিস্থান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মিঃ গোলাম ফারুক সম্প্রতি আর একটি পাইপলাইন স্থাপনের উদ্দেশ্যে পরিদর্শনকার্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত লাইনটি সুই হইতে ২০০ মাইল উত্তরে, সিন্ধুনদের বামতীরস্থ

কট আদ্দু-তে লইয়া যাওয়া হইবে। সেখানে ১ লক্ষ কিলোওয়াট বিশিষ্ট একটি শক্তি-গৃহ (power station) এবং একটি বৃহত্তর লোহা ও ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করা হইয়াছে।

প্রাথমিক অবস্থায় প্রত্যহ ৩৭ লক্ষ কিউবিক ফুট গ্যাস দ্বারা হায়দরাবাদ, কোটরি এবং করাচি এই তিনটি পাওয়ার ষ্টেশনের প্রয়োজন মিটিবে।

এই প্রাকৃতিক গ্যাস আবিষ্কারের ভবিষ্যৎ বিপুল সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ, কেননা বৈদ্যুতিক-শক্তি-উৎপাদনে ব্যবহৃত হওয়া ছাড়া ইহা প্লাষ্টিক, রেসিন, সিলিকোন, রেফ্রিজারেন্ট এবং মুদ্রণশিল্পে ব্যবহৃত কার্ব্বন ব্লেক প্রভৃতি উৎপাদনে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য-প্রস্তুতির ভিত্তিপত্তন করিতে পারে। যাহাই হোক, আগামী কিছু-কাল মুখ্যতঃ বৈদ্যুতিক-শক্তি-উৎপাদনের জন্যই সুই গ্যাস ব্যবহৃত হইবে।

এই সুই গ্যাস আবিষ্কৃত হওয়াতে পাকিস্থানের যে কত সুবিধা হইয়াছে তাহা আর বলিবার নয়। সেইদিন হয় ত বেশী দূরে নয় যখন করাচির গৃহিণীরা কয়লা অথবা কাঠের আগুনের পরিবর্তে সুই গ্যাসের সাহায্যে আধুনিক গ্যাস-ষ্টোভে রন্ধনকার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবেন।

ন. ভ.

দেশ-বিদেশের কথা

হেলেন কেলার

সম্প্রতি ড. হেলেন কেলার ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তাঁহার যখন মাত্র সতর বৎসর বয়স, সেই সময়েই তাঁহার সম্বন্ধে "মুকুল" মাসিকে (১৩০৪, আশ্বিন-কার্ত্তিক) কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মোহিনীমোহন মজুমদার "কুমারী হেলেন কেলার" শীর্ষক একটি সচিত্র প্রবন্ধ লেখেন। মোহিনীমোহন পরে ইংরেজী ১৯০৩ সনে "মূক-শিক্ষা" পুস্তক প্রকাশিত করেন। এ বিষয়ে এইখানি এদেশীয় ভাষায় লিখিত সর্ব্বপ্রথম পুস্তক। এই পুস্তকে ড. কেলারের অল্প বয়সের একখানি চিত্রও প্রকাশিত হয়। সেই চিত্রের প্রতিলিপি এখানে প্রদত্ত হইল। বলা বাহুল্য, মোহিনীমোহনের "মুকুলে" লিখিত উক্ত প্রবন্ধ এবং এই পুস্তকখানির মাধ্যমে হেলেন জনসাধারণের নিকট প্রথম পরিচিত হন।

হেলেন কেলার

মোহিনী দেবী
('বিবিধ প্রসঙ্গ' দ্রষ্টব্য)

লাইফবয় সাবান

প্রতিদিন ময়লার বীজাণু থেকে
আপনাকে রক্ষা করে

ভারতে প্রস্তুত

L. 251-X52 BQ

বঙ্কিম রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)—সাহিত্য সংসদ, ৩২এ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ১২॥০।

বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় খণ্ডে সন্নিবিষ্ট 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদের প্রতি নিবেদন' শীর্ষক নিবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।" বস্তুতঃ কোন্ মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র লেখনী-ধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন উপরের উদ্ধৃতিটুকুর মধ্যেই তাহার হদিস পাওয়া যাইবে। অন্তরের দিব্য আনন্দের প্রেরণায় দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি উপন্যাসের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম পথিকৃৎ বঙ্কিমচন্দ্র যে অফুরন্ত সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহাই নিত্যকালের জন্য তাঁহাকে অমরত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবে, কিন্তু তাঁহার সাহিত্য-কৃতি ত শুধু গল্প-উপন্যাস রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, জ্ঞানগর্ভ সরস এবং চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ-সম্ভারে বাংলা মনন-সাহিত্যকেও তিনি প্রভূত পরিমাণে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ সৃজনীপ্রতিভার সঙ্গে মনীষার, রসসৃষ্টির সঙ্গে মননশীলতার এমন অপূর্ব্ব মণিকাঞ্চন-সংযোগ শুধু বাংলা-সাহিত্যে কেন অন্যান্য সমৃদ্ধ সাহিত্যেও খুব বেশী হইয়াছে কিনা সন্দেহ। তাঁর প্রবন্ধ-সাহিত্য পরিমাণে যেমন বিপুল, বিষয়-বৈচিত্র্যে এবং উৎকর্ষেও তেমনি অতুলনীয়। আমাদের দেশের বেদ উপনিষদ সাংখ্য বেদান্তদর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র এবং তাঁহার সমকালীন পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ড বহু আয়াসে মন্থন করিয়া যে অমৃত তিনি আহরণ করিয়াছিলেন তাহাই 'বিজ্ঞান রহস্য', 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'ধর্ম্মতত্ত্ব' প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থের মাধ্যমে অকৃপণ দাক্ষিণ্যে গৌড়জনের নিমিত্ত পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন। মুখ্যতঃ মনুষ্যজাতির মঙ্গলসাধনেচ্ছাই যে তাঁহাকে অক্লান্তভাবে অজস্র প্রবন্ধ-রচনায় অনুপ্রাণিত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সহিতই সাধারণ বাঙালী পাঠকের ঘনিষ্ঠ পরিচয়, কিন্তু মনীষী বঙ্কিমকে বুঝিতে হইলে, ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাতা বঙ্কিমের মনোজগতের বিবর্ত্তনের ধারাটি অনুধাবন করিতে চাহিলে—এক কথায় বঙ্কিমের সাহিত্যিক সত্তা ও ব্যক্তিসত্তার অখণ্ড সামগ্রিক পরিচয়টুকু লাভ করিতে হইলে তাঁর প্রবন্ধাবলী অধ্যয়ন এবং তৎসমুদয়ের বিষয়বস্তুর মনন ও নিদিধ্যাসন একান্ত কর্ত্তব্য। বঙ্কিমের সমগ্র প্রবন্ধ-সাহিত্য স্বল্পমূল্যে সাধারণ বাঙালী পাঠকের পক্ষে সহজলভ্য করিয়া সাহিত্য সংসদ এক পুণ্য-কৃত্য সম্পাদন করিয়াছেন এবং বঙ্কিম-সাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে সংসদকর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রথম খণ্ড—যাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাস একত্রে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, পাঠক-সাধারণের বিশেষ সমাদর লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বর্ত্তমান খণ্ডটি বিষয়ানুক্রমে পাঁচভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আছে—'লোকরহস্য', 'কমলাকান্ত' ও 'মুচিরাম

কোন মেয়েগুলি সব চেয়ে সুন্দরী?
আর জিতে নিন্
প্রবেশমূল্য লাগবে না
২০০০০ টাকা
রেক্সোনা সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতা
শেষ তারিখ- ১৬ই মে, ১৯৫৫ সাল
আপনাকে যা ক'রতে হবে তা হোল, একটী প্রবেশপত্র যোগাড় করা আর তাতে যে নয়টী সুন্দরী মেয়ের ফটো দেওয়া আছে তা মনোযোগ দিয়ে দেখা। তারপর আপনার মত অনুযায়ী এদের সৌন্দর্য্য ও শোভা'র যথাযথ পারম্পর্য্যে বসিয়ে যেতে হবে।
আপনার পছন্দ যদি বিশেষ বিচারকমণ্ডলীর নির্দ্ধারিত ক্রমের সঙ্গে মিলে যায় তা হলে আপনি প্রথম পুরস্কার পেয়ে যাবেন। এর কোন প্রবেশমূল্য নেই—কেবল একটী রেক্সোনা সাবানের মোড়ক প্রতি সমাধানের সঙ্গে পাঠালেই হোল'।
একটী সাধারণ আকারের রেক্সোনা সাবনের মোড়ক (কিম্বা তিনটী ছোট সাইজ সাবানের মোড়ক) প্রতি সমাধানের সঙ্গে পাঠান—একটী বড় সাইজের মোড়ক আপনাকে দুইটী সমাধান পাঠাবার অধিকার দেবে।
রেক্সোনা
ক্যাডিলযুক্ত একমাত্র সাবান
প্রত্যেকেই যোগ দিতে পারেন (বোম্বাই রাজ্যে যাঁরা আছেন তাঁরা ছাড়া)
রেক্সোনা বিক্রেতার কাছ থেকে একটী প্রবেশপত্র চেয়ে নিন্।
RP. 129-X52 BG

গুড়ের' জীবন-চরিত—এই তিনটি আপাতদৃষ্টিতে লঘু ও ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা, দ্বিতীয় ভাগে—'বিজ্ঞান রহস্য' 'বিবিধ প্রসঙ্গ' এবং 'সাম্য', তৃতীয় ভাগে 'কৃষ্ণ চরিত্র' 'ধর্মতত্ত্ব' 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা' এবং 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম' চতুর্থ ভাগে 'সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা' 'সাময়িক পত্রে প্রকাশিত ও পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা' 'পত্রাবলী' ও বঙ্কিমপ্রণীত পাঠ্যপুস্তক 'সহজ রচনা শিক্ষা' এবং পঞ্চম ভাগে 'গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক', 'বাল্য রচনা' এবং অসম্পূর্ণ রচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। এমনি ভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের যাবতীয় প্রবন্ধ-রচনা একত্রে সন্নিবিষ্ট করিয়া প্রথম খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডটিকেও সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণতা দান করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সংস্করণের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা বঙ্কিমের জীবিতকালের সর্ব্বশেষ সংস্করণ হইতে মুদ্রিত। বিভিন্ন সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত নানা পরিবর্ত্তনের পর সর্ব্বশেষে তাঁহার রচনাবলী যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, সাহিত্য সংসদ-সংস্করণে তাহাই বিধৃত হইয়া রহিল।

প্রথম খণ্ডের উপন্যাস-প্রসঙ্গের ন্যায় বর্ত্তমান খণ্ডেরও সাহিত্য-প্রসঙ্গ লিখিয়াছেন সুসাহিত্যিক এবং বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। এই প্রসঙ্গটি সুলিখিত ও সুচিন্তিত—বঙ্কিম-সাহিত্য সম্বন্ধে প্রচুর অধ্যয়ন এবং মননশীলতার সুপরিণত ফল। ইহার গোড়ার দিকে যোগেশবাবু দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-দর্শন ও জীবন-জিজ্ঞাসার মূল সূত্রটি অনুধাবনের প্রয়াস পাইয়াছেন। বেন্থামের হিতবাদ, আগষ্ট কোঁতের ধ্রুববাদ (Positive Philosophy), জন ষ্টুয়ার্ট মিল, ম্যাথু আর্নল্ড, চার্লস ডারউইন, হার্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত ও সংশয়াচ্ছন্ন বঙ্কিমচন্দ্র কেমন করিয়া 'পরধর্ম' পরিহারপূর্ব্বক 'স্বধর্ম্মে' প্রতিষ্ঠিত হইলেন, কোন্ ঘটনা তাঁহাকে গভীর অভিনিবেশ সহকারে হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত করিল, বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্ধৃতিসহ স্বল্পপরিসরের মধ্যে এ সকল বিষয়ে যোগেশবাবুর সুষ্ঠ আলোচনা দার্শনিক বঙ্কিমের মনোবিবর্ত্তনের দিগদর্শনের সহায়ক হইবে। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক সত্তার সঙ্গে তাঁহার দার্শনিক সত্তা ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। শুধুমাত্র নিজের জীবন-জিজ্ঞাসারই নয়, মনুষ্য-জীবনের চরম সার্থকতা কিসে তাহারও সদুত্তর খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীমদ্ভগবদগীতার অমর বাণীর মধ্যে এবং 'সর্ব্বগুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল' বুদ্ধের 'অহিমালয় চরিত্রে ঈশ্বরের প্রভাব' তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্রকে না বুঝিলে, তাঁহার ব্যাখ্যাত, অনুশীলনতত্ত্ব বুঝিতে পারা যাইবে না; তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' 'ধর্ম্মতত্ত্ব' 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা' 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্মের' নিগূঢ় তত্ত্ব গুহাহিতই থাকিয়া যাইবে; শুধু তাই নয় 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে কেন তিনি ভবানী পাঠকের জবানিতে প্রফুল্লর নিকট নিষ্কাম কর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন সে রহস্যও উদ্ঘাটিত হইবে না। যোগেশবাবু বঙ্কিম-প্রতিভার এই স্বল্প-আলোচিত দিকটিকে আলোকিত করিবার প্রয়াস পাইয়া চিন্তাশীল পাঠকের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে সৃজনীপ্রতিভা মনীষা এবং গবেষণাশক্তির এক অপূর্ব্ব ত্রিবেণীসঙ্গম হইয়াছিল। বস্তুতঃ তিনিই বাঙ্গালীর প্রকৃত ইতিহাস আলোচনার প্রথম পথিকৃৎ। আজ হইতে সত্তর বৎসর পূর্ব্বে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ঐতিহাসিক আলোচনার দ্বারা বঙ্কিম 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' ক্ষালন করিয়া গিয়াছেন। যখন এদেশে নৃতত্ত্বালোচনার সূত্রপাতও হয় নাই সেই কতকাল আগে 'বাঙালীর উৎপত্তি' প্রবন্ধে তিনিই প্রথম বলিয়াছিলেন—"বাঙ্গালীর মধ্যে বিস্তর অনার্য্য। অন্য কোন আর্য্যদেশে অনার্য্য শোণিতের এত প্রবল স্রোত বহে না।" বাঙ্গালীর উৎপত্তির আলোচনায় 'বাঙ্গলার ভিতরে ও পার্শ্বে' থামটি, লিংফো, মিশমি, চুলকাটা মিশমি, পাদম, মিরি, দফলা, নাগা, কুকী, মণিপুরী, সাঁওতাল, হো ভূমিজ, মুণ্ড (মুণ্ডা?), বীরহোড় প্রভৃতি 'আদিমবাসীদের (বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্ভাবিত শব্দ, হালের 'আদিবাসী'র সমার্থক) সম্বন্ধে আলোচনা যে অপরিহার্য্য সে বিষয় তিনিই প্রথম শিক্ষিত বাঙ্গালীকে সচেতন করিবার প্রয়াস পান। বিবিধ প্রবন্ধে 'বাঙালীর উৎপত্তি' 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রভৃতি প্রবন্ধ যেমন বাঙালী পাঠকের মনে জাতীয় গৌরববোধ জাগ্রত করে, অন্যদিকে 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' 'আর্য্যীকরণ' প্রভৃতি রচনা বাঙালীজাতির নাড়ী-নক্ষত্রের সহিত পরিচিত হইবার সহায়ক হয়।
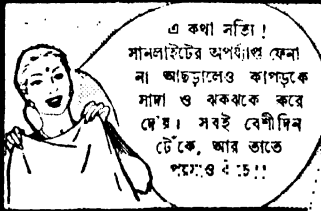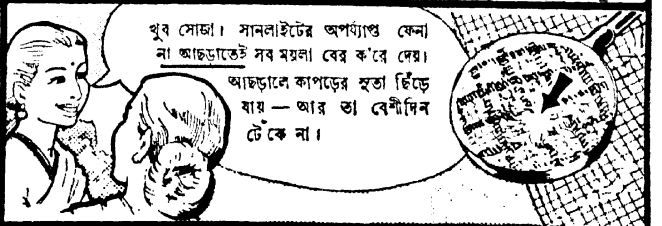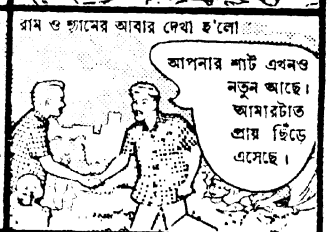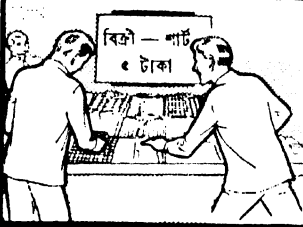
দুই শার্টের গল্প
বিক্রী — শার্ট
৫ টাকা
রাম ও শ্যাম দুজনে একই রকম শার্ট কিনলেন
এইটা
এইটা
এই নিন, মশায়— একটি ক'রে !
তিন মাস পরে — ময়দানে
ঘুড়ির সুতা জড়িয়ে গেছে— বাবাকে ডাকি।
রাম ও শ্যামের আবার দেখা হ'লো
আপনার শার্ট এখনও নতুন আছে। আমারটাত প্রায় ছিঁড়ে এসেছে।
দুই গৃহিণী
এর রহস্য কি ?
খুব সোজা। সানলাইটের অপর্য্যাপ্ত ফেনা না আছড়াতেই সব ময়লা বের ক'রে দেয়। আছড়ালে কাপড়ের সুতা ছিঁড়ে যায় — আর তা বেশীদিন টেঁকে না।
এ পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ !
এ কথা সত্যি ! সানলাইটের অপর্য্যাপ্ত ফেনা না আছড়ালেও কাপড়কে সাদা ও ঝকঝকে করে দেয়। সবই বেশীদিন টেঁকে, আর তাতে
SUNLIGHT SOAP
Rs 10000 Reward
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট সাবান
টেঁকসই করে

বঙ্কিম সাহিত্যের মধ্যে আছে এমন প্রাণদ মন্ত্র যাহা বর্তমানের দুর্গত বাঙ্গালীজাতির অন্তরে আবার সঞ্জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করিতে পারে। সাহিত্য সংসদ বঙ্কিম রচনাবলীর যে সুষ্ঠ, সুমুদ্রিত শোভন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধার তেমনি বাংলা সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক প্রীতির পরিচায়ক। সমগ্র বঙ্কিম-সাহিত্যকে দুটি মাত্র খণ্ডে (১ম খণ্ড ৯০৬ পৃ. ও ২য় খণ্ড ১০৩৬ পৃ.) বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিবার আয়োজন করিয়া সাহিত্য সংসদ সমগ্র বাঙ্গালীজাতিকে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিলেন।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

মেঘমালা—শ্রীরেণুকা দেবী। গ্রন্থজগৎ—৭জে, পণ্ডিতিয়া রো কলিকাতা-২৯। মূল্য ২॥০ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে নগরাজ হিমালয়-বিজয়-কাহিনীর সঙ্গে ঘরো একটি গল্প গাঁথিয়াছেন লেখিকা। ১৯২১ সালে এভারেষ্ট জয়ের সাধনা সু হয়, সিদ্ধিলাভ ঘটে ১৯৫৩ সালের ২৯শে মে তারিখে। এই সুদীর্ঘকালে মধ্যে যে অভিযাত্রী দল দুর্গম পথে যাত্রা করিয়াছিল তাহাদের সংক্ষি পরিচয় আলোচ্য গ্রন্থে আছে—ইহার মধ্যে কর্ণেল হাণ্ট-পরিচালিত অভিযা কাহিনীটি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত এবং হৃদয়গ্রাহীও বটে। পড়িতে পড়ি দুর্গম গিরিপথ, হিমবাহ, তুষারঝঞ্ঝা প্রভৃতির ছবি মানসনেত্রে ফুটিয়া উঠে প্রকৃতি-জয়ের পাশে ঘরোয়া কাহিনীটুকু যদি ঠিকমত মনকে না টানি পারে—সে ত্রুটি অবশ্য ঘরোয়া কাহিনীর নহে। বিরাট রহস্যময় হিমা যেখানে নায়ক—সেখানে প্রাচীরঘেরা জীবনের সুখদুঃখে অভিভূত হইব অবকাশ আর কতটুকু!

কল্লোল—শ্রীস্বর্ণপ্রভা ভাদুড়ী। দেব, দত্ত এণ্ড কোং, ৪ চিত্তরঞ্জন কলোনী, কলিকাতা-৩২। মূল্য ২॥০ টাকা।

চৌধুরী বংশের একমাত্র সন্তান সূর্য্য—কাকা কৃষ্ণশরণের স্নেহে মানুষ হইতেছিল। কুলদেবী ভবানী-মন্দিরে নিত্য সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলিবে আশায় কৃষ্ণশরণ ছেলেটিকে প্রাচীন আদর্শে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলে সূর্য্য কিন্তু বর্তমানকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে পারিল না। দু'এক ছোটখাটো ঘটনায় দুটি কালের সংঘাত প্রথম দিকে মন্দ জমে নাই। সূর্য্য কলিকাতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীর গতি ভিন্নমুখী হইয়া একই বাড়ীতে থাকিবার সময় সূর্য্য, সূর্য্যের পিসতুতো ভাই পলাশ ও শি নামে একটি মেয়ে চিরন্তন 'ত্রয়ী' নায়কনায়িকা হইয়াছে। পলা ভালবাসে শিউলিকে, শিউলির প্রেম সূর্য্যের দিকে প্রসারিত আর সূর্য্য সে প্রেম স্বীকার করিয়াও শিউলিকে গ্রহণ করিতে পারে না ইহার পরে অনেকগুলি মৃত্যু ও সূর্য্যের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া গল্প করুণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন লেখিকা। ছোট ছোট ঘটনাগুলি পল্লী-প্রকৃতি বর্ণনায় অনুভূতির দান আছে, কিন্তু উপন্যাসখানি যে লেখিক প্রথম রচনা এটি শিথিলবদ্ধ প্রকাশভঙ্গীতেই ধরা পড়ে।

সিদ্ধার্থ—হেরমান হেস। অনুবাদক—শীলভদ্র। কে, মুখোপাধ্যায়, ৬।১এ, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা-১২। মূল টাকা।

এই উপন্যাসের রচয়িতা হেরমান হেস জাতিতে জার্মাণ। ১৯৪৬ সাহিত্যে ইনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। হেস কিছুদিনের জ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন ইঁহার জীবনে যে বিস্তার করিয়াছিল তাহার ফলস্বরূপ এই উপন্যাসখানি রচিত হয়। শুধু বই পড়িয়া এবং কিছুকালের জন্য দেশভ্রমণ করিয়া ভারতীয় মর্ম্মোদ্ঘাটিত জীবন-জিজ্ঞাসার উপাদানে এমন একটি চমৎকার কাহিনী করা কম শক্তির কথা নহে। দেশকে এবং দেশের মানুষকে ভালম জানিলে এবং প্রাচ্য-দর্শনের তত্ত্বটি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি না করিলে— জীবনকে এমনভাবে চিত্রিত করা সম্ভব হয় না।

এই কাহিনীর নায়ক সিদ্ধার্থ এক শ্রেষ্ঠিকুমার—ভগবান সমসাময়িক সে। শাস্ত্রপাঠে ও বৈধকর্ম্মে জীবন-জিজ্ঞাসার উ পাওয়ায় সে গৃহত্যাগ করে। সন্ন্যাস-আশ্রমে আসিয়া কঠোর বি মানিয়া ভগবান বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়াও তাহার জীবনের দ্বন্দ্ব নি না, সে ফিরিয়া আসে সংসারাশ্রমে। সেখানকার প্রাচুর্য্য ও ভোগা তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে না। আবার সে পথে বাহির হইয়া এবার আশ্রয়লাভ করে এক পাটনীর কুটীরে। নদী ও প্রকৃতি-

জীবনকে নূতন করিয়া দেখিবার সুযোগ লাভ করে। নদীপ্রবাহের মধ্যে সে আবিষ্কার করে কালপ্রবাহকে এবং নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যবোধে যে সৃষ্টির মূল সুরটি নিহিত—এই তত্ত্বটিকে এই প্রবাহধারার পশ্চাৎপটে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ লইয়া রচিত অবিভাজ্য এক জীবনসত্তাকে প্রত্যক্ষ করিয়া জীবন-জিজ্ঞাসার সদুত্তর লাভ করে। মোটামুটি এইটুকু কাহিনী। আড়াই হাজার বছরের পিছনের কাহিনী—আধুনিক সমস্যা ও মনোবিকলন-তত্ত্বে জর্জ্জরিত নয়, তথাপি যে চিন্তা ও সমস্যা অনাদিকাল হইতে মানুষের মনে অশান্তি ঘনাইয়া তুলিয়াছে—তাহারই সুষ্ঠু প্রতিফলন ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। ভারতীয় দর্শনের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন সারা কাহিনীর মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।
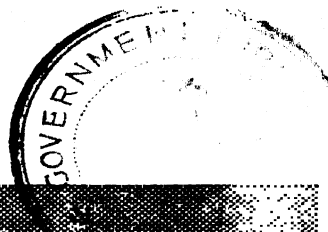
অনুবাদের ভাষা সর্ব্বত্র সাবলীল হয় নাই, ইহার কারণ অনুবাদক ভূমিকাতেই ব্যক্ত করিয়াছেন। তথাপি উপন্যাসের মূল সুরটি অবিকৃত রাখার কৃতিত্ব অনুবাদকেরই প্রাপ্য।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বিদ্যাপতি-শতক—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত। রেনেসাঁস প্রিণ্টার্স, ১০, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা। তিন টাকা মূল্য।

প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের অনেক অংশের সঠিক পাঠ ও অর্থ এখন অজ্ঞাত। বহুল-প্রচারিত বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কেও এই একই অবস্থা—একথা লজ্জা ও ক্ষোভের সহিত স্বীকার করিতে হয়। এই দুরবস্থার প্রতীকারের জন্য যথোচিত চেষ্টা ও যত্নের অভাব সাহিত্যানুরাগীর পক্ষে বিশেষ পীড়াদায়ক। প্রাচীন সাহিত্যরসিক সুপণ্ডিত অধ্যাপক শহীদুল্লাহ দীর্ঘকাল প্রাচীন সাহিত্যের রহস্যোদ্ঘাটনে ব্যাপৃত আছেন। সম্প্রতি তিনি বিদ্যাপতির এক শত পদের বিশুদ্ধ পাঠ নিরূপণ ও ব্যাখ্যাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই ব্যাপারে যে দুরূহ সমস্যা বিদ্যমান তাহার আভাস তিনি আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকায় দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন—প্রচলিত বিভিন্ন পাঠ ও ব্যাখ্যার মধ্যে যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশ আছে। তবে এই সংশয়ের নিরসন প্রচুর আয়াসসাধ্য। আলোচ্য গ্রন্থে অধ্যাপক মহাশয় পদগুলির পদ্যানুবাদ দিয়াছেন এবং মাঝে মাঝে পাঠান্তর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহার ফলে পদগুলি সুখবোধ্য হইয়াছে এমন কথা অবশ্য বলা যায় না। তবে এ সম্পর্কে প্রয়াসমাত্রই সাহিত্যামোদীর অভিনন্দনযোগ্য এবং বর্ত্তমান গ্রন্থে এক অভিনব প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

চার ইয়ার—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। শুভানী, ৫৫ শিকদার বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪। মূল্য ১৷০।

চার ইয়ার, ষ্ট্যাম্প, উত্তরায়ণ, রংচং, ভিজিট, ক্যামাক ষ্ট্রীটে—এই ছ'টি ছোট গল্পের সমষ্টি। প্রথম গল্পের নামে বইয়ের নাম। প্রজাপতির মত ছোট্ট রঙিন কয়েকটি কল্পনার ছবি। জীবন নিয়েই কল্পনা—সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে অথচ তা অতিপরিচিত নয়। রচনাকৌশলে গল্পগুলি উপভোগ্য হয়েছে।

অনুলেখা নাম—শ্রীহৃষীকেশ ভাদুড়ী। শুভানী, ৫৫ শিকদার বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪। মূল্য ২৷৷০।

সমালোচনার কষ্টিপাথরে নিখুঁত বলে গণ্য না হলেও কোন কোন বই পড়তে ভাল লাগে—বিশেষ করে যদি তাতে অন্তরের স্পর্শ পাওয়া যায়। এ বইখানি সম্বন্ধেও তাই মনে হ'ল।

লেখক গল্প করে চলেছেন—প্রধানতঃ অমলদা'র গল্প। সংযমী, উদারমনা, নিঃস্বার্থ যুবক অমলদা। তাঁর মহৎ হৃদয়ে আঘাত দিয়ে গেছে কয়েকটি মেয়ে। কেউ এসেছে প্রেমের প্রত্যাশায়, কেউবা টাকার। সহানুভূতি তারা সকলেই পেয়েছে। ভুল অর্থে পায় নি প্রেম। যার টাকার প্রয়োজন, সে টাকাও পেয়েছে। কারও কারও ছলনায় ঘৃণা জন্মেছে অমলদার মনে, জেগেছে মানুষের প্রতি সাময়িক অবিশ্বাস। কিন্তু তার পর করুণার অশ্রুজলে সব ধুয়ে মুছে গেছে। কি অভাবের তাড়নায় তারা বাধ্য হয়েছে ছলনার আশ্রয় নিতে, তিনি বুঝতে পেরেছেন—তাঁর অভিযোগের বাণী স্তব্ধ হয়ে গেছে। আমাদের সমাজের কয়েকটি চিত্র প্রগাঢ় অনুকম্পার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। হয়ত চিত্র ক'টি খুব সংক্ষিপ্ত—অসম্পূর্ণ—তবু হৃদয়স্পর্শী। দু'একটি বানান ভুল চোখে পড়ল, বিশেষ করে 'ঘাড়'।

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য—শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিঃ, ১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৪৲।

যাঁদের প্রবন্ধ লঘু মন্তব্য মাত্র নয়—অধ্যয়ন ও অভিনিবেশের স্বাক্ষর বহন করে—ত্রিপুরাশঙ্কর বাবু তাঁদের একজন। বর্ত্তমান গ্রন্থে ঊনবিংশ শতকের বার জন সাহিত্যিকের দান সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেছেন। রামমোহন, ঈশ্বর গুপ্ত, অক্ষয় দত্ত, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ, রাজনারায়ণ, ভূদেব, মধুসূদন, দীনবন্ধু, বঙ্কিম, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র। আরও অনেকে ঐ সময়ে সাহিত্য রচনা করে গিয়েছেন সন্দেহ নেই, তবে এই বার জনকে জানলেই ঐ যুগের গতি ও প্রকৃতির মোটামুটি ধারণা করে নেওয়া যায়। লেখকের মতামতে স্বাধীন বিচারশক্তির পরিচয় আছে। সে বিচার অসামান্য বুদ্ধি-দীপ্ত না হলেও প্রীতিকর। কারণ সমালোচনায় আমরা 'আপ্তবাক্যে'র পুনরাবৃত্তি শুনতে চাই না, ব্যক্তিমানসের স্বতঃস্ফূর্ত্তি দেখতে চাই। বঙ্কিমের মতে, "ঈশ্বর গুপ্তের ঈশ্বরের প্রতি পিতৃভাব এবং রামপ্রসাদের জগজ্জননীর প্রতি মাতৃভাবে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।" এ বিষয়ে ত্রিপুরাশঙ্করবাবুর মত, "বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্যকে তাঁহার সাহিত্যগুরুর উদ্দেশ্যে অতিপ্রশস্তি হিসাবেই গ্রহণ করা চলে।" বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের দেশপ্রীতির যে প্রশংসা করেছেন, তার সমর্থন করেও গ্রন্থকার গুপ্তকবির দুর্ব্বলতার দিকটি উল্লেখ করতে ভোলেন নি। ইংরেজের প্রতি অতিশ্রদ্ধায় তিনি যে ঝান্সীর রাণীকে বিদ্রূপ করেছেন এবং প্রার্থনা করেছেন, "উড়ুক ব্রিটিশ ধ্বজা সমুদ্র স্থলে"—তা আমাদের কাছে অসঙ্গত মনে হয়।

'অনবধানতার চিহ্ন দু' একটি চোখে পড়ল। এক স্থলে লেখক উদ্ধৃত করেছেন "দেশের কুকুর মাগি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।" যতদূর মনে পড়ে, গুপ্তকবি লিখেছিলেন "কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।"

মোটের উপর বইখানি সারগর্ভ এবং সুখপাঠ্য।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ সঙ্গ—শ্রীনিশাকর চৌধুরী। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ২১১ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা- ৯। ১৩৫৮। মূল্য ৩॥০ টাকা।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের খ্যাতি-প্রতিপত্তি আজ দেশ-বিদেশে প্রসারিত হইয়াছে। এই শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের অপূর্ব্ব সাফল্য প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দের অবদানরূপে গ্রহণীয়—স্বামিজীর পরিচয় লওয়া বাঙ্গালীমাত্রেরই এখন কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থ তাঁহার ধারাবাহিক জীবনী না হইলেও তাঁহার বহুমুখী শক্তির অভিব্যক্তিকে প্রত্যক্ষীকৃত নানা ঘটনার চিত্রে নিপুণভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য ও সংযম যাঁহার মূলমন্ত্র তাঁহার বাণীমালা আজ পদে পদে অধঃপতিত ও বিভ্রান্ত বাঙ্গালী-জাতির কল্যাণসাধনে সমর্থ। সাধারণ লোক জীবনে যে সকল সমস্যা সম্মুখীন হইয়া বিপন্ন হয়, স্বামিজীর অমোঘ উপদেশ তাহাদের উৎকৃষ্ট সমাধান বহন করিয়া শান্তির পথ উন্মুক্ত করে—গ্রন্থে তাহা বিশেষ করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থকার দায়রা জজ ও স্বামিজীর মন্ত্রশিষ্য—তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী উভয়ের সামঞ্জস্যে বলীয়ান্ হইয়া গ্রন্থটিকে উপভোগ্য করিয়াছে। একদিকে শিষ্যের ভক্তির আতিশয্য যেমন স্বভাবসঙ্গত হইয়াছে, অপর দিকে বর্ত্তমান কালের চাহিদা বুঝিয়া জজ গ্রন্থকার যুক্তিবিচার ও প্রমাণচর্চ্চা সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়া বাস্তব চরিত্রকে নাটক-উপন্যাসের অবাস্তব নায়কে পরিণত করিয়া ফেলেন নাই। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রামতীর্থ প্রভৃতি পূর্ব্বতন মহাপুরুষদের বাণী স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া, উৎকট সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করিয়াও গ্রন্থকার ধন্য হইয়াছেন। আমরা এই গ্রন্থের ঘরে ঘরে প্রচার কামনা করি।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

থেল্‌মা—[illegible] বুক এজেন্সী, ২০৬ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। পৃষ্ঠা ২১৩, মূল্য ৩॥০।

থেলমা—সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক মেরি করেলি রচিত বিখ্যাত উপন্যাস। বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীকুমারেশ ঘোষ। এরূপ সহজ সুন্দর অনুবাদ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক।

পুস্তকে 'উচিত' শব্দটি প্রতিবারই উচিৎ হইয়া দেখা দিয়াছে, ইহা চক্ষুর পীড়াদায়ক। কয়েকবার পাওয়া যায় 'কিম্বা'। এই সামান্য ত্রুটিবর্জ্জিত হইলে গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।

শ্রীতারাপদ রাহা

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

গ্রীষ্মের পল্লী

শ্রী অমিতরঞ্জন বসু

উপরে : বান্দুং যাত্রার প্রাক্কালে পালাম বিমান-ঘাটিতে
পণ্ডিত শ্রীজবাহরলাল নেহরু
নীচে : বান্দুং-এ প্রেসিডেন্ট সোয়েকর্ণ কর্তৃক
পণ্ডিত শ্রীজবাহরলাল নেহরুর অভ্যর্থনা

উপরে : বান্দুং-এ পণ্ডিত শ্রীজবাহরলাল নেহরু
ও ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী উ-নু
নীচে : বান্দুং-এ ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল
নেহরু ও পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলি

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৫শ ভাগ ১ম খণ্ড | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২ | ২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

আজ এক যুগের অধিক হইল বাংলা তথা ভারতের সংস্কৃতির আকাশ রবি-প্রতিভার উজ্জ্বল আলোক হইতে বঞ্চিত। নূতন জ্যোতিষ্কের উদয় তথায় হইয়াছে কিনা সে বিষয়ে তীব্র বাদানুবাদ চলিতেছে, সে বৃথা তর্কে যোগ দিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। বহু শতাব্দীর পর মানবসমাজে এক এক মহামানবের আবির্ভাব হয়, ইহাই ইতিহাস, পুরাণের শিক্ষা। যাঁহারা একই যুগে বহু মহামানবের আগমনের সংবাদ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন তাঁহাদের ভক্তি, বিশ্বাস ও উচ্ছ্বাস যুক্তিতর্কের অতীত। যাঁহারা বর্তমানের গুরুত্ব প্রমাণ করিবার জন্য নূতন ওজনে ও অভিনব মাপকাঠিতে রবীন্দ্র-প্রতিভা নানা ব্যাখ্যায় লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতকে আনিতে চেষ্টিত, তাঁহাদের ঐ অন্ধের হস্তী-দর্শন প্রচেষ্টাকেই বা আমরা কি বলিব? বাংলা তো আজ অধমত্বের শাপে অভিশপ্ত দেশ।

রবীন্দ্রনাথের অমরকীর্ত্তি ম্লান করিবার সকল প্রকার প্রক্রিয়াই ত চলিতেছে। নগদ মূল্যে তাঁহার অমূল্য অবদান-মালা অযোগ্য লোকের অধিকারে তুলিয়া দেওয়া হইতেছে। বিক্রেতারা তাঁহাদের গ্রাহকদিগের উপযোগী করিবার জন্য সেই রত্নরাজীকে বাজার-চল্‌তি মালে পরিণত করিতেছেন। ফলে গানের সুর তাল লয়ের বিকৃতি এবং নৃত্যনাট্য ও গীতিনাট্যের বিকারগ্রস্ত ও প্রক্ষিপ্তপূর্ণ প্রতিরূপ চতুর্দ্দিকেই হইতেছে।

রবীন্দ্র-জয়ন্তীর উৎসবেরও এবার বাজার-চল্‌তি রূপ চতুর্দ্দিকে দেখিলাম। এমনকি মূল উৎসবেও আগেকার সেই গাম্ভীর্য্য এবং শ্রদ্ধার পূর্ণভাব লক্ষিত হইল না। এ যেন বার মাসের তের পার্ব্বণের উপর চতুর্দ্দশ পার্ব্বণের সৃষ্টি হইল। রবীন্দ্রোত্তর যুগ যেন এই ১৩৬২ সালের ২৫শে বৈশাখে বাস্তব রূপ গ্রহণ করিল।

কিন্তু মেঘের আড়াল পড়িলেই ত রবি নিষ্প্রভ হয় না। পঙ্কের প্রলেপেও কৌস্তুভমণি মণিই থাকিয়া যায়। বাংলার অধোগতি বা বাঙ্গালী সাধারণের মানসিক আচ্ছন্ন ভাবে বা বিকারে কি বিশ্বমানবের সম্মুখে যিনি মানবত্বের জয়গান গাহিয়া গিয়াছেন তাঁহার সেই সূর্য্যপ্রভ প্রকাশ ক্ষীণ হইয়া যাইবে?

মানুষের মধ্যে যাহা অবিনশ্বর তাহা নষ্ট করিতে পারেন শুধু মহাকাল। সে কথা স্মরণ করিয়া আজ শ্রদ্ধা নিবেদন করি সেই অমর প্রকাশের গৌরবময় স্মৃতির উদ্দেশে।

সর্ব্বোদয়

স্বাধীনতা লাভের পর মহাত্মা গান্ধী অতি অল্পদিনই আমাদের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু উহারই মধ্যে তিনি কংগ্রেসের অধোগতি ও অবনতি বোধের কথা ভাবিয়াছিলেন এবং তাহার বিশোধনের জন্য এই সর্ব্বোদয় অভিযানের আরম্ভ করেন।

সর্ব্বোদয়ের মূলগত সংজ্ঞা কি তাহার আলোচনা এখানে অবান্তর। দেশ ও জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি এবং নৈতিক প্রগতির অভিযান এই সর্ব্বোদয়ের আদর্শ। মহাত্মার তিরোধানের পর তাঁহার আদর্শের ধারক যাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বোদয়ের ব্যাখ্যা ও সর্ব্বোদয়ের অভিযান চালনার যাত্রাপথ সম্বন্ধে নানা মুনি নানা মত দিয়াছেন। সে বিষয়ে আলোচনা করাও এখন বৃথা। শুধু এইমাত্র বলা প্রয়োজন যে, একমাত্র মহাত্মার শ্রেষ্ঠ শিষ্য ও প্রিয়তম মানস-পুত্র, বিনোবা ভাবে ঐ সর্ব্বোদয়ের একটি প্রত্যক্ষ ও সরল পরিচয় জনসাধারণকে দিতে সক্ষম হইয়াছেন।

কিন্তু ভূদান যতই মহৎ কার্য্য হউক—এবং উহার মাহাত্ম্যে সন্দেহের অবকাশ নাই—উহা ভারতের সার্ব্বজনীন ও সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নয়নের পথ নহে। জাতীয় জীবন এদেশে ক্রমেই ব্যাধিগ্রস্ত ও কলুষিত হইয়া পড়িতেছে। শুধু ভূদানে এখানকার সমাজ সম্পূর্ণ নিরাময় হইতে পারে না। তাহার জন্য প্রয়োজন ভিন্ন পন্থা।

পণ্ডিত নেহরু তো সোজাই বলিয়াছেন যে, তাঁহার অনুচর-মণ্ডলী, অর্থাৎ কংগ্রেস, যোগ্যতা অর্জ্জন এখনও করিতে পারে নাই এই সর্ব্বোদয়ের নাম গ্রহণের। সেবাগ্রামের তো সকলে ভূদান যজ্ঞে আত্মদান করিতে প্রস্তুত হইতেছেন।

দেশের নৈতিক অবনতি যেরূপ দ্রুত বেগে চলিয়াছে তাহাতে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই শঙ্কিত। পুলিস এখন কর্ত্তব্যে অবহেলা ও উৎকোচ গ্রহণ পূর্ব্বের ন্যায়ই করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শাসন-তন্ত্রে নিদারুণ ত্রুটি-বিচ্যুতি বাড়িয়াই চলিতেছে। সরকারী বিভাগের বড় উচ্চ অধিকারীর নৈতিক অধঃপতনের কথা সর্ব্বত্রই শুনা যাইতেছে। তবে দেশের পরিত্রাণ শুধু ভূদানে কেমনে সম্ভব হইতে পারে?

আমাদের সকলেরই এখন এ বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

সমবায় প্রথার অগ্রগতি

১৯৫০-৫২ সনে সমবায় সমিতির অগ্রগতি সম্বন্ধে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্প্রতি একটি দ্বিবার্ষিকী বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে দেখা যায় যে, ১৯৫০ সন হইতে ১৯৫২ সন পর্য্যন্ত সমবায় সমিতির সংখ্যা ১৭৩,০০০ হইতে ১৮৬,০০০ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সভ্যসংখ্যা ১·২৫ কোটি হইতে ১·৩৭ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে এবং কার্য্যকরী মূলধন ২৩৩ কোটি হইতে ৩০৬ কোটিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থাৎ এই দুই বৎসরে সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৭·৩ ভাগ; সভাসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৯·৮ ভাগ এবং কার্য্যকরী মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৩১·৪ ভাগ। ভারতের পূর্ব্বেকার করদ রাজ্যগুলিতে সমবায় সমিতির উন্নয়ন ও পূর্ণসংস্থান এই উন্নতির কারণ।

আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, জাতীয় অর্থনীতির প্রয়োজনের সহিত সমবায় আন্দোলনকে একত্রীভূত করা হইয়াছে। কৃষিঋণ, বীজ সরবরাহ, সার সরবরাহ প্রভৃতি দ্বারা সমবায় সমিতিগুলি কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করিয়াছে। জমিবন্ধকী সমবায় সমিতিগুলি তাহাদের ঋণনীতির পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে এবং ঋণ যাহাতে উৎপাদনশীল হয় সেদিকে নজর দিতেছে। বৃহত্তর যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠার দিকে সমবায় সমিতি সচেষ্ট হইতেছে। মাদ্রাজে একটি সমবায় সুতার কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং মাদ্রাজে ও বোম্বাই শহরে একটি করিয়া সমবায় চিনির কল প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। সমবায় যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠা ভারতীয় সমবায় আন্দোলনের নূতন অবদান। সমবায় সমিতির দ্বারা উদ্বাস্তু এবং তাঁতীদের পুনর্বসতির সুবিধা হইয়াছে।

সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে কৃষিঋণ সমিতিরই প্রাধান্য দেখা যায়, তাহাদের সংখ্যা শতকরা ৬৪ ভাগ। কার্য্যকরী মূলধনের প্রায় ২৫ ভাগ ঋণগ্রহণ দ্বারা সংগ্রহ করিতে হয়; আমানতের পরিমাণ কার্য্যকরী মূলধনের মোট ৫ ভাগ মাত্র। সমবায় আন্দোলনের ভিত্তি হইতেছে মিতব্যয় এবং সঞ্চয়; কিন্তু ভারতীয় সমবায় আন্দোলন এই দুইটি আদর্শ হইতে এখনও বহু দূরে। এখানকার সমিতিগুলিকে কার্য্যকরী মূলধনের জন্য ঋণের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় এবং ইহাই ইহাদের প্রধান দুর্ব্বলতা।

সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলিকেও ঋণের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। ইহাদের অংশীদারী মূলধন এবং উদ্বৃত্ত ইহাদের কার্য্যকরী মূলধনের শতকরা মোট ১১ ভাগ মাত্র। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি সাধারণতঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ পায়। নূতন যে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক হইতেছে, সেখান হইতে সমবায় সমিতিগুলি প্রয়োজন মত ঋণ পাইতে পারিবে। বৎসরে প্রায় ১০০০ কোটি টাকার মত কৃষিঋণ প্রয়োজন হয়, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সেই তুলনায় মোট ১৫ কোটি টাকার মত ঋণ দেয়। নূতন রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক কৃষিঋণের অভাব মোচন করিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

দশমিক মুদ্রা

ভারতবর্ষে দশমিক মুদ্রাব্যবস্থা প্রচলনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিল আনয়ন করিয়াছেন। ভারতবর্ষে দশমিক মুদ্রাব্যবস্থা প্রচলনের চেষ্টা এই প্রথম নয়। প্রায় ৯০ বৎসর আগে ইহার সূচনা হয়। ১৮৬৭ সনে তদানীন্তন ভারত সরকার এই প্রথার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ভারতবর্ষের পক্ষে দশমিক মুদ্রাব্যবস্থা উপযোগী। কর্নেল আর. ষ্ট্রেচী একজন পণ্ডিত মানুষ ছিলেন এবং তিনি এই ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য উৎসাহীও ছিলেন। ১৮৭০ এবং ১৮৭১ সনে ভারত সরকার এইজন্য আইন পাস করেন, কিন্তু তদানীন্তন ভারত-সচিব এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করায় আইনটি কার্য্যকরী হয় নাই। ভারত-সচিবের আপত্তির প্রধান কারণ এই যে, রেল কোম্পানীগুলি দশমিক মুদ্রা ব্যবস্থার বিরোধিতা করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে ইহাতে তাঁহাদের খরচ বৃদ্ধি পাইবে।

তখনকার সময়ে বহু অর্থনীতিবিদ, শাসন কর্ম্মচারী এবং রাজনৈতিক নেতা দশমিক মুদ্রাব্যবস্থা প্রচলনের জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ দশমিক প্রথার জন্মস্থান এবং এই দেশ হইতে অন্যান্য দেশে দশমিক ব্যবস্থার প্রচলন হয়। অবশ্য ফরাসী দেশ বর্ত্তমান কালে প্রথম এই ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। বর্ত্তমানে পৃথিবীর প্রায় শতকরা ৭৫টি দেশ দশমিক মুদ্রাব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। ঘরের কাছে সিংহল এবং মালয় এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে।

দশমিক মুদ্রাব্যবস্থার প্রধান সুবিধা এই যে, ইহাতে সময় বাঁচে এবং শিশুরা পর্য্যন্ত ইহা সহজে আয়ত্ত করিতে পারে। দশমিক প্রথার অঙ্ক শেখা সহজ হইয়া যায় এবং ফলে অন্যান্য জিনিষ শেখার দিকে শিশুরা নজর দিতে পারে। পণ্ডিত এবং বিজ্ঞানবিদ্‌দের মতে মেট্রিক প্রথা সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক ও শ্রেষ্ঠ প্রথা এবং সকল সভ্য দেশেরই ইহা অবলম্বন করা উচিত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রকম হিসাব-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। মেট্রিক প্রথার দ্বারা এককত্ব লাভ করা সম্ভব। ১৯৪০ সনে জাতীয় প্ল্যানিং কমিশন হিসাবে এবং ওজনে এককত্ব আনয়নের জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন।

১৯৪৬ সনে দশমিক মুদ্রাব্যবস্থা প্রচলনের জন্য একটি বিল প্রণয়ন করা হয়। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও বণিক সমিতিগুলি এই বিলটি সমর্থন করেন। কাহারও কাহারও অভিমত এই যে, মেট্রিক প্রথা প্রচলনের পূর্ব্বে দশমিক প্রথা প্রচলন করা প্রয়োজন। অধিকাংশ প্রদেশই দশমিক এবং মেট্রিক ব্যবস্থা অবলম্বনের সপক্ষে অভিমত দিয়াছেন। তবে এই ব্যবস্থা অবলম্বনের খরচও আছে। মেট্রিক প্রথা প্রচলন করার জন্য ভারতীয় রেলপথগুলিকে প্রায় এক কোটি টাকা খরচ করিতে হইবে। ডাক ও তার বিভাগ-

কেও নূতন ব্যবস্থা প্রচলন করার জন্য মোটা টাকা খরচ করিতে হইবে। ওজন এবং মাপের জন্য কোন কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান ইতিপূর্ব্বেই মেট্রিক প্রথা অবলম্বন করিয়াছে; যেমন, অম্বরনাথ এবং জলহল্লী যন্ত্রশিল্প কারখানা এবং ভারত ইলেকট্রনিক্স মেট্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। আশা করা যাইতেছে যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ে দশমিক মুদ্রা প্রথা এবং মেট্রিক ওজন ও মাপ ব্যবস্থা প্রচলিত হইবে। মেট্রিক ওজন ও মাপ প্রথা গ্রহণ করিবার ব্যাপারে অভিমত দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন।

দশমিক মুদ্রাব্যবস্থায় টাকাকে শতাংশে বা এক শত সেণ্টে ভাগ করা হইবে। বর্ত্তমানের আধুলি এবং সিকি চালু থাকিবে; আধুলির মূল্য হইবে পঞ্চাশ সেণ্ট এবং সিকি হইবে পঁচিশ সেণ্টের সমান। নূতন ব্যবস্থায় দশ সেণ্ট, পাঁচ সেণ্ট, দুই সেণ্ট, এক সেণ্ট এবং অর্দ্ধ সেণ্ট মুদ্রা প্রচলন করা হইবে। বর্ত্তমানের দুই আনা মুদ্রা, আনি, দুই পয়সা এবং এক পয়সা আর চালু থাকিবে না, কারণ দশমিক মুদ্রাব্যবস্থায় ইহাদের স্থান নাই। দশমিক মুদ্রা প্রচলনের বিপক্ষে প্রধান যুক্তি এই যে ইহাতে আনা, পয়সা প্রভৃতি কথা যাহাতে ভারতবাসীরা অভ্যস্ত, সেগুলি থাকিবে না। কিন্তু এই আপত্তি অযৌক্তিক। অন্তবর্ত্তী সময়ে যদিও কিছু অসুবিধা হয় কিন্তু শেষকালে ভারতবাসীরা দশমিক মুদ্রা ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া যাইবে।

নিম্নোক্ত সংবাদে ভারতে দশমিক প্রথার গোড়াপত্তনের সূচনা পাওয়া যায়। কিন্তু ওজন ও মাপ সংক্রান্ত বিষয়েই এই প্রথার প্রয়োজন অত্যধিক। তাহারও আশু প্রবর্তন প্রয়োজন:

"নয়াদিল্লী, ৭ই মে—রাজস্ব ও প্রতিরক্ষা ব্যয় দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ অদ্য লোকসভায় ভারতীয় মুদ্রা (সংশোধন) বিল উত্থাপন করিয়াছেন। বর্ত্তমান মুদ্রার স্থলে দশমিক প্রথায় মুদ্রা প্রবর্ত্তনের সরকারী সিদ্ধান্তকে কার্য্যে পরিণত করা এই বিলের উদ্দেশ্য।

"এই বিল অনুসারে টাকা পূর্ব্ববৎই অপরিবর্ত্তিত থাকিবে। তবে টাকাকে ষোল আনায় ও আনাকে ১২ পাইয়ে বিভক্ত করার পরিবর্ত্তে টাকাকে একশত সেণ্টে বিভক্ত করিয়া সেণ্টের হিসাবে মুদ্রার প্রচলন করার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

"বর্ত্তমান মুদ্রাগুলিকে 'সেণ্টে' রূপান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তবে কিছুকাল প্রচলিত মুদ্রাগুলিও চলিতে থাকিবে।

"এই বিষয়ে ১৯৪৬ সনে একটি বিল পেশ করা হইয়াছিল। কিন্তু দেশবিভাগের পর অনিশ্চিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় এই বিল লইয়া আর অগ্রসর হওয়া যায় নাই।

"বিলের উদ্দেশ্যপ্রকরণে বলা হইয়াছে যে, আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে হিসাব-পদ্ধতির সরলতা ও দ্রুততা অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দশমিক প্রথাই উপযুক্ত। পৃথিবীর অধিকাংশ প্রগতিশীল দেশেই এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। ভারতেও জনমত 'দশমিক প্রথা' প্রবর্ত্তনের অনুকূলে।"

ভারতের বহির্বাণিজ্য

১৯৫৪ সনে ভারতের বহির্বাণিজ্যে আমদানী রপ্তানী অপেক্ষা বেশী হইয়াছে। আমদানীর পরিমাণ ৬২৪ কোটি টাকার এবং রপ্তানীর পরিমাণ ৫৪৮ কোটি টাকার মত। মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭৫ কোটি টাকার মত। চলতি হিসাবে অবশ্য চার কোটি টাকার মত লাভ দেখানো হয়। আমদানী খাতে ঘাটতি পূরণ দেখানো হয় বৈদেশিক সাহায্য দ্বারা। আমেরিকা হইতে সাহায্য, কলম্বো পরিকল্পনা খাতে সাহায্যপ্রাপ্তি, এবং ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের নিকট হইতে সাহায্যপ্রাপ্তি দ্বারা ঘাটতি পূরণ করা হইয়াছে। বাস্তবক্ষেত্রে বহির্বাণিজ্যে ভারতবর্ষের ঘাটতি হইয়াছে।

পাকিস্থানের সহিত ব্যবসায়ে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষ বার কোটি টাকার মাল আমদানী করিয়াছে আর এগার কোটি টাকার মত মাল রপ্তানী করিয়াছে। ইদানীং পাকিস্থান হইতে পাট আমদানীর পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৫৪ সনে ভারতবর্ষ হইতে সূতী-বস্ত্র বহুল পরিমাণে পাকিস্থানে রপ্তানী হইয়াছে। ডলার দেশগুলি হইতে ভারতবর্ষ ৯৭ কোটি টাকার জিনিষ আমদানী করিয়াছে এবং ১০৮ কোটি টাকার জিনিষ রপ্তানী করিয়াছে। ১৯৫৩ সনের তুলনায় আমদানী ও রপ্তানী দুই-ই হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৫৩ সনে ১১৮ কোটি টাকার মাল আমদানী করা হইয়াছিল ও ১২০ কোটি টাকার মাল রপ্তানী করা হইয়াছিল। আন্তর্জাতিক ঋণ ব্যতীত ডলার দেশগুলিতে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী আমদানীর চেয়ে বেশী হইতেছে। এই দেশগুলি হইতে আমদানীর মধ্যে খাদ্য আমদানীর পরিমাণই প্রধান ছিল। খাদ্য আমদানীর পরিমাণ বর্ত্তমানে এক-তৃতীয়াংশ হইয়া গিয়াছে। তবে সম্প্রতি কাঁচা তুলা আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে ডলার দেশগুলি প্রধানতঃ পাটজাত শিল্পদ্রব্য, খনিজদ্রব্য ও গোলমরিচ আমদানী করে। এই তিনটি জিনিষের রপ্তানী গত বৎসর হ্রাস পাইয়াছে।

ষ্টার্লিং দেশগুলির সহিত ব্যবসায়ে ভারতবর্ষের ঘাটতি যাইতেছে। ১৯৫৪ সনে ষ্টার্লিং দেশগুলি হইতে ভারতবর্ষ ৩১৯ কোটি টাকার মাল আমদানী করিয়াছে ও ২৯৫ কোটি টাকার মাল রপ্তানী করিয়াছে। পূর্ব্বে ষ্টার্লিং দেশের সহিত ব্যবসায়ে ভারতবর্ষের লাভ থাকিত, গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ঘাটতি হইতেছে।

ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার হইতে যে ঋণ লইয়াছিল তাহার মধ্যে বাইশ কোটি টাকা গত বৎসর শোধ দিয়াছে। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের ঋণ ও ব্যক্তিগত খাতে মিলিয়া প্রায় ৬·৯ কোটি টাকা শোধ দেওয়া হইয়াছে।

ভারতীয় চা-শিল্প

সম্প্রতি লণ্ডনের নীলামে চায়ের মূল্য হ্রাস পাওয়াতে ভারতীয়

চা-শিল্প শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে যে, আবার বুঝি দুর্দ্দিন আসে। ১৯৫৪ সনে ভারতবর্ষে ৬৩·৮৫ কোটি পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয় এবং অন্যান্য সকল বৎসরের পরিমাণকে ইহা ছাড়াইয়া গিয়াছে। ১৯৫৩ সনের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৬০·৭৭ কোটি পাউণ্ড। গত বৎসর ৪৫ কোটি পাউণ্ড চা ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী করা হইয়াছে এবং ১৯৫৩ সনে চা রপ্তানীর পরিমাণ ছিল পঞ্চাশ কোটি পাউণ্ড। গত বৎসর যদিও চা রপ্তানীর পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে, তথাপি চায়ের বর্দ্ধিত মূল্যের দরুন সাতাশ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হইয়াছে ১৯৫৩ সনের তুলনায়। ১৯৫৩ সনে লণ্ডনের নীলামে চায়ের পাউণ্ড প্রতি গড়পড়তা দাম ছিল ৩ শিঃ ৬ পেঃ, আর ১৯৫৪ সনে পাউণ্ডের গড়পড়তা দাম ছিল ৫ শিঃ ৩ পেঃ। ভারতের আভ্যন্তরিক বাজারেও চায়ের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং প্রায় ১৯ কোটি পাউণ্ড চা বিক্রয় হইয়াছে।

১৯৫৪ সনে ভারতবর্ষ তেত্রিশ কোটি পাউণ্ড চা ইংলণ্ডে এবং একচল্লিশ কোটি পাউণ্ড চা আমেরিকায় রপ্তানী করিয়াছে। এত দিন পর্য্যন্ত ইংলণ্ড ছিল ভারতীয় চা রপ্তানীর একচেটিয়া বাজার। কিন্তু ইদানীং সিংহল এবং ইন্দোনেশিয়া ভারতবর্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে উঠিতেছে। ১৯৫৪ সনে সিংহল এবং ইন্দোনেশিয়া বর্দ্ধিত হারে ইংলণ্ডে চা রপ্তানী করিয়াছে এবং ভারতীয় চায়ের মূল্য যে ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় চা রপ্তানী হ্রাস পাইলে আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ার মত কিছু নাই।

জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে লণ্ডনের বাজারে ভারতীয় চায়ের পাউণ্ড প্রতি যে মূল্য ছিল, মার্চ্চ মাসের শেষ সপ্তাহে তাহা হইতে প্রায় ২ শিঃ কমিয়া গিয়াছে। মূল্য হ্রাস চাহিদা হ্রাসের সূচনা করে। ভারতীয় চা-উৎপাদনকারী সমিতির চেয়ারম্যান সম্প্রতি এই ব্যাপারে সাবধান বাণী ঘোষণা করিয়াছেন। আমেরিকাতে চা প্রচারের জন্য ভারতবর্ষ ও সিংহল অধিক খরচ করে এবং ১৯৫৩ সন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ, সিংহল ও ইন্দোনেশিয়া ইহার দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিল, যদিও সিংহল আমেরিকাতে বেশী চা রপ্তানী করে। ১৯৫১ সনে আমেরিকা ৯ কোটি পাউণ্ড চা আমদানী করিয়াছিল এবং ১৯৫৪ সনে আমদানীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১২ কোটি পাউণ্ডে। ১৯৫৪ সনে ভারতীয় ও সিংহলের চা রপ্তানীর পরিমাণ আমেরিকাতে মোট শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ব্রিটিশ আফ্রিকা এবং আফ্রিকার অন্যান্য দেশগুলির চা রপ্তানীর পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৩ সনে আফ্রিকা আমেরিকাতে মোট ৩ কোটি পাউণ্ড চা রপ্তানী করিয়াছিল, আর ১৯৫৪ সনে আফ্রিকা আমেরিকাতে ৬ কোটি পাউণ্ড চা রপ্তানী করে; যদিও আফ্রিকা আমেরিকায় চা প্রচারের জন্য কোন খরচ করে না। ফরমোসা পূর্ব্বে আমেরিকায় ২ কোটি পাউণ্ড চা রপ্তানী করিত, গত বৎসর ঐ দেশ ৬ কোটি পাউণ্ড চা রপ্তানী করিয়াছে। আমেরিকাতে জাপানী সবুজ চা রপ্তানীর পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আমেরিকার চা সমিতির সভ্য ভারতবর্ষ, সিংহল ও ইন্দোনেশিয়া। গত বৎসর ১৯৫৩ সনের তুলনায় আমেরিকায় চা রপ্তানীতে ইন্দোনেশিয়ার পরিমাণ শতকরা ৩২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে; ভারতবর্ষের শতকরা মাত্র ৯ ভাগ বাড়িয়াছে; আর সিংহলের শতকরা ১৩ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। সিংহলের চা রপ্তানী হ্রাসের কারণ এই যে, উহা রপ্তানী কর অত্যধিক হারে বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে। তার দেখাদেখি ভারতবর্ষও রপ্তানী কর বৃদ্ধি করিয়াছে এবং ফলে চা রপ্তানী যথোচিত হারে বৃদ্ধি পাইতেছে না। এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভারতবর্ষ তাহার পাটজাত দ্রব্যের উপর অত্যধিক হারে রপ্তানী কর বৃদ্ধি করাতে রপ্তানী হ্রাস পায়। তেমনি চায়ের উপর রপ্তানী কর বৃদ্ধি করিয়া দেওয়াতে রপ্তানী হ্রাস পাইতেছে।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা

নিম্নোদ্ধৃত সংবাদে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরুর বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়:

"বহরমপুর, ১০ই মে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা সম্পর্কে একটি সরকারী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরু বলেন, গুরু শিল্পপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে; কিন্তু ভোগ্য পণ্যের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা ও কর্ম্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে পল্লী ও কুটীরশিল্প প্রসারের জন্য আমাদিগকে অধিকতর নিষ্ঠার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে।

"শ্রীনেহরু আরও বলেন, গুরু শিল্প ও সরঞ্জাম সামগ্রী উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠাই জাতীয় অর্থনীতির বুনিয়াদ দৃঢ় করার একমাত্র পন্থা। তাহা না হইলে আধুনিক রাষ্ট্রকে পরনির্ভর হইয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে দেশবাসীর আশু প্রয়োজন মিটিতে পারে না।

"আপনারা এখন দেখিতে পাইতেছেন যে, একদা যাঁহারা পল্লী ও কুটিরশিল্পের প্রতি বিরক্ত ছিলেন এবং বর্ত্তমানে যাঁহারা সুপরিকল্পিত অর্থনীতির কথা ভাবিয়া থাকেন, তাঁহারা আজ বাধ্য হইয়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন যে, ভবিষ্যতের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য পল্লী এবং কুটিরশিল্পের ব্যাপক উন্নতি একান্ত আবশ্যক।

"পরিকল্পনা কমিশনের ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীনেহরু বলেন, ১৯৩৮ সনে কংগ্রেস-সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু পরিকল্পনা কমিশন নিয়োগ করিয়া আমাকে উহার সভাপতি মনোনয়ন করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া কমিশন কাজও করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ বাধিয়া যাইবার পর আমাদিগকে কারাবরণ করিতে হয়। ইহার পর নানা কারণে কমিশন সন্তোষজনকভাবে কাজ করিতে পারেন নাই। তারপর ১৯৪৬ সনে আমি তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য নিয়োগী কমিটি নিযুক্ত করি।

"দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার উল্লেখ করিয়া শ্রীনেহরু বলেন, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা রচনা করিতে হইবে। পরিকল্পনার সমস্যাসমূহের সমাধানের সূত্রাবলীর উল্লেখ করিয়া পরিকল্পনা কমিশন কয়েকটি বিবরণ প্রস্তুত করিয়াছেন। গত সপ্তাহে সংসদে সেগুলি পেশ করাও হইয়াছে। এগুলিকে

পরবর্তী পরিকল্পনার পরীক্ষামূলক খসড়া বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কমিশন এখনও এ সম্বন্ধে কোন চূড়ান্ত কথা বলেন নাই; জনসাধারণের অবগতির জন্ম এবং তাহাদের মন্তব্য ও সমালোচনা জানিবার জন্ম তাঁহারা উহা প্রকাশ করিয়াছেন। সুচিন্তিত মন্তব্য ও সমালোচনা পাইলে কমিশনের অনেক লাভ হইবে।

"অতঃপর শ্রীনেহরু বলেন, কি হারে উন্নতি হইয়াছে সে প্রশ্নও উঠিয়াছে। গত কয়েক বৎসর হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উন্নতির (উৎপাদন-বৃদ্ধির) হার বার্ষিক ৩ শতাংশ। অর্থাৎ পাঁচ বৎসরের ১৫ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই উন্নতি প্রশংসনীয় বটে; কিন্তু তাই বলিয়া যথেষ্ট নয়। কারণ প্রত্যেক বৎসরে ৪৫ লক্ষ শিশুর জন্ম হইতেছে। সেই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে বার্ষিক ১৮ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান প্রয়োজন।

"আমরা পরবর্তী পরিকল্পনায় উন্নয়নের হার পাঁচ শতাংশ স্থির করিয়াছি। অর্থাৎ পাঁচ বৎসর পর সাকুল্যে দাঁড়াইবে পঁচিশ শতাংশ। তৃতীয় পরিকল্পনায় উন্নতির গতি আরও দ্রুত হইবে। যাহা হউক, এই বিশাল প্রচেষ্টার জন্ম একদিকে যেমন কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন অন্যদিকে তেমনি কৃচ্ছ্রসাধনেরও আবশ্যক। ভারতবাসীরা যে কি পরিমাণ গুরু কর্তব্যের ভার বহন করিতে পারে তাহার পরিচয় আমরা ইতিপূর্বেই পাইয়াছি। কিন্তু চিরদিন এই 'বীরত্বে'র দোহাই দেওয়া চলে না। পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্ম কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন, একথা সত্য; কিন্তু ইহাও দেখিতে হইবে যে লোকে যেন গুরুচাপে ভাঙিয়া না পড়ে।

"অতঃপর শ্রীনেহরু প্রস্তাবের একটি অংশের প্রতি সদস্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলেন, কংগ্রেসকর্মীদিগকে সমবায় সমিতি গঠন এবং স্বল্পায়তন ও পল্লীশিল্পের কার্যে সাহায্যের জন্ম আহ্বান করা হইয়াছে। সমাজ পরিকল্পনা আর একটি উত্তম কর্মক্ষেত্র। এই সব পরিকল্পনার সহিত দেশের জীবনের ও দেশের মাটির ঘনিষ্ঠ সংযোগ রহিয়াছে।

"বক্তৃতার প্রারম্ভে শ্রীনেহরু ভারতের ন্যায় অনুন্নত দেশের উন্নতির জন্ম পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা কি তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, স্বাধীনতা লাভের পর শুধু বড় বড় উদ্দেশ্য ঘোষণা করিলেই কাজ হইবে না। বাস্তবে উহার রূপায়ণ প্রয়োজন। দুনিয়ার কোন সরকার—তাহা যতই শক্তিশালী হউক না কেন, শূন্যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন না।

"ভারতের লক্ষ্য বর্ণনার সময় শ্রীনেহরু কেন যে 'সর্বোদয়'কে 'সমাজতন্ত্রে'র চেয়ে ব্যবহার করিতে চান, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বলেন, 'সমাজতন্ত্রে'র চেয়ে সর্বোদয় কথাটি অধিকতর সুষ্ঠু বলিয়া আমি মনে করি। কিন্তু এ কথা ব্যবহারের আমরা উপযুক্ত কিনা তাহা আমি নিশ্চিতভাবে মনে করিতে পারি না। আচার্য্য ভাবের ন্যায় ব্যক্তিদের এই কথা ব্যবহারের অধিকার আছে। যাহা হউক, তিনি শুধু আদর্শ মানিয়া চলিতেছেন না, পরন্তু অন্যকেও এই আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতেছেন। আপনারা যদি এ কথাটি ব্যবহার করেন অথচ মনেপ্রাণে স্বীকার না করেন, তবে তাহাতে কোন ফল হইবে না। এমন একদিন হয়ত আসিবে যখন আমরা এই আদর্শের যোগ্য হইয়া সর্বোদয় কথাটি ব্যবহার করিব।'

"দ্বিতীয়তঃ, সর্বোদয়ে কোন ঐতিহাসিক সম্বন্ধসূত্র নাই। অবশ্য এ কথাও সত্য যে, সমাজতন্ত্র কথাটির বহু অর্থ আছে। কিন্তু উহার একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকাও আছে, ইহাও সত্য। তাই আমরা যখন সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলি তখন উহার অর্থ অনেকটা নির্দিষ্ট বলিয়াই লোকের মনে প্রতিভাত হয়।"

বর্তমান কংগ্রেস যে মহাত্মার আদর্শবাদ হইতে কত দূর সরিয়া গিয়াছে তাহার পরোক্ষভাবে স্বীকৃতি পণ্ডিতজীর "সর্বোদয়" ও "সমাজতন্ত্র" এই দুই শব্দের টীকায় পাওয়া যায়। পাঁচসালা পরিকল্পনায় বেকার সমস্যা সমাধান সম্পর্কে সরকারী বিবৃতি এইরূপ:

"১২ই মে—অর্থদপ্তর, কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা ও ভারতীয় পরিসংখ্যান ইনষ্টিটিউটের সহিত পরামর্শক্রমে পরিকল্পনা কমিশন ৬,৫০০ কোটি টাকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যে খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার জন্ম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে অতিরিক্ত কর্মের ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়, তাহার আনুমানিক হিসাব পাওয়া যায়।

"দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত নহে এইরূপ ১ কোটি ২০ লক্ষ লোকের কর্মের সংস্থান করা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও যাহারা কৃষিকার্য্য ও ছোটখাট শিল্প-প্রচেষ্টায় নিযুক্ত আছে, তাহাদের জন্ম অতিরিক্ত কর্ম অথবা আয়ের ব্যবস্থা প্রয়োজন।

"হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ছোটখাট শিল্প-প্রচেষ্টায় সর্ব্বাধিক লোক গৃহীত হইবে। ১৯৫০-৫১ সনে ইহাতে ১ কোটি ১৫ লক্ষ লোক নিযুক্ত হইয়াছিল।

"ইহা সুস্পষ্ট যে, ছোটখাট শিল্প-প্রচেষ্টায় নিযুক্ত লোকের আয় কম এবং তাহাদের অনেকের যথেষ্ট কাজ নাই। সেই কারণেই উহাতে উৎপাদনের ন্যায় দ্রুত কর্ম সংস্থান হইতে পারে না। অধিক কর্মের সংস্থান হইবে বলিয়া ধরিয়া লইলেও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ইহাতে ৩০ লক্ষ অতিরিক্ত লোকের কর্মের সংস্থান হইবে।

"বাণিজ্য ও যানবাহন কর্ম সংস্থানের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। ১৯৫০-৫১ সালে ইহাতে প্রায় ৯৫ লক্ষ লোক নিযুক্ত ছিল। ইহাতেও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রায় ২০ লক্ষ লোক নিযুক্ত হইতে পারে।

"বিভিন্ন বৃত্তি কর্মসংস্থানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। ১৯৫০-৫১ সনে ইহাতে ৬৪ লক্ষ লোক নিযুক্ত ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ইহাতে আরও ১৫ লক্ষ লোক নিযুক্ত হইতে পারে।

"১৯৫০-৫১ সনে কারখানাসমূহে প্রায় ৩০ লক্ষ লোক নিযুক্ত ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ইহাতে আরও ১২ হইতে ১৪ লক্ষ লোক নিযুক্ত হইতে পারে।

চা-শিল্প শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে যে, আবার বুঝি দুর্দ্দিন আসে। ১৯৫৪ সনে ভারতবর্ষে ৬৩'৮৫ কোটি পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয় এবং অন্যান্য সকল বৎসরের পরিমাণকে ইহা ছাড়াইয়া গিয়াছে। ১৯৫৩ সনের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৬০'৭৭ কোটি পাউণ্ড। গত বৎসর ৪৫ কোটি পাউণ্ড চা ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী করা হইয়াছে এবং ১৯৫৩ সনে চা রপ্তানীর পরিমাণ ছিল পঞ্চাশ কোটি পাউণ্ড। গত বৎসর যদিও চা রপ্তানীর পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে, তথাপি চায়ের বর্দ্ধিত মূল্যের দরুন সাতাশ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হইয়াছে ১৯৫৩ সনের তুলনায়। ১৯৫৩ সনে লণ্ডনের নীলামে চায়ের পাউণ্ড প্রতি গড়পড়তা দাম ছিল ৩ শিঃ ৬ পেঃ, আর ১৯৫৪ সনে পাউণ্ডের গড়পড়তা দাম ছিল ৫ শিঃ ৩ পেঃ। ভারতের আভ্যন্তরিক বাজারেও চায়ের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং প্রায় ১৯ কোটি পাউণ্ড চা বিক্রয় হইয়াছে।

১৯৫৪ সনে ভারতবর্ষ তেত্রিশ কোটি পাউণ্ড চা ইংলণ্ডে এবং একচল্লিশ কোটি পাউণ্ড চা আমেরিকায় রপ্তানী করিয়াছে। এত দিন পর্য্যন্ত ইংলণ্ড ছিল ভারতীয় চা রপ্তানীর একচেটিয়া বাজার। কিন্তু ইদানীং সিংহল এবং ইন্দোনেশিয়া ভারতবর্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে উঠিতেছে। ১৯৫৪ সনে সিংহল এবং ইন্দোনেশিয়া বর্দ্ধিত হারে ইংলণ্ডে চা রপ্তানী করিয়াছে এবং ভারতীয় চায়ের মূল্য যে ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় চা রপ্তানী হ্রাস পাইলে আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ার মত কিছু নাই।

জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে লণ্ডনের বাজারে ভারতীয় চায়ের পাউণ্ড প্রতি যে মূল্য ছিল, মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে তাহা হইতে প্রায় ২ শিঃ কমিয়া গিয়াছে। মূল্য হ্রাস চাহিদা হ্রাসের সূচনা করে। ভারতীয় চা-উৎপাদনকারী সমিতির চেয়ারম্যান সম্প্রতি এই ব্যাপারে সাবধান বাণী ঘোষণা করিয়াছেন। আমেরিকাতে চা প্রচারের জন্য ভারতবর্ষ ও সিংহল অধিক খরচ করে এবং ১৯৫৩ সন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ, সিংহল ও ইন্দোনেশিয়া ইহার দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিল, যদিও সিংহল আমেরিকাতে বেশী চা রপ্তানী করে। ১৯৫১ সনে আমেরিকা ৯ কোটি পাউণ্ড চা আমদানী করিয়াছিল এবং ১৯৫৪ সনে আমদানীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১২ কোটি পাউণ্ডে। ১৯৫৪ সনে ভারতীয় ও সিংহলের চা রপ্তানীর পরিমাণ আমেরিকাতে মোট শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ব্রিটিশ আফ্রিকা এবং আফ্রিকার অন্যান্য দেশগুলির চা রপ্তানীর পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৩ সনে আফ্রিকা আমেরিকাতে মোট ৩ কোটি পাউণ্ড চা রপ্তানী করিয়াছিল, আর ১৯৫৪ সনে আফ্রিকা আমেরিকাতে ৬ কোটি পাউণ্ড চা রপ্তানী করে; যদিও আফ্রিকা আমেরিকায় চা প্রচারের জন্য কোন খরচ করে না। ফরমোসা পূর্ব্বে আমেরিকায় ২ কোটি পাউণ্ড চা রপ্তানী করিত, গত বৎসর ঐ দেশ ৬ কোটি পাউণ্ড চা রপ্তানী করিয়াছে। আমেরিকাতে জাপানী সবুজ চা রপ্তানীর পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আমেরিকার চা সমিতির সভ্য ভারতবর্ষ, সিংহল ও ইন্দোনেশিয়া। গত বৎসর ১৯৫৩ সনের তুলনায় আমেরিকায় চা রপ্তানীতে ইন্দোনেশিয়ার পরিমাণ শতকরা ৩২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে; ভারতবর্ষের শতকরা মাত্র ৯ ভাগ বাড়িয়াছে; আর সিংহলের শতকরা ১৩ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। সিংহলের চা রপ্তানী হ্রাসের কারণ এই যে, উহা রপ্তানী কর অত্যধিক হারে বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে। তার দেখাদেখি ভারতবর্ষও রপ্তানী কর বৃদ্ধি করিয়াছে এবং ফলে চা রপ্তানী যথোচিত হারে বৃদ্ধি পাইতেছে না। এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভারতবর্ষ তাহার পাটজাত দ্রব্যের উপর অত্যধিক হারে রপ্তানী কর বৃদ্ধি করাতে রপ্তানী হ্রাস পায়। তেমনি চায়ের উপর রপ্তানী কর বৃদ্ধি করিয়া দেওয়াতে রপ্তানী হ্রাস পাইতেছে।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা

নিম্নোক্ত সংবাদে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরুর বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়:

"বহরমপুর, ১০ই মে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা সম্পর্কে একটি সরকারী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরু বলেন, গুরু শিল্পপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে; কিন্তু ভোগ্য পণ্যের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা ও কর্ম্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে পল্লী ও কুটীরশিল্প প্রসারের জন্য আমাদিগকে অধিকতর নিষ্ঠার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে।

"শ্রীনেহরু আরও বলেন, গুরু শিল্প ও সরঞ্জাম সামগ্রী উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠাই জাতীয় অর্থনীতির বুনিয়াদ দৃঢ় করার একমাত্র পন্থা। তাহা না হইলে আধুনিক রাষ্ট্রকে পরনির্ভর হইয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে দেশবাসীর আশু প্রয়োজন মিটিতে পারে না।

"আপনারা এখন দেখিতে পাইতেছেন যে, একদা যাঁহারা পল্লী ও কুটিরশিল্পের প্রতি বিরক্ত ছিলেন এবং বর্ত্তমানে যাঁহারা সুপরিকল্পিত অর্থনীতির কথা ভাবিয়া থাকেন, তাঁহারা আজ বাধ্য হইয়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন যে, ভবিষ্যতের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য পল্লী এবং কুটিরশিল্পের ব্যাপক উন্নতি একান্ত আবশ্যক।

"পরিকল্পনা কমিশনের ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীনেহরু বলেন, ১৯৩৮ সনে কংগ্রেস-সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু পরিকল্পনা কমিশন নিয়োগ করিয়া আমাকে উহার সভাপতি মনোনয়ন করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া কমিশন কাজও করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ বাধিয়া যাইবার পর আমাদিগকে কারাবরণ করিতে হয়। ইহার পর নানা কারণে কমিশন সন্তোষজনকভাবে কাজ করিতে পারেন নাই। তারপর ১৯৪৬ সনে আমি তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য নিয়োগী কমিটি নিযুক্ত করি।

"দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার উল্লেখ করিয়া শ্রীনেহরু বলেন, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা রচনা করিতে হইবে। পরিকল্পনার সমস্যাসমূহের সমাধানের সূত্রাবলীর উল্লেখ করিয়া পরিকল্পনা কমিশন কয়েকটি বিবরণ প্রস্তুত করিয়াছেন। গত সপ্তাহে সংসদে সেগুলি পেশ করাও হইয়াছে। এগুলিকে

পরবর্তী পরিকল্পনার পরীক্ষামূলক খসড়া বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কমিশন এখনও এ সম্বন্ধে কোন চূড়ান্ত কথা বলেন নাই; জনসাধারণের অবগতির জন্য এবং তাহাদের মন্তব্য ও সমালোচনা জানিবার জন্য তাঁহারা উহা প্রকাশ করিয়াছেন। সুচিন্তিত মন্তব্য ও সমালোচনা পাইলে কমিশনের অনেক লাভ হইবে।

"অতঃপর শ্রীনেহরু বলেন, কি হারে উন্নতি হইয়াছে সে প্রশ্নও উঠিয়াছে। গত কয়েক বৎসর হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উন্নতির (উৎপাদন-বৃদ্ধির) হার বার্ষিক ৩ শতাংশ। অর্থাৎ পাঁচ বৎসরের ১৫ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই উন্নতি প্রশংসনীয় বটে; কিন্তু তাই বলিয়া যথেষ্ট নয়। কারণ প্রত্যেক বৎসরে ৪৫ লক্ষ শিশুর জন্ম হইতেছে। সেই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে বার্ষিক ১৮ লক্ষ লোকের কর্ম্মসংস্থান প্রয়োজন।

"আমরা পরবর্তী পরিকল্পনায় উন্নয়নের হার পাঁচ শতাংশ স্থির করিয়াছি। অর্থাৎ পাঁচ বৎসর পর সাকুল্যে দাঁড়াইবে পঁচিশ শতাংশ। তৃতীয় পরিকল্পনায় উন্নতির গতি আরও দ্রুত হইবে। যাহা হউক, এই বিশাল প্রচেষ্টার জন্য একদিকে যেমন কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন অন্যদিকে তেমনি কৃচ্ছ্রসাধনেরও আবশ্যক। ভারতবাসীরা যে কি পরিমাণ গুরু কর্ত্তব্যের ভার বহন করিতে পারে তাহার পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছি। কিন্তু চিরদিন এই 'বীরত্বে'র দোহাই দেওয়া চলে না। পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন, একথা সত্য; কিন্তু ইহাও দেখিতে হইবে যে লোকে যেন গুরুচাপে ভাঙিয়া না পড়ে।

"অতঃপর শ্রীনেহরু প্রস্তাবের একটি অংশের প্রতি সদস্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলেন, কংগ্রেসকর্ম্মীদিগকে সমবায় সমিতি গঠন এবং স্বল্পায়তন ও পল্লীশিল্পের কার্য্যে সাহায্যের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। সমাজ পরিকল্পনা আর একটি উত্তম কর্ম্মক্ষেত্র। এই সব পরিকল্পনার সহিত দেশের জীবনের ও দেশের মাটির ঘনিষ্ঠ সংযোগ রহিয়াছে।

"বক্তৃতার প্রারম্ভে শ্রীনেহরু ভারতের ন্যায় অনুন্নত দেশের উন্নতির জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা কি তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, স্বাধীনতা লাভের পর শুধু বড় বড় উদ্দেশ্য ঘোষণা করিলেই কাজ হইবে না। বাস্তবে উহার রূপায়ণ প্রয়োজন। দুনিয়ার কোন সরকার—তাহা যতই শক্তিশালী হউক না কেন, শূন্যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন না।

"ভারতের লক্ষ্য বর্ণনার সময় শ্রীনেহরু কেন যে 'সর্ব্বোদয়'কে 'সমাজতন্ত্রে'র চেয়ে ব্যবহার করিতে চান, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বলেন, 'সমাজতন্ত্রে'র চেয়ে সর্ব্বোদয় কথাটি অধিকতর সুষ্ঠু বলিয়া আমি মনে করি। কিন্তু এ কথা ব্যবহারের আমরা উপযুক্ত কিনা তাহা আমি নিশ্চিতভাবে মনে করিতে পারি না। আচার্য্য ভাবের ন্যায় ব্যক্তিদের এই কথা ব্যবহারের অধিকার আছে। যাহা হউক, তিনি শুধু আদর্শ মানিয়া চলিতেছেন না, পরন্তু অন্যকেও এই আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতেছেন। আপনারা যদি এ কথাটি ব্যবহার করেন অথচ মনেপ্রাণে স্বীকার না করেন, তবে তাহাতে কোন ফল হইবে না। এমন একদিন হয়ত আসিবে যখন আমরা এই আদর্শের যোগ্য হইয়া সর্ব্বোদয় কথাটি ব্যবহার করিব।'

"দ্বিতীয়তঃ, সর্ব্বোদয়ে কোন ঐতিহাসিক সম্বন্ধসূত্র নাই। অবশ্য এ কথাও সত্য যে, সমাজতন্ত্র কথাটির বহু অর্থ আছে। কিন্তু উহার একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকাও আছে, ইহাও সত্য। তাই আমরা যখন সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলি তখন উহার অর্থ অনেকটা নির্দ্দিষ্ট বলিয়াই লোকের মনে প্রতিভাত হয়।"

বর্তমান কংগ্রেস যে মহাত্মার আদর্শবাদ হইতে কত দূর সরিয়া গিয়াছে তাহার পরোক্ষভাবে স্বীকৃতি পণ্ডিতজীর "সর্ব্বোদয়" ও "সমাজতন্ত্র" এই দুই শব্দের টীকায় পাওয়া যায়। পাঁচসালা পরিকল্পনায় বেকার সমস্যা সমাধান সম্পর্কে সরকারী বিবৃতি এইরূপ:

"১২ই মে—অর্থদপ্তর, কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা ও ভারতীয় পরিসংখ্যান ইনষ্টিটিউটের সহিত পরামর্শক্রমে পরিকল্পনা কমিশন ৬,৫০০ কোটি টাকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যে খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে অতিরিক্ত কর্ম্মের ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়, তাহার আনুমানিক হিসাব পাওয়া যায়।

"দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত নহে এইরূপ ১ কোটি ২০ লক্ষ লোকের কর্ম্মের সংস্থান করা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও যাহারা কৃষিকার্য্য ও ছোটখাট শিল্প-প্রচেষ্টায় নিযুক্ত আছে, তাহাদের জন্য অতিরিক্ত কর্ম্ম অথবা আয়ের ব্যবস্থা প্রয়োজন।

"হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ছোটখাট শিল্প-প্রচেষ্টায় সর্ব্বাধিক লোক গৃহীত হইবে। ১৯৫০-৫১ সনে ইহাতে ১ কোটি ১৫ লক্ষ লোক নিযুক্ত হইয়াছিল।

"ইহা সুস্পষ্ট যে, ছোটখাট শিল্প-প্রচেষ্টায় নিযুক্ত লোকের আয় কম এবং তাহাদের অনেকের যথেষ্ট কাজ নাই। সেই কারণেই উহাতে উৎপাদনের ন্যায় দ্রুত কর্ম্ম সংস্থান হইতে পারে না। অধিক কর্ম্মের সংস্থান হইবে বলিয়া ধরিয়া লইলেও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ইহাতে ৩০ লক্ষ অতিরিক্ত লোকের কর্ম্মের সংস্থান হইবে।

"বাণিজ্য ও যানবাহন কর্ম্ম সংস্থানের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। ১৯৫০-৫১ সালে ইহাতে প্রায় ৯৫ লক্ষ লোক নিযুক্ত ছিল। ইহাতেও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রায় ২০ লক্ষ লোক নিযুক্ত হইতে পারে।

"বিভিন্ন বৃত্তি কর্ম্মসংস্থানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। ১৯৫০-৫১ সনে ইহাতে ৬৪ লক্ষ লোক নিযুক্ত ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ইহাতে আরও ১৫ লক্ষ লোক নিযুক্ত হইতে পারে।

"১৯৫০-৫১ সনে কারখানাসমূহে প্রায় ৩০ লক্ষ লোক নিযুক্ত ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ইহাতে আরও ১২ হইতে ১৪ লক্ষ লোক নিযুক্ত হইতে পারে।

"দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সরকারী চাকুরীতে সম্ভবতঃ প্রায় ৫ লক্ষ লোক নিযুক্ত করিতে হইবে।

রাজ্য পুনর্গঠন ও আসাম

আসামে সম্প্রতি যাহা ঘটিয়াছে তাহার পর আমরা পুনর্গঠন কমিশনের কার্য্যাবলির উপর আরও গুরুত্ব আরোপ করিতেছি। সেই কারণে নিম্নোক্ত সংবাদ প্রণিধানযোগ্য :

"শিলচর, ৪ঠা মে—রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সদস্য পণ্ডিত কুঞ্জরু এবং সর্দার পানিকর অদ্য এখানে উপনীত হইয়াছেন।

অদ্য অপরাহ্নে কমিশন বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবর্গের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। প্রতিনিধিবর্গের সাক্ষ্যে মোটামুটিভাবে তিনটি ভিন্ন অভিমত ব্যক্ত হয়; যথা—প্রথমতঃ বৃহত্তর আসাম গঠনের দাবি, দ্বিতীয়ত স্বতন্ত্র পূর্ব্ব পার্ব্বত্য রাজ্য গঠনের দাবি এবং তৃতীয়তঃ কাছাড়, ত্রিপুরা, মণিপুর, লুসাই, উত্তর কাছাড় ও নাগা পার্ব্বত্য অঞ্চল লইয়া পূর্ব্বাচল প্রদেশ গঠনের দাবি। তৃতীয় দাবিটিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল বলিয়া অনুভূত হয়।

আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি আসামের বর্ত্তমান অবস্থা বজায় রাখার পক্ষপাতী। কিন্তু স্থানীয় কংগ্রেসী দল কমিশনের নিকট এইরূপ দাবি জানান যে, ভবিষ্যতে আসামের যে মানচিত্র অঙ্কিত হইবে তাহাতে যেন ত্রিপুরা, মণিপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং এবং উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত এজেন্সী উহার অন্তর্ভুক্ত হয়।

এইরূপ জানা গিয়াছে যে, কমিশনের সহিত আলোচনাকালে ভৌগোলিক সংলগ্নতা হেতু পশ্চিমবঙ্গের তিনটি জেলাকে আসামের সহিত যুক্ত করার দাবির প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। কারণ তাহাতে সমগ্র ভারতকে একটি ইউনিটে গঠন করিতে হয়।

কংগ্রেসী দলের অন্যতম মুখপাত্র জনাব মৈনুল হক চৌধুরীকে কমিশনের একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। কমিশন প্রশ্ন করেন, আসামের গোয়ালপাড়া অঞ্চলে যে বাঙালীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল দশ বৎসরের মধ্যে তাহাদের সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত হওয়ার রহস্যটি কি? প্রকাশ, জনাব চৌধুরী ইতস্ততঃ করিয়া জবাব দেন যে, গোয়াল-পাড়ার একটি স্থানীয় ভাষা আছে। এই ভাষাভাষীদের গত আদমসুমারীতে বাঙালী বলিয়া গণ্য করা হয় নাই।"

পশ্চিমবঙ্গের দুর্গতি

আনন্দবাজার পত্রিকা নিম্নোক্ত তথ্যগুলি দিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ যে কিভাবে ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে ইহা তাহার একটি ইঙ্গিত মাত্র :

"পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় অর্থনৈতিক দুর্গতি ব্যাপক আকারে দেখা দিয়াছে এবং আটটি জেলায় প্রায় দুই লক্ষ লোককে সরকার হইতে বিভিন্ন প্রকারের সাহায্য দিতে হইতেছে।

"বুধবার সরকারী দপ্তরখানায় আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিনিধির নিকট উপরোক্ত সংবাদ দিয়া জনৈক সরকারী মুখপাত্র বলেন যে, আটটি জেলার মধ্যে মেদিনীপুরেই দুঃস্থের সংখ্যা সর্ব্বাধিক। তথায় ৭৫,০০০ লোক টেষ্ট রিলিফের কার্য্যে নিযুক্ত আছে। অনা-বৃষ্টির জন্য মেদিনীপুরের অনেক স্থানে গত বৎসর ফসল ভাল হয় নাই এবং তজ্জন্যই তথায় এই দুর্গতি দেখা দিয়াছে। উত্তরবঙ্গের বন্যার দরুন তথাকার কয়েকটি জেলায় দুর্গতি দেখা দেয়।

"টেষ্ট রিলিফের কার্য্যে যাঁহারা নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগকে নগদ ও খাদ্যদ্রব্য মিলাইয়া প্রত্যেককে দৈনিক গড়ে এক টাকা দেওয়া হয়।

"আটটি জেলায় টেষ্ট রিলিফের হিসাব এই প্রকার :

"মেদিনীপুর ৭৫,০০০, বাঁকুড়া ১৮,৭০০, বীরভূম ৩,৭৫০, চব্বিশ পরগণা ২৭,০০০, জলপাইগুড়ি ১০,১০০, কোচবিহার ১০,৬৩০, মালদহ ৪,০৪০, নদীয়া ১৭০ জন।

"টেষ্ট রিলিফ ছাড়াও বিকলাঙ্গ, দুঃস্থ ও কর্ম্ম করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, এইরূপ ৫৪,০০০ ব্যক্তিকে চাউল, আটা প্রভৃতি দেওয়া হইতেছে বলিয়া মুখপাত্র জানান।"

কলিকাতায় অরাজক

গত শুক্রবার রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর এক ঘটিকা নাগাদ এক ব্যক্তির তহবিল লুণ্ঠিত ও তাহার স্ত্রী অপহৃত হয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সারাদিনের কাজের শেষে ৫০ বৎসর বয়স্ক শ্রীনেপালচন্দ্র রায় নামে জনৈক বণিক উত্তর কলিকাতার গরাণহাটা ষ্ট্রীট হইতে তাঁহার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া একটি রিক্সায় ময়দানের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহার পকেটে সেদিনকার উপার্জ্জন ২৬০্টি টাকাও ছিল। রেড রোড বরাবর অগ্রসর হইবার সময় তাঁহারা দেখিতে পান, রাস্তার পার্শ্বে একটি মোটরগাড়ী দাঁড় করানো আছে এবং উহারই গা ঘেঁষিয়া সার্ট ও ট্রাউজার পরিহিত পাঁচটি লোক দাঁড়াইয়া আছে। রিক্সাটি উহাদের নিকটবর্ত্তী হইলে অপেক্ষমাণ লোকগুলি এই দম্পতির উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে ও তাঁহাদের প্রহার করিতে থাকে। একটি দুর্ব্বৃত্ত রিভলবার উদ্যত করে এবং ব্যবসায়ীর তহবিল ছিনাইয়া লয়।

ভয়ে স্ত্রী পলায়নের চেষ্টা করিতেই দুর্ব্বৃত্তেরা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া ফেলে এবং দাঁড় করানো গাড়ীতে আনিয়া তোলে ও সকলে গাড়ী চাপিয়া ঐ স্থান হইতে চলিয়া যায়। ব্যবসায়ীর স্ত্রী গাড়ীতে পাঁচটি লোক ছাড়া একটি স্ত্রীলোককেও দেখিতে পান। দুই ঘণ্টাকাল গাড়ীটি চলিতে থাকে এবং দুর্ব্বৃত্তদের চারজন বিভিন্ন জায়গায় নামিয়া যায়। পরে ব্যবসায়ীর স্ত্রীকেও শনিবার প্রত্যূষে চার ঘটিকা নাগাদ বীডন ষ্ট্রীটে মিনার্ভা থিয়েটারের নিকট নামাইয়া দিয়া চলিয়া যায়।

ইতিমধ্যে স্বামী রিক্সাযোগেই হেয়ার ষ্ট্রীট থানায় হাজির হইয়া এই বিবরণ জানান, কিন্তু ঘটনাটি হেষ্টিংস থানা এলাকায় ঘটিয়াছে বলিয়া হেয়ার ষ্ট্রীট থানার লোকেরা কোন কিছু করে না। নিরুপায় হইয়া তখন তিনি হেষ্টিংস থানায় এজাহার দেন।

আমলাতন্ত্রে দুর্নীতি ও দণ্ডদান

নিম্নে প্রদত্ত সংবাদ পাঠে আমাদের মনে এই প্রথম ধারণা হয় যে, স্বাধীনতার পরেও দেশে ধর্ম্মাধিকরণ ও ন্যায়াধীশ আছেন। এতাবৎ বিভিন্ন হাইকোর্টে যাহা চলিয়াছে ও চলিতেছে তাহাতে দুর্নীতি সম্পর্কে হাইকোর্টের বিচারপতিদিগের যে কোনও দায়িত্ব-জ্ঞান আছে তাহার প্রত্যক্ষ ও বিশদ পরিচয় আমরা পাই নাই :

"১২ই মে—পঞ্জাব হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীজি. ডি. খোসলা অদ্য কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পদপ্তরের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী শ্রীএস. এ. বেঙ্কটরমনের মামলার রায় দেন।

শ্রীবেঙ্কটরমনের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইতেছে, ১৯৪৭ সনের আগষ্ট মাস হইতে ১৯৫১ সনের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত সেক্রেটারী হিসাবে যে সমস্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি কাজ করিতেন সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে বিনা দ্বিধায় তিনি মূল্যবান দ্রব্যাদি গ্রহণ করিতেন। এই প্রসঙ্গে বোম্বাইয়ের মেসার্স মিলার্স টিম্বার এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড এবং বোম্বাইয়ের মেসার্স সুন্দরদাস স' মিলস-এর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।

রায়ের শেষাংশে বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'এই মামলায় যে দণ্ড দেওয়া হইয়াছে তদপেক্ষা আরও কঠোর দণ্ড দেওয়া উচিত বলিয়া আমি মনে করি। ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড অতি সামান্য এবং আমার মতে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ন্যায়বিচারের দিক দিয়া ন্যূনতম শাস্তি।

'সেই কারণে আমি আপীল নাকচ করিয়া দণ্ডের মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছি"।

দুর্নীতির প্রবাহ

দেশে যে দুর্নীতির প্লাবন বহিতেছে তাহার আংশিক পরিচয় নিম্নের সংবাদে আছে :

"সরকারী বাসের জন্য রোড-ট্যাক্স বাবদ যে টাকা জমা দেওয়া হয়, উহার দেড় লক্ষাধিক টাকা তছরূপ হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। এই সম্পর্কে সন্দেহক্রমে পরিবহন বিভাগের দুই জন কর্ম্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হইয়াছে এবং অপর একজন কর্ম্মচারী দুই দিন যাবৎ নিখোঁজ আছেন বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

"রাষ্ট্রীয় পরিবহনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত মহল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, সরকারী বাসের লাইসেন্সের জন্য মোটর ভেহিক্‌ল্‌স বিভাগে টাকা জমা দিয়া যেসব রসিদ পাওয়া যায়, তাহারই কতক-গুলি জাল করা হইয়াছে ও কতকগুলি আসল রসিদের প্রকৃত টাকার অঙ্ক মুছিয়া ফেলিয়া উহার পরিবর্ত্তে সেই স্থলে অনেক বেশী টাকার অঙ্ক বসান হইয়াছে এবং এইভাবে পরিবহন বিভাগ হইতে দেড় লক্ষাধিক টাকা তহবিল তছরূপ হইয়াছে। আরও প্রকাশ, মাত্র এক কোয়ার্টারের ট্যাক্স জমা দিবার ব্যাপারেই এত অর্থ তছরূপ হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, অনুসন্ধানে ইহাও ধরা পড়িয়াছে যে, একই গাড়ীর ট্যাক্স একই কোয়ার্টারে দুই বার জমা দিবার নাম করিয়াও অর্থ তছরূপ করা হইয়াছে।"

পাক-আফগান বিরোধ

সম্প্রতি খবর আসিয়াছে যে, এই বিরোধে দুই পক্ষই মিশরকে মধ্যস্থ মানিতে সম্মত। অবশ্য পাকিস্থান কয়েকটি সর্ত্ত রাখিতে চাহে। ইহার পূর্ব্বে অবস্থা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার আভাষ নিম্নোক্ত সংবাদে পাওয়া যায় :

"করাচী, ৭ই মে—এখানকার আফগান দূত সর্দ্দার মহম্মদ আতিক খান রফিক অদ্য সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট বলেন, 'সর্ব্বপ্রকার চরম অবস্থার জন্য আফগানিস্থান প্রস্তুত রহিয়াছে।'

"পাকিস্থান যদি শেষ পর্য্যন্ত আফগানিস্থানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক স্যাংশন জারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে আফগানিস্থান কি পন্থা অবলম্বন করিবে, এই প্রশ্নের জবাবে আফগানদূত বলেন, বর্ত্তমানে পাকিস্থান এলাকার মধ্য দিয়া খাদ্য ও অন্যান্য যে সকল পণ্য আমদানী করা হয়, সেগুলি অন্যস্থান হইতে অন্য পথে আমদানী করা হইবে।

"সর্দ্দার রফিক বলেন, প্রতিবেশী রাশিয়ার সহিত বর্ত্তমানে আমাদের 'গভীর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক' রহিয়াছে।

"ভবিষ্যতে আমাদের উভয় দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিবে বলিয়াই আমি বিশ্বাস করি।"

গোয়া

গোয়ার অবস্থা ক্রমেই জটিলতর হইতেছে। পণ্ডিত নেহরুর নিম্নোক্ত বিবৃতিতে সরকারি উদ্বেগের পরিচয় পাওয়া যায় :

"৪ঠা মে বুধবার প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু লোকসভায় বলেন, গোয়ার অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে—পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃপক্ষ যদি আর একজন সত্যাগ্রহীকেও পর্ত্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চল হইতে বিদেশে প্রেরণ করেন, তাহা হইলে অবস্থা আরও গুরুতর হইয়া উঠিবে।

"গোয়ার বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবৃতি দান প্রসঙ্গে শ্রীনেহরু ঐ উক্তি করেন। তিনি বলেন, গোয়ার বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সরকার বিশেষ উদ্বিগ্ন; কেননা গোয়ার বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, তথায় সঙ্কট ঘোরতর আকার ধারণ করিয়াছে। পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃপক্ষ গোয়াবাসীদের উপর মোটেই আস্থা স্থাপন করিতে পারিতে-ছেন না—গোয়ার পুলিস কর্ম্মচারীদিগকেও সন্দেহের চক্ষে দেখিতে-ছেন—এক্ষণে তাঁহারা সেনবোতিনীর উপরই অধিক পরিমাণে নির্ভর করিতেছেন।

"গত সপ্তাহে কয়েকজন সদস্য গত বৎসর আগষ্ট মাসে ধৃত এবং ২৮ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত ৩২ জন গোয়া সত্যাগ্রহীকে —তন্মধ্যে কয়েকজন ভারতীয়ও আছেন—বিদেশে প্রেরণের সংবাদ সম্পর্কে যে মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন, ঐ সম্পর্কে শ্রীনেহরু লোকসভায় আজ এই বিবৃতি দান করেন।"

এশিয়-আফ্রিকা সম্মেলন

বান্দুং-এ অনুষ্ঠিত এশিয়-আফ্রিকান সম্মেলন সাম্প্রতিক কালের আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং শহরে এশিয়া ও আফ্রিকার ২৯টি দেশের প্রতিনিধিগণ সপ্তাহব্যাপী সম্মেলনে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করিয়া নিজেদের সম্মিলিত কর্ম্মপদ্ধতি স্থির করিতে মিলিত হন।

১৯৫০ সনের এপ্রিল-মে মাসে কলম্বোতে ভারত, ব্রহ্ম, পাকিস্থান, সিংহল এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রীদের যে সম্মেলন হয় তাহাতেই সর্ব্বপ্রথম একটি এশিয়-আফ্রিকান সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করা হয়। এই সম্পর্কে সম্ভাবনাগুলি বিশেষভাবে বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য ইন্দোনেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ডাঃ আলি শাস্ত্রআমিদ্‌জজোর উপর ভার দেওয়া হয়। কোন্ কোন্ দেশকে প্রস্তাবিত সম্মেলনে যোগদানের জন্য আহ্বান করা হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য গত ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে ইন্দোনেশিয়ার বোগর শহরে উক্ত পঞ্চ প্রধান মন্ত্রীদের মধ্যে পুনরায় এক আলোচনা বৈঠক বসে। তাহাতে উক্ত আহ্বায়ক পাঁচটি দেশ ব্যতীত ২৫টি দেশকে সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়। উহাদের মধ্যে কেবলমাত্র সেন্ট্রাল আফ্রিকান ফেডারেশন ব্যতীত সকল রাষ্ট্রই সম্মেলনে যোগদান করে। ইস্রাইল এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নকে এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান হয় নাই।

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি ডাঃ সোয়েকার্ণো। ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ আলি শাস্ত্রআমিদ্‌জজো সর্ব্বসম্মতিক্রমে সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

১৭ই এপ্রিল সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধি দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে এক গোপন বৈঠকে সম্মেলনে আলোচনার জন্য একটি সাত দফা কর্ম্মসূচী গৃহীত হয়। কিন্তু পরে আলোচ্য বিষয়গুলি পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করা হইবে বলিয়া স্থির হয়। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল: (১) অর্থনৈতিক সহযোগিতা, (২) সাংস্কৃতিক সহযোগিতা, (৩) মানবিক অধিকার এবং স্বায়ত্তশাসন, (৪) পরাধীন জনগণের সমস্যা এবং (৫) বিশ্বশান্তির সহায়তা।

সম্মেলনের আলোচনাকালে ঔপনিবেশিকবাদ সম্পর্কে আলোচনার সময় সিংহলের প্রধানমন্ত্রী "সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদ" আলোচনার জন্য দাবি জানান। পাকিস্থান, তুরস্ক, ইরাণ এবং ইরাক সিংহলের প্রস্তাব সমর্থন করে। ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ভারত, ব্রহ্ম, চীন, সিরিয়া এবং অন্যান্য প্রতিনিধিদল। পরে সিংহলের প্রধান মন্ত্রী এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আর ব্যগ্রতা না দেখাইলেও অপরাপর রাষ্ট্রগুলি বর্দ্ধিত উৎসাহের সহিত এই বিষয় আলোচনার জন্য জোর করেন।

সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়া প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্ণো বলেন, "ভ্রাতা ও ভগিনীগণ, আমরা যেন স্মরণ রাখি যে মানুষের দৈহিক, আত্মিক এবং বুদ্ধিবৃত্তির যে বন্ধনসমূহ দীর্ঘকাল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানবসমাজের উন্নয়নের গতিকে রুদ্ধ করিয়াছিল, মানুষকে সেই বন্ধন হইতে মুক্তিদানের উদ্দেশ্যেই আমরা এশিয়া ও আফ্রিকাবাসী অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হইব।"

তিনি সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, বহু রকম প্রচার সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটে নাই। "এশিয়া ও আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরাধীনতার নাগপাশে এখনও আবদ্ধ রহিয়াছে। উপনিবেশবাদ চতুর ও দৃঢ় সংকল্প শত্রুবিশেষ এবং বহু ছদ্মবেশে তাহার অভিব্যক্তি দেখা দেয়। পৃথিবী হইতে এই মানবতার শত্রু উপনিবেশবাদের অবসান ঘটাইতে হইবে।"

ডাঃ সোয়েকার্ণো বলেন যে, এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি যদি "বাঁচুন ও বাঁচিতে দিন" নীতি পরস্পরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন তাহা হইলে বিশ্বে একটি নূতন শক্তির সৃষ্টি হইবে।

তিনি বলেন যে, এশিয়া ও আফ্রিকার সম্মিলন ব্যতীত বিশ্বের নিরাপত্তা রক্ষিত হইতে পারে না। তিনি আরও বলেন, বাহ্যতঃ বিভক্ত হইলেও এশিয়া ও আফ্রিকার মধ্যে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মিল রহিয়াছে। উভয় মহাদেশের জনসাধারণকেই ঔপনিবেশিকবাদের নিষ্পেষণ সহ্য করিতে হইয়াছে। উভয় মহাদেশেরই কোন কোন অংশ এখনও সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অধীন রহিয়াছে।

সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ আলি শাস্ত্রআমিদ্‌জজো বলেন, বিশ্বের উদ্বেগজনক উত্তেজনাই এশিয়-আফ্রিকান সম্মেলন আহ্বানের প্রধান কারণ। এশিয়া ও আফ্রিকার অধিবাসীরা কোন মতবাদের দাসত্ব স্বীকার করিবে না—সে মতবাদ যে মহল হইতেই আসুক না কেন।

ডাঃ শাস্ত্রআমিদ্‌জজো বলেন, "এখনও যাঁহারা পরাধীন রহিয়াছেন, তাঁহাদের দিকেই আমাদের মন পড়িয়া রহিয়াছে—একথা আমি উপস্থিত সকল সদস্যের পক্ষ হইতে বলিতেছি বলিয়া মনে করি। ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলিতে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা বিলোপের জন্য যাঁহারা এখনও সংগ্রাম করিতেছেন সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিনিধিদের সম্মেলন আহ্বানের এক দিন সুযোগ হইবে এবং সে দিন হয়তো শীঘ্রই আসিবে। এশিয়া ও আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিকে পরাধীন জাতিগুলির স্বাধীনতা লাভের শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে হইবে।"

তিনি আরও বলেন যে, সম্প্রতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ঔপনিবেশিকবাদের অবসানের সদিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বহু বিবৃতি দিয়াছেন, "কিন্তু আমি অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, বিশ্ব হইতে ঔপনিবেশিকবাদের সম্পূর্ণ বিলোপের পক্ষে কেবল সদিচ্ছাগুলিই যথেষ্ট নয়। তাহাদের কার্য্যাবলী এবং নীতিগুলি আমাদের পক্ষে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।"

ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতির উল্লেখ করিয়া সভাপতি বলেন, কেবলমাত্র স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিই সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হইবেন, এই নীতি গৃহীত হইবার জন্য তাহাদের আমন্ত্রণ জানান সম্ভব হয় নাই।

ডাঃ শাস্ত্রআমিদজ্জো বলেন, "বর্ণবৈষম্য উপনিবেশবাদেরই একটি অঙ্গ।"

বিশ্বশান্তি এবং উপনিবেশবাদ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, ভারত কোন দলভুক্ত নহে এবং কাহাকেও ভারতীয় ভূমিতে আক্রমণ চালাইতে দিবে না। ভারতবর্ষ কমিউনিষ্টও নহে, কমিউনিষ্ট-বিরোধীও নহে। যাহাতে বিশ্বযুদ্ধে আণবিক বোমার আঘাতে বিশ্বসভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয় সে সম্পর্কে মার্কিন এবং সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের দায়িত্বের কথা শ্রীনেহরু উল্লেখ করেন। এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলিকে বিচার করিতে হইবে যে আণবিক যুদ্ধ হইতে কে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে। এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলি সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শান্তির পক্ষে শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারেন।

প্রত্যেক রাষ্ট্রের আত্মরক্ষার একক বা যৌথ অধিকার আছে বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য পাকিস্তান যে প্রস্তাব আনয়ন করে তাহার বিরোধিতা করিয়া শ্রীনেহরু বলেন, "আত্মরক্ষা"র নামে উহা সামরিক জোট গঠনেরই একটি প্রচেষ্টা মাত্র।

উত্তর অতলান্তিক চুক্তির প্রশংসা করিয়া তুরস্কের প্রতিনিধি যে বক্তৃতা দেন তাহার সমালোচনা করিয়া শ্রীনেহরু বলেন, ন্যাটোর (NATO) অন্য দিকও রহিয়াছে। উত্তর অতলান্তিক চুক্তিসংস্থা উপনিবেশবাদের একটি শক্তিশালী রক্ষক। গোয়া সম্পর্কে ন্যাটো-শক্তিগুলির ভারতকে নির্দ্দেশ দিতে আসা চরম ধৃষ্টতার প্রকাশ। ন্যাটো না থাকিলে এতদিন উত্তর আফ্রিকার দেশগুলি স্বাধীন হইয়া যাইত।

উপনিবেশবাদ সম্পর্কে সিংহলের প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া শ্রীনেহরু বলেন যে, পূর্ব্ব-ইউরোপের দেশগুলিকে সাধারণ অর্থে কখনই উপনিবেশ বলা চলে না। পোলাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া জাতিপুঞ্জের পূর্ণ সদস্য।

বান্দুং সম্মেলন সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরুর অভিমত নিম্নোক্ত সংবাদে পাওয়া যায়:

"৩০শে এপ্রিল—প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরু অদ্য লোকসভায় বলেন, বান্দুং সম্মেলন এশিয়া-আফ্রিকার নবজন্মের প্রতীক। এই সম্মেলন বিশ্ব-ব্যাপারে পৃথিবীর অর্দ্ধেকেরও বেশী অধিবাসীর আবির্ভাব-সংবাদ ঘোষণা করিয়াছে। কাহারও প্রতি বিরুদ্ধতা বা শত্রুতার ভাব লইয়া তাহারা আবির্ভূত হয় নাই—এশিয়া-আফ্রিকার নূতন ও স্বাধীন জাতিসমূহ কাহারও প্রতি বলপ্রয়োগ বা নূতন কোন রাষ্ট্রজোট গঠনে প্রয়াসী হয় নাই।

শ্রীনেহরু বলেন, এ সম্মেলন বিরাট সাফল্য লাভ করিয়াছে, উহার গুরুত্বও অসাধারণ। কিন্তু যদি উহাকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলিয়া মনে করা হয়, যদি মনে করা হয় যে, মানব-ইতিহাসের বিরাট অভ্যুদয়ের সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই, তবে ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যা করা হইবে।

শ্রীনেহরু বলেন, বান্দুং সম্মেলনে শান্তি ও সহযোগিতা সম্পর্কে যে ঘোষণাবাণী প্রচার করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা পঞ্চশীলের প্রতিই নূতন সমর্থন জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ভারত এই ঘোষণার সহিত সম্পূর্ণ একমত রহিয়াছে এবং পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সহিত উহা মানিয়া চলিবে। ঘোষণায় যে যৌথ প্রতিরক্ষার কথা রহিয়াছে, তাহার উল্লেখ প্রসঙ্গে শ্রীনেহরু বলেন, ভারতবর্ষ এখনও সামরিক চুক্তি এবং প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রজোট গঠনের বিরোধী রহিয়াছে। বান্দুং ঘোষণায় যে আত্মরক্ষার কথা রহিয়াছে, উহাতে রাষ্ট্রপুঞ্জ সনদকেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষ উহা সমর্থন করে।

পর্ত্তুগীজ ঔদ্ধত্য

বিগত ৬ই এপ্রিল মাপুকাতে শ্রীমতী সুধা যোশীর সভানেতৃত্বে গোয়া জাতীয় কংগ্রেসের নবম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উহার অব্যবহিত পরেই মাপুকা ও মারগাও অঞ্চলে গোয়ার পর্ত্তুগীজ কর্তৃপক্ষ বেপরোয়া গ্রেপ্তার আরম্ভ করে। ফলে বহু গোয়া জাতীয়তাবাদী গ্রেপ্তার হন। শ্রীমতী সুধা যোশীকেও গ্রেপ্তার করা হয়। যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয় তাহাদের প্রতি স্বাভাবিক পর্ত্তুগীজ বর্ব্বরতার অনুষ্ঠানে কোনই ত্রুটি হয় নাই। শ্রীমতী যোশীর প্রতি অভদ্র আচরণের জন্য শ্রীযোশী অনশন ধর্ম্মঘট করেন। পর্ত্তুগীজ সরকারের এই সকল নিষ্ঠুরতা এবং বর্ব্বর আচরণের প্রতিবাদ জানাইয়া ভারত সরকার পর্ত্তুগীজ সরকারের নিকট একটি নোট পাঠান। পর্ত্তুগীজ সরকারের হাতে নোটটি পৌঁছায় ১১ই এপ্রিল। ১২ই এপ্রিল নোটটি ফিরাইয়া দিয়া বলা হয় যে, ভারত সরকারের পর্ত্তুগালের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার নাই।

পর্ত্তুগালের এইরূপ ঔদ্ধত্য সম্পর্কে ভারতের নীতি কিরূপ হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে ২০শে এপ্রিল এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "হিতবাদ" লিখিতেছেন যে, গোয়ার পরিস্থিতির সর্ব্বশেষ রূপ দেখিবার পর পর্ত্তুগীজ অধিকার হইতে গোয়ার মুক্তি আন্দোলনের প্রতি ভারতের নীতি পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। পর্ত্তুগীজ সরকার সম্প্রতি গোয়া, দমন এবং দিউকে পর্ত্তুগালের "সমুদ্র-পারস্থিত প্রদেশ" (overseas province) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। ভারতের সহিত পুনর্মিলনের জন্য গোয়াবাসীদের দাবীকে প্রতিহত করিবার জন্যই নামের এই পরিবর্ত্তন সাধন করা হইয়াছে।

ভারতের পর্ত্তুগীজ অধিকৃত এলাকাগুলির এই নাম পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া পর্ত্তুগীজ সরকারের নীতিতে যে শঠতা প্রকাশ পাইয়াছে

তাহা অন্যান্য রাষ্ট্রের নিকট পরিষ্কার করিয়া তুলিয়া ধরিবার জন্য "হিতবাদ" পরামর্শ দিয়াছেন। পর্তুগাল সাড়ে চারি শত বৎসর ব্যাপিয়া গোয়ার উপর প্রভুত্ব করিয়াছে কিন্তু তথাকার অধিবাসীদের উন্নতিবিধানের জন্য কোন চেষ্টাই করে নাই। শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় গোয়াবাসীদের কোনই হাত নাই। স্বাধীন মতামত প্রকাশের সামান্যতম অধিকার হইতেও তাহারা বঞ্চিত। মুখ খুলিলেই তাহাদিগকে পুলিসের হাতে অকথ্য লাঞ্ছনা এবং জেলখানার অবর্ণনীয় বর্ব্বরতার সম্মুখীন হইতে হয়। এমন কি আফ্রিকাস্থিত পর্তুগীজ উপনিবেশগুলিতে তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত পর্য্যন্ত করা হয়। গোয়াবাসীদের যেটুকু অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য রহিয়াছে তাহা ভারতের জন্য সম্ভব হইয়াছে। গোয়ার মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয়দিগের অংশগ্রহণের উপর ভারত সরকার যে নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছিলেন "হিতবাদ" তাহা তুলিয়া লইবার পরামর্শ দিয়াছেন।

বিদেশী প্রতিনিধিদের শিক্ষা কোর্স

"বিশ্বের ১১টি বিভিন্ন দেশ হইতে আগত এক দল পার্লামেন্টিয় প্রতিনিধি সম্প্রতি ব্রিটেনের কমন্স সভা পরিদর্শন করেন। কমনওয়েলথ পার্লামেন্টিয় পরিষদ কর্ত্তৃক আয়োজিত একটি তিন সপ্তাহকালীন কোর্সে যোগদানের জন্য সম্প্রতি ইঁহারা ব্রিটেনে আসিয়াছেন।

"প্রতিনিধিদলের মধ্যে আছেন: মধ্যপ্রদেশের কৃষিমন্ত্রী মিঃ শঙ্করলাল তেওয়ারি, এম-এল-এ; পশ্চিমবঙ্গের সরকারপক্ষের প্রধান হুইপ ও প্রচার উপসচিব মিঃ জি. বি. সেনগুপ্ত, এম-এল-এ.; পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভার ক্লার্ক মিঃ এ. আর. মুখার্জ্জি এবং বোম্বাইয়ের মিঃ এল. এম. প্যাটেল, এম-এল-এ।

"২রা মে কমন্স সভার এক প্রশ্নোত্তর অধিবেশনে উপস্থিত থাকার পর প্রতিনিধিগণ স্পীকার ও তাঁহার পত্নীর সহিত চা পান করেন এবং ৪ঠা মে ঔপনিবেশিক সচিব ইঁহাদের সম্মানার্থে একটি পার্টি দেন। ৫ই মে কমনওয়েলথ পার্লামেন্টিয় পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ইঁহাদের প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করেন। এই প্রতিনিধিদল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা পরিদর্শনের জন্য এসেক্সের প্রাচীন নগরী কোলচেষ্টারে যান।

"প্রতিনিধিগণ ৮ই মে উত্তর আয়ারলণ্ডে যাইবেন এবং ষ্টরনণ্টে (যেখানে উত্তর আইরিশ পরিষদ অবস্থিত) ১৫ দিন থাকিয়া কোর্সের অবশিষ্ট অংশ সম্পূর্ণ করিবেন। ইঁহারা উত্তর আইরিশ পার্লামেন্টের বিভিন্ন কার্য্য সম্পর্কে বক্তৃতাদি শ্রবণ করিবেন এবং একদিন গবর্ণর ও লেডী ওয়েকহার্ষ্ট গবর্ণমেণ্ট হাউসে ইঁহাদের আপ্যায়িত করিবেন।"

ইঁহারা কি শিক্ষা লাভ করিলেন তাহা "ফলেন পরিচীয়তে"।

গত বৎসরে ব্রিটেন ভ্রমণকারীর সংখ্যা

"১৯৫৪ সনে মোট ৯০১,০০০ লোক ব্রিটেন পরিভ্রমণে আসে, যদিও ঐ বৎসর ১৯৫৩ সনের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে বা ১৯৫১ সনের ফেষ্টিভ্যাল অফ ব্রিটেনের ন্যায় কোন বিশেষ উৎসবের আকর্ষণ ছিল না।

"১৯৫৩ সনের তুলনায় এই ভ্রমণকারীর সংখ্যা ৮২,০০০ অধিকতর এবং ১৯৩৭ সনের তুলনায় (এই বৎসর ব্রিটেন ভ্রমণকারীর সংখ্যা সর্ব্বাধিক হয়) শতকরা ৮০ জন অধিকতর।

"আইরিশ রিপাবলিক হইতে যাঁহারা ভ্রমণে আসেন এবং যাঁহারা ইংলণ্ডের পক্ষে অন্যত্র গমনকালে দুই বা এক দিনের জন্য ইংলণ্ডে অবস্থান করেন তাঁহাদের এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই।

"১৯৫৫ সনের টুরিষ্ট সেশন আরম্ভ হইয়াছে গত সপ্তাহে, কিন্তু ইতিমধ্যে বহু ভ্রমণকারী অবকাশ যাপনের জন্য বা দেশ ভ্রমণের জন্য সাদাম্পটনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

আমাদের দেশেও "টুরিষ্ট ব্যুরো" গঠন করা হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিদেশে ভারত ভ্রমণ সম্পর্কে নানারূপ উদ্ভট বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এদেশেও বহু লক্ষ টাকা প্রতি বৎসর মাহিনা হিসাবে চাটুকারবর্গের ও শাসনতন্ত্রের কর্ম্মচারীবর্গের অযোগ্য অন্নধ্বংসকারীদিগের প্রতিপালন ও পোষণে ব্যয়িত হয়।

ফলে দেখিতেছি টমাস কুক ইত্যাদি পরিভ্রমণ সহায়ক প্রতিষ্ঠানগুলি উঠিয়া যাইতেছে এবং টুরিষ্ট বা ভারত ভ্রমণকারী বিদেশী প্রায় অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। সংখ্যায় যত টুরিষ্ট এদেশে আসে তাহার অনুপাতে ঐ বিভাগে কর্ম্মচারী এদেশে কত নিযুক্ত আছে তাহা জানিতে কৌতূহল হয়।

রাষ্ট্রপুঞ্জের কর্ম্মচারী নিয়োগ

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে এশিয়াবাসীদের সংখ্যাল্পতার সমালোচনা করিয়া শ্রীনেহরু সম্প্রতি একটি বিবৃতি দিয়াছেন। জাতিপুঞ্জে প্রায় ৪,১৫১ জন কর্ম্মী নিযুক্ত রহিয়াছেন; তন্মধ্যে তিন শতেরও কম এশিয়াবাসী। উহাদের মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যা ৪৬ এবং চীনদেশীয়দের সংখ্যা ৪৯।

১৯৫৪ সনে ভারত সরকার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ব্যয়বরাদ্দ মিটাইবার জন্য ৬৩,৪৩,৭০৫ টাকা দিয়াছেন। "পাইয়াছেন কি" —তাহার উত্তরে নিম্নোক্ত সংবাদটি দেওয়া গেল:

"৯ই মে, শনিবার জম্মুর নিকট নেকোয়াল গ্রামে কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর সংস্থার একদল ভারতীয় কর্ম্মীর উপর পাক সীমান্ত পুলিসের বিনা-কারণে গুলিবর্ষণের বিরুদ্ধে ভারত সরকার পাক সরকারের নিকট তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই গুলীবর্ষণের ফলে সেনাবাহিনীর জনৈক অফিসার ও পাঁচ জন সৈন্যসহ ১২ জন লোক নিহত হইয়াছে।

প্রতিরক্ষা সংস্থা বিভাগের মন্ত্রী শ্রীমহাবীর ত্যাগী প্রাথমিক অবস্থা পর্য্যালোচনা ও স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলোচনার জন্য সোমবার প্রাতে বিমানযোগে জম্মু রওনা হইয়া গিয়াছেন, রাষ্ট্রপুঞ্জ পর্য্যবেক্ষকদল এখন ঘটনাটি সম্পর্কে তদন্ত করিতেছেন।

রবিবার ঘটনাস্থলে উভয়পক্ষের সেনাবাহিনীর উর্দ্ধতন অফিসার-

দের মধ্যে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ ঘটনা রোধ করার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে সে সম্পর্কে আলোচনা হয়।

এখন ঘটনা সম্পর্কে যে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে সে সম্পর্কে প্রতিরক্ষা দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র সোমবার নয়াদিল্লীতে বলেন যে, শনিবার সকাল প্রায় ১০-৩০ মিঃ নাগাদ কেন্দ্রীয় ট্র্যাক্টর সংস্থার কাজে নিযুক্ত সেনাবাহিনীর অফিসার মেজর এস. আর. বধোয়ার পাঁচ জন ট্র্যাক্টর ড্রাইভার ও অপর চার জন বেসামরিক কর্ম্মচারী সমভিব্যাহারে সীমান্তের ভারতীয় এলাকাভুক্ত নেকোয়াল গ্রামে তাঁহাদের জমিতে লাঙ্গল দেওয়ার কাজ তদারক করিতেছিলেন। ঐ এলাকাটির তিন দিক পাকিস্থান অঞ্চল দ্বারা পরিবেষ্টিত।

হঠাৎ বিনাকারণে পাক সীমান্ত পুলিস সীমান্তের প্রায় ১৫০ গজ দূর হইতে ঐ দলের উপর গুলীবর্ষণ করে।

সেনাবাহিনীর প্রায় ছয় জন লোক ঐ দলের প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। গুলীবর্ষণের ফলে মেজর বধোয়ার ও অন্য এক জন লোক নিহত হন। অতঃপর তিনটি দিক হইতেই ভারতীয় দলের উপর গুলীবর্ষণ আরম্ভ হয়। স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র যথা লাইট মেসিন গান প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় রক্ষীবাহিনী আত্মরক্ষার জন্য পাল্টা গুলীবর্ষণ করে। স্থানীয় রাষ্ট্রপুঞ্জ পর্য্যবেক্ষক দলকে ঘটনা সম্পর্কে জানান হয় এবং দুই জন পর্য্যবেক্ষক বেলা ১-৩০ মিনিটের সময়ে উক্ত অঞ্চলে গিয়া পৌঁছান। কিন্তু তাঁহাদের উপরেও পাকিস্থান অঞ্চল হইতে গুলীবর্ষণ করা হয়। অতঃপর তাঁহাদের মধ্যে এক জন গুলীবর্ষণ বন্ধ করার জন্য প্রধান রাস্তা দিয়া শিয়ালকোট অভিমুখে রওনা হন। বেলা প্রায় ৫-৩০ মিঃ নাগাদ গুলীবর্ষণ বন্ধ হয়।

ভারতীয় পক্ষের অফিসার মেজর বধোয়ার, সেনাবাহিনীর ৫ জন ও ৬ জন বেসামরিক কর্ম্মচারী নিহত এবং সেনাবাহিনীর অপর এক জন আহত হয়।

ভারতে শ্রমিক কল্যাণ

ভারতে শ্রমিক কল্যাণ-সাধনের নিমিত্ত সরকারী প্রচেষ্টার এক বিবরণ ৭ই এপ্রিলের "উইকলি ওয়েষ্ট বেঙ্গল" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রমিক কল্যাণ, শ্রমিকদের কর্ম্মসংস্থান এবং শিক্ষাদানের প্রধান দায়িত্ব প্রধানতঃ ভারত সরকারের। কয়েকটি ক্ষেত্রে রাজ্যসরকারগুলির সহিত সংযুক্তভাবে কার্য্য পরিচালনা করিলেও শ্রমিককল্যাণ সম্পর্কিত জাতীয় নীতি কেন্দ্রীয় সরকারই নির্দ্ধারণ করেন এবং রাজ্যসরকারগুলি প্রধানতঃ সেই সকল নীতির বাস্তব প্রয়োগে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। বিভিন্ন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার নীতি নির্দ্ধারণ এবং তাহার প্রয়োগ সম্পর্কে নির্দ্দেশ দান করেন।

শ্রমিকগণ যাহাতে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে পারেন তজ্জন্য সমগ্র ভারতে ৫৬টি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। এই সকল কেন্দ্রে পঞ্চাশ প্রকার কারিগরিবিদ্যা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষাকাল এক বৎসর হইতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত।

শ্রমিকদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব যাহাতে না ঘটে সেজন্য কেন্দ্রীয় শ্রম-মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা ভবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বিলাসপুরের নিকটবর্ত্তী কোনী নামক স্থানে ঐ ভবনটি অবস্থিত। উক্ত ভবনে শিক্ষাকাল সাড়ে পাঁচ মাস। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলি কর্ত্তৃক মনোনীত শ্রমিকগণ ঐ ভবনে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের মনোনীত প্রার্থী এমন কি স্বতন্ত্র প্রার্থিগণও ঐ ভবনে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন।

শ্রমিকদিগের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য রাষ্ট্র বীমা আইন চালু হইয়াছে, স্বাস্থ্যবীমার সুযোগ যাহাতে শ্রমিকগণ পান তাহারও ব্যবস্থা হইয়াছে। মাহিনা এবং অন্যান্য ভাতাসহ শিল্পে নিযুক্ত যে সকল ব্যক্তি মাসিক অনধিক চারি শত টাকা পান তাঁহারা সকলেই স্বাস্থ্য বীমার সুযোগ সুবিধাগুলি ভোগ করিবেন। স্বাস্থ্য বীমার ফলে ঐ সকল কর্ম্মচারী অসুখ হইলে বিনা পয়সায় চিকিৎসার সুযোগ পাইবেন, নারী কর্ম্মচারীরা সন্তান প্রসবের সময় সাহায্য পাইবেন, কর্ম্মরত অবস্থায় আহত কর্ম্মীরা অর্থসাহায্য পাইবেন।

মালিক এবং শ্রমিকদিগের নিকট হইতে লব্ধ অর্থে ঐ পরিকল্পনার ব্যয় সঙ্কুলান হইবে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলির নিকট হইতেও সেজন্য অর্থ সাহায্য পাওয়া যাইবে। শ্রমিকগণ কেবলমাত্র তখনই অর্থ দিবে যখন তাহারা উপরোক্ত সুবিধাগুলি ভোগ করিবার অধিকারী হইবে। কিন্তু ১৯৫২ সনের ২৪শে ফেব্রুয়ারী হইতে ভারতের সকল মালিকই একটি বিশেষ অর্থ সাহায্য করিতেছেন। বর্ত্তমানে দিল্লী, কানপুর, বৃহত্তর বোম্বাই এবং পঞ্জাবের নয়টি কেন্দ্রে ঐ পরিকল্পনা বলবৎ রহিয়াছে।

কয়লাখনির শ্রমিকদিগের সুবিধার জন্য আইন করিয়া সকল শ্রমিকের নিমিত্ত বাধ্যতামূলক প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। তদনুসারে মালিক এবং শ্রমিক সমপরিমাণ অর্থ ঐ ফণ্ডে জমা দিবেন। উপরন্তু ফণ্ডের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মালিক উক্ত সম্মিলিত অর্থের শতকরা পাঁচ ভাগ অতিরিক্ত অর্থ দিবেন। শ্রমিক, মালিক এবং সরকারের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি ট্রাষ্টি বোর্ডের হাতে ঐ ফণ্ড পরিচালনার ভার রহিয়াছে। কর্ম্ম হইতে বিদায় লইবার সময় শ্রমিকগণ ঐ ফণ্ড হইতে নিয়মানুযায়ী মালিকপ্রদত্ত অর্থেরও সম্পূর্ণ বা ভগ্নাংশ সহ স্ব স্ব অর্থ লইয়া যান।

সিমেণ্ট, সিগারেট, লৌহ ও ইস্পাত, কাগজ, বস্ত্রশিল্প এবং ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল ও ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পে নিযুক্ত কর্ম্মীদিগেরও প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সকল শিল্পে ৯৩৮,৪১০ জন কর্ম্মী নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহাদের সঞ্চিত ফণ্ডের পরিমাণ ২০ কোটি টাকা।

ছাটাই বা কর্ম্মহীনতার জন্য যাহাতে শ্রমিকগণ ক্ষতিপূরণ

পাইতে পারে তজ্জন্য ১৯৫৩ সনে ১৯৪৭ সনের শিল্পবিরোধ আইনটি সংশোধন করা হইয়াছে।

বিভিন্ন রাজ্যে কারখানা পরিদর্শকদের কার্য্যের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা ফ্যাক্টরী সম্পর্কীয় প্রধান উপদেষ্টার কাজ। শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে সে সম্পর্কে সমস্ত খবরাখবর প্রধান উপদেষ্টার নিকট থাকে, যাহাতে প্রধান উপদেষ্টা সুষ্ঠুরূপে তাহার কার্য্য চালাইতে পারেন তজ্জন্য বোম্বাইতে একটি কেন্দ্রীয় শ্রমিক ভবন নির্ম্মিত হইতেছে। শিল্প-বিকাশে শ্রমিকদের অবস্থান সম্পর্কে সকল প্রকার তথ্যাদি পর্য্যালোচনা করা এই ভবনের কার্য্য হইবে। ঐ ভবনে শিল্পে নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণকার্য্য সম্পর্কিত একটি যাদুঘর, একটি শিল্পস্বাস্থ্য লেবরেটরী, একটি শিক্ষণকেন্দ্র এবং একটি পাঠাগার থাকিবে।

হিন্দী ও সর্ব্বভারতীয় পরীক্ষা

সম্প্রতি লোকসভায় শ্রীবি. জি. খেরের নেতৃত্বে একটি হিন্দী কমিশন গঠনের সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে। হিন্দীকে সরকারী ভাষা রূপে গ্রহণের কার্য্য কি ভাবে অগ্রসর হইয়াছে কমিশন সেই সম্পর্কে রিপোর্ট দিবেন। কমিশনের অন্যান্য সভ্যদিগের নাম এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

সম্প্রতি লোকসভায় এক বিবৃতি প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ বলেন যে, কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্ত্তৃক গৃহীত পরীক্ষাগুলিতে যাহারা অংশ গ্রহণ করে তাহাদিগকে ইংরেজী, হিন্দী অথবা তাহাদের আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে পরীক্ষা দিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। প্রার্থীরা যদি ইংরেজীর মাধ্যমে পরীক্ষা না দেয় তবে তাহাদিগকে ইংরাজীর জন্য বিশেষ পরীক্ষা দিতে হইবে। অনুরূপভাবে যাহারা হিন্দীর মাধ্যমে পরীক্ষা দিবে না তাহাদিগকে হিন্দীর জন্য একটি বিশেষ পরীক্ষা দিতে হইবে।

এই ব্যবস্থার ফলে হিন্দী যাহাদের মাতৃভাষা সেই সকল পরীক্ষার্থী অন্যান্যদের তুলনায় অধিকতর সুবিধা লাভ করিবে। ঐ ব্যবস্থাকে ঠিক ন্যায়সঙ্গত বলা চলে না। যদি এইরূপ নিয়ম করা হইত যে, কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীপ্রার্থী প্রত্যেককে ইংরেজী, মাতৃভাষা এবং অপর একটি ভারতীয় ভাষা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে তবে তাহা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হইত। এই ব্যবস্থায় যাহা-দের মাতৃভাষা হিন্দী নহে তাহারা দ্বিতীয় ভারতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দী ভাষার জন্য পরীক্ষা দিবে এবং যাহাদের মাতৃভাষা হিন্দী তাহারা অপর কোন ভারতীয় ভাষার জন্য পরীক্ষা দিবে।

হিন্দী এবং সর্ব্বভারতীয় পরীক্ষা ব্যবস্থায় তাহার স্থান সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে নাগপুরের দৈনিক "হিতবাদ" ৭ই মে লিখিতেছেন যে, সর্ব্বভারতীয় পরীক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দী অন্যান্য ভাষার ন্যায় পরীক্ষার্থীর ইচ্ছাধীন মাধ্যম হিসাবে থাকিতে পারে। হিন্দীকে সর্ব্বভারতীয় পরীক্ষার মাধ্যম করিবার বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভারতের বিরোধিতার উল্লেখ করিয়া পত্রিকাটি লিখিতেছেন যে, হিন্দীকে বাধ্যতামূলক মাধ্যম হিসাবে ঘোষণা করিলে অহিন্দী-ভাষী পরীক্ষার্থি-গণ বিশেষ অসুবিধায় পড়িবে। এই অবস্থায় সরকার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব মানিয়া চলিবেন বলিয়া যে ঘোষণা করিয়া-ছেন তাহাতে পত্রিকাটি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

১৯৫৪ সালের ৫ই এপ্রিল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক প্রস্তাবে যে নীতি ঘোষিত হয় তাহাতে পরীক্ষার মাধ্যম সম্পর্কিত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধনের সময়কে দুই ভাগ করা হয়। প্রথম অবস্থায় হিন্দী, আঞ্চলিক ভাষা এবং ইংরেজীর মাধ্যমেও পরীক্ষা গৃহীত হইবে ও প্রার্থীরা উহাদের মধ্যে যে কোন একটি ভাষার মাধ্যমে পরীক্ষা দিতে পারিবে। যদি কেহ হিন্দী অথবা আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে পরীক্ষা দেয় তবে তাহাকে ইংরেজীতেও একটি বিশেষ পরীক্ষা দিতে হইবে। তবে সকল ছাত্রকেই হিন্দীতে একটি পরীক্ষা দিতে হইবে। দ্বিতীয় স্তরে প্রত্যেক প্রার্থী ইংরেজী, হিন্দী অথবা নিজ আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে পরীক্ষা দিতে পারিবে, তবে যাহাদের মাতৃভাষা হিন্দী নহে তাহাদিগকে বাধ্যতামূলক ভাবে হিন্দীতে একটি পরীক্ষা দিতে হইবে এবং হিন্দীভাষী প্রত্যেক ছাত্রকে অপর কোন একটি ভারতীয় ভাষায় বাধ্যতামূলক ভাবে পরীক্ষা দিতে হইবে। উভয় ক্ষেত্রেই সকল পরীক্ষার্থীকে বাধ্যতামূলক ভাবে ইংরেজীতে একটি পরীক্ষা দিতে হইবে।

আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরুর মত নিম্নোক্ত সংবাদে পাওয়া যায়:

"বহরমপুর, ৮ই মে—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য এখানে দৃঢ়তার সহিত এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, কোন রাজ্যে কোন প্রকারেই কোন ভাষা দমন করা উচিত নহে।

তিনি বলেন যে, যে সকল রাজ্যে বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকেরা বাস করে তথায় আদালতে সেই সকল ভাষা ব্যবহার করিতে দেওয়া এবং স্কুল ও অন্যান্য বিদ্যায়তনে সেই সকল ভাষা শিক্ষা করিতে দেওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখা রাজ্য সরকারের কর্ত্তব্য।

শ্রীনেহরু ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন লইয়া কলহের নিন্দা করেন। কারণ ঐ সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইতেছে ভারতে তাঁহারা যদি পৃথক পৃথক হইয়া বাস করিতে চাহেন, তবে তাহাতে দেশ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে।

কলিকাতায় স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন

আমরা সরকারী প্রেস নোটে নিম্নলিখিত সংবাদটি পাইয়াছি:

"১৪ই মে শনিবার সন্ধ্যা ছয়টার সময়ে কলিকাতা টেলিফোনের 'ব্যাঙ্ক' ও 'সিটি' এক্সচেঞ্জে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু করা হয়। উহার উদ্বোধন করেন ভারত গবর্ণমেণ্টের যোগাযোগ মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম।

"১৯৪৩ সনে ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ কলিকাতা টেলি-ফোনের পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন। উহার পূর্ব্বে বেঙ্গল টেলি-ফোন কোম্পানী নামক একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান উহা পরিচালনা

করিতেন। তখন কলিকাতায় দশটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ছিল। উহাদের মধ্যে কয়েকটি তখনই বহু বৎসরের ব্যবহারের ফলে প্রায় অকেজো হইয়া গিয়াছিল।

"কলিকাতায় টেলিফোনের চাহিদা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট স্থির করেন যে, ভবিষ্যতের প্রয়োজনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া যতদূর সম্ভব দ্রুত পুরাতন যন্ত্রপাতির স্থলে নূতন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি বসান হইবে। প্রথমে 'সেণ্টাল', 'জোড়াসাঁকো' এবং 'এভিনিউ' এক্সচেঞ্জকে স্বয়ংক্রিয় করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, 'নর্থ' নামক একটি নূতন ছোট স্বয়ংক্রিয় এক্সচেঞ্জ খোলা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ভূগর্ভে নূতন কেবল স্থাপন, পুরাতন টেলিফোন সংযোগের সংস্কার, নূতন টেলিফোন সংযোগ সাধন, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি সংস্থাপন, নূতন নম্বর নির্ণয় এবং নূতন ভাবে টেলিফোন ডাইরেক্টরী প্রণয়ন কার্য্য চলিতে থাকে।

"ভারত গবর্ণমেণ্ট ও ইংলণ্ডের অটোমেটিক টেলিফোন এণ্ড ইলেকট্রিক কোম্পানীর মধ্যে চুক্তিক্রমে ১৯৪৮ সনে ইণ্ডিয়ান টেলিফোন ইণ্ডাষ্ট্রীজ স্থাপিত হয়। প্রথম পর্য্যায়ের এক্সচেঞ্জগুলির স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ উহার পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ ঐগুলি ইংলণ্ড হইতে আমদানীর সিদ্ধান্ত করেন। ১৯৪৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য ইংলণ্ডের অটোমেটিক টেলিফোন এণ্ড ইলেকট্রিক কোম্পানীকে অর্ডার দেওয়া হয়।

"১৯৫১ সনের জুন মাসে প্রথম পর্য্যায়ের এক্সচেঞ্জগুলিতে কাজ আরম্ভ করিবার জন্য চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং ঐ বৎসর আগষ্ট মাসে প্রকৃত কাজ সুরু হইয়াছে। ১৯৫৩ সনের মার্চ্চ মাসের মধ্যে ৪০০০টি সংযোগ সম্বলিত 'সেণ্ট্রাল' এবং 'নর্থ' এক্সচেঞ্জে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি বসান শেষ হয় ও ঐ বৎসর ৩০শে মে তারিখে ভারত গবর্ণমেণ্টের যোগাযোগ মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম আনুষ্ঠানিক ভাবে উহাদের উদ্বোধন করেন।

"পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ড. হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৫৩ সনের ৮ই আগষ্ট তারিখে 'জোড়াসাঁকো' ও 'এভিনিউ' এক্সচেঞ্জের উদ্বোধন করার ফলে কলিকাতা টেলিফোনের প্রথম পর্য্যায়ের মোট ২,০০০টি স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন লাইন বসাইবার কাজ শেষ হইয়াছে। দ্রুত ঐ কাজ সম্পাদনের জন্য কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে প্রায় ২০০ কারিগরকে নিয়োগ করা হয়। তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিশেষ ট্রেনিং ক্লাসেরও আয়োজন করা হইয়াছিল।

"প্রথম পর্য্যায়ের কাজ শেষ হইবার বহু পূর্ব্বেই ভারত গবর্ণমেণ্ট দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কাজের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির জন্য ১৯৫০ সনের জুন মাসে ইণ্ডিয়ান টেলিফোন ইণ্ডাষ্ট্রীজের নিকট অর্ডার পেশ করেন। ঐ সময়ের মধ্যে উক্ত ভারতীয় প্রতিষ্ঠান স্বয়ংক্রিয় টেলিফোনের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ যন্ত্রপাতি উৎপাদন আরম্ভ করিয়াছিল। মাত্র যে কয়েকটি শ্রেণীর যন্ত্রপাতি সেখানে উৎপাদন সম্ভব ছিল না, সেগুলির জন্য ইংলণ্ডের অটোমেটিক টেলিফোন এণ্ড ইলেকট্রিক কোম্পানীতে অর্ডার পেশ করা হয়।

"লালদীঘির দক্ষিণ তীরে ডাক ও তার বিভাগের যে নবতল বিশিষ্ট টেলিফোন ভবন নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার পশ্চিমাংশে ব্যাঙ্ক ও সিটি এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হইয়াছে। ঐ ভবনে কলিকাতার সকল দূরবর্ত্তী টেলিকমিউনিকেশন সার্কিট ছাড়াও ডাক এবং তারবিভাগের পরিচালনা ও কারিগরী বিভাগের আপিস খোলা হইবে।

'ব্যাঙ্ক' ও 'সিটি' এক্সচেঞ্জে যথাক্রমে প্রথমে ৬,১০০টি ও ৭,৫০০টি টেলিফোন সংযোগ খোলা হইবে এবং ঐগুলি কলিকাতার ঘনবসতি ও ব্যবসা-কেন্দ্রে পরিব্যাপ্ত থাকিবে।

"দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কাজ যখন ব্যাপকভাবে চলিতেছিল তখন অটোমেটিক টেলিফোন এণ্ড ইলেকট্রিক কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড অতিরিক্ত ৫০০ জন লোককে নিয়োগ করিয়াছিল। তাঁহাদের অধিকাংশ এক্ষণে ডাক ও তার বিভাগে চাকুরী পাইয়াছেন। তাঁহারাই বর্ত্তমানে সরকারী পরিচালনায় তৃতীয় ও চতুর্থ পর্য্যায়ের অধিকাংশ কাজ করিতেছেন।"

প্রেস নোট সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই, কেননা উহা ঐতিহাসিক প্রথায় প্রদত্ত বিবৃতি।

কিন্তু টেলিফোন যাঁহাদের আছে, অর্থাৎ যাঁহারা ভুক্তভোগী তাঁহাদের ঐ বিবৃতিতে উল্লসিত হইবার কোনও কারণ নাই। কেন নাই তাহা বলিতেছি।

জুন ১৯৫৩ সনে প্রকাশিত টেলিফোন ডাইরেক্টরীতে লিখিত ছিল যে ঐ বৎসরের ডিসেম্বরে নূতন ডাইরেক্টরী প্রকাশিত হইবে—অর্থাৎ ছয় মাস পরে। সেই ডাইরেক্টরী প্রকাশিত হইল ১৯৫৫ সনের এপ্রিল—অর্থাৎ প্রায় দুই বৎসর পরে। এখন প্রয়োজন আর একটি পুস্তক যাহাতে ঐ নূতন ডাইরেক্টরী ব্যবহার শিক্ষা করা যায়! বস্তুতঃ এত গোলমেলে ডাইরেক্টরী বোধ হয় ভূভারতে আর নাই। কোন্ বিদগ্ধ-চূড়ামণি এরূপে নাম সাজাইলেন তাহা জানা প্রয়োজন। কেননা তিনি ও তাঁহার "ম্যাগনম ওপুস" এই ডাইরেক্টরী, দুই-ই মিউজিয়ামে সযত্নে রক্ষার উপযোগী।

বর্ত্তমানে কলিকাতায় যদি কেহ দুই মাইলের মধ্যে স্থিত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে চাহেন, তবে হাঁটিয়া যাইলেও অপেক্ষাকৃত দ্রুত কাজ হয়। এই অপরূপ ব্যবস্থা আরও দুই তিন বৎসর চলিবে শুনিতেছি।

লালফিতার দৌরাত্ম্য

সরকারী দপ্তরখানায় লালফিতার দৌরাত্ম্য সম্পর্কে ৬ই মে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "বোম্বে ক্রনিকল" পত্রিকা লিখিতেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের সংগঠন এবং পদ্ধতি বিভাগ ([illegible] Methods Division) প্রদত্ত প্রথম বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে সরকারী দপ্তরখানায় অযথা বিলম্বের যে সকল অভিযোগ করা হইয়া থাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই সকল অভিযোগ সত্য।

অনেক সময় বলা হইয়া থাকে যে কর্ম্মসম্পাদনে বিলম্বের জন্য সিবিল সার্বিস দায়ী নহে; উহা পার্লামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থারই অন্তর্নিহিত ত্রুটি। সময় সময় এরূপও বলা হয় যে পার্লামেণ্টারী নিয়ন্ত্রণ অপসারিত করিয়া আমলাতন্ত্রকে একচ্ছত্র ক্ষমতা দিলেই মাত্র কর্ম্মসম্পাদনে তৎপরতা আনয়ন করা সম্ভব। কিন্তু উক্ত সংগঠনের রিপোর্ট হইতে দেখা যায়, বিভিন্ন দপ্তরে কর্ম্মসম্পাদনে বিলম্বের কারণ উপযুক্ত যত্ন এবং মনোযোগের অভাব; পার্লামেণ্টারী নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা নহে। বহুক্ষেত্রেই কোন প্রস্তাব বিবেচনা করিতে অযথা কালহরণ করা হয় এবং কোন ব্যাপারে আদেশ দিতে অযথা বিলম্ব করা হয়। ইহা হইতেই আমলাতান্ত্রিক নিষ্ক্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কতদিনে এই ত্রুটির নিরসন হইবে তাহা বলা শক্ত। কিন্তু উক্ত বিবরণীতে ঐ সংগঠনের কার্য্যের ফলাফল বিশ্লেষণ করিয়া বলা হইয়াছে যে, বাহির হইতে উপযুক্ত গুণসম্পন্ন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ নিয়োগ এবং বর্ত্তমান কর্ম্মচারিগণের উপর অধিকতর ব্যক্তিগত দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রেই বিলম্বের হেতু সাংগঠনিক কারণ—উর্দ্ধতন অফিসারগণ নিম্নতন অফিসারদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন না। সেকশনাল অফিসারদের হাতে বর্দ্ধিত ক্ষমতা দেওয়ার জন্য উক্ত বিবরণীতে বলা হইয়াছে।

"বোম্বে ক্রনিকল" লিখিতেছেন যে, সরকারী কর্ম্মব্যবস্থায় যে সকল পরিবর্ত্তন সাধনের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে তাহার পরিণতি কি ঘটে সে সম্পর্কে অনেকেই কৌতূহল পোষণ করিবেন।

পশ্চিমবঙ্গে পানীয় জল সরবরাহ

পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে ইতিমধ্যেই পানীয় জলের অভাবে জনসাধারণকে বিশেষ দুরবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। কয়েক-স্থানের সংবাদ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি বৎসরই গ্রীষ্মকালে রাজ্যের নানাস্থানে জলকষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মের ন্যায় দেখা দেয়।

বিগত ৬ই এপ্রিল কলিকাতা বেতারকেন্দ্র হইতে বিশ্বস্বাস্থ্য-দিবস উপলক্ষ্যে এক বক্তৃতায় রাজ্যের স্বাস্থ্য-বিভাগের মন্ত্রী ডাঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পানীয় জল সরবরাহের ৪০,৩৭৩টি সংরক্ষিত কেন্দ্র রহিয়াছে। কিন্তু রাজ্যের সমগ্র অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য আরও প্রায় ১৯০০০ সংরক্ষিত কেন্দ্রের প্রয়োজন। এই কার্য্যের জন্য তিন কোটি টাকা লাগিবে। পশ্চিমবঙ্গের ৮১টি মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে ৩৭টিতে জলসরবরাহ ব্যবস্থা রহিয়াছে। ৯টি মিউনিসিপ্যালিটিতে ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জলসরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতির আয়োজন চলিতেছে। ডাঃ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের শতকরা ৬০ ভাগ এবং শহর অঞ্চলের অধিবাসীদের শতকরা ৯৬·৭২ ভাগ বিশুদ্ধ পানীয় জল লাভের সুযোগ পায়।

ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে বিশুদ্ধ পানীয় জল লাভের পথ হইতেছে অধিকতর সংখ্যায় গভীর নলকূপ খনন করা। সংরক্ষিত বাঁধান কূপ হইতেও আংশিকভাবে প্রয়োজন-সাধন হয়। ১৯৪৮ সন হইতে গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সরকার বার্ষিক কুড়ি লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া আসিতেছেন। শহর অঞ্চলের জন্য ঐ ব্যয়ের পরিমাণ বার্ষিক বার লক্ষ টাকা। ১৯৫৪ সনের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত এই ভাবে ৩,১৬৯টি নূতন নলকূপ খনন করা হইয়াছে, ৩৫৫৮টি নলকূপ পুনরায় বসান হইয়াছে এবং ৪৭৭টি বাঁধান কূপ খনন করা হইয়াছে। সুন্দরবন অঞ্চলে জল সরবরাহের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সরকারের লক্ষ্য ছিল প্রতি চারি শত জন অধিবাসীর জন্য একটি করিয়া বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও এখনও তাহা করা সম্ভব হয় নাই।

মেদিনীপুর জেলায় জলকষ্ট

১লা বৈশাখ এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে সমগ্র মেদিনীপুরে ব্যাপক জলকষ্টের উল্লেখ করিয়া "মেদিনীপুর পত্রিকা" জেলার পুষ্করিণী ও কূপগুলির অবিলম্বে সংস্কারসাধনের আবেদন জানাইয়া লিখিতেছেন, "মেদিনীপুর জেলায় ৪৩৩টি ইউনিয়ন আছে এবং যদি একটি পরি-কল্পনা সুষ্ঠুভাবে খাড়া করা যায় এবং নিঃস্বার্থ অথচ সর্ব্বজনমান্য স্থানীয় মহানুভব ব্যক্তিগণ অগ্রসর হইয়া আসেন তাহা হইলে ১২০০ হইতে ১৫০০ নলকূপের ব্যবস্থা হওয়া অসম্ভব নয় এবং তাহা হইলে সমগ্র জেলা বাঁচিয়া যাইবে।"

এই সকল নলকূপের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহা উন্নয়ন খাতে, ছোট ছোট সেচব্যবস্থা এবং জনস্বাস্থ্য এমনকি শিক্ষাখাতে বরাদ্দ অর্থ হইতেও লওয়া যাইতে পারে বলিয়া পত্রিকাটির অভিমত।

সম্পাদকীয় মন্তব্যে মেদিনীপুর জেলা হইতে নির্ব্বাচিত বিধান সভার প্রত্যেক সদস্যের নিকট আবেদন জানান হইয়াছে তাঁহারা যেন "অবিলম্বে তাঁহাদের স্ব স্ব এলাকায় প্রত্যেক ইউনিয়ন প্রেসিডেণ্টের সহিত যোগাযোগ এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত আলোচনা ও সমগ্র এলাকা পরিভ্রমণ করিয়া নিঃস্বার্থভাবে প্রত্যেকটি ইউনিয়নকে ভিত্তি করিয়া নলকূপের চাহিদার, পুষ্করিণী ও কূপ প্রভৃতির একটি ব্যাপক তালিকা প্রস্তুত করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, স্থানীয় মহকুমা অফিসার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মেদিনীপুর সম্মিলনী ও জেলার বিভিন্ন পত্রিকার নিকট প্রেরণ করেন।"

এ বিষয়ে আমরা কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বাঁকুড়ায় জলকষ্ট

"শ্রীদুর্ম্মুখ" ২২শে চৈত্রের 'হিন্দুবাণী'তে লিখিতেছেন, "সমগ্র বাঁকুড়া জেলায় অবর্ণনীয় জলকষ্ট দেখা দিয়েছে। এই বৎসর বৃষ্টি আদৌ হয় নাই। তদুপরি ফসল রক্ষার জন্য প্রায় সব জলটুকু শেষ করে দেওয়া হয়েছে। গত ৫।৬ মাসের মধ্যে একফোটা বৃষ্টি না হওয়ায় অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কূপ ও পুকুর শুষ্কপ্রায়, শতকরা ৯০টি পুকুরে পাঁক ছাড়া কিছুই নাই।"

বাঁকুড়ার জনসাধারণ যদি সরকার ও অন্য ভাগ্যদেবতার মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বেচ্ছাসেবকের সাহায্যে পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার ও সংস্কারে এইবেলা সচেষ্ট হইতে পারেন তবে আগামী বৎসরে এইরূপ অবস্থার কারণ থাকিবে না। নচেৎ এরূপ কষ্ট অনিবার্য্য।

বর্দ্ধমানে খাদ্যোৎপাদন হ্রাস

বর্দ্ধমান জেলায় খাদ্যোৎপাদন হ্রাস সম্পর্কে আলোচনা করিয়া সাপ্তাহিক 'নূতন পত্রিকা' লিখিতেছেন, "চাষের সময়ে বৃষ্টিপাতের অভাবে ক্যানেল হইতে সময়মত প্রয়োজনীয় জলসরবরাহের ব্যর্থতা, সর্ব্বোপরি প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টির ফলে রায়না থানা অঞ্চল, কাটোয়া, মঙ্গলকোট, পূর্ব্বস্থলী, মন্তেশ্বর, আউসগ্রাম এবং প্রায় সমগ্র আসানসোল মহকুমায় খাদ্যাভাব সুরু হইয়া গিয়াছে।"

ইতিমধ্যে আগামী ফসলের জন্য আবাদের প্রস্তুতির সময় আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু অর্থাভাবে কৃষকগণ বিশেষ সঙ্কটাপন্ন হইয়াছেন। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কৃষিঋণ না পাইলে কৃষকদের পক্ষে চাষের মরশুমে চাষ করা প্রায় অসম্ভব হইবে। কোন কোন স্থানে কৃষকগণ অর্থাভাবে জমি, গরু প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া দিতেছে বলিয়াও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। অথচ প্রায় দুই-তিন মাস পূর্ব্ব হইতে কৃষিঋণ, বলদ ক্রয় করিবার জন্য ঋণ এবং উপযুক্ত সাহায্য-ব্যবস্থার জন্য আবেদন জানাইয়াও কৃষকগণ ব্যর্থকাম হইয়াছেন। বিভিন্ন ইউনিয়ন বোর্ড এবং সরকারীভাবে গঠিত রিলিফ কমিটিও ঐ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

'নূতন পত্রিকা' লিখিতেছেন, "এ অবস্থায় নূতন করিয়া প্রয়োজনীয়তার কথা নিষ্প্রয়োজন। গতানুগতিক আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিবর্ত্তে প্রয়োজনীয় ঋণ সময় থাকিতে সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য আমরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

ব্যাপক কৃষিঋণ দান ও তাহা আদায় করা বর্ত্তমান সরকারী ব্যবস্থায় অসম্ভব। উহার জন্য ভিন্ন মনোভাবাপন্ন ও অভিজ্ঞ এবং কর্ম্মঠ লোকের প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় কৃষিব্যাঙ্ক বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান ভিন্ন ইহার ব্যবস্থা সম্ভব নহে।

বাঁকুড়ার বাসনশিল্পে সঙ্কট

১৯শে বৈশাখ 'হিন্দুবাণী' পত্রিকায় "শ্রীদুর্মুখ" লিখিতেছেন যে, বাঁকুড়ার বাসনশিল্প বর্ত্তমানে বিশেষ সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। বাসনশিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রায় দুই হাজার ব্যক্তি কয়েকদিন পূর্ব্বে শোভাযাত্রা করিয়া বিষ্ণুপুর মহকুমা শাসকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের দুরবস্থার কথা তাঁহাকে অবগত করান এবং দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য সরকারী সাহায্য প্রার্থনা করেন। মহকুমা শাসকের আশ্বাস পাইয়া তাঁহারা চলিয়া আসেন।

"শ্রীদুর্মুখ" লিখিতেছেন, "দুরবস্থার আশু প্রতিকার জন্য সরকারী সাহায্য ও ঋণ দেওয়া দরকার। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখা দরকার যে গত কয়েক বৎসর যাবৎ জেলার অন্যতম প্রধান এই শিল্পটিতে ক্রমাগত আর্থিক অবনতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এর ফলে এ কাজে নিযুক্ত লোকদের অন্যত্র কাজের সন্ধানে যেতে হচ্ছে এবং এই কুটীর-শিল্পটি বিলোপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় স্থায়ী প্রতিকার আবশ্যক। কি ভাবে তা করা যেতে পারে এ বিষয়ে সরকার ও সমিতির চিন্তা করা দরকার। তাঁতশিল্পের প্রতি সরকার যেরূপ উৎসাহ দেখাচ্ছেন এদিকে তার কিছুটাও দেখান উচিত।"

বালুরঘাট হাসপাতালে চিকিৎসায় অবহেলা

৪ঠা বৈশাখ সাপ্তাহিক 'আত্রেয়ী'র সংবাদে প্রকাশ, "বালুরঘাটের বাসিন্দা শ্রীষষ্ঠিচরণ সেন মহাশয়ের আট বৎসর বয়স্ক পুত্র শ্রীমান মিছরীপ্রসাদ সেন বৃক্ষ হইতে পতনের পর যথাসময়ে তাহাকে বালুরঘাট সদর হাসপাতালে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও সময়মত চিকিৎসা না করিবার ফলে গত ১৬ই এপ্রিল বেলা দুই ঘটিকার সময় হাসপাতালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সংবাদে শহরে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।"

পত্রিকাটিতে প্রকাশিত সংবাদের সারমর্ম্ম এইরূপ: বিগত ১৪ই এপ্রিল বালকটি গাছ হইতে পড়িয়া গেলে পর দিন ১৫ই এপ্রিল আহত বালকটিকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। কিন্তু হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ মনোরঞ্জন সমাদ্দার মহাশয় নববর্ষ উপলক্ষ্যে নানাবিধ উৎসব-আয়োজনে ব্যস্ত থাকায় বালকটির প্রতি কোন দৃষ্টি দিতে পারেন নাই। ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে বালকটিকে মাত্র একবার হাসপাতালের "সর্ব্বরোগহর পেটেন্ট ঔষধ" মিকশ্চার খাওয়ান হয়। ১৬ই এপ্রিল যখন বালকটির অবস্থা বিশেষ সঙ্কটাপন্ন তখনও নাকি ডাক্তার মহাশয় নাটকাভিনয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

'আত্রেয়ী'র বিবরণীতে বলা হইয়াছে: "প্রকাশ, বালকটির মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে কর্ত্তব্যকর্ম্ম নথীবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বালকটির দেহের ভগ্নস্থান 'প্লাষ্টার' করা হয় এবং মৃত্যুকালে অক্সিজেনও দেওয়া হয়। আরও প্রকাশ, কম্পাউণ্ডারদের ব্যস্ততা লক্ষ্য করিয়া ডাক্তারবাবু নাকি বলেন, 'ও ত মরবেই, অযথা এ হয়রানী।'..."

"এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ থাকে যে, বালকটি হাসপাতাল-পাড়ারই ছেলে। বালকটির মৃত্যুদিবস হাসপাতাল-পাড়ারই ছেলেদের দ্বারা ডাক্তারবাবুর পরিচালনায় রাত্রিতে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে নাট্যাভিনয় হয়। এই দিবস নাট্যাভিনয়টি বন্ধ রাখিবার জন্য পাড়ার লোকেরা ডাক্তারবাবুকে অনুরোধ জানান। কিন্তু উচ্চ সরকারী কর্ম্মচারীকে নাট্যাভিনয় দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে বিধায় নাট্যাভিনয়টি স্থগিত রাখা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।"

এ বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় কি কোনও সংবাদ লইতে পারেন? পশ্চিমবঙ্গ অবশ্য "ওয়েলফেয়ার ষ্টেট" নহে। কিন্তু এইরূপ অপঘাত মৃত্যুর ব্রিটিশ আমলে হইলেও তদন্ত হইত।

আসানসোল হাসপাতালের অবস্থা

সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাণী' আসানসোলের এল. এম. হাসপাতালের কয়েকটি অব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া ২০শে বৈশাখ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে হাসপাতালের ব্যবস্থায় তিনটি প্রধান ত্রুটির উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রথমতঃ, সরকারী হাসপাতালটিতে বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা নাই। আসানসোলে ভয়ানক মাছির উপদ্রবের দরুন অজ্ঞান অথবা দুর্ব্বল রোগী যাহারা হাতপাখা নাড়িয়া মাছি তাড়াইতে অক্ষম এরূপ রোগীকে দিনের বেলাতেও মশারির ভিতরে রাখিতে হয়। আসানসোলের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে ইহার ফলে রোগীদিগকে যে কিরূপ অসুবিধা সহ্য করিতে হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রসূতি-সদনে সদ্যোজাত শিশুকে মাছি ছাঁকিয়া ধরে; সেজন্য তাহাদিগকে কাপড় চাপা দিয়া রাখিতে হয়। কলেরা ওয়ার্ডে পাখার অভাবে গ্রীষ্মাধিক্যে রোগীর দেহ হইতে জলীয় পদার্থ ঘামের ফলে বাহির হইয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ, প্রসূতি ওয়ার্ডের নিকটেই কলেরা এবং নবনির্ম্মিত বসন্ত ওয়ার্ড অথচ তথায় মক্ষিকা-নিরোধের কোনই ব্যবস্থা নাই। ফলে বসন্ত ও কলেরা ওয়ার্ড হইতে বহুসংখ্যক মাছি আসিয়া সদ্যোজাত শিশুদিগকে ছাঁকিয়া ধরে।

তৃতীয়তঃ, "হাসপাতালের প্রধান মেডিক্যাল অফিসারকে আদালতে সাক্ষ্য দেওয়া এবং বড় বড় লোক আসিলে বিমান ঘাঁটিতে উপস্থিত থাকা প্রভৃতি কাজে এত ব্যস্ত থাকিতে হয় যে, তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়াই কষ্টকর। ইহাতে অবশ্য তাঁহার কোন দোষ নাই। তাঁতের মাকুর মত তাঁহাকে একবার এদিক একবার ওদিক ছুটাছুটি করিতে হয়।" একজন উপযুক্ত শিক্ষিত সহকারী চিকিৎসকের নিতান্তই প্রয়োজন রহিয়াছে। হাসপাতালে নার্সের সংখ্যাও অল্প, তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

আসানসোল হাসপাতালের উক্ত অব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া 'বঙ্গবাণী' লিখিতেছেন যে, ঐসকল ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বেও আলোচনা করা হইয়াছে, কিন্তু তাহা নিষ্ফল হইয়াছে। "এই সকল ছোট ছোট বিষয়ে সরকারী ঔদাসীন্য সত্যই বিরক্তিকর এবং কোনক্রমেই সমর্থন-যোগ্য নহে। তাহা ছাড়া এইগুলি না করার পক্ষে সরকারী মনোভাব সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক এবং এমন কি সাধারণ স্বাস্থ্যনীতিরও সম্পূর্ণ বিরোধী।"

উপসংহারে পত্রিকাটি আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, অতঃপর সরকার এই সকল অব্যবস্থার প্রতিবিধানে সচেষ্ট হইবেন।

সহযোগী বোধ হয় এখনও "ওয়েলফেয়ার ষ্টেটে"র প্রকৃত অর্থ বুঝেন নাই। উহার অর্থ চাটুকার ও চৌরচক্রের ভূস্বর্গ। অন্যের পক্ষে নহে।

বারাসাতে দৈনিক বাজার

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুদিগের আগমনের পূর্ব্বে বারাসাতে কোন দৈনিক বাজার ছিল না। হাটের উপরই স্থানীয় অধিবাসীদিগকে নির্ভর করিতে হইত। কলিকাতার বাজার দ্বারাও অধিবাসীদের কতক অংশের কাজ চলিয়া যাইত। উদ্বাস্তুদের আগমনের পর ঐ স্থানে একটি দৈনিক বাজার গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বাজারে উপযুক্ত ছাউনি (শেড) এবং নীচে পাকা ভিটা ও বাঁধান চত্বরের অভাবে প্রতি বৎসর বর্ষাকালে জনসাধারণ, ক্রেতা ও বিক্রেতাকে বিশেষ অসুবিধা সহ্য করিতে হয়। তদ্ব্যতীত বাজারের সহিত কোন শৌচাগার বা প্রস্রাবাগার না থাকায় বাজারের নিকট-বর্ত্তী স্থানসমূহ প্রতিদিন নরককুণ্ডে পরিণত হইতেছে।

বারাসাত দৈনিক বাজারের এই সকল অসুবিধার প্রতি বারাসাত পৌরসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ১৮ই বৈশাখ 'বারাসাত বার্ত্তা' লিখিতেছেন, "গ্রীষ্মের পরেই বর্ষা আসিতেছে। এখন যেমন-তেমন করিয়া বাজারের ক্রেতা ও বিক্রেতার কাজ চলিয়া গেলেও বর্ষার দিনে উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে প্রত্যেককেই যে কিরূপ অসুবিধা ও দুরবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়, আশা করি ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। উপযুক্ত ছাউনির অভাবে দোকান পসারের দ্রব্যগুলি জলে-কাদায় মাখিয়া একাকার হয় এবং ঝুপঝাপ বৃষ্টিপাত সুরু হইলে দোকানী ও ক্রেতাকে ছুটিয়া গাছের নীচে, দূরের দোকানে অথবা আদালতের বারান্দায় আশ্রয় লইতে হয়। বাজারের প্রাঙ্গণ ও ছাউনির নীচের ভিটি পাকা সান বাঁধানো না হইলে বর্ষাজনিত দুর্দ্দশা ও দুর্ভোগ লাঘব সম্ভব হইবে না।"

মেদিনীপুরে মহিলা কলেজ

মেদিনীপুর শহরে একটি মাত্র কলেজ রহিয়াছে। মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র কোন কলেজ না থাকায় শহরের অধিবাসিগণ যে অসুবিধা ভোগ করিতেছিলেন তাহা দূর করিবার উদ্দেশ্যে শহরে একটি স্বতন্ত্র মহিলা কলেজ স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। প্রকাশ যে, এই উদ্দেশ্যে মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে সভাপতি এবং ডাঃ ক্ষিতীশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারীকে সম্পাদক করিয়া একটি এড-হক কমিটি গঠিত হইয়াছে। মেদিনীপুরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিই নাকি এইজন্য অর্থসাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসর জুন মাস হইতেই যাহাতে কলেজের কার্য্যারম্ভ হইতে পারে তজ্জন্য উদ্যোক্তারা বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন বলিয়াও প্রকাশ।

মেদিনীপুর শহরে মহিলা কলেজ স্থাপনের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাইয়া এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে ১৬ই চৈত্র 'মেদিনীপুর পত্রিকা' লিখিতেছেন, "বলা বাহুল্য, মেদিনীপুরের মত বৃহৎ জেলায় একাধিক মহিলা কলেজ স্থাপিত হইতে পারে এবং হওয়াও উচিত।" কারণ বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীশিক্ষা যেরূপ দ্রুত বিস্তারলাভ করিতেছে তাহাতে ছাত্রীর অভাব ঘটিবে না।

আমাদেরও মনে হয় মেদিনীপুরে ইতিপূর্ব্বেই মহিলা কলেজ স্থাপিত হওয়া উচিত ছিল। যাঁহারা এই অভাব পূর্ণ করিতে উদ্যোগী আমরাও তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রাচীন ভারতের লোকায়তিক বিপ্লব

শ্রীকালিদাস দত্ত

৩

গত কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে একটি প্রবন্ধে আমি বৈদিক যুগে উদ্ভূত লোকায়তিক বিপ্লবের বিষয় কিছু আলোচনা করিয়াছি। উক্ত বিপ্লবের প্রধান কারণ ছিল আত্মা, জন্মান্তর ও পরলোকের সংস্কারে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত শূদ্রবর্ণের প্রতি বহুবিধ অমানুষিক ব্যবহার এবং দ্বিজাতিগণের বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্যাশ্রমে কঠোর আত্মনিগ্রহ, মহাপ্রস্থানাদি বিধিমত অকালে দেহ বিনাশ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে অসংখ্য গোমহিষাদি পশু হত্যাদি কতকগুলি নিষ্ঠুর আচরণ।

শূদ্রবর্ণের প্রতি ঐ সকল ব্যবহারের কথা উক্ত প্রবন্ধে বিশদভাবে বলা হইয়াছে; কিন্তু উহাতে দ্বিজাতিগণের ঐরূপ আচরণগুলির উল্লেখ খুব সংক্ষিপ্ত। সে কারণ এই প্রবন্ধে উহাও বিশদভাবে বলিয়া আমি লোকায়তিক বিপ্লব ও মতবাদ সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করিতেছি।

বৈদিক যুগে (পৌরাণিককাল ত্রেতা ও দ্বাপরে) উল্লিখিত বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য আশ্রম দুইটি বেদবিহিত চতুরাশ্রমের অন্তর্গত থাকায় দ্বিজাতিগণের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়বর্ণের অবশ্য পালনীয় ছিল। তজ্জন্য তাঁহারা সকলেই ঐ আশ্রম দুইটির নিয়মানুসারে জীবনের মধ্যভাগ অতীত হইলে, পরলোকে স্বর্গসুখ ভোগের লোভে, মস্তকে জটা ও দেহে বল্কল ও মৃগাজিন ধারণ করিয়া বনে যাইতেন এবং সেখানে নিঃসম্বল ও গৃহরহিত হইয়া বৃক্ষতলে বাস করিতেন। তৎকালে তাঁহাদের কেহ কেশ, শ্মশ্রু, নখ ও রোম ছেদন বা গাত্রের ময়লা পরিষ্কার করিতে পারিতেন না। সকলকেই রাত্রে কঙ্করময় ভূমিতে শয়ন, ত্রিসন্ধ্যা স্নান ও মধ্যে মধ্যে উপবাসাদির দ্বারা দেহ শোষণ করিতে হইত।

ঐ সময় তাঁহারা কপোত বৃত্তি (খুঁটিয়া খাওয়া) অভ্যাস-পূর্ব্বক ফল, মূল, গলিত লতা ও বৃক্ষপত্রাদি কেবলমাত্র দন্তের দ্বারা আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। উহা ভিন্ন গ্রীষ্মকালে তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বালিয়া অগ্নিতাপ ও রৌদ্রে বসিয়া সূর্য্যতাপ গ্রহণ করিতে হইত এবং বর্ষাকালে ছত্রাদি আবরণশূন্য হইয়া বৃষ্টিধারায় দাঁড়াইয়া ও হেমন্তে আর্দ্র দেহে থাকিয়া তপস্যার বৃদ্ধি করিতে হইত।

ঐ অবস্থায় আবার অনেকে কেবল ভূমিতে লুটিয়া গমনাগমন করিতেন। কেহ কেহ আবার পদাগ্রে দাঁড়াইয়া কিংবা আসনে ঊর্দ্ধমুখে বসিয়া থাকিতেন।১

ঐ প্রকার কৃচ্ছ্রসাধনে সর্ব্বক্ষণেই ঐ ভাবে থাকিয়া উত্তাপ, বৃষ্টি ও শীত সহ্য করাতে ও ঐ সকল নিয়ম পালন ও আহার সংকোচের ফলে তাঁহাদের গাত্রের মাংস ও শোণিত শুষ্ক হইয়া যাইত এবং তাঁহারা কঙ্কালসার দেহ ধারণ করিয়া থাকিতেন।১

যাঁহারা ঐ সকল কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইতেন তাঁহারা মহাপ্রস্থান-বিধিমত দেহনাশ করিতেন।২ আবার যাঁহারা সস্ত্রীক উক্ত আশ্রম অবলম্বন করিতেন তাঁহাদের কাহারও ঐ অবস্থায় সন্তান হইলে দুর্দ্দশার আর শেষ থাকিত না। ঐরূপ ব্যক্তি নিন্দা ও অপমানে অস্থির হইয়া অগ্নি প্রবেশে মৃত্যুবরণ করিতেন এবং তাঁহার পত্নীও স্বামীর চিতায় সহমৃতা হইতেন।

ঐ সময় যে সন্তান জন্মগ্রহণ করিত তাহারও সমাজে স্থান খুব হেয় ছিল। পুরাণে উহার যে উল্লেখ আছে তাহা এই,

> 'বানপ্রস্থাশ্রমে উৎপাদিত সন্তানের সহিত দ্বিজগণ আলাপ করিবেন না, আর সেই বালকবংশীয়দের বেদপাঠে অধিকার থাকিবে না (৩)।'

মানব-আত্মার স্বর্গসুখ ভোগের জন্য ঐরূপ আত্মনিগ্রহ ব্যতীত মহাপ্রস্থান নামক দেহনাশের পদ্ধতিটিও ঐ সময় ঋষিরা আবিষ্কার করিয়া সমাজে প্রচলিত করেন। ঐ পদ্ধতি অনুসারে বহু ব্যক্তি জলে ডুবিয়া, অগ্নিতে পুড়িয়া, পর্ব্বতাদি উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া, যুদ্ধে যোগ দিয়া ও অনাহারে মৃত্যু বরণ করিতেন।৪ পৌরাণিক গ্রন্থগুলিতে উহারও যে সমস্ত বিবরণ আছে তাহা হইতে জানা যায় যে, ঐ সকল উপায়ে মৃত্যুবরণ তৎকালে মহাগৌরব ও পুণ্যজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। সে কারণ রাজা হইতে ভিক্ষুক পর্য্যন্ত সকলেই ঐ প্রকারে দেহান্ত ঘটাইবার চেষ্টা করিতেন।

মানবগণের [illegible] মঙ্গলের নিমিত্ত ঐ সকল

১। মনুসংহিতা, ৬ অধ্যায়

১। মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়, ১৯২ অধ্যায়

২। মনুসংহিতা, ৬ অধ্যায় ৩১

৩। কূর্ম্মপুরাণ, উপরিভাগ, ২৭ অধ্যায় ১৭।১৮

৪। ঐ সমস্ত উপায়ে দেহ নষ্ট করিতে পারিলে কোন কোন স্বর্গ লাভ করা যায় তাহার যে উল্লেখ নরসিংহপুরাণে আছে তাহা এই,

> "জলপ্রবেশী চানন্দং প্রমোদং বহ্নি সাহসী।
> ভৃগুপ্রপাতী সৌখ্যন্ত রণে চৈবাতিনির্ম্মলং॥
> অনশনমৃতো যঃ স্যাৎ সগচ্ছেত্তু ত্রিপিষ্টপং॥"

অর্থাৎ—জলপ্রবেশে আনন্দ নামক স্বর্গ, সাহসপূর্ব্বক অগ্নি প্রবেশে প্রমোদ নামক স্বর্গ, পর্ব্বতাদি উচ্চস্থান হইতে পড়িলে সৌখ্যনামক স্বর্গ, যুদ্ধে যোগ দিলে নির্ম্মল নামক স্বর্গ ও অনাহারে ত্রিপিষ্টপনামক স্বর্গ লাভ হয়।

আচরণ দেশের সর্ব্বত্র প্রবল হইয়া উঠিলে ইহজীবন অকিঞ্চিৎকর ধারণায় তৎকালীন শিক্ষিত ব্যক্তিরা চিকিৎসা, স্থাপত্য ও শিল্প প্রভৃতি মানবগণের বাস্তব জীবনের কল্যাণকর কার্য্যের অনুশীলনও, উহা পার্থিবতায় আকৃষ্ট করে বলিয়া, কত দোষাবহ বিবেচনা করিতেন প্রাচীন গ্রন্থগুলি হইতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মনুসংহিতায় উহা এইরূপ,

"চিকিৎসাজীবীর অন্ন ভোজন করিবে না (১)। চিত্রকর্ম্মাদি শিল্পকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা বিখ্যাত বংশও হীনতা প্রাপ্ত হয় (২)। চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদের যাহা দান করা যায় তাহা পুয় ও শোণিতবৎ ত্যজ্য। (৩) চিকিৎসা ও বাস্তুজীবী ব্রাহ্মণদের হব্যে কাব্যে পরিত্যাগ করিবে (৭)।"

উহার জন্য তৎকালীন সর্ব্বোচ্চ শিক্ষালাভের একমাত্র অধিকারী, ব্রাহ্মণগণ ঐ সকল বিদ্যার অনুশীলন ও ব্যবহার পরিত্যাগ করেন এবং উক্ত বিদ্যাগুলি অশিক্ষিত নিম্নবর্ণদের অধিকারে গিয়া বৈগুণ্যতা পাইতে থাকে।

এই সমস্ত কারণে পার্থিব জীবনের গুরুত্ব নষ্ট হওয়ায় জন্মান্তরে মানবাত্মার সুখের উদ্দেশ্যে কর্ম্মকাণ্ডের ব্যবস্থাগুলিও খুব বৃদ্ধি পায় এবং তাহার ফলে অসংখ্য প্রকারের ব্যয়বহুল যজ্ঞ ও পারলৌকিক অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। রাজা ও ধনী ব্যক্তিরা ঐ সকল অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণদের নানারূপ দান দক্ষিণা দিয়া কত সমারোহে সম্পন্ন করিতেন ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, বাল্মীকি রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সময় কোন কোন নরপতি বিশ্বজিৎ যজ্ঞে ঐরূপ সমারোহের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া সর্ব্বস্ব দান করিতেন। ঐ সকল দানের মধ্যে শত শত সালঙ্কারা সুন্দরী রমণী হইতে আরম্ভ করিয়া নানা জাতীয় মূল্যবান গৃহপালিত পশু, স্বর্ণ রৌপ্যের তৈজসপত্র ও অলঙ্কার প্রভৃতি মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদি থাকিত। দ্বিজাতি গৃহস্থদেরও সাধ্যমত ঐ সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে হইত। নচেৎ রাজদণ্ডে তাঁহারা দণ্ডিত হইতেন। এ বিষয়ে পুরাণে এইরূপ ব্যবস্থা দেখা যায়,

"যস্তু দ্রব্যার্জ্জনং কৃত্বা নার্চ্চয়েদ্ ব্রাহ্মণানসুরান্
সর্ব্বস্বমপহৃত্যৈনং রাষ্ট্রাদ্বিপ্রতিবাসয়েৎ" (৫)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দ্রব্য উপার্জ্জন করিয়া তদ্দ্বারা দেবতা ও ব্রাহ্মণকে অর্চ্চনা না করে, রাজা তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া রাজ্য হইতে তাহাকে বহিষ্কৃত করিবেন।

ঐরূপ সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠানে তখন পশু-বিনাশও অত্যাবশ্যক ছিল। ঐ বিষয়ে ঋগ্বেদে হিরণ্যস্তূপ ঋষির এই উক্তিটি উল্লেখযোগ্য :

"যে যজমান স্বগৃহে পশুবলি যুক্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করে সে স্বর্গের উপমাস্থল (৬)।"

মনুসংহিতায়ও উহার এই প্রকার নির্দ্দেশ আছে :

"এই চরাচর জগতে বেদবিহিত যে পশুহিংসার নিয়ম আছে তাহাকে অহিংসা বলিয়া জানিবে। প্রজাপতি স্বয়ং যজ্ঞের নিমিত্ত পশুসকল সৃষ্টি করিয়াছেন। মধুপর্কের জন্য, পিতৃকার্য্য ও দেবকার্য্যের জন্য পশুহিংসা করিবে। এই সকল মধুপর্কাদি কার্য্যের নিমিত্ত পশুহিংসা করিয়া বেদতত্ত্ববিদ্ দ্বিজগণ আত্মা ও পশু উভয়কে স্বর্গাদি সুখভোগ যোগ্য উত্তম গতি লাভ করাইয়া থাকেন (৭)।"

ঐ প্রসঙ্গে মহাভারতেও মহর্ষি স্যুমরশ্মির এই সকল উক্তি উদ্ধৃত আছে :

"ধেনু, ছাগ, মনুষ্য (৮), মেষ, অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দ্দভ এই সাত গ্রাম্য এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, হস্তী, ভল্লুক, মহিষ ও বানর এই সাত অরণ্য এই চতুর্দ্দশবিধ পশুর দ্বারা যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। পশুবিনাশ করা যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ এবং উহা পূর্ব্বপূর্ব্বতন মহাত্মাদের অনুমোদিত বলিয়া কীর্ত্তিত। সমস্ত বিদ্বান্ ব্যক্তি স্ব স্ব ক্ষমতামত পশুবিনাশ করেন। মনুষ্য, পশু, ওষধি প্রভৃতি সকলেই স্বর্গ কামনা করে কিন্তু যজ্ঞভিন্ন উহাদের স্বর্গলাভের উপায়ান্তর নাই (৯)।"

ঋষি ও শাস্ত্রকারদের এইরূপ মতবাদ প্রচারের ফলেই তৎকালে সর্ব্বপ্রকার দৈব ও পারলৌকিক কার্য্যে পশু হত্যার সংখ্যা অসম্ভব রকমে বৃদ্ধি পাইয়া গোমহিষাদি তৎকালীন বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রাণীকুলও নির্ম্মূল হইবার উপক্রম হয়।

১। মনুসংহিতা, ৪ অধ্যায় ২১২, ২২০

২। মনুসংহিতা, ৩ অধ্যায় ৬৪

৩। মনুসংহিতা, ৩ অধ্যায়, ১৮০

৪। মনুসংহিতা, ৩ অধ্যায় ১৫২, ১৬৩

৫। কূর্ম্মপুরাণ, উপরিভাগ ২৬ অধ্যায় ৫৯

৬। ঋগ্বেদ, ১।৩১।১৫

৭। মনুসংহিতা, ৫ অধ্যায় ৩৯-৪৪

৮। প্রধানতঃ নরমেধ বা পুরুষমেধ যজ্ঞে পশুরূপে মনুষ্য বিনাশের ব্যবস্থা ছিল। শুক্লযজুর্ব্বেদের ৩০।৩১ অধ্যায় হইতে জানা যায় যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই বর্ণ অভিষ্ঠ স্বর্গকামনায় উক্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন ও উহা ৪০ দিনে সমাপ্ত হইত। উন্মাদ, ব্রাত্য, বিকল প্রভৃতি পুরুষ ও বন্ধ্যা, যমজপ্রসবিনী, পলিতকেশা ও রজকিনী প্রভৃতি নারী উহাতে বধ্য ছিল। ঐরূপ ১৮৪ প্রকার বধ্য নরনারীর উল্লেখ উক্ত গ্রন্থে আছে। শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র, বৈতানসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে উহার বিধানসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। অম্বরীষ, যযাতি ও হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি নৃপতিগণ ঐ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন বলিয়া পুরাণে উল্লিখিত আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও হরিশ্চন্দ্রের ঐ যজ্ঞের উল্লেখ শুনঃশেফের কাহিনীতে দেখা যায়। ঋগ্বেদেও উহার আভাষ শুনঃশেফের ঋকগুলিতে আছে। ব্রাহ্মণপ্রধানকালে, লোকায়তিক আন্দোলন সময়ে ঐরূপ অনুষ্ঠান হইত কিনা তাহা লোকায়তিকদের গ্রন্থাদির অভাবে নির্ণয় করা কঠিন। তবে বৃহন্নারদীয় প্রভৃতি পরবর্ত্তীকালীন কয়েকটি পুরাণে লিখিত আছে যে উহা কেবল কলিতেই নিষিদ্ধ হয়। ঐ সময় কিন্তু লৌকিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে যে মনুষ্য বিনাশ করা হইত বৌদ্ধজাতক গ্রন্থ হইতে তাহা জানা যায়। —*Pre-Buddhist India*, (Based on the Jataka stories) Ratilal Mehta, p. 326.

৯। মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়, ২৬৮ অধ্যায়

পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে যে তৎকালীন সমাজের উল্লিখিত রূপ শোচনীয় অবস্থা ও অনাচার দূর করিয়া মানবগণরে বাস্তব জীবনের সুখ-স্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধনের উদ্দেশ্যেই লোকায়তিক মতবাদ প্রচারিত হয় এবং উহার প্রভাবেই ঐ সময় বহু নরনারী আত্মা, জন্মান্তর ও পরলোকে বিশ্বাস হারাইয়া উক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব্বোক্তরূপ সমাজের বিলোপ সাধনদ্বারা, ঐ মতবাদের আদর্শে একটি সাম্যমূলক লৌকিক সমাজ স্থাপনের চেষ্টা করেন।

বৈদিকযুগের (পৌরাণিক কাল ত্রেতার) কোন্ সময় ঐ ঘটনা ঘটে তাহা এখন সঠিক নির্দ্ধারণ করা কঠিন। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বিবৃত একটি কাহিনী পাঠে বোধ হয় যে উক্ত গ্রন্থ রচিত হইবার পূর্ব্বে জনৈক বৃহস্পতি একবার বেদধর্ম্মকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন কিন্তু তাহাতে তিনি সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই।১

মহাভারতেও উল্লিখিত আছে যে ভারতযুদ্ধের পূর্ব্বকালে একবার বেদধর্ম্ম উচ্ছিন্ন প্রায় হয়, কিন্তু ক্ষত্রিয় শক্তির সাহায্যে সে সময় উহা রক্ষা পায়।২ উহা ব্যতীত মৎস্য ও বিষ্ণু পুরাণেও বহু প্রাচীনকালে বেদধর্ম্মবিরোধিগণের সহিত বেদানুগত আর্য্যদের সংঘর্ষের উল্লেখ আছে।৩ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলেও, মুষ্কবান ইন্দ্রঋষির একটি ঋকে ঐরূপ সংঘর্ষের ইঙ্গিত আছে। উহা এই:

"হে বহুতর লোকের স্তুতিভাজন ইন্দ্র! আর্য্য ও দাস জাতির যে কেহ দেবরহিত লোক আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবার কামনা করে সেই সকল শত্রু যেন অক্লেশে আমাদের নিকট পরাজিত হয়। তোমার প্রসাদে আমরা যেন তাহাদের যুদ্ধে নিধন করি (৪)।"

বৈদিক যুগে লোকের দেবতায় অবিশ্বাসের প্রাচীনতম আভাষ পাওয়া যায় ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলে, ঋষি গৃৎসমদ রচিত কয়েকটি ঋকে।৫ উহার জন্যই তিনি ঐ সকল ঋকে ইন্দ্রদেবতার উপর সকলের বিশ্বাস উৎপাদন ও সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার মহিমা বিশেষ ভাবে প্রকটিত করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে এক স্থানে আগ্রহ সহকারে বলিয়াছেন:

"যাঁহার সম্বন্ধে লোকে বলে তিনি নাই, তাঁহাতে বিশ্বাস কর; তিনিই ইন্দ্র (৬)।"

ঐ সময় তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থার মূলভিত্তি আত্মা ও জন্মান্তরের অস্তিত্বে যে অনেকে বিশ্বাস করিতেন না, কঠোপনিষদে লিখিত নচিকেতা ও যমের উপাখ্যান হইতেও তাহা

১। প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩৬১, পৃষ্ঠা ১৮

২। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৬১, পৃষ্ঠা ১৪৬

৩। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৬১, পৃষ্ঠা ১৪৬

৪। ঋগ্বেদ, ১০।৩৮।৩

৫। ঋগ্বেদ, ২।১২।১-১

৬। ঋগ্বেদ, ২।১২।৫

প্রতিপন্ন হয়। উহাতে উক্ত কারণেই কঠোপনিষদকার আত্মা ও জন্মান্তরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিবার পূর্ব্বে নচিকেতার দ্বারা যমকে জিজ্ঞাসা করাইয়াছেন:

"মানুষের মরণ হইলে এই যে সন্দেহ উপস্থিত হয়, কেহ বলেন পরলোকগামী আত্মা আছেন, কেহ বলেন নাই। আপনার উপদেশ হইতে আমি এই আত্মার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব জানিতে চাই (১)।"

ইহার উত্তরে তিনি যমের দ্বারা ইহাও বলাইয়াছেন যে ঐ বস্তুর সম্বন্ধে পূর্ব্বে দেবগণেরও সন্দেহ জন্মিয়াছিল।(২)

অন্যান্য প্রাচীন উপনিষদগুলিতেও বহুবিধ উপায়ে আত্মা ও জন্মান্তর প্রতিপাদনের যে সমস্ত যৎপরোনাস্তি চেষ্টার পরিচয় আছে তাহা লক্ষ্য করিলে তৎকালে উক্ত বিষয়ে লোকের বিশ্বাসের কিরূপ অভাব হইয়াছিল তাহা বেশ উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

ঐ সময় সাধারণ লোক ভিন্ন ঋষিরাও অনেকে ঐ প্রকার মনোভাব পোষণ করিতেন। ঐ শ্রেণীর ঋষিদের মধ্যে ভরদ্বাজ ও জাবালীর নাম উল্লেখযোগ্য। মহর্ষি ভৃগুর সহিত ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে ভরদ্বাজের ঐরূপ মনোভাবের পরিচয় মহাভারতে এই ভাবে লিপিবদ্ধ আছে:

"দেহ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলে জীব কাহার অনুগমন, কি শ্রবণ ও কিরূপে বাক্য প্রয়োগ করে? আমি পরলোকে যাত্রা করিলে গাভী আমাকে উদ্ধার করিবে এই মনে করিয়া যে ব্যক্তি গোদান করে সেই গাভী কিরূপে তাহাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়? যখন গাভী গ্রহিতা ও দাতা এই তিনজনকেই ইহলোকে লয় প্রাপ্ত হইতে হইবে তখন তাহাদের পুনরায় আগমনের সম্ভাবনা কোথায়? বিহঙ্গম কর্ত্তৃক ভক্ষিত (৩), শৈলাগ্র হইতে নিপতিত ও অগ্নিতে দগ্ধ মানবগণ কি পুনরায় চৈতন্যলাভ করিয়া পুণ্যফল ভোগ করিতে পারে? বৃক্ষের মূল ছেদন করিলে যখন উহা আর প্ররোহিত হয় না, তখন মৃতব্যক্তি কিরূপে আবার জন্মগ্রহণ করিবে? যাহা হউক আমার বোধ হয় যে পূর্ব্বে একমাত্র বীজ সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই বীজ হইতে ক্রমে ক্রমে অসংখ্য বীজের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে। জীবগণ যে সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় সেই সন্তান-সন্ততি হইতেই অপর অন্যান্য সন্তান-সন্ততি সৃষ্টি হয়, কিন্তু যাহারা একবার পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় তাহারা আর কখনও জন্মগ্রহণ করে না (৪)।"

১। কঠোপনিষদ, ১।১।২০

২। কঠোপনিষদ, ১।১।২১

৩। ভরদ্বাজের এই উক্তিটিতে সম্ভবতঃ যে সমস্ত ব্যক্তি পারলৌকিক সুখের আশায় ঐ সময় বিহঙ্গম কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া, পর্ব্বত হইতে পড়িয়া ও অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া দেহ নাশ করিতেন, তাঁহাদের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। বিহঙ্গম দ্বারা দেহনাশের ফল পুরাণে এইরূপে কথিত আছে।

"যে ব্যক্তি নিজের দেহ কাটিয়া শকুনদিগকে দান করে এবং যাহার মৃতদেহ বিহঙ্গম কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, তাহার যে কতদূর ফল হয় শ্রবণ কর। সেই ব্যক্তি শতবর্ষ সোমলোকে বাস করে, পরে সেই স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্ত্যলোকে ধাম্মিক রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহার রূপ, গুণ ও বিদ্যার কিছুই অভাব থাকে না। সে বিপুল ভোগ উপভোগ করে।"—মৎস্যপুরাণ, ১০৭ অধ্যায়, ১৬-১৯

৪। মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়, ১৮৬ অধ্যায়

ঋষি জাবালিরও ঐ বিষয়ে মনোভাবের পরিচয় বাল্মীকি-রামায়ণে আছে। উহাতে দেখা যায় তিনি রামকে রাজা দশরথের স্বর্গীয় আত্মার মঙ্গলার্থ বনবাসের কষ্ট ভোগ না করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিবার উপদেশ দিয়া তাঁহার উক্ত মনোভাব এইরূপে প্রকাশ করেন :

"এক্ষণে রাজা দশরথ যে স্থানে যাইবার গিয়াছেন, ইহাই মানুষের স্বভাব। কিন্তু বৎস! তুমি স্ববুদ্ধির দোষে বৃথা নষ্ট হইতেছ। যাহারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ পুরুষার্থ ত্যাগ করিয়া কেবল ধর্ম্ম লইয়া থাকে আমি তাহাদের জন্য ব্যাকুল হইতেছি। তাহারা ইহলোকে বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অন্তে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হয়। কারণ কে কোথায় শুনিয়াছ যে মৃতব্যক্তি আহার করিতে পারে? যদি একজন ভোজন করিলে অন্যের শরীরে উহার সঞ্চার হয়, তবে প্রবাসীর উদ্দেশে এক ব্যক্তিকে আহার করাও, উহাতে কি ঐ প্রবাসীর তৃপ্তি হইবে? কখনই না। যে সমস্ত শাস্ত্রে দেবপূজা, যজ্ঞ ও তপস্যার কথা আছে, বুদ্ধিমান মনুষ্যেরা কেবল লোকদিগকে বশীভূত করিয়া রাখিবার জন্য সেই সকল শাস্ত্র রচনা করিয়াছে। অতএব রাম পরলোক ধর্ম্ম সাধন নামে কিছুই নাই। ভরত তোমাকে অনুরোধ করিতেছে, তুমি সর্ব্বসম্মত বুদ্ধির অনুসরণপূর্ব্বক রাজ্যভার গ্রহণ কর (১)।"

প্রাচীন গ্রন্থগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ত্রেতায় ঐ ভাবে বেদবিরুদ্ধ মতবাদ বিস্তারলাভ করিলে উহার বিরুদ্ধে নানারূপ সামাজিক দণ্ড ও রাজদণ্ডের ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়(২) এবং ঋষিরা বেদধর্ম্মকে ক্রমশঃ মানবতার ভিত্তিতে রূপান্তরিত করিয়া উপনিষদগুলির মাধ্যমে প্রচার করিতে থাকেন। তাহার ফলে বেদধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ অনেক ব্রাহ্মণ বেদবিহিত আশ্রম ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে উক্ত শাস্ত্রে নির্ণীত মোক্ষধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত সুমতির কথায় উহার যে একটি নিদর্শন আছে তাহাতে দেখা যায় সুমতি নামক জনৈক ব্রাহ্মণ যুবককে তাঁহার পিতা আশ্রমধর্ম্ম পালন করিবার উপদেশ দিলে তিনি তাঁহাকে বলিতেছেন :

"পিতা! এই সংসারচক্র ভ্রমণ করিতে করিতে আমার মুক্তিজনক জ্ঞানলাভ হইয়াছে। সেকারণ ঋক, যজুঃ ও সামবিহিত ক্রিয়াকলাপ আমার নিকট সর্ব্বথা বিফল ও অসাম্যক বলিয়া প্রতীতি হইতেছে।...তজ্জন্য আমি উহা ত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মে আশ্রয় লইব। বৈদিক ধর্ম্ম অধর্ম্মে পরিপূর্ণ এবং অতীব জুগুপ্সিত পাপফল সন্নিভ, সঙ্গে সঙ্গে উহাও ত্যাগ করিব (৩)।"

ত্রেতার শেষে উপনিষদের মতবাদ প্রচারের ফলে ব্রাহ্মণগণের কিয়দংশ ঐ প্রকারে মোক্ষধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও কিয়দংশ পূর্ব্ববৎ বেদবিহিত আচরণগুলি পালনে নিযুক্ত থাকেন। ঐ সময় লোকায়তিক আন্দোলনও অপ্রতিহত

১। বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৮ সর্গ

২। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৬১, পৃষ্ঠা ১৪৭, ১৪৮

৩। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ১০ অধ্যায়

থাকে এবং ক্রমশঃ দ্বাপরে আরও বর্দ্ধিত হয়। মৎস্যপুরাণকার বোধ হয় তজ্জন্যই দ্বাপর যুগ সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :

"ত্রেতাযুগ ক্ষীণ হইলে দ্বাপরযুগের আরম্ভ হয়। এই যুগে তত্ত্ববিষয়ের নিশ্চয়তা থাকে না। কর্ম্ম সকলের বিপর্য্যয় ঘটে। রজস্তম বহুল বৃত্তি নিচয়ের সমধিক বৃদ্ধিবশে বর্ণসকল ধ্বংসোন্মুখ হইয়া উঠে।...এই দ্বাপরযুগেই লোকসকল বিভিন্নাগার সম্পন্ন ও পৃথক মতাবলম্বী হয়। বিভিন্নদর্শন মুনিগণই এইযুগে বিষয়সমূহ আকুলিত করিয়া তোলেন (১)।"

মহাভারত পাঠে জানা যায়, ঐ সময়ই চার্ব্বাকের আবির্ভাব ঘটে। তাঁহার সহিত তখন দুর্য্যোধনের বন্ধুত্ব হয় ও তিনি ব্রাহ্মণদের সন্তাপের কারণ হইয়া উঠেন। বেদব্যাসের পুত্র শুকদেবও তখন তাঁহার দলে যোগদান করেন(২) এবং কয়েকজন রাজাও বেদধর্ম্মবিরোধী হন। ঐ সকল রাজার মধ্যে কেহ কেহ আবার যজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্য বিলোপ করিবারও চেষ্টা করেন। বিষ্ণুপুরাণে উদ্ধৃত যোদ্ধগণের প্রতি কংসের এই আদেশটি উহার একটি দৃষ্টান্ত।

"তদেয় যশস্বিনঃ কেচিৎ পৃথিব্যাং যে চ যজ্বিনঃ
কার্য্যো দেবাপকারায় তেষাং সর্ব্বাত্মনা বধঃ॥"(৩)

অর্থাৎ, এই পৃথিবী মধ্যে যাহারা দেবতোদ্দেশে দান করিবে বা যজ্ঞ করিবে তোমরা সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাদের বিনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হও।

ভীমের পুত্র ঘটোৎকচও ঐ শ্রেণীর একজন ধর্ম্মবিরোধী রাজা ছিলেন। তিনি ভারতযুদ্ধে নিহত হইলে অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত কথা বলেন তন্মধ্যে তাঁহার ঐ রূপ আচরণের উল্লেখ মহাভারতে এই ভাবে লিখিত আছে :

"যদি সূতপুত্র বাসবদত্ত শক্তিদ্বারা ঘটোৎকচকে সংহার না করিতেন তাহা হইলে আমাকেই উহার বধোপায় করিতে হইত। ঐ নিশাচরও ব্রাহ্মণবিদ্বেষী, যজ্ঞনাশক ও ধর্ম্মলোপ্তা।...আমি ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য এরূপ দৃঢ় পণ করিয়াছি যে যাহারা ধর্ম্মনাশক তাহাদিগকে অবশ্যই বিনাশ করিব।

প্রাচীন ভারতে বেদধর্ম্মবিরোধীরা রাক্ষস, অসুর প্রভৃতি ঘৃণ্য নামে অভিহিত হইতেন।৪ উহার জন্যই বোধ হয় ঘটোৎকচকেও, তিনি পাণ্ডবপক্ষীয় হইলেও, মহাভারতে ও অন্যান্য পুরাণে রাক্ষস বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

উপরোক্ত বিবরণগুলি হইতে লোকায়তিক মতবাদের প্রভাব ঐ সময় সর্ব্বশ্রেণীর লোকের উপর কিরূপে বিস্তারলাভ করে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ব্রাহ্মণদের অনেকে

১। মৎস্যপুরাণ, ১৪৪ অধ্যায়

২। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৬১, পৃষ্ঠা

৩। বিষ্ণুপুরাণ, ৫ অংশ, ৪ অধ্যায় ১১। এই গ্রন্থে ও অন্যান্য পুরাণে আমরা কংসকে কেবলমাত্র একজন ভীষণ অত্যাচারীরূপেই দেখিতে পাই। কিন্তু বহু প্রাচীন বৌদ্ধজাতক গ্রন্থে তাঁহার ভিন্ন রূপ পরিচয়ও আছে।

৪। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৬১

যে উহার উপর লিখিত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতেন তাহার উল্লেখ প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ অম্বথসুত্তে আছে।১ কৌটিল্যের পূর্ব্বে আর্য্যশূরও তাহার প্রসিদ্ধ জাতকগ্রন্থে উহাকে দর্শন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।২ উহা ব্যতীত শুক্রনীতিতেও একটি যুক্তির্বলীয়সী শাস্ত্ররূপে উহার পরিচয় আছে। যথা—

"যুক্তির্বলীয়সী যত্র সর্ব্বং স্বাভাবিকং মতম্
কস্যাপি নেশ্বরঃ কর্ত্তা, নবেদোনাস্তিকং হিতৎ ॥"(৪)

ঐ প্রকার যুক্তির্বলীয়সী ধর্ম্মবিরোধী শাস্ত্র বিদ্যমান থাকিলে লোকের ধর্ম্মে মতি থাকিবে না সম্ভবতঃ এই বিবেচনায়ই উহা পরে নিশ্চিহ্ন করা হয় এবং স্বয়ং ভগবানই অসুরদের ধর্ম্মহীন করিয়া বিনাশ করিবার জন্য ঐরূপে উক্ত মতবাদ সৃষ্টি করেন—ইহাও জনসাধারণের নিকট প্রচার করা হয়। মৈত্রায়ণী উপনিষদ ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থে উহার দৃষ্টান্ত আছে।

প্রাচীন সাহিত্যে বার্হস্পত্য অর্থশাস্ত্র ও বার্হস্পত্য নীতি নামে লোকায়তিকদের অন্য দুইখানি গ্রন্থেরও নাম পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ গ্রন্থ দুইখানিরও তাঁহাদের দর্শনশাস্ত্রের ন্যায় অস্তিত্ব নাই। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের সহিত দ্রৌপদীর যে সমস্ত আলাপ-আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে তন্মধ্যে এক স্থানে দেখা যায় দ্রৌপদী কোন ব্যক্তিরই দৈবের উপর বিশ্বাস করিয়া কার্য্যে অবহেলা করা উচিত নহে ইহা উক্ত বার্হস্পত্য নীতির নানা যুক্তি দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে বুঝাইয়া অবশেষে উক্ত শাস্ত্রের এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

"পূর্ব্বে আমার পিতা নিজভবনে একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে রাখিয়াছিলেন। তিনি এই বৃহস্পত্য নীতি তাঁহার নিকট বলেন ও ভ্রাতাদিগকে শিক্ষা দেন। আমি তখন তাঁহার নিকট ইহা শ্রবণ করি(৫)।"

দ্রৌপদীর এই উক্তি হইতে জানা যায় যে ঐ সময় উক্ত নীতিরও শিক্ষিত সমাজে যথেষ্ট সমাদর ছিল এবং পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণও উহা শিক্ষা করিতেন ও লোককে শিক্ষা দিতেন। মহাভারত ব্যতীত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও বাৎস্যায়নের কামসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থেও বার্হস্পত্য নীতির উল্লেখ আছে। উক্ত নীতিশাস্ত্রে বোধ হয় বার্হস্পত্য দর্শন অনুযায়ী সামাজিক সাম্যের ন্যায় অর্থ নৈতিক সাম্যেরও নির্দ্দেশ ছিল।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায় রাজা পরীক্ষিতের নিকট শুকদেব ধর্ম্ম ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,

"অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভাগো
ভূতেভ্যশ্চ যথা ইতঃ ॥" (১)

অর্থাৎ, সকলের মধ্যে অন্নবস্ত্রাদি যথাযথরূপে বিভাগ করিয়া দেওয়াটাও মানুষের ধর্ম্ম। এই বিষয়ে তিনি আরও বলিয়াছেন,

"যাবদ্‌ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ সত্বং হি
দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত সস্তেনো
দণ্ডমর্হতি ॥"(২)

অর্থাৎ, যে পরিমাণ অর্থাদির দ্বারা লোকের উদর পূরণ হয় তদুপযোগী অর্থে সকলেরই সমান অধিকার। তদপেক্ষা অধিক আকাঙ্ক্ষাকারী চোর। অতএব তাহাকে দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য।

এই প্রকার আচরণও যে মানুষের ধর্ম্ম একথা এক শুকদেব ব্যতীত অন্য কোন প্রাচীন শাস্ত্রকার বলেন নাই। মহাভারতে উল্লিখিত আছে যে শুকদেব প্রথমে লোকায়তিক ছিলেন।৩ সে কারণ তাঁহার উপরোক্ত মতবাদ লোকায়তিক নীতিসম্ভূত হওয়া অসম্ভব নহে। লোকায়তিকদের কয়েকটি খণ্ডিত উক্তি হইতে জানা যায় যে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থারও কথা পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম তাঁহারাই উত্থাপন করেন।৪

প্রাচীন গ্রন্থাদি অনুধাবন করিলে ইহা বেশ উপলব্ধি করা যায় যে বৈদিক যুগে আর্য্যজাতির চিন্তা, ভাব ও কল্পনা যে আদিম খাতে প্রবাহিত ছিল তাঁহাদের মতবাদের আঘাতেই তাহা অনেকটা বদলাইয়া যায় এবং দেশে একটা স্বাধীন চিন্তাস্রোত উদ্ভূত হইয়া জ্ঞানিগণের দৃষ্টি ক্রমশঃ বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হয়—যাহার ফলে মানবতার সম্প্র-সারণের সহিত সাহিত্য কেবলমাত্র পরলোকতত্ত্ব ও দেব-সেবায় নিয়োজিত না থাকিয়া ইহলোকতত্ত্ব ও মানবসেবায়ও নিয়োজিত হয়।

ঐ সময় ও উহার পরবর্ত্তীকালে রচিত চরকের ভেষজতত্ত্ব সুশ্রুতের শরীরতত্ত্ব, কণাদের জড়োৎপত্তিতত্ত্ব ও পাণিনির ভাষা ও বর্ণমালাতত্ত্ব প্রভৃতি উহার নিদর্শন।

এই সকল বিষয় হইতে প্রতিপন্ন হয় যে লোকায়তিক মতবাদ বেদবিরোধী জড়বাদ হইলেও প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নে কম সাহায্য দান করে নাই।

---

(1) *Six System of Indian Philosophy*, Maxmuller, page 210.

(2) A Sketch of Indian Materialism—G. Tucci, *Proceedings*, Indian Philosophical Congress, Calcutta.

৪। শুক্রনীতিসার, ৪।৩।৫৫

৫। মহাভারত, বনপর্ব্ব, ৩২ অধ্যায়

১। শ্রীমদ্ভাগবত, ৭।১১।১০

২। শ্রীমদ্ভাগবত, ৭।১৪।৮

৩। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৬১, পৃষ্ঠা ১৪৭, ১৪৮

৪। প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩৬১, পৃষ্ঠা ২২

ভাবের মানুষ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ক্ষুদ্র প্রদীপ-শিখায় যে জ্যোতি রহে—
সেও মিশে যায়, অচিরে জ্যোতির্ম্ময়ে।
ভাব অমৃত, ক্ষুদ্র বৃহৎ—
ভাবের বিনাশ নাহি,
মিশে ভাবময়ে, জনার্দ্দন যে
স্বয়ং ভাবগ্রাহী।
ভাব তনু লয়ে তারা ফিরে আসে,
লভিয়া নূতন বেশ,
ভাবে রূপে চলে এই গতায়তি
এ লীলার নাহি শেষ।
বিবর্ত্তন যে চলিছে নিরন্তর,
জড় হইতেছে চেতন—চেতন জড়।

২

প্রেম ও পুণ্য করে যে জন্মলাভ—
মহাপুরুষের তাহাই আবির্ভাব।
মানবজাতিকে সে-ই তুলে লয়
দেবতার কাছাকাছি,
অমৃতের পরিবেশন সে করে
নাহি কোন বাছাবাছি।
গোটা এ ধরাকে উর্দ্ধেতে টানে
তার চৌম্বিক টান,
করে চঞ্চল আনন্দময়
উৎকণ্ঠিত প্রাণ।
তারে নিপীড়ন দম্ভীরা করে তেজে,
চির-অক্রোধ পরমানন্দ সে যে।

৩

বসুধাকে করে সুবর্ণশস্যা—
মানুষে দেবতা, তাহার তপস্যা।
সে বলে সকলে "যাহা বলি কর
আমি যাহা ভাবি ভাবো—
না শোনো, না ভাবো, পরে তা ভাবিবে—
এসেছি চলিয়া যাব।"
নাই তার রোষ, নাই তার ব্যথা
নাই তার অপমান,
সব শক্তির উৎস যে তার—
একা সেই ভগবান
কেহ চেনে, কেহ চিনিতে পারে না তাকে,
চলে গেলে কাঁদে চরণের ধুলা মাথে।

৪

ফিরাইয়া দিতে অমৃতের অধিকার—
নাশিতে ও ভালবাসিতেই আসা তার।
নিজে 'বলি' হয়ে শান্ত সে করে
জগতের যত পাপ,
ধুয়ে মুছে দেয় সব কলঙ্ক
সঞ্চিত অভিশাপ।
শাস্ত্রই যে তাহার হস্তে
অস্ত্র যে পশুপাত,
অতি দুর্জ্জয় দর্প-দুর্গ
হয় তাতে ভূমিসাৎ
সত্যদ্রষ্টা তিনি—দেয় তাঁর বাণী
সুদর্শনের শক্তি মন্ত্রে আনি।
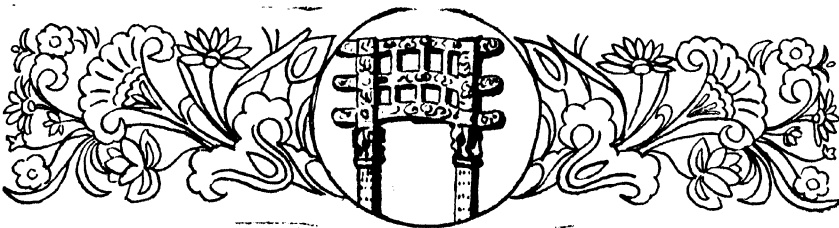
গুরুদক্ষিণা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রামজয় পণ্ডিত—শিবনাথ ছেলেটি চলে যেতে দরজাটি ভেজিয়ে দিলেন, ছাতার ডাঁট দিয়ে ঠেলে খোলা জানালাটিও বন্ধ করে দিলেন। তারপর চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

চন্দ্রভূষণ তাঁর বাল্যসাথী—পাঠশালার সহপাঠী, কিন্তু কর্ম্মজীবনে তিনি চন্দ্রভূষণের অধীন সে কথা ভুলে যান না। যখন তুমি সম্বোধন করে দুটো প্রাণের কথা বলবার বাসনা হয় তখন এই ভাবেই দরজা বন্ধ করে প্রথমেই একটু হেসে নিয়ে কথা সুরু করেন। চন্দ্রবাবুও হাসেন। তার পর বলেন—কি? হাতে বই বা কলম যাই থাক সেটা সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে বসেন।—কও, কি বার্ত্তা?

আজ কিন্তু রামজয়ও হাসলেন না, চন্দ্রবাবুও না। হাসা দূরের কথা, চন্দ্রবাবু রামজয়ের মুখের দিকে তাকাতেও পারলেন না। প্রায়-অন্ধকার ঘরের মধ্যে সামনের দেওয়ালে টাঙানো চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশনের প্রতিষ্ঠাতা চৈতন্যবাবুর অয়েল পেন্টিঙের দিকে চেয়ে রইলেন।

পণ্ডিত বললেন—আমি শুনেছি সব।

—শুনেছ? কোথায়? কার কাছে?

—বাবুদের বাড়ীতে তুলসী দিতে গিয়েছিলাম। পূজুরী ঠাকুর বললে—পণ্ডিতমশায় আপনাদের ইস্কুলের নাকি ভারি গোলমাল? সব—মানে মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সব ওলোট-পালট? সব জবাব হয়ে নাকি নতুন মাষ্টার আসছে? জিজ্ঞাসা করলাম—কে বললে? তো বললে—এমনই তো শুনছি—কাছারিতে সব গুজগাজ ফিসফাস হচ্ছিল। ম্যানেজার বাবুর কাছে নাকি চিঠি এসেছে কলকাতা থেকে।

চন্দ্রবাবু প্রশ্ন করলেন—ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা কর নি?

—হ্যাঁ। তাও করেছি।

—কি বললে ম্যানেজার?

—ভাঙলে না। তবে বললে—পুরনো মাষ্টারের জবাব নতুন মাষ্টার বহাল এ সবের কথা কিছু নাই পণ্ডিতমশায়—শুধু লিখেছেন—মাষ্টারদের জন্যে বাসাবাড়ী চাই। ছ'সাতটা বাড়ী দেখে রাখতে হবে, তার উপযুক্ত ব্যবস্থা চাই। পাকা উঠোন—পাকা মেঝে স্নানের ঘর চাই।

চন্দ্রবাবু হাসলেন—পাকা মেঝে স্নানের ঘর! সে তো আমাদের জন্যে নয় রামজয়। কথা ঠিকই বটে। আমিও চিঠি পেয়েছি। ওতেও তাই আছে। কলকাতায় মাষ্টার-পণ্ডিত ঠিক হয়ে গেছে।

রামজয় টেবিলের উপর থেকে হাতপাখাখানা তুলে নিয়ে বাতাস খেয়ে নিলেন বারকয়েক—তারপর বললেন—কে লিখেছে?

—বেনামী চিঠি। কোন এক্স্-ষ্টুডেণ্ট বোধ হয়। এঁদের আপিসে ত অনেক এক্স্-ষ্টুডেণ্ট রয়েছে।

—শ্যামাপদ নয়? ওই রমেন্দ্রবাবুর খাস কেরাণী—প্রাইভেট সেক্রেটারী না কি তোমরা বল।

—না। তার হাতের লেখা ত চেনা। কলকাতার সব চিঠি তো সে-ই লেখে। তার লেখা নয়। আর সে লিখবে না। নাঃ, সে লিখতে পারে না।

—কি লিখেছে? সব জবাব?

—এক রকম তাই। লিখেছে আগাগোড়া বদল হবে। ওখানে কর্ত্তাদের তিন-চারটে গোপন মিটিং হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেক মাষ্টার-পণ্ডিতের দোষক্রটি নিয়ে প্রকাণ্ড বড় ফিরিস্তি তৈরি হয়েছে। খোদ ডিভিশনাল ইনস্পেক্টার অব স্কুলস মাষ্টার পছন্দ করে দেবেন। আসল ব্যাপার হ'ল রামজয়—ইস্কুলের গ্র্যাণ্ট-ইন্-এড বেড়েছে। আশী টাকা থেকে তিন শো টাকা। এক বছরের টাকাটা একেবারে হাতে আসবে। এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট সর্ত্ত দিয়েছে—ছেলেদের মাইনের হার বাড়াতে হবে। ওদিকে মাষ্টারদের মাইনে বাড়বে। আমরা যারা এতকাল কম মাইনেতে কাজ করে এসেছি তাদের মাইনে কি করে বাড়াবে বল?

চন্দ্রবাবু একটু হাসলেন।

—তা বটে। পণ্ডিত বললেন—মেধোকে মাধব বলা যায় কি করে। হাজার টাকা পণই বা দেয় কি করে? আর মেয়েই বা প্রণাম করে কি করে? আমাদের হরি মুখুজ্জের কন্যের বিবাহ—হাজার টাকা পণ, পাত্র দ্বিতীয় পক্ষ, প্রথম পক্ষের পরিবারের উপর রাগ করে বিয়ে করছে, তাকে নেবে না; বিয়ের লগ্নে পাত্র এল না, খবর এল—সে মেয়ে দু'হাজার টাকা আঁচলে বেঁধে স্বামীর ঘরে এসে চেপে বসেছে। তখন কি হয়? গ্রামে ছিল মাধব বাঁড়ুজ্জে, গরীবের ছেলে—খেটেখুটে খায়, বাড়ীতে বিধবা মা, সে বেচারী পাঁচ জনের ক্রিয়াকর্ম্মে রান্নাবান্না করে দেয়। সেই মাধবকে এনে লগ্ন রক্ষে হ'ল, বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু বিয়ের পর মুশকিল হ'ল—মেয়ে বলে—বিয়ে হয়েছে, হয়েছে—ওকে পেনাম করব কি করে? বাপ বলে—তাই তো—মেধোকে মাধবই বা বলব কি করে? বাবাজীই বা

মুখে বেরোয় কি করে ? আর হাজার টাকা পণ মেধোকে দেব কি বলে ?

চন্দ্রবাবু হাসলেন—এবারের হাসিতে ছিল প্রাণের স্পর্শ। বললেন—শেষ পর্য্যন্ত মেয়েটা মাধবের ঘর করেছে ত রামজয় ? কোন্ মাধব বল ত ?

—সে তুমি চেন না। হরি মুখুজ্জে আমাদের শিষ্য। শ্রীপুর বাড়ী। তা মাধব হার মানে নি। বুঝেছ। ছেলেটার জেদ চেপে গেল। বউকে ফেলে চলে গেল। বললে—বউ প্রণাম করবে, শ্বশুর বাবাজী বলে হাতে ধরে বসাবে, ওই হাজার টাকা পণ দেবে, শাশুড়ী মাছের মুড়ো দিয়ে ভাত দেবে—তবে আমার নাম মাধব বাঁড়ুজ্জে। চার পাঁচ বছর পর ফিরল মেধো মাধব হয়ে। জামা, জুতো মায় বুকে চেনঘড়ি ঝুলিয়ে। ভুষি মালের কারবার করে ফেঁপে উঠেছে। এসে গাঁয়ে জমি কিনলে—পুকুর কিনলে। তখন আর শ্বশুর এসে বাবাজী বলে হাত না ধরে পারলে না। মেয়েও পাঠালে। মেয়েটাও প্রণাম করলে। শাশুড়ী মাছের মুড়ো রান্না করে জামাইকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ালেও। সবই হ'ল। কিন্তু হাজার টাকা পণ আর হরি মুখুজ্জে দিলে না। বললে—ওটা আর ভুলে যাও এত দিন পর। মাধব কিছু বললে না। কিছু দিন পর ছেলে হ'ল। ছেলেটা বছরখানেকের হলে তাকে নিজের বাড়ীতে রেখে মাধব বউকে শ্বশুরবাড়ীর দোরে এনে নামিয়ে দিয়ে বললে—হাজার টাকা নিয়ে আমার বাড়ী যাবি, নইলে থাকবি এখানে। ব্যস—ওই বলেই মাধব উধাও, একেবারে ব্যবসার জায়গায়। শেষ হরি মুখুজ্জে জমি বিক্রী করে হাজার টাকা নিয়ে মেয়ে ঘাড়ে করে মাধবের বাড়ী গিয়ে বললে—বাবাজী এইবারে ক্ষান্ত দাও।

চন্দ্রবাবু কি বলতে যাচ্ছিলেন—হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। ঘরে এসে ঢুকলেন মৃগাঙ্কবাবু সেকেণ্ড মাষ্টার। তাঁর সঙ্গে কেষ্টবাবু ফোর্থ মাষ্টার। পাশের লাইব্রেরী এবং জেনারেল আপিস ঘরে আরও অনেকগুলি পায়ের শব্দ ধ্বনিত হয়ে উঠল। চন্দ্রবাবুর বুঝতে বাকী রইল না যে, খবরটা শুনতে কারুর আর বাকী নেই। তিনি মৃগাঙ্কবাবুকে সম্ভাষণ জানিয়েই বললেন—বসুন।

ভীরু প্রকৃতির মানুষ মৃগাঙ্কবাবু। এর মধ্যেই আশঙ্কায় চঞ্চল হয়ে পড়েছেন। চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে গিয়ে দু'বার চেয়ারের হাতলে কাছার কাপড় জড়িয়ে ফেললেন। কোন রকমে ছাড়িয়ে আসন পরিগ্রহ করে বললেন—কি সব শুনছি মাষ্টারমশাই ? এ সকল কি সত্যি ?

চন্দ্রবাবু স্তব্ধ হয়ে রইলেন, উত্তর কি দেবেন ভেবে পেলেন না। মৃগাঙ্কবাবুর পা নাচছে, মুখের চেহারা অস্বাভাবিক। যে-কোন রকমের সামান্য উত্তেজনা—সে ভয় হোক, রাগ হোক, আনন্দ হোক—হলেই মৃগাঙ্কবাবুর ডান পা নাচতে থাকে। পা নাচাতে নাচাতে মৃগাঙ্কবাবু বললেন—কথাটা তা হলে সত্যি ? Well, we are going to be driven away ? Chucked out ? So it is true ? এঁ্যা ? Well, well—I don't care। পঁয়তাল্লিশ টাকার চাকরি—ইজ ইট চাকরি ?—A মুটে can earn, a মজুর can earn, a মেথর can earn, anybody···anybody can earn forty-five rupees a month. Others may care, but I don't care, you see I don't care.

টেবিলের উপর একটা চাপড় মেরে কথাটা শেষ করলেন মৃগাঙ্কবাবু। কাঁচা সোনার মত রঙ মৃগাঙ্কবাবুর। কপালে সেই রঙের মধ্যে রক্তোচ্ছ্বাসের আভা দেখা দিয়েছে। শান্ত চোখ দুটির দৃষ্টি একই সঙ্গে চঞ্চল এবং ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। ঠোঁট দুটি থর থর করে কাঁপছে। মৃগাঙ্কবাবু সমস্ত কথাগুলি হেডমাষ্টার চন্দ্রবাবুকে লক্ষ্য করে বললেন। অভিযোগ যেন তাঁরই বিরুদ্ধে। এর উদ্যোক্তা যেন তিনি। চন্দ্রবাবু সহিষ্ণু ধীর মানুষ। তিনিও চঞ্চল হয়ে উঠলেন এ অভিযোগে। কিন্তু তবু তিনি স্থির হয়ে বসে রইলেন। প্রতিবাদ করলে মৃগাঙ্কবাবু হয়ত চীৎকার করে উঠবেন। হয়ত বা ভদ্রলোক কেঁদে ফেলবেন। রামজয় পণ্ডিত কেষ্টমাষ্টার এঁরা দু'জনে নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। দক্ষিণ পাশের ঘরে লাইব্রেরীতে অন্য মাষ্টারেরা স্তব্ধ হয়ে শুনছে। সৌভাগ্যক্রমে ঘরখানা এক পাশে এবং সমস্ত ইস্কুলটাই ঠিক এই মুহূর্ত্তে প্রায় ছাত্রশূন্য তাই রক্ষা—কেউ শুনতে পায় নি। নইলে এতক্ষণে পশ্চিম পাশের হলটায় ছেলেরা হুড়মুড় করে এসে জমে যেত। ছেলেরা ইস্কুলের নিয়মানুযায়ী বোর্ডিঙের উঠানে সমবেত হচ্ছে। তারা সারবন্দী দাঁড়াবে—স্তোত্রপাঠ করবে :

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরমনিধানম্।

ইস্কুল প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকে এই প্রথাটি চলে আসছে। স্তোত্রপাঠ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাস আরম্ভ — কেষ্ট চাকর ঘণ্টা পিটবে—দশটি শব্দের পর ঢনো ঢনো ঢনো ঢনো শব্দের একটি তরঙ্গ সৃষ্টি করে শেষে আবার একটি বিচ্ছিন্ন একক উচ্চ ঢং শব্দ। ঠিক পূর্ণচ্ছেদের মত।

চন্দ্রবাবু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—এখন সময় নেই মৃগাঙ্কবাবু। স্তোত্রপাঠ আরম্ভ হয়েছে। যতক্ষণ কাজে রয়েছি ততক্ষণ কর্ত্তব্য করতে হবে। চলুন ওখানে যাই।

বলে নিজেই অগ্রগামী হলেন চন্দ্রবাবু। তাঁর আপিসরুম থেকে বেরিয়ে প্রকাণ্ড হল—হলের উত্তর দিকে রাস্তার উপর

প্রশস্ত বারান্দা, বারান্দার প্রান্তে সারবন্দী গোল থাম। তার পর বারান্দার সমান লম্বা সিঁড়ি ধাপে ধাপে রাস্তায় গিয়ে নেমেছে। হলের দক্ষিণ দিকে ঘরের সারি—পর পর দুটি ঘরের সারি, তার পর সিঁড়ি, সিঁড়ি গিয়ে নেমেছে বোর্ডিঙের উঠানে। ওই উঠানেই স্তোত্রপাঠ হচ্ছে।

চন্দ্রবাবু আকারে দীর্ঘকায় মানুষ। দীর্ঘ পদক্ষেপে হল পার হয়ে ঢুকলেন ফোর্থ ক্লাসে। হলে পাশাপাশি তিনটি ক্লাস; ফিফথ-সিক্সথ-সেভেন্থ। এ আমলের ক্লাস সিক্স্-ফাইভ-ফোর। হলের দক্ষিণ গায়ে এক সারিতে চারখানি ঘর। পূর্ব্বপ্রান্তের ঘরে লাইব্রেরী, তার পর থার্ড ফোর্থ সেকেণ্ড ও ফার্ষ্ট ক্লাস অর্থাৎ ক্লাস এইট, সেভেন, নাইন ও টেন। তার দক্ষিণে এক সারিতে তিনখানা ঘর, মাঝখানের বড় ঘরটা শিশুমহল—প্রাইমারি সেকশন, দু'পাশের একখানা ঘরে ফার্ষ্ট সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্রদের এডিশনাল সাবজেক্টের ক্লাস। আর একখানায় ইস্কুলের ভাঙা চেয়ার-টেবিল, ব্ল্যাক বোর্ড, ছেলেদের খেলার সরঞ্জাম—ফুটবল ক্রিকেট, কাগজের বোঝার সঙ্গে নানান টুকিটাকি বোঝাই করা আছে।

ফোর্থ ক্লাস পার হয়ে প্রাইমারি সেকশনের ঘরটায় ঢুকবার মুখে বললেন। তাঁর পিছনের শিক্ষকদের উদ্দেশ করেই বললেন; তাঁর পিছনে অনেকগুলি পদশব্দ ধ্বনিত হচ্ছে, মাষ্টাররা আসছেন; স্তোত্রপাঠের সময় মাষ্টার মশায়রাও উপস্থিত থাকেন, এই নিয়ম; বললেন—আপনারা হয় ত আমাকেও সন্দেহ করছেন, ভাবছেন এর মধ্যে আমিও রয়েছি। ভাবছেন—আমার পরামর্শ অনুসারে এ সব হচ্ছে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি এবং শেষ দরজার মুখে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন, জুতোর ডগা দিয়ে দরজার চৌকাঠে কয়েকটা মৃদু ঠোক্কর দিয়ে বললেন, আপনাদের এ সন্দেহ স্বাভাবিক। হতেই পারে। আমি ম্যানেজিং কমিটির মেম্বর, আমি হেডমাষ্টার। অনেকের ধারণা ফাউণ্ডার্সদের সঙ্গে আমার গভীর অন্তরঙ্গতা। কিন্তু—

এবার তিনি মুখ তুললেন—এতক্ষণ মাটির দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলেন, এতগুলি সহকর্ম্মীর উৎকণ্ঠিত শুকনো মুখের দিকে চোখ তুলতে—চোখে চোখ মেলাতে গভীর বেদনা অনুভব করছিলেন, বুকের ভিতর একটা আবেগের সৃষ্টি হচ্ছিল। আবেগ জীবনধর্ম্ম—প্রাণের স্পর্শের উষ্ণতাময় প্রকাশ, কিন্তু সে প্রকাশের উষ্ণতা বেশী হলে বিকার-ব্যাধির মত বিভ্রমের সৃষ্টি করে। সেই কারণেই তিনি কঠিন সংযমে সংযত করে রাখছিলেন নিজেকে, তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে তার পরিচয় ছিল, তিনি যেন মেপে পা ফেলছেন—তিনি যেন আজ অত্যন্ত শান্ত, সমস্ত কিছুর মধ্যে একটা প্রচণ্ড চেষ্টা রয়েছে; শক্ত বাঁধে বাঁধা নদীর জমে থাকা শান্ত গভীর জলরাশির মত অচঞ্চল তিনি। স্রোতের চিহ্ন আবিষ্কার করতে হলে গম্ভীর তলায় ডুবতে হবে—নয় ত অনেক উপরে গিয়ে খুঁজতে হবে।

মুখ তুলে ফিরে তাকিয়ে তিনি মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলেন, কৈ? মৃগাঙ্কবাবু কৈ?

ফোর্থ মাষ্টার কেষ্টবাবু মৃদুস্বরে বললেন—সেকেণ্ড মাষ্টার-মশাই আসেন নি। তিনি লাইব্রেরী-ঘরে—। কথাটা সমাপ্ত করলেন না কেষ্টবাবু।

চন্দ্রবাবু সেকেণ্ড পণ্ডিত শম্ভু চাটুজ্জেকে বললেন—আপনি যান, মৃগাঙ্কবাবুকে আসতে বলুন। বলুন আমি বলছি। যতক্ষণ আছি ততক্ষণ ডিসিপ্লিন মানতেই হবে। যান।

শম্ভুবাবু ফিরলেন। চন্দ্রবাবু যে কথা সুরু করেছিলেন 'কিন্তু' বলে—সে কথা আর বললেন না। মৃগাঙ্কবাবু নাই। ওদিকে স্তোত্রপাঠ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। এ সময়ে এখানে সকল শিক্ষককে উপস্থিত থাকতে হবে—এই নিয়ম। তিনি দীর্ঘ পদক্ষেপ দীর্ঘতর করে চৌকাঠ পার হয়ে ইস্কুলের সিঁড়ির উপর দাঁড়ালেন।

থার্ড মাষ্টার রতনবাবু স্তোত্রপাঠ আরম্ভ করিয়েছেন। স্থুলবপু রতনবাবু দাঁড়িয়ে আছেন হাতজোড় করে—স্থির দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে। খালি গা, জামা এবং উড়নি কাঁধে ফেলা, মুখে চোখে কোনখানে কোন দুশ্চিন্তার লেশমাত্র চিহ্ন নাই; নিরুদ্বিগ্ন, নির্ব্বিকার!

শম্ভু পণ্ডিত ফিরে এলেন; ফিরে এলেন একা। তিনি একেবারে ওধারে মৌলবী জেয়াউদ্দিনের পাশে স্থান গ্রহণ করলেন।

চন্দ্রবাবুর সংযত শান্ত দৃষ্টি উত্তেজনায় চঞ্চল হ'ল না, কিন্তু অধিকতর গাম্ভীর্য্যে গম্ভীর হয়ে উঠল, থমথমে হয়ে উঠল মুখখানা।

'তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্।।"

এইখানেই শেষ হ'ল গীতা থেকে স্তোত্রপাঠ। এর পর কোরাণ থেকে বয়েৎ পাঠ করবে মুসলমান ছেলেরা। "লা ইলাহি ইল্লাল্লা—"। হিন্দুর ছেলেরা যখন গীতার স্তোত্রপাঠ করে তখন মুসলমান ছেলে পাশে দাঁড়িয়ে থাকে—ইচ্ছে হলে স্বরে ও সুরে স্বর ও সুর মিলিয়ে পাঠ করতেও পারে, না হলে চুপ করে থাকতেও পারে। স্তোত্রপাঠ শেষ হলে

মুসলমান ছেলেরা বয়েৎ পাঠ করে—হিন্দুর ছেলেরা দাঁড়িয়ে থাকে, চুপ করে থাকতেও পারে, যোগ দিতেও পারে।

গোড়ার দিকে ইস্কুল আরম্ভ হওয়ার সময় শুধু স্তোত্রপাঠই হ'ত। তখন ইস্কুলে ফার্‌সী পড়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না, মুসলমান ছাত্রও ছিল সংখ্যায় নগণ্য। গোটা ইস্কুলে একশো কুড়ি-পচিশ ছাত্রের মধ্যে দশ-বারো জন, তাও সবই ছিল নীচের ক্লাসে। ইস্কুলে তখন মৌলবীও ছিল না। পাঁচ বছর পর ১৯১০ সনে এখানে এসেছিলেন একজন মুসলমান সব-রেজিষ্ট্রার, তাঁর ছেলে রহমান ভর্ত্তি হয়েছিল সেকেণ্ড ক্লাসে—সে ফার্‌সী পড়ত। প্রায় মাসতিনেকের মধ্যে এসেছিলেন একজন মুসলমান পুলিস সব-ইনসপেক্টার। তাঁর ছেলে ভর্ত্তি হয়েছিল ফোর্থ ক্লাসে। সব-রেজিষ্ট্রার ইস্কুলের কমিটির একজন এক্স-অফিসিয়ো মেম্বর ছিলেন, কিন্তু ফজলুর রহমান সাহেব ছিলেন উদার মানুষ। তিনি তাঁর ছেলের একলার জন্য মৌলবী রাখতে বা ফার্‌সী ক্লাস খুলতে জেদ দূরের কথা—অনুরোধও করেন নি। বলেছিলেন—আমি নিজে বাড়ীতে রহমানকে ফার্‌সী পড়িয়ে দেব। কিন্তু দারোগা হক ছিল সেকেলে খাঁটি দারোগা এবং ধর্ম্মবিশ্বাসে গোঁড়া। চোর-ডাকাত সন্দেহে গ্রেপ্তার করতে, কবুল খাওয়াবার জন্যে ঠ্যাঙাতে যেমন ওস্তাদ ছিলেন, ধর্ম্মের গোঁড়ামিতেও ছিলেন তেমনি ধুরন্ধর। তিন ওয়াক্ত নামাজ পড়া, রোজা রাখা ইত্যাদি পালনীয় কর্ত্তব্য পালন করেই তিনি যথেষ্ট মনে করতেন না, আরও অনেক কিছু করতেন যা ইসলাম ধর্ম্ম-বিধিতে নেই। গোঁড়া বৈষ্ণবে যেমন কালীকে মসী বলে—কাটাকে বিনানো বলে তেমনি সংস্কৃতকে তিনি নাগরী ভাষা বলতেন, ও ভাষার বই ছুঁতেন না, এমনকি যাত্রাগান পর্য্যন্ত শুনতেন না, কারণ তার মধ্যে কালী-কৃষ্ণ-শিব-দুর্গা আছে। এই হক সাহেব জেদ ধরলেন ফার্‌সী ক্লাস খুলতে হবে এবং মৌলবী রাখতে হবে। সেবার ফোর্থ ক্লাসে স্থানীয় মুসলমান ছাত্র ছিল চার জন, থার্ড ক্লাসে দু'জন, সেকেণ্ড ক্লাসে সব-রেজিষ্ট্রারের ছেলে ছাড়া দু'জন, ফার্ষ্ট ক্লাসে ছিল না; এদের সকলেরই বিশেষ ভাষা ছিল সংস্কৃত। হক সাহেব স্থানীয় মসজিদে গিয়ে মুসলমানদের কঠিন তিরস্কারে তিরস্কৃত করেছিলেন এবং থার্ড ফোর্থ ক্লাসের ছাত্র ও অভি-ভাবকদের কাছে দরখাস্ত সই করিয়ে পরদিন ইস্কুলে দাখিল করেই ক্ষান্ত হন নি, তার নকল পাঠিয়েছিলেন শিক্ষাবিভাগে, রীতিমত একনলেজমেণ্ট ডিউ রেজেষ্ট্রি করে পাঠিয়ে-ছিলেন। এর এক মাসের মধ্যেই এল মৌলবী জিয়াউদ্দিন আহম্মদ। রামজয় পণ্ডিতের সঙ্গে পরামর্শ করেই চন্দ্রবাবু তাঁকে ডেকে এনে চাকরি দিলেন। হক এতেও আপত্তি তুলেছিলেন; জিয়াউদ্দিন মৌলবী সংস্কৃত জানে এবং পড়ে, হিন্দুদের পৌত্তলিক পালাগান শুনে কাঁদে। কিন্তু সে আপাত্ত টেকে নি। মৌলবী জিয়াউদ্দিন এ অঞ্চলের মুসল-মান সমাজের মাথার মণি ঠাকুর সাহেবদের বাড়ীর দৌহিত্রে, তাঁদের উত্তরাধিকারী, কোরাণ ও যাবতীয় ইসলাম ধর্ম্মশাস্ত্রে মহাশয় ব্যক্তি!

এর কিছুদিন পরই আপত্তি উঠল স্তোত্রপাঠে।—এ মুসলমানদের পক্ষে অধর্ম্ম শাস্ত্রবিরুদ্ধ। স্তোত্রপাঠ আমরা করব না।

দরখাস্ত হাতে করে দিয়ে এল জিয়াউদ্দিন মৌলবীরই আত্মীয় আবু হোসেন—ফার্ষ্ট ক্লাসের ছাত্র। চন্দ্রবাবু দরখাস্ত পড়েই বললেন—হোয়াট? স্তোত্রপাঠ তোমরা করবে না? ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে তোমাদের আপত্তি?

আবু হোসেন ছেলে হিসেবে খারাপ ছিল না, বরং ছেলে সে ভালই ছিল। তার উপর সে ছিল অবস্থাপন্ন সিয়া বংশের। জিয়াউদ্দিনের মাতামহ দৌহিত্রকে ফকীরের পাট দিয়ে গিয়েছিলেন—আবু হোসেনদের আমিরীর পাট ক্ষয়িত হয়েও জোত-জমিদারীর ঠাট বজায় ছিল। তার উপর তার বাবা জেলার হাকিমদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন নানা কারণে। ও অঞ্চলের প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েত হয়েছিলেন। লোকে বলত খান সাহেব খেতাব তাঁর জন্যে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের খাস কামরায় তাকের ওপর 'জাগ' দেওয়া রয়েছে, পেকে উঠলেই সেটি তিনি পাবেন। সুতরাং আবু হোসেন সাধারণ ছেলের মত হেডমাষ্টারকে ভয় করত না। সহ-পাঠীদের কাছে সে বেশ হেঁকে-ডেকেই বলত—তুমরা ডর করবে কিন্তু আমি করব না। উনি হেডমাষ্টার—আমিও ইচাকল্লার পুরনো আমীর-ঘরের ছেলে। বাপজান হা হা করে হেসে বলেন—তুদের হেডমাষ্টার—আমাদের কি বলে—ই দত্তের পোলা; পাঠশালায় মৌলবী ছিল, আমাদের নানকায়ের সেরেস্তায় এক টাকা পাঁচ আনা জমা রাখে। চন্দরের ঠাকুরদাদাকে আমার বাবা ধরে এনে দু'টাকা জরিমানা করে আদায় নিয়া তবে ছেড়ে দিয়েছিল। বলে-ছিল ভারি ত নানকারদার! তার আবার এত দাপ। জমিদার হলেও না হয় বুঝতাম। এখুনও চন্দর মাষ্টার বছরের প্রথমেই এক টাকা পাঁচ আনা পাঠায়ে দেয়। হাঁ।

সুতরাং আবু হোসেন দরখাস্ত দিয়েই চলে যায় নি। সে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। হেডমাষ্টার সবিস্ময়ে 'হোয়াট' বলে গর্জ্জন করে উঠলেও টলে নি। চন্দ্রবাবুর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল—দরখাস্তে সব লিখা আছে। সংস্কৃতে ওই হিঁদুদের শাস্তর থেকে পাঠ আমরা করব না। হিঁদুর ঈশ্বরের কাছে আমরা মুছলমানরা কেন প্রার্থনা করব?

চন্দ্রবাবু একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে আবুকে আল্লা ঈশ্বর গড-এর অভিন্নতা বুঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। বলেছিলেন —ওর মধ্যে হিন্দুধর্মশাস্ত্রের দেবতার নাম যে-যে শ্লোকে আছে সে শ্লোক বাদ দিয়ে যেটুকু সকল ধর্মের পক্ষে গ্রহণীয় তাই আছে ওর মধ্যে।

রামজয় পণ্ডিত এবং মৌলবী জিয়াউদ্দিন দু'জনকে ডেকে পণ্ডিতকে দিয়ে শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা করিয়ে শুনিয়েছিলেন। এ নিয়ে গোড়া থেকেই তাঁরা সাবধান ছিলেন। সে সেই ইস্কুল স্থাপনের কাল থেকে। গীতার একাদশ অধ্যায় থেকে অর্জ্জুনের স্তবমালার তিনটি শ্লোক গ্রহণ করেছিলেন— 'ত্বমাদি দেব; পিতাঽসি লোকস্য'; এবং 'তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং'; যে শ্লোক ক'টি ভাষান্তরিত করলে পৃথিবীর যে-কোন ধর্মশাস্ত্রের নিজস্ব মনে হবে। এ পরামর্শ দিয়েছিলেন এক মহৎ ইংরেজ শিক্ষাব্রতী মিষ্টার জোন্‌স। এতে বাধা গোড়া থেকে ত কম পড়ে নি। ইস্কুল প্রতিষ্ঠার তিন মাস পর বোর্ডিং হাউস প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। বোর্ডিঙের দ্বারোদ্ঘাটনের জন্য এসেছিলেন খোদ কমিশনার সাহেব। সঙ্গে এসেছিলেন ডিভিশনাল ইনস্পেক্টর অব স্কুলস আর এসেছিলেন সূর্য্যের চারদিকে প্রদক্ষিণরত গ্রহকুলের মত জেলার ম্যাজিস্ট্রেট, এস-ডি-ও, এস-পি থেকে পুলিসের সার্কেল ইনস্পেক্টর পর্য্যন্ত। সে এক রাজসূয় যজ্ঞ। লাল-মুখ কমিশনার, ডিভিশনাল ইনস্পেক্টর অব স্কুলস দু'জনে সূর্য্য-চন্দ্রের মত ছিলেন কেন্দ্রস্থলে ডাকবাংলোয়। চারি পাশে ছোট বড় মাঝারি তাঁবু খাটানো হয়েছিল পাঁচ-ছ'টা। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন বাঙালী আই-সি-এস, পুলিস সাহেব ছিলেন একজন সাদা চামড়া কিন্তু এদেশী সাদা। ওঁরা সকলে এই সব তাঁবুতে বাসা নিয়েছিলেন—মঙ্গল-বুধ-বৃহস্পতি ইত্যাদির মত। "রেল ছাড়া বিশ ক্রোশ" বলে একটি প্রবাদবাক্য দেশে রেললাইন পড়ার পর থেকে প্রচলিত হয়েছে, এ অঞ্চলটি তাই। সবচেয়ে কাছের ষ্টেশন এখান থেকে আট মাইল দূরে। তাই মহামান্য অতিথিরা কিছু আগেই এখানে শুভ পদার্পণ করেছিলেন। একদিন আগে এখানে এসে এখানকার বেল থেকে কুল পর্য্যন্ত সমস্তকিছু ইন্‌সপেক্‌শনের কর্ত্তব্য নিখুঁত ভাবে পালন করতে অবহেলা করেন নি। ইস্কুলের পাশেই সব-রেজেষ্ট্রি আপিস—সেই আপিসে এসেছিলেন কমিশনার এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। ইস্কুলে তখন স্তোত্রপাঠ হচ্ছে। কোরাসে স্তোত্রপাঠের সুরে আকৃষ্ট হয়ে কমিশনার সাহেব ঢুকে পড়েছিলেন।

—এ কি হইটেছে? জান?

চন্দ্রবাবু তখন সেকেণ্ড মাষ্টার। হেডমাষ্টার ছিলেন প্রৌঢ় শিক্ষাব্রতী গিরিজাবাবু। তিনি বলেছিলেন— It is a prayer, Sir!

—Prayer?

—Yes Sir; prayer.

—But it is not from the Bible?

—No Sir, this is from our Geeta.

—Geeta! চমকে উঠেছিলেন কমিশনার। Geeta! তার পর কঠিন কণ্ঠে আদেশ দিলেন—

You must stop it.

স্টপ ইট? হেডমাষ্টার নির্ব্বাক হয়ে গেলেন। প্রতিবাদ করবার সাহস তাঁর ছিল না। বাঁচিয়েছিলেন ডিভিশনাল ইনস্পেক্টর অব স্কুলস। প্রাচ্যভাষায় তিনি ছিলেন পণ্ডিত-মানুষ। তিনি শুনে বলেছিলেন—সে কি? গীতার মত পবিত্র গ্রন্থ থেকে স্তোত্রপাঠে আপত্তির কি থাকতে পারে? আমি গীতা ভাল করে পড়েছি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পবিত্র গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রথম সারিতে গীতার স্থান।

তাঁদের নিজেদের মধ্যে কি আলোচনা হয়েছিল তা কেউ শোনে নি। ডাকবাংলোর দরজা জানালা বন্ধ করে বেশ জোর জোর কথাবার্ত্তা হয়েছিল এ কথা বলেছিল ডাকবাংলার মালী বাবুর্চিরা একবাক্যে। এস্‌-ডি-ও ছিলেন ওরই মধ্যে হিন্দুমানুষ। তিনি চৈতন্যবাবুকে বলেছিলেন—ওরে মশায়, সে হাতাহাতির উপক্রম। ইন্‌স্পেক্টর জোন্‌স সাহেব চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ—কখ্‌খনো না, এ তুমি বন্ধ করতে পার না। ইউ কাণ্ট স্টপ ইট। কেউ যদি বলে যে বাইবেল পড়ার জন্যে ইংলণ্ড বিপন্ন হবে —তবুও বাইবেল পড়া বন্ধ করবে ইংরেজ? এদেশের লোক তাদের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ গীতা পড়লে যদি ইংরেজ সাম্রাজ্য যায় ত যাক সে সাম্রাজ্য। তুমি কমিশনার হয়েছ, ক্ষমতার অপব্যবহার করে যদি গীতার স্তোত্রপাঠ বন্ধ কর তবে আমি প্রতিবাদ ত করবই, উপরন্তু ইংলণ্ডের কাগজে প্রকাশ করে দেব। এ সব শুনে ত হকচকিয়ে গেলাম আমরা। পর্দ্দা ফাঁক করে উঁকি মেরে শুনছিলাম। পর্দ্দা ফেলে দিলাম। কি জানি—কোথায় কখন নজরে পড়বে, মুণ্ডুপাত করবে আমাদের। ওদিকে কালেক্টর সাহেব বাংলোর দরজা জানালা বন্ধ করে দিলেন।

বিকেলবেলা দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানের শেষে সমাপ্তি-সঙ্গীত গাওয়া হবে ঘোষণা হতেই জোন্‌স সাহেব বললেন— হেডমাষ্টার, আপনার স্কুল বসবার সময় গীতা থেকে যে প্রেয়ার হয় সেই প্রেয়ার আমরা শুনতে চাই। কমিশনার সাহেব শুনেছেন, তিনি অর্থ বুঝতে পারেন নি কিন্তু ভাষার ধ্বনিগাম্ভীর্য্য সুরের পবিত্রতা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। আমি

কিছু স্যানস্কৃট বুঝি, আমি শুনলে খুব খুশী হব। সভাপতি কমিশনার সাহেবও খুশী হবেন।

গিরিজাবাবুর মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল ভয়ে। চন্দ্রবাবুই তাড়াতাড়ি ছেলেদের ডেকে এনে সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন।—গাও। কোন ভয় নাই। গেয়ে যাও।

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্"

সমবেত কণ্ঠের সঙ্গীতধ্বনি আকাশে উঠে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইনস্পেক্টর জোন্‌স মাথা নত করে গির্জ্জায় উপাসনাকালের সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন আরও তিনটি শ্লোক ছিল, 'বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ', 'সখেতি মত্বা' 'যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি', যার মধ্যে হিন্দু পুরাণের দেবতা ইত্যাদির উল্লেখ আছে। প্রার্থনার শেষে জোন্‌স সাহেব বলেছিলেন—আমি হেডমাষ্টারকে অনুরোধ করব—তিনি যেন এই তিনটি শ্লোক বাদ দেন। কারণ এই শ্লোক তিনটিতে প্রজাপতি পিতামহ যাদব শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি দেবতার উল্লেখের জন্য এটি বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রার্থনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্লোক তিনটি বাদ দিলে এটি পৃথিবীর সর্ব্বমানবের প্রার্থনাসঙ্গীতে পরিণত হবে।

যাবার সময় হেডমাষ্টারকে ডেকে বলেছিলেন—আমি বোধ হয় শীগগির চলে যাব মিঃ চক্রবর্ত্তী। তোমাদের ওই প্রার্থনাসঙ্গীত যেন তোমরা তুলে দিয়ো না। উপর থেকে খোঁচা বা বন্ধ করার হুকুম আসবে না—এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। সে পথ আমি বন্ধ করে যাব। তবে দোজ থ্রি ষ্ট্যানজাস—বাদ দিয়ো। ভবিষ্যতে ভাল হবে।

ও তিনটি শ্লোক বাদ দিয়েছিলেন তাঁরা, ওই ধাম্মিক পণ্ডিত ইংরেজটির কথা অবহেলা করেন নি। সেদিন আবু হোসেনের আপত্তি শুনে, দরখাস্ত হাতে নিয়ে চন্দ্রবাবু মনে মনে জোন্‌স সাহেবকে নমস্কার করেছিলেন।

আবু কিন্তু এতেও মানতে চায় নি। সে বলেছিল—হিন্দুদের সংস্কৃত ভাষায় ঈশ্বরকে ডাকা মানেই এছলামের অধর্ম্ম।

তার দিকে কয়েক মিনিট স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে চন্দ্রবাবু বলেছিলেন—তা হলে তুমি আমার ইস্কুল থেকে অন্য ইস্কুলে চলে যেতে পার। বলেই তিনি ডেকেছিলেন—গোপাল।

গোপাল—নৃত্যগোপাল ছিল তখন ইস্কুলের কেরানী। এই ইস্কুলেরই ছাত্র, ইস্কুলের প্রথম ফোর্থ মাষ্টারমশায়ের ছেলে। গোপাল এসে দাঁড়িয়েছিল সামনে। কেউ বলত কালো গোপাল, একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি দুষ্ট ছেলে বলত—ড্যান্সিং গোপাল অর্থাৎ নৃত্যগোপাল।

আবুকে দেখিয়ে চন্দ্রবাবু বলেছিলেন—এর সার্টিফিকেট দিয়ে দাও। আর কোন ছাত্রের যদি আপত্তি থাকে ত সেও চলে যেতে পারে।

আবুকে বলেছিলেন—ভেবে দেখ তুমি। তিন দিন সময় দিলাম আমি। নাও, গো টু ইয়োর ক্লাস। গো।

জিয়াউদ্দিন মুসলমান ছাত্রদের ডেকে অনেক বুঝিয়েছিলেন। আবু বলেছিল—আপনি যদি শক্ত হতেন তবে আমাদের ভাবনা কি ছিল? আপনি নিজে যে উদের শাস্তর পড়েন, সংস্কৃতের তারিফ করেন।

জিয়াউদ্দিন হেসে বলেছিলেন—ওরে আবু হিন্দুরা দুধ দই মধু ঘি চিনি মিশায়ে পঞ্চামৃত করে দেবতাদের ভোগ দেয়। জিনিসটা কিন্তু যেমন মিঠা তেমনি পোষ্টাই। তা হিন্দুর দেবতাকে ভোগ দেওয়া সিন্নী কি প্রসাদ না খাই, নিজের ঘরে উ পাঁচটা মিঠা জিনিস মিশায়ে খেতে দোষ কি? বল—তুমিই বল বুঝে। রমজানে আমরা জাকাৎ করি পেস্তা বাদাম চিনি দি, তা বলে হিন্দুরা পেস্তাবাদাম দেওয়া ফল খাবে না, না খায় না?

শেষ উদার সব-রেজিষ্ট্রার রহমন সাহেব এসে ব্যাপারটার মীমাংসা করে দিয়েছিলেন। গীতার স্তোত্রপাঠের শেষে কোরাণ থেকে বয়েৎ পাঠ হবে। সমস্তক্ষণই হিন্দু-মুসলমান সমস্ত ছাত্রদের থাকতে হবে। ইচ্ছে করলে যে-কোন একটি প্রার্থনার সময় চুপ করে থাকতে পার, কিন্তু কোন রকমের বিন্দুমাত্র অবজ্ঞা কেউ প্রকাশ করতে পারবে না। চন্দ্রবাবু আনন্দের সঙ্গে এ প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। রামজয় পণ্ডিতও আপত্ত করেন নি। আপত্তি করেছিলেন মৃগাঙ্কবাবু। সেকেণ্ড মাষ্টার মশায়।

—এ সব মীনিংলেস মাষ্টারমশাই। গীতা—কোরান! দু'দিন পর বাইবেল থেকে পাঠ করতে হবে। উঠিয়ে দিন—ও সব উঠিয়ে দিন। কোন ফল নেই এতে। আননেসেসারী ওয়েস্টেজ অব টাইম এ্যাণ্ড এনার্জি, শীয়ার ওয়েষ্টেজ।

চন্দ্রবাবু উত্তর দেন নি কথার। অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলেছিলেন—আপনাদের চার জনকে—সেকেণ্ড মাষ্টার মশায় আপনি—হেডপণ্ডিত মশায়, মৌলবী সাহেব, ফোর্থ মাষ্টার মশায়কে—একটি কাজের ভার দিচ্ছি। ওই গীতার শ্লোকের আর কোরানের বয়েতের বাংলা অনুবাদ করে দিন। পবিত্রতা গাম্ভীর্য্য বজায় রাখতে হবে। কেষ্টবাবু যদি বাংলা ভার্স করে দিতে পারেন ত খুব ভাল হয়। আমাদের সিক্সথ মাষ্টার গোপাল আর ড্রয়িং মাষ্টারমশায় দু' জনে সুন্দর করে লিখে দিন; প্রত্যেক ক্লাসের জন্যে এক এক কপি। প্রত্যেক ক্লাসে টাঙানো থাকবে। এক সপ্তাহের মধ্যে এটা হওয়া চাই।

এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে আবার বললেন—আর একটা কথা, এই ব্যাপার নিয়ে ক্লাসে যেন কোন আলোচনা না হয়। অর্থাৎ যা ঘটে গেল তা নিয়ে। এবং এই প্রার্থনা করে ফল আছে কি নাই তা নিয়ে। বুঝেছেন? প্লিজ গো টু ইয়োর ক্লাসেস। নো ডিসকাসন প্লিজ।

মৃগাঙ্কবাবু মাষ্টারদের মজলিসে বলেছিলেন—অলরাইট! ইট ইজ অলরাইট! ইস্কুল অথরিটিজ যখন আমাকে চল্লিশ টাকা মাইনে দেয়, তখন ওরা যদি বলে যে, সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘোরে না, পৃথিবীর চারিদিকেই সূর্য্য ঘোরে অন এ চ্যারিয়ট ড্রন বাই সেভেন হর্সেস—এই শেখাতে হবে, অলরাইট তাই শেখাব—তাই বলব। অলরাইট।

সঙ্গে সঙ্গে পানের ডিবে খুলে খিলি তিন-চার পান মুখে পুরে দ্রুত চর্ব্বণে চিবুতে আরম্ভ করেছিলেন, তার সঙ্গে বাঁ হাতের আঙুলগুলি সযত্নপুষ্ট দাড়ির মধ্যে চালাতে সুরু করেছিলেন। এই দীর্ঘ দশ বৎসর স্তোত্রপাঠের সময়ে তিনি নিয়মানুযায়ী উপস্থিত থেকেছেন এবং স্তোত্রপাঠ যতক্ষণ হয়েছে ততক্ষণ বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে দাড়ির ফাঁস ভেঙেছেন। পাঠ শেষ হলেই ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের আঙুল থেকে, জড়িয়ে-যাওয়া কয়েকটি ছেঁড়া দাড়ি ছাড়িয়ে ফেলে দিয়ে ইস্কুলে ঢুকেছেন।

রামজয় রসিকতা করে পরশু অর্থাৎ শনিবার পর্য্যন্ত বলেছেন—এর চেয়ে নিত্য ক্ষৌরকর্ম্ম করুন সেকেণ্ড মাষ্টার মশায়। আস্তিক্যতত্ত্বে প্রায়শ্চিত্ত-বিধানে শ্মশ্রু গুম্ফ কেশ সব মুণ্ডন করতে হয়; আপনার নাস্তিক্যতত্ত্ব—ওতে অন্ততঃ দাড়ি-গোঁফটা কামানো দরকার। অসুবিধেও নেই! এ দু'চার গাছি ছেঁড়ে কষ্টও হয়, আর কি বলে প্রায়শ্চিত্তও পুরো হয় না।

মৃগাঙ্কবাবু বলেন—পান খান এক খিলি। বিধানের দক্ষিণা এর অধিক দিতে পারব না। নিত্যাশৌচ যেখানে সেখানে পূর্ণ অশৌচান্তে ওটা করব; এই চল্লিশ মুদ্রার মাষ্টারীর পাপ থেকে মুক্তি যেদিন পাব—সেইদিন; বুঝেছেন না, একেবারে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করে দাড়ি-গোঁফ ফেলে দেব। তার দেরি নেই, বুঝলেন, দরখাস্ত কয়েকটা করেছি।

দরখাস্ত মৃগাঙ্কবাবু করেন এবং মৃগাঙ্কবাবুর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে বহু স্থান থেকেই তাঁর আহ্বান আসে; এই দশ বৎসরে অন্ততঃ দশ জায়গা থেকে তাঁকে ডেকেছে কিন্তু তিনি যান নি। ডাক এলে তিনি সকলের সঙ্গে পরামর্শ করেন। সকলেই তাঁকে যেতে বলে। পঁয়তাল্লিশ থেকে ষাট টাকা পর্য্যন্ত বেতন দিতে চেয়েছে। কোন কোন জায়গায় বাসাবাড়ীরও ব্যবস্থা এবং প্রাইভেট টিউশনির সম্ভাবনার ইঙ্গিত ছিল। মৃগাঙ্কবাবু প্রথমটা নিজে উৎসাহ দেখিয়েছেন, চাকর কেষ্ট থেকে সুরু করে সকলকে বলেছেন 'যাচ্ছি এবার। ফরটি রুপিজ এ মন্থ, নো মোর অব ইট।' রামজয় পণ্ডিতকে বলেছেন—'পণ্ডিতমশায় শ্মশ্রুগুম্ফ মুণ্ডন-বিধির বিকল্প ব্যবস্থা থাকা চাই কিন্তু। এত সযত্নপালিত দাড়িগোঁফ—যা না কি—নবপ্রবালোদ্গমশস্যরম্যঃ প্রফুল্ল-লোধ্রঃ পরিপক্বশালিঃ"র সঙ্গে তুলনীয় তাকে আর নষ্ট করতে পারব না। মূল্য নিয়ে শুদ্ধ করে দিন। দক্ষিণা—কিছু মোদকের রসগোল্লা এক পোয়া, তার বেশী নয় কিন্তু।

কয়েক দিন পরই কিন্তু মত পালটেছেন তিনি—নো। নো। নো। নট গোয়িং দেয়ার। আই এ্যাম দি লাষ্ট পারসন টু গো দেয়ার। দে আর ব্রুটস। চিঠি লিখতে জানে না।

না-হয় বলেছেন—খবর নিয়েছি সময়ে মাইনে দেয় না।

না-হয় বলেছেন—মাই গড, এ ডেঞ্জারাস প্লেস।

কতবার শিক্ষকেরা বলেছেন—কেন আপনি যাচ্ছেন না মৃগাঙ্কবাবু। চল্লিশ টাকা মাইনেতেও আপনি এখানে কেন পড়ে আছেন?

দাড়িতে হাত বুলিয়ে, পা নাচিয়ে, মৃগাঙ্কবাবু বলেছেন—নো ম্যাটার। ওরা চল্লিশ টাকার মত মাইনে দেয়—আমি চল্লিশ টাকার মত পড়াই। ওজন করে দি। দেয়ার আই ফলো মাই প্রিন্সিপল—ভেরি ভেরি ষ্ট্রিক্টলি। এ্যাণ্ড য়্যাজ ফাউ—আই অ্যাটেণ্ড দি স্তোত্র প্যারেড।'

আজ এই বোধ করি প্রথম দিন মৃগাঙ্কবাবু স্তোত্রপাঠের সময় এলেন না।

চন্দ্রবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। মৃগাঙ্কবাবুর মত লোকের কাছে এটা তিনি প্রত্যাশা করেন নি।

কোরান থেকে বয়েৎ পাঠ শেষ হয়ে গেল। ইস্কুলের ও পাশের বারান্দা থেকে সঙ্গে সঙ্গেই ঘণ্টা বাজতে সুরু করল; কেষ্ট ঘণ্টার সামনে কাঠের হাতুড়ি ধরে দাঁড়িয়েই ছিল, পাঠ শেষ হওয়া মাত্র সে বাজাতে সুরু করেছে—ঢং-ঢং, ঢং-ঢং, ঢং-ঢং, ঢং-ঢং, ঢং-ঢং—দশটি ঘণ্টার পর দ্রুততালে—ঢনো-ঢনো-ঢনো-ঢনো—ঢং!

ছেলেরা বাঁধ-ভাঙা জলের মত ছুটছে। ক্লাসে এসে বসবে। তরুণ কিশোর থেকে কচি শিশুর দল। চঞ্চল বেগবান—অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে সতেজ। লাফ দিয়ে বেঞ্চি ডিঙিয়ে বসবে। তা না বসলে ওদের আনন্দ হবে না। ঘোষণা করে না বললেও 'কে আগে গিয়ে বসতে পারে'—এ প্রতিযোগিতা ওদের মনে মনে ওদের নিজেদের অজ্ঞাতসারেই আরম্ভ হয়ে গেছে।

—আস্তে, আস্তে, বয়েজ! আস্তে আস্তে! বললেন

তিনি। তার পর আবার দীর্ঘপদক্ষেপে ঘরের পর ঘর অতিক্রম করে এসে আপিসে বসলেন।

মৃগাঙ্কবাবু বসে আছেন। টেবিলের উপর এ্যাটেণ্ড্যান্স খাতা পড়ে আছে। মাষ্টাররা এসে দাঁড়ালেন সই করবার জন্যে। চন্দ্রবাবু বললেন—টিফিনের সময় বা ইস্কুলের পর যখন আপনাদের ইচ্ছে একবার আমার সঙ্গে বসবেন। আমার কিছু দেখাবার আছে, জানাবার আছে আপনাদের। সমস্ত দেখাব এবং যা জেনেছি সবই বলব। শুধু বিশ্বাস করবেন। ওনলি—আই উড আস্ক ইউ টু বিলিভ ইট। টু বিলিভ মি।

সর্ব্বাগ্রে মৃগাঙ্কবাবু হন হন করে বেরিয়ে গেলেন।

গোপাল ক'খানা খাতা খুলে সামনে এগিয়ে দিল। সই করে দিয়ে চন্দ্রবাবু এক শিট ফুলস্কেপ কাগজ টেনে নিলেন। লিখতে লাগলেন—মাই ডিয়ার অমরবাবু—। অমরবাবু স্বর্গীয় চৈতন্যবাবুর ভাগ্নে। এই ইস্কুল প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন চৈতন্যবাবুর ডান হাত। চৈতন্যবাবুই তাঁকে পড়িয়ে মানুষ করেছিলেন। এম-এ পাস করেছিলেন অমরবাবু, প্রথম জীবনে পশ্চিমে প্রোফেসারি করতেন। চৈতন্যবাবুই তাঁকে এনে তাঁর কলকাতার ব্যবসায়ে ঢুকিয়েছিলেন। অমরবাবু এখন ধনী ব্যবসায়ী, রাজসরকারে প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি, প্রকৃত পক্ষে তিনিই প্রতিষ্ঠাতা পক্ষের প্রতিনিধি।

ইংরিজীতে লিখে চললেন চন্দ্রবাবু। মধ্যে মধ্যে তাকাচ্ছিলেন চৈতন্যবাবুর অয়েল পেণ্টিঙের দিকে। তাঁকে যেন সাক্ষী মানছিলেন। অথবা তাঁর দিকে চেয়ে দেখেই তাঁর সব কথা মনে পড়ছিল। তিনি আরম্ভ করলেন—ইন দি ভেরি বিগিনিং আই বেগ অব ইউ—ইয়োর ফরগিভনেস—।

সর্ব্বাগ্রে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, অনধিকারপ্রবেশ করে আমি আপনার মূল্যবান সময়ের হয়ত অনেকটুকুর উপর হস্তক্ষেপ করছি।

মাই লেটার উইল বি এ লং লেটার। আই উড আস্ক ইউ টু রিমেমবার—।

১৯০৫ সালের সে কাহিনী মনে করতে বলছি।

ক্রমশঃ

দরদী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

দিয়েছ তুমি যে কী—হে প্রভু কৃপাধার, কেমনে বর্ণিব বলো না তারে ?
আমার মন তব লভিল যে-প্রসাদ—অপর মন কি তা জানিতে পারে ?
তোমারি তরে শুধু সহিতে অপমান শকতি দাও—মান জানি তাহারে।
নাই যে তোমা বিনা জ্ঞান এ-বসুধায়—শুধু এ-জ্ঞান প্রভু, দিও আমারে।
হ'য়ে অধীন তব, সহায়-বলহীন, চরণে চাই ঠাঁই—এ-বল দিও।
একটি আশা শুধু জপি—তোমারি তরে সকল আশা হোক লুপ্ত, প্রিয় !
অপরে কী জানিবে—আমার দু'নয়নে বয় অঝোর কোন্ সুখের ধারা ?
অপরে কী জানিবে—তনুর তাপনেও শান্তি মনে পায় সর্বহারা ?
তোমার তরে হ'য়ে নিঃস্ব—কী সে-ধন লভে অকিঞ্চন—অপরিমেয়,
তোমারি তরে দিয়ে বিদায় সবারেই পরশমণি পায় অপরাজেয়,
নাই আপন পর, বন্ধু কি বা অরি বোধ যাহার—সে যে পায় কী বরে,
নিখিল জিনি' লয় চরণ লভি' তব—করিবে কল্পনা কেমনে পরে ?
গাহিল মীরা : "প্রভু, তোমার করুণার কেমন পরিচয়—জানিবে কে সে ?
জানো কেবল তুমি হে দাতা, আর জানে—জেনেছে বেদনায় যে ভালোবেসে।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর সমাধিশ্রুত মীরাভজনের বাংলা অনুবাদ

মৈথিল ও রাঢ়ীয় কুলব্যবস্থা

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

একজন উদীয়মান মৈথিল গবেষক কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, বাংলা দেশে প্রচলিত কৌলীন্য প্রথা মিথিলা হইতে ধার করা (borrowed from Mithila)। তাঁহার মতে বঙ্গদেশে কৌলীন্য সৃষ্টি হইয়াছিল খ্রীষ্টীয় ১৪শ হইতে ১৬শ শতাব্দীর মধ্যে এবং বাংলার কুলগ্রন্থসমূহ মৈথিল স্মৃতিনিবন্ধকার হরি মিশ্র, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতির নাম বহন করিতেছে।* আজ পর্য্যন্ত কোন বাঙালী লেখক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে এই মতের আলোচনা করেন নাই। তাহার প্রধান কারণ এক দিকে মিথিলার "পঞ্জীপ্রবন্ধে"র অপ্রাপ্যতা (মৈথিল ব্রাহ্মণদের বিবরণাত্মক একটি গ্রন্থও অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই), অপর দিকে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের "মূল" কুলগ্রন্থের সহিত শিক্ষিত সমাজের অপরিচয় ও মুদ্রিত গ্রন্থে বহু কৃত্রিম রচনার যোজনা। ফলে মৈথিল ও রাঢ়ীয় কুলব্যবস্থার সহিত যাঁহাদের বস্তুতঃ বিন্দুমাত্র পরিচয় নাই এইরূপ একাধিক ইতিহাসরসিক মনীষী উক্ত মৈথিল গবেষকের ন্যায় নিতান্ত ভ্রমাত্মক ও স্থানে স্থানে হাস্যজনক মন্তব্য করিয়াছেন। একটি তাম্রশাসন আবিষ্কার হইলে যাঁহাদের ক্ষুরধার মনীষা প্রতিটি অক্ষরে নিয়োজিত হইয়া সার্থক হইতেছে তাঁহারাই মুদ্রিত কুলগ্রন্থের প্রামাণ্যবিচারে অতি বিস্ময়কর বুদ্ধিবিভ্রমের পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। আমরা একটি উদাহরণ দিতেছি। ১২৯৬ সনে গোপালভট্ট-রচিত "বল্লালচরিত" গ্রন্থ প্রথম মুদ্রিত হয়, গ্রন্থশেষে (পৃ. ৫৮-৬৫) আনন্দভট্ট-রচিত "পরিশিষ্ট"ও ছিল। গোপালভট্ট "বৈদ্যবংশাবতংস" বল্লালসেনের "শিক্ষক" ছিলেন এবং আনন্দভট্ট তাঁহার বংশধর। গ্রন্থটি নাথসম্প্রদায় হইতে প্রাপ্ত। ১৯০১-৪ খ্রীষ্টাব্দে অপর একটি "বল্লালচরিত" দুই বার মুদ্রিত হয় এবং পৃথক্ ইংরেজী ও বাংলা অনুবাদ ছাড়া তদুপরি প্রবন্ধাদিও প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ সুবর্ণবণিক সম্প্রদায় হইতে প্রাপ্ত। সামান্য আলোচনা করিলেই স্পষ্ট ধরা যায় যে উভয় গ্রন্থই "জাল"—কিন্তু অদ্যাপি এই জাল গ্রন্থের প্রতি অল্পবিস্তর প্রামাণ্যবোধ বাংলার শিক্ষিত সমাজে বিদ্যমান রহিয়াছে। উভয় গ্রন্থেরই পূর্ব্বখণ্ডে বঙ্গে ব্রাহ্মণ আনয়নের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে এবং কেহ কেহ এই বৃত্তান্তকে কুলগ্রন্থের বিবরণ অপেক্ষা অধিকতর প্রামাণিক মনে করেন। অথচ যেখানে শত শত কুলগ্রন্থের প্রতিলিপি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া যাইতেছে সেখানে বল্লালচরিতের একটি পুথিও বস্তুতঃ বিদ্যমান আছে কিনা সন্দেহ।

২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে কুলীন শব্দের ব্যুৎপত্তির জন্য পাণিনি সূত্র করিয়াছিলেন "কুলাৎ খঃ" (৪।১।১৩৯) অর্থাৎ কুল শব্দের উত্তর অপত্যার্থে প্রত্যয় করিয়া ঐ শব্দ নিষ্পন্ন। এতকাল কুলীন শব্দের অর্থ সম্বন্ধে কাহারও কোন সংশয় ছিল না—পাণিনি হইতে শব্দকল্পদ্রুম পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র ব্যাকরণ ও অভিধান গ্রন্থে বংশবাচক কুল শব্দ হইতেই ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। কৌলীন্যের মূলে সকল দেশে ও সকল কালে সভ্যতাসঙ্গত বংশোন্নতির আকাঙ্ক্ষাই বিদ্যমান থাকে। হঠাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দুই-একজন মনীষী কল্পনা করিলেন অন্ততঃ বাংলা দেশে কৌলীন্যের উৎপত্তি তান্ত্রিক কুলাচার হইতে। অর্থাৎ যে অতি গোপনীয় ও দুষ্কর সাধনপদ্ধতিতে ঘৃণালজ্জাদি অষ্টপাশের মধ্যে "কুলং শীলং তথা জাতিঃ" ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতে হয় তদ্দ্বারাই কুলশীল-জাতির উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল! সাহিত্যে ও সমাজে কুলাচারের কোনপ্রকার সম্পর্ক বা প্রভাব থাকিতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। ঘটকদের কুলগ্রন্থে একাধিক স্থলে স্পষ্টাক্ষরে তাহার নিন্দা আছে এবং সমাজে তাহা একপ্রকার দোষমধ্যে পরিগণিত ছিল।

ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতেই উচ্চশ্রেণীর মধ্যে বংশ-বিবরণ লিপিবদ্ধ করার রীতি প্রচলিত আছে। কুমারিল ভট্ট "তন্ত্রবার্তিকে" ব্রাহ্মণত্বের বিচার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন (১।২।২ সূত্রের টীকায়):—"ন চ স্ত্রীণাং কচিদ্ব্যভিচার-দর্শনাৎ সর্বত্রৈব কল্পনা যুক্তা লোকবিরুদ্ধানুমানাসংভবাৎ। বিশিষ্টেন হি প্রযত্নেন মহাকুলীনাঃ পরিরক্ষন্ত্যাত্মানম্। অনেনৈব হেতুনা রাজভির্ব্রাহ্মণৈশ্চ স্বপিতৃপিতামহাদি-পারম্পর্য্যাবিস্মরণার্থং 'সমূহলেখ্যানি' প্রবর্ত্তিতানি। তথা চ প্রতিকুলং গুণদোষস্মরণাৎ তদনুরূপাঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্তয়ো দৃশ্যন্তে।" (পৃ. ৬, কাশী সং) [বঙ্গানুবাদ : স্ত্রীলোকদের মধ্যে কোন কোন স্থলে ব্যভিচার দর্শন করিয়া সর্বত্র তাহা কল্পনা করা অনুচিত, কারণ ঐরূপ লোকবিরুদ্ধ অনুমান করা অসম্ভব। মহাকুলোৎপন্ন ব্যক্তিরা বিশেষ চেষ্টা করিয়াই

---

* Jayakanta Mishra: "Some Aspects of Maithila Cultural Life" (*Indian P.E.N.*, Nov. 30, 1946, p. 12 f. n.)। লেখক পরে তাঁহার থিসিস্ গ্রন্থে ইহা পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন—(*History of Maithili Literature*, Vol. I, p. 26), প্রমাণস্থলে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন Risley: *People of India*, p. 215 এবং G. N. Datta's Hist., 1906.

আত্মরক্ষা করিয়া থাকেন। এই কারণেই ক্ষত্রিয়েরা ও ব্রাহ্মণেরা নিজ নিজ পিতৃপিতামহাদির পারম্পর্য্য বিস্মৃত না হওয়ার জন্য "সমূহলেখ্য" অর্থাৎ মূল পুরুষ হইতে বর্ত্তমান পুরুষ পর্য্যন্ত সম্বন্ধ পরিচয়সহ নামমালা রচনা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এই ভাবে প্রত্যেক বংশের গুণদোষ স্মরণ করিয়া তদনুযায়ী কুলকর্ম্মে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়।] সুতরাং কুমারিল ভট্টের সময়ে প্রায় ৭০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রত্যেক "মহাকুলীন" ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ বংশের গুণদোষ কীর্ত্তন করিয়া বর্ত্তমান কুলপঞ্জীর ন্যায় গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

মিথিলার পঞ্জীপ্রবন্ধ ঃ বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে যে সকল কুলপঞ্জী ধারাবাহিক ক্রমে লিখিতাকারে পাওয়া যায় তন্মধ্যে মৈথিল ব্রাহ্মণদের "পঞ্জীপ্রবন্ধ" এবং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের কুলপঞ্জিকা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাপেক্ষা বিপুলায়তন বটে; মিথিলায় অদ্যাপি "পঞ্জীকার"শ্রেণীর প্রভাব-প্রতিপত্তি অল্পবিস্তর বিদ্যমান আছে—বঙ্গদেশে শতাধিক বৎসর পূর্ব্বেও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ঘটকদের অভাবনীয় প্রতিপত্তি ছিল।* কর্ণাটবংশীয় মিথিলাধিপতি হরিসিংহদেব (হরসিংহ নহে) ১২৪৮ শকাব্দে (১৩২৬ খ্রীষ্টাব্দে) একটি বিস্ময়কর অশাস্ত্রীয় "স্বজনা"বিবাহের পর তাদৃশ বিবাহের প্রতিরোধকল্পে পঞ্জীকারশ্রেণী নূতন করিয়া সুশৃঙ্খলার সহিত প্রবর্ত্তিত করেন। (অস্মদ্রচিত বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চ্চা, পৃ. ১৬-১৭ দ্রষ্টব্য)। মিথিলার পঞ্জীতে লিখিত আছে ঃ

শাকে শ্রীহরিসিংহদেবনৃপতির্ভূপার্কতুল্যেঽজনি
তস্মাদন্তমিতেঽব্দকে দ্বিজগণৈঃ পঞ্জীপ্রবন্ধঃ কৃতঃ।

(অর্থাৎ ১২১৬ শকাব্দে হরিসিংহের জন্ম এবং ৩২ বৎসর পরে পঞ্জীপ্রবন্ধ রচিত হয়)। তদবধি অদ্যপর্য্যন্ত মিথিলায় পঞ্জীকারপ্রদত্ত বরকন্যার "অস্বজনপত্র" ব্যতিরেকে বিবাহ হইতে পারে না—অন্যূন ৬০০ বৎসর মধ্যে মিথিলায় আর একটিও অশাস্ত্রীয় স্বজনাবিবাহ প্রকাশ্যে হইতে পারে নাই। সুতরাং মিথিলার পঞ্জীর মূল উদ্দেশ্য হইল বিবাহকালীন স্বজনানির্ণয় এবং তজ্জন্য ১২৪৮ শকাব্দ হইতে প্রধান প্রধান বংশের নামমালা এবং প্রত্যেক বিবাহসম্বন্ধের বিবৃতি অতি বিপুলাকার ধারণ করিয়া পঞ্জীতে ক্রমান্বয়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত এই সকল মহামূল্য পঞ্জীগ্রন্থ লোকলোচনের সম্পূর্ণ অন্তরালে পঞ্জীকারসম্প্রদায় যক্ষের ধনের মত রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। মিথিলার পঞ্জীগ্রন্থ প্রধানতঃ দ্বিবিধ, "মূল" ও "শাখা"—দুষ্প্রাপ্য প্রাচীনতর মূলে একটিমাত্র বংশের প্রত্যেক সন্তানের (পুত্রকন্যা উভয়ের) নাম ও বিবাহসম্বন্ধসহ বংশধারা বিবৃত আছে। শাখাপঞ্জী তদপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য—দ্বারভাঙ্গার রাজবংশের বিবরণ হইতে ইহার আরম্ভ এবং বিবাহপ্রসঙ্গে অন্যান্য বংশের আমূল বিবরণ ইহার মধ্যে লিপিবদ্ধ থাকে। প্রায় ২৫ বৎসর হইল সৌভাগ্যবশতঃ দ্বারভাঙ্গা রাজগ্রন্থাগারে একটি তালপত্রের শাখাপঞ্জী (পত্রসংখ্যা ৬২৬, লিপিকাল ১৬৪২ শকাব্দ) এবং দুইটি খণ্ডিত "মূল" সংগৃহীত হইয়াছে। তত্রত্য গ্রন্থাধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীরমানাথ ঝার পরম সৌজন্যে পঞ্জীনিবদ্ধ মৈথিল ব্রাহ্মণদের কুলব্যবস্থার অজ্ঞাতপূর্ব্ব আমূল বিবরণ জ্ঞাত হইয়া আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত তাহার সারসঙ্কলন করিলাম। অধ্যাপক ঝার মতে হরিসিংহদেবের পূর্ব্বে কোন কুলব্যবস্থা কিংবা কুলপঞ্জী মিথিলায় ছিল না, অন্ততঃ তদ্বিষয়ক কোন প্রমাণপত্রের অত্যন্তাভাব রহিয়াছে।

(১) মিথিলায় কেবল সামবেদের কৌথুম শাখা ও শুক্লযজুর্বেদের মাধ্যন্দিন শাখা আবহমান কাল হইতে প্রচলিত, অন্য শাখা ও ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ সেখানে নাই। প[illegible]রে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ প্রধানতঃ কেবল সামবেদী বটে।

(২) মৈথিল ব্রাহ্মণদের গোত্রসংখ্যা মোট ১৯। যথা, "ব্যবস্থিত সপ্ত গোত্রাঃ"—শাণ্ডিল্য, পরাশর, বৎস্য, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, ভারদ্বাজ ও সাবর্ণ। প্রত্যেক গোত্রে "মূলগ্রাম" (অর্থাৎ আমাদের গাঞি) সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে—শাণ্ডিল্যে ৪৩, বৎস্যে ৪০, কাশ্যপে ২৭, পরাশরে ১২, ভারদ্বাজে ৭, সাবর্ণে ৫ ও কাত্যায়নে ৪ (সপ্তগোত্রে মোট মূলগ্রাম ১৩৮)। বাকী ১২ গোত্র—গোতম, অলাম্বুকাক্ষ, গার্গ্য, বশিষ্ঠ, কৌণ্ডিন্য, বৃদ্ধবিষ্ণু, উপমন্যু, কপিল, কৃষ্ণাত্রেয়, কৌশিক, মৌদ্গল ও তণ্ডি—ইহাদের "মূল" সংখ্যা বহু শত, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট নাই এবং সপ্তগোত্র-বহির্ভূত বলিয়া ইহাদের সামাজিক মর্য্যাদা অত্যন্ত কম। পক্ষান্তরে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের গোত্রসংখ্যা মাত্র পাঁচ।

(৩) মৈথিল ব্রাহ্মণমাত্রই কোন-না-কোন মূলগ্রামসম্ভূত। মোট মূলগ্রামের সংখ্যা প্রায় এক হাজার হইবে। কিন্তু প্রত্যেক মূলগ্রাম একই গোত্রান্তর্গত হইলেও সম্পূর্ণ পৃথক্ বংশ বলিয়া গৃহীত হয়—প্রত্যেকেরই বীজিপুরুষ পৃথক্। এ স্থলে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের গাঞিসৃষ্টির সহিত গুরুতর পার্থক্য লক্ষ্য করা আবশ্যক—শাণ্ডিল্যগোত্রে রাঢ়ীয় ১৬টি গাঞিরই আদিপুরুষ একক ভট্টনারায়ণ বটে।

(৪) প্রায় সমস্ত মূলগ্রামই মিথিলার অন্তর্ভূত বটে। বর্ত্তমান দ্বারভাঙ্গা রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ "উপাধ্যায় সঙ্কর্ষণ"

* ১২৩৭ সনে চুঁচুড়ার বিশ্বম্ভর হালদারের জ্যেষ্ঠ কন্যা প্যারীকমলের বিবাহে ৫০০ শত কুলাচার্য্য প্রত্যেকে ১/০ মোন সিধা সহ ১৬৲, ১২৲ বা ৮৲ টাকা বিদায় পাইয়াছিলেন (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, ২য় সং, পৃ. ৫২৩)

একজন তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ ছিলেন এবং "সঞ্জী" নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি মধ্যপ্রদেশে জব্বলপুরের নিকটে "খণ্ডোয়া" গ্রাম প্রাপ্ত হন (অনুমান খ্রী. ১৩শ শতাব্দীতে) এবং তদবধি তাঁহার বংশধরগণ "খণ্ডবলা"-সম্ভূত বলিয়া পরিচিত। কিন্তু পঞ্জীগ্রন্থে স্পষ্ট লিখিত আছে সঙ্কর্ষণ "গঙ্গোলী" মূলগ্রামের বীজিপুরুষ গঙ্গাধর উপাধ্যায়ের প্রপৌত্র ছিলেন (শাণ্ডিল্য গোত্র, সামবেদ, কৌথুম শাখা)। বস্তুতঃ মৈথিল, রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র প্রভৃতি ভৌগোলিক সংজ্ঞাধারী বংশের মূলগ্রাম বা গাঞি তত্তৎ দেশভাগের সীমান্তর্ভুক্ত ছিল তদ্বিষয়ে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। মিথিলায় "গঙ্গোলী" গ্রাম অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তাহার সহিত নামসাদৃশ্য মাত্র অবলম্বন করিয়া রাঢ়ীয় "গাঙ্গুলী" (সাবর্ণ গোত্র), বারেন্দ্র "গাঙ্গৈল" (কাশ্যপ গোত্র মৈত্রেয় বংশের একটি শাখা) অথবা কূর্মাচলী "গঙ্গাবলী" (ভারদ্বাজ গোত্র) বংশের সম্বন্ধ কল্পনা করিতে যাওয়া ভ্রান্তির পরাকাষ্ঠা হইবে।

(৫) পঞ্জীগ্রন্থে মৈথিল ব্রাহ্মণদের কোনপ্রকার শ্রেণীবিভাগ লিখিত নাই। পরবর্ত্তীকালে ২০টি মূলগ্রাম "উত্তম" বলিয়া [illegible]ত হয়। তাহাদের তালিকা প্রদত্ত হইল:—

খণ্ডবলা (শাণ্ডিল্য—বিশেষণপদ খড়োরয়), খৌআল (কাশ্যপ—খৌআড়য়), বুধবাল (বৎস্য—বুধবাড়য়), ঘুসোত (বৎস্য—ঘুসোতয়), মাণ্ডর (কাশ্যপ—মড়রয়), দরিহরা (কাশ্যপ—দরিহরয়), তিসওত (বৎস্য—তিসোতয়), করম্বহা (ঐ—করমহয়), হরিঅম্ব (ঐ—হরিঅম্বয়), সোদরপুর (শাণ্ডিল্য—সোদরপুরিঅয়), নরওন (পরাশর—নরোনয়), সরিসব (শাণ্ডিল্য—সরিসবয়) বস্তনিআম (বৎস্য—°আময়)।

গঙ্গোলী (শাণ্ডিল্য—বিশেষণপদ গঙ্গুলিবার), পবৌলী (ঐ—বার), কুজৌলী (কাত্যায়ন—বার), অলয়ী (বৎস্য—অলৈবার), বহেরাঢ়ী (ঐ বহরঢ়িবার), পালী (ঐ—পলিবার) এবং সকরাঢ়ী (কাশ্যপ—সকরঢ়িবার)। ইহাদের সম্বন্ধে কারিকা আছে "অয়াস্তাঃ ত্রয়োদশ শ্রেষ্ঠাঃ বারাস্তাঃ সপ্ত তত্সমাঃ"। উত্তম শ্রেণীর মধ্যে সাবর্ণ ও ভারদ্বাজ গোত্র নাই। খণ্ডবলা ও গঙ্গোলী, বুধবাল ও ঘুসোত, বহেরাঢ়ী ও পালী মূলতঃ এক বংশ বলিয়া পরিচিত।

(৬) নিম্নলিখিত ১৪টি মূলগ্রাম "মধ্যম"। দীর্ঘঘোষ অথবা দীঘো (শাণ্ডিল্য—দিঘবয়), বেলওচ অথবা বিল্বপঞ্চক (ভারদ্বাজ—°চয়), একহরা (ঐ—°রয়, উভয়ে মূলতঃ এক বংশ), পণিচোম (সাবর্ণ—°ময়), বলিআস (কাশ্যপ—°সয়), জজিবাল (শাণ্ডিল্য—°ড়য়), টঙ্কবাল (বৎস্য—টঙ্কবয়), পণ্ডুআ (কাশ্যপ—°অয়), শকোনা (বৎস্য—শকুনয়, মূলতঃ উত্তম শ্রেণীর হরিঅম্ব হইতে অভিন্ন), সুরগণ (পরাশর—°ণয়), সতলখা (কাশ্যপ—°খয়), ওচিতী (বৎস্য—°তিবার), বিসপী (কাশ্যপ বিসৈবার) এবং জালয় (বৎস্য—জলৈবার)।

কালক্রমে বর্ত্তমানে এই শ্রেণীদ্বয়ে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে—তিসওত, গঙ্গোলী, বিদ্যাপতির বংশ বিসপী প্রভৃতি এখন তৃতীয় অর্থাৎ অধম শ্রেণীর অন্তর্গত এবং একহরা, বলিয়াস ও সুরগণ উত্তম শ্রেণীর অন্তর্গত।

(৭) মিথিলায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি "শ্রোত্রিয়" সংজ্ঞায় অভিহিত হয়—"কুলীন" শব্দ সেখানে সামাজিক মর্য্যাদার শ্রেষ্ঠতা কোন কালেই সূচনা করে নাই। সুরগণবংশীয় বিখ্যাত গ্রন্থকার জগদ্ধরের মতে:

> জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।
> বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয় উচ্যতে॥

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জন্ম-সংস্কার-বিদ্যার গুণে এই শ্রোত্রিয়ত্ব ব্যক্তিগত ছিল, সম্পূর্ণরূপে বংশগত নহে, যদিও শ্রোত্রিয়মূলের সংখ্যা বরাবরই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। অধম শ্রেণীর শত শত মূলগ্রামের মধ্যে একটি মাত্র (ফনন্দহ) দ্বারভাঙ্গারাজের আদেশে সম্প্রতি শ্রোত্রিয় সংজ্ঞা পাইয়াছে। বর্ত্তমানে উত্তম ও মধ্যম শ্রেণীর মধ্যে ১৮টি বংশে শ্রোত্রিয়তা রহিয়াছে। মিথিলায় একটি প্রবাদ আছে, হরিসিংহদেব ১৩ জন শ্রোত্রিয়কে সর্ব্বোত্তম মর্য্যাদা দিয়াছিলেন, কিন্তু পঞ্জীতে তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। উল্লিখিত উত্তম শ্রেণীর অন্তর্গত ১৩টি বংশ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কেহ কেহ গ্রহণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহার বিশেষ কোন লিখিত প্রমাণ নাই। তাহা সমাজে প্রচলিত একটা পরম্পরাগত লোকপ্রবাদ মাত্র।

পক্ষান্তরে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের ৫৬ (অথবা ৫৯) গাঞির মধ্যে আটটি গাঞি হইতে বাছিয়া মাত্র ১৯ জনকে বল্লালসেন কুলীনপদবাচ্য সর্ব্বোত্তম মর্য্যাদায় বিভূষিত করিয়াছিলেন এবং অদ্যাপি রাঢ়ীয় কৌলীন্য ঐ ১৯ জনের বংশধারায় সীমাবদ্ধ রহিয়াছে—কস্মিন কালেও তাহার কোন প্রকার ব্যতিক্রম হয় নাই। রাঢ়ীয় কৌলীন্যপ্রথার এই কঠোরতা মিথিলায় প্রচলিত নাই।

মাত্র ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে শ্রোত্রিয়তা বংশগত হইয়া মিথিলায় নানা দোষের আকর হইয়া পড়িয়াছে। অর্থাৎ বল্লালী কৌলীন্যপ্রথার অন্ততঃ ৬০০ বৎসর পরে মিথিলায় তাহার অনুকরণ হইয়াছিল। অথচ কুলীন শব্দটা পর্য্যন্ত যেখানে সামাজিক মর্য্যাদার পরিভাষারূপে প্রচলিত নাই সেখান হইতে বাঙালী কৌলীন্য ধার করিয়া আনিল—একজন অর্ব্বাচীন মৈথিল অম্লানবদনে এই অসম্ভব উক্তি করিয়া কোন কোন বাঙালী মনীষীরও

উল্লাস উদ্রিক্ত করিয়াছে। মিথিলার শ্রোত্রিয়তা গুণত্রয়ে পর্য্যবসিত, আর বঙ্গদেশে "নবধা কুললক্ষণম্"। মিথিলার শ্রোত্রিয়তা অতি শিথিলভাবে বংশগত, আর বঙ্গদেশে বল্লালী আদিকুলীনের বংশধর ছাড়া ৮০০ বৎসর মধ্যে এক জনও কুলীনপদবাচ্য হইতে পারে নাই। মিথিলার পঞ্জীতে ঘুণাক্ষরেও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের সহিত কোন সম্পর্ক সূচিত হয় নাই এবং রাঢ়ীয় কুলপঞ্জীতে আমরা একটিও মৈথিল সম্পর্কের আভাস খুঁজিয়া পাই নাই।

(৮) এখন প্রশ্ন হইল মিথিলায় "মূলগ্রাম" সৃষ্টি কাহার সময়ে হইয়াছিল। পঞ্জীতে যে সকল বীজিপুরুষ ধরিয়া বংশ কীর্ত্তিত হইয়াছে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই মূলগ্রাম লিপিবদ্ধ আছে—অথচ এই সকল বীজিপুরুষ হরিসিংহের ৭৮ পুরুষ (অর্থাৎ প্রায় ২০০ বৎসর) পূর্ব্ববর্ত্তী। গঙ্গৌলীবংশের বীজী গঙ্গাধরের অধস্তন একাদশ পুরুষ ছিলেন মিথিলাধিপতি মহেশ ঠক্কুর। এক পুরুষে ৪০ বৎসর ধরিয়া (মিথিলায় এক পুরুষের গড়পড়তা ন্যূনপক্ষে ৪০ বটে) গঙ্গাধরের সময় হয় প্রায় ১১০০ খ্রীষ্টাব্দ। তজ্জন্য অনেকে অনুমান করেন কর্ণাট বংশীয় নান্যদেব (রাজত্বকাল ১০৯৭—১১৪৭ খ্রী.) মূলগ্রাম সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু পঞ্জীতে ইহার বিন্দুমাত্র সমর্থন নাই—ইহা অনুমানই মাত্র। অধ্যাপক ঝা বলেন, হরিসিংহদেবের সময় যখন বংশাবলী সংগৃহীত হয় তখনই মূলগ্রাম প্রথম লিপিবদ্ধ হয়—পূর্ব্বে নহে। কিন্তু এসিয়াটিক সোসাইটির একটি পুথিতে (G. 4770) লিপিকার পরিচয় দিয়াছেন "দেউলাশ্রীকটকে 'পীতুপাটক'সং উপাধ্যায়-শ্রীগিরীশ্বরৈর্লিখিতমিদম্। লসং ১৬৪ জ্যৈষ্ঠবদি ১১।।" ইহা নিঃসন্দেহ হরিসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী লেখা এবং এখানে মূলগ্রামের উল্লেখ অবিকল পঞ্জীর ভাষায়ই নিবদ্ধ বটে, যদিও অধ্যাপক ঝা অদ্যাপি এই মূলগ্রাম পঞ্জীতে খুঁজিয়া পান নাই। সুতরাং হরিসিংহের পূর্ব্বেই যে মূলগ্রাম মিথিলায় প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল—এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য বলিয়া আমরা মনে করি। নান্যদেবের সময়েই সম্ভবতঃ মূলগ্রামের সৃষ্টি হইয়াছিল, নিশ্চিতই তাহার পূর্ব্বে নহে। কারণ, সাবধানে লক্ষ্য করা আবশ্যক, পঞ্জীনিবদ্ধ বংশের বীজিপুরুষ কেহই নান্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন না।

পক্ষান্তরে রাঢ়ীয় গাঞিসৃষ্টি নান্যদেবের বহু শতাব্দী পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা। নান্যদেবের সমকালীন ভট্ট ভবদেবের কুলপ্রশস্তিতে ভবদেবের ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ (আদি) ভবদেব ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম আছে। "সিদ্ধল" গ্রামের বীজিপুরুষ হইতে এই আদি ভবদেব অন্ততঃ ৪।৫ পুরুষ পরবর্ত্তী হইবেন। কারণ প্রশস্তির চতুর্থ শ্লোকে "দৃঢ়বদ্ধমূল" সিদ্ধলবংশের বিস্তৃতি আদি ভবদেবের পূর্ব্বেই কীর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং গাঞিসৃষ্টির কাল পাওয়া যায় প্রায় ৭০০ খ্রীষ্টাব্দে—মৈথিল বাচস্পতি মিশ্রের ও তদুল্লিখিত আদিশূরের অন্ততঃ ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে, যদি তর্কস্থলে ধরাও যায় যে বাচস্পতি মিশ্রের কাল ৮৯৮ বিক্রমাব্দ (শকাব্দ নহে)।

(৯) পরিশেষে আমরা উদাহরণ-স্বরূপ মিথিলার পঞ্জী ও রাঢ়ীয় কুলপঞ্জী হইতে অংশবিশেষ অবিকল উদ্ধৃত করিলাম। উভয়ের মধ্যে বিজাতীয় পার্থক্য তদ্দ্বারা পরিস্ফুট হইবে।

"গংগৌর সং বীজী শাশ্বতঃ। এস্তুতো দামোদরঃ। এস্তুতাঃ রঘুমাধবচন্দ্রকরদেবধরাঃ ছতিমনসং শৃঙ্গারদৌ।
চন্দ্রকরসুতৌ বীনুবীদুকৌ পণ্ডুয়াসং রামদৌ।
বীদুসুতাঃ বিশ্বনাথশ্রীনাথদেবনাথাঃ সত্তলখাসং মহিধরদৌ।
বিশ্বনাথসুতাঃ লক্ষ্মীনাথশশিনাথ-মহামহোঃ হরিনাথজগন্নাথধর্ম্মনাথ-ভবনাথাঃ নিসয়ীপালীসং দিবাকরসুত হীঙ্গুদৌ…।
মহামহো হরিনাথসুতো রামনাথঃ মটিহানীসং তারাপতিদৌ॥"

(দৌ অর্থ দৌহিত্র। এই হরিনাথই "স্বজনা" বিবাহ করিয়া মিথিলায় প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করেন। হরিনাথ গঙ্গেশের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রায় ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের লোক। লক্ষ্য করা আবশ্যক, শাণ্ডিল্যগোত্র গঙ্গৌর মূলগ্রামের বীজী শাশ্বত হরিনাথের ঊর্দ্ধতন ষষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। এই বংশ অধম শ্রেণী এবং কোন কালেই "শ্রোত্রিয়" মধ্যে পরিগণিত হয় নাই।)

"অথ মুখৈটিকুলং। শ্রীহর্ষসুতশ্রীগর্ভ তৎসুত শ্রীনিবাস তৎসুত মেধাতিথি তৎসুতাঃ আবরপাবরসাবরকাঃ। আবরসুতাঃ সত্তোলখোত্রিবিক্রমাঃ। ত্রিবিক্রমসুতাঃ কাককুলপতিকৌতুকাঃ। কাকসুতাঃ ধাধুবরাহসুরেশ্বরাঃ। ধাধুঃ মুখৈটিগ্রামনিবাসী তৎসুতো জলাশয়ঃ তৎসুতো বাণেশ্বরঃ তৎসুতঃ প্রাণেশ্বরঃ তৎসুতৌ জিয়াগুঞ্জিকৌ। গুঞ্জিসুতাঃ নহুড়উমাপতি-বরাহমাধবাচার্য্যাঃ। মাধবাচার্য্যসুতাঃ কোলাহলসন্ন্যাসী উৎসাহগরুড়দাঞিবিঠোকাঃ। উৎসাহস্য উচিত পুতি উৎসাহ আচার্য্য পিতৃতুল্য অত্র পর্য্যায়বৃদ্ধিঃ। তৎসুতাঃ…।"

উৎসাহ আদি বল্লালী কুলীন এবং মিথিলার হরিসিংহদেবের অন্ততঃ ১৫০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী—তাঁহার সময় হইতেই রাঢ়ীয় কুলপঞ্জীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দুরূহ পরিভাষা (আর্ত্তি, ক্ষেম্য, উচিত, পর্য্যায়বৃদ্ধি প্রভৃতি) প্রবর্ত্তিত হয়। এই সকল পরিভাষা মিথিলায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। পক্ষান্তরে মিথিলার পঞ্জীতে কে কাহার দৌহিত্র বা দুহিতৃদৌহিত্র ছিলেন তাহা অতি স্পষ্ট করিয়া আদ্যন্ত সর্ব্বত্র লিখিত রহিয়াছে—তদ্দ্বারাই অশাস্ত্রীয় বিবাহ নিষিদ্ধ হইতে পারিত। রাঢ়ীয় সমাজে স্বজনা-বিবাহের শত শত উদাহরণ পাওয়া যায়—তাহা রোধ করা রাঢ়ীয় সমাজের উদ্দেশ্য ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল অতি সূক্ষ্মভাবে কৌলীন্য মর্য্যাদা নির্ণয় করা।

রোহিণী-উদয়

শ্রীসুখময় সরকার

"ছোঁড়ারা সব কেতাব নিয়েই মেতে আছে, পাল-পার্বণ ভুলেই গেল।" গল্প-পুস্তক পাঠে রত আমাদের একটি দলকে লক্ষ্য করিয়া অশীতিপর বৃদ্ধ পিতামহ গর্জিয়া উঠিলেন।

"আজ আবার কি পরব, দাদু?" একজন জিজ্ঞাসা করিল।

"কেন, জানিস না? আজ ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, রোহিণী উদয়। যা, পাহাড়-কোল থেকে পলাশ-ডাল, মহুল ডাল কেটে নিয়ে এসে তলোয়ার বানাতে লেগে যা। বিকেলে রোহিণী-খেলা খেলবি না?"

"ওরে, সত্যিই ত। আজ রোহিণী-উদয়, মনেই ছিল না। চল চল, পাহাড়-কোলে ডাল কাটতে যাই।"

সকলে মিলিয়া এক-একটা কাটারি সংগ্রহ করিয়া আমরা পাহাড়-কোলে ডাল কাটিতে চলিয়াছি। যাইতে যাইতে দেখি, আমাদেরই মত এক দল বালক জোড়ের ধারে (বাঁকুড়ায় ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর নাম জোড়) ভেরেণ্ডা গাছ কাটিতেছে। তাহারা ভেরেণ্ডার তরবারি নির্মাণ করিয়া বৈকালে রোহিণী-খেলা খেলিবে। কিন্তু যাহারা অকর্মা, তাহারাই গাঁয়ের কাছাকাছি ভেরেণ্ডাগাছ খুঁজিয়া বেড়ায়; আমরা কেন খুঁজিতে যাইব? আমরা পাহাড়-কোলে পলাশ আর মহুল-ডাল কাটিতে চলিলাম।

গ্রাম হইতে পাহাড়-কোল আধ ক্রোশের কিছু বেশী। বেলা প্রায় দশটা বাজিতে চলিয়াছে। কিন্তু ভয় কি? ইস্কুলে গ্রীষ্মের অবকাশ হইয়াছে। এই ত, দশ দিনও হয় নাই। সামনে লম্বা ছুটি। দিন দুই আগে জানিতে পারিলে আয়োজনটা কি চমৎকার হইত! গত বৎসর রোহিণী-খেলায় ও-পাড়ার দল আমাদিগকে হারাইয়াছিল। হারিবার একমাত্র কারণ, পূর্ব হইতে আয়োজন ছিল না। এবারেও পাছে তাহাই হয়—আমি এইরূপ জল্পনা করিতেছিলাম; বোধ হয়, দলের অন্য বালকেরাও করিতেছিল। একজন বলিয়া উঠিল, "বাংলা তারিখগুলো ভাই আমাদের মনেই থাকে না। আমাদের ইংরেজি নিয়েই কারবার ত।"

আর একজন বলিল, "শুধু কি তাই? আচ্ছা, যদি জানতাম, আজ ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, তা হলেই কি মনে পড়ত যে আজ রোহিণী-উদয়?"

আমি বলিলাম, "সত্যি। আমরা ভাই একটা পাঁজি কিনে রাখব। বড় পাঁজি।"

এইরূপ কথা কহিতে কহিতে পাহাড়-কোলে আসিয়া পৌঁছিলাম। পাহাড়-কোলে শাল-পলাশ-মহুল-হরিতকীর অগণিত তরুশ্রেণী। শান্ত, স্নিগ্ধ, মনোহর পরিবেশ। পাহাড়ের গা ঘেঁসিয়া শিলাবতী নদী বহিয়া গিয়াছে। জ্যৈষ্ঠের খররৌদ্র-তাপে তাহার স্রোতোধারা ক্ষীণতর হইয়াছে, তথাপি তাহার সৌন্দর্য মনোহারী। মৃদুমন্দ পবন-হিল্লোলে পথশ্রম অপনোদিত হইলে আমরা এ গাছে সে গাছে চড়িয়া ডাল কাটিতে আরম্ভ করিলাম। দুই দণ্ডে কার্য সমাপ্ত করিয়া ডাল টানিয়া টানিয়া জ্যৈষ্ঠের রৌদ্র মাথায় করিয়া বাড়ী আসিলাম। বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছে, অপরাহ্নে রোহিণী-খেলা হইবে। অতএব বিশ্রামের উপায় নাই। তরবারি নির্মিত হইতে লাগিল। গ্রামের এক প্রৌঢ় ব্যক্তি প্রতি বৎসর আমাদের তরবারি নির্মাণে সহায় হইতেন; তাঁহার সাহায্যও যথাসময়ে মিলিয়া গেল। চুণ-হলুদ মিশাইয়া—লাল এবং হলুদ ও ভুসাকালি মিশাইয়া সবুজ রং হইল। নানা বর্ণে তরবারি চিত্রিত হইল। তরবারির মুষ্টিতে শণের দড়ি বাঁধা হইল। তরবারি নির্মিত হইয়া যে সকল সরু ডাল অবশিষ্ট রহিল, তাহার ত্বক উঠাইয়া আমাদের বয়ঃকনিষ্ঠ বালকেরা লাঠি বানাইল। লাঠিগুলিও বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইল। শিশুরাও লাঠি দিয়া রোহিণী-খেলা খেলিবে। আমরা খেলিব মাঠে, শিশুরা চণ্ডীমণ্ডপ-প্রাঙ্গণে।

গ্রামের দক্ষিণে একটা বৃহৎ পুষ্করিণী, নাম যমুনা। শুনিতে পাওয়া যায়, আমাদের এক পিতৃপুরুষ বন্য পশুদের জলপানের নিমিত্ত প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে এই পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। ত্রিশ বৎসর পূর্বেও এই পুষ্করিণীর চতুর্দিকে এমন নিবিড় অরণ্য ছিল যে, মানুষের প্রবেশ অসাধ্য ছিল। তখনও নেকড়ে বাঘ ঐ পুষ্করিণীতে জল পান করিত এবং ভল্লুক উহার তটবর্তী মহুয়া-বৃক্ষতলে মহুল খাইয়া বেড়াইত। এই সে বৎসরও এক গোঁসাই গরুর গাড়ীতে যাইতে যাইতে একটা পুষ্পিত বেতস-লতা ভাঙিতে গিয়া বাঘের কবলে প্রাণ হারাইয়াছিল। এক্ষণে সে অরণ্য নাই। যাহা আছে, তাহাকে উপবন বলা যাইতে পারে। উপবনের দক্ষিণে একটা বিস্তীর্ণ প্রান্তর; প্রান্তরের এক পার্শ্বে একটা 'জোড়' বহিয়া গিয়াছে। এই প্রান্তরেই রোহিণী-খেলা হয়। প্রতি বৎসর হয়। কত বৎসর ধরিয়া হইতেছে জানি না। পার্শ্ববর্তী সকল গ্রামেই রোহিণী-খেলা হয়; তাহাদেরও খেলার নির্দিষ্ট স্থান আছে। কিন্তু

আমার মনে হইত, আমাদের মত রোহিণী-খেলার চমৎকার মাঠ আর কোথাও নাই। ইহার উত্তরে বিশাল যমুনা-পুষ্করিণী, দক্ষিণে স্রোতস্বিনী, পূর্ব ও পশ্চিমে হরিতকী, বয়ড়া, তিন্দুক ও পলাশের বন।

বৈকাল প্রায় চারিটার সময় আমরা দল বাঁধিয়া রোহিণী-খেলার মাঠে চলিয়াছি। পার্শ্ববর্তী গ্রামের হাড়ীরা ঢাক বাজাইতে জানে, তাহাদের দুই জন দুই পাড়া হইতে নিযুক্ত হইয়াছে। আমরা মাঠে উপস্থিত হইবার পূর্বেই তাহারা সেখানে গিয়া ঢাক বাজাইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ঢাকের বাদ্য শুনিয়া আবাল-বৃদ্ধ সকলে প্রান্তরের দিকে ছুটিতেছে। বালক ও যুবকদের প্রত্যেকের হাতে কাষ্ঠনির্মিত তরবারি, কাহারও হাতে চিত্রিত যষ্টি। মাঠে আসিয়া দেখি, গ্রামের পুরুষেরা সকলে আসিয়া জুটিয়াছে; বালিকারাও আসিয়াছে; বাড়ীতে আছে কেবল বধূরা। ক্ষণকাল পরে গ্রামের পুরোহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে বসিবার আসন নাই, সকলের মত তিনিও দাঁড়াইয়া রহিলেন। দুই পাড়ার দুই দল বিভক্ত হইয়া রণোদ্যমের জন্য প্রস্তুত হইল। প্রথমে লাঠিখেলা হইবে। যাহার লাঠি ভাঙিবে তাহার পরাজয়, যাহার ভাঙিবে না সে বিজয়ী। পুরোহিতের ইঙ্গিতে দুই দলের দুই জন লাঠিখেলার জন্য অগ্রসর হইল, এবং পাঁয়তারা কষিয়া খেলা আরম্ভ করিয়া দিল। ঢাকের বাদ্য দর্শক ও খেলোয়াড়দের হৃৎপিণ্ড আন্দোলিত করিতে লাগিল। প্রায় তিন মিনিট খেলা চলিল, কাহারও লাঠি ভাঙিল না। পুরোহিতের ইঙ্গিতে তাহারা নিরস্ত হইল। এইরূপে চার-পাঁচ জোড়া খেলোয়াড়ের খেলা হইল, কাহারও লাঠি ভাঙিল না। অবশেষে ও-পাড়ার এক খেলোয়াড়ের লাঠি ভাঙিল, আর এ পাড়ার ছেলেদের কোলাহলে প্রান্তর মুখর হইয়া উঠিল; তাহার ধ্বনি দূর হইতে দূরতরে, বন হইতে বনান্তরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

ইহার পর তরবারি-খেলা। যথানিয়মে খেলা আরম্ভ হইল। প্রথম প্রথম কাহারও তরবারি ভাঙিল না। আর বেলা নাই দেখিয়া পুরোহিত মহাশয় একসঙ্গে তিন-চার জোড়া খেলোয়াড়কে নামিতে আদেশ করিলেন। গ্রামের মাতব্বরগণ তাহা সমর্থন করিলেন। মাতব্বরগণের মধ্যে আমাদের পিতামহ প্রধান। একাশী বৎসর বয়সেও তাঁহার উৎসাহ-উদ্যমের সীমা নাই। প্রায় আধ ঘণ্টা তরবারি-খেলা চলিল। এবার আমাদের দলের এক জনের তরবারি ভাঙিল। তখন অপর দলের বালক ও যুবকেরা চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল।

রোহিণী-খেলা প্রকৃতপক্ষে কৃত্রিম যুদ্ধ (Mock-fight)। ইহাতে বিজয়ীর আত্মশ্লাঘা এবং বিজিতের আত্মগ্লানি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। রবি পাটে বসিয়াছেন। তাঁহার রক্ত-রশ্মি বনচূড়ায় প্রতিফলিত হইয়া যেন গোধূলির অন্তরালে আজিকার মত কাঁদিয়া বিদায় লইতেছে। বৈকালে সামান্য মেঘ করিয়াছিল, দুই-চারি ফোঁটা বৃষ্টিও পড়িয়াছিল। কিন্তু খেলার উৎসাহে কেহ তাহা গ্রাহ্য করে নাই। সন্ধ্যা আসন্ন দেখিয়া পুরোহিত ও মাতব্বরগণ ক্রীড়া-বিরতির আদেশ দিলেন। ক্রীড়া সমাপ্ত হইল, ঢাকের বাদ্য নীরব হইল। আমরা—খেলোয়াড়েরা—প্রান্তরে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। বন-সমীরণে অবিলম্বে আমাদের ক্লান্তি অপনোদিত হইল।

রবি অস্তাচলে গমন করিয়াছেন। কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। পুরোহিত পশ্চিম গগনের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঐ দেখ, রোহিণী।" সকলে রোহিণী দেখিবার জন্য পশ্চিম দিগন্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। আমিও রোহিণী দেখিবার জন্য সাগ্রহে সকলের অগ্রবর্তী হইলাম। পশ্চিম দিগন্তের নিকটে একটা রক্তবর্ণ তারা দেখা যাইতেছিল, উহাই রোহিণী তারা। রোহিণী দর্শন ও নমস্কার করিয়া সকলে যমুনার জলে স্নান করিতে গেলাম। প্রত্যেকে নিজ নিজ তরবারি ও যষ্টি যমুনার জলে বিসর্জন দিয়া স্নান করিলাম। দারুণ গ্রীষ্ম। সূর্যাস্তের পর স্নান স্বাস্থ্যহানিকর হয় না। বরং ধূলি-ধূসরিত, ক্লেদ-মলিন দেহে স্নান বেশ আরামদায়ক বোধ হয়। স্নানান্তে সিক্তবস্ত্রে গ্রামে ফিরিয়া শিবমন্দিরে ও চণ্ডীমণ্ডপে প্রণাম করিলাম; বিষ্ণুমন্দিরে আরতি দর্শন করিলাম। পরে উভয় দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে আলিঙ্গন ও প্রীতি-সম্ভাষণ হইল। অতঃপর পুরোহিত এবং বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে প্রণাম করিয়া স্ব-স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলাম। 'রোহিনী-উদয়' উৎসব সমাপ্ত হইল।

এতক্ষণ আমরা খেলায় মাতিয়াছিলাম; রোহিণী-উদয়ের আর একটি প্রকরণ বলা হয় নাই। এখন বলি। লোকের বিশ্বাস, রোহিণী-দিনে বৃষ্টি অবশ্যই হইবে। আর যত দূর আমার মনে পড়িতেছে, রোহিণী-দিনে বাস্তবিকই দুই-চারি ফোঁটা বৃষ্টি না হইয়া যায় নাই। বৃষ্টির পর প্রত্যেক পরিবারের গৃহিণী বাড়ীর কামিনকে (কামিন=কর্মিণী, কৃষি-কর্মের সহায়িকা) 'রোহিণী-মাটি' আনিতে প্রেরণ করেন। কামিনেরা কেহ রোহিণী-খেলার মাঠের পার্শ্ব হইতে, কেহ-বা প্রভুর কর্ষিত ক্ষেত্র হইতে এক ঝুড়ি করিয়া মাটি লইয়া আসে এবং মাটির ঝুড়িটি মাথায় লইয়া গৃহদ্বারে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকে। শীঘ্রই বাড়ীর কেহ আসিয়া তাহার মস্তকস্থ ঝুড়ি হইতে খানিকটা মাটি লইয়া ভূমিস্পর্শ না করাইয়া অলগ্ন ভাবে তুলিয়া রাখে। অলগ্ন ভাবে আর কি,

যেখানে ঘরের দেওয়াল শেষ হইয়াছে এবং ঘরের চাল আরম্ভ হইয়াছে, সেইখানে। রোহিণী-মাটি আনার দরুন কামিন এক আঁচল মুড়ি এবং স্নানের জন্য শালপাতার থালায় একথালা তেল পাইয়া সহাস্যবদনে প্রস্থান করে। লোকের বিশ্বাস, সর্পদংশন হইলে ঐ মাটি ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হইবে। অবশ্য, এ পর্যন্ত আমাদের গ্রামে কাহাকেও সর্পদষ্ট হইতে দেখি নাই; সুতরাং রোহিণী-মাটির উপযোগিতা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ হয় নাই। তবে দেখিয়াছি, কেহ কেহ রোহিণী-মাটি মাদুলীতে ভরিয়া কবচরূপে ধারণ করে। ইহাতে নাকি জ্বর উপশম হয় এবং ডাইনী ও অপদেবতায় 'নজর দিতে' পারে না। আরও বিশ্বাস, রোহিণী-খেলার যে চিত্রিত তরবারি ও যষ্টিগুলি জলাশয়ের জলে নিক্ষিপ্ত হয়, সেগুলি সর্পে পরিণত হয়। এই বিশ্বাসের মূলে কি সত্য আছে, কে জানে?

কিন্তু 'রোহিণী-উদয়ে'র মূল প্রকরণে ভাবিবার কথা আছে। বর্তমান কালের সৌরমাস গণনায় ১৩ই জ্যৈষ্ঠ রোহিণী-উদয়। কথাটা মিথ্যা নয়। বাঁকুড়া জেলার অজ্ঞ, অশিক্ষিত কৃষকেরাও জানে, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ রোহিণী নক্ষত্রের উদয় হয়। তাহারা জানে, রোহিণী-উদয়ে এক পশলা বৃষ্টি হইবে এবং তাহার পর ধানের বীজ ছড়াইতে হইবে। আষাঢ়ের মাঝামাঝি ধানের চারাগাছ বেশ বড় হইয়া উঠিবে, তখন বর্ষা নামিবে, ধানের চারা পোঁতা হইবে। যখন পঞ্জিকা ছিল না, তখন নক্ষত্রের উদয়াস্ত দেখিয়া লোকে ঋতুর আগমন অনুমান করিত। নক্ষত্রের উদয়াস্তের কাল বাঁধা আছে; নক্ষত্র চিনিয়া রাখিলে বাস্তবিকই পঞ্জিকা প্রয়োজন হয় না। অবশ্য সূক্ষ্ম জ্যোতিষিক বিষয় গণিত-সাপেক্ষ, সেখানে পঞ্জিকা চাই। কিন্তু পুরোহিত যে পশ্চিম দিগন্তে রোহিণী তারা দেখাইয়াছিলেন, ইহা কিরূপ? কথাটা 'রোহিণী-উদয়'; পশ্চিম গগনে কি কোনও জ্যোতিষ্কের উদয় হইতে পারে? পুরোহিতের দোষ নাই। তিনি সন্ধ্যাকালে রোহিণী দেখাইয়াছিলেন, তখন রোহিণী পশ্চিম-দিগন্তে অস্ত যাইতেছিল। বস্তুতঃ ১৩ই জ্যৈষ্ঠ

চিত্র ১। রোহিণী-নক্ষত্র
১—রক্তবর্ণ রোহিণী-তারা; ২—রবিপথ

প্রভাতে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রোহিণী-নক্ষত্রের উদয় হয়।
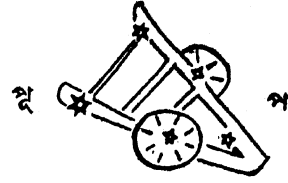
চিত্র ২। রোহিণী-শকট

রোহিণী-নক্ষত্রে পাঁচটি তারা (চিত্র ১)। মূল তারাটি রক্তবর্ণ। তারাগুলি একটা শকটের আকারে সজ্জিত। রোহিণী নামের অর্থ, যাহাতে (আ)রোহণ করিতে পারা যায় (চিত্র ২)। বৈদিক সাহিত্যে রোহিণী নক্ষত্রে মৃগ কল্পিত হইয়াছিল। রোহিণীর পাঁচটি তারা যোগ করিলে একটি মৃগের আকৃতিও পাওয়া যায়। গ্রীক খ-গোল চিত্রে ইহার নাম

চিত্র ৩। রোহিণী-মৃগ

'টরাস্'। টরাস্ একপ্রকার মৃগ (চিত্র ৩)। ইচ্ছা করিলে সকলেই ১৩ই জ্যৈষ্ঠ প্রত্যুষে পূর্বদিগন্তে রোহিণী নক্ষত্রের উদয় দেখিতে পারেন।

রোহিণী-উদয় দর্শন এবং রোহিণী-ক্রীড়া কেন বিহিত হইয়াছে? এ পর্যন্ত কেহ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রয়াসী হইয়াছেন কিনা সন্দেহ। এখানে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিতেছি।

পূর্বে বলিয়াছি, প্রাচীনকালে যখন পঞ্জিকা ছিল না, তখন লোকে নক্ষত্রের উদয়াস্ত দেখিয়া ঋতুর আগমন নির্ণয় করিত। কেবল তাহাই নহে, নক্ষত্রের উদয়দ্বারা বৎসরের দৈর্ঘ্যও নিরূপিত হইত। ব্যাপারটা কিরূপ? মনে করুন, আজ পূর্বদিগন্তে সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্বে একটা নক্ষত্র উদিত হইতে দেখিলাম। আবার কবে সেই নক্ষত্র ঠিক সেই স্থানে উদিত হইতে দেখিব? পূর্ণ এক বৎসর পরে। কোনও নক্ষত্রের প্রভাত উদয় (heliacal rising) হইতে সেই নক্ষত্রের পুনরায় প্রভাত-উদয়ের মধ্যে যে কালের ব্যবধান, তাহার নাম নাক্ষত্র বৎসর (Sidereal Year)। নক্ষত্রের নড়চড় নাই, যেন আকাশের গায়ে উহাদিগকে আঁটিয়া রাখা হইয়াছে। এক্ষণে ১৩ই জ্যৈষ্ঠ রোহিণী-নক্ষত্রের উদয় হয়; বহু সহস্র বৎসর পূর্বেও এইরূপ হইত,

আবার বহু সহস্র বৎসর পরেও এইরূপ হইবে। এই কারণে নাক্ষত্র বৎসরের দৈর্ঘ্য সর্বদা সমান থাকে। বর্ষমানের ইহাই সর্বাপেক্ষা বৈজ্ঞানিক রীতি।* এককালে আমাদের দেশে রোহিণী-নক্ষত্রের উদয় দেখিয়া বৎসর আরম্ভ করা হইত, 'রোহিণী-উদয়' উৎসবে সেই ঘটনার ইঙ্গিত পাইতেছি। এই ইঙ্গিত স্পষ্টতর হইয়া উঠে, যখন চিন্তা করি রোহিণী নক্ষত্রের দেবতা প্রজাপতি। প্রজাপতি আধুনিক কালে ব্রহ্মা হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু প্রাচীনকালে তিনি যুগপতি বা বর্ষপতি ছিলেন। রোহিণী নক্ষত্রের অধিপতি সেই স্মরণাতীত কালে বর্ষাধিপতি হইয়াছিলেন।

রোহিণী দিনে কৃত্রিম যুদ্ধের অনুষ্ঠান কেন, ইহার উত্তরটা এক্ষণে স্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। ইহা নববর্ষোৎসবের একটি অঙ্গ। সকল দেশে, সকল কালে, সকল জাতির মধ্যে নববর্ষোৎসবের কতকগুলি বিশেষ অনুষ্ঠান আছে। যথা: দেবার্চনা, নববস্ত্র পরিধান, উত্তম ভোজ্য ভক্ষণ, অক্ষক্রীড়া, কৃত্রিম যুদ্ধ, বিজয়যাত্রা ইত্যাদি। নববর্ষ দিবসে অক্ষক্রীড়া ও কৃত্রিম যুদ্ধে জয়ী হইলে সমস্ত বৎসর সকল কর্মে বিজয় লাভ হইবে, এই বিশ্বাস বহুকাল হইতে আছে। এককালে বিজয়া দশমীর দিন নববর্ষ হইত; ইহার পূর্বে কয়েক দিন জগন্মাতার অর্চনা, নববস্ত্র পরিধান ও উত্তম ভোজ্য ভক্ষণ করিয়া আমরা সেই স্মৃতি রক্ষা করিতেছি। অদ্যাপি ভারতের দেশীয় নৃপতিগণ বিজয়া দশমীতে বিজয়যাত্রার অনুষ্ঠান করেন। এককালে আশ্বিন পূর্ণিমায় (কোজাগরী পূর্ণিমায়) এবং আর এককালে কার্তিক অমাবস্যায় (দীপালী) নববর্ষ আরম্ভ হইত। এই কারণে কোজাগরী রজনীতে এবং দীপালীর পরদিন দ্যূত প্রতিপদে অক্ষক্রীড়া বিহিত হইয়াছে। এই ক্রীড়ায় কাহারও পরাজয় হয় না, সকলেই বিজয়ী হয়। রোহিণী-দিনেও কৃত্রিম যুদ্ধে কেহ পরাজিত হয় না, সেদিন সকলেরই বিজয়।

পূর্বে বলিয়াছি, রোহিণী-ক্রীড়ায় পরাজয়ের গ্লানি এবং বিজয়ের গৌরব স্থায়ী হয় না। বাস্তবিক ইহা খেলা। আজকাল শুনিতে পাওয়া যায়, গ্রীসদেশে অলিম্পাস পর্বতেই সর্বপ্রথম খেলাধুলা ধর্মানুষ্ঠান রূপে গণ্য হয় এবং খেলোয়াড়-সুলভ মনোবৃত্তি (sportsman-like spirit) ইউরোপ হইতেই অন্যত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু রোহিণী-খেলা দেখিলে এবং তাহার উৎপত্তিকাল চিন্তা করিলে উক্ত ধারণা ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে হয়। অলিম্পাসের ক্রীড়া (Olympic Games) অতি পুরাতন হইতে পারে; কিন্তু রোহিণী খেলাও নূতন নহে। ইহার প্রাচীনতা নির্ণয় করা আয়াস-সাধ্য।

আমরা দেখিয়াছি, এককালে ১৩ই জ্যৈষ্ঠ রোহিণী-উদয় দেখিয়া নববর্ষ আরম্ভ করা হইত। একটা বিশেষ জ্যোতিষিক যোগ না ঘটিলে নববর্ষ ধরা হয় না। নববর্ষ আরম্ভের নিমিত্ত অয়ন দিন অথবা বিষুব-দিন অবশ্য চাই। বর্তমান কালে ১৩ই জ্যৈষ্ঠ অয়ন-দিন কিংবা বিষুব-দিন, কিছুই হয় না। কিন্তু যে-কালে ঐ দিনে নববর্ষ ধরা হইত, সে-কালে ঐরূপ একটা যোগ অবশ্য ঘটিয়াছিল। জ্যোতির্গণিতের সামান্য জ্ঞান হইতেও বলিতে পারা যায়, উক্ত দিবসে উত্তরায়ণ, জলবিষুব ও দক্ষিণায়ন-দিন হইতে পারে না; হইতে গেলে আর্যকৃষ্টি এত পুরাতন হইয়া পড়ে যাহা বিশ্বাস করা অসম্ভব। সুতরাং আমরা স্বচ্ছন্দে ধরিতে পারি, যে-কালে ১৩ই জ্যৈষ্ঠ রোহিণী-নক্ষত্রে রবি থাকিলে মহাবিষুব দিন হইয়াছিল, রোহিণী-উদয় উৎসবে সেই কালের স্মৃতি রক্ষিত আছে। সে কোন্ কালের কথা?

জ্যোতির্গণিত হইতে জানা যায়, অয়ন ও বিষুব দিন শনৈঃ শনৈঃ পশ্চাদ্‌গত হইতেছে; এক মাস পশ্চাদ্‌গত হইতে কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র বৎসর লাগে। বর্তমান কালে ৭/৮ই চৈত্র মহাবিষুব দিন হইতেছে। যে-কালে ১৩ই জ্যৈষ্ঠ মহাবিষুব দিন হইয়াছিল, সে কাল হইতে বিষুবদিন:

চৈত্রের ২২।২৩ দিন = ¾ মাস
বৈশাখের ৩১ দিন = ১ মাস (কিঞ্চিদধিক)
জ্যৈষ্ঠের ১৩ দিন – ½ মাস (কিঞ্চিন্ন্যূন)

২¼ মাস

একুনে ২¼ মাস পশ্চাদ্‌গত হইয়াছে। অতএব 'রোহিণী-উদয়' অন্ততঃ ২০০০ × ২¼ = ৪৫০০ বৎসরের প্রাচীন স্মৃতি বহন করিতেছে। আনুমানিক খ্রী. পূ. ২৫০০ অব্দের ঘটনা।

এই গণনা নিতান্ত স্থূল; সূক্ষ্ম গণনায় প্রাচীনতর কাল পাওয়া যাইবে। তদ্‌ব্যতীত এই কাল গণিতলব্ধ; শাস্ত্রীয় উল্লেখ দ্বারা ইহা সমর্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এখানে আমি রঘুনন্দন-ধৃত দশহরা এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রজাপতি-রোহিণীর উপাখ্যান স্মরণ করিতেছি। আমি 'প্রবাসী'তে প্রবন্ধান্তরে দেখাইয়াছি, এককালে দশহরার দিন নববর্ষ ধরা হইত—রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; আরও

* আমাদের নূতন ভারত-পঞ্জিকায় সায়ন বৎসর (Tropical year) গ্রহণ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। সায়ন বৎসর, অয়ন হইতে অয়ন অথবা বিষুব হইতে বিষুব পর্যন্ত বৎসর। কিন্তু এই বৎসরের দৈর্ঘ্য সর্বদা সমান হয় না, প্রতি বৎসর প্রায় তিন মিনিট করিয়া কমিতে থাকে। আমরা মনে করি, ভারত-পঞ্জিকায় নাক্ষত্র বৎসর গৃহীত হইলে উত্তম হইত।

দেখাইয়াছি, একদা কালরূপ প্রজাপতি রোহিণীতে সমর্পিত হইয়াছিলেন; ঋষিগণ এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এক উপাখ্যান রচিয়া গিয়াছেন। এই দুই ঘটনাই মহাবিষুব-দিনে ঘটিয়াছিল এবং আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় এই দুই ঘটনার কাল জ্যোতির্গণিতের সাহায্যে সূক্ষ্মরূপে গণিয়া দিয়াছেন; এগুলি খ্রী. পূ. ৩২৫৬ অব্দের ঘটনা। এই অব্দ হইতেই মনু গণনার কল্পমুখ ধরা হইয়াছিল।* যদি খ্রী. পূ. ৩২৫৬ অব্দে জ্যৈষ্ঠ শুক্লাদশমীতে মহাবিষুব দিনের শাস্ত্রীয় উল্লেখ থাকে, তবে সেই সময়ে কিংবা তাহার কিছুকাল পরে ১৩ই জ্যৈষ্ঠ যে মহাবিষুব হইয়াছিল এবং আমাদের পিতামহগণ সেকালে 'রোহিণী-উদয়' উৎসব করিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। এখনকার মত সৌর মাস গণনা সেকালে ছিল না। এখনকার ১৩ই জ্যৈষ্ঠ তখনকার কোন্ তিথি ছিল, গণিতে পারিলে বিষয়টি সহজ হইয়া পড়িবে। পূর্বেই বলিয়াছি, নক্ষত্রের উদয়ের দিন বাঁধা আছে। অতএব ১৩ই জ্যৈষ্ঠ সেকালে নিশ্চয় শুক্লাদশমী ছিল এবং তাহা খ্রী.পূ. ৩২৫৬ অব্দের কথা। এই অব্দটির জ্যোতিষিক গুরুত্ব দেখিয়া মনে হয়, ইহাই 'রোহিণী-উদয়' উৎসব প্রবর্তনের বৎসর।

রোহিণী-দিনে আরও যে সকল অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা গিয়াছে, সে সকল অধুনাতন কালে সংযোজিত হইয়াছে এবং মূল প্রকরণের সহিত তাহাদের কোনও সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না। দুইটি ঘটনা একসঙ্গে ঘটিতে পারে, কিন্তু একটি অপরটির সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইতে পারে। রোহিণী-দিনে এক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা যে অতিআধুনিক কালের, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু রোহিণী-খেলার লাঠি ও তরবারি সর্পে পরিণত হওয়ার বিশ্বাস, সর্পদংশনে রোহিণী-মাটির ব্যবহার ইত্যাদি নূতন হইলেও এই সকল বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের মূলে কি সত্য আছে, সুধীবৃন্দের উপর তৎসমুদয় বিচারের ভার অর্পিত হইল।

* পৌরাণিক উপাখ্যান—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, পৃঃ ১১০

দীনবন্ধু এণ্ডরুজ

শ্রীসীতা দেবী

যে পরলোকগত মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্য আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি, তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে অনুরুদ্ধ হয়ে আমি নিজেকে কিছু বিপদ্‌গ্রস্ত বোধ করছি। পৃথিবীতে সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে কিছু বলা বিশেষ কঠিন নয়, চিরাচরিত নিয়মে কতকগুলি কথা তাঁদের সম্বন্ধে বলা যায় এবং তাতেই তাঁদের একটি সম্পূর্ণ চিত্র মানুষের মনে আঁকা হয়ে যায়। কিন্তু দীনবন্ধু এণ্ডরুজ সে জাতের সাধারণ মানুষ ছিলেন না। মানুষের ভিতর ভগবানের প্রকাশ যখন অতিশয় উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়, তখন আমাদের দেশের লোকে সেই মানুষকে ভগবানের অবতার বলে বরণ করে নেন। মানুষ হয়েও সাধারণ মানুষের বহু ঊর্দ্ধে যে চলে যাওয়া যায়, তা ভাবতে তাঁদের ভাল লাগে না হয়ত। কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁরা অবতারবাদে বিশ্বাস করেন না, তাঁরা মহামানবকে দেখে এই ভেবে আনন্দিত এবং আশান্বিত হন যে, মানুষের উন্নতির কোন শেষ নেই, ভগবানকে আমরা যে সকল গুণের আধার বলে পূজা করি, মানুষ মানুষ থেকেই তার অনেক-গুলির অধিকারী হতে পারেন। দীনবন্ধু এণ্ডরুজ এই শ্রেণীর মহাপুরুষ ছিলেন।

তিনি জাতিতে ছিলেন ইংরেজ এবং ধর্ম্মে খ্রীষ্টান। কিন্তু তাঁর অতলস্পর্শ মানবপ্রেম কোনও জাতি বা ধর্ম্মের গণ্ডীকে মানত না। এশিয়াবাসীর উপকারের জন্য তিনি যে ভাবে আজীবন অক্লান্ত চেষ্টা করে গিয়েছেন, তার তুলনা পাওয়া যায় না। শারীরিক উৎপীড়ন, নিন্দা অপমান কোনও কিছুই গ্রাহ্য করেন নি। হয়ত নিজের শরীরের দিকে একটু দৃষ্টি দিলে, তিনি আরও কিছুকাল পৃথিবীতে থাকতে পারতেন; কিন্তু যে ব্রত তিনি গ্রহণ করেছিলেন তার জন্য জীবন উৎসর্গ করা তাঁর কাছে কিছুই ছিল না।

তিনি জীবনের গোড়াতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করে ভারতবর্ষে চলে আসেন। কিন্তু মানবজাতির প্রতি বিমুখ হয়ে, নিরাসক্ত হয়ে যে ধর্ম্মাচরণ সাধারণ সন্ন্যাসীতে করে থাকে, তাঁর সন্ন্যাস সে জাতের ছিল না। ক্ষুদ্র পরিবারের গণ্ডীতে তিনি নিজেকে আবদ্ধ করেন নি ঠিকই, কিন্তু বিশ্বের সমগ্র মানবসমাজকে তিনি নিজের আত্মীয় বলে গ্রহণ করে ছিলেন। কাউকে তিনি পর ভাবতে পারেন নি, ছোট বা নীচ মনে করতে পারেন নি। ইংরেজ বলে কোনও অহঙ্কার তাঁর ছিল না, পৌত্তলিক হিন্দুকেও তিনি নিজের চেয়ে নীচু

মনে করতেন না। শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন, বহু বৎসর আগে তাঁর নিকট-প্রতিবেশীরূপে থাকবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। দেখে আশ্চর্য্য হতাম যে তিনি স্বচ্ছন্দ চিত্তে ধুতি ও পাঞ্জাবী পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। গুরুদেবের সঙ্গে বসে অম্লান বদনে নিরামিষ খাবার খাচ্ছেন। গাছতলার ক্লাশে গুরুদেব তখন অনেক সময় ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াতে বসতেন। ক্লাশের বাইরের আমরা অনেকে সে সময় গিয়ে জুটতাম তাঁর পড়ানো শোনার লোভে। এণ্ডরুজ সাহেবও অনেক সময় সেখানে এসে উপস্থিত হতেন এবং আমাদের সঙ্গে মাটিতে বসতে যেতেন। ছাত্ররা একটু অপ্রস্তুত হয়ে দৌড়ে মোড়া-টোড়া কিছু জোগাড় করে আনত, তিনি সস্মিত ভাবে ধন্যবাদ দিয়ে তাতে বসতেন। প্রথম প্রথম বাংলা বুঝতে ও বলতে পারতেন না বলে কষ্টবোধ করতেন, পরে বাংলা বুঝতে পারতেন, তবে বাংলা বলতে তাঁকে স্বকর্ণে কখনও শুনি নি।

মানুষ এ জগতে অহঙ্কার করে অনেক জিনিষ নিয়ে, যেমন বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, বংশমর্য্যাদা, জাত্যভিমান। এ সকলই তাঁর ছিল, বিশেষ সে যুগ ছিল ভারতীয়দের উপর ইংরেজের প্রভুত্বের যুগ। কিন্তু এমন নিরহঙ্কার মানুষ আমার জীবনে আমি কখনও দেখি নি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে এণ্ডরুজ সাহেব অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন, রোজ তাঁর খবর নিতে যেতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ অতি অকপট সরলচিত্ত মানুষ ছিলেন, কারও সামনে রেখে ঢেকে কথা বলা তাঁর স্বভাব ছিল না। এক দিন তিনি কোন কারণে ইংরেজদের উপর চটে বসে আছেন, এমন সময় এণ্ডরুজ সাহেব গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন, "বড়দাদা কেমন আছেন?" দ্বিজেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন যে, প্রভুজাতির সব লোক ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত না হলে আর শান্তি নেই। এণ্ডরুজ সাহেব হাসিমুখেই তাঁর মন্তব্য শুনলেন, তাঁর মুখভাবের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটল না। পরে দিনেন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, "I say Dinoo, your grandfather is terrible"।

তিনি আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন, এই সূত্রে আমাদের বাড়ীতে অনেক সময়ই আসতেন। বেশভূষা বাঙালীদেরই মত; শান্তিনিকেতনের কাঁকরভরা লাল মাটির পথে অনেক সময় তাঁকে খালি পায়েই ঘুরে বেড়াতে দেখতাম। তখনকার প্রবাসী আপিসের কেরোসিনের ম্লান-আলো-জ্বালা ছোট ঘরটিতে একটা ছোট টুলে বসে বাবার সঙ্গে আলাপ করতেন। সে সময়কার লর্ড বিশপ অফ্ ক্যালকাটা তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, তাঁকেও দু'একবার সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর পর আমার পিতৃদেব রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিতর্পণে যা লিখেছিলেন তার থেকেই কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করে আমার বক্তব্য শেষ করি। তিনি লিখে গিয়েছেন, "সাধারণতঃ ভারতীয় ইংরেজরা তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার মত স্বদেশপ্রেমিক বিরল। যে সকল ইংরেজ তাঁহাকে ভালবাসিতেন না, তাঁহারা জানেন না বুঝেন না দীনবন্ধু এণ্ডরুজের মত প্রতিনিধি পাওয়া একটা জাতির কত বড় সৌভাগ্য। তিনি জাতিতে জাতিতে মৈত্রীর, বিশ্ব-মৈত্রীর অন্যতম অগ্রদূত ছিলেন। তিনি ভারতীয়দের ও ভারতের সম্পর্কে সব কাজ এই ভাবে করিতেন যেন তিনি নিজ জাতির সব দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। কিন্তু আমরা তাহা প্রায়শ্চিত্ত মনে করিব না, তিনি আমাদিগকে মৈত্রী ও হিতকারিতার অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, ইহাই মনে করিব।"*

* দীনবন্ধু সি. এফ. এণ্ডরুজের পঞ্চদশ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৫৫ সালের ৫ই এপ্রিল লোয়ার সার্কুলার রোডের সমাধিক্ষেত্রে পুষ্পার্ঘ অর্পণ অনুষ্ঠানে কলিকাতা শাখা শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীসীতা দেবীর ভাষণ।]

ইলোরা ও অজন্তার পথে

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

ট্রেনের কামরাটা ছিল বেশ ফাকা। একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামলে বিছানা পেতে ঘুমোবার তোড়জোড় করছি, এমন সময় মূর্ত্তিমান বিঘ্নের মত এসে ঢুকলেন এক ইংরেজনন্দন। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশী নয়। বেশভূষা দেখে মনে হয়েছিল, ইনি একজন মিশনরী, এই অল্প বয়সেই হতভাগ্য ভারতবাসীকে অন্ধকার থেকে

বিশাল অন্ধ্রের পল্লীপথে

[ফোটো : কে. ভি. এন. আপ্পারাও

আলোকে নিয়ে যাবার জন্যে আদাজল খেয়ে লেগে গেছেন। আলাপ করে বুঝলাম অনুমান মিথ্যা নয়, বিশাল অন্ধ্রেরই কোন এক অঞ্চলের একটি খ্রীষ্টান মিশনের তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা। কি একটা সূত্র ধরে 'মিশু মহাশয়' খ্রীষ্টের মাহাত্ম্যবর্ণনা সুরু করে দিলেন। গাড়ীর এক পাশে একমুখ দাড়ি নিয়ে বসে ছিলেন মৌলবী-মোল্লাগোছের চেহারা, একজন মুসলমান, হঠাৎ দেখি তাঁর মুখে ভুল ইংরেজী জবানের খৈ ফুটছে—মিশনরী পুঙ্গবের সঙ্গে তাঁর সুরু হয়ে গেছে তুমুল বচসা এবং ইসলাম ধর্ম্মই যে সকল ধর্ম্মের সার সেকথা তিনি ঘোষণা করতে লাগলেন তারস্বরে। এদিকে আমার ত ঘুমের দফা রফা, বসে বসে এই ধর্ম্মযুদ্ধের পবিত্র মহান্ দৃশ্য অবলোকন করে নয়ন সার্থক করতে লাগলাম। খ্রীষ্টানধর্ম্মের ধ্বজাধারীটি কয়েকটা ষ্টেশন পরে নেমে গেলেন। হাঁপ ছেড়ে বাঁচা গেল। শয্যা আশ্রয় করবার সঙ্গে সঙ্গে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লাম।

পরদিন ভোর পাঁচটায় ঘুম ভাঙলে পর দেখি ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে কাজিপেট ষ্টেশনে। হায়দরাবাদ থেকে সাতাশী মাইল দূরবর্ত্তী এই কাজিপেট বিশাল অন্ধ্রের একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই জেলার এক কাজীর নির্ম্মিত গম্বুজযুক্ত সমাধি থেকে এই স্থানের নাম হয় কাজিপেট। ট্রেন থেকে নজরে পড়ছে—অনতিদূরে একটি রমণীয় শৈলসানুদেশে অবস্থিত দুটি শৃঙ্গাকৃতি বিরাট প্রস্তরখণ্ড।

কাজিপেটের পশ্চিম দিকে ওয়ারাঙ্গল জেলার হেড কোয়ার্টার্স হানামকোণ্ডা নামক বিখ্যাত শহরটি অবস্থিত। হানামকোণ্ডা এবং ওয়ারাঙ্গলের মধ্যে সংযোগ-স্থাপনকারী রাজপথের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছে অপূর্ব্বসুন্দর একটি মন্দির—সহস্র-স্তম্ভ-মন্দির নামে এর পরিচিতি। ১১৬২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারাঙ্গলের শেষ হিন্দু রাজবংশের একজন নৃপতিকর্ত্তৃক এই মন্দির নির্ম্মিত হয়—চালুক্য স্থাপত্যের
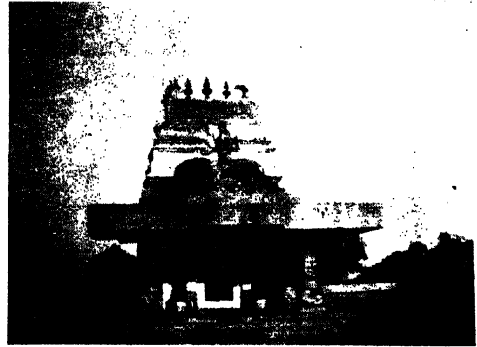
বিশাল অন্ধ্রের একটি পার্ব্বতীমন্দির

এটি একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। চমৎকার ভাবে খোদাই করা তিন শতটি স্তম্ভ ধারণ করে রেখেছে এর দেউড়ির ছাদকে, তন্মধ্যে অনেকগুলি কঠিন কালো বাসাল্ট প্রস্তরে তৈরি। পশ্চিম দিকের প্রবেশদ্বারে খোদিত নৃত্যপরা নারীমূর্ত্তিগুলি অনবদ্য।

ট্রেন চলেছে তেলুগুদের বাসভূমি বিশাল অন্ধ্রের বিস্তীর্ণ সমতল প্রান্তরের উপর দিয়ে। রেলপথের উভয় পার্শ্বে সুদূরপ্রসারিত শস্যক্ষেত্রে কর্ম্মরত স্ত্রীলোকদের ঘন সবুজ এবং টকটকে লাল বসনের বর্ণাঢ্যতা একঘেয়ে দৃশ্যের মধ্যে বেশ একটুখানি বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। রোদে-ঝলসানো পীতবর্ণ ঘাসে ঢাকা মাঠের বুকে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে আছে তালপাতায় ছাওয়া, লাল মাটির পাঁচিল দিয়ে ঘেরা সারি সারি ঘরবাড়ী—শীতের প্রভাতে আকাশের নীলিমায় সুনির্ম্মল প্রসন্নতা।

বেলা দশটা নাগাদ ট্রেন এসে দাঁড়াল হায়দরাবাদ ষ্টেশনে। ট্যাক্সি করে সরাসরি এসে পৌঁছলাম সুধীরবাবুদের আস্তানায়। গেল বারে হায়দরাবাদে এসে সুধীরবাবু এবং তাঁর দাদা প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে গড়ে উঠেছিল নিবিড় প্রীতির সম্পর্ক, এবার তাই মুখ্যতঃ তাঁদের সঙ্গলাভের জন্যেই এখানে আসা।

তেলুগু-পল্লীর একাংশের দৃশ্য

[ফোটো : শ্রী কে. ভি, এন আপ্পারাও

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সুধীরবাবুর সঙ্গে তাঁদের ফার্ম্মেসী—ন্যাশনাল ড্রাগ কনসার্নে গিয়ে বসি, ক্রমে ক্রমে বাঙালী অবাঙালী আড্ডাধারীরা এসে জোটেন। আসর জেঁকে উঠে। সুধীরবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরস ভঙ্গীতে সুরু করেন কর্ণ-মাহাত্ম্য বর্ণন। মহাভারতের কর্ণের কাহিনী নয়, তাঁর দাদা প্রফুল্লবাবুর কর্ণযুগল হচ্ছে কাহিনীর বিষয়বস্তু। কিছুকাল আগে এক [illegible], ভবঘুরে যুবক নাকি এসে উপস্থিত ফার্ম্মেসীতে। ঘরে ঢুকেই প্রফুল্লবাবুর পা জড়িয়ে ধরে, ফুলে ফুলে তার সে কি কান্না! প্রফুল্লবাবু পড়লেন মহা ফাঁপরে—লোকটা পা-ও ছাড়ে না, প্রবোধও মানে না—শুধু প্রফুল্লবাবুর কানের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে আর কাঁদতে থাকে একেবারে হাপুস নয়নে। অনেক জেরার পর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে যা বললে তার নির্গলিতার্থ হচ্ছে এই যে, তার গুরুদেবের কান নাকি ছিল হুবহু প্রফুল্লবাবুর কানের মত। প্রফুল্ল বাবুকে দেখে নাকি তাঁর স্বর্গত গুরুদেবের কথা মনে পড়ছে এবং বুঝতে পেরেছে যে, গুরুর অবর্ত্তমানে প্রফুল্লবাবুই তার একমাত্র আশ্রয়। প্রফুল্লবাবুর কর্ণ-মাহাত্ম্য অবগত নই, কিন্তু তিনি যে দাতাকর্ণের সগোত্র সেকথা ভাল করেই জানি এবং শুনেছি যে, তাঁর ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে অনেকে তাঁকে ঠকিয়েছে এবং বার বার প্রবঞ্চিত হয়েও তাঁর চৈতন্য হয় নি। কাজেই এক্ষেত্রেও যা অনিবার্য্য তাই হ'ল, লোকটা প্রফুল্লবাবুর ওখানে আশ্রয় পেল এবং নির্ব্বিকারচিত্তে তাঁর অন্ন ধ্বংস করতে লাগল—শেষ পর্য্যন্ত বড় বিদ্যা থেকে সুরু করে নানা অপবিদ্যায় তার পটুতার কথা জানতে পেরে সুধীরবাবু তাকে বিতাড়িত করতে বাধ্য হলেন।

ফার্ম্মেসীর আসর ভাঙলে পর তারাচাঁদ নামে জনৈক বিখ্যাত ব্যবসায়ীর মোটরে করে আমি আর প্রফুল্লবাবু গোটা হায়দরাবাদ শহরটা চক্কর দিয়ে এলাম। সন্ধ্যার পর নিখিল-ভারত শিল্প প্রদর্শনীতে বহুক্ষণ কাটিয়ে বাসায় ফিরে আসা গেল।

পরদিন বেলা চারটা নাগাদ আওরঙ্গাবাদের ট্রেন ধরবার জন্যে কাচিগুডা ষ্টেশনে গিয়ে পৌঁছলাম। টিকিট কেটে ষ্টেশন-প্রাঙ্গণে পায়চারি করছি এমন সময় অদূরে উপবিষ্ট এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক হাতের ইশারায় আমাকে ডাকলেন। এই ঘটনার পেছনে যে বিধাতার অদৃশ্য হস্তের ইঙ্গিত ছিল তা তখন বুঝতে পারি নি, পরে পেরেছিলাম। এবারকার দীর্ঘ ভ্রমণকালে অন্তরে অন্তরে এই সত্যেরও উপলব্ধি হয়েছিল যে, ঘরের আরাম থেকে ছিন্ন করে পথের দেবতা যাকে অজানা পথে বের করেন তার উপর থাকে তাঁর সদাজাগ্রত প্রসন্ন দৃষ্টি—সেই নিঃসঙ্গ পথচারীর সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা এবং সঙ্কটত্রাণের দায়িত্বও তাঁরই এবং সেইজন্যই সংঘটিত হয় অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ। যাক সে কথা—এখন সেই বৃদ্ধের কথাই বলি। বৃদ্ধের ইঙ্গিতে কৌতূহলী হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হলাম। বয়স ষাটের কাছাকাছি। গায়ের রং মিশকালো, মাথার চুলগুলো সব সাদা, আকৃতিতে একটা কঠিন রুক্ষতা—পরনে তাঁর ঢিলে পায়জামা, গায়ে চুড়িদার হাতাওয়ালা পাঞ্জাবী। বৃদ্ধের হাসিটি কিন্তু ভারি সুন্দর, অন্তরের সরলতার পরিচায়ক।

হানামকোণ্ডা, সহস্র-স্তম্ভ মন্দিরের একাংশ

চেহারা দেখে বৃদ্ধকে অশিক্ষিত বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু যখন তিনি পরিষ্কার ইংরেজীতে আমার গন্তব্যস্থলের কথা জিজ্ঞেস করলেন তখন রীতিমত অবাক হলাম। আমি আওরঙ্গাবাদে নেমে অজন্তা-ইলোরা দেখতে যাচ্ছি শুনে বৃদ্ধ বললেন—"আমিও আওরঙ্গাবাদে যাচ্ছি আমার ছেলের কাছে। সে ওখানকার ইণ্ডাষ্ট্রি এণ্ড কমার্স আপিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। আপনি আমার সঙ্গেই চলুন না, আমার ছেলের ওখানে উঠলে সব দেখাশুনোর পক্ষে আপনার খুব সুবিধে হবে। আই হোপ ইউ উইল বি কোয়াইট কম্ফর্টেবল দেয়ার।"

মক্কা মসজিদ, হায়দরাবাদ

অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেল সুকুমার এবং শেষে মারা গেল হার্ট ফেল করে।"

সুকুমারের করুণ কাহিনী শেষ করে ভদ্রলোক চুপ করেন। শেষের দিকে গলাটা তাঁর কেমন যেন ভারী হয়ে ওঠে। ট্রেনের কামরায় একটা থমথমে করুণ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। জানালা দিয়ে বাইরের পানে তাকিয়ে দেখি চরাচর নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, শুধু অন্ধকার আকাশে ছ'একটি তারা যেন তামসী রাত্রির বেদনাশ্রুর মত টলটল করছে··· । সুকুমার দেউস্করকে আমি চোখে দেখি নি। কিন্তু নানা প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি দেখে মুগ্ধ হয়েছি। সেই অদেখা শক্তিমান শিল্পীর অকালমৃত্যুর করুণ কাহিনী শুনে আমার মনে বেদনার ছায়া ঘনিয়ে আসে।
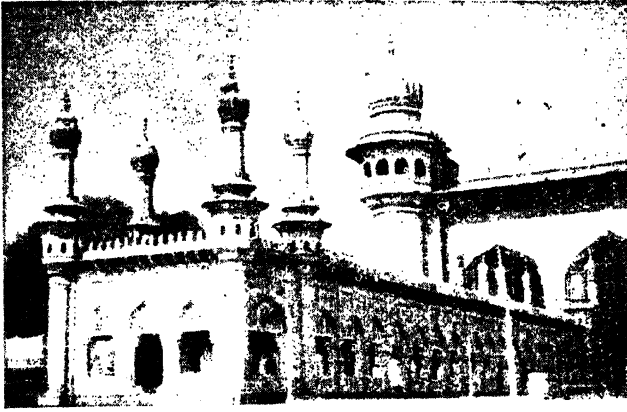
জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, তিনি জাতিতে মরাঠী। মহারাষ্ট্রের কোকণ প্রদেশে তাঁদের আদি বাসস্থান, পদবী দেউস্কর— তাঁরা সখারাম গণেশ দেউস্করের সগোত্র। কয়েক পুরুষ আগেই তাঁরা দেশছাড়া হয়েছেন। তিনি হায়দরাবাদে একটা স্কুলে মাষ্টারি করতেন, এখন পেন্সন পান এবং হায়দরাবাদেই অবস্থান করছেন।

ট্রেন ছাড়বার সময় হয়ে এল, ছ'জনে গিয়ে একই কামরায় উঠলাম। পাঁচটা নাগাদ ট্রেন ছেড়ে দিলে। ভদ্রলোক থলের ভেতর থেকে বের করলেন কিছু গোটা সুপুরি আর একটা জাঁতি। পরম যত্নে কুচি কুচি করে সুপুরি কেটে কিছু আমাকে দিলেন, ট্রেনের অন্যান্য যাত্রীদেরও দরাজ হাতে বিতরণ করলেন, তার পর কিছু সুপুরি নিজের মুখে পুরে দিয়ে তাঁদের পারিবারিক কাহিনীর জের টেনে চললেন :

"আর্টিষ্ট সুকুমার দেউস্করের নাম শুনেছেন তো, সুকুমার আমার ভাইপো। সুকুমারের বাবাও ছিলেন এক জন চিত্রশিল্পী, ছবি আঁকতেন চমৎকার, ফ্লোরেন্সে অবস্থান কালে বাংলাদেশের ময়মনসিংহের কেশ পরিবারের সঙ্গে হ'ল তাঁর গভীর অন্তরঙ্গতা। ঐ পরিবারের একটি কন্যার প্রতি তিনি অনুরক্ত হলেন এবং অবশেষে তাঁকে আবদ্ধ করলেন পরিণয়সূত্রে। সুকুমার তাঁর বাঙালী স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। সুকুমার পিতার প্রতিভার উত্তরাধিকারী হয়েছিল। স্বয়ং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত তাঁর শিল্প-প্রতিভার প্রশংসা করতেন। বহু দিন জীবিকার জন্যে কঠোর সংগ্রামের পর অবশেষে চাকরি পেয়েছিল হায়দরাবাদ গবর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজে। এক দিন ক্রিকেট খেলতে গিয়ে

ট্রেন এসে পৌছল নিজামাবাদ ষ্টেশনে—দেউস্কর মহাশয় সুপুরি বিতরণ-পর্ব্ব শেষ করে ঘুমিয়ে পড়েছেন—কিন্তু ঘুম নেই আমার চোখে। সারা রাত ঠায় জেগে বসে রইলাম। ভোরবেলা ট্রেন এসে পৌছল আওরঙ্গাবাদ ষ্টেশনে। ট্রেন থেকে নেমে দেউস্কর মহাশয়ের সঙ্গে এসে টাঙ্গায় উঠলাম। ষ্টেশন ছাড়িয়ে ফাঁকা জায়গার মাঝখান দিয়ে টাঙ্গা ছুটল নিউ ওসমানপুরার দিকে।

ছাদিকে শেষ রাতের তরল অন্ধকার-জড়ানো সাদা রঙের বাড়ীগুলোকে দেখাচ্ছে নিদ্রিত মায়াপুরীর মত। নৈশ অন্ধকার ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে, মোগল আমলের স্মৃতিবিজড়িত নিসুপ্ত নগরী যেন নবাগতের নিকট ধীরে ধীরে উন্মোচিত করছে তার রহস্যাবগুণ্ঠন।
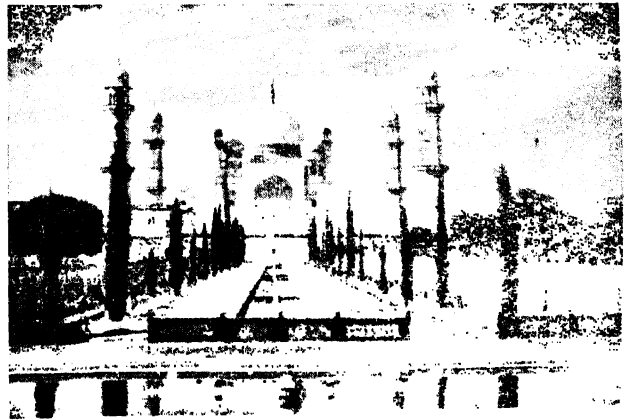
বিবি-কা-মকবারা, আওরঙ্গাবাদ

মাইলখানেক রাস্তা অতিক্রম করে আমরা এসে পৌঁছলাম ইণ্ডাষ্ট্রি এণ্ড কমার্স আপিসের সঙ্গে লাগাও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বাংলোয়। নবনির্ম্মিত ভবনটি বেশ তকতকে ঝকঝকে, পেছনে অবারিত মাঠ দিগন্তে গিয়ে মিশেছে।

গিরি-চূড়ায় দৌলতাবাদ দুর্গ

দেউস্কর মশায় আমাকে সরাসরি নিয়ে গেলেন ভিতর-বাড়ীর একটি কক্ষে। আমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হ'ল একটি মুসলমান ভৃত্য। মুখে তার লম্বা দাড়ি, গোঁফ খুব ছোট করে ছাটা। একেবারে আদত খোরাসানী বা মুলতানী চেহারা। দেখলাম অন্তঃপুর পর্য্যন্ত তার অবাধ গতি। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত গোঁড়া বলেই জানতাম, কিন্তু এই দেউস্কর-পরিবারে দেখলাম এর ব্যতিক্রম, সম্ভবতঃ জায়গার গুণেই এমনটা হয়েছে।

দু'দিনের বেশী আওরঙ্গাবাদে থাকা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়, কাজেই এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই আমাকে এখানকার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি এবং ইলোরা অজন্তা দেখা শেষ করতে হবে। প্রাতরাশ সমাপন করবার পরেই দেউস্কর মশায় মুসলমান ভৃত্যটিকে পাঠালেন টাঙ্গা ডেকে আনবার জন্যে। তাকে নির্দ্দেশ দিলেন যেন সে আমাকে বিবি-কা মকবারা দেখিয়ে ইলোরাগামী বাসে উঠিয়ে দেয়। টাঙ্গায় বসে তার মেজাজটা শরীফ করে দেবার জন্যে তাকে 'খাঁ সাহেব' বলে সম্বোধন করলাম। শুনে তার দিল খুশ হয়ে উঠল—ছাটা গোঁফের আড়ালে খেলে গেল ঈষৎ হাসির ছটা। 'আকা বৈরিঙ্গিতৈর্গত্যা' এমনি আনুগত্য প্রকাশ করতে লাগল যে, পারে তো সে আমাকে পিঠে করেই বয়ে নিয়ে যায়।

শীতের স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রভাত—আওরঙ্গাবাদের ধুলাভরা রাস্তার উপর দিয়ে টাঙ্গা চলেছে টুংটাং আওয়াজ করে—টাঙ্গার পেছনে আসছে অনেকগুলি মালবোঝাই গরুর গাড়ী, গরুর ক্ষুরে রাশি রাশি ধুলো উঠে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে চারিদিক—সেই ধূলিজাল ভেদ করে নজরে পড়ছে মসজিদ গম্বুজ আর মিনার-চূড়া—অনতিদূরস্থ শ্বেতপাথরে গড়া বিবি-কা-মকবারা থেকে যেন শুভ্র দ্যুতি বিকীর্ণ হচ্ছে। ইসলামিক স্থাপত্যের এই সমস্ত নিদর্শন দেখে মনশ্চক্ষে ভেসে উঠছে মোগলযুগের আওরঙ্গাবাদের গৌরবোজ্জ্বল চিত্র। সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী পর্য্যটক টাভার্নিয়ে সুরাট থেকে গোলকুণ্ডা যাবার পথে দৌলতাবাদ হয়ে এখানে এসে উপনীত হয়েছিলেন। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে জানতে পারি—একটি পল্লীগ্রামের সীমারেখা সম্প্রসারিত করে তাকে বিরাট নগরীতে পরিণত করেন বাদশাহ আওরঙ্গজেব এবং তাঁরই নামানুসারে এর নাম হয় আওরঙ্গাবাদ। নগরীটি নির্ম্মিত হয়েছিল ছয় মাইল দীর্ঘ একটি হ্রদের তীরে।
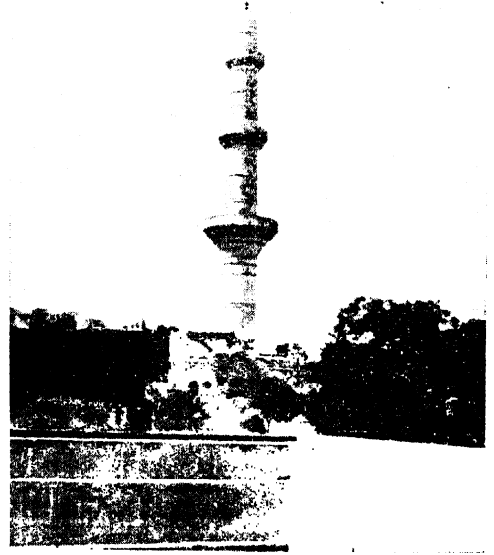
চাঁদ মিনার, দৌলতাবাদ দুর্গ

আওরঙ্গাবাদের উপকণ্ঠস্থ ধূলিধূসর জনবিরল পথে যেতে যেতে মনে পড়ছিল সপ্তদশ শতকে গৌরবের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত এই নগরীটির বিগত বৈভব এবং বিরাট ঐতিহ্যের কথা। মোগল আমলে সমগ্র ভারতে খুব কম নগরীই আওরঙ্গাবাদের মত প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করতে সমর্থ হয়েছিল, কিন্তু কালের স্থূল হস্তাবলেপে এর অতীত গৌরবের প্রায় সকল নিদর্শনই নিশ্চিহ্নপ্রায়। নগরোপান্তে অবস্থিত, বাদশাহ আওরঙ্গজেবের পত্নী রাবিয়া দুরাণীর সমাধি-মন্দিরে গতগৌরব নগরীর অন্তর-বেদনা যেন পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।

টাঙ্গা থেকে নেমে জলের ফোয়ারা এবং ঘনসবুজ বিটপীশোভিত রমণীয় উদ্যানভূমিতে অবস্থিত বিবি-কা-মকবারায় গিয়ে প্রবেশ করলাম। এর গঠন-কৌশলে হুবহু তাজমহলের অনুকৃতি—এটি

নির্ম্মিত হয় ১৬৫০ থেকে ১৬৫৭ সনের মধ্যে। টাভার্নিয়ে'র বর্ণনায় পাই—বাদশাহ সমাধি-সৌধের সঙ্গে একটি সুন্দর সরাইখানাও নির্ম্মাণ করিয়ে দেন। তখন এই সমাধি সংরক্ষণের জন্যে প্রচুর অর্থব্যয় করা হ'ত। এর যে অংশটুকু খাঁটি মর্ম্মর-প্রস্তরে নির্ম্মিত তা গাড়ী করে আনা হয়েছিল লাহোর থেকে, তখন আওরঙ্গাবাদ থেকে লাহোরে যেতে লাগত পুরো চারটি মাস।

ইলোরা গুহার সাধারণ দৃশ্য

একবার আওরঙ্গাবাদ থেকে পাঁচ দিনের রাস্তা অতিক্রম করে টাভার্নিয়ে দেখতে পান যে, মর্ম্মর-প্রস্তরে বোঝাই তিন শতটি গাড়ী চলেছে আওরঙ্গাবাদের অভিমুখে। তন্মধ্যে সবচেয়ে কম বোঝা যেটিতে সেটি ছিল বারোটি বলদ দ্বারা বাহিত। মকবারা মর্ম্মর-প্রস্তর এবং একরকম সাদা প্লাষ্টারে তৈরি—এতে মিনার আছে চারটি। শতাধিক সোপান বেয়ে মিনারের উপরে উঠতে হয়। সেখান থেকে সমগ্র আওরঙ্গাবাদের বিস্তীর্ণ সীমারেখা দৃশ্যমান হয়।

তাজমহলের সঙ্গে তুলনা চলে না বটে, কিন্তু একথা বলতে দ্বিধা নেই যে বিবি-কা-মকবারা তাজমহলের সার্থক অনুকৃতি। এটির অনিন্দ্য গঠনকৌশল দেখতে দেখতে এই কথাটাই মনে জাগছিল যে, সম্রাট আরওঙ্গজেবের কঠোর হৃদয়ে পত্নী-প্রেমের স্থান না থাকারই সম্ভাবনা। রাবিয়া দুরাণী ছিলেন আওরঙ্গজেবের মহিষী, তাঁর সন্তানের জননী, কিন্তু সম্রাটের প্রণয়সুখভাগিনী হওয়ার সৌভাগ্য হয় তো তাঁর হয় নি। দক্ষিণ-ভারতে তাজমহলের অনুরূপ সমাধি-সৌধ নির্ম্মাণ করে পিতা সম্রাট শাজাহানের মত কীর্ত্তিমান হওয়ার আকাঙ্ক্ষাই সম্ভবতঃ সম্রাট আওরঙ্গজেবকে বিপুল অর্থব্যয়ে পাষাণ-স্তূপ সমাহরণে প্রবৃত্ত করেছিল। কিন্তু কোথায় তাজমহল আর কোথায় বিবি-কা-মকবারা! কোন কবির কল্পনা, কোন বিরহীর দীর্ঘশ্বাস তো বিবি-কা-মকবারায় প্রাণসঞ্চার করে নি। এ যে নিতান্তই নিষ্প্রাণ সমাধি-মন্দির! 'তাজমহল' কবিতায় সম্রাট শাজাহানকে লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।" বিবি-কা-মকবারার শুভ্র সুষমা দেখে আমার মনে হ'ল, মানুষ আওরঙ্গজেব চাপা পড়ে গেছেন তাঁর কীর্ত্তির আড়ালে—সম্রাটের অন্তরের সম্পদকে ছাপিয়ে উঠেছে ঐশ্বর্য্যাড়ম্বর প্রকাশ করে খ্যাতিলাভের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা।

বিবি-কা-মকবারা দেখে শাহগঞ্জ বাস ষ্টেশনে পৌঁছে রোড ট্রান্সপোর্ট আপিসের বারান্দায় বসে ইলোরার বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি। সামনেই একটা পান-বিড়ির দোকান থেকে বড় মিঠে সুরের বাঁশীর আওয়াজ কানে আসে—বাঁশী বাজে খাঁটি গজল সুরে—সঙ্গে সঙ্গে হালকা চটুল তালের সঙ্গত। মনে লাগে অকারণ খুশীর আমেজ। সুরের ছোঁয়া-লাগা, মিষ্টি রোদে-ভরা দিনটিকে চেখে চেখে উপভোগ করি, মৃদু কণ্ঠে আওড়াই :

ইলোরার একটি গুহার সম্মুখভাগের দৃশ্য [ফোটো : শ্রী ডি. কে. ধবলীকার

"শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গারে আজি প্রাণ
নূতন দিনের আলোকে।"

ইলোরার বাস এসে পৌঁছল বেলা এগারোটা নাগাদ। খাঁ সাহেব আমাকে বাসে উঠিয়ে দিয়ে 'বন্দেগী জাহাপনা' ভঙ্গীতে আভূমি নত হয়ে সুদীর্ঘ সেলাম জানিয়ে বিদায় নিলে। যাত্রী-বোঝাই বাস ছেড়ে দিলে লক্ষ্য করে দেখি, পুরুষদের সকলেরই মাথায় লাল এবং জরদা রঙের পাগড়ি, মেয়েদের রঙীন সাড়ীগুলো কাছা দিয়ে পরা, কপালে মস্ত বড় কুঙ্কুমের ফোটা, মস্তক অনবগুণ্ঠিত—কোন কোন মরাঠিনীর চেহারায় কাঠিন্যের সঙ্গে কমনীয়তার এক অপূর্ব্ব সমন্বয়। পিচঢালা রাস্তার উপর দিয়ে মাইলকয়েক চলে বাস এসে থামল পাঁচগাও বাস ষ্টেশনে। বাঁদিকে রৌদ্রদগ্ধ পীতবর্ণ তৃণাচ্ছাদিত রুক্ষ উষর বন্ধুর পার্ব্বত্য প্রান্তর, মাঝে মাঝে ঘন-সন্নিবিষ্ট খেজুরগাছের সারি। সামনের দিকে অর্দ্ধবৃত্তাকার পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে প্রাকার-বেষ্টনীর মত। নয় মাইল যাবার পর বাস থামল দৌলতাবাদ দুর্গের নিকটে।

দৌলতাবাদ দুর্গের প্রতি আকর্ষণ ছিল আমার দুর্নিবার, কিন্তু কাছে গিয়ে দেখবার সময় হাতে নেই, কাজেই দূরের থেকে দেখেই তৃপ্ত হতে হ'ল। মাইলখানেক ব্যবধানে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২,২৫০

ফুট উচু এক শৈলসানুদেশে সমুন্নত শিরে দাঁড়িয়ে আছে দৌলতাবাদ দুর্গ—উপরের অংশ কালো রঙের আর নীচেকার অংশ সাদা। পাহাড়ের কটিদেশ কালো পাথরের প্রাকারে বেষ্টিত।

এই দুরারোহ দুর্ভেদ্য দুর্গের ইতিহাসের সূচনা দ্বাদশ শতাব্দী থেকে। অতি প্রাচীনকালে এই পাহাড়ের পাদদেশস্থ নগরীর নাম ছিল দেওগিরি, সম্ভবতঃ ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে যাদব বংশের কোন কীর্তিমান নৃপতি এই নগরীর পত্তন করেন—এই বংশ এখানে রাজত্ব করেন এক শতাব্দীরও অধিককাল। ১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এই দুর্গ আক্রমণ করে সম্রাট আলাউদ্দীন বিপুল ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে যান। ১৩০৯ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের শেষ স্বাধীন নৃপতি আত্মসমর্পণ করলেন মালিক কাফুরের নিকট। তাঁর জামাতা হরপাল দুর্জ্জয় সাহসের উপর ভরসা করে বিধর্ম্মীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করলেন, ফলে তাঁকে পেতে হ'ল ভয়াবহ নিদারুণ শাস্তি—জীবিতাবস্থায় তাঁর গাত্রচর্ম্ম উৎপাটিত করা হ'ল, আর তাঁর মস্তক বিদ্ধ করা হ'ল দুর্গতোরণের একটি পেরেকের উপর—এই শোকাবহ বীভৎস ঘটনার পরেই হ'ল যাদব-রাজত্বের অবসান।
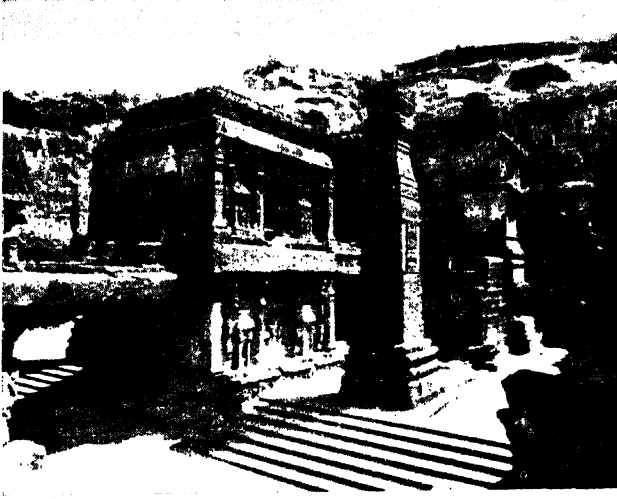
কৈলাস মন্দির, ইলোরা

দেওগিরির ইতিহাসে আর এক অধ্যায়ের সূত্রপাত হ'ল আবার ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন খেয়ালী নৃপতি মহম্মদ তোগলক দিল্লী থেকে দেওগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করবার জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন, তাঁর মন্দভাগ্য প্রজারা বাধ্য হ'ল এই নূতন শাসনকেন্দ্রে এসে বসতিস্থাপন করতে। সতের বৎসর পরে আবার তাদের দিল্লী ফিরে যাবার অনুমতি দেওয়া হ'ল। স্বদেশের ক্রোড়চ্যুত অধিকাংশ লোকই এরূপ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল যে, তারা এই নগরীতে থাকার চাইতে অশেষ ক্লেশ স্বীকার করে ছয় শত দশ মাইল পথ অতিক্রম করে দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করাই শ্রেয়ঃ বলে মনে করল।

কালক্রমে দৌলতাবাদে পাঠান রাজত্বেরও অবসান হয়ে প্রতিষ্ঠিত হ'ল মোগল আধিপত্য। কিন্তু গোলকুণ্ডা এবং বিজাপুরের রাজা যখন মোগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন তখন আর এই দুর্গের উপর তাঁদের আধিপত্য বজায় রাখা সম্ভবপর হ'ল না, বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে কূটনীতির দ্বারা আবার এই দুর্গ এল মোগলদের তাঁবে। ষোড়শ শতাব্দীর সপ্তম দশকের শেষের দিকে ফরাসী পর্যটক টাভার্নিয়ে যখন দৌলতাবাদে আসেন, তখন এখানে মোগল আধিপত্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত। দৌলতাবাদ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—"দৌলতাবাদ মোগল রাজ্যের শ্রেষ্ঠ দুর্গসমূহের অন্যতম। এই দুর্গটি সর্ব্বতোভাবে দুরারোহ এক পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। এর উপরে উঠবার রাস্তা একটিমাত্র, তাও আবার এত অপ্রশস্ত যে এক সঙ্গে একটিমাত্র ঘোড়া বা উট চলতে পারে। পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত নগরীটি উত্তমরূপে প্রাচীরবেষ্টিত।"

দুর্গের শীর্ষদেশস্থ অষ্টকোণবিশিষ্ট বারাদারী বা মণ্ডপগৃহ ছিল সম্রাট শাজাহান এবং তাঁর পুত্র বাদশাহ আওরঙ্গজেবের প্রিয় গ্রীষ্মনিবাস। এই অত্যুচ্চ স্থানে আছে বিশ ফুট দীর্ঘ একটি কামান। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের সৈন্যবাহিনীতে কর্ম্মরত জনৈক ওলন্দাজ এঞ্জিনীয়ারের বুদ্ধিকৌশলে ঐ কামান পাহাড়ের শীর্ষদেশে উত্তোলনের ব্যবস্থা হয়েছিল। এই দুর্গের চিনি মহল নামক প্রাসাদের সঙ্গে গোলকুণ্ডার শাহী বংশের শেষ স্বাধীন নৃপতি আবুল হাসান টানা শাহের বিষাদমাখা স্মৃতি বিজড়িত, আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক অন্তরায়িত হয়ে তের বৎসর বন্দীদশায় কাটিয়ে এই হতভাগ্য রাজা এখানেই অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দুর্গের সন্নিকটস্থ চাঁদ মিনার নামক গোলাপী রঙের সুদৃশ্য জয়স্তম্ভটি দূরের থেকে সুস্পষ্ট নজরে পড়ে। এটি নির্ম্মিত হয় ত্রয়োদশ কিংবা চতুর্দ্দশ শতকে। পনর ফুট ভিত্তিসহ এটির উচ্চতা এক শ' পাঁচ ফুট—এটির শীর্ষদেশ কিয়ৎপরিমাণে ক্রমসূক্ষ্মায়মাণ। মিনারের বাইরের দিকে চূণের প্রলেপের উপর হাল্কা নীল বর্ণের প্রয়োগে চমৎকার বাহার হয়েছে। এই অলঙ্করণের বেশীর ভাগই বিনষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু যেটুকু অটুট রয়েছে তা আজও আনকোরা বলে মনে হয়। গঠন-কৌশলের চমৎকার সৌসামঞ্জস্যের দরুন চাঁদ মিনার দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ স্মারক স্তম্ভসমূহের অন্যতম। উন্মুক্ত আকাশের নীচে দুর্গকিরীটী শৈলোপরি দণ্ডায়মান এই সুচারু স্মারক স্তম্ভটি

শুধু নয়নেরই পরিতৃপ্তি সাধন করে না, কল্পনাকেও উদ্বুদ্ধ করে। বাস ষ্টেশনের নিকটেই পাথরের প্রাচীরে ঘেরা শাহী ইমাম বা বাদশাহী আমলের রাজকীয় স্নানাগার। ভিতরে অজস্র লাল রঙের ফুল ফুটে রয়েছে। ওদিকে একটা চা ও পান-বিড়ির দোকানে গ্রামোফোন রেকর্ডে সিনেমার গান বাজছে। সাইনবোর্ডে মালিকের নাম দেখি সন্ত শ্রীজনার্দ্দন স্বামী। স্বামিজী চতুর্বর্গের এক বর্গলাভের অন্ধিসন্ধি ভালো করেই জানেন দেখছি। আশেপাশে দু'একটা

রাবণ কর্ত্তৃক কৈলাস পর্ব্বত উৎপাটন, ইলোরা

ভাঙা মসজিদ, এখানে সেখানে গোলায় ছাওয়া, মাটির বেড়া-দেওয়া ভাঙ'চোরা কুটীর, কোথাও-বা বন ঝোপের মাঝখানে ভগ্ন ইটের স্তূপ, চতুষ্পার্শ্বে কেমন যেন একটা শ্রীহীন ভাব। যে দৌলতাবাদ দুর্গের পাদমূলে একদা গড়ে উঠেছিল এক সমৃদ্ধ নগরী ও জনপদ আজ সেখানে কি লক্ষ্মীছাড়া দৈন্যদশার নিদর্শন!

মিনিট পনর অপেক্ষা করবার পর বাস ছাড়বার সময় হয়ে এল—উঠে এসে নিজের জায়গায় বসলাম। বাস ছেড়ে দিলে পরও দুর্গের পানে তাকিয়ে রইলাম—বিভিন্ন রাজবংশের গৌরবোজ্জ্বল অতীত স্তব্ধ হয়ে আছে এর পাষাণ-বেষ্টনীতে। সুদীর্ঘ আট শত বৎসর ধরে এমনিভাবে শৈলশিখরে দাঁড়িয়ে এই দুর্গ লক্ষ্য করছে ইতিহাসের কত পটপরিবর্তন, কত রাজবংশের উত্থান-পতন—কত জয়-পরাজয় ষড়যন্ত্র নৃশংসতার কাহিনী অদৃশ্য অক্ষরে লিখিত আছে এর পাষাণগাত্রে।

দৌলতাবাদ দুর্গ পেছনে ফেলে মোটর আঁকা-বাঁকা পার্ব্বত্য পথ বেয়ে একটু একটু করে উপরে উঠতে লাগল। এখানে আকাশ কি গভীর নীল! মনে হয়, বহু ঊর্দ্ধে সঞ্চরমাণ সাদা মেঘখণ্ডগুলোর গায়ে যেন নীল রঙের ছোপ লেগে যাবে।

মাইল পাঁচেক এগিয়ে মোটর এসে থামল খুলদাবাদে। এর অন্য নাম রাওজা। এই প্রাচীরঘেরা ছোট্ট শহরটি হচ্ছে দাক্ষিণাত্যের মুসলমানদের কারবালা তীর্থ। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের শবদেহকে এখানেই সমাধিস্থ করা হয়—সমাধিফলকে লেখা আছে—Here lies Aurangzeb···ইত্যাদি। দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে আওরঙ্গজেবের যেরূপ গভীর যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল আর কোন মোগল সম্রাটের তেমনটি হয় নি। এখানে তাঁর জীবনের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে—আওরঙ্গাবাদ প্রতিষ্ঠা,—দুরাণী বেগমের দেহান্ত, গোলকুণ্ডা জয় প্রভৃতি, অবশেষে তাঁর জীবন-নাট্যের যবনিকাপতনও হ'ল দিল্লী থেকে বহুদূরে দাক্ষিণাত্যে। যে অধিত্যকাভূমিতে তিনি অশান্তির ঝড় বইয়ে দিয়েছিলেন, সেখানকার মাটির বুকেই রচিত হ'ল তাঁর অশান্ত আত্মার চিরবিশ্রান্তি নিকেতন—বিশ্বনিয়ন্তার কি বিচিত্র বিধান!

শিব-পার্ব্বতীর বিবাহ, ইলোরা

রাওজাতে শুধু আওরঙ্গজেবের নয়, হায়দরাবাদের আশফ ঝাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা আশফ ঝা এবং অন্যান্য অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিরও সমাধি বিদ্যমান। চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে বহুসংখ্যক বিধ্বস্ত সমাধি, মসজিদ এবং আগেকার দিনের লোকবসতির ধ্বংসাবশেষসমূহ। এসব দেখে শুধু ঐহিক ঐশ্বর্য্য নয়, মনুষ্যজীবনের নশ্বরতার কথাও ভেবে মন নির্ব্বেদগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

খুলদাবাদ থেকে মোটর বাঁদিকে মোড় নিলে—আর দূরে নয় বহুপ্রতীক্ষিত ইলোরা। বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। না জানি চৌত্রিশটি গুহার প্রতিটি কক্ষে কি অভাবিত বিস্ময় অপেক্ষা করছে আমার জন্যে—সেখানে কি চরিতার্থ হবে আমার দীর্ঘকালের রূপবুভুক্ষা—রূপদক্ষ শিল্পীদের অনুপম সৃষ্টি দেখে, না রূপের মধ্যে রূপাতীতের প্রকাশ প্রত্যক্ষ করে মনে জাগবে আরও গভীরতর অতৃপ্তি! ইলোরা! ইলোরা—ভারতীয় শিল্পসাধনার ঐতিহ্যবিজড়িত এই নামটি যেন মধুক্ষরা—বার বার উচ্চারণ করেও মনের তৃপ্তি হয় না।

অবশেষে বাস থেকে নামতে হ'ল ইলোরা গুহার নিকটেই রাস্তার উপরে। বাঁদিকে সুদূরপ্রসারিত প্রান্তরের পেছনে কতকগুলি শিলাময় পাহাড়ের বিচিত্র রূপ দেখে মুগ্ধ হলাম—

এ যেন বিধাতার স্বহস্তনির্মিত ভাস্কর্য্যশিল্পের অনুপম নিদর্শন—এই নৈসর্গিক সৃষ্টি হয়ত আংশিক প্রেরণা সঞ্চার করেছিল ইলোরায় বিভিন্ন যুগের শিল্পীদের মনে।

দলে দলে যাত্রীরা চলেছে ইলোরা গুহার অভিমুখে—নিছক কৌতূহলী যাত্রীর দল, কিন্তু আমার এ বহুপ্রতীক্ষিত তীর্থদর্শন—মন্দিরপথযাত্রী ভক্তের আকুল আগ্রহ নিয়ে আমিও চলি তাদের পেছনে পেছনে, অল্পক্ষণের মধ্যেই এসে পৌঁছাই এক নম্বর গুহার সামনে। বাইরের দিকে গুহাগাত্রে ইংরেজীতে নম্বর দেওয়া আছে।

একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শিলাময় পাহাড় কেটে নির্ম্মিত গুহাগুলি উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত, দৈর্ঘ্য এক মাইলের চেয়ে কিছু বেশী। গুহার সংখ্যা সবসুদ্ধ চৌত্রিশটি। অজন্তার মত ইলোরার সবগুলিই কিন্তু বৌদ্ধ-মন্দির বা বৌদ্ধ-বিহার নয়। বৌদ্ধযুগের গৌরবময় দিনে ভারতে যে ভাস্কর্য এবং স্থাপত্যশিল্পের উদ্ভব হয়েছিল, পরবর্ত্তীকালে ব্রাহ্মণ্য এবং জৈন ধর্ম্মের আওতায় তার ক্রমবিকশিত রূপের পরিচয় মেলে ইলোরার স্থাপত্যে এবং ভাস্কর্য্যে। গুহাপুঞ্জ তিনটি অংশে বিভক্ত। দক্ষিণপ্রান্তের গুহাগুলি বৌদ্ধগুহা, উত্তর প্রান্তের ৩০ নং থেকে ৩৪ নং পর্য্যন্ত জৈন গুহা এবং এই দুই অংশের মধ্যবর্ত্তী গুহাপুঞ্জ ব্রাহ্মণ্য গুহা।

বৌদ্ধ, জৈন এবং ব্রাহ্মণ্য—ভারতের তিনটি যুগের ভাস্কর্য্য এবং স্থাপত্যশিল্পের ত্রিবেণীতীর্থ এই ইলোরা গুহানিচয়। অধ্যাত্ম-আদর্শে অনুপ্রাণিত ভারতের শিল্পীরা এখানে যে অপরূপ রূপসৃষ্টি করে গেছেন, কালজয়ী হয়ে তা লাভ করেছে চিরন্তন মর্য্যাদা। এখানেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে স্বকীয় মহিমায় গৌরবোন্নত শিরে দাঁড়িয়ে আছে একটি মাত্র শিলাময় পাহাড় কেটে তৈরি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিস্ময় কৈলাস মন্দির—ব্রাহ্মণযুগের হিন্দুর শিল্প-প্রতিভা এই মন্দিরের রূপসৃষ্টির মাধ্যমে বিকশিত হয়ে উঠেছিল পরিপূর্ণ মহিমায়। কৈলাস মন্দির অপূর্ব্ব অদ্ভুত, অনুপম। আজ পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে, কোন দেশে কোন কালে এমন কোন পাথর-কাটা মন্দির নির্ম্মিত হয় নি যা পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যে, অলঙ্করণ-শিল্পের সূক্ষ্ম সৌকুমার্য্যে, দেবমূর্ত্তির গঠনসৌষ্ঠবে এবং সর্ব্বোপরি অধ্যাত্ম অনুভূতির রূপময় প্রকাশে কৈলাস-মন্দিরের সমকক্ষ বলে গণ্য হতে পারে।

শ্রেষ্ঠ পূজা

শ্রীতপতী মুখোপাধ্যায়

আমার দৃষ্টির দীপ নিভে গেল, আঁধারে বিলীন
বিশ্ব, না কাটিতে অর্দ্ধেক জীবন, হ'ল আলোহীন।
অপমৃত্যু ঘটে গেছে, যে প্রতিভা দিয়েছিলে, স্বামী,
বিকশিত হয় নি তা, যদিও সে মনে প্রাণে আমি
চেয়েছি করিতে সেবা তাহা দিয়া আমার স্রষ্টারে,
জীবনের দিনপঞ্জী চাহি আমি দেখাবারে তাঁরে।
তবু মোর ভয় হয়, পাছে
শাস্তি মোরে পেতে হয় মৃত্যুর পরেতে তার কাছে।
"সারাটি দিনের কাজ মোর কাছে চাহিবেন তিনি,
করেছেন বঞ্চিত গো দিবসের আলো থেকে যিনি ?"
জিজ্ঞাসি মূর্খের মত, মূঢ় আমি, ধৈর্য্য যে আমার
থামাইল সে গুঞ্জন আর দিল উত্তর তাহার,

"মানবের কৃত কর্ম্ম চাহেন না কভু ভগবান,
কিম্বা মানুষেরে দেওয়া তাঁহার দানের প্রতিদান।
রাজরাজেশ্বর তিনি : সহস্র যে দেবদূত তাঁর,
জলে স্থলে ক্লান্তিহীন ছুটিয়া চলেছে অনিবার।
মানুষের কোন কাজে তাঁহার নাহিক প্রয়োজন,
ঐকান্তিক প্রচেষ্টাই তাঁহার পূজার শ্রেষ্ঠধন।
প্রত্যক্ষ কাজের দ্বারা তাঁর পূজা করে যেই জন,
ভালবাসা সেই পায়। তবু জানি তাহারই মতন
শুধু যে দাঁড়ায়ে আছে তাঁহার আহ্বান প্রতীক্ষায়,
অপার তাঁহার স্নেহ, সেও তার ভালবাসা পায়।

[মিল্টনের "On His Blindness" এর ভাব অবলম্বনে]

'ডিটেকটিভ'

শ্রীহীরেন মুখোপাধ্যায়

উনিশ শ' পঁয়ত্রিশ সনের ব্যাপার তাই, পঞ্চাশ সন হলে এতক্ষণে 'আপৎকালীন অবস্থা' ঘোষণা হয়ে যেত।

যতক্ষণ দিনের আলো আছে বেশ আছে, সন্ধ্যেটি হয়েছে কি আর রক্ষে নেই। একখান দুখান করে সুরু হয়ে শেষে শিলা-বৃষ্টির মত ইট পড়তে থাকে চতুর্দিকে। তাও কি শুধু ইট, সঙ্গে থান থান লাইনের পোয়া। কোনগতিকে একখানা মাথায় এসে পড়লে আর 'মা' বলতে দেবে না। সামনেই আবার রেললাইন, অতএব খোয়ার বাজেটে ঘাটতি পড়ারও আপাততঃ বিশেষ কোন সম্ভাবনা নেই।

রাত যত বাড়তে থাকে বর্ষণের বেগও তত বৃদ্ধি পায়। বেশ খানিকটা একটানা বর্ষণের পর হয়ত কিছুক্ষণের জন্যে ছেদ পড়ল, তাও ঠিক যে কতক্ষণের জন্যে তারও কোন স্থিরতা নেই। হয়ত সারা রাতের মধ্যে আর হ'লই না, আবার হয়ত বর্ষার জলো-মেঘের মত, কখনও ফিসফিসানি, কখনও মুষলধারে, সারাক্ষণই এই করে কাটল। কিন্তু যা-কিছু হবার ওই রাতটুকুর মধ্যেই, সূর্য্য উঠেছে কি বাস, আর কোন হাঙ্গামা নেই।

ছোট পাড়া, সব জড়িয়ে বড়জোর ঘরবিশেক লোকের বাস। পাকাবাড়ী যা দু'চারখানা আছে বেশীর ভাগই মহারাণী ভিক্টো-রিয়ার আমলের, নতুবা বাড়ী-ঘর বলতে সবই প্রায় টালির ছাত আর মাটির দেয়াল। পাড়ার ঠিক মধ্যিখানেই খানিকটা ফাঁকা জায়গা, অনেকটা এজমালী-মত। তার এক পাশে হাবু মাষ্টারের পাঠশালা (দরজা জানালা অপহৃত একখানা পাকা ঘর) আর সার্ব্বজনীন পাঠাগার (এর দরজা জানলা ক'খানা এখনও স্থানচ্যুত হয় নি বটে, তবে মাথার উপর অশ্বত্থ শিমুল আর বনশিউলীর বিচিত্র সমারোহ)। এক পাশে নরহরি কাকার হাল আমলের 'আনন্দ নিকেতন', ওপাশে মোক্ষদা গয়লানীর খোলার ঘর, আর সামনেই ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা রাস্তা চলে গেছে বরাবর ইষ্টিশান পর্য্যন্ত। চত্বরের ঠিক মধ্যিখানেই ত্রিপদ-অবশিষ্ট অশ্বচালিত বারোয়ারী রথ, বছরের মধ্যে দশটা দিন ছাড়া বাকি সময়টা টিন দিয়ে ঢাকা থাকে। রথের খানকয়েক চাকা ভেঙ্গে যাওয়ায় আপাততঃ ক'বছর হ'ল জগন্নাথদেব চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে পড়েছেন।

পাড়ার একটা 'ডিফেন্স পার্টি' আছে অনেককালের। বছরের মধ্যে ফাল্গুন থেকে জ্যৈষ্ঠ এই চারটে মাস, বর্ষার জলপাওয়া মরা দুর্ব্বোঘাসের মত হঠাৎ এ জীইয়ে ওঠে; তারপর আকাশে বর্ষার জলভরা মেঘের আবির্ভাব হওয়ামাত্রই এর গুরুদায়িত্ব অকস্মাৎ শেষ হয়ে যায়। সারা বছরের মধ্যে এই বিশেষ ক'টা মাসই বা কেন রাত জেগে পাহারা দিতে হয় এর সঠিক কারণ এখনও উপলব্ধি করতে পারি নি। তবে অনেক ভেবে চিন্তে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি যে, বর্ষাকালের জল-কাদা ভেঙ্গে আর শীতকালে নাকে কানে কাপড় জড়িয়ে সিঁধকাটি নিয়ে বেরোবার মত স্পৃহা অতি বড় অভাবী চোরেরও বোধ হয় থাকে না। তা ছাড়া গৃহস্থের বাগানের আম, কাঁঠালও এ সময় এক-আধটা করে নামতে সুরু করে, তাই পরোপকাররূপ মহৎপ্রবৃত্তিটা এই সময়টাতেই হঠাৎ প্রবল হয়ে দেখা দেয়।

কিন্তু তাই বলে লোকদেখানো বাঘশিকারে বেরিয়ে শেষে সত্যি সত্যিই যে বাঘের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে অতটা কে আর তখন ভাবতে পেরেছিল।

জরুরি মিটিং 'ডিফেন্স পার্টি'র। 'বর্ত্তমান গুরুতর পরিস্থিতি'ই আজকের আলোচ্য বিষয়বস্তু! আশাতীত লোকসমাগম হয়েছে। খবর পেয়ে আশেপাশের তাঁতীপাড়া, মালোপাড়া থেকেও লোক এসেছে 'বাবুমশায়দের' রগড় দেখতে। পাড়ার বদ্যিনাথ পাকড়াশী ওরফে সার্ব্বজনীন বদুদা সম্মুখসমরে একবার এক ব্যাঘ্র-নন্দনকে নিহত করায় সেই থেকে ডিফেন্স পার্টির আজীবন অনারারী ক্যাপ্টেন। জনকয়েক বিশ্ব-নিন্দুক ছাড়া একথা সবাই স্বীকার করে যে, তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। যাত্রা, থিয়েটারে 'হিরোর' পার্ট চিরকাল তাঁরই প্রাপ্য; ওজস্বিনী বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতাটাও ওখান থেকেই আয়ত্ত করেছেন। তাই সুযোগ-সুবিধা পেলেই সভা-সমিতিতে একটা করে রোমাঞ্চকর বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। আজকেও চারদিকের অবস্থাটা একবার নিরীক্ষণ করে নিয়ে বারকয়েক গলাখাঁকারি দিয়ে সুরু করলেন—

ভাই সব, আজ আমাদের বড় দুর্দ্দিন। সামনে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে অমানিশার গাঢ় অন্ধকার; চামচিকের মত কালো, মরার মত স্থির, জোঁকের ন্যায়ই কুটিল। তবু এই অন্ধকার পথ বেয়েই অগ্রসর হতে হবে তোমাদের আশায় বুক বেঁধে। আলো নাই-বা রইল, অন্তরের গভীর জিজ্ঞাসা অগ্নিশিখা হয়ে জোনাকির মত টিপ টিপ করতে থাকবে তোমাদের ললাটে। সহায়-সম্বল নাই-বা রইল, বুকের দুর্জ্জয় সাহসই হবে তোমাদের পথের পাথেয়। বন্ধু, সহকর্ম্মী নাই-বা রইল আকাশের লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রই হবে তোমাদের পথচলার সঙ্গী। অজানা পথের পথিক তোমরা, দিগভ্রান্ত হলে ত তোমাদের চলবে না।

হাততালির আওয়াজের চোটে কানে তালা লেগে যাওয়ার যোগাড়।

একটু দম নিয়ে বদুদা আবার বলতে লাগলেন, ব্রিটিশের শাসনে নিরুপদ্রবে বাস করে আজ আমরা আত্মরক্ষার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলেছি, এ বড় লজ্জার কথা। তাই আমার মনে হয় অদূর ভবিষ্যতেই যাদের উপর দেশের শান্তিশৃঙ্খলা

রক্ষার ভার পড়বে, তাদের নিজেদের সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন বাধ্যতা-মূলক সামরিক শিক্ষার।

ভাইস-ক্যাপ্টেন নীলুদা এটেনশনের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, এ প্রস্তাব আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

রীতিমত গণতান্ত্রিক প্রথা। একজন প্রস্তাব উত্থাপন করবে, একজন সমর্থন করবে, বাকি সকলে হাততালি দেবে। কোথাও এতটুকু ত্রুটি হবার জো নেই।

বহুদা বললেন, তা হলে এই ঠিক হ'ল, কাল থেকে ডিফেন্স পার্টির প্রত্যেক সভ্যকে 'রেগুলার মিলিটারী ট্রেনিং' নিতে হবে। ট্রেনিং দেবে আমাদের নীলু, গত বছর ডিফেন্স পার্টির তরফ থেকে সদরে গিয়ে ও ট্রেনিং নিয়ে এসেছে। তা ছাড়া সবাইকে নিয়মমত পাহারায় বেরোতে হবে। কে কবে বেরোবে তার একটা 'ফিক্সচার' আজই আমি বাড়ীতে গিয়ে ঠিক করে ফেলছি। কার কবে দিন পড়ল কাল সব আমার কাছ থেকে জেনে নিয়ে আসবে।

সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়ে সভাভঙ্গ হ'ল।

সবাই উঠি উঠি করছি হঠাৎ ওদিক থেকে বিবিঙ্কির ঠাকুরমা ডুকরে কেঁদে উঠল। কপালে করাঘাত করে বললে, কি করতে জন্মেছিনু গো ছোটনোকের ঘরে, ছেরটা কাল কুকুর শেয়ালের অধম হয়ে কাটাতে হ'ল।

হাঁ হাঁ করে উঠল সবাই ; কি হ'ল রাঙাদি, কি হ'ল ?

কাপড়ের খুঁটে সশব্দে নাক ঝেড়ে ধরা গলায় রাঙাদি বললে, হবে আর কি। বলছিলাম, ভদ্দরনোক না হলে এমন সোন্দর সোন্দর কথাগুনো কি আর মুখ দিয়ে বার করতে পারে। শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, আহা কথা নয় ত যেন গোকুল ঘোষের ভীমের পাট, হাতে শুধু একটা গদা নেই এই যা। তাও ত ছাই সব কথা এখন আর কানে ঢোকে না, যেটুকু শুনতে পেয়েছি তাতেই দেখ না গায়ের এখনও কাঁটা মরে নি।

সত্যি সত্যিই একটা লণ্ঠনের সামনে বাঁ হাতখানা তুলে ধরল রাঙাদি।

পরের দিন রাত্রিবেলা নীলুদা এসে ডাকাডাকি আরম্ভ করলে। টিকটিকি যেমন করে উচ্চিংড়েকে ধরে নিয়ে যায় তেমনি করে ধরে নিয়ে গেল বাড়ী থেকে। বাইরে বেরিয়ে দেখলাম সব-সুদ্ধ জন-বার জুটেছে, তা ছাড়া বহুদার কালকের ওজস্বিনী বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে মালোপাড়া থেকে একজন এসে হাজির হয়েছে, নাম হরিচরণ। নীলুদাই আমাদের 'সেক্সান লীডার'। প্রতি দলে চারজন করে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনটে 'গ্রুপ' তৈরি করে ফেললে। একদলকে পাঠিয়ে দিলে রেললাইনের ধারে বলখেলার মাঠের দিকে, একদলকে পাঠিয়ে দিলে ষ্টেশন-বাজারের দিকে, আমাদের দলটাকে রাখলে রথতলায়, আর নিজে একা বেরুল ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা-বরাবর টহল দিতে।

রাত বড়জোর দশটা হবে। বাইরে ফুট ফুট করছে চাঁদের আলো। একখানা খেজুর পাতার চাটাই বিছিয়ে চুপচাপ ক'জনে বসে আছি হাবু মাষ্টারের পাঠশালায়। সারা পাড়াটা এরই মধ্যে ঘুমে অচেতন। আমাদেরও একটু একটু ঢুলুনি আসছিল, হঠাৎ রথের টিন থেকে ধাতব ঝঙ্কার উঠল, ঠং।

ঠোঁটকাটা ষষ্ঠী (দুর্ম্মুখ বলে সবাই তাকে ওই নামে ডাকে) পাশেই বসেছিল, কোমরে একটা মর্ম্মভেদী চিমটি কেটে চাপা গলায় ডাকলে, বেন্দা।

ঘুম তৎক্ষণে ছুটে গেছে, ওদিক থেকে আবার একটা আওয়াজ উঠল, ঠং।

ও কোণ থেকে হরিচরণ করুণ কণ্ঠে বলে উঠল, বলি বাবু-মশায়রা জেগে আছেন ত ?

ঠোঁটকাটা ষষ্ঠী খ্যাক করে উঠল, জেগে নয় ত কি ঘুমিয়ে থাকব নাকি কানের পাশে এই বাদ্যি শুনে ?

বাইরে রীতিমত শিলাবৃষ্টি সুরু হয়ে গেছে। কোনদিক থেকে আসছে, কোথা দিয়ে আসছে, কিছুই বোঝার উপায় নেই, অবিরাম টিনের বাজনা শুনতে পাচ্ছি এই পর্য্যন্ত। আশপাশের বনে ঝোপে, মাটির ওপরে, বাড়ীতে দেয়ালের গায়েও যে দু'দশটা পড়ছে না এমন নয়। চাটাইখানাকে টেনে নিয়ে দেয়ালের দিকে সরে বসলাম। ওদিক থেকে মোক্ষদা গয়লানী হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে শাপ-শাপান্ত সুরু করে দিলে—তার চালের একখানা টালি বোধ হয় ফাটল। এ পাশ থেকে নরহরি কাকাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুদারায় রামনাম সাধতে সুরু করে দিলেন, তাঁর জানালার কবাটে খুব সম্ভব একখানা ঠোক্কর খেয়েছে। মাঠের দিকে যারা ছিল একটু বাদেই তারা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির হ'ল, ওখানে নাকি কানের পাশ দিয়ে ভীমরুল ডেকে যেতে সুরু করেছে। বাজারের দলও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পড়ি কি মরি করে এসে ঢুকল পাঠশালার ভেতরে, সেখানকার অবস্থা আরও খারাপ। নীলুদাও এসে পড়ল একটু বাদেই ; প্রাণের মায়াটা ত আছে সবারই।

পুষ্পবৃষ্টি বন্ধ হ'ল প্রায় মিনিট কুড়ি বাদে। আগে নীলুদা, তারপর আমরা একে একে বেরিয়ে এলাম হাবু মাষ্টারের পাঠশালা থেকে। ঘাসের উপর চাঁদের আলোয় চক চক করছে অসংখ্য রেল-লাইনের খোয়া। একখানা পোয়াটাক আন্দাজ তুলে নিয়ে ষষ্ঠীচরণ বললে, ওজনটা দেখেছিস বেন্দা।

বাকী ইঙ্গিতটুকু সুস্পষ্ট।

মানুষের গলার আওয়াজ পেয়ে মোক্ষদা গয়লানীর শাপ-শাপান্ত আর নরহরি কাকার রামনাম যুগপৎ বন্ধ হয়ে গেল। দোতলা থেকে জানলার একখানা কপাট ঈষৎ ফাঁক করে নরহরিকাকা বললেন, কে নীলু নাকি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—চারদিকটা একবার ভাল করে খুঁজে দেখ দিকি বাবা। ভূতটুত কিছু নয়, ওসব বাজে কথা, কোন বদমাস লোকেরই কাণ্ড, কাছেপিঠেই আছে কোথাও ঘাপটি মেরে। ভয়ের কোন

কারণ নেই, সারা পাড়া এখনও জেগে; তা ছাড়া আমি ত রইলামই, যখন ডাকবে তখনই সাড়া পাবে।

ঠোঁটকাটা ষষ্ঠী হাসি চাপতে গিয়ে বেড়ালের মতো ফ্যাচ করে উঠল। নীলুদা একটা ধমক দিয়ে বললে, ঠিক আছে কাকা, আপনি নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমোনগে যান, আমি দেখছি এদিকে। যদি দরকার টরকার কিছু পড়ে তখন ডাকব'খন।

একে ভীতু মানুষ নরহরি কাকা, তার উপরে পাটের ব্যবসায়ে দু'পয়সা করার পর থেকে রাত্তিরে ভাল করে ঘুমোতে পারেন না।

কোথায় কে, চারিদিকে ভোঁ-ভাঁ। মাঠ পেরিয়ে রেল-লাইনের উপর এসে পৌঁছলাম, সেখানেও কেউ নেই। মাঠের উত্তরদিক থেকে আরম্ভ করে ষ্টেশন-বাজার পর্যন্ত রেল-লাইনের ধার বরাবর বন-শিউলীর জঙ্গল। মাঝে মাঝে তাল, খেজুর আর তেঁতুল গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এর ভেতরে যদি কেউ লুকিয়ে বসে থাকে তা হলে অবিশ্যি আলাদা কথা, সে রকম অবস্থায় একটা ছেড়ে একশ'টা লোকও তাকে খুঁজে বার করতে পারবে না এর ভেতর থেকে।

মাথার উপর হাতের চেটো দুখানা আড়াআড়ি করে পেতে শুকনো মুখে সবাই চলতে থাকি নীলুদার পিছু পিছু। বলা যায় না দৈবাৎ যদি মাথায় এসে পড়ে ত হাতের উপর দিয়েই যাবে, প্রাণটা বেঁচে যাওয়ার সমধিক সম্ভাবনা।

দু'চারটে চক্কর মেরে আবার ফিরে এলাম পাঠশালায়। চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে কখন যে চোখের পাতা দুটো এক হয়ে গিয়েছিল খেয়াল নেই, হঠাৎ একটা ধাতব ঝঙ্কারে ছ্যাৎ করে ঘুমটা ছেড়ে গেল। চোখ রগড়ে উঠে বসতে না বসতে রথের টিন থেকে আবার আওয়াজ উঠল, ঠং।

—জ্বালালে বাবা, ষষ্ঠীচরণ পাশ ফিরে শুলো।

সারা রাতের মধ্যে প্রায় বারচারেক বর্ষণ চলেছিল, তারই জের চলছে আজ সকালবেলা। পাথরের ঘায়ে মোক্ষদা গয়লানীর খোলার চালের খানকয়েক টালি কাল পরমাগতি লাভ করেছে। তারই শোকে কাতর হয়ে মোক্ষদাসুন্দরী সকালে উঠেই সেই অজ্ঞাত-পরিচয় 'ড্যাকরা'র চতুর্দ্দশ পুরুষের ভিটেয় ঘুঘু চরাতে সুরু করে দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে এমন সব শুভকামনা ব্যক্ত করছে যা শুনলে সে ব্যক্তি সবিশেষ পুলকিত হয়ে উঠবে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। আমাদের মুখে আনুপূর্ব্বিক সবকিছু শুনে বড়দা বললেন, ঠিক আছে, কিচ্ছু ঘাবড়াস না। আমি যখন ক্যাপ্টেন রইছি তখন এর একটা বিহিত না করে ছাড়ছি না। ভূতই হোক আর মানুষই হোক, বাছাধনকে একটু শিক্ষা দিয়ে দিতে চাই। এই ন'টার ট্রেনেই আমি থানায় চললাম; কিন্তু দেখিস তোরা যেন এদিকে কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা করিস নে। নীলু, বলা রইল আজ থেকেই যেন এদের মিলিটারী ট্রেনিং সুরু হয়ে যায়।

মিলিটারী ট্রেনিং সুরু হ'ল। সত্যিকারের মিলিটারী ট্রেনিং যে কি বস্তু এর থেকেই তা হাড়ে হাড়ে অনুমান করে নিলাম। বোশেখ মাসের খরা রোদ্দুরে খোলা মাঠে সকাল ছ'টা থেকে বেলা বারোটা এই ছয় ঘণ্টা শিরদাঁড়া সোজা রেখে সমানে 'লেফট রাইট' আর 'কুইক মার্চ্চ'। কাঁধে আবার একখানা আধমুণে রাইফেল্স, অবিশ্যি সত্যিকারের হলে এতটা দুশ্চিন্তার কারণ ছিল না। কাঁচা বাঁশের গোড়াকার হাত দুই অংশ কেটে নিয়ে রাইফেলের অনুকল্প এক গদা বানানো হয়েছে। শিরদাঁড়া কট কট করছে তবু রেহাই নেই, তালভঙ্গ হয়েছে কি কিটব্যাগ (জলে ভেজানো দু'খানা বড় বড় থান ইট) ঘাড়ে করে পঞ্চাশ গজ দৌড়। কাছেপিঠে কোন গাছতলায় গিয়ে যে দুদণ্ড জিরিয়ে আসব তারও উপায় নেই, ননীর শরীর নিয়ে নাকি মিলিটারী ট্রেনিং নেওয়া চলে না। এমতাবস্থায় প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয়ে এসেছে তখন নিতান্ত করুণাপরবশ হয়ে নীলুদা বললে, আজ প্রথম দিন এই পর্য্যন্তই থাক, কাল আবার হবে'খন।

আমাদের তখন এমন অবস্থা যে ছেড়ে দিলে কেঁদে বাঁচি

বিকেলের গাড়ীতে বড়দা ফিরলেন থানা থেকে। গাড়ী থেকে নামতেই সবাই সোৎসুক নেত্রে উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইলাম তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শোনার জন্য। বড়দা অধিনায়কোচিত গাম্ভীর্য্য যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখে আস্তে আস্তে পকেট থেকে টেনে বার করলেন একখানা কালো রঙের দু'ব্যাটারীর টর্চ্চ।

আমরা কেউ কিছু বুঝতে না পেরে এ ওর মুখের দিকে চাইতে লাগলাম।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না, বড়দা নিজে থেকেই সুরু করলেন, থানায় পৌঁছুতেই বড় দারোগা শিবচরণবাবু বললেন, 'আরে বদ্দিনাথবাবু যে, আসুন আসুন, তারপর খবর কি মশাই।' আগাগোড়া সব বললাম, তিনিও গভীর মনোনিবেশ সহকারে সবকিছু শুনলেন। শুনে বললেন, 'দেখুন বদ্দিনাথবাবু, গবর্মেণ্ট এ সব ব্যাপারে সব সময় আপনাদের পেছনে আছে জেনে রাখবেন, তবে কি জানেন এত বড় একটা দেশের শাসনভার চালাতে হচ্ছে তাদের, কত বড় বড় সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে, এ সময় এ সব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে থাকতে গেলে কি আর তাদের চলে? তাই এ সব ব্যাপারে সরকার আপনাদের খুব বেশী কিছু সাহায্য করতে পারবেন না। তবে এয়েছেন যখন অদ্দুর থেকে, আপাততঃ এই টর্চ্চটাই নিয়ে যান; নতুন আমদানী আমেরিকান মাল, তিন শ' ফুট ফোকাসিং, ডবল সুইচ, ডবল ব্যাটারী। দুটো ব্যাটারীও ওই সঙ্গেই দিয়ে দিলাম। তবে যদ্দুর মনে হচ্ছে কোন পাজী-বদমাস লোকেরই কাণ্ড, তার ওপরে আপনার মত 'এফিসিয়েণ্ট' লোক থাকতে এর মধ্যে আমরা আর ও নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না।

ঠোঁটকাটা ষষ্ঠী ফস করে বলে উঠল, ঠিক ঐ রকম টর্চ্চই যেন সেদিন দেখছিলাম—কলকাতায় ফুটপাথের উপর ঢেলে বেচছে।

বড়দা একবার রোষকষায়িত দৃষ্টি মেলে ষষ্ঠীর পানে তাকালেন। কিন্তু না, এ সব ব্যাপারে ষষ্ঠীর মত একজন অর্ডিনারী মেম্বারের সঙ্গে তর্ক করা তাঁর আত্মসম্ভ্রমে বাধে, তাই জবাব দেবার আর কোন প্রয়োজন বোধ করলেন না।

রাত্রিবেলা নীলুদা এসে যখন ডাকাডাকি সুরু করল তখন সর্ব্বাঙ্গে পাকা ফোড়ার বেদনা। মনে পড়ল পুরো ছ'ঘণ্টা এই শরীরের উপর দিয়ে মিলিটারী ট্রেনিঙের ধকল বয়ে গেছে। বেরিয়ে দেখি নীলুদার পুরোদস্তুর মিলিটারী সাজ। আমায় খালি-হাতে বেরুতে দেখে সবিস্ময়ে নীলুদা বলল, রাইফেল আনিস নি?

থতমত খেয়ে বললাম, না ত?

নীলুদা খেঁকিয়ে উঠল, কি করতে বেরুচ্ছ তা হলে শুনি, হাওয়া খেতে? যা রাইফেল নিয়ে আয়।

মনে হ'ল ডাক ছেড়ে কাঁদি, কিন্তু তাতেও কোন ফল হবে বোধ হ'ল না। সূর্য্য পশ্চিমে উঠবে তবু 'মিলিটারী রুলের' ব্যতিক্রম ঘটবে না। অগত্যা কাঁচা বাঁশের সেই ভীমসেনী ঘাড়ে করে কোন-রকমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে পড়লাম। রথতলায় পৌঁছে দেখি অনেকের অবস্থা আমার চেয়েও শোচনীয়—কেউ কেউ এক-খানা আস্ত থলেকে জামার আকৃতি দিয়ে গায়ে চড়িয়েছে, উদ্দেশ্য সাধু, শিরদাঁড়া আর পাঁজরার হাড় ক'খানাকে কোনরকমে বাঁচানো। বিপদে পড়লে মানুষের কেমন মাথা খেলে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম।

ওদিক থেকে কে একজন প্রশ্ন করলে, নীলুদা, আজ—বড়দা বেরুবে না?

কথাটা মনে লাগল সবারই। এতগুলো লোকের মাথা খাটবে আর একজন ওদিকে দিব্যি নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমোবে, এতটা সহ্য করার মত উদারতা অনেকেরই নেই।

সবার মনের ভাবগতিক নিরীক্ষণ করে নীলুদা বললে, আচ্ছা চ' একবার জিগ্যেস করে আসি বেরুবে কিনা। কিন্তু ও রকম করে কারও যাওয়া চলবে না, সব 'রো' দিয়ে দাঁড়াও। সবাই রো দিয়ে দাঁড়ালাম।

নীলুদা একবার দেখে নিয়ে বললে, হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে। চল সব, কুইক মার্চ্চ।

দোতলায় রাস্তার দিকের একখানা ঘরে বড়দা শোয়। নীচে দাঁড়াতেই মৃদারায় নাসিকাগর্জ্জন কানে এল। খানিক হাঁকাহাঁকির পর জানালার একখানা কপাট খুলে বড়দা বললেন, কে?

নীলুদা উপরদিকে মুখ করে বললে, আজ বেরুবে নাকি বড়দা?

বড়দা যেন একটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু শোনার আশা করছিলেন—এমন ভাব দেখিয়ে বললেন, এরই জন্যে এত ডাকাহাঁকা, আমি ভাবলাম কি না কি। এই সামান্য একটা ব্যাপারের পেছনে আমি কি মাথা ঘামাব ত তুই রইছিস কি জন্যে। তা ছাড়া আমার পর ত তোকেই ক্যাপ্টেন হতে হবে, এখন, থেকেই তার একটু দায়িত্ব টায়িত্ব নিতে না শিখলে তখন গিয়ে করবি কি? যা ভয়ের কিছু নেই, আমি না হয় মাঝরাতে একটা 'সারপ্রাইজ ভিজিট' দিয়ে আসব'খন।

ঠোঁটকাটা ষষ্ঠী বললে, তা হলে না হয় টর্চ্চটাই আমাদের দাও, নিজের ব্যাটারী পুড়িয়ে কে আর কাঁহাতক টর্চ্চ জ্বালবে?

বড়দা সবিস্ময়ে বললেন, টর্চ্চ? এই জ্যোছনা রাত্তিরে টর্চ্চ কি হবে রে? গবর্মেণ্টের জিনিষ বলে তার কি আর মা-বাপ নেই? তা ছাড়া যে গবর্মেণ্ট এদ্দিন ধরে খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে, তার ভালমন্দ লাভ-লোকসানের দিকটা তোদের দেখতে হবে না? এই রকম মনোভাব নিয়ে—

খট করে কি একটা এসে ঠোক্কর খেল বড়দার একখানা জানালার কপাটে, পরক্ষণেই আমাদের মুখের উপর কপাটখানা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল ভেতর থেকে। কি যে হ'ল ঠিক বুঝে উঠতে না উঠতেই আর একটা কঠিন বস্তু দেয়ালে লেগে সশব্দে গড়িয়ে পড়ল উপরের বারান্দায়।

এবার আর কারও বুঝতে বাকি নেই। সবাই আর কাল-বিলম্ব না করে উদ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল হাবু মাষ্টারের পাঠশালা লক্ষ্য করে।

নীলুদা পেছন থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে হাঁকলে 'ফল ইন্'।

আর ফল ইন্, সবাই এতক্ষণে পৈতৃক প্রাণটাকে কোনরকমে বাঁচিয়ে ঢুকে পড়েছে হাবু মাষ্টারের পাঠশালায়।

এদিকে নরহরি কাকার রামনাম আর মোক্ষদাসুন্দরীর প্রীতি-সম্ভাষণ ততক্ষণে পাল্লা দিয়ে সুরু হয়ে গেছে।

পরের দিন বড়দার সঙ্গে দেখা হতেই বললেন, কাল যে তোরা পালিয়ে এলি বড়? আমি তখনি তখনি ছাতে উঠে চারধারে টর্চ্চ ফেলে তোদের কারও টিকিটি দেখতে পেলাম না।

অতি কষ্টে হাসি চাপলাম। হাবু মাষ্টারের পাঠশালা থেকে বড়দার বাড়ীর ছাত স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়, সেখান থেকে টর্চ্চ ফেললে আমাদের চোখ এড়াত না। কিন্তু সে কথা বেমালুম চেপে গিয়ে বললাম, আমরা ত আর তাল্লে পানি পাচ্ছি না বড়দা, তুমিই না-হয় একবার দেখ না কেন?

বড়দা গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, তোদের ওপর এই সামান্য কাজের ভারটুকু দিয়েও দেখছি ভরসা নেই। আচ্ছা দেখি আমিই না হয় আজ বেরুব'খন।

রাত্রিবেলা বড়দা যখন বেরুলেন তখন আর তাঁকে চেনবার উপায় নেই। মাথার টুপীখানা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডি কায়দায় নাক পর্য্যন্ত নামানো। গায়ে একখানা স্থূল 'ওয়াটার প্রুফ' জড়ানো, দরকার হলে যাতে 'শকপ্রুফে'র কাজ করতে পারে। পায়ে দুখানা কামানের মত দেখতে হাঁটু পর্য্যন্ত তোলা রবারের জুতো, সেও একরকম 'অল-প্রুফ'। এ রকম অপূর্ব্ব পোশাকে ভূষিত হয়ে বড়দা

...ন রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলেন, তখন দেখে শ্রদ্ধা না জাগা ...ড়া উপায় ছিল না।

আমাদের ক'জনকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্কুদা হাঁটতে লাগলেন রেল-...ইনের উপর দিয়ে। রাত বড়জোর দশটা সাড়ে দশটা হবে, ...র বেশী নয়। শঙ্কিত হয়ে পথ চলছি, কখন কি হয় কিছু বলা ...য় না। বেশ খানিকটা নিরুপদ্রবে চলার পর যখন ভাবছি আজ ...র কিছু হ'ল না বোধ হয় ঠিক সেই মুহূর্তেই সাঁ করে মাথার উপর ...য়ে কি যেন একটা উড়ে বেরিয়ে গেল। চমকে উঠে এদিক ...দিক তাকাচ্ছি এমন সময় ঠং করে সামনেই রেল-লাইনে ঘা ...য়ে ঠিকরে উঠল এক পাথরের টুকরো।

লাইন থেকে ক'হাত তফাতেই শুকনো খাদ। ষ্টেশনে নতুন ...প্ল্যাটফর্ম্ম হচ্ছে তার মাটি কাটা হচ্ছে এখান থেকে। বঙ্কুদা আর ...লবিলম্ব না করে শুয়ে পড়ে গড়াতে লাগলেন সেই দিক লক্ষ্য ...রে। তার পর আমাদের বিস্মিত দৃষ্টির সুমুখ থেকে কয়েক ...সেকেণ্ডের মধ্যেই ঘটোৎকচের মত সেই বিপুল দেহভার নিয়ে ...ড়াতে গড়াতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন খাদের গর্ভে।

কি যে হ'ল ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে ...ড়িয়ে এ ওর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চাইতে লাগলাম। ...নিক বাদে চেতনা ফিরে আসতেই আগাগোড়া সব ব্যাপারটা ...কবার বুঝে নিয়েই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটলাম হাবু মাষ্টারের পাঠশালা ...ক্ষ্য করে।

পাথরবৃষ্টি বন্ধ হয়েছে অনেকক্ষণ, অথচ বঙ্কুদার এখনও দেখা ...নই। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে থাকার পর শেষে সবাই ...লে রওনা হলাম খাদের দিকে। গিয়ে দেখি বঙ্কুদার এক রকম ...নির্বিকল্প সমাধি অবস্থা। একজন তাড়াতাড়ি ছুটল জল আনতে। ...ল আনা হলে বারকয়েক জলের ঝাপটা দিতেই বঙ্কুদা চক্ষুরুন্মীলন ...রে উঠে বসলেন। চারপাশে এত লোকজন দেখতে পেয়ে ...থমটায় বিস্ফারিত নেত্রে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন, তার পর ...কটুখানি সামলে নিয়ে বললেন, 'ক্লুলিডে'র সময় একখানা থান ...টে মাথাটা এমন ঠুকে গেল—

ঠোঁটকাটা ষষ্ঠী বলে উঠল, ইট ত কোথাও দেখছি নে বঙ্কুদা, ...রদিকেই ত নরম মাটি।

এ রকম তুচ্ছ কথায় কান না দিয়ে যথোচিত গাম্ভীর্য্যের ...ঙ্গে বঙ্কুদা বললেন, 'এয়ার রেডের' সময় 'ট্রেঞ্চে' কেমন করে ...শেল্টার' নিতে হয় এদের এখনও শেখাস নি নীলে?

রাত প্রায় বারটা-সাড়ে বারটা হ'ল।

দ্বিতীয় স্কেপের বর্ষণ সাঙ্গ হয়ে গেছে। আমরা ক'জনে মিলে ...চল দিয়ে ফিরছি মাঠের চারপাশে। সামনে বন্দুক হাতে বঙ্কুদা, ...ধ্যিখানে নীলুদা, সব শেষে আমি আর ষষ্ঠী। হঠাৎ চলতে চলতে ঝপথে থমকে দাঁড়ালেন বঙ্কুদা, অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, নী-ইলে।

নীলুদা চমকে উঠে বললে, কি হ'ল।

বঙ্কুদার গলার ভেতর থেকে ততক্ষণে একটা বিচিত্র শব্দ উঠছে, কি যেন একটা বলতে চেষ্টা করলেন, পারলেন না, শেষে কম্পমান ডান হাতখানা কোন রকমে তুলে ধরে তর্জ্জনীটাকে একদিকে বাড়িয়ে দিলেন।

পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় বনশিউলীর ঝোপের উপর দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া গেল দুটো লোক এগিয়ে আসছে লাইনের ধার দিয়ে। নীলুদা হাঁক দিলে, কে যায়?

লোক দুটো মানুষের গলার আওয়াজ পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। একজন পর-মুহূর্ত্তেই লাইন থেকে নেমে পড়ে ধেনোজমির উপর দিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াতে লাগল আল ভেঙ্গে, আর একজন ভ্যাবাচাকা খেয়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল। আমরা পৌঁছে দেখি লোকটা ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

দুলে বাউরী শ্রেণীর লোক। গায়ে একখানা ময়লা জামা, পরনে কোঁচানো শান্তিপুরী ধুতি। মাথায় টেরী চক্ চক্ করছে চাঁদের আলোয়। পায়ে নূতন কেনা পাম্‌শু। তর্জ্জনী আর মধ্যমার ফাঁকে একটা আধপোড়া বিড়ি আড়ষ্টভাবে ধরা রয়েছে, ফেলে দেওয়ার কথা আর মনে নেই। মুখের চেহারা দেখে মনে হ'ল এমন বিপাকে পড়বে একেবারেই আশা করতে পারে নি!

বঙ্কুদা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে তর্জ্জন করে জিজ্ঞেস করলেন, বাড়ী কোথায়?

লোকটা ভড়কে গিয়েছিল, কাঁপতে কাঁপতে জবাব দিলে, এজ্ঞে নারকোলডাঙ্গা।

নারকোলডাঙ্গা এখান থেকে প্রায় ক্রোশ দেড়েকের পথ।

বঙ্কুদা আবার সগর্জ্জনে জিজ্ঞেস করলেন, যাওয়া হচ্ছিল কোথায়?

—এজ্ঞে হরিরপুরে গান শুনতে।

বঙ্কুদা মাটিতে পা ঠুকে বললেন, ব্যাটা তুমি ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখ নি? আমি কে জান? স্বয়ং বঙ্কিনাথ পাকড়াশী, তোমার মত অনেক ঘুঘুকে চরিয়ে আনতে পারি। এই রাত-দুপুরে তুমি যাচ্ছিলে গান শুনতে পাঁচ মাইল পথ ভেঙে। আচ্ছা দাঁড়াও তোমায় গান আমি শোনাচ্ছি।

তারপর নীলুদার দিকে ফিরে রবার্ট-ব্লেকের ভঙ্গীতে আরম্ভ করলেন, দেখছিস নীলে, কেমন পয়েন্ট টু পয়েন্ট মিলে যাচ্ছে? রাত বারোটার সময় একচোট পাথরবৃষ্টি হয়ে যাবার পর দু'জন লোককে সন্দেহজনকভাবে লাইনের ধারে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল। তাদের চ্যালেঞ্জ করায় একজন ত ছুটে পালাল, আর একজন বলছে, সে এই রাত-দুপুরে পাঁচ মাইল পথ ভেঙে যাচ্ছিল যাত্রা দেখতে। অথচ সে স্বচ্ছন্দে 'লাষ্ট ট্রেন'টা এভেল করে রাত ন'টার মধ্যে সেখানে পৌছুতে পারত। সর্ব্বোপরি তার বেশভূষা চাল-চলন সবকিছুই সন্দেহ উদ্রেক করার মত। আচ্ছা এখন ভেবে দেখ দিকি এই এতগুলো 'ক্লু' থেকে তুমি কি 'কনক্লুশান' ড্র' করতে পার। তা ছাড়া 'ইনসিডেন্ট'গুলোর (বঙ্কুদা incident-কে

incidence বলেন) 'কইনসিডেন্স'ও লক্ষ্য করার মত। একেবারে দুয়ে দুয়ে চারের মত মিলে যাচ্ছে নয় কি ?

আশ্চর্য্য বিশ্লেষণী শক্তি ; আর হবে নাই-বা কেন, 'শেয়ালকাঁদা সার্ব্বজনীন পাঠাগারে'র—আলমারীভর্ত্তি 'রহস্য-লহরী'র একখানাও বাদ দেন নি বড়দা।

একটু দম নিয়ে বড়দা বললেন, আচ্ছা এবার তুই ওর পকেট দুটো ভাল করে 'সার্চ্চ' করে দেখ দিকি। কিন্তু খুব সাবধান।

পকেট সার্চ্চ করতে বেরুল এক শিশি 'মনমোহিনী' এসেন্স, একখানা দাঁতভাঙ্গা চিরুণী, আর আনা-আষ্টেক নগদ পয়সা।

এতক্ষণে মালুম হ'ল এত সাজগোজের অর্থ, বললাম আর কেন বড়দা, বেচারাকে এবার ছেড়ে দিলেই ত পার।

কথা শুনে হা হা করে হেসে উঠলেন বড়দা, বললেন, সাধে কি আর এসব জায়গায় ঝানু লোকের দরকার রে বেন্দা। এ রকম ঘোরালো কেসে যদি তোদের মত ছেলে-ছোকরাদের দিয়ে কাজ চলত তা হলে আর ভাবনাটা ছিল কি ? এই দেখ না, কোন কথাবার্ত্তা না বলে মাঠ থেকে শুধু কেমন ইঙ্গিতে আমি লোক দুটোকে তোদের দেখিয়ে দিলাম, আর তোরা হলে এখানে করতিস কি, চেঁচামেচি করে এমন এক কাণ্ড বাধিয়ে বসতিস যাতে করে শেষ পর্য্যন্ত দুটোর একটারও আর পাত্তা পেতিস না। এই যে 'এসেন্সের' শিশিটা পেয়েই তোরা একটা 'কনক্লুশান' ড় করে বসলি, কিন্তু এমনও ত হতে পারে ওর ভেতর 'এসেন্স' আদপেই নেই।

আমরা কিছু বুঝতে না পেরে বড়দার মুখের পানে হাঁ করে চেয়ে রইলাম।

আমাদের মুখের দিকে চেয়ে একটু ক্ষমাসুন্দর হাসি হেসে বড়দা বললেন, বুঝতে পারলি না ত, ওটা 'এসেন্স' না হয়ে 'সেণ্টেড পটাসিয়াম সায়নাইড'ও ত হতে পারে।

শিশিটা হাত থেকে ঠক করে লাইনের উপর পড়ে চুরমার হয়ে গেল। বড়দা হাঁ হাঁ করে উঠলেন, করলি কি, করলি কি, ওর যে একটা 'কেমিক্যাল এনালিসিস' দরকার ছিল। তারপর বললেন, আচ্ছা যাক্‌গে, যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, কিন্তু দেখলি ত গোড়ায় যা আমি সন্দেহ করেছিলাম তাই শেষ পর্য্যন্ত 'কনফার্ম্মড' হ'ল। তা হলে নীলু তুই একে নিয়ে গিয়ে আজকের মত 'লাইব্রেরী' ঘরে পোর, তারপর কাল আমি বাছাধনকে নিয়ে থানায় যাচ্ছি।

লোকটা এতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন রকমে সয়ে ছিল, কিন্তু থানার নাম শুনে আর পারলে না, হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে বললে, ঘাট হয়েছে বাবুমশায়, এই কান মলে, নাকে ক্ষত দিয়ে পিতিজ্ঞে করছি এমন কাজ আর জীবনে করব না।

বড়দা উল্লসিত হয়ে বললেন, দেখছিস নীলে, যেটুকু সন্দেহ ছিল সেটুকুও মিটে গেল, কাল হয়ত থানায় গিয়ে দেখব ব্যাটা দাগী আসামী।

চাবি খুলে লাইব্রেরী ঘরে ঢোকবার সময় বড়দা বলে উঠলেন, ওরে নীলু, দাঁড়া দাঁড়া ওর গেঁজেটা দেখা হয় নি, একবার দেখে নে দিকি।

গেঁজে 'সার্চ্চ' করে বেরোল এক তাড়া বিড়ি আর একটা দেশলাই।

বড়দা বললেন, দেখেছিস, যা ভেবেছি তাই, ব্যাটা ঘরে আগুন লাগিয়ে খসে পড়ার মতলবে ছিল। ওগুলো রেখে দে ভাল করে তোর কাছে, হাতছাড়া করিস নে, 'এভিডেন্সে'র সময় দরকার হতে পারে।

লোকটা নাক কান মলে বললে, দিব্যি করে বলছি বাবু ওসব মতলব নেই।

নীলুদা তখনও ইতস্ততঃ করছে দেখে বড়দা ধমক দিয়ে বললেন, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন নীলে, যা বলছি তাই কর না, ঘরে ঢুকিয়ে তালা এঁটে দে।

বড়দা বললেন, দলের একটা যখন ধরা পড়েছে তখন এই থেকেই একে একে আর সবাই ধরা পড়বে, তার জন্যে ভাবনা নেই। এখন এইটে যাতে না পালায় তাই দেখার দরকার। আজ আর কাউকে পাড়া ঘুরতে হবে না, সবাই চুপচাপ বসে থাক আমার সঙ্গে হাবু মাষ্টারের পাঠশালায়। কিন্তু ঘুমোলে চলবে না, সব সময় জানলা দিয়ে লাইব্রেরী-ঘরের দিকে নজর রাখতে হবে।

তাই করছি। চুপচাপ সামনের দিকে চেয়ে বসে আছি। লাইব্রেরী-ঘরের জানালা আর হাবু মাষ্টারের পাঠশালার জানালা (দরজাও বলা চলে) একেবারে মুখোমুখি, আবছা আবছা ভেতরটা দেখা যাচ্ছে। লোকটা বোধ হয় চলে বেড়াচ্ছে চারধারে, অন্ততঃ সেই রকমই ত মনে হচ্ছে। খানিক বাদেই চড়াৎ করে একটা চাপড়ের আওয়াজ হ'ল, তারপরেই জানালার সামনে থেকে আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, বাবু!

নীলুদা বললে, কি ব্যাপার ?

—বেদম মশা কামড়াচ্ছে বাবু, বই-ভর্ত্তি কাঠের সিন্দুকের পেছন থেকে ঝাঁক বেঁধে বেরিয়ে আসছে।

বড়দা খিঁচিয়ে উঠলেন, তবে আর কি, লাট-সায়েবকে এবার গদী পেতে মশারি টাঙিয়ে দিয়ে আসতে হবে।

আর কোন সাড়াশব্দ শোনা গেল না। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনের মিনিট আধঘণ্টা কেটে গেল। বড়দা এতক্ষণ পদ্মাসনে বসেছিলেন এবার একটুখানি দেওয়ালে হেলান দিলেন। খানিক বাদেই খেয়াল হ'ল বড়দা সটান লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছেন। একটু পরেই তাঁর নাসিকা গর্জ্জন সুরু হয়ে গেল ; প্রথমটা আরম্ভ হ'ল বিলম্বিত 'ফড়াৎ' 'ফড়াৎ' দিয়ে, শেষের দিকে ঘরের ভেতর যেন ঝড় বইতে সুরু হয়ে গেল।

হুড়মুড় করে কিসের একটা শব্দ হ'ল। বড়দা তড়াক করে ভূমিশয্যা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে ঢুলন্ত গঙ্গারামের গালে সজোরে

একটা চপেটাঘাত কষিয়ে দিয়ে বললেন, পাহারা দিবি না বসে বসে ঢুলবিরে হতভাগা, উঠে দেখ কি হ'ল ?

গালে হাত বুলোতে বুলোতে গঙ্গারাম উঠে দাঁড়াল। নীলুদা বললে, দাঁড়া আগে একটা সাড়া নিয়ে দেখি, তারপর জানালার দিকে মুখ করে বললে, হ্যাঁরে, আছিস ত।

ওপাশ থেকে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে উত্তর এল, থাকব না ত আর যাব কোথায় বাবু। এতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে এই বেঞ্চিখানা দেখে কোথায় একটু শুতে গেলাম তা হুড়মুড় করে সবসুদ্ধ উল্টে পড়ল। মুড়োর দিকের দুখানা পায়াই যে নেই তা আর জানব কি করে। গেল বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলখানা ছেঁচে।

বড়দা গম্ভীর গলায় বললেন, স্রেফ ভণ্ডামি, এই রকম করে সাড়া নিয়ে দেখছে সব জেগে আছে কিনা।

আবার সব চুপচাপ। বড়দা চোখ বুঁজে যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলেন। আমরা কোনরকমে চোখের পাতা দুটোকে খুলে রেখে সামনের দিকে চেয়ে বসে আছি। আবছা আলো-আঁধারিতে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে লোকটা যেন ঘরের মধ্যে অস্থির হয়ে পায়চারি করছে। কি ব্যাপার কে জানে !

বড়দার নাক সবে ডাকতে সুরু করেছে, এমন সময় ডাক এল, বাবু।

মুহূর্তের মধ্যে বড়দার নাসিকাগর্জ্জন স্তব্ধ হয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল নীলে, দেখ দিকি কি বলে।

নীলুদাকে আর দেখতে হ'ল না, তার আগেই জবাব এল, বড্ড তেষ্টা বাবু।

জ্বালালে দেখছি, বড়দা ভূমি-শয্যা ছেড়ে উঠে বসলেন। বিপন্ন মুখে বললেন, দেখ দেখি এই রাত-দুপুরে কে আবার জল আনতে ছোটে।

ওপাশ থেকে শোনা গেল, জল নয় বাপু একটা বিড়ি।

বিড়ি ? বড়দা যেন সামনে ভূত দেখে আঁৎকে উঠলেন। পরক্ষণেই বললেন, মানিক, এ বড় শক্ত ঘাগি। তুমি ঘোর ডালে ডালে আমি ঘুরি পাতায় পাতায়, তোমার মতলব আমার আর জানতে বাকি নেই। তার চাইতে যা বলি শোন, ভাল চাও ত চুপচাপ মুখ বুঁজে পড়ে থাক।

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ, একটু বাদেই আবার সেই, বাবু।

নীলুদা বললে, আবার কি হ'ল রে।

লোকটা কাতর কণ্ঠে বললে, মুখের কথায় পেত্যয় না হয় বাবু, আপনারা কেউ না হয় একটা ধরিয়ে এনে জানলার সামনে ধরুন, আমি এপাশ থেকে একটা টান দিয়ে নি। দিব্যি গেলে বলছি বাবু একটার বেশী টান দেব না।

বড়দা ভারিক্কী চালে বললেন, দেখছিস নীলে, কি রকম শ্যাচারাল অভিনয়।

রাত প্রায় তিনটে সাড়ে তিনটের সময় পাশের জানালা থেকে ভয়ার্ত্ত কণ্ঠের ডাক এল, বাবু, ও বাবু।

সকলেরই একটু-আধটু আমেজ এসেছিল, ডাকাডাকিতে সবাই ধড়মড় করে উঠে বসল। কি ব্যাপার ?

—ছাতের উপর কি একটা গড়িয়ে পড়ল বাবুমশায়।

বড়দা দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, তোমার মাথা।

মাথা না হউক ঐ জাতীয়ই একটা কিছু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঠং করে এসে ঘা খেল রথের টিনে। ঠোঁটকাটা ষষ্ঠী বাঁকা হাসি হেসে বলে, কি ব্যাপার বড়দা, আসামীকে ত পাকড়ালে, এদিকে আবার বাজনা-বাদ্যি উঠে কেন ?

বড়দা কোণের দিকে নিরাপদ জায়গায় সরে গিয়ে বললেন, তুই হচ্ছিস একটা আস্ত গাড়ল। বললাম না দলে একটা লোক নেই, অন্ততঃ একটা পুরো গ্যাঙ ঘুরছে এর পেছনে।

মাইলতিনেকের পথ খানা, হেঁটেই যাওয়া যায়, তবে সকালের দিকে সুবিধামত একটা ট্রেন থাকায় ট্রেনেই চলে গেলেন বড়দা। যাবার আগেও লোকটা আবার বারকয়েক নাকে-কানে খত দিয়েছিল—কিন্তু বড়দা অটল। ট্রেনে ওঠার সময় বলে গেলেন, বিকেলের ট্রেনে নাও ফিরতে পারি বুঝলি। কেননা থানায় গিয়ে অনেক রেকর্ড ফেকর্ড খুঁজে দেখতে হবে কোন রকম প্রিভিয়াস হিষ্ট্রী পাওয়া যায় কিনা। যদি সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাই তা হলে ত মিটেই গেল, আর যদি পেতে দেরি হয় তা হলে সেই লাষ্ট ট্রেন।

তবু একবার বিকেলের ট্রেনে ষ্টেশনে হাজিরা দিয়েছি, বলা যায় না যদি সকাল সকাল কাজ মিটে যায়। দেখলাম অনুমান মিথ্যে হয় নি, এই ট্রেনেই ফিরলেন বড়দা। কিন্তু এ কি, বড়দার মুখের দিকে চাইতেই মনে হ'ল যেন একটা কোন নিদারুণ দুঃসংবাদ বহন করে এনেছেন। মাথাখানা ঝুঁকে পড়েছে বুকের ওপর, কাঁধের চাদর হেলে পড়েছে, কাছাখানা ধুলার ওপরে অসহায় ভাবে লুটোচ্ছে। সব দেখে শুনে যখন ভাবছি এমতাবস্থায় কিছু জিজ্ঞেস করা উচিত হবে কি হবে না—এমন সময় ষষ্ঠীচরণ বলে বসল, তার পর বড়দা আইডেণ্টিফাই করা গেল ?

বড়দা বাঁ হাতখানা তুলে যেন দুঃসহ ব্যথায় ওষ্ঠ কুঞ্চিত করে বললেন, এখন নয় পরে।

পরে অবশ্য সবই শুনতে পেলাম। কালকের মহামান্য অতিথি নাকি খাস বড় দারোগার পেয়ারের চাকর। গান শোনার ছুতো করে এক ইয়ার দোস্তকে সঙ্গে নিয়ে নৈশাভিসারে বার হয়েছিলেন। প্রথমটায় কিছুতেই স্বীকার করতে চায় নি, শেষে হাজতে পোরার ভয় দেখানোয় সবকিছুই স্বীকার করেছে।

অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে পাড়ার লোক। নেহাত দায়ে না পড়লে সন্ধ্যের পর কেউ আর বড় একটা ঘরের বার হয় না। রাত ন'টার সময় লাষ্ট ট্রেনে ডেলিপ্যাসেঞ্জাররা ফেরেন আপিস থেকে। নেহাত না ফিরলেই নয় তাই প্রথম শ্বশুরবাড়ী-যাত্রিণী নবোঢ়ার মত নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ট্রেন থেকে নেমে গুটি গুটি ষ্টেশনে

এসে ঢোকেন। সেখানে এক কোণে পাশাপাশি খানকয়েক টিনের ক্যানেস্তারা জড়ো করা থাকে, তার ভেতর থেকে সবাই নিজের নিজেরটি বেছে নিয়ে ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়েন। বলা যায় না যে রকম হালচাল তাতে দৈবাৎ যদি পোয়াটাক একখানা এসে পড়ে তবু মাথাটা অন্ততঃ বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা।

সম্ভব অসম্ভব নানা রকম গুজবের সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিদিন। এই ত ক'দিন আগে গুপীকাকা একটা আড়াই সেরী রুই মাছ হাতে করে সন্ধ্যে ঘেঁসে ফিরছিলেন জামতলা দিয়ে। পাশের কচু-বন থেকে চিনিবাসের মেনী বিড়ালটা মিহি গলায় 'মেয়াও' করে ডেকে উঠতেই তাকে নাকিসুরের 'মেয়াও' ধরে নিয়ে সেইখানেই ভিরমী। শেষে গোঙানি শুনতে পেয়ে একটা রাখাল ছোঁড়া ছুটে এসে মাথায় জলটল ঢেলে ধাতস্থ করে।

ডিফেন্স পার্টির উৎসাহের বেগও ক্ষীণ হয়ে এসেছে। নীলুদা এখন আর বাড়ী বাড়ী গিয়েও পাহারা দেবার ছেলে জোগাড় করতে পারে না, অভিভাবকদের কাছ থেকে তাড়া খেয়ে ফিরে আসে। মিলিটারী ট্রেনিঙেও আর কারও আগ্রহ নেই, সবাই নিয়মিত অনুপস্থিত, রোজই নতুন নতুন সিক রিপোর্ট দাখিল হচ্ছে। নিতান্তই যারা মায়ে-তাড়ানো বাপে-খেদানো তারাই এখনও পর্য্যন্ত বেরুচ্ছে, কিন্তু হাবু মাষ্টারের পাঠশালায় খেজুর পাতার চ্যাটাইয়ের উপর রাতভোর ঘুমিয়েই তাদের ডিউটি শেষ হয়ে যায়। ডিফেন্স পার্টিকে এই ভাঙনের কবল থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে আগামী শনিবার এক সভার আয়োজন করে তাতে সর্ব্বসাধারণকে যোগদানের আহ্বান জানিয়ে এক আবেদন প্রচার করেছেন ডিফেন্স পার্টির যাবজ্জীবন অনারারী ক্যাপ্টেন শ্রীবৈদ্যনাথ পাকড়াশী।

মিটিং বসতে বসতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। বিকেলের ট্রেনে আপিসের বাবুরা সব ফিরলেন, দেরিটা হ'ল তাঁদের জন্যেই। তা হলেও লোক হয়েছে প্রচুর, আশপাশের গাঁ থেকেও অনেকে এসেছে এ রকম জোরালো মিটিঙের খবর শুনে। লাইব্রেরী-ঘর থেকে পা ভাঙা বেঞ্চিখানাকে টেনে বার করা হয়েছে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জন্যে; আর সবাইয়ের জন্যে ঢালাও সতরঞ্চি। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করে বসে আছেন বহুদা স্বয়ং। সামনে লাইব্রেরীর সাড়ে তিন (বাকি আধখানা ইট দিয়ে পূরণ করা হয়েছে) পাওয়ালা টবিলখানার উপর স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে 'অফিসিয়াল' কাগজপত্র। টেবিলের ঠিক মধ্যিখানেই জ্বলছে একটি হ্যাণ্ডেলবিহীন হ্যাজাক বাতি।

একজন স্থানীয় আর্টিষ্ট হারমোনিয়াম বাজিয়ে উদ্বোধন-সঙ্গীত ধরলেন—

"এমন দিন কি হবে তারা
যে দিন তারা তারা তারা বলে
দু' নয়নে ববে ধারা—"

উদ্বোধন-সঙ্গীত সমাপ্ত হলে বহুদা খানিকক্ষণ কপালে হাত রেখে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। খানিক বাদে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে যখন উঠে দাঁড়ালেন তখন দেখে মনে হ'ল পারিপার্শ্বিক জগৎ ছাড়িয়ে যেন অনেক দূরে চলে গেছেন। শান্ত নিরাসক্ত কণ্ঠে অনেকটা স্বগতোক্তির মতই সুরু করলেন, দু'নয়নে ববে ধারা, কিন্তু কবে? সে দিন কবে আসবে, সে দিন প্রাণের আকুতি অশ্রু-রূপে ফুটে উঠবে; অন্তরের যত মলিনতা, আবিলতা নিঃশেষে ধুয়ে যাবে অশ্রুর প্লাবনে? হয় ত সে দিন আসতে এখনও ঢের দেরি, হয় ত তার জন্যে যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করে থাকতে হবে, তবু সে দিন আসবে। সবার জীবনেই আসবে। এই আজ যারা বহুদা কেন বেরোয় না বলে পাহারায় বেরুচ্ছে না তারাও একদিন আসবে, নিজেদের ভুল সংশোধনের জন্যেই এগিয়ে আসবে। সে দিন তারা বুঝতে পারবে সেনাবাহিনীতে একজন কম্যাণ্ডারের কাজ সাধারণ 'সোলজারের' মত রাইফেল কাঁধে নিয়ে লড়াই করা নয় বটে, কিন্তু তার চাইতে আরও শক্ত, আরও অনেক বেশী দায়িত্বপূর্ণ। তার একটা কথার উপর নির্ভর করে একটা জাতির উত্থান-পতন, অথচ পক্ষান্তরে একজন সাধারণ সৈনিক শুধু তার উপরওলার নির্দ্দেশ মেনে নিয়েই খালাস। আশা করি এ সম্পর্কে আর বেশী কিছু প্রয়োজন হবে না।

এবার মূল বক্তব্যে ফিরে আসি। সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পর্য্যালোচনা করে যে সব বৈশিষ্ট্য আমার চোখে পড়েছে তার কয়েকটা দেওয়া হ'ল:

(১) প্রায় প্রত্যেক দিনই বিকেলের দিকে কালবোশেখীর জলঝড় হচ্ছে অথচ ইট পাথর যা পড়ছে সবই শুকনো।

(২) ষ্টেশন-বাজারে কুকুর কিছু কম নেই, অথচ কোনদিন তাদের সন্দেহজনক ভাবে ডাকতে শোনা যায় না।

(৩) লাইনে যে সব খোয়া চোখে পড়ে বেশীর ভাগই 'ট্রাই-অ্যাঙ্গুলার' অথচ যে সব খোয়া পড়ছে চারদিকে সবই প্রায় 'স্ফেরিক্যাল'।

আপাতদৃষ্টিতে এ সব পয়েণ্ট অর্থহীন বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এমনও হতে পারে—হয় ত এদেরই ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে এক একটা অগ্নিগর্ভ বিসুভিয়াস।

কোঁচার খুঁটে কপালের ঘাম মোছার ফাঁকে চারদিকের আব-হাওয়াটা একবার অনুমান করে নিয়ে আবার সুরু করলেন বহুদা—

অনেককিছু ভেবে চিন্তে, বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌছেছি যে, কোন একটি 'ওয়েল অর্গানাইজড পার্টি'র হাত রয়েছে এর পেছনে। তাদের মতলব, পাথরের ভয়ে যখন ডিফেন্স পার্টির লোকেরা পাহারায় বেরুনো বন্ধ করবে সেই সময় তারা তাদের কাজ হাসিল করবে। তা ছাড়া সামনেই আসছে অমাবস্যার রাত, এমন সুযোগ অনেক দিন

আউটরাম ঘাটে সন্ধ্যা [ফটো ঃ শ্রীমীরেন অধিকারী

গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নে [ফটো : শ্রীবিনয়ভূষণ দাস
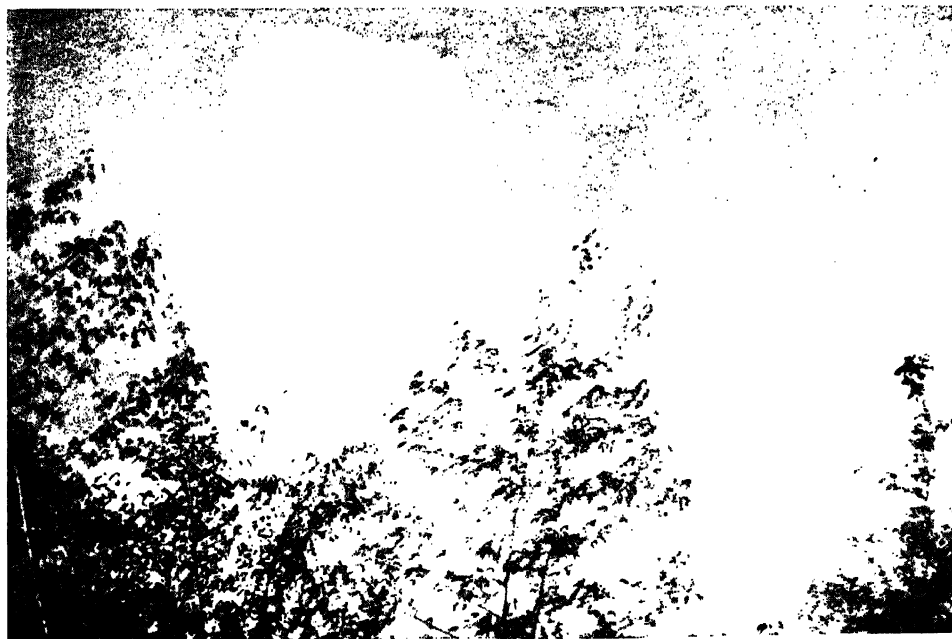
ঘরের দেওয়ালে এবং সিলিংএ সূক্ষ্ম কণা আকারে কীটপতঙ্গনাশক ডিডিটি নিক্ষেপ

ম্যালেরিয়া স্কোয়াডের জনৈক ইন্‌স্পেকটর কর্তৃক একটি বদ্ধ জলাশয়ের জল পরীক্ষা

পাওয়া যাবে না। এ ক'টা দিন তারা শুধু আমাদের কার্যাকলাপ গতিবিধি ইত্যাদির ওপর নজর রেখে চলেছে আড়াল থেকে।

কি সর্বনাশ! সবাই সভয়ে একবার আশপাশের বনঝোপের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলে তেমন কাউকে চোখে পড়ে কিনা। নরহরি কাকা ভীতু মানুষ, এতখানির জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না, কাতর কণ্ঠে বলে উঠলেন, বদ্যিনাথ, তুমি বাবা কাল একবার এস-পি'র কাছে যাও, খরচপত্তর যা লাগে না হয় আমিই দেব'খন। তবু এ রকম হতে থাকলে ত দেশ থেকে শেষ পর্য্যন্ত বাস ওঠাতে হবে।

মোক্ষদা গয়লানী কোথায় ছিল হঠাৎ ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল সামনের দিকে। (আহা, বেচারার আর একখানা টালিও আস্ত নেই)। সভার মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছে হাত পা নেড়ে বলে উঠল, তোমাদের রকম সকম দেখে হাসব কি কাঁদব কিছু ঠিক পাই না দাদাবাবু। চোর-ডাকাতের ত আর মরণ পড়ে নি যে তোমার এই ঢাল-নেই-তরোয়াল-নেই-নিধিরাম-সদ্দার হোমগার্ড পার্টির পাহারাওলাদের তাড়াবার জন্যে দশ-বারোদিন ধরে পড়ে পড়ে নাইনের গোয়া ছুঁড়বে। চুরি ডাকাতি করার মতলবই যদি তাদের থাকত তো দিনদুপুরে এসেই তারা তা করে যেতে পারত, তোমরা থেকেও কিছু করতে পারতে না। কিন্তু আসল কথা তা নয়, আসল কথা হচ্ছে দুখানা চাকা বিনে আজ দু'বচ্ছর ধরে যে বাবার অথের টান বন্ধ রয়েছে সিদিকে কি কারও হুঁস আছে? সিদিন রাজীব কাকাকে পথে দেখতে পেয়ে সুধনু, কি গো কাকা, বাবা কি আর নড়বেন না ওখান থেকে? তাতে তিনি বললেন, কি বলব বল মা, বারোইয়ারীর কাজ, সবাই যদি মিলে মিশে না করে—আমি একা আর কি করতে পারি। যাকে জিগোস করব সবাই এখন ওই কথা বলবে। আসল কথা সবাই দেখছে এখন আরম্ভ করতে গেলেই ত কিছু বার করতে হবে ঘর থেকে, তার চাইতে যা আছে বেশ আছে। ইদিকে দেশে আজ একটা যাত্তা থ্যাটার লাগুক দিকিনি তখন দেখবে কেমন সব দরাজ হাত। এ হচ্ছে ঠাকুরদেবতার কাজ, কিছু আর বলতে আসছেন না ত, সবাই তাই চুপচাপ বসে আছে নাকে সরষের তেল দিয়ে। ভগমান আর কি করবেন, এদ্দিন সয়ে সয়ে আর থাকতে না পেরে শেষে দেখিয়ে দিলেন সবার চোখে আঙুল দিয়ে। এখন এতেও যদি তোমাদের জ্ঞান না হয় ত তিনি আর কি করতে পারেন?

তার পর রথের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে হাত দুটো কপালে ছুঁইয়ে ভক্তিগদগদ কণ্ঠে বললে, কিন্তু তোমার এ কি নীলা-খেলা ঠাকুর, বর্ষার দিনে মাথা গোঁজার মত একটু ঠাঁইও আর এ অবলার জন্যে রেখে দিলে না।

কথাটা মনে লেগেছে সবারই। চারদিক থেকে এরই মধ্যে একটা হট্টগোল উঠতে সুরু করেছে। এমন সময় সবাইকে থামিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মুরলীধর ভটচাযি্য, আশপাশের তিনখানা গাঁয়ের লোকের পাপপুণ্যের ক্যাশিয়ার। একটিপ নস্যি নাসিকা মারফত ব্রহ্মরন্ধ্রে উঠিয়ে নিয়ে, শিখার ফাঁস থেকে স্থানচ্যুত ফুলটাকে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করে বিজ্ঞের মত বলতে লাগলেন, ও-সব কিছু নয় টয় বাপু, আসল যা ব্যাপার তাই বলি শোন। কাল ভোররাতে গঙ্গা নাইতে যাচ্ছি এই ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা ধরে, মিত্তিরপুকুরের কাছবরাবর এসে পড়েছি, এমন সময় স্পষ্ট দেখতে পেলাম শান-বাঁধানো ঘাটের ওপর পাঠশালার দিকে মুখ করে হাবু মাষ্টার দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি যেন কিছুই দেখি নি এমনি ভাব দেখিয়ে পৈতেগাছখানাকে বার করে গায়ত্রী জপতে জপতে তাড়াতাড়ি জায়গাটুকু পেরিয়ে গেলাম। কেননা বাবার মুখে শুনেছি কিনা ঠিক এই ব্রাহ্মমুহূর্তেই ওঁরা নরদেহ ফিরে পেয়ে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে পৃথিবীতে বেড়াতে আসেন, আর সেই সময় যদি কোন মানুষের চোখে পড়ে যান এবং ওঁরা যদি তাই জানতে পারেন তা হলে যে তাঁকে দেখেছে তার আর রক্ষে থাকবে না। ওই যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারতেন যে আমি তাঁকে দেখতে পেয়েছি তা হলে আমার অবস্থাটাও যে কি হ'ত আশা করি আর ভেঙে বলতে হবে না।

সামনেই ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা, আর তার ওপাশেই মিত্তিরদের পুকুর। হাবু মাষ্টারের ওই পুকুরে ডুবে-মারা-যাওয়া আজ প্রায় বছরতিনেক আগেকার ঘটনা।

সবাই হাতখানেক করে জমি এগিয়ে বসল। কেউ কেউ প্রশ্ন করলে, তা হলে কি উপায় হবে ঠাকুরমশায়?

ভটচাযি্য মশাই আর একটিপ নস্যি নিয়ে খানিকক্ষণ চিন্তামগ্ন থেকে উত্তর দিলেন, উপায়? উপায় এক গয়ায় পিণ্ডি দেওয়া কিন্তু সে আর দিচ্ছে কে, বিশেষতঃ তার যখন আত্মীয়স্বজন কেউ নেই—অতএব দেশেই একটা শান্তি-স্বস্ত্যেন করতে হয় ভাল করে।

মোক্ষদা গয়লানী দাঁড়িয়ে উঠে বললে, তাই যদি হবে ঠাকুরমশায়—তবে বাবার অথের টিনে গোয়া পড়তে যাবে কিসের জন্যে?

কথাটা উপস্থিত অনেকেরই মনে লেগেছে দেখে ভটচাযি্যমশাই খেঁকিয়ে উঠে বললেন, আরে বেটী, হাবু মাষ্টার ছিল আজন্ম শুদ্ধাচারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ; তার আত্মা কি আর তোর মত শ্যাওড়াগাছে বাঁশবাগানে ঘুরে বেড়াবে, না সন্ধ্যেবেলা আড়াই হাত জিব বার করে নাকিসুরে 'মাছ খাবো, মাছ খাবো' বলতে বলতে মানুষের পিছু পিছু ধাওয়া করবে। উদ্ধার ত সে এক রকম পেয়েই গেছে কেবল অপঘাতে মৃত্যুর জন্যেই যা পৃথিবীর মায়াটা পুরোপুরি আর কাটিয়ে উঠতে পারছে না।

তুমুল হট্টগোল আর বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত স্থির হ'ল সবার প্রস্তাবই সমান গুরুত্বপূর্ণ। নরহরিকাকার প্রস্তাবমত বদ্যিদা কাল এস. পি'র সঙ্গে গিয়ে দেখা করবে। সেখান থেকে তিনি কি বলেন শুনে এসে, আশপাশের দু'তিনখানা গাঁয়ের লোক মিলে কালকেই এক সর্বাত্মক অভিযান সুরু করে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় চাঁদা তুলে ফেলে রথের দুখানা চাকা আগে করিয়ে ফেলতে হবে, তার পর আর একদিন আর একটা 'মিটিং কল' করে শান্তি-স্বস্ত্যেনের ব্যবস্থাটা কেমন করে

সমাধা করা যায় সে বিষয়ে ভটচাষ্যি মশায়ের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।

পরের দিন দুপুরের গাড়ীতে বদ্দা ফিরতেই সবাই সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম, তার পর কি হ'ল ?

বদ্দা আলেকজাণ্ডারের মত ঘাড় উঁচু করে বললেন, হবে আর কি। সব শুনে এস.পি. ত সঙ্গে সঙ্গেই থানায় অর্ডার পাঠিয়ে দিলেন যে এখখুনি একজন কনেষ্টবল সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। আসার সময় বললেন, আপনি কিচ্ছু ভাববেন না বদ্দিনাথ বাবু, ওতেও যদি না হয় ত পরে আর্মড পুলিস পাঠাব, এতেও যদি না হয় ত তখন 'মিলিটারী ফোর্স' পাঠাব, তবু এ রকম একটা অরাজকতা যে আমাদের 'গবর্মেণ্ট' চলতে দেবে না এটা স্থির জানবেন।

সিপাহীজী খুব সম্ভব পাঁচটার ট্রেনে এসে পৌঁছবেন। বিকেল থেকেই লোকজন জমতে সুরু করেছে ষ্টেশনের আশেপাশে। গাড়ী যখন প্লাটফর্মে এসে দাঁড়াল তখন ষ্টেশনের বাইরে রীতিমত জনতার সৃষ্টি হয়েছে। একটু বাদেই দেখা গেল অনুমান মিথ্যে হয় নি, দীর্ঘ ছ'ফুট এক বংশদণ্ড বগলে করে, আকর্ণবিলম্বিত গুম্ফশোভিত হয়ে, মধ্যম পাণ্ডবতুল্য এক ছাপরা জেলার অধিবাসী খইনি ডলতে ডলতে ষ্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। জনতার মধ্যে থেকে কেউ কেউ জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। ডিফেন্স পার্টির তরফ থেকে ক্যাপ্টেন বদ্দা এগিয়ে গিয়ে মাল্যদান করলেন সিপাহীজীর গলায়। জনতাকর্তৃক বেষ্টিত হয়ে মুহুর্মুহুঃ আনন্দোচ্ছাসে সিপাহীজী এগিয়ে চললেন লাইব্রেরীর দিকে। সেখানে ইতিপূর্ব্বেই তাঁর বিশ্রামের সবকিছু ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে রাখা হয়েছে।

সাতটা বাজতে না বাজতেই রথতলায় যেন হাট বসে গেল। এত যে লোক হবে বদ্দা নিজেও আশা করতে পারেন নি। মানুষগুলো বসে থেকে থেকে অধৈর্য্য হয়ে উঠছে দেখে নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে এক হাজার বিড়ি আনিয়ে দিলেন বাজার থেকে। কিন্তু তাই বা কতক্ষণ চলে। ওদিকে সিপাহীজীরও দেখা নেই, সেই যে বিকেলবেলা এসে লাইব্রেরী-ঘরে ঢুকেছেন এখনও সেখান থেকে বেরুবার নাম নেই। মাঝে মাঝে ভীমরবে নাসিকাধ্বনি কানে আসছে এবং তা থেকেই অনুধাবন করা যাচ্ছে যে তিনি এখনও গভীর নিদ্রামগ্ন। উপায়ান্তর না দেখে আবার এক হাজার বিড়ি আনতে পাঠালেন বদ্দা। এবার ভগবান তাঁর দিকে মুখ তুলে চাইলেন, কেননা সেই এক হাজার নিঃশেষিত হবার পূর্ব্বেই সিপাহীজী তাঁর ছ'ফুট দীর্ঘ বংশদণ্ড বগলে নিয়ে হাই তুলতে তুলতে বেরিয়ে এলেন লাইব্রেরী-ঘরের দরজা খুলে। জনতার ভেতরে যে ক্ষোভ এবং নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়েছিল, নিমেষে তা অন্তর্হিত হ'ল। সিপাহীজী সেদিকে দৃকপাত না করে আশপাশের জনতা থেকে সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে একটা উঁচু ঢিবির ওপরে আসীন হলেন। তার পর লাঠিগাছটি মাটিতে নামিয়ে রেখে বাঁ হাতের তালুর ওপর একখানা আস্ত দোক্তাপাতা রেখে ডলতে ডলতে অনুকম্পাভরে মন্তব্য সুরু করলেন, আরে তুমলোগোকা বাংগালী আদমীর কামই আলাইদা। কোনখানে কি হ'ল কুছ ঠিকঠিকানা নেই, ইধারে সুপারিনটেন সাবকা পাশ খবর চালান হোয়ে গেল। আসুক না দেখি কোন বদমাসা আসে হামার পাশে, দেখিয়ে দিই লোগ কেমন শকত আদমী আসে। একঠো লাঠি বাড়িয়ে সব ঠাণ্ডা বন যায়েগা।

তার পর ডান হাতের চেটো দিয়ে বাঁ হাতের তালুর ওপর বিরাশী সিক্কার এক চাপড় মেরে খইনিটুকু মুখ-গহ্বরে নিক্ষেপ করে 'সুরদাসকা-ভজন' সুরু করলেন,—

'লাজো-ও মেরী-ই-ই রাখো হে-এ
ব্রজরা আ-আ-আ-জ।'

অবাক বিস্ময়ে যখন ভাবছি পাঞ্চালীর এমন গলা শুনেও শ্রীকৃষ্ণের কেন হৃৎকম্প উপস্থিত হয় নি—এমন সময় অকস্মাৎ পাঞ্চালীর কাতর প্রার্থনা নীরব হয়ে গেল। কি ব্যাপার কিছু বুঝে ওঠার আগেই সিপাহীজী বিকট চীৎকার করে এমন এক লাফ মেরে জনতার মধ্যিখানে এসে পড়লেন, যা দেখলে স্বয়ং পবন-নন্দনেরও লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যেত। মাটিতে পড়েই সঙ্গে সঙ্গে বৃষভ-নিন্দিত কণ্ঠে চীৎকার সুরু করে দিলেন, আরে বাসরে, একদম খতম হো গিয়া, জান চলা গিয়া রে ভাই-ই।

সবাই হাঁ-হাঁ করে উঠল, কেয়া হুয়া সিপাইজী, কাঁহাসে চোট লাগল ?

সম্মান বিপন্ন দেখে সিপাহীজী রক্তচক্ষু মেলে উঠে বসলেন, ষাঁট আস্ফালন করে বললেন, আরে, এইসান বুরবাক আদমী ত হাম কভী নেই দেখা।—তার পর ছ'হাত দীর্ঘ বংশদণ্ডখানি সঙ্গীনের মত বাড়িয়ে দিয়ে একটি স্থূলকায় লাইনের খোয়া নির্দ্দেশ করে বললেন, ইসমে চোট লাগলে হামি ফিন বাতচিত করতে পারতাম মালুম হোয় ?

সিপাহীজীর বীরত্বের নমুনা দেখে যারা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল তাদের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হ'ল না।

রাত প্রায় বারটা সাড়ে বারটা হ'ল। এরই মধ্যে বারচারেক বর্ষণ হয়ে গেছে। সিপাহীজী ব্যাপার দেখে লাষ্ট ট্রেনেই থানায় ফিরে গেছেন। যাবার সময় 'সাচ বাত' কবুল করে গেছেন, নোকরী গেলে নোকরী ফিন মিলবে, লেকিন জান একবার গেলে আর দুসরা বার মিলবে না।

প্রায় জন পঞ্চাশ লোক এইটুকু গাঁ টহল দিয়ে ফিরছে অথচ কারুর পাত্তা নেই। দলে ভারী থাকায় সবারই বুকে সাহস রয়েছে। সবাই ভাবছে নিতান্তই যদি পাথর এসে পড়ে কারও মাথায়, তা সে এত লোক থাকতে বেছে বেছে যে আমার মাথাতেই এসে পড়বে এমন তো কোন কথা নেই। অতএব সবার মাথাই নিরাপদ থাকার সমান সম্ভাবনা।

কে একজন এসে খবর দিলে মাঠের উত্তর দিকের জঙ্গলে এক তালগাছ থেকে কাকে যেন নামতে দেখা গেছে একটু আগে।

সঙ্গে সঙ্গে জন তিরিশেক লোক ছড়িয়ে পড়ল জঙ্গলের আশে-পাশে। বাকি জন বিশেককে নিয়ে বড়দা নিজে এসে হাজির হলেন সেই তালগাছের গোড়ায়। সরকারী টর্চের আলোয় গাছের গোড়াটা একবার দেখে নিয়ে গম্ভীর মুখে বললেন, কিছু বুঝতে পারছিস বেন্দা ?

আমি কিছু বুঝতে না পেরে বোকার মত ওঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে বড়দা বললেন, এতক্ষণে সবকিছু জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল।

আমরা আরও এক বাঁও জলে পড়ে গেলাম।

আমাদের মুখের অবস্থা দেখে বড়দা একটু অনুকম্পার হাসি হেসে বললেন, গাছের গোড়ায় কতকগুলো পাথর পড়ে আছে দেখেছিস ?

ঠোঁটকাটা ষষ্ঠী বলে উঠল, কিন্তু ওগুলো যদি পাথর না হয়ে আমের আঁটি হ'ত, ওর থেকে এ্যাদ্দিনে বড় বড় মহীরুহ গজিয়ে যেত।

বড়দা খ্যাঁক করে বলে উঠলেন, যা বলি তাই শোন না। এ্যাদ্দিন এইটেই শুধু 'সল্‌ভ' করতে পারিনি যে ছুঁড়ছে কোত্থেকে।

ষষ্ঠী চোখ কপালে তুলে বললে, সে কি এই তালগাছের মাথায় উঠে ছ'হাত ছেড়ে দিয়ে—

বড়দা মাঝপথেই তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, তা না হলে তোর সঙ্গে তার আর তফাৎটা কোথায় রইল রে হতভাগা ? তার পর আশপাশের লোকজনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ভাই সব, আততায়ী এই জঙ্গলেই লুকিয়েছে। এইটুকু সময়ের মধ্যে তার পক্ষে জঙ্গল ছেড়ে পালানো সম্ভব নয়, বিশেষতঃ চারদিক যখন ঘিরে ফেলা হয়েছে। তোমরা আর দেরি না করে জঙ্গল ঠ্যাঙাতে সুরু করে দাও।

ধপাধপ লাঠি পড়তে লাগল বন-শিউলীর ঝোঁপের মাথায়, দেখতে দেখতে অত বড় জঙ্গলটা মাটির সঙ্গে সমান হয়ে গেল। কিন্তু কোথায় আততায়ী ? মাঝখান থেকে তাড়া খেয়ে গোটাকয়েক শেয়াল খ্যাঁক করে দাঁত দেখিয়ে ছুটে পালাল।

রাত দুপুর গড়িয়ে গেছে, এ দিকে পাথরেরও কামাই নেই। মানুষগুলোও সব যেন হন্যে হয়ে উঠেছে, একটা হেস্তনেস্ত না করে আজ আর ছাড়বে না।

ষ্টেশন-বাজারের দিক থেকে একটা সোরগোল উঠল, ছ'তিনটে 'এলার্ম সিগন্যাল'ও বেজে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। আমরা মাঠের দিকে বারা টহল দিচ্ছিলাম, আর দাঁড়িয়ে থাকা যুক্তিযুক্ত হবে না ভেবে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটলাম বাজার লক্ষ্য করে।

পৌঁছে দেখি রীতিমত ভিড় জমে গেছে। কাকে কেন্দ্র করে ভিড় বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই। পাশের দু-একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, কেউ উত্তর দিলে না, সবাই তখন ভেতরে ঢোকার জন্য ব্যস্ত। অগত্যা উপায়ান্তর না দেখে জয়দ্রথের সেই ব্যূহ ভেদ করেই ভেতরে ঢোকা মনস্থ করলাম। লাঠিগাছ-খানাকে বগলে নিয়ে কনুই দুটোকে এরোপ্লেনের পাখার মত ছড়িয়ে দিয়ে ভিড় ঠেলে এগোতে লাগলাম সামনের দিকে। দেখলাম এতে সুফল ফলল অনেকখানি, কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিড়ের মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছে গেলাম। পেছনের ভিড়ের চাপ থেকে আত্মরক্ষা করে ব্যালেন্স রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল, এক ছোকরা সাঁওতালী কুলী, খুব সম্ভবতঃ রেলওয়ে গ্যাঙম্যান, মাটির ওপর উঁচু হয়ে বসে দু'হাতে দুখানা পৃথুলকায় লাইনের খোয়া নিয়ে করতালের ভঙ্গীতে বাজাচ্ছে আর বিড় বিড় করে কি সব বকছে আপন মনে। পাশের একজনকে জিজ্ঞেস করে উত্তর পেলাম ছোঁড়াটা নাকি ষ্টেশনের পিছনে আঠার নম্বরের যে কুলী-ক্যাম্প পড়েছে তারই পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাথর ছুঁড়ছিল এইদিক লক্ষ্য করে। কে একজন দেখতে পেয়ে দলে গিয়ে খবর দেয়, তখন সবাই মিলে এসে একে পাকড়াও করে। ছোঁড়াটা অবশ্য আপত্তি জানায় নি কোন-রকম।

এদিক ওদিক তাকিয়ে বড়দা নীলুদা কাউকেই দেখতে পেলাম না। ওদিকে জনতার মধ্যেও ক্রমশঃ ধৈর্য্যচ্যুতির লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। কল-কোলাহলের মধ্যে থেকে নানা রকম বীরত্বব্যঞ্জক উক্তি কানে আসছে। কে একজন এমন কথাও বলে উঠল, আর দেরি করে লাভ কি, এবার আরম্ভ করে দিলেই ত মিটে যায়।

বড়দা ঠিক সেই সময়েই কোথা থেকে হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির হলেন। কণ্ঠে অধিনায়কোচিত গাম্ভীর্য্য অক্ষুণ্ণ রেখে বলে উঠলেন, তোমরা সব সরে দাঁড়াও দিকি, যা করার আমি করছি।

সবাই সসম্মানে সরে গিয়ে রাস্তা করে দিলে।

বড়দা বীরদর্পে এগিয়ে গিয়ে বন্দুকের কুঁদোটা সশব্দে মাটিতে নামিয়ে একটা সিংহনাদ ছেড়ে বললেন, ব্যাটা পাজী নচ্ছার হারাম-জাদা ইষ্টুপিট ড্যাম শুয়ার রাস্কেল ভিটকেলেমির আর জায়গা পেলে না। ভেবেছ বুঝি ক্যাম্পের আড়ালে দাঁড়িয়ে তুমি কি করছ না করছ কেউ কোন দিন জানতে পারবে না ? জান না যার সঙ্গে তুমি চালাকি করতে এসেছ, তোমার মত হাজারটা লোককে সে ট্যাকে গুজতে পারে ? তুমি ত তুমি, তোমার—

মাঝপথে হঠাৎ থেমে গেলেন বড়দা। খেয়াল হ'ল যাকে উদ্দেশ্য করে এ সব কথা বলা হচ্ছে সে নির্ব্বিকারে পাথর বাজিয়ে চলেছে তন্ময় হয়ে। বড়দা খানিক অসহায় ভাবে সেদিকে তাকিয়ে থেকে তার পর দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, আচ্ছা, তোর মত পাজী লোককে কি করে শায়েস্তা করতে হয় আমি একবার দেখাচ্ছি—তার পর নীলুদার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, নীলে, ওর গালে একটা থাপ্পড় মার ত।

নীলুদা আর দ্বিরুক্তি না করে চটাং করে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিলে বাঁ গালে।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ছোঁড়াটা পাগল নাকি ? নতুবা এমন

একটা থাবড়া খেয়েও নির্বিকারে সেই আগেকার মত পাথর বাজাচ্ছে আর বিড় বিড় করে বকে চলেছে আপন মনে। সব দেখে শুনে বড়দার মনেও বোধ হয় একটু খটকা লাগল, বন্দুকের নল দিয়ে ঠেলা দিয়ে বললেন, হ্যাঁরে এই, কথা বলিস না কেন ?

ছোঁড়াটা রক্তচক্ষু মেলে বড়দার মুখের দিকে তাকাল। বড়দা সভয়ে ক'হাত পেছিয়ে এলেন।

এমন সময় এক বুড়ো সাঁওতাল ভিড় ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে এল, সাজপোশাক দেখে মনে হ'ল 'গ্যাঙম্যান'দের সর্দ্দার-টর্দ্দার গোছের কিছু একটা হবে। ছোঁড়াটার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বুড়ো তার চুলের ঝুঁটি ধরে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, এ ঝণ্ডু, গড় কর বাবুকে।

ঝণ্ডু ফ্যাল ফ্যাল করে সর্দ্দারের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে আবার খঞ্জনী বাজাতে সুরু করলে।

অগত্যা সর্দ্দার নিজেই বড়দাকে একটা পেন্নাম করে বললে, ছোঁড়াটারে লিয়ে বড় মুস্কীলে পড়ে গেছি বাবু মশায়। লতুন লেশা করতে শিখেছে এই আঠার লম্বর কুলী-কেম্পে বদলী হয়ে, আর সব ছোঁড়াগুলার পাল্লায় পড়ে। সবাই উরে বুঝায়েছে যে ভরদিন খাটার পর একটুক আধটুক লেশা না করলে শরীল থাকবে লাই। উ-উ তাই মনে লিয়ে লেশা করতে সুরু করলে। আমি আর কি বুলব বাবু বুললাম ত্যাখ, তু লেশা করবি কর, কিন্তুক গোড়াতেই যে তাড়ি ধরবি, সহ্য করতে পারবি ত ? উ বুললে খুব পারব। তো বাবু পারব বুললেই কি পারে, তার উপরে পিথম লেশা বলে উকেই সবাই খাওয়াচ্ছে বেশী করে। তাই লেশা করেই উয় আর মাথার ঠিক থাকে না, লাইন থেকে টুকরী বোঝাই খোয়া লিয়ে এসে হরদম ছুড়তে থাকে ইদিক উদিক। একদিন মানা করতে গেছিলাম, তাতে খোয়া লিয়ে তাড়া করে আসেছিল। সেদিন থেকে বুললাম, যা, তুর যা পান চায় তাই তু করগা যা তার পর তুর কপালে যা আছে তাই হবে।

একটুখানি থেমে বললে, যাকৃগে বাবু, ইবারটির মুতন দে উরে ছাড়ান দিয়ে, তার পর কালকেই ত উ বদলি হয়ে চলি যাচ্ছে তিন লম্বরে। আর পিথম নেশায় সবারই অমন একটুক আধটুক মাথা বিগড়ায়। এই আমিই যখুন পিথম লেশা করতে শিখলাম কুলীর কাজে ঢুকে, তখুন সনদে বেলা লেশা করে চোপর রাত বসে থাকতাম এক বিরিক্ষির মাথায়। সকাল হতেই সুরুয ঠাকুরকে দেখতে পেয়ে লেশা যেত ছুটে, তখুন আস্তে আস্তে লেমে আসতাম ভুয়ের পরে। তাই বুলছি পিথম লেশায় সবারই অমন একটুক আধটুক মাথা বিগড়ায়, উ লিয়ে কি আর বিচার করলে চলে।

বড়দা খানিকক্ষণ গভীর ভাবে চিন্তা করে বললেন, আচ্ছা এবারের মত ওকে ছাড়ছি বটে, কিন্তু দ্বিতীয় বার হলে আর ছাড়ব না মনে থাকে যেন।

সর্দ্দার বললে, সি দরকারও আর হবে না বাবু, কালকেই ত উ বদলি হয়ে যাচ্ছে তিন লম্বরে।

পরের দিন রাস্তায় বড়দার সঙ্গে দেখা হতেই বললেন, দেখলি, তখনি বলেছিলাম যত সব—

অষ্টাদশী

শ্রীনির্ম্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়

তোমারে দেখিনু যবে বসন্তের মূচ্ছিত বাতাসে,
সমস্ত অন্তর মম বিভ্রান্তিতে উঠেছিল ভরি';
ক্ষুব্ধ হৃদয়ের সর্ব্ব উন্মত্ততা ভাসিছে হুতাশে—
যে-হুতাশে অনিন্দিত কান্তি পড়ে ধীরে ধীরে ঝরি'!

মূর্চ্ছাহত অন্ধ বায়ু তীব্র বেগে মত্ততায় লীন,
বিশুষ্ক বনানী ক্ষোভে ক্রন্দিল যে মর্ম্মরিয়া শুধু;
বিষণ্ণ পৃথিবী চির রিক্ততায় ক্লান্ত, ছন্দ-হীন,
স্তিমিত নিস্তেজ রুক্ষ মরুসম—করে বুঝি ধূ-ধূ!

বিমর্ষ কুঞ্জেতে শ্রান্ত নেত্র দুটি ক্লান্ত ভাবে মেলি'
চাহিলাম তব পানে—শূন্য চোখে চির মুহ্যমান!
মূর্চ্ছে দেহ, মূর্চ্ছে মন, ঝরি' যায় চম্পক, চামেলি!—
তব মুখে সারা বিশ্ব জর্জ্জরিত, চির কম্পমান!

সূর্য্যের কিরণ তব তন্দ্রিত চক্ষেতে প্রজ্বলিত,
লাবণ্য পড়িছে হায়, তপ্ত বায়ে মুহুর্মুহুঃ ঝরি',—
তব পানে তবু চেয়ে অসহ্য আবেগে বিস্ফারিত
আঁখি মেলে অবসন্ন দেহে কুঞ্জে লুটাইয়া পড়ি!

তব কুঞ্জে ফুটিবে না হে সুন্দরি, যৌবনে উচ্ছসি'?
অষ্টাদশ-বসন্তের উগ্র রূপে, ওগো অষ্টাদশী।

নৃত্যে কথকতা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

প্রাচীনকাল থেকেই শক্তিশালী চের রাজ্যের কথা ইতিহাসে স্থানলাভ করেছে। খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট অশোকবর্দ্ধনের অনুশাসনে চের বা কেরলপুত্রের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। চের বা কেরলের নির্দ্দিষ্ট সীমা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এখানে মোটামুটি এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, আধুনিক মালাবার প্রদেশ এবং ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন রাজ্যের অধিকাংশ প্রাচীন চের বা কেরলের অন্তর্গত ছিল। এখন কেরল বলতে বুঝায় মালাবারকেও। ঐ দেশটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে সমৃদ্ধ।

শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধনদাস শাস্ত্রী হচ্ছেন একজন মালাবারী পণ্ডিত এবং বাংলা ভাষায় বিশেষ রূপে অভিজ্ঞ। তিনি বলছেন, "আজব দেশ এই মালাবার, এক কথায় একে নাচের দেশ বলা চলে। একটা-না-একটা নাচ সর্ব্বদা লেগেই আছে। সন্তান-জন্মে নাচ; নামকরণ, অন্নপ্রাশন ও চূড়াকর্ম্মে নাচ; উপনয়নে, বিবাহে, ঋতুশান্তিতে নাচ; বার্ষিক জন্মতিথি-গুলিতে নাচ; পূজায়-পার্ব্বণে নাচ; উৎসবে-আমোদে নাচ; এমন কি মড়কে-মহামারীতে পর্য্যন্ত সে দেশের লোকেরা না নেচে থাকতে পারে না।"

এই দেশের নৃত্য হচ্ছে "কথাকলি"। দক্ষিণ-ভারতে অন্যান্য সব নাচের চেয়ে বেশী নাম কিনেছে "কথাকলি" ও "ভরতনাট্যম্"। শেষোক্তটি নারীদের নাচ এবং কথাকলি হচ্ছে পুরুষদেরই নিজস্ব। এর মধ্যে নারীভূমিকা থাকলেও তা গ্রহণ করে পুরুষেরাই। কিন্তু আজকাল নারীরাও এই নাচে দেখা দিতে সুরু করেছেন—যেমন শ্রীমতী রাগিণী দেবী ও শ্রীমতী শান্তা প্রভৃতি। কিন্তু কথাকলিতে তাণ্ডবের প্রাধান্য থাকলেও তার মধ্যে লাস্যও উপেক্ষিত হয় নি।

কথাকলিকে বলা চলে নাচে কথকতা। ভাবভঙ্গী-গানের দ্বারা পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনা করাই হচ্ছে উভয়ের উদ্দেশ্য। উত্তর-ভারতে যা "কথক" নাচ নামে বিখ্যাত, তাও এই অর্থ প্রকাশ করে কিনা বলতে পারি না।

কথাকলি আধুনিক নাচ নয় বটে, কিন্তু "ক্লাসিক্যাল" বা প্রাচীন নৃত্য বলতে আমরা যা বুঝি, কথাকলিকে তাও বলতে পারি না। ভরতনাট্যম্ প্রাচীনতার ঐতিহ্য যথা-সম্ভব বজায় রাখবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কথাকলির মধ্যে আদিম বা প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন কোন লক্ষণ ও বিশেষত্ব আবিষ্কার করা গেলেও তাকে ঠিক "ক্লাসিক্যাল" বা খুব-পুরানো নাচ বলাও চলে না। হয়ত স্মরণাতীত কালে তা ছিল এক শ্রেণীর লোকনৃত্যেরই মত, কিন্তু নব-পর্য্যায়ের সংস্কৃত কথাকলি সর্ব্বপ্রথমে পরিকল্পিত হয় মধ্যযুগে দক্ষিণ-ভারতীয় রাজসভায়। এর প্রথম পরিকল্পক নাকি সেকালের ত্রিবাঙ্কুরের একজন রাজা। আর একজন রাজা কথাকলির জন্য কয়েকখানি নৃত্যনাট্য রচনা করে নাম কিনেছেন। প্রাচীন ভারতে কাব্যকার রূপে একাধিক রাজা খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন বটে, কিন্তু নৃত্যশিল্পী রূপে প্রখ্যাত আর কোন রাজার নাম শুনেছি বলে স্মরণ হয় না। মালাবার নাচের দেশ বলেই বোধ করি এটা সম্ভবপর হয়েছে। কারণ পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীমহাশয়ই বলছেন:

"বৎসরের প্রথম নৃত্য হচ্ছে শ্রবণানৃত্য। এই নৃত্যকে সে দেশের ভাষায় "ওনক্কুলি" বলে।...সকলে মিলে দলে দলে যায় পাহাড়ে ফুল আনতে। এ যাত্রায় উচ্চনীচ, ইতর-ভদ্র, রাজা-প্রজায় কোন তফাৎ নেই—সবাই এক। এত বড় ছোঁয়াছুঁতের দেশেও এ বিষয়ে যথেষ্ট উদারতা দেখা যায়।"

কাজেই ওদেশের রাজাদেরও আর পাঁচ জনের মত নৃত্য-শিল্পী হতে বাধে না। অন্যান্য দেশের রাজারা মনসার মত নেচে উঠতে পারতেন বড়জোর এক কারণে এবং তা হচ্ছে যুদ্ধেরগন্ধ। কিন্তু নটরাজ মহাদেবের দৃষ্টান্ত দেখেও এবং ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র পাঠ করেও পায়ে নূপুর বাজিয়ে নাচতে বোধ হয় তাঁরা লজ্জিত না হয়ে পারতেন না।

কথাকলি হচ্ছে প্রাদেশিক নৃত্য। ভরতনাট্যমের বিশেষজ্ঞরা দাবি করেন, আজ তা দক্ষিণ-ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকলেও তার ভিতরে পাওয়া যায় বিদেশী-বিধর্ম্মীদের দ্বারা বিতাড়িত আর্য্যাবর্ত্তের নিজস্ব নৃত্যেরই লুপ্তাবশেষ। কিন্তু কথাকলি এমন কোন সর্ব্বভারতীয় দাবি উপস্থিত করতে পারে না। দক্ষিণ-ভারতের শেষপ্রান্তে যখন তার জন্ম হয়, আর্য্যাবর্ত্তের সৌভাগ্যসূর্য্য তখন অস্তমিত এবং ভারতবর্ষে চলছে মোগলদের পূর্ণ প্রভাব। তার পর তার সামনেই হ'ল মোগলদের অধঃপতন এবং ব্রিটিশ-সিংহের সমুত্থান। এই ভাঙাগড়ার মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরে কথাকলিকে আপন প্রদেশের চতুঃসীমার ভিতরেই বাস করতে হয়েছে, মাত্র দুই-চারি জন বিশেষজ্ঞ ছাড়া সমগ্র ভারতের অন্যান্য প্রদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা তার অস্তিত্বের কথা একেবারেই জানত না বললেও অত্যুক্তি হবে না। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৃত্য-পরিবেশক পরলোকগত হরেন ঘোষ একাধিকবার বিভিন্ন প্রাদেশিক নৃত্যের সঙ্গে কলকাতার

জনসাধারণের পরিচয়সাধন করে দিয়েছেন। ১৯৩৬ সনে তিনিই কথাকলি সম্প্রদায় ও তার নৃত্যগুরু শঙ্করম্ নম্বুদিরিকে নিয়ে সর্ব্বপ্রথমে কলকাতায় এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সফরে বহির্গত হন। সেই সময়েই কথাকলি সম্বন্ধে সর্ব্বভারতীয় জনসাধারণের কৌতূহল ও আগ্রহ প্রথম জাগ্রত হয়। তার পর নর্ত্তকশ্রেষ্ঠ উদয়শঙ্কর কথাকলির কোন কোন বিশেষত্ব সাদরে গ্রহণ করে তাকে দক্ষিণ-ভারতের বাইরে অধিকতর পরিচিত ও লোকপ্রিয় করে তোলেন। ধরতে গেলে তখন থেকেই মালাবারের বাইরে দেশে দেশে কথাকলির যাত্রাপথ প্রশস্ত হয়ে যায় এবং বহু দক্ষিণ-ভারতীয় নৃত্যশিল্পী এদেশের সর্ব্বত্র সমাদৃত ও অভিনন্দিত হন।

কিন্তু ভারতের দেশে দেশে কথাকলির এই আনাগোনার ফলে সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে কেবল কথাকলি নয়, ভরতনাট্যম্ সম্বন্ধেও ঐ কথাই বলা যায়। বাজারে এক শ্রেণীর পেশাদার ও পল্লবগ্রাহী নৃত্যশিক্ষকের আবির্ভাব হয়েছে, তাঁদের কাছ থেকে মাস চার-পাঁচ বা আরও অল্পদিন তথাকথিত শিক্ষালাভ করে কচি কচি শিক্ষার্থীরাও বড় বড় আসরে—এমনকি নৃত্যপ্রতিযোগিতাতেও—কথাকলি ও ভরতনাট্যমের নমুনা দেখাতে সঙ্কুচিত হয় না। অথচ ঐ দুটি নাচের প্রত্যেকটি সদ্‌গুরুর অধীনে থেকে নিখুঁত ভাবে শিখতে গেলে সময় লাগে অন্ততঃ ছয়-সাত বৎসর।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কথাকলি ভারতের প্রাদেশিক নৃত্য হলেও বৃহত্তর ভারতে—অর্থাৎ জাভা ও সিংহলে গিয়েও সেখানকার জাতীয় নৃত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। আর এক দিক দিয়ে এ অঞ্চলের অন্য কয়েকটি দেশীয় নাচের সঙ্গে কথাকলির একটা সাধারণ মিল দেখা যায়। জাভা, সিংহল, তিব্বত, নেপাল, আসাম ও সেরাইকেলা প্রভৃতি স্থানে নাচে মুখোশের ব্যবহার প্রচলিত আছে। কথাকলির নর্ত্তকরা পৃথক মুখোশ ব্যবহার করে না বটে, কিন্তু বিভিন্ন বর্ণের পুরু প্রলেপ দিয়ে তারা যেভাবে সারা মুখ ঢেকে রাখে, তা যে-কোন মুখোশেরও চেয়ে ফলপ্রদ। সাধারণ মুখোশে একটি বিশেষ ভাব স্থিরীকৃত হয়ে যায়, ভাবের কোন পরিবর্ত্তন তা দেখাতে পারে না—যা দেখাতে পারে কথাকলির নর্ত্তকরা।

কথাকলির "মেক-আপ" বা রূপসজ্জা হচ্ছে এক এলাহি ব্যাপার, তার খুঁটিনাটি প্রায় অসংখ্য। দেখেছি, গুরু শঙ্করম্ নম্বুদিরির এক পুত্র কথাকলির জন্যে রূপসজ্জা করতে সময় নিয়েছিলেন তিন ঘণ্টার কম নয়।

আধুনিক সভ্যতা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছে অতি-তুরন্ত বিদ্যুৎ-গতি। মন ছোটে দেহের আগে। কিন্তু আধুনিক মানুষের দেহ ছুটতে চায় অন্ততঃ মনের সঙ্গে সঙ্গে। সব সময়েই সে ব্যস্ত, সব কাজেই তার তাড়াতাড়ি। আগে হেসে-খেলে ধীরে-সুস্থে নানান দেশের নানান দৃশ্যমাধুরী দেখতে দেখতে লোকে কলকাতা থেকে যেত লণ্ডনে। এতটা গড়িমসি এখন আর তার সয় না। আজ সে এখান থেকে বিলাতে যাবার জন্যে চার-পাঁচ দিনের বেশী সময় খরচ করতে চায় না, তাই তার জন্যে তৈরি হয়েছে বিমানপোত। আগে বাঙালীরা নাট্যাভিনয় দেখত সারারাত ধরে। এখন তিন ঘণ্টার বেশী অভিনয় দেখতে গেলে তাদের বিরক্তি ধরে যায়। সেইজন্যেই আধুনিক পৃথিবীর ব্যস্ত জীবনযাত্রার মধ্যে কথাকলিকে ঠিক মানানসই বলে মনে হয় না। তা শিখতে সময় লাগে অন্ততঃ ছয় বৎসর, তার রূপসজ্জা করতে সময় লাগে অন্ততঃ তিন ঘণ্টা এবং তার নাচ চলে প্রতি রাত্রে নয় ঘণ্টা করে উপরি-উপরি কয়েক রাত্রি পর্য্যন্ত। মালাবারের জনসাধারণ ছাড়া আর কোন দেশেরই আধুনিক নৃত্যানুরাগীরা নাচ দেখবার জন্যে এতটা সময় ব্যয় করতে প্রস্তুত হবেন না। যে সব পুরাতনপন্থী ব্যক্তি কথাকলি ও ভরতনাট্যম্ প্রভৃতি সেকেলে নাচের অন্ধ ভক্ত, তাঁরা যুগ-ধর্ম্মের খাতিরেও সেকেলে নাচে তিলমাত্র রদবদল সহ্য করতে রাজী নন। অনেক দিন আগেই বলেছি, ভারতীয় আর্টকেও এখন যুগধর্ম্মকে স্বীকার করে বিশাল বিশ্বের অংশ-বিশেষ হয়ে উঠতে হবে। কালিদাসকে আমরা শুধু ভারতের মহাকবি বলে পূজা করতে অসম্মত নই। কিন্তু একালেও কেউ যদি সে যুগের ভাষা ও নাট্যরচনাপদ্ধতিকে হুবহু অবলম্বন করে কালিদাসের চেয়ে ভাল নাটক রচনা করেন এবং তা সত্ত্বেও আধুনিক লোকসাধারণ যদি তার রস উপভোগ করতে না পারেন, তা হলে তাঁকে অরসিক বলে গালাগালি দিলে সঙ্গত হবে না। রক্ষণশীল দাক্ষিণাত্যেও এই পরম সত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছেন কেউ কেউ। তাই আজকাল নব্য রসিকদের সুবিধার জন্যে কর্ত্তৃপক্ষ যুগোপযোগী নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছেন। সমগ্র নৃত্য-নাট্য থেকে এক-একটি দৃশ্য বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে দর্শকদের সামনে তারই নাচ দেখানো হয়। যদিও মালা-ছেঁড়া ফুল দেখে অবিচ্ছিন্ন মালার শোভা বোঝা অসম্ভব, তবু এই ব্যবস্থাকে মন্দের ভালো বলা ছাড়া উপায় নেই। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার না করলে চলে না যে, এই পল্লবগ্রাহিতা রসের সমগ্রতার সঙ্গে আমাদের পরিচিত করতে পারে না। আমরা দুধের স্বাদ ঘোলের সাহায্যে মেটাবার চেষ্টা করছি বটে, কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলে যে অসুবিধা হয়, তার কথাও পরে বলব।

কথাকলি এদেশে নৃত্যনাট্য নামে পরিচিত এবং নৃত্য-

নাট্যকে আমরা "ব্যালে" বলেই মনে করি, কারণ দুটিরই মধ্যে থাকে গল্প। কিন্তু আধুনিক "ব্যালে"র মধ্যে কেবল গল্পই থাকে না, তা হচ্ছে একাধারে নৃত্য, সঙ্গীত ও চিত্রের সমষ্টি। কথাকলির সঙ্গে চিত্রের সম্পর্ক নেই বললেই চলে, কারণ এ নাচে দৃশ্যপট ব্যবহৃত হয় না।

কথাকলির সঙ্গীতে নর্ত্তক যোগ দেয় না, অন্যান্য বাদ্যের —অর্থাৎ ঝাঁঝ, করতাল এবং খাটো ও লম্বা ঢোলের— সঙ্গতের সঙ্গে দুই জন গায়ক গান গাইতে থাকে এবং নর্ত্তক অঙ্গহারের সাহায্যে করে সেই গানেরই ভাবাভিব্যক্তি। ভরতনাট্যমে নাচের সময়ে গানের ভার নেয় গায়ক। শুনতে পাই, প্রাচীন কালেও ভারতীয় নৃত্যে নাকি এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হ'ত।

কিন্তু প্রাদেশিকতার জন্যে কথাকলি শ্রেষ্ঠ আর্টের নিদর্শন হয়েও সর্ব্বভারতীয় নৃত্য রূপে গণ্য হতে পারবে না। তার নাচের অর্থ বোঝায় গান, কিন্তু সে গানের ভাষা হচ্ছে দক্ষিণ-ভারতীয়, মালাবারের বাইরে যা গ্রীকেরই সামিল। আর এক দিক দিয়ে কথাকলির অর্থ বোধ হতে পারে অল্পবিস্তর। তা হচ্ছে "প্যান্টোমাইম" বা "মূকনাট্য", তার নর্ত্তকের ভাষা মৌখিক নয়, আঙ্গিক। গানের কথা ছেড়ে দিলে বলা যায় কথাকলির প্রধান ভাষা হচ্ছে মুদ্রার ভাষা। যে মুদ্রার বিনিময়ে বাজারে গিয়ে মণ্ডামিঠাই হস্তগত করা যায়, শিশুদেরও কাছে তা সুপরিচিত। কতকগুলি পুথিগত মুদ্রাও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জনসাধারণের এক শ্রেণীর কাছে অপরিচিত নয়। উপরন্তু ভরতনাট্যশাস্ত্র, অভিনয়দর্পণ, সঙ্গীতরত্নাকর ও অন্যান্য বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থে যে সব মুদ্রার বর্ণনা আছে, অন্ততঃ ভারতের অন্যান্য প্রদেশেরও বিশেষজ্ঞরা তাদের কথা জানেন। কিন্তু হস্তলক্ষণদীপিকা নামে নৃত্য-শাস্ত্রসম্পর্কীয় আর একখানি প্রাচীন গ্রন্থ বোধ করি তেমন প্রসিদ্ধ নয়। কথাকলি নাচের মুদ্রাগুলি পরিকল্পিত হয়েছে ঐ গ্রন্থের বর্ণনানুসারেই। সেইজন্যে অধিকাংশ পণ্ডিতও সে সব মুদ্রাকে চিনতে পারেন না। পণ্ডিতদেরই যদি এই অবস্থা হয়, তা হলে সাধারণ দর্শকদের কথা বলাই বাহুল্য। এইখানে একটা ব্যাপার স্মরণ হচ্ছে। বছর ছয় আগে সেরাইকেলায় এক নৃত্যোৎসবে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে জনৈক বিশিষ্ট দক্ষিণ-ভারতীয় নর্ত্তক দেখালেন কথাকলি নৃত্যাভিনয়। কিন্তু নাচ দেখে সেরাইকেলার দর্শকরা সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলেন, তাঁরা যা দেখলেন তা নৃত্যপদবাচ্য হতে পারে কিনা! সকলেই জানেন, নৃত্যচর্চ্চার জন্যে ভারতের যে চার-পাঁচটি প্রদেশ বিশেষ রূপে বিখ্যাত, সেরাইকেলা হচ্ছে তাদেরই অন্যতম। কিন্তু সেখানকার দর্শকরা নৃত্যের রসগ্রাহী, তবু কথাকলির মুদ্রাবাহুল্য তাঁদেরও বিভ্রান্ত করে তুলেছিল। একে কথাকলির ভাষা হচ্ছে প্রধানতঃ মুদ্রারই ভাষা, তার উপরে সে ভাষা আবার শেখানো হয়েছে বিশেষ এক গ্রন্থ থেকে—দাক্ষিণাত্যের নৃত্য-বিশারদগণ ছাড়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশের জনসাধারণের সঙ্গে সে গ্রন্থের কোনই সম্পর্ক নেই। লোহার সিন্দুকে সুপরিচিত মুদ্রার আধিক্য মানুষের পক্ষে আনন্দদায়ক বটে, কিন্তু নাচে অপরিচিত পুথিগত মুদ্রার অতিবাহুল্য দর্শকদের পক্ষে বেদনাদায়ক। এই কারণেই দাক্ষিণাত্যের বাইরে কথাকলির যোগ্য সমাদরলাভের সম্ভাবনা না থাকারই কথা।

কথাকলিতে মূল-মুদ্রা আছে চব্বিশটি কিন্তু তার সংযোগ-পরিবর্ত্তনের সংখ্যা হয় না, তার আঙ্গিক ভঙ্গী-পরিবর্ত্তনের সংখ্যা হচ্ছে এই : মাথার নয়টি, চোখের আটটি, ভুরুর ছয়টি এবং কণ্ঠের চারটি। তার উপরে পা, পায়ের গোড়ালি, পদাঙ্গুলি, কোমর, মণিবন্ধ, করতল, গণ্ডদেশ ও চোখের পাতার ভঙ্গী-পরিবর্ত্তনের সংখ্যা চৌষট্টিটি। কথাকলিতে নাচ আছে ত্রিশ রকম।

আমরা মালাবারী নই, তাই কথাকলির আসরে কর্কশ কণ্ঠমুখর গায়কেরা (কথাকলির কোন নাচেই কখনও আমি সুকণ্ঠ গায়ক দেখি নি) আমাদের নাচের অর্থ ত বোঝাতে পারে না বটেই, বরং তাদের গানকে মনে হয় দুর্ব্বোধ্য ও বিরক্তিকর [illegible] মত। কিন্তু রসিকের চোখ দিয়ে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারি, নর্ত্তকেরা অঙ্গভঙ্গী ও অঙ্গুলি-সঙ্কেতের দ্বারা ফুটিয়ে তোলে না কেবল মানুষের জীবনযাত্রা, সেই সঙ্গে তারা দেখিয়ে চলে আকাশ-বাতাস, ভূধর-সাগর, নদনদী, লতাপাতা ও ফলফুল প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য-সম্ভার। তারও উপরে তারা দেখাতে পারে তাবৎ পশুপক্ষী —এমনকি কীটপতঙ্গের বিশেষত্বকেও। এই সব নাচের পরিকল্পকদের সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণশক্তি দেখে রীতিমত বিস্মিত হতে হয়।

কলকাতার একাধিক রঙ্গালয়ে বহুবার কথাকলি নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়ে গিয়েছে এবং যাঁরা ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে দেখেছি কয়েক জন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী এবং কোন কোন নৃত্যাচার্য্যকেও। মালাবারে কুঞ্জু কুরুপ, কাভালাপারা নারায়ণ নায়ার, থাকাবী ও রাভম্নি মেনন প্রভৃতি নৃত্যাচার্য্যের খ্যাতি-প্রতিপত্তি যথেষ্ট। তবে তাঁদের না দেখলেও পরলোকগত শঙ্করম্ নম্বুদিরিকে বারংবার দেখবার সুযোগ আমাদের হয়েছে। কেবল নৃত্যাচার্য্য নন, তিনি ছিলেন অতুলনীয় নৃত্যশিল্পীও। কিন্তু তাঁদের পূর্ণশক্তির যথার্থ নিরিখ আমরা পাই নি। কারণ সমগ্র নৃত্যনাট্য থেকে বিচ্ছিন্ন সেই সব খণ্ড খণ্ড দৃশ্যে শিল্পীদের ব্যক্তিগত শক্তির

অল্পবিস্তর পরিচয় পাওয়া গেলেও পরিকল্পনার অখণ্ডতা থেকে বঞ্চিত হয়ে কথাকলির পরিপূর্ণ মহিমা আমরা উপলব্ধি করতে পারি নি। আড়াই বা তিন ঘণ্টাকালের মধ্যে শহুরে রঙ্গমঞ্চের আবদ্ধ পরিস্থিতির ভিতরে কথাকলির ঘনীভূত রস উপভোগ করা একেবারেই অসম্ভব। কথাকলির দৃশ্যসংস্থান অত্যন্ত সাদাসিধা। মাথার উপরে থাকে চারটে খুঁটি দিয়ে টাঙানো সামিয়ানা, যথাস্থানে সুদীর্ঘ দীপাধারের উপরে একটি বৃহৎ কাংস্যপ্রদীপ স্নিগ্ধ কোমল আলোক বিতরণ করে। অর্দ্ধযবনিকা রূপে ব্যবহৃত হয় একখানা বর্ণবিচিত্র সুন্দর বস্ত্র —দুই দিক থেকে তা ধারণ করে থাকে দুই জন বালক। সামনের দিকে মেঝের উপরে আসীন হয় দর্শকরা। শঙ্খধ্বনি করে পালা সুরু হয়। রাত নয়টা থেকে সকাল ছয়টা পর্য্যন্ত নৃত্যাভিনয় চলে। রসবৈচিত্র্যের জন্যে মাঝে মাঝে ভাঁড়েদেরও আবির্ভাব দেখা যায়। বলা বাহুল্য, রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি পুরাণ অবলম্বন করেই অভিনয়ের বিষয়বস্তু রচিত হয়।

শোনা যায়, সর্ব্বপ্রথমে কথাকলির জন্যে মোট আটখানি নৃত্যনাট্য রচিত হয়েছিল এবং তার প্রত্যেকখানিতেই অবলম্বন করা হয়েছিল রামায়ণের কাহিনী। এইজন্যে আগে নাকি কথাকলির নাম ছিল "রামনাট্যম্"। বোধ করি রামায়ণের সঙ্গে পরে অন্যান্য পুরাণের কাহিনীও সংযুক্ত করা হয়েছিল বলেই নূতন নামকরণের দরকার হয়। কথাকলি হচ্ছে সাধারণ নাম—তার মধ্যে যে-কোন পুরাণের কাহিনী থাকতে পারে।

নৃত্যগুরু শঙ্করম্ নম্বুদিরি কলকাতার রঙ্গালয়ে অখণ্ড ভাবে না হোক, কতকটা অবিচ্ছিন্ন ভাবে কথাকলি নৃত্যাভিনয় দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর নৃত্যপ্রতিভা ছিল এমন বিস্ময়কর যে উদয়শঙ্কর পর্য্যন্ত তাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার না করে পারেন নি। তাঁর সুপটু অঙ্গুলিগুলি ক্ষণে ক্ষণে ছন্দে ছন্দে প্রকাশ করত অকথিত বাণী এবং মূর্ত্ত করে তুলত অমূর্ত্তকেও। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষায় অভ্যস্ত অতি-আধুনিক বাঙালী দর্শকরা তাঁর যথার্থ মর্য্যাদা অনুভব করতে পারেন নি।

এমনকি লোকপ্রিয়তায় অসাধারণ উদয়শঙ্কর পর্য্যন্ত একবার তাঁর নাচের সফরে কথাকলির মুদ্রাবাহুল্যকে বিশেষ ভাবে গ্রহণ করে যে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন, তার ফল হয় নি সন্তোষজনক। তাঁর ঐ শ্রেণীর নাচ দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠেছিল। উপরন্তু মন্থর হয়ে পড়েছিল নাচের গতি—ফলে নাটকীয় ক্রিয়া আহত না হয়ে পারে নি। উদয়শঙ্করের আধুনিক মনীষা অবিলম্বেই এই ত্রুটি উপলব্ধি করতে পেরেছিল, তাই পরের বারে তাঁর নৃত্য-প্রদর্শনীতে দেখা গেল, কথাকলির মুদ্রা পরিত্যক্ত হয় নি, কিন্তু তার ব্যবহার হয়েছে সংযত ও বাহুল্যহীন।

আর একটি কারণে আমাদের আধুনিক রঙ্গালয়ে কথাকলি প্রভৃতি নাচ দেখতে গেলে দর্শকদের অসুবিধা বোধ করতে হয়।

পৌরাণিক ধর্ম্মকাব্য কেবল কথাকলির অবলম্বন নয়, এটা হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যকলার একটি প্রধান বিশেষত্ব। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেরই নিজস্ব নৃত্য এই বিশেষত্বের পরিচয় দেয়। ভারতের প্রভাবমণ্ডলের মধ্যে এসে সিংহল, শ্যামদেশ, কাম্বোডিয়া ও যবদ্বীপ প্রভৃতির নৃত্যকলাও ঐ বিশেষত্ব থেকে বঞ্চিত নয়। আর্য্যাবর্ত্তের একমাত্র নিদর্শন বলে কথিত ভরতনাট্যম্ আজ পর্য্যন্ত দেবালয়ের আশ্রয় ত্যাগ করে নি। পাশ্চাত্ত্য নৃত্যকলায় এমন ব্যাপার দেখা যায় না, এবং পাশ্চাত্ত্য প্রথায় নির্মিত শহুরে রঙ্গমঞ্চের উপরেও কথাকলি প্রভৃতি নৃত্য স্ফূর্ত্তিলাভ করে না। "আপ-টু-ডেট" বা হালনাগাদ ড্রয়িং-রুমের মধ্যে মানানসই হয় না ঠাকুরঘরের সাজসজ্জা।

এইজন্যেই প্রায় আঠারো বৎসর আগে সর্ব্বপ্রথমে কথাকলি নাচ দেখে মৎসম্পাদিত সাপ্তাহিক "ছন্দা" পত্রিকায় আমি লিখেছিলাম: "শঙ্করম্ নম্বুদিরি যে একজন প্রতিভাবান্ শিল্পী, একথা স্বীকার করছি মুক্তকণ্ঠেই। নিজের অবলম্বিত বিশেষ আর্টটির উপরে যে তাঁর কতখানি নিষ্ঠা ও অধিকার, সেদিনকার আসরে তার আশ্চর্য্য প্রমাণ পেয়ে অভিভূত হয়েছি। মনে হ'ল, শিল্পীর সমগ্র আত্মা যেন এই বিচিত্র নৃত্য-সাধনার মধ্যে সমাহিত হয়ে আছে। নৃত্য বলতে লোকে যা বোঝে, এ ত তা নয়, একে পূজা বলতে পারি—আধুনিক যুগের লঘু রঙ্গমঞ্চের রঙিন পাদপ্রদীপের আলোকে ও বাচাল প্রেক্ষাগৃহের তরল দৃষ্টিপ্রদীপের সামনে অতীতের এই গভীর ধ্যান আজ আর তার যোগ্য সম্মান অর্জ্জন করতে পারবে না। একে নৃত্যকলা না বলে বলা উচিত, নৃত্য-বেদ।"

কথাকলির মর্ম্মার্থ এবং স্বকীয় রস সমগ্র ভাবে উপভোগ ও উপলব্ধি করতে গেলে আমাদের যেতে হবে সেই সাগর-চুম্বিত মালাবার প্রদেশে, বিমলনীল মুক্ত আকাশের তলায় প্রকৃতির নিজস্ব নর্ম্মনিকেতনে যেখানে সাজানো হয় কথাকলির আপন নাচঘর।

শ্রীপাট-শ্রীখণ্ড

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

পঞ্চ মহান্তের স্থান

কাটোয়া হইতে প্রায় পাঁচ মাইল পশ্চিমে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ শ্রীপাট-শ্রীখণ্ড অদ্যাপি গৌরলীলা পরিকরগণের স্মৃতি বহন করিতেছে। শ্রীখণ্ডে মুকুন্দদাস ঠাকুর, নরহরি সরকার ঠাকুর, রঘুনন্দন ঠাকুর, চিরঞ্জীব সেন, সুলোচন ও চিরঞ্জীবের আত্মজ রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজ প্রমুখ মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন ; কেহ কেহ বা তথায় বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের মাতামহ কবি দামোদর ও পদকর্ত্তা বলরাম দাস প্রমুখ মহাজনগণও শ্রীখণ্ডবাসী ছিলেন। (১) নরহরি, (২) মুকুন্দদাস, (৩) রঘুনন্দন, (৪) চিরঞ্জীব ও (৫) সুলোচন—এই পাঁচ জন শ্রীগৌরপার্ষদের নামানুসারে শ্রীখণ্ড 'পঞ্চ মহান্তের স্থান' মহাপাট নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকার ঠাকুরের ভজনাসন

শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ দক্ষিণ, মধ্য ও উত্তর—এই তিন বাড়ীতে পালাক্রমে বিজয় করিয়া থাকেন। প্রতি মাসে বিগ্রহদ্বয় দক্ষিণ বাড়ীতে দশ দিন, উত্তর বাড়ীতে পনর দিন ও মধ্য বাড়ীতে পাঁচ দিন অবস্থান করিয়া সেবা গ্রহণ করেন। মধ্যবাড়ীতে নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের 'ভজনপীঠ' অবস্থিত। শ্রীল সরকার ঠাকুর মহাশয় যে আসনে উপবিষ্ট হইয়া ভজন করিতেন, সেই স্থানে উক্ত আসনের সমাধি প্রদত্ত হইয়াছে। মধ্যবাড়ীর নাট্যমন্দিরের পার্শ্বস্থিত একটি ক্ষুদ্র কুটীরে ঐ সমাধি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বর্ত্তমানে সেই স্থানে একটি পর্য্যঙ্কে শ্রীল সরকার ঠাকুরের সেবার উদ্দেশ্যে শয্যাসনাদি সংরক্ষিত আছে। উত্তর-বাড়ীতে নাট্যমন্দিরের এক পার্শ্বে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের সূতিকা-গৃহ বলিয়া একটি স্থান প্রদর্শিত হয়।

মধুপুষ্করিণী

কথিত আছে, কোন সময় সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীল সরকার ঠাকুরের নিকট শ্রীখণ্ডে আগমন করিয়া মধুপানের ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি তাঁহার গৃহের সন্নিকটস্থ একটি পুষ্করিণীর জল মধুরূপে পরিণত করিয়াছিলেন।—শ্রীখণ্ডে মধু পুষ্করিণী নামে একটি পুষ্করিণী প্রদর্শিত হইয়া থাকে। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর নামে আরোপিত শ্রীল নরহরি-ঠকুরাষ্টকের সপ্তম শ্লোকে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

বড়ডাঙ্গায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির

চক্রে মত্তাং গৌরসুতভক্তান্
নিত্যানন্দ প্রভৃতি-সমেতান্।
মাধ্বীকৈর্যো গৃহখনিজৈস্তং
বন্দে শ্রীল-নরহরিদাসম্।

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দকে স্বভবনে প্রাপ্ত হইয়া শ্রীল নরহরি বিবিধ ভোগের আয়োজন করেন। শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দ ভক্তগণের সহিত শ্রীশ্রীগোপীনাথের বিচিত্র প্রসাদান্ন ভোজন করিয়াছিলেন।

শ্রীখণ্ডে গৌরসেবা-স্থাপন

কিংবদন্তী, এই ঘটনার কিছুদিন পরেই গৌরসুন্দর নরহরিকে শ্রীখণ্ডে গৌর-বিগ্রহ-স্থাপনে স্বপ্নাদেশ করেন। শ্রীখণ্ড

হইতে প্রায় তিন ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম দিকে কুলাই গ্রাম। তথায় কায়স্থবংশোদ্ভূত যাদব কবিরাজ, দৈত্যারি ঘোষ ও কংসারি ঘোষ নরহরি সরকার ঠাকুরের অনুগত ছিলেন। ঠিক এই সময়েই তাঁহাদিগকেও শ্রীগৌরসুন্দর স্বপ্নযোগে বিগ্রহ প্রকাশ করিবার আজ্ঞা প্রদান করেন। তদনুসারে তাঁহারা ছোট, বড়, মধ্যম বিগ্রহত্রয় প্রকট করিয়া সরকার ঠাকুরকে অর্পণ করেন। নরহরি পরমানন্দে শ্রীখণ্ডে নিজ গৃহে তিনটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে ছোট বিগ্রহকে শ্রীখণ্ডে রাখেন, মধ্যমটি গঙ্গানগরে ও বড় বিগ্রহকে কাটোয়ায় প্রেরণ করেন। কাটোয়ায়

বড়ডাঙ্গায় অভিরাম-রঘুনন্দন মিলন-স্থান। এইখানে লোচনদাস ঠাকুরের "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল" রচনা করেন।

বিদ্যানন্দ পণ্ডিত নামে শ্রীদাস-গদাধর প্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত এক শিষ্য বাস করিতেন। বিদ্যানন্দ পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সন্ন্যাস-লীলাস্থান কাটোয়ায় সেই বড় বিগ্রহটিকে শ্রীখণ্ড হইতে লইয়া আসেন এবং বনের ভিতর এক ঝুপড়ি বাঁধিয়া মাধুকরী ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল ও বন্য শাকের দ্বারা সহধর্ম্মিণীর সহিত গৌরসেবা করিতে থাকেন। এক দিন বীরভদ্র প্রভু তথায় শুভ বিজয় করিয়া সস্ত্রীক পণ্ডিতের সেবাদর্শনে বিশেষ সন্তুষ্ট হন এবং বিদ্যানন্দকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন—"তোমাকে আর ভিক্ষায় যাইতে হইবে না; শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় ঘরে বসিয়াই সেবার সমস্ত উপকরণ পাইবে।" ইহার পর হইতেই বিদ্যানন্দের গৃহ গৌরসেবার উপকরণে পরিপূর্ণ হইতে থাকে। শ্রীগৌরসুন্দরের জন্য বিভিন্ন সেবক নানা প্রকার রত্নভূষণ ও দ্রব্যাদি প্রেরণ করেন; কেহ কেহ বা মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া দেন। বর্ত্তমানে সেই বিগ্রহ কাটোয়ায় বিরাজমান আছেন। মধ্যম বিগ্রহটি বগুড়া জেলার গাং নগর বা গঙ্গানগর হইতে উক্ত জেলারই ভাগ্‌কোলা গ্রামে নীত হইয়া বর্ত্তমানে পূজিত হইতেছেন। ধনেশ্বর ক্রোড় নামক সরকার ঠাকুরের এক ক্রোড়পতি শিষ্য ছিলেন। সরকার ঠাকুর ধনেশ্বরকে মধ্যম বিগ্রহ সেবার্থ প্রদান করিয়াছিলেন। ধনেশ্বর ক্রোড়ের বংশীয় কোন ব্যক্তি শ্রীখণ্ডের ভক্তানন্দ ঠাকুরকে সেই বিগ্রহের সহিত বহু সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। সেই সকল সম্পত্তির সহিত উক্ত বিগ্রহের সেবা শ্রীখণ্ডের রাধিকানন্দ ঠাকুর মহাশয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গোপীনাথ ও রঘুনন্দন

শ্রীখণ্ডে গৌরসুন্দরের বামে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ও তৎপার্শ্বে মদন-গোপাল (শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ) বিরাজমান রহিয়াছেন। গৌর-সুন্দর প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব হইতে সরকার ঠাকুরের পূর্ব্বপুরুষের পূজিত গোপীনাথ বিগ্রহও সেই সিংহাসনে পূজিত হইতেছেন। গোপীনাথের বামে শ্রীমতী প্রকাশিত নাই। ইনি ত্রিভঙ্গমূর্ত্তি নহেন। গোপীনাথের হস্তে একটি অর্দ্ধ লড্ডুক আছে। কথিত হয় মুকুন্দ-দাস ঠাকুর এক সময় গৃহদেবতা গোপীনাথের সেবার ভার বালক রঘুনন্দনের উপর প্রদান করিয়া কার্য্যান্তরে গমন করেন। শিশুমতি রঘুনন্দন মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিতে না পারিয়া কেবলমাত্র সেবার সামগ্রী গোপীনাথের সম্মুখে আনিয়া "খাও" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শুদ্ধপ্রেমবাধ্য গোপীনাথ বালকের এইরূপ প্রীতিদর্শনে কিছুমাত্র অবশেষ না রাখিয়া সমস্ত নৈবেদ্য ভোজন করিলেন। মুকুন্দ দাস গৃহে ফিরিয়া যখন বালককে ভগবৎ-প্রসাদ আনিবার আজ্ঞা করিলেন, তখন বালক বলিলেন, "গোপীনাথ সমস্ত নৈবেদ্যই ভোজন করিয়াছেন, কিছুই অবশেষ রাখেন নাই।" রঘুনন্দনের এই কথা শুনিয়া মুকুন্দ বিস্মিত হইলেন এবং এই কথার সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য আর এক দিন বাড়ীর বাহিরে গমন করিবার কথা বলিয়া নিকটেই লুকাইয়া রহিলেন। এদিকে রঘুনন্দন ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া গোপীনাথের হস্তে একটি লাড়ু প্রদান করিয়া 'খাও খাও' বলিতে লাগিলেন। গোপীনাথ অর্দ্ধেক লাড়ু ভোজন করিবামাত্র মুকুন্দ মন্দিরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এতৎপ্রসঙ্গে পদকর্ত্তা উদ্ধবদাস গাহিয়াছেন :

শ্রীরঘুনন্দন অতি, হইয়া হরিষ-মতি
গোপীনাথে লাড়ু দিয়া করে।
'খাও, খাও' বলে মন, অর্দ্ধেক খাইতে হেন,
সময়ে মুকুন্দ দেখি, দ্বারে ॥
যে খাইল, রহে তেন, আর না খাইলা পুন
দেখিয়া মুকুন্দ প্রেমে ভোর।
নন্দন করিয়া কোলে, গদগদ স্বরে বলে,
নয়ানে বরিখে ঘন লোর ॥
অদ্যাপি শ্রীখণ্ডপুরে অর্দ্ধ লাড়ু আছে করে,
দেখে যত ভাগ্যবন্ত জনে।
অভিন্ন মদন যেই, শ্রীরঘুনন্দন সেই,
এ উদ্ধবদাস রস ভণে ॥

নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য কবি লোচনদাস 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে' লিখিয়াছেন :

তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র—শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর।
সকল সংসারে যশঃ ঘোষয়ে প্রচুর ॥

শ্রীমূর্ত্তিকে লাড়ু খাওয়াইল যেই জন।
তারে অল্পবুদ্ধি কহে কোন্ মূঢ় জন ?১

'ভক্তিরত্নাকরে' নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও লিখিয়াছেন :

শ্রীসরকার ঠাকুরের জীবন গৌরাঙ্গে।
দেখিতেই বিপুল পুলক ভরে অঙ্গে॥
শ্রীরঘুনন্দন যা'রে লাড়ু খাওয়াইল।
তা'রে দেখি' মনে মহাকৌতুক বাড়িল॥২

রঘুনন্দন ঠাকুরের পুত্র কানাই ঠাকুর ও তৎপুত্র মদনরায়ের বংশীয় ব্যক্তিগণ রাষ্ট্র বিপ্লবের ফলে কেহ শ্রীখণ্ডে বাস করেন, কেহ কেহ বা আসানসোলের নিকট দক্ষিণখণ্ডে৩ গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন।
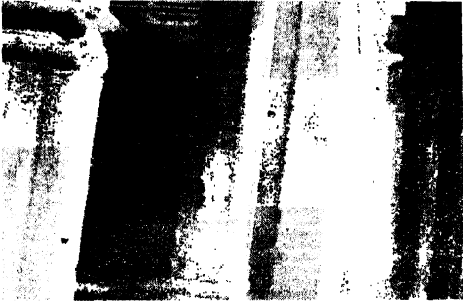
রঘুনন্দন ঠাকুরের আবির্ভাব-স্থান

নরহরি সরকার ঠাকুর দারপরিগ্রহ করেন নাই। কিন্তু ভরত-মল্লিকের (?) রচিত 'চন্দ্রপ্রভা' নামক একটি পুস্তকে উক্ত হইয়াছে যে, সরকার ঠাকুর বিবাহ করেন এবং তাঁহার একাধিক সন্তান হয়। বস্তুতঃ এইরূপ কোন কথা শ্রীখণ্ডে প্রচারিত নাই।

শ্রীখণ্ডের সাহিত্য

নরহরি সরকার ঠাকুরের বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত' গ্রন্থ শ্রীখণ্ড হইতে ১৩০৯ বঙ্গাব্দে নিত্যানন্দ কাব্যতীর্থের দ্বারা বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে ১৩০৫ বঙ্গাব্দে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'শ্রীসজ্জনতোষণী' পত্রিকায় ১০ম বর্ষের ১০ম সংখ্যা হইতে ১১শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা পর্য্যন্ত ইহা 'আস্বাদ-বিস্তারিণী ভাষা' টীকার সহিত প্রকাশ করেন। শ্রীখণ্ডের সেবক-সম্প্রদায় নরহরি সরকার ঠাকুরের শ্রীমুখবিনির্গত ও তৎশিষ্য লোকানন্দাচার্য্য সংগৃহীত 'ভক্তিচন্দ্রিকাপটল' নামে একটি পুথির উল্লেখ করেন। এই পুথির একটি হস্তলিখিত প্রতিলিপি শ্রীখণ্ডের পণ্ডিত-প্রবর রাখালানন্দ ঠাকুরের পুথিশালায় আমরা দেখিয়াছি। কথিত আছে, এই গ্রন্থ পুরুষোত্তমে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সাক্ষাতে, মহাভাগবতগণের সভায় সরকার ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য লোকানন্দাচার্য্য দিগ্বিজয়ী-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। 'ভক্তিচন্দ্রিকাপটলে'র উপসংহারে এইরূপ লিখিত আছে, "ইতি শ্রীমন্নরহরি মুখচন্দ্রবিনিঃসৃত শ্রীচৈতন্য-মন্ত্রসুধানিকরাঃ শ্রীলোকানন্দাচার্য্যেণ যৎকিঞ্চিদাস্বাদ্য শ্রীশ্রীজগন্নাথ-সাক্ষাৎ শ্রীভাগবতোত্তমসভায়াং প্রকাশিতাঃ।"

সরকার ঠাকুরের নামে আরোপিত 'শ্রীগৌরাঙ্গাষ্টক-মালিকা' নামে শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে ঊনপঞ্চাশ শ্লোকে রচিত যে গ্রন্থের কথা শুনা যায়, তাহার সন্ধান শ্রীখণ্ডের কাহারও নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই।

মধুকুণ্ড ও কদম্বৃক্ষ

রঘুনন্দনের নামে আরোপিত দুইটি পদ শ্রীখণ্ডে প্রচারিত আছে।

(১)

নিম্নলিখিত পদটি শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠে গমনকালে কোন গোপীর উক্তি :

সুন্দরি ! শুন, দেখহ পুন, নিজ জীবননাথম্।
বান্ধবগণ, নীলবসন, সুন্দর বটু-সাথম্॥
বারিদ-মদ-হারি সুখদকান্তি মধুর-ধামম্।
শারদশশিরাশি-বিকসি তুণ্ডবিজিত-যামম্॥
মন্মথধনু চামর-জনু সুস্নকুটিলকেশম্।
চন্দ্রককুল-চম্পকফুল-কল্পিত কচবেশম্॥
দীর্ঘনয়ন, চারুনটন মোহিত মধুজালম্।
দিব্যগঠন বক্ষসি ঘনদোলিত বনমালম্॥
কুঞ্জরকর-গঞ্জনকর বাহুযুগল-খেলম্।
সিংহরুচির-মধ্যগভীরনাভিকনকচেলম্
বারণপতি-মন্থরগতি পদ্মবিজয়িপাদম্।
কিঙ্কর রঘুনন্দন লঘু চিত্তহরণ নাদম্॥

(২)

আর একটি গীত এই :

মধুসূদন হে, জয় দেবপতে,
বিপদে পড়ি' পীড়িত লোকগতে !

১। চৈ. ম. সূত্রখণ্ড ৪৪৭, ৪৪৮ ; ২। ভ. র. ৯।৫২৪, ৫২৫ ; ৩। আসানসোল হইতে অণ্ডাল ষ্টেশন হইয়া চারি মাইল পূর্ব্বোত্তর কোণে 'দক্ষিণ-খণ্ড' গ্রামে যাওয়া যায়।

তব নাম সুমঙ্গল গান করি',
অতি ঘোর ভবাম্বুধি-বারি তরি।
সুগভীর নদীসলিলে পড়িয়ে,
তব নাম জপি ভকতি করিয়ে।
করুণাময় চাহি কৃপার্দ্র মনে
কর পার নদীজলে ভক্তজনে।
তব নামে কলঙ্ক কেন বা ঘটে
রঘুনন্দন তোটকছন্দে রটে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির হইতে উত্তর দিকে প্রায় এক ফার্লঙের মধ্যে চিরঞ্জীব, সুলোচন, রামচন্দ্র কবিরাজ ও দামোদর কবিরাজের

বড়ডাঙ্গার প্রসিদ্ধ প্রাচীন বটবৃক্ষ

ভিটা বলিয়া একটি স্থান প্রদর্শিত হয়। এই স্থানে বর্ত্তমানে একটি উচ্চ তুলসীবেদী ব্যতীত অন্য কোন নিদর্শনই নাই।

রসিক রায় ও চন্দ্রশেখর

শ্রীখণ্ডের উপকণ্ঠে খণ্ডেশ্বরীতলা বলিয়া একটি স্থান আছে। সরকার ঠাকুরের শিষ্য শ্রীখণ্ডবাসী চন্দ্রশেখর বৈদ্য সেই খণ্ডেশ্বরীতলায় রসিক রায় কৃষ্ণমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাঁহার সেবা করিতে থাকেন। বিধর্ম্মী মোগলেরা স্বর্ণময়ী মূর্ত্তি মনে করিয়া তাহা লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হয়। কিন্তু চন্দ্রশেখর স্বীয় ইষ্টদেবকে বক্ষে ধারণ করিয়া বসিয়া থাকেন। ইহাতে দুর্দ্ধর্ষ বিধর্ম্মিগণ চন্দ্রশেখরের মস্তক বিচ্ছিন্ন করে। চন্দ্রশেখরের ছিন্ন মুণ্ড 'নরহরি' 'নরহরি' নাম উচ্চারণ করিতে থাকে। বিধর্ম্মিগণ এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে স্থানত্যাগ করে। এইরূপে চন্দ্রশেখর নিজ জীবন বিসর্জ্জন দিয়া বিগ্রহকে বিধর্ম্মীর হস্ত হইতে রক্ষা করেন।

শ্রীখণ্ডের দক্ষিণে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে বড়ডাঙ্গা নামক প্রসিদ্ধ স্থান। কথিত আছে, এক সময় অভিরাম ঠাকুর শ্রীখণ্ডে আসিয়া রঘুনন্দনের সন্ধান করেন। সম্পূর্ণ বৈষ্ণবতায় প্রতিষ্ঠিত না হইলে কেহই অভিরাম ঠাকুরের 'প্রচণ্ড প্রণাম' সহ্য করিতে পারিতেন না। অভিরাম ঠাকুর রঘুনন্দনকে প্রণাম করিবেন, এরূপ আশঙ্কা করিয়া বৎসল-স্বভাব মুকুন্দ দাস রঘুনন্দনকে লুকাইয়া রাখেন। মহাপ্রেমিক রঘুনন্দন বড়ডাঙ্গায় গিয়া অভিরামের সহিত মিলিত হন এবং তাঁহার প্রচণ্ড প্রণাম অনায়াসে স্বীকার করিয়া অভিরাম ঠাকুরের সহিত শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের নামকীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে থাকেন। কেহ কেহ বলেন, বড়ডাঙ্গায় নরহরি সরকার ঠাকুর নির্জ্জনে ভজন করিতেন। রঘুনন্দন ও অভিরাম গোস্বামীর মিলনস্থানে একটি শ্বেতপ্রস্তরের বেদী ও তদুপরি একটি ছত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। অগ্রহায়ণী কৃষ্ণা একাদশী দিবসে সরকার ঠাকুরের বিরহতিথি উপলক্ষে এই স্থানে বিরাট মহোৎসব হইয়া থাকে। দশমীর দিন শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীগোপীনাথ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা করিয়া এই স্থানে বিজয় করেন। এই স্থানে একটি প্রাচীন বিশাল বটবৃক্ষ বিরাজিত রহিয়াছে। উহারই নিম্নপ্রদেশে একটি উচ্চ মন্দির, এই মন্দিরে বৎসরে মাত্র তিন দিন অর্থাৎ অগ্রহায়ণী দশমী, একাদশী ও দ্বাদশী তিথিতে শ্রীশ্রীগৌরগোপীনাথ শুভবিজয় করিয়া সেবিত হন। সেই সময় এই স্থানে চব্বিশ-প্রহর নামকীর্ত্তন হয়।

সরকার ঠাকুরের শিষ্যবর্গ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কয়েকজন প্রধান শিষ্যের নাম— (১) কানাই ঠাকুর—রঘুনন্দনের পুত্র। (২) মদনরায় ঠাকুর—কানাই ঠাকুরের পুত্র। (৩) বংশীবদন ঠাকুর—মদনরায়ের সহোদর ভ্রাতা। (৪) দ্বিজগোপাল দাস-ঠাকুর (ব্রাহ্মণ)। ইনি শ্রীখণ্ড হইতে পরে তকিপুর গ্রামে গিয়া বাস করেন এবং বহু শিষ্য করিয়াছিলেন। (৫) লোচন দাস—শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-প্রণেতা, কো-গ্রাম নিবাসী। (৬) চক্রপাণি চৌধুরী। (৭) নিত্যানন্দ চৌধুরী। (৮) জনানন্দ চৌধুরী—ইঁহাদের নিবাস শ্রীখণ্ডে; বৈদ্যবংশে আবির্ভূত। নরহরি ঠাকুর চক্রপাণিকে বৃন্দাবনচন্দ্র বিগ্রহ প্রদান করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ অদ্যাপি উক্ত বিগ্রহের সেবা করিতেছেন। (৯) লোকানন্দাচার্য্য—ব্রাহ্মণ, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। (১০) কৃষ্ণপাগলিনী—ব্রাহ্মণী। ইনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সেবার নিমিত্ত নরহরি সরকার ঠাকুরের আদেশে মায়াপুরে থাকিতেন। (১১) রামদাস ঘোষাল, নিবাস শ্রীখণ্ড। (১২) চন্দ্রশেখর—শ্রীখণ্ডবাসী; বৈদ্যকুলোদ্ভূত সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা। ইঁহারই নামান্তর শশিশেখর। ইঁহার বাটীতে রসিকরায়-নামে বিগ্রহ ছিলেন। (১৩) দ্বিজ লক্ষ্মীকান্ত—শ্রীখণ্ডবাসী ব্রাহ্মণ; সরকার নরহরি ঠাকুরের ভবনে পূজারী ছিলেন। (১৪) গৌরাঙ্গ দাস ঘোষাল—শ্রীখণ্ডবাসী। সুপ্রসিদ্ধ মধুপুষ্করিণীর অগ্নিকোণে ইঁহার বসতবাটী ছিল। (১৫) মধুসূদন দাস—শ্রীখণ্ডবাসী, বৈদ্যকুলোদ্ভূত; (১৬) মিশ্র কবিরত্ন—ব্রাহ্মণ, নিবাস এড়ুয়াগ্রাম। (১৭) বৈষ্ণব কৃষ্ণকিঙ্কর দাস, নিবাস রূপপুর; শ্রীগোবিন্দ রায়ের সেবা প্রকাশ করেন। (১৮) কবিরাজ যাদব—কায়স্থকুলোদ্ভূত, কুলাই গ্রামনিবাসী। (১৯) দৈত্যারি ঘোষ ও (২০) কংসারি ঘোষ—কুলাই গ্রামবাসী। ইঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মূর্ত্তি প্রকট করিয়া গুরুদেবকে অর্পণ করেন।

মুক্তিপথে

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

৩

ীলরতন ও জয়ন্ত কয়েকজন সদ্যমুক্ত রাজবন্দীর সঙ্গে দেখা ়রিল। বিশেষ ভরসা পাইল না। অধিকাংশ আথিক তথা াংসারিক চাপে মুইয়া পড়িয়াছে। মন বিষাদগ্রস্ত। নীলরতন য়ং ইহার কবলে। কাহারও স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া গিয়াছে, কাহারও াহারও মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আর এ পথে চলিতে পারিবে া। কেউ কেউ আর সংসারে ফিরিয়া না গিয়া সন্ন্যাস অবলম্বনই স্থর করিয়াছে, মত ও আদর্শ তাহাদের বদলাইয়া গিয়াছে।

কালীকৃষ্ণের পিতা কিছু অর্থ সঞ্চিত রাখিয়া পরলোকগমন করিয়া- ছেলেন। সুতরাং তাহার পুত্র হিসাব করিয়া দেখিয়াছে যে, একটু ়সিয়ার হইয়া ঐ সঞ্চিত অর্থ নাড়াচাড়া করিলে দিনগুলি মন্দ াটিবে না। কিন্তু বিপ্লবীর পথ ধরিলে সমস্তই ধ্বংস হইয়া যাইবে। াজেই সে সাফ কথা বলিয়া দিল—"ঘরের খেয়ে আর ক'দিন ভাই ়নের মোষ তাড়াবে! দেশের লোক যখন মাথা ঘামায় না, তখন োমার আমার অত কি হে!"

শ্যামাদাস ভরসা পাইয়াছে সরকারী চাকুরির। সুতরাং ংরেজের বিরুদ্ধে কথা বলিয়া দেয়ালকেও শুনাইয়া রাখিতে চাহে া, কারণ দেয়ালেরও নাকি কান আছে। সে বলিল—"ও পথে ার পা দেবেন না, এতে শুধু যে নিজের সর্ব্বনাশ হয় তা নয়— ়মস্ত দেশের সর্ব্বনাশ হয়! ওর চেয়ে আপনারা বরং দেশে শিক্ষার ়ভাবটা দূর করতে চেষ্টা করুন। যত দিন না দেশ শিক্ষিত হয়ে ়ঠছে তত দিন কোন ভরসাই নেই। ইংরেজের সঙ্গে লড়াই কি ছলেখেলা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তি ইংরেজ। ও সব পাগলামি ছেড়ে ়ন। এখনও বয়স হয়েছে।"

নরনাথ কারামুক্তির পর এক সাধুর শিষ্য হইয়াছিল। বসুল- ়রে নাকি একজন অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি ভস্ম াখা জটাজুটধারী সন্ন্যাসী নন। তিনি ইংরেজী লেখাপড়া কিছু কছু জানিতেন, সংসারেই বাস করিতেন। শিষ্যেরা বলিত যে, ়তনি লোকশিক্ষার জন্য সংসারে আছেন। সংসারপঙ্কে নিমজ্জিত াকিলেও কাদা তাঁহার গায়ে লাগিতে পারে না, সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত াবে লীলাচ্ছলে সংসারে আছেন। নীলরতন ও জয়ন্তকে নরনাথ লিল, "আমি ঠাকুরের চরণে আশ্রয় পেয়েছি, আমার আর কোন ়কে এখন আকাঙ্ক্ষা নেই। ঠাকুর জগৎ উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ য়েছেন। তিনি এদেশের উদ্ধার নিশ্চয়ই করবেন। তাঁর ইচ্ছায় বই হবে, এদেশের দুঃখও ঘুচবে।"

জগমোহন "লয়েন ক্লথ" পরিধান করিয়া, পরিমিত ভাবে কম াহার করিয়া মনে করে মহাত্মা গান্ধীর পথ অনুসরণ করিতেছে। াছ মাংস খাওয়া ত দূরের কথা মশা মাছিও তাহার নিকট অবধ্য। তাহার আশ্রয়ে তাহার এক ভাগিনেয় এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। উভয়েই পিতৃহীন। স্কুলে তাহাদের নাম কাটাইয়া চরকা ধরাই- য়াছে। নিজে তিনি অকৃতদার।

তাহার এক মিনিটও সময় নষ্ট করিবার উপায় নাই, চরকায় সুতা কাটিতে কাটিতে কুশলপ্রশ্নাদি চলিতেছিল। সমিতির কথা উঠিতেই জগমোহন বলিল, "ভেবে দেখলাম মহাত্মা গান্ধীর কথাই ঠিক, আত্মিক শক্তিই হ'ল আসল। অহিংসা পরম ধর্ম্ম। হিংসার পথে ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী, আমরাই তার দৃষ্টান্ত। ভ্রান্ত পথে চলে নিজেদেরও আত্মিক বল নষ্ট করেছি, দেশকেও সনাতন আদর্শভ্রষ্ট করেছি। আত্মিক বলে বলীয়ান্ হতে হবে। ষড়-রিপু দমন করতে হবে, শুধু দমন নয়, মনের ভিতরে সুপ্ত ভাবেও কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতির অস্তিত্ব থাকতে পারবে না। তাতেই অসীম আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হওয়া যায়। তাতেই দেশের উদ্ধার হবে। অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে, পুণ্যের দ্বারা পাপকে, প্রেমের দ্বারা হিংসাকে জয় করতে হবে। প্রেমের দ্বারা ইংরেজের হৃদয় জয় করতে হবে। অথচ ইংরেজের অন্যায় অত্যাচারের কাছে মাথা নোয়াব না, তার অন্যায় কার্য্যে সাহায্যও করব না।" ওদের কামান বন্দুক? ও সব কিছু নয়। আধ্যাত্মিক শক্তির কাছে ওসব কিছুই নয়।"

"আমরা অনেকেই এখন মহাত্মাজীর পথ অবলম্বন করেছি। চাই এখন আমাদের আলোকবর্ত্তিকা।"

বিনীত ভাবে জয়ন্ত বলিল, "একটা কথা নিবেদন করি, মহাত্মার মতের অপব্যবহার, তাঁর দোহাই দিয়ে নিজের দুর্ব্বলতা ঢাকবার চেষ্টা দেখলে তিনি আশ্চর্য্য হবেন। তাঁর অহিংসা ভীরুর জন্য নয়। তিনি নিজে সত্যাশ্রয়ী, তিনি চান তাঁর মতাব- লম্বীরাও সত্যাগ্রহী হোক। আর একটা কথা—ভীরুতা ও কাপুরুষতার চেয়ে অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য অস্ত্র ব্যবহারও ভাল —মহাত্মাজীই একথা বলেন।"

জগমোহন চক্ষু বুজিয়া বলিলেন, "জয় গুরু, জয় গুরু, ভগবান আপনাদের ভ্রান্তি দূর করুন, এই প্রার্থনাই করি।"

সেদিন আর কোথাও ঘোরাঘুরি করা সম্ভব হয় নাই। যে যাহার বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়াছে। দিন দুই পরে রাখালের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

রাখাল একটা জীর্ণ পতনোন্মুখ খড়ের ঘরকে খাড়া রাখিবার জন্য বাঁশের ঠেকা লাগাইতেছিল। সমস্ত শরীর ঘর্ম্মে আপ্লুত— হাত দুইটা মাটিতে নোংরা। ডান হাতে বাঁশটা ধরিয়া বাঁ হাতের বাহুতে কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে স্মিতহাস্যে কহিল—"আরে, এস, এস, নীলুদা, জয়ন্ত এস ভাই। তোমরা ঘরের মধ্যে গিয়ে

বস, আমি এই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এসে পড়ছি।" কথাটা শেষ করিয়া একটু দম লইল রাখাল।

জয়ন্ত কিন্তু রাখালের কথার কোন জবাব না দিয়া রাখালের পাশে দাঁড়াইয়া বাঁশে নিজের বাহুবল প্রয়োগ করিল। রাখাল হাঃ হাঃ করিয়া উঠিল, "ভাই আমার মোটেই দেরি হবে না, এই এসে পড়লাম বলে।"

"হাত লাগালে আরও তাড়াতাড়ি হবে"—ছোট্ট করিয়া মন্তব্য করিল জয়ন্ত। আর প্রতিবাদ করিয়া কোন লাভ নাই মনে করিয়া, বাকী কাজটুকু শেষ করিয়া ঘরের দাওয়ায় আসিয়া বসিল।

রাখাল বয়সে নীলরতনের অনেক ছোট। তা ছাড়া সমিতির কাজের মারফত একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। কাজেই রাখাল নীলরতনের কাছে 'তুমি' ছাড়াইয়া 'তুই'-এর পর্য্যায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। "এবার জেলে গিয়ে তোর বেশ উপকার হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। তোর সশ্রম কারাদণ্ডটা কাজে লেগে গেল দেখছি।" মিটি মিটি হাসিতে লাগিল নীলরতন। কিন্তু রাখাল এবং জয়ন্তকে অবাক হইতে দেখিয়া হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। "আরে নইলে কি আর অমনি করে বাঁশ লাগাতে পারতিস?"

এইবার তিন জনেই একসঙ্গে একচোট হাসিয়া লইল। হাসি থামিলে রাখাল বলিল, "উপকার, বলে উপকার। ভাগ্যিস এখন ছাড়া পেয়েছিলাম, নইলে এক দিন জেলে বসে খবর পেতাম মা আমার ঘর চাপা পড়ে মরেছেন!"

"কেন তোর দাদা ত রয়েছেন—তোদের অন্যান্য ঘর ত তেমন জীর্ণ নয়! বরং শক্তই মনে হচ্ছে!"

"বাইরের দিকটা দেখে তাই মনে হয় বটে!"

"কেন, মাকে তোর দাদা দেখাশুনো করেন নাকি?"

"এমনি কথা বললে ঠিক সত্য কথা বলা হবে না। কেননা, ঘরের এমনি অবস্থা দেখে সেদিনও দাদা মাকে তার ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করলেন!"

"তবে?"

"একটু ইতিহাস আছে।"

"বাধা থাকলে বলিস নে!"

"এ ত নিত্যকারের ইতিহাস নীলুদা! এর মধ্যে ঢাকাঢাকির কিছু নেই।" তার পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিতে লাগিল—"জানই ত, বাবা খুব বেশী উপায় করেন নি বটে কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণ ভাবে দোল-দুর্গোৎসব করে আমাদের জন্য কিছু রেখে গিয়েছিলেন। বাবা মারা যাওয়ার বছরখানেকের মধ্যেই আমি ১০৯ ধারায় ধরা পড়ে চোরডাকাতের মত জেলের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। বছর ঘুরতে ঘুরতেই ছাড়া পেয়েছিলাম কিন্তু ফের তিন মাস বাদে অস্ত্র আইন বলে পাঁচটি বছরের জন্য ঠুকে দিল!

"ঐ যে বললাম তিন মাস বাইরে ছিলাম, তখন দাদা আমায় পরামর্শ দিলেন—আমি যে জীবন যাপন করছি তাতে কোন্ ফিকিরে সরকার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেয় তার ঠিক নেই! এ পরামর্শ আমি যুক্তিসঙ্গতই মনে করলাম। তার নামে সব লিখে দিলাম। যদিও ফল আমার বরাতগুণে একই হ'ল!"

"কেন তোদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়েছে নাকি?"

'না, তা হয় নি; তবে জেল থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই দাদা সাফ জানিয়ে দিলেন আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, কেননা তাতে নাকি তাঁরও বিপদ ঘটতে পারে! অবশ্য দয়া করে বাড়ীর এ অংশটা ছেড়ে দিলে থাকবার জন্য। এইটুকু বলে শেষ করলে তোমরা ভাববে দাদা আমার একান্ত পাষণ্ড। কিন্তু সে বদনাম তাকে দেওয়ার উপায় নেই। সংসারের চাপ না পড়লে আমার মতিগতি ফিরবে না, তাই তিনি বিধবা মেজবৌদি আর তার ছেলে ও মেয়েকে আমার ভাগে বসিয়ে দিলেন।

'সেই থেকে মা দাদার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। কাজেই দাদা সেদিন সাধাসাধি করলেও তাকে সাফ বলে দিয়েছেন, 'এ ঘরের নীচে চাপা পড়ে মরাও বরং তাঁর পক্ষে ভাল তথাপি দাদার আশ্রয় যেন তাঁকে কোন দিনই কামনা করতে না হয়!"

ঘরের দাওয়ার আবহাওয়া যেন থম থম করিতে লাগিল। কয়েক সেকেণ্ড কেহ কোন কথা বলিতে পারিল না।

রাখালই নীরবতা ভঙ্গ করিল। বিষাদক্লিষ্ট মুখে কহিতে লাগিল, "জেলের মধ্যে অন্ধকার সেল, গলায় লোহার হাঁসুলি, পায়ে বেড়ী—এর কোনকিছুই কিন্তু আশা, উৎসাহ আর মনের আনন্দকে নষ্ট করতে পারে নি। মনে হ'ত পথের মাঝে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলুক, কিংবা সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ পথের বাধা হয়ে দাঁড়াক না কেন, সবকিছু অবহেলায় পার হয়ে যাব। মনে হ'ত বুক চিরে দেশমাতৃকার অঙ্কিত ছবি দেখাতে পারব। কিন্তু একি হঠাৎ এক প্যাঁচে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি!" রাখালের বিস্ফারিত নেত্রে হতাশার ছবি!

কিছুক্ষণ একথা সেকথার পর নীলরতন আর জয়ন্ত উঠিয়া দাঁড়াইল। রাখাল ভগ্ন কণ্ঠে কহিল, "নীলুদা, ভাই জয়ন্ত, এমনি করে সব শেষ হবে এ কোনদিন কল্পনাও করতে পারি নি। তবু অনুরোধ রইল—অপদার্থ ছোট ভাইকে যেন তোমরা তোমাদের স্নেহ থেকে বঞ্চিত করো না। আমি ত জানি, যারা দুর্ব্বলতার অছিলায় এ পথ থেকে সরে দাঁড়ায়, তাদের তোমরা ছায়াও মাড়াও না। কিন্তু তবুও দাবি জানাই—মাঝে মাঝে খোঁজখবর করো! মনে আমার যে অশান্তির আগুন জ্বলছে তা কি তোমরা বোঝ না। ক্লান্ত হয়ে যদি আজ পথের কিনারায় বসে থাকি তবে তাকে পথ ছেড়ে আসার পর্য্যায়ে ফেলো না যেন।

নীলরতন, কিংবা জয়ন্ত কেহই এই কথার কোন জবাব দিতে পারে নাই। মাথা নীচু করিয়া পথে পা দিল।

৪

নীলরতন আর জয়ন্ত পথে বাহির হইয়াও নীরবে চলিতে লাগিল পাশাপাশি।

নীলরতনের বলার মত কিছুই ছিল না বলিয়া সে নীরব। কিন্তু জয়ন্ত বেশীক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, বলিল, "জেল থেকে যারা বেরিয়ে এসেছে তাদের ত এই অবস্থা!"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সে চুপ করিল নীলরতনের নিকট হইতে সম্মতিসূচক মন্তব্য শুনিবার জন্য। কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া ভাবিল ইহাতে আর দ্বিমত কি থাকিতে পারে, সুতরাং বলিয়া যাইতে লাগিল—"কিন্তু তাই বলে ত আর আমরা কর্ত্তব্য থেকে বিচ্যুত হতে পারি নে? পুরোনো লোক জোটে ভাল, না জোটে নতুন লোক তৈরি করে নেব! কি বলেন।"

ইহারও কোন জবাব না পাইয়া জয়ন্ত নীলরতনের মুখের দিকে তাকাইয়া বিস্মিত হইল। মুখ চিন্তাক্লিষ্ট—দৃষ্টি যেন কোন্ সুদূরে নিবদ্ধ। সংসারে অনভিজ্ঞ জয়ন্ত ভাবিল—হয়ত নীলুদা সমিতির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া চিন্তায় মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। রাখালের কথাগুলি শুনিয়া নীলরতনের নিজের অবস্থার দিকে দৃষ্টি ফিরিল। সে সমিতি পুনর্গঠনের জন্য লোকের বাড়ী বাড়ী যাইতেছে, অথচ দৈন্যদশায় পতিত হওয়ায় তাহার নিজের পক্ষেই যে আর এই পথে চলা সম্ভব হইবে না, রাখালের কথা শুনিয়া এই সত্য যেন তাহার চক্ষুর সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। নিজের সংসারের আর্থিক অবস্থার পরিচয় সে ইতিমধ্যেই কতকটা পাইয়াছিল, কিন্তু তাহার জীবনের ব্রতের সঙ্গে ইহার যে এতটা বিরোধ তাহা সে এতদিন ভাল করিয়া উপলব্ধি করে নাই। বিশেষতঃ জেল হইতে সদ্য-প্রত্যাগত স্বামীর মনে যাহাতে কোনরকম দুঃখের উদয় না হয় সেই দিকে সরমার দৃষ্টি ছিল। তাই সে নিজেদের দুরবস্থার কথা স্বামীকে ভাবিবার অবসর দিতে চাহে নাই। সরমা সবকিছু ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টার কসুর করে না, কিন্তু সীমাহীনকে ঢাকিয়া রাখিবার শক্তি তাহার নাই। নীলরতনের জীবন আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছে এক চৌমাথায় যেখানে আদর্শের পথ আর সংসার বিপরীতমুখী।

সারা রাস্তা নীলরতনের কোন চেতনা কেন যে ছিল না তাহা আন্দাজ করিবার ক্ষমতা জয়ন্তের নাই। বাড়ীর দরজার কাছে আসিয়া বিদায় লওয়ার সময় কিছু না বলিয়াও যেন জয়ন্ত যাইতে পারিল না। "যাই বল না কেন, আমি কিন্তু এতটুকু নিরাশ হই নি। আর কেউ না এলেও যতক্ষণ তুমি আছ, ততক্ষণ কোন কিছুতেই ভয় পাই নে!

"সেই বছর দশেকের আগেকার কথা ত আর ভুলে যাই নি! যখন সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র-মামলায় অনেক লোক ধরপাকড় হয়ে সমিতি ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল—তখনও দেখেছি তোমার সংগঠনশক্তি! তুমিই ত সমস্ত আবার বাঁচিয়ে তুলে-ছিলে।"

নীলরতন জয়ন্তের কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল—"ভাই জয়ন্ত, আমার দ্বারাও বোধ হয় আর কিছু সম্ভব হবে না। আমারও আর এগিয়ে চলার ক্ষমতা নেই। পারিবারিক দুরবস্থার কথা বলে আমি কৈফিয়ত দিতে চাই নে, কারণ আমি এখনও ভুলি নি যে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ না করার কোন কৈফিয়তই খাটে না। এর দাবি যে সকলের আগে! কিন্তু সাংসারিক চিন্তায় আমার মন যে বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে ভাই।" নীলরতন হয়ত আরও কিছু বলিত, কিন্তু তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া সমস্ত আবছা করিয়া দিল। জয়ন্তর নিকট দাঁড়াইয়া থাকা যেন অসহ্য মনে হইতেছিল—তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

এই মুহূর্তে একটা বোমা ফাটিয়া পড়িলেও বোধ হয় জয়ন্ত এত অবাক হইত না। তাহার বোধশক্তি কেমন যেন দিশাহারা হইল—নীলুদার সম্পর্কে এমন একটা অবস্থা তাহার নিজের মুখ হইতে বাহির হইলেও বিশ্বাসের অযোগ্য! গোড়াপত্তন যেভাবেই হউক না কেন এই কি তবে সকলেরই পরিণাম! তাহার মন ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। তাহার একবার মনে হইল বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া আসল ব্যাপারটা বুঝিয়া লয়, কিন্তু একটু ইতস্ততঃ করিয়া নিজের আস্তানার দিকে আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে লাগিল।

নীলরতন বরাবর নিজের ঘরে গিয়াই শুইয়া পড়িল। সরমা উদ্বেগকাতর কণ্ঠে বলিল—"এসেই শুয়ে পড়লে যে? অসুখ করে নি ত?" বলিয়াই স্বামীর কপালে হাত দিয়া দেখিল, ভাবিল—এমনিই ঘুরে ঘুরে বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। সরমা পুনরায় বলিল—"হাত-মুখ ধুয়ে এসে চারটি খাও, সেই দুপুরবেলা বেরিয়েছ, এখন পর্য্যন্ত মুখে জলটুকুও ত বোধ হয় দাও নি।"

নীলরতন বলিল—"আজ আর খাব না, শরীরটা ভাল নেই। তোমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও গিয়ে।

আবেগের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়া যাইতে নীলরতন ভাবিল, তাহার স্ত্রী, কন্যার ত কোন অপরাধ নাই! সে না খাইলে তাহারাও হয়ত আজ রাত্রে উপবাসী থাকিবে!

তাড়াতাড়ি কোনরকমে সামান্য কয়েক গ্রাস গিলিয়াই নীলরতন আবার আসিয়া শুইয়া পড়িল। সুষমা শিয়রে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ধীরে ধীরে কহিল—"এই ক'দিন ঘুরে ঘুরে তোমার শরীরটা বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, কাল আর বাড়ী থেকে কোথাও বেরিয়ে কাজ নেই!"

নীলরতনের কণ্ঠে নিরাশার আভাস, "আর বোধ হয় বেরুবার দরকারও হবে না—তোরাই বোধ হয় আমার ঘোরবার সামর্থ্য কেড়ে নিয়েছিস!" এই উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিবার মত অবস্থা সুষমার নয়। সে শুধু বিস্মিত হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—ইহার অর্থ কি!

নীলরতন আবার লজ্জিত হইল মনে মনে। মনের আবেগকে ভিন্ন পথে চালিত করিবার জন্য নিজে কথা পাড়িল—"আচ্ছা সুষি, ধর, আমি যদি জেল থেকে আর ফিরে না আসতাম তা হলেও ত তোদের চলে যেত!"

"তা হয় না, বাবা !"

"কেন হবে না ! এই ত দেখ না, আজ ক'দিন বেরিয়ে এসেছি। কোথায় আমি তোদের খাওয়া-পরার সংস্থান করব, না, উল্টে তোরাই করছিস আমার আহারের ব্যবস্থা।"

সুষমা পিতার এই কথার কোন জবাব খুঁজিয়া না পাইয়া কিছুক্ষণ পর পিতাকে নিদ্রিত মনে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"গোরা ঘুমোচ্ছে নাকি রে !"

সুষমা লজ্জিত হইল পিতা না ঘুমাইতেই উঠিয়া পড়ার জন্য। জবাব দিল—"না, দাদা আজ রাত্তিরে আর বাড়ী আসবে না।"

"কেন ?"

"ওরা নাকি কি একটা থিয়েটার করবে, তারই রিহার্সাল চবে আজ সারা রাত।"

এই সম্পর্কে আর কোন কথা সুষমার সঙ্গে আলোচনা নিরর্থক মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোর মা কোথায় রে সুষি ! তার খাওয়া-দাওয়া কি এখনও শেষ হয় নি।"

"মা রাত্তিরে খাবেন না।"

"কেন ?"

"আজ ক'দিন থেকেই ত মা রাত্তিরে খান না।"

সমস্ত শরীর দিয়া কিসের একটা আশঙ্কার বিদ্যুৎপ্রবাহ ক্ষণিকের জন্য বহিয়া গেল। তবে তাহাকে খাইতে দিয়া কি সরমার ভাগে আর কিছুই থাকে না। প্রাণপণ বেগে নিজেকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়া আপন মনেই ভাবিতে লাগিলেন—না, না, হয়ত তার শরীর ভাল নেই। "তোর মার কি শরীর অসুস্থ !"

"না, তেমন কিছু নয়। আজ ক'দিন ঐ বিকেলের দিকে একটু যেন জ্বরভাব হয়, তাই মা সাবধান হওয়ার জন্য আর রাতে কিছু খান না।"

"কই, এদ্দিন ত কিছু বলিস নি। আর জ্বরভাবই যদি হয় তবে এত রাত্তির জেগে কি করছে সে।"

"জামা সেলাই করছেন।"

"কার জামা।"

"ঐ স্বদেশীবাবুরা একটা কাটা-কাপড়ের দোকান খুলেছে। ওরাই বাড়ী বাড়ী অর্ডার দিয়ে যায়। আবার সময়মত নিয়ে যায়। কাল সকালেই কয়েকটা দেওয়ার কথা। তাই সেগুলো শেষ করবার জন্য একটু রাত হয়ে যাচ্ছে। একলা করছেন, তাই দেরি হচ্ছে। আমিও একটু সাহায্য করি কিনা। তোমার শরীর ভাল নেই, তাই আমাকে তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিলেন।"

কে যেন নীলরতনকে কশাঘাত করিল। এই সরমা যে শুধু তাহার পথ বা আদর্শের অন্তরায় হয় নাই তাহাই নহে, তাহার বিন্দুমাত্র মনঃকষ্ট না হয় তাহার জন্য সম্পূর্ণ নীরবে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলিয়া লইয়াছে। আর সে নিজে কোন বিচার-বিবেচনা না করিয়াই, সংসার কি ভাবে চলে না চলে তাহার কোন সংবাদ না লইয়াই, তাহাদের উপর চটিয়া বসিয়া আছে। তাহার মাথা নত হইল।

"কি রে, বাপ-মেয়ের কথা কি আজ রাতে আর শেষ হবে না। রাত কত হয়েছে, তার কোন খেয়াল আছে কি ?" ঘরের মধ্যে লঘু পরিহাসের হাওয়া ছড়াইয়া দিয়া প্রবেশ করিল সরমা। "যা সুষি শুয়ে পড় গিয়ে, আর রাত জেগে কাজ নেই।"

সুষমা লজ্জারক্ত হাসিমুখে উঠিয়া গেল। সরমা বাতি নিভাইয়া দিয়া স্বামীর পার্শ্বে শুইয়া পড়িলেন।

"তোমার রাতের দিকে রোজ জ্বর হয়, অথচ তুমি ত আমাকে কিছুই বল নি !" কথা শেষ করিতে করিতেই নীলরতন সরমার কপালে হাত দিয়া চমকিয়া উঠিলেন। "ইস, এ যে ভীষণ জ্বর।" তিনি উঠিয়া বসিলেন।

"এ কি, উঠে বসলে কেন !"

"ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি।"

"পাগল হয়েছ। এত রাত্তিরে ডাক্তার ! ও এমন কিছু নয় যে ডাক্তার ডাকতে হবে। অমনিতেই সেরে যাবে।" এখন শুয়ে পড় লক্ষ্মীটি। কাল সকাল পর্য্যন্ত যদি জ্বর না সারে তবে নিশ্চয়ই তুমি ডাক্তার নিয়ে এস। আমি বারণ করব না।

নীলরতন নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল। স্বামীর যাহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত না হয় সেজন্য সরমাও আর কোন কথা তুলিল না।

৫

সারা রাত্রি নীলরতনের চোখে ঘুম আসিল না। সে কেবল ঠাকুর-দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিল, "হে ঠাকুর, আমার প্রাণে বল দাও। আমায় পথ দেখাও। সংসারের প্রতি টান ও সমিতির প্রতি টান এই দোটানায় পড়ে যে আমি পথহারা, প্রাণে যে অসীম জ্বালা, এই জ্বালা নিবাও ঠাকুর।"

তার সেই সময়ের কথা মনে পড়িল যখন সে প্রথম সমিতির সভ্য হয়। যাহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সে এই পথে আসিয়াছিল, আজ তাহাকে স্মরণ করিয়া সে মনে মনে বলিতে লাগিল, "তুমি ত দেশের সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করে বন্দুকের গুলির সামনে বুক পেতে দিয়ে ধন্য হয়ে গেছ, তোমার প্রিয় শিষ্য আমি, তুমি আমার দুর্ব্বলতা দূর কর। তোমার শক্তির কণামাত্র দান করে আমায় উদ্ধার কর।"

তখন তার অনেক পূর্ব্বকথা স্মরণে আসিল, তার কথায় কত লোক এই পথে আসিয়াছে, কত লোক কারাগারে, দ্বীপান্তরে তিল তিল করিয়া মরিতেছে, তার শিক্ষায় ফাঁসীমঞ্চেও হাসিমুখে আরোহণ করিয়াছে। আর আজ সে নিজে আসক্তি, মায়া, মমতা, কামনা-বাসনার গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হইতেছে। সে ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল—সকল দেবদেবীর নিকট শক্তি প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহার সাধের তরণী যেন প্রবল ঝড়ে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সে নিমজ্জনোন্মুখ, চতুর্দ্দিকে হাত বাড়াইয়া ব্যাকুল ভাবে আশ্রয় খুঁজিতেছে। তাহার বুকে কান্না গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছিল, এই

যায় তাহা ফাটিয়া পড়িল। দুই চক্ষে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

বাড়ী ফিরিবার পর হইতেই স্বামীর মানসিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া সরমা চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। স্বামী যে না ঘুমাইয়া উসখুস করিয়া, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেছেন তাহা তাহার লক্ষ্য এড়ায় নাই। তাহার চোখেও ঘুম ছিল না। পাছে কথা বলিয়া হিতে বিপরীত হয় এই জন্য এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই; কিন্তু আর সেও চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। আস্তে আস্তে স্বামীর মাথা নিজের বুকের উপর টানিয়া লইয়া, মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ধীরে ধীরে কহিল, "দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করে সারাজীবন দুঃখ ভোগ করে এলে। তোমার স্ত্রী হয়েও কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার কোন ভাগই আমি নিতে পারলাম না। তুমি কি জান না যে আমার সমস্ত সুখদুঃখ তোমাতে বিসর্জ্জন দিয়েছি। তোমার কাছে কিছুই চাই নি। কিন্তু আজ আমার তোমার কাছে একটি ভিক্ষা আছে, বল তুমি আমায় বিমুখ করবে না!"

নীলরতন নীরব।

"চুপ করে থেকে আমার বেদনা বাড়িয়ো না। তোমার সুখের সমভাগী যদি হওয়ার অধিকার তুমি দিয়ে থাক তবে দুঃখ অশান্তির ভাগও আমায় কেন দাও না।"

নীলরতন তথাপি চুপ।

"এমনি করে কথা না বলে আমায় আর শাস্তি দিও না লক্ষ্মীটি।"

নীলরতন বলিল, "কি বলব সরমা, আমার হাতে পায়ে যে শেকল বাঁধা। বুকে যে লক্ষ মণ পাষাণ চাপানো।"

সরমা বলিলেন, "আমরাই কি তোমার গলগ্রহ? আমাদের জন্য একটুও ভেব না তুমি। তুমি তোমার কর্ত্তব্য করে যাও. আমরা বাধা দেব না। আমাদেরও কর্ত্তব্য আছে—তোমার যাত্রার পথে এগিয়ে দেওয়ার কর্ত্তব্য থেকে আমাদের বঞ্চিত করো না। কর্ত্তব্যের পথে তোমার পরিচয়ই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ।"

নীলরতন জবাব দিবার মত কোন কথাই খুঁজিয়া পাইল না। সরমা নীরবে নীলরতনের চুলের মধ্যে আঙুল চালাইতে লাগিল। দূর হইতে পাঁচটার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সরমা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল।

নীলরতন কি যেন বলিতে যাইতেছিল, জয়ন্তর ডাকে থামিয়া গেল। তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিয়া জয়ন্তকে বসাইয়া নিজের হাত মুখ ধুইবার জন্য ভিতরে চলিয়া গেল।

গতকল্য সন্ধ্যার সময় বিদায় লইতে গিয়া নীলরতন যাহা জয়ন্তকে বলিয়াছে তাহা জয়ন্ত মোটেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে নাই। রাতারাতি এমন পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, অন্ততঃ নীলরতনের বেলা, ইহা বাস্তবে ঘটিলেও বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। কাজেই ঠিক সময়মতই আসিয়া সে উপস্থিত হইয়াছে।

ফিরিয়া আসিয়া নীলরতন বলিল, "ট্রেন ছাড়বার দেরি আছে। ষ্টেশনে গিয়ে বসে থেকে কি হবে বরং এখানেই একটু অপেক্ষা কর।" একটু নীরব থাকিয়া নীলরতন নিজের মনকে অপরের মনের মাপকাঠিতে ফেলিয়া দেখিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা জয়ন্ত, তোমার সংসারের অবস্থা ত একেবারেই সুবিধে নয়, কিন্তু তবুও আবার এ পথে এলে কেমন করে। মনে কি তোমার একটুও চিন্তা হয় না?"

"নিশ্চিন্ত আর হতে পারলাম কৈ! কিন্তু ঐ যে মন্ত্র কানে দিয়েছ, 'তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম, ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে' এর বাইরের ভাবনা যে তোমরাই পরিত্যাগ করতে শিখিয়েছ।"

"কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে প্রিয়পরিজনের দুঃখ-দুর্দ্দশা, বৃদ্ধা মাতা, অন্ধ পিতা, বিধবা ভগ্নী, এদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থানের কোনই পথ নেই, এদের জন্য কি তোমার মনে এতটুকু দোলা লাগে না!"

জয়ন্ত মনে করিল কার্য্যে পা বাড়াইবার আগে আর একবার তার মানসিক শক্তি পরীক্ষা হইতেছে যেমন সচরাচর হইয়া থাকে।

জয়ন্তর মনে কোন দ্বিধা নাই সে বেশ সহজভাবেই কহিল, "বেঁচে আছে বলেই দেখতে হয়, সাধ্যে কুলোয় না বলেই সহ্য করি। সমগ্র দেশের লোকের দুঃখের চাইতে ওদের দুঃখ বড় নয়। সকলের অনশন-ক্লেশ যতখানি, আমার প্রিয়-পরিজন বলে ত আর তাদের ক্লেশের মাত্রা বেশী নয়।

"দেশের স্বাধীনতা যজ্ঞে যেমন অনেককে শহীদ হতে হয় ফাঁসীর মঞ্চে, দ্বীপান্তরের কারাগারে তিলে তিলে মৃত্যুর বিষের ধোঁয়ায়, তেমনি তাদের সঙ্গে সঙ্গে বহু পরিবারের ধ্বংসও অনিবার্য্য।

"বাঁচা মরার উপর যখন আমার কোন হাত নেই তখন আজ যদি আমার মৃত্যু হয় তবুও এদের চলে যাওয়া আটকে থাকবে না। সেই ভাবেই সবকিছুকে সহজ করে নেওয়ার কথা ভাবি।

"আমার প্রিয়জনের যদি দুঃখ হয় তা আমি কি করব? তাদের জন্য আমার দুঃখ হবে, কিন্তু এ দুঃখও আমায় সইতেই হবে।"

উচ্ছ্বাসের আবেগে এতগুলি কথা একবারে বলিয়া ফেলিয়া জয়ন্ত লজ্জিত হইয়া বলিল, "আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা কর নীলুদা। তোমার কাছে শেখা কথা তোমাকেই শোনাবার মত সাহস আমার কি করে হ'ল জানি নে। তুমি আশীর্ব্বাদ কর, তার জোরেই সবকিছু অতিক্রম করে যাব।

"না জয়ন্ত, কে যে কার গুরুর উপযুক্ত তা শুধু বয়স দিয়ে বা কর্ম্মক্ষেত্রে আগে আসা বিচার করে ঠিক হয় না। আজ আমার পক্ষে তোমার আশীর্ব্বাদেরও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, বাহিরের দিকে তাকাইয়া তাহার মনে হইল যে ট্রেনের সময় হইয়া আসিয়াছে। দ্বিধা-সঙ্কোচ সবকিছু ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিবার জন্য নীলরতন উঠিয়া বলিল, "আর দেরি নয় ভাই, তুই একটু বোস, আমি গায়ে জামাটা চড়িয়ে আসি।"

"বামুনঠাকরুণ কৈ গো!"

এত সকালে বাড়ীতে মেয়েছেলের গলা শুনিয়া, নীলরতন

একটু বিস্মিত হইল—কেননা ঝি রাখিয়া যে সরমা সংসার চালাইতেছে না তাহাও এই কয়দিন সে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। সরমা তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হইয়া ঘরের বাহির হইয়া আসিল। নীলরতন ঘরের মধ্যে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"কি গা বামুনের মেয়ে, আজ তুমি যাবে না! আমি উনুন-টুনুন সব ঠিক করে রেখেছি। গিন্নীমা রাগারাগি করছে, বললে, 'এমনধারা লোক নিয়ে চলবে কি করে! বাবুরা তাড়াতাড়ি খেয়ে যায়। বলে আয় তার আর এসে কাজ নেই—তুই বরং অন্য লোক দেখ'।"

"চুপ, চুপিচুপি বল···"

"চুপিচুপি বলব কি গো! আমি বললাম বড় দুঃখী মানুষ, হয়ত অসুখ-বিসুখ করেছে। ছাড়িয়ে দিলে বড্ড মুশকিলে পড়বে। জবাবে বলে কি, 'তা আমি কি করব। তার অসুখ বলে ত আর আমার বাড়ীর কাজ বন্ধ হবে না।' আমিও বলি, গিন্নী ঠাকরুণ কুড়ের হদ্দ, এ ধারের কুটো ওধারে সরাবে না।"

নীলরতন আর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। তাহার মাথা যেন ঘুরিতেছে—প্রভাতের আলো যেন নিবিয়া গেল, আবার যেন রাত্রির অন্ধকারে সব ছাইয়া গেল। দৌড়াইয়া বাহিরে আসিয়া স্ত্রীকে বলিল, "আজ থেকে তুমি যদি আর যাও তবে আমার অতিবড় দিব্যি রইল।" সরমার কোন জবাবের অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতপদে বাহিরের ঘরে আসিয়া জয়ন্তকে বলিল, "তুমি এখন যেতে পার, আমাকে আর তেমাদের পথে টেনো না।"

তাহার গলার স্বর কাঁপিতেছে। "তোমাদের মত হতভাগাদের সঙ্গে থেকে, অসম্ভবের পেছনে ঘুরে ঘুরে আর আমি স্ত্রী-পুত্রকে না খাইয়ে মারতে পারব না। নিজের স্ত্রীকে পরের ঘরে দাসীবৃত্তি করতে দিতে পারব না।" কথাগুলি এক নিশ্বাসে বলিয়াই সে ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেল।

নীলরতনের এই মূর্তি জয়ন্তের কল্পনার অতীত। বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া গেল। 'তবে কি নীলুদা পাগল হয়ে গেল।' ধীরে ধীরে উঠিয়া বাহিরের দিকে পা বাড়াইতে শুনিতে পাইল সুষমা ডাকিতেছে—"জয়ন্ত কাকা, তোমায় মা ডাকছেন।"

জয়ন্তকে ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইল। সরমা দরজার পাশে মাথার কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিয়া দাঁড়াইল। তাহার হইয়া সুষমাই কথা কহিল। "তোমরা বাবাকে একেবারে ত্যাগ করো না জয়ন্ত কাকা। তিনি আজ যে কি বললেন, তা হয়ত তিনি নিজেই জানেন না। তোমরা যদি তাকে ছেড়ে যাও তবে হয়ত বাবাকে আর আমরা কোন দিনই ফিরে পাব না, হয় পাগল হয়ে যাবেন নইলে···।" সুষমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল সে আর কিছুই বলিতে পারিল না।

জয়ন্তর মন বিস্ময় বেদনায় বিগলিত হইল। আস্তে আস্তে বলিল, "কথা দিচ্ছি, কোন দিনই নীলুদাকে ছেড়ে যাব না। আর সত্যি কথা বলতে কি তাঁকে ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারি নি। তোমরা নিশ্চিন্ত থেকো, আমি মাঝে মাঝে এসে খবর নিয়ে যাব।"

জয়ন্ত ব্যথিত চিত্তে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। আজ সে নিজেকে সম্পূর্ণ একা বোধ করিল। এত নিরাশার মধ্যেও কবির বাণী তাহার স্মরণে আসিল, নিজের হৃদয়ে বলসঞ্চয়ের জন্য গুন গুন করিয়া গাহিতে গাহিতে রাস্তায় চলিতে লাগিল, "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে।" ক্রমশঃ

কবি

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

জানি জানি আমি কবি, আমি করি আমারে প্রকাশ।
ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ভরা এই সংসারের ছদ্ম আবরণ,
সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মাঝে নিরর্থক স্বপ্ন-সঞ্চরণ,
মিথ্যা সব, মিথ্যা আত্ম-বিলোপের প্রাণান্ত প্রয়াস।
সামান্যের মাঝে যেথা অসামান্য—তাহার আভাস
পাই আমি ক্ষণে ক্ষণে, তুচ্ছে তাই করি না স্মরণ,
ক্ষুদ্রতারে ক্ষমি' আমি বৃহত্তেরে করি যে বরণ,
পৃথিবীর ঊর্দ্ধে মোর আছে দূর অসীম আকাশ।

আমার বেদনা যদি হ'ত শুধু একার বেদনা,
সাহারার নদী সম সে হ'ত যে বালুতে বিলীন।
হৃদয়ের গঙ্গা করে সিন্ধুপথযাত্রার সাধনা,
কি আবেগে বেগবতী, সে কল্লোল নহে অর্থহীন।
আত্ম-নিবেদন ছলে জীবনের করি আরাধনা
নিজেরে খুঁজিতে হেরি সারা বিশ্ব সেথা সমাসীন।

মদনলাল ধিংড়া

ডক্টর শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

১৯০৫ সনের জানুয়ারী মাসে ভারতীয় বিপ্লবী পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা লণ্ডনে তিনটি যুগান্তকারী উদ্যম মারফত ভারতবর্ষের তরুণ সম্প্রদায়কে নব নব আশা-আকাঙ্ক্ষায়, বিরাট ভবিষ্যৎ গঠনের পরিকল্পনায় সঞ্জীবিত করিতে প্রয়াসী হন। এই তিনটি উদ্যম যথাক্রমে "ভারতীয় হোমরুল সোসাইটি" প্রতিষ্ঠা, "ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিষ্ট" নামক পত্রিকা প্রকাশ এবং ভারতীয় ছাত্র ও যুবকগণের জন্য 'ইণ্ডিয়া হাউস" নামে একটি বোর্ডিং হাউসের উদ্বোধন। লণ্ডনের হাইগেট অঞ্চলে অবস্থিত তাঁহারই একখানি নিজস্ব বাটীতে ছাত্রাবাস স্থাপিত হইল।

ইণ্ডিয়া হাউস প্রতিষ্ঠার পর শিবাজী বৃত্তি, রাণা প্রতাপ বৃত্তি ও গুরুগোবিন্দ বৃত্তি নামে কতকগুলি বৃত্তিরও তিনি ব্যবস্থা করেন।

বিপ্লবী বিনায়ক দামোদর সাভারকর (বীর সাভারকর) জ্যেষ্ঠ গণেশ দামোদর সাভারকরের সহযোগে নাসিক ও পুণায় গোপনে "অভিনব ভারত" সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া ওতপ্রোতভাবে বৈপ্লবিক সংগঠনকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি গ্র্যাজুয়েট হইয়া বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক এল্‌এল্, বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মার বিঘোষিত বৃত্তির বার্ত্তা অবগত হইয়া সাভারকর লোকমান্য তিলকের সুপারিশপত্রসহ একটি বৃত্তির জন্য প্রার্থী হইলেন। চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া প্রথম কিস্তির ৪০০৲ টাকা তিনি পাইলেন। কিন্তু ইহাতে বিলাতযাত্রা সম্ভবপর নয়, সুতরাং তিনি তাঁহার শ্বশুরের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। শ্বশুরের আনুকূল্যে সাভারকর তাঁহার পত্নী এবং শিশুপুত্র প্রভাকরকে পশ্চাতে রাখিয়া ১৯০৬ সনের ৬ই জুন লণ্ডন যাত্রা করিলেন। নাসিক এবং পুণার প্রকাশ্য ও গুপ্ত সংস্থাগুলির কর্ম্মভার রহিল তাঁহার অগ্রজ গণেশ দামোদর সাভারকরের উপর।

শ্যামজী নবাগত সাভারকরের সঙ্গে আলোচনায় পরম প্রীত হইলেন। তিনি উপলব্ধি করিলেন এই ত্রয়োবিংশবর্ষীয় যুবক পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস, বৈপ্লবিক কার্য্যের বিবরণ, য়িহুদী, পোলিশ, রাশিয়ান ও অন্যান্য জাতির বিপ্লববাদিগণের গুপ্তভাবে সন্ত্রাসসূচক কার্য্যপরিচালনা সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। পণ্ডিতজী ইণ্ডিয়া হাউসের পরিচালনভার এই যুবকের হস্তেই অর্পণ করিলেন।

সাভারকর গঠনকার্য্য আরম্ভ করিলেন। বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ত্রিমূল আচারিয়া, ডি. ভি. এস. আয়ার, ম্যাডাম ভিকাজী কামা (তিনি প্রবীণ কংগ্রেস-নেতা দাদাভাই নৌরজীর প্রাক্তন রাজনৈতিক সেক্রেটারী ছিলেন) এবং সর্ব্বশেষে মদনলাল ধিংড়া আসিয়া সাভারকরের দলে যোগ দিলেন। ইণ্ডিয়া হাউসে অভিনব ভারত সঙ্ঘের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইল, আর একটি প্রতিষ্ঠান "ফ্রি ইণ্ডিয়া সোসাইটি"ও গঠিত হইল। ভারতের মুক্তিকামী ছাত্র ও যুবকগণ সহযোগিতা করিয়া সাভারকরের দলের শক্তি বৃদ্ধি করেন।

মদনলাল ছিলেন পঞ্জাবের অধিবাসী; লণ্ডনে ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যানুশীলন করিতেন। তিনি বৈপ্লবিক কার্য্যে একাগ্রতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করিয়া সাভারকরের বিশেষ প্রীতি ও বিশ্বাসভাজন হইলেন। মদনলাল ইণ্ডিয়া হাউসেই আশ্রয় লইলেন।

প্রতি রবিবার লণ্ডন ও সন্নিকটবর্ত্তী শহরগুলি হইতে সঙ্ঘের সদস্যেরা আসিয়া ইণ্ডিয়া হাউসে সমবেত হইতেন। চরিত্রবল

মদনলাল ধিংড়া (১৯০৯ সনে)

ও শারীরিক শক্তি বৃদ্ধির বিষয়ে সাভারকর, চট্টোপাধ্যায়, ম্যাডাম কামা প্রমুখ সদস্যগণ আলাপ-আলোচনা সুরু করেন। ভারতে নির্ব্বিচার দলননীতি, মুক্তিমন্ত্রের সাধকগণের কর্ত্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও তর্ক চলিত, কিন্তু মদনলাল থাকিতেন নীরব, নিথর। তবে বাংলার তৎকালীন একটি জনপ্রিয় সঙ্গীতের একটি কলি প্রায়শঃ তিনি বলিতেন:

"ও যাঁর মাতৃকণ্ঠে বাজিছে শৃঙ্খল
দুর্ব্বল সবল সে কি ভাবিবে?"

মদনলালের ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা বন্ধ হইয়া গেল। মায়ের মুক্তিযজ্ঞে আত্মাহুতি দেওয়ার চিন্তাই তাঁহাকে পাইয়া বসিল। মদনলাল অহর্নিশ ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন। কি করিবেন, কি

ভাবে আত্মোৎসর্গ করিবেন এই চিন্তা তাঁহাকে বিচলিত করিল। ভারতমাতার বন্ধনশৃঙ্খল-মুক্তিকামী সহস্র সহস্র সন্তানের মত তাঁহারও অন্তরে দীর্ঘকালের ক্রোধ, প্রতিহিংসা দেদীপ্যমান ছিল।

একদিন ইণ্ডিয়া হাউসের একজন সদস্য বলিলেন যে, জাপানীরাই এশিয়ার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সাহসী, তাঁহারাই দেশের জন্য হেলায় প্রাণ দিতে পারেন। মদনলাল বলিলেন, ভারতীয় হিন্দুগণ যে তদপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে তাহার প্রমাণ ইতিহাসে প্রচুর রহিয়াছে। এখনও যে বহুলোক প্রাণ দিতে পারে তাহার প্রমাণ কার্যাকালে পাইবেন।

ইহাতে সদস্যদের মধ্যে তর্কের অবতারণা হইল, সর্ব্বশেষে স্থির

সাভারকার (১৯০৮ সনে)

হইল মদনলাল সাহস ও ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিবেন। একটা আলপিন তাঁহার দক্ষিণ হস্তের তালুতে বসাইয়া দেওয়া হইবে, তিনি নির্ব্বিকার থাকিয়া দেখাইবেন তাঁহার ধৈর্য্য কিরূপ। মদনলাল সম্মত হইলেন। মদনলাল হাতপাতিয়া দাঁড়াইলেন, একজন সহকর্ম্মী একটি আলপিন ঢুকাইয়া দিতেছেন, ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছে—অমিতশক্তি অবিচলিতচিত্ত দেশপ্রাণ তরুণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আর একদিন "ফ্রি ইণ্ডিয়া সোসাইটি"র সদস্যগণের মধ্যে আলোচনার বিষয় ছিল, 'বর্ত্তমানে ভারতের সাঙ্ঘাতিক শত্রু কে?' কে তখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শত্রুতাসাধন করিয়াছেন বা করিতেছেন? ব্রিটেনের কোন্ ধুরন্ধর নির্ব্বিচারে ভারতের সর্ব্বাধিক অনিষ্ট সাধনে রত?

কেহ কেহ বলিলেন, "নিঃসন্দেহরূপে লর্ড কার্জ্জন অব কেডেলষ্টোন।" একজন বলিলেন, "না, তিনি ভারতের শত্রু নিশ্চয়ই নহেন। তিনিই অসময়ে আঘাত হেনে আমাদের মোহনিদ্রা ভঙ্গ করেছেন। সুতরাং তিনি আমাদের কম মিত্র নহেন।"

একজন বলিলেন, "ইণ্ডিয়া আপিসের এ. ডি. সি. কর্নেল স্যর কার্জ্জন ওয়াইলী। ইনিই তখন ভারতে অনুষ্ঠিত অত্যাচার, অনাচার ও ব্যভিচারের নির্দ্দেশদাতা। জন (পরে লর্ড) মর্লী ভারতসচিব বটে, কিন্তু ইঁহারই হস্তের ক্রীড়নক। ওয়াইলী রক্ষণশীল দলের মিঃ ব্যালফুরের প্রধান মন্ত্রিত্বকাল হইতেই এই গদীতে বসিয়া আমাদের পুণ্যভূমিকে শোষিত, দলিত ও মথিত করিতেছেন, নিত্য নব নব ভাবে নৃশংস অত্যাচারের তাণ্ডবে স্বদেশী, বয়কট ও স্বরাজ আন্দোলন দাবাইয়া রাখিবার জন্য সর্ব্বশ্রেণীর দেশসেবকগণকে নিগৃহীত করার অনুজ্ঞা প্রেরণ করিতেছেন। তিনিই বাংলায়, পঞ্জাবে, মাদ্রাজে, মহারাষ্ট্রে সর্ব্বত্র সভা, সঙ্ঘ ও স্বেচ্ছাসেবকদলগুলিকে বেআইনী আইনের বিধানে অবৈধ ঘোষিত করিয়াছেন, তিনিই আমাদের তিক্ততম শত্রু!"

মদনলাল ধীরভাবে অচপল নেত্রে শুনিতেছেন, সহসা সকলকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া বলিলেন, "উভয়েই—লর্ড কার্জ্জন এবং স্যর কার্জ্জন, একই দেবতার দুই মূর্ত্তি। আরও আছে, আরও আবির্ভূত হবেন। এই জাতই দৈত্যের, ইহারা গত তিন শত বৎসর ধরে পৃথিবী লণ্ডভণ্ড করছে, সভ্যতার নামে সাম্যের নামে বর্ব্বরযুগীয় তাণ্ডবে ধরা কম্পিত করছে। ইংলণ্ডের স্বার্থের জন্য পৃথিবীর সকল ষ্ট্রেটেজিক অঞ্চল ক্রমে ক্রমে দখল করেছে। এদের শায়েস্তা করতে হবে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পর্য্যুদস্ত করতে হবে। এর জন্য চাই আমাদের আত্মদান, আমাদের রক্তস্নান। আমাদেরই অগ্রে মরে অমর হতে হবে। কারও গালে একটি চড় মেরে নয়, কোন প্রতিমূর্ত্তিতে কালি লেপন করে নয়, বেনামী চিঠি ছেপে—অথবা ভীতিপ্রদর্শক পত্র লিখেও নয়। আত্মোৎসর্গ করে, ধূপের মত অগ্নিতে নিজেকে নিঃশেষ করে, মাতৃ-অঞ্চল সৌরভে পূর্ণ করতে হবে, দীপের মত জ্বলে জ্বলে দেশমাতৃকার বদনমণ্ডল প্রদীপ্ত করতে হবে।"

কার্জ্জন ওয়াইলী হত্যার মাসতিনেক পূর্ব্বে প্যারিস হইতে এক প্যাকেট প্রচারপত্র আসিল। গবর্ণমেণ্ট তখন ইণ্ডিয়া হাউস বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। মুক্তিকামীরা বিভিন্ন স্থলে কক্ষ লইয়া বাস করেন। বীর সাভারকর বিপিনচন্দ্র পালের ফ্ল্যাটে, মদনলাল অন্যত্র, চট্টোপাধ্যায় ত্রিমূল আচারিয়া প্রমুখ ব্যক্তিগণ এখানে সেখানে একা কিংবা দুই জনের উপযোগী কক্ষে রহিয়াছেন। প্রচারপত্র তাঁহাদের নিকটে পৌঁছিয়াছে। পত্রটি ছিল পোলিশ বিপ্লবী সঙ্ঘের ইস্তাহারের ইংরেজী অনুবাদ। ইহার মর্ম্ম এইরূপ: "বিনা রক্তপাতে, বিনা রক্তদানে, বিনা সন্ত্রাসবাদী কার্য্যে কোন জাতি কখনও কিছু পায় নাই।" আমেরিকা, ইটালী, প্রভৃতি দেশসমূহ স্বাধীনতালাভার্থে কি পরিমাণ আত্মদান ও ত্যাগস্বীকার করিয়াছে তাহারই একটা ফিরিস্তি উহাতে ছিল। ভারতের মুক্তিসাধকগণ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, ভারতে সিপাহীযুদ্ধকালে ভারতবাসী যে বিপুল পরিমাণ রক্তদান করিয়াছিল, যে অগণিত নরনারী

আত্মবলি দিয়াছিল এবং সংগ্রাম বিপর্য্যস্ত হইলে ব্রিটিশের নৃশংস ঘাতকগণ যে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ নরনারীকে নির্বিচারে হত্যা করিয়াছিল তাহাও পোলিশ বিপ্লবীরা ফরাসী প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। মদনলাল উক্ত ইস্তাহার পড়িয়া হৃদয়ঙ্গম করিলেন এই পথেই হয়ত ভারতের মুক্তি।

পোলিশ ইস্তাহার প্রথমতঃ প্যারিসে ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়, পরে প্যারিসে অবস্থিত প্যারিস কর্মকেন্দ্রের অন্যতম নায়ক শ্রী এস. আর. রাণার (বর্ত্তমানে তিনি সৌরাষ্ট্রের লিম্‌দি ষ্টেটে বাস করেন) উদ্যোগে ইংরেজীতে অনুবাদিত হয়।

মদনলাল ইণ্ডিয়া হাউসের অন্যান্য সহকর্মী বন্ধুদের মতই গুলি-ছোঁড়া, অসিচালনা, যুযুৎসু প্রভৃতি শিক্ষা করেন। এবার তিনি গুলিছোঁড়ায় দক্ষতা-অর্জ্জন এবং লণ্ডনের কিছুসংখ্যক অভিজাতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাস্থাপনের উদ্দেশ্যে জলি ক্লাবে যোগ দিলেন। তিনি এখানে অনেক প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি ও পদস্থ রাজপুরুষের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করেন। যথোচিত পোশাক-পরিচ্ছদে শোভিত হইয়া তিনি নিত্য ক্লাবে উপস্থিত হইতেন। সকলে ভাবিল মদনলাল এবার লয়ালিষ্ট হইয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের চাকুরির জন্য লালায়িত হইয়াছেন। তিনি সত্বর লর্ড মর্লি, লর্ড কার্জ্জন, কর্ণেল স্যর কার্জ্জন ওয়াইলী প্রমুখ প্রতিপত্তিশালী পুরুষগণের আস্থাভাজন হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাইকে চড়ারও দক্ষতা অর্জ্জন করিলেন।

১৯০৯, ১লা জুলাই সন্ধ্যাবেলা লণ্ডনের ইম্পীরিয়াল ইনষ্টিটিউট অব সায়ান্স এণ্ড টেকনোলজী হলে ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বার্ষিক উৎসব। জলি ক্লাবের সভ্যগণ আমন্ত্রিত, ইণ্ডিয়া হাউসের প্রাক্তন বোর্ডারদের মধ্যেও কাহারও কাহারও আমন্ত্রণ আসিয়াছে। মদনলালের একটি চরম সুযোগ উপস্থিত। তিনি নিজ কক্ষে বসিয়া নিভৃতে দুইটা পিস্তলে গুলি পুরিলেন। একটি উৎকৃষ্ট স্যুট পরিলেন, তার পর মারণাস্ত্রগুলি কোটের স্থানে স্থানে পুরিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সুসজ্জিত সভাগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন এক দিকে তাঁহার সহকর্মী ও স্বদেশবাসীরা উপবিষ্ট। তিনি সেদিকে তাকাইলেন না, তিনি জলি ক্লাবের অভিজাত সদস্যগণের সন্নিকটেই যাইয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

সভার কার্য্য আরম্ভ হইয়া বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ পর্য্যন্ত হইয়া গেল। মদনলাল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, যিনি পরোক্ষে প্রতিহিংসামূলক নিপীড়ন চালাইয়া আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষে আতঙ্ক সৃষ্টি করিতেছেন সেই কর্নেল স্যর উইলিয়ম কার্জ্জন ওয়াইলী সভামধ্যে উপবিষ্ট। মদনলাল দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন এবং তাঁহার উপরে পর পর তিনটি গুলি ছুঁড়িয়া তাঁহাকে ভূপাতিত করিলেন।

তখনি বিদ্যুদ্‌বেগে মদনলালের দিকে ছুটিয়া আসিলেন পার্শী চিকিৎসক ডাক্তার কাওয়াস লালকাকা। মদনলাল নিমেষে তাঁহাকে গুলিবিদ্ধ করেন এবং তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। মদনলাল তখন গ্রেপ্তার হইলেন। সভাস্থলে হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে সভাভঙ্গ হইল।

পুলিস মদনলালের দেহ তল্লাস করিয়া দুইটি পিস্তল, একটি ড্যাগার, একখানা ছুরি, কিছু কাগজপত্র এবং কিছু অর্থও পাইল। বিচারালয়ে কাগজপত্র প্রাপ্তির কথা পুলিস অস্বীকার করে।

পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা

পুলিস-হেপাজতে চিকিৎসকগণ তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া বিস্ময়াভিভূত হইলেন, কারণ তাঁহার নাড়ী ও হৃৎপিণ্ডের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। দুইটি হত্যাকাণ্ডের পরও তাঁহার কোন উত্তেজনা বা ভয়ভ্রান্তি নাই, যেন কিছুই ঘটে নাই। চিকিৎসকগণ বলিলেন, তিনি সাধারণ অপরাধী নহেন; দীর্ঘকাল চিন্তা ভাবনার পর অবশ্য-কর্ত্তব্য সম্পাদনের মতই এই হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করিয়াছেন। মদনলালকে ব্রিক্‌সটন জেলে আবদ্ধ রাখা হইল।

সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব্ব ও অপ্রত্যাশিত হত্যাকাণ্ডে সমগ্র ইংলণ্ডের অস্থিমজ্জা পর্য্যন্ত প্রকম্পিত হইল। সর্ব্বত্র রব উঠিল, এখনই ইহার প্রতিকার চাই, এখনই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে হইবে। ভারতীয় ছাত্রের আগমন, ভর্ত্তি, এমনকি বসবাস নিয়ন্ত্রিত করিতে

হইবে। তাঁহাদিগকে সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বতোভাবে সংযত করিতে হইবে, শায়েস্তা করিতে হইবে ইত্যাদি মন্তব্য বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইল।

মধ্য-ইউরোপের মুক্তিকামী জাতি, গোষ্ঠী, এবং সম্প্রদায়ের জনগণ কিন্তু উল্লাসে আত্মহারা হইল। লেডী কার্জ্জন ওয়াইলীর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য পরবর্ত্তী ৫ই জুলাই বিখ্যাত ক্যাক্সটন হলে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হইল। সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন আগা খাঁ (বর্ত্তমানে এইচ. এইচ. আগা খাঁ), স্যর মাঞ্চেরজী ভবনাগরী, দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (তৎকালে প্রেস কনফারেন্স উপলক্ষে লণ্ডনে উপস্থিত ছিলেন), বাগ্মীবর বিপিনচন্দ্র পাল, ফজলভাই করিমভাই (পরে স্যর), স্যর দিনশা পেটিট প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইলেন।

আগা খাঁ (১৯০৯ সনে)

প্রারম্ভে সুরেন্দ্রনাথ এবং তারপর বিপিনচন্দ্র এ প্রকার হত্যাকার্য্য যে অন্যায় তাহা বলিলেন। প্রসঙ্গতঃ ভারতীয় যুবকগণের অন্তরে যে অসন্তোষ ও হতাশা জমিয়া উঠিতেছে তাহা নিরাকরণের জন্য দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের অবতারণা করিয়া বক্তৃতা দিলেন। মাঞ্চেরজী ভবনাগরী, ফজলভাই করিমভাই, পেটিট এবং অন্যান্য কয়েক জন তীব্র ভাষায় হত্যাকাণ্ডের নিন্দাবাদ করিলেন। আগা খাঁ সভাপতির আসন হইতে এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন:

"মদনলাল ধিংড়ার কার্য্যের তীব্র নিন্দাপ্রকাশের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।"

অমনি সভাকক্ষের এক প্রান্ত হইতে কে বলিয়া উঠিলেন, "না, না, কিছুতেই না, সর্ব্বসম্মতিক্রমে কিছুতেই নয়।"

উত্তেজিত কণ্ঠে সভাপতি হাঁকিলেন, "কে বলছেন, না?"

উত্তর দিলেন বীর সাভারকর, "আমি"।

সভাপতি। "আপনার নাম?"

আগা খাঁ সাভারকরকে জানিতেন, কিন্তু না জানার ভান করিয়াই প্রশ্ন করিলেন এবং উত্তরে শুনিলেন, "আমি? সাভারকর।"

সভামধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। সভাক্ষেত্রেও ভীষণ গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইল। এক দল উত্তেজিত ব্রিটন চিৎকার করিয়া প্রতিবাদীকে শায়েস্তা করিতে বলিলেন। পামার নামক একজন ইউরেশীয় সাভারকরের দিকে ত্বরিতে যাইয়া সাভারকরের মুখে ঘুষি বসাইয়া দিলেন। তাঁহার চশমা ভাঙিয়া গেল। ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। সাভারকরের সহকর্ম্মী ত্রিমূল আচারিয়া পামারকে ঘুষিতে জর্জ্জরিত করিলেন। অপর সহকর্ম্মী রেঙ্গুনের উকীল ভি. ভি. এস আয়ার পিস্তলের গুলিতে তাহাকে নিহত করিতে উদ্যত হইলেন, সাভারকর বাধা দিলেন।

রক্তাক্ত বদনে সাভারকর চিৎকার করিয়া বলিলেন, "এর পরও আমি বলছি, আমি সাভারকর, আমি এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধী, সুতরাং প্রস্তাব সর্ব্ববাদিসম্মত নহে।"

এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সাভারকরের উপর আক্রমণ অন্যায় হয়েছে, আমি এর প্রতিবাদে সভা ত্যাগ করে চললাম।"

তিনি নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। বিপিনচন্দ্র পাল এবং অন্যান্য অনেকে সভা ত্যাগ করিলেন। সভায় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। শ্রোতৃমণ্ডলীর অনেকেই দলে দলে সভা হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বিনা প্রস্তাব গ্রহণেই মহামান্য সভাপতিও বিদায় লইলেন।

সভা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই আইনজ্ঞ সাভারকর "লণ্ডন টাইমসে" একখানা পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। এখানি ৬ই জুলাই তারিখের প্রাতঃকালীন সংস্করণে প্রকাশিত হইল।

সাভারকর লিখিলেন, "যে মামলা বিচারাধীন (subjudice) মদনলাল ধিংড়া জেল হাজতে, সেই সময়ে প্রকাশ্য সভায় তাঁহার কার্য্যের নিন্দা ও ঘৃণা প্রকাশের জন্য সভা করা যাইতে পারে না। ইহাতে আদালতের অবমাননা এবং বিচারককে পক্ষপাতের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে।

"টাইমস" পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে ইহার সমর্থনে একটি প্যারা প্রকাশিত হইল, সাভারকরের জয় হইল।

১০ই জুলাই (১৯০৯) ওয়েষ্টমিনষ্টার কোর্টে প্রাথমিক তদন্ত আরম্ভ হইল। প্রফুল্লচিত্ত প্রশান্তবদন মদনলাল কাঠগড়ায় বসিলেন। তিনি প্রথমেই বলিলেন, তিনি এই কার্য্য কেন করিয়াছেন সে সম্বন্ধে একটি বিবৃতি লিখিয়া তাঁহার পকেটে রাখিয়াছিলেন। ব্রিক্সটন জেলে তাঁহার শরীর তল্লাস করার কালে পুলিস তাহা লইয়াছে, তাহা কোর্টে উপস্থিত করা হউক।

তদন্তকারী পুলিস অফিসার বলিলেন, তাঁহারা কাগজপত্র কিছু পান নাই। মদনলাল বলিলেন—তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করিবেন না, মাত্র একটি বিবৃতি দিবেন। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে স্পষ্টভাষায় বলিলেন, "জার্ম্মানদের যেমন এই দেশ করায়ত্ত করার কোনও অধিকার নাই,

তেমনই ইংরেজদেরও পুণ্য ভারতভূমি আয়ত্ত করার অধিকার নাই। এজন্যই আমাদের পক্ষে ইংরেজকে হত্যা করার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, কারণ ইংরেজ আমাদের পবিত্র দেশ কলুষিত করিতেছে।

আমি ইংরেজের ভণ্ডামি, ব্যঙ্গ অভিনয় এবং বৃথা আড়ম্বর দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।"

মদনলালকে দায়রায় সোপর্দ্দ করা হইল।

সেসন আদালতে বিচার একটা লোকদেখানো প্রহসন মাত্র হইল। মদনলাল আত্মপক্ষ সমর্থন করিলেন না, কিন্তু বলিলেন—তাঁহার পকেট হইতে পুলিস যে বিবৃতি পাইয়া গোপন করিয়াছে তাহা কোর্টে উপস্থিত করিতে পুলিস কর্ম্মচারিগণ দ্বিধা বোধ করিতেছেন—ইহা অসঙ্গত ও অন্যায়।

সুচতুর রাজনৈতিক এবং নির্ভীক জাতি বলিয়া যাঁহারা গর্ব্ব করেন সেই রাজপুরুষগণ মদনলালের আত্মীয়স্বজনের পক্ষে একজন কৃতী ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়া বিচারকালে ঘোষণা করাইলেন, মদনলালের কার্য্যে তাঁহাদের সহযোগিতা ও সহানুভূতি ছিল না, তাঁহারা রাজভক্ত, ইংরেজভক্ত ইত্যাদি। ইহা আদালতে কিরূপে সম্ভব হইল তাহা লণ্ডনস্থ ভারতবাসীর বোধগম্য হইল না। মনীষী বিপিনচন্দ্র তাঁহার সম্পাদিত "স্বরাজ" পত্রে তীব্র ভাষায় এই কার্য্যের সমালোচনা করিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না।

বিচার আরম্ভ এবং শেষ হইল। কাঠগড়ায় বীর মদনলাল নিশ্চিন্ত মনে উপবিষ্ট। জুরীগণ কক্ষান্তর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া "pre-established harmony" (পূর্ব্বনির্দ্ধারিত কার্য্যক্রম), "মদনলাল দোষী" এইরূপ অভিমত দিলেন। মদনলালের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। তিনি শান্তভাবে দণ্ডাদেশ গ্রহণ করিলেন। ১৭ই আগষ্ট ফাঁসীর দিন ধার্য্য হইল।

বীর সাভারকর একদিন জেলে যাইয়া মদনলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি বিশেষ উদ্যোগী হইলেন মদনলালের বিবৃতি—যাহা পুলিস পাইয়াও পাইয়াছে বলিয়া স্বীকার করে নাই তাহার একটি অনুলিপি মুদ্রিত করিবার জন্য। সজ্ঘ-সম্পাদক শ্রীজ্ঞানচাঁদ বর্ম্মা ১৫ই আগষ্ট তাহা প্রকাশ করিলেন। ইংলণ্ডের সংবাদপত্রসমূহে ইহা প্রকাশ করা দুরূহ হইল, অগত্যা "ডেলী নিউজ" পত্রিকার—ইহার মূলধনে দাদাভাই নৌরজীর মোটা অংশ ছিল—জনৈক আইরীশ নৈশ সম্পাদকের সৌজন্যে ইহা ১৬ই আগষ্টের প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়া সমগ্র ইংলণ্ডে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল। প্যারিস, বার্লিন, ভিয়েনা, বুডাপেষ্ট, বোর্ণ, জুরিখ সর্ব্বত্র ইহা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শিরোনামাসহ যথাযোগ্য সম্মানের সহিত প্রকাশিত হইল।

মদনলাল কারাকক্ষে মুদ্রিত বিবৃতি পাঠ করিয়া পুলকিত হইলেন, ভাবিলেন তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে। বিবৃতিটি এইরূপ :

"I admit, the other day I attempted to shed English blood, as an humble revenge for the inhuman hanging and deportations of patriotic Indian youths . . . .

"I believe that a nation held in bondage with the help of foreign bayonets is in perpetual state of war. Since open battle is rendertd impossible to unarmed race, I attacked by surprise; since guns were denied to me, I drew forth my pistol and fired.

"As a Hindu, I feel that a wrong done to my country is an insult to God.

"The war of independence will continue between India and England so long as the English and Hindu races last (if this present unnatural relation does not cease)."

ম্যাডাম কামা

১৭ই আগষ্ট মদনলাল ফাঁসীমঞ্চে আত্মদান করিলেন। তাঁহার শেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁহার শব যেন কোন অহিন্দু স্পর্শ না করে, ইহা যেন হিন্দুশাস্ত্রমতে দাহ করা হয়, তাঁহার পোশাক-পরিচ্ছদ ও জিনিষপত্রের বিক্রয়লব্ধ অর্থ যেন ভারতীয় জাতীয় ধনভাণ্ডারে প্রদত্ত হয়। কিন্তু তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না।

মৃত্যুর পূর্ব্বে মদনলাল বলিয়াছিলেন :

"My wish is that I should be born again of the same Mother and that I should die the same death for her again!"

অর্থাৎ, "আমার এই আকাঙ্ক্ষা যে আমি পুনর্ব্বার সেই মায়ের সন্তান হইয়াই জন্মগ্রহণ করি এবং আমার মৃত্যুও যেন সেই মায়ের জন্যই একই ভাবে হয়।"

পরবর্তী কালে প্যারিসে ম্যাডাম কামার সঙ্গে আমাদের আলোচনা-কালে তিনি একটি কক্ষ দেখাইয়া বলেন, এই স্থলে সাভারকর বাস করিতেন। তার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মদনলাল-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন এবং পরদিন বহুবিধ কাগজপত্র প্রদর্শনকালে মদনলাল সম্পর্কে প্রকাশিত বিভিন্ন দেশের পত্রিকাসমূহের কাটিং দেখাইতে তিনি মদনলালের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিবার সময় একেবারে যেন ভাঙিয়া পড়িলেন।

সে

শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র

[শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু, শ্রদ্ধাস্পদেষু]

সে এসে পুঞ্জিত গ্লানি ধুয়ে দেয় প্রাণের শিশিরে,
দৃষ্টির আড়ালে দীর্ঘ অন্ধকার ভরে প্রতীক্ষায়।
বহু দীর্ণ রুক্ষ মাটি স্নিগ্ধ করে সবুজ অঙ্কুরে,
প্রভাত প্রসন্ন করে ফুল-পাখি-পাতার শোভায়।
সূর্যের দক্ষিণ দীপ্তি তারই দান নিগূঢ় রসনে।
সত্তার পুলকে, স্নানে, স্বীকরণে আকাশ-বিস্তারে
শুদ্ধ নীল নিরুদ্বেগ শূন্য তার আপন বর্ণভি—
জীবন-চৈতন্য সেই উর্দ্ধতলে শুদ্ধ বিধূনন।

নিচে অন্ধ অন্তরাল। বিপরীত বিপত্তি-বিন্যাসে
নশ্বর সংসার যাপে বহুকুণ্ঠ, ক্লিষ্ট বর্তমান।
সুসীম শৃঙ্খলা নয়,—দিনগুলি অসম, বন্ধুর।
নির্মম আবর্তে রাত্রি ব্যর্থ করে শান্তির সন্ধান।
আমরা রয়েছি সেই স্থূল সত্যে, পৃথুল স্বভাবে।
রিপুর বিচিত্র কীর্তি আমাদের মুখ্য পরিচয়—
যদিও সহস্র শব্দে অস্বীকার করি বারংবার,
যদিও আদর্শ সেই সর্বগ্রাসী রিপুরই বিলয়।

প্রণয়পাংশন লোভ স্বোপার্জিত ব্যর্থতার ক্ষোভে
মাঝে মাঝে উচ্চকিত চেয়ে দেখে—কুবের-লাঞ্ছিত
উপদ্রুত শ্রীসদন! লক্ষ্মীহীন অমেয় সঞ্চয়ে
ঘনায় অমোঘ খর কালদৃষ্টি পুঞ্জিত সোনায়।
কৃপণ বন্ধনে প্রাণ বিস্ফোরণত্বরণ সাধক।
অবশ্য ঘটায় ধ্বংস সে সংকোচ প্রলয়সংবাহী।
আর, পঙ্গু-মূঢ়-মত্ত সভাসদ্ লোলুপ উচ্ছ্বাসে
ক্লীবের ব্যসনে করে ঘন ঘন প্রশংসা বর্ষণ।
শকুনি প্রমত্ত দ্যূতে,—ধৃতরাষ্ট্র দৈবের নিয়োগে
স্নেহান্ধ নিমিত্তমাত্র; ক্ষীণকণ্ঠ বিদুর বিরোধী;
অনিবৃত্ত ধর্মরাজ অগ্রসর শঠের আহ্বানে,—
ধর্মের দুর্বোধ গতি বহুদুঃখে যাজ্ঞসেনী জানে।

শত শত শোকস্থান, হিংস্রপ্রাণিসমাকুল বন
অযোধ্যা, বিদিশা, বঙ্গ—দেশে-দেশে আছে শ্রান্ত মন
কৈকেয়ী-নির্বন্ধে ত্রস্ত দৃঢ়ব্রত, সত্যার্থী নৃপতি
বৃথা অনুনয় শেষে পেয়েছে সে নির্দয় নিয়তি।
সৌমিত্রি সুচিরক্ষত্র অকৃতার্থ দৈবের শাসনে।
সাধ্বী মৈথিলীর সত্য পূর্ণ হয় চির-নির্বাসনে॥

ভয়ের কবন্ধ রাত্রি দিকে দিকে উত্থানে-পতনে
দেদীপ্য বজ্রদ মেঘে তবু এক আছে পক্ষান্তর,—
বিদ্যুৎ-ঝলকে জ্বলে বিধাতার কঠোর বিদ্রূপ,
লক্ষ্মণের পরিহাসে শূর্পণখা হারায় নাসিকা,—
ঔদরিক, তুবরক ভীমহস্তে ক্ষান্ত দুর্যোধন।
দুর্মুখ দুরাত্মা পায় সমুচিত প্রচণ্ড শমন॥
সৃষ্টির গভীর মূলে যে কল্যাণ স্রষ্টার ঈপ্সিত
বর্ম তার ধৈর্য আর অস্ত্র তার নিত্য জাগরণ।
সে নয় আপন কর্মে হঠবাদী। অভীষ্টের ধ্যান
রাখে সে অম্লান নিত্য, পলে পলে লক্ষ্যের অর্জন।
বাহিরে গাম্ভীর্য তার, অন্তরে সে প্রসন্ন সাধনা।
সিদ্ধি তার সুনিশ্চিত পরিব্যাপ্ত মানুষের মনে॥

লেখনী কৌতুক-কশা,—লঘু-গুরু অজস্র বচনে
সেই অনির্বাণ প্রাণ দেখা দিলো গম্ভীর রচনে।
বাল্মীকি-ব্যাসের ন্যাস বহু যত্নে করে প্রত্যর্পণ।
রাখে সে অমর কীর্তি চলন্তিকা ভাষার দর্পণ।
বন্ধুর পথের যাত্রী, দেখালো সে তুলে অন্তরাল
সংকট সংকট নয়,—অসংগতি ধুস্তূরের জাল!*

---

* ১৬৪ ল্যান্সডাউন রোডে অনুষ্ঠিত শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক আহূত সাহিত্য-আসরে (৩রা বৈশাখ, ১৩৬২) কবি কর্তৃক পঠিত।]

বিচার

ও' হেনরী

অনুবাদক—শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

সোপী ম্যাডিসন পার্কের বেঞ্চির উপর বসে উসখুস করছে। বুনো হাঁস যখন রাতের বেলায় চেঁচাতে থাকে, সীল-চামড়ার কোট না থাকায় স্ত্রীরা যখন তাঁদের স্বামীর প্রতি সহসা সদয় হয়ে ওঠেন আর সোপী পার্কের বেঞ্চির উপর অস্থির হয়ে ওঠে, বুঝে নেবেন শীত আসতে আর বেশী দেরি নেই।

সোপীর কোলের উপর একটি শুকনো পাতা ঝরে পড়ল,—সেটি তুষার-জ্যাকের চিঠি। ম্যাডিসন স্কোয়ারের পাকা বাসিন্দাদের প্রতি জ্যাকের করুণা আছে, সে আগে থেকেই তার বাৎসরিক আগমন-বার্তা জানিয়ে দেয় তাদের।

গৃহহারাদের এই আচ্ছাদনহীন বাসাবাড়ীর ভৃত্য হ'ল উত্তর-পবন; জ্যাক চৌমোহনার কোণে দাঁড়িয়ে তার হাতেই নিজের কার্ডখানা দিয়ে যায়,—বাসিন্দারা যাতে সময় থাকতে প্রস্তুত হয়ে নেয়।

আগামী শীতের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য সোপী সচেতন হয়ে উঠল, বুঝলো এখন থেকেই কোন উপায় খুঁজে বার করতে হবে। সেই ভাবনায় সোপী বেঞ্চির উপর অস্থির হয়ে পড়েছে।

শীতাবাস সম্বন্ধে সোপীর তেমন কোন উচ্চাভিলাষ নেই। বিসুভিয়াসের সমুদ্র-উপকূল, কিংবা ভূমধ্যসাগরের প্রমোদযাত্রায় সে যেতে চায় না, দক্ষিণপ্রান্তের সাবানের ফেনার মত আকাশের আকর্ষণও নেই তার। সে কেবল মাসতিনেকের জন্য দ্বীপে থাকতে চায়। সে ক'মাস আহার, আশ্রয় আর মনের মত সংসর্গ পাওয়া যাবে, ঠাণ্ডা বাতাস আর নীলকোর্তার হাত থেকেও নিস্তার পাবে সে।

গত ক'বছর থেকে সে ব্ল্যাকওয়েলেই আশ্রয় পেয়ে এসেছে। নিউ ইয়র্কের ভাগ্যবান নাগরিকেরা প্রতি বৎসর শীতকালে যে সময়ে পামবীচ কিংবা রিভিয়েরা যাবার টিকিট কাটায়, সোপীও সে সময়ে ঐ দ্বীপে হেজিরা-যাত্রার আয়োজন করে, কিন্তু আর সময় নেই। গত রাত্রে সে পুরোনো পার্কের ফোয়ারার কাছে শুয়েছিল, রবিবারের তিনখানি মোটা খবরের কাগজ কেটে, পা আর পেটে জড়িয়েও সে শীত তাড়াতে পারে নি। সুতরাং দ্বীপটি সোপীর চোখের সামনে এখন মহিমময় হয়ে ভেসে উঠল।

শহরে আতুরদের জন্য দাক্ষিণ্যের নামে যে সব ব্যবস্থা আছে, সোপী তা ঘৃণা করে। তার মতে দয়ার আশ্রয়ের চেয়ে আইন ঢের বেশী ভদ্র। চারিদিকেই মিউনিসিপ্যালিটি ও সাধারণের দানে পুষ্ট অসংখ্য অনাথালয় আছে। ইচ্ছা করলে তারই যে-কোন একটায় সে নিজের থাকা-খাওয়ার সামান্য প্রয়োজন মিটিয়ে নিতে পারত, কিন্তু দয়ার সে দান সোপীর মত দাম্ভিক মানুষের কাছে অপমানজনক বোধ হয়। টাকায় না দাও, দাতব্যের প্রতিটি উপকারের জন্য আত্মসম্মান খুইয়ে তোমাকে তার মূল্য শোধ করতে হবে। ব্রুটাসের হাতে সীজারের যেমন হয়েছিল, দয়ার সামান্য মাত্র আশ্রয়ের পেছনেও তেমনি হলাহল মেশানো থাকে, প্রতি টুকরো রুটির বিনিময়ে মানুষকে তার ব্যক্তিগত এবং গোপন জীবনের সব তথ্য প্রকাশ করে দিতে হয়। তার চেয়ে আইনের আতিথ্য গ্রহণ ঢের বেশী শ্রেয়স্কর। আইন যদিও কতকগুলি নিয়মের অধীন, তবু তা কোন ভদ্রলোকের ব্যক্তিগত জীবনে অকারণ হস্তক্ষেপ করে না।

সুতরাং সোপী দ্বীপে যাওয়াই স্থির করলে এবং সঙ্গে সঙ্গে অভীষ্টসিদ্ধির কাজে লেগে গেল। এর অনেক সহজ উপায় আছে। সব চেয়ে আরামের হ'ল একটি ভাল রেস্তোরাঁয় পেট ভরে খেয়ে জানিয়ে দেওয়া সঙ্গে পয়সা নেই। তারপর, কোন গোলমাল না বাধিয়ে চুপচাপ পুলিসের হাতে আত্মসমর্পণ। বাকী কাজটুকু কোন সহৃদয় ম্যাজিস্ট্রেটই করে দেবেন।

সোপী বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালে। তারপর পার্ক ছেড়ে এসফল্টের চওড়া রাস্তা পেরিয়ে এল ব্রডওয়ে আর ফিফথ এভিনিউয়ের সঙ্গমস্থলে। এবার সে ব্রডওয়ের মোড় ঘুরে জমকালো এক কাফের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এখানে প্রতি রাত্রে আঙুর, রেশমের গুটিপোকা এবং জীবকোষের উৎপন্ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামগ্রী এসে একত্র হয়।

ভেষ্টকোটের নীচের বোতাম থেকে উপর পর্য্যন্ত সোপীর কোন ভয় ছিল না, ক্ষৌরকর্ম্মকরা মুখ, কোটটাও ভাল এবং তার পরিচ্ছন্ন কালো টাইটা এক ধর্ম্মযাজিকা কোন এক পর্ব্বদিনে তাকে উপহার দিয়েছিলেন। রেস্তোরাঁর টেবিলে পৌঁছানো পর্য্যন্ত যদি কেউ সন্দেহ না করে, সে বাজী মেরে দেবে। দেহের যে অংশটুকু টেবিলের উপর জেগে থাকবে তা দেখে ওয়েটারের মনে কোনই সন্দেহ জাগবে না।

সোপী ভাবলে, রোষ্ট-করা একটি বুনো হাঁস হলেই চলবে; তার সঙ্গে এক বোতল 'চ্যাবলিস', তারপর 'ক্যামেম্বর্ট', একটি ডেমি-টাস আর সবশেষে একটি সিগার। এক ডলারেই একটি সিগার হয়ে যাবে। সব মিলিয়ে এত বেশী হবে না যাতে করে 'কাফে'র মালিক খুব বেশী হিংসার পরিচয় দেবে, অথচ সে ভূরি-ভোজন করে মনের আনন্দে তার শীতাবাস পর্য্যন্ত পৌঁছে যাবে।

কিন্তু যেই সোপী রেস্তোরাঁর দরজার ভেতর পা গলিয়েছে, অমনি তার কোঁচানো ট্রাউজার আর ছেঁড়া জুতোর ওপর ওয়েটারের নজর পড়ল। অমনি বলিষ্ঠ দুটি হাত এসে তাকে বার করে দিলে।

সোপীও নীরবে বেরিয়ে এসে রাস্তার কোণ ঘেঁসে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল, আশঙ্কিত বুনো হাঁসটিও তখনকার মত নির্ম্মম অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেল।

সোপী ব্রডওয়ে ত্যাগ করলে, বুঝলে রসনাপথে সে তার ঈপ্সিত দ্বীপে পৌঁছুতে পারবে না। সুতরাং জেলে ঢোকার অন্য উপায় চিন্তা করতে হবে।

ষষ্ঠ এভিনিউ'র কোণের একটি দোকানে কাঁচের জানালার পেছনে নানা কৌশলে পণ্যসম্ভার সাজানো, বিজলীর আলোয় দোকানটি ঝলমল করছে। সোপী এক টুকরো পাথর তুলে জানালার কাঁচের উপর ছুঁড়ে মারল। সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে লোকজন ছুটে বেরিয়ে এল, আগে আগে একটি পুলিস। সোপী দু'হাত পকেটে গুঁজে ভালমানুষের মত দাঁড়িয়ে গেল, পুলিস দেখে তার মুখে হাসি ফুটেছে।

লোকটা গেল কোথায়?—উত্তেজিত ভাবে পুলিস অফিসারটি জানতে চাইলে।

আপনার কি মনে হয় না, এ কাজে আমারও যোগ থাকতে পারে?—সামান্য শ্লেষ থাকলেও সোপীর কথা বন্ধুত্বব্যঞ্জক, সে যেন সৌভাগ্যকে বরণ করছে।

পুলিসটি সাক্ষী হিসেবেও সোপীকে গ্রহণযোগ্য মনে করলে না। সত্যিই ত, জানালার কাঁচ ভেঙে কেউ কি আইনের বরপুত্রের সঙ্গে আলাপ জমায়! এমন সময় পুলিসটি দেখল একজন লোক ছুটে গিয়ে একটি চলন্ত ট্যাক্সিতে উঠছে, লগুড় উঁচিয়ে অমনি সে তার পিছু তাড়া করলে। বুকভরা হতাশা নিয়ে সোপী আবার ঘুরতে লাগল। সে দু'বারই অকৃতকার্য্য হয়েছে।

রাস্তার ওপারে একটি সাধারণ শ্রেণীর রেস্তোরা দেখা গেল, এখানে সস্তায় পেটভরে খেতে দেয়। রেস্তোরার বাতাবরণ আর ছুরি কাঁটা যেমন মোটা, টেবিলক্লথ আর সুপও তেমনি পাতলা। এমন স্থানে জুতো বা ট্রাউজার নিয়ে বাধা পাবার কোন ভয় নেই। সোপী ঢুকল সেখানে। তারপর একটি টেবিলে বসে তিন-চার পদ সস্তার আহার্য্য খেয়ে ওয়েটারকে ডেকে জানালে—একটি কাণাকড়িও তার সঙ্গে নেই।

'এবার তাড়াতাড়ি পুলিশ ডাকো'—সোপী বললে, 'ভদ্রলোককে অযথা বসিয়ে রেখো না।'

'তোমায় পুলিসে দিচ্ছি না'—ওয়েটারের কণ্ঠে ননীমাখানো কেকের সুর আর চোখে ম্যানহাটান ককটেলের চেরিফুলের রঙ। —'এই কন্, আয় ত?'

এবার দুই ওয়েটারে মিলে সোপীকে খোয়াপাতা পথের উপর বাঁ কানের ভরে সোজা বিছিয়ে দিলে। ছুতোর যেমন তার ভাঁজ-করা রুল খোলে, সোপীও তেমনি দেহের এক একটি গাঁট সোজা করে উঠে দাঁড়িয়ে পোশাকের ধুলো ঝেড়ে নিলে। ধরা পড়ার আশা মনে হ'ল আকাশকুসুম, দ্বীপটিও যেন সরে গেছে বহুদূরে।

ক'খানা বাড়ীর পরে একটি ওষুধের দোকানের সামনে একজন পুলিস দাঁড়িয়েছিল, সেও হেসে চলে গেল।

পুরো পাঁচটি বাড়ী পেরিয়ে সোপী আবার কারাবরণ করবার উপযুক্ত সাহস পেল। এবারকার সুযোগ দেখে সে মনে মনে বললে, এবার আর ছাড় নেই।

ভদ্রবেশী এক লাজুক তরুণী দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বিপুল আগ্রহে দাড়ি-কামানো মগ আর দোয়াতদান দেখছিল, ক'গজ দূরেই ভারিক্কিগোছের একজন পুলিস কর্ম্মচারী জলের কলের উপর ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে।

সোপী স্থির করলে তাকে এবার ঘৃণ্য লম্পটের অভিনয়ই করতে হবে। তরুণীর মার্জ্জিত বেশ এবং হাতের কাছে একজন বিবেচক ধরণের পুলিস দেখে সোপীর মনে উৎসাহ এল। ভাবলে, সুদর্শন পুলিসটি একটু পরেই তার হাত চেপে ধরে তার সেই ছোট্ট দ্বীপটিতে সোজা চালান করে দেবে।

অতএব সোপী ধর্ম্মযাজিকার দেওয়া টাইটি টেনে সমান করে নিলে, কোটের হাতের ভেতর থেকে গুটানো কামিজের কাফ বার করে দিলে, তারপর বিশেষ ভঙ্গীতে হ্যাটটি তির্য্যক্‌ভাবে মাথায় চাপিয়ে সে তরুণীর পাশ ঘেঁসে দাঁড়াল। সে এবার তরুণীর দিকে চোখের ইশারা করলে, গলা খাকারি দিয়ে হাসলও একটু এবং নির্লজ্জের মত ধৃষ্ট লম্পটের অভিনয় করতে লাগল। বাঁকা চোখে সোপী দেখলে পুলিসটি একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছে। তরুণী কয়েক পা সরে গিয়ে আবার একাগ্র দৃষ্টিতে দাড়িকামানো মগ দেখতে লাগল। সোপীও দর্পভরে তার পাশে সরে এসে হ্যাট তুলে বললে, এই তো বিডেলিয়া? তার পর!

পুলিসটি তখনও দেখছে। উৎপীড়িত তরুণীটি যদি একটু অঙ্গুলি সঙ্কেত করে, তো হলেই সে এতক্ষণে তার সামুদ্রিক নিকেতনের পথ ধরতে পারত। সোপীর মনে হ'ল সে যেন ইতিমধ্যেই ষ্টেশন-বাড়ীর গরম ঘরের উত্তাপ পাচ্ছে।

তরুণীটি এবার ঘুরে দাঁড়ালে এবং হাত বাড়িয়ে সোপীর কোটের হাতা ধরে বললে, বেশ তো মাইক্, চল না। ভেবেছিলাম আমিই আগে কথা কইব, কিন্তু পুলিসটা যে ভাবে তাকাচ্ছিল!

আইভি-লতা যেভাবে ওক-বৃক্ষকে জড়িয়ে থাকে, তরুণীও তেমনি সোপীকে আশ্রয় করল। পুলিসের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সোপীর মন বিষাদে ভরে উঠল—নাঃ, জেল তার ভাগ্যে নেই।

পরের মোড়ে এসেই সোপী সহসা তার সঙ্গিনীর হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালাল—পালিয়ে এল এমন জায়গায় যেখানকার পথ প্রতি রাত্রে দীপসজ্জায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, আনন্দ-উৎসবে সেখানকার মানুষও বিভোর হয়ে থাকে। ফারকোট গায়ে মেয়েরা আর বড় বড় গ্রেটকোট চাপিয়ে পুরুষেরা মনের আনন্দে এই শীতেও কেমন বেড়িয়ে যাচ্ছে!

সহসা সোপীর মনে কেমন ভয় হ'ল, কোন নিষ্ঠুর মায়ার ছলনাতেই বুঝি আজ তাকে কেউ ধরছে না। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে

সোপীর মনের আশঙ্কাও বেড়ে চলল। এমন সময় দেখা গেল আর একজন পুলিস জমকালো এক থিয়েটারবাড়ীর সামনে দিয়ে দৃপ্ত মনে পদচারণা করছে। সোপীর হঠাৎ বুদ্ধি খুলে গেল—এখানে চেঁচামেচি সুরু করলেই ত হয়!

যেমন চিন্তা, তেমনি কাজ। সোপী রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে মাতালের মত কর্কশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে গালিগালাজ আরম্ভ করে দিলে। নেচে, চেঁচিয়ে এবং আরও নানা উপায়ে সে পাড়ার শান্তিভঙ্গ করতে লাগল। পুলিসটি বগলে লগুড় গুটিয়ে নিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ল। কৌতূহলী এক নাগরিকের প্রশ্নের উত্তরে সে বললে—'ইয়েলের ছোড়াগুলো হার্টফোর্ড কলেজের 'গুজ-এগ' উৎসব সেরে ফিরছে আর কি! গণ্ডগোল করলেও কারও ক্ষতি করবে না। ওদের ঘাটাতে আমাদের উপর নিষেধ আছে।'

নিরাশ হয়ে সোপী তার সখের অভিনয় বন্ধ করলে। পুলিস কি আজ তাকে ছোবেও না? দ্বীপে পৌঁছনো একরকম অলীক কল্পনা বলেই মনে হ'ল। ঠাণ্ডা বাতাসে সোপীর শীতবোধ হচ্ছে, সে পাতলা কোটের বোতামগুলো এটে নিলে।

সিগারের দোকানে এক ভদ্রলোক ঝোলানো বাতিতে সিগার ধরাচ্ছিলেন, ভেতরে যাবার সময় সিল্কের ছাতাটা দরজায় ঝুলিয়ে গেছেন। সোপী ঘরে ঢুকে ছাতাটা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। ভদ্রলোকও ছুটে বেরিয়ে এলেন এবং রূঢ়ভাবে বললেন, 'আজ্ঞে ছাতাটা আমার!'

'ও, তাই নাকি?'—ছিচকে চুরির অপরাধের উপর অপমান বাড়িয়ে সোপী ব্যঙ্গ করলে—'তা, পুলিস ডাকছেন না কেন? আপনার ছাতা আমি নিয়েছি, ডাকুন না পুলিসকে। ঐ ত মোড়ের মাথায় একটা দাঁড়িয়ে আছে।'

ছাতার মালিকের গতি মন্থর হয়ে গেল, সোপীও ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে গেল, পাছে আবার বরাত ফসকে যায়। পুলিসটি কৌতূহলী হয়ে দু'জনের দিকেই চাইতে লাগল।

'দেখুন মানে',—ছাতার মালিক বললেন, 'এমন ভুল হয়েই থাকে। আমি—আপনার কি না—বেশ ত, আপনারই যদি হয়, আশা করি আমায় মার্জ্জনা করবেন। আজ সকালেই ওটা আমি এক রেস্তোরায় কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। আপনি যদি ঠিক চিনে থাকেন,—কেমন? আমায়—

'নিশ্চয় আমার।' উদ্ধতভাবে সোপী জবাব দিলে। ছাতার আগের মালিক পিছিয়ে গেলেন। অল্পদূর থেকে একটি মোটরকার ছুটে আসছিল, অপেরা ক্লোক পরিহিতা একটি তন্বী সুন্দরীকে রক্ষা করবার জন্য পুলিসটিও সেদিকে ছুটে গেল।

সোপী এবার পূবমুখো হয়ে হেঁটে চলেছে। রাস্তা তৈরির জন্য পথটিকে খুড়ে কতকগুলি গর্ত্ত করা হয়েছিল, গভীর আক্রোশে সোপী তারই একটিতে ছাতাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মনে মনে হেলমেট-পরা বেটনধারীদের যমালয়ে পাঠাতে লাগল। যেহেতু সে ওদের হাতে ধরা দিতে চাচ্ছে, তারা যেন আজ ওকে রাজা বলে ঠাউরেছে—রাজা কি অপরাধ করে!

অবশেষে সোপী পূবদিকের একটি নির্জ্জন পথ ধরে ম্যাডিসন স্কোয়ারের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। ঘরের মোহ মানুষের কোন দিন কাটে না, সে ঘর পার্কের বেঞ্চি হলেও টানে তাকে। অতি নির্জ্জন এক জায়গায় এসে সোপী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সামনেই এক প্রাচীন গীর্জ্জা, নীল কাচের শার্সির ভেতর দিয়ে আলোর আভা বেরুচ্ছে। ঘরের ভেতর বোধ হয় অর্গ্যানবাদক রীডের ওপর আঙুল চালিয়ে রবিবারের উপাসনার গৎ অভ্যাস করছিল। সেই সঙ্গীতের মধুর সুর সোপীর কানে ভেসে এসে তাকে এক মোহজালে আচ্ছন্ন করে ফেললে—সে যেন লোহার রেলিঙের সঙ্গে গেঁথে গেছে।

আকাশে চাঁদের প্রশান্ত জ্যোৎস্না, যানবাহনের সঙ্গে লোক-চলাচলও কমে এসেছে, নিদ্রালস কণ্ঠে কচিৎ দু'একটি পাখী কোটরের ভেতর শিস দিয়ে উঠছে—কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত পরিবেশটি একটি গ্রামীণ গীর্জ্জার শান্তি মনে করিয়ে দেয়। অর্গ্যানবাদকের উপাসনা-সঙ্গীত সোপীকে যেন সিমেণ্ট দিয়ে গীর্জ্জার রেলিঙের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। এক দিন ছিল যখন সে এই সঙ্গীতের স্পর্শ হৃদয়ে অনুভব করতে পারত—তখনও তার জীবনে মায়ের স্নেহ, ফুলের সুষমা, বন্ধুপ্রীতি এবং পবিত্র চিন্তার একটি মহৎ স্থান ছিল। মনের এই অবস্থায়, গীর্জ্জার পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের প্রভাব সংযুক্ত হয়ে তার হৃদয়ে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন এনে দিল।

সন্ত্রস্ত হয়ে সোপী নিজের পতিত জীবনের কথা চিন্তা করতে লাগল, আজ তার জীবন নানা পঙ্কিল বাসনা, বিভ্রান্ত চিন্তা, ইতর মনোবৃত্তি আর নৈরাশ্যে কলুষিত। সেই মুহূর্ত্তে তার হৃদয় এই অভিনব চিন্তায় সাড়া দিল, চকিতে এক দুর্ব্বার প্রেরণা এল মনে—সে তার বিড়ম্বিত জীবনের সঙ্গে একবার শেষ যুদ্ধ করবে, টেনে তুলবে নিজেকে এই পঙ্কের ভেতর থেকে, আবার সে মানুষ হবে। যে পাপ আজ তাকে ঘিরে ধরেছে, তাকেও সে জয় করবে। এখনও সময় আছে, সময় যায় নি—জীবনের ব্যর্থ বাসনারাশিকে পুনরুজ্জীবিত করে সে স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে। অর্গ্যানের স্নিগ্ধগম্ভীর সুর তার জীবনে এক ক্রান্তির সৃষ্টি করেছে। কালই সে নীচের ঐ কর্ম্মচঞ্চল পল্লীতে গিয়ে কাজ খুঁজে নেবে। এক পশমের আড়তদার একবার তাকে ড্রাইভারের কাজ দিতে চেয়েছিল—সোপী কাল তাকে খুঁজে বার করে চাকরিটা চেয়ে নেবে। এ জগতে সেও আবার একজন মানুষ বলে গণ্য হবে, সে—

সোপী নিজের বাহুর উপর হাতের স্পর্শ পেয়ে মুখ ফিরিয়েই দেখে, এক পুলিস।

'এখানে কি হচ্ছে?'—অফিসারটি জিজ্ঞেস করলেন।

'কিছু না'—সোপী উত্তর দেয়।

'আমার সঙ্গে চলো তা হলে!'—পুলিশ বললেন।

পরের দিন পুলিস কোর্টের বিচারে ম্যাজিষ্ট্রেট রায় দিলেন—'দ্বীপের ওপর তিন মাসের জন্য কারাবাস।'*

---

* ও' হেনরীর 'দি কপ এণ্ড দি এনথেম'-এর অনুবাদ

ভারতে ভাগ্যান্বেষী বৈদেশিক সৈনিক

অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বেগম সমরু সম্বন্ধে নানা গ্রন্থ ও বহু প্রবন্ধ দীর্ঘকাল হইতে রচিত হইলেও তাঁহার দরবারে ভাগ্যান্বেষণ-নিরত ইউরোপীয় সৈনিকগণ সম্বন্ধে কোন আলোচনা কেহই করেন নাই। তখনকার দিনে ভারতবর্ষের অন্যত্র যেমন সার্দ্ধানাতেও তেমনই ইউরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত বহু ভাগ্যান্বেষী সৈনিকের সমাবেশ হইয়াছিল। এমন কি এক সময়ে উত্তর ভারতে, দি বইনের পূর্ব্ববর্তী যুগে, পাশ্চাত্ত্য সমর-পদ্ধতিতে শিক্ষিত সেনাদল বলিতে সমরু-গঠিত বাহিনীকেই বুঝাইত। সেইজন্যই জর্জ্জ টমাস দক্ষিণ ভারতে ইংরেজ রণপোত পরিত্যাগ করিয়া সহস্রাধিক মাইল পথ অতিক্রম পূর্ব্বক ভাগ্যান্বেষণ করিতে সার্দ্ধানা দরবারে বেগম সমরুর সন্নিকটে উপস্থিত হন।

বেগমের ইউরোপীয় বা ইউরেশীয় সৈনিকবৃন্দ সম্বন্ধে সবিশেষ জানা যায় না। সার্দ্ধানা, ঝাড়সা, টপ্পল প্রভৃতি যে সকল স্থানে বেগমের ছাউনি ছিল তথায় পুরাতন পরিত্যক্ত সমাধিক্ষেত্রসমূহে খ্রীষ্টান সৈনিকগণের অস্তিত্বের নিদর্শন কয়েকটি পুরাতন জীর্ণ কবরমাত্র দেখা যায়। কালের প্রভাবে এবং সংস্কারের অভাবে আজ তাহাদের নিতান্ত শোচনীয় দশা। কয়েকটি ক্ষেত্রে সমাধিগাত্র হইতে স্মারকলিপি পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হইয়াছে; সুতরাং সমাহিত ব্যক্তির কোন পরিচয়প্রাপ্তি সম্ভব নহে। যেগুলির অঙ্গে বর্ত্তমান লিপি আছে তাহা হইতেও শুধু মৃতের নাম এবং মৃত্যুর তারিখটুকু ব্যতীত আর কিছুই জানার উপায় নাই।

যাহা হউক, বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিভিন্ন সূত্র হইতে সংগৃহীত, বেগম সমরুর ইউরোপীয় ও ইউরেশীয়, সামরিক এবং অসামরিক কয়েক জন কর্ম্মচারীর পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

প্রথম—কর্নেল পাওলী, ইনি জাতিতে জার্ম্মান ছিলেন। ইঁহার প্রথম জীবন সম্বন্ধে কোন কথা জানা নাই। সমরুর মৃত্যুর (৪।৫।১৭৭৮) পর মোগল সাম্রাজ্যের উজীর মীর্জ্জা নজফ খাঁ তাঁহাকে সমরুর নাবালক প্রধান পুত্র (লুই ব্যালথাজার রাইনহার্ড) প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্য্যন্ত সার্দ্ধানা বাহিনীর অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ইহার কারণ তিনিও সমরুর মত জাতিতে জার্ম্মান ছিলেন; কিন্তু সেকথা সত্য বলিয়া মনে হয় না। চারি বৎসর পরে মীর্জ্জার দেহান্ত হইলে (১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ) তদীয় শূন্য পদের অধিকার লইয়া তাঁহার দত্তক-পুত্র আফ্রাসিয়াব খাঁ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র মীর্জ্জা সফি খাঁর মধ্যে বিরোধ বাধে। আফ্রাসিয়াবই প্রথমটায় উজীরী লাভ করে। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মীর্জ্জা সফি অসন্তুষ্ট আমীরগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র শাহজাদা জীবন বখত উহাদেরকবল হইতে সম্রাটকে মুক্তিদানের এবং বিশৃঙ্খলা প্রশমনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সফিকে ধৃত করিয়া বন্দী করার জন্য গোপন ষড়যন্ত্র ও প্রচেষ্টা চলিতে লাগিল। এই সংবাদ জানিতে পারিয়া তিনি একদিন রাজধানী হইতে সহসা অন্তর্হিত হইয়া যান এবং এক দল সৈন্য সংগ্রহান্তে দিল্লী অভিমুখে অভিযান করেন। এই সঙ্গে পথিমধ্য হইতে দূত পাঠাইয়া বাদশাহের নিকট নিজের উজীরী দাবি করিলেন। তাঁহার সসৈন্য আগমনের সংবাদে শাহ আলমের আতঙ্কের অবধি রহিল না। বৃথাই শাহজাদা তাঁহাকে রণজয়ের আশ্বাস দিলেন; বৃথাই পাওলী তাঁহাকে স্বীয় শিক্ষিত সিপাহী সৈন্যবলে বলীয়ান করিয়া বিদ্রোহীগণকে পর্য্যুদস্ত করিয়া দিবেন বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি কাহারও কোন যুক্তিতেই কর্ণপাত করিলেন না। পাওলীকে বিদ্রোহীদের সহিত সন্ধিস্থাপনের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। পাওলী তখন কি আর করিবেন? তিনি সম্রাটের জায়গীরদার বেগমের আজ্ঞাবহ পরিচারকমাত্র। যাহা হউক, পাওলী যখন আলাপ-আলোচনান্তে বিদ্রোহী-শিবির হইতে সদলে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে গোপনে লুক্কায়িত একদল শত্রুসেনা তাঁহাকে অতর্কিতে আক্রমণ করে। তাঁহার দেহরক্ষীদল পর্য্যুদস্ত হইয়া পলায়ন করিলে বিদ্রোহীরা "অমানুষিক যন্ত্রণাসহকারে" পাওলীর প্রাণবধ করেন।

দ্বিতীয়—কাপ্তেন লে মার্শা তার স্থলে সেনাপতিত্ব লাভ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে সকল কথাই অজ্ঞাত। ৩রা মার্চ্চ, ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিচেরী হইতে ফরাসী সেনাপতি মার্কুইস দি বুসী স্বদেশে সমরসচিব মার্শাল দি কাস্ত্রিয়ে (Castries)-কে ভারতবর্ষের সমসাময়িক রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে অন্যান্য নানা কথার মধ্যে তিনি লিখেন,"পরলোকগত সোম্বের কোরে ৪০০০ সিপাহী এবং ৮২ জন ইউরোপীয় আছে বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। সমরুর বিধবার সৈনিকগণের অবস্থা এখন অত্যন্তই শোচনীয়। পরগণা (?) বেগম নাম্নী এই মহিলা আগ্রার সন্নিকটে আকবরাবাদে বাস করেন। মৃত স্বামীর বাহিনীর তিনি আধিপত্য লাভ করিয়াছেন। পাওলী উহাদের পরিচালনাভার পাইয়াছিলেন; কিন্তু রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রমধ্যে তিনি নিজেকে জটিলভাবে জড়িত করিয়া ফেলায় তাঁহাকে প্রাণ হারাইতে হইয়াছে। তাহার পর হইতে মাসিয় লে মার্শা ঐ দলের অধ্যক্ষতা করিতেছেন। সোম্বের বিধবাকে প্রভূত ধনসম্পত্তিশালিনী বিবেচনা করিয়া পণ্ডিচেরির গবর্ণর ম্যাসিয় মন্তিনী বিবাহ করিয়া তাঁহার সেনাদলের কর্ত্তৃত্বলাভে সমুৎসুক হইয়াছিলেন; কিন্তু পাওলীর হত্যাকাণ্ডের এবং বেগমের সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হওয়ার সংবাদপ্রাপ্তিতে তিনি সে চিন্তা মন হইতে বিসর্জ্জন দিয়াছেন।"*

---

* *Cataolgue des Manuscripts des . . . L'Inde Francaise*, I, p. 153.

১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে দি বইনের প্রথম ব্রিগেডে মাসিক ৩০০৲ টাকা বেতনে একজন কাপ্তেন লে মার্শাকে দেখা যায়। ঐ ব্যক্তি দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ উভয় ব্যক্তি অভিন্ন। সিন্ধিয়ার প্রশস্ততর কর্ম্মক্ষেত্রে অধিকতর সম্মান এবং অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখিয়া লে মার্শা বেগমের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পেরঁ তাঁহাকে দিল্লীর শহর-কোতোয়ালের পদ প্রদান করেন। পর বৎসর নবেম্বর মাসে মৃত্যুকালেও তিনি উক্ত দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার দেহান্তের পর তাঁহার বিধবা পত্নী তদীয় শূন্যপদ এবং সৈন্যগণের নেতৃত্বভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পেরঁ অপর এক জনকে উক্ত পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলে মাদাম তাঁহার হস্তে অধ্যক্ষতা ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হইলেন। উঁহাকে নানা ভাবে বুঝাইয়া কোন-মতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে না পারিয়া পেরঁ পরিশেষে কাপ্তেন এমিলিয়স ফেলিক্স স্মিথকে একদল সৈন্যসহ তাঁহার বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দেন। উক্ত কাপ্তেন প্রথম দিকে কিছুই সুরাহা করিয়া উঠিতে পারেন নাই; দীর্ঘ চারি মাস অবরোধের পর মাদাম উপায়ান্তরাভাবে অবশেষে বশ্যতা স্বীকার করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার পদে তাঁহার বিধবার বিনিয়োগ ভারতবর্ষের ইতিহাসে নূতন নহে, বেগম সমরুর দৃষ্টান্তই ত মাদাম লে মার্শার সমক্ষেই বিদ্যমান ছিল। মাদাম মেকুনেজ এবং আইভনের ইহারই অনুরূপ কাহিনীর উল্লেখ প্রবন্ধান্তরে করাও হইয়াছে।

তৃতীয়—ইহার পর কর্নেল রোহান এই ব্রিগেডটির অধ্যক্ষতা লাভ করেন। ইতিহাসে ইনি ভ্রমক্রমে 'Baours' অথবা 'Bahors' নামে অভিহিত হইয়া আসিয়াছেন। মেজর বাওয়ার্স জাতিতে ফরাসী, বেগম সমরুর বাহিনীতে তাঁহার যোদ্ধজীবনের আরম্ভ। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে পাওলীর নিধনের পর তিনি প্রথম এই দলের নেতৃত্ব লাভ করেন। কিন্তু দি বইন যখন তাঁহার প্রথম ব্রিগেড গঠন করেন, তখন বাওয়ার্স হৃষ্টচিত্তে সিন্ধিয়ার অধীনে এক ব্যাটালিয়ন সৈনিকের পরিচালনভার পাইয়া বেগমের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। খুব শীঘ্রই তাঁহার কর্ম্মজীবনের অবসান ঘটিয়া যায়, যেহেতু ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে পাটন-যুদ্ধে তিনি নিহত হইয়াছিলেন।" কমটনের এই কথাগুলির মধ্যে অনেকগুলি মারাত্মক ভুল রহিয়া গিয়াছে! ইঁহার প্রকৃত নাম বাওয়ার্স নহে; পাওলীর পরেই ইনি সেনাপতিত্ব লাভ করেন নাই; পাটন-যুদ্ধে ইঁহার মৃত্যু ঘটে নাই! মেরতা যুদ্ধে (১০।৯।১৭৯০) উরুদেশে বন্দুকের গুলির আঘাত পাইয়া সপ্তাহকাল নিদারুণ যন্ত্রণাভোগান্তে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। মেরতায় তাঁহার কবর আজিও দেখা যায়। যুদ্ধক্ষেত্রের অদূরে একটি পুষ্করিণীর পাড়ে অবস্থিত কবরটির আজ জীর্ণ দশা। মেরতা-যুদ্ধ প্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বে কর্নেল রোহানের কথা বলা হইয়াছে। ঐ যুদ্ধে তিনি দি বইনের বাহিনীর বাম প্রান্ত পরিচালনার ভার প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে দল ছাড়িয়া স্বীয় ব্যাটালিয়নসহ হঠকারী ভাবে কিছু-দূর অগ্রসর হইয়া পড়েন। তাঁহার এই হঠকারিতার ফলে ব্যূহমধ্যে যে রন্ধ্রপথের সৃষ্টি হয় সেই ছিদ্রপথে বারংবার আক্রমণপূর্ব্বক রাঠোর অশ্বারোহী সেনা মরাঠাদের একেবারে পর্য্যুদস্ত করিয়া ফেলে। শুধু দি বইনের শিক্ষিত পদাতিকগণের জন্যই সেবারকার যুদ্ধজয় সম্ভবপর হইয়াছিল। মেজর লুই স্মিথ দি বইনের শিবির হইতে ১৩।৯।১৭৯০ তারিখে কলিকাতার একটি সংবাদপত্রে মেরতা যুদ্ধ সম্বন্ধে একটি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে Rohan স্থলে ভ্রমক্রমে 'Bahors' মুদ্রিত হওয়াতে এই ভুল অতঃপর চলিয়া আসিতেছিল। উক্ত পত্রে Bahors-এর উরুদেশে আহত হইয়া প্রাণত্যাগের কথা লিখিত হইয়াছে।

চতুর্থ—অতঃপর কাপ্তেন এভান্স বা এভেন্স ঐ অধ্যক্ষতা পদ লাভ করেন। স্মিথ ইঁহাকে ফরাসী বলিয়া উল্লেখ করিলেও এভান্স নামটি কিন্তু ইংরেজী নাম। ইনিও অচিরে সিন্ধিয়ার কর্ম্মে প্রবেশ করেন এবং কালক্রমে মাসিক ৪০০৲ টাকা বেতনে কাপ্তেন পদে উন্নীত হন।

কর্নেল স্কিনার বলিয়াছেন যে, সুণ্ডার যুদ্ধে কর্নেল উইলিয়ম হেনরী টোনের সহিত এভান্স নামক একজন সৈনিকও বন্দী হইয়া-ছিলেন। উঁহারা দুই জনেই পরে হোলকারের কর্ম্মে প্রবেশ করেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে মরাঠাদিগের সহিত সংগ্রামকালে ওয়েলেসলীর ঘোষণাপত্রের সুযোগে যে সকল ব্রিটিশ জাতীয় সৈনিক মরাঠাপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজ সরকারের আশ্রয় লইয়াছিল, স্মিথ প্রদত্ত তাহাদের নামের তালিকা মধ্যে একজন কাপ্তেন এভান্সের নামও দেখিতে পাওয়া যায়। কোম্পানী তাঁহাকে মাসিক ৪০০৲ টাকা পেন্সন দিয়াছিলেন। এই তিন এভান্স বিভিন্ন অথবা অভিন্ন সে বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় করা সম্ভব নহে। তবে মেজর স্মিথ সিন্ধিয়ার সৈনিকগণের কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু টোন এবং এভান্স হোলকারের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁদের পক্ষে স্বল্পদিন পরেই পুনরায় প্রভু পরিবর্ত্তন করা কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল না। তদ্‌ভিন্ন আরও একটা কথা এই যে, ১৭৯০ সালে যে ব্যক্তি সার্দ্ধানায় সৈন্যাধ্যক্ষ ছিল, দীর্ঘ ত্রয়োদশ বর্ষ পরে তাহার মাসিক ৪০০৲ টাকা বেতনভোগী কাপ্তেন পদে অধিষ্ঠিত থাকাও ত সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং তিন জন বিভিন্ন এভান্স নামধারীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা খুবই চলিতে পারে।

পঞ্চম—পরবর্ত্তী সেনানায়ক শ্যেভালিয়ে শান দি দুদ্রেনেক ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে বেগমের কর্ম্মে প্রবেশ করেন, ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সৈন্যা-ধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং দুই বৎসর পরে মাসিক ৩০০০৲ টাকা বেতনে যশোবন্তরাও হোলকারের জন্য শিক্ষিত সৈন্যদল গঠনের ভারপ্রাপ্ত হইয়া তথায় গমন করেন।

ষষ্ঠ—ইঁহার পরবর্ত্তী সেনাপতি জর্জ্জ টমাস ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বেগমের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এক মতে দুদ্রেনেকের পর লেজোয়া (Liegeois বা Legois) নামক একজন ওয়ালুন অর্থাৎ আধুনিক বেলজিয়ম দেশের অধিবাসী সৈনিক সেনাপতিত্ব লাভ করেন কিন্তু

সাময়িক কৃতিত্বের জন্য বেগম তাঁহার পরিবর্তে টমাসকে অল্পদিন মধ্যেই উক্ত পদক প্রদান করিয়াছিলেন। এ কথা কিন্তু সত্য বলিয়া মনে হয় না, কারণ অখ্যাতনামা লেজোয়ার স্থলে বেগমের তদানীন্তন প্রীতিপাত্র কর্ম্মঠ নিপুণ সৈনিক টমাসেরই অধ্যক্ষতা লাভ অধিকতর সম্ভাব্য। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে টমাস বেগমের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়াই ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে টমাস বেগমের কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন।*

সপ্তম—লিয়েজোয়ার কথা এইখানে একটু বলা ভাল। উহার প্রকৃত নাম সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অনেকে বলেন ঐ ব্যক্তি লিয়েজ নগরের অধিবাসী ছিল। যে-কোন কারণেই হউক, এ দেশে স্বীয় নাম গোপন-কালে সে ঐ ছদ্মনাম ধারণ করিয়াছিল, এ কথা কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারি না। বেগম এবং লেভাসুলতের বিরুদ্ধে লিয়েজোয়া অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিল এবং বেগমের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর জাফর ইয়ার খাঁর সহিত সেও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। অপরাপর বিদ্রোহী সৈনিকগণের মত তাহাকে মার্জ্জনা করা হয় নাই। কারাগারে বিষপ্রয়োগে তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল। মীরাট অঞ্চলে তাহার বংশধরগণকে আজিও দেখা যায়। উচ্চারণগত পরিবর্ত্তনে তাহাদের নাম আজ 'Lez-wah-য়' দাঁড়াইয়াছে। উহাদিগকে আজ ইউরোপীয়, এমন কি ইউরেশীয় বলিয়াও চেনা দুষ্কর।

অষ্টম—কর্নেল লেভাসুলৎ আনুমানিক ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে বেগমের কর্ম্মে প্রবিষ্ট হন। তিনি প্রথমে গোলন্দাজদলের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং ঐ বিভাগের অনেকটা উন্নতিসাধনও করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। টমাসের প্রস্থানের পর তিনি দলের অধ্যক্ষতা লাভ করেন এবং তাহার প্রায় ছয় মাস পরে বেগমের সহিত তাঁহার পরিণয়ক্রিয়া গোপনে সম্পন্ন হইয়াছিল (১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ)। ইঁহার সম্বন্ধে সকল কথাই ইতিপূর্ব্বে বেগম-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

সান্ধানার ক্যাথলিক সমাধিভূমে লেভাসুলতের কবর বর্ত্তমান আছে। সমাধিক্ষেত্রের ঠিক মধ্যস্থলে নাতি-উচ্চ একটি চবুতারা এবং তাহার উপরে মনোরম জালির কাজ করা একটি মর্ম্মর আস্তরণ—ইহাই হইল এই বৈদেশিক ভাগ্যান্বেষী সৈনিকের শেষ বিশ্রামাগার! কালধর্ম্মে সমাধিলিপিটি বিলুপ্তপ্রায়; মাত্র এইটুকুই কোনমতে পড়িতে পারা যায়: "priez pour son ame; requiescat in pacem; 18th October 1795"। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে এইচ. জি. কীন, এতদতিরিক্ত "age de 47 ans" এই কথা কয়টি দেখিয়াছিলেন। ফাদার নটি প্রণীত 'Das Furstenttum Sardhana' (1906) গ্রন্থে সম্পূর্ণ বিভিন্ন একটি পাঠ প্রদত্ত হইয়াছে। "Ci-Git N. Le Vassoult, age de 42 ans, Priez Dieu pour son ame"। পাঠান্তরের কারণ কি বলিতে পারি না।

সান্ধানার বিদ্রোহ জুন মাসে ঘটিয়াছিল, লেভাসুলতের মৃত্যু সেই সময়েরই ঘটনা। অক্টোবর মাসের প্রদত্ত তারিখ স্মারক-লিপি প্রতিষ্ঠার সময় বলিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, সে কথা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি। লেভাসুলতের যে ভাবে মৃত্যু ঘটিয়াছিল, তাহার জন্য তিনি আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারেন, কিন্তু জীবদ্দশায় তিনি ইহার উপযুক্ত পাত্র ছিলেন কি না সন্দেহের বিষয়। সান্ধানা বাহিনীতে তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

নবম—পরবর্ত্তী সৈন্যাধ্যক্ষ কর্নেল জা রেমী সাল্যুর ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের অন্তর্গত নান্সী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোন্ সময় এ দেশে আসিয়াছিলেন সে কথা জানা যায় না, তবে তাঁহার ভাগ্যান্বেষী জীবন সান্ধানা বাহিনীতেই অতিবাহিত হইয়াছিল এবং তিনি এখানকার সৈন্যদল গঠনকাল হইতেই উহার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। লেভাসুলতের সহিত বেগমের গুপ্ত বিবাহে তিনি এবং মেজর বার্নিয়ে এই দুই জন সাক্ষী ছিলেন। বিদ্রোহ-ব্যাপারে তিনি কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই, বরং সহকর্ম্মী-গণকে উক্ত কার্য্য হইতে বুঝাইয়া প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার সবিশেষ চেষ্টার ফলে পরিশেষে জর্জ্জ টমাসের দ্বারা বেগমের উদ্ধারসাধন ঘটিয়াছিল। বিদ্রোহী ইউরোপীয় সৈনিকগণ বেগমের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইয়া এই সময় যে অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দিয়াছিল তিনিই তাহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। স্বাক্ষরকারিগণের মধ্যে একমাত্র তিনিই নিজের পুরা নাম লিখিতে সমর্থ ছিলেন, অপর সকলেই ঢেরাসহি (×) দিয়াছিল। বেগমের অফিসারগণ কোন স্তরের জীব ইহা হইতেই সে কথা সম্যক রূপে বুঝা যাইবে! সাল্যুর আট বৎসর কাল (১৭৯৬-১৮০৪) সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। এই সময় ঐ দলে ছয় ব্যাটালিয়নে মোট ৪০০০ সিপাহী, ২০০ সওয়ার পর্ণ্টন এবং ৪০টি কামান ছিল।

উজ্জয়িনী-যুদ্ধে (২।৭।১৮০১) সিন্ধিয়ার পরাজয়ের পর তাঁহার আদেশানুসারে বেগম সাম্রাজ্যের জায়গীরদাররূপে নিজ বাহিনী তাঁহার সাহায্যকল্পে দাক্ষিণাত্যে পাঠাইতে বাধ্য হন। একটি ব্যাটালিয়ন শুধু জায়গীর রক্ষাকার্য্যে নিরত রহিল, বাকীগুলি লইয়া সাল্যুর সিন্ধিয়ার সাহায্যার্থে গমন করিলেন। বেগমের সিপাহী-গণের কোন দিনই যুদ্ধ করা অভ্যাস ছিল না। উহারা যে সারাপথ দারুণ অসন্তোষের সহিত বিদ্রোহোন্মুখ অবস্থায় যাত্রা করিয়াছিল, সে কথা বেগমকে লিখিত সৈন্যাধ্যক্ষের পত্র হইতে জানা যায়। বিখ্যাত আসাইয়ের রণভূমে (২৩।৯।১৮০৩) বেগমের এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য ভাবী ডিউক অফ ওয়েলিংটনের হস্তে বিধ্বস্ত হইয়া যায়; অপর চারি দল যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাদ্দেশে শিবির রক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত থাকায় সম্পূর্ণরূপেই রক্ষা পাইয়াছিল। এ বিষয়ে কর্নেল স্কিনার বলেন, "বেগমের সৈনিকগণের সম্বন্ধে ইহা অত্যন্ত প্রশংসার কথা যে, আসাইয়ের রণক্ষেত্র হইতে সিন্ধিয়ার বাহিনীর যে অংশ অটুট অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা শুধু তাঁহার চারি অথবা পাঁচটি ব্যাটালিয়ন মাত্র। সংগ্রামের

* *Military Memoirs of George Thomas*, p. 3.

প্রায় শেষের দিকে ব্রিটিশ অশ্বারোহী সেনা উহাদের প্রবল আক্রমণ করিয়াও কিছু করিতে পারে নাই, বরঞ্চ উহাদেরই নায়ক কর্নেল ম্যাক্সওয়েল ইহাদের গোলার আঘাতে নিহত হইয়াছিলেন।*

আসাইয়ের যুদ্ধের পূর্ব্বেই সুচতুর বেগম অবস্থা দেখিয়া এবং আসন্ন সময়ে মরাঠাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া গোপনে ইংরেজ পক্ষ অবলম্বন করিলেন এবং ব্রিটিশ প্রধান সেনাপতি লর্ড লেকের নির্দ্দেশমত সালারকে সিন্ধিয়ার বাহিনী পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজ সেনাদলে যোগ দিবার জন্য পুনঃপুনঃ আদেশ পাঠাইলেন। কিন্তু সে সময় উহার পক্ষে তদনুসারে কার্য্য করা সম্ভবপর ছিল না। বুরহানপুরে মরাঠা-শিবির পরিত্যাগ করিয়া সাল্যর ১৪ই অক্টোবর তারিখে হিন্দুস্থান অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন এবং ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি দীগে আসিয়া পৌঁছেন। অতঃপর সেখান হইতে কনৌজে ইংরেজ সেনাপতি কর্নেল বলের নিকট গমন করেন। পর বৎসরের ৩১শে মে পর্য্যন্ত বেগমের সৈনিকগণ ইংরেজ সরকারের কর্ম্মে নিরত থাকে; সে সময়ের যাবতীয় ব্যয়ভার উঁহারাই বহন করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বে ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৮০৪ তারিখে কর্নেল সাল্যর শারীরিক অসুস্থতার জন্য নেতৃত্ব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সুদীর্ঘ সপ্তাশীতি বৎসর বয়সে ১২।৭। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। সার্দ্ধানার সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার কবর আজিও বিদ্যমান।

একাদশ—জুন মাসে পরবর্ত্তী সেনানায়ক কর্নেল লুই ক্ল্যদ পীথো (Peethod) সৈনিকগণকে লইয়া সার্দ্ধানায় ফিরিয়া আসিলেন। ইনিও জাতিতে ফরাসী ছিলেন। ১৩ই জানুয়ারী ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ৭৮ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। সার্দ্ধানায় তাঁহার সমাধি দেখা যায়। বিধবা মাদাম পীথোকে বেগম একটি বৃত্তি দিয়াছিলেন।

দ্বাদশ—পরবর্ত্তী সেনাপতি কর্নেল পের্তঁ সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা নাই। ইনিও জাতিতে ফরাসী। ১৮১০ সনে মিসেস ডীন নাম্নী জনৈক ইংরেজ মহিলা সার্দ্ধানায় বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীতে বেগমের সৈন্যদল সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—"বেগমের সৈন্যাধ্যক্ষ কর্নেল তাঁর জায়গীর মধ্যে আমাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। তিনি জাতিতে ফরাসী, নাম পের্তঁ; —এক জন প্রবীণ সম্মানার্হ ব্যক্তি, দীর্ঘদিন হইতে বেগমের দরবারে আছেন। সৈনিকগণের জন্য বেগমের যথাবিধি ক্যান্টনমেণ্ট এবং কেল্লা আছে। দুর্গের ভিতর অনেকগুলি ভাল ভাল বাড়ী আছে; অফিসারগণ এবং তাহাদের পরিজনবর্গ ঐগুলিতে বাস করে। সিপাহীগণ দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ-গঠন, অপেক্ষাকৃত স্বল্প কৃষ্ণবর্ণ, বক্রনাসা এবং সুগঠিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত। উহারা প্রধানতঃ রাজপুতজাতীয়। তাহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামরিক গুণযুক্ত হয়, কিন্তু অত্যন্ত দাম্ভিক, অহিফেনসেবী এবং অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত অশিষ্ট। তাহাদের পরিচ্ছদ ঘন নীলবর্ণের স্থূল বস্ত্র নির্ম্মিত, পায়ের নিম্নাংশ অবধি লম্বা। উষ্ণীষ এবং শিরস্ত্রাণ রক্তবর্ণ। বেগমের তোপখানার অবস্থা ভাল বলিয়াই মনে হইল। অনেকগুলি কামান প্রাসাদের প্রবেশ-পথের সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সজ্জিত রহিয়াছে।*

ত্রয়োদশ—পরবর্ত্তী সেনাধ্যক্ষ কর্নেল জাঁ রেমী সাবিয়া সম্বন্ধে কোন কথা জানা যায় নাই।

চতুর্দ্দশ—বেগমের শেষ সেনাধ্যক্ষ মেজর এণ্টনিও রেঘেলিনী জাতিতে ইটালীয়ান এবং পাডুয়াপ্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। কখন এবং কি সূত্রে তিনি এদেশে আসেন সেকথা জানা নাই। ৯ই মে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেগমের কার্য্যে যোগদান করেন। বেগমের মৃত্যুকালে (১৮৩৬) ঐ দলে তিনি ব্যতীত আরও এগারজন ইউরোপীয় অফিসার ছিলেন, জর্জ্জ টমাসের পুত্র জন টমাস তাঁহাদের অন্যতম; সাধারণ সৈনিকগণের সংখ্যা ছিল মোট ৪৪৭৪। তন্মধ্যে পদাতিক ২৯৪৬, বেগমের দেহরক্ষী ২৬৬, অনিয়মিত সওয়ার পল্টন ২৫৫ এবং গোলন্দাজ দলে ১০০৭ জন ছিল। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট বেগমের মৃত্যুর পর তাঁহার সৈনিকগণকে নিজেদের কার্য্যে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে তজ্জন্য যথাবিহিত আদেশ আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মীরাটের ম্যাজিষ্ট্রেট বেগমের জায়গীর কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত হইল ঘোষণা করিবার সঙ্গে সঙ্গেই উহাদের প্রাপ্য বেতনাদি মিটাইয়া দিয়া সৈন্যদলটি ভাঙ্গিয়া দেন। অফিসার এবং সৈনিকগণের মধ্যে অনেকেই অতঃপর পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের দরবারে ভাগ্যান্বেষণে গমন করেন।

সন্ধিসর্ত্তানুসারে বেগম তাঁর সৈন্যবাহিনীর অর্দ্ধাংশ কোম্পানীর নির্দ্দেশিত স্থানসমূহে তাঁহাদের কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে বাধ্য ছিলেন। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে উহারা এইমত অবস্থিত ছিল,—

		সৈন্যসংখ্যা
২য় ব্যাটালিয়ন	রাণিয়া	২২৮
	ভব্‌রাণী	১২৮
৩য় ব্যাটালিয়ন	মীরাট	২৫৯
	মজঃফরনগর	১৯৪
	সাহারাণপুর	৬২
৫ম ব্যাটালিয়ন	কর্নাল	২৫০
	গুরগাঁও (ঝাড়সা)	২৬৫
	মোট	১৫৪৬ সিপাহী

রেঘেলিনি একজন সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন। সার্দ্ধানার সুরম্য প্রাসাদ, গির্জ্জা সমস্তই তাঁহার পরিকল্পনানুসারে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বেগম তাঁহাকে অনেকটা স্নেহদৃষ্টিতে দেখিতেন বলিয়াই মনে হয়, কেননা প্রাসাদের হলঘরে অন্যান্য বহু তৈলচিত্রের সহিত রেঘেলিনির একটি চিত্রও রক্ষিত ছিল। বেগম তাঁহার উইলে উহাদের সকলকে যথেষ্ট অর্থদানও করিয়াছিলেন;—রেঘেলিনিকে ৯০০০৲, তাঁহার পত্নী ভিক্টোরিয়াকে ১১০০০৲ এবং তাঁহাদের পাঁচ পুত্রকন্যার প্রত্যেককে ৫০০০৲ টাকা করিয়া দিয়াছিলেন।

---

* *A Tour Through the Upper Provinces of Hindusthan*, p. 149.

বেগমের দেহান্তের পর এণ্টনিও আগ্রা শহরে গিয়া বাস করেন। তখনকার দিনে ঐ শহরটি ভূতপূর্ব্ব ভাগ্যান্বেষী সৈনিক-গণের কেন্দ্রস্থানীয় ছিল। তিনি যে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন তাহা ঐ বৎসরের ৮ই মে তারিখে তাঁহাকে লিখিত ডাইস-সাম্বের এক পত্র হইতে জানা যায়। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র পাস্কাল রেঘেলিনির এক পুত্র জন বাপতিস্তের চৌদ্দ বৎসর বয়সে আগ্রা শহরে মৃত্যু হইয়াছিল (৬।৩।১৮৫১)। তথাকার ক্যাথলিক সমাধিভূমে তাহার কবর বর্ত্তমান আছে। অপর একপুত্র মেজর ষ্টিফেন বেগমের সৈন্যদলভুক্ত ছিলেন এবং সিন্ধিয়ার আর্ম্মানজাতীয় সেনানী কর্নেল ডেভিড জেকবের পৌত্রী ফেরিনকে বিবাহ করিয়া-ছিলেন। আগ্রার ক্যাণ্টনমেণ্ট সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার কন্যা ফিলোসিনার কবর রহিয়াছে। (জন্ম ১৮৪৯ খ্রীঃ; মৃত্যু ৫।৭। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ)। ষ্টিফেনের পৌত্র জন মাইকেল রেঘেলিনিকে ১৯৩০ সালে আগ্রার দেওয়ানী আদালতে সেরেস্তাদার পদে কার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়াছি।

কেরোলাস মুটি ভেনেটাস

১৫।১২।১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩৪ বৎসর বয়সে সার্দ্ধানায় ইহার মৃত্যু ঘটে। এ ভিন্ন অপর কোন কথা জানা যায় না।

কাপ্তেন ম্যান্যুয়েল পেরেরা ও বালো

নাম হইতে ইহাকে পর্ত্তুগীজ অথবা গোয়ানিজ বলিয়া মনে হয়। ২৫শে ডিসেম্বর ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে অশীতিবর্ষ বয়সে সার্দ্ধানায় ইহার মৃত্যু হয়।

কাপ্তেন রোসেল

এই ব্যক্তি জাতিতে পোল। ২৫শে ডিসেম্বর ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহার জন্ম হইয়াছিল। অর্দ্ধ শতাব্দীকাল যাবৎ কোয়েন বেগমের কর্ম্মনিরত ছিল। তন্মধ্যে শেষ ৩২ বৎসর সে ভুধানার তহশীলদার পদে অধিষ্ঠিত ছিল। ১১ই সেপ্টেম্বর ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়।

মেজর গটলিয়েব কোয়েন

এই ব্যক্তি বেগমের অশ্বারোহীদলের অফিসার। কোন সময় বিদ্রোহী সৈনিকগণ কর্ত্তৃক নিহত হয়। তাহার বিধবা পত্নী এনকে বেগম একটি বৃত্তি দিয়াছিলেন। ৩রা জানুয়ারী ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে এনের মৃত্যু ঘটে। লিফিভারের কন্যা জুলিয়া আনা বা বহুবেগমকে সমরু-নন্দন লুই ব্যালথাজার (নবাব মজঃফর উদ্দৌলা জাফার আয়াব খাঁ) বিবাহ করিয়াছিল। উহাদের এলয়সিয়াস রাইনহার্ড নামে এক পুত্র এবং জুলিয়া নাম্নী এক কন্যা জন্মিয়াছিল। পুত্রটির অল্প বয়সে মৃত্যু হয় এবং বেগম সমরু জর্জ্জ আলেকজাণ্ডার ডেভিড ডাইসের সহিত কন্যাটির বিবাহ দিয়াছিলেন। ১৩ই জুন ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে জুলিয়ার মৃত্যু হয়।

কর্নেল জর্জ্জ আলেকজাণ্ডার ডেভিড ডাইস

এই ব্যক্তি লেফটেনাণ্ট ডেভিড ডাইস নামক ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জনৈক সৈনিকের দেশীয়া রমণীর গর্ভজাত পুত্র। মাত্র দুই বৎসর বয়সে ইহার পিতৃবিয়োগ হয়। অতঃপর সে কলি-কাতার মিলিটারী অর্ফানেজে লালিতপালিত হয়। বেগম সমরু তাঁহার বন্ধু সার ডেভিড অক্টারলোনিকে তাঁহার পালিতা পৌত্রীর পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি ঐ জর্জ্জকে মনোনীত করিয়াছিলেন। অতঃপর জর্জ সার্দ্ধানায় প্রেরিত হন এবং ৮।১০।১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে জুলিয়ার সহিত তাহার পরিণয়কার্য্য সমাধা হয়। কর্নেল পদবী উঁহাকে কতকটা সম্মান দেখাইবার জন্যই প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, কারণ তাহাকে বেগমের সৈন্য বিভাগের সহিত কখনও সংশ্লিষ্ট দেখা যায় না। বেগম গোড়ার দিকে জর্জকে অত্যন্ত স্নেহ এবং বিশ্বাস করিতেন, স্বীয় সুবিস্তীর্ণ জায়গীরের সমুদয় ভার তাঁহার হস্তে সমর্পণও করিয়াছিলেন, এমন কি এক সময়ে তিনি উঁহাকে স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করিবেন ইহাও স্থির করেন, কিন্তু অচিরেই জর্জ স্বভাবদোষে বেগমের বিরাগভাজন হইয়া উঠে। ৪ঠা এপ্রিল ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। ডাইস এবং জুলিয়ার ছয়টি পুত্রকন্যার মধ্যে তিনটি শৈশবেই মানবলীলা সম্বরণ করে। শুধু একটি পুত্র এবং দুইটি কন্যা প্রাপ্ত-বয়স্ক হইয়াছিল। জর্জের পরিবর্ত্তে বেগম তদীয় পুত্র ডেভিড অক্টারলোনি ডাইস-সোম্ব্রেকে তাঁহার উত্তরাধিকারী করিয়াছিলেন। কন্যা দুইটির নাম ছিল এন মেরী এবং জর্জিয়ানা।

কর্নেল জন রোজট্রুপ এবং ব্যারণ পিটার পলসারী সোলারোলী

৩রা আগষ্ট ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে এন মেরীর সহিত ট্রূপের এবং জর্জিয়ানার সহিত সোলারোলীর বিবাহ হয়। ট্রূপ এককালে কোম্পানীর সৈনিক ছিল। ব্যারণ সোলারোলী জাতিতে ইটালীয়। উত্তরকালে ঐ ব্যক্তি মাকুইস দি ব্রিয়োনা নামক গৌরবময় পদের অধিকারী হয়। বিবাহের কয়েক মাস মাত্র পূর্ব্বে উভয়ে মাসিক ৮৫০্ টাকা বেতনে বেগমের দরবারে নিযুক্ত হইয়াছিল। বিবাহ-কালে এবং পরে বেগমের চরমপত্রে উভয়ে তাঁহার নিকট হইতে বহু অর্থ লাভ করিয়াছিল। ডাইস-সোম্ব্রের বিপদের দিনে ইহারা উভয়ে তাঁহার সহিত নিতান্ত অসদ্ব্যবহার করিয়াছিল এবং তাঁহাকে উন্মাদ প্রতিপন্ন করার হীন ষড়যন্ত্রেও যোগ দেয়। ৫ই জুলাই ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ট্রূপের এবং ১৮ই মার্চ্চ ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তাহার পত্নীর মৃত্যু হয়।

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের খাদ্যশস্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

তৃণজাতীয় শস্য

(১) আউশ ধান (বোনা)—বেলে, দোআঁশ এবং এটেল মাটিতেও জন্মে ; চৈত্র-বৈশাখ মাসে বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয় ; বিঘা প্রতি ১০।১২ সের বীজ লাগে, শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফসল পাকে, বিঘা প্রতি ৫।৬ মণ ফলন হয়।

(২) আউশ ধান (রোয়া)—উপরোক্ত মাটিতে জন্মে ; বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ৬ ইঞ্চি অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়। এক বিঘার উপযুক্ত চারা উৎপাদনের জন্য ৪।৫ সের বীজ লাগে, শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফসল পাকে, বিঘা প্রতি ৫।৭ মণ ফলন পাওয়া যায়।

(৩) আমন ধান (বোনা)—দোআঁশ ও এটেল মাটিতে জন্মে, ফাল্গুন হইতে বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বীজ ছিটাইয়া বুনিতে পারা যায়। বিঘা প্রতি ৮ হইতে ১২ সের বীজের প্রয়োজন হয়, অগ্রহায়ণ হইতে মাঘ মাসের মধ্যে ফসল পাকে। বিঘা প্রতি ৭ হইতে ১০ মণ ফলন হয়।

(৪) আমন ধান (রোয়া)—উপরোক্ত মাটিতে জন্মে ; জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি হইতে আষাঢ়ের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বীজতলায় চারা উৎপাদন করিতে হয়। আষাঢ় হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত ৯ ইঞ্চি অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়, এক বিঘার উপযুক্ত চারার জন্য ৪ ৫ সের বীজ লাগে, অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসের মধ্যে ফসল পাকে, বিঘাপ্রতি ৭ হইতে ১০ মণ ফলন হয়।

(৫) ভুট্টা—জল দাঁড়ায় না, এরূপ উঁচু দোআঁশ মাটিতে জন্মে, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে এক হাত অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে এক হাত অন্তর বীজ বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ২।৩ সের বীজ লাগে, ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ফসল পাকে। বিঘা প্রতি ২।৩ মণ ফলন (দানা) পাওয়া যায়।

(৬) জোয়ার—উপরোক্ত জমি জোয়ারেরও উপযুক্ত, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ২।৩ সের বীজ লাগে, ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ফসল পাকে, বিঘা প্রতি ২।৩ মণ (দানা) ফলন হয়।

(৭) কাওন—উঁচু বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ১।১॥ সের বীজ লাগে, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ফসল পাকে, বিঘা প্রতি ২।৩ মণ ফলন পাওয়া যায়। ইহার খড় গরুকে খাওয়ান চলে।

(৮) চীনা—উপরোক্ত জমি চীনারও উপযুক্ত, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ১।১॥ সের বীজ লাগে, শ্রাবণ ভাদ্র মাসে ফসল পাকে। বিঘা প্রতি ১॥ ২ মণ ফলন হয়, ইহার খড়ও গরুকে খাওয়াইতে পারা যায়।

ডাল শস্য

(৯) অড়হর—জল দাঁড়ায় না এইরূপ উঁচু জমি দরকার, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ২॥-৩ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রতি লাইনে ২॥-৩ ফুট অন্তর বীজ বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ২।৩ সের বীজ লাগে। মাঘ-চৈত্র মাসে ফসল পাকে, বিঘা প্রতি ২।৩ মণ ফলন হয়।

(১০) মাসকলাই—বেলে দোআঁশ জমি উপযুক্ত ; শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ৪।৫ সের বীজ লাগে। কার্ত্তিকের মাঝামাঝি হইতে মাঘের শেষ পর্য্যন্ত ফসল পাকে। বিঘা প্রতি ১॥-২ মণ ফলন হয়।

(১১) বরবটী—এটেল ও দোআঁশ মাটি উপযুক্ত। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ৫।৬ সের বীজ লাগে। অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি হইতে মাঘের মাঝামাঝি ফসল পাকে। বিঘা প্রতি ২-৩॥ মণ ফলন (দানা) পাওয়া যায়।

(১২) সয়াবীন বা গাড়ী কলাই—বেলে দোআঁশ ও দোআঁশ মাটিতে জন্মে। বৈশাখের মাঝামাঝি হইতে আষাঢ়ের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ৩॥-৪ সের বীজ লাগে। কার্ত্তিকের মাঝামাঝি হইতে পৌষের মাঝামাঝি ফসল পাকে, বিঘা প্রতি ১॥-২॥ মণ ফলন হয়।

শাকসব্জী

(১৩) বেগুন—জল দাঁড়ায় না এইরূপ উঁচু দোআঁশ জমি উপযুক্ত। আশু জাতীয়ের জন্য মাঘের মাঝামাঝি হইতে চৈত্রের মাঝামাঝি এবং নাবি জাতীয়ের জন্য বৈশাখের মাঝামাঝি হইতে আষাঢ়ের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বীজতলায় চারা উৎপাদন করিতে হয়, আশু জাতীয়ের চারা চৈত্রের মাঝামাঝি হইতে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি এবং নাবি জাতীয়ের চারা আষাঢ়ের মাঝামাঝি হইতে ভাদ্রের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত তিন ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ২॥-৩ ফুট অন্তর রোপণ করিতে হয়। বিঘা প্রতি ১॥-২ ছটাক বীজ লাগে। শ্রাবণের মাঝামাঝি হইতে ফাল্গুনের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত আশু জাতীয়ের ফলন এবং আশ্বিনের মাঝামাঝি হইতে বৈশাখের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত নাবি জাতীয়ের ফলন পাওয়া যায়, বিঘা প্রতি ৩৫।৫০ মণ ফলন হয়।

(১৪) ঢেঁড়শ—দোআঁশ মাটি উপযুক্ত, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ২।৩ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ২।৩ ফুট অন্তর বীজ বুনিতে হয় ; বিঘা প্রতি ১/১॥ সের বীজ লাগে ; আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ফলন পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি ২০।২৫ মণ ফলন হয়।

(১) লাউ—দোআঁশ মাটি উপযুক্ত ; জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ৬ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয় ; বিঘা প্রতি এক পোয়া

বীজ লাগে। ৩।৪ মাস পর ফল ধরে; বিঘা প্রতি ৩৫।৪০ মণ ফলন হয়। মাচার দরকার।

(১৬) কুমড়া—দোআঁশ মাটি উপযুক্ত; ফাল্গুনের মাঝামাঝি হইতে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ৬ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি এক পোয়া বীজ লাগে; ৩।৪ মাস পরে ফল ধরে। বিঘা প্রতি ৩৫।৪০ মণ ফলন হয়। মাচার দরকার।

(১৭) চিচিঙ্গা—দোআঁশ মাটিতে জন্মে; চৈত্রের মাঝামাঝি হইতে আষাঢ়ের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ৬ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি আধ সের বীজ লাগে; শ্রাবণের মাঝামাঝি হইতে আশ্বিনের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ফলন হয়; বিঘা প্রতি ৩০।৩৫ মণ ফলন হয়। মাচার দরকার।

(১৮) চাল কুমড়া—দোআঁশ মাটি উপযুক্ত; ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ৬ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি আধ সের বীজ লাগে; ৪ মাস পরে ফল ধরে; বিঘা প্রতি ৩০।৩৫ মণ ফলন হয়।

(১৯) করলা—দোআঁশ মাটি উপযুক্ত। ফাল্গুন-জ্যৈষ্ঠ মাসে ৬ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি এক পোয়া বীজ লাগে। ৩ মাস পরে ফল ধরে। বিঘা প্রতি ৩০,৩৫ মণ ফলন হয়। মাচা করিয়া দিতে হয়।

(২০) কাঁকরোল—বেলে দোআঁশ জমি উপযুক্ত। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে কন্দ রোপণ করিতে হয়। ৩।৪ মাস পর ফল ধরে; বিঘা প্রতি ৩০,৩৫ মণ ফলন হয়। মাচার দরকার।

(২১) ঝিঙ্গা (পালা)—দোআঁশ মাটি উপযুক্ত। বৈশাখ-আষাঢ় মাসে ৪।৫ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি আধ সের বীজ লাগে। ২,৩ মাস পর ফল ধরে; বিঘা প্রতি ৩৫।৫০ মণ ফলন হয়। মাচার দরকার।

(২২) কাঁকড়ি—দোআঁশ মাটি উপযুক্ত। চৈত্র-বৈশাখ মাসে ৪।৫ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ৩।৪ ছটাক বীজ লাগে। বর্ষাকালে ফল দেয়; বিঘা প্রতি ২৫।৩৫ মণ ফলন হয়।

(২৩) সীম—বেলে দোআঁশ মাটি উপযুক্ত। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ৫।৬ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ১।-২ সের বীজ লাগে; অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ফসল ধরে। বিঘা প্রতি ৩০।৪০ মণ ফলন হয়। মাচার দরকার।

(২৪) বাকলা সীম—দোআঁশ মাটি উপযুক্ত। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ৯।১২ ইঞ্চি অন্তর বীজ বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ২ সের বীজ লাগে; তিন মাস পরে ফল ধরে; বিঘা প্রতি ৩০।৩৫ মণ ফলন হয়। মাচার দরকার।

(২৫) চুকারী—দোআঁশ মাটিতে জন্মে। চৈত্র-বৈশাখ মাসে ৪ ফুট অন্তর বীজ বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ১।১॥ সের বীজ লাগে। ৫ মাস পর ফল ধরে। বিঘা প্রতি ১৪।১৫ মণ ফলন হয়।

(২৬) মেটে আলু বা চুবড়ি আলু—বেলে দোআঁশ মাটি উপযুক্ত। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ৪।৫ ফুট অন্তর বীজআলু রোপণ করিতে হয়। বিঘা প্রতি ৩।৫ মণ বীজ লাগে। ৮।৯ মাস পরে ফলন পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি ৩৫।৫০ মণ ফলন হয়।

(২৭) মূলা—বেলে দোআঁশ জমিতে জন্মে। চৈত্র হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি তিন পোয়া হইতে এক সের বীজ লাগে। ২ মাস পর ফলন পাওয়া যায়। গাছগুলি ৬ ইঞ্চি অন্তর পাতলা করিয়া দিতে হয়। বিঘা প্রতি ৪০।৫০ মণ ফলন হয়।

(২৮) শিমুল আলু—বেলে দোআঁশ মাটি উপযুক্ত। চৈত্র-বৈশাখ মাসে ৫ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ৫ ফুট অন্তর ১ ফুট লম্বা, ১ ফুট চওড়া এবং ৫।৬ ইঞ্চি গভীর গর্ত্তে ডগা বসাইতে হয়। বিঘা প্রতি ২,০০০ ডগা লাগে। ৮।৯ মাস পরে ফলন পাওয়া যায়; বিঘা প্রতি ১০০ মণ ফলন হয়।

(২৯) কচু—বেলে দোআঁশ ও এটেল মাটি উপযুক্ত। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ১॥-২ ফুট অন্তর "মুখী" রোপণ করিতে হয়। বিঘা প্রতি ১।১২ মণ মুখা লাগে। ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক মাসের মধ্যে ফলন পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি ৬০।৭০ মণ ফলন হয়।

৩০। মানকচু—বেলে দোআঁশ মাটি উপযুক্ত; বৈশাখের মাঝামাঝি হইতে আষাঢ়ের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ২।২॥ ফুট অন্তর মূল (পোয়া বা চারা) বসাইতে হয়; পৌষ-ফাল্গুন মাসে কচু পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি ৪০।৬০ মণ ফলন হয়।

৩১। ওল—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে; জ্যৈষ্ঠ মাসে ১॥।২ হাত অন্তর "মুখা" রোপণ করিতে হয়; বিঘা প্রতি ২।৩ মণ "মুখী" লাগে; ছয় মাস পরে ওল তোলা হয়। বিঘা প্রতি ৫০।৭০ মণ ফলন হয়।

৩২। টেঁপারি—দোআঁশ মাটি উপযুক্ত। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ২ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ২ ফুট অন্তর বীজ বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ২।৩ তোলা বীজ লাগে। ৪ মাস পরে ফল ধরে।

৩৩। উচ্ছে—দোআঁশ মাটিতে জন্মে। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ৩।৪ ফুট অন্তর বীজ বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ৪।৫ ছটাক বীজ লাগে; আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ফলন পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি ৩৫।৪০ মণ ফলন হয়। মাচার দরকার।

৩৪। নানাবিধ দেশী শাক—(নটে, পুঁই, ডাঁটা, ফুলকা ইত্যাদি)। যে-কোন জমিই উপযুক্ত। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ২।৩ ছটাক বীজ লাগে; ১।১॥ মাস পরে শাক তোলা যায়।

মশলা

৩৫। হলুদ—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে; চৈত্র-বৈশাখ মাসে ১॥ হাত অন্তর লাইন করিয়া প্রতি লাইনে আধ হাত অন্তর মূল বা গেঁড় বসাইতে হয়। বিঘা প্রতি ১ মণ মূল লাগে।

অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ফলন পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি ৫।৭ মণ ফলন (শুষ্ক) হয়।

৩৬। আদা—ঐ। ফলন ২০।৩০ মণ।

৩৭। লঙ্কা—বৈশাখ-আষাঢ় মাসে ১৷-২ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ১৷-২ ফুট অন্তর চারা বসাইতে হয়। চারার জন্য বিঘা প্রতি ১।১৷ ছটাক বীজ লাগে। পৌষ-ফাল্গুন মাস হইতে ফলন পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি ৬।১০ মণ ফলন হয়।

৩৮। গোলমরিচ—নীচু সরস জমি উপযুক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসে ৩ হাত অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ৩ হাত অন্তর চারা লাগাইতে হয়। বিঘা প্রতি ৩।৪ শত "কাটিং" বা চারা লাগে। ৩।৪ বৎসর পর ফলন হয়। প্রত্যেক গাছে ১ সের গোলমরিচ পাওয়া যায়।

৩৯। পিঁপুল—বেলে দোঁয়াশ মাটিতে জন্মে। শ্রাবণ মাসে ৩ হাত অন্তর চারা লাগাইতে হয়। বিঘা প্রতি ১৫০টি চারা লাগে। পৌষ-ফাল্গুন মাসে ফলন হয়। বিঘা প্রতি ২ মণ ফলন হয়।

তৈলবীজ

৪০। চীনাবাদাম—বেলে দোআঁশ মাটি উপযুক্ত। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বিভিন্ন জাতি অনুযায়ী ২।২৷ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রতি লাইনে ২।২৷ ফুট অন্তর বীজ বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি খোসা সমেত ৬।৭ সের বীজ লাগে। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ফসল তোলা যায়। বিঘা প্রতি ফলন ৬।৭ মণ।

৪১। তিল (সাদা)—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ২।৩ সের বীজ লাগে। কার্তিক-পৌষ মাসে ফসল পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি ২।৩ মণ ফলন হয়।

ফল

৪২। কলা—উঁচু দোআঁশ মাটি উপযুক্ত। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে তেউড় ১৷ ফুট চওড়া এবং ১৷ ফুট গর্তে ৮ হাত অন্তর লাগাইতে হয়। বিঘা প্রতি ১০০ তেউড় লাগে। তেউড় বসাইবার ১০।১২ মাস পরে ফলন হয়। "সবরী" ও "চিনিচম্পা" সর্বোৎকৃষ্ট।

৪৩। আনারস—বেলে দোআঁশ ও এঁটেল মাটি উপযুক্ত। আষাঢ়-আশ্বিন মাসে ১৷-২ হাত অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ১৷ হাত অন্তর তেউড় লাগাইতে হয়। ১৮ মাস পরে ফলন হয়।

৪৪। পেঁপে—উঁচু দোআঁশ জমিতে জন্মে। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে বীজতলায় বীজ বুনিতে হয়। চারাগুলির যখন ৩।৪টি পাতা হয় তখন উহাদিগকে নাড়িয়া ৭।৮ ফুট অন্তর রোপণ করিতে হয়। বিঘা প্রতি ২ তোলা বীজ লাগে। ৮।১০ মাস পর ফল ধরে।

৪৫। শসা—বেলে দোআঁশ মাটি উপযুক্ত। চৈত্র-বৈশাখ মাসে ৫।৬ ফুট অন্তর বীজ বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ২।৩ তোলা বীজ লাগে। ৩ মাস পরে ফলন পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি ৩৫।৪০ মণ ফলন হয়।

পশুখাদ্য

(ইহার ব্যবস্থা করাও একান্ত দরকার)

১। ভুট্টা—বেলে দোআঁশ ও এঁটেল মাটি উপযুক্ত। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ৩০।৪০ সের বীজ লাগে। ২৷-৩ মাস পর কাটিয়া গরুকে খাওয়াইতে হয়। বিঘা প্রতি ১০০ মণ কাঁচা ঘাস পাওয়া যায়।

২। জোয়ার—বেলে দোআঁশ ও এঁটেল মাটিতে জন্মে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ৮।১০ সের বীজ লাগে। ২৷।৩ মাস পর কাটিয়া গরুকে খাওয়ান চলে, বিঘা প্রতি ১০০ মণ ফলন হয়। অনাবৃষ্টিতে আক্রান্ত বা "মরকুটে" শস্য গরুকে খাওয়ানো উচিত নয়, উহাতে বিষাক্ত পদার্থ থাকে।

৩। বরবটি—বেলে দোআঁশ ও এঁটেল মাটি উপযুক্ত। ফাল্গুন হইতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ৬।৭ সের বীজ লাগে। ২।২৷ মাস পর কাটিয়া গরুকে খাওয়ানো যায়। বিঘা প্রতি ৩৫।৫০ মণ কাঁচা শস্য পাওয়া যায়। ইহা ভুট্টা ও জোয়ারের সঙ্গে মিশাইয়া বোনা যাইতে পারে।

৪। বাজরা—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ২।৩ সের বীজ লাগে। ১৷-২ মাস পর কাটিয়া গরুকে খাওয়ানো যায়। বিঘা প্রতি ৬০।৭০ মণ কাঁচা ঘাস পাওয়া যায়।

৫। মাসকলাই—বেলে দোআঁশ মাটি উপযুক্ত। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ৪।৫ সের বীজ লাগে। ১৷-২ মাস পর কাটিয়া গরুকে খাওয়ানো চলে। বিঘা প্রতি ৩৫।৫০ মণ ফলন হয়।

উপরে যাহা বলা হইল, খুবই সংক্ষিপ্ত ও মোটামুটি ভাবে বলা হইল। স্থানীয় মাটি, জলবায়ুর অবস্থা প্রভৃতি অনুযায়ী বীজ বোনা, বীজের হার, ফলন প্রভৃতির তারতম্য হইবে।

ভূরশুট রাজবংশ : রায়বাঘিনী ও কালাপাহাড়

শ্রীপঞ্চানন রায়, কাব্যতীর্থ

স্বাধীনতা-লাভের পর দেশের প্রকৃত ইতিহাস সঙ্কলনের যে প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, মোগল আমলের পশ্চিম বাংলার প্রখ্যাত ভূরশুট রাজবংশ সম্পর্কে তাহার ব্যতিক্রম দেখিতেছি। জনশ্রুতি ঐতিহাসিক উপাদান সংযোগে প্রমাণিত হইলেই প্রকৃত ইতিহাসের রূপ পায়, কিন্তু অধিকসংখ্যক লেখকই এই রাজবংশ সম্পর্কে জনশ্রুতিকে প্রাধান্য দিতেছেন। এইরূপে ঐ রাজবংশের ইতিহাস দুইটি ধারায় লিখিত হইতেছে—একটি জনশ্রুতিমূলক, অপরটি তথ্যমূলক। প্রথমটির প্রধান ও আদি লেখক ৺বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য—তাঁহার "বঙ্গবীরাঙ্গনা রায়বাঘিনী" গ্রন্থখানি ১৯১৮ সনের কাছাকাছি প্রকাশিত হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উহার ভূমিকা লেখেন। বিধুবাবুর অনুবর্ত্তী লেখক—চাঁদমোহন চক্রবর্ত্তী (ভারতবর্ষে প্রকাশিত প্রবন্ধ), গোপালচন্দ্র রায় (ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক ১৩৫৭, পৃ. ৩৬২-৬৫), সুপান্থ (কিংবদন্তীর দেশে, রাণী রায়বাঘিনী, অর্দ্ধ সাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭শে চৈত্র শুক্রবার ১৩৫৯), ডাঃ কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (ভূরীশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ রাজবংশ, যুগান্তর ৫ই ভাদ্র ১৩৬১), শ্রীঅজিতকুমার ভট্টাচার্য্য রায়বাঘিনীর কথা (প্রবাসী আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৩৬১)। দ্বিতীয়টির প্রধান লেখক প্রসিদ্ধ গবেষক সুপণ্ডিত শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (কৃত্তিবাসের কুলকথা, ভারতচন্দ্র ও ভূরশুট রাজবংশ—সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, ৪৮শ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৪৮ সাল) ; ভূরশুটের ব্রাহ্মণ রাজবংশ, (প্রবাসী ভাদ্র ১৩৫৯, পৃ. ৫৩৫-৩৯) ; রায়বাঘিনী ও কালাপাহাড়, (প্রবাসী পৌষ ১৩৬১) এবং বর্ত্তমান লেখকের রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র (শ্রীভারতী ১৩৫৪ ভাদ্র) ; কবিগুরু কৃত্তিবাস (শ্রীভারতী ১৩৫৪ আশ্বিন) ; কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান ('বর্ত্তমান' ১৩৫৭ মাঘ) ও সম্বন্ধনির্ণয় ষষ্ঠ পরিশিষ্ট (পৃ. ২৭)।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক দীনেশবাবু ও আমি নানা প্রামাণ্য তথ্যসহযোগে ঐ বংশের ইতিহাসের কয়েকটি অদ্যাবধি অপ্রকাশিত অলীক বিষয় বারংবার দেখাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও পরবর্ত্তী লেখকগণ ঐ সকল বিষয়েরই অনুবর্ত্তন করিয়া ভ্রমপূর্ণ ইতিহাস লিখিতেছেন ইহাই আশ্চর্য্য। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র উক্ত বংশের প্রকৃত ইতিহাস সঙ্কলনের জন্য অধ্যবসায় সহকারে বিভিন্ন জেলার বহু সহস্র তায়দাদ, কুলগ্রন্থ ও অন্য নানা উপকরণ আজীবন অনুশীলন করিতেছেন। আর, আমি ১৯১৮ সন হইতে ঐ কার্য্যে ব্রতী হইয়া মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া, নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা জেলার নানাস্থানে ব্যাপক ভ্রমণ করিয়াছি। ঐ সম্পর্কীয় দলিল, তায়দাদ, পুথি, মন্দিরলিপি প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ এবং শ্রদ্ধেয় দীনেশবাবুর সহিত আলোচনা করিয়া বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস উদ্ধারে যত্নবান আছি।

১৯১৮ সনে কলিকাতায় ড. সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের বাটীতে আমার সহিত রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান পাঁড়ুয়াগড়-নিবাসী শ্রীবিনয়ভূষণ রায়ের আলাপ হয়। বিনয়বাবুর সহিত আলোচনায় আমরা পরস্পর জ্ঞাতি বলিয়া পরিচিত হই। আমার অনুরোধে তিনি রায়বাঘিনীর বংশলতাটি তাঁহাদের উডমণ্ট ষ্ট্রীটের দোকান হইতে দেন ও আমাদের গুরুবংশীয় আঁটপুর শাখার বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্যের ঠিকানা বলিয়া দেন। বিধুভূষণ তখন হাওড়া জেলা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। আমি ঐ স্কুলে দেখা করিলে তিনি আমাকে তাঁহার বাসায় লইয়া গিয়া একখণ্ড রায়বাঘিনী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সমালোচনার জন্য দেন। আমি তখন আদি ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে পড়িতাম। বিধুবাবু পরে এই স্কুলে আসেন। আমি তখন কলেজের ছাত্র। পাঁড়ুয়া বংশের শ্রীজিতেন রায় আমার কলেজের সহপাঠী। এই স্কুলেই আমি বিধুবাবুর নিকট হইতে পাঁড়ুয়া বংশের মূল কুড়চিনামাটি লইয়া রাখি। বিধুবাবুর দমদমের বাড়ী হইতে আমি তাঁহাদের বংশের তালিকা সংগ্রহ করি ও রায়বাঘিনী সম্বন্ধে বহুবার আলোচনা করি। ভূরশুট রাজবংশ হইতে দুইখানি গ্রাম ও দুই হাজার বিঘা নিষ্কর ভূমি প্রাপ্তির কথা বিধুবাবু বার বার বলিতেন।

বিধুবাবু রায়বাঘিনী লিখিবার প্রেরণা পাইয়াছিলেন রায়গুণাকর-বংশীয় পাঁড়ুয়ানিবাসী পূর্ব্বোক্ত বিনয়বাবুর দাদা শ্রীবিধুভূষণ রায়ের নিকট হইতে। 'প্রবাসী'তে অজিতবাবুর প্রবন্ধে এই নামটি উল্লিখিত হইয়াছে। বিধু রায় মহাশয় আত্মচেষ্টায় বিত্তশালী হইয়া পাঁড়ুয়ার পথঘাট, বিদ্যালয়, আরোগ্যশালা, চতুষ্পাঠী প্রভৃতি স্থাপনের সহিত স্বীয় বংশের ইতিহাস প্রণয়নে উদ্যোগী হইয়া, গুরুবংশীয় বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্যের দ্বারা রায়বাঘিনী রচনা করাইয়াছিলেন। গ্রন্থকার কতকগুলি ফারসী সনন্দ, দেবীপুর গুরুবংশের তাঁহার জ্ঞাতি নফর ভট্টাচার্য্যের মুখে শ্রুত গল্প, আর বসন্তপুরের রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে পাটনার উকীল অতুলকৃষ্ণ রায় মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও খেয়ালমত সংযোজিত বংশ

তার সাহায্যে ঐ গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯৪৩ সনে ভ্রমণ-কালে আমি দেবীপুরের নফর ভট্টাচার্য্যের মুখে রায়বাঘিনী-সংক্রান্ত ঐ কাহিনী শুনি।

নফর ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভূরশুট রাজবংশের সহিত বর্দ্ধমান রাজবংশের বিবাদের কাহিনী সম্পর্কে বলেন যে, ভূরশুট বংশের গড়ভবানীপুরের এক রাণী গঙ্গাস্নানে গেলে, সেখানে বর্দ্ধমানের কোন রাণীর সঙ্গে আলাপ হয়। ফলে বর্দ্ধমানের রাণী সখ্যসূত্রে ভূরশুটের রাণীকে কোন ভেট পাঠাইলে তিনি শূদ্রের দান বলিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করেন—ইহাই বিবাদের মূল। কিন্তু বিধু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট শুনি যে, বাংলার শিবাজী চেতুয়ারাজ শোভাসিংহের বিদ্রোহে ভূরশুট বংশের সহানুভূতি হেতু নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ ক্রুদ্ধ হইয়া বর্দ্ধমানরাজ কীর্ত্তিচন্দ্রকে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র ভূস্বামি-গণের রাজ্য ও নাটোররাজ রঘুনন্দনকে পূর্ব্ববঙ্গের ঐ প্রকার রাজ্য বাজেয়াপ্ত করিবার ভার দেন। এইরূপে ঐ সকল রাজ্য দখল করিয়া উক্ত দুই ভূস্বামী বঙ্গের দুই অংশে প্রধান হন। এই সূত্রে ভূরশুটও বিজিত হয়—ভূরশুটরাজ নবাবকে একটি কম্বল ও ছাগল মাত্র রাজকর দিতেন। কৌলীন্য সম্পর্কেও বিধুবাবুর মত ছিল—তান্ত্রিকগণ কুলীন, বেদজ্ঞগণ শ্রোত্রিয়। এই মত ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির দ্বারাও সমর্থিত হইয়াছে। কৌলীন্যের এই গুপ্তফল্গু ভূরশুট বংশে প্রবাহিত। ঐ অঞ্চলের বহু স্থানে রায়বাঘিনীর গল্পও আমি শুনিয়াছি। অজিতবাবুর প্রবন্ধে কয়েকটি নূতন ঐতি-হাসিক তথ্য থাকিলেও আকবর কর্ত্তৃক রায়বাঘিনীকে প্রদত্ত খড়গ পাঁড়ুয়াগড়ের বাটীতে দেখি নাই। গড়ভবানীপুরের লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দিরের দেবতারা এখন পাঁড়ুয়াগড়ের বাটীতেই আছেন। কয়েক বৎসর আগে ঐ দেবতাগণের মধ্যে কেহ একবার স্বপ্নে গড়ভবানীপুর যাইয়া তরমুজ খাইবার বাসনা করায় সেখানে তাঁহাকে নাকি লইয়া যাওয়া হয়। রায়বাঘিনী সম্পর্কে উল্লিখিত গল্প ছাড়া প্রামাণ্য উপাদান এখনও পাই নাই। একবার সংবাদপত্রে তারকেশ্বরের নিকট ভূনিয়ে রায়বাঘিনীর দুর্গ প্রভৃতি আবিষ্কারের কথা ঘোষিত হইয়া-ছিল মাত্র।

১৯৪৩ সনের ভ্রমণে গড়ভবানীপুরের ৺মণিনাথ মন্দিরের লিপির আমি এইরূপ পাঠোদ্ধার করি ঃ

শ্রীভগবতঃ বাস	শুভমস্তু শকাব্দাঃ
দেবনারায়ণ	১৩০৬॥২১ শ্রাবণ

আমার মতে বাম দিকের লিপিটি "শ্রীভগবতঃ বাসুদেব নারায়ণস্য" আর উক্ত লিপি পূর্বে কোন প্রাচীন বিষ্ণুমন্দিরে ছিল। তাঁহার লুপ্তির পরে উহা বর্ত্তমান মন্দিরে লাগানো হইয়াছে, কারণ অক্ষরগুলি প্রাচীন মনে হয়। তারকেশ্বর মাহাত্ম্যে আছে শ্যামগিরির আমলে মণিনাথ মন্দির তারকেশ্বর মঠের অধীন ছিল। ইহা সত্য হইলে, ভারামল্ল স্থাপিত তারকেশ্বর মঠ মাত্র দুই শত বৎসরের, এবং মণিনাথ মঠ তদপেক্ষাও আধুনিক। এই ভ্রমণকালে গড়ভবানীপুরের বর্ত্তমান জমিদার শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ রায়ের নিকট আমি রাজা নরনারায়ণ রায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত বলিয়া কথিত মণিনাথ মন্দিরের ১০৯২।৫ই বৈশাখের সনন্দখানি দেখিয়া একটি নকল লই। শ্রদ্ধেয় দীনেশবাবুও আমার নিকট জ্ঞাত হইয়া পরে ঐ সনন্দ দেখিয়া আসেন। তাঁহাকে দেবীপুর ও আঁটপুর গুরুবংশের কুলজীও আমিই দিই। নফর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও রাজা নরনারায়ণ কর্ত্তৃক দেবীপুর গুরুবংশকে প্রদত্ত একান্ন বিঘা ভূমিদানের একটি সনন্দের কথা আমাকে লেখেন।

১৯১৮ সনে হাওড়ার সাঁকরেল ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী ধূলাগোড়ি গ্রামে পাঁড়ুয়া বসন্তপুরনিবাসী ঘটক ৺কেদার-নাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র ৺রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত আমার পরিচয় হয়। তিনি বার্ষিক লইতে ঐ বাটীতে আসিতেন। আমাদের বংশের সহিত ভূরশুট বংশের যোগসূত্র জানাইবার জন্য আমি তাঁহাকে অনুরোধ করি এবং দীর্ঘকাল পরে নিজে প্রথমবার ১৯৩৩ সনে তাঁহার বসন্তপুর বাড়ীতে যাই, কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। এই সময়ের কিছুপূর্ব্বে মাজুতে বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন হয় ও প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব নগেন্দ্র-নাথ বসু সকলকে ভূরশুটের প্রাচীন ঐতিহ্য আর রায় গুণাকরের জন্মস্থান দর্শনের কথা বলিয়া দেন। আমিও এইবার প্রথম পাঁড়ুয়াগড় প্রভৃতি দেখিবার সুযোগ লাভ করি। পুনরায় ভ্রমণসূত্রে ১৯৩৯ সনে বসন্তপুরে চট্টো-পাধ্যায় বাটীতে গিয়া তাঁহার বৈঠকখানায় রক্ষিত ঘটক পুথির ২৬২ পৃষ্ঠায় আমার বৃদ্ধপ্রপিতামহ রাজচন্দ্র রায় ও তাঁহার ভ্রাতা বেচারাম রায়ের নাম দেখিয়া ঐ বংশলতা নকল করিয়া লই। ঐ কুলজী দীনেশবাবুকেও দিয়া-ছিলাম—তাঁহার সংগৃহীত ঢাকা পুঁথির কুলজীর সহিত ইহার অনেকাংশে মিল আছে। বসন্তপুর পুঁথির ভূরশুট রাজ-বংশ ঃ—শতানন্দঃ চতুরানন মহালেউকী কন্যাগ্রহণাদ্ ভঙ্গঃ। শতানন্দসুতৌ শ্রীমন্তরামকৃষ্ণরামৌ। শ্রীমন্ত রামসুতাঃ মহেন্দ্র রাম শ্রীবল্লভাঃ। রাম শ্রীবল্লভয়োঃ সুতাভাবঃ। মহেন্দ্রস্য সুতঃ গোপীরমণ রামঃ। সুতাঃ ভূপতি শ্যাম প্রাণবল্লভ জগজীবন নরোত্তম জনার্দ্দন মধুসূদনাঃ। ভূপতি সুতাঃ সদাশিবচাঁদ রাজবল্লভ কিশোর কন্দর্প বাণেশ্বরাঃ। সদাশিব-সুতাঃ নরেন্দ্রবংশী কাশী রসিক শুকদেবাঃ। নরেন্দ্রসুতাঃ চতুর্ভুজ অর্জ্জুন দয়ারাম ভারতচন্দ্রাঃ ইত্যাদি।—গোপীরমণ রামসুত নরোত্তমের ধারা। নরোত্তম সুতো সন্তোষ রামেশ্বরৌ। সন্তোষ সুতঃ রাধাবল্লভঃ সুত রামকৃষ্ণঃ সুতো

রাজচন্দ্র বেচারামৌ সাং মেল্যাক। সন্তোষ, রাধাবল্লভ, রাম-কৃষ্ণ, রাজচন্দ্র ও বেচারাম নামগুলি আমাদের বাসুদেবপুর (পোঃ শঙ্করপুর—মেদিনীপুর) বাটীর কয়েকটি দলিল ও মেল্যাকের ৩৫৭৪২ নং তায়দাদেও আছে। নরোত্তম হইতেই ভুরশুট বংশের সহিত আমাদের সংযোগ। রাজচন্দ্রের পরবর্ত্তী ধারা—রাজচন্দ্রস্য সুতাং রামভক্ত ঈশান উদয়চন্দ্র ন্যায়ভূষণাঃ উদয়সুত সুরনাথসুত সতীশচন্দ্র সুতৌ পঞ্চানন ভবান্যৌ। পঞ্চাননসুতাঃ শ্রীপ্রণব কনক পিণাকিনঃ সাং বাসুদেবপুর। গড়ভবানীপুর রাজবংশ ঃ—কৃষ্ণরামসুতাঃ রাজা দর্পনারায়ণ মুকুটরাম প্রভৃতি। রাজা দর্পনারায়ণসুত রাজা উদয়নারায়ণসুত রাজা প্রতাপনারায়ণসুত রাজা শিব-নারায়ণসুত রাজা নরনারায়ণঃ সুত রাজা লক্ষ্মীনারায়ণঃ সুত রামনারায়ণঃ। মেল্যাকের তায়দাদ নম্বরটি আমার স্মরণ নাই—উহা ভুল হইতেও পারে। সম্বন্ধনির্ণয়ে ভুল করিয়া কৃষ্ণরামের ধারা রায়বাঘিনী হইতেই দিয়া ফেলিয়াছি।

বসন্তপুর পুঁথির ধারায় রায়বাঘিনীর দেবনারায়ণ, সত্য-নারায়ণ, রুদ্রনারায়ণ, সুরেন্দ্র ও রাজীব প্রভৃতি অলীক বলিয়া সন্দেহযুক্ত নামগুলি নাই। রায়বাঘিনীর বংশলতা সত্য বলিয়া ধরিলে আদিকবি কৃত্তিবাস অপেক্ষা কয়েক পুরুষ অর্ব্বাচীন দেবনারায়ণ আদিকবি হইতেও প্রাচীন হইয়া পড়েন। রুদ্রনারায়ণ ও রাজীবের নাম না থাকায় রায়-বাঘিনী ও কালাপাহাড়ের সহিত এই বংশের সম্পর্ক কল্পনা-মাত্র। ঐ পুঁথির কৃষ্ণরামের অধস্তন প্রত্যেক রাজার নামেই ভুরশুট অঞ্চলে গ্রাম ও চক আছে। কিন্তু খানাকুল কৃষ্ণ-নগর ও জাঙ্গীপাড়া কৃষ্ণনগর ভুরশুটের বাহিরে বলিয়া উহা-দের সহিত কৃষ্ণরামের সম্পর্কও ইতিহাসবিরুদ্ধ মনে হয়। আমরা এই বংশের সন্তান হইলেও রূপকথার দ্বারা কুলের গৌরব বর্দ্ধনের বিরোধী ও এই বিষয়ে দীনেশবাবুর মতের সর্ব্বাংশে সমর্থক। ১৯৪৩ সনে দমদমের বাটীতে বিধু-বাবুকে এই সকল কথা জানাইয়া কোন সদুত্তর পাই নাই। বসন্তপুর পুঁথি রাজচন্দ্রে কুলজী শেষ করিয়াছে—রাজচন্দ্র ১২২২ সালে লোকান্তরিত হন বলিয়া বিশ্বাস। ইহাতে ঐ পুঁথির কালনির্ণয় করা যায়। রামবাবু বলিতেন তাঁহার পিতা ঢাকা বিক্রমপুর হইতে ঘটক পুঁথি আনিয়াছিলেন।

মেদিনীপুর জেলার ক্ষীরপাই গ্রামে রায়বাঘিনী ঠাকুরের অবস্থিতির কথা আমি দীনেশবাবুকে জানাইয়াছিলাম। ঐ দেবতার বর্ত্তমান পূজক ৺প্রিয় ভট্টাচার্য্যের পুত্র শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্য। এই ভট্টাচার্য্য বংশ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শ্বশুরকুল। আমার মাতুলবাটীও ঠিক ঐ দেবতার কুটীরের নিকটেই ছিল। শৈশব হইতেই দেবতার বিষয় জানিলেও বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য ১৯৫৩ সনে ঐ অঞ্চলে গিয়াছিলাম। উহাতে অবগত হই রায়বাঘিনী প্রথমে বারা গ্রামে ছিলেন, পরে আমার গ্রাম হইয়া ক্ষীরপাইয়ে গিয়াছেন। দীনেশ-বাবুর উল্লিখিত শ্যামসুন্দরপুরের ৬১৪০৯নং তায়দাদভুক্ত সম্পত্তি ইঁহারই হইতে পারে। প্রায় দেড় শত বৎসরের প্রাচীন (১৭৩১ শক) মাণিক রায়ের "ধর্ম্মমঙ্গলে" আছে—"জাড়া গ্রামে কালু রায়ে কামিন্যা সহিত" (পৃ. ৬), কিন্তু ইহাও ভুল—কারণ জাড়া গ্রামের ধর্ম্মের নাম জগৎ রায় আর বারা গ্রামে এখনও কালু রায় ধর্ম্ম আছেন—রায়বাঘিনী উঁহারই কামিন্যা—ঐ গ্রামে এখনও পর্ব্বাদিতে ইঁহার উদ্দেশ্যে পূজা হয়। ত্রিধর্ম্মের পূজক কথিত রায়বাঘিনীর ধ্যান।—ওঁ নীল জীমূতসংকাশাং সর্ব্বসৌন্দর্য্যসুপ্রভাং। পূর্ণেন্দু সূর্য্যনয়নাং মৌলিচন্দ্র বিভূষিতাং। সুচারু বদনাং দেবীং সদা মদন বিহ্বলাং। সর্ব্বকামেশ্বরীং দেবীং কামিন্যাং প্রণমাম্যহম্॥ প্রণামমন্ত্র ঃ—ওঁ নমস্তে কামিনাকুণ্ডে ত্রিদশৈঃ পরিসেবিতে। অন্ধকুষ্ঠহরে দেবি কামিন্যায়ৈ নমোহস্তুতে॥ ওঁ বরদে কামিনাকুণ্ডে ত্রিদিবেশি সুরার্চিতে। অন্ধকুষ্ঠহরে দেবি কামিন্যাং প্রণমাম্যহম্। ওঁ নানাগজ-ঘটারূঢ়ে নানালংকারভূষিতে। পদ্মহস্তে শুভাচারে কামিন্যায়ৈ নমোনমঃ॥—মানুষ যে দেবতায় পরিণত হন, ধর্ম্মঠাকুরের নামগুলি হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাঁকুড়া রায় এক ধর্ম্মের নাম, ব্রাহ্মণভূমের রাজবংশে কবি মুকুন্দরামের আশ্রয়দাতা রাজার নামও বাঁকুড়া রায়। তিনিই যদি ধর্ম্ম-ঠাকুর হইয়া থাকেন তাহা হইলে কালু রায়, রায়বাঘিনী প্রভৃতির ঐরূপ পরিণতি অনুমান করা যায়।

প্রায় বৎসরাধিক পূর্ব্বে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের কোন এক গঙ্গোপাধ্যায় পাঁড়ুয়ার বিজলীবাবুকে পত্র লিখিয়া বৈবাহিক-সূত্রে ভারতচন্দ্র বংশের সহিত তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের সংযোগ জানিতে চাহেন। বিজলীবাবু পাঁড়ুয়া অঞ্চলের কানপুর হাই স্কুল হইতে নিজ লিপির সহিত ঐ পত্র আমাকে পাঠাইয়া দিলে আমি দীনেশবাবুর সহিত যোগাযোগ স্থাপনের উপদেশ দিয়া পত্রটি বিজলীবাবুকে ফেরত দিই।

এক্ষণে ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকগণের প্রতি নিবেদন—তাঁহারা কবি কৃত্তিবাস, রাজা প্রতাপনারায়ণ ও রায়-গুণাকর ভারতচন্দ্রের সংযোগে গৌরবান্বিত ভুরশুট রাজবংশ সম্পর্কে প্রচলিত সাহিত্য ও ইতিহাসে সন্নিবিষ্ট ভুলগুলি সংশোধন করুন এবং প্রামাণ্য ঐতিহাসিক উপাদান দ্বারা জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করুন।

অশ্রুকমল

শ্রীঅরবিন্দ পালিত

"এই শোন, তুমি তো ভারি দুষ্টু মেয়ে। দেখা হওয়ার পর থেকে একটা কথাও তো বললে না।" মেয়েটি দরজার বাজু ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কথার উত্তর দিল না। দরজার পাল্লায় হেলান দিয়ে, বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখতে লাগল। ঘরের মধ্যে ক্লান্ত মধ্যাহ্নের বিষণ্ণ আলো-আঁধারি। ভেতর থেকে ওর মুখের যে পাশটা দেখা যাচ্ছিল, সেটা যেন রেখায় টানা একটা আবছা ছবি।

"ভেতরে এসে দাঁড়াও না।" ও ঠিক একই রকম ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। আমার কথা শুনতে পেয়েছে বলে মনেও হ'ল না। আমিও বাধ্য হয়ে চুপ করলাম। কিছুক্ষণ চুপচাপ। ও কি ভাবছে? কেন আর যাই নি ওর কাছে? না কি, দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর আমার কথায় আবার স্নেহের আভাস পেল—তাই বুঝি অভিমানে মুখ ফিরিয়ে আছে? ওকে কি আবার ডাকব? ওর কি অভিমান ভাঙাব? না, যাকে ফেলে এসেছি পথের প্রান্তে, তাকে আবার তুলে আনব কেন? উদাস আকাশে ও কি ওর মনের কথার প্রতিধ্বনি খুঁজে ফিরছে।

অনেকক্ষণ এই রকম কাটবার পর ও ধীরে ধীরে মুখ ফেরালে। কি বিচিত্র ওর চোখ দুটো! হিমালয়ের প্রগাঢ় নীরবতা আর মহাসাগরের আবেগ-মুখর উচ্ছ্বাস যেন এক হয়ে মিশেছে সেখানে। এবারে আমি বললাম, "কেমন আছ?"

আবার ও মুখ ফিরিয়ে নিল। অল্প পরেই অবশ্য ফিরে তাকাল। দেখলাম ওর চির আনন্দময় চোখ দুটোর প্রান্তে প্রান্তে জলের আভাস, যেন আনন্দের সায়র-মাঝে ছোট্ট একটা কান্নার তরঙ্গ। তারপর মুখটা নামিয়ে নিজেকে বোধ হয় সংযত করতে লাগল।

এগিয়ে এসে ওর সামনে দাঁড়ালাম। শুধালাম, "এতদিন পরে দেখা—শুধু কি নীরবতার সঞ্চয় নিয়েই বিদায় নেব!"

ও কথা বলল,

"কি বলব বল। পথের পাশে দু'ধারে কত গাছ, তাতে কত ফুল! যাবার পথে ক্ষণিকের ভাল লাগায় তাদেরই একটি তুলে নিয়ে পথিক আঘ্রাণ নিয়েছিল। তারপর পথের পাশে তাকে ফেলে রেখে সে এগিয়ে গেছে। ফুলের হৃদয়ের বেদনা সে কি বুঝবে।" অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বলে ফেলে ও চুপ করল।

বুঝলাম। এ ত শুধু ওর অভিমান নয়। এ যে ওর হৃদয়ের বিরহ-বেদনার বীণা। স্পর্শ করলেই ব্যথার রাগিণী বেজে উঠবে। কিন্তু কি করে ওকে বোঝাই, পথপরিক্রমার কোন এক লগ্নে, হঠাৎ ভাল লাগায় কোন ফুলই পথিক তুলে নেয় নি। পথ-চলার নেশাই তার আনন্দ। বাঁধনের আনন্দে সে কি করবে। ছুটে চলার আনন্দের ক্ষণিকে, তার স্নেহদৃষ্টিতে সম্ভাষণ পাঠিয়েছিল, তার ভাল লাগা ফুলটিকে। তার আনন্দোজ্জ্বল চোখের চাহনিই শুধু রেখেছিল তার সঞ্চয়ের ঝোলায়। আর কিছুই নয়। বৃন্তচ্যুত সে কোন ফুলকেই করতে চায় নি। আপন বৃন্তে আপন পরিবেশে তারা সার্থকভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠুক। দূর থেকে সে তাদের নীরব অভিনন্দন জানিয়ে যাবে। কিন্তু যে নিজেকে স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করে দিয়েছে, তাকে নিয়ে সে কি করবে।

"আমার স্নেহের ধারা চিরকাল তোমায় সিঞ্চিত করবে। কিন্তু কোনদিনই সে তোমাকে উৎসাহিত করে আপন স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে না। দেখ নি, নদীর ধারে লতাগাছটি কেমন করে তমালের বাহুতে বাহুতে বন্দী হয়ে আপনাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, প্রকাশ করেছে। তার তলায় চিরন্তন বয়ে চলেছে নদীর আশীর্ব্বাদী ধারা।"

"চাই না, চাই না আমি নির্ভরশীল জীবন। ঐ নদীর স্রোতেই চিরকালের মত আমি গা ভাসিয়ে দেব।" হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠে ও।

"তা সে হয় না। নদীর স্রোতের তো কোন সঙ্গী নেই। একলাই সে বয়ে চলে।"

ও আর কোন কথা খুঁজে পায় না। আবার উদার নীলাকাশে ওর উদাস দৃষ্টি পাঠিয়ে দেয়। যেন নিজের সমস্ত বেদনাকে এক নিমেষে সংহত করে, নিজের চারদিকে একটা আবরণ রচনা করে।

এতক্ষণে ওর জন্যে সত্যকার বেদনা বোধ করলাম হৃদয়ে। ওর নিজের ভুলের মাশুল ও নিজেই যাই দিতে প্রস্তুত হ'ল, আমিও অমনি নিজেকে যেন একটু অপরাধী মনে করলাম। আমার স্নেহদৃষ্টিই তো ওর চোখে ভালবাসার অঞ্জন পরিয়েছে। আজকে হঠাৎ এই ক্ষণিকের দেখা। আবার দু'জনে চলে যাব দু'দিকে। যাবার সময়ে ওকে কি দিয়ে যেতে পারি!

ও এবার আমার সামনে এসে দাঁড়াল। বুঝল বিদায়ের ক্ষণ আসন্ন। চোখ তুলে তাকাল। তারপর নীচু হয়ে প্রণাম করল। ওর হাত দুটো ধরে তুললাম। ও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আস্তে আস্তে মুখটা নামিয়ে এনে ওর হাতের উপর এঁকে দিলাম বিদায়কালীন স্নেহচুম্বন। তার পরই "আজ চলি" বলে এগিয়ে এলাম।

দরজার পাশে এসে একবার ফিরে তাকালাম। দেখি, ওর চোখে প্রচ্ছন্ন বেদনার উপর প্রসন্ন হাসির ঝিলিক। শ্রাবণের জলভরা মেঘের কোণায় কোণায় সূর্য্যরশ্মির আলতো স্পর্শ।

অজানা দেশের ডাক

(গত বৈশাখ সংখ্যার সংযোজনী)

শ্রীনরেন্দ্র দেব

আলাস্কার চিরতুষারাবৃত 'সেণ্ট এলায়াস' পর্ব্বতশ্রেণীর সঙ্গে হিমালয়ের পিণ্ডারী গ্লেসিয়ার বা অপর কোনও জমাট হিমানীক্ষেত্রের কতকটা তুলনা করা যেতে পারে। এটি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটি আগ্নেয়গিরি। জাপানের বিশ্ববিশ্রুত ফুজিয়ামা পর্ব্বতের অপূর্ব্ব রূপ এর নেই বটে, কিন্তু সেই বরফ ও আগুনের একসঙ্গে হাত-ধরাধরি করে খেলা এ পাহাড়েও চলেছে। এরই পাদমূলে উত্তর আমেরিকার সঙ্গে কানাডার সীমান্তরেখা চির-অক্ষয় তুষারবক্ষে লৌহদণ্ড প্রোথিত করে, এবং তারের বেড়া দিয়ে চিহ্নিত করা আছে। এ অঞ্চলের কয়েকটি পর্ব্বতের এখনও আদিম অধিবাসীদের দেওয়া নামই প্রচলিত রয়েছে। এ নামগুলি শুনলে মনে হয় এর উৎপত্তি সম্ভবতঃ সংস্কৃত ভাষার উৎস থেকেই। যেমন "সুশীতনা", "কুক্কোকিম", "দ্বিনালা" ইত্যাদি।

আলাস্কা মেরুপ্রান্ত-প্রদেশে দিনান্ত হয় না বলে একথা যেন কেউ না মনে করেন যে, সমগ্র আলাস্কা প্রদেশেই বুঝি দিবাকরের একচ্ছত্র রাজত্ব চলে। সুদীর্ঘ দেড় হাজার মাইল বিস্তৃত য়ুকোন নদী প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ কলম্বিয়া থেকে সুরু করে বেয়ারিং সাগর পর্য্যন্ত এ দেশকে দ্বিধাবিভক্ত করে রেখেছে। এই বিশাল নদীর অরণ্যপরিশোভিত উভয় তীরের মনোহর উপত্যকাগুলিতে একেবারে চাঁদের আলোর বন্যা বয়ে যায়। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর এই অপরূপ শোভা ও সৌন্দর্য্য একমাত্র ভারতের পৌর্ণমাসী রাত্রির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

আলাস্কার আদিম অধিবাসীদের সম্বন্ধে সামান্য দু'চার কথা বলে অজানা দেশের ডাক এখানেই শেষ করব। এদেরই পিতৃ-পিতামহের যে মাটিতে আজ শ্বেতাঙ্গ পুঙ্গবেরা উড়ে এসে জুড়ে বসে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে শাসন ও শোষণ করছেন, আদিবাসীদের প্রতি তাঁদের কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা বা প্রেম নেই। এখানকার আদিবাসীরা কেউ কৃষ্ণবর্ণ নয়, কাজেই 'ব্ল্যাকনিগার' বলবার অসুবিধা দেখে তাঁরা এঁদের নাম দিয়েছেন 'রেড-ইণ্ডিয়ানস'। সাদা বর্ব্বরেরা বলেন, এরা নাকি অসভ্য বর্ব্বর নোংরা জংলী জাত। কিন্তু এদের পল্লীতে এসে কিছুদিন বসবাস করলে দেখবেন এমন খাটি মানুষ অন্য সভ্যদেশে বিরল। সুকুমারকলামণ্ডিত রহস্যময় পটমণ্ডপে এদের নিবাস। পৌরাণিক বীরোচিত এদের আকৃতি ও বেশভূষা। এরা নোংরা ত নয়ই, বরং বহু সুসভ্য ইউরোপীয়ের চেয়ে এরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। প্রকৃতির কোলে এরা মানুষ বলে এরা সহজাত শিল্পী। পাখীর পালক ও কড়ির মালাকে এরা যেন একটা নবীন শ্রী দান করেছে। নিজেদের জাতীয় ধর্ম্মে এরা গভীর বিশ্বাসী। পশু-পক্ষীর উপাসনা করে কিনা জানি না তবে এক এক দল তাদের স্ব-স্ব গোষ্ঠীর প্রতীকস্বরূপ এক এক রকম পশু-পক্ষী গ্রহণ করেছেন বটে। ভারতও এক দিন গ্রহণ করেছিল। কপিধ্বজ···গরুড়স্তম্ভ প্রভৃতি তার প্রমাণ। এদের মধ্যেও ধ্বজাপূজার প্রচলনটা খুব বেশী। এই এক একটি ধ্বজার কারুকার্য্য দেখলে বিস্মিত হতে হবে। বিশ-পঁচিশ ফুট লম্বা কাঠের গুঁড়ি খোদাই করে ও রং করে এগুলিকে যেন শিল্প ও সৌন্দর্য্যের রাজদণ্ড করে তোলেন এঁরা। এদের বসন-ভূষণ তৈজসপত্র সবকিছুই বিচিত্র শিল্প ও কারুসম্মত। অর্থের লালসা নেই। দিন চলে গেলেই হ'ল। পরিশ্রম এরা সেইটুকুই করে, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য মাত্র যেটুকুর প্রয়োজন। অতিরিক্ত শ্রমে অনিচ্ছুক বলে বিদেশীরা বলে এরা অলস। এদের সঙ্গে প্রাচীন ভারতবাসীদের যেন কোথায় একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়! আমাদের পিতৃ-মাতৃশ্রাদ্ধে যে বৃষোৎসর্গের চিত্রিত দারুস্তম্ভ প্রোথিত করা হয় এ যেন তারই বৃহৎ সংস্করণ!

জাপানী পুতুল

প্রত্যেক দেশের নিজস্ব ধরণের পুতুল আছে, কিন্তু অন্য যে-কোন দেশ অপেক্ষা জাপানী পুতুল-শিল্প সমৃদ্ধ। শিশুদের খেলনা-পুতুল ছাড়া জাপানে এমন অনেকগুলি সুন্দর, সুষমাময় এবং বহুমূল্য পুতুল আছে যাহা শিল্পসৃষ্টির পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

ইয়েদো আমলের মেয়েদের অতিপ্রিয় পুতুল

জাপানী পুতুল-নির্ম্মাতাদের চমৎকার কারুকার্য্য এখন সার্ব্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। উপরন্তু জাপান প্রায়শঃই "পুতুলের দেশ" বলিয়া অভিহিত হয়। জাপানের আধুনিক মডেলের পুতুলের ইতিহাসের সূচনা তিন শত বৎসরের কিছুকাল আগে। কিন্তু আট নয় শত বৎসর পূর্ব্বেকার লিখিত বিবরণাদি হইতে জাপানী পুতুলের প্রাথমিক রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। এ কথা বলা যাইতে পারে যে, এই শিল্পের উৎপত্তির তারিখ ইহারও কিছুকাল পূর্ব্ববর্তী।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত জাপানী পুতুলের প্রাচীনতম নমুনাগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য। এই সমস্ত পুতুলই ক্রমে ক্রমে শিশুমহলে প্রবেশলাভ করে এবং অবশেষে ছোটদের আনন্দবর্দ্ধক খেলনা-শিল্পে পরিণত হয়। আদি এবং মৌলিক পুতুলগুলির মধ্যে খুব অল্পসংখ্যকই এখনও পর্য্যন্ত টিকিয়া আছে। খেলনা-পুতুলগুলি কেবল ক্ষণভঙ্গুরই ছিল না, তাদের আকারও প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইত।

মাটির তৈরি রঙীন পুতুল—এগুলি 'পাপেট শো'তে প্রদর্শিত হয়

আনুমানিক তিন শত বৎসর পূর্ব্বে শান্তিপূর্ণ ইয়েদো আমলে পুতুলগুলির অধিকতর আলঙ্কারিক রূপায়ণ হয় এবং তাহা ধীরে ধীরে উচুদরের শিল্পকলার স্তরে উন্নীত হয়। ফলে দুইটি বিভিন্ন ধারার পুতুল-শিল্পের উদ্ভব হয়। একটি শিশুদের উপযোগী এবং অপরটি

জনসাধারণের রুচির অনুযায়ী। শেষোক্ত শ্রেণীর পুতুলের মধ্যে অনেকগুলি কাজ কারুকৃতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

জাপানের উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলের একটি জেলার হাতে তৈরি কাঠের পুতুল

এই সকল শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পী স্থানীয় কাঁচা মালের উপর তাহাদের মৌলিকত্ব এবং সৌন্দর্যবোধকে পরিপূর্ণ ভাবে রূপায়িত করিতে সমর্থ হইয়াছে, ফলে এমন সব বিভিন্ন আকারের পুতুলের সৃষ্টি হইয়াছে যাহা ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক।
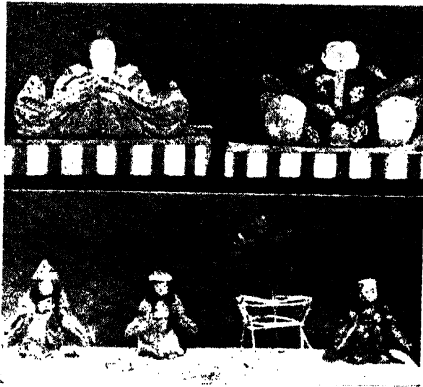
উপরে—সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞী পুতুল
নীচে—কিয়োটোর কামো তীর্থে ১৭৩৭ সনে উদ্ভাবিত কামো-নিঙ্গিয়ো পুতুল

'হিনামাত সুরি' অথবা পুতুল-উৎসবের জনপ্রিয়তা যেমন সাধারণ ভাবে পুতুল-শিল্পের বিকাশের পক্ষে বিশেষ ভাবে সহায়ক হইয়াছিল তেমনি ইহার উৎকর্ষ-সাধনে টাঙ্গো-নো-সেক্কু অথবা ছেলেদের উৎসবও কম সাহায্য করে নাই। এই সময় বিখ্যাত সামন্ত যোদ্ধাদের অনুকৃতিমূলক পুতুলসমূহ প্রদর্শিত হয়। পুতুল-উৎসবের তারিখ ৩রা মার্চ আর বালকদের উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ৫ই মে তারিখে।

ইয়েদো আমলের সামন্ত প্রভু এবং রাজ-সভাসদগণের প্রিয় এক শ্রেণীর পুতুল

বর্ত্তমান কালে এমন কতকগুলি পুতুল তৈরি হয় যেগুলির সঙ্গে জটিলতাপূর্ণ যন্ত্রপাতি সংযুক্ত থাকে। ইয়েদো আমলে যদিও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মান ছিল নীচু স্তরের তথাপি 'কারাকুরি নিঙ্গিও' নামে কাঠের চক্রে নির্ম্মিত এক ধরণের যান্ত্রিক পুতুলের অস্তিত্ব ছিল।

উৎসবানুষ্ঠান-সংশ্লিষ্ট 'ডলে'র সঙ্গে সঙ্গে পাপেট ডল নামে এক শ্রেণীর পুতুলেরও বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। এগুলি অনেকটা আমাদের পুতুলনাচের পুতুলের মত। আজিকার দিনে ইহাকে বলা হয় "বানরাকু"।

যদিও জাপানের সাম্প্রতিক কালের পুতুলসমূহ বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, তথাপি উহার মূলগত ঐতিহ্য এখনও বজায় রহিয়াছে।

জার্ম্মানীর অল্পবয়স্ক বাস্তুহারাদের সমস্যা

সোভিয়েট অধিকৃত অঞ্চল হইতে যে ৪,৭৫,০০০ জন উদ্বাস্তু ১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাসের পর পশ্চিম জার্ম্মানীতে আসিয়াছে

তাহার মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেকই পঁচিশ বৎসরের নিম্নবয়স্ক। তাহাদের অধিকাংশেরই পশ্চিম জার্ম্মানীতে পরিবার-পরিজন নাই। যাহারা একাকী অথবা পিতা কিংবা মাতা ইহাদের একজনের সঙ্গে আসিয়াছিল তন্মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ জনের বয়স স্কুলের ছাত্রদের বয়সের সমান, অথবা তাহাদের চেয়েও কম। এই সমস্ত অল্পবয়স্কের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অনেকেই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

বার্লিনের একটি বাস্তুহারা-গ্রহণ-কেন্দ্রের উদ্বোধনে সমবেত সঙ্গীত

সোভিয়েট অধিকৃত অঞ্চলের সীমা অতিক্রম করিয়া যে সকল তরুণ পশ্চিম জার্ম্মানীতে আসে তাহাদের কর্ম্মপ্রেরণা এবং উৎসাহ আছে—কাজেই তাহাদের পক্ষে কর্ম্মপ্রাপ্তি বিশেষ কঠিন হয় নাই। সেইজন্যই তাহাদের আগমনের দরুন বেকারসংখ্যা বৃদ্ধি পায় নাই। সাধারণ সাহায্য-ভাণ্ডার হইতে কয়েক সপ্তাহ বা মাসকয়েক সাহায্য পাওয়ার পরই দেখা যায় যে, এই সকল তরুণের অধিকাংশই করদাতাদের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উদ্বেগের আসল কারণ ইহাদের জন্য কর্ম্মসংস্থান-সমস্যা নয়, তাহা বরং অনেকটা মনস্তত্ত্ব-ঘটিত। অনেকেই তাহাদের অতীত বেদনা ভুলিতে পারিতেছে না এবং ভবিষ্যতের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইবার মত মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। পরিবারের সহিত সম্পর্কহীন তরুণ বাস্তুহারাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত অন্যতম সদন (হোম)—'হাউস ক্রফডর্ফে' তথ্যানুসন্ধান করিয়া দেখা যায় যে, আগষ্ট ১৯৫৩ এবং '৫৪ সনের মধ্যে আগত ছেলেদের ভিতর শতকরা ৫২.২ জনই যে পরিবারের সন্তান তাহা সুস্থ ও স্বাভাবিক নয়। তাহাদের মধ্যে শতকরা ২৪.৯ জন, পিতৃহারা এবং সাধারণতঃ পিতাকে তাহারা হারাইয়াছে যুদ্ধে, শতকরা ৫.৫ জনের মা ছিল না, ৬.১ জন অনাথ ছিল, ৫.৭ জনের জন্ম অবৈধ মিলনের ফলে এবং শতকরা এগার জনের পিতামাতার মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ হইয়াছে।

অনেক তরুণ বাস্তুহারার জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাহাদিগকে কঠোর সমালোচক এবং সন্দেহপ্রবণ করিয়া তুলিয়াছে। বাস্তুহারাদের মধ্যে কর্ম্মরত, প্রচুর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন পাদ্রী বলিয়াছেন —"রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্বন্ধে আমরা ইহাদের সঙ্গে যত কম কথা

পশ্চিম বার্লিনের একটি উদ্বাস্তু-কেন্দ্রে জনৈক ব্রিটিশ সমাজ-কর্ম্মীর তত্ত্বাবধানে এক দল বাস্তুহারা শিশু

বলিব এবং মানবতার দিকে আমরা যতই বেশী আমাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করিব ততই তাহারা কল্যাণের পথে দ্রুত অগ্রসর হইবে। তরুণ বাস্তুহারাদের উপস্থিতির দরুন যে সকল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে পশ্চিম জার্ম্মানীর কেবল শিক্ষাদাতার ভূমিকা গ্রহণ করিলেই চলিবে না, তাহাকে শিখিতেও হইবে।

জার্ম্মানীর বিদ্যালয়সমূহে সাম্প্রতিক শিক্ষাব্যবস্থা

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর জার্ম্মানীর শিক্ষা-ব্যবস্থায় গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। নাৎসী আমলে শিক্ষা-নিয়ন্ত্রণের যাবতীয় ব্যবস্থা ন্যস্ত ছিল কেবলমাত্র ফুরারের নিকট দায়ী রাইখ শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের উপর। এখন বিদ্যালয়ের ব্যাপারে ফেডারেল রিপাব্লিকের প্রত্যেকটি রাজ্যই স্বায়ত্বশাসন-ক্ষমতাসম্পন্ন এবং তাহারা সর্ব্বপ্রযত্নে এই স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া থাকে। বস্তুতঃ সবগুলি রাজ্যেই 'জনগণের' শিক্ষার উন্নতিবিধান, বিদ্যালয়ে শ্রেণীগত পার্থক্য দূরীকরণ এবং সমাজের অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর সন্তানদের জন্য ব্যাপক ভাবে শিক্ষার সুযোগ সুবিধা করিয়া দেওয়ার নিমিত্ত বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে বা হইতেছে।

কোন কোন রাজ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ছাত্র-বেতন রহিত হইয়াছে, অন্যগুলিতে বছরের পর বছর ইহার পরিমাণ কমানো হইতেছে, ফলে প্রায় সর্ব্বত্রই মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষালাভের প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রসংখ্যা বাড়িতেছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির মর্য্যাদা ক্রমবর্দ্ধমান, কেননা এগুলি অধিকতর প্রযত্নের সঙ্গে সাধারণ এবং সামাজিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে। এই বৃত্তিমূলক শিক্ষা-বিষয়ে প্রস্তুতি এবং অভিজ্ঞতার দরুন ছাত্রদের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং উচ্চতর টেক্‌নিকাল ইনষ্টিটিউশনগুলিতে

প্রবেশ করিয়া উচ্চস্তরের ব্যবহারিক বিদ্যালাভের পথ সুগম হইতেছে। আগেকার তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢের বেশী ছাত্র ছুটির সময়ে কাজ করিয়া অথবা 'ষ্টাডি ফাউণ্ডেশন অফ দি জার্ম্মান পিপলে'র মত সংস্থাগুলির নিকট হইতে বৃত্তি পাইয়া পড়াশুনার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইতেছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভাবী শিক্ষকদের সাধারণ এবং বৃত্তিমূলক উভয়বিধ শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সবগুলি রাজ্যকর্ত্তৃকই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বিত হইয়াছে—ইহার দরুন প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক এই দুই গ্রুপের শিক্ষকদিগকে পরস্পরের ঘনিষ্ঠতর সান্নিধ্যে আনয়ন করা সম্ভবপর হইবে। এতদ্বিষয়ে মূল নীতি হইতেছে এই যে, ভবিষ্যতে যিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত হইতে চাহিবেন তাঁহাকে সাধারণ শিক্ষালাভে তের বৎসর ব্যয়িত করিতে হইবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষালাভ আরম্ভ করিবার

কিয়েলে আধুনিক 'গেটে' স্কুল

আগে তাঁহাকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতেই হইবে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই সকল ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, উভয় গ্রুপের শিক্ষকদের মধ্যে বেতন ও সামাজিক পদমর্য্যাদার পার্থক্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে এবং ভবিষ্যতে শিক্ষাব্রতে পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিতে ইচ্ছুক সেই সকল যুবক-যুবতীর সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে যাহারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর শিক্ষকতা করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষাদানের যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত অধ্যয়নের নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরিয়া যায়। শিক্ষাদান-পদ্ধতিতেও লক্ষণীয় পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। ক্লাসে বক্তৃতা এবং প্রশ্নোত্তরের রীতিও ক্রমে ক্রমে পরিত্যক্ত হইতেছে। বিদ্যালয়-কর্ত্তৃপক্ষ যৌথকর্ম্ম এবং শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে স্বয়ং-শিক্ষা এ দুটির উপর বিশেষ জোর দিতেছেন। এই সমস্ত আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তনের দরুন শিক্ষায়তনগুলির আকৃতিগত পরিবর্ত্তনও সাধিত হইয়াছে। নূতন বিদ্যালয়ভবনগুলি দেখিতে পুরানোগুলি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। তাহারা প্রায়শঃই প্যাভিলিয়ন বা মণ্ডপগৃহের মত আকৃতিবিশিষ্ট, এগুলি স্থানান্তর-করণযোগ্য আসবাবপত্রসমন্বিত, বৃহৎ কাঁচের দরজাওয়ালা ক্লাসরুম-বিশিষ্ট এবং এগুলিতে বেতার-গ্রাহক-যন্ত্র, লাইব্রেরির জন্য অধিক-সংখ্যক বিশেষ ধরণের কক্ষ, প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ, পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নশাস্ত্র শিক্ষাদান, বৃহত্তর খেলার মাঠ ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত আছে।

সাধারণ রাজনৈতিক সমস্যা এবং সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কে শিক্ষাদান এখন সমুদয় বিদ্যালয়ে কারিকুলামের অঙ্গীভূত বলিয়া গণ্য হয়। বিদ্যালয়ের প্রশাসনে এখন ছাত্রেরা বিশেষ ভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে কঠোর কর্ত্তৃত্বমূলক আজ্ঞানুবর্তিতার পরিবর্ত্তে এখন অধিকতর মানবীয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত
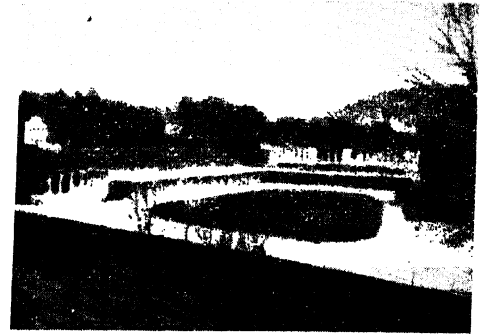
ওয়েইসেনবাগের নূতন বিদ্যালয়

হইয়াছে। শারীরিক শাস্তি প্রদান অধুনা নিষিদ্ধ। জার্ম্মানীর কোন কোন রাজ্যে এখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ বিদ্যালয়-মনস্তত্ত্ববিদ নিয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফলে বিদ্যালয় এবং ক্লাসরুমের পরিবেশই বদলাইয়া যাইতেছে।

সাম্প্রতিক জার্ম্মানীর শিক্ষার উন্নয়নের আর একটি দিক হইতেছে বিদ্যালয়ে ছাত্রদের পিতামাতার ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব। অনেকগুলি বিদ্যালয়ে পিতৃ-মাতৃ পরিষদ গঠিত হইয়াছে এবং 'রাজ্য স্কুল কর্তৃপক্ষে'র অনুমোদন লাভ করিয়াছে।

পরীক্ষণমূলক বিদ্যালয়গুলিও সর্ব্বসাধারণের উৎসাহ এবং অর্থ-সাহায্য লাভ করিতেছে। "স্কুল ভিলেজ বার্গষ্ট্রাসে" নামক এমনি ধরণের একটি বিরাট আকারের গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যালয় গত বৎসর "ল্যাণ্ড অব হেসে"তে খোলা হয়। কিণ্ডারগার্টেন, প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং বৃত্তিমূলক ক্লাস ইহার অন্তর্ভুক্ত। সবগুলি ক্লাস একই ভবনে অবস্থিত নয়, কেননা এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে প্যাভিলিয়ন ধরণের অনেকগুলি আধুনিক গৃহ আছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহা এক অধ্যক্ষের অধীনে একটি সংস্থা বলিয়াই গণ্য হয়।

নানা বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়া গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে সাম্প্রতিক জার্ম্মানীর নূতন শিক্ষাপদ্ধতির জয়যাত্রা সুরু হইয়াছে। যদি সাধারণ রাজনৈতিক অবস্থা অবিচল থাকে এবং শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহা হইলে নিশ্চিত ভাবেই এই আশা পোষণ করা যাইতে

...র যে, ভবিষ্যতে অধিকতর ভারসাম্যযুক্ত এবং দায়িত্বপূর্ণ সমাজ-...নে বিদ্যালয়সমূহ বিশেষ ভাবে সহায়ক হইবে।

জার্মান বাস্তুহারাদের জন্য নরওয়েজীয়ানদের দান

পশ্চিম জার্মানীর গৃহের স্বল্পতার সমস্যা লাঘব করিবার নিমিত্ত ...ওয়ের সামাজিক বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিসেস ব্রাকেল স্ইবিন ...ওয়েজীয়ানদের দান-স্বরূপ পঁচিশটি কাঠের ঘরওয়ালা দুটি উপনি-...বেশ বহু শিশুসমন্বিত বাস্তুহারা জার্মান পরিবার এবং অন্যান্য ...তির স্বদেশ হইতে বহিস্কৃত পরিবারসমূহকে উপহার দিয়াছেন।

এই কাঠের উপনিবেশ দুটি এসেন এবং ওয়ুপ্পারতালে নির্মিত ...। ভাবী অধিকারীদের নিকট এসেন উপনিবেশদ্বয় হস্তান্তরের ...নুষঙ্গিক অনুষ্ঠানে নর্থ রাইন-ওয়েষ্টফালিয়ার গৃহনির্মাণের ভার-...প্ত মন্ত্রী প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। নরওয়েজীয়ান ...তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে এই উপনিবেশের নামকরণ করা ...ইয়াছে 'নর্থল্যাণ্ড মেডো।'

পাঁচটি কক্ষসমন্বিত প্রত্যেকটি একতলা গৃহে আছে একটি ...যুক্ত রন্ধনশালা এবং থাকিবার কক্ষ, স্নানের এবং ভাঁড়ারের

জার্মান বাস্তুহারাদের জন্য নরওয়েজীয়ানদের দান

জায়গা। বাগানের জন্য প্রত্যেক গৃহের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট কিছু জায়গা আছে। কিছুকাল ভাড়া দিয়া বাস করিবার পর দখলকারীরা নিজ নিজ গৃহের মালিকানা লাভ করিবে। গৃহনির্মাণ-ব্যয়ের কিয়দংশ উঠাইবার জন্য তাহাদিগের নিকট হইতে এই ভাড়া লওয়া হইবে।

ন. ভ

বাস্তবিকা

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

জানি—তুমি কাব্যের নায়িকা নও!
তোমার হাস্যে ঝরে না মুক্তা
আর কান্নায় ঝরে না পান্না!
পুষ্প-পাগল ফাল্গুনের কোনো উতল অসতর্ক মুহূর্তে
কলহংস-মুখরিত মালিনীর তীরে
মাধবী-বিতানের শীতল ছায়ায় ব'সে
শকুন্তলার মত পেলব পদ্মপর্ণ ছিঁড়ে
লিখ নাই আকুল প্রণয়-লিপিকা!
নিভৃত বৃক্ষবাটিকায় সাগরিকার মত
কোনোদিন কুসুম-অঞ্জলি দিয়ে
কর নাই কুসুমধন্বা কন্দর্পের অর্চনা।
মেঘম্লান বর্ষায় বিদ্যুদ্দামস্ফুরণ চকিতনেত্রে
দলিতঅঞ্জনদ্যুতি কৃষ্ণ মেঘের পানে চেয়ে
শর্বরীবিনী বিরহব্যথার মত প্রতীক্ষা করো নাই
তমালকুঞ্জের পুঞ্জ অন্ধকারে
কারো চারু চরণের মঞ্জুল মণিময় মঞ্জীরগুঞ্জন!
বিলাসিনী যক্ষবধূর মত
বীণাতারে তোলো নাই সকরুণ ললিত ঝঙ্কার;
কণিতকঙ্কণ করপল্লবের তালে তালে
নাচাওনি কোনোদিন আদরিণী ভবন-শিখিনীকে!
তুমি অবাস্তব কবিকল্পনার মিথ্যাময় সৃষ্টি নও,—
রক্তমাংসে-গড়া নিতান্ত গদ্যময়ী মানবী!
কবে কোন্ এক পল্লী-প্রাঙ্গণে
নামহীন বনপুষ্পের মত
যৌবনের সুখস্পর্শে উঠেছিলে ফুটে।
তোমাকে চাইনে রোমান্টিক ভাববিলাসের
নরম গোলাপী নেশার ঝোঁকে;
চাইনে তোমাকে আমার মদির মধুযামিনীর
মায়াবিনী স্বপ্নসঙ্গিনীরূপে।
এসো তুমি আমার লাঞ্ছিত, বেদনাদগ্ধ কুশ্রী মধ্যবিত্তজীবনে
শান্তি, সুষমা, স্নিগ্ধতার হিল্লোল তুলে।
আমার জীর্ণ কুটীরের মাঝখানে এসো
মেদুরমধুর শীতল চাঁদের আলোর মত!
দাঁড়াও আমার দুঃখদারিদ্র্যের সাথে সংগ্রামের পুরোভাগে।
আমার গলিত ছিন্ন কন্থা
আর ক্লান্ত দিনান্তের অশ্রু-নিষিক্ত কদন্নের
হও তুমি চিরঅংশভাগিনী!
এ জীবনে স্বপ্ন নেই, সঙ্গীত নেই, সৌন্দর্য নেই—
আছে শুধু জান্তব বুভুক্ষার জ্বালা,—
আছে নিঃসীম আকুতি আর প্রচণ্ড ব্যর্থতা!
আমার এই জীবনভরা ব্যর্থতার মরুপ্রান্তরে
জেগে থাকো তুমি স্নিগ্ধ পল্লবিনী লতার মত!

কবি করুণানিধান-প্রসঙ্গে

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বছর দুই হ'ল ভদ্রকালীতে কন্যা-গৃহে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করছিলেন কবি। দেহ ক্রমশঃই জীর্ণ হয়ে পড়ছে, আর কোথায়ই বা যাবেন! কিন্তু দেহ অশক্ত হলেও মনের যাযাবরবৃত্তি একটুও স্তিমিত হয় নি, কতকটা সুস্থ হতেই দৌড় দিলেন ধানবাদের দিকে। এই ধানবাদে থাকাকালীন ভদ্রকালীতে এমন একটি দুর্ঘটনা হ'ল—যার ফলে ওখানে তাঁর ফিরে আসা সম্ভব হয় নি। ওঁর বড় দৌহিত্র শ্রীমান্ অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় দুরারোগ্য ব্রেণ-টিউমারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ল! আত্মীয় বন্ধুরা মিলে স্থির করলেন—এই দুঃসংবাদ কবিকে দেওয়া হবে না। ওই ছেলেটি ছিল ওঁর শেষ জীবনের পরম সহায়। ভাল ভাল বই পাঠাগার থেকে এনে কবিকে পড়ে শোনানো, কবির কবিতার অনুলিপি করা, প্রুফ দেখা, চিঠিপত্রের জবাব লেখা, কবির হয়ে সুধীজনের সঙ্গে আলাপ চালানো, সভা-সমিতিতে কবির সঙ্গী হওয়া—সব বিষয়েই ছেলেটি ছিল অপরিহার্য্য। সুতরাং শোকজীর্ণ কবিকে ওর মৃত্যু-সংবাদ না দিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ানো চলতে লাগল। ধানবাদ থেকে কবি এলেন হাওড়ায়। সেখান থেকে সেণ্ট্রাল এভিনিউ, তার পর বালিগঞ্জ—কামালপুর হয়ে পুনরায় হাওড়া, এমনি করে বছরখানেক কাটল।

এই সফরের সময় কবি যখন কামালপুরে ছিলেন, তখন চাকদহ পৌরজন মিলে ওঁর সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করলেন।

...অজ পাড়াগাঁ কামালপুর থেকে চাকদহের দূরত্ব মাত্র তিন মাইল। ঐটুকু পথ কবি অনায়াসে অতিক্রম করতে পারবেন ভেবে চাকদহ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে সভার স্থান নির্দিষ্ট হ'ল।

এটি হচ্ছে গত জ্যৈষ্ঠ মাসের কথা। সে সময়ে কবির শরীর বিশেষ ভাল যাচ্ছিল না। রক্ত আমাশয় থেকে উঠে কিছু দিন জ্বর ভোগ করেছেন, বুকের যন্ত্রণাটাও রয়েছে। শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল। অভিনন্দনের কথাটা শোনাতেই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, এই বয়সে টানাপোড়েন ভাল লাগে না, কি হবে সম্মান কুড়িয়ে!

অনেক করে বুঝিয়ে ওঁকে রাজী করিয়ে ওঁর নাতি দেবপ্রসাদ আমাকে চিঠি লিখল: দাদু রাজী হয়েছেন, আপনি অবশ্য করে আসবেন। কলকাতা থেকে আসবেন কয়েকজন গুণীমানী সাহিত্যিক, কৃষ্ণনগর থেকে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় আসবেন, আরও অনেকে আসবেন জানিয়েছেন। সভাটা যাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় সেই চেষ্টাই করছি আমরা।

যথা দিনে পৌঁছে দেখি আয়োজনের ত্রুটি নাই। নদীয়া জেলার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ জীবিত কবির প্রতিভার সমাদর করতে নদীয়াবাসী ও কবির গুণমুগ্ধ ভক্তের দল সভায় যোগদান করেছেন। চাকদহ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ লোকে ভরে গেছে—কবিকে দেখবার জন্য, কবির মুখের বাণী শোনবার জন্য, ওঁর পায়ের ধুলো নেবার জন্য।

গ্রীষ্মকাল। গরম খানিকটা ছিল, কিন্তু উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সভার আয়োজন হওয়াতে ভারি চমৎকার লাগছিল। আকাশে খানিকটা মেঘ—পরিবেশ ছিল স্নিগ্ধ। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়কে সভাপতি আর পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে প্রধান অতিথি করে সভার কাজ আরম্ভ হ'ল। চাকদহের পৌর-প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সারস্বত-সমিতি মিলে কবিকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা নিবেদন করল। শ্রদ্ধা-আয়োজনের উত্তর দিলেন কবি একটি মনোজ্ঞ নাতিদীর্ঘ ভাষণে। অতীত দিনের সঙ্গী-সাথী, আনন্দ-বেদনা, সাহিত্যসাধনার কথা আর প্রকৃতি-পরিবেশ সেই ভাবগম্ভীর ভাষণে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

সভাভঙ্গ হলে কবি বললেন, শরীর আর চলে না। আর ভাল লাগে না এই সম্মানখ্যাতি কুড়ানোর পালা। তবে তোমাদের এই প্রীতি-ভালবাসা-শ্রদ্ধার স্পর্শ যখন পাই—নতুন করে ফিরে পাই নিজেকে। এই পাথেয় আমার পথ উত্তরণের শক্তি যোগায়। শেষ পথ, বুঝলে?

দু'মাস কামালপুরে কাটিয়ে কবি এলেন হাওড়ায়—মধুসূদন বিশ্বাস লেনে। দেবু খবর দিয়ে গেল, দাদু এসেছেন হাওড়ায়। খুব কাছেই এসেছেন কবি—একেবারে দুয়ারে—আমার শিবপুরের বাসা থেকে মাত্র দু' মাইল দূরে।...কিন্তু সংসারে মাঝে মাঝে এমন ঝঞ্ঝাট এসে জোটে যার ফলে দু' মাইল হয়ে দাঁড়ায় দু'শো মাইল। কিছুতে আর সময় করে উঠতে পারি না। অবশেষে একদিন মধুসূদন বিশ্বাস লেনে গিয়ে শুনলাম, মাত্র দু'দিন হ'ল কবি বালিগঞ্জে চলে গেছেন। মাসখানেকের মধ্যেই ফিরবেন। বালিগঞ্জের ঠিকানা আমি জানি না, ওঁরাও বলতে পারলেন না, অপেক্ষা করতেই হ'ল।

মাসখানেক পরেই হবে—কবি ফিরলেন।

খবর পেয়েই একদিন বিকেলবেলায় দেখা করতে গেলাম। ইদানীং ওঁর চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছিল—নাম না বললে মানুষ চিনতে পারতেন না।

...আমায় বললেন, নাম না বললে কাউকে চিনতে পারি না, আর অপরাধই বা কি! আসছে অগ্রহায়ণে আটাত্তর হবে—সবাই ছুটি চাইছে যে! বসো, বসো ভাল করে, অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে। তোমার গ্রন্থাবলী বেরিয়েছে শুনলাম, আন নি?

বললাম কাগজে বেরিয়েছে, বই হাতে এখনও আসে নি। এলেই আপনাকে দিয়ে যাব।

দিও—দিও। অত্যন্ত খুশী হয়ে উঠলেন কবি।—বাংলা-

...তাকে যারা ভালবাসে তারা আমার আপনার জন। ভাবি ...নার জন। দেখ, নানান জায়গা থেকে লোক আসেন—সভা-...তিতে নিয়ে যেতে চান, কিন্তু দেহ স্ববশে নয়, পারি না। তবু ...কে 'না' বলতে ভারি কষ্ট হয়। আর মানপত্র কুড়িয়ে কি ...বে! এখন মনে হয় কি জান? 'ঝরাফুলে' একদিন বলেছি ...। বলে আবৃত্তি করলেন:

মিছে মান কুড়াইয়া কি হবে?
দেয়ে দেয়ে লাজ ভাসায়ে,
সাজ সাজ তুই পথের পাগল
ঘৃণায় প্রণয় মিশায়ে।
খুলে ফেল ফুল—আঙিয়া
বালুকার ঘরে লুকোচুরি খেলা
সন্ধ্যায় যাক ভাঙিয়া।

কথায় কথায় সন্ধ্যা উৎরে গেল। কবি কৌটা থেকে দোক্তা ঢেলে নিলেন হাতের তালুতে। বললেন, বড় খারাপ অভ্যাস হয়ে গেছে—এটুকু মুখে না দিয়ে পারি না। হাঁ, ভাল কথা, বৌমার অসুখ বলছ, তা কোথাও চেঞ্জে নিয়ে যাও না কেন?

কোথায় যাব বলুন?

কেন, কাছাকাছি একটা ভাল জায়গা রয়েছে তো; ভুবনেশ্বরে চল।—কবি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন:—খুব ভাল জলহাওয়া ওখানকার, গিয়েছিলাম বহুদিন আগে। পাণ্ডার বাড়ীতে ছিলাম, খুব যত্ন করত। তা আমিও না হয় যাব তোমার সঙ্গে। বেশী দিনের ছুটি না পাও—আমি বউমাকে আগলাব। তাই ঠিক করে ফেল, কেমন? দাঁড়াও, দাঁড়াও এর মধ্যে কে যেন ভুবনেশ্বরে গিছলেন—গল্প করছিলেন সেদিন। বলে গৃহ-কর্ত্তার ভাইকে ডাকলেন, শোন—সেদিন যে ছেলেটি ভুবনেশ্বরে এক মাস কাটিয়ে এল—তাকে এক বার ডাকাও তো। আমরা ভুবনেশ্বরে যাব—বাড়ী ভাড়া-টাড়া কি রকম—

গৃহ-কর্ত্তার ভাই বললেন, ও তো আমিও জানি। দুরকম ব্লক আছে। পঞ্চাশ টাকা আর পঁচাত্তর টাকা—একতলা আর দোতলা।

বেশ, বেশ। আমার দিকে ফিরে বললেন, তাই ঠিক করে ফেল তুমি। আমিও তোমাদের সঙ্গে থাকব গেষ্ট হয়ে। আর দেখ, অদ্ধেক বাড়ী-ভাড়া আমি দেব।

আপনি—

আরে না, না, বোঝ না, আজকালকার দিনে কারও ভার হয়ে থাকা ঠিক নয়। আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলকার অবস্থাই তো সমান; এর জন্ম কিন্তু-কিন্তু করছ কেন, ছোট ভাই কি বড় ভায়ের রোজগারের টাকা নেয় না?

চোখে জল এল। পা ছুঁয়ে মনে মনে বললাম, এমন দাদা পাওয়ার সেই ভাগ্য সকলের হয় না, ধন্য আমি!

পরের সপ্তাহে গেলাম 'গ্রন্থাবলী' নিয়ে। ওঁর হাতে দিতেই কি আনন্দ!—বেশ, বেশ। ওই 'শাশ্বত পিপাসা'খানা অনেক দিন আগে দিয়েছিলে—হারিয়েছিলামও। এখন আর একবার পড়ব। আমার নাতনীটিও গল্প, উপন্যাস পড়তে ভালবাসে। বই পেয়ে ও নিশ্চয় খুশী হবে। আর দেখ, তোমাকেও আমার একখানি বই দেব।...বইখানা সজনী বার করেছে। বঙ্গমঙ্গল, প্রসাদী আর ঝরাফুল—এই তিনখানা বই ওতে আছে—তাই নাম দিয়েছে ত্রয়ী। চল্লিশ বছরের ওপর হ'ল বইগুলি ছাপা হয়েছিল, এখন পাওয়া যায় না। যাই হোক, একসঙ্গে বার হ'ল—এখন কিছুদিন তো লোকের সামনে থাকুক।

বলে ষ্টীলের সুটকেশ থেকে বই বার করে কলম তুলে নিলেন।

এই অল্প আলোয়—বিনা চশমায় লিখতে পারবেন?

চশমা তো নিই না—চাল্‌সে কাটিয়ে উঠেছি যে। ঠিক লিখব শুধু লাইনটি ধরিয়ে দিও—লাইন ছেড়ে গেলে মুশকিল হয়।

বইয়ের পাতা খুলে বললেন, এইখান থেকে আরম্ভ করি, কেমন?

ত্রয়ীর ভূমিকা-পৃষ্ঠায় ৩১.১০.৫৪ তারিখে ওঁর আঁকাবাঁকা স্বাক্ষরটি এখনও জল্ জল্ করছে।

বই দেওয়া হয়ে গেলে ট্রাঙ্ক থেকে একখানি খাতা বার করলেন। কলম আর খাতা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এইবার তোমাকে একটি কাজ করতে হবে ভাই। প্রকাণ্ড একটা কবিতা লিখেছি—চারশ' লাইন হবে, কি বেশীই হবে। সেকালের যত স্মৃতি-কথা ওর মধ্যে আছে। সতীশ বাগচির কথা—ওর গিরিডির বাড়ীর কথা, আরও অনেক কথা। নাম দিয়েছি 'শেষ পসরা'। ওর মধ্যে বেশ ভাল ভাল অনেকগুলো লাইন আছে—চমৎকার লাইন। সেগুলো রেখে—আর কোথায় কি অসঙ্গতি রয়েছে দেখে কবিতাটি ছোট করে দাও তো। যা তোমার ভাল লাগবে না, নির্ম্মম ভাবে কেটে দাও।

খাতা খুলে দেখি ইতিমধ্যে লাইনগুলো যথেষ্ট কাটাকুটি করা হয়েছে। অত্যন্ত খুঁতখুঁতে ছিলেন কবি—ধ্বনি ও শব্দ সম্বন্ধে এমনই সজাগ ছিল ওঁর কান যে, বার বার পড়ে ও কাটাকুটি করে ঠিক জিনিষটি না বসানো পর্য্যন্ত আশা মিটত না।

বললেন, একটু কষ্ট হবে, তা আর কি করবে ভাই। অনেক-গুলো ভাল লাইন না থাকলে সবটাই বাদ দিতাম। ওই ভাল লাইনগুলি উদ্ধার করতেই হবে।

বয়োজীর্ণ কবিকে বড় অসহায় মনে হ'ল। নূতন করে লেখার সামর্থ্য প্রায় নাই, পুরাতনের মোহও কাটছে না। ঠিক মোহ নয়—পরিমার্জ্জনায় পরিশ্রমে অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েছেন। দৃষ্টিশক্তি গেছে—লিখতে গেলে হাত কাঁপে, একজন সূত্রধার না হলে নিজেকে বড়ই অসহায় মনে করেন। অথচ মনে প্রকাশ ব্যাকুলতা কিছুমাত্র হ্রাস পায় নি। সর্ব্বপ্রকারে পরমুখাপেক্ষী কবির ভাবোদ্বেল চিত্তকে বশে রাখা যে কি মর্ম্মান্তিক ব্যাপার তা ভুক্তভোগী ছাড়া বোঝেই বা কে! কিন্তু ছন্দ-পরিমার্জ্জনার ভার দিচ্ছেন যার উপর তার যোগ্যতার কথা একদম ভুলেই যাচ্ছেন। ধ্বনি মাত্রা বর্ণ

সম্বন্ধে তার কতটুকুই বা জ্ঞান, ছন্দে বাক্যের মণিমুক্তা সাজানো তার পক্ষে দুঃসাধ্যই। উপায় কি! কবির আগ্রহে এক-একটি করে লাইন পড়ি, মন্তব্য করি, কখনও বা একটি শব্দের পরিবর্তে আর একটি শব্দ যোজনা করি, এবং একসঙ্গে দশ-বিশ লাইন নির্মম-ভাবে কেটে দিই। এমনি করে দু' ঘণ্টা পরিশ্রমে আধাআধি কাজ এগোতেই কবি বললেন, আজ থাক ভাই, রাত হয়েছে। আর একদিন এসে বাকিটা ঠিক করে দিও। ওটুকু নাতনীকে দিয়ে ফেয়ার করিয়ে নেব।

কয়েকদিন পরে ওঁর কাছে গেলাম।

সেদিন অবশ্য কবিতা সংস্কার করবার সুযোগ হয় নি। আমায় দেখে বললেন, এসেছ ভাই—তোমার কথাই ভাবছিলাম। কালই আমি কামালপুরে চলেছি। পাঁচই অগ্রহায়ণ আমার জন্মদিন—ওখানেই ওরা জন্মতিথি পালন করবে। যাবে তো তুমি?

কি জানি, বাড়ীতে যে রকম ভুগছে—

ও—তা বটে। তা যেতে না পার একটা লেখা পাঠিয়ে দিও, ওরা পড়বে। যাই হোক, কাল আমি এখান থেকে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে যাব। সেটা মেস-বাড়ী, সেখানে রাত কাটাব না—সঙ্গে সঙ্গেই চাকদহ। তা তুমি ফোনে হোক, কি দেখা করে হোক, আমার ভাগ্নী-জামাইকে একটা খবর দিও যেন সে সকাল সকাল মেসে ফিরে আসে। আচ্ছা সে যদি পাঁচটার মধ্যে ওখানে না আসে—আমাকে কি আর কেউ তাঁর ঘরে বসতে দেবেন না একটু-খানি? না হয় কবি বলে আমার পরিচয় দেব।

ওঁর ব্যাকুলতা দেখে হেসে ফেললাম। বললাম, নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি, যেমন করে হোক খবর পাঠাব আমি।

দেখ ভাই, যেন কলকাতার মেসে রাত কাটাতে না হয়।

আর দু'একদিন থাকুন না হাওড়ায়?

আরে রামঃ, হাওড়া জায়গা তেমন ভাল নয়, শরীরটা বড্ড খারাপ হয়ে পড়েছে। কালই যাব।

জানি চিরদিনের খেয়ালী উনি, যদি মন টানল তো কার সাধ্য ধরে রাখে!

প্রণাম করে উঠতেই বললেন, কিন্তু তুমি কোথায় চেঞ্জে যাবে বললে না তো?

এখনও ঠিক করি নি কিছু—এলাহাবাদ কি লক্ষ্ণৌ যেতে পারি।

বেশ, বেশ। কিন্তু যদি ভুবনেশ্বরে যাও, আমায় খবর দেবে, আমি চলে আসব কামালপুর থেকে। বেশ জায়গা ভুবনেশ্বর।

বলা বাহুল্য, ভুবনেশ্বরে যাওয়া হয় নি।

সুদূর পশ্চিমে দ্বারকাধামে যখন পৌঁছেছি কোন আত্মীয়ের পত্রে তখন জানলাম—কবি শান্তিপুরে যাবেন মনস্থ করেছেন। বিস্মিত হলাম। ইদানীং শান্তিপুরে যাবার কথা উঠলে—সত্রাসে বলতেন, না, না, ওখানে নয়। ওখানে গিয়ে সেবার বড় ভুগেছি, পা খানা ত যাবার সামিল হয়েছিল।

শুধু কি দেহের চিন্তা? বাল্য কৈশোর যৌবনের লীলাভূমি অতীত-স্মৃতির পীড়নে ওঁকে জর্জ্জরিত করে তুলত। যারা ছিল সঙ্গী সাথী—কেউ বা দেশান্তরে, অধিকাংশই লোকান্তরে! গৃহে প্রদীপ জ্বালবার কেউ নেই—বহুদিন হ'ল গৃহলক্ষ্মী চিরতরে চলে গেছেন, ছেলেরা দেশান্তরে, মেয়ে নিজের সংসারে বাঁধা পড়েছে। অপটু দেহ কার স্নেহ-ভক্তি-ভালবাসার পরিচর্য্যায় সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন? অন্তর-বাহিরের সম্পদে ও সৌন্দর্য্যে এই ভবনই একদিন পরিপূর্ণ ছিল। আজ ভবনের শ্রী চলে গিয়ে ভুবন হয়েছে অন্ধকার। সেই অন্ধকারে বাস করার কল্পনাতে কেঁপে ওঠেন কবি। বলেন, না, না, শান্তিপুরে আর নয়।

আশ্চর্য্য, শেষ পর্য্যন্ত শান্তিপুরেই গেলেন কবি। দেশের মাটি—জন্মভিটার মাটি স্নেহের কোল পেতে তাঁর অপেক্ষা করছিল। যে জলহাওয়া আর আলোয় পরিপুষ্ট হয়েছে দেহ—পরিপূর্ণ হয়েছে মন—উন্মেষিত হয়েছে সুকুমার বৃত্তিগুলি—চৌদ্দ বছর বয়সে প্রকৃতির রূপ রস সৌন্দর্য্যকে অক্ষরের কুসুমে বন্দী করে বঙ্গজননীর চরণে দিয়েছেন উপহার—সেই মাটি-মা আহ্বান পাঠান পরিশ্রান্ত কবিকে। সে আহ্বান উপেক্ষা করার সাধ্য কারও নাই; সে যে মায়ের কোল—কেনা মাটি।

দীর্ঘ দু'মাস পরে বাংলায় ফিরে খবর পেল্যুম—কবি শান্তিপুরে গেছেন। মন উৎফুল্ল হ'ল। দেশের মাটিতে বসে প্রথম দিনটিতে যেমন একান্ত করে পেয়েছিলাম কবিকে তেমনি তাঁর কাছে বসে প্রথম দিনের গল্প করব, শুনব তাঁর কথা—আস্বাদ করব স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা। কিন্তু হায়, সপ্তাহ কাটল না, রবিবারে সংবাদপত্র খুলে দেখি কবি মহাপ্রয়াণ করেছেন। মনে ইচ্ছা জাগামাত্র যেমন অধীর আগ্রহে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছুটে যেতেন—তিলমাত্র অপেক্ষা করতেন না কারও জন্য—তেমনি আগ্রহেই বুঝি—এই ভুবন ছেড়ে অন্য ভুবনে চলে গেলেন।

বহুদিন থেকেই শেষযাত্রার দিন গুনছিলেন কবি। সুদীর্ঘ বত্রিশ বছর গৃহলক্ষ্মীহারা হয়ে পথের মাঝে বেঁধেছিলেন বাসা। রোগ শোক দুঃখ-দহনে অন্তরে ওঁর তিলমাত্র শান্তি ছিল না। তবু কাব্য-লক্ষ্মীর ধ্যানে বসলে সব বেদনা ভুলে যেতেন। ঝরাফুলে 'পদ্মাতটে' কবিতার শেষ কয়েকটি ছত্রে তাঁর যাত্রাশেষের প্রতীক্ষা ও অন্তর্বেদনার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে:—

> জানিনে যাত্রা কোন্‌খানে শেষ,
> কবে উতরিব সন্ধ্যার দেশ,—
> পূর্ণ পক্ক ফলের মতন
> বৃন্ত-ভ্রষ্ট টুটিবে জীবন
> সকল বেদনা এড়ায়ে।

আমাদের অজানা সৈনিক

বিলকুইস সৈয়দীন

সে ছিল একটি সুন্দর শিশু, দৃষ্টি তার মধুর, স্বাস্থ্য এবং আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি সে। তার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের পরিকল্পনা করে কি আকুল আগ্রহের সঙ্গেই না তাঁরা কয়টি মাস তার প্রতীক্ষা করেছিলেন! তখনও এই অদেখা অজানা ছোট্ট শিশু-সন্তানটি—তাঁদের পরস্পরকে পরস্পরের যতটা ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এনেছিল, তাঁদের বিবাহিত জীবনের কয় বৎসরের মধ্যে ঠিক তেমনটি হয়ে ওঠে নি। এখন যদি তাঁদের গোটা সংসার এত অসহায় এবং কষ্টদায়ক অথচ এত প্রিয় ও মধুর এই ছোট মেয়েটিকে কেন্দ্র করে আবর্ত্তিত হয় তা হলে তাতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে?

মেয়েটি বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের উচ্চাভিলাষও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে লাগল এবং তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতেও হয় ত সে সক্ষম হ'ত, কেননা বুদ্ধি এবং অধ্যবসায় দুই-ই তার ছিল। তাকে ভর্তি করে দেওয়া হ'ল একটি কনভেণ্ট স্কুলে, সেখানে পড়াশুনায় তার দ্রুত উন্নতি অনেকের ঈর্ষার হেতু হয়ে দাঁড়াল। সে ছিল অমায়িক প্রকৃতির এবং অতি সত্বরই সে শিক্ষক এবং স্কুলের সঙ্গীদের স্নেহ ও প্রশংসা অর্জ্জন করতে সমর্থ হ'ল। সে ছিল সুখী—খুবই সুখী! মানুষ যা চায়—স্নেহপরায়ণ পিতামাতা, বোদ্ধা শিক্ষক, অকপট বন্ধু সবকিছুই তার ছিল। উৎকৃষ্ট এবং সুন্দর জিনিসে পরিপূর্ণ ছিল তার ক্ষুদ্র রাজ্য; সত্যি কথা বলতে কি, তার সবকিছুই ছিল অত্যুত্তম।

হাঁ, তাই ছিল বটে, কিন্তু তার পরে নেমে এল অন্ধকার, অপ্রত্যাশিত এবং পরিপূর্ণ অন্ধকার, তার রাজ্য বিধ্বস্ত হ'ল, হারিয়ে গেল তার যাবতীয় মূল্যবান সম্পদ। সে আক্রান্ত হ'ল মারাত্মক ব্যাধি—পলিওতে। হীন, নির্ম্মম প্রকৃতি ভেঙে ফেলল তার সুখের পরিপূর্ণ পাত্রটিকে।

তার পিতামাতার দুঃখের আর পরিসীমা রইল না। অদৃষ্ট তাদের আদরের শিশুটির প্রতি কেমন করে এত নিষ্ঠুর হতে পারল? কিন্তু তাঁদের উপর নিয়তির যে নিদারুণ কৌতুক-লীলা অভিনীত হ'ল সে সম্বন্ধে চিন্তা করবারই বা সময় কোথায়! এদিকে যে মেয়েটির জীবন বিপন্ন হবার উপক্রম। তাকে বাঁচাবার জন্যে তাঁরা মরীয়া হয়ে চেষ্টা করতে লাগলেন। বিশিষ্ট চিকিৎসা-ব্যবস্থার অধীনে তাকে রাখা হ'ল এবং চিকিৎসকেরা যখন জীবন ও মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করছিলেন, তাঁরা তখন রুদ্ধশ্বাসে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে, অলৌকিক কিছু ঘটবার প্রতীক্ষা করছিলেন—নীরব প্রার্থনায় তাদের ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হচ্ছিল।

অলৌকিক ব্যাপার শেষ পর্য্যন্ত ঘটল। মেয়েটির জীবন রক্ষা হ'ল। কিন্তু কোন পরিস্থিতিতে? দণ্ডাদেশ তখন উদ্ঘোষিত হয়ে গেছে—সারা জীবন তাকে থাকতে হবে পঙ্গু হয়ে। আর কখনও পারবে না সে নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে। বান্ধবীদের সঙ্গে খেলা করবার জন্যে আর কখনও সে ছুটে যেতে পারবে না। একটি চক্রযুক্ত চেয়ারে বন্দিনী হয়ে থাকতে হবে তাকে, অথবা দীর্ঘকালব্যাপী চিকিৎসার পর হয়ত বা সে কৃত্রিম পা অবলম্বন করে হাঁটতেও পারে।

কাজেই এইটেই হতে চলেছিল তার ভবিষ্যৎ পরিণাম। মুক্তির একটিমাত্র পথ ছিল তার—মৃত্যু, মরবেই সে।

না সে মরবে না। অদৃষ্টকে সে তার উপরে জয়ী হতে দেবে না। সে রুখে দাঁড়াবে এবং যুঝবে প্রতিকূল অদৃষ্টের সঙ্গে। হাঁ, সুখের উপর তার হারানো অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে সে প্রাণান্তকর লড়াই করবে। এবং লড়াই সে করেও ছিল। প্রতি পদক্ষেপে তার নিষ্ঠুর শত্রু—যে তার পথে সৃষ্টি করেছিল অনতিক্রম্য প্রতিবন্ধ—তাকে করছিল পরিহাস। কোনও স্কুলই তাকে নেবে না। কেননা সে পঙ্গু—তার দায়িত্ব গুরুতর এবং অন্যান্য শিশুদের পরিহাসের পাত্র সে। কোনও সংস্থায়ও যোগ দিতে পারল না সে, কেননা, পঙ্গুর সঙ্গে খেলা করতে চাইবে কে? সাহস এবং বীরত্বের সঙ্গে মেয়েটি সকল বাধার সম্মুখীন হ'ল—অন্তরে তার একাকিত্বের তীব্র বেদনাময় অনুভূতি, নিজেকে তার মনে হ'ত নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর এবং অসুখী।

তারপর সে যা খুঁজছিল তা পেলে, সে এমন সব লোকের সংস্পর্শে এল যারা তাকে বহুকালের হারিয়ে-যাওয়া বন্ধু বলে স্বাগত করলে। ওরা অনায়াসে তাকে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত শিশুদের ক্লাবের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। তাঁরা সাহায্য করলেন তাকে তার স্বাভাবিক গুণাবলী ও শক্তির বিকাশসাধনে—সঙ্গীত, হিন্দী এবং চিত্রবিদ্যা-শিক্ষায়। ক্রমে ক্রমে তাঁরা তার আত্মবিশ্বাসের ভিত্তিপত্তন করে দিলেন তার পর অন্যদের মধ্যে যাতে সে নিজের স্থানটি খুঁজে পেতে পারে, সে ভার তার উপরেই ছেড়ে দিলেন। তাই বলে একথা মনে করবার কারণ নেই যে, তখন তার অঙ্গহীনতা নিয়ে কেউ কোনরকম বিরূপ মন্তব্য করত না। তা করত সত্য, কিন্তু এ ধরণের অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার তার আত্ম-বিশ্বাসের ভিত্তি শিথিল করতে সক্ষম হ'ত না। সে এমন কিছু অর্জ্জন করেছিল যার দরুন, সে যে ভাগ্যকর্তৃক বঞ্চিত

হয়েছে এ বোধ তিরোহিত হয়ে তার পরিবর্ত্তে সন্তোষ ও সুখানুভূতিতে তার মনের প্রশান্তি ফিরে এল।

ওখানেই তার সঙ্গে আমি দেখা করি। সে বসেছিল তার চক্রযুক্ত চেয়ারে। তার ঠোঁটের উপর মাখানো মৃদু হাসি, কতকগুলি প্রশংসমান দৃষ্টি তাকে ঘিরে রেখেছিল আর সে নিকটবর্ত্তী সমুদ্রতীর থেকে যোগাড় করা খোলা দিয়ে তৈরি করছিল একটি সুন্দর পুতুল। এই খোলার পুতুল নির্ম্মাণে তার নৈপুণ্য প্রশংসনীয়।

যেরূপ অবলীলাক্রমে এবং আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সে তার চারপাশের শিক্ষার্থীদের এর নির্ম্মাণ-কৌশল শেখাচ্ছিল তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। সে যখন তার গভীর পিঙ্গ. চোখ দুটি তুলে আমার পানে তাকালে, তখন আমি লক্ষ্য করলাম সাহসিকতা এবং আনন্দের দীপ্তি থাকা সত্ত্বেও চক্ষুদ্বয়ে তার অতীত অগ্নিপরীক্ষার ক্ষীণ আভাস রয়ে গেছে—আমার মুখ দিয়ে স্বতঃই বেরিয়ে এল সহানুভূতি এবং করুণাপূর্ণ বাক্য। এই দুর্ব্বল মেয়েটির শক্তির আভ্যন্তরীণ উৎস, প্রতিকূল অদৃষ্টের সঙ্গে সংগ্রামে সুখী হওয়ার ক্ষমতা এবং বীরত্বপূর্ণ বিজয়লাভে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে আমি ফিরে এলাম।

পঙ্গু শিশুদের সমস্যা

"স্বাস্থ্য, শক্তি ইত্যাদির পুনরুজ্জীবন যেমন শরীরের তেমনি অন্তর-সত্তার উপর নির্ভর করে। শরীর এবং মন এ দুটি পরস্পর পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত, একটিকে ছাড়া আর একটির আরোগ্য-বিধান অসম্ভব।" এই কথাগুলি বলেছেন জন গল্‌সওয়ার্দি।

পঙ্গু শিশুদের বেলায় আমাদের ব্যবহারিক প্রক্রিয়াসমূহ থেকে আমরা যদি সর্ব্বোত্তম ফললাভ করিতে চাই তাহা হইলে এই মূলগত সত্যটি মনে রাখিয়া আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে। যখন আমরা পঙ্গু অবস্থাপ্রাপ্ত কোন শিশুর চিকিৎসা করি তখন তার স্বাধীনতাবোধের যাহাতে বিকাশ-সাধন হয় এবং নিজের মৌলিক শক্তির উপর তাহার বিশ্বাস জাগ্রত হয় সে বিষয়ে সহায়তা করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

কোন হাসপাতালে বা আরোগ্য-নিকেতনে যে-কোন শিশুকে এই দিক দিয়া সহায়তা করিবার একটি পন্থা হইতেছে তাহার নিজস্ব জগতের পরিবেশ যতদুর সম্ভব সৃষ্টি করিয়া দেওয়া—তাহার সাধারণ গৃহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, স্কুলের কাজ, আমোদ-প্রমোদ এবং যে সকল কাজকর্ম্ম তাহার শারীরিক অবস্থার উপযোগী সেগুলির ব্যবস্থা করা, আর তাহার সমবয়সী শিশুদের সাহচর্য্যলাভের সুযোগ করিয়া দেওয়া।

এই সকল প্রচেষ্টা শুধু আরোগ্যবিধানের দিক দিয়া নয়, আমরা যে ব্যষ্টি হিসাবেও তাহার সম্বন্ধে ভাবিয়া থাকি বিশেষ ভাবে সেই দিক দিয়া তাহার নিকট মূল্যবান বলিয়া গণ্য হইবে। কাজেই আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা যেন তাহাকে তাহার নিজের উপর এবং আমাদের উপর তাহার আস্থা বজায় রাখিতে উৎসাহিত করে।

তাহার মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া দিবার জন্য চিকিৎসক, নার্স, সমাজকর্ম্মী, ওয়ার্ড মেইড, আর্দালী সকলেই সাহায্য করিতে পারে যদি তাহারা তাহার সঙ্গে ব্যবহার করিবার সময় মনে রাখে যে, সে-ও একটি ব্যক্তিসত্তা, সে যে ভাঙা অথবা মচকানো পা-ওয়ালা শিশু এইটাই তাহার আসল পরিচয় নয়।

যাঁরা এই ধরণের শিশুদের স্বাস্থ্যের পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা যদি তাহার ব্যক্তি-সত্তার কথা ভুলিয়া যান এবং কাজ করিবার সময় কেবল বিশেষ পদ্ধতি লইয়াই ব্যাপৃত থাকেন আর সেই বিশেষ পদ্ধতি ফলপ্রদ না হইলে উত্তেজিত হইয়া পড়েন তাহা হইলে শিশুর পক্ষে সমূহ ক্ষতির কারণ উপস্থিত হয়। তাহার উপর এমন একটি বোঝা চাপানো হয় যাহা বহন করা তাহার সাধ্যের অতীত হইতে পারে।

বস্তুতঃ, যদি না শিশুর সঙ্গে আমাদের প্রীতি, আস্থা এবং পারস্পরিক সম্মানের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে তাহার প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধানের জন্য আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতে পারে। কাজেই একথা মনে রাখিতে হইবে যে, পঙ্গু শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশই হইতেছে তাহার চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ। শিশুকে তাহার পক্ষে যতদুর সম্ভব উৎকৃষ্ট জীবন-যাপনের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে।

চিকিৎসা ব্যাপারে চিকিৎসক নার্স সমাজকর্ম্মীকেই শুধু নয়, পঙ্গু শিশুর নিজেকেও অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। পঙ্গু শিশুর চিকিৎসা-ব্যাপারে চূড়ান্ত রকমের সুফল পাইতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখিতে হইবে: (১) শিশুর প্রয়োজন কি কি তাহা জানা, (২) তন্মধ্যে যতগুলি সে

নিজে মিটাইতে পারে তদ্বিষয়ে সাহায্য করা, (৩) তাহার মধ্যে এমন শক্তি সঞ্চারিত করা যাহাতে ক্রমে ক্রমে অন্যান্যগুলিও সে নিজেই মিটাইতে সমর্থ হয়।

এই ধরণের চিকিৎসা হইতেছে শিশু এবং তাহাকে সাহায্য করিতে তৎপর পূর্ণবয়স্কদের মধ্যে পারস্পরিক বুঝাপড়ার ব্যাপার। কেবল হাসপাতালের কর্ম্মীবৃন্দ নয় শিশুর পিতামাতাও যখন তাহাকে অবস্থানুযায়ী নিজের কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য উৎসাহিত করেন তখন পূর্ণবয়স্কদের অতিরিক্ত উদ্বেগের দরুন শিশু একেবারে মাটি হইয়া যাইবে একথা মনে করিবার কোনও কারণ নাই।

কখনও কখনও কোন প্রকার রোগের দরুন চিকিৎসাধীন ছোট ছেলে বা মেয়ে নিতান্তই শিশুর মত ব্যবহার করে। সে নিজে নিজে খাইতে চায় না, অথবা অন্য প্রকারে নিজের শৈশবের একেবারে গোড়ার দিকে ফিরিয়া যাইতে চায়। ইহা যদি স্বল্পকালস্থায়ী হয় ত ভাবনার কিছুই নাই, এবং কেহ তাহার মনে অতিরিক্ত পরনির্ভরপরায়ণতার ভাব জন্মাইয়া না দিলে ইহা স্থায়ী হওয়ারও সম্ভাবনা নাই। কিন্তু একথা আমাদের ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয় যে, নিরন্তর পরনির্ভরতা শিশুকে স্থায়ী ভাবে অশক্ত করিয়া ফেলিতে পারে।

পঙ্গু শিশুকে আমাদের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করিতে দেওয়া উচিত নয়, বরং ইহাই আমাদের দেখানো প্রয়োজন যে তাহার ভিতরে যে স্বাস্থ্য-শক্তি নিহিত আমরা সে সম্বন্ধে সচেতন। এই শক্তি যাহাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় সেই সুযোগই আমাদের করিয়া দেওয়া উচিত।

পঙ্গু শিশুদিগকে আমরা অন্যান্য সুস্থ শিশুদের নিকট হইতে পৃথক করিয়া রাখিতে চাই না, কিন্তু তাই বলিয়া তার শারীরিক অপটুতা অন্যান্যদের সঙ্গে তাহার যে পার্থক্যের সৃষ্টি করে তাহাকেও আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। যে বুদ্ধিমান শিশু শারীরিক দিক দিয়া অপটু সে জানে যে, সে কোন্‌খানে অন্যান্য শিশুদের চেয়ে পৃথক।

কোন কোন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি অবশ্য পঙ্গু শিশুর মনে এই ধারণা জন্মাইয়া দিতে পারেন যে, সে যদি চূড়ান্ত রকম চেষ্টা করে তাহা হইলে অন্যান্য শিশুদের মত সেও যে-কোন কাজ করিতে সমর্থ। শিশুকে মাত্রাতিরিক্ত যত্নে রক্ষণের ন্যায় এই ভাবে জোর করিয়া কাজে প্রবৃত্ত করানোও সমান ক্ষতিকর। এই দুইটির যে-কোনটিই তাহার জীবনকে অসুখী করিয়া তোলে। এতদুভয়ের মাঝখানে এমন একটি দিক আছে যাহা গঠনমূলক, এবং বাস্তব—শারীরিক দিক দিয়া অপটু শিশুকে ব্যষ্টি হিসাবে জানার প্রয়াস হইতে ইহার সূচনা। আমাদিগকে তাহার সঙ্গে কথা বলিতে হইবে, তাহার কথা শুনিতে হইবে। অবশ্য তাহার শারীরিক অপটুতার কথা শুনিলেই কেবল আমাদের চলিবে না, তাহার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধেও আমাদিগকে সচেতন হইতে হইবে। অনেক সময় শিশু নিজেই তাহার ব্যক্তিত্বের সূত্র ধরাইয়া দেয় যখন সে বলে, "আপনি জানেন যে, আমি অন্যান্য ছোটদের মত দৌড় ঝাঁপ এবং লম্ফ ঝম্ফ করতে পারি না। কিন্তু আমি আঁকতে পারি।" আমরা গম্ভীরভাবে তার কথা শুনি, বলি—"হাঁ, তা ঠিক, তুমি ঠিকই আছ, লাফালাফি এবং দৌড়-ঝাঁপ ছাড়াও জীবনে অনেককিছু করবার আছে।"

সাধারণ বুদ্ধিমান ছেলেকে অতি যত্নে রক্ষণ বা জোর করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত না করিলে সে অন্যান্য শিশুদের মধ্যে নিজের স্থানটি করিয়া লইতে পারিবে এবং আমরা যারা বয়স্ক আমাদের বরং তাহাদিগকেই ইহা করিতে দেওয়া উচিত।

কেবল শারীরিক দিক দিয়া অপটু শিশুদের সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন কর্ম্মীরাই যে এই ধরণের শিশুদিগকে আত্মনির্ভরপরায়ণ হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করিতে পারে তাহা নয়, শিক্ষক এবং পিতামাতারাও অনুরূপ আচরণ করিবার শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। বিশেষজ্ঞ কর্ম্মীদের উচিত, তাঁহারা নিজেরা যে সকল জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তন্মধ্যে কিয়দংশ শিক্ষক এবং পিতামাতাকে প্রদান করা, কেননা শিশুরা তাঁহাদেরই দৈনন্দিন সাহচর্য্য ও সাহায্য লাভ করিয়া থাকে।

অনেক সময় পিতামাতারা গৃহে পঙ্গু শিশুর প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ প্রদান করেন, ফলে অন্যান্য শিশুরা উপেক্ষিত হয়। ইহাতে পঙ্গু শিশুর ক্ষতি হয় দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, ইহাতে তাহার ভ্রাতা-ভগিনীরা তাহার উপর বিরূপ হইয়া উঠিতে পারে; দ্বিতীয়তঃ, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে এই আশা করিতে পারে যে, সবকিছুই তাহাকে কেন্দ্র করিয়া আবর্ত্তিত হউক, যখন ইহার ব্যত্যয় ঘটে, তখন সে মনে করে সকলেই তার বিপক্ষে। পঙ্গু শিশুর পিতামাতা যখন তাহাকে সে যেমনটি ঠিক তেমনি ভাবে গ্রহণ করেন এবং তার অবস্থার জন্য নিজেদের দোষী বলিয়া মনে করেন না তখন উক্ত শিশু পরিবারের অন্যান্যদের মতই স্বকীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহার আবেগময় জীবনেরও স্থায়িত্ববিধানের সুযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে।

পাটশিল্পে নারী

ভারতে গুরুত্বের দিক দিয়া তুলা-শিল্পের পরেই পাটশিল্পের স্থান। যন্ত্রশিল্পের প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে বাংলা দেশে হস্তচালিত তাঁতে-তৈরি পাটশিল্প ছিল বিশেষ সমৃদ্ধ এবং বাংলাদেশই ভারতের বাহিরে ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, মালয়, সিংহল এবং আরবে রপ্তানী-করা সমগ্র পাটতন্তু সরবরাহ করিত। কিন্তু ডাণ্ডি কোম্পানী পাটজাত দ্রব্যের যান্ত্রিক উৎপাদন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পর ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এতদ্দেশীয় তাঁত-শিল্পের অবনতির সূচনা হইল। তার পর বাংলা দেশে বৈদ্যুতিক শক্তি-চালিত কারখানাসমূহের প্রতিষ্ঠা তাঁতের ব্যবসায়কে ধ্বংস করিল। ভারতের প্রথম পাটকল প্রতিষ্ঠিত হইল শ্রীরামপুরে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। বর্ত্তমানে কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই ১০১টি পাটকল আছে এবং ভারতরাষ্ট্রের অন্যান্য অংশে পাটকলের সংখ্যা মাত্র এগারটি।

পাটকলে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ২,৫০,০০০ জন, তন্মধ্যে নারী-শ্রমিক প্রায় ২৬,০০৫ অর্থাৎ, মোট শ্রমিকের শতকরা ১০.১ ভাগ হইতেছে নারী। কয়েক বৎসর আগে নারীদের হার ছিল শতকরা ১৪ জন। ইহা হইতে দেখা যায় যে, পাটশিল্পে নিযুক্ত নারী-শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। দেশের যাবতীয় শিল্পে কর্ম্মরত নারী-শ্রমিকের মোট সংখ্যা অর্দ্ধ লক্ষ এবং ভারতের সমগ্র নারী-শ্রমিক দলের মধ্যে শতকরা প্রায় পাঁচ জন পাটশিল্পে কর্ম্মে নিযুক্ত। সুতরাং কোনমতেই তাহারা উপেক্ষণীয় নহে।

হুগলী নদীর দুই তীরে কলিকাতার উভয় পার্শ্বে প্রায় ষাট মাইল দীর্ঘ এবং দুই মাইল প্রস্থ অঞ্চল জুড়িয়া পাট-শিল্প কেন্দ্রীভূত। মাড়োয়ারী ও স্কচরাই বেশীর ভাগ মিলের মালিক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিলগুলি শেষোক্ত-দের দ্বারা পরিচালিত। সাধারণ পাটকল কাপড়ের কল অপেক্ষা আয়তনে বড় এবং প্রধান কারখানায় এমন এক বা একাধিক বড় 'শেড' থাকে যাহাতে এক প্রান্ত দিয়া সোনালী আঁশ কাঁচা মাল রূপে প্রবেশ করে এবং অপর প্রান্ত দিয়া তৈরি মাল (finished product) রূপে বাহির হয়।

প্রথমতঃ, পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ এবং অন্যান্য প্রদেশের ভূমিহীন কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে শ্রমিক দলকে লওয়া হইত। কিন্তু এই শিল্পের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যা, অন্ধ্র এবং বিহার প্রভৃতি বহিরঞ্চল হইতে শ্রমিকদের আগমন সুরু হইল। সাম্প্রতিক কালে পাটকলে নিযুক্ত বাঙ্গালীর সংখ্যা খুব কম এবং শ্রমিক দলের মধ্যে এখন বিভিন্ন ভাষাভাষী রাজ্যসমূহ হইতে আগত বিভিন্ন জাতীয় লোকের বিচিত্র সমাবেশ হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে মোটা অংশ হিন্দু, মুসলমান নারীরা সংখ্যালঘিষ্ঠ।

যে সকল বিভাগে নারীরা কাজ করে সেগুলি হইতেছে —(১) ব্যাচিং, (২) প্রিপেয়ারিং বা প্রস্তুতি, (৩) ওয়াইণ্ডিং বা জড়ানো এবং (৪) হ্যাণ্ড সুইং বা হাতে বোনা। নারীদিগকে কিন্তু 'সফেনার ফীডার' রূপে কাজ করিতে দেওয়া হয় না। ইহার কারণটি শোচনীয়। স্ত্রীলোকেরা ভারী চুড়ি পরিয়া কাজ করিবার জন্য গোঁ ধরে, ফলে এমন একটি ঘটনা ঘটে যাহা বাস্তবিকই দুঃখজনক—একটি মেয়ের হাত যন্ত্রের ভিতরে ঢুকিয়া যায় এবং গুরুতররূপে জখম হয়। অনুনয়-বিনয় এবং যুক্তিপ্রদর্শন দ্বারা নারীদিগকে যখন কিছুতেই ভারী চুড়ি পরার অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে রাজী করানো গেল না তখন ক্রমে ক্রমে এই বিভাগ হইতে তাহাদিগকে অপসারিত করা হইয়াছে। পাটশিল্পে নিয়োজিত নারীদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। ইহাতে এই শিল্প হইতে তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে অপসারিত করিবার প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, অনেক স্বামী-পরিত্যক্তা এবং বিধবা স্ত্রীলোককে পুরুষদের ন্যায়ই—যদিই-বা তাহাদের চেয়ে বেশী নাও হয়—উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হয়। কেননা অনেকের উপরেই বড় পরিবারের তত্ত্বাবধান করিবার দায়িত্ব অর্শে। ব্যাপারটা কিন্তু দাঁড়াইতেছে এই যে, অন্যান্য দেশে যে ক্ষেত্রে কারখানার সহায়িকারূপে নারীদের সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান, সেই ক্ষেত্রে ভারতে ঐ শ্রেণীর নারীদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে।

কোন পাটকলে ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গে যাহা সর্ব্বপ্রথম মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাহা হইতেছে কারখানার অভ্যন্তরস্থ ধূলি এবং হট্টগোল। একথা ভাবিয়া আমি প্রায়ই বিস্মিত হইয়াছি যে, কর্ম্মীরা দিনের পর দিন কেমন করিয়া ইহা সহ্য করে। আমার মনে হয় যে, তাহারা কাজের বিঘ্নোৎপাদক এই উভয় বস্তু সম্পর্কেই পুরাপুরি অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ১৯৪৮ সনের ফ্যাক্টরী আইনে নিম্নোক্ত কথাগুলির উল্লেখ দেখিয়া উৎসাহ বোধ করা যায়ঃ "প্রত্যেক কারখানায়—যেখানে দ্রব্যাদির নির্ম্মাণকার্য্য চলিবার দরুন ধূলি এবং ধোঁয়া বিকীর্ণ হয় সেখানে নিশ্বাসের সঙ্গে যাহাতে ইহা গৃহীত না হইতে পারে সেজন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে…(ধারা ১৪)। একটি বা দুটি মিল সেজন্য বায়ুতে সঞ্চিত ধূলিকণা

প্রসারিত করিবার জন্য যন্ত্রপাতি প্রবর্ত্তন করিতেছে। অন্যান্য কার্য্যোপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থাও—যথা: অত্যধিক লোকের ভিড় কমানো, প্রচুর আলোক, বায়ু-চলাচল, পরিচ্ছন্নতা, পানীয় জল সরবরাহ ইত্যাদির বন্দোবস্ত করাও পাটকলে উপেক্ষিত হয় না। যেমন নারী-কর্ম্মীদের জন্য শৌচাগার-ব্যবস্থার ঢের বেশী উন্নতিবিধান করা যাইত তেমনি অধিকসংখ্যক পিকদান সরবরাহ, বিশ্রাম-স্থল, এবং বস্ত্রাদি ধৌতির সুবিধা ইত্যাদিরও ব্যবস্থা করিতে পারা যাইত।

অধিকাংশ পাটকলের কর্ম্মীকেই কাজ করিবার সময় দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়, কিন্তু কোন কোন ফ্যাক্টরীতে বসিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে এবং নারীরা ইচ্ছা করিলেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে বসিতে পারে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্ত্রীলোকদিগকে ফিনিশিং ডিপার্টমেণ্টে ভারী বোঝা লইয়া যাইতে অভ্যস্ত হইতে হইত, কিন্তু অবশেষে 'ইণ্ডিয়ান জুট মিল্স এসোসিয়েশনে'র 'উইমেন লেবার অফিসারে'র অনুমোদনক্রমে স্থির হইল যে, কুলীরা নারীদিগের পরিবর্ত্তে এই কাজ করিবে। বস্তুতঃ কারখানা আইনে নারীদের পক্ষে ভারী বোঝা বহন করা অথবা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরানো নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং এই বিধান দিয়াছে যে, প্রত্যেক রাজ্যেরই এই বিষয়ে নিজস্ব ক্ষমতা আছে। পশ্চিমবঙ্গ কারখানা আইন অনুসারে স্ত্রীলোকদিগকে পঞ্চাশ পাউণ্ডের বেশী বোঝা বহন করিবার অনুমতি দেওয়া হয় না।

প্রায় প্রত্যেক মিলেই নারী-কর্ম্মীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাযুক্ত ক্যাণ্টিন আছে। অবশ্য চিরাচরিত কুসংস্কারসমূহ 'জেনানা'দিগকে বিনামূল্যে ক্যাণ্টিনের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিতে প্রতিনিবৃত্ত করে।

ইণ্ডিয়ান জুট মিল্স্ এসোসিয়েশনের ওয়েলফেয়ার অফিসার রূপে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকা কালে আমি কয়েকজন নারী-শ্রমিকের ব্যক্তিগত বিষয় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হই—অনেকেই বহুক্ষণ একটানা দাঁড়াইয়া থাকিতে হয় বলিয়া আমার নিকট অনুযোগ করে। এইটুকুই যা দুঃখের কারণ, নচেৎ তাহারা নিজেদের কাজে পুরাপুরি সুখী বলিয়াই প্রতীয়মান হইল। ইহাতে উৎসাহবোধ করিবার কথা যে, কারখানা আইন (ধারা ৪৪) ফ্যাক্টরিগুলিতে কাজের সময় উপবেশনের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়াছে। চিকিৎসা ও সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কিত একটি আলোচনা এবং গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গিয়াছে—"শারীরিক গঠনের দিক দিয়া নারীরা পুরুষ হইতে পৃথক। তাহাদের দেহ ছোট কাঠামোর উপরে তৈরি, তাহাদের সাধারণ উচ্চতা, উপবেশনের ভঙ্গীতে উচ্চতা, বাহুর দৈর্ঘ্য, মুষ্টি ইত্যাদি ক্ষুদ্রতর; কাজেই কি শারীরবৃত্ত কি সমাজতত্ত্ব উভয় দিক দিয়াই নারী-কর্ম্মীরা পুরুষ-কর্ম্মী হইতে পৃথক। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্ম্মে নারীদের যোগদানের ফলে এমন কতকগুলি বিশিষ্ট স্বাস্থ্যঘটিত এবং ব্যক্তিগত সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে যাহার সমাধান বিশেষ আলোচনাসাপেক্ষ। উক্ত রিপোর্টেই উপরন্তু এই কথাও বলা হইয়াছে যে, বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকার দরুন দেহের নিম্নাংশে অস্বাভাবিক রকমের রক্তসঞ্চয় হইয়া থাকে। বহু স্ত্রীলোককে প্রশ্ন করা হইলে তাহারা বলে যে, তাহাদের কাজের পরিমাণ খুব বেশী এবং ইহার দরুন তাহাদের এক ধরণের ক্লান্তি এবং দুর্ব্বলতার সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ স্ত্রীলোকই কিন্তু স্বীকার করে যে, কেবলমাত্র ঘরসংসারের কাজ সমাপ্ত করিবার পরই তাহারা ক্লান্তিবোধ করে। অনেক স্ত্রীলোক আমাকে বলিয়াছে যে, চাঙ্গা হইবার জন্য তাহারা তামাকপাতা এবং তালপাতার মিশ্রণে তৈরি খইনি খাইয়া থাকে, কিন্তু যাহাদিগকে আমি প্রশ্ন করিয়াছিলাম তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই স্বীকার করিয়াছে যে, সে কখনো ধূমপান, মদ্যপান বা অন্য নেশায় অভ্যস্ত হয় নাই।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর পাটকলের কর্ম্মীদের মজুরি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সম্প্রতি নারী-শ্রমিকের সর্ব্বনিম্ন মজুরি ২৬৲ টাকা এবং তাহার মাগ্‌গি-ভাতা ৩৭৷৷৹ আনা। যেখানে ১৯৪৮ সনে তাহার মাসিক আয় ছিল ৫৮৷৷৹ আনা, সেখানে আজ তাহার মোট মাসিক আয় দাঁড়াইয়াছে ৬৩৷৷৹ আনা। তৎপূর্ব্বে তাহাদের আয়ের স্বল্পতা ছিল শোচনীয়। এমন কি, যুদ্ধের সময় যখন জীবিকা-নির্ব্বাহের ব্যয় ছিল অত্যধিক, তখন স্ত্রীলোকের সাপ্তাহিক রোজগার ছিল মাত্র তিন টাকা আর মাগ্‌গিভাতা দুই টাকা। ১৯৩৮ সনে প্রত্যেক স্ত্রীলোক সপ্তাহে রোজগার করিত তিন টাকা এবং মাসে তাহা ১৩৲ টাকায় দাঁড়াইত। আজিকার দিনে বেতনের হার তাই নারী-কর্ম্মীর মনে কতকটা আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করিয়াছে, কেননা ইদানীং যদিও জীবিকানির্ব্বাহের ব্যয় খুবই বেশী তথাপি তাহার বেতন এখন একজন সম্মানিতা স্ত্রীলোকের সমপর্য্যায়ের এবং সেজন্য তাহার মর্য্যাদাও স্বভাবতঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

কারখানায় নারী-কর্ম্মীদের কাজের সময় সকাল ছয়টা হইতে রাত্রি সাতটা পর্য্যন্ত বাঁধিয়া দিতে হয়। দৈনন্দিন কাজের সময় সাড়ে দশ ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হয়। এই সমস্ত নিয়মকানুন পাটশিল্পে কর্ম্মে নিযুক্ত নারীদের প্রতিও প্রযোজ্য। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কোন কোন স্ত্রীলোককে ভোর পাঁচটা হইতে কাজ করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। পাটকলের স্বাভাবিক কাজের সময় হইতেছে

সকাল সাড়ে ছয়টা হইতে বেলা এগারটা এবং একটা হইতে বিকাল পাঁচটা পর্য্যন্ত। ইহাতে দিনের মধ্যভাগে কর্ম্মী দুই ঘণ্টা বিশ্রাম করিতে পারে। যখন অবস্থা স্বাভাবিক থাকে এবং কাঁচা মাল নিয়মিতভাবে সরবরাহ হয় ও তৈরি মালের চাহিদা থাকে তখন মিলে কাজের সময় হইতেছে সচরাচর সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা, কিন্তু দেশবিভাগের পর সোনালি আঁশ সংগ্রহে অসুবিধার সৃষ্টি হওয়ায় ১৯৪৯ সনে কাজের সময় কমাইয়া ৪২॥ ঘণ্টা করা হইয়াছে। যদিও তাহার পর হইতে কাঁচা পাট সরবরাহের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে তথাপি পাটজাত মালের চাহিদা হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়াতে মিলগুলি সপ্তাহে ৪২॥ ঘণ্টাই কাজ চালাইয়া যাইতেছে।

বর্ত্তমানে এমন কতকগুলি মিল আছে যাহা 'ডবল শিফটে' কাজ করে—সকাল ছয়টা হইতে এগারটা, অপরাহ্ন দুইটা হইতে পাঁচটা এবং পাঁচটা হইতে দশটা পর্য্যন্ত। ইহার মানে এই যে, কাজের সময় সবসুদ্ধ এগার ঘণ্টাব্যাপী। বার ঘণ্টা কাজ করিতেও অনুমতি দেওয়া হয়, কেননা আইনের ৫৬ ধারায় উল্লিখিত আছে যে, কাজের সময় সাড়ে দশ ঘণ্টা অতিক্রম করিবে না, তবে প্রধান পরিদর্শক লিখিতভাবে হেতু প্রদর্শন করিলে কাজের সময় বাড়াইয়া বার ঘণ্টা করিতে পারেন।

মধ্যাহ্নের কর্ম্মবিরতিকালে স্ত্রীলোকেরা যে খুব বেশী বিশ্রাম করিতে পায় তেমন নহে। কেননা তখন তাহাদিগকে পায়ে হাঁটিয়া কুলী লাইনে ফিরিয়া গিয়া রান্নাবান্না করিতে এবং শিশুদের দেখাশুনা করিতে হয়। বস্তুতঃ এই দিক দিয়া পুরুষ-শ্রমিকের চাইতে নারী-শ্রমিকের অসুবিধা ঢের বেশী। কেননা তাহাকে কেবল যে ঘরগৃহস্থালির কাজে সময় দিতে হয় তেমন নহে, তদুপরি তার পুরা সময়ের কাজও করিতে হয়। বঙ্গীয় মাতৃমঙ্গল সহায়ক আইন (The Bengal Maternity Benefit Act) নারী-শ্রমিকদের পক্ষে বিশেষ অনুকূল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগকে সন্তানজন্মের পূর্ব্বে চার সপ্তাহ এবং সন্তানজন্মের পরে চার সপ্তাহ—মোট এই আট সপ্তাহ বিশ্রাম লইতে দেওয়া হয় এবং এই সময়ে তাহাদিগকে দৈনন্দিন গড় মজুরি দেওয়া হয়। সন্তান জাত হইবার পূর্ব্বে নয় মাস কাজ না করিলে তাহারা এই 'বেনিফিট' বা আনুকূল্য দাবি করিতে পারে না।

'এমপ্লয়িজ ষ্টেট ইনস্যুরেন্স এক্ট' প্রবর্ত্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বীমাকারিণী স্ত্রীলোক তাহার আয়ের (যাহা দৈনিক বার আনার কম হইবে না) শতকরা পঞ্চাশ ভাগ দাবি করিতে পারিবে এবং তাহাকে বার সপ্তাহের ছুটি মঞ্জুর করা হইবে। এমপ্লয়িজ ষ্টেট ইনস্যুরেন্স এক্ট বলবৎ হওয়ার পর হইতে ১৯৩৯-এর 'মেটার্নিটি বেনিফিট এক্ট' আর কার্য্যকরী হইবে না। কোন স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হইলে ১৯৪৮-এর 'জুট টেক্সটাইল এওয়ার্ডে' তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। সেক্ষেত্রে মিলের মেডিক্যাল অফিসারের সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে গর্ভপাতের পরবর্ত্তী দিবস হইতে পুরা বেতনে উর্দ্ধকল্পে দুই মাসের ছুটি মঞ্জুর করা হইবে। এই অধিকার এমপ্লয়িজ ষ্টেট ইনস্যুরেন্স এক্ট প্রবর্ত্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকিবে।

অনেকগুলি মিলে এমন সব প্রসূতি হাসপাতাল এবং ক্লিনিক আছে যেখানে বিনামূল্যে সন্তান-প্রসব-কার্য্য সম্পন্ন করাইবার ব্যবস্থা আছে। প্রসূতি-আগারের ব্যবস্থা করা অবশ্য মিলগুলির পক্ষে বাধ্যতামূলক নহে এবং অনেকগুলি মিলে এখনও পর্য্যন্ত একটিও প্রসূতি-আগার নাই। ফলে স্ত্রীলোকদিগকে এমন সব দাইয়ের উপর নির্ভর করিতে হয় যাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে যাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। নারীদের আভ্যন্তরীণ নানা জটিলতা এবং তাহাদের স্থায়ী অনিষ্ট নিবারণ করা যাইত প্রসূতিসদন প্রতিষ্ঠা দ্বারা আনাড়ী দাইদিগকে কাজ করা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলে—কিংবা তাহাদিগকে মাতৃনীতি শিক্ষাদান করিয়া উপযুক্ত সাজসরঞ্জামসহ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেও সন্তান-প্রসবের বেলায় স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন করার দরুন যে সকল শোচনীয় ব্যাপার সঙ্ঘটিত হয় তাহার নিরাকরণে সাহায্য হইত। অনেকগুলি প্রগতিশীল মিলে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার ক্লাস খোলা হইয়াছে এবং লাইনে যখন প্রসব-কার্য্য সম্পন্ন করানো আবশ্যক হয় তখন তাহাদিগকে মেটার্নিটি বক্স বা সন্তান-প্রসব-কার্য্যের যন্ত্রপাতিসমন্বিত বাক্স সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

যেখানে পঞ্চাশ জনের অধিক নারী কর্ম্মে নিযুক্ত আছে সেখানেই শিশু রক্ষাণাগার প্রতিষ্ঠা বাধ্যতামূলক। এগুলির দরুন কাজ করিবার সময় শিশুর জন্য নারী-শ্রমিকের দুশ্চিন্তা দূর হয় এবং এগুলিতে তাহাদের সযত্ন তত্ত্বাবধান, পুষ্টিবিধান এবং প্রয়োজন হইলে চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। দুই শিফটের অন্তর্ব্বর্ত্তী সময়ে শিশু-রক্ষণাগারে গিয়া শিশুসন্তানকে খাওয়াইবার জন্য মায়েদের কুড়ি মিনিট সময় দেওয়া হয়। দেশে উৎকৃষ্ট শিশু-রক্ষণাগারের অভাব নাই, কিন্তু ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় যে, শ্রমিক-স্ত্রীলোকেরা এগুলিতে তাহাদের জন্য যে সকল সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হইয়াছে তৎসমুদয় কাজে লাগায় না। বহু কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ কেবলমাত্র আইনের চাহিদা মিটাইবার জন্যই শিশু-রক্ষণাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

এখন প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের কথা বলা যাইতেছে। ত্রিশ বৎসর কাজ করিবার পর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের উপর—যাহাতে

...দিয়াছে তাহার বেতনের সোয়া ছয় অংশ এবং যাহাতে ...ও সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করিয়াছে, শ্রমিক-স্ত্রীলোকের অধিকার জন্মে। পাটকলের অন্যান্য কর্ম্মীদের ন্যায় সেও বেতনসহ চৌদ্দ দিনের ছুটি এবং নয় দিন পূজা-পার্ব্বণের ছুটি পাইবার অধিকারিণী।

ইহা অত্যন্ত দুঃখজনক হইলেও সত্য যে, পাটকলের কুলি লাইনে মহাজনের শোষণের নিদর্শন এখনও সুস্পষ্ট। তাহারা অভাবগ্রস্ত অজ্ঞ শ্রমিকদিগকে অত্যন্ত চড়া সুদে টাকা ধার দেয়। আমি প্রায়ই ভাবি যে কখন পাটকলের সর্ব্বত্র বিপুল সংখ্যায় সমবায় ঋণদান সমিতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইবে আর পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা যুক্তিযুক্ত মূল্যে, সুদে টাকা খাটাইতে ও ধার করিতে পারিবে। যে সকল শ্রমিকের যৎসামান্য টাকাকড়ি আছে তন্মধ্যে অনেকেই অন্যান্য শ্রমিকদিগকে চড়া সুদে টাকা ধার দিয়া লাভজনক ব্যবসা করিয়া থাকে। বর্ত্তমানে গয়নাগাঁটিই হইতেছে স্ত্রীলোকের ব্যাঙ্ক, তাহা দ্বারাই সে তাহার দেহকে সজ্জিত করিয়া থাকে। এই ধরণের সঞ্চয় অর্থ সচল রাখার সহায়তা করে না, কিংবা নিরাপত্তাবিধানও করে না। পক্ষান্তরে ইহা এমন এক ধরণের সেকেলে অঙ্গসজ্জার সহায়ক যাহা স্ত্রীলোককে বোঝার ভারে অবনত করিয়া তাহার স্বচ্ছন্দ অঙ্গসঞ্চালনকে ব্যাহত করে।

উপরে উদ্ধৃত চিকিৎসা এবং সামাজিক তথ্য সংক্রান্ত রিপোর্টে নিম্নলিখিত মন্তব্য করা হইয়াছে—"পাটকলের নারীকর্ম্মীর গার্হস্থ্যজীবন হইতেছে এক নিরন্তর ঘূর্ণ্যমান কর্ম্ম-চক্র, তাহাতে অবসর বা অবসরবিনোদনের ব্যবস্থা একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। কারখানা হইতে বাড়ীতে ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীলোককে রান্নাবান্না এবং শিশুসন্তানের খবর-দারির কাজে ব্যাপৃত হইতে হয়। স্ত্রীলোকেরা বাড়তি ঘরগৃহস্থালির কাজে গড়পড়তা যতটুকু সময় ব্যয়িত করে, দৈনন্দিন তাহা চার ঘণ্টায় দাঁড়ায়। যখন চিন্তা করা যায় যে, ইহা কারখানার ভিতরে তাহার আট ঘণ্টা পরিশ্রমের অতিরিক্ত খাটুনি, তখন বুঝিতে পারা যায়—ইহা রীতিমত দীর্ঘ সময়। কারখানার নারী-কর্ম্মীদের কাজের সময় সম্পর্কে আইন বিধিবদ্ধ করিবার সময়, নারীদের পক্ষে—বিশেষতঃ সে যদি সদ্যপ্রসূতি হয় তাহা হইলে, অতিরিক্ত পরিশ্রম বা ক্লান্তি পরিহার করা যাহাতে সম্ভবপর হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তাহাকে ঘরগৃহস্থালির যে বাড়তি কাজ করিতে হয় তৎসম্বন্ধেও বিবেচনা করিতে হইবে। মোটামুটি বিবেচনা করিয়া দেখিলে নারী-শ্রমিকের স্বাস্থ্য ভালই থাকে, কিন্তু পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে অনেকের ভিতরে ভিতরে এমন সব অসুখের সৃষ্টি হয় যাহার দরুন পরিণামে অকালবার্দ্ধক্য দেখা দেয় অথবা স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়ে। প্রত্যেক মিলের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট থাকে একটি ঔষধালয় যেখানে সাধারণ অসুখবিসুখের চিকিৎসা হইয়া থাকে। কোন কোনটির সঙ্গে হাসপাতাল আছে এবং সবগুলিতেই চিকিৎসক আছেন। যেখানে মহিলা-চিকিৎসক নাই সেখানে স্ত্রীলোকেরা কারখানার ডাক্তারের নিকট নিজেদের অসুখের কথা খোলাখুলি ভাবে বলিতে সঙ্কোচ বোধ করে।

নোংরা, অপরিচ্ছন্ন গৃহে বাস, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বায়ুচলাচলের অব্যবস্থা, অতিরিক্ত ভিড়, জলসরবরাহের অপ্রাচুর্য্য প্রভৃতির দরুন স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া থাকে। শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার অস্বাভাবিক রকম বেশী এবং নিবার্য্য পদ্ধতির প্রয়োগে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া সত্ত্বেও সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের পৃথক ভাবে রাখিবার কক্ষের অভাব হেতু তাহা মড়কের আকার ধারণ করিয়া অনাবশ্যক ভাবে ছড়াইয়া পড়ে। জীবনযাত্রার মান সম্পর্কিত কোন বিধিব্যবস্থাপন না থাকায় কুলি লাইনগুলিতে অনেক ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। কতকগুলি অবশ্য উত্তমরূপে নির্ম্মিত, ভাল পায়খানাযুক্ত এবং জলসরবাহের সুব্যবস্থাসমন্বিত, কিন্তু অন্যান্যগুলি কালের অগ্রগতির তুলনায় এখনও অনেক পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। নিকৃষ্টতম হইতেছে বেসরকারী মালিকানার অধীন অথবা পৌরপ্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত বস্তিগুলি। আমার মতে তন্মধ্যে বেশীর ভাগই বিনষ্ট করিয়া নূতন লাইন নির্ম্মাণ করা উচিত। যদিও পাটশিল্প-প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং ইণ্ডিয়ান জুট মিলস এসোসিয়েশন শ্রমিকগণের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার মান-উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট করিয়াছে তথাপি এখনও আরও অনেক উত্তম বিদ্যালয় এবং খাদ্য-বিপণির প্রয়োজনীয়তা রহিয়া গিয়াছে।

পাটশিল্পাঞ্চলের একটি বিশেষ অঙ্গ হইতেছে, নারী-কর্ম্মীদের কল্যাণার্থে "এসোসিয়েশন উওম্যান লেবার অফিসার" কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "নারীকল্যাণ সমিতি (Women's Welfare Society)। এই সমিতির উদ্যোগে মাসিক সামাজিক সম্মেলন, শিক্ষামূলক অভিনয় এবং স্বাস্থ্য-সপ্তাহান্তিক ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সমিতি একটি চলমান সিনেমাও কিনিয়াছে, শিক্ষা এবং আমোদ-প্রমোদ উভয় দিক দিয়াই উক্ত অঞ্চলে যাহার উপযোগিতা অপরিসীম।

উপসংহারে আমি এই কথাটার উপরে জোর দিতে চাই যে, পাটকলের নারী-কর্ম্মী সাহসী এবং নির্ভীক নারীদের সমপর্য্যায়ভুক্ত। তাহার অফুরন্ত রসবোধ তাহাকে দুঃখ দৈন্য-বিঘ্ন-বিপৎসঙ্কুল জীবন-পথে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া লইয়া যায় এবং ভাগ্যের উপর বিশ্বাস তাহাকে কঠিন আঘাত —তন্মধ্যে প্রচণ্ডতম হইতেছে নিরন্তর সন্তানবিয়োগ-দুঃখ

সষ্ট করিতে তৈরি করে। একটু শিক্ষা, বসবাসের উৎকৃষ্টতর পরিবেশ এবং অধিকতর মানবীয় সহানুভূতিসম্পন্ন সমাজে প্রবেশাধিকার লাভ—এই সকলের ব্যবস্থা করিলে যোগ্যতার, এমন কি সংস্কৃতির কোন উচ্চ স্তরে যে নারী-শ্রমিক উপনীত হইবে তাহা কে বলিতে পারে? বর্ত্তমান সময়ে কিন্তু বাইরের জগৎ তাহার সম্বন্ধে খুব কম খবরই রাখে, এবং ইহার দরুন বর্ত্তমান জগতেরই ক্ষতি হইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সমাজ-কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদ্

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৬। হাওড়া—

স্থান—বালী ও ডোমজুর থানা।

লোকসংখ্যা—১৪,৪৪০

কর্ম্মতালিকা—প্রতিটি কেন্দ্রে প্রসূতি মেয়েদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা, শিল্প কেন্দ্রের ও শিশুদের খেলাধূলা ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা

মুর্শিদাবাদ—

স্থান—গোয়ালজান ও মণীন্দ্রনগর কলোনী।

লোকসংখ্যা—১৬,৪৫০ (১৭টি গ্রাম অন্তর্ভুক্ত)

কর্ম্মতালিকা—মেয়েদের জন্য প্রসবের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী-কালীন স্বাস্থ্যব্যবস্থা, শিল্প ও সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্র, শিশুদের জন্য খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদ।

২৪ পরগণা—

স্থান—গাইঘাটা, জলেশ্বর, ধরমপুর ও ইছাপুর ইউনিয়নের অংশ লইয়া গঠিত।

লোকসংখ্যা—১৬,৫৮০

কর্ম্মতালিকা—প্রসূতিসদন, মেয়েদের প্রসবের পূর্ব্বে ও পরবর্ত্তীকালীন চিকিৎসা ব্যবস্থা, শিল্প শিক্ষা প্রভৃতি।

পশ্চিম দিনাজপুর—

স্থান—বালুরঘাট সাবডিভিশনের অন্তর্গত।

লোকসংখ্যা—২৩,০০০

কর্ম্মতালিকা—বয়স্ক শিক্ষা, বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ ব্যবস্থা, মেয়েদের প্রসবের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তীকালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, শিল্প শিক্ষা।

মালদহ—

স্থান—পুরাতন মালদহ, মালবাড়ী, সাহাপুর ও কোতোয়ালী ইউনিয়ন।

লোকসংখ্যা—১৭,৫৬৫

কর্ম্মতালিকা—মেয়েদের প্রসবের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তীকালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, শিশুদের জন্য লাইব্রেরী।

মেদিনীপুর—

স্থান—ঝাড়গ্রাম থানার অন্তর্ভুক্ত ৮ ও ৯নং ইউনিয়ন।

লোকসংখ্যা—১৩,৬০০

কর্ম্মতালিকা—শিশু স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, মেয়েদের প্রসবের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তীকালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা।

বীরভূম—

স্থান—কীর্ণাহার ও করেয়া, নান্নুর থানার অন্তর্গত।

লোকসংখ্যা—১৩,৮৭০

কর্ম্মতালিকা—প্রসূতি মেয়েদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, শিল্পকেন্দ্র মেয়েদের ক্লাব, শিশু স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতি।

দার্জ্জিলিং—

স্থান—ফুলবাজার, জোড়বাংলো, কার্সিয়াং, খরীবাড়ী, মিরিক, ফাঁসি দেওয়া।

লোকসংখ্যা—২২,১৯৪

কর্ম্মতালিকা—প্রসবের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তীকালীন ব্যবস্থা, শিশুস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, ব্রতচারী ও স্কাউটিং, শিশুশিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা প্রভৃতি।

জলপাইগুড়ি—

স্থান—জলপাইগুড়ি ও রায়গঞ্জ থানা।

লোকসংখ্যা—১৭,৭৪৫

কর্ম্মতালিকা—প্রসবের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তীকালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, শিশুদের অবসরবিনোদনের জন্য খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ, স্কাউটিং, গাইডিং প্রভৃতি, বয়স্ক শিক্ষা, শিল্প শিক্ষা, মহিলা ক্লাব প্রভৃতি।

বাঁকুড়া—

লোকসংখ্যা—২০,৪২৪ (৪০টি গ্রাম)

কর্ম্মতালিকা—শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র, শিশুদের আমোদ-প্রমোদ, খেলাধূলার ব্যবস্থা, প্রসবের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তীকালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, শিল্প শিক্ষা ও উৎপাদন কেন্দ্র, বয়স্ক শিক্ষা প্রভৃতি।

বড় সাইজ

রেক্সোনা

আরও নির্ম্মল, আরও

লাবণ্যময় ত্বকের জন্য

'ক্যাডিল'* যুক্ত একমাত্র সাবান

* ত্বকপোষক ও কোমলতাপ্রদ কতকগুলি তেলের বিশেষ সংমিশ্রণের এক মালিকানী নাম।

RP. 128A-X52 BG

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারি লিঃএর তরফ থেকে ভারতে প্রস্তুত

স্মৃতিরঙ্গ—শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়। নাভানা, ৪৭ গণেশ-চন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩। মূল্য আড়াই টাকা।

বাঙালী ছাত্রদের বিলাত-প্রবাসের স্মৃতি-কথা সেই আদি যুগে সুরেন বাঁড়ুজ্যে ও রমেশ দত্ত সে দেশে পড়িতে গিয়া ইংরেজীতে লেখেন, তাহার পর গিরিশ বোসের মধ্য দিয়া এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। সবই পড়িয়াছি। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তপনমোহনের "স্মৃতিরঙ্গ" যে স্থায়ী সাহিত্যরস ও স্নিগ্ধতা আনিয়া দেয় তাহা এইগুলিতে পাই নাই। মাঝে মাঝে মনে হয় যেন ডিকেন্সীয় বুকনী ঢুকিয়াছে; এখানে কি বাস্তব সত্যের উপর রং-করা ধামাচাপা দেওয়া হইয়াছে?

এই বইখানির অতুলনীয় আকর্ষণের কারণ এও হইতে পারে যে, কবিগুরুর উপস্থিতি এবং বিলাতের সর্ব্বোচ্চ কলাবিদ ও লেখকদের সঙ্গে সংস্পর্শের সৌভাগ্য আর কোন বাঙালী ছাত্রের হয় নাই।

শ্রীযদুনাথ সরকার

যারা হারিয়ে গেল—শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত। ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য তিন টাকা।

আলোচ্য রচনা-সংগ্রহটিকে গল্পপুস্তক আখ্যা দেওয়া চলে না—অথচ প্রত্যেকটি রচনায় গল্পের গুণভাগ নিহিত। লেখক তিন নম্বর রেগুলেশনে রাজবন্দী ছিলেন, এবং পঞ্জাবের মিয়ানওয়ালি জেলে থাকাকালীন বিপ্লবাদী বন্ধুদের স্মরণ করিয়া এগুলি লিপিবদ্ধ করেন। ভাবের উন্মাদনা ও শ্রদ্ধা-সহানুভূতির উত্তাপ প্রতিটি লেখার মধ্যে বিদ্যমান। পরশাসন-মোচনের জন্য একদা বাংলার তরুণ দলে—'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান—তারি লাগি কাড়াকাড়ি' পড়িয়া গিয়াছিল। গল্পের সীমা অতিক্রম করিয়া এই সর্ব্বত্যাগী স্বদেশভক্ত তরুণরাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছেন। বর্ত্তমানকালে ইঁহারা অস্পষ্ট হইলেও—ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কোনদিনই হারাইয়া যাইবেন না।

শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের জীবনচরিত—শ্রীআশালতা সিংহ। বালানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তন, কলিকাতা-৬। মূল্য সাড়ে চার টাকা।

দেবভূমি ভারতবর্ষ অধ্যাত্ম-বিদ্যায় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাগ্রগামী। ভারতবর্ষের সাধু সন্ত মহাপুরুষেরা ব্রহ্ম-বিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া জীবন-দর্শনের ধারাটিকে অনন্তে প্রবাহিত করিয়াছেন। সেই অনন্ত জীবনবাদে প্রতিষ্ঠিত যে সমস্ত সাধক নরসমাজে নিত্য বন্দনীয় শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ তাঁহাদেরই অন্যতম। তাঁহার জীবন-দর্শন এবং বাণী ভারতের প্রাচীন ও শাশ্বত মন্ত্রেরই প্রতিধ্বনি।

সর্ব্বভূতান্তরাত্মা শ্রীভগবানকে ধ্যান, পূজা, সেবা ইত্যাদিতে উপলব্ধি করাই সাধক-জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁহারা জানেন—সেই পরমরূপময়কে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে বহুরূপের মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইতে হয়। জাগতিক বন্ধন পরমার্থলাভের অন্তরায় হইলেও অণুপরমাণুতে পরমসত্তা নিহিত—এই সত্যকে ভারতীয় সাধকেরা কোনদিন অস্বীকার করেন নাই। শুধু যে-মোহাসক্তি দৃষ্টিকে আবিল করে, জগৎকে চারটি দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে এবং মনকে করে সঙ্কীর্ণ—তাহা হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টাকেই তাঁহারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপায়স্বরূপ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। বস্তুবিশেষের প্রতি আসক্তির অবসান ঘটিলেই সর্ব্ববস্তুতে প্রেমের সঞ্চার হয়। সেই প্রেমই প্রেমময়কে লাভ করিবার হেতুস্বরূপ এবং সর্ব্বজীবের কল্যাণকারক। শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের জীবন সেই জীব ও শিবের সমন্বয়সাধনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মাত্র নবম বর্ষ বয়সে—উপনয়নের কয়েক দিন পরে—স্বামীজী গৃহত্যাগ করেন, প্রায় শতাব্দীব্যাপী সাধক-জীবন যাপন করিবার পর ব্রহ্মে

আমাদের মেয়ের
বিয়েতে...
... খাবার লোক হয়েছিল অনেক ! সত্যি বলতে কি খরচটা আমাদের ভাবিয়ে তুলেছিল—যদি ডাল্‌ডা বনস্পতি আমাদের না বাঁচাতো। ডাল্‌ডায় রাঁধলে খরচও কম পড়ে—খাবার খেতেও হয় চমৎকার! আর ডাল্‌ডা বায়ু-রোধক শীল-করা টিনে বিক্রী করা হয় ব'লে, তা যে সর্ব্বদা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর পাওয়া যায় সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। প্রতি-দিনের রান্নাতেই হোক বা বড় রকম ভোজের ব্যাপারেই বলুন, সর্ব্বদা ডাল্‌ডা ব্যবহার করবেন।
বিয়ের ভোজের উপযোগী মিষ্টান্ন তৈরী সম্বন্ধে বিনামূল্যে উপদেশের জন্য লিখুন:
দি ডাল্‌ডা
এ্যাডভাইসারি সার্ভিস
ইণ্ডিয়া হাউস (জি. পি. ও'র সামনে)
বোম্বাই ১
DALDA
ডাল্‌ডা
ডাল্‌ডা বনস্পতি
রাঁধতে ভালো—খরচ কম
১/২, ১, ২, ৫ ও ১০ পাউণ্ড টিনে ভারতের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

লীন হ'ন। নানা ঘটনা ও তথ্যে পরিপূর্ণ এই জীবনালেখ্য সুলেখিকা সাবলীল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রচনায় যেমন আন্তরিক শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়—সেই পরিমাণে রহিয়াছে সাহিত্যরচনার সৌরভ। তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠক ছাড়া সাধারণ পাঠকের কৌতূহল-নিবৃত্তির বহু উপকরণ এই জীবনী-গ্রন্থে রহিয়াছে।

আমরা আবার বাঁচব—শ্রীনগেন দত্ত। ৫ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য আড়াই টাকা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিশাপ বাংলার বুকে যেমন মর্ম্মান্তিক আঘাত হানিয়াছে—এমনটি ভারতবর্ষের আর কোথাও হয় নাই। মন্বন্তর, নীতি-হীনতা, ভারত-বিভাগ আন্দোলন, মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম প্রভৃতিতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে বাংলা। তারপর স্বাধীনতা আসিয়াছে, বাংলা খণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার অন্তর্দাহী বেদনার পরিমাপ রক্তপাতহীন স্বাধীনতার অন্তরালেই রহিয়া গিয়াছে। আলোচ্য কাহিনীর মাধ্যমে লেখক তাহারই একটা হিসাব-নিকাশ করিতে চাহিয়াছেন। এটি অবশ্য পুরাপুরি কাহিনী নয়, ইতিহাসও নয়—ইহা বাংলার সেই সব অর্দ্ধশিক্ষিত ও লিপিজ্ঞানহীন মানুষের অন্তর্বেদনার কথা যাহারা রাজনীতির জটিল তত্ত্ব না বুঝিয়াও তাহারই আবর্ত্তে পাক খাইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। গোটা একটা গ্রামের ছবি ধরিয়া দিয়াছেন লেখক—তাহারই মধ্যে কিন্তু স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে সারা বাংলার অশান্ত মূর্ত্তি। গল্প হয়তো রীতিসম্মতভাবে গড়িয়া উঠে নাই—চরিত্রগুলি খণ্ড, বিচ্ছিন্ন এবং কেন্দ্রাতিগ, কিন্তু নানা বিপর্য্যয়ের সঙ্গে বাংলাদেশ ও মানুষগুলি হইয়াছে অত্যন্ত স্পষ্ট।

বাংলা অতীতে কি ছিল, বর্ত্তমানে কোথায় পৌঁছিয়াছে, জনমনের বিক্ষোভ—এবং দুঃখ হতাশ্বাসের কাহিনী প্রভৃতি মিলাইয়া অশান্ত এক যুগের চিত্রটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন লেখক। প্রকাশভঙ্গী বলিষ্ঠ এবং চিন্তা-ঐশ্বর্য্যদীপ্ত বলিয়াই আমাদের জীবনমরণের প্রশ্নগুলি মনে বেশ একটু দোলা দেয়। চিন্তাশীল পাঠকের কাছে বইখানি যে সমাদৃত হইয়াছে—তাহার প্রমাণ পরিমার্জ্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

অনির্ব্বাণ—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়। নবভারত পাবলিশার্স, ১৫৩।১ রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

উপন্যাস। নায়ক প্রভাত সাহিত্যিক এবং আদর্শবাদী যুবক। দরিদ্র পিতার সন্তান সে, কিন্তু অন্তরের দিক দিয়া দরিদ্র নয়। মন তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ—স্বপ্ন দেখে দশজনের এক জন হইবার। পারিপার্শ্বিকের প্রচণ্ড নিষ্পেষণে বারে বারেই তার স্বপ্ন ভাঙিয়া যায়—আবার নূতন করিয়া স্বপ্নের জাল বোনে প্রভাত। আত্মশক্তিতে সোজা হইয়া না দাঁড়াইতে পারিলে ত মনের গ্লানি ঘুচিবে না। কিন্তু মন তার যত উঁচু পর্দ্দায় বাঁধা থাকুক না কেন—মাতাপিতার যুক্তিপূর্ণ দাবি, ছোট বোন লক্ষ্মীর কাতর অনুনয়, সংসারের অভাব-অনটন সম্বন্ধে তাহাকে সচেতন করিয়া তোলে। যেমন তেমন একটা চাকুরি না জুটাইলেই নয়—নহিলে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া লেখাপড়া শেখার কোন অর্থই নাকি হয় না! নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও প্রভাত লক্ষ্যচ্যুত হয় নাই। নিজের আদর্শে সে অটল থাকিতে চেষ্টা করে, কিন্তু দারিদ্র্যের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা তাহাকে কাবু করিয়া ফেলিল পিতার আকস্মিক মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই।

পুস্তকখানিতে আরও বহু স্ত্রী ও পুরুষ চরিত্রের সাক্ষাৎ মিলিয়াছে—দীপা, তার দাদা অনিমেষ ও বাবা অর্দ্ধেন্দু রায় প্রভৃতি। উহারা কালো-বাজারের দৌলতে প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিয়াছিল। এই শ্রেণীর ধনীদের চরিত্র যেমন হইয়া থাকে সেইরূপই দেখানো হইয়াছে।

ত্রিলোচন সেন তার কন্যা সিপ্রা ও স্ত্রী (মেজ জেঠীমা) একটি পতনোন্মুখ অভিজাত পরিবার। এই পরিবারের প্রত্যেকটি চরিত্র বড় সুন্দর ভাবে ফুটিয়াছে। ত্রিলোচনের চরিত্রে আভিজাত্য ও দারিদ্র্যের সঙ্গে অপরোক্ষ লড়াইয়ের যে চিত্রগুলি ফুটিয়াছে তাহা এক কথায় অপূর্ব্ব। মেজ জেঠীমার মতবাদগুলি মনকে অভিভূত করে। আর সিপ্রা যদিও বরাবর আড়ালেই রহিয়া গিয়াছে তথাপি সামান্য দু'একটি তুলির টানে তাহার চরিত্রটি একেবারে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। পুস্তকখানি রসিক-সমাজে আদৃত হইবে সন্দেহ নাই।

অকূলকন্যা—শ্রীপ্রভাত দেব সরকার। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য ২৸৹।

"সেদিনটা এমনি ছিল। এমনি কয়লার ধোঁয়ার মত নুয়ে-পড়া বিবর্ণ আকাশ।" উপন্যাসখানির আরম্ভ এইরূপ। নায়িকা নিভা তার রেণু কাকীমার আশ্রয় হইতে পলাইয়া আসিল কলিকাতা হইতে সাত শ' পঁচাত্তর মাইল দূরে। সে আশ্রয় লইতে আসিল এমন একটি লোকের কাছে যে নিতান্ত তুচ্ছ কারণে অপমানসূচক আচরণ করিয়া তাহাকে ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিল। এই সামান্য পরিচয়ের সূত্র ধরিয়া নিভা চলিয়া আসিল অমলের কাছে। অমলের মা সারদা দেবী তাকে আশ্রয় দিলেন এবং রেণু কাকীমার নানা প্রকার কুৎসিত ইঙ্গিতপূর্ণ চিঠি পাওয়া সত্ত্বেও সারদা দেবী নিভাকে আশ্রয়চ্যুত করিলেন না। কিন্তু এ আশ্রয় তাহাকে ছাড়িতে হইল সারদা

দেবীর মৃত্যুর পরে। অমল যুবক—তাহার সহিত এক বাড়ীতে থাকা মোটেই শোভন নয় বলিয়াই নিভা পুনরায় অন্য আশ্রয়ের সন্ধানে বাহির হইল, কিন্তু চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে নিভার প্রতি অমলের আচরণের বর্ণনায় শালীনতার সীমা লঙ্ঘিত হইয়াছে। নিভাকে লইয়া লেখক অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য নিভা আবার অমলের কাছেই ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু মনে হয় পুস্তকে যে পরিবেশ সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা সহজ, সুস্থ ও স্বাভাবিক নহে। নিভাকে 'অকূলে' ভাসাইবার জন্যই যেন জোর করিয়া ওরূপ করা হইয়াছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

কয়লা—শ্রী[illegible] সরকার। পৃষ্ঠা ৫৪। মূল্য আট আনা।

পোর্সিলেন—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু। পৃষ্ঠা ৩১। মূল্য আট আনা।

উভয় পুস্তিকাই বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়—২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত। প্রথমখানিতে কয়লার অবদান, জন্ম, বর্ণভেদ, উপাদান, খনি, উৎপাদন, সদ্ব্যয়, দহন, অঙ্গারক বর্দ্ধণ, গ্যাসীয়করণ, তৈল ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির উৎপাদন অপচয়, কয়লার গবেষণা, সংরক্ষণ ও ও সদ্ব্যবহার প্রভৃতি বিষয় সরল ভাষায় আলোচিত হইয়াছে। সাধারণ পাঠকও এই পুস্তিকা পাঠ করিয়া কয়লা সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় পুস্তিকায় চীনামাটি হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ১৯০৮ সনে কলিকাতায় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অর্থানুকূল্যে পরলোকগত সত্যসুন্দর দেবের চেষ্টায় কলিকাতা পটারি ওয়ার্কস স্থাপিত হয়। ভারতে ইহাই প্রথম চীনামাটির কারখানা। বর্ত্তমানে এই প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল পটারিজ নামে পরিচিত এবং ইহা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। পুস্তকের ভূমিকায় লেখক চীনামাটির জন্মকথা এবং পরবর্ত্তী তিনটি অধ্যায়ে উহার গঠন, প্রস্তুতের উপকরণ ও ইহার উপরে চিত্রণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। যাঁহারা এই শিল্পে কর্ম্মরত আছেন পুস্তিকাখানি তাঁহাদের কাজে লাগিবে।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষির অবনতির কারণ ও উন্নতির উপায়—শ্রীনলিনাক্ষ বসু। ১০।২, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ পৃষ্ঠা ৪৮। মূল্য দশ আনা।

লেখক দীর্ঘকাল কৃষিবিভাগে দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন তাহার ভিত্তিতে এই পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ, কিন্তু ইহার সমস্যা ঠিক অন্যান্য দেশের অনুরূপ নহে। লেখক জাপানী ধানচাষ প্রথা এদেশের উপযোগী বলিয়া মনে করেন না। কোটি কোটি টাকা বড় বড় ব্যয় (অপব্যয়?) সাপেক্ষ সেচ-পরিকল্পনার পরিবর্ত্তে অল্প ব্যয়ে মজা পুকুরসংস্কার প্রভৃতি দ্বারা বেশী ফললাভ হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন। সারপ্রয়োগের নামে প্রভূত অর্থব্যয় দরিদ্র দেশের পক্ষে সাধ্যাতীত বলিয়া লেখক সহজ উপায়ে সার প্রস্তুত করিয়া বা শস্যাবর্তন (Rotation of crops) দ্বারা ভূমির ক্ষয় নিবারণ এবং উহার উর্ব্বরতা-বৃদ্ধির পক্ষপাতী। তিনি বলেন, বাংলা দেশে বড় কৃষিযন্ত্র বা ট্রাক্টর ব্যবহার করিলে সমস্যার সমাধান হইবে না বরং বেকার-সমস্যার বৃদ্ধি হইবে। দেশের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা ও কৃষি-ব্যবস্থা একসূত্রে বাঁধা। ইংরেজ নিজের শাসন এবং শোষণ কায়েম করার জন্য রেল ও রাস্তা চালাইয়া দেশের স্বাস্থ্য ও কৃষি উভয়েরই ক্ষতি করিয়া গিয়াছে। স্বাধীন ভারতের কৃষিকর্ম্মচারিগণকে লেখক দেশের প্রকৃত অবস্থা জানিয়া যথোচিত ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারী ও সাধারণ পাঠক উভয়েই পুস্তিকাখানি পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

মুক্তির আহ্বানে—ভিক্টর ক্রেভ্‌শেঙ্কো। অনুবাদক—শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্ত। প্রাচী প্রকাশন, ১২ চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা-১। পৃষ্ঠা ৩৯৪। মূল্য দেড় টাকা।

ভিক্টর ক্রেভ্‌শেঙ্কো সোভিয়েট রাশিয়ার এক জন প্রাক্তন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। নানা অবস্থার ভিতর দিয়া তিনি উচ্চপদে উন্নীত হইয়াছিলেন। এই পুস্তকে তাঁহার ঘটনাবহুল জীবনের অভিজ্ঞতা সুন্দর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। "I chose Freedom" বইখানি ১৯৪৬ সনে প্রথম প্রকাশিত হইলে লৌহ-যবনিকার বাহিরের দেশগুলিতে আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন দেশের ভাষায় ইহা অনূদিত হইতে থাকে। দেশত্যাগী রাশিয়ান লেখকের পুস্তককে সোভিয়েট-বিরোধী আন্দোলনের সহায়ক হিসাবে প্রচার করিলেও ইহা একখানি কাল্পনিক চিত্র বা উপন্যাস বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। নানাবিধ উন্নতিসত্ত্বেও বর্ত্তমান রাশিয়ায় ব্যক্তিস্বাধীনতা কত সঙ্কুচিত এবং বিরুদ্ধমতাবলম্বীদিগকে সেখানে কি দুঃসহ জীবনযাপন করিতে হয়, ভুক্তভোগী লেখকের বর্ণনায় তাহা জীবন্ত হইয়া ফুটিয়াছে। গোয়েন্দা বিভাগের নিষ্ঠুরতা, সুশৃঙ্খলার নামে অবর্ণনীয় কঠোরতা সোভিয়েটের রাষ্ট্রীয় ও নাগরিক জীবন বিষময় করিয়া তুলিতেছে। মানুষের উন্নতির নামে সোভিয়েট আজ মানুষের ব্যক্তিত্বকে বিনাশের পথে লইয়া যাইতেছে। সেইজন্যই আপাতদৃষ্টিতে সোভিয়েট রাশিয়ার সবিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হইলেও মূলতঃ ইহার ভিত্তি কাঁচা রহিয়া গিয়াছে।

অন্ধ অনুকরণে দেশের তরুণেরা আজ বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। সাধারণ পাঠকও বর্ত্তমান সময়ে সুলভ সোভিয়েট সাম্যবাদী পুস্তক ও চিত্রসমূহে সে দেশের একটি মাত্র আলেখ্যই দেখিতে পায়। কিন্তু বর্ত্তমান পুস্তকখানি পাঠককে রাশিয়ার বৈচিত্র্যপূর্ণ দিকটি সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিবে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত
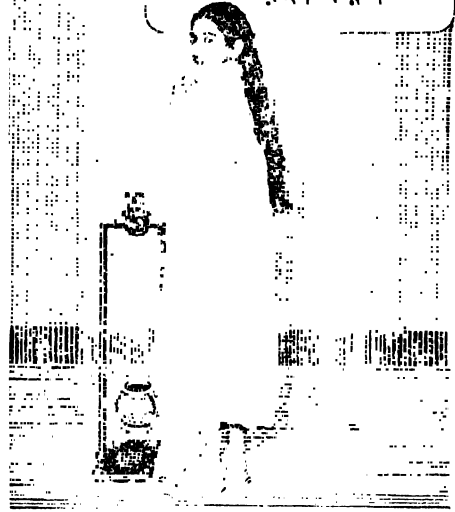
লাইফবয়ের “রক্ষাকারী ফেনা” ছেলেমেয়ে-দের স্বাস্থ্যকে নিরা-পদে রাখে

লাইফবয় সাবান

প্রতিদিন ময়লার বীজাণু থেকে আপনাকে রক্ষা করে

ভারতে প্রস্তুত

L. 252-X52 BG

শ্রীশ্রীচণ্ডী—অনুবাদক—ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার। সুদর্শন কার্য্যালয় ৩ অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা-৩। পৃষ্ঠা ১৯২। মূল্য বার আনা।

ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার 'সুদর্শন' ত্রৈমাসিকের সম্পাদক এবং নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সাধু। গত দশ বর্ষ যাবৎ মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক তিনি শাস্ত্র-প্রচারে ব্রতী আছেন। বর্ত্তমান পুস্তকে প্রথমেই তিনি সাতাশ-আটাশ পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীর তেরটি অধ্যায়ের মূল শ্লোক ও অনুবাদ ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। অর্গলা স্তোত্র, কীলক স্তব দেবী কবচ, রহস্যত্রয়, দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্তের অনুবাদ না দেওয়াতে গ্রন্থখানিতে ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। পুস্তকখানিতে একটি সূচীর অভাবও অনুভূত হয়। ভেদাভেদবাদী নিম্বার্ক সম্প্রদায়োক্ত বেদান্তে শক্তিবাদ স্বীকৃত, তাই অনুবাদক চণ্ডী-তত্ত্বের আলোচনায় এই দার্শনিক সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াছেন। ভেদাভেদবাদের সহিত শক্তিবাদের নিকট-সাদৃশ্য রহিয়াছে। সানুবাদ শ্রীশ্রীচণ্ডীর এই সুলভ সংস্করণ জনপ্রিয় হইবে বলিয়া মনে হয়।

দীঘ নিকায়—অনুবাদক—ভিক্ষু শীলভদ্র। মহাবোধি সোসাইটি ৪-এ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা ৩১২। মূল্য ২৸০ আনা।

ভিক্ষু শীলভদ্র বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ-সাহিত্য-রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই তিনি বাংলায় দশখানি বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তৎকর্ত্তৃক অনূদিত 'দীঘ নিকায়' ১ম খণ্ড পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানি উক্ত পালিগ্রন্থের ২য় খণ্ডের অনুবাদ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ., পিএইচ ডি. মহাশয় এই খণ্ডের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। ভূমিকা-লেখকের মতে বর্ত্তমান অনুবাদে মূল পালির গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য অব্যাহত রহিয়াছে। দীঘ নিকায়ের দ্বিতীয় খণ্ড দশটি সুত্তান্তে বিভক্ত। প্রত্যেক সুত্রান্তের পূর্ব্বাভাষ তথ্যপূর্ণ ভূমিকায় প্রদত্ত হইয়াছে। দীঘ নিকায় স্থবিরবাদী সম্প্রদায়ে প্রচলিত পালি সুত্তপিটকের অন্তর্গত এবং চৌত্রিশটি সুদীর্ঘ সুত্তে পরিপূর্ণ। সুত্তপিটকে ভগবান বুদ্ধদেবের কথোপকথন ও জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। দীঘ নিকায়োক্ত মহাপরিনির্ব্বাণ সুত্তে বুদ্ধদেবের অন্তিম জীবনের বর্ণনা এবং তাঁহার পূতাস্থির বণ্টন-বিবরণ পাওয়া যায়। আলোচ্য পুস্তকে প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের সম্প্রসারণ এবং রাষ্ট্রীয় উন্নতির ইতিহাস ও বিবৃত হইয়াছে।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

ঈশ-কেন-কঠ—ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার। সুদর্শন কার্য্যালয়, ৩ অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা-৩। পৃষ্ঠা ৯৫। মূল্য আট আনা।

আলোচ্য পুস্তকে ঈশ, কেন ও কঠ এই উপনিষদত্রয়ের প্রধান শ্লোকগুলি এবং উহাদের সহজ ও সরল বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। ভূমিকায় লেখক উপনিষদের সৃষ্টি ও দার্শনিকতা এবং পূর্ব্বোক্ত তিনটি উপনিষদের সারাংশ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বিরাট ঔপনিষৎ সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত প্রারম্ভিকা হিসাবে ইহা ধর্ম্মপিপাসুগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইবার যোগ্য। শ্লোকসমূহের সহিত অন্বয়ার্থ থাকিলে ইহার উপযোগিতা আরও বৃদ্ধি পাইত।
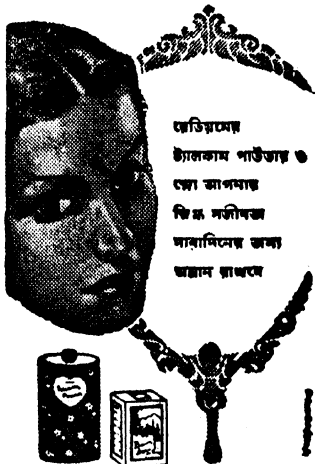
শ্রীশিবানীপ্রসাদ মৈত্র

নির্ব্বাণ—শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা ২২৪, মূল্য ৩৷০।

লেখক ইতিপূর্ব্বে বড় ও ছোটদের কয়েকখানা উপন্যাস এবং একখানি সমালোচনা-গ্রন্থ লিখিয়াছেন। নির্ব্বাণ তাঁহার হালে প্রকাশিত উপন্যাস। উপন্যাসের প্রধান নায়ক তরুণ রাজকুমারের স্কুল-কলেজের বিদ্যা নাই বটে, বিত্তও নাই, কিন্তু চিত্ত আছে। সে আদর্শবাদী। গ্রামোন্নয়ন, স্বাধীনতা পবিত্র প্রেম ইত্যাদির স্বপ্নে তার মন বিভোর। কিন্তু তরুণের মনের এই সব স্বপ্ন বুঝি পুষ্পকলিকারই মত কোমল, দুর্ব্বল, অসহায়; প্রতিকূল আবহাওয়ায় শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে। তরুণ রাজকুমারের জীবনমুকুলও বাস্তব জগতের রূঢ় আঘাতে অকালে ঝরিয়া পড়িল। 'নির্ব্বাণ' এই ঝরা মুকুলের জীবন-ইতিহাস।

গ্রন্থের ভাষা প্রথম দিকে একটু আড়ষ্ট, কিন্তু শেষের দিকে ক্রমে সাবলীল হইয়া উঠিয়াছে। উপন্যাসে ঘটনার কাল সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বিত হয় নাই। মাতার অন্ত্যেষ্টির পর বেশবাস পরিবর্তন না করিয়া শ্মশান হইতেই রাজকুমার কলিকাতা যাত্রা করিতেছে এবং সেখানে আসিয়াই শোভাযাত্রার পতাকা ধারণ করিতেছে, জেলে যাইতেছে। আবার এদিকে মনতোষ বাবু কর্পোরেশনের মেয়র হওয়ার মাসদুয়েক পরে তাঁহার বাড়ীতে এই উপলক্ষ্যে উৎসব হইতেছে।

এ সকল ত্রুটি সত্ত্বেও লেখক উপন্যাসখানিতে বেশ কতকটা করুণ রস সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

শ্রীতারাপদ রাহা
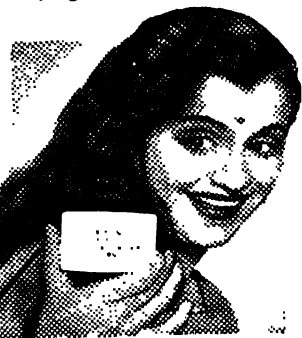
কবিকঙ্কণ মুকুন্দ ও রাজা রঘুনাথ—শ্রীসুধীরচন্দ্র ভাদুড়ী, এম্‌-এ। ৫১ডি, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২৫। পৃ. ২৭৪। মূল্য ৩৲ টাকা।

এই অত্যদ্ভুত গ্রন্থের মতে মৃত্যুঞ্জয়ী দামুন্যার কবি কবিকঙ্কণ যাঁহার বাসস্থান সম্বন্ধে সাড়ে তিন শত বৎসর ধরিয়া কোন বাঙ্গালী ঘুণাক্ষরেও কোন দিন সংশয় পোষণ করে নাই)—"ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমাধীন দামিহা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন" (পৃ. ১৬৬, ২৫১, ২৭১) এবং তাঁহার পোষ্টা ছিলেন সুসঙ্গের রাজা রঘুনাথ! গ্রন্থকার পয়সা খরচ করিয়া ময়মনসিংহবাসীকে এবং বিশেষ করিয়া প্রথিতনামা সুসঙ্গ-রাজবংশকে প্রকারান্তরে কলঙ্ককালিমায় লিপ্ত করিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি। মুকুন্দ বাৎস্যগোত্রীয় কাঞ্জিয়ারী বংশীয় কিংবা পাশ্চাত্ত্য বৈদিক "কোঁয়াড়ী" বংশীয় হইতে পারেন (পৃ. ৩৪-৫), 'আড়রা' নামটি সুসঙ্গস্থলে পরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে (পৃ. ২৭২-৩) প্রভৃতি বহুতর প্রলাপোক্তি গ্রন্থটিকে [illegible] পরিণত করিয়াছে। এক স্থলে গ্রন্থকার তাঁহার "মুস্কিলে"র কথা বলিয়াছেন—সুসঙ্গ রাজবংশে রাজা রঘুনাথের ঊর্দ্ধতন নামগুলি [illegible] নামের সহিত "আদৌ মিলে না" (পৃ. ২৪০)। কিন্তু তথাপি তাঁহা "বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই" (পৃ. ২৫৪) যে কবির রাজা রঘুনাথ সুস[illegible] রাজবংশেরই বটে! পক্ষান্তরে ইহাও বক্তব্য যে কবিকঙ্কণের [illegible] জীবনী অদ্যাপি সুলিখিত হয় নাই—পল্লীগ্রাম ঘুরিয়া পুথিপত্র ঘাঁটিয়া [illegible] সংগ্রহ করা কলিকাতার প্রাসাদে বসিয়া হয় না। নির্ভরযোগ্য জীবনী অভাবই ভাদুড়ী মহাশয়ের পরিশ্রম ও অর্থব্যয়কে এইভাবে বিপথগা[illegible] করিয়াছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
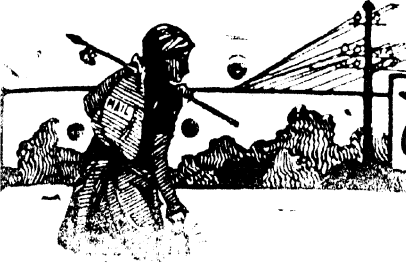
গীতবিতানের সমাবর্ত্তন উৎসব

গত ১৩ই মার্চ্চ বিকাল পাঁচটায় কলিকাতা রাজভবন-প্রাঙ্গণে রাজ্যপাল ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গীতবিতানের ষষ্ঠ বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর গীতবিতানের কর্ম্মসচিব শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত তাহার ভাষণে বলেন :

"বর্ত্তমানে প্রায় ১০০০ জন ছাত্রছাত্রী ৫০ জন অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে গীতবিতানে নৃত্যগীতবাদ্যের নিয়মিত অনুশীলন করিতেছে। প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আয় প্রায় ৭০,০০০৲ টাকা। তাহার মধ্যে মাত্র ছয়-সাত হাজার টাকা বিভিন্ন খাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট হইতে সাহায্য হিসাবে পাওয়া যায়। ব্যয়সঙ্কুলানের জন্য বাহির হইতে আর কোনরূপ সাহায্য বা আয় লাভের পথ নাই। প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব আর্থিক সঙ্গতির উপরেই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া চলিতে হয়। ১৯৫৩ সালের পরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে ৩৭,৩৭২৲ প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে ১০,৪২১৲ ও উদ্বৃত্ত তহবিলে ২০,৬৭৭৲ মোট ৬৮,৪৭০৲ টাকা সঞ্চিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠান হইতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হিতার্থে প্রভিডেণ্ট ফণ্ড গঠন করা হইয়াছে। তাঁহাদের বেতনের উপযুক্ত হার নির্দ্ধারণ এবং নিয়মিত বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করাও একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু প্রধানতঃ ছাত্রছাত্রীদের মাসিক মাহিনা হইতে পাওয়া অনির্দ্দিষ্ট ও অনিশ্চিত আয়ের উপর নির্ভর করিয়া এই আর্থিক দায়িত্বের গুরুভার স্বীকার ও বহন করা সম্ভবপর নয়। সরকারী অথবা বেসরকারী সূত্রে যথেষ্ট পরিমাণ আর্থিক আনুকূল্য অথবা এককালীন মোটারকমের দান না পাওয়া পর্য্যন্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আর্থিক উন্নতি অথবা বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কোনরূপ পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিয়া তোলা সুদূরপরাহত বলিয়া মনে হয়।"

সভাপতি রাজ্যপাল ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণে বলেন, "উপযুক্তভাবে রবীন্দ্র সঙ্গীত অধ্যাপন ও পরিবেশনের উদ্দেশ্যে এই সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে। তার পর হইতে সুদীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসর অক্লান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিষ্ঠাতৃগণ ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীত ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে হইলে ভারতীয় রাগসঙ্গীত এবং লোকসঙ্গীতের ধারণা আবশ্যক। সেদিকটি ইহারা উপেক্ষা করেন নাই। স্বতন্ত্র ভাবে রাগসঙ্গীত শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া নৃত্য ও যন্ত্রসঙ্গীত সংযোগে যাহাতে সঙ্গীতের পূর্ণ রসাস্বাদন সম্ভব হয়, সে বিষয়েও ইহারা অবহিত।"

উৎসবের সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন সুপ্রিয়া চট্টোপাধ্যায়, আরতি দাশগুপ্ত, শেলি ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি। উপাধি বিতরণ করেন রাজ্যপাল-পত্নী শ্রীযুক্তা বঙ্গবালা মুখোপাধ্যায়। গীতবিতানের সভাপতি ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত, নাট্য ও নৃত্য সংসদ

গত ১লা বৈশাখ ৫নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনস্থ 'রবীন্দ্র-ভারতী' ভবনে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীবিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত, নাট্য ও নৃত্যসংসদ উদ্বোধন করেন। শিক্ষকগণকে শিক্ষাদান, গবেষণা ও প্রচার—এই সংসদের প্রধান উদ্দেশ্য। সংসদের সঙ্গীত, নাট্য ও নৃত্যবিভাগে শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী এবং উদয়শঙ্কর যথাক্রমে সর্ব্বাধিনায়কের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। শিল্প ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ইঁহাদের প্রতিভা ও অবদান সর্ব্বজনবিদিত। স্বাধীন রাষ্ট্রমাত্রেই সংস্কৃতির অন্যতম নিদর্শন ললিতকলার যথাযোগ্য সম্মান দিয়া থাকেন। সঙ্গীত, নাট্য-নৃত্য প্রভৃতি চারুকলার অনুশীলন ও উন্নতিবিধানকল্পে ভারত ও প্রাদেশিক সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা এবং উৎসাহদান লক্ষণীয়।

ঋষি বঙ্কিমের তিরোধান উৎসব

বিগত ২৬শে চৈত্র বন্দেমাতরম মন্ত্রের উদ্গাতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধান উৎসব বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নৈহাটি শাখার উদ্যোগে কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমভবনে আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নৈহাটি শাখার সম্পাদক শ্রীঅতুলচরণ দে পুরাণরত্ন বঙ্কিমভবনে প্রতিষ্ঠিত সংগ্রহশালাটির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত পুস্তকাদি এবং অন্যান্য বহু মূল্যবান জিনিষ সংগৃহীত হইয়াছে। বঙ্কিমের বসতবাটি এবং তৎসংলগ্ন স্থান অধিকারপূর্ব্বক সংগ্রহশালায় পরিসরবৃদ্ধি ও বঙ্কিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

সভাপতি শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র তাঁহার জ্ঞানগর্ভ এবং চিত্তাকর্ষক ভাষণে বঙ্কিমের বহুমুখী প্রতিভার কথা আলোচনা করিয়া বাংলার ইতিহাস ও জাতিতত্ত্বের আলোচনায় বঙ্কিম যে অভিনব আলোক-সম্পাত করেন তৎসম্বন্ধে শ্রোতৃবৃন্দকে অবহিত হইবার কথা বলেন। বঙ্কিমভবনে একটি বঙ্কিমপাঠচক্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রহশালার কর্ত্তৃপক্ষকে তিনি বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানান।

পণ্ডিত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী প্রমুখ আরও কেহ কেহ সভায় বক্তৃতা করেন। কতকগুলি কবিতা এবং প্রবন্ধও পঠিত হয়। স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হইবার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ কর্ত্তৃক আলোকচিত্র দেখানো হইয়াছিল।

রবিবাসর রজত-জয়ন্তী

রবিবাসরের এক অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া রবীন্দ্রনা[illegible] বা ছিলেন, "আমাদের তরুণ বয়সে আমরা এই রকম বৈঠক প্রা করে বাঁচিয়ে রাখতে পারি নি। রবিবাসর যেন বেঁচে থাকে কবির আশীর্ব্বাদ সার্থক হইয়াছে। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর এই প্র ষ্ঠানের নিয়মিত বৈঠক বসিয়াছে। রবিবাসর সাহিত্যিক, শি সাংবাদিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক এবং সাহিত্যামোদীদের মি সভা। ইহার সদস্য সংখ্যা পঞ্চাশ জনে নিবদ্ধ। বাংলার স প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিকই কোন-না-কোন সময়ে ইহার সদস্য শ্রে ভুক্ত ছিলেন। শরৎচন্দ্র ইহার অধিবেশনে নিয়মিত ভাবে যো দান করিতেন। রবীন্দ্রনাথ ইহার অধিনায়ক এবং স্বর্গত জ সেন ইহার প্রথম সর্ব্বাধ্যক্ষ ছিলেন। অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মি ইহার বর্ত্তমান সর্ব্বাধ্যক্ষ। ১৩৬১ সাল রবিবাসরের রজত-জয় বৎসর। গত ২৭শে চৈত্র সর্ব্বাধ্যক্ষ মিত্র মহাশয়ের আহ্বানে না বালিগঞ্জ প্লেসের ভবনে রজত-জয়ন্তী বর্ষের শেষ অধিবেশন হ আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে এই জয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানটি মনো হইয়াছিল। সর্ব্বাধ্যক্ষের রেকর্ড-নিবদ্ধ কীর্ত্তনটি উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ মুগ্ধ করে। কবি শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা রজত-জয়ন্তী-শীর্ষক এক স্বরচিত কবিতা পাঠে সকলকে আনন্দদান করেন। অধ্যাপক শ্রীযু শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'সংস্কৃতি' সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা বলেন, "যুগযুগান্তব্যাপী সাধনায় সঞ্জাত গভীর ও নিবিড় প্রাণরস সঞ্জীবিত সংস্কারই জাতির সংস্কৃতির ভিত্তি।"

ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা

ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা তিরাশী বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। এই সমাজসেবামূলক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটি সুদীর্ঘকাল যাবৎ যে ভাবে নানা প্রতিকূলতার ভিতর দিয়া নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে তাহা বিস্ময়কর। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রমুখ ত্রিপুরা জেলার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ১২৭৮ বঙ্গাব্দে এই সভার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাকাল হইতে এই সংস্থা মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অখিলচন্দ্র দত্ত, অবিনাশচন্দ্র সেন প্রমুখ ত্রিপুরার বহু কৃতী সন্তানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। তখনকার দিনে বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। এই বিষয়ে ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার কর্ম্মপ্রচেষ্টা সমগ্র বাংলা দেশে প্রশংসিত হইয়াছিল। বাংলা সরকারের এডমিনিষ্ট্রেশন রিপোর্ট এবং শিক্ষাবিষয়ক বার্ষিক রিপোর্টেও এই বিষয় একাধিকবার উল্লিখিত হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ছাড়া সমাজসেবামূলক বহু কর্ম্মও সভার কর্ম্মিবৃন্দকর্তৃক প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন ইত্যাদির সময় সভা শুধু ত্রিপুরা জেলায় নয়, অন্যান্য জেলা এবং বিভিন্ন প্রদেশেও অর্থ, বস্ত্র ও ঔষধাদি প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছে। সভার সেবাবিভাগ কর্ত্তৃক দুঃস্থের সেবাকার্য্য এবং পল্লীর সংগঠনের কাজ সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হইতেছে।

বরিশাল সেবাসমিতি, ময়মনসিংহ সম্মিলনী, শ্রীহট্ট সম্মিলনী প্রভৃতির ন্যায় ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভাও কলিকাতার প্রাচীন সংস্থাসমূহের অন্যতম। এই জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানটি ত্রিপুরাবাসীর সাংস্কৃতিক মিলনক্ষেত্ররূপে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। বাংলার অন্যান্য জেলার কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। প্রত্যেক ত্রিপুরাবাসীর উচিত ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হওয়া। ত্রিপুরাবাসী কিংবা ত্রিপুরার হিতাকাঙ্ক্ষী অনূ্যন ১৫ বৎসরবয়স্ক পুরুষ বা স্ত্রী বার্ষিক ১৲ টাকা চাঁদা দিলেই ইহার সভ্য হইতে পারেন। সম্প্রতি ইহার বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

প্রাচ্যবাণী মন্দির

গত ৩০শে এপ্রিল ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসুর সভাপতিত্বে প্রাচ্যবাণী মন্দিরের দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভার উদ্বোধনপ্রসঙ্গে প্রাচ্যবাণী মন্দিরের সভাপতি ডাঃ শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত বলেন যে, সংস্কৃত সাহিত্যের প্রচারে ব্রতী এই মন্দির বহুলভাবে ভারত সরকার, বঙ্গীয় সরকার এবং জনসাধারণের সাহায্যে পুষ্ট হইয়াছে। প্রাচ্যবাণী মন্দিরের যুগ্ম-সম্পাদিকা ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী বঙ্গদেশে অবিলম্বে একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসু ও প্রধান অতিথি বিচারপতি শ্রীবিশ্বনাথ বিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের ভাষণে এই মত সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। প্রধান অতিথি বিচারপতি মুখোপাধ্যায় ও শিক্ষামন্ত্রী প্রাচ্যবাণী মন্দিরের কার্য্যাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। সম্পাদকীয়

প্রাচ্যবাণী মন্দিরের বার্ষিক অনুষ্ঠানে বক্তৃতারত ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

বিবরণীতে ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বলেন যে, প্রাচ্যবাণী মন্দির এ পর্য্যন্ত ১২০ খানি গবেষণা-গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছে। গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগে সাড়ে সাত হাজার টাকা অর্থসাহায্যের জন্য তিনি ভারত সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সভান্তে প্রাচ্যবাণী মন্দিরের সদস্য ও সদস্যাগণ কর্ত্তৃক মহাকবি ভাসের অভিষেক নাটক সংস্কৃতে অতি সুন্দর ভাবে অভিনীত হয়।

কথাসাহিত্যিক ও কবি সম্মেলন

বিগত চৈত্রসংক্রান্তি ও ১লা বৈশাখ সাহিত্যতীর্থের উদ্যোগে কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটস্থ 'মন্মথনাথ মল্লিক স্মৃতিমন্দিরে' কথাসাহিত্যিক ও কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কথাসাহিত্যিক সম্মেলনের প্রারম্ভে সাহিত্যতীর্থের অনুষ্ঠান সচিব শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মাইতি এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, এইরূপ কথাসাহিত্যিক সম্মেলন পরীক্ষামূলক হওয়ার জন্য এবং সময়ের স্বল্পতার দরুন বহু বিশিষ্ট লেখককে আমন্ত্রণ জানানো সম্ভব হয় নাই। এই সম্মেলনে আশাপূর্ণা দেবী, মনোজ বসু, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, দক্ষিণারঞ্জন বসু ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় স্বরচিত ছোটগল্প পাঠ করেন। আসামে বাঙালী ও বাংলা ভাষার উপর যে অত্যাচার চলিতেছে, সম্মেলনে তাহার প্রতিবাদ ও প্রতিকারের দাবি জানাইয়া একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু এবং শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রস্তাবটি সমর্থন করেন।

...কবি সম্মেলনের বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, রবীন্দ্রোত্তর যুগের প্রাচীনপন্থী এবং আধুনিকপন্থী উভয়বিধ কবিবৃন্দই যোগদান করেন। বহু কবি পর পর স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন রাধারাণী দেবী, উমা দেবী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, নরেন্দ্র দেব, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, দিনেশ দাস, হরপ্রসাদ মিত্র, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি।

শ্রীমতী বীথিকা বসু

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাদপ্তর কর্ত্তৃক ১৯৫৩ সনে অনুষ্ঠিত লেডী ব্র্যাবোর্ণ নিডল ওয়ার্ক ডিপ্লোমা ফাইন্যাল পরীক্ষায় সমগ্র কলিকাতা, চব্বিশ পরগণা ও নদীয়া জেলার ছাত্রীদের মধ্যে বিজয়গড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী শ্রীমতী বীথিকা বসু প্রথম স্থান অধিকার করিয়া "বঙ্গবালা মুখার্জ্জী পদক" লাভ করিয়াছেন। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্ল্‌স স্কুল ভবনে মেয়েদের সূচী ও হস্তশিল্পের প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের পত্নী শ্রীযুক্তা বঙ্গবালা মুখার্জ্জীর নিকট হইতে শ্রীমতী বসু উক্ত পদক গ্রহণ করেন।

শ্রীমতী বসু ১৯৫২ সনে বি-এ পরীক্ষা পাস করার পর শ্রীঅমৃতলাল দে মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে শিল্পকর্ম্ম শিক্ষা সুরু করেন। শ্রীমতী বসু বর্ত্তমানে বিজয়গড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানে প্রধানা শিক্ষিকার পদে অধিষ্ঠিতা আছেন।

তপোবন পাহাড়ে অষ্টভুজার মন্দির

বাঁকুড়া জেলায় গঙ্গাজলঘাটি থানার অন্তর্গত অমরকাননের সন্নিকটে বড় পাহাড়ের (সম্প্রতি তপোবন পাহাড় নামে পরিচিত) উপর স্বামী ধ্রুবানন্দজীর স্বপ্নাদিষ্ট অষ্টভুজার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এক্ষণে মন্দির-নির্ম্মাণ-পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করার নিমিত্ত তোড়জোড় চলিতেছে। কিছুদিন পরেই মন্দির-নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইবে। ইহার জন্য আনুমানিক পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। উক্ত আশ্রমে অষ্টভুজার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে প্রত্যহ বহু ভক্তের সমাগম হইতেছে এবং স্থানীয় লোকেদের মধ্যেও এই মন্দির-নির্ম্মাণ সম্পর্কে প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে। এই মন্দির নির্ম্মাণকল্পে অর্থসাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিতব্য : উত্তমাশ্রম, ডুমুরদহ হুগলি। তপোবন পাহাড়, পোঃ কাপিষ্টা, বাঁকুড়া।

বালি রাধানাথ বাচ সমিতি

("রাজ্যপাল জয়নিধি" নৌবাহন প্রতিযোগিতা)

রাজ্যপাল শ্রীহরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে নবপর্য্যায়ের বাচখেলা আরম্ভ হয় ১৯৫১ সনে। ঐ সনে বঙ্গীয় নৌবাহন সঙ্ঘ কর্ত্তৃক পরিচালিত বাচলীগ খেলায় দলের সংখ্যা ছিল ৬। ১৯৫২ সনে লীগ খেলায় দলের সংখ্যা হয় ৮ ও খেলার সংখ্যা ২৮—ঐ বৎসর রাজ্যপাল শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে নৌকা-মোচন-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন যে, বাচখেলা রীতিমত চলিতে থাকিলে ঐ খেলায় উৎসাহ দিবার জন্য তিনি একটি পারিতোষিক দিবেন। ১৯৫৪ সনে দলের
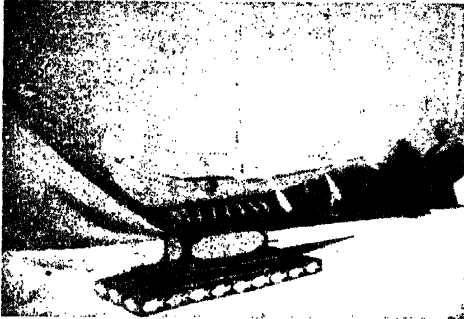
বিজয়ীদলকে "রাজ্যপাল জয়নিধি" দেওয়া হইয়াছে (১৩৬১)

সংখ্যা ১৪ ও খেলার সংখ্যা হয় ৯১। লীগ খেলা ব্যতীত এই কয় বৎসর ধরিয়া উত্তরপাড়া, আড়িয়াদহ ও চাতরায় স্থানীয় বাচ-দল কর্ত্তৃক পরিচালিত এক একটি প্রতিযোগিতা এবং বরাহনগরে একটি দূরপাল্লা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিগত ৪ বৎসরে নৌকাবাহন-প্রতিযোগিতা যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে।

১৯৫৩ সনে নৌবাহনের প্রসার লক্ষ্য করিয়া এবং ভবিষ্যৎ অগ্রগতির সুস্পষ্ট লক্ষণ বুঝিয়া বঙ্গীয় নৌবাহন সঙ্ঘের বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় রাজ্যপাল মহোদয়ের নিকট ঐ কথা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁহার প্রতিশ্রুত পারিতোষিকের কথা স্মরণ করাইয়া দেন। তদনন্তর রাজ্যপাল মহোদয় রতনবাবুর উপর তাঁহার প্রতিশ্রুত পারিতোষিক গঠনের ভার অর্পণ করেন।

রতনবাবু প্রচলিত কাপ বা শিল্ডের পথে না গিয়া, বহুদিন ধরিয়া মিউজিয়ম, বিভিন্ন গ্রন্থাগার প্রভৃতি স্থানে অনুসন্ধানের পর, "রাজ্যপাল জয়নিধি"র চিত্রটি বালি সাধারণ গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুরাতন জার্ণাল অফ ইণ্ডিয়ান আর্ট হইতে বাহির করেন এবং উহার একটি প্রতিরূপ রাজ্যপাল মহোদয়ের নিকট প্রেরিত হয় ও তাঁহার অনুমোদন লাভ করে। রাজ্যপাল ময়ূরপঙ্খীর ধ্বজদণ্ডের উপর আমাদের ত্রিবর্ণরঞ্জিত অশোক-চক্রলাঞ্ছিত রাষ্ট্রীয় পতাকা স্থাপনের নির্দ্দেশ দেন।

অতঃপর একজন দেশীয় কারিগর কর্ত্তৃক ময়ূরপঙ্খীর সম্পন্ন হইলে পর রতনবাবু 'গবর্ণরস ট্রফি'র পরিবর্ত্তে উহার "রাজ্যপাল জয়নিধি" নামকরণ করিবার প্রস্তাব করেন। তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে রাজ্যপাল মহোদয় এই রৌপ্যনির্ম্মিত, সুদৃশ্য, ভারতীয় সুকুমারশিল্পের মনোহর নিদর্শন, ভারতীয় সংস্কৃতির স্মৃতিবিজড়িত ময়ূরপঙ্খীর নাম দেন "রাজ্যপাল জয়নিধি।" গঙ্গাবক্ষে নৌবাহন ক্রীড়ায় উৎসাহদানের উদ্দেশ্যে তিনি বালি রাধানাথ বাচ সমিতিকে এই জয়নিধি উপহার দেন।

বালি রাধানাথ বাচ সমিতি এই বৎসর বালির গঙ্গায় 'রাজ্যপাল জয়নিধি' নৌবাহন প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করেন। প্রথম বর্ষের প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদল বরাহনগর রোয়িং ক্লাব এবং বিজিতদল বালি রাধানাথ বাচ সমিতি। এই প্রতিযোগিতায় ১৬টি দল যোগ দেন। বিজয়ীদল "রাজ্যপাল জয়নিধি" রাখিবার গৌরব পান—বিজিত দল পান "কেদারপ্রসাদ স্মৃতি" পারিতোষিক।

১৯৫৪-৫৫ সনে বঙ্গীয় নৌবাহন সঙ্ঘ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত উত্তরপাড়ার বাচলীগ খেলায় জয়ী হন বরাহনগর রোয়িং ক্লাব (এ) এবং বরাহনগর রোয়িং ক্লাব বিজিত বলিয়া ঘোষিত হন। চাতরা বাচ খেলায় বিজয়ী হন আরিয়াদহ রোয়িং ক্লাব (এ) এবং বিজিত দক্ষিণেশ্বর ওয়াই. এম. এ।

বাচখেলা নূতন নহে। দেশে জাতীয় ভাবের উদ্বোধন কল্পে ইং ১৮৬৭ সনে নবগোপাল মিত্র কলিকাতায় জাতীয় মেলার প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা হিন্দু মেলা নামেই অভিহিত হয়। বাচখেলা এই জাতীয় মেলার অন্যতম অঙ্গ ছিল।

গঙ্গাবক্ষে বাচের জন্য পানসিই একমাত্র নৌকা—অন্য কোন ধরণের নৌকা নহে। পানসির গঠন সুঠাম এবং চলন মনোরম। বাচের পানসি দৈর্ঘ্যে ৪৬।৪৭ ফুট, প্রস্থে ৪॥০ ফুট। বাচখেলার সময় পানসিতে ১ জন হালি, ৬ জন দাঁড়ি ও ১ জন টালসামাল থাকেন। টালসামাল ভিতরে থাকিয়া প্রতিযোগিতার সময় পানসির ভারসাম্য রক্ষা করেন। পানসির সরঞ্জাম সব দেশী, কারিগর দেশী, পানসীতে বিদেশীর অনুকরণ কোথাও কিছুই নাই। বাচখেলার বিজয়ধ্বনি হিপ হিপ হুরে নয়—জয় হিন্দ অথবা কালী মাই কি জয়!

নবপর্য্যায়ের বাচখেলার প্রথম নৌকা গঠিত হয় বালির 'অলকানন্দা'। বঙ্গীয় নৌবাহন সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত দলগুলির মধ্যে দক্ষিণেশ্বর, লিলুয়া ও বেলুড় এই তিন দলের এখনই এক একখানি করিয়া নৌকার প্রয়োজন। 'অলকানন্দা' গঠনে প্রায় ৩০০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এক্ষণে গঠনের ব্যয় কমিয়া ২০০০৲ টাকায় নামিয়াছে।

বাচের পানসি গঠনের জন্য স্থানীয় চেষ্টায় ১০০০৲ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইলে পর সরকার যদি বঙ্গীয় নৌবাহন সঙ্ঘের সুপারিশ-মত নূতন নৌকা পিছু ১০০০৲ টাকা সাহায্য দেন, তবে অচিরে গঙ্গার দুই তীরে নানা স্থানে বাচের দল গঠিত হইয়া প্রত্যেকেরই এক-একখানি করিয়া বাচের নৌকা রাখিবার সুযোগ হইবে।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

বিরহিণী যক্ষপ্রিয়া

শ্রীবীরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

বামে—লণ্ডনের 'ইম্পীরিয়্যাল ইনষ্টিটিউট অব আর্ট পেভিলিয়নে' শ্রীনীরেন ঘোষের চিত্র-প্রদর্শনীতে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

দক্ষিণে—"মাউণ্ট এভারেস্ট ভোরের আলো"
[শিল্পী : শ্রীনীরেন ঘোষ
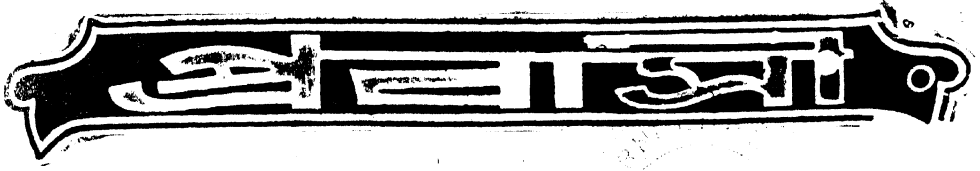
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৫শ ভাগ ১ম খণ্ড | আষাঢ়, ১৩৬২ | ৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

শিক্ষার মান

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ইহার প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী উৎসব লিতেছে। বাংলা তথা ভারতের শ্রেষ্ঠতম ও প্রাচীনতম উচ্চ শক্ষায়তনের জয়ন্তী-উৎসবে যোগদান করিয়াছেন বহু কৃতী ছাত্র ও ধী শিক্ষাব্রতী।

প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাংলায় বলেন য, এই শতবার্ষিকী উৎসবে যোগ দিয়া তিনি অতুল উল্লাস লাভ রিয়াছেন। তিনি বলেন, ঐ উচ্চ বিদ্যামন্দিরে যে শিক্ষা তনি পাইয়াছিলেন তাহারই জন্য দেশের সেবায় 'অল্প-স্বল্প' কিছু রিতে পারিয়াছেন। সেজন্য তিনি তথাকার অধ্যাপক ও আচার্য্য-দের প্রতি এবং সেই সময়ের সহপাঠী সুহৃদ্ যাঁহারা ছিলেন হাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেন।

তিনি বলেন, এখন এই শিক্ষায়তনের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির য়োজন। "দেশে যত বিদ্বান, চরিত্রবান মানুষের সৃষ্টি হইবে, তই তাঁহারা দেশের আশা ভরসা বাড়াইবেন, তাই এই কলেজের না আরও ভাল ভাবে কাজ করা দরকার।" আচার্য্য যদুনাথ রকারের উদ্বোধনী ভাষণের সমর্থনে তিনিও বলেন, আজ শিক্ষার ান উচ্চতর করা প্রয়োজন এবং শিক্ষার প্রসারেরও প্রয়োজন।

আচার্য্য যদুনাথ বলেন যে, বর্ত্তমানে শিক্ষা বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা রুতর সমস্যা শিক্ষার মান উচ্চ ও যথাযথ রাখা। তাঁহার মতে াজ শিক্ষায়তনের ক্ষেত্রেও গ্রেসামের ন্যায় চলিতেছে, অর্থাৎ "মেকি াকার ঠেলায় ভাল টাকা বাজার হইতে হটিয়া যাইতেছে।" শিক্ষার ামে ও গণতন্ত্রের নামে বিদ্যায়তনের ঝুটা বা মেকিই চলিতেছে।

আচার্য্য যদুনাথ সরকার উদ্বোধনী ভাষণে আরও বলেন যে, াজিকার দিনে পূর্ব্ব গৌরব স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ চিন্তা করাও চিত হইবে। এখনকার প্রধানতম প্রশ্ন হইতেছে কি ভাবে শিক্ষণ পরীক্ষার উচ্চমান বজায় রাখা যায়। কারণ বর্ত্তমানে প্রাদেশিক ায়ত্ত শাসনের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারেও সঙ্কীর্ণতা প্রবেশ রিয়াছে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেশীদের অধ্যাপনায় নযুক্ত করিতে সম্মত নন এবং গণতন্ত্রের নামে সস্তায় ডিগ্রীও বতরণ করা হয়। বিগত শতাব্দীতে প্রেসিডেন্সী কলেজ শিক্ষার মহনীয় মান রক্ষার জন্য একাকী সংগ্রাম করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও ভারতবর্ষকে মধ্যযুগীয় তামসিকতা হইতে রক্ষা করার জন্য তাহাকেই এই অপ্রিয় দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। বর্ত্তমানে স্বাধীন দেশে বিদ্যার মান উন্নীত করার প্রয়োজন আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে, ভিক্ষুকের ন্যায় অক্সফোর্ড কেমব্রিজ, প্যারিস কিংবা ভিয়েনায় রুটির টুকরা কুড়ানোর 'বিদ্যা-অন্ত্যজ' অবস্থা এখন আর সহনীয় নয়। প্রতি বৎসর ছয় হাজার ভারতীয় ছাত্র বিদেশে বিদ্যালাভের জন্য যান এবং এই বাবদ বছরে সাড়ে ৩ কোটি টাকা খরচ হয়। দ্বিতীয় সমস্যা তিনি মনে করেন, এই কলেজের আভিজাত্য রক্ষা করা। ইহার পূর্ব্বতন আভিজাত্য আজিকার দিনে নিন্দিত এবং ঈর্ষাযোগ্য হইবে, কারণ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি বা মর্য্যাদার ইহাই স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু যদি কার্য্যের দ্বারা তাঁহারা নিজেদের অগ্রগণ্যতা রক্ষা করিতে পারেন, তবেই প্রতিভার আভিজাত্য থাকে, অর্থাৎ গ্রীক অর্থে আভিজাত্য বলিতে যাহা বুঝায় সেই শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্ব যদি তাঁহারা লাভ করিতে পারেন তবেই কলেজের আভিজাত্য রক্ষা পাইবে। তিনি আরও বলেন যে, একত্র অবস্থানের দ্বারা যে ঘনিষ্ঠ ঐক্যবোধ জন্মে তাহার পরিবৃদ্ধির জন্য তিনি প্রস্তাব করেন যে, ইহার চৌদ্দ শত ছাত্র এবং পঁচিশ জন অধ্যাপক যাহাতে একই স্থানে বাস করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।

বাংলার ও বাঙালীর বর্ত্তমান শোচনীয় দুর্দ্দশার মূল কারণ শিক্ষাদানের ও শিক্ষালাভের মানের অবনতি। যখন সারা ভারতে বাংলার বিদ্যা-বুদ্ধির খ্যাতি ও গৌরব ছিল, তখন বাঙালী জীবন-যাত্রার সকলক্ষেত্রেই উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহার বিদ্যা-বুদ্ধি, ব্যবহারিক ও ব্যবসা-ব্যাপারের, সকল ক্ষেত্রেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল ঐ একই কারণে। শিক্ষিত ব্যক্তির জীবন যেরূপ বিনয়যুক্ত (disciplined) হয় তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ আমাদের প্রাচীনগণের মধ্যে ছিল। আজ শিক্ষার মান অবনত, শিক্ষার্থী দুর্বিনীত ও উচ্ছৃঙ্খল। ফলে সকল ক্ষেত্রেই বাঙালী পরাজিত হইতেছে। চাণক্যের শ্লোক যথার্থ ই সত্য।

"বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্ বিনয়াৎ এতি পাত্রতাম্।
"পাত্রতাম্ ধনম্ আপ্নোতি ধনাৎ ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ।।"

রাশিয়ার পথে পণ্ডিত নেহরু

পণ্ডিত নেহরুর রাশিয়া যাত্রা ও ভ্রমণ সম্পর্কে অনেক সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে। আমাদের নিকট পূর্ণ বৃত্তান্ত এখনও পৌঁছাইবার সময় হয় নাই। সুতরাং কেবলমাত্র তাঁহার যাত্রার সংবাদ আমরা নিম্নে দিলাম :

"বোম্বাই, ৫ই জুন—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য অপরাহ্ণ ৩টায় সান্তাক্রুজ বিমান ঘাটি হইতে এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনালের 'রাণী অব অজন্তা' নামক একখানি সুপার কনষ্টেলেশন বিমানযোগে রাশিয়ার পথে প্রাগ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে সমবেত সাংবাদিকদের নিকট তিনি বলেন, 'আমি ভারতের জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ লইয়া যাইতেছি।'"

শনিবার ৪ঠা জুন পুণায় ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমীর শিক্ষার্থীদের এক সভায় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, "ভারতবাসীর শান্তি, সৌহার্দ্দ্য ও সহযোগিতার বাণী লইয়া যাওয়াই সোভিয়েট রাশিয়া তথা অন্যান্য দেশ পরিভ্রমণ আমার উদ্দেশ্য। মস্কো বা অন্য কোন রাষ্ট্রের রাজধানীতে কোন বিশেষ কাজ লইয়া আমি যাইতেছি না বটে; কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য লইয়া যাইতেছি। তাহা হইতেছে রাশিয়া ও অন্যান্য দেশের নিকট ভারতের শান্তি, সৌহার্দ্দ্য ও সহযোগিতার বাণী লইয়া যাওয়া। নয়াদিল্লী ত্যাগের পূর্ব্বে রাষ্ট্রপতি আমাকে এইরূপ কথা বিশেষভাবে বলিয়া দিয়াছেন। ভারতের বাণী—'সংগ্রামের বাণী নয়; উহা শান্তি ও মৈত্রীর বাণী।'"

মধ্যবিত্তের গৃহসমস্যা

মধ্যবিত্তের গৃহসমস্যা, বিশেষতঃ কলিকাতা শহরে, বর্ত্তমানে একটি প্রধান সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে, যদিও এ সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ তেমন মাথা ঘামানো প্রয়োজন মনে করেন না। তাঁহারা কয়েকবার ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন পাস করিয়াই তাঁহাদের লোক-দেখানো কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন—যদিও ভাড়া-নিয়ন্ত্রণ আইন অনিয়ন্ত্রিত বেআইনীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, অন্ততঃ বাড়ীওয়ালারা তাহাই মনে করেন। দক্ষিণ-কলিকাতায় দুইখানি ছোট ছোট ঘর যাহার ভাড়া পূর্ব্বে ছিল ১৫৲ টাকা, বর্ত্তমানে তাহার ভাড়া দাঁড়াইয়াছে ১২৫৲ টাকায়। কি নিয়মে এইরূপ ভাড়া বর্দ্ধিত হইল তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নূতন বাড়ীর তিনখানা ঘর ২৫০৲ হইতে ৩০০৲ টাকা ভাড়া, লেক অঞ্চলে কেয়াতলায় এই রকম ভাড়ার রেওয়াজ হইয়াছে। বাড়ীওয়ালারা নির্ভয়ে এবং নির্ভাবনায় ষ্টেটসম্যান কাগজে এইসব বাড়ীর বিজ্ঞাপন দেয়।

যুদ্ধের কালোবাজারে যাহারা ফাটকা খেলিয়া ফাঁপিয়া গিয়াছে তাহাদের এবং মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে একটা সামাজিক ঘৃণার ভাব জাগে। কিন্তু অনেক বাড়ীওয়ালা মুনাফাখোরদের অপেক্ষা কম ঘৃণ্য নহে, সেইজন্যই হাঙ্গরের সঙ্গে তাহাদের তুলনা করা হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপে, বিশেষতঃ ইংলণ্ডে মধ্যবিত্তের গৃহসমস্যা বহুলাংশে সমাধান করা হইয়াছে। বীমা কোম্পানীগুলি এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়া নিজেদের খরচে ছোট ছোট বাড়ী তৈরি করিয়া মধ্যবিত্তদের বিক্রয় করিয়া দিতেছে। বিক্রয়ের টাকা বাবদ বাড়ী বন্ধক রাখা হইতেছে—২০।২৫ বৎসরে দেনা শোধ দিলেই চলিবে। এ ব্যবস্থায় কাহারও আপত্তি করিবার কারণ নাই। যে টাকা বাড়ীভাড়া হিসাবে দেওয়া হইত, সেই টাকাতে নিজেদের বাড়ী হইয়া যায়। বীমা কোম্পানীসমূহ বাড়ীগুলি ভালভাবেই করিয়া দিতেছে, অন্ততঃ দশ বৎসর বাদে মাথায় ভাঙিয়া পড়ার সম্ভাবনা নাই।

আমাদের দেশের দৃষ্টিভঙ্গী ফাটকাবাজারী দৃষ্টিভঙ্গী। ১০০৲ টাকায় বিঘা কিনিয়া চার হাজার টাকায় কাঠা বিক্রীর দিকে ঝোঁক। তাহাও মাত্র দু'একটি বীমা কোম্পানী করিয়া থাকে। অন্যান্যরা কোম্পানীর কাগজে টাকা খাটাইয়াই নিরস্ত। সামাজিক কাজ এবং কল্যাণের দিকে আগ্রহ নাই। অতীতের মুনাফাখোরী মনোবৃত্তি লইয়া ব্যবসা চালাইয়া যাইতেছেন। ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলি বাড়ী তৈয়ারীর দিকে নজর দিলে সামাজিক কল্যাণ সাধিত হইত। আর বাড়ী বন্ধকী ব্যবসা কোম্পানীর কাগজের অপেক্ষা লাভজনক।

আর আমাদের কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের প্রাদেশিক সরকার? তাঁহাদের এ সম্বন্ধে মাথা ঘামাইবার ফুরসত নাই। মন্ত্রীমহাশয় এবং উদ্ধতন কর্ম্মচারীদের বাড়ীর সমস্যা নাই, সরকারী কল্যাণে তাঁহাদিগকে হাঙ্গররূপী বাড়ীওয়ালাদের কবলে পড়িতে হয় নাই, সেইজন্যই তাহারা অপরের অসুবিধা কি করিয়া বুঝিবেন? কেন্দ্রীয় সরকার এতদিন পরে এ বিষয়ে একটু সজাগ হইয়াছেন, অন্ততঃ কাগজে মাঝে মাঝে আশার বাণী শুনানো হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিন্তু সবাইকে নাকি কল্যাণীতে ঠেলিতে চাহেন। কল্যাণী পরিকল্পনা করিয়া তাঁহারা মহা ফ্যাসাদে পড়িয়া গিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার মধ্যবিত্তদের বাড়ীর জন্য যে টাকা দিতে রাজী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সে টাকা কল্যাণীতে চালান দিতে আগ্রহশীল। কাজেই সমস্যার আশু সুরাহা কিছু একটা দেখা যায় না। কেন্দ্রীয় সরকার নাকি সমবায় সমিতির মারফত মধ্যবিত্তের গৃহনির্ম্মাণের জন্য টাকা ধার দিবেন বলিয়া চিন্তা করিতেছেন। কিন্তু "কো-অপারেটিভ হোমস"-এর কথা স্মরণ করিয়া আমরা ইহাতে উৎসাহিত বোধ করি না। বীমা কোম্পানীগুলির মারফত কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে অগ্রণী হইলে পারেন।

বাড়ীভাড়া কমাইবার প্রকৃষ্ট উপায় এই যে, আয়করের মত ক্রমবর্দ্ধমান হারে বাড়ী ভাড়ার উপর মিউনিসিপ্যাল কর ধার্য্য করা উচিত। ভাড়া যেখানে বেশী, করও বেশী হওয়া প্রয়োজন, করের একটি হার নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন ভাড়ার অনুপাতে। আর কর্পোরেশন যখন বাড়ীর উপর কর ধার্য্য করিবে সেই সঙ্গে বাড়ীর ভাড়াও কত হওয়া উচিত তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিবে এবং ইহার ব্যতিক্রমে বাড়ীওয়ালারা শাস্তি পাইবে।

মহলানবীশ পরিকল্পনা

গত ৯ই জুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার পরিসংখ্যান উপদেষ্টা এবং দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার খসড়া কাঠামো রচয়িতা অধ্যাপক পি. সি. মহলানবীশ কলিকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে ঐ কাঠামো-পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যসমূহ বিশ্লেষণ করেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র চীফ রিপোর্টারের সংবাদে আমরা তাহা এইরূপে পাইতেছি। পরিকল্পনা কমিশন এবং জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ ঐ কাঠামো-পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য অনুমোদন করিয়াছেন। এক্ষণে উহা দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা প্রণয়নের মূল ভিত্তিস্বরূপ ব্যবহৃত হইবে।

"অধ্যাপক মহলানবীশ বলেন, কাঠামোপরিকল্পনা রচনার মূল উদ্দেশ্য দ্বিবিধ—(১) যত শীঘ্র সম্ভব বেকার সমস্যার সমাধান এবং (২) ভবিষ্যতে যথার্থ শিল্পোন্নয়নের দৃঢ় ভিত্তি রচনা। বেকার সমস্যা সমাধানের একমাত্র সম্ভাব্য উপায় হইতেছে হস্তচালিত এবং গার্হস্থ্য শিল্পগুলির সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা। এইজন্য ঐ সকল শিল্পজাত দ্রব্যাদির ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা এবং বাজার সৃষ্টি করিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে বেকার সমস্যার পূর্ণ সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত গার্হস্থ্য শিল্পসমূহের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে এইরূপ কারখানা-শিল্পসমূহের আরও সম্প্রসারণ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

"দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ কি প্রকারে সংগৃহীত হইবে, বিভিন্ন মহল হইতে এই প্রকার সংশয়পূর্ণ সমালোচনার উত্তরে অধ্যাপক মহলানবীশ বলেন, কতকগুলি নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্য—যেমন লবণ, চিনি, বস্ত্র, জুতা ইত্যাদি এবং সকল প্রকার বিলাসদ্রব্যের উপর উৎপাদন শুল্ক ধার্য্য করিলে অতিরিক্ত অর্থাগমের কোন অসুবিধা হইবে না। তাঁহার মতে নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির উপর কর ধার্য্য করা সমর্থনযোগ্য ; কারণ ঐ টাকা কর্ম্ম-সংস্থান এবং দরিদ্র শ্রেণীর জনসাধারণের আয় বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হইবে।

"অধ্যাপক মহলানবীশ বলেন, আগামী ১৪ বৎসরের মধ্যে জাতীয় আয় দ্বিগুণ এবং ২৮ বৎসরের মধ্যে চতুর্গুণ করাই পরিকল্পনা-রচয়িতাদের উদ্দেশ্য। ৬ হইতে ৮ বৎসরের মধ্যে বেকার সমস্যা দূর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইতিমধ্যে জীবনযাত্রার মানের ক্রমিক উন্নতি হইতে থাকিবে। ২০০ কোটি টাকা গার্হস্থ্য শিল্পগুলিতে কর্ম্মরত ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ইস্পাত, ভারী যন্ত্রপাতি, কয়লা, বিদ্যুৎ, রেলওয়ে প্রভৃতি মূল ভারী শিল্পসমূহ যাহা গার্হস্থ্য শিল্পগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করে না উহাদের উন্নয়নের জন্য বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করিতে হইবে। এই প্রকার অর্থবিনিয়োগের ফলে ক্রয়ক্ষমতার সৃষ্টি হইবে এবং গার্হস্থ্য শিল্পজাত ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির উৎপাদন এবং মূল শিল্পসমূহের অর্থবিনিয়োগ—উভয়ই একসঙ্গে বৃদ্ধি করিতে হইবে। ইহা আমেরিকা অথবা রাশিয়ার অনুকৃতি নহে ; পরন্তু ভারতের অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

"অধ্যাপক মহলানবীশ বলেন, শিল্পসমূহের ব্যাপক জাতীয়করণের কোন প্রস্তাব উহাতে করা হয় নাই। বড় বড় ব্যবসায়িগণ ক্রম প্রসারিত বাজারের সুবিধা ভোগ করিবেন এবং সমৃদ্ধিশালী হইবেন।

"অধ্যাপক মহলানবীশ আরও বলেন, এদেশের বেকার সমস্যার সহিত ইউরোপের দেশগুলির বেকার সমস্যার তুলনা চলে না। তাহাতে কারখানা, যন্ত্রপাতি ও উৎপাদনের উপায়ের অভাব আছে। সুতরাং শুধু চাহিদা সৃষ্টি করিলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে। এমতাবস্থায় এই দেশে কারখানা, রেলওয়ে প্রভৃতির সম্প্রসারণের দ্বারা নূতন মূলধন সৃষ্টি করিতে হইবে।

"পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত তাঁহার (অধ্যাপক মহলানবীশের) দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য কোথায় এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা সম্পর্কে ডাঃ রায় যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা দুই বার পাঠ করিয়াও তিনি উহার মর্ম্মোদ্ধার করিতে পারেন নাই। এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে যে, খসড়া প্রস্তাব কার্য্যকরী হইলে কতকগুলি কারখানা অচল হইয়া পড়িবে। ইহার উত্তরে অধ্যাপক মহলানবীশ বলেন যে, লক্ষ লক্ষ লোকের কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে পারিলে তিনি প্রথমোক্ত অবস্থা অপেক্ষা দ্বিতীয় অবস্থাকেই অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করেন। অধ্যাপক মহলানবীশ বলেন, তিনি সংবাদ পাইয়াছেন যে, ডাঃ রায় নাকি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রস্তাবিত দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার মত বড় পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার উপযুক্ত অর্থ-সামর্থ্য ভারতের নাই। এতৎসম্পর্কে তিনি বলিতে পারেন যে, প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ হইতে ৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা হইয়াছিল। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় সমস্ত রাজ্যসমূহের জন্য ৮০০।৯০০ কোটি টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা করা হয়। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা পাবলিক সেক্টরে ১৫০০।১৬০০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব হইতে পারে। এক্ষণে একটি রাজ্য (পশ্চিমবঙ্গ) হইতেই যদি ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা করা হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার জন্য উপযুক্ত আর্থিক সামর্থ্য নাই—এইপ্রকার যুক্তি স্বতঃবিরোধী হইয়া পড়ে।

"অধ্যাপক মহলানবীশ জানান যে, আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা এবং পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যদের মধ্যে আলোচনা হয় এবং একটি যুক্ত কমিটি গঠন করা হইয়াছে। তিনি আরও জানান যে, ছোটখাট শিল্প সম্পর্কে পর্য্যালোচনার নিমিত্তও একটি কমিটি গঠন করা হইতেছে।

"অধ্যাপক মহলানবীশ বলেন, প্রয়োজন হইলে গবর্ন্মেণ্টকেও শিল্প বাণিজ্যে অবতীর্ণ হইতে হইবে। অনেকের ধারণা যে, এই প্রকার শিল্প-বাণিজ্য হইতে গবর্ন্মেণ্টের কোন মুনাফা করা উচিত নহে। তাঁহার মতে জনসাধারণের কল্যাণার্থে ব্যয়ের নিমিত্ত গবর্ন্মেণ্টের যথাসম্ভব মুনাফা করা উচিত।"

পরিকল্পনায় আকাশকুসুম

কল্পনা জিনিষটি বরাবরই আনন্দদায়ক, তাহা যতই উদ্ভট হউক না কেন। আর নূতন কিছু বলিবার ইচ্ছা মানুষকে সময়ে সময়ে এমন পাইয়া বসে যে, নূতন কথা বাস্তবকে ছাড়াইয়া আকাশ কুসুমের কল্পনা করে। সম্প্রতি শ্রীপ্রশান্ত মহলানবিশ মহাশয় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ব্যাপারে যে প্রস্তাব দিয়াছেন তাহা কল্পনার দিক হইতে অনবদ্য—অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা যেন (অলীক) কল্পনার রূপান্তর মাত্র। গত ১৪ই সেপ্টেম্বর প্ল্যানিং কমিশন অধ্যাপক মহলানবিশকে জিজ্ঞাসা করেন যে, "আপনি কি এমন কোন পরিকল্পনা দিতে পারেন যাহাতে দশ বৎসরে ভারতের বেকার সমস্যার সমাধান হইতে পারে?" সেই অনুসারে তিনি একটি পরিকল্পনার প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন। তাঁহার অভিমত এই যে, ঘরোয়া শিল্পের ব্যাপক প্রসার প্রয়োজন এবং ঘরোয়া শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহদায়তন শিল্পসমূহের উৎপাদন হ্রাস করাইয়া দিতে হইবে। হাতের কাজের শিল্প এবং ঘরোয়া শিল্পের প্রসার দ্বারাই ভারতের বেকার সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে।

কথাটা অবশ্য নূতন কিছু নয়। মহাত্মা গান্ধী বহু বৎসর আগেই একথা বার বার বলিয়াছেন যে, বেকার সমস্যার সমাধান করিতে হইলে বৃহদায়তন শিল্প বন্ধ করিয়া দিয়া কুটীর-শিল্পের প্রসার করিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধীর কথা সর্ব্বতোভাবে গৃহীত হয় নাই কারণ ইহা হয়ত গরুর গাড়ীর যুগের অর্থনীতিতে ফিরিয়া যাওয়ার প্রচেষ্টা মাত্র এবং ইহাতে জাতীয় সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে না। ভারতবর্ষে দুই হাজার বৎসর ধরিয়া ঘরোয়া অর্থনৈতিক কাঠামো বজায় ছিল, কিন্তু তাহাতে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি না পাইয়া অবনতির দিকে গিয়াছিল, জনসাধারণের ক্রমহ্রাসমান ক্রয়-ক্ষমতার অভাবে শিল্প প্রসার ব্যাহত হইয়াছিল। ফলে অধিকসংখ্যক লোক অল্প পরিমাণ জমির উপর নির্ভরশীল হইয়া কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করিতেছিল।

ভারত সরকার অবশ্য বৃহদায়তন এবং কুটীরশিল্পের মধ্যে সমন্বয়-সাধন করিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছেন, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদন হ্রাস করিয়া দিয়াছেন, যেমন, মিল বস্ত্র উৎপাদন ব্যাপারে। অধ্যাপক মহলানবীশ মহাশয় বলিয়াছেন যে, ঘরোয়া শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদন হ্রাস করিয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহদায়তন শিল্প কয়টি আছে? একমাত্র কাপড়ের মিলগুলিই নজরে পড়ে এবং সে সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার ইতিপূর্ব্বেই উৎপাদন হ্রাস করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পায় নাই। বস্ত্রশিল্প ভারতের প্রধান বৃহত্তম শিল্প এবং ইহার উৎপাদন হ্রাস করিয়া দেওয়ার অর্থ দেশের উৎপাদন-ক্ষমতাকে অচল করিয়া দেওয়া এবং বেকার সমস্যাকে বৃদ্ধি করা। ভারত সরকারের এইরূপ জোড়াতালি দেওয়া অর্থ নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীই বেকার সমস্যা সমাধানের ব্যর্থতার জন্য দায়ী।

অধ্যাপক মহলানবিশ হয় ত বলিবেন যে, চিনির কারখানা বন্ধ করিয়া দিয়া গুড় খাওয়া হউক, মিলে কাগজ উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিয়া ঘরোয়া শিল্পে উৎপাদিত তুলট কাগজ ব্যবহার করিতে হইবে; সিমেন্টের কারখানা বন্ধ করিয়া বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুটিং পোড়াইয়া চূণ তৈয়ার করিয়া সুরকীর সঙ্গে মিশাইয়া বাড়ী তৈয়ার করিতে হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ভারতবর্ষে কাগজ কিংবা চিনির উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম এবং ইহার উপর যদি আবার মিলগুলির উৎপাদন হ্রাস করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে ত আর কথাই নাই। অধ্যাপক মহলানবিশের প্রস্তাব যেন ইঞ্জিনের বদলে গরু দিয়া রেলগাড়ী টানানোর ব্যবস্থা করা। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন যে, বৃহদায়তন কারখানাগুলির উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার হওয়া উচিত এবং ইহাতে অধ্যাপক মহলানবিশ উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন। কংগ্রেসী নেতারা মহাত্মাজীর ঘরোয়া শিল্পের আদর্শ হুবহু গ্রহণ করেন নাই; তাই আজ জীবিত থাকিলে তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত অধ্যাপক মহলানবিশের প্রস্তাবে তিনি অবশ্যই প্রীত হইতেন। যন্ত্রশিল্পের যুগে পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলি বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিষ্ঠা দ্বারা বেকার সমস্যার সমাধান তথা জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা করিতেছেন। সেই দিক হইতে অধ্যাপক মহলানবিশের পরিকল্পনা অভিনব। আরও অভিনব তাঁর করধার্য্য করার প্রস্তাব; লবণ এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির উপর কর ধার্য্য করিবার জন্য তিনি আগ্রহশীল। তিনি বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ গরীবের দেশ।

আমাদের অভিজ্ঞতা যাহা তাহাতে ঐরূপ প্রস্তাবে "লাভে ব্যাং অপচয়ে ঠ্যাং" হওয়াই সম্ভব। ভোর কমিটি বলিলেন দেশে চিকিৎসা শিক্ষা এক পরিমাপে হওয়া উচিত, অতএব মেডিক্যাল স্কুলগুলিকে কলেজে পরিণত করিয়া একই মানে চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হউক। ফলে মেডিক্যাল স্কুলগুলি মহা উৎসাহে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল; কলেজে পরিণত হইল পশ্চিমবঙ্গের একটি মাত্র স্কুলই।

ঐ যে বস্ত্রশিল্পের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহাতে লাভ কি হইয়াছে? খদ্দর ত জনসাধারণের নিকট এখনও দুষ্প্রাপ্য, অল্প দিন স্থায়ী ও মহার্ঘ।

আমরা প্রথমে কুটীরশিল্পের গোড়াপত্তন পুরা দেখিতে চাই। যদি প্রয়োজন হয় তবে বৃহৎ শিল্পে শুল্ক বসাইয়া তাহার সাহায্য করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার বৃদ্ধি বা পূর্ণ বিকাশে বাধা দেওয়ায় এক দলের নিকট বাহবা পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু দেশের উপকার কিছুই হইবে না। শিল্পের প্রগতিতে প্রতিবন্ধক হওয়া সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে।

তাঁত ও তাঁতি

"পুণা, ১৪ই জুন—ভারত সরকারের রাজস্ব ও প্রতিরক্ষা ব্যয় দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ এখানে অদ্য অপরাহ্নে মহারাষ্ট্র বণিক সভার ২১তম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন উদ্বোধনকালে বৈদ্যুতিক

শক্তিচালিত তাঁত, হস্তচালিত তাঁত ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহ সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি বর্ণনা করেন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি দশটি তাঁত অপেক্ষা কমসংখ্যক তাঁত-সমন্বিত বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত তাঁতের কারখানার বার্ষিক লাইসেন্স ফী ১০০৲ টাকা হ্রাস করিয়া নামমাত্র এক টাকা লাইসেন্স ফী ধার্য্য করা সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত তাঁতের সাহায্যে উৎপাদিত দ্রব্যজাতের উপর উৎপাদন-শুল্ক পুনরায় ধার্য্য করা সম্পর্কে আশঙ্কার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, এই আশঙ্কা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত নহে। তিনি বলেন, যে সমস্ত বৈদ্যুতিক তাঁতের কারখানায় পাঁচখানি পর্য্যন্ত তাঁত থাকিবে সেই সমস্ত কারখানাকে উৎপাদন শুল্ক হইতে রেহাই দেওয়া হইয়াছে। বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত তাঁতজাত দ্রব্যের উপর ধার্য্য উৎপাদন-শুল্ক টেক্সটাইল মিলে উৎপাদিত দ্রব্যের উৎপাদন-শুল্ক অপেক্ষা অনেক কম। বৈদ্যুতিক তাঁতের কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যের উপর ধার্য্য উৎপাদন-শুল্কের পরিমাণ শতকরা পনর হইতে ত্রিশ ভাগ মাত্র। মিশ্র জাতীয় মিলে ধুতি ও শাড়ী উৎপাদন সম্পর্কে বিধিনিষেধ আছে। কিন্তু বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত তাঁত সম্পর্কে সেরূপ কোন বিধিনিষেধ নাই। ১৮ই মে পর্য্যন্ত মজুত মালের জন্য উৎপাদন-শুল্ক লাগিবে না। এইভাবে বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত তাঁতকে সুবিধা দান করা হইয়াছে।

হস্তচালিত তাঁত সম্পর্কে শ্রীগুহ বলেন যে, হস্তচালিত তাঁত-শিল্পের অবস্থা বহুলাংশে দুর্ব্বল বলিয়া হস্তচালিত তাঁতশিল্পের রক্ষাব্যবস্থাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সরকার বাস্তবিক পক্ষে বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত তাঁতকে মিশ্রজাতীয় মিল ও হস্তচালিত তাঁতের মধ্যবর্ত্তী সোপান বলিয়া মনে করেন এবং তদনুসারে শুল্ক ধার্য্য করা হইয়াছে।

শ্রীগুহ বলেন, "আমি সানন্দে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা বর্ত্তমান বার্ষিক লাইসেন্স ফী ১০০৲ টাকা বিশেষভাবে হ্রাস করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছি। যে সমস্ত বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত তাঁতের কারখানায় ১০ খানির কম তাঁত থাকিবে, তাহার জন্য মাত্র এক টাকা, ২৫ খানির কম তাঁতের জন্য পাঁচ টাকা এবং ১০০ খানির কম তাঁতের জন্য দশ টাকা বার্ষিক লাইসেন্স ফী ধার্য্য করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।"

প্রস্তাব অতি উত্তম, কিন্তু বাংলা দেশের তাঁতি ত সুতার অভাবে এবং দীর্ঘ দিনের অবহেলায় মরণদশাগ্রস্ত। চন্দ্রকোণা, ফরাশডাঙ্গা শান্তিপুর কোন প্রকারে বাঁচিয়া আছে। তাহারা দশটি তাঁত কিনিবে কেমন করিয়া, রাখিবে কোথায় এবং বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাই বা করিবে কাহার দৌলতে?

পশ্চিমবঙ্গ ফিনান্স কর্পোরেশন

পশ্চিমবঙ্গ বিত্ত-নিগম (Finance Corporation)-এর গত তের মাসের কার্য্য-বিবরণী নৈরাশ্যব্যঞ্জক—এ কথা নিগমের সভাপতি এবং ডিরেক্টরবর্গ স্বীকার করিয়াছেন। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ইহা নিগমের প্রথম বৎসর এবং স্বল্পায়তন শিল্পকে ঋণদান ব্যাপারে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের প্রয়োজন। কিন্তু এ কথাও প্রণিধানযোগ্য যে, শুধুমাত্র অর্থসাহায্য দিলেই স্বল্পয়াতন শিল্পসংস্থা গড়িয়া উঠে না। নিগমের চেয়ারম্যান শ্রী বি. এম. বিড়লা বলিয়াছেন যে, বিত্ত-নিগম হইতে ঋণ গ্রহণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে আবেদন-পত্র পাওয়া যায় নাই, তাহার কারণ ঋণগ্রহীতারা ঋণ পরিশোধ করা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, দেশের কর-ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাহাতে শিল্পঋণ শোধের সহায়ক হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীবিড়লা বলেন যে, রাষ্ট্র যদি অধিক কর আরোপ করিয়া ভোগ্যবস্তু ক্রয়ে নিরুৎসাহ করেন তাহা হইলে স্বল্পায়তন শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে না। বিত্ত-নিগমের কার্য্যাবলী সীমাবদ্ধ, কারণ যদিও ইহা মূলধন সরবরাহ ব্যাপারে সাহায্য করিবে, তথাপি জনসাধারণের সঞ্চয়-প্রবৃত্তির উপর যে মূলধন সৃষ্টি নির্ভরশীল তাহার উপর বিত্ত-নিগমের কোন প্রভাব নাই।

শ্রীবিড়লার এই সকল কথা কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে অন্য অবস্থা প্রমাণ করে। ঋণ-আবেদন এবং ঋণদানের মধ্যে বিরাট ব্যবধান দেখা যায়। প্রথম বৎসরে বিত্ত-নিগম ১০১টি শিল্পসংস্থার নিকট হইতে ১.০৮ কোটি টাকার ঋণ গ্রহণের জন্য আবেদন-পত্র পান। কিন্তু মোটে ছয়টি সংস্থাকে ঋণ দেওয়া হইয়াছে এবং ঋণের পরিমাণ মোটে ১৪॥ লক্ষ টাকা এবং ১৯৫৫ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত মোট ৯॥ লক্ষ টাকা প্রকৃত দাদন দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায় যে, শ্রীবিড়লার উপরোদ্ধৃত নীতিবাক্যগুলি বাস্তবের সঙ্গে গরমিল হইয়া যাইতেছে।

ঋণদানের এই কার্পণ্য সম্বন্ধে কৈফিয়ত দেখানো হইয়াছে গতানুগতিক, অর্থাৎ ঋণগ্রহণকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি যথোপযুক্ত প্রতিভূতি দিতে অসমর্থ। কিন্তু ব্যাঙ্কের মত বিত্ত-নিগমের প্রতিভূতি গ্রহণের মান এত কড়াকড়ি নয়। তবে কর্পোরেশন যদিও ঋণদান ব্যাপারে ঝুঁকি লইতে প্রস্তুত, তথাপি ইহা সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছে যাহাতে সরকারী অর্থের অপব্যবহার না হয়। ঋণের জন্য আবেদনকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশই স্বত্বাধিকারী কিংবা অংশীদারী সংস্থা এবং ইহাদের যথাযথ আর্থিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় না আর ইহারা নিজেরাও দেয় না।

কার্য্যকরী মূলধন সরবরাহ বিত্ত-নিগমের কাজ নহে, কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক কার্য্যকরী মূলধন সরবরাহ করিবে। জমি, বাড়ী ও কারখানা প্রভৃতির বন্ধকে বিত্ত-নিগম দীর্ঘমেয়াদী দাদন দিবে। কিন্তু অধিকাংশ স্বল্পায়তন শিল্প-সংস্থাগুলির নিজেদের কোন জমি নাই। ভাড়া কিংবা লীজের জমি প্রতিভূতি হিসাবে গ্রহণীয় নহে। বাড়ীর কোন স্থিরীকৃত বাজারদর নাই এবং স্বল্পায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি শীঘ্রই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই সকল অসুবিধা অধিকাংশ স্বল্পায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই প্রযোজ্য, কিন্তু তাই বলিয়া কি প্রাদেশিক বিত্ত-নিগমগুলি পাততাড়ি গুটাইবে। এই সকল

অসুবিধার জন্য ইহারা সর্ব্বভারতীয় শিল্পবিত্ত-নিগমের নিকট হইতে দাদন পায় না এবং এ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার সম্যক্ অবগত আছেন। স্বল্পায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অসুবিধার কথা স্মরণ করিয়া প্রাদেশিক বিত্ত-নিগম প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। স্বল্পায়তন শিল্পের জন্য যে দরদ প্রচার করা হয়, বাস্তবক্ষেত্রে তাহার কতকটা কার্য্যকরী হইলেও দেশের পক্ষে শুভ হইত। বিত্ত-নিগমের প্রয়োগ ব্যবস্থায় রদবদলের অবকাশ রহিয়াছে।

গত তের মাসে বিত্ত-নিগমের লাভ হইয়াছে মোট ১,২৩,৭৫৭ টাকা। কিন্তু এই লাভের অধিকাংশ পাওয়া গিয়াছে শিল্পে টাকা খাটাইয়া নহে; ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিয়া এবং ট্রেজারী বিলে টাকা খাটাইয়া যে সুদ পাওয়া গিয়াছে তাহাই লাভ হিসাবে ধরা হইয়াছে। এই লাভ হইতে ৬০,০০০ টাকা আয়কর হিসাবে বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং ২৪,৭৫০ টাকা রিজার্ভে জমা রাখা হইয়াছে। বাকী ৩৯,০০৭ টাকা অংশীদারদের মধ্যে লভ্যাংশ হিসাবে বিতরিত হইবে। আইনতঃ অংশীদাররা কমপক্ষে শতকরা ৩॥০ হারে সুদ পাইবে। এই সুদ দেওয়ার জন্য বিত্ত-নিগম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে ২,১৩,৫৬৭ টাকা সাহায্য হিসাবে চাহিয়াছে। অর্থাৎ, প্রথম বৎসরে এই পরিমাণ টাকা নিগমের ঘাটতি হইয়াছে।

এদেশে কো-অপারেটিভের ঋণদানে প্রচুর লোকসান ও ঘাটতি গিয়াছে। সেখানেও ব্যবস্থার কড়াকড়ি ছিল। কিন্তু ঋণদানে মিথ্যা ও প্রতারণায় অসাধু লোকেই বেশী টাকা পাইয়াছিল; আমরা চাই না পশ্চিমবঙ্গ ফিনান্স কর্পোরেশন সেই ভাবে নষ্ট হয়। কিন্তু ব্যবসার ব্যাপারে অনির্দ্দিষ্ট ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা প্রায়ই ঘটে। সে কারণে লাভ-লোকসানের বাঁধা-ধরা কিছু থাকে না। সেক্ষেত্রে কতকটা ঝুঁকি সরকারকে লইতেই হইবে। ধ্বংসোন্মুখ কুটির বা স্বল্পায়তন শিল্পকে গড়িয়া তুলিতে হইলে যে অভিজ্ঞতা বা দূরদৃষ্টি প্রয়োজন তাহা বিড়লা প্রমুখ কোটিপতিদের মধ্যে বিন্দুমাত্রও নাই।

বৃহৎশিল্পে যে নিয়ম প্রযোজ্য তাহাও ত যথেষ্ট রদবদল করিয়া বিড়লা প্রভৃতিকে বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছে। আজও যদি বাহির হইতে বিনা শুল্কে মোটর আনা হয়, কাগজের আমদানী হয় এবং ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে অনুরূপ ব্যবস্থা হয় তবে এই কোটিপতিরা রিক্তবিত্ত হইতে কতদিন লাগে? পাটশিল্পে পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে পাটক্রয়ে সরকারী সাহায্যে যে দশ কোটি টাকা লুঠ করান হইয়াছিল তাহাও কি সম্ভব হইত ব্যবস্থা অনুরূপ থাকিলে?

সরকার কি চান তাহা সুস্পষ্ট জানা দরকার; যদি দেশের লোকের উন্নতি তাঁহারা চাহেন তবে অন্যপ্রকার কমিটি গঠনের প্রয়োজন, যাহাতে সহানুভূতিযুক্ত বিচক্ষণ লোক থাকে, যাহাদের কিছু অভিজ্ঞতা আছে ও দূরদৃষ্টিও আছে।

লোকসমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা

লোকসমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যাপারে জনসাধারণের উৎসাহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এই খাতে আজ পর্য্যন্ত মোট সরকারী খরচ হইয়াছে ১৩.৪৮ কোটি টাকা এবং জনসাধারণ নগদ টাকায়, পরিশ্রমে এবং অন্যান্য উপায়ে প্রায় ৭.৪৮ কোটি টাকার মত দিয়াছে। বেসরকারী খরচ সরকারী খরচের মোট ৫৫ শতাংশ। লোকসমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং জাতীয় প্রসার পরিকল্পনা উভয়ে মিলিয়া বর্ত্তমানে প্রায় এক লক্ষ গ্রামে ব্যাপৃত হইয়াছে। প্রায় ছয় কোটির উপর লোক এই পরিকল্পনাগুলি দ্বারা উপকৃত হইবে। সর্ব্বসমেত ৮২৮টি পরিকল্পনা কার্য্যকরী আছে; ইহার মধ্যে ২২০টি লোকসমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাকী ৬০৮টি জাতীয় প্রসার পরিকল্পনা। লোকসমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় পড়িয়াছে ৩২,৯৫৭টি গ্রাম, যাহার জনসমষ্টি হইতেছে প্রায় ২ কোটি। আর জাতীয় প্রসারের আওতায় পড়িয়াছে ৬৬,৩৩৫টি গ্রাম, ইহাদের জনসমষ্টি ৪.১৮ কোটি।

লোকসমাজ পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন সাধন করা যাহাতে তাহারা নিজেরা নিজেদের উন্নয়ন সাধন করিতে পারে। প্রকৃত কল্যাণ-কার্য্যের দ্বারা দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্ত্তন সাধন করা হইবে। কৃষিকার্য্যে গভীর কর্ষণের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে জমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধির জন্য সার দেওয়া হইতেছে। গ্রামে বিরাট বিরাট গর্ত্ত করিয়া সার তৈয়ারির বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ১১৯,৪৪২ টন সার এবং ৪৩,২০০ টন বীজ বিতরণ করা হইয়াছে। ৩৯৬ হাজার একর পতিত জমিকে কর্ষণযোগ্য করা হইয়াছে। ১৫৫,৫২০ একর জমিতে শাকসব্জী ও ফলের গাছ লাগানো হইয়াছে এবং ৭৫৯,৭৭৬ একর জমিতে সেচের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বহুবিধ বন্দোবস্ত অবলম্বন করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৬১৬টি নালি কাটা হইয়াছে এবং ৮৩০৪টি কূপ খনন করা হইয়াছে। ছাত্রদের জন্য ৫৫৯০টি গ্রাম্য স্কুল এবং পূর্ণবয়স্কদের জন্য ১৪,৪৪৫টি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় ১২,০০০ মাইল রাস্তা তৈয়ার করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে ১১,৮৮৬ মাইল কাঁচা রাস্তা এবং ১,১৪৫ মাইল পাকা রাস্তা; ১৪,১২৬টি সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে।

ষ্টেট ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে সম্প্রতি ষ্টেট ব্যাঙ্ক হিসাবে জাতীয়করণ করা হইয়াছে। জাতীয়করণের পক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। আমরা শুধু দুটি কথা এখানে আলোচনা করিব। প্রথমতঃ, ক্ষতিপূরণ। ভারতীয় রাষ্ট্রতান্ত্রিক বিধান অনুসারে ব্যক্তি-গত সম্পত্তি জাতীয়করণ করিলে ক্ষতিপূরণ অবশ্যই দিতে হইবে। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ যাহাতে অতিরিক্ত না হয় তাহার জন্য ভারতীয় রাষ্ট্রতন্ত্র সম্প্রতি সংশোধন করা হইয়াছে। ইহার ফলে বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন এবং সাধারণতঃ ইহা আইন-আদালতের ক্ষমতার বহির্ভূত করিয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু এত ঘটা করিয়া রাষ্ট্রতন্ত্র পরিবর্ত্তন করা সত্ত্বেও ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়। প্রতি

১০০৲ টাকার শেয়ারে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে ১৭৬৫৷৶০ আনা হিসাবে। কর্ত্তৃপক্ষের কৈফিয়ত এই যে, ঐ শেয়ারের বর্ত্তমান বাজার দর নাকি এইরূপ। কর্ত্তৃপক্ষের বোধ হয় স্মরণ নাই যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতিতে শেয়ার বাজার থাকিতে পারে না এবং শেয়ার বাজারের মূল্য ফাটকা খেলার উপর নির্ভর করে। ফাটকার জোরে ১০০৲ টাকার শেয়ার ১৭০০৲ টাকায় উঠিয়াছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার উহাকে নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইলেন কেন? ৩০৲ টাকার টাটা ডেফার্ড শেয়ার যুদ্ধের সময় চার হাজার টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। যুদ্ধের পর টাটা ডেফার্ড শেয়ার বাতিল করিয়া সব সাধারণ শেয়ারে রূপান্তরিত করিয়া দেওয়া হয়। সাধারণ শেয়ারের মূল্য ১০০৲ টাকা। প্রতি ডেফার্ড শেয়ারের জন্য তিনটি করিয়া সাধারণ শেয়ার দেওয়া হয়। ভারত সরকারও ঐ রকম ব্যবস্থা করিতে পারিতেন, প্রতি ১০০৲ টাকার শেয়ারের জন্য দুইটি কিম্বা তিনটি করিয়া শেয়ার দিতে পারিতেন।

দ্বিতীয়তঃ, জাতীয়করণের পর আবার মোট শেয়ারের শতকরা ৪৫ ভাগ জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করা হইতেছে কেন? ষ্টেট ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান মূলধন ৫,৬২,৫০,০০০৲ টাকা, ইহাই ভূতপূর্ব্ব ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের মূলধন ছিল। ক্ষতিপূরণ দিয়া জাতীয়করণ করিবার পর শতকরা ৪৫ ভাগ আবার জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করা নিরর্থক। ১০০ টাকার শেয়ার ১৭৬৫৷৶০ আনায় ক্রয় করিয়া আবার ১০০ টাকায় বিক্রয় করা হইতেছে—সোজা কথায় ইহাই দাঁড়ায়। অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় সরকার মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে যেন টাকার দানখয়রাতি করিতেছেন; ইহারা অবশ্য ভাগ্যবান পুরুষ। ইহাকেই বলে "ঝড়োহাওয়ার" মুনাফা (windfall profit)। অনেকে অবশ্য ১০০ টাকায় শেয়ার কেনেন নাই, অনেক বেশী দামেই কিনিয়াছেন, কিন্তু যাঁরা বেশী দামে কিনিয়াছেন, তাঁহারা ফাটকা খেলার আশায় কিনিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারাও এইরূপ অতিরিক্ত হারে ক্ষতিপূরণ পাইতে পারেন না। ক্ষতিপূরণ বাবদ রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে প্রায় ১২-১৫ কোটি টাকা দিতে হইবে কি তারও বেশী। এই টাকায় কেন্দ্রীয় সরকার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের অপেক্ষা একটি বৃহত্তর নূতন ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারিতেন। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারে ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রাধান্য পাইয়াছে।

"হরিজন পত্রিকা"র প্রকাশ বন্ধ

২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫ সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর বাংলা সাপ্তাহিক 'হরিজন পত্রিকা'র প্রকাশ বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। অবশ্য পত্রিকার পরিচালকবর্গ আশ্বাস দিয়াছেন যে, দেশের বর্ত্তমান জীবন ও কর্ম্মপ্রচেষ্টা সম্পর্কে গান্ধীজীর ভাবধারাযুক্ত নূতন কোন পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব কিনা সে সম্পর্কে তাঁহারা সহানুভূতি-সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের সহিত আলোচনা করিয়া দেখিবেন।

কেবলমাত্র অর্থাভাবেই দশ বৎসর প্রকাশিত হইবার পর 'হরিজন পত্রিকা'র প্রকাশ বন্ধ হইল। পত্রিকা বন্ধ করা সম্পর্কে এক বিবৃতিতে পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় লিখিতেছেন, "১৯৪২ সনে আগষ্ট আন্দোলনের সময় গান্ধীজীর 'হরিজন'-এর এই বাংলা সংস্করণের ১ম সংখ্যা, ইংরেজী সংস্করণের ঐ সংখ্যার প্রবন্ধাবলী সহ, ২রা আগষ্ট তারিখে বাহির হয়। এই সময় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ বাংলা হরিজন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ২য় ও ৩য় সংখ্যা পর পর বাহির হইতেই দেশের সর্ব্বত্র বিপ্লব জাগিয়া উঠে এবং ইংরেজী 'হরিজন'-এর সহিত বাংলা 'হরিজন পত্রিকা'ও বন্ধ হইয়া যায়। তখন বাংলা সংস্করণের মাত্র তিন সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল।

"তৎপরে ১৯৪৫ সনের ডিসেম্বর এবং ১৯৪৬ সনের জানুয়ারী মাসে সোদপুরে অবস্থিতিকালে গান্ধীজী যখন ইংরেজী 'হরিজন' পুনঃপ্রকাশের কথা চিন্তা করিতেছিলেন তখন পূর্ব্বের মত তাহার বাংলা সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তাব হয়, এবং উহা প্রকাশের ভার তিনি পুনরায় আমাদের উপর অর্পণ করেন।

"তার পর ১৯৪৬ সনের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে নবপর্য্যায়ের ইংরেজী 'হরিজন'-এর সহিত বাংলা 'হরিজন পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যা একই প্রবন্ধ সমষ্টি লইয়া বাহির হয় এবং পূর্ব্ববৎ ইংরেজী সংস্করণের সহিত একই দিনে বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হইতে থাকে।"

১৯৪৮ সনে গান্ধীজীর আকস্মিক তিরোভাবের পর 'হরিজন পত্রিকা' আর প্রকাশিত হইবে কিনা সে সম্পর্কে আলোচনার পর পত্রিকা চালাইয়া যাইবার সিদ্ধান্ত হয় এবং কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীর নিয়ত আন্তরিক সহযোগিতায় বাংলা 'হরিজন পত্রিকা' নিয়মিত প্রকাশিত হইতে থাকে। গত কয়েক বৎসর যাবৎ পত্রিকার পাঠক সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস হওয়া সত্ত্বেও গ্রামাঞ্চলের স্বল্পসংখ্যক পাঠক ও কর্ম্মীর অনুরোধে আমরা অত্যধিক আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া সপ্তাহে সপ্তাহে গান্ধীভাবধারা পরিবেশনের প্রয়াস করিয়াছি। এক্ষণে তাহা আর সম্ভবপর নহে। আমাদের অর্থবল ও লোকবলের অতিশয় অভাব এবং অন্য নানা কারণে বহুবিধ অসুবিধা ঘটিয়াছে। সুতরাং সহৃদয় পাঠকগণের নিকট হইতে আমরা দীর্ঘ নয় বৎসর পরে বিদায় লইতেছি।"

বাঙালীর সংস্কৃতিগত অবনতি ও বাংলার কংগ্রেসের চূড়ান্ত অধঃপতন না হইলে 'হরিজন পত্রিকা'র প্রকাশ এভাবে বন্ধ হইত না; পশ্চিম বাংলায় বাঙালীর দুর্গতির চরম নির্দ্দেশ ইহাতে হইল। বাঙালীর নৈতিক মৃত্যু কি অবশ্যম্ভাবী?

প্রজা-সমাজতান্ত্রিক দলে ভাঙ্গন

বিগত সাধারণ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস সদস্যগণ কর্ত্তৃক আচার্য্য কৃপালনীর নেতৃত্বে কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টি গঠিত হয়। নির্ব্বাচনে প্রজা পার্টি কয়েক স্থানে কম্যুনিষ্টদের সহিত সহযোগিতার ভিত্তিতে কংগ্রেসের বিরোধিতা করে। নির্ব্বাচনের অব্যবহিত পরেই অবশ্য প্রজা পার্টি কম্যুনিষ্টদের সহিত কোনরূপ সহযোগিতার নীতি পরিত্যাগ করিয়া ভারতীয় সোস্যালিষ্ট পার্টির সহিত মিলিত হয় এবং ঐ নবগঠিত দলের নাম হয় প্রজা-সমাজ-

তান্ত্রিক দল। সমাজতন্ত্রী দলের সমাজতান্ত্রিক মনোভাব এবং প্রজা পার্টির গান্ধীবাদী মনোভাবের মধ্যে যে বিরোধ ছিল তাহা অবশ্য অমীমাংসিতই থাকিয়া যায়। ফলে গত কয়েক বৎসর প্রজা-সমাজতান্ত্রিক দলকে কয়েকবার বিশেষ অধিবেশন মারফত দলের অন্তর্নিহিত বিরোধ মীমাংসার জন্য চেষ্টা করিতে হইয়াছে।

প্রজা-সমাজতান্ত্রিক দলের রাজনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে মোটামুটি দুইটি ধারা পরিলক্ষিত হয়। শ্রীঅশোক মেহতা এবং শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন যে ভারতের মত পশ্চাৎপদ দেশের অর্থনীতির এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে যাহাতে দেশের এবং জাতির উন্নতি কামনা করিলে বিরোধী দলগুলিকে নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকিয়া সরকারের সহিত সহযোগিতা করা কর্ত্তব্য। উপরন্তু কম্যুনিজম এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির অস্তিত্বের ফলে দেশের সম্মুখে যে বিপদ উপস্থিত হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে সরকারের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদী প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলিয়া তাঁহারা মনে করেন।

এই নীতির বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্য হইল এই যে, কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করিলে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের জনপ্রিয়তা ক্রমশঃই হ্রাস পাইবে। এই পথ অনুসরণ করিলে দলের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে। কম্যুনিজমকে দমন করা প্রয়োজন। কিন্তু যে কংগ্রেস সরকার জনগণের নিকট ক্রমশঃই অপ্রিয়তা অর্জ্জন করিতেছে, তাহার সহিত সহযোগিতা করিলে বিরোধী দল হিসাবে কম্যুনিষ্টরাই প্রাধান্য লাভ করিবে। জনসাধারণের প্রকৃত স্বার্থের পরিপোষকরূপে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল যদি কংগ্রেস এবং কম্যুনিষ্টদের দোষত্রুটি জনসাধারণের নিকট তুলিয়া ধরিতে পারে তবে উহার পক্ষে জনসমর্থন লাভ সহজেই সম্ভব হইবে। ঐ নীতির ভিত্তিতে সরকার গঠন করিতে সক্ষম হইলে কম্যুনিষ্টদের দমন করা দলের পক্ষে কোনই সমস্যা হইবে না। এই চিন্তাধারার অন্যতম মুখপাত্র হইলেন ড. রামমনোহর লোহিয়া।

সম্প্রতি প্রজা-সমাজতান্ত্রিক দলে যে ভাঙ্গনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে ঐ দুই নীতির বিরোধ। কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতার নীতির সমর্থনে শ্রীঅশোক মেহতা যে সকল কথা বলেন বোম্বাই রাজ্যের প্রজা-সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীমধু লিমায়ে দলের মুখপত্র 'জনতা' পত্রিকায় তাহার সমালোচনা করেন। এই সমালোচনার জন্য শ্রীলিমায়েকে সাময়িকভাবে দল হইতে পদচ্যুত (suspended) করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য শ্রীঅশোক মেহতা-বর্ণিত নীতিকেও দলের নীতি হিসাবে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করা হয়। শ্রীলিমায়েকে এই ভাবে সসপেণ্ড করার বিরুদ্ধে ড. লোহিয়া বলেন যে, শ্রীমেহতার নীতি যখন বর্জ্জন করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে তাহার পর শ্রীলিমায়ের উপর ঐ শাস্তিমূলক বিধানের কোনই যুক্তি নাই এবং ঐ ব্যবস্থা দলের সংবিধানবিরোধী। তিনি শ্রীলিমায়ের প্রতি সুবিচারের জন্য সকলের নিকট আবেদন জানান।

সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ রাজ্য প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের বার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধন করিবার জন্য পদচ্যুত সদস্য শ্রীলিমায়েকে আহ্বান করা হয়। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বিধানকে এই ভাবে অমান্য করার দরুন প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের কেন্দ্রীয় কমিটি, উত্তরপ্রদেশ রাজ্য কমিটি এবং উহার সভাপতিকে বাতিল করিয়া দিয়া একটি 'এড হক' কমিটি গঠনের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু উত্তরপ্রদেশ রাজ্য কমিটি এই নির্দ্দেশও মানিতে অস্বীকার করিয়াছেন। উপরন্তু উত্তরপ্রদেশ বিধান সভায় বিরোধীদলের নেতা প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের কেন্দ্রীয় কমিটি হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন।

রাজনৈতিক পর্য্যবেক্ষকগণের অভিমত এই যে, শীঘ্রই ড. রামমনোহর লোহিয়ার নেতৃত্বে প্রজা-সমাজতান্ত্রিক দল হইতে পৃথক আর একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হইবে।

প্রজা-সমাজতন্ত্রীদলের উত্তরপ্রদেশ রাজ্য কমিটির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আলোচনা করিয়া এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ২৯শে মে লক্ষ্ণৌ-এর ইংরেজী সাপ্তাহিক 'পিপল' লিখিতেছেন যে, এই সংঘর্ষের মধ্য দিয়াও বিভিন্ন গ্রুপের আদর্শগত পার্থক্যই মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। মধু লিমায়েকে রাজ্যসম্মেলন উদ্বোধন করিবার জন্য যে সিদ্ধান্ত রাজ্য কমিটি গ্রহণ করিয়াছেন তাহার অন্যতম সমর্থক শ্রীরাজনারায়ণ (রাজ্য বিধান সভায় বিরোধী দলের নেতা), গোপালনারায়ণ শকসেনা (উত্তরপ্রদেশ রাজ্য প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের সভাপতি) গ্রুপ। উঁহারা সকলেই লোহিয়ার সমর্থক। অপর পক্ষে রাজ্য কমিটির সদস্যদের মধ্যে যাঁহারা এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিয়াছেন তাঁহাদের নেতা হইলেন (প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের সর্ব্ব-ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক) শ্রীত্রিলোকী সিং। তৃতীয় গ্রুপ আচার্য্য নরেন্দ্র দেবের নেতৃত্বে এই উভয় গ্রুপের মধ্যকার বিরোধ নরম করিবার চেষ্টা করিতেছে।

কিন্তু সম্প্রতি কেন্দ্রীয় কমিটি কর্ত্তৃক উত্তর প্রদেশ রাজ্য কমিটিকে বাতিল করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার পর মনে হয় যে, উভয় গ্রুপের বিরোধ মীমাংসার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপেই ব্যর্থ হইয়াছে।

প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের মধ্যে কয়েকজন নেতা দেশের অবস্থা বিবেচনা করা অপেক্ষা পার্টি বা দলের স্বার্থ রক্ষা করিতেই চেষ্টিত। তাঁহাদের ধারণা এই যে, বর্ত্তমানে যাঁহারা দেশের শাসনতন্ত্রের অধিকারী তাঁহাদিগকে বিব্রত ও পদচ্যুত করার চেষ্টাই প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের প্রধান কার্য্য এবং উহার জন্য সর্ব্ববিধ সক্রিয় আন্দোলন চালনা করাই ঐ দলের একমাত্র কর্ত্তব্য। বলা বাহুল্য, কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তিই বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এরূপ মতের সমর্থন করিতে ইচ্ছুক নয়।

ভারত-পাকিস্থান আলোচনা ও কাশ্মীর

পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলী সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে আসিয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রীর সহিত বিশেষতঃ কাশ্মীর সমস্যা লইয়া যে আলাপ-আলোচনা করেন তাহার ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা

করিয়া সাপ্তাহিক 'কাশ্মীর পোষ্ট' পত্রিকার শ্রীনগরস্থিত বিশেষ প্রতিনিধি লিখিতেছেন যে, কাশ্মীরের সরকারী মহল আলোচনার ঘোষিত ফলাফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। অমীমাংসিত প্রশ্নসমূহ আলোচনার জন্য দুই প্রধান মন্ত্রী পুনরায় মিলিত হইবেন বলিয়া যে ঘোষণা করা হইয়াছে তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য পাক-প্রধান মন্ত্রী যাহাতে পাকিস্থানের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিরোধী পক্ষকে নিরস্ত করিতে পারেন সেই জন্য তাঁহাকে সাহায্য করা।

উক্ত প্রতিনিধি লিখিতেছেন, ইহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে পাক-প্রধানমন্ত্রী নয়াদিল্লীতে সাংবাদিকদিগকে বলিয়াছেন এইবারের আলোচনায় অনেক নূতন বিষয় আলোচিত হইয়াছে এবং সমগ্র কাশ্মীর সমস্যাটি আলোচনাও অপেক্ষাকৃত সরলভাবে হইয়াছে। কাশ্মীর আলোচনায় যদি গোঁড়ামির প্রাধান্য কমিয়া থাকে স্পষ্টতঃই তাহার কারণ এই যে পাকিস্থান বুঝিতে পারিয়াছে যে তাহার কঠোর বা নরম মনোভাব দ্বারাই এই সমস্যার ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। ভারতের সহিত মিলিত হইবার জন্য কাশ্মীরের জনগণ যে ঐক্যবদ্ধ এবং চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন উহার ভিত্তিতেই কেবলমাত্র কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হইতে পারে। যদি পাকিস্থান সত্যই গোঁড়ামি ত্যাগ করিতে পারে তবে পাকিস্থান অতি সহজেই স্বকৃত এই বেড়াজাল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে।

২১শে মে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 'কাশ্মীর পোষ্ট' লিখিতেছেন যে পাক-ভারত আলোচনায় কি কি নূতন বিষয় আলোচিত হইয়াছিল তাহা অজ্ঞাত, পাকিস্থানের গোঁড়ামির কতটুকু হ্রাস পাইয়াছে তাহাও অজ্ঞাত; ফলে এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করা সহজ নহে। তবে যেহেতু কাশ্মীর সম্পর্কে আলোচনা ভবিষ্যতে চলিতে থাকিবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে সেহেতু কয়েকটি মৌলিক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

প্রথমতঃ, স্মরণ রাখা দরকার যে কাশ্মীরের জনসাধারণ তাহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের মারফত ভারতের সহিত মিলনের জন্য তাহাদের চরম সিদ্ধান্ত জানাইয়া দিয়া এই বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়াছেন। এখন প্রয়োজন সকলের পক্ষে এই সিদ্ধান্তকে মানিয়া লওয়া। যথাশীঘ্র ইহা করা হয় ততই মঙ্গল। পাকিস্থান এবং তাহার বিদেশী বন্ধুরা এই সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে না বলিয়া কাশ্মীরের জনগণ যে নতি স্বীকার করিবেন এরূপ যেন কেহ মনে না করেন।

দ্বিতীয়তঃ, বলা হইয়া থাকে যে পাকিস্থানের অর্থনীতির পক্ষে কাশ্মীর অপরিহার্য্য। পত্রিকাটির অভিমতে এ প্রস্তাব আলোচনারও অযোগ্য কারণ পাকিস্থানের অর্থ নৈতিক সুবিধার জন্য কাশ্মীর তাহার আদর্শ পরিত্যাগ করিতে পারে না। উপরন্তু কাশ্মীরের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ভারতের সহযোগিতা অপরিহার্য্য।

তৃতীয়তঃ, বহুবর্ষব্যাপী অনিশ্চয়তার পর গণপরিষদের সিদ্ধান্তে কাশ্মীরের জনগণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছেন; কাশ্মীরের অবস্থাও অনেকাংশে স্বাভাবিক হইয়াছে। এই অবস্থায় বর্ত্তমান স্থিতাবস্থার ক্ষতি করিয়া কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে তাহার কোন সমাধানই হইবে না।

চতুর্থতঃ, যুদ্ধবিরতি রেখার কোন পরিবর্ত্তন সাধনে সম্মত হইবার পূর্ব্বে ভারত যেন পাকিস্থানের কাশ্মীর আক্রমণের কথা এবং মার্কিন সামরিক জোটের সহিত তাহার (পাকিস্থানের) বর্ত্তমান একাত্মতার কথা না ভুলিয়া যায়। রক্ষাব্যবস্থা দুর্ব্বল করিলে পাকিস্থান যে পুনরায় কাশ্মীর আক্রমণ করিবে না সে রকম কোন আশ্বাসই নাই। কাশ্মীর উপত্যকার প্রধান সীমারেখা হইতে পাকিস্থানের দূরত্ব মাত্র দুই ঘণ্টার পথ। অপরপক্ষে ভারতের নিকটতম সরবরাহ কেন্দ্র কাশ্মীর হইতে ২৫০ মাইল দূরে অবস্থিত।

উপসংহারে 'কাশ্মীর পোষ্ট' লিখিতেছেন, "আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, ঐ সকল ভিত্তির উপর নির্ভর না করিয়া যদি কাশ্মীর সমস্যার কোন সমাধান করা হয় তবে তাহা হইবে সম্পূর্ণ অলীক (unreal) এবং কাশ্মীরের জনগণের নিকট গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য।"

বাঁকুড়া হাসপাতাল সম্পর্কে অভিযোগ

'হিন্দুবাণী' পত্রিকার ১লা জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় "শ্রীদুর্মুখ" লিখিতেছেন:

"মাননীয় জেলা শাসক মহোদয় এক পত্রে জানাইয়াছেন, হিন্দুবাণী ১২শ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাঁকুড়া সদর হাসপাতালে চরম অব্যবস্থা' শীর্ষক লেখাটি তদন্তে 'সারহীন, ভুল এবং ঈর্ষাপ্রসূত সংবাদরূপে প্রতিভাত হইয়াছে।' আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, উক্ত তথ্যগুলির মধ্যে কোনটি ভুল? অভিযোগগুলি পুনরায় উদ্ধৃত করিলাম।—

(১) হেলথ অফিসের কেরানী ভদ্রলোককে '৫৪ সনে ২০।২১ দিন পর্য্যবেক্ষণের নামে হাসপাতালে রাখা হয় নাই কি? ভদ্রলোক রোগে ভোগা সত্ত্বেও 'তেমন কোন রোগ নাই' বলিয়া রিপোর্ট দেওয়া হয় নাই কি? এই রিপোর্ট দেওয়ার আগে এক্সরে পরীক্ষা করা হইয়াছিল কি?

(২) রোগ নাই বলিয়া দেওয়ার পরেও ছেলেটি রোগযন্ত্রণায় কি ভোগে নাই?

(৩) রোগীর বন্ধুরা attend করার অনুমতি চাওয়ায় এ্যাঃ সার্জেন ডাঃ উকিল কি প্রত্যাখ্যান করেন নাই?

(৪) রোগী মারা যাওয়ার ২ ঘণ্টা পূর্ব্বে ডাঃ উকিলকে রোগীর বন্ধুরা ডাকিতে গেলে তিনি আসিয়াছিলেন কি? রোগী কি এইরূপে অবহেলায় মারা যায় নাই?

(৫) ডাঃ উকিল কি বিনা অনুমতিতে হাসপাতাল ছাড়িয়া বাহিরে আড্ডা দিতে যান না?

(৬) দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রোগিণীটির অপারেশন করিয়া কি রোগ দেখা গিয়াছিল? মারা যাওয়ার আগের দিন রাত্রে নার্স কোথায় ঘুমাইতেছিল? রাত্রে কাছে কে ছিল?

(৭) রাত্রে রোগী বিছানা হইতে পড়িয়া গিয়াছিল কি না ? রাত্রে বাতি সব ওয়ার্ডে থাকে কি ?

(৮) বেলা ১২টা থেকে ৪টা পর্য্যন্ত ও রাত্রে কোন ডাক্তার হাসপাতালের চার্জ্জে থাকেন ? এ সময়ে কোন্ দিন ক'টি রোগী ভর্ত্তি হইয়াছে ?

(৯) সদর হাসপাতালে কোন ট্রেনিং প্রাপ্ত নার্স আছে কি ?

উপরোক্ত বিষয়গুলির যে কোনটি নিরপেক্ষ অফিসার দিয়া তদন্ত করাইলে সত্য প্রতিপন্ন হইবে। অবশ্য অভিযুক্তের কাছে বিবৃতি চাওয়ার নাম যদি তদন্ত হয় তবে নিশ্চয়ই সত্য খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। যতদূর জানা যায়, তদন্তের নামে ডাঃ উকিলের একটি বিবৃতি লইয়া সেইটিতে "ডিটো" দিয়া সিভিল সার্জ্জেন সাহেব জেলা শাসকের কাছে উপস্থিত করিয়াছেন। জেলা শাসককে ভুল বোঝানর জন্য ১৩শ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি ব্যাপারকেও এই একই রিপোর্টের মধ্যে কৌশলের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

"আমরা জেলা শাসককে অনুরোধ জানাই, কোন নিরপেক্ষ ম্যাজিষ্ট্রেট দিয়া তদন্ত করাইলে সত্য প্রকাশিত হইবে। যেখানে মানুষের জীবনের প্রশ্ন সেখানে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়া ধামাচাপা দেওয়া উচিত নয়।"

উক্ত পত্রিকার পরবর্ত্তী সংখ্যাতেও "শ্রীমুখ" বাঁকুড়া সদর হাসপাতাল সম্পর্কে আরও কতকগুলি অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন :

"গত ২৩শে মে ঝড়ের দিন ১৷৷০ ঘণ্টা যাবৎ বহু জরুরী আহত কেস এলেও ডাক্তারের পাত্তা পাওয়া যায় নাই। বিকাল ৬টার আগে কেউ আসেন নাই। এর প্রমাণ আমরা দিতে প্রস্তুত। তদন্ত হবে কি ?

রাত্রিতে গোটা হাসপাতাল এখনও শ্মশানপুরীর মত অন্ধকার থাকে। হ্যাজাক লাইট কতকগুলি আছে, সেগুলি জ্বালানো হবে না কেন ?"

পল্লী অঞ্চলে জলকষ্ট

২২শে জ্যৈষ্ঠ 'বারাসাত বার্ত্তা'র সংবাদে প্রকাশ যে, বারাসাত মহকুমার প্রায় সকল পল্লী হইতেই প্রবল জলকষ্টের সংবাদ আসিতেছে। দারুণ গ্রীষ্মে প্রায় সকল পুষ্করিণীই শুকাইয়া গিয়াছে। পল্লী অঞ্চলে নলকূপের সংখ্যাও নগণ্য, ফলে জনসাধারণ অবর্ণনীয় দুর্দ্দশার সম্মুখীন হইয়াছেন।

১২ই জ্যৈষ্ঠ 'দামোদর' পত্রিকায় বর্দ্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থানে পানীয় জলের অভাবে জনসাধারণের দুর্দ্দশার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। সংবাদে বলা হইয়াছে যে, জামালপুর থানার জ্যোগ্রাম অঞ্চলে জলাভাব এমন পর্য্যায়ে পৌছাইয়াছে যে নলকূপের জল ব্যবহারের পর ব্যবহৃত জল ডোবা কাটিয়া আটকাইয়া রাখিয়া গ্রামবাসিগণ বাসন ধুইবার কাজে লাগাইতেছেন। অধিকাংশ পুকুরই শুষ্ক। ঐ থানার জ্যোৎশ্রীরাম ইউনিয়নের রোশালাপুর গ্রামে জল একেবারেই না থাকায় গ্রামবাসীদিগকে এক মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে জল আনিতে হইতেছে।

জলাভাব ও রৌদ্রের তাপে বর্দ্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থানে পাট ও ইক্ষুর চাষ নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

পল্লী অঞ্চলে জলকষ্ট এবং উহা নিরসনকল্পে সরকারী নিস্ক্রিয়তার সমালোচনা করিয়া ১৮ই জ্যৈষ্ঠ 'ভারতী' লিখিতেছেন যে, গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে জলাভাবের চিত্র সকলেরই পরিচিত। কিন্তু তাহার উন্নতিবিধানের কোনই চেষ্টা নাই। "প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হইলেও গত বৎসরের বাজেটে সাড়ে উনিশ লক্ষ টাকা পল্লী অঞ্চলের জলাভাব দূর করিবার জন্য ধার্য্য করা হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় উক্ত টাকার প্রায় চৌদ্দ লক্ষ টাকা সরকারী তহবিলে মজুত রহিয়াছে এবং তিন লক্ষাধিক টাকা বিভাগীয় ব্যয়বরাদ্দ সত্ত্বেও পল্লী অঞ্চলের মানুষ জলাভাবে শুকাইয়া মরিতেছে। আজকাল সাধারণের হিতার্থে মাথা ঘামাইবার মানুষ পাওয়া দুষ্কর। প্রাথমিক ইউনিয়ন কংগ্রেসে কাগজে কলমে যাহাদের নাম আছে তাহারাও সরকারের সহিত যোগাযোগের অভাবে নিজেদের কোন কাজে লাগাইতে পারে না, ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্যরা পরস্পর পরস্পরের সহিত ঝগড়া লইয়া ব্যস্ত। সরকারী কর্ম্মচারীরা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হইয়া নিজেদের সুবিধামত ব্যক্তিদের সহিত সলা-পরামর্শ করেন বা করেন না। চাকুরী বজায় রাখিতে যতটুকু প্রয়োজন তদতিরিক্ত মাথা ঘামান বা ঝুঁকি লওয়া তাঁহারা প্রয়োজন মনে করেন না। কাজেই উনিশ লক্ষ ব্যয়বরাদ্দ টাকার চৌদ্দ লক্ষ মজুত তহবিলে জমা থাকিলে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। গ্রামের লোক মরুক বা বাঁচুক তাহাতে কিছু আসে যায় না। শুধু উপরওয়ালাকে খুশী রাখিবার মত রিপোর্ট পেশ করিতে পারিলেই হইল। বিধান সভায় মোটা অঙ্কের ব্যয়বরাদ্দ দেখিয়া লোকে ভাবে সরকার দু'হাতে টাকা খরচ করিতেছেন, অথচ কাজের খতিয়ান করিয়া দেখা যায় কাজের কাজ কিছুই হইল না। দৈনিক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা খুলিলেই দেখা যাইবে নেতা হইতে সুরু করিয়া পেয়াদা পর্য্যন্ত সকলেই পল্লীর দুঃখে বিগলিত অশ্রু। তাহা ছাড়া পাঁচসালার ফিরিস্তি হাতের মুঠোর মধ্যেই আছে, প্রয়োজন হইলেই শুনাইয়া দেওয়া হইবে দশ বৎসরের মধ্যেই পল্লীবাসীর দুঃখদৈন্য ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার হইয়া যাইবে।"

সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জ থানায় দুই শত নলকূপ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইতেছে এবং উহার প্রাথমিক দায়িত্ব রাজ্যবিধান সভার স্থানীয় সভ্যদের উপর অর্পিত হইয়াছে। 'ভারতী' লিখিতেছেন, "জঙ্গীপুর ও ধুলিয়ান মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে টিউবওয়েলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা বিশেষ প্রয়োজন কারণ পানীয় জলের অভাবে এই সব অঞ্চলে কলেরা ও আমাশয়ের প্রকোপ প্রায়ই দেখা যায়। জঙ্গীপুর ও রঘুনাথগঞ্জের বিশটি (২০টি) টিউবওয়েল স্থাপনের পরি-

কল্পনার কথা অনেক দিন হইতে আমরা শুনিতেছি কিন্তু আজ পর্য্যন্ত উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইল না কেন তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।"

বিভিন্ন এলাকায় শোচনীয় জলকষ্টের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া পত্রিকাটি লিখিতেছেন, "আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস তৃষ্ণার্ত্ত পল্লীবাংলার আকুল আবেদন তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিবে।"

বর্দ্ধমান জেলার পোষ্ট আপিসসমূহে অব্যবস্থা

৫ই জ্যৈষ্ঠ এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে রায়না ডাকঘর হইতে টেলিগ্রাম করিবার অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া 'দামোদর' লিখিতেছেন, "রায়নার ডাকঘর হইতে টেলিগ্রাম করিতে গেলে প্রায়ই লাইন খারাপ হইয়াছে এই জবাব পাইয়া বিমর্ষচিত্তে ফিরিয়া আসিতে হয়। দূরবর্ত্তী গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণকে বিশেষ জরুরী কাজে তার করিতে আসিয়া অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় এবং ডাকবিভাগেরও প্রচুর ক্ষতি হয়। কোন দিন হয় ত হঠাৎ শুনা যাইবে যেহেতু রায়না টেলিগ্রাফ আপিসে তার হইতেছে না, সেই হেতু ইহা তুলিয়া দেওয়া হউক। আমরা বিষয়টির প্রতি বর্দ্ধমান বিভাগের ডাক-অধ্যক্ষ ও উপরিতন কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

আসানসোলেরও জনসাধারণকে পোষ্ট আপিসে নানারূপ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। ৩রা জুন এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আসানসোল পোষ্ট আপিসের কার্য্য সম্পর্কে জনসাধারণের অসুবিধার কথা বিবৃত করিয়া সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাণী' লিখিতেছেন, "পোষ্ট আপিসের রেজেষ্ট্রি এবং মণিঅর্ডার কাউণ্টারে বিশেষ ভীড় হয়, ফলে জনসাধারণকে বহুক্ষণ যাবৎ লাইনে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। আসানসোল ভারতের অন্যতম গ্রীষ্মপ্রধান স্থান। ফলে অনেকক্ষণ ঐরূপ ভীড়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে অনেকেরই অসুবিধা হয়, এমন কি কেহ কেহ সর্দ্দি-গরমির ভাব পর্য্যন্ত অনুভব করেন। সেজন্য পত্রিকাটি এই দুইটি বিভাগে আরও একটি করিয়া কাউণ্টার খুলিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

আসানসোলে প্রসূতি আগারের অসুবিধা

আসানসোলে জনসাধারণের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রসূতি আগারের অভাব সম্পর্কে আলোচনা করিয়া সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাণী' লিখিতেছেন যে, আসানসোল এল. এম হাসপাতালে যে প্রসূতি আগার রহিয়াছে তাহাতে বেডের সংখ্যা নিতান্তই কম। বর্ত্তমানে যদি অন্ততঃ আরও ১০।১২টি বেড বৃদ্ধি করা যায় তবে অবস্থার উন্নতি হইতে পারে বলিয়া পত্রিকাটি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে অন্ন ও বস্ত্র সমস্যার ন্যায় প্রসূতি আগারের সমস্যাও নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনসাধারণের প্রধান সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় বহু বাড়ীতেই আজ আর প্রসূতিদিগের জন্য পৃথক ঘর ছাড়িয়া দেওয়া সম্ভব হয় না। উপরন্তু বাড়ীতে প্রসূতি রাখিতে হইলে যে পরিমাণ অর্থবলের প্রয়োজন তাহাও অধিকাংশের নাই। বিষয়টির এই সকল দিকের আলোচনা করিয়া 'বঙ্গবাণী' লিখিতেছেন, "দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকগণ যেখানে জন্মলাভ করিবে সেই স্থানকে যতদূর সম্ভব স্বাস্থ্য ও সুরুচিসম্মত এবং সুন্দর করিয়া রাখা রাষ্ট্রের ও সমাজের সকলেরই কর্ত্তব্য।"

আসানসোল পোলো গ্রাউণ্ড

আসানসোল কোর্টের নিকট বিস্তৃত এলাকা জুড়িয়া পোলো গ্রাউণ্ড নামক ময়দানটিকে সরকার হইতে ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন এণ্ড এসিটিলিন কোম্পানীর নিকট বিক্রয় করিবার বা বন্দোবস্ত দিবার প্রস্তাব হইয়াছে এবং সে সম্পর্কে কাজও নাকি অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে।

পোলো গ্রাউণ্ড সম্পর্কিত প্রস্তাবিত ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া 'জি. টি. রোড' পত্রিকা ২৭শে বৈশাখ সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখেতেছেন, "এই স্থানটি যদি বিক্রয় বা বন্দোবস্ত দেওয়া হয় তবে আসানসোল শহরের প্রগতি রুদ্ধ হইয়া যাইবে। বর্ত্তমানে আসানসোল শহরের এ-অঞ্চল এবং বার্ণপুরের ঐ অঞ্চল এইরূপ বাড়িতেছে যে অল্পদিনে এই অঞ্চল ঘন বসতিপূর্ণ হইয়া যাইবে। তখন খোলা ময়দান বলিতে মাত্র ঐ পোলো গ্রাউণ্ডটি অবশিষ্ট থাকিবে। জনস্বাস্থ্য বজায় রাখিতে শহরের মধ্যে (উভয় শহর এক ধরিয়া) ঐরূপ খোলা ময়দানের খুবই প্রয়োজন। ঐ ময়দান ভবিষ্যতে কলিকাতা মহানগরীর গড়ের মাঠের ন্যায় কাজ করিবে।"

তদ্ব্যতীত পুলিস এবং প্রয়োজন হইলে সামরিকবাহিনীর কুচকাওয়াজের ক্ষেত্র হিসাবে উহার বিশেষ উপযোগিতা রহিয়াছে। শহরের নিকট মহতী জনসভার স্থান হিসাবেও পোলো গ্রাউণ্ডের যে মূল্য রহিয়াছে পণ্ডিত নেহরুর আসানসোল আগমনের পর তাহাও বিশেষভাবে উপলব্ধি হইয়াছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করিয়া পত্রিকাটি অনুরোধ করিয়াছেন যেন ঐ স্থানটি উক্ত কোম্পানী বা অপর কাহাকেও বন্দোবস্ত না দেওয়া হয়।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

দেশে রবীন্দ্র-জয়ন্তী পালন উপলক্ষে যে সকল অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। ২৯শে বৈশাখ 'বঙ্গবাণী' একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই সক উৎসবের অধিকাংশের ভাসা ভাসা ভাবের সমালোচনা করিয়াছেন। মহাপুরুষের পূজা ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন জাতীয় চরিত্রের উন্নয়নসাধনে সাহায্য করে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেজন্য প্রয়োজন আন্তরিকতার। "এই সকল অনুষ্ঠানের পশ্চাতে যদি দেখিতাম রবীন্দ্রনাথকে জানিবার বুঝিবার, রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সহিত পরিচিত হইবার এবং তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিবার কোন চেষ্টা হইতেছে তাহা হইলে এই সন্দেহ করা হয়ত অন্যায় হইত। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিতই লক্ষ্য করি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্য প্রায় অচলের পর্য্যায়েই আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বর্ত্তমান যুবকদিগের মধ্যে কয়জনই বা উহা পাঠ করে? সকলেই সাহিত্য আলোচনা

করে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য এবং সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ কয়জন পড়ে? বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, নিখিল রায়, অক্ষয় মৈত্রেয়, স্বামী বিবেকানন্দ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিপিনচন্দ্র পাল, জগদীশচন্দ্র বসু, জগদানন্দ রায় প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের বহু দিকপালের প্রবন্ধ সাহিত্য আমরা ত ইহার মধ্যেই শিকায় তুলিয়া রাখিয়াছি। আরও কয়েকদিন পর হয়ত জাতীয় মিউজিয়মেই ইহাদের স্থান হইবে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্যকেও আমরা শিকায় তুলিবার উদ্যোগ করিতেছি, অথচ এই সকলের মধ্যে কত গভীর ভাব, প্রগাঢ় চিন্তা এবং কত গঠনমূলক পথ নির্দ্দেশ যে রহিয়াছে তাহা একবার পাতা উল্টাইয়াও আমরা দেখি না।"

অন্যান্য দেশবরেণ্য নেতার তুলনায় রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালনের জনপ্রিয়তার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া শ্রীঅবনী রায় 'ভারতী' পত্রিকায় লিখিতেছেন, রবীন্দ্র-জীবনের সীমাহীন বৈচিত্র্যের ফলে "রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে আত্মপ্রচারের যে সুযোগ আসে, অন্যান্য মহাপুরুষদের জন্মোৎসব-অনুষ্ঠানে সে সুযোগের অভাব দেখা যায়। এঁদের জীবনাদর্শ নিয়েই আলোচনা করা চলে কয়েকটি প্রবন্ধ ও বক্তৃতার মাধ্যমে এবং তার জন্য প্রয়োজন হয় বক্তা বা লেখকের—তাঁদের জীবনাদর্শের পূর্ণ অনুভূতির, তাঁদের লেখা অথবা আদর্শের সঙ্গে কিছুটা পরিচয়ের। কিন্তু রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে তার কোন বালাই না থাকলেও চলে; রবীন্দ্রনাথকে না জানলেও রবীন্দ্র-জয়ন্তীকে উপলক্ষ্য করে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বা বসে আত্মপ্রচারের কোন অসুবিধাই থাকে না।" রবীন্দ্র-জয়ন্তী অনুষ্ঠান পালনে যে লঘুচিত্ততার পরিচয় পাওয়া যায় সে সম্পর্কে শ্রীযুত রায় লিখিতেছেন:

"রবীন্দ্র-জয়ন্তীর অনুষ্ঠান যেন সরস্বতীপূজার প্রতিযোগিতা—পাড়ায় পাড়ায় তার অনুষ্ঠান। কার মাইক কত জোরে বাজল, কার গান কত ভাল হ'ল, নৃত্যে আবৃত্তিতে কারা অন্যকে কতটা টেক্কা দিতে পারল, এটাই বর্ত্তমান রবীন্দ্র-জয়ন্তীর বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা, ব্যবহারিক জীবনে রবীন্দ্র-আদর্শের রূপায়ণের ব্যবস্থা কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না রবীন্দ্র-জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে। নৃত্য, গীত, আবৃত্তিতে অবশ্যই আমাদের কোন আপত্তি নাই (আর থাকলেই বা শোনে কে)। এই সব অনুষ্ঠানকে অবলম্বন করে সুরুচিসঙ্গত শিল্পের চর্চা দেশের পক্ষে অবশ্যই হিতকর। কিন্তু দুঃখ হয় তখনই, যখন দেখি আত্মপ্রচারই হয় রবীন্দ্র-জয়ন্তী অনুষ্ঠানে। সত্যিকারের রবীন্দ্রনাথ ধামাচাপা পড়েন মাইকের কান-ফাটান শব্দে।

"এই রকম রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে নৃত্যগীতের মাঝে যখন কোন রবীন্দ্র-সাহিত্য বিশারদ উঠলেন বক্তৃতা করতে তখন কর্ম্মকর্ত্তারা তাঁর কানে কানে বললেন, 'একটু ছোট করে বলবেন স্যার।' অর্থাৎ, তাঁর বক্তৃতায় যেন অন্যদের আত্মপ্রচারের কর্ম্মসূচীর ব্যাঘাত না ঘটে।

"কোথাও কোথাও এও দেখা গিয়েছে, সভা লোকে লোকারণ্য, তিলধারণের না হোক লোকধারণের আর জায়গা নাই। নৃত্য, গীত সবাই দেখছেন, শুনছেন অখণ্ড মনোনিবেশ সহকারে। অবশেষে সভায় যখন রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা আরম্ভ হ'ল, তখন অনেকেই একে একে সভাত্যাগ করতে আরম্ভ করলেন—বাড়ীতে সবারই বিশেষ কাজ। ছোটরা আরম্ভ করল গোলমাল; যাঁদের শোনার ইচ্ছে আছে তাঁরাও হতাশ হলেন, বক্তারও গেল সব গুলিয়ে—বসে পড়লেন তিনি তাঁর আলোচনা কোনরকমে শেষ করে। এর পর যখন সভাপতি বক্তৃতা দিতে সুরু করলেন, তখন সভায় আর লোক নাই বললেই চলে।

"এরই মধ্যে থাকেন এক একজন বক্তা। বক্তৃতা করতেই তাঁরা আসেন সভায়। এসেই কর্ম্মকর্ত্তাদের বললেন, 'আমারটা যেন একটু আগে দেওয়া হয়।' যেমন তাঁর বক্তৃতা শেষ হ'ল অমনি উঠে পড়লেন তিনি, তাঁর অন্যত্র কাজ আছে।"

কিন্তু রবীন্দ্র-জয়ন্তী পালনে কাহারও সত্যিকার আপত্তি থাকিতে পারে না। কি উপায়ে যথাযোগ্য ভাবে তাহা প্রতিপালিত হইতে পারে, রায় মহাশয় লিখিতেছেন:

"তবে অনুষ্ঠানটিকে তিনটি শাখায় ভাগ করলে হয় ত খানিকটা কাজ হতে পারে। একদিন ছেলেমেয়েরা সঙ্গীত, নৃত্য আর আবৃত্তির অনুষ্ঠান করল। রসপিপাসুর দল রস গ্রহণে আনন্দিত হলেন। আর এক দিন হোক না কেন রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা। স্বল্প কয়েকজন শান্ত পরিবেশে আলোচনা করুন রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিভিন্ন দিক। তৃতীয় দিনে রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করবার হোক একটা চেষ্টা। সার্থক হোন রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবনে।"

বর্দ্ধমানে বিশ্ববিদ্যালয়

একটি সংবাদে প্রকাশ, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে দার্জ্জিলিং, কল্যাণী ও বর্দ্ধমানে তিনটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। ১০শে জ্যৈষ্ঠ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই প্রস্তাবে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া সাপ্তাহিক 'দামোদর' লিখিতেছেন, "ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারের মিলিত উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের মফস্বলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার নীতিকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন ও অভিনন্দন করিতেছি।"

মফস্বলে ঐরূপ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে শিক্ষার মান নিম্নগামী হইবে বলিয়া 'অমৃতবাজার পত্রিকা' যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার সমালোচনা করিয়া 'দামোদর' লিখিতেছেন, "কলকাতার বাহিরে যে মানুষ বাস করে এবং তাহারা যে কলিকাতাবাসী অপেক্ষা কোন দিক দিয়াই পশ্চাৎপদ নয় এবং মফস্বলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে যে তাহার শিক্ষাব্যবস্থা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা নিম্নস্তরের হইবে, এ ধারণা তাহার কোথা হইতে হইল? উত্তর প্রদেশে এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, বেনারস,

আলিগড় ও আগ্রা এই পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়, বিহার প্রদেশের বিহার ও পাটনা দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়, অন্ধ্রের আন্নামালাই ও ওয়ালটেয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, বম্বের পুণা ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রত্যেকটি যেরূপ সুচারুরূপে ও সগৌরবে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলেই সহযোগীর আশঙ্কা দূরীভূত হইবে।"

'দামোদর' লিখিতেছেন, যেহেতু মফস্বলের ছাত্রগণ কলিকাতায় যাইয়া স্থানাভাবে এবং অর্থাভাবে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পায় না এবং যাহাতে তাহারা স্বল্পব্যয়ে লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ পায় সেইজন্যই মফস্বলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি উঠিয়াছিল। ড. রাধাকৃষ্ণণের সভাপতিত্বে যে শিক্ষা কমিশন বসানো হয় তাহাতেও স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। অবশেষে সরকার যখন এই বিষয়ে অগ্রণী হইতে চলিয়াছেন তখন একটি দায়িত্বশীল সংবাদপত্র হইতে বাধা আসিলে একান্ত পরিতাপের কথা।

পরিশেষে 'দামোদর' লিখিতেছেন, "তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় হউক, ভাল কথা, কিন্তু কল্যাণীর ভুমুক্তির মাঠে এবং দার্জিলিঙের শৈলাবাসের পূর্বে সুগঠিত ও অনুকূল পরিস্থিতিতে সর্বপ্রথম বর্দ্ধমানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক। 'আবাসিক' শুনিয়া আমরা একটু আতঙ্কিত হইয়াছি। মফস্বলে আমরা সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় চাই। অধিকাংশ দরিদ্রের সন্তানসন্ততি নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী বাড়ীতে থাকিয়া ও থাকিয়া স্বল্পব্যয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করিবে ইহাই আমাদের কাম্য। শুধু আবাসিক হইলে ধনী ও মুষ্টিমেয় লোকের জন্য হইবে।"

আমরা এ বিষয়ে এখন কোনও মন্তব্য করিতে প্রস্তুত নহি। কারণ মফস্বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন জটিল। অন্য প্রদেশে যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা সহযোগী বলিয়াছেন তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটিকেই দীর্ঘদিন নানা বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে এবং প্রত্যেকটিরই পিছনে একনিষ্ঠ লোকের সাধনা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় শুধু টাকাতেই হয় না, তাহার জন্য আরও অনেককিছুই চাই।

পশ্চিমবঙ্গের মফস্বলের জনসাধারণের দাবি

সম্প্রতি মহাবোধি সোসাইটি হলে হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার অধিবাসিগণের এক সম্মিলিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (বর্তমানে প্রাক্তন) ভাইস-চ্যান্সেলার ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ।

সভার বিবরণীতে ১লা জ্যৈষ্ঠের 'মেদিনীপুর পত্রিকা' লিখিতেছেন, "সভায় গৃহীত মূল প্রস্তাবটিতে বলা হয় যে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির অষ্টম বৎসরেও রেলপথ, জলপথ ও স্থলপথের সুব্যবস্থার অভাবে আজও হুগলী, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার লক্ষ লক্ষ অধিবাসীকে পশ্চিম বাংলার প্রাণকেন্দ্র কলিকাতার সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য, যাতায়াত ও সংযোগ রক্ষার নিমিত্ত বহু সময় এবং অর্থের অপব্যয় করিয়াও বহু প্রকারের দুর্ভোগ সহ্য করিতে হইতেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হইতে চলিল—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাও প্রস্তুতির পথে; কিন্তু এই বিস্তীর্ণ এলাকার অধিবাসিগণের জন্য বিশেষ কোন সুব্যবস্থা পরিলক্ষিত হইতেছে না ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।"

উক্ত পাঁচটি জেলার প্রতিনিধিবর্গের সম্মিলিত সভা হইতে অনুরোধ করা হইয়াছে যেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবিলম্বে পরিকল্পনা কমিশনের নিকট নিম্নলিখিত দাবিগুলি উপস্থিত করিয়া যাহাতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উহারা অগ্রাধিকার পায় তাহার ব্যবস্থা করেন।

মূল প্রস্তাবটিতে দাবি করা হইয়াছে: (১) সাঁত্রাগাছি ও বিষ্ণুপুরের মধ্যে (রাধানগর ও কামারপুকুর হইয়া), (২) তারকেশ্বর হইতে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত (আরামবাগ হইয়া), (৩) মেচাদা হইতে দীঘা পর্যন্ত (তমলুক-কাঁথি হইয়া) রেলপথ নির্মাণ করিতে হইবে এবং কলিকাতা-খড়্গপুর রেলপথের বৈদ্যুতীকরণ করিতে হইবে।

"জলপথ ও নদী সংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবটিতে দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী প্রভৃতি নদীর সম্পূর্ণ সংস্কার ও প্রয়োজনীয় বাঁধ ও জলাধার স্থাপন করিয়া, দামোদর স্রোতকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, প্রয়োজনীয় ড্রেজিং প্রভৃতির ব্যবস্থা এবং রূপনারায়ণ নদের সুষ্ঠু পৌতিক ব্যবস্থার দাবি করা হয়।

"এতদ্ব্যতীত চাকি-মুণ্ডেশ্বরী কানা-দ্বারকেশ্বর নদীর সংস্কার সাধন ও অবোরা খালকে সালালপুর খালের সহিত সংযুক্ত করারও দাবি করা হয়।

"অপর প্রস্তাবটিতে বর্দ্ধমানে বৈঁচি-কালনা-রামকৃষ্ণ রোড নির্ম্মাণ ও সংস্কারের জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়।"

সভাপতির অভিভাষণে দাবিগুলির যৌক্তিকতার সমর্থন করিয়া ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ বলেন যে, কলিকাতা হইতে কাশী যাইতে ১৩ ঘণ্টা এবং ঘাটাল বা আরামবাগ যাইতেও যদি ঐ সময় লাগে তবে বুঝা যায় জনসাধারণকে এখনও কিরূপ অসুবিধার মধ্যে বাস করিতে হইতেছে। অবিলম্বে এই অবস্থার প্রতিকার হওয়া দরকার।

সভায় প্রধান অতিথি শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ বলেন যে, রেলপথ সম্পর্কিত যে প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে তাহা কার্যকরী করিতে প্রায় আট কোটি টাকা ব্যয় হইবে। কিন্তু ঐ পরিকল্পনা কার্যকরী করা অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয়। তিনি বলেন যে, যে সকল রাস্তা ও নদী ক্ষয়িষ্ণু হইতে চলিয়াছে সেগুলি সংস্কারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ দেওয়া উচিত।

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী পদত্যাগে বাধ্য

উক্ত তারিখের 'মেদিনীপুর পত্রিকা'য় অপর এক সংবাদে বলা হইয়াছে, "ঘাটাল প্রসন্নময়ী বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীকে গত ২৫।৪।৫৫ তারিখে ৫।৬ মাস আগের কোনও এক স্বাভাবিক ঘটনার কাল্পনিক অজুহাতে নাকি জোর করিয়া পদত্যাগ করিতে বাধ্য করায়

জনসাধারণের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং স্কুল কমিটির এইরূপ আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয়। ২৬।৪।৫৫ তারিখে উক্ত প্রধানা শিক্ষয়িত্রী যখন ঘাটাল ছাড়িয়া যাইতেছিলেন তখন তাঁহার ছাত্রীরা ও জনসাধারণ শোকার্ত্ত হৃদয়ে বিদায় জানান। পরদিন স্কুলে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ধর্ম্মঘট প্রতিপালিত হয়।"

মফস্বল সাংবাদিক সম্মেলন

৬ই জুন 'বর্দ্ধমানের ডাক' পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ যে, ১২ই জুন বর্দ্ধমান টাউন হলে পশ্চিমবঙ্গ মফস্বল সাংবাদিকদিগের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবেন প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। মফস্বল সাংবাদিক-দিগের নানারূপ অসুবিধা, অভাব, অভিযোগ সম্পর্কে রাজ্যব্যাপী আলোচনার এই প্রথম প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে পশ্চিমবঙ্গের মফস্বল অঞ্চলের প্রায় তিন শত সাংবাদিক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিবেন।

মফস্বলে ঝড়বৃষ্টি

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রবল ঝড় ও বারিপাতের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে: ১লা জ্যৈষ্ঠ 'মেদিনীপুর পত্রিকা'র সংবাদে প্রকাশ যে, মেদিনীপুর শহরে এমন শিলাবৃষ্টি হইয়াছে যে গত ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে তেমন আর দেখা যায় নাই। মেদিনীপুরের লাল রাস্তা শিলাবৃষ্টির পর সাদা হইয়া গিয়াছিল। "শিলাঘাতে সারসি দেওয়া সব বাড়ীর কাঁচ ভাঙ্গিয়া ঘরের ভিতরে প্লাবনের সৃষ্টি করিয়াছে।"

৬ই জুন 'বর্দ্ধমানের ডাক' সংবাদ দিতেছেন যে, গত ২রা জুন বর্দ্ধমানে যে প্রবল ঝটিকা উত্থিত হয় গত দশ বৎসরের মধ্যে উহা প্রবলতম। "কয়েকটি স্থানে বৃক্ষ পতনের ফলে বিদ্যুৎ ও টেলি-গ্রাফের তার কাটিয়া যায়। শহরে ও গ্রামাঞ্চলে বহু গৃহ ও গৃহের ছাউনি পড়িয়া যায়। শহরতলীর উদ্বাস্তু পল্লীগুলি সর্ব্বাধিক ক্ষতি-গ্রস্ত হয়।"

মেদিনীপুরে মহিলা কলেজ

মেদিনীপুর শহরে একটি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ-আয়োজন সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সম্প্রতি এক সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার নাকি প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, মেদিনীপুরে মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য জেলার অধিবাসিগণ যদি এক বৎসরের মধ্যে এক লক্ষ টাকা তুলিয়া সরকারের হাতে দিতে পারেন তবে কেন্দ্রীয় সরকার তিন লক্ষ টাকা সাহায্য করিবেন। রাজ্য সরকার গৃহ নির্ম্মাণ এবং কলেজ পরিচালনার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করিবেন বলিয়াও জানা গিয়াছে।

আমরা আশা করি, সরকার পক্ষ হইতে ঐরূপ প্রস্তাব আসার পর সকলেই বিশেষতঃ মেদিনীপুরবাসী, মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য যে প্রচেষ্টা হইতেছে তাহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে যথাশক্তি সাহায্য করিবেন।

আসামে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার রূপ

আসামের তথাকথিত দায়িত্বশীল দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতেও কিভাবে দিনের পর দিন প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার বিষ প্রচারিত হয় ২৯শে বৈশাখ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে করিমগঞ্জ হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'যুগশক্তি' তাহার নমুনা তুলিয়া দিয়াছেন।

গৌহাটি তথা আসামের একমাত্র ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা 'আসাম ট্রিবিউন'। সম্প্রতি রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের আগমন উপলক্ষ্যে আসামের গোয়ালপাড়ায় বাঙালীদের উপর যে শোচনীয় অত্যাচারের অনুষ্ঠান হয় সেই সম্পর্কে ৭ই মে 'আসাম ট্রিবিউন' একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটির শিরোনামা ছিল, "পুলিস জুলুম"। 'আসাম ট্রিবিউনে'র উক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে যে মন্তব্য করা হয় তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ:

"সম্প্রতি গোয়ালপাড়াতে যে পুলিস মোতায়েন করা হইয়াছে তাহাদের হস্তে গোয়ালপাড়ার আদি অধিবাসীদের লাঞ্ছনার সংবাদে আমরা বিশেষ উদ্বেগ বোধ করিতেছি। অভিযোগ করা হইয়াছে বাঙালীদের সামান্যতম সংবাদের ভিত্তিতেই নির্দ্দোষ অসমীয়াগণকে গ্রেপ্তার করা হইতেছে, তাহাদের বাড়ী-ঘর সার্চ হইতেছে এবং তাহাদের জিনিষপত্র লইয়া যাওয়া হইতেছে। কলিকাতার সংবাদ-পত্রগুলির একাংশে যে সকল অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রকাশিত হয় এবং যাহার ফলে গোলমালের সৃষ্টি হয় ও গোয়ালপাড়ায় বিশৃঙ্খলা ঘটে তাহাতে প্রভাবিত হইয়া আসাম সরকার ভিত্তিহীন অভিযোগের উপর ভিত্তি করিয়া অতি উৎসাহী হইয়া কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসার সহ গোয়ালপাড়াস্থিত পুলিসবাহিনীর সকলকেই স্থানান্তরিত করেন।"

'আসাম ট্রিবিউনে'র উক্ত মন্তব্যের আলোচনা করিয়া 'যুগশক্তি' লিখিতেছেন:

"গোয়ালপাড়া জেলায় হতভাগ্য বাঙালীদের উপর যে শোচনীয় অত্যাচার হইয়াছে এখানে তাহার পুনরালোচনা না করিয়া শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি এই সম্পর্কে দুঃখজ্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং কংগ্রেস সভাপতি শ্রীধেবর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় গোয়ালপাড়ায় অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর নিন্দা করিয়াছেন। ('আসাম ট্রিবিউন' অবশ্য এই সব বিবরণ প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করেন নাই।) কিন্তু 'আসাম ট্রিবিউন' এখানে শুধু ভাবিতেছেন, আসামের এক অঞ্চলে বাঙালীদের অভিযোগে অসমীয়াভাষী লোকেরা গ্রেপ্তার হইয়াছে, তাহাদের বাড়ী-ঘর তল্লাসী হইয়াছে—ইহা কি সহ্য করা যায়? তাহারা এমন কি অপরাধ করিয়াছে? হাঙ্গামা যাহা সামান্য হইয়াছে তাহাও তো কলিকাতাস্থ বাঙালীদের কতিপয় সংবাদ-পত্রের অপপ্রচারের ফলেই হইয়াছে (ব্যাপারটা যদিও কিছুই বুঝা গেল না: ধরিয়া লইলাম কলিকাতার বাঙালী পত্রিকাওয়ালারা গোয়ালপাড়ার ঘটনাদির অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন,

কিন্তু তাহার পাঠক ত প্রধানতঃ বাঙালী, অসমীয়াভাষীরা কি তাহা পাঠ না করিয়াই অনুমানে উত্তেজিত হইয়া বাঙালীর উপর হামলা করিল ?) !—কর্তব্যে অবহেলাকারী বা শান্তি রক্ষায় অসমর্থ পুলিস কর্মচারীদের শাস্তি নয়, স্থানান্তরিত হওয়াটাই সহযোগী বরদাস্ত করিতে পারিতেছেন না।

"গোয়ালপাড়া জেলায় সাম্প্রতিক হাঙ্গামায় বাঙালীরা আক্রান্তই হইয়াছে—আক্রমণকারী ছিল না—তবুও তথায় বহু বাঙালীকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। আসাম ট্রিবিউনকে এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করিতে দেখা যায় নাই ত !—'পুলিস জুলুম' হয় শুধু অসমীয়াভাষীদের বেলায়।

"গোয়ালপাড়ার কংগ্রেস নেতারাও স্থানীয় অসমীয়াভাষী অধিবাসীদের উপর পুলিস জুলুম সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট নাকি অভিযোগ করিয়াছেন। তাহা মোটেই অস্বাভাবিক নহে। নিখিল-ভারত কংগ্রেসের প্রস্তাবাদির পর এই নেতাদের মধ্যে অনেকেরই এখন সুনিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে নিশ্চয়।"

ভারতে পতঙ্গ আক্রমণের সম্ভাবনা

লণ্ডনস্থিত পতঙ্গ-বিরোধী গবেষণাকেন্দ্র (Anti-locust Research Centre) কর্তৃক প্রকাশিত এক বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, ভারত ও পাকিস্থানে মরুভূমি-পতঙ্গের উপদ্রব প্রবল আকারে হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। আরব উপদ্বীপে সম্প্রতি পূর্ব্ব-জাত পতঙ্গ-নিয়ন্ত্রণ কার্য্য শেষ হইতে চলিয়াছে। অবশ্য বহু পতঙ্গই সম্ভবতঃ পলাইবার সুযোগ পাইয়াছে। উপরন্তু তথায় এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে সৌদী আরবে নবজাত পতঙ্গের ঝাঁক দেখিতে পাওয়া গিয়াছে এবং উহারা নাকি উত্তরে ইরাক এবং লোহিত সাগর পার হইয়া পশ্চিম দিকে যাইতেছে। এপ্রিল মাসের প্রথম এবং শেষ দিকে পারস্যে স্বল্পপুষ্ট পতঙ্গের ঝাঁক দেখা যায়। মে মাসের প্রথম দিকে পশ্চিম হইতে পাকিস্থানে পতঙ্গের আক্রমণ সুরু হয়। পূর্ব্ব আফ্রিকাতে বহু পরিপুষ্ট পতঙ্গের ঝাঁক দেখা গিয়াছে।

উক্ত কেন্দ্র হইতে প্রচারিত পূর্ব্বাভাসে বলা হইয়াছে যে, মে-জুন এবং জুন-জুলাই মাসে উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর আফ্রিকাতে আরও পতঙ্গের আবির্ভাব ঘটিতে পারে। ফ্রান্স-অধিকৃত পশ্চিম আফ্রিকা ও চাদ অঞ্চল এবং সুদানে উত্তর এবং পশ্চিম হইতে প্রবল আকারে পতঙ্গের আক্রমণ ঘটিবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

আরব উপদ্বীপ এবং পারস্যে আরও পতঙ্গের ঝাঁক সৃষ্টি হইতে পারে এবং জুন-জুলাই মাসে দক্ষিণ-পশ্চিম আরব, সুদান, ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া, পাকিস্থান এবং ভারতবর্ষে পতঙ্গ-আক্রমণের আশঙ্কা রহিয়াছে।

এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী সামরিক চক্রান্ত

মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব মিঃ জন ফষ্টার ডালেস কিছুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, আরও বেশী করিয়া এশিয়ার কথা ভাবিবার সময় আসিয়াছে। এশিয়ার প্রতি মার্কিন মনোযোগের এই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া এন্. পাস্তকফ লিখিতেছেন যে, ঐ উক্তি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে গুরুতর সঙ্কটের পরিচায়ক। ডালেসের উক্তির পরবর্ত্তী ঘটনাবলী হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ডালেসের উক্তি কার্য্যে পরিণত করা হইতেছে। উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হিসাবে পাস্তকফ সম্প্রতি বাগুইওতে অনুষ্ঠিত সিয়াটোর অন্তর্গত দেশগুলির সামরিকবাহিনীর ৮৬ জন প্রতিনিধির গুপ্ত বৈঠকের উল্লেখ করিয়াছেন।

তিনি লিখিতেছেন, "সবিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বাগুইও বৈঠকের উদ্বোধন হয় ২৫শে এপ্রিল অর্থাৎ এশিয়া ও আফ্রিকার ২৯টি দেশের প্রতিনিধিদের বান্দুং সম্মেলনের অব্যবহিত পরে। ইহা কোন আকস্মিক ব্যাপার নহে। বান্দুং সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরে উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছে।"

ঔপনিবেশিক শোষণ-ব্যবস্থার অবসান, আণবিক অস্ত্রশস্ত্রের নিষিদ্ধকরণ দাবি করিয়া এবং এশিয়া ও আফ্রিকার জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ঘোষণা করিয়া এবং সর্ব্বোপরি বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থা নির্ব্বিশেষে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তি হিসাবে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতিকে মানিয়া লইয়া বান্দুং সম্মেলনে যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, পাস্তকফের অভিমতে তাহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকচক্র তীব্র-ভাবেই উপলব্ধি করিয়াছেন যে, আক্রমণাত্মক সিয়াটো চুক্তির বিষ-দাঁতের অভাব আছে, অর্থাৎ সোজা কথায় বলিতে গেলে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন দমন করার ও 'এশিয়াবাসীর বিরুদ্ধে এশিয়া-বাসী'কে লেলাইয়া দিবার জন্য এখন পর্য্যন্ত কোন সৈন্যবাহিনী গঠন করা হয় নাই।

"সুতরাং বাগুইও সম্মেলনের সম্মুখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে মুখ্য কর্ত্তব্য উপস্থাপিত করিল তাহা হইতেছে রণাত্মক সিয়াটো চুক্তির সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী গঠনের কথা। এশিয়া ও আফ্রিকার অধিবাসীদের নিকট হইতে বাগুইও বৈঠকের সামরিক ষড়যন্ত্রের প্রকৃতি ঢাকিয়া রাখার জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে দরকার হইয়াছিল এমন অতি-সতর্ক গোপন বৈঠক।"

বাগুইও বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবগুলি আলোচনা করিয়া পাস্তকফ লিখিতেছেন, "থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইন ও পাকিস্থান এশিয়ার এই তিনটি সিয়াটো রাষ্ট্রের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নির্ভরতার সুযোগ লইয়া বাগুইও বৈঠক এই তিনটি দেশকে সিয়াটো সৈন্যবাহিনীর জন্য স্থলসৈন্য যোগাইবার নির্দ্দেশ দেয়। ব্রিটেন, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড এই সৈন্যবাহিনীর অধীনে রিজার্ভ সৈন্যবাহিনী রাখার দায় গ্রহণ করে। রণাত্মক সিয়াটো জোটের প্রধান মোড়ল হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স ঐ সৈন্যবাহিনী ভরণপোষণের ব্যয়ভার স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছে।"

ঐ বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যাঙ্কক, সিঙ্গাপুর ও ফিলি-

পাইন দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত লুজন দ্বীপের মধ্যভাগে অবস্থিত ক্লার্ক ফিল্ড নামক স্থানে সিয়াটো বাহিনীর প্রধান বিমান সাহায্য ঘাটি প্রতিষ্ঠিত হইবে। থাইল্যাণ্ডের সহিত অভিন্ন সীমান্ত রহিয়াছে এই অজুহাতে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, লাওস এবং কাম্বোডিয়াকেও সিয়াটোর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। উহা জেনেভা যুদ্ধবিরতি চুক্তি বানচাল করিবার একটি অপচেষ্টা মাত্র। বৈঠকে যে সংবাদ-সংস্থা স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয় তাহার আসল উদ্দেশ্য হইল গুপ্তচর ও ধ্বংসাত্মক কাজের গুণ্ডাবাহিনীর প্রতিষ্ঠা। ইহাদের পাঠানো হইবে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার শান্তিকামী দেশগুলিতে ও চীনের লোকায়ত্ত প্রজাতন্ত্রে। এই সব দেশে উহারা ধ্বংসাত্মক কার্য্য করিবে।"

পান্তকফ লিখিতেছেন, ১০ই মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে থাইল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী পিবুল সংগ্রাম আন্তর্জাতিক আলাপ-আলোচনার বিরুদ্ধে এবং যুদ্ধের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া যে বিবৃতি দেন তাহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সিয়াটো সামরিক চুক্তির অংশীদাররা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। পিবুল বলিয়াছিলেন যে, আলাপ-আলোচনায় কোন "সুফল" পাওয়া যায় না এবং যুদ্ধ "অবশ্যম্ভাবী"। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, চীনের লোকায়ত্ত গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চিয়াং-চক্র কর্ত্তৃক যে কোন আক্রমণাত্মক অভিযান থাইল্যাণ্ডের সমর্থন পাইবে।

পিবুলের এই সকল উক্তির সহিত বান্দুং সম্মেলনে থাই প্রতিনিধিদলের নেতা প্রিন্স ওয়া ওয়েথেয়াকনের বিবৃতির বিরাট অসঙ্গতির উল্লেখ করিয়া পান্তকফ লিখিতেছেন যে, যদিও প্রধানমন্ত্রী পিবুল সংগ্রাম যুদ্ধের গুণগান করিয়াছেন তথাপি ওয়েথেয়াকন বান্দুং সম্মেলনে বলিয়াছিলেন যে থাইল্যাণ্ড পরিপূর্ণরূপে শান্তিকামী এবং আন্তর্জ্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার উন্নতির জন্য যে কোনরূপ আলাপ-আলোচনার দৃঢ় সমর্থক।

পান্তকফ লিখিতেছেন, "স্পষ্টতঃই বান্দুং সম্মেলনের 'সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত' লঙ্ঘন করিয়া থাইল্যাণ্ড এক বিপজ্জনক জুয়াখেলা খেলিতেছে।"

মার্কিন জনসাধারণ ও কম্যুনিজম

মার্কিন সরকার বিশ্বে কম্যুনিজমকে প্রতিহত এবং সম্ভব হইলে সমূলে বিলোপের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়কদের চক্ষে কম্যুনিজমই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা বিশ্বের সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু। কিন্তু মার্কিন জনসাধারণ সেরূপ মনে করেন বলিয়া মনে হয় না।

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাজ্যে "ফাণ্ড ফর দি রিপাবলিক" নামক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে মার্কিন জনসাধারণ কোন্ বিষয়ে বেশী চিন্তা করেন সে বিষয়ে এক "সার্ভে" করা হয়। ঐ পর্য্যবেক্ষণের যে ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, কম্যুনিজম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিপর্য্যয় ঘটাইতে পারে বলিয়া যাঁহারা উদ্বেগ বোধ করিয়া থাকেন তাঁহাদের সংখ্যা শতকরা একজনেরও কম। শতকরা ৮০ জন মার্কিন নাগরিক ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যা লইয়াই বেশী ব্যস্ত থাকে। শতকরা ১০ জন কোন বিষয় লইয়াই চিন্তা করে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার বিপন্ন হইয়াছে বলিয়া যাহারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তাহাদের সংখ্যা শতকরা অর্দ্ধজনেরও কম।

টাটা কোম্পানীর কর্ম্মচারী নিয়োগনীতি

২৫শে বৈশাখ 'নবজাগরণ' লিখিতেছেন, "টাটা কোম্পানীর আবাসিক ডাইরেক্টর স্যর জাহাঙ্গীর গান্ধী গত ২৩শে এপ্রিল বিহার ক্লাবে এক বক্তৃতা দিয়া টাটা কোম্পানীর গৌরবকে অনেকখানি ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয়গুলি হইতেছে 'অবিহারীরা যদি যন্ত্রকলা বিদ্যায় বিহারীদের অপেক্ষা অধিকতর গুণসম্পন্ন হয়, তাহা উপেক্ষা করিয়াও প্রয়োজনীয় বিদ্যা থাকিলে যাবতীয় পদে বিহারী নিয়োগ করিতে হইবে।' 'প্রমোশনের পূর্ব্বে কার্য্যক্ষমতা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি বিচার করা হয়, কিন্তু নির্দ্দেশ দেওয়া আছে সাধারণ পদে যেখানে বিহারীরা সমতুল্য গুণসম্পন্ন প্রমোশনের বেলায় তাঁহাদের সুযোগ দেওয়া হয়।' '১৯৫৪ সনের শেষার্দ্ধ ছয় মাসে যত নিয়োগ হইয়াছে, তাহার মধ্যে খাঁটি বিহারী ও ডোমিসাইলড বিহারীর সংখ্যা শতকরা সত্তর জন, সুপারভাইজার পদে শতকরা সাঁইত্রিশ জন।' 'গৃহনির্ম্মাণ উদ্দেশ্যে রক্ষিত মোট জমির দশ শতাংশ জমি বিহারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখিয়া বিলি করা হয়' ইত্যাদি ইত্যাদি।"

'নবজাগরণ' মন্তব্য প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালী ও সর্ব্ব-ভারতীয়ের প্রচেষ্টায় ও পরিশ্রমে যে কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে যাহা জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সম্মান লাভ করিয়াছে তাহাতে বিশেষ এক রাজ্য-অধিবাসীদের সুযোগ সুবিধা দান অন্যান্য প্রদেশবাসীর মনে কি প্রতিক্রিয়া আনিতে পারে তাহা আদৌ বিবেচনা না করিয়া চাপে পড়িয়া টাটা কোম্পানী বিহারীদের জন্য যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আত্মঘাতী তুল্য।"

ভারতীয় সংবিধানে জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে কাহারও প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা হইবে না বলিয়া বলা হইয়াছে। টাটা কোম্পানীর ঐরূপ নীতি কি সংবিধান-বিরোধী নহে? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি কি স্যর জাহাঙ্গীর গান্ধীর এই বিবৃতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে? হইয়া থাকিলে তাঁহারা এ সম্পর্কে কোন প্রতিবাদ করিয়াছেন কি? না করিয়া থাকিলে অবিলম্বে এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুরোধ জানান উচিত যেন অবিলম্বে তাঁহারা এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। কারণ বিহার সরকার এ বিষয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন সে আশা আকাশ-কুসুম মাত্র। প্রত্যেক রাজ্যেই যদি প্রাদেশিকতা এই প্রকার উগ্র রূপ ধারণ করে তবে ভারতীয় ঐক্য কোথায় থাকিবে?

ভারতের মুখ্য ভাষা

শ্রীশুভেন্দুশেখর ভট্টাচার্য্য

মাতৃভাষা ভিন্ন অপর কোন ভারতীয় ভাষা শিখিবার কিছু প্রয়োজন আছে কি? প্রয়োজন দুইটি—for pleasure or for profit—আনন্দের জন্য অথবা লাভের নিমিত্ত। ভাষা শিক্ষা অবসর-বিনোদনের অন্যতম প্রকৃষ্ট উপায়। সত্যই যদি কেহ ইহাতে আনন্দ পায়, সে আহার-নিদ্রা ক্লেশ-দুঃখ ভুলিয়া এ বিষয়ে মগ্ন হইয়া থাকে। মানুষের কৌতূহল দুর্নিবার। প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের কথা আমার নিকট দুর্বোধ্য, তাহার সাহিত্যের রসগ্রহণে আমি অক্ষম,—এ কল্পনা অনেকের পক্ষে পীড়াদায়ক। ভিন্ন ভাষাভাষীর সহিত বহু ক্ষেত্রে আমাদের সংস্পর্শ ঘটে। দেশভ্রমণে অথবা তীর্থ-দর্শনে গেলে অজানা ভাষার জন্য আমাদের মুশকিলে পড়িতে হয়। জীবিকা অর্জনের জন্য অনেককে মাতৃভূমি ছাড়িয়া অন্য রাষ্ট্রে যাইতে হয়। অন্য রাষ্ট্রের বহু লোক একই প্রয়োজনে আমাদের রাষ্ট্রে উপনীত হইয়াছে। অপর কোন ভাষা জানা থাকিলে আমরা আরও ব্যাপক ভাবে এই সব ক্ষেত্রে সংযোগ রক্ষা করিতে পারি। প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের ভাষা, সাহিত্য ও জীবনদর্শনের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলে আমাদের অনেক ভ্রান্ত ধারণা দূর হইবে এবং সর্ব-ভারতীয় ঐক্যবোধ আরও দৃঢ় হইবে। নিজের মাতৃভাষার নাড়ীনক্ষত্র উত্তমরূপে জানিতে হইলে অপর দুই-একটি ভাষা জানা আবশ্যক—যাহার সহিত তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা আমরা মাতৃভাষার প্রয়োগশৈলী ও শব্দগঠন-প্রণালী সম্যক্ অনুধাবন করিতে পারি। এ প্রসঙ্গে গ্যেটের একটি উক্তি স্মরণীয়ঃ

"The man who knows no foreign language knows nothing of his mother tongue."

অতএব ভারতীয় ভাষা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে।

আমরা সর্বদা শুনিয়া আসিয়াছি—ভারত বহু ভাষাভাষী জনগণ-অধ্যুষিত দেশ। এখানকার অধিবাসীদের পরস্পরের মধ্যে কোন যোগসূত্র নাই। ব্রিটিশ শাসনকালে বিশেষ গর্বের সহিত ইহা উল্লেখ করা হইত যে, ইংরেজ জাতি ইংরেজী ভাষা মারফত এই যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছে এবং ভারতীয় ঐক্যবোধ জাগ্রত করিয়াছে। ভারতবর্ষে ভাষা মোট কয়টি? গ্রীয়ার্সন সাহেব হিসাব করিয়াছিলেন যে, ভারতে মোট ভাষার সংখ্যা ১৭৯টি। তাঁহার হিসাবের পর ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ভারতের এক অংশ পাকিস্থান রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পর (বেলুচি, ব্রাহুই, পশ্‌টো প্রভৃতি) আরও কতকগুলি ভাষা বাহির হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে ভাষার সংখ্যা ন্যূনাধিক ১৫০ হইবে। এই ভাষাগুলিকে শ্রেণী হিসাবে ভাগ করিয়া দেখা আবশ্যক।

ভারতীয় ভাষাগুলি চার শ্রেণীতে বিভক্ত—কিরাত, নিষাদ, দ্রাবিড় ও আর্য। প্রথম নাম দুইটি ড. সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ভাবিত। যথাক্রমে এই চার শ্রেণীর ইংরেজী নামঃ

(1) Tibeto-Chinese languages
(2) Austric languages
(3) Dravidian languages
(4) Indo-European languages

এই শ্রেণীগুলি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। (১) কিরাত শ্রেণী—এই শ্রেণীর চারটি সুপ্রাচীন এবং সাহিত্যসমৃদ্ধ ভাষা আছে। চীনা ভাষা, থাই ভাষা (শ্যামের ভাষা), বর্মী ভাষা এবং তিব্বতী ভাষা। তবে দুঃখের বিষয়, এগুলি সমস্তই ভারতের বাহিরের ভাষা। ভারতে এই শ্রেণীর যে ভাষাগুলি আছে তাহা আদিবাসীদের কথ্য ভাষা, অধিকাংশই আসামে সীমাবদ্ধ। ভাষার সংখ্যা অন্যূন এক শত হইবে। এই সমস্ত ভাষাভাষীর সংখ্যা ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা এক ভাগেরও কম। প্রধান ভাষা—গারো, নাগা ও মণিপুরী।

(২) নিষাদ শ্রেণী—ইহাও আদিবাসীদের ভাষা—প্রধানতঃ বাংলা ও বিহারের সীমান্ত অঞ্চলে নিবদ্ধ। মোট ভাষার সংখ্যা ২০টি হইবে। এই ভাষাভাষীর সংখ্যা ভারতের জনসংখ্যার শতকরা এক ভাগের একটু বেশী। প্রধান ভাষা সাঁওতালী ও খাসিয়া। দেখা যাইতেছে, ভারতের মোট দেড় শত ভাষার মধ্যে ১২০টি হইতেছে আদিবাসীদের কথ্যভাষা—জনসংখ্যার অনুপাতে যাহাদের সংখ্যা শতকরা দুই ভাগেরও কম হইবে। সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে এই ভাষাগুলি নিতান্ত অকিঞ্চিৎ-কর। বাকী ভাষাগুলির মধ্যে আনুমানিক দশটি দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর অন্তর্গত এবং আন্দাজ কুড়িটি আর্যগোষ্ঠীর অন্তর্গত। দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষা ভারতের বাহিরে পাওয়া যায় না। আর্য-গোষ্ঠীর ভাষা সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত এবং ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ভাষাগোষ্ঠী। পৃথিবীর যে অংশে আর্যজাতি বসতি স্থাপন করিয়াছে, সেখানেই অপর গোষ্ঠীর ভাষাকে

পরাভূত করিয়া নিজেদের ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ভারতের প্রধান ভাষাগুলি দ্রাবিড় এবং আর্যগোষ্ঠীর ভাষাই হইবে।

প্রধান ভাষা বলিতে কোন্ কোন্ ভাষা ধরিব? একটা স্থূল হিসাব ঠিক করিয়া লওয়া আবশ্যক। অন্ততঃ এক কোটি লোক কথা বলে এইরূপ ভাষাকে প্রধান ভাষা বলিয়া ধরিব। এদিক দিয়া হিসাব করিলে প্রধান ভাষা নয়টি। যথা:

হিন্দী	...	১৬ কোটি
তেলুগু	...	২ কোটি ৬০ লক্ষের উপর
বাংলা	...	২ কোটি ২৫ লক্ষ
		+ পাকিস্থানে ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ
মরাঠী	...	২ কোটি ১০ লক্ষ
তামিল	...	প্রায় ২ কোটি
		+ সিংহলে উপনিবিষ্ট ২০ লক্ষ
পঞ্জাবী	...	১ কোটি ৫৫ লক্ষ
কানাড়ী	...	১ কোটি ১০ লক্ষের উপর
উড়িয়া	...	১ কোটি ১০ লক্ষ
গুজরাটী	...	১ কোটি ১০ লক্ষ

ভারতীয় সংবিধানে মোট ১৪টি ভাষার উল্লেখ আছে: বাকী পাঁচটি হইতেছে—মালয়ালী (জনসংখ্যা ৯০ লক্ষের উপর), অসমীয়া (২০ লক্ষ), কাশ্মীরী (প্রায় ১৫ লক্ষ), উর্দু (উপরের হিসাবে পৃথক ভাষা বলিয়া ধরা হয় নাই) এবং সংস্কৃত (চলিত কথ্যভাষা নহে)। পৃথিবীর প্রধান ভাষাগুলির মধ্যে দুইটি ভারতীয় ভাষা স্থান লাভ করিয়াছে—জনসংখ্যার অনুপাতে হিন্দীর স্থান তৃতীয় এবং বাংলার স্থান দশম।

বর্তমান আলোচনাকে উক্ত নয়টি ভাষার মধ্যে নিবদ্ধ রাখা হইবে। এই নয়টির মধ্যে তিনটি দ্রাবিড়শ্রেণীর ভাষা—তেলুগু, তামিল এবং কানাড়ী। বাকী ছয়টি আর্যভাষা। ভারতীয় আর্যভাষাগুলিকে মোটামুটি দুইটি উচ্চশ্রেণীতে ভাগ করা যায়—কেন্দ্রিক ও প্রান্তিক। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়া এই বিভাগ সহজে বুঝা যাইবে। উত্তর-ভারতের মধ্যস্থলে যদি একটি বৃত্ত অঙ্কিত করা যায় তাহা হইলে এই বৃত্তের মধ্যে যে ভাষাগুলি পড়ে তাহারা কেন্দ্রিক ভাষা। পরিধির পাশে পাশে যে ভাষাগুলি পাওয়া যায় তাহারা প্রান্তিক ভাষা। পূর্ব দিক হইতে যথাক্রমে প্রান্তিক ভাষা হইতেছে—গাড়োয়ালী, নেপালী, অসমীয়া, বাংলা, উড়িয়া, মরাঠী। পশ্চিম দিকে আছে—লহন্দা (পশ্চিম পঞ্জাবী) এবং সিন্ধী। কেবলমাত্র এক জায়গায় বৃত্তের পরিধি ভাঙিয়া কেন্দ্রিক ভাষা কীলকের ন্যায় প্রান্তিক ভাষার মধ্যে প্রোথিত হইয়া আছে এবং পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে—গুজরাটী এবং রাজস্থানী। ভৌগোলিক অবস্থান ব্যতীত ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য এবং ভাবগত ঐক্যের দিক দিয়াও এই বিভাগ কার্য্যকরী। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, আমাদের আলোচ্য নয়টি ভাষাকে আমরা সমান তিনটি ভাগে ভাগ করিয়া রাখিতে পারি:

কেন্দ্রিক আর্যভাষা	প্রান্তিক আর্যভাষা	দ্রাবিড় ভাষা
হিন্দী	বাংলা	তেলুগু
পঞ্জাবী	মরাঠী	তামিল
গুজরাটী	উড়িয়া	কানাড়ী

এই বিভাগ সত্ত্বেও ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে অনেক বিষয়ে গভীর ঐক্য বিদ্যমান। দুইটি সাধারণ লক্ষণ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য—বর্ণমালার ক্রম এবং শব্দসম্ভার। সমস্ত ভারতীয় বর্ণমালাই একই পদ্ধতিতে সজ্জিত—প্রথমে স্বরবর্ণ, তার পর যথাক্রমে ব্যঞ্জনবর্ণ, ফলা-যোগ এবং যুক্তাক্ষর। তামিল লিপির কিছু বিশেষত্ব আছে। তাই একটু বিস্তারিত আলোচনা আবশ্যক। তামিলে ফলা-যোগ ও যুক্তাক্ষর নাই। তাহার ফলে বর্ণমালা অনেক সরল হইয়া গিয়াছে। বর্ণমালার ক্রম এইরূপ:

স্বরবর্ণ—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, দীর্ঘ এ, ঐ, ও, দীর্ঘ ও, ঔ।

(দীর্ঘ এ এবং দীর্ঘ ও লক্ষণীয়। তেলুগু এবং কানাড়ীতে এই অতিরিক্ত স্বর দুইটি গ্রহণ করা হইয়াছে।)

ব্যঞ্জনবর্ণ—ক, ঙ, চ, ঞ, ট, ণ, ত, ন, প, ম, য়, র, ল, ব, ঝ, ল়, র', ন'।

(দেখা যাইতেছে, বর্গীয় বর্ণের কেবলমাত্র প্রথম ও পঞ্চমটি আছে। প্রথম বর্ণের দ্বারা চারটি বর্ণের কাজ চালানো হয়। শব্দের প্রথমে থাকিলে ইহারা ক, চ, ট, ত, প রূপে উচ্চারিত হয়। সাধারণতঃ শব্দের মধ্যে থাকিলে গ, জ, ড, দ, ব রূপে উচ্চারিত হয়। চারটি অতিরিক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি আছে—ঘোষবৎ মূর্দ্ধন্য ষ [ফরাসী jর অনুরূপ]: ঝ, মূর্দ্ধন্য ল: ল়, তালব্য র: র', তালব্য ন: ন'। এই বিচিত্র বর্ণমালার প্রভাবে সংস্কৃত শব্দ কিরূপ পরিবর্তিত হয় তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি:

বুদ্ধি = পুত্তি; গুরু = কুরু; ভক্তি = পত্তি; জাতি = চাদি)।

লিপির প্রভেদসত্ত্বেও বর্ণমালার ও অক্ষর যোজনার পদ্ধতি সমস্ত ভারতীয় ভাষায় একই প্রকার। ইহা ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে এক মূল্যবান যোগসূত্র। সম্ভবতঃ সমস্ত লিপিই এক মৌলিক লিপি হইতে উদ্ভূত, যাহা প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মীলিপি নামে পরিচিত ছিল। এরূপ বৈজ্ঞানি

প্রণালীতে গঠিত বর্ণমালা পৃথিবীতে আর একটিও নাই। অক্ষরযোজনার জটিলতা না থাকিলে ইহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বর্ণমালা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিত। কেবলমাত্র সমস্ত ভারতীয় ভাষা নয়, ভারতের বাহিরে অনেকগুলি ভাষা এই বর্ণমালাকে গ্রহণ করিয়াছে—তিব্বতী ভাষা, বর্মী ভাষা, থাই ভাষা, ইন্দোনেশিয়ার ভাষা।

ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে অপর যোগসূত্র হইতেছে শব্দাবলী। সংস্কৃত ভাষা ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির বাহক অতি শক্তিশালী ভাষা। ইহার শব্দসম্ভার অফুরন্ত এবং নূতন শব্দগঠনের ক্ষমতা অপরিসীম। বহু শব্দ কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে পরিবর্তিত বা অপরিবর্তিত আকারে সমস্ত ভারতীয় ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। সাহিত্যের ভাষায় উচ্চশ্রেণীর চিন্তা প্রকাশ করিতে হইলেই সংস্কৃত শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। নূতন শব্দ গঠন করিতে হইলে সংস্কৃত রীতিকে অবলম্বন করিতে হয়। আর্যভাষাগুলির শতকরা ৯০ ভাগ শব্দ সংস্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত। দ্রাবিড় ভাষাগুলির আনুমানিক শতকরা পঞ্চাশভাগ শব্দ সংস্কৃতমূলক। বিভিন্ন লিপি বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি না করিলে এক ভাষাভাষীর পক্ষে অন্য ভাষা সহজে বোধগম্য হইত। শব্দাবলীর ঐক্যের ফলে অপর কোন ভারতীয় ভাষা কানে শুনিলে (তাহা লোকের মুখে, সবাক চিত্রে, রেডিও যোগে বা গ্রামোফোন রেকর্ডে হউক) আমাদের নিকট খুব বেশী অপরিচিত মনে হয় না।

দুইটি উল্লেখযোগ্য এবং অত্যন্ত কার্যকরী যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া গেল। কিন্তু কেবলমাত্র ঐক্যকে জানিলে চলিবে না—পরস্পরের মধ্যে প্রভেদ কি তাহাও জানা দরকার। পূর্বে ভাষাগুলিকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই বিভাগ কেবলমাত্র ভৌগোলিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করিয়া নহে, অধিকন্তু প্রকৃতিগত ঐক্য বলিতে ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য বুঝায়। ক্রিয়াপদের গঠন লক্ষ্য করিলেই এই তিন বিভাগের সার্থকতা বুঝা যাইবে। প্রথমে দ্রাবিড়গোষ্ঠীর একটি ভাষা (তামিল) ধরা যাক। "যাওয়া" ধাতুর প্রতিশব্দ হিসাবে তামিলে 'পোও' ধাতু ব্যবহৃত হয়। এই ধাতুর উত্তম পুরুষের একবচন বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎকালে দেওয়া হইতেছে।

আমি যাই—নান' পোওগিরে' এন'

আমি গিয়াছিলাম—নান' পোওন্নিনে' এন'

আমি যাইব—নান' পোওরে এন'

দেখা যাইতেছে, প্রত্যেক ক্রিয়াপদের শেষে<এন> এই অংশটুকু আছে—ইহা উত্তমপুরুষ একবচনের চিহ্ন: প্রথমে মূল ধাতুটি আছে—মাঝের অংশটুকু কিসের চিহ্ন? বর্তমানকালের আর কয়েকটি রূপ পাশাপাশি ধরিলে বুঝা যাইবে:

আমি যাই—নান' পোও গিরে' এন'

তুমি যাও—নির্ পোও গিরী'র

সে যায়—অবন' পোও গিরা'ন

এইবার পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে মাঝের অংশটুকু কাল-বাচক চিহ্ন: <<গির'>> বর্তমান কালের, <<ইন'>> অতীতকালের, <<ব'>> ভবিষ্যৎকালের চিহ্ন। তামিল ক্রিয়াপদ একটি অপরিবর্তনীয় নিয়ম অনুসারে গঠিত হয়।

ধাতু + কালবাচক চিহ্ন + পুরুষবাচক চিহ্ন

এই তিনটি অংশ যেন সম্পূর্ণ পৃথক—পাশাপাশি বসাইয়া রাখা হইয়াছে মাত্র। বাংলায় যেমন ধাতু এবং বিভক্তি মিলিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে, কোন্‌টি কিসের চিহ্ন তাহা সহজে ধরা পড়ে না, তামিলে সেরূপ নহে। তিনটি জিনিসই প্রথম দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে। তেলুগুতেও একই ভাবে ক্রিয়া-পদ গঠিত হয়।

আমি যাই—[পো + তা + নু] নেএনু পোতানু

তুমি যাও—[পো + তা + রু] নীরু পোতারু

সে যায়—[পো + তা + ডু] বাডু পোতাডু

বাংলা ক্রিয়াপদ গঠনের সঙ্গে দ্রাবিড় রীতির পার্থক্য হইতেছে এই যে বাংলায় ধাতু, কালবাচক চিহ্ন ও পুরুষ-বাচক চিহ্ন মিলিয়া-মিশিয়া একীভূত হইয়া গিয়াছে—পৃথক অংশগুলি খুঁজিয়া পাওয়া আয়াসসাপেক্ষ। দ্রাবিড় ক্রিয়াপদের পৃথক অংশগুলি সহজেই চোখে পড়ে—অনেক সময় মনে হয় যেন ভাল করিয়া জোড়া লাগে নাই।

কেন্দ্রীয় ভাষাগুলি এ ব্যাপারে মধ্যপন্থী। ক্রিয়া ও বিভক্তির বাঁধন কতকটা আলগা, কতকটা শক্ত। গুজরাটী হইতে উদাহরণ দেওয়া যাক:

আমি যাই—হুঁ জায়ুঁ ছুঁ

তুমি যাও—তমে জায়ো ছো

সে যায়—তে জায় ছে

আমি যাই—হুঁ জায়ুঁ ছুঁ

আমি গিয়াছিলাম—হুঁ গয়ো

আমি যাইব—হুঁ জইশ

দেখা যাইতেছে, কোন স্থলে বিভক্তি ধাতুর সঙ্গে মিশিয়া যাওয়া সত্ত্বেও পৃথক সত্তা বজায় রাখিয়াছে, কোন স্থলে মিশিতে গিয়াও একটু দূরত্ব বজায় রাখিতেছে। হিন্দীর গঠন-প্রণালীও একই প্রকার—

আমি যাই—মৈঁ জাতা হুঁ

তুমি যাও—তুম জাতে হো
সে যায়—বহ জাতা হৈ

ক্রিয়াপদ গঠনের তিনটি রীতি দেখা গেল। একটি উপমার সাহায্যে তফাৎটুকু বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। দ্রাবিড় রীতিকে একটি সরল রেখার উপর তিনটি বিন্দু বসানো আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাক। তাহা হইলে প্রান্তিক ভাষার রীতিকে একটি বৃত্ত বলিতে পারি। তিনটি বিন্দু আছে বটে, তবে কোথায় আছে খুঁজিয়া লওয়া কষ্টসাধ্য। কেন্দ্রীয় ভাষার রীতি তাহা হইলে একটি ত্রিভুজ। তিনটি বিন্দুও দেখা যাইতেছে। তাহাদের পরস্পর যোগাযোগও দেখা যাইতেছে। মোটের উপর কথা হইল দ্রাবিড় ভাষায় ধাতু ও বিভক্তি পরস্পরবিচ্ছিন্ন, কেন্দ্রীয় ভাষায় ধাতু ও বিভক্তি পরস্পরসংযুক্ত, প্রান্তিক ভাষায় ধাতু ও বিভক্তি একাত্ম। শুধু ক্রিয়াপদ গঠনের বেলায় নয়, সমস্ত পদসাধনের ক্ষেত্রে এই একই রীতি অবলম্বিত হয়। এই রীতিগুলির ইংরেজী ভাষায় পারিভাষিক নাম আছে—দ্রাবিড় রীতিকে বলা হয়—agglutinative, কেন্দ্রীয় রীতিকে বলা হয়—analytical, প্রান্তিক রীতিকে বলা হয়—synthetical।

আমাদের আলোচ্য নয়টি ভাষাকে যে আমরা সমান তিনটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলাম, সেই বিভাগ নানা দিক দিয়া মূল্যবান। ভাষাগুলির ভৌগোলিক অবস্থান সহজেই মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠে। ভাষাগুলির প্রকৃতিগত পার্থক্যও অনায়াসে আমরা বুঝিতে পারি এবং তাহা ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হইবে।

এখন প্রত্যেক ভাষা সম্বন্ধে পৃথক পৃথক ভাবে সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতেছে।

(১) হিন্দী (কেন্দ্রীয় আর্যভাষা: ১৬ কোটি)

স্বগোষ্ঠীর এবং ভিন্ন গোষ্ঠীর বহু কথ্য ভাষাকে গ্রাস করিয়া উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও মধ্যপ্রদেশ জুড়িয়া হিন্দী একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। ভিন্ন বর্গের কথ্য ভাষাগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিহারের কথ্য ভাষাগুলি—ভোজপুরী, মগহী ও মৈথিলী (ইহারা বাংলা ভাষার অতি ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি) এবং রাজস্থানের কথ্য ভাষাগুলি—জয়পুরী, যোধপুরী, বিকানিরী প্রভৃতি যেগুলিকে সাধারণতঃ মাড়োয়ারী ভাষা বলা হয় (গুজরাটী ভাষার সহিত ইহাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ)। হিন্দী ভাষার প্রবল প্রতাপে সাহিত্যে অপ্রতিষ্ঠিত পঞ্জাবী ভাষা যে কালক্রমে ইহার কুক্ষিগত হইয়া যাইবে না, একথা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না।

হিন্দী ভাষা অতি সহজবোধ্য। ফলে রাস্তাঘাটে, ট্রেনে বাসে লোকের মুখে মুখে ইহা সর্বত্র প্রচলিত। উত্তর ভারতের জনসাধারণের মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে ইহাকে উত্তর ভারতের lingua franca বলা যাইতে পারে। হিন্দী ভাষা সহজে শিক্ষণীয়। যে-কোন ব্যক্তি অল্প কয়েক দিন শুনিলেই কাজ চালাইবার মত হিন্দী ভাষা নিজেই প্রয়োগ করিতে পারে। কোন বিদেশী ভারতে আসিলে প্রথমে হিন্দী ভাষা শিখিয়া লয়। হিন্দী ভাষা সহজে শিক্ষণীয় এবং এইটি উক্ত ভাষার ব্যাপক প্রসারের প্রধান কারণ।

সাহিত্যিক হিন্দী ভাষার দুই রূপ। একটি সংস্কৃত শব্দবহুল এবং নাগরী লিপিতে লিখিত। ইহাই সাধারণতঃ হিন্দীভাষা বলিয়া স্বীকৃত। অপরটি আরবী-ফারসী শব্দবহুল এবং আরবী লিপিতে লিখিত। এই ভাষাকে উর্দু ভাষা বলা হয়। ইহার কোনটিই হিন্দীভাষার প্রকৃত স্বরূপ নয়। রাজনৈতিক উত্তেজনা বা ধর্মীয় গোঁড়ামির বশে যাঁহারা কেবলমাত্র সংস্কৃত বা আরবী শব্দের প্রয়োগ করিতেছেন তাঁহারা এই বিপুল জনসমষ্টির ভাষাকে দুর্বল করিয়া দিতেছেন। যে হিন্দী ভাষা আপন শক্তিতে সমগ্র উত্তর ভারত জয় করিয়াছে, তাহা হইতেছে উত্তরপ্রদেশের কৃষক-শ্রমিকের মুখের ভাষা, তাহা হইতেছে হিন্দী ফিলমে সাধারণতঃ যে ভাষা ব্যবহার করা হয় সেই ভাষা। এই ভাষায় সংস্কৃত, আরবী ও দেশী তিন রকমের শব্দই উপযুক্ত পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। এই তিন উপাদানে গঠিত ভাষাই অমরত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য।

(২) তেলুগু (দ্রাবিড় ভাষা: ২ কোটি ৬০ লক্ষ)

তেলুগু নবগঠিত অন্ধ্ররাষ্ট্রের ভাষা। অন্ধ্রদেশের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। তেলুগু ভাষায়ও প্রকৃতপক্ষে দ্বাদশ শতাব্দী হইতে সাহিত্যের বিকাশ হইয়াছে। দ্রাবিড় ভাষাগুলির মধ্যে তেলুগু সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সংস্কৃতাশ্রয়ী। তেলুগু অত্যন্ত শ্রুতিমধুর ভাষা। এই প্রসঙ্গে হার্বার্ট ষ্ট্রাঙ্গওয়েজ-এর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাইতেছে:

"Telugu is the most musical language of the South as Bengali is of the North."

সাহিত্যিক তেলুগু ভাষারও বাংলার ন্যায় দুইটি ধারা। লেখ্য ভাষার পাশাপাশি কথ্য ভাষাও সাহিত্যে সমানে চলিতেছে।

(৩) বাংলা (প্রান্তিক আর্যভাষা: ভারতে ২ কোটি ২৫ লক্ষ ও পাকিস্থানে ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ, মোট ৬ কোটি)

আধুনিক যুগে ভারতের অপর কোন ভাষায় বাংলার ন্যায় বিরাট ও সমৃদ্ধ সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এই তিন জন যুগন্ধর সাহিত্যিকের আবির্ভাব বাংলা ভাষাকে ভারতে অনন্যতুল্য মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এই সাহিত্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্যান্য ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা দিয়াছে।

(৪) মরাঠী (প্রান্তিক আর্যভাষা ঃ ২ কোটি ১০ লক্ষ)

বীরপ্রসবিনী মহারাষ্ট্রভূমি কেবলমাত্র শৌর্য্যেই ভারতের শীর্ষস্থানীয় নহে, হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনেও ইহার অনেক দান আছে। বাঙালীর ন্যায় বুদ্ধিজীবী মরাঠা জাতিও উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য রচনা করিয়াছে। প্রাচীন যুগের মোরোপন্থ, নামদেব ও রামযোশী হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্য্যন্ত এই সাহিত্য-রচনার ধারা অব্যাহত আছে। বাল-গঙ্গাধর তিলকের 'গীতারহস্য' মরাঠা সাহিত্যের অক্ষয় কীর্তি। বাংলার বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র মহারাষ্ট্রে বাংলার ন্যায়ই জনপ্রিয়। মরাঠী ভাষা উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলির মাঝখানে 'বাফার'-এর ন্যায় অবস্থান করিতেছে। ফলে উভয় জাতীয় ভাষার বিশেষত্ব ইহাতে কিছু কিছু আসিয়া গিয়াছে।

(৫) তামিল (দ্রাবিড় ভাষা ঃ ভারতে ২ কোটি ও সিংহলে ২০ লক্ষ)

তামিল অতি প্রাচীন ভাষা। তামিল ভাষায় রচিত গ্রন্থ 'কুড়ল' খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতেই দক্ষিণ ভারতে বেদের ন্যায় সমাদৃত। এতদিন আমাদের ধারণা ছিল সংস্কৃত ভারতের প্রাচীনতম ভাষা। কিন্তু সম্প্রতি মিশরের কবরের ভিতর তামিল অক্ষরে লিখিত পুথি পাওয়ায় ধারণা হইতেছে যে, তামিল সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাচীনতর। প্রথম শতাব্দী হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত তামিল ভাষায় সাহিত্যচর্চা অব্যাহত আছে। বর্তমান যুগে সুব্রহ্মণীয়া ভারতী ও 'কল্কি'র (আর. রামমূর্তি) নাম ভারতবিদিত।

এরূপ দীর্ঘজীবী ভাষা পৃথিবীতে বিরল এবং ইহা ভাষার অন্তর্নিহিত অদম্য প্রাণশক্তির পরিচায়ক। এই প্রাণশক্তি আর্যভাষার প্লাবনের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র আত্মরক্ষাই করে নাই, স্বগোষ্ঠীর অন্যান্য ভাষাগুলিকেও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। উদ্ধত বিদ্রোহের মত তামিল ভাষা বিচিত্র বর্ণমালা ও নিজস্ব শব্দসম্ভার লইয়া দাঁড়াইয়া না থাকিলে আর্যসভ্যতা ও আর্য-ভাষার প্লাবনে দ্রাবিড় ভাষা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত।

সাহিত্যিক তামিল ভাষার সংস্কৃত উপাদানকে আমরা সহজেই চিনিতে পারি। সংস্কৃত শব্দের পরিবর্তিত রূপকেও আমরা চেষ্টা করিলে ধরিতে পারি। কিন্তু তামিল ভাষার নিজস্ব উপাদানের সহিত মোটেই পরিচিত নই। ইংরেজী ভাষার মারফত কয়েকটি তামিল শব্দ অবশ্য আমরা জানি—teak, atoll, betel, calico, coir, curry, mango.

(৬) পঞ্জাবী (কেন্দ্রীয় আর্যভাষা ঃ ১ কোটি ৫৫ লক্ষ)

পঞ্জাবী ভাষায় সাহিত্য বলিতে বিশেষ কিছু নাই। এক-মাত্র উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ "গ্রন্থসাহেব" শিখদের ধর্মগ্রন্থ।

শব্দসম্ভার ও ব্যাকরণের দিক দিয়া পঞ্জাবী বহুল পরিমাণে হিন্দীর উপর নির্ভরশীল। তবে ব্যাকরণের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এবং নিত্যব্যবহার্য শব্দের বেলায় হিন্দী হইতে বিভিন্নতা ইহার পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। পঞ্জাবী ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা আছে—তাহার নাম গুরুমুখী। তবে ইহার প্রচলন শিখদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। হিন্দুরা নাগরীতে এবং মুসলমানেরা উর্দু হরফে পঞ্জাবী লিখিয়া থাকেন।

(৭) কানাড়ী (দ্রাবিড় ভাষা ঃ ১ কোটি ১০ লক্ষ)

প্রাচীনত্বের দিক দিয়া প্রচলিত ভাষাগুলির মধ্যে কানাড়ীর স্থান তামিলের পরেই। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকেও যে কানাড়ী ভাষা বর্ত্তমান ছিল তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ আছে। কানাড়ী ও তেলুগু ভাষার মধ্যে বর্ণমালা, ব্যাকরণ ও শব্দাবলীর দিক দিয়া যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, পূর্বে কানাড়ী ও তেলুগু একই ভাষা ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর কাছাকাছি তেলুগু কানাড়ী হইতে পৃথক হইয়াছে। দ্রাবিড় ভাষাগুলির মধ্যে কানাড়ী শিক্ষা করা আমাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ।

(৮) উড়িয়া (প্রান্তীয় আর্যভাষা ঃ ১ কোটি ১০ লক্ষ)

উড়িয়া ভাষার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব আছে। প্রথম, ব্যাকরণের বিধিগুলি অত্যন্ত সরল। নিয়মসমূহের ব্যতিক্রম একরূপ নাই বলিলেই হয়। সুতরাং উড়িয়া ব্যাকরণ আয়ত্ত করা সর্বাপেক্ষা সহজ। দ্বিতীয়, কথ্য ও লেখ্য ভাষার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। কথ্যভাষাও সর্বত্র প্রায় একরূপ, প্রভেদ যাহা কিছু আছে তাহা নগণ্য। এত সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও উড়িয়া ভাষা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই, তাহার কারণ উড়িয়া লিপির জটিলতা—উড়িয়া অক্ষরে লেখা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ব্যাপার এবং খুব বড় টাইপে ছাড়া ছাপানো যায় না। ছোট টাইপে ছাপাইলে কালি চুবড়াইয়া যায়। এই দিক দিয়া উড়িয়া লিপি সত্য সত্যই কুটিল লিপির বংশধর।

চৈতন্যদেব যখন শেষজীবনে নীলাচলে বাস করিতেন তখন হইতে উড়িয়ায় উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টা দেখা যায়। আধুনিককালেও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংঘাতে উক্ত ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টি চলিতেছে। তবে এখনও কোন লোকোত্তর প্রতিভার স্পর্শে এ ভাষা ধন্য হয় নাই।

বাংলা এবং উড়িয়্যার মধ্যে সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। চলতি শব্দসম্ভার এবং বাক্যগঠনরীতিতে বিশেষ ঐক্য থাকায় উড়িয়া ভাষা শিক্ষা করা বাঙালীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ।

(৯) গুজরাটী (কেন্দ্রীয় আর্যভাষা ঃ ১ কোটি ১০ লক্ষ)

রাজনৈতিক নেতা হইয়াও মহাত্মা গান্ধী গুজরাটী ভাষার বিশেষ কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার সমস্ত মৌলিক

রচনা গুজরাটী ভাষায় লিখিত। ফলে সমগ্র ভারতে গুজরাটী শিখিবার প্রবল আগ্রহ জন্মিয়াছে। আর গুজরাটী শিখিলে যে-কোন শিক্ষার্থী যথার্থই উপকৃত হইবেন। সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের ভাষা হইলেও গুজরাটী সাহিত্য-সমৃদ্ধ ভাষা। অতি প্রাচীনকাল হইতে গুজরাটীতে মহৎ ও সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি হইতেছে। রাজস্থানের চারণগাথা যাহা যুগে যুগে ভারতবাসীকে শৌর্যের আদর্শ ও প্রেরণা দিয়াছে, তাহা প্রাচীন গুজরাটী ভাষার নিজস্ব সম্পদ। আধুনিককালেও বহু দিকপাল লেখক গুজরাটীতে লিখিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকানাইয়ালাল মুনসী, কিশোরীলাল মশরুওয়ালা, শ্রীমতী লীলাবতী মুনসী ও শ্রীমতী হংসা মেহতার নাম বহুজনবিদিত।

গুজরাটী ভাষায় বর্তমানকালের ক্রিয়াপদে 'আছে' ধাতুর ব্যবহার করা হয় এবং অতীতকালের ক্রিয়াপদে 'ইল' প্রথম পরিচয়ে বিভক্তি ব্যবহার করা হয়। বাংলা ভাষার সহিত এই অপ্রত্যাশিত সামঞ্জস্য আমাদের বিস্মিত করিয়া তোলে। সিংহলে যাহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহারা খুব সম্ভব এই অঞ্চল হইতে গিয়াছিল। ফলে সিংহলী ভাষার সহিত গুজরাটী ভাষার অনেক সাদৃশ্য আছে। জানি না কি সূত্রে বাঙালীর সিংহলবিজয়ের কাহিনী আমাদের দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীতে কি বাঙালীজাতি প্রথমে গুজরাটে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া আবার সেখান হইতে অজানা সমুদ্রের বুকে পাড়ি জমাইয়াছিল?

সমস্ত আর্য ভাষা সংস্কৃত ভাষা হইতে উদ্ভূত। ক্রমবিকাশের ধারা অনেকটা এইরূপ—সংস্কৃত→পালি→প্রাকৃত→আধুনিক ভারতীয় ভাষা। এই ক্রমবিকাশকে পণ্ডিতেরা প্রচুর গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন। একমাত্র গুজরাটী ভাষাতে এই ক্রমবিকাশের ধারার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রক্ষিত আছে। প্রতি শতাব্দীতেই গুজরাটীতে লিখিত গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ফলে ভাষা ধীরে ধীরে কি ভাবে পরিবর্তিত হইতেছে তাহা আমাদের কাছে সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। এদিক দিয়া গুজরাটী ভাষা ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই এক ভাষার পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আমরা অন্যান্য ভাষার সম্ভাব্য গতিপথ ধরিতে পারি—এই কথাটি গ্রীয়ার্সন খুব চমৎকার ভাবে বলিয়াছেন:

"We have a connected chain of evidence as to the growth of the Gujerati language from the earliest times. We can trace the old Vedic language through Prakrit down to Apabhramsa and we can trace the development of Apabhramsa from the verses of Hemachandra down to the language of a Parsi newspaper. No single step is wanting. The line is complete for nearly four thousand years.

* * *

কেবলমাত্র নয়টি ভাষার সাহায্যে ভারতের প্রায় একত্রিশ কোটি লোকের চিন্তা-ভাবনা ও বাগ্‌ভঙ্গীকে বুঝিতে পারি, ইহা আমাদের পক্ষে কম স্বস্তির কথা নহে। বহু ভাষা আমাদের দেশের জ্ঞানী ব্যক্তিদের দুশ্চিন্তার কারণ। ভাষাগত বিরোধ রাজনৈতিক আকাশকে কলুষিত করিয়া রাখিয়াছে। ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্য ভাষা-বিদ্বেষে বারংবার বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে। মাত্র নয়টি ভাষার স্বাধীনতা (আরও দুই-একটি সংখ্যাল্প ভাষাকে ধরিতে হইবে) স্বীকার করিয়া লইলে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব তিরোহিত হইয়া যাইতে পারে। এই সুবুদ্ধির উদয় হইলে সমস্ত দিক হইতে দেশের মঙ্গল হইবে। যে-কোনও বিদ্যার্থী নিশ্চিত রূপে জানিতে পারিবেন যে, নয়টি ভাষা দ্বারা সমগ্র ভারতকে হস্তামলকবৎ নিজের মধ্যে অনুভব করা সম্ভব। আর এই ভাষাগুলি পরস্পর এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত যে, এক ভাষা হইতে অপর ভাষায় প্রবেশ করা যে-কোন পাশ্চাত্য ভাষা শিক্ষা করা অপেক্ষা অনেক সহজসাধ্য। আমাদের মধ্যে ভারতীয় ভাষাশিক্ষার আগ্রহ জন্মিলে বহু বিপর্যয় হইতে আমরা রক্ষা পাইতে পারি।

It was like a dark night; there was darkness everywhere; darkness of ignorance.

হেড মাষ্টার চন্দ্রবাবুর লেখা চৈতন্য ইনষ্টিটুশনের এন্যুয়েল রিপোর্টের প্রথম লাইন হ'ল এই। আজ দশ বৎসর চৈতন্য ইনষ্টিটুশন স্থাপিত হয়েছে, দশ বৎসরে আট বার পুরস্কার বিতরণী সভা হয়েছে। আট বারের এন্যুয়েল রিপোর্টের আরম্ভ এই। এর বদল কখনও হয় নি। এর পরই চৈতন্য ইনষ্টিটুশন স্থাপনকে সূর্যোদয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এমনি একটি কল্পনার ছবি বোধ করি, চন্দ্রবাবুর মনের মধ্যে বাসা গেড়ে আছে। শুধু ইস্কুলের ওই এন্যুয়েল রিপোর্টেই নয়, যখনই এখানে শিক্ষা-সংক্রান্ত সভা-সমিতি হয় তখনই তিনি ওই বলেই বক্তৃতা আরম্ভ করেন—It was like a dark night ;—লোকে—বিশেষ করে আধুনিকেরা, নিজেদের মধ্যে গা টেপাটেপি করে বলে—এই সুরু হ'ল বাঁধা বুলি।

এন্যুয়েল রিপোর্ট লিখে প্রতিবারই মাষ্টারদের ডেকে শোনানো হয়, মৃগাঙ্কবাবু বসেন সামনে, তিনি বিলাসীসুলভ ভঙ্গিতে নিজের দাড়িতে হাত বুলিয়ে রসিকতা করে বলেন—সবই বেশ হয়েছে কিন্তু মালিকদের স্তব একটু বেশী করা হয়েছে।

চন্দ্রবাবু বলেন—Truth is Truth ; চৈতন্যবাবু না এগিয়ে এলে যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকত এ জায়গা। কে করত, বলুন ?

মৃগাঙ্কবাবুর ছোটখাটো পা দুখানি ঘন আন্দোলনে দুলে ওঠে, বোঝা যায় সারা অন্তরটা দমকা হাওয়ায় তরঙ্গমুখর দীঘির মত চঞ্চল হয়ে উঠেছে ; মুখে চোখে কৌতুক-দীপ্তি ফুটে ওঠে ; তিনি বলেন—Yes, but one can challenge ; কূট তার্কিক অবশ্যই বলতে পারে, কর্মটি শয়তানের কর্মের মত অপকর্ম। প্রশ্ন করতে পারে—ইস্কুল করে হয়েছে কি ? বাপমায়ের খরচ বেড়েছে। টেরি কাটতে শিখেছে, ওপেন ব্রেষ্ট, ডবল ব্রেষ্ট কোট পরতে শিখেছে, পম্পশুর রেওয়াজ হয়েছে। And they can—আই মীন দি কূটতার্কিকস can quote Paradise Lost.

—the fruit
of that forbidden tree whose mortal taste
Brought death into the world and all our woe.

এঁ্যা ? তা হলে কি বলবেন ? কথা শেষ করে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে আর একবার হেসে নেন এবং আবার বলেন —
And everything has been told about the sun,
but nothing has been told about the moon;
why ? কি গো কেষ্টবাবু ? চন্দ্র সম্পর্কে কিছু নিশ্চয় বলা উচিত ছিল না ? চন্দ্র অনেক আলো দিয়েছে।

রামজয় পণ্ডিত এবার বলেন—চন্দ্র এখানে এক নয়, দুই। কৃষ্ণপক্ষ এখানে নেই-ই। একে চন্দ্র, দুইয়ে মৃগাঙ্ক। আমাদের ফকীর বৈরেগী গায়—'যুগল চাঁদ কেউ দেখিস নি দেখসে নদীয়ায়'।

চন্দ্রবাবু বলেন—গোপাল, কেষ্টকে বল তামাক-টামাক দিক। আর একটু মিষ্টি জল। পাঁচটা বাজে। এখন let us finish,—শেষ করে নেওয়া যাক। কি বলেন ?

প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশনের আগে ইস্কুলের পর মাষ্টারেরা

বলেন, এনুয়েল রিপোর্ট পড়া হয়। ইস্কুল থেকেই জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়। চন্দ্রবাবু পড়ে যান—Then there came a torch-bearer in that darkness. A great soul, a true lover of light—light of knowledge.

চৈতন্য ইনষ্টিটুশনকে সূর্য্যের সঙ্গে তুলনা করলেও চৈতন্য বাবুকে টর্চ-বেয়ারার বলেন। বলেন চৈতন্যবাবু আলোক-অর্ঘ্য দিয়ে যে পূজা করেন সেই পূজার ফলেই এই সূর্য্যোদয়, অর্থাৎ, চৈতন্য ইনষ্টিটুশনের অভ্যুদয়।

—বাট দেয়ার ওয়ার টোলস এণ্ড মক্তাবস এণ্ড পাঠশালাজ—

তার্কিক মৃগাঙ্কবাবু ঘন ঘন দাড়িতে হাত বুলাতে থাকেন। ওঁর উত্তেজনা যত বাড়ে তত বাড়ে ওঁর দাড়িতে হাত বুলানোর মুদ্রাদোষ।

তা ছিল। কিন্তু সে সবের অবস্থা তখন নিবন্ত গ্রহের মত। চন্দ্রবাবু বলেন—তা যদি বলেন তবে এটাও বলতে হবে যে, গুলিতে আলো দূরের কথা উত্তাপও একরকম ছিল না। পুরুতগিরি মৌলবীগিরি আর গমস্তাগিরি—টোল মক্তাব পাঠশালা থেকে পড়ে এই তিনটে কাজ করা যেত। আর কিছু না। বড় জোর আদালতে টাউটের কাজ। কোনটা না পেলে পাঠশালায় পণ্ডিতি।

এ সব রচনা করা কথা নয়, এক বিন্দু রঙ ফলানো নয়, শোনা নয়, ভুক্তভোগীর কথা। চন্দ্রমাষ্টার বাপের পাঠশালা থেকে পড়া শেষ করে যখন বের হলেন তখনকার কথা আজও যে মনে জলজল করছে! রামজয় এবং জেয়াউদ্দিনও তাঁর সঙ্গে পড়ত। ওদের দু'জন ভুজঙ্গ পণ্ডিতের পাঠশালা থেকে পৈতৃক পেশায় শিক্ষানবীশ হিসেবে গিয়ে ভর্ত্তি হ'ল আপন আপন বাপের কাছে। রামজয় ব্যাকরণ পড়ে কাব্য পড়বে শাস্ত্র পড়বে, বড় হয়ে ভাগবত পাঠ করে বেড়াবে, গুরুগিরি করবে, সমাজে বিধি-ব্যবস্থা দেবে। জেয়াউদ্দিনও তাই করবে নিজেদের সমাজে। মসজেদে আজান পড়বে—ঈদে বকরীদে মুসলমানদের নামাজ পড়াবে। চলে যাবে ওদের একরকম করে। মুশকিল হ'ল চন্দ্রভূষণের। কি করবে সে? ভুজঙ্গ পণ্ডিতের ইচ্ছে ছিল ছেলে মোক্তারি পড়ে। না পারলে আদালতে টাউটগিরি করবে। ওর পিছনে ভুজঙ্গ দত্তের জীবনের একটি মর্ম্মান্তিক স্মৃতির প্রেরণা ছিল।

ভুজঙ্গ দত্তের পৈতৃক বাসভূমি অভয়পুরের কোলেই ময়ূরাক্ষী নদী। তার ঠিক ওপারেই বিখ্যাত গন্টুটিয়ার রেশমকুঠি। সারা বাংলা দেশের মধ্যে এত বড় রেশমকুঠি আর ছিল না। এখন কুঠি উঠে গিয়েছে কিন্তু বিশাল কুঠি-বাড়ীটা এখনও পড়ে রয়েছে। প্রায় মাইল দেড়েক দূর থেকে সব চেয়ে উঁচু চিমনিটা দেখা যায়। বিরাটকায় ল্যাঙ্কাশায়ার বয়লার দুটো এখনও গাঁথা পড়ে আছে। এক হাজার ঘাই অর্থাৎ রেশমের গুটি ভিজানো ভাটি আজও অটুট রয়েছে। কুঠিতে চার জন সায়েব কর্ম্মচারী থাকত। চার জন সায়েবের জন্যে ষোলটা ঘোড়া। ও অঞ্চলে চারি পাশে পাঁচ-সাত মাইলের মধ্যে গ্রামে প্রায় ঘরে ঘরে ছিল পলুপোকা পালনের ধুম। ধানের ক্ষেতের চেয়ে পাট চাষের জমির কদর ছিল অনেক বেশী। অনেক কাল ধরেই অবশ্য এ অঞ্চলে রেশমের চাষ প্রধান। এখানকার রেশম থেকেই মুরশিদাবাদের প্রসিদ্ধ গরদের তাঁত চলত, এবং ওই কুঠি ছাড়াও কয়েকটা গ্রামে আগেকার প্রথায় কিছু কিছু রেশম তৈরি হ'ত। এ রেশমের কারবারের মূল কারবারী ছিল বেজা বীরনগরের তন্তুবায়েরা। ওই তন্তুবায়দের কারবারেই ভুজঙ্গ দত্তেরা তিন পুরুষ ধরে কাজ করত। কারবারের সকল দায়িত্ব ছিল দত্তদের উপর; তেমনি ছিল অগাধ বিশ্বাস। সম্পর্কটা মনিব-ভৃত্যের ছিল না, সম্পর্কটা ছিল আত্মীয়তার। এদের কারবারে রেশমের পরিমাণ বেশী ছিল না, কিন্তু রূপে গুণে এদের রেশম ছিল অনেক উৎকৃষ্ট। কি কৌশল যে ছিল এর মধ্যে সে সায়েবরাও ধরতে পারত না। তবে একটা জিনিস সকলেই জানত। অল্প পরিমাণের জিনিস নিপুণ হাতের যত্নে যেমন সুন্দর করে তৈরি করা যায়—পাইকিরী হারে রাশীকৃত জিনিস কলের মুখে তেমন সুন্দর কখনও হয় না। এই কারণে কুঠির রেশমের চেয়ে এদের রেশমের কদর ছিল বেশী। খাস বিলেত থেকে এদের রেশমের উল্লেখ করে অর্ডার আসত। কুঠির কোম্পানী বিলেত থেকে কলকাতায় নির্দ্দেশ দিলেন—'তোমাদের রেশমের উন্নতি করো। নয় তো ওই যে উন্নত ধরণের রেশম যা ওই অঞ্চলেই পাওয়া যাচ্ছে—সেটা যাতে তৈরি না হয় তাই কর।' হাজার ঘাইয়ে কলে-ঘোরানো টাকুর মুখে এবং দু' হাজার আড়াই হাজার দিনমজুরের মোটা হাতে রেশমের উন্নতি কি করে হবে? হ'ল না। কাজেই উন্নত ধরণের রেশম-সুতো তৈরি করার পথ বন্ধের দিকে নজর দিলেন সায়েবরা। ভুজঙ্গ দত্ত তখন তন্তুবায়দের কাজকর্ম্ম দেখেন। সায়েবরা তাঁকে ডেকে অনেক লোভ দেখালে। কুঠিতে চাকরি দিতে চাইলে। তার পর ভয় দেখালে। একদিন তাঁর অভয়পুরের ঘর পুড়ে গেল। বেজা বীরনগরে তন্তুবায়দের ঘরেও আগুন লাগল। দত্ত অভয়পুর থেকে উঠে এলেন রামজয়দের গ্রামে। তন্তুবায়েরা পাকা বাড়ীর বনেদ পত্তন করলে। কিন্তু পাকা-

বাড়ী শেষ হবার আগেই একদিন রাত্রে তন্তুবায়দের বাড়ীতে পড়ল ডাকাত, এবং তন্তুবায়দের তিন ভাইয়ের বড় দুই ভাইকে সড়কী দিয়ে গেঁথে খুন করলে, বড় ভাই বড় ছেলে আপাদমস্তক কাঁথা চাপা দিয়ে পড়েছিল—তাকে বলিদানের খাঁড়ার কোপে কাঁথাশুদ্ধ দু'আধখানা করে দিয়ে গেল। জানলে সবাই—বুঝলে সবাই যে, এ কাণ্ডের পিছনে কে আছে, কিন্তু প্রমাণ হ'ল না। সব চেয়ে বড় দুঃখ ছিল ভুজঙ্গ দত্তের যে, এই নিয়ে লড়াই করবার জন্যে—একখানা দরখাস্ত করবার জন্যে সারা সদর শহরে একজন উকীল কি মোক্তার সে পায় নি। চন্দ্রকে মোক্তার করবার সাধ ছিল তার এই জন্য।

তাই পাঠশালার পড়া শেষ হতেই ভুজঙ্গ দত্ত এক শীতের সকালে চন্দ্রভূষণকে নিয়ে এলেন এই বিল্বগ্রামে। বিল্বগ্রামে তখন একটি মাইনর ইস্কুল হয়েছে। একটা মাইনর ইস্কুল ছিল ওই গন্নুটিয়ায়। রেশম-কুঠির সায়েবরা ইস্কুলটা করেছিল। ওটা ছিল সায়েবদের কুঠি চালাবার কর্ম্মচারী কেরানী তৈরি করবার জন্য। একেবারে ইংরেজী না-জানা বাংলা-নবীশ লোক নিয়ে কাজ চালাতে অসুবিধা হ'ত। ইস্কুলটা অবশ্য কুঠির সাহেবরা করে নি, করেছিল রেভারেণ্ড জন টমাস। পাগলা পাদ্রী জন সায়েব। সুরুলের চীফ সায়েবের কুঠি থেকে এসেছিল গন্নুটিয়ায়। তার উদ্দেশ্য ছিল—ইংরেজী শিখিয়ে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করবে। পাগলা পাদ্রী গ্রামে গ্রামে 'হরিজন' পল্লীতে ঘুরে বেড়াত, তাদের দুঃখে-কষ্টে-রোগে-শোকে পরমাত্মীয়ের মত গিয়ে পাশে দাঁড়াত। লোকে বলে—পাগল সায়েব তাদের ঘরে পান্তা ভাত খেত; তাদের দুঃখের রাত্রে শীতে বর্ষায় তাদের দাওয়ায় পড়ে থাকত। প্রলোভনও দেখাত। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের বলত—ইংরাজী শেখ, বাইবেল পাঠ করিয়া দেখ, প্রভু যীশুর অমৃত উপদেশ অনুধাবন কর। আমরা তোমাকে বিলাত পাঠাইব। দেখিবে সে কি দেশ। সেখানে ছোট জাতি নাই। কুসংস্কার নাই। নূতন জীবন লইয়া ফিরিয়া আসিবে। সুসভ্য হইবে। আত্মার উন্নতি হইবে। এখানে তখন তুমি উচ্চ পদ পাইবে।—কিন্তু আশ্চর্য্য একজনও ক্রীশ্চান হয় নাই। রেভারেণ্ড জন চলে যাবার পর ইস্কুলটি অবশ্য উঠে যায় নি, কিন্তু তার আর উন্নতিও হয় নি। সায়েবরা তা চান নি।

মৃগাঙ্কবাবু ওই কুঠিয়ালদের ইস্কুল থেকেই মাইনর পাস করেছিলেন। চন্দ্রভূষণকে তার বাপ ও ইস্কুলে দেয় নি ওই কুঠিয়ালদের ভয়ে। যে কুঠিয়ালদের ভয়ে গ্রাম পরিত্যাগ করে চলে আসতে হয়েছে তাদের ইস্কুলে ছেলেকে পড়তে দেবে কোন্ সাহসে? বিল্বগ্রামের পাশে কৃষ্ণপুর কায়স্থপ্রধান গ্রাম। সম্পন্ন গৃহস্থ সব। কৃষ্ণপুরে ওই অবস্থাপন্ন আত্মীয় গোপাল ঘোষের বাড়ীতে ছেলের জন্য আশ্রয় এবং অন্ন ভিক্ষা করেছিল ভুজঙ্গ দত্ত। ওখানে খাবে থাকবে এবং মাইলখানেক দূরে বিল্বগ্রাম মাইনর ইস্কুলে পড়বে।

সেদিনের কথা আজও মনে জলজল করছে চন্দ্রভূষণবাবুর। বাল্যকালের স্মৃতির মত মধুর মনোরম আর কিছু হয় না। কতদিন—অবসর সময়ে একা বসে বসে ভাবেন। স্কুলের সেসন সুরুতে যখন আপার প্রাইমারি শেষ করে দশ-বারো বছরের ছেলেগুলি টিনের পোর্টম্যাণ্টো, শতরঞ্চি বা চটমোড়া বিছানা নিয়ে বোর্ডিঙে এসে ভর্ত্তি হয় তখন তাঁর মুখে একটি স্মিত হাস্যরেখা ফুটে ওঠে। গ্রাম্য চেহারা, সরল ভীরু চোখের দৃষ্টি, নতুন জামা, নতুন কাপড়, নতুন জুতো পায়ে খোঁড়াতে খোড়াতে এসে দাঁড়ায় অভিভাবকের সঙ্গে। ঠিক এমনি ভাবে বাপ ভুজঙ্গ দত্তের সঙ্গে এগার বছরের চন্দ্র এসে কৃষ্ণপুরের গোপাল ঘোষ মশায়ের বাড়ীতে উঠেছিল। লম্বা হিলহিলে চেহারা, মাথায় পুরু চুল, চোখে চকিত দৃষ্টি, মনে পড়ে বৈ কি। মনে আছে কপালে তিলক, গলায় তুলসীর মালা, মাথায় টিকি, স্থূলকায় গোপাল ঘোষ তক্তপোষের উপর বসে জমিদারী সেরেস্তার কাগজ লিখছিলেন। চন্দ্রকে দেখে বলেছিলেন—ও ভুজঙ্গ, তোমার ছেলে যে চকা গরুর মত তাকায় হে! কিরে তুই গুঁতোস নাকি?

বলে হো হো করে হেসে উঠেছিলেন। গোপাল ঘোষ কর্কশভাষী ছিলেন না—সে আমলে লোকে তাঁকে রসিকজন বলত। সে আমলে এমনিই ছিল গ্রাম্য রসিকতা। অবশ্য অন্নপ্রার্থী বলে একটু অবজ্ঞা নিশ্চয়ই ছিল। চন্দ্রভূষণের ঠোঁট দুটি থরথর করে কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু ভয়ে কাঁদতে পারে নি তখন। কেঁদেছিল বাপ চলে যাওয়ার সময়। বিল্বগ্রাম ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দিয়ে ছেলেকে উপদেশ দিয়ে ভুজঙ্গ দত্ত উঠে দাঁড়াতেই কেঁদে ফেলেছিল। ঠিক এক মুহূর্ত্তে মনে হয়েছিল—পৃথিবীতে সে একা, তার আর কেউ নাই। সে এক বিচিত্র অবস্থা—মর্ম্মান্তিক অনুভূতি। অমাবস্যার রাত্রে দমকা বাতাসে দপ করে আলো নিভে গেলে হঠাৎ যেমন অমাবস্যার অন্ধকার এক মুহূর্ত্তে আচ্ছন্ন করে ফেলে ঠিক তেমনি ভাবে মুহূর্ত্তে ছেলেদের মন আচ্ছন্ন করে দেয়—হতাশা—ভয়, এবং হঠাৎ কেঁদে ফেলে। চন্দ্রও কেঁদে ফেলেছিল। অনেক ছেলে বাপের কাপড় বা চাদরের খুঁট চেপে ধরে। তা চন্দ্র পারে নি। ভুজঙ্গ দত্তকে লোকে বলত কঠিন লোক। বাইরে সমাজে ছিল নিঃশব্দ ব্যক্তি,

বরং ভীরু, কিন্তু বাড়ীতে পাঠশালায় ছিল ঠিক তার বিপরীত। কুঠিয়াল সায়েবদের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে এসে ভিন্ন গ্রামে বাস-করা অবধি তার এই চরিত্র দিন দিন কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠেছিল। ঠিক মাটির পাথর হয়ে যাওয়ার মত। ক্রমশঃ জলধারণের শক্তি চলে যায়, জলে নরম হয় না শুধু শীতে ঠাণ্ডা হয়, গ্রীষ্মে তেতে ওঠে। তার মাত্রা—সাধারণ মাত্রাকে ছাড়িয়ে যায় দু'দিকেই।

চন্দ্র কেঁদে ফেলতেই ভুজঙ্গ দত্তের ট্যারা চোখ স্থির হয়ে গিয়েছিল। মুখের কোন জায়গায় কোন পরিবর্ত্তন দেখা দেয় নি—ভুরু বা কপালে একটি কুঞ্চনরেখাও না। শুধু আশ্চর্য্য রকমের স্থির। দেখেই চন্দ্রের চোখের জল মুহূর্ত্তে শুকিয়ে গিয়েছিল। ভুজঙ্গ দত্ত এতক্ষণে একটু নড়েছিল। নড়েছিল শুধু ঠোঁট দুটি। মৃদু স্বরে ধীর উচ্চারণে কয়েকটি কথা বলেছিল শুধু—খবরদার! কাঁদবি না। যদি শুনি কান্নাকাটি করেছিস—তা হলে এসে তোকে নিয়ে যাব, পথে গলায় পা দিয়ে মেরে নদীর জলে ভাসিয়ে দোব।

বলেই ভুজঙ্গ দত্ত ছেলের দিকে পিছন ফিরে নিজের গ্রামের দিকে পা বাড়িয়েছিল। একবারও ঘুরে তাকায় নি। চন্দ্রভূষণও আর কোন দিন দিনের আলোতে কাঁদে নি। কাঁদত রাত্রে।

গোপাল ঘোষ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। জোতজমা পুকুর বাগানের মালিক—গোয়ালে গাই, পুকুরে মাছ, গোলায় ধান, সিন্দুকে বন্ধকী গয়না ছাড়াও সামান্য দু'শো আড়াই শো টাকা আয়ের পত্তনী মহলের অংশও ছিল তাঁর। কায়স্থের ছেলে, জমিদারী সেরেস্তার কলমে দক্ষতাও ছিল অসামান্য। বসেও খেতেন না, বড় জমিদারের মহলে গোমস্তাগিরি করতেন। ঘরে ছিলেন মিতব্যয়ীর চেয়েও একটু বেশী। বাড়ীতে চাকর-বাকর ছিল না। গরুবাছুরের রাখাল মাহিন্দার দিয়েই সব কাজ চলত। বাড়ীতে অন্য লোক ছিল না। বাইরের ঘরটা ছিল বাড়ী থেকে প্রায় পৃথক। সম্পত্তির মধ্যে থাকত একখানা তক্তপোষ, কয়েকটা মোড়া, খান-দুই চেয়ার। আর তাকের উপর থাকত দোয়াত-কলম এবং হালসালের পঞ্জিকা ও একখানা চৈতন্যচরিতামৃত। এই ঘরেই স্থান হয়েছিল এগার বছরের চন্দ্রভূষণের। ডাকাতির ভয়ে সন্ধ্যার ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই গোপাল ঘোষ ইষ্টস্মরণ, হরিনাম-সংকীর্ত্তন ইত্যাদি সেরে খেয়ে-দেয়ে টিনে-ছাওয়া কোঠাবাড়ীর উপর-তলায় উঠে সিঁড়ির মুখে চাপা দরজা ফেলে দিতেন। চাপা-দরজা এক বিচিত্র ব্যবস্থা। পাশাপাশি দু'প্রস্থ ঘরের মাঝখানে সোজা সিঁড়ির মাথায় একখানা ভারী তক্তা সিঁড়ির মাথায় পড়ে যেত পাটাতনের মত। খোলা ফেলার ব্যবস্থা উপর থেকে। ঢেঁকী শাবল গাঁইতি কুড়ুল কোন কিছুই চালানো যায় না—মাথার উপর ঘা পড়ে থাকে সিন্দুকের ডালার মত। ঘোষ উপরে বসে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জেগে থাকতেন। জানালার ধারে বসে মধ্যে মধ্যে হাঁকতেন—কে যায়?

চন্দ্রভূষণ থাকত বাইরের ঘরে। দিনে যে কান্না কাঁদতে ভরসা পেত না, সেই কান্না কাঁদত রাত্রে। দুরন্ত আতঙ্কে অধীর হয়ে কাঁদত। এ কোন্ পৃথিবী? কেউ কোথাও আপনার জন নাই, কোথাও একবিন্দু আনন্দ নাই—হাসি নাই—সুখ নাই—এ কোন্ পৃথিবী? সঙ্গে সঙ্গে চোখের জলে মাথার বালিশ ভিজত। বাল্যকালে পাঁচ বছর বয়সেই মা মারা গিয়েছিলেন—বাবা আর বিবাহ করেন নি—একটি বৈষ্ণবদের মেয়ে বাড়ীতে থাকত কাজকর্ম্ম করত। তার আকর্ষণ খুব ছিল না। এ কালে তার কথা মনে হলে চন্দ্রভূষণ বাবুর ভুরু দুটি কুঞ্চিত হয়ে ওঠে; সে কথায় আজ-কাল মনে মনে পিতৃনিন্দা অস্ফুট ভাবে সাড়া দিয়ে ওঠে, একটু লজ্জা অনুভব করেন। কিন্তু সেকালে কিছু মনে হ'ত না। সেকালে এটা যেন একটা অত্যন্ত সাধারণ দোষের কথা ছিল। বাড়ীর কোন বিশেষ মানুষের জন্য কাঁদত না, কাঁদত সবার জন্য সকল কিছুর জন্য—পরিচিত ঘরবাড়ী মাঠঘাট গাছপালা জীবজন্তু, পরিচিত সকল মানুষ সবার জন্যই কাঁদত। অপরিচয়ের পীড়ায় পরিচিত সকল-কিছুর জন্য বিচিত্র মমতা।

হঠাৎ কান্না থেমে যেত। কোন শব্দ উঠত। গাছে ডালপালায় ঝটপট করে উঠত কিছু, নয় ত সশব্দে কিছু পড়ত কোথাও, নয় ত দ্রুত পদক্ষেপের শব্দ উঠে চলে যেত দূরে। হয়ত-বা কোন স্বর শোনা যেত। এ্যাঁ—ও!

চন্দ্রভূষণ আঁতকে উঠত। কি? কিসের শব্দ? ভূত? প্রেত? পিশাচ? ডাকাত? ওঃ, সে-কি মর্ম্ম-যন্ত্রণাকর আতঙ্ক। বিস্ফারিত চোখে অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে বসে থাকত চন্দ্রভূষণ। তখন ভূত-প্রেত-পিশাচ-ডাইন-ডাকিনী চারিদিকে স্বচ্ছন্দ-বিচরণে ঘুরত। কত গাছে কত ভূতই না ছিল! এই যেখানে চৈতন্য ইনষ্টিটুশন হয়েছে এইখানেই ছিল দুটো প্রকাণ্ড প্রাচীন বট। কৃষ্ণপুর থেকে বিল্বগ্রাম মাইনর স্কুলে যেতে হলে এই বটগাছের তলা দিয়ে যেতে হ'ত। এই পথে সেকালে শব নিয়ে যেত উদ্ধারণপুর, বিল্বগ্রাম ঢুকবার মুখে, এই গাছে মড়া ঝুলিয়ে রেখে শববাহকেরা গাছতলায় রান্নাবান্না করে খেত। গাছ দুটোয় পিশাচ থাকার প্রবাদ ছিল। কত শব নাকি হারিয়েছে এখানে। দক্ষিণ দিকে—প্রশস্ত মাঠটায় সেকালে আলেয়া জ্বলে জ্বলে বেড়াত!

ভোর হ'ত। সূর্য্য উঠত। চন্দ্র বেরিয়ে আসত ঘর

থেকে। আলোর মধ্যে বাঁচত। হতাশা কাটত। অন্ধকার রাত্রি আর একাকিত্ব এর চেয়ে ভয়াল নিষ্ঠুর আর কিছু হয় না। রাত্রে সে সঙ্কল্প করত—ভোর হলেই উঠে সে পালাবে। দু'চার দিন মাঠের পথ ধরে খানিকটা চলেও যেত, কিন্তু খানিকটা গিয়েই থমকে দাঁড়াত, তার পর আবার ফিরত। পড়া করতে হবে—অঙ্ক কষতে হবে। ফেরার পথে মাঠের এখানে-ওখানে বৈঁচি ফুলের গাছ থেকে বৈঁচি সংগ্রহ করে নিত। ক্লাসে শরৎ বলে একটি ছেলে আছে—ভারি মিষ্টি চেহারা—তাকে দেবে।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি, History repeats itself—বিখ্যাত ইংরেজী প্রবচনটি আশ্চর্য্য ভাবে সত্য। পৃথিবীতে সেই আদিকাল থেকে মানুষের জীবনে একই খেলার পুনরাবৃত্তি হয়ে আসছে। সেই একই খেলা—শুধু রং বদলায়, ঢঙ পালটায়, পুরনো পোশাকের বদলে নতুন পোশাক পরে। এই ত মাসখানেক আগে কেষ্টচন্দ্র দুটি যুধ্যমান ছেলেকে ধরে এনেছিল তাঁর কাছে। ক্লাস ফোর আর ফাইভের ছেলে দু'জনেরই বাড়ী বিল্বগ্রাম। চাটুজ্জেদের রবি আর মুখুজ্জেদের দুলু। রবি দুলুর নাকে খামচে দিয়েছে, তার জামার পকেটটা ছিঁড়ে দিয়েছে, দুলু রবির হাতে কামড়ে ধরেছিল জন্তুর আক্রোশে। আক্রমণ করেছে আগে রবি।

—কি হয়েছে? কিসের জন্য এ মারামারি? একটু কঠোর স্বরেই বলতে হয়। ধমক দিতে হয়—এও—বলো বলো।

ছেলে দুটি কাঁদে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের জল মোছে আর ফোঁপায়। রবির ফোঁপানি—কান্না চোখ মোছা—একেবারে মেকি; ছেলেটা দুষ্টু। সত্য সত্য কাঁদছে দুলু। ওর ভয় দুঃখ অভিমান অকৃত্রিম। হাসি আসে কিন্তু সে হাসি সম্বরণ করতে হয়। বলতে হয়—Don't cry, you, don't cry—বল—কথা বল।

বলে কেষ্ট দুলুর কাকা কাল কলকাতা থেকে এসেছে, 'লেবেনচুষ' এনেছে। সেই লেবেনচুষ দুলু পকেটে পুরে এনেছে ওর কেলাসের বন্ধু অমরের জন্যে।

—অমর?

—ওই যে বনগাঁয়ের সুন্দর মতন ছেলেটা এবার এসে ভর্ত্তি হয়েছে। থাড় কেলাসের সমরের ভাই!

—আচ্ছা। তার পর?

তার পর বলে প্রশ্ন করলেও বাকিটা বুঝতে বাকি থাকে না। রবি ওর কাছে লেবেনচুষ চেয়েছিল। দুলু দেয় নি। কেন দেবে? কেমন করে দেবে? নিজের ভাগ থেকে দুটি নিয়ে এসেছে অমরের জন্যে, সে কি অন্য কাউকে দেওয়া যায়? রবির দাবি—সে তার পাড়ার ছেলে—আপনার লোক; তার চেয়ে ওই কোন্ দেশের কে—'অমরা না ফমরা' সে বড় হ'ল? তাই বা কেন হবে? এবং সে যখন বয়সে বড়—অধিকতর শক্তিশালী তখন দুলুর অমতে অনিচ্ছায় কি আসে যায়! মাৎস্যন্যায় ত এমনি ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অন্ততঃ মানুষের ক্ষেত্রে। বড় মাছ ছোট মাছকে খায় দেখতে পেলেই, মানুষ মানুষের কাছ থেকে শক্তিপ্রয়োগে কেড়ে নেবার আগে একবার বলবে না? সে যে কথা কইতে শিখেছে! দুলুর পিঠে হাত বুলিয়ে শান্ত করে রবির কানটা আলগা করে ধরে বেশ কয়েকটা ধমক দিয়ে বিদেয় করেছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেদিন তাঁর ছেলেবেলার এই কথাটি মনে পড়েছিল। শরতের জন্য বৈঁচি আনার কথা:

কয়েক দিনেই শরতের সঙ্গে ভাব হয়ে গিয়েছিল।

বিল্বগ্রামের পশ্চিমে কৃষ্ণপুর, পূর্ব্বে গোবিন্দপুর। গোবিন্দপুরের ব্রাহ্মণদের ছেলে শরৎ। ভারি ভাল গান গাইত। ওর বাবা যাত্রার দলে সেকালে জুড়ির গান করত।

ভোলা মহেশ্বর—বোম্!
লটপট জটাজুট গলে ফোঁসে অজগর—বোম্।

ওই শরতের সঙ্গে ভালবাসাই চন্দ্রভূষণের সেদিনের অপরিচয়ের শ্বাসরোধী যন্ত্রণার লাঘব করেছিল। প্রথম বছরেই আর একজনকে ভাল লেগেছিল; মাইনর ক্লাসের দেবরাজ মুখুজ্জেকে; বিল্বগ্রামেরই কুলীনপাড়ার গৃহস্থ-বাড়ীর ছেলে; ক্লাসের ফার্স্ট বয়; টকটকে রঙ, নীলচে চোখ, ধারালো চেহারা, কিন্তু কথা ছিল ভারি মিষ্ট। আর ছিল দেবরাজের খুড়তুতো ভাই ঋষিরাজ—দেবরাজের সঙ্গেই পড়ত, মোটা-সোটা গোলগাল—কথাবার্তা বিস্বাদ ছিল না, কিন্তু কেমন যেন ভাল লাগত না। দেবরাজের মত বুদ্ধি ছিল না তবে কখনও পিছনে পড়ে থাকে নি। বরাবর পাস করে গিয়েছে। হেড মাষ্টার বিশ্বেশ্বর চাটুজ্জে বলতেন—দেবরাজ the intelligent and ঋষিরাজ the diligent। দেবরাজের সঙ্গে ভাব হয়েছিল বিচিত্র ভাবে। দেবরাজের স্বভাব ছিল নীচের ক্লাসের ছেলেদের পড়া ধরা। অঙ্কে দেবরাজ ছিল অদ্ভুত তীক্ষ্ণধী। ইংরেজীতেও ভাল ছিল দেবরাজ। কিসেই বা ভাল না ছিল। দেবরাজ চন্দ্রকে দেখেই প্রশ্ন করেছিল—Hallo boy—where do you come from?

চন্দ্র উত্তর দিতে পারে নি। কি করে দেবে? ইংরেজী

A.B.C.D.ও তখন শেখেনি। সে বলেছিল—ইংরিজী আমি জানি না।

—হে বালক, কোথা হইতে আসিয়াছ? কোথায় ঘর?

চন্দ্র উত্তর দিয়ে প্রশ্ন করেছিল—আপনি কোথায় ঘর কেন বললেন?

—কি বলব তবে? গৃহ?

—না। কোথায় নিবাস!

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত্ত চন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হেসে তার পিঠ চাপড়ে বলেছিল—Very good, very good ; very, very, very good.

দেবরাজ সেই বৎসর বিল্বগ্রাম জি.সি.এম-ই স্কুল থেকে চার টাকা বৃত্তি নিয়ে মাইনর পাস করেছিল। ঋষিরাজ সাধারণ ভাবে পাস করেছিল। চন্দ্রভূষণও নিজের ক্লাসে সেবার ফার্স্ট হয়ে উপরের ক্লাসে উঠেছিল। বিশ্বেশ্বরবাবু হেডমাষ্টার বলেছিলেন—ভাল করে পড়বে তুমি। দেবরাজের মত স্কলারশিপ নিতে হবে তোমাকে!

দেবরাজ বি-এল পাস করে উকীল হয়েছেন। মস্ত বড় উকীল। বিল্বগ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। ঋষিরাজও উকীল। তিনিও গ্রামে আসেন না। অথচ দেবরাজ বলতেন—আমি হব একজন ম্যাথামেটিসিয়ান। ঋষিরাজের ওসব বালাই ছিল না। তিনি বলতেন—আমি ভাই চাকরি করব। এই পোষ্টমাষ্টার-টাষ্টার গোছের।

চন্দ্রভূষণের মোক্তার হবার কথা। সেও মাইনরে বৃত্তি পেয়েছিল। যেদিন বৃত্তি পাওয়ার খবর এসেছিল, সেদিন বাপ ভুজঙ্গ দত্ত সমাদর করে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে বলেছিল—মোক্তার নয়, উকীল হতে হবে। মনে থাকে যেন। তুই যেদিন উকীল হয়ে সদরে শামলা মাথায় দিয়ে জজকোর্টে ঢুকবি, সেই দিন আমি গাঁয়ের ভিটেতে নতুন বাড়ীর ভিৎ পত্তন করব। বড় দুঃখে গাঁ ছেড়ে এসেছি, কুঠিয়াল সায়েবদের এলাকায় সেরা জমি ছিল পাঁচ বিঘে তা জলের দামে বেচে দিয়েছি। কিন্তু ভিটেটা বেচি নি—তোর আশায়। বুঝলি!

তবু চন্দ্রভূষণের উকীল হওয়া হয় নি।

রামজয় বলে—'ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন চ বিদ্যা ন চ পৌরুষম্।' ভাগ্য? না। ভাগ্য নয়। উকীল হতে চান নি তিনি।

৩

রামজয় তার শাস্ত্রবাক্যের অভ্রান্ত সত্যতা প্রমাণ করবার জন্যে বলে- ভাগ্যের চক্রান্ত, নইলে পণ্ডিতমশায় এমন ধড়াস করে মরে যাবেন কেন? সামনে বি-এ পরীক্ষা, ক্ষৌরির দিনে পরীক্ষা আরম্ভ!

তর্ক চন্দ্রভূষণ করেন না। মনে মনে ভেবে দেখেন; অতীত ঘটনাগুলিকে বিচার করেন। কি থেকে কি হ'ল, কেন হ'ল বিশ্লেষণ করে বুঝতে চেষ্টা করেন। সব মনে পড়ে না। কত বিচিত্র সংঘটনের স্মৃতি মন থেকে মুছে যায়। নিজের ত্রুটি ও অপরাধের স্মৃতিজড়িত ঘটনা সেগুলি; এগুলি মন ভুলে যায়; এ তার স্বভাব। অপকর্ম্ম বা কুকর্ম্মের ছোঁয়াচলাগা জিনিসপত্র যেমন জলে ফেলে দিয়ে বা পুড়িয়ে ফেলে মানুষ—ঠিক তেমনি ভাবে মনও স্মৃতিকে বিস্মৃতির অতলে ডুবিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায়। কিন্তু বিচিত্র স্মৃতির খেলা, ডুবে গিয়েও সে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত নষ্ট হয় না, ধ্বংস হয় না। সুযোগ পেলেই বিস্মৃতির অতল থেকে উপরে ভেসে ওঠে। গল্পের সেই সাত ভাই চম্পা ও বোন পারুলের মত। বড় রাণী ছোট সতীনের সাত ছেলে ও এক মেয়েকে আঁতুড়ে মেরে ছাইগাদায় পুঁতে দিয়েছিল—তাই থেকে হয়েছিল সাতটি চাঁপার গাছ আর একটি পারুলের গাছ। গোপন কথা প্রকাশ করে দিয়েছিল। সুখস্মৃতি, প্রশংসার কাজ, গৌরবের ঘটনা মানুষ অহরহ মনে করে রাখে—ভেসে যাবে জলের উপরে পদ্মফুলের মত।

মাইনরে বৃত্তি পেয়ে জেলা ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়েছিল চন্দ্রভূষণ। শিবচন্দ্র সোম; হেডমাষ্টার। বাংলা দেশের হাই ইংলিশ স্কুলের ইতিহাসে ভীষ্ম-দ্রোণের মত মহারথী; দেখলে অভিভূত হয়ে যেত চন্দ্রভূষণ। কি তেজস্বিতা! কত জ্ঞান! কি চরিত্র!

কত বড় বড় মানুষ তিনি তৈরি করেছেন। এই ত রায়পুরের ব্যারিষ্টার সিংহ তাঁর ছাত্র। এই বারই সিংহ সর্ হয়েছেন। তাঁর ভাই সিবিল সার্জ্জন হয়েছেন। তিনিও শিববাবুর ছাত্র। বড় বড় ব্যারিষ্টার উকীল, বড় বড় ডাক্তার, প্রফেসর, হেডমাষ্টার, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, মুনসেফ কত যে তাঁর ছাত্র সে হিসেব কেউ করে নি। তাঁর জীবনী লেখা হয় নি। হবেও না। শোনা যায় একজন বিদ্বান ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর সঙ্গে আলাপ করে পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—ওয়েল মিঃ সোম, একটা প্রশ্ন করব কিছু মনে করো না। তোমার মত পণ্ডিত এবং যোগ্যতাসম্পন্ন লোক হেড মাষ্টার হয়েছ কেন? কেন তুমি শাসনবিভাগে চাকরি নাও নি? চেষ্টা করো নি? না—চেষ্টা করে পাও নি?

হেসে তিনি বলেছিলেন—আমি চেষ্টা করি নি।

—শুনে আমি সুখী হলাম। কারণ এদেশে অনেক বড়

ইংরেজ কর্ম্মচারীর তোষামোদপ্রিয়তার কথা জানি। তারা আমাদের খাতিরে যোগ্য প্রার্থীকে ফেলে অনেক ক্ষেত্রে অযোগ্য স্তাবকদের ছেলেপুলেদের চাকরি দেয়। যোগ্য প্রার্থীর নির্ভীকতা বা আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান দেখলে তারা রুষ্ট হয়। আমি ভেবেছিলাম এইরকম কিছু শুনব।

—না। আমার ক্ষেত্রে সে রকম কিছু ঘটে নি।

—কিন্তু তুমি শাসন-বিভাগে চাকরির চেষ্টা করো নি কেন?

—শিক্ষাবিভাগের চাকরি আমি পছন্দ করেছিলাম, আজও করি। তুমি জান কিনা জানি না—আমাদের দেশে গুরুর স্থান সর্ব্বোচ্চে।

—সে সব দেশে মিঃ সোম। আমাদের দেশেও।

—তা ছাড়াও—। শিবচন্দ্র বলেছিলেন—সায়েব, কথা বলতে গিয়ে আধখানা বলে আধখানা না বলা সেও এক ধরণের মিথ্যাচরণ। সেই হিসেবেই তোমাকে বলি—প্রথম জীবনে একটা সঙ্কল্প নিয়েছিলাম। এ ডিভাইন ভাউ। এন্ ওথ। টু ডেডিকেট মাই লাইফ টু বিল্ড এ নিউ বেঙ্গল। নতুন বাংলা তৈরির হিরো তৈরি করছি আমি।

সায়েব বলেছিল—বিরাট আদর্শ তোমার মিঃ সোম। দেশে ফিরে গিয়ে এ দেশ নিয়ে আমার বই লিখবার ইচ্ছা আছে। যদি কাজে পরিণত করতে পারি সে ইচ্ছেকে, তা হলে তার মধ্যে একটা চ্যাপ্টার রাখব—যে সব বিচিত্র মানুষ আমি দেখেছি। তার মধ্যে তোমার কথা আমি লিখব মিঃ সোম।

শিবচন্দ্র জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন—যেন আকাশের গায়ে তাঁর কল্পনার ছবি ভেসে উঠেছিল; বলেছিলেন—'আমার কল্পনা কি জানো সায়েব, আমার কল্পনা—ইউরোপে যেমন ইংলণ্ড গড়ে উঠেছে, তোমরা গড়ে তুলেছ, ভারতবর্ষে তেমনি করে বাংলা দেশ গড়ে তুলব। ভারতবর্ষের ইংলণ্ড!' তার পর হেসে বলেছিলেন—'কিন্তু আমার নামের জন্য আমি আদৌ ব্যগ্র নই। নট এট্ অল্।' বলেই তিনি কবি টমাস গ্রের এলিজি থেকে আবৃত্তি করেছিলেন:

"Full many a gem of purest ray serene
 The dark unfathomed caves of ocean bear:
Full many a flower is born to blush unseen
 And waste its sweetness on the desert air."

আমি বাংলা দেশের গৌরবের সমুদ্রের তলায় অনাবিষ্কৃতই থাকব।

শিবচন্দ্র সোমের এলিজি পড়ানো এখনও কানের কাছে গানের মত বাজে। খানিকটা দূরে গম্ভীর এবং গভীরকণ্ঠ গায়কের গাওয়া ধ্রুপদ গানের মত। তানপুরার তারের ধ্বনির প্রতিধ্বনি যেমন ঘরের জানালার গরাদে এবং অন্য ধাতুপাত্রে স্পর্শ করলে বুঝা যায়, ধাতুর সর্ব্বাঙ্গে নীরব কম্পনে একটি ঝঙ্কার ওঠে, তেমনি ঝঙ্কার উঠত বুকের ভিতর।

"The boast of heraldry, the pomp of power.
 And all that beauty, all that wealth e'er gave,
Awaits alike th' inevitable hour:
 The paths of glory lead but to the grave."

ফার্স্ট ক্লাসে এলিজি তিনি পড়াতেনই। সে পাঠ্য থাক বা না থাক। সেই ফার্স্ট ক্লাসেই মুখস্থ হয়ে গেছে। আর পড়াতেন 'ডেজার্টেড ভিলেজ'। বাংলা দেশের গ্রামের সঙ্গে তুলনা করতেন। বিচিত্র মানুষ—গ্রামের এম-ই স্কুলে স্কুলে খোঁজ করে ভাল ছেলেদের আনাতেন। পড়বার ব্যবস্থা করে দিতেন। বৃত্তি পাওয়া ছেলেদের নামে পত্র যেত। চন্দ্রভূষণ পত্র পেয়েছিলেন। বড় দুঃখ সে পত্র নাই, হারিয়ে গেছে। ভর্ত্তির সময় ছেলেদের জিজ্ঞাসা করতেন—Well—what's your name? ইংরেজীতে প্রশ্ন করতেন,ইংরেজীতে উত্তর দিতে হ'ত। সবশেষে জিজ্ঞাসা করতেন—One more question. Well—বড় হয়ে কি হবে তুমি? ম্যাজিস্ট্রেট? এ জাজ? প্রফেসর? টিচার? ডক্টর? এ বার-এ্যাট-ল? এ ভকীল? হোয়াট? কি হবে তুমি? ইউ। বল। স্পীক আউট।—এ ভকীল! গুড। বক্তৃতা করতে পার? ওয়েল—বল, মনে কর আমি জাজ, তুমি এসেছ ভর্ত্তি হতে। বল—তোমার কেস বল। তোমার নাম বল, বাবার নাম বল, গ্রামের নাম বল। জাষ্ট লাইক দিস—সর্ মাই নেম ইজ—হোয়াট'স ইওর নেম?—রাখালচণ্ডর ঘোষাল সন অব ঘোষাল; আই এম এন ইনহ্যাবিট্যাণ্ট অব বিল্বগ্রাম ইন দি ডিষ্ট্রিক্ট অব—; গো অন। গো অন।

ছেলে বলে যেত। সোম কখনও বলতেন—গুড, ভেরি গুড, কখনও বলতেন—নো নো নো মিষ্টেক। ভুল সংশোধন করে দিতেন।

চন্দ্রভূষণের বুকের ভিতরটা ভয়ে গুর্ গুর্ করে উঠেছিল। উকীল হব বললেই বক্তৃতা করতে বলবেন—এই বিরাট পুরুষ! গলা শুকিয়ে গিয়েছিল।

তখন একজন ডাক্তার হতে ইচ্ছুক ছেলেকে শিবচন্দ্র সোম প্রশ্ন করছিলেন—ওয়েল মিঃ উডবি ডক্টর ক্যান ইউ টেল মি—হোয়ট ইজ দি ইংলিশ ওয়ার্ড ফর দি ডিজিজ ওলাউঠা? বসন্ত? পানবসন্ত? ক্যান ইউ স্পেল টাইফয়েড? ওয়েল টেল মি। ধর একজন রোগী, তার পেট কেটে অপারেশন করতে হবে, না করলে সে মরে যাবে আর

করলেও সে মরে যাবে, তবে একশ'র মধ্যে এক ভাগ আশা বাঁচলেও বাঁচতে পারে, সেখানে তুমি কি করবে ?

ছেলেটি অকপটে বলেছিল—সে আমি জানি না সর্। That I don't know sir.

হো হো করে হেসে উঠেছিলেন শিবচন্দ্র সোম। তার পর বলেছিলেন—একজন ইংরেজ ডাক্তার কি করবে জান ? সে কাটবে। ওই এক পারসেণ্ট চান্স, হি উইল নট মিস। গুড। দেন—ইউ—হোয়টস ইউর নেম—

—মাই নেম ইজ চন্দ্রভূষণ দত্ত।

—সে—শ্রীচণ্ড্রভূষণ ডাটা। কি হবে তুমি ?

—এ টিচার সর্।

উকীল ডাক্তারদের অবস্থা দেখে নিতান্ত নিরীহ মাষ্টার হবারই বাসনা করেছিল সে। জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের ধার দিয়েই যায় নি—কে জানে কোন ফ্যাসাদ বাধবে।

—এ টিচার ? দ্যাটস গুড, বাট হোয়াট টিচার—এ হেডমাষ্টার লাইক মি ?

ওরই মধ্যেই যে ভবিষ্যতের সঙ্কল্পের বীজ পরিবর্ত্তন হয়েছিল তা সেদিন অনুমান করতে পারেন নি চন্দ্রভূষণ।

ক্রমশঃ

আগ্রা-দুর্গে

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

রে পাষাণ, খোল দ্বার, তোল যবনিকা।
তব মর্ম মণিপদ্মে কি-বা আছে লিখা
পড়ে যাই প্রাণভরে নবারুণ রাগে।
ওই তো উদিল সূর্য পূর্ব দিকভাগে।
প্রতিধ্বনি নাহি পশে এ পাষাণ ভেদি'।
মোগল-হারেম এ যে, দুর্গ অভ্রভেদী।
হেথা শুনি আজো বাজে মৃদু গুঞ্জরণ,
বাতাসে মিলায়ে যায় স্বপ্নের মতন।
হংসপাদিকার দল আজো মাথা কুটে।
কামনার রক্তজবা ঝরে যায় ফুটে।
কুসুম-পেলব কত নবনীত দেহ
কোথায় মিলালো জানে পরিচয় কেহ ?
চলিয়াছি অগ্রসরি' সিংহদ্বার দিয়া
পুঞ্জীভূত দীর্ঘশ্বাস দু'হাতে ঠেলিয়া।
কানে থেকে থেকে পশে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ।
পাশে অট্টহাসি হাসে নির্মম জল্লাদ।
মহল, মহল চারিধারে।
আশাহীন, ভাষাহীন, রাজভিক্ষু কালের দুয়ারে।
স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন
পাষাণের মর্মে লেখা অমরতা-আকাঙ্ক্ষা স্বপন।
ইন্দোপারসিক শিল্প হোথা উচ্চশির।
হেথা যোধাবাঈ-স্মৃতি দৃঢ় করে হিন্দুর মন্দির।
আকবর সাম্রাজ্য-স্বপ্ন রূপ নিল পুষ্পিত পাষাণে।
জাহাঙ্গীর তারে নৃত্য-গানে
ছন্দায়িত করে দিল শুভ্র হর্ম্য পরে।
সুন্দর উঠিল জাগি রূপদর্শী খুররম অন্তরে।
ভ্রাতৃহন্তা সাজাহান হ'ল স্রষ্টা কবি।
প্রাণের প্রাচুর্যে রচে শুচিস্মিত মর্মরের ছবি।
আজো আছে রঙমহল, ফুরায়েছে রঙের ফোয়ারা।
তবু হেরি হই আত্মহারা।
আপন আপন ছবি বিলম্বিত হয় চারিধারে।
তৃতীয় নয়ন ভরে অতীতের সৌন্দর্য-সম্ভারে।
দেওয়ানী আমের বক্ষ নিপীড়িত করে আগন্তুক।
দেওয়ানী খাসেতে ফেরে রাত্রে বায়ুভুক।
ভারতের মাটি ছাড়ি' চলে গেছে ময়ুর আসন।
সে অপূর্ব সিংহাসন,
হীরামণি-মাণিক্যের পূর্ণ সমন্বয়।
কোথা কোন রাজকোষে ছিন্নভিন্ন খিন্ন পড়ে রয়।
চলিলাম অগ্রসরি' সর্ব পূর্ব ধারে।
স্রোতবহা যমুনার স্রোতের কিনারে।
দেখিলাম হাওয়াই মহল।
হর্ম্যে যার মিশে আছে সাজাহান তপ্ত অশ্রুজল।
বরষে বরষে যেথা সপ্ত বর্ষ ধরি
বন্দী সাজাহান নিজ প্রেয়সীরে স্মরি',
তাকায়েছে অপলকে প্রেমের সমাধি-তীরপানে।
ঝরেছে অঝোরে অশ্রু করুণ নয়ানে।
ক্ষীণ কণ্ঠে বলিয়াছে, কতদিন আর জাহানারা
কবে প্রাণবায়ু উড়ে তাজের মাঝারে হবে হারা ?
আগ্রা-দুর্গ বেদনার গুপ্ত ইতিহাস।
পাষাণের মর্ম ভেদি' বাহিরায় তপ্ত দীর্ঘশ্বাস।
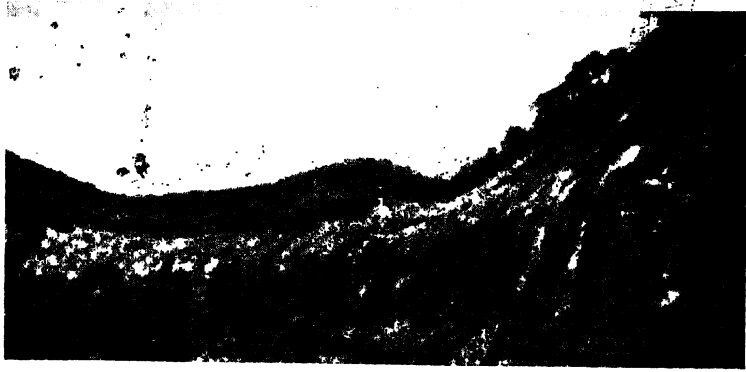
অজন্তা গুহানিচয়ের সাধারণ দৃশ্য

ইলোরা ও অজন্তার পথে

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

...ধু গঠন-কৌশলে নয়, আয়তনের বিরাটত্বেও কৈলাস মন্দির হৃদয়কে বিস্ময়ে অভিভূত করে। এর দৈর্ঘ্য একশ' চৌষট্টি ফুট, প্রস্থ একশ' নয় ফুট, আর উচ্চতা ছিয়ানব্বই ফুট। একটিমাত্র বিপুলায়তন শিলা কেটে এই অভ্রভেদী মন্দির তৈরি হয়েছে, চোখে দেখেও এ কথা যেন বিশ্বাস করা যায় না। বিরাট পরিকল্পনার সঙ্গে শিল্প-সুষমার এমন অপূর্ব্ব সমন্বয় কেমন করে সাধিত হ'ল অবাকবিস্ময়ে তাই শুধু ভাবতে হয়। এর সর্ব্বাঙ্গে ভাস্কর্য্য এবং অলঙ্করণ-শিল্পের বিচিত্র সব নিদর্শন, জীবন্ত হস্তীর সমান আয়তনবিশিষ্ট হাতীর মূর্ত্তি-গুলি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন্দিরের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তম্ভসমূহ আগাগোড়া বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত। দুটি প্রাচীরে কৃষ্ণের জন্মলীলা এবং রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীকে রূপায়িত করা হয়েছে ভাস্কর্য্য-শিল্পের মাধ্যমে—নীরস পাষাণে মহাকাব্যদ্বয়ের রসমাধুর্য্য যেন রূপোজ্জ্বল মহিমায় সহস্রদল পদ্মের মত বিকশিত হয়ে উঠেছে। কৈলাস মন্দিরে উৎকীর্ণ, রাবণের কৈলাস উৎপাটনের দৃশ্যটি অপূর্ব্ব। দশানন রাবণ কৈলাস পর্ব্বতকে উন্মূলিত করে দশটি মাথার উপরে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, এই আকস্মিক বিপর্য্যয়ে ভীতা ত্রস্তা পার্ব্বতী শিবের গাত্রসংলগ্ন হয়ে তাঁকে আঁকড়ে ধরেছেন—মহাযোগী মহাদেব কিন্তু নির্ব্বিকার, আননে তাঁর গভীর প্রশান্তি, দক্ষিণ বাহুটি অভয়দানের ভঙ্গীতে ঈষৎ উচ্ছ্রিত। সোপান-পথ বেয়ে দোতলায় উঠবার সময় দেখি, এক শিল্পী পেন্সিলে শিব-পার্ব্বতীর মূর্ত্তি স্কেচ করছেন, দৃষ্টিতে তাঁর গভীর তন্ময়তা, যেন দিব্য আনন্দানুভূতির কোন অতলে ডুবে গেছেন।

দোতলায় উঠে, পশ্চিম দিকে মন্দিরের একেবারে প্রান্তদেশে এসে বসি। এখানে জনপ্রাণী নেই। মন্দিরাভ্যন্তরে যুগযুগ-সঞ্চিত রহস্যের ঘন গন্ধ। সামনে চক্রবাল-প্রসারিত সমতলভূমির বুকে মাঝে মাঝে মনোরম বনঝোপ। উত্তরে নীল আকাশের গা ছুঁয়ে ঢেউখেলানো পাহাড়ের সুনীল রেখাটি যেন কোন নিরুদ্দেশের পানে উধাও হয়ে চলে গেছে—বাঁ দিকে গড়ানে গিরিগাত্র ক্রমশঃ

অজন্তার পথে জলগাঁওয়ে সুভাষ জয়ন্তী উপলক্ষে নির্ম্মিত তোরণ
[ফোটো : ড, এন, ধবলীকার

শূন্য হয়ে নেমে এসেছে প্রান্তরের বুকে। মুক্তির আনন্দে গোটা-কয়েক চিল উড়ে বেড়াচ্ছে অসীম আকাশে। স্থান-মাহাত্ম্যে অন্তরের অন্তরতম স্থলে অনুভব করি আত্মার বন্ধনমুক্তির জন্যে আকুল আকুতি। 'বিপুল সুদূরে'র বাঁশীর সুর শুনে চিত্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে, কিন্তু হায়,

> "মোর ডানা নাই আছি এক ঠাঁই
> সে কথা যে যাই পাসরি।"

এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নীচে নেমে এলাম। দর্শনার্থীরা সবাই অন্যান্য গুহা দেখতে চলে গেছে, কিন্তু আমার কৈলাস দর্শনের আশ মেটে নি। মন্দির প্রদক্ষিণ করে দেব-দেবীর মূর্ত্তি দেখতে লাগলাম—কত বিচিত্র সব মূর্ত্তি—কালীয় নাগের উপর দাঁড়িয়ে আছেন কৃষ্ণ, বিষ্ণু বরাহরূপে ধারণ করে রেখেছেন পৃথিবীকে, নরসিংহ রূপে হিরণ্যকশিপুর উদর করছেন বিদীর্ণ। পদ্ম থেকে উদ্ভূত হয়েছেন ভৈরব; এক হাতে তাঁর ত্রিশূল, ভৈরবরূপী শিব নৃত্য করছেন এক বামনের উপর—তাঁর বাহুযুগল এবং পদদ্বয়ের কি মনোরম ভঙ্গী! এখানে রূপসৃষ্টির অজস্রতা যতই দেখি ততই অতৃপ্তি আরও যেন বেড়ে যায়।

অজন্তা গুহানিচয়ের আর একটি দৃশ্য

কৈলাস মন্দির যেন ইলোরার মধ্যমণি—এর উভয় পার্শ্বে অন্যান্য গুহাগুলি 'সূত্রে মণিগণাঃ ইব' সংস্থিত। বৌদ্ধ গুহানিচয়ে প্রস্তরে গঠিত ভগবান বুদ্ধের বিরাট মূর্ত্তিসমূহ হৃদয়কে নির্ব্বাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দেয়। অপরাহ্ন কালে অস্তসূর্য্যের তির্য্যক রশ্মিমালা যখন সরাসরি গুহাগুলির অভ্যন্তরভাগে এসে প্রবেশ করে, শিলাময় পাহাড় তখন আরক্ত আভা ধারণ করে অপূর্ব্ব শোভায় মণ্ডিত হয়। অনেকগুলি গুহার একেবারে পিছন দিককার কক্ষস্থিত বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তিগুলিতে তখন যেন প্রাণচেতনার সঞ্চার হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। পদ্মাসনে উপবিষ্ট মূর্ত্তিসমূহের মুখমণ্ডল যেন একটা অপার্থিব দ্যুতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

বৌদ্ধ গুহানিচয়ের মধ্যে বিশ্বকর্ম্মার বিরাট চৈত্য' এবং ত্রিতল বিহার বা তিন থাল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তিন থালই হচ্ছে ইলোরার বৃহত্তম বিহার। একটি পাথরকাটা সিঁড়ির সাহায্যে নীচের তলা থেকে উপরে উঠতে হয়। উপরের কক্ষটি দৈর্ঘ্যে ১১৩ ফুট আর প্রস্থে ৭২ ফুট, পাঁচ সারিতে বিভক্ত চল্লিশটি চতুষ্কোণ বিরাটকায় স্তম্ভ উপরের ছাদকে ধারণ করে রেখেছে।

ব্রাহ্মণ্য গুহাগুলিতে শিব ও পার্ব্বতীর বিভিন্ন ভঙ্গীর মূর্ত্তির আর অন্ত নেই। কোথাও দেখি শিব-দুর্গা পাশাপাশি উপবিষ্ট—পিছনে লক্ষ্মী সরস্বতী, কার্ত্তিক গণেশ—শিবের বাহন নন্দী একপাশে সুঠাম ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান। 'শিবের বিবাহ' ভাস্কর্য্যশিল্পের এক অপূর্ব্ব নিদর্শন। শিবের মাথায় সুন্দর মুকুট—পার্ব্বতীর দক্ষিণ পাণি শিবের করধৃত, আর তার সুবলিত বাম পাণি ঈষৎ উত্তোলিত। কোথাও বা পার্ব্বতী বসে আছেন বীণাবাদিনি সহচরীগণ-পরিবৃতা হয়ে। শিবের কতই না বিচিত্র রূপ! কোথাও লিঙ্গোদ্ভব মূর্ত্তি—লিঙ্গ বিদীর্ণ করে আবির্ভূত হয়েছেন মহাদেব, কোথাও-বা পার্ব্বতীকে বাহু-বন্ধনে বন্দিনী করে শিব উপবিষ্ট প্রত্যালীঢ় ভঙ্গীতে।

২১ নং গুহায় নৃত্যপর শিবের মূর্ত্তিটির তুলনা নেই। বাম পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে নৃত্যের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছেন, মুকুটধারী চতুর্ভুজ শিব—ঈষদুত্থিত দক্ষিণপদ পাদপীঠ স্পর্শ করতে উদ্যত—মনে হয় শিবসুন্দরের ছন্দায়িত পদপাতে গুহাকক্ষের পাষাণময় ভিত্তিতল বিদীর্ণ করে রূপের ফোয়ারা উৎসারিত হয়ে উঠবে সহস্র ধারায়। নৃত্যপর শিবের চোখ দুটি নিমীলিত, আনন্দস্মিত হাস্যে উদ্ভাসিত—সমস্ত দেহে যেন জেগে উঠেছে ছন্দের অনুরণন, বিপুল পুলকাবেগ দেহের তটপ্রান্তে সীমায়িত না থেকে যেন উপচে পড়তে চাইছে। নটরাজের তাণ্ডব নৃত্যের ভঙ্গী এ নয়, সুঠাম দেহভঙ্গীতে শিবসুন্দরের এ যেন মঙ্গল-আরতি। নৃত্যপর শিবের বামপার্শ্বে বংশী বাদনরতা একটি নারীমূর্ত্তি, আর ডান পাশে তিনটি নারী তন্ময় হয়ে অবলোকন করছে শিবসুন্দরের নৃত্যলীলা। যে শিল্পীর সাধনায় পাষাণের বুকে এ অপরূপ লীলা-বিভঙ্গ প্রকটিত হয়ে উঠেছে, মনে মনে তাঁর সৃজনী-প্রতিভার উদ্দেশে প্রণতি না জানিয়ে থাকতে পারা যায় না।

জৈন গুহাপুঞ্জের মধ্যে ইন্দ্রসভা আর জগন্নাথসভা এ দুটি প্রাসাদের প্রাচীরে অলঙ্করণ-প্রাচুর্য্য আর স্তম্ভগাত্রের কারুকার্য্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিশেষ ভাবে। দেবমূর্ত্তির সংখ্যাধিক্য জৈন মন্দিরগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য। একত্রিশ থেকে চৌত্রিশ পর্য্যন্ত চারটি গুহা পাশাপাশি একই জায়গায় অবস্থিত। বত্রিশ নম্বর গুহাটি সুদৃশ্য তোরণবিশিষ্ট—ভেতরকার বহুচূড় মন্দিরটি ছোট হলেও দেখতে সুন্দর। মন্দিরের পাশে একটি প্রকাণ্ড হাতীর মূর্ত্তি—দ্বিতলের স্তম্ভগাত্রের কারুকার্য্য দেখলে মুগ্ধ হতে হয়—ব্যালকনিতে কতকগুলি শুণ্ডযুক্ত গজমুণ্ড।

ঘণ্টা পাঁচেক লাগল চৌত্রিশটি গুহা পরিক্রমণ করতে। সব-গুলি গুহাই দেখা হ'ল বটে, কিন্তু ভাল করে কিছুই দেখা হ'ল না —এত অল্প সময়ে তা সম্ভবপরও নয়। কিন্তু আমার পরম লাভ হ'ল এই যে, ইলোরা গুহায় এসে ভারতের ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য-শিল্পের প্রাণসত্তার প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করে আমি ধন্য হলাম।

চৌত্রিশ নং গুহা থেকে বেরিয়ে কাঁচা রাস্তা ধরে পশ্চিম দিকে এগিয়ে একটা ঝুরিনামা বটগাছের পার্শ্বস্থ জনবিরল রাস্তা ধরে চললাম। গাছতলাটা পাথর দিয়ে বাঁধানো।

চলেছি মহাতীর্থ শ্রীঘৃষ্ণেশ্বরের পথে।

চৈত্যের সম্মুখভাগের দৃশ্য (১৯নং গুহা, অজন্তা)

বেজওয়াদাতে ইন্দুবাবুর বাসায় ব্রহ্মচারী জ্যোতির্জীবন বলেছিলেন—"ইলোরা গুহায় গেলে ভেরুল গ্রামে গিয়ে শ্রীঘৃষ্ণেশ্বর দেখে আসতে ভুলবেন না। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ এই শ্রীঘৃষ্ণেশ্বর মন্দির।"

ভেরুল অথবা ইলোরা হচ্ছে হায়দরাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত একটি ছোট গ্রাম—আওরঙ্গাবাদ থেকে বার-চৌদ্দ মাইল দূরে এর অবস্থিতি। এই ইলোরা গ্রাম থেকেই নামকরণ হয়েছে ইলোরা গুহার। হিন্দুর পুণ্যতীর্থ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম শ্রীঘৃষ্ণেশ্বরের মন্দির এই ইলোরা গ্রামেই বিদ্যমান। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের সাতটিই পশ্চিম ভারতে—এর মধ্যে বহুখ্যাত তিনটি হচ্ছে—পশ্চিমে কাথিয়াবাড়ে সোমনাথ, উত্তর-পূর্ব্বে উজ্জয়িনীতে কালিদাসের মেঘদূতে প্রোক্ত মহাকাল আর দক্ষিণ-পূর্ব্বে নাগনাথ।

যাঁরা ইলোরা দেখতে যান তাঁদের মধ্যে অনেকেই জানেন না এই মহাতীর্থের কথা—যদিও মূলতঃ এই জ্যোতির্লিঙ্গের অধিষ্ঠান যে ছিল ইলোরা গুহায়, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আওরঙ্গজেব কর্তৃক

একটি গুহার ভাস্কর্য্যে মণ্ডনশিল্পের নিদর্শন

অপবিত্রীকৃত হবার পর ধীরে ধীরে এর খ্যাতি লোপ পেতে লাগল, অবশেষে এটি স্থানান্তরিত হ'ল ইলোরা গ্রামে। ইন্দোরের পুণ্যবতী রাণী অহল্যাবাঈ সেখানে তৈরি করে দিলেন একটি সুন্দর মন্দির, সেই মন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত জ্যোতির্লিঙ্গ।

এবড়ো-খেবড়ো প্রান্তরের বুকের উপর দিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা চলে গেছে শ্রীঘৃষ্ণেশ্বরের মন্দিরাভিমুখে। দূরে সুক্ষ্মাগ্র চূড়াবিশিষ্ট মন্দিরটির ফিকে লাল রঙের উত্তরার্দ্ধ নজরে পড়ছে। নীচেকার অংশ ঘনসন্নিবিষ্ট তরুশ্রেণীর সবুজ পাতায় ঢাকা। পত্রাবরণ বিদীর্ণ করে একটি স্ফুটনোন্মুখ বিরাট স্থলপদ্ম যেন আকাশের পানে দল মেলে দিয়েছে।

পশ্চিমে দূর বনশ্রেণীর ওপারে সূর্য্য হেলে পড়েছে। ইলোরা-গুহা-রাঙানো পড়ন্ত রোদের আভায় মাঠ-বন-পাহাড় হয়ে উঠেছে মায়াময়।

পায়ে-চলার সুঁড়ি পথের দুই পাশে বনঝোপের ভেতরে লাল সাদা হরেক রঙের নাম-না-জানা ফুল ফুটে রয়েছে। কোথাও জনারের ক্ষেতে বাতাসের সির সির শব্দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একটা অদেখা পাখী অশ্রান্ত ভাবে শিস দিয়ে চলেছে। জনারের শীষগুলো হাওয়ায় দুলছে সাদা চামরের মত। ফুলের শোভা, পাখীর ডাক, মাঠভরা রাঙা আলো জীবনের অপরাহ্নবেলায় আমার চলার পথের

দুই পাশে মায়াজাল বিস্তার করে আমাকে করে ফেলেছে মোহাচ্ছন্ন, পথ চলছি যেন নেশার ঘোরে।

বুদ্ধ যশোধারা ও রাহুল (১৭নং গুহা, অজন্তা)

মাইল দেড়েক রাস্তা অতিক্রম করে অবশেষে জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দিরের প্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করবামাত্র এক পাণ্ডা এসে পাকড়াও করলেন—নাম তাঁর পণ্ডিত দেবীদাস ডুণ্ডুশাস্ত্রী। তাঁর সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করলাম। ঈষৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠিত আছেন স্বয়ম্ভু জ্যোতির্লিঙ্গ। চার পাশে জ্বলছে সারি সারি ঘৃত-প্রদীপ। অন্ধকারের বুকে সেগুলোর স্নিগ্ধোজ্জ্বল শিখা শোভা পাচ্ছে নিকষে স্বর্ণলেখার মত। পশ্চাদ্ভাগে পার্ব্বতীর মূর্ত্তি। গম্ভীর কণ্ঠে পুরোহিত করছেন মন্ত্রপাঠ। উদাত্ত স্বরিত অনুদাত্ত স্বরে উচ্চারিত মন্ত্রধ্বনির সঙ্গে ঘণ্টারবের সংমিশ্রণে মন্দিরাভ্যন্তরে গম্ভীর ভাবোদ্দীপক এক শান্তগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। কেমন যেন অভিভূতের মত মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে বসে অধ্যাত্মসাধনাপূত ভারত-বর্ষের নিত্যকালের মহিমাকে প্রত্যক্ষ করছি। পাণ্ডা নিয়ে এলেন কিছু পূজোর বাসনকোসন আর 'পত্রপুষ্পমতোয়ঞ্চ', যথারীতি মন্ত্রপাঠ এবং আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হ'ল।

পূজো-আর্চ্চা শেষ করে মন্দির-চত্বরের একপ্রান্তে একলা এসে বসি। লোকালয়ের কোলাহল থেকে দূরে ফাঁকা জায়গায় অবস্থিত এই নিভৃত মন্দিরের একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে, স্তরে স্তরে বিন্যস্ত মন্দিরটি ক্রমসূক্ষ্মায়মাণ ভাবে উপরের দিকে উঠে গেছে—গঠন-কৌশল অনিন্দ্য, শিখরদেশে শিব ও পার্ব্বতীর মূর্ত্তি। নিকটেই একটি পাহাড় যেন দেবতার কল্যাণহস্তের মত মন্দিরাভিমুখে প্রসারিত। এক ফালি নরম রোদ এসে পড়েছে মন্দির-প্রাঙ্গণে। রাঙা আলো গায়ে মেখে কাঠবিড়ালীগুলো মনের আনন্দে পাঁচিলের উপর লাফালাফি করছে। প্রাচীর-বেষ্টনীর বাইরে বনের ভেতরে নজরে পড়ে তিন-চারিটি ছোট ছোট পরিত্যক্ত মন্দির—চূড়া গম্বুজের মত আকৃতিবিশিষ্ট।

দক্ষিণ-ভারতের সুদূরতম প্রান্তে অবস্থিত এই জ্যোতির্লিঙ্গের মন্দিরে পুণ্যলোভীর ভিড় নেই বটে, কিন্তু এমন শান্তিপূর্ণ স্নিগ্ধ রমণীয় পরিবেশ খুব কম তীর্থমন্দিরেই বিদ্যমান।

সন্ধ্যার ছায়া যখন মন্দির-প্রাঙ্গণে ঘনিয়ে এল তখন মন্দির পরিত্যাগ করে, আওরঙ্গাবাদগামী বাস ধরবার জন্যে রওনা হলাম। বিদায় নেবার প্রাক্কালে ডুণ্ডুশাস্ত্রী পূজা-অর্চনাদির জন্যে যা দক্ষিণা দাবি করলেন তা শুনে তো মুণ্ডু ঘুরে যাবার উপক্রম। যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত মাঝামাঝি একটা রফা হ'ল। দেখলাম যে, এখানে পাণ্ডাদের তরফ থেকে কোনো রকম জুলুমজবরদস্তি নেই।

পাণ্ডা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চললেন, বাসে উঠিয়ে দেবেন। পথে যেতে যেতে একটা কুণ্ডের শোভা দেখে মুগ্ধ হলাম। লাল রঙের শান-বাঁধানো সিঁড়ি বেয়ে অনেকখানি নীচে নামতে হ'ল—জলের রং সবুজ, কুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে কতকগুলি লাল রঙের ছোট ছোট মন্দির।

ষ্টেশনে পৌঁছেই বাস পাওয়া গেল। রাত আটটা নাগাদ বাস এসে পৌঁছল আওরঙ্গাবাদে।

ভোর চারটের সময় এলার্ম ঘড়ির আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম। ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রেখেছিলেন দেউস্কর মহাশয়। আমার পাশেই আলাদা একটা খাটে শুয়েছিলেন তিনি, চোখ রগড়াতে রগড়াতে তিনিও উঠে পড়লেন ওদিকে গৃহস্বামীও শয্যাত্যাগ করে নিজেই চায়ের জল চড়িয়ে

দিলেন। গৃহিণী ছিলেন অসুস্থ, চাকর-বাকরদের সুখনিদ্রা তখনো ভঙ্গ হয় নি।

প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করে এসে দেখি দেউস্কর মহাশয় পরম যত্নে কুচি কুচি করে সুপুরি কাটছেন। দুয়ারে টাঙ্গা প্রস্তুত। গৃহস্বামী একটা টিফিন কেরিয়ার ভর্ত্তি খাবার টাঙ্গায় তুলে দিলেন।

অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি বুদ্ধ, অজন্তা গুহাচিত্র

দেউস্কর মহাশয় বললেন, "সুপুরির পোঁটলাটা নিতে ভুলবেন না যেন"।

পিতাপুত্রের আন্তরিকতা হৃদয় স্পর্শ করল। ভারতের পূর্ব্বতম প্রান্ত থেকে সুরু করে পশ্চিমতম প্রান্ত পর্য্যন্ত বহু স্থান পরিভ্রমণ করেছি। কিন্তু এমন উদার আতিথেয়তা, অকপট প্রীতি, সযত্ন পরিচর্য্যা কোথাও পেয়েছি বলে তো মনে পড়ে না। জানি না এটা মরাঠাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য কিনা।

টাঙ্গায় করে রওনা হলাম অজন্তা রোড ট্রান্সপোর্ট ষ্টেশনের উদ্দেশে—ষ্টেশনে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই বাস এসে হাজির। যাত্রী বোঝাই করে কিছুক্ষণ পরেই বাস ছেড়ে দিলে। বাস চলতে লাগল ধূলির ঝড় বইয়ে দিয়ে। দু'ধারে চষা-ক্ষেত—মাটির রং নিকষকালো। ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন, স্মরণাতীত কালে দাক্ষিণাত্যের অধিত্যকাভূমিতে ভূগর্ভস্থ অগ্ন্যুচ্ছ্বাসের ফলে যে গলিত লাভাস্রোত নিঃসৃত হয়েছিল, অবশেষে তা জমাট বেঁধে চূর্ণ হয়ে রূপান্তরিত হয় কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকায়।

বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ মোটর এসে দাঁড়াল অজন্তা গ্রামে। অধিত্যকাভূমির উপরিস্থিত এই গ্রাম থেকেই অজন্তা গুহার নামকরণ করা হয়েছে।

বাঁদিকে একটা সাইনবোর্ড-ঝুলানো দোকানের সামনে কয়েক-জন লোক বসে জটলা করছে, মাথায় তাদের লাল রঙের পাগড়ি। মেয়েদের পরনে কাছা-দেওয়া রঙীন সাড়ি, কিন্তু মাথায় ঘোমটা, গায়ে খাটো হাতা ও খাটো বহরের 'চাউলি', পৃষ্ঠদেশ এবং বক্ষ অর্দ্ধ অনাবৃত। এদের বেশভূষা অজন্তা গুহার নারীচিত্রগুলির কথা মনে করিয়ে দেয়।

অজন্তা গ্রাম ছাড়িয়ে বাস চলল উঁচু-নীচু আঁকা-বাঁকা পার্ব্বত্য পথ বেয়ে অজন্তা ঘাটের দিকে। রাস্তার উভয় পার্শ্বে পীতবর্ণ তৃণাচ্ছাদিত শিলাকীর্ণ পাহাড়। এ পথে সরসতা শ্যামলতার লেশমাত্র নেই। প্রকৃতি এখানে সর্ব্ব-আভরণ-বিবর্জ্জিতা পীত-

ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস রেলওয়ে ষ্টেশন, বোম্বাই

বসন-পরিহিতা—এখানকার আকাশে-বাতাসে বৈরাগ্যের সুর, রিক্ততার বুকে যে পরম সম্পদ নিহিত তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়বার জন্যে এই ঊষর অধিত্যকা-প্রদেশ মানুষকে আহ্বান করে। সেই আকুল আহ্বান শুনে আজ থেকে দু'হাজার বৎসর পূর্ব্বে, সংসারের কোলাহল থেকে দূরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অবস্থান করে ধর্ম্ম আচরণ করবার উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরা নানা স্থান পরিভ্রমণ করে অবশেষে এসে উপনীত হয়েছিলেন এই পার্ব্বত্য অঞ্চলে, সেদিন এই নিভৃত স্থানের অস্তিত্বের কথা কেউ জানত না—অজন্তা মানেই নাকি এমন স্থান যার কথা কেউ জানে না। ধীরে ধীরে এখানে গড়ে উঠল রূপময় বৌদ্ধ চৈত্য, বিহার। আজ প্রাচীন ভারতের শিল্পসাধনার শ্রেষ্ঠতম পাদপীঠ রূপে সমগ্র পৃথিবীতে এর পরিচিতি।

বেলা এগারোটা নাগাদ বাস এসে পৌঁছল গন্তব্য স্থলে। জায়গাটি চারি দিকেই পাহাড়ে ঘেরা। পেছনদিককার পাহাড়ের পাদমূলে একটি শুষ্কপ্রায় গিরিনদী, রাস্তার পাশে দুটি চায়ের দোকান। সুমুখের পাহাড়টি দৃষ্টির আড়াল করে রেখেছে মানুষের সৃষ্ট এক নিরুপম রূপলোককে। পাহাড়ের গাত্রস্থ বাঁধানো পথ বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই এক নম্বর গুহার সামনে এসে উপস্থিত হলাম। এই গুহাটি নাকি নির্ম্মিত হয় সকলের শেষে।

স্তরে স্তরে বিন্যস্ত, পূর্ব্ব থেকে পশ্চিম দিকে প্রসারিত একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পাহাড়ের বুকে উনত্রিশটি গুহা অবস্থিত। তন্মধ্যে ৯,

১০, ১৯, ২৬ এবং ২৮ (অসমাপ্ত) এই কয়টি চৈত্য অর্থাৎ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সমবেত উপাসনা-স্থান, বাকীগুলি বৌদ্ধ বিহার বা মঠ। ইলোরার মত অজন্তা গুহাপরিক্রমণ আয়াসসাধ্য নয়, গুহাগুলি পরস্পরের খুব কাছাকাছি। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশটি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ অথচ পরম রমণীয়। চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মান পাহাড়শ্রেণী

'গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়া', বোম্বাই

একটি নিভৃতি রচনা করে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্প-সম্পদকে যেন পরম যত্নে রক্ষা করছে। গুহার প্রবেশ-পথগুলিকে দেখাচ্ছিল রহস্য-কক্ষের সিংহদ্বারের মত। এগুলির অবস্থিতিতে বৈচিত্র্য আছে, সবগুলি এক সারিতে নয়, কোনোটি উপরে কোনোটি বা নীচে। ডান দিকে শিলাময় পাহাড়ের বুকে একটির পর আর একটি গুহা, বাঁদিকে সঙ্কীর্ণ পথ—পথের পাশেই গভীর খাদ। ওই পথ ধরে সরাসরি চলে গেলাম একেবারে পশ্চিম প্রান্তে ২৬নং গুহায়—এখান থেকেই সুরু হবে আমার গুহাপরিক্রমণ।

গুহামধ্যে প্রবেশ করতেই দৃষ্টি আকর্ষণ করল—শায়িত অবস্থায় বিরাট আকারের এক বুদ্ধমূর্ত্তি; ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের দৃশ্যটি ভাস্কর্য্য-শিল্পের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে অপূর্ব্ব মহিমায়। সংসারের নরনারীকে শান্তির পথ প্রদর্শন করে অমৃতলোকে প্রয়াণ করেছেন প্রভু বুদ্ধ, তাঁর মহানির্ব্বাণে মর্ত্ত্যলোকে হাহাকার পড়ে গেছে, আকুল হয়ে রোদন করছে নরনারী। ওদিকে স্বর্গলোকে সুরু হয়েছে আনন্দ-কোলাহল, গীতবাদ্যে দশদিক হয়ে উঠেছে মুখরিত।

মূর্ত্তিগুলোর পরিচয় লাভ করবার জন্যে আমার আগ্রহ দেখে, যে লোকটি ২৬নং গুহার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত সে সবকিছু বুঝিয়ে দিতে লাগল। তারপর সামনের দিকে অনতিদূরে অবস্থিত একটি পাহাড়ের উপরকার গোলমত একটা পাথর-বাঁধানো জায়গা দেখিয়ে বললে, "আজ থেকে ১৩০ বছর আগে এক সাহেব ওখান থেকেই প্রথম অজন্তা গুহা দেখতে পান, এটি তারই স্মারক-চিহ্ন।"

লোকটির কথা শুনে মনে পড়ে গেল উনবিংশ শতাব্দীতে জনৈক মিলিটারি অফিসার কর্ত্তৃক অজন্তাগুহা পুনরাবিষ্কৃত এবং বিশ্বের সমক্ষে প্রকাশিত হওয়ার চিত্তাকর্ষক কাহিনী।

১৮১৯ সালের কথা। মাদ্রাজ সেনাবিভাগের অবসরপ্রাপ্ত এক মিলিটারী অফিসার একদিন শিকার করবার উদ্দেশ্যে একলা গেছেন অজন্তা গ্রামের সন্নিহিত অরণ্যে। বিফল মনোরথ হয়ে তিনি প্রস্তরাকীর্ণ জঙ্গলে রাস্তা ধরে ক্রমাগত এগোতে লাগলেন। এমনি ভাবে কিছুদূর অগ্রসর হবার পর অফিসারটি মনে করলেন যে, তিনি লোকালয় থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছেন, এমন সময় অনতিদূরে একটি বালকের কর্কশ কণ্ঠস্বর এসে পৌঁছল তাঁর কানে। দ্রুত পদে এগিয়ে এসে তিনি দেখেন, জঙ্গলের মাঝখানে একটি রাখাল বালক কতকগুলো মোষ চরাচ্ছে এবং সেগুলোকে লক্ষ্য করেই চেঁচামেচি করছে।

সাহেবকে দেখে ছোকরা ভাবলে একে বাঘ-শিকারের আসল জায়গা দেখিয়ে দাঁও মারবার এই একটা সুবর্ণসুযোগ। তাঁকে সঙ্গে করে কিছুদূর নিয়ে গিয়ে গাছপালার ভেতর দিয়ে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করে ছোকরাটি বললে,—"দেখ সাহেব।" তাঁর কথামত ঘন সবুজ পত্ররাজির ভেতর দিয়ে দৃষ্টিপাত করে তিনি কতকগুলি খোদিত প্রস্তর-স্তম্ভের আড়ালে এমন কিছু দেখতে পেলেন যা কতকটা লাল-সোনালী রঙের।

কোনো প্রত্নদ্রব্য আবিষ্কারের আশায় উৎফুল্ল হয়ে সাহেব তৎক্ষণাৎ মশাল, ঢাক ও গুহার প্রবেশ-পথ পরিষ্কার করবার জন্য কুঠার এবং বর্শা ইত্যাদি সহ আসবার জন্যে গাঁয়ের লোকেদের নিকট খবর পাঠালেন। তারা এসে জঙ্গল সাফ করে গুহাগুলিতে প্রবেশের পথ করে দিলে। খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতক থেকে আরম্ভ করে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক পর্য্যন্ত এই হাজার বৎসরেরও অধিককাল ধরে রূপদক্ষ শিল্পীদের সাধনায় নিরেট পাষাণের বুকে ভাস্কর্য্য ও প্রাচীরচিত্রের মাধ্যমে যে অপরূপ রূপমাধুরী বিকশিত হয়ে উঠেছিল, উনবিংশ শতাব্দীতে এক বিদেশীর কল্যাণে বিস্মৃতির গহ্বর থেকে পুনরুদ্ঘাটিত হয়ে তা ভারতবাসীকে তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় সম্পদের সঙ্গে পরিচিত করলে।

অজন্তার বিহার এবং চৈত্যগুলির মধ্যে কোন কোনটি দু' হাজার বৎসরের পুরনো। বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক বৌদ্ধসঙ্ঘ প্রবর্ত্তিত হবার (খ্রীঃ পূঃ ৫৬৩—খ্রীঃ পূঃ ৪৮৩) তিন শতাব্দী পরে মঠ-প্রতিষ্ঠার জন্যে যে-সকল বৌদ্ধ ভিক্ষু এখানে এসে উপনীত হয়েছিলেন, তাদের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল এই অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পাহাড়, তারপর তাঁরা আত্মনিয়োগ করলেন এখানে এক শিল্প-তীর্থ গড়ে তুলবার সাধনায়। ভাস্করের ছেনি ও বাটালি পাষাণকে দিল প্রাসাদের আকৃতি, বুদ্ধ-মূর্ত্তিসমূহের আননে ফুটিয়ে তুলল করুণাঘন প্রশান্ত রূপ। শিল্পীর নিপুণ তুলিকা গুহা-প্রাচীরে রঙে ও রেখায় সৃষ্টি করল এমন বিচিত্র রূপের ইন্দ্রজাল, সৌন্দর্য্যের এমন অম্লান পুষ্পরাজি—সমস্ত পৃথিবীতে যার তুলনা নেই।

ভারতের, শুধু ভারতের কেন জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপতীর্থ অজন্তা। স্থাপত্য-ভাস্কর্য্য এবং চিত্র এই ত্রিবিধ কলার এক অপূর্ব্ব মিলন হয়েছে এখানে। শিল্পকলার এমন অপূর্ব্ব সমন্বয়-ক্ষেত্র আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ। অজন্তা তাই রূপরসিকের নিকট পরম

ায়। ভারতের আত্মাকে আবিষ্কার করতে হলে, রূপের মধ্যে অরূপের লীলাকে প্রত্যক্ষ করতে হলে আসতে হবে এই অজন্তা তীর্থে—এখানে না এলে উন্মীলিত হবে না রূপস্রষ্টা এবং রূপদর্শীর তৃতীয় নেত্র—রূপতীর্থ পরিক্রমা থেকে যাবে অসমাপ্ত।
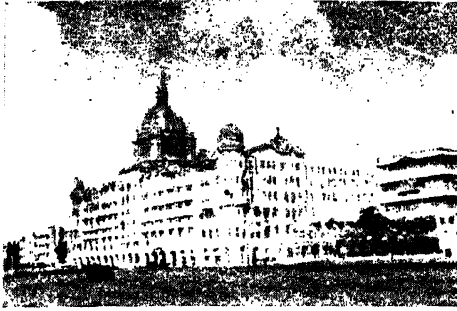
তাজমহল হোটেল, বোম্বাই

কতকগুলি গুহা দেখে এসে প্রবেশ করলাম ১৯ নম্বর গুহায়, এটি একটি চৈত্য। সুমুখটা খোলা, প্রচুর আলো ভিতরটাকে পরিপূর্ণ ভাবে আলোকিত করে তুলেছে। চৈত্যের শীর্ষদেশ স্পর্শ করেছে অত্যুচ্চ গুহাছাদ। চৈত্যের গায়ে দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট উভয়বিধ ভঙ্গীর কতকগুলি বুদ্ধমূর্ত্তি, মূর্ত্তিগুলোর গায়ে হলুদ রঙের ছোপ। সুমুখে প্রাচীরগাত্রে দ্বারপালের মূর্ত্তিটি অপূর্ব্ব, মাথায় মুকুটে মোতির মালা, গলায় হার, বাহুতে বাজুবন্ধ, হাতে কঙ্কণ, সবকিছুই পাথরে খোদা, দাঁড়ানোর সুঠাম ভঙ্গীটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১৭ নম্বর গুহা থেকে সামনে যে দৃশ্য দেখা যায়, তা রুক্ষ হলেও সুন্দর। সামনে সমুন্নত শিরে দাঁড়িয়ে আছে একটা অর্দ্ধাবৃত্তাকার পাহাড়। আর একটা পাথুরে পাহাড়ের সর্ব্বাঙ্গ পীতবর্ণ তৃণে আচ্ছাদিত। যেন পীতবাসে আবৃতদেহ বৌদ্ধ ভিক্ষু ধ্যানাসনে উপবিষ্ট। পাহাড়টি বেষ্টন করে চলে গেছে স্বল্পতোয়া একটি নদী, জল তার স্ফটিকের মত স্বচ্ছ—নদীর বুকে উপলখণ্ড এবং বড় বড় পাথরের টুকরো বিছানো। খণ্ডিত নীল আকাশটা পাহাড়ের উপর চন্দ্রাতপের মত টাঙানো। এ যেন চারিদিকে পাহাড়ের প্রাকারবেষ্টনীর মধ্যে সীমায়িত, বহির্জ্জগতের সংস্রববর্জ্জিত, স্বর্গ থেকে খসে-পড়া একখানি নিরুপম সৌন্দর্য্যচ্ছবি।

সতের নম্বর গুহাপ্রাচীরে জাতকের ছবি, শ্বেত হস্তী ও নানা জীবজন্তুর ছবির রেখাবিন্যাসনৈপুণ্য এবং বর্ণসুষমা নয়নানন্দকর। সতর এবং ষোল নম্বর গুহায় নিপুণ তুলিকায় আঁকা প্রাচীর-চিত্রের প্রাচুর্য্য মনে একটা অনপনেয় ছাপ রেখে যায়।

পনর নম্বর গুহা দেখে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে একটি অসমাপ্ত গুহার সামনে একটা শিলাপট্টে এসে বসলাম। এই গুহার কোন নম্বর নেই ও এখানে দ্রষ্টব্য কিছু না থাকায় কেউ আসে না—সামনে কোন রেলিং নেই। নীচের দিকে তাকালে মাথা ঝিম ঝিম করে। এই অত্যুচ্চ স্থানে কোন কোলাহল নেই, সুগভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে কচিৎ দু'একটি পাখীর ডাক। এখান থেকে আকাশটাকে মনে হয় অতি নিকটে। মনে জাগে অসীমের জন্যে অপরিসীম ব্যাকুলতা, নীচেকার রূপলোকের আকর্ষণ ছিন্ন হয়ে যায়, মনে যেন পাখা বিস্তার করে অনন্ত ঊর্দ্ধলোকে উধাও হয়ে চলে যেতে চায়—অন্তরে এই অনুভূতি একান্ত সত্য হয়ে জাগে—"হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে।"

ক্রফোর্ড মার্কেট, বোম্বাই

আরো কয়েকটা গুহা দেখে শেষে দশ নম্বর গুহার সামনে এসে উপস্থিত হলাম। এটি একটি বিশাল চৈত্য, অজন্তার সকল গুহার মধ্যে এটিই গভীরতম এবং উচ্চতম। উত্তরচ্ছদবিশিষ্ট, অর্দ্ধবৃত্তাকার প্রবেশ-তোরণটি অভ্র ভেদ করে উঠেছে, পঁচানব্বই ফুট দীর্ঘ, একচল্লিশ ফুট প্রশস্ত আর ছত্রিশ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট এই গুহাকে বেষ্টন করে আছে উনত্রিশটি বিরাট স্তম্ভ। এক সঙ্গে অন্ততঃ দশ হাজার লোক এর ভেতরে ধরতে পারে। এই গুহাটির বিরাটত্বে অভিভূত হতে হয়, এবং দু'হাজার বৎসর পূর্ব্বে (নির্ম্মাণকাল ৩৫০ থেকে ২০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ) যখন সহস্র সহস্র বৌদ্ধভিক্ষু এই চৈত্যে সমবেতভাবে উপাসনায় বসতেন, সমবেত কণ্ঠে আবৃত্তি করতেন "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি," আর বিরাট কক্ষ পরিপূর্ণ করে এই অমরমন্ত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকত, তখন যে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ স্বর্গীয় দৃশ্যের অবতারণা হ'ত তা কল্পনা করে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে।

গুহার মাঝখানে তিনটি স্তরে বিভক্ত, সাঁচি স্তূপের মত বিরাট স্তূপ—সর্ব্বোচ্চস্তরের উপরে পিরামিডের মত আকৃতিবিশিষ্ট দুর্নিরীক্ষ্য চূড়া। স্তূপগাত্রে বুদ্ধের মূর্ত্তিতে কি অপূর্ব্ব ভাবব্যঞ্জনা—অর্দ্ধ-নিমীলিত চক্ষু দুটি দিয়ে বিশ্বের সকল করুণা যেন ঝরে পড়ছে। এই গুহা-প্রাচীরে মানুষের বর্ব্বরতার নিদর্শন দেখে মনে আঘাত পেলাম। প্রাচীরচিত্রগুলির উপর বহু লোক নিজেদের নাম লিখে

সেগুলোকে হতশ্রী করে ফেলেছে। অমর কীর্ত্তিকে বিনষ্ট করে অমরত্বলাভের কি হাস্যকর অপচেষ্টা!

একে একে সবগুলি গুহাই পরিক্রমণ করা হ'ল। কিন্তু হাজার হাজার বৎসর ধরে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের অক্লান্ত সাধনায় এখানে যে রূপ-লোক সৃষ্টি হয়েছে তার কি পরিচয় দেব! ছবিগুলি দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে ক্ষণিকের জন্যে যে দিব্যানুভূতি লাভ করেছি কোন্ ভাষায় তাকে প্রকাশ করব! কোন্‌টি রেখে কোন্‌টির কথা বলব। সতর নম্বর গুহায় সম্বোধি লাভের পর, বুদ্ধের স্ত্রী-পুত্রের নিকট

ডক্টর শ্রীআজ্জারাপু ভেঙ্কট রমন রাও, এম-এ, পিএইচ-ডি

প্রত্যাবর্ত্তনের ছবিটির কি অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা! অমৃতলোকের শ্রেষ্ঠতম সম্পদের অধিকারী যিনি, যশোধরা এবং রাহুলের নিকট ভিক্ষাপাত্র হস্তে তিনি উপনীত—চোখে তার করুণার প্রস্রবণ, সে দৃষ্টি যেন মাতা-পুত্রকে অমৃতধারায় অভিসিঞ্চিত করে দিচ্ছে, এ ছবি মনের মণিকোঠায় ভাস্বর হয়ে জেগে থাকবে, তেমনি স্মৃতির পট থেকে কখনো মুছে যাবে না অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধের মূর্ত্তি, মার কর্ত্তৃক বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করার দৃশ্য প্রভৃতি। কিন্তু শিল্পীর তুলিকা তো এখানে শুধু বুদ্ধের জীবন বা জাতকের কাহিনীকেই নিপুণ ভাবে রূপায়িত করে নি—সৃষ্টির আনন্দে নরনারী, পশুপক্ষী, লতাপাতা যা কিছু তাঁরা এঁকে গেছেন, সবই যেন সুষ্ঠু প্রাণচ্ছন্দে লীলায়িত গতির আনন্দে উচ্ছল। রাণীর প্রসাধন, চামরধারিণী বালিকা, প্রণয়িযুগল, বংশীবাদিকা এ সকল ছবি চোখে যেন মায়া-কাজল বুলিয়ে দেয়—দৃষ্টি এখানে ধন্য হয় রূপের সায়রে অবগাহন করে; শুধু এই কথাটাই মনে জাগে যে, এই স্বপ্নলোকে এসে এমন কিছু দেখলাম যা অপূর্ব্বসুন্দর। এই কথাটাই শুধু বলতে ইচ্ছা হয়—"যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।"

গুহাপরিক্রমা শেষ করে নীচে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই আওরঙ্গাবাদের বাস এসে হাজির। বেলা চারটায় বাস ছেড়ে দিল। বেলা আটটা নাগাদ আওরঙ্গাবাদে এসে পৌঁছলাম।

খাওয়া-দাওয়ার পর যথারীতি পাশাপাশি শুলাম আমি আর দেউস্কর মহাশয়।

'নলিনীকুমার, কেমন দেখলেন অজন্তা', আগ্রহভরে প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধ।

"অপূর্ব্ব, প্রকাশ করতে পারি এমন ভাষা আমার নেই।"

দেউস্কর মহাশয় ভগবান বুদ্ধের অপরিসীম মানব-প্রেম ও করুণার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। সরলপ্রাণ বৃদ্ধ তাঁর মনের কপাট খুলে দিলেন আমার কাছে। দিনকতক আগে নাকি শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি জীবনী পড়েছিলেন। ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে অনর্গল কথা বলে যেতে লাগলেন। শেষে বললেন, "মানুষের প্রতি প্রেম ও ভালবাসাই সারবস্তু নলিনীকুমার। প্রকৃত ভালবাসায় মানুষ কেন, পশুপক্ষী পর্য্যন্ত বশ হয়, এমনকি ভালবাসলে গাছপালার নিকট থেকে পর্য্যাপ্ত সাড়া পাওয়া যায়, আমার কথাটা অবিশ্বাস করবেন না।" নিজের দু'একটি অভিজ্ঞতার কথা বললেন।

আশ্চর্য্য মানুষ এই মরাঠী ব্রাহ্মণ।

পর দিনও এলার্ম ঘড়ির আওয়াজে ঘুম ভাঙল। ধড়মড় করে উঠে দেখি, দেউস্কর মহাশয় যথারীতি সুপারি-কর্ত্তন-পর্ব্ব সুরু করে দিয়েছেন।

আজ আমার বোম্বাই যাত্রার পালা।

"সুপুরির পোঁটলাটা নিতে ভুলবেন না।"—যাত্রার প্রাক্কালে দেউস্কর মশায় একটুখানি ম্লান হেসে বলেন।

"তা ভুলব না। কিন্তু একথাও ভুলব না যে, সুদূর প্রবাসে এসে একটা মানুষের মত মানুষ দেখে গেলাম। আপনার কাছে যে অকৃপণ দাক্ষিণ্য, যে অনাবিল প্রীতি পেয়েছি সে কি ভুলবার। সুপুরি সে ত উপরি পাওনা।"

টাঙ্গা ছেড়ে দিলে। দেখি দেউস্কর মহাশয় একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন।

ষ্টেশনে গিয়ে টিকিট কেটে ট্রেনে চাপলাম। মনমাদে গাড়ী বদল করতে হ'ল। বেলা চারটা নাগাদ ট্রেন পৌঁছল ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস ষ্টেশনে।

আমার উঠবার কথা ছিল আন্ধেরীতে মঙ্গেশ্বর শর্ম্মার জামাতা শ্রীরমন রাও. এম-এ, পিএইচ-ডি মহাশয়ের ওখানে। কিন্তু ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সমুদ্রতীরবর্ত্তী গেট অব ইণ্ডিয়া, মেরিন ড্রাইভ, মালাবার হিল ইত্যাদির আলোকসজ্জা দেখবার ইচ্ছা ছিল, কাজেই সেদিন সেখানে না গিয়ে বোম্বাইয়ের বিখ্যাত ক্রফোর্ড মার্কেটের নিকটে একটা বাঙালী হোটেলে গিয়ে উঠলাম।

মধুসূদন দত্ত কি একজন ?

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্বন্ধে সম্প্রতি বিভিন্ন পত্র-পত্রীতে আলোচনা হইতেছে। ইহার মধ্যে তাঁহার ছাত্র-জীবন তথা হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন বিষয়েও দু-চার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩৪, ১২ই মার্চ দিবসীয় 'সমাচার দর্পণে' মধুসূদন দত্ত নামে হিন্দু কলেজের জনৈক ছাত্রের উল্লেখ পান। ইহা হইতে তিনি ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তই উক্ত 'মধুসূদন দত্ত'। ১৮৩২ সনের 'এশিয়াটিক জর্ন্যাল' হইতে একটি তথ্য উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখান যে, হিন্দু কলেজের জুনিয়র বিভাগে ভর্তি হইবার বয়স ৮ হইতে ১২-এর মধ্যে। কবিবরের প্রচলিত জীবনচরিতগুলিতে ১৮৩৭ সনে তাঁহার হিন্দু কলেজে জুনিয়র বিভাগে প্রবেশের কথা বলা হইয়াছে। উক্ত নিয়ম অনুসারে ঐ সময় মধুসূদনের বয়স হয় তের বৎসর (মধুসূদনের জন্ম-তারিখ ২৫শে জানুয়ারী ১৮২৪, শনিবার)। ১৮৩৪ সন হইতে হিন্দু কলেজের জুনিয়র বিভাগের শ্রেণীসমূহের সঙ্গে বৎসরগুলি মিলিয়া যাওয়ায় ব্রজেন্দ্র-বাবুর ঐ ধারণা দৃঢ়তর হয় এবং 'সমাচার দর্পণে' উল্লিখিত মধুসূদনই যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাহা ব্যক্ত করেন।* এখন দেখা যাক, ১৮৩৪ সনে প্রাপ্ত 'মধুসূদন দত্ত' কবিবর মাইকেল মধুসূদন কিনা।

১৮৩৪, ৭ই মার্চ কলিকাতা টাউন হলে মহাসমারোহে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কলেজের ছাত্রগণ যথারীতি নাট্যবিষয়ক প্রস্তাবসমূহ আবৃত্তি করেন। 'ষষ্ঠ হেনরী' আবৃত্তি করেন ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল এবং 'গ্লষ্টর' আবৃত্তি করেন মধুসূদন দত্ত। ইহার পরে মধুসূদন দত্তের দ্বিতীয় বার উল্লেখ পাই ১৮৩৬ সনের শিক্ষাবিষয়ক বার্ষিক রিপোর্টে হিন্দু কলেজের জুনিয়র বিভাগের সর্ব্বনিম্ন শিক্ষকরূপে। এই সময় তাঁহার মাসিক বেতন ছিল পঁচিশ টাকা।† মধুসূদন ১৮৪১ সন পর্য্যন্ত হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা-কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। তখনও তিনি কলেজের জুনিয়র বিভাগের শিক্ষক, বেতন মাসিক পঞ্চান্ন টাকা।* মধুসূদন এই বৎসরের প্রথম অবধিই কলেজে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, কারণ পরবর্ত্তী ১৮৪১-৪২ সনের শিক্ষা-বিষয়ক বার্ষিক রিপোর্টে আর তাঁহার উল্লেখ পাই না।

সমসাময়িক অন্য নথিপত্রেও মধুসূদন দত্তের উল্লেখ পাইতেছি। ১৮৩৮ সনে কলিকাতায় প্রধানতঃ হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের উদ্যোগে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা' (ইংরেজী নাম—Society for the Acquisition of General Knowledge) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভায় রীতিমত প্রবন্ধ পাঠ, বক্তৃতা ও আলোচনা হইত। কোন কোন রচনা বাংলায়ও লিখিত হয়। এই সকল রচনা ও বক্তৃতা হইতে বাছাই করিয়া কতকগুলি সভা-কর্ত্তৃপক্ষ পুস্তকাকারে তিন খণ্ডে প্রকাশ করেন যথাক্রমে ১৮৪১, ১৮৪২ ও ১৮৪৩ সনে। প্রত্যেক খণ্ডে সভার সভ্যদের একটি করিয়া তালিকা মুদ্রিত হয়। তালিকাগুলিতে 'মধুসূদন দত্ত'কে সভ্য হিসাবে পাইতেছি।

সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার এই মধুসূদন যে কবিবর মাইকেল মধুসূদন হইতে পারেন না তাহার দুইটি পরোক্ষ প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ, স্কুল ও কলেজের প্রাক্তন যুব-ছাত্রদের লইয়াই প্রধানতঃ এই সভা গঠিত। তৃতীয় তালিকার (১৮৪৩-এ প্রকাশিত) তৎকালীন প্রখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে শুধু প্যারীচরণ সরকারের নামই পাওয়া যাইতেছে। তিনি ১৮৪১ সনে প্রথম শ্রেণীর পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া সর্ব্বপ্রথম মাসিক চল্লিশ টাকা সিনিয়র বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে এই বৃত্তি মুখ্যতঃ তাঁহারাই ভোগ করিতে পাইতেন যাঁহারা প্রথম শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও দু-তিন বৎসর অধ্যয়ন-কার্য্য চালাইতেন। এই সময়টিকে আধুনিককালের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শ্রেণীর পাঠের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, উক্ত মধুসূদন কবিবর মধুসূদন হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার সতীর্থদেরও নাম পাওয়া যাইত। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক, জগদীশনাথ রায় প্রমুখ সে যুগের হিন্দু কলেজের প্রখ্যাত ছাত্রগণ তাঁহার সতীর্থ। অপর পক্ষে, হিন্দু কলেজের শিক্ষক মধুসূদন দত্তের সম-সাময়িক, পরবর্ত্তীকালের বিখ্যাত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ঈশ্বরচন্দ্র

* মধুসূদন দত্ত (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা) ৩য় সং, পৃ. ৭-১০।

† *Report of the General Committee of Public Instruction for the Bengal Presidency, etc., for 1836.* App. No. 10: Hindoo College, p. 167.

* *The Bengal and Agra Annual Guide and Gazetteer for 1841,* Vol. I, Part III, Educational Institution: Hindu College of Calcutta, p. 299.

ঘোষাল সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার সভ্যপদে বৃত হিলেন। হিন্দু কলেজের শিক্ষক মধুসূদন দত্ত ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের সহপাঠী এবং ইঁহারা উভয়েই ছিলেন জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার সভ্য। কবিবর মধুসূদন দত্ত কখনো হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা করেন নাই এবং সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার সঙ্গেও তাহার কোনো সম্বন্ধ ছিল না। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন যে, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের 'সহপাঠী' মধুসূদন দত্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত হইতে ভিন্ন ব্যক্তি।

এখন মাইকেল মধুসূদনের হিন্দু কলেজে প্রবেশ সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। তাঁহার জীবনচরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসু এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন :

"তিনি [মধুসূদন] ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন, এবং ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ ত্যাগ করেন।... মধুসূদন ১৮৩৭ হইতে ১৮৪২ পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক এই ছয় বৎসরের মধ্যে যে ইংরেজী বর্ণপরিচয় হইতে বি-এ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন ইহা তাঁহার বুদ্ধি-বিদ্যার পক্ষে গৌরব-জনক বলিতে হইবে।"—'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত', ৩য় সং, পৃ. ৩৯।

'মধু-স্মৃতি'র লেখকও এই মত সমর্থন করিয়াছেন। এখন ব্রজেন্দ্রবাবুর উক্তি যাচাই করা যাক। ১৮৩৪ সনে হিন্দু কলেজের ছাত্র এই মধুসূদন দত্তকে দেখিয়া, ৮ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক ছাত্রকে কলেজের জুনিয়র বিভাগে ভর্ত্তি হইতে হইবে ১৮৩২ সনে প্রকাশিত এইরূপ নিয়মের নিরিখে, এবং বৎসরানুযায়ী জুনিয়র বিভাগের শ্রেণীগুলিও মিলিয়া যাওয়ায় তিনি যোগীন্দ্রনাথ বসু ও নগেন্দ্রনাথ সোম লিখিত উক্ত ১৮৩৭ সনে হিন্দু কলেজে প্রবেশের কথা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রায় সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবার পর উক্ত বয়সের (৮ হইতে ১২) বাঁধাধরা নিয়ম আর ছিল না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ভূদেব মুখোপাধ্যায় (জন্ম তারিখ ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৮২৫, রবিবার) তের বৎসর বয়সে ১৮৩৯ সনে হিন্দু কলেজের জুনিয়র বিভাগে প্রবেশ করেন।* রাজনারায়ণ বসু (জন্ম-তারিখ ৭ই সেপ্টেম্বর ১৮২৬) ১৮৪০ সনে চৌদ্দ বৎসর বয়সে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হন।† কাজেই মধুসূদনের পক্ষেও তের বৎসর বয়সে (জন্ম-তারিখ ২৫শে জানুয়ারী, ১৮২৪) ১৮৩৭ সনে হিন্দু কলেজ প্রবেশে কোন বাধা ছিল না।

এখন, মধুসূদন কবে নাগাদ কলিকাতায় পিতা রাজনারায়ণের খিদিরপুরস্থ বাসাবাটীতে আসিয়াছিলেন? যোগীন্দ্রনাথ বসু ও নগেন্দ্রনাথ সোম উভয়েই বলিয়াছেন যে, মধুসূদনকে ১৮৩৭ সনে সাগরদাঁড়ি হইতে কলিকাতায় আনা হইয়াছিল। ইহা অবিশ্বাস করিবার হেতু নাই।

বর্ত্তমান আলোচনায় কয়েকটি কথা আমরা বুঝিতে পারিতেছি : ১৮৩৪ সনে 'সমাচার দর্পণে' উল্লিখিত মধুসূদন দত্তই যে পরবর্ত্তী কালের হিন্দু কলেজের জুনিয়র বিভাগের শিক্ষক এবং সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার সভ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত হিন্দু কলেজের জুনিয়র বিভাগের শিক্ষক অথবা সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার সভ্য ছিলেন এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মাইকেল মধুসূদনের ১৮৩৭ সনে হিন্দু কলেজের জুনিয়র বিভাগে ভর্ত্তি হওয়ায়ও কোন বাধা ছিল না, যেমন ভূদেব বা রাজনারায়ণের পক্ষেও কোন বাধা হয় নাই। এ কথা মাইকেলের সকল জীবনীকারই স্বীকার করিয়াছেন যে, ছাত্রাবস্থায় মধুসূদন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করিয়া সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তথাপি ১৮৩৭ সনের পূর্ব্বে যে তিনি কোন ইংরেজী পাঠ লন নাই তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, হিন্দু কলেজের ছাত্র অন্ততঃ দুই জন মধুসূদন দত্ত ছিলেন।

* ভূদেব মুখোপাধ্যায় (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা), ২য় সং, পৃ. ১০।

† রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, পৃ. ১১।

প্ল্যানচেট্

শ্রীমদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
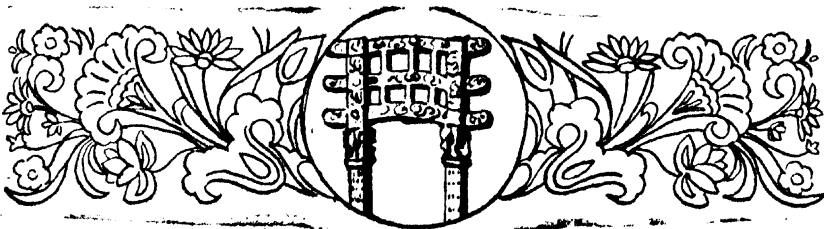
বনবিহারী ঘোষালের বাড়ীতে একটা পাঁচ মাসের কুকুরছানা হঠাৎ জলে ডুবে আত্মহত্যা করল। অবিশ্বাস্য সন্দেহ নেই, কিন্তু ওটা যে আত্মহত্যাই প্রবীণ প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে তার কোনও বিরুদ্ধ যুক্তি খুঁজে পাওয়া গেল না। বনবিহারী এবং তাঁর স্বর্গত অগ্রজের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু প্রোফেসার পঞ্চানন চাটুজ্জে তখন পুকুরে মাছ ধরছিলেন। ঠিক দুপুরবেলা। কুকুরটা পাড় থেকে একটা অ-কুকুরসুলভ লাফ দিয়ে একেবারে পুকুরের মাঝখানে পড়ল এবং হাত-পা (অথবা চার পা) গুটিয়ে ডুব দিতে লাগল মানুষের মত। প্রথমটা তাঁরা কিছু বুঝতে পারেন নি, যখন বুঝলেন তখন সে দরকারমত জল খেয়ে পরপারের দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। কেউ কেউ বললে, মৃগী ছিল। কিন্তু বনবিহারী আর পঞ্চানন বললেন পঞ্চত্বপ্রাপ্তির লোভে ডুব দেওয়া এবং এলোপাথারি হাত-পা নেড়ে অসহায় ভাবে জলাঞ্জলি মেনে নেওয়ার তফাৎটুকু ওঁরা ভাল করেই বোঝেন।

কিন্তু যুবকেরা এই অলৌকিক আত্মহত্যার কাহিনী বিশ্বাস করতে চাইল না কোনমতেই। ওরা বললে, সংসারের অসারতা উপলব্ধি করে তার থেকে নিষ্কৃতিলাভের সবচেয়ে অনায়াসসাধ্য এই প্রক্রিয়াটি মানুষের নিজস্ব আবিষ্কার। তার মধ্যেও আবার যাদের একাগ্রতার অভাব অর্থাৎ যাদের জীবনে সারবস্তু বলতে পদোন্নতি আদি গোছের কোনও একটি নির্দিষ্ট কাম্যের ধারণা নেই তারা এর সুযোগ নিতে পারে না। কুকুরের মত জীবের প্রশ্নই আসে না। বিস্তর আলাপ-আলোচনা-গবেষণার পর প্ল্যানচেট্ করে সন্দেহ ভঞ্জনের আয়োজন করা হ'ল। কুকুরকুলের মধ্যে প্রচলিত বর্ণমালার সীমাবদ্ধতা এবং প্রয়োগপদ্ধতির জটিলতার কথা চিন্তা করে বনবিহারী আপত্তি তুলেছিলেন। পঞ্চানন বললেন, এটা একটা কথাই নয়। আত্মা এক। চুরাশী লক্ষ জীবগোষ্ঠী তাঁর লীলার পুতুল। অতএব এদের কোনও একটির ভাষায়ও তাঁর দক্ষতার অভাবের কথা চিন্তা করা মূর্খতা।

জীবিতাবস্থায় কুকুরটার নামকরণ করার প্রয়োজন হয় নি। এখন সাদা-কালো-খয়েরীর বিচিত্র মিশ্ররূপের ধ্যান ছাড়া গত্যন্তর রইল না। পঞ্চানন আবার বললেন, ধ্যানই সব, নাম নিষ্প্রয়োজন।

মাত্র আধ ঘণ্টার অভিনিবেশেই ফললাভ হ'ল। নিষ্প্রাণ কাঠের টেবিল খড় খড় শব্দে নড়ে চড়ে স্থির হয়ে দাঁড়াতেই ওদের পাঁচ জোড়া চোখ পড়ল সাদা কাগজখানার ওপর।

বেশ পাকা হাতের লেখা—এসেছি, রাসবিহারী।

বনবিহারী এবং পঞ্চানন চাটুজ্জে তখন পুকুরে মাছ ধরছিলেন

ছিল। তার মধ্যেও বোধ হয় সেই পদটির প্রেরণা ছিল। সব রকম ভোগের আয়োজনে পরিপূর্ণ সেই পৃথিবীর মানুষ হিসেবে আমি কি না করতে পারতাম। দর্শনের চশমা চোখে এঁটে সাহিত্য, শিল্প, মানুষ, পশু এবং পত্রপুষ্পের সত্যিকার সৌন্দর্য্য দেখতে পাই নি, বুঝতে পারি নি একদিনের জন্যেও, যে সে আমার স্বাভাবিক দৃষ্টি নয়। আজ নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জন্মান্তরের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে রূপান্তরিত হতে বাধ্য হচ্ছি সে ত আমার এই বুদ্ধিভ্রষ্টতার ফল! পৃথিবী দেখা শেষ না করে (চেষ্টামাত্র না করে) ছুটে এসেছি পৃথিবীর পরে কি আছে তাই দেখতে।

যাক সে সব। আশা করেছিলাম দেহটা নিঃশেষে পুড়ে গেলে যথেচ্ছ বিচরণের সুযোগ পাব। পৃথিবীভ্রমণের সখ তখনও যায় নি। কিন্তু তা ত হ'ল না। ছান্দোগ্যের শ্লোকটি বর্ণে বর্ণে মিলে গেল। সামনে নিমগাছে বসে আমি নিজের দেহটাকে পুড়ে যেতে দেখলাম। আমার চিন্তাক্লিষ্ট বিদ্যুৎ-বিধ্বস্ত ব্রেণখানাকে বাঁশ দিয়ে ফাটিয়ে ফেলতে দেখলাম। সে দৃশ্য কার না খারাপ লাগে বল? চিতায় জল পড়তেই উৎক্ষিপ্ত ভস্মের সঙ্গে কি যেন উঠে এসে আমায় স্পর্শ করল, তার পর মিশে গেল আমার নিরাকার কাঠামোয়। টের পেলাম গাছ ছেড়ে এক মুহূর্ত্তে অনেক উপরে উঠে পড়েছি। নীচে নামবার অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ আর আমার ওপর কাজ করে না—আমি হতাশ হয়ে লক্ষ্য করলাম। চাঁদের প্রায় কাছাকাছি গিয়ে আমার গতি রুদ্ধ হ'ল। বৃহদারণ্যকে জীবাত্মার চাঁদের খাদ্যে পরিণতির যে অত্যুক্তি আছে ওটা বোধ হয় আরুণির ছেলের কাছে প্রসেসটার ওপরে রঙ ফলানোর ফলস্বরূপ। কিংবা একটু দুর্ব্বোধ্য ব্যাপার বলে ছেলেমানুষের জন্যে ব্যাখ্যাটাকে সরল করা হয়েছে।

সঠিক বলতে পারি না। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার মত চাঁদের কাছে থাকতে হয়েছিল। আলোর ঝরণায় স্নান করতে করতে আমার আয়তন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ থেকে কয়েকটা অণুতে রূপান্তরিত হ'ল। ক্রমে অণুর সমষ্টি-রূপও আর রইল না। ক্রমাগত কিরণস্নানের চোটে অবস্থান আছে পরিমাণ নাই এমনি একটা অবস্থা দাঁড়াল শেষ পর্য্যন্ত। অর্থাৎ পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়ে একটা দমকা হাওয়ার ধাক্কায় তীব্র গতির কবলিত হলাম। আমারই মত অসংখ্য অণু দিয়ে যে বায়ুর সৃষ্টি হয়েছে, আশেপাশে দেখে বুঝতে পারলাম। একটু অবাক হয়েছিলাম বলতে হবে। আমাদেরই সম্মিলিত শক্তি এই গতির মূলে! তা যেমন অনির্দ্দিষ্ট তেমনই ভয়াবহ। শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ে এই তীব্র গতিশীল অনিশ্চয়তার

এই ভাবে কত দিন ঘুরেছি তার ঠিক নেই। বোধ হয় লক্ষ পৃথিবী ঘোরা হয়ে থাকবে। অত উঁচু থেকে কিছুই ঠাহর হয় নি। নীচে নামবার ক্ষমতা ছিল না আমাদের। তার পর হঠাৎ একদিন নীচে নামতে আরম্ভ করলাম সদলবলে। এরোপ্লেন বাম্প করলে আরোহীর যে সেন্সেশন হয় তেমনি একটা যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা এবার পৃথিবীর আকর্ষণের আওতায় এসে পড়লাম। ভাবলাম এবার ল্যাণ্ড করা যাবে। কিন্তু নীচে তাকিয়ে দেখি সমুদ্রের ওপর দিয়ে চলেছি। বঙ্গোপসাগর—ভারতবর্ষের মত ছাঁচের নীচে সিংহলের ফুটকি দেখে বুঝলাম। হঠাৎ একরাশ ভিজে বাষ্প উঠে আমাদের নিয়ে চলল ঠেলে উত্তর দিকে। বুঝলাম মেঘ হতে চলেছি।

এর পর যখন হিমালয়ের ঠাণ্ডা বাতাস পেয়ে আমরা সব মিলে একটা মেঘের ঘনত্ব লাভ করলাম তখন আমাদের দীর্ঘ যন্ত্রণার অবসান হ'ল। ওজনের ফলে গতি হ'ল শ্লথ। ধীরে সুস্থে শস্যশ্যামল ক্ষেত, কর্ম্মমুখর জনপদের ওপর দিয়ে আমরা ভেসে চললাম। পথে অনেকে বৃষ্টির ফোঁটার সঙ্গে মাটিতে নেমে গেল। আমার মত অনেকে নিজের ভিটের সাক্ষাৎলাভের আশায় থেকে গেল।

মনে পড়ল কালিদাসকে। ধূম্রজ্যোতি সলিলমরুতের গঠিত যে মেঘকে জড়পদার্থ ভেবে তিনি যক্ষের আবেদনকে বিরহকাতর প্রলাপ বলেছেন আমি সেই রূপ নিয়েই ভেসে চলেছি আজ। যন্ত্রসভ্যতার যুগে যক্ষের মত ডেসপারেট লাভারকে তেমন অসহায়তা বোধ করতে হয় না তাই—নইলে সে সময় কেউ বেকায়দায় পড়ে আমায় ও ধরণের আবেদন জানালে হাসিমুখে তা করে দিয়ে আসতাম। জনপদবধূদের মধ্যে সেই ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞ প্রীতিস্নিগ্ধ লোচনের তৃষ্ণা আবিষ্কার করবার চেষ্টা করলাম। (এটা বন্ধু যেন তার বৌদিকে না বলে) সে যে কি আনন্দ! সেই সদ্যঃসীরোৎকষণসুরভি...কবিত্ব থাক।

এই ভাবে অন্যমনস্ক হয়ে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ দেখি আমাদের বাড়ী ছাড়িয়ে এসেছি। কালবিলম্ব না করে একটি জলকণাকে আশ্রয় করে ঝাঁপ দিলাম। বাড়ী থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে গিয়ে পড়লাম একটা ধানক্ষেতে। একেবারে একটা ধানের গর্ভে। ধানটা যেন আমার জন্যেই হা করেছিল—মুখ বন্ধ করল আমাকে পেয়েই। চিত্রা নক্ষত্রের বৃষ্টির সময় জীবাত্মাকে স্থান দেওয়ার জন্যে শস্যের মুখ খোলা থাকে একথা পড়েছি।

এর পর উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষা। এখানে আমার কলেবর বাড়তে সুরু করল এবং শেষে একদিন চাল হয়ে চার্ [illegible]

আমার যাত্রা হলাম।

অদ্ভুত লীলা পরমেশ্বরের। নইলে বনবিহারীই যে মূল্য ধরে আমায় কিনে নেবে চাষীর কাছ থেকে একথা কি কখনও চিন্তা করতে পেরেছিলাম ? বউমা যখন হাঁড়িতে চাল তুলছিল তখন আমি ইচ্ছে করেই ওর হাত থেকে মাটিতে পড়লাম। যত তাড়াতাড়ি তণ্ডুললীলা শেষ হয় ততই মঙ্গল। হ'লও তাই। ভাতের চাল মেপে ওঠাবার সময় সুষমা আমায় মাটি থেকে খুঁটে তুলে নিয়ে গেল।

২১২° ফারেনহিটের জ্বালায় দ্বিতীয় বার মর মর হয়ে শেষ পর্য্যন্ত সত্যি সত্যিই আমি বন্ধুর পাতে গিয়ে পড়লাম। পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সুষমার গর্ভে জাতিস্মর হয়ে জন্মলাভের স্বপ্নে বিভোর হয়ে রইলাম। শৈশবটুকু কোনওমতে কাটিয়ে একটা নতুন যুগ সৃষ্টি করবার সম্ভাবনা একেবারে আত্মহারা করে দিয়েছিল আমায়, বন্ধুর একটা বেয়াড়া রকম ঢেঁকুরে যখন হুঁস হ'ল তখন ও আসনে উঠে দাঁড়িয়েছে।...তা হলে! আমি শঙ্কিত হলাম রীতিমত। এতগুলি সুন্দর নিয়মের মধ্যে দিয়ে নিয়ে এসে এ আজ কি বিপদে ফেললেন ভগবান! বন্ধু চলে যাচ্ছিল; আবার কি মনে করে ফিরে এল। আবার আশা! আবার আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন! ভাবগদগদ চিত্তে ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বন্ধু হঠাৎ হেঁট হয়ে এক থাবা ভাতের সঙ্গে আমায় কবলিত করে হাঁক দিয়ে ডাকল—লুসী আয়, লুসী। লুসী!...লুসী! 'আমি শিউরে কঁকিয়ে উঠলাম, বন্ধু শুনতে পেল না। তবু একবার শেষ চেষ্টা করলাম। হাতের মধ্যে থেকে গোটা পঞ্চাশ ভাতকে ঠেলে মাঝপথে উঠোনে লাফিয়ে পড়লাম। বন্ধু এগিয়ে গিয়ে ছাইগাদার কাছে ভাতগুলোকে মুক্তি দিলে। লুসী এল। সঙ্গে চক্রবর্ত্তী বাড়ীর টাইগার। বন্ধুর ভয়ে লুসীর অন্নে ভাগ বসাতে না পেরে বিকট মুখভঙ্গীর সঙ্গে জিভ বাড়িয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে আমার কাছে এগিয়ে এল। আমি আবার চীৎকার করে উঠলাম—বন্ধু আমায় বাঁচা! বন্ধু শুনতে পেল না।

আমার এ জন্মের বাপমা হয়ে টাইগার এবং লুসী যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে আমায় সুখে রাখবার। আমার মধ্যে মানবশাবকসুলভ অলসতা এবং অল্পে সুখী হওয়ার অপারগতা প্রত্যক্ষ করে আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ওরা চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। আজ পুত্রবিয়োগে কষ্ট পেলেও এই দুর্ভাবনার হাত থেকে রেহাই পাবে ওরা।

তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কোনও সম্ভাবনা নেই দেখেই আবার এই মহাপাপে ব্রতী হলাম। তবে তোমাদের ইচ্ছাশক্তির দৌলতে আমার প্রধান ব্রতটি উদ্‌যাপিত হয়েছে, এতেই আমি পরিতৃপ্ত। এখন আর উদ্ধার হয়ে যেতে আপত্তি নেই। এবার গয়ায় একটা পিণ্ডি দিয়ে দিও।

বিকট মুখভঙ্গীর সঙ্গে জিভ বাড়িয়ে এদিক ওদিক চেয়ে আমার কাছে এগিয়ে এল

হ্যাঁ—কাল সকালে পুকুরধার থেকে আমার মৃতদেহটা কুড়িয়ে এনে পোড়াবার ব্যবস্থা করো। ওটা নিশ্চিহ্ন না হলে চন্দ্রলোকে যাওয়ার উপায় নেই। আচ্ছা যাই ভাই!"

লেখা পাঠাস্তে বনবিহারী 'দাদা গো!' বলে কেঁদে আছড়ে পড়লেন প্ল্যানচেট টেবিলটার ওপর। পঞ্চানন চোখ মুছতে মুছতে বললেন, "কাঁদিস নি ভাই, কাঁদিস নি, সে মহাপুরুষ ছিল!"

বুধ ও ইলা

শ্রীকৃষ্ণধন দে

[পৌরাণিক কাহিনী। রাজপুত্র "ইল" মৃগয়াকালে বনমধ্যে গোপনে অপ্সরাদের জলক্রীড়া দর্শন করিলে অপ্সরা-অভিশাপে তৎক্ষণাৎ এক বৎসরের জন্য নারীদেহ প্রাপ্ত হন। নারীদেহে তিনি "ইলা" এই নাম ধারণ করেন ও তপস্বী বুধকে ভালবাসিয়া তাঁহার সহিত বিবাহিতা হ'ন, কিন্তু বুধের নিকটে এই অভিশাপ-কথা গোপন রাখেন। এক বৎসর পরে অভিশাপ শেষ হইলে ইলার নারীদেহ পুনরায় পুরুষদেহে রূপান্তরিত হইবার পূর্ব্বক্ষণে বিস্মিত ও আতঙ্কিত বুধ ইলার অভিশাপ-রহস্য জানিতে পারেন। বর্ত্তমান নাট্যকাব্য ইলার নারীজীবনের এই শেষনিশা অবলম্বনে রচিত।

স্থান : আশ্রম-কুটীর। বাতায়নপথে উষালোক অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। বুধ ও ইলা বাতায়নপার্শ্বে মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ইলার একটি হাত বুধের হাতের মধ্যে রহিয়াছে।]

বুধ

আজি তব শেষ নিশা ?

ইলা

শেষ চিহ্ন নারীত্বের মম
এখনি মিলায়ে যাবে। পূর্ব্বাকাশে ফুটিছে নির্ম্মম
উষালোক, শুকতারা ধীরে ধীরে হয়ে আসে ম্লান,
আজি মোর অভিশপ্ত নারীত্বের সর্ব্বশেষ দান
তোমারে আহুতি দিয়া লভিব নূতন রূপান্তর।
হে বাঞ্ছিত, নারীর এ চুম্বন-লোলুপ ওষ্ঠাধর
হারাবে আবেগ তার। নারীর এ বাহুর বন্ধন
প্রণয়-মধুর-লাস্যে উড়াবে না কামনা-কেতন।
নবমল্লিকার মাল্যে সুরভিত সর্পিল কবরী
সৃজিবে না মোহ আর। উষালোকে নব কায়া ধরি'
বক্ষ, উরু, নাভিতট, জঘন, নিতম্ব, কটি ক্ষীণ—
পৌরুষে লভিবে রূপান্তর। ধীরে হইবে বিলীন
যত কিছু কোমলতা, যত কিছু নারীত্বের মায়া
অভিশাপ-মুক্তি মাঝে। আমি ধরি পুরুষের কায়া
নূতন মুক্তির স্বর্গে হেরিব অতীত স্বপ্নবুকে—
কবে যেন ছিনু নারী ! ব্যঙ্গ হাসি হাসিব কৌতুকে।

বুধ

দীর্ঘ এক বর্ষ মাঝে মনে পড়ে কত বিভাবরী
কেটে গেছে সুখস্বপ্নে ! আজি তুমি নবরূপ ধরি
আমারে রাখিবে দূরে ? লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে
তব পাশ হতে আমি ফিরে যাব নিজ গৃহপানে
ধিক্কৃত জীবন লয়ে ? এই যদি ছিল অভিলাষ,
নারীরূপে, প্রিয়ারূপে কেন করেছিলে পরিহাস ?

ইলা

পরিহাস নহে প্রিয়, সৃষ্টির এ অনিয়ম মাঝে
নারীদেহে যতটুকু মোর সাধ্য ছিল, শঙ্কালাজে
নিঃশেষে করেছি তাহা দান, তার বেশী কিছু নহে।
কামনার যেই শিখা নারীদেহ-অন্তরালে রহে,
করি নাই নির্ব্বাপিত তারে। তুমি পতঙ্গের মত
মোর রূপবহ্নি মাঝে পড়েছিলে স্মর-শরাহত।

বুধ

তব রূপান্তর-কথা বল নাই ক্ষণিকের ভুলে
কোনদিন। রহস্যের যবনিকা ধর নাই তুলে।
জেনেছিনু এতকাল, আমি নর, আর তুমি নারী,
বিহগ-বিহগীসম নিত্য মোরা গগন-বিহারী
পুলকমন্দির স্বপ্নে। যৌবনের দুরন্ত উচ্ছ্বাসে
বেঁধেছ তনুর স্বর্গে। নিশিগন্ধা-সুরভি নিশ্বাসে
কয়েছ প্রেমের কথা। মোহময় অক্লান্ত চুম্বনে
চঞ্চল করেছ মোরে। জ্যোৎস্নালোকে বসি উপবনে
তোমার কণ্ঠের মালা কণ্ঠে মোর দিয়াছ পরায়ে
কত-না আবেগ ভরে। বক্ষে মোর দিয়াছ জড়ায়ে
তোমার ও তনুলতা। অর্দ্ধরাতে সুখতন্দ্রাভরে
বাঁধিয়াছ আবেষ্টনে। আজি দীর্ঘ এক বর্ষ পরে
আসন্ন উষারে হেরি কহিলে পরম সত্যবাণী—
নারী নহ তুমি ! বসন্তের ফুলবনে বজ্র হানি
কিবা প্রয়োজন ছিল দাবানলে দহিবারে মোরে ?
তৃষার্ত্ত অধরে মোর বিষ কেন দিলে পাত্র ভরে ?

ইলা

আমাকে করো না দোষী। এতটুকু ছলনার স্থান
ছিল না'ক মনে মোর। নারীত্বের সর্ব্ব উপাদান
পেয়েছিনু এই দেহে। আনন্দ-বিষাদ-বেদনাতে
গড়িয়াছি এ জীবন। আমার এ মুগ্ধ আঁখিপাতে
দেখ নি মদির স্বপ্ন ? সারা অন্তরের ভালবাসা ?
জাগে নি কি প্রাণে তব মোর লাগি অসহ পিপাসা
শুক্লা চৈতালীর রাতে ? ওই দূরে স্বর্ণমেঘচ্ছায়ে
দিক্-চক্রবালে উষা ধীরে ধীরে আসে পায়ে পায়ে

নারীত্বের মৃত্যু-লিপি লয়ে হাতে, এ কি আশীর্ব্বাদ
ভাবিব জীবনে মোর ? নারীদেহে যে মধু আস্বাদ
লভিয়াছি যৌবনের ফেনায়িত পা'নপাত্র ভরি',
সে কি হবে স্বপ্ন আজ ? তিলে তিলে নিঃশেষিত করি'
দিয়েছি তনুর অর্ঘ্য, ক্ষমা কর হে দয়িত মোর,
এবার বিদায় দাও, ওই দেখ হয়ে এল ভোর !

বুধ

তোমারে বিদায় দোব, জাগে নাই মনে কোনদিন,
ভাবি নাই এই স্বপ্ন অতর্কিতে হয়ে যাবে লীন
নির্ম্মম আঘাতে, প্রিয়ে। কোনদিন শুনি নাই আমি
আজি তব অভিশপ্ত নারীত্বের সর্ব্বশেষ যামী।
অবিশ্রান্ত রহস্যের যে দুর্ভেদ্য ঘন অন্ধকার
তোমারে ঘিরিয়া ছিল, এত দিন কোন কথা তার
কেন বল নাই প্রিয়ে ? মিলনের এ শেষ বাসরে
রহস্য-মালিকাখানি ছিঁড়ে কেন দিলে রূঢ় করে ?

ইলা

আর ত সময় নাই ! নারীত্বের শেষ অর্ঘ্য দিয়া
তোমারে জড়ায়ে বুকে, বলে যাই "আমি তব প্রিয়া !"
—আসে কানে মৃত্যুসম আসন্ন উষার পদধ্বনি,
এ নব প্রভাতবুকে নবরূপ লভিব এখনি,
তবু কি গাহিতে হবে অভিশপ্ত জীবনের গান ?
কোথা-সে কুমার-বন, কোথা ভল্ল, অসি, ধনুর্বাণ,
কোথা মৃগয়ার সজ্জা, সব যেন দুঃস্বপ্নের মত
স্মৃতির দুয়ারে আসে ! তবু মনে জাগিছে নিয়ত
রাজার তনয় আমি, নারী আজ কোন্ ইন্দ্রজালে !
—এ দুঃসহ অভিশাপ কে লিখিল আমার এ ভালে ?

বুধ

তব অভিশাপ-কথা হে দয়িতে, আমারে শোনাও
অভিশপ্ত-উষামাঝে, জীবনের স্বপ্ন ভেঙ্গে দাও
সত্যের আঘাতে আজ, যবনিকা ধর প্রিয়ে তুলে
সে অতীত-রহস্যের। অতল বিরহ-নদীকূলে
তব স্মৃতি লয়ে আমি রব বসি' অনন্ত আঁধারে,
তুমি শুধু জেগে রবে নিত্য-ঝরা মম অশ্রুধারে !

ইলা

তরুণ বয়সে আমি বনে বনে শিকার-সন্ধানে
ভ্রমিতাম দিবানিশি। এ বিলাস তৃপ্তি দিত প্রাণে।
আমারি শায়কাহত বনমৃগ লুটাত ধরায়
সদ্যঃছিন্ন দূর্ব্বামুখে। মোর দৃপ্ত কৃপাণের ঘায়
নিহত ব্যাঘ্রীর বুকে ক্রীড়ারত ব্যাঘ্রশিশু আসি
চাহিত জাগাতে তা'রে। ছড়ায়ে মধুক পুষ্পরাশি
ভল্লুকী আসিত বেগে, নিষ্ঠীবন-সিক্ত বক্ষতলে
সবেগে দু'বাহু হানি, দীপ্তমুখ হিংসার অনলে,
আমি বধিতাম তারে, ধনুর্বাণ তুলি হেলাভরে
সকৌতুকে, লুটাত সে পদপ্রান্তে সুতীক্ষ্ণ নখরে
বিদ্ধ করি' মৃত্তিকায়, কৃষ্ণদেহ রক্তাক্ত বিশাল !
বন্য মহিষের শৃঙ্গে জড়াইয়া বেত্র-লতাজাল
পুচ্ছ ধরি টানিতাম, আতঙ্কে সে উন্মাদ নর্ত্তনে
চাহিত লভিতে মুক্তি। করতালি দিয়া ক্ষণে ক্ষণে
হিংসায় উন্মত্ত করি' বধিতাম লীলাচ্ছলে তারে।
বন্যবরাহের দন্ত ভগ্ন করি সুতীক্ষ্ণ কুঠারে
বধিতাম শিলাঘাতে। বন্যহস্তিযূথ হেরি বনে
করিতাম শরবৃষ্টি। আতঙ্কিত সুতীব্র বৃংহণে
তুলি' শুণ্ড ঊর্দ্ধশ্বাসে তরুলতা উন্মুলি' চকিতে
বৈশাখী ঝঞ্ঝার মত যেত তারা ছুটিতে ছুটিতে !
ভল্লাহত আসি যবে হিংসাতুর উন্মত্ত কেশরী
পড়িত সুদীর্ঘ লম্ফে অতর্কিতে মোর অশ্ব'পরি,
মৃত্যুভীত অশ্ব ছাড়ি নামিতাম ত্রস্তে ভূমিতলে,
কেশরীকেশররাজি এক হস্তে আকর্ষি সবলে
অন্য হস্তে হানিতাম মুহুর্মুহুঃ সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা
উদরে পঞ্জরে বক্ষে, যতক্ষণ তার প্রাণশিখা
না হইত নির্ব্বাপিত। চিতাব্যাঘ্রে কন্দুকের প্রায়
আকাশে ছুঁড়িয়া দিয়া বধিতাম ফেলি মৃত্তিকায়।

বুধ

তারপর কহ এবে কেমনে হইলে তুমি নারী।

ইলা

নিবিড় কাননতলে যেথা ভূর্জ্জ-চিত্রকের সারি
নবীন বসন্তে সাজি' কিশলয়-পুষ্প আভরণে
ধরেছে অপূর্ব্ব শোভা, তারি পার্শ্বে চঞ্চল নর্ত্তনে
ছুটিয়াছে নির্ঝরিণী। সেথা প্রসারিয়া ক্লান্ত দেহ
সমীর-ব্যজনছলে লভিতাম বনানীর স্নেহ।
একদা সহসা শুনি গীতিধ্বনি অপরাহ্ণকালে
সুখতন্দ্রা হ'তে জাগি হেরিলাম পত্র-অন্তরালে
স্নানার্থিনী অপ্সরীরা স্বর্গ হতে নেমেছে ধরায়
গিরি-নির্ঝরিণী তীরে। কণ্ঠচ্যুত মন্দারমালায়
জড়ায়ে বসনগুলি তরুতলে রাখি' ক্ষিপ্র করে,
ঝাঁপ দিল উচ্চ হাসি ফেনোচ্ছল আবর্ত্ত উপরে
ললিত লীলার ছন্দে। সৌরকরে ওঠে ঝলমলি
দ্যুতিময় শুভ্র তনু। নয়ন-অপাঙ্গে ওঠে জ্বলি
অনঙ্গের দীপশিখা। কলহাস্যে, অস্ফুট গুঞ্জনে
সলিল-প্রক্ষেপে সৃজি' ইন্দ্রধনু তপন-কিরণে

রহিল ক্রীড়ায় মগ্ন। রূপোজ্জ্বল উচ্ছল যৌবন
চঞ্চল-তনুর ছন্দে রক্তে মোর আনিল প্লাবন।
কুতূহলী দৃষ্টি লয়ে বেতসকুঞ্জের অন্তরালে
আমি রহিলাম স্থির। ক্লান্ত রবি হেমরশ্মিজালে
প্লাবিয়াছে নদীতট। লীলাশেষে ত্রস্ত পদ ফেলি
উঠিল অপ্সরীকুল। অন্তরাল হতে কর মেলি'
নিঃশব্দে তুলিয়া লয়ে একে একে বস্ত্রগুলি ধীরে
রাখিনু কৌতুকভরে। সদ্যস্নাত-শুভ্র তনু ঘিরে
গোধূলি-কিরণ-হাসে। তটে উঠি চাহি চারিপাশে
না হেরি' বসনগুলি অন্বেষণ করে তারা ত্রাসে
উচ্ছল যৌবন-ছন্দে। সচকিতা অপ্সরার দল
চরম দুর্দ্দশামাঝে কেঁদে ওঠে আতঙ্ক-বিহ্বল!

বুধ

এ কি অপরূপ কথা! ভাসে যেন চক্ষুর উপর
অপূর্ব্ব সে চিত্রগুলি। বল প্রিয়ে কিবা তার পর?

ইলা

কুঞ্জের বাহিরে আসি' বস্ত্রগুলি লয়ে মোর হাতে
কহিলাম সবিনয়ে—"ওই রূপ-কিরণ-সম্পাতে
ধন্য হ'ল মর্ত্ত্যভূমি। চিরযৌবনের বহ্নিশিখা
জ্বালিয়াছে প্রাণে মোর অনির্ব্বাণ কামনা-বর্ত্তিকা।
লহ বস্ত্র, কর ক্ষমা, ও প্রস্ফুট যৌবন-মঞ্জরী
দেখায়েছে স্বর্গস্বপ্ন মর্ত্ত্যভূমে দুটি নেত্র ভরি!"
সহসা শুনিনু কানে মৃত্যুসম রূঢ় অভিশাপ—
"ওরে মূঢ়, স্নানরতা সুরাঙ্গনা দেখিবার পাপ
হবে না ক্ষালিত তোর। আজি হতে নারীদেহ ধরি
এক বর্ষ র'বি তুই, অনুতপ্তা দিবসশর্ব্বরী!"
মুহূর্ত্তে বসন পরি' চলে গেল অপ্সরার দল
মেঘের সোপানপথে গোধূলি-আলোকে রূপোজ্জ্বল।
আমি উঠিলাম হাসি'। এ বিশ্বের সৃষ্টির বিধান
কে পারে করিতে ব্যর্থ? যেই দেহ বিধাতার দান,
তুচ্ছ নারী-অভিশাপে হবে আজি তার রূপান্তর?
এ শুধু স্বর্গের দম্ভ, অপ্সরার কৌতুক সুন্দর।
বসিলাম নদীতটে। তরঙ্গের মৃদু কলকলে
উদগ্র কামনা মোর আনে ছবি সুখতন্দ্রাচ্ছলে
অপ্সরা-লীলার স্মৃতি। ধীরে ধীরে খুলিয়া উত্তরী
পাতিলাম শয্যা মোর তটোপান্তে শ্যামশষ্প 'পরি।
উত্তরী খুলিতে গিয়া মহাতঙ্কে শিহরিয়া উঠি
হেরিলাম বক্ষে মোর কমল-কলিকা ওঠে ফুটি
নারীত্বের চারুচিহ্ন। দীর্ঘ বেণী সর্পিল গতিতে
আবরিল পৃষ্ঠ মোর। জঘন-নিতম্ব আচম্বিতে
ধরিল নূতন রূপ। ওষ্ঠপ্রান্তে শ্মশ্রুরেখা ক্ষীণ
জানি না কখন হায়, ধীরে ধীরে হইল বিলীন!
কিণাঙ্কিত দৃঢ় কর কেন হ'ল কুসুম-কোমল
বুঝিতে না পারি কিছু। সারা দেহে লাবণ্য উচ্ছল
ধরিল নূতন শোভা। বার বার উঠিনু শিহরি,
বুঝিলাম নারী আমি। দাঁড়ালাম শ্যামতট 'পরি
হেরিবারে প্রতিবিম্ব নিস্তরঙ্গ স্বচ্ছ নদীজলে।
নারী আমি! যেন নদী উপহাসি' মৃদু কলকলে
তুলিল সে প্রতিধ্বনি! রূপময়ী তরুণী মোহিনী
কে যেন বলিছে মোরে—"আমি সখা, তোমারি সঙ্গিনী,
চিনিতে পার নি মোরে? তোমারি অন্তরতল হতে
প্রচ্ছন্ন কামনা আজি রূপ ধরি' রূপান্তর-স্রোতে
গড়েছে নূতন কায়া। রহি নরদেহ-অন্তরালে
যে শাশ্বত-নারী তার অতৃপ্ত তৃষার মায়াজালে
ঘিরে রাখে আকিঞ্চন, আজি তার বাহিরিল ছায়া,
তোমারি সত্তার মাঝে গড়ে নিল নব নারী-কায়া!"
অস্ত গেল রক্তরবি। ঘনকৃষ্ণ দুর্ভেদ্য কানন
আমারে গ্রাসিতে আসে! বেড়ে চলে বক্ষের স্পন্দন
নারীর স্বভাবজাত। যেন মোরে করে আমন্ত্রণ
অদূরের গিরিগুহা রাত্রিটুকু করিতে যাপন
তাহার নির্জ্জন বক্ষে। ছুটে গিয়া অভ্যন্তরে তার
আতঙ্কে লুকানু দেহ। ধরণীর বুকে অন্ধকার
ধীরে ধীরে এল নামি। আমি শুধু রুক্ষ শিলাতলে
একাকী রহিনু পড়ি বেদনার তপ্ত অশ্রুজলে!

বুধ

অনন্ত সৃষ্টির মাঝে রহস্যের মহা-পারাবার
কি অদৃশ্য রত্নরাজি লুকাইয়া রাখে বক্ষে তার
কে পায় দেখিতে তারে? মানবের জ্ঞান ও বিজ্ঞান
সে চলোর্ম্মি-অতলের কোনদিন পাবে না সন্ধান!

ইলা

প্রভাত হইল ধীরে বনবিহঙ্গের কাকলীতে,
উঠিল নূতন সূর্য্য বনশীর্ষ-অঙ্কিত প্রাচীতে
প্রথম নারীর চক্ষে! গুহাদ্বারে ধরেছে মুকুল
তাম্রপর্ণী লতাগুলি, নারীচক্ষে সে শোভা অতুল
জাগাল নূতন সাধ। কলস্বনা সর্পিলা তটিনী
বন-অন্তরালে তুলি নৃত্যছন্দে মঞ্জীর-শিঞ্জিনী
শুনাল নূতন সুর। লঘুমেঘ-প্লাবিত অম্বরে
স্বর্ণ-শতদলরাজি ফুটে উঠি' যেন থরে থরে
সৃজিল নূতন স্বর্গ। নারীত্ব যে এতই মধুর
ভাবি নাই কোন দিন। নিজ-অঙ্গ-দর্শন-বিধুর

কুতূহলী নেত্র মোর নিষ্পলক রহিল বিস্ময়ে,
নারীত্ব নূতন রূপে দেখা দিল কি রহস্য লয়ে!
কোন্ মধুবসন্তের পুলকিত রোমাঞ্চ-হিল্লোলে
কাঁপিয়া উঠিল তনু। ধমনীতে উন্মাদ কল্লোলে
প্রতি রক্তবিন্দু যেন তৃষার্ত্ত বুভুক্ষু হয়ে কাঁদে,
তবু জাগে শিহরণ যৌবনের মুক্ত আশীর্ব্বাদে!
এত রূপ, এত আলো কে জানিত ছিল ধরণীর?
এত মোহ, এত মায়া, এত প্রেম বিহ্বল নিবিড়
ছিল এ মাটির স্বর্গে? এত তৃষা বিলোল নয়নে
কেন এল? তনু আজি কেন চাহে নিবিড় বন্ধনে
লভিতে পরশ কার? গিরি, নদী, পুষ্পিত বনানী
রূপ-রস-গন্ধ-শব্দে কি বারতা দেয় মোরে আনি
কোন্ স্বপ্ন-জগতের! সারা অঙ্গে উঠেছে উচ্ছ্বাস
অকারণ আনন্দের। বনের শীতোষ্ণ মৃদুশ্বাস
চৈতালী বসন্ত বায়ু ছড়াইয়া দেয় সর্ব্বদেহে।
ধরণীর প্রতি তৃণ, প্রতি পুষ্প প্রসারিত স্নেহে
আমারে জড়াতে চায়! সৃষ্টির আদিম তৃষা বহি'
আমি যেন দাঁড়ায়েছি নারীরূপে চির রূপময়ী।

বুধ

অপূর্ব্ব কাহিনী তব। সৃষ্টির এ অনিয়ম মাঝে
বিধাতার কোন্ বর এল নামি কি রহস্যসাজে
কে পারে বলিতে প্রিয়ে! তবু যেন হস্ত বিধাতার
নূতন সৃষ্টির তরে চঞ্চল হয়েছে বার বার
অভিনব কল্পনায়। শেষে হেরি' আপনার ভুল,
আপনি ভাঙিয়া দেয় নিজ হাতে-গড়া সে পুতুল!

ইলা

আসিলাম নদীতটে। স্নানরত পুরুষ সুন্দর
হেরিনু তোমারে আমি। তুমি তুলি নেত্র-ইন্দীবর
বিস্ময়ে শুধালে মোরে—"হে রূপসি, কাননচারিণী
কিবা নাম, কোথা বাস? রূপোজ্জ্বল-যৌবনধারিণী
তুমি কি স্বর্গের কেহ? নিত্য আমি এই নদীনীরে
স্নান করিবারে আসি, কোনদিন তোমায় সুধীরে,
দেখি নাই। আমি বুধ ব্রহ্মচারী, যদি শুচিস্মিতে
আমারে করুণা কর, আমি চির-প্রেমমুগ্ধ চিতে
তোমারে করিব সাথী। বনমাঝে কুটির আমার
রয়েছে অদূরে দেবি, সেথা মোরা পুষ্প-মালিকার
করি' বিনিময় দোঁহে, হব বদ্ধ উদ্বাহ-বন্ধনে,
প্রত্যাখ্যান করো না'ক অয়ি তন্বি, অয়ি সুলোচনে!"
ধরিলে আমার কর। তব স্নিগ্ধ মুগ্ধ দৃষ্টিপাতে
চাহিলে আমার পানে। সেই চারু-দৃষ্টির আঘাতে
কাঁপিল হৃদয় মোর, কাঁপিল যৌবন লাজহীন।
প্রথম পুরুষ-কর-স্পর্শে জাগে উল্লাস নবীন
সর্ব্ব অঙ্গে! মনে হ'ল আমি যেন আদিম সে নারী
শুনিলাম নরস্তুতি! নর যেন হইয়া ভিখারী
করে মোর আরাধনা! এত তৃপ্তি, এত আকিঞ্চন
কোথায় লুকায়ে ছিল? নারীর এ উন্মুখ যৌবন
পুরুষ বেসেছে ভাল, শুধু এই প্রচ্ছন্ন চেতনা
ব্যাকুল করিল মোরে, জাগাইল অজানা কামনা!

বুধ

মনে পড়ে বনপথে মধুক-মঞ্জরী ঝরে ধীরে
উতল দক্ষিণ বায়ে, তারি মাঝে বেপথুমতীরে
করিলাম সাথী মোর। কত ভালবাসিলাম তারে
দীর্ঘ এক বর্ষ ধরি। যৌবনের ঐশ্বর্য্য-সম্ভারে
সাজাল সে তনু-অর্ঘ্য। রূপে প্রেমে পুলকে ভরিয়া
দিল সে আমার স্বর্গ। কণ্ঠ হতে যে মালা ঝরিয়া
লুটাত শয্যার 'পরে, তারে লয়ে আবার সোহাগে
পরাতাম লীলাশেষে, অচঞ্চল প্রেম-অনুরাগে।
নির্জ্জন কুটীরতলে রহিতাম মোরা দুটি প্রাণী
প্রেমের গুঞ্জন-রত। অর্দ্ধরাতে ঘন অরণ্যানী
পত্রের মর্ম্মরছলে তুলিত যে প্রতিধ্বনি তার!
রাত্রির রহস্যমাঝে কাঁপিত যে কুটীরের দ্বার
উদ্দাম বৈশাখী ঝড়ে, তুমি প্রিয়ে আতঙ্কবিহ্বলা
আমারে জড়ায়ে বক্ষে রহিতে যে স্তব্ধা অচঞ্চলা!

ইলা

দেহে মনে নারী আমি, শুধু এই তীব্র অনুভূতি
অধীর করিল মোরে। প্রসাধনে সাজিলাম দূতী
শত উগ্র কামনার। মনে হ'ল আমি সেই নারী
যার দ্বারে এ নিখিল দাঁড়ায়েছে অমৃত-ভিখারী!
চির-আরাধিতা নারী সাজায়েছে সৃষ্টির পসরা
কল্যাণ-মধুর স্পর্শে, ধন্য হ'ল রূপময়ী ধরা।
হে দয়িত, জান না কি, আমি আছি তাই যে সুন্দর
চন্দ্রমা তোমার চক্ষে। আমি আছি তাই মনোহর
ধরার বসন্ত-সাজ। আমি আছি তাই স্রোতস্বিনী
শোনায় তোমার কানে নটিনীর নূপুর-শিঞ্জিনী।
ফুল সে যে স্পর্শ মোর! প্রভাতের বিহগ-কাকলী
সে যে সুর এ কণ্ঠের। মলয়পর্ব্বত হ'তে চলি'
যে মৃদুল সমীরণ স্নিগ্ধ করে তৃষার্ত্ত ভুবন,
সে যে তব কল্পলোকে আমারি ব্যাকুল আলিঙ্গন!
আমি যে রহস্যময়ী প্রেমোৎপলা চির-মায়াবিনী,
আমি সৃজি ইন্দ্রজাল, অমারাতে জ্যোৎস্না-যামিনী!

বুধ

মিথ্যা নহে তব বাণী। মোর বিদ্যা, ধ্যান, জ্ঞান, ধৃতি,
খুঁজেছে তোমার মাঝে অগ্নি তন্বি, সুখাশ্রয় নিতি!
মনে হ'ত বার বার, ও দুটি অতল কালো চোখে
দেখেছি যে ইন্দ্রধনু আমার কামনা-কল্পলোকে!
মনে হ'ত তব তনু-স্পর্শ-লোভে চঞ্চল বিধুর
আমার উন্মত্ত স্নায়ু, সব জ্ঞান করে দিত দূর
সংহিতা ও দর্শনের। মনে হ'ত যুগ যুগ ধরি
তোমার তনুর স্বর্গে যাপি আমি মধু-বিভাবরী।

ইলা

এখনো মেটে নি তৃষা? সত্য বল চেয়েছিলে কারে?
শুধুই চেয়েছ দেহ, কখনো কি চেয়েছ আমারে?
প্রেমের অমৃতস্পর্শে—সঞ্জীবিত তনুখানি তুলি
ধরেছি সম্মুখে তব, তুমি তার ত্বক্-পেশীগুলি
শুধুই করেছ ভোগ। নিলে কোথা অন্তরের সুধা?
দেহের আকাঙ্ক্ষা মাঝে জাগে নাই দেহাতীত ক্ষুধা?
...হয়েছে প্রস্ফুট উষা, রূপান্তর আসিবে এখনি,
তখনো বাসিবে ভাল? আমারে কি জড়াবে তেমনি
তোমার বাহুর ডোরে? এতটুকু ঘৃণা-অবহেলা
করিবে না মোরে আর? ভাবি মনে অদৃষ্টের খেলা
নিজেরে সান্ত্বনা দেবে? হে দয়িত, বল সত্যবাণী
চাহ না আমার মন, চাহ শুধু নারী-দেহখানি?
সেই দেহ-রূপান্তরে তুমি যাবে চলি দূরান্তরে
কোনদিন ফিরিবে না আর। শুধু 'চির-[illegible]
ভাবিবে যে প্রতারিত তুমি। হায়, কেহ বুঝিল না,
কে পেল জীবনে তার অদৃষ্টের চির-প্রতারণা!
আমার এ নারীদেহে যা-কিছু করেছ তুমি দান
তোমার দেহের অর্ঘ্যে, চিরদিন রহিবে অম্লান
স্মৃতি তার। দিশাহারা কামনার অসহ তৃষায়
যা-কিছু পেয়েছি আমি যৌবনের মরু-বালুকায়
হবে কি নিশ্চিহ্ন তাহা? নিঃসঙ্গ কণ্টকগুল্ম মাঝে
একান্তে একটি ফুল ফুটিবে না বেদনার সাজে?
যদি কভু জ্যোৎস্নাভরা রাত্রি হয় যৌবন-উতলা,
তুমি কি স্মরিবে মোরে? যদি কভু নামে রূপোজ্জ্বলা
একটি বসন্ত-উষা তব শান্ত কুটীর-প্রাঙ্গণে,
তুমি কি ডাকিবে মোরে? যদি কভু ফুলহারা বনে
একটি লুকানো ফুল তব তরে পথ চেয়ে থাকে,
তারে কি ধরিবে বুকে? যদি কভু কৃষ্ণচূড়াশাখে
তোমারি স্মৃতির স্বপ্ন মালা হয়ে ওঠে দুলি' দুলি',
তুমি কি পরশে তব শুভ্র তার করিবে গোধূলি?

নিবিড় তমিস্রামাঝে এতটুকু উল্কা-ঝরা আলো
তুমি ত দিয়েছ, প্রিয়! জানি আমি সকলি ফুরালো
অভিশপ্ত এ উষায়। তবু যেন অভিনয়-শেষে
খুলি মোর নারী-সজ্জা দাঁড়ায়েছি অন্ধকারে এসে
জনহীন রঙ্গমঞ্চে। যা-কিছু করেছি অভিনয়
সমগ্র অন্তর দিয়ে, তার স্মৃতি রহিল অক্ষয়!

বুধ

আবার ফিরিয়া পাবে অতীতের পুরুষ-মুরতি,
চলে যাবে নিজ রাজ্যে, এ যে তব আকাঙ্ক্ষিত অতি।
কেন তবে দীর্ঘশ্বাস, কেন তবে অধীর হৃদয়
অতীতের স্মৃতিমাঝে? যে নারীত্ব অভিশাপময়
তাহারে করিবে ত্যাগ, এ যে তব হবে আশীর্ব্বাদ,
কেন তবে অশ্রুজল, অন্তরের কেন এ বিষাদ?

ইলা

তুমি প্রাজ্ঞ, স্বর্গচারী, মানবের অদৃষ্টদেবতা,
তুমি কি বোঝনি আজো রমণীর অন্তরের কথা?
হিমমৌলি গিরিমালা আপনার সঞ্চিত তুষারে
স্নেহ-নির্ঝরিণী সৃজি' অর্ঘ্য দেয় নিঃস্ব মৃত্তিকারে,
ধরণী শ্যামলরূপা ফলে ফুলে শস্যে রূপময়ী
ছড়ায় করুণাধারা গিরির সে আশীর্ব্বাদ বহি'
জীবের মঙ্গলতরে। দূরে গিরি নিঃসঙ্গ একাকী
তুষার-ঝটিকাবুকে, চেয়ে থাকে স্নেহস্নিগ্ধ আঁখি
শ্যামলা ধরিত্রীপানে। এতটুকু আনন্দের কণা
পায় না সে কোনদিন, মেঘ-বজ্র তুলি অগ্নিফণা
নিয়ত আঘাত করে। শিরে বহি' অশোধ্য সে ঋণ
অনাদি যুগের মৌনী স্তব্ধ হয়ে আছে চিরদিন।
আমার অন্তরলোকে নবরূপে নারীত্ব মহান্
আমারে দিয়েছে বর, দেখায়েছে পথের সন্ধান।
কি দিয়েছ তুমি তারে? শুধু কামনার শতধারে
পঙ্কিল করেছ পথ। নিত্য তুমি তনু-অভিসারে
আমারে চেয়েছ কাছে। তবু যেন তারি মাঝে মোর
স্নেহাচ্ছন্ন ধ্যানলোকে জগতের কল্যাণ-বিভোর
একটি নারীর প্রাণ চেয়েছে যে সহস্রবন্ধন।
অনন্ত তৃষ্ণার মাঝে সবচেয়ে বড় আকিঞ্চন—
জগৎ বাসিব ভাল। সেই সাধ না পুরিতে হায়,
নারীত্ব বিলীন হবে চিরতরে এ নব উষায়!
এবার বিদায় দাও, যেন অনাগত কালস্রোতে
মোর এ দুঃসহ স্বপ্ন মুছে যায় তব স্মৃতি হ'তে।

বুধ
হোক্ তবে অবাঞ্ছিতে, অনন্ত তিমিরবুকে লীন
আমার প্রেমের স্বর্গ। অতীতের রূপোজ্জ্বল দিন
দুর্যোগের রাত্রি হয়ে দিক দেখা জীবনে আমার।
অনন্ত মরুর বুকে যে ক্ষণিক মৃগতৃষ্ণিকার
দেখেছি মধুর স্বপ্ন, তারি লাগি পশ্চাতে ফিরিয়া
আর চাহিব না কভু। মুহূর্ত্তের জ্যোতি বিচ্ছুরিয়া
যে উল্কা মিলায়ে গেল, তারি লাগি নভোপানে আর
কভু রহিব না চাহি। তবু মোর অনন্ত তৃষ্ণার
একটি সার্থক লগ্নে তৃপ্ত হোক্ বিদায়ের ক্ষণ,—
নারীত্বের মৃত্যুদ্বারে দাও প্রিয়ে, একটি চুম্বন!

[বুধ ইলার দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়াই সহসা আতঙ্কে চিৎকার করিয়া সরিয়া আসিলেন। উষালোক প্রস্ফুট হইয়া উঠিল। ইলার নারীদেহ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। বুধ নত মস্তকে নিজ বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া দ্রুত কুটীর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আশ্রমের বাহিরে প্রভাত-সমীরণে আন্দোলিত বেণুবনে একটা করুণ সুর বাজিতে লাগিল।]

বিনোবা

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

কর্ম্মসমাধিতে

ওয়াইতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা শেষ হইল। সুরু হইল চারি শত মাইলব্যাপী মহারাষ্ট্র পর্য্যটন। পর্য্যটনান্তে বিনোবা আশ্রমে রওনা হইলেন। পথিমধ্যে বরোদায় গেলেন। তাঁহার বন্ধুগণ গীতার প্রকাশ্য আলোচনার আয়োজন করেন। বরোদার সে প্রবচন অতুলনীয় হইয়াছিল। শ্রোতারা সকলে তুষ্ট, মুগ্ধ। তাহাদের বলিতে শোনা গেল "ঘর পালিয়েছিল। পালানো সার্থক হয়েছে।"

বিনোবা আশ্রমে ফিরিলেন। কাজে লাগিলেন। কায়িক কর্ম্ম ও মানসিক কর্ম্ম সমানে চলিল। এক দিকে ঝাড়ুদার, সূপকার ও মলমূত্র অপসরণকারী মেথর, অপর দিকে আশ্রম-বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গুজরাট বিদ্যাপীঠের ধর্ম্মোপদেষ্টা, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক।

আশ্রম-জীবনে আবার ছেদ পড়িল। ছেদ পড়িল বলা ঠিক হইবে না। জীবন সেই চলিল। দিনকয়েকের জন্য বাহিরে—বাড়ীতে যাইতে হইল।

মহাযুদ্ধ (প্রথম) শেষ হইয়াছে। মহাযুদ্ধের প্রসাদ বা প্রমাদ নানা দেশকে তখন ভুগাইতে আরম্ভ করিয়াছে। অন্য অনেক দেশের মত ভারতের ঘরে ঘরে ইনফ্লুয়েঞ্জা। কে কাহাকে দেখে। কে কাহার সেবা করে। মৃতের সংকার করিতে পর্য্যাপ্ত লোকের অভাব। বিনোবার বিদ্যার্থীমণ্ডলের বন্ধুগণ এ কার্য্যে (রোগীসেবার কার্য্যে) অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা ঘরে ঘরে যান, খোঁজখবর নেন, রোগীর পরিচর্য্যা করেন, মৃত-সংকার করেন। বিনোবাদের বাড়ী গিয়া তাঁহারা দেখেন বিনোবার বাবা অসুস্থ, ছোট ভাই দত্ত জ্বরে ধুকিতেছে, মা শয্যাশায়ী। বিনোবাকে তাঁহারা এ খবর দিলেন, আসিতে লিখিলেন। বিনোবা নিরুত্তর। গান্ধীকে তাঁহারা জানাইলেন। গান্ধী বিনোবাকে ডাকিলেন ও বলিলেন, "আমরা আশ্রমবাসী। কোন লোকবিশেষের প্রতি আমাদের বিশেষ প্রীতি আছে তা নয়। এ মুহূর্তে তোমার উপর বিশেষ কোন দায়িত্ব ন্যস্ত নয়। আর সহজপ্রাপ্ত সেবা করা কর্ত্তব্য। অতএব তুমি বাড়ী যাও। রোগীদের পরিচর্য্যা কর।

বিনোবা বাড়ী গেলেন। মাতৃচরণে মস্তক স্পর্শ করাইলেন। মা বলিলেন, "এসেছ? কাজ ফেলে এলে? কেন এলে?" কথা কয়টি তড়িৎপ্রবাহের মত অন্তরে বিঁধিল। অশ্রুহীন বেদনায় হৃদয় মথিত হইল। অনুক্ত শব্দে বিনোবা মাতৃচরণে ক্ষমাভিক্ষা করিলেন। মায়ের কোমলতায় মায়ের সেবা করিতে লাগিলেন।

মা চলিয়া গেলেন। ১৯১৮ সন।

প্রেতকৃত্য। পিতা নরহরপন্ত ব্রাহ্মণের দ্বারা, তথাকথিত ব্রাহ্মণের দ্বারা মন্ত্র পড়াইবেন। পুত্র বিনায়কের তাহা ভাল লাগিল না। মুখাগ্নি তিনি করিলেন না। মায়ের ঘরে সমস্তটা সময় গীতা পাঠ করিলেন।

বিনোবা আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন। সঙ্গে লইলেন মায়ের একখানি শাড়ী আর মায়ের নিত্য পূজার দেবতা অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি। রাত্রে যখন শুইতেন, শাড়ীর উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেন। ইতিমধ্যে খাদির প্রবর্ত্তন হইল। খাদি দেশপ্রেমের প্রতীক হইল, জাতীয়তা-বোধের নিদর্শন হইল। শাড়ীখানি ছিল মিলে তৈরি। অতএব রাখা যায় না। এক প্রভাতে বিনোবা শাড়ীখানি সবরমতীর পুণ্যপ্রবাহে সমর্পণ করিয়া আসিলেন।

অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি তিনি শ্রীকৃষ্ণদাস গান্ধীর মাতা কাশীবেনের জিম্মা করিয়া দিলেন। কাশীবেন ঐ মূর্ত্তির নিত্য পূজা করেন। যখনই বিনোবা ওয়ার্দ্ধায় যাইতেন—অন্নপূর্ণার মূর্ত্তির কাছে দাঁড়াইতেন, প্রণাম করিতেন।

'বিচারপোথী'তে বিনোবা লিখিয়াছেন :

"মা, তুই আমায় যা দিয়েছিস, কেউ তা দেয় নি। কিন্তু মৃত্যুর

পরে তুই যা দিচ্ছিস, জীবিতকালে তুইও তা দিস নি। ব্যস্, আত্মার অমরত্বের এইটুকু প্রমাণ আমার কাছে যথেষ্ট।"

আর এক জায়গায়:

"মা চলে গেছেন। কিন্তু তাঁর স্নেহের পরশ অন্তরে নিত্য অনুভব করি। অমরত্বের ইহা প্রমাণ নয় ত কি?"

২

ওয়াই হইতে আশ্রমে ফেরার পরে বিনোবার চক্ষু নেহাত খারাপ হইয়া যায়। দৃষ্টিশক্তি এত ক্ষীণ হইয়াছিল যে, ক্ষুদ্র জিনিস দেখিতে পাইতেন না। পাঠ্যাবস্থায় বরোদায় কৃচ্ছ্রসাধন করিতেন। ওয়াইতে কৃচ্ছ্রসাধনের মাত্রা আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। অত্যধিক অধ্যয়ন ত পূর্ব্বাপর চলিতেছিলই। আর জন্মাবধিই বিনোবার শরীর দুর্ব্বল। কারণ যাহাই হোক চক্ষু একান্ত খারাপ হইয়া গিয়াছিল। চশমা লইতেছিলেন না। অবশেষে গান্ধী চশমা আনাইয়া দেন।

চক্ষু খারাপ হওয়ার প্রসঙ্গে কোন বন্ধুকে বিনোবা একটি ক্ষুদ্র কাহিনী বলিয়াছিলেন। কাহিনীটি এই:

"আশ্রমে যে ঘরে থাকতাম সে ঘরে অসংখ্য লাল পিঁপড়ে ছিল। দেখতে পেতাম না। চশমা এল। আর যেখানে সেখানে পিঁপড়ে দেখতে লাগলাম। মনে হ'ল, আজ পর্য্যন্ত কত পিঁপড়ে যে পায়ে দলেছি তা ভগবান জানেন। বহিশ্চক্ষুর সম্বন্ধে যে কথা, বুদ্ধি সম্বন্ধেও সে কথা। চিন্তা যদি স্বচ্ছ না হয়, জ্ঞানচক্ষু যদি অন্ধ হয় তবে আমাদের দ্বারা কত অনুচিত কর্ম্ম যে অনুষ্ঠিত হয় তার সীমাসংখ্যা নেই।"

১৯১৯। রাউলাট বিল উপস্থাপিত হইল। গান্ধী বিরোধিতা করিলেন। আন্দোলন সুরু হইল। বিনোবা তখন একবার নিজ জন্মস্থান গাগোদে যান। অসহযোগ বিষয়ে পেণে বক্তৃতা করেন। আশ্রমে ফিরিবার সময় খুড়তুত ভাই রঘুনাথকে সঙ্গে লইয়া আসেন।

বিনোবা অসহযোগ অন্দোলনে যোগ দিলেন। বক্তৃতাও করিতেন। আর হইতও তাহা ওজস্বিনী, আবেগময়ী। কিন্তু লোকমনে প্রেরণা সৃষ্টি করার যথেষ্ট শক্তি থাকিলেও আন্দোলনে মুখ্য অংশ গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার লক্ষ্য ছিল অন্যত্র। তাঁহার বাল্যসহচর শ্রীরঘুনাথ শ্রীধর ধোত্রের (যদিও রঘুনাথ বিনোবাকে দাদা বলেন) কথায় তখনকার বিনোবার পরিচয় এইরূপ:

"অসহযোগ আন্দোলনের দিন। নব বিপ্লবের প্রবাহ দিন দিন পুষ্ট হচ্ছিল। ঐ আন্দোলনকে শক্তিশালী করার, এগিয়ে দেওয়ার মত বক্তৃতাদি দেওয়ার গুণ বিনোবার সবিশেষ ছিল। তবু আন্দোলনের পুরোভাগে তিনি আসিতেন না। আন্দোলনের সহিত যুক্ত ত ছিলেন বটেই; তবুও যেন একটু আলাদা। আশ্রমের জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপনাকার্য্যের উপর ছিল সমধিক দৃষ্টি। কোন লোক তাঁকে বলেন, 'এ আন্দোলনে তোমার মত শক্তিশালী লোকের একান্ত দরকার।'" তদুত্তরে বিনোবা বলেছিলেন:

"আমি পরবর্ত্তী পর্য্যায়ের জন্য লোক সৃষ্টি করছি। আমা[র] কাজ এ পর্য্যায়ে নয়, আগামী পর্য্যায়ে।"

"আর সে দৃষ্টি থেকে তিনি কর্ম্মী সৃষ্টি করছিলেন।"

৩

অসহযোগ আন্দোলনের দিনে যমুনালাল বাজাজ গান্ধী[কে] ধরিলেন ওয়ার্দ্ধায় আশ্রম করিতে হইবে। বিনোবাকে চাহিলেন গান্ধী সম্মত হইলেন। ১৯২১ সাল। বিনোবা সবরমতী হই[তে] ওয়ার্দ্ধায় আসিলেন। সঙ্গে আসিলেন ছাত্র-শিষ্য বল্লভস্বামী [ও] শ্রীকৃষ্ণদাস গান্ধী। মোঘেজী, ধোত্রেজী, গোপাল রাও কা[...] প্রভৃতিও আসিলেন। সবরমতীতে তাঁহারা গিয়াছিলেন বিনোবা[র] টানে। ওয়ার্দ্ধায়ও তাঁহারা আসিলেন বিনোবারই টানে। কিশোর জনকয়েক আসিয়া জুটিলেন—দত্তবা দাস্তানে, কুন্দর দীবান, মনো[হর] দীবান, বালুঙ্কর, প্রভাকর। দক্ষিণ হইতে আসিলেন সত্যে[...] জ্ঞান-বিজ্ঞানে এই নবীনদের বিনোবা প্রবীণ বানাইলেন। বি[...] কার্য্যে তাঁহাদের নিপুণ করিয়া তুলিলেন। রুচি ও যোগ্যতা অ[নু]সারে ভিন্ন ভিন্ন কাজে তাঁহাদের লাগাইলেন। সারা দিনই কাজ কখনও মাঠে, কখনও তাঁতে, কখনও কুয়ায়। আর ঐ কর্ম্ম করি[তে] করিতে তাঁহারা পাইতেন নানা বিষয়ে শিক্ষা, বেদ-বেদান্তে দীক্ষা দত্তবা দাস্তানের কথায় সেই শিক্ষা-দীক্ষার স্বরূপ ছিল এই:

"১৯২৭ সনে আমি বিনোবার আশ্রমে যাই। আমার ব[য়স] তখন চৌদ্দ। আগেই জানতাম আশ্রমে স্কুলের পদ্ধতিতে শি[ক্ষা] দেওয়া হয় না। সারা দিন কাজ আর কাজ। শিল্পোদ্যো[গের] মধ্যে বয়নবিদ্যা আর গৃহকর্ম্মের মধ্যে রন্ধনক্রিয়া।

"সকাল-সন্ধ্যায় বিনোবার প্রার্থনা-প্রবচন, দুপুরে খাওয়ার প[র] আধ ঘণ্টা ধান-নিড়ানোর কথা, আর সান্ধ্য আহারের পরে আগুনে[র] ধারে বসে গল্প, এই ছিল পাঠের ক্রম। গীতার সমবেত ক্লাস হ[ত] আধ ঘণ্টা। বড় বড় লোকের আলাপ-আলোচনা শুনতে পেতা[ম]। সর্ব্বোপরি, বিনোবা সহজাত শিক্ষক। ঘরে—চার-দেয়ালে [...] ঘরে, ক্লাস বসত না বটে; কিন্তু যেখানে বিনোবা সেখানেই জ্ঞা[ন] চর্চ্চা। টানা হাঁটতে হাঁটতে শুনতে পেতাম বিনোবার মুখে প্রাচী[ন] কালের বেদান্তের কথা, শুনতে পেতাম কবীরের দোঁহার আলোচনা

"প্রভাতে সূর্য্য কিরণ বিকিরণ করেন, দিনান্তে সমাহরণ করেন এ তুলনা দিয়ে বিনোবা কৌতুক করে আমাদের বলতেন, "[...] সকালে তোমরা টানা হাঁটবে আর সন্ধ্যায় বোনা শেষ করবে বিনোবার সান্নিধ্যে কান থাকত শ্রবণোন্মুখ, হৃদয় থাকত গ্রহণো[ন্মুখ] ফলে বিনা আয়াসে জ্ঞান লাভ হ'ত।"

বাহিরে ইঁহাদের পরিচয় নাই। গুরু বিনোবারও এক সম[য়] ছিল না। পরিচয় নাই-বা থাকিল, তাঁহাদের অনেকে আজ নি[...] বান বড় কর্ম্মী, বড় পণ্ডিত। বিনোবা বহু কর্ম্মী সৃষ্টি করি[য়া]ছেন। এত অধিক কর্ম্মী আধুনিককালে আর কেহ সৃষ্টি করি[য়া]ছেন কিনা সন্দেহ। অথচ সাধারণ অর্থে যাকে লোক-সংগ্রহ ব[...]

বিনোবার বৃত্তি ও বিচার ছেলেবেলা হইতে তদনুকূল ছিল না। বিনোবার লোক-সংগ্রহের কথা শ্রীশ্রীধর ধোত্রের কথায় বলা ভাল :

"সাধারণ অর্থে যাকে লোক-সংগ্রহ বলে বিনোবার বৃত্তি ও বিচার ছেলেবেলা থেকে তদনুকূল ছিল না। লোক-সংগ্রহ বিষয়ে এরূপ নিস্পৃহ ও আগ্রহরহিত বিনোবা দ্বারা বিশেষ অর্থে ভরপুর লোক-সংগ্রহ হয়েছে এ এক আশ্চর্য্যের ব্যাপার।

"অপর লক্ষণীয় কথা হচ্ছে, তাঁর কাছে যারা আসত তাদের মধ্যে কে বুদ্ধিমান, কে বুদ্ধিহীন, কে এ জাতের, কে সে গোত্রের সেসব বিচার বিনোবা করতেন না। কর্ম্মক্ষেত্র সম্বন্ধে তিনি বলে থাকেন যা মেলে তা-ই উত্তম। ওতে বাছাবাছির কি আছে। কর্ম্মী সম্বন্ধেও তিনি ঐ কথাই বলেন। যে সকল ছেলে আসত, শিক্ষা দিতে দিতে তাদের তিনি এগিয়ে দিতেন। তার ফলে তাঁর আশপাশে নিষ্ঠাবান কর্ম্মীর এক গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণ অর্থে লোক-সংগ্রহের পক্ষপাতী তিনি কোনদিনই ছিলেন না। তখনকার দিনে কথাবার্তাচ্ছলে বা বক্তৃতা-প্রসঙ্গে—লোক-সংগ্রহ নয় তো লোক-স্তূপ সংগ্রহ এরূপ উক্তি তিনি করতেন। তাঁর একটি সূত্রই আছে—লোক ভিড়ে, কাজ নাশে।"

৪

১৯২১ হইতে ১৯৩০। এই নয় বৎসরকে বিনোবার কর্মসমাধি, ধ্যানসমাধি ও জ্ঞানসমাধির কাল বলা যাইতে পারে। অখণ্ড সমাধি তো বিনোবার বরাবরই চলিয়াছে। তবু সময়-বিশেষে বিশেষ অবসর মিলে। ঐ সময়টায় নিরবচ্ছিন্ন একান্ত সাধনার অবসর তিনি পাইয়াছিলেন। সেই সাধনার সাক্ষ্য দিতেছেন তাঁহার ছাত্র-শিষ্য দত্তবা দাস্তানে :

"১৯২১ থেকে ১৯৩০-এ নয় বছরের সাধনা বিনোবার সান্নিধ্যে থেকে দেখার সুযোগ আমাদের হয়েছিল। তখন বিনোবা নিজের মধ্যে একরূপ সমাধিস্থ থাকতেন। তার ফলে তাঁর কথায় ও চেহারায় গাম্ভীর্য, কঠোরতা ও কতকটা একরোখো ভাব পরিলক্ষিত হ'ত। ঐ গাম্ভীর্য আরও বেশী বৃদ্ধি পেয়েছিল দীর্ঘ শ্মশ্রু ও কৃশ দেহের দরুন। লোককে তখন বলতে শোনা যেত, বিনোবাকে দেখে ভয় লাগে। কথাটা তিনি জানতেন। আমাদের মত বালকদের তিনি এক দিন বলেছিলেন, "সিংহ থেকে অন্যে ভয় পায়। তার শাবকেরা কখনও ভয় পায় কি ?"

"বিনোবার কঠোরতা তাঁর গর্ব্ব ও অভিমানের দ্যোতক এমন ভুল ধারণা অনেক ভাল লোককেও করতে দেখেছি। আর বাপুর কানে পর্য্যন্ত এ অভিযোগ পৌঁছেছিল। তদুত্তরে বাপু তাদের বলেছিলেন :

'আদৌ তা নয়, সাধনার প্রখরতা।' সাধনায় যেমন-যেমন তিনি সিদ্ধি লাভ করছিলেন তেমন-তেমন ঐ কঠোরতা কমে যাচ্ছিল। আর আজ তো তিনি স্নেহময়ী মায়ের সদৃশ।"

অনন্তের সুরে যাঁহাদের সুর মিলিয়াছে গণ্ডিতে আবদ্ধ জীব আমাদের কাছে তাঁহাদের আচরণ কতকটা বেসুরা ঠেকিবে, সাধনার তীব্রতা অভিমান বলিয়া মনে হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! যে লোক অনন্ত আকাশকে গবাক্ষের ভিতর দিয়া দেখে সে অনন্ত আকাশের এতটুকুই দেখে। সাধু-চরিত উপরে রুক্ষ-শুষ্ক, অন্তরে তাহাদের ফল্গুর স্নিগ্ধ শীতল প্রবাহ। একথাই বুঝি মহাদেবভাই ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রে (১৯১৭) বলিয়াছেন :

"তাঁর সান্নিধ্যে দিনের পর দিন থেকেও তাঁকে বোঝা না যেতে পারে। আর যখন মনে হবে তাঁকে বুঝেছেন তখন আপনি তাঁকে সবে বুঝতে আরম্ভ করেছেন মাত্র। তাঁর গাম্ভীর্য্য এমন যে তা ভেদ করা দুরূহ। বিনোবা স্বল্পভাষী। আর নিজের সম্বন্ধে তো প্রায় কিছুই বলেন না। তবুও তাঁর অতল গভীরে যদি প্রবেশাধিকার পান তো স্বতঃই আপনি বলবেন,'এমন আলোঝলমল মহল ত আর কোথাও দেখি নাই'।"

মহাদেবভাই ধরিয়াছেন আমাদের সামনে ১৯১৭ সালের বিনোবাকে। দত্তবা ধরিয়াছেন এক দশক পরেকার বিনোবাকে। দত্তবার শেষ বাক্যটি—'আর আজ তো তিনি স্নেহময়ী মায়ের সদৃশ' —স্মরণ করাইয়া দিয়া বলি তবু বিনোবার একটা আক্ষেপ আছে। অন্তরঙ্গদের কখনও কখনও তিনি বলেন :

"শঙ্করের প্রভাব আমার উপর বড় বেশী।
বাপুর প্রভাব যদি আরও বেশী হ'ত।"

৫

ঐ সময়ে (১৯২১) নাগপুরে পতাকা-সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়। বিনোবা সত্যাগ্রহে* যোগ দেন। সাময়িক ভাবে সাধনায় ছেদ পড়িল। কারাপ্রাচীরের ভিতরেও সাধনা অখণ্ড ভাবে চলিতে লাগিল একথা বলাই ঠিক হইবে। সাধকের সাধনায় ছেদ কখনও পড়ে না। পরিবেশ ভিন্ন। রূপ ভিন্ন। মহারাষ্ট্রের সত্যাগ্রহীদের সহিত আলাপ হইল। বহিরাগত সত্যাগ্রহীদের সহিত পরিচয় হইল। চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা এক জন লোকের মত লোক দেখিতে পাইল।

১৯২৪ সাল। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সংস্থাপনের নিমিত্ত গান্ধী দিল্লীতে একুশ দিনের উপবাস করিতেছিলেন। ঐক্য ত্বরান্বিত করার জন্য বিভিন্ন ধর্ম্মের নেতৃগণ সর্ব্বধর্ম্ম পরিষদের আয়োজন করেন। বিনোবা আমন্ত্রিত হন। সর্ব্বধর্ম্ম-পরিষদে কঠোপনিষদ অবলম্বনে তিনি এক অপূর্ব্ব ভাষণ দেন।

পরিষদের পরোক্ষ একটি ঘটনার—ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। বিনোবা বলেন :

---

* সত্যাগ্রহে যোগদানের প্রাক্কালে নিজ সম্পাদিত 'মহারাষ্ট্র ধর্ম্ম' পত্রিকায় 'ধর্ম্মক্ষেত্রে নাগপুরে' শীর্ষক তাঁহার একটি অতীব তেজস্বী লেখা প্রকাশিত হয়। 'মহারাষ্ট্র ধর্ম্ম' তখন মাসিক পত্র ছিল। পরে সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয়।

"পরিষদ বসত সকাল নয়টায়। কিন্তু নয়টায় পরিষদ-মণ্ডপে কেবল দুটি লোক দেখা যেত—এক এনি বেসান্ট আর দ্বিতীয় আমি।"

সময়ানুবর্তিতার কথায় অন্য এক প্রসঙ্গে বিনোবা বলিয়াছেন, "ঘড়ির আবিষ্কার হয়েছে পাশ্চাত্যে। সময়ের মূল্য তারা অধিক জানে।"

সর্ব্বধর্ম্ম-পরিষদের কার্য্যশেষে বিনোবা ওয়ার্দ্ধায় ফিরিতেছিলেন। গাড়ীতে একটি লোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, "মহাত্মাজী এখন কি করছেন, কোথায় আছেন?" প্রশ্নকর্ত্তা ছিল গ্রামের লোক—কৃষক, নিরক্ষর; সুতরাং সংবাদপত্র পড়ার কথা ওঠেই না। মহাত্মাজীর নাম সে জানিত। তপোমূর্ত্তি খদ্দরধারী বিনোবাকে দেখিয়া মহাত্মাজীর কথা তাহার মনে হয় ও তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করে। বিনোবার রাগ হইল—ঐ লোকটির উপর নয়, শিক্ষিত লোক আমাদের উপর। মহাত্মাজী অগ্নি-পরীক্ষার ভিতর দিয়া চলিয়াছেন, হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন আর দেশের জনসাধারণ সে খবরটা পর্য্যন্ত জানে না, এই ছিল তাঁহার ক্ষোভের কারণ। গান্ধীর উপবাসের কথা জনসাধারণের কাছে পৌঁছাইবে কে? শক্তিগৃহে বিজলী উৎপন্ন হয়। আপনা হইতেই তাহা ছড়াইয়া পড়ে না। সরু-মোটা তার-সহায়ে তাহা দূরে দূরে লইয়া যাইতে হয়। তবে না অন্ধকার নাশ হয়, আলো ফোটে। প্রাচীনকালে সাধু-সন্তেরা সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ঘরে ঘরে শুভবার্ত্তা বহন করিতেন, কিন্তু আজ জাতীয়তাবোধের কথা ঘরে ঘরে পৌঁছাইবে কে? সখেদে বিনোবা বলিয়াছেন:

"আজিকার শিক্ষিতদের অন্তরে আর্দ্রতা নাই। হৃদয় তাদের গলে না। যে-কোন প্রবাহের বিরুদ্ধে তারা দাঁড়ায়। পাথরখণ্ডের মত মধ্যে এসে পথরোধ করে। হাজারো ব্রতী প্রচারক, হাজারো সেবকের একান্ত প্রয়োজন। এ আহ্বান আসা চাই, আর তা পূর্ণ হওয়াও চাই। সমর্থ (রামদাস) এগার শ' মঠ পরিচালন করার জন্য লোক পেয়েছিলেন। আর আজ পাওয়া যাবে না! আমরা কি পাষাণে পরিণত হয়েছি? যত দিন এরূপ লোক না বেরুচ্ছে তত দিন আশা নেই।"

১৯২৫ সালে ভাইকমে যান। সেখানে সত্যাগ্রহ চলিতেছিল। মালাবারের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে তাঁহার মনে পড়ে যে, শঙ্করাচার্য্যের জন্মস্থান আশপাশে কোথাও হইবে। উহা দেখার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে। কিন্তু প্রলোভন তিনি সংবরণ করেন। গীতা-প্রবচনে এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন:

"ভাইকম সত্যাগ্রহ দেখতে গিয়েছিলাম। ভূগোলে পড়েছিলাম শঙ্করাচার্য্যের জন্মস্থান মালাবারে। মনে হ'ল, যেদিকে যাচ্ছি তার কাছাকাছি কোথাও ভগবান শঙ্করাচার্য্যের 'কালড়ী' গ্রাম হবে। সঙ্গী মালয়ালী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, 'এখান থেকে দশ মাইল। যাবেন?' বললাম, 'না।' গিয়েছিলাম সত্যাগ্রহের ব্যাপারে। পথিমধ্যে অন্য কাজে আর কো[থাও] যাওয়া উচিত নয়।"

ঐ বছর সবরমতী আশ্রমেও তাঁহাকে যাইতে হয়। আ[র] একটা ঘটনা ঘটে। গান্ধী সাত দিনের উপবাস করিতেছিলে[ন]। কোন লোক বালকোবাকে (বালকোবা বিনোবার দ্বিতীয় ভ্রা[তা] তখনও তিনি সবরমতীতে ছিলেন) জিজ্ঞাসা করেন, "বিনোবা এসেছেন। ব্যাপার কি?" বালকোবা তাঁহাকে বলেন, "গান্ধী ডেকে এনেছেন, সাত দিনের জন্য। ব্যাপার ঘটেছে। ... সংশোধনের নিমিত্তে।"

৬

সংস্কৃত ভাষায় বিনোবার পাণ্ডিত্য অসাধারণ। কিন্তু বিনো[বা] বলেন (আর আচরণে তিনি তাহাই করেন) যে, প্রার্থনা ম[াতৃ]ভাষায়*, নিদেনপক্ষে যে ভাষা বহু লোকে বুঝে সে ভাষায় হ[ওয়া] উচিত। প্রার্থনার উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি। কিন্তু শব্দের অর্থবো[ধ না] হইলে ভাষা চিত্ত স্পর্শ করিবে কেন? আর চিত্তে ছাপ না প[ড়িলে] জীবন-শুদ্ধি হইবে কোথা হইতে। কপচানো কলনো প্রার্থনা ন[য়]। প্রার্থনার মুখ্য বস্তু অর্থবোধ, মনন, চিন্তন। তাই বিনোবা হিন্দী বা মাতৃভাষায় প্রার্থনা করেন। আর লোককে তাহাই ক[রিতে] বলেন। তাঁহার প্রার্থনা-সভায় গীতার 'স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ' ... শ্লোকে আবৃত্তি করা হয়, ঈশোপনিষদের আবৃত্তি হিন্দীতে ... আর যে প্রদেশে তিনি যান সে প্রদেশের ভাষায় তাহা ভাষান্ত[রিত] হয়। বাংলায়ও হইয়াছে। প্রার্থনার ভাষা যত সরল করা [যায়] সেদিকে তাঁহার নজর। তিনি নিজে যে সর্ব্বধর্ম্মী প্রার্থনা-শ্লো[ক] রচনা করিয়াছেন তাহা অতি সহজ। অনায়াসেই তাহা বুঝা যা[য়]। শ্লোকটি এই:

ওঁ তৎসৎ শ্রী নারায়ণ তু, পুরুষোত্তম গুরু তু।
সিদ্ধ-বুদ্ধ তু, স্কন্দ বিনায়ক সবিতা পাবক তু।
ব্রহ্ম মজ্দ তু, যহ্ব শক্তি তু, ঈশু-পিতা প্রভু তু।
রুদ্র বিষ্ণু তু, রাম কৃষ্ণ তু, রহীম তাও তু।
বাসুদেব গো-বিশ্বরূপ তু, চিদানন্দ হরি তু।
অদ্বিতীয় তু, অকাল নির্ভয় আত্ম-লিঙ্গ শিব তু।

ভারতের যে-কোন ভাষাভাষী লোক ইহা বুঝিতে পারিবে ব[লিয়া] মনে হয়।

আর প্রার্থনা সকলের পক্ষে সহজবোধ্য হওয়া চাই এই [চিন্তা] হইতে গীতার সহজ অনুবাদের কথা তাঁহার মনে জাগে। তাঁহার মা তাঁহার কাছে গীতাপাঠের যে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত ক[রি]...

---

* বিনোবার প্রার্থনা-সভার কাজ হিন্দীতে চলে। সেখা[নে] গীতার 'পারায়ণ' হইত। গান্ধী গীতার পারায়ণ-স্থলে গীত[াই] পারায়ণের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। গীতাই গীতার সম[শ্লোকী] অনুবাদ।

...লেন তাহা দ্বারা বিনোবার ঐ সঙ্কল্প* বহুলাংশে প্রভাবিত হইয়া-ছিল।

গীতার সমশ্লোকী অনুবাদের সঙ্কল্প অনেক দিন হইতেই ছিল। ...র তাহার জন্য তৈয়ারও তিনি হইতেছিলেন। কিন্তু ১৯৩০ সালের পূর্ব্বে সে কাজে হাত দেওয়ার অবসর তাঁহার ঘটে নাই। ...রেণ সত্যাগ্রহের আন্দোলনে যখন দেশ উদ্বেল বিনোবা তখন নিশ্চিন্ত মনে গীতাঈ রচনায় নিমগ্ন হইলেন। 'গীতাঈ কা স্মরণ' ...র্ষক লেখায় বিনোবা স্বয়ং গীতাঈ রচনার বিবরণ দিয়াছেন। লেখাটি এই :

"গীতাঈ প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে। কিন্তু উহার রচনা শেষ হয়েছিল ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩১ সালে। রচনা আরম্ভ হয় ১৯৩০ সালের ৭ই অক্টোবর। ঠিক দু' যুগ আগেকার কথা। সে শুভ-আরম্ভের স্মৃতিও আমায় পবিত্র করে দেয়। স্কুলে আমি সংস্কৃত পড়ি নাই। গোপাল রাওয়ের সাহায্যে ১৯১২ সালে পড়তে আরম্ভ করি। 'গীতা-রহস্য' হাতে আসার আগে গীতা আমি পড়ে শেষ করেছিলাম।

কিন্তু সংস্কৃত শেখার পূর্ব্বেই আমার নিজ মায়ের মুখ থেকে গীতার সহিত পরিচয় হয়েছিল। আমার মা মানে মহারাষ্ট্রে যাকে মা বলে জানে সেই মা—'জ্ঞানেশ্বরী'। ষোল বৎসর বয়সে, ১৯১১ সালে মহা আগ্রহে 'জ্ঞানেশ্বরী' আদ্যন্ত পাঠ করে ফেলি। অর্থ সবটা বুঝেছিলাম তা নয়। তবে একথাও নয় যে আদৌ বুঝি নাই। ...নদেব ঐ বয়সে 'জ্ঞানেশ্বরী' লিখেছিলেন। ঐ বয়সে তা আমি ...ন্ততঃ পড়ে নেব এরূপ তীব্র বাসনা আমার হয়েছিল। এক মহা ...যের কার্য্য যেন আমি করেছিলাম। পরে সংস্কৃতের পরিচয় ...য়। তখন জ্ঞানের (জ্ঞানদেবেরও) অনুসরণ করতে করতে ঋগ্বেদ ...্যন্ত গিয়ে পৌঁছাই। অন্যান্য ধর্ম্মের গ্রন্থও পড়ি। তার ফলে গীতার প্রতি আমার শ্রদ্ধা দৃঢ়তর হয়। গীতাঈ রচনার পূর্ব্বে গীতার অর্থ আমি নিশ্চয় করে নিই। এ কথা ঠিক যে তা ছিল তাৎকালিক। তার আগে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও ইংরেজী যত ভাষ্য টীকা পেয়েছিলাম, পড়ে নিয়েছিলাম। শঙ্কর, রামানুজ, জ্ঞানদেব, শ্রীধর, তিলক, অরবিন্দ, গান্ধী প্রভৃতি গীতার যে অর্থ করেছেন তা গভীর ভাবে অধ্যয়ন করেছিলাম। তার প্রতিবিম্ব গীতাঈয়ের কোথাও কোথাও ব্যক্ত দেখা যাবে। শঙ্কর ও জ্ঞানদেবের অর্থের হানি না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি ছিল—যদিও গীতাঈ রচনাকালে কোন টীকাই সামনে রাখি নাই।

গীতার্থ-নির্ণয়-ব্যাপারে গীতার পঞ্চম অধ্যায় আমার কয়েক বছর নিয়েছে। এই অধ্যায়কে আমি গীতার চাবি মনে করি আর তারও চাবি হচ্ছে চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোক—কর্ম্মে অকর্ম্ম, অকর্ম্মে কর্ম্ম। উহার অর্থ আমার কাছে যেমনটি প্রতিভাত হয়েছে তেমনটি আমি গীতা-প্রবচনে ধরেছি। সমস্ত গীতা-প্রবচনের উপর এর ছায়াপাত হয়েছে।

কর্ম্মের অর্থ—প্রবাহ-প্রাপ্ত কর্ত্তব্য করা। তার জুড়ি হচ্ছে বিকর্ম্ম; অর্থাৎ চতুর্থ অধ্যায়ে যজ্ঞ যাগ বলে বর্ণিত আন্তরিক সাধন—ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে সপ্তদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত এক এক করে যার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কর্ম্ম ও বিকর্ম্ম এ দুয়ের অভ্যাস থেকে আত্মদর্শনের লাভ দ্বারা যে সহজাবস্থার অনুভব হয় তা হচ্ছে অকর্ম্ম। এ সহজাবস্থা বাহ্যতঃ দ্বিবিধ মনে হতে পারে। এক—কর্ম্মে অকর্ম্ম; আর এক—অকর্ম্মে কর্ম্ম। প্রথমটির নাম যোগ, দ্বিতীয়ের নাম সাংখ্য বা সন্ন্যাস। উভয়ই তত্ত্বতঃ ও ফলতঃ এক-রূপ। উভয়ের পর্য্যবসানও এক—মোক্ষ। সাধকের পক্ষে যোগ অনুবর্ত্তনীয়, সন্ন্যাস অনুচিন্তনীয়। তাই যোগের বিধান। চাবি-স্বরূপ ঐ অধ্যায়ের এ অর্থের পরিচয় গীতা-প্রবচনের পাঠক ইতি-মধ্যে পেয়েছেন।

চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে এই দিনটিতেই প্রাতঃকালীন প্রার্থনার পরে পাঁচটার সময় গীতাঈ রচনা আরম্ভ হয়—পঞ্চম অধ্যায় থেকে।

(যথা) স্বরের মধ্যে স্বর পঞ্চম
অথবা বর্ণের মধ্যে বর্ণ পঞ্চম
তথা গীতার মধ্যে অধ্যায় পঞ্চম
পরম ধন সাধক-জনার।

—জ্ঞানদেব"

* বলরামপুর আশ্রমে (১৯শে জানুয়ারী '৫৫) সাহিত্যিকদের উপ-স্থিতিতে বিনোবা যে ভাষণ দেন তাহাতে এ সম্পর্কে উল্লেখ ছিল :

"মা লেখাপড়া জানতেন না। আমি তাঁকে শিখাই। মা গীতা ...ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সংস্কৃত জানতেন না। গীতার মরাঠী ...বাদ এনে দি'। সুবিধা হ'ল না। মা বললেন, 'বিন্যা, তুই নিজে অনুবাদ করে দে।' আমি অনুবাদ করতে পারব এ বিশ্বাস ...র কোথা থেকে হয়েছিল জানি না। তবে আমার ওপর মায়ের যে বিশ্বাস তা থেকে গীতাঈ রচনার শক্তি আমি পেয়েছিলাম।"

কালিদাস-সাহিত্যে 'প্রকৃতি'

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক, এম-এ

মহাকবি কালিদাস তাঁহার সাহিত্যের বহুস্থানে বহুভাবে প্রকৃতির বর্ণনা করিয়াছেন ; তাহা যেমন উপভোগ্য, তেমনি প্রতিভার পরিচায়ক। তাঁহার প্রকৃতি বর্ণনা প্রকৃতির কেবল বাহ্যরূপের বর্ণনায় আবদ্ধ নহে, প্রকৃতির বাহ্যত জড়ত্বভাবের অন্তরালে তিনি যে একটা চেতনাবিশিষ্ট সত্তার অনুভূতি পাইয়াছেন, তাহাই তিনি বহুস্থানে সুস্পষ্টরূপে জানাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। জড়ত্বের আবরণের মধ্যে থাকিয়াও প্রকৃতি যে কি ভাবে মানবমনের উপর তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, মানুষের সুখে-দুঃখে কি ভাবে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতে পারে, বিপদে-আপদে সাহায্য ও সহযোগিতা করার ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিতে পারে, তাহা তিনি এমন নিপুণভাবে দেখাইয়াছেন যে, তাহার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে এমন কবির লেখা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল এক ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ যাঁহাকে 'প্রকৃতির কবি' বলিয়া অভিহিত করা হয় তাঁহার প্রকৃতি বর্ণনার সহিত কালিদাসের প্রকৃতি বর্ণনার কতকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। উভয়ের কেহই প্রকৃতিকে জড় বলিয়া স্বীকার করিয়া লন নাই, বাহ্যত অচেতন প্রকৃতির মধ্যে দুই কবিই চৈতন্যের সন্ধান পাইয়াছেন, উভয়েই উপলব্ধি করিয়াছেন প্রকৃতি জড় নহেন—চৈতন্যধর্মে মহীয়ান, মানুষের সুখ-দুঃখ সে যে কেবল অনুভব করিতে পারে তাহা নহে মানুষকে তাহার সুখ-দুঃখে হৃদয়ের সমবেদনাও জ্ঞাপন করিতে পারে। তবে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, মনে হয় যেন প্রকৃতিকে দেখিয়াছেন এক অখণ্ড আত্মিক সত্তারূপে—যে আত্মিক সত্তা সারা বিশ্বজগতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন এবং বৃক্ষ, লতা, স্রোতস্বিনী প্রভৃতিকে নিমিত্ত বা আশ্রয় করিয়া মাতৃরূপে, ধাত্রীরূপে, শিক্ষয়িত্রী-রূপে মানবমনকে শিক্ষা দিতেছেন, প্রেরণা যোগাইতেছেন এবং নিয়মনও করিতেছেন। আর কালিদাস দেখিয়াছেন যেন বৃক্ষ, লতা, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন চেতনাবিশিষ্ট সত্তা বিরাজিত রহিয়াছে। বৃক্ষ যেমন চেতনাবিশিষ্ট প্রাণীর মত তাহার সাধ্যানুসারে মানবমনের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে, তেমনি লতা, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি অপরাপর পদার্থগুলিও সজীব প্রাণীর মত কখনও স্বতন্ত্রভাবে, কখনও-বা সম্মিলিতভাবে মানবমনের সহিত হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করে।

মহাকবির প্রকৃতি বর্ণনার স্থানে স্থানে বনদেবতাদের উল্লেখ াওয়া যায়। বৃক্ষ, লতা, পর্ব্বতাদির অন্তরালে বা মধ্যে থাকিয়া ানদেবতারা মানুষের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন, এরূপ চিত্রও তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন। বনদেবতারা বৃক্ষাদির আত্মা ়য়, বৃক্ষাদি হইতে তাঁহারা সম্পূর্ণ পৃথক, তবে মধ্যে মধ্যে কৌতূহলী হইয়া বৃক্ষাদির মধ্যে বা অন্তরালে থাকিয়া মানুষের দেহমে উপর দূর হইতে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করেন। অবশ্য, এ কল্পনা অন্যান্য দেশের কোনও কোনও কবিদের মধ্যে যে নাই ত নহে, কিন্তু কালিদাসের কল্পনা যেন অন্যান্য কবিদের ছাড়াই গিয়াছে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র চতুর্থ অঙ্কে—যেখানে ি বনদেবতাদিগকে 'পল্লববর্ণের বাহু মণিবন্ধ পর্য্যন্ত' বিস্তৃত করাই ুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মানুষের হাতে সমর্পণ করাইয়াছে শকুন্তলার পরণের চেলি, পায়ের আলতা ও দেহের অলঙ্কার বৃক্ষ ও বনদেবতারাই মুনিশিষ্যকে দিয়াছিলেন।

প্রথমে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব কালিদাসের প্র নির্জীব নয়, সজীব। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' গাছের গোড়ায় দিতে দিতে শকুন্তলা তাঁহার সখীদিগকে বলিতেছেন, "দেখ ঐ আমগাছ, বাতাসে কাঁপা ওর ঐ পল্লবরূপ অঙ্গুলি দিয়ে আ যেন কি বলতে চাইছে, কাছে গিয়ে বুঝে আসি।" তিনি বৃ নিকট আগাইয়া গেলেন।

এখানে মহাকবি বুঝাইতে চাহিতেছেন যে, শকুন্তলার স অবস্থিত আমগাছের পল্লবগুলি বাতাস লাগিয়া কাঁপিতে দেখাইতেছে যেন মানুষ যেমন তাহার প্রিয় বা পরিচিত ব্যক্তি অঙ্গুলির সঙ্কেত দ্বারা নিকটে আসিবার আবেদন জ্ঞাপন ক বৃক্ষও তেমনি তাহার পল্লবরূপ অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া শকুন্তল তাহার নিকটে আসিয়া কিছু বক্তব্য শুনিবার আবে জানাইতেছে। শকুন্তলার মনে হইল বৃক্ষ তাঁহাকে ডাকিতে তিনি যে কেবল একথা ভাবিলেন তাহা নহে, বৃক্ষের বাণী বুঝি জন্য বাস্তবিকই বৃক্ষের নিকট আগাইয়া গেলেন। প্রকৃতির প্র যে কতদূর হৃদয়স্পর্শী হইতে পারে মহাকবি যেন তাহার বাস্তব এখানে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

'কুমারসম্ভবে' মহাকবি ত্র্যম্বকের আশ্রমে সহসা অ বসন্তের আবির্ভাবে তাহার দুর্দ্দমনীয় প্রভাব যে কিভাবে সেখান পশু, পক্ষী, নর কিন্নর প্রভৃতির উপর বিস্তৃত হইয়াছিল দেখাই গিয়া লতাদিগকেও বাদ দেন নাই, সেই 'অবিস্মরণীয় মুহূ বর্ণনায় মহাকবি বলেন, 'লতাবধূভ্যস্তরবোঽপ্যবাপুর্বিনম্রশাখা বন্ধনানি' (কু—৩।৩৯), অর্থাৎ মনে হইল যেন, 'লতাব তাহাদের শাখারূপ বাহু দ্বারা তরুদিগকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গনে করিতেছে।' সহসা বসন্তের আবির্ভাবে একটা প্রেমের ভাব যে পশু, পক্ষী, নর কিন্নরের মনে আসিয়া পড়িল তাহা নহে, লত চেতনাবিশিষ্ট প্রাণীদের মত এ ভাবের প্রভাব হইতে মুক্তি নাই, প্রেমের ভাব যেন তাহারাও অনুভব করিতে পারে।

'রঘুবংশ' মহাকাব্যে বসন্তকালের এক বর্ণনায় মহা

অপরাহ্ণে তরুবীথিকা

বর্ষায়

[ফোটো ঃ শ্রীবিনয়ভূষণ দাস

নিজের উদ্ভাবিত এণ্টি পোলিও ভ্যাক্সিন দ্বারা একটি শিশুকে টিকাদান-রত
ডাক্তার জোনাস ই. সাক

বোম্বাই হইতে বিমানে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র যাত্রী এগার জন ভারতীয় গ্রন্থাগারিক

...লতেছেন, 'বৃক্ষের পল্লবগুলি বাতাস লাগিয়া দুলিতেছে ...খাইতেছে, তাহারা যেন জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরও মন ভুলাইবার ...ভিনয় শিক্ষা করিতেছে' (রঘু—৯।৩৩)।

বৃক্ষলতার মত নদীতরঙ্গের মধ্যেও মহাকবি চেতনা ও মানুষের ...তে তাহার হৃদয়ের সমবেদনা জানানোর আকাঙ্ক্ষা বিবৃত ...িয়াছেন। এখানে তাহার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল।

সীতাকে লইয়া রাম যখন 'পুষ্পকবিমানে' বসিয়া আকাশপথে ...া হইতে অযোধ্যার উপকণ্ঠে আসিয়া পড়িলেন, তখন উর্দ্ধ ...তে নিম্নে প্রবাহিতা সরযূ নদীকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার মনে ...ল, তিনি প্রবাস হইতে বহুকাল পরে ফিরিয়া আসিতেছেন ...খিতে পাইয়া সরযূ যেন তাঁহার তরঙ্গরূপ হাত উপরদিকে বাড়াইয়া ...া জননীর মত (স্নেহভরে) তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে ...িতেছেন (রঘু—১৩।৬৩)।

কি গভীর, কি উচ্চাঙ্গের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন মহাকবি এই ...োকটিতে। 'রঘুবংশের' চতুর্দ্দশ সর্গেও তাঁহার এ অপূর্ব্ব কবি-...তিভার পরিচয় পাওয়া যায়। নদীতরঙ্গের প্রাণবন্ত রূপ দেখাইতে ...িয়া তিনি বলিতেছেন যে, রামের আদেশে লক্ষ্মণ যখন অনিচ্ছা-...েও সীতাকে লইয়া মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে তাঁহাকে পরিত্যাগ ...রিয়া আসিবার জন্য রথে চাপিয়া গঙ্গার তীরে আসিয়া পড়িলেন, ...খন সম্মুখে গঙ্গার ঢেউগুলিকে তীরের দিকে আসিতে দেখিয়া ...াহার মনে হইল, 'তিনি জ্যেষ্ঠের আদেশে পতিব্রতা সীতাকে বন-...েশে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন বুঝিতে পারিয়া জাহ্নবী ...েন তাঁহার তরঙ্গরূপ হাত নাড়িয়া তাঁহাকে এমন কাজ করিতে ...িষেধ করিয়া দিতেছেন' (রঘু—১৪।৫১)।

মহাকবি এখানে যে কেবল নদীর মধ্যে চেতনার সন্ধান ...াইয়াছেন এবং নদী যে তরঙ্গের মাধ্যমে মানুষের মন নিয়ন্ত্রণ ...রার চেষ্টা করে তাহা দেখাইতে চাহিতেছেন তাহা নহে, তিনি ...খানে এক উচ্চ স্তরের মনস্তত্ত্বের অভিজ্ঞতারও পরিচয় দিয়াছেন। ...িনি দেখাইতেছেন যে, মানুষ যখন প্রথম তাহার বিবেকের বিরুদ্ধে ...োনও অকাজ করিতে যায়, তখন তাহার সহসা মনে হয় যেন এক ...দৃশ্য শক্তি তাহাকে একাজে বাধা দিতে চাহিতেছে।

নদীতরঙ্গের মধ্যে চেতনার অস্তিত্ব 'মেঘদূতে'ও দেখিতে পাই। ...খানে বিরহী যক্ষ মেঘকে বলিতেছে যে, সে যখন স্বচ্ছসলিলা ...ম্ভীরা নামক নদীর উপর দিয়া উড়িয়া যাইবে, আর তার ছায়াটি ...দীর জলে প্রতিবিম্বিত হইবে, তখন দেখাইবে যেন নদীর হৃদয়ের ...ভ্যন্তরে মেঘ প্রবেশলাভ করিয়াছে এবং সেই সময় সাদা সাদা ...টিমাছ যখন খেলা করিতে থাকিবে, মনে হইবে তাহারা বুঝি ...দীর চোখ, নদীই যেন চক্ষুর ইসারায় হৃদয়ের অনুরাগ ব্যক্ত ...রিতে চাহিতেছে (পূ-মে—৪১)।

'মেঘদূতে' মহাকবি পর্ব্বতের বন্ধুপ্রীতি দেখাইয়াছেন। 'পূর্ব্ব-...েঘের' ১২শ শ্লোকে যক্ষের মুখ দিয়া তিনি বলিতেছেন, 'মেঘ ...খন চিত্রকূট পর্ব্বতের নিকট গিয়া পৌঁছাইবে পর্ব্বত তখন তাহার পুরাতন বন্ধুর আলিঙ্গন পাইয়া প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ বহুদিনের সঞ্চিত বিরহবাষ্প মোচন করিতে থাকিবে।' অর্থাৎ, পুরাতন বন্ধু মেঘের আলিঙ্গন পাইয়া পর্ব্বত হইতে যখন বর্ষাকালের জল পড়িতে থাকিবে, তখন দেখাইবে যেন বহুদিন পরে পুরাতন বন্ধুর সাক্ষাৎ পাইয়াছে বলিয়া প্রীতির আবেশে পর্ব্বতের চোখের জল বাধা মানিতেছে না।

'কুমারসম্ভবে' হিমালয়ের বর্ণনা দিতে গিয়া মহাকবি বলিতেছেন যে, 'পর্ব্বতের গুহাগুলির মুখ হইতে আগত বাতাস যখন বাঁশঝাড়ের বাঁশগুলির রন্ধ্রের ভিতর দিয়া বহিয়া সুমিষ্ট শব্দ উৎপাদন করিতে থাকে, তখন মনে হয় যেন কিন্নরেরা উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিতেছেন দেখিয়া পর্ব্বত বাঁশী বাজাইয়া সে গানের সঙ্গে তান দিতেছেন' (কু—১৮)।

'পুষ্পক' বিমানে বসিয়া রাম যখন সীতাকে লইয়া অযোধ্যায় আসিতেছিলেন, সম্মুখে মাল্যবান পর্ব্বত দেখিতে পাইয়া তখন তিনি বলিতেছেন যে, যখন তিনি সীতার অন্বেষণে অদূরের ঐ মাল্যবান পর্ব্বতের নিকট আসিয়া দুঃখে চোখের জল ফেলিতেছিলেন, সে সময় পর্ব্বতের শিখর হইতে মেঘের সঞ্চিত জল ঝরিয়া পড়িতেছিল, এক সঙ্গে দুই জনে জল ফেলিতেছিল। মহাকবি এখানে স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই যে, পর্ব্বত যেন রামকে সীতার বিচ্ছেদদুঃখে চোখের জল ফেলিতে দেখিয়া তাঁহার দুঃখে হৃদয়ের সমবেদনা জানাইবার জন্য চোখের জল ফেলিতেছে, তবু স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও তিনি যে এই ভাবটিই গৌণভাবে বলিয়া বুঝাইতে চাহেন তাহা পরিষ্কার বুঝা যায়, নচেৎ 'ত্বদ্বিয়োগাশ্রু সমং বিসৃষ্টম্' (রঘু—১৩।২৬) পদের 'সমং' শব্দটির কোনও সার্থকতা থাকে না।

পৃথিবীও যে চৈতন্যহীনা নহেন, তাহাও মহাকবি দেখাইয়াছেন 'রঘুবংশের' চতুর্দ্দশ সর্গে। তিনি বলিতেছেন যে, লক্ষ্মণ যখন রামের 'বিসর্জ্জনে'র আদেশ কোনওগতিকে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সীতার সম্মুখে 'বমন' করিয়া দিলেন, তখন সীতা এ অপমানের নিদারুণ ব্যথা সহ্য করিতে না পারিয়া ঝড়ের বেগে উৎক্ষিপ্তা লতার মত তাঁহার জননী বসুন্ধরার বক্ষে জ্ঞানহারা হইয়া পড়িয়া গেলেন, দেহের অলঙ্কারগুলি পুষ্পের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বসুন্ধরা কিন্তু তাঁহাকে গর্ভে স্থান দিলেন না, কারণ মহাকবি বলেন, জননীর যেন সন্দেহ হইল যে, রামের মত প্রসিদ্ধ ইক্ষাকু বংশে জাত অমন সাধুচরিত্র স্বামী কি আর অকারণে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাই যথার্থ কারণ না জানা পর্য্যন্ত কিছু করা উচিত নয় (রঘু—১৪।৫৫)।

কুশ যখন কুশাবতী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সমস্ত লোকজন, সৈন্যসামন্ত সঙ্গে লইয়া অযোধ্যায় আসিতেছিলেন, তখন তাঁহার সে বিরাট বাহিনীর পায়ের চাপে উত্থিত পথের ধূলির বর্ণনা দিতে গিয়া মহাকবি বলিতেছেন যে, ধূলি এমন জমাট বাঁধিয়া আকাশে উঠিয়া যাইতেছিল যে দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন পৃথিবী বুঝি এত বেশী ভার সহ্য করিতে পারিবেন না বলিয়া 'বিষ্ণুপদং

দ্বিতীয়মধ্যাহ্নরোহেব রজশ্ছলেন' (রঘু—১৬।২৮) অর্থাৎ, 'ধূলির রূপ ধরিয়া আকাশে উঠিয়া পলাইয়া যাইতেছেন।'

সৈন্য ও লোকজনদের পায়ের চাপে ধূলা এমন জমাট বাঁধিয়া বিশাল আকার ধারণ করিয়া আকাশের কাছ পর্য্যন্ত উঠিতেছিল যে, তাহা দেখিয়া লোকের মনে হইতেছিল যেন পৃথিবীই বুঝি স্বয়ং ধূলার আকার ধারণ করিয়া, বা ধূলার ছদ্মবেশে আকাশে উঠিয়া যাইতেছে।

বৃক্ষেরা যে কেবল মনুর মতানুযায়ী 'অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ' অর্থাৎ, এদেরও ভিতরে ভিতরে জ্ঞান আছে এবং তাহারা সুখ-দুঃখও অনুভব করিতে পারে তাহা নহে, মহাকবি কালিদাসের মতে তাহারা মানুষের সুপুত্রের মত কর্ত্তব্য পালনও করিতে পারে। 'রঘুবংশে' শরভঙ্গ মুনির আশ্রম বর্ণনার প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন যে, মুনির আশ্রমে মুনি আর নাই বটে, তবে তাঁহার আশ্রমে কেহ আসিলে তাঁহাকে শীতল ছায়া আর সুমিষ্ট ফল দান করিয়া তাঁহার সুপুত্রের মত অতিথি সংকার করার ভার এই আশ্রম বৃক্ষগুলির উপর ন্যস্ত রহিয়াছে (রঘু—১৩।৪৬)।

বৃক্ষের সহিত মানুষের পিতাপুত্রের বা মাতাপুত্রের সম্বন্ধ তিনি বহুস্থানে দেখাইয়াছেন, এখানে দুই-একটি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। 'রঘুবংশের' দ্বিতীয় সর্গে মায়ার সিংহ রাজা দিলীপকে সম্মুখে অবস্থিত দেবদারু বৃক্ষটিকে দেখাইয়া বলিতেছেন, 'পুত্রীকৃতোঽসৌ-বৃষভধ্বজেন' অর্থাৎ, বৃষভবাহন স্বয়ং মহাদেব উহাকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই প্রসঙ্গে সিংহ বলিতেছে, মা ভগবতী যেমন করিয়া পুত্র কার্ত্তিককে স্তন্যপান করাইতেন, তেমনি (স্নেহভরে) এই বৃক্ষটিতে স্বর্ণকলসী করিয়া জল দিতেন (রঘু—২।৩৬)।

মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমের নিকটে সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণ যখন চলিয়া গেলেন এবং সীতা দুঃখে ভয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, রোদনের শব্দ শুনিতে পাইয়া তখন মহর্ষি সীতার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিবার সময় বলিয়াছিলেন, 'অসংশয়ং প্রাক্ তনয়োপপত্তেঃ স্তনন্ধয়প্রীতিমবাপ্স্যসি ত্বম্' (রঘু—১৪।৭৮) অর্থাৎ, আমাদের আশ্রমে গিয়া বাস করিলে মুনি-কন্যাদের মত কলসী লইয়া ছোট ছোট গাছের গোড়ায় জল দিলে, 'সন্তানের জননী হওয়ার পূর্ব্বেই সন্তানকে স্তন্যপান করানোর সুখ আস্বাদ করিয়া লইতে পারিবে।' মহাকবির মতে মেয়েরা নিজের হাতে ছোট ছোট গাছের গোড়ায় জল দিলে মনে করে যেন তাহারা নিজের সন্তানকে স্তন্যদুগ্ধ পান করাইতেছে।

বৃক্ষ ও লতা যে মানুষের প্রতি কিরূপ সহানুভূতিশীল তাহা নিম্নলিখিত কয়েকটি উদাহরণে দেখা যায়:

রাজা দিলীপ যখন তাঁহার গুরুদেবের গাভীটিকে লইয়া মাঠে মাঠে চরাইতে যাইতেন আর পথের পার্শ্বস্থ বৃক্ষগুলির শাখায় বসিয়া পাখীরা কূজন করিয়া উঠিত, 'তখন', মহাকবি বলেন, 'মনে হইত যেন বৃক্ষগুলি রাজা আসিতেছেন দেখিয়া তাঁহার জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিতেছে' (রঘু—২।৯)। দিলীপরাজার বনভ্রমণের আরও বিবরণ দিতে গিয়া মহাকবি বলিতেছেন, 'বাতাসের প্র[illegible] লতাগুলি হইতে পুষ্প উড়িয়া আসিয়া যখন বাতাসের বদ্ধু[illegible] মত দীপ্তিশালী রাজার দেহের উপর পড়িত, তখন দেখাইত[illegible] রাজাকে যাইতে দেখিলে শহরের মেয়েরা যেভাবে তাঁহার [illegible] খৈ-এর অঞ্জলি বর্ষণ করে, 'বাললতারাও' যেন সেইভাবে তাঁ[illegible] উপর পুষ্পগুলি নিক্ষেপ করিয়া দিতেছে (রঘু—২।১০)।

বাতাসও যে চৈতন্যবিশিষ্ট, ও মানুষের প্রতি সহানুভূতি[illegible] তাহা তিনি 'রঘুবংশে'র দ্বিতীয় সর্গে দেখাইয়াছেন। [illegible] রাজার গরু চরাইয়া বেড়ানোর প্রসঙ্গে মহাকবি বলেন, 'বা[illegible] গিরিনির্ঝরিণীর বারিকণায় সিক্তি হইয়া ও বনকুসুমের সৌ[illegible] সুরভিত হইয়া ছত্রহীন গুদ্ধাচারী রৌদ্রক্লান্ত রাজার সেবা ক[illegible] অর্থাৎ, রোদে রোদে ছত্রহীন হইয়া ঘুরিয়া বেড়ানোর ফলে [illegible] ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন দেখিতে পাইয়া বাতাস নির্ঝরিণী [illegible] শীতলতা, পুষ্প হইতে সৌগন্ধ বহিয়া আনিয়া সযতনে তাঁহার [illegible] দূর করার চেষ্টা করিত (রঘু—২।১৩)।

ঠিক এই ধরণের বর্ণনা মহাকবি দিয়াছেন রঘুর দিগ্বিজয়[illegible] হিমালয় অভিযানের সময়। রঘু যখন সসৈন্যে হিমালয়[illegible] অতিক্রম করিয়া যাইতেছিলেন, মহাকবি বলেন, তখন ব[illegible] ভূর্জ্জপত্রবৃক্ষে মর্ম্মরধ্বনি উৎপাদন করাইয়া, বাঁশঝাড়ের ভিতর সুমিষ্ট শব্দ করিতে করিতে বহিয়া ও গঙ্গাপ্রবাহের শ[illegible] আনিয়া দিয়া তাঁহার সেবা করিত ('সিষেবিরে'), রঘু—৪[illegible]

বাতাস যে মানুষের সেবা করিতে ভালবাসে মহাকবির [illegible] উক্ত শ্লোক দুইটি হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য, ভাবের প্রকাশ তাঁহার অন্যান্য কয়েকটি শ্লোকেও পাওয়া যায়[illegible]

আকাশের চৈতন্য দেখাইতে গিয়া মহাকবি 'কুমারস[illegible] চতুর্দ্দশ সর্গে বলিতেছেন যে, দেবসৈন্য যখন উচ্চনিনাদে [illegible] বাজাইতে বাজাইতে তারকাসুরের রাজ্য আক্রমণ করিতে [illegible] ছিলেন আর সে শব্দের প্রতিধ্বনি যখন আকাশ হইতে[illegible] যাইতেছিল এবং তাহাদের পায়ের চাপে উত্থিত ধূলির রাশি উঠিয়া আকাশকে মলিন করিয়া দিতেছিল, তখন মনে হই[illegible] 'আকাশ যেন ধূলির সে বেয়াদবি সহ্য করিতে না পারিয়া র[illegible] প্রতিধ্বনিচ্ছলে তর্জ্জনগর্জ্জন করিতেছে' (কুমার—১৪।[illegible])

'কুমারসম্ভবের' ষোড়শ সর্গে মহাকবি বলিতেছেন যে, সৈন্য আর অসুরসৈন্য যখন পরস্পরের প্রতি অজস্র শর[illegible] করিতেছিল, তখন বহু শর আকাশের দিকে উঠিয়া যাইতেছি[illegible] সেই সময় শকুনিরাও যখন উপর হইতে মাঝে মাঝে [illegible] করিতেছিল, তখন মনে হইতেছিল আকাশই বুঝি সৈন্যদে[illegible] আহত হইয়া যন্ত্রণায় বিকট স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে[illegible] বিরসং ব্যোম শ্যেন প্রতিরবচ্ছলাৎ' (কু—১৬।১২)।

প্রকৃতির সঙ্গে মেঘ যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, মেঘ[illegible] চেতনাবিশিষ্ট প্রাণীদের মত সম্বোধন করিয়া নিজের কোন[illegible] ভাব দিতে চায়, এমন লোকও সংসারে থাকিতে পারে, তা[illegible]

'মেঘদূত' গীতিকাব্যে অতি সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। প্রভুর কাজে ভুল করিয়া ফেলার অপরাধে যখন এক তরুণ যক্ষকে তাহার ঘর ছাড়িয়া, প্রেমময়ী পত্নীকে ছাড়িয়া সুদূর রামগিরি পর্ব্বতে এক বৎসর বাস করিতে হইয়াছিল, সেই বিরহকাতর যক্ষের মুখ দিয়া তিনি মেঘকে 'বন্ধু' বলিয়া সম্বোধন করাইয়াছেন, অলকানগরে তাহার বাসস্থানে গিয়া তাহার বিরহিণী পত্নীকে নিজের একটা খবর দিয়া আসিবার অনুরোধ করাইয়াছেন, কোন্ পথ দিয়া অলকায় যাইতে হইবে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা শুনাইয়াছেন, পথশ্রমে শ্রান্ত হইলে নদীর জল পান করিতে বলাইয়াছেন, অন্ধকার নিশীথে অভিসারিকা নারীদের পথচলার সুবিধার জন্য বিদ্যুৎ চমকাইতে অনুরোধ করাইয়াছেন, রাত্রি গভীর হইলে কোনও বাড়ীর ছাদে বিশ্রাম লইয়া রাত কাটাইতে উপদেশ দেওয়াইয়াছেন, কি উপায়ে তাহার বাড়ী চিনিতে পারা যায় তাহার বিবরণ দেওয়াইয়াছেন এবং স্ত্রীকে কি কি কথা কি ভাবে বলিতে হইবে তাহাও শুনাইয়া দিয়াছেন।

মেঘ যে কেবল চৈতন্যে সমৃদ্ধ নয়, প্রাণীদের মত তাহারও বিবাহিতা পত্নী এবং 'বন্ধুর প্রতি দায়িত্বজ্ঞান'ও থাকিতে পারে তাহাও মহাকবি 'মেঘদূতে' দেখাইয়াছেন। যক্ষ সেখানে মেঘকে বলিতেছে, "তাং কস্যাঞ্চিদ্ভবনবলভৌ সুপ্তপারাবতায়াং নীত্বা রাত্রিং চিরবিলসনাৎ খিন্ন-বিদ্যুৎ-কলত্রঃ" ইত্যাদি, বহুক্ষণ ধরিয়া স্ফুরণ করাতে 'পত্নী' বিদ্যুৎ নিশ্চয়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িবেন, তাই যখন দেখিবে কোনও বাড়ীর পায়রাটিও আর জাগিয়া নাই, সেই বাড়ীর ছাদে নামিয়া আসিয়া রাত্রিটা সেখানে কাটাইও; অবশ্য, প্রভাতে আবার যে তুমি পথের শেষটুকু চলিতে আরম্ভ করিয়া দিবে, সে আমি জানি কারণ তোমার মত লোক যখন বন্ধুর একটা কাজ করার ভার নেয়, মিছামিছি দেরি সে কিছুতেই করিতে পারে না" (পূ-মে—৩৯)।

মহাকবির চোখে রাত্রিও চিন্ময়ী। মানুষের মত রাত্রিরও হৃদয়ে কৌতূহল আছে, মানুষের মত সেও চোখ মেলিয়া দেখিতে পারে। পার্ব্বতী যখন নিজেকে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত করিয়া ফেলিলেন, তখন মহাকবি বলেন, 'ব্যালোকয়ন্নিব তড়িন্ময়ৈঃ মহাতপঃ সাক্ষ্য ইব স্থিতাঃ ক্ষপাঃ' (কু—৫,২৫) অর্থাৎ, 'রাত্রিরাও যেন উমার সে মহাতপস্যার সাক্ষী হইয়া বিদ্যুৎরূপ চক্ষু মেলিয়া তাঁহাকে দেখিতে থাকিত।'

কেবল রাত্রি কেন, কেবল প্রকৃতি কেন, মহাকবির কাছে কোনও কিছুই নির্জ্জীব নয়, সকলেই যেন জ্ঞান ও চেতনায় সমৃদ্ধ। তাই দেখি, তিনি সীতার চরণের নূপুরকেও চেতনাবান্ প্রাণীর মত বিবৃত করিয়াছেন। রাম ও লক্ষ্মণ যখন সীতার সন্ধানে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন সহসা সম্মুখে সীতার একটা নূপুর—তাঁহার প্রথম নিদর্শন, দেখিতে পাইয়া রামের মনে হইয়াছিল, যেন 'সীতার চরণপদ্ম হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়া থাকিতে হইয়াছে বলিয়া দুঃখে বেচারা বাক্যহারা হইয়া গিয়াছে' (রঘু—১৩,২৩), অর্থাৎ, যে নূপুর সীতার চরণে থাকাকালে মধুর রুণুঝুনু শব্দে মুখরিত থাকিত, আজ তাহাকে সীতার চরণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া থাকিতে হইয়াছে, সুতরাং সে নীরব, শ্রীরামের চোখে—দুঃখে বাক্যহারা।

মহারাজ অজও যখন তাঁহার প্রাণাধিকা পত্নী ইন্দুমতীর সহসা অকালমৃত্যুতে শোকে বিহ্বল হইয়া বিলাপ করিতেছিলেন, তখন সম্মুখে প্রিয়ার চন্দ্রহারটি ভূমির উপর পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল, "ইন্দুমতীর মৃত্যুতে সেও বুঝি শোকে 'অনুমৃতা' হইয়া রহিয়াছে", অর্থাৎ, যে প্রভুপত্নীর দেহে চন্দ্রহার সর্ব্বদাই স্থান পাইত, সহসা তাঁহাকে চিরদিনের মত হারাইতে হইল বলিয়া সে নিদারুণ শোক সহ্য করিতে না পারিয়া যেন মৃত্যুকেই অবশেষে বরণ করিয়া লইয়াছে, তাই সে ঐরূপভাবে নীরব, নিশ্চল হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে (রঘু—৮,৫৮)।

'রঘুবংশে'র তৃতীয় সর্গে ইন্দ্রের সহিত রঘুর যুদ্ধের সময়, যখন দেবরাজের একটা তীক্ষ্ণ বাণ রঘুর বক্ষে বিদ্ধ হইয়া রহিল, আর বুক হইতে রক্তপাত হইতে লাগিল, তখন মহাকবি বলেন, 'দেখাইতেছিল যেন ভয়ঙ্কর দানবদের রক্তপানে অভ্যস্ত বাণ আজ মানুষের তাজা রক্ত পাইয়া মহা কৌতূহলে পান করিয়া লইতেছে' (রঘু—৩,৫১)।

সাধারণত 'প্রকৃতি' বলিতে আমরা বৃক্ষ, লতা, নদী, নির্ঝরিণী, মেঘ ইত্যাদি চৈতন্যহীন পদার্থগুলিকে বুঝি, মহাকবি কিন্তু প্রকৃতির অর্থ এইগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ করেন নাই, তাঁহার বর্ণনা হইতে মনে হয়, তিনি কেবল বৃক্ষ, লতা নয়, বনের চৈতন্যবিশিষ্ট প্রাণী হরিণ-হরিণী, ময়ূর-ময়ূরী প্রভৃতিকেও 'প্রকৃতি' শব্দের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কতকগুলি উদাহরণ দিয়া এ কথার সার্থকতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিব।

রাবণ বধের পর রাম যখন সীতাকে লইয়া 'পুষ্পক' বিমানে বসিয়া অযোধ্যায় আসিতেছিলেন তখন উপর হইতে নীচে এক পরিচিত স্থানের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, যেখানে তিনি ও লক্ষ্মণ সীতার খোঁজে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। সেই পরিচিত স্থানটি দেখিতে পাইয়া রাম সীতাকে বলিয়াছিলেন যে, সেদিন যখন তাঁহারা তাঁহার খোঁজে ঘুরিতেছিলেন, তখন কেবল যে ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতাগুলি—যাহারা কথায় বলিতে না পারিয়া তাহাদের পল্লবযুক্ত শাখাগুলি বাড়াইয়া দিয়া রাবণ যে তাঁহাকে কোন্ পথ দিয়া লইয়া গিয়াছে, দেখাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহা নহে, এমন কি হরিণীরাও ঘাস খাওয়া বন্ধ রাখিয়া দক্ষিণদিকে নির্নিমেষ লোচনে চাহিয়া থাকিয়া তাঁহাদিগকে যেন জানাইয়া দিতে চাহিতেছিল যে, রাবণ ঐ দক্ষিণদিক দিয়া সীতাকে লইয়া পলাইয়া গিয়াছে (রঘু—১৩, ২৪-২৫)।

সীতার বনবাসের করুণ কাহিনী বর্ণনা করিতে গিয়াও মহাকবি এইরূপ চিত্রই প্রদর্শন করিয়াছেন। লক্ষ্মণ যখন তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেছিলেন, সীতা তখন দুঃখে, শোকে, ভয়ে 'ভয়ার্ত্তা

কুররী পাখীর মত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।' সীতার কাতর ক্রন্দনধ্বনি সেই নীরব নির্জ্জন বনের মাঝে কিরূপ ব্যথার সৃষ্টি করিল, তাহা দেখাইবার জন্য মহাকবি বলিতেছেন, 'ময়ূর-ময়ূরী যাহারা এতক্ষণ নৃত্যে মাতিয়াছিল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, হরিণীর মুখের গ্রাস মুখ হইতে পড়িয়া গেল, বৃক্ষেরা তাহাদের শাখা হইতে স্তবকে স্তবকে পুষ্প ভূমির উপর ফেলিতে লাগিল, যেন বনভূমিতেও অযোধ্যার রাজপ্রাসাদের মত, সীতার দুঃখে সমবেদনায় রোদন আরম্ভ হইল' (রঘু—১৪।৬৯)।

অযোধ্যার রাজপ্রাসাদের অধিবাসী ও অধিবাসিনীরা যখন জানিতে পারিলেন যে লক্ষ্মণ সীতাকে লইয়া মহর্ষির তপোবনে জন্মের মত তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিতে গিয়াছেন, সীতাকে আর তাঁহারা কখনও দেখিতে পাইবেন না, তখন তাঁহার শোকে পুরবাসীদের মধ্যে যে করুণ ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল, মহাকবি যেন তাহারই প্রতিধ্বনি সমগ্র বনভূমিতেও চেতন অচেতন সকলের মধ্যে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন। কেবল বৃক্ষলতা নয়, বনের হরিণী, ময়ূর-ময়ূরীরাও আপনজনের মত তাঁহার দুঃখে সমবেদনা জানাইয়া রোদন করিতেছিল।

'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটকেও মহাকবি প্রাণীদিগকে প্রকৃতি পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। পতিগৃহে যাইবার সময় শকুন্তলা যখন তপোবনের সহিত আসন্ন বিচ্ছেদ স্মরণ করিয়া দুঃখে অভিভূতা হইয়া পড়িতেছিলেন, তখন তাঁহার প্রিয়সখী প্রিয়ংবদা বলিতেছেন, "কেবল যে তুমি সখি, তপোবন বিচ্ছেদের দুঃখে কাতরা হইয়া পড়িয়াছ তাহা নহে, তুমি চলিয়া যাইতেছ বুঝিতে পারিয়া তপোবনের কি অবস্থা হইয়াছে দেখ। হরিণীরা আর ঘাস খাইতে পারিতেছে না, তাহাদের মুখ হইতে ঘাস পড়িয়া যাইতেছে, ময়ূরীরা আর নৃত্য করিতেছে না, লতাগুলি হইতে শুষ্কপত্র ঝরিয়া পড়িতেছে, যেন দুঃখে লতাদেরও চোখের জল ঝরিয়া পড়িতেছে' (শকু—৪র্থ অঙ্ক)।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মহাকবির সাহিত্যে মধ্যে মধ্যে 'বনদেবতাদের' উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহারা বৃক্ষাদির মধ্যে বা অন্তরালে থাকিয়া মানবমনের সহিত কিভাবে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে, এখানে তাহার দুই-তিনটা উদাহরণ দেওয়া গেল।

'রঘুবংশে'র নবম সর্গে মহাকবি রাজা দশরথের মৃগয়ার বর্ণনা দিয়াছেন। অশ্বের পৃষ্ঠে বসিয়া দশরথ সবুজ রঙের বর্ম্ম পরিয়া হস্তে ধনুর্ব্বাণ লইয়া অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। বনের পথ যেমন বৃক্ষে তেমনি লতায় ভরা, পাশাপাশি লতা, লতার পর লতা, লতাদের উপর ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, ফুলের উপর আবার কালো কালো ভ্রমর বসিয়া মধুপান করিতেছে, মনে হইতেছে যেন 'বন-দেবতারা লতাগুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের কৃষ্ণতারকা-সমন্বিত চক্ষুগুলি বিস্ফারিত করিয়া রাজা দেখিতেছে' (রঘু—৯।৫২)।

এই শ্লোকটিতে মহাকবি বলিতেছেন না যে, লতাগুলি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া রাজা দেখিতেছেন ; তিনি বলিতেছেন, লতাদের সাদা সাদা ফুলের উপর কালো কালো ভোমরা যেন চক্ষুর সাদা সাদা বলের উপর কৃষ্ণতারা—বনদেবতাদের বিস্ময়ে বিস্ফারিত চক্ষু। তাঁহারা যেন লতাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজা দেখিতেছেন।

'রঘুবংশে'র দ্বিতীয় সর্গেও বনদেবতাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে রাজা দিলীপ বনের প্রান্তে রাখালের বেশে চলিয়াছেন একা, অদূরে বাঁশের ঝাড়, মহাকবি বলিতেছেন, বাঁশঝাড়ের বাঁশগুলির রন্ধ্রে রন্ধ্রে বায়ু প্রবেশ করিয়া বংশীধ্বনির মত সুমিষ্ট শব্দ উৎপাদন করিত এবং যখন 'বনদেবতারা লতাকুঞ্জের মধ্যে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে রাজার যশোগীত গাহিতেন তখন তিনি তাহাও শুনিতে পাইতেন' (রঘু—২।১২)।

শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা করার সময় বিদায় মুহূর্ত্তে মহর্ষি কণ্ব প্রথমে উচ্চকণ্ঠে তপোবনের বৃক্ষ ও 'বনদেবতাগণকে' উদ্দেশ্য করিয়া শকুন্তলার জন্য তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন (শকু—৪র্থ অঙ্ক)।

'অভিজ্ঞান শকুন্তলে'র চতুর্থ অঙ্কে মহাকবি প্রকৃতির সহিত মানবের যে অপূর্ব্ব হৃদ্যতার বিবরণ দিয়াছেন, তাহার তুলনা অন্য কোনও কবির কাব্যে পাওয়া কঠিন। মহর্ষি কণ্বের তপোবনের প্রত্যেকেই, তা হউক না সে মানব-মানবী, হরিণ-হরিণী বা বৃক্ষলতা, শকুন্তলার কাছে সকলেই ছিল সমান আপন জন। তাহাদের বিচ্ছেদ শকুন্তলার কাছে যেমন বেদনাদায়ক, শকুন্তলার বিচ্ছেদও তাহাদের কাছে তেমনি ভাবে দুঃখজনক। পতিগৃহে যাত্রা করিবার সময় শকুন্তলা প্রতিপদে তপোবনের আকর্ষণ যেভাবে অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "বনের সহিত মানুষের বিচ্ছেদ যে এমন সকরুণ মর্ম্মান্তিক হইতে পারে, তাহা জগতের সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে কেবল 'অভিজ্ঞান শকুন্তলে'র চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায়। এই কাব্যে স্বভাব ও ধর্ম্ম নিয়মের যেমন মিলন, মানুষ ও প্রকৃতির তেমন মিলন। বিসদৃশের মধ্যে এমন একান্ত মিলনের ভাব বোধ করি ভারতবর্ষ ছাড়া আর অন্য কোনও দেশে সম্ভবপর হইতে পারে না।"

তপোবনের আকর্ষণ—যে তপোবনে তিনি আশৈশব প্রতিপালিতা হইয়াছিলেন, সে আকর্ষণ কি যে-সে আকর্ষণ। শকুন্তলার কাছে তাঁহার পিতা কণ্ব, প্রিয়সখী অনসূয়া প্রিয়ংবদা যেমন প্রিয়, যেমন আপন জন, তেমনি প্রিয় তেমনি আপন জন ছিল তাঁহার স্বহস্তে বর্দ্ধিতা মাধবীলতা যাহাকে সজলনয়নে আলিঙ্গন করিয়া তিনি তার কাছ হইতে বিদায় লইয়াছিলেন, তেমনি আপন জন ছিল তাঁহার লতা ভগিনী বনজ্যোৎস্না, তেমনি আপন জন ছিল তাঁহার গর্ভভারে অলসা হরিণী, তেমনি আপন জন ছিল তাঁহার সেই মৃগশাবকটি অকালে যার জননী মারা যাওয়াতে তিনি তাহাকে স্বহস্তে লালন-পালন করিয়াছিলেন।

মহর্ষি কণ্বও বনের নিকট হইতে যেভাবে তাঁহার প্রিয় দুহিতা শকুন্তলার জন্য বিদায় আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা

বাস্তবিকই অনন্যসাধারণ। বিদায়ের প্রাক্কালে বনের সকলকে উচ্চৈঃস্বরে সম্বোধন করিয়া মহর্ষি বলিতেছেন, "ভো ভো সন্নিহিত-বনদেবতাস্তপোবনতরবঃ" অর্থাৎ, হে নিকটস্থ বনদেবতাগণ ও তপোবনের বৃক্ষসমূহ, যে তোমাদের মূলে জল না দিয়া নিজে কখনও জল পান করে নাই, অলঙ্কার পরার সাধ থাকিলেও যে কখনও বৃক্ষের একটি পল্লব ভাঙ্গে নাই, তোমাদের শাখায় ফুল ফুটিলে আনন্দের যার সীমা থাকিত না, সেই শকুন্তলা আজ স্বামীর গৃহে যাইবে তোমরা সকলে অনুমতি দাও।"

মহর্ষির আবেদনের উত্তর আসিল আকাশ হইতে অদৃশ্য বাণী—"শিবশ্চ পন্থাঃ"—"শকুন্তলার গমন পথ মঙ্গলযুক্ত হউক" এবং "পথের উভয়পার্শ্ব প্রস্ফুটিত পদ্মে শোভিত জলাশয়ে মনোহর হউক, বৃক্ষগণ শীতল ছায়া প্রদান করিয়া রৌদ্রতাপ দূর করুক, পথের ধূলি পুষ্পের রেণুর মত কোমল, এবং বাতাস শান্ত ও অনুকূল হউক।"

কেবল অশরীরী বাণীই নয়, সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল কোকিলের কুহুধ্বনি যাহা শুনিয়া মহর্ষির এক শিষ্য বলিলেন, 'গমনের সময় কোকিলের স্বর মঙ্গলের চিহ্ন', যেন সমস্ত তপোবন শকুন্তলার আসন্ন বিচ্ছেদ দুঃখ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে ও এই দুঃখের মধ্যেও পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর মত, পরমাত্মীয়ের মত মুখর হইয়া আন্তরিক মঙ্গলেচ্ছা জানাইয়া দিতেছে।

কণ্বের ভগিনী আর্য্যা গৌতমীও সব শুনিয়া বলিলেন, 'জ্ঞাতি-গণের ন্যায় স্নেহশীল তপোবনের দেবতারা তোমার যাত্রার অনুমতি দিতেছেন, প্রণাম কর।'

এতক্ষণ আমরা দেখিলাম প্রকৃতি কি ভাবে মানুষের উপর তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, এবার আমরা দেখাইব মানুষ, বিশেষতঃ যে সব মানুষের মধ্যে বৈশিষ্ট্য থাকে, তাঁহারা প্রকৃতির উপর কি ভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের ভাবে প্রভাবিত হইয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় মহাকবি সেক্সপীয়রের 'টেম্পেষ্ট' নাটকের প্রস্পেরোর মত যাদুবিদ্যার সাহায্যে নয়, জোর-জবরদস্তি দ্বারা নয়, প্রভু ভৃত্যের সম্পর্কে নয়—চরিত্রের মাধুর্য্যে, স্নেহ ও প্রীতির আকর্ষণে, জ্ঞাতসারে নয়, অজ্ঞাতসারে।

সম্রাট দিলীপ যখন বনের পথে গরু চরাইতে যাইতেন, তখন তাঁহার মত পুণ্যবান্ ও লক্ষ্মীবান পুরুষের উপস্থিতি বনের উপর কি প্রভাব বিস্তার করিত দেখাইবার জন্য কালিদাস বলিতেছেন, 'শশাম বৃষ্ট্যাপি বিনাদবাগ্নি রাসীদ্বিশেষা ফলপুষ্প বৃদ্ধিঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ সেই বনের মধ্যে যখন তিনি রক্ষীর ন্যায় ভ্রমণ করিতেন, তখন (তাঁহার উপস্থিতির মাহাত্ম্যে) বনবহ্নিও বিনা বৃষ্টির ধারায় নির্ব্বাপিত হইয়া যাইত, বৃক্ষলতা ফুলফলে ভরিয়া থাকিত, এমন কি শক্তিশালী জন্তুরাও দুর্ব্বল প্রাণীদিগকে বধ করিত না' (রঘু২।১৪)।

'কুমারসম্ভবে'ও পার্ব্বতীর জন্ম বর্ণনায় মহাকবি প্রকৃতির উপর তাহার প্রভাবের কথা বলিয়াছেন। পার্ব্বতী যেদিন হিমালয়ের ঘরে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন, মহাকবি বলেন, তখন 'চারিদিক প্রসন্ন হইয়া উঠিল, বায়ু ধূলিশূন্য হইয়া বহিতে লাগিল, অলক্ষ্যে শঙ্খের মঙ্গলধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল, আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল ও সকলের মন যেন একটা নির্ম্মল আনন্দে ভরিয়া গেল।'

যেন বিশ্ব-প্রকৃতি সেদিন ধরার বক্ষে জগন্মাতার শুভ আবির্ভাব সাদর অভ্যর্থনায় বরণ করিয়া লইলেন।

কামনা

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র

নভঃ হতে উর্দ্ধতর কোন এক বাতায়নে বসি'
আঁখি মোর মুগ্ধ হলো জন্মাতীত বিস্ময়ের ক্ষণে
ধরণীর রূপ হেরি'। প্রদীপ্ত কামনা বুঝি মনে
আবেগে পুলকে তাই শতরূপে উঠিল বিকশি';
চাহিল লভিতে এই ধরণীর শ্যাম আলিঙ্গন।
আমার অজানা সাধ পূর্ণ হলো, আমি লভিলাম
মর্ত্ত্যের এ শ্যামাঞ্চলে ক্ষণেকের একটু বিরাম,
একটু গোপন কথা, কানে কানে স্নেহ-সম্ভাষণ।

তার পর বিদায়ের বেলা নামে জীবনের দ্বারে,
যে কথা বলিতে আসা হয় ত হলো না তবু বলা,
যেটুকু চেয়েছি মন পূর্ণরূপে করিতে অর্পণ,
হয় ত হয় নি তাহা, পড়ে থাকি পিছনের ভারে,
থেমে আসে অবশেষে ক্লান্ত পদে পথ বেয়ে চলা,
ধরার অধরে শুধু স্পর্শ লভে শেষের চুম্বন।

চেনা

সুফী মোতাহার হোসেন

যে কথা ঘুমায়ে রয় গুকাল সে কালের হৃদয়ে
তুমি যে গানের সুরে পারো তারে ফুটাইতে ফুলে।
আনন্দ-কুসুম তব করতলে, তব করাঙ্গুলে
প্রাণের অরূপ সুধা কণ্ঠে তব ক্ষরে সুর হয়ে।
যে কথা মিশিয়া রয় আকাশের নীলের সঞ্চয়ে
তোমার চোখের নীলে কথা কয়ে উঠে সে কি ভুলে?
চকিতে ফুটাও কোন্ পরিচয় সময়ের কূলে
ফুটে যা দুর্লভ ক্ষণে অমৃতের পরসাদ লয়ে?

আলোতে আলোতে স্ফুরে জীবন-চেতনা ভুবনের
গানেতে গানেতে লুটে মুঞ্জরিত কুসুম-আবেশ,
লীলা বেশে ফুটে রূপ—অরূপের অব্যক্ত ব্যঞ্জনা
কালের হৃদয় হতে বাহিরায় নিগূঢ় বেদনা।
তোমার গানের তানে বাজিল কি তারি সুর-রেশ
তোমাতে চিনিনু তব চির-রূপ, ছবি অব্যক্তের।

ভাগীরথী তীরের লুপ্তকীর্ত্তি

শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র

ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য-শিল্পের অনবদ্য মাধুর্য্যে উড়িষ্যা এবং দক্ষিণ ভারতের মন্দির ও মূর্ত্তিগুলি বিখ্যাত সন্দেহ নাই, তবে বাংলায় বিভিন্ন স্থানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত চৈত্য, বিহার, সঙ্ঘারাম, মঠ, মন্দির এবং সেগুলিতে প্রাপ্ত মূর্ত্তিসমূহ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য-শিল্পে ইহারও সমৃদ্ধির কথাই ঘোষণা করে। খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম হইতে চতুর্থ শতকে বাংলায় বহু রমণীয় মন্দির চৈত্য ও বিগ্রহাদির অস্তিত্বের কথা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্‌ উল্লেখ করিয়াছেন। পাহাড়পুর, বানগড়, গৌড়, পাণ্ডুয়া, মুর্শিদাবাদ, বিষ্ণুপুর, নবদ্বীপ, তমলুক, চন্দ্রনাথ, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট ও চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলের স্তূপ, মন্দিরাদি দেউল ও মূর্ত্তিগুলি তাঁহার উক্তির যাথার্থ্যই সপ্রমাণ করিতেছে।

সেনদীঘি হইতে প্রাপ্ত লাল বেলে পাথরে নির্ম্মিত তারামূর্ত্তি
(খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দী)

রাজসাহী জেলার সূর্য্যমূর্ত্তি, বিহারৈল গ্রামের বুদ্ধমূর্ত্তি, পাহাড়পুরের ইন্দ্র, যম, কুবের, অগ্নি, অবলোকিতেশ্বর ও গণেশ ইত্যাদি উৎকীর্ণ চিত্রশিলাগুলি, বরিশালের জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি, চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত কাশীপুরের সূর্য্যমূর্ত্তি, বোড়াল গ্রামের বিষ্ণু ও তারা- ... বীণাবাদিনী সরস্বতী-মূর্ত্তি এবং জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভনাথের মূর্ত্তিগুলি এক অপূর্ব্ব ভাবধারা ও শিল্পনৈপুণ্যে সমৃদ্ধ।

সেনদীঘি হইতে প্রাপ্ত পোড়া মাটির কালীমূর্ত্তি
(খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দী?)

বহু প্রাচীন কাল হইতে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তাম্রলিপ্ত (বর্ত্তমান তমলুক) একটি প্রধান সামুদ্রিক বন্দর ছিল। বিভিন্ন স্থান হইতে ব্যবসায়ী ও সমুদ্রপথে ভ্রমণকারিগণ তৎকালে এই তাম্রলিপ্তি বন্দরে আসিয়া উপনীত হইতেন। ভারতবর্ষ হইতে সিংহল, চীন ও জাপান প্রভৃতি দূরদেশে বহির্বাণিজ্যের উদ্দেশে গমনাগমন করিবার জন্য তাম্রলিপ্তই ছিল প্রধান বন্দর। খ্রীঃ পূঃ ৩০৭ অব্দেও তাম্রলিপ্তি একটি সামুদ্রিক বন্দর রূপে ব্যবহৃত হইত এবং ঐ স্থান হইতেই পবিত্র বোধিদ্রুম সিংহলে প্রেরিত হইয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ২৪৩ অব্দে সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র বুদ্ধদেবের বাণী বহন করিয়া বহু ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীসহ তাম্রলিপ্তি হইতে সিংহলে গমন করেন।

পরবর্ত্তীকালে বাংলা দেশে যখন স্বাধীন পালরাজ (ইং ৭৫০- ১১৫০) ও সেনরাজগণ (ইং ১০৫০-১২৩০) কর্ত্তৃক শাসিত হয় তখন গৌড় হইতে বহির্বাণিজ্যের জন্য তাম্রলিপ্তি বন্দরে অবিরাম গমনাগমন করা তাঁহাদের এক নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল। পাল ও সেন রাজগণ গৌড় (বর্ত্তমান ইংরেজবাজার বা মালদহ হইতে দশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে) ও নবদ্বীপে রাজধানী

স্থাপন করেন। সেখান হইতে তাম্রলিপ্তি বন্দরে যাইবার প্রধান জলপথ ছিল প্রাচীন ভাগীরথী। এই জলপথের উভয় কূলে উক্ত রাজগণ কীর্ত্তিস্তম্ভ, মঠ, মন্দির ও ধর্ম্মশালা প্রভৃতি স্থাপন করেন। বিভিন্ন শিলালিপি-প্রশস্তি ও তাম্রশাসন-লিপি হইতে দেখা যায় যে, উক্ত রাজগণ দক্ষিণ-সমুদ্রের কূলে, শ্রীক্ষেত্রে, বারাণসীতে ও গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে মন্দিরাদি ও জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন।

সমুদ্রপথে যাত্রার প্রাক্কালে সওদাগর ও রাজারা স্ব স্ব ইষ্ট-দেব-দেবীর আরাধনা করিতেন। সূর্য্য, গণেশ, বিষ্ণু, শিব ও কালী এই মূর্ত্তিগুলিই প্রধানতঃ বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পূজিত হইত।

"সরলদীঘি" হইতে প্রাপ্ত, কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত "কীর্ত্তিমুখ"
(খ্রীঃ ১০ম শতাব্দী ?)

বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ একই উদ্দেশ্যে বাংলার স্বাধীন রাজগণ জেলা চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী গড়িয়া, বোড়াল, গোবিন্দপুর, রাজপুর, জয়নগর, ধপধপি, কুলপি, মথুরাপুর, লক্ষ্মীকান্তপুর এবং সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু মঠ, মন্দির ও বন্দর স্থাপন করেন। লক্ষ্মীকান্তপুরের অনতিদূরে সুন্দরবনের ১১৬নং লাটে "জটার দেউল" নামে এক অতি প্রাচীন মন্দির দৃষ্ট হয়। উহার উচ্চতা প্রায় নব্বই ফুট এবং উহার গঠনকৌশল ভুবনেশ্বরের মন্দিরের অনুরূপ। কেহ কেহ বলেন, উহা একটি শিবমন্দির, আবার কাহারও কাহারও মতে উহা একটি বৌদ্ধ চৈত্য। জটার দেউলের নিকটে হাতিয়া গড় নামে একটি গড় আছে। প্রাচীনকালে এই অঞ্চল হাতিয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে সেনরাজগণ হীনবল ও মুসলমান আক্রমণ প্রবল হইতে থাকিলে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে এবং ভাগীরথীর স্থানে স্থানে মগ ও জলদস্যুদের অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ হয়। উহারা সমৃদ্ধিশালী জনপদগুলির ভিতর দলবদ্ধভাবে প্রবেশ করিয়া নরহত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ ও যথেচ্ছ অত্যাচার করিত। এমনকি উহারা অসহায় গ্রামবাসী ও তরুণীদিগকে ধরিয়া লইয়া ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ বণিকগণের নিকট ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিত। এই অত্যাচারের ফলে ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী জনবহুল এবং সমৃদ্ধ গ্রাম ও নগরগুলি ক্রমে ক্রমে জনশূন্য হইয়া যায়। রাজা প্রতাপাদিত্য ষোড়শ শতাব্দীর শেষাঙ্কে যমুনা ও ইচ্ছামতীর সঙ্গমস্থলে ধূমঘাট নামক স্থানে এক নূতন নগরী স্থাপন ও সেনা-বাহিনী গঠন করিয়া ঐ মগ ও জলদস্যুগণকে দমন করিতে সমর্থ

বোড়াল গ্রামে প্রাপ্ত, কৃষ্ণ প্রস্তরে উৎকীর্ণ বিষ্ণুমূর্ত্তি
(খ্রীঃ ৮ম শতাব্দী)

হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু উক্ত জনপদগুলির হৃতশ্রী আর ফিরিয়া আসে নাই। ফলে ঐ সকল স্থান বনাকীর্ণ হয় এবং স্থানীয় প্রাচীন মঠ ও মন্দিরগুলি পরিত্যক্ত ও কালক্রমে ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়।

প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্তরায়ের রাজধানী ও "রায়-গড়" দুর্গ দক্ষিণ কলিকাতার বড়িষা অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া সম্ভবতঃ ভাগীরথীর কূলবর্ত্তী গড়িয়া পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমানে উক্ত গড়ের চিহ্ন না থাকিলেও "গড়িয়া", 'গড়িয়া-হাট' প্রভৃতি নামগুলি উক্ত গড়ের অস্তিত্ব স্মরণ করাইয়া দেয়। এই গড়িয়ার নিকটবর্ত্তী বোড়াল গ্রামে একটি সেনস্তূপ ও সেন-দীঘি নামক অসংস্কৃত এক সুপ্রাচীন জলাশয় আছে। পুরীর "চন্দন সরোবর", ভুবনেশ্বরের "বিন্দু সরোবর" ও তাম্রলিপ্তির "রাজদীঘি"র ন্যায় উক্ত সেনদীঘির মধ্যস্থলেও একটি মন্দির ছিল। বোড়াল গ্রামের উক্ত স্তূপ ও দীঘির পাড় খনন করাইয়া খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিভিন্ন সময়ের নানা প্রস্ত-

ভাগীরথী তীরের লুপ্তকীর্ত্তি

শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র

ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য-শিল্পের অনবদ্য মাধুর্য্যে উড়িষ্যা এবং দক্ষিণ ভারতের মন্দির ও মূর্ত্তিগুলি বিখ্যাত সন্দেহ নাই, তবে বাংলার বিভিন্ন স্থানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত চৈত্য, বিহার, সঙ্ঘারাম, মঠ, মন্দির এবং সেগুলিতে প্রাপ্ত মূর্ত্তিসমূহ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য-শিল্পে ইহারও সমৃদ্ধির কথাই ঘোষণা করে। খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম হইতে চতুর্থ শতকে বাংলায় বহু রমণীয় মন্দির চৈত্য ও বিগ্রহাদির অস্তিত্বের কথা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ উল্লেখ করিয়াছেন। পাহাড়পুর, বানগড়, গৌড়, পাণ্ডুয়া, মুর্শিদাবাদ, বিষ্ণুপুর, নবদ্বীপ, তমলুক, চন্দ্রনাথ, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট ও চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলের স্তূপ, মন্দিরাদি দেউল ও মূর্ত্তিগুলি তাঁহার উক্তির যাথার্থ্যই সপ্রমাণ করিতেছে।

সেনদীঘি হইতে প্রাপ্ত লাল বেলে পাথরে নির্ম্মিত তারামূর্ত্তি
(খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দী)

রাজসাহী জেলার সূর্য্যমূর্ত্তি, বিহারৈল গ্রামের বুদ্ধমূর্ত্তি, পাহাড়পুরের ইন্দ্র, যম, কুবের, অগ্নি, অবলোকিতেশ্বর ও গণেশ ইত্যাদি উৎকীর্ণ চিত্রশিলাগুলি, বরিশালের জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি, চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত কাশীপুরের সূর্য্যমূর্ত্তি, বোড়াল গ্রামের বিষ্ণু ও তারামূর্ত্তি, সুন্দরবনের চক্রমধ্যস্থ গরুড়-বিষ্ণু, বীণাবাদিনী সরস্বতী-মূর্ত্তি এবং জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভনাথের মূর্ত্তিগুলি এক অপূর্ব্ব ভাবধারায় ও শিল্পনৈপুণ্যে সমৃদ্ধ।

সেনদীঘি হইতে প্রাপ্ত পোড়া মাটির কালীমূর্ত্তি
(খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দী?)

বহু প্রাচীন কাল হইতে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তাম্রলিপ্ত (বর্ত্তমান তমলুক) একটি প্রধান সামুদ্রিক বন্দর ছিল। বিভিন্ন স্থান হইতে ব্যবসায়ী ও সমুদ্রপথে ভ্রমণকারিগণ তৎকালে এই তাম্রলিপ্তি বন্দরে আসিয়া উপনীত হইতেন। ভারতবর্ষ হইতে সিংহল, চীন ও জাপান প্রভৃতি দূরদেশে বহির্বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে গমনাগমন করিবার জন্য তাম্রলিপ্তই ছিল প্রধান বন্দর। খ্রীঃ পূঃ ৩০৭ অব্দেও তাম্রলিপ্তি একটি সামুদ্রিক বন্দর রূপে ব্যবহৃত হইত এবং ঐ স্থান হইতেই পবিত্র বোধিদ্রুম সিংহলে প্রেরিত হইয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ২৪৩ অব্দে সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র বুদ্ধদেবের বাণী বহন করিয়া বহু ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীসহ তাম্রলিপ্তি হইতে সিংহলে গমন করেন।

পরবর্ত্তীকালে বাংলা দেশে যখন স্বাধীন পালরাজ (ইং ৭৬০-১১৫০) ও সেনরাজগণ (ইং ১০৫০-১২৩০) কর্ত্তৃক শাসিত হইত তখন গৌড় হইতে বহির্বাণিজ্যের জন্য তাম্রলিপ্তি বন্দরে অবিরাম গমনাগমন করা তাঁহাদের এক নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল। পাল ও সেন রাজগণ গৌড় (বর্ত্তমান ইংরেজবাজার বা মালদহ হইতে দশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে) ও নবদ্বীপে রাজধানী

স্থাপন করেন। সেখান হইতে তাম্রলিপ্তি বন্দরে যাইবার প্রধান জলপথ ছিল প্রাচীন ভাগীরথী। এই জলপথের উভয় কূলে উক্ত রাজগণ কীর্ত্তিস্তম্ভ, মঠ, মন্দির ও ধর্ম্মশালা প্রভৃতি স্থাপন করেন। বিভিন্ন শিলালিপি-প্রশস্তি ও তাম্রশাসন-লিপি হইতে দেখা যায় যে, উক্ত রাজগণ দক্ষিণ-সমুদ্রের কূলে, শ্রীক্ষেত্রে, বারাণসীতে ও গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে মন্দিরাদি ও জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন।

সমুদ্রপথে যাত্রার প্রাক্কালে সওদাগর ও রাজারা স্ব স্ব ইষ্ট-দেব-দেবীর আরাধনা করিতেন। সূর্য্য, গণেশ, বিষ্ণু, শিব ও কালী এই মূর্ত্তিগুলিই প্রধানতঃ বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় কর্তৃক পূজিত হইত।

"সরলদীঘি" হইতে প্রাপ্ত, কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত "কীর্ত্তিমুখ"
(খ্রীঃ ১০ম শতাব্দী ?)

বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ একই উদ্দেশ্যে বাংলার স্বাধীন রাজগণ জেলা চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী গড়িয়া, বোড়াল, গোবিন্দপুর, রাজপুর, জয়নগর, ধপধপি, কুলপি, মথুরাপুর, লক্ষ্মী-কান্তপুর এবং সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু মঠ, মন্দির ও বন্দর স্থাপন করেন। লক্ষ্মীকান্তপুরের অনতিদূরে সুন্দরবনের ১১৬নং লাটে "জটার দেউল" নামে এক অতি প্রাচীন মন্দির দৃষ্ট হয়। উহার উচ্চতা প্রায় নব্বই ফুট এবং উহার গঠনকৌশল ভুবনেশ্বরের মন্দিরের অনুরূপ। কেহ কেহ বলেন, উহা একটি শিবমন্দির, আবার কাহারও কাহারও মতে উহা একটি বৌদ্ধ চৈত্য। জটার দেউলের নিকটে হাতিয়া গড় নামে একটি গড় আছে। প্রাচীনকালে এই অঞ্চল হাতিয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে সেনরাজগণ হীনবল ও মুসলমান আক্রমণ প্রবল হইতে থাকিলে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে এবং ভাগীরথীর স্থানে স্থানে মগ ও জলদস্যুদের অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ হয়। উহারা সমৃদ্ধিশালী জনপদগুলির ভিতর দলবদ্ধভাবে প্রবেশ করিয়া নরহত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ ও যথেচ্ছ অত্যাচার করিত। এমনকি উহারা অসহায় গ্রামবাসী ও তরুণীদিগকে ধরিয়া লইয়া ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ বণিকগণের নিকট ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিত। এই অত্যাচারের ফলে ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী জনবহুল এবং সমৃদ্ধ গ্রাম ও নগরগুলি ক্রমে ক্রমে জনশূন্য হইয়া যায়। রাজা প্রতাপাদিত্য ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যমুনা ও ইচ্ছামতীর সঙ্গমস্থলে ধুমঘাট নামক স্থানে এক নূতন নগরী স্থাপন ও সেনা-বাহিনী গঠন করিয়া ঐ মগ ও জলদস্যুগণকে দমন করিতে সমর্থ

বোড়াল গ্রামে প্রাপ্ত, কৃষ্ণ প্রস্তরে উৎকীর্ণ বিষ্ণুমূর্ত্তি
(খ্রীঃ ৮ম শতাব্দী)

হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু উক্ত জনপদগুলির হৃতশ্রী আর ফিরিয়া আসে নাই। ফলে ঐ সকল স্থান বনাকীর্ণ হয় এবং স্থানীয় প্রাচীন মঠ ও মন্দিরগুলি পরিত্যক্ত ও কালক্রমে ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়।

প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্তরায়ের রাজধানী ও "রায়-গড়" দুর্গ দক্ষিণ কলিকাতার বড়িষা অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া সম্ভবতঃ ভাগীরথীর কূলবর্ত্তী গড়িয়া পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমানে উক্ত গড়ের চিহ্ন না থাকিলেও "গড়িয়া", 'গড়িয়া-হাট' প্রভৃতি নামগুলি উক্ত গড়ের অস্তিত্ব স্মরণ করাইয়া দেয়। এই গড়িয়ার নিকটবর্ত্তী বোড়াল গ্রামে একটি সেনস্তূপ ও সেন-দীঘি নামক অসংস্কৃত এক সুপ্রাচীন জলাশয় আছে। পুরীর "চন্দন সরোবর", ভুবনেশ্বরের "বিন্দু সরোবর" ও তাম্রলিপ্তির "রাজদীঘি"র ন্যায় উক্ত সেনদীঘির মধ্যস্থলেও একটি মন্দির ছিল। বোড়াল গ্রামের উক্ত স্তূপ ও দীঘির পাড় খনন করাইয়া খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিভিন্ন সময়ের নানা প্রস্ত-

তাত্বিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে পাল আমলের দুইটি প্রস্তরময় বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং সেন আমলের দারুময়ী যোড়শী (ত্রিপুরসুন্দরী দেবী) মূর্ত্তি, তন্ত্রোক্ত মন্ত্র-ক্ষোদিত দেবী-যন্ত্র, প্রস্তরোৎকীর্ণ বিষ্ণু পাদ-পদ্ম, এবং লাল বেলে পাথরের একটি মনোরম তারামূর্ত্তি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত বহু প্রকার চিত্রিত ইষ্টক, পোড়া মাটির কালীমূর্ত্তি, একটি বৃহদাকার কীর্ত্তিমুখ শীলা (স্থানীয় প্রচলিত নাম ককাই চণ্ডী), ভগ্ন নৌকার অংশ, অঙ্গারীভূত (carbonised) খাদ্যশস্য, প্রস্তরীভূত কঙ্কাল (fossil) ও সারিবদ্ধ প্রাচীন ধরণের বহু ইঁদারার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত নিদর্শনের কতকগুলি কলিকাতার আশুতোষ মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার "বাংলার ভাস্কর্য্য" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—

চব্বিশ পরগনার কাশীপুরে প্রাপ্ত, কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত সূর্য্যমূর্ত্তি
(খ্রীঃ ৭ম শতাব্দী)

"যে সব মূর্ত্তিকে সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর সৃষ্টি বলে ধরা যেতে পারে তাদের মধ্যে ২৪ পরগণার বোড়াল গ্রামের বিষ্ণুমূর্ত্তিটিতে অন্য মূর্ত্তি থেকে স্বতন্ত্র কয়েকটি বিশেষত্ব চোখে পড়ে। চতুষ্কোণ একখানি ফলকের উপর অগভীর ভাবে উৎকীর্ণ মূর্ত্তিটি দৈর্ঘ্যে অনতিবিস্তৃত, কিন্তু আয়তনে একটু প্রশস্ত। শীর্ষদেশ ও দুই প্রান্তের অনুচ্চ বন্ধনী, পরিস্ফুট বাদামী আকারের চক্ষু ও তীক্ষ্ণ গভীর রেখায় বিশিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, অলঙ্কার ও পরিধেয়ের ভাঁজ মূর্ত্তিটিকে অনেকটা আদিমধর্মী করে রেখেছে।"

বিভিন্ন যুগের এই সমস্ত শিল্প-নিদর্শন, ধ্বংসাবশেষ ও প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের লক্ষণ হইতে প্রত্নতাত্বিক ও ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, চব্বিশ পরগনার এই সমস্ত অঞ্চল প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে সভ্যতার স্তরে আসিয়াছিল।

বোড়াল গ্রামের কয়েক মাইল দক্ষিণে গোবিন্দপুর গ্রামে, ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্ত্তী বকুলতলা ও করঞ্জলি গ্রামে অতি প্রাচীন ভাস্কর্য্য-শিল্পের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। মথুরাপুরের নিকট বড়াশী মাধবপুর গ্রামে সুপ্রাচীন চক্রতীর্থ অবস্থিত। গঙ্গা, সঙ্কেত মাধব, অম্বুলিঙ্গ শিব ও ত্রিপুরসুন্দরী শক্তি এই চারি মহাশক্তি সমন্বয়ে চক্রতীর্থ স্থাপিত। ধপধপি হইতে কয়েক মাইল দূরে ঘোঁড়ারায় দক্ষিণেশ্বর আছেন। ধপ্‌ধপির অদূরে প্রাচীন ভাগীরথীর গর্ভে "কালীদহ" ও "শিঙ্গাদহ" নামে দুইটি দহ দেখা যায়। প্রবাদ আছে যে, সিংহল-যাত্রাকালে শ্রীমন্ত সওদাগর উক্ত দহে "কমলে-কামিনী" দর্শন করেন। এতদঞ্চলে "দ্বারীর জাঙ্গাল" নামে একটি সুপ্রাচীন রাজপথের অস্তিত্ব আছে। পুরী গমন কালে শ্রীচৈতন্যদেব এই পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন জয়নগর ও মজিলপুর নামক গ্রাম দুইটিতেও বহু প্রাচীন দীঘিকা ও দেবালয় আছে। পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ "সোম প্রকাশ" নামক পত্রিকায় এতদঞ্চলের বহু ঐতিহাসিক তথ্যাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বাংলার বিভিন্ন স্থানে এতাবৎ লক্ষ্মণসেনের ষষ্ঠ রাজ্যসম্বৎ পর্যন্ত প্রদত্ত ছয়খানি তাম্রশাসন-লিপি পাওয়া গিয়াছে। ঐগুলির প্রাপ্তিস্থান নিম্নে দেওয়া গেল:

১। গোবিন্দপুর গ্রাম (শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রাপ্ত), ২। সুন্দরবন (শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, এম-এ কর্ত্তৃক প্রাপ্ত), ৩। নদীয়া জেলার আনুলিয়া গ্রাম, ৪। দিনাজপুরের তপন দীঘি, ৫। ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্ত্তী বকুলতলা গ্রাম এবং ৬। মুর্শিদাবাদ জেলার শক্তিপুর গ্রাম।

ঐ সকল তাম্রশাসন-লিপি হইতে ভাগীরথী-তীরে, বাংলার বিভিন্ন স্থানে এবং বাংলার বাহিরেরও বহু বিখ্যাত অঞ্চলে সেন রাজাদিগের নানা কীর্ত্তি-স্থাপনের বিষয় প্রমাণিত হয়।

আবার ভাগীরথী সম্পর্কে ভগীরথ-কাহিনী আমরা ভুলিতে পারি না। মিশর দেশের সেচ-বিভাগের বিশেষজ্ঞ সর্ উইলিয়ম উইলকক্স বলিয়াছেন:

"ভাগীরথীর প্রবাহ-প্রকৃতি দেখিলে সুদৃঢ় ধারণা হয় যে, উহা এবং আরও কয়েকটি নদী গঙ্গার সহিত সংযোগকারী কাটা খাল।...ভগীরথই সেই সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার যাঁহার খনিত কৃত্রিম জলপথগুলির সাহায্যে বাংলা দেশ সুজলা সুফলা হইয়াছিল।"

প্রমাণপঞ্জী

(১) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বাংলার ইতিহাস'
(২) রাজনারায়ণ বসু প্রণীত 'গ্রাম্য উপাখ্যান'
(৩) শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত 'বাংলার ভাস্কর্য্য'
(4) *Statistical Accounts of Bengal* by Sir W. W. Huntetr; (5) *Bengal District Gazetteer*; (6) *The Restoration of the Ancient Irrigation of Bengal* by Sir William Wilcocks, K.C.M.G.

রূপকথা

শ্রীঅনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাল নয় পাড়াটা। ভাল নয় রাস্তাটাও। লোকগুলো সব কেমন বিশ্রীভাবে তাকায়। আস্ত গিলে খাবে সুবিধে পেলেই যেন। খুঁজে খুঁজে এমন জায়গায় শেষে ঘরভাড়া পাওয়া গেল যে, বলবার নয়। চার পাশ থেকে চেপে ধরেছে অন্ধকার। হন্ হন্ করে হাঁটতে থাকে সুচিত্রা। কিন্তু তাড়াতাড়ি হাঁটা যাচ্ছে না। পায়ের গোড়ালিটায় তখন থেকে কি যেন ফুটছে। চপ্পলটার পেরেক বেরিয়ে গেছে নিশ্চয়ই। যত সব ঝঞ্ঝাট একসঙ্গে।

দরজাটা বন্ধ। দুমদাম ধাক্কা দিল।

এই সুমিত্রা, খোল না তাড়াতাড়ি।

কে?

আমি রে, আমি।

ও, দিদি। সুচিত্রাকে দরজা খুলে দিল সুমিত্রা। আজ তোর দেরি হ'ল অনেক। খুব ঘুরেছিস বুঝি?

হ্যাঁ। দরজাটা সুচিত্রা ভেজিয়ে দিল।

মেয়ের সাড়া পেয়ে মা মুখ বার করলেন চাদরের ভেতর থেকে। কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ?

কোথাও না, মা। সুচিত্রা মায়ের পাশে এসে বসল। রোগা, শুকনো কপালে হাত বোলাতে লাগল আস্তে আস্তে। আজ তোমার জ্বর কেমন আছে?

থাক, আর সোহাগ দেখাতে হবে না। থাকিস কোথায় সারাদিন, তাই জানতে চাই।

থাকব আর কোথায়? ঘুরতেই হয় শুধু।

ধিঙ্গি মেয়ে, সারাদিন রাস্তায় টো টো করে বেহায়ার মত ঘুরছিলেন! ঝাঁটা মারি অমন ঘুরে বেড়ানোর মুখে। লজ্জাও করে না?

কেন লজ্জা করবে শুনি? লজ্জা করে ঘরে লজ্জাবতী লতা হয়ে বসে থেকে হবেটা কি শুনি? পেট ভরবে না দশটা হাত গজাবে? —মায়ের গালাগাল বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারে না। ঝটপট জবাব দেয় মেজ মেয়ে সুমিত্রা।

কিন্তু সহ্য করবার ক্ষমতা অদ্ভুত সুচিত্রার। মাকে ও ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করে। চুপ কর তো মা তুমি। বেশী চেঁচামেচি করলে তোমার জ্বর আবার বাড়বে যে।

বাড়ুক গে। মরলে বাঁচি। হারামজাদা যমও আমায় নেয় না। যমের পর্য্যন্ত অরুচি হয়েছি গা! তা হলে ত আমি বাঁচি। আর তোরাও বাঁচিস।

আঃ, চুপ করো না মা। মরবার সময় এলে সকলেই মরবে, ঠেকাতে পারবে না কেউ। তাই নিয়ে চেঁচামেচি করে আর হবেটা কি?

বাপ এক কোণে একগাদা কাগজ ছড়িয়ে একমনে তখন থেকে লিখছিলেন। এদের গোলমালে এতক্ষণে তন্ময়তা ভাঙল।

বড্ড গণ্ডগোল হচ্ছে কিন্তু।

হবে না গণ্ডগোল? কি সুখের সংসারই তুমি বানিয়ে রেখেছ!

হয়েছেটা কি?

হবে আবার কি? নবাবনন্দিনী রূপের ধ্বজা নিয়ে টো টো করতে বেরিয়েছিলেন—এতক্ষণে ফিরে এলেন। তাই বলতে, দুই বোনে ফোঁস করে উঠছেন। যা ইচ্ছে কর। মর সব, মর। আমার আর কি?

কে, সুচিত্রা? কখন এলি রে?

এই ত এলাম বাবা।

কোথায় তুই ঘুরিস রে সারাদিন?

কোথাও ত নয় বাবা। এমনিই।

এমনিই কেউ ঘোরে নাকি রে বোকা মেয়ে? অথচ ঘোরার কথা ত আমারই। কিন্তু কোথা থেকে কি যে সব গোলমাল হয়ে গেল।

ওসব কথা থাক না বাবা। বাপের কাছে ঘেঁসে আসে সুচিত্রা।

থাকবে বলছিস? থাক তবে, কিন্তু তুই একলা একলা অমন করে ঘুরিস নি রে। এখানকার লোকেরা ভাল নয়।

কিন্তু বাবা, আমি যদি ভাল হই, কেউ আমায় খারাপ করতে পারবে কেন? একরাশ কালো চুলের ভিড়-করা মাথাটা বাপের বুকের কাছে নামিয়ে আনে সুচিত্রা।

ঠিক। খুশীতে মাথাটা দুলে ওঠে সুরেশ্বরের। ঠিকই বলেছিস। ওগো শুনছ, তোমার এই মেয়েটি কথা বলে চমৎকার।

কি কথা বলার ছিরি! আর তাতেই তুমি গলে গেলে একেবারে। তোমার আদরেই ত মেয়েটা গোল্লায় যাচ্ছে।

আদর? কৈ, আদর ত ওকে আমি করি না। করেই বা কাকে আমি আদর করতে পারলাম!

আদিখ্যেতা করো না, গা জ্বলে যায় শুনলে।

খিল খিল করে হেসে উঠল সুমিত্রা।

কে হাসল রে? চারদিকে তাকালেন সুরেশ্বর। সেকেণ্ডটা বুঝি?

হ্যাঁ বাবা, সুমিত্রাই।

ভারি চমৎকার হাসে মেয়েটা। কি করে হাসে রে?

কি জানি বাবা।

ও একটা জিনিয়াস রে। নইলে এই রকম দুরন্ত হাসতে পারে?

সত্যিই তাই বাবা, সত্যিই।

হ্যাঁ রে, এই কান্নার দেশে এমন করে হাসতে ও কোথেকে শিখল রে?

আবার হেসে উঠল সুমিত্রা। হেসে লুটিয়ে পড়ে।

ওর পাশে এসে দাঁড়াল সুচিত্রা। এই কি হয়েছে? অত হাসছিস কেন?

হাসব না? কি হাসির বইরে দিদি। হাসতে হাসতে পেট ফেটে যায়। পড়ে দেখিস।

কোথেকে পেলি বইটা?

বিমলদা দিয়েছে।

ও ত তোকে খুব বই দেয়।

বাঃ, ওদের ক্লাবের যে মস্ত লাইব্রেরী আছে।

বাপ আবার লেখায় ডুবে গেলেন। মুহূর্তেই হারিয়ে গেল একটু আগের হঠাৎ পাওয়া পৃথিবী।

ভাল সাড়ীটা ছেড়ে এল সুচিত্রা। একটা ছেঁড়া সাড়ী জড়িয়ে নিল। এটাও আর পরা যায় না। বড্ড ছিঁড়ে গেছে। খাওয়া শেষ করে সাড়ীতে হাত মুছতে মুছতে আবার ফিরে এল সুচিত্রা বাবার কাছে। তখনও কাগজ কলম নিয়ে বসে রয়েছেন সুরেশ্বর।

বাবা, ডাকল আস্তে।

কে? সুচিত্রা? কখন এলি রে?

এই ত এলাম। তুমি এখনও লিখছ বাবা!

হ্যাঁরে। কত কি লেখবার রয়েছে। কিন্তু সময় কতটুকুই বা পাচ্ছি।

বা রে, দিনরাতই ত তুমি লিখছ। কি এত লেখ বাবা?

মানুষের গল্প লিখছি রে। ভাল করে লিখতে হবে যে! খুব ইনটারেষ্টিং করে। নইলে পড়বে না কেউ। কিনবেও না কেউ। কিন্তু ঠিকমত গুছিয়ে লিখতে পারছি কৈ? পা দুটো যাবার পর থেকে ব্রেনও আমার বিগড়ে গেছে যে। না?

বেশ ভালই ত লেখা হচ্ছে বাবা।

ভাল হচ্ছে বলছিস? শুনিস ত এক দিন। তোকে শোনাব। সুরেশ্বর আবার ডুব দিলেন কালি কলমে।

গালে স্নো ঘষতে ঘষতে সুমিত্রা এল। বাবা।

কে? মুখ তুললেন সুরেশ্বর। ও, সেকেও। আলো নেভাবি বুঝি?

হ্যাঁ। রাত কত হ'ল জান?

অনেক হয়েছে বুঝি রে? চশমার ভেতর দিয়ে বাইরে চোখ বোলালেন সুরেশ্বর। একটু থাক না। আজ কিছু লেখা হয় নি যে। ব্রেনটা কেন জানি ওয়ার্ক করছে না।

'তাই বলে ওই ছাইপাঁশ, মাথামুণ্ডু লেখবার জন্তে রাত পর্য্যন্ত আলো জ্বালিয়ে রাখতে হবে নাকি?' মা চেঁচিয়ে উঠলেন। 'পেটে খাবার ভাত জোটে না। কেরোসিন তেল পোড়াতে লজ্জা করে না? আদিখ্যেতা দেখে বুড়ো বয়সে বাঁচি নে আর। হবে কি রাতদিন কলম আর কাগজ নষ্ট করে? রবি ঠাকুর হবে?'

আলোর জন্তে নয় বাবা। বেশী রাত অবধি জাগলে তোমা যে শরীর খারাপ হবে! মিষ্টি গলার আস্তে আস্তে বলল সুচিত্রা

বাবার জন্তে ভারি কষ্ট হয় সুচিত্রার। বড্ড ভালমানুষ বাবা ও কখনও রাগতে দেখে নি বাবাকে, কখনও কাউকে বকতে দেখে নি। কখনো কারুর ক্ষতি করে নি বাবা, কাউকে দুঃখ দেয় নি কিন্তু পৃথিবীতে যত দুঃখ আছে, তা সব কি ভালমানুষদেরই জন্তে জমা করে রাখে ভগবান? কেন?

আলো নিভিয়ে পাশে এসে শুয়েছে সুমিত্রা।

আজ কোথায় কোথায় ঘুরলি রে দিদি?

সব জায়গাতেই।

হ'ল কিছু?

উঁহু। নো হোপ। কত বি-এ, এম-এ ক্যা ক্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের ত কোন আশাই দেখি না।

তোকে বি-এটা পড়াবার মত টাকা যদি থাকত আমাদের!

তাতেও কি চাকরি হ'ত ভাবছিস? হাসল সুচিত্রা। আর এক জন কি বলল জানিস? বলল, এমন আগুনের মত চেহারা চাকরি করে কতই বা উপায় করবে? তার চেয়ে…।

চপ্পলটা খুলে মুখে সপাসপ ঘাকতক দিলি না কেন?

তাতে কি হ'ত? আমার চপ্পলটাই যেত রে মাঝ থেকে।

নাঃ, তুই বড্ড ভাল রে দিদি। অত ভাল হলে কি আর কিছু হয়? ভালমানুষের পৃথিবী আর নেই রে।

ঘং ঘং করে কাসছে অসিত। রাত বাড়লেই ওর কাসি বাড়ে কাসির শব্দে কারুর ঘুম হয় না। বিশ্রী, বেয়াড়া কাসি।

এই এক মড়াখাগী কাসি হয়েছে হারামজাদার। মা গজ গজ করে ওঠে। একটু নিশ্চিন্দি হয়ে রাতটুকুও যে ঘুমোব, তার জো নেই। মরণ, মরণ।

কাসি পেলে কাসব না? খ্যাক করে উঠল অসিত। করব কি?

করবি আবার কি? ডাক্তার দেখাও, ওষুধ-পত্তরের ব্যবস্থা কর। রোগটাকে সারাতে হবে না?

ডাক্তার দেখাতে পয়সা লাগে। ওষুধও মাগনায় পাওয়া যায় না। দাও না পয়সা।

আমার কাছে পয়সা চাইছিস কেন? আমি কোত্থেকে পাব? আমি কি রোজগার করি? তোর বাপ-বোনেদের কাছে চাগে যা না।

অসিত আর সাড়া দেয় না। পাশ ফেরে দেয়ালের দিকে।

ছটফট করছে বিছানায় সুচিত্রা। সমস্ত দিন ঘুরেছে ত ও ক্লান্তিতে দু' চোখে ঘুম নেমে আসা উচিত। কিন্তু ঘুম ওর আসে না। রাতে বিছানায় গড়িয়ে অনেক কথাই মনে পড়ে যায় কি ছিল আর কি হ'ল, তারই দুঃসহ ইতিহাস রোজ রাতে ওর কাছে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে। শৈলেনের কথা ত ভুলতেই দেয় না ওরা। দাদা বেঁচে থাকলে আজ কি এমনি অবস্থা হ'ত! ভাল চাকরিই করত দাদা। কিন্তু একটা বছরও কি করতে পারল

একটা দিনের অসুখেই হঠাৎ সব শেষ হয়ে গেল। এত তাড়াতাড়িও মানুষ মরে!

আবার কাসছে অসিত। কি যে এক কাসি হয়েছে ওর।

কাল চলিস আমার সঙ্গে। মেডিক্যাল কলেজে তোর গলাটা দেখিয়ে আনব—বুঝলি?

ওদিকে সুরেশ্বর ছটফট করছেন। এই কোণে শুয়েও বুঝতে পারে সুচিত্রা। যেদিনই রাতে ঘুম আসে না সুচিত্রার, সেদিন বাবার জেগে থাকার সাড়া ও ঠিক পায়। ঘুমোয় কখন বাবা?

পাশেই ঘুমিয়েছে সুমিত্রা। ফিরে তাকাল। বালিশটার অনেক নীচে মাথা রেখে কেমন যেন কুঁকড়ে শুয়ে রয়েছে মেয়েটা। এলোমেলো, রুক্ষ চুলগুলো মুখের উপর এসে পড়েছে। আস্তে আস্তে সরিয়ে দিল ও। দিন দিন আগুনের মত দেখতে হচ্ছে মেয়েটাকে। রোগা শরীরের স্বল্প শক্তি কিছুতেই রুখে রাখতে পারছে না যৌবনের দুর্বার প্লাবন। কেমন ভিজে ভিজে লাগছে ওর গোলাপী ঠোঁটদুটো।

কে দিদি? নড়ে উঠল সুমিত্রা।

ওমা, এখনও জেগে রয়েছিস তুই?

ঘুম আসছে না রে।

ঘুমো দিকি চুপটি করে, ঠিক আসবে। ওর নীল চোখের নরম পাতাদুটো নামিয়ে দিল সুমিত্রা।

তুই বেশ আদর করতে পারিস রে। দিদির একটা হাত নিজের দু'হাতের মুঠোয় টেনে নিল সুচিত্রা। এই দিদি—

কি রে?

তোর হাতটা খালি কেন রে? চুড়িগুলো কি হ'ল?

খুলে রেখেছি। বড্ড লাগে রে।

মিথ্যে বলতে হবে না কষ্ট করে। বেঁচে ফেলেছিস, না?

এই আস্তে বল, মা শুনতে পাবে যে।

অসিত কাসছে। ভারি বেয়াড়া কাসিটা ওর।···

জানলার কাছে একবার উঁকি মেরে, দরজাটা ঠেলে ঢুকল বিমল।

পড়া হয়েছে বইটা?

ওমা তুমি? আধ-শোয়া অসংবৃত অবস্থাটা থেকে ধড়মড়িয়ে সোজা হয়ে বসল সুমিত্রা। এলোমেলো খসে-পড়া সাড়ীটা ঠিক করে নিল। ভারি অসভ্য কিন্তু তুমি বিমলদা। বলা-কওয়া নেই, এমন হুট করে ঢুকে পড়।

বা রে, ডাক দিয়েই ত ঢুকলাম। পড়া হয়েছে বইটা?

হুঁ। খুব মজার বই কিন্তু বিমলদা। বাপরে বাপ, হাসতে হাসতে পেটের নাড়িভুঁড়ি সব ছিঁড়ে যায়। তোমার হাতে ও বইটা কি?

ও কিছু না।

দেখি ত। হাত থেকে ছোঁ মেরেই টেনে নিল একরকম। ওমা, এ ত সেই ডিটেকটিভ বইটা। কি পাজি, বলা হ'ল কিছু নয়।

খুশী ত?

খুব। থ্যাঙ্ক ইউ। থ্যাঙ্ক ইউ।

চল না, বেড়িয়ে আসা যাক।

কোথায়?

চল না, কি করবে বাড়ীতে বসে বসে?

আচ্ছা দাঁড়াও। এক ছুটে পাশের ঘরে চলে গেল সুমিত্রা।

সুরেশ্বর এক কোণে একরাশ কাগজ ছড়িয়ে একমনে লিখে চলেছেন। বিমল পাশে এসে বসে পড়ল।

কে? ও, বিমল। সাড়া পেয়ে মুখ তুললেন।

যে বইটার কথা সেদিন বলছিলেন, সেটা কি লেখা শেষ হয়েছে আপনার?

শেষ? না, কৈ আর হ'ল? অনেক সময় লাগছে। সময় ত লাগবেই বিমল—অনেক সাবধান হয়ে লিখতে হবে যে। কি বল?

সে ত নিশ্চয়ই।

আচ্ছা বিমল, তোমার কি মনে হয় ছাপলে বিক্রি হবে বইটা?

হবে বৈ কি। কেন হবে না?

একটা ভাল সাড়ী অনেক খুঁজে বার করল সুমিত্রা। স্নোর শিশিটার গায়ে একটুখানিই লেগে রয়েছে। তাই দু'গালে ঘষে নিল তাড়াতাড়ি, আঙুলে তুলে। কবে যে এই স্নোটা কেন হয়েছে!

চল বিমলদা, আমি রেডি। একটা আলোর ঢেউ যেন আছড়ে পড়ল। বাবা, আমরা একটু বেড়িয়ে আসছি।

তোর মাকে বলেছিস?

এখখুনি ত আসব ফিরে! আর দাঁড়াল না সুমিত্রা। এস বিমলদা, এস না তাড়াতাড়ি।

সব্বাই তোমরা মাকে ভয় কর দেখছি।

লম্বা বিনুনীটা ডান হাতে ঘোরাতে ঘোরাতে ও হাসল শুধু।

মোড়ের মাথায় অসিতের সঙ্গে দেখা। ও স্কুল থেকে ফিরছে।

এই মেজদি, তোরা কোথায় যাচ্ছিস রে?

যেখানেই যাই, তোর তাতে কি? তুই বাড়ী যাচ্ছিস, বাড়ী যা না।

আমি জানি, কোথায় যাচ্ছিস তোরা।

কোথায়?

ট্রাম লাইনের উপর সেই বড় হোটেলটায় যাচ্ছিস। সেখানে খুব চপ, কাটলেট, আমলেট মারবি।

কে বললে?

আমি ক'দিন দেখেছি তোদের ঢুকতে।

বিমল একটা চকচকে আধুলি পকেট থেকে বার ক'রে ওর হাতে গুঁজে দিল এবার। এই নাও, তুমিও খেয়ো।

আমি খাব না।' আমি পয়সা জমাব।

কি করবে জমিয়ে?

একটা মোটর কিনব।

হেসে লুটিয়ে পড়ল সুমিত্রা রাস্তাতেই।

এই, অত হেসো না, সবাই কি ভাববে?

চাকরি খুঁজে খুঁজে পাওয়া গেল না। কিন্তু হঠাৎ একদিন সুচিত্রা রাস্তায় খুঁজে পেল সুশান্তকে। দাদার সঙ্গে ওকে কতবার দেখেছে। পুরনো বাড়ীতে অনেকবার এসেছিল দাদার সঙ্গে। এক ঝাঁক খুশী, হঠাৎ যেন ঝাপটে ধরল ক্লান্ত, বিমর্ষ সুচিত্রাকে।

খুশী সুশান্তও কম হ'ল না। অনেকদিন তোমাদের কোন খবর পাই নি? খবর নিতেও পারি নি। কেমন আছ?

ভালই।

শৈলেন এখন কোথায়? কি করছে?

দাদা মারা গেছে।

থমকে দাঁড়াল সুশান্ত। সে কি! কবে মারা গেল? কি হয়েছিল!

কিছুই হয় নি। কিছু হলে তবু আমাদের সান্ত্বনা থাকত। একটা দিনের অসুখেই পতন হয়ে গেল।

আর তোমার বাবা-মা?

বাবার দুটো পায়েই প্যারালিসিস হয়েছে। বছরখানেক থেকে আপিস যাওয়া বন্ধ। এখন হাফ পে ছুটিতে আছেন, ও মাস থেকে বিনা মাইনের ছুটি সুরু হবে। মার শরীরও ভাল নেই। প্রায়ই জ্বর হয় মাঝে মাঝে।

একটা দুঃসহ কান্নার ইতিহাস। কিন্তু শোনাতে দুটো মিনিটও সময় লাগল না।—সত্যি বড্ড স্যাড—বললে সুশান্ত।

সমবেদনা আর সহানুভূতি শুনতে আসে নি সুচিত্রা। ওসব শুনে নষ্ট করবার মত সময় নেই।

একটা চাকরি করে দাও না। ও সোজা বলে উঠল।

চাকরি? হেসে ফেলল সুশান্ত।

হাসলে যে?

চাকরি ত আমিও খুঁজে বেড়াচ্ছি।

তুমিও!

হ্যাঁ। অবাক হবার কিছু নেই এতে। এস দু'জনেই একসঙ্গে খুঁজি।

ওরা এগোলো রাজধানীর জনারণ্যের মাঝে পথ কেটে।

তোমরা এখন আছ কোথায়?

ঠিকানা বললে সুচিত্রা।

ওখানে জায়গা হবে?

কে থাকবে? তুমি?

হ্যাঁ।

এখন আছ কোথায়?

একটা হোটেলে। সেখানে আর মানসম্ভ্রম নিয়ে থাকা যায় না। অনেক ধার হয়ে গেছে। ম্যানেজারটি তবু খুব ভদ্র। গালাগালি করে না।

আমাদের ত একটা ঘর। আর দুটোর একটা রান্নার, আর একটা নানা জিনিষে ঠাসা। জায়গা বড্ড কম। আমাদেরি হয় না! তা চলে এস তো, হয়ে যাবে কোনরকমে।

না, তবে থাক।

সত্যি বলছি, খুব কষ্ট হবে না আমাদের।

তা জানি। এখন খুব দরকার নেই। সত্যেনদার মেস অন্ততঃ যত দিন লাল বাতি না জ্বালাচ্ছে।···

সুশান্তকে দেখে খুশী হ'ল বাড়ীর সকলেই। মায়ের পুরনো শোক উথলে উঠল। কান্না সুরু করল হাত পা ছড়িয়ে।

চুপ কর তো মা। কেঁদে আর হবে কি? ধমকে উঠল সুমিত্রা। কাঁদলে দুঃখই আরও বাড়ে, কমে না।

সুরেশ্বর লেখায় তন্ময় হয়েছিলেন। সুচিত্রা ডাকল, বাবা।

কে? ও, তুই।

দেখ তো বাবা, কে এসেছে।

কে? মুখ তুলে ভাল করে তাকালেন সুরেশ্বর। কিন্তু চিনে নিতে দেরি হ'ল না একটুও। সুশান্ত না?

হ্যাঁ, আমিই। কেমন আছেন?

ভাল আছি বলতে পারলে খুশীই হতাম। কিন্তু পারছি কই? কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল সুশান্ত।

ভাববেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে আবার।

আবার সব ঠিক হয়ে যাবে বলছ? কি জানি। আবার ডুব দিলেন কাগজে সুরেশ্বর।

খেতে বসে রোজ চেঁচামেচি করে অসিত। দূর, একঘেয়ে ভাত ডাল আর তরকারি খেতে ভাল লাগে না রোজ।

ভাত ডাল মুখে রোচে না ত এই বাড়ীতে মরতে জন্মাতে এসেছিলি কেন? রাজরাজড়ার ঘরেই জন্মাতে পারতিস? মা ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করে।

সুমিত্রা মাদুরে উপুড় হয়ে একটা ডিটেকটিভ বই পড়ছিল। ধমকে উঠল অসিতকে, এই চেঁচাচ্ছিস কেন?

চেঁচাবই ত।

যা হয়েছে খেয়ে নে।

না খাব না।

আবার মুখের উপর চোপা করছিস উল্লুক ছেলে? দোর নাকি ঠাস ঠাস করে গালে চড়।

জানলার কাছে চুপটি করে দাঁড়িয়েছিল সুচিত্রা। ঠেলা দিল অসিত, এই বড়দি।

কি রে?

আজ মাংস আনা না। রোজ কি একঘেয়ে খাওয়া যায়! ভাল লাগে তোদের?

কোন জবাব দিল না সুচিত্রা। একটা রুপোর টাকা বার করে ওর হাতে দিল।

টাকা কি হবে বড়দি?

কোনও হোটেলে গিয়ে মাংস খেয়ে নিস।

বা রে, আমি একা খেতে চাইছি নাকি? সবায়ের জন্যেই বললাম।

মাংস খেতে আমার মোটেই ভাল লাগে না যে।

টাকাটা ফিরিয়ে দিল অসিত।

হাসল সুচিত্রা। কিরে, কি হ'ল? ফিরিয়ে দিলি যে?

কোনও সাড়া দিল না অসিত। বাইরে বেরিয়ে গেল।

নেমে আসছে অন্ধকার। রাস্তার গ্যাসের আলোগুলো যেন চোখ মেলে চেয়েছে। পানের দোকানের রেডিওতে গান বাজছে। একদল ছোট ছেলে খেলে বাড়ী ফিরছে।

অন্ধকারে তুমি দেখতে পাচ্ছ বাবা? দাঁড়াও, আলো জ্বালছি। লণ্ঠনটা জ্বেলে আনল সুচিত্রা।

জানিস রে বিমল সেদিন বলছিল, বইটা আমার ছাপা হলে ভাল বিক্রিই হবে। হবে না রে, কি বলিস?

আমারও তাই মনে হয়।

ও বলছিল, ওর নাকি একজন জানাশোনা পাবলিশার আছে।

তবে ত খুবই ভাল বাবা।

বেশ ছেলেটি। কিন্তু তাড়াতাড়ি আমায় শেষ করতে হবে লেখা। তাড়াতাড়ি। সময় বড্ড কম রে। বড্ড কম।

এই দিদি, কাল সিনেমা যাবি? পাশে শুয়ে শুয়ে জিজ্ঞেস করল সুমিত্রা।

সিনেমা? সময় কোথায় যাবার? আর পয়সাই বা কৈ?

পয়সা লাগবে না। তিনটে পাস জোগাড় করছে বিমলদা।

না রে, সিনেমা-টিনেমা ভাল লাগে না আমার। তুই যাস।

তুই একটা একেবারে যা-তা! সিনেমা ভাল লাগে না কি রে? আর কাউকে বলিস নি, শুনলে হেসে লুটোপুটি খাবে।

কেউ খাবে না। সবাই ত আর তোর মত সিনেমা-পাগল নয়।

খিল খিল করে হেসে উঠল সুমিত্রা। একবার হাসতে সুরু করলে ওকে থামায় কার সাধ্যি!

আরও একটা আসন্ন সন্ধ্যার আগমনী ঘনিয়ে এল।

চল, ওই হোটেলটায় ঢোকা যাক। তোমার ক্ষিধে পেয়েছে। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল সুশান্ত।

না ত।

ফট করে মিথ্যে কথাটা বলে ফেললে।

সত্যিই পায় নি। হাসল সুচিত্রা।

সেই কখন তুমি খেয়ে বেরিয়েছ, এখনও ক্ষিধে পায় নি বিশ্বাস করি না।

কি রকম শুকিয়ে গেছে মুখখানা।

ক্ষিধে পেলেই খেতে হবে নাকি?

ক্ষিধে পেলেই ত মানুষে খায়।

আগে তাই জানতাম। আবার হাসল সুচিত্রা।

আর এখন কি জান?

এখন জানি যে ক্ষিধে পেলেও ক্ষিধে চেপে রাখতে হয়।

এটা না জানলেও চলত।

আচ্ছা, তোমার থাকার কি হ'ল?

সেই হোটেলেই আছি।

তাতে মান-সম্মান খুব বাড়ছে, না?

তা জানি না, তবে ম্যানেজারের উৎকণ্ঠা বাড়ছে কবে আমি চাকরি পাব। চাকরি পেলে সব শোধ করে দেব, এই কণ্ডিশানে ওকে রাজী করিয়েছি অনেক কষ্টে। যাক, এতে অন্ততঃ আমি ছাড়া এই পৃথিবীতে আরও একজন পাওয়া গেল যে একমনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে যে তাড়াতাড়ি আমার চাকরি হোক।

মৃদু কণ্ঠে বলে উঠল সুচিত্রা, আরও একজন আছে।···

অনেক রাত হয়ে গেছে। বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়ে সন্তর্পণে, চাপা গলায় ডাকল সুমিত্রা, এই দিদি, দিদি রে।

ঘুম আসে না সুচিত্রার। তবু ওরই জন্যে আজ বিশেষ করে জেগেছিল। দরজা খুলে দিল উঠে।

এত দেরি হ'ল যে? সিনেমা ত কখন ভেঙ্গেছে।

উঃ, কি মজাটাই হ'ল যে। দাঁড়া ছেড়ে আসি কাপড়টা, সব বলছি।

তোর ভাত ঢাকা আছে, খেয়ে নিস।

কিছু খাব না আর। পেট ভীষণ ভরেছে কত কি খেয়ে। এর পর ভাত খেলে ফেটেই যাবে পেটটা।

নীল সাড়ীতে অপরূপ দেখাচ্ছে কিন্তু সুমিত্রাকে।

সাড়ীটা ছেড়ে এসে ও লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সুচিত্রার পাশে।

তুই এলি না দিদি, কি মজাটাই না হ'ল।

কেমন দেখলি ছবিটা?

খুব ভাল রে। তারপর শোন ত। সিনেমার পর একটা হোটেলে খুব খাঁটি হ'ল। সেখানে বিমলদার অনেকগুলো বন্ধু ছিল। একজন জানিস দিদি, ফিল্ম ডাইরেক্টার। আমার চেহারা আর ফিগার দেখে খুব তারিফ করলে। এক দিন ষ্টুডিওতে যেতে বলেছে।

সিনেমায় নামতে তোর বুঝি খুব ইচ্ছে করে রে।

করেই ত।

জানিস, বিমলদা বললে হয়ে যাবে। একটু ভাল ড্রেস করে

যদি সেজে গুজে থাকি, তবে যে-কোন সিনেমা কোম্পানি নাকি আমায় লুফে নেবে।

বিমল তোর মাথায় এই সব ঢোকাচ্ছে বুঝি রে?

বা রে, বিমলদার কি দোষ। সত্যিই ত তাই। আজকাল যে সব মেয়ে সিনেমায় নামে, তাদের অনেকের চেয়ে আমায় ভাল দেখতে। তুই-ই বল না?

কি করে বলব বল? ক'টা সিনেমাই বা আমি দেখি।

আচ্ছা, তুই যাকে হয় জিজ্ঞেস করে দেখিস।

তা না হয় দেখব। এখন ঘুমো। রাত হয়েছে।

কিন্তু ঘুমোতে পারবে কি করে সুমিত্রা। একটু বাদেই আবার ডাকল, দিদি।

কি রে?

তারপর একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে অনেকক্ষণ ঘোরা হ'ল আমাদের।

কে কে ঘুরলি?

কে কে আবার, আমি আর বিমলদা। তারপর মুখটা ওর অনেক কাছে এনে আস্তে বললে, জানিস দিদি, বিমলদাটা এত দুষ্টু···?

সুমিত্রা কিন্তু শুনবার একটুও উৎসাহ না দেখিয়ে বললে, ঘুমো দিকি। ঘুম পাচ্ছে আমার।

বাবার কাছে মা এসে গর্‌ গর্‌ করে উঠল।

কি যে ছাইপাঁশ লেখা হচ্ছে দিন দিন বুঝি না বাপু। দেখলে জ্বলে যায় গা। দেব এক দিন সব পুড়িয়ে উনুনে।

কেন, এরা কি দোষ করল? অবাক হয়ে মুখ তুললেন সুরেশ্বর।

না, কেউ কিছু দোষ করে নি, যত দোষ সব আমিই করেছি। মরণও হয় না আমার।

হয়েছেটা কি?

আদর দিয়ে দিয়ে মেয়েদের মাথাগুলো তুমিই ত চিবিয়ে খেয়েছ। আবার বলা হচ্ছে, কি হয়েছে? ন্যাকামি দেখলে পিত্তি জ্বলে যায়।

কেন মেয়ে আবার কি করল?

রাতদিন ঘাড় গুঁজে লেখায় বুঁদ হয়ে থাকলে কি কিছু দেখা যায়? তোমার পেয়ারের ছোট মেয়েটি গো। যার হাসিতে তুমি মুচ্ছো যাও।

হেসে ফেললেন সুরেশ্বর। তা কি করেছে ও?

কি করতে বাকী রাখছে তাই বল না? রাতদিন ওই বিমলের সঙ্গে ঘুর ঘুর, হাসাহাসি এসব ভাল নাকি? রোজ রাত করে বাড়ী ফিরছে। আমি বকতে গেলে খেঁকিয়ে ওঠে আবার।

কিন্তু বিমল ছেলেটি ত বেশ ভাল।

ভাল ত সকলেই। কিন্তু মন্দ হতে কতক্ষণ? অত মাখামাখি মোটেই ভাল নয়। কেলেঙ্কারি একটা কিছু না হয়ে যাবে না, এই তোমায় বলে দিচ্ছি।

কিন্তু কি করতে হবে আমাকে?

রঙ্গ দেখলে গা আমার জ্বলে যায়। করবে আবার কি? শাসন কর মেয়েকে—বক ঝক, গালমন্দ দাও।

ওসব আমি পারি না। তুমি বরং এক কাজ কর, সুচিত্রাকে বল।

ও ত তোমারি জুড়ি।

না না, ও খুব ভাল মেয়ে। ওর ভারি বুদ্ধি। কোন্‌টা ভাল আর কোন্‌টা ভাল নয়, ওর মত বুঝতে খুব কম মেয়েই পারে।

মাদুরে উপুড় হয়ে, বুকটা বালিশে চেপে সিনেমার বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছিল সুমিত্রা। সুচিত্রা ডাকল, শোন।

কি রে?

রোজ এত রাত করিস কেন? যাস কোথায়?

ষ্টুডিওতে রে। কি বিরাট ব্যাপার। কি মজা রে সেখানে। বিমলদার ওখানে অনেকের সঙ্গে চেনা। আমারও চেনা হয়েছে ওর জন্যে। অনিলকুমার, সেই 'মহাকাল' ছবিটার হিরো, ওর সঙ্গেও আলাপ হ'ল। কি নাইস লোক রে দিদি। চল না তুইও একদিন। তোর কিছুতেই ইনটারেষ্ট নেই। তুই একটা ওয়ার্থলেস।

একটা কথা শুনবি?

কি কথা?

বিমলের সঙ্গে বেশী মিশিস নে তুই।

কেন? বিমলদা ত বেশ ভাল ছেলে।

কিন্তু তোর ভাল ও কিছু করতে পারবে না।

তুই বড় জানিস কিনা! বিমলদা আমায় ফিল্মে ঢুকিয়ে দেবে বলেছে।

আমি জানি সব। তাই বলছি বেশী মিশতে হবে না।

তুই বললেই শুনতে হবে নাকি?

হবে। গলাটা শক্ত করল সুচিত্রা।

তুই হিংসেয় ফেটে মরছিস তাই বল না সাফ সাফ। মিথ্যে বিমলদার বদনাম দিচ্ছিস কেন?

অবাক হ'ল সুচিত্রা। হিংসে? কিসের হিংসে?

তোকে কেউ পছন্দ করে না, তোর সঙ্গে মেলামেশা করে না—তাই, তাই ত তোর রাগ, তাই ত এই হিংসে। আমি বুঝতে পারি না বুঝি?

এসব কি বলছে সুমিত্রা? অবাক হয়ে তাকাল সুচিত্রা। এমন কথা ত ও ভুলেও ভাবতে পারে না।

কি চুপ করে রইলি কেন? জবাব দে না।

হতভাগা, উজবুক, বাঁদর মেয়ে। যা মুখে আসে তাই তুই বলবি নাকি? ওর দু'গালে ঠাস ঠাস করে অনেকগুলো চড় কষিয়ে দিল সুচিত্রা, রাগ আর আঘাতের দুরন্ত উত্তেজনায়।

মার খেয়ে একটা কথাও বলল না সুমিত্রা। চীৎকার করে উঠল না। বাধাও দিল না দিদিকে। গুম্ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ শুধু। দু'চোখের কোণে জলের কোন ছোট্ট ফোঁটাও চিকচিক করে উঠল না। একটু পরে আস্তে আস্তে বলে উঠল, আমায় তুই মারলি দিদি।

চাকরি হয়েছে সুশান্তর। ওর হাতটা টেনে নিল। দেখি তোমার হাতটা।

হাত নিয়ে কি হবে?

দেখিই ত। তার পর দশ টাকার তিনটে নোট নরম হাতের আঙুলগুলোর মধ্যে গুঁজে দিল।

টাকা কি হবে?

তোমায় দিলাম।

তোমার দরকার নেই?

আমার চেয়ে তোমার দরকার অনেক বেশী।

কিন্তু টাকা আমি ত চাই নি। সুচিত্রা বললে।

চাইতে সকলে পারে না। আবার চাইলেও সকলে পায় না।

না না, এ টাকা ফিরিয়ে নাও তুমি।

রাখো না। মনে করো ধারই নিচ্ছ। চাকরি পেলে ফেরত দিও। পরশু তোমার ইণ্টারভিউ আছে না?

হুঁ।

হয়ে যাবে।

কে বললে?

আমি বলছি।

তুমি ভারি জান কিনা!

আচ্ছা বেশ, বেট রাখ? পাঁচ টাকা?

বেট থাক। চাকরি হলে খুব মিষ্টি খাওয়াব তোমায়।

মিষ্টি চাই না। অন্য কিছু চাই।

অন্য কি? হেসে জিজ্ঞেস করল সুচিত্রা।

আজ থাক। অন্য একদিন বলব। এস, হোটেলটায় ঢোকা যাক।

চাকরির খাওয়া বুঝি?

তা-ই। এস ত।

একটুই খেল সুচিত্রা।

কিচ্ছুই খাচ্ছ না তুমি।

আর নয়। বরং দুটো চপ কাগজে বেঁধে দিতে বল। বাড়ী নিয়ে যাব। মাংস খেতে ভারি ভালবাসে অসিত।...

পাশে এসে বসল সুচিত্রা। সাড়া পেয়ে তাকালেন সুরেশ্বর।

কে রে, কে এলি?

আমি বাবা, সুচিত্রা।

ও, তুই। হ্যাঁরে বলতে পারিস চাঁদ মস্ত বড় করে উঠবে?

কেন বাবা? চাঁদের খোঁজে তোমার দরকারটা কি?

আছেরে, আছে। তখন আমি বাইরে চাঁদের আলোয় অনেক রাত অবধি লিখতে পারব বসে বসে। তোরা আলো নিভিয়ে দিলেও আমার কিছু মুশকিল হবে না।

সুচিত্রা বাবার বুকের কাছে মাথা এনে নরম গলায় বলে উঠল, তাই যদি হয়, তবে তুমি অনেক রাত অবধিই আলো জেলো বাবা।

না রে। সারা রাত ধরে আলো জ্বাললে কত কেরোসিন তেল খরচ হবে জানিস?

হোক্‌গে।

দূর বোকা মেয়ে। তাই কি হয়? কিন্তু আমার তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। কত এখনও বাকী।

আমার চাকরিটা হয়ে যাক, তখন তুমি যতক্ষণ খুশী আলো জ্বালিও বাবা।...

কেমন?

অসিত চপটায় কামড় দিয়ে বলল, বেশ গ্র্যাণ্ডরে। কোত্থেকে এনেছিস বড়দি?

কি যে নাম হোটেলটার, মনে নেই।

পাশে এসে শুয়েছে সুমিত্রা। সুচিত্রা কিছুক্ষণ উসখুস করে, শেষে জিজ্ঞেস করল ওকে, তোর খুব লেগেছে নাকি রে?

না তো।

বল না সত্যি করে?

দূর। তোর চড়ে লাগে নাকি? ওই তো নরম তুলতুলে আঙুলগুলো।

সত্যি, তোকে আমি মারতে চাইনি রে। বিশ্বাস কর। কোনদিন তোকে মেরেছি আমি কখনও? বল না? দেখি তোর গাল দুটো। হাত বুলিয়ে দিই।

সত্যি, তুই বড্ড ভাল রে দিদি, বড্ড ভাল। খিল খিল করে হেসে উঠল সুমিত্রা।

একবার হাসতে সুরু করলে ওকে থামায় কার সাধ্যি।

অদ্ভুত হাসে মেয়েটা। সুরেশ্বর অবাক হয়ে ভাবেন। কে শেখাল ওকে?

দুপুর থেকে বৃষ্টি সুরু হয়েছে ফোটা ফোঁটা। সন্ধ্যার পর বেশ জোরেই নামল। জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিল সুচিত্রা। রাস্তায় গ্যাসের আলোয় চিকচিক করছে জলের ফোঁটাগুলো।

হুড়মুড় করে ঢুকল অসিত।

এই, এদিকে আয়। কোথায় ঘুরছিলি রে বৃষ্টিতে?

কোথাও নয়রে বড়দি।

আবার মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে! উল্লুক ছেলে, ডাক্তারে তোকে না ঠাণ্ডা লাগাতে বারণ করেছে—আর তুই দিব্যি জলে ঘুরছিস।

বেশী ভিজিনি রে। কিই বা এমন বৃষ্টি পড়ছে।

এদিকে আয়, দেখি।

সুচিত্রার কাছে ঘেঁসে দাঁড়াল অসিত।

এই দিদি, সন্দেশ খাবি ?

সন্দেশ ? কোত্থেকে পেলি ?

তুই ভালবাসিস, তাই নিয়ে এলাম।

কিন্তু পেলি কোত্থেকে ?

সে এক জায়গা থেকে।

কোন দোকান থেকে চুরি করেছিস নিশ্চয়ই ?

দুর, চুরি করব কেন ? জানিস, একটা বিয়েবাড়ীতে দেখলাম খুব খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে, সটান ঢুকে পড়লাম। কি খাওয়া রে দিদি। খুব বড়লোক ওরা। সব তো খেতে পারলাম না। সন্দেশগুলো তোর জন্যে নিয়ে এসেছি। খুব গ্র্যাণ্ড রে বড়দি। দেখ না খেয়ে। মুঠো করা ডান হাতটাকে ও শার্টের ভিতর থেকে আস্তে আস্তে বার করল। পাঁচ আঙুলের মধ্যে তাল পাকিয়ে গেছে সন্দেশগুলো।

ওখানে ভিকিরির মত ঢুকতে লজ্জা করল না তোর ?

বা রে, লজ্জা করবে কেন ? কেউ ধরতেই তো পারে নি। মাংসের কত রকম রান্না করেছিল রে দিদি।

বেরিয়ে যা আমার সামনে থেকে। বেরিয়ে যা হতভাগা। দিন দিন কি হচ্ছিস বল তো তুই ! আগে তো এমন ছিলি না। ওগুলো ছুঁড়ে ফেলে দে বলছি। ফেলে দে উল্লুক—

ফেলল না কিন্তু অসিত। ভয়ে ভয়ে সরে এল দিদির কাছ থেকে।

হাওয়া বইছে। জানলা দিয়ে জলের ছাট আসছে। লণ্ঠনের পলতেটা একবার দপ দপ করে উঠল। সাড়ীটা ভিজে যাচ্ছে। জানালাটা বন্ধ করে দিল সুচিত্রা এবার।

বাইরে ট্যাক্সি থামার আওয়াজ হ'ল। লণ্ঠনের আলোতে সুমিত্রার ছায়া পড়ল দেয়ালে। ফিরে তাকাল সুচিত্রা। কেমন যেন এলোমেলো দেখাচ্ছে ওকে, কেমন যেন ক্লান্ত। খসখস শব্দ উঠল সাড়ীটায়। কোনদিকে চাইল না, কারও সঙ্গে কথাও বলল না। সোজা পাশের ঘরে চলে গেল।

কাপড় ছেড়ে সুমিত্রা বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। আজকের হালচাল ওর কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে সুচিত্রার।

এই দিদি, আলোটা নিভেয়ে দে না রে, চোখে লাগছে।

আলো নিভিয়ে পাশে এসে শুলো সুচিত্রা।

কি হয়েছে রে আজ তোর ?

কিছু ত নয়।

দিন দিন তুই এমন রোগা হয়ে যাচ্ছিস কেন রে ?

রোগা ? কে বললে ?

আমি বলছি।

চোখে চশমা নে দিকি। ওপাশে মুখ ফেরাল সুমিত্রা।

বাইরে বৃষ্টি বেড়েছে। চুপ করে বৃষ্টির শব্দ শোনে সুচিত্রা। বেশ লাগছে শুনতে।

কিন্তু ছটফট করছে সুমিত্রা। এমন ত ও কখনো করে না।

কি হয়েছে রে তোর ?

বলছি না, হয় নি কিছু।

কাসছে অসিত। কাসিটা আবার ওর বাড়ল না কি ?

তা হলে অমন করছিস কেন ?

কি রকম আবার ?

লক্ষ্মী মেয়ে, বল না। বলবি না আমায় ? ওর এলোমেলো চুলগুলো সরিয়ে কপালে আর গালে হাত বুলিয়ে দিল সুচিত্রা।

কি বলব ? কিছুই ত হয় নি।

নাঃ, বড্ড আজ কাসছে অসিত। ভিজেছে যে তখন বৃষ্টিতে।

আমার কাছে লুকোতে পারবি নে। এদিকে ফের, দেখি সুন্দর মুখটা। দেখি না; অনেক করে বলতে মুখ ফেরাল সুচিত্রার দিকে। কিন্তু দেখাল না। সোজা ওর বুকের মধ্যে লুকোল।

কি হয়েছে রে ? ওর পিঠে হাত বুলায় সুচিত্রা। বল না।

বিমলদা—। ও বলে উঠল বুক থেকে মুখ না তুলেই।

বিমলদা কি ?

কিছু না, কিছু না···

কাঁদছে সুমিত্রা। অবাক হয়ে আবিষ্কার করল সুচিত্রা।

কি, কি হয়েছে বল ?

জিজ্ঞেস করিস নে দিদি, লক্ষ্মীটি। মুখটা দিদির কোমল বুকের অতলে আরও নিবিড় করে চেপে ধরল সুমিত্রা।

কাঁদছে সুমিত্রা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বুকের কাছটা ভিজে যাচ্ছে।

বাইরে ঝম ঝম বৃষ্টি। আকাশের কান্নায় এই অদ্ভুত প্রাণ-চঞ্চল মেয়ের কান্না মিশে যাচ্ছে কি ?

ভীষণ কাসছে অসিত। সত্যিই, কেমন কষ্ট হচ্ছে এবার সুচিত্রার। কি যে এই এক কাসি এনেছে ছেলেটা।

রাতে ঘুম আসে না সুরেশ্বরের। কান্না কানে যেতে চমকে চারদিকে ফিরে তাকালেন।

সুচিত্রা।

কি বাবা ?

কে কাঁদছে রে ? তোর মা বুঝি ?

হ্যাঁ। আস্তে জানাল সুচিত্রা।

শৈলেনের কথা হঠাৎ বুঝি মনে পড়ে গেছে রে ?

তাই হয় ত।

বারণ করে দে, বারণ করে দে। বুঝিয়ে বল না, কি হবে কেঁদে ? কাঁদলে কি ছেলে ওর ফিরে আসবে ?

তাই বলছি বাবা।

কান্না থেমে যায় সুমিত্রার। কিন্তু রাতভোরই কাসে অসিত।

মা এক সময় গর্ গর্ করে উঠল, হারামজাদা ছেলে এক দিন এমনি কাসতে কাসতেই দম আটকে মরবে।

স্বর্ণমন্দির

অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়, এম-এ
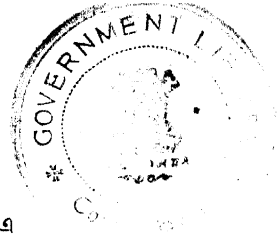
পঞ্চ নদীর দেশ পঞ্জাব। পঞ্চনদীর তীরে একদিন গুরুর মন্ত্রে শিখ সম্প্রদায় জাগিয়া উঠিয়াছিল। সে খুব বেশী দিনের কথা নয়। এই পঞ্জাবেই ভারত-পাকিস্থান সীমান্তে অমৃতসর বেশ বড় একটি শহর। লোকসংখ্যা চার লক্ষ বা তাহার কাছাকাছি হইবে। অমৃতসর শিল্পপ্রধান শহর। অমৃতসরের খ্যাতি কিন্তু তাহার জন্য নহে। শিখ সম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থ স্বর্ণমন্দির অমৃতসরে অবস্থিত। স্বর্ণমন্দির কেবল শিখতীর্থ নহে। ইহা শিখ সম্প্রদায়ের প্রাণকেন্দ্র। এই স্বর্ণমন্দিরের জন্যই অমৃতসর বিখ্যাত। অমৃতসরের প্রসিদ্ধির

স্বর্ণমন্দির

দ্বিতীয় কারণ জালিয়ানওয়ালাবাগ। ১৯১৯ সনের ১৩ই এপ্রিল ইংরেজ সেনানী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ার জালিয়ানওয়ালাবাগে যে নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ভারতবাসী কোন দিনই তাহার কথা ভুলিবে না। ধর্ম্মতীর্থ স্বর্ণমন্দির এবং রাষ্ট্রতীর্থ জালিয়ানওয়ালাবাগের জন্যই অমৃতসর ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি স্থায়ী আসন অধিকার করিয়া থাকিবে।

৫১০ ফুট দীর্ঘ এবং ৫১০ ফুট প্রশস্ত বিশাল জলাশয়ের কেন্দ্রস্থলে স্বর্ণমন্দির অবস্থিত। এই জলাশয়ের নাম অমৃত সরোবর, সংক্ষেপে অমৃতসর। শহরের নামও ইহা হইতে আসিয়াছে।

কিংবদন্তী এই যে, আদিকবি বাল্মীকির আশ্রমে লব-কুশের সহিত যুদ্ধে নিহত রামচন্দ্র প্রভৃতিকে বাঁচাইবার জন্য স্বর্গ হইতে যে অমৃত আনা হয়, তাহার কিছু অংশ বাঁচিয়া যায়। এই উদ্বৃত্ত অংশ যেখানে পুঁতিয়া রাখা হয়, কালে সেইখানে একটি ডোবার সৃষ্টি হয়। এই ডোবাই অমৃত সরোবরের আদি রূপ। অমৃতসরের পাঁচ-ছয় মাইল দূরে রামতীরথে (রামতীর্থ) নাকি বাল্মীকির আশ্রম ছিল। নির্ব্বাসিতা সীতা দেবী বাল্মীকির আশ্রমে আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন। লব এবং কুশও বাল্মীকির আশ্রমেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। রামতীরথে মন্দির এবং দীঘি তাহার প্রাচীনত্বের সাক্ষী। বাল্মীকির তপোবনের প্রান্তবাহিনী তমসা নদীর কোন নিদর্শনই কিন্তু রামতীরথে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।
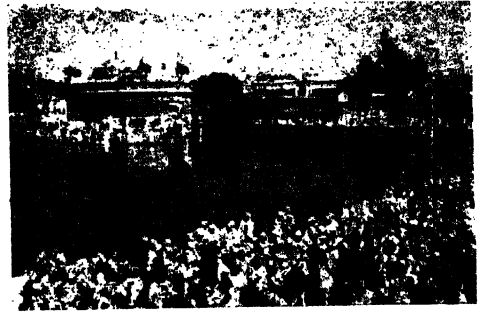
রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের আগমন উপলক্ষে স্বর্ণমন্দিরে জনতা

শিখ সম্প্রদায়ের আদিগুরু নানকদেব (খ্রীঃ ১৪৬৯-১৫৩৮) প্রথম বার ধর্ম্মপ্রচারে বাহির হইয়া কিছুদিন উল্লিখিত ডোবার তীরে অবস্থান করিয়াছিলেন। ডোবার চারিদিকে তখন বনজঙ্গল। ধ্যান-ধারণার পক্ষে অনুকূল নির্জ্জন এই স্থানটি নানকের খুবই ভাল লাগিয়াছিল। তৃতীয় শিখগুরু অমরদাস (খ্রীঃ ১৫৫২-৭৪) স্বীয় শিষ্যদিগের বসবাস এবং উপাসনার জন্য এই স্থানটি মনোনীত করেন।

এই ডোবাই সংস্কৃত এবং পরিবর্দ্ধিত হইয়া অমৃতসরে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহার জলে দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় হয় বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। এই মাহাত্ম্য কি করিয়া প্রকটিত হয় সে সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীর উল্লেখ করিতেছি। বিকলাঙ্গ, চলৎ-শক্তিহীন গলিত কুষ্ঠীর দুঃখিনী স্ত্রী স্বীয় অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয় আর দিনরাত ভগবানকে ডাকে। অক্ষম স্বামীকে সে ঝুড়িতে করিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে বহন করে। ঘুরিতে ঘুরিতে এক দিন সে এই

ডোবার তীরে উপস্থিত হইল। এখানে স্বামীকে মাটিতে নামাইয়া সে নিকটস্থ লোকালয়ে গেল—হয়ত-বা ভিক্ষার জন্য। স্ত্রীর অনুপস্থিতিকালে স্বামী দেখিতে পাইল যে একটি কালো রঙের পাখী জলের মধ্যে নামিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর পাখীটি যখন আকাশে উড়িয়া গেল, তখন তাহার রং একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। কুষ্ঠরোগীর ধারণা হইল যে, ডোবার জল নিশ্চয়ই অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন। বহু কষ্টে গড়াইতে গড়াইতে ডোবায় নামিয়া স্নান করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে ভাল হইয়া গেল। ইহার পর স্ত্রী তাহাকে যেখানে রাখিয়া গিয়াছিল সেখানে গিয়া সে অপেক্ষা করিতে লাগিল। স্ত্রী ফিরিয়া ত অবাক। স্বামী যে ঝুড়িতে ছিল, সে ঝুড়ি শূন্য। ঝুড়ির অদূরে সুস্থ, সবলকায়, সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি লোক। সে তাহার
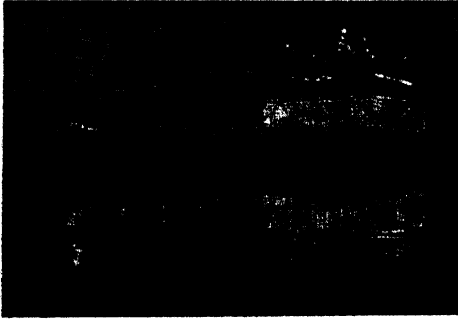
পর্ব্বদিনে দীপালোকিত স্বর্ণমন্দির

স্বামী বলিয়া নিজের পরিচয় দিল। স্ত্রী মানিবে না। সেও ছাড়িবে না। প্রমাণের জন্য সে নিজের হাতের একটি কনিষ্ঠ অঙ্গুলিও দেখাইল। ইচ্ছা করিয়াই সে এইটি ডোবার জলে ডুবায় নাই। ফলে অঙ্গুলিটি ব্যাধিগ্রস্তই রহিয়া গিয়াছিল। অবশেষে স্ত্রীর সন্দেহ দূর হইল। কুষ্ঠ-রোগী যে জায়গায় স্নান করিয়াছিল, তাহার বর্ত্তমান নাম দুঃখভঞ্জনী ঘাট। একটি কুলগাছের নীচে বাঁধানো দুঃখ-ভঞ্জনী ঘাটে স্ত্রী পুরুষ উভয়ের স্নানের ব্যবস্থা আছে। মেয়েদের স্নানের জায়গাটির চারিদিক ঘেরা।

গুরু অমরদাসের পর তাঁহার জামাতা রামদাস (খ্রীঃ ১৫৭৪-৮১) গুরুর আসন অধিকার করেন। রামদাসই অমৃতসর শহরের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রথমে অমৃতসর হইতে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে গৈণ্ডোয়ালে বাস করিতেন। গুরুর পদে অধিষ্ঠিত হইবার পর তিনি উল্লিখিত ডোবার তীরে বাস করিতে থাকেন। এই হইতেই অমৃতসর শহরের ... রামদাস

অথবা রামদাসপুর বলা হইত। বাদশাহ আকবর ১৫৭[illegible] খ্রীষ্টাব্দে ডোবাটি রামদাসকে দান করেন। রামদাস ইহা[র] পর ডোবার চারি পাশের জমি মালিকদিগের নিকট হইতে ক্রয় করেন। এদিকে ডোবার জলের মাহাত্ম্যের ক[থা] শুনিয়া বহু শিখ ইহার আশেপাশে বসতি স্থাপন করিল। এই ডোবাকে কেন্দ্র করিয়া যে শহর গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাই বর্ত্তমান অমৃতসর।

রামদাসের পুত্র পঞ্চম গুরু অর্জ্জনমল (খ্রীঃ ১৫৮১-১৬০[৬]) অমৃতসরে প্রথম মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দিরকে হরিমন্দির বলা হইত। জনশ্রুতি এই যে, গুরু অর্জ্জনে[র]

অকাল তখ্‌ত

গুণগ্রাহী এবং ভক্ত মুসলমান ফকির মিঞা মীর [illegible] অনুরোধে হরিমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। ভিত্তিপ্র[স্তর] খানি তিনি একটু তেরছা ভাবে বসাইয়াছিলেন। মি[স্ত্রী] একজন স্থপতি প্রস্তরখানিকে সোজা করিয়া বসাইলে ফ[কির] বলিলেন যে, ভিত্তিপ্রস্তর তিনি যে রকম বসাইয়াছিলে[ন] রকম থাকিলে তাহার উপর নির্ম্মিত মন্দির কোন[দিন] ধ্বংস হইত না। কিন্তু তাহা যখন হইল না, তখন [ইহার] ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। ফকিরের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে [অক্ষরে] সত্য হইয়াছিল।

মুসলমানগণ হরিমন্দিরকেই শিখশক্তির উৎস বলিয়া কল্পিত। সেইজন্যই তাহারা বার বার ইহার উপর [আক্রমণ] চালাইয়াছে। একাধিকবার তাহারা শিখদিগের নিকট

মন্দির কাড়িয়া লইয়াছে। অবশেষে তাহারা হরিমন্দির ধ্বংস করিয়া দেয়।

১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহের ভারত অভিযানের কিছু দিন পর মাসা রঙ্গর নামে স্থানীয় মুসলমান রাজকর্ম্মচারী শিখদিগকে হরিমন্দির হইতে তাড়াইয়া দেয়। মন্দির মাসা রঙ্গরের আস্তাবলে এবং মন্দিরের যে প্রকোষ্ঠে শিখ বেদ আদি গ্রন্থ বা গ্রন্থসাহেব স্থাপিত ছিল, তাহা তাঁহার প্রমোদকক্ষে পরিণত হইল। সুখা সিং এবং মেহতাব সিং নামে

অটল বাবার সর্ব্বোচ্চ তল হইতে অমৃতসরের সাধারণ দৃশ্য

দুই জন জয়পুরপ্রবাসী শিখ এই অনাচার বন্ধ করিবার জন্য অমৃতসরে আগমন করে। খাজানা দিতে আসিয়াছে এই মিথ্যা অজুহাতে, মুসলমান প্রজার ছদ্মবেশে তাহারা মন্দিরে প্রবেশ করে। সুখা সিংকে দরজায় পাহারায় রাখিয়া মেহতাব সিং মাসা রঙ্গরের প্রমোদকক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রমোদরত মাসা রঙ্গরকে হত্যা করিয়া সঙ্গীসহ পলায়ন করে। মন্দিরের দরজায় যে কুলগাছে মেহতাব সিং ঘোড়া বাঁধিয়াছিল তাহা এখনও বাঁচিয়া আছে। এই গাছে ছোট ছোট কুল হয়। সেইজন্য গাছটিকে ইলাচি বেড় বা এলাচি কুল বলা হয়। মাসা রঙ্গরের হত্যার পর হরিমন্দির পুনরায় শিখদিগের হস্তগত হয়।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানগণ শিখদিগের নিকট হইতে আবার হরিমন্দির কাড়িয়া লইল। বাবা দীপসিংহের নেতৃত্বে শিখগণ মুসলমানদিগকে তাড়াইয়া দিয়া মন্দির পুনরধিকার করে। বাবা দীপসিং যুদ্ধে নিহত হন। কিন্তু হরিমন্দির বেশী দিন শিখদিগের হাতে রহিল না। ১৭৬১ সনে তাহারা আবার মন্দির হইতে বিতাড়িত হইল। এই ১৭৬১ সনেই আহম্মদ শাহ আবদালি বারুদের আগুনে হরিমন্দির উড়াইয়া দেন এবং গোরক্তে অমৃত সরোবরের জল কলুষিত করেন। আবদালি ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গেলে শিখগণ নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করে। এই মন্দির দরবারসাহেব নামে পরিচিত। ১৮০২ সনে রণজিৎ সিং অমৃতসর অধিকার করেন। তিনি মন্দিরের চূড়া, মন্দির-প্রাচীরের উপরকার অংশ এবং ইহার কপাট গিল্টি-করা তামার পাতে মুড়িয়া দেন। সেইজন্য ইহাকে স্বর্ণমন্দির বলা হয়। অমৃতসরের বাহিরে 'দরবারসাহেব' এই নামেই ইহা সমধিক পরিচিত।

অমৃত সরোবরের কেন্দ্রস্থলে সমচতুষ্কোণ প্রস্তরবেদীর উপর স্বর্ণমন্দির নির্ম্মিত। বেদীটির প্রত্যেক পার্শ্বের দৈর্ঘ্য ৬৭ ফুট। স্বর্ণমন্দিরও সমচতুষ্কোণ। ইহার প্রত্যেক পার্শ্বের দৈর্ঘ্য ৪০ ফুট ৬ ইঞ্চ। মর্ম্মরনির্ম্মিত, স্বর্ণমণ্ডিত মন্দিরের চারটি দরজা। অমৃত সরোবরের পশ্চিম তীর হইতে

স্বর্ণমন্দিরের অন্নসত্রে ভোজনের দৃশ্য

মন্দিরের পশ্চিম দ্বার পর্য্যন্ত প্রসারিত মর্ম্মর-সেতু। সেতুমুখে সুদৃশ্য তোরণ—দর্শনী দরওয়াজা। জলাশয়ের চারিদিক বেষ্টন করিয়া ২৫ ফুট প্রশস্ত পথ। এই পথটিকে ৬০ ফুট চওড়া করা হইতেছে। মন্দির-প্রাঙ্গণে যানবাহনের প্রবেশ নিষিদ্ধ। মন্দিরমধ্যে উচ্চ বেদীর উপর শিখবেদ আদিগ্রন্থ। মাথার উপর বহুমূল্য চন্দ্রাতপ।

গুরু গোবিন্দ সিংহের মৃত্যুর (খ্রীঃ ১৭০৮) পর আর কেহ গুরু হন নাই। আদিগ্রন্থই গুরুর স্থান অধিকার করিয়াছেন। তবে শিখসম্প্রদায়ভুক্ত নামধারী এবং নিরহঙ্কারিগণ ব্যক্তিগত গুরুতেও বিশ্বাস করিয়া থাকেন। শীতকালে ভোর পাঁচটা এবং গরমের দিনে শেষরাত্রি চারিটায় আদিগ্রন্থ মন্দিরপ্রাঙ্গণে অবস্থিত 'অকাল তখ্‌ত' (বিধাতার সিংহাসন) হইতে সোনার পালকিতে স্বর্ণমন্দিরে আনীত হয়। শীতকালে রাত্রি দশটা এবং গ্রীষ্মকালে রাত্রি এগারটায় আদিগ্রন্থ আবার 'অকাল তখ্‌ত'-এ ফিরাইয়া আনা হয়। আদিগ্রন্থ যতক্ষণ স্বর্ণমন্দিরে থাকে, অবিরাম কীর্ত্তন চলে। মন্দিরের বেতনভোগী 'রাগী' অর্থাৎ কীর্ত্তনীয়াগণ পালা করিয়া আদিগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট বিভিন্ন গুরু এবং ভক্তসাধক-রচিত পদাবলী কীর্ত্তন করে।

মন্দির-প্রাঙ্গণে বিদ্যমান 'অকাল তখ্‌ত' গুরু অর্জ্জনের

পুত্র ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের (খ্রীঃ ১৬০৬-৪৫) আদেশে নির্মিত হয়। এই 'অকাল তখ্‌ত' একদিন শিখসম্প্রদায়ের ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইত। বিভিন্ন গুরু এবং শহীদদের ব্যবহৃত কয়েকটি অস্ত্রশস্ত্র অতিশয় যত্নের সহিত এখানে রক্ষিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুইটি বন্দুক, কয়েকটি চক্র, একটি লোহার মুগুর এবং দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের (খ্রীঃ ১৬৭৫-১৭০৮) দুইটি স্বর্ণমণ্ডিত তীর উল্লেখযোগ্য। তাঁহার প্রত্যেকটি বাণে নাকি এক তোলা সোনা থাকিত।

এলাচিবেড়। মাসাবরঙ্গরের হত্যাকারী মেহতাব সিং এই বৃক্ষে ঘোড়া বাঁধিয়াছিল

মন্দির-প্রাঙ্গণের এক কোণে গুরু হরগোবিন্দের পুত্র অটলরায়ের শ্মশানের উপর নির্মিত একটি সাত-তলা মিনার। সর্ব্বনিম্নতলে একটি গুরুদ্বারা। গুরুদ্বারা এবং মিনার অটলবাবা নামে পরিচিত। ইহার সর্ব্বোচ্চ তল হইতে চারিদিকে বহু দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়। নীচে অমৃতসর শহরকে শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির মত মনে হয়।

লঙ্গর বা অন্নসত্র (রুটিসত্র ?) শিখমন্দিরের অপরিহার্য্য অঙ্গ। শিখসম্প্রদায়ের আদিগুরু নানকের সময় হইতেই মন্দিরে মন্দিরে লঙ্গর রাখিবার ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। নানক জানিতেন যে, খালি পেটে ধর্ম্ম হয় না। বুভুক্ষু মানুষকে অন্নদান না করিয়া ধর্ম্মের কথা শুনাইলে মানুষের মধ্যে যে ভগবান আছেন তাঁহাকে অপমানই করা হয়। ছোট, বড় সমস্ত শিখমন্দিরেই অন্নসত্রের ব্যবস্থা। হিন্দু-শাস্ত্রেও সর্ব্বাগ্রে অন্নরূপী ব্রহ্মকে তুষ্ট করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

স্বর্ণমন্দিরের লঙ্গরখানার জন্য বার্ষিক প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে দেশী-বিদেশী সকলের নিকটই ইহার দ্বার অবারিত। ভোজনকারীদিগকে ডাল, রুটি এবং একটা নিরামিষ তরকারি দেওয়া হয়। দুই বেলাই আহার্য্য বিতরণের ব্যবস্থা আছে। ভোজনার্থীদিগকে সারবন্দী হইয়া মাটিতে বসিতে হয়। কি মন্দিরে, কি লঙ্গরে কোথাও ছোঁয়াছুয়ির বাছবিচার নাই। শিখধর্ম্মে জাতিভেদ বা অস্পৃশ্যতার স্থান নাই। সমাজের কথা স্বতন্ত্র। পরিবেশন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কয়েক বার সমবেত কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়—"বলে সো নিহাল, সৎশ্রী অকাল", "ওয়াহিগুরু, সৎশ্রী অকাল"।

দুঃখভঞ্জনী ঘাট

দূর হইতে সমাগত যাত্রীদিগের জন্য মন্দির-সংলগ্ন একটি যাত্রীনিবাস আছে। ইহা শ্রীগুরু রামদাস যাত্রীনিবাস নামে পরিচিত। সাধারণতঃ একাদিক্রমে চারদিন পর্য্যন্ত এখানে থাকা যায়। যাত্রীনিবাস হইতেই যাত্রীদিগকে চারপাই, বিছানা এবং আলো দেওয়া হয়, ভাড়া লাগে না।

খালি পায়ে মাথা ঢাকিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে হয়। প্রবেশের পূর্ব্বে হাত-পা ধুইয়া লওয়া নিয়ম। যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য মন্দিরের বেতনভোগী গাইড আছে। পাণ্ডা এবং পুরোহিতের উৎপাত শিখমন্দিরে নাই। অমৃতসর স্বর্ণমন্দির এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান শিখমন্দির শিরোমণি গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটির কর্ত্তৃত্বাধীন।

অমাবস্যা, সংক্রান্তি এবং মাসপয়লা উপলক্ষে স্বর্ণমন্দিরে অন্যান্য দিনের তুলনায় যাত্রীর ভিড় অনেক বেশী হয়। দেওয়ালী, গুরুপরব অর্থাৎ শিখগুরুগণের জন্মদিন, নববর্ষ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ পর্ব্বদিনে স্বর্ণমন্দিরের দীপসজ্জা দেখিবার মত।*

* প্রবন্ধের আলোক-চিত্রগুলি সর্দার রবীন্দর সিং এবং সর্দার পরমজিৎ সিং কর্ত্তৃক গৃহীত।

গত ৯০০ বৎসরে ইংলণ্ডের লোক-বৃদ্ধির তারতম্য

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

ভারতবর্ষে আদমসুমারী আরম্ভ হয় ১৮৭২ সনে। তাহার পূর্ব্বে প্রদেশ বিশেষে, যেমন পঞ্জাবে মানুষ-গণনা হইয়াছিল ১৮৫৩ সনে। ইংরেজী ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে মানুষ-গণনা হয় নাই। ১৮০১ সন হইতে প্রতি দশ বৎসর অন্তর ইংলণ্ডে মানুষ-গণনা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ইংলণ্ডে জন্মমৃত্যু ও বিবাহের হিসাব বিভিন্ন গির্জ্জার খাতায় আছে; তাহা হইতে পণ্ডিতগণ সমগ্র ইংলণ্ডের বিভিন্ন সময়ের জনসংখ্যার হিসাব করিয়াছেন। এই সব হিসাব একত্র করিলে তথাকার লোকসংখ্যা যুগে যুগে কি হারে বাড়িয়াছিল তাহার একটা হিসাব পাওয়া যায়।

১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে নরম্যাণ্ডির ডিউক উইলিয়াম ইংলণ্ড জয় করেন; তিনি ইতিহাসে 'উইলিয়ম দি কংকারার' বলিয়া বিখ্যাত ইংলণ্ডের রাজা প্রথম উইলিয়াম বলিয়াও তিনি পরিচিত। তিনি বিজিত ইংলণ্ডের কিরূপ কর ধার্য্য করিলে প্রজারা একেবারে উচ্ছন্ন না যায় অথচ তাঁহার আয় বৃদ্ধি হয় এই উদ্দেশ্যে ১০৮৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি তদন্ত করেন। এই তদন্তের ফলাফল বিখ্যাত "The Doomsday Book"-এ লিখিত আছে। তৎকালীন ইতিহাসকার বলেন:

"He sent his men into every shire, and caused them to find out how much land it contained, what lands the king possessed therein, what cattle there were, and how much revenue he ought to receive. So narrowly did he cause the survey to be made that there was not a single rood of land, nor was there an ox or a cow or a pig passed by that was not set down in his book."

অর্থাৎ, উইলিয়াম তাঁহার লোকজনদের ইংলণ্ডের বিভিন্ন জেলায় পাঠান ও কত জমি আছে তাহার হিসাব করান। রাজার রাজস্ব কত হওয়া উচিত তাহারও হিসাব করেন। এত সূক্ষ্মভাবে তিনি এই তদন্তকার্য্য করাইয়াছিলেন যে এক বিঘা জমি বা একটি ষাঁড় বা গরু বা শূকর এই হিসাব হইতে বাদ যায় নাই। সবই খাতায় লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

ফলে, এই সকল তথ্য হইতে তৎকালে ইংলণ্ডের জনসংখ্যা কত তাহার আমরা একটা হিসাব করিতে পারি।

'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' নামক বিখ্যাত কোষ-গ্রন্থের (১৪শ সংস্করণ) মতে ১০৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের ১৫,০০,০০০ লক্ষ লোক ছিল। ইতিহাস পাঠে যতদূর বুঝা যায়, ইংলণ্ডের লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বৃদ্ধি পাইয়া লোকসংখ্যা ইং ১৩৪৮ সনে ২৫,০০,০০০ লক্ষ হইয়াছিল। এই বিষয়ে মতভেদ আছে; কাহারও কাহারও মতে লোকসংখ্যা ২৫ লক্ষের উপর ছিল।

এই ১৩৪৮ সনে ইংলণ্ডে "Black Death" নামক এক মহামারী বা প্লেগের আবির্ভাব হয়। এই মহামারী কাহারও মতে ভারতবর্ষ হইতে, কাহারও মতে চীনদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া সমগ্র এশিয়া ও ইউরোপ ধীরে ধীরে ধ্বংস করে। ১৩০৩ সনে আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালে মোগলগণ ভারত আক্রমণ করে এবং প্রায় দুই মাস ধরিয়া দিল্লী অবরোধ করিয়া রাখে। তৎপরে তাহারা হঠাৎ অবরোধ উঠাইয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করে। অনেকে মনে করেন যে, টাকা দিয়া দিল্লী রক্ষা করা হয়। আবার কাহারও কাহারও মতে মোগলগণের মধ্যে ও তাহাদের বাসস্থানে এই মহামারীর আবির্ভাব হয়; ফলে তাহাদের বহুসংখ্যক লোক মারা যাওয়ায় তাহারা ভারত আক্রমণ একেবারে পরিত্যাগ করে। সে যাহাই হউক, এই "Black Death" বা মহামারীর ফলে দুই বৎসরে, অর্থাৎ ১৩৪৮ ও ১৩৪৯ সনে ইংলণ্ডের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মারা যায়। এই হিসাবে ১৩৫০ সনে ইংলণ্ডের লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ১৬,৬৭,০০০ হাজার। ইহার পরেও দুই বার অল্প-বিস্তর এই মহামারী ইংলণ্ডে দেখা দেয়।

এই হিসাবের মধ্যে ওয়েলসের লোকসংখ্যা ধরা হয় নাই। ইংলণ্ডের আয়তন ৫০,৮৫১ বর্গ মাইল ওয়েলসের আয়তন ৭,৪৬৭ বর্গ মাইল। ইংলণ্ডের লোকসংখ্যা যেখানে ৩,৫৭,০০,০০০, ওয়েলসের লোকসংখ্যা সেখানে ২২,০০,০০০। ইহা ১৯২১ সনের অবস্থা। আয়তনে ওয়েলস ইংলণ্ডের তুলনায় শতকরা ১৪ ভাগ; লোকসংখ্যা হিসাবে শতকরা ৬ ভাগ। পূর্ব্বকালে এই অনুপাত আরও কম ছিল বলিয়া মনে হয়।

বিভিন্ন সময়ে ইংলণ্ডের লোকসংখ্যা কিরূপ ছিল, তাহার একটি আনুমানিক হিসাব পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন। নিম্নে আমরা সেই হিসাবটি দিলাম। যথা:

সন	লোকসংখ্যা (হাজারে)
১৫৭০	৪,১৬০ হাজার
১৬০০	৪,৮১২ ,,
১৬৩০	৫,৬০১ ,,
১৬৭০	৫,৭৭৪ ,,
১৭০০	৬,০৪৫ ,,
১৭৫০	৬,৫১৭ ,,

নিম্নে আমরা ইংলণ্ড ও ওয়েলসের লোকসংখ্যা বিভিন্ন সনের আদমসুমারী অনুযায়ী দিলাম। যথা:

বিকেল নাগাদ হয় ত স্পেশাল ষ্টীমারের ব্যবস্থা হবে। এখানেই বসা যাক, কি বল?

উত্তর দেন বৌদি—অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ। আমার খেয়াল হয় নি। বিদেশে বিভ্রাটের মধ্যে দেশের মানুষ পেয়ে সব ভুলে গিয়েছি ভাই।

বৌদি বোঁচকা থেকে ছোট সতরঞ্চি বার করে পাতেন। সকলে বসার পর বলেন—এইবার তোমার পালা।

বৌদির সঙ্গে অকারণ কথাকাটাকাটিতে লজ্জিত হই। মানুষের বয়স বাড়লেও দুষ্টামি যায় না, হয় ত খানিকটা চাপা পড়ে। অপরাধীর মত বলি—আর বিরক্ত করব না। আমি চট্টগ্রামে অধ্যাপনা করি। জরুরি কাজে কলকাতায় এসেছিলাম। আজ ফিরছি—

—চট্টগ্রামে! সেখানে যে বোমা পড়ে। আছ কি ক'রে?

—উপায় কি? সরকারী চাকরি ত ছাড়তে পারি নে, আপনি গাঁয়ে থেকেও বেশ খবর রাখেন।

—বা রে, কাগজ পড়া তোমার দাদার রোজকার অভ্যাস তা বুঝি মনে নেই! সমস্ত খবর আমার কানে আসে। চট্টগ্রামে প্রাণ হাতে করে থাকা—কখন কি হয় বলা যায় না। জ্যাঠাইমা কাশীবাস করেন তোমাকে সংসারী করতে পারেন নি বলে। গাঁয়ের লোকের এই ধারণা। তাই যদি হয় ত চাকরির এত মায়া কিসের?

—চট্টগ্রামে সকলেই ত চাকরি করছেন! প্রাণের ভয় আমার একার নয়।

—অপরের বিষয় আমি জানি নে, তা নিয়ে মাথাও ঘামাতে চাইনে। কিন্তু তোমাকে ভাল পরামর্শ দেবার অধিকার আমার আছে। আমার কথা শোন। ও চাকরি ছেড়ে দাও, এ অঞ্চলে ফিরে এস। বিয়ে কর, চাকরি আবার মিলবে। কথায় বলে—'স্ত্রী-ভাগ্যে ধন'।

—বৌদির বোন থাকলে আপত্তি করতাম না, কিন্তু কেন জানি-নে অজানা জায়গায় পা ফেলতে সাহস হয় না। বয়স হলে বোধ হয় এমনিই হয়।

—বৌদির ওপর ভারি ভক্তি দেখছি। আমি এতে ভুলিনে ভাই। যে কথা শোনে না তার মৌখিক ভক্তিতে আমার বিশ্বাস নেই।

বৌদির কণ্ঠে অভিমানের সুর। আমার প্রাণে ব্যথা লাগে। বলি, রাগ করবেন না। আপনার উপদেশ আমি বিবেচনা করে দেখব।

বৌদির মুখে অপরূপ হাসি। বলেন—এই ত ভাইয়ের মত কথা।

বেলা বাড়ে। রৌদ্রের তেজে কষ্ট বোধ হয়। আশেপাশে গুড় হেঁকে যায়। অতি সুস্বাদু গোয়ালন্দের গুড়। বৌদি গুড় কিনে টিফিন বাটি থেকে লুচি বার করে মনুকে ও আমাকে খেতে দেন। খাওয়া শেষ হলে আমরা জিনিষপত্র নিয়ে সরে যাই প্ল্যাট-আমার সামনে। চমৎকার পান সাজতেন বৌদি। এজন্য তাঁর গ্রামজোড়া সুখ্যাতি ছিল। পান চিবোতে চিবোতে বলি—এ সখ আর নেই বৌদি, এক রকম ভুলেই গিয়েছি। আপনার ভাজা মসলার সুগন্ধে বয়ে আনছে হারানো দিনের স্মৃতি।

—যেখানে খাওয়া-দাওয়ার পর একটা পান জোটে না সেখানে কি মানুষ থাকে!

—পান মেলে, শুধু সাজবার লোকেরই অভাব। আচ্ছা, সেই কান্তি ঠাকরুণের খবর কি? ভারি তারিফ করতেন তিনি আপনার পানের। রোজ দুপুরে এসে বলতেন, 'একটা পান দাও তো বৌমা। রান্না-বান্না সারতে বেলা হয়ে যায়। আলিস্যি লাগে। আর পেরে উঠিনে।' কথাগুলো আজও আমার মনে রয়েছে। বকবকে মানুষ, ছটফটে স্বভাব, চলতি খবরের জীবন্ত গেজেট।

—আশ্বিন মাসে মারা গিয়েছেন। আহা, তাঁর কথা ভাবতেও কষ্ট হয়। দিনরাত ঘুরে বেড়াতেন, হলেন পক্ষাঘাতে অচল। সারাক্ষণ কথা বলতেন, হলেন একেবারে বোবা। মানুষ দেখলে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকতেন। ইশারা করবার শক্তিও হারিয়েছিলেন। চোখের জলই তাঁর ভাষা। এই জবুথবু মানুষটাকে দেখাশোনা করবারও কেউ ছিল না। ভগবান কেন যে এমন শাস্তি দেন তিনিই জানেন।

বৌদির কপোলে অশ্রুরেখা চিক্ চিক্ করে। আমার অন্তরে ঘনিয়ে ওঠে বিষাদের ছায়া। সমবেদনায় নীরব থাকি। কিছুক্ষণ বাদে প্রসঙ্গ-পরিবর্তনের চেষ্টা করি—পশ্চিম-পাড়ার বামুনদিদি কেমন আছেন? তাসখেলা খুব ভালবাসতেন। আমরা যখন 'টোয়েন্টি নাইন', 'ব্রে' বা 'ক্লু' খেলতাম তখন বলতেন, 'কি ছাইপাঁশ খেলা তোমাদের! সোজাসুজি বিন্তি খেললে বুঝতে পারি।' বুঝতেন না অথচ আড্ডা ছেড়েও যেতেন না। একেই বলে নেশা।

—বামুনদিদির পরিবর্তন অদ্ভুত। বছর পাঁচ-ছয় আগে তীর্থ-দর্শনে বেরোলেন বামুনপুকুরের মাধব চক্রবর্তীর যাত্রীর দলের সঙ্গে, আর ফিরলেন না। এখন তিনি খাঁটি ব্রজবাসিনী। কপালে তিলক, গলায় কণ্ঠি, হাতে ঝুলি। পথে পথে ভিক্ষা করেন আর সুর করে বলেন—'শ্যাম কুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরি-গোবর্দ্ধন, মধুর মধুর বংশী বাজে এই সে বৃন্দাবন।' আমাদের পাড়ার হলধর খুড়ো গত শীতকালে বৃন্দাবন গিয়েছিলেন। খবর তাঁর কাছেই শোনা।

—আশ্চর্য্য! বামুনদিদি শেষে বৈষ্ণবী! আপনাদের তাসের আসর জমে?

—তেমন জমে না। খেলুড়ের অভাব। ছেলেদের রুচি বদলে গিয়েছে। তারা রাজনীতি করে, ফুটবল-ম্যাচ খেলে। গোয়াড়িতে সিনেমা দেখতে যায়। মেয়েরা অনেকেই সভা-সমিতিতে যোগ দেয়, দু'এক জন চরকাকেন্দ্র খুলেছে, কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবিকার দলে নাম লিখিয়েছে।

আপনার পড়াশুনোয় ঝোঁক ছিল। এখন বোধহয় বই নিয়ে সময় কাটান?

[illegible] কতক

...পুরনো বই সবল। উই লেগে সেগুলো নষ্ট হলেও দেখি ...ই। বড়দিনের সময় কলকাতায় বোমা পড়ার পর মিত্তিরদের ...এসে কয়েক মাস গাঁয়ে ছিল। সে বাংলায় এম-এ পড়ে। ...কাছ থেকে আমার প্রিয় একজন লেখকের দু'চারখানা উপন্যাস নিয়ে পড়েছিলাম। কি দরদী লেখা! বাংলা দেশের গাঁয়ের ছবি তিনি যেমন এঁকেছেন তেমন আর কেউ পারেন না। কবি ...শেষ-সপ্তক' পড়তে দিয়েছিল।

অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম :

—এলোকেশীকে মনে পড়ে ?

—পড়ে বৈকি। রাম বাগদীর মেয়ে। কি মিষ্টি গলা ছিল ...! একটি গান আজও ভুলি নি :

"দিন দুপুরে চাঁদ উঠেছে রাত পোহানো ভার।

হ'ল পুন্নিমেতে অমাবস্যা, তের পহর অন্ধকার।"

—শোন তার অদৃষ্টের কথা। চার বছর আগেকার ঘটনা। কেষ্টনগরে বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে বেহুলার গান হবে। শুনতে যাবে ব'লে বেরোল ওর স্বামী ধুবুলে থেকে। তার পর একেবারে নিখোঁজ। জলজ্যান্ত মানুষটা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! সৃষ্টি-ছাড়া কাণ্ড। মেয়েটার দুর্গতির সীমা ছিল না। শ্রাবণ মাসে বাপের আশ্রয়ে ফিরে এসেছে। এখন সে আর হাল্‌কা গান গায় না, গায় ভক্তিমূলক গান। সে গান যদি শোন তো চোখের জল রাখতে পারবে না ঠাকুরপো।

কথায় কথায় দুপুর গড়িয়ে যায় অপরাহ্ণে। সারাদিনের অনাহার অবসাদ আনে। অদূরে এক ঝাঁক যাত্রীর ভিতর চাঞ্চল্য দেখা যায়। এক জন চীৎকার করে—"পাঁচটায় চাঁদপুর স্পেশাল ছাড়বে আর ছয়টায় ছাড়বে নারায়ণগঞ্জ স্পেশাল।" আমরা মিষ্টি কিনে জলযোগ করি। বৌদির ব্যবস্থার ত্রুটি নেই। ষ্টীমার ভিড়বে ঘাটে, তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে হবে। বিনীত ভাবে বলি—বৌদি, আসি তা হলে। আর একটা পান নিতে পারি ?

—একটা কেন, গোটাকতক নাও, অনেক আছে। বহু দূর যাবে। যতক্ষণ পান গালে থাকবে বৌদির কথা মনে পড়বে। কি করব ভাই, পান তো আর দূরে পাঠানো যায় না। কিছু ভাজা মসলা তৈরি করে পোষ্টাল পার্শেলে তোমার কলেজের ঠিকানায় পাঠাব।

—পাগল হয়েছেন! সেই বোমার মুলুকে কোন জিনিস পাঠায়। ডাকের গোলমাল, পাব কি না কিছুই ঠিক নেই। কেন মিছে কষ্ট করবেন ?

—সে আমি বুঝব, তোমাকে বুড়োমি করতে হবে না। কত কাল পরে দেখা, কত আনন্দ! কেমন করে দিনটা যে কেটে গেল একটুও টের পেলাম না। আমার অনুরোধ মনে রেখো। গরমের ছুটিতে রূপদহে আসবার চেষ্টা করতে ভুলো না।

—রূপদহের যে কাহিনী শুনলাম তাতে যাবার উৎসাহ পাই কৈ ? যেখানে আপনার মন পালাই পালাই করে সেখানে কি আমি টিকতে পারব ?

—তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। সত্যিই কি আমি রূপদহ ছেড়ে যেতে পারি ? ওটা আমার কথার কথা। পুরনো দিনের কথা তুলে দুঃখ করা মানুষের স্বভাব। তোমরা যাওয়া-আসা করলে গাঁ যেমন ছিল আবার তেমনি হবে। আমাদের রূপদহ একাধারে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন।

বৌদিকে প্রণাম করি। তিনি ব্যস্ত হয়ে আলতামাখা পা দুখানি সরিয়ে নিয়ে বলেন—হয়েছে, হয়েছে, পায়ে হাত দিও না। তুমি তো আর ইস্কুলে-পড়া ঠাকুরপো নও, কলেজের প্রফেসর—জ্ঞানে বড়। পণ্ডিতের প্রণাম নিতে সঙ্কোচ হয়।

বৌদির কাছে বিদায় নিয়ে ষ্টীমারে এসে উঠি। ডেকের উপর রেলিং ধরে দাঁড়াই। সূর্য্যাস্তের রক্ত-রাঙা রূপ। নৌকার মৃদুগামী মিছিল। পদ্মার কলকল শব্দ। বৌদির ছলছল আঁখি। বাঁশি বাজে। ষ্টীমার ছাড়ে। বাতাসের দোলা লাগে বৌদির লাল-পেড়ে সাড়ির আঁচলে। ঢাকা পড়ে আগ্রহ-আকুল মুখ। অস্পষ্ট—অদৃশ্য হয়ে যায় তীরভূমি।

আঁধারে টলটল করে ব্রহ্মপুত্রের জল। আকাশে জ্বল জ্বল করে বৃশ্চিকরাশি। সুটকেসে ঠেস দিয়ে ডেকের উপর বসে আছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ভাবি কেবল রূপদহের কথা। কান্তি ঠাকরুণ পরলোকে। বামুনদিদি বৃন্দাবনে ভিখারিণী। এলোকেশীর স্বামী নিরুদ্দেশ। প্রাণে হাহাকার ওঠে—নেই, নেই, নেই। মনে জাগে অনেক দিনের অনেক স্মৃতি। পুলকলাগা প্রাতে বাগানে বাগানে ঘুরে পেয়েছি কত বেলি, টগরের গন্ধ। ঘুঘু-ডাকা দুপুরে বুড়ো বটের জটা ধরে খেয়েছি কত দোল। ঘুম-আসা সন্ধ্যায় তুলসীতলায় মাদুরে শুয়ে শুনেছি কত রূপকথা। চোখে ভাসে অনেক দূরের অনেক ছবি। ক্ষীণাঙ্গী জলাঙ্গী, বসন্তবিহ্বল বন, সবুজ সুনিস্তব্ধ মাঠ। পথের ধারে ধারে ধুতরো, গাছের ডালে ডালে ধুঁদুল। ঝিকিমিকি বেলায় মানিক জ্বলে খেজুর গাছে, তাল-গাছের ডোঙা হয় সোনার তরী। যন্ত্রদানবের কালো ছায়া পড়ে নি রূপদহে, বিজ্ঞান কেড়ে নেয় নি চিত্তের শান্তি। সেখানে যেমন আছে প্রকৃতিদেবীর অনন্ত সৌন্দর্য্য তেমনি আছে ললিতা বৌদির অফুরন্ত স্নেহপ্রীতি।

বিশ্ব-রচনায় সব কিছুই হারায় না—যেমন যায় তেমনি থাকে।

ঋগ্বেদে নিসর্গ-চিত্র

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ

আদিকবি বাল্মীকির বর্ষাবর্ণনায় আছে :

স্বনৈর্ঘনানাং প্লবগাঃ প্রবুদ্ধা
বিহায় নিদ্রাং চিরসন্নিরুদ্ধাম্।
অনেক রূপাকৃতিবর্ণনাদা-
নবাম্বুধারাভিহতা নদান্ত ॥

অর্থাৎ, নানা বর্ণের ও নানা আকারের ভেকগণ দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ স্থানে ছিল। তাহারা জাগরিত হইল এবং নিদ্রা ত্যাগ করিয়া নবজলধারায় সিক্ত হইয়া নানাপ্রকার শব্দ করিতেছে।

বর্ষায় ভেক-সমারোহের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন চিত্র পাই ঋগ্বেদে। ৭ম মণ্ডলের ১০৩ সূক্তটি বসিষ্ঠ ঋষির মণ্ডুক-স্তুতি। সূক্তের প্রথম মন্ত্র :

সংবৎসরং শশয়ানা
ব্রহ্মণা ব্রতচারিণঃ।
বাচং পর্জন্যজিম্বিতাং
প্র মণ্ডুকা অবাদিষুঃ ॥

অর্থাৎ, সংবৎসর শুইয়া থাকিয়া মণ্ডূকগণ ব্রতচারী স্তোত্র-উচ্চারণকারীর ন্যায় পর্জন্যের প্রীতিকর বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন।

বর্ষাগমে ব্যাঙের ডাকের সঙ্গে সকলেই কিছু-না-কিছু পরিচিত। ব্যাঙের ডাক সম্বন্ধে গ্রাম্য ছড়া শুনিয়াছি :

গলা-ফোলা কোলা ব্যাঙ।
ডাকিছে গ্যাঙর্ গ্যাঙ্ ॥

ছড়াটি বাল্মীকির "নবাম্বুধারাভিহতা নদন্তি" এবং বৈদিক ঋষির "বাচং পর্জন্যজিম্বিতাং প্র মণ্ডুকা অবাদিষুঃ"র গ্রাম্য ভগিনী সন্দেহ নাই।

সূক্তের অন্য মন্ত্রগুলিতে ভেককুলের বর্ণ-বৈচিত্র্য, স্বর-বৈচিত্র্য এবং তাহাদের ক্রিয়াকলাপ বর্ণিত হইয়াছে।

দিব্যা আপো অভি-যদেনমায়ন্
দৃতিং ন শুষ্কং সরসী শয়ানম্।
গবামহ ন মায়ুর্বৎসিনীনাং
মণ্ডুকানাং বগ্নুরত্রা সমেতি ॥

অর্থাৎ, শুষ্ক চর্মের ন্যায় সরসীতে শয়ান মণ্ডূকগণের নিকট যখন স্বর্গীয় জল আগমন করে তখন বৎসযুক্ত ধেনুর শব্দের ন্যায় মণ্ডুকগণের স্বর-সঙ্গৎ হয়।

যদীমেনাঁ উশতো অভ্যবর্ষীৎ
তৃষ্যাবতঃ প্রাবৃষ্যাগতায়াম্।
অক্‌খলীকৃত্যা পিতরং ন পুত্রো
[illegible] ॥

অর্থাৎ, বর্ষা আগত হইলে তৃষ্ণার্ত মণ্ডুকগণকে (প[illegible] যখন জলসিক্ত করেন, তখন পুত্র যেমন খল্ খল্ শব্দ করি[illegible] পিতার নিকট গমন করে সেইরূপ এক মণ্ডুক অপর মণ্ডু[illegible] নিকট গমন করে।

অন্যো অন্যমনু গৃভ্ণাত্যেনো-
রপাং প্রসর্গে যদমন্দিষাতাম্।
মণ্ডুকো যদভিবৃষ্টঃ কনিষ্কন্
পৃশ্নিঃ সংপৃঙ্ক্তে হরিতেন বাচম্ ॥

অর্থাৎ, বৃষ্টি পড়িয়া দুই মণ্ডুক যখন হৃষ্ট হয়, তখন তা[illegible] প্রবল লম্ফপ্রদান করিয়া ধূম্রবর্ণ মণ্ডুক হরিদ্বর্ণ মণ্ডুকের স[illegible] একত্রে শব্দ করে।

যদেষামন্যো অন্যস্য বাচং
শাক্তস্যেব বদতি শিক্ষমাণঃ।
সর্বং তদেষাং সমৃধেব পর্ব
যৎ সুবাচো বদথনাধ্যপ্সু ॥

অর্থাৎ, শিষ্য ও গুরুর ন্যায় এই মণ্ডুকগণের মধ্যে এ[illegible] যখন অন্যের বাক্য অনুকরণ করে; হে মণ্ডূকগণ, তোম[illegible] যখন সুন্দর শব্দবিশিষ্ট হইয়া জলের উপর লম্ফ দি[illegible] দিতে শব্দ কর, তখন তোমাদের সমস্ত পর্বযুক্ত শরীর স[illegible] শালী হয়।

গোমায়ুরেকো অজমায়ু-রেকঃ
পৃশ্নিরেকো হরিত এক এষাম্।
সমানং নাম বিভ্রতো বিরূপাঃ
পুরুত্রা বাচং পিপিশুর্বদন্তঃ ॥

অর্থাৎ, কাহারও শব্দ গরুর ন্যায় কাহারও শব্দ ছা[illegible] ন্যায়, কেহ ধূম্রবর্ণের কেহ-বা হরিদ্বর্ণের। সকলেরই নাম এ[illegible] কিন্তু রূপ নানাবিধ। ইহারা নানা দেশে শব্দ করিতে ক[illegible] আসিয়া উপস্থিত হয়।

ব্রাহ্মণাসো অতিরাত্রে ন সোমে
সরো ন পূর্ণমভিতো বদন্তঃ।
সংবৎসরস্য তদহঃ পরি ষ্ঠ
যন্মণ্ডুকাঃ প্রাবৃষীণং বভূব ॥

অর্থাৎ, অতিরাত্র নামক সোমযজ্ঞে স্তোতাগণের ন্যা[illegible] পূর্ণ সরোবরের চারিদিকে তোমাদের শব্দের মধ্যে [illegible]দিন প্রাবৃট্ আসিল, হে মণ্ডুকগণ, সেই দিন তোমরা চারি[illegible]কে অবস্থান কর।

ব্রাহ্মণাসঃ সোমিনো বাচমক্রৎ
ব্রহ্ম কৃণ্বন্তঃ পরিবৎসরীণম্।
অধ্বর্যবো ঘর্মিণঃ সিষ্বিদানা
আবির্ভবন্তি গুহ্যা ন কে চিৎ ॥

অর্থাৎ, সোমযুক্ত সাংবৎসরিক যজ্ঞে স্তোত্র-উচ্চারণকারী স্তোতাগণের ন্যায় এই মণ্ডুকগণ শব্দ করিতেছে। অধ্বর্যু-দের ন্যায় ঘর্মাক্তদেহ লুক্কায়িত কোন কোন মণ্ডুক আবির্ভূত হইতেছে।

দেবহিতিং জুগুপুর্দ্বাদশস্য
ঋতুং নরো ন প্র মিনন্ত্যেতে।
সংবৎসরে প্রাবৃষ্যাগতায়াং
তপ্তা ঘর্মা অশ্নুবতে বিসর্গম্॥

অর্থাৎ, (মণ্ডুকগণ) দেবতাকৃত বিধান রক্ষা করে; ইহারা দ্বাদশ মাসের ঋতুগণকে হিংসা করে না। সংবৎসরান্তে বর্ষা আগত হইলে গ্রীষ্মের উত্তাপে ঘর্মাক্ত মণ্ডুকগণ গর্ত হইতে মুক্তি লাভ করে।

ঋগ্বেদের আরও কয়েকটি মন্ত্রে মণ্ডুক সম্বন্ধে উক্তি আছে তাহা বসিষ্ঠ ঋষির এই মণ্ডুক স্তুতির ন্যায় বিস্তৃত নয়। এই স্তুতিটি বৃষ্টি নামাইবার মন্ত্র। নিরুক্তকার বলেন, বসিষ্ঠ ঋষি বৃষ্টি কামনা করিয়া পর্জন্যকে স্তব করেন। মণ্ডুকগণ তাঁহার অনুমোদন করেন। এ কারণ তিনি মণ্ডুকগণকে স্তুতি করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্ ডাকিলে বৃষ্টি হয় ইহা প্রাচীন প্রবাদ।

আরও একটি সুন্দর নিসর্গ-চিত্র পাই ১০ম মণ্ডলের ১৪৬ সূক্তে, অরণ্যানী সম্বন্ধে:

অরণ্যান্যরণ্যা-ন্যসৌ
যা প্রেব নশ্যসি।
কথা গ্রামং ন পৃচ্ছসি
ন ত্বা ভীরিব বিন্দতী॥

অর্থাৎ, হে অরণ্যানি, তুমি যেন দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিত হইয়া যাও (অর্থাৎ, কত দূর চলিয়া গিয়াছ বোঝা যায় না)। তুমি কেন গ্রামে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা কর না?' তোমার কি একা থাকিতে ভয় হয় না?

বৃষারবায় বদতে
যদুপাবতি চিচ্চিকঃ।
আঘাটিভিরিব ধাবয়-
ন্নরণ্যানির্মহীয়তে॥

অর্থাৎ, (অরণ্যমধ্যে) এক জন্তু বৃষের ন্যায় শব্দ করিতেছে, আর-এক জন্তু চিঁচিঁ শব্দ করিয়া যেন তাহার উত্তর দিতেছে। ইহারা বীণার ঘাটে-ঘাটে (পর্দায় পর্দায়) শব্দ বাহির করিয়া অরণ্যানীর বর্ণনা করিতেছে।

উত গাব ইবাদন্ত্যুত
বেশ্মেব দৃশ্যতে।
উতো অরণ্যানিঃ সায়ং
শকটীরিব সর্জতি।

অর্থাৎ, কোথাও যেন গাভী চরিতেছে, এইরূপ ভ্রম হয়, কোথাও যেন একটি অট্টালিকার মত দেখা যায়, যেন উহার মধ্য হইতে শত শত শকট বাহির হইয়া আসিতেছে (বনের মধ্যে আলো-অন্ধকারের দ্রুত পরিবর্তনে এইপ্রকার ভ্রম-দৃষ্টি হয়)।

গামঙ্গৈষ আ হ্বয়তি
দার্বঙ্গৈষো অপাবধীৎ।
বসন্নরণ্যান্যাং সায়
ম ক্রুক্ষদিতি মন্যতে॥

অর্থাৎ, তবে কি এই ব্যক্তি গাভীকে আহ্বান করিতেছে? তবে কি কেহ কাষ্ঠ ছেদন করিতেছে? যে ব্যক্তি অরণ্যানীমধ্যে থাকে, সে মনে করে যেন সন্ধ্যাবেলা কেহ চীৎকার করিয়া উঠিল।

ন বা অরণ্যানির্হ-
ন্ত্যন্যশ্চেন্নাভিগচ্ছতি।
স্বাদোঃ ফলস্য জগ্ধায়
যথাকামং নি পদ্যতে॥

অর্থাৎ, বাস্তবিক অরণ্যানী কাহারও প্রাণবধ করে না। অন্যান্য পশু না আসিলে সেখানে কাহারও কোন আশঙ্কা নাই। তথায় সুস্বাদু ফল আহার করিয়া অতি সুখে কাল কাটানো হয়।

আঞ্জনগন্ধিং সুরভিং
বহ্বন্নামকৃষীবলাম্।
প্রাহং মৃগাণাং মাতর-
মরণ্যানিমশংসিষম্॥

অর্থাৎ, মৃগনাভীর ন্যায় অরণ্যানীর কত সৌরভ, আহার তথায় বিদ্যমান আছে; তথায় কৃষক-লোক আদৌ নাই। অরণ্যানী হরিণদিগের জননীস্বরূপা। এইরূপে আমি অরণ্যানীর বর্ণনা করিলাম।

বৈদিক ঋষিদিগের নিসর্গ বর্ণনে, উষা, মরুদ্‌গণ, পর্জন্য, নদী প্রভৃতিও প্রচুর স্থান পাইয়াছে। তবে তাহা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

পর্জন্য -(মেঘ বা বৃষ্টির দেবতা) স্তুতিতে ঝড় জল ও বিদ্যুৎ-চমকানীর সমাবেশ বর্ণনায় আছে:

দূরাৎ সিংহস্য স্তনথা উদীরতে
যৎ পর্জন্য কৃণুতে বর্ষ্যং নভঃ। ৫. ৮৩. ৩.

অর্থাৎ, যৎকালে পর্জন্য বারিদসমূহ অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত করেন, তৎকালে সিংহবৎ মেঘের গর্জন দূর হইতে উদ্গত হয়।

কালিদাস বলিয়াছেন:

মেঘালোকে ভবতি সুখিনো-
ঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ।

অর্থাৎ, সুখী ব্যক্তির চিত্তও মেঘদর্শনে ভাবান্তর প্রাপ্ত হয়।

বর্ষার আকাশে মেঘের সমারোহ দেখিয়া বৈদিক ঋষিরাও বলিলেন :

প্র বাতা বান্তি পতয়ন্তি বিদ্যুত
উদোষধীর্জিহতে পিন্বতে স্বঃ।
ইরা বিশ্বস্মৈ ভুবনায় জায়তে
যৎ পর্জন্যঃ পৃথিবীং রেতসাবতী। ৫ ৮৩.৪

অর্থাৎ, যৎকালে পর্জন্য বৃষ্টিদ্বারা পৃথিবী রক্ষা করেন, তখন প্রবল বায়ু বহিতে থাকে, চতুর্দিকে বিদ্যুৎস্ফুরণ হয়। ওষধিসমূহ অঙ্কুরিত হয়, অন্তরীক্ষ বিগলিত হয়, এবং পৃথিবী সমস্ত জীবের হিতসাধনে সমর্থ হয়।

যস্য ব্রতে পৃথিবী নংনমীতি
যস্য ব্রতে শফবজ্জর্ভুরীতি।
যস্য ব্রত ওষধীর্বিশ্বরূপাঃ
স নঃ পর্জন্য মহি শর্ম যচ্ছ॥ ৫, ৮৩, ৫

অর্থাৎ, যাহার কার্যবশতঃ পৃথিবী অবনত হয়, খুর-বিশিষ্ট গবাদি পুষ্টিলাভ করে এবং ওষধিসকল বিবিধ রূপ ধারণ করে, হে পর্জন্য, সেই তুমি আমাদিগকে বিপুল সুখ প্রদান কর।

মরুদ্‌গণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

দিবা চিৎ তমঃ কৃণ্বন্তি
পর্জন্যেনোদবাহেন। ১. ৮৩. ৯.

অর্থাৎ, মরুদ্‌গণ উদকধারী পর্জন্যদ্বারা দিবাকালেও অন্ধকার করিতেছেন।

অধ স্বনান্মরুতা বিশ্বমা সদ্ম পার্থিবম্।
অরেজন্ত প্র মানুষাঃ। ১. ৩৮, ১০

অর্থাৎ, মরুদ্‌গণের গর্জনে সমস্ত পৃথিবীর গৃহাদি সমস্তাৎ কম্পিত হয়, মনুষ্যগণ কম্পিত হয়।

প্র বেপয়ন্তি পর্বতান্
বি বিঞ্চন্তি বনস্পতীন্। ১. ৩৯. ৫

অর্থাৎ, মরুদ্‌গণ পর্বতসমূহকে বিশেষরূপে কম্পিত করিতেছেন। বনস্পতিদিগকে বিযুক্ত করিতেছেন।

অগ্নিকে তাঁহারা প্রধান দেবতারূপে স্তব করিয়াছেন। কিন্তু বিভিন্ন পরিবেশে অগ্নির যে বিশেষ বিশেষ রূপ প্রকাশ পায় তাহাও তাঁহারা স্তোত্রমধ্যে আঁকিয়াছেন।

অগ্নির শিখাগণ লঘুগতি কৃষ্ণাপন্থা (রঘুদ্রুবঃ কৃষ্ণসীতাসঃ) ১.৪০,৪

অগ্নি রাত্রিকালে দিবস হইতেও অধিক দর্শনীয়।(নক্তং সুদর্শতরো দিবাতরাৎ) ১.১২৭.৫

যে সময় অগ্নি গর্জন করিয়া শ্বাস প্রক্ষেপ করিয়া বিস্তীর্ণ পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়া শব্দ করে, সেই সময় অগ্নির স্ফুলিঙ্গসকল যুগপৎ চারিদিকে গমন করে। অন্ধকার ধ্বংস করিয়া গমন করে ও কৃষ্ণবর্ণ পথে উজ্জ্বল রূপ প্রকাশ করে। ১.১৪০.৫

অগ্নি দুর্দ্ধর্ষরূপ ধারণ করিয়া ভয়ঙ্কর পশুর ন্যায় শৃঙ্গচালনা করিতেছেন। ১.১৪০.৬

অগ্নি পৃথিবীর উপরিভাগের আচ্ছাদন তৃণগুল্মাদি ভেদন করিতে করিতে যে পথে যাইতেছেন, তাহা কৃষ্ণবর্ণ করিয়া যাইতেছেন। ১.১৪০.৯

বাচাল বিদূষক যেমন অবাধে তোষামোদ করিতে থাকে বায়ু কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া অগ্নি চারিদিকে ব্যাপ্ত হন। ১.১৪১.৭

অগ্নি তৃষিতের ন্যায় বনসমূহকে দগ্ধ করেন, জলের ন্যায় ইতস্ততঃ গমন করেন, রথবাহী অশ্বের ন্যায় শব্দ করেন, তিনি তাপক হইলেও নভোমণ্ডলে পরিশোভিত দ্যুলোকের ন্যায় রমণীয়। ২.৪.৬.

যদুদ্বতো নিবতো যাসি বপ্সৎ
পৃথগেষি প্রগর্ধিনীব সেনা।
যদা তে বাতো অনুবাতি শোচি-
র্বপ্তেব শ্মশ্রু বপসি প্র ভূম॥ ১০-১৪২-৪

অর্থাৎ, বায়ু যখন তোমার পশ্চাৎ হইতে বহিতে থাকে, তখন নাপিত যেমন লোকের শ্মশ্রু মুণ্ডন করে তেমনি তুমি বিস্তর প্রদেশ মুণ্ডন করিয়া দাও।

অতএব দেখা যাইতেছে, ঋগ্বেদের সময় হইতে, অর্থাৎ সাহিত্য সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই কবিরা নিসর্গ-চর্চা করিয়া আসিতেছেন। আর দেখিতেছি, পর্জন্যের মুখর সন্তান মণ্ডূক সেই আদি কবিদিগের নিকট পূজা লাভ করিয়াছেন।

গোমায়ুরদাদজমায়ুরদাৎ
পৃশ্নিরদাদ্ধরিতো নো বসূনি।
গবাং মণ্ডূকা দদতঃ শতানি
সহস্রসাবে প্র তিরন্ত আয়ুঃ॥ ৭-১০৩-১০

গরুর ন্যায় শব্দবিশিষ্ট মণ্ডূক আমাদিগকে ধন দান করুন, ছাগলের ন্যায় শব্দবিশিষ্ট মণ্ডূক আমাদিগকে ধন দান করুন, ধূম্রবর্ণ মণ্ডূক আমাদিগকে ধনদান করুন, হরিদ্বর্ণ মণ্ডূক আমাদিগকে ধন দান করুন। সহস্র ওষধি-প্রসবকারী বর্ষা ঋতুতে মণ্ডূকগণ অপরিমিত গো প্রদান করিয়া আমাদিগের আয়ু বর্দ্ধিত করুন।

আইনষ্টাইন ও বর্ত্তমান বিজ্ঞান

শ্রীদেবকুমার মুখোপাধ্যায়

১৮৭৯ খ্রীঃ ১৪ই মার্চ উর্ত্তেমবার্গের (Wurthemberg) উলম শহরে এক সম্ভ্রান্ত ইহুদীবংশে আইনষ্টাইন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছাত্রাবস্থায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। মিউনিকের বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া তিনি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখ শহরের এক উচ্চ শিল্প-বিজ্ঞান বিদ্যালয়ে পদার্থ ও গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্ত ভর্ত্তি হন। পাঁচ বৎসর কাল তথায় পাঠ করিবার পর এক ইঞ্জিনীয়ারের পদ গ্রহণ করিয়া সুইস পেটেণ্ট আপিসে প্রায় দশ বৎসর কাজ করেন। এই সময় তিনি ধারাবাহিক ভাবে কয়েকটি চিন্তামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৯০৫ সনে তাঁহার বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব বিজ্ঞানজগতে এক নূতন যুগের সূচনা করে। ১৯০৯-১১ পর্য্যন্ত আইনষ্টাইন জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯১২ সনে তিনি প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯১৩ সনে তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। এই সময় তিনি গবেষণাকার্য্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগের সুযোগ পাইলেন। তাঁহার প্রকাশিত আপেক্ষিক তত্ত্ব ও শক্তির কণাবাদ তৎকালীন প্রকাশিত মতবাদের বিরোধী হওয়ায় সে সময়ে তাদৃশ সমাদৃত হয় নাই বটে, কিন্তু কিছুদিন পরে যখন তাহা পরীক্ষালব্ধ ফলাফল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল তখন এই নূতন মতবাদের সাহায্যে পূর্ব্বের বহু অমীমাংসিত প্রশ্নের সমাধান মিলিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার মতবাদ পুরাতন চিন্তাধারাকে অপসারিত করিয়া সারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠালাভ করিল। ১৯২১ সনে তাঁহাকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়—উক্ত বৎসর ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটি তাঁহাকে সদস্য নির্ব্বাচিত করিলেন। ১৯২৫ সনে রয়াল সোসাইটি তাঁহাকে "কপলে" পদক উপহার দিয়া সম্মানিত করেন। ১৯৩৫ সনে তাঁহাকে ফ্রাঙ্কলিন ইনষ্টিটিউট পদক দ্বারা গৌরবান্বিত করা হয়। জার্ম্মানীর অন্তর্বিপ্লবের পর ১৯৩৩ সনে যখন জাতীয় সমাজতন্ত্রী দল ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতে লাগিল ও সমগ্র জার্ম্মানীর কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিল, তখন জার্ম্মানীতে ইহুদীদের বড় দুঃসময় পড়িল। তাহাদের উপর নির্যাতন ও দুর্ব্ব্যবহার ক্রমেই বাড়িতে সুরু করিল। ইহার হাত হইতে এই নিরহঙ্কার, নির্লিপ্ত মনীষীও রেহাই পাইলেন না। তিনি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া আমেরিকায় প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করিলেন। তাঁহার অমায়িক বালকসুলভ ব্যবহার তাঁহাকে সকলের নিকট প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। গবেষণাকার্য্যে সারাক্ষণ লিপ্ত থাকিবার পর অবসর সময়ে বেহালা যন্ত্রটি তাঁহার নিপুণ হস্তে ঝঙ্কৃত হইয়া তাঁহার চিত্তবিনোদন করিত।

পদার্থবিদ্যার সহায়তায় আমরা যে জ্ঞান আহরণ করি তাহা মাত্র তিনটি নিরপেক্ষ একক হইতে সম্ভব হয়। এই তিনটি মৌলিক একক হইল দৈর্ঘ্য, ভর ও কালের একক। ইহাদের ভিত্তিতে পদার্থ-বিজ্ঞানের যাবতীয় বিষয়বস্তুর সম্যক্ ধারণা করা সম্ভব হয়। এই তিনটি এককের সঠিক বা নির্ভুল মাপের উপর বিচার্য্য ফলের সত্যতা নির্ভর করে। এই তিনটি এককের নির্ভুল মাপের জন্ত বিজ্ঞানে এযাবৎ অনুশীলন চলিতেছে; বহু সূক্ষ্ম-বিচারী যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে, নির্ভুল ফল নির্দ্দেশ করিবার জন্ত জটিল গণিতের সাহায্য লওয়া হইতেছে। বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম যন্ত্রের উপর আস্থা রাখিয়া ও বিশুদ্ধ গণিতশাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া নিউটন প্রকৃতির নিয়মাবলীর ব্যাখ্যা করিলেন। নিউটনের নির্দ্দেশে যে ফলাফল পাওয়া গিয়াছিল তাহা নির্ভুল বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল। নিউটনের সূত্রানুসারে প্রাকৃতিক বহু প্রশ্নের আপাত ব্যাখ্যা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু কিছু প্রশ্ন অমীমাংসিত রহিল যাহার ব্যাখ্যা নিউটনের মতবাদ অনুসারে মিলিল না। নিউটনের সূত্রানুসারে সূর্য্যের গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে মহাকর্ষবশতঃ তাহাদের গতিবিধি ও পর্য্যায়কাল নির্দ্দেশ করা সম্ভব হইল বটে, কিন্তু সূর্য্যের নিকটতম বুধগ্রহের পর্য্যায়কাল ও গতিবিধি হিসাবমত মিলিল না। নিউটনের সূত্রানুসারে বর্ণিত বলের মাপ ক্ষেত্রভেদে পৃথক হইতে লাগিল। ফিজোর পরীক্ষায় চরম স্থিতিশীল দেশের কল্পনা ফুরাইল; ঈথরের অস্তিত্ব অপ্রমাণিত হওয়ায় নিউটনের মহাকর্ষ এবং চৌম্বকী আকর্ষ ও বিকর্ষ মতবাদ আর টিকিল না। ঈথরবিহীন শূন্যস্থলের মধ্য দিয়া আকর্ষণী বা বিকর্ষণী প্রভাবের কার্য্যকারিতা কল্পনাতীত হইয়া দাঁড়াইল। বিজ্ঞানের ধারাবাহিক গতি এইবার এক অভাবনীয় বাধার সম্মুখীন হইল—বিজ্ঞানের পূর্ব্ব নির্দ্দেশগুলি ভ্রান্তিপূর্ণ বলিয়া অনুমিত হইল। এই সময় মনীষী আইনষ্টাইন প্রচার করিলেন যে, বিজ্ঞানে এককের চরম মান নির্ণয় করা সম্ভব নয়, সে কারণ চরম সত্য বা নির্ভুল ফল নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। যাহা কিছু আমরা বিচার করি বা নির্দ্দেশ দিই তাহা তুলনামূলক মাত্র, তাহা পূর্ণ সত্য বা চরম মান নয়। তিনি মন্তব্য করিলেন যে, বস্তুর ভর, দৈর্ঘ্য বা কালের একক কোনটিরই চরম মান আমরা নির্ণয় করিতে পারি না, উপরন্তু পরীক্ষাধীন একই বস্তুর ভর ও দৈর্ঘ্য সকল ক্ষেত্রে ধ্রুবক নয়। ক্ষেত্রভেদে একই বস্তুর ভরের মান পৃথক হয়। স্থিতিশীল ও গতিশীল অবস্থায় একই বস্তুর ভরের পার্থক্য হইয়া থাকে। গতিবেগ বাড়িলে বস্তুর ভর বাড়িতে থাকে, বস্তুর গতিবেগ যদি আলোকের গতিবেগের সমান হয় তাহা হইলে অতি ক্ষুদ্র ভরসম্পন্ন বস্তুটিও অসীম ভরযুক্ত হইয়া উঠিবে। গতিশীল বস্তুর অনুদৈর্ঘ্য ভর-জড়তা হ্রাস পাইয়া থাকে এবং উহার অনুপ্রস্থ ভর-জড়তা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, ফলে গতিশীল বস্তু দৈর্ঘ্যে কুঞ্চিত হইয়া প্রস্থে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। নিউটনের মতে বস্তুর ভর

সকল অবস্থাতেই ধ্রুবক, দৃঢ় বস্তুর গতি বা স্থিতিশীল অবস্থাতে ভরের ও আয়তনের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। পরীক্ষালব্ধ ফলে নিউটনের মত টিকিল না।

আইনষ্টাইন মন্তব্য করিলেন যে, কোন বস্তুর মাপ এবং দুইটি ঘটনার কালান্তর নিত্যবস্তু নয়। আপেক্ষিক গতির উপর নির্ভরশীল—বস্তুর দৈর্ঘ্য বা দুইটি বিন্দুর ব্যবধান নির্ভর করে মান নির্ণয়ের প্রণালী বা নির্ণয়কালীন পরীক্ষকের গতিশীল বা স্থিতিশীল অবস্থার উপর। উচ্চতার ফলে বা দুইটি বিন্দুর মধ্যে গতিবেগ বিদ্যমান থাকায় তাহাদের মধ্যে যে ব্যবধানের পার্থক্য সৃষ্টি হইবে তাহা যথাযথ বিচার করিয়াও উহার চরম দৈর্ঘ্য বা দূরত্ব নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কোন বস্তুর দৈর্ঘ্য বা দুইটি বিন্দুর মধ্যে ব্যবধান মাপিতে হইলে আমরা সাধারণতঃ একটি সর্ব্বসম্মত মাপকাঠির সাহায্যে দেখি—বস্তুর একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে মাপকাঠিটির পূর্ণ বা আংশিক কতটুকু প্রয়োজন হয়। একটি পরীক্ষাধীন যষ্টির দৈর্ঘ্য উচ্চতার ফলে পরিবর্ত্তিত হয় বটে, কিন্তু উহা সম-উচ্চতায় রক্ষিত হইয়াও স্থিতিশীল ও গতিশীল অবস্থায় উহার দৈর্ঘ্যের পার্থক্য ঘটায়। আইনষ্টাইন ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিলেন যে, পরীক্ষক ও পরীক্ষাধীন বস্তুর মধ্যে আপেক্ষিক বেগ বিদ্যমান থাকায় বস্তুর অন্তিম দুই বিন্দু যুগপৎ সম অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভব নয়। লরেঞ্জের পরীক্ষালব্ধ ফল উক্ত মতবাদের অনুকূলে সায় দিল। পরীক্ষায় একটি গতিশীল যষ্টির দৈর্ঘ্য উহার আপেক্ষিক স্থিতিশীল অবস্থার দৈর্ঘ্য হইতে কম হইল। কোন কোন বিজ্ঞানী বস্তুর আয়তন পরিবর্ত্তনের জন্য আলোকের আপেক্ষিক গতিকে দায়ী করিলেন—ইহা অনুমিত হইল যে, পৃথিবীর গতি ও বস্তুর গতি অথবা পরীক্ষকের গতির ফলে যষ্টিটির শেষ দুই বিন্দু হইতে যে দুইটি আলোক-রশ্মি পরীক্ষকের চোখে আসিতেছে তাহা ভিন্ন আপেক্ষিক গতিসম্পন্ন হওয়ায় যষ্টির দৈর্ঘ্যের পরিবর্ত্তন হয়। উদাহরণ-স্বরূপ মনে করা যাক—এক দ্রুতগামী ট্রেনে বসিয়া একটি বিশাল অট্টালিকা নজর করা হইতেছে—অট্টালিকার অগ্রভাগস্থ একটি বিন্দু হইতে যে আলোক-রশ্মিটি চোখে আসিতেছে তাহা ট্রেনের গতিপথের বিপরীত দিকবাহী, অনুরূপ অট্টালিকার শেষ প্রান্তটি হইতে যে আলোকরশ্মিটি বিচ্ছুরিত হইয়া চোখে আসিতেছে তাহা ট্রেনের গতির সমদিক-সম্পন্ন। অতএব উক্ত দুইটি আলোক-রশ্মির আপেক্ষিক গতিবেগ ভিন্ন হইবে এবং ট্রেনের গতিশীল ও স্থিতিশীল অবস্থায় অট্টালিকার দৈর্ঘ্যের মধ্যে পার্থক্য থাকিবে। পরীক্ষাধীন বস্তুর আয়তন হ্রাসের কারণ আলোকের আপাত আপেক্ষিক গতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হইল। এই ব্যাখ্যা দ্বারা পরীক্ষালব্ধ ফলের সাময়িক সমন্বয় করা হইল। নদীর স্রোতে নৌকার আপেক্ষিক বেগ, দুইটি চলন্ত ট্রেনের আপেক্ষিক গতি, বৃষ্টির আপেক্ষিক বেগ প্রভৃতির কথা আমাদের জানা আছে, সে কারণ আলোকের আপেক্ষিক গতির কথা [illegible] বিস্মিত হইলাম না। কিন্তু আইনষ্টাইন প্রচার গতি নহে—ইহা ভিন্ন প্রণালীতে মাপের ফলে একই অবস্থার ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ মাত্র। পরীক্ষণীয় বস্তু ও পরীক্ষক সম অবস্থাপন্ন হইলে অর্থাৎ একই পদ্ধতির বিষয়ভুক্ত হইলে বস্তু ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে না। আপেক্ষিক তত্ত্ব সকল গতিবেগক্ষেত্রে প্রযোজ্য বটে, কিন্তু আলোকের গতির উপর ইহা মোটেই প্রযোজ্য নহে। আইনষ্টাইন জটিল গণিত সাহায্যে প্রমাণ করিলেন যে, আলোর বেগ পৃথিবী হইতে যে উপায়ে যে দিকেই মাপা যাউক না কেন সকল ক্ষেত্রেই অপরিবর্ত্তনীয়, ইহা নিত্য ও সর্ব্বোচ্চতম বেগের মান। মাইকেলসন ও মরলের পরীক্ষায় প্রমাণিত হইল যে, দিক বা অবস্থা নির্ব্বিশেষে আলোর বেগ অপরিবর্ত্তিত থাকে। তিনি পৃথিবীর আহ্নিক গতির পক্ষে ও বিপক্ষে আলোক-রশ্মি পাঠাইয়া উহার ব্যতিচার সাহায্যে প্রমাণ করিলেন যে আলোর বেগ উভয় ক্ষেত্রেই সমান অর্থাৎ অপরিবর্ত্তনীয়। ফিজো তাঁহার পরীক্ষালব্ধ ফল প্রচার করিলেন—ঈথরের কল্পনা ভ্রান্তিমূলক, উহাকে চরম স্থান (absolute space) বিবেচনা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। নিউটনের ঈথরকে নিত্য ও চরম স্থিতিশীল স্থান কল্পনা করা আর চলিল না। আলোর নির্দ্দিষ্ট বেগ থাকায় ফলে দুই ভিন্ন পদ্ধতিতে একই বস্তুর অবস্থা বিভিন্ন প্রতীয়মান হইল—আলোর বেগ অসীম ধরিলে নিউটনের বিচার লরেঞ্জের পরীক্ষালব্ধ ফলের সহিত মেলে, কিন্তু আলোর গতি প্রচণ্ড বটে, তবে অসীম নয়। এক্ষণে এই পরীক্ষালব্ধ সত্যটি আইনষ্টাইনের মতবাদের সপক্ষে সাক্ষ্য দিল। নিউটনের বিচার-পদ্ধতি এবং ব্যাখ্যা অর্থহীন ও ভ্রান্তিপূর্ণ প্রমাণিত হওয়ায় বিজ্ঞান-জগতে এক আলোড়ন উপস্থিত হইল। ঈথর-বিহীন ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া মহাকর্ষ শক্তি বা বৈদ্যুতিক ও চৌম্বকীয় প্রভাবের কার্য্যকারিতা দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িল। ফলতঃ নিউটনের মতবাদ ক্রমশঃই পশ্চাদপসরণ করিতে লাগিল, সেই সুযোগে আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। ভর ও শক্তির সাম্য, শক্তির কণাবাদ, চিরন্তন কালের অভেদ্য সংস্থা প্রভৃতি অপর চিন্তাধারায় তাঁহার মতবাদ পুষ্ট হইল।

আপেল ফল ভূপতিত হওয়ার মধ্যে অভিকর্ষের প্রভাব কল্পনা করা নিষ্প্রয়োজন অনুমিত হইল। বিশ্বের প্রতি পদার্থকণা অপর কণাকে মহাকর্ষজনিত আকর্ষণ করিতেছে এরূপ চিন্তা করার অবসান হইল। আইনষ্টাইন গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করিলেন যে, কোন স্থানে বস্তু থাকিলেই সেখানকার দেশ বক্রতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বস্তুর চারিদিকে এক জড় তরঙ্গের সৃষ্টি হইয়া থাকে—এই জড় তরঙ্গের উপরি-পাতনের ফলে বস্তুবিশেষের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ উদ্ভূত হইয়া থাকে। মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ ক্ষেত্রঘটিত সমস্যা (field problem)—বৈদ্যুতিক ও চৌম্বকীয় সমস্যাও এই জাতীয়। বড় বস্তুর সহজাত তরঙ্গ বড়, ক্ষুদ্র বস্তুর তরঙ্গ ক্ষুদ্র—সে কারণ আকর্ষণী বা বিকর্ষণী বলের তারতম্য হইয়া থাকে। বস্তুর আবর্ত্তে বৈদ্যুতিক প্রভাব সংবদ্ধ করিয়া তিনি অধুনা এক নূতন [illegible] field

problem)। আইনষ্টাইনের মতবাদের উৎকর্ষে বস্তুর সকল অবস্থার মাপের মধ্যে চিরন্তন কালের সংস্থা অবিচ্ছিন্ন হইয়া দাঁড়াইল। বিশ্বজগৎ এক বিচিত্র রূপ ধারণ করিল। নিউটনের ত্রিমাত্রিক কল্পনা, ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রয়োজন শেষ হইল। আইষ্টাইনের নিপুণ ছাঁচে বিশ্বের রূপ চতুর্মাত্রিক। নিউটনের ধারণা ছিল, বস্তুমাত্রই স্থিতিপ্রবণ (inertia of rest); আইনষ্টাইন প্রচার করিলেন, বস্তুমাত্রই গতিপ্রবণ। বিশ্বে স্থির বস্তুর স্থান নাই। বিশ্বের প্রতিটি বস্তু ছুটিয়া চলিয়াছে অনন্তের দিকে—সারা বিশ্বের আয়তন আজ বাড়িয়া চলিয়াছে। নিউটনের নিকট বিশ্বের রূপ ছিল সীমাবদ্ধ, আইনষ্টাইন দেখাইলেন "সীমার মাঝে অসীম তুমি।" যে বস্তুটি আপাত স্থির হইয়া রহিয়াছে তাহা কাল—অক্ষের সমান্তরাল সমবেগে ছুটিয়া চলিতেছে—যে বস্তুটি আপাত সমবেগোদ্ভূত তাহা স্থান-কাল-পটে বক্র রেখায় চলিতেছে আর যে বস্তুটির আপাত ত্বরণ বিদ্যমান তাহা দেশ-কালের আবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরিতেছে।

বস্তুর ভর ও দৈর্ঘ্য জানা সত্ত্বেও কালের সাহায্য ব্যতিরেকে উহার সম্যক্ পরিচয় দেওয়া যায় না। কোন স্থির বা গতিশীল বস্তুর অবস্থা নির্দ্দেশ করিতে হইলে কালের অবতারণা করিতে হয়। যে বস্তুটি পরীক্ষাধীন সময়ে অপর একটি স্থির বস্তুর তুলনায় স্থান পরিবর্ত্তন করে না তাহা উক্ত সময়ের জন্য স্থির বস্তু, যদি স্থান পরিবর্ত্তন করে তবে বস্তুটি গতিশীল বলিতে হইবে। সে কারণ বস্তুর অবস্থার পরিচয় দিতে হইলে কালের নির্দ্দেশ করিতে হয়। সূর্য্যের চারিদিকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে পৃথিবীর যে সময় লাগে তাহা লক্ষ্য করিয়া সময়ের মাপ স্থির করা হইয়াছে—ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড; এবং ইহার সাহায্যে ঘটনাকালের স্থায়িত্ব, দুই ঘটনাকালীন ব্যবধান এবং দুই ঘটনার অগ্র-পশ্চাৎ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। চিরন্তন কালপ্রবাহ অনাদিপ্রসূত ও অনন্তপ্রবাহী—(জলস্রোতের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে)। এই প্রবাহের মধ্যেই দুইটি ঘটনার স্থায়িত্ব বা কালের ব্যবধান, বুদ্বুদের স্থায়ী কালের মত চিরন্তন কালপ্রবাহের এক খণ্ড হিসাবে নিরূপিত হইতে পারে—ইহাই সময়ের চরম মান (absolute time)। বিশ্বের সকল বস্তুই এই কালস্রোতের একটি মুহূর্ত্তে সৃষ্ট হইয়াছে এবং অপর একটি মুহূর্ত্তে এই কালস্রোতে জলবুদ্বুদের ন্যায় লীন হইবে। এই কালস্রোত সর্ব্বদিকপ্রসারী, সমগ্র বিশ্বব্যাপী।

আইনষ্টাইন কাল সম্পর্কে চিন্তাধারার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটাইলেন। উক্ত ধারণায় কালের মাপ নির্ভুল পাওয়া যায় না ইহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য। এই কালস্রোত সমগ্র বিশ্বকে আবেষ্টন করিয়া আছে ইহা অস্বীকার করা যায় না বটে, কিন্তু তিনি বলিলেন—বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুর নিজস্ব স্বতন্ত্র এক একটি জগৎ আছে এবং সেই জগতে সে বস্তুটি নিজস্ব কালস্রোতে নিমজ্জিত। সার্ব্বজনীন কালস্রোত হইতে নিজস্ব কালস্রোত পৃথক। সে কারণ দুইটি ঘটনার মধ্যস্থিত কালের ব্যবধান বা ঘটনার অগ্র-পশ্চাৎ সকল ক্ষেত্রে সমান নয়। মিনকাউস্কি উক্ত মতবাদ সমর্থন করিলেন। প্রত্যেক বস্তুর নিজস্ব জগৎকে চিরন্তন দেশ কাল (space time continuum) বা 'মিনকাউস্কি জগৎ' (Minkowski World) বলা হয়। সার্ব্বজনীন কালস্রোতের মাপে দুইটি ঘটনা সমসাময়িক বা যুগপৎ হওয়া সত্ত্বেও চিরন্তন দেশকালপটে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য থাকিতে পারে; ফলে ইহাই অনুমিত হয় যে, বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন কালসম্পন্ন হইয়া থাকে। যে দুইটি ঘটনা একই স্থলে যুগপৎ ঘটিতেছে তাহা ভিন্ন স্থল হইতে নজর করিলে তাহাদের মধ্যে কালের পার্থক্য লক্ষিত হইবে। দেশভেদে কাল ভিন্ন—ইহাই এক মাত্র কারণ।

নক্ষত্রের আলোক সোজা পথে পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছায়, আলোকরশ্মি সরল রেখায় পথ অতিক্রম করে ইহাই ছিল পূর্ব্বের ধারণা। ১৯১৯ সনের ২৯শে মে যে পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ হইল তাহাতে পূর্ব্বেকার ধারণা ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রমাণিত হইল। নক্ষত্র হইতে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি সরল রেখায় পথ অতিক্রম না করিয়া সূর্য্যের চারিপাশে পথবিকৃতি বা পথবিক্ষেপের নির্দ্দেশ দিল। তদানীন্তন বিজ্ঞানসম্মত কোন ব্যাখ্যাই পাওয়া গেল না। আইনষ্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বে ইহার সদুত্তর পাওয়া গেল।

আজ অতীতকালীন চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সে যুগের দেশ, কাল, ভর-এর ধারণা আজ বদলাইয়াছে। নিউটনের 'দেশে'র অস্তিত্ব কালকে পৃথক করিয়া, দেশ কালনিরপেক্ষ এবং কালদেশনিরপেক্ষ সত্তা। আজ এই দুই সত্তা পৃথক নয়; শুদ্ধ দেশ বা শুদ্ধ কাল দুইই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ সংস্থা। দেশ কাল মিলিতরূপ, সংযুক্ত সংস্থা। আজ বস্তু ও শক্তি ভিন্ন শ্রেণীর সত্তা নয়, ইহাদের মধ্যে মূলগত কোন পার্থক্য নাই। পদার্থনিহিত শক্তির পরিমাণ প্রচণ্ড। ক্ষুদ্র সমীকরণ সাহায্যে প্রকাশ পায় E=mc

E=শক্তি, m=পদার্থের ভর, c=আলোকের বেগ। ইহা প্রতীয়মান হয় যে, অতিক্ষুদ্র ভরসম্পন্ন পদার্থ অতি প্রচণ্ড শক্তির আধার। ইহাই এটম বোমার মূলসূত্র, বস্তু আর শক্তির সমষ্টি, কেবল রূপভেদ মাত্র। একটি বস্তুর ভর ধ্রুবক নয়। অবস্থাভেদে ভরের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। কোন বস্তুর অবস্থার মাপ বা দুই ঘটনার কালান্তর নিত্যবস্তু নয় উহা পরীক্ষকের আপেক্ষিক গতির উপর নির্ভর করে। একটি যষ্টির দৈর্ঘ্য ক্ষেত্রভেদে ভিন্ন হওয়া আশ্চর্য্য নয়। সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি নির্ভুল কালের নির্দ্দেশ দেওয়া অসম্ভব। বিশ্বে স্থির পদার্থের স্থান নাই। বস্তুর ভর, দৈর্ঘ্য ও দুই ঘটনার কালান্তর আমরা চরম সত্য অবস্থায় মাপিতে পারি না, সুতরাং বস্তুর বর্ত্তমান অবস্থা যাহা আমরা উপলব্ধি করিতেছি তাহা সম্পূর্ণ সত্য নয়। বস্তুর বর্ত্তমান অবস্থা উপলব্ধি করিয়া উহার ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্পর্কে নির্ভুল নির্দ্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা যাহা কিছু লক্ষ্য করি বা উপলব্ধি করি তাহা তুলনামূলক—আপেক্ষিক সত্য। ইহাই আপেক্ষিক তত্ত্বের মূলকথা।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জ্ঞানের পরিধি প্রসার-লাভ করিতেছে সত্য, কিন্তু জীবনদর্শন ও প্রকৃতির রহস্য তাহার নিকট জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। আলোর সন্ধানে ছুটিয়া অন্ধকার হইতে আরও অন্ধকারে যখন মানুষ ছুটিয়া চলিয়াছে—রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া যখন সে অধিক রহস্যের মধ্যে নিমজ্জিত হইতেছে তখন এই পথনির্দ্দেশকারী, অন্তর্দ্রষ্টা বিজ্ঞানীকে সে হারাইল।

শ্যামাপ্রসাদ

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বিপ্লবিনী বাংলা-বুকে জন্মেছিল অগ্নিপুরুষ
শ্যামাপ্রসাদ এই ভারতের শ্রেষ্ঠ বীর,
দর্প এবং পাশব বলের রক্ত চোখের ধমকানিতে
হয় নি নত কখনো তার উচ্চ শির।
পৌরুষেরি মহা প্রতীক নরের নরসিংহ সে যে—
হুঙ্কারে তার শয়তানেরা কম্পমান,
সাম্প্রদায়িক হিংসাবিষের ভণ্ডবেশী বর্ব্বরতার
শ্যামাপ্রসাদ স্বয়ং ছিল মৃত্যুবাণ।
সভ্যতারি ঘাতক যারা গুপ্ত হয়ে থাক্‌ত তারা
স্তব্ধ হয়ে তাহার ডরে গর্ত্তেতে,
এ বীর কখন সুপ্ত হবে, কখন ইহার মৃত্যু হবে
নিত্য তারা জপতো ইহাই মর্ত্তেতে।
প্রতিজ্ঞা তার যাদুর মত রাত্রিকে সে করতো দিন
ইচ্ছা তাহার ঝঞ্ঝাবাতের ঘোড়সোয়ার,
চক্ষুতে তার বন্দী তড়িৎ অঙ্গুলিতে বজ্রপরশ
বক্ষ তাহার লক্ষ গানের সুর-বাহার।
সর্ত্তে ঘেরা আইন রচা চুক্তিবাঁধা চলার পথের—
মুক্তিকে সে ভাঙতো কঠোর ধাক্কাতে,
সর্পসম বিষাক্ত খল মানববেশী সরীসৃপ
কেঁচোর মত থাক্‌ত তাহার সাক্ষাতে।
আর্য্য মহা সভ্যতারি গৌরবেরি রক্ষাতে সে
পান করিল বঙ্গছেদের সর্ব্ব বিষ,
বাস্তুহারার অস্তি লাগি হয় নি কভু স্বস্তি তাহার
জ্বল্‌তো আগুন চিত্তে যে তার অহর্নিশ।
সেই আগুনে রাত্রিদিবা দগ্ধ হয়ে মুক্তিব্রতে
চাকরি নিয়ে মনুকে বলে—দিল্লী চল্‌।
দুঃখেরি এই অগ্নি খবর সবাই জানে—মন্ত্রীগিরির
কেমন করে ভাঙলো সে যে পাপ-শিকল।

এক নিমেষে দিল্লী থেকে স্বপ্ন তাহার ছিন্ন করি
ঊর্দ্ধ শিরে মুক্ত করি আত্মমান,
বাংলা-মায়ের বক্ষে ফিরে' মৃত্যুপণে হস্তে নিল
জাতির লাগি যুদ্ধ করার লাল নিশান্‌।
জম্বু থেকে বন্দনাতে কন্যাকুমারিকার তলে
সর্ব্ব ভারত গাইল তাহার জিন্দাবাদ,
স্বর্গাদপি জন্মভূমির সূর্য্যসম ভর্গ-তনয়
কাশ্মীরে সে ছাড়লো গিয়ে সিংহনাদ।
কাশ্মীরে তার ঢুকতে মানা অন্যায়ের এই ভাঙতে আইন
বিপ্লবী বীর করল ইহাই মৃত্যুপণ,
"কাশ্মীর ইহা ভারত কিনা ? তাহার চরম মীমাংসা আজ
আমার প্রবেশ রাখবে তারি' নিদর্শন।"
নির্ঘোষ এই বজ্রবাণী, রুদ্রগতি অগ্নিপুরুষ
ঢুকলো গিয়ে কাশ্মীরেতে উচ্চশির,
অন্যায়েরি দর্প-আইন ভঙ্গ করি সিংহ-মানব।
বন্দী হ'ল গৌরবেতে হিমাদ্রির।
তাহার পরে ঘটলো যাহা—কলঙ্কিত তার খবর
সর্ব্ব মানব সভ্যতা আজ মুখ ঢাকো,
রুদ্র ধাতার রুদ্র হাতে হবেই হবে এর বিচার—
ভারতবাসী তাঁর পায়ে এর ডাক্‌ ডাকো।
স্বয়ং ন্যায়ের দণ্ডী যিনি অমোঘ তাঁরি বিধান ছাড়া
অন্যায়ের এই করবে বিচার কোন্‌ জনা ?
বৃদ্ধা মায়ের বুকের মানিক ফিরলো না আর মায় কোলে
বাংলা-মায়ের পড়ল বুকে ঝঞ্ঝনা।
অর্ঘ্য লহ সিংহ-মানব, বক্ষেরি মোর তর্পণেতে
ব্যাপ্ত তুমি আকাশ-বাতাস মাঠ-বনে,
জ্যোতির মত জীবন-পথে থাক্‌বে জেগে মোদের মাঝে
জাতির মনের বিপ্লবেরি সাইক্লোনে।

ভারতে ভাগ্যান্বেষী বৈদেশিক সৈনিক

অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মেজর হিয়ার্সে

ষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেনাবিভাগে লেফটেনাণ্ট কর্নেল এণ্ড্রু
ড্রুসন হিয়ার্সে নামক একজন সৈনিক পুরুষ ছিলেন।
লাহাবাদ দুর্গের কিল্লাদার থাকাকালে অশ্ব হইতে পতন-ফলে
০ই জুলাই ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দেহান্ত হইয়াছিল। এলাহাবাদ
গরের কীডগঞ্জ অঞ্চলে এক খ্রীষ্টীয় সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার কবর
বস্থিত।* মেজর হায়দর ইয়ং হিয়ার্সে ইঁহার এক মুসলমানী
রক্ষিতার গর্ভজাত পুত্র। কিন্তু সে সকল লজ্জাকর প্রসঙ্গের কোন
উল্লেখ না করিয়া হিয়ার্সের বংশের ইতিবৃত্ত-লেখক মেজর পিয়ার্স
হায়দরকে সংক্ষেপে 'কর্নেল হিয়ার্সের একজন নিকট আত্মীয়' বলিয়া
উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন এবং ইংরেজদের চিরশত্রু মহিশুরের
হায়দর আলির সহিত এক জন ইংরেজের নামসাদৃশ্য কেমনে সম্ভব
হইল সে সম্বন্ধে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন।

"Hyder Hearsey, a near relation of Lieutenabt-Colonel Andrew Hearsey, was born in India in the year 782, and, by a strange fancy, was given the name of Hyder of Mysore, the arch-enemy of England. His second name was believed to have been originally Jung," which, combined with Hyder, was a truly warlike designation, but he subsequently anglicised it into Young.

"After being educated at Woolwhich, Hyder Hearsey, through the influence of his guardian, Colonel Andrew Hearsey, was in 1798 appointed aid-de-camp to Saddut Ali Khan, the Nawab-Wazir of Oudh."†

দেখা যায়, ইহার মধ্যে অনেকগুলি অযথার্থ কথা স্থান পাইয়াছে।
হায়দর জঙ্গ যে কর্নেল হিয়ার্সের নিকটতম আত্মীয় ছিলেন সে
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু সম্বন্ধটা এতই অপ্রীতিকর যে তাহা
চাপিতে ঐতিহাসিকের বাধিয়াছে। সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাসে
খ্যাতনামা লেফটেনাণ্ট-জেনারেল সার জন বেনেট হিয়ার্সে, কে.সি.
বি., ছিলেন এণ্ড্রু হিয়ার্সের বিবাহিতা ইংরেজ-পত্নীর গর্ভজাত
পুত্র। তিনি বিবাহ করেন হায়দরের কন্যা চার্লোটকে, অর্থাৎ
সম্পর্কে নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রীকে। এই সকল লজ্জাকর প্রসঙ্গ চাপা
দিবার জন্য হায়দর জঙ্গের প্রকৃত পরিচয় গোপনের এত প্রয়াস।
হায়দর জঙ্গ নামকরণ তদীয় মুসলমান জননী করিয়াছিলেন।
মহিশুরাধিপতির নামের সহিত এ ব্যাপারের কোন সংস্রব ছিল না।
মুসলমান সমাজে হায়দর অতি সাধারণ নাম। হায়দরের তিনটি
সোদরা ভগ্নী ছিল। কোম্পানীর সেনাবিভাগের জেনারেল সার্
উইলিয়ম রিচার্ডস, মেজর জন ক্লার্কসন এবং মেজর আর্থার
আওবেনের সহিত তাহাদের যথাক্রমে বিবাহ হয়।

উলউইচের সামরিক কলেজে হায়দরের শিক্ষালাভের কথাটাও
সর্ব্বৈব মিথ্যা। দেশীয়া রমণীর গর্ভজাত পুত্রের শিক্ষার জন্য ইংরেজ
পিতা এত ব্যস্ত হইতেন না, হইলেও বর্ণসঙ্কর মেটে-ফিরিঙ্গির পক্ষে
উক্ত প্রতিষ্ঠানে অথবা ইংলণ্ডের রাজকীয় বা কোম্পানীর বাহিনীতে
প্রবেশলাভও সম্ভবপর ছিল না। সেইজন্য তখনকার দিনে সমাবস্থ
আরও অনেকের মত হায়দরকেও দেশীয় দরবারে ভাগ্যান্বেষণে
যাইতে হইয়াছিল। এখানে তাহার আর বেশী দিন থাকা হয়
নাই। পর বৎসর উহাকে 'ক্যাডেট' বা শিক্ষানবীশ অফিসররূপে
জেনারেল পেরর সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইতে দেখা যায়। কর্নেল
পিয়ার্স বলিয়াছেন, হায়দরের ফরাসী ভাষায় উত্তম ব্যুৎপত্তি ছিল
এবং পেরঁ তাঁহাকে স্বীয় এডিকং পদ প্রদান করিয়াছিলেন ও প্রথম
তাঁহার সহিত সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ, এমনকি উদারতার সহিতই ব্যবহার
করিতেন। ফরাসী ভাষাজ্ঞানের কথাটা ঠিক বিশ্বাসের যোগ্য না
হইলেও অন্য কথাগুলি সত্য হইতেও পারে। পেরঁ সিন্ধিয়ার
প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইবার পর মহারাজের ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী
বল্লভ তান্তিয়ার পক্ষীয়গণের হস্ত হইতে তাঁহাকে বাহুবলে দিল্লী
এবং আগ্রার দুর্গদ্বয় অধিকার করিতে হইয়াছিল। সে কথা ইতি-
পূর্ব্বে উক্ত জেনারেল প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। আগ্রার যুদ্ধে বালক
হিয়ার্সের সাহস ও কৃতিত্বে প্রীত হইয়া পেরঁ তাহাকে "এনসাইন"
বা নিম্নতন অফিসরের পদ দিয়াছিলেন। ইহার কয়েক মাস
পরে হায়দর লেফটেনাণ্ট পদে উন্নীত ও আগ্রার সহকারী কিল্লাদার
নিযুক্ত হইলেন। তখনও তাঁহার বয়স সপ্তদশ বৎসর অতিক্রম
করে নাই।

ইহার পর পেরঁ হায়দরকে তাঁহার বাহিনীর ডেপুটি-কোয়ার্টার-
মাষ্টার জেনারেল পদ প্রদান করেন। প্রথমে তিনি হিয়ার্সে এবং
অপরাপর ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত সৈনিকগণের সহিত অপক্ষপাতপূর্ণ
ব্যবহার করিতেন, পরে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতে তাঁহার
আচরণে সর্ব্বপ্রথম একটা বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। ইংরেজ
লেখকগণ বলেন, এই সময় হইতেই পেরঁ ভারতবর্ষ হইতে
ইংরেজদিগকে বিতাড়ন এবং এদেশে ফরাসী প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা-
কল্পে চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেইজন্যই স্বভাবতঃ নিজ
বাহিনীতে ব্রিটিশ অফিসারের পরিবর্ত্তে ফরাসী অফিসরের সংখ্যা
বৃদ্ধি করা তাঁহার প্রাথমিক কার্য্য হইয়াছিল। ক্রমে সকল উচ্চ
এবং দায়িত্বপূর্ণ পদগুলিই ফরাসীদের অধিকৃত হইয়া গেল। ইহাতে
অপর পক্ষের বিরাগ জন্মানো খুবই স্বাভাবিক। এতদিন পর্য্যন্ত
পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমে (seniority) ও যোগ্যতানুসারে পদোন্নতি

* Furher ;—*List of Christian Tombs and Monuments and their Inscriptions in the N.W.P. and Oudh*, No. 5, p. 121.

† Col, Hugh Pearse ;—*The Hearseys.* p. 38.

হইত। এক্ষণে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখিয়া ইংরেজ এবং এংলো-ইণ্ডিয়ান যে সকল সৈনিকপুরুষ এযাবৎ পরম বিশ্বস্ততার সহিত ব্রিগেডের সেবা করিয়া আসিতেছিল এবং বহু যুদ্ধে নিজেদের শোণিতপাতে যশোলাভ ও প্রভুকার্য্যে পশ্চাদ্‌পদ হয় নাই, তাহাদের মনে ক্ষোভ এবং বিরাগের সঞ্চার হইয়াছিল। পেরর স্বজাতিপ্রীতিতে বিরক্ত হইয়া যাঁহারা এই সময় ভাগ্যলক্ষ্মীর অনুসন্ধানে অন্যত্র গমন করেন তন্মধ্যে কাপ্তেন হায়দর হিয়ার্সে এবং কাপ্তেন জন হপ্‌কিন্স অন্যতম। সুহৃদ্‌দ্বয় অতঃপর হান্সির রাজা জর্জ্জ টমাসের কর্ম্মে প্রবিষ্ট হন।

নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাকে বেশী দিন থাকিতে হয় নাই। অচিরেই পেররর সহিত টমাসের যুদ্ধ বাধিল। সে যুদ্ধে টমাসের পতন হইল, হপকিন্স প্রাণ হারাইলেন এবং হিয়ার্সেকে ভাগ্যান্বেষণের নূতন পন্থার সন্ধান করিতে যাইতে হইল। ব্যক্তিগত ভাবে যথোচিত বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দিলেও হায়দর কোন সামরিক কৌশলপূর্ণ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই, বরং জর্জ্জগড়ের যুদ্ধের পর (২৯।৯।১৮০১) যখন পানোন্মত্ত টমাস তাঁহার শিবিরে পক্ষকাল নিষ্ক্রিয় হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন এবং হিয়ার্সের স্কন্ধে তখনকার সমস্ত দায়িত্বভারই ন্যস্ত হইয়াছিল, সেই সময় জর্জ্জগড় পরিত্যাগ করিয়া সুরক্ষিত হান্সিদুর্গে তাঁহার আশ্রয় লইতে না যাওয়াই টমাসের অধঃপতনের অন্যতম কারণ বলিয়া ঐতিহাসিকগণ বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। কম্‌টন ইহা হায়দরের বুদ্ধির ভুল বা 'error of judgment' বলিয়া মনে করেন।* কিন্তু এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, হায়দর এ সময় উনবিংশ বর্ষীয় যুবকমাত্র এবং সমরনীতি সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই তিনি এযাবৎ অর্জ্জন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই। পতনোন্মুখ জর্জ্জগড় পরিত্যাগ করিয়া টমাস যখন অবরোধকারী শত্রুব্যূহ ভেদপূর্ব্বক দীর্ঘ ষাট ক্রোশ পথ একাদিক্রমে অশ্বপৃষ্ঠে অতিক্রম করিয়া হান্সিতে পলায়ন করিলেন, তখন সেই ভয়ঙ্কর নৈশ অভিযানে হিয়ার্সে প্রভুর সহচর ছিলেন। হান্সির যুদ্ধেও হায়দর যথেষ্ট সাহস এবং বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। শত্রুসৈন্য আসিয়া হান্সি অবরোধে প্রবৃত্ত হইলে টমাস তাহাদের বাধাদানের উদ্দেশ্যে স্বীয় সৈন্যদল তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া এক দলের পরিচালনা-ভার হিয়ার্সেকে দেন। আত্ম-সমর্পণের পর শত্রুশিবিরে পানোন্মত্ত টমাসের উচ্ছৃঙ্খলতা প্রশমনেও হিয়ার্সে যথেষ্ট সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

অতঃপর জীবিকানির্ব্বাহের জন্য চিন্তিত হায়দরকে জয়পুর ও যোধপুরের অধিপতিদের বাহিনীতে প্রবেশলাভে সচেষ্ট দেখা যায়; কিন্তু পেররর বিরাগ-আশঙ্কায় উহাদের কেহই তাঁহাকে সৈন্যদলে লইতে সাহসী হইলেন না। তখন হিয়ার্সে টমাসের জীবনী হইতে অধীত বিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত অর্থাৎ কতকগুলি সশস্ত্র অনুচর সংগ্রহ করিয়া অর্থবিনিময়ে অস্ত্রব্যবসায়ী বা ভাড়াটিয়া গুণ্ডায় পরিণত হইলেন। দিল্লীর দক্ষিণে উষর মেবাত প্রদেশ তাঁহার কর্ম্ম-ক্ষেত্র হইল।

মরাঠাদিগের সহিত সমর আসন্ন হইলে (১৮০৩ খ্রীঃ) গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির ঘোষণাপত্র অনুসারে যে-সকল ব্রিটিশ সৈনিক দেশীয় বাহিনী হইতে কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ইংরেজ সরকারে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদের নামের তালিকামধ্যে হিয়ার্সেরও নাম দেখা যায়। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মাসিক ৮০০্ টাকা বেতন দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি এতটা অনুগ্রহের কারণ কিন্তু বুঝিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ সেই সময়ে তিনি মরাঠাবাহিনী-ভুক্তও ছিলেন না, অর্থাৎ—তাঁহার কর্ত্তব্য-পালনে পরাঙ্মুখতার ফলে ইংরেজ সরকারের কোন বড় রকম সামরিক লাভের কোনই সম্ভাবনা ছিল না। মেবাত প্রদেশে হায়দরের যেরূপ প্রতিষ্ঠালাভ হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত সামরিক সাহায্য সাতিশয় মূল্যবান হইবে, এইরূপ আশা করিয়াই কর্ত্তৃপক্ষ যে তাঁর প্রতি এতাদৃশ দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন ইহা সহজে অনুমেয়। এ সময় হায়দরের বয়স একুশ বৎসর মাত্র।

ইংরেজ সেনার যুদ্ধযাত্রার প্রায় সমসময়েই হিয়ার্সে রাজপুতানায় একটি মরাঠাদুর্গ আক্রমণ করিয়া তাঁহার পক্ষ হইতে যুদ্ধ বাধাই-লেন। কিন্তু তাঁহার চিরসহচর ব্যর্থতা এখানেও তাঁর সহগামী হইল। যুদ্ধের প্রারম্ভেই তিনি মস্তকে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার সিপাহীগণ অধিনায়কের পতনে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। লাটবাহাদুরের আদেশপত্রানুসারে হিয়ার্সে অতঃপর শুধু এক রেজিমেণ্ট ইরেগুলার বা অনিয়মিত অশ্বারোহী মাত্র রাখিয়া সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দিলেন। লর্ড লেকের বাহিনীর সহিত উহারা আগ্রা অধিকার, দিল্লী পুনরুদ্ধার এবং লাসওয়ারীর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার পর হায়দরকে বেরিলি অঞ্চলে শান্তিপ্রতিষ্ঠা-কার্যে নিযুক্ত দেখা যায়। এ কার্য্য তাঁর পক্ষে খুব সহজসাধ্য হয় নাই, ইহা বলা বাহুল্য, তবে করেলির যুদ্ধে দুর্দ্দান্ত রোহিলা পাঠানেরা তাঁহার হস্তে সম্পূর্ণরূপে পর্য্যুদস্ত হইয়াছিল। তথাপি এতদঞ্চলে পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠা ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষের পূর্ব্বে সম্ভবপর হয় নাই। উত্তর-কালে তাঁহার বিজয়লাভের ক্ষেত্র ঐ করেলির সন্নিকটেই তিনি একটি বিস্তীর্ণ জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন। উহা তাঁহার বংশীয়গণের অধিকারে আজিও বর্ত্তমান আছে।

ইহারই কাছাকাছি কোন এক সময়ে হিয়ার্সে এক মুসলমানী নবাবজাদীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজ্যচ্যুত ক্যাম্বের নবাব তখন দিল্লীতে নাম-সর্ব্বস্ব মোগল বাদশাহের আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার কন্যা দুইটিকে সম্রাট ধর্ম্মকন্যারূপে গ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠাটির ইতিপূর্ব্বেই কর্নেল উইলিয়ম লিনিয়স গার্ডনারের সহিত বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। নবাব তখনও অবশ্য মসনদভ্রষ্ট হন নাই। বেগম হিয়ার্সের নাম ছিল—'নবাবসাহ জুহুর উন্নিসা বেগম দেহলমে খানুম'। বলা বাহুল্য, গার্ডনার এবং হিয়ার্সে উভয়ের বিবাহই আইনতঃ বৈধ ও সিদ্ধ ছিল এবং উভয়েই বিবাহিত জীব

* *European Military Adventurers*, p. 362.

...ত হইয়াছিলেন। উভয়েই মরাঠা-সমরে কৃতিত্বের জন্য ...কারের নিকট হইতে বিস্তীর্ণ জায়গীর লাভ করেন। খাসগঞ্জে ...ডনার এবং বেরেলিতে হিয়ার্সে অতঃপর নিজ নিজ বেগমসহ নব-...ব্ধ জায়গীরে বাস আরম্ভ করিলেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে, ...খনকার দিনে ভারতবর্ষে ইংরেজদিগের ভূ-সম্পত্তি লাভে কর্তৃপক্ষের ...নুমোদন ছিল না। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম এ বিষয়ের প্রতি-...ন্ধক আইন বিদূরিত হইল। তংসত্ত্বেও যে কোম্পানী এই দুই ...পূর্ব্ব ভাগ্যান্বেষী সৈনিককে জায়গীর দিয়াছিলেন তাহার একমাত্র ...রণ ইহাদের দেশীয়া স্ত্রী বিবাহ এবং ইউরোপে প্রত্যাবর্ত্তনে ...নিচ্ছা। অবশ্য হায়দরের পক্ষে ইংলণ্ড তাঁহার স্বদেশও ছিল না।

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে হিয়ার্সেকে আবার ইংরেজ সরকারের কর্ম্মে ...রত দেখা যায়। নবার্জ্জিত রাজ্য সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানলাভের জন্য ...র্ণমেণ্ট সার্ভে কার্য্য আরম্ভ করেন। গঙ্গানদীর প্রবাহ সম্বন্ধে ...খন সঠিক কোন ধারণাই ছিল না। প্রচলিত এক মতে গাড়োয়াল ...দেশে অবস্থিত গঙ্গোত্রীই গঙ্গার উৎপত্তিস্থল। পক্ষান্তরে আর ...ক মত প্রচলিত ছিল যে, গঙ্গা আসলে তিব্বতের মানসরোবর ...ইতে উৎপন্ন হইয়া হিমালয় পর্ব্বতের অধোদেশস্থ এক ভূগর্ভস্থিত ...ড়ঙ্গ-পথে প্রবাহিত হইয়া গঙ্গোত্রীতে শুধু লোকলোচনের সম্মুখস্থ ...ইয়াছেন, অর্থাৎ এই মতে গঙ্গোত্রী ঐ সুড়ঙ্গপথের মুখ বলিয়া ...বেচিত হইত। এ বিষয়ে সত্যনির্দ্ধারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট ১৮০৮ ...ষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এক অভিযাত্রী দল পাঠান। হায়দর এই দলে ...লেন। অভিযানকারীরা বেরিলি হইতে যাত্রা করিয়া গাড়ো-...লের অন্তর্ব্বর্ত্তী হরিদ্বার, দেবপ্রয়াগ, শ্রীনগর, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ, ...শীমঠ, বদ্রিনাথ প্রভৃতি গঙ্গার মূলপ্রবাহ পথে অবস্থিত হিন্দুর পরিচিত তীর্থস্থানসমূহ পরিদর্শন করেন। ইঁহাদের কৃত জরীপ হই-...তই প্রথম অভ্রান্তরূপে প্রতিপন্ন হইল যে, গঙ্গোত্রীই গঙ্গা নদীর ...ধান উৎপত্তিস্থল—হিমালয়ের অপর পারে মানসরোবরে নহে। ...খানে বলিয়া রাখা ভাল যে, তখনও নেপালের সহিত ইংরেজ-...গের সমর বাধে নাই, তখনও গাড়োয়াল গুর্খা সরকারের অধীনস্থ ...ল। অজ্ঞাতপরিচয় 'উত্তরাখণ্ডে' হিয়ার্সের দলই প্রথম পদার্পণ-...রী ইউরোপীয়। গাড়োয়াল প্রদেশের গুর্খা-গবর্ণর হস্তিদল ...চৌতুরিয়ার সহিত হিয়ার্সের সবিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহার আনুকূল্য ...তিরেকে ঐ সমস্ত বৈদেশিক আগন্তুকের উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হইতে ...রিত না সে কথা বলাই বাহুল্য মাত্র। কথিত আছে, একদিন ...ক বন্য ভল্লুকের আক্রমণ হইতে হিয়ার্সে চৌতুরিয়ার প্রাণ রক্ষা ...রেন এবং ইহারই ফলে উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় সম্প্রীতির সঞ্চার হয় ...-উত্তরকালে চৌতুরিয়াও নাকি হিয়ার্সেকৃত উপকারের যথোচিত ...তিদান দিয়াছিলেন।

সীমান্ত প্রদেশে অশান্তি ও গোলযোগ প্রায়শঃ লাগিয়া থাকে। ...রাও অনেক সময় নিজেদের অধিকার ছাড়াইয়া পার্শ্ববর্ত্তী ...ম্পানীর অথবা তাঁহাদের আশ্রিত অযোধ্যাপতির জনপদ-মধ্যে ...সিয়া লুঠতরাজ প্রভৃতি উপদ্রব করিত। কিছুকাল পরে অনুরূপ ব্যাপার হইতেই নেপাল-সমরের সমুদ্ভব হইয়াছিল। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে গুর্খারা তরাই অঞ্চলের কিয়দংশ অধিকার করিলে গবর্ণমেণ্ট হিয়ার্সের উপর উহাদিগকে বিতাড়িত করিবার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ইহার জন্য যথাপ্রয়োজন সৈনিকসংগ্রহ এবং তাহাদের শিক্ষা-বিধানের ব্যবস্থাও তাঁহাকেই করিতে হয়। এই আদিষ্ট কার্য্য হিয়ার্সে সুচারু ভাবেই সম্পন্ন করেন। গুর্খারা তাঁহার হস্তে উপর্য্যুপরি তিনটি খণ্ডযুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিজেদের দেশে পলায়ন করে। হিয়ার্সে কর্ত্তৃক বিজিত জনপদ এবং কানপুরের সমীপবর্ত্তী হাণ্ডিয়া পরগনা কোম্পানী অযোধ্যাধিপতিকে এক কোটি টাকা মূল্য-বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া দেন।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে গুর্খারা গাড়োয়াল রাজ্য জয় করে। রাজ্যভ্রষ্ট নৃপতি প্রদ্যুম্ন সাহ পর বৎসর বিনষ্ট মুকুট উদ্ধারের চেষ্টায় ব্যাপৃত হইয়া প্রাণ হারাইলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী সুদর্শন সাহ সিংহাসনের সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বেরিলিতে ইংরেজ অধিকারে পলাইয়া আসিয়া নিতান্ত দৈন্যদশায় দিনাতিপাত করিতে-ছিলেন। ক্রমে তাঁহার অবস্থা এতই শোচনীয় হইয়া উঠিল যে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিয়ার্সের নিকট নগদ ৩০০৫৲ টাকা মূল্য লইয়া তাঁহাকে গাড়োয়াল রাজ্যের অন্তর্গত চাঁদি এবং দুন এই দুইটি পরগনা বিক্রয় করিয়া দেন। যথারীতি আইনসম্মত ভাবে বিক্রয় কোবালা সম্পাদিত হইলেও* বিক্রেতার পক্ষে ক্রেতাকে অধিকার দান সম্ভব ছিল না, কারণ পরগনা দুইটি তখন গুর্খাদের অধিকারভুক্ত। হিয়ার্সে কি ভাবিয়া এই অদ্ভুত রাজ্য ক্রয় করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারা কঠিন। নেপাল দরবারের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলাই এই সময় ছিল ভারত গবর্ণমেণ্টের রাষ্ট্র-নীতি। তাহাদের নিকট হইতে সাহায্যপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা ছিল না। হিয়ার্সে কি আশা করিয়াছিলেন যে, তিনি একাই ঐ জনপদটি গুর্খাদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারিবেন। তরাই অঞ্চলে লুঠপাটকারী দলকে বিতাড়ন এবং নেপাল সরকারের কবল হইতে রাজ্যজয় এই দুইটি যে এক বস্তু নহে, এ কথা কি তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই? সম্ভবতঃ গুর্খাদের সামরিক শক্তি সম্বন্ধে হিয়ার্সে অতি হীন ধারণা পোষণ করিতেন। পরিণামে তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ ভাবেই বিপদে পতিত হইতে হইয়াছিল। যথাস্থানে সেকথা বলা হইবে।

পরবর্ত্তী ঘটনার উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইলেও হিয়ার্সে কৃত রাজ্য-ক্রয়ের পরিণতির কাহিনী এখানে বলা যাইতেছে। গুর্খা সমরের অবসানের পর ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট সুদর্শন সাহকে গাড়োয়াল রাজ্যের একাংশে অর্থাৎ অলকানন্দা নদীর পশ্চিম তটবর্ত্তী প্রদেশে পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। নদীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী জনপদ তাঁহারা স্বাধি-কারভুক্ত করিয়া লন। বর্ত্তমান গাড়োয়াল জেলা, চাঁদি এবং

* মূল দলিল হিয়ার্সের বর্ত্তমান বংশধরের নিকট আছে এবং কর্ণেল পিয়ার্সের গ্রন্থে উহার ইংরেজী অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

দেরাহুন পরগণা এই অংশে অবস্থিত। হিয়ার্সে তাঁহার এই জমিদারী ক্রয়ের কথা কর্তৃপক্ষের গোচরে আনিয়াছিলেন এবং ২৮শে অক্টোবর ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে এক কোবালা সম্পাদন করিয়া চাঁদি পরগনাটি ইংরেজ সরকারকে বিক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। অবশ্য, তৎপূর্ব্বে তাঁহারা বাহুবলে ঐ অঞ্চল শত্রুহস্ত হইতে অধিকার করিয়াছিলেন এবং সেগৌলি সন্ধিসর্ত্তানুসারে পরাজিত নেপাল দরবার উহার অধিকার তাঁহাদেরই উপর অর্পণ করিয়াছেন, তাহা হইলেও তাঁহারা হিয়ার্সের নিকট হইতে তাঁহার পূর্ব্বক্রীত জমিদারী মূল্য দিয়াই কিনিয়া লইলেন। মূল দলিল হিয়ার্সের বংশধরের নিকট আজিও রক্ষিত আছে। উহা হইতে জানা যায়, ১লা জানুয়ারী ১৮১২ তারিখ হইতে কোম্পানী তাঁহাদের অর্জ্জিত প্রদেশের জন্য হিয়ার্সেকে এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারিগণকে চিরস্থায়ী ভাবে বার্ষিক ১২০০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন। একশত চল্লিশ বর্ষের অধিককাল হিয়ার্সের-বংশ ভারত সরকারের নিকট হইতে এই টাকা নিয়মিত রূপে পাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু 'দেরা' পরগনা সম্বন্ধে হিয়ার্সের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত কোবালা মধ্যে একটি সর্ত্ত ছিল যে উক্ত পরগনাও যখন কোম্পানীর অধিকারে আসিবে, তখন তাহার অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলি তিনি কোম্পানীকে বিক্রয় করিয়া দিবেন। কিন্তু ঐগুলি আর ইংরেজ সরকার অর্থব্যয়ে কিনিতে সম্মত হন নাই। এ বিষয়ে হিয়ার্সে এবং তাঁহার বংশধরগণের সর্ব্ববিধ আবেদন-নিবেদন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। চাঁদি এবং দুন দুইটি পরগনাই তাঁহারা গুর্খাদের নিকট হইতে জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একটির সম্বন্ধে হায়দরের দাবি মানিয়া লইয়া তাহার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই অপরটির সম্বন্ধে অনুরূপ দাবি প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কর্নেল পীয়াস গবর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে চুক্তিভঙ্গের অপরাধে অপরাধী মনে করেন। তাঁহার গ্রন্থটি হিয়ার্সেবংশের সপক্ষে ওকালতী করিবার কতকটা উদ্দেশ্য লইয়া বিরচিত হইয়াছে বলিয়াই যেন মনে হয়।

অতঃপর আবার হায়দর হিয়ার্সের প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসা যাইতেছে। তাঁহার মনে এই সময় একটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মিয়াছিল যে, নেপালের সহিত ইংরেজের সমর অদূর ভবিষ্যতে অবশ্যম্ভাবী। ভারত সরকারের দপ্তরে রক্ষিত তাঁহার এই সময়কার লিখিত পত্রসমূহ হইতে জানা যায় যে, গুর্খাদিগকে নবার্জ্জিত জনপদসমূহ হইতে বিতাড়িত করিয়া পুনরায় তাহাদের আদিম পার্ব্বত্য অধিকারমধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখার একান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা হিয়ার্সে সুবিধা পাইলেই তাঁহাদের বুঝাইবার জন্য সবিশেষ প্রযত্ন করিতেছিলেন। হিয়ার্সে এই সময় বেরিলি নগরের অন্যতম 'সম্ভ্রান্ত ও ধনী রইসে' পরিণত হইয়াছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও হিমালয়ের অজ্ঞাতপ্রায় দুর্গম পার্ব্বত্যভূমি সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানলাভের জন্য তিনি ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ উইলিয়ম মুরক্রফটের নেতৃত্বে পরিচালিত এক অভিযানের সহগামী হইলেন। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে মুরক্রফট সর্ব্বপ্রথম এদেশে কোম্পানীর সামরিক অশ্বশালার তত্ত্বাবধায়কপদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। বিজ্ঞানের অনুশীলনে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, অজ্ঞাত দেশে নূতন নূতন ভৌগোলিক আবিষ্কার, মধ্য এসিয়াজাত তাতারীর অশ্বের সহিত রক্তমিশ্রণের ফলে এ দেশের অশ্বজাতির উন্নতিবিধান, অজ্ঞাতপ্রায় হিমালয় ও তিব্বতদেশস্থ উদ্ভিদাদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের চর্চায় তিনি একান্ত অনুরাগী ছিলেন।* হিয়ার্সের সাহস ও কৌশল, দেশীয় আচার-পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞান এবং বহুদূরবিস্তীর্ণ প্রভাবপ্রতিপত্তির জন্যই যে পর্য্যটকদ্বয়ের পক্ষে তখনকার দিনে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত পশ্চিম তিব্বতে নিরাপদে যাতায়াত সম্ভব হইয়াছিল তাহাতে কোনই সংশয় নাই।

রোহিলখণ্ডে ব্রিটিশ সীমানা অতিক্রম করিয়া বন্ধুদ্বয় গোঁসাই বা হিন্দুতীর্থযাত্রীর ছদ্মবেশে কুমায়ুন প্রদেশে ৯ই মে ১৮১২ তারিখে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের দলে সর্ব্বসমেত ৫২ জন লোক ছিল, ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল ভারবাহী কুলি। দুই জন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতও ইঁহাদের সহগামী হইয়াছিলেন। ইঁহাদের নাকি সার্ভে করিবার জন্য সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল। উঁহাদের মধ্যে একজন, তাঁহার নাম হরখদেব (হর্ষদেব) সারা পথ পদব্রজে গিয়াছিলেন। উঁহার দুইটি পদক্ষেপের ব্যবধান পুরা চারি ফুট করিয়া। এইরূপে সমস্ত পথের দূরত্ব পরিমাপ করা হয়। হিয়ার্সের মেবাত অঞ্চলে দস্যুজীবনের অনুচর গোলাম মহম্মদ খাঁও এই অভিযানে তাঁহাদের সঙ্গী ছিলেন। এইরূপে খ্রীষ্টান মুসলমান এবং হিন্দু সকলেই হিন্দু তীর্থযাত্রী সাজেন। যোশীমঠে বদ্রিনাথ যাইবার রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া উঁহারা নীতিপাসের পথে অগ্রসর হইলেন। ইতিপূর্ব্বে এ পথে কোন ইউরোপীয়ের পদচিহ্ন পড়ে নাই। বদ্রিনাথে পূর্ব্বে হিয়ার্সে নিজে একবার এবং দুই বৎসর পূর্ব্বে কর্নেল কোলব্রুকের সঙ্গে আর একবার গিয়াছিলেন।

৪ঠা জুন তারিখে পর্য্যটকগণ নীতি গ্রামে আসিয়া পৌঁছেন। এখানকার তিব্বতী কর্তৃপক্ষ উঁহাদের আরও ভিতরে প্রবিষ্ট হওয়ার পথে নানাপ্রকার বাধার সৃষ্টি করিতে লাগিল। এই পথ দিয়া কেন তাঁহারা মানসরোবর যাইতেছেন ; এ পথে সাধারণতঃ যাত্রীরা কখনও যায় না ; তাঁহাদের দলে এত লোকই-বা কিজন্য তাঁহাদের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র রহিয়াছে কেন, তাঁহারা গোর্খা কি অথবা ফিরিঙ্গি বলিয়া কথা উঠিয়াছে এবং হুণদেশ (তিব্বত দেশের

---

* মুরক্রফট লিখিত ভ্রমণ-কাহিনী এসিয়াটিক সোসাইটির তাৎকালীন সভাপতি কোলব্রুক কর্ত্তৃক কতকটা সংক্ষিপ্ত আকারে সম্পাদিত হইয়া *Asiatic Researches* পত্রিকার ১২শ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। হিয়ার্সেও তাঁহার ভ্রমণের এক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহা সাধারণ্যে অপ্রকাশিত, উহার পাণ্ডুলিপি তাঁহার বংশীয়গণের নিকট রক্ষিত আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে " "—চিহ্ন মধ্যে প্রদত্ত অংশ উহা হইতে পরিগৃহীত

...ী নাম) সম্বন্ধে মন্দ অভিপ্রায় লইয়া তাঁহারা যাইতেছেন, ... সত্য কিনা, ইত্যাদি নানা জটিল প্রশ্নের কৈফিয়ত ...দের দিতে হইয়াছিল। উত্তরে তাঁহারা নীতিপথের ... মোড়লকে জানাইয়াছিলেন, "আমরা পুণ্য এবং সুকৃতি-...ন আশায় পবিত্রতম হ্রদ দর্শনে যাইতেছি এবং আবশ্যক ...য়ের কিয়দংশ নির্ব্বাহ-জন্য পথিমধ্যে বিক্রয়ার্থ আমাদের দেশের কিছু কিছু পণ্যদ্রব্যও সঙ্গে লইয়াছি ; সে কারণে আমাদের দলে এত বেশী লোক দেখাইতেছে। হিংস্রজন্তু বা দস্যু হইতে আত্ম-...ার যদি প্রয়োজন দেখা দেয় এই ভাবিয়াই অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে লইয়া-ছিলাম, ইহাতে যদি আপত্তি থাকে তবে হূণদেশে ভ্রমণকালে আমরা সে সমস্তই নীতি গ্রামে রাখিয়া যাইতে প্রস্তুত আছি।" ...হাদের প্রদত্ত উত্তর সন্তোষজনক বিবেচিত না হ...তে প্রদেশের ...সনকর্ত্তার নিকট হইতে পত্র না আসা পর্য্যন্ত এক পক্ষকাল ...হারা নীতি গ্রামে বাস করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। নিষ্ফল ও বিরক্তিকর বহু বাদানুবাদের পর কয়েকদিনের মধ্যে হিয়ার্সে এবং ...েক্রফট বুঝিলেন, তাঁহাদের এই অযথা বিলম্বের জন্য নীতি গ্রামের মোড়লরাই দায়ী। নীতি পাসের অপর প্রান্তস্থ তিব্বতের কর্ত্তৃপক্ষের এ ব্যাপারের সহিত কোন সম্বন্ধই নাই। এমন কি প্রথমোক্ত ...ক্তিগণ বিনা বাধায় কাহাকেও যাইতে দিলে শেষোক্তগণের পক্ষে ...হাকে আটক করিবার কোন উপায় থাকে না। ২৩শে জুন ...রিখে বৈঠকে "এক বোতল ব্রাণ্ডি উত্তমরূপে সুমিষ্ট ও পাঞ্চ করিয়া ...তরণ করা মাত্র" ঈপ্সিত কাজ সিদ্ধ হইয়া গেল।

পথের দুর্গমতার জন্য ভ্রমণ তাঁহাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর হইয়া-ছিল। গ্রামসমূহের প্রধান এবং লামাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে ...রিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া ৩রা জুলাই তারিখে পর্য্যটকগণ ...তি কষ্টকর নীতি পাস অতিক্রম করিয়া তিব্বত দেশের অন্তর্গত ডাবা নামক স্থানে উপনীত হইলেন। এখানকার তিন জন প্রধান ব্যক্তিকে হিয়ার্সে লামা, উজির এবং দেব (জমিদার মহাশয়) নামে অভিহিত করিয়াছেন। উজির মহাশয় তখন কার্য্যানুরোধে মান-সরোবরে গিয়াছেন। হিয়ার্সের পায়ের বিলাতি বুট দেখিয়া সন্দেহের উদ্রেক হইলেও উদারচিত্ত উজিরপুত্র বিশেষ চেষ্টা করিয়া গারটোপের ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে ইঁহাদের জন্য মানসরোবর যাইবার অনুমতিপত্র সংগ্রহ করিয়া দেন। ১২ই জুলাই তারিখে ডাবা পরিত্যাগ করিয়া ছয় দিন পরে তীর্থযাত্রীরা গারটোপে আসিয়া পৌঁছিলেন। এখানে আসিয়া উঁহাদিগকে আবার তাঁহারা যে হিন্দু তীর্থযাত্রী নহেন, আসলে ফিরিঙ্গি সেই সন্দেহের নিরাকরণ বিশেষ ভাবেই করিতে হইয়াছিল। লাদকের রাজার কাশ্মীর-জাতীয় প্রতিনিধি এ সময় গারটোপে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার নিকট হিয়ার্সে শুনিয়াছিলেন যে, উরুশরা (অর্থাৎ রাশিয়ানরা) অনেক দিন হইতে লাদকদেশের সহিত বাণিজ্য-ব্যাপারে লিপ্ত আছে এবং মাত্র তিন বৎসর হইতে এজেণ্ট বা দালাল মারফত উঁহারা কাশ্মীর দেশের সহিত বেশ ভালরূপেই ব্যবসায় পত্তন করিয়াছে। কাশ্মীরে জনকয়েক উরুশ বসবাস আরম্ভ করিলেও খাস লাদকে উঁহারা তখনও দেখা দেয় নাই। গারটোপ হইতে হিয়ার্সেরা কৈলাস পর্ব্বত, রাবণ হ্রদ এবং মানসরোবর দর্শনে গিয়াছিলেন। উঁহারাই যে ঐ পবিত্র তীর্থভূমে সমাগত প্রথম ইউরোপীয় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

প্রত্যাবর্ত্তন-পথে গাড়োয়াল প্রদেশের কিয়দংশ অতিক্রমণান্তে ইঁহারা পুনরায় নিজেদের ইউরোপীয় বেশ ধারণ করিলেন। কুমায়ুনের অন্তর্গত চাঁদপুর নামক স্থানে ১৫ই অক্টোবর কাঠমাণ্ডু হইতে প্রাপ্ত আদেশের বলে বান্দা থাপা নামক জনৈক নেপালী সর্দ্দার ইঁহাদের সকলকে বন্দী করেন। তাঁহাদের অযথা বন্দিত্ব এবং তাঁদের প্রতি গুর্খাদের কঠোর আচরণ সম্বন্ধে হিয়ার্সে বহু অভিযোগ করিলেও ইহার জন্য থাপাকে দায়ী করা চলে না। তিনি রাজ-সরকারের আদেশ পালন করিয়াছিলেন মাত্র। হিন্দু গোঁসাই সহসা ফিরিঙ্গিবেশ ধারণ করিলে সকলকার মনেই সন্দেহ উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। তদ্ভিন্ন থামিবার আদেশ পাওয়া সত্ত্বেও হিয়ার্সে ও মুরক্রফট ঐ আদেশে কর্ণপাত করা যখন আবশ্যক বোধ করেন নাই, তখন সন্দেহ প্রত্যয়ে পরিণত হয়। যাহা হউক, পক্ষকাল পরে মুক্তিলাভ করিয়া সকলে ইংরেজাধিকারে ফিরিয়া আসেন।

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে গুর্খাদের সহিত সংগ্রাম বাধিল। যুদ্ধের প্রথম দিকে ইংরেজ সেনা কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে নাই। অক্টারলোনি, জিলেপ্সী, উড এবং মারলে এই চারি জন জেনারেল চারিটি বিভিন্ন বাহিনীর পরিচালনা-ভার লইয়া চারি বিভিন্ন প্রান্ত হইতে নেপাল রাজ্য আক্রমণে প্রবৃত্ত হন। তন্মধ্যে অভিযান প্রায় আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই জিলেপ্সী কলুঙ্গার ক্ষুদ্র গিরিদুর্গ আক্রমণে গিয়া পরাজিত ও নিহত হন। তাঁহার উত্তরাধিকারী জেনারেল মার্টিণ্ডেলও জৈতকের যুদ্ধে শত্রুসেনার হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হইয়াছিলেন (ডিসেম্বর ১৮১৪)। অপর সেনাপতিত্রয়ও কোন দিকে কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

তখন ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের রণপদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন-সাধনে যত্নবান হইলেন। লর্ড ময়রা তখন গভর্ণর জেনারেল পদে আসীন। ইনি নিজে একজন সুদক্ষ যোদ্ধা এবং আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামে ও নেপোলিয়নের যুদ্ধসমূহে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শনও করিয়াছিলেন। নেপালের অভ্যন্তরভাগ ও সমস্ত রাজ-ধানীর সঙ্গে পশ্চিম নেপালে অক্টারলোনীর সহিত সমরনিরত বিখ্যাত গুর্খা সেনাপতি অমরসিংহের বাহিনীর যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবার জন্য অতঃপর দুইটি বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে কুমায়ুন প্রদেশ আক্রমণের বন্দোবস্ত করা হইল। ইংরেজরা জানিতে পারিয়াছিলেন, ঐ অঞ্চলে শত্রুর অধিকতর সৈন্যবল নাই, উহা জয় করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য এবং এই কূটনীতির ফল সুদূরপ্রসারী হইবে। কর্নেল উইলিয়ম লিনিয়াস গার্ডনার এবং মেজর হায়দর ইয়ং হিয়ার্সে এই দুই জন ভূতপূর্ব্ব ভাগ্যান্বেষী সৈনিক এবং উঁহার শ্যালীপতির উপর এই কার্য্যভার প্রদত্ত হইল। ইতিপূর্ব্বে গার্ডনার-প্রসঙ্গে বলিয়াছি

যে, এই সুষ্ঠু সামরিক পরিকল্পনাটি তাঁহারই চিত্ত হইতে উদ্ভূত এবং তাঁহার রণনৈপুণ্যের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। মোরাদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাশীপুর হইতে গার্ডনার ৩০০০ এবং বেরিলি ও পিলিভিট হইতে হিয়ার্সে ১৫০০ সৈনিক সংগ্রহ করিলেন। গার্ডনার কোশী উপত্যকার পথে এবং হিয়ার্সে পিলিভিট হইতে কালীনদীর তট ধরিয়া অগ্রসর হইয়া টিমলা পাসের পথে কুমায়ুন প্রদেশে প্রবেশ করিবেন, এইরূপ স্থির হইয়াছিল।

হিয়ার্সে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সৈন্য এক মাসের মধ্যেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু বেরিলির রোহিলা পাঠানদের শৌর্য্যবীর্য্যের খ্যাতি কোন দিনই তেমন ছিল না। উহাদের সামরিক শিক্ষা-দীক্ষার জন্য এক মাসের অধিককাল ব্যয় করা হিয়ার্সে আবশ্যক বিবেচনা করেন এবং তৃতীয় মাসের প্রারম্ভে তিনি যুদ্ধযাত্রা করিলেন। দুই বার গাড়োয়াল এবং কুমায়ুন প্রদেশে পরিভ্রমণের ফলে হিয়ার্সের মনে গুর্খাদের সামরিক শক্তি অতিশয় হীন বলিয়া ধারণা জন্মিয়াছিল, এবং এই অবিমৃষ্যকারিতার সমুচিত প্রতিফল পাইতেও তাঁহার বিলম্ব ঘটিল না।

ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি পিলিভিট হইতে যাত্রা করিয়া হিয়ার্সে পূর্ব্বদিক হইতে কুমায়ুনে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। প্রথমে শত্রুপক্ষের নিকট হইতে তিনি বিশেষ কোন বাধা পান নাই। টিমলা পাসের পথিমধ্যে অবস্থিত দুইটি ক্ষুদ্র গিরিদুর্গ তিনি ১৮ই তারিখে অধিকার করিয়া লন। ২৮শে তারিখে কুমায়ুন প্রদেশের প্রাচীন রাজধানী চম্পাবৎ তাঁহার হস্তগত হয়। শত্রুসেনা তাঁহাকে বাধাদানে অসমর্থ হইয়া কালীনদী পার হইয়া পলায়ন করে, কিন্তু সৈন্যসংখ্যার স্বল্পতার জন্য তাঁহাকে এই সময়ে দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হয়। পিলিভিটের কেন্দ্র হইতে রসদ প্রাপ্তির পথ উন্মুক্ত রাখিবার জন্য তাঁহাকে উহার মধ্যে মধ্যে ঘাঁটি স্থাপন করিতে হইল। কালী নদী পার হইয়া যাহাতে শত্রু অতর্কিতে পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিতে না পারে, তজ্জন্য ঐ পথ সুরক্ষিত রাখিতে তাঁহাকে প্রায় তিন শত সৈনিক নিযুক্ত করিতে হয়। কুতলগড় দুর্গ অবরোধে তাঁহার একমাত্র ইউরোপীয় অফিসর মার্টিণ্ডেলকে পাঁচ শত সিপাহীসহ পাঠাইয়া দেওয়ায় চম্পাবতে তাঁহার নিকট তিন শতের অধিক সৈনিক অবশিষ্ট রহিল না। তাঁহার তোপখানা ছিল না এবং গুলিবারুদ ও রসদেরও বিশেষ অপ্রাচুর্য্য, কিন্তু এ সত্ত্বেও তিনি শত্রুসৈন্যের সহিত সংগ্রামে অগ্রসর হইতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। সেই অতি দর্পেই তাঁর পতন ঘটিল।

এদিকে গার্ডনার কুমায়ুন প্রদেশে প্রবেশ করিয়া একটি বক্র পথে পৌঁছিলেন। রাণীক্ষেত অধিকারপূর্ব্বক হিয়ার্সে উক্ত প্রদেশের প্রধান শহর আলমোড়ার অদূরে তাঁহার সহিত আসিয়া সম্মিলিত হইলে উভয়ে একযোগে সুরক্ষিত শত্রুদুর্গ আক্রমণ করিবেন ইহাই তাঁহাদের মধ্যে স্থির হইয়াছিল, কিন্তু হিয়ার্সেকে সসৈন্যে আসিতে হইল না। ৩১শে মার্চ্চ তিনি আলমোড়া অভিমুখে অগ্রসর হইবার আয়োজনে ব্যাপৃত আছেন, এমন সময়ে সংবাদ আসিল, চম্পাবৎ হইতে সাত ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক স্থলে শত্রুসেনা কালী নদী পার হইয়াছে। মার্টিণ্ডেলকে তাঁহার দলে আসিয়া যোগ দিবার আদেশ পাঠাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সেই দিকে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পরদিবস রজনী-প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। হিয়ার্সের সৈন্যগণ প্রবলতর বিপক্ষের সহিত অসম সাহসে যুদ্ধ করিয়া সাবধানে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় পূর্ব্বোল্লিখিত গুর্খাসর্দ্দার হস্তিদল চৌতুরিয়া দেড় সহস্র নূতন সৈন্য লইয়া যখন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন, তখনও মার্টিণ্ডেলের দেখা বা সংবাদ নাই। হস্তিদলের আগমনে হিয়ার্সের দলের সকল আশা-ভরসাই বিলুপ্ত হইয়াছিল। যুদ্ধের প্রারম্ভেই হিয়ার্সে উরুদেশে একটি প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হন। তাঁর অন্যতম শ্যালক নবাবজাদা প্রাণ হারান এবং গোলাম হায়দর খাঁও সাঙ্ঘাতিক রূপে আহত হন। অধিনায়কগণের পতনে রোহিলা সৈন্যরা রণে ভঙ্গ দিলে তৎক্ষণাৎ গুর্খারা অগ্রসর হইল এবং তাহাদের প্রথামত জীবিত বা মৃত নির্ব্বিশেষে সকলের শিরশ্ছেদ আরম্ভ করিল। এক জন ব্যক্তি আহত হিয়ার্সেকে বধ করিবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে হস্তিদল চৌতুরিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া আততায়ীর হস্ত হইতে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিলেন। হস্তিদল তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আলমোড়ায় লইয়া যান এবং পূর্ব্বতন উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁহার সহিত নিজ সহোদরের মত ব্যবহার করেন।

কর্নেল গার্ডনার ২৫শে এপ্রিল আলমোড়া আক্রমণ করেন। গুর্খারা আলমোড়া দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাকে প্রবল বাধাদানে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু তিনি উহাদিগকে পুনরায় দুর্গমধ্যে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এমন সময় দুই হাজার নূতন সৈন্য লইয়া কর্নেল (পরে কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ জেনারেল সার জ্যাসপার) নিকোলস আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে নেতৃত্বভার গ্রহণ করিলেন। তখন সংখ্যাবলে বলীয়ান ইংরেজ সেনা আবার মহোৎসাহে আলমোড়া আক্রমণ করিল। যখন আর কোন আশাই রহিল না, তখন দুর্গাধ্যক্ষ বামশাহ বিপক্ষ দলের সহিত আত্মসমর্পণের সর্ত্ত নিরূপণের দৌত্যকার্য্যে বন্দী হিয়ার্সেকে তাঁদের নিকট প্রেরণ করিলেন।

হিয়ার্সের এই আঘাতের ক্ষত সম্পূর্ণরূপে কোন দিনই আর আরোগ্য হয় নাই। ইহার পর প্রায় পনর বৎসরকাল জীবিত থাকিলেও তাঁহাকে ইহার জন্য কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল।

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র বেরিলি জেলায় ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত হইতেছিল। চির অশান্ত রোহিলা-পাঠান ইংরেজশাসনে তাহাদের পূর্ব্বতন লুণ্ঠনরাজের পেশা বিলুপ্ত হইতে দেখিয়া সাতিশয় অসন্তুষ্ট ও বিদ্বিষ্টচিত্তে অবস্থিতি করিতেছিল। অনেকেই প্রাক্তন সুদিনের কথা স্মরণ করিয়া রীতিমত দুঃখিত। এই সময়ে বেরিলির ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে যে ইংরেজ রাজপুরুষটি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি যেমন দাম্ভিক ও অবিবেচক তেমনই রুক্ষ প্রকৃতির। তাঁর কয়েকটি হঠকারিতামূলক কার্য্যের ফলে সেই

দুর্গাস্থিত বহ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইল। ১৬ই এপ্রিল শহরে ভীষণ দাঙ্গা বাধিয়া গেল। ইহাতে অনেকে হতাহতও হইল। দেখিতে দেখিতে সমীপবর্তী স্থানসমূহ হইতে পাঁচ সহস্রেরও অধিক উত্তেজিত মুসলমান আসিয়া নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং অল্পকাল মধ্যেই সমগ্র জেলা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। শহরে তখন কিঞ্চিদধিক চারি শত সিপাহী এবং দুইটি মাত্র তোপ ছিল। কিন্তু গোলন্দাজগণের কোনই অফিসর ছিল না। হিয়ার্সে এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র উঁহাদের পরিচালনভার গ্রহণ করিয়া বিদ্রোহদমনে আত্মনিয়োগ করিলেন। তিন দিন পরে এক দল অশ্বারোহী সৈন্য বেরিলিতে আসিল এবং যথেষ্ট পরিমাণ সৈন্যদল শীঘ্রই আসিয়া পৌঁছিবে এই সংবাদও পাওয়া গেল। উহারা আসিয়া পৌঁছিলে বিজয়লাভ দুরূহ হইবে বুঝিয়া উত্তেজিত জনতা বিলম্ব না করিয়া ২১শে তারিখে সহসা সৈন্যদলকে আক্রমণ করিয়া বসিল। সংখ্যায় বহুগুণে গরীয়ান্ প্রতিপক্ষ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াও সৈনিকগণ প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। কাপ্তেন কানিংহাম পরিচালিত সওয়ারদলের চার্জের ফলে আক্রমণকারীদের অনেকে হতাহত হইল। হিয়ার্সে পরিচালিত কামান দুইটির প্রচণ্ড অগ্নিবর্ষণে বহু রোহিলা ধরাশায়ী হইল। স্বল্পক্ষণের মধ্যেই প্রায় তিন-চার শত ব্যক্তিকে নিহত এবং আরও অনেককে আহত হইতে দেখিয়া আক্রমণকারীদিগের সাহস অন্তর্হিত হইয়া গেল এবং তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল। ইহার পর অচিরেই সমগ্র জনপদে শান্তি সংস্থাপিত হয়। এই কার্যে হিয়ার্সের কৃতিত্বের জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে একটি রত্নখচিত মূল্যবান তরবারি উপহার এবং কোম্পানীর সেনাবিভাগে মেজর পদ প্রদান করেন আর স্বয়ং গবর্ণর-জেনারেল লর্ড হেষ্টিংস তাঁহাকে বহু প্রশংসাবাদ করিয়া পত্র লেখেন।

ভরতপুর যুদ্ধে হিয়ার্সেকে আবার অস্ত্রধারণ করিতে দেখা যায় (১৮২৬ খ্রীঃ)। ভরতপুরের পতনের পর বিরাট লুঠের মাল সকলকার মধ্যে যথাযথ বণ্টনের জন্য হিয়ার্সে যাবতীয় অফিসর কর্তৃক একবাক্যে "এসিষ্টাণ্ট প্রাইজ এজেণ্ট" নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সততায় সকলকার প্রত্যয় থাকার ইহা প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এই যুদ্ধের গুরু পরিশ্রমের দরুন তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং তিনি চিকিৎসকগণ কর্তৃক হিমালয় প্রদেশে স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য যাইতে আদিষ্ট হন। এই যাত্রায় তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কাপ্তেন জন বেনেট হিয়ার্সে ছয় মাসের ছুটি লইয়া তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন। ইনি হায়দরের পিতার বিবাহিতা ইংরেজ-পত্নীর গর্ভজাত পুত্র ছিলেন এবং কয়েক বর্ষ পরে (৭।১।১৮৩২ খ্রীঃ) হায়দরের কন্যা স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রী চার্লোটের পাণিপীড়ন করিয়াছিলেন। অবশ্য, তাঁহার জন্মের জন্য হায়দর হিয়ার্সের সামাজিক মর্য্যাদা বা হিয়ার্সে বংশের সহিত সম্বন্ধ স্বীকৃত হইত না। হায়দরের জন্ম-বিবরণ এবং জেনারেল সার্ জন বেনেটের নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ ইত্যাদি লজ্জাকর প্রসঙ্গগুলি ঢাকা দিবার জন্য তাঁহার প্রকৃত পরিচয় কুত্রাপি প্রদত্ত হয় নাই। সার্ জন বেনেটের রচিত আত্মকাহিনীতে তাঁহাদের এই সময়ের ভ্রমণ-বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু সর্ব্বত্রই তিনি হায়দরকে "My kinsman" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে মেজর হিয়ার্সে পরলোকগমন করেন। বেগম ইহার পর প্রায় দশ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। তাঁহাদের বিবাহিত জীবন খুব সুখের হইয়াছিল। কন্যা চার্লোট ভিন্ন তাঁহাদের দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কাপ্তেন উইলিয়ম মুরক্রফট এবং কাপ্তেন জন বেনেট ভ্রাতৃযুগলের পক্ষে কোম্পানীর সেনা বিভাগের বর্ণসঙ্করত্ব হেতু প্রবেশলাভ সম্ভব না থাকায় উভয়ে অযোধ্যাধিপতির বাহিনীতে সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করেন। প্রধানতঃ রাজস্ব-সংগ্রহ-কার্য্যে নবাবের সৈন্যদলকে নিরত থাকিতে হইত এবং তাহাতে মধ্যে মধ্যে খণ্ড অভিযানও লাগিয়া থাকিত। তদ্ভিন্ন অপর কোন প্রকার সংগ্রামের অবকাশ ইংরেজআশ্রিত অযোধ্যারাজ্যে সম্ভবপর ছিল না। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সুলতানপুর জেলার এক অবাধ্য তালুকদারের অধিকৃত রামগড় দুর্গ আক্রমণ কালে উইলিয়ম সাঙ্ঘাতিক ভাবে আহত হন।

অযোধ্যারাজ্য গ্রাস করিবার পর ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নবাবী ফৌজের কয়েকটি ব্যাটালিয়নকে ইরেগুলার ইন্ফ্যানট্রি বা মিলিটারী পুলিস রূপে তাঁহাদের কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত ভ্রাতৃযুগলও এই দলে কর্ম্মলাভ করিয়াছিলেন। "আউধ ফ্রন্টিয়ার পুলিস" দলের অধ্যক্ষতা উইলিয়মকে প্রদত্ত হয়। তরাই প্রদেশে দস্যুবৃত্তি নিবারণ, ঠগীদমন এবং নেপাল হইতে উপদ্রব নিবারণে ইঁহারা প্রধানতঃ নিরত থাকিতেন। মোকরাম সিংহ নামক জনৈক দুর্দ্দান্ত দস্যুসর্দ্দারকে ধৃতকরণে উইলিয়ম যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। বন্দিত্ব হইতে মুক্তিলাভ-জন্য ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে নিজ দেহের সমভার স্বর্ণমুদ্রা উৎকোচ প্রদান করিতে চাহিয়াছিল। সিপাহী বিদ্রোহকালীন বহু অভিযানে হিয়ার্সে-ভ্রাতৃদ্বয় যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। উইলিয়ম মুরক্রফট হিয়ার্সের দেহান্তের পর তাঁহার পুত্র লায়োনেল ডেভিড (১৮৪৬-১৯১২) সুবিশাল পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। প্রায় সমগ্র খেরী জেলাটিই তাঁহার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। ইনি যুক্তপ্রদেশের একজন সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী, সুদক্ষ শিকারী এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া এংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের একজন মুখপাত্র ছিলেন। বিগত মহাসমরে ইঁহার দুই পুত্র রয়্যাল এয়ার ফোর্সে অফিসার হইয়াছিলেন এবং উভয়েই কাপ্তেন পদ লাভও করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ লায়োনেল ডেভিড উইলিয়ম বীরত্বের জন্য বহু আকাঙ্ক্ষিত "মিলিটারী ক্রস" পদক পুরস্কার পাইয়াছিলেন। একটি বিষয়ে অপরাপর ভাগ্যান্বেষী সৈনিক বংশধরদিগের সহিত হিয়ার্সেদের গুরুতর পার্থক্য দেখা যায়। উহারা এখনও যথেষ্ট বিত্তশালী আছে; ইহারা দৈন্যদশাগ্রস্ত হয় নাই এবং মুসলমানী বংশজাতাদের সহিত রক্ত-সংমিশ্রণও হয় নাই।

মুক্তিপথে

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

৬

নীলরতন চাকরির জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থমনোরথ হইল। সারাদিন ঘুরিয়া মার্চেন্ট আপিসের বড়বাবুদের অনেক খোশামোদ করিয়াও একটা চাকরি যোগাড় করিতে পারিল না। অনেক জায়গায় দরোয়ান ভিতরে ঢুকিতে দেয় না, কোনমতে ঢুকিতে পারিলেও অনেক জায়গায় কর্তৃপক্ষ 'নো ভেকেন্সি' নোটিশ দেখাইয়া কৈফিয়ত চায় যে, ইহা দেখিয়াও কেন বিরক্ত করিতে আসিয়াছে। সদ্যমুক্ত রাজবন্দী শুনিয়া অনেকেই এক কথায় বিদায় করিয়া দিল।

অনেক ঘোরাঘুরির পর বাসা হইতে মাইলতিনেক দূরে একটা দোকানে খাতা লিখিবার চাকরির আশা পাইয়া অনেক দিন পর নীলরতন যেন অনেকটা সুস্থ মস্তিষ্কে বাসায় ফিরিল। হউক সামান্য বেতন, কিন্তু তবুও ত কিছু।

পরদিন চাকরিতে বহাল হইল। সকালবেলা আহারের পর কর্মস্থলে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই সে উপস্থিত হয়। সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরিয়া আসে। এই ভাবে মাস দুই চলিল।

স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সহিত নীলরতন এখন আর ভাল করিয়া কথাও বলে না। সে নিজ মনে এক রকম থাকে, তাহারাও তাহাকে বেশী ঘাঁটাইতে সাহস পায় না। অবশ্য তাহার ছেলের কথা আলাদা। সখের থিয়েটারের কর্তাবাবুর সঙ্গে তাহার বিশেষ খাতির, সে তাহা লইয়াই মাতিয়া আছে। পুত্রের সঙ্গে নীলরতনের এক রকম দেখাই হয় না।

সুষমা কিম্বা সরমা কেহ হাসিয়া কথা কহিলে তাহার যেন মনে বিষম জ্বালা ধরিয়া যায়। সেদিন বাড়ীতে ঢুকিতেই শুনিতে পাইল সুষমা কি একটা কথায় হাসিতে ফাটিয়া পড়িয়াছে। নীলরতনের ইহা সহ্য হইল না। স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া ফেলিল—"আমার সর্ব্বনাশ করে তোমাদের আনন্দ আর ধরে না।" স্ত্রী ও কন্যা ব্যথাতুর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

সুষমার মুখ এতটুকু হইয়া গেল। সরমা অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। নীলরতনকে কে যেন তীব্র কশাঘাত করিল। এ কি কথা সে বলিয়া ফেলিল। যাহাদের মুখে হাসি ফুটাইবার জন্য তাহার এই পরিবর্ত্তন, তাহাদের সুখ দেখিয়া সে কেন এমন করিয়া জ্বলিয়া উঠে! নীলরতন নিজের কপালটা সজোরে টিপিয়া ধরিয়া আপন মনেই বলিতে বলিতে গেল—"কখন কাকে কি যে বলি কিছুই ঠিক থাকে না, মাথাটা বুঝি খারাপই হয়ে গেল!"

পর দিন সকালে জয়ন্ত নীলরতনের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে। সে দিনটা ছিল রবিবার। স্কুল, আদালত, আপিস সব ছুটি, যদিও নীলরতনের কাজে ছুটি ছিল না।

বাইরের ঘরে নীলরতন দেখিল জয়ন্ত বসিয়া আছে। জয়ন্ত হাসিমুখে বলিল—"নীলুদা, বেশ একটা সুবিধা হয়েছে। শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক একটা 'হিতসাধনমণ্ডলী' স্থাপন করে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় করবার সঙ্কল্প করেছেন, কিন্তু কর্ম্মীর অভাবে কিছুই করতে পারছেন না। আমি এই সম্মিলনীর কর্তাদের সঙ্গে দেখা করেছি। একটা বেশ মজার কথা শুনে এলাম। এই মণ্ডলীর সভাপতি শহরের একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ ভদ্রলোক। আমরা সব মুক্ত রাজবন্দী শুনে তিনি বললেন—তাতে আর কি হয়েছে, কাজ যার কাছে পাই, সেই ভাল। উদ্যমশীল চোরও ভাল। কতকগুলি নিষ্প্রাণ নিষ্কর্ম্মা লোক দিয়ে কি হবে। তোমরাই কাজের ভার নাও। তোমরা যাই হও না কেন আমার আপত্তি নেই।' ভদ্রলোকের উপমা শুনে আমাদের হাসি সামলানো দায় হইল। "উদ্যমশীল চোর" কথাটা চিরকাল মনে থাকবে! তা যা হোক, আমরা সব কাজের ভার নিয়েছি, অবশ্য উপরে তাঁরাই থাকবেন, তাঁদের নামেই সব চলবে। থাকাও ভাল, নইলে পুলিস সন্দেহ করবে। সমস্ত জনহিতকর কাজের উপরই গোয়েন্দা পুলিসের সন্দেহ থাকে। আমরা ইতিমধ্যেই সাতটা অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেছি। বস্তির গরীব লোকেরা প্রথমে আসতে না চাইলেও এখন তাদের কাছে খুব উৎসাহ পাচ্ছি, যাবে এক দিন নীলুদা? একাজটার ভার যদি তুমি নাও তবে বহু ছেলে তোমার শিক্ষায় মানুষ হয়ে উঠবে।"

নীলরতন এতক্ষণে চুপ করিয়া শুনিতেছিল, আগের দিন স্ত্রী-কন্যাকে রূঢ় কথা বলার পর মনে একটু অনুতাপ হইয়াছিল তাই বোধ হয় চুপ করিয়াছিল। কিন্তু আর পারিল না।

নীলরতন হঠাৎ যেন ক্ষিপ্ত হইয়া বলিল—"আবার কেন এসেছ? যে ছেড়ে যেতে চায় তাকে টানাটানি করে রাখলে যে সমিতির সর্ব্বনাশ হয় এ জ্ঞান এখনও জন্মায় নি? আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও বলছি।"

কথা শেষ করিয়াই নীলরতন হোঃ, হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল—"দেখ একবার কাণ্ড! পাগলে আবার অপরকে পাগল বলছে!"

এই কথা বলিয়া একটুও অপেক্ষা না করিয়া নীলরতন রাস্তায় বাহির হইয়া গেল। জয়ন্তকে এরূপ কঠোর বাক্য বলিয়া আসিয়া মনটা অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিল। জয়ন্ত তাহাকে এত ভালবাসে যে, তার দুর্ব্বলতা দেখিয়া আজও তাহাকে ত্যাগ করে নাই। সেদিনটা নীলরতন আর কর্ম্মস্থলে গেল না। কতক্ষণ উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে এ রাস্তা সে রাস্তা ঘোরাফেরা করিয়া পার্কের ভিতরে গিয়া একটা বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িল। ঐ বেঞ্চের এক

ধারে এক ব্যক্তি বসিয়াছিল, সে নীলরতনকে দেখিয়া হঠাৎ কি জানি কেন বড়ই লজ্জিত ভাবে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল।

নীলরতন বলিল—"এ কি সুবোধ যে। উঠলে কেন? বসো, বসো। সেদিন চৌরাস্তার মোড়ে দেখলাম মনে হ'ল যেন ছাতা আড়াল দিয়ে গেল, কথা কইতে যেন অনিচ্ছুক মনে হ'ল।"

সুবোধের কথায় লজ্জার আভাস, অতি বিনীত ভাবে বলিল,—"মাপ কর নীলুদা, আমি অধঃপাতে গিয়েছি, তাই তোমাদের মত লোককে মুখ দেখাতে লজ্জা করে।"

নীলরতন একরকম অস্বাভাবিক হাস্য করিয়া বলিল, "অধঃ-পাতে গিয়েছ, বেশ করেছ, কতদূর পর্য্যন্ত গিয়েছ?"

সুবোধ নীলরতনের গলার স্বরে ও কথায় ক্ষণেকের তরে চমকিত হইল, পুনরায় অত্যন্ত বিনয়নম্র স্বরে বলিল, "আমি সমিতির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেড়ে দিয়েছি, চাকুরি নিয়েছি, তাও আবার সরকারী চাকুরি, রাউলাট রিপোর্ট যারা দস্তখত করেছে তাদেরই একজনের সুপারিশে চাকুরি মিলেছে।"

হঠাৎ নীলরতন উপুড় হইয়া সুবোধের পায়ের ধুলা লইয়া মাথায় দিল, সুবোধ চমকিয়া 'কর কি? কর কি?' বলিয়া দ্রুত পিছাইয়া গেল।

নীলরতন আবার সেইরূপ উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "সুবোধ তুমি আমার কাছে দেবতা—কর্ত্তব্য না করতে পেরে এখনও তুমি লজ্জিত হও, আমায় ভাল লোক মনে করে আমার কাছেও তোমার লজ্জা হয়, কত বিনীত ভাবে কথা বলছিলে, আর আমি কি করেছি জান?—আমি, হাঁ আমি! অমনি করে তাকিয়ে আছ কেন? আমি যে শুধু সবকিছু ছেড়েছি তা নয়, যারা সমিতির কোন ধার ধারে তাদের গা ঘেঁষেও আর চলি নে। দেখতে পেলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিই। আজ দিয়েছি জয়ন্তকে তাড়িয়ে, একেবারে দূর, দূর করে। অথচ তুমি ত জান ওকে আমি কত ভালবাসি, ও আমাকে কত ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে।"

কথাগুলি শেষ করিয়া নীলরতন হাঁপাইতে লাগিল। পুনরায় নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কহিল, "ঠিক কাজ করেছি, আবার দেখা হলে এইরূপই করব। এদের সঙ্গে জুটে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে উপোস করাতে ত পারি নে। কি বল? নাঃ, তোমার সঙ্গও ছাড়তে হয়। তোমার মধ্যে এখনও মানুষ বলে পদার্থটি আছে।"

নীলরতন হন্ হন্ করিয়া পার্ক হইতে বাহির হইয়া গেল। সুবোধ অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার মন অত্যন্ত ব্যথিত হইল, ভাবিল, "তবে কি নীলুদা পাগল হয়ে গেল!"

রাস্তায় ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া নীলরতন আসিয়া একটা গাছতলায় বসিল। অদূরে একটা বেঞ্চিতে বসিয়া খবরের কাগজ হাতে কয়েক ব্যক্তি তখন রাজনৈতিক আলোচনায় ব্যস্ত ছিল।

"এই দেখুন, স্বদেশী যুগের ছেলেগুলো জেল থেকে বেরিয়ে এসে আবার বুঝি হাঙ্গামা বাধিয়েছে!"

"ওরাই হচ্ছে গিয়ে দেশের আসল শত্রু। দেশের সর্ব্বনাশ না করে আর ওরা ছাড়বে না। অসহযোগ আন্দোলনটা এরাই মাটি করে দেবে।"

"এখন দেখছি এদের জেলে পুরে রাখলেই ঠিক হ'ত। এরা বেরিয়ে আসাতেই অহিংস আন্দোলনটা শান্তভাবে চলতে পারছে না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই মহাত্মাজী আবার বিনা বিচারে জেলে আটক রাখার এই রাউলাট আইনের বিরুদ্ধেই এত বড় একটা আন্দোলন চালালেন!"

"এমনিধারা ব্যাপার ঘটবে এ আশঙ্কা আমার আগেই হয়েছিল।"

উপস্থিত প্রায় সকলেই এই আশঙ্কায় সায় দিয়া নিজ নিজ রাজনৈতিক জ্ঞানের গভীরতা প্রমাণ করিল।

নীলরতন এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিল। তাহার যেন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। লোকগুলির দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "বাঃ বাঃ, বেশ জুটেছে ত কয়েকটি মহাপুরুষ একসঙ্গে! এদের মুখেও আবার মহাত্মা গান্ধীর নাম শুনতে পাচ্ছি যে!"

উপস্থিত কেহই এতক্ষণ নীলরতনের উপস্থিতি টের পায় নাই। কিন্তু তাহার কথায় সকলেই চমকিয়া উঠিল। এক জন ব্যঙ্গের সুরে কহিল, "তুমি কে হে বাপু, তোমার ত বড় আস্পর্দ্ধা দেখছি!"

নীলরতন হাসিতে ফাটিয়া পড়িল। হাসি থামিলে কহিল, "আস্পর্দ্ধা ছিল না, কিন্তু তোমাদের দেখে জন্মেছে! নাঃ, তোমাদের সঙ্গে এক গাছতলায় দাঁড়ানো ঠিক নয়। তোমাদের দেখলে আমার মত হতভাগার মনেও আত্মসম্মান জেগে ওঠে।" কথাগুলির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য না করিয়াই আবার উঠিয়া রাস্তায় হাঁটিতে আরম্ভ করিয়া দিল। যাইতে যাইতে শুনিতে পাইল—

"ব্যাটাকে পুলিসে দেব নাকি!"

"না, না, যেতে দে, নিশ্চয় পাগল!"

৭

নীলরতন রাত্রি দশটার সময় বাড়ী ফিরিয়া সামান্য কিছু আহার করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। স্ত্রী ও কন্যার সহিত বিশেষ কোন কথা হইল না। তাহার সারাদিনের অনুপস্থিতি লইয়া কেহ কোন কথা তুলিতে সাহস পাইল না। আজকাল নীলরতনের সঙ্গে কথা বলাও সহজ ছিল না। আলাপ আরম্ভ হইলেই দুই একটা কথার পরই কথার গতি অপ্রীতিকর হইয়া উঠিত। নীলরতন স্বাভাবিক ভাবে বেশীক্ষণ আলাপ করিতে পারিত না।

ঘণ্টা দুই পরে মৃদু করাঘাতের শব্দ পাইয়া সরমা দরজা খুলিয়া দেখিলেন জয়ন্ত। জয়ন্ত চুপি চুপি প্রবেশ করিল। জয়ন্ত খুব আস্তে আস্তে বলিল, "নীলুদা কি ঘুমুচ্ছেন?"

নীলরতন চোখ মেলিয়া বলিল, 'বসো।'

জয়ন্ত বলিল, না, বসব না, দাঁড়িয়েই দু'কথা বলে চলে যাই। খবর পেয়েছি খুব শীঘ্রই আবার ধরপাকড় সুরু হয়ে যাবে। আমি পালিয়ে যাচ্ছি, নইলে কাজ করবার ত কেউ রইল না। আমাকে

খোঁজ করবার একটা ঠিকানা তোমায় দিয়ে যাই। তোমার বৈপ্লবিক কাজকর্ম এখন বন্ধ আছে, কাজেই তোমাকে বোধ হয় ধরবে না। তাই তোমাকেই সব জানিয়ে যাচ্ছি। রাখালকেও কিছু আভাস দিয়ে গেলাম।"

নীলরতন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে! বিশ্বাস করবে আমাকে?"

"নিশ্চয়ই! তোমাকে বিশ্বাস করব। তুমি ত অবিশ্বাসী নও। বিপদের সময় এমন বন্ধু আর কে আছে!"

জয়ন্ত বলিল, "হ্যাঁ, আর একটা কথা, আমাকে গোটা পাঁচেক টাকা দিতে পার? কোথাও পেলাম না, হাতে একেবারেই কিছু নেই।"

নীলরতন তার আগের দিনই বেতন পাইয়াছিল, সরমাকে বলিল, বেতনের সব টাকাটাই ওর হাতে দাও। পাঁচ টাকায় কিছুই হবে না।"

জয়ন্ত বলিল, 'অত টাকার দরকার নেই, পাঁচ টাকা হলেই চলবে।"

নীলরতনের মুখ বিষাদাচ্ছন্ন হইল, সে বলিল, "এও নেবে না আমার কাছ থেকে! আমারও ত যাওয়া উচিত ছিল!"

নীলরতনের মুখের দিকে চাহিয়া জয়ন্ত আর আপত্তি না করিয়া টাকা গ্রহণ করিল।

সরমা বলিলেন, "ঠাকুরপো, কাল কোথায় যাবে কি করবে ঠিক ত নেই, আহার না জুটবারই সম্ভাবনা। কিছু খাবার, চিড়ে, মুড়ি বাতাসা যা আছে, তাই নিয়ে যাও।" তিনি একটা ছোট পুঁটুলিতে কিছু বাঁধিয়া দিলেন।

নীলরতন বলিল, "ষ্টীমার ছাড়বার ত এখন অনেক দেরি, রাত্রি চারটায় ছাড়ে। এখন ত রাত দেড়টার বেশী নয়। ঘণ্টা দুই এখানেই বিশ্রাম করে যাও। ষ্টেশনে গিয়ে বসে থাকা নিরাপদ নয়।"

ঘণ্টা দুই পরে জয়ন্ত উঠিয়া নীলরতনের কানে ফিস ফিস করিয়া বলিল, "বাইরে যেন ভারী জুতোর শব্দ পাচ্ছি।"

নীলরতন বলিল, আলো জ্বালব না, অন্ধকারেই প্রস্তুত হয়ে থাক, আমি দেখছি।

নীলরতন বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিল পুলিস বাড়ী নিঃশব্দে ঘেরাও করিতেছে; এক একজন করিয়া একটু দূরে দূরে দাঁড়াইতেছে। নীলরতন ও জয়ন্তর এক মিনিট পরামর্শ হইল। স্থির হইল জয়ন্তর পালাইতেই হইবে। নীলরতন বলিল, "এস, আমি তোমাকে বার করে দিচ্ছি। আমার কি হয় না হয় সেদিকে চেও না, তুমি চলে যাবে।" নীলরতনের কণ্ঠে দৃঢ়তা। তাহার পূর্ব্বশক্তি ও বুদ্ধি যেন ফিরিয়া আসিয়াছে।

দুই জনে ভাল করিয়া কাপড় আঁট-সাঁট করিয়া পরিয়া অগ্রসর হইল। অন্ধকার রাত্রি। বাড়ীর একদিকে একটা গাছের ছায়া পড়িয়া অন্ধকার যেন জমাট হইয়াছিল। সেদিকে একজন বন্দুকধারী পুলিস আসিয়া দাঁড়াইল। নীলরতন হঠাৎ তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল। পুলিস হঠাৎ আক্রমণে বিহ্বল হইয়া চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল। কয়েকজন পুলিস ও অফিসার দৌড়াইয়া আসিলেন। একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। জয়ন্ত অন্ধকারে মিশিয়া গেল। নীলরতনের উপর নির্ম্মমভাবে প্রহার চলিল, সঙ্গীনের খোঁচাও কয়েকটা লাগিল। আহত স্থান দিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। নীলরতন আঘাত পাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। কিন্তু অল্পসময়ের মধ্যেই তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল।

নীলরতন গ্রেপ্তার হইল, হাতে হাতকড়ি এবং কোমড়ে দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে হাত ও পা ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া বাড়ীর ভিতরে লইয়া আসা হইল, দুই জন পুলিস তাহাকে ধরিয়া রাখিল।

নীলরতনের বাড়ী খানাতল্লাসী সুরু হইল। সে হো হো করিয়া উচ্চ হাস্যে বাড়ী মাথায় করিয়া তুলিল—"হাঃ, হাঃ, হাঃ, দেখছি এখনও আমার মধ্যে কিছু মনুষ্যত্ব আছে! ও গিন্নি, ও সুষমা তোরা কাঁদিস নে, আনন্দ কর, শাঁখ বাজা—আমি এখনও মানুষ!"

স্বামীর রক্তাক্ত দেহ এবং হাতকড়া ও দড়ি-বাঁধা অবস্থা দেখিয়া সরমার যেন ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গেল—সে মূর্চ্ছা গেল। সুষমা তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মা মা বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

নীলরতন বলিল, "ও সুষি তোর মায়ের চোখে মুখে জল দে, এখখুনি জ্ঞান হবে।" তার পর সরমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"ওগো চোখ মেল, তোমার স্বামী একেবারে অমানুষ হয়ে যায় নি। সুষি, কাঁদিস নে মা, তোর বাবা নিজের দুর্ব্বলতায় কর্ত্তব্য করতে না চাইলেও ভগবানের কৃপায় সুফল তার লাভ হয়ে গেল। তোরা আনন্দ কর, তোরা আনন্দ কর।"

বৃদ্ধা হরমোহিনী লাঠি ভর দিয়া দরজার ধারে উপস্থিত হইলেন। প্রহরী পুলিস তাহাকে বাধা দিল। তিনি চেঁচাইয়া বলিলেন, "মর মুখপোড়া, দোর ছাড়, আজ কত দিন যাবৎ বাতের বেমোয় নড়তে পারি নে, ওদের কোন খবরও নিতে পারিনি। এ খবর পেয়ে কোন-মতে এলাম, তাও আবার এইটুকু রাস্তায় জিরোতে জিরোতে। এখনও বলে কিনা যেতে দেবে না!"

তখন নিকট দিয়া এক জন ইংরেজ পুলিস অফিসার যাইতে-ছিলেন। হরমোহিনী তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—"ও সাহেব, পুলিসটাকে বলে দাও ত দোর ছেড়ে দিতে।"

সাহেব হরমোহিনীকে বাড়ীর কোন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক মনে করিয়া আসিবার অনুমতি দিলেন। বৃদ্ধা বাড়ীতে ঢুকিয়া সরমার পাশে গিয়া কহিলেন, "আঃ হা হা বউটার দুঃখে দুঃখেই জনম গেল।"

নীলরতনের রক্তাক্ত চেহারা এবং হাতে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি দেখিয়া বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "ও ডাকাতরা, মানুষটাকে তোরা মেরে ফেললি! ছেড়ে দে, শীগ্‌গির ছেড়ে দে।" এই কথা বলিয়া বৃদ্ধা নীলরতনের কাছে যথাশক্তি ছুটিয়া

আসিবার উপক্রম করিতেই নীলরতন বলিল, "এসো না মাসীমা, আমার কাছে এসো না, তোমাকে ওরা অপমান করবে! আমাকে ত বেঁধে রেখেছে, আমিও প্রতিকার করতে পারব না। তুমি ওদিকে তোমার বউমাকে ধর, সুষমাকে দেখ।"

বাহির হইতে একজন পুলিস অফিসার সাইকেল করিয়া আসিয়া পুলিস সাহেবকে কি যেন কানে কানে বলিয়া গেল। পুলিস সাহেব নীলরতনকে বলিলেন, "দেখ নীলরতনবাবু, জয়ন্তকে এখনও পাওয়া যায় নি। সে কোথায়? সে ত তোমার কাছে আসত। তার সন্ধান যদি তুমি দাও তবে এখনই তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি।"

নীলরতন অট্টহাস্যে ফাটিয়া পড়িল। "ও, জয়ন্ত ধরা পড়ে নি! বাঃ বেশ; বেশ। কি বলছিলে—আমি ধরিয়ে দেব তাকে! ভেবেছ কি, এত অধঃপাতে আমি গিয়েছি! হাত দুটো শেকলে বাঁধা, নইলে"···সাহেব দুই পা পিছাইয়া গেল।

"তবে যাও সারাজীবন জেলে পচে মর।"

"জেলের ভয় দেখাচ্ছ!" বলিয়া নীলরতন পুনরায় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। আহত স্থান দিয়া পুনরায় বেশী করিয়া রক্তক্ষরণ হইতে লাগিল।

এমন সময় বাহিরে দরজার সম্মুখে বড়ই গোলমাল সুরু হইল। গোরা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া বাড়ীতে দ্রুত প্রবেশ করিতেছিল। দ্বার-রক্ষক পুলিস প্রহরী বাধা দিয়া বলিল, 'মৎ যাও'।

গোরা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কেন?'

"হুকুম নেহি।"

"রেখে দাও তোমার হুকুম, আমার বাড়ীতে আমি ঢুকব তার আবার হুকুম!"

গোরা নিষেধ না মানিয়া দরজায় প্রবেশ করিবামাত্র পুলিসপ্রহরী তাহার গায়ে হাত দিয়া বাধা দিল। গোরা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "কি গায়ে হাত!"

নিকটে একজন শ্বেতাঙ্গ পুলিস অফিসার ছিল। সে ধমক দিয়া বলিল—"ইউ ব্লাডি রাসকেল। সন্ অব এ···গেট আউট!" গোরা তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল—"কি? এতদূর আস্পর্দ্ধা, গাল দিচ্ছ! গালের বদলে এই নাও।" বলিয়া শ্বেতাঙ্গ অফিসারের মুখে প্রচণ্ড ঘুসি মারিল। তখন অন্যান্য পুলিস ছুটিয়া আসিয়া গোরাকে ঘিরিয়া ফেলিল—হাতে হাতকড়ি পরাইল, উপরন্তু ঘুসি, লাথি, বেটনের প্রহারও চলিতে লাগিল।

গণ্ডগোল শুনিয়া সমস্ত পুলিস ও অফিসারগণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহারা আশঙ্কা করিল হয়ত বা বিপ্লবীরা বন্দুক, রিভলবার লইয়া আক্রমণ করিয়াছে, আসামী ছিনাইয়া লইতে আসিয়াছে ভাবিয়া নীলরতনকে তাহারা শক্ত করিয়া বাঁধিল।

ইংরেজ পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হুকুম দিলেন—দুটোকে একই জোড়া হাতকড়িতে একই সঙ্গে বেঁধে রাখ, তা হলে আর পালাতে পারবে না। তখন নীলরতনের ডান হাত ও গোরার বাঁ হাতে একই জোড়া হাতকড়ি লাগাইয়া একই দড়ি দুই জনের কোমরে জড়াইয়া পিতাপুত্রকে একই সঙ্গে পুলিস বাঁধিয়া ফেলিল।

হোঃ হোঃ···হাসিতে নীলরতন বাড়ী কাঁপাইয়া তুলিল—"হাঃ হাঃ হাঃ বাপ ছেলেকে একই সঙ্গে বেঁধে দিয়েছে! বাঃ বেশ হয়েছে! গোরা, তুই ছেড়ে থাকতে চাইলে কি হবে! এ হ'ল আসলে বিধাতার বিধান!"

খানাতল্লাসী দেখিয়া কৌতূহলী হইয়া বহুলোক বাহিরে রাস্তায় জমায়েত হইয়াছিল। সকলের উপর দিয়া যেন একটা অট্টহাস্যের দমকা হাওয়া বহিয়া গেল।

অত্যধিক উত্তেজনায়, অতিরিক্ত রক্তক্ষয়ে নীলরতন একেবারে অবশ ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইন্‌স্পেক্টরকে বলিলেন—এম্বুলেন্স ডাকাও, একে এখনই হাসপাতালে পাঠাতে হবে!"

সমাপ্ত

জার্ম্মানীর লোকোমোটিভ নির্ম্মাণের একটি প্রতিষ্ঠান

মেসার্স হেনশেল এণ্ড সোহন ইউরোপে লোকোমোটিভ নির্ম্মাণের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান। এই কারখানায় ষ্টীম লোকোমোটিভ ছাড়া ডিজেল ট্রাক, ডিজেল রোড রোলার এবং ভারী যন্ত্রপাতিসমূহ বহুল পরিমাণে নির্ম্মিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের ওয়ার্কশপগুলিতে ডিজেল এবং বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভ রোটারি এবং লোকোমোটিভের আলাদা আলাদা অংশ উৎপাদনের উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে।

দেন। মেসার্স হেনশেল এণ্ড সোহন কারখানায় সাধারণভাবে লোকোমোটিভ এবং বিশেষ ভাবে ডবল্যু জি শ্রেণীর লোকোমটিভ নির্ম্মাণ-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া যাইতেছে।

ভারতের রেলওয়েসমূহের সেণ্ট্রাল ষ্ট্যাণ্ডার্ড আপিসের ব্যবস্থানুযায়ী ডবল্যু জি শ্রেণীর এঞ্জিনের চিত্র এবং বিশেষ নির্দ্দেশপ্রাপ্তির

হাপরের সাহায্যে লৌহা তাতাইয়া ছাঁচ নির্ম্মাণ

ফাউণ্ডিতে একটি প্রকাণ্ড ছাচে ধাতু ঢালাই

ভারতের রেলওয়ে মন্ত্রণালয় (রেলওয়ে বোর্ড) সেণ্ট্রাল রেলওয়ের কাজের জন্ত ১৯৫৩ সনের শেষ ভাগে মেসার্স হেনশেল এবং সোহনের নিকট "ডবল্যু জি" শ্রেণীর ষাটটি লোকোমোটিভের অর্ডার

পর, এই সংস্থার এগুলি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা হইল। নির্ম্মাণ-পদ্ধতি অথবা পরিকল্পনা সম্পর্কিত পরিবর্ত্তনাদির কথা লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনারের রেলওয়ে এডভাইসার বা উপ-

দেশের নিকট উল্লেখ করা হইল। অতঃপর কাঁচা মাল সরবরাহ এবং কোন কোন তৈরী (ফিনিসড) অথবা আধা-তৈরী দ্রব্য—যথা রোলার বিয়ারিং, ইজেক্টর, ইম্প্রেক্টর, ষ্টীল কাষ্টিং প্রভৃতি সরবরাহের জন্য সাব-কন্ট্রাক্টরদের নিকট অর্ডার দেওয়া হইল। মেসার্স হেন্‌শেলের কারখানায় রপ্তানি হইবার পূর্ব্বে সাব-কন্ট্রাক্টরদের সরবরাহ-করা যাবতীয় উপকরণ ইণ্ডিয়া ষ্টোর ডিপার্টমেন্টের ইন্সপেক্টিং অফিসারগণ কর্ত্তৃক যথারীতি পরীক্ষিত হইল। এই সমস্ত উপকরণ মেসার্স হেনশেল এণ্ড সোহন ওয়ার্কস-এ পৌঁছিলে পর সেখানকার কর্তৃপক্ষ নিজেদের গবেষণাগারে এগুলি পুনরায় পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তাহাদের গবেষণাগারটি অতিআধুনিক পরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রপাতি সমন্বিত এবং উৎকৃষ্ট ধরনের।

বৃত্তাকার প্লেট-বেণ্ডিং মেশিনে প্লেটের প্রান্ত গুটানো
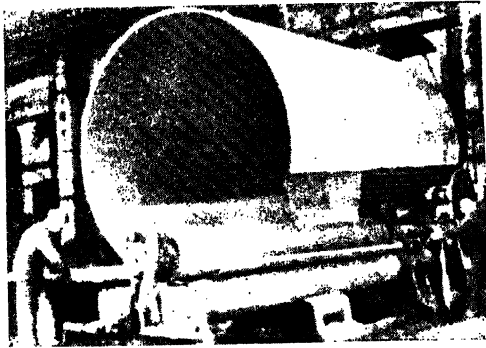
ইউরোপের অন্যান্য লোকোমোটিভ-নির্ম্মাণ-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মেসার্স হেনশেল এণ্ড সোহন-এর একটি পার্থক্য এই যে, এই কারখানায় যন্ত্রসাহায্যে বহুলপরিমাণে উৎপাদন-ব্যবস্থাযুক্ত নিজস্ব ফ্ল্যাঙ্গিং শপ, হাপর এবং ঢালাইয়ের কারখানা (Foundry) আছে। এই সকল কাজের জন্য সাব-কন্ট্রাক্টরদের ফার্ম্মের উপর নির্ভর করিতে হয় না বলিয়া এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে উৎকৃষ্ট মাল চালান দেওয়া সম্ভবপর হইয়া থাকে।

এই কারখানায় ফ্ল্যাঙ্গিং শপের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। গ্যাসের চুল্লীতে প্লেটগুলিকে উত্তপ্ত করা হয় এবং ক্রেনে বোঝাই করিয়া 'হাইড্রলিক প্রেসে' লইয়া যাওয়া হয়। এই ফ্ল্যাঙ্গিং প্রেসের পিছনে রহিয়াছে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা, ফ্ল্যাঙ্গিং শপে যে সকল সুদক্ষ শিল্পী কাজ করেন তাহাদিগকে লইয়া মেসার্স হেনশেল এণ্ড সোহন রীতিমত গর্ব্ববোধ করিতে পারে।

এই কারখানার বয়লার শপ প্রচুর উৎপাদন-ক্ষমতাবিশিষ্ট—ইহাতে অতিআধুনিক, মিতব্যয়সাধ্য উৎপাদন-পদ্ধতি অনুসৃত হইয়া থাকে। রোলারের ভিতর দিয়া চালান করিয়া দিবার পর প্লেটগুলি সোজা হইলে, প্লেটের ধারগুলি ৪৬ ফুট দীর্ঘ একটি প্লেনিং মেশিনে নির্দ্দিষ্ট আকার প্রদানের জন্য স্থাপন করা হয়। ইহা উল্লেখ্য যে, মেসার্স হেনশেল এবং সোহনের কারখানার উৎপাদন-স্থানগুলিতে (shop) বয়লারসমূহের পিটাইয়া সংযুক্ত করা জোড়ার
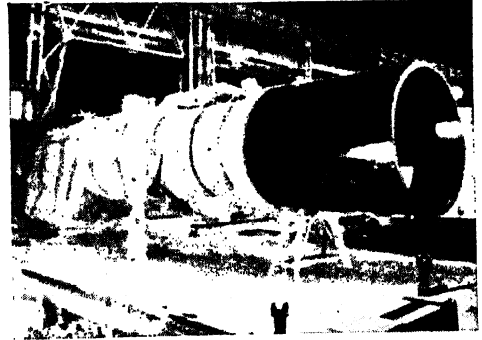
বয়লার ব্যারেলে ছিদ্রকূপ নির্ম্মাণ

মুখের (welded seam) রঞ্জন-রশ্মি (X-ray) ফোটোগ্রাফ তুলিবার ব্যবস্থা আছে। কোন ত্রুটি থাকিলে তাহা সারাইয়া লইবার জন্য ইন্সপেক্টিং ইঞ্জিনীয়ারগণ কর্ত্তৃক ফিল্মগুলি পরীক্ষিত হয়। মেসার্স হেনশেলের কারখানা আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক এবং
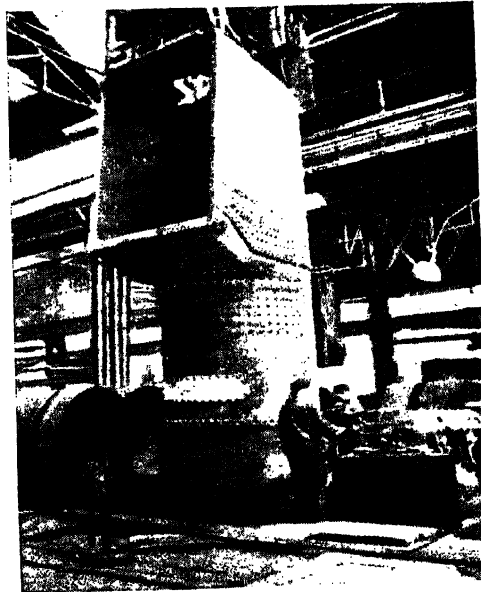
ক্রেন থেকে ঝুলানো একটি ডবল্যু জি শ্রেণীর বয়লারের জোড়ার মুখে পেরেকের প্রান্ত আটকানো

ব্যয়সাধ্য পদ্ধতিতে বয়লারের ঠেকনা (boiler stay) প্রস্তুতির বিশিষ্ট যন্ত্রপাতি সমন্বিত। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা এবং গবেষণার ভিত্তির উপরে নূতন ধরনের বয়লারের ঠেকনাগুলি পরিকল্পিত। ডবল্যু জি শ্রেণীর লোকোমোটিভের কতকগুলি বয়লারে এই নব-পরিকল্পিত ঠেকনা সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে এবং ভারতীয় রেলওয়ে-সমূহেও এগুলি পরীক্ষিত হইবে।

এই কারখানায় যন্ত্রপাতির কাজে জিগ, ফিক্সার, বিশিষ্ট ধরনের গেজ প্রভৃতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। মেসার্স হেনশেল এণ্ড সোহনের নিজেদেরই যন্ত্রপাতি গেজ ইত্যাদি প্রস্তুতির উত্তম ব্যবস্থা আছে। ইহাদের আধুনিক পরিমাপ-যন্ত্র (measuring instruments) সমন্বিত, শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত (air conditioned) একটি পরিমাপ-কক্ষ (measuring room) আছে —এই সকল যন্ত্র জেইস ষ্ট্রাসমান প্রভৃতি কর্তৃক নির্মিত এবং এগুলি
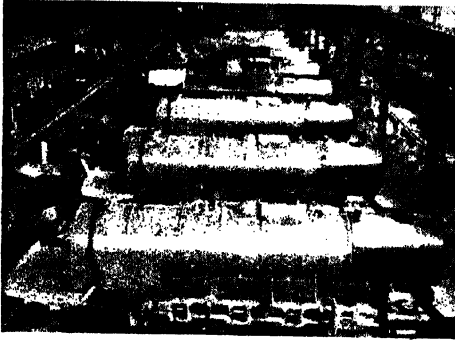
ইরেক্‌টিং শপের একটি দৃশ্য

দ্বারা এক মিলিমিটারের হাজার ভাগের এক ভাগের পরিমাপ করা যাইতে পারে। ওয়ার্কশপে ব্যবহৃত যাবতীয় গেজ এবং পরিমাপ-যন্ত্র এখানে মাঝে মাঝে পরীক্ষা করা হইয়া থাকে।

এই সমস্ত প্রস্তুতি-কার্য্য সমাধা হইলে পরে পূর্ব্বনির্দ্ধারিত উৎপাদন-তালিকা অনুযায়ী পৃথক পৃথক লোকোমোটিভের নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে আলাদা আলাদা অংশ এবং পরস্পরসংশ্লিষ্ট অংশগুলিকে 'ইরেকটিং শপে' লইয়া যাওয়া হয়। যৌগিক অংশ-গুলির (component parts) প্রস্তুতি এবং অংশগুলির একত্রীকরণের সময় যেমন ওয়ার্কশপের নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শন বিভাগের কর্ম্মিগণ তেমনি ইণ্ডিয়া ষ্টোর ডিপার্টমেণ্টের ইন্সপেক্‌টিং অফিসার-গণও উৎকর্ষবিধানের জন্ম সকল সময়ই নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন। এই নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাসমূহ যাবতীয় নির্ম্মাণ-কার্য্যে, এমনকি চূড়ান্ত নির্ম্মাণের (final erection) ক্ষেত্রে এবং লোকোমোটিভের পরীক্ষামূলক চালনার বেলায় পর্য্যন্ত প্রযোজ্য হয়। ইরেক্‌টিং শপে কাজ নিম্নলিখিত রূপে হয় :—প্রথমে বয়লার এবং ক্যাবটিকে (ইঞ্জিনের আচ্ছাদিত অংশ) ফ্রেমে রাখা হয়, এ অবস্থায় বয়লারটিকে আচ্ছাদিত করা হয়। লোকোমোটিভে চাকা ও চালন-যন্ত্র (motion gear) লাগানো এবং ভালভ সেটিং নিয়ন্ত্রিত করা ইত্যাদি যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। অতঃপর লোকোমোটিভকে পরীক্ষামূলক ভাবে চালাইবার ব্যবস্থা করা হয়। ডবল্যু জি শ্রেণীর লোকোমোটিভসমূহের পরীক্ষামূলক চালনার উদ্দেশ্যে ৫৭৩ ফুট ব্যাসার্দ্ধবিশিষ্ট একটি ৫-৬´´ গেজ পরীক্ষণ বর্ত্ম (trial track) পাতা হইয়াছে। এই বর্ত্মে লোকোমোটিভ চালানো হইবার পর কারখানার যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত সমস্ত পরিদর্শন-কার্য্যের পরিসমাপ্তি হয়।
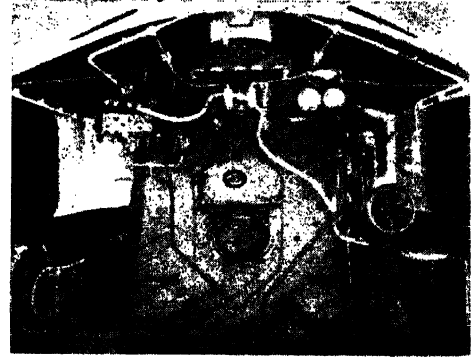
যাবতীয় যন্ত্রপাতি-লাগানো ক্যাব বা এঞ্জিনের আচ্ছাদিত অংশ

এই সমস্ত লোকোমোটিভের গেজ বিভিন্ন বলিয়া এগুলিকে বিশেষ ধরনের ওয়াগনে করিয়া বন্দরে চালান দেওয়া হয় এবং সেখান হইতে বোম্বাইয়ে পাঠানো হয়।
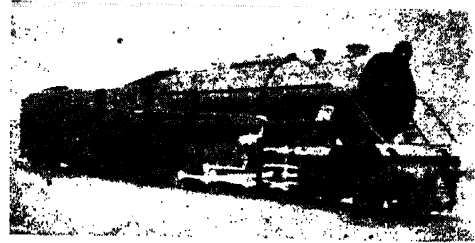
পরীক্ষামূলক ভাবে লোকোমোটিভ চালানো

৬০টি ডবল্যু জি লোকোমোটিভ একটি নির্দ্দিষ্ট চালানি পরি-কল্পনা (delivery plan) অনুযায়ী হেনশেলের ওয়ার্কশপে প্রস্তুত হয়। ইহার প্রথম দফা প্রেরিত হয় আগষ্ট মাসে—অর্ডার প্রাপ্তির মাত্র নয় মাস পরে এবং শেষ দফা পাঠানো হয় ১৯৫৫ সনের জানুয়ারী মাসে।

ভারতের জন্ম এই ডবল্যু জি লোকোমোটিভ-সরবরাহ করা ছাড়া হেনশেল ওয়ার্কশপ জার্ম্মান ফেডারেল রেলওয়েজ-এর নিমিত্ত

ষ্টীম এঞ্জিন এবং কতিপয় ভারী ইলেক্‌ট্রিক এঞ্জিনও উৎপাদন করিয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত উক্ত সংস্থা কয়লার খনিতে ব্যবহারের জন্তও কতকগুলি ভারী বৈদ্যুতিক এঞ্জিন সরবরাহ করে, তদুপরি জার্ম্মান এবং বিদেশী ক্রেতাদের নিমিত্ত কতকগুলি ডিজেল হাইড্রলিক এঞ্জিনও নির্ম্মিত হয়। ম. ভ.

বিশ্বশান্তি ও স্বাক্ষর-সংগ্রহ

শ্রীভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

দেশ ও জাতিনির্বিশেষে বিশ্বের সাধারণ মানুষ আজ শান্তি কামনা করেন। শান্তির স্বরূপ কি, এর সুস্পষ্ট ধারণা সাধারণ মানুষের নেই, কিন্তু একথা সত্য যে, যুদ্ধ যেন না হয়, নিশ্চিন্তে জীবনযাত্রা চলে—বিশ্ববাসী মনে প্রাণে তা প্রার্থনা করেন। আর এই জন্য সাধারণ মানুষের অন্তরের আগ্রহকে রূপায়িত করার প্রচেষ্টায় বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষর-সংগ্রহের কাজে কেউ কেউ আজ উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। আমাদের দেশে বিশিষ্ট স্বাক্ষরকারীদের যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তাতে কিছু নিরপেক্ষ জ্ঞানী-গুণীর নাম দেখা গেছে। বাস্তবিক এই স্বাক্ষর-সংগ্রহ-অভিযানের পিছনে কার্যতঃ কিছু অশান্তিবাদীর দল থাকলেও নিরপেক্ষ আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার লোক মাত্র কয়েক জন আছেন। সেইজন্য প্রশ্ন জাগে, যে মহতী প্রেরণায় তাঁরা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন তার সম্ভাবনা এই অভিযানের মধ্যে আছে কি? এ কথা ত সকলেই জানেন যে, সাধারণ মানুষ শান্তি চাইলেও যাঁরা শাসন-ক্ষমতার অধিকারী তাঁরাই চিরকাল গণতন্ত্রের নামে, স্বাধীনতার নামে যুদ্ধ ডেকে এনেছেন। সুতরাং সাধারণ মানুষের অন্তরের কামনাকে স্বাক্ষর-সংগ্রহের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে কি ঐ ক্ষমতা-অধিকারী, সমরলিপ্সু মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মনে শান্তিস্থাপনার আগ্রহ জাগ্রত করা হবে?

এই প্রশ্নের মধ্যেই সমাজবিজ্ঞানের মূল কথাটি নিহিত। প্রত্যক্ষ চাপ না থাকলেও বহুজনের আকাঙ্ক্ষা কি প্রভুত্বকামী মুষ্টিমেয় লোকের হৃদয় পরিবর্তন করতে পারে? অর্থাৎ, সমাজের পরিস্থিতির পরিবর্তন কি হৃদয়-পরিবর্তনের দ্বারা সম্ভব? বাস্তবিক এই সম্ভাবনার স্বীকৃতিই রয়েছে স্বাক্ষর-সংগ্রহ-অভিযানের মধ্যে। যদিও এই অভিযানের উদ্যোক্তাদের অনেকেই এই স্বীকৃতিকে মেনে নেবেন না। আর তার অর্থ হবে, যে বিশ্বাসের বুনিয়াদ নিয়ে অভিযান সুরু তাকেই অস্বীকার করে অভিযানকে স্বীকার করা। এই রকম স্ববিরোধী মতের সমন্বয়সাধনের ব্যর্থ প্রচেষ্টা শুধু স্বাক্ষর-সংগ্রহ-অভিযানে নয়, সমাজ-রচনার ক্ষেত্রেও চলেছে। ফলে বিশ্বশান্তির পথ পিচ্ছিল হয়ে উঠছে। পরস্পরবিরোধী মতের সমন্বয় করে শান্তি আনবার ব্যর্থ প্রয়াস না করে যদি অনুকূল মতের সামঞ্জস্যবিধান করা যায় তবে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সেজন্য সমাজ-রচনার ক্ষেত্রে এই দিক থেকে সচেতন থাকা দরকার।

শোষণহীন সমাজের প্রতি আকর্ষণ আজ সকলেরই। সেজন্য 'সাম্যবাদে'র আদর্শ যখন শোষণহীন সমাজের এক চিত্র সাধারণের কাছে উন্মোচন করে তখন স্বভাবতঃই মানুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সাম্যবাদ চরম লক্ষ্য রূপে শাসনহীন সমাজকেও স্বীকার করে। তখন বিশ্বশান্তির পথে এই আদর্শ অনেক দূর অগ্রসর বলেই সাধারণতঃ মনে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও পরস্পরবিরোধী মতের সমন্বয়ের চেষ্টায় পথ জটিল হয়ে ওঠে। সাম্যবাদী সমাজ-রচনায় মজুরশ্রেণীর একতা একান্ত আবশ্যক। তাই 'কম্যুনিষ্ট মেনিফেষ্টো'র শেষ নির্দেশ হ'ল 'দুনিয়ার মজুর এক হও'। এই নির্দেশের মধ্যে একটি তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের মজুরদের মধ্যে পারস্পরিক পরিচয়ের অবকাশ খুবই কম, তাদের স্বার্থও সকল ক্ষেত্রে এক নয়। তবু একটি মাত্র স্বার্থসূত্রের মাধ্যমে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন, এই তত্ত্বই সেখানে রয়েছে। সেই স্বার্থসূত্র হ'ল, উৎপাদনের পুঁজি যাদের কাছে তাদের নিকট থেকে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা। কিন্তু স্বার্থরক্ষার উপায় হিসাবে পুঁজিপতির প্রতি বিদ্বেষ জাগ্রত করা হয়। এক দিকে সমশ্রেণীর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান আর অপর দিকে অন্য শ্রেণীর প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি। বিশ্বের মজুরদের সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই; শুধু একটি ক্ষীণ সাধারণ স্বার্থ আছে—এই বোধ থেকে যখন সাধারণ মানুষের মনে ঐক্যভাব জেগে ওঠে তখন নৈতিক স্থিতির একটি বরণীয় গুণের প্রকাশ হয়। কিন্তু এই ঐক্যসাধনের মধ্য দিয়ে যখন আর এক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ঘৃণা ও দ্বন্দ্ব জাগিয়ে তোলার চেষ্টা চলে তখনই মানুষের মনে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই প্রতিক্রিয়া বিশ্বশান্তির অনুকূল নয়। শ্রমিক-

আন্দোলনেও অনুরূপ অবস্থা দেখা যায়। কারখানার বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের স্বার্থ আজ এক নয় বরং তাদের মধ্যেও অসাম্য বর্তমান। তবু মালিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করা হয়। আভ্যন্তরীণ স্বার্থের সংঘাতকে দূর না করে সমষ্টিগত স্বার্থসাধনের সম্ভাবনায় তাকে চেপে রাখা হয়। অর্থাৎ, ভিতরকার অসাম্যকে স্বীকার করে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় যখন শ্রমিক আন্দোলন পরিচালিত হয় তখন অন্তর্বিরোধী মতগুলির সমন্বয়ের চেষ্টা চলে। এর স্বাভাবিক পরিণামস্বরূপ অন্ধ অনুসরণের প্রবৃত্তি দেখা দেয় —একটি বিশেষ মতবাদের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয়, কিন্তু তার জীবনে আদর্শের সঙ্গতি হয় না। বিচার ও আচারের অসঙ্গতি জীবনকে জটিলতর করে তোলে; ফলে বিভিন্ন সমস্যা মাথা তুলে ওঠে আর সেই সমস্যার সমাধানে হিংসাকেই গ্রহণ করা হয়। কেননা সেই অবস্থায় হিংসাই মানুষের একমাত্র অবলম্বন। সুতরাং এই অবস্থাকে স্বীকার করে শুধু স্বাক্ষর সংগ্রহ করলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, বরং উল্টা পথেই যাওয়া হবে।

কিছুদিন পূর্বে বিনোবাজীকে যখন বিশ্বশান্তির জন্য স্বাক্ষর করতে বলা হয় তখন তিনি অস্বীকার করেন। তিনি বলেছিলেন যে, এটম বোমা ও হাইড্রোজেন বোমার কথা চিন্তা না করে আমরা যদি সর্বোদয় প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হই তবেই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অর্থাৎ, আমরা যা কামনা করি তার সজ্ঞান অনুশীলনই সত্যকার শান্তি আনতে পারে। সর্বোদয় সমাজের লক্ষ্যও হ'ল শোষণহীন এবং শাসনমুক্ত সমাজ। কিন্তু সাম্যবাদের মত অন্তর্বিরোধী ভাব-ধারণা ও প্রবৃত্তির উন্মেষের দ্বারা সর্বোদয় তার লক্ষ্যে পৌছবার কথা বলে না। শতদলের দলগুলি যেমন একটি একটি করে বিকশিত হতে থাকে তেমনি শান্তির অনুকূল প্রবৃত্তি ক্রমশঃ সৃষ্টি করতে হবে। শুধু অনুকূল প্রবৃত্তি নয়, অনুকূল পরিস্থিতিরও সৃষ্টি করতে হবে। নইলে মানুষের প্রবৃত্তির ও সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তন না করে স্বাক্ষর-সংগ্রহ বা চুক্তির দ্বারা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। জনগণের আন্তরিক ইচ্ছাকে স্বাক্ষর-সংগ্রহের দ্বারা বলবতী করা যায় না; কাম্য-বস্তুর সাধনায় অন্ধ অনুসরণের পরিবর্তে জীবন-যাত্রায় অভ্যাস বেশী প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। এই জন্য বিনোবাজী তাঁর কাজকে সাম্যযোগ আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, বাদের অর্থ মতবাদ আর যোগের অর্থ অভ্যাস। সাম্যের অনুকূল মনোভাব অনেক দিন আগেই প্রস্তুত হয়ে গেছে, এখন প্রয়োজন অভ্যাস। দর্শন ও কর্মের সঙ্গতিবিধান করেই শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

অসঙ্গতি ও অসাম্য লক্ষ্যের পথে প্রতিবন্ধক। সুতরাং বিশ্বশান্তির লক্ষ্যে পৌছতে হলে জীবনের অসঙ্গতি ও অসাম্য দূর করতে হবে। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় এই পরি-বর্তন ঘটলে শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কতিপয় লোক আপন ইচ্ছায় অশান্তির সৃষ্টি করতে পারবেন না। এই জন্য সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন কেন্দ্রীয় শাসনের ইঙ্গিতের অপেক্ষায় থাকলে চলবে না। স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন প্রয়োজন। তাই এমন একটি কার্যসূচীর দরকার যার দ্বারা ব্যক্তির জীবন ও সমাজের জীবন একসঙ্গেই পরিবর্তিত হতে থাকবে। এইখানেই সার্থক সমন্বয় দেখা দেয়। সর্বোদয়ের স্বীকৃতিও তাই—সমাজ কেন্দ্রীয় শাসনের মুখাপেক্ষী যেন না থাকে, আবার পারস্পরিক সহযোগিতার সূত্রেও যেন বিদ্যমান থাকে। বিনোবাজী ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনকে এই রকমই একটি কর্মসূচী বলে মনে করেন। আর সেজন্য স্বাক্ষর-সংগ্রহ-কারীদের ভূদানের কাজে আত্মনিয়োগ করতে তিনি আহ্বান করেছিলেন। কর্মীদের আহ্বান করে তিনি বলেছেন তাঁরা যেন প্রতি ঘরে এই বার্তাই পৌছে দেন যে, ভূদানে অংশগ্রহণের অর্থ বিশ্বশান্তির পক্ষে ভোট দান। কারণ ভূদান সর্বোদয় প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ—জীবন-পরিবর্তন ও সমাজ-পরিবর্তনের একটি শুভ ইঙ্গিত এর মধ্যে রয়েছে। প্রতিবেশীর স্বার্থের সঙ্গে সাধারণ মানুষ যখন নিজের স্বার্থকে যুক্ত করবে তখন মানুষের মনে এক নূতন আশাবোধ, নূতন প্রবৃত্তির জন্ম হবে। এই আশাবোধ ও নূতন প্রবৃত্তিই বিশ্ব-শান্তির পক্ষে অনুকূল। নইলে শুধু স্বাক্ষর-সংগ্রহের দ্বারা অতি অল্পসংখ্যকের হৃদয় পরিবর্তন করা যাবে না। কেননা ক্ষমতার নেশা মানুষকে উন্মাদ করে দেয়। একটি সক্রিয় কর্মপন্থাই তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এজন্য মনে হয়, স্বাক্ষর-সংগ্রহ-অভিযানে যুক্ত হয়ে হৃদয়-পরিবর্তন নীতি যাঁরা স্বীকার করেছেন তাঁরা সর্বোদয় আন্দোলনে যোগদান করেই বিশ্বশান্তির পথকে সুগম করতে পারেন।

নার্সের পুরস্কার

আঁদ্রে মেগিয়েরি

১৫ই মার্চ্চের অপরাহ্ণকাল। একটি মেয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল বুডাপেষ্টের পার্লামেণ্ট হাউসের উপরে—মাথার চুল তার ঈষৎ বাদামী রঙের, হাতে ভায়োলেট ফুলের একটি ছোট তোড়া।

লবিতে একজন তার পোশাক-পরিচ্ছদ একটু ঠিকঠাক করে দিলে। সে তার রিষ্টওয়াচের দিকে তাকালে, তারপর দ্রুত পা চালিয়ে দিলে। তাকে যে যেতে হবে ঠিক সময়মত, নইলে ব্যর্থ হয়ে যাবে তার জীবনের পরম শুভক্ষণ।

সে বাস্তবিকই তাড়াহুড়ো করছিল, কিন্তু কেতাদুরস্ত বেশভূষা করা সে এক মহা হাঙ্গামা।

ছাত্রীনিবাসে—যেখানে সে অবস্থান করে এবং যেখানে থেকে সে তৈরি হচ্ছিল শেষ পরীক্ষার জন্য—আট জন 'রুম মেট' তার পোশাক-পরিচ্ছদ ইস্ত্রি করবার এবং চুল আঁচড়ে দেবার জন্যে আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করেছিল। প্রকাণ্ড গম্বুজবিশিষ্ট হলের একটা স্তম্ভের নিকটে কতকটা হতবুদ্ধি হয়ে থমকে দাঁড়াল মেয়েটি।

লাল সাদা এবং সবুজ পতাকার পটভূমিকায় মন্ত্রী ও উপমন্ত্রিগণ পরিবৃত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন সভাপতি পরিষদের (Presidential Council) সভাপতি ইস্টভান ডোবি, আর মন্ত্রীপরিষদের চেয়ারম্যান (Chairman of the Council of Ministers) ইমর ন্যাগি।

এই সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে মেয়েটি চিনতে পারল শিক্ষামন্ত্রীকে—একটি বিদ্যালয়ের উৎসবে একবার সে তাঁকে জানিয়েছিল স্বাগত-সংবর্দ্ধনা।

সভামঞ্চের মুখোমুখি চেয়ারগুলি দখল করে বসে ছিলেন প্রায় একশ' জন মহিলা আর পুরুষ। লেখক, শিল্পী, কর্ম্মী, অধ্যাপক, কৃষিজীবী প্রভৃতির এই বিরাট সমাবেশে মেয়েটির উৎসুক দৃষ্টি খুঁজছিল কালো পোশাক-পরা ছোটখাটো একটি নারীকে যিনি···

কিন্তু পক্ককেশবিশিষ্ট এক ব্যক্তি যখন বক্তৃতা করতে আরম্ভ করলেন তখন মেয়েটির মনোযোগ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হ'ল। বৃদ্ধ বলতে লাগলেন :

"পিসেল-এর নার্স আঁদ্রে মেগিয়েরিকে দশ হাজার ফোরিণ্ট-এর 'কোসুথ পুরস্কার' দেওয়া হয়েছে—মাতা এবং শিশুদের সেবা ও তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে তাঁর সফল, একাগ্র কর্ম্মপ্রচেষ্টার জন্য। প্রায় ৮০০০ অধিবাসী সমন্বিত পিসেল গ্রামে শিশুমৃত্যু দ্রুত কমে যাচ্ছে। সেখানে আজ যে গর্ভিণী মায়েদের নিয়মিত ভাবে তত্ত্বাবধান করা হচ্ছে, তার কৃতিত্ব আঁদ্রে মেগিয়েরির। তা ছাড়া আঁদ্রে মেগিয়েরির অনেকগুলো নূতন নার্সারিও সেখানে গড়ে তুলেছেন।

শ্রোতৃমণ্ডলীর করতালি-ধ্বনিতে সভাকক্ষ মুখরিত হয়ে উঠল। মেয়েটির ইচ্ছে হ'ল যে সে এমন ভাবে চেঁচিয়ে ওঠে যেন সকলে তার কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। "মা, আমার মা, ওই যে ছোটখাটো, রোগা মানুষটি ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে কোসুথ প্রাইজ সার্টিফিকেট গ্রহণ করছেন, তিনি যে আমারই মা।"

কাজটা শোভন হবে না অশোভন হবে তা খেয়াল না করেই মেয়েটি সরাসরি চলে গেল তার মায়ের কাছে এবং তাকে নিবিড় ভাবে আলিঙ্গন করল, তার চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

হর্ষধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল সভাকক্ষ। একটি থামের নিকটে একজন রেডিও রিপোর্টার মাইক্রোফোনের সুমুখে দাঁড়িয়ে তাঁর ভাষণ দিচ্ছিলেন। তাঁর কথাগুলি সেই মুহূর্ত্তের আনন্দকে সমগ্র জাতির নিকট বিকীর্ণ করে দিলে।

সেই মুহূর্ত্তে বিদ্যুৎ চমকের মত শ্রীমতী মেগিয়েরির মানসপটে ভেসে উঠল তাঁর অতীত জীবনের ঘটনাবলী। তাঁর মনে পড়ল সেই ছোট্ট গাঁয়ের বিগত দুঃখের কাহিনী যেখানে শিশুদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় মায়েদের সঙ্গে আকুল হয়ে রোদন করতেন তিনি।

কিন্তু আজ অবস্থার কি পরিবর্ত্তন!

সুখী মায়েদের নবজাত শিশুদের পাশে গিয়ে আজ তিনি হন তাঁদের আনন্দের অংশভাগিনী। নিশ্চয়ই তাঁর স্মৃতি-পটে সমুদিত হ'ল সেই দিনগুলির কথা যখন গ্রামে ছিল না কোনো ডাক্তার এবং ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনায় পূর্ণ কত শিশুর জীবন বিনষ্ট হয়ে যেত কুসংস্কার ও দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে।

আজ যে পিসেলের লোকেরা বেতার-ভাষণ শুনছে তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর নাম শুনে অনেক মায়ের চোখ দিয়ে নিশ্চয়ই গড়িয়ে পড়ছে কৃতজ্ঞতার অশ্রু।

যাবতীয় অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হলে পর মিসেস মেগিয়েরি সকলের অভিনন্দন গ্রহণ করলেন—প্রশংসাবাণীর আতিশয্যকে এড়িয়ে গেলেন তিনি।

"এখন আমি আমার গ্রামের জন্যে যে ভাবে কাজ করছি, গাঁয়ের মুক্তির আগেও ঠিক তেমনি ভাবেই কাজ করতাম।

তখন আমি ছিলাম নিতান্ত একা। এখন আমাদের ওখানে অনেক চিকিৎসক আছেন এবং লোকেদেরও অবস্থার উন্নতি হয়েছে। ওখানে আমরা যে এমন সাফল্যলাভ করতে পেরেছি তার মূল রহস্য হচ্ছে এই যে, চিকিৎসক এবং নার্সেরা গর্ভবতী মায়েদের দেখাশুনা করেন এবং তাঁদের উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে থাকেন। আইন তাঁদের দুশ্চিন্তা-রহিত হয়ে বিশ্রাম-গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেয়। গুরুতর পরিশ্রমসাধ্য কাজে সন্তান-সম্ভাবিতা মায়েদের নিয়োগ এবং রাত্রে তাঁদের কাজ করা আইনের বলে নিষিদ্ধ হয়েছে, ডাক্তার নিজে প্রসব-কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন। মায়েদের তিন মাসের জন্য পুরা বেতনে 'মাতৃত্বের ছুটি' মঞ্জুর করা হয় এবং শিশুদের পরিচর্য্যা করবার জন্যে কাজের সময় থেকে কিছু সময় বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। শিশুকে শিশু-রক্ষণাগারে রাখবার ব্যবস্থা আছে—খরচ খুব কম, কয়েকটি ফোরিন্ট মাত্র। সেখানে শিক্ষিত কর্ম্মিগণ তাঁদের দেখাশুনা করে থাকেন।"

"কাজেই স্পষ্টতঃ দেখা যাচ্ছে যে, এক জন নার্সের পক্ষে কোস্যুথ-পুরস্কার-বিজয়িনী হওয়া মোটেই কঠিন নয়—" নিজের বক্তব্য গুটিয়ে এনে মৃদু হেসে বললেন মিসেস মেগিয়েরি। "আসল জিনিষ হচ্ছে নির্ম্মল বিবেকের নির্দ্দেশে নিঃস্বার্থভাবে উৎসাহের সঙ্গে কাজ করা।"

কল্যাণব্রতী 'নাইডু গারু'

কে. শাস্ত্রী

লোকে আদর করিয়া যাঁহাদিগকে 'পান্তলু গারু' এবং 'নাইডু গারু' বলিয়া সম্বোধন করিত, সেই কে. বীরেশলিঙ্গম এবং আর. ভেঙ্কটরত্নম নাইডু হইতেছেন দক্ষিণে বর্ত্তমান ভারতের নব প্রভাতের অগ্রদূত। ইঁহারা একত্রে সামাজিক, ধর্ম্মীয় এবং শিক্ষাবিষয়ক আদর্শসমূহের পরিপূর্ণ পুনরুজ্জীবন দ্বারা এই দেশের দক্ষিণ অঞ্চলকে অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশ হইতে আলোকিত রাজ্যে উন্নীত করেন। দু'জনেই ছিলেন শিক্ষাব্রতী এবং আজিকার দিনে দক্ষিণ-ভারতের সমাজ-জীবনে যে নেতা-ই গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তিনিই দ্রুত বিলীয়মান সে যুগের এই দুই জন অসাধারণ মনীষীর মধ্যে একজনের অথবা উভয়েরই পুরনো ছাত্র কিংবা উদ্যমশীল শিষ্য। তাঁহাদের ছাত্র হওয়া মানেই চরিত্র, সংস্কৃতি, সরল জীবন এবং উচ্চ চিন্তার নিদর্শন-চিহ্ন লাগান। ইঁহারা ছিলেন পরস্পরের অন্তরঙ্গ সহায়ক—নাইডু ছিলেন বক্তা, পান্তলু গারু লেখক। যেমন জীবনে তেমনি মৃত্যুতেও পর্য্যন্ত নাইডু গারু ছিলেন পান্তলু গারুর অনুগামী—নাইডু গারুর মৃত্যু হয় ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে মে, আর পান্তলু স্বর্গারোহণ করেন ইহার দুই দশক পূর্ব্বে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে মে তারিখে।

১৮৬২ সনের মহানবমী তিথিতে মসলিপটমে রঘুপতি ভেঙ্কটরত্নম নাইডুর জন্ম হয়। মসলিপটম পূর্ব্ব-সমুদ্রের তীরবর্ত্তী একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। নাইডু গারু এক মিলিটারি পরিবারের সন্তান। ১৮৬৪ সনের যে ঘূর্ণিবাত্যায় মসলিপটম শহর বিধ্বস্ত হইয়া যায় তাহাতে তিনি প্রাণে বাঁচিয়া থাকেন এবং বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহার চোখ দুটির একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। তাঁহার উন্নত ললাট বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্যের পরিচায়ক। ঘটনাক্রমে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন উত্তর ও মধ্যভারতে। কেননা তাঁহার পিতা সুবাদার আপ্পিয়া নাইডুকে অনবরত নিজের রেজিমেণ্ট সহ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ঘোরাঘুরি করিতে হইত। উর্দ্দু ভেঙ্কটরত্নমের দ্বিতীয় ভাষা হওয়ার ইহাই কারণ এবং পরবর্ত্তী জীবনে এই ভাষায় তাঁহার বিশেষ দখল হয়। তাঁহার শিক্ষক এবং অধ্যাপকগণের মধ্যে ছিলেন ড. অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, মিঃ এ. ই. হোম এবং ড. মিলার। ড. মিলারের সঙ্গে তাঁহার সারা জীবন সম্পর্ক বজায় ছিল এবং উভয়ের মধ্যে পত্রব্যবহারও চলিত।

১৮৮৫ সনে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পাস করিয়া রঘুপতি ভেঙ্কটরত্নম নাইডু 'পিপলস ফ্রেণ্ড' নামক একটি মাদ্রাজী সাপ্তাহিকের সম্পাদকীয় বিভাগে কর্ম্মগ্রহণ করেন। ইহা হইতেই তাঁহার কর্ম্মজীবনের সূচনা হয়। এখানে কিছুকাল কাজ করিবার পর তিনি শিক্ষকতাবৃত্তি অবলম্বন করেন এবং এই কার্য্যে তাঁহার বেশ নাম হয়। তিনি মসলিপটমে নোবল কলেজে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং প্রাথমিক পরীক্ষা পর্ষদের (Primary Examination Board) চেয়ারম্যানরূপে তিন বৎসর কাজ করেন। ইতিমধ্যে ১৮৯১ সনে তিনি ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ ডিগ্রি লাভ করেন এবং ছয় বৎসর পরে এল-টি

ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। ক্রমে তিনি কাকিনাড়া পি. আর. কলেজে অধ্যক্ষের পদে বৃত হন এবং ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

কর্ত্তব্যের আহ্বান আবার তাঁহাকে তাঁহার কর্ম্মজীবনের উন্নতির চরম সীমায় লইয়া গেল, তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্যের পদে বৃত হইলেন—১৯২৫ হইতে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিশেষ কৃতিত্বের সহিত তিনি এই পদ অলঙ্কৃত করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলি দূরপ্রসারী সংস্কার প্রবর্ত্তন করেন। সিনেট এবং সিণ্ডিকেট সভার সদস্য রঘুপতি ভেঙ্কটরত্নম কেবল যে এই গৌরবময় প্রতিষ্ঠানের প্রথম নির্ব্বাচিত উপাচার্য্য ছিলেন তাহা নয়, তিনিই প্রথম বেসরকারী শিক্ষাব্রতী যাঁহাকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক পর্ষদের (Board of University Exminers) সদস্য, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং এস. এস. এল. সি. পর্ষদের অন্যতম সদস্য। ১৯১৪ এবং '১৮ সনে তিনি পাবলিক সার্ভিস রয়্যাল কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে নীতিশিক্ষার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। সরকার কর্ত্তৃক গঠিত শিক্ষা পুনর্গঠন সমিতির (The Educational Re-organisation Committee) চেয়ারম্যানরূপেও তিনি কাজ করিয়াছিলেন।

শিক্ষাব্রতী, বাগ্মী, মহা বিদ্বান, অন্ততঃ এক ডজন নিখিল-ভারতীয় সংস্থার চেয়ারম্যান বা প্রেসিডেণ্ট, কিংবা প্রদেশ বিধান পরিষদের ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট রঘুপতি নাইডু আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়, কিন্তু তিনি তো নন আমাদের একান্ত প্রিয় আপনার জন—যে মহাপ্রাণ, কল্যাণব্রতী অনাথের অশ্রুজল মুছাইয়া দিয়াছিলেন সেই ভেঙ্কটরত্নমই আমাদের অন্তরে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

বহুমুখী সামাজিক সমস্যা সেবামূলক কর্ম্মের সুযোগের ক্ষেত্র উন্মুক্ত করিয়া অনন্তরূপে নিজেকে তাঁহার সমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছিল। অল্প বয়স হইতে সুরু করিয়া তাঁহার সমগ্র জীবন এই আদর্শের জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।

২৭ বৎসর বয়সে পত্নীর মৃত্যুর পর মানবপ্রেমিকরূপে ভেঙ্কটরত্নমের হইল নবজন্মলাভ। জন্মের মাত্র দেড় মাস পরে কি ভাবে তাঁহার প্রথম সন্তানের মৃত্যু হইল সেই মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী বর্ণনাকালে তিনি একথারও উল্লেখ করেন যে, তাঁহার উপর বিরূপ সমালোচকেরা বলেন—ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া সংস্কারপ্রিয় ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার যোগদানই এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। সেই তমসাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনে যিনি ভেঙ্কটরত্নম এবং তাঁহার আদর্শকে তাঁহার নিজের চেয়েও অধিকতর নিষ্ঠার সহিত আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছিলেন—তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণী, এই বিশ্বস্ত জীবন-সঙ্গিনীর অকালমৃত্যুতে তিনি নিতান্ত একাকী এবং বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কয়েকজন গায়ে-পড়া গোঁড়া হিতৈষী অবশ্য তাঁহাকে পুনরায় বিবাহের পরামর্শ দিতে বিলম্ব করে নাই। তিনি কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া আর্ত্ত মানবতার উন্নয়নের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন।

নারীদের উন্নয়নই ছিল মুখ্য বিষয় যাহা তাঁহার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। নৃত্যোপজীবিনী মেয়েদের মধ্যে সংস্কারমূলক কর্ম্মপ্রচেষ্টার তিনিই প্রথম ও প্রধান প্রবর্ত্তক। যে অন্ধকার গহ্বরে তাহারা নিপতিত তাহাকে আলোকিত করিবার প্রয়াস প্রথম তিনিই পান। দক্ষিণের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত বেঙ্কটরত্নম সম্বন্ধে এখনও এমন অনেকগুলি কাহিনী বর্ণিত হইয়া থাকে, যাহা শুনিলে এই মহাপুরুষের দয়ালু স্বভাব, ঔদার্য্য এবং মানুষের প্রতি দরদ প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী যেন জীবন্ত হইয়া মানুষকে মহত্ত্বলাভে উদ্দীপিত করে।

চা-বাগান ইত্যাদিতে নারী-শ্রমিক

শ্রীপদ্মিনী সেনগুপ্তা

অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে প্ল্যানটেশন বা চা কফি রবার ইত্যাদি শ্রমশিল্পের পার্থক্য আছে। খোলা জায়গায় এই কাজ করিতে হয় এবং ইহা একটি বিশিষ্ট ধরণের কৃষিকর্ম্মে শ্রমিক-নিয়োগ। স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে, এই কারণেই কারখানা-সমূহ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগকে চা-বাগান এবং কফি-বাগানে অধিকতর সংখ্যায় কাজে নিযুক্ত করা হয়। ইহা অশিক্ষিত-পটুত্বের কাজ এবং সেই জন্যই হাতে-কলমে কাজ শিখিয়া নৈপুণ্য অর্জ্জনপূর্ব্বক অন্যান্য শিল্পে কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়া অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা এই ধরণের কাজে ঢের বেশী অভ্যস্ত হইয়া থাকে। অধিকাংশ চা-বাগান ও কফি-বাগানই দূরবর্ত্তী স্থানে উচ্চভূমিতে অবস্থিত এবং শ্রমিক সেখানে অনায়াস-লভ্য নহে, তদুপরি এগুলিতে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী শ্রমিক

দল অত্যাবশ্যক, সেই জন্য সাধারণতঃ গোটা পরিবারসমূহকেই কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। বিশেষতঃ অন্যান্য শিল্প অপেক্ষা মজুরির হার কম বলিয়া আর্থিক কারণে পরিবারের প্রত্যেককেই এখানে কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে হয়। ১৯৫১ সনের প্ল্যানটেশন লেবার আইনে বার বৎসরের অধিকবয়স্ক বালক-বালিকাদের কর্ম্মে নিয়োগ নিষিদ্ধ নহে, ব্যক্তিগত ভাবে কর্ম্মী রংরুট করা অপেক্ষা গোটা পরিবারকে কাজে লাগাইয়া দেওয়ার ইহাও অন্যতম কারণ। স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষের চেয়ে কম মজুরি দেওয়া হইয়া থাকে এবং সেই জন্যই তাহারা অধিকতর সংখ্যায় কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া থাকে।

সুতরাং চা-বাগান ইত্যাদিতে নিযুক্ত নারীদের মোট সংখ্যা, অন্যান্য শিল্পে যাহারা নিযুক্ত আছে তাহাদের অপেক্ষা ঢের বেশী এবং ১৯৪৯ সনে শ্রমিক দলের মোট ১১,৪১,৬৪৭ জনের মধ্যে ৫,৩২,৪০৬ জন অর্থাৎ শতকরা ৪৬·৬ জন ছিল নারী। বার বৎসরের অধিকবয়স্কা বালিকারা এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত।

নারীদিগকে সাধারণতঃ চা-পাতা তোলা, কফির গুটি কুড়ানো এবং চা ও কফি বাগান এবং রবারের ক্ষেত নিড়ানোর কাজে নিযুক্ত করা হয়। এই সমস্ত কাজে তাহাদের নৈপুণ্য পুরুষদেরই ন্যায় এবং পাতাসংগ্রহের কাজে (plucking) তাহারা অধিকতর পটু বলিয়া বিবেচিত হয়। চা-বাগানে তাহারা যখন পাতা সংগ্রহ করে তখনকার দৃশ্যটি বড়ই উপভোগ্য। বিশেষতঃ সমুন্নত রূপালি ওক গাছের ছায়ায় ঢাকা কফি ক্ষেতে স্ত্রীলোকেরা যখন অবনত হইয়া কফি গাছের ঝোপ হইতে লাল গুটি সংগ্রহ করে তখন এক চমৎকার শোভার সৃষ্টি হয়। ইউকিলিপ্‌ট্যাসের সুগন্ধ; রূপালি ওক গাছ এবং কফির চারার উপর রোদের ঝিকি-মিকি—দক্ষিণের কফি বাগানের এই সকল মনোহর দৃশ্য দেখিলে সহজে ভুলিতে পারা যায় না। এখানে চায়ের পাতা সংগ্রহ হইতেছে পুরাপুরি নারীদেরই কাজ। আসামে এবং পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু এই কর্ম্মে পুরুষদেরও নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। চায়ের পাতা সংগ্রহ এবং কফির গুটি কুড়ানো এই উভয় কর্ম্মেই নারীরা পুরুষ অপেক্ষা অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। এ ছাড়া স্ত্রীলোকেরা আরো নানা কাজ করিয়া থাকে। বয়স্কা স্ত্রীলোকেরা চায়ের কারখানায় বোঁটা কুড়ানোর কাজ করিয়া থাকে। ভারতীয়দের মালিকানার অধীন চা বাগান এবং চায়ের কারখানাগুলিতে নিযুক্ত নারী-শ্রমিকদের শতকরা হার অপেক্ষাকৃত অধিক। "ভারতীয় চা-বাগানসমূহের কারখানাগুলিতে নিযুক্ত নারী-শ্রমিকদের শতকরা হার ১৩·৪৮, ইউরোপীয় বাগানগুলিতে কিন্তু তাহাদের হার শতকরা ২·১২ ভাগ।"

চা এবং কফি-বাগান ইত্যাদির অধিকাংশই দক্ষিণ-ভারত, পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামে অবস্থিত। শেষোক্ত দুইটি রাজ্যে কেবল চা-বাগান আছে, কিন্তু দক্ষিণে চা, কফি ও রবার এই তিনটিই প্ল্যানটেশনের অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণে—আন্না-মাল্লাই, নীলগিরি, উইনাডে চা-বাগান; কইম্বাটুর, মাদুরা, মালাবার, নীলগিরি, সালাম জেলা এবং কুর্গে কফি-বাগান; এবং মালাবার, কইম্বাটুর, নীলগিরি এবং কুর্গে রবার-ক্ষেত বিদ্যমান। উত্তরে আসাম উপত্যকা, সুরমা উপত্যকা, ডুয়ার্স, দার্জ্জিলিঙ্‌ এবং তরাই অঞ্চলে চা-বাগানসমূহের অবস্থিতি। আসামের চা-বাগানের জন্য শ্রমিক রংরুট করা বরাবরই ছিল দুরূহ কাজ। বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, প্রভৃতি হইতে এজেন্ট বা সর্দ্দারদের মাধ্যমে পরিবারগুলিকে আনাইতে হইত। অবশেষে এক দল স্ত্রীলোক আসামে গিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস সুরু করে—১৯৪৯-৫০-এর শ্রমিকদের মধ্যে তাহাদের হার ছিল শতকরা আটাশ জন। রংরুট এখন 'টি ডিষ্ট্রিক্টস এমিগ্রাণ্ট লেবার এক্ট' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সাম্প্রতিক কালে সর্দ্দারগণকে লাইসেন্স দেওয়া হয়, আসামের রাস্তাঘাটগুলিও অনুমোদিত হইয়াছে এবং যাতায়াত-ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। কোনো বিবাহিতা স্ত্রীলোক স্বামীকে ছাড়িয়া তাহার অনুমতি ব্যতিরেকে আসামে যাইতে পারে না। চা-বাগান-গুলিতে রংরুট-করা পরিবারসমূহের বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে এক সপ্তাহের রেশন, একটি কম্বল এবং রান্নার বাসন-কোসন বিনামূল্যে দেওয়া হয়। ডুয়ার্সে এবং তরাই অঞ্চলে সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুর হইতে বহু শ্রমিক রংরুট করা হইয়াছে। দক্ষিণ-ভারতের কফি-বাগান এবং রবার-ক্ষেতে শ্রমিকদের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের কাঙ্গানী এবং মাইস্ত্রীদের মারফত রংরুট করা হয়। আমার মনে পড়ে যে, আমি কুড়ি বৎসর আগে উড়িষ্যার করাপুর এজেন্সীর রংরুট-করা শ্রমিকদিগকে টি ডিষ্ট্রিক্টস লেবার এসোসিয়েশনে সমবেত হইতে দেখিয়াছিলাম। গোটা পরিবারগুলি তাহাদের যৎসামান্য মালপত্রসহ দুরবর্ত্তী চা-বাগানে চলিয়া গিয়াছিল এবং এই সকল পরিবারের ভাগ্যে কি আছে তাহা ভাবিয়া আমি প্রায়ই অবাক হইতাম। কিন্তু ইহারা সকলে এবং আরো অনেকে সম্ভবতঃ ইতিমধ্যে তাহাদের নূতন পারিপার্শ্বিকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৫১ সনে 'প্ল্যানটেশন লেবার এক্টে' নিম্নলিখিত কথাগুলি ঘোষিত হইয়াছে—"প্রত্যেক মনিবের কর্ত্তব্য হইবে চা-বাগান ইত্যাদিতে অবস্থানকারী প্রতিটি কর্ম্মী এবং তাহার পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় গৃহের ব্যবস্থা করা।"

১৯২৩ সনে এফ. কারজেন লিখিত, 'শিল্পক্ষেত্রে নারী'

নীর্দের একটি রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ডুয়াস অঞ্চলের নারী-শ্রমোপজীবিনীদের বেশ সুস্থ দেখাইতেছিল। জমানো টাকা দিয়া তাহারা জমি কিনিত এবং নিকটবর্ত্তী বস্তিগুলিতে গিয়া তাহারা আশ্রয় লইত। পরিবারসমূহ গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া বাস করিত। এমন একখণ্ড জমি লাভ করা তাহারা পছন্দ করিত যেখানে চাষবাস এবং তাহাদের গৃহপালিত জন্তুগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বাস্থ্যনীতিমূলক যথোচিত ব্যবস্থাদি ছিল না এবং মলমূত্র ত্যাগের জন্য খোলা জায়গা ব্যবহৃত হইত। ইহার দরুন হুকওয়ার্ম ব্যাধি ছড়াইয়া পড়িত, পরিণামে শ্রমিকেরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িত, তাহাদের কর্ম্মক্ষমতা লোপ পাইয়া যাইত। পাহাড়ের ধারকার চা-বাগানগুলিতে স্বাস্থ্যনীতিমূলক ব্যবস্থাদি অবলম্বিত হওয়াতে হুকওয়ার্ম ব্যাধি নিবারিত হইল। আজিকার দিনেও হুকওয়ার্মের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, কিন্তু ১৯৫১ সনের প্ল্যানটেশন লেবার এক্টে যথোচিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ইহার দরুন হুকওয়ার্মের প্রকোপ কমিয়া যাইতেছে।

সম্প্রতি শ্রমিকদের পারিবারিক আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্বন্ধে যে তথ্যানুসন্ধান করা হইয়াছে তাহা কৌতূহলোদ্দীপক। ১৯৪৬ সনে কুনুর নিউট্রিশন রিসার্চ লেবরেটরী কর্ত্তৃক পুষ্টি-বিজ্ঞানের দিক দিয়া 'লেবার ব্যুরোর' তথ্যানুসন্ধান বিশ্লেষিত হইয়াছিল। তাহা হইতে দেখা যায় যে, শ্রমিকদের আহার্য্যের পরিমাণ পর্য্যাপ্ত নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে, আসাম উপত্যকায় দেখা যায় যে, তাহাদের খাদ্যবস্তুতে ক্যালোরির ভাগ কম এবং তাহাতে ক্যালসিয়াম, লৌহ, ভিটামিন 'এ' এবং 'সি' নাই। ইহার আনুষঙ্গিক হিসাবে, ১৯৪৭ সনে মেজর লয়েড জোন্স চা-বাগান ইত্যাদির শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ এবং আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। কুমারী কার্জেলের ১৯২৩ সনের সিদ্ধান্তের সহিত তাঁহার গবেষণালব্ধ বিষয়ের গরমিল পরিলক্ষিত হইল। তিনি প্রমাণ করিলেন যে, শ্রমিকেরা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে এবং তজ্জনিত সাধারণ দুর্ব্বলতায় ভুগিতেছে। "যাহাদের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘনিষ্ঠতর, উত্তর-ভারতের সেই কুলী স্ত্রীলোকদের সঙ্গে এই সমস্ত স্ত্রীলোকের সাধারণ আচরণের যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হইল। চা-বাগানে কাজ করিবার অথবা সংগৃহীত চা-পাতা ফ্যাক্টরিতে লইয়া যাইবার সময় তাহারা বিষণ্ণ নীরবতার সঙ্গে অতি কষ্টে পথ চলে, তাহাদের দৃষ্টি থাকে সামনে মাটিতে নিবদ্ধ।" (ষ্ট্যাণ্ডার্ডস অব মেডিক্যাল কেয়ার ফর টি প্ল্যানটেশনস্ ইন ইণ্ডিয়া —ই লয়েড জোন্স কৃত)। আসামের স্ত্রীলোকদের মধ্যে অত্যন্ত সাধারণ ব্যাধি হইতেছে—ম্যালেরিয়া, আন্ত্রিক অসুখ, রক্তাল্পতা এবং হুকওয়ার্ম। ঘন ঘন সন্তান প্রসবের দরুন চা-বাগানের স্ত্রীলোকদের শরীর দুর্ব্বল হইয়া যায় এবং আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, বহুক্ষেত্রে স্ত্রীলোকেরা একটি সন্তান-প্রসবের সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় গর্ভধারণ করে। ১৯৪৭ সনে আসাম বাংলা এবং দক্ষিণ-ভারতে গড়পড়তা হাজার-করা মাতৃত্বের হার ছিল যথাক্রমে ২১·৫, ২০·১ এবং ১৪। যক্ষ্মারোগের প্রকোপও যথেষ্ট, কিন্তু এখন বি, সি, জি, ভেকসিন দেওয়া হইতেছে এবং ইহা যে সুফল প্রসব করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রসবের পূর্ব্বকালীন এবং পরবর্ত্তী অবস্থা সম্বন্ধেও বিশেষ কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বিত হইতেছে। বিনামূল্যে কড্‌লিভার অয়েল এবং দুধ যোগানো এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। সন্তান-সম্ভাবিতা অবস্থায় স্ত্রীলোকেরা হাসপাতালে যাইতে পারে, বিশেষতঃ যখন সনাতন সংস্কারগুলি দ্রুত বিলীন হইয়া যাইতেছে তখন ইহাতে কোনো বাধা নাই। গৃহে অশিক্ষিতা দাইয়ের হাতে সন্তান-প্রসব-কার্য্যের ভার দেওয়া প্রায়শঃই মাতৃমৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। এই সমস্ত দাইকে লেখাপড়া শিখাইবার এবং আধুনিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি শিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করা উচিত—যেমন কোনো কোনো পাটকলে তাহা হইতেছে। মেজর লয়েড জোন্‌সের মতে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, এবং দক্ষিণ-ভারতে শিশুমৃত্যুর হার—জাত প্রত্যেক এক হাজার শিশুর মধ্যে যথাক্রমে ১৯০, ১৩৪·১ এবং ১২২। প্রত্যেক চা-বাগানেই চিকিৎসা-সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা আছে। ১৯৫১ সনের 'প্ল্যানটেশনস্ এক্ট' অনুযায়ী "এত হারে, এত সময়ের জন্য এবং এত কালান্তরে যথানুমোদিত" 'মেটার্নিটি বেনিফিট' দিতে হইবে। কোনো একটি লেবার ব্যুরো কর্ত্তৃক প্রকাশিত, "ইকনমিক এণ্ড সোশ্যাল ষ্টেটাস অব উইমেন ওয়ার্কার্স ইন ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকে আছে—"চা-বাগান ইত্যাদিতে কর্ম্মরত নারীদিগকে 'মেটার্নিটি বেনিফিট' বা মাতৃনীতি সহায়ক সাহায্য দানের আইনানুগ ব্যবস্থা কেবল আসাম, পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিবাঙ্কুর কোচিন-সরকার কর্ত্তৃক অবলম্বিত হইয়াছে। সে যাই হোক, অন্য কোনো কোনো রাজ্যে কিন্তু চা-বাগান ইত্যাদিতে কর্ম্মে নিযুক্ত স্ত্রীলোকেরা স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে বেনিফিট পাইয়া থাকে। প্ল্যানটেশন লেবার এক্ট অনুযায়ী নিয়মকানুন যখন গঠিত হইয়াছে তখন আশা করা যায় যে, সবগুলি রাজ্যেই চা-বাগান ইত্যাদিতে কর্ম্মরত স্ত্রীলোকেরা মাতৃ-সংরক্ষণ-ব্যবস্থার (Maternity Protection) সুযোগ-সুবিধা পাইবে। উক্ত বিধির ৩২ ধারা অনুযায়ী স্ত্রীলোকেরা সন্তান-সম্ভবা অথবা প্রত্যাশিত সন্তান-সম্ভবা অবস্থায়

তাহাদের মনিবের নিকট হইতে মাতৃত্ব ভাতা (Maternity allowance) পাইবার অধিকারিণী। ইহার হার, 'বেনিফিটে'র কাল ইত্যাদি আইন-কানুন অনুযায়ী নির্দ্ধারিত হইবে।"

চা-বাগান ইত্যাদিতে নারীদের উপার্জ্জনের পরিসংখ্যান যোগাড় করা সহজসাধ্য নহে এবং এ পর্য্যন্ত এগুলি একান্ত অনায়াসে পাওয়া গিয়াছে আসামের চা-বাগানসমূহে। ১৯২৯-৩০ সনে নারী-শ্রমিকের মাসিক রোজগার ছিল ৮/২ পাই, ১৯৪৯-৫০-এ তাহা দাঁড়ায় ১৫৸৴১ পাইয়ে। সেক্ষেত্রে এক জন পুরুষের মাসিক উপার্জ্জন ১৯৪৯-৫০ সনে ছিল ২১৸৫ পাই। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, নারী এবং পুরুষের উপার্জ্জনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে এবং চা-বাগান ইত্যাদিতে উভয়কে সমান বেতন দেওয়া হয় না। চা-বাগানের কর্ম্মে নারীদের অপেক্ষাকৃত অধিকতর অনুপস্থিতি ইহার কারণ হইতে পারে। ১৯৪৭ সনে লেবার বুরো কর্ত্তৃক পরিচালিত একটি এড হক বা বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনমূলক অনুসন্ধান সমিতির রিপোর্টে দেখা যায় যে, নারী-শ্রমিকদের মধ্যে অনুপস্থিতির হার ছিল অত্যন্ত উচ্চ শতকরা ত্রিশ জন, আর সে ক্ষেত্রে পুরুষদের অনুপস্থিতির হার শতকরা ২২ থেকে ২৩ জন। বস্তুতঃ, রোজগারের অঙ্ক হইতে আপাতদৃষ্টিতে যাহা প্রতীয়মান হয়, নারী এবং পুরুষের মাসিক সম্ভাব্য উপার্জ্জন তদপেক্ষা কতকটা স্বল্প পরিমাণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ১৯৪৯-৫০ সনে আসামের চা-বাগানগুলিতে নারী-শ্রমিকদের মাসিক নগদ উপার্জ্জন দাঁড়ায় ১৯।৵৫ পাইয়ে, আর সে ক্ষেত্রে পুরুষদের উপার্জ্জন ছিল ২৪॥৴৩ পাই। (ইকনমিক এণ্ড সোশ্যাল ষ্টেটাস অব উইমেন ওয়ার্কার্স ইন্ ইণ্ডিয়া)

ঋতু অনুযায়ী এবং কখনো কখনো বিশেষভাবে বর্ষাকালে যখন লোকের হাতে কম কাজ থাকে তখন উপার্জ্জনের হার উঠা-নামা করে। বিভিন্ন রাজ্য সরকার ১৯৪৮-এর মিনিমাম ওয়েজেস এক্ট বা সর্ব্বনিম্ন বেতনের আইন অনুসারে 'টাইম রেট' কর্ম্মীদের জন্য বেতন নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। আসাম এবং মাদ্রাজে স্ত্রীলোক রোজ ১৲ টাকা পর্য্যন্ত এবং ত্রিবাঙ্কুরে ১৵৩ পাই পর্য্যন্ত রোজগার করিতে পারে। কিন্তু 'টাইম রেট' ব্যবস্থায়ও পুরুষ-কর্ম্মীকে নারী-কর্ম্মী অপেক্ষা বেশী মজুরী দেওয়া হয়। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, পুরুষদের কাজ অধিকতর পরিশ্রমসাধ্য।

ফ্যাক্টরিগুলিতে কাজের সময় সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা, চা-বাগান ইত্যাদিতে কিন্তু সাপ্তাহিক কার্য্যকাল ৫৪ ঘণ্টা। কাজের জন্য প্রতীক্ষা করিতে যে সময়টুকু যায় তাহা লইয়াও কাজের বাড়তি সময় কিন্তু দশ ঘণ্টার বেশী হইতে পারে না। সাত দিনের মধ্যে একদিন বিরতি-দিবস বলিয়া গণ্য হইবেই এবং অন্ততঃ আধ ঘণ্টা বিশ্রাম না করিয়া কোনো কাজের 'শিফ্‌ট'ই পাঁচ ঘণ্টার বেশী চলিতে পারে না। এমন কি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াও কোনো কর্ম্মী এক দিন বিশ্রাম না করিয়া একাদিক্রমে দশ দিনের বেশী কাজ করিতে পারে না। কোনো স্ত্রীলোক সকাল ছয়টা হইতে সন্ধ্যা সাতটা এই সময় ছাড়া অন্য সময়ে কাজ করিতে পারে না। শিশু এবং কিশোরগণকে সপ্তাহে চল্লিশ ঘণ্টার অধিক কাজ করিতে দেওয়া হয় না। বার বৎসরের অধিকবয়স্ক যে সকল শিশু চা-বাগান ইত্যাদিতে কাজ করে, তাহাদিগকে নিজেদের উপযুক্ততা প্রমাণ করিবার জন্য চিকিৎসকের সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হয়। বার বৎসরের নিম্নবয়স্ক কোনো ছেলেকে কাজ করিতে দেওয়া হয় না। উত্তরে স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ দৈনিক সাত ঘণ্টা এবং দক্ষিণে স্ত্রীলোকেরা দৈনিক আট ঘণ্টা চা-বাগান ইত্যাদিতে কাজ করিয়া থাকে, যদিও আইন ১২ ঘণ্টা কাজ করিবার অনুমতি দিয়া থাকে। আসাম এবং বাংলায় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের কাজের সময় দীর্ঘতর হয়, কেননা পুরুষেরা চার-পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে কাজ শেষ করিয়া ফেলে, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা সাত হইতে আট ঘণ্টা পর্য্যন্ত পাতা সংগ্রহে ব্যয়িত করিয়া থাকে। চা-বাগান ইত্যাদিতে কাজের সময় সম্বন্ধে কড়াকড়ি নাই। গ্রীষ্মকালে পরিবেশ এমন প্রতিকূল থাকে যে, তখন কাজ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। তখন উত্তপ্ত প্রচণ্ড সূর্য্য কর্ম্মীদের উপর অগ্নিবর্ষণ করিতে থাকে, এবং তাহারা অল্পমাত্র ছায়া পায়, অথবা একেবারেই পায় না। মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের সময় নগ্নপদ শ্রমিকদিগকে জোঁকের কামড়ে বড় দুর্ভোগ ভুগিতে হয়—আসামের চা-বাগানগুলি জোঁকে জোঁকে একেবারে ছাইয়া আছে। দক্ষিণে যে সকল পাহাড়-অঞ্চলে চা-বাগান এবং কফি-বাগান অবস্থিত সেখানকার শীত এবং বিরক্তিকর বৃষ্টির মধ্যে কাজ করা শ্রমিকদের পক্ষে এক কঠোর পরীক্ষা বটে!

যেখানে পঞ্চাশ জনের অধিক নারী কর্ম্মে নিযুক্ত, 'প্ল্যানটেশনস্ লেবার এক্ট' সেখানে শিশু-রক্ষণাগার প্রতিষ্ঠার জন্য জোর দিয়া থাকে। কিন্তু যেখানে এরূপ কোনো সুযোগ-সুবিধা নাই সেখানে কাজ করিবার সময় স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের শিশুগণকে পিঠে বহন করিতে হয় এবং আইনটিও কিছুদিন হইল প্রণয়ন করা হইয়াছে বলিয়া উহাকে এখনো কাজে লাগানো হয় নাই। "চা-বাগানে নারী-শ্রমিকদিগকে আর একটি অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়—তাহা এই যে, তাহাদিগকে সংগৃহীত চায়ের পাতা কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী, ফ্যাক্টরিতে বহিয়া লইয়া যাইতে

হয়।" চায়ের ক্ষেতে যদি পাতা ওজন করিবার ব্যবস্থা করা হইত তাহা হইলে এই অসুবিধা পরিহার করা সম্ভবপর হইত এবং নারী-শ্রমিকদের এই কঠোরতারও লাঘব হইত। ("ইকনমিক এণ্ড সোশ্যাল ষ্টেটাস্ অব উইমেন ওয়ার্কাস অব ইণ্ডিয়া)।"

বস্তুতঃ চা-বাগান ইত্যাদিতে নারীর দৈনন্দিন জীবনকে কিছুতেই আরামের জীবন বলা যায় না। গোটা পরিবারের জন্য রান্না করিবার নিমিত্ত অতি প্রত্যুষে তাহাকে উঠিতে এবং ছয়টার মধ্যে কাজে বাহির হইয়া পড়িতে হয়। দিনের কাজের শেষে ঘরে ফিরিয়া সে জল এবং কাঠ আনিতে যায়, তারপর তাহাকে পুনরায় রান্না করিতে হয়। জীবিকার কাজের উপর ঘর গৃহস্থালির কাজে তাহার আরো পাঁচ ঘণ্টা ব্যয়িত হয়। উৎসব, বিবাহ-অনুষ্ঠান এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে যা একটু তার দৈনন্দিন একঘেয়েমির ব্যতিক্রম হয়—ইহা ছাড়া কোন সামাজিক আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা তাহার জন্য নাই। ট্রেড ইউনিয়নের প্রতি, অন্যান্য শিল্পে যাহারা কাজ করে তাহাদের অপেক্ষা চা-বাগান ইত্যাদিতে কর্ম্মে নিযুক্ত নারীদের অধিকতর আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়—এক্ষেত্রে তাহাদের শতকরা হার সর্ব্বোচ্চ। ১৯৪৯-৫০-এ এই হার ছিল শতকরা ২৫·৮—যাহারা রীতিমত এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা ৩৬,০৬৩।

চা-বাগান ইত্যাদিতে কর্ম্মে নিযুক্ত স্ত্রীলোকদের শিশুদের জন্য অধিকতর সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন। এ সম্পর্কে একটি সাম্প্রতিক তথ্যানুসন্ধানমূলক রিপোর্ট হইতে নিম্নে বিশদভাবে উদ্ধৃত করা হইতেছে—"চা বাগানে শিশুরক্ষণাগার-প্রতিষ্ঠা-ব্যবস্থার কোনো উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। পরিদর্শন-তালিকার অন্তর্ভুক্ত ৩৮টি চা-বাগানের মধ্যে মাত্র পাঁচটিতে—মায়েরা কাজে নিযুক্ত থাকাকালে শিশুদের দেখাশুনা করিবার ব্যবস্থা আছে, এমনকি এই পাঁচটিতে পর্য্যন্ত শিশুরক্ষণ-ব্যবস্থা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। এগুলিতে এমন দু'একটি মাত্র কাঁচা শেড আছে যেখানে মায়েরা একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের হেফাজতে শিশুদের রাখিয়া কাজে যাইতে পারে। মধ্যাহ্নকালে চায়ের পাতা ওজন করিবার জন্য যে ধরনের চালাঘর ব্যবহৃত হইত, সাধারণতঃ শিশুরক্ষণের এই শেডগুলি ছিল সেই ধরনের। এতৎসম্পর্কে চা-বাগানের অনেক ম্যানেজার এই মর্ম্মে বিবৃতি প্রদান করেন যে, এক সময়ে বাগানে শিশু-রক্ষণাগারের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, কিন্তু এগুলি জনপ্রিয় বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই এবং তৎকালে শিশু-রক্ষণাগারের ব্যবস্থা যদিও-বা করা হইত, সেগুলি কিন্তু ব্যবহৃত হইত না। যতদূর জানা যায়, দেশের কোনো কোনো ফ্যাক্টরিতে চালু শিশু-রক্ষণাগারের অনুরূপ রক্ষণাগারের ব্যবস্থা কোনো চা-বাগানেই হয় নাই। শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে অর্জ্জিত অভিজ্ঞতার কথা বিচার করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না যে, যদি এমন সব প্রকৃত শিশু-রক্ষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয় যেগুলিতে উপযুক্ত কর্ম্মীবৃন্দ সেবাকার্য্যে রত থাকিবে, যেগুলিতে শিশুদিগকে যথোচিতভাবে খাওয়ানোর সুযোগ-সুবিধা থাকিবে এবং যেখানে নারী-শ্রমিকদের এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইবে যে, তাহাদের শিশুদের তত্ত্বাবধান উত্তমরূপেই করা হইবে তাহা হইলে চা-বাগান ইত্যাদির একটি দীর্ঘকাল-অনুভূত অভাব দুরীভূত হইবে এবং এই সমস্ত শিশু-রক্ষণাগার কেবল যে প্রয়োজনীয় বলিয়াই প্রমাণিত হইবে তাহা নয়, এগুলি জনপ্রিয়তাও অর্জ্জন করিবে। কারখানা অপেক্ষা চা-বাগান ইত্যাদিতে শিশু-রক্ষণাগারের প্রয়োজনীয়তা অধিকতর, কেননা এখানে শুধু যে নারী-শ্রমিকের আনুপাতিক সংখ্যা ঢের বেশী তা নয়, পরিবারের সকল পূর্ণবয়স্ক লোকেই এখানে কাজ করিয়া থাকে। বর্ত্তমানে স্ত্রীলোকেরা যখন চা-বাগানে কাজ করে তখন ছোট ছোট শিশু এবং কাচ্চাবাচ্চারা যেভাবে তাহাদের পিঠে বাঁধা থাকে তাহা দেখিলে কষ্ট হয়" ('প্ল্যানটেশন লেবার ইন্ আসাম ভ্যালি'।)

যেখানে পঁচিশটির অধিক শিশু আছে, আইন সেখানেই কিন্তু ক্যানটিন, শিশু-রক্ষণাগার, প্রমোদানুষ্ঠান, বিদ্যালয় ইত্যাদির ব্যবস্থা করার সমর্থন করিয়াছে। আইন-প্রণয়ন এবং ক্রমবর্দ্ধমান সমাজ-চেতনার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থারও উন্নতি হইতেছে। 'দি ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েশন' নামক সমিতি কর্ত্তৃক পঞ্চবিধ কল্যাণ-কর্ম্ম-সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে যেখানে গৃহস্থালি, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি, সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে। নাট্যাভিনয়, লোকগীতি, সান্ধ্য-ক্লাস এবং অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও করা হইবে। চা-বাগান ইত্যাদিতে নারী-শ্রমিকেরা সংহতভাবে গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া বাস করে, কাজেই আজিকার দিনে সরকার যখন ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন তখন চা-বাগানগুলিতে ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নারীদের পক্ষে উত্তম বলিয়া বিবেচিত হইবে। কেননা ইহা কার্য্যে পরিণত হইলে ক্রমাগত সন্তান-প্রসবের—যাহা তাহাদের জীবনীশক্তিকে তিলে তিলে ক্ষয় করিয়া আনে, অতিরিক্ত বোঝা আর তাহাদিগকে বহন করিতে হইবে না। ফলতঃ আজ রাজ্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান, ট্রেড ইউনিয়ন এবং স্বেচ্ছাকর্ম্মীদের পক্ষে নারী-শ্রমিকদের অধিকতর কল্যাণ-সাধন করিবার প্রভূততর অবকাশ রহিয়াছে—এই সকল কল্যাণকর্ম্ম যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইলে চা-বাগান ইত্যাদির নারীকর্ম্মীর ভবিষ্যৎ সুখময় ও অধিকতর অনুকূল হইয়া উঠিবে।

'অবাঞ্ছিত' শিশুসন্তান

বর্ত্তমানে বাঙ্গালোরে যে সকল সমাজ-কল্যাণ-কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তৎসমুদয় প্রবর্ত্তিত হয় বাঙ্গালোরের শেফার্ড কনভেণ্ট কর্ত্তৃক ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে। 'সিষ্টার'রা ছিল দরিদ্র এবং স্থানের অভাবে তাহাদের কর্ম্মও ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু তাহাদের অপেক্ষাও যাহারা নিঃস্ব তাহাদের সঙ্গে তাহারা নিজেদের দারিদ্র্যকে ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছিল। পরিবারে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়াছে এই অজুহাতে যে সকল কুমারী-মাতাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করা হয়, সেই সকল পরিত্যক্তা এবং নৈরাশ্যগ্রস্তা মেয়েদের পুনর্ব্বসতির বন্দোবস্ত করা ছিল শেফার্ড কনভেণ্টের লক্ষ্য।

এখানে সন্তান-সম্ভাবিতা জননীদের গ্রহণ করা এবং আশ্রয় দেওয়া হইত। নার্সারি ছিল দুইটি—একটি ভারতীয় শিশু এবং তাহাদের মায়েদের জন্য ও অপরটি এংলো-ইণ্ডিয়ানদের নিমিত্ত। বাঙ্গালোরের শুলেতে এই কার্য্য ১৮৬৪ সন হইতে ১৯২২ সন পর্য্যন্ত পরিচালিত হইয়াছিল। শিশুরা বড় হইয়া হাঁটি হাঁটি পা পা করিয়া চলিতে শিখিলে এবং স্কুলে যাইবার বয়সে পা দিলে তাহাদিগকে একটা-না-একটা অনাথ-আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত হইতে হইত এবং বিদ্যালয়ে গিয়া নিজেদের মাতৃভাষা তামিল অথবা ইংরেজীর মাধ্যমে লেখা-পড়া করিতে হইত। তাহাদের মায়েরা তখন স্বাধীনভাবে নিজেদের জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিত এবং সাধারণতঃ তাহারা নিজেদের বাড়ীতে স্বজনবর্গের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন অথবা বিবাহ করিত। পার্থিব জিনিষের মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর সেই শিশুর জন্য মায়ের ভালোবাসা বিনষ্ট করিবার কোন চেষ্টাই করা হইত না, বরং তাহাদিগকে একথা স্মরণ করিবার জন্য উৎসাহিত করা হইত যে, ছোট বাচ্চাদের প্রতি যথাযথ মনোভাব অবলম্বন করিলেই তাহাদের অপরাধের প্রতিবিধান হইবে। তাহাদের উচিত ঐ সকল শিশুকে ভালবাসা, তাহাদের যত্ন-আত্তি করা, তাহাদের জন্য কাজকর্ম্ম করা আর যদি যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় অথবা সম্ভবপর হয় তবে তাহাদিগকে নিজের বলিয়া দাবি করা।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে শেফার্ড কনভেণ্টের আশ্রিতদের সংখ্যা হাজারের উপর দাঁড়াইল। তখন ইহা উপলব্ধ হইল যে, শিশু এবং মায়েদের প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত নিরালা পারিপার্শ্বিক, অধিকতর নিভৃতি, বিশুদ্ধ বায়ু এবং স্বচ্ছন্দতর গতিবিধি। প্রভূত স্বার্থত্যাগের ফলে পুরনো মাদ্রাজ রোডের উপরে আলসুরে একটি সম্পত্তি ক্রয় করা হইল; মাতৃমঙ্গল বিভাগ সেখানে স্থানান্তরিত এবং সেণ্ট মাইকেলস নামে অভিহিত হইল। তার পর হইতে ত্রিশ বৎসর যাবৎ ইহা, গৃহহারা আশাহীন এবং অসহায়দের গৃহ ও আশ্রয়স্থল-স্বরূপ গণ্য হইয়া আসিতেছে। শিশুর জন্মের পূর্ব্বে এবং পরে ইহা নৈরাশ্যগ্রস্তা মাতাকে আশ্রয় দিয়াছে, তাহার মনের লুপ্ত বিশ্বাস পুনরুজ্জীবিত করিয়া এবং তাহার নিজের আবেষ্টনে সে যে নূতন এবং উৎকৃষ্টতর জীবন গঠন করিয়া তুলিতে পারে তাহার মনে এই জ্ঞান ও ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিয়া আবার তাহাকে তাহার নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে ফেরত পাঠাইয়াছে।

যদিও সেণ্ট মাইকেলস-এ তাঁতবোনা, এবং ফলমূল উৎপাদন ইত্যাদি বহু শিল্প লইয়া পরীক্ষণ হইয়াছে তথাপি তরুণী মায়েদের উপযোগী বৃত্তির ব্যবস্থা করা কিন্তু দুরূহ ব্যাপার বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভর্ত্তি করিবার সময় দেখা যায় যে, অধিকাংশই ভগ্নস্বাস্থ্য, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে দুর্ব্বল ও অবসাদগ্রস্ত। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, সূচীশিল্প প্রভৃতির মত যে সকল বৃত্তিতে অল্প খাটুনির প্রয়োজন সেগুলি তাহাদের পক্ষে সকলের চেয়ে বেশী উপযোগী। কিন্তু সেগুলি হইতে পারিশ্রমিক খুব বেশী পাওয়া যায় না।

বদান্যতার জন্য সেণ্ট মাইকেলসের খ্যাতি ইহাকে পরিণত করিয়াছে সমাজের তথাকথিত অবাঞ্ছিতদের স্বর্গধামে। কেবল দরিদ্র ও বুভুক্ষু মাতারাই যে এখানে স্থান হয় তেমন নহে, শিশুদিগকেও এখানে আনা হয় এই বিশ্বাসে যে, এখানে কেহই প্রত্যাখ্যাত হয় না। শিশুরা প্রায়শঃই এখানকার দোরগোড়ায় নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়—তাদের পিতামাতার কোন পাত্তাই পাওয়া যায় না। এখানে আশ্রিতা মায়েদের গর্ভজাত অনেক শিশুই জন্ম হইতে রোগে অথবা মাতার দুর্ব্ব্যবহারে কষ্টভোগ করে। এই ছোটদের জীবনকে ভাল করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা সত্ত্বেও সকল সময় তাহা সম্ভবপর হয় না। বর্ত্তমানে তরুণী মাতারা হাসপাতালে হাজিরা দেয়, সেখানে প্রসবের পূর্ব্বে এবং পরে উভয় অবস্থায়ই তাহাদের প্রতি যথোচিত যত্ন লওয়া হয়।*

---

* "সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার" হইতে।

আশুতোষ চক্ষু-চিকিৎসালয়

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়

গান্ধী-আন্দোলনের গতিবেগ শহরের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া শতমুখে গ্রামের দিকে ছুটিয়াছিল। কর্ম্মিদলের মন গান্ধীভাবধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়া গ্রামমুখী হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে গ্রাম-মুখীনতার অনুশীলন ছিল কর্ম্মিবৃন্দের প্রতি গান্ধীজীর অন্যতম প্রধান নির্দ্দেশ। ইংরেজ আমলে গ্রামের প্রাণশক্তি গ্রাস করিয়া শহরগুলি স্ফীত হইয়াছে। তাই বঙ্কিমচন্দ্র একদিন শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যাইতেছে দেখিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "দেশের যে অতি ক্ষুদ্র অংশে বুদ্ধি, বিদ্যা, ধন, মান সেই শতকরা পাঁচ পরিমাণ লোকের সঙ্গে পঁচানব্বই পরিমাণ লোকের ব্যবধান মহাসমুদ্রের ব্যবধানের চেয়ে বেশী। আমরা এক দেশে আছি অথচ আমাদের এক দেশ নয়।"

ডাঃ আশুতোষ দাস

গ্রাম ও শহরের, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের শতকরা পাঁচ এবং শতকরা পঁচানব্বই-এর এই বিচ্ছেদ ঘুচাইবার জন্য গান্ধীজী নানা গঠনকর্ম্মের আয়োজনের মধ্যে গণ-সংযোগের পথ খুলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহর একত্র হাত ধরিয়া না দাঁড়াইলে স্বাধীনতালাভ সম্ভব হইবে না।

চক্ষু-চিকিৎসালয় সম্পর্কে এই ভূমিকাটুকু 'ধান ভানিতে শিবের গীতের' মত শুনাইতে পারে। তথাপি একথা সত্য যে চক্ষু-চিকিৎসালয় একদা হুগলী জেলার সুদূর পল্লী অঞ্চলে সেবার সূত্রে গণ-সংযোগের পথ খুলিয়া দিয়াছিল, সেই কথাই এক্ষণে সংক্ষেপে বলিতেছি।

ডাক্তার আশুতোষ দাস ছিলেন হুগলী জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কংগ্রেসসেবী। বাংলার বিপ্লব-কর্ম্মের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকেন। এই সময় তিনি ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের অন্যতম সহকর্ম্মী ছিলেন। তার পর গান্ধী-আন্দোলনের গতি বুঝিয়া তিনি শহর ছাড়িয়া গ্রামে গিয়া বসেন। স্বাধীনতার উপাসক আশুতোষ দেশসেবায় আপন তনু-মন-ধন সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছিলেন—নিজের বলিতে কিছু রাখেন নাই। গ্রামে বসিয়া তিনি গণ-সংযোগের কার্য্যে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন (বর্ত্তমানে

চোখের ছানি কাটায় রত ডাঃ শ্রীঅনাদিচরণ ভট্টাচার্য্য

মন্ত্রী) প্রমুখ কর্ম্মিগণকে সহযোগী হিসাবে পান। আদর্শের অনুসরণে তাঁহাদের সম্পর্ক ত্যাগ ও নিষ্ঠার নিয়ত স্পর্শে শতদলের মত বিকশিত হইয়া উঠে। তাঁহার সম্বন্ধে জনৈক কর্ম্মী বলিয়াছেন, "চিরকুমার আশুদা হুগলী জেলার কর্ম্মীদের মধ্যে নিজেকে একেবারে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ঘর ছিল আমাদের সকলের ঘর, তাঁহার অন্ন ছিল আমাদের সকলের অন্ন, তাঁহার অর্থ ছিল আমাদের সকলের অর্থ। তিনি ছিলেন কর্ম্মীদের সকলের, আর কর্ম্মীরা ছিল তাঁর নিতান্ত আপনার।"

গ্রামে বসিয়া গণ-সংযোগের সূত্রেই চক্ষু-চিকিৎসালয়ের পরিকল্পনা মনে আসে। দেখা যায় বহু গ্রামে লোকে চোখে ছানি পড়িয়া দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছে। কলিকাতার হাসপাতালে ভর্ত্তি হইয়া

চোখের ছানি তুলাইয়া আসিবে এমন সাহস, শক্তি, যোগাযোগ ও ভরসা তাঁহাদের কস্মিন্‌কালেও হয় না। আশুতোষ সুদূর পল্লীতে ইহাদের জন্য চোখের ছানি তুলাইবার ব্যবস্থা করেন। ইহারা সব আমাদের দেশের "মূঢ়, ম্লান, মূক"—"শ্রান্ত, শুষ্ক, ভগ্ন"।

আশুতোষ চক্ষু চিকিৎসালয়ে ছানি তোলার পর চোখ বাঁধা রোগী

চক্ষু-চিকিৎসালয় ছিল সাময়িক। কাহারও আটচালায় বা বড় ঘরে চিকিৎসালয় খোলা হইত। কোন কোন স্থলে গ্রামের লোক খড়, বাঁশ, দড়ি প্রভৃতি দিয়া নিজ হাতে চালা তুলিয়া দিত এবং তাহার ভিতর চিকিৎসালয় বসিত। চক্ষে অস্ত্রোপচারের আয়োজন ও পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক—আর সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর ছিল চক্ষু-চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা। ছানি তুলিবার পর দশ হইতে পনর দিন পর্য্যন্ত রোগীদিগকে চক্ষু-চিকিৎসালয়ে রাখিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিতে হইত। বেড প্যান্ দিয়া মলমূত্র পরিষ্কারের ব্যবস্থা, রোগীদের পার্শ্বে পালা করিয়া চব্বিশ ঘণ্টা বসিয়া থাকা, তাহাদের যথাসময়ে আহার দেওয়া প্রভৃতি সকল কার্য্য গ্রামের কর্ম্মিগণই করিত। গ্রামের মেয়েরা মেয়ে রোগীদের সেবা করিত—দেখা গিয়াছে হিন্দুঘরের মেয়ে-কর্ম্মী মুসলমান বৃদ্ধার মলমূত্র অম্লান মুখে পরিষ্কার করিয়াছে। ডাক্তার আশুতোষ সকলের মধ্যে থাকিয়া প্রতিটি কর্ম্মের ব্যবস্থা করিতেন।

প্রথম চক্ষু-চিকিৎসালয় খোলা হয় ১৯৩৪ সনে আরামবাগ মহকুমার বন্দর গ্রামে। বন্দর গ্রাম শিলাবতী ও দ্বারকেশ্বরের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত—এই স্থানে ঐ দুই নদী মিলিয়া রূপনারায়ণ নাম লইয়াছে। বি. এন. রেলের কোলাঘাট ষ্টেশন হইতে ষ্টীমার-যোগে রাণীচক প্রায় ৩০ মাইল, রাণীচক হইতে নৌকাযোগে বন্দর পাঁচ মাইল। এই স্থানে ছাব্বিশ জনের চোখের ছানি তোলা হয়। ১৯৩৫ সনে চক্ষু চিকিৎসালয় বসে বড়ডোঙ্গল গ্রামে। বন্দর হইতে দ্বারকেশ্বর নদী ধরিয়া উপরদিকে বার মাইল দূরে বড়ডোঙ্গল। এইখানে "সাগরকুটীর"-এ চৌদ্দ জনের ছানি তোলা হয়। ১৯৩৬ সনে ছানি তোলার কার্য্য হয় নৌকুণ্ডা গ্রামে। এই গ্রাম আরামবাগ মহকুমার গো-ঘাট থানায়, বড়ডোঙ্গল হইতে ছয় মাইল পশ্চিমে আমোদর নদীর তীরে। এই স্থানে ছানি তোলার সংখ্যা ১১। ১৯৩৭ সনে রাজবলহাট গ্রামে চোখের হাসপাতাল খোলা হয়। রাজবলহাট হাওড়া-চাঁপাডাঙ্গা রেলপথের আঁটপুর ষ্টেশন হইতে প্রায় চার মাইল পশ্চিমে। এখানে পঁচিশ জনের চোখের ছানি তোলা হয়। উপরি-উক্ত চারটি গ্রামে চোখের ছানি তুলিয়া দেন ডাক্তার শ্রীনিমাইচন্দ্র রায়, এম, ডি (জার্ম্মেনী)।

ছানি তোলার পর চোখ বাঁধা আর কয়েকজন রোগী

তার পর ১৯৩৮ সালে হুগলী সদর মহকুমায় ধনিয়াখালি গ্রামে ডাক্তার শ্রীঅনাদিচরণ ভট্টাচার্য্য ও ডাক্তার সুবোধ গাঙ্গুলী ১৯ জনের চোখের ছানি তুলিয়া দেন। ১৯৩৯ সনে হরিপাল গ্রামে ও ১৯৪০ সনে ফতেপুর গ্রামে ডাক্তার শ্রীঅনাদিচরণ ভট্টাচার্য্য যথাক্রমে চার ও বাইশ জনের ছানি তোলেন। ফতেপুর গ্রাম আরামবাগ মহকুমার পুরশুরা থানায়—চাঁপাডাঙ্গা হইতে দক্ষিণে চার মাইল দূরে, দামোদরের অপর পারে।

১৯৪০ সনে ব্যষ্টি-সত্যাগ্রহে যোগদান করিয়া ডাক্তার দাস কারারুদ্ধ হন। কারামুক্তির পর সত্যাগ্রহে পুনরায় যোগদান করেন এবং যুদ্ধবিরোধী ধ্বনি তুলিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে থাকেন। তার পর হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং ৩১শে জুলাই তারিখে তাঁহার দেহান্ত হয়।

স্বাধীনতালাভের পর তাঁহার কয়েকজন সহকর্ম্মী পুনরায় উদ্যোগ-আয়োজন করিয়া ১৯৪৮ সনে খামারগোড়ী গ্রামে চক্ষু-চিকিৎসার আয়োজন করেন। এই সময় হইতে ইহার নামকরণ করা হয় "আশুতোষ চক্ষু চিকিৎসালয়"। খামারগোড়ী গ্রাম খানাকুল থানায়। চাঁপাডাঙ্গা হইতে পশ্চিমে চার মাইল গেলে মুণ্ডেশ্বরী নদীর উপর হরিণখোলা গ্রাম—হরিণখোলা হইতে সাড়ে তিন মাইল দক্ষিণে মুণ্ডেশ্বরীর উপর গোপালদহ—গোপালদহ হইতে কাণানদী ধরিয়া আড়াই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে খামারগোড়ী। এই গ্রামে "রামচন্দ্র ট্রাষ্ট ভবন"-এ ১৯ জনের ছানি তোলা হয়। ঐ বৎসর দ্বিতীয় বার আশুতোষ চক্ষু চিকিৎসালয় বসে রাজবলহাট গ্রামে—ছানি তোলার সংখ্যা ১৯।

এতদিন চক্ষু-চিকিৎসালয় হুগলী জেলার ভিতর বসিয়াছে এক্ষণে ১৯৫০ ও ১৯৫১ সনে বালি "আশুতোষ নিলয়ে" আশুতোষ চক্ষু-চিকিৎসালয় বসে—বালি, হাওড়া জেলায়। এই দুই বৎসরে
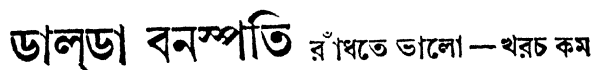
ছানি তোলার সংখ্যা যথাক্রমে ৩ ও ৭। ১৯৫১ সনে এদিকে হুগলী জেলার ফতেপুর গ্রামেও ছানি তোলা হয়—সংখ্যা ২৭। ১৯৫২ সনে জগদীশপুরে (হাওড়া) ১০ ও ফতেপুরে (হুগলী) ২০, ১৯৫৩ সনে জগদীশপুরে ১৪ ও ফতেপুরে ১৯, ১৯৫৪ সালে জগদীশপুরে ২২ ও ১৯৫৫ সালে হাওড়া-শিয়াখালার রেলের মশাট ষ্টেশন হইতে তিন মাইল পশ্চিমে আইয়া গ্রামে এগার জন এবং ফতেপুরে ২০ জন লোকের ছানি তোলা হয়। জগদীশপুর গ্রামে স্থানীয় জুনিয়র হাই স্কুলের হল-ঘরে বড়দিনের বন্ধের সময় ১৯৫২, '৫৩, '৫৪ পরপর এই তিন বৎসর ছানি তোলার কাজ হয়, ফতেপুরে হয় স্থানীয় আশুতোষ সেবাকেন্দ্র।

১৯৩৯ সন হইতে আজ পর্য্যন্ত এই চক্ষু-চিকিৎসালয়ে অস্ত্রোপচারের সকল কার্য্য কলিকাতার ডাক্তার শ্রীঅনাদিচরণ ভট্টাচার্য্য করিয়াছেন। আরোগ্যের সংখ্যা শতকরা ৯৯ বলা চলে। তাঁহার এই কার্য্য সম্পূর্ণ সেবামূলক। পূর্ব্বে এক একটি চিকিৎসালয়ের কার্য্যে প্রায় ১০০০৲ ব্যয় হইত। রোগীদের ঔষধ পথ্য ছাড়া তাহাদের আত্মীয়স্বজন দেখিতে আসিলে তাঁহাদের জন্যও দুই বেলা দুই মুঠার ব্যবস্থা করিতে হইত। অর্থ চাঁদা তুলিয়া সংগ্রহ করা হইত। এক্ষণে গত তিন বৎসর রেড ক্রশ হইতে ঔষধাদি পাওয়া যাইতেছে। ইহার উপর রোগীর শয্যা ও পথ্যাদি আপন আপন গৃহ হইতে আনিবার ব্যবস্থা করায় ব্যয়ভার অনেকটা কম পড়িয়াছে।

গ্রামগুলির অবস্থান সম্বন্ধে আমরা খুব সংক্ষেপে একটু লিখিয়াছি। অধিকাংশ গ্রামই অজ্ঞাত, অখ্যাত এবং দূরতম প্রান্তে অবস্থিত। এই নিষ্পন্দ নিভৃত পল্লীতে সেবার সূত্রে গণ-সংযোগ স্থাপন সম্ভব হইয়াছিল এই কথা বুঝানোই আমাদের উদ্দেশ্য।

১৯৫৪ ডিসেম্বরে জগদীশপুরে ও ১৯৫৫ এপ্রিলে ফতেপুর গ্রামে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এই আশুতোষ চক্ষু-চিকিৎসালয় দেখিয়া আসিয়াছেন। আমাদের ধারণা বিভিন্ন জেলায় স্থানীয়

এই সকল গ্রামবাসীর ছানি তোলা হইয়াছে

কর্ম্মিগণের চেষ্টা ও সরকারী উদ্যোগ সরল ও সুষ্ঠু ভাবে মিলিত হইতে পারিলে পশ্চিমবঙ্গে চোখে ছানি পড়িয়া দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছে এরূপ লোক দশ বৎসর পরে আর দেখা যাইবে না। ইহা নিতান্ত দুরাশা নহে।

আশুতোষের মৃত্যুর পর গান্ধীজী লিখিয়াছিলেন: "...তাঁর মৃত্যুতে দেশের সত্য সত্যই ক্ষতি হ'ল। জন্মভূমির মঙ্গলের প্রতি চিত্তে গভীর অনুরাগ জাগানো ছাড়া আমরা আর কি করতে পারি......"

দেশগঠনের দিনে গান্ধীজীর এই অমূল্য বাণী সর্ব্বথা স্মরণীয়।

স্বগত সন্ধ্যায় কোথা ওঠে তারা?

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

আমার পাষাণস্তরে তুমি যেন স্বচ্ছতোয়া নদী,
রূপের তরঙ্গ তুলে তারুণ্যের কান্তি লয়ে এলে;
সুবর্ণ মেঘের মাঝে নীলাকাশ সম আঁখি মেলে।
সূর্য্যের প্রদীপ্ত প্রভা তব অঙ্গে বহে নিরবধি!
ভোরের সোনালী আলো রাত্রিশেষে শান্ত ছায়াতলে,
সলাজ নম্রতা লয়ে দাঁড়ালে কি শুভ্র শতদলে?

রক্তিম অধরে তব যৌবনের অনন্ত আহ্বান,
সে আহ্বানে পুলকিত ওষ্ঠ মোর মিনতিরে খুঁজে;
সে গানের মাধুরিমা অশ্রু কিগো সুরে দেয় মুছে?
পাষাণ-গলানো প্রাণে নির্ঝরের শুনালে যে গান।

শিল্প উপাদান সম কল্পনার নগ্নতারে ঢেকে
তুমি কি ভেবেছ বাণু! দেবে মোরে তুলি ও লিখন?
আমার জীবনে আজ নাহি কোন ক্ষণ-উদ্দীপন
তোমার জীবন-শিল্প হৃদয়ের অজন্তায় রেখে।

সেদিন আসিতে যদি কৈশোরের কালোত্তর ক্ষণে
লক্ষ সর্পশিশু সম ত্রস্ত কেশ এলায়ে গ্রীবাতে!
বসন্ত নিশীথে মোর অসংবৃত পুষ্প-আভরণে
পূর্ব্বরাগে চিত্ত তব ভরিতাম নির্জ্জনে দিবাতে!
স্বগত সন্ধ্যায় কোথা ওঠে তারা দূর চক্রবালে,
অনাগত পথে শঙ্খ বাজে কার?—দীপ কেগো জ্বালে?

কুসুম-আস্তীর্ণ পথ নাহি ভগ্ন জীবনে আমার,
আরণ্য উল্লাসে যাহা মর্ম্মে মোর ছিল ব্যাধ সম।
মায়াহরিণীর পিছু ছুটে-যাওয়া ব্যর্থ হ'ল মম,
অজ্ঞাত দুঃস্বপ্নে তারে ত্রস্ত হয়ে খুঁজি অনিবার।
গৃহ-বাতায়ন হ'তে প্রতিদিন পথ-চলা তব,
আমার মরমলোকে রচেছে কি কাব্য নব নব?

আরও মসৃণ, কমনীয় ত্বক্
দিনে দিনে...
ক্যাডিল্*যুক্ত রেক্সোনা'কে
আপনার অবগুণ্ঠিত রূপকে
উন্মোচন করতে দিন
রেক্সোনা'র ক্যাডিল্-সমৃদ্ধ ফেনা আপনার ত্বকে
মোলায়েমভাবে রগড়ে নিয়ে ধূয়ে ফেলুন। দেখবেন,
আপনার ত্বক্ দিনে দিনে মসৃণতর আর কোমল হয়ে'-
এক নতুন উজ্জ্বলতর কমনীয়তায় ভরে তুলেছে।
বড় সাইজেও
পাওয়া যায়
Rexona
Rexona
রেক্সোনা
ক্যাডিল্‌যুক্ত একমাত্র সাবান
* ত্বক্ পোষক ও কোমলতাপ্রসূ তৈল সমূহের এক
বিশেষ সংমিশ্রণের মালিকানী নাম।
RP. 130-X52 BG
রেক্সোনা প্রোপাইটারী লিঃএর তরফ থেকে ভারতে প্রস্তুত

সম্মেলনে বর্ম্মী মেয়েদের বাংলা গান

নিখিল-ব্রহ্ম বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

ডক্টর শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ চৌধুরী

বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন ব্রহ্মদেশের, বিশেষতঃ রেঙ্গুনের প্রবাসী বাঙালীদের বিশেষ প্রিয় অনুষ্ঠান। বিগত মহাযুদ্ধের পরেও একাধিকবার এই ধরণের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নানা কারণে ১৩৫৯ ও ১৩৬০ সালে এই সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন সম্ভবপর হয় নি। এবার স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উৎসাহে এবং ব্রহ্ম সরকারের সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের মূল পরিকল্পনা অনুসারে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন আহ্বান করা স্থিরীকৃত হয়। এই উদ্দেশ্যে একটি কর্ম্মসমিতি সংগঠিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীপ্রফুল্লকান্ত বসু, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, অধ্যাপক শ্রীদেবপ্রসাদ গুহ সম্পাদক; শ্রীশিশিররঞ্জন গুহ ও শ্রীসুশান্ত চৌধুরী সহ-সম্পাদক এবং শ্রীসত্যেন্দ্রলাল মিত্র কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

বিগত ২রা, ৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল রেঙ্গুনস্থ রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটি হলে এই সম্মেলনের অধিবেশন সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের মূল সভাপতি নির্ব্বাচিত হন কলিকাতার "যুগান্তর" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথিরূপে আমন্ত্রিতা হন কলিকাতার লেডী ব্র্যাবোর্ন কলেজের অধ্যক্ষা ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী। বিশেষ অতিথিরূপে যথাক্রমে ভারত, পাকিস্থান ও ব্রহ্মদেশ থেকে আমন্ত্রিত হন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্কৃত শিক্ষা-পরিষদের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কবি জসীমউদ্দিন এবং বঙ্গভাষাবিদ্ সুপণ্ডিত, রেঙ্গুনবাসী উ আউং চ জান। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মাননীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী উ উইন্। তিনি ইংরেজীতে একটি জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন। তাহাতে বলেন যে, ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পুনরুজ্জীবনে বাংলা দেশই যে অগ্রণী, একথা সর্ব্বজনবিদিত। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ফলে নবভারত গঠিত হলেও বাংলা দেশ, বাংলা সাহিত্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণের মত সাধক এবং রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ বাঙালী মনীষীবৃন্দের শক্তি ও অনুপ্রেরণাতেই বিশিষ্টতম পুষ্টিলাভ করেছে। উ উইন্ মহাশয় সম্মেলনের উদ্যোক্তৃগণকে বাংলাভাষার মাধ্যমে ব্রহ্মদেশের সংস্কৃতি বহির্বিশ্বে, বিশেষতঃ বাঙালীদের সম্মুখে উপস্থিত করার জন্য অনুরোধ জানান।

মূল সভাপতি তাঁর লিখিত নাতিদীর্ঘ ভাষণে বাংলা দেশের বর্ত্তমান জীবনযাত্রা এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক্ ও সমস্যা সম্পর্কে একটি অতি হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন। তিনি বঙ্গসাহিত্যে প্রবাসী বাঙালীদের দানের সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বিবরণীও প্রদান করেন। ভাষণের উপসংহারে তিনি একটি চিরন্তন আশার বাণী ধ্বনিত করে বলেন, "সেই আগামী দিনের শোভাযাত্রীদের অস্পষ্ট পদধ্বনি আমি আজকের সাহিত্যে দূরাগত সমুদ্র-কল্লোলের মত শুনতে পাচ্ছি। এই পদধ্বনি যেদিন স্পষ্ট হবে, প্রত্যক্ষ হবে— সেদিন ভূত ও ভগবান, ভিখারী ও পতিতা এবং যুদ্ধবাদী ও মুনাফা-জীবীর ঊর্দ্ধে সাধারণ মানুষের জয় নিশ্চিত হবে।"

প্রধান অতিথি ডক্টর শ্রীযুক্তা রমা চৌধুরী তাঁর চিত্তাকর্ষক ও জ্ঞানগর্ভ মৌখিক বক্তৃতায় বঙ্গসংস্কৃতিতে ভারতীয় দর্শন বা বেদান্তের দান বিষয়ে সবিস্তারে পর্য্যালোচনা করেন। কি ভাবে আধুনিক বাংলার ধর্ম্মান্দোলন, রাজনীতিক আন্দোলন এবং সাহিত্য

ওতপ্রোতভাবে বেদান্ত-রসসিক্তিত, সে বিষয়ে রাজা রামমোহন, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির উদাহরণ সহ তিনি সারগর্ভ ব্যাখ্যা দান করেন। তাঁর তথ্যপূর্ণ মৌখিক ভাষণ, সুমধুর ভাষা ও সুললিত বাচনভঙ্গী সকলকেই বিশেষ মুগ্ধ করে ও সকলেরই প্রাণ স্পর্শ করে।

সম্মেলনে বক্তৃতারত ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

বঙ্গভাষাবিদ্ সুপণ্ডিত উ আউং চ জান তাঁর বাংলা ভাষায় লিখিত প্রবন্ধে ভারত ও ব্রহ্মদেশের শাশ্বত-মৈত্রী বন্ধনের বিষয়ে সুন্দর বিশ্লেষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, এই সংস্কৃতিমূলক আদান-প্রদানের মধ্যেই নিহিত আছে উভয় দেশের প্রকৃত মুক্তি।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে, পূর্ব্বাহ্নে প্রথমেই "বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে নারী, মুসলমান ও অভারতীয়দের দানের" বিষয়ে একটি তথ্যবহুল, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দেন ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী। তিনি বলেন যে, মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও প্রেমসাধনার ফলে তদানীন্তন খণ্ড-বিখণ্ড বঙ্গদেশ পুনরায় মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়, এবং এই মৈত্রীসাধনায় নারী এবং মুসলমানদের দান অতুলনীয়। বহু অজ্ঞাত গবেষণামূলক বিষয়ে আলোকপাত করে তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষ পরিতৃপ্ত করেন।

এই দিন পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে যথাক্রমে "বাঙালী ও বাঙালার সংস্কৃতি" এবং "বাঙালী সমাজ ও ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালী" সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনা হয়। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ধর্ম্মাধার মহাস্থবির প্রমুখ সুধীবর্গ এই আলোচনায় যোগদান করাতে সভায় বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি হয়। প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রীমতী অচলা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী বেলা মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীসুশান্ত চৌধুরী, সহিদুর রহমান প্রমুখ স্থানীয় সাহিত্য-সাধকবর্গ।

তৃতীয় দিন অপরাহ্নে প্রধান অতিথি জসীমউদ্দীনের ভাষণ দেবার কথা ছিল। কিন্তু পূর্ব্ব-পাকিস্থান সরকার তাঁকে যাওয়ার অনুমতি দান না করাতে তিনি উপস্থিত হতে পারেন নি, এবং তাতে সকলেই বিশেষ দুঃখিত হন। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য প্রখ্যাত পল্লী-সংগীত গায়ক জনাব বেদারুদ্দীন আহম্মদকে তিনি প্রেরণ করেন। সেই দিন জনাব জসীমউদ্দীনের লিখিত বাণী পাঠ করেন ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, এবং স্থানীয় শিল্পিবৃন্দের সহযোগিতায় পূর্ব্ববঙ্গের সঙ্গীত পরিবেশন করেন জনাব বেদারুদ্দিন সাহেব। তাঁর সুমধুর সঙ্গীতে সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হন।

সম্মেলনে রবীন্দ্র-সঙ্গীত, মণিপুরী পোনা-কীর্ত্তন, কবিগান, যাত্রাভিনয়, পালাকীর্ত্তন এবং পল্লীগীতির সুবন্দোবস্ত করা হয়েছিল। যাবতীয় অনুষ্ঠানই বিশেষ মনোরম হয়েছিল।

রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটি হলে অনুষ্ঠিত বিরাট সভায় শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী ও ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী যথাক্রমে "বাঙালীর সমস্যা", "শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাধনায় শ্রীশ্রীসারদামণি দেবীর দান" এবং "সমাজ সেবক আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দে"র বিষয়ে মৌখিক ভাষণ দানে সকলকেই মুগ্ধ করেন।

ভ্রম সংশোধন
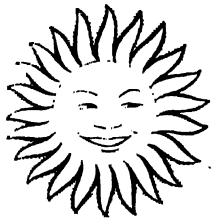
পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	হইবে না	হইবে
২৪৬	১	২১	পরলোকগত সত্যসুন্দর দেবের	শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দেবের

কাকলি (প্রথম খণ্ড)—অতুলপ্রসাদ সেন। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ, ২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

এই স্বরলিপির বইখানির বহিরঙ্গ সুন্দর। বলা বাহুল্য, কবি ও গীতিকার অতুলপ্রসাদের কুড়িটি গানের সুর যখন ভিতরে ধরা আছে, তখন তার অন্তরঙ্গও মধুর।
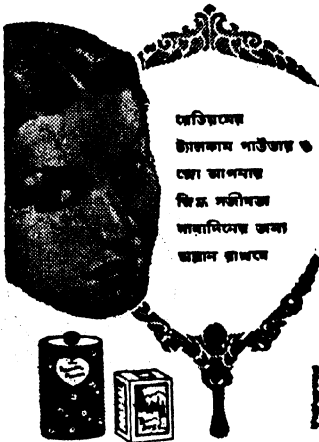
অতুলপ্রসাদ সেনের গানগুলির ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত স্বরলিপি সংগ্রহপূর্ব্বক খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করবার উদ্যোগের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষ সংগীতভক্তসমাজের ধন্যবাদের পাত্র; এবং যাঁদের উপর সে কাজের ভার দিয়েছেন তাঁরাও যোগ্য পাত্র, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে তাঁরা এ স্থলে সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী, অন্ততঃ অপ্রকাশিত গান সম্বন্ধে। কারণ যতক্ষণ অতুলপ্রসাদের গুণী জ্ঞানী আত্মীয়বন্ধুগণ তাঁদের স্মৃতির ভাণ্ডারের চাবি খুলে সুরকে স্বরে পরিণত করে না দিচ্ছেন ততক্ষণ ভারপ্রাপ্তগণ ভারবাহী হয়ে অপেক্ষা করতে বাধ্য হবেন। বড়জোর মাঝে মাঝে তাগাদা লাগাতে পারেন। কিন্তু আশা করি লিপিকারগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই এই বন্ধুকৃত্য সত্বর সম্পাদন করবেন। আমি নিজেই শেষোক্ত দলের একজন; তাগিদ ও ইচ্ছা উভয়ই এ ক্ষেত্রে বর্ত্তমান।

অতুলপ্রসাদের সঙ্গে আমাদের দু'জনেরই বহুকাল থেকে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল—তাঁর নেশা ও পেশা দু'দিক দিয়েই। এই সূত্রে কত ছোটখাটো স্মৃতি মনে উদয় হয়—কবে কোন্ নিমন্ত্রণ-সভায় তিনি 'ভারত-ভানু' গেয়ে শুনিয়ে-ছিলেন, কবে 'তুমি মধুর অঙ্গে' ও 'আজি হরষ-সরসে কি জোয়ারা' আমাকে নিজে শিখিয়েছিলেন; তাঁর 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী' ও 'হও ধরমেতে ধীর' কত সভায় গেয়েছি ও গাইয়েছি; তাঁর 'বল বল বল সবে' আমাদের কালে স্বদেশী গানের মধ্যে কত প্রিয় ছিল, হয়তো এখনো আছে; আর অন্য গানের মধ্যে বোধ হয় 'চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে' আর 'মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা'; একবার জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে একটি শ্রাদ্ধবাসরে তাঁর মাসী সুবালা দেবী তাঁর একটি বাউলের সুরের গান গেয়ে সকলকে মোহিত করেছিলেন; আর একবার তাঁর 'পাগলা মনটারে বন্দে পাখী' মাঘোৎসবে গাইয়েছিলুম, তখনকার দিনে সেটা একটা নূতনত্ব বলেই গণ্য হয়েছিল।

উত্তর-পশ্চিমে বাস বলে হয়ত ঠুংরিজাতীয় গানের দিকেই তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। তাঁর গলাও সেই গান গাবার মত ছিল। গলা যায় কিন্তু গান থাকে। আশা করি, বাংলাদেশ তাঁর গানকে সাদরে রক্ষা ও সযত্নে শিক্ষা করবে।

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

গল্পলতা—শ্রীসুবোধ বসু। গ্রন্থাগার, পি-৪৮ ল্যান্সডাউন রোড কলিকাতা-২৯। মূল্য চার টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থের গল্পগুলি আকারে ছোট এবং প্রকৃত গল্প-রসযুক্ত এ কথা বলিলে গল্পের জাতিনির্ণয়ে হয়তো বা ত্রুটি রহিয়া যাইবে। যেহেতু অনেক গল্প ছোট হইলেও গল্প হয় না এবং দীর্ঘ হইয়াও অনেক উপন্যাস ছোট গল্প গুণান্বিত। আলোচ্য গ্রন্থের অধিকাংশ গল্পের যে বৈশিষ্ট্য রসিক-চিত্তকে আকর্ষণ করে তাহা প্রথমতঃ, রসনিঃস্যন্দী প্রকাশভঙ্গী। বাক্য রসাত্মক না হইলে অন্তরে আশ্রয় লাভ করে না, এবং মন গ্রহণ না করিলে সুখাদ্য স্বাদহীন ভোজ্যে পরিণত হয়। দ্বিতীয়তঃ, গল্পগুলির পটভূমিকা ভারত বিস্তৃত; এবং পাত্রপাত্রীরা বিভিন্ন গোত্র ও ভাষাভাষী মানুষ। বোম্বাই কলিকাতা, দিল্লী, হাজারীবাগ, দার্জ্জিলিং, পাঠানীস্থান পর্য্যন্ত এর পটভূমি প্রসারিত; গোয়ানিজ, দিল্লী বা বোম্বাইওয়ালা, মরাঠি, মাদ্রাজী, পঞ্জাবী নেপালী প্রভৃতি বিভিন্ন নরনারী গল্পসমূহের নায়ক-নায়িকা; বিষয়বস্তু বৈচিত্র্যও কম নহে। শ্রীযুক্ত বসুর নিপুণ দৃষ্টিতে মৌন প্রকৃতি, মূক পশুপক্ষী এবং সর্ব্বস্তরের মানুষ সমান সহজবোধ্যতায় অবলীলাক্রমে ধরা পড়িয়াছে
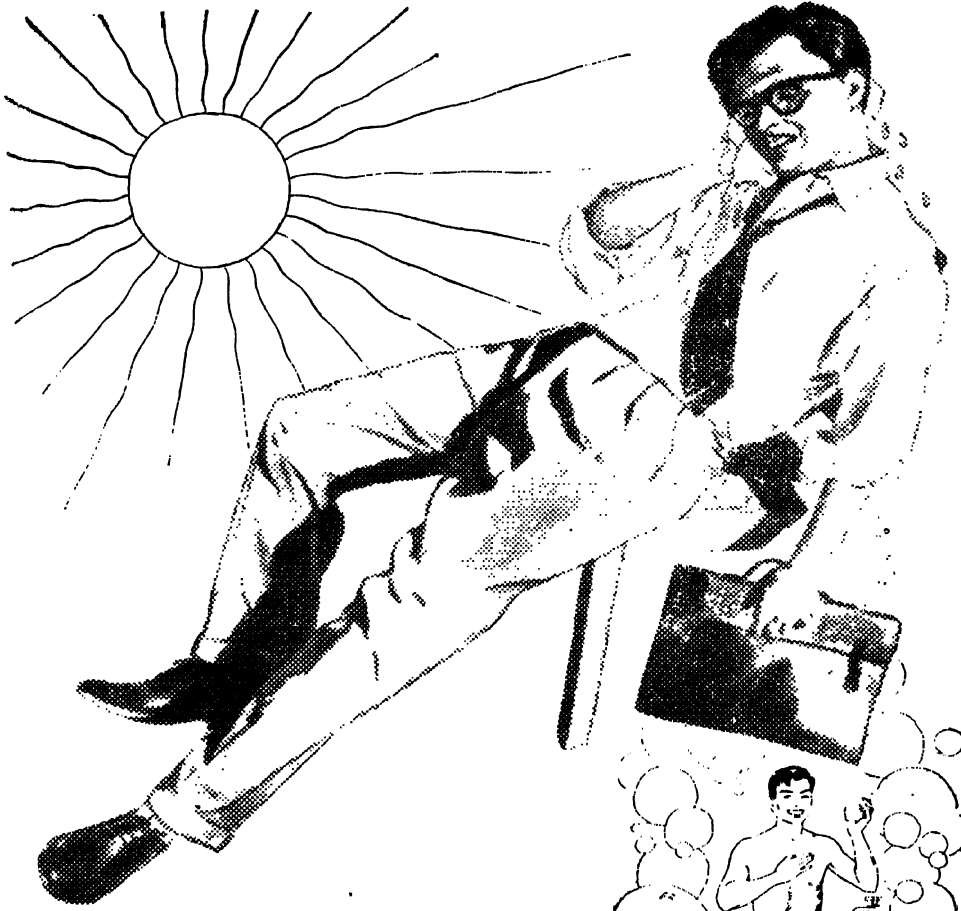
"লাইফবয় সাবান
দিয়ে এইবার চান্ করতে হবে"
– এটি সেই ঝরঝরে
তাজা ভাব এনে দেয়!
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP

ইহাদের অঙ্গে পরিমিত রং লাগাইয়া ছবি আঁকিয়া গল্পের চিত্রশালা তিনি ভরাইয়া তুলিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি গল্পের উল্লেখ করিতেছি।

'ভুক্তেয়' গল্পে 'তারা' নাম্নী যে শান্ত, অপাপবিদ্ধ, কল্যাণময়ী, সরলা খ্রীষ্টান কুমারীর ছবি আঁকিবার বাসনা শিল্পীমনে দুর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছে, ঘটনার স্রোতে স্টুডিও-টেষ্ট উত্তীর্ণ হইয়া সেই মেয়েটিই শিল্পী-মনকে বিমুখ করিয়া দিয়াছে। স্বপ্ন-ভঙ্গের বেদনার সুরটি মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে। পক্ষান্তরে 'ছায়া' গল্পে ছায়া-বিভ্রমের এমন এক কৌতুককর পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে—যাহা আজিকার বাস্তব জীবনের অতি সাধারণ ঘটনা। 'মানব-অশ্ব-কথা'য় বয়োজীর্ণ টাঙ্গা চালকের সঙ্গে ভারবাহী পশুর স্নেহকল্পের সংযোগ-সাধন ঘটিয়াছে। দিল্লীর পুরাতন কিল্লার কোলে বসিয়া স্বপ্ন দেখার কালে বিস্মৃত মোগল যুগকে বর্ণনভঙ্গীতে সঞ্জীবিত করার কৃতিত্ব 'আধুনিকা' গল্পে লক্ষণীয়। 'নদী শাসনে' অত্যাসন্ন বন্ধনভীত দামোদর ও মেঘের বার্ত্তা-বিনিময়ে দরদী দৃষ্টির আশ্চর্য প্রকাশ দেখা যায়। 'আজাদী' গল্পে হুমায়ুনের কবর-স্থানে আগিন্দী যুবক-যুবতীর আজাদী-তৃষ্ণা ও তাহার বিচিত্র পরিণতি যেমন মনে দোলা লাগায়, 'উপকরণে' ছোটনাগপুরের জঙ্গলে শহর-সভ্যতার পরিচয়ে তেমনি চিত্ত ক্ষুব্ধ হয়। 'পথিক' গল্পের অঙ্গহীন মুরারি দাস এক অদ্ভুত চরিত্র; নিজে পদহীন হইয়াও গতির প্রতি সে সশ্রদ্ধ মোহ পোষণ করে। পাহাড়ী মেয়ে 'কাকী'র মাতৃত্বের ক্ষুধা যে-কোন সমতলবাসিনীর চেয়ে বিন্দুমাত্র কম নহে।

দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া লাভ নাই। প্রায় প্রতিটি গল্প পটভূমি, বিষয়বস্তু, নর-নারী এবং রস-আবেদনে স্বতন্ত্র ও বিচিত্র এবং এগুলি লেখকের বস্তুজ্ঞান ও শিল্প-দৃষ্টির যথার্থ সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বাংলা-সাহিত্যের কথা (প্রথম খণ্ড)—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, এম-এ। রেনেসাঁস প্রিণ্টার্স, ১০ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা। মূল্য আড়াই টাকা।

প্রাচীন বাংলাভাষা ও সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় অধ্যাপক শহীদুল্লাহ সাহেবের লেখা কতকগুলি প্রবন্ধ একত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে 'ভাষা ও সাহিত্য' নামে বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক তাঁহার আর একটি প্রবন্ধ-সংকলন প্রকাশিত হইয়াছিল (ঢাকা ১৩৩৮)। বর্ত্তমান প্রবন্ধগুলির বেশীর ভাগই সিদ্ধাচার্য্য ও তাঁহাদের সৃষ্ট সাহিত্য অবলম্বনে রচিত। নাথপন্থ, ধর্ম্মপূজা ও লোক-সাহিত্য সম্বন্ধেও কয়েকটি প্রবন্ধ আছে। একটি প্রবন্ধে প্রাচীন যুগে বাংলা সাহিত্যের ধারা নিরূপিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি কোনও বিশেষ ধারা বা নিয়ম অনুসারে সজ্জিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া অনেক স্থলে একই কথার পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ বিভিন্ন সময়ে সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্ব্বে স্থানে স্থানে একটু অদল-বদল করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া দিলে ভাল হয়। অন্যথা তাহাদের মধ্যে নানারকম দোষত্রুটি থাকিয়া যাইতে পারে। আশা করি প্রবীণ অধ্যাপক মহাশয় গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের সময় এদিকে একটু দৃষ্টি দিবেন এবং তাঁহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধগুলি যাহাতে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের ব্যবহারের পক্ষে অধিকতর উপযোগী হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। অন্যান্য মনীষীরও এই জাতীয় প্রবন্ধ-সংকলন প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

ভারতবর্ষের জনবহুলতা কি বিপজ্জনক সীমায় পৌঁছিয়াছে? সত্য হইলে প্রতিকার কি?—শ্রীশশাঙ্ক ভূষণ রায়। মূল্য আট আনা।

লেখক বিহার সরকারের কৃষি-বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালক। পুস্তিকাখানিতে বহু তথ্য ও বিশেষজ্ঞগণের অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তিকাখানি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

রোম থেকে রমনা—শ্রীদেবেশ দাশ। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিমিটেড, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য—দুই টাকা দশ আনা।

বইখানি নয়টি ছোট গল্পের সমষ্টি। কবিতা, রম্য রচনা, ভ্রমণ-কাহিনী এবং ঐতিহাসিক কাহিনী লিখিয়া শ্রীদেবেশ দাস যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার দেখিবার চক্ষু এবং শুনাইবার ভঙ্গী আছে। দেশে-বিদেশে যাহা সাধারণের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় দেবেশ দাশের সতর্ক দৃষ্টিতে তাহা ধরা পড়ে এবং বর্ণনাচ্ছলে সেই বৈশিষ্ট্যটুকু তিনি কৌশলে ফুটাইয়া তোলেন। তাঁহার লেখার মধ্যে চিত্রাঙ্কনী শক্তির পরিচয় পাই।

বইখানির নাম "রোম থেকে রমনা", কিন্তু ছ-টি গল্পেরই পটভূমিকা ইউরোপের কোন-না-কোন দেশ, শেষ গল্পটিতে রমনার সাক্ষাৎ পাই। প্রেম চিরনূতন এবং চিরপুরাতন। পুস্তকের সব-ক'টি গল্পের বিষয়বস্তু সেই চিরন্তন প্রেম। যুগে যুগে এবং দেশে দেশে প্রেম নব নব রূপ পরিগ্রহ করে। বিদেশী পরিবেশে দেশের ছেলেদের গল্প লিখিতে প্রথম আরম্ভ করেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। পরে এ পথ বড় কেহ অবলম্বন করে নাই। শ্রীদেবেশ দাশের ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আছে। এই গল্পগুলির মধ্য দিয়া সেই অভিজ্ঞতা তিনি কাজে লাগাইয়াছেন।

প্রথম গল্প 'স্বপ্নে গড়া ঘর'—জিপসি-জীবনের একটি করুণ কাহিনী। 'সোনার সন্ধ্যা'র নায়িকা সোনিয়া একটি রাশিয়ান তরুণী এবং নায়ক সেন এক বাঙালী যুবক। 'নিশাস্বপ্নে'র পটভূমি ভেনিসের এক চন্দ্রালোকিত রাত্রি। 'যাবার বেলা পিছু ডাকে' বাঙালী মেয়ে অনিতার স্পেনে অবস্থানকালের ঘটনা। 'বিদেশিনী'র পটভূমিও স্পেন। 'পাপের অধিকার' বিলাতের এক বনেদী ঘরের গল্প। জাপানী আক্রমণে বর্ম্মা-প্রবাসী যে-সব ভারতীয় আসাম-সীমান্তের দুর্গম পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া পায়ে হাঁটিয়া পলাইতেছিল, 'সন্ধ্যার মেঘ' সেই দলের একটি পুরুষ এবং দুটি মেয়ের কাহিনী। 'বসন্ত-সেনা'র নামের মধ্যেই গল্পটির পরিচয়। 'ভাসিয়ে দিলাম মালা'য় রোম ও রমনা একসঙ্গে মিলাইয়া গিয়াছে।

লেখকের ভাষা স্বচ্ছ ও প্রবহমাণ, এবং ভঙ্গীর মধ্যে একটি স্বকীয়তা আছে। মিলনে যাহার পরিসমাপ্তি সে প্রেম হয়ত মনোরম, কিন্তু বিরহ ও বিচ্ছেদ যাহার পরিণাম সে প্রেম মহীয়ান্। প্রেমের ট্র্যাজেডির সুর সব গল্পের মধ্যেই ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। পরিবেশ-প্রভাবে সার্থক এই গল্পগুলি তাই মনের উপর একটি রেখাপাত করিয়া যায়।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

রবীন্দ্র-প্রদর্শনী

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়মে, ১৪ই মে হইতে ২১শে মে পর্যন্ত আট দিন ব্যাপী, 'টেগোর সোসাইটি'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-প্রদর্শনীতে প্রত্যহ বিপুলসংখ্যক নরনারীর সমাগম হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলী, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী রচনা ও তাঁহার বিভিন্ন রচনার অনুবাদ; তাঁহার কয়েকটি চিঠি ও কবিতার পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি ছাড়া কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, ইণ্ডিয়া সোসাইটি অব লণ্ডন হইতে প্রকাশিত 'গীতাঞ্জলি' ও 'চিত্রা'র প্রথম সংস্করণ এই প্রদর্শনীতে স্থান পায়।

কবির জীবদ্দশায় দেশ-বিদেশের বহু গুণী তাঁহার বিভিন্ন বয়সের ছবি আঁকিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে উইলিয়াম রোদেনষ্টাইন, জাপানী শিল্পী মাৎসুহারা, লেভন ওয়েষ্ট এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত কয়েকখানি ছবি এই প্রদর্শনীর সমৃদ্ধি ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছিল, কবির প্রতিকৃতি ছাড়া ঐতিহাসিক আলোকচিত্রও ইহার অন্যতম আকর্ষণ ছিল।

প্রদর্শনীর উদ্বোধন-ভাষণ দিতে গিয়া ড. শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসু বলেন, কোন মহাপুরুষকে সম্যক্‌ভাবে বুঝিতে হইলে একটা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকা দরকার। দেশবাসীর মধ্যে এই ঐতিহাসিক মূল্যবোধ গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং সেই দিক হইতে এই প্রদর্শনীর সার্থকতা।

প্রদর্শনী সমিতির সভাপতি ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ বলেন, আজ যখন সারা দেশ ব্যাপিয়া রবীন্দ্র-জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হইতেছে তখন এই প্রদর্শনী এক নূতন সুর সংযোজিত করিবে।

উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅমল হোম। তিনি 'টেগোর সোসাইটি'র কর্মীবৃন্দকে 'রবীন্দ্র-প্রদর্শনী'র আয়োজন করার জন্য অভিনন্দিত করেন।

তপশীলীভুক্ত ছাত্রদের জন্য সরকারী বৃত্তি

ভারত সরকারের নিউ দিল্লীর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তপশীলীভুক্ত জাতি, তপশীলীভুক্ত উপজাতি এবং অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের বৃত্তি পর্ষদ (Scholarships Board) পুনর্গঠিত তপশীলী জাতি, তপশীলী উপজাতি ও অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছাত্রদের নিকট, ১৯৫৫-৫৬ সনের ভারত সরকারের বৃত্তির জন্য অনুমোদিত ফরমে আবেদনপত্রের জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। যে সকল স্বীকৃতি-প্রাপ্ত (recognised) শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে প্রবেশিকার পরবর্তী স্তরের শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে, কেবলমাত্র সেগুলির ছাত্রেরাই এই এক বৎসরের বৃত্তিলাভ করিতে পারিবেন। উক্ত পর্ষদে এই সকল আবেদনপত্র দাখিল করিবার তারিখ ১৯৫৫ সনের ৩১শে জুলাই পর্যান্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

যে সকল প্রার্থী পর্ষদের নিকট হইতে ১৯৫৪-৫৫ সনের বৃত্তি পাইয়াছিলেন তাঁহারাও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের নিকট যথা-রীতি প্রেরিত অনুমোদিত 'রিনিউয়্যাল ফরমে' আবেদন করিতে পারেন।

কাহারা বৃত্তি পাইবার অধিকারী এবং তাহার নিয়মাবলী কি কি এ সকল বিষয়ে যাবতীয় তথ্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানিতে পারা যাইবে :

জেনারেল সেক্রেটারী, ওয়েষ্ট বেঙ্গল প্রদেশ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ফেডারেশন,
১১৪এ, পার্ক ষ্ট্রীট, ফার্ষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা—১৭

অধ্যাপক আইনষ্টাইন (প্রবন্ধ অন্যত্র দ্রষ্টব্য)

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

বাসক-সজ্জা
শ্রীরামগোপাল বিজয়বর্গীয়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

চিত্রাঙ্গদার প্রতি মদন ঃ "আমি দিনু বর কটাক্ষে রবে তব পঞ্চম শর। মম পঞ্চম শর..."

রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কৃত রঙীন কাঠখোদাই চিত্র হইতে

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৫শ ভাগ
১ম খণ্ড
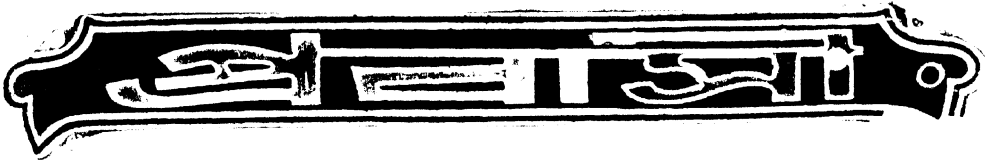
শ্রাবণ, ১৩৬২

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

"সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা"

উপরোক্ত তিনটি শব্দ ফরাসী বিপ্লবের মূলমন্ত্র ছিল এবং প্রথম ফরাসী সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইলে উহাই ফরাসী রাষ্ট্রের বীজমন্ত্ররূপে গৃহীত হয়।

রাজা রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া অগণিত সামন্ত ও অভিজাতবর্গের শোণিতস্রোতে ফরাসী বিপ্লবের তর্পণ হয়। অত্যাচার, ব্যভিচার, শোষণ ও দমননীতির সংশোধন যে ভাবে সে সময় হইয়াছিল তাহা জগতের ইতিহাসের এক বিভীষিকাপূর্ণ অধ্যায়রূপে রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও মানবজাতির সাম্য ও স্বাধীনতার মূল সত্য যে আদর্শবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার প্রথম চিত্রে রেখাপাত ফরাসী বিপ্লবের অধিকারীবর্গই করিয়া গিয়াছেন। ইহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়াই সর্ব্বজনবিদিত। তবে ইহাও সত্য যে "সাম্য" শব্দের অর্থ তখন যে ভাবে গৃহীত হইয়াছিল তাহা বর্তমান যুগের ন্যায় ও ধর্ম্ম অনুযায়ী নহে। "মৈত্রী" শব্দ ফ্রান্স উচ্চারণ মাত্র করিয়াছিল, প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই।

সাম্যের ঐরূপ বিকৃত অর্থ গৃহীত হওয়ার ফলে ফ্রান্সে বিপ্লববাদের অব্যবহিত পরেই, নেপোলিয়নের যুগে, সাম্রাজ্যবাদের বন্যা সমগ্র ফ্রান্স প্লাবিত করিয়া প্রায় সমস্ত ইউরোপকে দাসত্বে নিমজ্জিত করে। বলা বাহুল্য, মৈত্রীর কোনও চিহ্ন ইউরোপে প্রায় পঁচিশ বৎসর ছিল না। তাহার পর ইউরোপে, তথা পাশ্চাত্ত্য সকল দেশেই যুদ্ধবিগ্রহ ও ক্ষমতালোলুপ শক্তিপুঞ্জের রেষারেষি জাতিগত নীতিরূপে গৃহীত হয়। পূর্ব্বে দিগ্বিজয় বা সাম্রাজ্য স্থাপন করিত নৃপতিকুল; সামন্তবর্গ ও প্রজাকুল ছিল বাহক ও আজ্ঞাবাহী মাত্র। ভিয়েনার চুক্তির পর এক একটি জাতি সাম্রাজ্যবাদের বিষের আধার হইয়া দাঁড়ায়।

আজও ফ্রান্সে সেই কলুষিত সাম্রাজ্যবাদের নীতি প্রবল রহিয়াছে, যাহাতে ফরাসি-সাধারণ সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা বলিতে স্বার্থই বুঝে। ইন্দোচীনে এক পর্ব্ব শেষ হইতে-না-হইতেই উত্তর আফ্রিকায় মাৎস্যন্যায়ের প্রবাহ বহিতেছে।

ফরাসী বিপ্লবের কিছুদিন পূর্ব্বে উত্তর আমেরিকায় ইংরেজ-রাজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার অভিযান চলে। ইংরেজ পরাজিত হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিস্থাপন হয়। যাঁহারা স্বাধীনতার ঘোষণায় স্বাক্ষর করিয়া অভিযান আরম্ভ করেন তাঁহাদের এক জনের বলিষ্ঠ উক্তি আজ জগদ্বিখ্যাত—"Give me Independence or give me Death"—"আমায় স্বাধীনতা দাও, নচেৎ মৃত্যু"। এখানে সাম্য বা মৈত্রীর কোনও প্রশ্নই ছিল না এবং তাহার সাক্ষ্য ইতিহাসের পাতায় পাতায় রহিয়াছে মার্কিন দেশের আদিম অধিবাসীদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার ও অবিচারের কথায়, এবং তাহাদের হত্যার বিবরণে। ততোধিক সাক্ষ্য দিতেছে মার্কিন দেশের হতভাগ্য নিগ্রো ক্রীতদাসদাসীর উপর পাশবর্বৃত্তি চরিতার্থ করিবার বিবরণ। ঐ দেশে দাসত্ব প্রথার বিলোপ এবং জগৎকে স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রকৃত সংজ্ঞা দান করিয়াছিলেন এক মার্কিন দেশীয় মহামানব—আব্রাহাম লিঙ্কন। এই কার্য্যের জন্য তাঁহাকে হত্যা করে অন্য এক জন মার্কিন। ফলে আজও সাম্যের পূর্ণ অধিকার মার্কিন নিগ্রো পায় নাই। সুতরাং সাম্য ও মৈত্রীর সত্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

রুশ দেশে কম্যুনিজমের প্রতিষ্ঠা শোণিতপ্লাবনে হইয়াছিল। ষ্টালিনের মৃত্যু পর্য্যন্ত সেই শোণিতপ্রবাহের বিভীষিকা চলিতেছিল। তাহার পর এক নূতন অধ্যায়ের আরম্ভ হইয়াছে শুনা যায়। তাহা সত্য কিনা জানিতে জগৎ উৎসুক। এত দিন ঐ দেশে সাম্য ও মৈত্রী স্তোকবাক্য মাত্র ছিল। স্বাধীনতা বলিতে শুধু রাষ্ট্রের স্বাধীনতা বুঝাইত, ব্যক্তিগত নহে। রাষ্ট্রই ছিল সবকিছুর অধিকারী। রাষ্ট্রের অধিবাসী স্ত্রী-পুরুষ ছিল দাবাবড়ের খুঁটি, সকল অধিকারবর্জ্জিত, রাষ্ট্রযন্ত্রের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ছিল পরোক্ষ সত্য মাত্র।

ইংরেজ বণিক জাতি। বহির্জগতের সহিত আদান-প্রদান ও ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে নিজস্ব ও জাতিগত স্বার্থ বজায় রাখিতে হইলে উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য প্রয়োজন এই বদ্ধমূল ধারণা ইংরেজের জাতিগত ইষ্টমন্ত্র। সেখানে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার স্থান শুধু শ্বেতকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজার অধিকারে। অন্যের নিকট "জোর যার মুল্লুক তার"।

এই শক্তি চতুষ্টয়ের শীর্ষস্থানীয় অধিকারীবর্গ ১লা শ্রাবণ জেনিভায় বিশ্বশান্তির উদ্যোগপর্ব্ব রচনা করিতে যাইতেছেন। শুভমস্তু!

জেনেভা অধিবেশন

মিত্রশক্তি যুদ্ধ জয় করিয়াছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁহারা শান্তি হারাইয়াছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরই মিত্রশক্তি দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া যায়—আমেরিকা ও তাহার মিত্রবর্গ এবং সোভিয়েট রাশিয়া ও তাহার মিত্রবর্গ। এ কথা অবশ্য হিটলার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রবর্গের সহিত ধনিকতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রগুলির বিবাদ যুদ্ধপরবর্তী যুগে অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্যই তিনি চার্চিলকে বলিয়াছিলেন—জার্ম্মানীকে আক্রমণ করিও না, কারণ জার্ম্মানী ডেমোক্রাসীর পক্ষ হইয়া কম্যুনিজমের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। হিটলারের সাবধান বাণী অবশ্য মিত্রশক্তি শুনে নাই। কিন্তু হিটলারের অস্তিত্ব তথা জার্ম্মানীর রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মিত্রশক্তিবর্গ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গেল এবং খণ্ডিত জার্ম্মানী সেই ফন্দী যোগাইল। আজ দুইটি বিবদমান শক্তিবর্গই বুঝিতে পারিয়াছেন যে খণ্ডিত জার্ম্মানীর মধ্যে নিহিত আছে ভবিষ্যতের বিশ্ব-মহাযুদ্ধের বীজ। সেইজন্য যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতির দিকে চলিয়াছে দুইটি দলের প্রাণপাত প্রচেষ্টা, অর্থাৎ তাঁহারা মনে করিতেছেন যে প্রস্তুতিই যুদ্ধ-বিরতির প্রধান উপায়।

কিন্তু সমরোপকরণ সজ্জা আজ যে স্তরে পৌঁছিয়াছে তাহাতে মানবজাতির ধ্বংস সূচিত হইতেছে। আণবিক বোমার আবিষ্কার আজ এত ভীতিপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহার ব্যবহারের পর মানব জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া উঠিবে। ভবিষ্যৎ যুদ্ধে অসামরিক এলাকা কিংবা জনসাধারণ বলিয়া কিছু থাকিবে না—হাইড্রোজেন বোমার বিধ্বংসী রশ্মি বিশ্বব্যাপী হইবে; বিজেতা এবং বিজিত বলিয়া কিছু থাকিবে না। এইচ, জি. ওয়েলস ভবিষ্যৎ দুনিয়ার যেরূপ অনুমান করিয়াছেন তাহাই যেন দুর্ব্বার গতিতে আসিতেছে, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ যুদ্ধে মানবসভ্যতা লোপ পাইবে এবং আগামীকালের মানব বনে জঙ্গলে বাস করিবে ও তীর ধনুক লইয়া যুদ্ধ করিবে। আণবিক বোমা যেন ফ্র্যাঙ্কেনষ্টাইন দানব, স্রষ্টাকে ধ্বংস করিতে উন্মুখ। সভ্যতার এই ধ্বংসোন্মুখ গতিতে বিশ্বের চিন্তাশীল মানব শঙ্কিত ও ত্রস্ত। আইনষ্টাইন, রাসেল প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ আণবিক বোমার বিরুদ্ধে আবেদন জানাইতেছেন। ভারতবর্ষও এ ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট নয়, সে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে শান্তি স্থাপনের জন্য। ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং রাশিয়ার কর্তৃপক্ষকে রাজী করাইয়াছেন জেনেভা অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য এবং তাঁহার দূত শ্রীকৃষ্ণ মেনন আমেরিকায় গিয়াছিলেন আইসেনহাওয়ারকে জেনেভা অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিতে। ভারতবর্ষের শান্তি প্রচেষ্টাই যে জেনেভা অধিবেশনের জন্য বহুলাংশে দায়ী সে কথা আজ সর্ব্বজনবিদিত।

খণ্ডিত জার্ম্মানীর মিলন বর্তমানে দুই দলই চায়, তবে আমেরিকা ও ইংলণ্ড চায় জার্ম্মানীকে নিজের আওতায় রাখিতে, আর রাশিয়া চায় জার্ম্মানী যেন কম্যুনিষ্ট হইয়া তাহার প্রভাবের মধ্যে থাকে। রাশিয়া আগে হইতে জার্ম্মানীর একত্রীকরণের জন্য বলিয়া আসিতেছে, কিন্তু মিত্রশক্তি শঙ্কিত ছিল যে, সংযুক্ত জার্ম্মানী কম্যুনিষ্ট হইয়া যাইবে। রাশিয়ার দাবি ছিল জার্ম্মানীর উভয় অংশ হইতে বিজেতাশক্তির সৈন্য অপসারণ করিয়া লইতে হইবে, তাহার পর জার্ম্মানেরা নিজেরাই সম্মিলিত হইবে। অর্থাৎ, রাশিয়া জানে যে, পূর্ব্ব জার্ম্মানীতে যে পরিমাণ কম্যুনিজমের বীজ ছড়ানো হইয়াছে তাহাতে মিলিত জার্ম্মানী রাশিয়ার দিকে আসিবে, অন্ততঃ তাহারা নিরপেক্ষ থাকিবে; কিন্তু মিত্রশক্তির দিকে আসিবে না। সেই হেতু মিত্রশক্তি বাগড়া দেওয়ার জন্য ফ্যাকড়া তুলিতেছে যে, আগে সর্ব্বজার্ম্মানীর নির্ব্বাচন হইবে তাহার পর মিত্রশক্তির সৈন্য অপসারণ করা হইবে। ঠিক ভারতবর্ষের বেলায় ব্রিটেন এই রকম ব্যবস্থা করিয়াছিল—আগে হিন্দু-মুসলমানের মিল হইবে, তাহার পরে তাহারা এদেশ ছাড়িয়া যাইবে। মিল যখন হইল না, কিংবা করানো হইল না, তখন ভারত ভাগ হইল। এ যেন মায়ের অপেক্ষা মাসীর দরদ বেশী।

জার্ম্মানীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ জার্ম্মানরা করিবে, ইহা তাহাদের জন্মগত অধিকার। ইহাতে জার্ম্মানী কম্যুনিষ্ট হউক কিংবা না হউক ইহা কাহারও দেখার প্রয়োজন নাই। আমেরিকার লাল-ভীতি এমন যে, সর্ব্বত্রই সে লাল দেখে এবং ইহা তাহার একটি মানসিক ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে। সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের দশম বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে রাশিয়ার বৈদেশিক মন্ত্রী মলোটোভ শান্তিস্থাপনের জন্য যে প্রস্তাবগুলি করিয়াছিলেন তাহার উত্তরে আমেরিকার বৈদেশিক মন্ত্রী ডালেস অযথা তিক্ততার সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, আমেরিকার তরফে দৃষ্টিভঙ্গীর সামান্যই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ডালেস বলিয়াছেন, জার্ম্মানীকে গত দশ বৎসর ধরিয়া অপ্রাকৃতিক বিভাগে ভাগ করিয়া রাখা হইয়াছে এবং বিশ্বশান্তির পক্ষে ইহা বাধা সৃষ্টি করিতেছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, জার্ম্মানীকে খণ্ডিতকরণের জন্য দায়ী কে? মিত্রশক্তিবর্গ সম্মিলিতভাবে জার্ম্মানীর দ্বিখণ্ডীকরণ পূর্ব্বনির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাই ইহার জন্য রাশিয়া এবং আমেরিকা উভয়েই সমানভাবে দায়ী।

জেনেভা অধিবেশনের পূর্ব্বে রাশিয়া জার্ম্মান সমস্যা সমাধানের জন্য প্রস্তাব করিয়াছে যে, ইউরোপে একটি সম্মিলিত নিরাপত্তা পরিষদ স্থাপিত করা হইবে এবং এই পরিষদে জার্ম্মানীর উভয় অংশই সভ্য হিসাবে যোগ দিবে। ইউরোপের সকল রাষ্ট্রই এই নিরাপত্তা পরিষদের সভ্য হইতে পারিবে। জার্ম্মানীর পুনর্মিলন সমস্যা ইতিপূর্ব্বেই ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে। আমেরিকা এবং ব্রিটেন যে উত্তর-আটলান্টিক সন্ধিসংস্থা স্থাপন করিয়াছে তাহাতে পশ্চিম জার্ম্মানী সভ্য হিসাবে যোগ দিয়াছে। জার্ম্মানী এখনও যখন মিলিত হয় নাই, তখন তাহার এক অংশকে উত্তর-আটলান্টিক সন্ধি-সংস্থায় যোগ দেওয়ানো ব্রিটেন ও আমেরিকার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। ইহা প্যারিস চুক্তি দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় এবং ইহাতে

রাশিয়া আপত্তি জানায়। প্যারিস চুক্তি গ্রহণের পর রাশিয়া পাল্টা জবাব হিসাবে তাহার পূর্ব্ব ইউরোপীয় মিত্র রাষ্ট্রগুলিকে লইয়া একটি নিরাপত্তা সংস্থা সৃষ্টি করিয়াছে।

জেনেভা অধিবেশনকে শুভেচ্ছা জানাইয়া ইহা বলা যাইতে পারে যে, ইহার ভবিষ্যৎ মোটেই আশাপ্রদ নয় যদি না রাশিয়া মিত্রশক্তির প্রস্তাবকে মানিয়া লয়। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ ইডেন পূর্ব্বেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, জার্ম্মান সমস্যার ব্যাপারে তিনি তিনটি নীতি হইতে বিচ্যুত হইবেন না। এই তিনটি নীতি হইতেছে: (১) ব্রিটেন উত্তর-আটলান্টিক সন্ধিসংস্থা ভাঙ্গিয়া দিতে রাজী নয়; (২) ব্রিটেন আমেরিকার সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে না, এবং (৩) ব্রিটেন জার্ম্মানীর পুনর্মিলনের জন্য চেষ্টা করিবে।

মিঃ ইডেনের কথার ভাবার্থ এই—"গ্রহণ কর কিংবা বর্জ্জন কর।" মিত্রশক্তি উত্তর-আটলান্টিক সন্ধি সংস্থা ভাঙ্গিয়া দিতে রাজী নহে, কিন্তু রাশিয়ার ইহাতে ভীষণ আপত্তি, কারণ সে জানে যে এই সন্ধিসংস্থা রাশিয়ার বিরুদ্ধে সমর-সজ্জার নামান্তর মাত্র। সুতরাং ইহার অস্তিত্বে রাশিয়া রাজী হইতে পারে না কিংবা পশ্চিম জার্ম্মানী ইহার সভ্য থাকুক তাহাও সে চায় না। তাহার অভিমত এই যে, যদি বিজেতা শক্তিবর্গ জার্ম্মানীর উভয় অংশ হইতে উঠিয়া আসিতে সত্য রাজী না থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রস্তাবিত নূতন যে ইউরোপীয় নিরাপত্তা সংসদ প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাতে জার্ম্মানীর উভয় অংশই সভ্য হিসাবে যোগ দিবে এবং ধীরে ধীরে তাহারা মিলনের পথে অগ্রসর হইবে।

সুতরাং দেখা যায় বর্ত্তমান অবস্থায় জার্ম্মানীর মিলন সুদূর-পরাহত এবং ইহা জেনেভা অধিবেশনের ব্যর্থতা সূচিত করে। ইউরোপের সামরিক ভারসাম্য নির্ভর করিতেছে বিজিত জার্ম্মানীর ভবিষ্যতের উপর। সংযুক্ত জার্ম্মানী যে পক্ষে থাকিবে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের গতি তাহার সপক্ষে যাইবে এবং ইউরোপীয় তথা বিশ্বরাজনীতি সেই পক্ষ দ্বারা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হইবে। তবে বিজিত জার্ম্মানী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাহার পরাজয়ের গ্লানি সহজে ভুলিতে পারিবে না। পরাজয় এবং পরবর্ত্তী অবস্থার ভয়াবহ স্মৃতি নেতাদের বিচার ও ফাঁসীর কথা জার্ম্মানীকে একটি নিরপেক্ষ অবস্থার দিকে চালিত করিবে। মিত্রশক্তি কিংবা রাশিয়া সহজে কাহাকেও জার্ম্মানী ক্ষমা করিতে পারিবে না। পড়িয়া মার খাইয়াছে এবং খাইতেছে কিন্তু জার্ম্মানীর কোন অংশ ভুলিতে পারে না তাহাদের অর্থনৈতিক লুঠতরাজ যাহা মিত্রশক্তিবর্গ এবং রাশিয়া যুদ্ধের পর করিয়াছে; জোর করিয়া যে তাহার শিল্পসংস্থানগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে সে কথা জার্ম্মানী ভুলিতে পারে না; সে ভুলিতে পারে না তাহার সার প্রদেশকে কাড়িয়া লওয়ার কথা এবং কেমন করিয়া বিজেতা শক্তিবর্গ তাহার বৈজ্ঞানিক ও শিল্প সম্বন্ধীয় তথ্যগুলি কাড়িয়া লইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হইয়াছিল ১৯১৯ সনের ভার্সাই সন্ধির অন্যায়ের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দেখা যায় যে, বিজেতা শক্তিবর্গ ইতিহাসের কোন শিক্ষাই গ্রহণ করেন নাই। প্রতিহিংসার যে হিংস্র রূপ তাঁহারা দেখিয়াছেন জার্ম্মানীর লক্ষ লক্ষ যুদ্ধবন্দীকে নিজেদের দেশে দাসশ্রমিকরূপে খাটাইয়া তাহা অতীব ভয়াবহ। তাই ভবিষ্যতের সংযুক্ত জার্ম্মানী কাহারও পক্ষেই থাকিবে না, সে থাকিবে নিরপেক্ষ। তবে তাহার স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য যে পক্ষ তাহাকে সাহায্য করিবে সে তাহার সহিত সাম্প্রতিক ভাবে সহযোগিতা করিবে।

পণ্ডিত নেহরুর ঘোষণা

দীর্ঘ দিন বিদেশ ভ্রমণের পর পণ্ডিত নেহরু দেশে ফিরিয়াছেন। ইতিমধ্যে দেশে ও বিদেশে নানা প্রকার সমস্যা পূরণে বাধা দেখা দিয়াছে। সে সকলের বিষয়ে পণ্ডিত নেহরুর মন্তব্য অনেক দিন আমরা শুনি নাই। দিল্লীতে পণ্ডিত নেহরুকে যে পৌর সম্বর্দ্ধনা দেওয়া হয় তাহাতে তিনি সেই বিরাট জনসভায় যে ঘোষণা দিয়াছেন তাহার সারাংশ নিম্নে দেওয়া গেল। আকালী মোর্চা সম্পর্কে আমাদের মত শেষে দিলাম।

শ্রীনেহরু এই আশা প্রকাশ করেন যে, বৃহৎ চতুঃশক্তির রাষ্ট্রনায়কগণ পৃথিবী হইতে যুদ্ধের বিভীষিকা দূর করিয়া সমস্ত দেশ ও জাতির মধ্যে সহযোগিতা এবং শান্তির নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতে কৃতকার্য্য হইবেন।

শ্রীনেহরু বলেন, সর্ব্বমানবের সহিত মৈত্রী ভারতের পররাষ্ট্র-নীতির মূলতত্ত্ব। যে দেশেই তিনি গিয়াছেন, এই নীতি সকলের অবিমিশ্র অভিনন্দন লাভ করিয়াছে।

গোয়ার পরিস্থিতি উল্লেখ করিয়া শ্রীনেহরু বলেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শান্তিপূর্ণ উপায়েই আমরা এই সমস্যার সমাধান করিতে পারিব। আমরা যে কৃতকার্য্য হইব, সে বিষয়ে আমার লেশমাত্র সংশয় নাই।"

কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি যে পত্র দিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রীনেহরু বলেন, কাশ্মীর সম্পর্কিত সমস্ত ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতিতে ভারত অবিচলিত থাকিবে। কিন্তু গত আট বৎসরে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহার ফলে এই সমস্যা সমাধানের জন্য এখন নূতন পথে চেষ্টা করার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। অতীতের ঘোষণাগুলির যত গুরুত্বই হউক না কেন, শুধু সেইগুলিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলে কোন দিনই এই সমস্যার মীমাংসা হইবে না। তিনি আরও বলেন যে, কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি জনাব মহম্মদ আলীর পত্রের উত্তর দিবেন।

শ্রীনেহরু তাঁহার ভাষণে অকালী মোর্চা ও কাণপুর বয়ন শ্রমিক ধর্ম্মঘটেরও উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী তাঁহার ভাষণে বলেন যে, প্রেসিডেণ্ট আইসেন-হাওয়ার এবং মার্শাল বুলগানিন উভয়েই এই দৃঢ়সঙ্কল্প ব্যক্ত করিয়াছেন যে, জেনেভা সম্মেলন যাহাতে ব্যর্থ না হয়, সেজন্য তাঁহারা চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না। তাঁহারা ইহাও বলিয়াছেন যে, সমগ্র পৃথিবীর জন্য তাঁহাদিগকে নূতন কোন পথ খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার ও মার্শাল বুলগানিনের

এই সদিচ্ছার জন্য আনন্দ প্রকাশ করিয়া তিনি বলেন যে, উভয়ের বিবৃতিই শান্তির আগ্রহ ও আশাবাদিতার প্রকৃষ্টতম নিদর্শন। তিনি আরও বলেন, বৃহৎ রাষ্ট্রপ্রধানগণ জেনেভায় অমীমাংসিত সমুদয় বিশ্ব-সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম হইবেন, এ আশা অবশ্য কেহই করে না। তবে এটুকু আশা করিলে অন্যায় হইবে না যে, পৃথিবীতে বর্তমানে যে বিরোধ ও উত্তেজনার ভাব বিদ্যমান, তাহা দূর করিয়া তাঁহারা শান্তির পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিতে সফলকাম হইবেন।

অতঃপর তিনি বলেন যে, ভারত কোনও শক্তিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত না হইয়া সমস্ত জাতির সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইতে চাহে। ইহাই ভারতের পররাষ্ট্রনীতি। পৃথিবী বর্তমানে যে অদ্ভুত ও বিপজ্জনক পরিবেশের মধ্যে রহিয়াছে, তাহাতে একমাত্র এইরূপ নীতি দ্বারাই কল্যাণ হইতে পারে। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি শান্তির নীতি, আর এই শান্তির জন্যই সমগ্র বিশ্ব আজ লালায়িত। কাজেই যে দেশই তিনি পরিদর্শন করিয়াছেন, সেখানেই ভারতের পররাষ্ট্র-নীতি বিপুল জনসমর্থন লাভ করিয়াছে।

গোয়া সমস্যার উল্লেখ করিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, শান্তিপূর্ণ উপায়েই তাঁহারা গোয়া সমস্যার সমাধান করিবেন। পুলিসী অভিযান দ্বারা গোয়া দখল করা ভারতের পক্ষে আদৌ কঠিন নহে। কিন্তু ইহা শান্তি-নীতির পরিপন্থী। শান্তিপূর্ণ পন্থা ব্যতীত অন্য যে-কোন পন্থাতেই পরিণামে তিক্ততা ও জটিলতার উদ্ভব অনিবার্য।

জার্মানীতে জঙ্গীবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া তিনি বলেন যে, এই প্রশ্নটির সন্তোষজনক সমাধান একান্ত আবশ্যক। অন্যথায় জার্মানীর উভয় পার্শ্বস্থিত জাতিগুলিকে পঁচিশ বৎসরের মধ্যে সে দুই-দুই বার পৃথিবীর দুইটি প্রলয়ঙ্কর জড়াইয়া ফেলিয়া ধ্বংসের বন্যা বহাইয়া দিয়াছে। আকালী মোর্চার উল্লেখ করিয়া প্রধানমন্ত্রী পঞ্জাবের হিন্দু ও শিখদিগকে ক্ষুদ্র বিবাদ-বিসম্বাদে অযথা শক্তি ক্ষয় না করিয়া ঐক্যবদ্ধ হইতে অনুরোধ জানান। তিনি এই আন্দোলনের নিন্দা করিয়া বলেন যে, এই শ্রেণীর আন্দোলন ভারতের সুনামে কলঙ্ক লেপন করিবে। "ক্ষুদ্র বিষয়ে ভারতবাসীকে যখন আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইতে দেখি, তখন আমার বিস্ময় ও মনস্তাপের সীমা থাকে না। সত্যাগ্রহ, আন্দোলন বা ধর্মঘট দ্বারা কোন সমস্যারই সমাধান হইতে পারে না। অভি-যোগের প্রতিকার লাভের ইহা ভ্রান্ত পন্থা। ইহা দেশকে দুর্বল করে এবং আন্দোলনকারীরাও অপরের চক্ষে নিজেদের হেয় করিয়া তোলেন।"

আকালী মোর্চার বিষয়ে পণ্ডিত নেহরু বোধ হয় মূলগত কারণ ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। সত্যাগ্রহ বা আন্দোলন দ্বারা কোন সমস্যারই সমাধান হইতে পারে না এ কথা ভুল। তবে সত্যাগ্রহ বা আন্দোলন যদি অসৎ অভিপ্রায়ে আরম্ভ হয় তবে তাহা ব্যর্থ হওয়া ধর্মতঃ উচিত।

কিন্তু আমাদের দেশে এখনও অসৎ লোকেরই জয়জয়কার। তাহারা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে সকল হীন পন্থা অবলম্বন করে তাহার নিন্দা মাত্র আমরা শুনি। তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত কোনও বিশেষ চেষ্টা আমরা দেখিতে পাই না। কংগ্রেসে ত ক্ষমতালোলুপ ও অর্থলোভী সদস্যের ঠেলায় সৎ লোকের স্থানই নাই। সেই কারণেই মাষ্টার তারা সিং ক্ষমতা-প্রাপ্তির চেষ্টায় লালায়িত।

শ্রীনগরে পণ্ডিত পন্থের ভাষণ

পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ বিগত ৫ই জুলাই শ্রীনগরে যে ভাষণ দিয়াছেন তাহার মর্মকথা লইয়া পাকিস্থান খুব সোরগোল বাধাইতেছে। পন্থজী কাশ্মীর সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহার সারাংশ নীচে দেওয়া গেল :

"শ্রীনগর ৫ই জুলাই—জাতীয় সম্মেলনের প্রধান কার্যালয় মুজাহিদ মঞ্জিলে সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ বলেন, কাশ্মীরের অধিবাসীরা গণপরিষদের মারফত অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন সম্পর্কে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, ভারত তাহা যথেষ্ট শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবে।

তিনি আরও বলেন, কাশ্মীরের অধিবাসিগণ ও জাতীয় সম্মেলন যখন দেখিলেন, ভারতের যথাশক্তি চেষ্টা সত্ত্বেও কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হইতেছে না, তখনই গণপরিষদ গঠিত হয়। অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে ইহাই দেখা গিয়াছে যে, পাকিস্থান কালহরণের নীতি অনুসরণ ও অসম্ভব সর্ত্ত আরোপ করায় কাশ্মীর সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসার জন্য ভারত যে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে অনিশ্চিত অবস্থা ও নিরাপত্তাবোধের অভাব দেখা দিয়াছে এবং সর্বপ্রকার উন্নয়ন কার্য বাধাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

তিনি আরও বলেন, ভারতের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন লইয়া ১৯৫১ সনে গণপরিষদের নির্বাচন হইয়াছিল। গণপরিষদের উদ্বোধন উপলক্ষে তখন সেখ আবদুল্লা বলিয়াছিলেন, কাশ্মীরীদের ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়াই একমাত্র পথ। পাকিস্থানে যোগদান বা স্বতন্ত্র থাকিতে চাহিলে কাশ্মীর ও জম্মুবাসীদের তাহাতে কল্যাণ হইবে না। গণতন্ত্রসম্মত উপায়ে গণপরিষদের নির্বাচন হইয়াছিল সুতরাং উহার সিদ্ধান্ত কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

সেখ আবদুল্লার উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত পন্থ বলেন, পুরাতন বন্ধুর সঙ্গ ত্যাগ সত্যই বেদনাদায়ক। কিন্তু জাতীয় সম্মেলন নীতির পথে বন্ধুত্বকে প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করিতে দিতে পারেন না। তিনি আশা করেন, শেখ আবদুল্লা সমগ্র বিষয়টি বিবেচনা করিয়া ভ্রান্তপথে চলিবার জিদ ত্যাগ করিবেন।

কাশ্মীর সর্ববিষয়ে অগ্রগতি লাভ করিতেছে বলিয়া পণ্ডিত পন্থ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেন, উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপায়ণে ও অন্যান্য জাতিগঠন কার্যে আপনারা সরকারের সহযোগিতা করুন।"

কাশ্মীর পরিস্থিতি

সম্প্রতি কাশ্মীর পরিস্থিতি সম্বন্ধে পাকিস্থান কিছু উষ্মা প্রকাশ

করিয়াছে এবং তাহার প্রধান কারণ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব পণ্ডিত পন্থ বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান অবস্থার বহুল পরিবর্ত্তন হওয়ায় কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণের জন্য আর নূতন করিয়া কোন গণভোটের প্রয়োজন নাই। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, কাশ্মীর যখন প্রথম ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেয় তখন গণভোটের দ্বারা ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণের আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল ঠিকই। কিন্তু গত সাত-আট বৎসরে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং কাশ্মীরের সংবিধান সভা (যাহা গণভোট দ্বারা নির্ব্বাচিত) কাশ্মীরের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্তি সমর্থন করিয়াছে।

এ ব্যাপারে পাকিস্থানের ক্রোধ প্রকাশের কোন কারণ থাকিতে পারে না। পন্থজী যাহা বলিয়াছেন তাহাই যথার্থ এবং তাহার অন্যথা কিছু হইতে পারে না। ভারত বিভাগ করিয়া দিয়া ব্রিটিশরাজ যখন ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যান তখন ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে অবিভক্ত ভারতের কোন সামন্তরাজ্যের রাজা যে রাষ্ট্রে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিবেন, সেই সামন্তরাজ্য সেই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে। এ কথা অবশ্য উভয় যুক্তরাষ্ট্রের সংলগ্ন রাজ্যগুলি সম্বন্ধে প্রযোজ্য, কিন্তু তাই বলিয়া হায়দরাবাদ পাকিস্থানে যোগ দিতে পারে না, কারণ ইহা ভারতের সীমারেখার মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে এক রাষ্ট্রের সীমারেখার মধ্যে অন্য রাষ্ট্রের অংশ থাকিতে পারে না, ইহাতে রাষ্ট্রের ভূমিসংস্থান ব্যাহত হয়। কাশ্মীর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থানের মধ্যস্থলে অবস্থিত, সেইজন্য কাশ্মীরের রাজা কোন রাষ্ট্রে যোগ দিবেন তাহার জন্য তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশের প্রয়োজন ছিল। ১৯৪৭ সনের ২৭শে অক্টোবর তদানীন্তন কাশ্মীররাজ ভারতীয় রাষ্ট্রে যোগ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং তদানীন্তন ভারতের বড়লাট লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন কাশ্মীর রাজ্যকে ভারতের অংশ বলিয়া গ্রহণ করেন। আইনতঃ ইহাতেই কাশ্মীর রাজ্য ভারতের চিরন্তন অংশ হিসাবে পরিগণিত হওয়ার কথা। কিন্তু ভারতবর্ষ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ঘোষণা করিয়াছিল যে, যদিও কাশ্মীর ভারতের মধ্যে আসিতেছে তথাপি পরে গণভোট দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে যে কাশ্মীর ভারতের সহিত থাকিবে কি থাকিবে না। সম্প্রতি কাশ্মীরের সংবিধান সভা ঘোষণা করিয়াছেন যে, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং আইনতঃ কাশ্মীর ভারতেরই অংশ।

কাশ্মীরের ভারতে যোগ দেওয়ার পর বহু রকম ঘটনা ঘটিয়াছে যাহার জন্য আইনতঃ ভারতবর্ষ প্রথম যে কথা দিয়াছিল কাশ্মীরে গণভোটের জন্য সে কথা বর্ত্তমানে নাও মানিতে পারে। তখন কথা ছিল যে, কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকাকালীন তাহার ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করিতে পারিবে। কিন্তু ৩০শে অক্টোবর ১৯৪৭ সনে পাকিস্থান বেআইনী ভাবে কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া বসে এবং কিছু অংশ দখল করিয়া লয়। কাশ্মীরের উপর পাকিস্থানের আইনগ্রাহ্য কোন অধিকার নাই, যে অধিকার বর্ত্তমানে আছে তাহা নিছক গায়ের জোর দ্বারা এবং ইহা এংলো-আমেরিকান ষড়যন্ত্রে সমর্থিত। পাকিস্থান অবশ্য কাশ্মীর আক্রমণের কথা প্রথমে অস্বীকার করিয়াছিল; কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘ কর্ত্তৃক যে কাশ্মীর কমিশন নিয়োজিত হয় তাহাদের নিকট পাকিস্থান স্বীকার করিতে বাধ্য হয় যে, কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া সে তাহার কিছু অংশ দখল করিয়া লইয়াছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ এংলো-আমেরিকান আঁতাতের জমিদারী এবং ব্রিটেন ও আমেরিকা পাকিস্থানকে হাতে রাখিবার জন্য কাশ্মীর কমিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এই সহজ ব্যাপারটিকে ঘোরালো করিয়া ছাড়িয়া দিলেন; সংখ্যালঘু দল অবশ্য ভারতের সপক্ষে রায় দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের অভিমতের কার্য্যকারিতা কিছুই নাই। কাশ্মীর সমস্যার সহজ সমাধান হইয়া যাইত যদি কাশ্মীর কমিশন পাকিস্থানকে বলিতেন যে, তুমি পররাষ্ট্র অপহরণকারী (aggressor ও usurper), সেইজন্য কাশ্মীরকে বেদখল করিয়া রাখিবার কোন অধিকার তোমার নাই। কিন্তু এই সহজ কথাই আজ অত্যন্ত ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘকে কাশ্মীর ব্যাপারে ডাকিয়া আনা খাল কাটিয়া কুমীর ডাকিয়া আনার সামিল হইয়াছে এবং এই "কৃতিত্বে"র জন্য দায়ী ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁহার আন্তর্জাতিক প্রীতি কিংবা সঠিকভাবে বলিতে গেলে তখন ইহা ছিল তাঁহার এংলো-আমেরিকান ব্লক-প্রীতি। এই প্রাথমিক ভুলের ফল ভারতবর্ষ আজও ভোগ করিতেছে এবং কাশ্মীর সমস্যার সমাধান আলেয়ার মত পিছু হটিয়া যাইতেছে।

বিচারক ওয়েন ডিক্সন ভারতের পক্ষে অভিমত দিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিমতে পাকিস্থানের কাশ্মীরের উপর কোন অধিকার থাকিতে পারে না, কারণ পাকিস্থান পররাষ্ট্র অন্যায় ভাবে আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু সে কথা আমেরিকা ও ব্রিটেনের মনঃপূত হয় নাই, সেইজন্য তাহাকে কার্য্যকরী করা হয় নাই। ভারতবর্ষ আজ নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অত্যন্ত দেরীতে।

কাশ্মীর পরিস্থিতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দেখা যায়, কাশ্মীর বিভাগ অবশ্যম্ভাবী, ভারতবর্ষের মধ্যে যে অংশ আছে তাহা ভারতবর্ষের এবং পাকিস্থানের দখলে যে অংশ আছে তাহা পাকিস্থানের। যদিও সমগ্র কাশ্মীর ভারতবর্ষের হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু প্রথম চালে তার ভুল হওয়ায় কাশ্মীরের কিছু অংশ উদ্ধার করা আজ প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। আর ঘন ঘন পাকিস্থানের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করা নিরর্থক, বিশেষতঃ উভয় পক্ষই যখন জানে যে গত আট বৎসর ধরিয়া আলোচনার দ্বারা কোন মীমাংসা সম্ভবপর হয় নাই। এইরূপ আলোচনার খারাপ দিকও আছে। কাশ্মীরের যে অংশ ভারতের সঙ্গে আছে তাহা তাহাদের সংবিধান সভার মারফত ভারতের সাহত সংযোগ সমর্থন করিয়াছে। এ অবস্থায় তাহাদের ভবিষ্যৎ গণভোটের দ্বারা নির্দ্ধারিত করার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না এবং এই ব্যাপারে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে মাঝে মাঝে যে আলোচনা হয় তাহাতে কাশ্মীরবাসীরা বিব্রত বোধ করে এবং একটি অনিশ্চিত মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

পাকিস্থানকে ভারতবর্ষের পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দেওয়া উচিত যে, সে কাশ্মীরকে জোর করিয়া বেআইনী ভাবে দখল করিয়া রাখিয়াছে, সুতরাং কাশ্মীরের কোন অংশের উপরই তাহার কোন অধিকার নাই। আর যতক্ষণ কাশ্মীরের সামান্য অংশও পাকিস্থানের দখলে থাকিবে ততক্ষণ গণভোটের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। পাকিস্থান আক্রমণকারী দেশ, সুতরাং তার কোন অধিকার নাই। আর আমেরিকা-পাকিস্থানের মধ্যে যে সামরিক সাহায্যের চুক্তি হইয়াছে তাহাতে কাশ্মীর সমস্যার রূপ পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, তাই ভারতবর্ষ আর গণভোট গ্রহণের জন্য বাধ্য নয়।

নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর সমস্যা আলোচনা ভারতবর্ষ ভাল ভাবে করিতে পারে নাই, তার ফলে কাশ্মীর পরিস্থিতির স্বরূপ জগতের কাছে পরিস্ফুট হয় নাই। ডাঃ গ্রেহাম যখন মধ্যস্থতার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ কর্তৃক নিয়োজিত হন তখন তাঁহার কাছেও ভারতবর্ষ তাহার দাবি সঠিক পেশ করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষের পক্ষে বার বার এক কথাই জোরের সহিত বলা প্রয়োজন যে, যতক্ষণ পাকিস্থান কাশ্মীর দখল করিয়া রাখিবে কিংবা তাহার একটি সৈন্যও কাশ্মীরে থাকিবে ততক্ষণ গণভোটের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। আর গণভোটের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল কাশ্মীরবাসীদের নিকট, পাকিস্থানকে কিংবা নিরাপত্তা পরিষদকেও নয়। সুতরাং পাকিস্থানের এ ব্যাপারে মাথা ঘামানোর অধিকার ভারতবর্ষ স্বীকার করে না।

নেকোয়ালের ঘটনা

জম্মু সীমান্তে নেকোয়ালে পাকিস্থানীদিগের আক্রমণে কয়েকজন ভারতীয় সৈনিক ও কয়েকজন অসামরিক ভারতীয় প্রাণ হারায়। সে বিষয়ে পাকিস্থান সরকার তাহাদের প্রথামত মিথ্যার ঢেউয়ে নিজেদের অন্যায় ঢাকিবার চেষ্টা চালাইতেছে। বর্তমান অবস্থা নিম্নের সংবাদে পাওয়া যায়:

নয়াদিল্লী, ২রা জুলাই—একজন সরকারী মুখপাত্র আজ এখানে বলিয়াছেন যে, জম্মু সীমান্তে নেকোয়ালের ঘটনায় জীবন ও সম্পত্তি হানির জন্য ভারত সরকার যে ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়াছিলেন, তৎসম্পর্কে পাকিস্থান সরকারের নিকট হইতে এখন পর্যন্ত কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। ইতিমধ্যে পাকিস্থানের সংবাদপত্রগুলি ঘটনাকে লঘু করিবার এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিদর্শকদের রিপোর্টের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশের জন্য চেষ্টা করিতেছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্য্যবেক্ষকদের রিপোর্টে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, নেকোয়ালের ঘটনা—পাকিস্থান-সীমান্ত পুলিস কর্তৃক পূর্ব্ব সঙ্কল্প ও পরিকল্পনা অনুযায়ী সীমা লঙ্ঘন।

উক্ত মুখপাত্র আরও বলেন যে, ভারত কর্তৃক অতীতে দুই সেনাবাহিনীর স্থানীয় অধিনায়কদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিভঙ্গের ভিত্তিহীন অভিযোগ আরোপ করিয়া জনসাধারণের মনে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা দ্বারা নেকোয়ালে পাকিস্থানী পুলিসের ইচ্ছাকৃত আক্রমণকে যুক্তিসঙ্গত প্রতিপন্ন করিবার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে।

মুখপাত্র বলেন যে, নেকোয়াল একটি ভারতীয় গ্রাম। ইহা কেবল রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্য্যবেক্ষকগণ কর্তৃক নহে, পাকিস্থান সেনাবাহিনীর অধিনায়কগণ কর্তৃকও সমর্থিত হইয়াছে।

যাহাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে এবং পাকিস্থানী সেনাদল ঐ গ্রামের ও উহার চতুর্দিকস্থ অঞ্চলের উপর ভারতীয় কর্তৃত্ব প্রয়োগে হস্তক্ষেপ না করে, তজ্জন্য ১৯৫০ সাল হইতে উভয় পক্ষের সেনাবাহিনীর অধিনায়কদের মধ্যে একাধিক চুক্তি সম্পাদিত হয়।

উক্ত মুখপাত্র আরও বলেন যে, রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্য্যবেক্ষকগণ ১২ জন নির্দোষ ভারতীয়ের হত্যার জন্য পাকিস্থান কর্তৃপক্ষ দায়ী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, এই হত্যা সমর্থনের এবং ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া প্রচারের চেষ্টা করা হইতেছে।

"তাজ্জব" ব্যাপার

আমরা নিম্নে প্রদত্ত সংবাদটির গুরুত্ব সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ভারত "সেকুলার ষ্টেট" হইতে পারে, কিন্তু নৌচলাচলের ব্যাপারে আমাদের নিরাপত্তা কোথায় তাহা আমাদের বুঝিবার সময় কি এখনও হয় নাই?

ভগবানগোলা (মুর্শিদাবাদ), ৯ই জুলাই—লালগোলাঘাট হইতে অদ্য প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ যে, গতকল্য মুর্শিদাবাদ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের 'নর্ম্মদা' নামীয় মোটর লঞ্চখানা লালগোলাঘাট হইতে ধুলিয়ান অভিমুখে যাত্রা করিবার পর পথিমধ্যে রঘুনাথগঞ্জ থানার এলাকা দয়ারামপুর কালীতলার নিকটবর্ত্তী কাঁচী চরের অপর পারে পাকিস্থানী সশস্ত্র রক্ষীবাহিনী তাহা আটক করে এবং লঞ্চের আরোহী প্রায় ৫।৬ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

সংবাদে প্রকাশ যে, জঙ্গীপুরের এস ডি ও লঞ্চে পরিভ্রমণ করিয়া এলাকা দেখিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের লঞ্চখানা লইয়া তাঁহার আস্তানা লালগোলাঘাট হইতে ধুলিয়ান অভিমুখে যাত্রা করেন। গতকল্য সকালে ছাড়িবার পর মধ্যস্রোত দিয়া যাওয়া সুবিধা বলিয়া লঞ্চের মুসলমান সারেং মধ্যস্রোত দিয়া যাইতে থাকে, কিন্তু সংবাদে প্রকাশ, দয়ারামপুর-কালীতলার নিকটবর্ত্তী কাঁচি চরের নিকটবর্ত্তী হইলে নাকি লঞ্চের কল বিগড়াইয়া যায়, ফলে তাহাকে স্রোতের টানে স্বাভাবিকভাবে যাইতে দেওয়া হয়। এই ভাবে স্রোতের টানে বিকল অবস্থায় যাইতে যাইতে নাকি অপর পারে পাকিস্থানের সীমান্তে ঘাটির নিকট যাইয়া লাগে এবং পাক-সশস্ত্র পুলিস লঞ্চখানাকে আটক করে ও আরোহিগণকে নাকি গ্রেপ্তার করে।

লঞ্চখানা ভাঙা অবস্থায় লালগোলাঘাট হইতে ছাড়িবার পর ঠিক পাকিস্থানী ঘাটির সম্মুখে কি করিয়া তাহার হঠাৎ কল বিগড়াইয়া গেল, সেই বিষয়ে সারেঙের কোন অদৃশ্য হাত রহিয়াছে বলিয়া অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সমবায়

১৭ই আষাঢ় অপরাহ্ণে কলিকাতায় রাজভবনে এই রাজ্যের উৎকৃষ্ট সমবায় সমিতিসমূহের মধ্যে "দেশমান্য বিধানচন্দ্র রায় কো-অপারেটিভ

নীড়" এবং অন্যান্য পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র বিতরণের এক অনুষ্ঠান হয়। উহাতে সম্বর্দ্ধনার উত্তরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সমবায় কর্ম্মিবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলেন যে, সকলে একত্র কাজ করিবার মনোভাব তাঁহারা যদি দেশের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত করিতে পারেন তাহা হইলেই বুঝা যাইবে যে, তাঁহাদের সমবায়ের কাজ অগ্রসর হইতেছে এবং সেই সঙ্গে দেশও অগ্রগতি লাভ করিতেছে।

সমবায়ের অন্তর্নিহিত ভাবধারাকে উপলব্ধি করিয়া সমবেত ভাবে দেশের উন্নতিকল্পে কার্য্য করিবার জন্য মনোভাব পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়া ডাঃ রায় আরও বলেন যে, শহর গ্রাম, ছোট বড়, ধনী গরীব এবং নর-নারীনির্ব্বিশেষে সকলে একযোগে কার্য্যে ব্রতী হইতে না পারিলে দেশের অগ্রগতি হইবে না, জাতি বড় হইতে পারিবে না এবং স্বাধীনতার ভিত্তিও সুদৃঢ়ভাবে গড়িয়া উঠিবে না। যৌথভাবে কার্য্যসাধনের জন্য ব্যক্তিগত মতভেদ সত্ত্বেও পরস্পরের উপর বিশ্বাস স্থাপন, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সর্ব্বোত্তম নীতি স্বরূপে সততা অবলম্বনের উপরও তিনি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

আমরা বহু বার বলিয়াছি সমবায়ই বাঙালীর একমাত্র পরিত্রাণের পথ। ডাঃ রায়ও তাহাই বলিয়াছেন।

মরক্কোতে মাৎস্যন্যায়

ফরাসী উত্তর আফ্রিকার বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে নিম্নে প্রদত্ত সংবাদটি বিশেষ আলোকপাত করে। সাম্রাজ্যবাদী ফরাসী যে কিরূপ নিম্ন স্তরের জীব তাহা ইহাতে বেশ বুঝা যায়:

কাসাব্লাঙ্কা, ১৭ই জুলাই—দুই দিনব্যাপী দাঙ্গাহাঙ্গামার পর অদ্য সৈন্যগণ কাসাব্লাঙ্কার রাজপথে টহল দিতে আরম্ভ করে। দুই দিনের দাঙ্গাহাঙ্গামায় কমপক্ষে ৩১ জন ইউরোপীয় এবং মরক্কোবাসী নিহত হইয়াছে।

ইউরোপীয় অঞ্চলে ইউরোপীয়গণ নবনিযুক্ত প্রেসিডেন্ট জেনারেল মঁ গিলবার্ট গ্রাণ্ডভালকে লাথি মারে ও প্রহার করে। তাহারা 'গ্রাণ্ডভাল নিপাত যাউক' ধ্বনি করিতে থাকে।

গত বৃহস্পতিবার রাত্রে এক বোমা বিস্ফোরণের ফলে ৬ জন ইউরোপীয় নিহত এবং অন্যান্য ৩০ জন আহত হয়।

সহরে দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় ১৩ জন মরক্কোবাসী গুলীর আঘাতে অথবা প্রহারের ফলে নিহত হইয়াছে।

গত রাত্রে আরব-অধ্যুষিত এলাকায় দাঙ্গাকারীরা দোকানে এবং টেলিগ্রাফের খুঁটিতে অগ্নিসংযোগ করিতে থাকে। মঁ গ্রাণ্ড-ভাল কর্ত্তৃক নিযুক্ত জেনারেল লেবর্গা অদ্য সহরের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি অদ্য আরব অঞ্চল পরিদর্শন করেন।

রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

কলিকাতা গবর্ন্মেণ্ট কলেজ অফ্ আর্ট এণ্ড ক্র্যাফ্ট-এর অধ্যক্ষ প্রখ্যাত শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী গত ৬ই জুলাই (২২শে আষাঢ়) সকালে অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রথম জীবনে তৎ-কৃত বিস্তর কাঠখোদাই, ড্রাইপয়েণ্ট, রঙীন কাঠখোদাই প্রভৃতির চিত্র 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। আধুনিক কালেও তাঁহার কোন কোন চিত্র আমরা পত্রস্থ করিয়াছি। দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁহার সঙ্গে আমরা ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলাম, তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি লক্ষ্য করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। তাঁহার দেহত্যাগে আমরা আত্মীয়বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিতেছি।

রমেন্দ্রনাথ ১৯০২ সনে ত্রিপুরা জেলায় চাঁদের চর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আগরতলাস্থিত উমাকান্ত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার ব্যুৎপত্তি এবং দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থাদি সুধীসমাজে তাঁহাকে সে যুগে সুপরিচিত করিয়াছিল। পুত্র রমেন্দ্রনাথকে তিনি আগরতলা লইয়া যান এবং নিজ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন। নদ-নদী, পাহাড়-পর্ব্বত, অরণ্যানী সমাকীর্ণ প্রকৃতির মধ্যে রমেন্দ্র-নাথের সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণা চিত্রবিদ্যার মধ্য দিয়া প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ পায়। ১৯১৯ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলি-কাতায় আসিয়া গবর্ন্মেণ্ট আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হন। এখানে দুই বৎসর অধ্যয়নের পর শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী কলাভবনে প্রবেশ করেন।

এখানকার শিক্ষা সমাপনান্তে রমেন্দ্রনাথ ১৯২৬ সনে অন্ধ্র জাতীয় কলাশালার অধ্যক্ষ হইয়া মসলিপট্টমে যান। দুই বৎসর পরে বিশ্বভারতীর কলাভবনে ফিরিয়া আসেন এবং নন্দলালের অধ্যক্ষতায় শিক্ষাব্রত গ্রহণ করেন। কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে হেডমাষ্টারের পদ প্রাপ্ত হন ইহার ঠিক এক বৎসর পরে ১৯২৯ সনে। এই পদে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত তিনি কার্য্য করেন। মধ্যে অস্থায়ী প্রিন্সিপালও হইয়াছিলেন। ১৯৩৭-৩৯, এই দুই বৎসর ইউরোপের বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রে চিত্রবিদ্যার উৎকর্ষ স্বচক্ষে দেখিবার জন্য গমন করেন এবং প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পীদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হন। ইঁহাদের মধ্যে সর্ মুইরহেড বোন, ষ্টানলি স্পেনসার, হেনরি মুর, এরিক গিল, এনড্রু লোতে প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ সকল শিল্পকেন্দ্র পরিদর্শন এবং এই সব বিখ্যাত কলাবিদের সংস্পর্শে থাকিয়া চিত্রবিদ্যা ও ইহার শিক্ষণ প্রণালী সম্পর্কে নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

রমেন্দ্রনাথ ১৯৪৬ সনে দিল্লীতে ভারত সরকারের পলিটেকনিক ইন্‌ষ্টিটিউটে কলাবিভাগের অধ্যক্ষ হইয়া যান। অতঃপর তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতার দপ্তরের প্রকাশন বিভাগে চীফ আর্টিষ্টের পদে কর্ম্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৭ সনে ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্যারিসে প্রেরিত হন ইউনেস্কোর অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চিত্র-প্রদর্শনীর ভারতীয় বিভাগের আয়োজন করিবার নিমিত্ত। ১৯৪৮ সনে তিনি পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া গবর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেন। এই সময় আর্ট স্কুল আর্ট কলেজে পরিণত হয়। রমেন্দ্রনাথেরই তত্ত্বাবধানে কলেজের কমার্শিয়াল আর্ট, কারুবিদ্যা প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ শিল্প এবং সমাজের পক্ষে অত্যাবশ্যক বিভাগ খুলিবার ব্যবস্থা হয়। আর্ট

স্কুলের সাম্প্রতিক বার্ষিক প্রদর্শনীগুলি চারু ও কারুবিদ্যার নিদর্শনে বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। কলেজের অধ্যক্ষপদাধিকার বলে তিনি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের অনারারী ট্রাষ্টী এবং মিউজিয়মের আর্ট বিভাগের 'কীপার' ছিলেন। রমেন্দ্রনাথ কাঠখোদাই চিত্রে সর্ব্বত্র খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, অন্যবিধ চিত্রেও তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। তিনি 'গ্রাফিক আর্ট' সম্বন্ধে সম্প্রতি বিশেষ উৎসাহী হইয়া উঠেন। কারণ চিত্রকে সাধারণগ্রাহ্য করিতে হইলে এই পন্থা অবলম্বন ব্যতীত উপায় নাই। রমেন্দ্রনাথের চিত্রকলা এবং গ্রাফিক আর্ট সম্বন্ধে উদ্যোগ বিষয়ে 'প্রবাসী'র ৪৬৯-৭২ পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

রমেন্দ্রনাথ ভারত সরকার কর্তৃক ১৯৫২ সনে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত হন। তিনি সেখানকার প্রধান প্রধান শহরে ভারতীয় চিত্রকলার প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন, তিনি সম্প্রতিও ভারতীয় চিত্রকলার প্রসার সম্পর্কে বিদেশে গমন করিয়াছিলেন। মাত্র অল্পদিন হইল তাঁহার মুখে কোন কোন ব্রিটিশ ও মার্কিন চিত্রানুরাগীর চিত্রশালা ও চিত্র-সংরক্ষণ ব্যবস্থার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। রমেন্দ্রনাথ স্বয়ং কলাবিদ্ ও কলাকুশল ত বটেনই, জনসাধারণকেও কলানুরাগী করার দিকে তাঁহার ঐকান্তিক প্রয়াস ছিল। রমেন্দ্রনাথ বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

নেহরু-বুলগানিন ঘোষণা

ভারতের প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশ পরিভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ৩৭ দিনব্যাপী পরিভ্রমণকালে শ্রীনেহরু যেখানেই গিয়াছেন সেখানেই প্রভূত সমাদর পাইয়াছেন। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নে তাঁহাকে যে অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছে তাহা অভূতপূর্ব্ব। ইহার পূর্ব্বে কোন বিদেশীয়কে সোভিয়েট ইউনিয়নে ঐ ভাবে সমাদৃত করা হয় নাই। শ্রীনেহরুর সম্মানে ক্ষেত্রবিশেষে সরকারী নিয়মকানুন পর্য্যন্ত ভঙ্গ করা হইয়াছে। শান্তিপ্রিয় ভারতের প্রতিনিধি হিসাবেই শ্রীনেহরু যে অভূতপূর্ব্ব সংবর্দ্ধনা লাভ করিয়াছেন সেকথা স্বয়ং শ্রীনেহরুও বলিয়াছেন। কিন্তু পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠী শ্রীনেহরুর এই সম্মানকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে নাই। পণ্ডিত নেহরুর রাশিয়া ভ্রমণের প্রথম দিকে ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠ পত্রিকাগুলি ইহার কোনই গুরুত্ব দেয় নাই। সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ-আলোচনার পর সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের স্বাক্ষরিত যে যুক্ত ঘোষণাটি প্রকাশিত হয় মার্কিন সংবাদপত্রগুলিতে তাহার গুরুত্ব যথাসম্ভব হ্রাস করিয়া দেখাইবার চেষ্টাই করা হয়।

নেহরু-বুলগানিন ঘোষণায় ভারতবর্ষ ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে সৌহার্দ্য এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, পাঁচটি নীতির উপর ভারত-সোভিয়েট সম্পর্ক অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত হইবে। সেই পঞ্চনীতি হইতেছে: "(১) পরস্পরের রাষ্ট্রীক অখণ্ডতা ও সার্ব্বভৌমত্ব রক্ষা, (২) অনাক্রমণ, (৩) যে-কোন বৈষয়িক, রাজনৈতিক ও আদর্শগত কারণে পরস্পরের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, (৪) সমতা ও পারস্পরিক সুবিধাদান, এবং (৫) নিরুপদ্রব সহাবস্থান।"

এই পঞ্চনীতির ক্রমবর্দ্ধমান স্বীকৃতির উল্লেখ করিয়া প্রধানমন্ত্রীদ্বয় এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে "বৃহত্তর ক্ষেত্রেও ঐসব নীতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের ব্যাপারে বিভিন্ন জাতিকর্তৃক ঐগুলির সুপ্রয়োগের মধ্যে তাহাদের মন হইতে ভয় ও অবিশ্বাস দূর করার এবং এইভাবে বিশ্বের উত্তেজনা প্রশমনের আশা নিহিত।" পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বৃহৎ শক্তিবর্গ সম্পর্কে ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল রাষ্ট্রগুলির মনে যে আশঙ্কা রহিয়াছে কেবলমাত্র উক্ত পঞ্চনীতির ভিত্তিতে সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেই সেই ভয় দূর করা সম্ভব।

প্রধানমন্ত্রীদ্বয় গত এপ্রিল মাসে বান্দুং-এ অনুষ্ঠিত এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমূহের সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করেন। তাঁহারা বলেন, "এই ধরনের সম্মেলন এই প্রথম হইল বলিয়া উহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব রহিয়াছে।...এই সম্মেলনে যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সেগুলির কেবলমাত্র সম্মেলনে যোগদানকারী রাষ্ট্রসমূহের পক্ষেই তাৎপর্য্য ছিল না, বিশ্বশান্তির দিক হইতেও উহার বিশেষ মূল্য রহিয়াছে।..."

সাধারণভাবে বিশ্বের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উন্নতি পরিলক্ষিত হইলেও এবং বিশেষ করিয়া দূরপ্রাচ্যে রেষারেষির ভাব হ্রাস পাইলেও প্রধানমন্ত্রীদ্বয় দূরপ্রাচ্যে মনকষাকষির বিভিন্ন কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাইওয়ান (ফরমোসা) সম্পর্কে চীনের ন্যায়সঙ্গত দাবি পূরণ করা সম্ভব হইবে। চীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যপদ দানে অসম্মতিই দূরপ্রাচ্যের অশান্তির মূল কারণ। সদস্যপদ লাভের যোগ্য সকল রাষ্ট্রকেই রাষ্ট্রপুঞ্জে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ইন্দোচীন সমস্যা সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া উক্ত ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, ইন্দোচীন সম্পর্কিত জেনেভা চুক্তিকে কার্য্যে রূপদানের চেষ্টায় যে পরিমাণ সফলতা ঘটিবে, তাহার দ্বারাই আন্তর্জাতিক বিরোধের সমাধানের উপায় হিসাবে আলাপ-আলোচনার সার্থকতাও বিচার করা হইবে। উক্ত চুক্তি কার্য্যকরী করিবার পথে যাহাতে কোন প্রতিবন্ধক না দেখা দেয় তজ্জন্য প্রধানমন্ত্রীদ্বয় সংশ্লিষ্ট সকল সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন।

পরমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কিত পরীক্ষাগুলি অবিলম্বে বন্ধ করিবার আবেদন জানাইয়া প্রধানমন্ত্রীদ্বয় আরও বলিয়াছেন যে, "যুগপৎ প্রচলিত অস্ত্রের পরিমাণও যথেষ্ট হ্রাস করা প্রয়োজন এবং এইজন্য কার্য্যকরীভাবে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত ও কায়েম করা আবশ্যক। নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে সোভিয়েটের সাম্প্রতিক প্রস্তাব শান্তির সহায়ক হইবে বলিয়াই স্বীকৃত হয়।"

পঞ্চনীতির ভিত্তিতে ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রসারের প্রভূত সুযোগের উল্লেখ করিয়া প্রধানমন্ত্রীদ্বয় বলিয়াছেন যে, "কিছুকাল

পূর্ব্বে উভয় দেশের মধ্যে যে বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদিত হয়, উহার কল্যাণে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার উল্লেখযোগ্য প্রসার দেখা যাইতেছে। সোভিয়েট সরকারের সহায়তায় ভারতে একটি ইস্পাত কারখানা স্থাপনের জন্য সম্প্রতি যে চুক্তি হইয়াছে, উহা এ ধরনের সহযোগিতার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এ ধরনের সহযোগিতার ফলস্বরূপ পারস্পরিক কল্যাণের কথা স্মরণ রাখিয়া উভয় প্রধানমন্ত্রীই অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি গবেষণার ব্যাপারে উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্ক বাড়াইয়া তুলিবার চেষ্টা করিবেন।"

পুলিসের দুর্নীতিপরায়ণতা

১৬ই আষাঢ় এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে বর্দ্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি-সম্পাদিত "বর্দ্ধমান বাণী" লিখিতেছেন :

"থানার দারোগা হইতে আরম্ভ করিয়া অধস্তন পুলিস কর্ম্মচারী-দের অসদাচরণ সম্পর্কে অভিযোগ প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় এবং এই সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্যও বর্দ্ধমান বাণীতে প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি আসানসোল যাইবার পথে মুনিয়া ব্রিজ পার হইবার সময় মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, উপমন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ এই প্রকার এক ছোট দারোগার সন্ধান পাইয়াছেন। ছোট দারোগাটি সাময়িক ভাবে বরখাস্ত হইয়াছেন। নিতান্ত মন্ত্রীর হাতে পড়িয়াছে, কাজেই একেবারে ধামাচাপা দিবার উপায় নাই। তথাপি ইহার শেষ কি ভাবে হইবে আমরা জানি না—আমরা পরিণতি দেখিবার প্রতীক্ষায় রহিলাম।"

পুলিস বিভাগে দুর্নীতির প্রসার সম্পর্কে "জি. টি. রোড" পত্রিকার পর পর কয়েকটি সংখ্যায় বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। পত্রিকাটি লিখিতেছেন, "পুলিসবিভাগের সর্ব্বত্রই যদিও দুর্নীতির প্রসার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে তবুও কর্ত্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোন মনোযোগ দিয়াছেন বলিয়া বুঝা যায় না।"

পুলিস বিভাগের দুর্নীতিপ্রবণতার দৃষ্টান্ত দিয়া "জি. টি. রোড" লিখিতেছেন, ট্রাফিক পুলিসকে ঘুষ না দিলে কাহারও পক্ষে কোন মালই ট্রাকে চালান দেওয়া অসম্ভব। পুলিসের সহিত যোগাযোগ না করিয়া কোন সৎ উকিলের পক্ষে ফৌজদারী মামলা চালান অসম্ভব।

"পঞ্চদেবতার মধ্যে গণেশ যেমন সর্ব্বাগ্রে পূজা পাইয়া থাকে তেমনি সর্ব্বস্তরের সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতির মুনফার একাংশ পুলিসের ভাগে তেমনি রাখিতেই হইবে। অর্থাৎ, সে যে বিভাগেই দুর্নীতি চালাক না পুলিসের আওতায় তাহাকে আসিতেই হইবে এবং পুলিস তাহার অংশ লইয়া সেই দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়া থাকে।"

২১শে আষাঢ় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে পুলিসের দুর্নীতিদমনের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করিয়া "জি. টি. রোড" লিখিতেছেন, 'অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের চরিত্র সংশোধনের জন্য অবিলম্বে একটি কমিশন বসান প্রয়োজন যাঁহারা দুর্নীতির তথ্য সংগ্রহ করিয়া কিরূপে তাহার নিরসন করা সম্ভব সে সম্পর্কে উপদেশ দিবেন। পুলিসের ত্রুটি প্রমাণিত হইলে সামরিক বিভাগের মত শাস্তি দিতে হইবে। "পুলিসে ঢুকিবার পূর্ব্বেই লোকের ধারণা ইহা উপরি রোজগারের স্থান। এই ধারণা বদলাইয়া দিতে হইবে এবং পুলিস ট্রেনিং কলেজে এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে তাহাদের ধারণা সুস্পষ্ট হয় যে পুলিস বিভাগে দুর্নীতি অচল।..."

কলিকাতার হাসপাতাল

পশ্চিমবঙ্গের মফস্বল অঞ্চলের হাসপাতালগুলিতে যে অরাজকতা চলিতেছে তাহার নানাবিধ দৃষ্টান্ত আমরা প্রায়ই প্রকাশ করিয়া থাকি। কলিকাতার হাসপাতালগুলিতেও যে অবস্থা বিশেষ উন্নত নহে সম্প্রতি দৈনিক সংবাদপত্রে কয়েকটি সংবাদে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। সরকারপক্ষ হইতে অবশ্য চিরাচরিত প্রথায় সকল ব্যাপারকেই "অতিরঞ্জিত এবং ভিত্তিহীন" বলা হইয়াছে।

সম্প্রতি একটি সংবাদে প্রকাশ, গোপীনাথ দে নামক একজন রোগী গত ৬ই মে নীলরতন সরকার হাসপাতালে মারা যান, কিন্তু মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনের নিকট তাঁহার মৃত্যুর খবর ৩রা জুনের পূর্ব্বে পৌঁছে নাই। ৩রা জুন উক্ত ব্যক্তির আত্মীয়বর্গ একটি বিশেষ জরুরী কার্য্যে তাঁহার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলে তাঁহারা শ্রীযুক্ত দে'র মৃত্যুর সংবাদ জানিতে পারেন। মৃত ব্যক্তির স্ত্রী শ্রীশান্তিলতা দে এই বলিয়া অভিযোগ করেন যে, তিনি ৩রা জুনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যহ তাঁহার স্বামীর জন্য বাড়ী হইতে আহার্য্য লইয়া যাইতেন এবং হাসপাতালের পক্ষ হইতে নিয়মিত ভাবে ঐ আহার্য্য রাখা হইত এবং জিজ্ঞাসা করিলে প্রত্যহই তাঁহাকে বলা হইত যে, রোগীর অবস্থা ভালই।

সরকারী অনুসন্ধান করিয়া বলা হইয়াছে যে, ৬ই মে মৃত্যুর খবর প্রথমত লালবাজারে জানাইয়া দেওয়া হয় এবং লালবাজার হইতে মুচিপাড়া থানায় সে খবর পাঠান হয় মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে জানাইয়া দিবার জন্য, কিন্তু "বুঝিবার ভুলে" ঐ খবর মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনের নিকট পাঠান সম্ভব হয় নাই।

সরকারী বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে যে, রোগীর আত্মীয়স্বজন প্রত্যহ তাঁহার খোঁজখবর লইতে যাইতেন তাহা সত্য নহে। জানুয়ারী মাসের ১১ তারিখে যখন রোগীকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয় তাহার পর মাত্র তিন বার রোগীর আত্মীয়েরা তাঁহার খবর লইতে যান এবং তাহাও মৃত্যুর বহু পূর্ব্বে। কোনও ডাক্তারের নিকট রোগীর আত্মীয়স্বজন রোগীর অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ লন নাই। একবার একটি সাদা কাগজে রোগীর সহি লইবার জন্য তাঁহার স্ত্রী ডাক্তারের নিকট গেলে ডাক্তার তাঁহাকে হাসপাতালের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অথবা সংক্রামক ব্যাধি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তার সহিত দেখা করিতে পরামর্শ দেন কিন্তু ভদ্রমহিলা তাহা করেন নাই।

বিভিন্ন সূত্র হইতে হাসপাতাল পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে যে

সকল সংবাদ আমরা পাইয়া থাকি তাহাতে একথা প্রায় নিশ্চিত করিয়া বলা যাইতে পারে যে উক্ত ভদ্রমহিলা মুরুব্বির জোর না থাকিলে চেষ্টা সত্ত্বেও হাসপাতাল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অথবা সংক্রামক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হইতেন না। দৈবাৎ সাক্ষাৎ লাভ ঘটিলেও যে উঁহাদিগের নিকট হইতে তিনি কোন সাহায্য সহজে পাইতেন তাহা মনে হয় না। রোগী লইয়া কোন হাসপাতালে যাইবার দুর্ভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে তাঁহারাই এই উক্তির যথার্থতা বুঝিতে পারিবেন।

মুর্শিদাবাদে প্রাথমিক শিক্ষকের নির্ব্বাচন বাতিল

"ভারতী"র সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার মুর্শিদাবাদ জেলা স্কুল বোর্ডে নির্ব্বাচিত প্রাথমিক শিক্ষক প্রতিনিধির নির্ব্বাচন আইনগত ত্রুটির অজুহাতে বাতিল করিয়াছেন, এবং নূতন নির্ব্বাচনের আদেশ দিয়াছেন। সরকারী অজুহাত এই যে, ১৯৪৭ সনের মার্চ মাসে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে সরকার যে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন তাহা প্রতিপালিত হয় নাই। সরকারী নির্দ্দেশে বলা ছিল যে, জেলা স্কুল বোর্ডে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের জন্য জেলার সকল প্রাথমিক শিক্ষকের একটি সভা আহ্বান করিয়া উক্ত সভাস্থলেই প্রাথমিক শিক্ষকগণের ভোটে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। কিন্তু প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে উক্ত নির্দ্দেশ প্রতিপালিত হয় নাই এবং পোষ্টাল ব্যালটযোগে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হয়। সেইজন্যই সরকার হইতে নির্ব্বাচন বাতিল করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

এই সরকারী বিধানের কড়া সমালোচনা করিয়া মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ হইতে সমিতির সভাপতি, শ্রীমদনমোহন ঘোষ এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি শ্রীনির্ম্মাল্য বাগচী এক যুক্ত বিবৃতি দিয়াছেন।

বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, "সকলেরই স্মরণ আছে যে, এতাবৎ কাল স্কুলবোর্ডে প্রাথমিক শিক্ষক প্রতিনিধি প্রাথমিক শিক্ষকগণের ভোটে নির্ব্বাচিত না করিয়া সরকার নিজস্ব বশম্বদ ব্যক্তিকে সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষক সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত করিয়া আসিতেছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষক-সমিতি দীর্ঘকাল আন্দোলনের ফলে মনোনয়ন প্রথার অবসান ঘটাইয়া নির্ব্বাচনের অধিকার আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং তাহারই ফলে গত জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পোষ্টাল ব্যালটে অত্যন্ত সাফল্যের সহিত উক্ত নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। শতকরা ৯৫ জন ভোটদাতা নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির প্রার্থী জনাব আজিজুর রহমান ২২৪১ ভোট পাইয়া স্কুলবোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। বিশ বৎসর যাবৎ সরকার-মনোনীত প্রার্থী পাইয়াছেন মাত্র ১৩ ভোট।

"নির্ব্বাচনের পর প্রায় ছয় মাস অতিবাহিত হইতে চলিল এবং স্কুলবোর্ডের মেয়াদ শেষ হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও নূতন বোর্ডের হস্তে ক্ষমতা অর্পণ এবং সভাপতি নির্ব্বাচন অদ্যাবধি স্থগিত রাখিয়া নির্ব্বাচিত প্রার্থীর অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। এই অহেতুক কালক্ষেপের পশ্চাতে কোন্ অদৃশ্য হস্তের ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহা জনসাধারণকে জানানো হউক।

"সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইভাবে প্রায় ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পর সরকার উক্ত নির্ব্বাচন সম্পূর্ণ বাতিল করিয়া পুনর্নির্ব্বাচনের আদেশ দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, নির্ব্বাচিত প্রার্থীকে নির্ব্বাচন বাতিল এবং পুনর্নির্ব্বাচনের আদেশ সম্পর্কে অদ্যাবধি কিছুই জানানো হয় নাই।"

প্রাথমিক শিক্ষক প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের পদ্ধতি সম্পর্কে সরকারী নির্দ্দেশের "তীব্র প্রতিবাদ" জানাইয়া উক্ত বিবৃতিতে বলা হইয়াছে—ঐ পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে গণতন্ত্রবিরোধী। "এই পদ্ধতিতে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে জেলার অধিকাংশ শিক্ষকই নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। রৌদ্র-ঝড়-বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং আর্থিক অভাবের দরুন অধিকাংশ শিক্ষকের পক্ষেই নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ের মধ্যে উপস্থিত হইয়া ভোটপ্রদান সম্ভব হইবে না।" উপরন্তু ঐ ব্যবস্থায় যে সকল প্রাথমিক শিক্ষক ভোট দিতে আসিবেন তাঁহারা প্রকৃত ভোটার কিনা তাহা সনাক্তকরণের কোন ব্যবস্থাই নাই।

এই অবস্থায় সরকারের নিকট অনুরোধ জানানো হইয়াছে যে পুনর্নির্ব্বাচনের আদেশ প্রত্যাহার করিয়া তাঁহারা যেন জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত নির্ব্বাচনকেই স্বীকার করিয়া লন।

২৩শে জুন এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে সাপ্তাহিক "ভারতী" সরকারী নির্দ্দেশের সমালোচনা করিয়া লিখিতেছেন যে, আইনগত যুক্তির অজুহাতে নির্ব্বাচন বাতিল করিবার পিছনে কি সমর্থন আছে তাহা বুঝিতে পারা কঠিন। "স্কুলবোর্ডের সেক্রেটারী জেলা স্কুলসমূহের পরিচালকের মত দায়িত্বশীল একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে এইরূপ আইনগত ত্রুটি কেন যে তাঁহার নিকট ধরা পড়িল না এবং কেনই বা তাহা নির্ব্বাচনের পর ধরা পড়িল তাহা ভাবিয়া বিস্ময় বোধ করিতেছি। যে পদ্ধতিতে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা ভারতীয় সংবিধানের অনুমোদিত পদ্ধতি এবং উক্ত পদ্ধতিতে অন্যান্য ক্ষেত্রেও নির্ব্বাচন পরিচালিত হইতেছে। সুতরাং ইহাকে মানিয়া লইয়া উক্ত প্রথায় অনুষ্ঠিত নির্ব্বাচনকে সিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিলে কি ক্ষতি হইতে পারে তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। তাহা ছাড়া এই নির্ব্বাচন বাতিল করিলে স্কুলবোর্ডের কর্তৃপক্ষের দোষে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থিগণের ও বোর্ডের যে অর্থব্যয় হইয়াছে তাহার জন্যই বা কে দায়ী হইবে?"

আমাদের মতে নির্ব্বাচন সম্পর্কে সরকারী নির্দ্দেশ যখন আসিয়াছিল তখনই এই সকল সমালোচনা করা উচিত ছিল। নির্দ্দেশ অমান্য করিলে নির্ব্বাচন বাতিল হওয়া স্বাভাবিক। নির্দ্দেশ যাহা ছিল তাহাতে যে সকল অসুবিধা আছে সে বিষয়ে কি পূর্ব্বে যথাস্থানে কিছু জানানো হইয়াছিল? শাসনতন্ত্রের নির্দ্দেশ ভুল

হইলে তাহার সংশোধনের চেষ্টা করাই উচিত, তাহা অগ্রাহ্য করিলে অসুবিধা হইবেই।

জঙ্গীপুরে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা

এই বৎসর মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জঙ্গীপুর মহকুমার ছাত্রগণ স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় তেমন সুবিধা করিতে পারে নাই। জঙ্গীপুর, রঘুনাথগঞ্জ, নয়নসুখ, ছাপঘাটি প্রভৃতি বিদ্যালয় হইতে প্রায় দেড় শত ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল। উহাদের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র পাস করিয়াছে।

৮ই আষাঢ় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে জঙ্গীপুর কেন্দ্রের ছাত্রদের এইরূপ নৈরাশ্যজনক ফলাফলে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া "ভারতী" এই বিপর্যয়ের যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করিয়া প্রতিবিধানের নিমিত্ত আবেদন জানাইয়াছেন।

পত্রিকাটি লিখিতেছেন, ছাত্রদের মেধা নাই বলিয়া সকল দোষ তাহাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া সমীচীন হইবে না। গ্রামাঞ্চলে যোগ্য শিক্ষকের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তথায় অধিকাংশ ছাত্রের ভবিষ্যৎই নির্ভর করে স্কুলে প্রদত্ত শিক্ষার উপর। অর্থাভাবে অধিকাংশের পক্ষেই প্রাইভেট শিক্ষক রাখা সম্ভব হয় না। অপরদিকে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের উপরও চাপ বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু নানাবিধ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে উপযুক্ত শিক্ষকের নিতান্তই অভাব রহিয়াছে। যদিও বর্তমানে সর্বত্রই শিক্ষকদিগের বেতনের হার একরূপ তথাপি গ্রামাঞ্চলে প্রাইভেট টিউশনির অভাব এবং অন্যান্য কারণের জন্য অনেকেই গ্রামাঞ্চলে শিক্ষকতায় স্বীকৃত হন না।

এই অবস্থায় স্পেশ্যাল ক্যাডারের গ্রাজুয়েট শিক্ষকদিগকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে অতিরিক্ত শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করিলে সমস্যার আংশিক সমাধান হইতে পারে বলিয়া পত্রিকাটি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই অভিমত আমরা যথাযথ মনে করি।

কিন্তু ছাত্রদিগকে শিক্ষাবিষয়ে অবহিত করার জন্য অন্য অনেক কিছু প্রয়োজন। বর্তমানে বাঙালী ছাত্র যেভাবে সকল দিকেই হটিয়া যাইতেছে তাহাতে জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কা জন্মিতেছে।

বারাসাত কলেজ

এ বৎসর স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় বারাসাত মহকুমা হইতে অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিকসংখ্যক ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে মহকুমার ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষালাভের পথে যে সকল প্রতিবন্ধক রহিয়াছে তাহার আলোচনা করিয়া "বারাসাত বার্তা" ১২ই আষাঢ় একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

বারাসাত মহকুমায় দুইটি কলেজ রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ অপেক্ষাকৃত পুরাতন এবং সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের নানারূপ সুবিধা রহিয়াছে। বারাসাতে একটি সরকারী ইন্টারমিডিয়েট কলেজ রহিয়াছে। কিন্তু তথায় ছাত্র ভর্তির পক্ষে প্রধান অন্তরায় এই যে নির্দিষ্ট বিষয়ের অতিরিক্ত চতুর্থ বিষয় লইয়া পড়িবার সুযোগ নাই। উপরন্তু স্থানীয় ছাত্রছাত্রী আই-এ পাস করিবার পর উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য কলিকাতা বা অন্যত্র যাইতে বাধ্য হয়, কারণ বারাসাত কলেজে বি-এ ক্লাসের কোন বন্দোবস্ত নাই।

পত্রিকাটি লিখিতেছেন, "বারাসাত অঞ্চলে ছাত্রসংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে অনতিবিলম্বে স্থানীয় কলেজের উন্নতিবিধান অত্যাবশ্যক। হাবড়া অঞ্চলেও কলেজ প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে।"

বারাসাত কলেজের ছাত্র এবং অধ্যাপকদিগের মধ্যে ব্যক্তিগত সান্নিধ্যের অভাবের উল্লেখপূর্বক "বারাসাত বার্তা" লিখিতেছেন, "ক্লাসের বাহিরে যদি কোন ছাত্র অধ্যাপকের সান্নিধ্য প্রয়োজন বোধ করে তবে তাহাকে পরদিবস কলেজের এক মুহূর্ত অবসর সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত মফস্বল শহরের কলেজের অধ্যাপক বা বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যদি শহরে বাস না করেন তবে স্থানীয় সমাজের শিক্ষার একটি অঙ্গই পঙ্গু হইয়া গেল। কর্তৃপক্ষ যদি উক্ত বিষয়ে যত্ন গ্রহণ করেন এবং অধ্যাপকগণের উপযুক্ত বাসগৃহের ব্যবস্থা করেন তবেই স্থানীয় কলেজটি আরও উন্নত হইবে।"

"বারাসাত বার্তা" যাহা লিখিয়াছেন তাহা বিশেষ বিবেচনার যোগ্য।

"চতুর্থ দফা" ও বেসরকারী কলেজসমূহ

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে মার্কিন কারিগরি সাহায্য সম্পর্কিত পাঁচটি কার্যকরী (operational) চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মাদ্রাজের "হিন্দু" পত্রিকা দেশের বেসরকারী কলেজগুলিকে বর্দ্ধিত হারে আর্থিক সাহায্য দানের জন্য সরকারকে পরামর্শ দিয়াছেন। "হিন্দু" লিখিতেছেন যে, চুক্তিগুলিতে মোট ২০ লক্ষ ডলার (প্রায় ৯৫ লক্ষ টাকা) সাহায্যের ব্যবস্থা রহিয়াছে—ভারত বা আমেরিকার কোন দেশের বাজেটেই এই সামান্য অর্থের বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। তৎসত্ত্বেও যে বিষয়ের জন্য ঐ সাহায্য দেওয়া হইতেছে সেই বিষয় এই সাহায্যে বিশেষ পরিস্ফুট হইবে সন্দেহ নাই। সাহায্যের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অংশ (৬,০৭,৯০০ ডলার) ব্যয়িত হইবে যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকারী ভারতীয় অধ্যাপক এবং ছাত্রদের জন্য। দ্বিতীয়তঃ প্রায় ৫ লক্ষ ডলার ব্যয়িত হইবে শিল্প গবেষণা প্রসার এবং কারিগরি বিদ্যা সম্পর্কিত সংস্থার সাহায্যে। এই সাহায্যের দ্বারা বিভিন্ন জাতীয় গবেষণাভবন এবং পরীক্ষাগারগুলি বিশেষভাবে উপকৃত হইবে। মেডিক্যাল কলেজ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যকল্পে দেওয়া হইবে তিন লক্ষ ডলার।

পত্রিকাটি লিখিতেছেন, দেখা যাইবে যে নূতন চুক্তির আওতায় যে সকল পরিকল্পনা এবং প্রতিষ্ঠান পড়ে তাহাদের সবগুলিই

সরকার-পরিচালিত। কিন্তু যে সকল বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রশংসনীয় উদ্যমে নানাবিধ কার্য্য চালাইয়া যাইতেছেন অথচ অর্থাভাবে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি এবং পুস্তকাদি ক্রয় করিতে অসমর্থ তাহাদিগকেও মার্কিন সাহায্যের আংশিক ভাগ দেওয়া প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রণাদপ্তর অথবা প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পর্কিত মন্ত্রণাদপ্তরের কর্ত্তব্য ঐ সকল বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা এবং চতুর্থ দফার অন্তর্গত মার্কিন সাহায্যের অংশবিশেষ ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন মিটাইবার কার্য্যে ব্যবহার করা যায় কিনা তাহা ভাবিয়া দেখা। সরকারী উন্নয়নমূলক ব্যয়-ব্যবস্থায় কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান মার্কিন সাহায্যের অংশ পাইলে বা না পাইলে বড় একটা ইতরবিশেষ হয় না। কিন্তু অনেক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট ঐ সাহায্য অমূল্য প্রতিভাত হইবে। প্রতি বৎসর সরকারী এবং বেসরকারী কারিগরি বিদ্যালয়গুলিতে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য ছাত্রদের মধ্যে যে কাড়াকাড়ি পড়ে তাহাতে বুঝিতে পারা যায় কারিগরি শিক্ষালাভের জন্য ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মিটাইবার পক্ষে বর্ত্তমান সরকারী ও বেসরকারী ব্যবস্থা কত অপ্রতুল। স্পষ্টতঃই সরকার যদি ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতি কিনিতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থসাহায্য করেন তবে তাহারা প্রভূত পরিমাণে সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি করিতে পারে।

"হিন্দু" যাহা বলিয়াছেন তাহা একান্তই সমীচীন এবং অত্যাবশ্যক। বেসরকারী কলেজ ও স্কুল বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সমস্যার যুগে অত্যন্ত বিপন্ন। অথচ দেশে শিক্ষাদীক্ষার বিষয়ে ইহাদের অবদান সরকারী প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা বহুগুণ অধিক ছিল। ক্ষমতা-পিপাসু শাসনতন্ত্রের অধিকারীবর্গের অবহেলায় ও অজ্ঞতাপ্রসূত বাধাদানে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি বহুস্থলে বিপন্ন।

পশ্চিমবঙ্গ মফস্বল সাংবাদিক সম্মেলন

বিগত ১২ই জুন বৰ্দ্ধমান বংশগোপাল টাউনহলে পশ্চিমবঙ্গ মফস্বল সাংবাদিকসম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। নিখিলবঙ্গ সাময়িকপত্র সঙ্ঘের সভাপতি এবং "ভারতবর্ষ"-সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বৰ্দ্ধমান সাংবাদিক সঙ্ঘের সভাপতি প্রবীণ সাংবাদিক "পল্লীবাসী"-সম্পাদক শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ। বিভিন্ন জেলা হইতে প্রায় এক শত প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ১৬টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলনের সর্ব্বশেষ প্রস্তাবে শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে সভাপতি ও শ্রীকুমার মিত্রকে আহ্বায়ক করিয়া এবং সম্মেলনে যোগদানকারী আটটি জেলার প্রতিনিধিবর্গ হইতে প্রত্যেক জেলার একজন প্রতিনিধি লইয়া একটি অস্থায়ী কার্য্যকরী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটী আগামী তিন মাসের মধ্যে মফস্বল সাংবাদিক সম্মেলনের সংগঠন প্রস্তুত করিবেন এবং অন্যান্য সাংগঠনিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। তিন মাস পরে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরে মফস্বল সাংবাদিকদের যে দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে সেখানেই স্থায়ী কার্য্যকরী সমিতি নিয়োগ সম্পর্কে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।

সম্মেলনে গৃহীত অপরাপর প্রস্তাবাবলীতে মফস্বল সাংবাদিকদিগকে যথাযোগ্য মর্য্যাদাদানের দাবি জানান হইয়াছে। সংবাদ-সংগ্রহে মফস্বল সাংবাদিকদিগকে যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় তাহার নিরসনকল্পে সরকারের নিকট অনুরোধ জানান হইয়াছে যেন তাঁহারা মফস্বলের সাংবাদিকদিগকে নিজ অঞ্চলে অবাধে কার্য্য চালাইয়া যাইবার জন্য উপযুক্ত পরিচয়পত্র প্রদান করেন এবং নিয়মিত আঞ্চলিক সংবাদপত্র প্রতিনিধি সম্মেলন আহ্বান করিয়া সরকারী কার্য্যকলাপ সম্পর্কে সাংবাদিকদিগকে অবহিত করেন। সাংবাদিক এবং প্রেস ফোটোগ্রাফারদিগকে যাহাতে প্রেস কার্ড দেওয়া হয় সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট আবেদন করা হইয়াছে। যাহাতে মফস্বল সাংবাদিকগণ নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাইতে পারেন সেজন্য রাজ্যের প্রত্যেক জেলায় প্রেস এডভাইসরী কমিটি গঠনের জন্যও দাবি করা হয়।

মফস্বলের পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত নানাবিধ অভাব-অভিযোগ, দুর্নীতি ও অনাচার সম্পর্কে যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হয় সে সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় কি না তাহা জনসাধারণের নিকট প্রকাশের একটি উপায় উদ্ভাবন এবং যাহাতে মফস্বলের সকল পত্রপত্রিকাই সমভাবে সরকারী বিজ্ঞাপন লাভের সুযোগ লাভ করিতে পারে সেজন্য সরকারের নিকট আবেদন জানান হইয়াছে।

বিধান সভার বিগত অধিবেশনে সরকার কর্ত্তৃক "দামোদর" পত্রিকাকে রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যা দিয়া ঐ পত্রিকায় সকল সরকারী বিজ্ঞাপনদান বন্ধ করিয়া দেওয়ার প্রতিবাদ জানাইয়া একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, সরকারী নীতির বিরোধিতাকে কখনই রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলা চলে না।

দ্বাদশ প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, "মফস্বল সাংবাদিকগণ স্বভাবতঃ স্থানীয় অভাব-অভিযোগ ও বিবিধ সমস্যা বিষয়ে অভিজ্ঞ, সে কারণ যাহাতে মফস্বল সাংবাদিকদের স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক গঠিত বিভিন্ন সমিতি ও বোর্ডে গ্রহণ করা হয় এবং জেলা পরিদর্শক হাসপাতাল সমিতির সদস্য ও অনুরূপ বিভিন্ন সমিতির সদস্য হিসাবে নিযুক্ত করা হয় তাহার জন্য এই সম্মেলন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নিকট দাবি করিতেছে।"

সভাপতির অভিভাষণে শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেন যে, রাজধানীর গুরুত্ব যেমনই হউক না দেশের শক্তির উৎস মফস্বল বাংলার মফস্বলের সংবাদপত্রের কখনও অভাব হয় নাই। "হালিসহর পত্রিকা" হইতে, "সাধারণী" "চারুমিহির" হইতে "বৰ্দ্ধমান সঞ্জীবনী" "মেদিনী বান্ধব" হইতে "চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ"—এই সকল সংবাদপত্র বাংলার মুখপত্রের কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিয়াছে।

শ্রীযুক্ত ঘোষ বলেন, "মফস্বল হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্রের প্রভাব কিরূপ হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যে ইংলণ্ডের সংবাদপত্রের আদর্শে এ দেশে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সেই ইংলণ্ডে "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান" পত্রের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। আর এ দেশে দৃষ্টান্ত পুণা হইতে প্রকাশিত লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক মহাশয়ের "কেশরী" পত্র।..."

মফস্বল সাংবাদিকদিগের এই সম্মেলন উপলক্ষে মফস্বলের সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা সম্পর্কে "জি. টি. রোড" ২২শে জুন এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন যে, মফস্বলবাসীর দুঃখদৈন্যের সংবাদ রাজধানীর পত্রপত্রিকায় প্রায়ই স্থান পায় না এবং স্থান পাইলেও অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের চাপে তাহা পাঠকের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। পত্রিকাটি উহার দৃষ্টান্তস্বরূপ লিখিতেছেন, "কাশ্মীর সমস্যা পাঠকের মনে যতখানি আগ্রহ সৃষ্টি করিতে সক্ষম মফস্বলের কোন এক ক্ষুদ্র গ্রামে প্রজাপীড়ন পাঠকের মনে ততখানি কৌতূহল সৃষ্টি করিতে পারে না। তাই দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে কাশ্মীর সমস্যার কথা লেখা হয় এবং স্থান যদি সঙ্কুলান হয় তবে ঐ বিরাট কলেবর পত্রিকার এক কোণে ছোট্ট হরফে মফস্বলের অত্যাচার-কাহিনী দু' এক লাইনে স্থান পায় যাহা কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে কাহারও করে না।"

কিন্তু মফস্বলের পত্রিকাসমূহের ঐরূপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে সরকার এবং জনসাধারণ সকলেই বিশেষ উদাসীন। বর্দ্ধমানে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী কার্য্যে পরিণত হইলে মফস্বলের সংবাদপত্রগুলির এই দুরবস্থার অবসান ঘটিতে পারে বলিয়া "জি. টি. রোড" উপসংহারে মন্তব্য করিয়াছেন।

লয়েডস্ ব্যাঙ্ক ও ৪০ জন কর্ম্মচারী

১৯৪৮ সালে ১৭ই আগষ্ট ধর্ম্মঘটের অজুহাতে কলিকাতার লয়েডস ব্যাঙ্কের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ৪০ জন ভারতীয় কর্ম্মীকে বরখাস্ত করেন। বিভিন্ন শিল্প আদালতে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করিয়া উক্ত ৪০ জন কর্ম্মীর পুনর্নিয়োগের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়, কিন্তু ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাহা মানিয়া চলিতে অসম্মত হন। সম্প্রতি একটি শ্রম-আদালতের রায়ে উক্ত ৪০ জন কর্ম্মীকে অবিলম্বে পুনর্নিয়োগের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ঐ আদেশ স্থগিত রাখিবার প্রার্থনা জানাইয়া হাইকোর্টে আবেদন করেন, কলিকাতা হাইকোর্ট সেই আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

চা-বাগানে গুলিচালনা

বিগত ২২শে জুন মজুরী বৃদ্ধি এবং অন্যান্য দাবির জন্য দার্জ্জিলিং অঞ্চলের চা-বাগান শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট সুরু করেন। সরকারী বিবৃতিতে বলা হয় ৮৯টি চা-বাগানের মধ্যে ৪৮টি বাগানের কাজকর্ম্ম অব্যাহতরূপে চলিতে থাকে—২৫টি বাগানে সম্পূর্ণরূপে ও ১৬টি বাগানে আংশিক ধর্ম্মঘট প্রতিপালিত হয়। ধর্ম্মঘটের নেতৃত্ব গ্রহণ করে দার্জ্জিলিং চিয়া-কামন মজদুর সঙ্ঘ (নিখিল-ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রভাবাধীন) এবং দার্জ্জিলিং চিয়া-কামন শ্রমিক সঙ্ঘ (গুর্খা লীগ প্রভাবিত) নামক দুইটি ইউনিয়ন।

শ্রমিকদিগের প্রধান দাবী ছিল এই যে ডুয়ার্স অঞ্চলের শ্রমিকগণ যে হারে মজুরী পান দার্জ্জিলিং অঞ্চলের শ্রমিকদিগকেও সেই হারে অর্থাৎ দৈনিক ১।৶১০ মজুরী দিতে হইবে। ১৯৫১ সনে চা-বাগান সম্পর্কিত যে আইনটি পাস হয় তাহার প্রবর্ত্তনও ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের অন্যতম দাবি ছিল। দার্জ্জিলিং অঞ্চলের শ্রমিকগণ বর্ত্তমানে দৈনিক মাত্র ১৷০ মজুরী হিসাবে পাইয়া থাকেন।

ধর্ম্মঘটের চতুর্থ দিনে পুলিসের গুলীচালনায় ছয় জন নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়। নিহতদের মধ্যে দুই জন স্ত্রীলোক, একজন ১২ বৎসর বয়স্ক কিশোর এবং একজন পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ। গুলীচালনার কারণ স্বরূপ সরকারী বিবৃতিতে বলা হয় যে, ২৫শে জুন সোনাদা উপত্যকার একটি চা-বাগানকে ধর্ম্মঘটী শ্রমিকগণ ঘেরাও করে এবং তাহাদের মধ্যে বিশেষ উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ পায়। পুলিস বিক্ষোভকারী শ্রমিকদিগকে চলিয়া যাইবার জন্য সতর্ক করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা চলিয়া যাইতে স্বীকৃত হয় না, বরং পুলিসকে ইটপাটকেল ছুঁড়িতে থাকে। তখন টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া হয়, কিন্তু ধর্ম্মঘটী শ্রমিকরা ক্রমশঃই পুলিসকে ঘিরিয়া ফেলিতে থাকে। তখন লাঠি চার্জ্জের আদেশ দেওয়া হয়। ইহাতেও শ্রমিকগণ নিরস্ত না হওয়ায় অবশেষে আত্মরক্ষার জন্য পুলিসকে গুলী চালনা করিতে হয়। ইতিপূর্ব্বেই ৭৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, ঐদিন আরও এগার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গুলীচালনার অযৌক্তিকতার সমালোচনা করিয়া শ্রমিকদিগের পক্ষ হইতে উত্তেজনার সংবাদ অস্বীকার করা হয়। পুলিসের আক্রান্ত হইবার আশঙ্কার কথাও উড়াইয়া দিয়া বলা হয় যে পুলিস পাহাড়ের উপর ছিল। নিরস্ত্র শ্রমিকদিগের পক্ষে সমতল হইতে চড়াই ভাঙিয়া পুলিসকে আক্রমণ করার মোটেই সম্ভব ছিল না। উপরন্তু ১৪৪ ধারা প্রচলিত না থাকায় শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা আটক করিবার কোন ক্ষমতাই পুলিসের ছিল না। আরও অভিযোগ করা হইয়াছে যে, হত্যা করিবার জন্যই পুলিস গুলী করে। অনেকেরই পেটে, বুকে এবং পিঠে গুলী লাগার দৃষ্টান্ত হইতেই ঐরূপ অনুমান করা হইয়াছে।

২৬শে জুন দার্জ্জিলিঙে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। ঐদিন গুলীচালনার প্রতিবাদে দার্জ্জিলিঙের সর্ব্বত্র হরতাল প্রতিপালিত হয়। দার্জ্জিলিঙের ইতিহাসে উহাই প্রথম সাধারণ ধর্ম্মঘট হিসাবে বলা হইয়াছে। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, নিখিল-ভারত গুর্খা লীগ এবং কংগ্রেসী নিখিল-ভারত জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গ শাখা গুলীচালনার তীব্র নিন্দা করিয়া নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান।

ইতিমধ্যে দার্জ্জিলিঙের দায়িত্বশীল নাগরিকগণ একটি নাগরিক শান্তি কমিটি গঠন করিয়া ডেপুটি কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ধর্ম্মঘট মীমাংসায় মধ্যস্থতা করিতে স্বীকৃত হন। উঁহাদের

মধ্যস্থতায় উক্ত দুইটি ইউনিয়ন এবং ডেপুটি কমিশনার ও ডেপুটি শ্রমমন্ত্রীর মধ্যে আলাপ-আলোচনার পর ধর্ম্মঘট মীমাংসার সর্ত্তগুলি উভয় পক্ষের স্বীকৃতি লাভ করে এবং ২৮শে জুন সপ্তাহব্যাপী ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করা হয়।

২৯শে জুন "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকায় ধর্ম্মঘট মীমাংসার যে সর্ত্তগুলি প্রকাশিত হয় তাহার সারাংশ মোটামুটি এইরূপ: দার্জ্জিলিঙের ৮৯টি চা-বাগানের ৬০,০০০ চা-শ্রমিকদের দৈনিক মজুরী ছয় পয়সা বৃদ্ধির দাবী মানিয়া লওয়া হয় এবং শ্রমিকের অন্যান্য দাবী সম্পর্কে পরে বিবেচনা করা হইবে বলা হয়। ২৯শে জুন ১৪৪ ধারা এবং অন্যান্য নিষেধাজ্ঞামূলক ধারাগুলি প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হইবে এবং ধর্ম্মঘটী শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে মুক্ত করা হইবে। চা-শ্রমিক সম্পর্কিত সর্ব্বনিম্ন মজুরী কমিটির অধিবেশন জুলাই মাসে বসিবে। তিন মাসের মাহিনা বোনাস হিসাবে দিবার নিমিত্ত শ্রমিকদের দাবি সম্পর্কে বিবেচনার জন্য জুলাই মাসে একটি ত্রিদলীয় বৈঠক বসিবে। চা-বাগান সম্পর্কিত ষ্টাণ্ডিং অর্ডারগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবার জন্য বিষয়গুলি সরকার একটি শ্রম-আদালতের নিকট পেশ করিবেন।

শ্রমমন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় উক্ত মীমাংসার সংবাদ ঘোষিত হইবার পূর্ব্বে বলেন যে, মার্গারেট হোপ চা-বাগানে গুলী চালনার সরকারী তদন্ত করা হইবে। তদন্তকারী অফিসার সাব-ডিভিসনাল অফিসারের নিম্নপদস্থ হইবেন না। তদন্তকারী অফিসার প্রয়োজনবোধে জনসাধারণের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

উক্ত পত্রিকায় পরদিন প্রকাশিত সংবাদে বলা হয় যে সরকারী সূত্র হইতে চা-শ্রমিকদিগের মজুরী বৃদ্ধির আশ্বাসদানের কথা সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করা হইয়াছে। সকল ধৃত ব্যক্তিকে মুক্তিদানের আশ্বাসও অস্বীকৃত হয়। বলা হয় যে, কেবলমাত্র ধর্ম্মঘটের পূর্ব্বে ধৃত ব্যক্তিদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে বলিয়াই সরকার হইতে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল।

দার্জ্জিলিং, ডুয়ার্স এবং আসামের চা-বাগানগুলির অবস্থা সম্পর্কে ২২শে জুনের "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকায় যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে কয়েকটি বাগানের সমৃদ্ধির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সকল চা-বাগানেরই লাভ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উহাদের সংরক্ষিত তহবিলও বর্দ্ধিত হইয়াছে। নিম্নের তালিকা হইতেই সমগ্র বিষয়টি পরিষ্কার হইবে :

শ্রমিক আন্দোলন দার্জ্জিলিং অঞ্চলে নূতন। দুঃখের বিষয় তাহার আরম্ভেই এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। তদন্ত যখন হইবে বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে তখন এ বিষয়ে মন্তব্য স্থগিত রাখাই সমীচীন।

আসামে ডাক-বিভাগের ভাষা-বৈষম্যনীতি

২রা আষাঢ় সাপ্তাহিক "যুগশক্তি"র সংবাদে প্রকাশ যে, সম্প্রতি ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগের আসাম অঞ্চলে কয়েকটি অপস্তন পদে কর্ম্মচারী নিয়োগের জন্য আবেদন আহ্বান করিয়া আসাম সার্কেলের ডিরেক্টর "আবেদকারীদের প্রতি নির্দ্দেশে" যে শ্রেণী ও ভাষা-বৈষম্যমূলক নব বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে আসামের ভাষাগত সংখ্যালঘুদের মধ্যে বিশেষ অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। ডিরেক্টরের উক্ত নির্দ্দেশে লোয়ার আসাম ডিভিসন রিক্রুটিং ইউনিটের জন্য অনুমোদিত আঞ্চলিক ভাষাসমূহের তালিকা হইতে বাংলা ভাষাকে বাদ দেওয়া হইয়াছে; অথচ বাংলাভাষী গোয়ালপাড়া জেলা উক্ত ইউনিটের অন্তর্গত।

কেন্দ্রীয় ডাক ও তার বিভাগের এইরূপ ভাষা-বৈষম্যমূলক নীতির সমালোচনামূলক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "যুগশক্তি" লিখিতেছেন যে, ঐ নূতন বিধানের ফলে আসামের কোন কোন অঞ্চলে বঙ্গভাষাভাষীদের উপর বিশেষ অবিচার করা হইয়াছে। "অন্য কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, গোয়ালপাড়া জেলার বাঙালীরা পর্য্যন্ত এই নব বিধানের ফলে ডাক ও তার বিভাগের উক্ত পদ-সমূহের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না! ইহা আবার আসাম রাজ্য সরকারের নির্দ্দেশ নহে; খোদ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভাগীয় কর্ত্তার বিধান। অবশ্য তিনি আসামের রাজধানী শিলং শহরেই অবস্থান করিয়া থাকেন।"

পত্রিকাটির অভিমতে ডাক ও তার বিভাগের এইরূপ বৈষম্য-মূলক বিধান ভারতীয় সংবিধানের ধারাগুলির বিরোধী। "আসাম ডাক ও তার বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ সমগ্র সার্কেলকে কতকগুলি আঞ্চলিক ইউনিটে বিভক্ত করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ইউনিটের জন্য বিশেষভাবে কতকগুলি শ্রেণীগত ও ভাষাগত দল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, ইহাতে শ্রেণীগত বা ভাষাগত কোনও দলবিশেষকে অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা দান ও অন্যদের তাহা হইতে বঞ্চিত করা

চা বাগানের নাম	লাভ (লক্ষ টাকা)	ট্যাক্স (লক্ষ টাকা)	সংরক্ষিত তহবিল (লক্ষ টাকা)	বন্টিত লভ্যাংশ (লক্ষ টাকা)
হলদীবাড়ী	২০·৬০	৬·৪৩(৩১·২%)	৬·১০(২৯·৬%)	৬·৬১(৩২·১%)
ঢেলকাহাট	১২·০২	৪·৫৪(৩৭·৮%)	২·৭৫(২২·৯%)	৪·৩৯(৩৬·৫%)
মেথনী	১১·০৯	৪·০০(৩৬·১%)	২·৩০(২০·৭%)	৩·৬০(৩২·৫%)
গিয়েল (Gielle)	৩·২০	০·৬২(১৯·৩%)	০·৯ (২৮·১%)	০·৫ (১৫·৬%)
নাগালসুরী	১৩·৫১	৫·০০(৩৭%)	৫·৭৫(৪২·৬%)	৩·৮৪(২৮·৪%)

হইয়াছে। এরূপ বিভেদমূলক ব্যবস্থা জাতীয়তাবিরোধী, সংবিধান-পরিপন্থী ও ভারতের সংহতির পক্ষে ক্ষতিকর।"

এই বিষয়ে পত্রিকাটি ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

আসামে বাংলা ভাষা দলন

২৩শে আষাঢ় অপর এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে "যুগশক্তি" লিখিতেছেন, "আসাম সরকার আসামের বাংলা ভাষাভাষী এলাকার ছাত্রছাত্রীদের জন্যও একমাত্র অসমীয়া ভাষার মাধ্যমে রচিত হিন্দী ব্যাকরণ পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধে যুগশক্তিতে কয়েকবারই আলোচনা করিয়া সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে—কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হয় নাই। আসাম সরকার অসমীয়া ভাষায় প্রণীত হিন্দী ব্যাকরণ পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া কলেকৌশলে অসমীয়া ভাষা প্রচারের অভিযানই চালাইয়া যাইতেছেন না কি?"

ত্রিপুরার অবস্থা

সম্প্রতি ত্রিপুরা রাজ্যের চীফ কমিশনার এক সাংবাদিক সম্মেলনে ১৯৫৪-৫৫ সনের শেষ তিন মাসে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির জন্য সরকারী কার্য্যের একটি লিখিত বিবরণী প্রকাশ করেন।

উক্ত বিবরণীর আলোচনা প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ২৮শে জ্যৈষ্ঠ "সেবক" লিখিতেছেন যে, সাংবাদিক সম্মেলন ডাকিয়া চীফ কমিশনার ত্রিপুরার "চিরাচরিত নিয়মের সামান্য ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছেন বলা যাইতে পারে।" উন্নয়ন-সম্পর্কিত যে সকল তথ্যাদি চীফ কমিশনারের বিবরণীতে দেওয়া হইয়াছে "তাহাতে মনে হয়, চীফ কমিশনার ব্যয়িত টাকার অঙ্কই উন্নতির একমাত্র 'মাপকাঠি' ধরিয়া লইয়াছেন।"

"সেবক" লিখিতেছেন, "যদিও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের উপর সর্ব্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া চীফ কমিশনারের বিবরণীতে বলা হইয়াছে তথাপি, "সারা বৎসরের কাজের চিত্রটিকে চোখের সামনে ধরিলে ত্রিপুরা সরকার রাস্তাঘাট উন্নয়নে কিছুই করিতে সক্ষম হন নাই বলিলে বোধ হয় সত্যের অপলাপ হইবে না।" চিকিৎসাখাতে ব্যয়িত সমুদয় অর্থই শহরের হাসপাতালটির সম্প্রসারণে খরচ করা হইয়াছে; গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা প্রসারের জন্য প্রায় কিছুই করা হয় নাই।

কৃষক-ছেলেমেয়েদিগকে হাতেকলমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সে সংবাদে "সেবক" আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু একমাত্র সার বিতরণের হিসাবে কৃষির উন্নতির মান বুঝা কঠিন।" কৃষির উন্নতির জন্য ত্রিপুরার সেচব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা নিতান্তই অপরিহার্য্য, কিন্তু এই অতি আবশ্যক ব্যাপারে প্রায় কিছুই করা হয় নাই। "সমবায় ব্যাঙ্ক আজও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং ৬।৭ মাসের পূর্ব্বে একটি সোসাইটির রেজিষ্ট্রেশন করানো যায় না, তাও আবার পুলিস রাজী না হইলে সম্ভবপর নহে।"

উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন ব্যবস্থার নিতান্ত অপ্রতুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার পর 'সেবক' ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচলিত বিভিন্ন আইন-কানুনের আসন্ন পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতার কথা উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন, "আইন প্রণয়ন সম্পর্কে চীফ কমিশনার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। কারণ দেশীয় রাজ্য আমলীয় আইনসমূহই ত্রিপুরার অগ্রগতির এবং জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে বিশেষ বাধাস্বরূপ থাকিলেও বিগত আট বৎসরে একটি আইনও পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হয় নাই।"

শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে সরকার ২২ জনকে জুতা তৈরির কাজ ও বেতের জিনিষ প্রস্তুত করিবার কাজ শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং আগরতলায় দোকান খুলিয়া সরকারী শিল্পালয়ে প্রস্তুত ১২৬৫।০ আনা মূল্যের দ্রব্য বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সরকারী উদাসীনতায় ক্লিষ্ট জামসেদপুর

২১শে আষাঢ় "অসামঞ্জস্যময় এই পরিস্থিতি" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে জামসেদপুর শহরের অধিবাসীদের নানাবিধ অসুবিধার প্রতি সরকারী ঔদাসীন্যে বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া "নবজাগরণ" পত্রিকায় লেখা হইয়াছে, "আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে স্থানবিশেষ আজও সামন্ততান্ত্রিক রীতিনীতিতে অনুশাসিত হইতে পারে তাহার এক জলন্ত দৃষ্টান্ত এই জামসেদপুর শহর। তিন লক্ষাধিক নাগরিক অধ্যুষিত বিহারের দ্বিতীয় এই নগরের অধিবাসীদের সুষ্ঠু জীবনধারণোপযোগী বিষয়গুলির প্রতি সরকার উদাসীন এবং টাটা কোম্পানীর উপর নির্ভরশীল···ফলে টাটা কোম্পানী এই শহরের নাগরিকদের শিক্ষা, চিকিৎসা-ব্যবস্থা, জমিবণ্টন, পৌরশাসন পরিচালনা ইত্যাদি সর্ব্ববিধ ব্যাপারেই সর্ব্বাধিকারী অভিভাবক, আর দায়িত্বকে দূরে সরাইয়া সরকার যেন কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় মগ্ন—যদিও অবশ্য কর আদায়ের সময় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যাপারে তাহাদের রাবণের মত কর্ম্মতৎপর হইয়া উঠিতে দেখা যায়। অথচ টাটা কোম্পানী তাহাদের নীতি অনুযায়ী সকলকে সমান সুবিধা দেন না। সরকার সব জানিয়াও কপট নিদ্রাভিভূত, তবে হতভাগ্য জনসাধারণ যায় কোথায়?"

নগরের বাস্তব জীবন হইতে দৃষ্টান্ত তুলিয়া "নবজাগরণ" লিখিতেছেন, জামসেদপুরে প্রায় ৪৫ হাজার বিদ্যালয়গামী ছাত্রছাত্রী রহিয়াছে। তন্মধ্যে কুড়ি হাজার ছাত্রছাত্রী টাটা কোম্পানী-পরিচালিত বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে এবং পনরো হইতে যোল হাজার জনসাধারণ-পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা পায়। অবশিষ্ট দশ হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষালাভের কোনই উপায় নাই।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও হতাশাব্যঞ্জক। পত্রিকাটির কথায় "প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হইবে ইহা রাজ্য সরকারের বহু ঘোষিত নীতি, কিন্তু জামসেদপুরে টাটা কোম্পানীর কর্তৃত্বাধীনে প্রাথমিক শিক্ষার বেতন লওয়া হয়—সরকার সে বিষয়ে নীরব থাকেন। অথচ খাসমহলে জনসাধারণের সাহায্যে পরি-

চালিত শ্যামাপ্রসাদ বিদ্যাভবনে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করিবার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সরকার বাধ্য করিয়াছেন। অন্য দিকে বিহারের এই দ্বিতীয় শহরে একটিও সরকারী বিদ্যালয় নাই কেন ?..."

কিন্তু এইরূপ সরকারী অবহেলা এবং নিশ্চেষ্টতা কেবলমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নহে। চিকিৎসাক্ষেত্রেও টাটা কোম্পানীর ব্যবস্থার উপর ঐরূপ একান্ত নির্ভরশীলতা প্রত্যক্ষ হয়। পত্রিকাটি লিখিতেছেন, "২২টি শয্যাবিশিষ্ট সাকচির সরকারী হাসপাতালটি মনে হয় সরকার ফৌজদারী মামলা পরিচালনা করিবার জন্যই রাখিয়াছেন আর রোগীদের পক্ষে তাহা যেন যমপুরীর বুকিং আপিস। একই ওয়ার্ডে যক্ষ্মা, কলেরা ও বিবিধ ব্যাধির সমাবেশ, নার্স নাই, কাজেই ওয়ার্ড বয়দের মর্জি ও অনুগ্রহের উপর রোগীদের সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়—মোটের উপর সুব্যবস্থার চূড়ান্ত।..."

সরকারী হাসপাতালটির উন্নতির জন্য সকল আবেদন-নিবেদন নিষ্ফল হইয়াছে। সরকারী কর্তাদের জন্য ত টাটা হাসপাতালই রহিয়াছে, সুতরাং জনসাধারণ বাঁচুক আর মরুক তাহা চিন্তা করিবার কোন প্রয়োজনই তাঁহারা অনুভব করেন না।

জমি ও গৃহ-নির্ম্মাণ ব্যাপারেও টাটা কোম্পানীর বদান্যতার উপর সেইরূপ অযৌক্তিক নির্ভরতা। "এখানে অবস্থিত সরকারী এমন কোন প্রতিষ্ঠান বা বিভাগ নাই যাহাদের কর্ম্মচারীরা টাটা কোম্পানীর কোয়ার্টারে না বাস করেন। শুধু কি তাই, অনেক সরকারী দপ্তর টাটা কোম্পানীর কোয়ার্টারেই পরিচালিত হইতেছে। সরকারী কর্ম্মচারীদের সম্পর্কে না হয় হইল, কিন্তু যাহারা বেসরকারী আপিসের কর্ম্মচারী এবং উকিল, মোক্তার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী ইত্যাদি সেই সব মন্দভাগ্যরা যায় কোথায় ? যাঁহারা টাটা কোয়ার্টারে বসবাস করিয়া চিরকাল কোম্পানীর বকলস গলায় করিয়া থাকিতে চান না তাঁহারা হয়ত চান বসবাসের জমি, কিন্তু হায় কে দিবে তাঁহাদের জমি ?"

পৌরশাসন পরিচালনা ব্যবস্থাতেও জনসাধারণের মতামত ও সুযোগ-সুবিধার প্রতি সমপরিমাণ উপেক্ষা এবং টাটা কোম্পানীর একচ্ছত্র প্রভুত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

"নবজাগরণ" লিখিতেছেন, "এইরূপে আজ আমরা এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে পড়িয়াছি। মনে হইতেছে ভারতের বিরাট অঞ্চল ব্যাপিয়া নিজামশাহী, রাণাশাহী, গাইকোয়াড়শাহী হয়ত শেষ হইতে চলিয়াছে, কিন্তু পাশাপাশি তেমনি গড়িয়া উঠিতেছে টাটা-শাহী, বিড়লাশাহী, ডালমিয়াশাহী। সকলেই বলিতেছেন, 'ভয় নাই ওরে ভয় নাই'—অচিরেই সমাজবাদী রাষ্ট্র গড়া হইবে। কিন্তু জন-জীবনকে এইরূপ বিচিত্র দ্বৈতশাসনের মধ্যে ক্রমশঃ মগ্ন করিয়া দেওয়াই কি তাহার নমুনা ?..."

পিউরিটি বার্লিতে ভেজাল

বিগত জুন মাসের শেষে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে, কলিকাতার খ্যাতিনামা পিউরিটি বার্লি প্রস্তুতকারক ব্রিটিশ রেকিট এণ্ড কোম্পানীর ডাইরেক্টর-ম্যানেজার মিঃ এ. টি. বল ডাল মিশ্রিত পিউরিটি বার্লি প্রস্তুত ও বিক্রয়ার্থ মজুত রাখার অপরাধে কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রী এল. এন. রায় কর্ত্তৃক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত বৎসর ২২শে এপ্রিল কলিকাতা কর্পোরেশনের খাদ্য ইনস্পেক্টর ডাঃ আর চন্দ্র সংবাদ পাইয়া পিউরিটি বার্লির কারখানায় গিয়া পরীক্ষার জন্য বার্লির নমুনা লন এবং ২৮০টি বার্লির টিন সীল করিয়া আসেন।

রায়দান প্রসঙ্গে বিচারক বলেন যে, "ইহা একটি চূড়ান্ত সমাজ-বিরোধী কাজ হওয়ায় বর্ত্তমান আইনে নির্দ্ধারিত সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ অর্থদণ্ডে আসামী মিঃ বলকে দণ্ডিত করা হইল।

বিচারক যথার্থই বলিয়াছেন যে, এইরূপ কার্য্য "চূড়ান্ত সমাজ-বিরোধী।" দুঃখের বিষয় এই যে, আজ এইরূপ ভেজাল মিশানই ব্যবসায়ের উৎকৃষ্টতম নীতি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কলিকাতায় ত খাঁটি জল-বাতাসও পাওয়া যায় না।

সর্পাঘাতে মৃত্যু

প্রতি বৎসর পল্লী অঞ্চলে বহু লোক সর্পাঘাতে মৃত্যুকবলিত হয় ; কিন্তু এই সম্পর্কে কোন সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা এখনও পর্য্যন্ত গৃহীত হয় নাই। "ভাগীরথী" ২৫শে আষাঢ় এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে উহার প্রতি সরকার এবং জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লিখিতেছেন, "আজ এই বিষয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন আছে চলিয়া আমরা মনে করি।"

পত্রিকাটি লিখিতেছেন যে, বাংলা দেশেই সর্পাঘাতে মৃত্যুর সংখ্যা সর্ব্বাধিক অথচ গ্রাম্য জনসাধারণ সর্পাঘাতের বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা-পদ্ধতির সহিত বিশেষ পরিচিত নহে। এখনও সর্পাঘাতের প্রতিষেধকরূপে প্রধানতঃ ওঝা ও ঝাড়-ফুঁকের উপরই নির্ভর করা হয়।

"ভাগীরথী" লিখিতেছেন, "বর্ত্তমানে চালু এন্টিভেনম ইনজেকশনের আংশিক সাফল্যে অনেকের প্রাণরক্ষা সম্ভব। জাতীয় সরকার (যদি) ব্যাপকভাবে পল্লীর প্রতিটি ইউনিয়নে, সরকারী ডাক্তারখানায় ও হাসপাতালে ঐ (ইনজেকশন) সরবরাহের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে সত্যই পল্লীগ্রামের অধিবাসীদের অকালমৃত্যু হইতে আংশিকভাবেও রক্ষা করা সম্ভব হইবে।"

—

বিশেষ দ্রষ্টব্য

পত্রিকার গ্রাহক, এজেণ্ট ও বিজ্ঞাপনদাতারা কাগজ অপ্রাপ্তি বিজ্ঞাপন প্রেরণ, ঠিকানা পরিবর্ত্তন, টাকাকড়ি পাঠানো, ভিঃপিঃতে পুস্তক লওয়া সংক্রান্ত চিঠিপত্র "ম্যানেজার, প্রবাসী"র ঠিকানায় পাঠাইবেন। সম্পাদকের নামে পাঠাইলে কাজের অসুবিধা হয় ও সময়মত উত্তরাদি পাইতেও দেরী হয়।
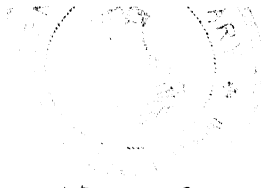
অশ্রেণিক সমাজ

রাজশেখর বসু

ক্লাস্‌লেস সোসাইটি' বা অশ্রেণিক সমাজের কথা এদেশের ও বিদেশের অনেকে বলে থাকেন, কিন্তু তার লক্ষণ কেউ স্পষ্ট করে বলেছেন বলে মনে হয় না। শ্রেণী অনেক রকম আছে, ভারতীয় আর পাশ্চাত্ত্য সমাজের শ্রেণীভেদ সমান নয়। সব রকম ভেদের লোপ অথবা কয়েক রকমের লোপ যাই কাম্য হোক, উপায় নির্ধারণের আগে বিভিন্ন ভেদের স্বরূপ বোঝা দরকার।

এমন আদিম জাতি থাকতে পারে যাদের মধ্যে শ্রেণী-ভেদ মোটেই নেই অথবা খুব কম। সভ্য সমাজ যদি পুরোপুরি অশ্রেণিক হয় তবে তার অবস্থা কেমন হবে তা কল্পনা করা যেতে পারে। জীবনযাত্রার মান সকলের সমান হবে, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য থাকবে না, কারও যদি অধিক অর্থাগম হয় তবে অতিরিক্ত অর্থ সাধারণের হিতার্থে বাজেয়াপ্ত হবে। সকলেই সমান পরিচ্ছন্ন বা অপরিচ্ছন্ন হবে, বিবাহ ও সামাজিক মিলনক্ষেত্রে সুন্দর-কুৎসিত বা পণ্ডিত-মূর্খের ব্যবধান থাকবে না। সকলেই শিক্ষা, জীবিকা, বিবাহ, আর চিকিৎসার সমান সুযোগ পাবে। অবশ্য বিদ্যা, বুদ্ধি আর বলের বৈষম্য থাকবেই, কিন্তু তার জন্য আর্থিক অবস্থা বা সামাজিক প্রতিষ্ঠার তারতম্য হবে না। দুঃসাধ্য রোগ বা বার্ধক্যের ফলে যারা অকর্মণ্য তাদের রক্ষা বা অরক্ষার ব্যবস্থা রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

ইতিহাসে দেখা যায়, অল্পসংখ্যক লোক যদি অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হয় বা নির্যাতন ভোগ করে তবে তারা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করে সমভোগী সংঘ গঠন করে। রোমান সাম্রাজ্যে অত্যাচারিত খ্রীষ্টানদের সমাজ প্রায় অশ্রেণিক ছিল। নাৎসি-বিতাড়িত অনেক ইহুদী পরিবারও নির্বাসনে এসে শ্রেণীভেদ পরিহার করেছিল। কিন্তু অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভেদবুদ্ধি আবার পূর্ববৎ হয়।

বর্তমান হিন্দুসমাজে একই ভেদ বিভিন্ন মাত্রায় দেখা যায়। অব্রাহ্মণের বাড়ীতে প্রাচীনপন্থী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ অন্নগ্রহণ করেন না। যাঁরা অল্প গোঁড়া তাঁরা বৈদ্যকায়স্থাদি ভদ্রশ্রেণীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন, কিন্তু পৃথক পঙ্‌ক্তিতে বসেন। যাঁরা আর একটু উদার তাঁরা বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদির ভোজে পঙ্‌ক্তিবিচার করেন কিন্তু অন্যত্র করেন না। যাঁরা আরও সংস্কারমুক্ত তাঁর কোনও ক্ষেত্রেই করেন না। ভোজন ব্যাপারে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ বহু শ্রেণীতে বিভক্ত, তবে এই ভেদ ক্রমশ কমে আসছে।

আমার এক ব্রাহ্মণ বন্ধু স্বজাতিকে চার শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। সর্বনিম্ন বা চতুর্থ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পরিচিত অব্রাহ্মণকে দেখলে আগেই নমস্কার করেন। কেউ কেউ এতই পতিত যে শূদ্রকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতেও তাঁদের বাধে না। যাঁরা তৃতীয় শ্রেণীর তাঁরা নমস্কার পাবার পর প্রতিনমস্কার করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ প্রতিনমস্কার করেন না, বড়জোর একটু হাত বা মাথা নাড়েন। প্রথম শ্রেণীর বিপ্র অতি বদান্য, প্রণাম পেলেই পদধূলি দেবার জন্য পা বাড়িয়ে দেন।

উচ্চবর্ণের বা আভিজাত্যের অভিমান অসংখ্য লোকের আছে। যাঁরা অতি সজ্জন, অপরকে ক্ষুণ্ণ করার অভিপ্রায় যাঁদের কিছুমাত্র নেই, এমন লোকেরও আছে। এঁরা শাস্ত্র-বিধি বা নিজ সমাজের চিরাচরিত প্রথা লঙ্ঘন করতে চান না, মনে করেন তাতে পাপ বা জাতিপাত বা মর্যাদাহানি হয়। অনেকে নির্বিচারে কেবল সংস্কার বা অভ্যাসের বশেই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখেন। যাঁরা অল্পাধিক সংস্কারমুক্ত তাঁদের প্রত্যবায়ের ভয় না থাকলেও নিজ সমাজের ভয় আছে, সেজন্য অবস্থা বুঝে নিয়ম পালন বা লঙ্ঘন করেন। যাঁরা আরও উদার ও সাহসী তাঁরা বর্ণানুসারে শ্রেণীবিচার করেন না, শুধু দেখেন পঙ্‌ক্তির লোকের বেশ ও আচরণ সভ্যজনোচিত কিনা। যাঁরা পূর্ণমাত্রায় সমদর্শী তাঁরা কিছুই বিচার করেন না, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা অতি অল্প।

ভারতবর্ষে হিন্দুসমাজের জাতিভেদ দূর করার চেষ্টা মাঝে মাঝে হয়েছে, কিন্তু তার ফলে ধর্মগত ভেদের উৎপত্তি হয়েছে। বৌদ্ধ, শিখ, বৈরাগী বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম প্রভৃতি সম্প্রদায় স্বতন্ত্র সমাজের সৃষ্টি করেছেন। অনেকে বলে থাকেন, চৈতন্যদেব ও রামকৃষ্ণদেব সংস্কারমুক্ত ছিলেন, বর্ণভেদের কঠোরতা মানতেন না। একথা যে মিথ্যা তা শ্রীযুক্ত বসন্ত-কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমাণ করেছেন। সম্প্রতি সংবাদপত্রে বহু নিবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন যে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ অব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ করতেন না। এঁরা উচ্চনীচ সকলের জন্য ভক্তিবাদ প্রচার করেছেন, ধর্মমতের সংকীর্ণতা নিরসনের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সমাজব্যবস্থা বা লোকাচারে হস্তক্ষেপ করেন নি। রামমোহন রায় ও তাঁর অনুবর্তীরাই এদেশে সমাজসংস্কারের প্রবর্তক। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রবল প্রচার বিবেকানন্দ আরম্ভ করে গেছেন। আজকাল প্রতিপত্তিশালী ধর্মোপদেষ্টা গুরুর অভাব নেই, কিন্তু তাঁরা কেউ বিবেকা-

নন্দর তুল্য সাহসী জনহিতব্রতী নন, সামাজিক দোষ শোধনের কোনও চেষ্টাই করেন না।

এককালে এদেশের ভদ্রশ্রেণীই উচ্চশিক্ষা আর ভদ্রোচিত জীবিকার সুযোগ পেত। দারিদ্র্যের জন্য এবং ক্ষমতাবান আত্মীয়বন্ধুর অভাবে ভদ্রেতর শ্রেণী এই সুযোগ পেত না। শিক্ষা ও জীবিকার ক্ষেত্রে এই বৈষম্য এখন ক্রমশ কমে আসছে, কালক্রমে একবারে লোপ পাবার সম্ভাবনা আছে।

শিক্ষা আর প্রচারের ফলে জাতিগত, বর্ণগত ও বংশগত ভেদবুদ্ধি দূর হতে পারে, কিন্তু অপরিচ্ছন্নতা আর অমার্জিত আচরণের প্রতি বিদ্বেষ ত্যাগ করা দুঃসাধ্য। শুচিতার ধারণা সকলের সমান নয়। এদেশের লোক আহারের পর আচমন করে, মলত্যাগের পর জলশৌচ করে, অতি দরিদ্রও প্রত্যহ স্নান করে। এই সব বিষয়ে অধিকাংশ পাশ্চাত্ত্য জাতি অপেক্ষাকৃত অপরিচ্ছন্ন। অনেক ইওরোপীয় নারী তার সন্তানের মুখ থুতু দিয়ে পরিষ্কার করে দেয়, বিড়াল যেমন করে।

কয়েকটি বিষয়ে শুচিতায় শ্রেষ্ঠ হলেও ভারতবাসীর কদভ্যাস অনেক আছে। যে অপরিচ্ছন্নতা দারিদ্র্যের ফল তা ধরছি না, কিন্তু যাঁরা অর্থবান ও ভদ্রশ্রেণীভুক্ত তাঁদেরও অনেক বিষয়ে শুচিতার অভাব দেখা যায়। বড় সওদাগরী আপিসে সাহেব আর দেশী কর্মচারীর জন্য আলাদা সিঁড়ি আছে। এখনকার দেশী সাহেবরাও বোধ হয় এই ব্যবস্থা বজায় রেখেছেন। পার্থক্যের কারণ কি তা সিঁড়ি দেখলেই বোঝা যায়। ভারতবাসীর বিচারে নিষ্ঠীবনের স্পর্শই ঘৃণ্য, দৃশ্য ঘৃণ্য নয়, যত্র তত্র থুতু ফেলার অভ্যাস বহু লোকের আছে। দেশী সিঁড়ির স্থানে স্থানে আধার আছে, কিন্তু তাতে অভীষ্ট ফল হয় না, আধার ছাপিয়ে দেওয়ালে পর্যন্ত পানের পিকের দাগ লাগে। সাহেবী সিঁড়ির এই বীভৎস কলঙ্ক নেই। যারা পরিচ্ছন্নতা চায় তাদের পৃথক সিঁড়ি আর পৃথক সমাজ না হলে চলে না।

ক্লাব বা আড্ডায় সমশ্রেণীর লোকেই স্থান পায়। বিলাতী ক্লাবে প্রবেশের নিয়ম খুব কড়া, যে-কেউ ইচ্ছা করলেই সদস্য হতে পারে না। বাঙালীর আড্ডায় সাধারণত নির্দিষ্ট কয়েক জনকেই দেখা যায়, কিন্তু নূতন লোকও স্থান পায় যদি তার আচার-ব্যবহার বিসদৃশ না হয়। ক্লাব বা আড্ডার যে রীতি, দেবমন্দির বা উপাসনাগৃহেরও তাই। যিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তিনি সাধারণত নিজ শ্রেণীর জন্যই করেন, এই কারণে নিম্ন জাতি মন্দিরপ্রবেশে বাধা পায়। কালক্রমে যদি প্রতিষ্ঠাতার উত্তরাধিকারীদের স্বত্বের প্রমাণ লোপ পায় তবে সরকারী আদেশে আপামর সকলেই প্রবেশাধিকার পেতে পারে। ভারতের অনেক বিখ্যাত মন্দিরে তাই হয়েছে। কিন্তু যত দিন সে ব্যবস্থা না হয় তত দিন শ্রেণীবিচার বজায় থাকে। চণ্ডীমণ্ডপ, ভাগবতসভা, ব্রাহ্মসমাজ বা গির্জায় যদি কোন অপরিচ্ছন্ন বা কুৎসিতবেশ লোক আসতে চায় তবে তার উদ্দেশ্য ভাল হলেও সে বাধা পায়।

জাতিবিচার বা অপরিচ্ছন্নতায় আপত্তি না থাকলেও নানা কারণে ভেদজ্ঞান আসে। আকৃতি, পরিচ্ছদ, ভাষা, খাদ্য, সংস্কৃতি, বিত্ত, সমাজ, ধর্ম, দেশ, রাজনীতি প্রভৃতির জন্যও শ্রেণীভেদ হয়। যেখানে অস্পৃশ্যতা নেই (যেমন মুসলমান ও ইওরোপীয় সমাজে) সেখানেও সৈয়দ ও মোমিন, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, ধনী ও দরিদ্র, মলিনবেশ শ্রমজীবী আর white-collar মসীজীবীর সমাজ পৃথক। পাশ্চাত্ত্য দেশের অনেক হোটেলে এশিয়া-আফ্রিকার লোক স্থান পায় না। কোনও কোনও রাষ্ট্রে আইন করে এই পার্থক্য নিবারণের চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু লোকমতের পরিবর্তন হয় নি। চণ্ডাল যদি শিক্ষিত সজ্জন ধনী ও ভদ্রবেশী হয় তথাপি সে নিষ্ঠাবান উচ্চ বর্ণ হিন্দুর বিচারে অপাঙ্‌ক্তেয়। এশিয়া-আফ্রিকার লোকের উপরেও পাশ্চাত্ত্য জাতির অনুরূপ ঘৃণা আছে।

এদেশের ধনী ও বিলাসী সমাজ সমশ্রেণী ভিন্ন বৈবাহিক সম্বন্ধ করতে চান না, পাছে শ্বশুরালয়ে মোটা চালচলনে কন্যার কষ্ট হয় বা বরের মর্যাদাহানি হয়। অল্পবিত্ত হিন্দু যৌথ পরিবারে অসবর্ণ বিবাহ খুব কম দেখা যায়, কিন্তু যেখানে দম্পতির নিজের আত্মীয়বর্গ থেকে পৃথক হয়ে বাস করবার সামর্থ্য আছে সেখানে অসবর্ণ বিবাহ ক্রমশ প্রচলিত হচ্ছে।

ভারতের তুলনায় ইওরোপ-আমেরিকার ভদ্রসমাজে আচারগত ভেদ কম, তথাপি রাজনীতিক কারণে বিদ্বেষ দেখা যায়। ব্রিটিশ ও জার্মন জাতির উৎপত্তি ধর্ম ও সংস্কৃতির পার্থক্য বেশী নয়, কিন্তু যুদ্ধ বাধলেই জার্মনরা হুন আখ্যা পায়। গত যুদ্ধে 'মিত্র'-পক্ষে থাকার সময় রাশিয়া জাতে উঠেছিল, কিন্তু এখন আবার অর্ধসভ্য এশিয়াটিক হয়ে গেছে, তাদের শায়েস্তা করবার জন্য বিজ্ঞানবলী জার্মন বীর জাতির প্রয়োজন হয়েছে।

লোকে কেবল যুক্তি আর ন্যায়বুদ্ধির বশে চলে না, বহু কাল থেকে বংশপরম্পরায় যে সংস্কার বদ্ধমূল হয় তা দূর করা সহজ নয়। কালক্রমে শিক্ষা আর প্রচারের ফলে অনেক বিষয়ে ভেদজ্ঞান কমে যাবে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে শ্রেণীলোপের সম্ভাবনা অত্যল্প। বর্তমান সমাজে যে সব পরিবর্তন হচ্ছে তা থেকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই অনুমান করা যেতে পারে—

(১) বিদ্যা, বিচারশক্তি, নীতিজ্ঞান প্রভৃতি অর্জনে

সকলের সমান নয়, কিন্তু জাতি বর্ণ বা শ্রেণী অনুসারে ও তারতম্য হয় না, প্রতিবেশ (environment) এবং স্থযোগ সমান হলে সকল শ্রেণীর লোকই তুল্য সামর্থ্য পারে। শ্রেণীবিশেষের সহজাত মানসিক উৎকর্ষ বা আভিজাত্য একটা ভ্রান্ত ধারণা—এই বৈজ্ঞানিক কালক্রমে শিক্ষিত জন মেনে নেবে। যাদের দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার আছে (যেমন হিটলারের সহকারিগণ, দক্ষিণ কার ডাচ-বংশীয় আফ্রিকাণ্ডার জাতি, মার্কিন দেশের বিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় এবং এদেশের অনেক উচ্চ লোক) তাদের ধারণার পরিবর্তন হতে বিলম্ব

(২) অনুকূল লোকমত এবং সরকারী চেষ্টার ফলে এ অস্পৃশ্যতা শীঘ্রই দূর হবে।

(৩) যৌথ পরিবার লোপের ফলে অসবর্ণ বিবাহ ক্রমশ প্রচলিত হবে, ভিন্নপ্রদেশবাসীর মধ্যেও বিবাহ বৃদ্ধি

(৪) আকৃতি, পরিচ্ছদ, ভাষা, খাদ্য, সংস্কৃতি আর পার্থক্যের জন্য অপরের প্রতি যে বিরাগ দেখা যায় তা বিস্তার এবং অধিকতর সংসর্গের ফলে ক্রমশ কমে

(৫) যাদের বিদ্যা রুচি বৃত্তি বা রাজনীতি সমান তারা মত ভবিষ্যতেও সংঘ ক্লাব বা ইউনিয়ন গঠন করবে এইপ্রকার দলবন্ধনের ফলে বর্ণভেদের তুল্য সামাজিক উদ্ভব হবে না।

(৬) অনেক রাষ্ট্র সমাজতন্ত্র অনুসারে ধনী-দরিদ্রের কমাবার চেষ্টা করছে। তার ফলে দারিদ্র্যজনিত যথা অশিক্ষা, অসংস্কৃতি, অপরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি দূর হবে এবং সামাজিক বৈষম্য কমবে। কিন্তু বৈষম্য একেবারে দূর হবে না, সোভিয়েট রাষ্ট্রেও হয় নি।

(৭) যে অপরিচ্ছন্নতা বহু দিনের কদভ্যাসের ফল তা দূর করার জন্য প্রবল প্রচার আবশ্যক, যেমন অস্পৃশ্যতা নিবারণের জন্য হয়েছে। যাঁরা রাজনীতিক প্রচারকার্যে নিযুক্ত আছেন তাঁরা জনসাধারণের কদভ্যাস নিবারণের জন্য কিছু সময় দিলে সমাজের মঙ্গল হবে। সংবাদপত্রেরও এ বিষয়ে কর্তব্য আছে।

(৮) পূর্বের তুলনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জাতির মধ্যে বিবাহ বেড়েছে, কিন্তু বহুপ্রচলিত হবার সম্ভাবনা কম। এইরূপ বিবাহের ফলে নূতন ইউরেশীয় সমাজের সৃষ্টি হচ্ছে না, সন্তানরা পিতা বা মাতার সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক জাতিরই কতকগুলি দৈহিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। রূপবিচারের সময় লোকে সাধারণত সেই সব বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখে। কটা চোখ আর কটা চুল অধিকাংশ ভারত-বাসীর পছন্দ নয়। এইপ্রকার রুচিভেদের জন্য বিবাহের ক্ষেত্রে শ্রেণীভেদ মোটের উপর বজায় থাকবে। তবে কাল-ক্রমে রুচির পরিবর্তন হতে পারে। শুনতে পাই, পাশ্চাত্ত্য সমাজে নিগ্রো জাজ-সংগীতের মত নিগ্রো দেহসৌষ্ঠবেরও সমঝদার বাড়ছে।

মোট কথা, অচির ভবিষ্যতে পূর্ণমাত্রায় অশ্রেণিক সমাজ হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এই আশা করা যেতে পারে—মানুষের ন্যায়বুদ্ধি ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে, তার ফলে শ্রেণীগত বৈষম্য কমবে। যে ক্ষেত্রে জনসাধারণ উদাসীন সেখানে রাষ্ট্রীয় চেষ্টায় সামাজিক অন্যায়ের প্রতিকার হবে, তার ফলেও শ্রেণীভেদ কমবে। মানব-স্বভাবের যে বৃহৎ অংশ জন্মগত নয়, শিক্ষা চর্যা আর পরিবেশের ফল, সেই অংশের গঠনে সম্ভবত ভবিষ্যতে সকলেই সমান স্থযোগ পাবে, তবে এই সামাজিক পরিবর্তন সকল রাষ্ট্রে সমান ভাবে ঘটবে না।

দীনতার আশ্রমে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দীনতা আমারে দীন দেখে দেছে, মাথা গুঁজিবার ঠাঁই,
কৃপা লভিয়াছি, চাহিবার কিছু নাই।
পেয়েছি যে ব্যথা, আঘাত, দুঃখ, ভয়,
হেথা প্রবেশের তাই হ'ল পরিচয়।
এখন নয়ন-স্বচ্ছ-সলিলে
মুকুতার খোঁজ পাই।

২

প্রভাতে 'সুরভি' মাতার স্তন্য, এক ধার করি পান,
শান্ত সে রস বুকে করে বল দান।
স্বপ্ন যে দেখি ছিন্ন চাটায় শুয়ে,—
স্বর্গ আমার বক্ষে পড়েছে নুয়ে,
দীনবন্ধুর এ দেশে দীনের
আশাতীত সম্মান।

৩

মাটির প্রদীপ মিটি মিটি জ্বলে, দীনতার আশ্রমে—
সে আলো-আঁধারে দেবতারা যেন ভ্রমে।
হেথা নিশি যাপে দিনশেষে ম্লান রবি,
নব প্রাতে ওঠে পুনঃ নব তেজ লভি।
এইখানে রূপ তপঃ ফলেতে
ভাব হয়ে যায় ক্রমে।

৪

হেথা সব শুচি, কিছুই নাহিক ঘৃণা কি অবজ্ঞার
কাঠুরিয়া বেশ শ্রীবৎস-চিন্তার।
জড়-ভরতের মত সবে রহে আহা,
জাগে সদা ভয় 'মৃগ শাবকের মায়া'
কুবেরের নয়, এখানে বিরাজে—
বিদুরের ভাণ্ডার।

৫

নাহিক শৃঙ্গী, নাহি দুর্ব্বাসা, কপিল মুনির ভয়,
হিংসা ও ক্রোধ অভিশাপ দূরে রয়।
এখানে ভক্ত, সাধু, সুধী, বিজ্ঞানী—
সকলেই এক অমৃতের সন্ধানী,
জীব ও জাতির জীবনেতে চায়
দিব্য অভ্যুদয়।

৬

অদূরে কালের গতিপথ, দেখি পর্ণকুটীরে থাকি,
যুগ ও জগৎ আঁধারে যেতেছে ঢাকি।
জন ঘন পথ রাখে না কোনই চিনে,
দেখিতে দেখিতে ভরিয়া উঠিছে তৃণে,
এত সমারোহ—একি মায়া, ভ্রম
প্রতারিত করে আঁখি ?

৭

কন্দুক ক্রীড়া করে মহাকাল বড় বড় নাম লয়ে,
স্বর্ণগোলক ফাটে বুদ্বুদ হয়ে।
বিশাল রাষ্ট্র, দুর্জ্জয় অনীকিনী
সব লয়ে কাল খেলিতেছে ছিনিমিনি
কীর্ত্তির শিলা-মূর্ত্তিসমূহ
ক্ষণেই যেতেছে ক্ষয়ে।

৮

স্বর্গ যাবার সব পথ যায়, এই আশ্রম ধরি,
পঙ্গু আমি,—সে পথকে প্রণাম করি।
বস্তুর চেয়ে নামের এখানে দাম,
সবে হরিনাম যপ করে অবিরাম—
শিথিল সর্ব্ব শরীর হইতে
ভাব-দেহ উঠে গড়ি।

৯

মহতের পদ রজময় ভূমে কিছুই হয় না কালো
এখানে নিভে না কখনো ধুনীর আলো।
ভূমিতলে থাকা সবচেয়ে হয়ে ছোট,
নামাতে চাহে না—সকলেই বলে 'ওঠো'
কি পরিতৃপ্তি ! চূড়া হওয়া চেয়ে
নূপুর হওয়াই ভাল।

১০

শায়িত দেবতা—যে রহে শিয়রে লভে 'নারায়ণী সেনা'—
জিঘাংসু ধরা সাথে তার লেনাদেনা।
যে রহে দাঁড়ায়ে চরণের তরে তাঁর,
ফলে নয়,—তার কর্ম্মেতে অধিকার,
সেবক কি পায় ?—প্রভু যেচে হন
সারথি তাহার কেনা।

জাল-তন্ত্র

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

এক

আমি যে রাস্তাটায় থাকি—গলি বললেই ঠিক হয়—সেটা পাঁচমিশালী ; কালোবাজারী লাখপতি থেকে নিয়ে ডায়েনা আয়রণ ফাউণ্ড্রীর ফিটার-মিস্ত্রি গোকুল পর্যন্ত সব দরের লোক আছে। আমার কাহিনী গোকুলকে নিয়ে।

গলিটায় পাঁচ রকম লোক আছে বটে, তবে বাড়ি খুব কম এখনও। আগে সমস্ত জায়গাটা ছিল একটা বস্তি ; সম্প্রতি ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট এসে রাস্তা, জল, আলো প্রভৃতির ব্যবস্থাটা শুধরে দেওয়ায় চেহারা পাল্টে গেছে বটে, মধ্যবিত্ত ও নব-অভিজাতদের দৃষ্টিও পড়েছে, তবে যেমন বাড়িঘর সব ওঠে নি, তেমনি বস্তির ভগ্নাংশেরও কিছু কিছু রয়েছে অবশেষ। গোকুলের বাড়িটা তারই একটি। নিজে, স্ত্রী, একটি বছর ছয়েকের ছেলে, একটি বছর তিনেকের মেয়ে, একটি ছোট ইট-বাঁধানো উঠোনের চারিদিকে গুটিকয় ছোট ছোট ঘর ; তিনটি ছানা নিয়ে একটি ছাগলী—এই হ'ল গোকুলের সংসার। একটা শ্রী ছাঁদ আছে ; জায়গাটা যখন বস্তি ছিল তখন গোকুল নিশ্চয় সম্পন্ন গৃহস্থের মধ্যে গণ্য হ'ত। সম্প্রতি ল-অফ-রিলেটিভিটির প্রভাবে নেমে যাচ্ছে বটে, তবে এখনও খুব বেমানান নয়।

আমার বাসার বাঁ দিকে কাঠা আটেকের একটা খালি প্লট সবে ইট পড়তে সুরু হয়েছে ; তার পর একটা ডোবা গোছের কয়লার ছাই দিয়ে ভরাট হচ্ছে। ডান দিকে বাড়ি ঘেঁসেই গোকুলের বাড়িটা, তার পর একটা দীর্ঘ খাটাল, তার পর একটা করোগেট টিন দিয়ে ঘেরা জায়গা। কি যে দাঁড়াবে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তার পর বেনে মশলার একটা নূতন দোকান, তার ওদিকে একটা বড় বাড়ি গড়ে উঠছে। আমার সামনে অনেকখানি নিয়েই একটা ফাঁকা মাঠ ; শোনা যাচ্ছে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট শিশুদের জন্য পার্ক করবে কি না করবে দামনা হয়ে রয়েছে। সুতরাং অন্ততঃ এখন কিছুদিনের জন্য গোকুল আমার একমাত্র প্রতিবেশী।

নূতন ভাড়াটে হয়ে সন্ধ্যার খানিকটা আগে নিচের বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে বসে একখানা বই পড়ছি, গোকুলের সঙ্গে প্রথম দেখা হ'ল। তেলকালি-মাখা একটা জিনের নিকার বোকার পরা, বাঁ হাতে একটা ছোট চামড়ার টুল-ব্যাগ একটা বিড়ি টানতে টানতে সামনে ঝুঁকে হনহন করে চলে যাচ্ছিল, আমার ওপর নজর পড়তে দাঁড়িয়ে পড়ল। জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এই বাসায় আমাদের নতুন ভাড়াটে হয়ে এলেন ?'

উত্তর করলাম, 'হ্যাঁ, আজ এই দুপুরে এলাম আমরা।'

একটু মফস্বল জায়গা ; খালি গায়েই ছিলাম, গলায় পৈতাটা ঝোলানো রয়েছে। গোকুল হাতের বিড়িটা ফেলে দিয়ে কপালে জোড় হাত ঠেকাল, বলল, "প্রেণাম হই। অধীনের নাম গোকুল, পাশেই এই খোলার কুঁড়েটুকুতে আড্ডা।"

বললাম, "বাঃ, বেশ, তুমি তা হলে হচ্ছ আমার প্রতিবেশী। কাছাকাছি তো এখনও বিশেষ বাড়ি ওঠে নি দেখছি।"

গোকুল মাথাটা নামিয়ে একটু সঙ্কোচের হাসি হাসল; বলল, "আজ্ঞে, পায়ের যুগ্যিও নই ; আশ্রয়ে রইলুম, এই আর কি। সবাই বেচে দিলে নিজের নিজের জমি, দর পেলে ত ভালো। অধীন কিন্তু মায়া কাটিয়ে উঠতে পারল না, বাপ-পিতেমোর ভিটে তো। বুঝছি মায়া জিনিসটা বড় পাজি, আমাদের গরীবদের ঘরে চলে না, তবু কাটিয়ে উঠতে পারলুম না, আঁকড়ে পড়ে আছি।"

কতদিন পারবে আঁকড়ে থাকতে চারিদিকে সর্বগ্রাসী লালসার মুখে ? কিন্তু সে কথা না বলে বললাম, "নিন্দের কি এমন ? টাকাটাই ত দুনিয়ায় সবকিছু নয়, যদি কাটিয়ে দিতে পারা যায় সুখে-দুঃখে এক রকম করে বাপ-পিতামহর ভিটেয় ত সেই বা মন্দ কি ?"

গোকুল আবার সেই রকম ভাবে একটু হাসল, কতকটা যেন তর্কের ভঙ্গিতে বলল, "কিন্তু মায়া জিনিসটাকেও ত আমল দেওয়া উচিত নয়, বলুন না কেন। বাড়ির মায়াই বলুন, কিংবা অর্থের মায়াই বলুন, কিংবা আপনার গিয়ে দারা-সুতের মায়াই বলুন—সংসারে যত অনর্থ তা ঐ ত মায়াই ঘটাচ্ছে…"

একটু যেন কি রকম কি রকম ঠেকছে ; মেনে নিয়ে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে বললাম, "হ্যাঁ—তা যদি ভাবা যায়…"

জিতছে দেখে গোকুল একটু উৎসাহিত হয়ে উঠল, বলল, "ভাবতেই হবে কিনা, না ভেবে উপায় নেই যে।…আচ্ছা, আবার আসব, ডিউটি দিতে যাচ্ছি ; এ হপ্তায় এই প্রেথম রাত্তিরের শিফট যাচ্ছে ত। অধীন হচ্ছে ডায়েনা ফাউণ্ড্রিতে ফিটার। যাই, বাজিয়ে আসি ডিউটিটুকু। শিফট পাল্টাকে

মাঝে মাঝে এসে বিরক্ত করব। সদ্ ব্রাহ্মণ, কপাল জোরে পিচরণের আশ্রয় পেয়েছি, ছাড়ব না, কিছু কিছু করে উপদেশ নিতে হবে ত। তা হলে এখন আসি।"

আবার সেই ভাবে প্রণাম করে চলে গেল।

শিফট্ বদলাবার পর গোকুল মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে বসতে লাগল। একে জায়গাটায় লোক কম তার ওপর পাঁচমিশালী জায়গায় সবারই ধরণ-ধারণ আলাদা, বাড়ি বাড়ি গিয়ে আলাপ করবার উৎসাহ থাকে না। এমন সময় দুটো কথা কইবার লোক হিসাবে মন্দ লাগে না গোকুলকে। ওর কথাগুলোতেও একটু নূতনত্ব আছে। অবশ্য সংসারটা ভেল্কি। মায়ারাক্ষসী মাকড়সার জাল পেতে নেপথ্যে বসে লক্ষ্য করছে কখন পা বাড়িয়ে দিই -এ তত্ত্ব সেই ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি, নূতনত্বের আর কি আছে? তবু গোকুলের মত লোকের মুখে যেন একটু আলাদা শোনায়। আমি বরং পরিবেশটাকে আরও রহস্যময় করে তোলবার জন্যে বারান্দার আলোটা নিভিয়ে দিই, অস্পষ্টতার সুযোগ নিয়ে গোকুল কোণের থামটার আড়াল হয়ে বসে, গল্প হয়।

আলোকে এমন ভাবে পরিহার করবার কারণ দিনদুয়েক আসার পর বুঝলাম ; গোকুল হাড়ভাঙা খাটুনির পর এই সময় এক পাত্র উদরস্থ করে আসে ; একটু রঙে থাকে।

কোলের কাছে বসে থাকে মেয়েটি। গল্প হয়—

"মেয়েটি তোমার বড় শান্ত গোকুল।"

"আপনার দাসী। শান্তর কথা যা বললেন, না হয়ে উপায় নেই। স্বভাবে সুরতে মায়ের দিকে গেছে কিনা। ওর মা যে হচ্ছে বড় শান্ত, আর আপনার যৎপরোনাস্তি ভাল মানুষ। বস্তি এখন ফাঁকা, কিন্তু চিরকাল ত এমন ছিল না, উদ্বাস্তু-ঝগড়া-ফরিয়াদ, কাক-কোকিল বসবার জো ছিল? তো কেউ বলুক যে একটা দিনের তরেও কেউ গোকুল মিস্ত্রির পরিবারের মুখে একটা রা শুনেছে! বাড়ির বাইরে পা দেবেই বা কেন যে ভালো মন্দ লোকের সঙ্গে বাধতে যাবে? এই মেয়ে, ঐ ছেলে, আর ঐ ছাগলী—এদের তদারকেই ত কেটে যাচ্ছে উদয়াস্ত। তবু একটা ফিটার মিস্ত্রির বৌ, সাধ্যি ত নেই যে ঠিকে জলের ব্যবস্থা করি, নিজেকেই কল থেকে নিয়ে আসতে হয় দিনে বার দু'তিন বেরিয়ে—বস্তির কল সে ত জানেনই—কে আগে নেবে তাই নিয়ে মুখের কথা ত ছেড়ে দিন রক্তপাতও হয়ে গেছে, কিন্তু গোকুল মিস্ত্রির বৌ? ঐ যে বললুম একটি দিনের তরে কারুর সঙ্গে একটু কথা-কাটাকাটিও নয়। হবে কি করে বলুন না?—'দিদি, তোমারটা আগে ভরে নাও...খুড়ি, তোমারটা আগে ভরে নাও...তা কি হয়েছে, আগে এয়েছি ত?—তোমার দুটো আগে ভরে নাও পিসি, তার পরে আমারটা বসিয়ে দিও; একটা হাতে কাজ ফেলে এয়েচি, ততক্ষণ সেরে নি গে'... এতে কি কারুর সঙ্গে দ্বন্দ্বমণি হতে পারে স্যার, বলুন না।"

বললাম, "তুমি তা হলে এদিক দিয়ে খুব সুখী দেখছি গোকুল। বাঃ, শুনে খুব আনন্দ হ'ল। ঘরে শান্তি থাকা—স্ত্রী ভাল, ছেলেমেয়ে দুটিও ঠাণ্ডা—মস্ত একটা সৌভাগ্যের কথা ত।"

"তাই মনে হবে বই কি স্যার। কিন্তু সত্যিই সৌভাগ্য কি?"

—একটু বিস্মিত হয়ে চাইতে হ'ল।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সেটাও একটু তলিয়ে ভেবে দেখতে হবে বই কি, নইলে ত সর্ব্বনাশ কিনা। আগাগোড়া সব ত মায়ার খেলা। সংসারটা ত আর কিছু নয়, একটা জাল বিছোন রয়েছে। তা জালটা যদি কাঁটা তারের হয়, আপনি সতর্ক হয়ে যেতে পারেন। তা না হয়ে যদি নরম রেশমের হ'ল, আপনার মনে হচ্চে, কে পুষ্পশয্যে বিচিয়ে দিয়েচে, তা হলে বিপদ নয়? পরিবারই বলুন, ছেলেপিলেই বলুন—এরা হ'ল ঐ মায়ার জাল স্যার। তাই যদি হ'ল ত যত নরম ততই ত দুশ্চিন্তার কথা?"

একটু গোলাপী নেশার মুখে বড় বড় কথাগুলো অবসর-বিনোদনের পক্ষে ভালই লাগে। তবুও একটু তর্ক তুলি মাঝে মাঝে। বলি, "কথাটা কি জান গোকুল? এ-জালের জেলে, সে হ'ল বড় জবরদস্ত, জালটাও বেড়াজাল, পরিত্রাণ নেই ; এ-ক্ষেত্রে ওঠবার আগে যেটুকু সময় ছটফট করে কাটাতে হবে সেটুকু কাঁটাজালে রক্তারক্তি না হয়ে একটু নরম জালের মধ্যেই কাটাই, সেই ভাল নয়?"

নরম জালটি প্রাণ দিয়ে ভালই বাসে ত, কথাগুলি নিশ্চয়ই মিষ্ট লাগে গোকুলের। মেয়েটিকে একটু স্নেহের চাপ দিয়ে কোলের কাছে টেনে নেয় ; হেসে বলে, "তা হলে কি পরিত্রাণ নেই স্যার? গুরুজী যে বলেন জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়তে হবে..."

গুরুজীরও সন্ধান নিয়েছি। ওদেরই ফাউণ্ড্রীর চৌকিদার দারোয়ান, বালিয়া জেলায় বাড়ি, এখানে চাকরি আছে, ছোটখাট একটা খাটাল আছে, ফাউণ্ড্রীর মজুর কর্মচারীদের সঙ্গে সুদী কারবার আছে, গলায় মোটা রুদ্রাক্ষের মালা আছে ; সিদ্ধি ঘোঁটার পাথরবাটি আছে, তুলসীদাস রামায়ণ আছে। শুধু নামটা কি তা জানি না ; সিদ্ধ মহাপুরুষদের নাম পাপমুখে আনতে নেই বলে বলে না গোকুল। গুরুজীর অসীম প্রভাব গোকুলের মনের ওপর। মনে হয় সবাইকে জাল ছিঁড়তে উৎসাহিত করাই তার নিত্যকর্ম।

যতটা পারি প্রভাবটা প্রতিরোধ করবারই চেষ্টা করি। বলি, "দরকার কি ছিঁড়তে যাওয়ার গোকুল। একটু ভেবে দেখ না। পড়ে আছি ডোবায়, জেলের উদ্দেশ্যটা যে খারাপ সেটাই বা ধরে নিই কেন? ধরো যদি ডোবা থেকে টেনে নদীতে ফেলবারই মতলব থাকে তার ত ছিঁড়ে বেরিয়ে এসে আবার সেই ডোবায় পড়ে থাকা বোকামি নয়?"

যুক্তির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য বা বাঁধুনি কিছু আছে কি না আমার অত ভেবে দেখবার প্রয়োজন হয় না; ক্লাসে ছেলেদের ত ন্যায়শাস্ত্র পড়াচ্ছি না। ফল হয়, তার কারণ আর সবার মত গোকুলও ত মায়ার এই বেড়াজালই ভালবাসে। মেয়েটিকে আর একটু টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলোয়, মুখে একটু হাসি লেগে থাকে। আবার হয় ত তর্ক তোলে, কিন্তু সে যেন আবার আমি আমার যুক্তি দিয়ে ওর তর্ককে পরাভূত করি সেই লোভেই। মনটি যখন ভরে আসে, এদিকে নেশাটুকুও হয় ত জমাট হয়ে এসেছে, মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করে, মেয়েটিকেও ঐ রকম করেই প্রণাম করায়, তার পর মুখে হাসিটুকু নিয়ে অল্প টলতে টলতে নেমে চলে যায়। কোন দিন হয়ত ছেলেটিই এল ডাকতে। গোকুল তাকেও দিয়ে যথাপদ্ধতি প্রণাম করিয়ে নেয়; বলে, "চিরকাল গড় কর্ বেটা। বেঁচে গেলি, নইলে আজই ত মনে করেছিলুম জাল ছিঁড়ে পড়ি না হয় বেরিয়ে।"

আমায় বলে, "বিপদ নয় স্যার? আপনি ত বলছেন। একটু সাধুসঙ্গ করব তার উপায় নেই। যায় না ত কাছ-ছাড়া হয়ে থাকি বেশিক্ষণ।"

কিন্তু আশু ফলপ্রদ হলেও মনে হচ্ছে আমার যুক্তিগুলো যেন স্থায়ী হতে পারছে না গোকুলের মনে। গুরুজীর মন্ত্র পুরাতন, রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে; তার ওপর যে রকম আন্দাজ করছি আমার কাটানগুলো গোকুল যেন প্রত্যহ তার কাছে হাজির করে, আর এটাও আন্দাজ আমার যে আমি তার যুক্তি যতটা খণ্ডন করতে পারি বা না পারি, গোটা রুদ্রাক্ষ আর তুলসী রামায়ণের বাছা বাছা দোহা—গোসাঁইয়ের জোরে গুরুজী আমার যুক্তিগুলিকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করেই বাতাসে উড়িয়ে দেয়। পরিণামে দিন দিনই লক্ষ্য করছি আমার এখান থেকে যেটুকু হাসির আলো নিয়ে ওঠে যায় গোকুল, পরদিন যখন আবার আসে তার চতুর্গুণ অন্ধকার লেগে থাকে ওর মুখে। এ যেন দুই গুরুর মধ্যে রশি টানাটানির শক্তিপরীক্ষা চলেছে, আর আমায় পা পা করে এগিয়ে গিয়ে পরাজয় স্বীকার করে নিতে হচ্ছে।

আগেই বলেছি, আমার এখানে আসতে মেয়েটি ছিল গোকুলের নিত্য-সঙ্গিনী। একদিন নিয়ে এল না। এমন কিছু ব্যাপার নয়, তবু দ্বিতীয় দিনও সঙ্গে নেই দেখে আমি একটু উদ্বিগ্ন হয়েই প্রশ্ন করলাম—অসুখ-বিসুখ করে নি ত? ...না অসুখ করে নি, তবু গোকুল একটু লজ্জিত ভাবে হেসে উত্তরটাকে যেন এড়িয়ে যেতে চায় দেখে আমার কেমন কৌতূহল হ'ল, বললাম, "তা হলে নিয়ে এলে না কেন? মেয়েটি তোমার একটু নেওটো, সমস্ত দিন দেখতে পায় না বাপকে..."

গোকুল সেই রকম হেসে মুখ তুলে উত্তর করলে, "সেইজন্যেই আর মায়া বাড়াচ্ছি না স্যার, আস্তে আস্তে কেমন করে যে আমাদের আচারের নুনের মত জারিয়ে ফেলে টের পাই না ত, তার পর একদিন হঠাৎ দেখি গাছের সে আমটি আর নেই আমি। গুরুজী বললেন কথাটা সেদিন; বললেন, দারা-সুত-সুতা ওরা হ'ল কোনটা আচারের ঐ তেল, কোনটা মসলা, কোনটা নুন, দূরে থাকাই ভাল।"

এই ভাষাই ওরা বোঝে। উপমাটা না বদলে বললাম, "গুরুজী তোমার ঠিকই বলেছেন গোকুল; আমের ফালি ছাড়া আর কি বল আমরা। গাছ থেকে পেড়ে এই সংসারের বঁটিতে কেটে টুকরো টুকরো করছেন তিনি। কিন্তু একটা হিসেবে একটু ভুল হয়ে যাচ্ছে গুরুজীর তোমাদের।"

"কি স্যার? ভুলটা কোথায়?"

একটু নড়েচড়ে বসে মুখের দিকে আগ্রহভরে চেয়ে থাকে গোকুল। বললাম, "ভুলটুকু এইখানে যে দারা-সুত-সুতা—তোমার ঐ নুন-তেল-মসলা, ওগুলোর মধ্যে জ'রে রয়েচি বলে তবু একরকম করে রয়েছি, অন্তত মানুষের পাতে ত পড়ছি, নইলে শুকিয়ে আমসি হয়ে যেতুম না?—পোকায় খেত না?"

মেয়েটির জন্য মনটা টনটন করছেই ত, গোকুল ভেতরে ভেতরে উল্লসিত হয়ে ওঠে, বলে. "তা হলে আপনি বলতে চান স্যার যখন এই সংসারের বঁটিতে ফেলে ফালি ফালি করে কাটবেই বিধেতা, তখন ওদের নিয়ে জড়িয়ে থাকাই ভাল?"

বলি, "নিজেই ভেবে দেখ না।"

একটু ভাবে, তার পর বেশ একটি তৃপ্তির হাসি হেসে বলে, "তাই যেন মন হয় স্যার,—এরা জারিয়ে রেখেছে তাই ত আমসি হয়ে শুকিয়ে মরছি না, পোকায় ধরচে না। তা হলে আপনি বলতে চান দরকার নেই তফাতে রাখবার?"

বলি, "নিজেই ভেবে দেখ না।"

ভাববার দরকার হয় না, তবু ভাবনার মত করে মাথাটা নিচু করে গোকুল, একটা গভীর তত্ত্বে প্রবেশ করছে ত; তার পর মুখটা তুলে আবার হাসে।

গল্প আমাদের সকাল সকাল শেষ হয়ে যায়, ছেঁড়ার মুখে সুত-সুতার টানটা আরও প্রবল হয়ে উঠেছে ত। প্রণাম করে মাটি থেকে মাথাটা যেন আজ উঠতে চাইছে না, তার পর অল্প টলতে টলতে নেমে চলে যায়।

দু'দিন বেশ গেল। মেয়েটিকে বুকে চেপে নিয়ে আসছে গোকুল; গল্প যাই দিয়েই আরম্ভ হোক না কেন শেষ পর্য্যন্ত ঐ মায়া আর বৈরাগ্যতেই এসে শেষ হচ্ছে, মুখে যতটুকু অন্ধকার নিয়ে আসছে গোকুল তার চতুর্গুণ আলো নিয়ে টলকে টলকে ফিরে যাচ্ছে। বেশ চলে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে রশি টানাটানির লড়াইয়ে আমার জিত প্রায় হাতের মুঠোয়, এমন সময় হঠাৎ একেবারে যেন একসঙ্গে কয়েক পা হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল আমায় গুরুজী।

আমি বাড়ি ছিলাম না, একটা দরকারে পড়ে বাড়ি ফিরতে একটু রাত হয়ে গেল। গলিতে প্রবেশ করতেই একটি শিশুকণ্ঠের আর্ত্তনাদ কানে গেল, মনে হ'ল যেন চিৎকার করে ফাটিয়ে ফেলবে গলা এবার। বাড়ির কাছে আসতে আসতেই বুঝতে পারলাম গোকুলের সেই মেয়েটি; বাড়িতেই কি একটা কঠিন বায়না ধরেছে, ঠাণ্ডা করবার জন্য মা ধস্তাধস্তি করে হার মেনে যাচ্ছে। মনে হ'ল এগিয়ে যাই, মেয়েটি যাওয়া-আসা করে, ভালবাসি। দু'পা এগুতে গলি থেকেই বারান্দায় নজর পড়তে দেখি গোকুল হাঁটু দুটি একত্র করে থামের পাশে যথাস্থানে নির্বিকার ভাবে বসে আছে। অতিমাত্র বিস্মিত হয়ে বললাম, "কি ব্যাপার গোকুল? কানে যাচ্ছে না তোমার? দেখ উঠে একটু!"

বৈরাগ্যে প্রায় তুরীয়ভাব গোকুলের। চোখ দুটি ঢুলঢুল করছে, একটু হেসে নির্বিকার ভাবে বললে, "আসতে চায় আমার সঙ্গে। তা আর নাই দেওয়া উচিত, বলুন স্যার?"

এই অবস্থাটাই দ্রুত বেড়ে চলল। শিফ্‌ট্ বদলালো, দিনকতক আর নিয়মমত দেখা নেই গোকুলের সঙ্গে, আমিও সন্ধ্যাটা বাইরে বাইরে কাটিয়ে দিই প্রায়, তার পর একদিন —প্রায় দিন কুড়ি পরে, আকাশটা মেঘলা থাকায় বারান্দাটিতে আলো নিভিয়ে ইজিচেয়ারে বসে আছি, গোকুল উঠে এল, কোলে মেয়েটি নেই, ভাবটা খুব যেন মুষড়ে গেছে। বললাম, "কি খবর গোকুল? অনেক দিন আর দেখা নেই তোমার!"

প্রণাম করে যথাস্থানে বসতে বসতে বললে, "আমি ত তিন দিন থেকে রোজই আসচি স্যার—শিফ্‌ট্টা পালটে গেল কিনা, তা আপনিই থাকেন না। এদিকে ঘাড়ে একটা নতুন বিপদ এসে পড়েচে, একটু উপদেশ নিতুম, তা..."

"হঠাৎ বিপদটা এমন কি?"—বেশ ব্যস্ত হয়েই প্রশ্ন করলাম।

"ঘরের কেচ্ছা স্যার, ভদ্দর লোকের কানে সব কথা ত তোলা যায় না। তবে গুরুজী যে বলেন কামিনী-কাঞ্চন—তা থেকে শত মাইল দূরে থাকবে তা খাঁটি কথা স্যার। নাজেহাল করে দিলে স্যার; বেড়াজালে ঘেরে ফেললে একেবারে..."

ভাষা যেমন তাতে নানা কুটিল আশঙ্কারই উদয় হয় মনে, প্রশ্ন জোগায় না; এ-ক্ষেত্রে কি ভাবে অগ্রসর হওয়া যায়, কি যুক্তির অবতারণা করা যায় ভাবছিলাম মনে মনে, গোকুল বলেই চলল, "লুকুনো থাকবার কথা নয় স্যার—এক দিন টের পাবেনই, পাড়ার তাবৎ লোকেই টের পাবে, তখন বুঝবেন গোকুল কিসের আশঙ্কায় এত ছটফট করত। গুরুজী খাঁটি কথাই বলেন, 'গোকুল, এসব হ'ল নারীর চক্রান্ত।' সমস্ত দুনিয়াটাই ত নারীর চক্রান্ত—প্রকিতি আর পুরুষ, ঘরেও তাই; তুমি চাইছ বাঁধন কাটাতে, এদিকে নেশায় ঢুল ধরিয়ে একটির-পর-একটি এমনি বাঁধন দিয়ে যাচ্ছে সাধ্যি কি টের পাও?...মায়ার নেশা স্যার, বুঝলেন না? কুহকিনীর মায়া, আপনাকে দিয়েই আপনার সব্বনাশ করাচ্চে।...গোকুল এবার ডুবল স্যার। আর উদ্ধার নেই।"

এর পর একটি সুদীর্ঘ বিরতি ঘটল আমাদের সন্ধ্যা বৈঠকে; কার্যব্যপদেশে আমায় দীর্ঘ পাঁচ মাস কলকাতার বাইরে কাটাতে হ'ল। গোকুলের কথা প্রায় মনে পড়ত; একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় মনটা এক এক সময় কাজের মধ্যেই বড় অবসন্ন হয়ে পড়ত। এমন একটি স্নিগ্ধ পরিবার যত যাই বলুক নেশার মুখে, নেশার মতই ত সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে জড়িয়ে পড়েছিল গোকুল; কি ভুলটা হয়ে গেল কোন্‌খানে হয় ত গিয়ে দেখব সোনার সংসারটি ছারখার হয়ে গেছে।

পাঁচ মাস পরে ফিরে টের পেলাম, ব্যাপারটা গোকুলের ভাবার মত গুরুতর কিছুই নয়, বরং উলটে খুবই সুখের—প্রায় চার বছর পরে গোকুলের আর একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। কুহকিনীর মায়ায় আর একটি গ্রন্থি পড়তে যাচ্ছে দেখে ঐ রকম আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল।

তবে আমার আশঙ্কা যতই অমূলক হোক, পরিণাম যা হবার তাই হয়েছে। গোকুল ত্যাগ করেছে দারা সুত সুতা।

অনেক বোঝালাম। থাকলে হয় ত ওর প্রতিদিনের তিল তিল করে অ হৃত বৈরাগ্য প্রতিদিনের যুক্তি দিয়ে কাটিয়ে যেতে পারতাম; সামলে যেত; কিন্তু দীর্ঘ পাঁ

মাসের ব্যবধানে গুরুজীর একছত্র আধিপত্যে দন্তস্ফুট করা গেল না।

গোকুল আসেও না আর বড় একটা। কুহকিনী মায়াই ত শুধু ভয়ের নয়, যে মায়াবদ্ধ মূঢ় তার হয়ে ওকালতি করতে যায় তার সান্নিধ্যও কি বিপৎসঙ্কুল নয়?

দুই

তার পর একদিন রাত হয়েছে, আহারাদি সেরে শয়ন-পর্বের উদ্যোগ করছি, দরজায় একেবারে ঘন ঘন কয়েকটা ত্রস্ত করাঘাত পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে গোকুলের কণ্ঠ, "স্যার, বাড়ি আছেন?"

অর্গল খুলে প্রশ্ন করলাম, "ব্যাপার কি? এত রাত্রে…"

"সৃষ্টি রসাতলে দিলে এরা স্যার…"

বেশ বিরক্তিই ধরেছে, প্রশ্ন করলাম, "তোমার ত তাতে খুশী হবারই কথা; যথাসাধ্য নিজেও এগিয়ে দিয়েছ ঐ পথে। কিন্তু বলছ কাদের কথা? এরা মানে?"

খুব যে কানে গেল কথাগুলো এমন মনে হ'ল না, গোকুল যেন নিজের কথার জের ধরেই বলে চলল, "শুনছি নাকি দিল্লীতে আইন করছে আর একটার বেশি বিয়ে করতে দেবে না কাউকে! একি অত্যাচার স্যার! খেতে দিতে পাচ্ছিস না, পরতে দিতে পার্চ্ছিস না—এই ত স্বরাজ তোদের, ঘেন্না ধরে গেল; তার ওপর লোকে খেয়ালখুশি মাফিক একটু বিয়ে করবে তাতেও হস্তারক হবি!—একি অত্যাচার স্যার!"

বললাম, "খেতে পরতে দিতে পারছে না তার ওপর দারা-সুত-সুতার ভিড় জমাতে দেবে?· ·তোমার গুরুজী কি বলেন?"

কানেই গেল না। দোরটা সে ধরেই দাঁড়িয়ে আছে, তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিতে চাই, সেদিকেও খেয়াল নেই। বললে, "ভেবে দেখুন একি অত্যাচার! আমারই ঠাকুরদাদার কথা বলছি স্যার—সে-যুগের কথা, টাকায় তখনও এক মোণ করে চাল বিকুচ্চে—ঠাকুরদাদার আমার পাঁচটা বিবাহ ছিল, মরচে আর বিয়ে করচে, শেষে দু' ঠাকুরমা টেঁকে ছিল, গল্প নয়, স্বচক্ষে দেখেছি; নেই নেই করেও আমারই ছিল দু'জন পত্নী। এরা এখন বলচে—একটার বেশি বিবাহ করতেই দেবে না! দিল্লীতে নাকি জোট বেঁধে আইন করচে!··· তোদের এত মাথাব্যথা? তোরা খাওয়াবি পরাবি?"

বললাম, "তা তোমারই বা এত মাথাব্যথা কেন গোকুল —দিল্লীতে কি আইন হচ্ছে না হচ্ছে? তুমি ত আর ওদিকে ঘেঁষছ না।"

"তা আইন করে বন্ধ করবে কেন স্যার? এইটে আমায় বুঝিয়ে দিন।"

"তোমার ক্ষতিটা হচ্ছে কোথায় সেটা আগে আমায় বুঝিয়ে দাও।"

নেশাটা বোধ হয় আজকাল একটু বাড়ায়; একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, যে কথাটা মাথায় এমন ঢুকে গেছে সেটা বের করা অসম্ভব বুঝে আর ওদিকে গেলাম না। প্রশ্নে যে উত্তরোত্তর বিরক্তির ভাব ফুটে উঠছিল সেটাও চেপে, নরম গলায় বললাম, "অবিশ্যি তোমার কথাটা যে একেবারে উড়িয়ে দেবার তা বলছি না গোকুল, তবে আইনের কথা ত, নানা মারপ্যাচ; আমি একটু ভেবে দেখি, না হয় আর এক দিন এসো একবার—সন্ধ্যের সময়।"

দোরটা ভেজিয়েই দিতে দিতে বলছিলাম, গোকুল বললে, আইনের প্যাচ বলেই রাতারাতি ছুটে এলুম স্যার! অপরাধ নেবেন না। দুশ্চিন্তের কথা ত।"

সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাওয়ার শব্দ হ'ল। শোয়ার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি, আবার দরজায় করাঘাত—

"স্যার, ঘুমুলেন?"

"কেন?"

আর দরজা খোলার দিকে না গিয়ে সেইখানে দাঁড়িয়েই প্রশ্ন করলাম।

"জিগ্যেস করছিলুম—আর নড়চড় নেই?"

"না। আইনসভায় পাস হয়ে গেছে, এবার প্রেসিডেন্টের মত পেলেই গেজেট হয়ে যাবে, তার পরে আইন চালু।"

"গেজেট কবে হবে স্যার?"

রাগ চেপে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। বললাম, "আমি ত গেজেট নয় বাপু, অত খবর কোথা থেকে দোব? যাও শুয়ে পড় গে না।

"যাই স্যার।···ঘুম তো হবে না এ রকম দুর্ভাবনা নিয়ে।"

অল্প একটি বিরতি; বোধ হয় ফিরেই যাচ্ছিল, আবার যেন এগিয়ে এসে—

"স্যার, ঘুমুলেন?"

"কি বলছ?···আমার ঘুমটাই কি এত সস্তা দেখলে?"

"পেসিডেন্টের ক'টা বিয়ে স্যার?"

এত দুঃখের মধ্যেও হাসি চাপা দায় হয়ে ওঠে। উদ্দেশ্যটা বুঝে নিয়ে, কোনরকমে সামলে উত্তর করলাম, "অত খোঁজ রাখিনে বাপু; বললুম ত, গেজেট নই ত। তবে এইটুকু বলতে পারি, আর বিয়ে করবার বয়েস নেই; মত দেবেনই। যাও।"

এর পরের কাহিনীটুকু খুব জটিল হয়েই আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু…

থাক্, ভূমিকায় আর দরকার নেই ; অল্প কথাতেই হয়ে যাবে—

দু'দিন পরের ঘটনা, এ দুটো দিন গোকুলের আর দেখা পাই নি। একবার বাইরে যাবার সময় বাড়িটায় নজর পড়তে দেখি তালা ঝোলানো। যে রকম অবস্থা, দিল্লী চলে গিয়ে থাকতে পারে ভেবে খানিকটা নিশ্চিন্ত হলাম।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে হাতমুখ ধুয়ে এইবার একটু বাইরে গিয়ে বসব, পাশেই হঠাৎ একটা হৈচৈ উঠল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বেশ একটু বিস্মিত হয়ে পড়তে হ'ল। গোকুলের বাড়ির সামনে গোটা সাত-আট রিক্সা করে এক দল লোক। শুধু লোক বলতে আমরা যা বুঝি ঠিক তা নয় ; প্রায় সবই স্ত্রীলোক, হয়ত জনতিনেক মাত্র পুরুষ। আরও যা বিস্ময়ের কারণ, সবাই সাজসজ্জায় একেবারে মনে হ'ল আপ-টু-ডেট, ঠিক গোকুলের স্তরের লোকের সঙ্গে খাপ খাওয়ার কথা নয়। তালা খুলেছে, সবাই হুড়োহুড়ি করে ভেতরে ঢুকছে, হাসি-হুল্লোড়, মস্করা, বাতাসে এসেন্সের গন্ধ আসছে ভেসে ; এত হঠাৎ, আর এত রকমারি ব্যাপার যে কিছু বুঝে উঠতে দিচ্ছে না।

তার পরেই গলির মাথায় একটা বরযাত্রীর ছোট প্রসেসন। গোটাচারেক রিক্সাই, তার মধ্যে একটাতে সানাই। গোকুলের বাড়ি থেকে সবাই বেরিয়ে এসেছে ; শাঁখ, উলু। দেখতে দেখতে প্রসেসন দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

গোকুলই। একটি আধ-ঘোমটা দেওয়া চব্বিশ-পঁচিশ বছরের ক'নেকে গাঁটছড়ায় বেঁধে সিঁড়ি দিয়ে উঠে সবার হুল্লোড়ের মধ্যে ঘরে গিয়ে উঠল।

দিনকয়েকের মধ্যেই ক'নে বউ পাড়া একেবারে মাৎ করে তুললে। রাস্তা, কলতলা, খাটাল, সর্বত্রই অবাধ গতি। সর্বত্রই ক'নে-বউয়েরই গলা সবার ওপরে। আর সে ভাষা! গোকুল মিস্ত্রির ক'নে-বউ বস্তিকে যেন আবার কবর থেকে জাগিয়ে তুললে!

সাত দিন গোকুলের দেখা নেই। তার পর একদিন সন্ধ্যাবেলার কথা। বাইরে বসা ছেড়ে দিয়েছি, বেরিয়ে এসে ভেতরের বারান্দাতেই বসে একটা সিগারেট টানছি, গোকুল এসে কুণ্ঠিত ভাবে দরজার চৌকাঠের পাশে একটু আড়াল হয়ে দাঁড়াল। আমল দেওয়ার মোটেই ইচ্ছা ছিল না ; যায় না দেখে বললাম, "গোকুল যে, কিছু বলবে নাকি?"

"সেই আইনটা চালু হয়ে গেল নাকি স্যার! যাতে গেরস্তকে তার দরকার মতন আর বিবাহ করতে দেবে না!"

বললাম, "আছে নাকি আরও দরকার তোমার! একটাতেই ত পাড়া নরককুণ্ড করে তুলেছে।"

"আইন করে আখেরের মতন বন্ধ করে দিচ্চে ত, সেই জন্যেই যে দুর্ভাবনা ; নইলে জাল ছিঁড়ে ত বেরিয়েই এসেছিলুম স্যার। আর দরকারের কথা যদি তুললেন, জোড়া বেঁধে দিলে ত সামলেও যায় অনেক সময়। বাবা তাই করেচে, ঠাকুর্দাও তার আগে তাই করেচে। তখন দেখবেন আর কিছু না হোক অন্তত পাড়ায় বেরুবে না। ফুরসত থাকবে না ত দু'জনের মধ্যে কারুরই।"

বেশ প্রীতিকর আলোচনা মোটেই নয় ; অব্যাহতি পাওয়ার জন্য বললাম, "তা আইন হয় নি এখনও ; দেখ এর মধ্যে য' জোড়া টেনে ঘরে তুলতে পার। যাও, আমার একটু কাজ আছে।"

তিন দিন পরে আবার সেই কাণ্ড। লগ্ন বোধ হয় দেরিতে ছিল, রাত্রি প্রায় দুটো-আড়াইটের সময় হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি নরক গুলজার। মনে হ'ল যেন সেই পার্টি, আর, একই পার্টি যেন দু'দিক সামলাচ্ছে, বিয়েটা ওদিকে সেরে এখানে এসে বাসরের ব্যাপারটা সামলাচ্ছে।

এর পর আর সাত দিন নয়। প্রথম দিনটা ভোজভাতেই কাটল, তার পর দ্বিতীয় দিন থেকেই দুটো ক'নে-বউয়ে মিলে একেবারে অতিষ্ঠ করে দিলে। ঘরে ত হচ্ছেই, পিতৃপুরুষের অভিজ্ঞতায় গোকুলের আন্দাজটা মোটেই ভুল ছিল না, তবে কলতলা, রাস্তা, খাটাল, পার্ক কোনখানেই বাদ গেল না, ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়ে দিলে পাড়ার লোকের ; বিশেষ করে ভাষার পারিপাট্য, কানে সর্বদা আঙুল দিয়ে থাকলেই ভাল।

বোধ হয় প্রথম রাত্রের শিফট্ ছিল, প্রায় একটার সময় কড়া নেড়ে তুললে আমায় গোকুল।

"স্যার, ঘুমুচ্চেন!"

বিছানা থেকেই বেশ রাগত স্বরে বললাম, "খুব অপরাধ করেছি। বারোটার ওদিক পর্যন্ত ত জেগেই কাটাতে হয়েছে।"

"জিগ্যেস করছিলুম আইনটা চালু হতে আর কত দেরি স্যার? শুনচি নাকি যেমন একটার বেশি ঢুকতে দেবে না আর তেমনি ডাইভোস নাকি একটা দিচ্চে—যেগুলো আচে সেগুলোকেও বিদেয় করা যাবে…"

পাড়াটা ছেড়ে দিতে হ'ল ; বেশ পছন্দ হয়েছিল, পাড়া আর বাড়ি, দুটোই ; কিন্তু আর ভদ্রস্থ থাকে না। একটা বাড়ি ঠিকও করেছি।

একটা কাজ নিয়ে দিনপাঁচেকের জন্যে বাইরে গিয়ে-

ছিলাম। সন্ধ্যার গাড়িতে ফিরলাম। কাল ছাড়ব বাড়িটা হাতমুখ ধুয়ে শেষবারের মতো বারান্দায় গিয়ে একটু বসতে ইচ্ছা করল কেমন। সত্যই ভাল লেগেছিল জায়গাটা।

পাড়া একেবারে নিস্তব্ধ। গোকুল কনে' বউ নিয়ে অষ্টমঙ্গলা গোছের কিছু করতে গেল নাকি? বাড়িটা লক্ষ্য করি নি। উঠতে যাব, দেখি গোকুল আসছে, এবার বুকে একটি কচি শিশু; মেয়েটির হাত ধরে নিয়ে রয়েছে।

সেই রকম ভাবে বসল, দুটিকে বুকের কাছে জড়িয়ে। প্রশ্ন করলাম, "খবর ভাল ত গোকুল?"

"আজ্ঞে, আপনার সিচরণের আশীর্ব্বাদ।...আর ডাই-ভোসের দিকে যেতে হ'ল না স্যার। আইন এনে ফেলচে, তখন তাড়াহুড়োয় আর অত জ্ঞানগম্যি ছিল না ত, কোন্ পাড়া থেকে মেয়ে আনচি বিয়ে করে।...যাক, তাদের পোষাবে কেন? জলের মাছ আপনিই জলে চলে গেছে।... তার পর আপনার কথাই দেখলুম দরের কথা স্যার, ঐ যে বলতেন না?—জাল থেকে যখন পরিত্রাণই নেই তখন কাঁটা জালের চেয়ে রেশমের জালই ভাল নয়?"

দুটিকে দু'হাতে বুকের আরও কাছে চেপে ধরলে, বললে, "ইটি হ'ল আপনার নফর স্যার। সেই যে সিদিনকে জন্মাল না?"

---

40 বৎসর পূর্ব্বে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

হঠাৎ আমার স্বর্গগত পিতার একখানি ছিন্ন এবং উইপোকা আক্রান্ত হিসাবের খাতা হাতে আসিয়া পড়িল; খাতাখানি ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া উহার পাতা উল্টাইতে লাগিলাম। আমার পিতার নিজের হাতে-লেখা হিসাবের খাতাখানি অনেক দিক হইতেই আমার নিকট অতি মূল্যবান। খাতাখানি সযত্নে রাখিয়া দিয়াছি। নিম্নে খাতাখানি হইতে কয়েকটি দ্রব্যের মূল্য উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।*

ছোলার ডাল	/১।০	৶০	ধনে	/॥	/১০
অরহর ডাল	/১।	৶০	সরিষা	/॥	/১৫
বিউলির ডাল	/১।	৶০	ময়দা	/১।	।০
মটর ডাল	/১।	৶০	আটা	/১	৶৫
সোনা মুগের ডাল	/১।	।৫	(যাঁতার)	/১	৵১০
মুগের ডাল	/১।	৶৫	চিনি	/॥	।১০
গুড়	/॥	৵৫	চিঁড়ে	/॥	৵০
সুপারি	/।	/৫	আলু	/২॥	৵১০
খয়ের	/৵	৵০	উচ্ছে	/৵	৻৭॥
জিরেমরিচ	/।	।/০	বেগুন	৫টা	৻১০
হলুদ	/॥	৶১৫	সীম	/॥	৻১২॥
লঙ্কা	/।	/১০	কপি	...	৻১৫
পাঁচফোড়ন	/।	/১০	পটল	/॥	৵১০

লাউ	...	৻১০	পাথা		৻১০
তেঁতুল	/॥	/০	সরিষার		
			তৈল	/১	॥০
শুটি	/।	/০	ঘৃত	/৸	১৶০
ডিম	৪	৵০	তাল	১৩টা	৻১৫
কমলা লেবু	৪	৵০	মিছরি	/।	/১০
এ চড়	২	/০	৪২ ইঃ ৫ গজ ধুতি ১ জোঃ		২৸০
কাঁচা আম	৭	/০	ঝিয়ের সাদা থান ৫ গজ ১ থান		১৵১০
মাছ	/৸	৵১০	শাড়ী ২ জোড়া		৫৸০
জয়নগরের মোয়া	/১	।৵০	জুতা ১ জোড়া		৪৲
কয়লা	৫ মণ	৪/০	বালাম চাল ১ মণ		৫।০
কেরোসিন তৈঃ	১৬ পাঁঃ	২।০	দেশী চাল ১ মণ		৪৲

বর্ত্তমান সময়ে উপরোক্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির মূল্য কি পরিমাণ বাড়িয়াছে—সকলেই, বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছেন। উহাদের মূল্য লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বে জিনিষের মূল্যও কম ছিল, জিনিষে তেমন ভেজালও ছিল না; কিন্তু অধুনা মূল্যও যেমন বাড়িয়াছে, ভেজালের পরিমাণও সেই অনুপাতে বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে এক বন্ধু মন্তব্য করিলেন—"আগে মানুষও খাঁটি ছিল, জিনিষও খাঁটি ছিল, জিনিষে ভেজাল ছিল না; এখন মানুষও ভেজাল, জিনিষও ভেজাল। বন্ধুর এই উক্তি ঠিক কিনা সুধীবৃন্দ বিচার করিবেন।

* এই সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলিতেছিল; সুতরাং দ্রব্যাদির মূল্য কিছু বাড়িয়া গিয়াছিল।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল

শ্রীবেল্লিকোৎ রঘুনাথ শেনোয়

অনুবাদক—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ছাপ্পান্নটি সদস্য-দেশের দ্বারা গঠিত একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান। তহবিলের কার্য্যাদি এবং কর্ম্ম-পদ্ধতি এই প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানপত্রসম্মত চুক্তি ও নিয়মাবলী অনুযায়ী সম্পাদিত হয়। ১৯৪৫ সনের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে ত্রিশটি সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ স্বাক্ষর করিলে এই চুক্তি ও নিয়মাবলী কার্য্যকরী হয়। নির্ব্বাহী অধিকর্ত্তাদের (Executive Directors) প্রথম অধিবেশন তহবিলের প্রধান কার্য্যালয় ওয়াশিংটনে ১৯৪৬ সনের ৬ই মে হইয়াছিল। তহবিলের বিনিময়-কার্য্য ১৯৪৭ সনের ১লা মে হইতে সুরু হয় এবং ঐ বৎসরই ৮ই মে ফরাসী দেশকে প্রায় দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ডলার কর্জ্জ দেওয়া হয়।

ভারত তহবিলের বড় অংশীদারগণের মধ্যে পঞ্চম—অপর চারি জন প্রধান অংশীদার হইতেছে যথাক্রমে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, চীন এবং ফ্রান্স। ভারতের চাঁদার পরিমাণ ডলারের হিসাবে চল্লিশ কোটি—তহবিলের মোট মূলধনের কিঞ্চিদধিক সাড়ে চার শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্রের 'কোটা' বা বরাদ্দ মূলধনের প্রায় একত্রিশ শতাংশ। তহবিলের প্রধান পাঁচ জন অংশীদারকে মোট মূলধনের ৬২ শতাংশ বরাদ্দ করা হইয়াছে অর্থাৎ ডলারের অঙ্কে ৮৯০ কোটি। ১৯৪৪ সনের জুলাই মাসে যদিও রাশিয়া সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘের অর্থ নৈতিক আলোচনায় যোগদান করিয়াছিল তবু শেষ পর্য্যন্ত তহবিলে যোগ দেয় নাই। রাশিয়া তহবিলে যোগ দিলে ভারত বৃহত্তম অংশীদারগণের পঞ্চম স্থান অধিকার করিতে পারিত না। পোল্যাণ্ড ১৯৫০ সনের মার্চ্চ মাসে তহবিলের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছে, চেকোশ্লোভাকিয়ার সদস্যপদ ১৯৫৫ সনের ২রা জানুয়ারী হইতে খারিজ হইয়া গিয়াছে (এই রাষ্ট্র বিশ্বব্যাঙ্কের চাঁদা না দেওয়ায় ইহাকে সদস্যপদ হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে। নিয়ম অনুযায়ী কোন দেশের বিশ্বব্যাঙ্কে সদস্যপদ না থাকিলে উহা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলে সভ্য থাকিতে পারে না)। বর্ত্তমানে সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র যুগোশ্লাভিয়াই তহবিলের সদস্য। ফরমোসা (জাতীয়তাবাদী চীন) সম্মিলিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য এবং তহবিলেরও সদস্য কিন্তু গণতন্ত্রী চীন ইহার কোনটিরই সদস্য নহে।

অধমর্ণ হিসাবে তহবিলের খাতকগণের মধ্যে ভারতের স্থান পঞ্চম—অবশ্য এ পর্য্যন্ত যাহা কর্জ্জ দেওয়া হইয়াছে তাহার পরিশোধের পরিমাণ বাদ দিলে এরূপ দাঁড়ায়। কর্জ্জের পরিমাণ হিসাবে প্রথম স্থানে ইংলণ্ড (৩০ কোটি ডলার) এবং পরে যথাক্রমে ব্রেজিল, ফ্রান্স এবং জাপান। তহবিলের মোট দাদনের পরিমাণ ১১৬ কোটি ডলার। এই কর্জ্জের ৪৭ কোটি ৭০ লক্ষ পরিশোধ করা হইয়াছে। ১৯৫৪ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর ভারতের নিকট মোট পাওনা ছিল ৫ কোটি ৩৩ লক্ষ ডলার। কর্জ্জের পরিমাণ হিসাবে প্রধান অধমর্ণ হইতেছে ফ্রান্স, দ্বিতীয় ব্রেজিল, তৃতীয় জাপান, চতুর্থ ভারত।

তহবিল পরিচালন করেন ১৬ জন নির্ব্বাহী অধিকর্ত্তা বা একজিকিউটিভ ডাইরেক্টর এবং ১৬ জন বিকল্প কর্ম্মাধ্যক্ষ (অলটারনেটস্)। বৃহৎ পাঁচটি দেশ, উহার মধ্যে ভারতও একটি, এক-একজন নির্ব্বাহী অধিকর্ত্তা এবং বিকল্প মনোনীত করে, বাকি ২২টি পদ অন্যান্য ৫১টি সদস্য-দেশ নির্ব্বাচন দ্বারা পূরণ করে। কিন্তু মূলধনের বরাদ্দ এবং ভোটের সংখ্যা বেশী থাকায় বেলজিয়ম (লুক্সেমবুর্গ), কানাডা, জার্ম্মানী এবং নেদারল্যাণ্ডস পরিচালন বোর্ডে নিজ নিজ স্বতন্ত্র নির্ব্বাহী অধিকর্ত্তা এবং বিকল্প নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হয়।

তহবিলের অনুষ্ঠানপত্র হইতে জানা যায় কি উদ্দেশ্যে ইহা স্থাপিত হইয়াছে—প্রথমতঃ, সুষ্ঠু বিনিময়ের ব্যবস্থাপন, যুদ্ধকালীন সময়ে প্রতিযোগিতা দ্বারা মুদ্রামূল্য হ্রাস করায় যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার নিরোধ এবং আলাপ-আলোচনা দ্বারা বিনিময় মূল্য নির্দ্ধারণ; দ্বিতীয়তঃ আন্তর্জ্জাতিক দেনা-পাওনা এরূপ ভাবে পরিচালন যাহাতে বাণিজ্য, শ্রমনিয়োগ এবং প্রকৃত আয় বৃহত্তম হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, যাহাতে পৃথিবীর নানা দেশের মধ্যে অবাধ মুদ্রাবিনিময় আবার প্রতিষ্ঠিত হয় তদ্বিষয়ে সহায়তা করা অর্থাৎ বর্ত্তমানে দুইটি দেশ পরস্পরের সহিত বন্দোবস্ত দ্বারা এবং বিদেশী মুদ্রা-বিনিময়ে নানা বাধার সৃষ্টি করিয়া যে ভাবে কার্য্য চালাইতেছে সে অবস্থার বিলোপ করা। অর্থাৎ, যে সকল বাধা বিশ্ব-বাণিজ্যের প্রতিকূল তাহা দূর করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যাহাতে আন্তর্জ্জাতিক ভাবে সুষ্ঠু শ্রমনিয়োগ হয় এবং প্রত্যেক দেশ নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী আর্থিক উৎপাদনে সক্ষম হয় সেই বিষয়ে চেষ্টা করা।

এই সকল উদ্দেশ্য কি পরিমাণে সফল হইয়াছে ইহাই

প্রশ্ন। এই সম্পর্কে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা-তহবিল স্বাধীন সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের সমবায় প্রতিষ্ঠান। যদিও তহবিল-কর্তৃপক্ষের শাস্তি দিবার ক্ষমতা আছে, যথা—কোন সদস্যকে তহবিলের মূলধন হইতে কর্জ না দেওয়া, কিংবা কোন সদস্য মুদ্রা বিনিময়ে প্রতিবন্ধকতা জন্মাইলে তাহাকে শাস্তি দেওয়া এমনকি সদস্যপদ হইতে তহবিলের নিয়মভঙ্গের অপরাধে বিতাড়িত করা। কিন্তু কার্য্যতঃ 'শাস্তি'র সময়ে একমাত্র অস্ত্র যাহা তহবিলে ব্যবহার করে তাহা হইতেছে যুক্তিতর্কদ্বারা সংশ্লিষ্ট সদস্যকে কর্ত্তব্য সম্পাদনে বাধ্য করা। দেখা গিয়াছে যে, তহবিল কোন আদেশ জারি করিয়াও তাহা কার্য্যকরী করিতে সক্ষম হয় নাই এবং পরে আপোষে নিজ আদেশ সংশোধন করিতে বাধ্য হইয়াছে।

বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা দ্বারা মুদ্রামূল্য হ্রাস আর দেখা যায় না। বিস্তৃত ক্ষেত্রে বহু দেশের মধ্যে আজ বিভিন্ন মুদ্রাবিনিময়ের হার স্থাপিত হইয়াছে এবং এই বিষয়ে তহবিলের চেষ্টা বিশেষ ভাবে সফলতা লাভ করে নাই। বাজার-দরের অধিক মূল্যে স্বর্ণ বিক্রয়ের কাহিনী—বিশেষ ভাবে স্বর্ণ উৎপাদনকারী দেশসমূহের এরূপ আগ্রহে তহবিলের সম্মতি দান তহবিলের পক্ষে সম্মানজনক হয় নাই। অন্যান্য বিষয়েও তহবিল নিজের আদেশ কার্য্যকরী করিতে পারে নাই এবং কোন কোন দেশের স্বল্প মতৈক্য সত্ত্বেও আদেশ সংশোধন করিতে বাধ্য হইয়াছে।

অনুষ্ঠানপত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিনিময় এবং লেন-দেন সম্পর্কীয় বাধানিষেধ তহবিলের কার্য্যারম্ভের তিন বৎসর মধ্যেই দূর হইবে। যদি স্বল্প কয়েক স্থানে এরূপ বাধানিষেধ থাকে তাহাও পাঁচ বৎসর পরে আর থাকিবে না। যুদ্ধ-পূর্ব্বকাল হইতে বর্ত্তমানে উৎপাদন শতকরা ৫০ এবং আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য এক-তৃতীয়াংশ বাড়িয়াছে কিন্তু তহবিলের পঁয়তাল্লিশটি সদস্য-দেশেই আজও মুদ্রার লেনদেন সম্বন্ধে বাধানিষেধ দেখা যায়। ১৯৫৪ সনের বসন্তকাল হইতে পৃথিবীর অনেক দেশেরই দেনা শোধ করিবার সামর্থ্য বাড়িয়াছে এজন্য বিনিময়ের বাধানিষেধ, বাণিজ্য—বিশেষ করিয়া ডলার দেশ হইতে আমদানীর উপর নিষেধাজ্ঞা হ্রাস এবং সংশোধিত হইয়াছে। ইহাতে আশা হয় ভবিষ্যতে এক দেশের মুদ্রা অপর দেশের মুদ্রায় সাধারণ ভাবেই পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে অর্থাৎ আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা-বিনিময়ে বাধা থাকিবে না।

তহবিলের ডলার ও স্বর্ণের পরিমাণ ডলার মূল্যে ৩৮৯ কোটি ৬০ লক্ষ। যুদ্ধোত্তরকালে প্রচুর ডলার ঘাট্তি সত্ত্বেও ১৯৫৪ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত তহবিল মোট ৯৭ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার অর্থাৎ তহবিলের মোট ডলার ও স্বর্ণ-ভাণ্ডারের এক-চতুর্থাংশ কর্জ্জ দিয়াছে। ১৯৫০ সন হইতে পৃথিবীর নানা দেশের পক্ষেই দেনা পরিশোধের ক্ষমতা বাড়িয়াছে, একারণ নূতন কর্জ্জ দাদনের পরিমাণ অপেক্ষা কর্জ্জ পরিশোধের অর্থের পরিমাণ বেশী দেখা যায়। অবশ্য ১৯৫৩ সনের নূতন কর্জ্জের পরিমাণ পরিশোধের পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হইয়াছে। ইহার ফলে ১৯৫৪ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখের হিসাবে দেখা যায় যে, পরিশোধনীয় কর্জ্জের পরিমাণ ৫৫ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার মাত্র অর্থাৎ তহবিলের মোট মজুত 'সিক্কা' এবং স্বর্ণের এক শত ভাগের ৬ ভাগ মাত্র। তহবিলের মূলধনের শতাংশের ১৪ অপেক্ষাও কম অংশ কর্জ্জে খাটানো হইয়াছিল। তহবিলের কর্ম্মপদ্ধতিতে নানা রকমের অসুবিধা থাকার দরুন উহা ডলার ঘাট্তি দূর করিবার জন্য খুব অল্প পরিমাণ দুর্লভ মুদ্রা কর্জ্জ দিতে সক্ষম হইয়াছে। বিদেশী সাহায্য কার্য্যসূচীর মারফত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বহুল পরিমাণে এই ডলার ঘাট্তিতে সাহায্য করিয়াছে।

স্বীকার করিতে হইবে যে, নানা অসুবিধা সত্ত্বেও তহবিল যুদ্ধোত্তরকালে আর্থিক বিষয়ে অনেক সাহায্য করিতে সক্ষম হইয়াছে। ব্রেটন উড্স্ সম্মেলনে পৃথিবীর জাতিসমূহ এইরূপ একটি আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিল গঠন করিতে সম্মত হওয়াও কম সাফল্য নহে, কারণ ১৮৬৭ সনের প্যারিস সম্মেলন ও ইহার পরে বহু সম্মেলন এ পর্য্যন্ত একমত হইতে পারে নাই। আর্থিক এবং বিনিময় ব্যাপারে আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা আজ সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছে ইহা খুবই বড় কথা।

প্রতি বৎসর তহবিলের বার্ষিক সভায় ৫৬টি দেশের অর্থ-মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহের গবর্ণরগণ সমবেত হইয়া প্রোপাগাণ্ডা ও ফট্কার বাহিরে থাকিয়া আলাপ-আলোচনা করেন এবং বিভিন্ন অঞ্চলের কিংবা একাধিক দেশের মধ্যে যে সকল জটিল সমস্যা দেখা দিয়াছে উহাদের সমাধান বিষয়ে মত স্থির করেন।

১৯৫২ সনের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তহবিল স্থির করেন যে, কোন দেশকে তাহার সিক্কা বিনিময়ের সাহায্যের জন্য কর্জ্জের অর্থ সংশোধন করিয়া পুনরায় কর্জ্জ দেওয়া যাইতে পারিবে। তহবিলের এই সিদ্ধান্ত হইতে বুঝা যায় যে, এই সংস্থা সদস্যগণের আর্থিক সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত নিয়ম-প্রণালীর সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। এই নূতন ব্যবস্থার সুযোগ প্রথম গ্রহণ করে বেলজিয়ম—ঐ দেশ ১৯৫২ সনের জুন মাসে ৫ কোটি ডলার কর্জ্জ নেয়। পেরু এবং মেক্সিকোর বেলায় ১২ মাসের মধ্যে বরাদ্দের শতকরা

পঁচিশের বেশী কর্জ্জ দিবার নিয়ম থাকা সত্ত্বেও ঐ নিয়ম প্রত্যাহার করিয়া কর্জ্জ দেওয়া হয়।

১৯৫২ সনের মার্চ্চ মাসের পরিকল্পনা অনুযায়ী তহবিল নামমাত্র ৩/৪ শতাংশ পরিবহন খরচ পারিশ্রমিক বাবদ লইয়া স্বর্ণের ক্রয় ও বিক্রয় বন্দোবস্ত করিতেছে। স্বর্ণের ক্রেতা ও বিক্রেতা দেশগুলি পরস্পরের ক্রয় এবং বিক্রয়ের অর্ডার তহবিলকে জানাইয়া দিলেই তহবিল এরূপ ভাবে ব্যবস্থা করে যাহাতে স্বর্ণের চলাচল ব্যতীতই উহা সুষ্ঠুভাবে সরবরাহ হইয়া থাকে। ১৯৫৪ সনের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৯ কোটি ৮০ লক্ষ মূল্যের স্বর্ণের কেনাবেচা হইয়াছে।

তহবিলের কার্য্যালয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বহু যোগ্য ব্যক্তি নিযুক্ত আছেন। তহবিলের কার্য্যালয়ে নানা সমস্যার অভিজ্ঞতা হইতে যে সুষ্ঠু জ্ঞানলাভ হয় তাহা সদস্য-দেশগুলিকে দরকারমত জ্ঞাত করান হয়। অধিকন্তু সদস্য-দেশে বিশেষজ্ঞ পাঠাইয়া তাহাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধানের সুযোগ-সুবিধা যাহাতে সদস্য-দেশ পায় তাহার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৫৪ সনের ৩০শে এপ্রিল যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসরে তহবিলের পঞ্চাশ জন কর্ম্মচারী একচল্লিশটি সদস্য-দেশে গিয়া বেসরকারী ভাবে সাম্প্রতিক সমস্যা ও কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে মতবিনিময় করিয়াছে, মুদ্রা বিনিময়ের বাধানিষেধ দূর করা সম্পর্কে অভিমত জানাইয়াছে এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞের সাহায্য দিয়াছে। তহবিলের কর্ম্মচারিগণও আন্তর্জাতিক—মোট সংখ্যা ৪৩৪। কর্ম্মচারিগণকে আটত্রিশটি দেশ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই আন্তর্জাতিক সিবিল সার্বিসের কর্ম্মচারীরা বিশ্বমৈত্রীর প্রতীক—এক দিকে নানা দেশের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানে ইঁহারা তহবিলকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, অন্য দিকে তহবিল হইতে বিশ্ব সমস্যা সম্পর্কে নানা জ্ঞান আহরণ করিয়া ইহারা নিজ নিজ দেশকে লাভবান করিতেছেন।

তহবিলের মতে প্রত্যেক দেশ নিজ নিজ জাতীয় মুদ্রা ও অর্থনীতি সম্পর্কীয় ব্যবস্থাগুলি কঠোর ভাবে আয়ত্তে রাখিতে পারিলেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লেনদেনের অসুবিধা দূর হওয়া সম্ভব। মুদ্রাস্ফীতির দরুনই সাধারণতঃ আন্তর্জাতিক মুদ্রা বিনিময়ের বিঘ্ন দেখা দেয়। মুদ্রা এবং দ্রব্যমূল্যের স্থিরতা ব্যতীত দেশের উৎপাদন এবং শ্রম-নিয়োগের সমতা সম্ভব নহে—এইগুলি ঠিক থাকিলে উচ্চ স্তরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমতা সহজেই আসে। দেশের মধ্যে এই সকল সংস্কার না হইলে আমদানীর বাধাগুলি দূর করা সম্ভব নহে। অবশ্য মুদ্রাবিনিময় সহজ করিবার জন্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কবিধির সংস্কার ও আমদানী সম্পর্কিত নিয়মগুলির পরিবর্ত্তন খুবই আবশ্যক এবং যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা-তহবিলকে আরও উদার ভাবে কর্জ্জ দিবার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। সম্প্রতি তহবিল-অনুসৃত নীতিগুলি সদস্য-রাষ্ট্রের মুদ্রা ও অর্থসম্পর্কীয় নীতি বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত করিতেছে।

তহবিল বিশ্বের মুদ্রা এবং অর্থসম্পর্কীয় তথ্যাদির সংগ্রহ ও বিতরণ-কেন্দ্র। এখান হইতেই পৃথিবীর নানা দেশে সিক্কা, ক্রেডিট, অর্থসরবরাহ, বাণিজ্য এবং লেনদেন সংশ্লিষ্ট যাবতীয় মূল্যবান তথ্য ও মূল উপাত্ত (data) সকলকে সরবরাহ করা হয়। "International Financial Statistics"—মাসিক, "International Financial News Survey"—সাপ্তাহিক বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। বার্ষিক "Balance of Payments Year Book", অধিকর্ত্তা ডাইরেক্টরগণের "Annual Report"-এ বিশ্বের বিশেষ বিশেষ ঘটনার উপর মতামত প্রকাশ করা হয়। বৎসরে তিনখানি "Staff Papers" প্রকাশিত হয়। ইহাতে বিশেষজ্ঞদ্বারা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির বিশ্লেষণ থাকে। অর্থনীতির ছাত্রগণের পক্ষে এই সকল পুস্তক খুবই মূল্যবান। Articles of Agreement, Bye-laws, Rules এবং Regulations বিনামূল্যে দেওয়া হয়। ভারতীয় সিক্কা, বিনিময় এবং অর্থনীতির ছাত্রগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইতেছে 'Report of the Fund Mission to India'। ইহা ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং তহবিল কর্ত্তৃক ১৯৫৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে 'Economic Development with Stability' নামে প্রকাশিত হইয়াছে।*

* অল-ইণ্ডিয়া রেডিওতে (আমেদাবাদ) প্রদত্ত ইংরেজী বক্তৃতার অনুবাদ। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে।

প্রকীর্ণকোষ

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

শব্দের অর্থ নির্দেশই অভিধানের মুখ্য লক্ষ্য। কোন বস্তুর বিস্তৃত পরিচয় প্রদান অভিধানের কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। বস্তুতঃ এরূপ পরিচয় দিতে হইলে অভিধানের কলেবর যেরূপ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে তাহাতে উহা সাধারণ ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া দাঁড়াইবে। সংস্কৃতের শব্দকল্পদ্রুম ও বাচস্পত্য এবং বাংলার বিশ্বকোষ নানা দিক দিয়া মূল্যবান ও উপযোগী হইলেও সব সময় ব্যবহারের উপযুক্ত নহে। অথচ সুলভ ও সুব্যবহার্য এই জাতীয় একখানি গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন আছে। ইংরেজীতে এরূপ গ্রন্থের অভাব নাই। অভিধানের মত এইরূপ প্রকীর্ণকোষ বা সাইক্লোপিডিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রের পক্ষে অপরিহার্য। যিনি যে জাতীয় গ্রন্থই আলোচনা করুন না কেন মাঝে মাঝে তাঁহাকে এমন বিষয়ের সম্মুখীন হইতে হয় যাহার প্রকৃত তাৎপর্য সাধারণ অভিধানের সাহায্যে সুস্পষ্ট হইতে পারে না। ক্ষুদ্র একখানি সাইক্লোপিডিয়া কিন্তু সহজেই সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের সহায়তা করিয়া থাকে। বাংলা গ্রন্থপাঠের সময়ও নানা সমস্যার উদ্‌ভব হয় কিন্তু বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে সমাধানের উপায় সুলভ নহে—অনেক স্থলে একেবারে অলভ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বাংলা গ্রন্থে ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাদের পরিচয় বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করা চলিলেও বাঙালীর ঐতিহ্যবিষয়ক অনেক প্রসঙ্গেরই বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান সাধারণ বাংলা গ্রন্থে দুর্লভ। সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজেও যতটুকু ধারণা আছে তাহা অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ, বিকৃত বা ভ্রান্ত। প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা আজ অনেকাংশে ব্যাহত—প্রাচীন সম্প্রদায় আজ অনেক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন—প্রাচীন সংস্কারের ধারক বাহক সংস্কৃত পণ্ডিতসম্প্রদায়ের সহিত আজ বাংলা সাহিত্যের যোগসূত্র ক্ষীণ। সুতরাং এ বিষয়ে তথ্যসংগ্রহের পথও লুপ্তপ্রায়। ফলে আমাদের প্রাচীন রীতিনীতি আচার-অনুষ্ঠান ক্রিয়াকর্মের প্রকৃত স্বরূপ ও রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা আজ দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আধুনিককালে প্রচলিত পাল-পার্বণের পরিচয়ও জানিবার সহজ কোন উপায় নাই। দণ্ডীরাজার উপাখ্যান, যযাতির নরমেধ যজ্ঞ প্রভৃতি এককালে বাংলাদেশে বহুলপ্রচলিত স্বতন্ত্র পুরাণ-কাহিনীর কথা বাঙালীর কাছে পরিচিত করাইবার তেমন কোন ব্যবস্থা নাই। অন্যান্য আরও অনেক বিষয় সম্পর্কেই বাঙালীর জানিবার বুঝিবার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার কোনও পথ নাই। বাঙালী পাঠকের জানিবার কৌতূহলও তাই কমিয়া গিয়াছে মনে হয়—'উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ।' বাংলা গল্প উপন্যাসে ইঁদ পরব, জিতাষ্টমী প্রভৃতির উল্লেখ বাঙালী পাঠকের অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করে না—কোন উৎসবের কথা বলা হইতেছে এইটুকু বুঝিয়াই সে সন্তোষ লাভ করে। বস্তুতঃ দীর্ঘ দিন ধরিয়া আমাদের পঠনপাঠনের যে ধারা চলিয়া আসিতেছে তাহাতে অনেক বিষয়েই আমরা বিস্তৃত বিবরণ বা পরিচয় পাইবার জন্য উদগ্রীব হই না। নির্দিষ্ট পশুপক্ষী বৃক্ষলতার অর্থ বুঝাইতে গিয়া সংস্কৃত টীকাকারেরা প্রায়ই পশুবিশেষ, পক্ষিবিশেষ এইটুকু মাত্র বলিয়া কার্য সমাধা করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান জগতের লোক ত এত অল্পে সন্তুষ্ট হইতে চাহে না—তাহাদের জানিবার ও বুঝিবার আগ্রহ অফুরন্ত। সেই আগ্রহ মিটাইবার জন্যই নানা ধরণের সাইক্লোপিডিয়ার সৃষ্টি। উপযুক্ত উপকরণের অভাবে আমাদের দেশে মানুষের এই স্বাভাবিক আগ্রহ স্তব্ধ হইয়া আছে। যথোচিত উপকরণ পাইলেই অগ্নিকণা স্পর্শে বারুদের মত সে আগ্রহ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিবে।

যাঁহারা জ্ঞানী গুণী ও দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী তাঁহাদের এ দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার—আমাদের জ্ঞানরাজ্যের এই নিদারুণ অভাব দূর করিবার জন্য তাঁহাদিগকে তৎপর হইতে হইবে। খুবই আশার কথা, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর মত একজন বিচক্ষণ সাহিত্যিক ও অভিধানকার সম্প্রতি 'দেশ' পত্রিকার মধ্য দিয়া এদিকে সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন—তিনি একখানি বাংলা সাইক্লোপিডিয়া বা 'বিষয়কোষ' সংকলনের প্রয়োজনীয়তা ও উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। আমি তাঁহার মূল প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। তবে প্রসঙ্গতঃ তাঁহার প্রস্তাবের দুই-একটি খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে আমার বক্তব্য উপস্থাপিত করা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি।

প্রস্তাবিত গ্রন্থের নাম 'বিষয়কোষ' না করিয়া 'প্রকীর্ণকোষ' করিলে কেমন হয় ভাবিয়া দেখা যাইতে পারে। 'বিষয়কোষ' শব্দের অর্থ কিছুটা অস্পষ্ট বলিয়া মনে হয়, 'বিভিন্ন বিষয়ের কোষ'—নামের তাৎপর্য যদি এইরূপ হয়। তাহা হইলে সংস্কৃত সাহিত্যে বহুল ব্যবহৃত প্রকীর্ণ শব্দটি ব্যবহার করিলে নামের অর্থ অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হইতে পারে।

গ্রন্থপ্রণয়নের ভার কোনও প্রতিষ্ঠানেরই লওয়া উচিত সন্দেহ নাই। নানা দেশের নানা বিদ্বৎপ্রতিষ্ঠান হইতে এই জাতীয় কার্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও কাশীর নাগরী-প্রচারিণী সভা হইতে হিন্দীর বিশাল অভিধান 'শব্দসাগর' প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহার পরিবর্ধিত ও সংশোধিত নূতন সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে। এই প্রতিষ্ঠানই সম্প্রতি হিন্দী সাহিত্যের ব্যাপক ইতিহাস সংকলনের কার্যে ব্রতী হইয়াছেন। বিভিন্ন কার্যে ব্যবহৃত ইংরেজী শব্দের হিন্দী অনুবাদের কার্যও এই প্রতিষ্ঠান নিয়মিত করিয়া যাইতেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বাংলা দেশের কোন প্রতিষ্ঠান হইতে যৌথ প্রচেষ্টায় কোন বৃহৎ কার্য সুসম্পন্ন হইবার দৃষ্টান্ত তেমন দেখা যায় না। তাই অনেক ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কল্পনাই থাকিয়া যায়—কার্যে রূপান্তরিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করে না।

বাংলা দেশের বেশির ভাগ বড় কাজই ব্যক্তিবিশেষের উদ্‌যোগ ও চেষ্টায় সম্পাদিত হইয়াছে। বাংলার 'শব্দকল্পদ্রুম' রাজা রাধাকান্ত দেবের অক্ষয় কীর্তি—'বঙ্গীয় শব্দকোষ' দরিদ্র পণ্ডিত শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু বৎসরের অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অপূর্ব নিদর্শন—শ্রীরাজশেখর বসুর অতুলনীয় নিষ্ঠা ও অসাধারণ দূরদর্শিতার সাক্ষী 'চলন্তিকা'। ইহা ছাড়া, রামায়ণ-মহাভারত ভাগবতাদি গ্রন্থ ও তাহার অনুবাদ প্রচারে বর্ধমানের মহারাজা, কালীপ্রসন্ন সিংহ ও মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। জমিদারী বিলোপ ও অন্যান্য কারণে আজ এ জাতীয় কাজে বৈষয়িক সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা বা সাহায্য লাভের সম্ভাবনা কম। তবে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা সরকারী সাহায্য লাভে সার্থক হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু এমন ব্যক্তিই বা কোথায় যিনি বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বিদ্বন্মণ্ডলীর সাহায্য ব্যতিরেকে এই বিরাট কার্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবেন বা পাঁচ জনের সহযোগিতা লাভ করিয়া কার্যে অগ্রসর হইতে পারিবেন? এই দুর্লভ সম্ভাবনার উপর নির্ভর না করিয়া কোন উৎসাহী পুস্তক-প্রকাশক যদি শ্রীরাজশেখর বসুর মত ধীর স্থির কর্মীকে পুরোধা করিয়া এই কার্যে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে অচিরকাল মধ্যে সুফল লাভের আশা করা যাইতে পারে। বৃদ্ধ হইলেও রাজশেখরবাবু কর্মপন্থা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন—কার্যে প্রাণসঞ্চার করিয়া ইহাকে সার্থকতার পথে অগ্রসর করিয়া দিতে পারিবেন। যে প্রস্তাব তিনি করিয়াছেন তাহাকে কার্যে রূপ দেওয়ার সূচনা যদি তিনি করিয়া দেন তাহা হইলে বাংলার একটি মস্ত অভাব দূরীভূত হইবে বলিয়া ভরসা করা যায়।

উপনিষদ্ দর্শন

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

কাঁপে থর থর জীবনসন্ধ্যা
ঘর্ঘর জরা-ঘর্ষণে,
হেন সন্ধ্যায় হে প্রিয় বন্ধু
এলে তুমি মধুবর্ষণে।
সঙ্গেতে তব জীবনের বেদ
সকল দুঃখে রচিয়াছে ছেদ
মিটাইলে মোর সংসার-খেদ
উপনিষদের দর্শনে।
সন্ধ্যা-খেয়াতে বাড়ায়ে চরণ
অন্ধকারেতে কাঁদে প্রাণ,
বন্ধু গো, তুমি সান্ধ্যঘাটেতে
এ কি উপহার দিলে দান!
এল শঙ্কর নাশিবারে তাপ
ভাবি জ্ঞান দিয়া সব সন্তাপ
ফেলেছিনু মুছি, ভ্রান্তির পাপ
হয় নি তো তবু নিরবাণ।

তুমি এলে প্রিয় হেন দুঃখের
বরষায় ঘোর বর্ষণে,
ভুলে গেনু মোর সকল দুঃখ
তব অঙ্গের স্পর্শনে।

পাঠ করি তব অমৃত-গ্রন্থ
সকল ভ্রান্তি হইল অন্ত
যাহা হয় নাই আগে কোন দিন
কোনো প্রজ্ঞার কর্ষণে,
মৃত্যুর পথে বাঁধিলাম বুকে
এ "উপনিষৎ-দর্শনে"।

[শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উপনিষৎ দর্শন' পাঠে]

সীতাবল্ডি দুর্গ, নাগপুর

বোম্বাই থেকে জব্বলপুর

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

সন্ধ্যার অনতিপরে উৎসবমুখর বোম্বাই নগরীর রাজপথে পা দেবামাত্র প্রাসাদশিখরে, সৌধবাতায়নে, পিচঢালা প্রশস্ত রাজপথের উভয় পার্শ্বে বিবিধ বর্ণের বৈদ্যুতিক আলোক-সজ্জার প্রদীপ্ত সমারোহ চোখ ধাঁধিয়ে দিলে।

আজ ছাব্বিশে জানুয়ারি—বোম্বাই শহরে স্বাধীনতা-উৎসব উদ্‌যাপিত হচ্ছে বিপুল জাকজমক সহকারে। আলোকমালা-শোভিত নগরীর রূপচ্ছটা যেন চোখের সামনে বিস্তার করেছে মোহন ইন্দ্রজাল। গোটা শহরের আবালবৃদ্ধবনিতা ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে উৎসব-সমারোহ অবলোকন করবার উদ্দেশ্যে। জনসমুদ্রের তরঙ্গ-দোলায় দুলতে দুলতে ভেসে চলেছি সমুদ্রতটাভিমুখে। রাস্তায় যানবাহন চলাচল প্রায় বন্ধ, ক্বচিৎ কখনো সর্ব্বাঙ্গে আলোর মালা ঝুলিয়ে এক একটি ট্রাম মন্থর-গমনে রাজপথ অতিক্রম করছে।

আমরা একসঙ্গে চলেছি চার জন। যুবক তিন জন হোটেলের বাসিন্দা, এদের মধ্যে আমার অবস্থা 'হংস মধ্যে বকো যথা'র মত। অদম্য আমার সঙ্গীদের উৎসাহ, ভিড় ঠেলে দৃঢ় পদক্ষেপে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন। এই কয় দিনের ঘোরাঘুরি আর পরিশ্রমে আমার অবস্থা ডাঙায় তোলা কই মাছের মত। পা দুটো যেন চলতে চায় না, কিন্তু থামবার উপায় নেই—পেছনের ধাক্কায় চরণযুগলের সঙ্গে রাজপথের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়—কাজেই শূন্যমার্গে চরণ তুলে অগ্রসর হও আর মনে মনে স্মরণ কর 'চরৈবেতি', 'চরৈবেতি'।

সমুদ্রতীরে মেরিন ড্রাইভে এসে পৌঁছাই। সাগরের তীরে এমন চমৎকার বাঁধানো পথ সমগ্র ভারতে আর নেই। ডান দিকে এক সারিতে সংস্থিত, একই ছাদের অভ্রভেদী সৌধমালা আলোক-ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে যেন ময়দানবের মায়াপুরীর মত অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেছে, বাঁদিকে নিস্তরঙ্গ সমুদ্র-বারির অনন্ত বিস্তার। এখানে ভিড় অনেকটা কম, প্রাণটা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

সমুদ্রতীর ধরে চলতে চলতে অবশেষে মালাবার হিলের নীচে পৌঁছলাম। পাহাড়ের গাত্রস্থ সঙ্কীর্ণ পথ বেয়ে উপরে উঠে দেখি, অপূর্ব্ব দৃশ্য। আলোখচিত অর্দ্ধবৃত্তাকার বেলাভূমিকে দেখাচ্ছে যেন সাগরিকার গলায় দোলানো মণিমালার মত—আকাশে হলুদ রঙের চাঁদ যেন তাঁরই ললাটের কাঞ্চন-টিপ।···

পরদিন বেলা সাতটার সময় লোকাল ট্রেনে বোম্বাইয়ের উপকণ্ঠস্থ আন্ধেরী রওনা হলাম। দিন-রাত সকল সময়ই বোম্বাই এবং তার উপকণ্ঠস্থ স্থানগুলির মধ্যে ট্রেন যাতায়াত করে—এই ট্রেনগুলোতে শ্রেণীভেদ নেই, এগুলিতে উঠলে 'সব সমান'।

ট্রেন আন্ধেরীতে পৌঁছলে পর ষ্টেশনে নেমে রমন রাওয়ের আস্তানার উদ্দেশে রওনা হলাম। কল্মী ষ্টেটে তাঁর বাসা—এ অঞ্চলে শহরের এক্সটেনশন হচ্ছে, অনেকগুলো নূতন গবর্ণমেণ্ট কোয়ার্টার্স নির্ম্মিত হয়েছে। রাও মহাশয় বোম্বাই সরকারের ডেপুটি কমিশনার অব লেবার, তদুপরি বিশিষ্ট বিদ্বান—গ্রাম্য পঞ্চায়েত সম্বন্ধে থিসিস লিখে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেছেন। এ অঞ্চলে সুপরিচিত ব্যক্তি। একটি ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করতেই রাও সাহেবের "উঘনতীশ বি" (২৯বি) নম্বর বাড়ীটা দেখিয়ে দিলে।

কড়া নাড়তেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন রাও মহাশয় আর তাঁর স্ত্রী। পরিচয় দিতে হ'ল না। রাও-গৃহিণী ইতিপূর্ব্বে কব্‌বুরে শর্ম্মাজীর বাড়ীতে আমাকে দেখেছেন। শর্ম্মাজীর তার

পেয়ে এরা স্বামী-স্ত্রীতে আজ কয় দিন ধরেই আমার প্রতীক্ষা করছিলেন।

রাও মহাশয় সম্বন্ধে আমি কল্পনায় যে ছবি এঁকে রেখেছিলাম, বাস্তবে তাঁর সঙ্গে একটুও মিল হ'ল না। ভেবেছিলাম, পণ্ডিত ব্যক্তি, তার উপর অর্থনীতির গবেষণা নিয়ে থাকেন—কাঠখোট্টা গোছের চেহারা হবে বোধ হয়। কিন্তু দেখলাম ভদ্রলোকের মুখশ্রী কমনীয়, মাথায় কোঁকড়ানো কালো চুল, চোখ দুটি স্বপ্নময়। তিনি শুধু যে শর্ম্মাজীর কন্যাকেই বিশেষরূপে বহন করছেন তা নয়, শর্ম্মাজীর জীবনের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলবার দায়িত্বও আংশিকভাবে স্কন্ধে গ্রহণ করেছেন।

ফিরোজ শা মেটা গার্ডেন, বোম্বাই

শহরের কোলাহল থেকে দূরে রাও মহাশয়ের সুসজ্জিত ড্রয়িং-রুমে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বসে কফি পানের সঙ্গে সঙ্গে চলে গল্প-গুজব। শর্ম্মাজীর কথা ওঠে। শর্ম্মাজীর কন্যা ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে যা বলেন তার ভাবার্থ হচ্ছে এই—"বাবার দিন-রাত খালি লেখা আর লেখা। এই সেদিন এক রকম মৃত্যুশয্যা থেকে উঠলেন। কিন্তু একটু তাকৎ হতেই আবার ডাক পড়ল সর্ব্বেশ্বরজীর (শ্রমিক ধর্ম্ম-রাজ্যসভার ওয়ার্কিং সেক্রেটারী)। সর্ব্বেশ্বরজী এলেই পিতাজী বলেন, "লিখ, লিখ, লিখ।"···পিতাজী অনর্গল বলতে থাকেন, আর সর্ব্বেশ্বরজীর কলমও চলে সমান তালে। এই 'লিখ' 'লিখ' করতে করতেই বাবা খতম হবেন। অথচ আজ বিশ বছর ধরে ভাত খান না, আছেন তো শুধু ফলমূল খেয়ে। নিজের শরীরের দিকে"···আবেগে ভদ্রমহিলার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।

মণ্ডেশ্বর শর্ম্মার কৃচ্ছ্র সাধন আমি স্বচক্ষে দেখেছি। ধূপ যেমন করে দেবতার পাদপীঠে একটু একটু করে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, শর্ম্মাজীও তেমনি আদর্শের বেদীমূলে নিজের অর্থ সামর্থ্য এবং জীবনীশক্তিকে তিল তিল করে নিঃশেষ করে দিচ্ছেন। কিন্তু সে কথা আজ থাক্।

আবহাওয়াটা হালকা করবার জন্যে প্রসঙ্গান্তর উত্থাপন করলাম। হঠাৎ রাও মহাশয় প্রশ্ন করলেন, "মিঃ ভদ্র, আর ইউ অলসো এ ডক্টর ?"

"নো মিঃ রাও, আই এম নট এ ডক্টর, বাট আই এম দি নেফিউ অব এ ডক্টর ; অফ কোর্স মাই আঙ্কল ইজ এ ডক্টর, বাট হি ইজ নট এ থিসিস-ডক্টর-বাট হি ইজ এ ডিজিজ-ডক্টর।" রাও মহাশয় হো হো করে হেসে উঠলেন। গুমট কেটে গিয়ে ঘরে আবার খুশির হাওয়া বইল।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর খানিক বিশ্রাম করে ডক্টর রাও এবং আমি ট্রেনে করে বোম্বাই রওনা হলাম। শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার কার্য্যব্যপদেশে আমাকে সবগুলো পত্রিকার সম্পাদক এবং ভারতন-কুমারাপ্পা প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে হবে।

শহরে পৌঁছে প্রথমে গেলাম টাইমস অব ইণ্ডিয়া আপিসে।

যাদুঘর, বোম্বাই

ডক্টর রাওয়ের এক বন্ধু ওখানে কাজ করেন। তিনি বোম্বে ক্রনিকল, ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস, বোম্বে সমাচার, লোকসত্ত্ব, ফ্রি প্রেস জার্নাল, কারেণ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার সংবাদপত্রের সম্পাদকদের নিকট পরিচয়পত্র দিলেন।

ডক্টর রাওকে নিয়ে পত্রিকা আপিসে ঘোরাঘুরি করতে করতে পাঁচটা বেজে গেল। তারপর দু'জনে একটা হোটেলে কফি খেয়ে পায়ে হেঁটে সরাসরি চলে গেলাম একেবারে সমুদ্রতীরে 'গেট অব ইণ্ডিয়া'র কাছ-বরাবর। সেখানে দু'জনের ছাড়াছাড়ি হ'ল। ডক্টর রাও চলে গেলেন আন্ধেরীর ট্রেন ধরবার জন্যে, আমি একটু সমুদ্র-বায়ু সেবন করে হোটেলে আমার আস্তানার পথ ধরলাম।

সন্ধ্যার পর আবার চারদিকে জ্বলে উঠল আলোর মালা, বন্ধ হয়ে গেল যানবাহন চলাচল। বুঝলাম স্বাধীনতা-উৎসবের জের চলছে। সমুদ্রতীর থেকে ক্রফোর্ড মার্কেট পর্য্যন্ত সোজা পথ। কিন্তু খানিক দূর গিয়ে দেখি সোজা আর সোজা নেই—একটা মোড় ছাড়িয়েই ঘুরপথে যেতে হ'ল—নিরাপত্তার জন্যে পুলিস প্রহরায় এই ব্যবস্থা। তারপর কি হ'ল তা বিশদভাবে বর্ণনা করে আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। সুয়েজ খাল কাটা হবার আগে ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে আসার কথাটা চিন্তা করলে আমার অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারবেন। যে ক্রফোর্ড মার্কেট সমুদ্রতীর থেকে মাত্র মাইলখানেকের ব্যবধান এবং রাস্তা যাতে

বলে একেবারে নাক-বরাবর; সেখানে পৌঁছলাম আমি গোটা বোম্বাই শহরটাই চক্কর দিয়ে, কত অন্ধকার অলিগলি পার হয়ে, নোটের তাড়া কোঁচার খুঁটে বেঁধে এবং ঠোঁটের আগায় তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর নাম উচ্চারণ করতে করতে। কখন? সেই রাত বারোটায়—"বিশ্ব যখন নিদ্রামগন এবং গগন অন্ধকার" হওয়ার কথা —তখন। তা হয় নি, কেননা, স্বাধীনতা-উৎসবের জন্য পুরবাসীরা ছিল জাগ্রত এবং গগনে ছিল অভ্রভেদী সৌধচূড়াসমূহে শোভমান দীপমালার রোশনাই আর হোটেলের গেটও ছিল খোলা।

প্রমোদ-ভ্রমণ ক্লাব, বোম্বাই
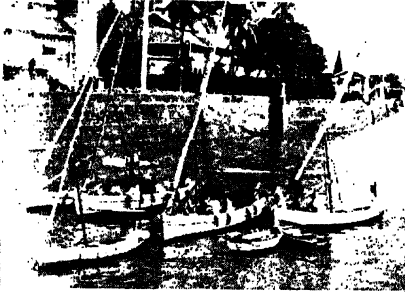
ঘুম ভাঙল শেষরাত্রে। কি শীত কি গ্রীষ্ম, ভোর পাঁচটায় স্নান করা আমার নিত্যকার অভ্যাস। হোটেলে বাথরুমে সারা রাত জল থাকে। স্নানাদি সেরে বেলা পাঁচটা নাগাদ বাইরে এসে দেখলাম তখনও রীতিমত অন্ধকার রয়ে গেছে, মনে হয় যেন রাত্রি প্রভাত হতে ঢের দেরি।

ভোরের আলোয় চারদিক যখন ফর্সা হ'ল তখন ঘড়িতে দেখি বেলা ছয়টা।

প্রায় এগারটার সময় ট্যাক্সি করে গেলাম চৌপাটিতে কে. এম. মুন্সী প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বিদ্যাভবনে। এই ভবনটির গড়নে ভারতীয় স্থাপত্যরীতির ছাপ দেখে প্রীত হলাম। ভারতীয় বিদ্যাভবনের মুখপত্রে শ্রমিক ধর্মরাজ্য সভা কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাদির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বেরিয়েছে, এর আদর্শকে এই প্রতিষ্ঠান জানিয়েছেন অকুণ্ঠ অভিনন্দন। সেই সুবাদে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শ্রমিক ধর্মরাজ্য সভার যে নিগূঢ় যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে তাকে দৃঢ়তর করবার জন্যে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। আমি দেখা করলাম ভারতীয় বিদ্যাভবন থেকে প্রকাশিত 'বুক ইউনিভার্সিটি জার্নাল' নামক পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত কর্মী শ্রীমুচ্ছালার সঙ্গে এবং তাঁকে আমাদের নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী কয়েক সেট দিলাম। বহুক্ষণ তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

ফেরবার পথে বাসে না উঠে সমুদ্রের শোভা দেখবার জন্যে মেরিন লাইনের উপর দিয়ে চলতে লাগলাম। মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য্য তখন আগুনের হল্কা বর্ষণ করছে। সূর্য্যকিরণস্নাত, অনন্ত-প্রসারিত নীলাম্বুধির কি প্রসন্ন প্রশান্ত রূপ—পুকুরের ঢেউয়ের মত ছোট ছোট ঢেউ উঠছে, ঢেউয়ের দোলায় চড়ে সাগর-বলাকারা ভাটির দিকে ভেসে চলেছে, তিলমাত্র অঙ্গসঞ্চালন নেই ঝাঁক বেঁধে পাখা গুটিয়ে চুপটি করে ওরা তরঙ্গ চূড়ায় বসে আছে। মনে হয়, নীলসায়রের বুকে যেন ফুটে উঠেছে অগণিত শ্বেত-কমল।

অনেকখানি রাস্তা অতিক্রম করে এসে দেখি একটা ট্যাক্সি আসছে ওদিক থেকে। তাতে উঠে হোটেলে ফিরে আসা গেল।...

মেরিন ড্রাইভ, বোম্বাই

ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস থেকে নাগপুর এক্সপ্রেস ছাড়ল রাত ন'টার সময়। বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম। ট্রেনে রাতে ঘুম আমার বড় একটা আসে না। খোলা জানলা দিয়ে যখনই বাইরে তাকাই তখনই দেখি একটা প্রকাণ্ড তারা জ্বল জ্বল করে আমার মুখের পানে চেয়ে আছে।

বেলা সাতটা নাগাদ ট্রেন এসে থামল ভুসাওয়াল নামক একটা ষ্টেশনে—নেমে এক পেয়ালা চা খেয়ে চাঙ্গা হওয়া গেল। ট্রেন ছাড়লে বাইরে তাকিয়ে উচ্চাবচ পার্ব্বত্যভূমির দৃশ্যসৌন্দর্য্য উপভোগ করতে লাগলাম।

"গুজরাতী লোগ বাল বাচ্চে বেচ দেতে হ্যায়"—হঠাৎ কাংস্যকণ্ঠের প্রচণ্ড হুঙ্কারে সচকিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখি এক মাড়োয়ারী-গিন্নির সঙ্গে বাক্যযুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে এক গুজরাটীর। জোর তর্ক চলেছে—তর্কের বিষয়বস্তু হচ্ছে কোন্ জাতির লোক বেশী অর্থগৃধ্ন গুজরাটী না মাড়োয়ারী। মাড়োয়ারি-গিন্নির শ্রীমুখ কথিত আত্ম-চরিত শুনে-বুঝতে পারলাম তিনি শুধু শাসে-জলে পুরুষ্ট নন, বেশ পয়সাওয়ালাও বটেন, নাগপুরে তাঁর নিজের কয়েকখানি দোকান আছে। স্বজাতিনিন্দা শুনে বিষম কুপিতা হয়ে উঠেছেন তিনি। সেই বিপুলাঙ্গীর ভীমা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির কি বর্ণনা দেব—গায়ের রং মেটে, দেহের ওজন কমসে কম সাড়ে চার মণ। এদিকে ত্রিকালোত্তীর্ণা হলে কি হয়, বেশভূষার সখটুকু ষোল আনা। পরনে লাল রঙের লতাপাতা-আঁকা ছাপানো সাড়ি, গায়ে ফুলতোলা ঘন নীল রঙের ব্লাউজ; কালিদাসের উপমা মনে পড়ল—ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য"—"দ্বিরদ-অঙ্গে বর্ণরচনা প্রায়।" সবচেয়ে দর্শনীয় শ্রীমতীর বর্ত্তুলাকার ভুঁড়িটি। শুনেছি সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই বিশাল ভুঁড়ি নাকি সৌন্দর্য্যের লক্ষণ বলে গণ্য

হয়। সেই মাপকাঠিতে বিচার করলে ইনি যে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বলে গণ্য হবেন তাতে সন্দেহ নেই। কিছুক্ষণ তাকিয়ে আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করে আশ্চর্য্য হলাম, সে তার আকর্ণবিস্তৃত—চক্ষু নয়, হাসি—কি আশ্চর্য্য কৌশলে যে ডান দিকের অধরোষ্ঠের প্রান্তদ্বয়কে একেবারে কর্ণমূল পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে বিদ্রূপের বাঁকা হাসি হেসে ওঠেন, না দেখলে তা বর্ণনা করবার জো নেই। সে বক্র হাস্য দেখলে অতি বড় বীরপুরুষেরও যে বুক শুকিয়ে উঠবে সেকথা আমি হলফ করে বলতে পারি। সে যেন তীক্ষ্ণধার বাঁকা ছুরিরই মত প্রতিপক্ষের যুক্তিতর্ককে শতধা খান খান করে দিতে লাগল এবং সম্ভবতঃ এই বাঁকা হাসির ফলায় ঘায়েল হয়েই গুজরাটী

মদন মহলের পথে—গোলাকৃতি প্রস্তরখণ্ড

স্বর নরম করে তাঁকে "মা-সাহেব" বলে সম্বোধন করে কাতর নয়নে তাঁর পানে তাকালে—ভাবখানা—"প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননি আমার।" কিন্তু জননীর ক্রোধের আর উপশম হয় না, গলার স্বর উত্তরোত্তর উচ্চগ্রামে উঠতে থাকে। মা-সাহেবের সে রুদ্রমূর্ত্তি দেখলে এবং ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনলে অনেক 'বাবা সাহেবের'ও হৃৎকম্প উপস্থিত হবার কথা।

একে চোখা চোখা বাক্যবাণ, তার উপর প্রতিপক্ষের মর্ম্মবিদারী সেই বক্র হাস্য—একেবারে বিষদিগ্ধ ব্রহ্মাস্ত্র। আমি সেই দোক্তারসে কৃষ্ণায়িত, বিঘতখানেক প্রসারিত, করাল দংষ্ট্রাকণ্টকিত, ব্যাত্ত বদন-বিবরে বিশ্বরূপ দর্শন করছি আর "হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ—হৃষ্যামি চ পুনঃপুনঃ।"

বহুক্ষণ পরে শ্রান্ত হয়ে মহিলাটি বসে হাঁফাতে লাগলেন, আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

ট্রেন চলেছে মরাঠা-অধ্যুষিত মধ্যপ্রদেশের পার্ব্বত্য প্রান্তরের উপর দিয়ে। ট্রেনের বেশীর ভাগ যাত্রীই মরাঠী—পুরুষদের প্রায় সকলেরই মাথায় সাদা অথবা কালো টুপী, মেয়েদের পরনে কাছা-দেওয়া সাড়ী। গায়ে খাটো হাতাওয়ালা রঙীন চাউলি, কপালে কুঙ্কুমের টিপ। নূতন দেশ আর নূতন মানুষ দেখতে দেখতে সময়টা বেশ আনন্দেই কেটে যাচ্ছে।

সন্ধ্যার পরে ট্রেন এসে পৌঁছল নাগপুর ষ্টেশনে। ট্রেন থেকে নেমে লাল কোর্ত্তা পরা এক কুলীর মাথায় লটবহর চাপিয়ে দিলাম। সে এনে হাজির করল এক রিক্সাওয়ালার কাছে। রিক্সাওয়ালা বাঙালী হোটেলে নিয়ে যাবে বলে আমাকে চালান করল নিকটে 'বসন্ত মহল' নামক এক গুজরাটী হোটেলে। বাইশ-তেইশ বছরের এক গুজরাটী ছোকরা এর মালিক ও ম্যানেজার দুই-ই।

হোটেলটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—চারদিক খোলা-মেলা। দোতলায় একটি সিঙ্গল সিটেড রুমে আমার থাকবার জায়গা হ'ল।

খানিক বিশ্রাম করে স্নান করবার জন্যে চলে গেলাম বাথরুমে। স্নানান্তে চাঙ্গা হয়ে এসে সুটকেস খুললাম কোন একটা দরকারী জিনিষ বার করবার জন্যে। জিনিষপত্র একটু ঘাঁটকাতেই সেটা বেরুল বটে, কিন্তু বিদেশ বিভূঁইয়ে সবচেয়ে দরকারী যা সেই সার

মদন মহল প্রাসাদ, জব্বলপুর

বস্তুর আধার আমার মনিব্যাগটা কোথায় গেল? স্নান করতে যাবার সময় সুটকেস খুলে তার ভেতরেই ত তালাবদ্ধ করে রেখে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেটা উধাও হয়ে গেল কি করে? আবার একটি একটি করে সুটকেসের সব টুকিটাকি জিনিষপত্র সরিয়ে তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগলাম। কিন্তু কোথায় মনিব্যাগ! তখনকার অবস্থা বলে বোঝাবার ক্ষমতা আমার নেই। জীবনে বহুবার নানা বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হয়েছি, কিন্তু নিজেকে এত অসহায় আর কখনও মনে হয় নি। শুধু এই কথাটাই মনে হতে লাগল যে, এখন স্বস্থানে ফিরব কি করে? কল্পনায় মনে মনে কত ছবি এঁকে রেখেছিলাম। নাগপুরের কাজ সেরে যাব জব্বলপুরে—সেখানে গিয়ে দেখব বিন্ধ্যপাদচুম্বী নর্ম্মদার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, মদন মহলের ভগ্ন প্রাসাদে সন্ধান করব আদিবাসী গোন্দ রাজাদের ছিন্ন ইতিহাসের ভগ্নাংশ। আরও কত স্বপ্নই না এই কয়দিন ধরে দিনরাত দেখে আসছি কিন্তু রূঢ় বাস্তবের আঘাতে স্বপ্ন আমার চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল

ক্ষেপে গেলাম যেন। জিনিষপত্র হাটকে, বিছানা, খাটের উপরকার গদি সবকিছু উল্টে পাল্টে একেবারে ছত্রখান করে ফেললাম। একটা খোলা ব্লেডে আঙুল কেটে গিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল, পুথিপত্র কাপড়চোপড়, সবকিছু রক্তে একেবারে ছয়লাপ হয়ে গেল—ব্যাপারটা শুধু করুণ নয়, বীভৎসও বটে। মনে পড়ল কেদারনাথের পথে যেতে টাকার থলি হারিয়ে প্রবোধ

নর্ম্মদা প্রপাত

সান্যাল মহাশয়ের শোচনীয় মানসিক অবস্থার কথা—কিন্তু তাঁর তো একটা পথ খোলা ছিল, টাকার থলিটা না পেলে "কৌপীনবন্ত খলু ভাগ্যবন্ত" বলে সন্ন্যাসীদের দলে ভিড়ে যেতে পারতেন, কিন্তু আমার যে সে উপায়ও নেই! প্রচণ্ড উত্তেজনার পর ক্লান্তিতে একেবারে অবসন্ন হয়ে ঝুপ করে মেঝেয় বসে পড়লাম। টের পেলাম দেহের স্নায়ুগুলো কেমন যেন শিথিল হয়ে আসছে—তৃষ্ণায় কণ্ঠ আর তালু যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে।

এমন সময় হোটেলের ম্যানেজারের আবির্ভাব। আমার অবস্থা দেখে সে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—তাকে সব খুলে বললাম। শুনে সে এমন মাত্রাতিরিক্ত ভাবে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগল যে, আমার মনে লেশমাত্র সন্দেহ রইল না যে, মনিব্যাগ ওই চুরি করেছে। টাকার জন্য ওরা সব পারে—মাড়োয়ারি-গিন্নি তো বলেই ছিল 'বাল-বাচ্চে বেচ দেতে হ্যায়'। আমি যখন স্নানের আরাম উপভোগ করছিলাম সেই ফাঁকে নিশ্চয়ই ব্যাগটা ও সরিয়ে তালা বন্ধ করে চলে যায়।

যাই হোক, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এখন উপায়? দেশে ফিরব কি করে?"

সে কিছু বললে না, টেবিলের উপর রাখা আমার হাত-ঘড়িটার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করলে।

নীরন্ধ্র অন্ধকারের বুকে যেন একটুখানি কনকরশ্মি ঝিলিক মেরে গেল। উপায় আছে—ঘড়িটা বিক্রি করলে অন্ততঃ ঘরের ছেলের ঘরে ফেরবার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে।

ওয়াচ মেকারের দোকানে যাচাই করে দেখবার জন্যে ম্যানেজার ঘড়িটা নিয়ে চলে গেল। মনে মনে ভাবতে লাগলাম—আচ্ছা ব্যবসাই ফেঁদেছ চাঁদ, তোমার এখানে উঠে আমার ঢাকীসুদ্ধ বিসর্জ্জন হ'ল।

ছোকরা চলে গেলে পর ভাবলাম ব্যাগটা পাওয়া যায় কি না একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক। তখন মেজাজ অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে। বিছানায় পাতা গদীটা একটু উঠাতেই দেখি ব্যাগটি সেখানে নিশ্চিন্ত আরামে পড়ে রয়েছে। আঃ, তার মসৃণ স্পর্শে কি আরাম—বাস্তবিকই হারানিধি ফিরে পাওয়ার আনন্দের বুঝি তুলনা নেই।

ব্যাগটা কখন যে এখানে রেখেছিলাম সে খেয়ালই ছিল না। অথচ গদীটা বার বার উল্টে পাল্টে দেখেছি, কিন্তু আশ্চর্য্য যে ওটা নজরে পড়ে নি। জানি না বিজ্ঞানবিদেরা এর কি ব্যাখ্যা করবেন।

কিছুক্ষণ পরেই ম্যানেজার ফিরে এসে বলল, "ঘড়িটা কত দামে বেচবেন?"

"ওটা আর বিক্রি করব না ম্যানেজার।" তাকে সব খুলে বললাম।

নর্ম্মদা প্রপাতের আর একটি দৃশ্য ফোটো—শ্রীচিররঞ্জন ঘোষ

শুনে সে আমার মুখের দিকে এমন ভাবে তাকাল যেন সে আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ করছে। যাবার সময় বক্র কটাক্ষ করে চোস্ত রাষ্ট্রভাষায় একটি কথা শুধু বলে গেল যার সরল বাংলা হচ্ছে—"ওটা কি ইচ্ছে করে হারিয়েছিলেন?" খোঁচাটা বড় তীক্ষ্ণ; বুকে যেন শেল পড়ল।

পরদিন সকালবেলা প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করে একটা রিক্সায় চড়ে নাগপুর শহরে বেরিয়ে পড়লাম। শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার কার্য্যোপলক্ষে কয়েকজন বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে দেখা করে বেলা নয়টা নাগাদ গিয়ে পৌঁছলাম ধানতুলিতে, এডভোকেট এন. কে. ব্যানার্জ্জি মহাশয়ের বাংলোয়। তাঁর ছেলে অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রবাসী'র একজন লেখক।

বাড়ীর সামনেকার প্রাঙ্গণে ইজিচেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় কাগজ পড়ছিলেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক—আমাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন, তিনিই অনুপমবাবুর পিতা।

ছুটির দিন। অনুপমবাবু বাড়ী ছিলেন না। তাঁদের বাড়ীর বারান্দায় বসে তাঁর বাবা ও কাকার সঙ্গে আলাপ বেশ জমে উঠল। অনুপমবাবুর বাবার পুরো নাম নলিনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তাঁর জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথা বলতে লাগলেন।

বেশ কিছুক্ষণ নানা প্রসঙ্গে কাটিয়ে এঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। একটি যুবক চললেন আমার সঙ্গে। তিনি আমাকে নিয়ে যাবেন বেঙ্গলী হোটেলে—সেখানেই নাকি অনুপমবাবুকে পাবার সম্ভাবনা।
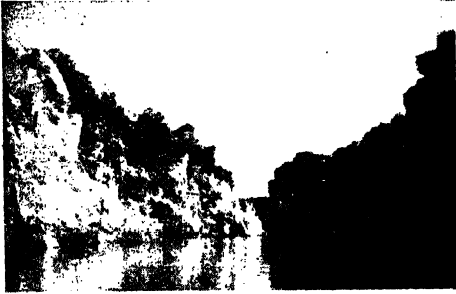
নর্ম্মদার উভয় তীরে মর্ম্মরশৈল [ফোটো—শ্রীচিররঞ্জন ঘোষ

পথে যেতে যেতে নজরে পড়ল অনতিদূরে পাহাড়ের উপর একটি দুর্গ অটল গাম্ভীর্য্য নিয়ে দণ্ডায়মান। আমার সঙ্গী যুবকটি বললেন, "এর নাম সীতাবল্ডি দুর্গ। এই পাহাড়ের উপরেই ইংরেজের সঙ্গে মরাঠাদের যুদ্ধ হয়েছিল।"

সিতাবল্ডির যুদ্ধ নাগপুরের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৭৮৮ সনে নাগপুরের মরাঠা রাজা ভোঁসলাবংশের মাধোজীর মৃত্যুর পর নাগপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হলেন দ্বিতীয় রঘুজী। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে ইতিপূর্ব্বেই নাগপুরের মরাঠারাজা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল—১৭৯৮ সনে মিঃ কোলব্রুক রঘুজীর দরবারে রিজেণ্ট নিযুক্ত হলেন। দ্বিতীয় রঘুজীর মৃত্যুর পর নাগপুরে কতকটা অরাজকতা দেখা দেয়। গুপ্ত ঘাতকের হস্তে রঘুজীর পুত্র পার্শজী নিহত হলে পর রাজা হলেন তাঁর নিকটতম আত্মীয় আপ্পা সাহেব। সিংহাসনে বসেই তিনি ব্রিটিশের সঙ্গে শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হলেন। ইংরেজ-লেখক এই আপ্পা সাহেবের চরিত্রকে চিত্রিত করেছেন মসীবর্ণে, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষভাগে তিনি যে পেশোয়া ও সিন্ধিয়ার সহযোগিতায় ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ রাজশক্তিকে উৎখাত করবার জন্যে সমরানল প্রজ্বলিত করেছিলেন সেকথা স্মরণ করে আজকের দিনে ভারতবাসী মাত্রেই গৌরববোধ করবেন এবং সীতাবল্ডি পাহাড়কে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম পাদপীঠরূপে মর্য্যাদা দান করতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না।

সীতাবল্ডির যুদ্ধ চলেছিল দুই দিন। দ্বিতীয় দিবসের যুদ্ধে আপ্পা সাহেবের মরাঠা এবং আরব সৈন্যদের আক্রমণে ইংরেজদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ক্যাপ্টেন ফিট্‌জেরাল্ড নামক জনৈক ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষের বীরত্ব এবং সমরকৌশলে মরাঠারা পর্য্যুদস্ত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে বাধ্য হ'ল। পরাজিত হয়েও কিন্তু আত্মসমর্পণ করেন নি আপ্পা সাহেব, হৃত রাজশক্তি পুনরুদ্ধার-মানসে আরও বারকয়েক ব্যর্থ চেষ্টা করবার পর অবশেষে তিনি পালিয়ে যান রাজপুতানায় এবং সেখানে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

নর্ম্মদাতটের আর একটি দৃশ্য
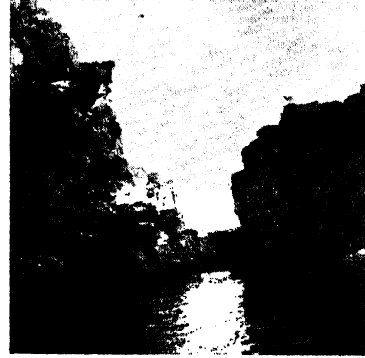
সীতাবল্ডির পতনের পরই প্রকৃতপক্ষে নাগপুরে মরাঠা রাজশক্তির অবসান হয়, ইংরেজেরা অবশ্য দ্বিতীয় রঘুজীর এক শিশু পুত্রকে রাজা বলে স্বীকার করেন। এঁর পদবী হয় তৃতীয় রঘুজী। ১৮৫৩ সালে এঁর মৃত্যুর পর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভোঁসলা রাজ্যে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করেন।

পথ চলতে চলতে সীতাবল্ডির গৌরবময় ঐতিহ্যের কথাই ভাবছিলাম।

বেঙ্গলী হোটেলের নিকটে পৌঁছে আমরা একটা রেষ্টুরেণ্টে গিয়ে ঢুকলাম—অনুপম বাবু সেখানেই ছিলেন। মৃদু এবং মিতভাষী এই লেখকটির বিনয়নম্র আচরণ মনকে মুগ্ধ করল। আমাকে সেদিনই নাগপুর ছাড়তে হবে—কাজেই শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার দু'একটি কাজের ভার তাঁর উপরেই চাপিয়ে দিলাম। তিনি জব্বলপুরে তাঁর এক বন্ধুর নিকট আমাকে একখানা পরিচয়পত্র দিলেন—বন্ধুটি ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেন।

অনুপম বাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রিক্সা করে হোটেলে ফিরে এলাম। বেলা তখন একটা। জব্বলপুরের বাস ছাড়ে বেলা আড়াইটা নাগাদ। তাড়াতাড়ি নাকে মুখে দুটো গুঁজে ষ্টেশনে এলাম বটে, কিন্তু সিট পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় টিকিট মিলল না। অগত্যা রেল ষ্টেশনে গিয়ে জব্বলপুরের ট্রেনের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম—ট্রেন ছাড়ল সেই বেলা সাড়ে পাঁচটায়। গাড়ী যখন সালওয়া ষ্টেশনে পৌঁছল সমস্তটা আকাশ তখন তারায় তারায় ভরে উঠেছে।

পরদিন ঘুম ভাঙতে দেখি গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে পিকারা ষ্টেশনে। প্রকৃতির মুখ ভার। আকাশে কালো মেঘের স্তূপ—চারিদিকে শ্যামল বনময় পাহাড়, মাঝে মাঝে সবুজ ধানের ক্ষেত। অল্পপরে নিকষকৃষ্ণ মেঘস্তূপ বিদীর্ণ করে প্রদীপ্ত সূর্য্য আকাশে উঠল। শিশিরসিক্ত প্রান্তরে আর ধানক্ষেতে আলোর ঝলমলানি, খেজুরগাছের রুক্ষ গাত্র এবং সুদীর্ঘ পত্ররাজি বেয়ে ছিন্নসূত্র মণিমালার মত আলোকদীপ্ত জলকণা ঝরে পড়ছে। ধানক্ষেতের ভেতর থেকে সবুজ বনটিয়ে উড়ে এসে বসেছে গাছের ডালে—পাখায় যেন মেখে নিয়ে এসেছে শস্যক্ষেত্রের শ্যামলিমা। এখানে প্রকৃতির সজীবতা, সরসতা, শ্যামসমারোহ চোখ জুড়িয়ে দিলে। পাথুরে পাহাড় আর রুক্ষ অনুর্ব্বর কালো মাটির দেশ অতিক্রম করে এবার এসে পৌছেছি তাপ্তী-শোণ-নর্ম্মদা-বারিবিধৌত বিন্ধ্য এবং সাতপুরা

স্তরে স্তরে বিন্যস্ত মর্ম্মরশৈল [ফোটো—শ্রীচিররঞ্জন ঘোষ
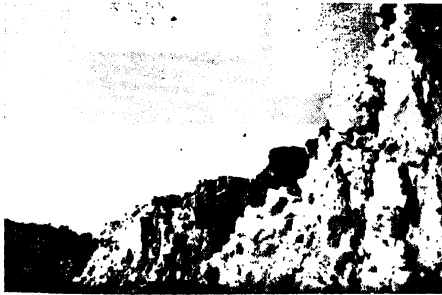
পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী পরম রমণীয় অধিত্যকাভূমিতে। বেলা আটটা নাগাদ বংগী ষ্টেশন পার হবার পর ট্রেন চলল নীলসলিলা একটি নদীর উপরকার পুলের উপর দিয়ে—নদীর উভয় তট মরকতশ্যাম তৃণরাজিতে সমাচ্ছন্ন। পশ্চিমে বনভূমির ওপারে বিন্ধ্য পাহাড়কে দেখাচ্ছে যেন আকাশের নীল পটের উপর গাঢ়তর নীল রঙের ছোপ। এই সেই নীলনয়না নর্ম্মদা—প্রাচীন ভারতে যার অন্য নাম রেবা, যার উপল-বিষম রূপের অনুপম বর্ণনা আছে মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে। কিন্তু আমি এখানে রেবার যে রূপ দেখলাম তা 'বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণা' নয়—বর্ণোজ্জ্বলা, রূপে রসে পরিপূর্ণা, পরিপুষ্টাঙ্গী—নীল স্বপ্ন ছড়িয়ে দিয়ে সবুজ বনের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে নর্ম্মদা উচ্ছ্সিত আবেগে।

বেলা এগারটা নাগাদ জব্বলপুর ষ্টেশনে পৌছলাম। একটা টাঙ্গা করে সরাসরি চলে গেলাম প্রবাসী হোটেলে অনুপমবাবুর সাদর আস্তানায়।

সদর রাস্তার উপরেই 'প্রবাসী হোটেলে'র দ্বিতল, সুরম্য ভবনটি অবস্থিত। আমার থাকবার জায়গা হ'ল একটি প্রশস্ত কক্ষে। ঝকঝকে তকতকে কক্ষটিতে প্রবেশ করেই মনটা খুশী হয়ে উঠল—এ বিষয়ে এমন চমৎকার বন্দোবস্ত খুব কম হোটেলেই আছে। এখানে আমার প্রীতিভাজন একটি কবি-শিল্পীর সঙ্গে অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হয়ে গেল। তিনি শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র, নাম শোভন সোম। কর্ম্মোপলক্ষে জব্বলপুরে আছেন এবং স্থায়ী ভাবে এই হোটেলে বাস করেন।

জলযোগের পর টাঙ্গায় করে রওনা হলাম গোয়ারী ঘাটের উদ্দেশে। সেখানে নর্ম্মদার পুণ্যসলিলে তীর্থস্নান সমাপনান্তে

নর্ম্মদা-গর্ভে প্রস্তরময় দ্বীপ—ওপারে বনভূমি [ফোটো—লেখক

আবার টাঙ্গায় করেই রওনা হলাম মদনমহল নামক গোন্দ প্রাসাদ দেখতে। মাইল কয়েক যাবার পর একটা পাহাড়ের কাছে এসে টাঙ্গা থামল। টাঙ্গাওয়ালাকে সঙ্গে নিয়ে বনপথ ধরে খানিক দূর যাবার পর সুরু হ'ল তৃণলতাবর্জ্জিত পাথুরে পাহাড়—এরই শীর্ষদেশে আদিবাসী গোন্দ নৃপতি মদন সিংহ নির্ম্মিত মদনমহল নামক প্রাসাদ। পাহাড়ে উঠবার সময় গোলাকৃতি বিরাট প্রস্তরখণ্ডসমূহ বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে—প্রকৃতি নিপুণ হস্তে সেগুলিকে যেন সযত্নে পাহাড়ের স্তরে স্তরে সাজিয়ে রেখেছেন।

দুটি গণ্ডশৈলের পাথর কেটে তদুপরি নির্ম্মিত এই দ্বিতল পাষাণময় প্রাসাদটি কালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে ছয় শতাব্দীরও উর্দ্ধকাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে অভ্রভেদী বিরাট মহিমায়। জনশ্রুতি এই যে, গোন্দ-নৃপতি মদন সিং এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়ে দেন খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে, কিন্তু ভগ্নাবশেষসমূহ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বলে অনুমিত হয়। এই প্রাসাদের সঙ্গে জড়িত রয়েছে গোন্দ রাজা দলপত সিংহের পত্নী রাণী দুর্গাবতীর পুণ্যস্মৃতি, মোগল সম্রাট আকবরের প্রতিনিধি আশফ খাঁর সঙ্গে সম্মুখ-সমরে প্রবৃত্ত হয়ে যিনি অতুলনীয় বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং শত্রুহস্তে অবমানিতা হওয়া অপেক্ষা স্বহস্তে মৃত্যুবরণ করাকেই শ্রেয়ঃ বলে মনে করেছিলেন।

পরিত্যক্ত প্রাসাদের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ পরিক্রমা করে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে পাহাড়ের উপর থেকে বহু নিম্নে সবুজ শস্যক্ষেত্রশোভিত উর্ব্বর উপত্যকাভূমির যে বিরাট দৃশ্য নজরে পড়ে, বাস্তবিকই তা অপূর্ব্ব সুন্দর,নয়নানন্দকর। গোন্দ রাজাদের কাটানো প্রকাণ্ড দীর্ঘিকাগুলিকে দেখায় যেন সবুজ ফ্রেমে বাঁধা আয়নার মত—অজস্র কালো পাথরে খচিত বনভূমি চোখের সামনে উদ্ঘাটিত করে এক অভিনব দৃশ্যপট।

সন্ধ্যার পর হোটেলে ফিরে এসে শুনলাম যে, বিশিষ্ট লেখিকা শ্রীযুক্তা হেনা হালদার আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্তে এসেছিলেন। তিনি নেপিয়ার টাউনে তাঁর বাসভবনে যাবার জন্তে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেছেন।

পরদিন সকালবেলা মোটরে নর্ম্মদা প্রপাত আর জব্বলপুরের মর্ম্মর-শৈল দেখবার জন্তে ভেড়াঘাট রওনা হলাম। শ্রীনিবাস রাও তেলাং বলে এক মরাঠী ভদ্রলোক আমার সহযাত্রী হলেন। ভেড়াঘাটে নেমে প্রথমে আমরা স্থানীয় একটি লোককে সঙ্গে নিয়ে নর্ম্মদা প্রপাত দেখতে রওনা হলাম। অধিত্যকার উপর দিয়ে পায়ে চলার পথ। এই শীতকালের সকালে এক পালা অকালবর্ষণ হয়ে গেছে, মালভূমির ভিজে মাটির সোদা গন্ধ স্নিগ্ধ বাতাসে চতুষ্পার্শ্বে বিকীর্ণ হচ্ছে—আকাশ মেঘে মেদুর বুকে যেন ঘনিয়ে আসে কত যুগযুগান্তর পূর্ব্বেকার বেদনার ছায়া—মালভূমির আর্দ্র মৃত্তিকার সৌগন্ধ্য যেন কোন্ জন্মান্তরের স্মৃতির সৌরভ বয়ে নিয়ে আসে, মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে মেঘদূতের অমর শ্লোক :

"সদ্যঃ সীরোৎকর্ষণসুরভি ক্ষেত্রমারুহ্য মালং
কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্ ব্রজলঘুগতিভূ র্য় এবোত্তরেণ ॥"

জলপ্রপাত দেখে নিবিড় জঙ্গলের ভেতর দিয়ে অনেকখানি পথ অতিক্রম করে চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরে এসে পৌছলাম। সুন্দর একটি মন্দিরাভ্যন্তরে হর-পার্ব্বতীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, মন্দির-প্রাঙ্গণকে বৃত্তাকারে বেষ্টন করে আছে সুদৃঢ় প্রাচীর—তার প্রতিটি খোপে একটি করে চৌষট্টি যোগিনীর মূর্ত্তি। যোগিনীমূর্ত্তি শুনে আমি ভেবেছিলাম, এগুলি বুঝি বিকট আকৃতির, আমাদের সার্ব্বজনীন কালীপূজার ডাকিনী-যোগিনীর ভগিনীই ত এরা। কিন্তু মূর্ত্তিগুলি দেখে আমার সে ভ্রান্ত ধারণা দূর হ'ল। এগুলি মূর্ত্তিশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে গণ্য হবার যোগ্য—যাঁরা মর্ম্মরশৈল দেখতে যান তাঁরা চৌষট্টি যোগিনীকে দেখে আসতে ভুলবেন না। অনুপম লাবণ্যমণ্ডিত মূর্ত্তি সব, অবশ্য অভগ্ন অটুট মূর্ত্তি একটিও নেই। এগুলির এই পরিণতির জন্ত দায়ী নাকি সম্রাট আওরঙ্গজেব—রূপসৃষ্টির উপর ধর্ম্মান্ধতার কুঠারাঘাত যে কত বড় গুরুতর ক্ষতিসাধন করতে পারে, এই মূর্ত্তিগুলিতে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে প্রকৃত ধার্ম্মিক এবং সৌন্দর্য্যানুরাগী মাত্রেই হৃদয়ে গভীর বেদনা অনুভব করবেন।

আনন্দ-বেদনা মিশ্রিত অনুভূতি নিয়ে ফিরে এলাম ভেড়াঘাটে পাণ্ডার আস্তানায়। পাণ্ডা যুবকটির নাম রামপ্রসাদ, বয়স বাইশ তেইশের কাছাকাছি, সদাহাস্যময়, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা—ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী তিনটি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে, আরও নানা ভাষা জানে। হায়, "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হরিনাথ ডোবে কত পাথারে।"

দেবতার প্রসাদ পেয়ে রামপ্রসাদসহ বোট আপিসে গিয়ে নৌকা ভাড়া করা গেল—বেলা এগারটা পঞ্চাশ মিনিটের সময় নৌকা ভাসল নর্ম্মদার নীল সলিলে। সৌভাগ্যক্রমে মেঘ তখন কেটে গেছে, ক্ষান্তবর্ষণ আকাশের নীলিমায় অপরূপ স্নিগ্ধতা। নর্ম্মদার জল কি গভীর নীল—স্বর্গ থেকে নীল আকাশের খানিকটা যেন মর্ত্ত্যলোকে খসে পড়ে তরলায়িত হয়ে গেছে। নদীর তরল নীলিমার উপর দিয়ে নৌকা চলে ধীরে ধীরে, তালে তালে দাঁড়ের শব্দ হয় ঝুপ ঝুপ। দুধারে প্রথমে দেখা দেয় যে মর্ম্মর-শৈলের সারি—তা সাদা নয়, ধূসর রঙের। রামপ্রসাদ চিনিয়ে দেয়—কোন্‌টা নীলমর্ম্মর, কোনটা গোলাপী, কোনটা শ্লেট পাথর—কোথায় ছিল দুর্গাবতীর মহল, কোথায় বাদল মহল। নৌকা এগিয়ে চলে দক্ষিণ দিকে—মুগ্ধ হয়ে দেখি, গজদন্তের মত শুভ্র মর্ম্মর-শৈলচূড়ায় কপোত-কপোতী পরস্পরে গাত্রসংলগ্ন হয়ে বিশ্রামসুখে মগ্ন, শুভ্র মর্ম্মরের ছায়া প্রতিফলিত হয়েছে নর্ম্মদার নীল নীরে—কোথাও নদীগর্ভে এক একটি গণ্ডশৈল। কোথাও বা শুভ্র মর্ম্মর-প্রস্তরে প্রকৃতির নিপুণ হস্তের বিচিত্র কারুকার্য্য—সর্ব্বত্রই চাঁদের কলঙ্ক-রেখার মত জলধারাঘর্ষিত মর্ম্মরে কৃষ্ণ বিদারণ-রেখা আর মর্ম্মরগাত্রে ছোট ছোট ছিদ্র। এখানে সবকিছু নির্ম্মল, সবকিছু পবিত্র, মর্ত্ত্যের কোন মলিনতা এখানে নেই। স্বর্গনদী অলকনন্দার বুকের উপর দিয়ে আমরা কি চলেছি সুরলোকের উদ্দেশে! হঠাৎ সুমুখের পানে তাকাতে নজরে পড়ল অপূর্ব্ব রূপময় একটি মর্ম্মরশৈলচূড়া—তার অভ্রভেদী উচ্চতা ও দুগ্ধনিভ শুভ্রতা দৃষ্টিকে বিমুগ্ধ এবং চিত্তকে বিস্ময়ে অভিভূত করে দিলে। সুমুখে পাহাড়ের পাঁচিলে নদীর গতিপথ অবরুদ্ধ, এবার নৌকা ফেরাতে হয়—স্বপ্ন যায় ভেঙে। নৌকা এসে ভিড়ে ভেড়াঘাটের নদীর ঘাটে।

সূর্য্যাস্তের প্রাক্কালে জব্বলপুরের বাসে উঠবার আগে উচ্চভূমিতে অবস্থিত আপার রেষ্ট হাউসের পিছন দিককার বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। বহুনিম্নস্থ নর্ম্মদার ওপারে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত মর্ম্মর-শৈলের পিছনে ছেদহীন নিবিড়শ্যাম বনভূমি ক্রমোচ্চভাবে উঠে গিয়ে আকাশ স্পর্শ করেছে, ধরণীর সকল সরসতা এবং শ্যামলতা পুঞ্জীভূত যেন এই অধিত্যকাভূমিতে। সূর্য্য ধীরে ধীরে বনশ্রেণীর ওপারে ডুবছে; অপরাহ্ণের রাঙা আলো ছড়িয়ে পড়েছে সবুজ বনানীর শিরে, মর্ম্মরশৈলের মসৃণ গাত্রে, নর্ম্মদার নির্ম্মল সলিলে—এক ফালি রোদ তেরছা হয়ে এসে পড়েছে এপারে মন্দিরচূড়ায়, আমার মুখে-চোখে নর্ম্মদার তীর্থদেবতার আশিসধারার মত।

"জব্বলপুরের বাস হাজির"—রামপ্রসাদ এসে খবর দেয়।

বিদায় মর্ম্মর-শৈলশোভিত নর্ম্মদার তটভূমি। তোমার সৌন্দর্য্য-লোকে এসে এবারকার মত আমার রূপতীর্থপরিক্রমার অবসান হ'ল। দু' কান ভরে শুনে গেলাম মহা ওঙ্কারধ্বনির মত যুগ-যুগান্ত ধরে উদ্গীত তোমার কল-গান, মানসপটে এঁকে নিয়ে গেলাম গোধূলির আলোয় মায়াময় তোমার অপরূপ রূপচ্ছবি, জীবনের তীর্থপরিক্রমণপথে রিক্ত পথিকের সে যে অমূল্য সঞ্চয়!*

---

* এই প্রবন্ধের কতকগুলি চিত্র শ্রীশোভন সোম ও শ্রীহেনা হালদারের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

গুরুদক্ষিণা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হেডমাষ্টার শিবচন্দ্রের প্রশ্নের ভয়ে সেদিন চন্দ্রভূষণ 'উকীল বা মোক্তার হব' একথা বলেন নি। যদি হেডমাষ্টার বক্তৃতা করতে বলেন? উকীলের ইংরিজী প্লীডার কথাটা জানা ছিল, কিন্তু মোক্তার কথাটার ইংরেজী তিনি জানতেন না। নবগ্রাম এম-ই ইস্কুলে কেউ কোন দিন বলে দেয় নি যে শব্দটা ফারসী ওর ইংরেজী হয় না। বলেছিলেন—আই শ্যাল বি এ টিচার, এ স্কুল মাষ্টার। কিন্তু মনে মনে উকীল বা মোক্তার হবার অকাজ্ক্ষা বিসর্জন দেন নি। সদর শহরে বড় বড় পাকা বাড়ীগুলির সামনে দাঁড়ালেই চোখে পড়ত ফটকের গায়ে বা মার্বেলের প্লেটে লেখা আছে কোন-না-কোন উকীলের নাম। ..বি-এল; এম-এ, বি-এল, প্লীডার জজকোর্ট। দু'চার জনের বাড়ীর সামনে ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকত। শহরে যেখানেই যা-কিছু হোক উকীলেরাই সামনে এসে আসর জাঁকিয়ে বসতেন। আদালতেও মধ্যে মধ্যে যেতেন চন্দ্রভূষণ। দেখতে যেতেন। চোগা, চাপকান শামলা, গার্ড চেন পরা উকীলেরা, কোর্টের প্রকাণ্ড লম্বা বারান্দা অতিবাহন করে এ কোর্ট থেকে অন্য কোর্টে যেতেন, পিছনে পিছনে মক্কেলের দল ছুটত, কেরানীরা ছুটত, তাঁদের পায়ের চকচকে চীনেবাড়ীর জুতোর মচমচ শব্দ উঠত, চন্দ্রভূষণ সম্ভ্রম এবং বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়ে থাকতেন। উকীলদের শুধু একটা জিনিস তাঁর ভাল লাগত না। যাঁরাই বড় উকীল, ভাল উকীল তাঁরাই প্রায় সকলেই বড় মোটা। মস্ত ভুঁড়ি। দু'একজন যে বেশ আঁটসাট-দেহ প্রবীণ ছিলেন না তা নয়, ছিলেন এবং দু'একজন অতি শীর্ণদেহও ছিলেন, তবু বড় উকীলত্ব এবং ভুঁড়িসমেত মোটাত্ব এ দুটোর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। তরুণ উকীলেরা ফিটফাট ছিলেন, কিন্তু দৃষ্টি তাঁর নিবদ্ধ ছিল বড় উকীলদের দিকে। ফৌজদারী বড় উকীল হরিহর মিশ্রের 'বহশ' শুনতে যেতেন মধ্যে মধ্যে। অনর্গল ইংরেজীতে বক্তৃতা করে যেতেন, কখনও গলা চড়ত, কখনও নামত, কখনও আবেগে কাঁপত, শুনে ভয় হ'ত চন্দ্রভূষণের। মনের জোর কমে যেত।

হঠাৎ একদা বিচিত্র ঘটনায় চন্দ্রভূষণ গভীর আবেগের সঙ্গে সঙ্কল্প করলেন—না, তিনি উকীল হবেন না। উকীল না, মোক্তার না, ডাক্তার না, জজ-ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট না, এ সব কিছু হবেন না তিনি।

বিচিত্র একটি ছেলে এল ইস্কুলে। ১৮৯৪ সন। চন্দ্রভূষণ সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেছেন। ক্লাসে তিনি প্রথম তিন জনের একজন। সেবার ফার্ষ্ট হয়েছেন। একদিন ইস্কুলটা হয়ে উঠল 'মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল পতঙ্গের মত'। সারা ইস্কুলে একটা গুঞ্জন উঠল। ইস্কুলের আপিস-রুমের পাশের ঘরের ক্লাস থেকে মিনিটকয়েকের মধ্যে সকল ক্লাসে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল—'অদ্ভুত একটা নতুন ছেলে এসেছে। আশ্চর্য্য ছেলে! এমন সুন্দর ছেলে গোটা ইস্কুলে নেই। সোনার মত গায়ের রং। আর ধারালো তলোয়ারের মত চেহারা।'

আবার কয়েক মিনিট পরে সংবাদ ছড়িয়ে গেল—'সেকেণ্ড ক্লাসে ভর্তি হচ্ছে। এখানকার নতুন এস-ডি-ও সাহেবের ছেলে।'

চন্দ্রভূষণদের ক্লাস-রুমের সামনেই বারান্দা, সেখানে সত্যই

এস-ডি-ওর তকমা-পরা আরদালী দাঁড়িয়ে ছিল। আধ ঘণ্টা পরেই স্বয়ং হেডমাষ্টার শিববাবু ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে ক্লাসে ঢুকলেন। ছিপছিপে লম্বা ছেলেটির গায়ের রং সোনার মতই বটে। মাথায় রুখু বড় চুল, অবিন্যস্ত এবং ঈষৎ পিঙ্গল। চোখে সোনার চশমা। দৃষ্টিতে প্রসন্ন দীপ্তি। পরনের কাপড় জামা ধবধবে সাদা। খালি পা। বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল সহপাঠীদের দিকে। ঠোঁট দুটির মিলন রেখায় হাসির আভাস।

শিববাবু বললেন—দিস ইজ ইওর ক্লাস। তার পর বললেন—বয়েজ, হি ইজ মাষ্টার সুপ্রকাশ বোস, ইয়োর নিউ ক্লাস ফেলো।

ছেলেরা অবাক হয়ে গিয়েছিল, এমন ভাবে ত শিববাবু কোন দিন কোন ছাত্রকে ক্লাসে নিজে নিয়ে আসেন নি। জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, এস-পি, এস-ডি-ও এঁদের ত কোনদিন তিনি অতি মর্য্যাদা দেন নি—আজ এস-ডি-ওর ছেলে বলে— ?

বিবরণ বললেন হেডপণ্ডিত দেবানন্দ কাব্যতীর্থ ; বললেন—ছেলেটা বোধ হয় শাপভ্রষ্ট। হেডমাষ্টারকে কি উত্তর দিয়েছে জানিস ?

হেডমাষ্টার বললেন—তুমি বড় হয়ে কি হবে বল ? কি হতে চাও ?

ছেলেটি বললে—বাবা মা বলেন আমাকে ইংলণ্ড পাঠাবেন, আই-সি-এস হব আমি। কিন্তু—

—কিন্তু কি বল ? আই-সি-এস হওয়া অবশ্যই খুব বড় কথা। তুমি শেষ পর্য্যন্ত কমিশনার হতে পারবে। আমাদের বাঙালীর মধ্যে প্রথম কমিশনার—কে হয়েছিলেন জান ?

—ইয়েস স্যার। রমেশচন্দ্র ডাট, আই-সি-এস। এ গ্রেট বেঙ্গলী নভেলিষ্ট টু। অথর অব মাধবীকঙ্কণ, মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত, এণ্ড মেনি আদার বুকস। বাট— স্যার—

—ওয়েল, গো অন! শিববাবু উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন —বলে যাও।

ছেলেটি বলেছে—বাট স্যার—টু টেল এ লাই ইজ এ সিন। স্পেশালি ইন প্রেজেন্স অব গুরু এণ্ড ফাদার। আই মাষ্ট টেল দি ট্রুথ। আই মাইসেলফ—ডু নট লাইক ইট, আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট টু বি এন আই-সি-এস।

—দেন ? হোয়াট ইজ ইট, ইউ ওয়াণ্ট টু বি, স্পীক আউট।

—স্যার, আই ওয়াণ্ট টু বি এ মিশনারী।

—মিশনারী ? ওয়েল—এ কৃশ্চান—

—না স্যার। এ হিণ্ডু মিশনারী, এ সন্ন্যাসী। লাইক স্বোয়ামী বিবেকানন্দ—অব চিকাগো ফেম।

স্তব্ধ বিস্ময়ে শিবচন্দ্র সোম ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। এ উত্তর তিনি কোন ছেলের কাছে শোনেন নি।

দেবানন্দ কাব্যতীর্থ নিজে নবদ্বীপের লোক। শুধু সংস্কৃতে কাব্যতীর্থই ছিলেন না। এম-এ পাসও করেছিলেন। তিনি একদিন ক্লাসে এই নিয়ে সুপ্রকাশকে অনেক প্রশ্ন করেছিলেন। বলেছিলেন—তা হলে তোমার কাছে নাম খ্যাতি প্রতিষ্ঠাই বড় ?

সুপ্রকাশ বলেছিল—না স্যার।

—না কেন ? তা হলে তোমার মা-বাবা যখন চান তুমি জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট হও, কমিশনার হও—তুমি তা না হয়ে সন্ন্যাসী হবে কেন ?

সুপ্রকাশ বলেছিল—"যেনাহং নামৃতাস্যাম—কিমহং তেন কুর্য্যাম্ ?"

চমকে উঠেছিলেন পণ্ডিতমশায়। বলেছিলেন—এ শ্লোক তুমি কার কাছে শিখলে ?

—উপনিষদে পড়েছি স্যার। বাবার লাইব্রেরীতে ইংরেজী ট্র্যানশ্লেসন পড়েছিলাম। তার পর বাংলা অনুবাদ সমেত সংস্কৃত উপনিষদ যোগাড় করে পড়েছি আমি। এ শ্লোকটি আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছে।

সুপ্রকাশ তেল মাখত না, মাছ-মাংস খেত না, জুতো পায়ে দিত না। সারাটা ইস্কুলের মধ্যে তার বন্ধু ছিল না। কয়েক জন অনুগত প্রীতিভাজন ছিল মাত্র। এ ছাড়া সব ছেলেই আড়ালে তাকে ব্যঙ্গ করত, সামনে তাকে সম্ভ্রম দেখাত। উকীল-মোক্তারদের এক দল ফেলকরা ছেলে তাকে সামনেই ব্যঙ্গ করে বলত—'নদের নিমাই। মহাপ্রভু!' সুপ্রকাশ গ্রাহ্য করত না।

এই সুপ্রকাশের প্রভাবে সেকেণ্ড ক্লাস থেকে ফার্স্ট ক্লাসে উঠবার আগে চন্দ্রভূষণ হৃদয়ের আবেগে মনে মনে শপথ করেছিলেন,"উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, জজ ম্যাজিষ্ট্রেট কিছু হবেন না তিনি। তিনি সুপ্রকাশের পিছনে পিছনে চলবেন।"

সুপ্রকাশের কাছে তিনি ক্লাসে হেরে গিয়েছিলেন, সে হার তিনি প্রায় প্রথম দিনই মেনে নিয়েছিলেন বিনা ক্ষোভে বিনা ঈর্ষায়। তিনিই ক্লাসের এক দিকে প্রথম বেঞ্চে প্রথম স্থানটিতে বসতেন, ভর্ত্তি হওয়ার পরদিন সুপ্রকাশ ক্লাসে আসতেই চন্দ্রভূষণ নিজের সীট ছেড়ে দিয়ে সরে বসেছিলেন। জেলা ইস্কুলের দুটি বছর তাঁরা পাশাপাশিই বসতেন।

সুপ্রকাশ ফার্স্ট, তিনি সেকেণ্ড। পরীক্ষাতেও তাই হ'ত। কিন্তু ফার্স্ট এবং সেকেণ্ডের ফলে অনেক পার্থক্য। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় সুপ্রকাশ হয়েছিল সেকেণ্ড। চন্দ্রভূষণ মাত্র ডিষ্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়েছিলেন।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষার শেষ দিনে সুপ্রকাশ বলেছিল—ডোণ্ট ফরগেট দি ওথ ইউ হ্যাভ টেকেন। দি মিশন অব আওয়ার লাইফ।

চন্দ্রভূষণ কেঁদেছিলেন। সুপ্রকাশ প্রসন্ন হাসিমুখে তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিল।

সুপ্রকাশ ভর্তি হয়েছিল প্রেসিডেন্সি কলেজে। চন্দ্রভূষণ গিয়েছিলেন বহরমপুর। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ। প্রিন্সিপ্যাল জানকীভূষণ ভটচাজ মশায়। ও-জন শীল তখন সবে চলে গেছেন। জীবনের সে একটা যুগ। জগতের রূপ বদলানো, আকাশের রং বদলানো, জীবনের অনেক কিছু পালটে গেল। ছুটিতে দেশে এসে দেখলেন—দু'বৎসরে ঘরের স্বাদ বদলে গেছে—শুধু ঘরেরই নয় এবং শুধু স্বাদই নয়—গোটা অঞ্চলটার বর্ণগন্ধশব্দস্পর্শস্বাদ সব বদলে গেছে। চোখে পড়ল অন্ধকার, নাকে এসে ঢুকল দুর্গন্ধ। অর্দ্ধনগ্ন—নিরক্ষর—মূক—ভীরু মানুষের বেদনাময় রাজ্য যেন অকস্মাৎ চোখে পড়ল। যেন আবরণটা হঠাৎ সরে গেল এতকাল পরে। যেন এত কাল এখানে রাত্রির অন্ধকারে বাস করেছেন। এইবার সকাল হয়েছে। সকালের আলোয় দেখছেন রাত্রির অন্ধকারে অজ্ঞাতসারে আশ্রয় নিয়েছিলেন একটা পরিত্যক্ত ভাঙা ভগ্নপুরীতে; আশেপাশে যাদের অস্তিত্ব অনুভব করেছিলেন তারা জীবন্ত মানুষ নয়; কঙ্কাল। কঙ্কালের মেলা।

রামজয় তখন ব্যাকরণ শেষ করেছে, কাব্য পড়তে সুরু করেছে। সে পড়ত নবদ্বীপে। সে থাকলে তার সময়টা আনন্দে কাটত। রামজয় তখন সংস্কৃত কাব্যের স্বাদ পেয়েছে। কত বিচিত্র সরস শ্লোক যে সে আবৃত্তি করত। রামজয় থাকলে জিয়াউদ্দিনও এসে জুটত। ভাল তামাক সে যথারীতি নিয়ে আসত। কিন্তু চন্দ্রভূষণ তখন তামাক ছেড়েছেন। ছেড়েছিলেন জেলা ইস্কুলে পড়বার সময়েই; সুপ্রকাশের প্রভাবে। চন্দ্রভূষণ গল্প করত শহরের কলেজের, নূতন কালের আদর্শের। কলেজের অধ্যাপকদের। রামজয় না থাকলে একলাই বেড়াতেন, গ্রামের প্রান্তরে প্রান্তরে, বাগানে বাগানে, ঘুরে বেড়াতেন; নদীর ধারে বসে থাকতেন। অনেক কিছু ভাবতেন। খুঁজে বেড়াতেন কোথায় পড়ে আছে কোন্ ভাঙা প্রস্তর-বিগ্রহ। কোথায় লোকের মুখে ছড়িয়ে আছে কোন মহিমময় জনপ্রবাদ। লোকগাথা। কানের কাছে মনের মধ্যে গুঞ্জন করত—হোষ্টেলের বন্ধুদের আলাপ-আলোচনা জল্পনা-কল্পনার কথা। সেখানকার শেখা গান এখানে তিনি নির্ভয়ে গাইতেন।

কতকাল পরে, বল ভারত রে,
দুঃখসাগর সাঁতারি পার হবে।

অথবা—

এস সুদর্শন-ধারী মুরারি।

অথবা—

স্বদেশ স্বদেশ করিস তোরা এদেশ তোদের নয়।

গান আজ ভুলে গিয়েছেন। নইলে গাইতে একটু-আধটু পারতেন চন্দ্রভূষণ। বাজাতে বেশ পারতেন।

বাবা মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যের সময় ডেকে কাছে বসাতেন, বলতেন—আজ কি বলে, ঘোষ মশায়ের সঙ্গে দেখা হ'ল নবগ্রামে। তিনি বলছিলেন—জেলা কোর্টের চেয়ে সাবডিভিশন কোর্টে বসলেই ভাল হবে। ওখানে উকীল-টুকীল কম। তা আমি বললাম উকীলই যখন হবে—তখন জেলা কোর্ট ছেড়ে সাবডিবিশনে বসতে যাবে কেন? কি বলিস তুই?

চন্দ্রভূষণ চুপ করেই থাকতেন। উকীল তো তিনি হবেন না। না। কি হবেন তা তিনি ঠিক করতে পারেন নি—তবে উকীল নয়। সন্ন্যাসের সঙ্কল্প ম্রিয়মাণ হয়ে এসেছে। সুপ্রকাশ যোগসূত্র ছিন্ন করেছে। চিঠি দিয়েও আর উত্তর পাওয়া যায় না। জীবনে নতুন বন্ধুদের ছোঁয়াচ লেগেছে।

বাবা বলতেন—কি রে কথা বলিস না যে?

নত মুখেই চন্দ্রভূষণ বলতেন—ওসব কথা এখন থেকে ভেবে কি হবে বাবা। আগে পড়া শেষ হোক। পাস করি।

বাবার মুখে স্মিত হাসি ফুটে উঠত। বলতেন—তা বটে। এফ-এতে স্কলারশিপ, বি-এতে স্কলারশিপ পেলে এম-এ পড়বি বৈ কি। আর এম-এ বি-এল পাস করে আগে হাইকোর্টের চেষ্টা না করে কি কেউ জজকোর্ট—সাবডিবিসন কোর্টের কথা ভাবে?

চন্দ্রভূষণকে আবার চুপ করে থাকতে হ'ত। কি বলবেন বাপের এই উৎসাহের মুখে? কেমন করে বলবেন—উকীল হবার কল্পনা আমি মুছে ফেলেছি বাবা।

বাবা বলে যেতেন—তবে জেলাকোর্টেও বড় পশার হয়, বহরমপুরে বৈকুণ্ঠ সেনের মত ক'জন উকীল আছে হাইকোর্টে? মাঝে মাঝে যাস, সেন মশায়ের মামলা করা দেখিস। বুঝলি?

বৈকুণ্ঠ সেনকে চন্দ্রভূষণ দেখেছেন, কিন্তু তাঁর ওকালতি

তিনি কোনদিন দেখেন নি। তাঁর বাবা বৈকুণ্ঠ সেনের ওকালতির গল্প করতেন। এখানকার রেশমকুঠির প্রেষ্টন সাহেবকে সাক্ষীর ডকে দাঁড় করিয়ে কি নাজেহাল করেছিলেন, কি ধমক দিয়েছিলেন—সেই সব বহুবার শোনা গল্প। বাবা বলতেন—তুই হাইকোর্টেই বসিস—কি অন্য কোনখানেই বসিস, এখানকার এ বেটাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা হলে বিনা পয়সায় তুই আসবি। আমার কাছে ওদের শয়তানির অকাট্য প্রমাণ আছে। আমি সব দোষ বার করে। তুই জেরা করে সেই সব কুকাজ ফাঁস করে দিবি। ব্যস, এই হলেই আমার হ'ল। আর কিছু চাই না আমি। তাঁর টেরা চোখ দুটি তীক্ষ্ণ হয়ে অদ্ভুত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠত। বাঁকা ছুরির মত।

মৃত্যুকালে চন্দ্রভূষণ কাছে ছিলেন না। হঠাৎ মারা গিয়েছিলেন তিনি। চন্দ্রভূষণ ছিলেন নবগ্রামে। এফ-এ পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী আসার পরই নবগ্রাম এম-ই ইস্কুলের হেডমাষ্টার, তাঁর মাষ্টারমশাই তাঁকে ডেকে বলেছিলেন—

—চন্দ্র, এ ক'মাস ত তুমি বাড়ীতেই থাকবে, তা কয়েক মাস আমার কাজটা চালিয়ে দাও। আমার শরীরটাও খারাপ, মেয়েটার বিয়েও না দিলে নয়। মাসকয়েক ছুটি পেলে আমি বাঁচি। কিন্তু এত বেশীদিনের জন্য ত কেউ একটিনি চালাবে না বাবা। ম্যানেজিং কমিটিও তাই বলেছে; লোক দেখে দিয়ে গেলে—তাঁদের আপত্তি নাই। মাইনেটা অবশ্যি আমি যা পাই তার চেয়ে কম দেবেন। তুমি ত বসেই থাকবে—যা হয় ক'মাস কিছু উপার্জ্জন করে নাও। কি বল? ইস্কুলের এখন দুঃসময়, বাবুরা মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছেন, গ্রাম-শত্রুতার কথা ত শুনেছ। অনেক দরখাস্ত হচ্ছে ইস্কুলের বিরুদ্ধে। সব মাসে মাষ্টাররা সময়ে মাইনে পান না। নতুন লোক এলে সে ত খাতির করবে না। তুমি পুরনো ছাত্র। ইস্কুলে ফ্রি ছিলে। তুমি থাকলে নিশ্চিন্ত হই আমি।

তখন নবগ্রামে এই চৈতন্য-এইচ-ই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা—চৈতন্যবাবুর নূতন অভ্যুদয় হচ্ছে। সামান্য অবস্থা থেকে ব্যবসার রাজপথ ধরে লক্ষ্মীর রথ এসে তাঁর ঘরের আঙিনায় থেমেছে। এম-ই ইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সুবর্ণবাবু তাঁর জ্ঞাতি। তাঁর সঙ্গে লেগেছে প্রতিষ্ঠাতার দ্বন্দ্ব। তুচ্ছ খুঁটিনাটি নিয়ে মামলা, মামলা আর মামলা। মামলার খরচ চালাতে মধ্যে মধ্যে ইস্কুল ফণ্ডের টাকায় হাত পড়ে। সে খবর সরকারী শিক্ষা বিভাগে উড়ো চিঠির মারফতে পৌঁছুচ্ছে কিন্তু ইস্কুলের মাষ্টারদের সহযোগিতায়, করুণার তদন্তের বিপদগুলি পার হয়ে যাচ্ছে। মাইনে বাকী থাকা সত্ত্বেও মাষ্টারেরা তাঁদের মাইনে পাওয়ার খাতায় যথারীতি স্বাক্ষর করে দিয়ে, হিসাব-নিকাশ তহবিল মিল করে রাখছেন।

চন্দ্রভূষণ 'না' বলেন নি। উৎসাহের সঙ্গে রাজী হয়েছিলেন। ভারী ভাল লেগেছিল। ছাত্রজীবনেই এমন অযাচিত ভাবে চাকরি পাওয়া এবং যেমন-তেমন চাকরি নয় হেডমাষ্টারির একটিনি, এবং যে ইস্কুলের ছাত্র ছিলেন সেই ইস্কুলের হেডমাষ্টারি—এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি হতে পারে! জেলা ইস্কুলের বোর্ডিঙে কলেজ হোষ্টেলের ঘরে শুয়ে কতদিন রাত্রে আজও স্বপ্ন দেখেন; নবগ্রাম এম-ই ইস্কুলের হেডমাষ্টার পড়া ধরছেন, তিনি বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছেন, উত্তর দিতে পারছেন না। নবগ্রাম ইস্কুলে এখনও তিন জন সে আমলের শিক্ষক রয়েছেন। তাঁদের উপরে হবে তাঁর স্থান। তিনি একটা বিচিত্র গৌরবের আস্বাদ পেয়েছিলেন, এবং রাজী হয়ে গিয়েছিলেন। নবগ্রামেই থাকতেন, ইস্কুলের বাবুদের বাড়ীতেই একখানা ঘর পেয়েছিলেন, সেখানেই খেতেন, বাবুর ছেলেটিকে প্রাইভেট পড়াতেন; শনিবার হাফ ইস্কুলের পর গামছায় একখানা কাপড় বেঁধে নিয়ে বাড়ী চলে যেতেন। রবিবার বাড়ীতে থেকে সোমবার ভোরবেলা রওনা হয়ে নবগ্রামে ফিরতেন। মাইল পাঁচেক পথ, নতুন বয়স তখন, দীর্ঘকায় মানুষ—সোয়া ঘণ্টার বেশী লাগত না। এরই মধ্যে বাবা একদিন, সেদিন মঙ্গলবার—ভোরবেলা হঠাৎ মারা গেলেন। শেষকালটায় তিনি তাঁকে খুঁজেছিলেন। বাড়ীতে যে বৈষ্ণবের মেয়েটি কাজকর্ম্ম, সেবা-শুশ্রূষা করত, সে তাঁর হাতে বাক্স-পেঁটরার চাবি তুলে দিয়ে কেঁদে বলেছিল—দেখে-শুনে নাও বাবা।

বাক্সের মধ্যে ছিল কিছু টাকা। আড়াই শো। কিছু বন্ধকী গহনা। আর সযত্নে কাপড় দিয়ে বাঁধা একতাড়া কাগজ। জমির দলিল, কিছু দাখিলা, আর ওই কুঠিয়াল সাহেবদের কীর্ত্তিকলাপের কাগজপত্র। অনেক কাগজ।

এফ-এ পরীক্ষাতেও স্কলারশিপ পেলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য সুপ্রকাশের নাম পেলেন না। কি হ'ল? সুপ্রকাশ নাই? বেঁচে নাই? সংসারে নাই? চলে গেছে সন্ন্যাসী হয়ে? অসংখ্য প্রশ্ন মনের মধ্যে উদ্যত হয়ে উঠল। জীবন তখন সুতোকাটা ঘুড়ির মত। বহরমপুর কলেজ থেকে প্রিন্সিপালের সই-করা আহ্বানপত্র পেয়েও বহরমপুর যেতে মন সরল না। কলকাতায় এলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ—আঠারো শো নিরানব্বই সাল। কলকাতা তখন অধিবাসের আসনে বিবাহের কন্যার মত বসেছে। দিকে দিকে নিত্য নব আয়োজন। পশ্চিমের বিজ্ঞান হোমশালা থেকে থরে থরে সাজানো চক্র আসছে। ঘোড়ার ট্রাম উঠে যাচ্ছে। ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম হবে। ইলেক্‌ট্রিক আলো আসছে। গঙ্গার বন্দরে সারি সারি

হাজ, সেখান থেকে নামছে কত আয়োজন, কত উপচার! নরীদের জেনারেল এসেম্বলী ইনষ্টিটিউশনে ভর্ত্তি হয়ে, নি গেলেন সুপ্রকাশের সন্ধানে। কি হ'ল সুপ্রকাশের? সারাটা দিন প্রেসিডেন্সি কলেজের ফটকের সামনে ড়িয়েছিলেন, যদি সুপ্রকাশের সঙ্গে দেখা হয়। প্রেসিডেন্সি লেজের গেটে তখন ঝকঝকে বার্নিশ করা বাড়ীর গাড়ীর রি লেগে যায়—সুবেশ সুদর্শন ছেলের দল। বহরমপুরের ছরের পরিমার্জ্জনায় চন্দ্রভূষণ তাঁদের কাছে শামাদানের লোর কাছে মাটির প্রদীপের মত নিষ্প্রভ। কেউ তাঁর কে ফিরে তাকায় নি। ছেলেদের মধ্যে সুপ্রকাশকে খুঁজে য় নি। সমস্ত অন্তরটায় সে যে কি বেদনার আলোড়ন— যে সে উদ্বেগ—সে যে কি নিদারুণ উৎকণ্ঠা সে তিনি অনুভবে জানেন, ভাষায় সেদিনও প্রকাশ করতে রতেন না, আজও পারেন না। কাঁদবার জন্য একটা মনীয় আবেগ তাঁর বুকের মধ্যে আছড়ে পড়ছিল।

বেলা তখন দুপুর, একটার তোপ পড়ার কিছুক্ষণ পর টি ছেলেকে অনেক সাহস করে ডেকে বলেছিলেন— ন একটু।

ছেলেটির সর্ব্বাঙ্গে শহরের পরিমার্জ্জনা, কিন্তু বেশভূষার প্ত ঝাড়ের আলোর বেলোয়াড়ী কলমের মত অসহনীয়। চোখ ধাঁধিয়ে যায় না।

সে বলেছিল—আমাকে বলছেন?

—হ্যাঁ।

—বলুন।

একটি ছেলের খবর বলতে পারেন? প্রেসিডেন্সি কলেজে ত। এবার এফ-এ দেবার কথা। এন্ট্রান্সে সেকেণ্ড হয়ে- । খুব সুন্দর দেখতে। খুব ব্রিলিয়াণ্ট।

—সুপ্রকাশ বোস?

—হ্যাঁ। তার নাম ত এবার পেলাম না—গেজেটে।

—? সে কি পরীক্ষা দেয় নি?

—সে ত বিলেত চলে গেছে। পরীক্ষা দেবার আগেই, াস আগে চলে গেছে।

—বিলেত চলে গেছে?

—হাঁ। তাকে জানতেন আপনি?

—জানতাম। আমরা একসঙ্গে এন্ট্রান্স দিয়েছিলাম। ই ইস্কুল থেকে। সে প্রেসিডেন্সিতে পড়তে এল, মি গেলাম বহরমপুর। আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। মাস আষ্টেক কোন খবর পাই নি। চিঠি দিলেও উত্তর নি।

একটু চুপ করে থেকে তিনি বলেছিলেন, এই জন্যে তা ! কিন্তু বিলেত গেল সে—?

হেসে ছেলেটি বলেছিল—আপনি তার সেই সন্ন্যাসী হওয়ার কথা ভাবছেন ত? এখানে এসে প্রথম প্রথম এই সব সে বলত। হোষ্টেলের ঘরে ধ্যানট্যান করত। কথাটা কানে উঠল সায়েব প্রিন্সিপালের। সায়েব ওকে ডেকে ওর সঙ্গে আলাপ করলেন। নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। প্রায়ই মধ্যে মধ্যে সে যেত। তার পর ওর সব পাল্টাতে লাগল। তার পর হঠাৎ একদিন বাবার কাছে গেল, সেখান থেকে ফিরে এসে বিলেত চলে গেল। সেখানে গ্রাজুয়েট হয়ে আই-সি-এস পরীক্ষা দেবে। কেউ কেউ বলে— প্রিন্সিপালের পনের-ষোল বছরের ফ্রকপরা মেয়ের প্রেমে পড়েছিল সে। আই-সি-এস হয়ে সায়েবের মেয়েকে বিয়ে করব প্রতিজ্ঞা করে নাকি সে বিলেত গিয়েছে।

চন্দ্রভূষণ কাঁদতে পারলে সুখ পেতেন, কিন্তু অপরিচিত ওই ছেলেটির সামনে কাঁদতে পারেন নি। সুপ্রকাশ, তাঁর আদর্শ সুপ্রকাশ শুধু ত নিজের আদর্শকে জাহাজ-ঘাটে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে চলে যায় নি, তার সঙ্গে চন্দ্রভূষণেরও সব ভাসিয়ে দিয়ে গেল। সেই সুপ্রকাশ, এই করলে শেষ পর্য্যন্ত। তিনি ঘুরতে ঘুরতে এসে গোলদীঘির মধ্যে ঢুকে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্ট্যাচুর নীচে যেন তাঁরই পা দুটি ধরে বসেছিলেন। কিছুক্ষণ পর উঠে গিয়ে বসেছিলেন একটা বেঞ্চের উপর। গোলদীঘির সামনে ট্রামের একটা ঘোড়া সেদিন মুখ থুবড়ে পড়েছিল। সবল সুস্থ শক্তিমান জানোয়ার! ওঃ! সে দৃশ্য সমস্ত জীবনে তিনি ভুলতে পারবেন না। ওঃ!

তিনিও যেন পড়েছিলেন। না। ঘোড়াটা মরে গিয়েছিল। তাঁর অবস্থা আরও করুণ। জীবনটা হয়ে গিয়েছিল যেন নোঙরছেঁড়া নৌকোর মত। তিনি বাসা নিয়েছিলেন একটা মেসে। তাঁদের মেসের চাকুরে বাবুদের মেস ও বৃত্তি পাওয়া ভাল ছেলে, গরীবের ছেলে; বাবুরা স্নেহের সঙ্গেই তাঁকে স্থান দিয়েছিলেন। দোতলার সিঁড়ির ঘরের পাশে ছোট্ট একখানি ঘরের মত ছিল; আগেকার কালে বোধ করি কাঠ ঘুঁটে থাকত। কয়লার পর কাঠ উঠেছে; ঘরটা আধখালি পড়েছিল, সেইটেই দিয়েছিলেন তাঁরা। নিরিবিলি পড়াশুনা করবে। নিরিবিলি অসাড় হয়ে পড়ে থাকবার সুবিধা নেই। বাবা ছিলেন না; উকীল হতে হবে এ তাগাদা কেউ দিত না। সুপ্রকাশ সন্ন্যাসের আদর্শ ভাসিয়ে চলে গেছে। জীবনের তাগিদই হারিয়ে গেল। মধ্যে মধ্যে চমকে উঠতেন, একটা চেতনা আসত, উঠে বসতেন। মনে জেগে জেগে উঠত, সুপ্রকাশের ভাসিয়ে দেওয়া আদর্শ তিনি তুলে নিয়ে আসবেন গঙ্গায় ডুব দিয়ে। রামকৃষ্ণ মিশন তখন স্থাপিত হয়েছে। বেলুড়ে আশ্রম পত্তন হয়েছে।

বাগবাজারে মিস মার্গারেট নোবল—সিস্টার নিবেদিতা এসেছেন। ওঁদের আশ্রমে গিয়ে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের সঙ্কল্প সার্থক করবেন। মধ্যে মধ্যে যেতেন ওখানে। আবার কয়েক দিন পর কেমন যেন সব শিথিল হয়ে যেত। হতাশায় এলিয়ে পড়তেন। মেসের ঘরে কলেজ কামাই করে শুয়ে ঘুমোতেন। মেসের বাবুদের নিমন্ত্রণে দু'একবার থিয়েটার দেখে মনটাকে সতেজ করে নেবার চেষ্টা করেছেন। কি প্রচণ্ড নেশা থিয়েটারের, কি দুর্নিবার আকর্ষণ! সে যেন স্বর্গলোকের মায়াপুরী। সেই সব অপরূপ সাজসজ্জায়—রঙে প্রসাধনে সুরঞ্জনার দল, সেই লাস্য, সেই কটাক্ষ, সেই হাসি —চোখ বুজলেই মনশ্চক্ষে ভেসে উঠত। সেই গান—সেই ঐকতান চোখে তন্দ্রা এলেই কানের পাশে বাজতে থাকত। এতেও ভয় পেয়েছিলেন তিনি। তিনি ভীরু, তিনি দুর্ব্বল —সে তিনি স্বীকার করেন। তিনি জানেন। তিনি সভয়ে সরে এসেছিলেন। বারতিনেক থিয়েটার দেখার পর আর যান নি। শেষবারের ঘটনা জীবনে লজ্জার কথা হয়ে রয়েছে। কাউকে বলতে পারেন নি, রামজয়কেও না। থিয়েটারের নাচের দলের একটি মেয়েকে দেখে তিনি পাগল হয়ে গেলেন। বহুকষ্টে তার নাম-ঠিকানা যোগাড় করে কয়েকটা দিন ঘুরে বেড়ালেন—ওই পাড়াটার আশেপাশে বিভ্রান্তের মত। একদিন সাহস করে ঢুকলেন; গলি পথ, দু'ধারের বাড়ীর দরজায়, উপরের বারান্দায় দেহপসারিণীদের মেলা। কত জনের কত অশ্লীল ইঙ্গিত, আহ্বান। ছুটে বেরিয়ে এলেন তিনি গলির ভিতর থেকে। সেখান থেকে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে স্নান করে মেসে ফিরলেন। সেই শেষ। তার পর আবার কিছুদিন বেলুড় মঠ। আবার কিছুদিন পর আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন নৈরাশ্যে; ঘুমে। তামসিকতায়।

থার্ড ইয়ার থেকে ফোর্থ ইয়ারের পরীক্ষায় ফেল হয়ে গেলেন। প্রিন্সিপাল ডেকে তাকে তিরস্কার করে বললেন, এ কি? তুমি না এফ-এতে স্কলারশিপ পেয়েছিলে?

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিলেন চন্দ্রভূষণ। সামনে দুটো আলমারীর ফাঁকের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হয়েছিল অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর বাবা। নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন তাঁর দিকে।

প্রিন্সিপাল রেভারেণ্ড জন মরিসন চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে তাঁর পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন—ইউ আর উইপিং মাই বয়? না না, চক্ষের জল মুছিয়া ফেল। অনুতাপে তোমার সকল অপরাধের মার্জ্জনা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কেন? এমন হইল কেন? তোমার সকল পুস্তক আছে?

—আছে।

—তুমি মেসে থাক, সেখানে অধ্যয়ন করিবার সুযোগ পাও না?

—না ফাদার, সে সব অসুবিধা আমার কিছু নাই।

—দেন? হোহাই? হোয়াটস রং? তোমার শরীর?

—শরীরও আমার ভাল আছে ফাদার।

—দেন্? স্পীক আউট, টেল মি মাই বয়।

—আমার বাবা—। বলতে গিয়ে আবার কেঁদে ফেলেছিলেন চন্দ্রভূষণ। ফাদার এবার তাকে কোলের কাছে ডেকে বসিয়ে বলেছিলেন—তোমার বাবা তোমাকে পড়াইতে চান না? খরচ দেন না?

—না ফাদার। তিনি নেই, তিনি মারা গিয়েছেন। সংসারে আমার আর কেউ নেই।

অকৃত্রিম সহানুভূতিতে ফাদার বারবার ঘাড় নেড়ে তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে বলেছিলেন—আই এম সরি, ভেরি সরি মাই বয়। ইউ হ্যাভ লস্ট ইয়োর ফাদার, মে হিজ সোল রেষ্ট ইন পীস! কিন্তু তাঁহার জন্য শুধু কাঁদিলে হইবে না— মাই বয়। তোমাকে বাঁচিতে হইবে, বড় হইতে হইবে। তোমার পিতা নিশ্চয়ই তোমাকে একজন সুশিক্ষিত বড়মানুষ দেখিতে চাহিয়াছিলেন। তুমি এণ্ট্রান্সে স্কলারশিপ পাইয়াছিলে—এফ-এতে পাইয়াছ, নিশ্চয় তিনি অনেক আশা করিয়াছিলেন। তাঁহার সে আশা তোমাকে পুর্ণ করিতে হইবে।

দীর্ঘদিন পর এমন স্নেহের স্পর্শ পেয়ে চন্দ্রভূষণ এক দিকে অজস্র ধারে কেঁদেছিলেন, অন্য দিকে অকপটে সকল কথাই তাঁর কাছে প্রকাশ করে বলেছিলেন—সুপ্রকাশের কথা, সন্ন্যাসের কথা, বর্ত্তমানের ভাঙাহাল ছেঁড়াপাল নৌকোর মত তাঁর নিজের অবস্থার কথা।

জিভ এবং তালুর ডগায় চুক চুক শব্দ করে মর্ম্মান্তিক আক্ষেপ প্রকাশ করে ফাদার বলেছিলেন—নো নো মাই বয়, হ্যাটস নট দি ওয়ে, হ্যাটস নট দি ওয়ে। এ পৃথিবীতে অনেক কর্ম্ম, অনেক অনেক। সন্ন্যাসী হইয়া যাঁহারা দেশের সেবা করিতেছেন—তাঁহারা মহাপ্রাণ, গ্রেট সোলস্। হ্যাট গ্রেট মঙ্ক স্বোয়ামী বিবেকানণ্ড—আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি। তাঁহার অনেক শক্তি। কিন্তু সকলেই বিবেকানণ্ড হইলে চলিবে না। পারিবেও না। এ পথ তোমার আছে না। তোমার দেশের অনেক কর্ম্ম আছে। দেশের দিকে তাকাইয়া দেখ। অন্ধকার, চতুর্দ্দিকে অন্ধকার। ডার্কনেস এভরিহোয়ার, ডার্কনেস এট হুন, ডার্কনেস অব ইগনোরেন্স, ইললিটারেসি

সুপারিষ্টিশন! তোমার দেশে এখন কত বড় লোক কত চেষ্টা করিতেছেন। লুক এট দেম! আলো জ্বালাইয়া ডাক দিতেছেন।

চন্দ্রভূষণ অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে শুনছিলেন, দুটি চোখের কোল থেকে গড়িয়ে পড়া জলের ধারা আপনি শুকিয়ে এসেছিল। ফাদার বলে চলেছিলেন—বড় বড় শিক্ষাব্রতীদের নাম। দেশসেবাব্রতীদের নাম।

—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুমি দেখিয়াছ? আনন্দমোহন বসু? গুরুদাস ব্যানার্জী? ফিলসফার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল? তুমি বহরমপুর হইতে আসিয়াছ, সেখানে তিনি আগে প্রিন্সিপাল ছিলেন? গিরিশচন্দ্র বসুকে দেখিয়াছ? বঙ্গবাসীর অধ্যক্ষ? সায়েন্টিস্ট প্রফুল্লচন্দ্র রায়—পি-সি-রায়কে দেখিয়াছ? সারাজীবন ইনিও বিবাহ করিলেন না, তোমার দেশের প্রাচীন বিদ্যাকে নূতন করিয়া আবিষ্কার করিয়া জগৎকে দেখাইতেছেন! তিনি কি সন্ন্যাসী অপেক্ষা কম? তোমাদের জে. সি. বোস এনাদার সায়েন্টিস্ট? জানকী ভট্টাচার্য্যের নিকট তুমি পড়িয়াছ। আশুতোষ মুখার্জ্জী, এ গ্রেট স্কলার, ইউনিভারসিটিজ রিপ্রেজেন্টেটিভ ইন দি গবর্ণরস কাউন্সিল। ইঁহাদের দিকে তাকাইয়া দেখ। ইঁহারা তোমাদের দেশের অন্ধকারের দুর্যোগ ঘুচাইবার জন্য জীবন পণ করিয়াছেন।

রেভারেণ্ড মরিসন সেদিন ভাবপ্রবণ হয়ে উঠেছিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলেন এর পর, তাকিয়েছিলেন খোলা জানালা দিয়ে আকাশের দিকে। কিছুক্ষণ পর আবার বলেছিলেন—আমাদের দেশের আকাশ এত নীল নয়, এমন নীল আকাশ—উজ্জ্বল নীল আকাশ আমরা দেখিতে পাই না। তোমাদের দেশের আকাশ আশ্চর্য্য নীল—এত বড় মনে হয়! কিন্তু বড় উত্তপ্ত দেশ। এই দেশে আমরা আসিয়াছি—নিপীড়িত মানুষকে সেবা করিতে। তোমরা সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে! এতো সহজে তোমরা পার। মধ্যে মধ্যে আমার বিস্ময় লাগে।

ফাদারের বয় এসে দাঁড়িয়েছিল এই সময়। ফাদার তাকে চা আনতে বলেছিলেন। বলেছিলেন—দুই জনের জন্য আনিবে। কিছু বিস্কিটস, দুই স্লাইস রুটি আনিবে।

তোমার নিশ্চয় ক্ষুধা পাইয়াছে। মুখ দেখিয়া বুঝিতেছি, তোমার ক্ষুধা পাইয়াছে। নাও, লুক হিয়ার মাই বয়; আমার কথা শুনিতে বলিব তোমাকে। আমি তোমার ভাল চাহিতেছি। তোমাকে আমি প্রমোশন দিব। বাট ইউ মাস্ট প্রমিস, ওই সকল কল্পনা তুমি করিবে না। নো। যত দিন পড়িবে তত দিন না। তোমার দেশ প্রাচীন দেশ। উইথ গ্রেট ট্র্যাডিশন! বাট এভরিথিং ইজ ফরগটন, দি হোল কান্ট্রি—সমগ্র দেশ অন্ধকারে মগ্ন হইয়া গিয়াছে। অন্ধকারের মধ্যে মানুষ আলো খুঁজিতেছে। লাইট, লাইট—মোর লাইট!

জীবনতরণী ঘুরল। জীবনকে তরণীর সঙ্গে উপমা দিয়ে বলতে হয়—ফাদারের স্নেহেই ছেঁড়া পাল, ভাঙা হাল—জোড়া লাগল। ঘূর্ণির টান থেকে সরে ঘাটের মুখে ফিরল। তখন আর একবার মনে হয়েছিল—উকীল হবেন তিনি। কত বিচিত্র কল্পনা করতেন। উকীল হবেন তিনি। সুপ্রকাশ আই-সি-এস হয়ে ফিরবে। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বা জজ হবে নিশ্চয়। কোন দিন দেখা হবেই। সুপ্রকাশ লজ্জা পাবার ছেলে নয়, লজ্জা সে পাবে না; মেমসাহেব বিয়ে করবার জন্য সে যখন সাহেব হবে তখন তার সাহেবিয়ানার উগ্রতার উত্তাপ বৈশাখের উত্তপ্ত বালির মত হবে। ইংরিজী ছাড়া কথা কইবে না, বাংলা সে ভুলে যাবে। তাঁকে চিনতেও সে পারবে না। তিনিও চিনবেন না। পরিচয় হবে কোর্টে। মামলার মধ্যে আইন নিয়ে, যুক্তি নিয়ে তর্ক উঠবে। তুলবার সুযোগ তিনিই দেবেন। অসহিষ্ণু করে তুলবেন। কটু মন্তব্য অবশ্যই সে করবে। অধিকতর কটু জবাব দেবেন তিনি। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মনের মধ্যে জেগে উঠত। উকীল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আইনের তর্ক করতে করতে বিরক্ত হয়ে একজন ইংরেজ জজ বলেছিল—'হাফ এডুকেটেড বার।'

গুরুদাস তৎক্ষণাৎ কথাটার পাদপূরণ করে জবাব দিয়েছিলেন—'এণ্ড কোয়ার্টার এডুকেটেড বেঞ্চ।'

তেমনি উত্তর দেবেন। ওই রেশমকুঠির সাহেবদের সঙ্গে দরিদ্র গ্রামবাসীর মামলা। রাত্রির পর রাত্রি কল্পনা করে একটি মনোমত কেস তিনি গড়ে তুলেছিলেন। রেশমকুঠির সাহেবরা অনেক দিন থেকে কুঠির সামনের রাস্তায় কালীপ্রতিমা বিসর্জ্জনের শোভাযাত্রা বন্ধ করে দিয়েছে। এর জন্য অনেক শাসন অনেক নির্যাতন করেছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত করে ফল হয় নি। মামলা করতে দরিদ্র দুর্ব্বল লোকগুলি সাহস পায় নি। নীরবে অপমানের বোঝা মাথায় করে নিজেদের অধিকার ছেড়ে দিয়ে সরে এসেছে। ওই—ওই নিয়ে মামলা হবে। তিনি বাধিয়ে তুলবেন। সুপ্রকাশ ম্যাজিষ্ট্রেট হলে ফৌজদারি, জজ হলে দেওয়ানি। তিনি বলবেন—'ইউরোপের এই উদ্ধত ব্যক্তিগুলি—এই সুপ্রাচীন দেশের মহাধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝতে পারে না। তারা কালীমূর্ত্তিকে বলে বর্ব্বরতার প্রতীক; নগ্ন নারীমূর্ত্তি হলে তাকে অশ্লীল বলেন। টু দেম পীপল অব দিস কান্ট্রি ইজ এ মাল্টিচুড অব পেগান্‌স্, ইন দি ডার্কনেস। ইয়োর অনার এ আমার

মনগড়া কথা নয় ; এ কথা হ'ল 'জন টমাসে'র। এই কথাই তিনি লিখে গেছেন। আজ ইউরোপ-আমেরিকায় ভারতের বাণী, ভারতধর্ম্মের তত্ত্ব প্রচার করে এসেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তারা উৎসুক হয়ে উঠছে ভারতকে জানবার জন্য। কিন্তু এখানে যারা সাম্রাজ্যের ঔদ্ধত্যে উত্তপ্ত তাঁরা এ-দিকে দৃকপাতহীন। এই জন টমাসই তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—কলকাতায় যখন তিনি প্রথম আসেন তখন একজনও ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে আবিষ্কার করতে পারেন নি। 'অন মাই এরাইভ্যাল এট ক্যালকাটা, আই সট ফর রিলিজিয়াস পীপ্‌ল—বাট ফাউণ্ড নান'। এরা তাদেরই সগোত্র। সব থেকে দুঃখের কথা, লজ্জার কথা—আমাদের দেশের এক দল লোক—কেউ প্রতিষ্ঠা-লোভে, কেউ-বা ইউ-রোপীয় সভ্যতার বিলাস-ঐশ্বর্য্যের লোভে, কেউ শ্বেতাঙ্গিনীর মোহে—এই সকল উদ্ধত, পরধর্ম্ম-অসহিষ্ণু, অনাচারীদের এই সব উক্তিকে সমর্থন করছেন উচ্চ কণ্ঠে! এ কথা আপনি আমার চেয়েও ভাল করে জানেন। ইয়োর অনার —মধ্যে মধ্যে অন্যমনস্ক ভাবে আয়নার দিকে তাকালে আমার মধ্য থেকেও তার ছায়া উঁকি মারে। আপনি নিশ্চয় আমার কথা সমর্থন করবেন!'

বিবর্ণ হয়ে যাবে সুপ্রকাশ!

হয়ত-বা উদ্ধত হয়ে তাঁকে তিরস্কার করবে।

তিনি তার কঠোর প্রত্যুত্তর দেবেন।

দিনকতক উৎসাহ অনুভব করতেন। জীবনে জোর পেতেন। আবার কিছুদিন পর স্তিমিত হয়ে যেতেন। বি-এ পরীক্ষা দিলেন। ভাল হ'ল না পরীক্ষা। বাড়ী ফিরে এলেন। বাড়ীতে একা। রামজয় সেবার বাড়ীতে ছিল না। সে ভাগবতের কথকতা করতে বেরিয়েছিল। একা জিয়াউদ্দিন তাঁর কাছে এগিয়ে আসত না। মধ্যে মধ্যে চন্দ্রভূষণ গেলে কৃতার্থ হ'ত। চন্দ্রভূষণ একলা ঘুরে বেড়াতেন—প্রান্তরে প্রান্তরে। অর্দ্ধনগ্ন দীন দরিদ্র লোক-গুলি তাঁকে দেখে পাশ কাটিয়ে সরে যেত। কথা বলত না। রাত্রিতে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতেন চন্দ্রভূষণ। রাত্রের আকাশে অসংখ্য তারা। কিন্তু গোটা দেশের জীবনের আকাশে তারাও নাই। সেখানে নীরন্ধ্র অন্ধকার।

হঠাৎ দেখা হ'ল অমরবাবুর সঙ্গে।

নবগ্রামের চৈতন্যবাবুর আত্মীয়, তাঁর শ্যালিকাপুত্র অমরবাবু। অমরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ। আশ্চর্য্য মানুষ। চৈতন্যবাবুর বাড়ীর সামনে রাস্তার ধারে প্রশস্ত বারান্দায় নবগ্রামের এক দল তরুণের মধ্যে বসে সুর করে কবিতা পড়ছিলেন। ইংরেজী নয় বাংলা কবিতা।

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শতকর্ম্মে রত
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে
দূরবনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্তবায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশী।

রাস্তা ধরে যেতে যেতে তিনি থমকে দাঁড়িয়েছিলেন।

ক্রমশঃ

জন্মদিনে

শ্রীকালিদাস রায়

ছাড়িয়া ঘাটের ঘাট উত্তরিব সত্তরে সত্বর
তোমার কৃপায় আজো আছি প্রভু অনন্যনির্ভর।
অর্জ্জিতেছি নিজ অন্ন দুই বেলা নিজ শ্রম-জলে,
পুত্র হোক, মিত্র হোক, ছাত্র হোক, কারো দ্বারতলে
দাঁড়াইনি ভিক্ষাপাত্র হস্তে ধরি। সেবার ভিখারী
হই নাই কারো কাছে ব্যাধিতের শয্যা অধিকারি'
জায়া হোক, কন্যা হোক, ভগ্নী হোক, কাহেও পীড়ন
করি নাই, কারো সেবা পরিচর্য্যা করিয়া গ্রহণ।
আজো করিতেছি সেবা সকলের করি ঘর্ম্মপাত ;
যষ্টি বিনা পথ চলি অবশ হয়নি আজো হাত।

ধরিতে লেখনী আজো পারে মোর বিশীর্ণ অঙ্গুলি,
প্রকাশের তরে যাহা করে বুকে আকুলি বিকুলি
তারে দিতে পারি রূপ ভালো মন্দ যাই হোক, প্রভু।
ভগ্নকণ্ঠ সুরহারা, তব নাম আজো গাই তবু।
হই নাই দৃষ্টিহারা, আজো তব সৃষ্টির ভুবন,
হেরিয়া জুড়াই মোর প্রাণমন জীবন নয়ন।
স্মরিয়া করুণা তব অভাজনে এই দীনহীনে,
প্রণমি সহস্র বার ভূমে লুটি আজি জন্মদিনে।

কালিদাসের গ্রন্থে ভৌগোলিক আলোচনা

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা

১

মহাকবি কালিদাসের প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে ভৌগোলিক জ্ঞান ছিল। তাঁহার মেঘদূত, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ কাব্য এবং অভিজ্ঞান শকুন্তল, বিক্রোমোর্ব্বশীয় ও মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক পাঠ করিলে প্রাচীন ভারতীয় ভূগোলের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধে তাঁহার গ্রন্থ হইতে ভৌগোলিক তথ্যসমূহের দিক্ নির্ণয় করিয়া আধুনিক গবেষণার সহিত সংগৃহীত ও বৈজ্ঞানিক নিয়মে আলোচিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের ভূগোল লইয়া যাঁহারা অনুসন্ধান করিতে চাহেন, তাঁহাদের নিকট এগুলি বিশেষ উপকারে আসিবে বলিয়া মনে হয়।

উত্তর ভারতবর্ষের জাতি, দেশ প্রভৃতি

প্রাচীন যুগে উত্তর ভারতবাসী কম্বোজগণ সম্ভবতঃ পশ্চিম হিমালয় অধিকার করিয়াছিল। ভৌগোলিক হিসাবে তাহারা উত্তরদিকের অধিবাসী ছিল। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীসূত্রে, পতঞ্জলির মহাভাষ্যে, এবং অশোকের শিলালিপিতে ইহাদের উল্লেখ আছে। ইহারা প্রাচীন বৈদিক যুগের একটি জাতি। সিন্ধু নদীর উত্তর-পশ্চিম দিকে ইহাদের বাস ছিল। ইহারা প্রাচীন পারসিক শিলালিপিতে উল্লিখিত কমবুজিয় নামে পরিচিত। স্মিথ সাহেবের মতে কম্বোজদেশ তিব্বত অথবা হিন্দুকুশের পর্ব্বতমালার মধ্যে অবস্থিত। আবার কেহ কেহ বলেন যে কম্বোজদেশ বর্ত্তমান সিন্ধু এবং গুজরাটের চতুষ্পার্শ্বে ছিল। কম্বোজেরা রঘু কর্ত্তৃক পরাজিত হয় (রঘুবংশ, ৪,৬৯-৭০)। রঘু কম্বোজদেশ হইতে উত্তম ঘোটক, রত্ন ও স্বর্ণ লাভ করেন (রঘুবংশ, ৪, ৭০)। কথিত আছে, রঘু হিমালয় পর্ব্বত শিখরে অধিরোহণ করিয়াছিলেন (রঘুবংশ, ৪, ৭১)।

শূরসেন রাজ্যের রাজধানী ছিল মথুরা (রঘুবংশ, ৬,৪৫-৫১)। মথুরা যমুনাতীরে অবস্থিত এবং ইহা যুক্তপ্রদেশের আগ্রা বিভাগের অন্তর্গত। কৌশাম্বির উত্তর-পশ্চিম দিকে ২১৭ মাইল দূরে মথুরার স্থান নির্ণয় করা হয়। মথুরা এবং পাটলিপুত্রের মধ্যে একটি নৌ-সেতু ছিল। মথুরার অপর নাম ছিল মধুপুরী (বর্ত্তমান মহোলি)। এই নগরটি বর্ত্তমান মথুরা হইতে ৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। গ্রীকগণ ইহার নাম দিয়াছিল মেথোরা এবং মদোরা। চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান ইহার নাম দেন মাতাউলো (Ma-t'aou-lo) অর্থাৎ ময়ূর নগর। হিউয়েন সাং ইহার নাম দেন ম-তু-লো (Mo (mei)-t'u-lo) জৈনেরা ইহাকে সৌরীপুর অথবা সূর্য্যপুর বলিত। বৈদিক সাহিত্যে মথুরার উল্লেখ নাই। এই নগরটি পাণিনি ও পতঞ্জলির নিকট পরিচিত ছিল। কালিদাসের মতে মধুপঘ্ন দেশটি মথুরার সন্নিকটে ছিল (রঘুবংশ, ১৫,১৫)।

কালিদাস তাঁহার রঘুবংশ কাব্যে (৬,৫০) হিন্দু তীর্থক্ষেত্র বৃন্দাবনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা যমুনাতীরে গোবর্দ্ধনের সন্নিকটে এবং মথুরার ছয় মাইল উত্তরে অবস্থিত। হরিবংশে বর্ণিত আছে যে যমুনাতীরস্থ রম্য বৃন্দাবন তৃণ, ফল ও কদম্ববৃক্ষে পরিপূর্ণ ছিল। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোপনারীগণের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। ভাগবত পুরাণেও ইহার উল্লেখ দেখা যায়।

উত্তর-কোশল রাজা রঘু এবং তাঁহার পরবর্ত্তীগণের রাজ্য ছিল। কবির মতে (রঘুবংশ ১৩,৬১; ১৪,২৯; ১৬,১১-২৯; ৫,৩১; ১৩,৭৯; ১৮,৩৬) উত্তর কোশল ও আউধ অভিন্ন। আউধের রাজধানী ছিল অযোধ্যা বা সাকেত। কালিদাস রঘুবংশ কাব্যে উত্তর-কোশলকেই কোশল বলিয়াছেন। রামায়ণে কোশলরাজ্যের পূর্ব্বতন রাজধানী হিসাবে অযোধ্যা এবং পরবর্ত্তী রাজধানী হিসাবে শ্রাবস্তী নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। উত্তর-কোশল অযোধ্যা হইতে অভিন্ন বলিয়া বিবেচিত হয়। অযোধ্যার উপকণ্ঠে নন্দীগ্রামে রামের নির্ব্বাসন সময়ে ভরত বাস করিতেন। পরবর্ত্তী যুগে উত্তর কোশলের নাম হইল শ্রাবস্তী। হিউয়েন সাঙের সময়ে ইহা এই নামে পরিচিত ছিল।

উত্তর দিকে গমনকালে বংক্ষু বা ওক্সাস (Oxus) ও ইহার শাখানদী তীরস্থ হূনদিগের উপনিবেশে রঘু উপস্থিত হন (রঘুবংশ, ৪,৬৭)। হূনগণ তাঁহার নিকট পরাজিত হয়। বিষ্ণুপুরাণের মতে শাম্ব, সৌবীর, সৈন্ধব, শাকল এবং মদ্রদিগের সহিত সুদূর পশ্চিমে হূনগণ বাস করিত। রাজশেখরকৃত কাব্যমীমাংসা গ্রন্থে হূনগণ উত্তর দেশের অধিবাসী বলিয়া কথিত আছে। পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে হূনগণ গন্ধার অধিকার করে।

কুরুপাণ্ডবগণের মধ্যে যে যুদ্ধ কুরুক্ষেত্রে সঙ্ঘটিত হয় কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে (পূর্ব্বমেঘ, ৪৮) আমরা ইহার উল্লেখ পাই। পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী সূত্রে কুরুক্ষেত্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভারতে, শৌরপুরাণে এবং পদ্মপুরাণেও ইহাকে পবিত্র নগর বলা হইয়াছে। ভগবদ্গীতায় ইহা ধর্ম্মক্ষেত্র নামে পরিচিত। কুরুক্ষেত্র থানেশ্বর সোনাপৎ, আমিন, কার্ণাল ও পানিপৎ প্রাচীন কুরুদেশের অন্তর্গত। এই অঞ্চলটি উত্তরে সরস্বতী নদী ও দক্ষিণে দৃষদ্বতী নদীর মধ্যে অবস্থিত। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের মতে কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণে খাণ্ডব, উত্তরে তুর্ঘ্ন এবং পশ্চিমে পরিণ ছিল। কুরু এবং তাহাদের দেশের বিবরণ বিশদ ভাবে মহাভারতে পাওয়া যায়। কুরুরাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত ছিল: কুরুক্ষেত্র, কুরুদেশ ও কুরুজাঙ্গল। কুরুজাঙ্গল নামে পতিতভূমি কুরুদেশের পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত এবং ইহা গঙ্গা ও উত্তর পঞ্চালের মধ্যস্থ এলাকাটিকে বুঝায়। কুরুদিগের এই অরণ্যভূমি কাম্যকবন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহে কুরুক্ষেত্র পবিত্র স্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, কারণ ইহার চতুঃসীমার মধ্যে দৃষদ্বতী, সরস্বতী ও আপয়া নামে

পবিত্র নদীগুলি প্রবাহিত হইত। মনু বলিয়াছেন কুরুদেশ ব্রহ্মর্ষিগণের পবিত্র দেশ এবং ব্রহ্মাবর্ত্তের পরেই কুরুদেশের নাম করিতে পারা যায়। র‍্যাপসন সাহেবের মতে কুরুগণের অধিকৃত ভূমিসমূহ কুরুক্ষেত্রের সীমানায় বহির্দেশে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কুরুগণ দোয়াবের উত্তরাঞ্চল অথবা যমুনা ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী অঞ্চল অধিকার করিয়াছিল এবং ইহাদের প্রতিবেশী উত্তর পঞ্চাল ও দক্ষিণ পঞ্চালবাসিগণ বৎসভূমি পর্য্যন্ত দোয়াবের অবশিষ্ট স্থান দখল করে।

কালিদাস দুষ্মন্ত রাজার রাজধানী হস্তিনাপুরের নামোল্লেখ করিয়াছেন (অভিজ্ঞান-শকুন্তল, নির্ণয় সাগর সংস্করণ; পৃঃ ১২৮)। ইহার নিকটে গঙ্গাতীরস্থ পবিত্র শচীতীর্থে শকুন্তলার অঙ্গুরীয় হারাইয়া যায়। ইহা ব্যতীত কালিদাস অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটকে সামতীর্থ ও কর্ণতীর্থ নামে দুইটি পবিত্র স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশের মীরাট জেলায় গঙ্গাতীরে হস্তিনাপুর নামে কুরুগণের প্রাচীন রাজধানী বিদ্যমান ছিল। মীরাটের অন্তর্গত মাওনা তহশীলের একটি পুরাতন নগর এবং হস্তিনাপুর অভিন্ন। ইহা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের শাসনে ছিল। পাণ্ডবগণ বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত মিলিত হন। ধৃতরাষ্ট্র পনর বৎসর হস্তিনাপুরে বাসের পর বনগমন করেন এবং সেখানে রাণীদের সহিত এক দাবাগ্নিতে দগ্ধ হন। অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎ হস্তিনাপুরের বুদ্ধিমান রাজা, শ্রেষ্ঠ বীর এবং ক্ষমতাশালী ধনুর্দ্ধারী ছিলেন। অসীম কৃষ্ণের পুত্র নিচক্ষুর রাজত্বকালে এই নগর গঙ্গাস্রোতে প্লাবিত হয় এবং রাজা তাঁহার বাসভবন কৌশাম্বীতে লইয়া যান। মার্কণ্ডেয় ও ভাগবত পুরাণের মতে হস্তিনাপুরের সহিত গজাহ্বয়দের সম্বন্ধ ছিল। ভাগবত পুরাণে বর্ণিত আছে যে হস্তিনাপুরের অপর নাম ছিল গজাহ্বয়। জৈনদিগের প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভ হস্তিনাপুরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ভরতকে সিংহাসনে বসাইয়া দেন। তিনি আপন আত্মীয়গণের মধ্যে নিজ রাজ্য ভাগ করেন। জৈন বিবিধতীর্থকল্পের মতে রাজা হস্তী ভাগীরথী তীরে হস্তিনাপুর নগর নির্ম্মাণ করেন। জৈনধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর এই নগর প্রায়ই পরিদর্শন করিতেন। হস্তীর দুই পুত্রের মধ্যে অজমীঢ় হস্তিনাপুরে প্রধান পৌরব বংশ বজায় রাখেন।

কালিদাস রঘুবংশে (১৯, ২) নৈমিষের উল্লেখ করেন। ইহাই বর্ত্তমান নিমসর। সীতাপুর জেলায় গুমতি নদীর তীরে ইহা অবস্থিত। হিন্দুদিগের ইহা একটি পবিত্র তীর্থস্থান এবং ৫১টি পীঠস্থানের অন্যতম। এখানে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ পুরাণ লেখেন। নৈমিষারণ্য পরিদর্শনকালে নারদ ঋষিগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হন। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ এবং জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে নৈমিষীয় অর্থাৎ নৈমিষারণ্যের অধিবাসীদের উল্লেখ আছে। মহাভারত ও কূর্ম্মপুরাণে এই পবিত্র স্থানের নাম পাওয়া যায়।

রঘুবংশের (১৫, ৮৯) মতে পুষ্কলাবতী পুষ্কল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহা তাঁহার রাজ্য শাসনকেন্দ্র ছিল। ইহার অপর একটি নাম ছিল পুষ্করাবতী। আরিয়ন ও ডায়-নিসিয়স পেরিগিটিসের মতে ইহার নাম ছিল পিউকেলেয়টিস ও পিলকেলেই। বৃহৎসংহিতায় ইহা নগর বলিয়া বর্ণিত আছে। ইহা সিন্ধু নদীর পশ্চিমতীরস্থ গন্ধার দেশের পূর্ব্বতন রাজধানী ছিল। বর্ত্তমানে ইহা চারসদ্দ নামে প্রসিদ্ধ এবং স্বাট ও কাবুল নদীর সঙ্গমস্থলের নিকট অবস্থিত। কাহারও কাহারও মতে এই নগরটি স্বাটনদীতীরস্থিত পেশোয়ারের সতর মাইল উত্তর-পূর্ব্বস্থ প্রাং ও চারসদ্দ হইতে অভিন্ন বলিয়া ধরা যায়। টলেমি সাহেবের মতে ইহা প্রোক্লে নামে পরিচিত। ইহা একটি বিস্তৃত এবং জনবহুল নগর। বিষ্ণুপুরাণের মতে এই নগরটি ভরতের পুত্র পুষ্কর নির্ম্মাণ করেন।

রঘুবংশ (১৫, ৮৯) হইতে জানা যায় তক্ষশিলা তক্ষ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই বর্ত্তমান টাক্‌সিলা। ইহা গন্ধার রাজ্যের রাজধানী ছিল। পাণিনি ও পতঞ্জলি ইহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আরিয়নের মতে এই নগর জনবহুল, সমৃদ্ধিশালী এবং সুবৃহৎ ছিল। গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবার প্রায় আশী বৎসর পরে তক্ষশিলা অশোকের আয়ত্তাধীনে আসে। গ্রীক পর্য্যটকেরা বলেন যে ইহার ভূমি উর্ব্বর এবং ইহা একটি প্রসিদ্ধ নগর। প্রায় খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে অপলোনিয়স এবং ডেমিস এই নগরটি পরিদর্শন করেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এখানে আসেন। ইহা তখন কাশ্মীরের অধীনে ছিল। হিউয়েন সাঙের মতে ইহা আয়তনে ২০০০ লি (li) বিস্তৃত। এখানে প্রচুর শস্য হইত। জলবায়ু ভাল এবং লোকেরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল। কতকগুলি বিহারে লোক ছিল না। কতিপয় বিহারে মহাযান ভিক্ষু ছিল। প্রাচীন ভারতের এই নগরটি বৃহৎ শিক্ষাকেন্দ্র বলিয়া খ্যাত। ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে নানাপ্রকার শিল্প-বিজ্ঞান শিখিবার জন্য এখানে ছাত্রগণ আসিত। দিব্যাবদানমালার মতে এই নগর প্রথমে ভদ্রশিলা নামে পরিচিত ছিল, পরে ইহার নাম হইল তক্ষশিলা। ইহার স্থান নির্ণয় করিতে গিয়া কানিংহাম সাহেব বলেন যে শাহডেরির নিকটে তক্ষশিলার স্থান পাওয়া যায়। তক্ষশিলার ভগ্নস্তূপ সুরক্ষিত কালকাসরাইর এক মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। এই নগরের চতুর্দ্দিকে ৫৫টি স্তূপ, ২৮টি বিহার এবং ৯টি মন্দির ছিল। কানিংহাম সাহেবের মতে তক্ষশিলা এবং পুষ্করাবতীর মধ্যে দূরত্ব ছিল ৮০ মাইল। ভাণ্ডারকর বলেন যে, অশোকের সময়ে তক্ষশিলা গন্ধারের রাজধানী ছিল না। কলিঙ্গ অনুশাসন হইতে জানা যায় যে তক্ষশিলা তাঁহার আয়ত্তে ছিল, কারণ এখানে তাঁহার এক পুত্রকে উপরাজার পদ দেওয়া হয়।

হরিদ্বারের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত কনখলের উল্লেখ কালিদাসের মেঘদূতে আছে (পূর্ব্বমেঘ, ৫০)। গঙ্গা এবং নীলধারার সঙ্গমস্থলে হরিদ্বারের দুই মাইল পূর্ব্বে ইহা অবস্থিত। মহাভারত ও পদ্মপুরাণে ইহাকে একটি পবিত্র স্থান বলা হইয়াছে। এখানে পুরাণে উল্লিখিত দক্ষযজ্ঞ হইয়াছিল।

কালিদাসের রঘুবংশে (১৫, ৯০, ৯৭) অঙ্গদপুর ও কুশাবতীর নাম পাওয়া যায়। কুশাবতী ও কুশীনগর অভিন্ন।

রঘুবংশে (১৫, ৯৭) শরাবতীর নামও আছে। ইহা গণ্ডা ও বরেক জেলার অন্তর্গত শ্রাবস্তী নামে পরিচিত। প্রাচীন শ্রাবস্তীর বর্তমান নাম সাহেট-মাহেট। যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত গণ্ডা এবং বরেক জেলার সীমায় ইহা অবস্থিত। বলরামপুর হইতে এখানে আসা যায়। প্রায় ছাব্বিশ মাইল দূরস্থিত বরেক হইতে এই স্থানে যাওয়া যায়। বৌদ্ধ টীকাকার বুদ্ধঘোষের মতে ঋষি সবত্থের বাসস্থান ছিল বলিয়া এই স্থানটি সাবত্থী বা শ্রাবস্তী নামে পরিচিত। বিষ্ণুপুরাণের মতে এই নগর রাজা শ্রাবস্ত নির্ম্মাণ করেন। মহাভারতের মতে শ্রাবস্ত বা শ্রাবস্তক শ্রাবের পুত্র এবং যুবনাশ্বের পৌত্র বলিয়া বিদিত। বৌদ্ধ-সাহিত্যে শ্রাবস্তী কোশল রাজ্যের রাজধানী ছিল। অচিরবতী নদীর তীরে অবস্থিত এই নগরটি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ও বৈদিক শিক্ষার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। তিনটি প্রধান বাণিজ্যপথের সংযোগস্থান ও শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া ইহার বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। এখানে অনেক রাজা, রাজকুমার, মন্ত্রী, সভাসদ এবং সাতান্ন হাজার পরিবার বাস করিত। ইহা প্রাচীরবেষ্টিত এবং ইহার চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি রাজপথও ছিল। প্রাচীরের মধ্যে নগরটির তিনটি ভাগ ছিল। ইহা ব্যতীত রাজকর্ম্মচারীদের শিক্ষা ও ধর্ম্মবিষয়ক প্রতিষ্ঠান, আবাসভূমি, পণ্যবিপণি, বেশ্যাদিগের বাসগৃহ প্রভৃতির জন্য পৃথক স্থানও ছিল। পথ-ঘাটেরও সুবন্দোবস্ত দেখা যায়।

শ্রাবস্তী কেবল ভারতীয় বাণিজ্যের ঘাঁটি ছিল তাহা নহে, ধর্ম্ম ও শিক্ষার একটি সুবৃহৎ কেন্দ্রও ছিল। জৈনদিগের নিকট এই নগর চন্দ্রপুরী বা চন্দ্রিকাপুরী নামে খ্যাত। ইহা দুই জন প্রসিদ্ধ জৈন তীর্থঙ্করের জন্মভূমি। এখানে বুদ্ধদেব অনেক ধর্ম্মোপদেশ দেন। এখান হইতে অনেক ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী বৌদ্ধসঙ্ঘে যোগদান করে। জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাবীর অনেকবার এই নগর পরিদর্শন করিয়াছিলেন এবং একটি বর্ষা এখানে অতিবাহিত করেন। জটিল, নির্গ্রন্থ, অচেলক, এক সাটক এবং পরিব্রাজকগণ এই নগরের লোকেদের সহিত পরিচিত ছিল।

দুই জন খ্যাতনামা চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়েন ও হিউয়েন সাঙ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম এবং সপ্তম শতকে এই নগর পরিদর্শন করেন। হিউয়েন সাঙের মতে এই নগর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইলেও এখানে কতকগুলি অধিবাসী ছিল। এখানে ভাল শস্য হইত এবং আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর। অধিবাসীরা সৎ, শিক্ষিত এবং উত্তম কর্ম্ম করিতে ভাল বাসিত। এই নগরে কতকগুলি বৌদ্ধবিহার ধ্বংসাবস্থায় ছিল। কতকগুলি দেবমন্দিরও ছিল এবং অবৌদ্ধের সংখ্যা অধিক ছিল।

ধনে, লোকসংখ্যায় এবং রাজনৈতিক প্রাধান্যের দিক দিয়া শ্রাবস্তীর অধঃপতন পরিলক্ষিত হয়। বুদ্ধের সময় হইতে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই নগর বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্র ছিল এবং প্রায় ১৮০০ বৎসর ধরিয়া একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনের সহিত ইহা বিজড়িত ছিল।

কালিদাস মেঘদূত কাব্যে (পূর্ব্বমেঘ, ৪৮) সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত জনপদ নামে অভিহিত করিয়াছেন। রঘুবংশের পঞ্চদশ সর্গে (৯০) কালিদাস যে কারাপথের নাম করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তাহা মল্লদিগের দেশ ছিল (রঘুবংশ, নন্দারসিকর, ৩ সংস্করণ, পৃঃ ৩২২)। মল্লদিগের দুইটি উপনিবেশ ছিল, একটি পাবা এবং অপরটি কুশিনারা। পাবা সম্ভবতঃ গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত কাসিয়া হইতে অভিন্ন এবং কুশিনারা বা কুশাবতীতে বুদ্ধ দেহত্যাগ করেন।

দক্ষিণ ভারতবর্ষের জাতি, দেশ, নগর প্রভৃতি

কালিদাস দক্ষিণ-ভারতস্থিত উৎকল ও কলিঙ্গ দেশকে দুইটি পৃথক রাজ্য বলিয়া মনে করেন (রঘুবংশ, ৪, ৩৮)। কলিঙ্গদেশ বঙ্গোপসাগরের উপকূল ধরিয়া উত্তরে উৎকল হইতে দক্ষিণে গোদাবরীর মোহনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। স্কন্দপুরাণের মতে উৎকল দক্ষিণ সাগরের তীরে বিদ্যমান ছিল এবং এখানে বহু তীর্থস্থান ছিল। প্রথম নরসিংহের ভুবনেশ্বর শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, উৎকল বিষয়ের মধ্যে পুরী ও ভুবনেশ্বর অবস্থিত। নারায়ণ পালের ভাগলপুর দানপত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, উৎকলের এক রাজা পালবংশের জয়পালের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া রাজধানী হইতে পলায়ন করেন। রাজা দেবপাল উৎকল বংশ ধ্বংস করেন এবং হূন ও দ্রাবিড় গুর্জ্জর রাজাদের গর্ব্ব চূর্ণ করেন। মহাশিবগুপ্ত যযাতির শোনপুর দানপত্র হইতে জানা যায় যে, উৎকলদেশ কলিঙ্গ ও কঙ্গোদ হইতে অভিন্ন। উৎকল দেশ ঋষিকুল্যা নদী হইতে সুবর্ণরেখা এবং মহানদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উৎকলের পূর্ব্বসীমানা সম্ভবতঃ কপিসা নদী পর্য্যন্ত এবং পশ্চিম সীমানা মেকলদিগের দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত (রঘুবংশ, ৪,৩৮)। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে, উৎকল দেশ বর্ত্তমান উড়িষ্যা রাজ্যকেই বুঝায়। গাহড়বাল গোবিন্দচন্দ্রের দ্বাদশ শতকের এক লিপিতে উৎকল দেশের উল্লেখ আছে। এখানে শাক্যরক্ষিত নামে জনৈক বৌদ্ধ পণ্ডিত বাস করিতেন।

চিকাকোলের সন্নিকটে মুখলিঙ্গম বা বংশধরা নদীর মোহনায় অবস্থিত কলিঙ্গপতম ও কলিঙ্গনগর অভিন্ন। মুখলিঙ্গম একটি তীর্থস্থান। ইহা গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত পারলাকিমেদি হইতে কুড়ি মাইল দূরে অবস্থিত। ফ্লীট সাহেব ইহাকে কলিঙ্গপটম-এর সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীসূত্রে এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্যে ইহার উল্লেখ আছে। পিথুণ্ডক, পিথুণ্ডগ ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী পিথুণ্ড কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত। প্রথম কলিঙ্গ অনুশাসন হইতে জানা যায় যে, কলিঙ্গ শাসনের ভার এক কুমারের উপর অর্পিত হয় এবং তাঁহার প্রধান কর্ম্মস্থান ছিল তোষলীতে বা সমাপায়। রাজা খারবেল অঙ্গমগধ হইতে জিনের সিংহাসন আপন রাজ্যে আনয়ন করেন। গোরথগিরি বা বরাবর পর্ব্বতে

তিনি মগধ সৈন্য আক্রমণ করেন এবং মগধের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজধানী রাজগৃহের অধিবাসীদের উপর অত্যন্ত বলপ্রয়োগ করেন। তিনি মগধের রাজা বহসতিমিতকে আপন সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করাইয়া লইতে বাধ্য করেন। খারবেল কলিঙ্গনগরে ঝড়ে বিধ্বস্ত বহু অট্টালিকা, প্রাচীর ও দ্বার সংস্কার করাইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের চতুর্থবর্ষে তিনি ভোজক এবং রাটিকগণকে পরাভূত করিয়া তাহাদিগকে তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করান। তিনি কলিঙ্গাধিপতি এবং কলিঙ্গচক্রবর্ত্তী নামে জ্ঞাত ছিলেন। খারবেলের রাজত্বকালে কলিঙ্গনগর কলিঙ্গের রাজধানী ছিল। তাঁহার সময়ে প্রকৃত রাজধানী ছিল খিবির। নূতন রাজপ্রাসাদের অবস্থিতি হইতে বুঝা যায় যে, প্রাচীনদীর তীরে রাজধানী বিদ্যমান ছিল। প্রাচীনদী পুরী জেলার উত্তরাংশ দিয়া প্রবাহিত এবং ইহার উভয় তীরে অনেকগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির আছে।

বর্ত্তমান উড়িষ্যা প্রাচীন কলিঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণে বৈতরণী ও সমুদ্র-উপকূলের দক্ষিণে ভিজাগাপট্টম পর্যন্ত ইহা বিস্তৃত। পশ্চিম দিকে অমরকণ্টক পর্ব্বত ইহার অন্তর্ভুক্ত। মৎস্যপুরাণের মতে জলেশ্বর অমরকণ্টকের একটি তীর্থস্থান। গোদাবরী ও মহানদীর মধ্যভাগে কলিঙ্গদেশ অবস্থিত। দন্তপুর-নগর কলিঙ্গের রাজধানী ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কলিঙ্গদেশ পরিদর্শন করেন। তাঁহার মতে আয়তনে ইহা ৫০০০ লি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখানে নিয়মিত কৃষিকার্য্য চলিত এবং প্রচুর ফুল ও ফল জন্মিত। এখানকার আবহাওয়া উষ্ণ ছিল। লোকেরা অসভ্য, রুক্ষ ও অশিক্ষিত। এখানে বহু বিহার ও দেবমন্দির ছিল। কৌটিল্যের মতে কলিঙ্গ ও অঙ্গদেশের হস্তী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কালিদাস রঘুবংশে (৪,৪৩,৬,৫৪) কলিঙ্গের রাজাকে মহেন্দ্রের রাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

কালিদাসের রঘুবংশে (৬,৫৯-৬৫) পাণ্ড্যগণের উল্লেখ আছে। ইহাদের রাজধানী ছিল উরগপুর। কাত্যায়নের মতে মাদুরা এবং তিন্নেভেলি জেলা পাণ্ড্যদেশের অন্তর্গত। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ত্রিবাঙ্কুর পাণ্ড্যরাজ্যভুক্ত ছিল। মহাভারত এবং জাতক হইতে জানা যায় যে পাণ্ড্যরা ইন্দ্রপ্রস্থের রাজন্যবংশসম্ভূত ছিলেন। কাত্যায়ন বলেন পাণ্ডু নাম হইতে পাণ্ড্যের উৎপত্তি হইয়াছে। রামায়ণে পাণ্ড্য দেশের উল্লেখ আছে। এই দেশে সীতার অন্বেষণে সুগ্রীব বানরসৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। মহাভারতে লিখিত আছে যে, পাণ্ডু-পুত্রদিগের সর্ব্বকনিষ্ঠ সহদেব পাণ্ড্যদিগের রাজাকে পরাস্ত করিয়া দক্ষিণাপথে গমন করেন। অশোকের দ্বিতীয় ও ত্রয়োদশ অনুশাসন-লিপিতে পাণ্ড্যগণের উল্লেখ আছে। ইহাদের দেশ তাঁহার রাজ্যের বাহিরে অবস্থিত। জৈন ইতিবৃত্তে দক্ষিণদিকস্থ পাণ্ড্যদেশের সহিত পাণ্ডুপুত্রদিগের সম্বন্ধের কথা পাওয়া মথুরা বা মদুরা পাণ্ড্যদেশের রাজধানী ছিল। হেরাক্লিস এবং পাণ্ডিয়া সম্বন্ধে মেগাস্থিনিসের বিবরণে উত্তর ভারতের পাণ্ডুদিগের এবং মথুরার শূরসেনদিগের সহিত দক্ষিণের পাণ্ড্যদের সম্পর্ক জানা যায়। তামিলদেশের পাণ্ড্য এবং চোড়বিভাগের মধ্যে প্রভেদ সুবিদিত। সিংহলের পালিবংশ সাহিত্যে পাণ্ড্যগণ পাণ্ডু বা পণ্ডু নামে পরিচিত। বিজয় পাণ্ডুরাজার এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। পাণ্ডুরাজার রাজধানী দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত মথুরা। এই মথুরা ও মাদ্রাজের অন্তর্গত মদুরা অভিন্ন।

রঘুবংশ কাব্যে (৪,৫০) তাম্রপর্ণির উল্লেখ আছে। গ্রীক লেখকদিগের নিকট ইহা তাপ্রোবানে নামে অভিহিত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ইহাকে পারসমুদ্র বলা হইয়াছে। এই নদী টিন্নেভেল্লির মধ্যে প্রবাহিত। ইহা বর্ত্তমান তাম্রবরি নদী। এই নদীতে মুক্তা পাওয়া যায়। বলরাম ইহা পরিদর্শন করিয়াছিলেন। এই নদী এবং গুপ্তর অভিন্ন। ইহা তাম্রবর্ণা নামেও পরিচিত। এই পবিত্র নদীর তীরে অগস্ত্য মুনির আশ্রম এবং গোকর্ণতীর্থ অবস্থিত। অশোকের ত্রয়োদশ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তাম্রপর্ণী নদী পাণ্ড্যদেশের নিম্নভাগে প্রবাহিত। এই নদী হিউয়েন সাঙের মলয়কুট নামে খ্যাত।

নাগার্জুনিকোণ্ড অনুশাসনে দেখা যায় যে, তম্বপংন তম্বপন্নি দ্বীপ বা সিংহল হইতে পৃথক।

কালিদাস রঘুবংশে (৬, ৬২; ১২, ৬৩, ৬৬) লঙ্কার উল্লেখ করিয়াছেন। গোকর্ণ নামে দক্ষিণ ভারতের একটি তীর্থস্থানের উল্লেখও রঘুবংশে রহিয়াছে (৮,৩৩)। কাহারও কাহারও মতে ইহা দক্ষিণ ভারতের একটি গ্রাম। ভগীরথ এই স্থানে আসেন এবং তপস্যা করেন, কারণ বহুকাল ধরিয়া তিনি অপুত্রক ছিলেন। মহাভারতে, পদ্মপুরাণে এবং কূর্ম্মপুরাণে এই পবিত্র স্থানের উল্লেখ আছে। সৌরপুরাণের মতে দক্ষিণ গোকর্ণ সিন্ধু নদীর তীরে অবস্থিত।

কেরলের উল্লেখ রঘুবংশে দেখা যায় (৪,৫৪), রঘুর সৈন্যগণের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রমণীগণ এখানে তাহাদের অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়াছিল। কেরল বর্ত্তমান মালাবার, কোচিন এবং ত্রিবাঙ্কুর নামে খ্যাত। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীসূত্রে এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্যে ইহার উল্লেখ আছে। পুরাকালে ইহা চেরল বা চেরলনাডু নামে পরিচিত ছিল। কাহারও কাহারও মতে চন্দ্রগিরি নদীর দক্ষিণদিকস্থ পশ্চিম পর্ব্বতাঞ্চল কেরল নামে বিদিত। কেরল দেশ চের নামে পরিচিত। রাজেন্দ্রচোড় এই দেশটি জয় করিয়াছিলেন। অশোকের দ্বিতীয় এবং ত্রয়োদশ শিলালিপিতে দেখা যায় যে কেরলগণ অশোকের রাজ্যের বাহিরে সীমান্তে বাস করিত। মহাভারতের মতে ইহারা একটি বন্যজাতি। পুরাণে দক্ষিণাপথবাসীদের মধ্যে চোড় এবং পাণ্ড্যদিগের সহিত কেরলদিগের উল্লেখ দেখা যায়।

পূর্ব্ব ভারতের জাতি, দেশ প্রভৃতি

কালিদাস রঘুবংশ কাব্যে (৪,৮৩) পূর্ব্ব ভারতের কামরূপের অধিবাসীদিগের কথা বলিয়াছেন। কামরূপের উত্তরে ভুটান, পূর্ব্বে দারাং ও নওগাঙ্গ জেলা, দক্ষিণে খাসি পর্ব্বত এবং

পশ্চিমে গোয়ালপাড়া অবস্থিত। গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমার বাহিরে কামরূপ একটি সীমান্ত দেশ। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ইহার রাজধানী ছিল। বর্ত্তমান গৌহাটি এবং প্রাগজ্যোতিষপুর অভিন্ন। কামরূপের প্রাচীন রাজা বর্ত্তমান দেশ হইতে বৃহত্তর স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং পশ্চিম দিকে করতোয়া নদী পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা রংপুর ও কুচবিহার কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত। আরও অনেক দেশ ইহার অন্তর্গত, যথা: মণিপুর, জৈয়ন্তিয়া, কাছাড়, পশ্চিম-আসাম, মৈমনসিংহের অংশ এবং শ্রীহট্ট। গোয়ালপাড়া হইতে গৌহাটি পর্য্যন্ত বর্ত্তমান জেলাগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত। কামরূপ দেশ আয়তনে প্রায় ১০,০০০ লি বিস্তৃত এবং ইহার রাজধানী ছিল প্রায় ৩০ লি বিস্তৃত। কামরূপের রাজা সমুদ্রগুপ্তকে কর দিত। বিজয়সেন ও লক্ষ্মণসেন কামরূপ জয় করেন। রাজা ভো...র্ম্মা কামরূপের রাজশক্তি হ্রাস করেন। কামরূপের অপর নাম প্রাগজ্যোতিষ কিন্তু কালিদাসের মতে (৪,৮৩-৮৪) কামরূপ ও প্রাগজ্যোতিষের অধিবাসীরা এক নহে। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং বলেন যে, কামরূপ পুণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে পূর্ব্ব দিকে ৯০০ লির অধিক দূরে অবস্থিত। এখানকার লোকেরা সং, জলবায়ু স্বাস্থ্যকর এবং ফসল নিয়মিতভাবে উৎপন্ন হইত। এখানে তিনি কোন অশোক-স্তম্ভ দেখেন নাই। এখানকার লোকেরা বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাস করিত না। অনেকগুলি দেবমন্দির ছিল এবং নানা ধর্ম্মের ভক্তেরা বাস করিত।

উত্তর-পূর্ব্ব দিকে কামরূপ স্বাধীন ছিল বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্ব ভারতের ইহা একটি করদ-রাজ্য ছিল। বহুকাল ধরিয়া এখানে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রাধান্য বিদ্যমান ছিল। কামরূপের রাজা ভাস্করবর্ম্মের সহিত শ্রীহর্ষ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। রামপাল কামরূপ জয় করেন। গৌড়ের রাজারা পুনঃ পুনঃ এই দেশ জয় করিয়াছিলেন। কামরূপ বাংলার পাল রাজাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আহোম রাজারা এই রাজ্যের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন।

কালিদাস বলেন যে, লোহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে প্রাগজ্যোতিষ অবস্থিত (রঘুবংশ, ৪,৮১)। কেবল যে কামরূপ দেশ তাহা নহে, উত্তর বাংলা এবং সম্ভবতঃ উত্তর বিহারের অনেক অংশ এই বিখ্যাত এবং সুন্দর দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাগজ্যোতিষ বর্ত্তমানে গৌহাটি নামে খ্যাত। এই দেশ কিরাত এবং চীন রাজ্যের সীমান্তে বিদ্যমান বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ বলেন, প্রাগজ্যোতিষ এবং কামরূপ একই। কালিকাপুরাণের মতে ইহা কামাখ্যা বা গৌহাটি হইতে অভিন্ন। রাজশেখরের কাব্যমীমাংসা হইতে জানা যায়, প্রাগজ্যোতিষ পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত।

কালিদাসের মতে (রঘুবংশ, ৪,৩৬) গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র কর্ত্তৃক গঠিত নদীর মুখের ত্রিকোণাকার স্থানে বঙ্গদেশ বিদ্যমান ছিল। বাংলার প্রাচীন নাম বঙ্গ। ঐতরেয়-আরণ্যকে, বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রে, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীসূত্রে, ভাগবত পুরাণে এবং কাব্যমীমাংসায় ইহার উল্লেখ আছে। সিংহলের বংশসাহিত্যে বঙ্গ এবং কলিঙ্গের মধ্যে রাঢ়ের স্থান নির্ণয় করা হইয়াছে। বঙ্গদেশের রাজা পৃথ্বীসেন রাজা মল্লের নিকট পরাস্ত হন। শ্রীচন্দ্রদেবের রামপাল ফলক হইতে জানা যায় যে, চন্দ্রবংশ সমতটসহ সমগ্র বঙ্গের উপর আধিপত্য স্থাপন করে। বঙ্গের রাজা লক্ষ্মণরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হন। চালুক্যের রাজা কর্ণ বঙ্গের রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্ববঙ্গের বর্ম্মণদিগের সহিত সিংহলের রাজা প্রথম বিজয়বাহুর বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। কোন এক বাংলার রাজার সৈন্য উত্তরবঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিল। ইহার ফলে বৌদ্ধ আচার্য্য করুণাশ্রীমিত্রের সোমপুর বিহারস্থিত গৃহ অগ্নিদগ্ধ হয় এবং তিনি নিজেও অগ্নিদগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বঙ্গের পশ্চিম দিকে সুহ্ম অবস্থিত (রঘুবংশ, ৪, ৩৫-৩৬)। বঙ্গ এবং কলিঙ্গের মধ্যে ইহার অবস্থান দেখা যায় (রঘুবংশ, ৪, ৩৫-৩৮)। পূর্ব্ব দিকে গমনকালে এই দেশ রঘু সর্ব্বপ্রথম আক্রমণ করেন (রঘুবংশ, ৪, ৩৫)। সুহ্ম সুম্হ হইতে অভিন্ন। ইহা বর্ত্তমানে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত। বুদ্ধদেব এখানে আসিয়াছিলেন।

কালিদাস তাঁহার রঘুবংশ কাব্যে (৬,২১-২৪, ২৭-২৯) মগধ ও তাহার রাজধানী পুষ্পপুর এবং অঙ্গের উল্লেখ করেন। রাজা দিলীপ মগধরাজবংশসম্ভূতা সুদক্ষিণার পাণি গ্রহণ করেন (রঘুবংশ, ১,৩১)। গয়া এবং পাটনা জেলা মগধের অন্তর্গত। কাহারও কাহারও মতে অঙ্গের পশ্চিম দিকে মগধ অবস্থিত। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীসূত্রে এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্যে মগধের উল্লেখ আছে। তিব্বতীয় বৌদ্ধ-ভূগোলে দেখা যায় যে, মগধ প্রাচীর অন্তর্গত নহে, মধ্যদেশের অন্তর্গত। দশকুমারচরিতের মতে মগধের রাজা মালবের রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের ফলে মালবের রাজা পরাস্ত এবং ধৃত হন। খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বৃহস্পতিমিত্র অঙ্গ-মগধের রাজা ছিলেন। কলিঙ্গের রাজা খারবেল মগধ আক্রমণ করেন। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর মগধ সাম্রাজ্য সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয় নাই। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে, ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের আধিপত্য বজায় ছিল। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌড়ের কোন একজন রাজা মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। মহাশিবগুপ্তের মাতা বাসটা মগধের রাজা সূর্য্যবর্ম্মণের কন্যা। প্রথম কীর্ত্তিবর্ম্মণ মগধ জয় করেন। অতিশয় ধবল (প্রথম অমোঘবর্ষ) মগধের নৃপতি কর্ত্তৃক পূজিত হন। কলচুরির রাজা বিজ্জন বা বিজ্জল মগধদিগকে পরাস্ত করেন।

অঙ্গ বলিতে বর্ত্তমান ভাগলপুরের চতুর্দ্দিকের দেশ বুঝাইত। কেহ কেহ বলেন শোন ও গঙ্গা নদীর তীরে অঙ্গদিগের বাসস্থান ছিল। অঙ্গের রাজধানীর নাম প্রথমে মালিনী ছিল। পরে ইহার নাম হইয়াছিল চম্পা বা চম্পাবতী। বুদ্ধের সময়ে চম্পা একটি বৃহৎ নগর। অশোকের পুত্র মহিন্দ, তাঁহার পুত্র এবং প্রপৌত্রগণ

ইহার রাজা ছিলেন। এই নগরে বুদ্ধ এবং মহাবীর আসিয়াছিলেন। এখানে মহাবীর বর্ষাকাল অতিবাহিত করেন। এখানে জৈনদিগের দ্বাদশ তীর্থঙ্করের জন্ম ও মৃত্যু ঘটে। জৈনধর্মের ইহা একটি প্রধান কেন্দ্র। চম্পাপুরীর জনৈক ব্রাহ্মণ পাটলিপুত্রের রাজা বিন্দুসারকে সুভদ্রাঙ্গী নামে একটি কন্যা উপহার দেন।

চম্পাপুরী বা চম্পানগর বা চম্পামালিনী ভাগলপুরের নিকটে অবস্থিত। অঙ্গ এবং মগধের মধ্যে চম্পানদী সীমাস্বরূপ ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়েন খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতে আসেন। চম্পা রাজ্যে তিনি কতকগুলি স্তূপ দেখিয়াছিলেন। এখানে আর একজন চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং আসেন। তাঁহার মতে ইহার পরিধি ৪০০০ লির অধিক ছিল। এখানকার অধিকাংশ বিহার ভগ্নাবস্থায় ছিল। প্রাচীন অঙ্গদেশে ঋষ্যশৃঙ্গ ও জহ্নু মুনির আশ্রম এবং কর্ণগড় ছিল। মোদাগিরি বা মুঙ্গের ইহার অন্তর্ভুক্ত। বুদ্ধের সময়ে অঙ্গরাজ্যে নাস্তিক আচার্য্যদিগের কর্ম্মস্থান ছিল। এখানে কতকগুলি মহাশালা বা স্নাতকদিগের সম্প্রদায় ছিল। অঙ্গ দেশের রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। দুর্য্যোধন এবং অপর কৌরব রাজার সাহায্যে কর্ণ অঙ্গের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। মগধ অঙ্গরাজ্য জয় করে। অঙ্গদিগের মধ্যে স্ত্রী এবং সন্তানের ক্রয়বিক্রয়-প্রথা প্রচলিত ছিল।

রাজা অজের সময়ে পুষ্পপুর বা পাটলিপুত্রের উল্লেখ রঘুবংশে (৬,২৪) পাওয়া যায়। ইহা মগধের পরবর্ত্তী রাজধানী ছিল। ইহাই বর্ত্তমান পাটনার প্রাচীন স্থান। ইহার অপর একটি নাম ছিল কুসুমপুর কারণ এখানকার রাজ-উদ্যানে অনেক পুষ্প প্রস্ফুটিত হইত। এখান হইতে স্থবির মধ্যান্তিক আকাশমার্গে গমন করিয়া হিমালয় পর্ব্বত অঞ্চলস্থিত অরবাল হ্রদে উপস্থিত হন। কবি দণ্ডিন বলেন যে, সকল নগরের শ্রেষ্ঠ নগর ছিল পাটলিপুত্র। বুদ্ধের সময়ে ইহা একটি বৃহৎ নগর ছিল। মেগাস্থিনিস এই নগরটিকে পালিবোথ্রা নামে জানিতেন। টলেমির এবং চীন পরিব্রাজকের নিকট ইহা পালিমবোথ্রা এবং পা-লিন-ফু নামে পরিচিত। এই নগরের মধ্য দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইত। গঙ্গা, শোন এবং গণ্ডক নদীর সঙ্গমের নিকট ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। মুদ্রারাক্ষসের মতে মলয়কেতু শোন নদী পার হইয়া পাটলিপুত্রে উপস্থিত হন। সর্ব্বপ্রথমে পাটলিগ্রাম নামে ইহা মগধের একটি গ্রাম ছিল। বৃহৎ বাণিজ্যপথের সংযোগস্থলে ইহা অবস্থিত। মথুরা এবং পাটলিপুত্রের মধ্যে একটি নৌসেতু ছিল। পাটলিপুত্র হইতে তাম্রলিপ্ত পর্য্যন্ত পথটি বিন্ধ্যাটবীর মধ্যে অবস্থিত।

পাটলি বৃক্ষ হইতে পাটলিপুত্রের নামকরণ করা হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়েন এখানে আসেন। মেগাস্থিনিস বলেন যে, এই নগরে ৬৪টি দ্বার ছিল এবং ইহার প্রাচীর ৫৭০টি তোরণ দ্বারা শোভিত। ষ্ট্রাবো বলেন যে এই নগরটি কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রাচীরের দ্বারা সুরক্ষিত। বহু বর্ষ ধরিয়া ইহা একটি শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। পাণিনি, পিঙ্গল, বর্ষ, উপবর্ষ, বররুচি এবং পতঞ্জলি এখানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সুপণ্ডিত হিসাবে যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

পাটলিপুত্র পরবর্ত্তী শিশুনাগদিগের, নন্দদিগের এবং সুপ্রসিদ্ধ মৌর্য্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের রাজধানী। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে এই নগর বিখ্যাত এবং জনবহুল ছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে হূন কর্ত্তৃক আক্রমণ কাল পর্য্যন্ত এই নগর নষ্ট হয় নাই। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ নরপতি শ্রীহর্ষ পুরাতন মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের কোন চেষ্টা করেন নাই। গৌড় এবং কর্ণ-সুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রে বুদ্ধের পদচিহ্ন এবং অনেকগুলি বৌদ্ধবিহার ও মন্দির নষ্ট করেন। বাংলার পাল রাজাদিগের মধ্যে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী নরপতি ধর্ম্মপাল পাটলিপুত্রের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কালিদাস রঘুবংশে (১২,২৬) বিদেহের উল্লেখ করেন। রাজ্য এবং রাজধানীর নাম ছিল বিদেহ (রঘুবংশ, ১১,৩৬)। ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের সম্পাদন কালে মধ্যদেশের পূর্ব্ব দিকে কোশল-বিদেহেরা বাস করিত। আর্য্যদিগের ভূমির পূর্ব্বদিকে বিদেহ দেশ অবস্থিত ছিল। রাজা বিদেঘ-মাথব বা বিদেহ-মাধব হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে। এই দেশে বৈদিক সভ্যতা এবং অগ্নিতে আহুতি-দানের প্রথা প্রচলিত ছিল। মিথিলা বিদেহের রাজধানী ছিল এবং ইহার প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন জনক। বিদেহের রাজারা নিকটস্থ রাজন্যবর্গের সহিত বন্ধুত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন। বিদেহের ইতিহাসে নিকটস্থ রাজপরিবারের সহিত বিদেহ রাজাদিগের বৈবাহিকসম্পর্কের প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। জৈন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাবীর বিদেহ-বাসী ছিলেন। বিদেহের লোকেরা দানশীল ছিল। এই দেশের রাজাদিগের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল এবং এখানকার রাণী-দিগের সতীত্বের কথা সুবিদিত। মিথিলার নরপতিগণ উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। বিদেহ রাজপরিবারের ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা প্রাচীন সাহিত্য হইতে জানা যায়। রঘুবংশে (৪, ৭৬) কিরাতদিগের উল্লেখ আছে। কিরাতেরা ব্রহ্মপুত্র নদীর পূর্ব্ব উপত্যকায় বাস করিত। টলেমি বলিয়াছেন যে ইহারা উত্তরাপথে বসবাস করিত। মহাভারতে ইহাদের উল্লেখ আছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের মতে ইহারা আর্য্যসঙ্ঘের বাহিরে বাস করিত। উত্তরাপথের কিরাতেরা ব্যাধের ন্যায় ছিল। কিরাত এবং কিন্নরদিগের মধ্যে কবি উৎসব সঙ্কেত-দিগের স্থান নির্ণয় করিয়াছেন (রঘুবংশ, ৪, ৭৮)।

পশ্চিম ভারতের দেশ, জাতি প্রভৃতি

রঘুবংশের মতে (৪, ৫৩) প্রাচীন ভারতের সমগ্র অপরান্ত (পশ্চিম ভারত) জয় করিবার জন্য রঘুর সৈন্য পশ্চিম দিকে আসিয়াছিল।

রঘুবংশে (৬, ৪৩) পশ্চিম ভারতস্থিত অনূপ দেশের উল্লেখ

আছে। ইহার রাজধানী ছিল মাহিষ্মতী। হরিবংশে দেখা যায় যে, সৌরাষ্ট্রের দক্ষিণে অনূপদেশ অবস্থিত। মহাভারত হইতে জানা যায় যে, কার্ত্তবীর্য্য ও নল অনূপের নরপতি ছিলেন। নর্ম্মদা নদী তীরস্থ মাহিষ্মতীর চতুর্দ্দিকে অনূপেরা বাস করিত। শক মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামন গৌতমীপুত্রের নিকট হইতে অনেকগুলি দেশ পুনরায় জয় করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

কালিদাসের মেঘদূতে (পূর্ব্বমেঘ, ৪৭) দশপুরের উল্লেখ আছে। পশ্চিম মালবের অন্তর্গত মান্দাসোর হইতে ইহা অভিন্ন। বাণ বলেন যে, ইহা উজ্জয়িনীর নিকটে মালবে অবস্থিত। সিবানা নদীর বামদিকে প্রাচীন দশপুর বিদ্যমান। পশ্চিম মালবদিগের বা মালবগণের প্রধান নগর ছিল দশপুর। প্রাচীন গুপ্তসাম্রাজ্যের ইহা একটি উপরাজার কর্ম্মস্থান। দশপুর এবং বিদিশা দুইটি নিকটস্থ নগর। উজ্জয়িনীর ন্যায় গুপ্তযুগে ইহারা সুবিখ্যাত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্য ভাগে দশপুর হূনদিগের হস্তগত হয়। দশপুরের রাজকবি রেবানদী হইতে পারিপাত্র পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেশের একটি সুন্দর বর্ণনা কাব্যে লিখিয়াছেন।

মধ্য ভারতের দেশ প্রভৃতি

কালিদাস তাঁহার রঘুবংশে (৫, ৩৯ ; ৭, ২, ১৩, ২০) মধ্য ভারতস্থ বিদর্ভের কথা বলিয়াছেন। ইহার রাজা ভোজরাজবংশীয় ছিল। মালবিকাগ্নিমিত্রে (১ এবং ৫ অঙ্ক) ইহার উল্লেখ আছে। বিদর্ভ হইতে দুইটি রাজ্য গঠিত হয়। বরদা নদী কর্ত্তৃক ইহাদের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল (মালবিকাগ্নিমিত্র, ৫, ১৩)। বিদর্ভই বর্ত্তমানে বেরার নামে পরিচিত। পুরাণের মতে এই দেশের লোকেরা দাক্ষিণাত্যে বাস করিত। রাজা নলের রাণী দময়ন্তীর রাজধানী ছিল বিদর্ভ। ভোজপরিবারের উজ্জ্বল রত্ন পুণ্যবর্ম্মা এই দেশে বাস করিতেন। কালিদাস-বিরচিত মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক (৫, ২০) হইতে জানা যায় যে, বিদর্ভে একটি নূতন রাজ্য সংস্থাপনের সঙ্গে সুঙ্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃহদ্রথ মৌর্য্যের রাজত্ব কালে মগধ সাম্রাজ্যে দুইটি দলের সৃষ্টি হইয়াছিল। মন্ত্রীর দলের নেতা যজ্ঞসেন বিদর্ভের শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যজ্ঞসেনের জ্ঞাতিভ্রাতা কুমার মাধবসেন কারারুদ্ধ হন। শুঙ্গদিগের রাজা অগ্নিমিত্র বিদর্ভ আক্রমণ করিতে বীরসেনকে অনুরোধ করেন। যজ্ঞসেন পরাস্ত হন এবং বিদর্ভ রাজ্য দুইটি জ্ঞাতি-ভ্রাতার মধ্যে বিভক্ত হয়। নাসিক গুহার অনুশাসন মতে রাণী গৌতমী বলশ্রীর পুত্র বিদর্ভ জয় করেন।

অবন্তীর রাজধানী উজ্জয়িনীর উল্লেখ রঘুবংশে (৬, ৩২-৩৬) পাওয়া যায়। এখানে মহাকালের মন্দির ছিল। মেঘদূত (পূর্ব্বমেঘ, ২৭, ২৯) হইতে জানা যায় যে, সিপ্রা নদীর তীরে ইহা অবস্থিত। অবন্তী পশ্চিম মালব হইতে অভিন্ন। অশোকের প্রথম পৃথক শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, মহামাত্রদিগকে উজ্জয়িনীতে পাঠান হইয়াছিল। মহাভারতের মতে পশ্চিম ভারতে অবন্তীর স্থান। নর্ম্মদা নদীর তীরে অবন্তী অবস্থিত। উজ্জয়িনী বর্ত্তমানে মধ্য ভারতস্থিত গোয়ালিয়রের অন্তর্গত উজ্জেন নামে পরিচিত। অবন্তী দুই ভাগে বিভক্ত ছিল: উত্তর ও দক্ষিণ। উত্তরের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী এবং দক্ষিণের রাজধানী ছিল মাহিষ্মতী বা পালি মাহিসসতী। মৎস্যপুরাণের মতে হৈহয় বংশ হইতে অবন্তীর উৎপত্তি। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন এই বংশের একজন প্রসিদ্ধ নরপতি। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীসূত্রে এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্যে অবন্তীর উল্লেখ আছে। প্রাচীন ভারতের অবন্তী একটি মহাজনপদ। ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের একটি বৃহৎ কেন্দ্র। জৈনধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাবীর এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন। প্রদ্যোতেরা অবন্তীর রাজা ছিলেন। অবন্তীর রাজা চন্দপ্রদ্যোত বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। অবন্তী ও কৌশাম্বীর রাজপরিবার বিবাহসূত্রে আবদ্ধ ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে উজ্জয়িনী মগধের শাসনাধীনে আসে। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক অবন্তী দেশের উপরাজা ছিলেন। উজ্জয়িনীর বিখ্যাত নরপতি বিক্রমাদিত্য ভারতের অধিকাংশ স্থানে তাঁহার প্রভুত্ব স্থাপন করেন। পুরাকালে অবন্তী একটি বাণিজ্য ও শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং বলেন, উজ্জয়িনী পরিধিতে প্রায় ৬০০০ লি বিস্তৃত।

দশার্ণ এবং মালব অভিন্ন। ইহার রাজধানী ছিল বিদিশা বা ভিলসা (মেঘদূত, পূর্ব্বমেঘ, ২৪)। মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে। রামায়ণ হইতে জানা যায় যে, উৎকল এবং মেকল দেশের সহিত দশার্ণের সম্বন্ধ ছিল। দশার্ণ নদীতীরে কোন একটি স্থানে দশার্ণেরা বাস করিত। মেঘদূতের দশার্ণ দেশ এবং রামায়ণ ও পুরাণের দশার্ণ দেশ পৃথক। উইলসন সাহেব বলেন যে, পূর্ব্ব বা দক্ষিণ-পূর্ব্ব দশার্ণ মধ্যপ্রদেশের ছত্তিশগড় জেলার অংশ ছিল। পারজিটার সাহেবের মতে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সময়ে দশার্ণ যাদবদিগের একটি রাজ্য ছিল। এই দেশ অসি নির্ম্মাণের জন্য প্রসিদ্ধ। ইহা প্রাচীন ভারতের একটি মহাজনপদ।

মেঘদূত কাব্যে (পূর্ব্বমেঘ, ৪২,১) দেবগিরি ও রামগিরির উল্লেখ পাওয়া যায়। চাম্বালের নিকটে উজ্জয়িনী ও মান্দাসোরের মধ্যে দেবগিরি অবস্থিত। রামগিরি এবং রামতেক অভিন্ন।

বেত্রবতী (বর্ত্তমান বেটোয়া) নদীতীরস্থ বিদিশার উল্লেখ কালিদাসের মেঘদূতে (পূর্ব্বমেঘ, ২৪-২৫) পাওয়া যায়। বিদিশার লোকেরা বৈদিশ নামে পরিচিত। বিদিশার অপর একটি নাম ছিল বৈশ্যনগর। বৈশ্যনগর বেশনগরের পুরাতন নাম। রামচন্দ্র এই নগর শত্রুঘ্নকে দান করিয়াছিলেন। ইহা একটি সমৃদ্ধিশালী এবং জনবহুল নগর। এখানে প্রাসাদ, অট্টালিকা প্রভৃতি ছিল। প্রাচীন নগর বিদিশা গোয়ালিয়রের অন্তর্গত ভিলসা হইতে অভিন্ন। ইহা ভূপালের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে ছাব্বিশ মাইল দূরে অবস্থিত। মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে জানা যায় যে, বিদিশা অবন্তীর পশ্চিম প্রতিবেশীদিগের মধ্যে একটি। ইহা পূর্ব্ব মালবের রাজধানী ছিল। ইহা শুঙ্গ বংশের পুষ্যমিত্র এবং অগ্নিমিত্রের পশ্চিম রাজধানী। ইহাই দশার্ণ দেশের রাজধানী। অশোকের সময় হইতে এই নগর বৌদ্ধধর্ম্মের

একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল এবং পরে বৈষ্ণব ধর্ম্মের কেন্দ্রও হইয়াছিল। পশ্চিম তীরের বন্দর সকল ও পাটলিপুত্র এবং প্রতিষ্ঠান ও শ্রাবস্তীর মধ্যে চলাচলের সুবিধার জন্য ইহা প্রাধান্য লাভ করে। হস্তিদন্তের কারুকার্য্যের জন্য ইহা প্রসিদ্ধ। সাঞ্চীর কোন একটি স্থাপত্য বিদিশার হস্তিদন্ত শিল্পীর কার্য্য। স্কন্দপুরাণের মতে বিদিশা একটি তীর্থস্থান। ভিলসায় বৌদ্ধধর্ম্মগৃহ নির্ম্মাণের জন্য বিদিশার আঠার জন দাতা প্রচুর অর্থ দান করেন। বৌদ্ধ স্তূপের জন্য বিদিশা বিখ্যাত ছিল। উজ্জয়িনীতে যাইবার পথে এই নগরে অশোক বিশ্রাম লন। এখানে তিনি জনৈক শ্রেষ্ঠীর দেবী নামে যুবতী কন্যাকে বিবাহ করেন। মালবিকাগ্নিমিত্র হইতে জানা যায় যে, বিদিশার রাজা অগ্নিমিত্র বিদর্ভের রাজকন্যা মালবিকার প্রণয়াসক্ত হন। মালবিকা তখন ছদ্মবেশে অগ্নিমিত্রের রাজসভায় বাস করিত। বিদিশা ও বিদর্ভের মধ্যে একটি যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধে বিদিশা জয়লাভ করে। শুঙ্গগণ প্রথমে মৌর্য্যদিগের করদরূপে বিদিশা শাসন করিত। পুরাণের মতে শুঙ্গরাজ্যের অবসান ঘটিলে শিশুনন্দি নামে কোন এক ব্যক্তি বিদিশার শাসনকর্ত্তা হন।

কালিদাসের রঘুবংশে (১৮,১) দেখা যায় যে, রেবায়ের উত্তর-পশ্চিম দিকে নিষধ অবস্থিত। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীসূত্রে উল্লিখিত নৈষধ বিদর্ভ হইতে অদূরে অবস্থিত বলিয়া মনে হয়। উইলসন সাহেব মনে করেন যে, ইহা বিন্ধ্য ও পয়োষ্ণী নদীর নিকটে অবস্থিত। কেহ কেহ মালবের দক্ষিণে ইহার স্থান নির্ণয় করেন। মহাভারতের মতে গিরিপ্রস্থ নিষধদিগের রাজধানী ছিল। নৈষধীয়চরিতের মতে নিষধদিগের রাজা নল সুদক্ষ রথচালক ছিলেন। তিনি অশ্বদিগের স্বভাব সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিতেন।

বিনোবা

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

মহৎ কার্য্যের প্রস্তুতি

লবণ-সত্যাগ্রহ শেষ হইয়াছে। করাচী কংগ্রেসে স্থির হইয়াছে কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে গান্ধী গোল-টেবিল বৈঠকে যাইবেন। ঐ সময়ে খানদেশে মহারাষ্ট্রের রাজবন্দীদের সম্মেলন হয়। সভাপতি ছিলেন বিনোবা। সম্মেলনে তিনি যে ভাষণ দেন তাহাতে অন্য কথার মধ্যে এ কথা কয়টি ছিল :

"ফৌজী যুদ্ধে ভাগ লয় কিছু বাছাই করা লোক। কিন্তু যে স্বাধীনতা দেশের সকল শ্রেণীর লোকে লড়িয়া আনে তার মূল্য অধিক। সকলে মিলিয়া যা আনে সকলে মিলিয়া তা রক্ষা করে। এ স্বাধীনতার জন্য আমিও খাটিয়াছি এ তৃপ্তি সবাইর থাকে। সত্যাগ্রহের অহিংসা-আন্দোলন সারা দেশকে স্পর্শ করে। মহাত্মার পথ সকলকে জাগ্রত করার পথ। সকলকে তা অনুপ্রাণিত করে।"

সংগ্রামের নিবৃত্তি হইল বটে। কিন্তু নিবৃত্তি হইতে না হইতে প্রবৃত্তির তোড়জোড় চলিল। সরকার মনে করিল গান্ধী-আরউইন চুক্তি করিয়া হার হইয়াছে। সরকারের দিক হইতে এখানে-সেখানে চুক্তি-ভঙ্গের পালা চলিতেছিল। গান্ধী বিলাত হইতে ফিরিলেন। ধরপাকড় সুরু হইল। পুনরায় সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইল। বিনোবা তখন খানদেশে প্রচারকার্য্য করিতেছিলেন। সরকার তাঁহাকে জেলে পুরিল—ধুলিয়া জেলে। বিনোবা যখন যেখানে যান সে স্থান আশ্রমে পরিণত হয়, তীর্থস্বরূপ হয়। মনে পড়ে তুলসীর চতুষ্পদীর দুইটি চরণ :

> মুদ-মঙ্গলময় সন্তসমাজু।
> জো জগ জঙ্গম তীর্থরাজু।

ধুলিয়া জেল তীর্থস্বরূপ হইল। সহবন্দীরা বিনোবাকে ধরিলেন তাঁহার মুখে গীতার কথা শুনিবেন। বহু বৎসরের গীতা অধ্যয়ন ও নিদিধ্যাসনে বিনোবা যাহা পাইয়াছিলেন সহ-সত্যাগ্রহী-দের উপলক্ষ্য করিয়া তাহা তিনি ভগবানে নিবেদন করিলেন।*

রবিবারে রবিবারে তিনি গীতা সম্বন্ধে বলিতেন। আঠার রবিবারে আঠার অধ্যায় শেষ করেন। প্রবচন আরম্ভ হয় ২১শে ফেব্রুয়ারী আর শেষ হয় ১৯শে জুন। বিনোবা মুখে বলিয়া যাইতেন—মারাঠিতে। সানে গুরুজী তাহা লিখিয়া লইতেন। তাঁহার ঐ অনুলিখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ক্রমে ক্রমে ভারতের দশটি ভাষায় গীতা-প্রবচন অনূদিত হইয়াছে।

বিনোবা কোনও প্রসঙ্গে গীতা-প্রবচন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

'গীতা-প্রবচনে' পরমার্থের সকল জনোপযোগী সহজ-সুগম বিচার রয়েছে। 'স্থিতপ্রজ্ঞ-দর্শন' আরও পরের গ্রন্থ। ঐ বিষয়েরই আলোচনা এক বিশেষ দিক থেকে তাতে করা হয়েছে। 'গীতাই কোশ'[১] 'গীতাই'র সূক্ষ্ম অধ্যয়নকারীদের জন্য লিখিত। গীতা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই তিনখানিতে সংক্ষেপে সাঙ্গোপাঙ্গ বলা হয়েছে। পুস্তকগুলি তো লিখেছি। আশা করি পরমার্থের

---

* "ইহাতে আমার কিছু নাই। তাঁর জিনিস তাঁকেই সমর্পণ।" এ কথা কয়টি দিয়া বিনোবা বাংলা গীতা-প্রবচনের প্রস্তাবনা শেষ করিয়াছেন। মারাঠি গীতা প্রবচনের প্রস্তাবনায় ঠিক এ কথাই আছে :
"যাত মাঝেঁ কাঁহী চ নাহীঁ।"

১। বিনোবাকৃত অপর দুইখানি গ্রন্থ।

টাসকেণ্ট বিমানঘাঁটিতে পণ্ডিত শ্রীজবাহরলাল নেহ্‌রুর সংবর্দ্ধনা [টাস ফটো
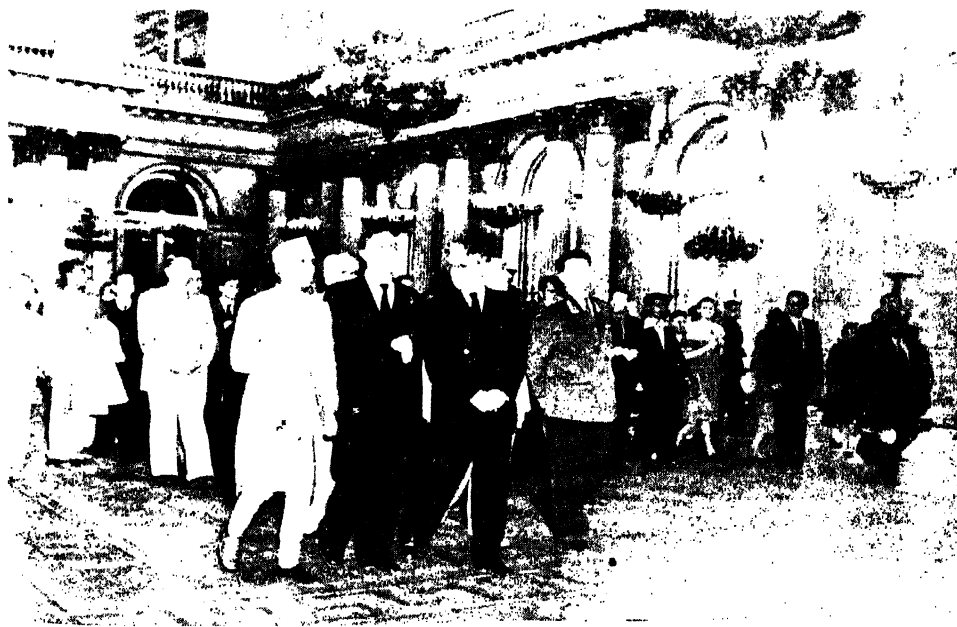
সোভিয়েট ইউনিয়নের 'ষ্টেট হারমিটেজে' প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহ্‌রু [ফটো : ভি. নস্‌কভ

ষ্টালিনগ্রাড বিমানঘাঁটিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহ্‌রু ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।
নেহ্‌রুর বাঁদিকে ষ্টালিনগ্রাড সিটি সোভিয়েটের অধ্যক্ষ মিঃ শাপুরভ [টাস ফটো
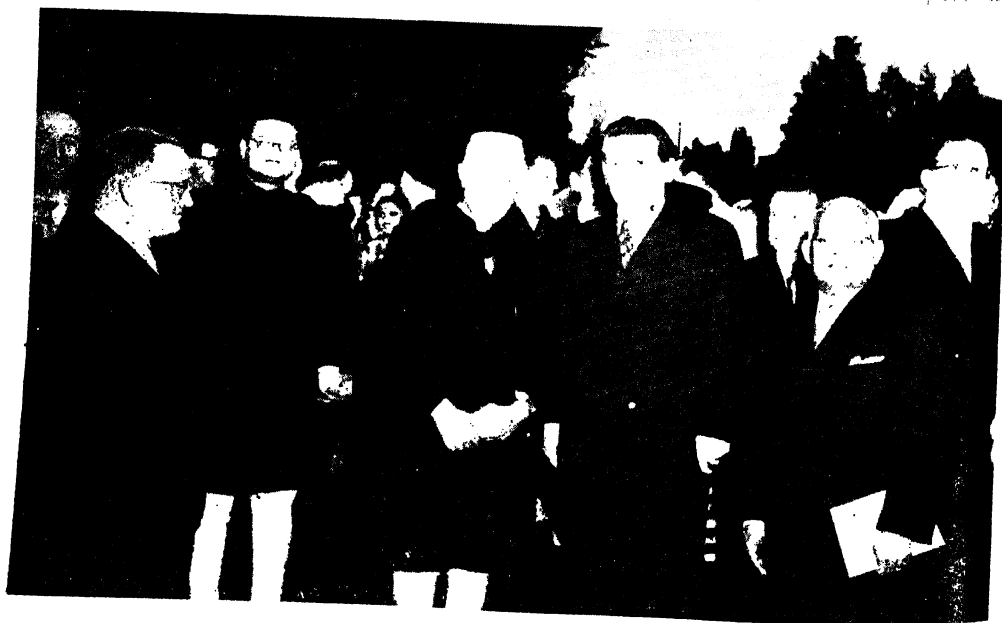
ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীধর্ম্মবীর কর্ত্তৃক শ্রীজবাহরলাল নেহ্‌রুর সংবর্দ্ধনা।
(ডান দিক হইতে) শ্রীধর্ম্মবীর, চেকোস্লোভাকিয়ার মুখ্যমন্ত্রী ভিলিয়াম সিরোকী এবং শ্রীজবাহরলাল নেহ্‌রু

জিজ্ঞাসুদের কাজে তাহা লাগবে। আর সে লাভ কারও কারও হয়েছেও। কিন্তু মুখ্যত নিজ প্রয়োজনেই ওগুলি আমি লিখেছি। সংসার-নাটক আমি দেখছি। এক জায়গায় বসেও দেখেছি আর পথ চলতে চলতেও দেখছি। অগণিত জনসমুদ্র ও তাদের নেতা, দুই-ই এক প্রবাহে ভেসে চলেছে। ইহা দেখে মনে হয় একমাত্র ঈশ্বরের চিন্তা করাতেই সার। আর সব কিছু অসার।

এ সহজ প্রবাহে লেখা। আদ্যোপান্ত পাঠ করে 'গীতা-প্রবচন' পরিপাক করা চাই। ইহার লেখন-শৈলী লৌকিক, শাস্ত্রীয় নহে। পুনরুক্তিও আছে। গায়ক যেমন অবান্তর চরণ গাইতে গাইতে নিজ প্রিয় ধুয়ায় ফিরে আসে এও তেমনি। ইহা মুদ্রিত হবে এ কথা মনে ছিল না। সানে গুরুজী সদৃশ সংস্থাগে লিখতে পটু সহৃদয় অনুলেখক যদি না মিলিত তবে বক্তা ও শ্রোতাতেই এর পরিসমাপ্তি হয়ত ঘটত। আর তার অধিক আমি আশাও করি নাই। এ প্রবচন হতে যমুনালালজী লাভবান হয়েছিলেন। বস, আমি মনে করি আশার অতীত কাজ হয়েছে। লক্ষ্য ছিল নিজ লাভ। নিজ চিন্তা সুদৃঢ় করার জন্য জপ-ভাবনা থেকে আমি বলে যেতাম। তা থেকে এত বড় ফল মিলেছে। "ঈশ্বরের তা ইচ্ছা এ ছাড়া আর কি বলা যাবে।"

মাণ্ডবী, হায়দরাবাদ
সেপ্টেম্বর ১৯৫১

—বিনোবা

'গীতা-প্রবচন' চূড়ান্ত রূপ পায় ১৯৩২ সনে। কিন্তু তাহা অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয়েছিল পনর বছর আগে ১৯১৭ সনে। বিনোবার বয়স তখন তেইশ। পদব্রজে চারিশত মাইল ব্যাপী মহারাষ্ট্র পরিভ্রমণকালে বিনোবা গীতা সম্বন্ধে পঞ্চাশটি প্রবচন দিয়াছিলেন। দুই দিনের বেশী কোন জায়গায় সাধারণতঃ থাকিতেন না। ক্বচিং কোথাও তিন-চার দিন থাকিতেন। দেখা যাইত প্রথম দিন সভায় যত লোক হইত, দ্বিতীয় দিনে তাহা অপেক্ষা অধিক লোক আসিত। দ্বিতীয় দিন অপেক্ষা তৃতীয় ও তৃতীয় দিন অপেক্ষা চতুর্থ দিনে আরও অধিক লোকের সমাগম হইত। ইহা হইতে স্বতঃই বুঝা যায় যে, প্রবচন লোকের চিত্ত স্পর্শ করিত। তাহারা আলোকের সন্ধান পাইত। সুতরাং বিনোবার গীতার জ্ঞান ও ব্যাখ্যা তখনই পরিপক্বতা লাভ করিয়াছিল।

গীতা-প্রবচনের আলোচনার আগে গীতা যে বিনোবার কাছে কি তাহা দেখিয়া লওয়া ভাল। তিনি বলিয়াছেন:

"অধিকাংশ সময় আমি গীতার আবহাওয়ায় থাকি। গীতা আমার প্রাণতত্ত্ব। কারও সঙ্গে যখন গীতার আলোচনা করি তখন আমি গীতা-সাগরে সাঁতার কাটি। আর যখন একলা, আমি তখন অমৃতসাগরে গভীর ডুব মেরে বসে যাই।"—গীতা-প্রবচন, পৃঃ ১।

প্রিয়জনকে সুখের ভাগ না দিলে, আনন্দের অংশ পরিবেশন না করিলে আমাদের সুখ জমে না, আনন্দ ঘন হয় না। পাওয়ার মধ্যে দেওয়ার তাগিদ নিহিত। বৃক্ষ ফল ধারণ করে, নিজ ভোগের জন্য নয়। দেওয়া পাওয়ার সর্ত্ত। আর সার্থকতাও তার তাতেই। গীতা বিনোবার প্রিয়তম বস্তু আর জনসাধারণ বিনোবার প্রিয়তম পরিজন। না দিয়া তাঁহার রেহাই আছে কি? তাই তিনি অমৃতের ভাগ তাহাদের দিয়াছেন, অমৃতের পাত্র সকলের কাছে খুলিয়া ধরিয়া অমৃতের নিবিড় আস্বাদ তিনি লইয়াছেন। আর তাঁহার এই দেওয়া পুষ্পফলে শোভিত হইয়াছে গীতা-প্রবচনে।

বিনোবা লিখিয়াছেন গীতা-প্রবচনের 'লিখন-শৈলী লৌকিক, শাস্ত্রীয় নহে।' তা বলিয়া শাস্ত্রার্থের হানি তিনি কোথাও ঘটান নাই। অন্য এক জায়গায় তিনি বলিয়াছেন, "শাস্ত্র-দৃষ্টি অক্ষুণ্ণ রেখেও শাস্ত্রীয় পরিভাষার ব্যবহার যথাসম্ভব কম করেছি।"

তাঁহার পূর্ব্বাচার্য্যগণ সাধারণ লোকের কাছে গীতা পৌঁছাইয়া দেন নাই, সে চেষ্টা করেন নাই। কারণও হয়ত তার ছিল। তখনও সে সময় হয় নাই। ঐ সকল মহান্ আচার্য্যের তুল্য শাস্ত্রীয় ভাষ্য লেখার যোগ্যতা ও সম্পদ তাঁহার ছিল। সেই বিভূতি তাঁহার আছে। আর তেমন শাস্ত্রীয় টীকা শুনিয়া তাঁহার কাছ হইতে পাইবেও। ঠিক শাস্ত্রীয় না হইলেও গীতা-প্রবচন মহান্। মৌলিক ত বটেই।

তাঁহার পূর্ব্বাচার্য্যদের অনেকে কোন-না-কোন 'বাদ'—দ্বৈত, অদ্বৈত—প্রতিষ্ঠার দৃষ্টিতে তাঁহাদের ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। বিনোবার দৃষ্টি কোন বাদে নিবদ্ধ নয়। তাই তাঁহার চিন্তা মুক্ত, দৃষ্টি প্রসারিত। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে, পূর্ব্বাচার্য্যগণ উচ্চ শিখরে আরোহণের সিঁড়ি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, তাই না পরবর্ত্তীদের অধিক দেখার সুযোগ মিলিয়াছে।

বিনোবার জীবনবীণার তন্ত্রী কোন সুরবিশেষে বাঁধা নহে। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধে বিনোবা বলিয়াছেন:

"জীবন মানে কেবল কর্ম্ম, কেবল ভক্তি, কেবল জ্ঞান এরূপ 'কেবল'-বাদ মানতে আমার ইচ্ছে হয় না। তদ্বিপরীত দৃষ্টি—কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের যোগরূপ সমুচ্চয়বাদও আমি মানি না; কিছু ভক্তি, কিছু জ্ঞান, কিছু কর্ম্ম এরূপ উপযোগিতাবাদও আমার ভাল লাগে না। প্রথমে কর্ম্ম, পরে ভক্তি, পরে জ্ঞান এরূপ ক্রমবাদও আমার কাছে গ্রাহ্য নয়। তিনের মিলনরূপ সামঞ্জস্যবাদেরও আমি পক্ষপাতী নহি। যা কর্ম্ম তাই ভক্তি আর তাই জ্ঞান, আমার ত একথা মনে করতে ভাল লাগে। সন্দেশের টুকরার মধুরতা, আকার ও ওজন পৃথক পৃথক বস্তু নয়।⋯সন্দেশের কোন টুকরোতে কেবল আকার, কোন টুকরোতে কেবল মধুরতা আর কোন টুকরোতে কেবল ওজন থাকে তা নয়। তদ্রূপ জীবনের প্রতি কর্ম্মে পরমার্থ ভরা থাকা চাই। প্রতি কর্ম্ম সেবাময়, প্রেমময় ও জ্ঞানময় হওয়া চাই।"—গীতা-প্রবচন, ষোড়শ অধ্যায়—দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ।

বিনোবা 'বিকর্ম্মের' এক স্বতন্ত্র অর্থ করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যকারগণ বিকর্ম্ম মানে প্রতিষিদ্ধ বা নিষিদ্ধ কর্ম্ম এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু বিনোবা বলিয়াছেন, বিকর্ম্ম মানে বিশেষ কর্ম্ম —'কর্ম্ম হইতেছে স্বধর্ম্মাচরণের বাহ্য স্থূল ক্রিয়া। এই বাহ্য কর্ম্মে চিত্তসংযোগ করাকে বিকর্ম্ম কহে।' একটু উদ্ধৃত করা যাইতেছে :

"বাহ্যত আমি কাউকে নমস্কার করি। কিন্তু ঐ বাহ্য শির-নতকরারূপ ক্রিয়ার সহিত যদি মনও নত না হয় তবে বাহ্য ক্রিয়া নিরর্থক। ভিতর বাহির এক হওয়া চাই। অনুক্ষণ জলধারা দিয়ে আমি শিবলিঙ্গের অভিষেক করতে পারি। তা বাহ্য ক্রিয়া। পরন্তু ঐ জলধারার সঙ্গে যদি মানসিক চিন্তার ধারা অখণ্ড বহিতে না থাকে তবে ঐ অভিষেকের মূল্য কি? সে স্থলে সম্মুখের ঐ শিব-লিঙ্গও পাথর আর আমিও পাথর। পাথরের সামনে পাথর উপবিষ্ট এ হবে তার অর্থ।"—চতুর্থ অধ্যায়, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ।

"কর্ম্মের সহিত মনের মিলন হওয়া চাই। কর্ম্মের সঙ্গে মনের এই যে সহযোগ তাকেই গীতা বিকর্ম্ম বলে। বাহিরের কর্ম্ম সাধারণ কর্ম্ম। আর আন্তরিক এই কর্ম্ম বিশেষ কর্ম্ম।" (চতুর্থ অধ্যায়, পঞ্চম অনুচ্ছেদ)। অপূর্ব্ব এই ব্যাখ্যা। গীতা যে শিক্ষা আমাদের দিতে চায় এই ব্যাখ্যা দ্বারা তাহা উদ্ভাসিত হইয়াছে।

অথবা অষ্টম অধ্যায়ের ২৪, ২৫ ও ২৬ শ্লোকের কথা ধরুন। এই রূপক ভেদ করা ভাষ্যকারদের পক্ষে কঠিন হইয়াছে। অনেকে ধাঁধায় পড়িয়াছেন। বিনোবা যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে এই রূপক ভেদ হইয়াছে, ধাঁধা দূর হইয়াছে। গীতা-প্রবচনের অষ্টম অধ্যায়ে শেষ দুই অনুচ্ছেদ দেখিলে তাহা বুঝা যাইবে।

গীতার ভূমিকাকে সংকলনকার অর্জ্জুন-বিষাদ-যোগ রূপ বিশেষ নাম দিয়াছেন। বিনোবা উহাকে বিষাদ-যোগ রূপ সাধারণ নাম দিয়াছেন। কারণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বিনোবা বলিয়াছেন :

"সংকলনকার গীতার ভূমিকাকে অর্জ্জুন-বিষাদ-যোগ রূপ বিশেষ নাম দিয়েছেন। আমি তাকে বিষাদ-যোগ রূপ সাধারণ নাম দিচ্ছি। কারণ গীতার পক্ষে অর্জ্জুন এক নিমিত্ত মাত্র। পন্ঢর-পুরের পাণ্ডুরঙ্গ কেবল পুণ্ডলীকের জন্য অবতার গ্রহণ করেছিলেন, তা নয়। জড়জীব আমাদের উদ্ধারের নিমিত্ত আজ হাজার বৎসর ধরে তিনি দণ্ডায়মান রয়েছেন। তদ্রূপ গীতার কৃপা অর্জ্জুনের নিমিত্ত হলেও আমাদের সকলের জন্যই তা হয়েছে। অতএব গীতার প্রথম অধ্যায়কে বিষাদ-যোগ এ সাধারণ নাম দেওয়াই শোভন হবে।"

তদ্রূপ সপ্তম অধ্যায়কে তিনি বলিয়াছেন, 'প্রপত্তিযোগ' (ঈশ্বরাভিমুখী একাগ্রতাযোগ), অষ্টমকে বলিয়াছেন, 'সাতত্য-যোগ', একাদশকে বলিয়াছেন, 'সমগ্রতাযোগ' ইত্যাদি।

এরূপ বিচারভেদ, মৌলিক বিচারভেদ আরও আছে। জিজ্ঞাসু পাঠক তাহার পরিচয় প্রায় সর্ব্বত্র পাইবেন। যোগ ও সন্ন্যাসের, সগুণ ও নির্গুণের বিশ্লেষণ পড়িতে পড়িতে অন্তর পুলকিত হয়, বিনোবার চিন্তার গভীরতা দেখিয়া বুদ্ধি স্তব্ধ হয়। কিন্তু এই বিচারভেদে কোথাও অবিনয়ের, পাণ্ডিত্যাভিমানের লেশও নাই। আছে অর্থোপলব্ধির বিনম্র প্রয়াস। এ বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাইবে নিম্ন উদ্ধৃতি হইতে :

"প্রাচীন শাস্ত্রীয় শব্দসমূহকে গীতা হামেশা নূতন অর্থে ব্যবহার করেছে। পুরাতন শব্দসমূহে নূতন অর্থের কলম বসানো বিচার-বিপ্লবের অহিংস প্রক্রিয়া। ব্যাসদেব এ প্রক্রিয়ায় সিদ্ধহস্ত। তাই গীতার শব্দসমূহ ব্যাপক সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়েছে অথচ সরল ও চির-সতেজ থেকে গিয়েছে। আর তাই জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা নিজ নিজ প্রয়োজন ও উপলব্ধি অনুসারে উহাদের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করতে পেরেছেন। নিজ নিজ দৃষ্টি থেকে ঐ সব অর্থই ঠিক হতে পারে। আর আমি মনে করি উহাদের বিরোধ না করে স্বতন্ত্র অর্থও আমরা করতে পারি।"—গীতা-প্রবচন, দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় অনুচ্ছেদ।

গীতা কর্ম্মফল ত্যাগ করিতে বলে। আর তাহা আমাদের লক্ষ্য হওয়া চাই। কিন্তু কর্ম্ম করিলে ফল ত ফলিবেই। সে ফল কি তবে ফেলিয়া দিতে হইবে? না, সে ফলও ত্যাগ করিবে—ভগবানে সমর্পণ করিবে। আর ভগবান ত তোমার চারিধারে চারিপাশে রহিয়াছেন। আমাদের জন্ম হইবার পূর্ব্বেই এই সমাজ ছিল, মা-বাপ ছিলেন, পাড়াপ্রতিবেশী ছিলেন। এই প্রবাহে আমরা জন্মগ্রহণ করি। আমাদের সেবার জন্য তাঁহারা আগে হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। অতএব ঋণের বোঝা লইয়া আমরা জন্মগ্রহণ করি। আর যথাসাধ্য সেই ঋণ পরিশোধ করাই আমাদের কর্ত্তব্য—তাহাই সধর্ম্ম। কর্ম্মফল এই সব ভগবানের সেবায় সমর্পণ করাতেই জীবন সার্থক। বিনোবা একথার উপর জোর দিয়াছেন।

গীতা-প্রবচনের প্রসঙ্গ একটু দীর্ঘ হইল। দীর্ঘ হইল তার কারণ গীতা-প্রবচনে বিনোবার জীবন প্রতিফলিত। বিনোবা বলেন, "গীতা-প্রবচনে আমি আমার জীবনোপলব্ধি ধরেছি।"

বিনোবা তাঁহার স্রষ্টার ওষ্ঠাধরে ফাঁপা মুরলী হইতে চান—মুরলী হইয়াছেন। গীতা-প্রবচনের সর্ব্বত্র বিনোবা অথচ কোথাও তাঁহার অস্তিত্ব ফোটে নাই। তাঁহার 'আমি' মরিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার 'আমি', 'আমি', 'আমি'র পালা শেষ হইয়া গিয়াছে, আছে কেবল 'তুমি', 'তুমি', 'তুমি' ছন্দে স্রষ্টার যশোবন্দনার বাসনা।

দাদুর সেই মধুর বচন উল্লেখ করিয়া বিনোবা তাঁহার গীতা-প্রবচন শেষ করিয়াছেন :

"বকরী জীবিত দশায় "মেঁ মেঁ মেঁ"—"আমি আমি আমি বলে।" মরে গেলে তার তাঁত পিঞ্জনে চড়ে, "তুহী তুহী তুহী—তুহী তুহী তুহী" বলে। তখন ত সব "তুহী···তুহী···তুহী।"

২

বিনোবা কারাগার হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার দৃষ্টি পড়িল গাঁয়ের দিকে। তিনি উপলব্ধি করিলেন শহরে থাকিয়া মধ্যে মধ্যে গাঁয়ে ঘুরিয়া আসিলে গ্রামের উন্নতি হইবার নয়। গাঁয়ের দুর্দ্দশা ঘুচাইতে হইলে গাঁয়ে বসা চাই। এ ভাব তাঁহাকে পাইয়া বসিল।

আর ওদিকে, ওয়ার্দ্ধায় আসার পরে পূর্ণ এক যুগ কাটিয়া গিয়াছে। যুগ-পরিবর্ত্তনে জীবনেও রূপান্তর ঘটে। জীবনের রূপান্তর কর্ম্মে প্রতিফলিত হওয়া চাই। বিনোবা স্থির করিলেন নূতন পরিবেশে নূতনভাবে কাজ আরম্ভ করিবেন। স্থির করিলেন নালবাড়ীতে গিয়া বসিবেন। নালবাড়ী একেবারে ষোল-আনা হরিজন পল্লী। বিনোবা তাঁহার সংকল্প গান্ধীকে জানাইলেন। বিনোবা ও গান্ধীর মধ্যে ঐ সময়ে যে সব পত্রের বিনিময় হয় তাহা হইতে বিনোবা-জীবনের ঐ সময়কার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইবে। পত্র মহাদেব ভাইয়ের ডায়েরি হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :

১৯-৯-৩২

বিনোবার পত্র এ সময়ে এল। তাতে তাঁর গ্রাম-প্রচারের বিবরণ ছিল। "কলিঃ শয়ানো ভবতি" এ উক্তি করে কৃতযুগে (সত্য যুগে) ভ্রমণ ধর্ম্ম পালন করতে হইবে আর আমাদের কৃতযুগী হতে হবে, এ ভাব তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। বাপু তার উত্তরে লিখিলেন :

কৃতযুগী বিনোবা,

তোমার কৃতযুগের ঈর্ষা করার কোনই হেতু আমাদের নেই। কারণ আমাদের এখানেও কৃতযুগী সরদার আছেন। অতএব (আমরা) তোমা অপেক্ষা অন্ততঃ এক বিঘৎ আগে বেড়ে আছি। নয় কি? তুমি জান যে, সরদার বেশীর ভাগ সময় ভ্রমণ করেন। যদি সম্ভব হ'ত গেতেনও তিনি চলতে চলতে আর সূতাও কাটতেন চলতে চলতে। বৃদ্ধ বয়সে ঘুরতে ঘুরতে তিনি গীতা আবৃত্তি করেন। উচ্চারণের জন্যে তাঁকে তোমার কাছে পাঠাতে হয়, আর তোমায় হাতে দিতে হয় এক গাছি বেত। কিন্তু সে অবসর তাঁর থাকল না।

দেখছি, গরীবদের ফুসলাতে তুমি ওস্তাদ! আমার মত গরীব যখন তোমার পত্রের প্রতীক্ষায় থাকে তখন ত তাকে লিখতে নাই। আর যখন সে মৃত্যুশয্যা নিতে যাবে তখন তাকে লিখবে—এখন থেকে লিখব, নিয়মিত পত্র দেব। কিন্তু অন্তর্যামী সাক্ষী, কৃতযুগীদের কোন প্রতিজ্ঞা মিথ্যা যায় না। তাই পাছে তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় এজন্যই হয়ত বিছানা থেকে আমায় উঠতে হবে। যাক নিয়মিত তোমার পত্র পাব এ আশায় থাকছি।

পরিহাসচ্ছলে গুরুগম্ভীর পত্র লিখছি। পরিহাস থেকে মন সরিয়ে নিচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে মনকে বললাম, তোমার কাজের কোথাও কিছু সমালোচনা করার মত নেই। বলতে যদি কিছু হয়ই ত একথাই বলব যে, তোমার এই অগ্নি-পরীক্ষায় জীব ও শিব এ দুয়ের মিলন ঘটবে। আর কিছু লেখার থাকে ত পরে লিখব। পত্র এখানে শেষ করছি।

*　　*　　*

বিনোবার কাছ থেকে হৃদয়স্পর্শী পত্র এল :

১-১-৩৩

পূজ্য বাপুজীর পবিত্র সমীপে,

'নালবাড়ী ওয়ার্দ্ধা থেকে দেড় মাইল দূরের একটি গ্রাম। অধিবাসী সবই হরিজন। ২৫শে তারিখ হরি-ভরসা করে ও-গ্রামে যেয়ে বসছি। ওয়ার্দ্ধা আশ্রমের (প্রতিষ্ঠার) বার বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে। এক সত্র* সমাপ্ত হ'ল। উত্তম অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে। কর্ত্তৃত্বের ভাব দূর হয়ে গেছে। একমাত্র ঈশ্বরই আছেন এ বোধ জাগ্রত হয়েছে। এতদিন ওয়ার্দ্ধায় থাকতাম না, থেকেছি আপনার আশ্রয়ে। আপনার আশীর্ব্বাদ ছাড়া এ জগতে আর সব শূন্য। একথা বলতে পারি যে, এই বার বছর সকল ব্রত পালন করার সতত চেষ্টা করেছি। তা হলেও আমাতে বহু অপূর্ণতা রয়েছে। ঈশ্বরে আমার যতটা ভক্তি তা অপেক্ষা ঢের বেশী কৃপা তাঁর আমি লাভ করেছি।

আপনার আশীর্ব্বাদ আমাকে ওতপ্রোত করে রেখেছে তা জানি। তবুও সে আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করার জন্যই এ পত্র লিখছি। আপনার তুচ্ছ কর্ম্মীর ওপর দৃষ্টি রাখবেন। আপনার মহাযজ্ঞে আহুতি হওয়ার যোগ্যতা ঈশ্বরের কাছ থেকে তাঁকে নিয়ে দিন। ভবিষ্যতের জন্য কোন নির্দ্দেশ দেওয়ার থাকে ত দেবেন।'

—বিনোবার দণ্ডবৎ প্রণাম

বিনোবার বজ্র অপেক্ষা কঠিন অথচ কুসুম অপেক্ষা কোমল। হৃদয় থেকে নির্গত সুমন অপেক্ষা মধুর আর কি হতে পারে? 'ধর্ম্মমনিমীন' শীর্ষক ভজন গাইতে গাইতে অনেক সময় বাপুর ভক্তমালের মণি গণনা করার সাধ আমায় হয়। আর তাঁদের মধ্যে তপোধন বিনোবাকে নিঃসংশয়ে আমি বিশেষ স্থান দিয়ে থাকি। এরূপ মানুষ যতদিন থাকবে ততদিন বাপুর পতাকা উড্ডীন থাকবে, এতে সন্দেহ মাত্র নেই। দুর্গত হরিজনদের ক'জন আর বিনাবাকে চেনে! হরিজনেরা না চিনলে কি হয়, হরি চেনেন! তবে আর ভাবনা কোথা?

এই পত্রের উত্তরে বাপু বাৎসল্যভরে অশ্রু-আর্দ্র পত্র লিখিলেন :

চিরঞ্জীব বিনোবা,

তোমার ভক্তি ও শ্রদ্ধায় চোখ আনন্দাশ্রুতে সিক্ত হয়। তার যোগ্য আমি হতে পারি, নাও হতে পারি। কিন্তু তোমাতে তা ফলপ্রসূ হবেই হবে। তোমা দ্বারা মহৎ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হবে। নালবাড়ী গিয়েছ। তা ঠিকই হয়েছে।

ভবিষ্যতের কথায় এ মুহূর্তে একথাই কেবল বলব যে, দুধ ছাড়ার জেদ না করে শরীর রক্ষার দিকে মন দেবে। অস্পৃশ্যতা-নিবারণাদি কাজ আজিকার স্বধর্ম্ম কর্ম্ম। আমি যা লিখি সময় করে তা পড়বে। বেশী ত লিখি না। পত্র দিতে ভুলবে না। সপ্তাহে একখানা পেলেই তুষ্ট।

—বাপুর আশীর্ব্বাদ

বিনোবা ওয়ার্দ্ধা ছাড়িলেন। নালবাড়ী গেলেন। এক সত্র সমাপ্ত হইল।

৩

আর এক সত্র আরম্ভ হইল। এক যুগের সাধনায় ওয়ার্দ্ধার আশপাশে গান্ধীর আঠার দফা গঠন কর্ম্মের—চর্ম্মশালা হইতে

* সত্র—বহুদিন ব্যাপী যজ্ঞ।

কুষ্ঠাশ্রম পর্য্যন্ত—প্রায় সকল গঠন কর্ম্মের কেন্দ্র গড়িয়া উঠিল, নিবিড় কর্ম্ম চলিতে লাগিল। ১৯৩২ সালের সংগ্রাম শেষ হইয়াছে। স্বরাজ লাভ হয় নাই। গান্ধী সবরমতি আশ্রমে ফিরিয়া যাইবেন না। যান কোথায়? গান্ধী বিনোবাকে সবরমতি আশ্রমে টানিয়াছিলেন। বিনোবাসৃষ্ট গঠন কর্ম্মের চক্রনাভি ওয়ার্দ্ধা গান্ধীকে ওয়ার্দ্ধা আশ্রমে আকর্ষণ করিল। গান্ধী ওয়ার্দ্ধায় আসিলেন। বিনোবার ওয়ার্দ্ধা গান্ধীর ওয়ার্দ্ধা হইল।

১৯৩৩ সন। গান্ধী ম্যাক্‌ডোনাল্ড রোয়েদাদের বিরুদ্ধে জীবনপণ উপবাস গ্রহণ করিলেন। উপবাস করার আগে তিনি অনেকের মতামত-নির্ণয় করিয়া লইয়াছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদ চাহিয়াছিলেন। তবুও অনেকে উপবাস ত্যাগের জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন। তাঁহাদের অনুরোধের উত্তরে গান্ধী যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এই:

"বিনোবা যদি বলে আমার ভুল হয়েছে ত বুঝব আমার ভুল হয়েছে। সে স্থলে উপবাস ত্যাগ করব।"

গান্ধীর দৃষ্টি উত্তরোত্তর গাঁয়ের দিকে পড়িতেছিল। তিনি অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন কংগ্রেসের অধিবেশন গ্রামে হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্থিরও হইল তাহাই। পালা ছিল মহারাষ্ট্রের। মহারাষ্ট্র অধিবেশনের স্থান নির্ব্বাচন করিল ফৈজপুর গ্রামে। দৌড়ঝাঁপ, ছুটাছুটি করার লোক ত চাই-ই। তেমন লোক পাওয়া কঠিন নয়। এক জায়গায় অনন্যচিত্তে বসিয়া কাজ করার লোক বেশী মিলে না, আর সহজেও মিলে না। মহারাষ্ট্রের কংগ্রেসকর্ম্মীরা বিনোবার শরণ লইলেন। তাঁহার হস্তে 'তিলকনগরের' ভিত্তি সংস্থাপিত হইল। ঝড়-বাদল ও অপর বাধা পদে পদে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে লাগিল। বিঘ্ন-সন্তোষী লোকেরা বলিতে লাগিল, "ফৈজপুর ফজীতপুর (মারাঠী ফজীত=দুর্দ্দশা) হবে।" সহকর্ম্মীরা দমিয়া যাইতেন। বিনোবা ধীর, স্থির, অনুদ্বিগ্ন। তাঁহাকে দেখিয়া দ্রুত বল তাঁহারা ফিরিয়া পাইতেন। বিনোবার সংকল্পপ্রভাবে ফৈজপুর ফত্তেপুর (মারাঠী ফত্তে তথা বাংলা ফতে=জয়, সিদ্ধি) হইল।

বিনোবা ছিলেন গান্ধীর গবেষণাগার (লেবরেটরি)। ঐ সময়ে বিনোবা তকলীর গতি বৃদ্ধির দিকে মন দেন। দিনে আট ঘণ্টা তকলী কাটিতেন। ডান হাত অবসাদগ্রস্ত হইত। গতি কমিয়া যাইত। তাই তিনি উভয় হাতে তকলী ও চরখা অভ্যাস করিয়াছিলেন। এই পরীক্ষা দুই-এক মাস নয়, বৎসর কয়েক চলিল। গান্ধী লক্ষ্য করিয়া যাইতেছিলেন। একদিন তিনি বিনোবাকে মজুরি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন আর নিম্ন কথোপকথন তাঁহাদের মধ্যে হইল:

"তুমি আট ঘণ্টা সুতা কাট। চরখা-সঙ্ঘ যে মজুরি দেয় সে হারে তোমার মজুরি কত হয়?

দু' আনা।

তোমার দৈনিক খরচ?

আট আনা।

তার মানে মজুরির এ হারে ভাল কাটুনীরও পেট ঠিক চলে না।"

গান্ধী আদেশ দিলেন আট ঘণ্টার মজুরি বাবদ কাটুনীকে অন্ততঃ আট আনা মজুরি দিতে হইবে। গান্ধী বলিলেন খাদির দাম বাড়ে বাড়ুক তা বলিয়া তত্ত্বভ্রষ্ট হওয়া চলিবে না। সর্ব্বোদয় চায় আয়ের ব্যবধান যথাসম্ভব কমাইতে। একদিকে বিনা শ্রম ও অতি ভোজনে শরীর নাশ আর একদিকে অতি শ্রম ও পুষ্টির অভাবে শরীর পাত। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যই চরখা ও চরখা-সঙ্ঘের জন্ম। অতএব মজুরি বাড়াইতেই হইবে।

কিন্তু এই পরীক্ষায় অগ্রসর হয় কে? চরখা-সঙ্ঘের বিভিন্ন প্রাদেশিক শাখা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। বিনোবা আগাইয়া আসিলেন। মহারাষ্ট্র চরখা-সঙ্ঘ এ পরীক্ষা চালাইল।

গান্ধী থাকিতেন সেবাগ্রামে। বিনোবা ছিলেন নালবাড়ীতে। দূরের গ্রাম নয়, প্রায় লাগালাগি—পাশাপাশি। তবুও বিনোবা গান্ধীর কাছে বড় একটা আসিতেন না। নিবিড় ভক্তির পরিচয় কাজে, সান্নিধ্য লাভের ব্যাকুলতায় নয়। গান্ধী বিনোবাকে জানিতেন। জরুরী পরামর্শের দরকার হইলে স্বয়ং তিনি বিনোবা সকাশে যাইতেন। প্রবাসে গান্ধী বিনোবার পত্রের প্রতীক্ষা করিতেন।

এ সময়ে বিনোবা বড় রোগা হইয়া যান। তাঁহার ওজন কমিয়া মাত্র নব্বই পাউণ্ডে আসিয়া দাঁড়ায়। গান্ধীর কানে এ খবর গেল। গান্ধী তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "দেখছি, আমাকে তোমার ওখানে গিয়ে থাকতে হবে।" বিনোবা মাস তিনেকের সময় চাহিলেন। গীতার নিদিধ্যাসনের ফলে দেহ ক্ষণভঙ্গুর, আত্মা অবিনাশী, স্বধর্ম্ম অলঙ্ঘনীয় এ ভাব তাঁহাকে একান্তভাবে পাইয়া বসিল। দেহ সাধন আর যতদিন তাহা আছে নিরন্তর তাহা হইতে কাজ লওয়া চাই। দেহ হইতে বিনোবা কেবলই কাজ লইতেছিলেন। যন্ত্রে তৈল দিতে হয়, কয়লা দিতে হয়—এ কথাটা তাঁহার ভুল হইয়া গিয়াছিল। গান্ধীর পত্রে তাঁহার হুঁশ হইল। কর্ত্তব্যের ইঙ্গিত পাইলেন। নিয়মিতভাবে মাটি কোপাইতে লাগিলেন আর পুষ্টির উপযোগী খাদ্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন। চার-পাঁচ মাসে ওজন বাড়িয়া একশত চল্লিশ পাউণ্ড হইল।

বিনোবা গান্ধীর একনিষ্ঠ অনুসারী ত বটেনই। তবুও তিনি স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দেন নাই। আর গান্ধী চাহিতেন তাহাই। গোষ্ঠীর গণ্ডির মধ্যে বিনোবার ভাবনা নিবদ্ধ নয়*। মার্ক্সবাদের প্রভাব আ[illegible]

* জীবে জীবের সমাবেশ, আত্মায় আত্মার মিলন, এরূপ আমরা করি কি? নিজ আত্ম-হংসকে পিঞ্জরের বাহিরের হাওয়া খাওয়াই কি? নিজ গণ্ডি বলিয়া যাকে জানি সেই গণ্ডি ভেদ করিয়া আগামীকাল নূতন দশ জন বন্ধু বানাইব একথা কখনও মনে হয় কি? আজ পনর, কাল পঞ্চাশ হইবে। আর পরিধি এভাবে বাড়িতে বাড়িতে সমস্ত বিশ্বই আমার আর আমি সমস্ত বিশ্বের এই অনুভব করিতে থাকিব।

—গীতা-প্রবচন, পৃঃ ১৬। প্রথম সংস্করণ

দুনিয়ায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মার্ক্সের বিচারপ্রভাবে শ্রমিক সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে। বিনোবা এ সময়ে সাম্যবাদীদের বেদ ক্যাপিটাল পড়েন। মার্ক্সের তত্ত্ব নিজ কষ্টিপাথরে* কষিয়া দেখেন। বিনোবা এক জায়গায় লিখিয়াছেন :

"চিন্তন থেকে পরীক্ষা আর পরীক্ষা থেকে চিন্তন এ ছাঁচে আমার জীবন গড়া। একে আমি নিদিধ্যাস বলি। নিদিধ্যাস থেকে বিচারের স্ফূর্তি হতে থাকে।"—বিচার-পোথী

৪

নালবাড়ীর সাধনা সিদ্ধ হইল। সেখানকার নানা কর্ম্ম সুগঠিত হইল। বিনোবা নালবাড়ী ত্যাগ করিলেন। শহর হইতে আরও একটু দূরের গ্রামের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। বিনোবা পৌনারে গিয়া বসিলেন। পৌনার ওয়ার্দ্ধা হইতে পাঁচ মাইল। ধাম নদীর তীরে। গ্রামের বেকারদের অন্নসংস্থানের প্রয়াস সুরু হইল। আর একদিকে সুরু হইল আরবী অধ্যয়ন। গীতা বিনোবা কবেই জীর্ণ করিয়াছিলেন। বাইবেলও† তিনি ইতিপূর্ব্বে শ্রদ্ধাভরে, অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন। বাকী ছিল ইসলামের ধর্ম্মগ্রন্থ কোরান। প্রতিবেশীর ধর্ম্মগ্রন্থের পরিচয় না থাকিলে প্রতিবেশীকে ঠিক জানা যায় না, তাহার হৃদয়ের সহিত সংযোগ সাধিত হয় না। বিনোবা আরবী শিখিলেন। মূল আরবীতে কোরান পাঠ করিলেন। আর ছয় মাস মধ্যে নিখুঁত শুদ্ধ উচ্চারণে অল ফতেমা আবৃত্তি করিতে সক্ষম হইলেন।

১৯৩৭ সনে বা তার কাছাকাছি বিনোবার বিচারপোথী রচিত হয়। বিচারপোথীতে ৭৩৬টি খণ্ড চিন্তা আছে। বিনোবার কথায় বিচারপোথীর পরিচয় এই :

"...নিদিধ্যাসন হতে চিন্তার স্ফুরণ হয়ে থাকে। সে সব চিন্তা লিপিবদ্ধ করার বৃত্তি সাধারণতঃ আমার নয়। কিন্তু মনের এক বিশেষ অবস্থায় এ বৃত্তির উন্মেষ হয়েছিল। সব চিন্তা লিপিবদ্ধ করেছি তা নয়। দু'চারটি লিখতাম। তা থেকে এ বিচারপোথী হয়েছে। সৌভাগ্যের কথা এ প্রেরণা অনেক দিন স্থায়ী হয় নি। অল্প দিন মধ্যে তা মিলিয়ে যায়।

"বিচারপোথী ছাপার কল্পনা ছিল না। তাই তাহা 'পোথী'। আর চিন্তা ও বেশ খানিকটা স্ব-সংবেদ্য ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। তা হলেও জিজ্ঞাসু লোকেরা পোথীর নকল করতে আরম্ভ করেন। বার বছরে দেড়শত প্রতিলিপি এভাবে লেখা হয়। কিন্তু আজকাল অশুদ্ধ লেখার ও বিশ্রী অক্ষরের প্রচলন হওয়ার দরুন আর সকলের পক্ষে মূল পোথী সুলভ ছিল না বলে প্রতিলিপিতে অপপাঠ দেখা দিতে থাকে। ফলে কতক বচন অর্থহীন হয়ে যায়। তাই শেষটায় মুদ্রিত আকারে ইহা প্রকাশ করতে হয়।

"চিন্তাগুলি সুভাষিতের তুল্য নয়। সুভাষিতের জন্য চাই আকার। এগুলি তো প্রায় নিরাকার। সূত্রের মতও এগুলি নয়। সূত্র তর্কবদ্ধ হওয়া চাই। এগুলি মুক্ত। তবে এগুলিকে কি বলা যাবে? আমি এগুলিকে অস্ফুট গুঞ্জন বলি।

"পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রুতি তো এই চিন্তাসমূহের অবলম্বন বটেই। তা হলেও এগুলি আপন ঢঙে নিরালম্ব। জ্ঞানদেবের পরিভাষায় বক্তা যদি কমাই হয় তো একে বাচাঋণ (অধ্যয়ন-ঋণ) পরিশোধ করা প্রযত্ন বলা যেতে পারে।"

গান্ধীর স্বপ্ন ছিল নূতন সমাজ গড়িবেন—সর্ব্বোদয়ের প্রতিষ্ঠা করিবেন। সর্ব্বোদয়ের মানে কাহারও উদয় অপর কাহারও অস্ত যাওয়া নয়। সর্ব্বোদয় মানে সকলের উদয়। ইহা জীবন-আদর্শের আমূল বিবর্ত্তনের কথা। এ সভ্যতা বাতিল করিয়া দেওয়ার কথা আর তার স্থলে নূতন সভ্যতা গড়ার কথা। পুরাতন ছাঁচে নূতন সমাজ গড়া যায় না। নূতন সমাজ গড়ার জন্য চাই নূতন ছাঁচ, নূতন মানুষ। সেই নূতন ছাঁচ গড়ার জন্য, সেই নূতন মন ও নূতন মানুষ সৃষ্টির জন্য গান্ধী নূতন শিক্ষার কথা ভাবিলেন। নয়ী তালিমের পরিকল্পনা দেশের কাছে ধরিলেন। নয়ী তালিম মানে উৎপাদনশীল শ্রমের মাধ্যমে, জীবনকর্ম্মের মাধ্যমে শিক্ষা দান—নূতন সমাজের কাঠামো রচনা। এই পরিকল্পনাকে রূপ দিবে কে? গান্ধী বিনোবার দিকে ফিরিলেন। বিনোবা নয়ী তালিমের শাস্ত্র রচনা করিলেন। বিনোবা নয়ী তালিমকে ভিত্তি প্রদান করিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। বলা-নাই, কওয়া-নাই, ভারতবাসীর পরামর্শ গ্রহণ করা নাই, বড়লাট ভারতকে যুদ্ধে লিপ্ত করিয়া দিলেন। ফ্রান্সের পতন হইল। কংগ্রেসের নেতারা ভাবিলেন এবার সুযোগ উপস্থিত। ভারতকে স্বাধীনতা না দিয়া ইংলণ্ডের উপায় নাই। গান্ধীর উপদেশ উপেক্ষা করিয়া কংগ্রেস পুনাতে প্রস্তাব গ্রহণ করিল যে, ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিলে কংগ্রেস যুদ্ধে সহায়তা করিবে। কংগ্রেস আগ্রহে হাত বাড়াইল, ব্রিটেন অনাগ্রহে তাহা প্রত্যাখ্যান করিল। নেতৃবৃন্দ ফাঁপরে পড়িলেন। জাত ও কুল দুই-ই যায়! তাঁহারা গান্ধীর শরণ লইলেন। গান্ধী তাঁহাদের মুখ বাঁচাইলেন, দেশের সম্মান বাঁচাইলেন। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের প্রবর্ত্তন করিলেন। কংগ্রেস স্ব-মর্য্যাদায় পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রথম সত্যাগ্রহী হওয়ার গৌরব কাহাকে বরণ করিল? গৌরব যে চায় না সেই বিনোবাকে। মহাদেব ভাইয়ের কথায় তাহা বলা যাইতেছে :

---

* কমুনিষ্টদের কোন প্রশ্নের উত্তর-দান প্রসঙ্গে বিনোবা বলিয়াছেন : বিপ্লব সাধনের নিজস্ব ধারা ভারতের আছে। নিজস্ব তত্ত্বজ্ঞান আছে। ভারতের নিজস্ব মিশন আছে। হিন্দুস্থানে কি প্রকার বিপ্লব হইবে তাহা আমি কমুনিষ্টদের অপেক্ষা ভাল জানি। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া গান্ধী পর্য্যন্ত সকল বিচার আমি মন্থন করিয়া খাইয়াছি।

† এক সময়ে বাইবেলের উপর বিনোবা একান্ত বিরূপ ছিলেন। বাইবেলকে তখন বিনোবা ইংরেজ শাসন ও শোষণের প্রতীক মনে করিতেন। যে সময়ের ঘটনা, তখন তিনি প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেন। তাঁহার কোন বন্ধু গীর্জ্জায় গিয়াছিলেন। একখানি বাইবেল লইয়া ফিরিয়া আসেন। বিনোবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বই ওখানি?" বন্ধু বলিলেন, "বাইবেল।" বিনোবা বন্ধুর হাত হইতে বাইবেলখানি লইয়া নদীতে ফেলিয়া দেন।

"প্রসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা যাঁর মনে আদৌ নাই তাঁকে গান্ধীজী অপরিসীম প্রসিদ্ধি দিলেন। কিন্তু এই প্রসিদ্ধি থেকে পদ্মপত্রের মত নির্লিপ্ত থাকার শক্তি বিনোবাতে যেমন আছে আর কোন লোকে তা নাই। আজ তাঁর (বিনোবার) বিশেষ পরিচয় নাই। বিশেষ প্রভাবও তাঁর নাই। কিন্তু একদিন লোকে তা দেখতে পাবে। কোন কিছু নিশ্চয় করেন তো সঙ্গে সঙ্গে সে নিশ্চয়কে কাজে পরিণত করার প্রযত্ন তিনি করেন। এ তাঁর বিশেষ গুণ। নিত্য নূতন বিকাশ করব এরূপ সংকল্প বেশী লোকের নাই। গান্ধীর পরে এক বিনোবাতেই আমি সে গুণ দেখতে পাই।"

আর বিনোবা নিজে কি দৃষ্টিতে এই নির্বাচনকে দেখিয়াছিলেন তাঁহার কথা উদ্ধৃত করি:

"আজ সেই দিন—১৭ই অক্টোবর। বার বছর হয়েছে। বাপুর আদেশে ঐ দিন প্রথম সত্যাগ্রহীরূপে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেছিলাম। তখন আমার চৈতন্ত হয় যে এ দেশের প্রতি-নিধিত্ব আমায় করতে হবে। আর সেদিন থেকে ভারতের জন-সাধারণের সহিত একরূপ হওয়ার নিমিত্তে ভারতের সকল ভাষা আমি অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করি। আজিকার দিন আমার পক্ষে গুরুত্বের দিন।"—মসরথ (বিহার) নামক স্থানে ১৭ই অক্টোবর ১৯৫২ সনে প্রার্থনা-প্রবচন হইতে।

তাম্রলিপ্ত

রওশান আলি শাহ্

বক্ষে তোমার স্বাক্ষর কার? চিহ্ন রেখেছে দূর অতীত
ধুলায় ধুলায় চূর্ণ প্রাকার কত না প্রাচীন প্রাসাদ-ভিত।
পথে প্রান্তরে অণুতে, রেণুতে
ঝাউ-দেবদারু কুঞ্জে, বেণুতে
মর্মরি' জাগে দিবস-নিশায় তাম্রধ্বজ রাজার গীত।

চরণপ্রান্ত চুম্বিয়া যেত একদা সফেণ সাগরনীর
যাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও হতে আমদানী হ'ত কত তরীর,
বন্দরে বাঁধা অর্ণবযান
অম্বরে ওঠে বুদ্ধের গান
সৈকতে সেনা সজ্জিত নিয়ে দাঁড়ায়ে থাকিত শত শিবির।

পুণ্য প্রজ্ঞা আলোক-কিরণ হ'ত বিকীর্ণ সুদূর চীন
হুয়েন-চোয়াং ধন্য হয়েছে এ পূত মাটিতে বাজায়ে বীণ।
ভক্তিমানেরা খুঁজে পেলো দিশা
শক্তিশালীর মিটেছে জিগীষা
কত ভাঙ্গা-গড়া, ওলট-পালট, এলো আর কত হ'ল বিলীন।

বৌদ্ধেরা নিলো বিদায়, চৈত্যে পুনরায় হ'ল দেব-আসন
শাক্ত, শৈব এলো প্রাক্তন নূতন করিয়া দিতে ভাষণ।
প্রেমের বন্যা নিয়ে এলো গোরা
রুক্ষ মরুতে নেমে এলো ঝোরা
নীলাচলগামী ভেঙ্গে দিয়ে গেল ভেদাভেদ-নীতি-অনুশাসন।

কোথা সে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত নিয়ে বিশাল বারিধি যার
আজি চুপসানো রূপনারায়ণ নিঃসাড়ে দেখে স্বপ্ন কার!
কোথা বন্দর সে উপনিবেশ
কালের চাকায় হ'য়ে গেছে শেষ;
মানুষের লেখা ইতিহাস বলো কতটুকু লিখে রেখেছে তার।

চক্রাবর্ত্ত দিন

শ্রীহেনা হালদার

তোমাকেই ঘিরে ঘিরে দিনগুলি আবর্তিত হয়,
যৌবনের চক্রতীর্থ পথে পথে: বিলম্বিত লয়
কোনো চেনা সুরের মতন।
বার বার কর উত্তরণ
সুরের সনেটবাহী চৌদ্দ ডিঙা মধুকর নামে
প্রাণের নির্জ্জন ঘাটে—
সেই খানে বেলা কাটে।
বিপুল নিমেষগুলি সাম্প্রতের আবরণ ফেলে
আপনাকে দেয় মেলে
প্রগল্‌ভ রঙীন কল্পনাতে
দীপ্ত সূর্য্যমুখী দিন মিশে যায় চন্দ্রমল্লী রাতে।
স্বপ্নের ময়ূরপঙ্খী ছেড়ে চলে শ্রাবস্তী বিদিশা
পিছু ডাকে: স্বাতী শতভিষা
অনুরাধা আর অরুন্ধতী
ইতিহাস লিখে যায় অজন্তা-ইলোরা-ধারাবতী।
চন্দ্রের অদৃশ্য টানে চিত্রা নক্ষত্রের মত:
অবন্ধনা প্রেমে,
রাতের গুণ্ঠন খসা অনাদৃত সুরের সিঁড়িতে
এলে তুমি নেমে।
বসন্ত-তিলক ছন্দে, অনুষ্টুপ্, মন্দাক্রান্তা তালে
লিখেছ যে রূপকথা, শিলালিপি-কালের কপালে
সপ্তর্ষির কক্ষপথে রাত্রির বিনিদ্র সপ্তস্বরা,
তোমার চলার পথে
রেখে যাবে সাত্ত্বিক প্রহরা।

পুতুল

শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ণিমার স্বর্ণময় চাঁদেও একটুখানি কলঙ্করেখা আছে। ঢলঢলে স্থলপদ্মের ভেতর বাসা করে কয়েকটা খুদে কীট। এই বোধ করি প্রাকৃতিক নিয়ম। অমোঘ, অদৃষ্টের মতো দুরতিক্রম্য।

পুতুল কিন্তু জানত না বাহির-বিশ্বের এ-সব কীট-কলঙ্কের কথা। আর জানবার সময়ই-বা ছিল কোথায়? সকাল-সন্ধ্যা বাস-ট্রামের পাশে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করা, তার পর বস্তির টিনপেটা খুপরিতে ঘণ্টাকয়েক শুয়ে পড়া। ঘুম ঠিক নয়, বিস্মৃতি-শয়ান। সেখানে ফুল ফুটত না, চাঁদ উঠত না। আহ্নিক জীবন কঠিন লৌহাবর্তে ঘুরে চলত, বৈচিত্র্যহীন, সম্ভ্রমহীন, বেপরোয়া জীবন। কখন কি হয়ে গেল, পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখবার প্রবৃত্তি হয় নি। জ্বালাময় বর্তমান মুহূর্ত সবকিছু পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিত। বর্তমান আর ভবিষ্যৎ। মা যার তেলেভাজা বিক্রি করে হোটেলের দরজায়, বাবা সে পয়সায় সস্তা মদ ভাত দিয়ে মেখে গিলতে থাকে, তার আবার সময়জ্ঞান! নরম একটুকরো ফুলের মত পুতুল শুধু চলছিল; বর্তমানেও নয়, ভবিষ্যতেও নয়, শুধু চলছিল।

চাঁদের মত মেয়ে, স্থলপদ্মের মত বহুধা-বিস্তৃত শতদলী পুতুল। পোকা ধরে গিয়েছিল, কলঙ্করেখা ফুটে উঠেছিল। চারিদিকে প্রতিফলন পড়েছিল, স্তব্ধ হয়ে জেনেছিল শুধু।

এখনো ঘুমের ঘোরে গুমরে গুমরে কেঁদে ওঠে পুতুল।

—শুনছ, এই পুতুল—ও পুতুল—

—এ্যা—

একটা কাঁপুনি দিয়ে উঠে বসল পুতুল। বেড-সুইচটা জ্বালল দেবনাথ, মেহগিনীর দেরাজের ভেনিসিয়ান গ্লাসে ছায়া পড়ল পুতুলের। বিভ্রান্ত ভাবে তাকাতে লাগল চোখ টেনে টেনে এদিক-ওদিক, বিড় বিড় করছে তখনো; আমি কোথায়? সেই বস্তি? বাবা—বাবা ও কোন্ ছাদ থেকে লাফাচ্ছে, পড়ে যাবে যে—

কি বলছ তুমি? এই পুতুল, তুমি তো আমার কাছে।

এ্যা?—ও, তুমি? কি একটা স্বপ্ন—

নিঃশব্দে স্বামীর গলাটা জড়িয়ে ধরে ঝিমিয়ে গেল পুতুল।

স্বপ্ন দেখছিলে?

মাথা নেড়ে সায় দিল শুধু সে। দেবনাথ তার চোখের জল দেখতে পেল না। পিঠের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে মধুর একটু হাসল, বলল, তোমাকে তো নিয়ে এসেছি সেখান থেকে। আমাকে বুঝি বিশ্বাস হয় না?

আবার মাথা নাড়ল পুতুল, হয়।

তবে ভয় পাও কেন?

দেবনাথ স্ত্রীকে টেনে আনল সামনে, গণ্ডের দু'ধারে তখন শুভ্র অশ্রুরেখা। স্নিগ্ধভাবে বলল, তোমার তো কোন ভয় নেই। বাবা তোমাকে কুড়িয়ে এনেছেন।

—কিন্তু তুমি যদি—

কাঁদতে লাগল পুতুল। কথা শেষ হ'ল না। মুখটা তুলে ধরে দেবনাথ বলল, আমি যদি ভাল না বাসি, তাই না?

হুঁ।

তা হয় না। বাবা ভুল করেন না। তুমি আমার কাছে এসেছ বাবার চেয়েও বড় জোরে, বিধাতার ইঙ্গিতে। তা না হলে পাশের বাড়ীতে মেয়ে দেখতে গিয়ে তোমাকে সে বাড়ীতে দেখতে পাবেন কেন, আর দেখেই সুলক্ষণা বলে পছন্দ করে ফেলবেন কেন?

এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হয়ে কথা বলল, পুতুল: আমাকে আবার পথে ফেলবে না তো?

বড় করুণ নিবেদন। দেবনাথ ব্যথাভরা কালো দুটি আনত নয়নের দিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল, অন্তরে একটা যন্ত্রণা জেগে উঠল যেন। টেনে কোলের কাছে সরিয়ে নিয়ে এল পুতুলকে, স্নেহ এবং প্রীতিভরা কণ্ঠে বলল, সাত দিন এসেছ, কিছুটা তো আমাকে বুঝতে পারলে। কেন তুমি এত ভয় কর বল তো?

ভয়? না তো।

অস্পষ্ট ফাঁকা গলায় অসম্পূর্ণ উত্তর। দেবনাথ কতক্ষণ নীরবে তাকিয়ে রইল, শরতের দীঘির মত তার উদার হৃদয়, করুণায় টলমল। বিরাট পুরুষ সোমনাথের উপযুক্ত বংশধর দেবনাথ, কুল-বিগ্রহ রাধাগোবিন্দজীউর সেবা সার্থক করে তুলেছেন তিনি মানুষকে ভালোবেসে, অসহায়কে আশ্রয় দিয়ে। এই প্রাসাদোপম বাড়ীর প্রতিটি ঘর গত তিরিশ বছর যিনি আলো করে লক্ষ্মীর মত বিরাজ করছিলেন, তিনিও ছিলেন এক দুঃস্থ কেরানীর কন্যা। দেবনাথের স্বর্গতা জননী, সোমনাথের সহধর্ম্মিণী। দ্বারকানাথ তাঁর ব্যাঙ্কের কেরানীর মৃত্যুতে তার বাড়ী গিয়েছিলেন সব ব্যবস্থা করবার জন্যে। ধুলোয় পড়া, তেলের অভাবে পিঙ্গলবর্ণা গৌরীকে পুত্রবধূরূপে কুড়িয়ে এনেছিলেন। এতদিন পরে দ্বারকানাথের পুত্র সোমনাথ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন, দেবনাথ সেই মেয়েকে অন্তরের সঙ্গেই গ্রহণ করেছে। আজ হতে পঞ্চাশ বছর পর এই পুতুলও হয়ত একদিন—তবে পুতুল কাঁদে কেন, ঘুমের ঘোরে আর্তনাদ করে ওঠে কেন? তাদের বাড়ীর উদার ঐতিহ্য তো তাকে কয়বার এ কয়দিনে বলেছে, আশ্বস্ত করেছে। নিজেই যেন লজ্জিত হয়ে উঠল দেবনাথ, আবার আগ্রহভরে প্রশ্ন করল, তুমি নিশ্চয়ই ভয় কর, আমাদের এসব বাড়ীঘর দেখে, না?

কি জানি।

অত রাত অবধি বই পড়া তোমার উচিত হয় না। তাই বোধ হয় ঘুম হচ্ছে না ভাল করে।

তাই হবে।

হবে নয়, নিশ্চয়ই।

একটু সহজ হয়ে উঠল পুতুল, লম্বা, টানা চোখে, পাতলা ঠোঁটের ধারে একটু হাসির আলো দেখা গেল, বলল, মেয়েদের ইস্কুলে এক দিন একটু পড়েছিলাম তো, অভ্যেসটা সুযোগের অপেক্ষায় ঘুমিয়ে ছিল।

কিন্তু সারাদিন কাজও তো কম কর না।

তা না করলে চলে? এত বড় বাড়ীর কি চেহারা হয়েছিল বল তো!

খুশীতে ভরে উঠল দেবনাথ। যা হোক, মেয়েটা এবার প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেছে। বলল, সত্যি, এক বছর হ'ল, মা গেছেন, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীটাও যেন শোকতাপে কালি-ঝুলি মেখে বসে ঝিমুচ্ছিল। দিনসাতেকে রংটাই পালটে গেল। আবার সেই পুরনো দিনের মতন যেন মনে হচ্ছে।

খাটের সামনে পূব দিকে মুখ করে দেয়ালে বৃহৎ অয়েল-পেন্টিং। গৃহিণী—জননী-রূপিণী গৌরীদেবীর। গায়ে সামান্য একটা সাদা সেমিজ, তার ওপর লাল নক্সাপাড়ের কড়িয়াল গরদ। প্রশান্ত ললাটের ওপর চওড়া করে সিন্দুর-রেখা। চোখের পল্লব বেয়ে চিবুক পর্যন্ত একটা স্নিগ্ধ-গম্ভীর সৌভাগ্যদীপ্তি নেমে এসেছে। দৃষ্টি নত হয়ে যায় পায়ের তলায় ও ছবির দিকে তাকালে। একটু একটু করে দেবনাথ মুখ তুলল, পুতুল যন্ত্রের মত স্বামীকে অনুসরণ করল, বলল, মা!

ধীরে ধীরে দেবনাথ উত্তর দিল, হাঁ, মা। আমার তোমার মা। প্রণাম কর, শান্তি পাবে। মা আশীর্বাদ করবেন।

চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল পুতুলের আবার, দুই হাত যুক্ত করে মাথায় ঠেকাল।

নিবীহ দেবনাথ বেদনার্ত্ত মনে দেখল পুতুলকে, প্রণাম জানাচ্ছে তন্ময় হয়ে মাকে। আর কাঁদছে। ভাবল, তার মা মাতৃহীনা হবার পর নিঃস্ব বাপের কাছ থেকে প্রথম এখানে নববধূরূপে এসে কি এমনি অকারণে কাঁদত? বুঝতে পারল না। পুতুলকে বলল, এবার ঘুমোও। ঘুম আসবে দেখ।

আধঘণ্টা পরেও জেগে বসে আছে কিন্তু দেবনাথ। ঘুমোতে পারে নি, সমবেদনায় জমে গেছে দেহটা। পুতুল ঘুমোচ্ছে এবার অঘোরে, পরম শান্তিতে অবরুদ্ধ যৌবনভার থিতিয়ে আছে নরম বিছানার আশ্রয়ে। গোল মুখ, পদ্মের মত দেহ-সুষমা, চাঁপার কলির মত ডান হাতের কয়েকটা আঙুল দিয়ে আলগা ভাবে ধরে আছে স্বামীকে, শিথিল হয়ে পড়ে আছে অঞ্চলপ্রান্ত। দেবনাথ ওর মুখের ওপর একমনে কি যেন দেখছে। আচমকা দীর্ঘশ্বাস পড়ে গেল একটা, চকিত হয়ে উঠল। পুতুলের চিবুকের নীচে একটা কালো দাগ, গোল হয়ে বসে আছে। হাত দিয়ে তুলতে গেল ধীরে ধীরে, উঠল না। আঁচিল। ওটা উঠবে কখনও না, চেপে বসে আছে। চাঁদের মত মুখটা একটু শ্রীহীন করে ফেলেছে কালো দাগটা।

নারকেলডাঙ্গার ও প্রান্ত হতে একটা মিলের চিমনির ধোঁয়া উঠছে। সারা রাত কাজ চলে কলটায়। যুদ্ধোত্তর যুগের বেসাতি বহন করে টাকার রূপালি পথে চলছে এখনও মদমত্ত কলটা। বিবর্ণ লোহার চিমনিটা কালো ধোঁয়া ছেড়ে সগর্ব্ব অভিযান ঘোষণা করছে। নূতন যুগের কল্যাণী জননী নয়, দানব প্রেতমূর্ত্তি।

দেয়ালের পাশে ছাতিম গাছটা হতে পেঁচা একটা ডেকে উঠল। অন্ধকারে খাদ্য-সন্ধানী শ্যেনদৃষ্টি জীব। তার ওপরে তারাগুলি জ্বলছে কিন্তু প্রাগ্‌যুদ্ধ-যুগের নরম মাধুর্য্য নিয়ে। সেই নীল তারাটা একলা তেমনি অম্লান-নীল। অন্ধকার মহাব্যোমে মিটমিট করছে আপন নির্ম্মলতায়। সারা পৃথিবীর ওপর এত ওলট-পালট হয়ে গেল, কিন্তু অপরিবর্ত্তন আলো সাজিয়ে বসে আছে ঐ তারাগুলো। মাঝে মাঝে এমনি বিমুগ্ধভাবে দেবনাথ তাকিয়ে থাকে ওদিকে। আজও তাকিয়ে তাকিয়ে আবোলতাবোল ভাবছে।

চোখটা জ্বালা করে এল। এক সময় আনমনে শুয়ে পড়ল।

এক মাসও পার হয় নি ঠিক।

এতদিন কতবার ঋতু-আবির্ভাব ঘটেছে পিচ আর সিমেন্টে জমাটবাঁধা কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে, পুতুলের প্রাণে কিন্তু সেসব নাড়া দেয় নি একটিবারও। তার কাছে আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল সীসের মত মৃত-মলিন। ধূলিকণার অনিশ্চয়তা নিয়ে রাজধানীর বাতাসে ভাসত শুধু। কিন্তু আশ্চর্য্য, বিয়ের পর পুতুল কামনা করতে শিখল—নীরব, অপ্রকাশিত একটি কামনা: ভগবান, তুমি যদি আছ, কলকাতা থেকে এবার আমায় দূরে নিয়ে চল।

সোমনাথ একদিন খাবার আগে বললেন, আমার শরীরটা আজও ভাল নেই, মা।

পুতুল বলে ফেলল, তবে বোধ হয় এখানকার জল হাওয়া—

হাঁ রে, দেশের বাড়ীতে ফিরে যাব ভাবছি।

চান করবার তেল দিতে এসেছিল পুতুল, ছবির মত দাঁড়িয়ে পড়ল, চোখের ওপর অলীক একটা উন্মাদনা। হাতটা কেঁপে উঠেছে কখন, কাঁচের বাটিতে তেল নিয়ে এসেছিল, মেঝেতে ছিটকে পড়ল। সোমনাথ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, বললেন, না হয় তুমি এখানে থাক পুতুল, কলকাতা থেকে সেখানে গিয়ে বোধ হয় ভাল লাগবে না।

—না বাবা! আমার এখানে ভাল লাগে না।

তবে এত গম্ভীর হয়ে গেলে যে?

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল পুতুল। এত শীঘ্রই সে কলকাতার পাঁক থেকে মুক্তি পাবে? সেই কলকাতা যেখানকার কাঁটা আর অন্ধকার তার মৃত্যু-স্বাক্ষর এঁকে রেখেছে? মানুষ আবার কামনা করে মুক্তি পাবার, সে কামনায় আবার অশরীরী দেবতা সাড়া দেন!

কে সে দেবতা ? মানুষ সোমনাথ ? গোলাকার পাথরের নারায়ণ-শিলা ? সোমনাথ আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন, সস্নেহে মাথায় একটি হাত দিয়ে টেনে নিলেন পুতুলকে কোলের কাছে, বললেন, মন চাচ্ছে না গ্রামে যেতে ?

আমি যাব, বাবা। সেখানে ত শুনেছি গোবিন্দজীউর সুন্দর মূর্ত্তি আছে। দেখব আমি।

মায়ের কোমল স্পর্শে যেন অন্তরে ছোঁয়া লাগল, এমনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন সোমনাথ : আমার মনের কথা কি করে টের পেলি মা ? তোকে আমি তাই দেখাতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু তুই জানলি কি করে ? হঠাৎ দু'হাতের আঙুলের লঘু আকর্ষণে মুখটি তার তুলে ধরলেন, যেন পুষ্প চয়ন করছেন, এমনি সাবধানে। সেই মুখের দিকে তাকালেন মনের পরিতৃপ্তিতে একটি বার, তারপর মাথার উপর হাত রেখে সঞ্চিত আশীর্ব্বাদ নিঃশেষ করে দিলেন। বললেন, ভুল আমি করি নি মা। আমার বাবা দ্বারকানাথও ভুল কোন দিন করেন নি। তোর দেখবার ত সৌভাগ্য হ'ল না পুতুল, হলে দেখতিস, গত তিরিশ বছর এই বাড়ী আলো করে বিরাজ করতেন যে—তাঁর ঘরে ভুলের ফসল জন্মাবে না। তোর মত এই ঘরেই প্রথম যেদিন এল—কি হ'ল ?

সোমনাথের খেয়াল ছিল না, সস্নেহে টেনে এনেছেন অনেকখানি পুতুলকে, তারও খেয়াল নেই, ভাঙ্গা কাঁচের ওপর পা'টা পড়েছে। তুলে ধরতেই দেখা গেল, আলতা পরা পায়ের কতকটা কেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে। সোমনাথের দৃষ্টি পড়তেই পুতুল রক্তটা মুছে ফেলল হাত দিয়ে, বলল, ও একটু ছড়ে গেছে, কিছু না।

ইস ! আরও রক্ত বেরুচ্ছে যে !

পুতুল পা'টা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, ও কিছু না, বাবা। কবে যাবেন, বলুন।

কালই যাব মা। ঠিক করে ফেল তুই।···

—এই শোন। অমলবাবুকে চেন ?

সোমনাথ চলে যেতেই পুতুল আনন্দ-উদ্বেল অন্তরে পা বাড়িয়েছে, দেবনাথ ডাকল পিছন থেকে। কতকটা পাশ ফিরে আভঙ্গমূর্ত্তিতে ঠিক সেই অবস্থাতেই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, হঠাৎ যেন মন্ত্রশক্তিতে রক্ত-মাংসের জীবন্ত শরীরটা নিষ্প্রাণ হয়ে গেল। বসন্তশেষের ফুটন্ত ফুলের মত নয়, জরা শীতের ঝরা-পাতার মত, ঝরে পড়ার মালিন্যে বিবর্ণ। অমলবাবু ! এ নামটার মধ্যে এমনি একটি সম্মোহন।

দেবনাথ হেসে ফেটে পড়ল, বিজয়ীর মত বলল, চেন না ত অমলবাবুকে ?

না। সে আবার কে ?

পরিষ্কার স্পষ্ট গলায় এতক্ষণে উত্তর দিল পুতুল। ঘুরে মেঝের ওপর শক্ত করে দাঁড়িয়েছে, সিন্দূরের টিপ-পরা কপাল, আয়ত চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ, নিঃশঙ্ক। না, আর ভালমানুষ হয়ে অদৃষ্টের ক্রীড়নক হবে না। ঢের হয়েছে. দাঁড়াবে এবার জোর করে সত্যমিথ্যার রাবিশের ওপর দিয়েই চলবে। দেবনাথ এগিয়ে এল খুশী-খুশী মুখে, বলে চলল, ব্যাটা জোচ্চোর, শয়তান কোথাকার। বললেই হয়, গরীব লোক, কিছু ভিক্ষে চায়, দিয়ে দিতাম। তা নয়, ব্যাটা আপনজন সাজতে যাচ্ছিল।

কি বলছিল লোকটা।

বলছিল আজগুবি সব কথা ! তুমি বুঝি নার্সিং হোমে ছিলে, সে—

আমি ? নার্সিং হোম—সেটা আবার কি ?

সে সব বিশ্রী ব্যাপার, জানবে কি করে তুমি। যত সব কলকাতার হাঙ্গেল ! কথা শেষ করতে পেল কি ? পত্রপাঠ বিদেয় করে দিয়েছি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল পুতুলের বুকের ভিতর থেকে, পায়ের ক্ষত স্থানটাও ভুলে গেছে। দেবনাথ বলল, তোমার বাপের বাড়ীর লোক বোধ হয়, নাম করছিল সব লোকের—ও কি ?

দেবনাথের নজর পড়েছে মেঝের উপর রক্তলেপা কয়েকটি পায়ের চিহ্নের দিকে, বিস্মিতভাবে আঙুল বাড়াল।

আলগা ভাবে হাসল পুতুল, পিছনের দাগগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে জবাব দিল নির্লিপ্তভাবে, ও ! কিছু না। বাটিটা পড়ে গেল হাত থেকে, একটু কেটে গেছে।

একটু ? এত কেয়ারলেস, তুমি !

মাটিতে কাঁচের টুকরো পড়ে থাকে। কখন লাগে পায়ের ভিতর, সাবধান হবার সুযোগই মেলে না।

তা বলে এমনি রক্তারক্তি করে ফেলবে ?

হেসে ফেলল পুতুল ! স্বামীর হাতটা ধরে বলল, কাঁচ জিনিষটাই এমনি তীক্ষ্ণ, লাগলেই কাটে ! তা ছাড়া খুব কসে কেয়াফুল হলেই যে ভাগ্যকে এড়াতে পারা যায়, এমন ত শোনা যায় না। শোন এখন। বাবার শরীর খারাপ, আমরা দেশে যাচ্ছি।

এরই মধ্যে ?

বাবার ভাল লাগছে না এখানে। কালই যাবেন বললেন।

ও, বাবা যেতে চাচ্ছেন ? আচ্ছা, যাও তবে তোমরা।

আর তুমি ?

দেবনাথ অসহায় ভাবে বলল, ব্যবসা বন্ধ রেখে কি করে যাই বল ?

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল পুতুল, শাড়ীর আঁচলটা ডান হাতের আঙুলে জড়াতে লাগল। নত নেত্রে প্রশ্ন করল, তোমার বুঝি কলকাতা ছাড়লে চলে না ?

একদম না। বছরে খুব জোর—

আচ্ছা, এবারটি সঙ্গে চল, যেতে হয়—না হলে বাবা দুঃখ পাবেন।

ঈষৎ চঞ্চল ভাবে চোখের মণি দুটো নেচে উঠল দেবনাথের : কিন্তু তুমি ত পারবে না, কেমন ? একবারও তো বললে না আমি

[illegible]

কেমন ভাবে তাকিয়ে রইল পুতুল, কাকা, নিষ্পলক দৃষ্টিতে থেমে থেমে বলল, হতভাগ্য মেয়ে, কি জোর তার আছে বল? আমার ভাল লাগা! ঠাকুরের কাছে কি সে ভাগ্য করে এসেছি যে তোমাদের স্নেহভালবাসায় যোগ্য হতে পারব! এ তো কোনদিন ভাবতেও শিখি নি!

দেবনাথ পুতুলের একটা হাত ধরে নিয়ে গেল ঘরের ভিতর, খাটের ওপর বসিয়ে দিয়ে বলল, মা বলতেন, আমাদের গোবিন্দজীউর কাছে প্রার্থনা করলে ইচ্ছা পূর্ণ হয়। বাড়ীতে আমাদের ঠাকুর আছেন, সে বিগ্রহের মোহনরূপ দেখলে তুমি সব দুঃখ ভুলে যাবে।

পুতুল আবেগপূর্ণ স্বরে প্রশ্ন করল, সত্যি?

হাঁ। আমার মা—তাঁর মুখ দেখলে বুঝতে, কোন সংশয় মনে তাঁর নেই। বছরের অর্দ্ধেক দিন সেখানেই থাকতেন।

নিরাকাঙ্ক্ষ, অচিন্তনীয় পুলক—শূন্য অন্তর কতকটা আজ কেমন করে পূর্ণ হয়ে গেল, স্নিগ্ধ বাতাস যেন সাহারার উপর ঝিরঝির করে উঠল। পুতুল কথা বলতে পারল না, দৃষ্টি প্রসারিত করে খোলা জানালার বাইরে স্বপ্নাবিষ্টের তন্ময়তায় কি যেন দেখতে লাগল। অবক্তব্য লজ্জা আর দুর্ব্বলতার বেসাতি সাজানো বাস্তব জগতের নীচে পচা নর্দ্দমা, উপরে অর্দ্ধদগ্ধ নরদেহের পূতিগন্ধ। বিষে ঠাসা মাঝের বাতাসটা। এরও মধ্যেই আছে দেবযান, এক স্বপ্নের অগোচর জ্যোতির্লোকের ক্ষণিক ইঙ্গিত ভেসে আসে হঠাৎ কোন অভাবনীয় মুহূর্ত্তে। সেই একটিমাত্র মুহূর্ত্তে অতীত পেছনে পড়ে থাকে, সে অতীতের চিতাভস্ম, ছাইগুলো উড়ে যায় একটা ঝটকা বাতাসে। স্বর্গের মত গরীয়ান্ নূতন জীবনের রামধনু ঝিলিক দিয়ে ওঠে সামনের নব-দিগন্তে। শেষ বুঝি শেষ নয়, পূর্ব্ব-তোরণে মমতাভরা সূর্য্যদেবতা গোলাপী আলোর মানুষের মুখে নূতন করে আশা ফুটিয়ে তোলেন। সে সূর্য্য ভগবান, তাঁর কিরণে আশার প্রস্রবণ! ভগবান আছেন। সূর্য্যের মত শাশ্বত জ্যোতি নিয়ে বস্তুজগতের ক্লিন্নতার উর্দ্ধজগতে দেখা দেন তিনি—ক্ষণে ক্ষণে, যুগে যুগে।

তরল হয়ে জলের ধারা নামল পুতুলের চোখে। কথা বলবার অবস্থা নয়, জলে-ধোয়া শুকনো ফুলের মত থিতিয়ে রইল।

নারকেলডাঙা থেকে বল্লভপুর। ব্যবধান অনেকখানি—মাটিতে, আকাশে, বাতাসে। এখানকার মাটি বন্ধুর, নীরস, তবু জননীর ঔদার্য্যে মানুষের সঙ্গে একাত্ম। শ্বশুরবাড়ীর এই গ্রাম্য দেশে এসে অবধি পুতুল ভোরবেলায় ছাদে উঠে সূর্য্যোদয় দেখে, নানা পাখীর কলকাকলি বিহ্বল হয়ে শোনে। বাড়ীর পূব দিকেই গোবিন্দজীউর পঞ্চরত্নশ্রেণীর মন্দির, মল্লরাজ চৈতন্যসিংহের আমল থেকে আজও অটুট সৌষ্ঠব নিয়ে একটি ভক্তের প্রার্থনার মত আকাশের দিকে উঠে আছে। শীর্ষচূড়ায় একটি রূপোর চক্র, নির্ম্মাতা স্থাপন করেছিলেন প্রতিষ্ঠার সময়ে। এমনি ধারাবাহিক কিংবদন্তী রায়কামাথের বংশে চলে আসছে, এই বংশে যেদি অশুচি অন্তায় প্রবেশ করবে, সেদিন ঐ চূড়ো কালো হয়ে যাবে সে এক মহা অশুভের সূচনা।

বুড়ী ঝি রাধিকার কাছে পুতুলও শুনেছে এ গল্প।

দোমহলা বাড়ীর চিলেকোঠা ছাড়িয়ে কিন্তু গোবিন্দজীউ মন্দিরের রৌপ্য-কিরীট ভাস্বর হয়ে আছে এখনও। শঙ্কা উত্তেজনায় পুতুল তাকিয়ে থাকে এদিকে সূর্য্যোদয় দেখতে দেখতে।

ওর ওপরে বসে ল্যাজঝোলা পাখী একটা ক্যাকাশে গা-ি খুঁটছে বেগুনি ঠোঁট দিয়ে। আশ্বস্ত হয়ে নিঃশ্বাস ফেলল পুতুল তাকাতে পারল জীবনে বোধ করি এই প্রথম দ্বিধাহীন মনে, বাড়ী চারিধারে, যতদূর দৃষ্টি চলে, দিগন্তরেখা পর্য্যন্ত। শুধু অফুর মাঠের উঁচু-নীচু বিস্তার, উপরের আকাশের মত অসীম উদারত স্বচ্ছ, বাধাহীন। এ ইট-ইস্পাতের নষ্টপ্রাণ রাজত্ব নয়, ত দারিদ্র্যক্লিষ্ট জনপদের করুণ রূপ, বাৎসল্যে ভরা কৃশ জননী প্রসন্ন-পাণ্ডুর অবয়ব। ভয় জাগায় না, স্নেহের দুর্ব্বল হাত এগি দেয় আশীর্ব্বাদ করতে। মাটিতেও প্রাণ আছে। বল্লভপুরে মাঠে দশদিক হতে অশ্রুতপূর্ব্ব এক মধুর স্বর এক এক সা শুনতে পায় পুতুল, স্বল্প-শস্প মাঠের এবড়োখেবড়ো স্তরগুলো প্রা চঞ্চল হয়ে সিরসির করতে থাকে। ইতস্ততঃ ছড়ানো দেব-দেউ সেই সজীব স্পন্দন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে, নিকষ পাথরের গোবিন্দজী স্বর্ণাভ পিতলের রাধারাণী বিরাজ করছেন প্রাণকেন্দ্রের উৎসমুখে ভাগ্যের ক্রীড়নক অবলা একটা মেয়ের উপর দাগ-রা মুক্তা-মাণিক্য? সে ত চলতি পথের এক ধারের একটা আস্তাকুড়, প্রাণের প্রস্রবণের কাছে ধুয়ে মুছে আবার সে জায়গা ঝরঝরে হয়ে উঠতে কতক্ষণ!

সূর্য্য আকাশে উঠে গেছে। পুতুল ধীরে ধীরে নীচে নাম কি হালকা লাগছে দেহটা এতদিন পর। যেন রক্ত-মাংসের ভ মুক্ত হয়ে গেছে। কতকটা এসেই থমকে দাঁড়াল, মাথায় আ তুলে দিল। দেবনাথ বিস্মিত হয়ে বলল, তুমি উপরে? এসেছেন যে।

মা?

আনন্দে হেসে উঠল দেবনাথ: মাকে বুঝি আর চিন পারছ না?

নেবানো প্রদীপের মত ধূমাচ্ছন্ন মুখে পুতুল শুধু বলল, পায়ে যেন কে আবার গুরুভার জড়িয়ে দিয়েছে, এমনি টেনে টে চলতে লাগল দেহটা, বলল, কোথায় মা?

ছিঃ! মা পূজনীয়া অতিথি, অমন শুকনো মুখ করে যায় না!

চেষ্টা করে হাসল পুতুল, দেবনাথ বুঝল না কিন্তু এ কৃত্রিমত খুশী হয়ে উঠল, বলল, আমাদেরই অবিশ্যি নিমন্ত্রণ করা উ ছিল। তোমার চিঠি পান নি, তাই নিজেই চলে এসেছেন। ম করেছেন ত।

কোথায় তিনি ?

শোবার ঘরে। আমি আসছি। মায়ের কোন অসুবিধা যেন না হয়, দেখ, লক্ষীটি!

না গো না। আমারও ত শ্বশুরবাড়ী।

পরস্পর সস্মিত দৃষ্টিবিনিময় করল। কিন্তু দেবনাথ নীচের দিকে অদৃশ্য হতেই পুতুল থমকে থমকে এগিয়ে এসে দরজার কাছে গম্ভীর মুখে দাঁড়াল, ডাকল, মা!

কালিপড়া, নৈরাশ্যভরা চোখে ঘরের আসবাবপত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন বিনোদিনী, চোয়ালের ওপর একটা নগ্ন-লুব্ধ ক্ষুধা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। মেয়ের ডাকে চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন, অপরিচ্ছন্ন দাঁতে হেসে এগিয়ে এলেন: তুই এসেছিস!

কিন্তু তুমি কেন এখানে এলে মা ?

তুই এ কথা বললি? তোকে পেটে ধরি নি? মানুষ করি নি?

থাক, থাক। পেটের মেয়ের জন্যে একটু বিষ যোগাড় করতে পার নি? মানুষ করেছ! বাবাকে মেরে ফেলেছ, আমার সর্বনাশ করে অন্ন জুগিয়েছ। তবু—তবু—এখনও পিছু নিয়েছ তুমি।

কেঁদে ফেটে পড়ল পুতুল, বিনোদিনীও মেয়েকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। পুতুল জানে, কি জঘন্য মূল্যহীন মায়ের ঐ কান্না। নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বলল, আবার আমার কাছে তুমি না এলেই ভাল করতে। একটু শান্তিতে কি আমাকে দুটো দিনও থাকতে দেবে না।

চলে যাব, তাই বলছিস? এই দুঃসময়ে একটু দাঁড়াবার জায়গা দিবি না ?

আঁচল দিয়ে চোখটা মুছে পুতুল জবাব দিল, না। এসেছ, আজ থাক। কাল সকালেই চলে যেয়ো।

কথান্তর হবার আগেই সে নিজেই বের হয়ে গেল, পেছন ফিরে একবার তাকাল না পর্যন্ত।

কিন্তু আশ্চর্য, বিনোদিনী একটু রাগ করলেন না। দুপুরে খাওয়ার পর পুতুল তাঁর শোয়ার ব্যবস্থা করতে ঘরে ঢুকতেই মেয়েকে খাটের ওপর হাত ধরে বসিয়ে দিলেন, চুড়িগুলো টিপে টিপে স্পর্শ করতে করতে বললেন, এগুলো নতুন হ'ল বুঝি? জামাই দিয়েছেন ?

হাতটা অস্থির ভাবে সরে এল পুতুলের, বলল, হাঁ।

বেশ ভারী চুড়ি। আমাকেও বিয়ের পর তোর বাবা এমনি জম-জমাট চুড়ি এনে দিয়েছিল লুকিয়ে লুকিয়ে। তখনকার দিনে সে যেন কি একটা প্যাটার্ন, জলছবি, না কি যেন। হাঁ রে, জামাই ভালটাল বাসে খুব ত ?

তুমি ঘুমোও মা। ভোর রাতে উঠেছ।

কুণ্ঠাহীন নজর দিয়ে বিনোদিনী তাকিয়ে রইলেন পুতুলের যাওয়ার দিকে।

শীতের স্বল্পায়ু দিন, দেখতে দেখতে কেটে গেল। সন্ধ্যার পর পুতুল দেরাজ খুলে টাকা বের করতে ঘরে ঢুকেছে, বিনোদিনী কাছে এসে বললেন, গয়না-পত্তর সব এমনি ভাবে ছড়িয়ে রাখিস, ত এইখানেই থাকে, ঝি চাকর—

মুখ ফিরিয়ে হাসল পুতুল, আমি ত আসছি এখানে সারাব

তবু ত বলা যায় না, মানুষের মন!

একটা পেরেকের মাথায় চাবির শেকলটা আটকে রাখল কোনও কথা বলল না। যাবার সময় মুখ টিপে হাসল একটু বিনোদিনী তা দেখতে পেলেন না। বোধ হয় ভাবছিলেন গভীর

দেবনাথ মায়ের পরিচর্য্যার কোনও ত্রুটি রাখে নি। রা[illegible] বিনোদিনী মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন, আনন্দের বললেন, খুব খুশী হলাম বাবা। ধনেপুত্তে বাড়-বাড়ন্ত [illegible] খবর না পেয়ে নিজেকেই ছুটে আসতে হ'ল, কালই যাচ্ছি সব

কালই? তা কি করে হয় মা?

আবার আসব বাবা। ভগবান সুদিন দিন, আবার আ[illegible]

অনেক রাত্রে পুতুল ঘরে ঢুকে দেরাজ খুলে থ' হয়ে [illegible] রইল। দেরাজের তাকের ওপর ব্রেসলেটের বাক্সটা খোলা অ[illegible] পড়ে আছে। চোখ ফিরিয়ে মায়ের দিকে তাকাতেই বিনে[illegible] বলে উঠলেন, কি নিতে এসে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে?

মনে করতে পারছি না মা। এমনি ভুল হয়ে যায় [illegible] কাল। দেরাজটা বন্ধ করে চাবিটা আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে [illegible] রাত্রে একলা থাকতে পারবে ত?

তা খুব পারব।

ভোর রাতে বিনোদিনী তৈরি হয়ে নিয়েছেন। পুতুল হাজির হতেই বললেন, এবার বেরুতে হয়, না?

একটু দাঁড়াও। বলে দেরাজটা খুলে দশগাছা ঝকঝকে বিনোদিনীর হাতে একটা প্যাকেটে মুড়ে দিতে দিতে বলল, এ গুলোও নিয়ে যাও মা। দাদার বউ যদি কোনদিন হয়, দি[illegible] আর শোন, দাদার বিয়ে দিয়েই তুমি কাশী যেয়ো, [illegible] তোমার। আমি তোমার খরচ মাসে মাসে পাঠিয়ে দেব।

একটি কথা বললেন না বিনোদিনী, হাত বাড়িয়ে [illegible] চুড়িগুলি। যেন কোন এক অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনছেন, [illegible] ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন পা দুটো ফাঁক করে।

—ছেলের কচি বউকে নিয়ে আর সংসার করতে যেয়ে[illegible] বুঝলে? তোমার সব গেছে, তাই আর কিছু সহ্য করতে পা[illegible] তুমি। তাই তুমি একটা দিনের সুযোগ বুঝে স্বচ্ছন্দে চুরি [illegible] করতে পার। তোমার দুঃখে কারও দয়া হয় না মা, দয়া হয় ঘৃণা হয়। তাই বলছিলাম, কাশী যেয়ো, এ কালো পৃথিবীতে কালি মাখিয়ো না।

আস্তে আস্তে পুতুল বিনোদিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে [illegible] তিনিও চললেন নির্বিকার, সুস্থ মনে।

এদিকে দরজার কাছে দেবনাথ অপেক্ষা করছে। পুতু[illegible] কাছে সরে গিয়ে নিম্নস্বরে প্রশ্ন করল, মাকে থাকতে বললে না [illegible] করে?

কেমন ভাবে তাকিয়ে রইল পুতুল, হাবা, নিষ্পলক দৃষ্টিতে থেমে থেমে বলল, হতভাগ্য মেয়ে, কি জোর তার আছে বল? আমার ভাল লাগা! ঠাকুরের কাছে কি সে ভাগ্য করে এসেছি যে তোমাদের স্নেহভালবাসার যোগ্য হতে পারব! এ তো কোনদিন ভাবতেও শিখি নি!

দেবনাথ পুতুলের একটা হাত ধরে নিয়ে গেল ঘরের ভিতর, খাটের ওপর বসিয়ে দিয়ে বলল, মা বলতেন, আমাদের গোবিন্দজীউর কাছে প্রার্থনা করলে ইচ্ছা পূর্ণ হয়। বাড়ীতে আমাদের ঠাকুর আছেন, সে বিগ্রহের মোহনরূপ দেখলে তুমি সব দুঃখ ভুলে যাবে।

পুতুল আবেগপূর্ণ স্বরে প্রশ্ন করল, সত্যি?

হাঁ। আমার মা—তাঁর মুখ দেখলে বুঝতে, কোন সংশয় মনে তাঁর নেই। বছরের অর্দ্ধেক দিন সেখানেই থাকতেন।

নিরাকাঙ্ক্ষ, অচিন্তনীয় পুলক—শূন্য অন্তর কতকটা আজ কেমন করে পূর্ণ হয়ে গেল, স্নিগ্ধ বাতাস যেন সাহারার উপর ঝিরঝির করে উঠল। পুতুল কথা বলতে পারল না, দৃষ্টি প্রসারিত করে খোলা জানালার বাইরে স্বপ্নাবিষ্টের তন্ময়তায় কি যেন দেখতে লাগল। অবক্তব্য লজ্জা আর দুর্ব্বলতার বেসাতি সাজানো বাস্তব জগতের নীচে পচা নর্দ্দমা, উপরে অর্দ্ধদগ্ধ নরদেহের পূতিগন্ধ। বিষে ঠাসা মাঝের বাতাসটা। এরও মধ্যেই আছে দেবযান, এক স্বপ্নের অগোচর জ্যোতির্লোকের ক্ষণিক ইঙ্গিত ভেসে আসে হঠাৎ কোন অভাবনীয় মুহূর্ত্তে। সেই একটিমাত্র মুহূর্ত্তে অতীত পেছনে পড়ে থাকে, সে অতীতের চিতাভস্ম, ছাইগুলো উড়ে যায় একটা ঝটকা বাতাসে। স্বর্গের মত গরীয়ান্ নূতন জীবনের রামধনু ঝিলিক দিয়ে ওঠে সামনের নব-দিগন্তে। শেষ বুঝি শেষ নয়, পূর্ব্ব-তোরণে মমতাভরা সূর্য্যদেবতা গোলাপী আলোয় মানুষের মুখে নূতন করে আশা ফুটিয়ে তোলেন। সে সূর্য্য ভগবান, তাঁর কিরণে আশার প্রস্রবণ! ভগবান আছেন। সূর্য্যের মত শাশ্বত জ্যোতি নিয়ে বস্তুজগতের ক্লিন্নতার উর্দ্ধজগতে দেখা দেন তিনি—ক্ষণে ক্ষণে, যুগে যুগে।

তরল হয়ে জলের ধারা নামল পুতুলের চোখে। কথা বলবার অবস্থা নয়, জলে-ধোয়া শুকনো ফুলের মত খিতিয়ে রইল।

নারকেলডাঙা থেকে বল্লভপুর। ব্যবধান অনেকখানি—মাটিতে, আকাশে, বাতাসে। এখানকার মাটি বন্ধুর, নীরস, তবু জননীর ঔদার্য্যে মানুষের সঙ্গে একাত্ম। শ্বশুরবাড়ীর এই গ্রাম্য দেশে এসে অবধি পুতুল ভোরবেলায় ছাদে উঠে সূর্য্যোদয় দেখে, নানা পাখীর কলকাকলি বিহ্বল হয়ে শোনে। বাড়ীর পূব দিকেই গোবিন্দজীউর পঞ্চরত্নশ্রেণীর মন্দির, মল্লরাজ চৈতন্যসিংহের আমল থেকে আজও অটুট সৌষ্ঠব নিয়ে একটি ভক্তের প্রার্থনার মত আকাশের দিকে উঠে আছে। শীর্ষচূড়ায় একটি রূপোর চক্র, নির্ম্মাতা স্থাপন করেছিলেন প্রতিষ্ঠার সময়ে। এমনি ধারাবাহিক কিংবদন্তী রায়কানাথের বংশে চলে আসছে, এই বংশে যেদিন অশুচি অন্তায় প্রবেশ করবে, সেদিন ঐ চূড়ো কালো হয়ে যাবে। সে এক মহা অশুভের সূচনা।

বুড়ী ঝি রাধিকার কাছে পুতুলও শুনেছে এ গল্প।

দোমহলা বাড়ীর চিলেকোঠা ছাড়িয়ে কিন্তু গোবিন্দজীউর মন্দিরের রৌপ্য-কিরীট ভাস্বর হয়ে আছে এখনও। শঙ্কায় উত্তেজনায় পুতুল তাকিয়ে থাকে এদিকে সূর্য্যোদয় দেখতে দেখতে।

ওর ওপরে বসে ল্যাজঝোলা পাখী একটা ফ্যাকাশে গা-টা খুঁটছে বেগুনি ঠোঁট দিয়ে। আশ্বস্ত হয়ে নিঃশ্বাস ফেলল পুতুল। তাকাতে পারল জীবনে বোধ করি এই প্রথম দ্বিধাহীন মনে, বাড়ীর চারিধারে, যতদূর দৃষ্টি চলে, দিগন্তরেখা পর্য্যন্ত। শুধু অফুরন্ত মাঠের উঁচু-নীচু বিস্তার, উপরের আকাশের মত অসীম উদারতায় স্বচ্ছ, বাধাহীন। এ ইট-ইস্পাতের নষ্টপ্রাণ রাজত্ব নয়, শুষ্ক দারিদ্র্যক্লিষ্ট জনপদের করুণ রূপ, বাৎসল্যে ভরা কৃশ জননীর প্রসন্ন-পাণ্ডুর অবয়ব। ভয় জাগায় না, স্নেহের দুর্ব্বল হাত এগিয়ে দেয় আশীর্ব্বাদ করতে। মাটিতেও প্রাণ আছে। বল্লভপুরের মাঠে দশদিক হতে অশ্রুতপূর্ব্ব এক মধুর স্বর এক এক সময় শুনতে পায় পুতুল, স্বল্প-শষ্প মাঠের এবড়োখেবড়ো স্তরগুলো প্রাণ-চঞ্চল হয়ে সিরসির করতে থাকে। ইতস্ততঃ ছড়ানো দেব-দেউলে সেই সজীব স্পন্দন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে, নিকষ পাথরের গোবিন্দজীউ, স্বর্ণাভ পিতলের রাধারাণী বিরাজ করছেন প্রাণকেন্দ্রের উৎসমুখে। ভাগ্যের ক্রীড়নক অবলা একটা মেয়ের উপর দাগ-রাখা মৃত্যু-মালিন্য? সে ত চলতি পথের এক ধারের একটা পচা আস্তাকুড়, প্রাণের প্রস্রবণের কাছে ধুয়ে মুছে আবার সে জায়গাটা ঝরঝরে হয়ে উঠতে কতক্ষণ!

সূর্য্য আকাশে উঠে গেছে। পুতুল ধীরে ধীরে নীচে নামল, কি হাল্‌কা লাগছে দেহটা এতদিন পর। যেন রক্ত-মাংসের ভার মুক্ত হয়ে গেছে। কতকটা এসেই থমকে দাঁড়াল, মাথায় আঁচল তুলে দিল। দেবনাথ বিস্মিত হয়ে বলল, তুমি উপরে? মা এসেছেন যে।

মা?

আনন্দে হেসে উঠল দেবনাথ: মাকে বুঝি আর চিনতে পারছ না?

নেবানো প্রদীপের মত ধূমাচ্ছন্ন মুখে পুতুল শুধু বলল, ও। পায়ে যেন কে আবার গুরুভার জড়িয়ে দিয়েছে, এমনি টেনে টেনে চলতে লাগল দেহটা, বলল, কোথায় মা?

ছিঃ! মা পূজনীয়া অতিথি, অমন শুকনো মুখ করে যায় নাকি?

চেষ্টা করে হাসল পুতুল, দেবনাথ বুঝল না কিন্তু এ কৃত্রিমতা। খুশী হয়ে উঠল, বলল, আমাদেরই অবিশ্যি নিমন্ত্রণ করা উচিত ছিল। তোমার চিঠি পান নি, তাই নিজেই চলে এসেছেন। মানুষ করেছেন ত।

কোথায় তিনি ?

শোবার ঘরে। আমি আসছি। মায়ের কোন অসুবিধা যেন না হয়, দেখ, লক্ষ্মীটি !

না গো না। আমারও ত শ্বশুরবাড়ী।

পরস্পর সস্মিত দৃষ্টিবিনিময় করল। কিন্তু দেবনাথ নীচের দিকে অদৃশ্য হতেই পুতুল থমকে থমকে এগিয়ে এসে দরজার কাছে গম্ভীর মুখে দাঁড়াল, ডাকল, মা !

কালিপড়া, নৈরাশ্যভরা চোখে ঘরের আসবাবপত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন বিনোদিনী, চোয়ালের ওপর একটা নগ্ন-লুব্ধ ক্ষুধা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। মেয়ের ডাকে চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন, অপরিচ্ছন্ন দাঁতে হেসে এগিয়ে এলেন : তুই এসেছিস !

কিন্তু তুমি কেন এখানে এলে মা ?

তুই এ কথা বললি ? তোকে পেটে ধরি নি ? মানুষ করি নি ?

থাক, থাক। পেটের মেয়ের জন্যে একটু বিষ যোগাড় করতে পার নি ? মানুষ করেছ ! বাবাকে মেরে ফেলেছ, আমার সর্বনাশ করে অন্ন জুগিয়েছ। তবু—তবু—এখনও পিছু নিয়েছ তুমি।

কেঁদে কেটে পড়ল পুতুল, বিনোদিনীও মেয়েকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। পুতুল জানে, কি জঘন্য মূল্যহীন মায়ের ঐ কান্না। নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বলল, আবার আমার কাছে তুমি না এলেই ভাল করতে। একটু শান্তিতে কি আমাকে দুটো দিনও থাকতে দেবে না।

চলে যাব, তাই বলছিস ? এই দুঃসময়ে একটু দাঁড়াবার জায়গা দিবি না ?

আঁচল দিয়ে চোখটা মুছে পুতুল জবাব দিল, না। এসেছ, আজ থাক। কাল সকালেই চলে যেয়ো।

কথান্তর হবার আগেই সে নিজেই বের হয়ে গেল, পেছন ফিরে একবার তাকাল না পর্যন্ত।

কিন্তু আশ্চর্য, বিনোদিনী একটু রাগ করলেন না। দুপুরে খাওয়ার পর পুতুল তাঁর শোবার ব্যবস্থা করতে ঘরে ঢুকতেই মেয়েকে খাটের ওপর হাত ধরে বসিয়ে দিলেন, চুড়িগুলো টিপে টিপে স্পর্শ করতে করতে বললেন, এগুলো নতুন হ'ল বুঝি ? জামাই দিয়েছেন ?

হাতটা অস্থির ভাবে সরে এল পুতুলের, বলল, হাঁ।

বেশ ভারী চুড়ি। আমাকেও বিয়ের পর তোর বাবা এমনি জম-জমাট চুড়ি এনে দিয়েছিল লুকিয়ে লুকিয়ে। তখনকার দিনে সে যেন কি একটা প্যাটার্ন, জলছবি, না কি যেন। হাঁ রে, জামাই ভালটাল বাসে খুব ত ?

তুমি ঘুমোও মা। ভোর রাতে উঠেছ।

কুণ্ঠাহীন নজর দিয়ে বিনোদিনী তাকিয়ে রইলেন পুতুলের যাওয়ার দিকে।

শীতের স্বল্পায়ু দিন, দেখতে দেখতে কেটে গেল। সন্ধ্যার পর পুতুল দেরাজ থেকে টাকা বের করতে ঘরে ঢুকেছে। বিনোদিনী কাছে এসে বললেন, গয়না-পত্তর সব এমনি ভাবে ছড়িয়ে রাখিস, চাবি ত এইখানেই থাকে, ঝি চাকর—

মুখ ফিরিয়ে হাসল পুতুল, আমি ত আসছি এখানে সারাক্ষণ।

তবু ত বলা যায় না, মানুষের মন !

একটা পেরেকের মাথায় চাবির শেকলটা আটকে রাখল পুতুল কোনও কথা বলল না। যাবার সময় মুখ টিপে হাসল একটু, কি বিনোদিনী তা দেখতে পেলেন না। বোধ হয় ভাবছিলেন গভীর কিছু

দেবনাথ মায়ের পরিচর্য্যার কোনও ত্রুটি রাখে নি। রাত্রিবেল বিনোদিনী মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, আনন্দের সঙ্গে বললেন, খুব খুশী হলাম বাবা। ধনেপুতে বাড়-বাড়ন্ত হোক খবর না পেয়ে নিজেকেই ছুটে আসতে হ'ল, কালই যাচ্ছি সকালে

কালই ? তা কি করে হয় মা ?

আবার আসব বাবা। ভগবান সুদিন দিন, আবার আসব।

অনেক রাত্রে পুতুল ঘরে ঢুকে দেরাজ খুলে থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দেরাজের তাকের ওপর ব্রেসলেটের বাক্সটা খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। চোখ ফিরিয়ে মায়ের দিকে তাকাতেই বিনোদিনী বলে উঠলেন, কি নিতে এসে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে ?

মনে করতে পারছি না মা। এমনি ভুল হয়ে যায় আজকাল। দেরাজটা বন্ধ করে চাবিটা আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে বলল, রাত্রে একলা থাকতে পারবে ত ?

তা খুব পারব।

ভোর রাতে বিনোদিনী তৈরি হয়ে নিয়েছেন। পুতুল এসে হাজির হতেই বললেন, এবার বেরুতে হয়, না ?

একটু দাঁড়াও। বলে দেরাজটা খুলে দশগাছা ঝকঝকে চুড়ি বিনোদিনীর হাতে একটা প্যাকেটে মুড়ে দিতে দিতে বলল, এ চুড়িগুলোও নিয়ে যাও মা। দাদার বউ যদি কোনদিন হয়, দিয়ো। আর শোন, দাদার বিয়ে দিয়েই তুমি কাশী যেয়ো, দোহাই তোমার। আমি তোমার খরচ মাসে মাসে পাঠিয়ে দেব।

একটি কথা বললেন না বিনোদিনী, হাত বাড়িয়ে নিলেন চুড়িগুলি। যেন কোন এক অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনছেন, এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন পা দুটো ফাঁক করে।

—ছেলের কচি বউকে নিয়ে আর সংসার করতে যেয়ো না, বুঝলে ? তোমার সব গেছে, তাই আর কিছু সহ্য করতে পার না তুমি। তাই তুমি একটা দিনের সুযোগ বুঝে স্বচ্ছন্দে চুরি পর্যন্ত করতে পার। তোমার দুঃখে কারও দয়া হয় না মা, দয়া হয় না ; ঘৃণা হয়। তাই বলছিলাম, কাশী যেয়ো, এ কালো পৃথিবীতে আর কালি মাখিয়ো না।

আস্তে আস্তে পুতুল বিনোদিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল, তিনিও চললেন নির্বিকার, সুস্থ মনে।

এদিকে দরজার কাছে দেবনাথ অপেক্ষা করছে। পুতুলের কাছে সরে গিয়ে নিম্নস্বরে প্রশ্ন করল, মাকে থাকতে বললে না ভাল হ'ত ?

বলেছি, কিন্তু থাকলেন না যে। দাদার বিয়ের কথা হচ্ছে বুঝি।

ওঃ। আচ্ছা, আমি মাকে এগিয়ে দিচ্ছি। তুমি ভেতরে যাও, বাবার শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়েছে আবার।

দুমড়ে মুষড়ে গেল পুতুল একটা আবছা আতঙ্কে, আগুনের ওপর একখণ্ড কাগজের মত। হায় রে অদৃষ্ট! ভাবতে ভাবতে চলে গেল পুতুল, মায়ের কাছে বিদায় নিতেও মনে হ'ল না। বিনোদিনী কিন্তু তরতর করে এগিয়ে গিয়ে বললেন দেবনাথকে, এস বাবা।...

গোবিন্দজীউর পঞ্চরত্নের মন্দির। সিমেন্টের ছোঁয়া নেই, শুধু পঙ্কের কাজ-করা। মসৃণ জগমোহনের বাঁদিকে ঠাকুরকে চৌকির ওপর শুইয়ে দেওয়া হয়েছে, পুরোহিত মশারি ফেলে দিয়ে চলে গেছেন। স্তিমিত ঘৃত-প্রদীপ সেবিকার অর্ঘ্যের মত পাশে ঊর্দ্ধমুখ হয়ে জ্বলছে। ঘরের সর্বত্র একটা মিষ্ট সুরভি, তামার ছোট গোলাকার স্নানপাত্রের জলটুকুতে পর্য্যন্ত সেই মধুর গন্ধের রেশ। দালান বন্ধ করতে এসে পুতুল তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে। নীরস মাটির দেশের প্রেমঘন মর্ম্মরমূর্ত্তি, আশা এবং আশিসের প্রতীক মোহন-শ্যাম সহজ মানুষগুলির সঙ্গে যেন একাত্ম হয়ে আছেন। পর পর দুটো ছবি অতীত এবং বর্ত্তমান থেকে এসে পুতুলের চোখের সামনে পাশাপাশি ভেসে উঠল। ময়লা, ছেঁড়া ক্যানভাসের জুতো পায়ে ধুলো-কাদা বিকীর্ণ কলকাতার রাজপথে ট্রামবাসের জানালায় শুকনো একটি হাত আর বিনীত দুটি চোখ তুলে ধরা, সেই এক দৃশ্য। আর এই মাঘের ভাস্বর সন্ধ্যায় মানব-মনের এক বাস্তব রূপকের সামনে বাসনাহীন, ভাবনাহীন লঘু অবস্থিতি, শুধু নয়ন ভরে পরিপূর্ণ শান্তি অনুভব করা, এ আর এক জিনিষ। নিষ্কম্প, সামান্য একটু দীপ-শিখার মত স্বচ্ছ, সীমায়িত জীবন; দেবায়তনের একটিমাত্র জানালার মত এখানকার জীবনের একটি আদর্শ মানুষের মনে, সে আদর্শ শান্তির স্নানজলে ভেজানো। কৃপণা বসুমতী বল্লভ-পুরের মানুষকে আর কিছু দিতে পারেন নি। মন্দিরের চাতালে দাঁড়িয়ে পুতুল ভাবে, না, চাইবার কিছু নেই।

—ওমা, বৌদি, তুমি হেথায় দাঁড়িয়ে যে গো!

সরলা ঝি। একটু থেমে বলল, আমি তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেলাম গা! দাদাবাবু কতক্ষণ ধরে বসে, বাবুকে ওষুধ কি খাওয়াতে হবেক—

চল সরলা, আমি যাচ্ছি।

একটু স্নানজল ছোট একটা বাটিতে করে তুলে নিয়ে পুতুল দরজায় তালা লাগাল। শ্বশুরের ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর বাটিটা রাখল, কয়েক ফোঁটা জল ছিটিয়ে দিল সোমনাথের মাথায়।

মা? ক্লান্ত চোখ মেলে তাকালেন সোমনাথ।

দেবনাথ বলল, জ্বরটা একটু দেখ ত, বেড়েছে মনে হচ্ছে।

সোমনাথ বললেন, ভয় পাস নি রে তোরা, ভয় পাস নি। আমি সেরে উঠব। তবে একবার জায়গাটা পাল্টালে বোধ হয় ভাল হয়।

পুতুল বলল, ঠিক বলেছেন বাবা। ডাক্তারও বলছিলেন, একটা চেঞ্জ হলে সুস্থ হয়ে উঠবেন এখনই।

ফোলা ফোলা চোখে হাসলেন সোমনাথ, ওসব চেঞ্জ-টেঞ্জ— বরং কলকাতাতেই ফিরে যাই চল।

না বাবা। চঞ্চল হয়ে উঠল পুতুল, সেখানে গেলে আপনার শরীর সারবে না। পশ্চিমে কোথাও চলুন।

দেবনাথ পুতুলের মুখের দিকে চেয়ে সহসা বলে ফেলল, তাই চল বাবা। আমিই বরং কলকাতা থেকে কাজগুলো গুছিয়ে ফিরে আসি।

সোমনাথ বুঝতে পারলেন ওদের অভিপ্রায়টা, হাসিমুখে বললেন, তবে তাই চল।

উদ্যোগ এবং আয়োজনে দিন পনের কেটে গেল। দেবনাথ সপ্তাহখানেক পরেই বল্লভপুরে ফিরে এল। সোমনাথ সুস্থ হয়ে উঠেছেন ইতিমধ্যে, একদিন সায়াহ্নবেলায় একটা চাদরে গা-টা ঢাকতে ঢাকতে ডাকতে আরম্ভ করলেন, পুতুল, পুতুল মা—

কেন বাবা?

দরকারী কয়েকটি ওষুধ বাক্সে কাগজ দিয়ে প্যাক করে রাখছিল, মাথায় আঁচলটা বাঁ হাতে টানতে টানতে হাজির হ'ল।

কার চিঠি?

হেমেন, আমার বন্ধু, বিশেষ বন্ধু, আসছে বোধ হয় এখনই। লিখেছিলাম চেঞ্জে যাচ্ছি, সেখানে কি ওষুধ খাব, একটা ব্যবস্থা দিতে। না নিজেই ছুটে আসছে, সঙ্গে যাবে। বোধ হয় দেব কলকাতা গিয়ে বাড়িয়ে যা-তা বলেছে আর কি! সময় হয়ে এল, পাঁচটা বাজল নাকি?

না, এখনও বাজে নি। আমি তবে যাই বাবা। উনি আসছেন, একটু আয়োজন করি। উল্লসিত হয়ে উঠলেন সোম-নাথ, নিশ্চয়, নিশ্চয়। ওখানে একটা সুন্দর পাহাড় আছে, এক-দিন পিকনিক করা যাবে। কি বল? দেব গেল কোথায়?

উত্তেজনায় পুতুল প্রায় লাল হয়ে উঠল, কথা বলতে পারল না। আনন্দে অন্তর-ময়ূর যেন পেখম মেলে নৃত্য করতে চায়। দূরে, অনেক দূরে, সেই কলকাতার কণ্টকাকীর্ণ, অন্ধকারাচ্ছন্ন চোরাগলি পেছনে ফেলে নূতন দেশের ঝরঝরে, সুপরিসর রাজপথে নূতন করে আবার চলা। মাঘ মাসের ঠাণ্ডা আবহাওয়ার মধ্যেও মনে হ'ল ফাল্গুনের একটা দমকা বাতাস গুঞ্জরণ করে উঠেছে থেকে থেকে। দমকা বাতাসটা আসছে পূব দিকের গোবিন্দজীউর মন্দির হতে। পুতুল একবার তাকাল বাইরের নীল আকাশের দিকে, মন্দিরের সাদা চূড়ার উপর। তারপর ত্বরিতপদে কাজ গোছাতে চলে গেল।

বোধ হয় আধ ঘণ্টাও হয় নি, ঘুঙুর বাজিয়ে ঘোড়ার গাড়ী এলো সদর গেটে। মিনিট পনের পর চা-খাবার নিয়ে পুতুল ঢুকল সোমনাথের ঘরে, গলা ছেড়ে দুই প্রাচীন বন্ধু গল্প জমিয়েছিলেন

এতক্ষণ সেখানে। হঠাৎ কার ডাকে নীচে যেতে হয়েছে সোমনাথকে। পাশের ঘরে খাবার সাজাতে সাজাতে হাতটা থেমে যাচ্ছিল পুতুলের, উৎকর্ণ হয়ে শোনবার চেষ্টা করছিল এ ঘারের কি একটা স্বর, কেমন চেনা চেনা, ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলার অবিস্মরণীয় একটা টান। ঘরের মধ্যে পা বাড়িয়েই থমকে গেল বেকাবি হাতে। বিগত দিনের তাদেরই বাড়ীর অনেক সঙ্কটের বন্ধু সেই ডাক্তার হেমেন রায়। একাকী বসে কি একটা বড় পত্রিকা একমনে পড়ছেন।

কানের মধ্যে অসংখ্য ঝিঁঝিঁ ডেকে উঠল পুতুলের, চোখের সামনে ঘন তমসা, তার মাঝে কিলবিল করে উঠল পচা অতীতের দুর্গন্ধময় কয়েকটা স্মৃতির আবছা রেখা। পরিষ্কার মেঝেয় জমে উঠল নোঙরা একহাঁটু পাঁক, পা দুটো ভারী হয়ে আটকা পড়ে গেল। অভাগিনীর মড়াকান্না বুক বেয়ে চল-চল করে ঠেলে উঠতে লাগল কণ্ঠ পর্যান্ত। সেই কবে আরম্ভ হয়েছিল ঠোকর খাওয়া, তার আর শেষ হবে না এ জীবনে! ভগবান দুটো দিনও সুখে চলতে দিলেন না! অদৃষ্ট ইচ্ছামত খেলবে ছোট একটা মানুষকে নিয়ে এই রঙ্গভরা খেলা!

হেমেন রায় এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নি। ক্ষীণ একটা কাতরানি কানে আসতেই চকিতে উঠে দাঁড়ালেন, নিমেষে বুঝতে পারলেন সবকিছু। কাছে এসে টেনে নিলেন পুতুলকে অকৃত্রিম স্নেহে, বললেন, ভয় নেই মা, আমি ডাক্তার।

ছায়াছবি সব মিলিয়ে গেল, কিন্তু তবু এমন স্নেহের স্পর্শে দেহটা সেই কিছুক্ষণ আগেকার মত হালকা হ'ল কৈ! এমনি সময়ে শব্দ করতে করতে সোমনাথ এসে পড়লেন, বললেন, মায়ের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল হেম?

হাঁ ভাই। এ যে আমার পুরোনো মা।

চিনতে বুঝি?

বা-রে! কল কণ্ঠে হেসে উঠলেন ডাক্তার, মাকে আবার ছেলে চেনে না! কি তোমার বুদ্ধি হচ্ছে বুড়ো বয়সে সোম!

পুতুল খাবার নামাচ্ছিল টিপয়ের উপর এক এক করে, দেবনাথ ঘরে ঢুকতেই আবার আরম্ভ করলেন ডাক্তার, ভাগ্যবান ছেলে তুমি বাবা, তাই এমন লক্ষ্মী মা-টিকে পেয়েছ। এমন মেয়ে, চোখ জুড়িয়ে যায়। বিয়ের সময় আসতে পারি নি, ভাগ্যিস এখন সুযোগটা হয়ে গেল! হেমেন পুতুলের গুণের বর্ণনায় আত্মভোলা হয়ে উঠলেন।

চেঞ্জে যাওয়া হবে কালই, ভোর রাত্রে। খাওয়ার পর পুতুল সোমনাথকে একান্তে পেয়ে বলল, আমার যাওয়া হবে না, বাবা।

কোথায় রে?

কথাটা ঠিক বোধগম্য হ'ল না সোমনাথের, তাকিয়ে রইলেন অবাক হয়ে। পুতুল পরিষ্কার করে বলল, ভেবে দেখলাম, এখানকার সংসার, ঠাকুর—এসব ছেড়ে আমার যাওয়া চলে না। আপনারা ঘুরে আসুন।

বিস্ময়ের ভাব কাটিয়ে উঠে সোমনাথ বোধ করি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, দেখলেন, পুতুল তখন চলে গেছে।

কথাটা দেবনাথের কানে পুতুলই তুলল শোবার আগে; যে সহজ ভাবে হাসতে হাসতে বলল, আমার যাওয়া হ'ল না এবার তোমাদের সঙ্গে।

দেবনাথ উঠে বসল, মানে?

গোবিন্দজীউর মন্দিরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে পুতুল উত্তর দিল ঠাকুরের ইচ্ছে।

তার মানে?

আমি সামান্য মেয়ে, তার মানে আমিই কি জানি গো! তুমি কিছু মনে করো না, এখানকার সংসার, ঠাকুর ছেড়ে যাওয়া আমার এখন চলবে না। পরে যাব তোমার সঙ্গে, কি বল?

দেবনাথ তাকিয়ে রইল পুতুলের দিকে, মুখে কথা যোগাল না আর পুতুল অনুরাগভরে স্বামীর মাথার চুলগুলি নাড়তে নাড়তে বলতে লাগল, বাবাকে আমি বলেছি। তুমি রাগ করো না কেমন?

রাতের অন্ধকার শেষ হয় নি তখনও। বরফের মত ঠাণ্ডা শীতের হাওয়া, থর থর করে কেঁপে উঠছে শরীরটা। পুতুল যাওয়ার সব তদ্বির করে শেষে দাঁড়াল বাইরের ঘরের দরজার কাছে গাড়ী ছেড়ে দিল।

অনুরোধ করেন নি কেবল ডাক্তার হেমেন রায়। প্রসন্ন সহাস চোখে অভয় দিয়েছেন সর্বক্ষণ, কিন্তু তাতে প্রাণের গভীরতা ছিল না। পুতুল অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিল বারে বারে, ভর করে দাঁড়াবার পায় নি সেখানে কিছু। মনে হ'ল, ওর ভেতরে যে রয়েছে, সে চেনে না পুতুলকে। দূরতম নক্ষত্রের মত ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে আছে সেই ভিতরের মানুষটি।

একটি কীটদষ্ট স্থলপদ্ম। ডাক্তার হেমেন রায় বোধ হয় তাই দেখছিলেন এক এক সময় হিমেল অক্ষি মেলে, তার উপর সমবেদনায় পরিষ্কার চিহ্ন।

যত কষ্টই হউক, পুতুল বুঝতে পেরেছে, হেমেন রায় অন্যায় কিছু ভাবেন নি। সুন্দর সাজানো ফুলটা, কিন্তু শুকিয়ে গেছে ভেতরে ভেতরে। তুলতে গেলেই ঝরে যাবে, দেবতার চরণতল পর্য্যন্ত পৌঁছবে না। একটু সজীব ক্ষণে যত স্বপ্ন-কল্পনাতেই বিভোর হয়ে থাক, তা আর সার্থক হবার নয়।

বাড়ীটা ফাঁকা হয়ে গেল। পূব আকাশ জেগে উঠেছে, স্বর্ণাভ পরিবেশে আলোর ইশারা। হঠাৎ কি একটা মনে হতেই গোবিন্দজীউর রোয়াকে গিয়ে উঠে দাঁড়াল পুতুল। সমস্ত সংশয় প্রায় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তাকাল মন্দিরের চূড়ার দিকে। এ বাড়ীতে অশুচি প্রবেশ করলে কুলদেবতার পঙ্করত্ন দেউলের রৌপ্যশিখর কালো হয়ে যাবে। কিন্তু না, নিবাত-প্রদীপের মত স্থির স্নিগ্ধ, জ্যোতির্ময় হয়ে আছে সেই কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বেকার পবিত্র শিখর; ঐ একটু-

তা ছাড়া আজ আর কিছু নেই বোধ হয় পুতুলের। শুধু কালো হয়ে যাওয়া নয়, হয়ত মরচেও পড়েছে অলক্ষিতে হৃদয়ের মাঝখানে। অভিশপ্ত এক অমাবস্যার রাতে, কান্না আর অন্ধকার ছাড়া সেদিন কিছু ছিল না। না ছিল মন্দির, না ছিল মমতাভরা মানুষ। আজ আছে, কিন্তু তার চারদিকে নেমে এসেছে বুকভাঙা শীতের আস্তরণ। জীবনটা কাব্য নয়। পুতুল জানে, খেলাঘরের মরা ঘাসে প্রাণ আর জাগবে না। আর একথা জানে, নার্সিং হোমের ডাক্তার হেমেন রায় এবং একথা আর এক দিক দিয়ে জানে আর একটি ব্যক্তি; সে পুতুলেরই দুর্বল মুহূর্তের প্রেত-সত্তা, কলকাতার আড়কাঠি—অমল চৌধুরী।

বুদ্ধঘোষ

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

থেরবাদী বৌদ্ধাচার্য্যগণের মধ্যে বুদ্ধঘোষ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। পালি ভাষ্যকার হিসাবে তিনি বৌদ্ধজগতে সবিশেষ পরিচিত। তাঁহার ভাষ্যগুলির প্রভাব দক্ষিণ বৌদ্ধসম্প্রদায়ের (Southern Buddhists) উপর বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। কারণ তাঁহার জীবনী সম্পর্কিত ঘটনাবলী (উপাখ্যান ও কিংবদন্তী) একমাত্র সিংহল, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে পাওয়া যায়। উত্তর বৌদ্ধসম্প্রদায় (Northern Buddhists) বলিতে নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান ও মঙ্গোলীয় দেশের অধিবাসীদের বুঝায়। এ সম্বন্ধে মোক্ষমূলার (Max Muller) বলেন:

"The radical difference between the two schools is this, the Northern Buddhism is the system developed after contact with Northern tribes settled on the Indus, while the Southern school, on the contrary, represents the primitive form of the Buddhist faith as it came (presumably) from the hands of its founder and his immediate successors. We might, without being far wrong, denote the developed school as the Buddhism of the Indus, whilst the earlier school is the Buddhism of the valley of the Ganges."
—*Sacred Books of the East.*

বুদ্ধঘোষ ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে তিনি পাণিনি ব্যাকরণে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জ্জন করেন। তিনি পতঞ্জলির নিয়ম-পদ্ধতির প্রতি বিশেষ ভাবে আস্থাবান ছিলেন। হিন্দু-দর্শন, বিশেষতঃ যোগ ও সাংখ্য দর্শনেও তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

মগধের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ বোধিবৃক্ষের অনতিদূরে 'ঘোষগামে' খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে বুদ্ধঘোষ জন্মগ্রহণ করেন।১ মোক্ষমূলারও তাঁহার আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রারম্ভে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পিতার নাম কেসী ও মাতার নাম কেসিনী। কেসী মহারাজ সংগ্রামের পুরোহিত ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথম দিকে মগধে রাজত্ব করেন।৩ সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে বুদ্ধঘোষ বেদ অধ্যয়নে লিপ্ত হন।৪ ক্রমশঃ তিনি বেদশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন।

সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস 'মহাবংস'৫ পাঠে বুদ্ধঘোষের জীবনী ও তদীয় কার্য্যাবলীর বিবরণ জানিতে পারা যায়। বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে বুদ্ধঘোষ বিরুদ্ধবাদী ধর্ম্মসম্প্রদায় বিশেষের সহিত তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। বেদের মাহাত্ম্য প্রচার ও তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করাই ছিল ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে তিনি জম্বুদ্বীপের গ্রাম, নগর, রাজধানী প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। একদা কোনও এক বিহারে স্বীয় প্রাধান্য বিস্তারপূর্ব্বক তথায় অবস্থান করিতে থাকেন। এই সময় মহাথের রেবতের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। বুদ্ধঘোষের অনন্যসাধারণ প্রতিভা এবং বিদ্যাবত্তায় তিনি মুগ্ধ হন। মহাথের রেবত বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার কর্ম্মপ্রচেষ্টা বুদ্ধ-শাসন প্রতিষ্ঠায় ও বৌদ্ধধর্ম্ম-বিস্তারে প্রভূত সাহায্য করিবে। তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে তিনি মনস্থ করিলেন। এই সময়ে উভয়ের মধ্যে বাগ্‌যুদ্ধ হয়। বুদ্ধঘোষের প্রতিটি যুক্তি ভ্রান্তিমূলক বলিয়া রেবত প্রতিপাদন করেন। অতঃপর রেবত 'অভিধম্মপিটক' হইতে একটি অনুচ্ছেদের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে বুদ্ধঘোষকে বলিলেন। বুদ্ধঘোষ উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইলেন। তখন রেবত সদ্ধর্ম্মের হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা করেন। বুদ্ধবচনের অপরূপ ভাবমাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া মহাথের রেবতের নিকট তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহার সন্ন্যাস-নাম হইল 'বুদ্ধঘোষ' অর্থাৎ বুদ্ধের বাণী।

দক্ষিণ বৌদ্ধসম্প্রদায় কর্ত্তৃক নবদীক্ষিত ব্রাহ্মণ-সন্তানকে বুদ্ধঘোষ নামে অভিহিত করার মধ্যে ধর্ম্মনৈতিক কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। উত্তর বৌদ্ধসম্প্রদায় ও তাহাদের সমগোত্রীয় চীন, জাপান, মঙ্গোলীয় দেশে বুদ্ধদেব অবলোকিতেশ্বর বলিয়া পূজিত।

---

1. cf. *Buddhism as a Religion* by Hackmann, p. 68.

2. *Sacred Books of the East,* Vol. X, (1924) p. XXii.

৩। 'জগজ্জ্যোতিঃ', আষাঢ়, ১৩১৫

4. *Sasanavamsa* (Ed. by M. Bode, P.T.S.).

5. *Mahavamsa* (Turnour), pp. 250-3.

সম্প্রদায়গত মতভেদের অন্যতম হিসাবে দক্ষিণ বৌদ্ধসম্প্রদায় বুদ্ধঘোষকে ভগবান্ তথাগতের বাণীর মূর্ত্তপ্রতীক বলিয়া প্রচার করেন; কারণ মহাপরিনির্ব্বাণের প্রাক্কালে ভগবান্ বুদ্ধ তদীয় শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান করেন, 'শাস্তার পরিনির্ব্বাণে তোমরা দুঃখ করিও না; কারণ বুদ্ধ তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। উপদিষ্ট ধর্ম্ম-বিনয় তোমাদের পক্ষে শাস্তা এবং পরিচালক হইবে।'৬ 'মহাবংসে' উল্লিখিত আছে :

"As he was as profound in his (ghoso) eloquence as the Buddha himself, they conferred on him the appellatiin of Buddhaghoso (the voice of the Buddha); and throughout the world he became as renowned as the Buddha."

বুদ্ধের জীবদ্দশায় ধর্ম্মকথক, ধর্ম্মধর, বিনয়ধর ও মাতৃকাধর নামধেয় শিষ্যগণ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রামাণিক বুদ্ধবচন ও শিষ্যবচন সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন। ভগবান্ তথাগতের মহাপরিনির্ব্বাণের তিন মাস পরে রাজগৃহে প্রথম সঙ্গীতি আহূত হয়। থের মহাকস্সপ ইহার অধিনায়কত্ব করেন। তাঁহারই নির্দ্দেশক্রমে ধর্ম্ম-বিনয়-সংগ্রহ সুপ্রণালীতে সংরক্ষিত হয়। পরবর্ত্তীকালে ইহাতে বহু প্রক্ষিপ্ত অংশ সংযোজিত হয়। সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্র সুত্ত, বিনয় ও অভিধর্ম্ম—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। ইহা ত্রিপিটক নামে অভিহিত।

স্থবির আনন্দ সুত্তপিটক, উপালি বিনয়পিটক এবং মহাকস্সপ অভিধম্মপিটকের সম্পাদনা করেন। সুত্তপিটকে বুদ্ধবচনসমূহ নিবদ্ধ হয়। এই সকল বুদ্ধবচনের সারনীতি সংগ্রহ করিয়া 'ধম্মপদ' নামে একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়। 'ধম্মপদ' বলিতে ধর্ম্মের পথ বা সোপান বুঝায়।৭ পিটকত্রয়ের পরিচ্ছেদ সংখ্যা চুরাশী হাজার, তন্মধ্যে বুদ্ধবচনের পরিচ্ছেদ সংখ্যা বিরাশি এবং অবশিষ্ট দুই হাজার পরিচ্ছেদে শিষ্য-ভাষণ স্থান পাইয়াছে।

মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মাশোকের নেতৃত্বে রাজধানী পাটলীপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধসঙ্গীতির অধিবেশন হয়। এই সঙ্গীতিতে তিস্স মোগ্গলিপুত্ত পৌরোহিত্যের পদে বৃত হন। এই মহাসঙ্গীতিতে 'পিটকত্রয়' ও 'অটঠকথা' নামক উহার ব্যাখ্যা সংগৃহীত হইলে ভিক্ষু মহেন্দ্র কর্ত্তৃক তাহা সিংহলে নীত হয়।৮

সিংহল এবং মগধ—এই দুই জনপদের মধ্যে সদ্ভাব বিদ্যমান ছিল; সিংহলরাজ তিস্স (খ্রীঃ পূঃ ৩০৭-২৬৭ অব্দ) তদীয় মিত্র প্রিয়দর্শী অশোকের নিকট বহুমূল্য উপঢৌকনসহ দূত প্রেরণ করেন। রাজর্ষি অশোকও নানাবিধ মূল্যবান উপহার সিংহলে পাঠাইয়া দেন। এই সময় তিনি তিস্সকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার সারাংশ এই :

"আমি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণ লইয়াছি। আমি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছি। হে রাজন্, এই মহান্ ধর্ম্মের দ্বারা আপনার হৃদয় পবিত্রীকৃত হউক—মুক্তিপথের সোপানস্বরূপ ত্রিরত্নের আশ্রয় লাভ করুন।'৯

সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই মহারাজাধিরাজ অশোক স্বীয় পুত্র মহেন্দ্রের নেতৃত্বে বৌদ্ধ প্রচারক-মণ্ডলী সিংহলে প্রেরণ করেন। ভিক্ষু মহেন্দ্র এবং ভাণক সম্প্রদায় সেখানে বৌদ্ধধর্ম্ম আবৃত্তির সাহায্যে সাধারণ্যে প্রচার করেন।১০ রাজা তিস্স মহেন্দ্র কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

সিংহলরাজ বট্টগামনির (খ্রীঃ পূঃ ৮৮-৭৬ অব্দ) রাজত্বকালে পালি ত্রিপিটক পুস্তকারূঢ় হয়। মহেন্দ্র কর্ত্তৃক প্রচারিত এবং সিংহলী ভাষায় অনূদিত 'অটঠকথা' বুদ্ধঘোষ পালি ভাষায় রূপায়িত করেন। এই অনুবাদ-কার্য্যে বুদ্ধঘোষ মাগধী ব্যাকরণের নিয়ম-পদ্ধতিকে অনুসরণ করেন।১১ 'ব্রহ্মজালসুত্তে'র ভূমিকায় বুদ্ধঘোষ স্বয়ং বলিয়াছেন :

". . . From thence I translated the Sihaliversion into the delightful (classical) language, according to the rules of that (the Pali) language, which is free from all imperfections omitting, only the . . . repetitions of the same explanations, but at the same time, without rejecting the tenets of the theros resident at the Mahawiharho (at Anuradhapura). . . ."—*Indian Antiquary.*

মহাথের রেবতের নির্দ্দেশক্রমে বুদ্ধঘোষ সিংহল গমন করেন। এই সময় মহানাম সিংহলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন (খ্রীঃ ৪০৯-৪৩১ অব্দ বা খ্রীঃ ৪০৯-৪২১ অব্দ)। সে সময় অনুরাধপুরে অবস্থিত মহাবিহারের পরিচালক ছিলেন থের সঙ্ঘপাল। সিংহল গমনের পূর্ব্বে বুদ্ধঘোষ 'ঞানোদয়' (জ্ঞানোদয়) নামে একটি মৌলিক পুস্তক রচনা করেন।

শ্যামদেশে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে দেখা যায়, বুদ্ধঘোষ সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। লাও এবং কম্বোজ দেশে ভগবান তথাগতের বাণী প্রচারিত হইলে শ্যামদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবেশ-লাভ ঘটে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, ভিক্ষু মহেন্দ্রই সিংহলে বুদ্ধবাণী প্রচার করেন। 'মহাবংস' ও 'দীপবংসে' বর্ণিত আছে, রাজর্ষি অশোক 'সুবর্ণভূমি'তে ধর্ম্মবিজয়কল্পে সোন এবং উত্তর নামধেয় ভিক্ষুদ্বয়কে তথায় প্রেরণ করেন। 'সুবর্ণভূমি'র ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। অনেকের মতে, ইহা শ্যাম-দেশের অন্তর্গত। শ্যামদেশের অধিবাসী 'থাই'-দের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তী মতে অশোক-প্রেরিত বৌদ্ধ প্রচারকমণ্ডলী নৌকাটের সাহায্যে জলপথে দক্ষিণ শ্যামের সমুদ্রতীরে অবস্থিত প্রাচীন নাখন পাথোনে প্রথম পদার্পণ করেন। রাজর্ষি অশোকের ধর্ম্মবিজয়কে কেন্দ্র করিয়া বৃহত্তর ভারত গড়িয়া উঠিতে থাকে। টার্ণার সাহেব বলেন :

6. Encyc. Brit., Vol. IV, p. 432.

৭। ভাণ্ডার—বৈশাখ, ১৩১২, পৃঃ ১৩।

8. Maxmuller, *Dhammapada* : Intr.

9. *The Book of Ceylon* by Henry W. Cave, p. 531,

10. Maxmuller, *Dhammapada*, Intr.

11. *A Manual of Buddhism*

"That the spread of Buddhism in Burma and Sham was the natural consequence of the intercourse of these countries with Ceylon in early times, rather than result of the preaching of Buddhaghosa."

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, বুদ্ধঘোষের বহু পূর্ব্বেই শ্যাম-দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল।

ব্রহ্মদেশীয় আখ্যানে দেখা যায়, 'বিশুদ্ধিমগ্‌গ' নামক ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদের জন্য বুদ্ধঘোষকে ব্রহ্মদেশ হইতে সিংহলে প্রেরণ করা হয়। তিনি সিংহলরাজকে একটি শ্বেতহস্তী উপঢৌকন প্রদান করিয়া 'বিশুদ্ধিমগ্‌গ', 'পিটকত্তয়' ও অন্যান্য ভাষ্য গ্রহণের অনুমোদন লাভ করেন। কিন্তু 'মহাবংস' মতে বুদ্ধঘোষই ইহার রচয়িতা। মহাথের রেবতের নির্দ্দেশে তিনি সিংহল গমন করেন। তথাকার মহাবিহারের 'মহাপধান হলে' থের সঙ্ঘপালের শ্রীমুখে সিংহলী 'অটঠকথা' ও 'থেরবাদ' আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত অভিনিবেশসহ শ্রবণ করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের অপরূপ মাহাত্ম্য এবং ভাবগাম্ভীর্য্যে তিনি অভিভূত হইয়া পড়েন। অতঃপর তিনি সঙ্ঘের নিকট তথায় স্বীয় আগমনের সাধু উদ্দেশ্য নিবেদন করেন। স্বীয় যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্য সঙ্ঘের আদেশে তিনি 'পিটকত্তয়' ও 'অটঠকথা'র একটি মনোরম সংক্ষিপ্ত ভাষ্য প্রণয়ন করেন। ইহাই 'বিশুদ্ধিমগ্‌গ' নামে অভিহিত। তাঁহার অলৌকিক প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া সঙ্ঘ তাঁহাকে পুস্তকারূঢ় সিংহলী 'পিটকত্তয়' ও 'অটঠকথা'র ভাষ্য রচনার অনুমতি প্রদান করেন। অনুরাধপুরের গ্রন্থাকার বিহারে অবস্থানপূর্ব্বক তিনি জীবনের মহান্ ব্রত উদ্‌যাপন করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বুদ্ধঘোষই 'বিশুদ্ধিমগ্‌গ' গ্রন্থের প্রণেতা, অন্য কেহ নহে।

কেহ কেহ বলেন, 'বিশুদ্ধিমগ্‌গ' বুদ্ধঘোষের রচনা নহে। ইহা 'বিমুত্তিমগ্‌গ' নামক পুস্তকের পরিমার্জ্জিত নূতন সংস্করণ মাত্র। থের উপতিসস ইহার রচয়িতা। তিনি সিংহলের অধিবাসী খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে বিরাজ করেন। 'বিমুত্তিমগ্‌গে'র সিংহলী সংস্করণ অধুনালুপ্ত। সঙ্ঘপাল নামক জনৈক কম্বোজ দেশীয় সন্ন্যাসী চীনা ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন (খ্রীঃ ৫০৫ অব্দ)। পালি 'বিশুদ্ধিমগ্‌গে'র বিষয়-বস্তুর সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়।[১২]

বার্ণফ, লাসেন প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে বুদ্ধঘোষ পালি 'ত্রিপিটক' ও অন্যান্য ভাষ্য সিংহল হইতে পেগুতে আনয়ন পূর্ব্বক তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। হার্ডি সাহেব বলেন, তাঁহার আগমনকে স্মরণীয় করিবার জন্য তত্রত্য জনপদবাসিগণ এক অব্দের প্রচলন করে। বার্ণফ প্রভৃতির বিশ্বাস, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অভ্যুত্থানে বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের উপর অত্যাচার-অবিচারের অভিযান সুরু হইলে বুদ্ধঘোষ ব্রহ্মদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই মতবাদের মূলে ঐতিহাসিক সত্য কতটা নিহিত আছে তাহা বিচার্য্য। পরমত-সহিষ্ণুতা হিন্দুধর্ম্মের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিশেষতঃ, হিন্দুশাস্ত্রে বুদ্ধদেব দশাবতারের এক অবতার বলিয়া পূজিত। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, হিন্দুরাজগণ বৌদ্ধদিগকে অকাতরে সাহায্য করিয়াছেন। শুধু বাংলার রাজা শশাঙ্কের রাজত্বে এই নিয়মের কতকটা ব্যতিক্রম দেখা যায়। কিন্তু তাঁহার রাজত্ব অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। অতএব হিন্দুদের উৎপীড়নে বৌদ্ধগণ ভারত ত্যাগ করিয়াছিল, ইহা ভিত্তিহীন বলিয়াই মনে হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির মূলে অন্যবিধ কার্য্য-কারণ ছিল। অতএব ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অভ্যুত্থানে বুদ্ধঘোষ ব্রহ্মদেশে আগমন করেন, ইহা সত্য নহে। ব্রহ্মবাসিগণ তাঁহাকে স্বদেশবাসী বলিয়া দাবি করে। কিন্তু 'মহাবংসে' বর্ণিত আছে, বুদ্ধঘোষ সিংহল হইতে মগধে গমন করেন। স্বীয় মহান্ ব্রত উদ্‌যাপিত হইলে তিনি জীবন-সায়াহ্নে পবিত্র বোধিবৃক্ষমূলে শেষ আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিশেষতঃ পেগু-দেশীয় জনৈক আধুনিক পণ্ডিত এই সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়—বুদ্ধঘোষ সিংহল হইতে জলপথে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে থাটোনে অবতরণ করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন, বুদ্ধঘোষ সিংহল হইতে 'কচ্চায়নের পালি ব্যাকরণে'র এক খণ্ড ব্রহ্মদেশে আনয়ন করেন। বুদ্ধঘোষ কর্ত্তৃক ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় ইহা অনূদিত এবং ইহার একটি ভাষ্য লিখিত হয়। কিন্তু প্রসিদ্ধ পালি বৈয়াকরণ মোগ্‌গল্লান (খ্রীঃ ১১৫৩-১১৮৬ অব্দ) ও হেমচন্দ্র প্রভৃতি প্রাকৃত বৈয়াকরণেরাও এ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। সুতরাং এই মতবাদ কাল্পনিক বলিয়া মনে হয়।[১৩]

হার্ডি সাহেব 'মধুরত্থবিলাসিনি' নামক পুস্তকের ভাষ্যকার হিসাবে বুদ্ধঘোষের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা 'বুদ্ধবংস' নামক গ্রন্থের ভাষ্য। কিন্তু গ্রিমলট অপর একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে (বুদ্ধদত্ত) ইহার রচয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'গন্ধবংসে' উল্লেখ আছে, বুদ্ধদত্ত সিংহলের 'মহাবিহারে'র একজন থের। তিনি চোল রাজ্যের অধিবাসী এবং বুদ্ধঘোষের পরবর্ত্তী।[১৪]

'মনুসারধম্মসটঠম্' নামক মনুসংহিতা (The Burmese Code of Manu) সিংহল হইতে ব্রহ্মদেশে বুদ্ধঘোষ কর্ত্তৃক আনীত হয়।[১৫]

ডাঃ এ. ফুরেরার বলেন :

"Finally this code, which was written in Pali only, and kept in the island of Ceylon . . . was at length brought into the Burmese empire and afterwards revised by Buddhaghosa . . ."[16]

বুদ্ধঘোষের 'সমন্তপাসাদিকা' নামক 'বিনয়পিটকের' ভাষ্যের

---

12. B. C. Law, *Buddhaghosa*, p. 82.
13. *Indian Antiquary*, Vol. XIX, 1890 (April)), p. 119.
14. *J.P.T.S.*, 1886, p. 59.
15. *Indian Antiquaru*, Vol. XIX, p. 119.
16. *J.A.S. Bom.* Vol. XV, pp. 34-35.

মুখবন্ধে জানা যায়, এ ভাষ্যটি রচনা করিয়া তিনি বুদ্ধ-অনুশাসন লঙ্ঘন করিয়াছেন। ইহার কারণ, তিনি বিনয়বাদকেই বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ বলিয়া মনে করেন। ভগবান তথাগতের জীবিতকালে বৌদ্ধধর্ম্ম ছিল ধর্ম্ম-প্রধান, কিন্তু তাঁহার মহাপরিনির্ব্বাণের পর উহা বিনয়-প্রধান হয়।

সিংহলে স্বীয় ব্রত উদ্‌যাপনের পর বুদ্ধঘোষ ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতি প্রথমেই মহাথের রেবতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার চরণ-বন্দনা করেন। সিংহলে অবস্থানকালে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তৎসমুদয় তিনি স্বীয় দীক্ষাগুরুর নিকট নিবেদন করেন। অতঃপর তিনি মাতাপিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন। জীবনে অবশিষ্টকাল তিনি বোধিদ্রুমতলে অতিবাহিত করেন। মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ চিতায় ভস্মীভূত করা হয়। তত্রত্য জনপদবাসিগণ তাঁহার দেহাবশেষের উপর একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করে।১৭ কম্বোজ দেশীয় অধিবাসীদের (Cambodians) মতে বুদ্ধঘোষ তাঁহাদের দেশে 'বুদ্ধঘোষ বিহারে' দেহ রক্ষা করেন।১৮

17. *Buddhaghosuppatti*, p. 66.
18. Dr. B. C. Law, *Buddhaghosa*, p. 13fn.

বাল্মীকি-প্রতিভা

শ্রীশান্তা দেবী

রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা' তাঁহার উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়সে রচিত। ইহার জন্ম দেশী ও বিলাতী সুরের চর্চ্চার মধ্যে। সুতরাং ইহার গানগুলির নানাপ্রকার সুর ও তাল লইয়া আলোচনা বহু লোক করিয়াছেন। তাঁহারা অনেকেই সঙ্গীতজ্ঞ, তাঁহাদের মতামতের মূল্য আমার মতামতের চেয়ে বড়। কিন্তু সম্প্রতি বহুকাল পরে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' অভিনীত হওয়ায় দেশী বিলাতী সুরের কথা ছাড়া ইহাকে ঘিরিয়া অন্য অনেক কথাও উঠিয়াছে।

সেই সকল কথার সূত্রে আমার নিজের মনে যে কথাগুলি উঠিয়াছে তাহারই দুই-চারিটা এখানে বলিতে চাই। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে বাল্মীকি-প্রতিভা তাহা নহে—ইহা সুরে নাটিকা।...বাল্মীকি-প্রতিভা গানের সূত্রে নাট্যের মালা।" 'বাল্মীকি-প্রতিভা'তে ঘটনাস্রোতটাই প্রধান, গান তাহাকে শুধু টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। এই কারণে ইহার অনেক গান বাস্তবিক গানই নহে, তাহা শুধু কথাকে সুর করিয়া বলা। সেই সকল গানে হৃদয়াবেগ প্রকৃত উপকরণ নয়, একটি বিশেষ চিন্তা বা ভাবকে এই গানগুলি রূপ দিতেছে না। তাহারা ঘটনাস্রোত বা কথোপকথনকে অগ্রসর করিতেছে মাত্র।

"এনেছি মোরা এনেছি মোরা রাশি রাশি লুঠের ভার।"
"এখন কর্ব্ব কি বল্। হে রাজা হাজির রয়েছে দল।"
"দেখ হো ঠাকুর বলি এনেছি মোরা।"
"আছে তোমার বিদ্যেসাধ্যি জানা। রাজত্ব করা এ কি তামাসা পেয়েছ।"

এই সকল বহু গানকে সুরে গাঁথা সাদা কথা ছাড়া আর কিছু নাম দেওয়া যায় না। এই গানগুলি বাদ দিলে নাটকটির নাট্যরূপের হানি হয়, কিন্তু গীত-উৎসবের কোন ক্ষতি হয় না। নাটকটির রূপ অক্ষত রাখিতে হইলে এখানে সঙ্গীতকে এইরূপ মোটা কথায় যেমন লাগানো প্রয়োজন রহিয়াছে, তেমনি আছে অভিনয়-কলার অন্যান্য অঙ্গেরও যথাযথস্থানে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন। সমস্ত নাটকটিতেই গান এবং অভিনয়কলা অবশ্যপ্রয়োজনীয় অঙ্গ।

দস্যুগণ ও বালিকা —'বাল্মীকি-প্রতিভা'

শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ তাঁহার রবীন্দ্র-সঙ্গীত পুস্তকে "বাল্মীকি-প্রতিভা"কে নাচের সাহায্যে অভিনয়যোগ্য করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। তাহা নৃত্যনাট্যের একটা নূতন রূপ দেখাইতে পারে; তেমনি দৃশ্যনাট্য রূপে বাল্মীকি-প্রতিভাকে রং, রেখা, পোশাক, মঞ্চসজ্জা ও আলোকপাত দিয়াও আর একটি বিশেষ রূপ দেওয়া যায়। রুশীয় ও অন্যান্য বিদেশী নৃত্যনাট্যে মঞ্চসজ্জা রং রেখা ও আলোর যে মায়ালোক দেখিয়াছি তাহাতে মনে হয় প্রকৃত গীতিনাট্যের সহিতও কেহ যদি উচ্চাঙ্গের মঞ্চসজ্জার মিলন গাঁথিয়া তুলিতে পারেন তাহাতে গানের অঙ্গহানি হইবে না। অবশ্য গান যেখানে কেবলমাত্র গান সেখানে একটি তানপুরা মাত্র তাহার সঙ্গী হইলে মানুষের মন শুধু গীতরসে নিমজ্জিত হইবার সুবিধা পায়। কিন্তু গান যেখানে নাটককে রূপদান করিতেছে এবং নাটকের পাত্রপাত্রীরা যেখানে কেবলমাত্র আইডিয়া বা ভাব নহেন, সেখানে দৃশ্যজগতে তাঁহাদের যে স্থান তাহাকে রং রেখায় সজ্জায় নয়নানন্দকর করিয়া তুলিতে পারাও শিল্পীর কাজ।

আজকাল সাজসজ্জাহীন মঞ্চে বই হাতে করিয়া পাত্র-পাত্রীর ভূমিকা পাঠ করিয়া নাটকের রূপদান করার একটি চলন পাশ্চাত্য জগতে চলিতেছে। আমাদের দেশে ইহা নূতন নয়। রামায়ণ গান, কথকতা ইত্যাদি এদেশে প্রাচীন কাল হইতে চলিত। এই ধরনের পাঠে শ্রোতার সূক্ষ্ম রসানুভূতি ও কল্পনাশক্তি থাকিলে তিনি পারিপার্শ্বিকটা আপনার মনে রচনা করিয়া লইয়া নাট্যকারের এবং পাঠকের কৃতিত্ব উপভোগ করিতে পারেন। ইহাতে কল্পনার ক্ষেত্র বড় বলিয়া শ্রোতার ক্ষমতানুযায়ী নাট্যজগৎ তিনি সৃষ্টি করিয়া লইতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে মঞ্চের রচিত জগৎ হইতে তাহা বড় হয়। কিন্তু দৃশ্যনাট্যেরও একটা ক্ষেত্র আছে এবং তাহাও শিল্পীর ক্ষেত্র। শিল্পী যদি মঞ্চে মায়া-লোক সৃষ্টি করিতে পারেন তবে তাঁহার কুশলতার সহিত অভিনেতা ও গায়কের কুশলতা যুক্ত হইয়া যে অভিনয় হয় তাহার ক্ষেত্রও নাট্যজগতে থাকা উচিত।

রোমে আমরা Verdi'র "Ida" গীতিনাট্য অভিনয় দেখিয়া-ছিলাম। তাহা মুক্তাকাশের তলায় প্রাচীন রোমীয় ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে অভিনীত হয়। ইহা গীতিনাট্য হওয়া সত্ত্বেও মঞ্চে সেদিন প্রাচীন মিশরের মায়ালোক দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া-ছিলাম। মঞ্চসজ্জা, হাজার অভিনেতা, ঘোড়া, উট, রাজ-সমারোহ, কোন কিছুই গানের অঙ্গহানি করিতে পারে নাই। বরং উচ্চাঙ্গ ইউরোপীয় সঙ্গীত সম্পূর্ণ বুঝিবার শক্তি যাহাদের নাই তাহারাও মিশরের মায়ালোকের এই ছবির সাহায্যে গানকে অনেক বেশী বুঝিতে পারিয়াছিল।

অবশ্য ইহার অন্য দিকও আছে। যাঁহারা ছবি আঁকেন তাঁহারা জানেন কল্পনায় দময়ন্তীর স্বয়ম্বর বা রামের সমুদ্র-শাসন বলিতে আমরা যাহা দেখি, ছবি আঁকিতে গেলে তাহা তাহার ঐশ্বর্য্য ও বিরাটত্ব হারাইয়া ক্ষুদ্র হইয়া যায়। রেখায় যদিবা কোন ছবি অপূর্ব্ব দেখায় তাকে রঙের বন্ধনে বাঁধিতে গেলে শিল্পীর মনে হয় কল্পলোকের অনন্ত রঙের খেলাকে ছোট করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু তাই বলিয়া শিল্পী রেখাঙ্কন বা চিত্রাঙ্কন ত্যাগ করেন না। মানুষের চেষ্টায় কল্পনা-জগৎকে কতখানি আয়ত্ত করা যায় তাহার চেষ্টা মানুষ চির-দিনই করিয়াছে এবং করিবে। কল্পলোককে শ্রোতা বা দর্শককে স্বয়ং মানসপটে আঁকিয়া লইবার সুযোগ দেন তাঁহারা অভিনয়ে যাঁহারা মঞ্চসজ্জাকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করেন, আবার মঞ্চসজ্জার সাহায্যে যাঁহারা কল্পিত জগৎকে রূপদান করিতে চান তাঁহারা দেন আপনাদের কুশলতার পরীক্ষা। ইঁহাদের সমালোচনা জগতে বেশী হয়, কারণ যাহা কল্পিত তাহা অপেক্ষা যাহা দৃষ্টিগোচর তাহার ত্রুটি বেশী হইবেই এবং দৃষ্টিগোচর পদার্থ সম্বন্ধে নানা মানুষের নানা রকম মতও হইবেই। মঞ্চে যাহা দেখা যায় না তাহার সমালোচনা চলে না, যাহা দেখা যায় তাহারই চলে।

মনে হইতে পারে, নাট্যমঞ্চ Verdi'র "Ida"র মত বিরাট হইলেই তাহার ত্রুটি কম এবং সামান্য হইলেই উপেক্ষার বস্তু এই বুঝি আমি বলিতে চাই। নিশ্চয়ই নয়। সিঁড়ির ধাপের মত সবেরই ধাপ আছে। কোন্ মঞ্চে এবং কোন্ নাট্যে কতখানি সজ্জা চলিবে তাহা বুঝিয়া চলা শিল্পীর কাজ। তিনি ওজন বুঝিয়া মঞ্চ রচনা করিবেন। মঞ্চ সোনায় মুড়িবেন কি কাগজে তাহা তাঁহার আর্থিক অবস্থার উপরও কিছু নির্ভর করে, হাঁড়ি কড়া দেখাইবেন কি বীণা মৃদঙ্গ দেখাইবেন তাহা তাঁহার রুচির উপর নির্ভর করে। তা ছাড়া নাট্যবস্তুর কোন্‌খানে কতখানি গুরুত্ব দেওয়া দরকার তাহাও তিনি বুঝিয়া দেখাইবেন। আমাদের ভারতীয় নাট্যমঞ্চে কি দেখাইবে না দেখাইবে ইহার বহু রীতি প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রে আছে। আধুনিক নাট্যশাস্ত্রে আরও অনেক অলিখিত নিয়ম গড়িয়া উঠিতেছে, তবে তাহা লইয়া মতদ্বৈধ বড় বেশী। এইগুলির লিখিত আলোচনা ও পরে তাহা গ্রন্থাকারে গ্রথিত হইলে ভাল হয়।

লাহিড়ী হাই স্কুল ভবন। পাশে কলেজ-ভবন পরে তৈরি হইয়াছে

চিরিমিরি

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

১

বিলাসপুরে মেল ছেড়ে ব্রাঞ্চ লাইনে অনুপপুরের ট্রেন ধরলাম। অনুপপুরে আবার ট্রেন বদলাতে হ'ল চিরিমিরির জন্য। চিরিমিরি এই ব্রাঞ্চ লাইনের শেষ ষ্টেশন—এই রাস্তাটুকুর প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। মধ্যপ্রদেশের নিবিড় জঙ্গল ভেদ করে আমাদের ট্রেন মন্থর গতিতে চলল। কখনও ট্রেন পাহাড়ে চড়ছে, কখনও-বা নীচে নামছে। গাড়ীর বাঙ্কে শোবার জো নেই, গদিটা লাফাচ্ছে যেন আরোহীকে নিয়ে বল খেলছে। গরাদ-আঁটা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ভাল করে দেখবার সুবিধে হয় না, তাই কামরার দরজাটা মাঝে মাঝে খুলে দিয়ে দু'দিকের জঙ্গল ও পাহাড় ভাল করে দেখতে লাগলাম। বিলাসপুর থেকে অনুপপুরের রাস্তায় একটা বেশ বড় টানেল পড়ে। ট্রেন টানেল ও গহন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলতে লাগল। দুর্ভেদ্য পাহাড় ফাটিয়ে গভীর অরণ্যের ভিতর প্রকৃতির বুক চিরে এই রেললাইন তৈরি করেছে; কোন কোন স্থানে রাস্তা এত অপরিসর যে হাত বাড়ালেই জঙ্গলের গাছপালা স্পর্শ করা যায়।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে, চিরিমিরির ট্রেন থামল। মধ্যপ্রদেশের সারগুজা জেলার অন্তর্ভুক্ত এই চিরিমিরি। পাহাড়ের কোলে সাদা চাল দেওয়া ছোট ষ্টেশন। বোর্ডে লেখা আছে ১১৭৮ ফুট উঁচু। অন্ধকারে চেয়ে দেখলাম চারদিকে পাহাড়ের গায়ে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে ইলেকট্রিক লাইটগুলো তারার মত চিকমিক করছে। ট্রেন থামতেই পাহাড়ের অধিবাসিনী নারীরা বিচিত্র ভাষায় কলরব করে মালপত্র টেনে নিতে লাগল। এদের পরনে লালপাড় বা ফুলপাড় শাড়ী, এক বিশেষ ধরনে পেঁচিয়ে পরা, অধিকাংশের গায়েই ব্লাউস আছে। এদের স্বামীরা কয়লার খনিতে কাজ করে। মেয়েলোকেরা মোট বয়। কেউ কেউ বা অফিসার ও কর্ম্মচারীদের বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করে। এই মোটবাহিকাদের দলকে সারগুজিয়া ভাষায় "রেজা" বলে। এসব আদিবাসী নারীর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য এই যে, এরা যুক্তিতর্ক বোঝে না, সোজা কথা বলে, সোজা উত্তর চায়। সাত দিন কাজ করবে, প্রত্যেক রবিবারে সপ্তাহের মজুরি নেবে। এ কাজ ছেড়ে অন্য আর এক বাড়ীতে কাজ নেবে, এক মনিবের অধীন হয়ে বছরের পর বছর এরা কাজ করতে রাজী নয়।

রাতের আবছা অন্ধকারে পাহাড়ের গায়ে আঁকাবাঁকা পথে সন্তর্পণে উঠতে লাগলাম। নীচে থেকে পাহাড়গুলির গায়ে আলোকমালায় উদ্ভাসিত বাংলোগুলো মায়াপুরীর মত মনে হচ্ছিল। ভোরে জানালা খুলে দেখতে পেলাম চারদিকের পাহাড় কুয়াসায় ঢাকা, খানিক বাদে উষারাণী তার লাজরক্তিম মুখখানা তুলে ধরলেন, চারদিক হেসে উঠল। উষার সুবর্ণকিরণস্নাত শ্যামল বনানীর সে দৃশ্য অপূর্ব্ব।

একদিকে পাহাড়ের গায়ে আমাদের বাংলোবাড়ী, তিন দিকের পাহাড় চমৎকার দেখা যাচ্ছিল। ঘন সবুজ গাছের সারির ভিতর দিয়ে লাল পাথর-কাটা পথ এঁকে বেঁকে কোন্ সুদূরে মিলিয়ে গেছে। পাহাড়ী রাস্তায় একটি দুটি লোক দেখা যায়। ভারী কাঁধে কাঠের

বাঁকে দুটো বালতি ঝুলিয়ে ঝরণা থেকে জল নিয়ে বহু কষ্টে উপরে উঠে অফিসারদের বাড়ীতে পানীয় জল দিয়ে যাচ্ছে। ছোট ছোট টাট্টু ঘোড়ার পিঠে বোঝা বা ইট চাপিয়ে মালিক তার ঘোড়াগুলি নিয়ে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। কখনও কখনও বা দেখা যায় রঙীন সাড়ীপরা গ্রাম্য নারী বোঁচকা মাথায় নিয়ে পাহাড়ী পথে চল্ছে।

আমাদের বাড়ীর পাশ দিয়ে পাহাড়ের কোল ঘেসে রাস্তা চলেছে উপরের দিকে কিঞ্চিৎ সমতল জমিতে, সেখানে লোকালয়, স্কুল, কলেজ আছে। সেই চলার পথের দৃশ্যটা অতি সুন্দর। এক দিকে খাড়া পাহাড়, বড় বড় গাছ সেই পাহাড়ের উপর মাথা উচু করে সদর্পে দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ী দেয়ালের গা ঘেসে যে রাস্তা চলেছে, তা খুব চওড়া নয়, নীচে গভীর খাদ, কয়লার খনি আর ষ্টেশন। অসাবধানতায় পদস্খলন হলে মৃত্যুকে বরণ করতে হবে, নয় ত দারুণ ভাবে আহত হতে হবে। এই সঙ্কীর্ণ লাল পাথুরে রাস্তায় কেদারবদরীর যাত্রীর ন্যায় আমরা চলেছি। অপরাহ্নের ম্লান ছায়ায় চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখলে মনে হয়—ঐ পড়ন্ত রৌদ্রোজ্জ্বল পাহাড় বুঝি মায়া জানে, ঘন সবুজ গাছের ফাঁকে ফাঁকে উচু নীচু লাল রাস্তাগুলি যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে।

২

চিরিমিরি পাহাড়ের চারিদিক নিবিড় অরণ্যে ঢাকা, এ সব পার্ব্বত্য স্থানের কোন কোন জায়গা একেবারে খাড়া, কোন কোন স্থান সমতল, তবে সর্ব্বত্রই ঘন বনানী। এ সকল গহন জঙ্গলে বাঘ ভালুকের অভাব নেই। বহু বৎসর পূর্ব্বে ইঞ্জিনীয়ার শ্রীবিভূতিভূষণ লাহিড়ী মহাশয় যখন এ অঞ্চলে কয়লার খনির অন্বেষণে এসেছিলেন তখন এই জঙ্গলে তাঁকে হাতীর পিঠে চড়ে আসতে হ'ত, তখনও চিরিমিরির জঙ্গল কেটে রেল লাইন বসানো হয় নাই বা ষ্টেশন তৈরি হয় নাই। ১৯২৯ সালে চিরিমিরির রেললাইন তৈরি হয় এবং সেই থেকে চিরিমিরি পাহাড়ের নূতন ইতিহাস সুরু হয়েছে। চিরিমিরি, কোরেশিয়া ও পোনরীছিল এই তিনটি পাহাড় ষ্টেশনকে বেষ্টন করে আছে। বর্ত্তমানে ষ্টেশন থেকে আধ মাইলের ভিতর তিনটি কোলিয়ারী এবং পাঁচ মাইলের ভিতর আরও তিনটি কোলিয়ারী আছে। বর্ত্তমানে এ সব খনিতে আধুনিক প্রথায় কয়লা তোলা হয়। ১৯২৫ সালে ২৬০ মাইল লম্বা রেল লাইন বসাবার কথা ছিল, তার ১৬০ মাইল শুধু তৈরি হয়েছে, বাকী ১০০ মাইল তৈরি করলে শানহাত উপত্যকা পর্য্যন্ত কয়লা সহজলভ্য হবে, আর চিরিমিরি ঝরিয়ার মতই কয়লার ব্যাপারে প্রাধান্যলাভ করবে।

চিরিমিরি হতে শুধু যে কয়লাই বহুল পরিমাণে বাইরে চালান য় তা নয়. পাহাড় থেকে রাশি রাশি বাঁশ কেটে মজুররা ষ্টেশনের াশে স্তূপীকৃত করে সাজিয়ে রাখে এবং রোজ মালগাড়ীর সাহায্যে ৭ সব বাঁশ কাগজের মিলের জন্য স্থানান্তরিত হয়।

ঘন জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের নীচে বিরাট কয়লার খনি, চব্বিশ ঘণ্টা খনির কাজ অবিশ্রান্ত ভাবে চলছে। দিনে এক দল মজুর কাজ করে ছুটি পাচ্ছে, রাতে আর একদল মজুর কাজে নিযুক্ত হচ্ছে। রাত দশটায় যখন শ্রমিকেরা তাদের পালি বদলায়, তখনকার দৃশ্য ভারি সুন্দর। পাঁচশ' শ্রমিক হাতে লন্ঠন নিয়ে পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথে সন্তর্পণে দলে দলে উপরে উঠতে থাকে এবং অপর পাঁচশ' শ্রমিক তাদের লন্ঠন নিয়ে নীচে নামতে থাকে, তখনকার সেই সুদীর্ঘ রেখায় চলন্ত দীপগুলো রাতের অন্ধকারকে বিচিত্র করে তোলে।

দিনরাত ইলেকট্রিক ট্রেন খনির অভ্যন্তর থেকে কয়লা টেনে এনে রেল লাইনের পাশে রাখছে এবং সশব্দে ফিরে যাচ্ছে। যন্ত্রসহযোগে সে কয়লা রেলের মালগাড়ীতে বোঝাই করা হচ্ছে, এবং শত শত টন কয়লা নিয়ে সকাল বিকাল সুদীর্ঘ মালগাড়ী ষ্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তারপর সর্পিল গতিতে পাহাড়ের চূড়া ডিঙিয়ে ট্রেন আবার নীচে নামছে। এ ভাবে চড়াই-উতরাই করে গাড়ী কয়লার বোঝা নিয়ে এ অঞ্চলের গভীর বনানীর ভিতর দিয়ে মেন লাইনে গিয়ে পৌঁছচ্ছে।

ষ্টেশনের আশেপাশের পাহাড়েও সাইডিং করা হয়েছে, মালগাড়ীগুলো অবিরত পাহাড়ের উচুনীচু রাস্তায় গাছগাছড়ার ভিতর দিয়ে চলছে। চব্বিশ ঘণ্টা পাওয়ার হাউসে দারুণ গর্জনে এঞ্জিন চলছে, সেই বিদ্যুৎ খনির ভিতর আলো দিচ্ছে, ইলেট্রিক ট্রেনের শক্তি সরবরাহ করছে, এবং সেই শক্তিতে বৈদ্যুতিক যন্ত্রে কয়লা কাটা হচ্ছে।

ভোরবেলা জানালা দিয়ে দেখতে পাই ইলেকট্রিক ট্রেন সারি সারি খোলা গাড়ী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের ধারে লাইনের উপর। নির্দ্দিষ্ট কুলীরা খালি গাড়ীতে উঠে বসেছে, ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন তাদের নিয়ে অন্ধকার খনির সুড়ঙ্গগহ্বরের দিকে তীরবেগে ছুটেছে।

এই মজুরদের দেখে মনে হ'ল যে কয়লা উনুনে জ্বালিয়ে অনায়াসে আমরা রান্নাবান্না করছি, তা মজুররা কি প্রাণপাত পরিশ্রম করে দিনের পর দিন কেটে আনছে। এই যে খনির কাজ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কয়লা কেটে লোকেরা কালিমাখা চেহারা করে উপরে ক্লান্ত হয়ে ওঠে, এতেই তাদের কষ্টের অবসান হয় না। প্রতি পদেই তাদের প্রাণের আশঙ্কা বিদ্যমান, কারণ খনির ভিতরের কাজ বড় বিপজ্জনক। আধুনিক প্রথায় যন্ত্রসহযোগে বহু কাজ সম্পন্ন হলেও আজ পর্য্যন্ত কোথাও এমন ব্যবস্থা হয় নি যে, খনির শ্রমিকেরা সর্ব্বদা খনির ভিতরে একেবারে নির্ব্বিঘ্নে কাজ সেরে বাইরে আসতে পারে। হয়ত খনির ভিতর হঠাৎ কোন কারণে উপর থেকে বিপুল স্তূপ ধ্বসে পড়ল, তার চাপে বহু লোকে প্রাণ হারাল, কিংবা কোথাও আবদ্ধ গ্যাস জ্বলে উঠে দারুণ বিস্ফোরণ হ'ল, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্ত্তী শ্রমিকেরা মারা পড়ল। ইতিপূর্ব্বে মধ্যপ্রদেশের এক খনিতে এমন হয়েছে যে, হঠাৎ দেয়াল কেটে পাশের খনির জমা জল প্রবল বেগে এসে শ্রমিকদের ভাসিয়ে

নিয়ে গেছে, এবং তা থেকে বাষট্টি জন শ্রমিক নিষ্কৃতিলাভের পথ না পেয়ে অসহায় ভাবে ডুবে মরেছে।

৩

এ ত হ'ল কয়লার খনির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। রেল লাইন বসাবার ও কয়লার খনির আবিষ্কারের পূর্ব্বে চিরিমিরি জঙ্গলের ইতিহাস কি তার কোন লিখিত বিবরণ নাই। চিরিমিরি শহরে এক আদিবাসী পরিবার ছিল। এই পরিবারের পুরুষটি এই অঞ্চলের "বেইগা" বা পুরোহিত ছিল। সেই পরিবারের কাছে পাহাড়ের পুরানো ইতিহাস জানা যায়। লাহিড়ী মহাশয়ের সে সব কণ্ঠস্থ। এজন্য চিরিমিরি-বাসীরা লাহিড়ী মহাশয়কেও "বেইগা" স্থানীয় মনে করে। তাঁর মুখে শুনলাম যে, এ সব জঙ্গলের আদিবাসীরা বেদেদের মত এক স্থান হতে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াত। তাদের হাতে থাকত তীর ধনু, বিষাক্ত তীর দিয়ে তারা সম্বর ও চিতল মারত, আর আগুনে পুড়িয়ে খেত। মাঝে মাঝে তারা পাহাড়ী বাজরা পাহাড়ের ধারে চাষ করত এবং পাহাড়ের মূল্যবান কাঠের গাছগুলোকে নির্ব্বিচারে জ্বালিয়ে ছাই করে ক্ষেতে সার দিত। বর্ত্তমানে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে তারা কতকটা সভ্য হয়ে উঠেছে। একটু সম্পন্ন গ্রাম্য পুরুষদের শরীরে অলঙ্কার থাকে। দু'হাতে মেয়েদের মত মোটা মোটা রূপার কড়া, গলায় একটা রূপার পাত সুতো দিয়ে ঝুলানো, কানে পেতলের আংটি। তারা গায়ে আঁটসাট একটা সাদা কুর্ত্তা ও মালকাঁচা দিয়ে ধুতি পরে। এদের অধিকাংশই নিরীহ, সভ্যতার প্রতারণার ছোঁয়াচ এখনও পুরামাত্রায় লাগে নি। চোখের দৃষ্টি সরল ও অর্থহীন, দেখে মনে হয় এদের ভিতর এখনও যেন ঠিকমত বুদ্ধির স্ফুরণ হয় নি।

কোরিয়া সাবডিভিসনের লোকসংখ্যা প্রায় দু'লক্ষ, এবং এক একটি কোলিয়ারীতে প্রায় তিন হাজার লোক কাজ করে। অন্যেরা কেহ চাষবাস করে, কেহ-বা গরু মোষ ছাগল পুষে দই দুধের ব্যবসা করে, কেহ-বা কাঠ বাঁশ কাটে। বাকী সব লোক এক রকম বেকার থাকে। এদের আয় বেশী নয়, এরা চাষ করে যে ধান উৎপন্ন করে তা থেকে শুধু দু'মাস চলে। তখন তারা ভুট্টা শুকিয়ে পিষে গুড়ো করে তা নুন ও জল দিয়ে সিদ্ধ করে ক্ষুধার নিবৃত্তি করে। বাকী কয়েক মাস ফলমূল, গাছের কন্দ, শকরকন্দ এ সব খেয়ে দিন কাটায় ও দু'তিন মাস প্রায় অর্দ্ধাশনে থাকে। সময়বিশেষে মহুয়া ফল গরীবদের প্রধান খাদ্য বললে অত্যুক্তি হয় না।

প্রত্যেক রবিবারে গ্রাম্য লোকদের দেখবার সুযোগ হয়। ভোরে ট্রেন ষ্টেশনে এসে থামতেই বহু যাত্রী পণ্যসম্ভার নিয়ে নেমে পড়ে ট্রেন থেকে। চিরিমিরি পাহাড়ের চূড়ায় সমতল ভূমিতে হাট বসে রবিবারে। তাই আশেপাশের শহর থেকে, গ্রাম থেকে যে যার সওদা নিয়ে আসে এই ট্রেনে, আর সমতল ভূমিতে সওদা বিছিয়ে বসে বেচবার জন্যে। সপ্তাহের বাকী কয়টা দিন রাস্তা প্রায় জনবিরল থাকে।

আমাদের বাংলোর নীচ দিয়ে দু'পাশে যে দু'টি রাস্তা উপরের দিকে চলে গেছে সেই রাস্তা দুটিতে প্রত্যেক রবিবারে হরেক রকমের যাত্রী চলতে সুরু করে ভোর থেকেই। বড় বড় বস্তা

শ্রীবিভূতিভূষণ লাহিড়ী

ভর্ত্তি চাল-গম রশি দিয়ে কাঠের ডাণ্ডায় ঝুলিয়ে দু'জন করে লোক কাঁধে নিয়ে ধীরে ধীরে সেই রাস্তা বেয়ে ওঠে। কেউ-বা বাঁকে করে টুকরি-ভর্ত্তি মুড়ি-চিড়ে দৈ নিয়ে যাচ্ছে। কারো হাতে বড় ছোট মাঝারি নানা ধরণের বাঁশের টুকরি। কেউ-বা মাথায় বড় বড় সব্জীর টুকরি নিয়ে চলেছে। কারো হাতে বা জঙ্গলী লম্বা ঘাসের তৈরি ঝাড়ু। কোন গ্রাম্য কিশোরের দু'হাতে দুটা লাল মাটির কলসী, দূর থেকে কৃষ্ণকায় নগ্নগাত্র কিশোরের শোভা বাড়িয়ে তুলেছে পরিহিত বস্ত্রের শাদা, আর হাতের কলসীর লাল রং। এরা এসব জিনিষ বাজারে বিক্রী করে সাত দিনের গম-চাল নিয়ে ফিরবে। ব্যাপারীরা কুলীর কাঁধে করে টিনের রঙীন বাক্সে গ্রাম্য নারীদের মনোরঞ্জক নানা জিনিষ নিয়ে আসে—আয়না-চিরুণী, কাঁচের চুড়ি, রূপোর চুড়ি, আংটি কিছুই বাদ যায় না। এলুমিনিয়াম, পিতল এবং কাঁচের বাসন সমস্তই অন্য শহর থেকে নিয়ে এসে দোকানীরা পাহাড়ের চূড়ায় দোকান বসায়। গ্রাম্য নরনারীরা একে একে চলেছে শূন্য টুকরি হাতে নিয়ে, অপরাহ্ণে পাহাড়ী রাস্তায় নীচে ফিরছে সব্জী ও আবশ্যক জিনিষে সেই শূন্য টুকরি পূর্ণ করে। খনির মজুরদের আজ অখণ্ড অবসর। এই একটি দিন সবার মুখে সাজসজ্জার ও বেচা-কেনার আনন্দ ফুটে ওঠে। রাত্রে মদ খেয়ে মাদল বাজিয়ে পুরুষ ও নারীরা মিলে নাচগান করে প্রাণের আনন্দে। শীতকালে এসব আদিবাসীর "কর্ম্মা"নাচ উল্লেখযোগ্য। নাচের সময় এরা কড়ি দিয়ে গাঁথা

সুন্দর পোশাক পরে। হোলি, দুর্গাপূজা ও অন্যান্য উৎসবে এই পুরুষ ও নারীদের মাদল বাজিয়ে নাচ বড় সুন্দর।

৪

নীচের উপত্যকা থেকে বাজারের রাস্তায় যেতে হলে লাহিড়ী মহাশয়ের বাড়ীর পাশ দিয়ে যেতে হয়। তিনি এ কোলিয়ারী শহরের সুদীর্ঘকালের বাসিন্দা। বার্দ্ধক্যে কোলিয়ারীর কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে এ অরণ্যের ভিতরে স্কুল-কলেজ নির্ম্মাণে আত্ম-নিয়োগ করেছেন। পাহাড়ের অধিত্যকায় উঠেই দেখা যায় অরণ্য-ময় পরিবেশের মধ্যে একটা নিতান্তই নূতন জিনিষ, ত্রিতল স্কুল-ভবন ও দ্বিতল কলেজভবন খনির মজুরদের 'দক্কাই'র পাশে সগর্ব্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এবং এ স্থানের শিশু, বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরীর কলরবে মুখরিত হচ্ছে।

স্কুলের পাশে পাথর কেটে সরিয়ে মাটি ঢেলে বাগান করা হয়েছে এবং তার উপর রংবেরঙে মরশুমী ফুল ফুটে আলো করে আছে। বাগানের আশেপাশে সুদূরবর্ত্তী অঞ্চল থেকে ইউ-কিলিপটাস ও সিলভার ওক ইত্যাদি সুদৃশ্য গাছ এনে সারি করে লাগানো হয়েছে। স্কুলবাড়ীর দ্বিতলে একটি বড় হল, তাতে প্রজেক্টার সহযোগে নানা দেশ-বিদেশের চিত্র ও শাব্দিক বর্ণনা ছাত্র-ছাত্রীদের মনোরঞ্জন করে।

স্কুল-কলেজের পাশে ছেলেদের হোষ্টেল এবং চারিদিক ঘিরে অধ্যাপকদের বাসগৃহ। বর্ত্তমানে চিরিমিরির খানিকটা জঙ্গল অর্দ্ধ শহরে পরিণত হয়েছে। মোটর চলাচলের জন্য দুটি পাকা রাস্তা তৈরি হয়েছে। বাড়ী বাড়ী ইলেকট্রিক লাইট ত আছেই, তার উপর শহুরে রাস্তার মত পথেও বৈদ্যুতিক আলোর বন্দোবস্ত আছে। জলের কলে শহরের সর্ব্বত্র জল সরবরাহ হয়। কারারপো বলে একটা জলাধার আছে, সেখানকার কয়লার স্তূপ কেটে তাতে বাঁধ দেওয়া হয়েছে। শহরে খেলার 'গ্রাউণ্ড', ক্লাব, এমনকি সিনেমা হল পর্যান্ত আছে। চিরিমিরি ষ্টেশন উপত্যকায় অবস্থিত এবং ২০০ ফুট উপরে অধিত্যকায় শহর। কয়লার খনির সংস্রবে ম্যানেজার, এঞ্জিনীয়ার, ওভারসীয়ার, ডাক্তার এবং অন্যান্য উচ্চ-নীচ পদে বহু বাঙালীর আগমন হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের এই অরণ্যের ভিতর বেশ একটি বাঙালী সমাজ গড়ে উঠেছে। স্কুলে হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হলেও বাংলা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং শান্তিনিকেতনের শিক্ষাপ্রাপ্ত মাষ্টার রেখে ছেলেমেয়েদের আধুনিক ধরনের নাচগান শেখানো হয়। তা ছাড়া দুর্গাপূজার সময় প্রত্যেক কোলিয়ারীতে সার্ব্বজনীন পূজা হয় এবং সরস্বতী পূজার সময়ে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে উৎসাহের সহিত বাণীর অর্চ্চনা ও প্রসাদ বিতরণ করে। এ সব পূজা ও উৎসবাদি উপলক্ষে ছেলে-মেয়েদের থিয়েটার, নাচগান ইত্যাদিতে চিরিমিরি পাহাড় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

লাহিড়ী মহাশয়ের সাহায্যে চিরিমিরির চারপাশের গহন গিরি-অরণ্যে ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছি। সেদিন কলেজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমরাও পিকনিক করতে চললাম, লাহিড়ী মহাশয়ের জিপে করে পাহাড়ে রওনা হলাম। কি সুন্দর পার্ব্বত্য স্থান, গভীর জঙ্গলের উঁচুনীচু রাস্তায় ড্রাইভার দক্ষতার সহিত জিপ চালিয়ে চলল। জিপের চলবার পথ শেষ হলে জিপ থেকে আমাদের নামতে হ'ল। আশেপাশে বহু বাঁশঝাড় আছে। লোকেরা ঝাড় থেকে বাঁশ কেটে নিয়ে গেছে, বহু বাঁশের টুকরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে। আমি একটা বাঁশের টুকরাকে যষ্টি বানিয়ে নিলাম। তাই দেখে সবক'টি মেয়েই ছুটাছুটি করে বাঁশ কুড়িয়ে নিল। আমরা সবাই গহন পথে যাত্রা সুরু করলাম, লাহিড়ী মহাশয় পথপ্রদর্শক হলেন। ঝাড়-জঙ্গল, পাহাড়ে রাস্তা তাঁর নখাগ্রে। কি দুর্গম রাস্তা, পা একটু এদিক সেদিক হলেই পাহাড় থেকে গড়িয়ে একেবারে বহু নীচের গভীর খাদে পড়ে ভবলীলা সাঙ্গ করতে হবে।

এ নিবিড় অরণ্যে সমতল ভূমির বৃক্ষগুলির চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ-দেড়গুণ উঁচু উঁচু এক একটি বিশাল বৃক্ষ বহুদূর বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা মেলে স্থানটিকে অন্ধকার করে রেখেছে। জঙ্গলে রাস্তার কোন কোন অংশ কণ্টকাকীর্ণ, কোথাও-বা এদিক সেদিকে বড় বড় কালো পাথরের টুকরা, পাহাড়ের দেয়াল ধ্বসে নীচে পড়ে আছে। তার নীচে একটু জলা জায়গা, সরু নালা দিয়ে জল ঝির ঝির করে বয়ে আসছে। জলা জায়গা থেকে কেমন একটা বোটকা গন্ধ বেরুচ্ছে। এসব স্থানে নাকি বাঘেরা জল খেতে আসে। শুনে গা'টা ছমছম্ করে উঠল।

ধীরে ধীরে আমরা হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে লাগলাম। রাস্তায় ফলফুল বিশেষ নেই। সবচেয়ে আশ্চর্য্য লাগল —পাহাড়গুলি নীরব নিঝুম, জনপ্রাণী দূরের কথা, একটি কাক-পক্ষীও দেখতে পেলাম না, মনে হ'ল বোবা পাহাড়।

পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে বিপরীত দিকের পাহাড়গুলো দেখতে লাগলাম, কি গম্ভীর স্তব্ধ সমাহিতভাব। অপরাহ্ণের স্তিমিত সূর্য্য-কিরণ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। মনে হয় এই নির্জ্জন পাহাড়ের চূড়ায় জীবনের উচ্ছ্বাস স্তব্ধ হয়ে যায়; সংসারের প্রতি আকর্ষণ কমে গিয়ে একটি বৈরাগ্য ভাবের উদয় হয়। তাই বোধ হয় মুনিঋষিরা এই ধরনের নীরব পার্ব্বত্য স্থানকেই বেছে নিয়েছেন সাধনার জন্যে। এই নিভৃত স্থানে মানুষ ত দূরের কথা, পশুপক্ষীও তাদের বিঘ্ন ঘটাতে পারবে না।

এক এক জায়গায় থেমে থেমে আমরা সামনের গভীর খাদের অপর পার্শ্বে যে পাহাড়ের সারি উঁচু-নীচু হয়ে আকাশে মাথা তুলে এই অঞ্চলের সীমা এঁকে দাঁড়িয়ে আছে, তা মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলাম। একটি পাহাড়ের চূড়া সুন্দরীর চোখের কাজলের মত গভীর কালো, তাই তার নাম "অঞ্জন"। আর একটি চূড়ার নাম "বরতুদা", মানে, পবিত্র চূড়া। "মঙ্গল মোহড়া" হ'ল পবিত্র স্থান। পর্ব্বতচূড়াগুলির এ ধরনের সুন্দর সুন্দর নাম শুনে চমৎকৃত হলাম।

একটি প্রস্রবণ আছে তার নাম "করবল্লী ধারা"। মানে, কুমারীর হাতের আকৃতির মত সুন্দর ধারা। এ প্রস্রবণ "কাঞ্চনকুণ্ডে" গিয়ে পড়েছে।

পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে কয়েকটি আশ্চর্য্য গাছ দেখলাম। দূর থেকে পাতাগুলো দেখে মনে হ'ল কলাগাছ, গাছগুলির কাণ্ড কিন্তু আম-কাঁঠাল গাছের মত, শুধু পাতাগুলি বড় বড় ও অবিকল কলাপাতার মত। আমাদের দেশের নিমন্ত্রণে অনায়াসে এই পাতায় খাওয়া চলে। আদিবাসীরা এ পাতাকে বলে "গেহেলা" এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামের নাম "গেহেলাপানি"। পাহাড়ের পাদদেশে ঘন অরণ্যের ভিতর খানিকটা জায়গা ফাঁকা শ্যামল সমতলভূমি, দু'চারখানা কুঁড়েঘরও দেখা যায়, ওগুলিই নাকি গ্রাম। পাহাড়ে গভীর অরণ্যের মাঝে মাঝে এ সব সমতলভূমি বড় চমৎকার দেখায়। চলতে চলতে আরও কতকগুলি গাছ দেখা গেল, তার পাতা ঠিক পদ্মপাতার মত বড় বড় গোল। তার নাম "মহুলাই" বা মধু লতা—এ পাতাতেও বেশ দেশী নিমন্ত্রণ খাওয়া চলে। এই গাছের ছাল দিয়ে পাহাড়ী লোকেরা খুব মজবুত দড়ি তৈরি করে ও তাদের কাজে ব্যবহার করে।

চলবার পথে দূরে দূরে অনেক আমলকী গাছ দেখতে পেলাম, তাতে অজস্র আমলকী ধরে আছে, আমরা মনের সাধ মিটিয়ে কোঁচড় ভরে আমলকী পাড়লাম। আমলকীগুলি বেশ বড় বড়। সুপক্ব আমলকী খেতে খেতে আমরা পিপাসা দূর করে এগোতে লাগলাম। বেশ উপরে উঠে এক রকম ফুল দেখলাম তার মৃদু সুবাস চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। গাছ থেকে ফুল পেড়ে হাতে নিতেই ফুলের রেণু থেকে ঝর ঝর করে হলদে পাউডারের মত গুঁড়ো ঝরে পড়তে লাগল। লাহিড়ী মহাশয় বললেন, এগুলি লোধ্র ফুল। অমনি কালিদাসের মেঘদূতের বিরহী যক্ষ-প্রিয়ার কথা মনে পড়ে গেল। আমি বললাম এ যে কালিদাসের আমলের ফুল। লাহিড়ী মহাশয় বলেন, হাঁ, এবং সোৎসাহে মেঘদূতের শ্লোক আবৃত্তি করতে লাগলেন :

হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং নীতা লোধ্র প্রসবরজসা
পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারুকর্ণে শিরীষং সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং
যত্র নীপং বধূনাম্‌।

৫

লাহিড়ী মহাশয় বললেন, কোন ঐতিহাসিক বলেছেন কালিদাসের কবিতায় বর্ণিত মেঘ এ সব পাহাড়ের উপর দিয়েই গিয়েছিল এবং এ অঞ্চলে যাকে রামগড় বলা হয় সেটাই কালিদাস-বর্ণিত রামগিরি। সেই রামগড়ে একটি পুরনো মন্দির আছে, মন্দিরটি লাল পাথরের তৈরি, মন্দিরগাত্রে ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা আছে, দেবদীন নামক এক ব্যক্তি দেবদাসী প্রিয়দর্শিকার প্রেমের প্রতীকস্বরূপ এক মন্দির তৈরি করবে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং এই মন্দির সেই দেবদীনের তৈরি। লেখা দেখে প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলেন, আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে এই মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল। গ্রীক নাট্যমঞ্চের অনুকরণে মন্দিরের সম্মুখভাগ অর্দ্ধবৃত্তাকারে তৈরি।

"ছেড়মারী" বা বড়মন্দির এই মন্দিরেরই সমসাময়িক, যদিও এর কোন অকাট্য প্রমাণ নেই। চিরিমিরি নামটি ছেড়মাড়ি বা বড় মন্দিরেরই অপভ্রংশ। স্থানীয় লোকেদের মুখের কথায় "চিরিমিরি" নাম স্থায়ী হয়ে গেছে।
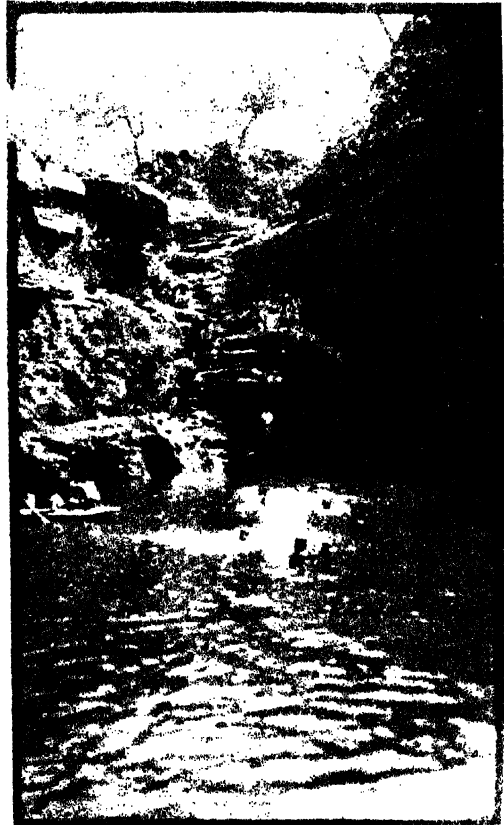
জলাশয়—এখানে সাঁতার কাটা হয়

১৯১৪ সনে লাহিড়ী মহাশয় একটি বিরাট প্রস্তরফলক পেয়েছেন, তা ১৫ ফুট লম্বা আর দেড় হাত চওড়া। এটা তুলতে ৫০ জন লোক লেগেছে—এত ভারী। এই ফলকের পাঠ উদ্ধার করে জানা গিয়েছে যে কলচুরি বংশের গোবিন্দচন্দ্রদেব বলে যে রাজা রাজত্ব করতেন, তিনি ১৩৬১ খ্রীষ্টাব্দে এখানে একটি ব্রহ্ম-মন্দির তৈরি করিয়েছিলেন। ঐ বড় মন্দিরের কাছে কমপক্ষেও ৫০টি সতীস্তম্ভ এখন পর্যন্ত বিদ্যমান আছে। এখানে কলচুরিরা

রাজত্ব করতেন। তাঁদের রাজত্বের সীমা ছিল বিলাসপুরের কাছে রতনপুর পর্য্যন্ত। এ সব পর্ব্বতচূড়ায় আরও কতকগুলি প্রস্তর-স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে। সেগুলি বড় সুন্দর এবং তার সঙ্গে ঐতিহাসিক স্মৃতি জড়িত আছে। প্রস্তরফলকের উপরিভাগে কঙ্কণ বাঁধা একটি নারীর হাত, তার এক পাশে সূর্য্য ও অন্য পাশে চন্দ্র আঁকা। হাতটি যদি চন্দ্রের দিকে বেঁকে থাকে তবে বুঝতে

চিরিমিরির একটি দৃশ্য

হবে রাণী চন্দ্রবংশীয়া ও রাজা সূর্য্যবংশীয় ছিলেন। আর হাতটি সূর্য্যের দিকে থাকলে রাণী সূর্য্যবংশীয়া ও রাজা চন্দ্রবংশীয়। প্রস্তর-ফলকের মধ্যভাগে দেখা যায় দু'দিকে দুটি নারীমূর্ত্তি হাঁটু ভেঙে পূজার ভঙ্গীতে বসে আছে। মাঝখানে প্রদীপ জ্বলছে, সকলের নীচে চলন্ত অশ্বপৃষ্ঠে বর্শা হাতে ও মুক্ত তলোয়ার হাতে আরোহী যুবাপুরুষ। এই বিচিত্র ধরনের তিনটি প্রস্তরফলকও লাহিড়ী মহাশয় পর্ব্বত-চূড়া থেকে সংগ্রহ করে চিরিমিরি কলেজে স্থানান্তরিত করেছেন।

আমরা পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে উঠতে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। বৃদ্ধ লাহিড়ী মহাশয় যুবকের মত শক্তি নিয়ে পূর্ণোদ্যমে চলছিলেন। তাঁর উৎসাহ-বাক্যে আমরাও সতেজ হয়ে পর্ব্বতচূড়ায় একটি অতি চমৎকার সমতল জায়গাতে এসে পৌঁছলাম। এই স্থানটি ২৭০০ ফুট উঁচু। তিনি এখানে একটি স্যানাটোরিয়ম প্রতিষ্ঠার কল্পনা করছেন। কল্পনা বাস্তবে পরিণত হলে চমৎকার হবে। পর্ব্বতচূড়ায় এই সমতল স্থানটির চারিদিকের শোভা অতুল। ডাইনে বাঁয়ে ঘন বনানীসংযুক্ত গভীর খাদ, আর সেই খাদের অপর পার্শ্বে আবার উচ্চ পর্ব্বতমালা—এই গহন জঙ্গলে লাহিড়ী মহাশয় বহু বাঘ শিকার করেছেন, তাঁর ছেলেরা বন্ধু-বান্ধব ও শিকারীদের নিয়ে প্রায়ই শিকারে আসেন ও বাঘ শিকার করে থাকেন। শিকারের জন্য এ সব জঙ্গল প্রশস্ত। কোন কোন সময় বাঘগুলি অতি লোভে নীচে গ্রামে গিয়ে, কখনও বা চিরিমিরি শহরে নেমে গরুটা ঘোড়াটা মেরে নেয়, এবং নিজেও শেষকালে শিকারীর হাতে প্রাণ হারায়। অঞ্জন পাহাড়ের পাশে দাঁড়িয়ে নীচের সমতলভূমিতে সতী-পিপল গাছ দেখলাম, কলচুরির রাণীরা এখানে সতী হতেন। এখনও সারগুজার অধিবাসীরা সেই সতী-পিপল বৃক্ষকে গভীর শ্রদ্ধায় পূজা করে।

সেখান থেকে একটা ঢালু জায়গায় নামলাম, এক টুকরা সমতল জায়গা শাল-পিয়াল গাছে ছাওয়া, একটি বড় শালগাছের নীচে সতরঞ্চি বিছিয়ে বসলাম, ছেলেমেয়েরা ছুটাছুটি করে কাজ করতে লাগল। ছেলেরা কুড়ুল দিয়ে শুকনো গাছের ডালপালা কেটে রান্না চড়িয়েছে। আজ মেয়েদের ছুটি, ছেলেরাই সবাইকে পরিবেশন করতে লাগল। একটা মনোরম স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে বনভোজন শেষ করে উঠলাম, ছেলেমেয়েদের কলহাস্যে, ডাকাডাকিতে নির্জ্জন অরণ্যভূমি মুখরিত হয়ে উঠল। চারদিকে স্তূপাকৃতি এঁটোপাতা ও ভুক্তাবশেষ দেখে কয়েকটা কাক এসে জুটল, উজ্জ্বল নীল আকাশে দু'চারটা শঙ্খচিল মুক্ত ডানা প্রসারিত করে আমাদের মাথার উপর দিয়ে চক্কর মারতে লাগল।

আমরা জীপে উঠে চিরিমিরির অপরদিকে আর একটি সুন্দর বনের পাশে এসে নামলাম। সেখানে এক একটা জায়গা গাছপালায় নিবিড় অন্ধকার করে রেখেছে। সারা বনটায় শুকনো পাতা বিছানো আছে। চলবার সময় আমাদের পায়ের চাপে পাতাগুলি মড় মড় করে ভেঙে যেতে লাগল, আর চৈতালী হাওয়ায় সেই শুকনো ভাঙাপাতা, আস্তপাতা ঘূর্ণির মত আকাশে উড়তে লাগল।

এক দিকের পাহাড়ের গায়ে মোটা লোহার পাইপ বসানো হয়েছে, তা দিয়ে বারো মাস পাহাড়ের গা চুঁইয়ে চুঁইয়ে স্বচ্ছ নির্ঝরিণীর জল একটা বাঁধানো ট্যাঙ্কে পড়ছে, সে জল পাইপ-সংযোগে রিজার্ভয়ারে জমা হয় ও সেদিককার পাহাড়ের অধিবাসীদের জন্য সরবরাহ করা হয়। এভাবে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করবার পদ্ধতিতে তিনটি পাহাড়ের গায়েই লোহার পাইপ স্থানে স্থানে বসানো আছে। অন্যদিকে পাহাড়ের কোলে একটি "সুইমিং পুল" আছে। স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা সেখানে সাঁতার শেখে। সে জায়গার দৃশ্যটা বড় চমৎকার। পাহাড়ের গায়ে এসমুদয় দ্রষ্টব্য জিনিষ দেখে আমরা বিশ্রামান্তে বাড়ী ফিরলাম।

৬

এক এক ঋতুতে পাহাড়ের এক এক রকম সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে।

বসন্তে পাহাড়ের গায়ে আশ্চর্য্য রূপ খোলে। শীত যাই যাই করছে, গাছগুলির ঝরাপাতার মর্ম্মরে বন মুখরিত, প্রকৃতির যৌবনরাজ্যে জোয়ার এসেছে। শাল কিংশুক, মহুয়া তাদের জীর্ণ শুষ্ক পাতাগুলোকে নির্ম্মমভাবে ত্যাগ করেছে। ডালে ডালে, গাছে গাছে, কচি কচি সবুজ কিশলয় উঁকিঝুঁকি মারছে। শীতকালে আভরণহীনা রিক্ত বিধবার মত যে ঘনবৃক্ষের সারি পাহাড়ে একটা ম্লান উদাস ভাব এনে দিত, সেই বৃক্ষরাজি সুসজ্জিতা তরুণীর মত পত্রপুষ্পে সুশোভিত হয়ে বনস্থল আলো করে তুলতে উন্মুখ হয়ে উঠেছে। লাল ফুলে ফুলে শিমুল গাছ ছেয়ে গেছে, দূর থেকে মনে হয় যেন আগুনের ফুলঝুরি। গন্ধরাজ আর মহুয়া ফুলের তীব্র গন্ধে পাহাড় আমোদিত। কৃষ্ণচূড়া, পলাশ রক্তবর্ণ ফুলভারে ঘনসবুজ বনানী উজ্জ্বল করে তুলেছে। লোধ্ররেণুর সুবাসে দখিন-হাওয়া উতলা হয়ে উঠেছে, প্রকৃতি দু' হাতে তার সম্পদ দান করেছেন এ নির্জ্জন বনভূমিকে।

সন্ধ্যায় দূর পশ্চিমে দেখা যায় কে যেন মেঘমুক্ত আকাশে মুঠো মুঠো আবীর ছড়িয়ে দিয়েছে, অস্তগামী রবির রক্তরাগে নীল আকাশের সিঁথি রঞ্জিত আর তারই লালিমার ছায়া পড়েছে কোরেশিয়া পনরী আর চিরিমিরি পাহাড়ের দিগদিগন্তব্যাপী শ্যামল ঘনবনানীর উপর। সেই রক্তিম আভায় চিরিমিরি পাহাড়ের বুক চিরে যে লাল রাস্তা সুদূরে মিলে গেছে তা আরো রক্তিম হয়ে উঠেছে। দু'পাশের বড় বড় গাছের ছায়া সেই রাস্তার গা থেকে তখনও মিলিয়ে যায় নি, সেই স্নিগ্ধ উজ্জ্বল রাস্তায় পথচারীদের ছবির মত মনে হয়। অদূরে পাহাড়ের চূড়ায় গাছের ফাঁকে সূর্য্য হেলে হঠাৎ টুপ করে আড়াল হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তিন দিকে পাহাড়ের উপর লাল স্নিগ্ধ আভা মিলিয়ে যেতে লাগল।

ধীরে ধীরে আঁধারের যবনিকা নেমে এল। নিশীথিনী কালো আবরণে দেহ জড়িয়ে তিন দিকের পাহাড় ঢেকে দিল। ঐ সব নিবিড় অরণ্য অন্ধকারে ভোজবাজীর মত কোথায় মিলিয়ে গে[illegible] আকাশ আর পৃথিবীর সীমানা মুছে দিয়ে। আঁধার আকাশে অসংখ্য তারার সঙ্গে পাহাড়ের গায়ের বৈদ্যুতিক আলো মি[illegible] এক হয়ে গেল। মাঝে মাঝে ফেউয়ের ডাকে এ নিবিড় জঙ্গল বিভীষিকাময়ী হয়ে উঠল।

কিন্তু পূর্ণিমাতে এই নিবিড় অরণ্যময় পাহাড়ে এক অপূর্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয়। নির্ম্মল মেঘশূন্য আকাশ চন্দ্রালোকে পনরী কোরেশিয়া আর চিরিমিরির অরণ্যের বৃক্ষের সারি অগণিত সৈন্য দলের মত স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কোরেশিয়ার চূড়ায় সুগো[illegible] চাঁদ উঠেছে, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় চারিদিক প্লাবিত, নীচে বহু নী[illegible] উপত্যকায় টিনের ছাউনি দেওয়া ছোট ষ্টেশন ঘরের উপর চাঁদে[র] আলো পড়ে চকমক্ করছে, সাপের মত বেঁকিয়ে চারটে রেল লাই[ন] বিছানো আছে সমতল জমিতে। উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণে বিজলীর আলো যেন নিষ্প্রভ হয়ে উঠেছে। রত্নগর্ভা সাতপুরা পর্ব্বতমালার শ্যামল উপত্যকা অধিত্যকা জ্যোৎস্নার রজতধারায় স্নাত হয়ে উঠেছে দিকে দিকে স্নিগ্ধরজনীর মধুর নীরব সুন্দর পরিবেশ। মধ্যপ্রদেশের প্রান্তভাগে গহন জঙ্গলের ভিতর যে এত অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য লুকিয়ে ছিল তা জানতাম না।

শ্রাবণে

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

কে তুমি একেলা বসি ছায়াম্লান আকুল শ্রাবণে
কাঁদ শুধু? কি কথা বলিতে চাও নয়নের জলে?
নাই কোন তার ভাষা? তাই বুঝি প্রকাশের ছলে
রোদনে বেদনা এত! তারি সুর বাজে বনে বনে,
অকারণ ব্যথা হয় পুঞ্জীভূত মানুষের মনে,
চকিত বিদ্যুৎশিখা চিত্তাকাশে ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে,
বজ্র হয়ে ফেটে পড়ে অবলুপ্ত গগনের তলে;
খুঁজে-না-পাওয়া সে বাণী ব্যক্ত কভু হবে কি জীবনে?

হে অন্বেষী, থেমে যাবে অবিশ্রান্ত ঝর ঝর ধারা,
স'রে যাবে আবরণ, অরুণের অপূর্ব্ব সে রথ
নীল নভে দেখা দেবে, বেদনা-সঙ্গীত হবে সারা,
আনন্দের আবেদনে ভরে যাবে সমস্ত জগৎ,
বাজিবে আলোর বাণী, হোয়ো না হোয়ো না আত্মহারা,
বর্ষা যাবে, স্বর্ণালোকে উদ্ভাসিত আসিবে শরৎ।

ম্যাগনিটগরস্ক অঞ্চলে শ্রীজবাহরলাল নেহরুর বিপুল সংবর্দ্ধনা

সোভিয়েট রাশিয়ায় পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু

ভারতরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়ায় গমন করিয়াছিলেন। মুখ্যতঃ সোভিয়েট রাশিয়া পরিদর্শন উদ্দেশ্যে হইলেও, তিনি চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, ইটালী এবং ইংলণ্ডেও যান। তিনি সর্ব্বত্রই অভিনন্দন লাভ করেন; কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ায় তিনি যে ভাবে অভ্যর্থিত হন, তাহার তুলনা বর্ত্তমান যুগে বিরল। সোভিয়েট রাশিয়া আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহার মূলে যেসব প্রধান কারণ রহিয়াছে তাহার অন্যতম হইল ঐ দেশে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিল্পোন্নয়ন-প্রচেষ্টা। পণ্ডিত জবাহরলাল সোভিয়েট রাশিয়ার এই শিল্পোন্নয়ন-প্রচেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়লাভে বিশেষ তৎপর হইয়াছিলেন।

সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধান শিল্পোৎপাদন-কেন্দ্র—উরাল পর্ব্বত অঞ্চল। উরাল পর্ব্বতমালা প্রায় দেড় হাজার মাইল ব্যাপিয়া বিরাজমান। এই অঞ্চল বিভিন্ন খনিজ-সম্পদে সমৃদ্ধ। লোহা, তামা, কয়লা, পেট্রোল, বক্সাইট, ম্যাগনেসিয়াম, সল্‌ট্‌স-এর খনির এখানে অন্ত-অবধি নাই। সোভিয়েট রাষ্ট্র খনি হইতে ঐ সকল দ্রব্য আহরণে সবিশেষ বদ্ধপরিকর। এ কারণ গত বিশ বৎসরের মধ্যে এই খনিজ অঞ্চলে বহু শিল্প-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। যেমন, স্লিকামস্কি বেরেজনিকি—এখানে রসায়নভিত্তিক শিল্পসমূহ প্রাধান্যলাভ করিয়াছে; নিজ্‌নি ট্রোগল ও ম্যাগনিটগরস্ক-এ দুইটি শহরে ধাতুঢালাই প্লাণ্ট প্রতিষ্ঠিত; চেলিয়াবিনস্ক ও মোলোটভ—এখানকার যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানা খুবই বিখ্যাত।

উরাল অঞ্চলের স্বের্‌ড্‌লভ্‌স্ক শহর রাশিয়ার একটি সুবৃহৎ শিল্প-সংস্কৃতি কেন্দ্র। ও অঞ্চলে এটির জুড়ি নাই। ইয়াকভ স্বেরড্‌লভ্‌স্ক নামে একজন প্রসিদ্ধ রুশ-বিপ্লবী নামে এই শহরটির নামকরণ হইয়াছে। তিনি লেনিন ও ষ্টালিনের বিশ্বস্ত সহকর্ম্মী ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল উরাল অঞ্চলের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে নিরত ছিলেন। শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি উদ্যানে তাঁহার স্মৃতিসৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে।

শহরটির অস্তিত্ব আগেও ছিল, কিন্তু প্রাক্‌-বিপ্লব যুগে ইহার অবস্থা ছিল অতীব শোচনীয়। সোভিয়েট আমলে শিল্পাঞ্চলে পরিণত হইয়া ইহার চেহারা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। আজ সোভিয়েট রাশিয়ায় এমন কেহ নাই যিনি ইহার অত্যাশ্চর্য্য রূপ-পরিবর্ত্তনের কথা মনে করিয়া গৌরব বোধ না করেন। বস্তুতঃ স্বের্‌ড্‌লভ্‌স্কের সুবৃহৎ শিল্প-কারখানাগুলি দেশী-বিদেশী সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। এখানকার প্লাণ্টসমূহ মিল-ফ্যাক্টরির নির্ম্মা

ভারী ভারী মেসিন, একসক্যাভেটর (খনন-যন্ত্র), হাইড্রলিক প্রেস, টারবাইন জেনারেটর প্রভৃতি প্রতিনিয়ত তৈরি হইতেছে। বিশ্ববিখ্যাত 'হেভি মেসিন বিলডিং প্লাণ্ট'ও এখানেই স্থাপিত। ১৯৩৩ সনের জুলাই মাসে ইহার কার্য্যারম্ভের দিনে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ম্যাক্সিম গর্কী বলিয়াছিলেন, "অনতি বিলম্বে এই প্লাণ্ট হইবে আরও বহু প্লাণ্ট বা কারখানার জনক।"

গর্কির ভবিষ্যদ্বাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে সার্থক হইয়াছে। এই প্লাণ্টটিকে সংক্ষেপে বলা হয় 'উরালমাস'। বাইশ বৎসরের মধ্যে উরাল অঞ্চল, সাইবেরিয়া, ইউক্রেন, জর্জিয়া এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রের নিকট ও দূরের বিভিন্ন স্থানে যত বিধ শিল্পকারখানা স্থাপিত হইয়াছে, তাহার

লেলিনগ্রাডের 'ইয়ং পাইওনিয়ার্স' কর্তৃক পণ্ডিত শ্রীজবাহরলাল নেহরুকে একটি এলবাম ও পুষ্পোপহার প্রদান

উরাল অঞ্চলের 'হেভি মেশিন বিল্ডিং' প্ল্যাণ্টের একটি দৃশ্য

যাবতীয় যন্ত্রপাতি এই উরালমাস যোগাইয়াছে। বর্তমানে এখান হইতে ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও বৃহৎশিল্পের উপযোগী যন্ত্রপাতি সরবরাহ হইতেছে। ভারতবর্ষে রাশিয়ান বিশেষজ্ঞদের আনুকূল্যে যে লৌহ-ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহার উপযুক্ত যন্ত্রপাতিও এখানে প্রস্তুত হইতেছে। উরালমাসে কি ধরনের সুবৃহৎ যন্ত্রপাতি নির্মিত হয়, একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা কতকটা উপলব্ধি হইবে। রেল-বীম বা সুদীর্ঘ রেল-বীম নির্ম্মাণের জন্য আধ মাইলেরও উপর দৈর্ঘ্যব্যাপী একটি ইমারত নির্ম্মিত হইয়াছে। বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্রের কারখানাটিও সুবৃহৎ এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিশেষ সহায়ক।

স্বেরড্‌লভস্ক তো আর শুধু শিল্পোৎপাদন-কেন্দ্র নয়, শিল্প-শিক্ষা-কেন্দ্র হিসাবেও ইহার নাম যথেষ্ট। এখানে একটি বিরাট প্রাসাদোপম ভবনে উরাল্‌স পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত। এই শিল্প-বিদ্যালয়ে ষোল হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করে। উরাল-ভূমের বিভিন্ন দিক হইতে ছাত্রগণ আসিয়া থাকে। ছাত্রদের মধ্যে বিদেশীও কিছু কিছু আছে। ইহারা চীন, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, পোলাণ্ড, রুমানিয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার অধিবাসী। পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট বাদে আরও আটটি ইনষ্টিটিউট রহিয়াছে। একটি ষ্টেট ইউনিভার্সিটি শহরে বিদ্যমান।

উরাল্‌স জিওলজিক্যাল মিউজিয়াম নামে ভূতত্ত্বের যাদুঘরও এখানে স্থাপিত হইয়াছে। মূল্যবান ধাতু ও প্রস্তরের প্রায় কুড়ি হাজার নমুনা মিউজিয়ামে আছে। শহরের থিয়েটারগুলি নাগরিকদের আনন্দ বর্দ্ধনের উপায়-স্বরূপ। ইয়ং পাইওনিয়ার প্যালেস শহরের অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের বিশ্রামাগার। এখানকার কতকগুলি প্রকোষ্ঠ কারিগরি বিদ্যার লেবরেটরি এবং চিত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট। দুইটি বড় বড় হল-ঘর শিল্পীদের আঁকা চিত্রে শোভিত।

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু এই বিখ্যাত শিল্পোৎপাদন-কেন্দ্রটি দেখিয়া আসিয়াছেন। গত ১৭ই জুন তিনি সেখানে যান এবং বিশেষ ভাবে অভ্যর্থনা লাভ করেন। পর দিবস প্রায় সমস্ত সময়ই তিনি বৃহৎ শিল্পোৎপাদন প্লাণ্ট উরাল-

মাস পরিদর্শনে কাটান। প্রথমেই লৌহ ইস্পাতের ফাউণ্ড্রি দেখিতে যান। এখানকার ডিরেক্টর জি. এন. গ্রেবোভ্স্কি তাঁহাকে ঢালাই এবং ছাঁচ তৈরির বিভিন্ন প্রণালী ব্যাখ্যা করেন। এই ফাউণ্ড্রিতে কতকগুলি বিশেষ ধরণের ঢালাই মেসিন আছে। একটি মেসিন সত্তর টন ভার পর্য্যন্ত তোলার ক্ষমতা রাখে।

জনৈক বৃদ্ধ কর্ম্মী পণ্ডিতজীর সম্মুখে আসিলেন। ডিরেক্টর মহোদয় তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। ইঁহার নাম পিওত্র্ এণ্টনভ্। ইনি এক জন যন্ত্রশিল্পী এবং প্রবীণতম কর্ম্মী। ষাট বৎসর উরাল অঞ্চলের শিল্প-কারখানায় কার্য্য করিতেছেন। তিনি বিস্তর তরুণ কর্ম্মীকে লৌহ ঢালাই শিক্ষা দিয়াছেন। ফাউণ্ড্রির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও এণ্টনভের নিকট একদা শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

মাননীয় অতিথিবৃন্দ উরালমাসের মেসিন তৈরি ও প্রেস বিভাগে গমন করেন। সেখানে দেখা গেল একটি বিরাট হাতুড়ির তলায় কয়েক টন ওজনের লৌহের তাল অতি হাল্‌কাভাবে এদিক-ওদিক আন্দোলিত হইতেছে। এই হাতুড়িটির নাম 'ম্যানিপুলেটর'। কিছুকাল পূর্ব্বেও বড় বড় লৌহখণ্ডগুলি আগুনে পরিশুদ্ধ করিয়া লইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইত, সময়ও লাগিত ঢের। উক্ত যন্ত্রটির আবিষ্কর্ত্তা হইলেন এক জন সাধারণ কর্ম্মী—টি ওলোনিকভ। এই হাতুড়ি-যন্ত্রের আবিষ্কারের পর হইতে একদিকে যেমন শ্রম ও সময় বাঁচিয়াছে, অন্যদিকে শিল্পোৎপাদন পাঁচ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। ওলোনিকভ এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী এই যন্ত্রটি দ্বারা কাজ করিতেছেন। ওলোনিকভ সম্প্রতি মস্কো গিয়া ইহার কার্য্যকারিতা ক্রেমলিনের একটি সাধারণ বৈঠকে ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, উরালমাসের কার্য্য আরম্ভ হয় ১৯৩৩ সনে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অঙ্গস্বরূপ। প্রথম প্রথম প্লাণ্টের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি জার্ম্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশ হইতে বিস্তর আয়াসে আনয়ন করিতে হইত। কিন্তু এখন আর এসব হাঙ্গামা পোহাইতে হয় না। কারখানা বা প্লাণ্টের যাবতীয় কলকব্জা, যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম এখানেই কর্ম্মীরা প্রস্তুত করেন। ভারতবর্ষে প্রস্তাবিত লৌহ ও ইস্পাতপ্লাণ্টের প্রয়োজনীয় যেসব যন্ত্রপাতি এবং সাজসরঞ্জামও এখানেই তৈরি হইতেছে, প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলালকে তাহাও দেখানো হইল।

পণ্ডিত জবাহরলাল সোভিয়েট রাশিয়ার সর্ব্ববৃহৎ লৌহ-ইস্পাত কারখানার কর্ম্মীদের জীবনযাপন-প্রণালী—জীবন-ধারণের মান, সোশ্যাল ইন্‌সিওরেন্স বা সমাজ বীমা, কারিগরি শিক্ষার উৎকর্ষ প্রভৃতি সম্বন্ধে জানিতে স্বতঃই ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। এখানকার টেক্‌নিক্যাল বা কারিগরি কর্ম্মীদের বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। প্রতি দশ জনের মধ্যে অন্ততঃ চারি জন নানারকম কারিগরি শিক্ষা পাইয়া থাকে। প্লাণ্টের অনতিদূরে শিল্পবিদ্যালয়ে বা টেকনিক্যাল স্কুলে তাহাদের জন্য এই ধরনের বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে। অঙ্গহানি, অসুস্থতা বা বার্দ্ধক্যবশতঃ কাজে অপারগ হইলে এইরূপ প্রতিটি কর্ম্মীকেই পেন্সন এবং অন্যরকম ভাতা দেওয়া হয়। তবে বার্দ্ধক্যহেতু কাহাকেও পেন্সন লইতে বাধ্য করানো আইনে নাই। এই প্রসঙ্গে ডিরেক্টর প্রধানমন্ত্রীর নিকট পূর্ব্বোক্ত পিওত্র্ এণ্টনভের উল্লেখ করেন; তাঁহার বয়স পঁচাত্তর বৎসর হইলেও কর্ম্মক্ষম থাকায় এখনও নিজ পদে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তিনি তাঁহার বেতন বাদে এখন পুরা পেন্সনও পাইতেছেন। অতঃপর ডিরেক্টর উরালমাসের রকমারি যন্ত্রপাতি, যন্ত্রনির্ম্মাণ পদ্ধতি, কর্ম্মীদল প্রভৃতির চিত্রসম্বলিত একখানি 'স্যুভেনির' বা স্মারক-গ্রন্থ পণ্ডিত জবাহরলালকে উপহার দেন।

প্লাণ্টের অনতিদূরে কর্ম্মীদের বাসস্থানও পণ্ডিত জবাহরলাল সঙ্গীবৃন্দ সহ পরিদর্শন করেন। কর্ম্মীদের বাসস্থান, জীবনযাপন, আহার-বিহার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি কুমারী-কর্ম্মীদের হোষ্টেলে যান, পরে বিবাহিতদের জন্য নির্ম্মিত আলাদা বাসস্থানেও গমন করেন। সর্ব্বত্রই তিনি সবিশেষ অভ্যর্থিত হন। শেষোক্ত একটি গৃহে মারবেলের ছোট ছোট হাতী দেখিয়া তাঁহারা বিশেষ কৌতূহল দেখান। গৃহকর্ত্রী বলিলেন—"হাতীকে আমরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতীক বলিয়া মনে করি।" তিনি জবাহরলালকে ইহার একটি সানন্দে দান করিলেন। অপরাহ্ণে পণ্ডিতজী জিওলজিক্যাল মিউজিয়মটি দেখিতে যান। এখানকার অপেরা হাউসে তাঁহার সম্মানার্থ কনসার্টের আয়োজন হইয়াছিল। সারাদিন কাতারে কাতারে লোক—যে সকল রাস্তা দিয়া তিনি যান সে সকল স্থানে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন জানান।

য-চ ব

শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

শান্তিনিকেতনে যখন কলাভবন প্রতিষ্ঠিত হ'ল, নন্দলাল-প্রমুখ শিল্পী সেখানে যোগ দিলেন, তখন আধুনিক ভারত-শিল্পে একটি নূতন পথ-পরিবর্তনের সূচনা হ'ল। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই পরিবর্তন পুরাতন থেকে প্রকৃতিতে, দেবতা থেকে মানুষে পরিবর্তন, এবং পুরাণ ও দেবতার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন।

রবীন্দ্রনাথের প্রাণোৎসাহের নিত্যসংস্পর্শে, উদার বন্ধহীন প্রকৃতির মধ্যে মুক্তিতে, বিচিত্র মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তায়, নন্দলালের তুলিকায় যে নূতন অনুপ্রাণনার সঞ্চার হ'ল যাঁরা তাঁর চিত্রের ধারাবাহিক আলোচনা কিছুও করেছেন তাঁরাই লক্ষ্য করেছেন। প্রকৃতি ও মানুষকে নূতন করে দেখবার ও শিল্পে তাকে নবভাবে রূপায়িত করবার এই আগ্রহে গুরুর সূত্রে তাঁর শিষ্যদের মধ্যেও সঞ্চালিত ও সার্থক হয়ে পুরাণাশ্রিত ভারতশিল্পে নূতন রসের সঞ্চার করেছিল; এই শিষ্যধারারই অন্যতম মুখপাত্র ছিলেন রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

২

১৯২১ সনে রমেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন কলাভবনে যোগ দেন। এই ছাত্রদশার একটি সংক্ষিপ্ত মনোহর চিত্র[১] তিনি নিজেই লিখেছেন:

"নন্দবাবু আমার কাজের বিশেষ সমালোচনা করেন না। কখনো কোন ছবিতে আঁচড় দেন নি।...কখনো হয়ত বললেন, 'এখানে যে গাছটি এঁকেছ তার সঙ্গে তোমার পরিচয় কই। ভাল করে জানতে হবে, এত সহজে কি কেউ আপনার হয়।' Mythology থেকে তখন ছবি সকলেই প্রায় করতেন। নন্দবাবু বলতেন, 'এই বিষয়টি তুমি নিজের মন থেকে কর নি? কোথাও এটা দেখবার তোমার সুযোগ হয়েছে কি?'"

নিজের ছাত্রজীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত গুরুর শিল্পী-জীবনেরও অন্তরঙ্গ একটু পরিচয় দিয়েছেন:

"অনেকদিন দেখেছি তিনি কলাভবন থেকে বাড়ি যেতে যেতে কত কিছু দেখতে দেখতে যাচ্ছেন—প্রজাপতির রং দেখছেন, ঘাসের ফুল দেখছেন, আমলকী গাছটির দিকে তাকিয়ে আছেন। বুঝলাম প্রকৃতিকে ভালবাসতে হবে, এবং তার রূপ যদি কখনো ধরা দেয় তবেই রস পাওয়া যাবে, এবং সে রস না পাওয়া পর্যন্ত আর কিছুতেই শান্তি নেই।...

"কতদিন গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে চারিদিকে ধুলো উড়ছে, নন্দবাবুকে দেখেছি খোয়াইয়ের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছেন টোকা মাথায়। কিসের টানে তিনি এ ভাবে ঘুরে বেড়ান, কোথায় তাঁর কল্পনার উৎস তিনি খুঁজে খুঁজে বার করেন এই একটা রহস্য আমার মনকে তোলপাড় করে তুলত।"
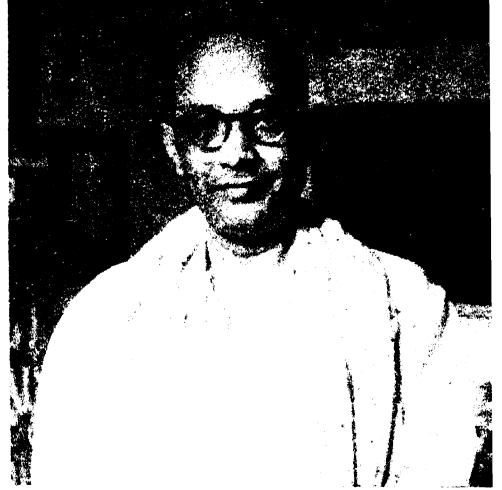
রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ছাত্রজীবনের আগ্রহ ও ব্যগ্রতার প্রসঙ্গে লিখেছেন:

"মাঠে মাঠে গ্রামে গ্রামে ভোরে বিকেলে ঘুরতে লাগলাম কাউকে না বলে লুকিয়ে কখনো সমস্ত দিন শালবনে শালবনে কাটাতে লাগলাম। মনে কেবল এই চিন্তা যে হঠাৎ হয়ত সব আমার কাছে ধরা দেবে। স্কেচ করে করে অনেক কিছু খাতা ভর্তি করতে লাগলাম,—পলাশ শিমুল শাল আমবনের মধ্যে কত বিষয়বস্তুর সমাবেশ আছে তার কিছু কিছু আভাস পেয়েছি। কিন্তু তবুও মনের বাধা কিছুতেই কমছে না। সাঁওতাল মেয়েরা শুকনো পাতা ও ডাল কুড়োচ্ছে, সাঁওতাল যুবক তীরধনু নিয়ে কাঠবিড়ালীর সন্ধানে ও ঘুঘুর সন্ধানে আমবনে ঘুরছে, সাঁওতাল গ্রামগুলিতে কত কিছু ঘটছে—যেদিকে তাকাই সেটিই যেন ছবি—মনে হয় যেন এর যে কোন টুকরো নিয়ে আমি ছবি করতে পারি, কিন্তু সত্যি সত্যি একটিও ছবি আঁকতে পারলাম না! কেয়াবনের ধার দিয়ে, শুকনো বালির উপর দিয়ে ছোট জলের ধারাটি—ওপারে লাল খোয়াইয়ের ডাঙার উপর ছোট্ট গ্রামটি দেখে দেখে আর চোখ ফেরাতে পারি নে।"

---

১ "গুরুবরণ," নিরীক্ষা, আশ্বিন ১৩৫১

সেতু, কাঠখোদাই

৩

এই দেখা, গুরুর এই পথসন্ধান, সার্থক হয়েছিল রমেন্দ্রনাথের জীবনে ও শিল্পে।২

বীরভূম-পল্লীর প্রকৃতির রূপ, সাঁওতাল-জীবনের নানা চিত্র রমেন্দ্রনাথের তুলিকায় একটি স্নিগ্ধ মূর্তিতে দেখা দিল—রমেন্দ্রনাথের ছাত্রদশার শেষভাগে সেই ছবির ফসলের সঙ্গে 'প্রবাসী'র সেকালের পাঠক সুপরিচিত; তার পরে শহর ও পল্লীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নিয়ে ছবি রচনার একটা দিকই খুলে গেল, যার সঙ্গে প্রধানত: কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলে রমেন্দ্রনাথের ছাত্রদের রচনার মধ্য দিয়েই আমরা পরিচিত হয়েছি। রমেন্দ্রনাথ পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে ছবি আঁকেন নি তা নয়, বহু এঁকেছেন, এবং সেগুলি সমাদরও লাভ করেছে; কিন্তু তাঁর চিত্রের পর্যালোচনা করলে এই সিদ্ধান্ত না করে উপায় থাকে না যে, ঐ পুরাণ-চিত্রগুলিতে তাঁর অঙ্কন পটুতার প্রভূত নিদর্শন থাকলেও, গ্রাম-পল্লীর অন্তরঙ্গ চিত্রগুলি তিনি যেরূপ মুগ্ধ হয়ে এঁকেছেন সেই মোহ এই পুরাণ-চিত্রগুলিতে সঞ্চারিত হয় নি। তার কারণ, এই ঘরোয়া ছবিগুলি ছিল তাঁর স্বধর্মপালনের ফল।৩

পদ্মা (ড্রাইপয়েন্ট) [রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

৪

নন্দলাল বসুর ছাত্রেরা গুরুর কাছ থেকে তাঁর পরীক্ষণ-প্রিয়তার উত্তরাধিকার লাভ করেছেন। রমেন্দ্রনাথের

---

২ নন্দলালের প্রথম যুগের ছাত্রদের অনেকেই বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন, একাধিক ছাত্র ভারতের আধুনিক শিল্প-ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করবেন—এখানে রমেন্দ্রনাথের কথাই আমাদের আলোচ্য।

৩ বিশ্ববিশ্রুত শিল্পী সার মুরহেড বোন্-এর একটি মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। ১৯৩৮ সনে লণ্ডনে রমেন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনীতে এই সকল ছবি দেখে :

"He remarked on the love and beauty which the Indian artist expressed in the study of even a humble village kitchen and wondered whether any European artist had shown such devotion to the simple and ordinary things of life."

[রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ক্ষেত্রে তার বিকাশ হয়েছিল বিভিন্ন উপাদান-উপকরণের সাহায্যে শিল্পচর্চায়, এবং তার শ্রেষ্ঠ বিকাশ লাভ ঘটেছিল ছাপের ছবির (graphic arts) চর্চায়। রমেন্দ্রনাথের পূর্বেই একবর্ণ ও রঙিন কাঠখোদাই এচিং লিথোগ্রাফি প্রভৃতির চর্চা আরম্ভ হয়েছিল, এ বিষয়ে তিনি পথিকৃৎ নন্; কিন্তু শিল্পীসমাজে এগুলির অনেকটা ব্যাপক চর্চা যে আমরা বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি তা নিঃসন্দেহ রমেন্দ্রনাথের উৎসাহের ফল। শুধু যে বহুল প্রবর্তনার গৌরব তাঁর তা নয়

চিত্রাঙ্গদা—"আমি তোমারে করিব নিবেদন আমার হৃদয় প্রাণ মন।"
অর্জুন—"ক্ষমা করো আমায়; বরণযোগ্য নহি বরাঙ্গনে, ব্রহ্মচারী, ব্রতধারী।"
[রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রস্তুত কাঠখোদাই চিত্র হইতে

এই ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজ নিরলস ও সার্থক শিল্পী। ১৯৩১ সা তাঁর woodcuts[4] প্রথম প্রকাশি হয়ে একটি নূতন শিল্পরূপের প্রতি রসিকসমাজের দৃষ্টিকে চমৎকৃ করেছিল; এক অংশে 'সাঁওতাল নৃত্য 'সাঁওতাল জননী', 'সাঁওতাল পরিবার এর ছবি; অপর অংশে কলকাতার গলি রাস্তা, ভাঙাবাড়ি, হাওড়া ব্রীজ। পল্লী সৌন্দর্যকে বর্ণবাহুল্য ব্যতিরেকেই তি অপরূপ রূপ দান করলেন, নগরে অবজ্ঞাত অপরিচ্ছন্ন নানা কোণকে, তার সত্যতা হরণ না করেও নূতন শ্রীমণ্ডিত করে দেখালেন। তার পরে জীবনের শেষকাল পর্যন্ত তিনি নিরন্তর এই ছাপের ছবির কাজে ব্যাপৃত ছিলেন —একবর্ণ ও রঙিন কাঠখোদাই, এচিঙের নানা বিভাগ, লিথোগ্রাফ। এখানে তার বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই; শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, আগামীকালে আমাদের

4. An Album of 20 origina woodcuts, in portfolio, with a appreciation by Rabindranat Tagore, 14 ins. × 11 ins.
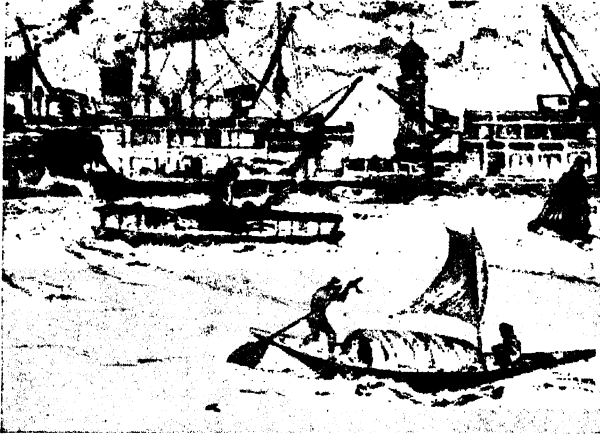
খিদিরপুর ডক (ড্রাইপয়েন্ট) [রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

বর্ষা-সন্ধ্যায় কলিকাতা (কাঠখোদাই) [রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

দেশেও আশা করা যায় এ সকল শিল্প-পন্থার যথোচিত সমাদর হবে, এবং এই সকল পন্থায় সার্থক শিল্পী রূপেই হয়ত রমেন্দ্রনাথ আগামীকালে চিরসমাদর লাভ করবেন।

রমেন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার সার্থক উপায় আমরা মনে করি, এযাবৎ এই সকল বিভিন্ন ছাপের পদ্ধতিতে এ দেশের বিভিন্ন শিল্পীর হাতে যে সকল সার্থক শিল্পকর্ম রচিত হয়েছে তার সংগ্রহে প্রকাশ; স্বভাবতই তার অনেক অংশ অঙ্কিত করে থাকবে তাঁর নিরলস উদ্যমের নিদর্শন। এই সকল ছবির প্রচারে রমেন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহ ছিল, মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বেও তিনি একটি বিভিন্ন শিল্পীর ছাপের ছবির কাজ সংগ্রহ করে সেগুলি লোকসমক্ষে প্রচারের জন্য বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

৫

এই সংক্ষিপ্ত স্মরণ-মন্তব্যেও একটি কথার উল্লেখ না করলে এ রচনা একান্তই অসম্পূর্ণ থাকবে। গুরু-পরম্পরায় রমেন্দ্রনাথ আর-একটি গুণেরও উত্তরাধিকার লাভ করে-ছিলেন-- ছাত্রদের প্রতি প্রীতি অনুভবের, ও ছাত্রদের প্রীতি আকর্ষণের ক্ষমতা। যে স্নিগ্ধতা ছিল তাঁর চিত্রে, সে স্নিগ্ধতা ছিল তাঁর চরিত্রেও; কেবল তাঁর ছাত্র নয়, অন্য যে কেউ তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরাই তাঁর মধুর স্বভাবের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। কর্মবন্ধন তাঁকে অজাতশত্রু হতে দেয় নি, কিন্তু অজাতশত্রু হবার বহু উপকরণই তাঁর চরিত্রকে উজ্জ্বল করেছিল।

চিত্রগুপ্ত

অনন্ত

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য

গরমের দিনের দুপুরবেলা। চারিধার বন্ধ করে নীচের তলার অন্ধকার স্যাঁতস্যেঁতে ঘরে সবাই মিলে আশ্রয় নিয়েছি দুপুরবেলাটা কাটিয়ে দেবার জন্য। শিবের দালানের কালো পাথর-বাঁধানো মেঝের শেতলপাটী বিছিয়ে বড়দা গড়াগড়ি খাচ্ছেন। মাথার ওপর টানা পাখাটি দুলছে। টোলের এক ছাত্র বাইরে বসে টানছে। আমি বসে বড়দার ঘামাচিখচিত পিঠে কোমল স্পর্শ সঞ্চার করছি। বাসনা, বড়দার নয়নকমলে নিদ্রার অবতারণা।

এলেন দেবী নিদ্রা! শুধু আসন ভুল করলেন। বড়দার নয়নকমলে পদার্পণ না করে, আমার পোড়া চোখে। ফলে কণ্ডুয়নের যন্ত্রণা, যন্ত্রণা-টু-দি পাওয়ার-টু-ইউ হয়ে উঠলেন।

তাড়া খেলাম, "কি হচ্ছে!"

গুছিয়ে বসে গুরুসেবায় রত হলাম, নিদ্রাদেবীকে ছুটকে ফেলে।

বড়দার কাছে তখন "মুগ্ধবোধম্" পড়ি।

হঠাৎ বিরাট জগদ্দল সদরের প্রকাণ্ড কড়াদুটো ঢন্ ঢন্ করে বেজে উঠল। পিওনের মণি-অর্ডার আনার সময় এটা। কড়া-নাড়ার তালটাও রাজকীয়।

ছুটে গেলাম। দরজা খুলতেই কাঠফাটা রোদে চোখ ধাঁধিয়ে দিলে। হু হু করে এক ঝলকা লুয়ের বাতাস ধুলোমাটি উড়িয়ে ঢুকল দরজার মধ্যে। তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিলাম বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খড়কুটোর মত ঢুকে পড়ল খাটোখোটো একটি মানুষ।

আমার পানে চেয়েই বললে—ব্রামিন ব্রামিন, ভেরি হট, থার্স্টি।

ও বালাই ছিল না। টুলো বাড়ীর ত্রিসীমানায় ম্লেচ্ছ ভাষার পাট ছিল না। কাশীতে আমাদের ধারণা ছিল মাদ্রাজীরা খেয়ে না খেয়ে বরর্ বরর্ করে ইংরেজী বলতে পারে, আর যত্র তত্র বলে বেড়ায় সেটা, যেন ওটি লিঙ্গুয়া টেরা কার্ণ্ণা।

আর চেহারাতেও মাদ্রাজী। তেমনি খাটো, তেমনি অবিসম্বাদিত দেশী রং, পরিপূর্ণ নাসিকা এবং মাথার খুলিটি নারিকেলের খোলবৎ।

লোকটি এসে শিবদালানের সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে দাদাকে লক্ষ্য করে ফের বলে গেল, "ব্রামিন সার, ব্রামিন—ভেরি হট—থার্স্টি।"

দাদা বললেন, সীট-ডাউন। আই গিভ ওয়াটার।

ওয়াটার শব্দটা ম্লেচ্ছ হ'লে কি হয়, ওর তাৎপর্য্য যেন জলের মত বুঝেছিলাম। ছুটলাম জল আনতে।

লোকটি দেখে বললে, "এ জাগ অব প্রেসড ওয়াটার।"

বাহুল্য করব না। অর্থ বোধগম্য হয় নি। জাগ মানে নেমন্তন্নবাড়ীতে যে বৃহৎ পাত্র করে জল পরিবেশন করা হয়—সেটা জানা ছিল। সেই ভয়ঙ্করী অল্পবিদ্যা প্রসাদাৎ একটি জাগে করে ঠাণ্ডা জল ভরে আনলাম। শুধু জল দিতে নেই জানি। তা স্বভাবমত একটু ভেলি গুড় নিয়ে এসেছিলাম।

কিন্তু অবাক্, জাগ ধরে ঢক্ ঢক্ করে জল খেলে। গুড়টা দিকে একবার তির্য্যক্‌ভঙ্গীতে চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলে।

দুপুরবেলার অতিথি। বাবার কাছে যেন সশরীরে বিশ্বনাথ নির্লিপ্ত কণ্ঠে দাদাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে? কি চায়?"

লোকটা বললে,—আই বেঙ্গলী—ভিলেজ মল্লিমাকুণ্ডী—হোম ফ্লেড সেভেন ডেজ। টু-ডে রিচিং বানারস—সেণ্টার অব সেন্সক্রি লার্নিং—টু-ডে ফার্ষ্ট রীড ছ্যান ইট। নো, নেভার ইট ইফ নট ব্রিকাষ্ট।"

বাবার ইংরিজী জ্ঞানে বিশেষ হাত পড়ে নি, এমনি বাঁধুনি ছিল ঐ লিঙ্গুয়া টেরা ফার্ণ্ণায়।

বাবা যেটুকু জানতেন তাই হাতড়ে বললেন, "সাত দিন ঘর ছাড়া, অনাহার, না পড়ে পাবে না বেশ কথা। থাক কোথায়? কোথায় নিবাস?"

"আই সে বেঙ্গল, বাঙ্গালা, মল্লিমাকুণ্ডী টুয়েণ্টি ফোর পরগণাস"

"বাংলার ছেলে? তা বাংলা বলছ না কেন? ইংরিজী কেন?"

"ওহো, মাপ করবেন। আপনারা বাঙালী?"

দাদা ত ফেটে পড়লেন হাসিতে। গুরুজনের সামনে জোরে হাসা অপরাধ। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে হাসি ত্যাগ করে আবার ঐ অদ্ভুত প্রাণীটির পরিচয়-পর্ব্বে যোগদান করলাম। ছুতো, জলের জগ ও দাদার গায়ে সুড়সুড়ি।

বাবা ততক্ষণ সরে পড়েছেন। তাঁরই ত এখন দায় অতিথির স্নানাহারের ব্যবস্থা করার। অন্যের মাধ্যাহ্নিক বিশ্রামে তিনি কিছুতেই বাধা দেবেন না।

দাদা জিজ্ঞাসা করলেন, "আমরা বাংলায় কথা বলে চলেছি, আর তুমি বুঝলে না আমি বাঙালী।"

"আজ্ঞে ভাবলাম মাদ্রাজী।"

"এ জাতীয় ভাবনার কারণ?"

"বাইরের পাথরের গেটটায় রং গেরুয়া, উঠতে সিঁড়ি, ভাবলাম বুঝি বা…"

"কেন? মন্দির আর শিবদালান কি মাদ্রাজীরই থাকতে হয়?"

"আমি এসেছি এগারোটায়। তার পর থেকে যে কটা জায়গায় গেছি…"

জানা গেল লোকটি ষ্টেশন থেকে এক্কাওলাকে বলেছে "সংস্কৃত

পড়ব, বিদ্যাপীঠে নিয়ে চল।" সে বুদ্ধি করে কাশীর মান্দ্রাজী পাড়ায় হাজির করেছে তাকে। তার কারণ অনুমান করা গেল। লোকটা নাম বলেছিল অনন্ত পুত্তুণ্ড। এক্কাওলাকে বলেছিল ইংরেজী মিশ্রিত বঙ্-হিন্দীতে, তাতেই সে ভেবেছে মান্দ্রাজী; মাল মান্দ্রাজী পাড়ায় চালান করেছে।

আমরা বাংলা বলা সত্ত্বেও কেন যে ও ইংরেজী বলেছিল সেটি বোঝাতে পারা গেলে এ কথা বলার দরকার হ'ত না।

যা হোক্, তার কথাই বলি। জন্মের দিন সূতিকাগারে ডান চোখের রগের কাছে কি একটা গুরুতর আঘাত লেগে ওর চোখের জ্যোতি ম্লান হয়ে গেছে এবং ক্রমশঃ ম্লানতর হচ্ছে। তাই ওর পড়াশুনা বন্ধ। অথচ ক'দিন আগে ওর দাদা ওকে গণ্ডমূর্খ বলে অপমান করেছে। তাই ও ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছে বিদ্যা আহরণ করতে এবং এজন্য বেছে নিয়েছে সংস্কৃত বিদ্যা ও কাশীবাস।

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে আমাদের টোলের মত প্রশস্ত স্থান আর ছিল না।

কিন্তু ফ্যাসাদ যে ও প্রতিজ্ঞা করেছে জ্ঞানলাভ না হওয়া পর্যন্ত আহার করবে না। সুতরাং সাত দিন না খেয়ে ও চিঁ চিঁ করছে।

বাবা শুনে বললেন, "বেশ ত জ্ঞানলাভ করার পরেই খাও।"

অনন্ত বাবাকে গড় হয়ে প্রণাম করে বলল, "আপনিই পারবেন।"

বাবা বললেন, "জ্ঞানলাভের জন্য গুরুবরণ করো।"

"আপনিই"—বললে তদ্গত চিত্তে, গদগদ হয়ে।

বাবা বললেন, "আমি গুরু হই না। বাধা আছে। ঐ আমার বড় ছেলে, ওকে গুরু কর।"

একেবারে যাকে বলে জ্যামুক্ত ধনুর মত সোজা ছটকে ও মেঝের উপুড় হ'ল যেন দণ্ড-শয়ান।

দাদা বললেন, "বর চাও।"

"জ্ঞানাঞ্জনশলাকা—বিদ্যালাভ।"

"আমার প্রথম আদেশ—ভাত খাও, স্নান সেরে আহার কর।"

বাবা বললেন, "গুরুবাক্য প্রত্যাহার করো না অনন্ত। তোমার জিনিষপত্র কোথায়?"

অনন্ত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে কাণ্ডকারখানা দেখে। ওকে শেষ অবধি নাইতে যেতে হ'ল জ্ঞানলাভের আগে!

দেখা গেল ওর বগলদাবায় যে পুঁটলি, সেটাই ওর সব। আর আছে প্রকাণ্ড মাথাটি ভর্তি কোঁকড়া চুলে ভর্তি। সেই পুঁটুলিটার মধ্যে একখানা ধুতি, একখানা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও একখানা হিতোপদেশ।

বাড়ীতে তখনও টোলে ছ'জন ছাত্র। অনন্ত পুত্তুণ্ড হ'ল সপ্তম ছাত্র।

দাদা ওকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন গুরুগৃহবাসের যাবতীয় উপকরণ ওকে সংগ্রহ করতে হবে; এবং সর্বপ্রকার আচরণ ওকে করতে হবে। তাই বৈকালে ও প্রথম কাজ করল শিবের দালান অর্থাৎ সমগ্র আশ্রম-অঙ্গন ধোয়া। আমরা ছোট ছ' ভাই ছোট ছোট ঘড়া ভরে জল এনে দিতে লাগলাম। রোজ আমরাই ধুই। আজ অনন্ত ধুতে লাগল। অনন্ত আমাদের চেয়ে প্রায় বছর ছ'য়েকের বড়।

জল আনতে যাচ্ছি। সে বলল, "চেপে চেপে ভরে নে' আয়।"

"চেপে জল আনব কি করে?" বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য্য সহকারে বিজ্ঞতার হাসি ফুটিয়ে অনন্ত বললে, "ঘড়া ভরা হলে পর চেপে ভরবে।"

একটু একটু মনে পড়ল, "এ জাগ অব প্রেসড ওয়াটার।"

কথাটার কৌতুক বৌদিকে জানালাম।

মা শুনে বললেন, "জোটেও যত পাগল।"

ইতিমধ্যে বাবা অনন্তদের ঠিকানা নিয়ে টেলিগ্রাম করে দিয়েছেন। জানিয়ে দিয়েছেন ও ছেলের পড়ার ভার তিনি নিয়েছেন।

টোলের অপর ছেলেরা অনন্তকে পেল যেন কাকের দলে অন্য দলের কাক। ঠুকরে ঠুকরে ওকে সারা করল।

ক'দিন পরে হঠাৎ একদিন সকালে দেখা গেল অনন্তর মাথা বেবাক কামানো। কেবল মধ্যখানটিতে জেগে রয়েছে প্রায় দেড় ইঞ্চি রেডিয়াসের এক চাবড়া সেই কুঞ্চিত কেশ। কয়েকদিন আগে পাওয়া নূতন লাল গামছাখানায় মাথা ঢেকে ও যখন দাঁড়াল মার সুমুখে, মা জিজ্ঞাসা করলেন, "মাথায় কি হ'ল অনন্ত?"

চিত্ত স্মৃতির ছাত্র। উত্তর দিল, "...চৈতন্য গজাচ্ছে অনন্ত। তাই আমরা আজ ওর মাথা কামিয়ে দিয়েছি।"

মা রেগে গিয়ে বললেন, "কি পেত্তার ছোঁড়াটার বল তো?' ..."বেশ করেছ, এবার একটু ঘোল ঢেলে দাও গে যাও, নিশ্চিন্দি হোক।"

বেলা তখন প্রায় দশটা। চিত্তকে একা পেয়ে অনন্ত জিজ্ঞাসা করল, "মা ঘোলের কথা কি বললেন? আমাদের দেশে ঘোল-ঢালাটা ঠাট্টা করে বলে। মা কি আর ঠাট্টা করেছেন?"

চিত্ত যেন অন্ধকারে আলো পেল। বললে, "আরে ছি, ছি, ও কি বললে তুমি? মা তোমায় ঠাট্টা করতে পারেন কখনও? মাঠাতোলা দইয়ের সঙ্গে গঙ্গামাটি গুলে লাগালে চৈতন্য তাড়াতাড়ি লম্বা হয়। আমরাই ত প্রথম প্রথম তাই করেছি।"

দীনেশ বললে, "যা-তা দই দিয়ে হবে না, বৃন্দাবন-সন্তার পাতা দই চাই।"

খেতে বসার সময় মা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "অনন্ত, তোমার মাথায় ওটা কি ঢেলা?

অনন্ত, সরল অনন্ত, সরল ভাবে বললে, "আপনি যে ঘোলের কথা বললেন মা!"

বিস্মিত হয়ে মা বললেন, "বেশ করেছ বাবা, বুদ্ধিমানের কাজ করেছ।"

চৈতন্যের উপযুক্ত ও আশানুরূপ ক্রমবিবর্দ্ধনের অভাবে পণ্ডিত

অনন্ত সংগোপনে চিত্তকে জিজ্ঞাসা করল, "ভাই, তোর মত লখা হচ্ছে না চৈতন্ত।"

চিত্ত বললে, "এখন ত ঝপ করে বলতে পারি না। জানতে যেতে হবে হরিশ-পণ্ডিতের বাড়ী। কি যে তার চৈতন্ত! দু'গোছায় ভাগ করা, দুটো বাণ্ডিলে বেঁধে রাখে। একটা নাকি জড়ের স্তূপ, অন্যটা চৈতন্তের আধার।"

"জেনে আসতে তুমিই পারবে ভাই। চৈতন্ত আমার লম্বা করতেই হবে। তোমার দাসানুদাস আমি। মতলবটা জেনে এসে জানাও ত ভাই। যা বলবে করব, তবু জ্ঞানলাভের পথে কণ্টক রেখে যাব না।"

চিত্ত একটু আধটু রগড় করতে ভালবাসত। কিন্তু বাড়াবাড়ি করতে সাহস করত না। অথচ অনন্ত নাছোড়বান্দা। চৈতন্ত প্রলম্বমান করার বিশল্যকরণী তার চাই-ই।

চিত্ত ত বিরক্ত হয়ে উঠল। সাহিত্যের ছাত্র সদানন্দকে বলল, "বল ত সদা কি করা যায়। বোদা অনন্তটা ত চৈতন্ত চৈতন্ত করে কুলকুণ্ডলিনীতে অবধি হেঁচকা ধরিয়ে দিলে।"

সদানন্দ বললে, "হচ্ছে।"···

সেদিন আপরাহ্নিক স্বাধ্যায়ের সময়ে দাদা নাসিকা কুঞ্চিত করে সপ্রশ্ন ভ্রূযুগল বাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ দুর্গন্ধটা কোত্থেকে?"

কেউ সাহস করে উত্তর দিলে না। সকলের দৃষ্টি যেন একতারে টান পড়ে নিবদ্ধ হ'ল অনন্তের চৈতন্তচন্দ্রোদয়ের শ্রীক্ষেত্রে—অর্থাৎ আবদ্ধ টিকির পানে।

চুলগুলি আর দেখা যাচ্ছে না। কি একটি গুড়মাখা তামাকের মত আটকে আছে সেখানটায়। দাদা বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোনও গুরুতর আঘাত পেয়েছে ও? তা থেকেই ঐ দুর্গন্ধ? এতটা বাড়াবাড়ি, :ক কেউ বল নি ত?"

কামাখ্যাদা টোলের নয়। বাজাঘাট থেকে পড়তে আসতেন। সবার বড়। তিনি বললেন, "অনন্তর চৈতন্ত গজাচ্ছিল না, তাই ওরা সবাই মিলে কি একটা ওষুধ লাগিয়েছে।"

অর্দ্ধশায়িত বড়দা তাকিয়া ছেড়ে সটান উঠে বসলেন। বিস্ময়-বিদীর্ণ অধরোষ্ঠ, আতঙ্কবিস্ফারিত নয়ন। "এ্যা, বল কি?" বলেই বড় এক টিপ নস্ত নিলেন বিরাট শব্দ করে।

"কি ঔষধ? কে দিলে? চৈতন্ত গজানো? এ সব কি বলছ তোমরা? এ্যাঃ! ভারি দুর্গন্ধ! পেঁয়াজ কি রসুনের গন্ধ!"

চিত্ত বলল, "বল না অনন্ত।

ওদের ইতস্ততঃ করতে দেখে দাদা হাঁক পাড়লেন, "কি যে আমতা আমতা কর তোমরা! কি লাগিয়েছ অনন্ত? কে লাগিয়েছে?"

সদা বলে চিত্ত, চিত্ত বলে সদা; মাঝখান থেকে অনন্ত বসে বসে ঘামতে লাগল। কিন্তু চৈতন্তচন্দ্রোদয় বটিকার প্রেসক্রিপশনে রসুন, ছাগলের-নাদি, আর আলকাতরা আছে জানতে পারার পর পূত-পবিত্র বড়দার সুতীক্ষ্ণ নাসিকা স্বাভাবিক বর্ণে তক্ষ থাকবে এ আশা অতীব সাংঘাতিক অনাচার। এত জোরে তাড়া খেল অনন্ত যে, সোজা কানে পৈতে জড়িয়ে ছুট মারল।

বড়দার হাঁকে বাবা এবং মা উভয়েই ছুটে এলেন। সব শোনার পর হাসির তরঙ্গ বয়ে গেল সারা বাড়ীখানায়। টোলে হাসির দকা-রকা হয়ে রয়েছে বেচারা সদা আর চিত্তর শুকনো ঠোঁটের মরুভূমিতে।

মা বললেন, "ও দুটো অমন ছিচকে চোরের মত দাঁড়িয়ে আছে কেন?"

দাদা বললেন, "ঐ দুটোই ত করেছে। শয়তানের অগ্রগণ্য। শিবের দালানে রসুন, ছাগবিষ্ঠা! অব্রহ্মণ্য! অব্রহ্মণ্য!!"

মা বললেন, "বামুনের মাথায় যা উঠতে পেরেছে, শিবের দালানে তা উঠেছে, এজন্ত এত শোক কেন?"

রাতে অনন্ত খেতে বসেছে, বৌদি বললেন, "বেশ করেছ অনন্ত, ঠাকুরপো তোমায় যা-ই বলুন, এ ওষুধ আমরাও করি মাঝে মাঝে।"

অনন্ত আশ্বস্ত হয়েছিল কিনা জানি না; কিন্তু ক'দিন পরে আর এক ব্যাপার। অক্ষয় তৃতীয়ার ব্রত হয়ে গিয়েছে। অনন্তর গামছা নেই দেখে মা একখানা নূতন গামছা দিয়েছিলেন। দিন দুই পরে অনন্তকে কালো চিরকুট একখানা ন্যাকড়া দিয়ে হাত পা মুছতে দেখে মা জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার গামছাখানা কি হ'ল অনন্ত?"

সদা বলল, "জানেন না কাকীমা, ও সেটা বাজী হেরেছে।"

আনন্দময়ী মা আমার বললেন, "সেরেছে। আবার কি ক্যাসাদ বাধাল ছেলেটা? বোকার মরণ! খোঁড়ার পা-ই কি গর্ত্তয় পড়বে?"

সদা বলল, "খালি পেটে ও ক'টা সন্দেশ খেতে পারে জিজ্ঞাসা করায় ও পুরুষোত্তমকে বলে যে দশটা খেতে পারে। বাজী ছিল প্রথমটা অনন্তর টিকি এবং পুরুষোত্তমের গোঁফ। পরে দাঁড়ায় অনন্তর গামছা আর পুরুষোত্তমের দোকানের এক সের ঘি। একটা সন্দেশ খাবার পর দ্বিতীয়টার বেলায় পুরুষোত্তম ওর গলা টিপে ধরে 'ঠাকুর তোমার খালি পেট আর আছে কি?'—বাজী হেরে ওকে গামছাখানা দিতে হয়েছে।"

মা বললেন, "রোজ রোজ ছেলেটার পেছনে লেগে ত তোমরা ওকে দেশছাড়া করবে দেখতে পাচ্ছি।"

কিন্তু অনন্ত পড়াশুনায় এগিয়ে যেতে লাগল। রোজ সকালে উঠে ও স্বাধ্যায় করত নিয়মিত। ফলে পরীক্ষায় প্রথম স্থান ত পেলই, পরে সে খুব প্রখ্যাত ছাত্র হয়েছিল। সেজন্তই যে অনন্ত স্মরণীয় হয়ে আছে তা নয়, সে স্মরণীয় হয়ে আছে একটি সজল ইতিহাসের সকরুণ বেদনার স্পর্শে।

বলেছি দাদার ছাত্র ছিল অনন্ত। সেই সুবাদে মা ওকে নিয়ে একটু ঠাট্টা করতেন। একটু স্নেহমধুর রহস্য, সাংসারিক জীবনকে যা রঙীন করে তোলে। মা ওকে নাতজামাই করার আভাস জানাতেন। যার নাতনীটির বয়স তখন পাঁচ পুরো নয়। কিন্তু তাকে দেখলেও অনন্ত অদৃশ্য হয়ে যেত। বাইরে থেকে গলা-

থাঁকারি দিত, 'আমি আসতে পারি ?' কেননা একদিন মা বলে দিয়েছিলেন, 'আগের কথা অন্ত ছিল অনন্ত। এখন যখন তখন উপরতলায় আসা তোমার ভাল দেখায় না। কাঞ্চন বা মেয়ে, সব সময় আব্রু রেখে থাকতেও চায় না। লজ্জা পেতে পারে। তা একটু গলাখাঁকারি দিতে হয়। ওঁরা যেমন দেন।' কাঞ্চন বড়দার মেয়ের নাম, বয়স চার।

আবার একদিন মা বললেন, "কাঞ্চনের জন্ত কখনও কিছু এনো না, এটা তোমার ভাল দেখায় না অনন্ত।"

কোথায় নেমন্তন্ন ছিল। একটা ভাঁড়ে দুটো মিষ্টি এনে মার হাতে দিয়ে অনন্ত বলল, "মিষ্টিটুকু দেবেন।"

মা বললেন, "বেশ, বেশ।"···এই নিয়েই বৌদি, দিদি সব হাসল।

জামাইষষ্ঠীর দিন অনন্ত লক্ষ্য করল সে যেন একটু বেশী যত্ন পাচ্ছে। অনন্তর মানসে কাঞ্চন উজ্জ্বলতর বিভায় রঞ্জিত হতে রইল। কাঞ্চন মাঝে মাঝে অনন্তর কোলে ওঠার জন্ত আবদার ধরত। মা বলতেন, "আনো না ঘুরিয়ে। আজকাল ত ফ্যাশন্ হয়েছে।" ও যেন লজ্জায় মরে যেত ; কিন্তু নিয়ে যেত।

সেদিনও এমনিই টোলের মধ্যে হঠাৎ নাচতে নাচতে কাঞ্চন উপস্থিত। কেবল বলছে, "অন্তদা তোলে নাও।"

অনন্ত নির্লজ্জ মেয়েটার ধিঙ্গিপনা দেখে বিস্মিত হচ্ছিল। ওকে কত যে ও বুঝিয়েছে যে গুরুজনের সামনে কোলে চড়তে চাওয়া ওর উচিত নয়, কিন্তু মেয়েটা বুঝবে না।

কাঞ্চন নাছোড়বান্দা। "অন্তদা তোলে—নাও"···টোলে সব মুখ টিপে হাসে।

বড়দা বুঝতে পারেন আশ্রমে চাঞ্চল্য এসেছে। কাঞ্চনকে বলেন, "যাও এখান থেকে। নিয়ে যাও না ওকে সরিয়ে অনন্ত। দিয়ে এস ওদের কাছে।"

অনন্ত লজ্জায় মরে গেল। "আমি পারব না"—বেরিয়ে গেল ওর মুখ থেকে। দাদার সামনে বজ্রপাত হলেও অতটা হতবুদ্ধি হতেন না তিনি।

কিন্তু কাঞ্চন বলে উঠল, "নেও না তোলে। আদ্‌কাল ত ক্যাত্তন্ হচ্চে।"

অনন্ত সজারু হলে ওর চুল খাড়া হয়ে উঠত। দাদা বুঝলেন না কাঞ্চন কি বলল। কিন্তু সদা আর চিত্ত হাসির দমক গুছলাতে গুছলাতে বাইরে গেল ছুটে। কাঞ্চনের গালে একটা চড় কসিয়ে অবশেষে অনন্ত ওকে তুলে নিয়ে চলে গেল। দাদা অবাক-বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন।

কাঞ্চনের অসুখ। দাদা তাকে নিয়ে ডাক্তারখানায় যাবেন। অনন্তকে বললেন, "ওকে নিয়ে যেতে পারবে অনন্ত ?"···অনন্তর সেই লজ্জা, সেই সঙ্কোচ।

দাদা ইতিমধ্যে রহস্যটা জানতে পেয়েছেন, বললেন, "ফাজামি রাখ, নিয়ে এস। মা ঠাট্টা করেন বুঝতে পার না ? আচ্ছা ত তোমার বুদ্ধি! মর্কট নৈলে হেন আশা করে। যাও নিয়ে এস ; যাও।"

গিয়েছিল অনন্ত কাঞ্চনকে আনতে। কিন্তু ভুলতে পারে নি কথাটা যে ওর পক্ষে কাঞ্চনকে আশা করা মর্কটের পক্ষে মুক্তা আশা করার সামিল।

কথাটা ওর বুকে শেলের মত বিঁধেছিল। ও দেখেনি ওদের বয়সের তারতম্য। ও বোঝে নি সহজ রহস্যের দিকটা। সরল বিশ্বাসে ও যাকে হৃদয় দিয়ে সত্য বলে ধরেছিল তাতে রূঢ় আঘাত লেগেছিল।

ফলে ও যেদিন নিঃশব্দে চলে গিয়েছিল সেদিনও কেউ ওর জন্ত দুঃখ করে নি। বরং জানতে পেরে হাসাহাসিই করেছিল, "আচ্ছা বোকা লোকটা !" বলত আর হাসত। ওর কথায় টোলে সবাই হাসত।

একজন আর কোন দিন হাসেন নি। তিনি মা।

বহুদিন পরে কাঞ্চনের বিয়ের পরদিনে কাঞ্চন চলে গেল শ্বশুর-বাড়ী। মেয়ে চলে যাবার পরেকার বেদনায় সবাই মুহ্যমান। বড়দা এসে মার কাছটিতে বসেন।

মা বললেন, "আজ অনন্তকে একখানা চিঠি লিখে দিস। কাঞ্চনকে ও বড় ভালবাসত। ও যেন কাঞ্চনকে আশীর্বাদ করে।"

মার কথাটা আমার আজও মনে পড়ে বলেই অনন্তকে আমার এতটা মনে আছে।

দুর্গত-আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী
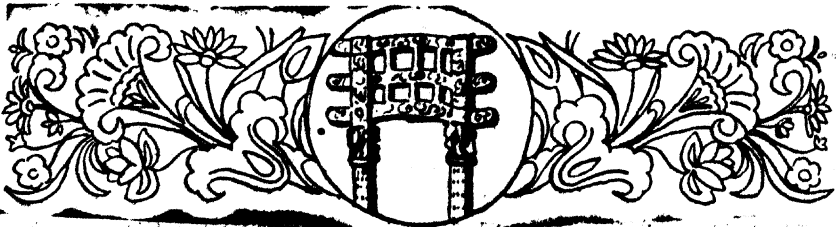
শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার লেখায় ভাষণে অস্পৃশ্যতাসৃষ্ট দুর্গতির শোচনীয়তাকে সুস্পষ্ট করে বারে বারে তাকে লোকসমক্ষে তুলে ধরেছেন। তাঁর 'অচলায়তন' নাটক (১৩১৮) এবং শেষ জীবনের 'চণ্ডালিকা' নাটিকাখানিও (১৩৪০ ভাদ্র) এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। একেবারে কার্য্যক্ষেত্রে আন্দোলনের রূপে এ সমস্যা সমাধানের প্রয়াস কবিকে আকর্ষণ করেছিল ১৩৩৯ সনে, মহাত্মাজীর ঐতিহাসিক পুণা-উপবাসের দিনগুলিতে।

ভারতের যুগপ্রবর্তক এই দুই মহামানবের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেছিল সমাজের সঙ্গে সমাজ-অবহেলিত নিম্নতন কোটি কোটি লোকের কৃত্রিম বিচ্ছিন্নতা ঘুচাবার একটি ঐকান্তিক লক্ষ্যে। সেদিন যে বেদনায় এ দু'জনে মিলেছিলেন তা শুধু অন্নপান প্রচলনেই প্রশমিত হবার মত নয়, অস্পৃশ্যের মধ্যে মানুষের দুর্গতি যা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে, সর্ব্বদিক দিয়েই তার বিলীনতা তাঁদের কাম্য ছিল। ঐ সময়কার আন্দোলন রবীন্দ্রনাথের সাধনক্ষেত্র শান্তিনিকেন তথা বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানে কি পরিণতিলাভ করেছিল, এতদিন সে বিষয়ে বড় একটা খোঁজখবর হয় নি। সম্প্রতি-প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে[১] দুর্গত মানবের জন্য কবিগুরুর মর্ম্মবেদনার গভীরতা অনেকটা ব্যক্ত হয়েছে: বিশ্বভারতীর কর্ম্ম-ইতিহাসের একটি অনুদ্‌ঘাটিত অধ্যায়ের প্রতি আলোকসম্পাতের প্রয়াসের জন্য লেখাটি মূল্যবান। এ সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত তথ্যমূলক আলোচনা এখানে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

মহাত্মাজীর প্রায়োপবেশন-ঘটনার মহত্ত্ব এবং ঐ ঘটনা থেকে উদ্ভূত অবস্থার গুরুত্ব বিষয়ে ১৩৩৯ সনের ৪ঠা আশ্বিন সকালে মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ আশ্রমবাসীদের নিকট এক ভাষণ দান করেন।[২] ঐদিন বিশ্বভারতীর কাজকর্ম্ম সব বন্ধ থাকে এবং আশ্রমে এক গম্ভীরভাব বিরাজ করে। কেবল আশ্রমবাসীদের নিকট বলেই গুরুদেব নিরস্ত হলেন না, যাদের কাছে বললে সমাজের আরও গভীরে যথার্থ প্রয়োজনের জায়গায় কথাগুলি সহজে গিয়ে পৌঁছবে আর যেখানে পৌঁছনোই তখন বেশী জরুরি, সেই গ্রামবাসীদের কাছে তাঁর বক্তব্য তিনি অবিলম্বেই সাক্ষাৎভাবে জানাবেন বলে ব্যাগ্র হয়ে উঠলেন। সেই দিনই দলে দলে চারদিকে লোক গেল। মহাত্মাজীর উপবাস এবং গুরুদেবের আহ্বানের কথা গ্রামাঞ্চলে সকলকে বুঝিয়ে বলে আসা হ'ল। পরদিন ৫ই আশ্বিন বিকেলে শান্তিনিকতনে 'সিংহসদনে' এক জনসমাবেশের নিকট কবি পল্লীবাসীদের উদ্দেশ করে প্রবল আবেগে 'মহাত্মাজীর শেষব্রত' নামক স্মরণীয় ভাষণ দান করেন। সভার প্রারম্ভে হরিজন সম্প্রদায়ের কতিপয় প্রতিনিধি মিলে সভাপতি রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত জানিয়ে মাল্যভূষিত করেন।[৩] সভার শেষে হরিজনদের পরিবেশিত সরবত সমবেত আশ্রমবাসীদের মধ্যে প্রায় সকলেই পান করেন। রাত্রে আশ্রমের সাধারণ ভোজনাগারে হরিজন-পক্ক খিচুড়ি-অন্ন দিয়ে এক ভোজ হয়। সেখানেও অনেকে অন্ন গ্রহণ করেন। এ স্থলে বলা আবশ্যক, রবীন্দ্রনাথ ঐদিন সভা ডেকেছিলেন নিজে থেকেই; কর্ম্মীমণ্ডলীর পক্ষ থেকে সভা ডেকে জলগ্রহণের প্রস্তাব তাঁর নিকট আসে এবং তাতে তিনি সম্মতি দান করেছিলেন এরূপ ঘটে নি। যদিও পান ও ভোজনের কার্য্যধারা থেকে সেরূপ মনে হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু তাই মনে করে নিলে বাস্তবেও যা ঘটেছিল তার পারম্পর্য্য ঠিক অনুসরণ করা হয় না।

এই প্রসঙ্গেই আর একটি বিষয়ের ধারণাও পরিস্ফুট হওয়া ভাল—শান্তিনিকেতনে অস্পৃশ্যতা থাকা না-থাকা। অনেকটা গুরুদেবের ও আশ্রমের আদর্শগত নৈতিক প্রভাব, আর কতকটা বাস্তবের প্রয়োজন—এই দুইয়ের যোগাযোগ থেকে শান্তিনিকেতনে যে পাঁচমিশেলি এক আন্তর্জাতিক সমাজ গড়ে উঠেছে, সেদিনকার অস্পৃশ্যতা বিচারের সঠিক ক্ষেত্র সেটি নয়। যার যার রক্ষণশীল সামাজিক-দায়িত্বের সঙ্গে বোঝাপড়ার কাজ এরূপ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আশা করা যায় না। অস্পৃশ্যতা শান্তিনিকেতনের আদর্শ-বহির্ভূত হলেও, সকল সমাজেরই লোকের সমাবেশ যে তার আদর্শের প্রধান কথা—তা অবশ্যই স্বীকার্য্য। সেই কারণেই রক্ষণশীল সমাজের লোকদেরও যে সেখানে সমাবেশ ঘটবে তা একান্ত স্বাভাবিক। অন্নপানের অনুষ্ঠান ও এই প্রতিজ্ঞাপত্র প্রচারের যে প্রয়োজন ঘটেছিল, তা কতকটা এই রক্ষণশীলদের জন্য বটে, কিন্তু একমাত্র তাঁদের জন্যই, এ কথা ধরে নেওয়াও ঠিক হবে না। বিশেষ করে প্রতিজ্ঞাপত্র সই করানোর কাজে কবির অতটা তীব্রভাবে তাগিদ দেওয়ার মধ্যে আর একটা দিকের প্রয়োজনের ইঙ্গিতও সুপরিস্ফুট। যাঁরা শান্তিনিকেতনের সমাজে উদার, সকল সমাজে—জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে মতে ও ব্যবহারে তাঁরা প্রকৃতই সমভাবে আদর্শনিষ্ঠ কিনা, এই নজিরই কবি আহ্বান করেছিলেন প্রতিষ্ঠাপত্রের পৃষ্ঠে স্বাক্ষর সংগ্রহ করার নির্দেশ দিয়ে। বলা চলে যে, সেই সৃষ্টিপ্রবণ স্বাক্ষরপত্রই একই কালে অন্য দিক দিয়ে ধ্বংসমূলক শায়ক হয়ে গা-ঢাকা অস্পৃশ্যতাকেও আশ্রমে এবং বাইরে তার পোশাকি উদারতার আবরণের তলায় তাক্ করে ফিরছিল। প্রথম দিন আশ্রমবাসীদের আহ্বান করে যা বলেছিলেন—সকল

---

১ 'মহাত্মাজীর প্রায়োপবেশনে বিশ্বভারতী''—শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রবাসী মাঘ ১৩৬১।

২ দ্রঃ Mahatmaji & the Depressed Humanity, ও 'মহাত্মাজীর শেষব্রত'।

৩ বিশ্বভারতী নিউজ ১৯৩২ অক্টোবর।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেই কবি যেমন তাঁর মর্ম্মবাণী আশ্রমের সকলকেই সর্ব্বাগ্রে জ্ঞাপন করতেন, প্রধানতঃ সেই স্বাভাবিক অভ্যস্ত রীতিতেই তার উৎসার ঘটেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় দিনের বেলায় পল্লীবাসী সাধারণকেই তিনি বিশেষ করে ডেকেছিলেন; তার কারণ এ নয় যে, শান্তিনিকেতনে অস্পৃশ্যতার অস্তিত্ব না থাকায় আশ্রমে সে বিষয়ে প্রচার অনাবশ্যক ছিল।

মহাত্মাজী এবং তাঁর মহান্ ব্রতের প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন-উদ্দেশ্যে ব্রতারম্ভের দিন ৪ঠা আশ্বিন তারিখে শান্তিনিকেতনের অধিবাসীবৃন্দ সারাদিন অরন্ধন ও উপবাসে কাটান। অনেকে রাত্রিতেও ঐ বিধি পালন করেন। বিশ্বভারতীর তৎকালীন কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বাক্ষরিত একখানি বিজ্ঞপ্তিপত্র সেদিন ঘরে ঘরে প্রচারিত হয়। তাতে এই আবেদনটি ছিল যে, উপবাসের দরুন আহার্য্য-ব্যয়ের যে অর্থ বাঁচবে আশ্রমবাসীরা তা যেন কর্ম্মীবিশেষের নিকট দয়া করে জমা দেন। সংগৃহীত অর্থ মহাত্মাজীর আকাঙ্ক্ষিত অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে এবং হরিজন-উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত হবে। অর্থের ভারপ্রাপ্ত বলে যে কর্ম্মীটির নাম বিজ্ঞপ্তিতে নির্দ্দেশ করা ছিল, তিনি আশ্রমের একজন সাধারণ কর্ম্মী। এরূপ স্মরণীয় ক্ষণে মহৎ দায়িত্বের স্থলে অভাবিতরূপে নিজের নামের উল্লেখ দেখে কর্ম্মীটি সে মুহূর্ত্তে এই সঙ্কল্প গ্রহণ করেন যে, স্থায়ীভাবের কিছু কাজ করা চাই। গুরুদেব ও মহাত্মাজীর নাম যাতে জড়িত রয়েছে সেরূপ আন্দোলনকে কিছুতেই কেবল আবেগ ও আলোচনার উপর দিয়ে ভেসে যেতে দেওয়া হবে না। এই স্থির করে আশ্রমের ঐ সময়কার উদ্বুদ্ধ প্রাণশক্তি ও কর্ম্মোদ্যমকে কেবল প্রচার নয়, সংগঠনেও লাগাবার জন্য অন্য অনেকের মত তাঁরও চিত্ত উপায় নির্দ্ধারণে নিরত হয়। 'সংস্কার-সমিতি'র অধিকতর স্থায়ী জীবনবৃত্তের মূলে তাঁর পরিকল্পনা অন্যতমরূপে অতঃপর কার্যাকর হয়েছিল। ইতিপূর্ব্বে ২৩শে সেপ্টেম্বর (১৯৩২) অর্থাৎ যেদিন গ্রামবাসীদের নিকট রবীন্দ্রনাথ ভাষণ দান করেন তার পরদিন এবং মহাত্মাজীর উপবাসের তৃতীয় দিনে—শান্তিনিকেতনে সর্ব্বপ্রথম উক্ত প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়।[৪] তার কার্য্যকালের স্থায়িত্ব মাসদেড়েকের মত মাত্র ছিল। তার মধ্যে ক'মাস কেটেছিল পূজাবকাশে। সেই সাময়িকভাবে গঠিত সমিতির কথা পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে উল্লিখিত হয়েছে।

সংস্কার সমিতির সূচনার দিনে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শ্রীযুক্ত সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের যোগ কিরূপ ঘনিষ্ঠ ছিল, তা তাঁর প্রবন্ধেই বিবৃত আছে। এ কাজে তিনি কেবল তখনকার আশ্রমিক ছাত্রসমাজের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন তাই নয়, তিনি আশ্রমের সাধারণের মধ্যেও ছিলেন সমধিক উৎসাহী ও কর্ম্মনিষ্ঠ। তাঁর সম্পাদকত্বে (তিনি কোষাধ্যক্ষও ছিলেন) প্রথম এ সমিতির প্রতিষ্ঠা যা হয়েছিল, সে ছিল শান্তিনিকেতনেরই মাত্র ঘরোয়া রকমে[illegible] আন্দোলন আরম্ভের মুখে প্রাথমিক কাজ প্রবর্ত্তনের প্রয়োজ[illegible] জনকয়েককে উত্তরায়ণে ডেকে নিয়ে বসে এর জন্ম উদ্ভব হ[illegible] তা সত্ত্বেও সে ক'দিনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উদ্দীপনাদীপ্ত।

সমিতির ব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে দায়িত্বশীল কর্ম্মী অধ্যাপকগণ কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে প্রতিবেশী পল্লীসমূহে সপ্তা[illegible] সপ্তাহে নিয়মিতরূপে প্রচারকার্য্য করতে লাগলেন। ভুবনডা[illegible] গোয়ালপাড়া, আদিত্যপুর, পারুলডাঙা, সর্পলেহনা ইত্যাদি গ্রা[illegible] গ্রামে বৈঠক বসত ও ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা হ'ত, ধর্ম্মসভায় [illegible] ও কীর্ত্তনের সঙ্গে প্রসঙ্গতঃ সামাজিক বিধিবিধানের সম[illegible] আলোচনাও চলত। আর করা হ'ত মাঝে মাঝে সার্ব্বজ[illegible] ভোজের আয়োজন। ২৪শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় ভুবনডাঙা গ্রা[illegible] এরূপ একটি সার্ব্বজনীন ভোজের অনুষ্ঠান হয়। গ্রামের অধিবাসীর[illegible] ছিলেন এর উদ্যোগী।[৫] প্রসাদ বিদ্যালয়ের[৬] প্রাঙ্গণে বাঁ[illegible] চালু পাড়িতে হাড়ি ডোম বাগদি মেথর মুচি সকলে এক পংক্তি[illegible] বসতে গিয়েও মাঝে মাঝে পরস্পর থেকে একটু-একটু ফাঁ[illegible] রেখেছে দেখা গেল। তখন শান্তিনিকেতনের কর্ম্মীরা [illegible] নিমন্ত্রিত বর্ণহিন্দুগণের অনেকে বসে পড়ে নিঃশব্দে সে ফাঁকগু[illegible] পূরণ করে দিলেন। অতঃপর জাতিপাঁতির ভেদ সব একাক[illegible] হয়ে গেল।

শান্তিনিকেতনে এ সময়ে কর্ম্মীরা রবীন্দ্রনাথের 'কালের যা[illegible] নাটিকখানি অভিনয় করেন, তার টিকেট বিক্রয়লব্ধ অর্থও [illegible] অস্পৃশ্যতা আন্দোলন-ভাণ্ডারে জমা হয়। এই অভি[illegible] সুজিত বাবু 'কবি'র ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। 'কালের যা[illegible] গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হয় ঔপন্যাসিকশ্রেষ্ঠ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে [illegible] ৫৭তম জন্মতিথি উপলক্ষে। তাঁকে উদ্দেশ করে এক পত্রে র[illegible] লেখেন, "রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পে[illegible] মহাকালের রথ অচল, মানুষের সকলের চেয়ে বড় দুর্গতি, কা[illegible] এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সমাজ-বন্ধন দেশে দে[illegible] যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথটানার রশি। [illegible] বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানবসম্বন্ধ অসত্য ও অসম[illegible] হয়ে গেছে তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এত[illegible] যাদের বিশেষ ভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বে[illegible] শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদে[illegible] আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে, তাদের অসম্মান ঘুচ[illegible] তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে[illegible] (রবীন্দ্রজীবনী, ২য় সং, ৩য় খণ্ড।)

---

৪ বিশ্বভারতী নিউজ, ১৯৩২ নবেম্বর।

৫ বিশ্বভারতী নিউজ, ১৯৩২ অক্টোবর।

৬ স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শান্তিনিকেতনের প্রা[illegible] ছাত্র কৈশোরে পরলোকপ্রাপ্ত মুক্তিদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষা[illegible] প্রতিষ্ঠিত ভুবনডাঙা গ্রামের নৈশবিদ্যালয়।

তখন 'কালের যাত্রা' অভিনয়ের জন্ত মহড়া চলছিল। উপরে বর্ণিত পরিস্থিতিতে সকলেই মুহ্যমান। মহাত্মাজীর প্রাণসংশয়জনক অনিশ্চিত ও উদ্বেগপূর্ণ সেই সঙ্কটকালে অভিনয়-অনুষ্ঠানের উপযোগিতা সম্বন্ধে তরুণ অধ্যাপক-মহল থেকে যে-কেউই ইতস্ততঃ করুন না কেন, গুরুদেবের তাতে ক্ষোভ হয়েছিল। তিনি যে কারণে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন 'প্রবাসী'র প্রবন্ধে তাও সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভের মূলে যেমন যুক্তি আছে, তেমনি অন্তদের দ্বিধার মূলেও কোন যুক্তি আছে কিনা, দেখা যেতে পারে। আশ্রমে অভিনয় হয়েছিল তা সত্য। কিন্তু এও সত্য যে, পরিস্থিতির কথা ভেবেই কলকাতায় শরৎ-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে এই নাটক অভিনয়েরই পূর্ব্বনির্দ্ধারিত সংকল্প কর্তৃপক্ষকে ত্যাগ করতে হয়। শুধু তাই নয়, সে বৎসরের 'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠানও সেপ্টেম্বরের শেষে কলকাতায় হওয়ার কথা ছিল, তাও মহাত্মাজীর উপবাসের দরুন উদ্ভূত পরিস্থিতির তীব্রতা দেখেই পরিত্যক্ত হয় ("considering the tense atmosphere of the country")।[৭] দুর্গত মানবের অধিকার-স্বীকৃতি ছিল মহাত্মাজীর সেই উপবাসের মূল কথা ; গুরুদেবের 'কালের যাত্রা' নাটিকার নিগূঢ় ভাবটিও ছিল তাই। বেদনার সঙ্গে সঙ্গে বড় এই একটা আদর্শের আহ্বানকে সকলের কাছে সেদিন মূর্ত্ত করবার জন্ত অভিনয়ের অনুষ্ঠানে কবি উদ্যোগী হয়েছিলেন,—নিছক রসোপভোগই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। মহাত্মাজীর হরিজন আন্দোলনের অন্তর্নিহিত আবেদন প্রচারের পক্ষে একান্ত অনুকূল ছিল বলে কবির নিকট এ অভিনয়ের সার্থকতা আরও বেশী অনুভূত হয়। সেক্ষেত্রে ইতস্ততঃকারীগণ প্রত্যক্ষ বাস্তবের দিক থেকেই বিষয়টিকে বেশী দেখে থাকবেন ; বিচার ও কল্পনার প্রসারে তাঁরা পশ্চাদ্বর্ত্তী থাকতে পারেন, কিন্তু তাঁদের এই দেখার মূলেও বেদনাই যে নিহিত ছিল সে কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

অচিরেই গুরুদেবের তখনকার ভাষণগুলি এবং এ আন্দোলন সম্পর্কে মহাত্মাজীর ও অন্তান্তদের সঙ্গে গুরুদেবের যে তার বিনিময় হয়, সেগুলির একটি সংগ্রহ "Mahatmaji and the Depressed Humanity" নাম দিয়ে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সত্তর বৎসর পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে ১৯৩২, ১১ ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই পুস্তিকাখানি শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ আচার্য্যের নামে উৎসর্গ করেন। পুস্তিকার আখ্যাপত্রে মুদ্রিত রয়েছে, পুস্তিকার বিক্রয়লব্ধ অর্থ সমস্তই অস্পৃশ্যতা দূরীকরণকল্পে বিশ্বভারতীর 'সংস্কার-সমিতি'কে দেওয়া হবে। এই পুস্তিকারই পরিশিষ্টরূপে মুদ্রিত হয় সংস্কার সমিতির 'সর্ব্বজনীন নিবেদন'খানি।

বিশ্বভারতীতে অন্তান্ত নানা বিভাগের মত দুর্গত শ্রেণীর মানুষদের জন্ত আবাসিক শিক্ষা ও সংগঠনের ব্যবস্থা যাতে হয়, সেই উদ্দেশ্যে একটি 'ভবন' স্থাপনের চেষ্টা চলতে লাগল ৮ এবারে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন—সমগ্র বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে নূতন করে সংস্থা গঠিত হয়। সমিতির নাম থাকে সেই পুরানোটাই। চাঁদা সংগ্রহের ভারপ্রাপ্ত পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মীটি সমিতির অনুষ্ঠানপত্রের একখানি খসড়া তৈরি করেন এবং আশ্রমের প্রবীণগণ পরিমার্জ্জিত করে তাকে সম্পূর্ণতা দান করেন। অবশেষে সেটিকে গুরুদেবের নিকট উপস্থাপিত করা গেল। গুরুদেব অনুমোদন করলেন। তখন গুরুদেবের সম্মতি লাভ করে তাঁর নামেই অনুষ্ঠানপত্রখানি পাঁচ হাজার কপি মুদ্রিত করা হয় এবং বাংলা দেশের সমস্ত জেলায় শহরে গ্রামে বুকপোষ্ট মারফতে তা বিতরিতও হয়। সেই মুদ্রিত 'সর্ব্বজনীন নিবেদন' পত্রে 'সংস্কার-সমিতি'র কেন্দ্রীয় সভার সদস্যদের যে নামোল্লেখ রয়েছে, তা এইরূপ :

"কেন্দ্রীয় সভার সদস্য, বিশ্বভারতী কর্ম্মসচিব, শ্রীনিকেতন সচিব, শ্রীনেপালচন্দ্র রায়, শ্রীজগদানন্দ রায়, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীকালীমোহন ঘোষ—সম্পাদক, শ্রীসুধীরচন্দ্র কর—সহ-সম্পাদক।

এতদুদ্দেশ্যে অর্থ ইত্যাদি যাবতীয় সাহায্য বিশ্বভারতী কর্ম্মসচিবের নিকট সংগৃহীত থাকিবে। সংস্কার-সমিতির কেন্দ্রীয় শাখার ব্যবস্থামত তিনি তাহা ব্যবহার করিবেন।"[৯]—এ সমিতির আচার্য্য ছিলেন বিশ্বভারতীরই আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ।

৭ বিশ্বভারতী নিউজ, ১৯৩২ অক্টোবর।

৮ এর ফলে আশ্রমে তখন "সংস্কার-ভবন" স্থাপিত হয়। দুই বৎসর স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত হবার পর বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ সেটিকে তাঁদের শিক্ষাবিভাগের অঙ্গীভূত করে নেন। দেশের চারদিকে আজ লোকশিক্ষার অনুশীলনে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ যেরূপ দেখা যাচ্ছে, তাতে শান্তিনিকেতনে একদা প্রতিষ্ঠিত এই দুর্গতজনের শিক্ষা ও সংস্কৃতিচর্চার অনুকূল "সংস্কার-ভবনে"র মত একটি বিভাগের গুরুত্ব অসংশয়িত।

৯ দ্র: Mahatmaji & the Depressed Humanity—Appendix—

• সংস্কার-সমিতি, সর্ব্বজনীন নিবেদন, ১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৯ সাল (১লা ডিসেম্বর ১৯৩২)।

চিরন্তনী

শ্রীকালীপদ ঘটক

ভুল ক'রে যদি ব্যথা দিয়ে থাকি মনে
মনের কোণে তা জমিয়ে রেখো না মিছে,
বেদনা সে চির প্রেমের নিগড়ে বাঁধা,
প্রেম সে যে ফিরে বেদনার পিছে পিছে।

দূর থেকে তোমা যতই নিকটে টানি
নিকট ততই সরে যায় যেন দূরে,
যে সহজ সুরে গান সে মেলিত পাখা—
বাধা পেলো কি সে আমার আপন সুরে !

অথবা এ বুঝি আমারি মনের ভুল,
আমি যে তোমায় চিনি গো স্বতন্তরা ;
যে কথা গোপনে ঢাকিয়া রাখিতে চাও,
দৃষ্টি যে তব তারই ইঙ্গিতে ভরা।

তোমার ও দুটি চটুল আঁখির কোণে
লুকোচুরি খেলে মেঘলা রাতের চাঁদ ;
ক্ষণিকের মাঝে গভীর তিমিরে ঢাকা,
ক্ষণে ঝরে পড়ে আলোকের পরসাদ।

তোমার মনের গোপন কুঞ্জছায়ে
আলো-আঁধারের আলপনা ছুঁয়ে ছুঁয়ে,
খুঁজিয়া ফিরেছি নন্দনবন-মধু,
ফুলে ফুলে তার স্বাক্ষর গেছি থুয়ে।

যা পেয়েছি তার আধখানি দিয়ে প্রিয়া,
রচনা করেছি সোনার স্বপনখানি,
বাকিটুকু দিয়ে রাঙায়ে নিয়েছি হিয়া,
ও রূপ-সায়রে প্রেমের মাধুরী ছানি।

সেদিন আকাশে ছিল বুঝি ভরা চাঁদ,
বাতাসের বুকে বেহাগের স্পন্দন,—
নিখিল বিশ্ব কি যে রহস্যে ভরা,
দুটি হিয়া ঘিরে থর থর কম্পন।

সে দিনের সেই প্রথম প্রেমের স্মৃতি
মনের দেউলে দীপশিখা হয়ে জ্বলে,
কামনার ধূপ পুড়ে হয়ে গেছে ছাই,
গন্ধটি আজো লুটায় মর্মতলে।

জীবনে-মরণে চিরজনমের রাখী
কোন্ সে লগনে কে যে দিয়ে গেল বেঁধে,
ও পরাণ লাগি সতত পরাণ ঝুরে,
মিলনে বিরহে তিলেকের বিচ্ছেদে।

মান-অভিমানে আপনারে দিয়া ফাঁকি
নিজেরে ভুলানো মিথ্যা ছলনা এ যে,
গোপনে যে কথা স্বপনে রেখেছ ঢাকি
নিখিলের বুকে ছড়ায়ে পড়েছে সে যে।

কাননে কাননে ফুলে ফুলে মধুকর
সে কথাটি নিয়ে আজো করে কানাকানি,
তটিনী যেথায় সাগরে মিলায় কায়া
একথা যে সেথা হয়ে গেছে জানাজানি।

দিবস যেখানে সোনার গোধূলি পারে
রভস-বিভোল রজনীর অভিসারে,
আমরা যে সেথা গোপনে বাজাই বাঁশী,
ঝঙ্কার তুলি বিশ্ব-বীণার তারে।

অসীমের বুকে অনন্ত প্রেমতৃষা—
রূপ পেলো কি সে ধরার যুগল প্রেমে,
তুমি আমি তার সাক্ষ্য বহিয়া নিতি
বারে বারে এই ধরায় এসেছি নেমে।

মোর চোখে তুমি চিরন্তনী সে প্রিয়া,
তুমি সে প্রেয়সী, সখী তুমি, তুমি বধূ ;
করিয়াছি পান হিয়ার পাত্র ভরি
যুগে যুগে তব যৌবন-বন মধু।

ধরার ধূলায় মাটির স্বর্গ রচি
মোরা দোঁহে যেথা বাঁধিয়াছি খেলাঘর,
ব্রজের বেণু যে ছড়ানো আজিও সেথা,
রাই-প্রেমডোরে বাঁধা যে ব্রজেশ্বর।

শোন নি কি সেই যমুনার কূলে কূলে,
কার নাম ধরি বাঁশী বাজে 'রাধা', 'রাধা' ;
সে যে তুমি ওই বাঁশরীর কলতানে,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে তোমারি নাম যে সাধা।

কে সে বেণুধর, কেবা সে ব্রজের কানু,
গোপীপ্রেম ধ্যানে যেয়ায় দিবস যামী ;
একদা যে তোমা সেধেছিল পায়ে ধরি
ভুলেছ কি তারে ? সে যে আমি, সেই আমি ।

আমি সেই কানু, সে চিরকিশোর আমি,
দেখা তব সাথে মাধবী-কুঞ্জ-ছায়ে,
ললাটে তোমার শ্যাম-কলঙ্ক-টিকা
এঁকে দিয়েছিনু তোমারি প্রেমের দায়ে ।

শতেক যুগের সে রসমাধুরী কথা
দুঁহু মিলি মোরা কব আজি কানে কানে,
রুদ্ধ হিয়ার বাতায়ন দাও খুলি
কথা হবে আজ গুঞ্জনে গানে গানে ।

দিবসের আলো ম্লান হয়ে এলো নভে
ভোল ব্যথা ভোল, ভোল শত অপরাধ ;
শেষ ক'রে দাও মান-মাথুরের পালা,
বৃন্দাবনের আকাশে উঠিছে চাঁদ ।

মহিলা-সংবাদ

শ্রীকাজল পালিত

উড়িষ্যার রাজ্যপালের সেক্রেটারী শ্রীসুনীলচন্দ্র পালিতের ষোল বৎসর-বয়স্কা কন্যা শ্রীমতী কাজল পালিত উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৫৫ সনের আই-এ পরীক্ষায় ছাত্র এবং ছাত্রীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। শ্রীমতী কাজল বোম্বাইয়ের গন্ধর্ব মহাবিদ্যালয় মণ্ডল হইতে সঙ্গীত প্রবেশিকা পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইয়াছে।

কুমারী তান ওয়েন

চীনা ছাত্রী কুমারী তান ওয়েন এ বৎসর শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর বি-এ পরীক্ষায় বাংলা অনার্সে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। কুমারী তান ওয়েন চীনা-ভবনের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক তান য়ুন-সান এর কন্যা।

কুমারী তান ওয়েন

বর্ত্তমান ইটালী
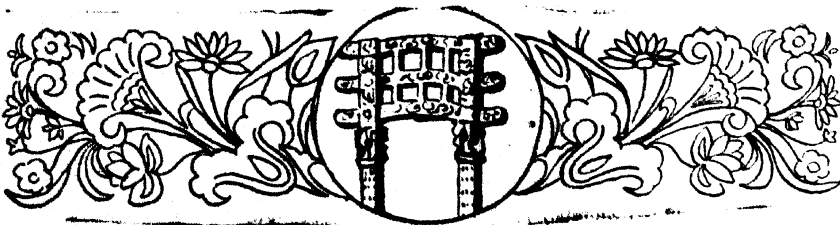
বর্ত্তমান ইটালীতে জাতীয় উন্নয়নের জন্য যে সকল প্রচেষ্টা চলিতেছে যৌথ জলসেচের (Collective Irrigation) ব্যবস্থা তাহার অন্যতম। দেশের জল-সম্পদ বৃদ্ধি এবং তাহাকে পরিপূর্ণ ভাবে কাজে লাগাইবার জন্য সেখানে একটি ব্যাপক কর্ম্মতালিকা গৃহীত হইয়াছে। এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ কাজই অনুষ্ঠিত হইতেছে সিসিলিতে। সেখানে সিমেতো নদীর তীরে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ জলসেচ-ব্যবস্থা ও বাঁধ নির্ম্মাণকার্য্য প্রায় সমাপ্তির পথে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইটালীতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজও পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে এবং বিভিন্ন স্থানে হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্লান্ট নির্ম্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

আলান্নো (পেসকারা) তৈলকূপ

আজিকার ইটালীতে তৈল-বিশোধন-শিল্পেরও বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে। সিসিলির রাগুসা প্রদেশে তৈল-সম্পদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং আলানোর আব্রুৎসুতে এক তৈলকূপের স্থান নির্দ্দেশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইটালীতে [illegible]টি তৈলবিশোধনাগারে মোট ২,১৬,৯৬,[illegible] টন তৈল পরিশ্রুত হয়।

বর্ত্তমান যুগের যান্ত্রিক সভ্যতার প্রগতির সঙ্গে ইটালী সমান তালে পা ফেলিয়া চলিয়াছে, কিন্তু ইটালী শুধু বর্ত্তমান লইয়াই সন্তুষ্ট নহে। শিশুরাই যে জাতির ভবিষ্যৎ এ কথা এই দেশ বিস্মৃত হয় নাই। সরকারী আনুকূল্যে সেখানে
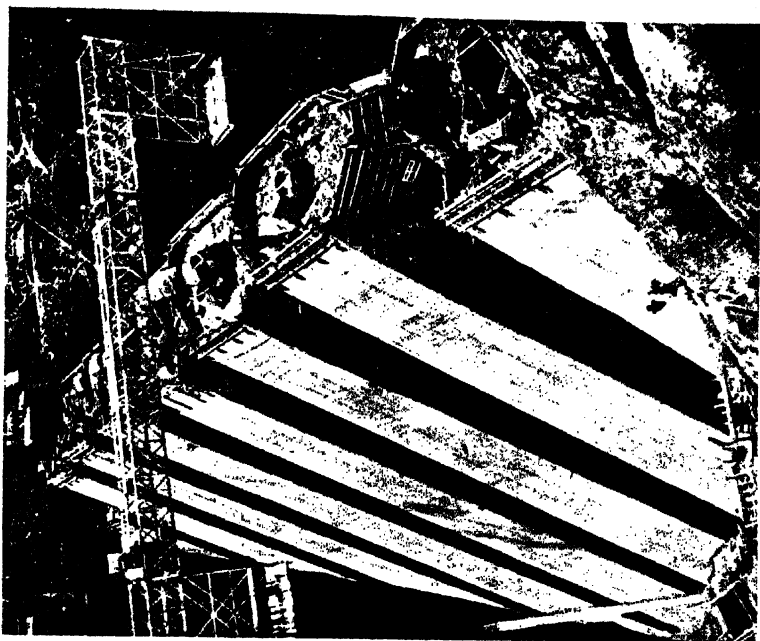
ফোরসিনান প্রদেশের বাগসোবানোতে একটি হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্ল্যান্ট

ত্রোইনা নদীর উপর নির্ম্মীয়মাণ এনসিপা বাঁধ
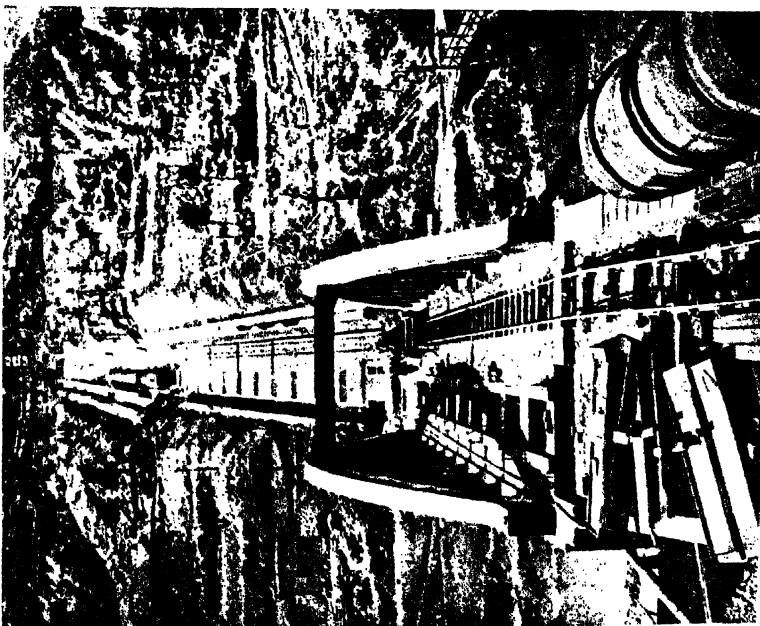
শিশুকল্যাণ-কার্য্য সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে। ও. এন. এম. আই. নামক আত্মকর্তৃত্বশীল সংস্থার মাধ্যমে সরকার মাতা এবং শিশুদের সাহায্য করিয়া থাকেন। নয় হাজার পরামর্শ-সমিতি, কিণ্ডার-গার্টেন এবং ক্লিনিক সম্বলিত এই সংস্থা একদিকে যেমন শিশুর স্বাস্থ্য এবং শারীরিক পরিপুষ্টির দিকে, অন্য দিকে তেমনি তাহার নৈতিক ও মানসিক বিকাশের দিকেও লক্ষ্য রাখিয়া থাকে।

ইটালীতে ও. এন. এম. আই-এর তত্ত্বাবধানে শিশুদের খেলাধূলা

সবাক চিত্রের জন্মকথা

যখন প্রথম সবাক চিত্র উদ্ভাবিত হয় তখন এই শিল্পকে কম প্রতি-কূলতার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। প্রারম্ভকাল হইতে আন্তর্জাতিক শিল্পক্ষেত্রে এমন একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও ছিলেন না যিনি সবাক চিত্রের সফলতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। তখন ভিয়েনাতে সবাক চিত্র প্রবর্তনের কল্পনাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা হয়, প্যারিস আবার ঘোষণা করে যে এগুলি পুরাপুরি অনাবশ্যক। লণ্ডনে এই শিল্পকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা হয় এবং অন্যান্য স্থানে যখনই সেগুলি প্রবর্তনের চেষ্টা করা হয় তখনই সকলে একবাক্যে এই মত প্রকাশ করে যে, সবাক চিত্রের কোন ভবিষ্যৎ নাই।

ইহা হইল ১৯২৭ সনের কথা, '২৮ এবং '২৯ সনেও সবাক চিত্র সম্বন্ধে লোকের এই মনোভাবই বজায় থাকে যদিও ইতিমধ্যে সমস্ত ফিল্ম ষ্টুডিওতে মাইক্রোফোন প্রবর্তিত এবং ১৯২৯ সনের বড়দিনের সময় বার্লিনের ক্যাপিটল সিনেমায় "দি নাইট বিলংস টু আস" নামক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল। সে আজ হইতে পঁচিশ বৎসর আগেকার কথা এবং ইহাই জার্মান সবাক-চিত্রের ক্ষেত্রে প্রথম সাফল্যমণ্ডিত অবদান।

গোড়ার দিকে সবাক চিত্রকে কত যে প্রতিবন্ধ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, আজ পঁচিশ বৎসর পরে তাহা কল্পনা করাও কঠিন। এখন আমরা একথা ভাবিতেও পারি না যে, আগে সবগুলি ফিল্মই ছিল মূক (silent), তখন শুধু ছায়াগুলিই যেন অভিনয় করিত। সেই মূক চলচ্চিত্রের যুগে না ছিল সংলাপ, না ছিল কথোপকথন এবং পর্দার উপরে কোন শব্দই শ্রুত হইত না। কিন্তু সবাক চিত্রের মত অত্যাশ্চর্য্য শিল্প উদ্ভাবনের কৃতিত্ব যাঁহাদের, চলচ্চিত্রের মূক মুখে যাঁহারা বাণী দিয়া গিয়াছেন—এই মুখরতার যুগে বার্লিনের সেই তিন জন জার্মানের কথা ভুলিয়া যাওয়া সমীচীন নয়।

ইঁহাদের পূর্ব্বে অবশ্য আরও কয়েক জন এই বিষয়টি লইয়া মাথা ঘামাইয়াছিলেন—দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় আমেরিকার বৈজ্ঞানিক এডিসনের কথা। ১৮৮৯ সনে তিনি তাঁর কয়েক জন বন্ধুকে পর্দায় একটি ছবি প্রদর্শন করেন, সঙ্গে সঙ্গে ফনোগ্রাফের সাহায্যে কয়েকটি কথা উচ্চারণ করাইবার ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সবাক চিত্রের জন্মদাতা বলা যাইতে পারে না সত্য, কিন্তু তাঁহার উদ্ভাবনশীল মন যে সবাক চিত্রের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং এই সমস্ত সম্ভাবনা পরে বাস্তবে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছিল তিন জন জার্মান টেকনিশিয়ানের দ্বারা। সবাক চিত্রের জন্মদানের কৃতিত্বের দাবি বস্তুতঃ তাঁহারাই করিতে পারেন। সবাক চিত্র উদ্ভাবনের ইতিহাসে ১৯২১ সনের ২৪শে মার্চ তারিখটি স্মরণীয়। কেননা ঐ দিনই ডক্টর জো এঙ্গল, যোশেপ মাসোল এবং হান্স ভোগ্ট এই তিন জন প্রথম তাঁহাদের 'সিনেমাটোগ্রাফির লেবরেটরি'তে প্রকাশ্য ভাবে নিজেদের আবিষ্ক্রিয়া প্রদর্শন করেন।

এই তিন জন কয়েক বৎসর ধরিয়া উক্ত গবেষণাগারে এই আবিষ্ক্রিয়া সম্পর্কে কাজ করিতেছিলেন, তাঁহারা ইহার নামকরণ করিয়াছিলেন "ট্রাই-আরগন", বা তিন জন লোকের কাজ। দীর্ঘ প্রস্তুতির পর গবেষণাগারের সুইচ নিবাইয়া দেওয়া হইল এবং শ্রোতৃমণ্ডলী প্রথম জার্মান সবাক চিত্র দেখিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া আসন গ্রহণ করিল। পর্দার উপর আবির্ভাব ঘটিল পুষ্প-বসনে সজ্জিতা একটি তরুণীর, তার পর ঘটিল সেই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। তরুণীটি তাহার মুখ খুলিল এবং গেটের "দি ওয়াইল্ড রোজ" নামক কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিল। সন্দেহপ্রবণ শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে প্রথম এই ধারণা জন্মিল যে, পর্দার পিছনে সে দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু বস্তুতঃ সে বসিয়াছিল তাহাদের মধ্যেই। সেই কক্ষে কোন গ্রামোফোনও ছিল না, কিন্তু গবেষণাগারের মধ্যে তাহার কণ্ঠস্বর এমনভাবে ধ্বনিত হইয়া উঠিল যেন ঠিক ঠিকই তাহা পর্দায় প্রতি-ফলিত ছবির মুখ হইতে নিঃসৃত হইতেছিল বলিয়া প্রতীয়মান হইল। উদ্ভাবক তিন জন—মানুষের কণ্ঠস্বরের আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়া একটি ফিল্ম ষ্ট্রিপ বা চলচ্চিত্রের ফালিতে চিত্রের সহিত তাহার একত্রীকরণে কৃতকার্য্য হইলেন।

অনুষ্ঠানটি যখন শেষ হইল, উদ্ভাবকগণ তখন পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এই প্রথম সাফল্যের পর বৃথা গর্ব্বে তাঁহারা স্ফীত হইলেন না, পরন্তু নিজেদের গবেষণাকার্য্য সমাপ্ত করিবার জন্য অর্থসাহায্যকারী পৃষ্ঠপোষকদের সন্ধানে তৎপর হইয়া উঠিলেন। মূক পর্দাকে মুখর পর্দায় পরিণত করিবার কল্পনা তাঁহাদিগকে পাইয়া বসিল। কিন্তু সবাক চিত্র প্রযোজনা ত তখনকার দিনে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না এবং মূক চিত্রে (silent films) যে সকল উপকরণ ব্যবহৃত হইত, সবাক চিত্রে তাহার কোনকিছুই ব্যবহার করা যাইত না বলিলেই চলে।

সে যাই হোক না কেন, "ওয়াইল্ড রোজে"র সাফল্য কতকগুলি রুদ্ধ দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিল। অর্থসাহায্যকারী পৃষ্ঠপোষকগণ এই তিন জনের প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য আগাইয়া আসিলেন। একটি প্রাক্তন মূক ফিল্ম ষ্টুডিও ভাড়া করা হইল এবং ছয় শত গোল আলুর থলের সাহায্যে ইহাকে সবাক চিত্র প্রযোজনার উপযোগী করিয়া লওয়া হইল। অতঃপর ষ্টুডিওতে প্রকাশ্য ভাবে সবাক চলচ্চিত্র প্রদর্শনের প্রস্তুতি চলিতে লাগিল। ১৯২২ সনের ১৭ই সেপ্টেম্বর বিরাট সাফল্যের সহিত এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল।

সংবাদপত্রসমূহ এবং জনসাধারণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল এই অনুষ্ঠানের প্রশংসায়। কিন্তু সেই সঙ্গে নির্ব্বাক চলচ্চিত্র শিল্পের তরফ হইতে প্রবল প্রতিবন্ধেরও সৃষ্টি হইল—কেননা সবাক চিত্রের সহিত প্রতিযোগিতায় ইহা টিকিতে পারিবে না—এই ধারণাই মূক চিত্রের পৃষ্ঠপোষকদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। কাজেই নির্ব্বাক চিত্র সর্ব্বপ্রযত্নে সবাক চিত্রের বিরুদ্ধে লড়িতে লাগিল। জার্ম্মানীর মূক চলচ্চিত্র-শিল্প ছিল জার্ম্মানীর অর্থনৈতিক জীবনের একটি শক্তিশালী অঙ্গ এবং ইহার পৃষ্ঠপোষকদের অভিমতের উপর এরূপ গুরুত্ব আরোপিত হইতে লাগিল যে, উদ্ভাবকদের আশা-ভরসা দ্রুত বিলীন হইয়া যাইবার উপক্রম হইল।

দেয় 'পেটেন্ট-ফি' এবং এই আবিষ্কারের অধিকতর বিকাশ-সাধনের জন্য যে প্রচুর পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তাহা জার্ম্মানীতে সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। অবশেষে এই আবিষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে আগ্রহশীল, সুইজারল্যাণ্ডের কয়েকজন লোক এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে চাহিলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই ত্রয়ী তাঁহাদের আবিষ্ক্রিয়া সুইজারল্যাণ্ডের নিকট এই সর্ত্তে বিক্রি করিলেন যে, সমস্ত সাজসরঞ্জাম থাকিবে জার্ম্মানীতে। এখন তাঁহারা এক লক্ষ সুইস ফ্রাঙ্কের অধিকারী হইলেন এবং এই অর্থের সাহায্যে গবেষণা-কার্য্য চালাইয়া যাইতে লাগিলেন।

বার্লিনে একটি নূতন ষ্টুডিও খোলা হইল এবং প্রথম সবাক ফিচার ফিল্ম "এ ডে ইন্ এ ভিলেজ"-এর আলোকচিত্র-রূপায়ণ সুরু হইল। মাসোল এই ফিল্মসহ জার্ম্মানীর বিভিন্ন শহর ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশসমূহ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্বত্রই উৎসাহপূর্ণ সংবর্দ্ধনা লাভ করিলেন। কিন্তু সাধারণের উৎসাহ যতই বাড়িতে লাগিল জার্ম্মান নির্ব্বাক চলচ্চিত্র-শিল্প ততই বাধা সৃষ্টি করিতে লাগিল। সুইজারল্যাণ্ডের অর্থসাহায্যকারী পৃষ্ঠপোষকগণ এই বিরোধিতা দ্বারা প্রভাবিত হইলেন—উইলিয়াম ফক্স এই সকল পেটেন্টের প্রতি আগ্রহান্বিত একথা জানিতে পারিয়া

ত্রয়ী

বাঁদিক হইতে—যোশেফ মাসোল, জো এঙ্গল, হান্স ভোগ্‌ট। ১৯১৯ হইতে ১৯২২ পর্য্যন্ত এই ত্রয়ী বার্লিনের যে গৃহে গবেষণা করেন গত বৎসর তাহাতে এক স্মারক ফলক উন্মোচিত হয়।

তাঁহারা তাঁহার নিকট আমেরিকান স্বত্ব বিক্রয় করিলেন এবং কৃতজ্ঞতার সহিত তৎপ্রদত্ত ৬০,০০০ ডলার গ্রহণ করিলেন। আমেরিকায়ও সবাক চিত্রের উৎকর্ষবিধানের জন্য কেহ কেহ কাজ করিতেছিলেন, কিন্তু জার্ম্মান পেটেন্টগুলি ছিল এদিকে তাহাদের অগ্রগতির পরিপন্থী। ফক্স একথা অবগত ছিলেন, অতএব তিনি 'পেটেন্ট'গুলি কিনিলেন।

মার্কিন চলচ্চিত্র-শিল্প কিন্তু সবাক চিত্রকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া ভীত হইল না। পক্ষান্তরে ইহাকে মূক চলচ্চিত্রের স্বাভাবিক ধারাবাহী ও বিকশিত রূপ বলিয়া ধরিয়া লইল, কাজেই সম্ভাব্য সর্ব্ববিধ উপায়ে ইহার উৎকর্ষসাধন করিতে লাগিল। ফিল্ম ষ্ট্রিপ বা চলচ্চিত্রের ফালির সঙ্গে গ্রামোফোন রেকর্ড জুড়িয়া দিবার পাশ্চাত্ত্য বৈদ্যুতিক প্রথা—যাহা প্রায় বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছিল—পুনরুজ্জীবিত হইল এবং ইহার নামকরণ করা হইল "ভিটাফোন"। ওয়ার্নার ভ্রাতৃগণ সাহস করিয়া একটি ভিটাফোন ফিল্ম প্রযোজনার পরীক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহা "সিঙ্গিং ফুল" নামে আখ্যায়িত হইল এবং বিরাট সাফল্যমণ্ডিত বলিয়া প্রমাণিত হইল। ভিটাফোন-পদ্ধতি যখন মূক চিত্র এবং সবাক চিত্রের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনে প্রবৃত্ত হইল, মার্কিন সবাক চলচ্চিত্র শিল্প তখন পুরাপুরি আনকোরা একটি পদ্ধতির বিকাশ-সাধনকল্পে প্রচলিত যাবতীয় পদ্ধতির সেরা অঙ্গগুলি (features) নির্ব্বাচনে নিরত হইল। এক্ষেত্রে "ট্রাই-আর্গন" পেটেন্টগুলির স্থান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ,

প্রথম উদ্ভাবিত সবাক চলচ্চিত্রের সম্পূর্ণ যন্ত্রপাতি—মাঝখানে "মোশন পিকচার ক্যামেরা", ডান দিকে মাইক্রোফোন।

কিন্তু সেগুলি ছিল উইলিয়াম ফক্সের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, তিনি তৎসমুদয় হাতছাড়া করিতে রাজী হইলেন না। ৬০ হাজার ডলার দিয়া তৎকর্ত্তৃক ইহা ক্রীত হয়, কিন্তু দুই বৎসর পরে ২৫ লক্ষ ডলারের বিনিময়েও বিক্রয় করিতে তিনি সম্মত হইলেন না। আমেরিকায় কিন্তু এন্টি-ট্রাষ্ট বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানবিরোধী আইন বলিয়া একটি আইন আছে। যখন ফক্স পেটেন্ট-আইন লঙ্ঘন করার দরুন মামলা-মোকদ্দমায় বিস্তর অর্থব্যয় করিতে বাধ্য হইয়া, বলিতে গেলে সমগ্র মার্কিন সবাক চলচ্চিত্র-শিল্পকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন, তখন প্রেসিডেন্ট সবাক চিত্রের উপর এই এন্টি-ট্রাষ্ট আইন প্রয়োগ করা সাব্যস্ত করিলেন। এই পন্থা অবলম্বিত হওয়াতে 'ট্রাই-আরগন' পেটেন্ট আমেরিকায় মুক্তিলাভ করিল এবং ফক্স দেউলিয়া হইয়া গেলেন।

জার্মান চলচ্চিত্র-শিল্প কিন্তু সবাক চিত্রের বিরুদ্ধে তখনও বৈরি-ভাব বজায় রাখিয়া চলিতে লাগিল। এদিকে আমেরিকায় সবাক চিত্রের ব্যাপক প্রচলন ও প্রসারের সংবাদ জার্মানীতে পৌঁছিয়া সেখানে আতঙ্কের সৃষ্টি করিল। অবশেষে জার্মানী আমেরিকায় চলচ্চিত্র-বিশেষজ্ঞদের এক ডেলিগেশন প্রেরণ করা স্থির করিল। বলা বাহুল্য, এই প্রতিনিধিদল আমেরিকা হইতে জার্মানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন নিরতিশয় হতাশ হইয়া; কেননা তাঁহারা এই বিষয়ে নিঃসংশয় হইলেন যে, সবাক চলচ্চিত্র আমেরিকায় স্বাভাবিক ভাবেই গৃহীত হইয়াছে, উপরন্তু তাহা সাগর পার হইয়া ইউরোপীয় বাজার দখলের তোড়জোড় করিতেছে। দেখিতে দেখিতে সবাক চিত্র ঝড়ের গতিতে সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িল, কিন্তু ইহার উদ্ভাবকেরা আজ নিমজ্জিত হইয়াছেন বিস্মৃতির অতল গর্ভে। মাসোল এখনও বার্লিনে অবস্থান করিতেছেন, হান্‌স ভোগট দক্ষিণ জার্মানীর বাসিন্দা হইয়াছেন এবং সম্প্রতি নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ডক্টর এঙ্গল জার্মানী পরিত্যাগ করিয়া স্থায়ী ভাবে চলিয়া যান আমেরিকায় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সেখানে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ন. ভ.

সমবেত প্রয়াস ও পল্লীর উন্নতি

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তখন দেশে ইংরেজ রাজত্ব। শীতের মধ্যাহ্নে সস্ত্রীক চলেছিলাম মেঠো পথে। পথের পাশে একটা মাটির ঘর। অতি জরাজীর্ণ চেহারা। ঘরে অনেকগুলো ছেলেমেয়ে। নিশ্চয়ই পাঠশালা হবে। কৌতূহল হ'ল—পাঠশালার অবস্থাটা একবার নিজের চোখে দেখি। ঢুকে দেখলাম এবড়ো-খেবড়ো মেঝের উপরে কি ধুলো! সেই ধুলোর উপরে ছেঁড়া চট বিছিয়ে নানা বয়সের ছেলে-মেয়েরা কেউ লিখছে, কেউ পড়ছে, কেউ বা গল্প করছে। তাদের কাপড় কি ময়লা। মাষ্টার মশাই একটা উঁচু জায়গায় ঘুমে ঢুলছেন। আস্তে আস্তে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আমাদের কথাবার্ত্তা চলতে লাগল। জানতে পারলাম রাতে ষাঁড় এসে ইস্কুল ঘর দখল করে। তাতেই মেঝের এমন দুরবস্থা। ইতিমধ্যে মাষ্টারের ঘুম ভাঙল। আমাদের দেখে তাঁর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল! আমি স্কুল ইন্সপেক্টর নই জেনে তবে তিনি খানিকটা আশ্বস্ত হলেন। একটি গ্রাম্য পাঠশালায় সেই শোচনীয় দৃশ্যের ছবি আজও আমার স্মৃতিপটে জ্বল জ্বল করছে। যেন কালকের ঘটনা।

ব্রিটিশ আমলে শিক্ষা-দীক্ষার দিক থেকে এই ছিল আমাদের গ্রাম্য জীবনের চেহারা! আমাদের দেশের লাখো লাখো পল্লীকে শোষণ ও ধ্বংস করে চোখঝলসানো ঐশ্বর্য্যের সমারোহের মধ্যে ইংরেজ পরমানন্দে নৃত্য করত। এই শোষণ-কার্য্যে সহায়তা করে কলকাতা, বোম্বাইয়ের মত আধ ডজন শহর ফেঁপে ফুলে অতিকায় হয়ে উঠেছে আর 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা' আমাদের গ্রামগুলি পর্য্যবসিত হয়েছে স্তূপীকৃত আবর্জ্জনার নরককুণ্ডে। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে স্বাধীন ভারতবর্ষের জীবনধারা উজান বইতে শুরু করেছে। আমাদের এই হিতব্রতী রাষ্ট্রের কর্ম্মধারা পল্লীর উন্নতিকে লক্ষ্য করে বিচিত্র পথে এখন প্রবাহিত হচ্ছে। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী আমাদিগকে শিখিয়ে গেছেন স্বাধীনতার এক অভিনব স্বপ্ন দেখতে। রামরাজ্য বলতে যে গ্রামরাজ্য বোঝায়—এ সত্য তাঁরই পায়ের কাছে বসে আমরা শিখেছি। শিখেছি, এ যুগের বৃহত্তম আয়োজন হচ্ছে পল্লী-সভ্যতাকে গড়ে তোলা। নির্ম্মল নীল আকাশের নীচে শ্যামল বনানীঘেরা প্রান্তরে নয়ন-ভুলানো সৌধ-

গুলি যেন পটে আঁকা ছবি! রাস্তা-ঘাট কি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন! ইঁদারা, পুষ্করিণী, নদী—এগুলির জল কেউ দূষিত করে না। বুনিয়াদী এবং বয়স্ক-শিক্ষার কল্যাণে অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে মুক্ত গ্রামবাসীরা রূপান্তরিত হয়েছে আদর্শ পুরুষে এবং আদর্শ নারীতে। কুটীর-শিল্পগুলিকে অবলম্বন করে গ্রাম্য জীবন হয়ে উঠেছে বহুল পরিমাণে স্বাবলম্বী এবং স্বয়ংপূর্ণ। গ্রামলক্ষ্মীর শুভ্র ললাট থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে অস্পৃশ্যতার কলঙ্ককালিমা। হিন্দু-মুসলমান—উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের সঙ্গে মিলে মিশে বাস করছে যেন দুধের সঙ্গে চিনি। শৃঙ্খলিতা নারী পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে সমাজ-সেবার বৃহত্তর ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ মহিমায়। সর্বোপরি গ্রামে ধনী আর দরিদ্র বলে দুটো পৃথক পৃথক শ্রেণী নেই। সবাই সাম্যের সমভূমিতে এসে পরস্পরের দুঃখসুখের ভাগী হয়েছে। প্রসন্ন খাদ্যের প্রাচুর্য্যে গ্রামবাসীদের দেহে স্বাস্থ্যের সুষমা! রোদ্দুর আর তারার আলো, শস্যশ্যাম প্রান্তর আর মধুক্ষরা বাতাস, মাথার উপরে ভাসমান শুভ্র মেঘ, আর সুমধুর বনমর্মর—এই সুন্দর পরিবেশের মধ্যে কল্যাণময় গ্রাম্য জীবনের জ্যোতির্ময় চিত্র আমাদের জন্যে গান্ধীজী এঁকে রেখে গেছেন। এই চিত্রকে বাস্তবে সত্য করে তুলবার জন্যে আমরা কি বদ্ধপরিকর হব না? মুক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে পল্লীসভ্যতার যে স্বপ্ন গান্ধীজী দেখেছিলেন তা কি লোভনীয় নয়?

কেন আমরা পল্লীর উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেব তার আরও একটা বড় কারণ হচ্ছে: পল্লীতে যারা বাস করে তাদেরই পরিশ্রমের উপরে সমাজের সমস্ত শক্তি এবং স্বাস্থ্য নির্ভর করে, এমনকি অস্তিত্ব পর্যন্ত। সবল দেহ এবং সতেজ মন নিয়ে যে জাতির কৃষিজীবী সম্প্রদায় গ্রামে বাস করে আনন্দে, তাকে কখনই রুগ্ন জাতি বলা যেতে পারে না। পক্ষান্তরে যে জাতির চাষীরা পল্লীতে আনন্দ না পেয়ে বাস্তুভিটা ত্যাগ করে ধাবমান হয়েছে শহরের দিকে জীবনের সন্ধানে—সে জাতি কোনক্রমেই সুস্থ নয়। তার শহরগুলিতে প্রাণের যতই প্রাচুর্য্য থাক—আসলে সেই জাতি হচ্ছে এমন একটা ফলের মত যার বাহিরটা কৃত্রিম কিন্তু ভিতরটা পোকায় খাওয়া এবং পচা।

পল্লীসভ্যতাকে গড়ে তোলার কাজে আমরা অনেকখানি অগ্রসর হয়েছি—এ কথা জোরের সঙ্গে বলা যেতে পারে। কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছতে এখনও বহু পথ বাকী আছে—এ কথাও কি সমান সত্য নয়? রাষ্ট্রের হাতে এমন কোন আলাদীনের প্রদীপ নেই যার যাদুতে আজিকার এই ছন্নছাড়া শ্রীহীন গ্রাম্য জীবন রাতারাতি স্বর্গে রূপান্তরিত হতে পারে। সমবেত প্রয়াসের দ্বারা ইঁটের পর ইঁট সাজিয়ে আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে গড়ে তুলতে হবে আমাদের স্বপ্নের পল্লীসভ্যতার সুন্দর মন্দিরটিকে।

আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে আগে সঙ্ঘ-জীবনের অভাব ছিল না। গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত ছিল। পল্লীর প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা স্থানীয় প্রয়োজনগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকতেন এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজেদের অভাব দূর করতেন। পঞ্চায়েতী শাসন চলে গিয়ে কখন বড় বড় শহরগুলিতে ক্ষমতা হ'ল কেন্দ্রীভূত। উপর উপর থেকে সরকারী কর্মচারীরা কাজ চালাতে লাগলেন—যে কাজ একদা গ্রামের লোকেরা স্বেচ্ছায় করত। সভ্যতা শহরকেন্দ্রিক হওয়ায় গ্রামের লোকেরা কর্মপ্রেরণা হারিয়ে ফেলে জড়ের পর্য্যায়ে নেমে গেল।

আমাদের পল্লীসমাজে সংহতি বলে এখন কিছু নেই। সব এলোমেলো, সব ছন্নছাড়া। সবাই নিজের নিজের কোলে ঝোল টানতে ব্যস্ত। যাতে সকলের ভাল হবে, সকলের উন্নতি হবে—তার জন্যে কোথাও কোন প্রচেষ্টা নেই। শহরের লোকেরা যদি খেলাধুলোর মাঠ অথবা বেড়াবার জন্যে কোন পার্ক চায়—তার জন্যে কর্পোরেশন আছে, মিউনিসিপ্যালিটি আছে। শহরের প্রতিনিধিরা পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন এবং সাহায্যও দিতে পারেন। কিন্তু গ্রামে সঙ্ঘশক্তি বলে তো কোন শক্তি নেই। গ্রামবাসীরা যদি বারোয়ারী ঘর বা এমনি কোন প্রতিষ্ঠান গড়তে যায়—জানে না তারা কোন্ রাস্তায় গেলে তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে পারে।

প্রায় দশ বৎসরের পল্লীজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি: আমাদের গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা সঙ্ঘবদ্ধ নয় বলেই তাদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার এত অভাব। নদীর চরে বালুকাগুলি যেমন একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন, কারও সঙ্গে কারও যোগ নেই—গ্রামবাসীদের জীবনও অনেকটা তেমনি। যে যার বাঁশঝাড়ের ছায়ায় আপন আপন প্রাত্যহিক গৃহকর্ম নিয়ে বিব্রত হয়ে আছে। প্রতিবেশীর জীবনের সঙ্গে প্রতিবেশীর জীবনের যোগের একান্ত অভাব। সমবেত প্রয়াস ছাড়া পল্লীজীবনকে উন্নত করে তোলবার আর কোন রাস্তা নেই।

কিন্তু ছন্নছাড়া এলোমেলো জীবনগুলোকে একসূত্রে গেঁথে তোলবার উৎসাহ এবং উদ্দীপনা আসতে পারে জ্ঞানের আলো থেকে। পল্লীবাসীদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা খুবই কম। পুঁথির সঙ্গে তাদের কারবার প্রায় নেই বললেই চলে। কল্যাণময় সুন্দর জীবন বলতে কি বুঝায়—অনেকেই জানে না। পল্লীবাসীদের মনে একটা মহৎ গরিমাময় জীবনের স্বপ্ন কোথায়? সেই মন সাহারার ধূসর শূন্যতা নিয়ে খাঁ খাঁ করছে। একমাত্র শিক্ষার এবং সংস্কৃতির সঞ্জীবনী-স্পর্শেই মানুষের জড়মনের এই শূন্যতাকে সুন্দরের স্বপ্ন দিয়ে ভরিয়ে তোলা যায়।

আজ তাই পল্লীতে পল্লীতে বিদ্যালয় গঠনের প্রয়োজন সত্য সত্যই অপরিমেয়। বিদ্যালয়ের মাধ্যমে আমরা পল্লীবাসীদের অন্তরে একটা মহৎ জীবনের স্বপ্নকে জাগিয়ে দিতে পারব। একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে, জনসাধারণের অন্তরের জীবন যেমন হবে, তাদের বাহিরের জীবনও তেমনি হবে। যে মানুষ সৌন্দর্য্যকে ভালবাসে, নোংরা ঘরে খুশীমনে সে কখনও বাস করবে না। আজ সব চাইতে তাই দরকার হয়ে পড়েছে পল্লীবাসীদের মনের জীবনকে

গড়ে তোলা। তাদের নিশ্চল মনের মধ্যে যদি একবার নব নব চিন্তার প্রবাহ বইতে সুরু করে তো গ্রামগুলির চেহারা বদলে যাবে, গ্রামবাসীরা অন্তরে অনুভব করবে নূতন উৎসাহ, নূতন উদ্দীপনা। দীর্ঘকাল ধরে আমাদের মনের সমস্ত শক্তি রাজনীতিতে কেন্দ্রীভূত ছিল। পরাধীন জাতির মনকে জুড়ে থাকবে শিকল ছেঁড়ার চিন্তা—এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাড়ার পালায় শেষে আজ দিন এসেছে গড়বার। এই গড়ার কাজে দরকার যেমন কর্ম্মবীরের তেমনি চিন্তাবীরের—বিশেষ করে শিক্ষাব্রতীদের—যাঁরা বিদ্যালয়ের মাধ্যমে পল্লীবাসীর তমসাচ্ছন্ন চিত্তে আনবেন নূতন দিনের আলো।*

* অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে

"মধুসূদন দত্ত কি একজন?"

(সংযোজন)

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

গত আষাঢ় সংখ্যায় নানা প্রমাণ প্রয়োগে দেখাইয়াছি যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে অন্ততঃ দুই জন মধুসূদন দত্ত বর্ত্তমান ছিলেন। দুই জনই হিন্দু কলেজের ছাত্র, তবে কয়েক বৎসরের ব্যবধানে। ১৮৩৪ সনে উক্ত কলেজের ছাত্র মধুসূদন দত্ত যে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত নহেন তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। এই মধুসূদন দত্ত হিন্দু কলেজের জুনিয়র বিভাগের শিক্ষক (১৮৩৬-৪১) এবং প্রতিষ্ঠার বর্ষ (১৮৩৮) হইতে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার সভ্য। সম্প্রতি আর একটি প্রমাণ পাইয়াছি, যাহাতে স্পষ্টতঃই বুঝা যায়, ইনি মাইকেল মধুসূদন হইতে ভিন্ন ব্যক্তি।

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এই সন হইতে ১৮৪৭ সন পর্য্যন্ত তিনি শিবপুরে বিশপ্‌স্ কলেজের ছাত্র ছিলেন। বলা বাহুল্য, এখানকার শিক্ষা ছিল খ্রীষ্টধর্ম্ম-ভিত্তিক। খ্রীষ্টান হইলেও, পিতা রাজনারায়ণ দত্ত ১৮৪৭ সন পর্য্যন্ত বিশপ্‌স্ কলেজে মাইকেলের অধ্যয়নের যাবতীয় ব্যয় বহন করিতেন। ১৮৪৭ সনের শেষে রাজনারায়ণ অর্থ দেওয়া বন্ধ করেন। মাইকেল বিপদে পড়িয়া মাদ্রাজী বন্ধুদের সহযোগিতায় ভাগ্যান্বেষণে ১৮৪৮ সনের প্রথমেই মাদ্রাজ রওনা হইলেন। সেখানে একাদিক্রমে আট বৎসর থাকিয়া ১৮৫৬ সনের জানুয়ারী মাসে মাদ্রাজ পরিত্যাগ করেন, এবং পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছেন ১৮৫৬, ২রা ফেব্রুয়ারী।

মাইকেলের এই আট বৎসর অনুপস্থিতিকালের মধ্যেও কলিকাতায় এক জন মধুসূদন দত্তের উপস্থিতি সম্বন্ধে জানা যাইতেছে। এই মধুসূদন দত্ত ১৭৭০ শক (ইং ১৮৪৮) হইতে ১৭৭৩ শক (ইং ১৮৫১) পর্য্যন্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য ছিলেন। তবে এই মধুসূদনই কি হিন্দু কলেজের ছাত্র, উহার জুনিয়র বিভাগের শিক্ষক এবং সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার সভ্য মধুসূদন দত্ত? এখানে একটি কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা রহিত হইলে ইহার অধিকাংশ সভ্য তত্ত্ববোধিনী সভায় যোগদান করেন। আমরা ১৭৬৯ শক (ইং ১৮৪৭) হইতে ১৭৭৫ শক (ইং ১৮৫৩) পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরের তত্ত্ববোধিনী সভার "সাম্বৎসরিক আয়ব্যয় স্থিতির নিরূপণ পুস্তক" দেখিয়াছি। সভার প্রতি বৎসরের সভ্যদের একটি করিয়া তালিকাও ইহাতে সংযোজিত রহিয়াছে। স্বদেশীয় ধর্ম্ম, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অনুরাগী ব্যক্তিগণ তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য ছিলেন। সভ্যদের মধ্যে যেমন প্রাচীনপন্থী সংস্কৃত-পণ্ডিতগণ ছিলেন, তেমনি ছিলেন ইংরেজী শিক্ষিত নব্যবঙ্গীয়গণ। কাজেই তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য মধুসূদন দত্ত যে পূর্ব্বেকার জ্ঞানোপার্জিকা সভার সভ্য সেবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

তবে এখানে আর একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। মাইকেল মধুসূদন কি মাদ্রাজ-প্রবাসী হইয়াও তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইতে পারেন না? সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায়ও তো রসিককৃষ্ণ মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব, গোবিন্দচন্দ্র বসাক প্রমুখ কেহ কেহ কলিকাতায় না থাকিয়াও সভাপদে বৃত ছিলেন? কিন্তু এখানে একটি বিশেষ কথা আছে। মাইকেল মধুসূদন ছিলেন খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত, এবং ঐ সময়কার পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে একান্ত আস্থাবান্; প্রথম কবিতা-পুস্তক ক্যাপটিভ্ লেডিও তিনি লেখেন ইংরেজীতে (১৮৪৯)। পক্ষান্তরে তত্ত্ববোধিনী সভার আদর্শ তাঁহার জীবন, কর্ম্ম বা আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই সভা ভারতীয়দের খ্রীষ্টান-করণের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনে রত ছিলেন ১৮৪৩ সন হইতেই। এক্ষেত্রে নিঃসংশয়ে বলা যায়, তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য তিনি হইতেই পারেন না। তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য মধুসূদন দত্ত সুতরাং কবিবর মাইকেল মধুসূদন হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। ১৭৭০, ১৭৭১ এবং ১৭৭২ শকের "বর্ত্তমান শকের সভ্যগণের দাতব্য ধন মাসিক দত্ত ধন" শীর্ষক চাঁদাদাতা সভ্যদের তালিকায় মধুসূদন দত্ত দুই টাকা করিয়া দিয়াছেন, উল্লিখিত আছে। ১৭৭৩ শকের উক্ত তালিকায় তিনি বর্ষমধ্যে চাঁদা দিয়াছেন দুই টাকা বারো আনা। স্মরণীয় যে, তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যপ্রতি মাসিক ন্যূনপক্ষে চারি আনা চাঁদা ধার্য্য হইয়াছিল।

একটি শিশুকল্যাণ প্রতিষ্ঠানে পুতুলনাচ প্রদর্শন

ভারতের শিশুকল্যাণ সংস্থা—'চিল্ড্রেন্‌স বুরো'

শ্রীজ্যোৎস্না শাহ্‌

ভারতের প্রয়োজনানুরূপ শিশুকল্যাণ-কর্ম্মের বিকাশ এখনও হয় নাই। স্বেচ্ছামূলক অথবা সরকারী কোন শিশু-কল্যাণ সংস্থার সাহায্য লাভ করিবার সুযোগ সারা দেশে এখনও বিপুলসংখ্যক শিশুর হয় নাই। কাজেই আমাদের স্বল্প অর্থসংস্থান এবং কর্ম্মচারীদের দ্বারা প্রভূততম কাজ পাইতে হইলে শিশুকল্যাণ প্রোজেক্টের পরিচালনায় সমন্বয়-সাধন এবং পরিকল্পনার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে।

"চিল্ড্রেন্‌স্ বুরো" নামক শিশুকল্যাণ সংস্থাটি ভারতে ঐরূপ একটি দীর্ঘকাল-অনুভূত অভাবের ফল এবং বর্ত্তমান বৎসরের প্রারম্ভে কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদের আনুকূল্যে ভারতীয় শিশুকল্যাণ পরিষদ (Indian Council for Child Welfare) কর্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ভারতীয় শিশুকল্যাণ পরিষদই হইতেছে এই কর্ম্মে নিয়োজিত মুখ্য নিখিল-ভারতীয় স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান। এই পরিষদের অধীনে আঠারোটি রাজ্য-শাখা আছে, এগুলি দ্বারা শিশুকল্যাণমূলক বহুমুখী কর্ম্মতালিকা অনুসৃত হইয়া থাকে। "দি চিল্ড্রেন্‌স বুরো" নিউ দিল্লীস্থ প্রধান কেন্দ্রের কর্ম্মপ্রচেষ্টায় আধুনিকতম সংযোজনা।

এখনও পর্য্যন্ত ভারতে শিশুকল্যাণ-কর্ম্মের কোনো ফেডারাল গবর্ণমেণ্ট এজেন্সী নাই। যত দিন পর্য্যন্ত না কেন্দ্রে সমাজ-কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সরকার শিশুকল্যাণমূলক কার্য্যের চাহিদাসমূহ মিটানোর ব্যাপারে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন ততদিন পর্য্যন্ত স্বেচ্ছামূলক সংস্থা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "চিল্ড্রেন্‌স বুরো"র উপরই দ্বৈত দায়িত্বভার ন্যস্ত থাকিবে। একদিকে শিশু-কল্যাণ-সমস্যার প্রতি জনসাধারণকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য ইহাকে আত্মনিয়োগ করিতে এবং স্বেচ্ছামূলক সংস্থা-গুলিকে তাহাদের সেবাকার্য্যের মান উন্নয়নের জন্য উদ্দীপিত করিতে হইবে, অন্যদিকে ইহা শিশুকল্যাণের প্রয়োজনীয়তা-সমূহ সরকারের নিকট ব্যাখ্যা করিবে এবং শিশুকল্যাণ-কর্ম্মের মূলনীতি ও কর্ম্মতালিকা সম্বন্ধে পরিপূর্ণ সরকারী সমর্থন লাভের চেষ্টা করিবে।

"চিল্ড্রেন্‌স বুরো"র উদ্দেশ্য বহুবিধ এবং বিচিত্র। তন্মধ্যে মুখ্য হইতেছে নিম্নলিখিতগুলি :

(১) সংবাদ বিতরণের কেন্দ্রস্থানরূপে কাজ করা—অর্থাৎ, শিশুকল্যাণের সকল দিক সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ এবং সরবরাহ করা।

(২) শিশুকল্যাণ-এজেন্সীসমূহের একটি নিখিল-ভারত নির্দ্দেশিকা (Directory) প্রস্তুত করা।

(৩) শিশুকল্যাণ-সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে

গবেষণাকার্য্য পরিচালনা করা, পিতা-মাতা শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিশুকল্যাণ-কর্ম্মীদের উপযোগী পুস্তকাদি প্রকাশ।

(৪) শিশুকল্যাণ বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ উল্লেখ্য (reference) গ্রন্থাগার গঠন এবং ঐ বিষয়ে একটি গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলন।

(৫) শিশু সাহিত্যে গবেষণাকার্য্য চালানো এবং শিশুদের জন্য সৎসাহিত্যে প্রকাশের উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন।

(৬) শিশুদের জন্য চলচ্চিত্র লাইব্রেরী গঠন এবং ভারতীয় শিশুদের উপযোগী উৎকৃষ্ট চলচ্চিত্র নির্ম্মাণে উৎসাহ প্রদান।

(৭) অন্যান্য দেশের অনুরূপ শিশু-কল্যাণ সংস্থাসমূহের সহিত আন্তর্জ্জাতিক সংযোগ প্রতিষ্ঠা।

কার্য্যতালিকা

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, "চিল্ড্রেন্‌স্ বুরো" নিজের সামনে একটি বিশেষ উচ্চ আদর্শপূর্ণ কার্য্যতালিকা তুলিয়া ধরিয়াছে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত:

(১) শিশুকল্যাণ-কার্য্যে সাধারণের সমর্থনলাভের জন্য সহজ ভাষায় রচিত পুস্তকাদি প্রকাশের মাধ্যমে প্রবলভাবে গঠনমূলক প্রচারকার্য্য। বহুসংখ্যক লোকের হাতে যাহাতে পৌঁছিতে পারে সেজন্য এ সকল পুস্তক জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় উভয়বিধ ভাষায়ই রচনা করিতে হইবে। কতিপয় পুস্তিকা বুরোর হাতে আছে এবং শাখাগুলিকে কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশদানের নিমিত্ত এই সংস্থা একটি মাসিক "নিউজ লেটার" প্রকাশ করিয়া থাকে। আশা করা যায়, অচিরেই ইহা একটি সাময়িক পত্রে পরিণত হইবে।

(২) স্বেচ্ছামূলক শিশুকল্যাণ এজেন্সীগুলির বেলায় "চিল্ড্রেনস বুরো"কে সমন্বয়কারী এজেন্সীরূপে কাজ করিতে হয়। চালু প্রতিষ্ঠানসমূহে শিশু-পরিচর্য্যার মান-উন্নয়নের নিমিত্ত ইহা সংবাদ-বিনিময় এবং মতের আদান-প্রদান কার্য্যকে সহজসাধ্য করিয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত জানা কথা যে, অনেক শিশুকল্যাণ এজেন্সীই শিশু-সেবাকার্য্যের নিম্নতম মানও বজায় রাখিতে সমর্থ নহে।

(৩) শিশুর বৃদ্ধি এবং বিকাশের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে গবেষণা এবং পরিদর্শনকার্য্য বুরোর কর্ম্মপ্রচেষ্টার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এ সম্পর্কে যে সকল বিষয় পরিকল্পিত হইয়াছে, সেগুলি হইতেছে শিশুদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, বিদ্যালয়-পদ্ধতির বিকাশ এবং উৎকর্ষসাধন, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও সৌসামঞ্জস্য বিধান, কর্ম্মে নিয়োগের ন্যূনতম বয়স এবং কাজের অবস্থা বিবেচনা করিয়া শিশুদের শ্রম ও মান নির্ণয়, ভারতের দৈহিক অপটু শিশুদের আদমশুমারি, অল্পবয়স্কদের অপরাধপ্রবণতার কারণ ও প্রতিকার ইত্যাদি। শিশুকল্যাণ এজেন্সীসমূহের একটি নিখিল-ভারত নির্দ্দেশিকা (Directory) যথারীতি সঙ্কলিত হইতেছে এবং খুব শীঘ্রই উহা প্রকাশিত হইবে। বুরো হিন্দী ভাষায় এবং অন্যান্য রাজ্যের ভাষায় লিপিবদ্ধ চালু শিশু-সাহিত্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে। ইহার বিভিন্ন বিভাগ যথা—ছবির বই, গল্প, গান, নাটক, জীবনী, মহাকাব্য, ইতিহাস, ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রভৃতি বুরোকর্ত্তৃক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষিত হইবে। এই পরীক্ষাকার্য্যে—তিন হইতে ছয়, ছয় হইতে দশ এবং দশ হইতে চৌদ্দ বৎসর এই তিন স্তরের বয়ঃক্রমের শিশু এবং কিশোরদের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের কথাও বিবেচনা করিতে হইবে।

(৪) বুরোর কাজের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হইতেছে নূতন আইন প্রবর্ত্তন এবং যে সকল চালু আইন শিশু ও যুবকদের রক্ষণের সহায়ক সেগুলিকে বলবৎ করা। শিশুদের জন্য যে কয়টি মাত্র আইন প্রচলিত আছে, বিভিন্ন রাজ্যভেদে সেগুলির মধ্যে প্রচুর পার্থক্য বিদ্যমান। 'গ' শ্রেণীর রাজ্যসমূহে উপেক্ষিত এবং অপরাধপ্রবণ শিশুদের সম্পর্কিত একটি বিল যথারীতি পার্লামেণ্টের সম্মুখে রহিয়াছে এবং ইহার পরিবর্ত্তনসাধনের চেষ্টা চলিতেছে।

(৫) সংবাদ-বিতরণ কেন্দ্র হিসাবে 'চিল্ড্রেনস বুরো' ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার নামক পরিষদের অন্তর্গত সবগুলি রাজ্য-শাখা-সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সংবাদ এবং পুস্তকাদি সরবরাহ করিয়া তাহাদের দাবি মিটাইয়া থাকে। জনসাধারণের তরফ হইতেও বহুসংখ্যক প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়। তাহারা বিভিন্ন ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান অথবা বিপত্তি হইতে মুক্তিলাভের উপায়, শিশু-রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে চায়—এতদুদ্দেশ্যে শিশুকল্যাণ-কর্ম্মীদের শিক্ষণ-ব্যবস্থাও গড়িয়া উঠিতেছে।

অন্যান্য দেশের অনুরূপ সংস্থাসমূহ, "ইণ্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার" নামক প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশিষ্ট সংস্থাসমূহের সহিত আন্তর্জ্জাতিক সংস্পর্শও বজায় রাখা হয়।

(৬) "চিল্ড্রেনস বুরো"'র কর্ম্মপ্রচেষ্টা যাহাতে চূড়ান্ত রকমে সাফল্যমণ্ডিত হয় সেইজন্য বিশেষজ্ঞ কমিটির অন্তর্ভুক্ত হইয়া কাজ করিবার নিমিত্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করা হইতেছে। কাজের ক্ষেত্রগুলি হইতেছে এই:

(ক) শিশুর বৃদ্ধি এবং বিকাশ।

(খ) স্বাস্থ্যোন্নয়নমূলক কার্য্য এবং চিকিৎসাদির ব্যবস্থা
(গ) শিক্ষা—প্রাগ-বিদ্যালয় শিক্ষা ইহার অন্তর্ভুক্ত
(ঘ) অবসরবিনোদন এবং অবসর-সময়ের কর্ম্মপ্রচেষ্টা
(ঙ) দৈহিক অপটু শিশুদের শিক্ষা এবং তত্ত্বাবধান
(চ) শিশু এবং যুবকদের কর্ম্মে নিয়োগ
(ছ) শিশুরক্ষণমূলক আইন
(জ) অল্পবয়স্কদের অপরাধপ্রবণতা
(ঞ) শিশু-প্রতিষ্ঠানসমূহের মান

এতদ্ব্যতীত 'চিল্ড্রেনস বুরো'র সামনে আরও একটি উচ্চ পরিকল্পনা রহিয়াছে, তাহা হইতেছে একটি প্রদর্শন-কেন্দ্র (demonostration centre) প্রতিষ্ঠা। এই প্রদর্শন-কেন্দ্রের লক্ষ্য হইবে আমাদের ভারতীয় পারিপার্শ্বিকের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী পদ্ধতির বিকাশসাধনকল্পে নানাবিধ পরীক্ষণ চালানো। এই প্রদর্শন-কেন্দ্রের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবে ক্ষেত্রকর্ম্মীদের (field workers) একটি দল যাহা অনুন্নত অঞ্চলে শিশুকল্যাণমূলক কর্ম্মপদ্ধতির উৎকর্ষবিধানে সহায়তা করিবে।

আমাদের অজানা সৈনিক

'প্রকৃত পরিচারিকা'

ডি. পাল, চৌধুরী

মধ্য প্রদেশের সমাজ-কল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন ব্যপদেশে অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে আমি ছিলাম নাগপুরে।

সিতাবল্ডি মেটার্নিটি হোমের ওয়ার্ডগুলি ঘুরে ফিরে দেখায় আমি ব্যস্ত ছিলাম এমন সময় আমার নজরে পড়ল একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকটি মেটার্নিটি হোমের অন্যতম পরিচারিকা হবে এ কথা ভেবে আমি আমার কাজ করে চললাম। শেষে যখন আমি ঐ প্রতিষ্ঠানের হিসাবপত্র পরীক্ষায় ব্যাপৃত ছিলাম, তখন আমি মাতৃসদনের কর্ম্মীদের সঙ্গে পুনরায় সেই স্ত্রীলোকটিকে দেখতে পেলাম।

অপরাহ্ণকালে আমরা যখন আমাদের পরিশ্রম-সাধ্য কাজ থেকে মুক্ত হলাম, তখন একজন বয়স্কা মহিলার সঙ্গে আমাদের পরিচিত করে দেওয়া হ'ল—আমাকে বলা হ'ল যে, ইনিই হচ্ছেন এই মাতৃসদনের (Maternity Home) প্রতিষ্ঠাত্রী। আমি শুধু বিস্মিত নয়, আমার ধারণা সম্বন্ধে লজ্জিতও হলাম, কেননা সকালবেলা যখন এই মহিলাকে আমি দেখি তখন আমার মনে হয়েছিল যে, তিনি প্রতিষ্ঠানের একজন পরিচারিকা হবেন। তাঁর পরনে ছিল একটি সাদাসিধা খদ্দরের কাপড়, আর তাঁর কাঁধের উপর সারাক্ষণ ঝুলানো ছিল একটা ব্যাগ।

যতক্ষণ আমরা মেটার্নিটি হোমে ছিলাম, ততক্ষণ তিনি ছিলেন তাঁর নিজের কাজ নিয়ে, আমরা কি করছি তা নিয়ে মোটেই তিনি মাথা ঘামাচ্ছিলেন না যদিও আমাদের কাজের সঙ্গে তাঁরই সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠতম।

আমি জানলাম যে, তাঁর বিয়ে হয়েছিল শৈশবে, বিবাহের অব্যবহিত পরেই তাঁর স্বামী পরলোকগমন করলেন, এবং আমাদের সমাজে প্রচলিত প্রথার দরুন তাঁর পক্ষে পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সম্ভবপর হ'ল না। এ কথা বলা হয়ে থাকে যে, মানুষের শক্তিকে এমন খাতে প্রবাহিত করতে হবে যেন তা সৃষ্টিমূলক কার্য্যের অনুকূল হয়। অন্যথায় আমরা খুব চমৎকার লোকের মধ্যেও শয়তানের স্বরূপ দেখতে পাই। একথা স্মরণ করেই তিনি মাতৃমঙ্গল-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। তারই ফল নাগপুর সিতাবল্ডি মেটার্নিটি হোম এবং মধ্যপ্রদেশের প্রায় ষোলটি শহরে প্রতিষ্ঠিত এর বিভিন্ন শাখা।

প্রতি বৎসর নাগপুরের দুইটি কেন্দ্রে ২৫০০টি প্রসবকার্য্য এবং নাগপুরের বাইরের সবগুলি শাখায় প্রায় এর সমসংখ্যক প্রসবকার্য্য সম্পন্ন করানো হয়ে থাকে। এই সংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশের চিকিৎসা করা হয় বিনামূল্যে। উচ্চ স্তরের (senior) ধাত্রীবিদ্যা এবং প্রাথমিক নার্সিং শিখবার জন্যে শিক্ষণ কোর্স আছে। এখানে প্রত্যেক দলে প্রায় চল্লিশ জন শিক্ষিতা ধাত্রী এবং ছাব্বিশ জন আনাড়ী দাইকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। এ পর্য্যন্ত তিন শত ধাত্রী এখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছে। নাগপুর মাতৃসদনে বেডের সংখ্যা প্রায় ২৫০টি। এই হোম যে ভাবে নিম্ন এবং মধ্যশ্রেণীর স্ত্রীলোকদের সেবা করছে তার মূল্য পরিমাপ করা যায় না।

কারও যদি কেবলমাত্র নাগপুরের দুটি শাখাও দেখবার সুযোগ হয় তা হলে তিনি বিশ্বাস করতে পারবেন না যে,

এ হচ্ছে এক নিঃস্বার্থপর বিধবার স্বতঃপ্রবৃত্ত চেষ্টার ফল—নাম তাঁর কমলা বাঈ হসপেট—তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজন খুব কম। তিনি একজন অত্যন্ত সরল প্রকৃতির মহিলা এবং সমাজকল্যাণ-কর্ম্মের নিমিত্ত যে ধরণের জীবনযাপনই তাঁকে করতে হোক না কেন তাতেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন। থাকবার জন্যে তাঁর নিজস্ব কোনও ঘর অথবা বাথরুমেরও দরকার হয় না। দুই প্রস্ত খাদির ধুতি, আর কাঁধে ঝোলানো একটি ছোট ব্যাগে কিছু টুকিটাকি জিনিষ—এই হ'ল তাঁর যাবতীয় লওয়াজিম।

ভারতের অনেক সমাজকর্ম্মীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, কিন্তু এমন নিঃস্বার্থপর, এমন প্রেরণার উৎস-স্বরূপ আর কোনো কর্ম্মীকে আমি দেখি নি যিনি মানবজাতির সেবা ছাড়া আর কিছুতে অনুরক্ত নন। এখনও আমি অনুভব করি যে তার সম্বন্ধে আমার প্রথম যে ধারণা হয়েছিল তা সত্য, কেননা তিনি সিতাবল্দি মাতৃসদনের একজন 'প্রকৃত পরিচারিকা', যদিও লোকে বলে যে, তিনি এর প্রতিষ্ঠাত্রী।

নারীদের 'সঞ্চয়-অভিযান'

"এ কথা বলা আদৌ অতিশয়োক্তি হইবে না যে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপায়ণে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করা উচিত ক্ষুদ্র সঞ্চয়সমূহের উপর। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, এই সঞ্চয় জাতির সেবায় নাগরিকদের অধিকতর কাজ ও স্বল্প ব্যয়ের আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচুর উৎপাদন ও স্বল্প ভোগের ইচ্ছার দ্যোতক।" নারীদের 'সঞ্চয় সপ্তাহে' ভারতের অর্থমন্ত্রী সি. ডি. দেশমুখ তাঁহার প্রেরিত এক বাণীতে উপরোক্ত কথাগুলি বলেন।

এই 'সপ্তাহ'টি জাতীয় সঞ্চয় অভিযানের একটি বিশেষ অঙ্গ এবং ক্ষুদ্র সঞ্চয়-উদ্যোগে নারীদের সহযোগিতা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে ইহা সংগঠিত হয়। ভারত সরকারের অনুরোধে অল-ইণ্ডিয়া উইমেনস কনফারেন্সের তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট শ্রীমতী হান্না সেন এই 'সপ্তাহ' সংগঠনের ভার গ্রহণ করেন। ১৫ই মার্চ হইতে ২১শে মার্চ পর্য্যন্ত ষোলটি রাজ্যে উক্ত সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়। জনসাধারণের নিকট হইতে উৎসাহজনক সাড়া পাওয়ায় এবং স্থানীয় কমিটি-গুলি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করাতে এই 'সপ্তাহ' সম্প্রসারিত হয় 'পক্ষে'। ঐ সময়ে মোট অর্থসংগ্রহ দাঁড়ায় নগদে ৫০ লক্ষ টাকা এবং ইহার সমপরিমাণ অর্থের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অর্থসংগ্রহের নিমিত্ত নারী এবং অন্যান্য সমাজকর্ম্মীদের সহযোগিতা লাভের এই পরীক্ষামূলক পন্থা অত্যন্ত আশাপ্রদ বলিয়া প্রমাণিত হইল। দেশের নারী-প্রতিষ্ঠান এবং জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে এই বিষয়ে নিশ্চিত সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে একথা উপলব্ধি করিয়া ভারত সরকার অধিকতর স্থায়ী ভিত্তির উপর এই সঞ্চয়-অভিযানকে প্রতিষ্ঠিত করা সাব্যস্ত করেন। ফলে 'নারীদের সঞ্চয় অভিযান' যাহাতে জাতীয় সঞ্চয় সংগঠনের (National Saving Organisation) অবিচ্ছেদ্য অংশ হয় এবং দেশের নারীজাতির মধ্যে ক্ষুদ্র সঞ্চয় আন্দোলনকে দৃঢ়ীভূত করে সেইজন্য '৫৩ সালের অক্টোবর মাসে একটি বেসরকারী কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি (Non-official Central Advisory Committee) গঠিত হয়। হান্না সেন ইহার চেয়ারম্যান, শ্রীমতী পারিজাতম নাইডু সেক্রেটারী এবং আরও এগার জন ইহার সভ্য হইলেন—এই কমিটির হেড কোয়ার্টার্স হইল নিউ দিল্লী। এই স্কিমের উদ্দেশ্য—কল্যাণ-সংস্থাসমূহের মাধ্যমে, বিশেষ ভাবে স্বল্প আয় বিশিষ্ট মহলে মিতব্যয়ের অভ্যাস সঞ্চারিত করা। এই উপায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত কল্যাণ-সংস্থাসমূহকে ঐক্যবদ্ধ এবং যৌথ দায়িত্ব পালনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া কাজ করিবার জন্য উৎসাহিত করা হয়।

কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতির সভ্যদিগকে বিভিন্ন অঞ্চল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। ঐ সকল অঞ্চলে তাহাদের কাজ হইবে স্থানীয় যোগাযোগ স্থাপন, সমিতি গঠন এবং স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ও রেজিষ্ট্রীকৃত সংস্থাসমূহকে ১২ কমিশন-ভিত্তিতে বার বৎসরের ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট বিক্রির এজেন্টরূপে নিয়োগ অনুমোদন করা। সূচনায় এক শত রেজিষ্ট্রীকৃত কল্যাণ-সংস্থাকে এজেন্টরূপে নিযুক্ত করা স্থিরী-কৃত হইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে যখন সভ্য এবং প্রতিষ্ঠান-সমূহের তরফ হইতে চাহিদা বাড়িতে লাগিল, তখন এই সংখ্যা বাড়াইয়া ১৫০ একক বা ইউনিটে দাঁড় করানো হইল। সংস্থাগুলি এমন ভাবে নির্ব্বাচিত হইল যেন যতদূর সম্ভব বিস্তীর্ণ গ্রামীণ অঞ্চল তাহাদের এলাকাভুক্ত হয়। নির্ব্বাচিত

সংস্থাগুলিকে ১০০৲ টাকা নগদ জমা দিয়া সরকারের সহিত এক চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে হইল। নির্দিষ্ট এলাকার সভ্যদের দ্বারা সংস্থাগুলি অনুমোদিত হইল এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক সযত্নে পরীক্ষিত হইবার পর বিনিয়োগের জন্য তাঁহার অনুমোদনসহ আবেদনপত্রগুলি সিমলায় ন্যাশনাল সেভিংস কমিশনারের নিকট পেশ করা হইল। এই বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্য্যবিধির জটিল প্রকৃতির দরুন কাজটি দুঃসাধ্য বলিয়া প্রমাণিত হইল। কর্ম্মীরা কিন্তু উৎসাহপূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে আগাইয়া চলিলেন। নিজেদের অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহারা জনসভায় স্কিমটির ব্যাখ্যা, নারীদের আঞ্চলিক 'সঞ্চয় সমিতি গঠন, এবং কল্যাণ-সংস্থাসমূহকে অনুমোদিত এজেন্সী লইবার জন্য প্ররোচিত করিতে লাগিলেন। কল্যাণ-সংস্থা এবং সমাজ-কর্ম্মীদের মধ্যে এইরূপে যে আগ্রহের সৃষ্টি হয় তাহার ফলে সরকারী কর্ম্মচারীদের সহযোগিতায় ভারতের কতিপয় প্রধান প্রধান স্থানে সাফল্যের সহিত নারী সঞ্চয়-অভিযানের উদ্বোধন হইল। কার্য্যবিধিঘটিত ও অন্যবিধ অসুবিধা এবং 'প্রতিনিধি সংস্থা' বিনিয়োগে বিলম্বের দরুন, অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই সুপরিকল্পিত অর্থসংগ্রহ-প্রচেষ্টা দ্বারা ইহার কর্ম্মধারা অনুসৃত হইতে পারে নাই। ১৯৫৩ সনের আগষ্ট মাসে এই অভিযান শিবিরের উদ্বোধন করিতে গিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এই ধরণের একটি আন্দোলন যদি সাফল্যমণ্ডিত হয় তাহা হইলে অর্থসম্পদ একত্রিত করা ছাড়াও পরিকল্পনার পরিপূর্ণতা বিধানে বস্তুতঃই ইহা সহায়ক হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে। অর্থসংগ্রহ ইহা নিজের চেষ্টা দ্বারাই করিবে।"

সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলে 'নারীদের সঞ্চয় অভিযান' সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারকার্য্য করা হয় এবং টাকা খাটানোর দ্বারা যে ফল লব্ধ হয় তাহাও উৎসাহজনক বলিয়া প্রমাণিত হয়। এ পর্য্যন্ত আবেদনকারী ১১৪টি সংস্থার মধ্যে একানব্বইটি ইউনিট বিশিষ্ট আটাত্তরটি সংস্থা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিনিধি (Recognised Agent) রূপে নিযুক্ত হইয়াছে। অন্যান্য আবেদনকারী সংস্থাসমূহের বিষয় বিবেচনাধীন রহিয়াছে। কার্য্যবিধিঘটিত খুঁটিনাটি বিষয়সমূহের মীমাংসার পর অনুমোদিত কর্ম্মসংস্থারূপে তাহাদের বিনিয়োগ-কার্য্য সম্পন্ন হইবে। বিনিয়োগের জন্য অর্থসংস্থান করা ব্যতীত সঞ্চয় অভিযানের এজেন্ট এবং কর্ম্মিগণ ক্ষুদ্র সঞ্চয় স্কিম সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য চালান এবং ভাবী অর্থবিনিয়োগ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। কার্য্যবিধিকে সহজ করা এবং প্রতিনিধি সংস্থাসমূহের পক্ষে নারীদের সঞ্চয় অভিযানকে প্রবল ভাবে পরিচালনার কাজ যাহাতে অধিকতর অনায়াসসাধ্য হয় তেমন পরিবেশসৃষ্টির জন্য চেষ্টা চলিতেছে।

ভারতের প্রায় সবগুলি রাজ্যে 'নারীদের সঞ্চয় পক্ষ' উদ্‌যাপনের তোড়জোড় চলিতেছে এবং কর্ম্মিগণ তথা প্রতিনিধি সংস্থাসমূহ প্রচারকার্য্যের অগ্রগতি ও অভিযানের অধিকতর তীব্রতার জন্য তাহাদের সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছে। লোকসভায় সাধারণ বাজেটের বিতর্কে ভারতরাষ্ট্রের অর্থ-মন্ত্রীর জবাব এবং জাতীয় পরিকল্পনা-ঋণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান পুনর্ব্বার ইহার গুরুত্বকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে। অর্থমন্ত্রী বলেন :

"এই আন্দোলনের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমরা সচেতন আছি এবং কাজ যাহাতে অধিকতর মসৃণভাবে চলিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ত্রুটিসমূহ অপসারিত করিবার নিমিত্ত বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। নারীদের সঞ্চয় সংস্থাসমূহ হইতে এ পর্য্যন্ত যে সাড়া পাওয়া গিয়াছে তাহা উৎসাহজনক নিঃসন্দেহ এবং আমার এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, তাঁহাদের সহযোগিতা দ্বারা এই আন্দোলন দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।"

কমিটির সভ্যগণ নিম্নলিখিত এলাকাসমূহের ভারপ্রাপ্ত এবং এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সংগৃহীত ও প্রতিশ্রুতি-প্রাপ্ত মোট টাকার পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে উদ্‌যাপিত 'পক্ষে' বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং পরে অর্থপ্রাপ্তির যে সকল প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে তাহাও এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত :

		টাকা
মধ্য ভারত	শ্রীমতী কুন্তি ভেঙ্গ্রোভি	৪.৭১,৮৬৫
আজমীর	,,	১,১০,৬৮৫
রাজস্থান	,,	৭,৮৩,৭৪০
(রাজস্থানের ভার বর্ত্তমানে শ্রীমতী এম. ওয়াঞ্চুর হাতে)		
দিল্লী	শ্রীমতী লক্ষ্মী মজুমদার	৬,১৮,৪৯৩
হায়দরাবাদ	,, জ্ঞানকুমারী হেদা	৭,৫৯,৫৫৮
মাদ্রাজ	,, টি নাল্লামুথু রামমূর্ত্তি	৬,২৯,৭৯৫
বোম্বাই	গুলেস্তান আর. বিল্লিমোরিয়া	১৩,৮৯,৬৭৫
মালাবার ও ত্রিবাঙ্কুর কোচিন	শ্রীমতী লীলা দামোদরা মেনন	১,২০,০৬০
আসাম	শ্রীমতী পুষ্পলতা দাস	২,৭৮,৪৯০
অন্ধ্র	,, ভারতী দেবী রঙ্গ	১৯,১৮৫
মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র	,, বিমলবাঈ দেশমুখ	১২,১৭,০৮০
ভুপাল	,, পি পারিজাতম নাইডু	৭০,০০০

মহীশূর	,, পি. পারিজাতম নাইডু	১১,৭৫,১৯৫
গুজরাট ও সৌরাষ্ট্র	,, পুষ্পবতী মেহতা	৬৫,০০০
কচ্ছ	,,	১১,৭৫,১৯৫
পঞ্জাব, পেপসু ও হিমাচল প্রদেশ	,, প্রেমবতী থাপার	২,৮০,৪৭৫
পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার	,, মীরা দত্ত গুপ্তা	১২,০৮,৮২৫
উড়িষ্যা	,, ,,	১৪,৬০০
উত্তরপ্রদেশ	,, ,,	৪,২৯,২২০
	মোট	৯৬,৭৪,১৮৪

রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশের আরও দুই জন সভ্য, শ্রীমতী এম. ওয়াঙ্কু এবং বেগম আলি জাহির সম্প্রতি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতির (Central Advisory Committee) অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। সদস্যবৃন্দ এবং নিয়োজিত এজেন্টগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত ক্ষেত্র-প্রস্তুতি কর্ম্ম (spade-work) এবং প্রচারকার্য্য ভাবী কার্য্যের উত্তম ভিত্তি রচনা করিবে বলিয়া মনে হয় এবং আশা করা যায় যে, আগামী বৎসর হইতে ক্রমশঃ অগ্রগমন দ্বারা বৎসরে ৮ কোটি টাকার লক্ষ্যবস্তুর নিকটে পৌঁছানো যাইবে। জনসাধারণের নিকট হইতে এ পর্য্যন্ত যে উৎসাহজনক সাড়া পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, এই সঞ্চয় আন্দোলন তাহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছে।

নারীদের পক্ষে ইহা প্রশংসার কথা যে, এই সঞ্চয় অভিযানের অগ্রণীদিগকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে—জাতীয় পরিকল্পনা ঋণ (National Plan Loan) ও জাতীয় পরিকল্পনা সার্টিফিকেট এবং তদুপরি জাতীয় সঞ্চয় আন্দোলনের সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য অর্থবিনিয়োগকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য। এ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত অর্থবিনিয়োগসমূহ নারীদের সঞ্চয় অভিযানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে :

(ক) বার বৎসরের ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেটসমূহ
(খ) দশ বৎসরের জাতীয় পরিকল্পনা সার্টিফিকেট
(গ) সাত বৎসরের ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট
(ঘ) দশ বৎসরের ট্রেজারি সেভিংস ডিপোজিটগুলি
(ঙ) ন্যাশনাল প্ল্যান লোন বা জাতীয় ঋণ পরিকল্পনা
(চ) পনের বৎসরের এনুইটি সার্টিফিকেট

প্রথম দুইটি অর্থবিনিয়োগের বেলায় প্রতিনিধি সংস্থাসমূহ স্বীয় বিক্রির উপর শতকরা ১½ হারে কমিশন পায়। ন্যাশনাল প্ল্যান লোন এবং অন্যান্য বিনিয়োগে যদিও তাহারা কোন পারিশ্রমিক পায় না তথাপি প্রধানমন্ত্রীর আবেদনে অনুপ্রাণিত কর্ম্মীরা 'জাতীয় পরিকল্পনা ঋণ'কে 'নারীদের সঞ্চয় সপ্তাহে'র অনুরূপ বিরাট সাফল্যমণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্যে স্বদেশপ্রেম ও সেবার ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া নিজেদের সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছে।

একটি 'শ্রম-সমবায়ে'র কথা

রাজস্থানের রাজাসামনাদে একটি অনাড়ম্বর প্রস্তরনির্ম্মিত অট্টালিকার বাইরে ঝুলছে একটা সাদামাটা সাইন বোর্ড—"ভবন নির্ম্মাণ সাবাকারি স্মিথি।" ভিতরে পরিপূর্ণ কর্ম্মচাঞ্চল্য—ঘণ্টা বাজছে টুংটাং শব্দ করে, টাইপ-রাইটারে একটানা আওয়াজ হচ্ছে খট্‌ খট্‌। এটি হচ্ছে সেই স্থান যেখানে শ্রম সমবায়ের (Labour Co-operative) কাজকারবারের লেনদেন হয়।

শ্রম সমবায় নামক সংস্থাটির হাতে বর্ত্তমানে যে কাজের জের চলছে তা হচ্ছে চারটি বীজগুদাম এবং কম্যুনিটি প্রোজেক্ট প্রশাসনের কর্ম্মীদের জন্য কোয়ার্টার্স নির্ম্মাণ। জানুয়ারির গোড়ার দিকে আরম্ভ হয়ে জুলাইয়ের শেষ ভাগে এ কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়—তার পর সমবায় লাভ গুনতে সুরু করে। লভ্যাংশের কিছু পাবে সমবায়ের সভ্যেরা, বাকীটা বিনিয়োগ করা হবে কোন নূতন কন্ট্রাক্টে।

কার্য্যকরী মূলধন

সমবায়ের প্রাথমিক মূলধন এসেছে—রাজমিস্ত্রী, সূত্রধর, শ্রমিক প্রভৃতি সাধারণ শ্রেণীর লোকেদের সঞ্চয় থেকে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সমবায়ের শেয়ার কেনবার জন্যে নিজেদের জিনিষপত্র আংশিক ভাবে বিক্রি করে। দেয় অর্থের ন্যূনতম পরিমাণ ২০৲—যার মানে দশটি শেয়ার—প্রত্যেকটি দু'টাকা করে। কোন কোন কর্ম্মী ৫০০টি পর্য্যন্ত শেয়ারের মালিক। এর উপর আছে 'সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক' থেকে নাম মাত্র সুদে ধার-নেওয়া ৫০০০৲ টাকা। কখনও কখনও ব্যক্তিবিশেষের নিকট থেকেও ধার পাওয়া গেছে।

কেবলমাত্র কর্ম্মীদের জন্য

সভ্য হওয়ার পক্ষে মূলধন বিনিয়োগই কিন্তু একমাত্র যোগ্যতা নয়। প্রত্যেক প্রার্থীকেই হতে হবে একজন

কর্ম্মী—সে যে-কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে লভ্যাংশকে কর্ম্মীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা, বিনিয়োগ করবার মত বাড়তি অর্থ যাদের আছে শুধু তাদের মধ্যে নয়।

মোটা টাকা বিনিয়োগ করলেই যে সমবায়ের সভ্যের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হবে একথা মনে করবার হেতু নেই। কেন-না যে কর্ম্মী এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত দিয়েছেন তিনিও মাত্র একটি ভোটের অধিকারী। অবশ্য বৃহত্তর লভ্যাংশ পাবার অধিকার তাঁর আছে বটে। নির্ব্বাচনপর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয় গোপন ভোটপত্রের সাহায্যে এবং প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হন এক বৎসরের জন্য।

নিম্ন হার

সমবায় ক্লাস 'বি' কণ্ট্রাক্টাররূপে রেজিষ্ট্রীকৃত হয়েছে এবং এই সংস্থা প্রতিযোগিতামূলক হারে কাজ সংগ্রহ করে। হাতে যে পঞ্চাশ হাজার টাকার কাজ আছে তা পাওয়া যায় হিসেব করে নিম্নতম হার নির্দ্ধারণপূর্ব্বক। যাই হোক্, এমন প্রস্তাব করা হয়েছে যে, বোম্বাইয়ের মত টেণ্ডার না চেয়ে শ্রম সমবায়ের উপর কাজের ভার দেওয়া হবে।

সকলের সমান অধিকার

সকল সম্প্রদায়ের এবং সকল বৃত্তির কর্ম্মীরাই দুটি সর্ত্তে সভ্য হতে পারে: প্রথমতঃ তাদের কর্ম্মী এবং দশটি শেয়ারের মালিক হতে হবে। কাজ করবার সময়ে পর্য্যন্ত তারা সভ্যশ্রেণীভুক্ত হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—যে ছুতার দৈনিক চার টাকা রোজগার করে, ইচ্ছা করলে সে তার কাজের পরিবর্ত্তে দুটি শেয়ার কিনতে পারে। তেমনি সে তার শেয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি করেও চলতে পারে।

সমবায়ের সভ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মী আর একটি উপকার পায়, বেতনের সোয়া ছয় ভাগ সে বোনাসরূপে উপার্জ্জন করে।

যৌথ কর্ম্ম

সকল কর্ম্মী তাদের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের সমবায় করে রোজ দশ ঘণ্টাব্যাপী কাজ সম্পন্ন করে। ছুতাররা ব্যাপৃত হয় কাঠের কাজে, শ্রমিকরা উপকরণ যোগান দেয়, মিস্ত্রীরা সাজায় ইটের পর ইট—তারা সকলেই 'কমরেডে'র মত কাজ করে—প্রত্যেকে সকলের জন্যে, এবং সকলে প্রত্যেকের জন্যে। সকলেই তারা একই কর্ম্মী-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

দুপুরের খাওয়ার জন্যে কোন প্রকার ভেদবৈষম্য না রেখে কর্ম্মীরা সকলে সমবায় রন্ধনশালার সামনে দাঁড়িয়ে যায়। খাদ্যদ্রব্যের দামটা কাটাকাটি করে নেওয়া হয় বেতনের সঙ্গে। রন্ধনশালার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে একটি ভাণ্ডার যেখানে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ন্যায্য দরে বিক্রী হয়। বিলম্বিত দেনা শোধ করে ফেলা হয় সাধারণতঃ এক মাসের মধ্যে।

একটি ঋণদান সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য আরও টাকা তোলা হচ্ছে—এই সমিতি আপৎকালে কর্ম্মীদের সাহায্য করবে।

"আমরা স্বেচ্ছায় কাজ করি"

দিনের কাজের শেষে সভ্যেরা গল্পগাছার জন্যে "টক শপে" গিয়ে সমবেত হয় এবং ব্যয়সঙ্কোচ, কর্ম্মক্ষমতা বৃদ্ধির পন্থা, লভ্যাংশ সঞ্চয় প্রভৃতি বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে।

পরদিন অধিকতর আত্মবিশ্বাস এবং আত্মনির্ভরতার সঙ্গে তারা কাজে যোগদান করে। কর্ম্মীরা জানে যে, সমবায়ের সভ্যরূপে তারা কেবল ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সমস্যার নয়, নিজেদের গ্রামীণ সমস্যাসমূহের সমাধানে সাহায্য করতে পারে।

শ্রীপাডকির সঙ্গে সাক্ষাৎ

কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদের ষ্টাফ রিপোর্টার সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান ইউথ হোষ্টেলস্ এসোসিয়েশনের ন্যাশনাল সেক্রেটারী শ্রীপাডকির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তখন উভয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত রূপ কথাবার্তা হয় :

প্রশ্ন—মিঃ পাডকি, যুব হোষ্টেলের কল্পনা প্রথম কখন এবং কোথায় কার মাথায় আসে এ সম্বন্ধে আপনি কি আমায় কিছু বলতে পারেন ?

পাডকি—১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে রিচার্ড শেরমান নামে জার্ম্মানীর একজন স্কুল মাষ্টারের মনে প্রথম এই পরিকল্পনার উদয় হয় এবং তিনি আল্‌টেনা নামক একটি ছোট শহরে প্রথম যুব হোষ্টেল প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর আদর্শ ফলপ্রসূ হতে লেগেছিল পুরো দশটি বছর, ১৯১৯ সালে পৃথিবীতে প্রথম জার্ম্মান ইউথ হোষ্টেলস এসোসিয়েশন গঠিত হয়।

প্রশ্ন—ভারতে যুব হোষ্টেল প্রবর্ত্তনের কৃতিত্ব কার, আমায় সে কথা দয়া করে বলুন মিঃ পাডকি ?

পাডকি—মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডবল্যু. জি. ঈগল্‌টন ১৯৪৯-এ ভারতে এই আন্দোলনের প্রবর্ত্তন করেন।

প্রশ্ন—যুব হোষ্টেল এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য কি ?

পাডকি—ইহার উদ্দেশ্য সবাইকে—বিশেষ ভাবে, যাহাদের আর্থিক সংস্থান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ সেই সকল যুবককে বৃহত্তর জ্ঞানলাভে সহায়তা করা ; বিশেষতঃ, ভ্রমণকালে তাহাদের জন্য হোষ্টেল অথবা অনাড়ম্বর বাসস্থানের ব্যবস্থা করে তাদের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার উন্নয়ন।

প্রশ্ন—ভারতে প্রথম যুব হোষ্টেল কোন্‌টি ?

পাডকি—প্রকৃতপক্ষে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক সংগঠিত হোষ্টেলটিই ভারতের প্রথম যুব হোষ্টেল।

প্রশ্ন—ভারতের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কি আপনাদের কোনো ভাবে সাহায্য করছেন ?

উত্তর—বর্ত্তমান বৎসরে প্রশাসনমূলক ব্যাপারাদির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় আট হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেছেন।

প্রশ্ন—কোন কোন রাজ্য উৎসাহসহকারে এ বিষয়ে এগিয়ে আসছেন এবং ভাল কাজ দেখাতে পারছেন ?

উত্তর—মহীশূর, বোম্বাই, বাংলা, সৌরাষ্ট্র, কাশ্মীর এই কয়টি রাজ্য এ বিষয়ে সব দিক দিয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করছে। আমরা যথারীতি বোম্বাই, মহীশূর এবং সৌরাষ্ট্রের জন্য আঞ্চলিক পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেছি এবং পশ্চিমবঙ্গেও অচিরেই একটি আঞ্চলিক পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হবে—এর পর আমাদের উদ্দেশ্য উত্তরপ্রদেশ এবং কাশ্মীরে এ বিষয়ে তৎপর হওয়া।

প্রশ্ন—মিঃ পাডকি, আমি আপনার ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা কিছু লিপিবদ্ধ করতে চাই, আপনি কি দয়া করে আমাকে এই ভ্রমণ-কথা বলবেন ?

পাডকি—তা হলে আমি উনোত্তোতে প্রদত্ত আমার নিজের রিপোর্ট থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি :

"যে ইউরোপ আমার অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ এবং আমার বন্ধুগোষ্ঠীর সীমারেখাকে সম্প্রসারিত করেছে, তার কাছ থেকে দুঃখিত অন্তঃকরণে আমি বিদায় নিলাম। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে সারাক্ষণই আমি ভবিষ্যতের সেই দিনগুলোর স্বপ্ন দেখতাম যখন এই সকল দেশের মত ভারতবর্ষেও যুব হোষ্টেল সঙ্ঘ (Youth Hostels Association) এ দেশের যুবকদের জন্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশে অবসর-বিনোদনের এরূপ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে পারবে। আমার ব্যাপক অভিজ্ঞতাকে কিরূপে বিশেষ ভাবে যুব হোষ্টেল আন্দোলনের কার্য্য এবং সাধারণ ভাবে যুব আন্দোলনের ক্ষেত্রে সফল করে তুলতে পারব আমি তাই ভাবছিলাম এবং শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, বিভিন্ন রাজ্য সরকার, সংবাদপত্রিকা এবং জনসাধারণ সকলেরই শুভেচ্ছা ও সহানুভূতিলাভের পন্থা ও প্রণালী উদ্ভাবনের প্রয়াস পাচ্ছিলাম।" বিদেশের যুব হোষ্টেলে এসে আমি একটি অপূর্ব্ব ঘরোয়া পরিবেশের স্পর্শ পেলাম, সভ্যেরা সম্পূর্ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কর্ত্তব্যকর্ম্মসমূহকে ভাগাভাগি করে নিয়ে এই পরিবেশসৃষ্টির অনেকখানি সহায়তা করে। যুব হোষ্টেলে একটি দিন কাটানো মানে এমন অভিজ্ঞতা লাভ করা যা রীতিমত মূল্যবান্। চার জন থেকে আরম্ভ করে ৭০০ জন লোকের থাকবার ব্যবস্থা হয় এমন সব হোষ্টেল আছে, কিন্তু সকল হোষ্টেলেই সেই ঘরোয়া পরিবেশ বিদ্যমান। "সপ্তাহান্তিক দিবস যুব হোষ্টেলে কাটানো তাদের এক ধরণের প্রথায় পরিণত হয়ে গেছে। ওখানে যুব হোষ্টেল এত জনপ্রিয় যে তার সভ্যসংখ্যা কয়েক লক্ষ। আমি ভারতের "ইউথ হোষ্টেল এসোসিয়েশনে"ও একদিন সমসংখ্যক সভ্য দেখতে চাই।"

"বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সূচনা ক্ষুদ্রই হয়" রিপোর্টার বললেন।

প্রশ্ন—আচ্ছা মিঃ পাডকি ভারতে এই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কি ?

পাডকি—ভাল, শুনুন, এ ধরণের ব্যাপার তো ভারতে নূতন নয়। প্রাচীনকালে আমাদের দেশের লোকেরা দূর তীর্থভ্রমণে বেরুত, রাত কাটাত তারা ধর্ম্মশালায়। কাজেই ভারতবর্ষে এই আন্দোলনকে জনপ্রিয় করা কঠিন নয়।

এই বিরাট দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, যুবকদের সৌন্দর্য্য-উপভোগের নিমিত্ত বাইরে যেতে প্রণোদিত করে। সর্ব্বশেষে রেলওয়ে মন্ত্রণালয় ব্যক্তিগত ভ্রমণের কনসেশন দেবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা স্মরণ করে আমি বলছি যে, আজকের এই ক্ষুদ্র আন্দোলন আগামী কাল ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী যুব আন্দোলনে পরিণত হবে।

আলোচনা

"হালিসহর"

(উত্তর)

শ্রীপূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়

(১)

হালিসহর সম্বন্ধে গত ১৩৬১, ভাদ্র সংখ্যা প্রবাসীতে আমার যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশিবদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বয় পৌষ সংখ্যা প্রবাসীতে তাহার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছেন।

এখন এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য নিবেদন করিতে চাই। প্রথমে, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে কালের কথা উল্লেখ করিয়াছেন সেই সম্বন্ধেই বলি। ৫ই ডিসেম্বর, ১৯০০ সালের "বেহার হেরাল্ড" পত্রিকায় হালিসহরের শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা স্বর্গত আশুবাবু টিকারী ষ্টেটের সহকারী ম্যানেজার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। বেহার হেরাল্ডের উপর ভিত্তি করিয়াই আমি তাঁহার ঐরূপ পরিচয় দিয়াছি। ১৯০০ সালের ৫ই ডিসেম্বরের পর পদোন্নতির ফলে আশুবাবু ম্যানেজার হইয়া থাকিবেন।

ভোলানাথ বাবু স্থানীয় পৌরসভার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকাকালীন গ্রামের জনহিতকর কার্য্য করিয়াছেন। তিনি কিছুকাল হালিসহর পৌরসভার চেয়ারম্যান পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন বটে। প্রবন্ধটি লিখিবার সময়ে আমি একথা বিস্মৃত হইয়াছিলাম।

(২)

এইবার শ্রীশিবদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে প্রশ্ন তুলিয়াছেন সে সম্বন্ধে বলিতেছি। আলোচ্য প্রবন্ধটি একাধিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধের উপর ভিত্তি করিয়া আমি লিখিয়াছিলাম। ঐ সব গ্রন্থ ও প্রবন্ধে কোথাও এরূপ উল্লেখ দেখি নাই যে, বর্ত্তমানের কাঁচড়াপাড়া বা কাঞ্চনপল্লীই পূর্ব্বেকার কুমারহট্ট ছিল। এই কুমারহট্টেই ঈশ্বরপুরী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুর বন্ধু ও ভক্ত শ্রীনিবাসও গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী বৃন্দাবন দাসের মাতা নারায়ণী দেবীও মধ্যে মধ্যে এই কুমারহট্টে বা হালিসহরে আসিয়া থাকিতেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহই কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়ায় গৃহ নির্ম্মাণ করেন নাই বা থাকিবার জন্য যাইতেন না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র হাবেলীসহর পরগণার কেন্দ্রস্থলের নাম দেন কুমারহট্ট এবং এই সেই কুমারহট্ট যেখানে সাধক রামপ্রসাদের পৈতৃক নিবাস—কাঁচড়াপাড়া বা কাঞ্চনপল্লীতে নহে। হালিসহরের নাম 'কুমারহট্ট' ছিল—কুমারহট্ট বা কুম্ভকারদিগের হাট ছিল না। ব্রাহ্মণকুমারদের বিদ্যাচর্চ্চা ও পঠন-পাঠনে স্থানটি সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত বলিয়াই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র উহার নাম কুমারহট্ট দিয়াছিলেন, ইহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে; কুম্ভকারদিগের মৃৎপাত্রের আড়ত বা হাট ছিল বলিয়া এই স্থানের নাম কুমারহট্ট হইয়াছিল—ইহা কি সম্ভব? পূর্ব্বেকার গ্রামগুলি প্রায়ই স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল, সর্ব্বপ্রকার জাতি ও ব্যবসার জন্য নির্দিষ্ট এক একটি পল্লী ছিল। সেই হিসাবে গ্রামের কোন এক বিশেষ পল্লীতে হয়ত কুম্ভকারদিগের নিবাস ছিল।

বাংলা সাহিত্য—ডক্টর শ্রীমনোমোহন ঘোষ। ইণ্ডিয়ান পাবলিসিটি সোসাইটি। পৃষ্ঠা ৫০২। মূল্য দশ টাকা।

গ্রন্থকার সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় সুপণ্ডিত এবং ভরতমুনির 'নাট্যশাস্ত্র' ইংরেজীতে অনুবাদ প্রকাশ করে দেশী ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের অভিনন্দন লাভ করেছেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্ররূপে তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রেরণা পান এবং কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা এবং অধ্যাপনার সুযোগে বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে বহুকাল আলোচনা করে এসেছেন। তার প্রমাণ এই নূতন গ্রন্থ 'বাংলা সাহিত্যে'র প্রতি ছত্রে পাওয়া যায়।

প্রাক্‌-চৈতন্য যুগের বাংলা সাহিত্য তিনি মাত্র শতাধিক পাতায় শেষ করেছেন, অথচ সেই আদি পর্বে জনগণের জীবনের সহিত ইতিহাসের সম্পর্কটিও সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেছেন। ২০০ পাতায় পৌঁছে দেখি তিনি মধ্যযুগ, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের রচনাদি শেষ করে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের অধ্যায় সুরু করেছেন। ২০০-৩০০ পাতায় দেখি রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন ও বঙ্কিম-যুগের ধারাবাহিক আলোচনা প্রকৃষ্টভাবেই শেষ করেছেন। শেষ শতাধিক (৪০০-৫০০) পাতায় রবীন্দ্রনাথের আলোচনা মনোজ্ঞ ভাষায় লিখে রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যের খসড়াও দিতে চেষ্টা করেছেন। এই অধ্যায়টি ভবিষ্যৎ সংস্করণে বড় করে লেখার অবকাশ আছে, তবে সাধারণ পাঠক ও পরীক্ষার্থীদের আশু উপকারসাধন করেছেন বিচক্ষণ গ্রন্থকার, সেজন্য তাঁর সাধুবাদ করি। তাঁর সমাজবোধ ও ঐতিহাসিক দৃষ্টি প্রখর বলেই তিনি বাংলা সাহিত্যকে বাংলা সামাজিক পটভূমিকায় ফুটিয়েছেন। বাংলা সাহিত্য প্রায় আমাদের হাজার বছরের (৯০০-১৯০০) ইতিহাসের জীবন্ত দলিল (লিখিত ও অলিখিত), কিন্তু এ পর্যন্ত প্রধানতঃ বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্তাদি ধর্মের খোপে ভরেই তার আলোচনা করে আসা হয়েছে। অথচ সামাজিক জীবনের বিবর্তন ও বিকাশের ফলে বাংলা সাহিত্যের রূপ ও রং কেমন বদলে চলেছে সেটি দেখাবার চেষ্টা করে গ্রন্থকার আমাদের ধন্যবাদ অর্জন করেছেন। তাঁর গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

দেশে দেশে চলি উড়ে—শ্রীদিলীপকুমার রায়। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৪২০। মূল্য ছয় টাকা।

সুর-শিল্পী দিলীপকুমারকে দেশ-বিদেশের মানুষ চিনেছে, ভালবেসেছে। কণ্ঠে তাঁর যাদু আছে, সেই মাধুর্যের সঙ্গে মিলেছে সাধনলব্ধ ঔদার্য যেটি প্রায় ওস্তাদদের মধ্যে মেলে না। ১৯১৯ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত তিনি সুরের মালা পরে কত বিচিত্র বৈঠকে ঘুরেছেন তার প্রমাণ রয়েছে তাঁর বহু রচনায়। হঠাৎ ঘোরা শেষ করে "ভ্রাম্যমাণ" দিলীপ আসন নিলেন শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা বহুকাল পরে, গান শুনিয়ে উপহার দিলেন "Among the Great"; তখন তাঁর পাশে দেখেছি শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর আতিথ্য-ভরা হাত দুখানি; শিষ্যা গুরুর সঙ্গে মিলে গানে ও সুরলিপি রচনায় বিভোর; "শ্রুতাঞ্জলি" রচনায় তার প্রমাণ রয়েছে। ছন্দোময়ী হয়ে শিষ্যা শ্রুতিধর গুরুর সঙ্গে ভূপ্রদক্ষিণ করবেন তখন বুঝি নি। সেদিন তাঁদের ভ্রমণ-কীর্তনের যুগ্ম-আলাপ মুগ্ধ করল: তান-বিন্যাস দিলীপের আর ছন্দমাধুর্য মীরা-প্রেরিতা ইন্দিরার: এরকম সহযোগ ও সমন্বয় দুর্লভ। তাই "দেশে দেশে চলি উড়ে" রচনাটি সবাইকে পড়তে অনুরোধ রিকস। শুধু দেশে নয় বিদেশেও আকস্মিক ভাবে ইন্দিরার সমাধি। মীরার প্রেরণায় নব নব ভাব ও ছন্দ-রচনার কথা গভীর বিস্ময়ের উদ্রেক করে; বিদেশী ও বিদেশিনীদের যে অভিভূত করেছিল তাও বোঝা যায়। [illegible] সুরের জহুরী জার্মানদেরও—গ্যয়টের দেশে—মোহিত করেছিল। [illegible] ভারতের কল্যাণকামী সপরিবার বারট্রাণ্ড রাসেলকেও দু'জনে [illegible] দিয়ে এসেছেন। বহুকাল পরে দিলীপের সুপরিচিত ফ্রান্স, সুইটজ্, ইটালি দেশগুলির ভাবময় প্রতিক্রিয়া পাঠকরা বুঝবেন। আবার [illegible] থেকে উড়ে হংকং, টোকিও, হনলুলু হয়ে আমেরিকায় অবতরণ-কাহিনী সুদক্ষ লিপির টানে দিলীপ অল্প কথায় ফুটিয়েছেন—পড়বার সময় [illegible] তাঁর সঙ্গে উড়ে চলতে চাইবেন। কিন্তু বইখানির বেশীরভাগই মার্কিন-[illegible] কাহিনীতে ভরা। সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার আছে মনে [illegible] রসিক-শিরোমণি দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমাণ করে গেছেন যে, "বিলাত [illegible] মাটির!" তাঁর উত্তরসাধক পুত্র দিলীপকুমার প্রমাণ করেছেন [illegible] আমেরিকানও মানুষ—অর্থাৎ অনেক আপাতবিরুদ্ধতা ভেদ করে [illegible] দেখিয়েছেন যে তারাও হাসে-কাঁদে—ভালবাসে। ভারতীয় শিল্পের [illegible] কিছু না বুঝলেও মার্কিনরা ভারতের পানে এগিয়ে আসছে—[illegible] অথবা সন্দেহ করে, কিন্তু ভারতের টান সুস্পষ্ট! ১৮৯৩ সালে প্রথম [illegible] নাড়া দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, তার ষাট বছর পরে দিলীপ [illegible] এলেন বেদান্তের চিরন্তন বাণী প্রাণে প্রাণে তরঙ্গিত হয়ে চলেছে: [illegible] দিলে, ছন্দ শিক্ষা দিলে মামুলী মার্কিনও নতুন ভাবে সাড়া দেয়; [illegible]

ডাল্‌ডা
আমার পক্ষে
ভালো

তাদের আতিথ্য উপভোগ করে বহু ইউরোপীয় ও খাঁটি ব্রিটিশ মনীষী যথা—ইশারউড্, জেরাল্ড্ হার্ড ও অলডাস্ হাক্স্লীও ভারতের বাণীতে অনুপ্রাণিত। প্রভবানন্দ পশ্চিমে ও নিখিলানন্দ পূর্ব্ব অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী-প্রচার কত উদার ভাবে করে এসেছেন তারও সার্থক রিপোর্টার দিলীপকুমার। তিনি শিল্পী বলেই শুধু অসাধারণদের নয় সাধারণ নরনারীর আশা-নৈরাশ্যের পুলক-বেদনাগুলিও গেঁথে গেছেন; তাদের যেন দেখছি, তাদের তর্ক-বিতর্ক শুনছি এমনি মনে হয়। আমেরিকার সেরা ভ্রমণকাহিনী দিলীপের রচনা। ভাগ্যিস তিনি দার্শনিক নন! তত্ত্বের চশমা দিয়ে না দেখে তিনি সুরশিল্পীর কানে তাদের হাসি-কান্নার ধ্বনি-ঝঙ্কার শুনেছেন ও আমাদের শুনিয়েছেন। অথচ শুধু সম্বাদী নয় বিবাদী সুরগুলিও—মার্কিন-কনসার্টে ধরে ফেলেছেন; এমন সব সামাজিক সমস্যার কথা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন যেগুলি আমাদের মনকে গভীরভাবে নাড়া দেবে—পুরোদমে মার্কিনবাদী হওয়ার আগে! ছোট সমালোচনায় সব কথা বলা চলে না; শুধু পাঠকদের অনুরোধ করি গুণী লেখকের সঙ্গে দেশে দেশে উড়ে চলুন।

শ্রীকালিদাস নাগ

কবিতাবলী—অন্নদাসুন্দরী ঘোষ। ষড়ার্ণ বুক এজেন্সী, ১০ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

স্থান ও কাল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যাঁহারা কাব্য পরীক্ষা করেন তাঁহাদের কাব্যবিচার অসম্পূর্ণ। বার্ণসের দেশকে না জানিলে বার্ণসের কবিতার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। উনবিংশ শতাব্দীকে না জানিলে [illegible] কাব্যের সম্পূর্ণ আস্বাদ গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়। যে যুগ [illegible] যদি অবহেলা করিয়া চলিয়া যাই তাহা হইলে আমরা সাহিত্যরসের [illegible] হইতে বহুল পরিমাণে বঞ্চিত হইব।

অন্নদাসুন্দরী ১২৮০ সালে (১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে) বরিশালের [illegible] জন্মগ্রহণ করেন। সতের-আঠার বৎসর বয়স হইতেই তিনি [illegible] করেন। বলিতে গেলে তখন রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার অপূর্ব [illegible] সময়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে, সকলের উপর না হইলেও [illegible] কাব্যযশঃপ্রার্থীর উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়িয়াছে। [illegible] সুন্দরীর রচনার উপর তাঁহার কাব্যের কোন প্রভাব অনুভূত [illegible] তাহার কারণ, হেমচন্দ্র-নবীন সেনের দেশপ্রেমের কবিতা [illegible] পাঠককে মাতাইয়া রাখিয়াছে। অন্নদাসুন্দরী ইঁহাদেরও [illegible] নাই, বরং মহিলা-কবি কামিনী রায়ের কতকটা প্রভাব তাঁহার [illegible] পরিলক্ষিত হয়।

প্রথম বয়সে তাঁহার অনেকগুলি কবিতা "অন্তঃপুর", [illegible] বোধিনী পত্রিকা", "নব্যভারত" প্রভৃতি মাসিকপত্রে প্রকাশিত [illegible] তখনকার দিনে মেয়েদের পড়াশুনার বিশেষ রীতি না থাকিলেও [illegible] বাড়ীতে পড়িয়াই নিজেকে সুশিক্ষিত করেন। অশ্বিনীকুমার [illegible] সুপণ্ডিত অধ্যাপক কেদারনাথ ঘোষ ছিলেন তাঁহার স্বামী। [illegible] পুত্রকন্যাগণও সকলেই সুশিক্ষিত। অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ [illegible] পুত্র। তিনিই মাতৃদেবীর কবিতাগুলি সঙ্কলন করিয়া [illegible] বলী" নাম দিয়া গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ করেন। [illegible] জীবিত। এখানি দ্বিতীয় সংস্করণ। তখনকার দিনে [illegible] মহিলাদের পক্ষে কাব্যের বিষয়বস্তু ছিল সীমাবদ্ধ। [illegible] সত্ত্বেও কবিতায় আত্মপ্রকাশ করা অল্প শক্তির পরিচায়ক নহে। [illegible] মহিমা' কবিতায় অন্নদাসুন্দরী বলিতেছেন :

> প্রেম সার সকলের, প্রেম করে মুক্তে প্রাণদান।

তিনি লিখিতেছেন :

> সে নহে বিশুদ্ধ প্রেম,
> যে প্রেমে মানবমন কামনাপ্রবাহে ভেসে যায়।

'ছেড়ে দাও' কবিতায় পাই :

> তোমারি প্রেমেতে সুখ, আশা তব সংসার,
> হেরি যদি তব দেখা, তবে বুক ভেঙ্গে যায়।

'এখনো বাস ভাল?' কবিতায় আছে :

> নিশীথ মধুময়!
> ঝিল্লীরা জেগে রয়,
> প্রেমের খেলা তারা খেলেছে কত সুখে,
> ভাবেতে মাতোয়ারা গেয়েছে মুখে মুখে!

'কুমারী-জীবনে'র কথা স্মরণ করিয়া কবি বলিতেছেন :

> গরিমাতে অপার্থিব ধন!
> তরুর শ্যামল আভা, নিষ্কলঙ্ক মনোলোভা
> ধরাধামে কুমারী-জীবন।

'উষার কোকিলে' আছে :

কি জানি কি যাদুমন্ত্রে সাধা ওর গলাখানি,
কুহুস্বরে ভুবন মাতায়।

'বসন্ত-স্বপনে' পাই :

চেয়ে দেখ বিশ্বমাঝে আনন্দের ছড়াছড়ি,
অপূর্ব্ব ভুবন !

'নীরবতা'য় আছে :

শব্দহীন জগতের ভাষা, নীরব—অনন্ত ভাবময়,
আপনার প্রাণের কাহিনী ইঙ্গিতে—অস্ফুটভাবে কয়।

'দুর্গোৎসবে' তিনি খেদ করিতেছেন :

নিপীড়িত, শৃঙ্খলিত দাসত্ব নিগড়ে,
ভারত-সন্তান তব ভাসে অশ্রুনীরে।

'পথহারা' কবিতায় তিনি নির্দেশ দিতেছেন :

জ্বলে শুধু ছায়াপথে তারা মিটি মিটি অনন্ত গগনে,
লক্ষ্যপথে হও অগ্রসর, চেয়ে ওই ক্ষীণালোক পানে।

অন্নদাসুন্দরীর প্রাণ কবিত্বময় ছিল। "কবিতাবলী"র অনেকগুলি কবিতা রসগ্রাহী পাঠককে আনন্দদান করিবে। পুস্তকে পুত্র শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ-লিখিত ভূমিকা ছাড়া 'পরিচয়' নামে অন্নদাসুন্দরীর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত আছে। একখানি স্বামী ও পুত্রকন্যাপৌত্রাদি পরিবৃত অন্নদাসুন্দরীর ছবি এবং একখানি শুধু তাঁহার একক ছবি বইখানিকে অলঙ্কৃত করিয়াছে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বাংলার অগ্নিযুগ—শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ত। হিন্দী প্রকাশনী ভবন, ১০ ডিকসন লেন, কলিকাতা-১৪। পৃষ্ঠা ১২৪। [illegible] টাকা।

ভারতের মুক্তি আন্দোলন, বিশেষভাবে মহাত্মা গান্ধীর [illegible] পূর্ব্বেকার আন্দোলন বহুলাংশে গুপ্ত অহিংস আন্দোলন। ইহার [illegible] বৃত্তান্ত আজও সরকারের গুপ্ত দপ্তরে লিপিবদ্ধ আছে। অবশ্য দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বিপ্লবীদের মধ্যে কেহ কেহ কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে [illegible] মূল্যবান। তবে ইহার কোন কোনটিতে যে আত্মপ্রচারের [illegible], অতিশয়োক্তি প্রভৃতি নাই তাহা বলা যায় না। বর্তমান পুস্তকের [illegible] ছিলেন একজন বিপ্লবী। ১৯০৫ সনে তরুণবাংলায় স্বষ্ট [illegible] আদর্শ পরবর্তীকালে যাহাদিগকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করে [illegible] অন্যতম। বাংলার তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী বা টেররিষ্ট [illegible] অনেকের সহিতই লেখক পরিচিত ছিলেন এবং অনেকের [illegible] এজন্য তাঁহার বর্ণিত বহু কাহিনী 'স্বদেশী যুগে'র অনেক [illegible] উপর আলোকপাত করিয়াছে। অবশ্য গত শতাব্দীতে ভারতে [illegible] সূচনা হইতে গান্ধী-যুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনেক কথাই, বিশেষতঃ [illegible] সংগ্রামের কথা এই গ্রন্থে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। সমাজ-[illegible] লন, সাহিত্যের ভিতর দিয়া স্বাদেশিকতা প্রচার, ওয়াহাবী [illegible] বিদ্রোহ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব প্রভৃতি বহু তথ্য [illegible] পরিবেশিত হইয়াছে। অনুশীলন সমিতি সম্পর্কীয় [illegible] ভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং এই সম্পর্কে [illegible] প্রভৃতির বিবরণও দেওয়া হইয়াছে। লেখক নিজে [illegible] ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ [illegible]

পুঁজিবাদের পরিণাম ও সর্ব্বোদয় [illegible]—শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ মাইতি। সর্ব্বোদয় প্রকাশনী মণ্ডল। [illegible] পাঁচ সিকা।

অর্থব্যবস্থার অর্থ ও লক্ষ্য, কেন্দ্রীয় অর্থব্যবস্থা, পুঁজিবাদের [illegible], সাম্যবাদ, গান্ধীজী ও সর্ব্বোদয় নীতি, সর্ব্বোদয় এবং সর্ব্বোদয় [illegible] সাতটি অধ্যায়ে এই পুস্তকখানি সম্পূর্ণ হইয়াছে।

লেখক দেখাইয়াছেন যে, পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার দরুন [illegible] ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। পুঁজিবাদের পথ হিংসা, [illegible] লোভের পথ। উৎপাদনবৃদ্ধি ও অতিরিক্ত লাভ ইহার উদ্দেশ্য [illegible] প্রাচুর্য্যের মধ্যে অভাব, দারিদ্র্য এবং বেকারের সৃষ্টি করে। [illegible] ব্যবস্থার ইহাই বিষময় ফল। ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদও এই [illegible] রূপান্তর মাত্র। লেখকের মতে সমাজবাদও একপ্রকার [illegible] কেন্দ্রীয় উৎপাদন ও অর্থব্যবস্থা বজায় রাখিয়া উহার দোষ [illegible] চায়, কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। এমনকি সাম্যবাদ—যাহা [illegible] পরিচিত তাহাও সমাজবাদের নামান্তর। হিংসার সাহায্যে [illegible] আনিবার চেষ্টা করে বলিয়া ইহা ধ্বংস ও বিদ্বেষের কারণ হয়। [illegible] 'বাদে'র কোনটিরই সহিত ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই। [illegible] সরকার বা গবর্ণমেণ্টকে শক্তিশালী করিয়া সমাজ ও মানুষের [illegible] করিতে চায়। ইহা অনেকটা মানুষকে মারিয়া মানুষের উন্নতি [illegible] আজ রুশদেশে এবং অন্যান্য সাম্যবাদী দেশে এই ভ্রান্ত চেষ্টা [illegible] আবার নৈরাজ্যবাদিগণ রাষ্ট্রের বিলোপ কামনা করে এই জন্য [illegible] স্বাধীনভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ লাভ করিতে পারে, যেন [illegible] মানুষ

আদর্শ সমাজে পূর্ণ শান্তিস্থাপন করিতে পারে। পুঁজিবাদের ব্যর্থতায় অবশ্য সাম্যবাদের জন্ম।

গান্ধীজীর সর্ব্বোদয় উভয় হইতেই পৃথক। ইহাতে আছে—মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, ধর্ম্মনীতি ও অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ যাহা অন্য কোনও বাদে স্বীকৃত হয় না। আধ্যাত্মিক উন্নতিই আসল উন্নতি এই সত্যের স্বীকৃতি এবং ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য সমাজ—সমাজের জন্য ব্যক্তি নয় এই ভাব ইহাতে ওতপ্রোত। জগৎকে সুখময় ও শান্তিময় করিয়া তুলিবার এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার ভাবধারাই সর্ব্বোদয়। এই উচ্চ আদর্শ অনেকের নিকট অলীক হইলেও গান্ধীপন্থীরা ইহাতে বিশ্বাসী। আচার্য্য বিনোবা ভাবের নেতৃত্বে যে বিরাট শান্তিপূর্ণ বিপ্লব চলিতেছে তা সর্ব্বোদয়েরই একটি চিত্র। ইহা সত্যাশ্রিত মতবাদ। ইহার আধার অধ্যাত্মবাদ। ব্যক্তি সম্পত্তির ভোক্তা নহে, রক্ষক বা অছি। এই বাদ মানুষের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন আনিতে চায়। সাম্যবাদ ও সর্ব্বোদয় পরস্পর হইতে পৃথক। পৃথিবীর এই সঙ্কটমুহূর্ত্তে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিরই সর্ব্বোদয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত—রাষ্ট্রকর্ণধারগণের ত বটেই।

এই সুলিখিত পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

নীরঞ্জনা—শ্রীকানাই সামন্ত। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য চার টাকা।

“তোমারে কে বলো রঞ্জিত করে—• • নীরঞ্জনা!” মানসরঙ্গিনী নীরঞ্জনার স্তব কবির এ কাব্য। সকল রঙের উৎস সে, তাকে আর রঞ্জিত করবে কে? তার স্পর্শে বিশ্বভুবনে জাগে রূপের হিল্লোল, সুখে দুঃখে ওঠে ভাবের তরঙ্গ। সম্ভবতঃ বিহারীলালের ‘সারদা’র এবং রবীন্দ্রনাথের ‘মানসী’ ও ‘চিত্রা’র সে নিকট-আত্মীয়া। কল্পলোকে তার নিত্যবিহার।

রবীন্দ্রপন্থী কাব্য আজ এক শ্রেণীর সমালোচকের কাছে ধিক্কৃত, নিন্দিত। তাঁরা নতুন চান, ভুলে যান—নূতনত্ব বিষয়বস্তুতে নয়, দৃষ্টির এবং রচনাভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্যে। সে স্বাতন্ত্র্য কানাইবাবুর আছে। রবীন্দ্রনাথের বাস্তব [illegible] মানস-সান্নিধ্যে থেকে তিনি তাঁর রীতি ও রুচিদ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন সন্দেহ নেই, তবু তাঁর রচনা রবীন্দ্র-রচনার ছায়া নয়। একটি পৃথক ব্যক্তিত্বের পরিচয় অধিকাংশ কবিতায় পরিস্ফুট। প্রথম কবিতা ‘কবিতাবধূ’র আরম্ভে এমন একটি সহজ ঘরোয়া সুর লেগেছে যাতে রবীন্দ্রনাথকে নয়, [illegible] দ্বিজেন্দ্রনাথকে—‘স্বপ্নপ্রয়াণে’র কবিকে—মনে করিয়ে দেয়।

> “ছলনাময়ী গো কবিতাবধূ,
> ঘর গড়ে আর ঘর করে সুখে সতীশ যদু,
> ঊর্মিলা, সরলা, সারদা, সুখদা ঘরণী লয়ে।
> এ হতভাগো উদয় হয়ে
> আমারে হাসালে কাঁদালে শুধু।”

এই ‘সতীশ যদু’ এবং ‘ঊর্মিলা সরলা’র উল্লেখ রবীন্দ্রপন্থী কবি [illegible] দুঃসাহস বলতে হবে। অতিলালিত্যলালিত রুচি হয়তো মৃদু [illegible] জানাবে। অথচ এ কথাগুলিতে একটি সরল আন্তরিকতার ভাব [illegible] যা অন্যথা আনা যেত না। এমনি আরও অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে [illegible] যেতে পারে যে, আলোচ্য গ্রন্থের কবি রবীন্দ্রশিষ্য হলেও অন্ধ অনুকারী নন। তাঁর নিজস্ব ভালোলাগা মন্দলাগার কথা তিনি নিজের ভাষাতেই [illegible] চেষ্টা করেছেন।

বাংলা ১৩৩০ থেকে ১৩৪৫ সাল পর্য্যন্ত পনেরো বছরের রচনা [illegible] ১৭টি কবিতা এই সঙ্কলনে নির্বাচিত হয়েছে। পুরোনো [illegible] কয়েকটি কবিতাও এতে স্থান পেয়েছে। চার ভাগে সাজানো [illegible] কবিতাগুলি। অপেক্ষাকৃত নতুন রচনা প্রথম দিকে, আর পুরোনো [illegible] শেষ ভাগে। অযথা পাণ্ডিত্য এবং অশোভন দুর্বোধ্যতা, দুয়েরই [illegible] এ কাব্য মুক্ত। সর্ব্বপ্রকার ভাবপ্রকাশে কবির অনায়াসনৈপুণ্য [illegible] দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না।

মেঘলা দিনে মুগ্ধ চোখে কবি দেখেন: “সোনাল ফুলের সাজে, [illegible] এ—শ্যামা মেয়ে লাবণ্যেতে ছলোছলো করে” (মেঘ ক’রে আছে, পৃ. [illegible]), কখনও আঁকেন কলকাতার পরিচিত পথের দৃশ্য: “ট্রামের পিছনে [illegible] দাঁড়িয়ে গেছে—রসা রোডের মাঝখানে—বেলা তখন দুটো”, কখনও [illegible] “স্বর্গ হইতে বিদায়”-এর প্যারডি “ভূমি-কক্ষ হইতে বিদায়”।

কানাইবাবু প্রধানতঃ প্রকৃতি-অনুরাগী কবি। সংসার-জীবনের [illegible] বাসনা সুখ-দুঃখের কথা কোন কোন কবিতায় থাকলেও, তেমন [illegible] সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। আকাশ বাতাস আলো, নদী সমুদ্র [illegible] হৃদয় আকর্ষণ করে টানিবার শক্তিতে। সেই আকর্ষণেই জাগে তাঁর [illegible] শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত। একটি দৃষ্টান্ত দিই:

> “পড়ন্ত বেলায় ক্ষীণ আলো, দীর্ঘতর ছায়া
> বনে পর্ব্বতে এলিয়ে পড়ে,
> সূর্য্য সহসা ডুবে যায় শিবালিকের পিছনে,
> দিনের রঙ্গমঞ্চে তখনই নামে অন্ধকার যবনিকা:
> পথপার্শ্বে জনহীন চটিতে
> রাত্রি যাপন করি ধুনী জ্বালিয়ে নিয়ে।

খুকীর নতুন ফ্রক
ও, মা, এ যে নতুন ফ্রক !
হঁ্যা, দেখ খুকী যেন খারাপ না হ'য়ে যায়।
না, আমার নতুন ফ্রক খারাপ হ'য়ে যাবে যে।
গ্যারাণ্টি দেওয়া এই ফ্রক দেখুন !
হুঁ…যে কেচেছে এ তারই দোষ !
আমিই কাচি !
মাপ করবেন,…
…কিন্তু এ আছড়ে কাচার জন্যেই হ'য়েছে, তাতে কাপড়ের সুতো ছিঁড়ে যায়, কলার ও আস্তিনের ফেঁসো বেরিয়ে যায়।
সানলাইট সাবানে কাপড় না আছড়ে কাচলেও সাদা ও ঝকঝকে হয়ে যায়।
আমার কাপড় আরও বেশীদিন টেঁকে, তাতে
SUNLIGHT SOAP
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট সাবান
কাপড়কে আরও টেঁকসই করে
ভারতে প্রস্তুত
S. 236-X52 BG

ভবঘুরে পথিক আমি
গেছি সুবর্ণবাহু শোন নদ যেখানে
বিস্তীর্ণ বালুশয্যার প্রান্তে চলেছে কুটিল গতি,
অজগর পৃষ্ঠের মতো অসিত অবয়বে তার
ঝিকিয়ে ওঠে আলো ;
ত্রিশরণ স্তবগানে বয়ে চলেছে নৈরঞ্জনা
নীল পাহাড়গুলির পাদদেশে···" ('ঘুঘু-ঘু'। পৃ. ১৯১)।

নিখরচায় জলযোগ—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য দেড় টাকা।

হাসির গল্প লিখিয়ে হিসাবে শিবরাম চক্রবর্ত্তী সুপরিচিত। অনুপ্রাসে-শ্লেষে-যমকে মজাদার কথা সাজিয়ে ছোটবড় সকলের মনোরঞ্জনে তিনি সিদ্ধহস্ত। অবশ্য অনেক সময় এ দিকে বাড়াবাড়ি না করেন এমন নয় ; তবু তাঁর লেখা কখনও নীরস মনে হয় না। আলোচ্য গ্রন্থে আছে আটটি উপভোগ্য রসালো গল্প—নিখরচায় জলযোগ, ধূমপানের ইতিহাস, ঠিক ঠিক পিক্‌নিক, অমূলক কাহিনী নয়, ইংরিজি যার নাম, হাতীমাকা বরাত, ফিস্‌টের ফিস্‌ট, জবাই !

হাসির খোরাক যোগাবার লোক তো বাংলা দেশে বেশী নেই ; কাজেই নিখরচায় না হোক, দেড় টাকা খরচায় এমন চমৎকার জলযোগের ব্যবস্থা যিনি করেছেন তিনি ধন্যবাদের পাত্র। আর শেষ পর্য্যন্ত জবাইয়েও ভয় নেই, কারণ জবাইটা হবে মনের অসুস্থতার, তাতে জীবনীশক্তি বাড়বে বই কমবে না।

উন্মেষ—শ্রীসুবোধচন্দ্র ঝা। প্রবাসী বঙ্গ-ভারতী, মিল-এরিয়া, জামসেদপুর-৭। দাম বার আনা।
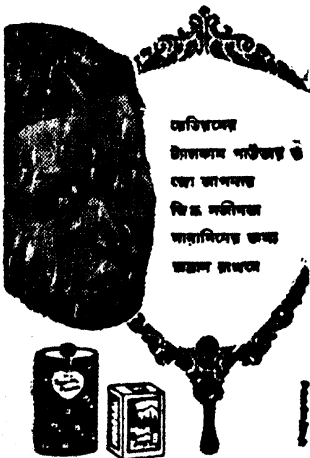
সুবোধচন্দ্র নতুন কবি। আমরা সাগ্রহে তাঁর 'উন্মেষ' লক্ষ্য করছি। ভাষা ও ছন্দের উপর তাঁর অধিকার জন্মেছে। ভাবের গভীরতা এলেই কবিতা সার্থকতা লাভ করবে।

মর্ম্মবাণী—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৫, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা। দামের উল্লেখ নেই।

"ঠাকুরের সর্ব্বময় প্রকাশ—স্বামিজীর বাণী পড়ি, বার বার পড়ার বাসনা জাগে সেদিনও পড়ছিলাম।···সেদিনেই এ ক'খানি পাতা লিখেছিলাম।" মানবের অধ্যাত্ম-যাত্রার কথা নিয়ে ক্ষুদ্র রূপকনাট্য। রচনা মন্দ নয়।

ফেরারী—আবদুল গনি খান। প্রকাশক : নুর মহম্মদ চৌধুরী, ১২ রতু সরকার লেন, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

কতকটা সুফী ভাবের কয়েকটি পদ্য, বৈশিষ্ট্যবিহীন।

সেই কন্যাকে—সুকুমার রায়। জিজ্ঞাসা, ১৩৩-এ রাসবিহারী এভেন্যু, কলিকাতা-২৯। দাম এক টাকা।

গভীরতা নেই, দুটি একটি কবিতায় কল্পনার আভা লেগেছে। কোনটিতে আছে প্রধানতঃ কথার কৌশল—যেমন, 'সেই কন্যাকে' ; কোনটি নরম সংসার-চিত্র বলে পড়তে ভালো লাগে—যেমন, 'অভিনয়'। অনুভূতি বা ভাবের গভীরতা এখনও আসে নি। ভাষাগত ত্রুটি দু'এক জায়গায় চোখে পড়ল, যেমন—'মৃত্যোবধি' (পৃ. ৩১)। রুচি-বিকারের চিহ্ন কয়েকটি কবিতায় আছে। 'কাবকন্যা'র প্রতি বর্ত্তমান কবির যতই অনুরাগ থাকুক, 'অব্‌লিক চোখ' আর 'হেলিয়োট্রোপ' কি তাকে ভালো মানিয়েছে ?

শতাব্দীর শতসূর্য্য—পণ্ডিত শ্রীদিগম্বর সাহিত্যরত্ন, সাহিত্য-বিশারদ। গ্রন্থবিপণি, ২৭ একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১৯। মূল্য দুই টাকা।

বিগত এক শতাব্দীর মধ্যে যাঁরা খ্যাতিলাভ করেছেন এমন এক শত এক জন ভারতবাসীর অতিসংক্ষিপ্ত জীবনকথা। সন্ধান-গ্রন্থ হিসাবে মন্দ নয়।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দেশান্তরের নারী—শ্রীসাধনা বিশ্বাস। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, ১৩১১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য দুই টাকা।

ভূমিকায় দেখছি লেখিকার এই 'প্রথম কলম ধরা।' কলম ধরেই এমন সুন্দর ভাষা-বিন্যাস ও চমৎকার প্রকাশভঙ্গী কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। সতেরটি কাহিনীর বর্ণনা রয়েছে বইয়ে, যেন সতেরটি গল্প, জীবন্ত চরিত্রগুলি মনে গল্প পড়ার আমেজ এনে দেয়। ইউরোপের প্রায় সব দেশের নারীদেরই লেখিকা দেখেছেন, তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি দেশের মর্ম্মস্থলে গিয়ে পৌঁচেছে এঁদেরি মাধ্যমে। একটা করুণ সুর আগাগোড়া বইখানাতে বাজছে আছে, যুদ্ধোত্তর পৃথিবী শান্তি চায়—এর জন্যে ভারতবর্ষের দিকে তাকাচ্ছে আজ ইউরোপ। শুধু ইউরোপের নয়, আজকের পৃথিবীর সকল দেশের মেয়েদের মর্ম্মোৎসারী কান্না যেন ভেসে আসে লেখিকার বর্ণনা থেকে। কি কেমন ভারী হয়ে ওঠে—স্পষ্ট হয়ে ওঠে ভারতীয় সভ্যতা আর ইউরোপীয় সভ্যতার মূলগত পার্থক্য। এদিক থেকে লেখিকার রচনা সার্থক।

নানা দেশের, নানা ধরণের মেয়েদের সংস্পর্শে এসেছেন লেখিকা। ইরিন, কালিনিন, হোনাওয়ারের মত এঁদের অনেকেই আমাদের পরিচিত, বাংলা দেশেও এঁদের মত মেয়েদের দেখা মেলে। আবার লোভাল, আগ্নেস এঞ্জেলের মত কেউ কেউ বা স্বতন্ত্র প্রকৃতির। তবু সব মিলিয়ে সমগ্রভাবে এঁদের মধ্যে দিয়ে সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের নারী-জাতির একটি সম্পূর্ণ রূপই ফুটে উঠেছে।
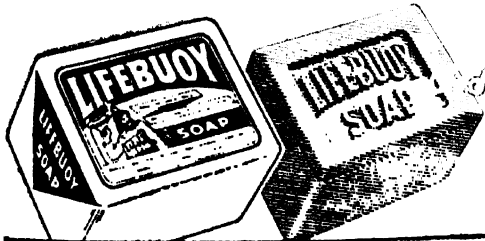
বইখানি পড়ে দেখবার মত। এ বই পড়ে পাঠকগণ আনন্দ পাবেন নিঃসন্দেহে এ কথা বলা চলে।

সেই পুরাতন কথা—শ্রীনীলিমা দেবী। ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড, ৮৯ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য তিন টাকা।

উপন্যাসখানির লেখিকা সম্ভবতঃ সাহিত্য-জগতে নবাগতা। কিন্তু তা হলেও তিনি পাকা হাতের পরিচয় দিয়েছেন।

জীবনের সুখদুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতই বইখানির প্রধান আকর্ষণ। সব চেয়ে লক্ষ্য করবার বিষয় লেখিকার দরদী মন। আন্তরিকতার স্পর্শে সরস হয়ে উঠেছে কাহিনী, অব্যাহত বয়ে চলেছে ভাষা সাবলীল গতিতে। বইখানি ঘটনাবহুল নয়, কিন্তু সুখপাঠ্য। কাহিনীতে নূতনত্ব কিছু নেই, সাধারণ ধনী আর মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের জীবন-সংঘাতই এর উপজীব্য। তবে লেখিকার দরদী মনের স্পর্শে সহজ ও অতি স্বাভাবিক ভাবে ফুটে উঠেছে এর নারী-চরিত্রগুলি,—সুহাসিনী, কমলা, হেমবরণী, রুমি, নীরা, মল্লিকা,—এঁদের অতিপরিচিত বলেই মনে হয়। পুরুষ-চরিত্রগুলি এঁদের পাশে অনেকটা নিষ্প্রভ। সম্ভবতঃ ব্যাপকতর অভিজ্ঞতার অভাবই এর কারণ, তবু একথা স্বীকার করতে হয়, লেখিকা জীবনকে দেখেছেন আর সেটা দরদী মন নিয়েই দেখেছেন।

শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য

মা—ম্যাকসিম গর্কী। অনুবাদক শ্রীঅশোক গুহ। ভারতী লাইব্রেরী, ৬ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম পাঁচ টাকা।

সমালোচ্য পুস্তকখানি গর্কীর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস 'মাদারে'র পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ। মূল গ্রন্থের বিস্তারিত পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। এক কথায় বলিতে গেলে জারতন্ত্রের যুগে 'মেহনতি' মানুষের অভ্যুত্থানের ভবিষ্যৎ নির্দেশ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। মেহনতি মানুষ একদিন জয়ী হইবেই এই কথাটাই ইহার মূল সুর।

এই উপন্যাসের নায়ক পাভেল একজন বিপ্লবী, উচ্চ আদর্শ [illegible] মানুষ। পুঁজিবাদী সভ্যতা সৃষ্টি করিয়াছে সর্বহারা শ্রমিক-সম্প্রদায়। তার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া আছে এক জীবন্ত নরক—নারী আর সুরা। [illegible] লেখক এই নরকের অন্ধকার হইতে আলোতে টানিয়া আনিয়াছেন—কিন্তু একদিনেই কেহ নেতা হইয়া উঠিতে পারে না, সুতরাং উপযুক্ত [illegible] সৃষ্টির প্রতিও তাঁহার সজাগ দৃষ্টি রহিয়াছে।

গৃহ-কোণে আছে মা। নিরক্ষর, অন্ধসংস্কারে আচ্ছন্ন—ছেলেদের [illegible] চরিত্র পথ ত্যাগ করিতে দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠেন, কিন্তু মন [illegible] মানিয়া লয়—চেতনায় ঘটে নূতন উপলব্ধি। জন্মবেশে অবতীর্ণ [illegible] সংগ্রামে। রক্তে, মাংসে, অস্থি-মজ্জায় গর্কী প্রাণবন্ত করিলেন [illegible]— বহু বিপ্লবী মায়ের সমন্বয়ে সৃষ্টি হইল উপন্যাসের মা। এই মা স্বামীপুত্র [illegible] জীবন কাটাইতেছিলেন, কিন্তু সন্তানের প্রতি মমত্ববোধ তাঁকে [illegible] টানিয়া আনিল—এমন এক নূতন উপলব্ধি তাঁহার হইল [illegible] সমগ্র জনগণকে সন্তানরূপে গ্রহণ করিতে অনুপ্রাণিত করিয়া [illegible] নির্দেশ দিল।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ-সাহিত্যের প্রসারলাভ [illegible] সুলক্ষণ। বিশেষ করিয়া বিশ্বসাহিত্যের এইরূপ প্রথম শ্রেণীর [illegible] বঙ্গানুবাদ আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিতে সহায়তা করিবে।

অনুবাদকরূপে অশোকবাবু খ্যাতিমান্। সমালোচ্য পুস্তক [illegible] অক্ষুণ্ণ রাখিবে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

আরও মসৃণ, কমনীয় ত্বক্
দিনে দিনে...
ক্যাডিল্*যুক্ত রেক্সোনা'কে
আপনার অবগুণ্ঠিত রূপকে
উন্মোচন করতে দিন
রেক্সোনা'র ক্যাডিল্-সমৃদ্ধ ফেনা আপনার ত্বকে
মোলায়েমভাবে রগড়ে নিয়ে ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন,
আপনার ত্বক্ দিনে দিনে মসৃণতর আর কোমল হয়ে-
এক নতুন উজ্জ্বলতর কমনীয়তায় ভরে তুলেছে।
বড় সাইজেও
পাওয়া যায়
Rexona
রেক্সোনা
ক্যাডিল্‌যুক্ত একমাত্র সাবান
* ত্বক্ পোষক ও কোমলতাপ্রদ তৈল সমূহের এক
বিশেষ সংমিশ্রণের মালিকানী নাম।
রেক্সোনা প্রোপাইটারী লিঃএর তরফ থেকে ভারতে প্রস্তুত
RP. 130-X52 BG

কশ্চিৎ কান্তা—শ্রীঅনিলেন্দু চৌধুরী। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৮৮। মূল্য দুই টাকা।

কশ্চিৎ কান্তা, সেই মেয়ে, সেদিন নিশীথে, চোর, ক্ষেন্তিদি, ভিখারিণী ও মিতারাণী এই সাতটি গল্পের সমষ্টি। লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত, তাঁহার ভাষা একটু বেশী কাব্য-ঘেঁষা, এবং অধিকাংশ গল্পেরই বিষয়বস্তু প্রেম। কিন্তু 'সেদিন নিশীথে' এবং 'চোর' গল্প তাঁহার শিল্পীমন এবং 'ভিখারিণী' তাঁর পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতার পরিচয় বহন করে। শিল্পী শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়-অঙ্কিত মনোরম প্রচ্ছদপটটি পুস্তকের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে।

প্রথম গল্প কশ্চিৎ কান্তার প্রারম্ভিক বাক্য 'প্রসন্ন রবিবারের আতপ্ত দুপুর' একটু বাড়াবাড়ি মনে হয়।

ব্রহ্মদেশে ছয় মাস—শ্রীরামনাথ বিশ্বাস। অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির, ৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা ১২৬। মূল্য দুই টাকা।

ব্রহ্মদেশ একদিন ভারতের অঙ্গীভূতই ছিল, তবু এর সম্বন্ধে আমরা কত অল্পই না জানি। লেখক এই গ্রন্থখানি লিখে আমাদের সেই না-জানার দুঃখ অনেকখানি ঘুচিয়েছেন। লেখক ওখানে ভ্রমণ করেছিলেন ১৯৩৩ সনে, আর এখন ১৯৫৫। বাইশ বছর আগেকার ব্রহ্মের সঙ্গে এখনকার ব্রহ্মের গুরুতর পার্থক্য সত্ত্বেও ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক দিয়ে গ্রন্থখানি এখনও বিশেষ মূল্যবান। তা ছাড়া ওখানকার ভৌগোলিক পরিবেশ, তৎকালীন রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রসঙ্গক্রমে এ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। লেখক স্থানে স্থানে শেষোক্ত দুই নীতি সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা চিন্তাশীলতার পরিচায়ক।

শ্রীতারাপদ রাহা

সবার মা সারদা—শ্রীঅতুলানন্দ রায়। নব গ্রন্থ-নিকেতন, ৩৭।১, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা ২১২। মূল্য তিন টাকা।

গ্রন্থকার ইতিপূর্ব্বে 'গদাধর—বালক শ্রীরামকৃষ্ণ' ও 'সাধক রামকৃষ্ণ' লিখিয়া পাঠক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সমালোচ্য গ্রন্থে গল্পচ্ছলে শ্রীশ্রীমাতা সারদাদেবীর জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের ভাষা সুললিত, বর্ণনা চিত্তগ্রাহী, বাচনভঙ্গী সুমধুর। সুখপাঠ্য উপন্যাসের মত গ্রন্থখানি পাঠককে মুগ্ধ করিবে। সারদা দেবীর শতবর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষে অনেকগুলি জীবনী বাহির হইয়াছে, এখানি তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিবে। জগন্মাতা আদ্যাশক্তির অংশরূপিণী সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনসঙ্গিনী হন; শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ ভক্তগণের উপর তাঁহার কার্য্যকলাপ কতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এই গ্রন্থে তাহার পূর্ণ পরিচয় পাই। সারদা-দেবী নিজের ব্যক্তিগত সকল সুখসাধ ও ভোগকামনা বিসর্জ্জন দিয়া 'সবার মা' হইয়া সন্তানগণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের যোগ্য সহধর্ম্মিণীরূপে তিনি মর্ত্যলীলা প্রকটিত করেন। সারদা-মায়ের জীবনের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি এই গ্রন্থে প্রতিফলিত হইয়াছে গ্রন্থকারের প্রাণ-ঢালা ভক্তির উচ্ছ্বাসে। গ্রন্থকারের লিপিকুশলতা ও রচনার প্রসাদগুণে পাঠক ইহা পড়িয়া মুগ্ধ হইবেন।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল
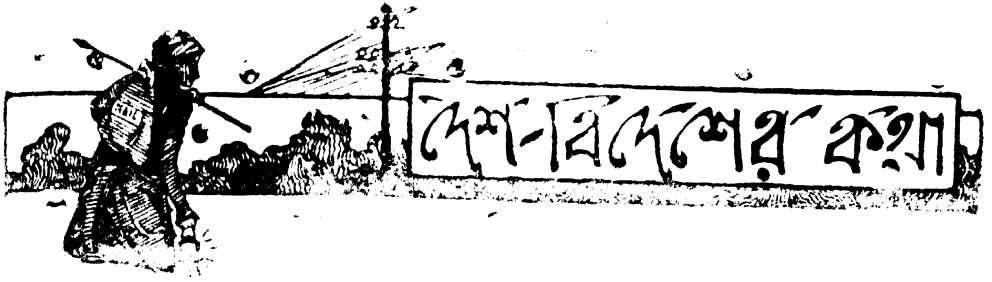
রাধানগর পরিক্রমা

রাধানগর এক্সকার্শন্ কমিটির আহ্বানে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উনিশ জন সভ্য ও সভ্যা গত ৮ই এপ্রিল অপরাহ্ণে রাধানগর রামমোহন-স্মৃতি-ভবনে গিয়া পৌঁছেন।

পরদিন প্রাতে স্মৃতিমন্দিরে ব্রহ্মোপাসনা হয়। আচার্যের কাজ করেন শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী। শ্রীস্নেহকুল দাস প্রভৃতি কীর্তন করেন। উপাসনান্তে সকলে মিলিয়া নগরকীর্তনে বাহির হন এবং (খানাকুল) কৃষ্ণনগর, নাঙ্গুলপাড়া, রঘুনাথপুর প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রাম পরিক্রমা করেন। কীর্তন শেষ হইলে সকলে রামমোহনের স্মৃতি-বিজড়িত বিভিন্ন স্থানগুলি পরিদর্শন করেন। রামমোহনের বাগান-বাড়ীর জমিতে যে বাড়ীর ভগ্নাবশেষ ছিল তাহার চিহ্নমাত্র নাই। জনৈক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীকে ঐ ইমারত বিক্রয় করিয়া দেওয়ায় সবই স্থানান্তরিত হইয়াছে। নাঙ্গুলপাড়ার বাড়ীগুলি এখনও ভগ্নাবস্থায় আছে।

৯ই এপ্রিল সন্ধ্যায় রামমোহন স্মৃতিভবনের বারান্দায় ও প্রাঙ্গণে জনসভা হয়। ঐ সভায় আশাতীত জনসমাগম হয়। শ্রীক্ষেমঙ্করী রায় নারীজাগরণে রামমোহনের দান ও ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন। তৎপরে অধ্যাপক শ্রীদেবকুমার দত্ত ও শ্রীযোগানন্দ দাস রামমোহনের আদর্শ সম্বন্ধে সুচিন্তিত বক্তৃতা করেন। পর দিন প্রাতঃকালে রাধানগর পরিক্রমাকারীরা কলিকাতা অভিমুখে রওনা হন।

শ্রীদেবকুমার দত্ত ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র যখন শনিবার সকালে রাম-মোহনের স্মৃতিচিহ্নগুলি দেখিতে যান, তখন দেখেন যে কলিকাতা হইতে আগত মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর লোকজন শাবল প্রভৃতি লইয়া কাছারিবাড়ী ভাঙিতে আরম্ভ করিয়াছে—ঐ অবস্থায় তাঁহারা আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। কিছুদিনের মধ্যে ঐ কাছারিবাড়ীর, বিশেষ করিয়া যে-গৃহে রাজা রামমোহন রায় আসিয়া আশ্রয় লইয়া-ছিলেন, তাহার ভগ্নাবশিষ্ট ভিত্তিভূমির আর চিহ্নমাত্রও থাকিবে না। ঐ সম্পর্কে জানা গেল যে, রামমোহনের বাগানবাড়ী বা কাছারি-বাড়ীর জমির জীবনস্বত্ব মাত্র বর্তমান বংশধরের আছে, বেচিবার অধিকার নাই। তিনি কেবলমাত্র উপরকার ইমারত বা কাঠামো বেচিতে পারেন। সেই অধিকার-বলে তিনি নাকি মাত্র নয় হাজার টাকায় এক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর নিকট উহা বেচিয়া দিয়াছেন।

খোঁজ লইয়া জানা গেল, একজন উৎসাহী হেড মাষ্টার—শ্রীরাম মিত্র (ছাঁদরা হাই স্কুল, গ্রাম—বিরাটী, পোঃ আঃ—হরিণ-খোলা, জেলা—হুগলী) প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ঐ জমিগুলিতে যদি রামমোহনের নামে একটি কলেজ করিবার ব্যবস্থা করা যায়, তবে তিনি তাহার জন্য পঞ্চাশ হাজার হইতে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিবেন।

শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়

রকফেলার ফাউণ্ডসনের অর্থানুকুল্যে ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট অব আর্ট ইন্ ইণ্ডাষ্ট্রির ডিরেক্টর শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায় গত ৩০শে এপ্রিল বিদেশযাত্রা করিয়াছেন। ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র ও এশিয়ার কয়েকটি দেশে চারি মাস কাল অবস্থান করিয়া তিনি রোম, মিলান, জুরিখ, প্যারিস, ষ্টক্‌হলম, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, টোকিও, জাকার্তা প্রভৃতি

শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়

স্থানের শিল্পসংগ্রহশালা এবং বিভিন্ন হাতের কাজ ও নক্সা-নমুনার কেন্দ্র পরিদর্শন করিবেন। ইহা ছাড়া তিনি আধুনিক শিল্পধারা ও ব্যবহারিক শিল্প-আন্দোলনের সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিতও যোগাযোগ স্থাপন করিবেন। ভারতীয় শিল্প ও প্রত্নতত্ত্বে শ্রীযুত মুখোপাধ্যায়ের গভীর ব্যুৎপত্তি আছে এবং তিনি একাধিক মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা।

শ্রীশচী রাউত রায়

শ্রীশচী রাউত রায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ইণ্টার ন্যাশনাল সেমিনার অব আর্টস এণ্ড সায়েন্স'-এ অংশ গ্রহণ করিবার এবং সমসাময়িক ভারতীয় সাহিত্য ও আর্ট, তথা শিল্প এবং সমাজকল্যাণ সম্পর্কিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়া আমেরিকা যাত্রা করিয়াছেন। ১৯৫৫ সালের ৫ই জুলাই হইতে আগষ্ট মাসের শেষ পর্য্যন্ত এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীরাউত রায় হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির অতিথি রূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিন মাস কাল অবস্থান করিবেন এবং প্রত্যাবর্ত্তনের পথে সাংস্কৃতিক মিশন ব্যপদেশে ইটালী, ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ড পরিভ্রমণ করিবেন।

শ্রীশচী রাউত রায়

যুগোশ্লাভিয়ার শিক্ষামন্ত্রী মিঃ কোলাকেভিকও শ্রীরাউত রায়কে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন।

শচী রাউত রায় ইতিপূর্ব্বে ১৯৫২ সালে অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত 'সোশ্যাল সার্ভিসেস সেমিনারে' যোগদান করিবার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন।

শচী রাউত রায় একজন খ্যাতিমান কবি ও লেখক। সম্প্রতি প্রবাসী কার্য্যালয় হইতে তাঁহার "দি বোটম্যান্ বয় এণ্ড ফর্টি পোয়েম্‌স" নামক কবিতা-সঙ্কলন প্রকাশিত হইয়াছে।

একটি স্বদেশী শিল্পপ্রতিষ্ঠান

কোলে বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেডের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কলিকাতা ষ্টার রঙ্গমঞ্চে এক মনোজ্ঞ উৎসবানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বঙ্গীয় জাতীয় বণিক সভার সভাপতি শ্রী জি. বাসু এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ও কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভাপতি মহাশয় ও প্রধান অতিথি উভয়েই তাঁহাদের ভাষণে কোলে বিস্কুট কোম্পানীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলেন যে, এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান আমাদের গর্ব্বের বস্তু। সভান্তে "কেদার রায়" নাটকটি সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

'মাটির টানে'

শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

বিবিধ প্রসঙ্গ

গোয়া
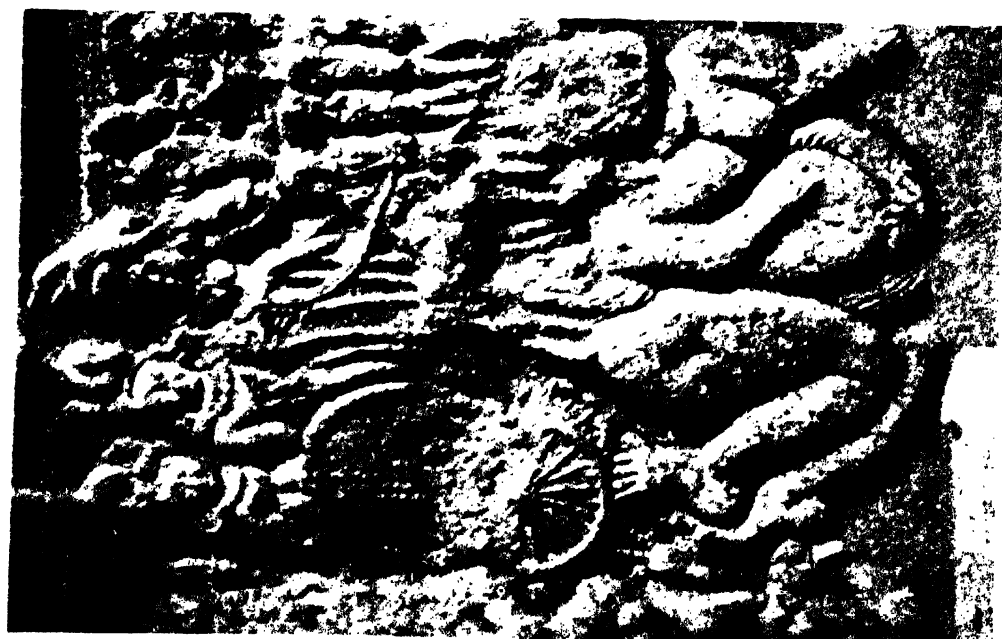
পর্তুগীজ জাতির ইতিহাস পাশ্চাত্য জাতির বর্ব্বরতার ইতিহাসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কলঙ্কিত অংশ। এই জাতির মধ্যে সাহসী নাবিক অনেক ছিল, কেননা ইহাদের বাসভূমি ইউরোপের পশ্চিম সীমান্তে, আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপকূলে। সমুদ্রযাত্রা ভিন্ন ইহাদের গ্রাস আচ্ছাদন এবং অন্য দেশের সহিত বাণিজ্য ও আদান-প্রদান অসম্ভব ছিল। যে সামান্য ভূখণ্ড ইহাদের স্বদেশ, তাহাতে উৎকৃষ্ট মদ ভিন্ন অন্য কিছু বিশেষ পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারিত না।

বারুদ ও আগ্নেয়াস্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ মহাসাগরগামী নাবিকদিগের সাহস বাড়িয়া যায় এবং জাহাজে কামান ও নাবিক-দিগের হস্তে বন্দুক ও পিস্তল সজ্জিত করিয়া ইহারা দূর দেশে যাত্রা করে।

প্রথমতঃ ঐ সকল নাবিকদিগের নৌযাত্রার উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য ও সামগ্রিক আদান প্রদান। কিন্তু যখন উহারা দেখিল যে বিদেশের —বিশেষতঃ এশিয়ার ও দক্ষিণ আমেরিকার—অধিকাংশ লোক ও রাষ্ট্র আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে অজ্ঞ তখন উহাদের লোভ বাড়িয়া গেল এবং নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র ও জাতিগুলির উপর লুটপাট এবং নিষ্ঠুর পাশবিক অত্যাচারের প্রবল বন্যা উহারা বহাইয়া ছাড়িল। পর্তুগীজ উপনিবেশ স্থাপনে নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ জাতি সকলের উপর যে অমানুষিক হত্যা, বলাৎকার ও লুণ্ঠনের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় তাহা সত্যই ঘৃণিত ও কলঙ্কিত।

অন্যদিকে যখনই যে স্থলের অধিবাসিগণ আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছে তখনই সেখান হইতে পর্তুগীজ রাষ্ট্রের বীরগণ পলায়ন করিয়াছে। আমাদের দেশে মোগল শাসকগণ পর্তুগীজ দস্যুদিগের নৌবন্দর দখল ও নৌবহর ধ্বংস করে। অন্য দেশেও সেই ব্যাপারই হয়। কাপুরুষ বলিয়া ইহাদের কুখ্যাতি বহুদিনের। এরূপ যে জাতির ইতিহাস তাহাদের সম্মুখে নিরস্ত্র সত্যাগ্রহী গেলে তাহারা যাহা করিবে তাহা ত জানাই ছিল। ফ্রান্স যাহা করিতেছে, ব্রিটেন যাহা পূর্ব্ব-আফ্রিকায় করিয়াছে, তাহাও অনুরূপ ব্যাপার। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ যাহাদের জাতিগত নীতি তাহাদের সকলেরই মনোবৃত্তি এইরূপ।

কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য কি এই ক্ষেত্রে? পণ্ডিত নেহরু সারা পৃথিবীতে অহিংসবাদ প্রচার করিয়াছেন। এখন এই ব্যাপারে যদি অস্ত্রের সাহায্য লওয়া হয় তবে জগতে আমাদের যে প্রতিষ্ঠা বর্ত্তমানে অর্জ্জিত হইয়াছে তাহা মুহূর্ত্তেই ধুইয়া যাইবে। "পুলিস একশন কর" বলিয়া যাঁহারা চীৎকার করিতেছেন তাঁহারা ঐ শব্দের অর্থ কি বুঝেন জানি না, তবে সাধারণ লোকে বুঝিবে যে নিজস্ব শাসনতন্ত্র যেখানে অধিকারী সেখানেই পুলিসের বা পুলিস সাহায্য-কারী সৈন্যের অভিযান চলিতে পারে। অন্যথায় পুলিস একশন ও যুদ্ধ ঘোষণা একই ব্যাপার।

তবে উপায় কি? পণ্ডিত নেহরু নৈতিক অবরোধ (moral sanctions) সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়াছেন কিন্তু সেখানে দ্রুত ফল লাভের সম্ভাবনা কম এবং বিশ্বজনমত সম্পর্কে ভরসা যাহা আছে তাহাতেও দ্রুত কিছু হওয়া সম্ভব নহে, কেননা বিশ্বের সকলেই নিজ নিজ মাথাব্যথা লইয়া ব্যস্ত।

তবে একথা ঠিক যে, যেভাবে গোয়ায় পর্ত্তুগীজ সরকার চলিতেছে তাহাতে তাহাদের আর্থিক দুর্দ্দশা সত্বরই আসিবে। গোয়াবাসী যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অহিংস বা সশস্ত্র বিদ্রোহ করে তবে আরও সত্বর সেখানকার অবস্থার চরম দুর্গতি হইবে। সুতরাং শুধু ঐ কারণেই পর্তুগীজেরা গোয়া ছাড়িতে বাধ্য হইবে, যেরূপে ইংরেজ ১৯২৯ সনে ইরাক ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিল ও যে কারণে ফ্রান্স সিরিয়া ও লেবানন হইতে উহার কিছুদিন পূর্ব্বে সরিতে বাধ্য হইয়াছিল।

মূলকথা গোয়াবাসীদিগের মনের জোর ও কার্য্যক্ষমতার উপর সবকিছুই নির্ভর করে।

আমাদের এখানে সত্যাগ্রহী হত্যার প্রতিবাদে হরতাল দেশ-ব্যাপী হইয়াছিল। ইহা স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু হরতাল কয়েক স্থলে যেভাবে হয় তাহাতে মনে হয় হরতাল যাঁহারা ঘোষণা করিয়াছিলেন তাঁহাদের দলের হয় দেশের শাসনতন্ত্রকে বিপদগ্রস্ত করার ইচ্ছা ছিল, নহিলে দেশের জনগণের উপর তাঁহাদের কোনও নৈতিক প্রভাব নাই। বোম্বাইয়ে স্বেচ্ছাচারের চূড়ান্ত হইয়া শেষ

পর্য্যন্ত গুলি চলে। কলিকাতায় অসংখ্য নিরীহ যাত্রী হাসপাতালে রোগী লইয়া যাইতে বা ঐরূপ অত্যাবশ্যক কাজে যাইতে অশেষ নিগ্রহ পাইয়াছে। ট্রেনে দীর্ঘপথের যাত্রীদিগেরও লাঞ্ছনার অন্ত ছিল না। ইহা বড়ই দুঃখকর।

ক্ষোভ ও শোক প্রকাশের পথ নানাপ্রকার আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে দেশের লোকের, বিশেষতঃ এক শ্রেণীর বেকার লোকের যেরূপ মনোবৃত্তি তাহাতে হরতাল বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া করা উচিত। একদিনের হরতালের ফলে বহুলোক যেভাবে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাতে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই এ বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

গোয়ার প্রতিক্রিয়া

গোয়া পরিস্থিতি ক্রমশঃ সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে এবং পর্ত্তুগীজদের বর্ব্বরতা ভারতে ইংরেজের অত্যাচারকেও বোধ হয় ছাড়াইয়া গিয়াছে। অবশ্য ইংরেজদের সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য ছিল, কিন্তু পর্ত্তুগীজদের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির বালাই কোনও দিন ছিল না। তাহাদের ইতিহাস বলে যে তাহারা ছিল জলদস্যু, সামুদ্রিক লুঠতরাজ ছিল ঐ জাতির প্রধান উপজীবিকা। পূর্ব্বপুরুষদের দস্যুতার এবং বর্ব্বরতার রক্ত এখনও তাহাদের ধমনীতে বর্ত্তমান, সেইজন্য গোয়াতে নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহীদের উপর গুলীচালনার বর্ব্বরতায় সভ্যজগৎ স্তম্ভিত হইলেও পর্ত্তুগীজরা ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের উপর মেশিনগানের গুলী চালনার পিছনে কোন কৈফিয়ৎ কিংবা অজুহাত থাকিতে পারে না।

পর্ত্তুগীজদের গোয়া এবং অন্যান্য ভারতীয় উপনিবেশ ভারতের অঙ্গাঙ্গী অংশ। ইতিহাসের নজির টানিয়া ভারতে উপনিবেশ বজায় রাখার চেষ্টা নিরর্থক—অদূরভবিষ্যতে পর্ত্তুগীজদের গোয়া প্রভৃতি ত্যাগ করিতেই হইবে। পর্ত্তুগীজদের গোঁয়ার্তুমি ও মূর্খতা এই যে তাহারা ইতিহাসের নির্দ্দিষ্ট গতিকে উল্টাইবার অপচেষ্টা করিতেছে। ইহাও অবশ্য প্রতীয়মান হয় যে, পর্ত্তুগীজদের গোঁয়ার্তুমির পিছনে অন্যান্য দেশের উস্কানি এবং সমর্থন আছে। ইংরেজ যেখানে তাহার বিরাট ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করিয়া গেল; ফ্রান্স যখন তাহার ভারতীয় উপনিবেশ ছাড়িয়া দিল তখন পর্ত্তুগীজদের বুঝা উচিত ছিল যে তাহাদের দিনও ফুরাইয়া আসিতেছে। এইটুকু তাহাদের বুঝা উচিত যে গোয়া, দমন এবং দিউ পর্ত্তুগীজদের পৈতৃক জমিদারী নয়।

নেহরু সরকার এই ব্যাপারে বিব্রত এবং সমস্যার সম্মুখীন। নেহরু লোকসভায় ১৬ই আগষ্ট যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে বলিয়াছেন যে, স্বাধীনতা দিবসে সত্যাগ্রহীদের উপর গুলী চালনা এই ব্যাপারের শেষ সূচনা করে না। অর্থাৎ, গোয়া অভিযান চলিতে থাকিবে সত্যাগ্রহীদের দ্বারা এবং তাহার ফলে আরও নৃশংস এবং বীভৎস ঘটনা ঘটিতে পারে। পণ্ডিত নেহরু পরিষ্কার ভাবে বলিয়া দিয়াছেন যে যুদ্ধের দ্বারা তিনি গোয়া সমস্যার সমাধান করিতে নারাজ। দ্বিতীয়তঃ, তিনি গোয়ায় পর্ত্তুগীজদের বর্ব্বরতা সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক অভিমতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন। পণ্ডিত নেহরু আজ বিষম সমস্যার সম্মুখীন—একদিকে তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত শান্তিকামী বলিয়া আন্তর্জাতিক সুনাম, আর অন্য দিকে সমগ্র দেশের স্বার্থ এবং সম্মান বিজড়িত। তিনি রাশিয়া ভ্রমণের পর যে সুনাম লইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে কংগ্রেস দলের যে সঙ্ঘবদ্ধতা ও প্রতিষ্ঠা সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা আজ বাধাগ্রস্ত। বিপক্ষ দলসমূহের ভাঙ্গন ধরিয়া গিয়াছিল, এবং রাজনীতিতে তাহারা বেকার হইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ যেন মরা গাঙে বান ডাকার মত এই সকল খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত রাজনৈতিক দলগুলি একজোট হইয়া উঠিয়াছে এবং গোয়ার ব্যাপারে খুব সক্রিয় হইয়াছে। পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন যে গোয়াতে সত্যাগ্রহী আন্দোলন চলিতে থাকিবে, কিন্তু এ অবস্থা বেশীদিন চলিতে পারে না। দিনের পর দিন নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীরা দলে দলে গুলীবিদ্ধ হইয়া হত হইবে—ইহা অবাঞ্ছনীয়।

পণ্ডিত নেহরু যে আন্তর্জাতিক অভিমতের কথা বলিয়াছেন তাহার বাস্তব মূল্য কতটা তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। কাশ্মীর ব্যাপারে স্পষ্টই দেখা গিয়াছে আন্তর্জাতিক অভিমতের মূল্য কতখানি। এবং ইহাও দেখা গিয়াছে যে, কাজের সময়ে ভারতের পক্ষে কোন আন্তর্জাতিক অভিমতের সমর্থন থাকে না, আন্তর্জাতিক অভিমত যদি ভারতের দিকে থাকিত তাহা হইলে বহু পূর্ব্বে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হইয়া যাইত। আর পণ্ডিত নেহরু যাহাকে আন্তর্জাতিক অভিমত বলিয়াছেন সে অভিমতের স্বরূপ কি এবং সে অভিমত কাহাদের? আন্তর্জাতিক অভিমত বলিতে এখন তিনটি দেশের অভিমত বুঝায় এবং এই তিনটি দেশ হইতেছে আমেরিকা, ব্রিটেন ও রাশিয়া। বর্ত্তমানে বিশ্ব বলিতে মাত্র এই তিনটি দেশকে বুঝায়; কিংবা আরও সঠিক ভাবে বলিতে গেলে বর্ত্তমান বিশ্বে আছে শুধু দুইটি দেশ— আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া। ব্রিটেন তাহার জমিদারী খোওয়াইয়া আমেরিকার উপগ্রহ হইয়া আমেরিকার পিছেই ঘুরিতেছে। সুতরাং এই বিশ্বের অভিমতের স্বরূপ কি? এক কথায় বলিতে গেলে ইহার স্বরূপ ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে। আমেরিকার অভিমত নিঃসন্দেহে ভারতের বিপক্ষে, অন্ততঃ পক্ষে নয়। বাকী থাকে শুধু রাশিয়া। রাশিয়া যদিও সম্প্রতি ভারতের সহিত মন দেওয়া-নেওয়া করিয়াছে, কিন্তু মিতালি কতখানি ঘনিষ্ঠ সে সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কাশ্মীরের ব্যাপারে দেখা গিয়াছে যে, সে নিষ্ক্রিয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে ডালেস বলিয়াছিলেন যে, গোয়া উত্তর আটল্যান্টিক সন্ধি সংস্থার অন্তর্গত (NATO); যদিও এ সম্বন্ধে পরিষ্কার করিয়া আর কিছু বলা হয় নাই। পর্ত্তুগালের অন্ততঃ সে ধারণা আছে যে, গোয়া যদি ভারতবর্ষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় তাহা হইলে

NATO শক্তিবর্গ পর্ত্তগালের সপক্ষে অস্ত্রধারণ করিবে এবং সে ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের উপর গুলী করিতে সাহস পাইতেছে। গোয়ার অত্যাচারে ভারতের জনমত বিক্ষুব্ধ। বোম্বাইতে সভা-সমিতি নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে পনর দিনের জন্য। বোম্বাই প্রদেশে গোয়াতে গুলী চালনার জন্য বিক্ষোভ দেখানোর অজুহাতে উচ্ছৃঙ্খলতা চলার ফলে ১৬ই আগষ্ট পুলিসকে গুলী চালাইতে হইয়াছে। গোয়ার সত্যাগ্রহ চলিতে থাকিলে তাহাদের উপর পর্ত্তগীজ সরকারের গুলীও চলিতে থাকিবে, ফলে ভারতের আভ্যন্তরিক গোলযোগ ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর হইতে থাকিবে এবং ইহা সর্ব্বতোভাবে বন্ধ করিতে হইবে। পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন যে পর্ত্তগালে সম্প্রতি কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়াছে যাহাতে গোয়ার মুক্তির আশু সম্ভাবনা আছে। পর্ত্তগালে জনমত নাকি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে গোয়াকে মুক্তি দেওয়ার সপক্ষে। পণ্ডিতজীর যদি এ সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে ১৯৪৭-৪৮ সনে ভারত সরকার এই সকল উইচিপির মত বিদেশী উপনিবেশগুলি ভারতবর্ষ হইতে ঝাঁট দিয়া ফেলিতে পারিতেন। বিগত ছয়-সাত বৎসরে পৃথিবীর প্রধান প্রধান শক্তিবর্গের সম্বন্ধের রূপান্তর ঘটিয়াছে। সেইজন্য ছয়-সাত বৎসর পূর্ব্বে ভারতের বৈদেশিক প্রীতি কিছু কম থাকিলে দেশের উপকার হইত। আমরা অবশ্য গোয়ার জন্য তৃতীয় মহাযুদ্ধের আহ্বান করিতে চাই না।

লোকসভায় গোয়া

লোকসভায় গোয়া সম্পর্কে এতাবৎ পণ্ডিত নেহরু যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :

নয়াদিল্লী, ১৭ই আগষ্ট—গোয়ার ব্যাপারে বিক্ষুব্ধ জনতার আক্রমণে গতকল্য বড় বড় শহর, বিশেষতঃ বোম্বাইস্থ বিদেশী দূতাবাসসমূহের যে ক্ষতি হইয়াছে প্রধানমন্ত্রী নেহরু তজ্জন্য পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দানের প্রস্তাব আজ লোকসভায় করিয়াছেন।

পর্ত্তগীজ উপনিবেশসমূহের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে বিবৃতিদান প্রসঙ্গে শ্রীনেহরু জনতার উচ্ছৃঙ্খলতার নিন্দা করেন। বিদেশী দূতাবাসসমূহের উপর যে আক্রমণ চলিয়াছে তজ্জন্য প্রধানমন্ত্রী গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন।

শ্রীনেহরু বলেন যে, পর্ত্তগীজ সরকার সত্যাগ্রহীদের হত্যা করিয়াছেন শুনিয়া গতকল্য কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ ও অন্যান্য স্থানে বিরাট বিক্ষোভ দেখা যায় এবং এই সকল অঞ্চলের পর্ত্তগীজ দূতাবাসসমূহ জনতার আক্রমণের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। বোম্বাইস্থ ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনারের অফিসের উপর জনতার হামলা পড়ে। অফিসের এক জন কর্ম্মচারী লাঞ্ছিত হন এবং কয়েকটি জানালার শার্শি ভাঙিয়া যায়।

সেক্রেটারীয়েট ভবনের সম্মুখে যে বিক্ষোভ দেখা যায় শ্রীনেহরু এই প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ করিয়া বিক্ষিপ্ত হিংসাত্মক কার্যের নিন্দা করেন এবং বলেন যে, ইহার ফলে গোয়ার শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। জনতার উচ্ছৃঙ্খলতার নিন্দা করিয়া শ্রীনেহরু বলেন, বাজারের হট্টগোল শুনিয়া যেভাবে কার্য্য করা হয় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাপারেও সেইভাবে কার্য্য করা হইলে সরকার ও জনসাধারণের দুর্নাম হইবে।

ভারতে যেসব কূটনৈতিক দূতাবাস রহিয়াছে সেইগুলির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য শ্রীনেহরু জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইয়া বলেন যে, ইহা না করিলে বিদেশস্থ ভারতীয় দূতাবাসগুলি সম্মান পাইবে না।

তিনি বলেন যে, উচ্ছৃঙ্খল জনতা বিদেশী দূতাবাসসমূহে আক্রমণ চালাইয়াছে বলিয়া বিদেশে যদি সংবাদ প্রচারিত হয় তাহা হইলে গোয়ার অহিংস ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে বলিয়া তিনি আশঙ্কা করিতেছেন।

সবাই মহলের ধারণা যে, গোয়ার পর্ত্তগীজ শাসন অপেক্ষা ভারত সরকারের গোয়া সংক্রান্ত নীতির জন্য অনেকে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীনেহরু বলেন যে, কূটনৈতিক দূতাবাসগুলিকে আন্তর্জাতিক সম্মান দেখাইতে হইবে এবং দেশের মধ্যে নিরাপদ রাখিতে হইবে।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু গোয়ার ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলেন, নির্ভরযোগ্য সূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ১৫ই আগষ্ট পর্ত্তগীজ পুলিসদের গুলি বর্ষণের ফলে চৌদ্দ জন সত্যাগ্রহী মারা গিয়াছেন এবং তের জন মারাত্মকভাবে আহত হইয়াছেন ও কুড়ি জন নিখোঁজ হইয়াছেন। এই কুড়ি জনের মধ্যে সম্ভবতঃ কয়েকজন হাসপাতালে আছেন এবং কয়েকজনকে আটক রাখা হইয়াছে। ১৫ই আগষ্ট ১৭১১ জন সত্যাগ্রহী গোয়া এবং ১২৪৪ জন সত্যাগ্রহী দমন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রত্যাবর্ত্তনের যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে মৃতদেরও ধরা হইয়াছে। মাপুসাগোয়া ও সন্নিহিত এলাকায় গোয়ার নাগরিকরা বার বার সত্যাগ্রহ করে। ইহাদের ছয়জন লইয়া গঠিত একটি করিয়া দল ভারতীয় পতাকা সহ সত্যাগ্রহ করে। তাহাদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং মারাত্মকভাবে প্রহার করা হয়। সারাদিন বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় এবং বাজারের সম্মুখে, প্রধান প্রধান সড়কে, পৌরসভার নিকট, মডেল হাই স্কুলের সম্মুখে এবং তত্রত্য ময়দানে সত্যাগ্রহ করা হয়। গোয়ার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও গ্রেপ্তার করা হয়। ১৪ই ও ১৫ই আগষ্ট বহু বিশিষ্ট গোয়াবাসীকে গ্রেপ্তার করিয়া প্রহারের পর তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মোট ৭০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই দুই গোয়ার নাগরিকরা বহু স্থানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে ও 'জয় হিন্দ' প্রাচীরপত্র লাগাইয়া দেয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, স্বাধীনতা দিবসে গোয়ার ভিতরে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা যায়।

শ্রীনেহরু বলেন, এই বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছে। বাজার হইতে যদি তাঁহাদের আন্তর্জাতিক নীতি বদলাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে দায়িত্বশীল ব্যক্তির পক্ষে তাহা মানিয়া চলার অসুবিধা রহিয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ভারতস্থ বিদেশী দূতাবাসগুলির

নিরাপত্তা সম্পর্কে ভারত সরকার যদি দেশবাসীর উপর নির্ভর করিতে না পারেন তাহা হইলে তাহা দেশের পক্ষে খুব ভাল কথা নহে। ইহার পরিণাম খুবই শোচনীয় হইবে। এই বিষয়ে লোকসভার সদস্যগণ আমার সহিত একমত হইয়া নিশ্চয়ই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিবেন এবং ইহা যাহাতে না ঘটে তাহাই চাহিবেন।

কম্যুনিষ্ট পার্টির সহকারী নেতা শ্রীহীরেন মুখার্জি নেহরুজীর বক্তৃতা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, প্রধানমন্ত্রী যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহার ফলে কয়েকটি প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছে এবং ইহা লোকসভায় আলোচিত হওয়া উচিত বলিয়া তিনি মনে করেন। তিনি বলেন যে, বিদেশী দূতাবাসসমূহের উপর হামলা নিশ্চয়ই কেহ পছন্দ করেন না।

লোকসভার স্পীকার শ্রীমবলঙ্কর ইহার উত্তরে বলেন যে, প্রয়োজন হইলে পরে শান্ত পরিবেশে এই সম্পর্কে আলোচনা হইতে পারে। এখন উত্তেজিত অবস্থায় এই সম্পর্কে আলোচনা করা উচিত হইবে না। সঠিক তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ করিতেও সরকারের কিছুদিন সময় লাগিবে। আলোচনা প্রয়োজন কিনা পরে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা হইবে।

শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের উপর কোন সরকারের পক্ষে গুলী চালনা করা যুক্তিসঙ্গত কি না, শ্রীনেহরু বিশ্ব জনমতের সমক্ষে এই প্রশ্নটি উত্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আন্তর্জাতিক আচরণ রীতির পক্ষে এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সমগ্র বিশ্বকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, পর্তুগীজদের এই আচরণ চরম নৃশংস ও বর্ব্বরোচিত।

শ্রীনেহরু বলেন, ইহা কাহিনীর শেষ নহে। দিনের পর দিন অন্যান্য ঘটনা ঘটিয়াছে এবং যত দিন লক্ষ্যে না পৌঁছান যায়, তত দিন ঘটিবে।

তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণভাবে গোয়া সমস্যা সমাধানের যে নীতি ভারত গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই অনুসৃত হইবে।

পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের কোন কার্য্যের দ্বারা ভারত সরকার তাঁহাদের নীতি হইতে বিচ্যুত হইবেন না। সরকার যাহা অন্যায় বলিয়া মনে করেন পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের প্ররোচনা সত্ত্বেও তাঁহারা তাহা করিবেন না। অদ্য লোকসভায় এক বিবৃতিদান প্রসঙ্গে শ্রীনেহরু উপরোক্ত মর্ম্মে ঘোষণা করেন।

গতকল্য গোয়ায় পর্তুগীজদের গুলীতে নিহত সত্যাগ্রহীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য অদ্য লোকসভার অধিবেশন অর্দ্ধঘণ্টাকাল স্থগিত রাখা হয়। ইহার পূর্ব্বে সদস্যরা মৌনাবলম্বন করিয়া দুই মিনিট দাঁড়াইয়া থাকেন।

বিবৃতি প্রসঙ্গে শ্রীনেহরু বলেন, গতকল্য যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহার যথার্থ বিবরণ দেওয়া তাঁহার পক্ষে খুবই কঠিন। কারণ কেবলমাত্র সীমান্ত হইতে ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করা গিয়াছিল, কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিক অবশ্য সেখানে ছিলেন। কিন্তু পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ কোন ভারতীয় সাংবাদিককে প্রবেশ করিতে দেন নাই।

শ্রীনেহরু বলেন, ক্যাসলরক অঞ্চলে একটি সুড়ঙ্গের মধ্যে নিহতের সংখ্যা সম্ভবতঃ আরও অধিক হইবে। সত্যাগ্রহীরা একটি রেলওয়ে সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। একটি বাঁক অতিক্রম করা মাত্র তাঁহারা অবিচ্ছিন্ন গুলী বর্ষণের সম্মুখীন হন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে মাটিতে পড়িয়া যান—কেহ নিহত ও কেহ আহত অবস্থায়। কয়জন নিহত এবং কয়জন আহত হইয়াছেন তাহা জানা খুবই কঠিন। আর একটি মুশকিল ব্যাপার এই যে, যাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেককে হটাইয়া দেওয়া হয় এবং কেহ কেহ গুলী চালনার পর ফিরিয়া আসেন কিন্তু পর্তুগীজরা কিছু সংখ্যক লোককে গ্রেপ্তার করিয়া আটক করিয়া রাখে। যাঁহাদের আটক করিয়া রাখা হইয়াছে, তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। পর্তুগীজরা তাঁহাদের গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছে, কোন কোন ক্ষেত্রে এইরূপ আশঙ্কা করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সত্যাগ্রহীরা গোয়া এবং দমনের নানা স্থানে প্রবেশ করেন। যতদূর জানা গিয়াছে, দিউয়ে কোন গুলী চালনা হয় নাই। ৮১জন লোক সেখানে গিয়াছেন এবং তাঁহারা সেখানেই আছেন বলিয়া মনে হয়। তবে তাঁহাদের কি হইয়াছে তাহা ঠিক বলা চলে না।

শ্রীনেহরু বলেন, সরকারের নিকট সর্ব্বশেষ যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে আটশত জন সত্যাগ্রহী এখনও গোয়া এলাকায় রহিয়াছেন। আজ সকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই বা তাঁহাদের সীমান্তে নিক্ষেপ করাও হয় নাই। গোয়ায় প্রবেশকারী সত্যাগ্রহীর সংখ্যা দুই সহস্রাধিক হইবে।

শ্রীনেহরু শ্রীমতী সুভদ্রা সাগরের অসীম সাহসিকতার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, যে কোন ব্যক্তির—তিনি ভারতীয় না হইলেও—ইহাতে গর্ব্ববোধ করা উচিত। ভারতীয়েরা ত আরও গর্ব্ববোধ করিবেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, অপরপক্ষে যে সকল বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে সংযত ভাষা ব্যবহারের চেষ্টা করিয়াও আমি বলিব, পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের আচরণ চরম নৃশংস এবং বর্ব্বরোচিত হইয়াছে। সত্যাগ্রহীরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ছিলেন বলিয়াই আমি জানি।

সত্যাগ্রহীদের বিরুদ্ধে পর্তুগীজরা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন, ইহা ঠিক। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ জনগণের উপর কোন সরকারের পক্ষে গুলী চালনা করা কতখানি যুক্তিসঙ্গত? এই প্রশ্নটি শুধু গোয়ার ক্ষেত্রে নহে বৃহত্তর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রীনেহরু বলেন, যতদূর জানা গিয়াছে, সত্যাগ্রহীদের হস্তে কোন অস্ত্র ছিল না, তাঁহাদের পক্ষে কাহাকেও আক্রমণের প্রশ্নই উঠে না। বস্তুতঃপক্ষে কয়েকটি ঘটনার বিবরণে বলা হইয়াছে যে, সত্যাগ্রহীরা মাটিতে বসিয়াছিলেন, পর্তুগীজ পুলিসরা চেয়ারে উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের গুলী করে। আন্তর্জাতিক আচরণ রীতির পক্ষে ইহা এক অতি অস্বাভাবিক ব্যাপার। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি শুধু লোক-

সভার সদস্যগণ এমনকি দেশবাসীকে উদ্দেশ্য করিয়াও ইহা বলিতেছি না, আমি বিশ্ববাসীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছি যে, এইরূপ আচরণ চরমতর নৃশংস ও বর্ব্বরোচিত।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার এ যাবৎ যে নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন পরিপূর্ণরূপে তাহাই অনুসরণ করিবেন। এ সম্পর্কে সভা অবশ্য তাহার মত সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে পারে।

অবশ্য নীতির কিছু রদবদল হইতে পারে কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবে গোয়া সমস্যার সমাধানের মূল নীতি হইতে তাঁহারা বিচ্যুত হইবেন না এবং তাঁহারা অস্ত্রধারণের পন্থাও অবলম্বন করিবেন না।

আমরা যে ব্যবস্থা অবলম্বন করি এবং যাহা যাহা ঘটিবে সে সম্বন্ধে আমি সদস্যগণকে ওয়াকিবহাল রাখিব।

যাঁহারা এই ব্যাপারে নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি আমরা সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। এই সভার সদস্য সকলেই যে তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন তাহাতে সন্দেহ নাই। এ সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদিগকে ধীরভাবে এবং ব্যাপারটিকে উহার যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করিতে হইবে।

গবর্ণমেণ্ট এবং লোকসভাকে যেমন মর্য্যাদাবোধের সহিত তেমনি দৃঢ়তার সহিত এ ব্যাপারে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। আবেগ বশে এমন কিছু করা উচিত নয় যাহা এই মর্য্যাদাবোধের পরিপন্থী।

নয়াদিল্লী, ১৮ই আগষ্ট—গোয়া পরিস্থিতি সম্পর্কে লোকসভায় বিতর্ক সুরু করাইবার জন্য বিরোধী দল আজ ব্যর্থ চেষ্টা করেন।

পর্তুগীজ সরকার ১৫ই আগষ্ট গোয়ায় দমন ও নিপীড়ন অত্যাচার চালাইবার ফলে ভারতে যে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা যায় এবং যে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সহকারী নেতা অধ্যাপক হীরেন মুখার্জ্জী আজ তৎসম্পর্কে মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

অধ্যাপক মুখার্জ্জি বলেন যে, তিনি দুইটি প্রশ্নের ভিত্তিতে প্রস্তাবটি উত্থাপন করিতেছেন। প্রথমতঃ, দেশব্যাপী বিক্ষোভের দ্বারা জনসাধারণের মনোভাব ব্যক্ত হইতেছে এবং দ্বিতীয়তঃ, সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করা হইতেছে না। সুতরাং আরও বহু লোক গোয়া যাইবেন। সরকার এই সম্পর্কে উদাসীন আছেন বলিয়া জনসাধারণ দোষারোপ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের উচিত এই বিষয়ে তাঁহারা কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন তাহার আভাস দেওয়া।

স্পীকার মুলতুবী প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া বলেন যে, তিনি দেশব্যাপী বিক্ষোভের কথা শোনেন নাই। দেশে হয়ত বিক্ষোভ হইয়াছে কিন্তু ইহার ফলে এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই যাহার জন্য এখানে আলোচনার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন যে, গোয়া সম্পর্কে ভারত সরকারের সাধারণ নীতি কি তিনি তাহা সব সময়েই যে আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছেন তাহা কয়েকদিন পূর্ব্বেই তিনি ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, বিরোধী দল অথবা বেশ কিছুসংখ্যক সদস্য যদি সরকারের গোয়া সংক্রান্ত মূল নীতি আলোচনা করিতে চাহেন তাহা হইলে তিনি তাহা করিতে প্রস্তুত আছেন। কারণ বিষয়টির আন্তর্জাতিক গুরুত্ব রহিয়াছে এবং দেশের বা সরকারের মূলনীতি কি তাহা সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হওয়া উচিত।

এইরূপ আলোচনা কিছুদিন পরে হইলে ভাল হয় বলিয়া তিনি মনে করেন। বর্ত্তমানে উত্তেজনার সময় বিষয়টি আলোচিত হইলে ইহার গুরুত্ব হানি হইতে পারে। এই বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে সদস্যদের উপর নির্ভর করিতেছেন বলিয়া তিনি জানান।

শ্রীনেহরু আরও বলেন যে, এই বিষয়ে দেশের প্রকৃত মনোভাব কি তৎসম্পর্কে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্নটি শুধু দেশের দিক হইতে নহে, আন্তর্জাতিক দিক হইতেও জটিল।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম

এই আগষ্টের "নিউইয়র্ক টাইমস" লিখিতেছেন যে, জেনেভায় বৃহৎ চতুঃশক্তি সম্মেলনের শেষে বৃহৎ শক্তি চতুষ্টয়ের নেতৃবৃন্দ এইরূপ আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে যদি জেনেভা সম্মেলনের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা কাজ চালাইতে পারেন তবে অদূর ভবিষ্যতেই বর্ত্তমানের "আশাপূর্ণ সম্ভাবনা" বাস্তবে পরিণত হইতে পারে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্বশক্তিবর্গ তাঁহাদের আশা কার্য্যে পরিণত করিতেছেন। দূর প্রাচ্যের ক্ষেত্রেই সর্ব্বপ্রথম "জেনেভার প্রেরণা"র (spirit of Geneva) পরীক্ষা হইতেছে সূচনা আশাপ্রদ। জেনেভাতেই সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কম্যুনিষ্ট চীনের রাষ্ট্রদূতগণ উভয় দেশের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয় লইয়া আলোচনার জন্য মিলিত হইয়াছেন। প্রারম্ভেই সংঘাতের একটি প্রধান কারণ অপসারিত করিয়া পিপিং (পিকিং-এর পূর্ব্বতন নাম—অর্থাৎ চীন সরকার) এগার জন মার্কিন বৈমানিককে মুক্তি দিয়াছে। বৃহৎ শক্তিচতুষ্টয়ের সম্পর্কের মধ্যেও বুঝাপড়ার মনোভাব সুস্পষ্ট। জেনেভা সম্মেলন সম্পর্কে মার্শাল বুলগানিন একটি সংযত বিবরণী দিয়াছেন। যদিও প্রথমে আইসেনহাওয়ার পরিকল্পিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে সামরিক সংস্থাগুলির পারস্পরিক পরিদর্শন ব্যবস্থাকে তিনি সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হইয়াছিল তথাপি প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার উহাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান বলিয়া ধরিয়া লন নাই এবং মার্শাল বুলগানিনও ত্বরান্বিত হইয়া বলেন যে ঐরূপ কোন ধারণা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না।

এই অবস্থায় পৃথিবীর বর্ত্তমান এবং অদূর ভবিষ্যৎ আবহাওয়াকে "সুন্দর এবং চিরবসন্তভুল্য" (fair and continued warm) বলা চলে। তথাপি ইহা পরিষ্কার যে মুক্ত এবং কম্যুনিষ্ট দেশগুলির মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্যগুলির সমাধান কেবলমাত্র আবহাওয়া এবং মনোভাব দ্বারা সম্ভব হইবে না তাহার জন্য সকল দিক হইতেই জাতীয় নীতি সম্পর্কিত নূতন এবং মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

পত্রিকাটি লিখিতেছেন, যদিও পাকিস্থানী সরকার বলিয়াছেন যে, নিতান্ত অর্থনৈতিক কারণেই পাকিস্থানী টাকার মূল্য হ্রাস ঘটানো হইয়াছে তথাপি রাজনৈতিক ঘটনাবলীর উপর উহার বিশেষ প্রভাব পড়িতে বাধ্য। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ষ্টার্লিং এলাকার অন্যান্য দেশের সহিত তাল রাখিয়া ভারতবর্ষ যখন মুদ্রামূল্য হ্রাস করে তখন পাকিস্থানী টাকার মূল্য হ্রাস না করায় ভারত বিশেষ প্রতিবাদ জানায় এবং উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যের সঙ্কোচ ঘটে। পাকিস্থানী টাকার মূল্য হ্রাস করিয়া সরকার সম্প্রতি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে উভয় দেশের বাণিজ্যের উন্নতি ঘটিবে এবং অর্থনৈতিক জঙ্গীবাদ (economic chauvinism) সম্পর্কে ভারতের অভিযোগের উত্তর দেওয়া হইবে। ইহাতে ভালই হইবে।

"নিউ ইয়র্ক টাইমসে"র উপরোক্ত সম্পাদকীয় স্পষ্টতঃই পাকিস্থানের বর্ত্তমান মন্ত্রীসভা গঠিত হইবার পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। পাকিস্থানের সর্ব্বশেষ রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ১৩ই আগষ্ট "ভিজিল" লিখিতেছেন, সাধারণ লোকের নিকট পাকিস্থানী রাজনীতি একটি গোলকধাঁধার ন্যায় দুর্ব্বোধ্য। ক্ষমতালাভের জন্য বিভিন্ন দল ও উপদলের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে তাহার শেষ ফলাফল যাহাই হউক না কেন একটি জিনিষ খুব পরিষ্কার হইয়াছে যে, কেহই সাধারণের কল্যাণ বা অনুরূপ কোন নীতির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে না। গোলাম মহম্মদের স্থলে জেনারেল মির্জ্জার নিয়োগে রাজনৈতিক ক্ষমতার কোন হস্তান্তর হইল কিনা তাহা বলা শক্ত। তবে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গোলাম মহম্মদ যখন দুই মাস যাবৎ বিদেশে অবস্থান করিতেছিলেন তখন একজন অস্থায়ী গবর্ণর-জেনারেলের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় নাই—দেখা দিল যখন তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন তাহার পর। মনে হয় কেবলমাত্র গবর্ণর-জেনারেলের কাজের চাপ হইতে গোলাম মহম্মদকে মুক্তি দেওয়াই এই পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয় না বরং উহাতে তাঁহার রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ হইতে অবসর গ্রহণের—অন্ততঃ তাহার সূচনারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অবশ্য ইহাতে এই কথাই বুঝায় না যে, তাঁহার পরবর্ত্তী গবর্ণর-জেনারেল ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে গোলাম মহম্মদের সমকক্ষ হইবেন। যদিও জেনারেল মির্জ্জা গোলাম মহম্মদের মনোনীত ব্যক্তি তথাপি দলের উপর গোলাম মহম্মদের যে ব্যক্তিগত প্রভাব ছিল জেনারেল মির্জ্জার তাহা নাই।

পাকিস্থানের দ্বিতীয় প্রধান রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন প্রধানমন্ত্রী বদল। যখন মহম্মদ আলির পরিবর্ত্তে চৌধুরী মহম্মদ আলি লীগ দলের নেতা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন তখন প্রথমে মনে হইয়াছিল যে, পূর্ব্ব-পাকিস্থানের সংযুক্ত ফ্রন্টের সহিত মিঃ মহম্মদ আলি মন্ত্রীসভা গঠনের যে আলাপ-আলোচনা চালাইয়াছিলেন তাহার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপিত হইল। তখন সুরাবর্দ্দীর প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভের সম্ভাবনা বিশেষ সমুজ্জ্বল বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনাবলীতে দেখা গেল প্রধানমন্ত্রীরূপে সুরাবর্দ্দীর অধিষ্ঠান সম্পর্কে মুসলীম লীগ দলের মধ্যে বিশেষ অনিশ্চয়তা রহিয়াছে এবং মিঃ সুরাবর্দ্দীকে ক্ষমতার গদী হইতে দূরে সরাইয়া রাখিবার জন্য সংযুক্ত ফ্রন্ট অনেক দাবি পরিত্যাগ করিতেও প্রস্তুত।

পাকিস্থানে বৈদেশিক সাহায্য

১৯৫০-৫১ হইতে ১৯৫৪-৫৫ এই পাঁচ বৎসরে পাকিস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিকট হইতে ১৫৬০ লক্ষ ডলার (৭৮ কোটি টাকা) আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে। তাহা ছাড়া ১৯৫৩-৫৪ সনে পাকিস্থানের খাদ্যসঙ্কটের তীব্রতা হ্রাসের জন্য মার্কিন সরকার ৭ লক্ষ টন গম সাহায্য হিসাবে দিবার সিদ্ধান্ত করেন; তন্মধ্যে পাকিস্থান কার্য্যতঃ ৬ লক্ষ ১০ হাজার টন গম আমদানী করে। প্রায় ৫০টি পরিকল্পনা সংস্থা পরিচালনা সম্পর্কে পাকিস্থান এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে।

১৯৫৩-৫৪ সনে পাকিস্থানের বহির্বাণিজ্যে বিশেষ ঘাটতি পড়ে। ঐ ঘাটতি হইতে পরিত্রাণের জন্য পাকিস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিকট আশাতীত আর্থিক সাহায্য (extraordinary economic assistance) প্রার্থনা করে। পাকিস্থানের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে ১৯৫৪ সনের আগষ্ট মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে হেনরী হাইনসের নেতৃত্বে একটি পর্য্যবেক্ষক দল পাঠানো হয়। পাকিস্থান ৭৫ কোটি টাকা সাহায্যের আবেদন জানায়। হাইনসে মিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৫৫ সনের জুন মাসের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্থানকে ৫৫ কোটি টাকা সাহায্য দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই অর্থের মধ্যে ১০ কোটি টাকা ৪০ বৎসরে পরিশোধ করিবার সর্ত্তে ঋণ হিসাবে দেওয়া হইয়াছে।

কলম্বো প্ল্যান অনুযায়ী পাকিস্থান কমনওয়েলথের দেশসমূহ কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড হইতে ১৯৫১-৫২ এবং ১৯৫৪-৫৫ এই চার আর্থিক বৎসরে যে সাহায্য পাইয়াছে তাহার পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে :

	অষ্ট্রেলিয়া	কানাডা	নিউজিল্যাণ্ড
বৎসর	জুলাই-জুন	এপ্রিল-মার্চ	এপ্রিল-মার্চ
(১০ লক্ষ মুদ্রায় হিসাব)			
১৯৫১-৫২	৩·৭৯৪ (অষ্ট্রেলীয় পাউণ্ড)	১০·০০০ (ডলার)	·২৫০ (পাউণ্ড)
১৯৫২-৫৩	—	৯·১০০	·২৫০
১৯৫৩-৫৪	২·০০০	১০·৩০০	·২৫০
১৯৫৪-৫৫	৪·৬৬০	১২·৩০০	·৩৫০

৪০ লক্ষ ডলার (২ কোটি টাকা) এখনও পাওয়া যায় নাই।

১৯৫৩-৫৪ সনে কানাডা হইতে ৫০ লক্ষ ডলার মূল্যের এবং অষ্ট্রেলিয়া হইতে ২০ লক্ষ (অষ্ট্রেলীয়) পাউণ্ড মূল্যের গম সাহায্য পাওয়া যায়।

সম্প্রতি করাচীর কাছিতে একটি সুইডিশ পাকিস্থান ইনষ্টিটিউট

অব টেকনোলজি প্রতিষ্ঠার জন্য সুইডেন সরকার পাকিস্থানকে সাহায্য দিতে সম্মত হইয়াছেন। শীঘ্রই এই সম্পর্কে উভয় দেশের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হইবে।

সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের কারিগরি সাহায্য সম্পর্কিত বিস্তৃত পরিকল্পনা (U. N. Expanded Programme of Technical Assistance) অনুযায়ী পাকিস্থান সরকার ৯০৭,০০০ ডলার সাহায্য পাইয়াছেন। তদুপরি আরও ২০১,৬৩৭ ডলার সাহায্য মঞ্জুর হইয়াছে। সমাজ-কল্যাণ শিক্ষার উন্নতির জন্য সম্প্রতি আরও ৪৮,০০০ ডলার সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

পাকিস্থান রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং অন্যান্য সংস্থা হইতে বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টাদিগেরও সাহায্য লাভ করিয়াছে।

ফোর্ড ফাউণ্ডেশন পাকিস্থানের শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশনের ব্যবহারের জন্য ৭০,০০০ ডলার সাহায্য দিয়াছে। উহা ব্যতীত পাকিস্থান সরকারকে অতিরিক্ত ১৫০,০০০ ডলার সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। এই অর্থে পাকিস্থান পরিকল্পনা বোর্ড বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতাদের ব্যয়ভার বহন করিবে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে একটি কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠার ডিজাইন প্রস্তুত করিবার জন্য ফোর্ড ফাউণ্ডেশন আরও ৪০,০০০ ডলার সাহায্য দেয়।

পাকিস্থানের বৈদেশিক ঋণ

পাকিস্থানের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করিবার জন্য পাকিস্থান সরকার বিভিন্ন দেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্বব্যাঙ্কের নিকট হইতে ১৪ কোটি [illegible]০ লক্ষ টাকা ঋণ লওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া কর্ণফুলী কাগজ কলের জন্য ৪২ লক্ষ ডলার (২ কোটি টাকা) এবং করাচী বন্দরের উন্নতির জন্য ১৩০ লক্ষ ডলার (৬। কোটি টাকা) ঋণের জন্য উক্ত ব্যাঙ্কের সহিত আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। ১৯৫৩-৫৪ সনে গম কিনিবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাঙ্ক হইতে ১৫০ লক্ষ ডলার (প্রায় ৭। কোটি টাকা) ঋণ গৃহীত হয়। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৫৩ সনে যুক্তরাজ্য সরকারের নিকট হইতে ১ কোটি পাউণ্ড (প্রায় ১৩।০ কোটি টাকা) একটি বিশেষ ঋণ পাওয়া যায়। উন্নয়নমূলক সংস্থাগুলির জন্য মার্কিন পারস্পরিক নিরাপত্তা আইন অনুযায়ী ১৯৫৪-৫৫ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ৪০ বৎসরে পরিশোধ করিবার সর্তে ২ কোটি ডলার (প্রায় ১০ কোটি টাকা) ঋণ গ্রহণ করা হয়।

ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনী

বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিবার জন্য সশস্ত্রবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। স্বাধীনতা লাভের পর বিগত আট বৎসরের মধ্যে ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর অগ্রগতির একটি সরকারী বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, দেশবিভাগের পর সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা হ্রাস এবং দায়িত্ব অকস্মাৎ বৃদ্ধি পাইলেও ভারতীয় সৈন্যবাহিনী তাহাদের সমরকুশলতার উচ্চ ঐতিহ্য বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছে, এমনকি তাহার উৎকর্ষ সাধনেও সক্ষম হইয়াছে। সৈন্যদের নিপুণতা বৃদ্ধির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া পরিহার্য ব্যয়সঙ্কোচের জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা চলিয়াছে। "এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে উদ্বৃত্ত দ্রব্যসামগ্রীর ব্যবহার, সেগুলির বিকল্প ব্যবহার উদ্ভাবন, পেট্রোল, তৈল ও লুব্রিকেশনের সামরিক সংস্থা পুনর্গঠন ইত্যাদি। এই সকল ব্যবস্থার ফলে এককালীন ব্যয় ৬ কোটি টাকা এবং পৌনঃপুনিক ব্যয় ৪ কোটি টাকা বাঁচিয়াছে।"

স্বাধীনতা লাভের সময় ভারতীয় নৌবাহিনী অপরিণত অবস্থায় ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে তাহার বিকাশ ঘটিয়াছে। "নাইজেরিয়া" নামক যুদ্ধজাহাজটি "মহীশূর" নামে ভারতীয় বাহিনীর জন্য ব্রিটেনে পুনঃসজ্জিত হইতেছে। ১৯৫৭ সনে উহা কমিশন লাভ করিবে—ঐ জাহাজটিকে "ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সর্কোত্তম যুদ্ধজাহাজগুলির সহিত তুলনা করিলেও কোন রকমেই বিসদৃশ হইবে না।"—অবশ্য সমপর্যায়ের জাহাজের তুলনায়।

একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুসারে ভারতীয় নৌবাহিনীতে ক্রমশঃই আধুনিক ও উন্নত ধরনের জাহাজ সংগ্রহ করা হইতেছে। নৌবাহিনীতে জাহাজ সরবরাহ সম্পর্কে যাহাতে বিদেশের উপর নির্ভরশীল না হইতে হয় সেজন্য ভারতে নৌবাহিনীর উপযুক্ত জাহাজ নির্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। "এই উদ্দেশ্যে বিশাখাপত্তনম্-এর হিন্দুস্থান জাহাজ নির্মাণ কারখানাকে ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য উপকূলে বিচরণকারী একটি জাহাজের নক্সা তৈয়ারি ও উহা নির্মাণ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। নির্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুসারে ডক ইয়াড সম্প্রসারণের কাজ চলিতেছে। ডক ইয়াড সম্প্রসারিত হইলে আমাদের ক্রমবর্দ্ধমান নৌবহরের মেরামতের কাজ সেখানে চলিবে।"

ভারতে নৌবাহিনীর শিক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা সম্ভবতঃ প্রাচ্যের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। উক্ত ব্যবস্থায় ভারতীয় বাহিনী ব্যতীত অন্যান্য দেশের নৌবাহিনীকেও শিক্ষা ব্যাপারে সাহায্য দেওয়া সম্ভব। অবশ্য জাপান যে-কোন দিন আমাদের ব্যবস্থাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে।

ভারতীয় বিমানবাহিনীকেও শক্তিশালীরূপে গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস চলিতেছে। ভারতীয় বিমানবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় বিমান যাহাতে ভারতেই উৎপন্ন করা যায় তজ্জন্য বিদেশী বিমাননির্মাতাদের সহিত আলোচনা চালানো হইতেছে। উল্লেখযোগ্য এই যে ইতিমধ্যেই ভারত এইচ. টি-২ বিমান নির্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। তাহা ছাড়া ভাম্পায়ার জেট বিমানও হিন্দুস্থান বিমান নির্মাণ কারখানায় তৈয়ার হইতেছে। ভারতীয় বাহিনীর জন্য বিভিন্ন ধরনের বিমান প্রয়োজন—মাত্র একটি বিমান কারখানা এবং একটি বিমান ইঞ্জিন কারখানা হইতে সেই প্রয়োজন মিটানো সম্ভব নহে। সেজন্য বিমানবাহিনীকে অন্যান্য দেশের বাহিনীর

সহিত তাল রাখিয়া চলিতে গেলে অন্যান্য দেশ হইতেও সর্বাধুনিক ধরনের বিমান আমদানী করা হয় বলা হইয়াছে। কার্যতঃ এখনও আমরা বহু পশ্চাতে—পাশ্চাত্য জাতিসমূহের তুলনায়।

অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম অধিক পরিমাণে উৎপাদনের সম্ভাবনা বিশদভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া ১৭ হাজার প্রকার দ্রব্য এদেশে প্রস্তুতের সুপারিশ করা হয়। তদনুযায়ী অস্ত্রকারখানা-গুলিতে কয়েক প্রকার দ্রব্য তৈয়ারি আরম্ভ হইয়াছে। ১৯৪৯ সনে আমদানীকৃত সরঞ্জাম পরীক্ষা কমিটি গঠিত হয়। অস্ত্রকারখানাগুলির ডিরেক্টর-জেনারেল এবং সরবরাহ ও বণ্টন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ ঐ কমিটির সদস্য। ঐ কমিটি সরঞ্জাম আমদানীর চাহিদাগুলি পরীক্ষা করিয়া সরঞ্জামসংগ্রহ সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দান করেন।

প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম নির্ম্মাণের অন্যান্য শিল্পও স্থাপন করা হইয়াছে। উহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৯৫৩ সনে প্রতিষ্ঠিত অম্বরনাথের মেশিনটুল প্রোটোটাইপ কারখানা; ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড (রেডিও ও ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম নির্ম্মাণের কারখানা) কারখানা প্রভৃতি।

যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে ধারণা হয় যে, আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সামরিক ক্ষমতাপন্ন হইবার জন্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছি। আমাদের জ্ঞান-বিবেচনায় যাহা পাই তাহাতে কিন্তু ঐ ধারণা সম্পূর্ণ অলীক না হইলেও ভ্রমাত্মক মনে হয়। সামরিক শক্তি হিসাবে আমরা এশিয়ায় তৃতীয় স্থানে। পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় আমাদের শক্তি অকিঞ্চিৎকর।

ভারতীয় জাহাজশিল্প

ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য ভারতীয় জাহাজশিল্পের উন্নয়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ভারত সরকার ভারতীয় জাহাজ-শিল্পের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়াছেন। ভারত সরকার এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় জাহাজী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি লইয়া একটি পর্য্যবেক্ষক কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরি-কল্পনায় জাহাজশিল্প সম্প্রসারণের লক্ষ্য স্থির করিবার ভার এই কমিটির উপর দেওয়া হইয়াছে। পরিকল্পনা কমিশন বর্তমানে কমিটির রিপোর্ট পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন।

আপাততঃ যে লক্ষ্য নির্দিষ্ট আছে তাহাতে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার টন পরিবহনক্ষম ৭২টি নূতন জাহাজ নির্ম্মিত হইবে। মোট ব্যয়ের মধ্যে ৭০ কোটি টাকা দিবেন সরকার এবং ১০ কোটি টাকা দিবেন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি। ভারতীয় জাহাজগুলির পরিবহনক্ষমতা বর্তমানে ৪ লক্ষ ৭০ হাজার টন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই পরি-বহনক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া ছয় লক্ষ টন করিবার ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হইয়াছিল। তদনুযায়ী ভারতে ও বিদেশে ৯৮০০০ টনের জাহাজের অর্ডার দেওয়া আছে। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে আরও প্রায় ৪০০০০ টনের জাহাজের অর্ডার দেওয়া হইবে বলিয়া আশা করা যায়। "কাজেই ভারতীয় মালিকানায় ৬ লক্ষ টনের জাহাজ থাকিবে বলিয়া প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা পূরণ ত হইবেই, উপরন্তু এই সীমা ছাড়াইয়া যাওয়াও বিচিত্র নহে।"

ভারতের উপকূল বাণিজ্যের সমস্ত পণ্য এখন ভারতীয় জাহাজেই বহন করা হয়। কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যে এখনও বিদেশী জাহাজগুলিরই প্রাধান্য থাকিয়া গিয়াছে। যাহাতে বৈদেশিক বাণিজ্যেও ভারতীয় জাহাজেই পণ্য বহন করা যাইতে পারে তজ্জন্য জাহাজ সংগ্রহের নিমিত্ত ভারত সরকার জাহাজী প্রতিষ্ঠানগুলিকে সুবিধাজনক সর্তে ঋণ দিবেন বলিয়া জানাইয়াছিলেন। গত বৎসর এই উদ্দেশ্যে ৮ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছিল।

"আর একটি শিপিং কর্পোরেশন স্থাপনের প্রস্তাবে ভারত সরকার কতকগুলি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা লাভের চেষ্টায় আছেন। এই কর্পোরেশনের সদর কার্য্যালয় হইবে কলিকাতায়। ইহাতে ভারতীয় জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এবং ভারতীয় জাহাজে অধিক পরিমাণ বৈদেশিক বাণিজ্যের পণ্য বহন করা সম্ভব হইবে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে আমাদের বিদেশগামী জাহাজের মোট পরিমাণ দাঁড়াইবে ২৮০,০০০ টন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে [illegible] জাহাজ [illegible] ২৭০,০০০ টন) সংযোজিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।"

নূতন নূতন দ্রুতগামী জাহাজ ক্রয়ের জন্য সরকার [illegible] দিতেছেন। উহা ব্যতীত বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের [illegible] বাণিজ্যচুক্তি সম্পন্ন হইতেছে। তাহাদের যাহাতে ভারতীয় [illegible] মোট মালের কতকাংশ বহন করা হয় সেজন্য [illegible] রাখা হইতেছে।

ভারতের তৈলবাহী জাহাজের একটি বহর গড়িবার প্রথম ধাপ হিসাবে সরকার ৮,৫০০ টনের দুইটি তৈলবাহী জাহাজ ক্রয় করিয়া পরিচালনা করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শীঘ্রই এই জাহাজ দুইটির জন্য অর্ডার দেওয়া হইবে।

জাহাজ শিল্পের উন্নতির জন্য ভারতীয় বন্দরগুলির উন্নয়নের একান্ত প্রয়োজন। সরকার সেদিকেও মন দিয়াছেন। কচ্ছের কান্দলা নামক স্থানে ১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি বড় বন্দর নির্ম্মাণের কার্য ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে। ১৯৫৭ সনে উহার নির্ম্মাণ সম্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ঐ পোতাশ্রয়ে ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টনের জাহাজ ভিড়িবার ব্যবস্থা থাকিবে। ৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, কোচিন, বিশাখাপত্তন—এই পাঁচটি বন্দর উন্নয়নের একটি পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

ভারতীয় সংবাদপত্রজগতে ম্যাকার্থীবাদের অভ্যুদয়

নয়াদিল্লীর কোন কোন সংবাদপত্রে ভারতীয় সাংবাদিকগণ কর্তৃক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সংবাদ পরিবেশনের সমালোচনা করা হইয়াছে। এই সকল সমালোচনার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য আলোচনা

করিয়া কলিকাতার "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকার সাপ্তাহিক রাজনৈতিক ভাষ্যকার "ভেদেত" (ইংরেজী কথাটির অর্থ সহস্রচক্ষু দানব অর্থাৎ সর্বদর্শী) লিখিতেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী নেহরুর চীন এবং রাশিয়া ভ্রমণের পরই যে ভারতীয় সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা তাৎপর্যপূর্ণ। পত্রবিশেষে বলা হইয়াছে যে সাংবাদিকগণ চীন এবং রাশিয়ার প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়া সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন এবং কম্যুনিষ্টদের দ্বারা প্রভাবিত হইবার ফলেই ঐরূপ করিয়াছেন। সাংবাদিকগণ প্রদত্ত সংবাদের গুণ সম্পর্কেও গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া ঐ সকল পত্রপত্রিকায় প্রধানমন্ত্রীর সহিত চীন এবং রাশিয়ায় সফররত সাংবাদিক দলের সভ্যদের মনোভাব ও চিন্তাধারা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে।

"ভেদেত" লিখিতেছেন যে প্রধানমন্ত্রীর সহিত যে সংবাদপত্র-প্রতিনিধিবৃন্দ চীন এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে গিয়াছিলেন তাহাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত অভিযোগের আংশিক কারণ পেশাগত হিংসা। চীন এবং রাশিয়া যাওয়া সকল সাংবাদিকের পক্ষে হইয়া উঠে না। তাহার আংশিক কারণ উক্ত দুই দেশের সরকারের সমালোচনা-অসহিষ্ণুতা। লেখক বলিতেছেন, তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া যায় যে সংবাদপত্রপ্রতিনিধিদল দুইটির সদস্য নির্বাচন যথাযথ হয় নাই। কিন্তু যে বিরূপ সমালোচনা করা হইয়াছে অন্যত্র তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে, এবং দেশের জনসাধারণের ও যে সম্পর্কে অবহিত হইবার সময় হইয়াছে।

"ভেদেত" লিখিতেছেন যে গত কয়েক বৎসর যাবৎ স্বদেশী স্বার্থীদের একটি দল তাহাদের কার্যকলাপ চালাইয়া যাইতেছে। তাহাদের প্রচারের পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের—কখনও-বা গুজব এবং কখনও-বা অপবাদ রটনা করিয়া তাহারা কার্য সিদ্ধি করে। এবং প্রধানতঃ দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রবন্ধাবলীর সাহায্যেই তাহাদের কার্য পরিচালিত হয়। ডজন ডজন "সম্পাদকের নিকট চিঠি" লেখা, অপরের মতবাদকে বিকৃত করিয়া প্রচার করা এবং ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কুৎসা প্রচার করা প্রভৃতি কোন কিছুতেই তাহারা পশ্চাৎপদ হয় না। ভারত সরকার এই সকল "পত্রলেখক" সাংবাদিক এবং লেখকের একটি তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সকল প্রচারধর্মী সংবাদপত্রের প্রচার নিতান্তই সীমাবদ্ধ এবং যখনই ঐ সকল দায়িত্বজ্ঞানহীন পত্রিকাগুলিতে কোন ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বিষোদ্গার করা হয় তখন তাহাকে বিনামূল্যে সংশ্লিষ্ট পত্রিকার একখানি কপি পাঠানো হয় এবং পত্রিকাটির উপরে একটি স্লিপে বিশেষ বিশেষ পাতার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। মূলতঃ তাহাদের আক্রমণের লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রী নেহরুর বৈদেশিক নীতি কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে উঁহাকে আক্রমণ করিবার সাহস না থাকায় তাহারা সাংবাদিকদিগের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে। সাংবাদিকদিগের মধ্যে অনেকেই শালীনতার খাতিরে ঐ সকল অভিযোগের উত্তর দেন না; অনেকে উহাতে ভীত হইয়া বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনে বিরত থাকেন।

ভারতের বর্তমান অবস্থায় চিন্তার অবাধ স্বাধীনতা নিতান্ত প্রয়োজন। রাজনৈতিক সংবাদ-পরিবেশন যাহাতে নিরপেক্ষ হয় তাহা দেখা অবশ্য প্রয়োজন। কিন্তু নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন এবং কোন রাষ্ট্রগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অন্ধ বিষোদ্গার কখনও এক জিনিষ নহে। ব্যক্তিগত কুৎসা প্রচার এবং নিরপেক্ষ সাংবাদিকদের ধ্বজাধারী এই সকল ক্ষুদে ম্যাকার্থীরা ভারতের যে ক্ষতিসাধন করিতে পারে তাহার প্রতি সরকার এবং জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া "ভেদেত" তাঁহার প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন।

হাসপাতালে দুর্নীতি

হাসপাতাল সম্পর্কে অভিযোগের যেন আর অন্ত নাই। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় হাসপাতালে দুর্নীতি এবং অব্যবস্থা সম্পর্কে যে অসংখ্য অভিযোগ প্রকাশিত হয় তাহাতে যে অবস্থার কোন ইতরবিশেষ হইয়াছে তাহা মনে হয় না। ৩০শে আষাঢ় "দামোদর" পত্রিকায় বর্ধমান বিজয়চাঁদ হাসপাতাল সম্পর্কে যে সকল অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইতে চাহে না। কিন্তু পত্রিকার সংবাদ-সংগ্রাহক নাম ঠিকানাসহ বিভিন্ন ব্যক্তির উল্লেখ করিয়াছেন যাহাদের নিকট অনুসন্ধান করিলে সত্যাসত্য নিরূপণ সহজেই করা যাইবে।

মফস্বলের গরীব রোগীদিগকে টাকা না দিলে হাসপাতালে ভর্তি করানো যায় না বলিয়া সংবাদ পাওয়ার পর "দামোদর" পত্রিকার এক বিশেষ প্রতিনিধি গত ১২ই জুলাই হাসপাতালটির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে যান। সকাল ৮টা হইতে বেলা ২টা পর্যন্ত অনুসন্ধানের পর উক্ত প্রতিনিধি যে বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সত্যই ভয়াবহ।

প্রতিনিধি লিখিতেছেন যে, হাসপাতালের রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসারকে টাকা না দিলে কাহাকেও হাসপাতালে ভর্তি করা হয় না। অবশ্য মফস্বল অঞ্চলের রোগীদের উপরই এইরূপ শোষণের সুযোগ সর্বাপেক্ষা বেশী। সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের নার্স জনৈক ব্যক্তি আর. এম. ও-র এই অবৈধ ব্যবসায়ের প্রধান সাহায্যকারী বলিয়া প্রতিনিধি লিখিতেছেন। "মফঃস্বলের রোগীরাই এই ব্যক্তির প্রধান শিকার। লোকটি রোগীদের আত্মীয়স্বজনকে ডাকিয়া বলে, সাহেবকে অর্থাৎ আর-এম-ওকে কিছু টাকা দিলেই সীট পাওয়া যাইবে এবং রোগীকে ভর্তি করা হইবে। টাকার মাত্রা দশ হইতে এক শত। লোক ও রোগ বুঝিয়া দালালটি টাকা হাঁকে। যে সমস্ত রোগী হাসপাতালে আছে, তাহাদের নিকট এবং তাহাদের আত্মীয়স্বজনের নিকট অনুসন্ধান করিলেই বিষয়টি আরও সহজে বুঝা যাইবে।...

"মোক্তার হোসেন নামে একটি ষোল বছরের ছেলেকে সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে গত ১২ই জুলাই ভর্তি করা হয়। উক্ত ছেলেটির আউটডোরের টিকিট নম্বর ৫৭৭৪। ছেলেটির অভিভাবক

দামোদর প্রতিনিধিকে বলেন যে, উক্ত দালালটির মারফতে সকালেই আর, এম. ওর বাসভবনে যাইয়া ১০৲ টাকা আর, এম, ওকে দিয়া আসিয়াছেন। তবে সে ছেলেটিকে ভর্ত্তি করাইতে সক্ষম হইয়াছে। আউটডোরে দেখা যায় কতকগুলি রোগীর টিকিটের সহিত আর, এম, ওর প্রেসক্রিপশন আঁটিয়া দেওয়া হয়—অনুসন্ধানে দেখা যায় তাহারাই ভর্ত্তির বা সীট পাইবার উপযুক্ত। আউটডোরের টিকিটে যে সমস্ত রোগী ভর্ত্তি হইবার উপযুক্ত পূর্ব্বে সীট না থাকিলে টিকিটের উপরে লিখিয়া দেওয়া হইত "Regret, no bed"। বর্ত্তমানে বহু টিকিটেই তাহা লেখা হয় না। দেখা যায়, বেলা ১১টার সময় যাহাকে সীট নাই বলিয়া ফেরত পাঠান হইল, পরদিনই সে অনায়াসে আর, এম, ও'র পূজা দিয়া ভর্ত্তি হইয়া গেল।"

আসানসোলের হাসপাতালে দুর্নীতি সম্পর্কে ৩রা শ্রাবণ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "ডি, টি, রোড" পত্রিকাও অনুরূপ অভিযোগ করিয়াছেন। রোগী হাসপাতালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও death certificate এর জন্য ১৮ টাকা দাবি করা হয়। "শতি শয্যা খালি থাকিতেও সময় সময় রোগী ভর্ত্তি করা হয় না। যে সব রোগী ডাক্তারদের সন্তুষ্ট করিতে পারিবে এই সকল শয্যা তাহাদের জন্য। রোগীকে মাত্র Prescription করিয়া বাহির হইতে ঔষধ কিনিতে বলা হয় এবং এমন Prescription করা হয় যাহা রোগীর প্রয়োজন হয় না। ঐ ঔষধ আবার পরে বাজারে বিক্রয় করা হয় এই ধরনের খবরও আসিতেছে।

Prescription এ এমন সব মূল্যের ঔষধ লেখা হয় যাহার ব্যয় বহন করা রোগীর পক্ষে অসম্ভব। ডাক্তারেরা ক্রমাগত হাসপাতালে ঔষধ নাই, সরকার কিছুই দেয় না ইত্যাদি প্রচার করিয়া রোগীদের নিকট চিকিৎসার খরচ আদায় করেন। X' Ray পরিচালনার জন্য কোন Radiologist না থাকায় বাহিরের কোন একটি বিশেষ ডাক্তারের সহিত যোগাযোগে চিকিৎসা করা হয়। ঐ বিশেষ ডাক্তার ছাড়া অন্য স্থানে X' Ray লইলে হইবে না।"

পুলিস কেসের রোগীদিগকে ভালরূপে সারিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই হাসপাতাল হইতে ডিসচার্জ করা হয় যাহাতে আসামী পক্ষের কেস হাল্কা হয়।

হাসপাতালের প্রাক্তন মেডিক্যাল অফিসার নাকি আসানসোলের কোন এক ধনীর পৌত্রীকে মাদুলী দিয়া ৩০০ টাকা লইয়াছেন।

সরকারী শিক্ষানীতির বিচিত্র রূপ

বাঁকুড়ায় একটি কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সরকারী আচরণের যে সংবাদ "হিন্দুবাণী" প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যথার্থ হইলে জনসাধারণ নিদারুণ বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই। "হিন্দুবাণী" লিখিতেছেন :

"স্থানীয় একটি কমার্স কলেজ স্থাপনের জন্য স্থানীয় শিক্ষাব্রতীরা বহুদিন ধরিয়া চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। এজন্য গত বৎসর একটি ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হয় ; উক্ত কমিটি আয়োজনাদি সম্পন্ন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট দরখাস্ত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনসপেক্সন হইবার পর সিণ্ডিকেট এবং সিনেট দরখাস্ত সম্পর্কে আলোচনা করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে এফিলিয়েশন মঞ্জুর করেন। ৮ই জুন, ১৯৫৫ তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার পত্রযোগে "বাঁকুড়া কমার্স কলেজে'র প্রিন্সিপ্যালকে জানান, সিণ্ডিকেটের প্রস্তাব চ্যান্সেলারের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হইল।...চ্যান্সেলারের অনুমোদন না পাওয়া পর্য্যন্ত ক্লাস যেন খোলা না হয়। বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজের ইতিহাস রেজিষ্ট্রারের বোধ হয় মনে ছিল।"

"চ্যান্সেলার-cum-রাজ্যপাল হবেন মুখুজ্জের সুযোগ্য সেক্রেটারী ডি. এম. সেন (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এডুকেশন সেক্রেটারীও বটেন) দিন কুড়ি পরে রেজিষ্ট্রারকে লিখিলেন, দুই হাজার টাকার বই কিনিবার যে সর্ত্ত দেওয়া হইয়াছে তাহা কেনা হইয়াছে কিনা জানাও এবং চ্যান্সেলারের নির্দ্দেশমত জানিতে চাহিতেছি, কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ দুই বৎসরের ভিতর নিজেদের ক্রীত জায়গায় নিজস্ব বাড়ী করিতে পারিবে কিনা।

"কমার্স কলেজের প্রিন্সিপাল রেজিষ্ট্রারকে জানাইলেন, বইয়ের অর্ডার আগেই দেওয়া হইয়াছে এবং বই দু'চার দিনের মধ্যে আসিয়া পড়িবে। গোয়েঙ্কা ট্রাষ্ট ও অনেক ধনী ব্যবসায়ী দুই বৎসরের মধ্যে কলেজের নিজস্ব ভবন নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। গোয়েঙ্কা ট্রাষ্টের লিখিত প্রতিশ্রুতির দুই চিঠিখানা হুজুর বরাবর প্রেরিত হইয়াছে। তারপর আর কোন সাড়াশব্দ নাই।"

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এইরূপ সরকারী অবহেলা নিতান্ত বিস্ময়কর। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেট যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিকে অনুমোদন দান করিয়াছেন সাধারণ ক্ষেত্রে সরকার পক্ষ হইতে তাহাতে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করা উচিত নহে। কেবলমাত্র বিশেষ এবং জরুরী কারণেই সরকারপক্ষ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করিবার কথা উঠিতে পারে। বাঁকুড়া কমার্স কলেজ সম্পর্কে এইরূপ দীর্ঘসূত্রী মনোভাবের একমাত্র কারণ বাঁকুড়াবাসীর নিজের গণ্ডা বুঝিয়া লইবার ক্ষমতার অভাব। যে কারণে হাসপাতালের দুরবস্থা সেই কারণেই কমার্স কলেজে বাধা। আরও কিছুদিন পরে অশিক্ষিত বাঁকুড়াবাসী বিনা চিকিৎসায় গাছতলায় পড়িয়া মরিবে। আধুনিক জগতে ক্লীবের কোনও অধিকার নাই।

জঙ্গীপুর কলেজ

জঙ্গীপুর কলেজে বর্ত্তমান বৎসর হইতে বি-এ ক্লাস খুলিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। তাহাতে সকলেই বিশেষ উৎসাহ বোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ বর্ত্তমান বৎসরের মত তাঁহাদের সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের আশঙ্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী তাঁহাদিগকে যে সংখ্যক অতিরিক্ত

অধ্যাপক নিয়োগ করিতে হইবে তাহার ব্যয়ভার এ বৎসরের ছাত্র-প্রদত্ত বেতন হইতে সঙ্কুলান হওয়া সম্ভব হইবে না।

কলেজ-কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ সিদ্ধান্তে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে নৈরাশ্যজনিত বিস্ময়ের প্রতিধ্বনি করিয়া "ভারতী" লিখিতেছেন, "ঘাটতি টাকা যখন সরকার দিবেন না এবং জনসাধারণের নিকট হইতেও তাহা পূরণের সম্ভাবনা কম তখন তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হইয়া উঠে। কর্তৃপক্ষের এই আশঙ্কা যে একবারে অমূলক একথা আমরা বলি না তবে পূর্ব্বেই চিন্তা করিয়া বিজ্ঞাপনাদি প্রচার না করাই বোধ হয় সমীচীন ছিল।..."

বালুরঘাটে ছাত্রধর্ম্মঘট

৫ই আগষ্ট "সাপ্তাহিক আত্রেয়ী"র সংবাদে প্রকাশ যে বালুরঘাট কলেজের ক্লার্ক শ্রীহরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি-এ, বি-এল মহাশয়কে সম্প্রতি কলেজ কর্তৃপক্ষ চাকুরী হইতে বরখাস্ত করায় বিগত ১লা আগষ্ট হইতে ছাত্রগণ উক্ত ক্লার্কের পুনরায় বহালের দাবিতে ধর্ম্মঘট পালন করিতেছেন।

এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে "আত্রেয়ী" লিখিতেছেন, "বালুরঘাট কলেজ প্রতিষ্ঠাকাল হইতে সাত বৎসর ধরিয়া হরিশবাবু বেক ...ছা, দর স্বাট দেওয়া হইতে ক্লার্ক ও একাউন্টেন্টের কাজ অক্লান্ত ভাবে করিয়া আসিতেছেন। বালুরঘাট কলেজ সংগঠন কার্য্যে তাহার আত্মবলিদানের এই কি পুরস্কার? হঠাৎ আজ কোন অজ্ঞাত কারণে তিনি কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট অক্ষম বলিয়া পরিগণিত হইলেন? এমনকি হরিশবাবু দায়ে পড়িয়া মাত্র এক বৎসরের জন্য কার্যকাল বজায় রাখিবার আবেদন জানাইয়াছিলেন। কিন্তু কলেজ-কর্তৃপক্ষ তাঁহার এই সামান্য দাবিটুকুও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী ত দূরের কথা, সাধারণ সৌজন্যসূচক মন লইয়াও বিচার করিয়া দেখেন নাই।"

"আত্রেয়ী" কলেজ-কর্তৃপক্ষদিগকে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।

বাস দুর্ঘটনা ও যাত্রীদের নিরাপত্তাবিধান

২২শে জুলাই বারাসাতে এক শোচনীয় বাসদুর্ঘটনায় ১২ জন আরোহী গুরুতররূপে আহত হন। দুর্ঘটনার বর্ণনা দিয়া "বারাসাত বার্ত্তা"র ষ্টাফ রিপোর্টার লিখিতেছেন, "৭৯ নং আপ বাস চাপাডালি হইতে বোঝাই যাত্রী লইয়া টাকী রোড ছাড়াইয়া যায়। ময়লা-পোতার নিকট কলিকাতাগামী ডাউন বাসের সম্মুখীন হইলে পাশ কাটাইতে গিয়া বাসটি উল্টাইয়া পাটক্ষেতে পতিত হয়। চাকা উপরের দিকে—ছাদ উপরের দিকে, দেহখানি মাটিতে পড়িয়া থাকে। অপর বাসের যাত্রী ও পথচারী সকলে বহুকষ্টে ও সাবধানে গাড়ীর ভিতর হইতে আহত দেহগুলি উদ্ধার করেন। খবর পাইয়াই চাপাডালির রিক্সাগুলি ছুটিয়া আসে এবং আহতদিগকে হাসপাতালে লইয়া যায়।..."

উক্ত রিপোর্টার লিখিতেছেন, "মার্টিন লাইনের ট্রেনগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়ার পর বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং রাস্তে লরী চলাচলের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। ট্রেনের লাইনগুলি না তুলিয়া লইবার ফলে এ পথের বর্দ্ধিত সংখ্যক বাস এবং লরীগুলি চলাচলের বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে।

অপর এক বাস দুর্ঘটনায় গত ৩০শে জুলাই অন্য এক ব্যক্তি গুরুতররূপে আহত হন। তাঁহাকে বারাসাত হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়।

পর পর তিন সপ্তাহে বারাসাত অঞ্চলে তিনটি শোচনীয় বাস দুর্ঘটনার উল্লেখ করিয়া এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "বারাসাত বার্ত্তা" বিশেষ দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া লিখিতেছেন :

"ইতিপূর্ব্বে আমরা বারাসাত মহকুমায় বিভিন্ন সড়কে বাস দুর্ঘটনার হিড়িক ও যাত্রীসাধারণের অমানুষিক পশুতুল্য পথযাত্রার চিত্র প্রকাশ করিয়াছি। বাস দুর্ঘটনায় নিহত পাঁচু ঘোষের তাজা রক্ত এখন পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগর রোডে শুকায় নাই—তাহার অকাল মৃত্যুর কি জবাব বাসের মালিক কি সরকারী কর্তৃপক্ষ আর কি বিধাতাপুরুষ কে কি দিবেন জানি না। এই পথের বাসগুলি যাত্রী (মানুষ?) গাদাইয়া আর যখন বাসের ভিতরে ঢুকাইতে পারে না তখন খোলা ছাদের উপর তুলিয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় ছুটিতে থাকে। এই দেশে মানুষের জীবনের কোন মূল্য নাই। যদি থাকিত তবে পথের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী পথের পুলিস এবং পথের পার্শ্বেই আমডাঙ্গা পুলিস ফাঁড়ির সম্মুখ দিয়া এইরূপ অবস্থায় বাস চলিতে পারিত কি না দেশবাসী কেন, 'দুর্নীতি দমনে কঠোর হস্ত' জাতীয় সরকার একবার চিন্তা করিয়া দেখুন।"

কেবল যে অত্যধিক ভীড়ের জন্যই যাত্রীদিগকে অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহা নহে। ইহার উপর রহিয়াছে বাস পরিচালক-দিগের স্বৈরাচার। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ষ্টেশন হইতে ছাড়িয়া বাসগুলি রাস্তায় অযথা সময় নষ্ট করে। ফলে সময়মত গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইবার জন্য বিপজ্জনক বেগে ছুটিতে হয়। তখন কোন যাত্রী তাঁহার গন্তব্যস্থানে নামিতে চাহিলে বাস ঠিকমত থামানো হয় না এবং চলন্ত বাস হইতে বাধ্য হইয়া নামিতে গিয়া অনেক যাত্রীর দৈহিক ও সামগ্রিক ক্ষতি হয়।

বাসের কনডাক্টরদিগের বিভিন্ন অত্যাচার এবং অশ্লীল ব্যবহারে যাত্রীসাধারণকে নিয়তই উত্ত্যক্ত হইতে হয়। যাত্রীসাধারণের দুর্গতির এক মর্ম্মন্তুদ চিত্র আঁকিয়া "বারাসাত বার্ত্তা" লিখিতেছেন :

"বাসের চ্যাংড়া কণ্ডাক্টরদের মধ্যে অনেকে এইরূপ অশ্লীল ভাষা প্রায়শঃ ব্যবহার করিয়া থাকে এবং এইরূপ কদর্য্য ইঙ্গিত করিয়া থাকে যে বাসের যাত্রী মহিলা কেন রুচিসম্পন্ন পুরুষ যাত্রীকে পর্য্যন্ত কানে আঙুল দিয়া অথবা চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকিতে হয়। তাহাদের যথেচ্ছাচারের এতটুকু প্রতিবাদ করিলে আর রক্ষা নাই, পাসকরা শ্রীমুখের বচনে যে কোন বিশ্বশ্রী মল্লবীর পর্য্যন্ত পরাস্ত হইতে পারে।

"বাসে বসিবার জায়গা থাকে না এবং ভিতরে দাঁড়াইবারও

জায়গা থাকে না তখন কণ্ডাক্টরেরা চীৎকার করিয়া ডাকিতে থাকে 'খালি গাড়ী···খালি গাড়ী'। হয়ত কোন অজ্ঞ যাত্রী কহিলেন, লোক আর কোথায় তুলিবে। শ্রীমুখ হইতে ভাষণ আসিল, মশাই আপনারা তো জানানা আদমী নন যে ঠাসাঠাসি করিয়া দাঁড়াইলে জাতি যাইবে। আবার কখনও তাহারা বাসের গন্তব্য স্থানের নাম উল্লেখ করিয়া বলিতে থাকে, সুরাইয়া গাড়ী—মধুবালার গাড়ী।···হাণ্ডেল ঝুলিয়া অথবা পিছনের সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া পল্লীর বনলতা দেখিয়া মুগ্ধ চ্যাংড়া কণ্ডাক্টরের লারে লাপ্পা মাফিক সঙ্গীত, সহকর্মীর সহিত ইয়ার্কী রসিকতার উৎপাত যাত্রীকে নীরবে সহ্য করিতে হয়। চলতি বাসে তখন তাহারা ক্ষুদে হিটলার। বাসের মালিকগণের ক্ষুদে হিটলারদের কীর্ত্তিকলাপ জানিবার কথা নহে, ট্রিপের আয় হইতে কর্ম্মীদের কীর্ত্তি ও যোগ্যতা নিরূপিত হইয়া থাকে। সেই যোগ্যতা দেখাইতে বাসের কর্ম্মীবৃন্দ চালানী মুরগীরও অধম মানুষগুলিকে তুলিয়া খাঁচার পশুর মত বিঁধিতে থাকে অর্থাৎ 'বাঁধকে, রোকো' বলিলে আর রক্ষা নাই। যাত্রী ধরিতে সময় নষ্ট হইয়াছে কাজেই যাত্রীর খুশিমত যেখানে সেখানে গাড়ী বাঁধিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে পৌঁছাইয়া লেট ফাইন দেওয়া অসম্ভব বলিয়া 'বাঁধকে রোকো'র প্রত্যুত্তরে তাহারা বিঁধিতে থাকে। গন্তব্য স্থান ছাড়াইয়া অনেক চিৎকার ও ঘণ্টা বাজাইয়া যখন গাড়ী থামিল তখন দেখা গেল পথের যাত্রী হাতে দেখাইয়াছে।"

নীরবে অপমান সহ্য করা তো আমাদের জাতীয় নীতি হইয়া দাঁড়াইতেছে। বাসের যাত্রীদের এই ক্লীব অবস্থা যত দিন থাকিবে তত দিন এইরূপ দুর্দ্দশা চলিবে। শুধু সরকারকে গালি দিলে লাভ কিছুই হইবে না।

ট্রেন-যাত্রীদের উপর হামলা

বনগাঁ লাইনের মধ্যমগ্রাম ষ্টেশনের অদূরে চলন্ত ট্রেনে কে বা কাহারা প্রস্তর নিক্ষেপ করায় যাত্রীসাধারণের বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া "বারাসাত বার্ত্তা"র সংবাদে প্রকাশ। উক্ত সংবাদে বলা হইয়াছে যে মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে জনৈক অধ্যাপক যাত্রী ঐ সকল দুর্বৃত্তের নিক্ষিপ্ত প্রস্তরাঘাতে চক্ষুহীন হইয়াছেন। তাঁহার আঘাত বিশেষ গুরুতর হইয়াছিল, হাসপাতালে চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করা হয়। ২৪শে জুলাই অনুরূপ অতর্কিত আক্রমণে জনৈক যাত্রীর মাথা ফাটিয়া যায় এবং তিনি গুরুতর রূপে আহত হন। ট্রেন-যাত্রী জনৈক ইঞ্জিনীয়ারিং ছাত্রের বিবৃতিতে দেখা যায় যে প্রস্তরনিক্ষেপকারী দুর্বৃত্তদের মধ্যে ২২।২৪ বৎসর বয়স্ক যুবকও রহিয়াছে।

এ বিষয়ে স্থানীয় পুলিস কি করিয়াছে ?

বহরমপুরে বিজলী সরবরাহের অব্যবস্থা

নবপ্রকাশিত "মুর্শিদাবাদ সংবাদ" পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় বহরমপুর শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতির সমালোচনা করিয়া একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

বহরমপুরে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার ভার একটি কোম্পানীর উপর রহিয়াছে, কিন্তু কোম্পানীটি কোন সময়েই নির্দ্দিষ্ট ২২০ ভোল্ট বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে সক্ষম হয় না। ফলে জনসাধারণ অর্থের বিনিময়ে উপযুক্ত ভোল্টেজ সরবরাহ না পাইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করিতে বাধ্য হন। এই অব্যবস্থার প্রতিকারের জন্য জনসাধারণের পক্ষ হইতে আন্দোলন হয় এবং বহরমপুরের পৌরসভাও জনসাধারণের অভিযোগ সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সরকার পক্ষ হইতে প্রথমে কোন কিছুই করা হয় নাই। পরে বলা হয় যে নর্থ ক্যালকাটা গ্রীড হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ আরম্ভ হইলে ভোল্টেজ সম্পর্কে কাহারও আর অভিযোগ থাকিবে না।

"মুর্শিদাবাদ সংবাদ" লিখিতেছেন, "কিন্তু তাহা হয় নাই। নূতন গ্রীড আসার পরেও শহরের বিদ্যুৎ সরবরাহের ভোল্টেজের যথাপূর্ব্ব কমতি আছে। আজিও সৈদাবাদ এলাকায় সন্ধ্যার পর ৬০-বাতির আলো ১৫-বাতির আলোর ন্যায় নিষ্প্রভ রহিয়া যায়, ভোল্টেজ অভাবে রেডিও হইতে ক্ষীণ শব্দ বাহির হয়। জনসাধারণকে শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে গোরাবাজার এলাকায় একটি Sub-station করা হইলেও তাহাতে আলোর কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। জনসাধারণের অভিযোগের কারণ রহিয়াছেই।

"ওদিকে সম্প্রতি এক সরকারী ইঞ্জিনীয়ার যন্ত্রের সাহায্যে শহরের সকল এলাকা পরীক্ষা করিয়া এই মত দিয়াছেন যে শহরের অধিকাংশ এলাকায় যে ভোল্টেজ সরবরাহ করা হয় তাহা ২২০ অপেক্ষা নিম্নে। সুতরাং দেখা যায় জনসাধারণ কম ভোল্টেজ সম্পর্কে যে অভিযোগ করে তাহা ন্যায়সম্মত। অথচ সরকার হইতে ভোল্টেজের এই গলতি দূর করিতে স্থানীয় ইলেকট্রিক কোম্পানীকে বাধ্যতামূলকভাবে কিছুই করা হয় নাই। মাঝে শুনা গিয়াছিল যে সৈদাবাদে ভোল্টেজ বাড়াইবার জন্য পৃথক লাইন টানা হইতেছে, কারণ বর্ত্তমান লাইন অত্যন্ত পুরাতন বিধায় তাহার মধ্য দিয়া বেশী শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব নহে।···কিন্তু কিছুই হইল না। নূতন একটি লাইন টানা হইল বটে, কিন্তু সাধারণে তাহার উপকার হইতে বঞ্চিত হইল। সেই নূতন লাইন শুনিলাম খাগড়া হইতে মোড় ঘুরিয়া জনৈক বিশেষ ব্যক্তির তৈলের কলে তাহার অভিসার বিস্তার করিয়াছে।···"

এই পরিস্থিতির প্রতি জেলা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সম্পাদকীয় মন্তব্যে অনুরোধ করা হইয়াছে যেন অবিলম্বে তিনি ইহাতে হস্তক্ষেপ করেন যাহাতে জনসাধারণের স্বার্থ ব্যক্তিবিশেষের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের নীচে পিষ্ট না হয়।

বিদ্যুৎ কোম্পানী আইন অনুযায়ী সরবরাহ করিতে বাধ্য। যদি সরকার এ বিষয়ে অবহিত হন তবে তাহারাও তৎপর হইবে। সম্ভবতঃ পুরাতন লাইন বা লাইন স্থাপনায় ইনসুলেশন সম্পর্কে ত্রুটি থাকায় অত্যধিক বিদ্যুৎ নষ্ট হইতেছে।

বর্দ্ধমান রেলষ্টেশনের কুলি

বর্দ্ধমান রেলষ্টেশনে ১৬০ জন কুলি আছে। তাহারা রেলওয়ে বিভাগের কর্ম্মী নহে। রেলওয়েকে লাইসেন্স ফি দিয়া তাহারা ষ্টেশনে মোট বহিবার অনুমতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু বর্দ্ধমানের কুলিদিগকে লাইসেন্স ফি বাবদ মাসিক চার টাকা দিতে হয় যদিও ভারতের অন্যতম রেলষ্টেশন হাওড়ার কুলিদিগকে লাইসেন্স ফি হিসাবে দিতে হয় মাত্র সাড়ে তিন টাকা। বর্দ্ধমান রেলষ্টেশনের কুলিদের দাবী লাইসেন্স ফি কমাইয়া মাসিক তিন টাকা হারে ধার্য্য করিতে হইবে।

কুলিদের দাবির ন্যায্যতা সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বর্দ্ধমান কংগ্রেস সভাপতি সম্পাদিত "বর্দ্ধমানবাণী" লিখিতেছেন, "বর্দ্ধমানের রেলওয়ে মজুরদের দাবি সামান্য এবং তাহা নিতান্তই সঙ্গত। এইরূপ অবস্থায় উহা লইয়া কালক্ষেপ করা কর্ত্তৃপক্ষের কোনক্রমেই উচিত হইবে না।"

মজুরদের দাবির সমর্থন করিয়া সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে হাওড়ায় কুলিদের উপার্জ্জনের সুযোগ বেশী, অপেক্ষাকৃত ছোট ষ্টেশন বর্দ্ধমানে সেইরূপ সুযোগ নাই। উপরন্তু হাওড়ার কুলিদের মজুরীর হারও বেশী—মোটপ্রতি চার আনা। বর্দ্ধমানের কুলিরা সেস্থলে পায় মোটপ্রতি তিন আনা। সে অবস্থায় বর্দ্ধমানে বর্দ্ধিতহারে লাইসেন্স ফি দাবী করিবার কোনই যুক্তি নাই।

সার বিক্রয়ের সরকারী নীতি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সার বিক্রয় নীতির কড়া সমালোচনা করিয়া "দামোদর" উক্ত শিরোনামাযুক্ত এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন, "পশ্চিমবঙ্গ সরকার কৃষকদের সাহায্য ও অধিক ফসল ফলাইবার নামে 'মিশ্রসার' নামক যে দ্রব্যটি বিভিন্ন এজেন্ট দ্বারা বিতরণ করিতেছেন তাহা এক কথায় চাষীদের গলাকাটা বলা চলে।"

সার বিক্রয়ের জন্য সরকার বর্দ্ধমান জেলায় যে দুই জন এজেন্ট নিযুক্ত করিয়াছেন তাঁহারা একই সারের জন্য দুইরকম মূল্য লইতেছেন। বর্দ্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি মণ প্রতি দাম লইতেছেন ১০৶০ আনা অথচ অপর এজেন্ট শ'ওয়ালেস কোম্পানী সাত আনা বেশি ১১৷৵০ আনা লইতেছেন। উহা ব্যতীত শ'ওয়ালেস কোম্পানী নিজেদের প্রস্তুত "তারামাকা" নামক মিশ্রসার ১৬৷০ মণ দরে বিক্রয় করিতেছেন। এই অবস্থায় চাষীদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে।

বালুরঘাটে ধানচাউলের মূল্য বৃদ্ধি

৩রা শ্রাবণ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সাপ্তাহিক "আত্রেয়ী" লিখিতেছেন, "যদিও পশ্চিম দিনাজপুর জেলাকে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম 'শস্যভাণ্ডার' বলা হয় তথাপি বর্ষার সমাগমেই তথায় ধান চাউলের মূল্য বৃদ্ধি আরম্ভ হইয়াছে। ধানের মণ ১০ টাকায় উঠিয়াছে এবং চাউল ১৮৲ মণ হিসাবে বিক্রয় হইতেছে। অথচ কলিকাতায় বসিয়া উল্লিখিত দরে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চাউল পাওয়া যাইতেছে।"

ধান এবং চাউলের ক্রমবর্দ্ধমান বাজার দরে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া পত্রিকাটি লিখিতেছেন যে, অনেকেরই ধারণা সরকার কর্ত্তৃক জেলা কর্ডন ব্যবস্থা উঠাইয়া দেওয়ায় প্রচুর পরিমাণে ধানচাউল বিভিন্ন অঞ্চলে বড় বড় ব্যবসায়ীরা চালান দিতেছেন এবং অনেক স্থানীয় ব্যবসাদার সাধ্যমত ধানচাউল মজুতও করিতেছেন। উহার ফলেই ঐরূপ মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস।

"এরূপ অবস্থায়", 'আত্রেয়ী' লিখিতেছেন, "জেলা সমাহর্ত্তা মহাশয়ের নিকট আমাদের আবেদন তিনি বিশেষ তৎপরতার সহিত ধানচাউলের দর নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য উদ্যোগ-আয়োজন করিবেন।"

নিয়ন্ত্রণ কিভাবে সম্ভব তাহা বুঝা গেল না। লোভী ব্যবসায়ীর অত্যাচার রোধ কি শুধু মূল্য বাঁধিয়া দিলেই কমিবে?

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে গোলমাল

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ পরিচালন-ব্যবস্থায় বিগত দুই-তিন বৎসর যাবৎ নানারূপ ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা গিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কলেজ হইতে সাত জন ছাত্রকে বহিষ্কৃত করায় ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। উক্ত বহিষ্কার আদেশের প্রত্যাহার এবং কলেজের অধ্যক্ষ এডওয়ার্ড ম্যাকিনানির পদত্যাগ দাবি করিয়া ছাত্রগণ ধর্ম্মঘট করে। সম্প্রতি পূর্ব্ববঙ্গ সরকার কলেজ কর্ত্তৃপক্ষকে উক্ত সাত জন ছাত্রের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইবার জন্য নির্দ্দেশ দিলে অধ্যক্ষ ম্যাকিনানি উহা পালন করিতে অসম্মত হন। জেলাশাসক এক আদেশবলে অধ্যক্ষ ম্যাকিনানিকে সসপেণ্ড করিয়াছেন। সহকারী অধ্যক্ষ মৌলভী মুজত আলীকে অধ্যক্ষের কাজ চালাইয়া যাইবার ভার দেওয়া হইয়াছে।

মহান্ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী বি. এম. কলেজে শিক্ষার মানের ক্রমবর্দ্ধমান নিম্নগতি এবং পরিচালন-ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতির উল্লেখ করিয়া "বরিশাল হিতৈষী" ১০ই শ্রাবণ এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন, "কলেজের সুনাম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একটি তদন্ত কমিশন গঠিত হওয়া আবশ্যক। যখন দেখা যাইতেছে যে ছাত্রগণ অধ্যক্ষ ম্যাকিনানি সাহেবকে চাহে না তখন কলেজের স্বার্থেই তাঁহার বি. এম. কলেজের পরিচালনা ভার ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।"

কলেজের মহিমাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করায় ছাত্রদের যে দায়িত্ব রহিয়াছে তাহার আলোচনা করিয়া সম্পাদকীয় প্রবন্ধটিতে বলা হইয়াছে:

"ছাত্ররা লেখাপড়া করিবে না, জনসাধারণের সহানুভূতি ও সমর্থন চাহিবে না, সীমাহীন অহঙ্কারে কেবল উচ্ছৃঙ্খলতা চালাইতে থাকিবে, নিজেদের ভবিষ্যৎ ভাবিবে না বলিয়া ছাত্রদের গালি দিতে আমরা চাহি না।

তবু ছাত্রদের একটি কথা বলিব, কলেজকে আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে ছাত্রদের দায়িত্ব আজ সহস্র গুণে বাড়িয়া গিয়াছে।

তাহাদের আচার-আচরণে, কথাবার্ত্তায় কেহ যেন অভিযোগ করিবার কিছু না পায় সেদিকে তাহারা সতর্ক হউক।"

ছাত্রদিগের অভিযোগে কলেজের অধ্যক্ষের পদচ্যুতি; ইহা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। সাতটি ছেলে কি কারণে বহিষ্কৃত হয় না জানায় আমরা কোনও মন্তব্য করিলাম না।

পূর্ব্ববঙ্গের শিক্ষা প্রশাসন

গবর্ণর-শাসনের আমলে এক সরকারী ইস্তাহারে পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ কলেজের পরিচালক কমিটি লুপ্ত হইয়াছে। উক্ত সরকারী বিধানে পরিচালক সমিতি গঠনের যে পদ্ধতি নির্দ্দেশিত হইয়াছে তাহার সমালোচনা করিয়া ১৭ই শ্রাবণ "বরিশাল হিতৈষী" একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন :

"গবর্ণিং বডি গঠনের নূতন নিয়মানুসারে উক্ত কমিটিতে প্রথম গ্রেড কলেজে দশ জন সদস্য থাকিবেন। সেই দশ জনের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনার বা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা মহকুমা হাকিম কমিশনার কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া সভাপতি হইবেন, কলেজের অধ্যক্ষ হইবেন পদাধিকারবলে সম্পাদক। প্রফেসরগণ দুই জন সদস্য নির্ব্বাচিত করিবেন। নির্ব্বাচন পর্ব্ব এইখানেই শেষ—বাকী ছয় জনের মধ্যে দুই জন অভিভাবক বরাবরের নিয়মানুসারে তাঁহারা নির্ব্বাচিত হইবেন না—আট জনের গবর্ণিং বডি তাঁহাদের কো-অপট করিয়া লইবেন এবং কমিটির কার্য্যকাল তিন বৎসর হইলেও অভিভাবক সদস্যদের কার্য্যকাল মাত্র এক বৎসর। কমিটিতে এক জন ডাক্তার, এক জন বিদ্যোৎসাহী এবং দুই জন Donor বা Benefactor থাকিবেন। শেষোক্ত চারি জনের এক জনও নির্ব্বাচিত না হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন।

"সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে যে সত্যটি বিশেষ ভাবে প্রকট হইয়াছে তাহা হইল শিক্ষায়তনের মধ্যে গণতান্ত্রিকতার বিকাশ সম্ভাবনার সম্পূর্ণ সংকোচন ও জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারে স্বৈরাচারী হস্তক্ষেপ।

"এ যেন শিক্ষায়তনের উপর ৯২-ক ধারার প্রয়োগ। বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা বিভাগের এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। প্রয়োজন যদি হইয়াই থাকিত তবে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার এত বড় একটা ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁহাদের জনগণকে অবহিত এবং গঠনতান্ত্রিক উপায়ে জনমত যাচাই করা উচিত ছিল।"

পত্রিকাটি আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে পার্লামেন্টারী শাসন-ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্ত্তনের পর এইরূপ গণতন্ত্রবিরোধী ইস্তাহার শীঘ্রই প্রত্যাহার করা হইবে।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যদের ভূমিকা

লণ্ডনের প্রবীণ পার্লামেন্টারী সংবাদদাতা মিঃ মরিস একিংহাম লিখিতেছেন, "সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও অল্প কয়টি আসনের পার্থক্যের দরুন সদস্যদের পার্টি এবং পার্লামেন্ট সংক্রান্ত কাজ যেমন কঠিন হয় তেমনই হয় শ্রমসাধ্য—গত পাঁচ বৎসরে এজন্য বহু সদস্যের স্বাস্থ্যহানি হইয়াছে এবং কাহারও কাহারও জীবনহানি পর্য্যন্ত হইয়াছে। এখন ওয়েষ্টমিনষ্টারে গবর্ণমেণ্ট মেজরিটি অনেক বেশী আসনের ব্যবধানে সম্ভব হইয়াছে, সেজন্য কিছুটা আরাম এবং নিশ্চিন্ততা সদস্যদের মনে থাকিলেও কাজ সম্পর্কে শিথিলতা প্রদর্শন তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেদিন আর নাই যেদিন ব্যবসায় এবং বাণিজ্যের মধ্যে অধিকাংশ জীবন কাটাইয়া বৃদ্ধ লোকেরা কমন্স সভায় আসিতেন বিশ্রামের জন্য—তাঁহারা রাজনীতি গ্রহণ করিতেন শেষজীবনের একটা অবলম্বন হিসাবে।"

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যদের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে উপরোক্ত বর্ণনা হইতেই অনুমান করা যাইবে তথায় সদস্যরা নিজেদের পার্লামেন্টারী কাজকর্ম্মকে কিরূপ গুরুত্ব দান করিয়া থাকেন। কিন্তু পার্লামেন্টে দলগত সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখিবার মধ্যেই সদস্যদের কর্ত্তব্য শেষ হয় না।

সাধারণভাবে নির্ব্বাচিত সদস্যগণ সকলেই তাহাদের স্ব স্ব নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলেন। সদস্য এবং নির্ব্বাচকদের মধ্যে চিঠিপত্র আদান-প্রদান মারফৎ সেই যোগাযোগ রক্ষিত হয়। কিন্তু সম্প্রতি আর একটি নূতন ব্যবস্থার কার্য্যকারিতা দেখিয়া সকল সদস্যই তাহা অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন। চিকিৎসকদের ন্যায় নির্ব্বাচন এলাকায় সুবিধামত তাঁহারা সদস্যগণ খোলেন "কনসালটিং রুম"—যেখানে দুই বা তিন সপ্তাহ পর পর একদিন সন্ধ্যার সময় নির্ব্বাচকদের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের সমস্যা এবং অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে সদস্যগণ অবহিত হন এবং সাধ্যমত দূর করিবার চেষ্টা করেন। উহাতে করে নির্ব্বাচক ও নির্ব্বাচিত সদস্য উভয় পক্ষই পরস্পরকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার সুযোগ পান।

মিঃ একিংহাম লিখিতেছেন, "এই ধরণের পরামর্শের মধ্যে অবশ্য রাজনীতি সংক্রান্ত কোন কথাই হয় না, কিন্তু পরামর্শের ফলে পার্লামেন্টের কোন বিভাগে হয়ত প্রেরিত হয় একটা চিঠি এবং প্রয়োজনমত প্রশ্ন উত্থাপিত কমন্স-সভায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর জবাব প্রার্থনা করে।"

সদস্যদের আর একটি বড় কাজ হইল নির্ব্বাচন এলাকার সকল শ্রমশিল্প এবং কর্মসংস্থান সম্পর্কে ও অপরাপর গঠনমূলক ও অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা, এবং নির্ব্বাচন এলাকার সকলকে বিশ্বের ও সেই সঙ্গে বিশেষভাবে নিজের দেশের রাজনৈতিক ঝোঁক সম্পর্কে খবরাখবর দেওয়া।

পার্লামেন্টের অভ্যন্তরেও সদস্যদিগকে অনেক দিনই সকাল হইতে সন্ধ্যা এমনকি সারা রাত পর্য্যন্ত কাটাইতে হয়। সাধারণতঃ রাত্রি দশটার সময় ডিভিশন দাবি করা হয়; কিন্তু ডিভিশনের সময় উত্তীর্ণ হইলেও অনেক সময় পার্লামেন্টারী দিনের শেষ হয় না। সাধারণভাবে কমন্স সভায় উপস্থিত থাকা ছাড়াও বিভিন্ন কমিটিতে তাহাদিগকে শ্রমসাধ্য কাজ করিতে হয়।

বাঙ্গালীর অগ্রগতির পথ

আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকার

দশ বছর আগে আমরা বড়াই করিতাম যে, মহামতি গোখলে আমাদের জাতিকে খুব প্রশংসা করিয়াছেন—তিনি বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালীরাই সমস্ত ভারতের গুরুস্থানীয়, চিন্তার নেতা ; "বঙ্গদেশ যাহা আজ বলছে, কাল সমস্ত ভারতবর্ষ সেই কথা বলবে।" যখন রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বজগৎ কবিশ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিয়া লইল, একজন 'কালা আদমি' প্রথম নোবেল পুরস্কার পাইলেন, তখন আমরা চেঁচাইতে লাগিলাম :

> জগং-কবিসভার মাঝে তোমার করি গর্ব,
> বাঙ্গালী আজি গানের রাজা, বাঙ্গালী নহে খর্ব।

এই গর্ব আমাদের পক্ষে আজ এক নিষ্ঠুর পরিহাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৬-৪৭ সালের ভীষণ নরহত্যা ও নারীনির্যাতন ; আর গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে যে বেকার ও অন্নকষ্ট, এ সব প্রমাণ করিতেছে—বাঙ্গালীরা কত দুর্বল, কত অসহায়, কত দুর্ভাগা। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সরু ফালির মত জমির উপর ৪২ লক্ষ পূর্ববঙ্গের ভাইবোন প্রায় একবস্ত্র অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের মিলিয়া আমাদের সকলের জন্য যত দরকার তার সিকি পরিমাণও কর্ম নাই, খাদ্য নাই, দাঁড়াইবার, মাথা গুঁজিবার স্থান পর্যন্ত নাই। অথচ সব জিনিসের দাম এখন চার গুণ বাড়িয়াছে।

আমাদের প্রপিতামহদের সময় এমন এক দিন ছিল, যখন বাঙ্গালীরা প্রাণের আগ্রহে ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিয়া, নিজ বুদ্ধি ও হৃদয়বল খাটাইয়া ভারতের সর্বত্রই ইংরেজী শাসনযন্ত্রের অত্যাবশ্যক সহায়ক হইয়া ছড়াইয়া পড়ে আর ধনেমানে বাড়িয়া উঠে। কোয়েটা হইতে ভামো পর্যন্ত বাঙ্গালী কমিসারিয়েট, গোমস্তা, ডাক-কর্মচারী, ইন্‌জিনিয়র, শিক্ষক, ডাক্তার, কেরানীতে ভরা ছিল। ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই যখন বিদ্রোহ করিলেন তখন সেই শহরে বাঙ্গালী ডাক-কর্মচারী, পথবিভাগের কেরানী ইত্যাদি ছিল ; বিদ্রোহী সিপাইরা তাহাদের মারপিট করিয়া বন্দী করিল ইংরেজের বন্ধু বলিয়া। পঞ্জাবে যখন রণজিৎ সিংহের রাজত্ব তখনই বাঙ্গালী কমিসারিয়েট বাবুরা আম্বালা লুধিয়ানায় বসতি করিতে যান এবং তাঁহাদের বংশের কেহ কেহ এখনও সেখানে আছেন।

ঐ সব কর্মস্থল, যেখানে বাঙ্গালী জাতি এক সময় প্রায় সব বড় কাজ করিত, সেখানে আজ তাহারা লোপ পাইয়াছে। তাহার উপর নানা অন্য প্রদেশবাসীরা আসিয়া বঙ্গভূমির সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য, এমনকি শহরে শহরে ছোট ছোট মিস্ত্রী ও ফেরীওয়ালার কাজ পর্যন্ত নিজেদের হাতে লইয়াছে। তাহাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকিতে না পারিয়া খাঁটি বাঙ্গালীর বংশ লোপ পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে আবার পৈত্রিক শ্রমিকের ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া ভদ্রলোক হইতেছে অর্থাৎ বেকারের দল পূর্ণ করিতেছে। নয়া দিল্লীতে দুই বা তিন জন বাঙ্গালী দেড় হাজারী, দুই হাজারী মনসবদার হইয়াছেন এই সুখবরে আমাদের মধ্যে যে মধ্যবিত্ত এবং আগেকার শ্রমিক-বংশের পাঁচ লক্ষ বেকার বা অস্থায়ী ঠিকা চাকুরে আছে, তাহাদের পেট ভরিবে না। সিনেমার আলো নিবিয়া গেলে, রাস্তা হইতে সত্যাগ্রহের হুল্লোড় চলিয়া গেলে, আমি স্থির হইয়া তাকাই। আর কি দেখি ?—

> দিনের দিন সবে দীন,
> ভারত হয়ে পরাধীন,
> অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ, অনশনে তনু ক্ষীণ ॥

এই দুর্দশা অনেক দিন হইতে ক্রমে ঘনাইয়া আসিতেছে। সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ও প্রফুল্ল সরকার যখন এ জগতে ছিলেন, এই দুইটি মহাপ্রাণের সঙ্গে দেখা হইলেই আমরা বাঙ্গালী জাতির এই মরণ-বাঁচন সমস্যা আলোচনা করিতাম , কোন পথ না দেখিয়া তাঁহারা কাঁদিতেন।

আজ আমরা কাঁদিব না। বরং দেখা উচিত যে, কোন্ কোন্ কারণে প্রথম যুগের নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালীরা ভারতময় খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা ছাড়িয়া দিই, তিনি ত দেবতুল্য ছিলেন। কিন্তু রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী ডাক্তার চুনীলাল বসু (গবর্ণমেণ্ট কেমিষ্ট এবং রায়বাহাদুর) প্রভৃতির জীবনী পড়িলে জানা যায়—কত কঠোর পরিশ্রম, কত ত্যাগ, কি বিলাসবর্জনের মধ্য দিয়া তাঁহারা শিক্ষালাভ করেন, চরিত্রগঠন করেন এবং এই সাধনার ন্যায্য পুরস্কার পাইয়া সমাজের মাথায় স্থানলাভ করেন। ঐ পথ এখনও খোলা আছে।

আজিকার তরুণদের যদি বড় হইবার ইচ্ছা থাকে, যদি জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়, তবে ঐ পথেই চলিতে হইবে। অর্থাৎ, বাঙ্গালীকে জীবনযাত্রায় সরল, চরিত্রে সবল হইতে হইবে। বিলাস ও ভোগের বাসনা দমন করিয়া, কঠিন শ্রমে বিদ্যা লাভ করিয়া, যন্ত্রচালনার শিক্ষা ও চরিত্র গঠন করিতে হইবে। ক্লাসে ও পরীক্ষায় ফাঁকি দিলে

চলিবে না। ফন্দী করিয়া খুব সহজে পাস করিব এই যাহার মতলব, সে ছেলেটির ভবিষ্যৎ জীবন ফাঁকিতেই শেষ হয়।

রবীন্দ্রনাথ একটা কথা প্রায়ই ব্যবহার করিতেন, সেটা "ভঙ্গিমা" অর্থাৎ—থিয়েটারি বীরত্ব দেখানো ও আস্ফালন করা, তাহার ফল কিছুই হয় না। কার্লাইল ঐ জিনিসটাকে বলিতেন 'simulacrum' অর্থাৎ অসার দেহহীন ছবি মাত্র, যেমন ভূতের ছায়া, তাহার নীচে মানুষ নাই। এই জিনিসটা আমরা ইলেকশনের সময় খুব দেখি। কিন্তু নবীন বাঙ্গালীকে এই ভণ্ডামি ত্যাগ করিতে হইবে, তাহাদের অন্তরে বাহিরে শক্ত হইতে হইবে, খাঁটি হইতে হইবে।

প্রায় দুই হাজার বৎসর আগে বেটোয়া নদীর তীরে একটা বিশাল পাথরের স্তম্ভের পায়ে ব্রাহ্মী অক্ষরে খোদা হয় এই কথাগুলি—

"তিনটি অমৃত-পদ যখন সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হয় তখন তাহারা মানুষকে স্বর্গে নিয়ে যায়। সে তিনটি হচ্ছে—
দম, ত্যাগ, অপ্রমাদ।"

শেষ কথাটির অর্থ বিশুদ্ধ চিন্তা, আমরা যে হুজুগে মাতিয়া দল বাঁধিয়া চীৎকার করি, শ্লোগান বলি, ঠিক তাহার বিপরীত স্থিরবুদ্ধি।

এই তিনটি গুণ আমাদের নেতাদের এবং অনুচরদের সবারই মধ্যে পূর্ণমাত্রায় থাকা চাই। যে নেতারা শুধু ভাবেন কি করিয়া অমুক সভা বা প্রতিষ্ঠানটির সর্বময় কর্তা হইব, যাঁহাদের একমাত্র পলিসী, "how to capture the 'Corporation or the University" তাঁহারা হয়ত জীবনকালে এই কাম্য লাভ করিলেন, কিন্তু তাহার পর তাঁহাদের হতভাগ্য চেলাদের কি দশা হয় তাহা আমরা চারিদিকে দেখিতে পাইতেছি।

দেখ, স্কটল্যাণ্ড দেশটা কি নিষ্ঠুর মাতা, পাথর-জঙ্গলে ঢাকা অনুর্বর অসহ্য শীতল। অথচ তাহার লোকগুলি কি শক্ত, জগৎ-জয়ী। বাঙ্গলার তরুণগণ এই আদর্শটি যেন সামনে রাখে। আমাদের জাতীয় মুক্তির পথ কি? কঠোর পরিশ্রমে ইচ্ছা ও তজ্জন্য শক্তি-উপার্জন, কর্মজীবনে ভোগ-বিলাসের প্রবৃত্তিকে দমন, আত্মসংযম্ যাহাকে 'ডিসিপ্লিন' বলে, হুজুগে যোগ না দিয়া নিজের স্বাধীন চিন্তাশক্তি খাটাইয়া নিজ নিজ জীবনের উদ্দেশ্য বাছিয়া লওয়া। এই ত পুরুষকার, এই ত সাধনা, এ সাধনা ভিন্ন সিদ্ধিলাভ হয় না।

এখন একটু কাজের পথ দেখা যাক। টাটার লোহার কারখানায় চোখমুখ ঢাকিয়া জলন্ত আগুনের কাছে লোহা পিটাইয়া ইস্পাত তৈরি করে পাঠান শ্রমিকেরা, বেহারী কুলী নয়। সে কাজ বাঙ্গালী-শরীরে সম্ভব নয়।

কিন্তু আর এক দিক আছে। সরকারের খরচে সহস্র কোটি টাকায় দেশে নানা স্থানে বাঁধ, কেনাল, বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র, ফ্যাক্টরি, খনি গড়িয়া উঠিতেছে। তাহার ফলে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ ও নলের জল আসিতেছে এবং গ্রামগুলি ও গ্রাম্যজীবন লোপ পাইয়া অসংখ্য শহর সৃষ্টি হইতেছে। আজকাল শুধু শুনি—"industrialisation, urbanisation, mechanisation of agriculture and transport।" এর ফলে লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট শ্রমিক "mechanic, electrician, plumber, machine-driver, fitter, repairer" অতি আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ছেলেরা এত দিন ধরিয়া যে মামুলি শিক্ষা general education বা liberal education পাইত, তাহাতে এই সব কাজের জন্ত নিজেদের প্রস্তুত করিতে পারিবে না, তাতে আর অন্ন জুটিবে না।

সুতরাং এই সব নূতন ধরনের শ্রমিক-জীবনের জন্ত নিজকে উপযুক্ত করিতে হইবে। তোমরা প্রস্তুত হইবে [illegible] খাইয়া ঠিক সময়ে কাজে উপস্থিত হইতে, হাতের দক্ষতা লাভ করিতে, শারীরিক শ্রম করিতে গিয়া অল্পে না হাঁপাইতে, জামায় তেলকালির ছিট পড়িলে নাক না সিঁটকাইতে। তবেই ভবিষ্যতে বাঙ্গালী বাঁচিবে।

পথ চলিতে দেখি যে, অসংখ্য লোক ছোট ছোট কল বিদ্যুতের সাহায্যে চালাইয়া spare parts তৈরি করিতেছে, ভাঙ্গা যন্ত্র মেরামত করিতেছে, অবিশ্রান্ত টাকা উপার্জন করিতেছে। তাহাদের মধ্যে ভদ্র বাঙ্গালীর স্থান এত কম কেন?

সুতরাং আমাদের তরুণদের জন্ত শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্তন এবং সামাজিক প্রথার উলটপালট চাই ত। তাহার উপর তাহাদের অন্তরের মধ্যে কয়েকটি নবশক্তি প্রবেশ করানো চাই। যেমন, সব ভারতবাসী যে এক এই বোধ, একসঙ্গে standardised meal খাইতে অভ্যাস এবং সব প্রদেশেই নিজকে দাঁড় করাইবার জন্ত, বাস করিবার জন্ত প্রস্তুত হওয়া। কারণ বাহিরের জগতে যেসব বিশাল পরিবর্তন হইতেছে তাহার ফলে এখন fluidity of labour অনিবার্য হইয়া পড়িতেছে। যেমন ইংলণ্ডে ল্যাঙ্কাশায়ারে কাপড়ের ব্যবসাতে মন্দা পড়ায় এ বৎসর ষোল হাজার ইংরেজ তাঁতী সেই সব কল ছাড়িয়া অন্ত জেলায় গিয়া লৌহ[illegible] যোগ দিয়া বাঁচিয়াছে।

এই ব্যবসা-বদলানোর দৃষ্টান্ত আমাদের ঘরেই আছে। বিধানচন্দ্র মুখ্যমন্ত্রী হইবার পর একনিষ্ঠ ভাবে বাঙ্গালী ভদ্রশ্রেণীর যুবকদের জন্ত নূতন পথ খুলিয়া দিতেছেন।

কলিকাতা-হাবড়ার প্রায় সমস্ত কনষ্টেবলের পদ আজ বাঙ্গালীরা পরদেশীর হাত হইতে লইয়াছে। মন্ত্রীবর বাঙ্গালী হিন্দুকে ট্যাক্সিচালক, মেকানিক, ফেরীওয়ালা (উচ্চ শ্রেণীর, যাকে commercial travel'er বলে), বই বাঁধিবার দপ্তরী করিয়া তুলিয়া বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বিহার হইতে যে তরকারী আসিত, তাহার অনেকটা এখন ধুবুলিয়া, গোঘাট প্রভৃতি অঞ্চলের বাঙ্গালী হিন্দু বাস্তহারারা জন্মাইতেছে, তা বাজারে বেশ চলে। অল্প ব্যয়ে নিম্ন গ্রেডের মেকানিকদের শিক্ষা দিবার জন্য যাদবপুরে সরকারী খরচে ক্লাস ও হোষ্টেল তৈরী হইয়াছে। তাতে বছরে তিন শত ছেলেকে শেখানো হয়। ইহাদের জন্য চাহিদা খুব বেশী।

সুতরাং যদি আমরা শক্ত হইতে পারি, "বাবু" থাকিবার ইচ্ছা দমন করিতে পারি, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার নহে।

কি পেয়েছি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দাস বটি আমি, যা চাই পেয়েছি, ধূলা-ধূসরিত পল্লীগ্রামে,
শঙ্খ ঘণ্টা খোল করতালে শুনি হরিনাম ডাহিনে বামে।
জল-বাহু দিয়ে ঘিরে আছে নদী, ফুলে ফলে বাড়ী ভরিয়া আছে,
পেয়েছি কান্তিমতী বসুমতী, শান্তিতে আছি মায়ের কাছে।
আছে অনটন, দুখ, দারিদ্র্য নহে তা বিশেষ কষ্টসহ,
যা খাই পরি, নিন্দাও করি, হয়ে আছি মার গলগ্রহ।

২

মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস, পর্ণকুটীর, অন্নমুঠি,—
তাহার উপর মায়ের সোহাগ উল্লাসে আমি ফুটিয়া উঠি।
সমীরণে লাগে শত রাজসূয় যজ্ঞভস্ম আমার গায়ে,
সলিলেতে পাই দ্রব নারায়ণ, দেহমনপ্রাণ জুড়ায় যাহে।
পুলকিত হই, দ্রবীভূত হই, শুনিয়া 'কমলে কামিনী' কথা—
পদ্ম হইয়া ফোটে চারি পাশে আমার মনের প্রসন্নতা।

৩

অবিশ্বাসের আঁচ লাগে পাছে, বহুদূরে তাই সরিয়া রহি,
উচ্চাকাঙ্ক্ষার ক্রীড়নক নই, বিকৃতির আমি বাহক নহি।
শুনিতে হয় না, শাণিত তর্ক ভগবান কেহ আছেন কিনা,
সহিতে হয় না, বিদ্ব-বিদগ্ধ তত্ত্বকথার লজ্জা ঘৃণা।
পঙ্কেতে ডোব, পঙ্কিল হলে, পঙ্কজ হবে বলে না কেহ
শুনিতে হয় না পাপই দিতে পারে দিব্যজীবন, দিব্যদেহ।

৪

ঘরে মোর দেব দেবীর মূর্ত্তি—ভক্তগণের পুণ্য ছবি—
আমি তাঁহাদের উপস্থিতির অনুভূতির যে প্রসাদ লভি।
ঘটে পটে তাঁরা আসেন বসেন—এ আসন পাতা নহেক বৃথা,
কি ব্যাকুলতায় আশাপথ চাই, দেবতা তাঁরা কি জানেন নি তা।
তাঁরা করে দেন পথনির্দ্দেশ, ঘুচে সন্দেহ, সকল ভীতি,
চুম্বক তাঁরা, এ লোহার কণা আপনি টানিয়া লয়েন নিতি।

৫

জেনেছি না হলে ইচ্ছা মায়ের—জীর্ণ পাতাও পড়ে না ঝরি,
তিনি বিশ্বাস, তিনি নিঃশ্বাস, তিনিই মা রাজ-রাজেশ্বরী।
সুরভিত হয়ে উঠে এ ভবন, কত দিন তাঁর অঙ্গবাসে,
তাঁহার ভালের খণ্ড চন্দ্র দেখেছি সহসা আঁধার নাশে।
দেখা দেন তিনি, কথা কন তিনি, তবে প্রতি পদে বিঘ্নবাধা,
বাজিকরের যে কন্যা তা ঠিক—ঘোরে সাথে শত গোলকধাঁধা।

৬

আমি টুনটুনি, সহসা কেমনে গরুড়ের বল পাই এ বুকে,
সব গ্রহ-তারা সংবাদ লয়, হাসে কাঁদে মোর দুঃখে সুখে।
আমি যে শফরী, সুধা-সাগরের জোয়ারের ঢেউ লেগেছে গায়ে
আমি মরীচিকা-লুব্ধ হরিণ, ফিরেছি ভুঞ্জ বনচ্ছায়ে।
দেখেছি কি তাঁরে? চিনেছি কি তাঁরে?
পেয়েছি কি কৃপা? বলি যা জানি
বলিতে পারি নে, মুখ চেপে ধরে—বাষ্পরুদ্ধ হতেছে বাণী।

কালিদাসের গ্রন্থে ভৌগোলিক আলোচনা

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা

২

গঙ্গা

কালিদাসের গ্রন্থে অনেক নদী, হ্রদ, পর্বত এবং অরণ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। কুমারসম্ভব (১.৩০, ৫৪ ; ৬.৩৬ ; ৭.৩৬,৭০) ও মেঘদূতে (পূর্বমেঘ, ৫০,৬৩) কালিদাস গঙ্গার উল্লেখ করিয়াছেন। গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলের কথা বিক্রমোর্বশীয় নাটকে (পৃ. ১২১) পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে অলকনন্দা বা দ্যুধুনী বা দ্যুনদী নামে গঙ্গা পরিচিত। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে এবং যোগিনীতন্ত্রেও এই নদীর উল্লেখ আছে। গঙ্গার অপর একটি নাম মন্দাকিনী। মার্কণ্ডেয়পুরাণে ত্রিপথগামিনী বলিয়া গঙ্গার বর্ণনা পাওয়া যায়। লাডউইগ সাহেবের মতে অথর্ববেদে উল্লিখিত বরণাবতী এবং গঙ্গা অভিন্ন। নারায়ণের পাদদেশ হইতে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে। গঙ্গার অবতরণ সম্বন্ধে বায়ু, মৎস্য ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে প্রায়ই অনুরূপ বর্ণনা আছে। ব্রহ্মপুরাণের মতে বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণদিকে প্রবাহিত গঙ্গা গৌতমী গঙ্গা নামে পরিচিত। ইহার উত্তরদিকে প্রবাহিত গঙ্গা ভাগীরথী গঙ্গা নামে বিদিত। গঙ্গা এবং সিন্ধুনদীর সঙ্গমস্থল একটি তীর্থ-স্থান। গঙ্গা সাতটি শাখায় বিভক্ত, যথা—বটোদক, নলিনী, সরস্বতী, জম্বুনদী, সীতা, গঙ্গা ও সিন্ধু। মহাভারতের মতে বিন্দুসরোবর হইতে গঙ্গার উৎপত্তি। কিন্তু পালিসাহিত্যে দেখা যায় যে, অনোতত্ত হ্রদের দক্ষিণ দিকে গঙ্গার উৎপত্তি-স্থল। হরিদ্বার হইতে বুলন্দ শহর পর্যন্ত গঙ্গা দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত এবং ইহার পর এলাহাবাদ পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত। এলাহাবাদে এই নদী যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছে। রাজমহলের নিম্নভাগে ইহা বাংলা দেশে প্রবেশ করিয়াছে। হরিদ্বার হইতে এলাহাবাদ পর্যন্ত গঙ্গা ও যমুনা সমান ভাবে প্রবাহিত। মহাভারতে সপ্ত গঙ্গার উল্লেখ আছে।

যমুনা

এলাহাবাদে যমুনা গঙ্গায় পতিত হইয়াছে। যমুনা কলিন্দকন্যা নামে পরিচিত, কারণ ইহা কলিন্দগিরি হইতে উত্থিত (রঘুবংশ, ৬.৪৮)। যমুনা ও সরস্বতীর মধ্যে পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে ত্রিৎসুদিগের দেশ অবস্থিত। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে, সাংখ্যায়ণ শ্রৌত সূত্রে, লাট্যায়ন শ্রৌত সূত্রে এবং আশ্বলায়ন শ্রৌত সূত্রে যমুনা নদীর উল্লেখ আছে। ভাগবতপুরাণ ও মহাবস্তুর মতে এই নদী কালিন্দী নামে পরিচিত। বাণের কাদম্বরী হইতে জানা যায় যে, এই নদীর জল কালো বলিয়া ইহাকে কালিন্দী বলা হয়। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে দেখা যায়, পাঁচটি বড় নদীর মধ্যে ইহা একটি। বান্দারপুঞ্চের পাদদেশে যমুনোত্রীর মন্দির আছে। গঙ্গার প্রথম এবং বৃহৎ পশ্চিম সীমানা যমুনা। ইহা হিমালয় পর্বত হইতে উত্থিত। মথুরা হইতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এই নদী প্রবাহিত হইয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া প্রয়াগে বিখ্যাত সঙ্গমস্থল গঠন করিয়াছে। আগ্রা ও এলাহাবাদের মধ্যে বাম দিকে ইহা পাঁচটি শাখানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে, যথা—চম্বল, কালিসিন্ধু, বেটোয়া, কেন এবং পৈশুনী। এই নদীর তীরে অনেকগুলি তীর্থস্থান আছে। শূরসেন ও কোশলের মধ্যে এবং কোশল ও বংশের মধ্যে এই নদী সীমানা নির্দেশ করে। শূরসেনের রাজধানী মথুরা এবং বংশের রাজধানী কৌশাম্বী এই নদীর তীরে অবস্থিত। কার্শোলি হইতে আট মাইল দূরে অবস্থিত যমুনোত্রী যমুনা নদীর উৎপত্তি-স্থল বলিয়া বিবেচিত হয়। যমুনা এবং গ্রীকদিগের ইরাম্বাবোয়াস (হিরণ্যবাহ ও হিরণ্যবাহু) অভিন্ন।

সিন্ধু

মেঘদূতে (পূর্বমেঘ, ২৯) এবং মালবিকাগ্নিমিত্রে (পৃ. ১০২) সিন্ধুর উল্লেখ আছে। ইহাই ইন্দাস নদী। দিব্যগঙ্গার সাতটি স্রোতের মধ্যে ইহা একটি। তৈত্তিরীয় সংহিতায় সৈন্ধব অর্থে সিন্ধু বা ইন্দাস নদীকে বুঝায়। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীসূত্রে এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্যে ইহার উল্লেখ আছে। মালবিকাগ্নিমিত্র (আয়ার সংস্করণ, পৃ. ১৪৮) হইতে জানা যায় যে, সিন্ধু নদীর তীরে অগ্নিমিত্রের পুত্র বসুমিত্র যবন-দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। সিন্ধু বা ইন্দাস দুইটি নদীর সংযুক্ত স্রোত। একটি কৈলাস পর্বতের উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে উত্তর-পশ্চিমে প্রবাহিত এবং অপরটি উত্তর-পশ্চিমে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত। সিন্ধু নদী দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া আরব্যোপসাগরে পতিত হইয়াছে।

সরস্বতী

মেঘদূতে (পূর্বমেঘ, ৪৯) কালিদাস সরস্বতী নদীর উল্লেখ করিয়াছেন। উত্তরাপথের ইহা একটি বিখ্যাত নদী। সিমলা পর্বতের উপরে হিমালয় পর্বত হইতে ইহা উত্থিত হইয়াছে। পাতিয়ালা অতিক্রম করিয়া রাজপুতানার মরুভূমির উত্তরাংশে ইহা বিলুপ্ত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় সংহিতায়, পঞ্চবিংশ

ব্রাহ্মণে, কৌশিতকী ব্রাহ্মণে, শতপথ ব্রাহ্মণে ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই নদীর উল্লেখ আছে। পদ্মপুরাণে গঙ্গোদ্ভেদ তীর্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। গঙ্গার সহিত সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থল এই নামে পরিচিত। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র, লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র, আশ্বলায়ন এবং সাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্র হইতে জানা যায় যে, এই নদীর তীরে অনেক বিখ্যাত এবং পবিত্র যাগযজ্ঞ হইয়াছিল। সরস্বতী নদী কোন স্থানে দৃষ্ট হইত এবং কোন স্থানে অদৃশ্য ছিল। এইরূপ বর্ণনা সিদ্ধান্ত-শিরোমণিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের মতে এই নদী অদৃশ্য হইয়া আবার তিনটি স্থানে দৃষ্ট হয় যথা—যমশোদ্ভেদ, শিরোদ্ভেদ এবং নাগোদ্ভেদ। এই নদী চালাউর গ্রামের নিকটে বালুকারাশির মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া ভবানীপুরে পুনরায় দৃষ্ট হইয়াছিল। গৌরপর্বতের পাদদেশে সরস্বতী নদী বেষ্টিত বিন্দুসর হ্রদ বলরাম পরিদর্শন করেন। এখানে ভগীরথ তপস্যা করিয়াছিলেন।

মালিনী

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে (৩ অঙ্ক, ৪) মালিনী নদীর উল্লেখ আছে। ইহার তীরে কণ্ব মুনির আশ্রম অবস্থিত। এখানে তিনি শকুন্তলাকে নিজ কন্যারূপে গ্রহণ করেন। মালিনী নদী সাহারানপুর এবং আউধ জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। রামায়ণের মতে বিখ্যাত চিত্রকূট পর্বতের ইহা একটি নদী।

গোদাবরী

রঘুবংশে (১২, ৩১ ; ১৩, ৩৪) গোদাবরীর উল্লেখ আছে। ইহার তীরে পঞ্চবটী অবস্থিত। এই নদী কলিঙ্গ দেশের দক্ষিণ সীমানা নির্দেশ করে। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই নদীতে লক্ষ্মণ স্নান করিয়াছিলেন। ত্র্যম্বক তীর্থ হইতে এই নদী উত্থিত। ইহার তীরে অনেকগুলি তীর্থস্থান আছে, যথা—কুশাবর্ত তীর্থ, দশাশ্বমেধিক তীর্থ, গোবর্দ্ধন তীর্থ, সাবিত্রীতীর্থ, বিদর্ভ মার্কণ্ডেয়তীর্থ এবং কিষ্কিন্ধ্যাতীর্থ। গোদাবরী দক্ষিণ-ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী। বিন্ধ্যপর্বতের নিম্নভাগে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ইহা প্রবাহিত। গোদাবরী জেলার অন্তর্গত বঙ্গোপসাগরে তিনটি প্রধান স্রোত লইয়া ইহা পতিত হইয়াছে। হায়দ্রাবাদ এবং মাদ্রাজের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইবার সময়ে অনেকগুলি শাখা নদীর সহিত ইহা মিলিত হইয়াছে। তুঙ্গভদ্রা, কাবেরী, ভীমরথী ও কৃষ্ণবেন্বার সহিত এই নদী সহ্য পর্বত হইতে উত্থিত হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতের ইহা একটি পবিত্র নদী। নাসিক হইতে কুড়ি মাইল দূরে ত্র্যম্বক গ্রামে অবস্থিত ব্রহ্মাগিরি হইতে বস্তুতঃ ইহার উৎপত্তি। কবিষ্ট অরণ্যের নিকট ইহা অবস্থিত। সপ্ত গোদাবরীর উল্লেখ মহাভারতে আছে।

কাবেরী

রঘুবংশ (৪.৪৫) হইতে জানা যায় যে, রঘু কাবেরী নদী অতিক্রম করিয়াছিলেন। এই নদী কুর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া কোয়েমবেটোর এবং ত্রিচিনাপল্লী জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। পল্লবদিগের ইহা একটি প্রিয় নদী। জনৈক পল্লবরাজা কাবেরী নদীতীরস্থ দেশ শাসন করিয়াছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে এই নদীর উল্লেখ আছে। কালিকাপুরাণের মতে মহাকাল হ্রদ হইতে এই নদীর উৎপত্তি। ইহা একটি অত্যন্ত পবিত্র নদী। দণ্ডিনের কাব্যাদর্শে কাবেরী নদীতীরস্থ অনেক দেশের উল্লেখ আছে। দক্ষিণ ভারতীয় অনুশাসনগুলিতে দেখা যায় যে, চোড়দিগের সহিত এই নদী সংশ্লিষ্ট ছিল। চালুক্যদিগের রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী তাঁহার বিজয়ী সৈন্য লইয়া এই নদী অতিক্রম করিয়া চোড়দেশে প্রবেশ করেন। প্রাচীন তামিল কাব্যে কাবেরীর গৌরব বর্ণিত হইয়াছে। রাজা কান্তের অনুরোধে অগস্ত্য মুনি তাঁহার জলপাত্র হইতে এই নদীকে মুক্তি দেন। জলাভাবের সময়ে এই নদী চোড়দিগের যথেষ্ট জলদান করিয়াছিল। দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত নদী কাবেরী পশ্চিম পর্বতমালা হইতে উত্থিত হইয়া মহীশূরের মধ্য দিয়া দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া তাঞ্জোর জেলার অন্তর্গত বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। পুরাকালে এই নদী মুক্তার জন্য বিখ্যাত ছিল। কাবেরী নদীর উত্তর তীরস্থ কাবেরীপট্টনম বা পুগার চোড়দিগের একটি প্রধান বন্দর ছিল। চোড়দিগের প্রাচীন রাজধানী উরগপুর এই নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত।

বরদা

মালবিকাগ্নিমিত্র (৫.১.১৩) নাটকে দক্ষিণ ভারতের বরদা নদীর উল্লেখ আছে। বিদর্ভ হইতে যে দুইটি রাজ্য গঠিত হইয়াছে, এই নদী তাহাদের সীমানা নির্দেশ করে। অনন্তপুরের উত্তর দিকে পশ্চিম পর্বতমালা হইতে এই নদী উত্থিত হইয়া করজগির পূর্ব দিকে তুঙ্গভদ্রার সহিত মিলিত হইয়াছে। বরদা নদী বেদবতী নামে পরিচিত। ইহা কৃষ্ণা নদীর একটি দক্ষিণ শাখা। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ব্যাহ্বা এবং অগ্নিপুরাণের বরদা অভিন্ন।

লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র

কালিদাসের রঘুবংশে (৪.৮১) লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র নদীর উল্লেখ আছে। আসামের ইহা একটি প্রধান নদী। এই নদী প্রাগ্‌জ্যোতিষের পশ্চিম সীমানা গঠন করিয়াছিল।

মানস সরোবরের পূর্ব অঞ্চল হইতে ইহার উৎপত্তি নির্ণয় করা যায়। ব্রহ্মকুণ্ড নামে ব্রহ্মপুত্র নদীতে একটি গভীর ও নিশ্চল জলরাশি ছিল। পরশুরাম যে কুঠার দ্বারা ক্ষত্রিয়গণকে ধ্বংস করিয়াছিলেন এই জলাশয়ে সেই কুঠারটি তিনি নিক্ষেপ করেন। হিন্দুযাত্রীরা এই জলাশয়টি প্রায়ই দর্শন করিতে যান।

মহাকোশী

কালিদাসের কুমারসম্ভবে (৬,৩৩) মহাকোশী নদীর উল্লেখ আছে। ইহা হিমালয় পর্বতের পাদদেশ হইতে নির্গত হইয়াছে। নেপালের দক্ষিণ অংশে কৌশিকী (বর্ত্তমান কুশী) চারিটি নদীর সংযুক্ত স্রোত বলিয়া বিদিত। ভাগলপুর এবং পূর্ণিয়া জেলার মধ্য দিয়া এই নদী প্রবাহিত হইয়া পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত মানহবির দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার মোহানার নিকট কোশিকী নদী সৌর নামে একটি ক্ষুদ্র শাখানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। প্যারজিটার সাহেবের মতে এই নদীর বিশেষ গতি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

নর্ম্মদা বা রেবা

কালিদাসের রঘুবংশে (৬.৪৩; ৫.৩৯; ৭.২,১৩,২০) নর্ম্মদা বা রেবা নদীর উল্লেখ আছে। অনুপদেশের রাজধানী মাহিষ্মতীর মধ্য দিয়া ইহা প্রবাহিত। ইহা মেকলসুতা নামে পরিচিত। এই নদীর দক্ষিণ দিকে বিদর্ভ দেশ অবস্থিত। কালিদাসের মেঘদূতেও ইহার উল্লেখ আছে। মধ্য এবং পশ্চিম ভারতে ইহা খুব বিখ্যাত নদী। টলেমীর নিকট ইহা নামাডস নামে পরিচিত। পদ্মপুরাণে, ভাগবতপুরাণে এবং যোগিনীতন্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে। মৎস্যপুরাণের মতে যেখানে এই নদী সাগরে পতিত হইয়াছে তাহা জামদগ্নিতীর্থ নামে পরিচিত। এই নদী মৈকাল পর্বত হইতে উত্থিত হইয়াছে। ইহা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া ভুপাল এবং মধ্যপ্রদেশের মধ্যে স্বাভাবিক সীমানা গঠন করিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে অমরকণ্টক পর্বত হইতে উত্থিত হইয়া ক্যাম্বে উপসাগরে ইহা পতিত হইয়াছে। এই নদী ইন্দোরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া রেওয়াকণ্ঠ প্রতিক্রম করিয়া ব্রোচে সাগরে মিশিয়াছে। বিন্ধ্য ও সৎপুরা পর্বতমালার মধ্য দিয়া এই নদী প্রবাহিত হইয়া অনেকগুলি শাখা নদীর সহিত যুক্ত হইয়াছে। রেবা, সমোদ্ভবা এবং মেকলসুতা নামে পরিচিত এই নদী প্রাচীন অবন্তী রাজ্যের দক্ষিণ সীমানা গঠন করিয়াছিল। দশকুমারচরিতের মতে রেবা বা নর্মদা নদীর তীরে বিন্ধ্যপর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দির আছে। এই নদী কর্কটপূর্ণ ছিল।

নির্বিন্ধ্যা বা নির্বন্ধ্যা

কালিদাসের মেঘদূতে (১,২৮-২৯) দেখিতে পাওয়া যায় যে, নির্বিন্ধ্যা বা নির্বন্ধ্যা নদী উজ্জয়িনী ও বেত্রবতীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত। কেহ কেহ বলেন, এই নদী বর্ত্তমান কালিসিন্ধু হইতে অভিন্ন। বেত্রবতী ও সিন্ধুর মধ্যে অবস্থিত নেভুজ নামে চাম্বালের একটি শাখা নদী এবং নির্বিন্ধ্যা অভিন্ন। এই নদী দশার্ণ এবং শিপ্রার মধ্যে অবস্থিত।

শিপ্রা বা বিশালা

মার্কণ্ডেয়পুরাণের মতে পারিপাত্র পর্বত হইতে শিপ্রা বা বিশালা (মেঘদূত, পূর্বমেঘ, ২৭,২৯) উত্থিত হইয়াছে। শিপ্রা নদীর তীরে প্রাচীন উজ্জয়িনী নগর অবস্থিত (মেঘদূত, পূর্বমেঘ, ২৭,২৯,৩১)। ইহা গোয়ালিয়র রাজ্যের একটি নদী। ইহা চর্ম্মণ্বতী নদীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ইহার দুইটি শাখা নদী আছে।

দশার্ণা

মার্কণ্ডেয়পুরাণের মতে ঋক্ষ পর্বত হইতে দশার্ণা নদী নির্গত হইয়াছে। কালিদাসের মেঘদূতে (পূর্বমেঘ, ২৩) ইহার উল্লেখ আছে। ইহা সাওগরের নিকট বর্ত্তমানে ধসন নামে পরিচিত। বেটৌয়া এবং কেনের মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

গম্ভীর

কালিদাসের মেঘদূতে (পূর্বমেঘ, ৪০) গম্ভীর নদীর উল্লেখ আছে। ইহা যমুনার একটি শাখা নদী। পূর্ব রাজপুতানার মধ্য দিয়া গঙ্গাপুর হইতে পূর্ব দিকে ইহা প্রবাহিত।

বেত্রবতী

মেঘদূতে (পূর্বমেঘ, ২৪) বেত্রবতী নদীর উল্লেখ আছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণের মতে এই নদী পারিপাত্র পর্বত হইতে নির্গত হইয়াছে। ইহাই বর্ত্তমানে বেট্‌য়োয়া নামে পরিচিত। ইহা যমুনার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। যমুনার দিকে প্রবাহিত কালে ইহা অনেকগুলি শাখা নদীর দ্বারা যুক্ত হইয়াছে।

হিমালয় পর্বত

কালিদাসের কুমারসম্ভব (১.১) হইতে জানা যায় যে, কার্ম্মুকের গুণের ন্যায় সাগর হইতে সাগর পর্য্যন্ত হিমালয় বিস্তৃত। প্রাচীনকালে হিমালয় পর্বতের অনেকগুলি নাম ছিল, যথা—হিমবান, হিমাচল, হিমবন্তপ্রদেশ, হিমাদ্রি এবং হিমবত। মহাভারতের মতে হৈমবত অঞ্চল নেপালের পশ্চিমদিকে অবস্থিত। কৈলাস পর্বত হিমালয় পর্বতমালার মধ্যভাগের উত্তরে বিদ্যমান। বাণের কাদম্বরীর মতে এই পর্বত স্বচ্ছ প্রস্তর দ্বারা নির্মিত হইয়া শ্বেতবর্ণ দেখাইত। মৈনাক হিমালয় পর্বতমালার একটি অংশ ছিল। পূর্ব

হিমালয় অঞ্চল আসাম ও মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচারের জন্য স্থবির মধ্যমকে হিমালয়ে পাঠান হইয়াছিল। প্রাচীন ভূগোলবিদের মতে সুলেমন হইতে পঞ্জাবের পশ্চিম দিক ধরিয়া আসাম পর্যন্ত ভারতের সমগ্র উত্তর সীমা এবং পূর্বদিকে আরাকান পর্বত পর্যন্ত হিমালয় পর্বত বিস্তৃত ছিল। কেহ কেহ বলেন যে হিমালয় পর্বতাঞ্চল ও তিব্বত অভিন্ন। ফারগুসানের মতে এই পর্বত ও নেপাল এবং রিজ ডেভিডসের মতে ইহা এবং মধ্য হিমালয় অভিন্ন। কুমারসম্ভবে (১.১) বর্ণিত আছে যে, হিমালয় ভারতের উত্তরে অবস্থিত এবং পূর্ব ও পশ্চিম দিকে সাগরের দ্বারা বেষ্টিত। ইহার চূড়ায় অনেক প্রকার খনিজ পদার্থ আছে (কুমারসম্ভব ১-৪)। মুনিগণ ইহার চূড়ায় আশ্রয় লন (কুমারসম্ভব ১.১৪)। এই পর্বতোপরি সিংহ হস্তিগণকে বিনাশ করিত (কুমারসম্ভব, ১,৬)। কিরাতেরা সিংহের গতিবিধি অবগত ছিল। এই পর্বতের অন্ধকারময় গুহার মধ্যে কিরাতের স্ত্রীগণ বাস করিত (কুমারসম্ভব, (১.১০)। বৌদ্ধসাহিত্যে সাতটি বৃহৎ হিমালয়-হ্রদ এবং এই পর্বতের সাতটি চূড়ার উল্লেখ আছে।

গোবর্দ্ধন

কালিদাস রঘুবংশে (৬ ৫১) গোবর্দ্ধন পর্বতের উল্লেখ করিয়াছেন। মথুরা জেলার অন্তর্গত বৃন্দাবন হইতে আঠার মাইল দূরে এই পর্বত অবস্থিত। পালি জাতকে, ভাগবতে এবং যোগিনীতন্ত্রে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। হরিবংশের মতে এই পর্বতে হরিদেবের এবং চক্রেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। শ্রীনাথজীর মূর্তিও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

গন্ধমাদন

কুমারসম্ভব কাব্যে (৮. ২৩, ২৪, ২৯, ৫৯) এবং বিক্রমোর্বশীয় নাটকে (পৃ. ৮৭) কালিদাস গন্ধমাদনের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাগবতপুরাণে লিখিত আছে যে, এই পর্বতোপরি ব্রহ্মা আগমন করেন। পালি জাতক হইতে জানা যায় যে রাজা বেষন্তর স্ত্রীপুত্রকন্যা সহিত এই পর্বতে আসেন। এই পর্বতটি রুদ্র হিমালয়ার একটি অংশ এবং রামায়ণ ও মহাভারতের মতে ইহা কৈলাস পর্বতমালার অংশবিশেষ। কথিত আছে, এই পর্বতটি মন্দাকিনীর জলে ধৌত হয়। ইহার পাদদেশে দশ বৎসর ধরিয়া রাজা পুরুরবা উর্বশীর সহিত বাস করিয়াছিলেন। পদ্মপুরাণের মতে এখানে সুগন্ধ নামে একটি তীর্থস্থান ছিল। এই পর্বতের পূর্ব দিকে কাম পর্বত অবস্থিত। গৌতম বুদ্ধ এই পর্বত পরিদর্শন করেন।

কৈলাস

অভিজ্ঞানশকুন্তলের (পৃ. ২৩৭) মতে কৈলাস হেমকূট নামে পরিচিত। ভাগবতপুরাণ হইতে জানা যায় যে, ইহা গঙ্গানদী পরিবেষ্টিত ভূতেশগিরি নামে বিদিত। মহাভারতে এবং দশকুমারচরিতে ইহা হেমকূট ও শঙ্করগিরি নামে বিদিত। জৈনেরা ইহাকে অষ্টাপদ পর্বত নামে জানিত। এই পর্বতের উল্লেখ কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয় নাটকে (নির্ণয়-সাগর সংস্করণ, পৃ. ৮৭) পাওয়া যায়। এখানে শিব ও পার্বতীর বাসস্থান ছিল (মেঘদূত, পূর্বমেঘ, ১১, ৫৮, ৫২, ৬০)। গন্ধমাদন পর্বতে এবং কৈলাসে শান্তনু বাস করিতেন। মহাভারতের মতে কৈলাস পর্বতমালার অন্তর্গত কুমায়ুন এবং গাড়োয়াল পর্বত।

কৈলাস পর্বতমালা লাডাক পর্বতমালার পাশাপাশি অবস্থিত। কৈলাস পর্বতের অনেকগুলি বৃহৎ চূড়া আছে। তিব্বতীয়েরা ইহাকে কাংগ্রিনপোচি নামে জানে। ইহার উপরে বদরিকাশ্রম অবস্থিত। কৈলাস ও বৈদ্যুত পর্বত অভিন্ন।

মহেন্দ্র পর্বত

কালিদাসের রঘুবংশে (৪,৩৯ ; ৬,৫৪) কলিঙ্গ দেশের অন্তর্গত মহেন্দ্র পর্বতের উল্লেখ আছে। গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত মহেন্দ্র নামে কতকগুলি পর্বতকে সম্ভবতঃ মহেন্দ্রাচল বলা হয়। মহেন্দ্র পর্বতমালা গঞ্জাম হইতে পাণ্ড্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গঙ্গাসাগরসঙ্গম ও সপ্ত গোদাবরীর মধ্যে ইহা অবস্থিত। গঞ্জামের নিকটে পূর্ব পর্বতমালার অংশ এখনও মহেন্দ্র পর্বত নামে বিদিত। পারজিটার সাহেবের মতে মহানদী, গোদাবরী ও ওয়েন গঙ্গার মধ্যে অবস্থিত পর্বতমালার নাম মহেন্দ্র। বাণের হর্ষচরিতের মতে এই পর্বত মলয় পর্বতের সহিত যুক্ত হইয়াছে। কলিঙ্গ দেশের রাজাকে কালিদাস মহেন্দ্রের অধীশ্বর বলিয়াছেন। কতকগুলি ছোট ছোট পর্বত মহেন্দ্র পর্বতের সহিত সংশ্লিষ্ট। উড়িষ্যা হইতে মাদুরা জেলা পর্যন্ত সমগ্র পর্বতমালা মহেন্দ্র পর্বত নামে পরিচিত ছিল। রামচন্দ্র কর্তৃক পরাজিত হইয়া পরশুরাম এই পর্বতে আসেন। পূর্ব পর্বতগুলির সর্বোচ্চ শিখর মহেন্দ্র-গিরি নামে আখ্যাত।

মলয় পর্বত

রঘুবংশে (৪,৪৬) মলয় পর্বতের উল্লেখ আছে। নীলগিরি হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত পশ্চিম পর্বতমালার অংশ এবং মলয় অভিন্ন। মলয় পর্বতোপরি অগস্ত্যমুনির আশ্রম ছিল। কাবেরী নদীর নিম্নভাগে পশ্চিম পর্বতগুলির দক্ষিণ দিকে বিস্তারকে ত্রিবাঙ্কুর পর্বতমালা বলা হয়। ত্রিবাঙ্কুর পর্বত-মালা বস্তুতঃ মলয়গিরির পশ্চিম দিক গঠন করে। রামায়ণ ও মহাভারতের মতে মলয়াচল দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত। জীমূতবাহন তাঁহার রাজ্য ত্যাগ করিয়া এই পর্বতে আশ্রয়

লন। এই পর্বতোপরি অবস্থিত কল্যাণতীর্থের উল্লেখ পদ্মপুরাণে আছে। দণ্ডীর কাব্যাদর্শে উল্লিখিত দক্ষিণাদ্রি এবং মলয়াচল অভিন্ন।

সহ্য

রঘুবংশ (৪.৫২) হইতে জানা যায় যে, রঘু সহ্য পর্বত অতিক্রম করিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতে পশ্চিম পর্বতমালার নাম সহ্যাদ্রি। বস্তুতঃ সহ্যাদ্রি বা সহ্য পর্বত পশ্চিম পর্বতমালার উত্তরাংশের নাম ছিল। সহ্য পর্বতের সহিত কতকগুলি ছোট ছোট পর্বতের যোগসূত্র ছিল, যথা—ত্রিকূট, ঋষ্যমূখ এবং গোমন্ত।

ত্রিকূট

রঘুবংশে (৪,৫৯) ত্রিকূটের উল্লেখ আছে। এই পর্বত হইতে ত্রৈকূটকদিগের নাম রাখা হয়। ভাগবতপুরাণের মতে সিনেরু পর্বতের পাদদেশে ত্রিকূট অবস্থিত।

মন্দার

কালিদাসের কুমারসম্ভবে (৮.২৩, ২৪, ২৯, ৫৯) হিমালয়ের অন্তর্গত মন্দারের নাম পাওয়া যায়। কৈলাস এবং গন্ধমাদনের নিকটে ইহা অবস্থিত। মেগাস্থিনিস ও আরিয়েনের নিকট এই পর্বত মেলুস নামে পরিচিত। ইহা ভাগলপুর জেলার বাঙ্কার অন্তর্গত। ইহা ভাগলপুরের দক্ষিণে তেত্রিশ মাইল এবং বংসির উত্তরে তিন মাইল দূরে অবস্থিত।

বিন্ধ্যপাদ পর্বত

কালিদাসের মেঘদূতে (পূর্বমেঘ, ১৯) বিন্ধ্যপাদ পর্বতের নাম পাওয়া যায়। মহাভারতে ইহা বিন্ধ্যপর্বত নামে পরিচিত। বিন্ধ্য ও সৎপুর পর্বতমালা অভিন্ন। এই পর্বত নর্মদার দক্ষিণে বিদ্যমান। আধুনিক ভূগোলবিদের মতে এই পর্বত উত্তর ভারতের দক্ষিণ সীমা। সৎপুর পর্বতের পূর্বভাগ মহাদেব পর্বত নামে বিদিত। বিন্ধ্যপর্বতের পূর্ব বিস্তার অর্থাৎ কৈমুর পর্বতমালা শোণ উপত্যকার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। নর্মদার উৎপত্তি স্থানের নিকট বিন্ধ্য ও সৎপুর পর্বতমালা অমরকণ্টকে যুক্ত হইয়াছে। মেকল পর্বতমালা সৎপুর পর্বতের পূর্বসীমা।

দণ্ডকারণ্য

কালিদাসের রঘুবংশে (১২,৯) দণ্ডকারণ্যের উল্লেখ আছে। কলিঙ্গ দেশের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ইহা একটি বৃহৎ অরণ্য ছিল। রামের বনবাসের সম্পর্কে এই অরণ্য রামায়ণে বিখ্যাত। বুন্দেলখণ্ড অঞ্চল হইতে কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত প্রায় সমগ্র মধ্যভারতে ইহা বিস্তৃত ছিল। কিন্তু মহাভারতের মতে গোদাবরীর উৎপত্তি-স্থান পর্যন্ত দণ্ডকবন বিস্তৃত ছিল। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, দণ্ডকারণ্য একটি পবিত্র স্থান। এই অরণ্যে একটি স্রোত এবং গুহা ছিল। জনস্থানের পশ্চিম দিকে ইহা চিত্রকুঞ্জবৎ নামে পরিচিত। বাণের হর্ষচরিতে এবং পালি মিলিন্দ-পঞ্হে ইহার উল্লেখ আছে। জৈনেরা বলেন যে, এই অরণ্য দাবানলে দগ্ধ হইয়াছিল। দণ্ডকারণ্য দক্ষিণাপথ হইতে মধ্যদেশকে পৃথক করিয়াছিল (রঘুবংশ, ১২, ১৫, ২৪; ১৩, ৪৭)। জনস্থান দণ্ডকারণ্যের অংশ এবং চিত্রকুটের নিকটে চিত্রকুটবন দণ্ডকারণ্যের একটি অংশবিশেষ (রঘুবংশ ১২,৯)।১

১। এই প্রবন্ধ প্রণয়নকালে যে সকল পুস্তক ও প্রবন্ধ হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি তাহাদের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

ঋগ্বেদ, অথর্ব্ববেদ, শতপথ ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয়-আরণ্যক, পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ, কৌশিতকী ব্রাহ্মণ, ঐতেরেয় ব্রাহ্মণ, সাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্র, লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র, কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র, আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র, রামায়ণ, মহাভারত, অগ্নিপুরাণ, সৌরপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, কালিকাপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ভাগবতপুরাণ, পদ্মপুরাণ (তীর্থমাহাত্ম্য), কূর্ম্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, বৃহৎ সংহিতা, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্র, পতঞ্জলির মহাভাষ্য, কাব্যমীমাংসা, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, অভিজ্ঞান-শকুন্তল, বিক্রমোর্ব্বশীয়, মালবিকাগ্নিমিত্র, হরিবংশ, যোগিনীতন্ত্র, দশকুমারচরিত এবং ধোয়ীর পবনদূত।

বিনয়-মহাবগ্গ, দীঘনিকায়, মজ্ঝিম নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, জাতক, ধম্মপদটীকা, মহাবংস, দীপবংস, মহাবোধিবংস, সাসন বংস, সমন্তপাসাদিকা, মিলিন্দ-পঞ্হ, ললিতবিস্তর, মহাবস্তু, দিব্যাবদান, সৌন্দরনন্দ-কাব্য, বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা। জম্বুদীবপন্নত্তি, বিবিধতীর্থকল্প, জৈন হরিবংশ পুরাণ, নিশীথচূর্ণী, সুয়গড়ঙ্গনিযুক্তি।

Watters On Yuan Chwang*, 2 Vols., *Travels of** *Fa-hien*, *Ancient Geography of India* (Cunningham), *Early History of India* (Smith, 4th Ed.), Pargiter *Dynasties of the Kaliage*, *Ancient Indian Historical Tradition*, *Cambridge History of India*, Vol. 1, *Historical Gleanings* (Law), *Historical Geography of Ancient India* (Law), *Geographical Aspect of Kalidasa's Works* (Law), *Jaina Canonical Sutras* (Law), *Rivers of India* (Law), Law—Alberuni's Knowledge of Indian Geography (Indo-Iranica, Vol. VII, No. 4), Barua—*Old Brahmi Inscriptions*, McCrindle—*Ancient India as Described by Megasthenes and Arrian*, Ray Chaudhury—*Political History of Ancient India* (4th Ed.), *Assam District Gazetteers* (Vol. IV), *Imperial* ***Gazetteer of India* (Vol. XIV), *Indian Antiquary (Vols. 1 & 2), *C. I. I.* (Vol. III), N. G. Majumdar—*Inscriptions of Bengal* (Vol. III), *J.R.A.S.* (1909, **1913), *The Modern Review* (March 1946), *Acta Orientalia* I, Beal—*Buddhist Records of the Western World*,** McCrindle—*Ancient India as Desorbied by Ptolemy*, Hultzsch—*South Indian Inscriptions*, *Archaeological Survey Report* (XXI), A. S. I.—*Annual Report 1935-36*.

কাঞ্চা গুরুং

শ্রীসুবোধ বসু

'ঘোড়া সাব্ ?'

ঘাড় নাড়িলাম।

'আচ্ছা ঘোড়া সাব্।' নিতান্ত উপরোধের কণ্ঠ।

তখন ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিলাম। বছর বারোর নেপালী ছেলে। ধব্‌ধবে ফরসা, কিন্তু ময়লার পলেস্তারা-পড়া গায়ের রং; গাল দুটো আপেলের মত লাল, মুখে সারল্য, চোখে উদ্বেগমিশ্রিত ঔৎসুক্য। এক হাতে সে টাট্টু ঘোড়াটার মুখের ষ্ট্রাপ ধরিয়া রহিয়াছে, সেটা আকারে তার চেয়ে অনেক বড় হইলেও আমার চেয়ে খুব বড় নয়; উচ্চতায় ত অর্দ্ধেকেরও কম। এমন জীবের উপর চড়িয়া বসা জীবে অত্যাচার বলিয়া মনে করি, বাহুল্যবোধে উহা আর তাকে বলিলাম না। কহিলাম, 'এতে ত 'বাবা'রা চড়বে।'

'নেহী সাব্। কিত্‌না সাব্ চড়তা। আইয়ে সাব্।'

মার্চ মাসের প্রথম ভাগ। দার্জ্জিলিঙের ভিজিটরেরা এখনও বড় একটা কেউ আসে নাই, আমিই আগাম চালান। আমার মত অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে ঘোড়ায় চড়াইবার আগ্রহ তাই কিছু বেশী।

'কেয়া নাম তুম্‌হারা ?'

'কাঞ্চা। কাঞ্চা গুরুং।' ছেলেটা বেশ একটু বিস্মিত হইয়া কহিল। সচরাচর কোন খদ্দের তার নাম জিজ্ঞাসা করে না, বিস্ময়টা বোধ হয় এই জন্যই।

'কোথায় থাক ?'

'ঘুম।'

অর্থাৎ দার্জ্জিলিঙের আগের ষ্টেশন ঘুম্ হইতে অতি প্রত্যূষেই ঘোড়া লইয়া আসিয়াছে দার্জ্জিলিঙের চৌরাস্তায় ভিজিটর পাকড়াইতে। ইহাকে হতাশ করিতে মায়া হইল। একটা আধুলি বাহির করিয়া তার হাতে দিলাম। কহিলাম, 'লেও।'

ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া আধুলিটা সে গ্রহণ করিয়াছিল। এই বার সবিস্ময়ে এবং সলজ্জভাবে কহিল, 'নেহী সাব্। আপতো নহী চড়া...'

'কোই বাৎ নেহী।' আমি তার প্রত্যর্পণ-উদ্যত হাতটাকে আমল না দিয়া কহিলাম। 'তুম্ মিঠাই খা লেও, কাঞ্চা।'

সে বেশ একটু বিব্রত ও সঙ্কুচিত বোধ করিল। কিন্তু আমাকে আর পীড়াপীড়ি করিতে সাহস পাইল না। তার বিবর্ণ ও ইস্ত্রিবিহীন গরম কোটের পকেটে আধুলিটা রাখিয়া দিয়া সে আমাকে মিলিটারি কায়দায় এক সাড়ম্বর স্যালুট করিল। কহিল, "কোঠীমা যাইন্‌ছ সাব্ ? 'বাবা'লোগ চড়ে গা ?...'

'কোঠীমে বাবালোগ কোই নেহী হ্যায়।'

কাঞ্চা খবরটায় বেশ একটু যেন হতাশ হইল। আমাকে সম্ভবতঃ তার ভাল খদ্দের মনে হইয়াছিল; বাড়ীর ছেলে-পিলেদের ঘোড়ায় চড়াইবার সম্ভাবনা নাই শুনিয়া সে দমিয়া গেল। কহিল, 'কব আয়গা সাব্? হম্ ঘোড়া দেঙ্গে। আওর কিসিকে পাস নেহী লেনা। বহোৎ আচ্ছা ঘোড়া। হামারা দোঠো...উই, রোজ্-'বাবা' আ গয়া। রোজ্ বাবা...' আমাকে কোনও রূপ বিদায়-সম্ভাষণ জানাইবার চেষ্টা না করিয়া পলকে সে ঘোড়াসহ জলাপাহাড় রোডের জংশনের দিকে ছুট লাগাইল। চাহিয়া দেখিলাম, কালো কোট ও চেক স্কার্ট পরা বছর আট-নয়ের একটি ইংরেজ মেয়ে এক নেপালী আয়ার সঙ্গে চৌরাস্তার দিকে আগাইয়া আসিতেছে।

বেচারি একটি ভাল খদ্দের পাইল দেখিয়া প্রফুল্ল ভাবেই আমি চৌরাস্তার একটি বেঞ্চে আসিয়া বসিলাম। ইহার দু' মিনিট পরেই দেখিলাম, রোজ-'বাবা' পাকা সওয়ারের মত ঘোড়ার পিঠে আসীন হইয়া, ঘোড়ার খুরের শব্দে জনবিরল চৌরাস্তা মুখরিত করিয়া পশ্চিম ম্যাল রোডের দিকে কদম ছুটিয়া চলিয়াছে—আর তার পিছনে আদত একটা ঘোড়ার বাচ্চার মত কাঞ্চা গুরুং ছুটিতেছে। এক হাতে চাবুক, আর এক হাতে কোট। বোধ হয় ঘোড়ার মত দৌড়াইতে পরিশ্রম হইবে জানিয়াই আগে হইতে কোটটা খুলিয়া ফেলিয়াছে।

ইহার পর কাঞ্চা গুরুংকে আরও বহুবার দেখিয়াছি। মুখোমুখি হইলে সেদিনকার সেই বকশিশের কথা স্মরণ করিয়াই বোধ হয় সর্ব্বদাই আমাকে স্যালুট করিয়াছে। তাহার ঘোড়ার চেয়ে বেশী ওজনের বহু লোককে তাহার ঘোড়া দাবড়াইতে দেখিয়াছি, বহু মাড়োয়ারি ভদ্রমহিলাকে ঘোমটায় লজ্জানিবারণ করিয়া মন্দ পায়ে অশ্বারোহণের আনন্দ উপভোগ করিতে লক্ষ্য করিয়াছি এবং বহু আনাড়ি বাঙালী ছেলেকে কাঞ্চার ঘোড়ার বিদ্রূপ ভোগ করিতে দেখিয়া সঙ্কোচ বোধ করিয়াছি। কিন্তু যে-ই চড়ুক, সর্ব্বদাই ঘোড়া-

ওলাকে সঙ্গে দৌড়াইতে হয়—কিছুটা সওয়ারির মনোবল রক্ষার জন্য এবং বাকিটা ঘোড়ার উপর মালিকানার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়োজনে। এই বছর বারোর ছেলেটাকে ঘোড়ার পিছনে পিছনে এমন ভাবে দৌড়াইতে দেখিয়া মায়া হইয়াছে। কিন্তু এটাই ওদের ব্যবসা; ওরা হয়ত এই পরিশ্রমে ভ্রূক্ষেপই করে না।

তবে রোজ-'বাবা' যেমন কদম ছোটে, এমন আর কাউকে ছুটিতে দেখি না। কাঞ্চার টাট্টু যেন উপযুক্ত সওয়ার পাইয়া নিজের কারদানী সকলটুকুই প্রকাশ করিয়া ফেলে। সওয়ার ও ঘোড়ার এই যৌথ নৈপুণ্যের সঙ্গে পাল্লা রাখিতে গিয়া কাঞ্চা গুরুং দার্জ্জিলিঙের পাহাড়ী রেলের এঞ্জিনের মত হাঁপাইতে হাঁপাইতে বিভিন্ন উঁচুনীচু দুরধিগম্য পার্ব্বত্য পথে প্রাণপণে ছুটিতেছে, এ দৃশ্য বহু দিন দেখিয়াছি। কাঞ্চা বোধ হয় এতে আনন্দই পায়। কারণ ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি যে, মক্কেল হিসাবে রোজকেই কাঞ্চার সবচেয়ে পছন্দ। ধনী মাড়োয়ারির সঙ্গে দরদস্তুর যখন প্রায় ঠিক হইয়া আসিয়াছে, তখন হয়ত দেখা গেল দূরে রোজ আসিতেছে। ব্যস্, আর কথা নাই। সকল সৌজন্য ও কুরণের সকল দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া সে এই ক্ষুদ্র মক্কেলটির দিকে ছুট দিল। তারপর সুরু হইল ঘোড়ার সঙ্গে ঘোড়দৌড়।

রোজ'বাবা'রও যে সমবয়স্ক এই ঘোড়াওলার প্রতি কতকটা আনুগত্য আছে, তাহা আমি স্বচক্ষে লক্ষ্য করিয়াছি। জলা-পাহাড় রোড হইতে চৌরাস্তায় নামিয়া আসিয়া ঘোড়ার আস্তাবলের দিকে চোখ বুলাইয়া হয়ত লক্ষ্য করিল, কাঞ্চা ও তার ঘোড়া অনুপস্থিত। পলকে দুইটা নেপালী ছোকরা ও এক ভুটানী বুড়ী নিজ নিজ টাট্টু লইয়া তাহার কাছে ছুটিয়া গেল। রোজ তাহাদের আমলই দিল না; মুখে গাম্ভীর্য্য এবং তাচ্ছিল্যের এক অপূর্ব্ব মিশ্রণ ফুটাইয়া তুলিয়া আগাইয়া গেল চৌরাস্তার ফোয়ারার দিকে। পিছনে পিছনে ঘোড়ার অভিভাবকেরা নানা উপরোধ ও প্রলোভন উদ্যত করিয়া অনুসরণ করিল। এমন সময় হয়ত দেখা গেল, কমার্শিয়াল রো বা বর্ত্তমান নেহরু রোড দিয়া কাঞ্চা গুরুং নিজের ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে। অন্যান্য ঘোড়া-ওলারা এবার হাল ছাড়িয়া দিল। অনতিবিলম্বেই দেখা গেল, কাঞ্চা তার ক্ষুদ্র মক্কেলটির কাছে সহাস্যে হাজির হইয়াছে এবং মক্কেলটি এই বিলম্বের জন্য কর্ত্তাব্যক্তিসুলভ এক তিরস্কার উচ্চারণ করিয়া উহারই ঘোড়ার রেকাবে পা দিয়া অশ্বারোহণ করিতেছে।

একদিন অনেকটা বেলা করিয়া চৌরাস্তায় উপস্থিত হইয়াছি। মোড়ের মাথায় ফোয়ারার ওদিকে যেখানে ঘোড়াওলাদের দাঁড়াইবার জায়গা সেখানে একটা বচসার মত শুনিয়া সেদিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, আমাদের দু'হাত উঁচু কাঞ্চা গুরুং তার প্রায় ডবল লম্বা এবং পাঁচ গুণ ওজনের এক ভুটিয়া যুবকের সঙ্গে রীতিমত ঝগড়া সুরু করিয়া দিয়াছে। কলহের ভাষা আমার কাছে একান্তই দুর্ব্বোধ্য, কিন্তু কাঞ্চা গুরুং যে বিশেষ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা তাহার চোখমুখের ভঙ্গী দেখিয়া সহজেই বুঝিলাম। তাহার এই উত্তেজনার পরিমাণ আঁচ করিয়া লইতেও দেরি হইল না, যখন দেখিলাম স্থান, কাল এবং বিশেষ করিয়া পাত্র বিবেচনা না করিয়াই সে তার তিন মুণে প্রতিপক্ষের উপর নেকড়ে বাঘের মত ঝাঁপাইয়া পড়িল।

অন্যেরা হৈচৈ করিয়া উঠিল, সমব্যবসায়ীরা ছুটিয়া গেল এবং শীঘ্রই মোড়ের নেপালী পুলিস ঘটনাস্থলে হাজির হইয়া শান্তিস্থাপন করিল। আমি কৌতূহল সংবরণ করিয়া চৌরাস্তার একটি বেঞ্চে আসিয়া বসিলাম ও আগের দিনের খবরের কাগজ খুলিয়া লইলাম।

'ঘোড়া সাব্?'

তাকাইয়া দেখি কাঞ্চা।

'আজ ঘোড়া হোগা, সাব্? বার্চ হিল, মাউণ্টেনারিং স্কুল…' একেবারে পাকা গাইডের ভঙ্গী।

'একটু আগে ঝগড়া হচ্ছিল কিসের?' আমি হিন্দীতে প্রশ্ন করিলাম।

'ওটা বড় পাজি। ওটা আমার মক্কেল ভাগিয়ে নেয়। রোজ-'বাবা'কে দু' হপ্তা ধরে ফুসলাচ্ছে। আজ তার কোঠীতে গিয়ে তাকে নিজের ঘোড়ায় তুলে নিয়েছে। আমি যখন বললাম, কেন আমার সওয়ারি ফুসলে নিয়েছ, তখন বদমাসটা বললে, তোর ত মরা টাট্টু; আমার ঘোড়া তেজী ঘোড়া, লিবং-এর রেসে দৌড়ায়। রোজ'বাবা'র আমার ঘোড়া পছন্দ। এবার থেকে আমার ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবে বলেছে।…ঝুট! মিথ্যেবাদী পাজি কোথাকার! তুমি ফুসলেছ তা বুঝি আর আমি টের পাই না!…কাল থেকে আমিই 'বাবা'র কোঠিতে হাজির থাকব, দেখি কি করে তুমি চালাকি খাটাও…'

কাঞ্চার প্রতিদ্বন্দ্বীর চালাকি যে টেকে নাই, তাহা শীঘ্রই টের পাইলাম। গত কয়দিন নিত্যই দেখিতেছি—কাঞ্চার টাট্টু চড়িয়া রোজ দিগ্‌বিদিকে ধাবমান হইতেছে এবং নিজের বিলম্বিতপুচ্ছ ঘোড়ার পিছনে পিছনে বালক কাঞ্চা আর একটা টাট্টুর মতই দৌড়াইতেছে। আর

কোনও সওয়ারই বোধ হয় এই রোজ'বাবা'র মত মেহনত করায় না। রোজ কাঞ্চার জানা মক্কেল; তাদের বাড়ি কাঞ্চা চেনে, পাকা সওয়ারি রোজের যে কাঞ্চার সহায়তায় কোনও প্রয়োজন নাই; তাহা সুস্পষ্ট। তবু যে কেন ছোকরা অন্যান্য মক্কেলের মত সর্ব্বদা তাহারও পিছনে ছুটিতে থাকে, ভাবিয়া পাই না। খদ্দেরের পিছনে পিছনে ছুটিয়া চলাই ইহাদের অভ্যাস, ইহাই বোধ হয় এই নিরর্থক অনুসরণের একমাত্র কারণ।

কিন্তু এই আপাততঃ অনাবশ্যক অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা একদিন টের পাইলাম।

বিশেষ উদ্যম সহকারে আমি দার্জ্জিলিং শহরেরই অন্যতম রাস্তা আচার্য্য জগদীশচন্দ্র রোড ধরিয়া তাহার শেষপ্রান্ত ও সেখান হইতে জলাপাহাড়ে চড়িবার কাঁচা রাস্তাটি আবিষ্কারে চলিয়াছি এবং উচ্চারোহণের পরিশ্রমে এতটা হাঁফাইতেছি যে, শেষ পর্য্যন্ত যাইব অথবা অভিযান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইব, ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছি না। এমন সময় সেণ্ট এণ্ডরুজ স্কুলের দিকে যে রাস্তাটা উঠিয়া গিয়াছে তাহার মোড়ের কাছাকাছি ছোটখাটো একটা জনতা দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। এগুলি দার্জ্জিলিঙের অভিজাত এবং জনবিরল পল্লী, ঘণ্টায় কুড়ি জন লোকও এ দিক দিয়া যাতায়াত করে কিনা সন্দেহ। এ রকম জায়গায় পনেরো-কুড়ি জনের একটা ভিড় আশ্চর্য্য ব্যাপার। নিশ্চয়ই বিশেষ কিছু একটা ঘটিয়া থাকিবে।

একজন বাঙালী ভদ্রলোককে কাছে পাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম।

'একটু আগেই একটা একসিডেণ্ট হয়ে গেল। তবে বাচ্চা [illegible] খুব বাঁচিয়ে দিয়েছে!' বলিয়া ভদ্রলোক ঘটনাটা আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন।

কিছুক্ষণ আগে জলাপাহাড়ে যাইবার উঁচু দিকের এই রাস্তাটা দিয়া একটি মেমের মেয়ে ঘোড়া ছুটাইয়াছিল। চড়াইয়ের রাস্তায় জোরে ছুটিতে গিয়া ঘোড়ার হোঁচট খাওয়াই হোক বা ঘোড়ার নিজস্ব দুষ্টামির জন্যই হোক, আরোহিণী টাল সামলাইতে অসমর্থ হইয়া স্যাডেল হইতে ছিট্‌কাইয়া একেবারে রাস্তার ধারের রেলিঙের উপর গিয়া পড়ে ও সেখান হইতে গড়াইয়া পাহাড়ের গায়ে পড়িয়া যায়। গড়াইয়া একেবারে অতলে চলিয়া যাইত, সৌভাগ্যক্রমে একটা পাইনগাছের গুঁড়িতে বাধা পায়। কিন্তু আশঙ্কা তখনও দূর হয় নাই, যে-কোনও মুহূর্ত্তেই আবার গড়ানো সুরু হইতে পারে।

অকুস্থলের ঠিক উপরে এক পাহাড়ী রমণী কাঠের হাতুড়ি পিটাইয়া কাপড় কাচিতেছিল, সে-ই প্রথম ঘটনাটা লক্ষ্য করিয়া চিৎকার করিয়া উঠে। হাঁকডাক শুনিয়া দু'-পাঁচ জন লোক ছুটিয়া আসিল, কিন্তু ইতিমধ্যেই মেয়েটি পাইনের আশ্রয়চ্যুত হইয়াছে, অতলে গড়াইয়া পড়িবার আর দেরি নাই। এমন সময় এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিল। রাস্তার নিম্নাংশের রেলিং ডিঙাইয়া বারো-তেরো বছরের এক নেপালী ছোকরা ঢালু এবং বন্ধুর পাহাড়ের গা বাহিয়া অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাছে ছুটিয়া আসিয়াছে। পলকে পতনোন্মুখ মেয়েটিকে সে সমস্ত দেহ দিয়া জাপ্‌টাইয়া ধরিল। ভার সামলাইতে না পারিয়া একবার কিছুটা পিছলাইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু পাহাড়ের গা বাহিতে সে অভ্যস্ত, শীঘ্রই খাড়া হইয়া দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে রবাহুতদের মধ্যে কয়েক জন সেখানে ছুটিয়া গেছে। উহারাই ধরাধরি করিয়া মেয়েটিকে উপরে তুলিয়া আনে।

'পাশের বাড়ী থেকে টেলিফোন পেয়ে এইমাত্র মেয়েটির বাপ-মা এসে তাকে বাড়ী নিয়ে গেলেন। দু'এক জায়গায় কেটে-ছড়ে গেছে, তা ছাড়া গুরুতর রকম কোনও জখম হয় নি।' বক্তা উপসংহার হিসাবে কহিলেন।

আমাদের কাঞ্চা আর তার রোজ-'বাবা' নয় ত? কিন্তু দার্জ্জিলিঙে এত মেমের বাচ্চা ঘোড়ায় চড়ে ও এত নেপালী বাচ্চা ঘোড়া ভাড়া দেয় এবং মক্কেলের পিছনে পিছনে ছোটে যে, আমার এ ধারণা হয়তো কল্পনামাত্র।

ক'দিনের জন্য কালিম্পং গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়াও দুই-তিন দিন চৌরাস্তা অঞ্চলে যাওয়া হয় নাই। আজ রবিবার, সকালের দিকে বহু পরিচিতের দেখা মিলিবে ভাবিয়া দার্জ্জিলিঙের এই সরকারী আড্ডাখানাটির দিকে যাত্রা করিলাম।

'সেলাম সাব্।'

'আচ্ছা হ্যায়, কাঞ্চা?'

'জীউ।' আমার পুরাতন বন্ধু আমার আত্মীয়তায় খুশী হইয়া কহিল, 'বাবালোগ কব আয়গা?'

'রোজ-'বাবা' কাহা?' অনাবশ্যক প্রশ্নের জবাব না দিয়া আমিও পালটা প্রশ্ন করিলাম।

'রোজ-'বাবা' চড়তা নহী', কাঞ্চা গম্ভীর ভাবে কহিল।

'কিউঁ? কেন?'

'হামারা ঘোড়াসে 'বাবা' গির গয়া।'

তবে আমার অনুমান মিথ্যা নয়! সেদিনকার দুর্ঘটনার নায়িকা রোজ। উদ্ধারকর্ত্তা কি সত্যাই কাঞ্চা? জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বিরস-বদনে জানাইল, সে-ই বটে। তবে সাহেব আর মেমসাহেব বড়ই গোসা হইয়াছেন, বলিয়াছেন তার ঘোড়া বদমাস ঘোড়া, ওতে আর 'বাবা' চড়িবে না।

সত্যাই কিন্তু তার ঘোড়া পাগলা নয়। চড়াইয়ের রাস্তায় বেশী জোরে ছোটানোয় হয়ত হোঁচট খাইয়া থাকিবে। রোজ-'বাবা'র কোনও বিপদ হইলে সে-ই দায়ী থাকিত, অথচ কোঠিতে ঘোড়া লইয়া গেলে পর পর তিন দিন সাহেব আর মেমসাহেব তাকে ভাগাইয়া দিয়াছেন। তারও সম্মানবোধ আছে, সে নিজেও আর সেখানে যাইবে না স্থির করিয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

'তুমিই যে সেদিন 'বাবা'কে বাঁচিয়েছিলে, তা তাঁরা জানেন ?'

খুশী ও দুঃখের একটা মিলিত ভাব তার মুখের উপর ভাসিয়া উঠিল। নীরবে জামার ভিতর-পকেট হইতে একটা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া আমাকে তুলিয়া দেখাইয়া সে প্রায় তাচ্ছিল্যের স্বরে কহিল, 'ইয়ে বক্‌শিশ মিলা!' অর্থাৎ রোজ-'বাবা'কে আর আমার ঘোড়ায় চড়িতে দিবে না, তবে সেদিন তাকে রক্ষা করিয়াছিলাম, এজন্য দশ টাকা মূল্য ধরিয়া দিয়াছে।

স্পষ্টই বুঝিলাম, তার শিভালরী রীতিমত আঘাত পাইয়াছে। কাঞ্চা বয়সে ছোট হইলে কি হয়, নেপালীদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে তার সম্মানজ্ঞান বড় প্রখর।

'বদমাস! হারামি!' অভিমানের সুর সহসা আক্রোশের কণ্ঠে পরিণত হইল।

সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে চাহিলাম। বিশেষণটি রোজ-'বাবা'র বাপ মায়ের প্রতি নয় ত? এ রকম অশিষ্ট ভাষা ভদ্রলোকের প্রতি উচ্চারণ করা নেপালী বালকের পক্ষে খুবই অস্বাভাবিক। দেখিলাম, উহার দৃষ্টি জলাপাহাড় রোডের দিকে নিবদ্ধ। এই দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া অবিলম্বে অশ্বারূঢ়া রোজকে দেখিতে পাইলাম। বোধ হয় তার বাপ-মায়ের নির্দ্দেশানুযায়ী তাঁর পক্ষে অত্যন্ত অস্বাভাবিক ধীর গতিতে ঘোড়া চালাইতেছে, আর তার ঘোড়ার পিছনে ঘোড়ার প্রায় লেজ ধরিয়া অনায়াসে হাঁটিয়া আসিতেছে সেই আলখাল্লা-পরা লম্বাবেণী ভুটিয়া যুবক—যার সঙ্গে রোজ-বাবার ঘোড়া চড়া লইয়া কাঞ্চার একবার হাতাহাতি হইয়া গেছে। উপরোক্ত বিশেষণ যে উহার প্রতিই উদ্দিষ্ট, এই-বার অনায়াসেই তাহা বুঝিতে পারিলাম।

সামনে দিয়া লাল জাম্পার ও কালো শ্ল্যাকস-পরা রোজ ঘোড়া চড়িয়া আগাইয়া গেল। একবার বোধ হয় সে আড়-চোখে কাঞ্চার দিকে তাকাইয়াছিল, কিন্তু তা খুব স্পষ্ট নয়। স্পষ্ট করিয়া যে তাকাইয়া গেল সে তাহার ভুটিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী। উহার মুখে ও চোখে তৃপ্তির এবং পরিহাসের হাসি। ভাবখানা এই—চেয়ে দেখ, রোজ-'বাবা' কার ঘোড়ায় চড়ে!

কাঞ্চা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার দুই চোখে ঈর্ষা, ক্রোধ এবং কান্নার এক অদ্ভুত মিশ্রণ। সহসা সে নিজের ঘোড়ার পিঠে লাফাইয়া চড়িল এবং সম্ভবতঃ দৃশ্যটা আর সহ্য করিতে না পারিয়া একদম কদম ছুটিল বিপরীত দিকে। আমি যুগপৎ কৌতুক ও সহানুভূতি বোধ করিয়া আস্তাবলের সম্মুখস্থ প্রেক্ষাগার ত্যাগ করিলাম।

যাহারা দোকানের শো-কেস নিরীক্ষণ করিয়া বেড়ায় আমি মোটেই সে শ্রেণীর লোক নই। কিন্তু আমার বন্ধুপত্নী মিসেস্ চৌধুরী আমাকে চৌরাস্তায় বেকার দেখিয়া হঠাৎ তাহাদের কনিষ্ঠতমা কন্যার জন্মদিনে নিমন্ত্রণ করিয়া বসিয়াছেন। ফলে প্রাথমিক তল্লাস হিসাবে আমাকেও গত দুই দিন ধরিয়া দোকানের শো-কেস অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে হইতেছে। একে ত চৌধুরীর জলাপাহাড়ের দুর্গম চূড়ায় অবস্থিত বাড়ীতে নিজেকে টানিয়া তুলিতে হইবে ভাবিয়া দমিয়া পড়িয়াছি, তার উপর গৃহিণীদের এই সব জন্মদিনের নিমন্ত্রণের উপর কোনদিনই আমি প্রসন্ন নই। কিন্তু উপায় নাই, সামাজিকতা করিতেই হইবে। বাড়ীর মেয়েরা কেহ উপস্থিত না থাকাতে উপহার-ক্রয় যে কি হাঙ্গামার ব্যাপার, তাহা ভাল করিয়াই টের পাইলাম।

যাই হোক, এই অনুসন্ধানের ফলে আজ সকালে নেহরু রোডের এক বাহারি দ্রব্যের দোকানের শো-কেসে চমৎকার একটি ডল আবিষ্কার করিয়াছি। কোঁকড়ানো চুল, মাথায় ব্যারে টুপী, নীলনয়না, শুভ্রদশনা খুকী। গায়ে লেসের ফ্রক, পায়ে কালো জুতো, গড়ন স্বাভাবিক শিশুর মত, মুখের ভাব সুপ্রসন্ন ও বুদ্ধিদীপ্ত। যেন একেবারে সজীব মানব-সন্তান। প্রায় চেনা চেনা মনে হইল।

দোকানে ঢুকিয়া দাম জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার বাজেটের চেয়ে খুব বেশী নয়। সাড়ে বারো টাকা ব্যয় করিলেই এই ফুটফুটে মেয়েটিকে সংগ্রহ করা যায়। পকেটে টাকা ছিল, কিন্তু তখনই কিনিলাম না। বিকালে এ পথ দিয়াই যখন জলাপাহাড়ে চড়িতে হইবে, তখন অনর্থক এখন ইহাকে বাড়িতে টানিয়া লইয়া গিয়া লাভ কি। দোকানদারকে বলিলাম, এটি বিকালে আমি ক্রয় করিব, সে যেন আমার জন্য রাখিয়া দেয়। সে ব্যক্তি সবিনয়ে এবং সাগ্রহে রাজী হইয়া গেল। মার্চের দার্জ্জিলিঙে এত চা[illegible] করিয়া জিনিস বিক্রি হয় না যে, ও-বেলা কিনিবে বলিলে খদ্দেরকে অসন্তুষ্ট করা যায়।

বিকালে আসিয়া দেখি, শো-কেসে পুতুলটি নাই। ভাবিলাম, দোকানী ব্যবসাদার লোক, আমার জন্য আগে-ভাগেই প্যাক্ করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। দোকানে ঢুকিয়া

আমার পুতুলটি চাহিলাম। লোকটা মুখে বিস্ময়ের ভাব আনিয়া কহিল, 'সেটা তো দিয়ে দিয়েছি...'

'কাকে ?' আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম।

'কিছুক্ষণ আগে একটা বাচ্চা ছোক্‌রা এসে নিয়ে গেল। আমরা তো ভাবলাম, আপনার চাকর...'

জানি না সত্য কথা বলিতেছে কিনা, অথবা অনিশ্চিত ক্রেতার প্রতীক্ষায় না থাকিয়া উপস্থিত কোনও ক্রেতাকে বিক্রয় করিয়া দিয়াছে। কিন্তু অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া আর লাভ কি ? কহিলাম, 'না, আমি কাউকে পাঠাই নি। যাই হোক, ও রকম আর আছে ? জিনিষটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল।'

'না, সার, আর নেই। ভারি সুন্দর পুতুলটা ছিল, না ?'

এবার প্রায় স্পষ্টই বোধ হইল, লোকটা জানিয়া-শুনিয়াই উহা অন্যকে বিক্রি করিয়াছে। এই সন্দেহ না হইলে উহার কাছ হইতেই অন্য কোনও উপহার-দ্রব্য ক্রয় করিতাম। তাহা না করিয়া উহা অন্য কোন দোকান হইতে কিনিয়া লোকটার আচরণে অসন্তোষ প্রকাশ করিলাম।

হৃৎপিণ্ডকে অক্ষত রাখিবার প্রয়াসে শামুকের গতিতে জলাপাহাড় রোড ধরিয়া উপরে উঠিতেছি। ফগে চারদিক বারবার অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছে। দীর্ঘাকার পাইনগাছ-গুলিকে অস্পষ্ট দাগের মত দেখাইতেছে। আমি একটির পর আর একটি বাড়ী অতিক্রম করিয়া চৌধুরীর দুর্গম নীড়ের দিকে আগাইয়া চলিয়াছি এবং হাঁফাইতেছি।

ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া ঐ ত রোজ একটা বাড়ীর ফটকে ঢুকিতেছে। সেই ভুটিয়া ছোকরাটারই ঘোড়া। রোজ-'বাবা' যাহারই মক্কেল হয়, বাঁধা-মক্কেল হয় দেখিতেছি। ক্রমে বাড়ীটার ফটকের সামনে পৌঁছিলাম। বাড়ীর নাম ও মালিকের নাম দুইটি বিভিন্ন কাষ্ঠ-ফলকে লেখা আছে। বহু দিন দার্জ্জিলিঙের রাস্তায় অশ্বধাবনরতা রোজকে দেখিয়াছি, আজ তার আস্তানার সঙ্গেও পরিচয় হইল। সহসা মনে হইল, যে ডলটি আজ চেষ্টা করিয়াও কিনিতে পারিলাম না, তার সঙ্গে রোজ-এর আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে।

মিসেস্ চৌধুরীর উৎসব হইতে ছাড়া পাইতে সাতটা বাজিয়া গেল। মার্চের সাতটায় দার্জ্জিলিঙে বেশ রাত ; তার উপর গাঢ় ফগ হওয়ায় তমিস্রা গভীর হইয়াছে। উতরাইয়ের পথে হন্‌হন্ করিয়া নামিতেছি। সহসা আমার হাতপাঁচেক দূরে এক বাড়ীর ফটকের সামনে এক বাচ্চা ছোকরাকে ভীমদর্শন এক বৃদ্ধের সঙ্গে বেশ উচ্চস্বরে কথা বলিতে দেখিয়া সেদিকে তাকাইলাম। বৃদ্ধ বোধ হয় বাড়ীর চৌকীদার, ফটকের ভিতর হইতেই সে কথা বলিতেছে, আর ছোকরা বাহিরে। হয়ত এদিকে আর ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সম্মুখে আগাইয়া যাইতাম, সহসা ছোট ছেলেটার বগলে একটা বড় ডল আবিষ্কার করিয়া সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া পড়িলাম। আমার পছন্দ করা সেই পুতুলটি নয় ত ?

'নহী নহী, 'বাবা' তুমারা ঘোড়া নহী চঢ়েগা...'

'ঘোড়াকা বাৎ নহী ! ইয়ে খেলোনা রোজ-'বাবা'কো দেও, আচ্ছা ?'

কথাগুলি স্পষ্টই শুনিয়াছিলাম। সুতরাং বক্তার মুখ না দেখিলেও তাকে সনাক্ত করিবার অসুবিধা হইবার কথা নয়। কিন্তু ঘোড়াটা কৈ ? কাছে দেখিতেছি না ত। উহাদের মধ্যে নেপালী-মিশ্রিত হিন্দীতে আরও দু'একটা কথাবার্ত্তা হইল, তার পর ছোকরা নিজের হাতে ডলটি চৌকীদারের হাতে তুলিয়া দিল এবং আর বিলম্ব না করিয়া রাস্তার দিকে ফিরিল। এক পলকই স্থির ছিল, তার মধ্যেই পথপ্রদীপের আলোকে কাঞ্চা গুরুংকে চিনিতে পারিলাম।

নিঃসন্দেহে বকশিশের দশ টাকার সঙ্গে নিজের উপার্জ্জনের কিছু মিলাইয়া কাঞ্চা গুরুং তার ভূতপূর্ব্ব ধনী মক্কেলের উপযুক্ত এই খেলনাটি ক্রয় করিয়াছে। জানি না, বহু দৌড়ের সঙ্গী রোজ-'বাবা'কে ইহা তার বিদায়-উপহার কিনা, অথবা বকশিশের টাকা প্রত্যাখ্যান করিবার ইহা এক বিচিত্র পন্থা।

তাহাকে পিছন হইতে ডাকিলাম না বা জোরে হাঁটিয়া গিয়া ধরিতে চেষ্টা করিলাম না। ফগে-ঢাকা জলাপাহাড়ের অবাস্তবপ্রায় রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে দরিদ্র নেপালী বালকের এই অভিমানের রূপ একই সময় কৌতুককর ও মর্য্যাদাদীপ্ত বলিয়া মনে হইল।

একটু পরেই জলাপাহাড় রোডের বাঁকের কাছ হইতে ঘোড়ার খুরের অপস্রিয়মাণ শব্দ শুনিতে পাইলাম।

চিত্রশিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুশীল রায়

আমাদের নিজেদের অজানতেই আমাদের জীবনের এক-একটি ত্রুটি ঘটে যায়। সে ত্রুটি যখন আমাদের চোখে ধরা পড়ে, তখন কখনও কখনও হয়ত-বা আমরা লজ্জিত হই, দুঃখিতও হই। এই জন্যে অনেক সময় আমরা নিজেদেরই সমালোচনা করি। বলি, স্বভাবতই আমরা উদাসীন। যার উপর আমাদের সজাগ এবং সশ্রদ্ধ দৃষ্টি রাখা দরকার, অনেক সময় তাকে হয়ত আমরা চেয়ে দেখতে ভুলে যাই। নিজের বাড়ীর খিড়কি দরজার পাশের চাঁপা গাছটির উপরেই হয়ত আমাদের চোখ পড়ে না, অথচ বৈঠকখানা ঘরে পিতলের টবে বসানো বিদেশী একটা গাছের কঙ্কাল নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখি। আমাদের স্বভাবের এ ত্রুটি আছে বলেই আমরা অনেকের প্রাপ্য দক্ষিণা দিতে ভুলে যাই।

বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার পল্লীর ঘরে ঘরে যেসব পৌরাণিক চিত্র টাঙানো থাকে, শহরের রাস্তার ধারের দোকানের সজ্জা হিসাবে আমরা প্রত্যহ যেসব ছবি দেখতে পাই, সেসব চিত্র কোন্ শিল্পীর তুলীতে চিত্রিত তা জানার কৌতূহল সব সময় আমাদের মনে জাগে না। 'কৈকেয়ী ও মন্থরা', 'শান্তনু ও গঙ্গা', 'দুর্বাসার অভিশাপ'—এই চিত্রগুলি আমাদের সকলের পরিচিত। কিন্তু এ ছবি কার আঁকা, তা জানার আগ্রহ ক'জনের আছে। অথচ এই ছবিগুলির কোণে শিল্পীর নাম চিহ্নিত আছে, ইংরেজী হরফে স্পষ্ট ক'রে লেখা শিল্পীর নাম—B. P. Banerjee, পুরো নাম বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল ৮১ বৎসর বয়সে চিত্রশিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় হাওড়ার শালকিয়াস্থ নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। খুব বেশী দিন না হলেও এরই মধ্যে বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আমরা ভুলতে বসেছি।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মার্চ বর্ধমান জেলার অন্তর্গত সাতগাছিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে শিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। বামাপদের পিত্রালয় হুগলী জেলার সিমলাগড় গ্রামে।

উনবিংশ শতাব্দী বাংলার এক স্মরণীয় শতক। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ প্রমুখ বহু মনীষী ও সাধক এই শতকে জন্মগ্রহণ করে বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করেছেন; রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতকের প্রায় অর্ধভাগ পর্যন্ত বর্তমান থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তিনিও উনবিংশ শতাব্দীরই শিক্ষা-দীক্ষায় পরিপুষ্ট মানুষ। সেই স্বর্ণময় শতকে চিত্র-শিল্পের ক্ষেত্রে যাঁরা বাংলার গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, শিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম।

রবিবর্মার অঙ্কিত পৌরাণিক চিত্র ও বামাপদ-অঙ্কিত পৌরাণিক চিত্র অনেকে এক করে দেখে থাকেন। প্রকৃত-পক্ষে এই দুই শিল্পীর অঙ্কনরীতির মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও উভয়ের মানসিক গঠন একরূপ ছিল না। লেখকের লেখায় যেমন, শিল্পীর-চিত্রেও তেমনি এই মনের প্রতিবিম্ব পড়ে। রবিবর্মার চিত্রে কিঞ্চিৎ বৈদেশিক প্রভাব আছে; তাঁর চিত্রের পাত্র-পাত্রী রামায়ণ, মহাভারত থেকে গৃহীত বটে, কিন্তু তাদের চেহারার আদলে বিদেশী ভাবের আঁচ পাওয়া যায়। বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরাণিক চিত্রগুলি সম্পূর্ণ ভারতীয় ছাঁচে ঢালা। কেবল এই পার্থক্যটুকু লক্ষ্য করে এই দুই শিল্পীর চিত্র পৃথক করা যায়। তা না হলে দু'জনের চিত্র প্রায় এক। এই জন্যেই রাজা রবিবর্মা ও বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্র অনেকের কাছে এক হয়ে গিয়েছে।

এনাটমির খুঁটিনাটি মান্য করে, শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গের সঙ্গে প্রত্যেকটি অঙ্গের অনুপাত রক্ষা করে চিত্র যে আঁকতেই হবে—এ নিয়ম বর্তমান কালের শিল্পীদের কাছে স্বীকার্য নয়। চিত্রের মাধ্যমে শিল্পী কোনও একটি ভাব পরিস্ফুট করার জন্য চিত্রের চরিত্রটি অঙ্কন করতে পারেন,

এখানে ফিগারটি মুখ্য বিষয় নয়, মুখ্য বিষয় হচ্ছে ভাব অভিব্যক্ত করা। কিন্তু বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় যেসব চিত্র অঙ্কন করে যশস্বী হয়েছেন, তার রীতি ছিল আলাদা। স্বাভাবিক মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গের অনুপাত যেমন একটা আছে, তাঁর চিত্রে চরিত্রের গঠনেও তেমনি অবিকল অনুপাত রক্ষিত হয়েছে। অর্থাৎ, তিনি পৌরাণিক চরিত্রগুলি এঁকেছেন আমাদের মত সহজ ও স্বাভাবিক মানুষেরই আকারে। তাঁর আঁকা চিত্র অচিরে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং প্রতি গৃহস্থ বাড়ীর অন্দরে স্থান লাভ করে। কেবল অন্দরে-অন্দরেই নয়, বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্র প্রত্যেকের অন্তরেও একটা আসন করে নেয়।

বহু প্রাচীন পুরাণ থেকে সেই পুরাতন চরিত্রগুলি তিনি ধরে আনেন নতুন রূপে। কোনও প্রকার জটিলতা বা কৃত্রিমতা না থাকায় আপামর জনসাধারণ সহজেই তাঁর চিত্রের ভাষা বুঝতে পারে, চরিত্রগুলি সহজেই চেনা হয়ে যায়। লোকনৃত্য, লোকসঙ্গীত, লোকসাহিত্য ইত্যাদি কথা প্রচলিত আছে, সেই দিক থেকে বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় অঙ্কিত চিত্রের নাম দেওয়া যায় লোকচিত্র। কেননা এই চিত্র সর্বজনবোধ্য। পল্লী-গৃহের জীর্ণ দেওয়ালেও যেমন, শহরের সৌখীন দোকানের উজ্জ্বল আলোর নীচেও তেমনি—সমান মানানসই তাঁর ছবি; 'অর্জুন ও উর্ব্বশী' কিম্বা 'শান্তনু ও গঙ্গা' অথবা অন্য কোনো ছবি।

বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিষ্ঠাবান, পরোপকারী, সরলহৃদয় ও গ্রামস্থ সকলের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মাতামহ ছিলেন সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ও অধ্যাপক। মাতুলালয়ে বামাপদের জন্ম, সেখানেই তাঁর শিক্ষারম্ভ। দুই মাতুলের তিনি প্রিয়পাত্র ছিলেন, এই জন্য বেশী দিন তাঁকে পিত্রালয়ে থাকতে দিতেন না, নিজেদের কাছে নিয়ে আসতেন। বর্ধমানের সাতগাছিয়া গ্রাম্য স্কুলেই তাই তাঁর বাল্যশিক্ষার সূত্রপাত হয়। সাত-আট বৎসর বয়সের সময় তিনি ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু বেশী দিন ইংরেজী স্কুলের পাঠ গ্রহণ করা হয় না। মাতামহ সংস্কৃতজ্ঞ, মাতামহী এই জন্যে সংস্কৃতের প্রতি শ্রদ্ধাশীলা ছিলেন, তিনি তাঁর দৌহিত্রকে সংস্কৃতজ্ঞ সুপণ্ডিত করে গড়ে তোলার জন্যে বামাপদকে চতুষ্পাঠীতে প্রেরণ

দুর্বাসার অভিশাপ [শিল্পী—শ্রীবামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

করেন। কিন্তু এ-পাঠেও বাধা এল। তাঁর দুই মাতুল অকালে পরলোকগমন করলেন। বামাপদকে পিতার গৃহে ফিরে আসতে হ'ল। এ গ্রামের সন্নিকটে কোনো ইংরেজী স্কুল না থাকায় জনাই ট্রেনিং স্কুলে তিনি ভর্তি হলেন।

স্কুলে ভর্তি হলেন বটে, কিন্তু স্কুলপাঠ্য বইয়ের প্রতি তাঁর তেমন মনোযোগ দেখা গেল না। তিনি তাঁর পাঠ্য সচিত্র বই দেখে দেখে ছবি এঁকে সময় কাটাতে লাগলেন। অঙ্কনের প্রতি তাঁর আগ্রহের এটি উদাহরণ বটে, কিন্তু এরও

আগে তাঁর অঙ্কনের প্রতি আগ্রহের দৃষ্টান্ত দেখা গিয়েছে। একে কেবল আগ্রহ নয়, সহজাত প্রবৃত্তি বলাই ঠিক। পাঁচ-ছয় বছর বয়সের সময় যখন তিনি মাতুলালয়ে ছিলেন, তখন তিনি বারোয়ারি সং দেখে তার অনুকরণে মাটির পুতুল গড়ে সঙ্গীদের উপহার দিতেন। অঙ্কনে ও মূর্তি-রচনায় এই স্পৃহার সঙ্গে সঙ্গে সেই শিশুচিত্তে সরসতাও ছিল। গ্রামের দুই দলে দলাদলি হলে তিনি বিপক্ষ দলের লোকজনদের নানা রকম কিম্ভূত মূর্তি গড়ে তাদের বিদ্রূপ করতেন। এক ঢিলে দুই পাখী মারার কাজ হ'ত এতে। বিপক্ষদল এই মূর্তিমান বিদ্রূপে বিচলিত হয়ে উঠত এবং অপর দলের কাছে এই কিশোর একজন নায়ক রূপে নন্দিত হ'ত।

এখানে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। বামাপদ তখন জনাই ট্রেনিং স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। জয়পুর রাজ্যের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী রাও কান্তিচন্দ্র বাহাদুর তখন ঐ স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তিনি একদিন চতুর্থ শ্রেণীর অঙ্কের পরীক্ষা নিতে যান। পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল, বামাপদ অঙ্কের পরিবর্তে অঙ্কনের পরীক্ষা দিয়ে বসেছেন। কান্তিচন্দ্র লক্ষ্য করেছিলেন যে, বামাপদ মনোযোগের সঙ্গে পেন্সিল দিয়ে কি যেন করছেন। যখন পেন্সিলে চিহ্নিত সেই কাগজ কান্তিচন্দ্র গ্রহণ করলেন, তখন দেখলেন তাতে অঙ্কের একটি অক্ষরও নেই, কিন্তু আছে বালক চিত্রকরের ভবিষ্যৎ জীবনের একটি সুস্পষ্ট স্বাক্ষর। সেই কাগজে বামাপদ নিজের অক্ষমতা ও অসহায়তার কথা চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তিনি এঁকেছেন একটি ছবি—অঙ্ক কষতে না পেরে একটি বালক মুখে পেন্সিল দিয়ে সেটি চুষছে।

আর একটি ঘটনার কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। সে আমলের খ্যাতনামা ইংরেজী লেখক 'Rais and Rayet' পত্রিকার সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একবার জনাই স্কুল পরিদর্শনে আসেন। শম্ভুচন্দ্রের চেহারা ছিল অতি সুন্দর—গৌরবর্ণ, নধরগঠন। তাঁকে দেখে বামাপদ চিত্র-রচনার লোভ সংবরণ করতে না পেরে অল্প সময়ের মধ্যে একটি চিত্র অঙ্কন করেন। শম্ভুচন্দ্র এই চিত্র দেখে বিশেষ প্রীত হন। তিনি উক্ত স্কুলের পৃষ্ঠপোষক ও গ্রামের জমিদার এবং পরবর্তী কালে বামাপদর শ্বশুর পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বলেন যে, এই বালককে অবিলম্বে আর্ট স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া উচিত।

এই ভাবে উৎসাহ লাভ করে জনাই ট্রেনিং স্কুলের পাঠ শেষে অর্থাৎ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর বামাপদ সরকারী আর্ট স্কুলে ভর্তি হলেন এবং প্রাইভেটে উচ্চতর ইংরেজী পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন। আর্ট স্কুল তখন ছিল বউবাজার-বৈঠকখানায় এবং এর অধ্যক্ষ ছিলেন লক সাহেব (H. H. Locke)। লক সাহেবের তত্ত্বাবধানে বামাপদ চিত্রাঙ্কনের প্রাথমিক পদ্ধতি শিক্ষা করার পর তাঁর তৈলচিত্র অঙ্কনের প্রতি ঝোঁক হয়। কিন্তু আর্ট স্কুলে তৈলচিত্র-অঙ্কন শিক্ষাদানের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় তিনি লক সাহেবের পরামর্শ অনুসারে একজন তৈল-চিত্রকরের সন্ধানে ব্যাপৃত হলেন এবং বিলাত থেকে চারুকলা সম্বন্ধীয় বই আনিয়ে সেসব পাঠ করতে আরম্ভ করলেন। প্রথিতযশা প্রতিমূর্তি-চিত্রকর প্রমথনাথ মিত্রের কাছে তৈলচিত্রাঙ্কনের প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেন। এই সময় বেকার (W. C. Becker) নামে এক জন জর্মান চিত্রকর কলকাতায় আসেন। তাঁর সন্ধান পেয়ে বামাপদ তাঁর কাছে যাতায়াত আরম্ভ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই বেকারের প্রীতিভাজন হয়ে ওঠেন। এই তরুণের আগ্রহ দেখে বেকার যত্নের সঙ্গে তাঁকে তৈলচিত্র অঙ্কন ও পুরাতন চিত্র সংস্কার করার পদ্ধতি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে শিক্ষা দেন। ক্রমশ এই শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে এমন হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপিত হয় যে, উভয় মিলেমিশে নানা রূপ চিত্র-অঙ্কনে ব্যাপৃত হন। এরূপ জানা যায় যে, বামাপদর অঙ্কন-দক্ষতা দেখে বেকার সাহেব এত আকৃষ্ট হন যে, বামাপদকে তিনি জার্মানীতে নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু সাগরপাড়ি দেওয়া ব্যাপারে সে আমলে কুসংস্কারজনিত নানা রূপ বাধা ছিল, তাই তাঁর সাগরপারে যাওয়া ঘটে ওঠে নি।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা ফাইন আর্ট এগ্‌জিবিশন' নামে একটি শিল্প-প্রদর্শনী হয়। বেকার সাহেবের অনুরোধে বামাপদ এখানে তাঁর আঁকা একটি তৈলচিত্র প্রেরণ করেন। প্রদর্শনী সোসাইটি এই চিত্রটি দেখে বিশেষ প্রীত হন এবং চিত্রকরকে একটি স্বর্ণপদক উপহার দেন। এই ছবিটি সম্বন্ধে তাঁরা বলেন :

"The best figure subject in oil by a native of India"

তদানীন্তন ভারতের বড়লাট লর্ড লিটন ঐ সোসাইটির সভাপতি ছিলেন ও ছোটলাট স্যর্ এশলি ইডেন ছিলেন সহ-সভাপতি। লক সাহেব প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ ছিলেন উক্ত সোসাইটির সদস্য। বেকার সাহেব অকস্মাৎ অন্তর্হিত হলেন। বামাপদ অনেক অনুসন্ধান করেও তাঁর আর কোনো খোঁজ পান নি। এর পর বামাপদ একাকীই চিত্রাঙ্কনকার্যে রত হলেন।

সোসাইটির পরবর্তী প্রদর্শনীতেও তিনি তাঁর অঙ্কিত কয়েকটি তৈলচিত্র দেন, এবারও তাঁর চিত্র শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয় এবং তিনি প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর

এবারকার চিত্রের মধ্যে ছিল ইংলণ্ডেশ্বর সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ডের একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্তি এবং 'জলঙ্গীতে সূর্যাস্ত' ও 'আসন্ন ঝড়' নামে দুটি চিত্র।

এই সময় ধুবড়িতে এক প্রদর্শনী হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানের এবং ভারতের বাইরেরও অনেক শিল্পী তাঁদের অঙ্কিত চিত্র দাখিল করেন। বামাপদ এই প্রদর্শনী থেকে স্বুবর্ণ পদক পান।

ভারতের বহু স্থান পর্যটন করেছেন বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৮১ সনে তিনি এলাহাবাদ যান। এইখানে থাকাকালে সর্বপ্রথম তাঁর মনে হয়, পৌরাণিক চিত্র অঙ্কন করে বিলাত থেকে তা মুদ্রণ করে আনা সম্ভব কিনা। কিন্তু তা ঘটে ওঠে না। এর পর বামাপদ যান লক্ষ্ণৌ। এখানে তিনি ক্যানিং কলেজের অধ্যাপক ও পরবর্তীকালে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদক রাজকুমার সর্বাধিকারীর যথেষ্ট সহায়তা লাভ করেন। 'ট্রিবিউন'-এর তৎকালীন সহকারী সম্পাদক স্বুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (পরে আমেরিকা-প্রবাসী প্রেমানন্দ ভারতী) মহাশয়ের চেষ্টায় তিনি লক্ষ্ণৌ থেকে লাহোরে যান। এখানে এসে তিনি কয়েকটি প্রতিমূর্তি চিত্র অঙ্কন করেন। চীফ কোর্টের বিচারপতি পণ্ডিত রামনারায়ণ, বিচারপতি প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সদার দয়ালসিং প্রমুখ প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের চিত্র তার মধ্যে ছিল। এই সময় একদিন তিনি লাহোর আর্ট স্কুল দেখতে যান—সেখানে আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ কিপলিঙের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় হয়। অধ্যক্ষ কিপলিং তাঁর ছাত্রদের উদ্দেশ করে বলেন, "বহুদূর বাংলা দেশ থেকে এক জন বাঙালী চিত্রকর এখানে এসে চিত্রবিদ্যার এমন পরিচয় দিচ্ছেন, কিন্তু তোমরা কি করছ ?"

লাহোর থেকে বামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরম্ভ হয় প্রকৃতপক্ষে উত্তর-ভারত-পরিক্রমা। অমৃতসর, আম্বালা, দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবন, আগ্রা, আলিগড়, গোয়ালিয়র, ভরতপুর, ঢোলপুর, আরা, শাহাবাদ, আজমীড়, পান্না, দ্বারভাঙা, ইন্দোর, যোধপুর, বিকানীর, পাতিয়ালা, ভূপাল, আলোয়ার, জয়পুর প্রভৃতি নানা স্থানে পর্যটন করে তিনি দেশীয় রাজ্যের তদানীন্তন রাজা-মহারাজাদের চিত্র অঙ্কন করে যেমন যশ লাভ করেন, অর্থও লাভ করেন সেইরূপ। জয়পুর মহারাজার খাসমন্ত্রী সংসারচন্দ্র সেন তাঁকে এসব কাজে বিশেষ সহায়তা করেন। ঘুরে ঘুরে তিনি আসেন কাশীতে। কাশী বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতধর্ম সভামণ্ডল তাঁকে "কলাবিদ্যাভূষণ" উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বামাপদর পিতৃবিয়োগ হয়। এ সময় তিনি একবার কলকাতায় ফিরে আসেন। এত দিন তিনি রাজা-মহারাজাদের প্রতিকৃতি অঙ্কন করে এসেছেন। কলকাতায় এসে তিনি লাভ করলেন নূতন উপদান। চিত্রাঙ্কনের জন্মে তিনি যেন পেলেন নতুন জীবন—তিনি কৃতবিদ্য ও মনীষীদের চিত্রাঙ্কনে রত হলেন। এবং একে একে আঁকলেন এঁদের

অভিমন্যু ও উত্তরা [শিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্র—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জষ্টিস চন্দ্রমাধব ঘোষ, সার্ রমেশচন্দ্র মিত্র, 'ইণ্ডিয়ান মিরর' সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন, মনোমোহন ঘোষ, কেশবচন্দ্র সেন, দাদাভাই নৌরজি, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাল গঙ্গাধর তিলক, গোখলে এবং সার আর্. এন্. মুখোপাধ্যায়। মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, দ্বারভাঙার মহারাজা, বর্ধমানের মহারাজা প্রমুখ বহু বিখ্যাত ব্যক্তির চিত্রও তিনি অঙ্কন করেন। এ ছাড়া বহু বিশিষ্ট ইউরোপীয়ের চিত্র তিনি এঁকেছেন।

দ্বারভাঙা-হল, ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট, সিনেট-হল, টাউন-হল, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্, রামমোহন লাইব্রেরী

এলবার্ট হল, এটর্নিজ লাইব্রেরী, কর্পোরেশন আপিস, মাড়োয়াড়ী অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের জন্য অনেক মেমোরিয়াল পোর্ট্রেট তিনি এঁকেছেন।

প্রতিকৃতি-চিত্র অঙ্কন প্রসঙ্গে দুইটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। একটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের, অপরটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের। বিদ্যাসাগর মহাশয় বামাপদর চিত্রাঙ্কনে প্রীত হয়ে তাঁকে একখানা কাশ্মীরী শাল উপহার দেন। বামাপদ প্রায়ই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে যেতেন। একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁকে বলেন, "ওহে, তোমরা ত শৌখিন লোক—আর্টিস্ট। সেদিন কাশ্মীর থেকে একটি শাল পাওয়া গেছে। দেখ ত কেমন।" এই বলে তিনি বামাপদর গায়ে শালটি জড়িয়ে দেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম তৈলচিত্র অঙ্কন করেন বামাপদ। বঙ্কিমের গৃহে তখন এই অঙ্কনের কাজ চলছে। এই সময় একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের বৈবাহিক সাহিত্যিক দামোদর মুখোপাধ্যায় তাঁর গৃহে এসে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে উক্ত ছবির কিয়দংশ দেখতে পেয়ে তাকে আসল বঙ্কিমচন্দ্র মনে করে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতেই বলতে থাকেন, "কি বেয়াই, এই অবেলায় সেজেগুজে কোথায় যাওয়া হচ্ছে?" এই ভ্রম অবশ্য তখনই ধরা পড়ে। আবার, এই ছবিটি আঁকা শেষ হবার পর বঙ্কিমের কুকুরটি পড়ে বিভ্রাটে—সে একবার স্বয়ং বঙ্কিমের দিকে, একবার ঐ ছবির দিকে চাইতে থাকে, কোন্‌টা আসলে তার মনিব তা যেন কুকুরটি ঠিক ধরতে পারে না।

একটি জীবনে এতজন বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতিকৃতি অঙ্কনের সুযোগ পাওয়া কম ভাগ্যের কথা নয়। বামাপদ সেই সৌভাগ্যের তিলক ললাটে অঙ্কিত করে জীবন সার্থক করেছেন।

এর পর তাঁর জীবনে এল নতুন অধ্যায়। বামাপদর অঙ্কিত যে চিত্রের কথা দিয়ে তাঁর জীবন-কথা আরম্ভ করেছি, এর পরে তিনি সেই কাজে—পৌরাণিক চিত্র অঙ্কনে হাত দিলেন। ১৮৯০ সনে, অর্থাৎ, আজ থেকে প্রায় পঁয়ষট্টি বছর আগে, তিনি এই কাজে হাত দেন। তাঁর চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা এবং তাঁর চিত্রকলা বিচার করার সময় এই কথাটি আমাদের মনে রাখা উচিত।

'বসুমতী'র প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ আগ্রহে তিনি তাঁর পৌরাণিক চিত্র প্রকাশে উৎসাহিত হন। কিন্তু এ কাজে বাধা ছিল। সে সময় ঐসব ছবি ছাপার মত ভাল প্রেস এদেশে ছিল না। তখন কেবল তিন রঙের পট এদেশে ছাপা চলত। কিন্তু বামাপদর আঁকা ছবির প্রতিলিপি ঠিকমত ছাপতে হলে বহু রঙে ছাপা প্রয়োজন হ'ত, কিন্তু তার কোন ব্যবস্থা না। অগত্যা অনেক অর্থ ব্যয় করে জার্মানী থেকে ছবিগুলি ছাপিয়ে এনে প্রচার করা হয়। আমরা আমাদের দেশের ঘরে ঘরে তাঁর আঁকা যেসব ছবি দেখি, তা মুদ্রিত হয়েছে জার্মানীতে।

কয়েক বৎসরের মধ্যে বামাপদ এ ধরনের অনেকগুলি ছবি আঁকেন, যথা—'অর্জুন ও উর্বশী', 'অভিমন্যু ও উত্তরা', 'কলঙ্কভঞ্জন', 'দুর্বাসা ও শকুন্তলা', 'শান্তনু ও গঙ্গা', 'কৈকেয়ী ও মন্থরা', 'সীতা ও রাবণ', 'নল-দময়ন্তী', 'দ্রৌপদী ও কৃষ্ণ', 'বশিষ্ঠ ও অষ্টবসু', 'যযাতি ও দেবযানী' ইত্যাদি। প্রবাসী পত্রিকার ১৩০৯ আশ্বিন ও ১৩১১ আশ্বিন সংখ্যায় বামপদর ছবি মুদ্রিত হয়েছে।

শিল্পীর জীবনে আঘাত থাকেই। বামাপদও নিজেকে সে আঘাত থেকে রক্ষা করতে পারেন নি। এই আঘাত তাঁর জীবন-সায়াহ্নেই আসে নির্মম রূপে। জীবনে তিনি চিত্র অঙ্কন করেছেন অনেক এবং তাতে অর্থও কম উপার্জন করেন নি। এ সত্ত্বেও তাঁর শেষজীবন চরম দুর্গতিতে কাটে। প্রথমে বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪) ঠিক আগে তিনি তাঁর সঞ্চিত তেইশ হাজার টাকা নিয়োগ করে ইউরোপ থেকে তাঁর কতকগুলি ছবির ওলিয়োগ্রাফ করে আনার ব্যবস্থা করেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগেই যাতে ছাপা ছবিগুলি এসে পৌছয়, এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। কিন্তু বিধি বাম হলেন। ছবিগুলি ছাপা হয়ে দেশের দিকে রওনা হয়েছে, এমন সময় আরম্ভ হ'ল যুদ্ধ। তাঁর এমনি বরাত, যে জাহাজে ছবিগুলি আসছিল শত্রুর গোলার আঘাতে সে জাহাজ হ'ল নিমজ্জিত। বামপদর সমস্ত আশা নির্মূল তো হ'লই, তাঁর ভাগ্যেও ঘটে গেল বিপর্যয়। তাঁর সঞ্চিত সব অর্থ ত গেল, সেই সঙ্গে অনেকগুলি মূল ছবিও সমুদ্রের অতলে তলিয়ে গেল।

এ ছাড়া ঘটল আর একটি দুর্ঘটনা। কলকাতার একজন চিত্রব্যবসায়ী তাঁর কয়েক হাজার টাকার চিত্র আত্মসাৎ করল। তারপর ভবানীপুর পোড়াবাজারে এক চিত্রপ্রদর্শনীতে আগুন লেগে বামাপদর পনর-ষোলটি ছবি ভস্মসাৎ হয়।

এমন কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি সে যুগে ছিলেন না, যিনি বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করেছেন। দেশী বিদেশী সংবাদপত্রও এই শিল্পীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

তাঁর অঙ্কিত বিভিন্ন মনীষীর প্রতিকৃতিসমূহই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকক্ষে প্রলম্বিত হয়ে এই শিল্পীর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছে বলা যায়। অপর একজন শিল্পী এসে যদি বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রতিকৃতি চিত্র রচনা করে ঐসব

চিত্রের পার্শ্বে রাখেন তা হলে উক্ত স্মৃতিসৌধের ভিত্তি সম্ভবত অধিকতর সুদৃঢ় হয়।*

* এই জীবন-কথা রচনায় নিম্নের সূত্রগুলি হইতে সাহায্য নেওয়া হয়েছে:: জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস লিখিত শিল্পীর জীবনী (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৪); শ্রীমতী বীণাপাণি মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী লতিকা মুখোপাধ্যায় রচিত শিল্পীর জীবনী (দেশ, ২১ আষাঢ় ১৩৫৯); এবং শিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রদত্ত শিল্পীর জীবনের বিবিধ তথ্য।

শশাঙ্ক

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

গুপ্তরাজ্য গৌরবহারা চন্দ্রগুপ্ত অস্তগত।
চালুক্য, হুণ, মৌখরীদল হেনেছে রাজ্যে আঘাত কত।
গৌড়বঙ্গে মগধে কেবল
গুপ্তরাজ্য হয়ে হীনবল
বেঁচে আছে শুধু দূর অতীতের ছায়া-কঙ্কাল রূপে।
রাজা মহাসেনগুপ্ত শাসেন বঙ্গ যে চুপে চুপে।

ষষ্ঠ শতের শেষভাগে এক সোনালি শরৎ হবে।
বনানীশীর্ষে সপ্তমী চাঁদ অস্তে নেমেছে সবে।
সহসা উঠিল ঘোর কলরব
রণ-দুর্মদ মৌখরী সব
গৌড়বঙ্গে আঘাত হানিতে কাতারে কাতারে আসে।
রাজা মহাসেনগুপ্ত দুর্গে লুকায়ে পড়েন ত্রাসে।

বিক্রমসেনে পাঠালেন রাজা বীর শশাঙ্ক কাছে।
সে ছাড়া রাজ্য রক্ষা করিবে এমন কে আর আছে?
মৌখরীদের করিয়া নিধন
শশাঙ্ক মহা-অমাত্য হন
বঙ্গ রক্ষা পেয়েছে সে-দিন বাঙালীর বাহুবলে।
কত শতাব্দী পরে ইতিহাস আজো সেই কথা বলে।

মহাকাল ডেকে নিলেন অচিরে গুপ্ত-নৃপতিবরে।
চক্রবর্তী রাজার তিলক শশাঙ্ক ভালে পরে।
মিত্র সে দেবগুপ্ত যখন
গ্রহবর্মারে করেন নিধন
বিপুল বাহিনী সাথে শশাঙ্ক আসে সাহায্য দিতে।
রণজয়ী দেবগুপ্ত রাজারে বরেণ হৃষ্টচিতে।

কান্যকুব্জ মহারাণী হন বন্দিনী নিজপুরে।
দেবগুপ্তের অমর্যাদায় বিধবা-নয়ন ঝুরে।
শশাঙ্ক বুঝি হবে আরো হীন
ঘনাবে কি তাঁর আরো দুর্দিন
দুই শত্রুর কবল হইতে কেমনে পাবেন ছাড়া।
থানেশ্বরের রাজনন্দিনী ভেবে ভেবে হন সারা।

রাজ্যশ্রীর উদ্ধার লাগি হর্ষ-বাহিনী রুষে।
উদ্বেল মহাসাগর যেন রে লক্ষ ফণায় ফুঁসে।
থানেশ্বরেতে পড়ে গেল সাড়া
জীবন তুচ্ছ করিয়া কাহারা
শশাঙ্ক আর দেবগুপ্তের যাবে শির আনিবারে।
রণ-দুন্দুভি আকাশ কাঁপায়ে বেজে উঠে বারে বারে।

হেথা খুলে দ্বার বন্দীশালার দীপ্ত দ্বিপ্রহরে।
দাঁড়াল সৌম্য শান্ত মূর্তি অসি ও চর্ম করে।
বন্দিনী রাণী শঙ্কা মগন
হয়ত ঘনাল চরম লগন
মৃত্যু বরিতে দ্বিধা নাই, ভয় নারীর অসম্মানে।
কঠিন চক্ষে চাহিলেন রাণী বলদর্পীর পানে।

ধীরে ধীরে মাথা অবনত করি কহিল আগন্তুক,
'ভগিনী, তোমার দুঃখে বিদরে সারা মালবের বুক।
আমি শশাঙ্ক গৌড়ের রাজা
লহ অসি, দাও যাহা খুশী সাজা
বন্ধুর মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহি।
যে দোষ করেছি আমরা তাহার জানি কোন ক্ষমা নাহি।

বল গো ভগিনী কোথায় তোমারে নিরাপদে লয়ে যাব?
বল কি করিলে আমরা তোমার কাছে মার্জনা পাব?
এই আমি তব ধরিনু চরণ
হয় ক্ষমা কর, নহে ত মরণ
বরণ করিব সমুখে তোমার আপন অসির ঘায়ে।
মূঢ় ভাইদের ক্ষমা কর দিদি, আবার ধরিনু পায়ে।'

ঝর ঝর ঝর ঝরিল অশ্রু রাজ্যশ্রীর চোখে।
প্রীতির প্রলেপে ক্ষণতরে ছেদ পড়িল গভীর শোকে।
মুছিয়া অশ্রু কহিলেন রাণী,
'বিনয় রাজন্ তোমার বাণী
ক্ষমা করিলাম অপরাধ যত বলেছ ভগ্নী মোরে।'
সে-দিন বাঙালী কান্যকুব্জে বেঁধেছে প্রীতির ডোরে।

পশ্চিম সমুদ্রবক্ষে

শ্রীঅশোক বাগচী

জাহাজ ছাড়ল শেষে···ঘন্টার ঢং ঢং নেই···হোষ্টেসের রাঙা মুখের ঢং নেই, শুধু আছে কপোতবক্ষ গোয়ানীজের স্যাক্সোফোনি নহবতের প্যাঁকপেঁকি! গোয়ানীজ ভায়ারা যতই চেষ্টা করছে আদত মার্কিনী ঘরানায় বাজাতে ততই ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে বাজনার আওয়াজ। অনেক কসরত করে সরতে লাগল তরণী—মোটরের টায়ার ঝোলান জেটিটা থেকে, উড়তে লাগল কয়েক শ' রুমাল···কোনটা শুক্‌নো কোনটা-বা সিক্ত। কাঁচা রঙের চটচটানি এড়িয়ে এদিকেও দু' একটি হাত রুমাল ওড়াল, কিন্তু আরও বহু হাত মনের ভাবে ঝুলে পড়েছে আর তাদের দীর্ঘশ্বাস যাচ্ছে মিশে লৌহদানবের প্রাণবন্ত
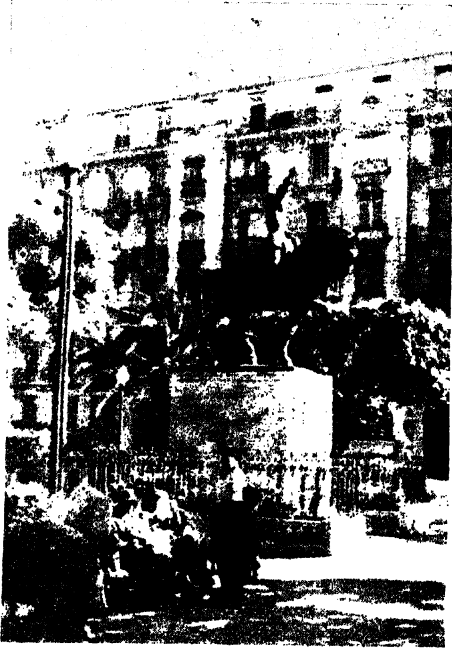
জোয়ান অব আর্কের প্রতিমূর্তি, আলজিয়ার্স

ঝন্‌ঝনানির সঙ্গে।···একি শুনি? একি সত্যি?···মিউজিকের টক ফুরিয়ে গোয়ানীজ অর্কেষ্ট্রা ধরেছে দেশী সুরের কাঁদন···

"আঁখিয়া মিলাকে জিয়াভরমাকে চলে নেহি জানা হো···চলে নেহি জানা···! এক অদ্ভুত সজীবতা অনুভব করলাম, ভাবলাম বাঁ হাতে চিমটি কেটে দেখব নাকি, আছি জেগে না ঘুমিয়ে। না সত্যিই 'আজাদী হো গিয়া', নইলে 'বেলায়েতী' জাহাজে এমন মধুর দেশওয়ালী সুর বাজে? যার যা তাল, মে মাসের গরমে, ছাই রঙের কামগারণ-এ গলদ্‌ঘর্ম্ম সাহেবটি দেখি কেতা করে পাইপে টান দিচ্ছে। আত্মস্থ হয়ে ভাবছিলাম সাতপাঁচ···পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল, "মে আই ইনট্রোডিউস মাইসেল্‌ফ?"···বলে উঠলাম, "ও, সিউর!"···"চক্রবর্ত্তী"···"ও চক্রবর্ত্তী, তবে বাংলাতেই হোক না"···

চলল কিছুক্ষণ ভাববাচ্যের প্রয়োগ। দেশী বুলি শুনে আরও এসে জুটল তাড়া-খাওয়া বুনো হাঁসের মত ননী, ভুলু, নাড়ুর দল··· প্রাদেশিক ভ্রাতৃত্বের দাপটে আপনি নামল তুমিতে আর তুমি এসে যখন তুই তোকারীতে দাঁড়াল ততক্ষণে বোম্বাইয়ের মেরিণ ড্রাইভ প্রায় আকাশে মেশে মেশে।

প্রচণ্ড গরম, কেবিনের ভেতরটা প্রায় রসুইখানার মত, আর বাইরে ডেকে জোলো হাওয়ার ভ্যাপসানি···সন্ধ্যা হতেই সাহেবী পোশাক-আশাক উঠল সব তাকে, আর বেরিয়ে এল ক্যাল্সি ড্রেসের মতলবে নেওয়া ধুতি ও পাঞ্জাবী। লাউঞ্জ নামধেয় এক ঠাঁইও আছে হেথায়···সাহেব দেখে 'নার্ভাস ফিল' করলেও সপ্রতিভ ভাবভঙ্গী মুখে ফুটিয়ে ঢুকলাম সে ঘরে: ও বাবা! দেখি সর্দ্দারজীদেরই 'মেজরিটি' —সেখানে খুব "তুসি তোয়াড্ডা কিথে ইথের" খই ফুটছে! এধার ওধার দেখতেই নজরে এল ম্লান একটি চেহারা, এক কাউচের কোণে ব'সে হাতের নখ খুঁটছে, মুখটা এত করুণ যে দেখামাত্রই আমারও বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল আর সুরু হ'ল বাড়ীর জন্য মন খারাপ হওয়া···হয়ত বা ওরও সেই কথাই মনে পড়েছে। এগিয়ে গেলাম তার দিকে এবং সেই কাউচেরই আর এক কোণে বসলাম। আমাকে প্রথমে বলবার সুযোগ না দিয়ে সেই-ই আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "দাদা আফনি কুথায় যাইবেন?" ক্রমে ক্রমে জান্‌তে পেলাম: সুদূর পূর্ব্ববাংলার নোয়াখালি জেলার এক অজ পাড়াগাঁয়ের চাষী সে, চলেছে বিলাত-প্রবাসী কাকার আহ্বানে ব্যবসা দেখাশোনা করতে। সে জাতে মুসলমান কিন্তু নামে হিন্দু! উগ্র সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে সে যে কি করে ঐ "ঠাকুরধন" নাম দিয়ে কাজ চালাচ্ছে সেটাই আশ্চর্য্য! মনের বল আছে বলতে হবে ঠাকুরধনের—না জানে ইংরেজী না জানে শুদ্ধ করে বাংলা বলতে—সম্বল কেবলমাত্র "কাচ কুইসার" 'নোয়াখাল্লা' বাংলা! আর আমরা? মুখে ইংরেজীর খই ফুটছে অথচ মনে মনে 'অক্সিডেন্টোফোবিয়া'—যাকে শুদ্ধ বাংলায় বলা যেতে পারে পশ্চিমাতঙ্ক। ছোট্ট তরণী, এক গলুই থেকে আর এক গলুই খুব আস্তে আস্তে যেতে দশ মিনিট লাগে, সামনের দিক বেশী পয়সার ও পেছনটা সেকেণ্ড কেলাসী পায়রার খুপরীতে বোঝাই। কেন যে কোম্পানী সখ করে 'সেকেণ্ড কেলাস' নামকরণ করেছে সে রহস্য

ভেদ করা সাধ্যাতীত। দুপুরের গরমে যখন আপাদমস্তক ঘামে ভিজে সেকেণ্ড কেলাসী যাত্রীরা ছটফট করতে করতে বাইরে আসেন, তখন ওঁদের দেখে সত্যিই কষ্ট হয়, নেহাত্ত দায়ে ঠেকে ওঁরা ঢুকেছেন ঐ আজব কেলাসে!

এ কেবিন ও কেবিন ঘুরতে লাগলাম দু'দিন ধরে একটি বিশেষ বস্তুর খোঁজে। নাঃ পাই না···কি বদভ্যাসই না করেছি বাড়ীতে বসে বসে। অভাবে জিভ গলা সব শুকনো···পানীয়ের অনেক সরঞ্জামই আছে এখানে, কিন্তু পান আর পাই না। দেখা পেলাম তিন দিনের দিন গোবর্দ্ধন মহাপাত্রের···বাড়ী কটকঅ··· যাচ্ছেন ডনকাষ্টারঅতে লকঅমটিভঅ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতে। সাদর অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন নিজের কেবিনে আর ড্রয়ার টেনে বের করলেন আদি অকৃত্রিম ভিজে ন্যাকড়ায় জড়ানো দেয়াল ক্রেস্কোর উৎস···পান! একটি 'কথা বিহীন' খিলি মুখে পুরতেই হোম সিক্‌নেস আবার চেগে উঠল। গোবর্দ্ধনচন্দ্রই নিয়ে গেলেন আর এক কামরায়—দেখি বেশ জমাটে আসর বসেছে, মেঝের পাটাতনের উপর বসে এক ভদ্রলোক একটি তানপুরা কাণে ঠেকিয়ে সুর ছাড়ছেন···গান ধরলেন, অপূর্ব্ব গলা আর যথোপযুক্ত গানটি···"ও আমার দরদীরে! আগে জানলে তোর ভাঙ্গা নৌকায় চড়তাম না···" এটার শেষে গাইলেন একটি রামপ্রসাদী, বাড়িয়ে বলছি না সত্যিই এত ভাল প্রসাদী গান আগে শুনি নি, নিশ্চয়ই ওঁর গায়ে আকাশবাণীর হাওয়াই ছোঁয়া এখনও লাগে নি। ভদ্রলোকের পেশা অডিটরী, বিধবা মাকে দেশে রেখে চলেছেন দীর্ঘ মেয়াদে বিদেশে, তাই বোধ হয় গানের শেষে ভাবাবেশে তাঁর চোখের প্রান্ত উঠেছিল ভিজে।

দেখতে দেখতে পাঁচটা দিন কেটে গেল খেয়ালই নেই, কাজের মধ্যে দু'বেলা বিরিয়ানী গেলা আর পরচর্চ্চা করা, পলিটিক্সও বাদ যায় না। এরই মধ্যে দুটো দল হয়ে গেছে, এক দলে আমি, মিত্তিরদা, নাড়ু, নিনি, রবেদা আর অবাঙালী দাড়ি-কামান-পাঞ্জাবী শিরিচাঁদ ···সর্দ্দারজীদের সঙ্গে না মিশ খেয়ে ভিড়ে গেছে আমাদের দলে। কথা বলবার সময় খেয়ালই থাকে না, বাংলায় বলে চলেছি, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে শিরিচাঁদ, "মারো গোলি, ফির বাংলামে বোলতা···।"

এডেনের কাছাকাছি এসে গেলাম, দু'একটি করে গাঙচিল আসছে ডেলিকাট এসেনের লোভে লোভে, আর শুশুকের দল চলেছে জাহাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঝাঁপাঝাঁপি করতে করতে—হয়ত ভাবছে জাহাজটা ওদেরই পাড়াপ্রতিবেশী কেউ না কেউ। দু'একটি করে তেল-বওয়া জাহাজ যাচ্ছে পাশ কাটিয়ে পূবে, তেলের যোগান দিতে আর আমরা চলেছি বিলেতী কায়দায় তেল দেওয়া রপ্ত করতে পশ্চিমে। সবাই চিঠি লিখতে ব্যস্ত, ঠাকুরধন এসেছে আমার কাছে, ইচ্ছে আমাকে দিয়ে বিলেতী কাকীমার কাছে চিঠি লেখাবে। লিখে দিলাম একটি চিঠি, তার মর্ম্ম অতি করুণ··· "চাচীমা! আমি আসিতেছি। চাচাকে দেখিয়া যদি আমার সম্বন্ধে ধারণা কর তবে বড়ই ভুল হইবে। আমি নিরক্ষর, কোন ভাষাই পড়িতে বা লিখিতে পারি না, তোমাদের তুলনায় অতি নগণ্য। আমার চেহারাও সুন্দর নয়, এক অতি সাধারণ চাষীর চেহারা কতই বা ভাল হইতে পারে! তোমার আশ্রয়ে যাইতেছি, তুমি আমাকে নিজের মত করিয়া মানুষ করিয়া লইও, চেষ্টা করিলে আমি সবই শিখিতে পারিব। আমার জড়তা বা নিরক্ষরতাকে ঘৃণা করিও না।"—ইতি। চিঠির কয়েক ছত্র বলবার সময় ঠাকুরধনের চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল আর আমি ভাবতে লাগলাম, ঠাকুরধনের অবস্থায় পড়লে আমার কি দশা হ'ত! নিরক্ষরতা আমাদের দেশের কত শত সহস্র লোককে ঠাকুরধনের মত অসহায় করে রেখেছে!

আলজিরিয়ান হারেমের অন্দরমহল

এল এডেন, নেমে গেলেন সেই আদ্দিস আবাবা যাত্রী বোহরা ভদ্রমহিলা ছোট্ট শমীম আর শিরীনের হাত ধরে···ঠিক যেন র‍্যাফায়েলের জীবন্ত ম্যাডোনা! কি অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি! ওঁর স্নিগ্ধ রূপের ছায়ায় সব কটাক্ষে সুন্দরীরা এতদিন ছিলেন ঢাকা পড়ে! চলে যাবার সময় ওঁর সেই কথাগুলো···"ভাইসাব! ইজ্জত দিজিয়ে, খুদা আপকা ভালা করে"—আজও আমার কানে লেগে রয়েছে। ছ' পেনি ঘাট-দক্ষিণা দিয়ে এডেনের মাটিতে পা দিলাম, ঘাটের পাশের দোকান ঠাসা বিলেতী, জার্ম্মানী পণ্যসম্ভার—সস্তা যার পয়সা আছে তার কাছে। শহরে যাবার আশায় সুরু হ'ল ট্যাক্সি-ওয়ালার সঙ্গে দরকষাকষি। এক ট্যাক্সিওয়ালা এসে বলল, "বাবু সাহেবরা! আমার ট্যাক্সি নিন, আমি গুজরাটী।" যাঁরা সেই

ট্যাক্সিতে গেলেন তাঁরা ফিরলে শুনলাম যে ফেরবার পথে, সে গাড়ী খারাপ হবার অছিলা দেখিয়ে প্যাঁচ কষে বেশী ভাড়া আদায় করে ছেড়েছে···সব বেড়ালই বনে গেলে বনবিড়াল হয়!

এক স্বপ্ন দেখছিলাম, ভয়াবহ স্বপ্ন···আফ্রিকার গহন অরণ্য—এক কচি মেমসাহেবকে সেদ্ধ করবার জন্য বন্যেরা জল চড়িয়েছে বিরাট এক ডেকচীতে আর বাচ্চাগোছের এক নিগ্রো জোরসে দু'হাতে বাজাচ্ছে জয়ঢাক···ধুপ-ধুপ-ধুপ। ভয়ে চীৎকার করে জেগে উঠলাম, বুঝলাম নিজের ভুল: ঢাক নয়, সুরু হয়েছে গাধাবোটের সিষ্টোল ডাবাষ্টোল, আফ্রিকার ধার ঘেঁষে চলেছি, জঙ্গল থেকে এখনও বহু দূরে! এক নূতন বন্ধু জুটেছে, আমাদের বয়সের পার্থক্য নেট পঁচিশ বছরের, কিন্তু ওর দেড় বছরী দাপটেই

দুটি ফুজি-উজি

আমি অস্থির···আমার ছোট্ট বন্ধু আইভীর চাচা। বাপ ওয়েলসী মা উত্তরপ্রদেশী বিদুষী, দুয়ের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ—যেন এক কেল্টিক শৌর্য্যগাথার লুকনোভী ঠাট। যেখানেই দেখা হয় কুরকুরে ছোট্ট ছোট্ট দাঁত বের করে ঝাঁপিয়ে পড়ে কোলে, সঙ্গে মনে পড়ে দেশে ফেলে-আসা ঐ রকম কারো কারো কথা।

দুই কেলাসের সরিকানী আঙিনায় ক্যাম্বিসের পুকুর খাটানো হয়েছে, পীতদশনা, বিম্বাধরোষ্ঠীদের দল এলেন ঝাঁপাঝাঁপি করতে ···এই সব কাণ্ডকারখানা দেখে পিরিচাঁদেরও হয়েছে অবগাহনের ইচ্ছা, সাহেবী ব্যাপার—পাজামা গুটিয়ে বা মালকোঁচা মেরে নামবার উপায় নেই! প্যাসের মাথায় নগদ একুশ টাকার দণ্ড দিয়ে পিরিচাঁদ কিনেছে এক জ্যাণ্টজেন বেদিং ড্রয়ার আর সুরু করেছে আনাড়ী সাঁতারুর আলোড়ন। প্রচণ্ড গরম, আরবীয় বাতাসের দাপটে প্রাণ ভাজা-ভাজা, ঘণ্টায় ঘণ্টায় আসছে কুলপী মালাই ওতেই যাচ্ছে পেট ভরে। শুনছি জাহাজ রাস্তা ছেড়ে চলেছে পূর্ব্ব আফ্রিকার পোর্ট সুদানের দিকে, যাত্রীদের মন মেজাজ উঠেছে খিচিয়ে··· আরও বেশী ক্ষেপেছেন স্বাধীন রিপাবলিকের ভক্তবৃন্দ।

জাহাজ ভিড়ল পোর্ট সুদানে, লোহিত সাগরের ধারে লাল মাটির এক খাঁড়ি পোর্ট সুদান, ফুজিউজিতে ভরা। অদ্ভুত এই ফুজিউজিরা—বেজায় গরীব, সুদানের তুলোর ব্যাপারীদের কেনা গোলাম। পরিধানে শতচ্ছিন্ন কুটকুটে ময়লা পোশাক, মাথায় গ্রীজ মাখানো কোঁকড়া চুলের বোঝা আর গায়ের গন্ধ সে ত চাটগেঁয়ে শুটকি মাছের ওপরে এক কাঠি! দূর থেকে দেখলে মনে হয় বাকিংহাম প্যালেসের দ্বাররক্ষীর টুপি পরা কাক্তাড়ুয়া! এদেরই ভোটের তদারকী করেছেন সেন মহাশয়, কাজটা কঠিন ছিল বটেক! ঝোলানো সিড়ি বেয়ে উঠে এল ওরা তুলোর গাঁট বোঝাই করতে, যেই ক্যামেরার তাগ করি, নেয় মুখ ফিরিয়ে, বলে "তোওবা! তোওবা"! ছ' পেনির একটা ছোট্ট চাক্তি হাতে দিতেই মুখে ফুটল হাসি, জর্জ্জের ধড়বিহীন মুণ্ডের অর্ঘ্যেই হ'ল মহাগুণাহর প্রায়শ্চিত্ত! দল বেঁধে খাঁড়ি পার হয়ে গেলাম শহরের দিকে···শহর বলতে কিছুই নেই—বাজারসর্ব্বস্ব; ইহুদী, য়ুনানী আর গুজরাটীরাই এ দীন দুনিয়ার মালিক। শহরে আছে খানতিনেক ট্যাক্সি ঝকঝকে তকতকে, তারি মধ্যে দুখানা ভাড়া নিয়ে রওনা হলাম বস্তি অঞ্চলে ···ধু ধু মাঠ, সবুজের ছোঁয়া নেই, ডাইনে বাঁয়ে ভাঙাচোরা ঘর-বাড়ী, কলকাতার বস্তির চেয়েও নিকৃষ্ট! চারিদিকে চড়ে বেড়াচ্ছে ঝোলিকাউ উটের দল, ঘ্যাচড়ামিতে 'ধর্ম্মের ষাড়ে'র দাদা। এক দল এদেশী মেয়ে যাচ্ছে, জুলজুল করে ঘোমটার আড়াল থেকে আমাদের দিকে চেয়ে দেখছে···সবই সৃষ্টিছাড়া, প্রত্যেকটি মেয়ের পরনে কালো পেড়ে লাল সাড়ী, গুজরাটী শেঠের বোম্বাই থেকে পাইকারী আমদানী। সহযাত্রিণীর ইচ্ছে, "উটের ব্যাকগ্রাউণ্ডে ছবি চাই কিন্তু একটা!"···নেমে যেই ছবি তোলার তোড়জোড় করেছি···হাঁহাঁ··· হাঁহাঁ···করতে করতে এল সব ছুটে—আবার তোওবা! তোওবা! বব, কিন্তু কম্পুরের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লায় পাত্তা পেল না।

পুরো দেড় দিন জাহাজ দাঁড়াবে এখানে, ম্যাঞ্চেষ্টারী তাঁতীদের আদেশে সুদানী তুলো দিয়ে হচ্ছে জাহাজের পেট ভর্ত্তি। আড়ালে চলেছে বিলেতী সিগারেট আর ফরাসী সেণ্টের কালোবাজারী। জাহাজের দোকানের দরজায় অবশ্য ঝুলছে শুল্কের সীলমোহর··· স্ক্রু ড্রাইভারের সাহায্যে সীলমোহরের বেড়া ডিঙিয়ে চলেছে রাও সাহেবের সাইড বিজনেস, ক্যাপ্টেনও বোধ হয় বখরা থেকে বাদ যাবে না। সন্ধ্যার দিকে এলেন প্রায় জনশতেক গুজরাটী ছেলে দেশের জাহাজ দেখতে, অবশ্য জাহাজের মধুভাণ্ডের দিকেই তাঁদের বেশী আনাগোনা···মাত্র এক শিলিঙে যে 'বড়া' পেগ···"বাপে! পায়ে ঠেলি কি করে তোমারে?" বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা, ন্যাশনালিষ্ট গুজরাটীরা এসেছে জাতীয় জাহাজ দেখতে অথচ তারই বুকে বাসা বেঁধেছে রাজভক্তেরা—যারা ভারতীয়ের সব সুযোগসুবিধা গ্রহণ করে, কিন্তু বুক পকেটে তাদের ব্রিটিশ পাসপোর্ট···তারা হোম নীডে চলেছে হোম ছেড়ে হোটেলওয়ালীর হোমে। আমাদের জাহাজের আগে ভিড়ে আছে এস. এস. ইউনিয়ন ক্যাসল, মালানী ঔদ্ধত্যের 'ব্যাষ্টিয়ন'···ছেলেরা দেখতে গেল কৌতূহলী হয়ে। কিন্তু ফিরে এল মুখ নীচু করে—কালো চামড়ার প্রবেশ নিষেধ। হিটলারী

এন্টিসেমিটিসিজমের ছোটো ভাই ঐ লৌহদানব, শত শত কালা আদমীর মেহনতে তৈরি আর কালা আদমীর কাঁধে বওয়া কয়লা দিয়েই সৃষ্ট হয় ওর প্রাণের স্পন্দন। আরও আগে দাঁড়িয়ে আর এক জলদানব, নাম "ইণ্ডিয়া', পর্তুগালের সদর-জেলা গোয়ায় যাবার অটোবান, ভৌগোলিক সত্যের মুখের চুণকালি। এখানে আমাদের খুব সমাদর, ওখানে আছে আমাদের নিপীড়িত গোয়ানীজ ভায়েরা।

কাহেরার সঙ্গে দিলচস্তী করতে। চলেছে কবুতর খাল বেয়ে, এ খাল এক ইতিহাস মুছে অন্য ইতিহাসের সৃষ্টি করেছে, অতীতে সুয়েজ যোজকের বুকের উপর দিয়ে হেঁটে গেছে উটের কারবাঁ, পাশ্চাত্য বিজয়ী অত্তোমান্ তুর্কের দল। যাঁরা একদিন তুর্কী সাম্রাজ্য মধ্য এশিয়া থেকে গ্রানাডা পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন, কালের পরিবর্তনে তাঁদেরই এলাকা আবার সঙ্কুচিত হয়ে গেছে এশিয়া মাইনরের সীমানার মধ্যে।

আলজিয়ার্স বন্দর

পোর্ট সুদান
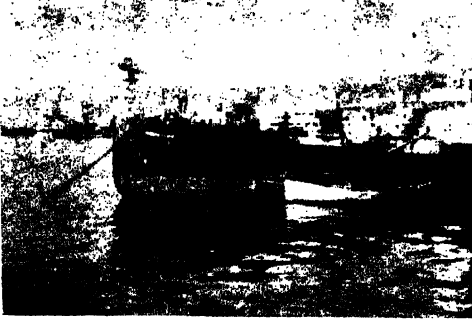
আবার চলেছি লোহিত সাগরের নীলবুকে রেখা কেটে, ডাইনে মেঘহীন আকাশের গায়ে ধূসর, আরবীয় পাহাড়ের সারি···হজরতের লীলাভূমি, উষর মরুর বুকে আজো তার স্মৃতি রয়েছে ছড়িয়ে মক্কায়, মদিনায়। দূরে একটা জাহাজ চলেছে আরবের কোল ঘেঁষে, বোধ হয় জেড্ডাগামী। মক্কা, মদিনার সদর গেট ঐ জেড্ডা··· বিধর্মীদের পক্ষে ঐ শহরের এলাকার বাইরে যাওয়া 'টাবু'। সুয়েজ আরও দু'দিনের পথ···কোণের একটা কেবিনে খুব হল্লা হচ্ছে, এক ছোকরা সর্দারজী সোমরসে মত্ত···তৃতীয় দিনের সন্ধ্যা হয় হয়···ডাইনে আকাবা উপসাগরের পাশ জুড়ে দাঁড়িয়ে এক বিরাট পাহাড়ের চূড়া—মুসার স্মৃতিবিজড়িত···মাউণ্ট সিনাই, এই মুসার আদেশেই গিয়েছিল লোহিত সাগরের জল শুকিয়ে, বেরিয়ে ছিল এক রাস্তা আর বাস্তহারা ইস্রায়েলীর দল গিয়েছিল হেঁটে প্রাণভয়ে মিশরের দিকে। আকাবা উপসাগর ধরে সোজাসুজি গেলেই পাওয়া যাবে ইস্রাইলের মাটি, যে মাটি ছুরির ফলার মত রেখেছে মিশর থেকে আরেদুনকে পৃথক করে···আরব লীগের চক্ষুশূল ঐ পবিত্র ভূমি। ধর্মের পাদপীঠ ঐ ইস্রাইল, নোয়া, মুসা, আব্রাহাম ও ঈশার পদচিহ্নে ধন্য। সুয়েজ উপসাগরে জাহাজ ঢুকেছে, পাশের এক জাহাজের সঙ্গে করছে আলো দিয়ে ভাবের আদান-প্রদান···বাঁয়ে আকাশের গা ঘেঁষে আগুনের হলকা, ইঙ্গ-মিশরীয় তেলের ধোঁয়ায় সে আকাশ কালো।

সকালে সোরগোল তাড়াহুড়ো, পিরামিডগামীর দল নাস্তা করে রাস্তার পানে চেয়ে, রবেদাও চলেছেন সাংবাদিক ভঙ্গীতে

আজ থেকে বহুদিন আগে বাংলার সপ্তগ্রামে গঙ্গা পারের জাহাজ স্প্যানিশ নাবিকের চালনায় লবণের পসরা নিয়ে লোহিত সাগর থেকে নীল নদের এক শাখা নদীর উপর দিয়ে ভূমধ্যসাগরে যেত, সে শাখার চিহ্নমাত্র আজ নেই, তাই পথ-সন্ধানীরা আবার পথের সৃষ্টি করেছে সুয়েজ খাল কেটে। এই সুয়েজখালের পেছনেও আছে ইতিহাস—এ খাল কাটতে সর্বপ্রথম অগ্রণী হয়েছিলেন ত্রিয়েস্তবাসী অষ্ট্রীয়ান ইঞ্জিনীয়ার নেগ্রেলী, তাঁর বিফলতাই ডেকে এনেছিল ফরাসী ফার্দিনান্দ দ্য'লেসেপসকে। বণিক ব্রিটিশ মিশরের অর্থাভাবের সুযোগ নিয়ে ছলেবলে হয়েছে এখন খালের মালিক। খালের মাঝে মাঝে বিটার লেক···ইঙ্গ-মিশরীয় 'বিটার রিলেশনে'র অর্থাৎ তিক্ত সম্পর্কের হেডকোয়ার্টার। দু'ধারে একটার পর একটা বিমানক্ষেত্র, ঝাঁকে ঝাঁকে উঠছে নামছে গ্লষ্টার ভাম্পায়ারের দল, দম্ভ করে দেখাচ্ছে লক্কা পায়রার খেল কসরত, ঐ দেখে কি ভুলবার পাত্র নাজিব? এবড়োখেবড়ো লাল মাটির পাড়ের শেষে ইসমাই-লিয়া, সুন্দর সবুজে ছাওয়া মিশরী হুরীর স্মিতহাস্য, আর ওখান থেকেই সুরু লালমুখোদের ঘরমুখো শেষ মাইল!

মাঝ রাতে জাহাজ এসে ভিড়ল সৈয়দ বন্দরে, নিকট-প্রাচ্যের যত দাগী খুনীর আড্ডা। এক প্রবীণের নেতৃত্বে গেল ছেলে-ছোকরার দল মিশরীয় কাবারের নাচ দেখতে। যে বন্দরের মাটিতে একদিন গুসেপ্পে ভার্দির আইডার প্রথম উদ্বোধন হয়েছিল আজ সেখানে জ্যাজ, বুগি আর রুম্বা সাম্বার তালে চলে ওঁচা নৃত্য প্রদর্শন। ভোর না হতেই আবার যাত্রা হ'ল সুরু, গতির পাল্লায়

যাত্রীবাহীরা তো বটেই, মালবাহীগুলোও গেল এগিয়ে। লাউড স্পীকারে কি একটা গান বাজছে···যতই বিলেতী মাটি এগিয়ে আসছে মনে জাগছে সংশয়···যাত্রা সফল হবে তো? সবারই বোধ হয় মনে জাগে এ ধরণের চিন্তা, অবশ্য প্রমোদভ্রমণকারী ছাড়া। পরদিন ভোর হয় হয়, পেটেণ্ট আপিসের বড়কর্তা খুব জোরসে ডেক রাউণ্ড দিয়ে ব্যায়াম করছেন, তাঁর পেছনে কুতকুতিয়ে চলেছে ছোট্ট ছোট্ট পাওয়ালা 'টিপসি', পারকিনস সাহেবের নয়নের মণি। বৃদ্ধ পারকিনস সাহেব চলেছেন ভুলে যাওয়া দেশ দেখতে। আজীবন ভারতে কাটিয়ে দেশের উপর বেশী অনুরাগ নেই, ভারত ভারত করে উনি পাগল। ওঁর চোদ্দ বছরের সঙ্গী
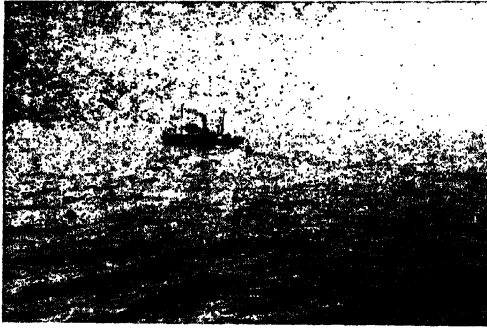
মার্সি নদীর মোহনায় পাইলট জাহাজ

ঐ টিপসি। 'মাই চাইল্ড'! 'মাই চাইল্ড'! করে যখন উনি কথা বলেন তার সঙ্গে, আড়াল থেকে মনে হয় বুঝি কোন মানুষ তাঁর সন্তানের সঙ্গে কথোপকথন করছে! টিপসিকে কিছু বলতে গেলে সে উঁচু হয়ে বসে মানুষের ঢঙে, আর ঘাড় কাত করে কথা শোনবার ভঙ্গী করে···

মাল্টা ছেড়ে গেলাম, এক ঝাঁক ব্রিটিশ জঙ্গী বিমান উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে। এলিজাবেথ রেজিনার ধ্বংসোন্মুখ সাম্রাজ্য রক্ষাকল্পে নীরস্ত্র কলোনিয়ালদের উপর ওরা নাপ্পামের পুষ্প বৃষ্টি করে!

জাহাজ আবার বিলেতের পথ ছেড়েছে, চলেছে বার্ব্বারীদের দেশে, ঐ বার্ব্বারীদের কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি বর্ব্বর শব্দ। দু'দিন থেকেই দেখা যাচ্ছে ধোঁয়ার মত আটলাস পর্ব্বতমালা, এই আটলাসের বুকেই বাসা বেঁধেছে বার্ব্বারীরা, অদ্ভুত জাত—ইউরোপ থেকে এসে ওরা ইউরোপকেই গেছে ভুলে, তুর্কদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছে ইসলাম ধর্ম্ম আর আচারে ব্যবহারে বনে গেছে আরবী! ওদের খোলসটা 'সেমিটিক' কিন্তু রক্তটা 'আরিয়ান'।

ঐ আটলাসের দক্ষিণে সাহারার কোল ঘেঁষে আছে এক প্রমীলার রাজ্য, যেখানে সবই উল্টো, ভীমদর্শন তুয়ারেগ, পুরুষ নারীকে দেখে লজ্জায় ঘোমটা দিয়ে ঘোরে ফেরে! জাহাজ এসে ভিড়েছে আলজিরিয়ার বন্দর আলজিয়ার্সে। আটলাসের উত্তর কোল ঘিরে, সাহারার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে গড়ে উঠেছে এই শহর—অনেকটা প্যারিসের ছাঁচে। মাঝখানে তুর্কী আমলের বিরাট এক দুর্গ, ঐ দুর্গটির আশপাশ ঘিরে আছে "কসবা" অঞ্চল, যেখানে কম ভাগ্যবান নেটিভরা থাকে। কসবার রাস্তাঘাটও বিচিত্র, অত্যন্ত অপরিসর আর রাস্তা জুড়ে বসেছে আলজিরিয়ান ফল-পসারীর দল। মাঝে মাঝে রাস্তা সিঁড়ি হয়ে নেমে গেছে বহু নীচে, আবার উঠেছে ধাপে ধাপে উপরের দিকে···সর্ব্বত্র আরবীয় সভ্যতার ছাপ মনে করিয়ে দেয় বাগদাদের রাস্তাঘাটের কথা! রাস্তায় চলেছে আলজিরিয়ান মেয়েরা, মেমসাহেবী পোশাকের উপর সাদা রেশমের চাদরের আচ্ছাদন, শুধু দেখা যায় ঘন কালো ভ্রূর নীচে মৃগনয়নাদের চকিত

ইসমাইলিয়ার কাছে

চাহনি। কারও-বা সঙ্গে হেঁটে চলেছে শিশুর দল, অপূর্ব্বসুন্দর···শতচ্ছিন্ন ময়লা পোশাকে নেমে এসেছে যেন দেবশিশুরা মর্ত্ত্যের সংসারের শোভা বাড়াতে। আলজিরিয়া ফরাসীদের এক ধাপ্পাবাজীর খেল, ভূমধ্যসাগরের বিস্তীর্ণ দূরত্বের ব্যবধানকে অবজ্ঞা করে ফরাসীরা রেখেছে ওকে ফ্রান্সের অবিচ্ছেদ্য অংশের পর্য্যায়ে আর এনে ঢুকিয়েছে আলজিরিয়ানদের মধ্যে প্যারিসের নীতিহীনতা, চঞ্চলমতিত্ব ও ব্যয়বহুল জীবনের ধরনধারন। পর্ত্তুগীজেরাও তাদের দৃষ্টান্ত দেখে শিখেছে আর আমাদের গুরুতর ক্ষতি সাধন করেছে গোয়ার মাধ্যমে। ভাবলেও হাসি পায় যে পর্ত্তুগালের মাটিতে ভাস্কো ডা গামা ও বার্থোলামিউ ডায়াজ জন্মেছিলেন, সে দেশের ধুরন্ধরেরাই করেছে ভৌগোলিক সত্যের পিণ্ডদান। আবার একবার ফ্রান্সের কথাটা ভাবুন, রাজনৈতিক ঔদার্য্যে যে দেশ ছিল ইউরোপের আদর্শ, সেই দেশের লোকেরাই আজ 'এগালিতে' (সাম্য), ফ্রেতারণিতে (মৈত্রী) ও লেবার্তের (স্বাধীনতার) আদর্শকে করেছে অর্থহীন। ওরাই হরণ করেছে আলজিরিয়ান, মরোক্কান ও টিউনিশিয়ানদের স্বাধীনতা আর তাঁবেদার সমাজের সৃষ্টি করে মৈত্রীকে দিয়েছে যূপকাষ্ঠে বলিদান।

এক মস্ত বড় ফরাসী ব্যাঙ্ক, উঁচুতে পত পত করে উড়ছে ফরাসী ত্রে-রঙা পতাকা। লাল, সাদা, নীলের অপূর্ব্ব সমন্বয়···এও এক স্বাধীন গণতন্ত্রী দেশের প্রতীক, কিন্তু ভিন্ন দেশের মাটিতে নিন্দনীয়

ঔপনিবেশিকতার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। একটা বড় বাড়ী, বিরাট কাচের দরজাটা খোলা, বোধ হয় আজব কিছু দেখবার আছে ভেতরে—এটা এক পাইকারী ছাঁদনাতলা, ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের অফিস, একই সঙ্গে চলেছে দু'জোড়া দম্পতির শুভলগ্নে ঘরবাঁধার প্রতিশ্রুতি। এই বিবাহে কোন রোমান্স কবিত্ব বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান নেই, এদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হবে না ত কার হবে? আবাহনে যেখানে শঙ্খ-ঘণ্টা ধ্বনিত হয় না, সেখানে বিসর্জ্জনেও কোন সাড়া জাগে না।

আজই জাহাজ ছেড়ে যাবে মাঝরাতে, গোটা দশেকের সময় সিঁড়ির কাছে খুব হৈহল্লোড় হাসির আওয়াজ শুনে এগিয়ে গেলাম। দেখি সেই ছাই রঙের স্যুটওয়ালা সাহেব খুব পেট ভরে কনিয়াক, শ্যাম্পানিয়া গিলে চেঁচাচ্ছেন আর তাঁর দু'জন স্যাঙাত তাঁকে ঠেলে সিঁড়ি দিয়ে উপরের দিকে উঠবার চেষ্টা করছে, পেছন পেছন হেঁটে আসছেন সোফার সাহেব।

আলজিয়ার্স ছেড়ে চলেছি জিব্রাল্টারের দিকে, আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণে আবছা আবছা দেখা যায় জিব্রাল্টার···ইউরোপের ঠোঁট, যে ঠোঁট টাঞ্জিয়ার সুন্দরীর দিকে গিয়েছে এগিয়ে সাগ্রহে। আরও কাছে এল জিব্রাল্টার—কিছুই নয় শুধু পাহাড় ও দুর্গের সমষ্টি, সে দুর্গকে খাড়া করে রেখেছে ব্রিটিশরা লক্ষ লক্ষ টন কংক্রীটের অপচয়ে, অথচ ওদিকে তাদেরই চোখের নীচে বহুকাল ঘুমিয়েছে কলকাতা বোম্বাইয়ের ফুটপাথে শত শত গৃহহারা যাদের বাসস্থান সমস্যা মিটে যেত ওই কংক্রীটে। কংক্রীট বর্ত্তমান সভ্যতার অন্যতম প্রতিচ্ছবি—কাউকে দিয়েছে আশ্রয় কাউকে করেছে বা স্থানচ্যুত। জিব্রাল্টার দিক্‌চক্রবালের সঙ্গে মিলিয়ে গেল, ফুটে উঠল চোখের সামনে আরও পাহাড়ের সারি, ওই পাহাড়ের একটি থাঁড়ি আজ বেঁচে আছে ট্রাফালগার হয়ে, নেলসনের শৌর্য্যবীর্য্যের লীলা-নিকেতন ওই ট্রাফালগার আর ওই ট্রাফালগার বিজয়ের পুরস্কার জিব্রাল্টার···স্বাধীন স্পেনের বুকের কাঁটা।

কুয়াশায় ঢেকে গেল স্পেনের উপকূল, অত- লান্তিকের ঢেউয়ের তালে তালে নেচে চলেছে তরণী সেই দেশের দিকে যেখান থেকে আমরা বেলায়েৎ হয়ে ফিরি আর মুড়োর ভাগটা পাই কাজকর্ম্মের দরবারে। আরও তিন দিনের পথ, কোনও চাক-চিক্যের বালাই নেই, কেবল চাপা বদ্ধ কুয়াশা। ভালই বলতে হবে কুয়াশাকে, যারা ভাগ্যান্বেষণে চলেছে, তাদের ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা এর নীচে চাপা পড়েছে। যারা স্বজনের সঙ্গে মিলতে চলেছে, তাদের আগ্রহ বাড়ছে কুয়াশার অন্তরালে দেশের মাটির রেখার আশায়, সকল আশার মাথায় ছাওয়া ঘেরাটোপ এই কুয়াশা। এল সেই দিন, মার্সি নদীর মোহনার মুখ থেকে নূতন যাত্রা হ'ল আবার সুরু নানা দেশের নানা দিকে।

জলখাবার

শ্রীদীপ্তি পাল

সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যসরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যপরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। এই পরীক্ষার ফলাফল দেখলে ৫-১৫ বৎসর বয়সের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যের অবস্থা কি শোচনীয় তা জানা যায়। অধিকাংশ ছাত্রই পুষ্টিকর খাবারের অভাবে ভুগছে। পুষ্টির অভাবে কেবল যে তাদের শরীর শীর্ণ তা নয়; তাদের শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধিও বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, তাদের রোগপ্রতিরোধ-ক্ষমতা কমে গেছে এবং চোখ, দাঁত প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। আমার মনে হয়, ছাত্রদের কাছ থেকে সরল উত্তর বার করতে পারলে দেখা যাবে যে, নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্র-ঘরের ছেলেরা কেবল পুষ্টির অভাবে কষ্ট পায় না—ক্ষুধার যন্ত্রণাও তাদের সইতে হয়।

সত্য কথা বলতে কি, অনেক দিন আগে বিলাতে ঠিক এই ব্যাপারই ঘটেছিল। ১৮৭০ ও ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষা আইন করা হয়েছিল সার্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য। কিন্তু ১৮৮০ সনে পরীক্ষার ফলে প্রকাশ পায়, এক লণ্ডন শহরেই ৫০,০০০ ছাত্রছাত্রী অর্থাৎ সমগ্র ছাত্রসমাজের এক-দশমাংশ এত কম খেতে পায় যে, বিদ্যালয়িক শিক্ষা গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। "Too hungry to learn"—এই কথাগুলিই রিপোর্টে ব্যবহার করা হয়েছিল। শিশুদের এই শোচনীয় দুর্দ্দশায় সেদিন অনেকেই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন; আর তারই ফলে প্রথম দরিদ্র শিশুদের স্কুলে খাওয়াবার ব্যবস্থা হয়। ক্রমশঃ সরকারী সাহায্য ও সহ-যোগিতায় বিলাতে এই ব্যবস্থার ব্যাপক প্রবর্ত্তন সম্ভব হয়েছে। পাশ্চাত্ত্যে অনেক দেশেই এখন 'School meal' বিদ্যালয়িক ব্যবস্থায় একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর উদ্দেশ্য আজ কেবল দরিদ্র শিশুর ক্ষুধার নিবৃত্তি নয়, সকল শিশুর যথাযথ পুষ্টিবিধানের ব্যবস্থা।

আমাদের দেশে প্রত্যেক শিশুকেই বিদ্যালয়ে খাওয়াবার ব্যবস্থা করা দরকার। এর কারণ এই নয় যে, আমাদের দেশে অবস্থাপন্ন

ঘরের ছেলেরা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে না এবং বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রই দরিদ্রের সন্তান। এর একটি কারণ, আমাদের দেশে দরিদ্রের সংখ্যাই বেশী—দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরে পিতামাতা শিশুদের জন্যে যথেষ্ট পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করতে পারেন না পয়সার অভাবে। দ্বিতীয় কারণ—আমাদের দেশে পুষ্টিকর খাবারের সম্বন্ধে লোকের জ্ঞান বিশেষ নাই—এই জন্য ধনিগৃহে শিশু প্রচুর খেতে পেলেও যথেষ্ট পুষ্টিকর খাবার অনেক সময়েই পায় না, আবার দরিদ্রের সংসারে সস্তায় যেটুকু বা পুষ্টির ব্যবস্থা করা সম্ভব, অজ্ঞতার জন্যই অনেক সময় তা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

শারীরিক বৃদ্ধি ও পুষ্টির দিক থেকে মানুষের ৫-১৫ বৎসরের গুরুত্ব খুব বেশী। তার ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যের ভিত্তি এই সময়েই ভাল করে গড়ে দেওয়া দরকার। দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার ফলে এই বিষয়ে যে বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে তার প্রতিকার করা যায় দুটি ব্যবস্থা করে—(১) বিদ্যালয়ে পরিপূরক খাদ্যের ব্যবস্থা ও (২) খাদ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সকল গৃহকর্ত্রীকে সচেতন এবং সুশিক্ষিত করে তোলা। এই বিষয়ে বিলাতের একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে, কেবল খেতে দিলে চলবে না—পুষ্টির দিক থেকেও সে খাবার যেন যথেষ্ট হয়। আবার প্রোটিন, কার্ব্বো-হাইড্রেট, ফ্যাট ইত্যাদি সব জাতীয় খাদ্য ও সকল জাতীয় ভিটামিনও তাতে উপযুক্ত পরিমাণে থাকা চাই। এই হিসাবে সাধারণ বাঙালী ঘরের খাবারের প্রধান দোষ—তার খাদ্যমূল্য (Food value) যথেষ্ট নয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রোটিনের বিশেষতঃ জান্তব প্রোটিনের অভাব এতে অত্যন্ত বেশী। সুতরাং স্কুলের পরিপূরক খাদ্যে এই অভাবগুলি মেটাতে হবে। স্কুলের টিফিনে কিছু দুধের ব্যবস্থা করা বিশেষ দরকার; এতে প্রোটিনের অভাবের হাত থেকে ছেলেরা রক্ষা পাবে আর উঠতি বয়সের ছেলেদের শরীরও সুগঠিত হবে। দৈনিক খাবারের খাদ্যমূল্য ঠিক রাখতে হলে সাধারণ বাঙালী ঘরের খাবারের সঙ্গে কিছু কাঁচা শাকসবজি ও ফলমূল যোগ দেওয়া দরকার। শাকসবজি দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত ঘরে সাধারণতঃ কম খাওয়া হয় না, কিন্তু তেল আর নানারকম মশলা সংযোগে বাঁধবার সময় তার খাদ্যমূল্য যায় কমে। সেই জন্য কিছু কাঁচা, আধসিদ্ধ বা সিদ্ধ-করা শাকসবজির (টম্যাটো, কড়াইশুঁটি, লেটুস, পালং, মুলো, পেঁয়াজ) ব্যবস্থা করলে ভাল হয়।

সাধারণ বাঙালী ঘরে ফলমূল ছেলেদের ভাগ্যে বড় একটা জোটে না। এ বিষয়ে কিছু বলতে গেলে নিজের সামর্থ্য নাই—এই কথা গৃহকর্ত্রী জানিয়ে দেবেন। কাজেই এই জিনিষটির ব্যবস্থাও স্কুলেই করতে পারলে ভাল হয়। আপেল আঙ্গুরের মত দামী ফল যে খাওয়াতে হবে না তা বলাই বাহুল্য—শশা, কলা, পেয়ারা, কুল, আম, জাম, তাল, তালশাঁস, ফুটি, নারকেল ইত্যাদি সস্তা অথচ পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করলেই যথেষ্ট। স্কুল-সংলগ্ন জমিতে এই সকল শাকসবজি, এবং ফল অতি সহজে ও অল্পব্যয়ে প্রচুর উৎপন্ন করা যায়। এতে যে খালি খরচ বাঁচবে তা নয়, নিজেদের খাবারের ব্যবস্থা নিজেরা করার আনন্দও ছেলেরা পাবে।

এক পেয়ালা দুধ এবং কয়েক কুচি ফলের খাদ্যমূল্য বড় কম নয়, কিন্তু এর সঙ্গে মুড়ি চিঁড়ে বা রুটি জাতীয় কিছু না থাকলে উঠতি বয়সের ছেলেদের পেট ভরা সম্ভব নয়। সম্ভবতঃ টিফিনের বহর দেখে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের বাক্‌রোধের উপক্রম হয়েছে। এই বিষয়ে "স্কুল মীল সার্ভিস" বলে কলকাতায় একটি প্রতিষ্ঠানে আমি যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছি তাই পাঠকদের জানাচ্ছি।

এই 'সার্ভিস' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কলকাতারই কয়েকটি উৎসাহী শিক্ষিতা মেয়ে। তাঁরা প্রত্যেক স্কুলের ছাত্র বা ছাত্রীর কাছ থেকে প্রতি মাসে একটি করে টাকা নিতেন আর তার পরিবর্ত্তে তাদের দিতেন এক পেয়ালা দুধ বা সরবৎ, কিছু ফল, একটি বিস্কুট ও কিছু মুখরোচক খাবার, যথা:—ভেজিটেবল চপ, ছোলাভাজা, আলু-কাবলি, ঘুগনি, স্যালাড ইত্যাদি। যে-কোন স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ ১৲ টাকা নিয়ে ছাত্রদের জন্যে এই ব্যবস্থা করতে পারেন। ছেলেদের দুধ পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিনামূল্যে সরবরাহ করতেন। সাধারণতঃ এই দুধ গুঁড়া দুধ হিসেবেই পাওয়া যায়। সুতরাং দুধের জন্য কোন খরচ নাই। বিস্কুট তাঁরা একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রদেরই জন্যে অপেক্ষাকৃত কম দামে পেতেন। এতে তাঁদের খরচ পড়ত জনপ্রতি ১৲ টাকা, ১।০। বর্ত্তমানে রেশনের হাঙ্গামা মিটে গেছে, তাতে বিস্কুট না কিনে হাতেগড়া রুটি বা চিঁড়ে-মুড়ির ব্যবস্থা করাই ভাল। গ্রামের স্কুলে যথেষ্ট জমি থাকে—ছেলেদের নিয়ে বাগান করলে ফলমূলের জন্য কিছু খরচ হওয়া উচিত নয়। ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্য্যন্ত, অর্থাৎ শীতকালে ছেলেদের টম্যাটো, লেটুস, কড়াইশুঁটি, শাঁকআলু, আখ, রাঙা আলু সেদ্ধ, কাঁচা ছোলা ইত্যাদি খাওয়ানো যায়। গরমকালে শশা, ফুটি, তরমুজ, চিনাবাদাম, ছোলামুগ ভিজে ও সেদ্ধ, মটরের ঘুগনি ইত্যাদি তারা খেতে পারে। শহরের যে স্কুলে জমি নাই সেখানে পাইকারী হারে এইগুলি কিনলে খুব খরচ পড়ে না। তা ছাড়া আর একটি জিনিষের প্রতি স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার—সাধারণতঃ বছরের মধ্যে পাঁচ-ছয় মাস স্কুল বন্ধ থাকে। সেই জন্য প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক মাসে ছেলেদের জন্য দুই টাকা করে খরচ করা যায়। কারণ স্কুলের মাইনের সঙ্গে বছরে বার মাসই তারা জলখাবারের চাঁদা দেবে।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বিষয়ে অগ্রণী হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের সরকারী মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে জলখাবারের ব্যবস্থা করার জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, যত ছেলে-মেয়ে খাদ্যের স্বল্পতা ও পুষ্টির অভাবে ভোগে তাদের শতকরা একজনও এই ব্যবস্থার উপকৃত হবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু যে কাজ আমরা নিজেরাই করতে পারি তার জন্য পরমুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকা এবং মাঝে মাঝে সরকারের নিন্দা করা ছাড়া আমরা আর বিশেষ কিছু করে উঠতে পারি নি।

আন্তর্জাতিক ন্যায় বিচারালয়

শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা

জাতিসঙ্ঘের সনদের আর্টিকেল ১নং প্যারাগ্রাফে এইরূপ উক্ত হইয়াছে :

One of the aims of the United Nations is "to bring about by peaceful means and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment and settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace."

সনদের অন্যান্য আর্টিকেলেও আন্তর্জাতিক আইনের উপরে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে সনদের চতুর্দশ অধ্যায়ে আন্তর্জাতিক ন্যায় বিচারালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হইয়াছে। বিচারালয় ইহার ষ্ট্যাটুট অনুসারে আপন কর্তব্য পালন করিবে। জাতিসঙ্ঘের সদস্য সমস্ত রাষ্ট্র এবং বাহিরের অন্যান্য রাষ্ট্রও বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত মানিতে সর্বদা বাধ্য থাকিবে। বাহিরের কোন রাষ্ট্রকে উক্ত বিচারালয়ের শরণাপন্ন হইতে হইলে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশে সাধারণ সভা (General Assembly) তাহাকে মতামত দিয়া থাকে।

বিচারালয়ের ইতিহাস

বিচারালয়ের ইতিহাস সম্বন্ধে এখানে সংক্ষেপে দু'চারটি কথা বলা যাইতেছে। প্রাচীনকালে বিভিন্ন রাষ্ট্র কোন পক্ষপাতশূন্য সালিশের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যেকার মতদ্বৈধের মীমাংসা করিত। গ্রীসে একরূপ উদাহরণ বিদ্যমান ছিল। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেট ব্রিটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 'Jay Treaty'র ফলে একটি যুক্ত কমিশনের প্রতিষ্ঠা হয়। এই কমিশন উভয় পক্ষেরই সমানসংখ্যক সভ্য এবং একজন 'আমপায়ার' লইয়া গঠিত। উক্ত কমিশনই তখন দুই দেশের বিভিন্ন আইনগত বিবাদ মীমাংসার চেষ্টা করিত। কালক্রমে কমিশনের সভ্যগণ রাজনৈতিক চিন্তা এবং আদর্শ দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার ফলে আইনজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত ট্রাইবুন্যাল প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং স্থির হয় যে, বিচারের রায় দানে ট্রাইবুন্যালের সদস্যদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেট ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের 'আলাবামা আরবিট্রেশন' ইহারই প্রত্যক্ষ ফল।

পরে সালিশের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মধ্যে স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৮৯৯ এবং ১৯০৭ সনে 'হেগ বৈঠক' বসে এবং এই দুই বৈঠকের অবিরাম প্রচেষ্টার ফলে, 'পার্মানেন্ট কোর্ট অব আর্বিট্রেশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা অদ্যাবধি 'ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাষ্টিসে'র পাশাপাশি বর্তমান আছে। পার্মানেন্ট কোর্ট অব আর্বিট্রেশন প্রথম কতকগুলি বিষয়ে বেশ সন্তোষজনক রায় দেয়, কিন্তু পরবর্তীকালে ইহাতে কিছু গোলযোগ দৃষ্ট হয়। ইহার প্রতীকারার্থে 'লীগ অব নেশনস' ১৯২০ সনের ১৬ই ডিসেম্বর পার্মানেন্ট কোর্ট অব ইন্টারন্যাশনাল জাষ্টিস প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার বিচারকগণ নয় বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইতেন। ১৯২২ হইতে ১৯৩৮ সনের মধ্যে উহা উনআশিটি মোকদ্দমা পরিচালিত করে। ১৯৪৬ সনে হেগে উহার সর্বশেষ বৈঠক বসে এবং সেই বৎসরই 'লীগ অব নেশনসে'র বিলুপ্তির সঙ্গে উহাও লয়প্রাপ্ত হয়।

আন্তর্জাতিক ন্যায় বিচারালয়

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে ১৯৪৩ সনের গোড়ার দিকে লণ্ডনে কয়েকটি দেশের রাজনীতিজ্ঞদের একটি সম্মেলন আহূত হয়। তাহাতে যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই একটি বিচারালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ১৯৪৪ সনের 'ডামবারটন ওকস' প্রস্তাব অনুসারে যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, রাশিয়া এবং চীনের মধ্যে আলোচনাক্রমে একটি আন্তর্জাতিক ট্রাইবুন্যাল গঠনের সিদ্ধান্ত হয় এবং স্থির হয় এই ট্রাইবুন্যালই জাতিসঙ্ঘের প্রধান বিচারবিভাগীয় প্রতিষ্ঠান হইবে।

'ডামবারটন ওকসে'র প্রস্তাবগুলিকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য ১৯৪৫ সনের এপ্রিল মাসে ওয়াশিংটনে মিঃ হ্যাকওয়ার্থের (ইনি বর্তমানে আন্তর্জাতিক ন্যায় বিচারালয়ের একজন বিচারক) সভাপতিত্বে একটি জুরি কমিটির বৈঠক হয়। এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ছিল সানফ্রান্সিসকো কনফারেন্সে উপস্থাপিত করিবার জন্য 'আন্তর্জাতিক ন্যায় বিচারালয়ে'র একটি ষ্ট্যাটুটের খসড়া প্রস্তুত করা। ১৯৪৫ সনের সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে ওয়াশিংটন কমিটির রিপোর্ট পরীক্ষা করা হয় এবং 'সনদের অধ্যায়' (চাপ্টার অব দি চার্টার) ও ইহার 'ষ্ট্যাটুট' খসড়া প্রস্তুতের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়। কমিটি নূতন বিচারালয়কে আন্তর্জাতিক ন্যায় বিচারালয় নামকরণের সুপারিশ করেন এবং আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী 'পার্মানেন্ট কোর্টে'র ষ্ট্যাটুট পরিবর্তনেরও সুপারিশ করেন। যাহা হউক, পূর্বতন বিচারালয়ের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নব ধারা সংযোজিত হইয়াছিল। কতিপয় বিষয়ে পরিবর্তন ভিন্ন অন্যান্য প্রায় সকল বিষয়েই প্রাক্তন কোর্টের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ষ্ট্যাটুটের ধারা বিধিবদ্ধ করা হয়।

বিচারালয়ে প্রবেশাধিকার

জাতিসঙ্ঘের সদস্য সকল রাষ্ট্রই এই বিচারালয়ের অধীন। বাহিরের রাষ্ট্রকে উক্ত বিচারালয়ের শরণ লইতে হইলে, প্রথম নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন প্রয়োজন, পরিশেষে সাধারণ সভা তাহার যোগ্যতা স্থির করে। ১৯৪৬ সনের ডিসেম্বর মাসে সুইস গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সাধারণ সভা সুইজারল্যাণ্ডকে কতিপয় সর্তে বিচারালয়ের আশ্রয়াধীন হইবার অনুমতি দান করে।

সুইজারল্যাণ্ড ২৮শে জুলাই, ১৯৪৮ সনে ষ্ট্যাটুটের অন্তর্গত সদস্য বলিয়া গণ্য হয়।

অবশেষে স্থিরীকৃত হয় যে, ষ্ট্যাটুটের সদস্য না হইয়াও কোন রাষ্ট্র কোর্টে প্রবেশাধিকার পাইতে পারে যদি উহা কোর্টের সীমার ব্যাপকতা স্বীকার করে এবং সনদের ৯৪ ধারা অনুযায়ী জাতিসঙ্ঘের সদস্য-রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্বস্ত ভাবে তাহার সকলপ্রকার দায়িত্ব-পালনের একটি প্রতিশ্রুতিপত্র পূর্ব্বেই পেশ করিয়া থাকে। এইরূপ প্রতিশ্রুতি সাধারণ বা বিশেষ ধরণের হইতে পারে। সাধারণ প্রতিশ্রুতি বলিতে বুঝায় যে, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র সকল প্রকার বিবাদমূলক বিষয়েই কোর্টের সীমার অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং বিশেষ প্রতিশ্রুতি বলিতে এরূপ বুঝাইবে যে, শুধু কোন কোন বিশেষ বিশেষ বিবাদী বিষয়েই সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র কোর্টের সীমার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। 'পীস ট্রিটি'র একটি ধারা অনুসারে কোর্টের সীমা শুধু টি টির আলোচনা বা কার্য্যকারিতার জন্যই জাপানে প্রযোজ্য হইবে —সকল ক্ষেত্রে নয়।

কোর্টের নির্ব্বাচন, গঠন ও সংহতি

জাতিসঙ্ঘের সনদ অনুসারে আন্তর্জাতিক ন্যায় বিচারালয় উহার একটি প্রধান অঙ্গ। ষ্ট্যাটুটে এরূপ সংযোজিত হইয়াছে যে, কোর্টের বিচারকগণ বিচক্ষণ আইনজ্ঞ হইবেন এবং তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য তাঁহাদিগকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইবে।

পনর জন বিচারক লইয়া কোর্ট গঠিত। উহাদের সদস্যপদের স্থায়িত্বকাল নয় বৎসর। তাঁহারা সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন। ১৯৪৬ সনে সাধারণ সভায় যাঁহারা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে প্রতি পাঁচ জনের যথাক্রমে তিন, ছয় ও নয় বৎসর অন্তে বিচারক-সদস্য থাকার কাল উত্তীর্ণ হইবে। ইতিমধ্যে ১৯৪৯ ও ৫২ সনে দুই দল বিচারকের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সকল বিচারকের ঐকমত্য ভিন্ন কোন বিচারককে নির্দ্ধারিত কালের পূর্ব্বে অপসারিত করা যায় না।

জাতিসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক সাধারণ সভায় ও নিরাপত্তা পরিষদে নির্ব্বাচনের জন্য সদস্যদের তালিকা উপস্থাপিত করেন এবং তাহা হইতে এই দুই সভা ভোটের মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করেন। জাতিসঙ্ঘের সদস্য নয় এমন রাষ্ট্রও ভোটে অংশ গ্রহণ করিতে পারে অবশ্য সেই রাষ্ট্র যদি ষ্ট্যাটুটের অন্তর্গত সদস্য-রাষ্ট্র হয়। কোন রাষ্ট্রের একাধিক ব্যক্তি বিচারক নিযুক্ত হইতে পারে না। যদি এক রাষ্ট্রের দুই জন সদস্য নির্ব্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেন তবে তাঁহাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিই চূড়ান্ত রূপে নির্ব্বাচিত বলিয়া ঘোষিত হন।

প্রত্যেক বিচারককেই রাজনীতি ও শাসনসম্বন্ধীয় কার্য্য বা অন্য কোনরূপ পেশা হইতে বিরত থাকিতে হইবে।

১৯৪৯ সনে যে পাঁচ জন বিচারকের নিজ পদের স্থায়িত্বকাল উত্তীর্ণ হইবার কথা ছিল তাঁহারা ১৯৪৮ সনে পুনরায় নয় বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হন। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে এম.এম. উইনিয়ারভসকি, জোরিসিক, বাদাওয়াই পাশা, রিয়াল এবং সু মো। ১৯৫১ সনে বিচারক এম এজেভেডো'র মৃত্যু হইলে, সাধারণ সভায় সেই বৎসরই তাঁহার স্থলে ব্রেজিলের এম. কারনেইরো নির্ব্বাচিত হন। ১৯৫২ সনের বসন্ত ঋতুতে যে পাঁচ জন বিচারকের পদাধিকার কাল শেষ হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে দুই জন—হ্যাকওয়ার্থ ও ক্লারেস্তাদ ১৯৫১ সনের ডিসেম্বরে পুনর্নির্ব্বাচনে জয়লাভ করেন এবং এম.এম. ফাবেলা, দ্য ভিসচার ও ক্রাইলর এই তিন জনের স্থলে স্যার বেনিগল রাও (ভারতবর্ষ) ও এম গোডোনসকি (ইউ. এস. এস, আর.) নির্ব্বাচিত হন। প্রতি তিন বৎসর অন্তর কোর্ট এক জন প্রেসিডেণ্ট ও একজন ভাইস-প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করেন।

কোন বিচারক অসুস্থতা, ছুটি বা অন্য কোন উপযুক্ত কারণ ভিন্ন কোর্টের সভা হইতে অনুপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। কোন বিচারকের স্বদেশসংক্রান্ত মামলায়ও তাঁহাকে কোর্টে উপস্থিত থাকিতে হয়। নয় জন বিচারক কোর্টে উপস্থিত থাকিলেই কোরাম হইতে পারে।

কোর্টের সর্ব্বোচ্চ অফিসারকে বলা হয় রেজিষ্ট্রার। রেজিষ্ট্রার এবং অন্যান্য অফিসারগণ কোর্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন। তাঁহাদিগকে আইনগত ও রাজনীতি বিষয়ক যাবতীয় কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিতে হয়।

নেদারল্যাণ্ডসের হেগ শহরে কোর্টের বৈঠক বসে। জাতিসঙ্ঘের সাধারণ সভায় কোর্টের বাজেট পেশ করা হয় ও আর্থিক বরাদ্দ মঞ্জুর করা হয়। ১৯৫১ ও '৫২ সনে কোর্টের মোটামুটি ব্যয় যথাক্রমে ৬০০,০০০ ডলার ও ৬৪০,০০০ ডলার।

কোর্টে বিশেষ ভাবে ফরাসী ও ইংরেজী ভাষা ব্যবহৃত হয়, তবে কোর্ট অন্য কোন ভাষা ব্যবহারেও রাষ্ট্রকে অনুমতি দেয়।

কোর্টে পরিচালিত মামলা

১৯৪৬ সনে আন্তর্জাতিক ন্যায় বিচারালয় প্রতিষ্ঠার পর হইতে অদ্যাবধি কোর্ট দশটি মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। তন্মধ্যে দুটির কথা সংক্ষেপে নিম্নে বলা যাইতেছে:

ধীবরদের মামলা: উক্ত মামলায় কোর্ট যে রায় প্রদান করে তাহা বহুদিন পর্য্যন্ত যুক্তরাজ্য এবং নরওয়ের মধ্যে একটি মতবৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই রায় কার্য্যকরী হইতে বিলম্ব হইয়াছিল। ১৯৩৫ সনে নরওয়ে তাহার উত্তর উপকূলের কিছু মৎস্যশিকার এলাকা সম্পূর্ণরূপে ধীবরদের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে এক নির্দ্দেশনামা জারি করে। নরওয়ের এরূপ নির্দ্দেশনামা জারি করা আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে ন্যায়সঙ্গত কি না এই প্রশ্নই কোর্টে উত্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত মামলাটি বিশেষভাবে সমুদ্রতীরবর্ত্তী দেশগুলির মধ্যে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং সেইজন্যই ইহার রায়দানে বিলম্ব ঘটে; আর রায়ও বিরাট আকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৫১ সনের ১৮ই ডিসেম্বর রায়দান কালে কোর্ট এরূপ মন্তব্য করে যে, একদিকে

যুক্তরাজ্যের উক্ত বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা এবং অপর পক্ষে নরওয়ে কর্ত্তৃক যে প্রক্রিয়ায় ১৯৩৫ সনের নির্দ্দেশনামায় সীমা-নির্দ্ধারণ করা হয় তাহা এবং নির্দ্ধারিত সীমা উভয়ই আন্তর্জ্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে অযৌক্তিক।

ইঙ্গ-পারস্য তৈল-কোম্পানীর মামলা : পারস্য সরকার কর্ত্তৃক ইঙ্গ-পারস্য তৈল কোম্পানীগুলির জাতীয়করণ হইলে যুক্তরাজ্য ১৯৫১ সনের ২৬শে মে কোর্টে যে মামলা দায়ের করে তাহাই উক্ত নামে অভিহিত। উপরন্তু ২২শে জুন যুক্তরাজ্য অন্তর্ব্বর্ত্তী-কালীন রক্ষণাবেক্ষণের উপায়নির্দ্দেশের জন্যও কোর্টের নিকট এক অনুনয়সূচক আবেদনপত্র পেশ করে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যতদিন পর্য্যন্ত অন্তর্ব্বর্ত্তী মামলা চলিতে থাকিবে সেই সময়-টুকুতে যাহাতে কোন পক্ষেরই অধিকার ক্ষুণ্ণ না হয় তাহারই উপযোগী একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা। পারস্য কোর্টের সীমার বহির্ভূত হওয়াতে পারস্য-সরকার উক্ত মামলায় অংশ গ্রহণ করেন নাই। যাহা হউক, ১৯৫১ সনের ৫ই জুলাই কোর্ট একটি অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন উপায় অবলম্বনের জন্য হুকুমনামায় নির্দ্দেশ প্রদান করে। উক্ত হুকুমনামায় সংশ্লিষ্ট উভয় দেশের সরকারকেই জানানো হয় যে, এরূপ কোন ব্যবস্থাই কেহ অবলম্বন করিতে পারিবে না, যাহা ভবিষ্যতে কোর্টের ন্যায়সঙ্গত রায়দানে বাধার সৃষ্টি করিতে পারে অথবা বিবাদমূলক বিষয়টি আরও জটিলতর করিতে পারে; দ্বিতীয়তঃ—ইঙ্গ-পারস্য তৈল-কোম্পানীর শিল্প ও বাণিজ্যে কোনরূপ প্রতিবন্ধের সৃষ্টি করিতে পারে এমন ব্যবস্থাও অবলম্বন করা চলিবে না। তখন হইতে মামলাটি উহার স্বাভাবিক গতিতেই পরিচালিত হয়।

জাতিতত্ত্বের সাংস্কৃতিক দিক্-নির্ণয়

শ্রীগোপীনাথ সেন, এম-এ

নানা শ্রেণীর মানবগোষ্ঠীর উৎপত্তি, শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পর্য্যালোচনাকে ইংরেজীতে 'এথনোলজি' (জাতিতত্ত্ব) বলে। এনথ্রোপলজি বা নৃতত্ত্ব এবং 'এথনোলজি' এই দুইটি নামের মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। ১৮৩৯ সনে ডবল্যু. এফ. এম. এডওয়ার্ডস প্যারিসে এথনোলজিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪৩ সনে লণ্ডনে এথনোলজিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইল এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের সদস্যেরা মানবজাতির সংস্কৃতির মূল উপকরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, পরে ১৮৬৩ সনে এনথ্রোপলজিক্যাল সোসাইটি স্থাপিত হয়। এই দুইটি সংস্থা ১৮৭৩ সনে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া 'এনথ্রোপলজিক্যাল ইনিষ্টিটিউট অব্ গ্রেট ব্রিটেন এণ্ড আয়ারল্যাণ্ড' নামে প্রখ্যাত হইয়াছে। তৎকালে জাতিতত্ত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসুগণ সামাজিক দিক দিয়া অনগ্রসর জনসমাজের সহিত উন্নত মানব-সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য বিষয়ে আলোচনা করিতেন।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪৮০ হইতে ৪২৫-এর মধ্যে রচিত হেরোডোটাসের রচনাবলীতে মানবগণের আদিম জীবনধারার ইতিবৃত্ত সন্নিবিষ্ট আছে। জাতিতত্ত্বের অন্যান্য তথ্য-সংগ্রাহকদের মধ্যে কবি লুক্রিটাস এবং ভূগোল-বিজ্ঞানী ষ্ট্রাবোরের নাম উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্যের বিখ্যাত ভ্রমণকারী মার্কো পোলো, এশিয়ায় ইবন বতুতা এবং জোয়াও ডি. বারোজের পর্তুগাল, আফ্রিকা এবং এশিয়ার নানা স্থানের ভ্রমণকাহিনীর অমূল্য বৃত্তান্ত হইতে লোকতত্ত্বের বিরাট অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। হাকলুত, পাচ্‌চাস এবং পিন্‌কারটন গল্পের মাধ্যমে জাতিতত্ত্বের মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। তখন-কার যুগের ভ্রমণকাহিনীর রচয়িতারা এই সকল দেশ ও জনগণের বৃত্তান্ত এরূপ চিত্তাকর্ষক ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সেই সকল দেশ দেখিবার জন্য বহু নৃতত্ত্ববিদ্ কৌতূহলী হইয়াছিলেন। এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য 'নিকোবরে মানবদের লেজ' নামক হাস্যোদ্দীপক কাহিনী। উহা এমনি চমকপ্রদ যে, জাতিতত্ত্ব বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু-দিগকে তথ্যসংগ্রহ করিবার কাজে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। নিকোবরে নৃতত্ত্ববিদগণ সত্য সত্যই কোন মানুষের লেজ দেখেন নাই, কিন্তু নিকোবরবাসীদের কাছা ঝুলাইয়া কাপড় পরিবার রীতিই পরখ করিয়াছেন। নানা কৌতুকপ্রদ গল্পে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এডমিরাল বায়রণ, জেমস ক্রস, এল-এ বউগেনভিলে, স্যার জন বারো, ক্যাপ্টেন কুক প্রভৃতি জাতিতত্ত্বের সাংস্কৃতিক দিক এবং নৃতত্ত্ববিষয়ক তথ্যানুসন্ধান করেন।

জাতিতত্ত্বের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকগণ ব্যতীত মিশনরীদের দান অতুলনীয়। গোড়ার দিকে জেসুইট মিশনরীগণ কানাডার ইণ্ডিয়ান-দের মধ্যে গবেষণা করেন। তাঁহাদের মধ্যে জোসী ডিকোষ্টা, জে. এফ. লাফিটাউ, এফ. এক্স. চারলিভোক্স এবং এম. ডোব্রিজ-হোফারের নাম স্মরণীয় হইয়া আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে উইলিয়ম এলিস দক্ষিণ আফ্রিকা এবং মাডাগাসকারের বিভিন্ন জাতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হন। তিনি পলিনেশিয়া সম্পর্কেও গবেষণা করিয়াছেন। আফ্রিকার অন্য দুই জন মিশনরী এবং জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রাহক বিশপ ক্যালওয়ে এবং ডেভিড লিভিংষ্টোন বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া জন উইলিয়ামস, জর্জ্জ টারনার এবং ডবলিউ. উয়াটগিল বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। রোমান ক্যাথলিক মিশনরীদের মধ্যে ই. আর. হাক চীন এবং তুর্কী সম্বন্ধে বহু সাংস্কৃতিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আবে ডুবইস বহু পরিশ্রম করিয়া হিন্দুদের আচার-

ব্যবহার এবং অনুষ্ঠানগুলির কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। লোকতত্ত্ব বিদ্যাটি দেশ-আবিষ্কারক, ভ্রমণকারী এবং শাসকবর্গের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী।

বর্তমান এথনোলজি বা জাতিতত্ত্বের গবেষকেরা মানবসম্প্রদায়ের নানা দিক, অর্থাৎ আহার-বিহার হইতে শাসনাদি পর্যন্ত কোনটিরই আলোচনা বাদ রাখেন নাই। ক্রিষ্টোফ মেনার নামে জার্মানীর একজন দর্শনের অধ্যাপক তুলনামূলক লোকতত্ত্বের আলোচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ইংলণ্ডের জেমস কোয়েলস প্রিচার্ড ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে মানবের প্রাকৃতিক ইতিহাস লেখেন। নৃতত্ত্ববিদ্যার সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয় বাল্যকালে—ব্রিষ্টলে। বালক প্রিচার্ড একাকী ডকে আসিয়া জাহাজ দেখিতেন, নানা ভাষা-ভাষী নাবিকদের সহিত পরিচিত হইয়া তিনি বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে নানা জাতীয় লোকের সহিত পরিচিত হইয়া ক্রমে তিনি নৃতত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন। তৎপরে ডক্টর অব মেডিসিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি নৃতত্ত্ববিষয়ক গবেষণার কাজে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। ঐ সময় হইতে ধারাবাহিক ভাবে জাতিতত্ত্ব গবেষণার কাজ আরম্ভ হয়। তাঁহার সমসাময়িক নৃতত্ত্ববিদগণের মধ্যে আনটোইন ডেসমউলিপন, আর. জি. লাথাম, আর. নক্স এবং টি. অয়েটজের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রেডারিক মুলার "Allgemeine Ethnographic" নামক পুস্তক প্রকাশ করেন।

নৃতত্ত্ববিদগণ তুলনামূলক আলোচনা করিয়া জাতিতত্ত্ব-বিজ্ঞানের সঠিক দিক্ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এথনোলজির মৌলিক বিষয় লইয়া স্যার এডওয়ার্ড টেলার "Early History of Mankind" এবং "Primitive Culture" নামক দুখানি সুবিখ্যাত পুস্তকে জাতিতত্ত্বের গোড়ার কথা বিবৃত করেন। এই দুইটি পুস্তক এমন সহজবোধ্য, তথ্যপূর্ণ এবং চিত্তাকর্ষক যে এগুলি পড়িয়া পাঠক যেন সেই আদিম যুগে ফিরিয়া যান। তাঁহার পুস্তকগুলি ব্যতীত নানা প্রবন্ধ ও রচনাবলী সংগ্রহ করিয়া মিস্ বি. ফ্রিরে মারেকো একটি গ্রন্থপঞ্জিকা প্রকাশ করেন। তিনি স্যার এডওয়ার্ড টেলারের অপ্রকাশিত প্রবন্ধাবলী "Anthropological Essays" নাম দিয়া ১৯০৭ সনের ২রা অক্টোবর তাঁহার জন্মদিনে প্রকাশিত করেন। জাতিতত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণায় অন্যতম প্রবর্তক স্যার জন লাবক (লর্ড এভেবেরি) এবং এডওয়ার্ড ক্লড সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের (Culturlal Anthropology) নূতন দিক খুলিয়া দিয়াছিলেন।

জাতিতত্ত্বের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় অনেকখানি সহায়ক হইয়াছে 'ফোকলোর' বা উপকথাসংগ্রহ। ইহা আদিম যুগের বিভিন্ন জাতির মানস-কল্পনার বিষয়বস্তু সংরক্ষণ করিয়া সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের উপর অভিনব আলোকপাত করিয়াছে। ইংলণ্ডের ফোকলোর সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার জি. লরেন্স গোমে ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান এবং জাতিতত্ত্বের গবেষণায় সারাজীবন মগ্ন ছিলেন। তিনি ফোকলোর সম্পর্কে যাহাতে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা হয় তৎসম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী হন। স্যার জি. লরেন্স "Folklore as an Historical Science" গ্রন্থে তাঁহার মত প্রকাশ করেন। তিনি এই মর্মে লিখিয়াছেন, "কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে 'ফোকলোরে'র স্থান নির্ণয় করিলেই চলিবে না, ইহার বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধ প্রতিটি ক্ষেত্রে নিরূপণ করিতে হইবে।" ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের ফোকলোর কংগ্রেসে মুখে মুখে লোক-কথার (Folk tales) স্থানান্তর গমন সম্পর্কে আলোচনা হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধে এস. হাটল্যাণ্ড বলেন:

"The anthropological theory of folktales no more excludes the possibility of multitudes of instances of dissemination than the anthropological theory of civilization."

যাঁহারা লোক-কথার কেবলমাত্র সাহিত্যিক মূল্য যাচাই করেন, তাঁহাদের নিকট উহা অবসরবিনোদনের জন্য রচিত বলিয়াই প্রতিভাত হইবে। নৃতত্ত্বের ক্ষেত্র হইতে লোক-কথার ব্যবধান খুব বেশী নয়, উহা মানবের জীবনধারা ও সংস্কৃতির অঙ্গীভূত। আদিম লোক-কথা স্থান, কাল ও পাত্রভেদে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। জোসেফ জ্যাকবস বলিয়াছেন:

"The survivals found in folktales or customs cannot be used as evidence of the former existence of the beliefs on which those survivals are founded in the actual place where either tale or custom is now to be met with, since the primitive savage characters in folktales may have been introduced into a country when they had already arrived at the stage of survivals."

লোক-কথা হস্তান্তরিত ও স্থানান্তরিত হওয়ার দরুন উহার মধ্যে রীতিনীতি, বিশ্বাস ও বিষয়বস্তুর পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, কিন্তু কথাসমূহ পর্যালোচনা করিলে সর্বত্রই মৌলিক ভাবটি বিদ্যমান দেখা যাইবে।

প্রাচীন যুগের মানবদের তৈয়ারি যন্ত্রপাতির ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করিলে নৃতত্ত্বের সাংস্কৃতিক দিকের একটি বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আমেরিকার জাতীয় যাদুঘরে ওটিস টি. ম্যাসন কর্তৃক অনুন্নত লোকেদের কৃষিকার্যের যন্ত্রপাতির ধারাবাহিক ক্রমোন্নতির নানারূপ নিদর্শন প্রদর্শিত হইয়াছে। এস. সি. হ্যাডন প্রথমে বিভিন্ন জাতির শিল্পগুলি সংরক্ষণ করিবার বৈজ্ঞানিক প্রণালী সম্বন্ধে সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহার মতে জাতিতত্ত্বের সহিত ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গ্রায়েডনার "Methode der Ethnologie" নামক পুস্তক রচনা করিয়া প্রথম দেখান যে, জাতিতত্ত্ব প্রকৃতি-বিজ্ঞান অপেক্ষা ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া মার্কিন নৃতত্ত্ববিদগণ মানবজাতির সভ্যতার নানা প্রকার নিদর্শন সংগ্রহ করিতেছেন। বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদগণের মধ্যে ক্লাকবোয়া নিজে জাতিতত্ত্বের উপকরণগুলি

অনুশীলন করিয়া তাঁহার ছাত্রদিগকে গবেষণার কষ্টসাধ্য পদ্ধতি অনুসরণ করিবার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। তিনি নিজে একজন বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ছিলেন, সেইজন্য তাঁহাদিগকে ভাষাবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিবার কথা বলেন।

নৃতত্ত্ববিদগণ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, পুরাতন সভ্যতা পৃথিবী হইতে লোপ পায় নাই, উহা যে প্রচ্ছন্ন ভাবে ইতিহাসের ভিতরে আত্মগোপন করিয়া আছে তাহা কোন কোন ক্ষেত্রে জাতিগত সাংস্কৃতিক আলোচনার বেলায় ধরা পড়ে। ব্যারণ এ. ভন হামবোল্ড বলেন, "মার্কিন সভ্যতা পূর্ব্ব এশিয়া এবং ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছে।" অবশ্য অধিকাংশ আমেরিকান জাতিতত্ত্ববিদ এই মতকে ভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন। এলিয়ট স্মিথ সভ্যতা-বিস্তারের প্রণালী সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "সমগ্র পৃথিবীর সভ্যতা মূলতঃ একটি স্থান হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।" ডাক্তার ডবলিউ. জে. প্যারি তাঁহার "Children of the Sun" নামক পুস্তকে প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, সভ্যতার প্রথম প্রভা মিশরেই উদিত হইয়াছিল এবং সেই জন্য তিনি মিশরীয়দিগকে সূর্য্যের সন্তানসন্ততি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে সেখান হইতে মানব-সংস্কৃতি বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করে।

গত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া জাতিতত্ত্বের যে আলোচনা হইয়াছে তাহার মূল বিষয়বস্তুকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) বিভিন্ন মনুষ্যজাতি সম্বন্ধীয় ক্ষেত্রকর্ম্মের (field-work) বিবরণ, (২) পাঠাগারে ও যাদুঘরে রক্ষিত উপকরণ এবং (৩) তুলনামূলক আলোচনা। ইদানীং বিবিধ মনুষ্যজাতি সম্পর্কে গবেষণা করিবার রীতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইহাতে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে একটি স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি গড়িয়া উঠিয়াছে। জাতিতত্ত্বের বৈষম্য বিশ্লেষণ করিতে গিয়া অনুসন্ধিৎসুগণ উপজাতিদের সমাজ, শিক্ষা, অর্থনীতি ও অন্যান্য দিক লইয়া বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়া নৃতত্ত্বের নূতন দিক্-নির্ণয় করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্যে আজ নৃতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

ভারতবর্ষে জাতিতত্ত্বের গবেষণা প্রথমে পাশ্চাত্ত্য মিশনরী এবং তত্ত্ববিদদের উদ্যোগে আরম্ভ হইয়াছিল। স্যর উইলিয়ম জোন্স এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করিয়া জাতিতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু লইয়া পুস্তক-রচনা, তথ্যসংগ্রহ এবং গবেষণা আরম্ভ করিয়া দেন। ভারতবর্ষে প্রকৃতপক্ষে প্রথম কর্নেল ডালটন জাতিতত্ত্ববিষয়ক গবেষণার সূত্রপাত করেন। "Descriptive Ethnology of Bengal" নামক গ্রন্থ তাঁহার অবদান কীর্ত্তি। কর্নেল ডালটনের সমসাময়িক কালে মেনওয়ারিং লেপচা ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়ন করিয়া লেপচা উপজাতির ঐতিহ্যের পরিচয় প্রদান করেন। স্যর চার্লস উইলকিন্সের অনূদিত হিতোপদেশ পাশ্চাত্ত্যে ভারতবাসীর লোক-কথার গৌরব প্রচার করে। ভারতবর্ষের জাতিতত্ত্ব বিষয়ক বহু প্রবন্ধ-উপকথা সংগ্রহ ইত্যাদি এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল, ইণ্ডিয়ান এ্যাণ্টিকোয়েরি, হিমালয়ান জার্নাল ও সরকারী গেজেটিয়ারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমস্ত পত্রিকায় যে সকল মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা জাতিতত্ত্বের ও লোক-কথার আলোচনার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। *Asiatic Researches and Journal* ও *Proceedings of the Asiatic Society of Bengal*-এ যে-সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার তালিকা এখানে দেওয়া হইল:

"On the Aborigines of India, Essay First on the Coch, Bodo and Duimal Tribes" by B. H. Hodgson; "On the Ballads and Legends of the Punjab" by Colonel James Abott, "On the Andamanese" by Capt. Anderson, "Identification of Certain Tribes Mentioned in the Puranas" by Rangalal Banerji, "Legends and Ballads Connected with Persons Deified or Held in Great Veneration in Bhagalpur and the Neighbouring Districts" by Rashbihari Bose, "Note on the Mechis, Note on the Lepchas, Note on the Limbos and on the Literature and Origin of Certain Hill Tribes in Sikkim" by Dr. A. Campbell, "The Ethnology of India" by Hon'ble G. Campbell, "Folklore in the Punjab" by Mrs. F. A. Steel, "Kitt's Compendium of the Castes and Tribes Found in India" by R. C. Temple, and "Folklore in Western India" by Mrs. Kabraji Pattibai, D. H. Wadia.

এই প্রবন্ধগুলি বর্ত্তমানেও অনেক নৃতত্ত্ব এবং জাতিতত্ত্ব আলোচককে গবেষণা-কার্য্যের প্রকৃত পথ নির্দ্দেশ করিতেছে। এতদ্ব্যতীত "Indian Antiquary"তে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করিতেছি যাহা এখনও প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত: "Santali Folklore" by Rev. F. T. Cole, "Folktales of Hindusthan" by W. Crooke. "Bengali Folklore" by G. H. Damant, "The Folklore of Gujarat" by R. E. Enthoven, "Maithila Folklore" by George Grierson "Folktales from the Indus Valley" by Fred McNair, "Folklore in Southern India" by Natesa Sastri, "The Song of Manik Chandra" by George A. Grierson Classification of Newars or Aborigines of Nepal proper.

প্রবন্ধগুলির মধ্যে কোন কোনটি ভারতীয়দের রচিত, কিন্তু অধিকাংশই বিদেশী বিদ্বান ও গবেষকদের লেখনীপ্রসূত। ইংরেজ শাসক-সম্প্রদায় ও মিশনরীদের মধ্যে কেহ কেহ ভারতের মাটির সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। ইংরেজগণ এদেশে রাজত্ব করিতে আসিয়া সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে সকল উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়াছেন, জাতিতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা প্রবর্ত্তন তাহার অন্যতম।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের কিছু আগ্রহ পরিলক্ষিত হইতেছে। নৃতত্ত্ববিদগণের কেহ কেহ লোক-কথা ও জাতিতত্ত্বের বিষয়বস্তু সাধারণ পাঠকের উপযোগী

করিয়া রচনা করিতেছেন। এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল ব্যতীত ইংরেজীতে নৃতত্ত্ববিষয়ক নানা পত্রিকা বাহির হইতেছে। তন্মধ্যে—*Man in India, Bombay University Journal, Vanyajati, Mythic Society Journal of Madras, Proceedings of the Anthropological Dept., Government of India* প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শরৎচন্দ্র রায়, ভেরিয়ার এলউইন, গ্রিগসন, ডবলিউ জি. আরচার, রেঃ ডবলিউ. জে. কালস, ভন হাইমেনডর্ফ, ডি এন. মজুমদার প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদগণ ভারতের বিভিন্ন উপজাতির কথা বর্ণনা করিয়াছেন। এলউইনের সুবিখ্যাত গ্রন্থ *Folksongs of the Maikal Hills, Folktales of Chattisgarh, Muria Murder and Suicide, Tribal Arts of the Middle India* প্রভৃতি গ্রন্থ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর আনন্দদান করে। আসামের উপজাতিদের সম্বন্ধে যে সকল বিদেশী বিদ্বান্ আলোচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে ড. হাটন, জে. পি. মিলস, পি. আর. টি. গর্ডন, এ. প্লেফেয়ার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় জাতিতত্ত্ববিদদের মধ্যে শরৎচন্দ্র রায়ের নাম অগ্রগণ্য। তিনি নানা প্রামাণ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিয়া এবং "Man In India" নামক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতের বিভিন্ন জাতির দৈনন্দিন জীবন এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে তথ্য প্রচারে যে কতদূর সহায়তা করিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বর্ত্তমানে শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু 'ম্যান ইন ইণ্ডিয়া'র সম্পাদক। লোকসঙ্গীত সংগ্রাহকদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সত্যার্থী, সামরাও হিভালে প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে'র "Folk Tales of Bengal"-এ জাতিতত্ত্বের এত উপকরণ নিহিত আছে যে, তাহা বিদেশীদিগকেও গবেষণা-কার্য্যে উৎসাহিত করিবে। বাংলা সাহিত্যে জাতিতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব বা বিভিন্ন উপজাতি সম্পর্কে আলোচনা খুব কমই হইয়াছে। এ সম্পর্কে শ্রীনলিনীকুমার ভদ্রের 'আসামের অরণ্যচারী', 'আদিবাসীদের বিচিত্র কথা', 'পাহাড়িয়া কাহিনী' (আদিম জাতিসমূহের উপকথাসংগ্রহ) প্রভৃতি এবং শ্রীসুবোধ ঘোষের 'ভারতের আদিবাসী'র নাম উল্লেখযোগ্য। জাতিতত্ত্বের বিষয়বস্তুসমূহ সহজ, সরল ভাষায় পরিবেশন করিলে তাহা সকল শ্রেণীর পাঠকের উপভোগ্য হইবে এবং উপজাতিদের উপকথার ভাণ্ডার হইতে উপকরণ আহরণ করিলে তাহা আমাদের রস-সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করিবে।

আশ্বাস

আ. ন. ম. বজলুর রশীদ

এই যে মাধবী ফুল কত ধৈর্য্য প্রতীক্ষার পর
ফুটেছে লতার বৃন্তে গুচ্ছে গুচ্ছে আনন্দ-সুন্দর
বর্ণে বর্ণে প্রাণ-স্ফূর্ত্তি। তৃণদল কত বর্ষ মাস
সাধনায় স্পর্শ লভে সবুজের কম্পন-উচ্ছ্বাস
মাটির কঠিন বুকে। সাধকের আতপ্ত বিরহ
অনন্ত প্রয়াস ধৈর্য্য, নিশিদিন চিত্তে অহরহ
বিচ্ছেদ-বহ্নির জ্বালা। দিন কাটে তবু অপেক্ষায়—
আহা সে আসিবে জানি, সে আসিবে শুধু সে আশায়।
সে আশায় বেঁচে আছি, এত যে দীনতা প্রবঞ্চনা,
খর্ব্বতা প্রত্যহ, শ্রান্তি সীমাহীন অতৃপ্ত কামনা
আসক্তি সংসারে শত, তুমি আছ, তবু ব্যবধান
যোজন দূরের পথ সৃষ্টি করি, কোথা সে সন্ধান
অনন্ত প্রেমের তৃষা? কম্পমান তারায় তারায়
তোমার আনন্দ-স্পর্শ নিত্য দীপ্ত আলোর শিখায়—
তোমার ভাবনা যেন নক্ষত্রের মত ধীরে জ্বলে
আমার মনের স্তব্ধ অন্ধকার আকাশের তলে—
অনির্ব্বাণ। জানি জানি একদিন করুণা বর্ষণ
তোমার অমৃত প্রেম অযাচিত আমার জীবন
শুষ্ক মরু দেহমন, নিষিক্ত করিবে অকস্মাৎ—
সেদিন ভুবন ধন্য, মনে হবে তোমার আঘাত
সে যে কি মধুর, আহা দীর্ঘ তপ্ত বিরহের দিন,
নিশ্চিহ্ন স্বপ্নের মত, মিলনের তৃপ্তিতে বিলীন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেদিনের অমরবাবু আর আজকের অমরবাবু স্বতন্ত্র মানুষ। অথবা তরুণ শাল আর পূর্ণপরিণত বিশালকায় বনস্পতি শালে যা তফাত তাই, তফাত অনেক আছে। অনেক পার্থক্য। তরুণ শালের সঙ্গে সাধারণ আম-জাম-কাঁঠালের—তরুণ অবস্থায় মিতালি হয়, অসম্ভব নয়, দৈর্ঘ্যে পল্লবে তখন ত খুব অসমতা থাকে না, তখন বর্ষার মেঘের দিকে তাকিয়ে একই সঙ্গে শীর্ষ আন্দোলন করে উল্লাসে মাতামাতি করা চলে; অমাবস্যার অন্ধকারের মধ্যে মর্মরধ্বনিতে সুরে সুর মিশিয়ে আলোর ঠাকুরকে ডাকা যায়; সূর্যোদয়ের মুহূর্তে দুজনের মাথাতেই একসঙ্গে আলোর আশীর্বাদ নেমে আসে; কিন্তু শাল তার স্বাভাবিক শক্তিতে পত্রপল্লবে বিস্তারলাভ করে দূর আকাশলোকে মাথা তুলে যখন পূর্ণ হতে চলে তখন তার পাশে থেকেও সাধারণ গাছের সম্পর্ক অনেক দূর হয়ে যায়। তার পল্লবের মর্মরধ্বনির গুরুগম্ভীর সুরের সঙ্গে সাধারণ গাছের সুর মেলে না; বর্ষার উল্লাসে সে যখন বাজায় মৃদঙ্গ কি সপ্তস্বরা তখন এ বাজায় একতারা আর ডুবকী। সূর্যোদয়ে আলোর আশীর্বাদ বনস্পতির মাথায় অনেক আগে নেমে আসে।

সেদিনের তরুণ অমরবাবু ছিলেন শুধু শিক্ষাব্রতী। শুধু শিক্ষার দীপ্তিতে ভাস্বর, চোখে ছিল শুধু এই একটি প্রশ্ন। দেশে শিক্ষাবিস্তার করবেন। তিনি সেদিন ডেকে চন্দ্রভূষণের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। কেউ বোধ করি কানে কানে তাঁর পরিচয় বলে দিয়েছিল। রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে কবিতা আবৃত্তি শুনতে দেখে তিনি নিজে ডেকে নিয়েছিলেন—আসুন—আসুন, উঠে আসুন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন? রসের আসর—মাঝখানে বসে যান।

তিনি মাঝখানে বসেন নি, একপাশে বসেছিলেন। আলাপ হতে বেশী সময় লাগে নি। দিনকয়েকের মধ্যে আলাপ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। চন্দ্রভূষণ বিস্মিত হয়েছিলেন অমরবাবুকে দেখে। বিল্বগ্রাম বনেদী ব্রাহ্মণ-জমিদারদের গ্রাম। তার মাঝখানে চৈতন্যবাবু অকস্মাৎ উদয় হয়েছেন—ব্যবসার ঐশ্বর্য্যের ছটা নিয়ে। তাতে মামলার জট পাকিয়েছে, দাঙ্গার দাপট বেড়েছে, খাওয়া-দাওয়া উৎসব-ব্যসনের সমারোহ বেড়েছে; পোশাক-আশাক গাড়ী-ঘোড়ার সম্ভ্রম বেড়েছে; খেমটা নাচ বাঈ নাচের আসর জেঁকে উঠেছে, প্যালা দেওয়ার প্রতিযোগিতা বেড়েছে, আর কিছু হয় নি। চৈতন্যবাবু মদ্যপ নন—মানুষটিও চরিত্রবান, কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। এঁদের মধ্যে অমরবাবুর মত মানুষকে দেখে অবাক হবার কথাই। কিছুদিনের মধ্যেই চন্দ্রভূষণের সকল কথা জেনে অমরবাবু বলেছিলেন—'মাই মিশন ইজ দাইন, দ্যাট অব দাইন—ইজ মাইন।'

আজকের অমরবাবু আর অধ্যাপক নন, বিরাট ব্যবসায়ের মালিক, তাঁর মিশন শুধু শিক্ষার মিশনই নয়, আরও অনেক বহু-বিস্তৃত।

আজকের অমরবাবুর সামনে শান্ত ধীর বিনীত ভাবেই আসন গ্রহণ করলেন চন্দ্রভূষণবাবু।

সেদিন থেকে পনের দিন পরের কথা। পনের দিন ধরে চন্দ্রবাবু সেই পত্রখানা লিখেও শেষ করতে পারেন নি।

ইতিমধ্যে হঠাৎ কাল রাত্রে অমরবাবু বিল্বগ্রামে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তখন রাত্রি বারোটা, অসমাপ্ত পত্রখানার খসড়ার উপরেই চোখ বুলাচ্ছিলেন তিনি। হঠাৎ চৈতন্যবাবুর বাড়ীর টমটমখানা ষ্টেশন থেকে এসে দাঁড়াল ওঁদের রেষ্ট-হাউসে, ঠিক ইস্কুলের সামনে—রাস্তাটার ওপারে। কে এল? নিশ্চয় কোন বিশিষ্ট অতিথি। মিনিটকয়েক পরেই কাঁকুরে রাস্তার উপর ভারী পায়ে দামী জুতোর মচমচে শব্দ তুলে কেউ এসে ডাকলে—চন্দ্রবাবু! জেগে আছেন? উঠুন। একবার উঠুন! আরে মশায় ঘুমোবার সময় নাই। কীপ এওয়েক, অনেক কাজ! অনেক কাজ!

অমরবাবুর কণ্ঠস্বর চিনতে চন্দ্রবাবুর ভুল হ'ল না। তিনি ধড়মড় করে উঠে বেরিয়ে এলেন—আপনি? অমর-বাবু?

অমরবাবুর কণ্ঠস্বর পাখোয়াজের আওয়াজের মত গম্ভীর। তিনি বললেন—মাউন্টেন হ্যাজ কম টু মহম্মদ। আপনার কাছেই এসেছি। আসুন, আপনার সঙ্গে কাজ সেরে—আবার ভোরের ট্রেনেই ফিরে যাব আমি। বলেই চলতে সুরু করলেন রেষ্ট-হাউসের দিকে। দুপুর রাত্রের নিস্তব্ধতার মধ্যে কাঁকর-বিছানো রাস্তায় জুতোর শব্দ উঠতে লাগল, আর উঠছে রেষ্ট-হাউসের সিঁড়ির দুপাশের বড় ঝাউ গাছ দুটোর সোঁ সোঁ শব্দ।

—মাসীমা চিঠি লিখেছিলেন।

অর্থাৎ, চৈতন্যবাবুর স্ত্রী। ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন চন্দ্রবাবু। কৈ তাঁকে ত কিছু বলেন নি তিনি?

—অনেক গুজব আপনি শুনছেন। আমি অবশ্য—ক্যান ওয়েল ইম্যাজিন—ইয়োর এ্যাংজাইটি!

সিঁড়ির উপর দিয়ে উঠতে লাগলেন তিনি। রেষ্ট-হাউসের প্রশস্ত বারান্দার উপর চেয়ার টেবিল সাজান, টেবিলের উপর দামী সেজ-দেওয়া ষ্ট্যাণ্ডিং ল্যাম্প জ্বলছে; একখানা ইজি-চেয়ারে তিনি শুয়ে পড়লেন—বসুন।

চন্দ্রবাবু ধীর শান্ত ভাবে চেয়ারে বসে সবিনয়ে বললেন—আমি গিন্নীমাকে কোন কথা বলি নি। আমি আপনাকেই চিঠি লিখছিলাম, এ লঙ লেটার, পনের দিনেও শেষ হয় নি।

একখানা ফাইল টেবিলের উপর রাখলেন অমরবাবু। —দেখুন।—ফাইলটির উপরে লেখা—"চৈতন্য ইনষ্টিটুশন চার্জেস এগেনষ্ট টিচারস্ এ্যাণ্ড আদার ডিফেক্টস অব দি অরগ্যানিজেশন।" বললেন—অন্য মাষ্টারমশায়েরা আপনার কলীগ, সহকর্মী, মৃগাঙ্কবাবু আপনার বন্ধু, যামিনী আপনার ভাগ্নে, গোপাল, যতীন্দ্র ঘোষ আপনার ছাত্র, সকলের সঙ্গেই আপনার একটা ঘনিষ্ঠতা আছে। এক দিকে ইস্কুল, অন্য দিকে পারসোনাল অবলিগেশন, এ দুয়ের মধ্যে পড়ে আপনি নিশ্চয় বিব্রত হবেন। তা ছাড়া ওদের কাছে আপনার দুর্নাম হ'ত। সেই কারণেই আমরা এর মধ্যে আপনাকে জড়াই নি। আপনার কনসেন্স ক্লীয়ার থাক এইটেই আমরা—অন্ততঃ আমি চেয়েছিলাম চন্দ্রবাবু। সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে আপনাকে ডাকতাম। কিন্তু মাসীমার হুকুম।

হাসলেন অমরবাবু।

মাসীমা—স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা চৈতন্যবাবুর স্ত্রী, বিল্বগ্রামে তিনি গিন্নীমা। চৈতন্যবাবুর গৃহিণী বলেই তাঁর খ্যাতি নয়, চৈতন্যবাবুর ভাগ্যলক্ষ্মী বলে বিপুল অহঙ্কারে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিতা। চৈতন্যবাবুর আমল থেকেই তাঁর প্রবল প্রতাপ। স্বয়ং চৈতন্যবাবু তাঁকে মেনে চলতেন। ভাগ্যের কথা জ্যোতিষীরা বলতে পারেন, তা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে—ও কথা থাক, কিন্তু ব্যক্তিত্বে এই গৌরবর্ণা দীর্ঘাঙ্গী মহিলাটি যে অসাধারণ তাতে সন্দেহ উঠতে পারে না; এবং সঞ্চয়ের অভ্যাসে যে তিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী এ কথাতেও এ অঞ্চলে মতদ্বৈধ নেই। তাঁর নিজের সিন্দুকের মধ্যে তার প্রমাণ আছে। ব্যাঙ্কের হিসাব-বই নয়, নোট নয়, গিনি এবং নগদ টাকায় প্রমাণ তিনি মজুত করে রেখেছেন। কাগজের মধ্যে আছে কোম্পানীর কাগজ; আর আছে এই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ ভূসম্পত্তির অধিকাংশগুলির বন্ধক রাখা তমসুক। পরিমাণ কয়েক লক্ষ। আজও পর্য্যন্ত—এখন তাঁর বয়স প্রায় পঞ্চান্ন, তিনি দুপুরে স্নানের পূর্ব্বে, ঝিকে সঙ্গে নিয়ে নিজে গোবর মেখে ঘুঁটে দিয়ে থাকেন। অন্দরমহলে—দলিল-দস্তাবেজ ও টাকার সিন্দুকের ঘর থেকে কাছারিবাড়ী পর্য্যন্ত তদারক করে আসেন, বাড়ীর ভাঁড়ার রান্নাশালের প্রতিটি বন্দোবস্ত থেকে ঠাকুরবাড়ীর দেবতাদের সকল বন্দোবস্ত তাঁর হাতে। তরকারি নিজে হাতে কোটেন, আলু-পটলের খোসাগুলি পর্য্যন্ত বেছে ভাজতে দেন, বাড়ীর তৈরি মিষ্টান্নের আকারগুলি পর্য্যন্ত তিনি নিরূপণ করে দেন। চৈতন্যবাবুর সংসার বিরাট, কীর্ত্তিকলাপ অনেক; তার প্রত্যেকটির প্রতিটি বন্দোবস্ত তাঁর অনুমোদন ভিন্ন হয় না। চৈতন্যবাবু পাকা উইল করে তাঁকে অধিকারও দিয়ে গেছেন। এই হলেন গিন্নীমা, অমরবাবুর মাসীমা।—তাঁর পত্র পেয়ে অমরবাবু এসেছেন বিল্বগ্রামে এবং চন্দ্রবাবুকে ডেকে তাঁর হাতে গোটা ফাইলটা তুলে দিলেন।

এটি রামজয় পণ্ডিতের কীর্ত্তি। পণ্ডিত নিজে থেকেই করেছে। চন্দ্রভূষণ তাঁকে অনুরোধ করেন নি। গিন্নীমা—এ সংসারে রাজা-মহারাজা সাহেব-সুবো থেকে সুরু করে প্রজা সজ্জন—দুষ্ট বদমাস পর্য্যন্ত মানুষ-জনের সঙ্গে কথা বলেন নিজে; সেখানে কারুর কোন সাহায্যেরই প্রয়োজন অনুভব করেন না তিনি। বারকয়েকই তাঁকে মোকদ্দমা

াক্ষ্য দিতে হয়েছে, অবশ্য কমিশনে সাক্ষ্য, তাতে তাঁদের পক্ষে বড় উকীলও হাজির ছিলেন কিন্তু সে উকীলের কোন সাহায্যই তিনি নেন নি। একবার বিপক্ষের উকীল তাঁকে অভদ্র ভাবে জেরা করেছিল, জেরার উত্তর দিয়ে সবশেষে তিনি উকীলটিকে ডেকে বলেছিলেন—ও বাবা, একটি কথা শুধোই তোমাকে!

উকীলটি হেসে বলেছিলেন—কি, বলুন।

—তোমার মা খুব বড় কুঁদুলী, নয়? পাড়ার লোক, গাঁয়ের লোক গাল না-দিয়ে জল খায় না, নয়?

উকীলটি বলেছিলেন—আপনার চেয়ে একটু কমই হবেন।

গিন্নীমা বলেছিলেন—তা কি করে হবে বাবা? তা হলে তোমার মত দজ্জাল-বজ্জাত ছেলে কি করে হ'ল? তোমার বাবার গুষ্ঠীর ত সুনাম শুনেছি বাবা।

এ অঞ্চলে কালা গোঁসাই বিখ্যাত দুর্মুখ বদমাস গৈরিক-ধারী। যার বাড়ীতে গিয়ে কালাগোঁসাই যা চায় তা না দিয়ে গৃহস্থের পরিত্রাণ নাই। না পেলে কালা গোঁসাই অভিশাপ দিতে সুরু করে, পৈতে ছেঁড়ে, মাথা কোটে। কিন্তু গিন্নীমায়ের বাড়ী সে ঢোকে না। গিন্নীমায়ের খাড়া হুকুম দেওয়া আছে—কালা গোঁসাই বাড়ী ঢুকলে তাকে ধরে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের পড়ো ঘরটায় ঢুকিয়ে—মৌমাছির চাকে খোঁচা দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিতে। ওই ঘরটায় মৌমাছির চাক আছে সেই বাড়ী তৈরির আমল থেকে। গিন্নী বলেন—ওই চাক যেদিন যাবে সেদিন আমার বাড়ীর লক্ষ্মী যাবে, আমার ভাগ্য ভাঙবে। তুই বেটা কালা গোঁসাই —তুই যদি সিদ্ধপুরুষ হোস, তোর কথা যদি ফলে—তবে তোকে মৌমাছিতে কামড়াবে না। তোর শপশ্‌পাস্ত ফলবে বলে মৌমাছি উড়ে পালাবে।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী এসেছিলেন সেদিন তাঁকে দেখতে। খাটি মেমসাহেব। তাঁর দুই হাতে দু'গাছি জড়োয়া চুড়ি পরিয়ে, সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে বলেছিলেন—শুধু হাত, সিঁথি ফ্যাক ফ্যাক করছে, বিধবার মত; তোমরা রাজার জাতই হও আর যাই হও মেমসাহেব, তোমাদের আচার-আচরণ কিছু ভাল নয়।

এই যে গিন্নীমা, বিশ্বসংসারে মানুষের সঙ্গে কারবারে কারুর সাহায্য যাঁর প্রয়োজন হয় না; কাউকে যিনি গ্রাহ্য করেন না, দেবতাদের সঙ্গে কারবারে তাঁর কিন্তু রামজয় পণ্ডিত ছাড়া এক পা চলে না। বড়জোর স্বাধীন ভাবে তিনি দেবতাকে প্রণামটি করতে পারেন, মনের কামনাটি মনে মনে জানাতে পারেন, তার বেশী কিছু নয়। চৈতন্য-বাবু বাড়ীতে রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা প্রতিষ্ঠা করেছেন, অন্নপূর্ণা জগদ্ধাত্রী প্রতিষ্ঠা করেছেন—তার উপর পুরানো মজা পুকুর কাটাবার সময় পুকুর থেকে বাসুদেব বিষ্ণুমূর্ত্তি পেয়েছেন—তাঁকেও প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ ছাড়া গ্রামে আছেন গ্রামদেবতা চণ্ডীদেবী, একান্ন মহাপীঠের অন্যতম মহাপীঠ; আরও অনেক দেবতা; যাঁদের সঙ্গে গিন্নীমায়ের নিত্য কারবার চলে! কারবার পূজা দেওয়ার ও প্রণামের। এঁদের কাছে গিন্নীমা একান্ত অসহায়; তাঁরা কি বলেন তা তিনি বিন্দু-মাত্র বুঝতে পারেন না, এবং তাঁদের বোঝাতে হলে অনুস্বার ও বিসর্গযুক্ত যে ভাষায় বলতে হয় তাও তিনি জানেন না, বলতে পারেন না, সে পারেন ওই রামজয় পণ্ডিত। রামজয় পণ্ডিতের ফিজ কম;—তুলসী দিতে আট আনা, বিল্বপত্র দিতে এক টাকা, চণ্ডীপাঠে এক টাকা; বিশেষ পূজা-হোমে দু'টাকা। খুব বড় ক্ষেত্রে পাঁচটা টাকা। কিন্তু বিশ্বাসের ক্ষেত্রে গিন্নীমা হাইকোর্টের পাঁচশো এক টাকা ফিওয়ালা ব্যারিষ্টার উকীল ও বত্রিশ টাকা ফিওয়ালা ডাক্তারদের চেয়ে বেশী বিশ্বাস করেন রামজয়কে।

রামজয় নিজের জন্য আসেন নি। নিজের জন্য তিনি ভাবেন না। মাসে পঁচিশ টাকা তিনি অনায়াসে উপার্জ্জন করতে পারবেন। ত্রিফুৎকারের অধিকার নিয়ে তিনি জন্ম-গ্রহণ করেছেন; কানে ফুৎকার—শঙ্খে ফুৎকার—উনানে ফুৎকার। উপবাসকেও তিনি ভয় করেন না। ভগবানের নাম নিয়ে মুষ্টিভিক্ষাতেও তাঁর মর্য্যাদা নষ্ট হবে না। এক মুষ্টি চালের বিনিময়ে তিনি তাকে ভগবানের নাম মনে পড়িয়ে দেবেন। তার মনের সকল অন্যায় সঙ্কল্প—সকল পাপ কল্পনা চমকে উঠবে। তিনি অন্য কারুর জন্যও গিন্নীমায়ের কাছে আসেন নি, এসেছিলেন—চন্দ্রভূষণের জন্য।

সংবাদটা পাওয়া অবধি চঞ্চল সব মাষ্টারই হয়েছেন; মুখের হাসি আর কারুরই স্বাভাবিক নয়; কেউ আস্ফালন করে, কেউ গালাগাল করে মনের উৎকণ্ঠা চাপা দিয়ে চলেছেন; কিন্তু চন্দ্রভূষণ অতিমাত্রায় গম্ভীর হয়ে গেছেন, কথাবার্ত্তা অত্যন্ত কম বলেন, অহরহই যেন চিন্তার মধ্যে ডুবে রয়েছেন। ইস্কুল ও বোর্ডিঙের কাজগুলি যন্ত্রের মত করে যান। রামজয় দু'তিন দিন তাঁর সঙ্গে কথা বলে তাঁকে সহজ মানুষ করে তুলবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পারেন নি; চন্দ্রভূষণ যেন বেদনার বন্যার মধ্যে ডুবে গিয়েছেন। মধ্যে মধ্যে রামজয়ের রসিকতায় হেসেছেন—কিন্তু সেই হাসি অত্যন্ত করুণ।

একদিন শুধু বলেছিলেন—রামজয়, শেষে চৈতন্যবাবুর মেজজামাইয়ের অবস্থা হ'ল আমার?

চৈতন্যবাবুর মেয়েরা এই গ্রামেই বাস করেন; বিষয়-

লোকে সকলেই শুনতে পেত। কর্তা মধ্যে মধ্যে বলতেন —"গিন্নী একটু আস্তে বকো! লোকে শুনছে যে।" তিনি বলতেন—"শুনুক না। আমি আমার সাতপাকের স্বামীকে বকছি। বকব না? হাজারবার বকব। যার শুনতে খারাপ লাগছে সে নিজের কানে তুলো গুঁজুক। তোমাকে আমি ঘরেই বকছি বাইরে গিয়ে তুমি যা করেছ তা ত না করে দিয়ে আসি নাই। তা যদি করতাম তা হলে লোকে বলতে পারত, মা গো, এমন পরিবার এমন মেয়ে, যে বাইরে বেরিয়ে স্বামীর নাকে ঝামা ঘষে দিলে!"

সেবার কর্তার মৃত্যুর পর তিনি খবরটা পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জুড়ি গাড়ী ডেকে বেরিয়ে পড়লেন। মেজ ছেলে বাড়ীতে থাকত, বিষয়সম্পত্তি দেখত, বড়-ছোট কলকাতায় কয়লা কুঠিতে ব্যবসা দেখত; মেজ ছেলে ছুটে এল—করছ কি মা? তুমি কোথায় যাবে?

গিন্নী বলেছিলেন—সরে দাঁড়া রে মেনিমুখো, আমি যাচ্ছি ইস্কুলে বোর্ডিঙে। কোচোয়ান হাঁকাও গাড়ী।

ইস্কুলের সামনে গাড়ী দাঁড় করিয়ে—হেঁকে চীৎকার করে বলেছিলেন—মুচকুন্দ সিং, মহাবীর পাঁড়ে, বাহড় শেখ —তুম লোক তিন বন্দুক ঘাড়ে করকে, তিন বাগান পাহারা দেও। টোটা ভরকে রাখো। কোন গাছকা এক পাতা নড়ে গা তো দাগ দেও বন্দুক। মানুষ কাঠবিড়ালী যে হোক—গাছ ছুঁয়ে গা তো লাগাও। কোচোয়ান ঘুমাও গাড়ী।

দু'দিন পর সকালে সে তচনচ কাণ্ড। নতুন কাটানো দীঘি শ্যামসায়রের চারি পারের বাগান লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে রাত্রে। চাপরাসী বন্দুক নিয়ে পাহারা দিয়েছে, সে কোন শব্দ পায় নি, অথচ গোটা পুকুর পারের এক শ' দেড় শ' কলাঝাড়ের—কুড়ি কাঁদি কলা—তিরিশ-চল্লিশটা মোচা— কারা কেটে নিয়ে গিয়েছে; নতুন লাগানো তরকারির গাছগুলি উপড়ে ফেলে দিয়েছে; আর ভূতের নৃত্য করেছে চারিদিকে।

খবর পেয়ে তিনি গাড়ীর অপেক্ষা করেন নি, হেঁটেই চলে গিয়েছিলেন। প্রথমেই মহাবীরের হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে বলেছিলেন—আভি নিকালো। এই গাঁ সে নিকালো। এই মুল্লুক সে নিকালো। তারপর বোর্ডিঙে গিয়ে উঠেছিলেন।

—কই বড়মাষ্টার? কোথায়?

বড়মাষ্টারের গরুর গাড়ী সেই সবে এসে নেমেছে বোর্ডিঙে। আগের দিন ছিল রবিবার, শনিবার বিকেলে বড়মাষ্টার বরাবর বাড়ী যায়। বড়মাষ্টার এসে দাঁড়িয়েছিল— আপনি গিন্নীমা!

—আমি খানাতল্লাস করব। ঘরদোর, সব ছেলের বাক্স পেঁটরা—বোর্ডিঙের ভাঁড়ার হাঁড়ি সব দেখব আমি।

বড়মাষ্টার ভাল মানুষ, ভাল বুদ্ধি। কি কি যে বলেছিলেন তাঁকে তা তাঁর মনে নাই, তবে হ্যাঁ কথাগুলি যেমন ন্যায্য, তেমনি ধীর, তেমনি মিষ্টি। বাড়ীর বউয়েরা-ঝিয়েরা, পাড়ার নিন্দুকেরা তাঁকে দজ্জাল, দর্কশা, খাণ্ডারণী—যা বলে বলুক—ন্যায্য কথা মিষ্টি কথা তিনি মানবেন না—এ কখনও হয়? একশো বার মানবেন। মাথা হেঁট করে মানবেন। মেনেওছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছিলেন তিনি। বড়মাষ্টার বলেছিলেন—আমি নিজে খানাতল্লাস করব। যদি ছেলেদের কাণ্ড হয়, যদি এতটুকু প্রমাণ পাই, তা হলে দোষীকে কঠিন শাস্তি দোব আমি।

তিনি বলেছিলেন—বেঁধে সে বেটাদের আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। আমি বেটাদের পাছায় কল্কে পুড়িয়ে ছাপ দোব।

বড়মাষ্টার হেসে বলেছিলেন—সে যা করবার আমি করব। আপনি যদি এসব নিজে করবেন—তবে আমরা রয়েছি কি জন্যে? আপনি গিন্নীমা! আপনি দান করবেন, ধ্যান করবেন, পুজো করবেন, পুণ্য করবেন। রাজা—জজ রাখে বিচার করবার জন্যে। নিজে কি পারেন না? পারেন। কিন্তু করেন না। কাউকে ফাঁসির হুকুম দিতে হবে, কারুর হাত কেটে দিতে হবে। সে সব তিনি নিজে মুখে উচ্চারণ করেন না। আবার জজ ফাঁসির হুকুম দেয়, ফাঁসি দেয় জল্লাদ। রাজা জজকে হুকুম করে, চুলচেরা বিচার করবে। কোতোয়ালকে বলবে—যেখান থেকে হোক বার কর চোরকে, খুনেকে।

ফিরে এসেছিলেন তিনি খুশী হয়ে, এবং পরে ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন আর বড়মাষ্টারকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করেছিলেন এর জন্য। ভাগ্যে তিনি সেদিন মাষ্টারের কথায় আর ভগবানের দেওয়া সুমতিতে ফিরে এসেছিলেন। কারণ এর পরই তাঁদের নানান বাগানে এমনি কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল। শুধু তাঁদের বাগানেই নয়—বিল্বগ্রামের আরও দু' এক বাবুর বাগানে পুকুরে এমন ঘটনা ঘটল। তখন প্রকাশ পেল যে, কাণ্ডটা কতকগুলি দুষ্ট প্রজার কীর্তি। অন্যবার যাঁদের এমন ক্ষতি হয়েছে তাঁরাও ওই মহলে তাঁদের শরীক। পুলিসের হাতে ধরা পড়েছিল বেটারা!

সেই অবধি বোর্ডিঙের ডাকাতরা অত্যাচার করলে— আর তিনি ইস্কুল পর্য্যন্ত যান না। ম্যানেজার তারণকে ডেকে বলেন—যাও তো তারণ একবার বড়মাষ্টারের কাছে!

তারণ যায়। তিনি ঘরে বসেই খবর পান—বড়মাষ্টার

খুব বকেছে ছেলেদের। বেত নিয়ে নাচিয়ে নাচিয়ে শাসিয়ে বলেছে—পিঠকা চামড়া ছাড়ায় দেগা!

শুধু তাই নয়। বড়মাষ্টার সত্যিকারের ভাল মাষ্টার। চুলচেরা কড়া বিচার। তাঁর বাড়ীর ছেলে কেউ অন্যায় করলে তাকে তিনি খাতির করেন না। সমান শাসন করেন। এই ত সমর—এখন তাঁর নাতজামাই,—তাঁর বড় জামাইয়ের ভাই; সেও ত এই বাড়ীর ছেলের মত, সেও এই বাড়ীতে থেকেই পড়ত; এবং সকলেই জানত—তাঁর বড় নাতনীর সঙ্গে তার বিয়ে হবে; বাড়ীর ছেলেদের চেয়ে তার খাতিরযত্ন একবিন্দু কম ছিল না, বেশীই ছিল; সেই 'সমর' বদ সঙ্গে মিশে সিদ্ধি খেয়ে কি কাণ্ড করলে! বড়মাষ্টার তাকে বাবুদের বাড়ীর ছেলে কি হবুজামাই বলে এতটুকু খাতির করে নি। পিঠে বেত মেরে শায়েস্তা করে দিয়েছিল। তাতেও হ'ল না দেখে তাকে এখান থেকে সরিয়ে কল-কাতার ইস্কুলে পাঠাতে বললে। তাই পাঠানো হয়েছিল। এবং তাতেই শোধরাল সমর। দু'বছর পর আবার এখানে এসে ভর্তি হ'ল, ফাষ্টো ডিবিসনে পাস করলে। এখন সমর বি-এ পাস করেছে, হোমরা-চোমরা হয়েছে। কিন্তু সেদিন বড়মাষ্টার কড়া শাসন না করলে, তাকে এ ইস্কুল থেকে অন্য ইস্কুলে পাঠাবার জন্যে না বললে—সমর বয়ে যেত।

কতবার পাড়া-ঘরের লোকেরা তাঁর কাছে এসেছে, কেউ ছেলে সঙ্গে এনেছে—পিঠে মারের দাগ দেখিয়ে—দেখুন, গিন্নীমা দেখুন, ইস্কুলের মাষ্টারে কেমন করে ছেলে মেরেছে দেখুন! বিচার করুন। কোন দোষ নাই ছেলের।

পাড়া-ঘরের কাণ্ড, কি করবেন তিনি? খবর পাঠিয়ে-ছেন তিনি বড়মাষ্টারকে। তাঁর ছোট ছেলে ইস্কুলের সেক্রেটারী, সে আবার বড়মাষ্টারের ছাত্র। তা তিনি ছেলেকে বড় আমলে আনেন না; সরাসরি মাষ্টারকেই খবর পাঠান বা গাড়ী করে ইস্কুলের খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়ান; মাষ্টার আসে—কি গিন্নীমা?

—হ্যাঁ মাষ্টার, ওই ওদের ছেলেটাকে কোন্ মাষ্টার বড্ড মেরেছে গো!

—দোষ করেছে গিন্নীমা। ও যদি মাষ্টারের নিজের ছেলে হ'ত তবে মেরে রক্তদর্শন করত।

মাষ্টার ছেলেটির দোষ বলতেই গিন্নীমা গালে হাত দিয়েছেন।

সেই বড়মাষ্টারকে ছাড়িয়ে দেবে? অধর্ম্ম হবে! অন্যায় হবে! পণ্ডিত তুমি ঠিক বলেছ—পাপ হবে। মঞ্জরী ডাক ত—ছোটবাবু কোথা আছে ডাক ত।

ছোটবাবু—চৈতন্যবাবুর ছোট ছেলে—পবিত্রবাবু। পবিত্রবাবুই ইস্কুলের সেক্রেটারী। পবিত্রবাবু এই ইস্কুলেরই ছাত্র। প্রথম বৎসর যারা এই ইস্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছিল—তাদেরই একজন। পবিত্রবাবু পাস করতে পারেন নি। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে অনেক পড়াশুনা করেছেন। মানুষটি বড় ভাল। শৌখীন মানুষ; বই লেখেন; থিয়েটার করেন; মিষ্টভাষী রসিক লোক।

পবিত্রবাবু আসতেই গিন্নীমা বললেন—বলি হ্যাঁরে, এসব কি শুনছি?

রামজয় তখন চলে এসেছেন।

—কি মা?

—গুরুমারা বিদ্যে? তোরা বড়মাষ্টারকেও ছাড়িয়ে দিবি?

—আমি ত ঠিক জানি না মা।

—তুই যে ইস্কুলের সেক্রেটারী। তুই জানিস না কি রকম?

—আমি সেক্রেটারী হলেও অমরদাদাই ত সর্ব্বেসর্ব্বা। তিনিই তদ্বির করে 'এডে'র টাকা বাড়িয়েছেন। তাঁর সঙ্গেই ইনস্পেক্টর অব স্কুলসের কথাবার্ত্তা হয়েছে। তা ছাড়া—হীরেন আর সমর তারা দু'জন এবার নতুন মেম্বর হয়েছে। তারা এ ইস্কুলে ছেলেবেলা থেকে পড়ে পাস করেছে—তারাই মাষ্টারদের দোষের কথা বলেছে। দোষ মাষ্টারদের আছে মা। ইস্কুলকে ভাল করতে হলে—মাষ্টার ভাল চাই।

—ও সব কথা আমি বুঝি না। অমরকে তুই আজই চিঠি লেখ। বড়মাষ্টার আর রামজয় পণ্ডিতকে ছাড়ালে আমি শুনব না। অমর আসুক। এসে আমার সামনে—বড়মাষ্টারের সঙ্গে কথা বলুক। পরামর্শ করে যা হয় করুক।

অমর সেই তাগিদেই এসেছেন। এসে চন্দ্রবাবুকে ডেকে তাঁর সামনে গোটা ফাইলটি নামিয়ে দিয়ে বললেন—দেখুন আপনি। আপনাকে বাদ দিয়ে কাজ আমরা করেছি, সেটা আমাদের ত্রুটি। কিন্তু মাষ্টারেরা আপনার কলীগ; কেউ বন্ধু কেউ আত্মীয়, কেউ ছাত্র। তাদের বিরুদ্ধে যাওয়া আপনার পক্ষে কষ্টকর হবে বলেই আপনাকে এর মধ্যে নিই নি। তা ছাড়া তাঁরাও আপনাকে অপবাদ দিত। আপনি চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশনের প্রাণ। আপনাকে বাদ দিয়ে চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশনের উন্নতির পরিকল্পনা আমরা করি নি।

চন্দ্রবাবু ফাইলটা উল্টে দেখলেন।

প্রথমেই মৃগাঙ্কবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগের ফিরিস্তি। সর্ব্ব-

শেষ রতনবাবুর। তার পর আরও একটি ফাইল—সেটির উপর লেখা জেনারেল।

সেইটেই সর্ব্বপ্রথম খুললেন।

প্রথমেই তাঁর নাম। শ্রীচন্দ্রভূষণ দত্ত। হেডমাষ্টার। হি ইজ দি লাইফ এণ্ড সোল অব দি ইনষ্টিট্যুশন। ক্রটি বলতে তিনি একটু ভীরু। ঠিক একালের মত উদার দৃষ্টি-ভঙ্গীর কিছু অভাব আছে। অতিমাত্রায় প্রাচীন শুচি-বাতিকের মত বাতিক আছে।

হাসলেন চন্দ্রবাবু।

পবিত্র-সমর-হীরেন এদের থিয়েটারে বাতিক আছে। ইস্কুলের পড়ুয়া গাইয়ে ছেলেদের অভিনয় করা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কয়েকবারই সংঘর্ষ হয়েছে।

আবার ফাইলটা উল্টে নিলেন তিনি। মৃগাঙ্কবাবুর ফাইল ওল্টালেন।

"এ গ্রেট স্কলার নো ডাউট।"

কিন্তু ছাত্রদের কাছে দুর্ব্বোধ্য দুরূহ। এবং কর্ত্তব্যকর্ম্মে একান্ত অমনোযোগী। ক্লাসে তিনি পড়ান না। অধিকাংশ সময়েই ক্লাসে এসে দরজা বন্ধ করে ছাত্রদের সঙ্গে গ[illegible] করেন। নাস্তিক্যবাদী পাণ্ডিত্যের বিলাসে—নীতিবাদ ধর্ম্ম বাদ শাণিত যুক্তিতে উড়িয়ে দিয়ে কৌতুক অনুভব করেন যদি বলা যায়—তাঁর নিজের জীবনেও এই নীতিবাদ শিথিল তা হলে মিথ্যা বলা হবে না। পরীক্ষার সময় তিনি ছাত্রদের কাছে উপঢৌকন গ্রহণ করেন। অনেক সময় প্রশ্নও তাঁর কাছে জানা যায়। ছাত্রেরা ছাত্রজীবনে কৌতুক ও উদ্দামতা বশে চৌর্য্যবৃত্তি করে তাঁর কাছে চুরি করা জিনিস নিয়ে এসেছে—তিনি তাও জেনে শুনে গ্রহণ করেছেন। ১৯০[illegible] সালে—শ্যামসায়রের পাড়ের বাগানে—যে কলা চুরি হয়েছিল, সে চুরি প্রজারা করে নি, ছেলেরাই করেছিল। ছেলেরা অনুমান করেছিল যে, গিন্নীমা এই নিয়ে অনেক হাঙ্গামা করবেন। জেনেই তারা কলা বোর্ডিঙে রাখে নি। নানা স্থানে লুকিয়ে রেখেছিল। তার একটি স্থান—মৃগাঙ্কবাবুর ঘর। মৃগাঙ্কবাবু গভীর রাত্রে উঠে ছেলেদের মত কৌতুকেই চুরি-করা কলাগুলি তাঁর বাড়ীতে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

(ক্রমশঃ)

এই ত জীবন

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

শুধু ছুটাছুটি আর খাটাখাটি—এই তো জীবন! হায় রে,
চলে যাযাবর পাখী এক ঝাঁক—কে কাহার পানে চায় রে!
যত দুই হাতে লুটে আনি টাকা
তবু প্রাণমন কেন লাগে ফাঁকা?
অর্থবিহীন এই বেঁচে থাকা—তার লাগি ; এত দায় রে!

হায় রে মানুষ! শূন্য ফানুস! তুমি প্রাণহীন যন্ত্র,
কিছু তব নাই, পুড়ে হ'ল ছাই—রহিল উদরতন্ত্র!
সুন্দর তাই লাজে কুণ্ঠায়
সংসার হ'তে নিয়েছে বিদায়,
মোরা কাপালিক রচিতেছি বসে তাহার মরণমন্ত্র!

কোথায় শান্তি? কোথায় তৃপ্তি? কেন সবে উদ্‌ভ্রান্ত?
শত উপচারে দগ্ধ জঠর কিছুতে না হয় শান্ত!
করি' কাড়াকাড়ি, ঘাতপ্রতিঘাত,
ভুলে গেছি খাঁটি জীবনের স্বাদ,
আমাদের চোখে জরতী এ ধরা—নহে সে শ্যামল কান্ত।

এত নির্ব্বোধ জগতের ধাতা—এই লাবণ্যপুঞ্জ,
জ্যোৎস্নার মায়া, গোধূলির ছায়া, কুসুম-উতল কুঞ্জ
গড়েছে কেবল খেয়ালখেলায়?
কারো তরে নহে—অকারণে হায়,
কোকিলকূজন, সাগরমন্দ্র, মধুপের গীতিগুঞ্জ?
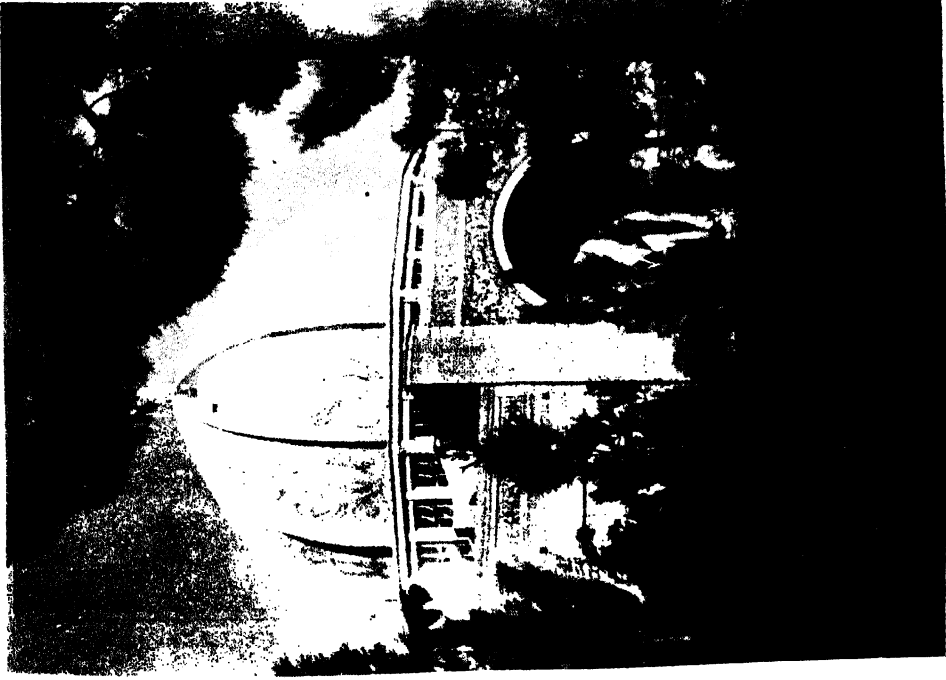
বাহাই-কেন্দ্র, তেহেরান, ইরাণ

মস্কৌয়ের ডায়নামো ষ্টেডিয়ামে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রু ও মার্শাল বুলগানিন

মালামপুঝা জলসেচ পরিকল্পনা—কান্নাড়ী নদীর জলনিকাশের নালা
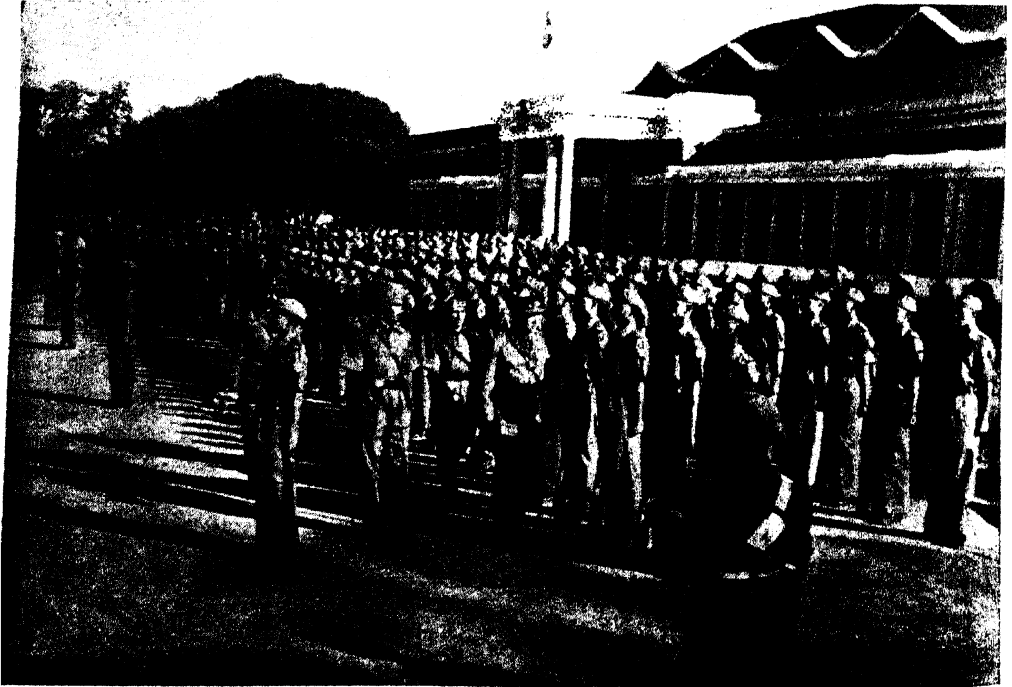
দেরাদুনে লেঃ জেনারেল সন্ত সিং কর্ত্তৃক মিলিটারি প্যারেড পরিদর্শন

বিনোবা

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

বিনোবা সত্যাগ্রহ (ব্যক্তিগত) করিলেন। ধৃত হইলেন। তাঁহার জেল হইল। নাগপুর জেলে তাঁহাকে আটক করা হইল। বিনোবা যখনই জেলে গিয়াছেন, ভারত তথা জগৎ তখনই তাঁহার কাছ হইতে কোন-না-কোন জ্ঞানোপহার পাইয়াছেন। '৩২ সনে (তখন তিনি পশ্চিম খান্দেশের ধুলিয়া জেলে) তিনি দিয়াছেন 'গীতাঈ' ও 'গীতা-প্রবচন'। '৪০-৪১ সনে বিনোবা দিলেন 'স্বরাজ্য-শাস্ত্র'।

সত্যাগ্রহী বন্ধুরা তাঁহার কাছে স্বরাজ্য-শাস্ত্রের আলোচনা শুনিতে চাহিলেন। বিনোবা রাজী হইলেন। তিনি মুখে বলিয়া যাইতেন। গীতা-প্রবচন লিখিয়া লইয়াছিলেন সানে গুরুজী। স্বরাজ্য-শাস্ত্রের 'কলমনবীশ' হইলেন ব্রিজলাল বিয়ানী। স্বরাজ্য-শাস্ত্রের নিবেদনে বিনোবা বলিয়াছেন :

নিবেদন

স্বরাজ্য-শাস্ত্রের এ ক্ষুদ্র টিপ্পনী মূলতঃ নাগপুর জেলে করা হয়। কিঞ্চিৎ সংশোধিত আকারে তা এখানে উপস্থিত করা যাচ্ছে। শ্রীবিয়ানীজী কেবল আদরপূর্ব্বকই নহে, আগ্রহ সহকারে যদি স্বয়ং 'কলমনবীশ' না হতেন আর আমা দ্বারা বলিয়ে না নিতেন তা হলে অন্ততঃ এখন এর সাকার রূপ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। একথা আমায় স্বীকার করতেই হবে।

রাজ্য এক : স্বরাজ্য আর এক। রাজ্য হিংসা দ্বারা পাওয়া যেতে পারে। স্বরাজ্য অহিংসা ছাড়া অসম্ভব। তাই চিন্তাশীল লোকেরা রাজ্য চান না। পক্ষান্তরে, "এস, সকলে স্বরাজ্যের জন্য চেষ্টা করো" এ বলে তাঁরা ব্যাকুলতা প্রকাশ করে থাকেন। "ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যম্" আর "যতেমহি স্বরাজ্যে" এ হচ্ছে তাঁদের নিষেধাত্মক ও বিধায়ক রাজনৈতিক ধ্বনি।

"স্বরাজ্য বৈদিক পরিভাষার অন্তর্গত একটি শব্দ। তার ব্যাখ্যা এরূপ করা যেতে পারে : স্বরাজ্য মানে প্রত্যেকের রাজ্য, অর্থাৎ এমন রাজ্য যাকে প্রত্যেকেই মনে করে এ 'আমার', তার অর্থ সকলের রাজ্য—রামরাজ্য।

"স্বরাজ্যের শাস্ত্র নিত্য বর্দ্ধিষ্ণু। তার পদ্ধতি দেশকালানুসারে সতত পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু তার মূল তত্ত্ব শাশ্বত। এখানে উপস্থাপিত রূপরেখা সেই শাশ্বতের ভিত্তিতে আঁকা হয়েছে। বিস্তার এর যত খুশী করা যেতে পারে। তা যথাসম্ভব ও যথা-প্রয়োজন ভবিষ্যতের জন্য রেখে এখানে ক্ষান্ত হচ্ছি।"

গান্ধীর মনে যে স্বরাজ্যের স্বপ্ন ছিল আর যার জন্য তিনি নিরন্তর কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন, বিনোবা তাকে শাস্ত্রের রূপ দিয়াছেন। বিনোবার কথায় সে স্বরাজ্যের রূপ ও কষ্টিপাথর হইতেছে এই :

(অ) সর্ব্বরাষ্ট্রীয় ভ্রাতৃভাব, (আ) রাষ্ট্রের সকল লোকের সজ্ঞান ও যথাশক্তি কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও হার্দ্দিক সহযোগিতা, (ই) সমর্থ অল্পসংখ্যকের ও সর্ব্বসাধারণ বহুসংখ্যকের হিতৈক্য, (ঈ) সকলের সর্ব্বাঙ্গীণ ও সমান বিকাশের দৃষ্টি, (উ) রাজসত্তার ব্যাপকতম বিভাজন, (ঊ) অল্পতম শাসন, (এ) সুলভতম তন্ত্র (শাসন-ব্যবস্থা), (ঐ) ন্যূনতম ব্যয়, (ও) যথাসম্ভব কম খবরদারি, (ঔ) সার্ব্বত্রিক, অব্যাহত নিরপেক্ষ অথবা মুক্ত জ্ঞান প্রচার।

থরোর জ্ঞানগর্ভ উক্তি উদ্ধৃত করিয়া গান্ধী বলিতেন, "That Government is best which governs the least"। প্রত্যেক গ্রাম হইবে এক একটি ক্ষুদে পল্লী গণতন্ত্র—জীবনের অত্যাবশ্যক বস্তুর উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে স্বাবলম্বী, কিন্তু অপর সকল বিষয়ে একে অন্যের অন্তরঙ্গ সহযোগী। তাহা হইবে রাষ্ট্রের একক। এই ছিল গান্ধীর স্বরাজের কল্পনা। ইহাকে রাজসত্তার ব্যাপকতম বিভাজন বলা যাইতে পারে। আর এরূপ স্বরাজের আধার স্বভাবতঃই অহিংসা। স্বরাজ্য-শাস্ত্রের এক জায়গায় বিনোবা বলিয়াছেন :

"জনসাধারণ যদি নিজ শক্তিবলে এরূপ ব্যাপক রাজকরণ চালাতে চায় তো তা অহিংসা বিনা সম্ভব নয়। কারণ হিংসা জনসাধারণের শক্তি নয়।"

বলিয়াছি, বিনোবা গান্ধীর স্বরাজ্যের কল্পনাকে শাস্ত্রের রূপ দিয়াছেন। তবুও বিনোবার মৌলিকত্ব আছে। বিনোবার বিচার ও চিন্তা আর গান্ধীর বিচার এবং চিন্তা অভিন্ন। তাই বিনোবার হাতে গান্ধীর স্বরাজ্যের কল্পনায় এমন দিব্য প্রকাশ।

স্বরাজ্য-শাস্ত্র আকারে ক্ষুদ্র, কিন্তু প্রকারে বড়। বিচার-গৌরবে অতি সমৃদ্ধ। জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বরাজ্য-শাস্ত্র বলিয়া ইহা চিরকাল আদৃত হইবে। অথবা বলিব কি, ইহার জুড়ি নাই। কারণ জনগণের সত্যিকার বন্ধনমুক্তির পথ আর কোন স্বরাজ্য-শাস্ত্র এমনভাবে দেখায় নাই। দেখায় নাই—তার কারণ সে সম্পদ আর কোন দেশের ছিল না। দুনিয়া চিরকাল জড় শক্তিতেই বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে। ভারতীয় সাধনায় আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ হইয়াছে। আর গান্ধী কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ দ্বারা অহিংসার শক্তি—সত্যাগ্রহের অস্ত্র—দুনিয়ার সামনে প্রকটিত করিয়াছেন।

ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহীদের খুব বেশী দিন জেলে থাকিতে হয় নাই। বিনোবাও মুক্তি পাইলেন। ভারতের সহিত মিটমাটের জন্য ক্রিপস সাহেব আসিলেন। কিন্তু ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে গান্ধী স্পষ্ট দেখিতেছিলেন স্বাধীনতা ছাড়া ভারতের কল্যাণ নাই। তিনি দেখিতেছিলেন, যুদ্ধের ফলে জাতি আত্ম-সম্মান খোয়াইতেছে। উপলব্ধি করিতেছিলেন, জাতির নৈতিক

অধঃপতন হইতেছে। বেদনা পুটপাকের মত তাঁহার অন্তরে ফুটিতেছিল। অহিংসা যদি এই অধোগতি রোধ করিতে না পারিল তবে আর সে অহিংসার মূল্য কি? হিংসার তাণ্ডবের বিরুদ্ধে যদি তাহা দাঁড়াইতে অসমর্থ তবে তো তাহা পঙ্গু! অনাচার চলিতে থাকিবে, আর অহিংসার পূজারী নিশ্চেষ্টভাবে তাহা দেখিতে থাকিবেন ইহাও কি সম্ভব? চৌরীচুরার হিংসা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল বলিয়া বারদৌলী সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখিয়াছিলেন। হিংসা দেখা দিতে পারে এই ভয়ে এখনও কি নিষ্ক্রিয় থাকিবেন? গান্ধীর মনে এরূপ বিচার আলোড়ন চলিতেছিল। স্থির করিলেন, 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' এই পণ করিয়া সংগ্রাম আরম্ভ করিবেন। উহার আনুষঙ্গিকরূপে জীবনপণ করিয়া উপবাসের কথাও তাঁহার মনে উকিঝুঁকি মারিতেছিল। একটি লোকের বিচার-শক্তিতে গান্ধীর গভীর প্রত্যয়। তিনি বিনোবা। গান্ধী বিনোবাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বিনোবা আসিলেন। নিজ চিন্তাধারা বিনোবার গোচর করিয়া গান্ধী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হিংসার প্রতিকারার্থে অহিংসক ব্যক্তি উপবাসে আত্মবলিদান করিতে পারে কিনা।" মহাদেবভাই প্রভৃতি উৎকণ্ঠ হইয়া বিনোবার উত্তরের অপেক্ষা করিতেছিলেন। বিনোবা নির্বিকার চিত্তে বলিলেন:

—এরূপ পরিস্থিতিতে অহিংসক লোকের আত্মবলিদান করা চলে। তা অহিংসাসম্মত।

গান্ধী—আরও বিচার করে দেখতে চাও ত দু'চার দিন সময় দিচ্ছি। চিন্তা করে পাকা রায় দেবে।

বিনোবা—এখানে ফের ভেবে দেখার আর কি আছে? যা বলেছি পুরোপুরি বিচার করে বলেছি।—এই কথা বলিয়া যে নিশ্চিত মনোভাব লইয়া তিনি আসিয়াছিলেন সেই মনোভাব লইয়াই পৌনারে ফিরিয়া গেলেন।

১৯৪২ সন, আগষ্ট মাস। বোম্বাইয়ে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন। ইংরেজকে বলা হইল, শাসন-ক্ষমতা পরিহার কর, ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাও। সরকার পক্ষ হইতে সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা জবাব আসিল। নেতারা গ্রেপ্তার হইলেন। বিনোবার সহ-কর্মীরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহারা কি করিবেন। বিনোবা তাঁহাদিগকে বলিলেন:

"যেখানে যাবে বলবে আজ থেকে আমরা রামনামের মত স্বাধীন—স্বতন্ত্র।"

অবিলম্বে বিনোবা গ্রেপ্তার হইলেন। ওয়ার্ধার অপর সকল সংস্থা অক্ষত রহিল। বিনোবার পরমধাম পৌনার বেআইনী ঘোষিত হইল। সুদূর ভেলোর জেলে তাঁহাকে বন্দী করা হইল।

বাহিরে আত্মীয়-স্বজনদের কাছে পত্রলেখার প্রশ্ন উপস্থিত হইল। বিনোবা গান্ধীকে পত্র লিখিবেন। কারা-কর্তৃপক্ষ বলিলেন তাহা হইতে পারে না। গান্ধী রক্তের সম্পর্কে বিনোবার আত্মীয় নহেন।

বিনোবা সরকারকে বলিলেন: গান্ধীর চেয়ে অধিকতর নিকট-সম্পর্কীয় আমার কেউ নেই। তাঁকে পত্র লিখতে পাচ্ছি না। কাউকেই লিখব না।

জেলে তিন বছর ছিলেন। কাহাকেও পত্র লেখেন নাই।

জেলে তিনি বিবিধ ভাষায় ও লিপির চর্চা সুরু করিলেন। এবং শাস্ত্রশুদ্ধ এক নূতন লিপি তৈরি করিলেন। এই লিপি উদ্ভাবনে তাঁহার দৃষ্টি ছিল শিক্ষকের দৃষ্টি, সংস্কারকের দৃষ্টি। টাইপ-রাইটার ও ছাপাখানায় যাহাতে সহজে ব্যবহার করা যায় সে দিকেও লক্ষ্য ছিল। তিনটি পরীক্ষা তিনি এই নব লিপির জন্য ধার্য করিয়াছিলেন—সহজে লেখা যায় কিনা, অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত এবং অধিকতর ধ্বনি অনুযায়ী কিনা। এই তিন পরীক্ষায় তাঁহার লিপি যখন উত্তীর্ণ হইল তখন তিনি পত্রাদিতে এই লিপি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন আর ছাপার কাজেও ব্যবহার করিতে থাকেন। কিন্তু লোকে তাহা এখনই গ্রহণ করুক এই আগ্রহ তাঁহার নাই। তিনি বলেন:

"আমার লিপির বিপ্লবী শক্তির উপর আমার অধিক বিশ্বাস। এ লিপি শাস্ত্রশুদ্ধ এ কথা যাঁদের মনে হবে তাঁরা এটি ব্যবহার করবেন।"

জেলে বিনোবা মাসকয়েক পূর্ণ মৌনব্রত পালন করেন। কোন বাছ-বিচার না করিয়া সর্বপ্রকার ও সর্বশ্রেণীর কয়েদীদের সহিত তিনি জেলে মেলামেশা করিতেন। কোন কম্যুনিষ্ট বন্ধু তাঁহাকে একদিন বলেন, "আপনি নব নব বিষয় অধ্যয়ন করেন না কেন?" তদুত্তরে বিনোবা বলেন, "ভাল, আপনিই বাছা বাছা বই পড়ে শোনাবেন।" বন্ধু পড়িতেন। বিনোবা সুতা কাটিতে কাটিতে পাঠ শুনিতেন। এ ভাবে প্রতিদিন এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা অধ্যয়ন ও শ্রবণ চলিত। বিনোবা বলিয়া থাকেন:

বোধগম্য নয়, বল। 'আমার' বুদ্ধিতে ধরা পড়ছে না এ কথা বলো না। তুমি বুদ্ধিবাদী কি মন্দ বুদ্ধিবাদী।

নব বিচারের জন্য তাঁহার মন সদা উন্মুক্ত। গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের গণ্ডীতে তাঁহার মন আবদ্ধ নয়।

ভেলোর জেল হইতে বিনোবা সিউনী জেলে স্থানান্তরিত হইলেন। জেলে উপনিষদ্ ও গীতার চর্চা চলিতেছিল। সান্ধ্য প্রার্থনায় গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ আঠার শ্লোকের আবৃত্তি করা হইত। বন্ধুদের কাছে ঐ অষ্টাদশ শ্লোকের উপর বিনোবা আঠারটি প্রবচন দেন। ত্রিশ বছরের নিদিধ্যাসনের ফলে যে অর্থ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইয়াছিলেন, তাহা তিনি ঐ প্রবচনসমূহে বন্ধুদের সমক্ষে উপস্থিত করেন। 'স্থিতপ্রজ্ঞ-দর্শনে'র নিবেদনে বিনোবা বলিয়াছেন:

"এ ব্যাখ্যানগুলি উনিশ শ' চুয়াল্লিশ সালের শীতকালে সিউনী জেলে কতিপয় বন্ধুর কাছে দেওয়া হয়। ভারতের সর্বত্র হাজারো সত্যাগ্রহী সান্ধ্য প্রার্থনায় এই লক্ষণসমূহ ভক্তিভাবে নিত্য পাঠ করে থাকেন। তাঁদের ব্যবহারের জন্য ব্যাখ্যানগুলি পুস্তকাকারে উপস্থিত করা যাচ্ছে। শাস্ত্রার্থের বোধসৌকর্য্যার্থে ওতে আবশ্যক পরিবর্তনও করা হয়েছে।

"স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণসমূহে এক সমগ্র দর্শন নিহিত। তা খুলে ধরার প্রযত্ন এখানে করা হয়েছে। সম্ভবতঃ প্রথমবার পাঠে এর কোন কোন অংশ হৃদয়ঙ্গম হবে না। কিন্তু বারবার পাঠ করে চিন্তা করতে থাকলে এবং যতটা বোঝা গিয়েছে তদনুসারে আচরণ করতে থাকলে ধীরে ধীরে অনুভব দ্বারা সবটা তাৎপর্য্য স্পষ্ট হয়ে যাবে।

ত্রিশ বছরের নিদিধ্যাসনে যে অর্থ নিশ্চিত বলে বুঝেছি তা এখানে ধরেছি। এদিক-ওদিক ত কতকটা হবেই। তবে তা থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে সবকিছু ঈশ্বরার্পণ করে ছুটি নেওয়া। এ দৃষ্টি থেকে এটি প্রকাশ করা যাচ্ছে।"

পূর্ব্ব-ভূমিকা—'সাংখ্যবুদ্ধি ও যোগবুদ্ধি' শীর্ষক অনুচ্ছেদে বিনোবা বলিয়াছেন :

"মানুষের তত্ত্বজ্ঞান তার বুদ্ধিতে গুপ্ত থাকবে। প্রকট হবে তার আচরণ। আর সে আচরণ থেকেই তার তত্ত্বজ্ঞানের পরিমাপ সংসার পাবে আর সে নিজেও পাবে। আচরণ ও জ্ঞানে ব্যবধান রইলই বা, কিন্তু বিরোধ যেন অবশ্যই না থাকে। আর ঐ ব্যবধানও সতত কমাতে হবে। এ কাজ হচ্ছে যোগবুদ্ধির।"

ঐ বারকার জেলে বিনোবা আর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন—ঈশাবাস্য-বৃত্তি। বিনোবার নিজ কথায় ঈশাবাস্য-বৃত্তির রচনা-বৃত্তান্ত এই :

"ঈশাবাস্যের উপর কিছু লেখার বাসনা অনেক দিন থেকে ছিল। যেদিন হাসপাতালে যখন গান্ধীজীকে দেখতে যাই তখন তিনি এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আর আমি রাজীও হয়েছিলাম। কিন্তু তীব্র কর্ম্মযোগের সে যুগে ততটা 'নিরাস্ত' (অবসর) পাওয়া সম্ভব ছিল না। পরে ত্রিবাঙ্কুরের হরিজন-পরিক্রমা অন্তে গান্ধীজী আমাকে আদেশই করলেন—'নিজ মনোমত লেখা যখন লিখতে পারে লিখবে, এখন ত আমার কাজের মত ছোটখাটো একটি টিপ্পনী অন্ততঃ লিখে দাও।' তদনুসারে ছোট একটি টিপ্পনী তাঁকে আমি লিখে দিই। তাও আজ দশ-বার বছর আগেকার কথা। ঐ টিপ্পনী প্রকাশ করার কথা ছিল না। কিন্তু এবার আমি যখন জেলে তখন বাইরে বন্ধুরা ওটা প্রকাশ করে ফেলেন আর তার এক প্রতি অকস্মাৎ জেলে এসে যায়। তখন আমার হুঁস হ'ল আর দু' মাস ও-বিষয় চিন্তা করে এক ছোট ভাষ্য—যাকে আমি বৃত্তি* নাম দিয়েছি, লিখে ফেলি। তা-ই পূর্ব্ববর্ত্তী টিপ্পনীর সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণরূপে প্রকাশিত হচ্ছে।

পূর্ব্বাচার্য্যগণ যে ভাষ্য করেছেন তা থেকে এতে অনেক স্থলে ব্যবধান দেখা যাবে। কিন্তু বিরোধ বলে তাতে কিছু নেই। বচন (প্রমাণীভূত বাক্য) অর্থের ভারে পীড়িত হয় না। আর বিচার (চিন্তা) যদি উত্তরোত্তর অগ্রসর হতে থাকে ত তা পূর্ব্বাচার্য্যগণের সার্থকতারই সাক্ষ্য। ভিন্ন রকমের কিছু বলার যদি না থাকে তবে লেখার আর আবশ্যকতা কোথায়?

ঈশাবাস্য এক পূর্ণ উপনিষদ। তার মানে পারমার্থিক জীবনের এক পরিপূর্ণ নক্সা সংক্ষেপে তাতে আঁকা হয়েছে। বেদের তা সার আর গীতার তা বীজ…"

২

যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিতেছিল। সরকার সত্যাগ্রহীদের মুক্তি দিলেন। গান্ধীও ছাড়া পাইলেন।

জেল হইতে বিনোবা এক নূতন অভিজ্ঞতা লইয়া বাহির হইলেন। সেই অভিজ্ঞতা এই যে, কোন বিশেষ দল বা সংস্থায় থাকিয়া তাঁহার কাজ চলিবে না। তাঁহার নিজ কথায়ই তাহা বলা যাইতেছে :

"আমি নির্জ্জনতাপ্রিয় লোক। ভগবানের কৃপায় আমার সঙ্গে জনকয়েক সাথী থাকেন তাঁহারা আমাকে সহায়তা করেন। তবুও আমি নির্জ্জনতাপ্রিয়ই বটে। কিন্তু জেলে ত সমাজেই থাকতে হয়েছে আর তা থেকে অনেক কিছু চিন্তা করে দেখার সুযোগও এসেছে। সেখানে নানা প্রকারের লোকের সংস্পর্শে এসেছি। কংগ্রেসের লোকের সঙ্গে মিলেছি, সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে মিলেছি, ফরোয়ার্ড ব্লক আদি লোকের সঙ্গেও মেলামেশা করেছি। দেখতে পেয়েছি এমন কোন বিশেষ সংস্থা নেই—যাতে অপর সংস্থা থেকে অধিকতর সততা বিদ্যমান। যে সততা গান্ধীপন্থীদের মধ্যে দেখা যায়, তা অন্যত্রও দৃষ্ট হয়। সততা কোন দলবিশেষের একচেটে নয় একথা যখন বুঝলাম—তখন স্থির করলাম যে, কোন বিশেষ দলে থেকে আমার কাজ চলবে না। সকলের নিকট থেকে আলাদা অবস্থান করে সততার সেবা আমায় করতে হবে। জেল হতে বেরিয়ে আমার মনের কথা গান্ধীজীকে বলি। তার উত্তরে তিনি বলেন :

"তোমার অভিপ্রায় আমি বুঝে নিয়েছি। তুমি সেবা করতে চাও, অধিকার চাও না। তা ঠিকই।—এর পরে যে যে সংস্থায় আমি রইলাম তা থেকে ইস্তফা দিয়ে আমি পৃথক হয়ে যাই। ও-সব সংস্থা আমার প্রাণতুল্য ছিল। তাদের উদ্দেশ্য ও কার্য্যক্রমকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা আমি বহু বৎসর ধরে করে এসেছি। তা থেকে বিযুক্ত হওয়ার সময় আমার অবশ্যই লেগেছিল। কিন্তু আনন্দও অনুভব করেছিলাম। কারণ ওসব সংস্থার সহায়তা করার সঙ্কল্প ত ছিলই। কিন্তু অহিংসার বিকাশের জন্য মুক্ত থাকা দরকার—মনে ভেবেছিলাম।"

অন্য এক জায়গায় বিনোবা বলিয়াছেন :

"নিজের জেলের অভিজ্ঞতা থেকে এটা আমি পেয়েছি। নর্ম্মদা ও গঙ্গার সব পাথরই সমান। নর্ম্মদার পাথরকে শঙ্কর বলতে হয়

* ভাষ্য ও বৃত্তি—আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক দেবভাষায় লিখিত টিপ্পনীকে ভাষ্য বলা হয়। আর সাধুসন্তেরা যে লৌকিক ভাষায় ঐ বিচার-প্রবাহকে লোকের কাছে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন তাহাকে বৃত্তি বলা যাইতে পারে। 'বৃত্তি' 'আচার্য্য' বিনোবা প্রথমে সংস্কৃতে লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু 'সন্ত' বিনোবা তাহাকে সংশোধন করেন আর লোক-ভাষায় উহা লেখাইয়া লন। খুব সম্ভব তাই বিনোবা এই রচনাকে 'ভাষ্য' না বলিয়া 'বৃত্তি' বলিয়াছেন।

বলুন, কিন্তু বললেই কিছু হয় না। এ কথা যখন মনে হ'ল তখন বাইরে এসে স্থির করলাম কোন সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক রাখব না। তার ফলে এক অদ্ভুত শক্তি আমি নিজের ভিতরে অনুভব করেছি। সংস্থায় থাকতাম তো কোন্ কোণে পড়ে থাকতাম। হোক না কেন তা আশ্রম। আজ আমি নিজেকে দুনিয়ার মধ্যে পেয়েছি।*

বিনোবা জেলে আর একখানি বইয়ের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। তাহা হইতেছে 'গীতাঈ-শব্দার্থ কোশ'। গীতাঈ মহারাষ্ট্রের অতি আদরের জিনিস। সংস্কৃত-অভিজ্ঞ অনেক লোকেও গীতা পাঠ না করিয়া গীতাঈ পাঠ করিয়া থাকেন। সংস্কৃত যাঁরা জানেন না তাঁরা তো পড়েনই। বহু লোকে গীতাঈ শব্দার্থ কোশ চাহিতে থাকেন। তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য বিনোবা গীতাঈ শব্দার্থ কোশ প্রণয়ন করেন। কিন্তু ইহা কোশ মাত্র নহে। ইহা ভাষ্যও বটে। বিনোবার কথা উদ্ধৃত করাই সমীচীন।

"গীতাঈর কোশ যাঁরা চেয়েছিলেন তাঁদের প্রত্যাশা থেকে এ কোশের স্বরূপ খানিকটা ভিন্ন। গীতাঈর উপর এ এক বিস্তৃত ভাষ্যও বটে।···আমার বিশ্বাস আমাদের ভাষায় এরূপ কোশ বড় একটা নেই। এ বিবেচনা থেকে নমুনা স্বরূপ একে পূর্ণাঙ্গ করার চেষ্টা করেছি।

গীতাঈ রচনাকালে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, এ কোশ রচনায় তার সম্পূর্ণ বিপরীত রীতি অনুসৃত হয়েছে। গীতাঈয়ে কোথাও 'আমি' না আসে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি ছিল। এখানে সবই 'আমি'···অর্থাৎ গীতা-চিন্তনের আমার যা পদ্ধতি তা এ কোশে স্পষ্ট দেখা যাবে। এ রীতিতে সকলে চিন্তা করুক একথা কখনও আমি বলি না। কারণ এ রীতিতে আমি নিজেই বাঁধা পড়তে রাজী নই। কাল আমি অন্যরূপ চিন্তা করতে পারি। 'গীতাঈ' হচ্ছে শব্দ। এখন তাতে আমার পরিবর্তন করার নেই। কিন্তু এ হচ্ছে অর্থ-চিন্তন। এখানে আমার ভাবনায় উত্তরোত্তর পরিবর্তন ঘটবে···"

কোশ রচনা করিয়া চারি বৎসর ফেলিয়া রাখেন। রচনা শেষ হয় ১৯৪৫-৪৬ সনে। বিনোবা ও শিবাজী (বিনোর কনিষ্ঠ ভ্রাতা) দুই জনে মিলিয়া দুই দফায় সাত মাস ও পাঁচ মাস, একুনে বার মাস খাটিয়া কোশের রচনা সম্পূর্ণ করেন। ছাপা হয় ১৯৫০ সনে। তখন আবার পাণ্ডুলিপি সংশোধন করা হয়।

---

* গীতা-প্রবচনে এরূপ আছে :

ভূতে দয়া হেতু তাঁহার (সাধু পুরুষের) দেহ সার্বজনিক হইয়া যায়। মৌমাছিরা গুড় ঢাকিয়া ফেলে, তদ্রূপ সারা দুনিয়া সাধুকে ভালবাসার আবরণে আচ্ছাদিত করে। সাধু ব্যক্তিতে প্রেমের এতটা 'প্রকর্ষ' (উত্তম বিকাশ) হয় যে সমস্ত দুনিয়া তাঁহাদের ভালবাসে। সাধু নিজে আসক্তি ছাড়েন, কিন্তু সমস্ত জগতের আসক্তি তাঁহাতে আসিয়া জড়ো হয়। সমস্ত জগৎ তাঁহাদের ভাবনা ভাবিতে থাকে। কিন্তু এই আসক্তিও সাধুব্যক্তির দূর করা চাই। সংসারের এই যে প্রেম, এই যে মহান্ ফল তাহা হইতে আত্মাকে পৃথক করা চাই···গীতা প্রবচন, ১৯৩ পৃষ্ঠা।

গান্ধী যখন নোয়াখালীতে পদব্রজে পরিক্রমা করিতেছিলেন (১৯৪৬-৪৭) তখন 'হরিজন' সম্পাদনার ভার কিশোরলাল ভাই, কাকা কালেলকর ও বিনোবা এই তিন জনের উপর পড়ে।

৩

একটু পিছনে ফিরিয়া যাই। ১৯৪৫ সনে কারামুক্তির পরে বিনোবা নাগপুর হইতে ওয়ার্ধায় ফিরিতেছিলেন। পথে দেখিতে পাইলেন লোকে যেখানে সেখানে মলত্যাগ করিতেছে। ব্যাপারটা নূতন নয় আর বিনোবা যে তাহা ঐ প্রথম দেখিলেন তেমনও নয়। লোকদের ঐ কদর্য্য অভ্যাস দূর করার চেষ্টা ওয়ার্ধায় বহুদিন হইতে চলিতেও ছিল। বিনোবা এক নূতন চেষ্টার কথা ভাবিলেন। পৌনারে ফিরিয়া এ কাজে তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। নিয়মিত ভাবে নিত্য সুরগ্রামে মলমূত্র অপসারণ করিতে লাগিলেন। সুরগাঁও পৌনার হইতে দেড় মাইল। লোকে জিজ্ঞাসা করিত—কত দিন আপনার এ কাজ চলবে? বিনোবা বলিতেন :

"কুড়ি বছর। যে আজ শিশু, কুড়ি বছর পরে সে জোয়ান হবে। ততদিন এ কাজ করে যেতে হবে আমি ধরে নিয়েছি।"

কুড়ি মাস পরে এ কাজে ছেদ পড়িল। প্রথমে পিতার মৃত্যু তার পরে গান্ধীর মৃত্যু। ব্যাপকক্ষেত্রে তাঁহার ডাক পড়িল।

বিনোবার পিতা বরোদায় থাকিতেন। তিনি অসুস্থ হইলেন। শিবাজী তাঁহাকে ধুলিয়াতে নিজের কাছে লইয়া গেলেন। অসুখ বাড়িয়া গেল। বিনোবা পিতৃসকাশে গেলেন। ১৯৪৭ সনের শারদীয়া পূর্ণিমা তিথিতে নরহরপন্থের দেহাবসান হইল। মাতার মুখাগ্নি বিনোবা করেন নাই। পিতার মুখাগ্নি করিলেন। গীতা পাঠ করিলেন।

নিজ শরীর অসুস্থ বিধায় ১৯৪৮ সনের জানুয়ারী অবধি বিনোবা ধুলিয়ায় থাকিলেন। নিত্য বহু লোক তাঁহার কাছে আসিত।

এ সময়ে গান্ধী চলিয়া গেলেন। জনগণের বান্ধব চিরবিদায় লইলেন। ওয়ার্ধা শোকমগ্ন হইল। বিনোবা শান্ত, গম্ভীর, ধীর স্থির। তাঁহারই ভাষায় তাঁহার তখনকার মনোভাবের কথা বলা যাইতেছে :

"বাপুর চলে যাওয়ার খবর যখন পেলাম, তখন দু'তিন দিন আমার চিত্ত শান্ত ছিল। আমার প্রকৃতি কতকটা এই যে কোন কিছুর প্রভাব আমার উপর আদৌ হয় না। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। কিন্তু দু'তিন দিন বাদে প্রভাব বিস্তার হতে লাগল আর চিত্তে ব্যাকুলতা দেখা দিল। সে সময় প্রতিদিন গোপুরীতে প্রার্থনার পরে বলতে হ'ত। সেবাগ্রাম আশ্রমেও তিন দিন বলেছিলাম। প্রার্থনা স্থানে প্রথম যে দিন বলতে সুরু করি, সেদিন আমার চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে। তা শুনে কোন বন্ধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'বিনোবাও কেঁদেছে?' আমি বলে-ছিলাম, 'হাঁ ভাই, ভগবান আমাকেও হৃদয় দিয়েছেন। তার জন্যে

ভগবানের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।' কিন্তু বাপুর মৃত্যু হয়েছে বলে আমি কাঁদি নি। কারণ আমি জানি মহাপুরুষদের যেমন হয়ে থাকে তাঁর ঠিক তেমনি হয়েছে। তাই তা ছিল আমার কাছে আনন্দের বিষয়। আমাদের ভাইদের এ জিঘাংসু মনোবৃত্তি প্রতিরোধ করতে পারি নি এ ছিল আমার দুঃখের হেতু। এমন কি আর-এস-এস দলভুক্ত বলে পৌনার থেকে পর্য্যন্ত জনকয়েক গ্রেপ্তার হয়েছে। তারা দোষী এ কথা আমি বলি না। সে যা হোক, ভাবার্থ এই যে, যে গাঁয়ে আমি দশ বছর থেকেছি তাদের হৃদয়ও আমি স্পর্শ করতে পারি নি। এটাই হচ্ছে, আমার বড় দুঃখ।"

গান্ধী তাঁর সহকর্ম্মী ও সহচরদের নিকট থেকে এমনটাই প্রত্যাশা করিতেন। তার প্রমাণ এই :

"আমার সঙ্গে তোমরা যদি উপবাস কর তো তাতে আমার শক্তি বাড়বে না। উল্টো, তোমাদের সকলের কথা আমার ভাবতে হবে। তাই তোমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে ভাল করে খেয়ে দেয়ে আমার সঙ্গে কাজ করে যাওয়া। এ উপবাসে যদি আমার দেহাবসান ঘটে তো সেদিন তোমাদের শোক করা উচিত হবে না। পরন্তু, আশ্রমজীবনে যদি মিঠাই-মণ্ডা খাওয়া চলে তো সেদিন মিঠাইমণ্ডা তৈরি করে খাবে···" (বাপু দর্শন, ২৪ নং পৃ. ৩৩।)

প্রকৃত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য বিনোবা গুরুর তিরোধানে কেনই বা কাঁদিবেন।

গুরু মরলো চেলা কাঁদলো।
দু'য়ের সাধন ব্যর্থ হলো।

এরূপ কেন হইবে? বিনোবা কি গান্ধীর তেমন চেলা!

মনে পড়ে একটি আখ্যায়িকা। দেহত্যাগের সময় উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন :

উদ্ধব, আমি চললাম।

উদ্ধব—আমায় সঙ্গে নেবেন না? এক সঙ্গেই দু'জনে যাব।

কৃষ্ণ—তা আমার ভাল লাগছে না। সূর্য্য নিজ তেজ অগ্নিতে রেখে যায়। আমার তেজ তেমনি তোমাতে রেখে যাচ্ছি।

এরূপে ভগবান উত্তরাধিকারীর ব্যবস্থা করিলেন আর উদ্ধবকে জ্ঞান দিয়া রওনা হইলেন। পরে প্রবাসে উদ্ধব মৈত্রেয় ঋষির কাছে জানিলেন যে, ভগবান নিজধামে চলিয়া গিয়াছেন। উদ্ধবের মনে ঐ সংবাদের কোন প্রতিক্রিয়া হইল না। কিছুই যেন হয় নাই।*

গান্ধী বিনোবাতে নিজ তেজ রাখিয়া গিয়াছেন।

---

* গীতা প্রবচন নং ৬২, (দ্বিতীয় সংস্করণ) পৃঃ ১৫৭

শেষ বর্ষায়

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

ঊর্মি-উপলে আলাপন চলে নীল সিন্ধুর তীরে,
কল-কল্লোলে অস্কুলের খতালি;
গগনে গগনে গুরু গরজনে মেঘদল আসে ঘিরে,
শেষ বর্ষণে বিদায়ের করতালি।
গভীর নিতলে স্রোতে কাঁপে শৈবাল,
বেলাভূমে হানে তরঙ্গ উত্তাল,
নীলাব্জ ফোটে সাগরের বুকে বর্ষার অনুরাগে,
শুক্তির বুকে মুক্তার আশা জাগে।
স্তব্ধ উদার শ্যাম দেওদার আকাশে তুলিল শির
শাখায় পাতায় আনন্দ উচ্ছাস,
গতি-চঞ্চল বর্ষা উচ্ছল মেঘদল সুনিবিড়
চলে তৃষাহরা মরুভূর সন্ত্রাস।
মন নহে মোর সঙ্গী মেঘের,
শক্তি লভিল তীব্র বেগের,
আগে চলে ছুটে দিগ-দিগন্তে মেঘে পশ্চাতে ফেলি,
মনে লাগে শেষ বর্ষার জলকেলি।

ভরা বাদরে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ঝিম্‌ঝিম্‌, ঝিম্‌ঝিম্‌ বারিধারা ঝরে।
বাদল মেঘের ছায়া ঘরের ভিতরে;
গুরু গুরু দেয়া ডাকে; খোলা বারান্দায়
বসে বসে হেরিতেছি, খরবেগে ধায়
'জলঙ্গী'র জলধারা; শূন্য খেয়াঘাট;
জনশূন্য ওপারের জলময় মাঠ;
বিদ্যুৎ চমকে; পথ দুর্গম, পিচ্ছিল;
খাল দিয়ে জল চলে কল্ কল্ কল্।
বর্ষণমুখর বনে পাখীরা নিশ্চুপ;
কোন শব্দ নাই—শুধু ঝুপ ঝুপ ঝুপ
বৃষ্টি পড়ে অবিশ্রান্ত। কোন কাজ নাই;
মনের গহনে বাজে করুণ সানাই!
হৃদয়-মন্দির শূন্য! কোথায় সে জন
যার লাগি আকাশের ঝুরিছে নয়ন?

কাকের বাসা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

পুরনো ভাড়াটে বাড়ী। পেছনের মহলটা ঝুলে পড়েছে, সামনের অংশে দশ বছর থেকে একটি কেরানী পরিবার বসবাস করছে। নীচে-উপরে তিনখানি ঘর নিয়ে ছোট সংসারটি সুখেই ছিল এত-দিন, বুঝতে পারে নি যুদ্ধের পরে বাড়ী ও ভাড়ার সমস্যা কতখানি শোচনীয় হয়ে উঠেছে।

সহসা বাড়ীটি বিক্রী হয়ে গেল, কিনলে এক কারবারী। বাড়ী কিনেই নূতন মালিক জানালে, বাড়ীটা সে ভেঙে আবার তৈরি করতে চায়। সুতরাং বাড়ী ছাড়ো। সঙ্গে সঙ্গে নিস্তরঙ্গ জীবন-প্রবাহে চাঞ্চল্য এল ; ভাড়াটের চোখে-মুখে দেখা দিল করুণ এক অসহায় ভাব ; কতক উৎকণ্ঠা, বেশীটা যেন অভিমান। নিজের বাড়ী হলে অন্ততঃ এতটা স্পর্দ্ধা কেউ সইত না।

স্বামী স্বভাবতঃ স্বল্পবাক্, দুশ্চিন্তায় তিনি আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন ; দুরন্ত অভিমানে স্ত্রী হয়ে উঠল মুখর।

'হ্যাগো, অমন চুপ করে গেলে কেন বল ত ?' রমা বললে, 'হুট বলতে উঠানো কি এতই সহজ ! ঐ ত নরেনদের আজ দু' বছর থেকে মোকদ্দমা চলছে, পারলে উঠাতে ?'

বিরস হেসে স্বামী জবাব দেন, 'কিন্তু মোকদ্দমা ত সবার ধাতে সয় না রমা। আর তা ছাড়া বাড়ী যখন নিজের নয়, 'উঠতে একদিন হ'তই।'

রমা সহসা ক্ষেপে ওঠে।—'তার চেয়ে সোজা কথা বল না কেন, ভয় পাও। অমন মেনি-মুখো পুরুষ-মানুষ না হলে গ্রাজুয়েট হয়ে তোমার এই দশা হয় ? একটুও যদি সৎসাহস থাকে তোমার !'

রমা যুদ্ধের জন্য বদ্ধপরিকর। তাকে অযথা উত্তেজিত না করে স্মিতহাস্যে ভুজঙ্গবাবু আশ্বাস দিলেন, 'বেশ ত, বাড়ীওয়ালাকে না হয় একবার খোশামোদ করেই দেখব, যদি আমার কথা রাখে।'

কথাটা তখনকার মত সেখানেই চাপা পড়ে গেল। দিন দশেক পরে নূতন মালিক ভাড়া নিতে এল। বাইরের ঘরে বসিয়ে ভুজঙ্গ-বাবু তার কাছে নিজের আর্জি পেশ করলেন। আড়াল থেকে রমা চুড়ির আওয়াজ তুলে স্বামীকে উৎসাহ যোগাতে লাগল।

বাড়ীওয়ালা উঠে গেলেই রমা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে, কি বুঝলে ? লোকটি ভদ্র বলেই মনে হ'ল, তাই না ?

ভুজঙ্গবাবু জবাব দিলেন, 'তাই ত মনে হয়, তবে ঝেড়ে কাশলে না কিছু।'

স্বামীর দ্বিধাজড়িত বাক্যে রমার আবার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। বললে, 'তোমার ঐ এক কথা, 'ঝেড়ে কাশলে না কিছু !' লোকে আবার কেমন করে বলে ? তুমি বাপু যাই বুঝে থাক, বাড়ী আমি ছাড়ব না।···পাড়ার এত আলাপ-পরিচয়, দোরের গোড়ায় বাজার হাট, কত সুবিধা। এ বাড়ী ছাড়লে আমি হাঁপিয়েই মরে যাব।'

রমা চোখে চাপা দিতে সবে আঁচলের খুঁটটা টেনে ধরেছে, আশঙ্কিত হয়ে ভুজঙ্গবাবু সেখানেই ছেদ টানলেন, 'আচ্ছা-হা, দেখই না দু'চার দিন, আপনিই সব বোঝা যাবে।···না হয় আমিই কাল দেখা করে বুঝিয়ে আসব।'

ভরসা পেয়ে রমার মুখে আবার হাসি ফুটল। 'এতও ভয় দেখাতে পার তুমি।···সত্যি বলছি, আমার সঙ্গে এমন ইয়ার্কি করবে না।'

অগত্যা পরদিন ভদ্রলোককে বাড়ীওয়ালার কাছে যেতেই হ'ল। ফিরে এসে জানালেন, যাক, রাজী করানো গেছে। বললে, "আপনারা যেমন আছেন থাকুন। আগে পেছনের মহলটাই তৈরী হোক, তারপর, আপনাদের সেদিকে সরিয়ে সামনে হাত দেব।"

কিন্তু ভুজঙ্গবাবু যে সেই অবসরে পাড়ায় পাড়ায় বাড়ী খোঁজ করে ফিরেছেন, সে কথাটা তখনকার মত চেপে গেলেন (যে-কোন অভিজ্ঞ স্বামীই তাই করত)।···যেটুকু অবসর পাওয়া যায়, তাই লাভ।

দিনকতক পরেই মজুর-মিস্ত্রী মিলে ওদিকের মহলটা টেনে মাটিতে নামালে, আর তার জায়গায় ভিত খুঁড়ে উঠতে লাগল আর একটি শিশু-ইমারত—যেমন উঠে বৃদ্ধ বটের অস্থি থেকে সবল এক তরুণ বট-বৃক্ষ।

রমার এ এক অভিনব অভিজ্ঞতা। কোন দিন চোখের সামনে বাড়ী তৈরি দেখে নি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে একবার করে চেয়ে দেখে কতদূর উঠল দেয়ালগুলি।

দশ বছরের বড় ছেলেটি স্বামীর সঙ্গে খেয়ে স্কুলে গেছে। আট বছরের মেজ ছেলে বিনু ঘুড়ি উড়াবার চেষ্টায় কাগজে সুতো বেঁধে ছোট বোনের সঙ্গে ছাতে ছুটাছুটি করছে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে রমা এসে বসল দোতলার সামনের বারান্দায়, শীতের রোদ্দুরে চুল এলিয়ে।

নীচে আবর্জ্জনার স্তূপ ; পাঁচ ছয় জন মেয়ে-পুরুষে ঝুড়ি ভর্তি করে তা বাইরে ফেলে আসছে। তারই এক পাশে জায়গা করে বালি-সিমেন্ট মাখছে অন্য দল। মাচানের উপর বুড়ো রাজমিস্ত্রী যোগানদারদের হাঁকছে, তার সুদক্ষ হাত দুটো পরতে পরতে সিমেন্ট দিয়ে ইট গেঁথে চলেছে। দেখতে দেখতে রমার কেমন আমেজ আসে—অলস কল্পনায় রোমন্থন তার মনে : ঐ নীচের আবর্জ্জনার স্তূপ, কত লোকের কত সুখ-দুঃখের স্মৃতি আর ওর তলায় চাপা পড়ে গেছে। আবার নূতন ইমারত উঠছে—পরেও আবার কত লোক আসবে-যাবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। সমস্ত সৃষ্টিই যেন তাই, ভাড়াটে বাড়ীর আনাগোনা জন্মে-জন্মে।

সহসা চিন্তায় বাধা পড়ল। রমা বুঝতেই পারে নি, কতক্ষণ সে তাকিয়ে ঐ বালক-যোগানদারের দিকে।

ছেলেটার নাম ইয়াসিন। মুসলমান বুড়ো রাজমিস্ত্রীর সঙ্গেই সে আসে যায়। বয়স তার বিনুর মতই হবে। দেহের উজ্জ্বল রং ধুলায় চাপা, টানা-টানা চোখের ভুরুরা সাদা হয়ে গেছে, খাটো ইজারের উপর এই শীতেও পরে আছে পাতলা একটা বেনিয়ান। ইয়াসিন একবার করে ইট তুলে রাখে মিস্ত্রীর পায়ের কাছে, আবার কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ায় নূতন আজ্ঞার প্রতীক্ষায়। বেনিয়ানটা নূতন, তারই মায়া : মাঝে মাঝে ধুলো ঝেড়ে নিচ্ছে।

রমা তাকেই দেখছিল নির্নিমেষ চোখে। মাতৃহৃদয়ের নানা কল্পনা এবার তাকে ঘিরেই প্রশ্ন তোলে, কার ছেলে, কোথায় থাকে। বাড়ী ফিরতেই ফিরতেই হয়ত বা ক্লান্তিতে চোখ জড়িয়ে আসে, খাবার অপেক্ষাও বুঝি সয় না।

দুপুরে এক ঘণ্টা খাবার ছুটি। সবাই নিজের নিজের খাবার খাচ্ছে। কেউ রুটি-গুড়, কেউ চাল-ছোলা ভাজা, কেউ-বা শুধু ছোলার শাক আর মূলো কিনে আনে, তাই একটু নুন-লঙ্কা দিয়ে সোনামুখ করে খায়। রমা আড়চোখে দেখলে ইয়াসিন একটা টিনের কৌটো খুলে মোটা মোটা দুখানা বাজরার রুটি বার করলে, সঙ্গে একটি কাঁচা পেঁয়াজ আর নুন। রমার কেমন মায়া হ'ল, আহা, এই খেয়ে এতটুকু ছেলে সেই সন্ধ্যে পর্যন্ত খাটে। সঙ্গে একটু তরকারিও নেই?

রমা ডাকলে, 'এই ইয়াসিন, আয় তরকারি দিচ্ছি।'

ছেলেটি একবার উপরের দিকে চাইলে, তারপর লজ্জা পেয়ে রুটি চিবোতে চিবোতে মাঝপথেই থেমে গেল, কিন্তু উঠল না।

রমা আবার তাগিদ দেয়, 'আয়, নিয়ে যা।'

বুড়ো মিঞা ইয়াসিনের সঙ্কোচ দেখে আদেশ করলে, 'বেটা ইয়াসিন, মাইজী ডাকছেন···শুনে এস।'

ইয়াসিন সসঙ্কোচে সিঁড়ির ধারে এসে দাঁড়ালে। রমা তার হাতে একতাল তরকারি আর দুটো পেয়ারা দিয়ে দূরে সরে গেল তার খাওয়া দেখতে।

ইয়াসিন আনন্দের আতিশয্যে ছুটে গেল বুড়ো মিঞার কাছে। —'চাচা তরকারি নেবে? পিয়ারা?'

'না বেটা, তুমিই খাও।'

কিন্তু তবু, সে তা একা খেতে পারলে না। সমান ভাগ করে নিলে সবার সঙ্গে। তার পর, খাওয়া হলে পেয়ারা দুটোও খেংলে ভাগ করে দিলে সঙ্গীদের। হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে বসে গেল, এতটুকু বিরোধ নেই, নেই ধর্ম্মাধর্ম্মের সূক্ষ্ম ভেদবুদ্ধি। রমার সংস্কারে এ এক বেন অভূতপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা। কিন্তু সবচেয়ে সে আশ্চর্য্য হ'ল অতটুকু ছেলের সুবুদ্ধি দেখে। যার কিছুই নেই, সেই বা এমন নির্লোভ হয় কেমন করে। দুঃখের দহনে মানুষ বুঝি এমনই সুন্দর হয়।—রমার মমতা যেন আশীর্ব্বাদের মত শতধারে বালকের শিরশ্চুম্বন করলে, 'আহা, ভগবান ওর মঙ্গল করুন, দারিদ্র্যের সমস্ত গ্লানি মুছিয়ে দিন ওর ললাট থেকে।'

পরের দিন আবার খাবার ছুটি হ'ল। রমা আজ একটু রাঁধা মাংস আলাদা রেখেছে ইয়াসিনকে দেবে বলে। আলগোছে মাংসটুকু ওর কৌটোয় ঢেলে দিতে রমা জিজ্ঞেস করে,'হাঁরে ইয়াসিন, বাড়ীতে আর কে আছে তোর?'

বুড়ো মিস্ত্রি শুনতে পেয়েছিল। ইয়াসিনের হয়ে সে-ই জবাব দিলে, 'বড় দুর্ভাগা মা···তিন বছর হ'ল মা হারিয়েছে। বাপ থাকে বিদেশে, সেও খোঁজ-খবর নেয় না। দুটো বোন, ছোটটা নিতান্ত শিশু। বড় বোনের এখনো বিয়ে হয় নি, সেই ওদের মানুষ করছে। তাই ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াই, যদি কিছু আয় করতে পারে; তবু ত দুমুঠো খেতে পাবে!'

ইয়াসিনের সে ভাবনা নেই। সে তখন রুটি-মাংস খেয়ে চলেছে, মুখে তৃপ্তির একটি সরল প্রসন্নতা।

রমা একবার অনুসন্ধানী চোখে ছেলেটির মুখের দিকে চাইলে। কার সাদৃশ্য দেখলে সেখানে? একটা পুরনো কথা মনে পড়তেই রমা যেন সহসা চমকে ভেতরে সরে এল।

রমার তিনটি সন্তান। ছোট দুটি হয়েছিল মাতৃসদনে। ছোট ছেলে বিনুকে নিয়ে আজও একটি প্রচ্ছন্ন সন্দেহ, জটিল একটি প্রশ্ন, মাঝে মাঝে রমাকে ব্যাকুল করে তোলে। তার অন্য দুটি সন্তান গৌর; বিনুই কেবল শ্যাম। আর শুধু তাই নয়, মুখে-চোখে, স্বভাবে-ব্যবহারে সে যেন সম্পূর্ণ আলাদা। পাশাপাশি দাঁড় করালে কেউ বলবে না, বিনু তার ছেলে। লোকে বলবে, 'এ আর এমন কি কথা, অমন অনেক হয়।' কিন্তু না, রমা কিছুতেই মানবে না তা। তার সন্দেহের কারণ আছে বৈ কি?

বিনু যখন পাঁচ দিনের, গায়ের রং কিংবা মুখ-চোখ কোনটাই স্পষ্ট হয় নি, ঠিক সেই সময়ে সে এক মুসলমানীর ছেলের সঙ্গে বদলে যায়।

মাথার দিকে প্রসূতিদের সারি সারি লোহার খাট, আর তাদেরই পায়ের দিকে নবজাতকের মশারিঢাকা ছোট ছোট পালঙ্ক। নিশুতি রাত, সবাই ঘুমে অচেতন। সহসা এক শিশুকণ্ঠের আর্ত্ত চীৎকারে রমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। পরক্ষণে দাই এসে বিনুকে কোলের কাছে দিতেই তার কেমন সন্দেহ হ'ল। সন্দেহ হ'ল তার কান্নার ভঙ্গীতে আর গলার ভারী আওয়াজে। রমা প্রতিবাদ জানালে এ তার ছেলে নয়। কিন্তু দাই তার গলার নম্বর দেখিয়ে মুখ বন্ধ করে দিলে। রমা ভাবলে, 'হবেও বা, ঠাণ্ডা লেগে গলা বসে গেছে।'

কিন্তু পরদিন যখন সে পাশের খাটে মুসলমানীর কোলে তারই ছেলেকে দেখলে, তখন আর সন্দেহের অবকাশ রইল না। সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তৃপক্ষের কাছে খবর গেল, দুটি ছেলেকে আবার তৌল করাও হ'ল, কিন্তু সঠিক কিছুই নির্ণয় হ'ল না।

স্বামী শুনে বললেন, 'রক্তপরীক্ষা করানো হোক।' তাও হ'ল,

কিন্তু লাভ হ'ল না কিছুই। এমন সময় কে যেন বললে, 'ও মাগীর ছেলে হয়ে বাঁচে না, তাই পরের ছেলে নিয়ে টানাটানি করে। আগেও নাকি ক'বার এমনি করেছে।'

আর যায় কোথা। সঙ্গে সঙ্গে মাতৃসদনেই সাময়িক একটি নারীবিপ্লব হয়ে গেল। খবর পেয়ে লেডী ডাক্তার এসে দু'জনের খাট দু'ঘরে করে দিলেন। কিন্তু আসল ব্যাপারের নিষ্পত্তি কেউ করলে না।...

আজ এতদিন পর সেই কথাটাই আবার রমার মনে পড়ে গেল। ধারণা হ'ল এই ইয়াসিনই তার সেই ছেলে। বিনুকে সে এতদিন পালন করেছে, তার স্বভাবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারও করেছে এতদিন, কিন্তু ইয়াসিনকে দেখে সে স্পষ্ট বুঝেছে, তার সন্দেহ অমূলক নয়।

রমা ঘর থেকে বেরিয়ে এল।—'বুড়ো মিস্ত্রি, ইয়াসিনের বয়েস কত হ'ল?'

বুড়ো খানিক কি ভেবে নিয়ে বললে, 'ঠিক তো জানি নে মাইজী, তবে সে বার হিন্দু-মোছলমানে খুব দাঙ্গা হয়। হঠাৎ মাঝরাতে ওর মায়ের ব্যথা উঠলো। বাপ বিদেশে, অগত্যা আমিই নিয়ে যাই হাসপাতালে আমার বুড়ীর সঙ্গে। তা আট বছর হয়ে গেল বোধ হয়, হিসেব করে নেন।'

আবার একটি ক্ষিপ্র প্রশ্ন আসে, 'বড় বোন্‌টা কি ওর নিজের?'

'না-না, মা,—সেও এক মা-খাকী বেটী।'

রমা যেমন বেরিয়ে এসেছিল, তেমনি ত্রস্তপদে ভেতরে ঢুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা জানালা বন্ধ হয়ে গেল। রমা সেই জানলার ফাঁক দিয়ে আবার দেখলে ইয়াসিনের কাজলটানা বড় বড় চোখ, ভ্রূ দুটো ধুলোয় সাদা হয়ে গেছে, মুখখানা কি করুণ! তার—

'মা ক্ষিদে পেয়েছে, খেতে দাও,'—বিনু মায়ের কোমর জড়িয়ে আবদার করে।

মাতৃত্ব আজ দ্বিধাগ্রস্ত। বিপরীত দুই আকর্ষণে পড়ে রমার অপত্যস্নেহ যেন কূলহারা স্রোতস্বিনীর মত বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছে। এক দিকে ইয়াসিন দাঁড়িয়ে সংস্কারের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান নিয়ে, আর-এক দিকে আত্মসংলগ্ন হয়ে বিনু আব্দার জানাচ্ছে 'মা, খেতে দাও।'

রমা দু'হাতে বিনুকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে নিথর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। সহসা বিনুর গালের উপর এক ফোঁটা জল পড়তেই সে বিস্ময়ে মায়ের মুখের দিকে তাকালে,'মা তুমি কাঁদছো?'

রমা মুখ ফিরিয়ে বিনুকে খাবার এগিয়ে দিলে।

'মা খাব না।'

'খাবি না কেন? তোর কি হয়েছে?'

'তুমি কাঁদছ কেন বল আগে।'

'তুমি যে কথা শোন না, তাই।'

বিনু এবার ভাল ছেলের মত থালা টেনে নিয়ে খেতে লাগল। আহার-রত ছেলের দিকে চেয়ে রমা ভাবছে, 'সে কি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল? নইলে যাকে সে সবচেয়ে ভালবাসে, বুকের সুধা দি[য়ে] যাকে লালন করেছে সে, তাকেই আজ ভাবছে কি না, সে তা[র] কেউ নয়?'

প্রবল চেষ্টায় স্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে রমা উঠে দাঁড়াল।—'স[ব] বাজে, এতও বাজে চিন্তা আসে আমার মাথায়।'

ওদিকে ছ'টা বেজে গেছে। মজুর-মিস্ত্রী নীচের কলে হাত মুখ ধুয়ে একে একে বিদায় নিচ্ছে। ইয়াসিনও চলে গেল। রমা[র] মনে হ'ল সে যেন একটা জীবন্ত বিভীষিকার হাত থেকে পরিত্রা[ণ] পেল।

যে কারণেই হোক, বিনুই মায়ের বেশী প্রিয়পাত্র ছিল। মনে[র] বিকার কেটে যেতে সে স্নেহ এবার যেন শতগুণ হয়ে সন্তানকে অধিকার করলে।...রমা স্বাভাবিক মনে আবার স্বামী-পুত্র নি[য়ে] সংসার করছে।

কত দিন কেটে গেল। ও-মহলে বুড়ো মিস্ত্রীর সঙ্গে আগেকা[র] মতই ইয়াসিনের যাতায়াত চলে। রমা ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনে[ক] সময় আড়াল থেকে তাকে দেখে বটে, কিন্তু তেমন আর প্রশ্র[য়] দেয় না।

সময়ে সময়ে রমার কোপ গিয়ে ইয়াসিনের উপরই পড়ে—কেন ছেলেটা তারই চোখের সামনে ঘুর ঘুর করে বেড়ায়। কেনই বা অমন দু'চোখ মেলে ইতিউতি খোঁজে তাকে?

কিন্তু পরক্ষণেই রমা বুঝতে পারে এ তার অন্যায়, মনের নিছ[ক] দুর্বলতা। একটা ধারণাকে পুষে রেখে আজ আর তার কো[ন] লাভ নেই। সন্দেহ যদি সত্য হয়, তবু বিনু তার ছেলে, তাকেই সে সন্তানজ্ঞানে লালন করেছে। জননী না হলেই বা কি, যশোদাই কৃষ্ণের মা, তার সাক্ষী স্বয়ং ভগবান।

কোণঠাসা হলে মানুষ শাস্ত্রের নজির টানে। মনকে প্রবোধ করার এমন সহজ উপায় আর নেই। রমা বুঝি আজ নিজেকে যশোদাই মনে ভেবেছে। কিন্তু আর একটি প্রশ্ন মনের কো[ণে] কোণে লুকিয়েছিল, সে ধরতে পারে নি। "ধর যদি বিনু মুসলমা[ন] হয়!" রমা আর ভাবতে পারে না। বজ্রাহতের মত সে যে[ন] বিমূঢ় হয়ে গেল, দু'হাতে শক্ত করে নিজেকে চেপে ধরে কোনমতে মনের বল ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছে: 'না, সব মিথ্যে। বিনু কখনও মুসলমান হতে পারে না।'

বিনা মেঘে আবার বজ্রাঘাত। রেজেষ্ট্রি নোটিশ এসেছে, বাড়ী ছাড়তে হবে। ভুজঙ্গবাবুর কথাই ঠিক হ'ল, 'ওদের আবার কথার দাম।' বাড়ীওয়ালা জানিয়েছে, তার ভাই বদলী হয়ে সপরিবারে আসছেন, তাঁর জন্যে জায়গা চাই।

এমন আকস্মিক নোটিশ পেয়েও রমার মনে এবার কোন ভাব-বৈকল্য দেখা গেল না। বরং খুশী হয়েই বললে সে, 'হাঁ, বাপু, তাই চল বরং,...বার বার এ ভাগাদা ভাল লাগে না।'

রমার কথা শুনে ভুজঙ্গবাবু আশ্চর্য্য হলেন, কিন্তু বিপন্ন বোধ করেন নি। বাহ্যেক্ষণ উপস্থিত দেখে তিনিও জানালেন, 'সব ঠিক

...তুমি রাজী থাকলেই হ'ল। নীচের তলায় তিনখানা ঘর, পৃথক, ভাড়াও পঁচিশের মধ্যে।'

আনন্দে রমার চোখের তারা দুটো যেন নেচে উঠল, 'এত পেলে?...তুমি সত্যি কি দূরদর্শী!'

ভুজঙ্গবাবুও শ্লেষ করলেন, 'মোটেই না, মেনিমুখো মানুষ, কদমার ভয়ে সরে পড়ছি।'

স্বামীর বাক্যবিদ্ধ হয়ে রমা বড় লজ্জিত হয়ে পড়ল—'আমি তো অন্যায় করেছি, মাপ কর।'

'থাক সে কথা, কবে যাবে তাই বল?'

রমা জানালে, পৌষের ক'টা দিন কাটিয়ে যে কোন দিন সে তে রাজী।

অতএব মাঘের এক প্রভাতে দুটো ঠেলা গাড়ী এসে দরজায় গল। মুটে-মজুর মিলে মালগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে, ফেলে ভেঙ্গে ন মতে নূতন বাড়ীতে নিয়ে রেখে এল। সারাদিন দাপাদাপির অন্ত নেই। সন্ধ্যার দিকে বাদ-বাকি মাল টাঙ্গায় চাপিয়ে তার ছেলেমেয়ে নিয়ে গাড়ীতে উঠে বসল। গাড়ী ছাড়তে বে, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে কে যেন গাড়ীর পাশে এসে ড়াল।

'ইয়াসিন! তুই এলি কোত্থেকে?'

বড় ছেলে চিন্ময় ওরফে চিনু জবাব দিলে, 'কেন, ও ত সারাদিন নীচের তলায় দাঁড়িয়ে ঠেলাগাড়ীতে মাল তুলে দিচ্ছিল।'

সহসা দুর্ব্বার বেগে রমার দু'চোখ ফেটে জল নেমে এল। ইয়াসিনও মাথা নামিয়ে ফেঁকে ফেঁকে কেঁদে উঠল!

ওদিকে থেকে ভুজঙ্গবাবু হাঁক দিলেন, 'কে ও?'

'কিছু না'—বলে রমা ডান হাতের আঙুলে ইয়াসিনের নরম গাল দুটো চেপে ভারী গলায় বললে, 'কি নিবি? পয়সা নিবি ইয়াসিন?'

ইয়াসিন নিরুত্তর। রমা এবার আঁচলের গাঁট খুলে তার হাতে পয়সা গুঁজে দিলে। পয়সাগুলি ঝনঝন করে মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ইয়াসিনও ফুঁকিয়ে কেঁদে উঠল—'হাম ভী সাথ যাবে।'

'পাগল কোথাকার, তুই যাবি কোথায়?' রমা আদর করে কাছে টানবার জন্যে ইয়াসিনের দিকে হাত বাড়ালে, কিন্তু হাত তার শূন্যেই রইল, হেঁচকা টান মেরে গাড়ী ছুটল নূতন ঠিকানায়।

ইয়াসিনও সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর দৌড়াবার বৃথা চেষ্টা করে পরিশ্রান্ত হয়ে এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে গেল।

বাইরে তখন কুয়াশার ঘন আবরণ। বার বার চোখ মুছেও রমার অস্বচ্ছ দৃষ্টি সে যবনিকা ভেদ করতে পারলে না।

— —

রাজকন্যা

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

পাহাড়তলীর এ কোন্ গলির ফটকে
পেয়ে গেনু ফের অরূপ রসের বন্যা!
ফুলের সুবাস সাধে কি ক্ষুদ্র চটকে,
পিছনে কি তার তুমি নেই রাজকন্যা?
এ ত গলি নয়—সকড়ি গলির হর্ম্ম্য
মাথা যে তুলেছে বিপুল দম্ভে আকাশে,
পাতার কুঞ্জে তোমার গুঞ্জে নর্ম্ম—
চুলের তোমার গন্ধ যে আছে বাতাসে!
আমি যে পদাতি—ক্লান্ত জীবন-যুদ্ধে;
দৃষ্টিতে মোর দুর্ব্বাশা খর রিষ্টি,
তুমি কি চিত্ত সঁপিয়া দিয়াছ বুদ্ধে,
অথবা চেয়েছ বাঁচাতে মিথ্যা সৃষ্টি?

ধানের কলের গোডাউনীতে যারা ত্রস্ত—
দু'দণ্ড তুমি ভেবেছ তাদের জন্যে?
কয়লার খাদে যারা বিবর্ণ, বাস্ত
তাদের জন্যে মায়া নেই রাজকন্যে?
তোমার লাগিয়া মিলন-মন্দির রাত্রি,
আর সকলের আজ নষ্টচন্দ্র?
একাই কি তুমি উদয়গিরির যাত্রী,
আর সকলের পথ তীর্থের বন্ধ?
ভীরু বাসনার তরে এ দুরভিসন্ধি,
ভাঙাই ত ভাল ভাগ্যের নির্ব্বন্ধে!
রাজকন্যা এ রাত নয় ফুলগন্ধী,
মিছিল যে আজ মত্ত মরণ-দ্বন্দ্বে।

আমরা ও তাহারা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

ছেলেদের কোন রকমের বৃত্তি-শিক্ষা (Vocational Education) দেওয়া দরকার, এই কথাটা সকল মহলে বহুদিন হইতেই শুনিতেছি, এখনও শুনি। বহুদিন হইতেই বৃত্তি-শিক্ষা দিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে; বহুদিন হইতেই স্থানে স্থানে কোন-না-কোন প্রকারের বৃত্তি-শিক্ষা দিবার শিক্ষা-নিকেতন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এখনও হইতেছে। স্বাধীন ভারত এই সম্বন্ধে খুবই মনোযোগী হইয়াছেন। এ কথাও শুনি, এবং জানি অনেক যুবক কোন-না-কোন রকমের বৃত্তি-শিক্ষা লাভ করিয়াছে, এবং করিতেছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই চাকরীর উমেদার, নিজেদের পায়ে দাঁড়াইবার মত আত্মবিশ্বাস ইহাদের নাই। আবার অনেক বৃত্তি-শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকের মুখে শুনিতে পাই যে, তাঁহারা শিক্ষালাভের পর শিক্ষা অনুসারে বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের পৈয়াজ-পয়জার দুই-ই হইয়াছে, এখন চাকরীর উমেদার। কলিকাতার উপকণ্ঠে একটি বিদ্যালয়ে ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি (cutlery) প্রস্তুত করিবার বিদ্যা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সুব্যবস্থা আছে, সেখানকার অধ্যক্ষ এই বিদ্যালয়ের জন্য 'প্রাণ ঢালিয়া' দিয়াছেন। ছাত্রগণ কর্তৃক প্রস্তুত ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি খুবই উৎকৃষ্ট, বিশারদগণ কর্তৃক প্রশংসিত, শুনি, বাজারেও বিক্রয় হয়। একদিন অধ্যক্ষ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম—কোন ছাত্র শিক্ষা অর্জ্জনের পর কি এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়া নিজের কারখানা খুলিয়াছে? তিনি নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। গলদ কোথায়? স্বর্গীয় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যখন কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী ছিলেন তখন এই বিষয়ে তাঁহার সহিত বহু আলোচনা হইয়াছিল। তিনি একটি পরিকল্পনার কথাও বলিয়াছিলেন, এবং লেখককে এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু সর্ব্ব বিষয়েই লেখকের শক্তি ও সুযোগ অতি কম, সেইজন্য তাঁহার পক্ষে এই বিষয়ে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নাই এবং তিনি বিশেষজ্ঞদের নিকট হইতে তেমন সাড়াও পান নাই।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিকল্পনাটি মোটামুটি এইরূপ ছিল: বিভিন্ন কেন্দ্রে বৃত্তি-শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে; এক এক কেন্দ্রে এক এক রকমের বৃত্তি শিক্ষা দিতে হইবে, যে সকল দ্রব্যের স্থানীয় চাহিদা ও কাটতি আছে, সেই সেই দ্রব্য প্রস্তুত সম্বন্ধেই শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার (competition) দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া বিভিন্ন বৃত্তি-শিক্ষা দিতে হইবে। যে প্রতিষ্ঠানে বৃত্তি-শিক্ষা দেওয়া হইবে সেই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ থাকিবে—যথা শিক্ষানবিশি বিভাগ, কাঁচামালের বিভাগ, দ্রব্য প্রস্তুতের বিভাগ, মূল্য নির্দ্ধারণের বিভাগ, বিক্রয়ের বিভাগ ইত্যাদি। অনুরাগ অনুযায়ী শিক্ষানবিশ যুবক নিযুক্ত করা দরকার। অর্থাৎ যে যুবকের যে বৃত্তির প্রতি অনুরাগ আছে, তাহাকে সেই বৃত্তি-শিক্ষা দিতে হইবে। শিক্ষানবিশদিগকে মাসিক একটা ভাতা দিতে হইবে—যাহাতে তাহারা গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে পারে। বৃত্তি অনুসারে শিক্ষানবিশির সময় নির্দ্ধারিত হইবে, শিক্ষানবিশির কাল উত্তীর্ণ হইলে শিক্ষানবিশগণকে দ্রব্য প্রস্তুতের বিভাগে নিযুক্ত করিতে হইবে, এই বিভাগে তাহারা কোন ভাতা পাইবে না, কিন্তু দ্রব্য বিক্রয়ের মুনাফার একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ পাইবে, শিক্ষানবিশ যুবকগণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থাকিয়া শিক্ষানবিশির পর নিজেরা মিলিয়া একটি সমবায় সমিতি গঠন করিতে পারে। এই সমিতিকে সর্ব্ববিধ সুযোগ, সুবিধা দিতে হইবে, এবং সমিতির প্রস্তুত দ্রব্যের বিক্রয়ের ভার প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় বিভাগকে লইতে হইবে। প্রতিষ্ঠান ক্রমশঃ বৃহৎ আকারে পরিণত হইবে। ইহার শাখা-প্রশাখাও বিস্তৃতিলাভ করিবে। বলা বাহুল্য যে, আপাত দৃষ্টিতে পরিকল্পনাটি যত সহজ মনে হইবে, ইহা তত সহজ নহে। বহু হিসাব নিকাশ করিয়া পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করিতেই হইবে, এবং ইহাকে কার্য্যকরী করিতে হইলে অনেক কাঠখড় পোড়াইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা স্বর্গত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা মনে পড়িল, তিনি লেখককে বলিয়াছিলেন—"কোন পরিকল্পনাই প্রথম অবস্থায় নির্ভুল হয় না, পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করিতে করিতে অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা যাইবে, এবং সেই সকল ভুলচুক সংশোধন করিতে হইবে, অনেক নূতন সমস্যা দেখা দিবে, সেই সকল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। সমস্যা দেখা দিবে বলিয়া হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকা উচিত নয়, কাজ আরম্ভ করিয়া দাও, সমস্যা যখন উপস্থিত হইবে তখন তার সমাধান করিবে"; তিনি বলিয়াছিলেন ('Solve the difficulties when they crop up') শ্যামাপ্রসাদবাবু বলিয়াছিলেন যে, তিনি কেন্দ্রীয় সরকার হইতে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থেরও ব্যবস্থা করিবেন। দুর্ভাগা দেশ, এই সুযোগও গ্রহণ করিতে পারিল না।

আমাদের দেশে এই বিষয়ে যে প্রয়াস চলিতেছে, তাহা আদৌ ব্যাপকভাবে কার্য্যকরী হয় নাই, এবং প্রয়াসও নগণ্য—প্রয়োজনের অনুপাতে। আমেরিকার প্রচেষ্টার সহিত তুলনা করিলে বুঝিতে পারিব আমরা কোথায় পড়িয়া আছি, আর তাহারা কোথায় উঠিয়াছে। ১৯১৭ সনে এক আইন (Smith Hughes Act) অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমিক শিক্ষার সহিত বৃত্তি-শিক্ষা সম্পূর্ণ অংশ হিসাবে গৃহীত হয়। পরবর্ত্তী আইনসমূহের দ্বারা ইহার ভিত্তি আরও দৃঢ় করা হয়। মনে রাখিতে হইবে সেখানে মাধ্যমিক

শিক্ষার পরিবর্তে বৃত্তি-শিক্ষা প্রবর্তিত হয় নাই, বরং মাধ্যমিক শিক্ষার অনুপূরক হিসাবেই বৃত্তি-শিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছে। চৌদ্দ বৎসরের ঊর্দ্ধে বয়স্কদের (যাহারা কোন কারিগরি শিক্ষা লাভ করিতেছে, কিম্বা কোন কারিগরি প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত আছে) জন্য অবৈতনিক বৃত্তি-শিক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে—এই ব্যবস্থার দ্বারা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর লোকই উপকৃত হয়, যুবকগণ এবং বয়স্কগণ।

বৃত্তি-শিক্ষা সম্বন্ধীয় আইনসমূহের বিধি অনুসারে ব্যবস্থা অবলম্বনের ও ৪৮টি রাষ্ট্রের সহিত এই বিষয়ে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান আছে, বৃত্তি-শিক্ষার বিভাগগুলি এইরূপ:

(১) কৃষি শিক্ষা,

(২) গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান শিক্ষা,

(৩) ব্যবসা এবং শিল্প শিক্ষা,

(৪) বিতরণোপযোগী পেশা

কৃষি শিক্ষা—যাহাতে যুবকগণ কৃষি-বিজ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জ্জন করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই এই শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্রদের নিজেদের ক্ষেতখামারে কিংবা সম্প্রদায়ের অন্যান্যদের ক্ষেতখামারে যে সকল সমস্যা দেখা দেয় সেই সকল সমস্যার সমাধান ক্ষেতখামারেই করা হইয়া থাকে। ইহার ফলে উন্নত কৃষি-প্রণালী ব্যাপক ভাবে বিস্তৃত হইতেছে; বহু ছাত্র শিক্ষা কালে নিজেদের পরিশ্রমে যে অর্থ উপার্জন করে তাহার দ্বারা নিজেদের কৃষি-ক্ষেত্র স্থাপন করে। আর আমাদের দেশও কৃষিপ্রধান; কিন্তু এখন পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার সহিত কৃষি-বিজ্ঞান জড়িত হইল না; বরং বিপরীত ফল হইয়াছে; যুবক সম্প্রদায়ের যুবকগণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার পরে কৃষিকে অবজ্ঞা করিতে থাকে; বাপ-ঠাকুরদাদার পেশা গ্রহণ করে না, চাকরীর সন্ধানে দেশে বিদেশে ঘোরাঘুরি করে; অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাকরীও জুটে না, তাহারা বেকারের দল পুষ্ট করে, জমি "পতিত" পড়িয়া থাকে; তাহাদের অভিভাবকগণ অদৃষ্টের দোষ দিয়া থাকেন; নিজের অভিজ্ঞতা হইতে এই কথা লিখিতেছি।

গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্য হইতেছে—যুবক সম্প্রদায় ও বয়স্কগণকে গৃহস্থালীর যাবতীয় বিষয়ে শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জ্জন করিবার সুযোগ দেওয়া; এই বিভাগে নানাবিধ বিষয়ে শিক্ষা দান করা হইয়া থাকে, যেমন গৃহস্থালীর জিনিষপত্র নির্ব্বাচন ও ক্রয়, খাদ্য নির্ব্বাচন, প্রস্তুত-প্রণালী, বন্টন, সংরক্ষণ ইত্যাদি, বস্ত্রাদি নির্ব্বাচন, উহাদের যত্ন, মেরামত করা ইত্যাদি, গৃহনির্ব্বাচন, উহার যত্ন, আসবাবপত্র নির্ব্বাচন ও উহাদের যত্ন, ব্যবহার, সংরক্ষণ ইত্যাদি, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, গৃহের নিরাপত্তা; পীড়িতদের সেবা-শুশ্রূষা, প্রাথমিক সাহায্য, পরিবারবর্গের অবকাশ বিনোদনের ব্যবস্থা, পরস্পরের মধ্যে প্রীতিকর সম্বন্ধ স্থাপন এবং সমাজের সহিত পরিবারের সম্বন্ধ প্রভৃতি। আর আমাদের একটি শিক্ষিত ব্যক্তি এই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ না হইলেও খুবই অজ্ঞ।

ব্যবসা এবং শিল্পশিক্ষার মধ্যে প্রায় সর্ব্বপ্রকার শিল্পদ্রব্যাদি প্রস্তুত-প্রণালীর ব্যবস্থা আছে; এই শিক্ষা দিবার প্রধান উদ্দেশ্য যে সকল শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণ বিবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত আছে, তাহারা তাহাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বাড়াইতে পারে। এই শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রথম অবস্থায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে এবং ইতিহাস, বিজ্ঞান, ইংরেজী এবং অন্যান্য সাধারণ বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

বিতরণোপযোগী পেশার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে, ছাত্রগণকে ব্যবসা-জগতের বিবিধ স্তরের সহিত পরিচিত করা। টাইপ রাইটিং, ষ্টেনোগ্রাফি, বুক-কিপিং প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়াও এই বিভাগের অন্তর্গত, ইহা ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য যে যে বিষয়ে পারদর্শিতা থাকা দরকার সে সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

প্রত্যেক বিভাগই সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হয়; প্রত্যেক বিভাগেই সুনির্দ্দিষ্ট বিষয়-সূচী আছে এবং সুনির্দিষ্ট শিক্ষা-প্রণালী আছে, ব্যবহারিক শিক্ষার উপরেই অধিক জোর দেওয়া হইয়া থাকে। সব চেয়ে বড় কথা এই যে, যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বত্রই এইরূপ বৃত্তি-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে—এবং বিভিন্ন স্থানের ব্যবস্থার পরস্পরের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে—সুনিয়ন্ত্রিত প্রণালীতে এবং অঙ্গাঙ্গীভাবে সকল স্থানের শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালিত হইতেছে। আমাদের দেশের মত খাপছাড়া ও এলোমেলো ভাবে কিছুই হয় না।

নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে যুক্তরাষ্ট্রে বৃত্তি শিক্ষার বিস্তৃতি কত দূর হইয়াছে। ইহা ১৯৫৪ সনের তালিকা:

একটি বৃত্তি-শিক্ষার উপযোগী বিদ্যালয়—	১৭,২৭৭
কৃষি-শিক্ষা বিদ্যালয়	৯,৯৭২
গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান ,,	১১,২৫০
ব্যবসা ও শিল্প	৪,৮৬২
বিতরণোপযোগী পেশা	১,৭৪২
শিক্ষকদের সংখ্যা	৬৯,৯৩৯
কৃষি-বৃত্তি শিক্ষা—ছাত্রসংখ্যা	৭,৩৭,৫০২
গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান ,,	১৩,৮০,১৪৭
ব্যবসা ও শিল্প ,,	৮,২৬,৫৮৩
বিতরণোপযোগী পেশা ,,	২,২০,৬১৯

আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্ক

শ্রীবেল্লিকোৎ রঘুনাথ শেনোয়

অনুবাদক—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্ক বা বিশ্বব্যাঙ্ক আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের মতই সদস্য-দেশসমূহের একটি প্রতিষ্ঠান। উভয় প্রতিষ্ঠানেরই সভ্যসংখ্যা ৫৬। উভয় প্রতিষ্ঠানই পরস্পরের সহিত নানাভাবে সংশ্লিষ্ট এবং এজন্য ইহাদিগকে ব্রেটনউড্‌সের যমজ-সন্তান বলা হয়। ১৯৪৪ সনের জুলাই মাসে আমেরিকার ব্রেটনউড্‌স নিউ হ্যাম্পশায়ারে রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্যোগে ৪৪টি জাতির যে আর্থিক এবং সিকা সম্পর্কীয় সম্মেলন হয় তাহারই ফলস্বরূপ এই দুইটি প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে। এই সম্মেলনে যোগদানকারী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া, লাইবেরিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড ব্যতীত আর সকলেই বিশ্বব্যাঙ্কের সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছিল। ব্যাঙ্কের নিয়মাবলী ১৯৪৫ সনের ২৭শে ডিসেম্বর ৩৩টি দেশ-কর্তৃক আনুষ্ঠানিক ভাবে অনুমোদিত হয়। ইহার ছয় মাস পরে ১৯৪৬ সনের ২৫শে জুন ব্যাঙ্ক নিয়মমত কাজ সুরু করে। ১৯৪৭ সনের মে মাসে ফ্রান্সের ক্রেডিট ন্যাশনালকে ২৫ কোটি ডলার কর্জ্জ দেওয়া হয়—ইহাই ব্যাঙ্কের প্রথম ধার দেওয়া। এই বৎসরেই পুনর্গঠনের জন্য আরও তিনটিকে কর্জ্জ দেওয়া হয়—অধমর্ণ দেশগুলি হইতেছে নেদারল্যাণ্ডস্, ডেনমার্ক এবং ল্যুক্সেমবার্গ।

আপনি ওয়াশিংটনে কোন ট্যাক্সিচালককে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের কার্য্যালয়ে লইয়া যাইতে বলিলে খুব সম্ভব সে বুঝিতে পারিবে না তাহাকে কোথায় যাইতে বলা হইতেছে। কিন্তু তাহাকে বিশ্বব্যাঙ্কের আপিসে যাইতে বলিলে সে আর কথাটি বলিবে না—সরাসরি ১৮১৮-এইচ ষ্ট্রীটের ঠিকানায় উপস্থিত হইবে। তহবিল এবং ব্যাঙ্কের আপিস একই বাড়ীতে। কিন্তু কোন্ কারণে ব্যাঙ্ক সাধারণের নিকট বেশী পরিচিত ! সম্ভবতঃ ব্যাঙ্ক সদস্য-দেশগুলির নিকট বেশী প্রিয়। এই উভয় প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলী যাঁহারা প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাঁহারা হয়ত ইহা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী কোন দেশ ইচ্ছা করিলে কেবলমাত্র তহবিলের সদস্য হইতে পারে কিন্তু কোন দেশ ব্যাঙ্কের সদস্য হইতে হইলে প্রথমে উহাকে তহবিলের সদস্য হইতেই হইবে।

ইহার কারণ হইতেছে যে, উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিই প্রত্যেক সদস্যের কতকগুলি দায়িত্ব পালন করিতে হয়। নিজের ঘরোয়া ব্যাপারেও প্রত্যেক তহবিল-সদস্যের কতকগুলি বিষয়ে বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া সদস্যগণ মুদ্রামূল্য হ্রাস করিতে পারে না। এজন্য মুদ্রামূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি শতকরা ১০-এর অতিরিক্ত হইলেই তহবিলের সম্মতি পূর্ব্বেই লইতে হইবে। যুদ্ধ-পরবর্ত্তী কালের মুদ্রা লেনদেনের নানা বাধানিষেধ চালু রাখিতে হইলেও সদস্য দেশগুলিকে এই বিষয়ে প্রতি বৎসর তহবিলের সহিত আলোচনা করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে প্রত্যেক দেশের সিকা, অর্থ এবং সম্পদ প্রভৃতির ও তৎসংশ্লিষ্ট নীতির আলোচনা স্বতঃই আসিয়া পড়ে। সদস্যগণ বাড়তি মূল্যে মুদ্রাবিনিময় বা স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করিতে কিংবা অপর কোন প্রকার নিয়মবহির্ভূত বিনিময় কার্য্য করিতে পারে না। কোন সদস্য ইচ্ছা করিলেই তহবিলের সাহায্যও পাইতে পারে না—সাহায্য দিবার পূর্ব্বে সদস্য দেশের আর্থিক অবস্থা এবং সাহায্য দিলে তাহা দ্বারা সংশ্লিষ্ট দেশের কি উপকার হইবে তাহা বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়।

তহবিল-সদস্যের দায়িত্ব অপেক্ষা ব্যাঙ্ক-সদস্যের দায়িত্ব অল্প। বিশ্বব্যাঙ্ক সদস্যের সিকা ব্যবস্থা এবং আর্থিক অবস্থার বিষয়ে মাথা ঘামায় না। অবশ্য যে সকল সদস্য-দেশ কর্জ্জ পাইয়াছে বা ধার চায় তাহাদের সম্বন্ধে ঐ সকল বিষয়ে ব্যাঙ্ক অনুসন্ধান করে। প্রত্যেক কর্জ্জের বিষয়েই ব্যাঙ্কের দৃষ্টি থাকে যে, যে কাজের জন্য ধার লওয়া হইয়াছে তাহা সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হইতেছে কিনা এবং অধমর্ণ চুক্তি অনুযায়ী দেনা শোধ করিতে পারিবে কিনা। চাঁদা দেওয়ার বিষয়ে সদস্য-দেশকে মোট চাঁদার শতকরা দুই ভাগ স্বর্ণে কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ডলারে দিতে হয় এবং চাঁদার বাকী অংশ নিয়ম অনুযায়ী যথাসময়ে পরিশোধ করিতে হয়।

নাম হইতেই বুঝা যায় যে, বিশ্বব্যাঙ্কের কাজ হইতেছে পুনর্গঠন ও উন্নয়ন কার্য্যে অর্থ সাহায্য করা। ইহার নিয়মাবলীতে লেখা আছে, পুনর্গঠন ও উন্নয়ন উভয় পরিকল্পনা সমদৃষ্টিতে বিচার করিতে হইবে। কেবল ব্যাঙ্কের আর্থিক সাহায্যেই এই সকল পরিকল্পনা কার্য্যকরী হওয়া সম্ভব নহে। ব্যাঙ্ক সদস্য-দেশের অল্পমেয়াদী দেনা শোধের অসুবিধা দূর করে মাত্র। বড় বড় পরিকল্পনার বৃহৎ অর্থ সাহায্য বেসরকারী সূত্র হইতে পাওয়া সম্ভব হয় না। এই জন্যই যুদ্ধোত্তরকালে বৃহৎ ঝুঁকি লইবার জন্য নানা দেশের সম্মিলিত চেষ্টায় যাহাতে এরূপ সাহায্য দেওয়া যায় তজ্জন্য

বিশ্বব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। সরকারী এবং বেসরকারী আরও যে সকল ঋণদানকারী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আছে তাহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় নাই। বরং এই সকল প্রতিষ্ঠানের ঋণ যে স্থানে পৌঁছায় না সেই সকল স্থানে সাহায্য করিবার জন্য ইহার জন্ম। ইহার অনুকরণে বেসরকারী মূলধন আরও আন্তর্জাতিক ভাবে দাদন দেওয়া হইবে ইহা আশা করা গিয়াছিল। নিয়ম অনুযায়ী বেসরকারী কর্জ্জ সম্পর্কে বিশ্বব্যাঙ্ক গ্যারাণ্টি দিতে পারে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ক কোন বেসরকারী কর্জ্জের জামিন বা গ্যারাণ্টর হয় নাই।

বিশ্বব্যাঙ্কের কর্জ্জ দিবার ধনভাণ্ডার আন্তর্জাতিক মুদ্রা-তহবিলের ভাণ্ডার হইতে সঙ্কীর্ণ। তাহা সত্ত্বেও ব্যাঙ্ক কর্জ্জ দিতে কার্পণ্য করে না। ব্যাঙ্কে কর্জ্জের ভাণ্ডারের পরিমাণ ২০০ কোটি ডলার হইতে কিছু বেশী—ইহা ব্যাঙ্কের মোট স্বর্ণ অথবা স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত হয় এরূপ মুদ্রার ৫৪ শতাংশ। এই পরিমাণ অর্থ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের মোট ভাণ্ডারের ২৫ শতাংশ মাত্র। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ব্যাঙ্কের কর্জ্জের পরিমাণ তহবিলের কর্জ্জের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশী। বিশ্বব্যাঙ্কের মোট কর্জ্জের ভাণ্ডারের দুই শত কোটি ডলারের মধ্যে দেড় শত কোটি ডলার কর্জ্জে খাটিতেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের কর্জ্জের পরিমাণ উহার মোট কর্জ্জের ভাণ্ডারের ১৪ শতাংশেরও কম।

বিশ্বব্যাঙ্কে কর্জ্জের অর্থ চারি প্রকারে সংগৃহীত হয়। প্রথমতঃ আসে সদস্যগণের ব্যাঙ্কে প্রদত্ত মূলধন বা চাঁদা হইতে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা-তহবিলে যে হারে চাঁদা দিতে হয় এখানেও চাঁদার পরিমাণ প্রায় সেইরূপ। কিন্তু দেয় চাঁদা মাত্র শতকরা দুই শতাংশ প্রথম দিতে হয়। ইহা আবার স্বর্ণে বা ডলারে দেয়। দেয় চাঁদার ১৮ শতাংশ সদস্যের নিজ সিক্কায় দিবার নিয়ম। সদস্যের এই নিজস্ব সিক্কা কর্জ্জে খাটাইবার পূর্ব্বেই তাঁহার সম্মতি লওয়ার প্রয়োজন হয়। ১৯৫৪ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর শতকরা দুই অংশ স্বর্ণ এবং ১৮ অংশ সদস্যের সিক্কা (অবশ্য ইহা হইতে যাহা ধার দেওয়া হইয়াছে তাহা বাদে) এই উভয়ে মিলিয়া বিশ্বব্যাঙ্কের মূলধন দাঁড়াইয়াছে ৯২ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার। ব্যাঙ্কের কর্জ্জ দিবার তহবিলের ইহাই বৃহত্তম অংশ কিন্তু ইহার গুরুত্বও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে।

অর্থ সংগ্রহের দ্বিতীয় উপায় হইতেছে পৃথিবীর নানা দেশের মূলধনের বাজার হইতে কর্জ্জ গ্রহণ। ব্যাঙ্ক যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য এবং সুইজারল্যাণ্ড হইতে এই ভাবে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে। সুইজারল্যাণ্ড বিশ্বব্যাঙ্কের সদস্য নহে। কিন্তু ব্যাঙ্কের সদস্যগণের সুইস মুদ্রার আবশ্যক হওয়ায় ব্যাঙ্ককে ঐ দেশের মূলধনের বাজার হইতে কর্জ্জ করিতে হইয়াছে। ১৯৫৪ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ক এই ভাবে ৮৫ কোটি ডলার কর্জ্জ করিয়া সংগ্রহ করিয়াছে। ক্রমেই কর্জ্জ দ্বারা সংগৃহীত অর্থের গুরুত্ব বাড়িতেছে। ভবিষ্যতে কর্জ্জ করা অর্থই হইবে ব্যাঙ্কের সর্ব্বাপেক্ষা বড় তহবিল এরূপ আশা করা যায়।

অর্থাগমের তৃতীয় উপায় হইতেছে ব্যাঙ্কের বণ্ড বা ঋণপত্র বিক্রয় দ্বারা অর্থ সংগ্রহ। অধমর্ণ বা কর্জ্জ গ্রহণকারী সদস্যের চাহিদা অনুযায়ী এই ঋণপত্র বিক্রয় হয়। ঋণপত্রগুলিতে কখনও ব্যাঙ্কের গ্যারাণ্টি থাকে, কখনও থাকে না। বিশ্বের টাকার বাজারে এই সকল বণ্ডের চাহিদা হইতেই বুঝা যায় ব্যাঙ্কের দাদনের উপর বণ্ড ক্রয়কারিগণের কিরূপ আস্থা আছে। বিশ্বব্যাঙ্কের ডিরেক্টর বা পরিচালকগণ অধমর্ণের দেনা পরিশোধ সম্পর্কে কিরূপ বিশ্বাস রাখেন তাহাও এই বণ্ড বিক্রয় হইতে উপলব্ধি হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই সকল বণ্ডের ক্রেতা অন্যান্য ব্যাঙ্ক বা বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি। বণ্ড-গুলির পরিশোধের মেয়াদ নানা রকমের হইয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে (যথা নেদারল্যাণ্ডস্, বেলজিয়ম এবং জাপান) বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বিশ্বব্যাঙ্ক ঋণদান করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বব্যাঙ্কের মাধ্যমে বেসরকারী মূলধন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করা হইয়াছে। অধিকাংশ কর্জ্জ গ্রহণকারী সদস্য দেশের কর্জ্জের একটা মোটা অংশই এই ভাবে বণ্ড বিক্রয় করিয়া সংগৃহীত হই-য়াছে। এই ভাবে ভারতের কর্জ্জের পরিমাণ ১৯৫৪ সনের ৩১শে অক্টোবর ছিল ১ কোটি ২৫ লক্ষ ডলার। বিশ্বব্যাঙ্ক এইরূপে মোট ১৯ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার সংগ্রহ করিয়াছে এবং সদস্য দেশগুলিকে কর্জ্জ দিয়াছে।

ব্যবসায়ের মুনাফা হইতে ব্যাঙ্কের যে আয় জমে তাহা আবার কর্জ্জে খাটান চলে। ইহাকে অর্থাগমের চতুর্থ উপায় বলা চলে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল সাত বৎসরে ৮০ লক্ষ ডলার লোকসান দিয়াছে কিন্তু বিশ্বব্যাঙ্ক প্রতি বৎসর লাভ করিয়া চলিয়াছে। প্রত্যেকটি কর্জ্জের জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক শতকরা এক টাকা হিসাবে কমিশন পাইয়া থাকে। সেই লাভ ছাড়াও গত সাত বৎসরে ব্যাঙ্ক লাভ করিয়াছে ১০ কোটি ৩৮ লক্ষ ডলার।

শতকরা ১ ডলার কমিশন আদায় হইতে বিশ্বব্যাঙ্কের বিশেষ সংরক্ষিত ভাণ্ডারে জমিয়াছে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার। ব্যাঙ্ক কর্জ্জ দাদনে যে সকল ঝুঁকি গ্রহণ করি-য়াছে উহার নিরাপত্তার জন্য এক দিকে যেমন ভাণ্ডারের অর্থ অপর দিকে রহিয়াছে অধমর্ণগণের ঋণ পরিশোধের স্বীকৃতি বা বণ্ড। ইহা অপেক্ষাও বড় জামিন বা নিরাপত্তা হইতেছে

ব্যাঙ্কের মূলধনের অনাদায়ী ৮০ শতাংশ। নিরাপত্তার দুই অঙ্ক যোগ করিলে পরিমাণ দাঁড়ায় ৭০০ কোটি ডলার। ইহার মধ্যে এক আমেরিকার অনাদায়ী মূলধনের পরিমাণই হইতেছে ২৫০ কোটি ডলার। নিয়ম অনুযায়ী অনাদায়ী চাঁদা (মূলধন) স্বর্ণে, মাকিন ডলার কিংবা অপর কোন সিক্কায় তখন আদায় করা চলিবে যখন ব্যাঙ্কের দেনা কিংবা গ্যারাণ্টি মিটাইবার জন্য অর্থের দরকার হইবে। ব্যাঙ্কের বণ্ডের পরিমাণ মোট মূলধনের শতকরা ৮০ ভাগের ১২ ভাগ, সুতরাং বণ্ড পরিশোধ করা বিষয়ে আট গুণ জামিন রাখা হইয়াছে। এই জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের বণ্ডগুলি পৃথিবীর বাজারে অন্যান্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান ও সরকারী বণ্ডের তুলনায় উপযুক্ত মূল্যেই কেনাবেচা হয়।

ব্যাঙ্কের দৈনন্দিন কার্য্য পরিচালিত হয় ষোল জন কার্য্যকরী ডাইরেক্টর এবং তাহাদের বিকল্প দ্বারা। পাঁচ জন প্রধান-সদস্যকর্তৃক পাঁচ জন কার্য্যকরী ডাইরেক্টর এবং তাহাদের বিকল্প নির্ব্বাচিত হয়—এই প্রধানগণের মধ্যে ভারতের স্থান পঞ্চম। বাকী ২২ জন ডাইরেক্টর এবং বিকল্প (১১+১১) ৫১টি সদস্য দেশ কর্তৃক নির্ব্বাচিত হয়। সাধারণতঃ ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী ডাইরেক্টরগণের সভা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ডাইরেক্টরগণের সভার মত ঘন ঘন হয় না। ব্যাঙ্কের বোর্ডের সভাগুলি মামুলী ধরণের হইয়া থাকে। কর্জ্জের দরখাস্ত বোর্ডে আসিবার পূর্ব্বে উহা বিশেষজ্ঞগণ নানা ভাবে পরীক্ষা করেন। ব্যাঙ্কের প্রধান কার্য্যই ঋণ দেওয়া। কিন্তু ঋণদান সম্পর্কে সদস্য-দেশের বিতর্কমূলক রাষ্ট্রনীতিসমূহ বিশ্বব্যাঙ্কের বিচার্য্য নহে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল সংশ্লিষ্ট দেশের নীতি সম্পর্কীয় বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করিয়া থাকে। বিশ্বব্যাঙ্ক হইতে পুনর্গঠনের জন্য ১৯৪৭ সনে যে ঋণ দেওয়া হয় উহার পরিমাণ ৫০ কোটি ডলার। ইহার কিছু পরেই দেখা গেল যে, পশ্চিম ইউরোপ পুনর্গঠনে যে অর্থের প্রয়োজন হইবে উহা সরবরাহ করা ব্যাঙ্কের ক্ষমতার বাহিরে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র তখন এই দায়িত্ব ১৯৪৮ সনের এপ্রিল মাসে উহার ইউরোপীয় পুনর্গঠন কর্ম্মসূচীতে গ্রহণ করে। বিশ্বব্যাঙ্ক অতঃপর পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিতে সাহায্য দিবার কাজে অগ্রসর হয়। ব্যাঙ্কের কর্জ্জের ব্যাপারে পুনর্গঠন অপেক্ষা উন্নয়নের দিকেই বেশী জোর দেওয়া হয়। উন্নয়ন বিষয়ে ব্যাঙ্কের কর্জ্জের পরিমাণ ১৫০ কোটি ডলার।

বিশ্বব্যাঙ্ক এ পর্য্যন্ত ৩৩টি দেশ বা ঐ সকল দেশের উপনিবেশকে প্রায় ১০০ কোটি ডলার কর্জ্জ দিয়াছে। অধিকাংশ কর্জ্জই দেওয়া হইয়াছে জলবিদ্যুৎ, চলাচল, সেচের উন্নতির কিংবা পতিত জমি উদ্ধারের জন্য, কারণ কোন দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এই সকলের প্রয়োজনই প্রথম ও প্রধান। পুনর্গঠনের কর্জ্জ বাদ দিলে কর্জ্জ গ্রহণকারিগণের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া (২০ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার) প্রথম, ব্রেজিল দ্বিতীয়, মেক্সিকো তৃতীয়, দক্ষিণ আফ্রিকা চতুর্থ এবং ভারত (১০ কোটি ৫ লক্ষ ডলার) পঞ্চম। কর্জ্জের শতকরা ৭৮ ভাগই মাকিন ডলারে দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, পুনর্গঠন ও উন্নয়ন-কার্য্যে ডলারের কত প্রয়োজন। অবশ্য অন্যান্য মুদ্রার আবশ্যকতাও পরে দেখা গিয়াছে, তবু ডলারের চাহিদা কমে নাই। ডলারের পরেই ষ্টার্লিংয়ের জন্য চাহিদার পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ইহাদের তুলনায় সুইস ও ফরাসী ফ্রাঙ্ক এবং জার্ম্মান মার্কের চাহিদা খুবই নগণ্য। অবশ্য ইহা হইতে জার্ম্মানীর যুদ্ধোত্তরকালের উন্নয়ন বুঝা যায়—জার্ম্মান জাতির শিক্ষা ও আর্থিক বিষয়ে রক্ষণশীল নীতি, কঠোর পরিশ্রম ও উন্নততর কর্ম্মক্ষমতা ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে।

অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর সদস্য-দেশসমূহে পরামর্শ দানের জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের ডাক পড়ে। যখন ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় তখন কেহ ভাবে নাই যে, এরূপ পরামর্শদানের কাজের কোন গুরুত্ব আছে; কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে এরূপ কার্য্যেরও বেশ চাহিদা আছে। সদস্য দেশের অনুরোধে ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের আর্থিক সমস্যা বিশ্লেষণ করিবার জন্য এবং দীর্ঘকালীন মূলধন নিয়োগ বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য বিশেষজ্ঞ পাঠাইয়া সাহায্য করিয়াছে।

বিশ্বব্যাঙ্ক একটি বিষয়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল হইতে পশ্চাতে রহিয়াছে। ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারিগণ তহবিলের কর্ম্মচারিগণের মত আন্তর্জাতিক ভাবে নানা দেশ হইতে সংগৃহীত নহে। ব্যাঙ্কের উচ্চপদস্থ কোন কর্ম্মচারীই স্বল্প অগ্রসর দেশ হইতে লওয়া হয় নাই। যখন স্বল্প-অগ্রসর দেশসমূহে আর্থিক সাহায্যের গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে তখন এই ত্রুটির গুরুত্ব অধিক। ঐ সকল দেশ হইতে বিশেষজ্ঞ গ্রহণ করিলে ব্যাঙ্কের কর্ম্মনীতি নির্দ্ধারকগণের পক্ষে ব্যাঙ্ক-সাহায্য কি ভাবে দেওয়া যাইবে এবং কার্য্যকরী হইবে ইহা জানিবার বেশী সুবিধা হইত।*

* অল-ইণ্ডিয়া রেডিওতে (আমেদাবাদ) প্রদত্ত ইংরেজী বক্তৃতার অনুবাদ। অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে।

ময়লা আকাশ

শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়

ঝিম্ ঝিম্ বৃষ্টি ঝরছে অঝোরে। মাথার উপরকার টিনের ছাউনিতে শব্দ হচ্ছে—শব্দ হচ্ছে শিস-দেওয়া হাওয়ায়। আরম্ভ হয়েছে সেই কোন্ সকাল থেকে, এখনও থামবার নামগন্ধ নেই। কাজকর্ম যদি না থাকত, কিংবা বাইরে বের হবার দরকার না হ'ত, তা হলে অবশ্য মন্দ লাগত না এ বৃষ্টি। কিন্তু আপিস বের হবার সময়, এ কি বিরক্তিকর ব্যাপার।

ঘুম থেকে উঠে, চা-খাবার খাওয়ার সময় বেশ লাগছিল। বৃষ্টির জলে আবছা-হয়ে-আসা আকাশের দিকে তাকিয়ে অনেক দিন পরে ভুলেযাওয়া মেঘদূতের কয়েকটা ছত্র সম্ভবতঃ বরুণের মনে এসেছিল। বিরহী যক্ষের বেদনা যেন অশ্রুধারায় বর্ষিত হচ্ছে পৃথিবীতে, পশু-পাখী, তরুলতা সিক্ত হচ্ছে সে ধারায়। কিন্তু কতক্ষণই বা, মেঘদূতের ছত্রগুলি মনে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই, ভুলে যেতে হ'ল। এ বৃষ্টিতে বাজার করতে যেতে হলে কবিতা না ভুলে উপায় ?

কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে দেখে বরুণ; কাঁটায় কাঁটায় ন'টা। আর কিছুক্ষণ এভাবে বৃষ্টি চললে, নির্ঘাত লেট; আর তার সঙ্গে আছে বীরেনবাবুর ট্যারা চোখের তেরছা দৃষ্টি। সে দৃষ্টির সামনে পড়তে হবে মনে হলেও সমস্ত শরীর যেন সির সির করতে থাকে। একটি মাত্র চাউনিতে যে এতখানি অবজ্ঞা আর শাসন দেখানো চলে, বীরেনবাবুকে দেখবার আগে ভাবতেও পারত না বরুণ। তার চেয়ে আপিসে না যাওয়াই ভাল। জুতোজোড়া খুলে বিছানার উপর উঠে বসল বরুণ। তিন'শ পঁয়ষট্টি দিন ত কাজ করতে হয়, একদিন না হয় বিশ্রাম নেবে।

অবশ্য এ বৃষ্টিঝরা যদি এক দিনে শেষ হয়।

প্রণতি ঘরে এল কি একটা কাজে। বরুণকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, শুয়ে পড়লে যে, আপিসে যাবে না ?

শরীরটাকে কাত করে একটা আরামের নিশ্বাস ছেড়ে, স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বরুণ বলল, আজ আর যাব কি করে, যে বৃষ্টি !

তোমার ত সুবিধেই হ'ল বৃষ্টি নেমে, দুপুরটা ঘুমিয়ে কাটাতে পারলে অন্ত কিছু চাও না। ঠাকুরপো এই বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বেরিয়ে গেল। এত খরচ কর, তবুও দুটো ছাতা কিনবে না। বৃষ্টি হলে গোটা বর্ষাকালটা কি শুয়ে কাটাবে ঠিক করেছ নাকি।

বরুণ হেসে উত্তর দিল, মন্দ কি। দুটো মাস না হয় তোমার মুখের পানে চেয়ে চেয়ে কবিতা পড়ে কাটাব। কবিদের বন্দিতা মানস-প্রিয়ার প্রশস্তি গাইব, বলব···

প্রণতি কপট রাগের ভান করে বলল, বয়স কি তোমার কমছে দিন দিন ? মা পাশের ঘরে রয়েছেন, শুনলে কি ভাববেন বল ত ? তারপর বরুণের কপালে হাতের উল্টো পিঠটা আলগোছে রেখে বলল, সত্যি কি কামাই করবে ঠিক করেছ ?

করলে, তোমাদের ত খুশী হবার কথা। সারাদিন আপিস করি, বাইরে বাইরে ঘুরি, বাড়ীতে থাকার সময় পাই না, এ নিয়ে ত অনুযোগের অন্ত নেই। তাই ভাবছি আজ আর যাব না।

যা ভাল বোঝ কর, আমার বলবার কিছু নেই। মাসের শেষ কামাই করবে; কত বাড়তি খরচ রয়েছে এ মাসে, সেকথা কতবার মনে করিয়ে দিতে হবে। তোমার আর কি, ভুগতে হবে আমাকেই।—রাগ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় প্রণতি।

বরুণের হাসি পেল। কালকেই না উদ্বেগ দেখিয়েছিল তার শরীর খারাপ জেনে। অথচ আজ আপিস যাবে না শুনে অসন্তুষ্ট হ'ল। বিয়ের পর এই সাত-আট বছরের মধ্যে কত পরিবর্ত্তন হয়েছে প্রণতির। এ প্রণতি যেন আগেকার এক জনের ছায়া, তার আসল সত্তার বিলুপ্তি ঘটেছে। অবুঝের মত এই কথাগুলো শুনলে রাগ হয়। বাড়তি খরচের কথা মনে না থাকলে কি আর সারা মাস ওভার-টাইম খাটে শরীরপাত করে ? এত করেও ত ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। মাইনে পাবার সঙ্গে সঙ্গেই খরচের হিসাব কষা হয়ে যায়, তার উপর বাড়তি খরচ ত লেগেই আছে। প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকা ধার নিতে নিতে শেষ হয়ে এসেছে।

জুতোটা পায়ে গলিয়ে, বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল বরুণ।

সেদিন আপিসে বেরুবার মুখে প্রণতি বলল, আজ মাইনে পেলে, মার জন্যে একটা কাপড় নিয়ে এস। ছেড়া কাপড় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরেন, তাকানো যায় না। আর ছেলেটারও সেই অবস্থা, বাইরে পাঠাতে লজ্জা করে।

বরুণ বলল, নিজেরটা বলতে আর লজ্জা কেন, কি কি চাই, সেটাও বলে ফেল।

প্রণতি একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ বরুণের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, সে কথাটা বললে এতটুকুও অন্যায় হবে না। দাসী-বাঁদির মত ত তোমার সংসারে খেটে যাচ্ছি; তার জন্যে কতটুকু দাবি জানিয়েছি ? একটা ঝি-চাকর রাখতে হলে, খাওয়া-পরা ছাড়া, মাইনে কিছু তাকে দিতে হয়। আমার বেলা ওইটুকুই তোমার লাভ। কোন দিন তাকিয়ে দেখেছ, কি ভাবে থাকি, কি পরি। এদিকে কথায় কথায় রাগ, কিছু বলতে যাওয়াটাই আমার ভুল। কিন্তু কি করব, তুমি ত আর কোন দিকে তাকিয়ে দেখবে না, তাই বার বার বলতে হয়। গট গট করে বেরিয়ে গেল প্রণতি।

বরুণ পিছন থেকে কথা ছুড়ে মারতে লাগল, কাটা কাটা কথা

বলতে সবাই পারে, কিন্তু টাকা কি ভাবে রোজগার করতে হয়, তা যাকে করতে হয় সে-ই জানে। আমি যদি সংসারের দিকে না তাকাতাম, তা হলে পেয়ে-পরে আর বড় বড় কথা শোনাতে হ'ত না।—আরও কিছুক্ষণ নিজে নিজে বকতে থাকে, তারপর এক সময় চুপ করে যায়, ওদিক থেকে কোন উত্তর না পেয়ে। তা ছাড়া ভাল করেই জানে প্রণতির উপর তার এই রাগের কোন মানে হয় না। আর সত্যি বলতে কি, রাগ তার প্রণতির উপর নয়, রাগ এই সংসারের উপর, নিজের অক্ষমতার উপর। সংসার ত নয়, যেন রাবণের চিতা, জ্বলছে ত জ্বলছেই। যা-কিছু দাও না কেন, নিমেষেই শেষ। তাই রাগ হয়, এত খাটছে, তবুও যদি এ জ্বলুনি এতটুকু কমাতে পারত।

প্রণতি কি একটা দরকারে ঘরে ঢোকে; বরুণ তাকিয়ে দেখে। অনেক রোগা হয়ে গিয়েছে প্রণতি; এই সাত বছরের দারিদ্র্য ওর নারীত্বের সবটুকু কোমলতা নিঃশেষে নিংড়ে নিয়েছে। চুল উঠে মাথার সামনেটা পাতলা হয়ে এসেছে, চোখের কোলে কালি জমেছে অনেকখানি। আগের চেয়ে অনেক রোগা, অনেক শ্রীহীনা হয়ে গিয়েছে প্রণতি। চোয়ালের হাড় একটু বেশী উঁচু হয়ে উঠেছে, রুক্ষ চামড়া ঠেলে। বরুণের দুঃখ হয়, এত কম বয়সে বুড়িয়ে যাচ্ছে প্রণতি। অথচ ইচ্ছে করলে অনেক বড় ঘরে ওর বিয়ে হ'তে পারত; সমর রায় ত সবকিছুতেই রাজী ছিল। দু'বেলা গাড়ী হাঁকিয়ে আসা-যাওয়ারও কিছু কসুর করে নি। অনুতাপ হতে থাকে বরুণের: প্রণতির এ ভালবাসার কতটুকু মর্য্যাদা সে দিতে পেরেছে? কত সময় এতটুকু সান্ত্বনা পাবার জন্যে প্রণতি তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে; কিন্তু সে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এসেছে ওই আবেদন। অথচ এ নিয়ে কোন অনুযোগ এক দিনের জন্যেও করে নি। নিজেকে পুরোপুরি গুটিয়ে এনেছে চারিধার থেকে। এ সংসারের পরিচর্য্যা করা ছাড়া যেন আর কোন পৃথক পরিচয় তার নেই। রাতে রুগ্ন ছেলেটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা কাঁদতে থাকে, আর শুকনো স্তন থেকে বুকের শেষ রক্তবিন্দুটিও বোধ করি শুষে নেয়; অথচ এর জন্যে কোন দিন এতটুকু বিরক্ত হতে দেখে নি। বরং ঘুম ভেঙে যাওয়ায় মাঝে মাঝে সে ধমক দিয়েছে প্রণতিকে, কিন্তু এটা ভাবে নি সারাদিন পরিশ্রম করে প্রণতি কি ভাবে এত ধকল সহ্য করে। রাতে বিশ্রাম না করে এত ভোরে উঠে আবার সংসারের কাজ করে যায় কেমন করে।

মাইনে পেয়ে বরুণ ভাবল, মায়ের জন্যে একখানা কাপড়, আর ছেলেটার প্যাণ্ট কিনে নেবে। আর কিনবে একটা ছাতা, নয়ত এ বর্ষাটা পার করা যাবে না। কিন্তু দোকানে এসে চমৎকার একটা বর্ষাতি দেখে বরুণের লোভ হয়। বর্ষাতি কেনার ইচ্ছে তার বহুদিন থেকে, টাকার অভাবে হয়ে উঠছে না। এইজন্য ছাতা কিনবে কিনবে করেও কেনে নি; কেননা তা হলে বর্ষাতি কেনা আর হবে না। আপিসে অসীম এসেছিল সুন্দর একটা বর্ষাতি গায়ে দিয়ে; অথচ তার চেয়ে মাইনে বেশী পায় না অসীম। ভাবল, একটা মাস না হয় এক রকম করে কাটিয়ে দেবে টেনে টুনে; এই সুযোগে না কিনলে পরে আর হয়ে উঠবে না। খানিকটা ইতস্ততঃ করে শেষ পর্য্যন্ত পঁয়ত্রিশ টাকা দিয়ে একটা কিনে ফেলল। টাকাগুলি গুণে দেবার সময় হাতটা বুঝি কেঁপে উঠল একবার; এত অভাবের মধ্যে অতগুলি টাকা সামান্য বিলাসে খরচ করে। বাকি জিনিষ কিনে, প্যাকেট দুটো নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

বাইরে টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ছে, হাওয়ার ঝাপটায় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে বৃষ্টির কণা। সিঁড়ির উপর একবার উঠে দাঁড়াল। বর্ষাতিটা গায়ে চাপিয়ে নিলে মন্দ হয় না; কিন্তু আজই পরে এটাকে ভেজাতে মন সরল না। ভাবল, নূতনের একটা মোহ আছে, যতটুকু সময় সেটাকে উপভোগ করা যায়। কিন্তু কতক্ষণে যে এ বৃষ্টি থামবে? মুখ বাড়িয়ে বাইরের দিকে তাকাল। বৃষ্টি ঝরছে একই ভাবে, কালো রাত্রির চেয়েও কালো রাস্তার বুকে রকমারি বিজ্ঞাপনের আলো এসে পড়েছে। বিভিন্ন রঙের সংমিশ্রণে, নূতন একটা রূপ নিয়েছে কলকাতা শহর। বরুণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। ইট-পাথরে গড়া এ যান্ত্রিক শহরটাকে এই প্রথম ভাল লাগল তার। আর সেই সঙ্গে ভাল লাগল, ওই কালো পথ ভিজিয়ে-দেওয়া বৃষ্টিটাকে।

বৃষ্টি ধরে আসতে, দোকানের আশ্রয় থেকে বেরিয়ে পড়ল বরুণ, এদিক ওদিক ঘুরে, আর কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস কিনে ফেলল

বাড়ী ফিরতে অন্য দিনের চেয়ে একটু দেরিই হয়ে গেল অথচ কত দিন আগে শোনা একটা গানের কলি, গুন্ গুন্ করে গাইতে গাইতে বরুণ ঘরে ঢুকল। মাঝখানে অনেক বছর ভুলে গিয়েছিল সে গান। প্রণতি একটু আশ্চর্য্য হয়েই তাকাল। প্যাকেট দুটো ওর হাতে দিয়ে বরুণ বলল, খুলে দেখ কি এনেছি।

প্যাকেট দুটো টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে প্রণতি বলল, দেখতো একটু, কুমারের জ্বর এসেছে হঠাৎ আবার।

বরুণের অসমাপ্ত গানের কলি গলার মাঝেই আটকে যায়, ভিজে জুতাজোড়া খুলে বিছানার কাছে এগিয়ে গেল।

বিছানার সঙ্গে লেপটে শুয়ে রয়েছে কুমার, বাসি ফুলের মত শুকিয়ে গিয়েছে ঠোঁট দুটো। মাত্র কয়েক ঘণ্টার জ্বরেই নেতিয়ে পড়েছে ছেলেটা, কপালে হাত দিয়ে দেখল, পুড়ে যাচ্ছে যেন। বরুণ ভাল করে তাকিয়ে দেখে, এইটুকু ছেলে, এরই মধ্যে চোখ দুটো বসে গিয়েছে কোটরে; দ্রুত নিঃশ্বাসের সঙ্গে উঠানামা করছে পাঁজরার দু'সারি হাড়। চেহারা দেখে কে বলবে ছ' বছরের ছেলে, শুকিয়ে-যাওয়া পাকানো চেহারা। উঠতি বয়সে পুষ্টিকর খাবার না পাওয়ার ফল। পুষ্টিকর খাদ্যের কথাটা মনে হতে বরুণের এত দুঃখেও হাসি পেল। কোনরকমে দু' মুঠো খেতে পেলেই যারা বেঁচে যায়, তাদের আবার খাদ্যবিচার?

বরুণকে দেখে কুমার বলল, আমার জন্তে প্যান্টের কাপড় এনেছ ত বাবা ?

—এনেছি।

—কৈ, দেখি। শুকিয়ে-যাওয়া ঠোঁটের ফাঁকে একটুকরো হাসি ফুটে উঠল। দেখাও না বাবা। আমি খুলে দেখব ? আনন্দের আতিশয্যে বিছানার উপর উঠে বসল।

—না রে তোকে উঠতে হবে না, তোর মা-ই দেখাবে।

প্রণতি ধমক দিয়ে উঠল, চুপ করে শুয়ে থাক ; বাড়ী ঢুকতে না ঢুকতেই জ্বালাতন করতে সুরু করেছিস। ভিজে জামা কাপড় ছাড়তে দে আগে।

বরুণ বাধা দিয়ে বলল, শুধু শুধু ওকে কেন বকছ, দেখাও না কাপড়টা।

তারপর বলল, কাপড়ের যা দাম আজকাল, কেনাই যায় না।

প্রণতি আর কোন কথা না বলে প্যাকেট দুটো খুলে ফেলল। বর্ষাতিটা দেখে ওর মুখটা ভার হয়ে উঠল, কাগজ সমেত ওটা এক পাশে রেখে দিল। অন্ত প্যাকেট থেকে প্যান্টের কাপড় বের করে কুমারের হাতে দিল। কাপড়ের ভেতর একটা সেন্টের শিশি দেখে জিজ্ঞাসা করল, এটা আনতে গেলে কেন ? আমি ত চাই নি ?

বরুণ একটু অপ্রতিভ ভাবে হেসে বলল, তোমার নেই কিনা, তাই আনলাম।

—টানাটানির সময় এমনি করে পয়সা নষ্ট করতে আমার ইচ্ছে হয় না ; তা ছাড়া এ সেন্ট আমার কোন কাজে লাগবে ? আর কিছু না বলে মায়ের জন্তে আনা কাপড়টা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

প্রণতি চলে যেতে, বর্ষাতিটার দিকে তাকিয়ে বরুণ নিজেকে অপরাধী মনে করতে লাগল। সত্যি, কি দরকার ছিল শুধু শুধু এতগুলো টাকা খরচ করে ওটা কেনবার। চার-পাঁচ টাকা দিয়ে একটা ছাতা কিনলেই বেশ চলে যেত। কিন্তু তবুও ভাবল, এ নিয়ে প্রণতির মুখ ভার করবার কি আছে ? বাড়তি টাকা যখন খরচ করেছে, তখন যে-কোন উপায়ে সামাল সে দেবেই। সেন্টের শিশিটা দেখে প্রণতি ভ্রূ কোঁচকাল কেন ? নিজে বর্ষাতি কিনেছে, তার বিকল্পে সেন্ট যদি কিনেই থাকে, তা নিয়ে এ ভাবে বলার প্রয়োজন সত্যি কি আছে ? অথচ এমন একদিন ছিল, যখন এই এক শিশি সেন্ট পেলে প্রণতির মুখ হাসিতে ভরে উঠত। স্নো-পাউডার বা অন্তান্ত প্রসাধনদ্রব্যের ওর প্রয়োজন হ'ত না, কিন্তু সেন্ট ওর চাই-ই। বরুণ ভাবল, প্রণতি হারিয়ে গিয়েছে সংসারের অনটনে, সেই সঙ্গে ওর হাসিটুকুও গ্রাস করেছে দারিদ্র্য। এর চেয়ে ট্র্যাজেডি আর কি হতে পারে জীবনে ?

বাবাকে ভাবতে দেখে কুমার মুখ তুলে গম্ভীর ভাবে বলল, মা টা যেন কেমন, না বাবা ? কেবল ঝগড়া করবে।

ছেলের কাছে নিজের অনুচ্চারিত মনের কথা ধরা পড়ে যেতে বরুণ লজ্জিত হয়, কুমারকে চুপ করাবার জন্তে বলল, ছিঃ, মাকে কি ও সমস্ত কথা বলতে হয় ?—কুমারের এত কথা চিন্তা করার সময় নেই, টেবিলটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ঐ কাগজে জড়ানো কি রয়েছে, বাবা ?

—বর্ষাতি।

—বর্ষাতি কি ?

—বর্ষাতি কি জানিস না ? বৃষ্টি পড়লে গায়ে দেয় ; জামা-কাপড় ভেজে না তা হলে।

—আমায় কিন্তু দিতে হবে ওটা।

বরুণ উত্তর দিল, আচ্ছা সে দেখা যাবে। এখন চুপ করে শুয়ে থাক।

অভাব যেন এ মাসে চার ধার থেকে ঘিরে ধরেছে। কথা বিশেষ বলে না প্রণতি, বরুণও চুপ করে থাকে। তবে দু'জনেই বুঝতে পারে এ স্নায়ুযুদ্ধের পরিণাম। প্রণতি যখন কথা বলে, তার প্রতিটি কথায় বরুণের ঘাড় নুয়ে আসতে চায়।

—চাল ফুরিয়ে গিয়েছে, আনার ব্যবস্থা কর এ বেলায়।

—বরুণ বলল, আচ্ছা, দেখা যাবে।

—সরষের তেল সেরখানেক অন্ততঃ আনতে হবে, আর সেই সঙ্গে কয়লাওয়ালাকে বলো, কয়লা দেবার কথা।

বরুণ চুপ করে শোনে। প্রণতি এমন অবুঝের মত ব্যবহার করলে সে আর কি করতে পারে। সংসারের অবস্থা কি প্রণতি জানে না ? কুমারের জন্যে ডাক্তারের খরচ যোগাতেই প্রাণান্ত, তার পর রোজই এই রকম লম্বা-চওড়া ফর্দ। কিছু বলতে গেলেই শোনাবে, নিজের জন্যে কিছুই সে করতে বলছে না, সংসারে যতটুকু প্রয়োজন তাই শুধু জানাচ্ছে। নিজের জন্যে এতটুকু বাড়তি খরচ যে সে করছে না, এটা প্রতি কথায় বুঝিয়ে দিচ্ছে। এদিকে ডাক্তার আবার কুমারের টাইফয়েড আশঙ্কা করছে, সে এক ভাবনা। অবশ্য বরুণ নিজেই স্বীকার করে, টাকা থাকলে ছেলের জন্যে এতটা চিন্তা সত্যিই হয়ত সে করত না, এখনও হয়ত ততটা করে না, যতটা চিন্তা করে টাকা যোগাড়ের। টাকা থাকলে আজ কি প্রণতি এত দূরে সরে যেত ? এটা বরুণ ভাল করেই বুঝেছে, যতই প্রেম বা ভালবাসা থাকুক, টাকা না থাকলে সব কিছুই উবে যেতে থাকে।

সে দিন শনিবার। বরুণ ঘরে বসে বসে ভাবছিল এই সমস্ত কথা এমন সময় প্রণতি ঘরে এল। কুমারের বিছানাটা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, ওয়াটারপ্রুফটা একটু দাও ত ঠাকুরপোকে।

বরুণ বলল, ওটা দিয়ে ওর আবার কি দরকার ?

—বাইরে যাচ্ছে, বৃষ্টি নামলে ভিজবে। তাই ঘরে যখন রয়েছে—

প্রণতিকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বরুণ বলল, ঘরে আছে বলেই দিতে হবে, এমন কোন কথা নেই। নবাবী করতে হয়, নিজের পয়সায় করতে বল।

অসভ্যের মত ওভাবে চীৎকার করছ কেন ? ভাল ভাবে কি কিছু বলতে পার না ? ছি, ঠাকুরপো শুনতে পেলে কি ভাববে

ধনো ত? ও ত চায় নি, রয়েছে বলেই আমি বললাম। বাড়ীতে একটা জিনিষ থাকলে, দরকারের সময় সবাই নেয়, সেজন্যে এ ভাবে কেউ চেঁচায় না।

বরুণ বলল, আমার জিনিষ, আমি কাউকে দেব না; তার জন্যে যার যা খুশি ভাবতে পার, আমি কোনকিছুই গ্রাহ্য করি না।

প্রণতি আর কিছু বলল না।

ওয়াটার-প্রুফটা ওই এক ভাবেই আছে, একবারও ব্যবহার করে নি বরুণ। অশান্তির কারণ জেনেও ওটাকে ফেরত দিতে পারছে না, ছোট হয়ে যাবে প্রণতির কাছে এই ভেবে। প্রণতি যদি হাসিমুখে অনুযোগ জানাত, আজই ফিরিয়ে দিয়ে আসত, কিন্তু সে ধার দিয়েও যায় না প্রণতি। সবচেয়ে বিশ্রী লাগে যে, ছেলেটাও বুঝতে পারে এই মনোমালিন্যের কথা। কি যে করবে কিছুই আর ভেবে পায় না। জোড়াতালি-দেওয়া সংসারে প্রণতি যদি অবুঝ হয়, কি করে সে সামলাবে সবকিছু? এক এক বার মনে করে, যেমন করেই হোক প্রণতির সমস্ত চাহিদা মেটাবে, তার জন্যে যদি মাথা বিকিয়ে দিতে হয়, তাও স্বীকার।

কিন্তু সংসারের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা মেটাতে মেটাতে প্রতিজ্ঞা বুঝি আর রাখতে পারে না। দোকানে টাকা বাকী পড়ছে, ডাক্তারও পাবে অনেক টাকা। যদি ক্লোরোমাইসেটিন কিনতে হয়, তার জন্যে টাকা লাগবে এক কাঁড়ি। কোথা থেকে যোগাড় করবে এত?

কুমারের বিছানার পাশে বসে বসে, আকাশ-পাতাল ভাবে বরুণ, কিন্তু কোন সমাধান খুঁজে পায় না।

বাবা!

কি রে? বরুণ ঝুঁকে পড়ে বিছানার উপর। ছেলেটার দিকে তাকানো যায় না, বিছানার সঙ্গে যেন মিশে গিয়েছে ক'দিনে।

আমি ভাল হয়ে যাবার পর বৃষ্টি হবে?

কেন হবে না? সমস্ত বর্ষাটাই তো রয়েছে। কিন্তু কেন রে?

একটু ইতস্ততঃ করে কুমার বলল, ওই জামাটা গায়ে দিয়ে বৃষ্টিতে ঘুরব। একটুও জল লাগবে না গায়ে, তাই নয়?

বেশ ত। ভাল হয়ে, নিশ্চয়ই পরবি।

এতগুলো কথা একসঙ্গে বলে শ্রান্তিতে আবার নেতিয়ে পড়ে ছেলেটা। কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বরুণের চোখ জ্বালা করে ওঠে। অক্ষম বাপের বোবা কান্নাও শুকনো চোখে জমা হতে থাকে। একে প্রকাশ করা চলে না, চেপে রাখাও প্রাণান্তকর। ছেলেমানুষের মত চীৎকার করে কিছুক্ষণ কাঁদতে পারলে বোধ হয় হাল্কা হ'ত জমাট-বাঁধা বুকের বোঝা। যতই সে ছোট হোক প্রণতির কাছে, ছেলের চেয়ে কিছুই বড় নয়। বরুণ স্থির করল, বর্ষাতিটা আজই ফিরিয়ে দিয়ে টাকা নিয়ে আসবে। দরকার হলে কালই দেবে ক্লোরোমাইসেটিন।

হাত মুখ ধুতে বাইরে গেল বরুণ। চোখে পড়ল পাশের ঘরে সুর করে লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়ছে প্রণতি। ঘিয়ের ছোট্ট প্রদীপটার পাশে বসে ছোট ছেলেটাকে কোলে করে মা শুনছেন। হঠাৎ এ ছবিটা বড় ভাল লাগল বরুণের। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখল, তারপর নিঃশব্দে সরে গেল। আজ এই মুহূর্তে বরুণ আবিষ্কার করল—প্রণতি শুধু তার একার নয়, প্রণতি সমস্ত সংসারের। একান্ত করে তাকে পেতে চেয়ে যে আঘাত সে পেয়েছে, তার জন্যে এতটুকু দোষ নেই প্রণতির।

ঘরে এসে জামা কাপড় পরে, বর্ষাতিটা একটা কাগজে জড়িয়ে নিল। আর ভুল সে করবে না।

কুমার জেগেই ছিল। বর্ষাতিটা নিতে দেখে জিজ্ঞাসা করল, ওটা নিয়ে কোথায় যাচ্ছ বাবা? গায়ে দেবে না?

উত্তরটা এড়িয়ে যাবার জন্যে বরুণ বলল, বাইরে যাচ্ছি, তোর জন্যে কি আনতে হবে বল।

হাতের ইশারায় কাছে ডেকে, চুপি চুপি বলল, আপেল এনো। কেউ যেন দেখতে না পায়।

বরুণ হেসে বলল, আচ্ছা, তাই হবে।

কুমারের মুখের উপর কিসের যেন একটা ছায়া পড়ল। ফিস ফিস করে বলল, ওটা আবার নিয়ে আসবে ত?

বরুণ ওর মুখের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে উত্তর দিল, এটা ত তোর গায়ে হবে না। ভাল হলে নূতন একটা কিনে দেব কেমন?

ঘর থেকে বের হতে প্রণতি ডাকল, শোন।

কি? বরুণ ওর দিকে তাকাল।

সত্যি কথা বলবে?

বরুণ হাসিমুখে বলল, কেন, মিথ্যে বলি নাকি কথায় কথায়?

বর্ষাতিটা বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছ?

হাঁ। কাজে লাগছে না ত কোন।

থাক। ওটা বিক্রি করতে পারবে না।

কেন? বরুণ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

এমনি বলছি। তারপর নিজের হাত থেকে এক গোছা চুড়ি খুলে বরুণের হাতে দিয়ে বলল, এটা নিয়ে যাও।

না না, এ হয় না। একটা নূতন কিছু তৈরি করতে পারি না, আর ওটা কি না বিক্রি করব। তা ছাড়া এটা ত আমার কোন কাজে লাগছে না।

বরুণের হাত থেকে বর্ষাতিটা নিয়ে প্রণতি বলল, তুমি দেনায় ডুবতে বসেছ, আর আমার চুড়ি না পরলে চলবে না? সময় এলে আবার গড়িয়ে নেব। যাও, তাড়াতাড়ি বাড়ী এসো।

বরুণ একদৃষ্টে প্রণতির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আবার নূতন করে যেন আবিষ্কার করছে প্রণতিকে। ঘরের আবছা আলোতেও ওর সিঁথির সিঁদুর স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পরমুহূর্তেই বরুণ দু'হাতে বুকের মাঝে টেনে নেয় প্রণতিকে।

ঘরের ভেতর থেকে কুমার ডাকে, মা!

যাই রে। বরুণের বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে লঘু পায়ে ঘরে গিয়ে ঢোকে।

বাইরে কিছুক্ষণ আগে নামা ঝিরঝির বৃষ্টিটা থেমে যায়।

শ্রীচৈতন্যদেব ও রায় রামানন্দের মিলন-স্থান—জগন্নাথবল্লভ উদ্যান

আলালনাথ

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

পুরী হইতে সমুদ্রতীর দিয়া দক্ষিণে যাইতে প্রায় ছয় ক্রোশ দূরে 'ব্রহ্মগিরি' বা 'আলালনাথ' নামক এক সুপ্রাচীন তীর্থস্থান আছে। কথিত আছে, এই স্থানে ব্রহ্মা সত্যযুগে ভগবান বিষ্ণুর উপাসনায় মগ্ন ছিলেন। ব্রহ্মার তপস্যার ক্ষেত্র বলিয়া এই স্থানের নাম 'ব্রহ্মগিরি' হইয়াছে।

আচার্য্য শ্রীরামানুজের বহুপূর্ব্ব হইতেই বহু সিদ্ধ মহাপুরুষ দক্ষিণ দেশে অবতীর্ণ হইয়া জগতে হরিভক্তির কথা প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রী-সম্প্রদায়ের ইতিহাস-লেখক অনন্তাচার্য্য তাঁহার 'প্রপন্নামৃত' গ্রন্থে দ্বাদশ জন পূর্ব্ব দিব্যসূরির১ কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই দিব্যসূরি অর্থাৎ ভগবৎ-পার্ষদগণকে তামিল ভাষায় 'আলোয়ার্' বা 'আলবার্' বলা হয়।

ব্রহ্মার ভজনসিদ্ধি-স্থান ব্রহ্মগিরি নির্জনতা ও পবিত্রতায় নারায়ণ-উপাসনার বিশেষ অনুকূল বলিয়া দক্ষিণদেশের কতিপয় দিব্যসূরি বা আলোয়ার্ এই স্থানে চতুর্ভুজ নারায়ণ-মূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক পাঞ্চরাত্রিক বিধিমতে অর্চ্চাবতারের পূজা করিয়াছিলেন। 'আল্বার্' বা আলোয়ার্গণের 'নাথ' বা প্রভু বলিয়া নারায়ণ 'আল্বার্নাথ' বা 'আলোয়ারনাথ' নামে খ্যাত হন এবং ব্রহ্মগিরির কিয়দংশ আলোয়ারনাথের নামানুসারে 'আল্বার্ পত্তনম্', 'আলার পাটনা', 'আলার্পুর', 'আল্বার্পুর' প্রভৃতি নামে অদ্যাপি খ্যাত রহিয়াছে। 'আল্বার্নাথ' বা 'আলোয়ারনাথের' অপভ্রংশই 'আলালনাথ'।

আলোয়ার বা দিব্যসূরিগণের দ্বারা আল্বার্নাথ অর্চ্চিত হইবার পর দক্ষিণদেশের 'কোমা' ব্রাহ্মণগণের হস্তে আল্বার্নাথের পূজা ন্যস্ত হয়। দক্ষিণদেশ হইতে বার শত ঘর কোমা-ব্রাহ্মণ ব্রহ্মগিরিতে আসিয়া বাস করেন এবং পর্য্যায়ক্রমে আল্বারনাথের সেবা করিতে থাকেন। কিন্তু সেবাপরাধের জন্য বার শ' ঘর ব্রাহ্মণই একে একে বিনষ্ট হইয়া যান। তাঁহাদের বংশে আর কেহ রহিলেন না। এই সময়ে আলবারনাথ পুরীর রাজা পুরুষোত্তমদেবকে স্বপ্ন প্রদান করিয়া অন্য ব্রাহ্মণ দ্বারা সেবার বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। মহারাজ পুরুষোত্তমদেব ব্রহ্মগিরিতে দুই ঘর বশিষ্ঠগোত্রীয় এবং এক ঘর ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিলেন। ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ আল্বার্নাথের অর্চ্চনকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন এবং বশিষ্ঠ গোত্রীয়েরা শৃঙ্গার ও রন্ধনাদির জন্য নির্দ্দিষ্ট হইলেন। এই তিন ঘর ব্রাহ্মণ হইতে বর্ত্তমানে ক্রমশঃ ত্রিশ ঘর বা ততোধিক পাণ্ডা ব্রাহ্মণের বিস্তার হইয়াছে। ইহারাই বর্ত্তমানে আলালনাথের

১ কাসার-ভূত-মহদাহ্বয়-ভক্তিসারাঃ, শ্রীমচ্ছঠারি-কুলশেখর-বিষ্ণুচিত্তাঃ।
ভক্তাঙ্ঘ্রি রেণু মুনিবাহ-চতুষ্কবীন্দ্রাস্তে দিব্যসূরয় ইতি প্রথিতা দশোর্ব্ব্যাম্॥
গোদা-যতীন্দ্রমিশ্রাভ্যাং দ্বাদশৈতান্ বিদুর্বুধাঃ॥
বিস্বজ্য গোদাং মধুরকবিনা সহ সত্তম।
কেচিদ্ দ্বাদশসংখ্যাতান্ বদন্তি বিবুধোত্তমাঃ॥
—প্রপন্নামৃতম্ ৭৪।১৫।১৭,

চিহ্ন' বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে তদুপরি একটি মন্দিরও নির্ম্মিত হইয়াছে। আলালনাথ বিগ্রহের সম্মুখে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু পুনঃপুনঃ সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন, তাহাতে কঠিন প্রস্তরও গৌরসুন্দরের অঙ্গস্পর্শে বিগলিত হইয়া ঐরূপ চিহ্নযুক্ত হইয়াছে।

আলালনাথের মন্দিরের সংলগ্ন উত্তর-পূর্ব্ব কোণে 'ব্রহ্মগৌড়ীয়-মঠ' অধিষ্ঠিত। মঠের শেষ সীমায় একটি বৃহৎ পুষ্করিণী। ইহাকে গৌড়ীয়গণ রাধাকুণ্ড বলেন। এই স্থানে মহাপ্রভু বিশ্রাম করিতেন।

শ্রীরামানুজাচার্য্য

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ১৪৩২ শকাব্দে প্রথম বার ব্রহ্মগিরিকে স্বীয় পাদপদ্মপরাগে বিভূষিত করেন। তাঁহার আলালনাথ বিজয়েচ্ছার পাঁচটি হেতু দৃষ্ট হয়—

(১) অনবসরকালে জগন্নাথ দর্শন না পাইয়া; যথা—

অনবসরে জগন্নাথ না পাঞা দরশন।
বিরহে আলালনাথ করিলা গমন।
গোপীভাবে বিরহে প্রভু ব্যাকুল হঞা।
আলালনাথে গেলা প্রভু সবারে ছাড়িয়া।৩

(২) ভক্তগণের প্রতি বিমনা হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়া, পরমানন্দপুরী যখন প্রভুর নিজ-পার্ষদ ছোট হরিদাসকে ক্ষমা করিবার জন্য মহাপ্রভুর নিকট আবেদন জানাইলেন, তখন মহাপ্রভু জীবশিক্ষার্থ বলিলেন,

৩। চৈ চ ১।১২২, ম ১১।৬৩

মোরে আজ্ঞা হয়, মুঞি যাঙ আলালনাথ।
একলে রহিব তাহাঁ গোবিন্দমাত্র সাথ।৪

(৩) যখন ভবানন্দ রায়ের আত্মজ গোপীনাথ পট্টনায়ক রাজবিত্ত নষ্ট করায় রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন গোপীনাথ পট্টনায়কের উদ্ধারের জন্য মহাপ্রভুকে রাজার নিকট আবেদন করিতে বলায় মহাপ্রভু বিরক্তি প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন,

আলালনাথ যাই, তাহাঁ নিশ্চিন্তে রহিমু।
বিষয়ীর ভালমন্দ বার্ত্তা না শুনিমু।৫
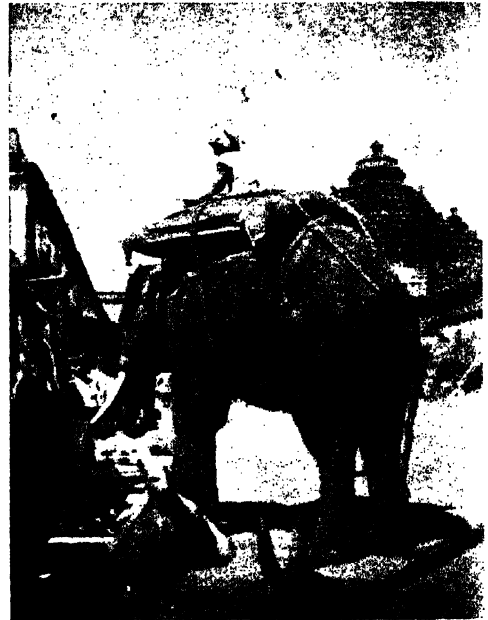
পুরী হইতে আলালনাথের পথে পুরীরাজের হস্তী

(৪) দাক্ষিণাত্য যাত্রার সময় শ্রীমন্‌মহাপ্রভু আলালনাথ হইয়া গিয়াছিলেন এবং নিত্যানন্দপ্রভু ও অন্যান্য ভক্তগণ আলালনাথ পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর অনুব্রজ্যা করিয়াছিলেন। আলালনাথে আসিয়া মহাপ্রভু চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দর্শনে অধিকতর বিরহে উৎক্ষিপ্ত হইয়া অত্যন্ত প্রেমাবেশে নৃত্যগীত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মগিরিবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা এইরূপ মহাপুরুষের দর্শনার্থ মন্দিরের নিকট আগমন করিয়া প্রভুর দর্শনমাত্রে হরিনামের রোল তুলিয়াছিলেন। মহাপ্রভু পুলকাশ্রু-কম্প-স্বেদ-ভূষণে ভূষিত হইয়া ভক্তগণের সহিত ব্রহ্মগিরি

৪। চৈ, চ, ২।১৩২ ; ৫। চৈ চ ৯।৯৩

(৫) দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালেও মহাপ্রভু আলালনাথ হইয়া নীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন।

বাসীদের মণ্ডলীমধ্যে নৃত্য করিয়াছিলেন। লোকসংঘট্ট এবং তাঁহাদের মহাপ্রভুকে ছাড়িতে অনিচ্ছা দেখিয়া নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে মাধ্যাহ্নিক করাইবার ছলে মন্দিরাভ্যন্তরে লইয়া গিয়াছিলেন। এদিকে মন্দিরের বহির্দ্দেশে মহাপ্রভুর দর্শনার্থ বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল এবং সকলে হরিনামের কলরব তুলিয়া প্রভুর দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন। মহাপ্রভু সেই প্রদেশের লোকসমূহের আর্ত্তি দর্শন করিয়া দ্বার উন্মোচন করাইলেন। তখন সমস্ত লোক মহাপ্রভুকে প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিতে লাগিল। এই প্রকারে মহাপ্রভু ব্রহ্মগিরিবাসিগণকে সমস্ত দিবসব্যাপী দর্শনদান করিয়া তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন এবং তথায় ভক্তগণের সহিত কৃষ্ণকথায় সেই রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা সপ্তম পরিচ্ছেদে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আলালনাথে আসি কৃষ্ণদাসে পাঠাইল।
নিত্যানন্দ আদি নিজগণে বোলাইল।৬

ব্রহ্মগিরি বা আলালনাথ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃষ্ণান্বেষণ-লীলা-পরাকাষ্ঠার স্থান বলিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরম প্রিয় এবং ভগবৎ-সেবা উদ্দীপনের বিশেষ অনুকূল স্থানরূপে বিবেচিত হইয়াছে। নবদ্বীপের স্মার্ত্তগণ যখন মহাপ্রভুর বিরোধী হইয়া উঠিলেন, তখন মহাপ্রভু তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে থাকিবার জন্য সন্ন্যাসলীলা আবিষ্কারান্তে নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে আসিলেন। আবার নীলাচলে আসিয়া যখন ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভুর কলহাদি হইত, তখন তিনি নীলাচল হইতে আলালনাথে যাইতেন। সুতরাং আলালনাথ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় সন্ন্যাসলীলার বা দ্বিগুণ সম্বর্দ্ধিত বিপ্রলম্ভের স্থান।

বেণ্টপুর

আলালনাথের অনতিদূরে রায় রামানন্দের আবির্ভাবক্ষেত্র বলিয়া কথিত 'বেণ্টপুর' নামক স্থান। এখনও সেই স্থানে তদানীন্তন সমৃদ্ধির কিছু কিছু নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। পুরী হইতে আলালনাথের মন্দিরে উপনীত হইবার প্রায় এক মাইল বাকী থাকিতে দুই পার্শ্বে প্রাচীন ভগ্নাবশেষের স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কপিলেশ্বরদেবের দুর্গের বিস্তৃত ভগ্নাবশেষ-স্তূপ এখনও পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিছুকাল পূর্ব্বে বেণ্টপুর-নিবাসী শ্রীযুত রাধামোহন পট্টনায়ক মহাশয় তথায় একটি পুষ্করিণী খনন আরম্ভ করাইলে কয়েকটি প্রাচীন প্রস্তরখণ্ড ও কতকগুলি কড়ি পাইয়াছিলেন। তিনি বলেন, "এই বেণ্টপুরেই শ্রীগৌরপার্ষদ রায় রামানন্দ আবির্ভূত হন; তবে তাঁহার জন্মভিটা এখন লুপ্ত।"

৬ চৈ. চ' ম।৭।৬৮

চন্দনপুকুর, পুরী

পট্টনায়ক মহাশয় নিজেকে রায় ভবানন্দের অন্যতম আত্মজ গোপীনাথ পট্টনায়কের (যাঁহাকে বড় জানা বা প্রতাপরুদ্রদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র চাঙ্গে চড়াইয়াছিলেন—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, নবম পরিচ্ছেদ) বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহার কথিত বিবরণ অনুসারে ভবানন্দ রায়ের অন্যতম পুত্রই গৌরপার্ষদ শিখিমাহিতি। শিখিমাহিতির ভগিনী মাধবী দেবী। মাধবী দেবী বেণ্টপুরে গোপীনাথ বিগ্রহ প্রকাশ করেন। তদনুসারে বেণ্টপুরের সংলগ্ন স্থান 'গোপীনাথপুর' নামে খ্যাত হইয়াছে। 'মুগলবন্দী'র ১ নং তৌজি 'বেণ্টপুর' ও ২ নং তৌজী 'গোপীনাথপুর' আলালনাথ বা ব্রহ্মগিরির দিকে যাইবার পথে প্রায় এক মাইল থাকিতে ডান দিকে একটি পদ্মশোভিত সরোবর দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সরোবরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামই গোপীনাথপুর। গোপীনাথপুরে অদ্যাপি 'শ্রীগোপীনাথ' নামক রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তি ও গৌর-নিত্যানন্দ বিগ্রহ অধিষ্ঠিত আছেন। স্থানীয় অধিবাসিগণের প্রদত্ত বিবরণানুসারে মাধবী দেবীর প্রতিষ্ঠিত শৈলী গোপীনাথ-মূর্ত্তি (যুগল বিগ্রহ) বর্ত্তমানে গুপ্ত হইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই ঠাকুরবাড়ীতে কৃষ্ণচরণ দাস নামক এক মহান্ত ছিলেন। কোন কারণবশতঃ তিনি সেবা হইতে বিচ্যুত হইলে গ্রামবাসীরা পুরীর রাধাকান্ত মঠের তদানীন্তন মহান্ত রাধাকৃষ্ণ দাসজীকে উক্ত সেবা প্রদান করেন। তদবধি এই মঠ পুরীর রাধাকান্ত মঠের তত্ত্বাবধানে আছে। ঐ ঠাকুরবাড়ীতে মাধবী-মাতার পরবর্ত্তী সাত জন সেবায়েত মহান্তের সমাধি আছে।

শ্রীযুত রাধামোহন পট্টনায়ক মহাশয় বলেন, এই গোপীনাথের সেবা শিখিমাহিতির ভগিনী মাধবী দেবীর দ্বারাই যে প্রতিষ্ঠিত, তাহা বংশতালিকা হইতে প্রমাণিত হয়। মাধবী দেবী 'পুরুষোত্তম-দেব নাটক' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সেই পুথিখানি রাধামোহনের নিকটেই ছিল। তিনি তাহা কটকস্থ র‍্যাভেন্‌শ কলেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুত আর্ত্তবল্লভ মহান্তি

পুরী হইতে আলালনাথের পথে লোকনাথ-কুণ্ড

মহাশয়কে প্রদান করিয়াছেন বলিয়া আমাদিগকে জানাইলেন। রায় রামানন্দের হস্তলিখিত 'টীকা-পঙ্ক' নামক একটি পুথিও তাঁহার নিকটে ছিল। সেই পুথিখানিও রাধামোহন বাবুর আত্মীয় এবং বেণ্টপুর নিবাসী শ্রীযুত প্রাণনাথ মহান্তি মহাশয় উক্ত আর্ত্তবল্লভ মহান্তিকে প্রদান করিয়াছেন।

রাধামোহন বাবুর কথিত বিবরণ হইতে আরও জানা যায়, গোপীনাথ পট্টনায়ক হইতে তাঁহাদের যে বংশলতা-সম্বলিত প্রাচীন তালপত্রের পুথি ছিল, তাহা তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত পদ্মচরণ পট্টনায়ক মহাশয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীকে প্রদান করিয়াছিলেন। 'নোয়াগা' প্রভৃতি স্থানে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের যে সকল ভূসম্পত্তি ছিল, তাহা এখন এমার-মঠের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের গৃহে উড়িয়া অক্ষরে হস্তলিখিত অনেক প্রাচীন পুথি ছিল; তাহাও কালক্রমে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ঘন-মহান্তি ১১৫৮ 'দিল্লীশ্বরাব্দে' জীবিত ছিলেন—ইহা কটক জজকোর্টে হরিচরণ পট্টনায়কের একটি আপীলের সার্টিফায়েড কপি হইতে প্রমাণিত হয়। রাধামোহন বাবু ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শীলমোহরযুক্ত একটি দলিল আমাদিগকে দেখাইয়াছিলেন। ঘন-মহান্তির তিন পুত্র—(১) উত্তরেশ্বর মহান্তি, (২) বৈষ্ণবচরণ মহান্তি ও (৩) হরিচরণ মহান্তি। হরিচরণ 'পট্টনায়ক' উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছিলেন এবং তিনি ১২৪৯ 'দিল্লীশ্বরাব্দে' জীবিত ছিলেন। হরিচরণ পট্টনায়ক পৌত্র কুলমণিকে দত্তক-পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই কুলমণির পুত্রই পদ্মচরণ পট্টনায়ক। বৈষ্ণব চরণের পুত্র ভাগবতচরণ। তাঁহার তিন পুত্র—(১) মাগুনি হরিচন্দন, (২) কুলমণি ও (৩) যদুমণি পট্টনায়ক। যদুমণির পুত্র নটবর। নটবরের পুত্র শ্রীরাধামোহন পট্টনায়ক।

কেহ কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ভবানন্দ ও রায় রামানন্দের আবির্ভাব-স্থানের প্রতি প্রীতি-নিবন্ধন তন্নিকটবর্ত্তী আলালনাথে আগমন করিতেন। কিন্তু প্রকাশিত বৈষ্ণব সাহিত্যে 'বেণ্টপুর' সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। কেহ কেহ 'বেঙ্কট-পুর' বা বৈকুণ্ঠপুরের অপভ্রংশ হইতে 'বেণ্টপুর' নামের উৎপত্তি অনুমান করেন। আলবারপুর বা আলালনাথের সন্নিকটে 'বেঙ্কটপুর' নামক স্থানের অবস্থিতি কিছু আশ্চর্য্য নহে। 'বেঙ্কট' শব্দটি আল্-বারগণের প্রিয় শব্দ। বর্ত্তমান বেণ্টপুর ও গোপীনাথপুর গ্রাম পাশাপাশি অবস্থিত।

শ্যামলী মেয়ে

শ্রীগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

তুমি ত পদ্মিনী নও, মৎস্যগন্ধা তুমি নও মেয়ে।
তবু কি মদির ঘ্রাণ পাই যে তোমাকে কাছে পেয়ে।
মুখে মধু মহুয়ার, দেহে দেবদারুর নিঃশ্বাস,
শালের মঞ্জরী হাতে, বুকে সিক্ত দূর্ব্বার সুবাস;
শাড়ীতে শাপলা-গন্ধ, দু'কানে কনকচাঁপা ফুল;
সর্ব্বাঙ্গে মাটির-গন্ধ লেগে-থাকা ঝরানো বকুল;
মৃন্ময়ীর কণ্ঠে ঢালা জীবনের সুধার উচ্ছ্বাস;
তোমার-লাবণ্যে আছে সোনালি শস্যের ইতিহাস।

তুমি বাঙলার মেয়ে। তোমার তনুর শ্যামলিমা
আমাকে বিমুগ্ধ করে; এখানেই খুঁজে পায় সীমা
আমার অভীপ্সা, তৃষ্ণা; তোমাকেই তাই দেবী ভাবি;
তুমিই পুরাতে পার জীবনের শ্রেষ্ঠতম দাবি
জীবনের,—পায়ে না বা অন্য কেউ। বহির্মুখী মন
যদি না সংযত হয়, তোলো তুমি তৃতীয় নয়ন।

শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্

শ্রীমীরা দেবী

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
নর্ক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয় ।"

শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দের আদি শ্লোকে অপূর্ব্ব শব্দ-ঝঙ্কার! পাঠক এবং শ্রোতার সমস্ত অন্তঃকরণে এক মধুর ভাবের হিল্লোল তোলে। মেঘাচ্ছন্ন অম্বর, তাহার গাম্ভীর্য্য, আসন্ন প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ—সেই আকাশতলে মেঘান্ধকারে তমালবৃক্ষের ঘনতর ছায়া যেন নেত্র-সমক্ষে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

কবি জয়দেব যে কোমলকান্ত পদাবলী সৃজন করিলেন, তাহাতে সে যুগের কাব্যকলার প্রসারের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। মহারাজ লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় কবি উমাপতিধর, আচার্য্য গোবর্দ্ধন, কবিরাজ ধোয়ী এবং শরণ প্রভৃতি সে যুগে বিচিত্র কবিপ্রতিভার পরিচয় দিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কাব্যের প্রয়াস বহুল আড়ম্বর এবং শব্দঝঙ্কার শ্রোতার চিত্তকে সাময়িক ভাবে অধিকৃত করিত ইহা সত্য, কিন্তু প্রকৃত রসাত্মক কাব্যই যথার্থ সাহিত্যপদবাচ্য হইতে পারে। স্বকীয় দৈবী প্রতিভা বলে কবি জয়দেব সম্যক্‌রূপে ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। রচনায় ভাব এবং রসই মুখ্যতম, একমাত্র উহা দ্বারাই পাঠক-সাধারণের অন্তর জয় করা সম্ভব; রসপিপাসু ও ভক্ত সাধককে প্রকৃত আনন্দদান উহাই করিতে পারে, কবি যেন দিব্যদৃষ্টিতে এ কথাটি বুঝিয়াছিলেন। তাই কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে সেন-রাজসভাকবিদের কবিতার খণ্ডাংশ আজ কোথাও কোথাও কচিৎ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু অমর কাব্যগীতি গীতগোবিন্দ আজিও সাহিত্য-রসপিপাসু নরনারী এবং ভক্তবৃন্দের অন্তরে চির আদরণীয় হইয়া আছে। ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু এই কাব্যটির একজন প্রকৃত বোদ্ধা ছিলেন, তিনি ইহার মধুর রসকে একান্ত আগ্রহভরে আস্বাদন করিতেন।

"বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তর সৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্য গোবর্দ্ধন
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ।"

ইহা স্বরচিত কাব্য বিষয়ে জয়দেবের গর্ব্বোক্তিমাত্র নহে, ইহাতে প্রকৃতই রসিকচিত্তের প্রকৃষ্ট পরিচয়ও আছে। গীতগোবিন্দের প্রতিটি শ্লোকে যে অপূর্ব্ব রসমাধুরী, শব্দঝঙ্কার, ভাব-মূর্চ্ছনার প্রকাশ, তাহা বিশ্বসাহিত্যের আসরেও বিরল।

গীতগোবিন্দের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের যে বিচিত্র প্রণয়লীলার বিবরণ বর্ণিত, বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাহা নিতান্ত প্রাকৃত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পরম ভক্ত এবং সাধক জয়দেব অন্তরের সবটুকু প্রেম ঢালিয়াই এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সাধারণ মানুষের মানদণ্ডে গীতগোবিন্দের গভীর আধ্যাত্মিক গূঢ়ার্থ ধরা পড়ে না, কিন্তু প্রেমময় মহাপ্রভু ইহার গভীরতা অন্তর দিয়া অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই উহার যথার্থ অধ্যাত্ম মূল্য দিয়াছিলেন। এই প্রেমলীলা যে অনন্ত প্রকৃতির সঙ্গে অনাদি পুরুষের নিত্যলীলা তাহা গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটিই নির্দ্দেশ করিয়া দেয়:

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ
নর্ক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ।"

"হে রাধিকে! নভোমণ্ডল নিবিড় জলদজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, বনভূভাগও শ্যামল তমাল তরুনিকরে অন্ধকারময়, শ্রীকৃষ্ণ অতীব ভীত, নিশাভাগে একাকী গমনে সমর্থ হইবেন না, সুতরাং তুমি ইঁহাকে আপনার সমভিব্যাহারে লইয়া গমন কর। নন্দকর্ত্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া বৃষভানুনন্দিনী রাধিকা হরি সমভিব্যাহারে পথপ্রান্তবর্ত্তী কুঞ্জবীথির অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন এবং কালিন্দীকূলে সমুপস্থিত হইয়া মনঃসুখে কেলি আরম্ভ করিলেন।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে রাধাকৃষ্ণের স্বরূপকে একটি কাহিনীতে উদঘাটিত করা হইয়াছে। বর্ষার এক নিবিড় রাত্রে সন্ত্রস্ত শ্রীকৃষ্ণকে নন্দ শ্রীমতী রাধার হস্তে অর্পণ করেন। নন্দ শ্রীমতী এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সেইজন্য তাঁহাকেই বালকরূপী শ্রীকৃষ্ণকে গৃহে লইয়া যাইবার ভার অর্পণ করিলেন। কবি জয়দেবও তাঁহার অমর কাব্যে সুগভীর আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনাটি প্রকটিত করিবার জন্যই এই কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়া কাব্যের আদি শ্লোকটি রচনা করেন

কৃষ্ণ যে পরমপুরুষ তাহা সাধক জয়দেব অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অন্যান্য দেবতারা যে তাঁহারই অংশ সে ইঙ্গিত তিনি তাঁর কাব্যে দিয়াছেন। বৈষ্ণব-সাধনার এই পরম রহস্য এবং চরম বাক্যটি "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—জয়দেব গোস্বামীর কাব্যে হেতু প্রধানতমরূপে স্থান লাভ করিয়াছে। তিনি তাঁর দশাবতার-স্তোত্রে বিশ্বসৃষ্টির প্রত্যেক স্তরে প্রত্যেকটি রূপের বন্দনা করিয়া অবশেষে দশরূপধারী শ্রীকৃষ্ণকেই প্রণাম নিবেদন করিয়াছেন।

বিশ্বজগৎ যাঁহাকে নিরন্তর অনুসন্ধান করিতেছে, যাঁহার মুহূর্ত্ত দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ত্রিভুবন ব্যাকুল; যোগী, ঋষি, মুনির যিনি পরম সাধনার বস্তু, তিনিও রাধার প্রেমে বিবশ, রাধা-বিরহে তিনিও পাগল হইয়া উঠেন। এই যে নূতন ভাবের পরিচয় দিলেন জয়দেব গোস্বামী, উহাই পরবর্ত্তী যুগে বৈষ্ণবকাব্যের ও বৈষ্ণবসাধনার

প্রধানতম রূপ ও বিষয় হইয়া উঠিল। ভগবান অকৃত্রিম প্রেমের ও ঐকান্তিক ভক্তির আকর্ষণ হইতে আপনাকে বিযুক্ত রাখিতে পারেন না। তিনি অনিরূপ্য স্বরূপ বাক্যমনের অগোচর হইলেও প্রেমময়, তাই প্রেমাকর্ষণে তিনি ভক্তচিত্তে নিজে আসিয়া ধরা দেন। প্রেমের দিব্য রূপ, লৌকিকের মধ্যে অলৌকিকত্ব, পার্থিবের মধ্যে অপার্থিবকে জয়দেব গোস্বামী লোকলোচনের সমক্ষে প্রতিভাত করিয়া তুলিলেন। তিনি দেখাইলেন ভক্তির প্রভাব, ভক্তের প্রাধান্ত যাহাতে কেশব শত শত গোপিকাবেষ্টিত হইয়াও শ্রীমতী-বিহীন রাসকুঞ্জে অবস্থান করিতে পারেন না। চৌম্বকাকৃষ্ট লৌহ-খণ্ডবৎ তাঁহাকেই অনুসরণ করিতে বাধ্য হন।

শ্রীমতী আপনার হৃদয়ের প্রেমাকুতি দিয়া অনুভব করেন :

"সাকূতস্মিতমাকুলাকুলগলদ্ধম্মিল্লমুল্লসিত
ভ্রূবল্লীকমলীকদর্শিতভুজামূলার্দ্ধদৃষ্টস্তনং।
গোপীনাং নিভৃতং নিরীক্ষ্য গমিতাকাঙ্ক্ষশ্চিরং চিন্তয়
ন্নন্তর্মুগ্ধ মনোহরং হরতু বঃ ক্লেশং নবঃ কেশবঃ।"

"গোপীরা যতই হাস্তরসে উচ্ছসিত হউক, যতই প্রেমকটাক্ষে উল্লসিত হউক, শিথিল কেশপাশ বাঁধিবার ছলে যতই অর্দ্ধপ্রকটিত কুচকুম্ভ প্রদর্শিত করুক না কেন, আমি জানি মাধবের অন্তরে শ্রীরাধা চিরাধিষ্ঠিতা। আমাদের মনোহর সেই কেশব নিখিলের দুঃখ দূর করুন।"

শ্রীরাধার প্রেমের ব্যাকুলতা, তাঁহার বিরহবেদনা কবি যে-ভাবে বর্ণনা করিলেন তাহা চৈতন্তচরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডের কয়েকটি পরিচ্ছেদ আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয়। শ্রীকৃষ্ণবিরহে দিব্যোন্মাদ মহাপ্রভুর যে বিবরণ আমরা পাই, দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন সাধককবি শ্রীরাধার সেই অবস্থাই বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীরাধার অবস্থা মেঘ-দূতের বিপ্রলব্ধা যক্ষবধূকে স্মরণ করায় না, ঈশ্বরপ্রেমিক ভক্তসাধকের কথা মনে করাইয়া দেয়। কৃষ্ণবিরহে রাধা পরমভক্তের মতই ইষ্টদেবের নাম জপ করিতেছেন। কথনও প্রলাপ, কথনও মূর্চ্ছা প্রভৃতি নানা সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইতেছে।

'হরিরিতি হরিরিতি জপতি স কামম।
বিরহ বিহিতমরণের নিকামম্।

* * *

সা রোমাঞ্চতি শীৎকরোতি বিলপত্যুৎকম্পতে তাম্যতি
ধ্যায়ত্যুদ্ভ্রাম্যতি প্রমীলতি পতত্যুদযাতি মূর্চ্ছত্যপি।"

"বিরহের হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্ত মরণই মঙ্গল ভাবিয়া তিনি তোমাকে পাইবার কামনায় অনুক্ষণ হরি হরি জপ করিতে-ছেন। * * তিনি কোন সময়ে পুলকিত হইয়া উঠিতেছেন, কথন-বা শীৎকার করিতেছেন, কোন সময় বা অনুতাপে নিমগ্ন হইতে-ছেন, কথন কম্পিত হইতেছেন, কোন সময়ে দুঃসহ ক্লেশ অনুভব করিতেছেন, কথন চিন্তামগ্ন হইতেছেন, কথনও-বা উদভ্রান্তার ন্তায় হইয়া উঠিতেছেন, কোন সময়ে নয়ন মুদ্রিত করিতেছেন, কথনও-বা ধরালুণ্ঠিত হইতেছেন, কথন গাত্রোত্থান করিতেছেন, কোন সময়ে বা মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইয়া চেতনা হারাইতেছেন।"

প্রেমোন্মাদিনী শ্রীরাধার এই অবস্থাগুলি শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতের বিরহখিন্ন মহাপ্রভুকেই মনে করাইয়া দেয়—

"উঠি প্রেমাবেশে প্রভু নাচিতে লাগিলা।
অষ্টসাত্ত্বিক অঙ্গে প্রকট হইলা।" (অন্ত্যখণ্ড ১৫।৫৫৮)

"এতেক প্রলাপ করি প্রেমাবেশে গৌরহরি
সঙ্গে লঞা স্বরূপ রামরায়।
কভু নাচে কভু গায় ভাবাবেশে মূর্চ্ছা যায়
এইরূপে রাত্রিদিন যায়।" (অন্ত্যলীলা ১৬,৫৬৬)

"কভু প্রেমাবেশে করেন গান নর্ত্তন।
কভু ভাবাবেশে রাসলীলানুকরণ।
কভু ভাবোন্মাদে কভু ইতিউতি ধায়।
ভূমি পড়ি কভু মূর্চ্ছা গড়াগড়ি যায়।।"

জয়দেবের গীতগোবিন্দে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। একথা তিনি বুঝিতেন যে, ভক্তিরসের যাঁহারা প্রকৃত রসিক, যাঁহারা ভক্ত এবং সাধক, তাঁহারাই এই কাব্য পাঠ করিবার প্রকৃত অধিকারী। কবি তাঁহার কাব্যের বহু স্থানেই এই ভাবের ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। তিনি জানিতেন যে, অপার্থিব রসের মোহন মাধুরী সকলে আস্বাদন করিতে সমর্থ হইতে পারে না, সেইজন্তই এই কথাটির সৃষ্টি হই-য়াছে—'ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ'। কবি বলিতেছেন :

"যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
মধুর কোমলকান্ত পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্।"

* * *

"ভণতি কবি জয়দেব হরি বিরহ বিলসিতেন
মনসি রভস বিভবে হরি রুদয়তু সুকৃতেন।"

সেন-আমলে বাংলার রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে গভীর অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছিল। জাতির সেই অধোগতির দিনে কবি জয়দেবের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। ভক্তকবি জয়দেব গোস্বামী তাঁহার আন্তরিক প্রেমসাধনা দ্বারা দেহাতীত দিব্য প্রেমের পরিচয়-গৌরবে ও পবিত্রতম দীপ্তিতে অন্ধকারাচ্ছন্ন জাতীয় জীবন, সমাজ ও সাহিত্যকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিলেন।

গান

স্বরলিপি—শ্রীওঁকারনাথ চট্টোপাধ্যায়

(রামদাসী মল্লার)

বাদরবা গহরে আয়ে, উমড় ঘুমড় ঘন গরজ গরজকে
বরসন কো উঠি ধায়ে ॥
বরণ বরণকে অতি সুন্দর ঘন, নভ মণ্ডলমে ছায়ে
চপলা চমকী দুরতী পুনি প্রগটতী কাঞ্চন অঙ্গ সুহায়ে ॥

মল্লার কথাটি হিন্দীতে মল্‌হার উচ্চারিত হয়। মল্‌হার অর্থে মলকে হরণ করে যে এরূপ বুঝায়। ধরার মলিনতা বর্ষার ধারায় ধৌত হয় তাই এই সময়ের উপযোগী রাগের নাম হইয়াছে মল্‌হার।

মল্‌হার নামে কোন দেশ, গায়ক অথবা রচয়িতার উল্লেখ পাওয়া যায় না সেইজন্য বোম্বাই প্রদেশের পণ্ডিত জয়সুখলাল শাহের মল্‌হার শব্দের এই ভাবার্থ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

আকবর বাদশাহের দরবারে বাবা রামদাস নামে যে প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন তিনি সাহানা ও গৌড় মল্লারের সংযোগে এক চিত্তাকর্ষক রাগ রচনা করেন তাহা রামদাসী মল্লার নামে প্রচারিত হইয়াছে। ইহার বাদী মধ্যম সংবাদী ষড়জ, দুই গান্ধার, দুই নিষাদ ও অন্যান্য স্বর শুদ্ধ ব্যবহৃত হয়।

শুদ্ধ গান্ধার আরোহণে সরল, যথা: সা রে গা মা, রে গা মা, নি সা রে গা মা ইত্যাদি।

অবরোহণে গান্ধার কোমল ও বক্র, যথা: গা মা রে সা, পা গা মা রে সা। মা রে ও রে পা মল্লার রাগবাচক এই সংগতি বার বার পরিলক্ষিত হয়।

মুখ্য অঙ্গ: ধা পা মা গা মা, পা গা গা মা রে সা।

আরোহণ: সা রে পা গা, মা, পা ধা নি র্সা।

অবরোহণ: র্সা ধা নি পা, মা পা গা মা, রে সা।

রাগবাচক বিন্যাস: নি সা রে গা মা, পা গা মা, পা মা নি পা, গা মা, পা গা মা, রে পা, পা ধা নি র্সা, ধা নি পা মা, পা গা মা, পা গা মা রে সা।

গৌড় মল্লারের অঙ্গ: সা রে গা মা, রে গা মা, মা গা মা ইত্যাদি ও সাহানার র্সা ধা নি পা, মা পা গা মা, রে সা এই দুই অঙ্গের মিলিত রূপ রামদাসী মল্লারের মধ্যে পাওয়া যায়।

---

* পণ্ডিত বিনায়কনারায়ণ পট্টবর্দ্ধনের গায়কী অবলম্বনে।

রামদাসী মল্লার—তেতালা

৩ 0 ১ +
— — রেপা গামা | রে সা, রে নি | সা, রে পা মা | পা নিধা রেসা ধাপা |
— — বা— আ— দ র, বা — —, গ হ রে আ — — — য় এএ)

৩ 0 ১ +
মাগা মা, — — | মগা মা, ধপা গমা | মা রে রেনি সা | সা মা রে পা |
এএ এ, — — উ ম, ড ঘু ম. ড ঘ ন গ র জে গ

৩ 0 ১ +
পা পা পমা পা | পা পা ধ নি | ধনি সারে নি সা | ধনি সারে, সানি ধাপা |
র জে রে — ব র স ন কো— — — উ ঠি ধা— —য়, এএ এএ

৩ 0 ১ + ৩
মাগা মা, রেপা গামা রে সা, রে নি | সা, রে পা মা | পা — — — | — — — — |
এএ এ, বা— আ— দ র, বা — আ, গ হ রে আ — — — — — — য়

(অন্তরা)

0 ১ + ৩
সা মা রে পা | পা পা নি ধা | নি নি নি সা | সা সা সা নিসা |
ব র ষে ব র ষে কে — অ তি সু — দ র ঘ ন

0 ১ + ৩
নি নি, নি — | সা সা ধনি সারে | রে — — ধা | নিপা মাগা মা — |
ন ভ, ম — ও ল মে— — — ছা — — য় এএ এএ এ —

0 ১ + ৩
মা রে পা — | সা সা ধা পা | মা পা মগা মগা | মা রে সা সা |
চ প লা — চ ম কী ছু র তী পু নি প্র গ ট তী

0 ১ + ৩
মা — পা পা | ধনি সারে, নি সা | ধানি সারে, সানি ধাপা | মাগা মা, রেপা গামা |
কা — ঞ্চ ন আঁ— ——, ঙ্গ সু হা— —য়, এএ এএ এএ এ, বা— আ—

0 ১ + ৩
রে সা, রে নি | সা, রে পা মা | পা — সা রে | পা গা মা — | (সরগম)
দ র, বা — —, গ হ রে আ য়,

0 ১ + ৩
— —, মপ ধনি | ধাপ মগ মা — | — — মপ ধানি | সারে নিসা, নিসা নিসা |
— —,

0 ১ + ৩
—সা, ধানি ধাসা —সা | ধাপা মা — — | মপ ধানি সারে গামা | গামা পা,গা মম রেসা |

0 ১ + ৩
মামা রেসা, রেসা নিসা | ধানি সারে নিসা ধানি | মাপা ধানি সারে সানি | ধাপা মামা রেসা নিসা |

0 ১ + ৩
মা রেসা, রেনি সা | — রে পা মা | পা — — — | — — — — II
বা দ র, বা— আ — গ হ রে আ য় — — — — — —

মহিলা সংবাদ

শ্রীমতী মঞ্জুলা মজুমদার

মঞ্জুলা মজুমদার বর্ত্তমান বৎসরে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। শ্রীমতী মঞ্জুলা কৃষ্ণনগর

শ্রীমতী মঞ্জুলা মজুমদার

কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক ও 'প্রবাসী'র লেখক শ্রীনির্ম্মলকান্তি মজুমদার মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী।

শ্রীমতী মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়

মজঃফরপুর মহন্ত দর্শনদাস মহিলা কলেজের ছাত্রী শ্রীমতী মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ত্তমান বৎসরে বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ

শ্রীমতী মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়

হইয়াছে। শ্রীমতী মুকুল ডেপুটি ইন্সপেক্টর-জেনারেল অব পুলিশ, শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা।

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

স্মৃতি সাহিত্যে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য সঙ্গে সঙ্গে চলেন। স্মৃতিশাস্ত্রের বিচারে উভয়ের সিদ্ধান্ত এক হলে শাস্ত্রমত বিষয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, বৈষম্য দৃষ্ট হলেই সুকঠোর বিচারের প্রয়োজন অনুভূত হয়। সৌভাগ্যক্রমে বহুল বিষয়ে এদের মতৈক্য দৃষ্ট হয়। সময়ের দিক থেকে মনুসংহিতা যে যাজ্ঞবল্ক্যের সংহিতার পূর্ব্ববর্ত্তী, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। যাজ্ঞবল্ক্যের সংহিতা খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিরচিত হয়েছিল, এ মতই সমীচীন।

মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা মনু সংহিতা থেকে সুসংশ্লিষ্ট ভাবে লিখিত। তাঁর সংহিতা তিন ভাগে বিভক্ত এবং স্মৃতিশাস্ত্রীয় যাবতীয় বক্তব্য বিষয় এ তিন ভাগের মধ্যেই যথাযথ ভাবে সন্নিবদ্ধ রয়েছে। মনুসংহিতার প্রায় সমস্ত বিষয়ই যাজ্ঞবল্ক্যে পর্য্যালোচিত হয়েছে; কিন্তু ভাষার সঙ্কোচন গুণে মনুসংহিতার দুই বা ততোধিক শ্লোকের বিষয় যাজ্ঞবল্ক্যে একটি মাত্র শ্লোকে ব্যক্ত হয়েছে। ফলে সমপরিমাণ বক্তব্য বিষয়ের জন্য মনুসংহিতার অত্যধিক সংখ্যক শ্লোকের স্থানে যাজ্ঞবল্ক্যে কেবল এক হাজার শ্লোক দৃষ্ট হয়। অবশ্য এমত নহে যে মনুসংহিতার কোনও কোনও শ্লোকের বিষয় যাজ্ঞবল্ক্যে একটি শ্লোকে ব্যক্ত হয় নি। (ফলতঃ মনু ৩.৭০ এবং যাজ্ঞবল্ক্য ১. ১০২, মনু ৩. ১১৯ এবং যাজ্ঞবল্ক্য ১. ১১০, মনু ৭. ১৭১ ও যাজ্ঞবল্ক্য ১. ৩৪৮, মনু ৭. ২০৫ এবং যাজ্ঞবল্ক্য ১. ৩৪৯ একই বিষয়ে লিখিত।) যাজ্ঞবল্ক্য ও মনুসংহিতায় সামঞ্জস্য এত অধিক যে অনেক ক্ষেত্রে মনে হয় যেন যাজ্ঞবল্ক্য মনুসংহিতার বক্তব্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে অনবদ্য তথ্যপূর্ণ ভাবগম্ভীর ভাষায় বলে গেছেন। অবশ্য যাজ্ঞবল্ক্যে এমন কতিপয় বিষয় আছে যা মনুতে নেই বা যা মনু প্রসঙ্গত অতি সংক্ষেপে মাত্র উল্লেখ করে গেছেন। যাজ্ঞবল্ক্যের বিনায়ক শান্তি ও গৃহ শান্তি (১. ২৭১-৩০৮) বিষয়ে মনুতে কিছুই উল্লেখ নেই। যাজ্ঞবল্ক্যে তুলা, অগ্নি, জল, বিষ ও কোষ—এ পাঁচ প্রকারের দিব্য বিশুদ্ধির বর্ণনা আছে; মনু কেবল অগ্নি ও জলের (৭. ১১৪) আকস্মিক উল্লেখমাত্র করেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য শরীরতত্ত্ব ও ভৈষজ্য বিষয়ে (৩. ৭৫-১০৮) অনেক বিষয় সন্নিবদ্ধ করেছেন, যার উল্লেখও মনুসংহিতায় নেই। অন্য দিকে মনুসংহিতায় উল্লেখ ও প্রপঞ্চন আছে, যা যাজ্ঞবল্ক্যে নেই সে রকম বিষয়ও রয়েছে, যেমন সৃষ্টিতত্ত্ব। উভয়ের উল্লিখিত বিষয়বস্তুর পার্থক্যের দিক্ থেকে বলতে গেলে নিম্নলিখিত বিষয়ের মতভেদ বিশেষ করে চোখে পড়ে—

(১) মনুর মতে ব্রাহ্মণ শূদ্র কন্যাকেও বিবাহ করতে পারেন (৩. ১৩) কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য এরূপ নিষিদ্ধ বলে স্পষ্টস্বরে ঘোষণা করেছেন—

যদুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রাদ্দারোপসংগ্রহঃ।
ন তন্মম মতং যস্মাত্তত্রাত্মা জায়তে স্বয়ম্ ॥১. ৫৬ (৫৭)।

অর্থাৎ, দ্বিজাতিগণ শূদ্রজাতীয় কন্যাকে বিবাহ করতে পারবেন বলে যে একটি কথা আছে তা আমার সম্মত নয়, যেহেতু তাতে স্বয়ং আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে।

(২) মনু প্রথমে নিয়োগপ্রথা বর্ণন পূর্ব্বক তৎপর এর অত্যন্ত নিন্দা করেছেন (৯. ৫৯-৬৮); কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য (১. ৬৮-৬৯) এর নিন্দা করেন নি।

(৩) মনু অষ্টাদশ প্রকারের ব্যবহার পদ উল্লেখ করেছেন; যাজ্ঞবল্ক্য এক স্থলে অষ্টাদশ ব্যবহার পদের কথা বলেন নি—তিনি কেবল ব্যবহারপদের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এবং ব্যবহারাধ্যায়ে এ বিষয়ে কয়েকটি প্রকীর্ণক কবিতা রচনা করেছেন।

(৪) পুত্রহীন ব্যক্তির বিধবার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার বিষয়ে মনু নির্ব্বাক, এবং উত্তরাধিকারের তালিকা তাঁর যেন এলোমেলো; কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য বিধবা স্ত্রীকে উত্তরাধিকার বিষয়ে শীর্ষস্থানে সমাসীনা রেখেছেন এবং সুশৃঙ্খলভাবে পর পর উত্তরাধিকারিগণের নামোল্লেখ করেছেন। ২-১১৭ ও পরবর্ত্তী শ্লোক।

যাজ্ঞবল্ক্য স্পষ্ট বলেছেন যদি সম্পত্তির সমান অংশ করতেই হয়, তা হলে পত্নীকেও সমান অংশ দিতে হবে—

"যদি কুর্য্যাৎ সমানাংশান্ পত্ন্যঃ কার্য্যাঃ সমাংশিকাঃ।" ২.১১৭।

পুনরায় যোগমূর্ত্তি ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন—

পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর সম্পত্তির বিভাগ করলে মাতাও সমান অংশ প্রাপ্ত হবেন :

"পিতুরূর্দ্ধং বিভজতাং মাতাঽপ্যংশং সমং হরেৎ।" ২.১২৩

(৫) মনু দ্যূতক্রীড়াদির নিন্দা করেছেন তীব্র ভাবে; যাজ্ঞবল্ক্য কিন্তু এ দ্যূতাদিকে রাজকর আদায়ের উপায় স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। ইত্যাদি।

সমগ্র যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি অনুষ্টুপ ছন্দে লিখিত। সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হলেও যাজ্ঞবল্ক্যের লেখনীর প্রসাদে সব শ্লোক মধুর হয়ে ফুটে উঠেছে। পাণিনির মতে অসিদ্ধ পদ যাজ্ঞবল্ক্য খুব বেশী ব্যবহার করেন নি।

গ্রন্থ বিরচন বিষয়ে কথিত হয়েছে যে মুনিরা মিথিলায় যাজ্ঞবল্ক্যের সম্মুখে উপস্থিত হলে তিনি তাঁদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রভৃতি ব্যাখ্যা করেন।

মিতাক্ষরার মতে যাজ্ঞবল্ক্য সামশ্রবস এবং অন্যান্য ঋষিদের এই স্মার্ত্তমতাবলী উপদেশ দেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩.১-২) কথিত আছে যে যাজ্ঞবল্ক্য সামশ্রবসকে এক হাজার গাভী নিয়ে

যেতে বলেন—তাতে মুনিগণ বাধা দেন (৩.১১৮-১২৯)। ফলে মুনিবর যাজ্ঞবল্ক্য বিষয়ের পর বিষয়, অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে বলতে থাকেন। তিনি যে মুখে উপদেশ দিয়েছিলেন, লেখেন নি—তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ "শৃণুধ্বম্" (যথা ১.১৭৮ শ্লোকে) প্রভৃতি পদ প্রয়োগ। চারটি বেদ ব্যতীত—যাজ্ঞবল্ক্য ষড় বেদাঙ্গ এবং চতুর্দ্দশ বিদ্যার উল্লেখ করেছেন। তিনি আরণ্যক ও স্বরচিত যোগ শাস্ত্রেরও উল্লেখ করেছেন। সাধারণ ভাবে ১.১৪৫ শ্লোকে আরণ্যকের বিষয়ে উল্লিখিত হয়েছে ; এবং ৩.৩০৯ শ্লোকে সুক্রিয় আরণ্যকের বিষয়ে উল্লেখ আছে। ৩.১৮৯ শ্লোকে উপনিষদের উল্লেখ আছে, এবং পুরাণ বিষয়ে বহুবচনে উল্লেখ আছে। ১.৪৫ শ্লোকে ইতিহাস, পুরাণ, বাকোবাক্য ও নারাশংসি গাথার উল্লেখ আছে। প্রারম্ভে আত্মব্যতিরেকে উনিশ জন ধর্ম্মশাস্ত্রকারের বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু গ্রন্থের অন্যত্র কোথাও কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রকার বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করেন নি। আন্বীক্ষিকী ও দণ্ডনীতির (১.৩১১) উল্লেখও তিনি করেছেন। তাঁর মতে ধর্ম্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রের বিরোধ যেখানে ঘটে, সেখানে ধর্ম্মশাস্ত্রের মতই প্রমাণ হবে। ৩.১৮৯ শ্লোকে তিনি সূত্র ও ভাষ্যের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। ১.৩৬ শ্লোকে একবার মাত্র তিনি সমবেতভাবে ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের মত উল্লেখ করেছেন। বৌধায়ন ধর্ম্মশাস্ত্রে (১,২.৪) উক্ত মত সমর্থিত হয়েছে।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার প্রথম বা আচার অধ্যায়ে প্রধান প্রধান বর্ণিত বিষয়—চতুর্দ্দশ বিদ্যা ; ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ এবং ধর্ম্মের উৎপত্তি স্থান। গর্ভাধান উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কার ; ব্রহ্মচারীর দৈনন্দিন কর্ত্তব্য। বিবাহ—কন্যার লক্ষণ প্রভৃতি। অষ্টপ্রকার বিবাহ। পত্নীর কর্ত্তব্য। বর্ণপ্রথা। গৃহীর কর্ত্তব্য ও পঞ্চ মহাযজ্ঞ। অতিথিসেবা। বৈদিকযজ্ঞ। স্নাতকের কর্ত্তব্য। অনধ্যায় দিবস। খাদ্য, পেয় প্রভৃতি বিনির্ণয়। তার পর যাজ্ঞবল্ক্য দান-বিষয়ক আলোচনা করেছেন। যথা গোদান, অন্যান্য দান প্রভৃতি—এবং মন্তব্য করেছেন যে, সমস্ত দানের মধ্যে জ্ঞানদানই শ্রেষ্ঠ দান—

> হেমশৃঙ্গা শফৈ রৌপ্যৈঃ সুশীলা বস্ত্রসংযুতা।
> সকাংস্যপাত্রা দাতব্যা ক্ষীরিণী গৌঃ সদক্ষিণা ॥ ১.২০৪
> দাতাস্যাঃ স্বর্গমাপ্নোতি বৎসরান্ রোমসংমিতান্।
> কপিলা চেত্তারয়তি ভূয়শ্চাসপ্তমং কুলম্ ॥ ১.২০৫
>
> *　　*　　*　　*
>
> সর্বদানময়ং ব্রহ্ম প্রদানেভ্যোঽধিকং যতঃ।
> তদ্দদৎ সমবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকমবিচ্যুতম্ ॥ ১. ২১২

অর্থাৎ, স্বর্ণময়শৃঙ্গ, রৌপ্যময় খুর, বস্ত্র, কাংস্যপাত্র এবং যথাশক্তি দক্ষিণার সহিত সুশীলা দুগ্ধবতী গাভী দান করিবে, এ গাভীদাতা—প্রদত্ত গাভীর যত রোম থাকে, তত বৎসর স্বর্গে বাস করেন, আর ঐ দত্ত গাভী যদি কপিলা হয়, তা হলে আপনার উদ্ধার ত হয়ই, অধিকন্তু পিত্রাদি ছয় পুরুষকেও উদ্ধার করে।...যেহেতু জ্ঞান সর্ব্বদানময়, ঐ জ্ঞানদান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। জ্ঞানদান করলে অক্ষয় ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ঘটে। যিনি সম্পূর্ণ পাত্র হয়েও অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভাবে দানের উপযুক্ত পাত্র হয়েও দানগ্রহণ করেন না, তিনি—যে সকল স্থান নিরন্তর দানকর্ত্তাদের প্রাপ্য—সে সমস্ত স্থান প্রাপ্ত হন—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন।

অনন্তর শ্রাদ্ধ বর্ণনপ্রসঙ্গে শ্রাদ্ধের যথার্থ সময়, শ্রাদ্ধনিমন্ত্রণের উপযুক্ত ব্যক্তি, পার্ব্বণ, বৃদ্ধি, একোদ্দিষ্ট প্রভৃতি শ্রাদ্ধ, শ্রাদ্ধে দেয় মাংস প্রভৃতির মনোহারী বিবৃতি প্রদান করেছেন। অতঃপর বিনায়ক ও নবগ্রহ শান্তি। বিনায়ক শান্তি মানবগৃহ্য সূত্রানুসারে লিখিত বলে মনে হয় (মানবগৃহ্যসূত্র ২.১৪৭)। অতঃপর বর্ণিত হয়েছে রাজধর্ম্ম, রাজার গুণাবলী, মন্ত্রী, পুরোহিত, রাজশাসন, মণ্ডলসংগঠন, চতুর্নীতি, ষড়্‌গুণ, দণ্ডদানে নিরপেক্ষতা, প্রভৃতি।

দ্বিতীয় বা ব্যবহার অধ্যায়ে বিচারক, ব্যবহারপদের সংজ্ঞা, বিচারপদ্ধতি, সাক্ষ্যপ্রদান, ধর্ম্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রের বিরোধ, প্রমাণ, দলিল, অধিকার গ্রহণ, বিভিন্ন বিচারালয়, জ্ঞানপ্রবঞ্চনা, বয়সন্যূনতা এবং অন্যান্য প্রকারের অসিদ্ধতা, ধনদৌলতপ্রাপ্তি, কর্জ্জ, সুদ, যৌথ-পরিবারের ঋণ, পুত্রের পিতৃঋণশোধ, টাকাজমা, সাক্ষীর প্রকারভেদ, সম্পত্তিবিভাগ, স্ত্রীর সম্পত্তি, পিতার মৃত্যুতে সম্পত্তি-বিভাগ, অবিভাজ্য সম্পত্তি, পিতা ও পুত্রের যৌথসম্পত্তি, দ্বাদশবিধ পুত্র ; অপুত্রক ব্যক্তির উত্তরাধিকার, স্ত্রীধনের উপরে স্বামীর ক্ষমতা, জমির সীমানির্দ্দেশ, মালিক ও প্রজার মধ্যে বিরোধ, কর্ত্তৃত্ব ব্যতিরেকে বিক্রয়, দানে অযোগ্যতা, বিক্রয়ে অক্ষমতা, চাকুরীর সর্ত্তভঙ্গ, বলপূর্ব্বক দাসত্ব, বেতনপ্রদানে অস্বীকৃতি, জুয়াখেলা, কলঙ্কারোপ, শারীরিক অত্যাচার, যৌথকারবার, চুরি, ব্যভিচার, বিভিন্নপ্রকারের অন্যায়, রায়দান প্রভৃতি ব্যবহার ও ব্যবহারাজীবের উপজীব্য বহুল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণন, বিচার ও বিশ্লেষণ এ অধ্যায়ে রয়েছে।

প্রায়শ্চিত্ত বা তৃতীয় অধ্যায়ে শ্মশান ও সমাধি ; পিতৃ-তর্পণ, অশৌচবিধান, জননাশৌচ ; মৃত্যু বা জন্মের অব্যবহিত পরেই অশৌচাভাব ; বিশুদ্ধির বিবিধ উপায় ; আপৎকালে আজীবাহরণাদির উপায় ; আরণ্যক যতি প্রভৃতি সম্পর্কিত নিয়মাবলী ; জীবাত্মার শরীরপরিগ্রহ ; ভ্রূণের বিভিন্ন পর্য্যায় ; শরীরের অস্থি-সংখ্যা ; প্লীহাযকৃৎ প্রভৃতি ; শিরা-উপশিরা ; আত্মবিষয়ক মন্তব্য ; মোক্ষমার্গে সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তা ; বিভিন্ন যোনিতে পাতকিগণের জন্মপরিগ্রহ ; যোগিগণের অমরত্বলাভ ; সত্ত্ব-রজ-তমোভেদে কার্য্যের পার্থক্য ; আত্মজ্ঞানোপায় ; অমরত্ব ও স্বর্গলাভের দুই পৃথক্ উপায় ; বিভিন্ন প্রকারের ব্যাধি ; প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশ্য ; এস্থলে নরক ; পাতক, উপপাতক ; ব্রাহ্মণ বধ, বা অন্য ব্যক্তিবধের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত ; মদ্যপান প্রভৃতির জন্য প্রায়শ্চিত্ত ; স্থান-কাল-সামর্থ্য-বয়স প্রভৃতি ভেদে প্রায়শ্চিত্ত বিধান ; দশবিধ যম ও নিয়ম ; সান্তপন, মহাসান্তপন, তপ্তকৃচ্ছ্র, পরাক, চান্দ্রায়ণ ও অন্যান্য প্রায়শ্চিত্ত সুব্যক্ত রয়েছে।

যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে বিষ্ণুধর্ম্ম সূত্রের একটি নিকট সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়।

সমভাবে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের সঙ্গেও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার অনেক সামঞ্জস্য রয়েছে। সময়ের দিক থেকে বিবেচনায় যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাই কৌটিল্যের দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে হয়। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার উপর যজুর্ব্বেদের এবং যজুর্ব্বেদীয়, বিশেষতঃ শুক্লযজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ শতপথ, উপনিষৎ বৃহদারণ্যক এবং পারস্কর গৃহ্য সূত্রের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। যাজ্ঞবল্ক্যে ধৃত মন্ত্রসমূহ কিছু ঋগ্বেদের; অধিকাংশ বাজসনেয়ি সংহিতার অন্তর্গত। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার রচয়িতা শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় ছিলেন বা ঐ গুরু-পরম্পরায় অন্তর্ভুক্ত—অনায়াসে একথা বলা চলে।

ঋগ্বেদের যুগ স্বাধীন চিন্তার যুগ। ধীরে ধীরে সমাজ যখন গড়ে উঠতে লাগল, সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে দর্শন, স্মৃতি, বেদাঙ্গ প্রভৃতিও সুপ্রতিষ্ঠ হ'ল। কালক্রমে বর্ণ প্রথাও কঠোরতর রূপ ধারণ করল। সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার যাগযজ্ঞের প্রতিও ভারতীয় সমাজ অধিকতর ভাবে আকৃষ্ট হ'ল। খ্রীষ্টপূর্ব্ব সময়ে দর্শন ও কল্প সূত্র সবই সূত্রাকারে গ্রথিত হ'ল। ক্রমশঃ তাও হ'ল দুর্ব্বোধ্য। বৌধায়নীয়, হিরণ্যকেশি, আপস্তম্ব, বশিষ্ঠ প্রভৃতির ধর্ম্মসূত্রে ধর্ম্মশাস্ত্রীয় বিষয় পর্য্যালোচিত হয়েছে অতি সুন্দর ভাবে—কিন্তু এ সূত্র সাহিত্যের মাধ্যমে স্মৃতি—ক্রমে শ্লোকাকারে সমাজে বিশিষ্টতর, ব্যাপকতর প্রবেশ লাভ করল। ফলে মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র সকলের হৃদয় আকর্ষণ করে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করল।

স্মৃতিশাস্ত্র সমাজের দৈনন্দিন জীবনের প্রকৃষ্টরূপ বিনির্ণয়ের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ দর্পণস্বরূপ। পারিবারিক, সামাজিক, ব্যক্তিগত জীবনের এমন নিখুঁত চিত্র আর কোথাও পাওয়া যায় না। সামাজিক উন্নতির দিক থেকে পুনরায় স্ত্রী ও শূদ্রদের প্রতি আচরণই শ্রেষ্ঠ পরিমাপক। দেশ যখনই স্বাধীনতা হারিয়েছে বা বহিঃশত্রুর করতলগত হয়েছে কিংবা অন্য প্রকারে বিধ্বস্ত হয়েছে, দেশে নারীদের শিক্ষা-দীক্ষা, স্বাধীন গতি হয়েছে ব্যাহত। বৈদিক যুগ থেকে উপনিষৎ-সূত্র যুগের মাধ্যমে প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রের যুগ পর্য্যন্ত সমাজের চিত্র পর্য্যালোচনা করলে এ সত্য সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না। এ চিত্র-চিত্রণের দিক থেকে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এঁদের চিত্রণে সমাজ তেমন অনুন্নত স্থানে অবনমিত হয় নি। নারীর অপ্রশংসা আছে, তাঁদের প্রতি কটাক্ষ আছে, কিন্তু প্রশংসাও আছে প্রচুর, তাঁদের প্রতি সমাজকর্তাদের সম্মান পূর্ণমাত্রায় অক্ষুণ্ণ না থাকলেও হ্রাস পায় নি ফলতঃ, এমনকি, পরবর্ত্তী স্মৃতি ও অন্যান্য সাহিত্য পর্য্যালোচন করলেও এ উপসংহার করতেই হয় যে, অন্যান্য তমসাচ্ছন্ন যুগে সমাজে দুটি বিরোধী মত ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া করেছে নিরন্তর তখনও অন্যান্য সাবধানী সমাজ সংরক্ষকেরাও নারীদের "গৃহপিঞ্জ কোকিল" বলেছেন, গৃহশ্রী, গৃহদীপ্তি ত বলেছেন-ই।

স্মৃতিকারদের মধ্যে অন্যতম প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ স্মৃতিকারের ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য আমাদের চিরপূজার্হ। বহু দিক থেকে তাঁ গ্রন্থ অভিনব ও আদর্শস্থানীয়। এজন্য তাঁর টীকাকার বিশ্বরূ (বালক্রীড়াকার), মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর, সুবোধিনীকা বিশ্বেশ্বর ও বালম্ভট্টিকার বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ড, অপরার্কিত্য বা অপরার্ক দীপকলিকাকার বাঙালী মহামহোপাধ্যায় সাহুড়িয়াল শূলপাণি বীরমিত্রোদয়কার মিত্রমিশ্র প্রভৃতিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে অমর হয়ে আছেন।

একটি বনেদী কাহিনী

শ্রীশৈলেশ বসু

...জ অবধি আমি এ কাহিনীর কোনো যুক্তিযুক্ত অর্থ খুঁজে পাই ...। মনোবিজ্ঞানীরা হয়ত তাঁদের দুর্বোধ্য বৈজ্ঞানিক ভাষায় ...র ব্যাখ্যা করতে পারেন। কিন্তু তাঁরাও আমার ভয় পাবার ...ন সঙ্গত কারণ দেখাতে পারবেন না। ভয় যে পেয়েছিলাম ...কথা এখনও আমার বেশ মনে আছে। শুধু ভয় নয়, ভীষণ ..., একেবারে নীল হয়ে গেছলাম। কিন্তু তবু সে রাত্রিতে কেন ... ভয় পেয়েছিলাম, বুঝতে পারি না। পারিপার্শ্বিকের জন্যে, ... কি অন্য কোনও অপ্রাকৃত কারণে?

রাঁচি থেকে ফিরছিলাম ডাউন রাঁচি প্যাসেঞ্জারে। প্রায় ...ড় দশটা বাজে। আর কিছুক্ষণ পরেই টাটানগর পৌঁছবার ...থা। মুড়ী ষ্টেশনে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়েছিলাম, কিন্তু ... চা-তেষ্টা পাচ্ছিল। কামরার মধ্যে সকলেই ঘুমে অচেতন, শুধু ...মার চোখেই ঘুম নেই। অতি দূরে অস্পষ্ট ভাবে টাটানগরের ...কটা আলো দেখা যাচ্ছে যেন। উৎসুক হয়ে সেই দিকে ...য়ে বসে রইলাম। হঠাৎ মাঠের মাঝখানে গাড়ী থেমে গেল। ...লাম, সিগন্যাল পায় নি। বি. এন. আর. লাইনের এই এক ...কেলিকা। গাড়ী প্রায়ই সিগন্যাল না পেয়ে যেখানে সেখানে ...মে যায়। কিন্তু দশ মিনিট, পনের মিনিট কেটে গেল, গাড়ী ...ড়বার নাম করে না। কি ব্যাপার, এ রকম ত সাধারণতঃ ... না। ইঞ্জিন মাঝে মাঝে হুইসল দিয়ে উঠছে। শীতের ...ত্রিতে ফাঁকা মাঠের মাঝখানে সে আওয়াজ কি রকম রহস্যময় ...নে হচ্ছে।

আধ ঘণ্টাটাক পরে সংবাদ পাওয়া গেল। অতি দুঃসংবাদ। ...নগরের ঠিক আগেই একটা মালগাড়ী লাইনচ্যুত হয়েছে। ...স্তা বন্ধ, অগত্যা আমাদের গাড়ীকে বম্বে মেলের লাইন দিয়ে ...রিয়ে নিয়ে যেতে হবে। একটু পরেই গাড়ী ব্যাক্ করা আরম্ভ ...ল। আমি এতদিন ট্রেনে যাওয়া-আসা করছি, কিন্তু কোন ...াড়ীকে মাইল দেড়েক পথ ব্যাক্ করতে দেখি নি। এ একটা ...তন অভিজ্ঞতা। গাড়ী কখন যে আসল লাইন ছেড়ে অন্য পথে ...রেছে, গাঢ় অন্ধকারে তা বোঝা যায় নি। আরও আধ ঘণ্টা ...রে একটা ষ্টেশনে এসে গাড়ী থামল। ষ্টেশনটার নাম দেখলাম ...দি।

গাড়ী থামতেই অনেকে নেমে গেলেন। কিন্তু বেশীক্ষণের ...ন্যে নয়। মিনিট পাঁচেকের ভেতরই একে একে সকলে লক্ষ্মী-...ছেলের মত ফিরে এলেন। সকলেরই মুখে এক কথা। 'বাপ, ...ক ঠাণ্ডা! উঃ, কি হাওয়া। হাড় অবধি কাঁপিয়ে দেয়।' ...শীগগিরই বিষ্টি হবে।' গাড়ীতে উঠেই আগে সকলে দরজা বন্ধ করতে ব্যস্ত হলেন। ষ্টেশন দেখতে দেখতে ফাঁকা হয়ে গেল। একজনকে প্রশ্ন করলাম, 'গাড়ী থামল কেন? যাবে কখন?'

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, 'বম্বে মেল পাস করে গেলে তবে আমাদের গাড়ী যাবে।'

আর একজন বললে, 'ষ্টেশন মাষ্টারটার সঙ্গে কথা বলতেই ভয় করে। লোকটা হাসছে কি কামড়াতে আসছে বোঝা শক্ত।'

একটা ছোকরা বললে, 'যা বলেছেন। উঃ, কি চেহারা! ঠিক যেন বরিস কার্লফ।'

এবার আমি উঠলাম। গাড়ী কতক্ষণ দাঁড়াবে তার যখন কোন স্থিরতা নেই, তখন চায়ের চেষ্টা না করলেই নয়। নেমেই কিন্তু বুঝলাম, কাজটা ভাল করি নি। আকাশে মেঘ বেশ পাকিয়ে উঠেছে। হু-হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। আমার গায়ে আবার গরম জামা নেই···সামান্য একটা সূতীর স্লিপ-ওভার আর শাল। শালটাকে ভাল করে গায়ে জড়িয়ে এদিক ওদিকে চেয়ে দেখলাম। ষ্টেশনের নির্জ্জন নির্জ্জীব চেহারা দেখে চা পাবার সব আশা মিলিয়ে গেল। গলাটা যেন আরও শুকিয়ে উঠল। আশা আর ছিল না, তবু নেমেছি যখন, ষ্টেশনটা একবার ঘুরে যাই ভেবে এক পা দু-পা করে এগোতে লাগলাম। সারা ষ্টেশনটা পায়চারি করেও আমারই মত দু'একজন দুঃসাহসী যাত্রী ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলাম না। যাবার সময় লক্ষ্য করি নি, ফেরবার পথে দেখলাম, ষ্টেশনমাষ্টার তাঁর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। কামরার সেই সহযাত্রী ছোকরার মন্তব্য মনে পড়ল। বরিস কার্লফই বটে। বিরাট চেহারা। অন্ততঃ ছ' ফুট চার ইঞ্চি লম্বা। বিশাল ছাতি, চওড়া কাঁধ, বুলডগের মত থ্যাবড়া মুখ। ঘন জোড়া ভ্রূ, চোখ দুটো ছোট, কিন্তু অন্ধকারে ঠিক বেড়ালের চোখের মতন জ্বলছে। আর আশ্চর্য্য, ভারী সুন্দর কালো কোঁকড়ানো লম্বা লম্বা চুল। পরনে একটা খাটো ধুতি, গায়ে টুইডের কোট, হাত দুটো পকেটে ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। নগণ্য ষ্টেশনের ক্ষীণ আলোয় হঠাৎ দেখলে ভয় পাবারই কথা।

আমাকে তাঁর দিকে চাইতে দেখে বললেন, 'মর্ণিং ওয়াক করছেন?'

চমক লাগল। ও রকম জান্তব চেহারা থেকে এতখানি কোমল স্বর আশা করি নি।

প্রশ্ন করলাম, 'বম্বে মেল আসতে আর কত দেরি?'

'বেশী দেরি নেই। টাটানগর ছেড়েছে।'

'যাক,' আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

ষ্টেশন মাষ্টার মুখের একটা বিকৃত ভঙ্গী করলেন। বোধ হয়,

হাসলেন। বললেন, 'এখন থেকেই নাচবেন না। এটা আপ বম্বে মেল। ডাউনটাও না গেলে আপনাদের গাড়ী যাবে না।

'ডাউনটা আবার কখন যাবে?'

ষ্টেশন মাষ্টার এবার সশব্দে হেসে বললেন, 'ভোর সাড়ে পাঁচটায়।'

'বলেন কি? এখন যে সবে সাড়ে বারোটা,' আমি হতাশ ভাবে বললাম, 'সেরেছে!'

'সেরেছে কেন!' ষ্টেশন মাষ্টারের স্বর আরও কোমল হয়ে উঠল, 'আর সবাইকার মত গাড়ীতে গিয়ে দিব্যি ঘুম দিন না। দেখতে দেখতে ভোর হয়ে যাবে।'

ফিরে দেখলাম, আমি আর ষ্টেশনমাষ্টার ছাড়া সারা ষ্টেশনটায় আর জনপ্রাণীও নেই। হাওয়ার গতি আরও বেড়েছে। গাছ-গুলো সো-সো শব্দ করে দুলছে। শুকনো পাতা ঘুরতে ঘুরতে উড়ে বেড়াচ্ছে।

বললাম, 'এই ঠাণ্ডায় কি আর সাধ করে গাড়ী থেকে নেমেছি। বেজায় তেষ্টা পেয়েছে। চায়ের সন্ধানে বেরিয়ে-ছিলাম। কিন্তু আপনাদের হতভাগা ষ্টেশনে একটা লোকেরও দেখা পেলাম না, চা ত দূরের কথা।'

দূরে একটা আলো উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে আসছিল। আমরা কথা বলতে বলতেই বম্বে মেল সদর্পে এবং সবেগে ষ্টেশন পার হয়ে গেল। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, মেঘ ডাকছে, দুর্যোগের আশঙ্কা বেশ ঘনিয়ে এসেছে। বোধ হয়, সেই জন্যেই কেউ আর কৌতূহলী হয়ে জানালা খুলে দেখল না, আমাদের গাড়ী এবার ছাড়বে কি না। ঠাণ্ডা হাওয়ায় থেকে থেকে কাঁপুনি ধরছে। গাড়ীতে ফিরে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালাম। ষ্টেশন মাষ্টার 'একটু দাঁড়ান' বলে ঘরের ভেতর ঢুকে গেলেন। কাকে যেন কি বললেন, তারপর এক হাতে ছাতা আর এক হাতে ষ্টেশন-লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

বললেন, 'আসুন আমার সঙ্গে। চা খাওয়াব।'

রাত দুপুরে অপরিচিত জায়গায় এ ধরণের আমন্ত্রণ আশাতীত। তবু ভদ্রতার খাতিরে একটু মৌখিক আপত্তি করলাম। কিন্তু ষ্টশনমাষ্টার গ্রাহ্যও করলেন না। বললেন, 'পা চালিয়ে আসুন। জোর বিষ্টি আসছে।'

ষ্টেশন মাষ্টারের কোয়ার্টার ষ্টেশন থেকে একটু দূরে। ষ্টেশনের ধারেই দুটো বড় বড় পুকুর আছে। সেইজন্যেই বোধ হয় প্রথা-মত ষ্টেশনের ধারে কোয়ার্টার করা সম্ভব হয় নি। এখন একটা পুকুর একেবারে শুকিয়ে গেছে, আর একটাতে খানিকটা জল আছে। ব্যাঙের দল মহা আনন্দে গান ধরেছে। যেতে যেতে ষ্টেশন মাষ্টার প্রশ্ন করলেন, 'দেশ কোথায়?'

'কলকাতা।'

'কি করেন?'

'মাষ্টারি।'

'লাভ হয় কিছু?'

ঠিক কি ধরণের লাভের কথা বলছেন বুঝতে না পেরে বললা[ম],
'মানে?'

'মানে, ছাত্রগুলো মানুষ হচ্ছে?' আমার উত্তরের অপেক্ষা ন[া] করে বিমর্ষ সুরে বলে চললেন, 'মানুষ হওয়া বরাত। আমার জ[ন্যে] আমার মাষ্টার মশাইরা কি কম চেষ্টা করেছিলেন। কি ফল হ'ল কিছু লেখাপড়া শিখলাম না। অতবড় বনেদী বংশের ছেলে, সি[েকেণ্ড] ক্লাস ষ্টেশনে ষ্টেশন মাষ্টার হয়ে পড়ে আছি।'

কত বড় বনেদী বংশ বোঝবার জন্যেই বোধ হয় তাঁর মুখে[র] দিকে তাকিয়েছিলাম। ষ্টেশন মাষ্টারও সেই সময় আমার দিকে চাইলেন। চোখাচোখি হতেই তাঁর চোখ জ্বলে উঠল। চাপা গলায় বললেন, 'জানেন মাষ্টার মশাই, আমার পূর্ব্বপুরুষ স্বয়ং হুসেন শার কাছ থেকে খাঁ-উপাধি পেয়েছিলেন।'

ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হয়েছিল। ষ্টেশন মাষ্টারের কোয়ার্টারে পৌঁছতে না পৌঁছতেই জোরে বর্ষণ সুরু হয়ে গেল। আমায় তিনি বাড়ীর ভেতর দিকের রকে নিয়ে গেলেন। ঠাণ্ডার জন্যই বোধ হয় চ্যাটাই দিয়ে রকটা ঘিরে নিয়েছেন। মাঝখানে একটা টেবিল আর একটা চেয়ার পাতা ছিল। আমায় চেয়ারে বসতে বলে তিনি ঘরে ঢুকে গেলেন। ঘরের ভেতর মৃদু কথাবার্ত্তার আওয়াজ পেলাম। একটু পরেই একটা পেট্রোম্যাক্স জ্বেলে একটা টুল হাতে ষ্টেশন মাষ্টার বেরিয়ে এলেন। পেট্রোম্যাক্সটা টেবিলের উপর রেখে তিনি টুলে বসলেন। তাঁর পেছন পেছন ঘোমটা দেওয়া একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। রকের এক কোণে একটা তোলা উনুন ছিল। মেয়েটি সেই নিবন্ত উনুন জ্বালাবার চেষ্টা করতে লাগল। চার-দিক বন্ধ থাকায় আর ততটা শীত করছিল না। আমি আরাম করে বসে একটা সিগারেট ধরালাম, ষ্টেশন মাষ্টারকেও দিলাম। তিনি যে রকম এক টানে সিগারেটটা অৰ্দ্ধেক শেষ করে দিলেন তাতে মনে হ'ল, তাঁর আরও কড়া কিছু টানা অভ্যাস আছে।

উজ্জ্বল আলোয় ভদ্রলোককে আর ততটা জান্তব লাগল না। রং এককালে বেশ ফর্সা ছিল; এখন রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। মুখটা থ্যাবড়া হলেও দেখতে খুব খারাপ লাগে না। দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার কামানো। তাঁর মাথার চুল চেয়ে চেয়ে দেখবার মত। ঠিক যেন কালো রেশম। দেখলাম, শুধু অন্ধকারে নয়, আলোতেও তাঁর চোখ জ্বলে।

উজ্জ্বল চোখে চেয়ে বললেন, 'আরামবাগ গেছেন কখনও?'

'না।'

আপন মনেই যেন বলে চললেন, 'আমার বাড়ী আরামবাগ মহকুমায় বদনগঞ্জের কাছে। আমাদের বংশ ও-অঞ্চলের সবচেয়ে নামী বংশ। স্বয়ং হুসেন শার কাছ থেকে আমরা খাঁ উপাধি পেয়ে-ছিলাম। চায়ের ত এখনও দেরি আছে, আপনাকে একটা গল্প বলি শুনুন। আমারই এক পূর্ব্বপুরুষের গল্প। প্রায় এক'শ বছর আগেকার কথা। তখন জমিদার ছিলেন চন্দ্রকান্ত দত্ত। তাঁর

সময়েই আমাদের বংশের নামডাক চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। শুধু লক্ষ্মী নয়, দেবরাজ ইন্দ্রও যেন তাঁর কৃপা চন্দ্রকান্তের উপর উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিপত্তি আর ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। লোকে তাঁকে 'রাজাবাবু' বলে ডাকত। নিজের চেষ্টায় তিনি জমিদারী এতদূর বাড়িয়েছিলেন যে, প্রায় সমস্ত আরামবাগ মহকুমা তাঁর জমিদারীভুক্ত হয়ে পড়েছিল।

অবশ্য লোকে তাঁকে খাতির বেশী করত কি ভয় বেশী করত—সেটা ভাববার কথা। চন্দ্রকান্ত দুর্দ্দান্ত লোক ছিলেন। যেমন ছিল তাঁর দৈত্যের মত বিরাট চেহারা, তেমনি ছিল দৈত্যের মত প্রচণ্ড রাগ। তাঁর চোখ দুটো ছিল ছোট, কিন্তু বাঘের মত জ্বলজ্বলে। রেগে গেলে তাঁর চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলত। তখন অনেক বড় বড় পালোয়ানও তাঁর সামনে থরথর করে কাঁপত। রং ছিল তাঁর ধবধবে ফর্সা। কি শীত, কি গ্রীষ্ম কখনও তিনি গায়ে জামা দিতেন না। একখানা সিল্কের উড়ানি কোণাকুণি ভাবে কাঁধে-কোমরে জড়িয়ে রাখতেন। আর সব সময় তাঁর কোমরে জড়ি-বসানো ভেলভেট-মোড়া খাপে একটা সোনার বাঁটওলা বাঁকা তলোয়ার থাকত। মালকোঁচা মেরে কাপড় পরে, জরিদার নাগরা পায়ে দিয়ে হাতে চাবুক নিয়ে তিনি যখন তাঁর প্রিয় সাদা আরবী ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতেন, তখন লোকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁকে ভক্তি-প্রদর্শন না করে পারত না।

চন্দ্রকান্তের দুটি দুর্ব্বলতা ছিল। এমন পুরুষ-সিংহের মত চেহারা হলে হবে কি, তিনি মাকুন্দ ছিলেন। দাড়ি তাঁর একদমই ছিল না, সামান্য একটু গোঁফের রেখা ছিল মাত্র। কিন্তু তাঁকে মাকুন্দ বলবার সাহস ছিল না কারও। শুধু সামনে কেন, আড়ালেও কেউ তাঁকে ও-কথা বলতে সাহস করত না। তাঁর আর একটা দুর্ব্বলতা ছিল। একবার অসুখ হয়ে তাঁর মাথার সমস্ত চুল উঠে গিয়েছিল, আর গজায় নি। মাথা-ভর্ত্তি টাক পড়ে গেছল। চন্দ্রকান্ত কলকাতা থেকে অর্ডার দিয়ে সেরা এক ডজন পরচুলা আনিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর মাথার রেশমের মত ঘন কালো চুল যে আসল নয়, এ কথা খুব কম লোকই জানত। যারা জানত, ভয়ে প্রকাশ করত না।

চন্দ্রকান্ত যে কি করে এত ঐশ্বর্য্যের মালিক হয়েছিলেন, সে কথা কারুরই অজানা ছিল না। তাঁর ডাকাতের দল ছিল। কিন্তু এই দলে যে কারা কারা ছিল, কেউ জানত না। জানতেন শুধু তিনি নিজে আর রতন সামন্ত। রতন সামন্ত ছিল তাঁর ডান হাত। তখন সারা বাংলার সেরা লাঠিয়াল ছিল ঐ রতন। আরামবাগের বাগদীদের পক্ষে ডাকাতি করাটা নতুনও নয়, অস্বাভাবিকও নয়। বছর তিরিশেক আগে অবধি তারা তাই করে বেড়াত। কিন্তু চন্দ্রকান্তের দলের প্রত্যেকটি ডাকাত ছিল অদ্ভুত শিক্ষাপ্রাপ্ত আর তাঁর একান্ত অনুগত। তাঁর সামান্য একটা মুখের কথায় তারা লাঠি আর সড়কি হাতে নিয়ে অস্ত্রশস্ত্রের সামনে এগিয়ে যেত। তাঁর দলে যে কখনও অসন্তোষ দেখা দিত না, তার একটা কারণ ছিল হয়ত এই যে, তিনি লুটের মাল ন্যায্য ভাবে দলের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। তা ছাড়া চন্দ্রকান্ত নিজে সব সময় দলের সঙ্গে উপস্থিত থাকতেন। তিনি আর রতন ঘোড়ায় চড়ে, আর বাকী সব রণপা পরে রাতারাতি অনেক দূর পর্য্যন্ত ডাকাতি করে আসত। তাঁর আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি কখনও আরাম-বাগ অঞ্চলে ডাকাতি করতেন না। বর্দ্ধমান, হুগলী, তারকেশ্বর, শ্রীরামপুর এই সব ছিল তাঁর কর্ম্মক্ষেত্র।

তখন আর একটা সুবিধে হয়েছিল। সেটা সিপাহী-বিদ্রোহের সময়। ইংরেজরা তাদের ধন আর প্রাণ সামলাতে ব্যস্ত—শান্তি এবং শৃঙ্খলার দিকে নজর দেবার সময় পেত না। চন্দ্রকান্ত এ সুযোগ ছাড়েন নি। বিদ্রোহের সময় বাংলা দেশই ছিল সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। তাই সব ইংরেজ পরিবার পাটনা হয়ে কলকাতায় যাবার চেষ্টা করত। এরা ছিল চন্দ্রকান্তের প্রিয় শিকার। দলবল নিয়ে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের পাশে তিনি ঘাপটি মেরে বসে থাকতেন। আর এক এক দল এলেই মেরে কেটে লুটপাট করে নিতেন। এই ভাবে কত যে বিলিতী মাল আমাদের বাড়ীতে জমা হয়েছিল, তার হিসেব নেই। একবার এক দল ইংরেজ সৈন্য কোন নবাব বাড়ী লুটপাট করে ফিরছিল, চন্দ্রকান্ত তাদের উপর বাটপাড়ি করে এক ছড়া অপরূপ মুক্তোর মালা পেয়েছিলেন। সে মালা এখনও আমাদের বংশের সম্পত্তি। শত দুরবস্থায়ও আমি সে মালা বিক্রি করি নি। তারপর যখন বিদ্রোহ থেমে গেল, সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হ'ল, তখন চন্দ্রকান্ত অনেক শান্ত হয়ে গেছেন।

চন্দ্রকান্ত নিজে কিন্তু জমিদারী নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। কলকাতা থেকে এক ইংরেজী জানা ছোকরা ম্যানেজার এনে-ছিলেন। সে-ই সমস্ত কাজকর্ম্ম দেখাশোনা করত। ভাগ্যের জোরেই হউক আর চন্দ্রকান্তের মানুষ চেনার গুণেই হউক, ছোকরা খুব কাজের লোক ছিল। তাঁর বিরাট জমিদারীর কোথাও সামান্য একটু বিশৃঙ্খলা দেখা যেত না। অযথা অত্যাচার ছিল না, প্রজারা বেশ সুখেই থাকত।

দুর্দ্দান্ত জীবন যাপন করলেও চন্দ্রকান্ত অশিক্ষিত ছিলেন না। তিনি বাংলা, সংস্কৃত, ফার্সী এই তিনটে ভাষাই ভাল করে জানতেন। কিন্তু বিদ্যাচর্চ্চার দিকে তাঁর তত ঝোঁক ছিল না। তাঁর প্রিয় ছিল শরীরচর্চ্চা। চন্দ্রকান্তের বাড়ীটা ছিল প্রকাণ্ড। এখনও বদনগঞ্জের কাছে সে বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখতে পাবেন। তাঁর নিজের মহলটা ছিল একেবারে আলাদা। তিনি যে শুধু বিয়ে করেন নি তাই নয়, নারীর কোন রকম সংস্রবে থাকতেন না। আত্মীয়স্বজনদের জন্যে অন্য মহল ছিল, তাঁর মহলে মেয়েদের ঢোকবার হুকুম ছিল না। সন্ধ্যা থেকে তাঁর মহলে ইয়ার-বন্ধুরা এসে জুটত। হরেক রকমের নেশা চলত। এই ভাবেই কেটে যাচ্ছিল।

তাঁর বয়স যখন সাতচল্লিশ আটচল্লিশ, সেই সময় একটা ঘটনা ঘটল যার ফলে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে গেল। একবার শিবরাত্রি

উপলক্ষে চন্দ্রকান্ত ঘোড়ায় চড়ে বৈদ্যনাথ ধাম যাচ্ছিলেন। আত্মীয় প্রতিবেশীরা সব পেছনে পেছনে আসছিল, তিনি আর রতন ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ অনেকগুলো মেয়েলি গলার গান শুনে পথের এক পাশে তিনি ঘোড়া থামালেন। মোড় ঘুরে একদল হিন্দুস্থানী মেয়ে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে এল। একটি হিন্দুস্থানী কিশোরী জল সইতে যাচ্ছে। হঠাৎ কি যেন হ'ল, চন্দ্রকান্ত নিজেও বুঝতে পারলেন না। মেয়েটি সুন্দরী ছিল ঠিকই, কিন্তু সুন্দরী মেয়ে ত তিনি জীবনে অনেক দেখেছেন। তা ছাড়া বাঙালী ছেড়ে হিন্দুস্থানী মেয়ে পছন্দ হবারও কোন কারণ ছিল না। যে কারণেই হোক, চন্দ্রকান্তের এতদিনের তপস্যা ভেঙে গেল। দেখেই মনে হ'ল, মেয়েটিকে তাঁর চাই-ই চাই। তাঁর চিন্তা কাজে পরিণত হতে দেরি হ'ত না। রতনকে ইসারা করে তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেলেন। তারপর নিমেষের মধ্যে মেয়েটিকে ঘোড়ায় তুলে উল্টো পথে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। বৈদ্যনাথধাম আর যাওয়া হ'ল না।—এই পর্যন্ত একটানা বলে ষ্টেশনমাষ্টার যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন, একটু চুপ করে থেকে আবার সুরু করলেন :—

মেয়েটির নাম লছমী। দেশে ফিরে চন্দ্রকান্ত লছমীকে হিন্দু-মতেই বিয়ে করলেন। এই থেকেই বোঝা যায়, তাঁর কি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল! আত্মীয়স্বজনেরা ত দূরের কথা, প্রজারাও এই অ-সম বিবাহের বিরুদ্ধে কোন রকম প্রতিবাদ করতে সাহস পেল না। লছমীকে বিয়ে করার পর থেকেই চন্দ্রকান্ত যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। শুধু যে তাঁর জীবনযাত্রার পরিবর্ত্তন হ'ল তাই নয়, তাঁর চরিত্রও যেন বদলে যেতে লাগল। সেই চণ্ডাল রাগ মিলিয়ে গেল, তিনি অনেকখানি শান্ত হয়ে উঠলেন। লছমীকে নিয়ে তিনি যেন এক কাব্যলোক গড়া সুরু করলেন। তাকে মনের মত করে সাজাতে লাগলেন। সঞ্চিত লুটের মাল থেকে তাকে নানা সুদৃশ্য উপহার দিলেন। মেমসাহেবদের গাউন কেটে লছমীর সিল্কের কাচুলী তৈরি হ'ল। মুর্শিদাবাদ থেকে তার জন্যে সিল্কের সাড়ী এল। কলকাতার হ্যামিলটনের দোকান থেকে চন্দ্রকান্ত তার গয়না গড়িয়ে দিলেন। আর দিলেন তাকে সেই লুট-করা অপরূপ মুক্তোর মালা।

লছমীর শরীরেও নিশ্চয়ই অভিজাত রক্ত ছিল। এত বড় জমিদারের ঘরে এসেও সে কিছুমাত্র বিচলিত হ'ল না। সে বৈদ্যনাথধামের মেয়ে, বাংলা বলতে না পারলেও বুঝতে পারত। সে নিপুণ হাতে সংসারের সমস্ত ভার তুলে নিল। তার আদেশ উপদেশ ছাড়া জমিদারবাড়ীতে কোন কাজ হবার উপায় ছিল না। এমন কি ইংরেজী জানা ম্যানেজারও এষ্টেটের কাজে তার পরামর্শ নিত। আর আশ্চর্য্য এই যে, সদ্যোভিন্নযৌবনা এই বিদেশিনী দৈত্যের মত বিরাট চন্দ্রকান্তকে পুরোপুরি বশ করে নিল। লছমী চন্দ্রকান্তের বেশভূষার দিকে নজর দিলে। এতকাল পরে চন্দ্রকান্তের গায়ে জামা উঠল। ইয়ারদের আড্ডা বন্ধ করে দিল লছমী। তার বদলে পাশাখেলার আসর বসাল! গণ্যমান্য লোকেরা সব আসতে লাগল আসরে। এক কথায়, সে চন্দ্রকান্তের জীবনের সংস্কারে লেগে গেল।

চন্দ্রকান্ত জীবনে কখনও নারীর সংস্পর্শে আসেন নি। নারী-মনের রহস্য তাঁর জানা ছিল না। কিন্তু লছমীর সান্নিধ্যে কিছুকাল অতিবাহিত হলে পর নারীচরিত্রের একটা বিচিত্র দিক তার নিকট উদ্‌ঘাটিত হ'ল। তিনি বুঝতে পারলেন লছমীকে তিনি ছিনিয়ে এনেছেন, কিন্তু জয় করতে পারেন নি। লছমী যতই তাঁর যত্ন করুক সে শুধু তাঁর গৃহিণী হয়েছে, প্রিয়া হয় নি। চন্দ্রকান্ত যে লছমীর মন পান নি, এ খবর চাপা রইল না। ঝি-চাকরদের মারফত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

চন্দ্রকান্ত বিগড়ে গেলেন। রাস্তায় বেরোলেই যেন তাঁর মনে হ'ত প্রজারা সব অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আছে। তাঁর মুখ সব সময় থমথম করতে লাগল। লছমীকে আনার পর তাঁর চোখের দৃষ্টি অনেকটা শান্ত হয়ে গিয়েছিল। এবার সে চোখ যেন আরও জ্বল জ্বল করতে লাগল। তিনি প্রায়ই একা একা দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াতেন। ডাকাতি করা একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলেন, আবার আরম্ভ করলেন। এবারে যেন সাংঘাতিক নৃশংস হয়ে উঠলেন। ডাকাতি করতে গিয়ে অকারণে খুন জখম করতে লাগলেন। তাঁর প্রিয় অনুচর রতন অবধি তাঁকে ভয় করে চলতে লাগল। একদিন রাত্রিবেলা ডাকাতি সেরে চন্দ্রকান্ত ফিরে এসেছেন। সে রাত্রিটাও আজকের মত এই রকম দুর্যোগময় ছিল। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল, মেঘ ডাকছিল, আর ঝড় বৃষ্টির মাতন চলছিল। তিনি যখন ফিরে এলেন, তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। কিন্তু ঝড় যেন আরও উদ্দাম হয়ে সোঁ-সোঁ করছে। রতনকে সঙ্গে নিয়ে নিজের মহলে চললেন চন্দ্রকান্ত। দু'জনেই আপাদমস্তক ভিজে গিয়েছিলেন। নিজের মহলে ঢুকে দেখলেন, লছমীর ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। আলোর রেখা বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরে এসে পড়েছে। আলোর রেখা দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। লছমী এখনও জেগে আছে? হঠাৎ লছমীর ঘরের দরজা খুলে গেল, আর প্যান্টের দু'পকেটে হাত পুরে শিস দিতে দিতে বেরিয়ে এল ম্যানেজার। চন্দ্রকান্ত যেন এই রকমই একটা কিছু আশঙ্কা করছিলেন। এ কয়মাসের রুদ্ধ আক্রোশ যেন পথ খুঁজে পেল। জন্তুর মত একটা অবোধ্য চীৎকার করে তিনি ম্যানেজারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লেন। বিদ্যুতের চকিত আলোয় তাঁকে দেখেই ম্যানেজার পালাতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তার আগেই চন্দ্রকান্তের তলোয়ারের ঘায়ে তার মুণ্ড দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। চন্দ্রকান্তের চেহারা দেখে দুঃসাহসী রতনও আর সেখানে দাঁড়াতে সাহস করল না, ভয়ে পালিয়ে গেল। যাবার আগে দেখে গেল, চন্দ্রকান্ত উন্মত্তের মত ম্যানেজারের মুণ্ডহীন দেহে তলোয়ারের আঘাত করে চলেছেন। পরদিন সকালে দেখা গেল, চন্দ্রকান্ত আর লছমী দু'জনেই

সরোজ। ম্যানেজারের ছিন্নভিন্ন মৃতদেহেরও কোন সন্ধান মিলল না। ম্যানেজারের পরিণামের কথা রতনের কাছ থেকে সকলেই শুনেছিল। কিন্তু লছমীর কি হ'ল? লছমীর বরাতে কি ভয়ঙ্কর শাস্তি জুটল, কেউ হদিস পেল না।'—ষ্টেশন মাষ্টার দম নেবার জন্যে একটু থামলেন।

'লছমীর কি হ'ল?' আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলাম।

'শুনুন না। ঠিক তিন মাস পরে চন্দ্রকান্ত ফিরে এলেন। আবার গর্বিতভাবে মাথা উঁচু করে সাদা আরবী ঘোড়ার পিঠে চড়ে চন্দ্রকান্ত এসে হাজির হলেন। সঙ্গে পাল্কীতে তাঁর নতুন বউ। পুরো এক সপ্তাহ ধরে জমিদারবাড়ীতে উৎসব চলল। জমিদারী-শুদ্ধ সকলের নেমন্তন্ন হ'ল। বউ দেখে সকলেই বেশ খুশী। বাঙালী মেয়ে, লছমীর চেয়েও সুন্দরী, নাম অন্নপূর্ণা। নিমন্ত্রিতদের সেতার বাজিয়ে শোনাল নতুন বউ। বেশ চমৎকার হাত। তবু যেন অনেকের সন্দেহ হ'ল, লছমীর সঙ্গে নতুন বউয়ের ঢের সাদৃশ্য আছে। সন্দেহ করলেও কিন্তু কেউ মুখ ফুটে প্রকাশ করতে সাহস করল না।'

'কিন্তু লছমীর কি হ'ল।' আমি আবার প্রশ্ন করলাম।

'লছমীকে কিছুতেই ভুলতে পারছেন না, না?' ষ্টেশন মাষ্টার অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন; তার পর একটু হেসে বললেন, 'লছমীই ত অন্নপূর্ণা। চন্দ্রকান্তের জীবনে লছমীই প্রথম ও শেষ নারী। চন্দ্রকান্ত কখনও তাকে ত্যাগ করতে পারেন? কিন্তু অন্যদিকে আছে বংশগৌরব। যে-সে বংশ নয়, স্বয়ং হুসেন শা খাঁ উপাধি দিয়েছিলেন যে বংশকে। অবিশ্বাসিনী স্ত্রীকে ঘরে স্থান দিলে এত বড় বংশের মর্যাদা ধুলায় লুটাবে। তাই কলকাতায় পালিয়ে গিয়ে চন্দ্রকান্ত লছমীর কঠোর শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। ফলে, হিন্দুস্থানী লছমী হ'ল বাঙালী অন্নপূর্ণা। লছমী লাল সাড়ী ভালবাসত, অন্নপূর্ণার পরনে নীল শাড়ী; লছমী পরত সিঁদুরের টিপ, অন্নপূর্ণা পরল কাঁচপোকার; লছমীর নাকে ছিল নথছাবি, অন্নপূর্ণার নাকে নোলক; লছমী ঢোল বাজাতে পারত, অন্নপূর্ণা শিখল সেতার।'

'কিন্তু লছমী এ অত্যাচার সহ্য করল কেন?' আমি অসন্তুষ্ট হয়ে বললাম।

ষ্টেশন মাষ্টার বিজয়ীর দৃষ্টিতে চাইলেন, বললেন, 'বুঝলেন না, সে রাত্তিরে চন্দ্রকান্তের রুদ্র রূপ দেখে লছমী তাঁকে ভালবাসতে আরম্ভ করেছিল। জানেন ত মাষ্টার মশাই, ভয় না পেলে কোন কোন মেয়ে ভালবাসে না।'

চন্দ্রকান্তের কাহিনী শুনতে শুনতে আমি এত অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে, কিছুতেই লছমীকে মন থেকে তাড়াতে পারছিলাম না। আপন মনেই বলে উঠলাম, লছমী খুব সুন্দরী দেখতে ছিল, না?'

'হাঁ, ঐ যে ঐ রকম,' বলে ষ্টেশন মাষ্টার চোখের ইঙ্গিত করলেন।

ফিরে দেখলাম, চা হয়ে গেছে। ষ্টেশন মাষ্টারের স্ত্রী দু'কাপ চা হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছেন। ঘোমটা খসে পড়েছে। পেট্রো-ম্যাক্সের উজ্জ্বল আলোয় দেখলাম, ষ্টেশন মাষ্টারের স্ত্রী তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, হিন্দুস্থানী—অপরূপ রূপসী; আর তার গলায় জলজ্বল করছে এক ছড়া বহুমূল্য মুক্তার মালা। এইখানে একটা কথা বলে রাখি, আমি শিক্ষাব্রতী; যতই আত্ম-বিস্মৃত হই, মেয়েদের সম্বন্ধে কখনও আমি কোনও অসঙ্গত উক্তি করি না। কিন্তু সে রাত্তিরে আমার সবকিছু আচরণই যেন কেমন বিসদৃশ হয়ে উঠেছিল। এই নগণ্য জায়গায় এত রাত্রে এরকম অপরূপ সুন্দরী মেয়ের দেখা পাওয়া এত অপ্রত্যাশিত যে আমার মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল, 'বাঃ, কি সুন্দর!'

ষ্টেশন মাষ্টারের চোখ জ্বলে উঠল। তিনি একবার তাঁর স্ত্রীর দিকে, একবার আমার মুখের দিকে চাইলেন। তাঁর মুখে একটা অদ্ভুত ভাব ফুটে উঠল। ষ্টেশন-মাষ্টারের স্ত্রী লজ্জিত হয়ে তাড়া-তাড়ি ঘোমটা দিয়ে ঘরে পালালেন। ষ্টেশন-মাষ্টারও সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেলেন।

একটু পরে যখন ফিরে এলেন, হাতে তাঁর একটা জরি-বসানো লাল ভেলভেটের খাপে সোনার বাঁটওয়ালা একটা বাঁকা তলোয়ার। চাপা গলায় বললেন, 'চন্দ্রকান্তের তরোয়াল।' তলোয়ারটা খাপ থেকে টেনে বার করলেন শাণিত ফলাটায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। একশ' বছর পরেও তার ধার একটুও ম্লান হয় নি। ঝকঝকে পরিষ্কার ফলা, তবু আমার যেন অকারণে মনে হ'ল, কোথায় রক্তের ছোপ লেগে আছে।

কথাবার্তা আর জমল না। ষ্টেশন মাষ্টারের স্ত্রীর সম্বন্ধে বেফাঁস কথা বলে ফেলে আমি বড় লজ্জিত হয়েছিলাম। নিঃশব্দে চা খেতে লাগলাম। ষ্টেশন মাষ্টারও হঠাৎ অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেলেন। শুধু একবার বললেন, 'বিষ্টি এখনও জোরে পড়ছে। রাত্তিরটা এখানেই থেকে যান।'

চা খাওয়া হয়ে গেলে তিনি আমায় অন্য ঘরে নিয়ে গেলেন। উঠোনের ও পাশে আর একটা ঘর আছে, আসবার সময় অন্ধকারে লক্ষ্য করি নি। ষ্টেশন মাষ্টার ছাতা নিয়ে আমায় উঠোনটা পার করে দিলেন। বৃষ্টি তখনও বেশ জোরে পড়ছে। ঘরে ঢোকবার আগে আমি নির্বোধের মত একটা প্রশ্ন করে বসলাম, 'ম্যানেজার দেখতে কি রকম ছিল তা কি শুনেছেন?'

ষ্টেশন মাষ্টার অদ্ভুত স্বরে উত্তর দিলেন, 'কতকটা নাকি আপনার মত।'

ঘরে একটা তক্তার উপর বিছানা পাতা ছিল। নরম বিছানা, চাদরটাও বেশ ফর্সা। বোধ হয় আমার জন্যেই পেতে দেওয়া হয়েছে। মাথার বালিশটাও নরম, তবু কিছুতেই ঘুম এল না। বেশী চা খাওয়ার জন্যেই হোক, আর গল্প শোনার উত্তেজনাতেই হোক, অনেক চেষ্টা করেও ঘুমোতে পারলাম না। শুয়ে শুয়ে চন্দ্রকান্তের কাহিনীই ভাবছিলাম। ষ্টেশন মাষ্টার আমায় গল্পটা

শোনালেন কেন? গল্পটা ত এমন নয় যে দশ মিনিটের আলাপীকে ডেকে বড়গলায় শোনানো যায়। বিশেষ করে ষ্টেশন মাষ্টারের মত যার বংশমর্য্যাদা-জ্ঞান এত বেশী, তার পক্ষে এ ধরণের বংশকলঙ্ক ত গোপন করবারই কথা। কোন ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে আমি অহেতুক অশ্রদ্ধা দেখাতে চাই না, কিন্তু ষ্টেশন মাষ্টারের স্ত্রীর সঙ্গে যখন আমার ক্ষণিকের জন্যে চোখাচোখি হয়েছিল, তখন স্পষ্ট দেখেছিলাম তাঁর চোখে এক রহস্যময় আহ্বান। আর··· আর লছমীর জন্যেই বা আমার এত মাথাব্যথা কেন? ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে উঠল, কান দিয়ে আগুন বেরুতে লাগল। আমার তেষ্টা পেতে লাগল। গলা এত শুকিয়ে উঠল যে জল না খেলেই নয়। অগত্যা উঠলাম। আমরা যে রকে বসে গল্প করছিলাম, তার এক ধারে জলের কুঁজো আছে দেখেছিলাম। দরজা খুলে বেরুলাম।

বৃষ্টি একেবারে থেমে গেছে। আকাশও খানিকটা পরিষ্কার হয়েছে। কিছু দূরে আমাদের ট্রেনটা বিরাট একটা সরীসৃপের মত নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে। ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরের দরজা বন্ধ, কোনও সাড়াশব্দ নেই। মাঝে মাঝে ব্যাঙ ডাকছে আর দূর থেকে হায়নার হাসি ভেসে আসছে। ঝড় কিন্তু তখনও সোঁ সোঁ করছে।

হাতড়ে হাতড়ে রকের উপর উঠলাম। কুঁজোটা ঠিক কোথায় আছে দেখবার জন্যে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললাম। আমরা যে টেবিলটার সামনে বসে গল্প করছিলাম, সেই টেবিলটা স্পষ্ট হয়ে উঠল: এত চমকে উঠলাম যে, হাত থেকে কাঠিটা পড়ে গেল। দেশলাইয়ের ক্ষণিক আলোয় দেখলাম, টেবিলের উপর একটা পরচুলা খোলা রয়েছে। ঘন কালো লম্বা কোঁকড়ানো চুল। আমার অতীত আর বর্ত্তমানে গোলমাল হয়ে যেতে লাগল। মনে হ'ল, আজ রাত্রির ঘটনাগুলির পেছনে অদৃষ্টের অদৃশ্য হাত আছে। টিটাগরের আগে মালগাড়ী লাইনচ্যুত হওয়া থেকে আরম্ভ করে আমার প্রবল চা-তেষ্টা পাওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা যেন অনিবার্য্যভাবে আমাকে ষ্টেশন মাষ্টারের গৃহে টেনে এনেছে। যেন আজকের দুর্য্যোগময় রাত্রিতে আমার এখানে উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু চন্দ্রকান্তের কাহিনীতে আমার স্থা[ন] কোথায়? হঠাৎ মনে পড়ল ষ্টেশন মাষ্টারের স্ত্রীর চোখে অ[প]রিচিত আমন্ত্রণ আর ষ্টেশন মাষ্টারের শেষ কথা, 'কতকটা আপনা[র] মত।' ভয়ে শিউরে উঠলাম। জলতেষ্টার কথা একেবারে ভু[লে] গেলাম। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পা টিপে টিপে ঘরে ফিরে এলাম।

ঘরে ফিরে দরজায় হুড়কো লাগিয়ে তবে দম ছাড়লাম। আমার সারা শরীর ভয়ে থর থর করে কাঁপছিল। দাঁড়িয়ে থাক[তে] পারলাম না, দুর্ব্বল দেহে খাটের উপর বসে পড়লাম। কবে কো[ন] যুগ আগেকার আর এক রাত্রির কথা আমার মনে পড়ছিল। চোখে ভাসছিল লছমীর লাস্যময় হাসি আর চন্দ্রকান্তের প্রতিহিংস[া] উজ্জ্বল চোখ। অনবরত কানে বাজছিল ষ্টেশন মাষ্টারের শে[ষ] কথা, 'কতকটা আপনার মত।' প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হচ্ছিল, চন্দ্রকা[ন্ত] যেন, না-না ষ্টেশন মাষ্টার যেন সোনার বাঁটওয়ালা ধারা[লো] বাঁকা তলোয়ার হাতে নিয়ে নিঃশব্দে উঠোন পেরিয়ে আসছেন। অন্ধকারে বাঘের মত তাঁর চোখ জ্বলছে। তাঁর চওড়া [কাঁ]ধের এ[ক] ধাক্কাতেই হুড়কো ভেঙে পড়ল, আর তারপর···। আমার শির[া] উপশিরায় হিমস্রোত বয়ে যাচ্ছিল। চীৎকার করবার শক্তি লোপ পেয়ে গেল। আর চীৎকার করলে শুনতেই বা পাবে কে? নিশ্চিত অমঙ্গলের আশঙ্কায় অসাড় দেহে খাটের উপর বসে রইলা[ম]। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না!

ঘুম ভাঙল দরজায় ধাক্কা শুনে। বাইরে থেকে কে যে[ন] ডাকছে, 'বাবু, বাবুজী।' দরজা খুলে বেরিয়ে দেখলাম, ষ্টেশনে[র] একটা কুলী। সে বললে, 'বাবুজী, মাষ্টারসাব আপকো বে[ালা]নে বোলা। বোম্বাই মেল আতী হায়।' কুলীর স[ঙ্গে] বেরিয়ে পড়লাম। বাড়ীর পাশে একটা বাঁধানো ইঁদারা ছিল। কুলী জল তুলে দিল। চোখ-মুখ ধুয়ে চশমাটা পুঁছে চো[খে] দিলাম। ভোরের আলোয় জায়গাটা খুব খারাপ লাগল না। রাত্রির সকল ঘটনা যেন মনে হতে লাগল এক নিদারুণ দুঃস্বপ্নে[র] মত।
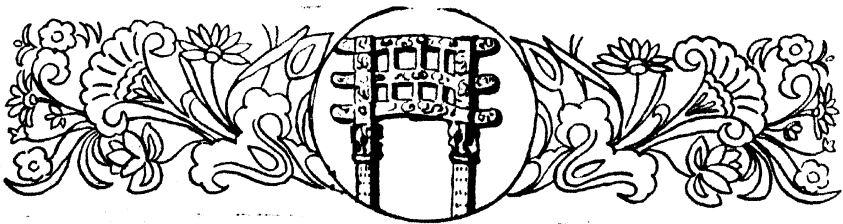
শশিশেখর বসু

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

সে যুগের বিখ্যাত সাংবাদিক, এবং একালের অনবদ্য বাংলার রস-রচনা লেখক শশিশেখর বসু বিরাশী বৎসর বয়সে, বিগত ২৬শে ফেব্রুয়ারী পরলোকগমন করিয়াছেন।

শশিশেখর নদীয়া জেলার উলা-বীরনগরের বিখ্যাত বসু-বংশ-সম্ভূত। তাঁহার পিতা চন্দ্রশেখর বসুর নাম গত শতাব্দীতে শিক্ষিত জনের নিকট সুবিদিত ছিল। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তথা আদি ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র এবং বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তকগুলি গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তাঁহার চারি পুত্র —শশিশেখর, রাজশেখর, কৃষ্ণশেখর এবং গিরীন্দ্রশেখর। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু 'পরশুরাম' ছদ্মনামে কয়েকখানি রস-রচনাত্মক পুস্তক লিখিয়া বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত হইয়াছেন। ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু মনস্তত্ত্ববিদ রূপে দেশ-বিদেশে সুপরিচিত। কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি গত হইয়াছেন। শশিশেখর বেশীর ভাগ ছদ্মনামে ভারতের সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্রসমূহে তিক্ত কথায় এবং কচিৎ মধুর রচনা লিখিয়া সরকার এবং জনসাধারণ উভয়েরই তাক লাগাইয়া দিতেন।

পিতা চন্দ্রশেখর বসু দারভাঙ্গা মহারাজের ম্যানেজার পদে বহু বৎসর নিযুক্ত ছিলেন। এই দারভাঙ্গাতেই শশিশেখর ১৮৭৪ সনের ১৬ই আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। বাল্যে ও কৈশোরে তাঁহার শিক্ষার বনিয়াদ বিশেষ পাকা হইয়াছিল। দারভাঙ্গা-রাজ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মিঃ ওয়ালটিঙের নিকট তিনি ইংরেজী পাঠ লন। ইংরেজী ভাষার উপরে শশিশেখরের যে এত দখল, তাহার মূলে ছিল মিঃ ওয়ালটিঙের সযত্ন শিক্ষাদান। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রথমে পাটনা কলেজ এবং পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। কিন্তু তাঁহার কালেজী শিক্ষা আর অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই।

কলেজ ত্যাগ করিয়া শশিশেখর কয়েক বৎসর যাবৎ 'কলিকাতা ইণ্টেলিজেন্স সিণ্ডিকেট' নামে একটি সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন। এ ধরনের স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের তিনি পথপ্রদর্শক। 'এসোসিয়েটেড প্রেস' স্থাপিত হইলে শশিশেখর স্বীয় প্রতিষ্ঠানটি তুলিয়া দেন। ইহার পর ১৯১১ সন নাগাদ তিনি এলাহাবাদ গমন করেন এবং সেখানেই বাসস্থাপন করা তাঁহার বাসনা হয়। পরে তিনি ইউরোপীয়ান স্টাইলের হোটেল চালাইতে থাকেন। লক্ষ্ণৌয় গিয়াও ঐ ধরনের একটি হোটেল স্থাপনা করেন। কিন্তু ব্যবসা তাঁহার ধাতস্থ হয় নাই। সংবাদপত্রের রস-রচনা, যাহা এত দিন তাঁহার স্বাভাবিক বৃত্তি ছিল, তাহাতেই পুনরায় মনঃসংযোগ করিলেন।

শশিশেখর বসু

তবে প্রথম জীবন হইতেই লেখনী পরিচালনা করিলেও, তিনি কোন বিশেষ সংবাদপত্রে 'চাকুরি' করেন নাই। লক্ষ্ণৌর 'পাইনীয়র', এলাহাবাদের 'লীডার', বোম্বাইয়ের 'ইন্দুপ্রকাশ' ও 'বোম্বে ক্রনিকল', কলিকাতার 'বেঙ্গলী' ও 'ইংলিসম্যান'—কত বিখ্যাত সংবাদপত্রেই না শশিশেখরের সরস রাজনৈতিক ও অন্যবিধ রচনা পরিবেশিত হইত! এলাহাবাদের 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' পত্রিকাও তাঁহার রস-রচনা হইতে বাদ যান নাই। শশিশেখর ছদ্মনামে লিখিতেন, তাই অনেকে প্রায় নিঃসংশয় ছিল যে লেখক ইংরেজ। শশিশেখর যখন যেখানেই থাকুন, সংবাদপত্রের সম্পাদক ও কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেন, তাঁহার নিকট হইতে রস-রচনা আদায় করিয়া তবে ছাড়িতেন। শেষে তিনি প্রায় এগার বৎসর যাবৎ পাটনার 'বিহার হেরাল্ডে' "Esobss" (ইংরেজীতে "S. S. Bose" শেষ হইতে পাঠ করিলে এইরূপ দাঁড়ায়) ছদ্মনামে গল্প, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, রাজনৈতিক মতামত কত কি লিখিতেন। তাঁহার লেখনী-মুখে অতি শুষ্ক বিষয়ও সরস হইয়া উঠিত, তুচ্ছতম বিষয়ের প্রতিও পাঠকের দৃষ্টি না পড়িয়া যাইত না। 'পাইওনীয়র' পত্রিকার সম্পাদক জি. এন. চেস্‌নি শশিশেখরের রস-রচনার একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন ১৯০৫ সনে। বইখানির নাম "Humorous Sketches"। ইহাতে লেখকের নাম ছিল—

"S, S, Bose"। কলিকাতার ষ্টেটসম্যান সম্পাদকীয় স্তম্ভে ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

এই দীর্ঘ জীবনে শশিশেখর কদাচিৎ বাংলা লিখিয়াছেন। অন্ততঃ শেষজীবনে শেষ কয় বৎসরের পূর্ব্বে কেহ ইহার পরিচয় পায় নাই। তাই যখন কলিকাতার একটি বাংলা দৈনিকে প্রায় প্রতি সপ্তাহে তাঁহার বাংলা রচনা প্রকাশিত হইতে থাকে তখন ইঁহার ভাষা-লালিত্য এবং রস-প্রাচুর্য্য দেখিয়া পাঠক মাত্রেরই বিস্ময় জাগে। ইংরেজীর মত মাতৃ-ভাষা বাংলায় রস পরিবেশনেও তিনি ছিলেন সমান সিদ্ধহস্ত। সাহিত্যিকপ্রবর শ্রীযুত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী শশিশেখরের রচনা সম্বন্ধে বলেন ঃ

"তাঁর সহজ অলঙ্কারশূন্য ভাষায় একটি শোভার সঞ্চার হয়। তাঁর ইংরেজী বা বাংলা লেখা ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, সংস্কৃত বুকনি বর্জ্জিত। একটাও বড় বা শক্ত শব্দ নাই। বিনীত ভাবে দীনের মত দরিদ্র শব্দ নিবেদন করেন। কলম যত অগ্রসর হয়, সগৌরবে নিজের পরিচয় দিতে থাকে। বাংলা রচনার পেছুতে আছে পঞ্চাশ বছর চালানো ঝানু ইংরেজীর অভিজ্ঞতা। তাই লেখনী নির্ব্বাধ, নির্ভীক। তাঁর ব্যঙ্গের পরিবেশনে পাঠকের মর্ম্মদাহ আমরা দেখি না।"

শশিশেখরের স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। বইপত্র তাঁর নিকট খুব কমই থাকিত। তিনি বলিতেন, 'আমি সাংবাদিক, বইপুত্রের কি ধার ধারি ?' তথাপি তাঁহার লেখনী কখনও তথ্যকে বিকৃত করে নাই। এ বিষয়ে স্মৃতিশক্তি তাঁহার প্রধান সহায় ছিল। মৃতদার শশিশেখর শেষজীবন কলিকাতায় কাটাইয়াছেন, তাঁহার মনের সঙ্গী ছিল তাঁহার 'টাইপ রাইটার'টি !

বর্ষা-নর্ত্তকী

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

নর্ত্তকী বর্ষা সুন্দরী বর্ষা,
এস ভীম ভৈরবে ছন্দে শ্রীহর্ষা,
বন্দি গো বর্ষা !
নাচে ওঠে ঝাঁপতাল ঝরে ঘন রিমঝিম,
অম্বুদ্‌পাখাজে বাজে জয়ডিণ্ডিম।
মধুরূপা রুদ্রাণী বরাভয়দর্শা,
এস নববর্ষা !
চঞ্চলকটিতটে দোলে রসহিন্দোল,
বিশ্বের প্রাণটিরে দাও নিশিদিন দোল,
গুরু গুরু উরু দোলে দোদুল নিতম্ব,
ডম্বরু বাজে মেঘে সঙ্গে মৃদঙ্গ,
ওঠে ও কি টঙ্কার—যৌবন-ঝঙ্কার,
ভয়হরা জয়বাজে কার রণডঙ্কার ?
কজ্জলটানা চোখে উজ্জ্বল কালো মেঘ
ঝঞ্ঝার ঘনবেগে দোল খায় নীল চুল,
বিদ্যুৎ চিরে চিরে লাখ লাখ বোল্ ফুলে
মালা ছিঁড়ে ব্যোমপথ ভরে গেল বিলকুল।
ধ্যানলোকময়া,
কৃষ্ণ ও কালী দেহে হৃদে আছে লগ্না,
ঝঞ্ঝার দমকায় কখন আচমকায়
হঠাৎ কি আনমনে হৃদে যাবে নগ্না ?
ভয় নেই শিবধ্যান হ'ল ঐ ভঙ্গ,
চমকাবে কামদেব ফুলশরবঙ্গ।

খুলে যাক্ অঙ্গের সব মধু উৎসব
হাঙ্কা সে দেহে তার ঝরুক বিভঙ্গে,
তারি মধু সঙ্গে—
শিব সাথে মিলে যাবে ধ্যানভাঙা গৌরী,
চল সখী দৌড়ি',
ফুলবাগে ঝুলনাটি আয় বাঁধি রঙ্গে।
আয় তবে বর্ষা সৃষ্টির ভরসা
সংসার পাপতাপে আজ সব ধ্বংসি',
বজ্রে ও ঝঞ্ঝায় ভাঙ সব ঝঞ্ঝাট
বাজুক এ বিশ্বের মিলনের বংশী।
বায়ু বো'ক শন্‌-শন্ চক্‌মাক্ বিদ্যুৎ,
আনন্দবাণী দিক্ স্বর্গের দেবদূত,
অম্বর থমথম,
বন্‌বন্ ঘোর তুই মুখেতে বমবম।
দেখা তোর দাপটা, মার তুই ঝাপটা
মরে যাক্ তার দাপে শয়তান সাপটা।
আয় তবে রঙ্গিণী সঙ্গীত ঝিকঝিক্
জীবন্ত হোক্ আজি সব তৃণজর্জ্জর,
গুণ্ঠন খুলে আজ হাস তুই ফিক্ ফিক্
ঝর্ঝরি ঝর তুই ঝর্ঝর ঝর্ঝর।
বিদ্যুৎ-জ্বালা বুকে মুখে মধুবর্ষা,
আয় নেচে বর্ষা।

ইটালীর আর্ট গ্যালারিতে একটি জাপানী পট

রেজ্জিও এমিলিয়ার আর্ট গ্যালারিতে সযত্নে রক্ষিত অনেকগুলি বিখ্যাত কলাশিল্প-সম্পদের অন্যতম হইতেছে তিন ভাগে বিভক্ত একটি বৃহদায়তন জাপানী কাগজের পট।

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধেই জাপানী রণতরীর বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইতে থাকে এবং সামরিক সর্ব্বাধিনায়ক (Military Dictator) লেয়াসুর (১৫৪২-১৬১৬) আগ্রহে ও নির্দ্দেশে এগুলি বিদেশাভিমুখে যাত্রা করিতে আরম্ভ করে। মেইজি রাজবংশের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত (১৮৬৮) যে টকুগাওয়া বংশ যাবতীয় নাগরিক এবং সামরিক ব্যাপারের উপর কর্তৃত্ব করিত, লিয়াসু ছিলেন সেই পরিবারের আদিপুরুষ। জাপানী জাহাজসমূহ সেযুগে শ্যাম, কোচিন-চীন, টঙ্কিন, কাম্বোডিয়া প্রভৃতির মত দূরবর্ত্তী স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিত। এই বিষয়ে তাহাদের সমকক্ষ হইয়া উঠে পর্ত্তুগীজ বণিকেরা এবং পরে স্পেনীয়েরা—তাহাদের জাহাজগুলিও ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধেই জাপানের দক্ষিণতম প্রান্তস্থিত কিয়ুসু দ্বীপে নোঙর করিত। যে পট দুটির কথা এখানে বলা হইতেছে তাহা ঐ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের সহিত জাপানের উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক সম্পর্কের উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করে।

২নং চিত্রটিতে চিত্রিত হইয়াছে খোলা ছাতার নীচে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির অগ্রসরণের দৃশ্য—ছাতাটি তাঁহার মাথার উপরে মেলিয়া ধরা হইয়াছে সম্মানের নিদর্শনস্বরূপ। রকমারি উপঢৌকনসহ অনুচরবর্গ আসিতেছে তাঁহার পিছনে পিছনে আর তিনি ডানদিকে ঘুরিতেছেন। তাঁহার পাশে প্রথামত দুইটি তলোয়ারধারী একজন সামুরাই—মনে হয় যেন একটি ক্ষুদ্র সাঁকোর মাথায় দাঁড়াইয়া তাঁহাকে স্বাগত করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। এই সাঁকো পার হইয়াই বিশিষ্ট ব্যক্তিটি গিয়া পৌঁছিবেন সেই ভবনে যেখানে অন্যান্য ব্যক্তিরা তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। আর একটি প্রাসাদের রেলিঙের পিছনে দাঁড়ানো দুই জন মিশনরী, সম্ভবতঃ জেস্যুইট, মনে হয়—আগ্রহের সহিত এই দৃশ্য অবলোকন করিতেছেন। ছবিটিতে এবড়ো-খেবড়ো সাদা মেঘ দ্বারা দৃশ্যচিত্রকে আংশিকভাবে ঢাকিবার প্রয়াস লক্ষণীয়—ইহা ঐ সময়কার জাপানী চিত্রের একটি প্রথাগত বৈশিষ্ট্য। এই পটে

১নং চিত্র (ক)

১নং চিত্র (খ)

১নং চিত্র (গ)

চিত্রিত ইউরোপীয়দের নাসিকাগুলিকে মাত্রাতিরিক্ত দীর্ঘ করিয়া আঁকিয়া ব্যঙ্গরসের অবতারণা করা হইয়াছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিটির অনুচরবর্গের মধ্যে একজন তাঁহার জন্য একটি আরাম-কেদারা বহিয়া লইয়া যাইতেছে—পাশ্চাত্ত্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং জাপানীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনাকালে উপবেশনের নিমিত্ত সর্ব্বদাই এই ধরণের আসনের প্রয়োজন হইত।

অপর পটটিতে (চিত্র নং ৩) চিরাচরিত পদ্ধতিতে অঙ্কিত হইয়াছে তীরসংলগ্ন, হয়ত একটি পর্ত্তুগীজ অথবা স্পেনিশ জাহাজ, দুইটি বাঁকানো পাইন গাছ এই চিত্রের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। জাহাজটি হইতে বস্তা এবং বাক্সে প্যাক করা পণ্যসম্ভার খালাস করা হইতেছে। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি—সম্ভবতঃ জাহাজের কাপ্তেন ডেক হইতে এই কাজ অবলোকন করিতেছেন। মালগুলি জাহাজ হইতে একটি নৌকায় উঠাইয়া তীরে লইয়া যাওয়া হইতেছে। একটির পর একটি করিয়া মাল আসিয়া পৌঁছিতেছে আর তীরে উপবিষ্ট দুইজন ইউরোপীয় গভীর মনোযোগের সহিত সেগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। কাপ্তেন এবং তত্ত্বাবধায়কদ্বয় সকলেই পাইপ টানিতেছেন। এই সময়কার জাপানী পটে যে সকল ইউরোপীয়কে চিত্রিত করা হইত তাহাদের মুখে সকল সময়েই পাইপ দিবার রেওয়াজ ছিল। জাপানী এবং ইউরোপীয়দের মোলাকাতের দৃশ্য আঁকা অনেকগুলি পট এখনো নাগাসাকিতে রক্ষিত আছে।

২নং চিত্র

এই পটগুলিতে যে সকল ইউরোপীয়কে চিত্রিত করা হইয়াছে তাহারা পর্তুগীজ এবং স্পেনীয় বলিয়া অনুমিত হয়। জাপানীদের সঙ্গে বৈদেশিকদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক—বস্তুতঃ প্রথমোক্তদের দ্বারা প্রবর্তিত হয় এবং শেষোক্তগণ কর্তৃকও ইহা অনুসৃত হইতে থাকে।

পরবর্তীকালে কিন্তু জাপানের সমুদ্রে প্রথমে স্পেনীয় এবং পরে পর্তুগীজ জাহাজ নোঙর করা নিষিদ্ধ হইল। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে ওলন্দাজ বণিকগণ সর্বতোভাবে তাহাদের স্থান অধিকার করিল এবং প্রায় মেইজি রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রাক্কাল পর্যন্ত ভিন্ন পদ্ধতিতে একান্তভাবে নিজেদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলিল। ইংরেজ বণিকদেরও বাণিজ্য করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু বাণিজ্যের দ্বারা আশানুরূপ ফললাভ না হওয়াতে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহারা সরিয়া পড়িল।

এই দুইটি পটের উপর আঁকা ইউরোপীয় বণিকদের পোশাক-পরিচ্ছদ ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের পোশাক-পরিচ্ছদের অনুরূপ বলিয়া অনুমিত হয়; পক্ষান্তরে ১নং পটের ওলন্দাজদের বেশভূষা যে পরবর্তীকালের তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। এক নম্বর পটে আঁকা পতাকার লাঞ্ছন হইতে একদিকে যেমন জাহাজটি কোন্ জাতির সম্পত্তি তাহা নির্ণীত হইতে পারে, অন্যদিকে তেমনি ইহার কতিপয় লিপি হইতে এই চিত্রের তাৎপর্য্য এবং উহা কি উদ্দেশ্যে অঙ্কিত তাও নির্ণীত হইতে পারে যদিও উপরকার অংশটি ছিন্ন হওয়াতে লিখনটি অসম্পূর্ণ। চিত্রলিপিতে যে তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে, ১৬৩৪ সনের সঙ্গে তাহার মিল হয়। ঐ পটে চিত্রিত হইয়াছে টক্কিন উপসাগরে নোঙর-করা মালবোঝাই একটি জাপানী জাহাজে এক উৎসবের দৃশ্য। ওলন্দাজ বণিকদের সম্মানার্থে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় এবং তাহাদের কারবার লাভজনকই হইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ঢাকের বাজনার তালে তালে একটি ছোট জাপানী মেয়ের নৃত্য (১নং, খ) এই উৎসবানুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। কতিপয় জাপানী নারী-পুরুষকে এই প্রমোদানুষ্ঠানে উপস্থিত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, ওলন্দাজদের দীর্ঘ মুখ এবং দীর্ঘতর নাসিকা লক্ষণীয়। একটি তাঁবুর নীচে দাঁড়াইয়া আছে দুই সম্প্রদায়ের দুই জন মুখ্য ব্যক্তি—ওলন্দাজ বণিকদের প্রধান এবং জাহাজের কাপ্তেন। তাঁবুর দুই প্রান্তে চিত্রিত হইয়াছে কতিপয় গৌণ ব্যাপার। যেমন :— একটি স্ত্রীলোক ছোট একটি কাঠি দিয়া জনৈক পুরুষের কান সাফ করিয়া দিতেছে, দুই জনে মিলিয়া বাজাইতেছে শামিসেন নামক লম্বা হাতলওয়ালা ম্যাণ্ডোলিন জাতীয় এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র, অপর দু'জন বসিয়া আছে একটি শতরঞ্চ খেলার ছকের সামনে। দড়ির উপর শূন্যে দোদুল্যমান তিনজন নাবিকের চিত্র কিঞ্চিৎ কৌতুকরসের অবতারণা করিয়াছে।

এই জাহাজটি সুমি নো কোরা ফার্মের সম্পত্তি। এই ফার্মের প্রতিষ্ঠাতা রিয়োই সুমি নো কুরা (১৫৫৪-১৬০৮) শোগান লেয়াসু কর্তৃক একটি প্রকাণ্ড জাহাজ নির্মাণ করিয়া আনামের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতে আদিষ্ট হন।

কিন্তু লেয়াসু কর্তৃক প্রবর্তিত অর্থনৈতিক-সম্প্রসারণ-নীতি যখন বিশেষ ভাবে ফলপ্রসূ হইয়া উঠিতেছিল এবং রপ্তানির সমপরিমাণ দ্রব্য আমদানি হইতেছিল পর্তুগীজ এবং স্পেনীয় বণিকদের মারফতে, তখন ঘটিল কতকগুলি অবাঞ্ছিত ঘটনা। উপরন্তু এই বৈদেশিক বাণিজ্যের দরুন মাকাও এবং ফিলিপাইনের অনুরূপ দুর্গতি জাপানের অদৃষ্টেও ঘটিতে পারে—এই আশঙ্কা তাঁহার উত্তরপুরুষদিগকে তাঁহাদের নীতি পরিবর্তিত করিতে প্রবৃত্ত করিল। জাপান পৃথকী-করণ নীতিকেই গ্রহণযোগ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিল। প্রথমে মিশনরী-দের, তার পর স্পেনীয় বণিকদিগকে এবং ক্রমে ক্রমে সাধারণভাবে

৩নং চিত্র

যাবতীয় বিদেশী সম্প্রদায়কে হুকুম করা হইল জাপান পরিত্যাগ করিতে এবং একথাও ঘোষণা করা হইল যে, এ দেশে পুনরাগমন করিলে মৃত্যুদণ্ড অনিবার্য্য। অবশ্য যেমন কতিপয় ওলন্দাজকে তেমনি চীনাদেরও ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইল। কিন্তু প্রথমোক্তদিগকে নাগাসাকির উল্টাদিকে ক্ষুদ্র দেশিমা দ্বীপে স্থানান্তরিত করিয়া তাহাদের উপর কড়া নজর রাখা হইল। বেগতিক দেখিয়া তাহারা সরিয়া পড়িবার জন্য নিজেদের মাল-জাহাজের উপস্থিতির জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এই সময়ে জাপানী জাহাজগুলির মালবহনক্ষমতা কমাইয়া দিয়া কেবলমাত্র 'উপকূল-বাণিজ্যে'র (coastal traffic) অনুমতি দেওয়া হইল এবং জাপানীদের পক্ষে স্বদেশ পরিত্যাগ ও এক বার দেশ ছাড়িলে পুনঃপ্রত্যাবর্ত্তন নিষিদ্ধ হইল। মারডোকের "History of Japan"-এ কিন্তু এ কথা উল্লিখিত আছে যে, গোশুইন বিউন নামে পরিচিত নয়টি জাপানী জাহাজ ১৬৩৩ সনে বিদেশে যাইবার অনুমতি পায়, অবশ্য শোগানের নিকট হইতে তাহাদিগকে বিশেষ অনুমতি লইতে হইয়াছিল। পালের উপর টোকুগাওয়ার লাঞ্ছনযুক্ত যে জাহাজটি পটে চিত্রিত হইয়াছে তাহা ঐ নয়টি জাহাজের অন্যতম কিনা সে কথা স্বতঃই কাহারও কাহারও মনে উদিত হয়।

পাশ্চাত্ত্য বণিক এবং তাহার সহায়ক মিশনরীদের কূটনীতির স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া জাপান সময়মত সাবধান হইয়াছিল, তাই সে-দেশে 'বণিকের মানদণ্ড' 'রাজদণ্ড রূপে' দেখা দেয় নাই। কিন্তু আমাদের দেশে ঘটিয়াছিল ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপার। বাণিজ্য করিতে আসিয়া ইংরেজ কিরূপে এ দেশে সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল সে ইতিহাস বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। দীর্ঘকালের রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সংগ্রামের ফলে ব্রিটিশরাজ ভারত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে সত্য, কিন্তু এ দেশে বিলীয়মান পাশ্চাত্ত্য উপনিবেশিকবাদের বিকৃত শবদেহকে আজও আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে পর্ত্তুগীজ জাতি ভারতের বুকে পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্যবাদের বিস্ফোটক-স্বরূপ গোয়ায় আজও মুক্তি-সাধক ভারতীয় সত্যাগ্রহীকে পুলিসের গুলীতে আত্মাহুতি দিতে হইতেছে।*

ইটালীতে জমির উৎকর্ষ-সাধন-প্রচেষ্টা

ইটালীতে জমির উৎকর্ষ-সাধন-প্রচেষ্টা বিশেষ ভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে দক্ষিণ ইটালী উন্নয়ন ফণ্ড (সাদার্ন ইটালী ডেভলপমেণ্ট ফণ্ড) কর্ত্তৃক দক্ষিণ ইটালীতে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করা হইয়াছে। ১৯৫৪ সনের ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে উক্ত ফণ্ড কর্ত্তৃক মোট ৩৬,৯২১টি পরিকল্পনা অনুমোদিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ভূমি-সংস্কার-প্রচেষ্টার সংখ্যা ১৬৫০টি।

যে সকল অঞ্চলে জমির উৎকর্ষ-সাধন-প্রচেষ্টা সংক্রান্ত কার্য্যাবলী পরিসমাপ্ত হইয়াছে, পেসকারা তাহাদের অন্যতম। এখানে উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য জল-বিদ্যুৎ এবং সেচ-ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি-বিধান করা হইয়াছে। এই অঞ্চলে অগণিত অর্থব্যয়ে ৯৫,০০ হেক্টেয়ার জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কম্পোনিয়া, আপুলিয়া, বাসিলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলেও বিস্তীর্ণ এলাকায় জলসেচের পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

সিসিলিতেও জলসেচ-পরিকল্পনা সমাপ্তির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে—নব পরিকল্পনা অনুযায়ী এখানকার 'আরানসিও' জলাধারটিরও আয়তন এবং জলধারণ-ক্ষমতা বাড়ানো হইবে।

* East and West অবলম্বনে।
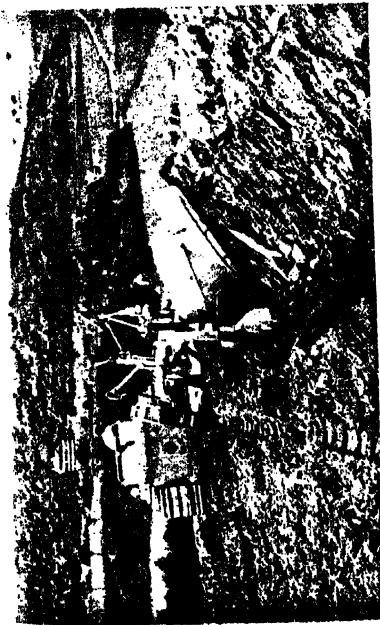
রোমের প্রাইমা পোর্তা অঞ্চলের কৃষি-উপনিবেশে ভূমিকর্ষণরত একটি কলের লাঙ্গল

প্রাইমা পোর্তার কৃষি-উপনিবেশের উৎপাদিত তামাক

সিলা ডিষ্ট্রীক্টের ফিয়োরের জিয়োভান্নি তরুণ—বৃক্ষরোপণ ও জলসরবরাহ-ব্যবস্থার দরুন এই উচ্চভূমির রূপ বদলাইয়া যাইতেছে

রোমের 'মারেম্মা রিফর্ম এজেন্সী' কর্ত্তৃক সংগঠিত একটি সংস্থায় তামাক সম্পর্কে ব্যবহারিক শিক্ষাদান

ফ্লুমেনদোসা এবং মুসারজিয়া প্রভৃতি বাঁধ-নির্ম্মাণকার্য্যও দ্রুত-গতিতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। জলসেচের এমন সুব্যবস্থা হইতেছে যে, তাহা জালের মতই ইটালীর সমগ্র দক্ষিণ অঞ্চলকে ঘিরিয়া রাখিবে। মস্তেপ্রাণোতে সম্প্রতি-নির্ম্মিত একটি জলাধারের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাতে যে পরিমাণ জল ধরিয়া রাখা হয় তাহা ২,২০০ হেক্টেয়ার আয়তনের জমিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সিলা অঞ্চলে জমি-সংস্কার এবং কৃষির জন্য জলসরবরাহ-ব্যবস্থা এরূপ পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে যে, তাহার দরুন সমগ্র অঞ্চলের রূপই বদলাইয়া যাইতেছে। এই অঞ্চলের রুক্ষ উচ্চভূমিতে ৩,০০০ হেক্টেয়ার পরিমিত স্থানে পরিকল্পনা অনুযায়ী বৃক্ষরোপণের এবং বনভূমির আয়তন আরও পনের হাজার হেক্টেয়ার বাড়ানোর কাজ চলিতেছে।

জমির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধির জন্য ইটালীর যে সকল সংস্থা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্বের সঙ্গে প্রশংসনীয় কাজ করিতেছে তন্মধ্যে রোমের মাত্র কয়েক মাইল উত্তরে অবস্থিত প্রাইমা পোর্ত্তার এগ্রেরিয়ান রিফর্ম্ম এজেন্সি বা ভূমি-সংস্কার-সংস্থার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার উদ্যোগে উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে বীজবপন এবং চারাগাছ রোপণকার্য্যের বিশেষ প্রসারসাধন হইতেছে এবং জমির উৎপাদন বাড়ানোর প্রচেষ্টাও বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইতেছে। গম, জলপাই এবং দ্রাক্ষালতা ছাড়া প্রাইমা পোর্ত্তা সংস্থা কর্ত্তৃক আধুনিকতম এবং কৃষিবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে তামাকের চাষও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

রোমের মারেম্মা এবং ফুসিনো এজেন্সীর সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নয়ন-প্রচেষ্টাও পূর্ণ বিকাশের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। বস্তুতঃ, সংস্কারমূলক পরিকল্পনা কেবলমাত্র নূতন রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ এবং জমির রূপান্তর-সাধনের কার্য্য চালাইয়া যাওয়ার মধ্যেই পর্য্যবসিত নহে; উপরোক্ত অঞ্চলসমূহে এমন সব সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যেগুলিতে তামাক প্রভৃতি মূল্যবান কৃষিদ্রব্যের উৎপাদন-কৌশল সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষণ-প্রণালীর ব্যবস্থা আছে। এই কোর্স শিক্ষার্থীর ব্যবহারিক জ্ঞান-লাভের পক্ষে বিশেষ সহায়ক এবং ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়।

সর্ব্বপ্রযত্নে ভূমির সংস্কার সাধন করিয়া তাহা হইতে সম্পদ আহরণের যে ব্যাপক প্রচেষ্টা ইটালীতে চলিতেছে তাহা ভবিষ্যতে এই দেশকে বিপুল ভাবে সমৃদ্ধিশালী করিবে।

ন. ভ.

"জাতির জনক"

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত

"জাতির জনক"—এই গৌরবময় গালভরা আখ্যাটি মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে হুবহু প্রযুক্ত হইতেছে। ফ্যাসনের ধর্ম্মে উহাতে স্থান-অস্থানও বিবেচিত হয় না। মহাত্মাজীর প্রতি কোনপ্রকার অসম্মানের ভাব মনে পোষণ না করিয়াও ইতিহাসের দৃষ্টি হইতে এই প্রশ্ন করা হয়ত অন্যায় নাও হইতে পারে—ঐ আখ্যাটি কি যথার্থ ?

আখ্যাটি অবশ্য ইংরেজী 'father of the nation' এই শব্দ-সমষ্টির অনুবাদ মাত্র। ইংরেজী অভিধানে ইহার কি অর্থ পাওয়া যায় তাহা পরে আলোচনা করিব। বাঙ্গালার কথাই আগে বলি, কেননা বাঙ্গালা শব্দ ও শব্দসমষ্টির নিজস্ব একটা অর্থপ্রকাশযোগ্যতা আছে। উহাদিগকে ইংরেজী অর্থেরই অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে এরূপ নিয়ম স্বীকার্য্য নহে।

বাঙ্গালায় 'জাতির জনক' এই কথার যদি কোনও অর্থ থাকে, তাহা অবশ্য মুখ্যার্থ হইবে না, লক্ষ্যার্থ হইবে। তদনুসারে জাতি বলিতে জাতীয়তাবোধ বা জাতিত্ব বোধ এবং জনক বলিতে উদ্বোধন-কর্ত্তা, প্রবর্ত্তক বা প্রাচীন প্রধান প্রচারক বুঝিতে হইবে। ইতি-হাসের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই সকল অর্থে মহাত্মা গান্ধীকে জাতির জনক বলা চলে কি ?

মহাত্মাজী ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে প্রবেশ করেন ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেই দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করিয়া ভারতে আসেন সত্য, কিন্তু সেই সময়ে মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে তাঁহাকে এই অনুরোধ করেন যে তিনি যেন এক বৎসরের মধ্যে এবং ভারতের জাতীয় জীবনের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলি সম্যক্ দর্শন না করিয়া রাজনৈতিক ব্যাপার সম্বন্ধে কোনও মত ব্যক্ত না করেন। মহাত্মা গান্ধী গোপালকৃষ্ণ গোখলেকে স্বীয় রাজনৈতিক গুরু বলিয়া মান্য করিতেন ; সেই জন্য উক্ত অনুরোধ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে সমগ্র ভারতের জাতীয় প্রধানতম প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস (Indian National Congress—ভারতের জাতীয় মহাসভা) একত্রিশ বর্ষ বয়সে পদার্পণ করিয়াছে। তৎপূর্ব্বে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ না হইলে সর্ব্বভারতের সর্ব্বজনমান্য ধীরমস্তিষ্ক নেতৃবর্গ উহার ঐরূপ নামকরণ করিবেন কেন ? গান্ধীজীর কংগ্রেসে প্রবেশের দশ বৎসর পূর্ব্বে—উহার ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতা অধিবেশনে—সভাপতির আসন হইতে ভারতের বর্ষিষ্ঠ নেতা দাদাভাই নৌরোজী স্বরাজ লাভই ভারতের জাতীয় লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করেন। একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, তখন আমাদের জাতীয়তাবোধ জাতমাত্র বা অপোগণ্ডদশায় স্থিত নহে, যৌবনের উদ্দাম উৎসাহ ও বীর্য্যে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার একটি বড় প্রমাণ এই যে বাঙ্গালী তখন লর্ড কার্জ্জন-কৃত বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে সমগ্র প্রদেশ-ব্যাপী তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করিয়া বিপুল বীর্য্য ও সাহস প্রদর্শন করিতেছেন, এমনকি ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা করিয়া রাজশক্তির হস্তে বহু লাঞ্ছনা, অত্যাচার ও অবিচার সদর্পে বরণ করিয়া লইতেছে। জাতীয়তার এই বলিষ্ঠ প্রকাশের সহিত গান্ধীজীর সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ কোনও সম্বন্ধ ছিল না। বাঙ্গালার বাহিরের গোখলে, মালবীয় প্রভৃতি নরমপন্থী নেতৃবর্গ ইহাতে সন্ত্রস্ত হইলেও লালা লাজপত রায়, বালগঙ্গাধর টিলক প্রভৃতি দূরদর্শী নেতৃগণ স্বদলবল সহ বাঙ্গালার পার্শ্বে নির্ভয়ে দাঁড়াইয়াছিলেন।

ইতিহাসের পথ ধরিয়া আরও একটু চলি। জাতীয় মহাসভার জন্ম হয় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। (গান্ধীর জন্ম ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে, সুতরাং মহাসভার জন্মকালে তাঁহার বয়স ১৬ বৎসর মাত্র।) উহার দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারত সভার (Indian Association) উদ্যম ও উৎসাহে কলিকাতায় এলবার্ট হলে জাতীয় সম্মেলন (National Conference) সমবেত হয় ; উহাতে মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি হইতে প্রতিনিধিগণ যোগদান করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন ভারত-সভার সম্পাদক। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দেই ডিসেম্বর মাসেও কলিকাতায় উক্ত সম্মেলনের আর এক অধিবেশন হয়। উহা পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট ছিল বলিয়া উহার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা সুরেন্দ্রনাথ বোম্বাইতে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগদান করিতে পারেন নাই। জাতীয় সম্মেলনের ষোল বৎসর পূর্ব্বে (১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে) কলিকাতায় নবগোপাল (বা "ন্যাশনাল") মিত্রের চেষ্টায় এবং জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীর সক্রিয় উৎসাহে "জাতীয় মেলা" হয়। ইহাও উন্মেষোন্মুখ জাতীয় ভাবের একটি নিদর্শন। দুঃখের বিষয়, জাতীয় জীবনের উন্মেষ ও পোষণ জন্য বাঙ্গালীর এই সকল চেষ্টার কথা আজকাল আর কেহ স্মরণ করে না। উপরে ভারত সভার নাম করা হইয়াছে ; ১৮৭৬ সনের ২৬শে জুলাই উহার পত্তন হয়। উহার কৃতিত্ব-গৌরব সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু উভয়ের প্রাপ্য, অবশ্য ইঁহাদের সহযোগী ও পৃষ্ঠপোষক গণ্যমান্য আরও অনেকে ছিলেন। যেদিন প্রকাশ্য সভায় উহা স্থাপনের প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে সেইদিন পূর্ব্বাহ্নে সুরেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্রটি পরলোকগমন করে। কর্ম্মবীর সুরেন্দ্রনাথ পুত্রশোক ঝাড়িয়া ফেলিয়া যথাসময়ে ঐ সভায় উপস্থিত হইয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন। ইহার পরে তিনি জাতীয়তা প্রচারের জন্য উত্তর ও পশ্চিম ভারতে বক্তৃতা করিয়া বেড়ান এবং তদুপলক্ষে রাওলপিণ্ডি, মুলতান, আহমেদাবাদ, পুণা, এমনকি দক্ষিণে মাদ্রাজ পর্য্যন্তও যান। প্রত্যেক স্থানেই সহস্র সহস্র লোক তাঁহার অতুলনীয় বাগ্মিতায় মুগ্ধ

হইয়া জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হয়। এইরূপেই এই কর্ম্মবীর জাতীয় মহাসভা পত্তনের পথ প্রস্তুত করেন।

উপরিলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে যে, জাতির জনক এই আখ্যা যদি ধর্ম্মতঃ ও ন্যায়তঃ কাহারও প্রাপ্য হয়, তবে তিনি গান্ধী নহেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরেন্দ্রনাথ অবশ্য শেষ পর্যন্ত জাতীয় মহাসভার সহিত যুক্ত থাকিতে পারেন নাই। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ রাজনীতির অনুরক্ত ছাত্র ও প্রতিষ্ঠাবান্ শিক্ষক। নিয়মানুগ আন্দোলনের (constitutional agitation-এর) বিলম্বিত হইলেও পরিণামে অবশ্যম্ভাবী সাফল্যে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। জাতীয় মহাসভা ১৯১৮ সন হইতে নবীনতর নেতৃগণের প্রভাবে ঐরূপ আন্দোলন পরিত্যাগ করিলে তিনি মনের দুঃখেই উহা হইতে সরিয়া দাঁড়ান এবং সদৃশবিশ্বাসসম্পন্ন নেতৃগণের সহযোগে উদারপন্থী সঙ্ঘ (Liberal Federation) সৃষ্টি করিয়া জাতির সেবায় প্রবৃত্ত হন। তিনি মহাসভার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিলেও জাতীয় ভাবের উদ্বোধনে ও প্রসারে যে অক্লান্ত ও বিপুল সাফল্যমণ্ডিত চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার মর্য্যাদা কিছুতেই লুপ্ত হয় নাই।

এখন 'জাতির জনক' যাহার অনুবাদ সেই ইংরেজী 'father of the nation' শব্দসমষ্টির অর্থানুসন্ধান করা যাক। হাতের কাছে Concise Oxford Dictionary-তে 'father' শব্দটির মুখ্যার্থ বাদে কতকগুলি লক্ষ্যার্থ উদাহরণসহ পাইতেছি। সবগুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। একটি অর্থ হইতেছে "originator, designer, early leader"—সূচনাকর্ত্তা, পরিকল্পনাকারী বা আদ্য নেতা। ইহার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে 'father of English poetry' (ইংরেজী কাব্যের সূচনা কর্ত্তা বা প্রাচীন নেতা), 'father of lies' (মিথ্যার প্রচলনকর্ত্তা অর্থাৎ সয়তান), 'father of the faithful' (বিশ্বাসী অর্থাৎ মুসলমানদিগের আদি নেতা মহম্মদ), 'fathers of the Church' বা শুধু 'fathers' (প্রথম পাঁচ শতাব্দীর খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রকারগণ)। ইহার পরে আর একটি অর্থ দেওয়া হইয়াছে—one who deserves filial reverence (যিনি পিতৃতুল্য সম্মানের যোগ্য); এই অর্থের উদাহরণ পাইতেছি 'father of the nation' কথাটি। এখন বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত ভাষার সহিত যাঁহার কিছু পরিচয় আছে তিনিই বলিবেন উক্ত সকল স্থানেই father শব্দের প্রতিশব্দ জনক না বলিয়া গুরু বলিলেই ঠিক হয়। মহাত্মা গান্ধী ভারতবাসীদিগের পিতৃতুল্য সম্মানের পাত্র এই নিতান্ত চমৎকারহীন (ইংরেজীতে যাহাকে বলে prosaic—গদ্যোচিত্র) অর্থে যে এতদ্দেশীয় ইংরেজী লেখকগণ তাঁহাকে 'father of nation' বলিয়া সংবর্দ্ধিত করেন এরূপ ত মনে হয় না। সে যাহা হউক, বাঙ্গালাতে 'জাতির গুরু' বলিলে তাঁহাকে নিতান্ত নীরস সম্মান দেওয়া হয় না। কেননা ভারতীয়দিগের কানে ও প্রাণে গুরু শব্দের ধ্বনি বিশেষ রূপেই গৌরবযুক্ত।

উপরে ইংরেজী অভিধান হইতে father শব্দের যে কয়টি অর্থ উদাহরণসহ উদ্ধৃত হইয়াছে বাঙ্গালা (এবং সংস্কৃতেও) তদনুরূপ স্থলে গুরু শব্দই প্রচলিত বলা যাইতে পারে। আমরা "ধর্ম্মগুরু", "সম্প্রদায়গুরু", এমনকি "বজ্জাতের বা বজ্জাতির গুরুঠাকুর" সর্ব্বদাই বলি। বেদোত্তর অর্থাৎ লৌকিক সংস্কৃত কাব্যের সূচনা-কর্ত্তা পুণ্যশ্লোক কবি বাল্মীকি কবিগুরু বলিয়াই চিরকাল সম্মানিত, এবং ঐ আখ্যা এতকাল অনন্যগামীই ছিল। কিছুদিন যাবৎ রবীন্দ্রনাথকে ঐ আখ্যায় ভূষিত করা হইতেছে, কিন্তু কোন্ অর্থে উহা সার্থক ভাবিয়া পাই না।

বেদে পালনকর্ত্তা বা রক্ষাকর্ত্তা অর্থে পিতৃ শব্দের প্রয়োগ আছে (অস্মরঃ পিতা নঃ—আমাদের বলিষ্ঠ রক্ষাকর্ত্তা), জনক শব্দ ঐ অর্থে অবাচক। মহাত্মা গান্ধীকে জাতির বা দেশের রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া স্তুতি করিবার ইচ্ছা হইলে অবশ্য তাঁহাকে দেশের বা জাতির পিতা বলা যাইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ সমাজ-কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদ

১১এ, ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট, কলিকাতা

• বার্ষিক কার্য্যবিবরণী

শুক্রবার, ২০শে জুলাই, ১৯৫৫

পশ্চিমবঙ্গ সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদ ১৯৫৪ সনের মধ্যভাগে সংগঠিত হয়। পর্ষদের দশ জন সদস্যের মধ্যে চেয়ারম্যানসহ ছয় জন কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদ কর্তৃক মনোনীত হন, আর বাকী চার জনকে মনোনয়ন করেন রাজ্য সরকার। পর্ষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সনের ২৯শে জুলাই তারিখে। রাজ্যপর্ষদের কাজ প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয় ১৯৫৪ সনের মাঝামাঝি হইতে। পর্ষদের সভার অধিবেশন সাধারণতঃ মাসে একবার হইয়া থাকে। কাজের চাপ যখন বেশী হয় তখন সময় সময় দুই দিনব্যাপী সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। বর্তমান সময় পর্য্যন্ত রাজ্যপর্ষদের চৌদ্দটি সভার অধিবেশন হইয়াছে।

ভারত সরকার কর্তৃক ১২.৮.৫৩ তারিখে কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় পর্ষদের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং করণীয় কার্য্যাবলী হইতেছে এই :

(১) সমাজ কল্যাণ সংস্থাসমূহের অভাব এবং প্রয়োজনীয় জিনিষ সম্বন্ধে অনুসন্ধান কার্য্য পরিচালনা,

(২) সমাজ-কল্যাণ সংস্থাসমূহকে অর্থসাহায্য প্রদান,

(৩) সাহায্যপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহের উদ্দেশ্য এবং কর্ম্ম-তালিকার মূল্যনির্দ্ধারণ,

(৪) যেখানে ঐ ধরনের সংস্থা নাই সেখানে স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে সংস্থাসমূহ প্রতিষ্ঠা,

(৫) সমাজকল্যাণ কর্ম্মপ্রচেষ্টার উন্নয়ন এবং সমন্বয়-সাধন।

বিকেন্দ্রীকরণের পন্থা অনুসরণপূর্ব্বক রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদের সহিত পরামর্শক্রমে পশ্চিমবঙ্গ সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদকে রাজ্যের সমস্তরে (state level) প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রতিষ্ঠান-ব্যয় এবং রাজ্যপর্ষদের অফিসের পৌনঃপুনিক (Recurring) ব্যয় রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদ সমভাবে বহন করিয়া থাকেন।

রাজ্যপর্ষদের কৃত্যসমূহ (functions)

রাজ্যপর্ষদ হইতেছে কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদের একটি উপদেষ্টা পর্ষদ। ইহা একদিকে রাজ্য সরকারের স্বেচ্ছা-মূলক কল্যাণ-সংস্থাসমূহের সহিত এবং অন্য দিকে কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া থাকে।

শিশু উদ্যান নিয়ালিশপাড়া, মুর্শিদাবাদ, 'সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার প্রোজেক্ট' কেন্দ্র

রাজ্যপর্ষদ নারী এবং শিশুদের জন্য কল্যাণকর্ম্মে রত স্বেচ্ছা-মূলক সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহের তরফ হইতে অর্থসাহায্যের নিমিত্ত আবেদনপত্র আহ্বান ও পরীক্ষা করে এবং ইহার অনুমোদনের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় পর্ষদ কর্তৃক অর্থসাহায্য মঞ্জুর হয়। কেন্দ্রীয় পর্ষদ অথবা রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রবর্ত্তিত নব পরিকল্পনা এবং কর্ম্মতালিকা কার্য্যকরীকরণে রাজ্য-পর্ষদ সহায়তা করিয়া থাকে। সংক্ষেপে রাজ্যপর্ষদের মুখ্য কৃত্যসমূহ হইতেছে—কেন্দ্রীয় পর্ষদের পরিকল্পনা এবং প্রোগ্রাম অনুযায়ী রাজ্যে সমাজকল্যাণ কর্ম্মপ্রচেষ্টার সাহায্য-

করণ, উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত রাজ্যপর্ষদ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে—যেখানে কল্যাণ-সংস্থা বিদ্যমান নাই সেখানে, সতেরটি কল্যাণ-সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে—নারী ও শিশুদের এবং দৈহিক অপটু ও অপরাধপ্রবণদের কল্যাণমূলক অন্য অনেকগুলি পরিকল্পনাও এই সংস্থা কর্তৃক গৃহীত হইবে। আরোগ্যোত্তর পরিচর্য্যামূলক কর্ম্মপ্রচেষ্টার (aftercare activities) নিমিত্ত বিশেষজ্ঞদের লইয়া একটি উপদেষ্টা পর্ষদ ইতিমধ্যেই সংগঠিত হইয়াছে এবং সভ্যগণ কর্ম্মতালিকা অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন।

অর্থসাহায্য

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ৩৬ অধ্যায়ে যে সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টার খসড়া করা হইয়াছে সেগুলির সহিত যে-সমস্ত স্বেচ্ছামূলক সামাজিক সংস্থার কর্ম্মপ্রচেষ্টার মিল আছে তৎসমুদয়ই অর্থসাহায্য পাইবার যোগ্যতাসম্পন্ন। অর্থসাহায্যের জন্য আবেদন করিতে হইবে রাজ্যপর্ষদ কর্ত্তৃক সরবরাহ-করা মুদ্রিত ফরমে বিগত তিন বৎসরের পরীক্ষিত হিসাবপত্রসহ। রাজ্যপর্ষদ সমস্ত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে; রাজ্যের যত সুদূর প্রান্তেই অবস্থিত হোক না কেন, কোন প্রতিষ্ঠানই বাদ দেয় না এবং যদি যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদের নিকট কর্তৃপক্ষের বিবেচনা এবং অর্থসাহায্য মঞ্জুরের নিমিত্ত স্বীয় অনুমোদন জ্ঞাপন করে। ১৯৫৫ সনের ৩১শে মে পর্য্যন্ত পর্ষদকর্তৃক প্রাপ্ত, সাহায্যলাভার্থ আবেদনপত্রের সংখ্যা ছিল ৪০৭। বোর্ডকর্তৃক যথোচিত পরীক্ষান্তে সবগুলি আবেদনপত্রই বিবেচিত এবং কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। ইহা লক্ষণীয় যে, কতকগুলি সংস্থা—তাহাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টা পর্ষদের দৃষ্টিসীমার আওতায় পড়ে না বলিয়া অনুমোদন লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। ১৯৫৫ সনের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ কর্ত্তৃক ২৭৩টি আবেদনপত্র বিবেচিত হইয়াছে এবং পশ্চিমবঙ্গে ঐ সকল স্বেচ্ছামূলক সংস্থার মধ্যে মোট ৮,৪৬,৮৩৩ টাকা বিলি করা হইয়াছে। বাদবাকী সংস্থাসমূহের বিষয় জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ কর্ত্তৃক বিবেচিত হইয়াছে।

এই সমস্ত সাহায্যীকৃত সংস্থার সহিত যোগাযোগ রক্ষার জন্য সকল প্রকার চেষ্টা করা হয়—কোন জটিলতার সৃষ্টি হইলে অথবা কল্যাণ-প্রচেষ্টাসমূহের সম্প্রসারণ এবং উন্নয়নকল্পে সক্রিয় সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দিলে রাজ্যপর্ষদের সদস্যবৃন্দ ও কর্ম্মচারীদিগকে আহ্বান করা হয়।

মাঝে মাঝে সদস্যবৃন্দ, পরিদর্শক অথবা কর্ম্মচারিগণ এই সকল সংস্থা পরিদর্শন করেন—সেগুলির কর্ম্মপ্রচেষ্টার মূল্য নির্দ্ধারণকল্পে এবং তৎসমুদয়ের কল্যাণ-প্রচেষ্টার উৎকৃষ্টতর পরিচালন-ব্যবস্থা ও সম্প্রসারণের উপায় এবং কর্ম্মনীতি বিধিবদ্ধকরণে সহায়তার নিমিত্ত।

ইহা আনন্দের বিষয় যে, অতুলনীয় সেবামূলক কার্য্যে এই সকল সাহায্যীকৃত সংস্থা উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। তাহাদিগকে মঞ্জুর-করা অর্থসাহায্য প্রদানের সময় যে সকল সর্ত্ত আরোপিত হইতে পারে সেগুলি কার্যকরীকরণে তাহারা প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করে।

কল্যাণ-সম্প্রসারণ পরিকল্পনা

কল্যাণ-সম্প্রসারণ পরিকল্পনাসমূহ মুখ্যতঃ সেই সকল গ্রামীণ অঞ্চলের নারী এবং শিশুদের জন্য উদ্দিষ্ট যেখানে কোন সমাজ-কল্যাণ সংস্থার অস্তিত্ব নাই। রাজ্যপর্ষদ ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পর্ষদ কর্ত্তৃক তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া ঐরূপ সতেরটি কল্যাণ-সম্প্রসারণ পরিকল্পনার মধ্যে সবগুলিই প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই সতেরটি পরিকল্পনার মধ্যে চৌদ্দটিই চৌদ্দটি জেলার ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে অবস্থিত এবং বাকী তিনটির অবস্থিতি কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতে।

প্রত্যেক উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট আছে রাজ্যপর্ষদ কর্ত্তৃক সংগঠিত উন্নয়ন-সম্প্রসারণ পরিকল্পনা রূপায়ণী সমিতি (Welfare Extension Project implementing Committee) নামে এক-একটি পৃথক কমিটি। নয় জন সদস্য লইয়া গঠিত এই কমিটির মধ্যে বেসরকারী আহ্বায়ক (Convener) সহ আট জনই স্বেচ্ছামূলক সমাজ-কল্যাণ সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি। এই কমিটিতে রাজ্য সরকারের একজন কর্ম্মচারী আছেন যুক্ত আহ্বায়করূপে; তিনি কমিটির ব্যবস্থাধীন নগদ তহবিলের ভারপ্রাপ্ত।

উন্নয়ন-পরিকল্পনা রূপায়ণী সমিতির আপিসকে নির্দ্দেশদান এবং ইহার পরিচালনার জন্য পর্ষদ প্রায়শঃই কেন্দ্রীয় পর্ষদ কর্ত্তৃক গৃহীত পরিকল্পনাসমূহ কার্য্যকরীকরণের উপায় সংবলিত সার্কুলার জারী করিয়া থাকে। রুটিনমাফিক কাজের অঙ্গ হিসাবে রাজ্যপর্ষদের সদস্য এবং কর্ম্মচারিগণ উন্নয়ন-পরিকল্পনাসমূহের সভায় যোগদান এবং তাঁহাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টার কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন। সমস্যাদি উপস্থিত হইলে তৎসমুদয়ের সমাধানে তাঁহারা সাহায্য করেন এবং কল্যাণ-প্রচেষ্টার অধিকতর উন্নতিবিধানে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করিয়া থাকেন।

এই সমস্ত উন্নয়ন-পরিকল্পনার আর্থিক দিকের তত্ত্বাবধান করেন কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ এবং রাজ্য সরকার। ঐরূপ প্রত্যেকটি পরিকল্পনার বার্ষিক মোট ব্যয় হইতেছে ২৫,০০০

টাকা, তন্মধ্যে কেন্দ্রীয় পর্ষদ ১২,৫০০ টাকার ব্যয়ভার বহন করেন, বাকী ১২,৫০০ দিয়া থাকেন রাজ্য সরকার। অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন কল্যাণ-সম্প্রসারণ রূপায়ণী সমিতি কর্ত্তৃক যে স্থানীয় অর্থ আদায় হইয়া থাকে তাহা এই সাড়ে বার হাজারের মধ্যে ধরা হয় না।

এই বিষয়ে কিছু বলা বাহুল্যমাত্র যে, পল্লীবাসীরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্গতি ভোগ করিয়া থাকে এবং কল্যাণ-প্রচেষ্টার প্রয়োজন তাহাদেরই সর্ব্বাধিক। পরিকল্পনাগুলি, কাজেই, এমন ভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে যাহাতে তাহাদের নিম্নলিখিত সুযোগ-সুবিধাগুলির ব্যবস্থা হইতে পারে:

১। নারীদের জন্য বয়স্ক এবং সামাজিক শিক্ষা

২। মাতৃনীতি এবং শিশুমঙ্গল—সন্তানজন্মের পূর্ব্বেকার এবং পরবর্ত্তী সেবাশুশ্রূষামূলক কার্য্য ইহার অন্তর্ভুক্ত

৩। দরজীর কাজ এবং খাঁটি দেশজ কারুশিল্প শিক্ষাদান

৪। শিশুদের বিনোদন ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা

৫। সাংস্কৃতিক কর্ম্মপ্রচেষ্টার উন্নয়ন

কোন বিশেষ উন্নয়ন-পরিকল্পনা যে অঞ্চলের সেবাকার্য্যে অর্থ ও সামর্থ্য বিনিয়োগ করিতে চায় সেই অঞ্চলের প্রয়োজন এবং লোকসংখ্যা অনুযায়ী কাজের উপর জোর দেওয়া হইয়া থাকে। প্রত্যেকটি উন্নয়ন-পরিকল্পনা পাঁচটি কেন্দ্রে বিভক্ত। কিন্তু প্রয়োজনের বিভিন্নতা এবং বিপুলতা হেতু সতেরটি উন্নয়ন-পরিকল্পনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত প্রায় সবগুলি কেন্দ্রকেই সর্ব্বার্থসাধক (Multipurpose) কেন্দ্রে পরিণত করা হইয়াছে।

কমিবেশী ২০,০০০ লোকসংবলিত, ২০ হইতে ৩০টি গ্রাম লইয়া এক-একটি পরিকল্পনা সংগঠিত। অন্যান্য কেন্দ্রের সহিত সমস্তরে কর্ম্মপ্রচেষ্টার সমন্বয়সাধনের সহায়তা করিবার নিমিত্ত যাহাতে সকল সময়ে সবগুলি কেন্দ্র পরিদর্শন করা সম্ভবপর হয় সেই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদ ঐ সমুদয় কল্যাণ-সম্প্রসারণ পরিকল্পনার জন্য জীপ-গাড়ীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। তন্মধ্যে কতকগুলি অবশ্য সাইকেল রিক্সার সাহায্যে নিজেদের কাজ চালাইয়া যাইতেছে। কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদ এ পর্য্যন্ত রাজ্য পর্ষদের জন্য পনেরটি জীপের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সমাজ-কল্যাণ কর্ম্মপ্রচেষ্টার ক্ষেত্রে জরুরি প্রয়োজন সম্বন্ধে সময় সময় পরিদর্শনকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং রাজ্যে আরও কতকগুলি কেন্দ্র খুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে। বর্ত্তমানে প্রায় তিন লক্ষ লোক এই সমস্ত কল্যাণ-সম্প্রসারণ পরিকল্পনা দ্বারা উপকৃত হইতেছে এবং প্রায় ২২৫ জন গ্রাম-কর্ম্মীর—শিক্ষিতা দাই, নার্স এবং মিডওয়াইফ বা ধাত্রী

কারুশিল্প কেন্দ্র—গোয়ালজান, মুর্শিদাবাদ, 'সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার প্রোজেক্ট' কেন্দ্র

ইহাদের অন্তর্ভুক্ত—কাজের ব্যবস্থা হইয়াছে। সপ্তাহে দুই অথবা তিন বার মাতৃ ও শিশু-মঙ্গল ক্লিনিকগুলিতে হাজিরা দিবার জন্য ডাক্তারদেরও নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহাদিগকে কেবলমাত্র মাসিক যানবাহনের ভাতা(Conveyance Allowance) দেওয়া হইয়া থাকে।

কল্যাণ-সম্প্রসারণ পরিকল্পনার স্কীম যে গ্রামবাসীদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাদের সক্রিয় সহযোগিতা এবং এই কার্য্যে অংশগ্রহণই তাহার প্রমাণ। প্রায় সকল প্রোজেক্টেই গ্রামবাসীরা ভূমি, গৃহ এবং টাকার পরিবর্ত্তে আসবাবপত্র ইত্যাদি নানা উপকরণ দান করিয়াছে। তাহাদের এই দান স্বভাবতঃই কল্যাণ-প্রচেষ্টার বিকাশ এবং বৃদ্ধির পথে গতিবেগ সঞ্চারিত করিয়াছে। কোন কোন প্রোজেক্ট বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে দুগ্ধ এবং ঔষধাদিও পাইয়াছে। একটি প্রোজেক্টের কর্ম্মীরা স্থানীয় লোকেদের নিকট হইতে সাড়ী এবং চালও সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে যে, এ পর্য্যন্ত যে সহযোগিতা ও দান পাওয়া গিয়াছে তাহা প্রভূত

পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে এবং পর্ষদের চেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার নিমিত্ত সকলেই নিজেদের যথাসাধ্য করিবে।

শিক্ষণ

ভারতে আজিকার দিনে এই সকল কল্যাণ-প্রচেষ্টা অপরিহার্য্য রূপে প্রয়োজনীয় এবং এগুলির কার্য্যক্ষেত্রও অনন্তপ্রসারিত। এই ক্ষেত্রে কাজ করিবার জন্য কর্ম্মীর পক্ষে কিছু বিশেষ জ্ঞান (specialised knowledge) আহরণ করা একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদ কর্ত্তৃক কস্তুরবা গান্ধী জাতীয় স্মারক নিধির (Ka-turba Gandhi National Memorial Trust) অধীনে ঐরূপ কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মীদের জন্য শিক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রাজ্যপর্ষদ এ পর্য্যন্ত এই শিক্ষণের জন্য পঞ্চাশ জন প্রার্থী:ক নির্ব্বাচিত করিয়াছে এবং তাহাদিগকে মেদিনীপুরের অন্তর্গত বলরামপুর কেন্দ্রে পাঠাইয়াছে। শিক্ষণকার্য্য চলিবে এক বৎসরকাল—যেন পরবর্ত্তী বৎসরেই শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মীদের কার্য্যে নিয়োগের জন্য পাওয়া যাইতে পারে।

সাময়িক সম্মেলন

রাজ্যপর্ষদের উদ্যোগে ১৯৫৪ সনের ১৩ই ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রীমতী দুর্গাবাঈ দেশমুখের সভাপতিত্বে সমাজকর্ম্মীদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের সকল স্থানের সমাজ-সংস্থাসমূহের ১৫০ জন প্রতিনিধি সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় অন্যান্য নানা বিষয় ছাড়া সাহায্যীকৃত প্রতিষ্ঠান, সমপরিমাণ অংশ (Matching Share), স্থানীয় দান এবং সম্প্রসারণ পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। প্রোজেক্টগুলির নিখুঁত পরিচালনা এবং কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ প্রবর্ত্তিত প্রোগ্রামসমূহের রূপায়ণের উপায় ও কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণের নিমিত্ত ১৯৫৫ সনের ৩রা মার্চ তারিখে সমস্ত আহ্বায়ক এবং যুক্ত আহ্বায়কদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রোজেক্টগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট যে সকল কর্ম্মীর [illegible] বিশেষ শিক্ষা নাই, তাঁহাদের শিক্ষণের বিষয়ও সভায় আলোচিত হয়।

প্রচারকার্য্য

সর্ব্বসাধারণকে শিক্ষাদান এবং সমাজকর্ম্মীদের মধ্যে এতদ্বিষয়ক শিক্ষার পথ সুগম করিবার উদ্দেশ্যে প্রতি মাসে "প্রবাসী" মাসিক পত্রিকায় একটি অধ্যায় প্রকাশিত হয় এবং ইহাতে উল্লিখিত বিষয়সমূহ ব্যাপক ভাবে ও নিয়মিত রূপে প্রচারিত হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকাগুলিতে অর্থসাহায্যলাভার্থ আবেদন-পত্র পেশ করিবার তারিখ বিজ্ঞাপিত এবং বেতার মারফতে ঘোষিত হইয়া থাকে। অন্যান্য পরিকল্পনার সদস্য এবং কর্ম্মিগণ যাহাতে চালু বিভিন্ন পরিকল্পনার কর্ম্মপ্রচেষ্টার মূল্য-নির্দ্ধারণ এবং সেগুলির সঙ্গে সমানতালে চলিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণী সমিতির সদস্যদের নাম আর কল্যাণ-সম্প্রসারণ পরিকল্পনার বৃত্তান্ত সংবলিত পরিকল্পনা ও কর্ম্মতালিকা সংক্রান্ত পুস্তক-সমূহ প্রকাশিত এবং প্রচারিত হইয়া থাকে। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, এই সকল পুস্তক এবং প্রচারপত্র দ্বারা ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ এবং অধিকতর কর্ম্মপ্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়ার ব্যাপারে গতিবেগ সঞ্চারিত হইয়াছে।

প্রত্যেকটি উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্বোধনের কথা বেতার এবং সংবাদপত্রের মারফতে ঘোষিত হইয়াছে। সমাজ-কল্যাণ, কল্যাণ-সম্প্রসারণ পরিকল্পনা এবং অর্থসাহায্য সম্পর্কে কয়েকটি বেতার-কথিকারও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

আপিস সংস্থা

আপিসের কর্ম্মচারী-সংসদে আছেন—একজন আপিস সেক্রেটারী, একজন একাউণ্ট্যাণ্ট, একজন জেনারেল এসিষ্ট্যাণ্ট, একজন টাইপিষ্ট, দুই জন পিওন এবং একজন ড্রাইভার। ১৯৫৪ সনের ১লা আগষ্ট হইতে ১৯৫৫ সনের ২৭শে জুলাই পর্য্যন্ত পর্ষদকে প্রায় ৩২৫০টি আভ্যন্তরীণ (inward) এবং ৬৮৮৭টি বাহ্যিক (outward) পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

পরিদর্শকগণের সঙ্গী হওয়া এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের পরিদর্শনকার্য্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও, পর্ষদের আপিস কর্ত্তৃক কি বিপুল পরিমাণ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে এই বিবরণী হইতে তৎসম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিবে।

উপসংহার

পশ্চিমবঙ্গ সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদ—এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যাহাদের সংস্রব আছে তাঁহাদের সকলের নিকট হইতে যে সাহায্য পাইয়াছে, কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছে; এই সহায়তা ব্যতিরেকে পর্ষদের পক্ষে কোন প্রকার উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হইত না।

পশ্চিমবঙ্গ সমাজকল্যাণ পর্ষদ সমুদয় প্রোজেক্টের পল্লী-বাসী এবং কর্ম্মিবৃন্দকে তাহাদের সক্রিয় সাহায্য এবং সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে। পর্ষদ তাহাদিগকেও ধন্যবাদ জানাইতেছে, যাঁহারা জমি, গৃহ, দুগ্ধ, ঔষধ ইত্যাদি দান করিয়া সম্প্রসারণ পরিকল্পনার সহায়তা করিয়াছেন। তাহাদের সমর্থনলাভের দরুন উন্নয়ন-পরিকল্পনার কর্ম্মশক্তি দিন দিন অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং ইহা বৃহৎ হইতে বৃহত্তর সেবামূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার অবস্থায় উপনীত হইবে।

রাজ্যপর্ষদ রাজ্য-সরকারের, বিশেষতঃ কম্যুনিটি ডেভেলপমেণ্ট, খাদ্য, রিলিফ ও সরবরাহ এবং শিক্ষা অধিকারের নিকট হইতে যে সহযোগিতা এবং সাহায্য পাইয়াছে, তাহার উল্লেখ না করিলে কর্ত্তব্যের ক্রটি হইবে। আশা করা যায় যে, রাজ্যপর্ষদের কর্ম্মপ্রচেষ্টা যাহাতে অব্যাহতভাবে পরিচালিত হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের তরফ হইতে সরাসরি যে সাহায্য আসিতেছে তাহা আরও জোরালো হইবে।

সর্ব্বশেষে রাজ্যপর্ষদ সেই সকল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্ম্মীদের নিকট আবার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে, যাঁহারা নানা ভাবে পর্ষদের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ প্রবর্ত্তিত, কল্যাণমূলক কর্ম্ম-তালিকার প্রচার এবং প্রসারসাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন; তাঁহাদের সেবামূলক কর্ম্ম যে কত মূল্যবান বাস্তবিকই তাহার পরিমাপ করা যায় না।

কারুশিল্প কেন্দ্র, নিয়ালিশপাড়া, 'সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার প্রোজেক্ট'

সংযোজনী (ক)

পশ্চিমবঙ্গ সমাজ-কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্যদের নামের তালিকা

চেয়ারম্যান:

শ্রীমতী রমলা সিংহ (১৯৫৫ সনের ৬ই এপ্রিল পর্য্যন্ত)*

" অশোকা গুপ্তা (১৯৫৫ সনের ৬ই এপ্রিল হইতে)

সদস্যবৃন্দ:

১। ডাক্তার শ্রীমতী ফুলরেণু গুহ, অনারারি সেক্রেটারি
২। শ্রীমতী আয়েষা আহম্মদ, অনারারি কোষাধ্যক্ষ
৩। " সুভদ্রা হাকসার
৪। " লাবণ্যপ্রভা দত্ত, এম-এল-সি
৫। ডাক্তার মিসেস এস. কাজী
৬। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ
৭। {শ্রীমতী অনিমা বসাক (মার্চ্চ, ১৯৫৫ পর্য্যন্ত)
শ্রীমতী অনু ব্যানার্জ্জি—উন্নয়ন বিভাগের (Development Department) প্রতিনিধি
৮। ডক্টর ডি. এম. সেন, শিক্ষাসচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৯। শ্রীমতী রমলা সিংহ

* শ্রীমতী রমলা সিংহ ব্যক্তিগত কারণে চেয়ারম্যানের পদে ইস্তফা দেন, কিন্তু তিনি এখনো ইহার সদস্যা আছেন।

কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদের সদস্যবৃন্দের তালিকা

শ্রীমতী দুর্গাবাঈ দেশমুখ (চেয়ারম্যান)

সদস্যবৃন্দ:

১। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী
২। " জারিনা করিমভয়
৩। " হান্না সেন
৪। " পদ্মিনী সেনগুপ্তা
৫। " মণিবেন প্যাটেল, প্রতিনিধি, লোকসভা
৬। " বেদবতী বরগোঁহাই, প্রতিনিধি, রাজ্যসভা
৭। শ্রী কে. সি. সৈয়ীদাইন, প্রতিনিধি শিক্ষা-মন্ত্রণালয়
৮। শ্রী ই. কলেট, প্রতিনিধি অর্থ-মন্ত্রণালয়
৯। শ্রী এস. টি. মেরানি, প্রতিনিধি শ্রম-মন্ত্রণালয়
১০। লেঃ কর্ণেল সি. কে. লক্ষ্মণন, প্রতিনিধি স্বাস্থ্য-মন্ত্রণালয়।

সংযোজনী (খ)

১৯৫৫ সালের ৩১শে মে পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সমাজ-কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদ কর্ত্তৃক অনুমোদিত এবং কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ কর্ত্তৃক মঞ্জুর করা সাহায্যের পরিসংখ্যান:

প্রতিষ্ঠানের রকম	রাজ্যপর্ষদ চালু হওয়ার পূর্ব্বে সি-এস-ডব্লু-বি'র মঞ্জুরীকৃত	রাজ্য-পর্ষদ কর্ত্তৃক অনু-মোদিত	সি-এস-ডব্লু-বি কর্ত্তৃক মঞ্জুর-করা	সি-এস-ডব্লু-বি'র বিচারাধীন আবেদন-পত্র
শিশু	১৪	৬৯	৪৬	২২
নারী	৩৯	৮৩	৪১	৪৩

সাধারণ	৪৭	১৭৯	৬৮	১০৩
দৈহিক অপটু	১০	৬	৫	১
অপরাধপ্রবণ	১	১	১	—
	১১১	৩৩৮	১৬১	১৬৯
প্রত্যাখ্যাত		৬৯	৮	
	১১১	৪০৭	১৬৯	১৬৯

এ পর্য্যন্ত মঞ্জুর-করা অর্থের পরিমাণ ৮,৪৬, ৮৩৩৲ টাকা।

কল্যাণ-সম্প্রসারণ পরিকল্পনাসমূহের (Welfare Extension Projects) তালিকা

প্রোজেক্টের নাম	উদ্বোধনের তারিখ		জনসংখ্যা	কেন্দ্রের সংখ্যা	নিয়োজিত কর্ম্মচারী
কালিকাপুর —					
প্রতাপনগর	অক্টোবর,	১৯৫৪	১৫৪০৮	৫	১৮
ঝোকা বিষ্ণুপুর	„	„	১৬৬২৩	৫	১৬
দার্জ্জিলিং	„	„	২২১৯৪	৫	৯
হুগলী	„	„	১২০০০	৫	১৫
মধ্যমগ্রাম	„	„	১৬৬৬৫	৫	১৪
নদীয়া	„	„	১৭৪৭৫	৫	১৬
গাইঘাট	জানুয়ারী,	১৯৫৫	১৬৫৮০	৫	২৭
জলপাইগুড়ি	„	„	১৭৭৪৫	১	৪
হাওড়া	„	„	১৪৪৪০	৫	১২
মালদহ	„	„	১৭৫৬৫	৫	১০
পশ্চিম দিনাজপুর	„	„	২৩০০০	৫	১৪
মুর্শিদাবাদ	„	„	১৬৪৫০	৫	২০
বীরভূম	„	„	১৮৪০০	৫	২০
মেদিনীপুর	ফেব্রুয়ারি,	„	১৩৬০০	৫	১২
বাঁকুড়া	মার্চ,	১৯৫৫	২০৪৪০	৫	১১
বর্দ্ধমান	এপ্রিল,	„	১৮৬৭৭	৫	১২
কুচবিহার	মে,	„	২০৬৯২	৫	৭
			২৯৭৯৫৪	৮১	২৩৭

সংযোজনী (গ)

পশ্চিমবঙ্গ সমাজ-কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদ

কর্ম্মপ্রচেষ্টা

প্রোজেক্ট	ইনডোর হাসপাতাল	মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র	শিশু কল্যাণ কেন্দ্র	কারুশিল্প শিক্ষা	সামাজিক	সন্তান জন্মের পূর্ব্বেকার এবং পরবর্ত্তী চিকিৎসাকেন্দ্র	শিশুদের বিনোদন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
গাইঘাটা	২	—	২	৫	৫	৩	৫
জলপাইগুড়ি		১	১	১	—	—	
বাঁকুড়া		—	৫	৫	—	৫	৩
দার্জ্জিলিং		—	১	২	২	২	২
হুগলী		—	৫	৫	৫	৫	—
মধ্যমগ্রাম		—	—	১	—	৪	৫
কালিকাপুর	১	—	—	২	—	২	৫
নদীয়া		৪	৪	১	—		৩
হাওড়া		১	২	৫	১	—	৫
মালদহ		—	—	১	৩	৩	
পশ্চিম দিনাজপুর		—	৫	৩	৩	৩	৪
বর্দ্ধমান		—	৫	৫	—	৫	৫
কুচবিহার		৪	৪	১	—	—	৩
মুর্শিদাবাদ		—	৫	৫	—	৫	৫
ঝোকা বিষ্ণুপুর		২	৫	৪	৩	৩	৩
বীরভূম	১	—	৫	৪	৫	৪	৩
মেদিনীপুর		৫	৫	৫	৫	—	৫
মোট	৪	১৭	৫৪	৫৫	৩২	৪৪	৫৬

প্রসব-কার্য্যের সংখ্যা	চিকিৎসিতা সন্তানসম্ভবা স্ত্রীলোক	সন্তান-প্রসবের পরে চিকিৎসিতা জননী	চিকিৎসিত শিশু	চিকিৎসিত রোগী	উপস্থিতি বয়স্ক ক্লাস	উপস্থিতি কারুশিল্প ক্লাস	যে সকল শিশু এবং সন্তানসম্ভবা স্ত্রীলোকদের দুগ্ধ বিতরণ করা হয় তাহাদের সংখ্যা	শিশুদের আমোদ-প্রমোদ এবং খেলাধুলার ব্যবস্থা
৯৮৪	১৯০৪	১১৭৪	৬৬৬৬	৫৭১৮	১০৫৫	১৩০৬	৪০১৯	১২০১

শ্রমোপজীবিনী মায়েদের জন্য শিশু-রক্ষণাগারের ব্যবস্থা

যেখানে স্ত্রীলোকেরা কর্ম্মে নিযুক্ত আছে এরূপ যে-কোন শিল্পাঞ্চলে গেলেই শ্রমোপজীবিনী মায়েদের জন্য শিশু-রক্ষণাগারের প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এমনিতেই তো যথোপযুক্তরূপে বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থাহীন যে একটিমাত্র ঘরে শ্রমিকেরা সপরিবারে বাস, আহার এবং শয়ন করে তাহা শিশুদের পক্ষে নিতান্ত অপকৃষ্ট, তার উপর মা যখন সারাদিন বাহিরে কাজে রত থাকে, শিশুরা তখন সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয় এবং মা চলিয়া গেলে সে ধূলি এবং আবর্জ্জনার মধ্যে খেলা করে। এমনকি মা যখন কাজ সারিয়া ফিরিয়া আসে তখনও শিশুদের এবং তাহাদের আহারের প্রতি যথোচিত মনোযোগ দিবার মত সময় ও শক্তি তাহার অবশিষ্ট থাকে না। বয়ন-শিল্প, খাদ্য এবং তাম্বকুটশিল্প প্রভৃতি যে সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কর্ম্মে নিযুক্ত নারীদের আনুপাতিক হার অধিক ; সেই সকল ক্ষেত্রে শিশুদের সাধারণ স্বাস্থ্যের যাহাতে অবনতি না হয় এবং তাহাদের লালনপালনে ত্রুটি না ঘটে সেজন্য শ্রমোপ-জীবিনী জননীদের শিশুসন্তানদের নিমিত্ত যথোচিত ব্যবস্থা থাকা উচিত। উপরন্তু একথাও মনে রাখা দরকার যে, মা তার কাজের প্রতি অধিকতর মনোনিবেশ করিতে পারে যদি শিশুদের ঠিকমত যত্ন লওয়া হয় এবং স্বাস্থ্যহানির কবল হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা যায়। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কর্ম্মীরা হইতেছে নিকৃষ্ট কর্ম্মী এবং কাজের সময় তাহাদের নিজেদের বেলায় যেমন দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, তেমনি তাহারা অপরের পক্ষেও দুর্ঘটনার হেতুস্বরূপ হইতে পারে। শ্রমশিল্পের স্বার্থ এবং সামাজিক উন্নয়ন উভয় দিক দিয়াই শ্রমোপজীবিনী মায়েদের শিশু-সন্তানগুলির ঠিকমত দেখাশুনার ব্যবস্থা হওয়া সমীচীন। অধিকন্তু ইহা খুবই সত্য যে, শৈশবে সুস্থ সুখময় পারিপার্শ্বিক পরবর্ত্তী পুরুষের কর্ম্মীদের চরিত্রবিকাশের পক্ষে সঞ্জীবনী-শক্তির মত কার্য্যকরী হইতে পারে।

সর্ব্বপ্রথমে যে কথাটি প্রণিধানযোগ্য তাহা এই যে, শিশু-রক্ষণাগারকে প্রকৃতপক্ষে কার্য্যোপযোগী এবং ইহার প্রতি শ্রমিকদের আকৃষ্ট করিতে হইলে, ইহাকে কর্ম্মস্থলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করিতে হইবে এই উদ্দেশ্যে যেন মায়েরা কাজ করিবার সময় একথা অনুভব করিতে পারে যে, তাহাদের শিশুরা নিকটেই আছে এবং অপেক্ষাকৃত ছোট বাচ্চাদের বেলায় তাহারা যেন ওখানে গিয়া তাহাদিগকে দিনে দুই অথবা তিন বার খাওয়াইয়া আসিতে পারে। ইহার দরুন 'প্রসূতের ছুটি' (Maternity leave) ফুরাইবামাত্রই মায়েরা কাজে আসিয়া যোগদান করিতে পারে। কখনো কখনো একথা বলা হইয়া থাকে যে, শিশু-রক্ষণাগার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে কারখানার ধোঁয়া এবং ধুলায় পরিপূর্ণ পরিবেশ হইতে দূরে, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণই অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। শিশু-রক্ষণাগার হওয়া উচিত যেখানে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাঞ্ছিত এবং যেখানে ইহা সর্ব্বাধিক ব্যবহৃত হইবে—স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, তাহা কারখানা অথবা মিলের নিকটে প্রতিষ্ঠা করাই সমীচীন।

শিশু-রক্ষণাগার পরিচালনায় ঘরোয়া, পরিচ্ছন্ন, সুখময় ও সুস্থ পরিবেশ এবং উত্তম সংগঠন এগুলি হইতেছে আসল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিশু-রক্ষণাগার কেবলমাত্র শিশুর নাসারি বা লালনক্ষেত্র হইতে পারে অথবা ইহার সঙ্গে যুক্ত হইতে পারে মায়েদের প্রসবের পূর্ব্বকালীন অথবা পরবর্ত্তীকালীন তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা। যদি ইহা কার্য্যে পরিণত হয় তাহা হইলে এইটুকু সুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা যে, শিশুর জন্মের পূর্ব্বেই তাহার জননী শিশু-রক্ষণাগারের পরিবেশে অভ্যস্ত হওয়ার দরুন শিশুদিগকে এখানে আনিবার জন্য অধিকতর আগ্রহান্বিত হইবে। শিশু-রক্ষণাগারের কর্ম্মচারীবৃন্দ এবং সংগঠনের উপর স্ত্রীলোকদের আস্থা সৃষ্টি করাই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

কোন পাটকল অঞ্চলের শিশু-রক্ষণাগারের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করা যাক। শিশু-রক্ষণাগারের দায়িত্বভার একজন শিক্ষাপ্রাপ্ত হেল্‌থ ভিজিটার বা স্বাস্থ্য-পরিদর্শকের হস্তে ন্যস্ত, তাঁহার সাহায্যকারিণীরূপে আছেন একজন জুনিয়ার নার্স অথবা জুনিয়ার হেল্‌থ ভিজিটার আর কতিপয় আয়া কিংবা দাই। এই সংস্থার সকল কর্ম্মচারীর পক্ষেই উপযুক্ত শিক্ষালাভ অপরিহার্য্য।

শিশু-রক্ষণাগারের দৈনন্দিন কাজ সুরু হয় অতি প্রত্যুষেই। ভোর সাড়ে পাঁচটার সময়েই একপাল শিশুকে এখানে লইয়া আসা হয়—বয়স তাহাদের এক মাস হইতে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত ; কেহ কেহ এখানে আসিয়াই ঘুমাইয়া পড়ে, অপরেরা খেলাধুলা সুরু করিয়া দেয়। বেলা ছয়টার সময় তৈলমর্দ্দন, স্নান, দাঁতের যত্ন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রোগপ্রতিষেধক চিকিৎসা ইত্যাদি কাজ আরম্ভ হয় এবং কর্ম্মচারীবৃন্দ কিছুক্ষণ এই সকল কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। ইহার পর শিশুদিগকে টিফিন ও এক গ্লাস স্বাদু গরম দুধ খাইতে দেওয়া হয়। ফ্যাক্টরিজ এক্ট বা কারখানা আইন অনুযায়ী শিশু-রক্ষণাগারে রোজ প্রত্যেক শিশুর জন্য কমপক্ষে অর্দ্ধ পাইন্ট অর্থাৎ প্রায় দেড় পোয়া দুধের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তার পরে শিশুরা সকলে মিলিয়া বাগানে খেলা করিতে যায়। এই ক্রীড়া-উদ্যান শিশু-রক্ষণাগারের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। অপেক্ষাকৃত বড় শিশুরা 'নার্সারি ক্লাস'গুলিতে হাজিরা দেয় এবং বেলা সাড়ে

এগারোটার মধ্যে সকলে তাহাদের দুপুরের খাওয়ার জন্য তৈরি হয়। ভাত, ডাল এবং তরিতরকারী এই হইল তাহাদের খাবার। সপ্তাহে দুই দিন খাদ্যের সঙ্গে মাংস এবং মাছ দেওয়া হইয়া থাকে। তার পর আপরাহ্নিক বিশ্রামের পর আরো খেলা অথবা বিভিন্ন ক্লাসে যোগ দেওয়ার পালা। খুব অল্প বয়সেও শিশুদের শিক্ষণীয় এমন অনেক বিষয় আছে যাহা পরে তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইতে পারে—যেমন: কাদা দিয়া নানা জিনিষ গড়িতে কিভাবে হাতের ব্যবহার করিতে হয়, স্বার্থপরতাশূন্য হইয়া কিভাবে অপরের সহিত খেলা করিতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। বেলা প্রায় সাড়ে তিনটার সময় আবার তাহাদিগকে টিফিন দেওয়া হয়, তার পর উত্তমরূপে ধোয়ানো মোছানো এবং সাফ করানোর পালা শেষ হইলে কারখানা বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত চলে খুব একচোট ছুটোপাটি। তখন মায়েরা বাচ্চাদের ঘরে লইয়া যাইতে পারে।

শিশু-রক্ষণাগারে ছোট বাচ্চাদিগকে ভাল করিয়া নাওয়ানো খাওয়ানো হয় এবং সেখানে তাহারা আরামে থাকে বলিয়া তাহাদের মেজাজ হয় বেশ হাসিখুশী এবং তাহারা মায়েদের অপেক্ষাকৃত কম কষ্ট দিয়া থাকে। খিটখিটে শিশুর মায়ের অদৃষ্টে বিশ্রামসুখ উপভোগ করা খুব কমই ঘটিয়া থাকে এবং শীঘ্রই সে শ্রান্ত এবং অযোগ্য কর্ম্মী বলিয়া পরিগণিত হয়। শিশু-রক্ষণাগারের সুখী শিশু কিন্তু শ্রমোপজীবিনী মায়ের জীবনকে মধুময় করিয়া তোলে।

ছোট শিশুদের যদি সুখী শিশুতে পরিণত করিতে হয় তাহা হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, তাহারা এমন স্তরে আছে যখন অধিকাংশ সময়ে তাহাদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এই সময়টাই তো জীবনগঠনের সময় এবং যদি শিশু-রক্ষণাগারে এই কার্য্যের গোড়াপত্তন সুষ্ঠুভাবে হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহারা অধিকতর সুস্থ এবং উৎকৃষ্টতর নাগরিকে পরিণত হইতে পারিবে। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, ভাল শিশু রক্ষণাগার ভবিষ্যতের সংস্থানের জন্য একটি উৎকৃষ্ট সংস্থা।

শিশু-রক্ষণাগারে প্রত্যেক শিশুর দৈনিক উপস্থিতি, স্বাস্থ্য-চার্ট এবং মাসিক রিপোর্ট সম্বলিত একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণী (record) রাখা হয়। এগুলি হেলথ ভিজিটার এবং মেডিক্যাল অফিসারকে রোগ ও স্বাস্থ্যহীনতা প্রতিরোধে সহায়তা করে। শিশু-রক্ষণাগারের শিশুদের প্রতি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল মেডিক্যাল অফিসারের বিশেষ যত্ন লওয়া এবং ইহার স্বাস্থ্যবিধির তত্ত্বাবধান করা সমীচীন।

শিশু-রক্ষণাগারের জন্য প্রয়োজন—সাধাসিধা হইলেও যথোপযুক্ত সাজসরঞ্জামযুক্ত, উত্তমরূপে বায়ুচলাচলের ব্যবস্থাযুক্ত গৃহ এবং এই সংস্থার জন্য কিছু প্রচারকার্য্য হওয়াও দরকার। ডাক্তারের নিকট হইতে উপদেশ লইয়া ইহার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে এবং বার্ষিক শিশু-প্রদর্শনীর মত অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া শ্রেষ্ঠ শিশুদিগকে পুরস্কারও দেওয়া যাইতে পারে। এক্ষেত্রে 'শ্রেষ্ঠ' বলিতে কেবল দেখিতে ভাল একথা বুঝাইবে না, স্বাস্থ্য ভাল ইহাও বুঝিতে হইবে।

ফ্যাক্টরিজ এক্ট অনুসারে, যে-কোন কারখানায় পঞ্চাশ জনের অধিক স্ত্রীলোক কর্ম্মে নিযুক্ত আছে সেখানেই শিশু-রক্ষণাগারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তৎসত্ত্বেও কিন্তু শিশু-রক্ষণাগার যে পরিমাণ চালু হওয়া উচিত ছিল, ততদুর হয় নাই। লেবার বুরোর "ইকোনমিক এণ্ড সোশ্যাল ষ্টেটাস অফ্ উইমেন ওয়ার্কার্স ইন্ ইণ্ডিয়া" নামক রিপোর্টে যে সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, পাঁচটি রাজ্যে মাত্র ৩১৯টি শিশু-রক্ষণাগার আছে। পশ্চিমবঙ্গে পাট-শিল্পের ৯৪টি মিলের মধ্যে মাত্র ৪৪টিতে শিশু-রক্ষণাগার আছে। 'কোল মাইন্স লেবার এক্ট' বা কয়লাখনি শ্রমিক আইন অনুসারে কয়লাক্ষেত্রসমূহে ৮৯টি শিশু-রক্ষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; কিন্তু রিপোর্টে এই মন্তব্য করা হইয়াছে যে, শিশু-রক্ষণাগারসমূহ যদি শ্রমোপজীবিনী নারীদের আস্থা অর্জ্জন করিতে চায় এবং সেগুলিকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করিতে হয় তাহা হইলে ঢের বেশী প্রচারকার্য্যের প্রয়োজন। অবস্থা এমনই যে, যে সকল খনিতে শিশু-রক্ষণাগারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে সেগুলিতে পর্য্যন্ত শিশুদিগকে খোলা টবে এবং কয়লার গাদার নিকটে খেলা করিতে দেখা যায়।

অন্য যে দুইটি বৃত্তিতে স্ত্রীলোকদিগকে ব্যাপকভাবে নিয়োজিত করা হয় সেগুলি হইতেছে মিউনিসিপ্যালিটিতে ঝাড়ু দেওয়ার কাজ এবং প্ল্যানটেশনের কাজ। এখানে শিশু-রক্ষণাগারের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। প্ল্যানটেশন-গুলিতে বস্তুতঃ এ পর্য্যন্ত শিশুদের জন্য কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই এবং মায়েরা এখনও শিশুদিগকে পিঠে বাঁধিয়া চা-বাগানে কাজ করিয়া থাকে। যে সকল প্ল্যানটেশনে পঞ্চাশ জনের অধিক স্ত্রীলোক কর্ম্মে নিযুক্ত আছে, প্ল্যানটেশন লেবার এক্টের কল্যাণে সেগুলিতে শিশু-রক্ষণাগার প্রতিষ্ঠা হইবে বাধ্যতামূলক। কিন্তু তাহা কিঞ্চিৎ সময়সাপেক্ষ, কেননা এখনও বিধিগুলির খসড়া তৈরি করা হইতেছে। মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ কর্তৃক কর্ম্মে নিযুক্ত স্ত্রীলোকদের জন্য কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছুই করা হয় নাই।

কর্ম্মসংস্থান সমস্যা ও শিল্পের প্রসার

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, এম-এ

আজ আমরা এ কথা অস্বীকার করতে পারি না যে, জীবনযাত্রার মান উচ্চ করতে হলে প্রধানতঃ দুটো জিনিষ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়; প্রথমতঃ প্রত্যেকটি কর্ম্মক্ষম লোকের কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, দ্বিতীয়তঃ, দেশের ভিতর ক্রয়বিক্রয়ের পথে যে সব অন্তরায় রয়েছে সে সব অন্তরায় দূর করতে হবে। এই দুটো প্রধান জিনিষের যদি অভাব হয় তা হলে একদিকে যে রকম দেশের শিল্পজাত সামগ্রীর কাটতি বর্দ্ধিত হবার সম্ভাবনা কমে যাবে সে রকম অন্যদিকে আয়ের সুযোগ শোচনীয় ভাবে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে।

বিগত কয়েক মাস ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যখনই দেশের বেকার সমস্যা সমাধানের প্রশ্ন উঠেছে তখনই দেশের মধ্যে যে সব কুটীর এবং ছোট-মাঝারি শিল্প রয়েছে সে সকল শিল্পের প্রসারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এর প্রধান কারণ হ'ল এই যে, কুটীর এবং ছোট-মাঝারি শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা আছে। দিনের পর দিন বেকার সমস্যা যেভাবে ভয়াবহ আকার ধারণ করছে তাতে কুটীর এবং ছোট-মাঝারি শিল্পের সম্ভাবনাগুলোকে আর উপেক্ষা করলে চলবে না। এগুলোকে সম্পূর্ণভাবে বাস্তবে রূপায়িত করবার চেষ্টা করতে হবে। এটা সত্যই পরিতাপের বিষয় যে, প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় কুটীর এবং ছোট-মাঝারি শিল্পের গুরুত্ব স্বীকৃত হয় নি।

ভারত সরকারের অর্থদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীদেশমুখ ঘোষণা করেছেন, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে প্রায় আড়াই কোটি নূতন কাজ সৃষ্টি করা হবে। প্রশ্ন হতে পারে, কোন কার্য্যসূচী প্রকাশ না করে কেন শ্রীদেশমুখ এতগুলো নূতন কাজ সৃষ্টি করবার কথা ঘোষণা করলেন। আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি, অর্থসচিব শ্রীদেশমুখ প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্ত্তৃক অনুপ্রেরিত হয়ে এই ধরণের ঘোষণা করেছেন। অবশ্য অর্থসচিব শেষ পর্য্যন্ত তাঁর ঘোষণাকে সম্পূর্ণভাবে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারবেন কিনা সে সম্বন্ধে কোন কোন অর্থনীতিবিদ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তবে আমরা মনে করি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত কার্য্যসূচী প্রকাশিত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন মন্তব্য করা সমীচীন হবে না। তা ছাড়া যেহেতু এখনও পর্য্যন্ত কার্য্যসূচী প্রকাশিত হয় নি সেহেতু সরকারী ঘোষণার গুরুত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করারও যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে বলে আমরা মনে করি না, কারণ আড়াই কোটি নূতন কাজ সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে কার্য্যসূচী রচনা করা সহজ ব্যাপার নয়। এর জন্য যথেষ্ট সময়ের দরকার।

ভারত সরকার নিজেই স্বীকার করেছেন, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কর্ম্মক্ষম লোকবলকে আশানুরূপ ভাবে কাজে নিযুক্ত করা সম্ভবপর হয় নি। তাই আজ সরকারের পক্ষ থেকে বার বার এই মর্ম্মে আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে, ভবিষ্যতে যে দুটো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরি করা হবে সে দুটো পরিকল্পনায় দু' কোটি চল্লিশ লক্ষ অর্থাৎ প্রায় আড়াই কোটি নূতন কাজ সৃষ্টি করা হবে। ভারত সরকার সত্যই যদি তাঁর প্রদত্ত আশ্বাস অনুযায়ী এতগুলো কাজ সৃষ্টি করতে পারেন তা হলে দেশের মধ্যে বেকারের সংখ্যা অনেক কমে যাবে। তবে এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, বেকার সমস্যার সমাধান এতটা সহজ নয়। সরকারকে এমন একটা কার্য্যসূচী বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য চেষ্টা করতে হবে যা হবে একদিকে যেমন বিস্তীর্ণ সে রকম অন্যদিকে সুদূরপ্রসারী। এ ছাড়া যে সব ক্ষেত্রে কর্ম্মক্ষম লোকবলকে কাজ দেবার সম্ভাবনা আছে সে সব ক্ষেত্র সম্বন্ধে ভাল ভাবে খোঁজখবর নিতে হবে। শুধু তাই নয়, কর্ম্মক্ষম লোকবল নিয়োগের ক্ষেত্রগুলো যাতে সংগঠিত হয়, সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার, যদি প্রয়োজন হয় তা হলে কোন্ কর্ম্মক্ষেত্রের কি ভূমিকা হওয়া বাঞ্ছনীয় সেটাও সরকারকে নির্দ্ধারিত করে দিতে হবে।

সম্প্রতি অর্থসচিব এবং ভারত সরকারের অন্যান্য মুখপাত্রেরা শিল্প সম্বন্ধে যেসব মন্তব্য প্রকাশ করেছেন সেসব মন্তব্য থেকে মনে হচ্ছে, আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কুটীর এবং ছোট-মাঝারি শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে সরকার বদ্ধপরিকর। প্রশ্ন হতে পারে, বেসরকারী মহল সরকারের এই মনোভাবের বিরোধিতা করবেন কিনা। বিগত কয়েক মাস ধরে বিভিন্ন সময়ে বেসরকারী নেতারা যা বলে আসছেন তা থেকে মনে হয় না, সরকারী মনোভাবের বিরোধিতা করা হবে। তা ছাড়া বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে অর্থনীতিবিদরা প্রমাণ করেছেন, কুটীর, এবং ছোট-মাঝারি শিল্পে একজন কর্ম্মক্ষম লোককে কাজ দিতে হলে খুব মোটা টাকা লগ্নী করার প্রয়োজন হয় না। যদি কুটিরশিল্পে মাথাপিছু আট শত টাকার কাছাকাছি লগ্নী করা হয় তা হলেই একজন লোককে অনায়াসে কাজ দেওয়া যায়। অন্যদিকে যদি ছোট শিল্পে এগার শত টাকার কিছু বেশী কিংবা বার শত টাকার কাছা-কাছি লগ্নী করা হয় তা হলে একজন কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিকে কাজ দেওয়া যেতে পারে। বাকী রইল মাঝারি শিল্প। এই শিল্পের ক্ষেত্রেও খুব বেশী টাকা লগ্নী করার প্রয়োজন হয় না। যদি মাথাপিছু ষোল শত টাকার কিছু বেশী লগ্নী করা হয় তা হলে একজন কর্ম্মক্ষম ব্যক্তির কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা মোটেই কঠিন হবে না। এক-জন কর্ম্মক্ষম ব্যক্তির কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার অর্থ হ'ল একটি পরিবারের অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া।

এ কথা বিনা দ্বিধায় বলা যেতে পারে, পৃথিবীতে যে সকল শিল্পোন্নত দেশ আছে সে সব দেশের মধ্যে জাপান, ব্রিটেন এবং

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রধান। প্রশ্ন হতে পারে, এই সব দেশে কুটীর শিল্পকে কি রকম গুরুত্ব দেওয়া হয়? শিল্পোন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে প্রকাশিত বিবরণী থেকে জানা যায়, কোথাও কুটীরশিল্পকে উপেক্ষা করা হয় নি। বরঞ্চ কোন কোন শিল্পোন্নত দেশে এই শিল্প বিশেষভাবে প্রসারিত হয়েছে। তবে লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে, প্রসারিত কুটীর শিল্পে কেবলমাত্র নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরী হয় না।

ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার কতকগুলো শিল্পোন্নত দেশে দেখা যায়, বৃহৎ বৃহৎ কারখানাগুলোর সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা একত্রে কাজ করে যাচ্ছে। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, বৃহৎ কারখানাগুলোতে বড় বড় আকারের যন্ত্রপাতি এবং সাজসরঞ্জাম তৈরি হয়। কিন্তু এই সব যন্ত্রপাতি এবং সাজসরঞ্জাম তৈরি করবার জন্য যে সব উপকরণ দরকার সে সব উপকরণ ছোট ছোট কারখানায় তৈরি করা হচ্ছে।

আমরা আগেই বলেছি, আমাদের দেশের অর্থনীতিবিদরা এই মর্শ্মে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, কুটীর এবং ছোট-মাঝারি শিল্প প্রসারিত করা দরকার। তবে কুটীর এবং ছোট-মাঝারি শিল্পে বর্ত্তমানে কি ধরনের সামগ্রী প্রস্তুত করা বাঞ্ছনীয় সে সম্বন্ধে অর্থনীতিবিদরা একমত নন্। দেশের অনেক সম্মানিত নেতা মনে করেন, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যেসব জিনিষ দরকার সেসব জিনিষের কতক অংশ কুটীর এবং ছোট-মাঝারি শিল্পের জন্য সংরক্ষিত করা বাঞ্ছনীয়। স্মরণ থাকতে পারে, কিছুদিন আগে নিখিল-ভারত পল্লীশিল্প সংসদের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। সে সম্মেলনে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছিলেন, নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষগুলোর কিছু অংশ কুটীরশিল্পের জন্য সংরক্ষিত করা দরকার। বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য সরকারী কর্ণধারদেরও এই ধরনের অভিমত প্রকাশ করতে আমরা দেখেছি। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল কুটীরশিল্পের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সংরক্ষিত করার প্রস্তাবটি বাজারদরের উপর কি ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। বাজারদরের বর্ত্তমান গতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবটি বিশ্লেষণ করলে তেমন আকর্ষণীয় বলে মনে হয় না। তা ছাড়া বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে, শিল্পের আয়তন ক্ষুদ্র হলে পড়তা খরচ বেড়ে যায়। শুধু তাই নয়, বৃহৎ শিল্পে যে ধরনের জিনিষ তৈরি করা হয় পড়তা খরচ বর্দ্ধিত হবার ফলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে সে ধরনের জিনিষ তৈরি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। মোট কথা হ'ল, দৈনন্দিন জীবনে যে সকল জিনিষ অপরিহার্য্য সে সব জিনিষ কুটীর এবং ছোট-মাঝারি শিল্পে তৈরি করতে গেলে খরচের পরিমাণ বর্দ্ধিত হবার সম্ভাবনা আছে। কাজেই ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের নিত্যব্যবহার্য জিনিষের চাহিদা মেটাবার দায়িত্ব কুটীর এবং ছোট-মাঝারি শিল্পের উপর ন্যস্ত করা যুক্তিযুক্ত হবে কিনা সেটা সরকারী কর্ণধারদের ভেবে দেখার সময় এসেছে। আমাদের মনে হয়, দিনের পর দিন ভারতের জনসাধারণ যেভাবে শোচনীয় অর্থ নৈতিক অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছেন তাতে তাঁদের উপর অতিরিক্ত খরচের বোঝা চাপানো সমর্থন করা চলে না।

এ কথাও আমাদের মেনে নিতে হবে যে, ভারত অনগ্রসর দেশ, কাজেই এদেশে বেকার সমস্যা সমাধান করার উদ্দেশ্যে এমন সব শিল্প প্রসারিত করা দরকার যে সব শিল্পে মোটা টাকা লগ্নী করা প্রয়োজন হয় না। অনেকে আমাদের দেশে বৃহৎ শিল্প স্থাপিত কিংবা প্রসারিত করার অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু শুধু বৃহৎ শিল্পের প্রসারের ফলেই বেকার সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হবে বলে আমরা মনে করি না। তা ছাড়া এই শিল্পে কমপক্ষে মাথাপিছু দশ হাজার টাকা লগ্নী করলে একজন লোককে কাজ দেওয়া সম্ভব। পৃথিবীর যেসব দেশকে আমরা ধনী বলে জানি সেসব দেশেও শিল্পে মাথাপিছু দশ হাজার টাকা লগ্নী করা সম্ভবপর হয় নি। কাজেই ভারতে বৃহৎ শিল্পের প্রসার বেকার সমস্যা সমাধানের পথ কতটা প্রশস্ত করে দেবে সেটা বোধ হয় আর বিশ্লেষণ করে বলতে হবে না। যাঁরা ভারতে কেবলমাত্র বৃহৎ শিল্পে লোকের কর্ম্মসংস্থানের কথা বলে থাকেন তাঁদের মোট উৎপাদনের কথাটিও বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। অর্থাৎ, আমরা যে কথাটি বলতে চাই তা হ'ল এই যে, যেহেতু বৃহৎ শিল্পে মাথাপিছু উৎপাদন অনেক বেশী সেহেতু কেবলমাত্র বৃহৎ শিল্প প্রসারিত হবার ফলে মোট যে দ্রব্য পাওয়া যাবে সেটা বিক্রী করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। যদি তৈরি দ্রব্য বিক্রী না হয় তা হলে আবার অন্য ধরণের জটিল সমস্যা দেখা দেবার আশঙ্কা। সুতরাং বৃহৎ শিল্পে কতটা জিনিষ তৈরি করা বাঞ্ছনীয় তা দেশের স্বার্থের খাতিরে সরকারের পক্ষে ঠিক করে দেওয়া দরকার।

HVM. 250-X52 BG

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বনির্ব্বাচিত গল্প—ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ। ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য চার টাকা।

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের আসর যে জমজমাট এই স্বীকৃতি অন্য সাহিত্যের দরবারেও রহিয়াছে। অথচ বাংলা ছোটগল্প সঙ্কলনের কাটতি সম্বন্ধে প্রকাশকেরা এতকাল সংশয় পোষণ করিয়া আসিয়াছেন। এই সংশয়ের মূলে গল্প-পাঠকের রসগ্রহণ-ক্ষমতাকে বেশ খানিকটা খর্ব্ব করিয়াই দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহাও যে অমূলক তাহার প্রমাণ কয়েকজন খ্যাতনামা লেখকের সাম্প্রতিক কালের প্রকাশিত গল্পপুস্তক। 'শ্রেষ্ঠ' 'সরস' 'স্বনির্ব্বাচিত' প্রভৃতি নানা নামের অন্তরালে—একই গল্প বারকয়েক পড়িয়াও পাঠকের চিত্তে বিরাগ সঞ্চিত হয় নাই। এই ধরনের সংগ্রহগুলির কয়েকটি সংস্করণও হইয়াছে। অবশ্য এই সব ক্ষেত্রে লেখকের সাহিত্য-কীর্ত্তিকে সযত্নে পাঠকের হাতে তুলিয়া দিবার প্রয়াসটাও প্রকাশকদের সাহিত্য-নিষ্ঠার পরিচয় বহন করিতেছে। কিন্তু 'শ্রেষ্ঠ' 'সরস' প্রভৃতি বিশেষণের সঙ্গে স্বনির্ব্বাচিত কথাটির তফাৎ যে অনেকখানি—সেটি ভূমিকাতে কোন কোন লেখক ব্যক্ত করিয়াছেন। কথাটা সত্য। গল্পের আসরে লেখকের সঙ্গে পাঠকের যোগসূত্র অবশ্যই আছে, কিন্তু লেখকের গল্প-বলার বিশেষ একটি মেজাজ আছে—যাহা সব সময়ে পাঠক-চিত্তের অনুকূল না হইতেও পারে। শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে যেমন মতভেদ, নির্ব্বাচনের ব্যাপারেও সেটা স্বাভাবিক। তা ছাড়া গল্পে লেখক এমন কতকগুলি নীতি ও পদ্ধতি প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করেন, যাহা কোন কোন পাঠক-চিত্তে কিছুমাত্র রেখাপাত করিতে পারে না। সাহিত্য-কর্ম্মের বিশেষ একটি ধারাকে ধরিবার এই যে প্রয়াস, ইহার মূল্য পাঠকের কাছে যৎসামান্য হইলেও—লেখকের কাছে তুচ্ছ নহে। এই পরীক্ষামূলক বস্তু পাঠকের মন গ্রহণ না করিলেও, লেখকের মন হইতে সহজে মুছিয়া যায় না—বিশেষ একটি প্রিয় স্মৃতির মত তাহার সাহিত্য-জীবনে জড়াইয়া থাকে। সুলেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই সংগ্রহের প্রারম্ভে সেটি নিবেদন করিয়াছেন। সামান্য একটি ঘটনা বা দৃশ্য কোন একটি মুহূর্ত্তে লেখকের অনুভূতির রাজ্যে এমন আলোড়ন সৃষ্টি করে যাহা স্থূলদৃষ্টির অন্তরাল সরাইয়া বস্তুকে ভিন্নতররূপে উপলব্ধি করায়। সেটি দিব্য-দর্শনের সগোত্রীয়। নিবেদনে এমনই এক দর্শনের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন লেখক।

এই কারণে আলোচ্য স্বনির্ব্বাচিত সংগ্রহে যে কয়টি গল্প স্থান পাইয়াছে তাহার ভালমন্দ বিচার-ভার গ্রহণ করা সমালোচকের পক্ষে সহজ নহে। এখানে মতে না মিলিলে লেখককে আঘাত দেওয়ার সম্ভাবনাটাই প্রবল। তবে শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প সম্বন্ধে দু-একটি বিষয়ে যে পাঠকসাধারণের মতভেদ ঘটিবে না—এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। যেমন, নিপুণ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি, নিখুঁত প্রকৃতিচিত্রণ, বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গী। এইগুলিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি রাখেন নাই লেখক। বরং কোন কোন স্থলে মানুষের চেয়ে প্রকৃতি বড় হইয়া উঠিয়াছে, এবং স্নিগ্ধমধুর পরিবেশের চেয়ে ভয়াল বন্য রূপটিই বেশি ফুটিয়াছে। মানুষের ভিতরকার পশুকে তার বৃত্তি সমেত এমন ভাবে ধরিয়া দিয়াছেন গল্পে—যাহা পড়িয়া ভয়াবহ পরিণামের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠে। মৃত্যুর ভয়াবহ এক একটি দিককে অনেকগুলি গল্পে উন্মোচন করিয়াছেন লেখক—যাহা সহ্য করা সকল পাঠকের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বাংলা-কথাসাহিত্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘরোয়া পরিবেশে দু'একটি গার্হস্থ্য চরিত্রের সহযোগে যে মনস্তাত্ত্বিক গল্প তৈয়ারী হয়, এই সংগ্রহের বেশীর ভাগ গল্পই তাহা হইতে স্বতন্ত্র। এইগুলিকে দুঃসাহসিকতার স্বাদে ভরপুর করিয়া লেখক গৃহকোণ হইতে ভয়াবহ আরণ্য পরিবেশে টানিয়া আনিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বনির্ব্বাচিত গল্পের বৈশিষ্ট্য হয়তো বা এইখানেই।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়
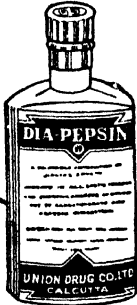
মঞ্জু দে বলেন

"লাক্স টয়লেটের নতুন সুগন্ধ কতো তাজা ও ফুলের মতো আর ঘন্টার পর ঘন্টা এর রেশ চলে..."

কেবল চিত্র-তারকারাই নন সারা ভারতের সুন্দরী রমনীরা জানেন যে এই বিশুদ্ধ সাদা সাবানের সুগন্ধি সরের মতো ফেনা ত্বককে অতি সুন্দর মোলায়েম ও পরিস্কার রাখে।

বড় আকারেও পাওয়া যায়

LUX TOILET SOAP

LUX TOILET SOAP

লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

ভারতে প্রস্তুত

LTS. 450-X52 BG

প্রাণকুমার—শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়। মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য সাড়ে ছয় টাকা।

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় চিত্রশিল্পীরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। "কৈলাস ও মানস-সরোবর" সাহিত্যেও তাঁহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এখানি আত্মজীবনী। প্রাণকুমার—প্রমোদকুমার স্বয়ং। কিছুদিন হইল বাংলা সাহিত্যে আত্মচরিত লেখার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু "প্রাণকুমার"-কে ঠিক সাম্প্রতিক রচনা বলা যায় না। ১৩৪৭ সাল হইতে ইহা "উত্তরা"য় প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে; ১৩৫৫ সালে শেষ হয়। পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বইখানি স্বল্পায়তন নয়। আশ্চর্য্য এই, সুবৃহৎ হইলেও রচনা প্রথম পৃষ্ঠা হইতে শেষ পর্য্যন্ত আমাদের আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলে। আত্মজীবনচরিত্রের ভিড়ের মধ্যে এ লেখা হারাইয়া যাইবে না। বইখানির বৈশিষ্ট্য এই, প্রমোদকুমার নিজেকে পোষাকী করিয়া চিত্রিত করেন নাই। ভাল-মন্দ, দোষ-গুণ লইয়া মানুষ। সেই সবল অথচ দুর্ব্বল মানুষটিকে নির্ব্বিচারে ব্যক্ত করিতে পারিলে জীবনচরিত সার্থক হয়। নিজের পরিবারের এবং বংশের ন্যায়-অন্যায়, ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং গর্ব্বগৌরব সহজভাবে প্রকাশ করিবার সাহস ও শক্তি সকলের থাকে না। যাহাদের সে শক্তি নাই তাহাদের রচনা প্রাণহীন; জীবনধর্ম্মবিচ্যুত হইয়া জীবনচরিত কথার রাশিতে পর্য্যবসিত হয়। নিজেকে জানা এবং জানিয়া নিজেকে প্রকাশ করা সহজ-সাধ্য নয়। এ পুস্তকে প্রমোদকুমারের সে শক্তির পরিচয় পাই। নিজেকে উদ্ঘাটন করিতে কোথাও তিনি সঙ্কোচবোধ করেন নাই। তা ছাড়া চিত্রপ্রতিভা তাঁহার কাজে লাগিয়াছে। চরিত্র-চিত্রণে তুলির ন্যায় তাঁহার লেখনীও অনায়াস-গতিতে অগ্রসর হইয়াছে। শৈশবে, বাল্যে এবং কৈশোরে তাঁহার মনের উপর যে ছাপ পড়িয়াছে সেগুলি আত্মজীবনচরিতের পৃষ্ঠায় স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার পিতা, ঠাকুরদাদা এবং মাতার চিত্র পাঠকের মনে গভীর রেখাপাত করিয়া যায়। মাতুলগৃহের পল্লীপ্রকৃতির প্রভাব জীবনের ন্যায় তাঁহার রচনাকেও শ্রীমণ্ডিত করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের কলিকাতা এবং তৎসাময়িক সমাজের ও মধ্যবিত্ত পরিবারের অবস্থার চিত্র-অঙ্কনে তিনি সাফল্যলাভ করিয়াছেন। তখনকার আর্ট স্কুলকেও তিনি স্মৃতির সাহায্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। চিত্রকলার সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রথম যৌবনের প্রারম্ভে আসিয়া আত্মজীবনচরিত শেষ হইয়াছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত যে জীবনে যুদ্ধ নাই তাহা আপনার হইবার যোগ্য নয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া যে জীবন জয়ী হইয়াছে তাহাই আমাদের কৌতূহলকে উদ্রিক্ত করে। সত্য অনেক সময় গল্পের চেয়েও বিচিত্র। তিন শ ছাপান্ন পৃষ্ঠার বইখানি উপন্যাসের মতই পাঠকের মনকে মুগ্ধ করে। বাংলা সাহিত্যে সার্থক আত্মজীবনচরিত সংখ্যায় অল্প। তাহার মধ্যে "প্রাণকুমার" এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

নার্সারি স্কুলের শিক্ষাপ্রণালী—শ্রীমৃদুলিকা চট্টোপাধ্যায়। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৩৮, মূল্য—দুই টাকা।

শিশুর দল মানবসমাজকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করে; তারা জাতির শিক্ষা সংস্কৃতি রাষ্ট্রব্যবস্থা—এক কথায় আমাদের অতীত এবং বর্তমানের আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারক ও বাহক; তাদের ভিতর দিয়ে অনাগত ভবিষ্যৎ রূপায়িত হয়ে উঠবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিশুর জীবন-গঠনের আয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করলে আমরা আমাদের বর্তমান ব্যবস্থায় সহসা কোন আলোর সন্ধান পাই না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশু অনাদরে, অবহেলার ভিতর দিয়ে শৈশব ও বাল্যের কতক সময় অতিক্রম করে। অনেক সম্পন্ন গৃহেও দেখা যায়, ঘড়ি, ফাউন্টেন পেন বা অন্য ব্যবহারের জিনিস সামান্য মাত্রায় অকেজো হলে তার মালিক যেমন ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন, শিশুর শিক্ষার ত্রুটি-সংশোধনে সেরূপ তৎপরতা দেখা যায় না। এ সম্বন্ধে অজ্ঞতা অবশ্য একটি অন্যতম কারণ। এর ফলে সুষ্ঠু মানসিক গঠন না পেয়ে এবং উপযুক্ত আচরণে অভ্যস্ত না হয়ে শিশু যখন শৈশব ও বাল্য পার হয়ে কৈশোরে উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং কলেজে এসে উপনীত হয় তখন তারা প্রায়ই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে লেখিকা মনোবিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিশুদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন। শিশু-শিক্ষা ভবন—নার্সারি স্কুল পরিচালনার বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে লেখা বলে সমগ্র বিষয়টি সুস্পষ্ট, স্বচ্ছ এবং হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সদাচরণ, সদভ্যাস গঠন, স্বাস্থ্য ও সুরুচিপূর্ণ জীবন-বিকাশের জন্য যে আয়োজন করা হয়েছে তা প্রশংসনীয়। সামান্য খুঁটিনাটি বিষয়ও লেখিকার দৃষ্টি এড়ায় নি, এমনকি নার্সারি স্কুলের জলের চৌবাচ্চা যে ঢেকে রাখা দরকার নতুবা কৌতূহলী শিশুর পক্ষে তা মারাত্মক হতে পারে, এ ব্যবস্থাটুকুও নয়।

লা ই ফ ব য় সা বা ন

প্রতিদিন ময়লার বীজাণু
থেকে আপনাকে রক্ষা করে

L. 254-X52 BG

ভারতে প্রস্তুত
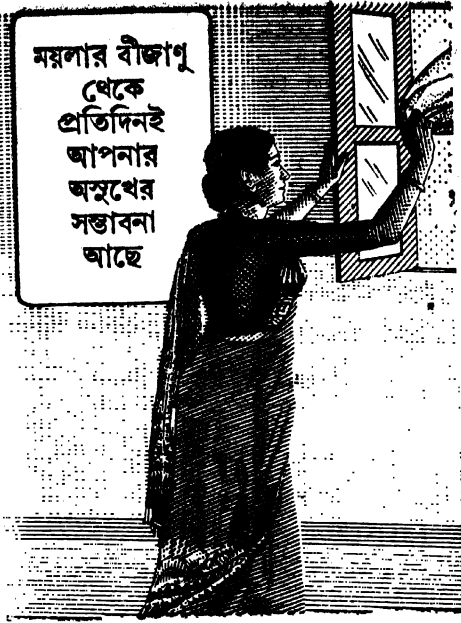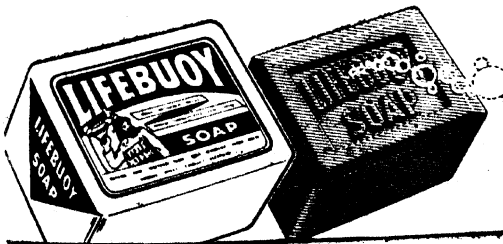
শ্রীপুলু চট্টোপাধ্যায় বহুদিনের অনুভূত একটি অভাব দূর করেছেন। শিশুর কল্যাণকামী প্রত্যেকের—বিশেষ করে মায়েদের বইখানি যত্নের সঙ্গে পাঠ করা উচিত। লেখা সরস ও সাবলীল; ছাপা পরিচ্ছন্ন। নার্সারি স্কুলের ছাত্রছাত্রী, খেলনা প্রভৃতির কতকগুলি সুন্দর ফটো পুস্তকখানির আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

অনুষ্টুপ ছন্দ—শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ২৪৮, মূল্য ৪৲।

বিবাহের কথা নিয়ে সমালোচ্য উপন্যাসের কাহিনীর সূচনা এবং বিবাহের প্রসঙ্গ নিয়েই এর উপসংহার। বস্তুতঃ, বিবাহের ব্যাপার নিয়ে শুধু যে নরনারীর হৃদয়ে সুখ-দুঃখ আশা-নৈরাশ্যের দোলা লাগে তা নয়, সমাজেও ওঠে নানা ঘাতপ্রতিঘাতের তরঙ্গ।

প্রাচীনপন্থী পরিবারের মেয়ে বারো বছরের সৌদামিনীকে বিয়ে করবার পর নায়ক প্রণব সুযোগ পেয়ে ব্যারিষ্টারি পড়তে বিলাত চলে যায়। চার বৎসর পরে যখন সে 'সাহেব' হয়ে ফিরে এল তখন তার দাম্পত্য-জীবনের স্বচ্ছন্দ গতি ব্যাহত হ'ল। প্রণব কিন্তু হাল ছেড়ে না দিয়ে এই জীবনকেই সহজ করে তুলবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলে। এই সময়েই ঘটনাচক্রে একা দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে দেখা হ'ল বিলেতের তার বন্ধু বরদার বোন সুচরিতার সঙ্গে। প্রথম দৃষ্টিতেই উভয়ে আকৃষ্ট হ'ল পরস্পরের প্রতি। কিন্তু এ প্রেম ত সফল হবার নয়, তাই মনের রাশ টেনে রাখতে হ'ল দুজনকেই।

সৌদামিনী একদিন নবজাত এক পুত্র রেখে প্রণবকে চিরমুক্তি দিয়ে গেল—প্রণব ছুটে গিয়েছিল সুচরিতার কাছে; কিন্তু তাদের কেউই সেদিন নিজের মনের কথা প্রকাশ করতে পারে নি। শিশুপুত্রকে মানুষ করবার জন্য বাধ্য হয়ে প্রণবের বিয়ে করতে হ'ল অরুণাকে। অরুণা আধুনিকা, এ বিয়ের পরও প্রণব ভুলতে পারে নি সুচরিতাকে; তারপর একদিন যখন সে বুঝলে সুচরিতা তারই স্মৃতি নিয়ে বিয়ে না করে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে, তখন তার আপসোসের আর সীমা রইল না।

প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় উপনীত হবার পর অরুণাও তাকে একদিন মুক্তি দিয়ে গেল। ছেলেমেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে, তারা দূরে। একাহার প্রৌঢ় প্রণব এবার সকল সঙ্কোচ বিসর্জ্জন দিয়ে তার প্রিয়তমার পাশাপাশি হয়ে দাঁড়ালে। দেহের প্রয়োজন আর নেই, পিতৃত্বের আকাঙ্ক্ষাও চরিতার্থ হয়েছে আঁর সন্তানের কামনা নাই; হৃদয় শুধু একটু আশ্রয় চায় আর একটি হৃদয়ে—একটু শান্তির আশ্রয়, একটি অবলম্বন।

প্রণব এ বয়সে সুচরিতাকে কেন জীবনসঙ্গিনী করতে চায় তা বোঝাতে গিয়ে তাকে বলছে—"কবির কাব্যে পুরুষকে সহকারতরু আর নারীকে মাধবীলতার সঙ্গে তুলনা করেছে। সেই কথাই জেনে এসেছ। আমার মনে হয়, কথাটা ঠিক উল্টো। সংসারযাত্রায় পুরুষই মাধবীলতা, মেয়েরা মাচা।"

বিখ্যাত রুশীয় গল্পলেখক শেকভ তাঁর 'ডার্লিং' গল্পে দেখিয়েছেন—ভালবাসার জন কেউ না থাকলে নারী-জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, আর সরোজবাবু দেখালেন হৃদয়ের দিক দিয়ে নারীর আশ্রয় ছাড়া পুরুষ-চিত্ত কেমন অসহায়, দুর্ব্বল।

লেখকের ভাষা জোরালো, সংযত ও সরস; সংলাপ বুদ্ধিদীপ্ত, মার্জিত। মূল প্রতিপাদ্যের সমান্তরালে প্রণব ও সুচরিতার ভোগলালসাহীন যে প্রেম ফল্গুধারার মত সমগ্র কাহিনীর মাঝে পরিব্যাপ্ত তা দিব্য, অতুলনীয়।

যেতে নাহি দিব—শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়। শান্তি লাইব্রেরী, ১০ বি কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য সাড়ে তিন টাকা

যেতে নাহি দিব—একখানি মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস। বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী শোভনা দেবী তার অতি প্রিয় মামাতো ছোট ভাই উৎপলকে ছেড়ে চিত্রজগতে এসেছে। অর্থ, যশ, প্রেম তার স্নেহবুভুক্ষু চিত্তে শান্তি দিতে পারে নি, তার মনের শূন্যতা ঘোচে নি ছোট ভাইটির অভাবে। 'দিদি' চিত্রে দিদির অভিনয় হ'ল অসাধারণ সাফল্যমণ্ডিত। এদিকে দরিদ্রের সন্তান, সদ্য দিদিকে হারিয়ে মুহ্যমান দ্বাদশবর্ষীয় বালক 'কিশোর' 'দিদি'-চিত্র দেখে অভিনেত্রীর মাঝেই যেন তার হারানো দিদিকে ফিরে পেল। পত্র-মাধ্যমে উভয়ের পরিচয় হ'ল। দুটি স্নেহব্যাকুল চিত্ত দুর্নিবার বেগে পরস্পরের প্রতি ধাবিত হ'ল। তার পরেই বাইরে থেকে আসতে লাগল নানা বাধা। 'যেতে নাহি দিব'—এই বাধা-দ্বন্দ্ব-বেদনার সকরুণ ইতিহাস।

লেখকের ভাষা অত্যধিক মাত্রায় কাব্যধর্মী এবং মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের সুযোগ পেলেই তিনি বক্তৃতা অথবা স্বগতোক্তি সুরু করে দেন, এই দুটি কারণে কাহিনীর গতি মাঝে মাঝে ব্যাহত হয়েছে। প্রতিবারই 'পবর'-এর স্থলে 'খপর', 'অপমান'-এর জায়গায় 'অবমান' এবং (ঙ্কু) মুদ্রিত করা অর্থে 'বুজায়ে'—লেখক কেন ব্যবহার করেছেন তার কারণ দুর্জ্ঞেয়, কিন্তু এগুলি পাঠকের কানে বাজে।

শ্রীতারাপদ রাহা

সৌন্দর্য্য-দর্শন—শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা। মূল্য আট আনা।

আলোচ্য পুস্তকে নন্দনতত্ত্বের (aesthetic) বিভিন্ন দিকের আলোচনা

করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পুস্তকের শেষ দুইটি প্রবন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্য-দর্শন আলোচিত হইয়াছে।

বইখানি নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারিবে কি না এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। ইহার জন্য দায়ী গ্রন্থকারের একদেশদর্শিতা। অতি অল্প পরিসরের মধ্যে দুরূহ বিষয়গুলির আলোচনা একান্তই অসংলগ্ন এবং প্রক্ষিপ্ত। উদাহরণ হিসাবে 'সৌন্দর্য্যের স্বরূপ' শীর্ষক আলোচনাটির কথা বলা যায়। এ বিষয়ে লেখক যে স্বকপোল-কল্পিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা সুধীজনগ্রাহ্য নহে, কাজেই আলোচনাগুলি ফলপ্রসূ হয় নাই।

আলোচ্য পুস্তকখানির স্থানে স্থানে প্রখ্যাত শিল্প-সমালোচক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্র-কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রূপশিল্প' গ্রন্থখানির প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে। গ্রন্থকার কিন্তু কোথাও অর্দ্ধেন্দ্রবাবুর নামোল্লেখ করেন নাই। এতদ্ব্যতীত এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটিতে স্ববিরোধী উক্তির অভাব নাই। ২০-২১ পৃষ্ঠায় সৌন্দর্য্যের 'ময়' (subjective) ধারণার কথা গ্রন্থকার বলিয়াছেন। তাঁহার উক্তিগুলি পাঠ করিলে ধারণা হয় তিনি প্লেটো, আরিষ্টটলের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে অতিক্রম করিয়া ক্রোচীয় ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী। ৩৯ এবং ৪১ পৃষ্ঠায় তিনি 'বাহিরের উপকরণকে' শিল্পে স্থান দিয়েছেন। প্লেটো রাস্কিনের ছায়া গ্রন্থকারকে আবিষ্ট করিয়াছে। এই ধরণের অসঙ্গতি বাদ দিলে গ্রন্থখানি পাঠকদিগের নিকট সমাদৃত হইতে পারিত।

পুস্তকের ভাষা সাধারণ; ইহার মুদ্রণ-পারিপাট্য প্রশংসনীয়। পুস্তকের প্রচ্ছদপটের জন্য লেখক জাভা ভাস্কর্যের নিদর্শন, 'প্রজ্ঞাপারমিতার' আলোকচিত্রখানি নির্বাচিত করিয়া রসিকজনের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

মাধুরী—শ্রীপূর্ণেন্দুবিকাশ মণ্ডল। গ্রন্থসমাজ, ৪৬, রাজা দীনেন্দ্র(?) রোড, কলিকাতা-২। দাম এক টাকা।

রবীন্দ্রনাথ যে কাব্যধারার প্রবর্তন করেছেন, তরুণ গ্রন্থকার তারই অনুসরণ করেছেন। মৌলিকত্ব প্রদর্শনের লোভে উৎকট ভাবের কসরত অথবা ভাষার ডিগবাজি দেখাবার চেষ্টা করেন নি। ফলে, [illegible] পাই, কয়েকটি প্রীতিকর কবিতা পেয়েছি। রচনায় এখনও দৃঢ়তা আসে নি তবু এর মধ্য দিয়ে একটি কল্পনাপ্রবণ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। "খরবেগে ছুটিয়া চলিব অসীম সাগর পানে। সেথায় মিলেছে কোটি [illegible] কোটি তরঙ্গ সনে॥"

বিচিত্র ভবন (আন্তর্জাতিক হোটেল)—শ্রীকেদারনাথ(?) রায়। কলিকাতা পুস্তকালয় লিঃ, ৩ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য দেড় টাকা।

বিচিত্রই বটে! মলাটের ভিতর দিকে পড়লাম, "আমার তিন বছরের ছেলে 'টুবুন'! তোমরা যখন বড় হবে, বাংলার সমাজ তখন [illegible] নতুন ক'রে তৈরি হয়েছে। যারা মিথ্যাচারী, যারা শঠ, যারা [illegible] ধ্বংস হয়ে গেছে।" আরও দেখলাম, এ বইয়ের প্রকাশক 'শিশুসাহিত্য প্রচার।' তারপর, পাতা উল্টে দেখি, 'বিচিত্র ভবনের' [illegible] নেবার জন্যে নানারকমের লোক আসছে যাচ্ছে; দরজায় [illegible] দাঁড়াচ্ছেন তরুণী, তা নিয়ে [illegible] করছেন অপরিচিত তরুণ; [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট এসেছেন ঘর ভাড়া নিতে, হোটেলের খাতাপত্র [illegible] সেই নগেন প্রশ্ন করছে, "বলুন, কি লিখব, আপনি স্ত্রীলোক না পুরুষ?" বোঝা গেল, এ সব হাস্যরসের উপাদান। আর আদি রসের [illegible] অভাব নাই। মোট কথা, পাত্রপাত্রীদের মধ্যে [illegible] লুকোচুরি আর ধাপ্পাবাজি। আর তাই উপলক্ষ্য করে লেখক [illegible] হাস্যরস, আদিরস আর বোধ হয় কিঞ্চিৎ অদ্ভুতরস। সন্ধ্যা অনিন্দকে [illegible] করছে "আমার এই হাতটা ধরুন।" আদেশ পালন করে অনিন্দ [illegible] "কিন্তু কেউ যদি এসে পড়ে!" লিলিকে সন্ধ্যা প্রশ্ন করে, "[illegible] প্রয়োজন?" লিলির উত্তর, "প্রয়োজনের জন্যই তো প্রেম।" দেখতে এসেছেন ডাক্তার বিনি বোস: "হৃদয়ে আঘাত লাগল [illegible] (লিলিকে) দেখি আপনার হার্টটা। (দেবশঙ্করকে) হৃদয়ে [illegible] পেয়েছেন?"

লঘু আমোদ-প্রমোদ অভিলাষীদের হয়তো বইখানা অপছন্দ হবে [illegible] তবে 'টুবুন' কি শিখবে, আর 'শিশু-সাহিত্য প্রচার' কি উদ্দেশ্যে [illegible] ভার নিয়েছেন, তা বোঝা গেল না।

বুদ্ধদেব বসুর স্বনির্ব্বাচিত গল্প—ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ। ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। দাম চার [illegible]

কবি, প্রবন্ধকার এবং গল্প-লেখকরূপে বুদ্ধদেববাবু সুপরিচিত। সব লেখাতেই কবিত্বের স্পর্শ আছে। এই গল্পগুলিতেও। কিন্তু কাব্যিক বর্ণনা নয়, যে দৃশ্য মনোরহস্য নিয়ে নিপুণ কথাশিল্পী [illegible] তোলেন তার কিছুমাত্র অভাব নেই। প্রত্যেকটি গল্প প্রথম [illegible] পর্য্যন্ত মনকে টানে। আর পড়তে পড়তে মনে হয়, আমাদেরই [illegible] কত কল্পনা ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে, কত চেনামুখে ফুটছে হাসির ঝলক, বিষাদ-ছায়া। প্রত্যেকটি নর-নারীকেই যেন কোথাও দেখেছি [illegible] ফেলতে পারি। প্রশ্ন ওঠে না মনে—'এরা কি স্বাভাবিক'?

বারোটি গল্প আছে এ বইয়ে। কোনটিই পূর্ব্বপ্রকাশিত [illegible] সংগৃহীত নয়, সবগুলি নতুন। সুতরাং এখানিকে সাধারণ [illegible] হিসেবে না দেখে নূতন গ্রন্থরূপে গণনা করা যেতে পারে। [illegible]

আরও মসৃণ, কমনীয় ত্বক্
দিনে দিনে...
ক্যাডিল্*যুক্ত রেক্সোনা'কে
আপনার অবগুণ্ঠিত রূপকে
উন্মোচন করতে দিন
রেক্সোনা'র ক্যাডিল্-সমৃদ্ধ ফেনা আপনার ত্বকে
মোলায়েমভাবে রগড়ে নিয়ে ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন,
আপনার ত্বক্ দিনে দিনে মসৃণতর আর কোমল হয়ে'-
এক নতুন উজ্জ্বলতর কমনীয়তায় ভরে তুলেছে।
বড় সাইজেও
পাওয়া যায়
Rexona
রে ক্সো না
ক্যাডিল্‌যুক্ত একমাত্র সাবান
* ত্বক্ পোষক ও কোমলতাপ্রদ তৈল সমূহের এক
বিশেষ সংমিশ্রণের মালিকানী নাম।
RP. 130-X52 BG

গল্প কয়টি সংহত, সু-মিত। শেষের কয়েকটি অপেক্ষাকৃত উচ্ছ্সিত, বিস্তারিত, তবু কোনটিই কাঁচা হাতের লেখা নয়। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করে তৃপ্তিলাভ করা গেল। একালের অনেক শক্তিমান গল্প-লেখক ঘটনাকে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে অস্বাভাবিকতার দিকে নিয়ে যান, নর-নারীর চরিত্রকে মোচড় দিয়ে বিকৃত করে ফেলেন, তা নইলে তাঁরা নাকি 'সমস্যা'র সৃষ্টি করতে পারেন না। বুদ্ধদেববাবুর এ গল্পগুলিতে তেমন অপচেষ্টা নেই ; এখানে জীবনের গতি সহজ, সাবলীল।

জীবনের উদ্দেশ্য—[illegible] সরকার। সৎসঙ্গ ক্যাম্প, দেওঘর। মূল্য আট আনা।

জীবনধারণে ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাব, সদ্গুরুলাভ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনাপূর্ণ পুস্তিকা।

হৃদয় পুষ্প—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সাহু। ভারত-সেবক-সমিতি। কটক-১। মূল্য এক টাকা।

কয়েকটি পদ্য। প্রারম্ভে নানা লোকের বহু পৃষ্ঠাব্যাপী প্রশংসাপত্র। রচনার একটি দৃষ্টান্ত :

'কেমন কোরে দিন কাটালাম,
কেমন কোরে এতদিন বাঁচিলাম,
কেমন কোরে সে নিয়ে এলো রে
সব ভীতি পার কোরে,
এখন যদি হাবুড়বু খাই,
সে-ই পার করিবে রে।'

যাক্, কবির মনে আশ্বাস আছে ; তবে আমরা মিছে ভাবনা করি কেন ?

কেনোপনিষদ্—শ্রীঅরবিন্দ। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। দামের উল্লেখ নেই।

শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজী রচনা থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন শ্রীনলিনীকান্ত সেন। অনুবাদ স্পষ্ট হয়েছে। প্রথমে রয়েছে মূল শ্লোকগুলি আর তার বাংলা তর্জ্জমা, পরে আছে বিস্তৃত ব্যাখ্যা। গভীর চিন্তা ও অধ্যাত্ম উপলব্ধির নিদর্শন রয়েছে ব্যাখ্যা অংশে। এখানে লেখকের আলোচ্য বিষয়—ঈশ, ও কেন উপনিষদের বিষয়বস্তু, প্রেরয়িতা কে, ইহলোক ও অমৃত, প্রতিভাস ও প্রকৃত সত্তা, ইন্দ্রিয়বোধের স্বরূপ, ব্রহ্মজ্ঞান, দেবতা ও [illegible] বিশ্বে মুক্তজীব। জীবনকে উর্দ্ধাভিমুখী করবার প্রেরণা যাঁদের মনে জেগেছে, উপনিষদ্ তাঁদের পরম সহায়ক। এর প্রতি শ্লোকে রয়েছে দিব্য চেতনার স্পর্শ। পরিশিষ্টে অনুবাদক তাঁর ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দসমূহের পরিচয় দিয়েছেন। এই শব্দগুলি দার্শনিক আলোচনার উপযোগী ও সুপ্রযুক্ত হয়েছে।

সাত-সাত্তে—ডক্টর শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। উত্তরায়ণ লি. ১৭০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম এক টাকা বারো আনা।

অভিনব কৌতুকচিত্র। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে লেখা। আগাগোড়াই ব্যঙ্গবিদ্রূপ। সে বিদ্রূপ যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি যথাযথ ও সুনিপুণ। পৃথিবীর এবং ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার স্বরূপ উদ্ঘাটন লেখকের উদ্দেশ্য। বিভিন্ন দলের বোলচালের আড়ালে কোথায় দুর্ব্বলতা, লেখক তার ইঙ্গিত করেছেন। সে ইঙ্গিত কৌতুককর, অথচ চিন্তাদ্যোতক। সুরুতেই দেখি, বিশ্বশান্তি বৈঠকের অসারতা। 'যুদ্ধ শেষ করবার যুদ্ধ' ঘটে গেল ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে, তবু যুদ্ধ থামল না। শান্তিবৈঠকের আবহাওয়া ঘন ঘন গরম হয়ে উঠতে লাগল। সংখ্যাবাদীদের প্রস্তাবে দেশের নামপরিচয় লোপ করে সংখ্যাপরিচয় প্রবর্ত্তন করা হ'ল। একটি দেশ—বলা বাহুল্য, আমাদের দেশ—চিহ্নিত হ'ল ৪৯'৪৯ সংখ্যায়। সেখানে নির্ব্বাচনান্তে বিভিন্ন দলের লোক নিয়ে মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হ'ল। স্বার্থের লড়াইয়ে মন্ত্রিমণ্ডলে দেখা দিতে লাগল ভাঙন। দলগুলির কার্য্যকলাপ পরম হাস্যকর হয়ে ফুটে উঠেছে। অবশেষে একদল গারদভাঙা পাগল এসে দখল করে শাসনযন্ত্র, তাদের সর্দ্দার হ'ল ডিক্টেটর। বইখানি হাল্কা হয়েও হাল্কা নয়।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সূর্য্যদীঘল বাড়ী—আবু ইস্হাক। নবযুগ প্রকাশনী। [illegible] সার্কাস মার্কেট প্লেস, কলিকাতা-১৭। মূল্য ২৸০ আনা।

সম্পূর্ণ গ্রাম্য পরিবেশে কয়েকটি অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমান-পরিবারের সরল প্রকৃতির পাত্রপাত্রীর জীবনালেখ্য পুস্তকখানিতে অঙ্কিত হইয়াছে। লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত হইলেও পূর্ব্ববঙ্গের এক অঞ্চলের যে ছবি তিনি আঁকিয়াছেন তাহা শুধু মনোরম নয়—মনে রাখিবার মত।

জয়গুণের চরিত্রটি কাহিনীর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। করিম তার অসংখ্য দোষগুণ লইয়া জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। দারিদ্র্যের সহিত লড়াই করিতে গিয়া, শরিয়তী অনুশাসনকে উপেক্ষা করিয়া জয়গুণের স্বাধীনভাবে চলিবার প্রাণপণ চেষ্টার মাধ্যমে উহাদের সামাজিক ব্যবস্থার গলদ কোথায় তাহা চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ইংরেজ আমল হইতে কাহিনীর সূচনা, এবং দেশ স্বাধীন হইবার পর ইহার সমাপ্তি। যাহাদের চরিত্র লেখক আঁকিয়াছেন তাহারা দরিদ্র, দুর্দ্দশাগ্রস্ত গ্রাম্য নর-নারী, স্বাধীনতা বলিতে তাহারা জানিত অজানা

মকুব আর সস্তায় ধান চাল কিনিতে পাওয়া। স্বাধীনতা আসিল, নিশান উড়িল…আনন্দোৎসব হইল, কিন্তু তাহাদের স্বপ্ন সফল হইল না।

লেখকের দৃষ্টি স্বচ্ছ ও মন দরদ-ভরা। চরিত্রসৃষ্টির কৌশলও তিনি মোটামুটি আয়ত্ত করিয়াছেন। তাঁহার বলিবার ভঙ্গীটিও চিত্তাকর্ষক।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

এরা কোথায়—শ্রীসমীরকুমার দাস এবং শ্রীভজন দাশগুপ্ত সঙ্কলিত। পৃষ্ঠা ৯০। মূল্য চার আনা।

মাওএর রাজ্যে মানস-নিধন—সীতারাম গোয়েল। পৃষ্ঠা ৭৯। মূল্য চার আনা।

কৃষকের রক্তে লাল চীন—সীতারাম গোয়েল। পৃষ্ঠা ৮৬। মূল্য চার আনা।

উপরোক্ত তিনখানি পুস্তকই ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

প্রথম পুস্তকখানিতে—রাশিয়ায় সাম্যবাদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে নানা অছিলায় নির্যাতন, এমন কি হত্যা পর্য্যন্ত করা হইয়াছে তাহারই বর্ণনা আছে। এককালে দেশভক্ত অন্য সময়ে দেশদ্রোহী প্রমাণিত হইয়া বা নিজের স্বীকৃতিতে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে এইরূপ দৃষ্টান্তই বেশী।

দ্বিতীয় পুস্তকখানিতে বর্ত্তমান চীনে কি ভাবে স্বাধীন চিন্তা দাবাইয়া রাখা হইতেছে তাহা দেখানো হইয়াছে। প্রমাণস্বরূপ ভারতীয় ভ্রমণকারীর বর্ণনা, চীনা সরকারী প্রমাণ, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, গল্পলেখক, চিত্রপরিচালক এবং জনৈক লেডি ডাক্তারের উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ার অন্ধ অনুকরণে মাওয়ের দেশ আজ গড়িয়া উঠিতেছে—পুস্তকখানির প্রতিপাদ্য ইহাই।

তৃতীয় পুস্তকের বিষয়বস্তু হইতেছে এই যে, বর্ত্তমান লাল চীনের তথাকথিত উন্নতি হইয়াছে কৃষকের সর্ব্বনাশসাধন করিয়া। কৃষকের ধ্বংসের উপরে শিল্পায়নের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। শস্য উৎপাদন এবং সংগ্রহ ব্যাপারেও কৃষকের স্বার্থ বলি দেওয়া হইতেছে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

পাষাণপুরীর রূপকথা—অসীমগুপ্ত। গ্রন্থকীট, ১১২ রাসবাগান লেন, কলিকাতা—১০। মূল্য আড়াই টাকা।

কলিকাতাকে লেখক আখ্যা দিয়েছেন 'পাষাণপুরী'। ঝরঝরে ভাষায় মহানগরীর বিবর্ত্তনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে বইখানিতে। জব চার্ণকের সেই ছোট্ট জমিদারী, এঁদোপুকুর আর পচা ডোবা ভর্ত্তি তিনখানি গণ্ডগ্রাম—কলিকাতা-সুতানুটি-গোবিন্দপুর—ক্রমবিকাশের ফলে কি করে আজকের মহানগরীতে পরিণত হয়েছে সে এক বিস্ময়! লেখক গল্পের মত করে তারই চমকপ্রদ ইতিহাস লিখেছেন। বইখানিকে শুধু কলিকাতার ইতিহাস নয়, বাংলাদেশের 'পতন-অভ্যুদয়ের' কাহিনী বলা চলে। তথ্যবহুল হলেও এর কাহিনীর গতি কোথাও ব্যাহত হয় নি।

'পাষাণপুরীর রূপকথা' শুধু প্রাচীন কলিকাতার ইতিহাসই নয়, একে বর্ত্তমানের 'কলিকাতা-পরিচয়'ও বলা যেতে পারে। কলিকাতা আর কলিকাতার রাস্তাঘাটের নামকরণের ইতিহাস থেকে আরম্ভ করে মহানগরীর ইমারত, মনুমেণ্ট, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর সব কিছুরই ইতিহাস দেওয়া হয়েছে সুখপাঠ্য ভাষায়। পুস্তকের পাতায় পাতায় জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে আগেকার দিনের কলিকাতার জনসাধারণের জীবনযাপন-প্রণালী, রীতি-নীতি, বিলাস-ব্যসন আর সুখ-দুঃখের ইতিহাস। প্রাচীন কলিকাতার ছবিগুলি ও পরিশিষ্টে সংযোজিত গ্রন্থপঞ্জী বইখানির সৌষ্ঠব ও মূল্য বৃদ্ধি করেছে।

প্রেম ও মৃত্যু—শ্রীঅরবিন্দ। অনুবাদক: শ্রীপৃথ্বীসিংহ নাহার। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। মূল্য ২৷৷০ টাকা।

শ্রীঅরবিন্দের 'লাভ এণ্ড ডেথ' নামক ইংরেজী কাব্যগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। কবিত্বশক্তি না থাকলে কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ কেমন বিসদৃশ হয়ে ওঠে এ বইখানি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আঠার অক্ষরের মিলহীন পয়ারে লেখা বইখানি আরম্ভ হয়েছে:—

"প্রথম প্রভাতে যবে বসুন্ধরা দীপ্ত মনোহর,
মদন আপনি নবপ্রেমে বিস্মিত আপনা মাঝে
আতপ্ত পুলকে, অমলিন, করিতেন খেলা তাঁর
নববধূ প্রিয়ংবদা সাথে শ্যাম বনতলে রুরু,"

দ্বিতীয় পংক্তির এই ছন্দপতনের ধাক্কা সামলে নিয়েও এগোবার উপায় নেই। অচল অনড় ভাষা আর অর্থহীন বিশেষণের স্তূপ বইখানিকে পাঠের অযোগ্য করে তুলেছে। এর উপর,

"অথবা তাহারে ভুলাইয়া নদীতটে লয়ে-যাওয়া;"
"ঈষদ্বিরক্ত-কুটিল দৃষ্টিপাতে কহিলেন পুনঃ,"
"গেলেন চলিয়া তিনি। বৈতরণীরে দ্বাদশ বার
করিলেন অতিক্রম. সেই বিষাদ-বিদীর্ণা নদী।
যমলোকেরে দ্বাদশবার করিলেন প্রতিহত,
দ্রুতগতি বেগে নামিলেন তিনি দুর্নিমিত্তময়
বিবর-অন্তরে যেথা বজ্রনাদে নিপতিত সেই
কৃষ্ণা সুবিপুলা স্রোতস্বিনী।—"

আর দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। ছন্দপতনের কত দৃষ্টান্ত যে বইখানির সর্ব্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে তার অন্ত নেই। অর্থহীন বিশেষণে ভারাক্রান্ত পংক্তিগুলি পদে পদে কবিতার স্বচ্ছন্দ গতিকে ব্যাহত করেছে। শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের এমন অক্ষম অনুবাদ সচরাচর দেখা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য

দেশ-বিদেশের কথা

নরসিংদাস বাংলা পুরস্কার—১৯৫৫

কলিকাতাবাসী, ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কস-এর ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত নরসিংদাস আগরওয়ালার প্রদত্ত অর্থ হইতে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কলিকাতার নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন নামক সংস্থার মাধ্যমে সাহিত্য (Arts) ও বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা পুস্তকসমূহের রচয়িতাদিগকে পুরস্কৃত এবং উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে "নরসিংদাস বেঙ্গলী প্রাইজ" নামে একটি পুরস্কার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এক হাজার টাকা মূল্যের এই পুরস্কার পর্য্যায়ক্রমে সাহিত্য এবং বিজ্ঞানবিষয়ক রচনার জন্য প্রদত্ত হইবে। ১৯৫৫ সনের পুরস্কার দেওয়া হইবে বিজ্ঞানের জন্য।

কোন বৎসরে যোগ্য প্রার্থীর অভাব হইলে এই পুরস্কার সাহিত্যের বদলে বিজ্ঞান অথবা বিজ্ঞানের পরিবর্ত্তে সাহিত্যের জন্য দেওয়া যাইতে পারে।

পুরস্কার প্রদানের বৎসরে যে লেখকের প্রকাশিত রচনা নির্ব্বাচক সমিতি কর্তৃক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে তিনিই উক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন। ১৯৫৫ সনের ৩১শে মার্চের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দুই বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত বিজ্ঞানবিষয়ক বাংলা পুস্তকসমূহের রচয়িতা, প্রকাশক এবং গ্রন্থকারদের অনুরাগীবৃন্দকে নির্ব্বাচক সমিতির বিবেচনার্থ ১৯৫৫ সনের ৩১শে আগষ্টের পূর্ব্বে প্রত্যেক পুস্তকের আটখানি কপি পাঠাইবার জন্য আমন্ত্রণ করা যাইতেছে। পুস্তকসমূহ রেজিষ্ট্রার, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী-৮—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম নামক সংস্থাটি ১৯৫৪-৫৫ সনে একত্রিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে। এই আশ্রমে বালকদের সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষার সুবন্দোবস্ত আছে। এখানকার শিক্ষামূলক কার্য্যাবলী নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত :—(ক) সাধারণ শিক্ষা ১। প্রাথমিক শিক্ষা, ২। মাধ্যমিক শিক্ষা, (খ) মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা (গ) স্বাস্থ্য ও খেলাধুলা। বর্ত্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত আশ্রমের আবাসিক বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। ভবিষ্যতে এই বিদ্যালয়কে একটি পূর্ণাঙ্গ উচ্চ বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করিবার সঙ্কল্প কর্তৃপক্ষের আছে। আলোচ্য বৎসরে আশ্রমের বালকদের সংখ্যা ছিল ১৩০, তাহার মধ্যে ২১ জন বাহিরের স্কুলে শিক্ষালাভ করে, অবশিষ্ট ১০৯ জন আশ্রমস্থ ধ্রুবেন্দ্রনারায়ণ বিদ্যা-মন্দিরে পাঠাভ্যাস করে। এখানে যেমন বালকদিগের লেখাপড়ার দিকে, তেমনি খেলাধুলা স্বাস্থ্য ও মানসিক উন্নয়নের দিকেও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা হয়। আলোচ্য বৎসরে ছাত্রদের জন্য ১১২৭খানি বিদ্যালয়পাঠ্য নূতন পুস্তক ক্রয় করা হইয়াছে এবং প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক বিভাগের প্রতিটি ছাত্রকে খাতাপত্র ও পাঠ্য পুস্তক বিলি করা হইয়াছে।

আশ্রমের কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় সমাজ উন্নয়ন সমিতির নিকট হইতে এই বৎসর ৫০০০৲ সাহায্য পাইয়াছেন। ইহা দ্বারা আশ্রমের অন্যতম সভ্য শ্রীতারকনাথ দত্ত এম-এ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ছেলেদের একটি গ্রন্থাগার খোলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বেকারী বিভাগ, দর্জ্জি বিভাগ, চর্ম্মশিল্প বিভাগ ও সাবান প্রস্তুত বিভাগ খোলা হইয়াছে। এখানে ছেলেদের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদির সঙ্গে যে-কোন বিখ্যাত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত দ্রব্যাদির তুলনা করা যাইতে পারে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা ছাড়া নৈতিক ও ধর্ম্মীয় শিক্ষাদানও এই প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য। আশ্রমের বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীঅমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বাল্যবন্ধু। নেতাজীর অনুরোধেই তিনি ১৯২৫ সন হইতে এই আশ্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট হন এবং ইহাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীশিশির-কুমার চক্রবর্ত্তী ব্রহ্মদেশে নেতাজীর সহকর্ম্মী ছিলেন।

বিদ্যালয়ে কতকগুলি বিভাগের স্থানসঙ্কুলানের অসুবিধা হওয়ার দরুন প্রধান দালানের উপর ত্রিতল গৃহনির্ম্মাণ আশু প্রয়োজন। ইহা ছাড়া বালকদিগের খেলাধুলা ও স্বাস্থ্য-চর্চ্চার জন্য আশ্রমের পার্শ্ব-পার্শ্বস্থ এক বিঘা আন্দাজ জমি ক্রয় করিবার পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করা অত্যাবশ্যক। অর্থাভাবে যাহাতে এই সংস্থার কর্ম-প্রচেষ্টা ব্যাহত না হয়, সে বিষয়ে সকলেরই মনোযোগী হওয়া উচিত। টাকাকড়ি নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিতব্য : সম্পাদক, দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম, ২৩ ও ২৭ ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা।

বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা-পরিষদ

এবারকার বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের পরীক্ষা ফলে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, হের ক্লাউস কামান নামে জনৈক জার্ম্মান দর্শনশাস্ত্রে সমস্ত ছাত্রের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, কয়েকজন মুসলমান ছাত্র পরিষদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, মহিলাদের মধ্যে কয়েকজন আদ্য মধ্য ও উপাধি সকল পরীক্ষাতেই বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং প্রথম দশ জনের মধ্যে স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মধ্য এবং উপাধি পরীক্ষায় ছাত্রসংখ্যাও প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

কলাবাগানে

শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা.
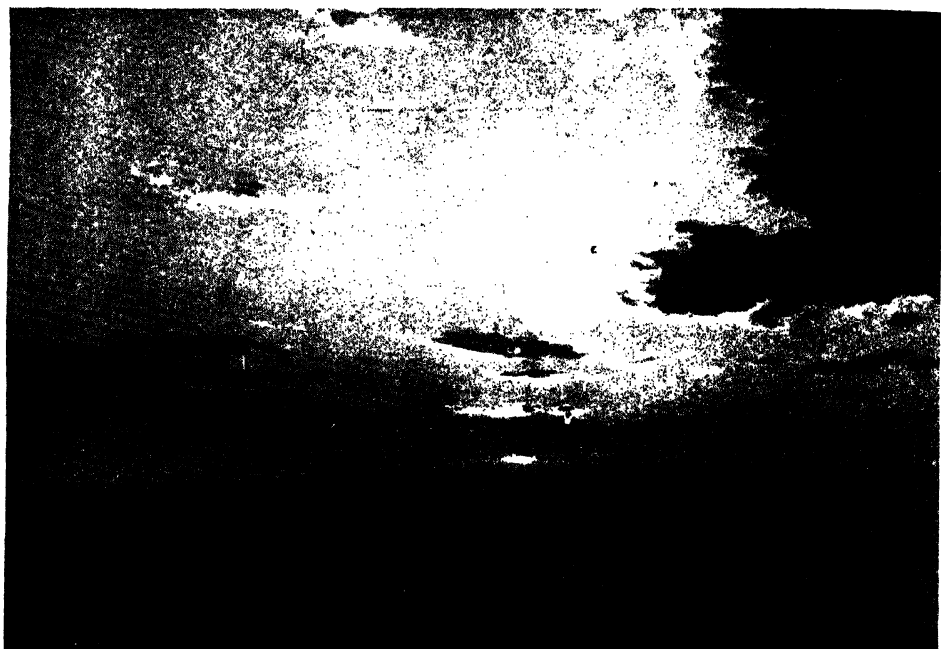
কুতুব মিনার হইতে সূর্য্যাস্তের দৃশ্য [ফোটো ঃ শ্রীপরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কাজের পথে [ফোটো ঃ শ্রীবিনয়ভূষণ দাস

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৫শ ভাগ ১ম খণ্ড { আশ্বিন, ১৩৭২ } ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম

বিগত ৩রা ও ৪ঠা সেপ্টেম্বর দিল্লীতে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির দুই দিনব্যাপী অধিবেশন হয়। তাহার কার্য্যক্রম সম্পর্কিত সংবাদ আমরা অন্যত্র দিলাম। এখানে সেই কার্য্যক্রম সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য আমরা করিতেছি। সংবাদ ও মন্তব্য আমরা পৃথক রাখিতেছি, কেননা উভয়ের বিষয়বস্তু ঠিক এক নহে।

প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকলাপে কিছুদিন যাবৎ অবাস্তবের ছায়া আমরা লক্ষ্য করিতেছি। সমস্ত কার্য্যক্রমে সমস্ত বিচারে যেন এক প্রচ্ছন্ন বহিঃশক্তির আদেশ-নির্দ্দেশের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়, যেমন এক-নায়কত্বের রাষ্ট্রে পাওয়া যায়। সবকিছুই যেন একজনের ইচ্ছাবশ, নির্দ্দেশসাপেক্ষ। বলা বাহুল্য, ইহার অর্থ স্পষ্ট। ইহার অর্থ এইমাত্র যে, কংগ্রেসের অস্তিত্বের সার্থকতা ক্রমেই লোপ পাইতেছে, তাহার আদর্শবাদ প্রায় লুপ্ত, তাহার কার্য্যকারিতা সম্পূর্ণ নষ্ট হইতে চলিয়াছে।

এই যে সেদিন কয়জনের নির্ব্বাচন হইল তাহার কথা বলি। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মুষ্টিমেয় ছয়-সাত জন ব্যতীত সকলেরই ভোট পাইয়াছেন। জানি না ঐ ছয়-সাত জন অসুস্থ ছিলেন কি না। যদি তাহা না হয় তবে বলিব সমস্ত নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটিতে এখনও শতকরা দুই আড়াই জন স্বাধীনচেতা ব্যক্তি আছেন।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার নাই। তিনি দেশের সর্ব্বজনের স্নেহের ও ভালবাসার উপযুক্ত পাত্রী। তাঁহার চিরকল্যাণ কামনা আমরা সকলেই করি। কিন্তু শুধু সেই কারণেই কি কমিটি তাঁহার যোগ্যতার স্থান এত উচ্চে দিয়াছে? অপত্যস্নেহ, পিতৃসেবা, প্রেম, পিতৃ-পিতামহের যশোগান, এ সকলই পারিবারিক ব্যাপারে অতি উচ্চ স্থান পায়। কিন্তু নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি কি ঠিক সেই জাতীয় গোষ্ঠী?

তাহার পর দেখুন গোয়া সম্পর্কিত বিচার। ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত গোয়া প্রস্তাবটি অনুমোদন কি কারণে সর্ব্বসম্মতভাবে হইল তাহার কোনও বিশদ ব্যাখ্যা কোথায়ও প্রকাশিত হয় নাই। অবশ্য উহার বিশদ আলোচনা না হওয়াই সম্ভব।

পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন যে, নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির গৃহীত প্রস্তাবে, বর্ত্তমান অবস্থায় একমাত্র নির্ভুল পন্থার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কংগ্রেসের অভিমতে অস্পষ্টতা নাই, যদিও সমস্যা জটিল ও ইহার সমাধান কষ্টসাধ্য।

আমরা বলিতে বাধ্য যে, যদিও নির্দ্দেশ সুস্পষ্ট—ও উহা নির্ভুল হইলেও হইতে পারে—কিন্তু উহার সমর্থনে যে যুক্তি দেওয়া হইয়াছে তাহা ধোঁয়ার মত সুস্পষ্ট আর কাদার মত পরিষ্কার ও স্বচ্ছ। তাহাতে তর্কের অবকাশ নাই।

গোয়ার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, অতএব উহাতে প্রবেশ করা ভারতীয়দিগের উচিত নহে এই এক যুক্তি। পণ্ডিত নেহরু আরও বলিয়াছেন, গোয়া ভারতের অংশ হইলেও ভারতীয় ইউ-নিয়নের অংশ নহে এবং "তাঁহাদিগকে বৈদেশিক শক্তির সহিত বুঝাপড়া করিতে হইবে"।

এখানে প্রথমেই প্রশ্ন এই যে, বৈদেশিক শক্তির সহিত বুঝা-পড়ার ভার কি নিঃ-ভাঃ কংগ্রেস কমিটির? যদি না হয় তবে ন্যায় ধর্ম্মের ও নৈতিক দৃষ্টির ভিত্তিতে বিচার হওয়া উচিত ছিল না কি?

সত্যাগ্রহের জন্ম দিয়াছিলেন জাতির পিতা সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকায়। তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে একমাত্র পিতৃপদানুসরণ করিতেছেন মণিলাল। তিনিও ইতিপূর্ব্বে সেখানে সত্যাগ্রহ করিয়া কারাবরণ করিয়াছেন। তবে কি ইঁহারা অন্যায় করিয়া-ছিলেন, না ভুল বিচার করিয়াছিলেন?

"Quit India, ভারত ছাড়" বলার পর ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে ত ভারতীয় কংগ্রেসের সম্পর্কচ্ছেদ হয়। সেই সঙ্গেই কি সত্যাগ্রহের কার্য্যক্রম অপসারিত হইয়াছিল?

ভারত সরকার বৈদেশিক শক্তির সহিত বুঝাপড়ার জন্য সত্যাগ্রহ বন্ধ করিতে পারেন। কিন্তু নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি সেই কারণে ন্যায়ধর্ম্মের প্রশ্ন ছাড়িয়া ঐরূপ যুক্তির আশ্রয় লইবে কেন? "যে বেটা বলিবে হেঁ হেঁ তা হোক, সে বেটা কতক ভদ্রলোক" —এই কি এখন সরকারের সঙ্গে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির মূল নীতি?

আমরা দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার বিষয়ে শ্রীগুলজারীলাল-নন্দের এক মন্তব্য ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছিলাম। তাহাতে বিচারবুদ্ধির

পরিচয় ছিল। কিন্তু এই নিঃ-ভাঃ কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে তিনি মূক-বধির রূপ ধারণ করেন। এই দুইটি ব্যতীত অন্য যাহা কিছু সেখানে হয় তাহা হাওয়া-ভরা বুদ্‌বুদের ন্যায় সারযুক্ত। ইহাকেই বলে কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম।

নূতন রেণ্ট কণ্ট্রোল আইন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ হইতে যে ভাড়া নিয়ন্ত্রণ বিল বিধান পরিষদে আসিতেছে সে সম্পর্কে একজন বাঙালী বাড়ীওয়ালার চিঠি গত ১২ই সেপ্টেম্বরের "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকায় ছাপা হইয়াছে। ইহার বক্তব্য নিম্নরূপ :

"বাড়ীওয়ালারা যাহাতে নূতন বাড়ী তৈয়ারীতে টাকা খাটায় এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে একটি অধিকতর যথাযথ 'রেণ্ট কণ্ট্রোল এক্ট' প্রচলিত করিতে চাহেন উহা অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু এই বিষয়ে প্রথম বাঞ্ছনীয় সর্ত্ত এই যে, বাড়ীওয়ালার ভাড়া কোন ক্ষেত্রেই মারা যাইবে না। বর্ত্তমানে যে কোন ভাড়াটিয়া পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত যে-কোন বাড়ী বা ফ্লাটে ভাড়া না দিয়া থাকিতে পারে। বাড়ীওয়ালাকে কিন্তু বাড়ীর ভাড়া অনুযায়ী ট্যাক্স গুনিয়া যাইতে হয়। সরকার যদি এরূপ আইন গঠন করিতে পারেন যে ভাড়া না দিলে ভাড়াটিয়া উচ্ছেদ দুই তিন মাসের মধ্যেই হইতে পারে, তবে অধিকাংশ বাড়ীওয়ালাই আবার গৃহ-সম্পত্তিতে টাকা লগ্নী করিতে ইচ্ছুক হইবেন। ইতি⋯"

বলা বাহুল্য, চিঠি যিনি লিখিয়াছেন তিনি বাঙালী বাড়ীওয়ালা, নহিলে পাঁচ বৎসর ভাড়া না দিয়া যে-কোন বাড়ীতে ভাড়াটে বসিয়া থাকিতে পারে এরূপ অপরূপ সত্যের অপলাপ সম্ভব হইত না।

ভাড়ার জন্য যে বাড়ী করিবে তাহার সম্পত্তির ন্যায্য আয় হইতে সে বঞ্চিত হইবে না এরূপ আইন ন্যায়সঙ্গত। এখন প্রশ্ন হইল, যে ভাড়াটিয়া তাহারও কোনও অধিকার আছে কিনা। বাঙালী জনসাধারণ, যাহাদের সহায়তা ও সম্মতি ভিন্ন এদেশের কাজ-কারবার, শাসন ইত্যাদি এক দিনের জন্যও সম্ভব হয় না, তাহাদের মধ্যে শতকরা নব্বই জনের কলিকাতায় ভিটামাটি নাই।

অন্য দিকে কলিকাতায় বাড়ী ও জমীর প্রায় অর্দ্ধেক ভিন্ন প্রদেশীয়দের হাতে চলিয়া গিয়াছে, এবং বাকীটুকুও ক্রমেই যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় নূতন রেণ্ট কণ্ট্রোল এক্ট কিরূপ হওয়া উচিত তাহা সাধারণ বুদ্ধিতে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিবেন।

ষ্টেটসম্যানের উক্ত চিঠির মর্ম্ম এই যে, সরকার বাড়ীওয়ালার খাঁই মিটাতেই ব্যস্ত, জনসাধারণের নিরাপত্তা বা আশ্রয়ের জন্য চিন্তিত নহেন। ইহা বিশ্বাস হয় না, কিন্তু যদি উহা সত্য হয় তবে ঐরূপ ঘৃণ্য সরকারের যত শীঘ্র পতন হয় ততই মঙ্গল।

বাড়ীওয়ালা তাহার ভাড়া পাইবে ইহা যেমন ন্যায়তঃ যথাযথ, তেমনি ভাড়াটিয়া যদি ন্যায্য ভাড়া দেয় তবে তাহার উচ্ছেদ বা ক্ষতিসাধন বাড়ীওয়ালার ক্ষমতার বাহিরে থাকা উচিত। আইন করিয়া বাড়ীওয়ালার স্বার্থ পুরা ষোল আনা বজায় রাখিয়া সারা বাংলা দেশের অসহায় ভাড়াটিয়াদিগকে অর্থপিশাচ বাড়ীওয়ালার সেলামী ও উচ্ছেদের জন্য বাড়ীর বে-মেরামত ও নানা প্রকার ছল-চাতুরীর শিকার হইতে দেওয়া অতি জঘন্য ও নীচ শাসনতন্ত্রের পরিচায়ক।

আইন সরল হওয়া উচিত। আদালতে যদি নালিশের সঙ্গে সঙ্গে ভাড়াটিয়া ন্যায্য ভাড়া জমা দেয় তবে বাড়ীওয়ালার অন্য কোনও ছলচাতুরী চলিতে দেওয়া অন্যায় ও অসঙ্গত।

আজকাল ভাড়াটিয়াকে বিব্রত করিয়া, অন্যায় দাবি করিয়া ছলে-বলে-কৌশলে উৎখাত করিয়া, নূতন ভাড়াটিয়ার নিকট হইতে "কালো" টাকায় সেলামী ও চড়া ভাড়া আদায় করা—শতকরা ৯৯জন বাড়ীওয়ালাই করিতেছে। এই ব্যাপারে সরকারী অবহেলা যথেষ্ট আছে, উপরন্তু যদি ঐরূপ শ্বাপদদের দরদীরূপে নূতন আইন করা হয় তবে বলিব কংগ্রেসের অধঃপতন চরমে পৌঁছিয়াছে। বাড়ীওয়ালা তাহার ন্যায্য ভাড়া পাইবে ইহা যেমন ন্যায়তঃ ঠিক, ভাড়াটিয়া ভাড়া দিলে যথাযথভাবে বাড়ীতে আশ্রয় পাইবে ইহাও সমান সত্য। অর্থলোলুপ বাড়ীওয়ালার চক্রান্তে তাহার উচ্ছেদ অসম্ভব হওয়া উচিত এবং বাড়ীওয়ালা যদি অন্যায় দাবি করে তবে তাহাকেই আদালতে গিয়া তাহার দাবি সমীচীন ইহা প্রমাণ করিতে বাধ্য করা উচিত। অন্যায় টাকা দাবি বা অন্যপ্রকারে ভাড়াটিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করা, ভাড়া বন্ধ করার কারণ থাকিবে।

সকল সভ্য দেশে বাড়ীওয়ালা বাড়ী মেরামত করিয়া বাসের উপযুক্ত রাখিতে বাধ্য হয়। একমাত্র কলিকাতায় উহার ব্যতিক্রম। সকল সভ্য দেশেই কোর্টে পুরা টাকা জমা দিলেই উচ্ছেদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়—অবশ্য কোথাও কোথাও ভাড়াটিয়া অযথা ভাড়া আটকাইয়াছে প্রমাণ হইলে কিছু সুদও বাড়ীওয়ালা পায়—এক শুধু কলিকাতায় উহা নাই।

আমরা যতদূর জানি এই নূতন রেণ্ট কণ্ট্রোল এক্ট-এর ড্রাফ্‌ট যে সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীব করিয়াছিলেন তিনি ঐ সব বিষয়ে কিছু ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যদি সরকারী মহল তাহার রদবদল করিয়া ভাড়াটিয়াদিগকে আরও অসহায় করিয়া থাকেন তবে ঐরূপ আইন অতীব গর্হিত এবং উহা পাস হইতে দেওয়া জনসাধারণের বিপদের কারণ হইবে।

কলিকাতায় গৃহসমস্যা

কলিকাতার গৃহসমস্যা সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে একবার 'প্রবাসী'তে আমাদের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলাম। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ আইন পরিষদে এই ব্যাপারটি উঠিয়াছিল এবং ইহা তুলিয়াছিলেন বিপক্ষ-দল, কারণ জনসাধারণের প্রতিনিধি কংগ্রেস সরকার এই সামান্য ব্যাপারে মাথা ঘামানোর সময় পান নাই। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইংলণ্ডে মধ্য-বিত্তের গৃহসমস্যা প্রায় সমাধান করা হইয়াছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাড়ীঘর যদিও যুদ্ধবিধ্বস্ত হয় নাই, তথাপি কংগ্রেস সরকারের এ বিষয়ে উদাসীনতা ও গাফিলতির জন্য সমস্যা দিন দিন জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। ব্যবসায়ে মুনাফাখোরবৃত্তি হয়ত বর্ত্তমানে ক্ষীয়মাণ কিন্তু বাড়ীওয়ালাদের মুনাফাখোর-প্রবৃত্তি দিন দিন ক্রমবর্দ্ধিত হারে

বৃদ্ধি পাইতেছে, গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাড়ীভাড়া সাত-আট গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মধ্যবিত্ত সংসারের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ বাড়ীভাড়ায় যায় অন্ততঃ শহরের দক্ষিণাঞ্চলে।

আইন পরিষদের বিপক্ষদল যথার্থই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, যে সকল বাড়ীওয়ালার একের অধিক বাড়ী আছে সেগুলি সরকার কর্তৃক রেক্যুইজিশন করিয়া যথোপযুক্ত হারে মধ্যবিত্তদের ভাড়া দেওয়া উচিত। ইহাতে কংগ্রেস সরকার আপত্তি করিয়াছেন। মেদিনীপুরের (কাঁথি) একজন কংগ্রেস সদস্য বলিয়াছেন যে, এই প্রস্তাব কার্যকরী করিতে গেলে সরকারকে বাড়ীওয়ালাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে—কোন্ আইনে সে কথা অবশ্য তিনি বলেন নাই। রাজনীতিবিশারদরা বলেন যে, গণতন্ত্রের প্রধান দোষ জনসাধারণের অজ্ঞতা, এই কংগ্রেসী সদস্যের অজ্ঞতা এত প্রকট (কিংবা উৎকট) যে আমরা এই প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিয়া পারিলাম না। এই সদস্যের জানা উচিত ছিল যে, রাষ্ট্র যেখানে বাড়ী রেক্যুইজিশন করিয়া লয় কিংবা লইয়াছে সে সকল ক্ষেত্রে কোনও ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। সরকার নিজের প্রয়োজনে বহু বাড়ী রেক্যুইজিশন করিয়া লইয়াছেন এবং তাহার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হয় নাই। আর ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনের দ্বারা রাষ্ট্রকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি পরিচালনার জন্য রাষ্ট্র তাহা লইতে পারিবে এবং তাহার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। তবে এই কংগ্রেস সদস্যের অজ্ঞতা ভবিষ্যতে তাঁহার কাজে লাগিতে পারে—যদি বাড়ীওয়ালাদের জন্য পৃথক কোন নির্ব্বাচন-কেন্দ্র সৃষ্টি হয় সেখান হইতে তিনি নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

আইন হওয়া প্রয়োজন যে, গত দশ বৎসরের মধ্যে যাঁহারা বাড়ী করিয়াছেন কিংবা ক্রয় করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে যাঁহারা বাড়ী করিবেন তাঁহাদের আয়ের উৎস কি তাহা দেখাইতে হইবে। ইহাতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রমাণিত হইবে যে আয়ের উৎস সৎ ছিল না এবং ইহার জন্য তাহাদের দেয় কর অবশ্য দিতে হইবে। আর বাড়ীভাড়ার উপর আয়করের মত ক্রমবর্দ্ধিত হারে কর বসাইলে বাড়ীভাড়া আপনা-আপনি কমিয়া যাইবে—এই কর বাড়ীর জন্য যে মিউনিসিপ্যাল কর দেওয়া হয় তাহার অতিরিক্ত হিসাবে বসানো হইবে।

বিক্রয়-কর

সরকারী হিসাব হইতে দেখা যায় যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সুরু হইতেই প্রাদেশিক সরকারসমূহের বিক্রয়-কর খাতে বর্দ্ধিত হারে আয় হইতেছে। ১৯৫১-৫২ সনে, 'ক' শ্রেণীর প্রদেশগুলির বিক্রয়-কর হইতে আয় হইয়াছিল ৪৭·৯৪ কোটি টাকা, ১৯৫২-৫৩ সনে ইহার পরিমাণ ছিল ৪৩·১০ কোটি টাকা; ১৯৫৩-৫৪ সনে ছিল ৪৯·০২ কোটি টাকা এবং ১৯৫৪-৫৫ সনে ছিল ৫০·৪০ কোটি টাকা। ১৯৫৫-৫৬ সনের অনুমান হিসাবে ৫০·২২ কোটি টাকা আয় হওয়ার কথা।

'খ' শ্রেণীর প্রদেশগুলিতেও বিক্রয়-কর রাজস্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫১-৫২ সনে ৬·৪৬ কোটি টাকার বিক্রয়-কর-রাজস্ব হইতে ১৯৫৪-৫৫ সনে ৮·৯৮ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সনে ইহার পরিমাণ হইবে ১১·১৩ কোটি টাকা। প্রদেশ-হিসাবে বোম্বাইয়ের বিক্রয়-কর-রাজস্ব সবচেয়ে বেশী, গত ১৯৫৪-৫৫ সনে ইহার পরিমাণ ছিল ১৬·৬১ কোটি টাকা। ইহার পরে আসে মাদ্রাজ, বিক্রয়-কর হইতে ১৯৫৪-৫৫ সনে ৯·৫০ কোটি টাকার রাজস্ব ইহার আদায় হইয়াছিল। ঐ বৎসর উত্তর প্রদেশের বিক্রয়-কর-রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৫·২৫ কোটি টাকা, পশ্চিম বাংলার ৪·৬০ কোটি টাকা, অন্ধ্রের ৩·১৫ কোটি টাকা, বিহারের ২·৭২ কোটি টাকা, পঞ্জাবের ২·১৪ কোটি টাকা; উড়িষ্যার ১·৩০ কোটি টাকা; মধ্যপ্রদেশের ১·৯৫ কোটি টাকা এবং আসামের মাত্র ৭২ লক্ষ টাকা। 'খ' শ্রেণী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে হায়দরাবাদের বিক্রয়-কর হইতে আয় হইয়াছে ২ কোটি টাকা, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে ২ কোটি টাকা, মহীশূরে ১·৫৭ কোটি টাকা, মধ্যভারতে ১·৪০ কোটি টাকা এবং অন্যান্য 'গ' শ্রেণী প্রদেশে ১ কোটি টাকা। 'গ' শ্রেণী প্রদেশগুলিতে বিক্রয়-কর হইতে মোট আয় হইয়াছে ১·৩২ কোটি টাকা—ইহার মধ্যে দিল্লী প্রদেশের আয় ১·১২ কোটি টাকা।

পূর্ব্বে আন্তঃপ্রাদেশিক বেচাকেনা প্রদেশের বিক্রয়-করের আওতায় পড়িত; কিন্তু সম্প্রতি সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তের ফলে আন্তঃপ্রাদেশিক ব্যবসায়ের উপর বিক্রয়-কর আরোপিত করা যাইবে না। কর অনুসন্ধান কমিশন এই ব্যাপারে ভারতীয় সংবিধান সংশোধনের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন এবং তাহাতে প্রত্যেক প্রদেশ তাহার নিকট হইতে অন্য প্রদেশে যে সকল মাল রপ্তানী করা হয় তাহার উপর বিক্রয়-কর ধার্য্য করিতে পারিবেন। এই সুপারিশ এখন কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে। ভারতের বিক্রয়-করের যে সকল গোলযোগ আছে তাহার আশু সমাধান প্রয়োজন।

তবে প্রদেশগুলির মধ্যে বর্তমানে বিক্রয়-করের অসদ্ব্যবহারের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চিনির উপর সম্প্রতি বিক্রয়-কর ধার্য্য তাহার একটি বড় নিদর্শন। তাঁহারা কেরোসিন তেলের উপরও বিক্রয়-কর ধার্য্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু বিপক্ষ দলের বিরোধিতার ফলে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু চিনির উপর বিক্রয়-কর ধার্য্য করিয়া তাঁহাদের আনুপাতিক জ্ঞানের অভাবের পরিচয় দিয়াছেন। কেন্দ্রীয় আইনে আছে যাহাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের উপর (প্রধানতঃ খাদ্য-সামগ্রী) যেন কোনপ্রকার কর ধার্য্য করা না হয়। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়, সোনার গহনার উপর বিক্রয়-কর ধার্য্য না করিয়া কর ধার্য্য করা হইল চিনির উপর। ইহা অনুমিত হয় যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মতে চিনি অপেক্ষা গহনার নিত্যপ্রয়োজনীয়তা অধিক, সেইজন্য শেষোক্ত জিনিষটিকে বিক্রয়-করের আওতা হইতে রেহাই দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলিতে পারেন যে, চিনির উপর কর দিতে অসমর্থ হইলে গুড় খাও, চিনির বিলাসিতার কি প্রয়োজন। অর্থনীতির মতে গহনা বিলাস-সামগ্রী, আর চিনি অবশ্য নিত্যপ্রয়োজনীয়—কিন্তু অর্থনীতির নীতি আজকাল বোধ হয় অচল

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি তাঁহাদের রাজস্ব-আয় বৃদ্ধি করিতে চান তাহা হইলে তাহার বহুপ্রকার উপায় আছে। ভারতীয় সংবিধান এই ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারকে অনেক ক্ষমতা দিয়াছে। কৃষিজমির উপর সম্পদা শুল্ক এবং উত্তরাধিকার কর বসাইতে পারেন। ইহা ব্যতীত জমি ও বাড়ীর উপর ক্রমবর্দ্ধিত হারে কর ধার্য্য দ্বারা রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে পারেন। কলিকাতার বহু ধনিকেরই একাধিক বাড়ী আছে, অনেকের হয়ত এক শতের অধিকও আছে, তাঁহারা কর্পোরেশনকে ট্যাক্স দিয়াই খালাস। বাড়ীভাড়া বর্ত্তমানে প্রায় সাত-আট গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেই কারণে জমি ও বাড়ীর উপর কর ধার্য্য করা অতি অবশ্য উচিত ছিল। কিন্তু আমাদের কল্যাণকামী তথা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র! সেই কারণে মুষ্টিমেয় ধনীকে বিব্রত না করিয়া আপামর জনসাধারণকে বিব্রত করা পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমীচীন বোধ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ আইনসভায় চিনির উপর বিক্রয়-কর ধার্য্য করার ব্যাপারে বিপক্ষদলের কোন কোন সভ্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, চিনির উপর কর ধার্য্য করিয়া যে আয় হইবে তাহা বিক্রয়-কর বিভাগের দুর্নীতি বন্ধ করিলেও পাওয়া যাইবে, অর্থাৎ কর ধার্য্য না করিয়া দুর্নীতি বন্ধ করা উচিত। ইহাতে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী দার্শনিকসুলভ দৃষ্টিভঙ্গীতে দুর্নীতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন দুর্নীতি পৃথিবীর কোথায় নাই, সর্ব্বত্রই আছে, সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের বিক্রয়-কর বিভাগে যদি দুর্নীতি থাকে ত থাকুক না—ইহা এমন কিছু অদ্ভুত কিংবা অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার নহে। অর্থাৎ আমরা এইটুকু বুঝিলাম যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র যাহা আছে, তাহা বিক্রয়-কর বিভাগেও থাকিতে পারে এবং ইহার দ্বারা কয়েকজন যদি অতিরিক্ত ভাবে কিছু করিয়া খায় তাহাতে আপত্তি করিবার মত কিছু নাই। সুতরাং চিনির উপর নির্ব্বিবাদে বিক্রয়-কর দিয়া যাও।

ম্যানেজিং এজেন্সী

বাংলায় প্রবাদ আছে যে, যত গর্জ্জে তত বর্ষে না। সম্প্রতি লোকসভায় যে কোম্পানী বিলটি পাস করা হইয়াছে তাহার ম্যানেজিং এজেন্সী ধারাগুলি সম্বন্ধে এই প্রবাদ-বাক্যটি সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য। তবে যাঁহারা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে জানেন তাঁহারা একথা অবশ্যই জানিতেন যে ম্যানেজিং এজেন্সী সম্বন্ধে যে সকল হুমকী প্রথম প্রথম দেখানো হইয়াছিল তাহার অনেকখানিই লোক-দেখানো এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহা টিকিবে না। ভারতে ম্যানেজিং এজেন্সী যে দুর্নীতিতে ভরা তাহা সর্ব্বজনবিদিত; ভারতে শিল্পোন্নতির প্রথম যুগে হয়ত ইহাদের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত, বিশেষতঃ শিল্পোন্নতির প্রধান দায়িত্ব যখন আজ রাষ্ট্রের। ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা ভারতীয় শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

লোকসভায় এই প্রথার বিরোধিতার বিরুদ্ধে অর্থমন্ত্রী চতুরতার সহিত সাফাই গাহিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, সংশোধিত অবস্থায় বর্ত্তমান পরিবেশে ম্যানেজিং এজেন্সী অতীব কার্য্যকরী এবং প্রয়োজনীয়। তাঁহার মতে নূতন কোম্পানী আইন এমনভাবে সংঘবদ্ধ হইয়াছে যাহাতে বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ কার্য্যকারিতা বজায় থাকে। ইদানীং শিল্প প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন ব্যাপারে ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থা প্রধান অংশ গ্রহণ করিতেছে, তাই তিনি সুপারিশ করেন যে সরকারী সর্ত্তে এই প্রথাকে বজায় রাখা দেশের পক্ষে উপকারী। এই প্রসঙ্গে ম্যানেজিং এজেন্সীর উপযোগিতার ফিরিস্তি তিনি দেন। ১৯৪৩-৪৪ সনে ভারতবর্ষে ১৩,৬৮৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল, আর ১৯৫৪-৫৫ সনে ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ২৭,৭৭৯টিতে, অর্থাৎ ১১।১২ বৎসরে কোম্পানীগুলির সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়া গিয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ সনের মোট প্রদত্ত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩৫৪ কোটি টাকা; আর ১৯৫৪-৫৫ সনে ইহার পরিমাণ গিয়া দাঁড়ায় ৯৮৩ কোটি টাকায়। যৌথ কোম্পানীগুলির মূলধন সরবরাহের ব্যাপারে দেখা যায় যে, মোট প্রদত্ত মূলধন ২০[illegible] কোটি টাকার মধ্যে, ম্যানেজিং এজেন্টগণ দিয়াছে ২৯·৩ কোটি টাকা কিংবা শতকরা ১৩·৬ ভাগ। ঋণের ব্যাপারে দেখা যায় যে, কোম্পানীর মোট ঋণপ্রাপ্তির মধ্যে ২৪ শতাংশ আসিয়াছে ম্যানেজিং এজেন্টগণের নিকট হইতে। অর্থমন্ত্রী ভারতীয় সংবিধান সভায় যেন ভারতীয় অর্থনীতির পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ বলিয়া দিয়াছেন। ১৯৪৩-৪৪ সন হইতে ১৯৫৪-৫৫ সন পর্য্যন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চোরাকারবারী মুনাফার প্রাচুর্য্য ছিল, এই মুনাফার অধিকাংশ গুপ্তভাবে গিয়াছে ম্যানেজিং এজেন্টদের পকেটে, আর বাকি এক-মাত্র প্রকাশ্যভাবে শিল্পে নিযুক্ত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে কোম্পানীগুলির অতিরিক্ত আয় কেমন করিয়া নূতন নূতন কার্য্যে নিযুক্ত করা হয় সে সম্বন্ধে বিশদভাবে বিপক্ষ দল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বর্ত্তমান শিল্পটি হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন নূতন শিল্পে টাকা ঢালা আয়করে ফাঁকি দেওয়ার প্রয়াস মাত্র। ভাবা কমিটি (কোম্পানী আইন কমিশন) এই বিষয়টি বিশদভাবে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান তাহাদের গুপ্ত আয় দ্বারা ঔষধের কারখানা ও বনস্পতি ঘিয়ের কারখানা খুলিয়াছে। ইহা নিছক আয়কর ফাঁকি দেওয়ার প্রয়াস এবং সেই কারণে ভাবা কমিটি সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, যদি শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণভাবে নূতন ও বর্ত্তমান শিল্পের সহিত বিচ্ছিন্ন শিল্পের প্রতিষ্ঠা বন্ধ না করে তাহা হইলে আইনের দ্বারা এই কুপ্রথা বন্ধ করা উচিত—সহজ বাংলায় ইহা জুয়াচুরি যাহাতে আয়করকে ফাঁকি দেওয়া যায়। সুতরাং অর্থমন্ত্রী যে সাফাই গাহিয়াছেন, ১১।১২ বৎসরে শিল্পমূলধন তিন গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার পিছনে যে রাষ্ট্রকে ফাঁকি দেওয়ার প্রয়াস আছে সে কথা অর্থমন্ত্রী বলিতে বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন।

নূতন কোম্পানী আইনের বিধি অনুসারে একটি ম্যানেজিং এজেন্সী দশটি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা করিতে পারে। কিন্তু একই কোম্পানী যে অন্ততঃপক্ষে দশটি সম্পূর্ণরূপে পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন শিল্পসংস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং করিতেছে তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্য কোম্পানী আইনে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। অর্থাৎ, আইনতঃ একটি ম্যানেজিং এজেন্সী যদিও দশটির অধিক কোম্পানী পরিচালনা করিতে পারিবে না, কিন্তু প্রত্যেক কোম্পানী ব্যক্তিগত ভাবে বহু প্রকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত থাকায় একই ম্যানেজিং এজেন্সী কার্য্যতঃ পাঁচ শত কি ততোধিক

কোম্পানীকে পরিচালনা করিতে পারিবে। নূতন কোম্পানী আইনে আইনের এই ফাঁকটি কি ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত তাহা ভাবিবার কথা।

ইহার ফলে বর্তমান শিল্পের লাভ দ্বারা নূতন শিল্পের প্রাথমিক ক্ষতিপূরণ করা হইবে। এই প্রথায় নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা রাষ্ট্রের প্রাপ্যকে বঞ্চনা করিয়া। নূতন কোম্পানী আইনের প্রধান উদ্দেশ্য মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে বিত্ত সঞ্চয়ের ঘনীভূতি নিরোধ করা, কিন্তু যে ফাঁক উপরে দেখানো হইল তাহাতে ভারতের শিল্পজগতে দলপ্রাধান্য (oligarchy) আসিতে বাধ্য। কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে সঠিক ভাবে কিছু বলেন নাই। তাঁহারা যদিও এই কুপ্রথা সম্বন্ধে সজাগ এবং ইহা তাঁহাদের বিবেচনাধীন, তথাপি ভারতের শিল্পপ্রসার যাহাতে ব্যাহত হয় এমন কিছু তাঁহারা করিবেন না।

কর অনুসন্ধান কমিটির মতে ভারতে ম্যানেজিং এজেন্টগণ কোম্পানীর মোট লাভের শতকরা ১৪ ভাগ পায়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এবং ব্রিটেনে ডিরেক্টরবর্গ মোট লাভের ১০ শতাংশ পায়। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব অনুসারে ১৯৫০ হইতে ১৯৫২ সন পর্যন্ত এই তিন বৎসরে মোট লাভের প্রায় শতকরা ২১·৭ ভাগ তাহারা পাইয়াছে। ইহাদের মুনাফা ভারতে অতিরিক্ত। নূতন সংশোধিত আইনে মুনাফার পরিমাণ হ্রাস করিয়া ১০ শতাংশে নির্ধারিত হইয়াছে এবং অর্থমন্ত্রী আশ্বাস দিয়াছেন যে, ম্যানেজিং এজেন্টদের মুনাফার পরিমাণ ভবিষ্যতে ৮ শতাংশে হ্রাস করা হইবে এবং তিনি দাবি করেন যে, ইহা নাকি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক নীতিসিদ্ধ।

কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন

নিম্নে উদ্ধৃত সংবাদগুলিতে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাব ও নির্দেশ এবং পণ্ডিত নেহরুর মন্তব্যের চুম্বক দেওয়া হইল :

"৪ঠা সেপ্টেম্বর—শনিবার নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যগণের তিনটি দল দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা রূপায়ণের উপায়, গ্রাম্য শিল্প ও সহযোগিতা এবং কংগ্রেসের সংগঠনগত বিষয়ে যে তিনটি রিপোর্ট দেন, রবিবার নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির এক ঘরোয়া সভায় সেই রিপোর্টগুলি আলোচিত হয়।

পরিকল্পনা সংক্রান্ত কমিটির রিপোর্টে দেশের শিক্ষিত বেকারের ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, দেশে ধনোৎপাদনশীল শিল্প-কারখানা স্থাপনের ও সমাজ-হিতকর ব্যবস্থা-সমূহ গড়িয়া তোলার পরিকল্পনা রচনা ছাড়াও দেশের লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকার যুবককে কাজে লাগাইবার এবং নূতন নূতন বৃত্তিতে তাহাদের শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা রচনা করিতে হইবে।

কমিটি প্রস্তাব করেন যে, দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার মেয়াদ মধ্যেই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আয় ও ধনের বৈষম্য কমাইয়া ফেলার জন্য সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

কমিটি ব্যক্তির সর্ব্বোচ্চ আয়ের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার সুপারিশ করিয়াছেন। সরকারী এবং বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রের চাকুরীতেই বেতনের বিরাট পার্থক্য হ্রাস করিতে বলা হইয়াছে। মজুরীতেও বৈষম্য হ্রাস করিতে হইবে।

জনসাধারণকে অধিকতর করের বোঝা বহনের জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলা হইয়াছে।

গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে দেশের বৈষয়িক কাঠামোর একটি অপরিহার্য্য ও স্থায়ী অঙ্গ হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।

সমস্ত ক্ষেত্রের উন্নয়ন পরিকল্পনা এমনভাবে রচনা ও কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, যাহাতে প্রত্যেক অঞ্চলের জনসাধারণ ব্যক্তিগতভাবে ও স্বেচ্ছামূলক সমবায় মারফত সম্পদ সৃষ্টির কার্য্যে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব বহনের সুযোগ পায়।

সংগঠনবিষয়ক কমিটি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে শক্তি সঞ্চার, কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে পরিবর্ত্তন সাধনের আবশ্যকতা, সরকার কর্তৃক আরব্ধ বিবিধ উন্নয়নমূলক কার্য্যে কংগ্রেসের কর্তব্য, কংগ্রেসে দলাদলি এবং কংগ্রেসের পার্লামেন্টারী কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর—অদ্য সন্ধ্যায় কনষ্টিটিউশন ক্লাবে নিঃ-ভাঃ কংগ্রেস কমিটির তিন ঘণ্টাব্যাপী বিশেষ অধিবেশনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত গোয়া প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতভাবে অনুমোদিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন এবং বোম্বাইয়ের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই উহা সমর্থন করেন।

অদ্য নিঃ-ভাঃ কংগ্রেস কমিটিতে গোয়া সম্পর্কিত প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, গোয়ায় ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটানোই গোয়া সম্পর্কে ভারতের নীতির মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে গোয়া ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইবে কি না, গোয়াবাসীরাই তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

গোয়া সম্পর্কিত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতীয় নাগরিকদের ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহও পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

আজ সকালে ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত উপরোক্ত প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য নিঃ-ভাঃ কংগ্রেস কমিটির নিকট পেশ করা হয়। প্রস্তাবে আরও বলা হইয়াছে যে, ভারত সরকার পর্তুগীজ সরকারের সহিত সহযোগিতার সম্পর্ক ছিন্ন করার পর ভারত ও ভারতস্থ পর্তুগীজ উপনিবেশসমূহের সীমান্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, এমতাবস্থায় ভারতীয় নাগরিকদের গোয়া এলাকায় প্রবেশ ঠিক হইবে না।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় পল্লী-শিল্পের ভূমিকা ও সাংগঠনিক সমস্যাবলী সম্পর্কিত এ পত্রয়ের রিপোর্ট বিবেচনার পর নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির দুই দিনব্যাপী অধিবেশন আজ সমাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীনেহরু বলেন যে, নিঃ-ভাঃ কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক যে

প্রস্তাবটি গৃহীত হইল, বর্ত্তমান অবস্থায় তাহাতে একমাত্র নির্ভুল পন্থার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্যা জটিল ও কষ্টসাধ্য। শ্রীনেহরু বলেন, দেশের অভ্যন্তরে সত্যাগ্রহ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আমাদের আছে, কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহের কোন অভিজ্ঞতা আমাদের নাই।

গোয়া সম্পর্কে কংগ্রেসের অভিমত সম্বন্ধে কোনরূপ দ্ব্যর্থপূর্ণ ভাষা বা অস্পষ্টতা আমরা রাখি নাই। এই প্রশ্ন সম্পর্কে বর্ত্তমানে দেশে যেরূপ উত্তেজনা বিদ্যমান, তাহার বিবেচনায় এই প্রস্তাব গ্রহণ কংগ্রেসের পক্ষে সাহসিকতার কার্য্য। সাহসের সহিত নির্ভুল উক্তি করা এবং জনগণকে অবস্থা বুঝাইয়া বলিয়া তাহাদের উপর আস্থা স্থাপন করা সর্ব্বথা উত্তম। গোয়া সম্পর্কে পুলিশী বা সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না এবং গণসত্যাগ্রহও সঙ্গত নহে—ইহা কংগ্রেস এ পর্য্যন্ত স্পষ্টভাবে বলিয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বে অবশ্য ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের পথ উন্মুক্ত রাখা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে আরও স্পষ্টভাবে ও সন্দেহাতীতরূপে অবস্থা বুঝাইয়া বলা হইল।

শ্রীনেহরু বলেন যে, অন্যান্য দল অসঙ্গতরূপে কংগ্রেসের সমালোচনা করিতেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ সম্পর্কে অন্যান্য দলের নিন্দা করা সমীচীন নহে। যে সমস্ত ব্যক্তি সাহসিকতার সহিত দুঃখদুর্ভোগ সহ্য করিয়াছেন এবং ত্যাগস্বীকারের মনোভাব দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা ও তাঁহাদের প্রশংসা করা যে উচিত, তৎসম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। তিনি বলেন, আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্র সম্পর্কিত তাঁহাদের মূল নীতি হইতে ভ্রষ্ট হওয়া সঙ্গত নহে। ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে হইবে যে, ভৌগোলিক দিক দিয়া গোয়া ভারতের অংশ হইলেও ইহা ভারতীয় ইউনিয়নের অংশ নহে এবং তাঁহাদিগকে বৈদেশিক শক্তির সহিত বুঝাপড়া করিতে হইবে। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁহাদের জাতীয় নীতি থাকা উচিত, ইহা সত্য। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে জাতীয় নীতির অর্থ মিশ্রনীতি বা বিভ্রান্তিমূলক নীতি হওয়া উচিত নহে।"

গোয়া জাতীয় কংগ্রেস ও সত্যাগ্রহ

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি গোয়ায় সত্যাগ্রহ করার বিরুদ্ধে যে অভিমত দিয়াছেন নিম্নোদ্ধৃত সংবাদে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়:

"বেলগাঁও, ৬ই সেপ্টেম্বর—গোয়া জাতীয় কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ পরিষদের চেয়ারম্যান মিঃ পিটার আলভারেজ অদ্য ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের নিকট প্রেরিত এক তারে বলিয়াছেন, গোয়ার মুক্তি আন্দোলনের জন্য ভারতীয়দের সত্যাগ্রহ বন্ধ হয় এমন কোন ব্যবস্থা ভারত সরকারের অবলম্বন করা উচিত নয়।

পুণা, ৬ই সেপ্টেম্বর—গোয়া সম্পর্কে গৃহীত নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবের ভিত্তিতে গোয়া মুক্তি আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বর্ত্তমান সপ্তাহে সর্ব্বদলীয় গোয়া মুক্তি কমিটির এক জরুরী বৈঠক আহ্বান করা হইয়াছে।

প্রস্তাব সম্পর্কে কোন সরকারী অভিমত জানা না গেলেও কমিটির সহিত ঘনিষ্ঠ মহল হইতে বলা হইয়াছে ভারত হইতে সাম্রাজ্যবাদের শেষ চিহ্নটুকু নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্য্যন্ত কমিটি সত্যাগ্রহ চালাইয়া যাইবে।

যাঁহারা কমিটি গঠন করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের নিকট এবং আন্দোলনে 'প্রেরণা' লাভের জন্য যাহারা প্রধান রাজনৈতিক দলের দিকে তাকাইয়া ছিল, সেই জনসাধারণের নিকট কংগ্রেসের প্রস্তাব বিস্ময় ও বিহ্বলতা সৃষ্টি করিয়াছে।"

নেহরু ও সমাজবাদ

ডিব্রুগড়ের অধিবাসীদিগের নগর-রক্ষা প্রচেষ্টার প্রশংসা করিয়া শ্রীনেহরু যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম্ম আনন্দবাজার পত্রিকা এরূপ দিয়াছেন:

ডিব্রুগড়, ২৯শে আগষ্ট—চৌকীডিঙ্গির ময়দানে নরনারীর এক বিরাট সমাবেশে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন, "আমি শুধু ধন বণ্টন ও দারিদ্র্যের পূর্ণ উচ্ছেদের পক্ষপাতী। ভারতে যে সমাজবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে প্রত্যেক নরনারীর অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করাই উহার লক্ষ্য। ঐ রাষ্ট্রে প্রত্যেকেরই শিক্ষিত ও স্বাস্থ্যবান হইবার এবং সর্ব্ববিষয়ে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সমতুল হইবার অধিকার থাকিবে। স্বাধীন জনগণ হিসাবে প্রত্যেকেরই তুল্য সুযোগসুবিধা থাকিবে—কোন বিষয়ে কোন পার্থক্য থাকিবে না।

শ্রীনেহরু বলেন যে, দেশের প্রত্যেকের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, বিশুদ্ধ পানীয় জল, চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া তিনি ক্ষান্ত হইবেন না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত কোন বড়রকমের কাজ করা সম্ভব নহে। জনগণের নিজের প্রচেষ্টায় অথবা কেবলমাত্র সরকারী প্রচেষ্টায় কোন বিরাট কাজে সাফল্যলাভ হইতে পারে না।

তিনি বলেন, জনসাধারণ এবং সরকার উভয়েরই সহযোগিতার ফলে যে কি বিরাট সাফল্য অর্জ্জন করা যায় তাহার উদাহরণস্বরূপ ডিব্রুগড় শহরকে রক্ষার কাজের উল্লেখ করা যাইতে পারে। শ্রীনেহরু বলেন, এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন ডিব্রুগড় শহর পরিদর্শন করিতে আসেন তখন বন্যার ফলে শহরটিতে ভীষণ ভাঙন ধরিয়াছিল। নবেম্বর মাসে প্রস্তরের বাঁধ নির্ম্মাণের কাজ আরম্ভ হয়। চা বাগানের শ্রমিক এবং ছাত্রগণসহ সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সহযোগিতার ফলে সরকারের পক্ষে দ্রুত কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হইয়াছে। বন্যার ধ্বংসলীলা নিবারণকল্পে অবলম্বিত ব্যবস্থার বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, চীনা সরকার এই ব্যাপারে ভারতের সহিত সহযোগিতা করিতেছেন। চীনা সরকার তিব্বতে ব্রহ্মপুত্র নদের উজানে নদীর জলের হ্রাসবৃদ্ধি সম্পর্কে প্রত্যহ সংবাদ

প্রেরণ করিতেছেন। ব্রহ্মপুত্রের বন্যার ধ্বংসলীলা বন্ধ করার কাজে ভুটানও ভারতের সহিত সহযোগিতা করিতে ইচ্ছুক। শ্রীনেহরু বলেন, ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, বড় রকমের সাফল্য অর্জন করিতে হইলে সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। অতঃপর প্রধানমন্ত্রী ডিব্রুগড়ের অধিবাসীদের বলেন, কর্তৃপক্ষের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ব্রহ্মপুত্রের যে বন্যায় প্রতি বৎসর এই শহরের ক্ষতি হয় সেই বন্যা নিয়ন্ত্রিত হইবে। এ পর্য্যন্ত যে সকল বাঁধ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা বন্যার ফলে নষ্ট হয় নাই। আরও ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে।

তিনি বলেন, আসাম সরকারই প্রথমে শহরের রক্ষা-ব্যবস্থার কাজ আরম্ভ করেন বটে, তবে কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকটি দপ্তর এই ব্যাপারে আসাম সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতেছেন। প্রসঙ্গক্রমে ডি-বি রেলদপ্তরের কাজের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, রেলদপ্তর বাঁধ নির্ম্মাণের জন্য প্রত্যহ প্রস্তর আনিয়া দিতেছে। প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কিত দপ্তর এবং ভারতীয় বিমানবহরও এই কাজে সহযোগিতা করিতেছে।

নর্থ-ঈষ্ট রেলওয়ে

রেলের পুনর্বিন্যাসের ফলে কলিকাতাস্থ রেল কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার বিচার-আলোচনা লোকসভায় নিম্নলিখিতরূপে হয়:

"৩১শে আগষ্ট—"বুধবার লোকসভায় রেলমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী বলেন যে, সরকার 'খোলা মন' লইয়া রেলওয়ে পুনর্বিন্যাসের প্রশ্ন বিবেচনা করিতে ইচ্ছুক। যদি বুঝা যায় যে, এ বিষয়ে আরও বিচার-বিবেচনা এবং আরও অঞ্চল গঠনের প্রয়োজন আছে তাহা হইলে সাবেক ব্যবস্থা আঁকড়াইয়া থাকা হইবে না। যদি বর্ত্তমান কোন রেলওয়ের কার্য্যভার বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট রেলওয়ের এলাকা সঙ্কুচিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইতে পারে এবং উহাকে দুই বা ততোধিক অঞ্চলে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

রেলওয়ে পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত আধ ঘণ্টা স্থায়ী আলোচনার উত্তরদানকালে তিনি বলেন যে, বর্ত্তমান সময়ে বিশেষজ্ঞ দ্বারা সমগ্র বিষয়ের পরীক্ষার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। আর বিষয়টিকে চাঙ্গা করিয়া রাখাও অনুচিত; কারণ ইহার ফলে কর্ম্মচারীদের মনে ভীতি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হইবে।

তিনি মনে করেন যে, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তগ্রহণের ভার রেলওয়ে বোর্ডের হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। বোর্ডের এ সম্পর্কে বাঁধাধরা কোন নীতি নাই। রেলওয়ে বোর্ডই প্রাক্তন ঈষ্টার্ণ রেলওয়েকে দুইটি অঞ্চলে ভাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন; আর এ বিষয়ে চূড়ান্ত ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়াও তাঁহারা মনে করেন না।

অধ্যাপক হীরেন মুখার্জ্জি (কম্যুনিষ্ট) এ বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি বলেন যে, রেল পুনর্বিন্যাসের সমগ্র বিষয়টি বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক পরীক্ষিত হওয়া উচিত।

কলিকাতা হইতে গোরক্ষপুরে নর্থ-ঈষ্ট রেলওয়ের আপিস স্থানান্তর ব্যাপারে কর্ম্মচারীদের আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করিয়া তিনি বলেন যে, কাহাকেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্থানান্তর করা অনুচিত; আর যদি কাহাকেও তাঁহার মত লইয়া স্থানান্তর করিতে হয় তাহা হইলে গোরক্ষপুরে তাহার বাসস্থানের ব্যবস্থা করা উচিত।

শ্রীশাস্ত্রী তদুত্তরে বলেন যে, নর্থ-ঈষ্টার্ণ রেলওয়ের কলিকাতায় কয়েকটি আপিস থাকিবে। নর্থ-ঈষ্টার্ণ রেলওয়ের কলিকাতাস্থিত 'ক্লেমস'-আপিস স্থানান্তরের ফলে যেসব কর্ম্মচারী উদ্বৃত্ত হইবেন এবং যাঁহারা গোরক্ষপুর যাইতে চাহিবেন না, তাঁহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত আপিসসমূহেই কাজ দেওয়া হইবে। এতদনুযায়ী গোরক্ষপুরে কাহাকেও যাইতে বাধ্য করা হইবে না এবং প্রবীণত্বের (সিনিয়রিটি) প্রশ্নও বিশেষ কোন অসুবিধা ঘটাইবে না। শুধু রেলওয়ের দুই শত প্রাক্তন কর্ম্মচারীকে রেলওয়েতে চাকুরি দেওয়া যাইবে না। কিন্তু তাঁহাদিগকে নবগঠিত দক্ষিণ-পূর্ব্ব রেলওয়েতে কাজ দেওয়া হইবে।

এই সম্পর্কে কলিকাতায় যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহাতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া শ্রীশাস্ত্রী বলেন যে, কর্ম্মচারীদিগকে তুষ্ট করার জন্য তিনি যথাসাধ্য করিয়াছেন। কলিকাতার নর্থ-ঈষ্টার্ণ রেলওয়ে আপিসে অচলাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেখানে একটি কাজও হয় নাই।"

আমরা এই বিষয়ে নর্থ-ঈষ্ট রেলওয়ের কলিকাতাস্থ বাঙালী কর্ম্মচারীদিগের মনোবৃত্তির প্রশংসা করিতে অক্ষম। চাণক্য নিন্দিত "কা কা কাপুরুষা নরাঃ"র ন্যায় যদি কেহ দেশে বসিয়া ক্ষারজল পান করিতে চাহেন তবে তাঁহার পৌরুষ নাই, ভবিষ্যৎ চিন্তা নাই এবং তাঁহার দেহমন ক্লীবত্বে পূর্ণ। গোরক্ষপুরে যাহারা গিয়াছে তাহারা ইহার মধ্যেই অনেক বিষয়ে লাভবান হইয়াছে।

বাঙালী এককালে সুদূর আফ্রিকাতেও রেল চালাইয়াছে। তখন তাহার আর্থিক ও সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সকল দিকেই হইত। আর আজ?

"অধিকার ও দায়িত্ব"

বর্ত্তমানে এদেশে শ্রমিক এবং শ্রমিক নেতাদের কার্য্যক্রম ও মনোবৃত্তির উদাহরণ দিয়া এক সমালোচনা—উপরোক্ত শিরোনামায়, "জনসেবক" সম্পাদকীয় রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা বহুদিন যাবৎ ঐরূপ মন্তব্য করিয়া আসিতেছি। দৈনিকের মধ্যে জনসেবকই এইরূপ সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা উহার প্রধান অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:

"সহজে দল পাকাইয়া নিজের প্রতাপ জাহির করিবার উপায় স্বরূপ একদল ক্ষমতালোলুপ ব্যক্তি রাজনীতিক্ষেত্রে শ্রমিক নেতা সাজিয়া শ্রমিক কল্যাণের অছিলায় ক্রমাগত তাহাদের লোভ জাগায়। ইহারা কোনও দিন শ্রমিকগণকে এই সত্য বুঝাইবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে না যে, দাবি ও কর্ত্তব্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আপন কর্ত্তব্যকর্ম্ম নিষ্ঠার সহিত যে প্রতিপালন করে না, তাহার কোনও দাবি থাকিতে পারে না।...যদি কোনও ব্যক্তি জীবিকা-

উপার্জ্জনের সকল চেষ্টায় বিমুখ হইয়া অলসভাবে দিনযাপন করে, তাহা হইলে সে মানুষের অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য শ্রম করা হইতে চ্যুত হইল, সে ব্যক্তির এই কর্ত্তব্যবিমুখতার দরুন তাহার বাঁচিবার জন্য পুষ্টিকর অন্নের দাবি আর তাহার থাকিতে পারে না, কেননা অলসতা ও কর্ম্মবিমুখতাকে প্রশ্রয় দিলে সমাজ ক্ষয়িষ্ণু হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। যে রাশিয়ার গুণগানে আমাদের দেশের কম্যুনিষ্ট শ্রমিক নেতারা প্রশংসায় পঞ্চমুখ, সেই রাশিয়ার শ্রমিকদিগের শ্রমবিমুখতার জন্য কঠোর দণ্ড দেওয়া হয় এবং দক্ষতার পরিমাণে তাহাদের মজুরির হার নির্দ্ধারিত হয়। সেখানে ষ্টাকোনোভাইট নামে দক্ষ শিল্পিগণ পরিচিতি লাভ করিয়া সাধারণ শ্রমিকগণ হইতে বহু উচ্চ হারে মজুরি পায়। আমাদের দেশে সাম্যবাদের কদর্থ করিয়া বলা হয় যে সকলেই সমান থাকিবে। সকলের সমান পরিমাণ মজুরি তখনই প্রাপ্য হয় যখন দক্ষতায়ও সমতা থাকে। সমতার অর্থই এই যে, বংশগত বা শ্রেণীগত বিভেদ থাকিবে না, সকল বংশের এবং সকল শ্রেণীর লোকেরই সমপরিমাণ দক্ষ শ্রমের পরিবর্ত্তে সমান মজুরি লইবার অধিকার ইহাই সাম্যবাদের মূল কথা।···শিল্পক্ষেত্রে অলসতা, কর্ম্মমন্থরতা, দক্ষতার অভাব প্রভৃতিকে প্রশ্রয় দিলে শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতার বাজারে টিঁকিয়া থাকিতে পারে না এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস হইলে কেবল মালিকগণই ক্ষতিগ্রস্ত হন না, জাতীয় সম্পদ কমিয়া পরিশেষে সমগ্র জাতিরই ক্ষতি হয়।

"দাবি ও কর্ত্তব্যবোধের মধ্যে এই যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাহার কথা শ্রমিকদিগকে না বুঝাইয়া কেবল দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে শ্রমিক নেতাদের কুকীর্ত্তির একটি জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত সম্প্রতি লরিচালক ও লরির মালিকদের ব্যাপার লইয়া শ্রমিক নেতাদের উৎকট খেলায় প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। বিনা লাইসেন্সে অনভিজ্ঞ চালক দিয়া গাড়ী চালানো, লরী সহযোগে বেআইনীভাবে নিষিদ্ধ মাল আমদানী রপ্তানী, গোপন সরবরাহে লিপ্ত থাকিয়া শুল্ক ফাঁকি দেওয়া প্রভৃতি কলিকাতা ও শহরতলীতে লরীর মারফত ব্যাপকভাবে চলে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে লরী লইয়া ডাকাতিও হইয়া গিয়াছে। সেজন্য এই সমস্ত অকাজের প্রতিবিধানের জন্য কলিকাতাভিমুখী বড় বড় রাস্তায় তদারকি মণ্ডল বা চেকপোষ্ট সৃষ্টি করিয়া উহার সম্মুখে লরী থামাইয়া পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা সম্ভব যে এই চেকপোষ্টে যে সমস্ত পুলিস থাকে তাহারা এই ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া উৎকোচ গ্রহণ করে। এই উৎকোচ গ্রহণরূপ অত্যাচারের দোহাই দিয়া লরিচালকগণ রাস্তা অবরোধ করিয়া কলিকাতার আগম-নির্গমের অন্তরায় হয়। উৎকোচ গ্রহণ বন্ধ করিবার অন্য উপায় সম্পর্কে কোনও চিন্তা না করিয়াই শ্রীজ্যোতি বসু প্রমুখ কয়েকজন বামপন্থী শ্রমিকনেতা সরাসরি চেকপোষ্ট তুলিয়া দিবার জন্য আন্দোলন, শ্রমিক শোভাযাত্রা প্রভৃতি আরম্ভ করিয়াছিলেন। চেকপোষ্ট ভিন্ন লরীচালকগণের অনেকে যে সমস্ত অনাচার নিত্য করে তাহা বন্ধ করিবার কোনও বিকল্প ব্যবস্থা যে প্রয়োজন সে বিষয়ে তাঁহাদের যেন কিছুই দায়িত্ব নাই ; ইহারা এমনই দায়িত্ববোধসম্পন্ন ! লরী চালকগণের মালিকগণ কলিকাতার ব্যবসাকেন্দ্রে জুলুমবাজী চালাইয়া এক এক অঞ্চলে এক এক চৌধুরীর একচেটিয়া মাল বহনের অধিকার স্থাপন করিয়া ব্যবসায়ীদের নিকট অত্যধিক উচ্চহারে বহনের ভাড়া আদায় করে, বাহিরের লরী আসিতে প্রায়ই দেয় না এবং যদি-বা ক্ষেত্রবিশেষে আসে তাহা হইলে সেই লরী যে ব্যবসায়ী ব্যবহার করে, তাহার নিকট হইতে চৌধুরীয়ানা নামে এক বেআইনী কর আদায় করে। মাল পাঠাইবার ও মাল বহিয়া লইবার স্বাধীনতার হস্তারক এই চৌধুরী জুলুমের বিরুদ্ধে এ পর্য্যন্ত কোনও শ্রমিক নেতা কিছু বলেন নাই। চৌধুরীগণ শুধু লরী সম্পর্কেই এই গুণ্ডাবাজী চালাইয়া ক্ষান্ত থাকে নাই। ঠেলা গাড়ী ও মুটিয়াদের সম্পর্কেও অনুরূপ ব্যবস্থা কায়েম করিয়াছে। পুলিস এ সম্পর্কে নিষ্ক্রিয় এবং শ্রমিক নেতারাও নীরব। তাই ব্যবসায়িগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে স্থির করে যে চৌধুরীয়ানা দিবে না এবং উহাদের লোকের দ্বারা মালবহন করিতেও বাধ্য থাকিবে না। ইহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া চৌধুরীদল গত সোমবার ঐ অঞ্চলে এক কীর্ত্তি করিয়া বসিয়াছে। এক জন ব্যবসায়ী একটি মুটের মাথায় করিয়া যখন মূল্যবান মালপত্র লইয়া যাইতেছিল, তখন চৌধুরীর দল তাহাদের অস্বীকার করিয়া চলিবার সাহসকে শিক্ষা দিবার জন্য মুটেটিকে আক্রমণ করে এবং বাবুর বাজারে উপর তলায় আটক করিয়া শাসন করিবার জন্য জোর করিয়া টানাটানি করে। এই সময়ে স্থানীয় দোকানদারগণ বাধা দেওয়াতে উহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। কিন্তু পরে গুণ্ডার দল মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ব্যবসায়ীদের আক্রমণ করে ও দোকানপাট লুট করে। ছয় জন দোকানদার গুরুতরভাবে জখম হয়। এই 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতির অবাধ প্রচলন বন্ধ হইতেছে না দেখিয়া দোকানদারগণ হরতাল ঘোষণা করে ও মঙ্গলবার দিন শোভাযাত্রা করিয়া বিধানসভার অভিমুখে যাত্রা করে। এই উপায়ে যে অরাজকতা কলিকাতার ব্যবসায়ী-প্রধান অঞ্চলে বহুদিন হইতে অবাধে চলিতেছে সে সম্পর্কে সরকারের ও জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু শ্রমিক উদ্বাস্তু প্রভৃতিদের কখনও বাস্তব কখনও কল্পিত অভিযোগের অজুহাতে বিধানসভা বসিলেই যে বামপন্থী নেতারা শোভাযাত্রা বিধানসভামুখে পরিচালন করেন ও বামপন্থীদলের সদস্যগণ বাহির হইয়া আসিয়া শোভাযাত্রীদের নিকট বক্তৃতা প্রদান করেন এবং বিধানসভায় ফিরিয়া গিয়া মন্ত্রীদের শোভাযাত্রীদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন, ব্যবসায়ীদের নির্যাতনের প্রতিকারকল্পে তাঁহাদের এই অতি সঙ্গত শোভাযাত্রায় তাঁহাদের কোনই চাঞ্চল্য দেখা গেল না, তাঁহারা নীরব নির্ব্বিকল্প ছিলেন। ইহাদের বল-ভরসার মস্ত একটি অঙ্গ হইল বড়বাজারের এই চৌধুরী দল ; কাজে কাজেই তাহাদের অত্যাচারের প্রতিকার যাঁহারা সঙ্গত ভাবে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষ ইহারা কেমন করিয়া অবলম্বন করিবেন ?"

পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইন

৭ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা (সংশোধনী) বিলটি উপস্থাপিত করেন। পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইনের (১৯৫০) মেয়াদ আরও পাঁচ বৎসর বাড়াইয়া ১৯৬১ পর্যন্ত যাহাতে উহা চালু থাকে প্রধানতঃ সেই উদ্দেশ্যেই সংশোধনী বিলটি আনা হয়। বর্ত্তমান আইনটির মেয়াদকাল আগামী ২৫শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত।

বিলটি উত্থাপন করিয়া মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বলেন, "আমরা এক পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া যাইতেছি। সময় সময় জনসাধারণের দাবি-দাওয়া গণ্ডগোল এবং দাঙ্গাহাঙ্গামায় পরিণত হয়। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং জনসাধারণকে রক্ষার জন্যই এই প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।"

তিনি বলেন যে, সরকার আইনজীবীদের একটি কমিটি নিয়োগ করিয়া তাঁহাদের উপর ভার দেন নিরাপত্তা আইনের ধারাগুলি সংবিধানসম্মত কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখিবার জন্য। তাঁহাদের পরামর্শ অনুযায়ীই বর্ত্তমান বিলে কয়েকটি সংশোধনী ধারা যোগ করা হইয়াছে। অন্যান্য সংশোধনগুলির বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই।

ডাঃ রায় বলেন যে, এমন কতকগুলি অপরাধ আছে সাধারণ আইনে যেগুলির কোন বিধান করা সম্ভব হয় না, যেমন নাশকতামূলক কাজ, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ক্ষতিসাধন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করিবার প্রচেষ্টা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় এসিড বাল্‌ব ছোঁড়া, লুঠ করা, খুন করা প্রভৃতি অপরাধের বিচারও প্রচলিত আইনে করা যায় না। সেজন্যই সরকারকে এইরূপ একটি আইনের সাহায্য লইতে হইয়াছে।

কম্যুনিষ্ট নেতা জ্যোতি বসু বলেন যে, তাঁহারা ঐ বিলটির সর্ব্বরকম বিরোধিতা করিবেন। নিরাপত্তা আইন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গারোধের কার্য্যেও ব্যবহৃত হয় নাই অথবা সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধেও প্রযুক্ত হয় নাই, ঐ আইনটি প্রধানতঃ শ্রমিক কৃষকের এবং মধ্যবিত্ত ও ছাত্র-আন্দোলনের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা হইয়াছে। কোন স্থানকে সংরক্ষিত এলাকা বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য আইনে যে ধারাগুলি রহিয়াছে তাহা প্রধানতঃ শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন কার্য্যকলাপ বন্ধ করিবার জন্যই প্রযুক্ত হইয়াছে। নাশকতামূলক কার্য্য নিবারণের জন্য যে ধারাটি রহিয়াছে তাহা সাধারণতঃ তাঁহারা সমর্থন করিতেন, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, উহা শিক্ষক আন্দোলন দমনের কার্য্যেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

বিতর্কের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে দমন করিবার কোন ইচ্ছাই সরকারের নাই। তবে যদি কোন বিশেষ দলের লোকেরা কোন আন্দোলনের সময় জনসাধারণকে হিংসাত্মক কার্য্যে প্ররোচিত করে—ট্রাম ভাড়া আন্দোলন এবং শিক্ষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে যেরূপ করা হইয়াছিল—সেক্ষেত্রে কোন সরকারই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। সে সকল ক্ষেত্রে এই আইন নিশ্চয় প্রয়োগ করা হইবে। এমন কি বিধানসভার সদস্যগণও যদি হিংসাত্মক কার্য্যকলাপে অংশগ্রহণ করেন তবে তাঁহাদের বিরুদ্ধেও এই আইন প্রয়োগ করা হইবে।

ডাঃ রায় বলেন, কম্যুনিষ্ট নেতা বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে কোন কোন ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ ধর্ম্মঘটীদের বিরুদ্ধে এই আইন প্রযুক্ত হইয়াছে। হইতে পারে হয়ত নূতন এবং উৎসাহী অফিসারেরা এ ভাবে তাঁহাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছেন। তবে তিনি সদস্যদের নিকট আবেদন জানাইতেছেন যেন তাঁহারা এ ধরণের ঘটনার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু ধর্ম্মঘট শান্তিপূর্ণ ভাবে হইতে হইবে এবং ধর্ম্মঘটীরা অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হইতে বিরত থাকিবেন।

১৬ই সেপ্টেম্বর বিলটি ১৪১-৪৯ ভোটে পাস হয়।

শ্রমিকের দাঙ্গা

কলিকাতায় এক শ্রেণীর দলগত স্বার্থান্ধ শ্রমিক নেতার উস্কানিতে আবার মাৎস্যন্যায়ের সৃষ্টির চেষ্টা চলিতেছে। 'জনসেবক' নিম্নোক্ত সংবাদটি দিয়াছেন :

"গতকল্য সকালে খিদিরপুর ডকের একটি চা গুদামে দুই দল শ্রমিকের দাঙ্গা বন্ধ করিতে পুলিস ৪ রাউণ্ড গুলিবর্ষণ করিতে বাধ্য হয়।

পুলিস দাঙ্গা বন্ধ করিতে আসিলে ক্ষিপ্ত শ্রমিকগণ পুলিসের গাড়ীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পুলিসদের আক্রমণ করে। এই অবস্থায় পুলিস গুলিবর্ষণ করে এবং জনতা ছত্রভঙ্গ হয়।

পূর্ব্বে ঐ দুই দল শ্রমিকের দাঙ্গা আয়ত্তে আনিবার জন্য পুলিস কয়েক রাউণ্ড কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ করিলে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, তাহার ফলে ২০ জন পুলিস সহ মোট ৪০ জন আহত হয়। এই সময় পুলিস লাঠি চার্জ্জ করে। পুলিসের গুলিতে কেহই আহত হয় নাই। পুলিস এই সম্পর্কে ৬০ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

হাসপাতালে দুর্নীতি

কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে জনসাধারণ নানাপ্রকার উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর লোকের দুর্নীতির ফলে হাসপাতালের রোগীও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতেছে। নিম্নোক্ত সংবাদটি দেশের নৈতিক অধঃপতনের দৃষ্টান্ত। উহা আনন্দবাজার পত্রিকা দিয়াছেন :

হাসপাতাল হইতে রোগীদের জন্য নির্দিষ্ট ঔষধপত্র অপসারিত করিয়া কারবার করিবার অভিযোগ সম্পর্কে কলিকাতার

এনফোর্সমেণ্ট বিভাগীয় পুলিসের অনুসন্ধানী হস্ত বৃহস্পতিবার বে-সরকারী হাসপাতালের গণ্ডি ছাড়াইয়া শহরের সরকারী একটি হাসপাতালেও প্রসারিত হয়। এইদিন ঐ পুলিস এক অভিযোগের সূত্র ধরিয়া সরকারী নীলরতন সরকার হাসপাতালের কলেরা ওয়ার্ডের এক জন পুরুষ নার্সকে গ্রেপ্তার করে। তৎপর ঐ হাসপাতালে রোগীদের জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে যেসব ঔষধপত্র দেওয়া হয় তাহা ঠিকমত রোগীদের দেওয়া হয় কিনা তাহা নির্ণয়ার্থ পুলিস ঐ হাসপাতালে ঔষধের হিসাবপত্র পরীক্ষা করে ও তল্লাসী করে বলিয়া প্রকাশ।

ইতিমধ্যে উত্তর কলিকাতার আর-জি-কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সম্পর্কে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ যে, উক্ত হাসপাতালের পরিচালন ব্যবস্থায় সংস্কার ও উন্নতিসাধন এবং ঔষধপত্রাদির হিসাবাদি রক্ষার ব্যাপারে শিথিল নিয়মের কড়াকড়ি করিতে গিয়া উক্ত হাসপাতাল ও কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী অজ্ঞাত এক শ্রেণীর দুষ্ট দুর্বৃত্ত দলের নিকট হইতে কিছুদিন পূর্ব্বে একাধিক ভীতিমূলক পত্র পান। ঐ পত্রে দুর্বৃত্তরা ডাঃ রায়চৌধুরী তাঁহার সংস্কারমূলক কার্য্য হইতে নিবৃত্ত না হইলে তাঁহার জীবনহানি হইবে বলিয়াও শাসায়।

পূর্ব্ববঙ্গের মন্ত্রীসভা

পূর্ব্ববঙ্গে এত দিনে সংখ্যালঘিষ্ঠদিগের বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষ কিছু নজর দিয়াছেন মনে হয়। করাচীর নিম্নস্থ সংবাদে অন্ততঃ কিছু আলোক পাওয়া যায়। ইহার ফল কতদূর কি হয় তাহাই দ্রষ্টব্য :

"করাচী, ৫ই সেপ্টেম্বর—পূর্ব্ববঙ্গ বিধান সভার কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীবসন্তকুমার দাস পূর্ব্ব-পাকিস্থান মন্ত্রীসভার সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

আর একজন কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীশরৎ মজুমদার ও তপশীল জাতি ফেডারেশনের সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন সিকদারও মন্ত্রীসভার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গে মোট ১৫ জন মন্ত্রী হইবেন—১২ জন মুসলমান ও ৩ জন অমুসলমান।

পূর্ব্ববর্ত্তী সংবাদে জানা গিয়াছিল যে, পাক গণপরিষদের তপশীলী সভ্য পার্লামেণ্টারী পার্টির নেতা শ্রী এ. কে. দাস পূর্ব্ববঙ্গের মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন।"

কনেষ্টবলের 'গুলীচালনা'র তদন্ত দাবি

"ভারতী"র সংবাদে প্রকাশ যে, সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জঙ্গীপুর মহকুমার দয়ারামপুর গ্রামে জনৈক কনেষ্টবলের গুলীতে নাকি একজন গোয়ালা গুরুতররূপে আহত হয়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উক্ত গ্রামের দুই দল গোয়ালার মধ্যে বিরোধের ফলে তাহাদের মধ্যে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়; কিন্তু পরে তাহারা নিজেরাই মিটমাট করিয়া ফেলে। ঐ সকল ঘটনার পর কয়েকজন উপরোক্ত গোয়ালার বাড়ীতে বসিয়া গল্পগুজব করিতেছিল এমন সময় জনৈক হাবিলদার নাকি উক্ত আহত গোয়ালার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ গ্রামের পুলিস ক্যাম্পে যাইতে বলে। গোয়ালা অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে বাক্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হয় এবং উক্ত হাবিলদার গুলী চালায়, ফলে গোয়ালা আহত হয়। যদিও ঐ ঘটনা উপলক্ষে ঐ অঞ্চলে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে তথাপি সরকার হইতে নাকি ঐ দুর্ঘটনা সম্পর্কে কোন বিবৃতি দেওয়া হয় নাই অথচ প্রকাশিত সংবাদের কোন প্রতিবাদও জানান হয় নাই।

২২শে ভাদ্র এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "ভারতী" এই ঘটনায় স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে যে চাঞ্চল্য ও ত্রাসের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন যে, অবিলম্বেই ঘটনার প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করিয়া সরকার হইতে একটি বিবৃতি প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া জনসাধারণের মনে পুলিসের আচরণ সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্ন জাগিয়াছে, অবিলম্বে তাহার সদুত্তর না পাইলে পুলিস সম্পর্কে জনসাধারণের মনে বিশেষ অস্বস্তির সৃষ্টি হইবে। পত্রিকাটি লিখিতেছেন, "শান্তিরক্ষার নামে পুলিসী তাণ্ডব কেহই সমর্থন করিতে পারেন না। কাজেই একজন সামান্য কনেষ্টবলের এই স্পর্দ্ধিত আচরণের মূল উৎস কোথায় তাহার সন্ধান করা ও প্রয়োজন হইলে তাহার বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক।"

উপসংহারে সম্পাদকীয় প্রবন্ধটিতে আহত গোয়ালাটির দুঃস্থ অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাহাকে কোনরূপ সাহায্য করা সম্ভব কিনা তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবার অনুরোধ জানান হইয়াছে।

আমরা এ বিষয়ে সরকারী বিবৃতির প্রয়োজন দেখি। যদি ঘটনা প্রকৃতপক্ষে যেরূপ ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছে সেইরূপই হয় তবে তদন্ত হওয়া নিশ্চয়ই প্রয়োজন।

শিক্ষার মাধ্যমরূপে ইংরেজী

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক নিযুক্ত ২৩ জন বিশেষজ্ঞ লইয়া গঠিত একটি কমিটি বৃহত্তর বোম্বাই অঞ্চলে অবস্থিত কলেজগুলিতে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে আরও দশ বৎসর পর্য্যন্ত ইংরেজী ভাষার প্রচলনের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। কমিটি বলিয়াছেন যে, ১৯৬৭ সন হইতে দেবনাগরী হরফে হিন্দীভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান আরম্ভ করা যাইতে পারে। কমিটির সভাপতিরূপে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ড. জন মাথাই।

ইহার প্রকৃত কারণ হিন্দী ভাষা এখনও রাষ্ট্রভাষার রূপ গ্রহণ করে নাই। কয়েকজন বিদ্যাভিমানী উহাকে ক্রমেই উৎকটরূপ দান করিতেছেন। পরিভাষা সঙ্কলনে বিশেষ ভ্রমাত্মক কার্য্য

চলিতেছে। জ্ঞান ও বিদ্যাভিমানের প্রভেদ উহাতে স্পষ্টতর প্রমাণিত হইতেছে।

বেতন না পাওয়ায় শিক্ষকগণের অসুবিধা

১৪ই ভাদ্র "আত্রেয়ী"তে প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে, দিনাজপুর জেলার গবর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড ফ্রি প্রাইমারী স্কুলের প্রায় একশত শিক্ষক গত জুলাই মাস হইতে বেতন না পাওয়ায় বিশেষ সঙ্কটজনক অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছেন। বেতনদান সম্পর্কিত সরকারী বিধিব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের ফলেই নাকি ঐরূপ অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে।

শিক্ষা বিভাগে ত ক্রমেই গোলমাল বাড়িতেছে। এরূপ ব্যাপার কি এখনও চলিবে?

বর্দ্ধমান জেলা স্কুলবোর্ড নির্ব্বাচন

গত ১১ ও ১২ই সেপ্টেম্বর বর্দ্ধমান জেলা স্কুলবোর্ডের নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্ব্বাচনে মোট ছয়টি আসনের সব কয়টিতেই কংগ্রেসপ্রার্থী জয়লাভ করেন। নির্ব্বাচনের অব্যবহিত পূর্ব্বে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "দামোদর" পত্রিকা নির্ব্বাচন সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়ের বিশেষ সমালোচনা করেন। নির্ব্বাচনের নিয়ম অনুযায়ী জেলার সকল প্রাথমিক শিক্ষকগণকে নিজব্যয়ে বর্দ্ধমান শহরে আসিয়া একজন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের জন্য ভোট দিবার কথা। এই প্রবল বর্ষার সময় এভাবে ত তাঁহাদিগকে হয়রানি না করিয়া যদি শিক্ষকগণকে নিজ নিজ থানার ভোট দান কেন্দ্রে ভোট প্রয়োগ করিবার সুযোগ দেওয়া হইত (ইউনিয়নবোর্ড সদস্যদিগের ক্ষেত্রে যাহা করা হইয়াছে) তবে তাঁহাদের অনেক পরিশ্রম, সময় ও অর্থ বাঁচিয়া যাইত। তাহা না করিয়া "জেলার সকল স্থানের শিক্ষককে বর্দ্ধমান শহরে আসিয়া ভোট দিতে বলার অর্থ তাঁহাদিগকে ভোটদান হইতে বঞ্চিত করা" বলিয়া পত্রিকাটি মন্তব্য করিয়াছেন। উপরন্তু বর্দ্ধমান জেলার অর্দ্ধাংশ সুবৃহৎ ৮টি থানা ও ৮৬টি ইউনিয়ন বিশিষ্ট সদর মহকুমার জন্য মাত্র দুই জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে। অথচ কাটোয়া এবং কালনার ন্যায় তিনটি থানা-সম্বলিত মহকুমার জন্যও দুই জন করিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে, সেই অনুপাতে সদর মহকুমায় অন্ততঃ ৫টি আসন রাখা উচিত ছিল বলিয়া বলা হইয়াছে।

বাঁকুড়ায় অনাবৃষ্টি

"শ্রীসূর্য্য" 'হিন্দুবাণী' পত্রিকায় লিখিতেছেন যে, পর পর দুই বৎসর অনাবৃষ্টির ফলে শস্যোৎপাদন বিশেষভাবে হ্রাস পাওয়ার পর এ বৎসর অবস্থার উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়াছিল কিন্তু শ্রাবণ মাসের শেষ হইতে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় স্থানে স্থানে চাষীদের মধ্যে বিশেষ হতাশার সৃষ্টি হইয়াছে। অনেক স্থানেই জলাভাবে ধান গাছ শুকাইয়া যাইতেছে।

বাঁকুড়ায় ছোটখাটো সেচের ব্যবস্থা আরও প্রয়োজন। জোড় বা নালায় বাঁধ দিয়া আরও অনেক জলাধার করা প্রয়োজন। তবে দেশের মানুষ যতদিন না জাগ্রত হয় ততদিন এরূপ দুর্দ্দশা চলিবেই।

স্বাধীনতা দিবসে নোটিশ

গত ১৫ই আগষ্ট ত্রিপুরারাজ্যে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের সময় ধর্ম্মনগরে যে সরকারী অনুষ্ঠান হয়—তাহাতে কয়েকটি হাতী উপস্থিত করিবার জন্য সরকার হইতে এগার জন বেসরকারী নাগরিকের উপর যে নির্দ্দেশ দেওয়া হয় তাহার সমালোচনা করিয়া সাপ্তাহিক "সেবক" পত্রিকা ২৫শে ভাদ্র "রাজতন্ত্রের জাগ্রত প্রহরী" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন যে, সরকারী নোটিশটিকে "রাজতন্ত্র শাসন যুগীয় হুকুমনামার একখানি প্রতিলিপি বলা যাইতে পারে। নোটিশ নোটিশই, অনুরোধ ভদ্রতা বা শালীনতার কোন বালাই ছিল না। পনরই আগষ্টের বা যে-কোন সরকারী অনুষ্ঠানে কাহাকেও বলপূর্ব্বক যোগদান করার নির্দ্দেশ দেওয়ার যেমন কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই কোন নাগরিকের অস্থাবর সম্পত্তিও হুকুমে স্বাধীনতা দিবসের মত অনুষ্ঠানে ব্যবহার করার কোন আইন আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। রাজতন্ত্রে প্রজা আর গণতন্ত্রে নাগরিক ইহার প্রকৃত পার্থক্য আমাদের শাসকগণ কবে উপলব্ধি করিবেন?..."

অবশ্য, পত্রিকাটির সংবাদ অনুযায়ী কোন মালিকই হাতী লইয়া যান নাই।

খনি দুর্ঘটনার তদন্তের ফলাফল

গত ১৯৫৪ সনের ১০ই ডিসেম্বর বেলা প্রায় দশটার সময় মধ্যপ্রদেশের নিউটন চিকলী কয়লাখনির ছয় নম্বর খাদে হঠাৎ প্রবলবেগে জল ঢুকিয়া যাওয়ায় ৬৩ জন লোকের প্রাণহানি ঘটে। এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে তদন্তের জন্য বিচারপতি সেনকে লইয়া একটি তদন্তকমিটি গঠিত হয়। গত ২রা সেপ্টেম্বর লোকসভায় শ্রমমন্ত্রী শ্রীখান্দুভাই দেশাই সেন কমিশনের রিপোর্ট পেশ করেন।

সেন কমিশনের রিপোর্টে দুর্ঘটনার জন্য কয়লাখনির ম্যানেজারকেই সম্পূর্ণরূপে দায়ী করা হইয়াছে। কয়লাখনি সম্পর্কিত নিরাপত্তা-ব্যবস্থার ১৪নং ধারা পালিত না হওয়াতেই দুর্ঘটনাটি ঘটিয়াছে। ম্যানেজারের কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলার ফলেই তাহা হইয়াছে।

যাহাতে অনুরূপ দুর্ঘটনা আর না ঘটিতে পারে তজ্জন্য কমিশন ৩৬টি সুপারিশ করিয়াছেন।

শ্রমমন্ত্রীর বিবৃতি অনুযায়ী রিপোর্টটি এখনও সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় অনাস্থা প্রস্তাব

সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় শুক্ল মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে একটি

অনাস্থা প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়। প্রস্তাবটি বিপুল ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য হয়। ১৪ই সেপ্টেম্বর এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে অনাস্থা প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করিয়া মধ্যপ্রদেশের দৈনিক "হিতবাদ" লিখিতেছেন, প্রস্তাবটি স্বাভাবিকভাবেই অগ্রাহ্য হইয়াছে, উহা পাস হইবে সে ধারণা কাহারও, এমনকি বিরোধী দলেরও ছিল না। "কিন্তু মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে বিরোধীদল যে সকল অভিযোগ আনিয়াছেন তাহা ভোটাধিক্যে চাপা দেওয়া যাইবে না। বিরোধী পক্ষের কয়েকজন সদস্য যে সকল অভিযোগ করিয়াছেন সে সম্পর্কে সরকার যদি অবিলম্বে ব্যবস্থা করেন তবেই জনমত তুষ্ট হইতে পারে।"

প্রবন্ধটিতে বলা হইয়াছে যে, রাজ্যে মন্ত্রীসভা ক্ষমতার অধিকারী; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ক্রমশঃই উহার মর্য্যাদা ও জনপ্রিয়তা হ্রাস পাইতেছে। এবারে বিরোধীপক্ষ পদোন্নতি, কণ্ট্রাক্ট এবং চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি প্রভৃতি কয়েকটি প্রশাসনিক বিষয়ের উপর জোর দিয়াছেন। মন্ত্রীসভা কোন অভিযোগই অস্বীকার করিতে পারেন নাই, তাঁহারা উহাকে সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। কয়েকটি অভিযোগের উত্তরে চিরাচরিত প্রথায় বলা হইয়াছে যে, সে সম্পর্কে তদন্ত করা হইতেছে। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, ডুই-খাদানে পুলিসের গুলীতে নিহত ব্যক্তিদিগকে ক্ষতিপূরণ দানের ব্যাপারে সরকারী মনোভাব সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। যেখানে গুলিতে প্রাণহানি ঘটিয়াছে এবং বিচারবিভাগীয় তদন্তে গুলিচালনার নিন্দা করা হইয়াছে সে ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দিবার কোন দায়িত্ব নাই, এই অছিলা দেখানো সরকারের পক্ষে অনুচিত। মানবতার খাতিরেই ক্ষতিপূরণ দেওয়া কর্তব্য। বিরোধীপক্ষের আর একটি অভিযোগ হইল এই যে, নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কয়েকজন অফিসারের চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা কি সত্য নহে যে, সরকার কয়েকজন অফিসারের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন? অপর একটি অভিযোগে সরকারী কণ্ট্রাক্ট বণ্টনের নিন্দা করা হইয়াছে। সরকারী উত্তরে জনসাধারণ সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। বিরোধীপক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, পাঠ্য পুস্তক ছাপাইবার জন্য এমন একটি এজেন্সীকে ভার দেওয়া হয় যাহার সহিত জনৈক আইনসভার সদস্য ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রহিয়াছেন। উক্ত এম-এল-এ নাকি ঐ কোম্পানীর অংশীদার অথচ আইন অনুযায়ী কোন এম-এল-এ সরকারী কণ্ট্রাক্ট গ্রহণ করিতে পারেন না। বিরোধীপক্ষের মিঃ তামাসকর বলিয়াছেন, সরকার জানিয়া শুনিয়াও উক্ত এম-এল-এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই।

"হিতবাদ" লিখিতেছেন, "আমরা অন্যান্য অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা করিব না। প্রধান মন্ত্রী শুক্ল বলিয়াছেন যে, রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হইতেছে। একথা মানিয়া লইলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্বজনপোষণের যে সকল অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার উত্তর মিলে না। এই সকল দুর্নীতির দৃষ্টান্ত লোকসমক্ষে তুলিয়া ধরা বিরোধী দলের কর্ত্তব্য, কিন্তু সেই সঙ্গে সরকার পক্ষেরও কর্ত্তব্য হইতেছে ঐ সকল অভিযোগ সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। পণ্ডিত শুক্ল আমাদের রাজ্যের অনেক উন্নতিবিধান করিয়াছেন; কিন্তু এইরূপ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে লোকচক্ষে মন্ত্রীসভার মর্য্যাদা বহু দূর নামিয়া যাইতেছে। জনসাধারণের আস্থা মন্ত্রীসভার উপর ফিরাইয়া আনাই মুখ্যমন্ত্রীর সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য।"

কংগ্রেসের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ অযোগ্য পোষণ ইত্যাদি সর্ব্বত্রই বাড়িয়া চলিতেছে।

বিভাগীয় বরাদ্দ আলোচনায় স্পীকারের অসম্মতি

১২ই সেপ্টেম্বর বোম্বাই রাজ্যবিধান পরিষদে স্পীকার চার জন মন্ত্রীর বিভাগীয় বরাদ্দ আলোচনার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন, কারণ মন্ত্রীবর্গ বরাদ্দ সম্পর্কিত যথাযথ তথ্য বিধানসভার সম্মুখে উপস্থাপিত করেন নাই। যে চার জন মন্ত্রীকে তাঁহাদের বিভাগীয় বরাদ্দ সম্পর্কে আলোচনা করিতে দেওয়া হয় নাই তাঁহারা হইলেন শ্রী এম. পি. পাটিল (সমবায়), শ্রী এম. এম. নায়েক-নিম্বলকার (পূর্ত), শ্রী বি. এস. হিরে (কৃষি) এবং শ্রীশান্তিলাল শাহ (শ্রম)।

স্পীকার শ্রী ডি. কে. কুন্তে সরকারী দলের নিন্দা করিয়া বলেন, "আমি স্পষ্ট ভাষায় মন্ত্রীদের বলিয়া দিতে চাই যে, এরূপ অসম্পূর্ণ তথ্যসহ অতিরিক্ত বরাদ্দের দাবি উপস্থিত করার অর্থ জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বকারী এই বিধানসভার উপর সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন না করা। মন্ত্রীদের বুঝিবার সময় হইয়াছে যে, আইনসভা এবং শাসনবিভাগের পরস্পর সম্পর্কের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সংবিধান গৃহীত হইবার পর আইনসভার ক্ষমতাই চূড়ান্ত, শাসনবিভাগ কেবলমাত্র আইন-সভার নির্দ্দেশ পালন করিয়া চলিবে।

অতএব ব্যয়-বরাদ্দ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য বিধানসভার নিকট উপস্থিত না করিলে তিনি সে সম্পর্কে আলোচনার অনুমতি দিতে পারেন না।

স্পীকার মহাশয় তাঁহার পদের মর্য্যাদা রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন, ইহা আনন্দের বিষয়।

বিমান কোম্পানী ও সরকার

কলিকাতাস্থিত ভারতীয় চেম্বার অব কমার্স কর্ত্তৃক প্রচারিত এক পুস্তিকায় রাষ্ট্রায়ত্ত যাত্রীবাহী বিমান পরিচালনা ব্যবস্থায় অপব্যয় প্রভৃতির সমালোচনা করিয়া সরকারের জাতীয়করণ নীতির নিন্দা করা হইয়াছিল। তদুত্তরে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস করপোরেশন যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে বিমান কোম্পানীগুলি জাতীয়করণের অব্যবহিত পূর্ব্বে বিমান কোম্পানীগুলির পরিচালকবর্গ সরকারের সহিত যে সকল চাতুরী খেলেন তাহার এক চমকপ্রদ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

মানুষের জীবনযাত্রা ও সংযোগ-ব্যবস্থা অচল করিয়া দিয়াছে বলিয়া অদ্য গভীর রাত্রিতে সর্ব্বশেষ সরকারী বিবরণ হইতে জানা গিয়াছে।

উড়িষ্যার বৃহত্তম নদী মহানদীতে বন্যার জল ১৮৭২ সনের বন্যার সর্ব্বোচ্চ জলমাত্রা ৭৫·৯৫ ফুট অতিক্রম করিয়াছে এবং অদ্য সন্ধ্যায় এই নদীতে বন্যার জল বিপৎসূচক চিহ্নের ৩ ফুট উপরে ৭৬ ফুট পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। সরকারী বিবরণ হইতে জানা যায় যে, উড়িষ্যার অন্যান্য নদীও বন্যাস্ফীত হইয়া উঠিয়াছে।

বৃষ্টিপাতের ফলে বন্যাস্ফীত ব্রাহ্মণী নদীর কূল ছাপাইয়া প্রায় ১৫০ বর্গমাইলব্যাপী অঞ্চল প্লাবিত হইয়াছে এবং তাহার ফলে দশ হাজার লোক নিরাশ্রয় হইয়াছে। কোন জীবনহানির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

আমাদের কটক আপিসের সংবাদে প্রকাশ যে, বন্যার কবল হইতে কটক শহর রক্ষার জন্য সর্ব্বপ্রকার সম্ভাব্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

আমাদের ষ্টাফ রিপোর্টারের সংবাদে প্রকাশ, উড়িষ্যা অঞ্চলে ব্রাহ্মণী নদীর বন্যায় রেলপথ জলমগ্ন হওয়ায় ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হইয়াছে এবং শুক্রবার মাদ্রাজ হইতে ডাউন মাদ্রাজ মেল ছাড়িয়া ২০ ঘণ্টা বিলম্বে সোমবার প্রত্যূষে হাওড়ায় পৌঁছিয়াছে।"

চীনে ভারতীয় গুটীপোকার চাষ

চীন বিজ্ঞান পরিষদের পরীক্ষামূলক প্রাণিবিদ্যাভবনের ডেপুটি ডিরেক্টর অধ্যাপক চু শি চীনে ভারতীয় গুটীপোকা চাষের অগ্রগতি সম্পর্কে লিখিতেছেন যে, ১৯৫২ সনে সাংহাইয়ে উক্ত প্রাণিবিদ্যা মন্দিরে সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় গুটী পোকা চাষের চেষ্টা হয়। গত তিন বৎসরের মধ্যে বিবিধ বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও প্রায় ২০টি পুরুষানুক্রমিক অবস্থা অতিক্রম করা সম্ভব হইয়াছে। সকল পোকাগুলিই বেশ সাফল্যজনক ভাবে কাজ করে এবং অধিকাংশ ডিমই ফুটিয়া কীট বাহির হয়। আনহুয়ে প্রদেশেও এ ব্যাপারে বিশেষ অগ্রগতি দেখা গিয়াছে। সেখানে শতকরা প্রায় ৮০টি পোকাকে দিয়া সূতা বুনান সম্ভব হইয়াছে। সেখানে প্রায় ১১০০ পাউণ্ড গুটী পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, চীনে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে ভারতীয় রেশম কীটের চাষ সম্ভব।

ভারতীয় রেশম কীটের সাধারণ খাদ্য এরণ্ড গাছের পাতা; ঐ গাছ যে-কোন মাটিতে সহজেই জন্মায়। এই গাছের আর একটি সুবিধা এই যে, রোপণের তিন-চার মাস পরই ঐ গাছ হইতে পাতা পাওয়া যায়। চীনের সর্ব্বত্র এই গাছ জন্মান যাইতে পারে, কিন্তু এই গাছ অত্যধিক শীত সহ্য করিতে পারে না।

অধ্যাপক চু শি লিখিতেছেন যে, চীনা গুটীপোকা এবং ভারতীয় গুটীপোকার সংমিশ্রণে সফলতার সহিত কোন অধিকতর উপযুক্ত পোকা সৃষ্টি করা যায় কিনা সেই বিষয়েই চীনা বৈজ্ঞানিকগণ বর্ত্তমানে সচেষ্ট আছেন।

আমাদের দেশে তসর, এণ্ডি ও মুগা লইয়া বিশেষ কোন কাজ হইয়াছে বলিয়া জানা নাই। অকাজ হইয়াছে মুর্শিদাবাদ বহরমপুরের প্রাচীন গরদের গুটী নষ্ট করিয়া ব্রহ্মদেশীয় গুটীর প্রচলনে। গরদের আর সেই পূর্ব্বেকার স্থায়িত্ব বা সৌন্দর্য্য নাই।

পাকিস্থান স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস

পাকিস্থান ইতিহাস বোর্ড ইংরেজীতে হিন্দ-পাকিস্থানের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়া এক সংবাদে প্রকাশ। ২০ জন বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষকের সহযোগিতায় রচিত ঐ ইতিহাসটি কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে বলা হইয়াছে।

ইতিহাস কাহারা লিখিলেন জানি না। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ইতিহাসে বানাবার ক্ষেত্র অবারিত।

কাশ্মীর অভিযানের আহ্বান

পাকিস্থানে সম্প্রতি কাশ্মীর সম্পর্কে নূতন চক্রান্তের যে অপচেষ্টা চলিতেছে পাকিস্থানী সংবাদপত্রগুলি হইতে তাহার আংশিক ধারণা পাওয়া যাইবে। ২৭শে আগষ্ট এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লাহোর হইতে প্রকাশিত "ষ্টার" পত্রিকায় কাশ্মীর অভিযানের জন্য পাকিস্থানের অধিবাসীদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে। সম্পাদকীয় প্রবন্ধটিতে বলা হইয়াছে: "কায়েদে-আজম একবার বলিয়াছিলেন, পাকা ফলের মত কাশ্মীর আমাদের কোলে পড়িবে। অর্থাৎ, কাশ্মীরকে হারাইবার কোন কথা উঠিতে পারে না। কিন্তু তথাপি আমরা উহাকে হারাইতে বসিয়াছি। নিজের অঙ্গ হারাইবার মতই ইহা এক মর্ম্মান্তিক ব্যাপার। এই কয়েক বৎসর আমরা কি কাশ্মীরকে পাইতে না হারাইতে চেষ্টা করিয়াছি? আমরা জানি না পাকিস্থান সরকার কি চিন্তা করেন, তবে পাকিস্থানের জনগণের বিশ্বাস যে, কাশ্মীরের পাকিস্থানভুক্তির সকল সম্ভাবনাই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নেহরুকে ধন্যবাদ, তাহারা মনে করে যে, কাশ্মীরের জনসাধারণকে মুক্ত করিবার আর একটি সুযোগ আসিয়াছে.... মন্ত্রীপদে ইস্তফা দিবার পরই মিঃ সুরাবর্দী কাশ্মীরের পরিপ্রেক্ষিতে গোয়া সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেন। চৌধুরী মহম্মদ আলীর আখ্যানুযায়ী সেই 'মহান নেতা' বলেন, 'যদি গোয়াতে সত্যাগ্রহ অনুমোদন করা যায় তবে কাশ্মীরে তাহা আরও অধিকতর উপযোগী।' সকল স্বদেশপ্রেমিক পাকিস্থানীদিগকে সুরাবর্দী কি বলিতে চাহিয়াছেন তাহা আমাদের বলিয়া দিতে হইবে না, সকলেই মনে মনে তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। যদি আমরা এই সুযোগ গ্রহণ করিতে না পারি তবে কাশ্মীর পাকিস্থানের 'জীবন-মরণে'র সমস্যা বলিয়া আমরা যেন আর চীৎকার না করি। যদি আমরা বিশ্বাস করি যে, কাশ্মীর পাকিস্থান হইতে অবিচ্ছেদ্য তবে আসুন আমরা কাশ্মীরে প্রবেশ করি—জম্মু ও কাশ্মীরের শরণার্থীবৃন্দ, আজাদ কাশ্মীরের অধিবাসিগণ, পাকিস্থানী নাগরিকগণ...আসুন আমরা যুদ্ধবিরতি রেখা অতিক্রম করিয়া অধিকৃত উপত্যকার সকল

সংশে অভিযান করি নিরস্ত্র লোকের এই বাহিনী, শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহীরূপে সমগ্র জনসাধারণের উপত্যকা প্রবেশ সমগ্র পৃথিবীর নিকট গণতান্ত্রিক পদ্ধতির এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিবে। আসুন আমরা উহা করি। এখন না হইলে আর কখনও ইহা সম্ভব হইবে না। যদি নেহরুর লোকেরা আমাদিগকে গুলি করে তবে নেহরুর কথাগুলি নেহরুকে 'গুলি করিবে'।..."

নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আলোচনায় পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিবর্গ কোন সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। জুলাই মাসে জেনেভাতে বৃহৎ রাষ্ট্রচতুষ্টয়ের নেতৃবৃন্দের বৈঠকের পর গত ২৯শে আগষ্ট নিউইয়র্কে নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা লইয়া পুনরায় আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। এবারের আলোচনা সম্পর্কে পর্য্যবেক্ষকমহলে ক্ষীণ আশার সঞ্চার হইয়াছে বলা চলে। সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরস্ত্রীকরণ সাবকমিটিতে ব্রিটেনের প্রতিনিধি মিঃ এন্টনী নাটিং বলেন যে, "সূচনা আশাপ্রদ"। ফরাসী প্রতিনিধি মসিয়ে মক বলেন যে, তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আশা পোষণ করেন।

নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ব্রিটেনের "ডেলী টেলিগ্রাফ" পত্রিকা লিখিতেছেন যে, বর্ত্তমান বৈঠকে যদি অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় তবে ইহাই প্রকাশ পাইবে যে, জেনেভাতে যে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা যতই কাম্য হউক না কেন তাহাতে পূর্ব্ব-পশ্চিমের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনের কোনই সহায়তা হয় নাই। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী পঞ্চশক্তির (ব্রিটেন, আমেরিকা, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফ্রান্স এবং কানাডা) কেহই এরূপ অস্বস্তিকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে উৎসুক নহেন। অতএব ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, প্রত্যেক সরকারই তাঁহাদের প্রতিনিধিগণকে কালহরণ করা অপেক্ষা পরস্পরের গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তেই উপনীত হইবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন। সোভিয়েট প্রতিনিধি মঁ সোবোলেভ এবং তাঁহার পশ্চিমী সহযোগীদের মধ্যে যে প্রাথমিক ভদ্রতার বিনিময় হইয়াছে তাহাতে অন্যান্য ব্যাপারের মধ্যে ইহা প্রতিভাত করার চেষ্টা হইয়াছে যে বর্ত্তমান বৈঠকে পারস্পরিক দোষারোপ অপেক্ষা আন্তরিকতা প্রতিষ্ঠারই চেষ্টা হইবে।

পত্রিকাটি লিখিতেছেন যে, অবশ্য এই সকল আলোচনায় সোভিয়েটের দিক হইতে আপোষকামী মনোভাব প্রকাশিত হইলেই আলোচনাকালে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের অসতর্ক হওয়া চলিবে না। কারণ যে মাসে সর্ব্বাপেক্ষে বাণিয়া যখন পাশ্চাত্য প্রস্তাব গ্রহণ করে তখনই প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মধ্যে নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা-সম্পর্কিত বিভেদ অনেক দূর প্রশমিত হয়।

সম্প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়ন সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিয়া যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া "ডেলী টেলিগ্রাফ" লিখিতেছেন যে, যদিও উহা সঠিকভাবে মিলাইয়া দেখিবার উপায় নাই তথাপি এই ব্যবস্থার দ্বারা প্রার্থিত লক্ষ্যের দিকে একটি পদক্ষেপ গৃহীত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন হইতে পারস্পরিক পরিদর্শন এবং সর্ এন্টনী ইডেন প্রস্তাবিত অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে "বাস্তব পরীক্ষা"র প্রস্তাব কোনটিই অপরটির সম্পূর্ণ বিরোধী নহে অথবা বাজেট নিয়ন্ত্রণের জন্য ফরাসী প্রস্তাবের বিরোধী নহে।

অবশ্য এই বৈঠকই প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র (conventional weapons) হ্রাসের অথবা পরিদর্শনের জন্য কোন নিখুঁত ফরমূলা তৈয়ারী করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। তবে সকলেই যদি এই কথাটি উপলব্ধি করেন যে অতঃপর কোন যুদ্ধ বাধিলে তাহা আণবিক যুদ্ধে পরিণত হইবে তবে প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধির দ্বারা সামরিকীকরণের যুক্তি সহজেই খণ্ডন করা যায়।

সাইপ্রাস

ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত সাইপ্রাস দ্বীপটি ক্ষুদ্র হইলেও পাশ্চাত্য রণনীতিবিদ্‌গণের দৃষ্টিতে উহার সামরিক গুরুত্ব খুব বেশী। দ্বীপটি পূর্ব্বে তুরস্কের অধীনে ছিল। ১৮৭৮ সনে ইঙ্গ-তুরস্ক চুক্তি অনুযায়ী তুরস্ক ঐ দ্বীপটির অধিকার এবং শাসনভার ইংলণ্ডের হাতে ছাড়িয়া দেয়। প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের পর ব্রিটেন দ্বীপটি পুরাপুরি নিজের দখলে লইয়া আসে। সাইপ্রাসের পাঁচ লক্ষ অধিবাসীর শতকরা আশী ভাগই গ্রীক ও এশিয়া মাইনরবাসী এবং বাকি এক লক্ষ তুরস্কদেশীয়। সাইপ্রাসের জনসাধারণ বহু দিন হইতেই স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলন চালাইতেছেন।

এক দিন পরে এই আন্দোলনের গতীব্রতা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এনোসিস (গ্রীসের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য) আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। তুরস্কের নিকট হইতে শাসনভার গ্রহণ করিবার পর আজ প্রায় ৮০ বৎসর যাবৎ সাইপ্রাসের উন্নতির জন্য ব্রিটিশ সরকার কিছুই করেন নাই, উপরন্তু সাইপ্রাসবাসীদের স্বাধীনতা আন্দোলন দমনের জন্য সর্ব্বপ্রকার নিপীড়ন চালাইয়াছেন।

গ্রীস কর্ত্তৃক সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের বিগত (১৯৫৪) অধিবেশনে সাইপ্রাস সমস্যা উত্থাপনের পর সাইপ্রাস একটি আন্তর্জাতিক সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে। সাইপ্রাসকে লইয়া গ্রীস, তুরস্ক এবং ব্রিটেনের মধ্যে বিশেষ মনকষাকষির সৃষ্টি হইয়াছে। তিনটি রাষ্ট্রের মনোভাবের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা দিয়াছে। ব্রিটেন সাইপ্রাসকে স্বাধীনতা দিতে অথবা হাতছাড়া করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। গ্রীস সরকার অবিলম্বে গ্রীসের সহিত সাইপ্রাসকে মিলিত করিবার দাবী করিতেছেন। তুরস্ক সরকার মোটামুটিভাবে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব সমর্থন করেন এবং স্থিতাবস্থা বজায় রাখিতে সমুৎসুক, অন্যথায় তাঁহাদের দাবি—সাইপ্রাসকে তুরস্কের হাতে তুলিয়া দেওয়া উচিত। তিন সরকারের নীতি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার

জন্য ২৯শে আগষ্ট লণ্ডনে তিনটি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাহাতে তিনটি সরকারের পরস্পরবিরোধী মনোভাব সম্পর্কে কোন মীমাংসায় পৌছান সম্ভব হয় নাই।

সাইপ্রাস সমস্যা সম্পর্কে ৭ই সেপ্টেম্বর এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে নাগপুরের দৈনিক "হিতবাদ" পত্রিকা লিখিতেছেন যে, সাইপ্রাসে গ্রীক স্বাধীনতাকামীদের বিরুদ্ধে তুরস্কজাতীয়দিগকে উস্কানী দিবার যে বিভেদপন্থী নীতি ব্রিটিশ সরকার চালাইতেছে তাহা ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর্যবেক্ষকদের নিকট সবিশেষ পরিচিত। পত্রিকাটি লিখিতেছেন, সাইপ্রাসের উপর আইনের দিক হইতে ব্রিটেনের যে দাবীই থাকুক না কেন অবিলম্বেই সাইপ্রাসবাসীদিগের স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করিয়া লওয়া প্রয়োজন। ঔপনিবেশিকতাবাদের অবসান ঘটিতেছে। ব্রিটেন তাহা বুঝিতে পারিয়াই ভারত, পাকিস্থান, ব্রহ্মদেশ এবং সিংহল ছাড়িয়া গিয়াছে। সেই ধারা অনুসরণ করিয়া সাইপ্রাসকেও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া ব্রিটেনের কর্তব্য।

এক দিকে যেমন "হিতবাদ" পত্রিকার মন্তব্য সত্য, অন্যদিকে একথাও ঠিক যে গ্রীক জাতি সংখ্যালঘু তুর্কিদের সহিত ব্যবহারের যে নমুনা অতীতে দেখাইয়াছে তাহাও বিশেষ সুবিধার নহে। দ্বীপটি তুরস্ক দেশ হইতে ৮০ মাইল দূরে ও গ্রীস হইতে ৪০০ মাইল দূরে।

শ্বেতাঙ্গ কর্তৃক নিগ্রো হত্যা

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি অঞ্চলে শ্বেতাঙ্গগণ একটি নিগ্রো বালককে "লিঞ্চ" করিয়া হত্যা করিয়াছে। চতুর্দশ বৎসর বয়স্ক বালকটির অপরাধ, সে নাকি একটি শ্বেতাঙ্গিনীকে দেখিয়া শিস দিয়াছিল। শিকাগোতে বালকটির ছিন্নবিচ্ছিন্ন মৃতদেহ আনা হইলে তাহা দেখিবার জন্য হাজার হাজার লোক আসে। শ্বেতাঙ্গগণের আচরণ যে কিরূপ নৃশংস বর্ব্বরতার আকার ধারণ করিয়াছিল তাহা যাহাতে জনসাধারণ স্বচক্ষে দেখিতে পারে সেজন্য বালকটির মাতার অনুরোধক্রমে মৃতদেহটি সাধারণের দর্শনের জন্য রাখা হয়।

আমাদের ধারণা ছিল যে, মার্কিন দেশ প্রায় সুসভ্য হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, এখনও অনেক অঞ্চলে মনুষ্যরূপী পশু সেখানে রহিয়াছে।

ভারতে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি দল

নয়াদিল্লীতে ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনীতে যোগদানের জন্য মার্কিন সরকারের বাণিজ্যদপ্তর মিঃ এমিল ই. শ্লেলবেকারের নেতৃত্বে পাঁচ জনের একটি বাণিজ্য মিশন ভারতে পাঠাইতেছেন বলিয়া প্রকাশ। উক্ত প্রতিনিধিবৃন্দ ৮ই অক্টোবর ভারতে আসিয়া পৌছিবেন। শিল্প প্রদর্শনীতে যোগদানের পূর্ব্বে তাঁহারা কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই পরিদর্শনে যাইবেন। মিশনের সদস্যগণ প্রত্যেকেই বাণিজ্যিক সংবাদাদি এবং পরামর্শদান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। তাঁহারা প্রত্যেকেই হয় সরকারী চাকুরিতে নতুবা মার্কিন শিল্প এবং বাণিজ্য জগতে বিশিষ্ট পদ অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। যে সকল ভারতীয় ব্যবসায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জিনিষপত্র বিক্রয় করিতে চান তাঁহারা মিশনের সদস্যবৃন্দের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় সংবাদাদি সংগ্রহ করিতে পারেন বলিয়াও জানান হইয়াছে। অনুরূপ ভাবে যাঁহারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে মাল আমদানী করিতে উৎসুক তাঁহারাও মিশনের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় সংবাদাদি সংগ্রহে সাহায্য পাইবেন।

বেসরকারী মার্কিন সাহায্য প্রতিষ্ঠান

*আমেরিকান ফাউণ্ডেশনস ইনফরমেশন সার্ভিস কর্তৃক পরি-চালিত এক সার্ভের ফলাফলে দেখা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৭,৩০০টি জনহিতব্রতী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪১০০টি প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৪৭০ কোটি ডলারেরও বেশী এবং প্রতি বৎসর ঐ সকল প্রতিষ্ঠান হইতে যে সাহায্য দেওয়া হয় তাহার পরিমাণ প্রায় ৩০ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার।

মার্কিন জনহিতব্রতী প্রতিষ্ঠানগুলি কোন মুনাফাকারী প্রতিষ্ঠান নহে, জনহিতব্রতেই উহাদের প্রতিষ্ঠা। ইহাদের প্রধান আয়ের উৎস হইল প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক দাতাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত বার্ষিক বা এককালীন দান।

উল্লিখিত 'সার্ভে'র ফলাফলে ৪১৬২টি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিবরণ তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, শতকরা ২০টি প্রতিষ্ঠানের হাতে সকল প্রতিষ্ঠানগুলির সমবেত সম্পদের প্রায় ৯০ [illegible] (৪২০ কোটি ডলার) কেন্দ্রীভূত। সাতটি বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানের হাতেই রহিয়াছে প্রায় ১২০ কোটি ডলার মূল্যের সম্পদ। যথা: ফোর্ড ফাউণ্ডেশন ৪৯৩,২১৩,৮৪২ ডলার; রকফেলার ফাউণ্ডেশন ৪৪৭,৬৮৬,৫৭৩ ডলার, নিউ ইয়র্কের কার্নেগী ফাউণ্ডেশন ১৭৮,৮৬১,৭৯৯ ডলার; ডব্লু. কে. কেলগ ফাউণ্ডেশন ১০৯,৮১২,২১৪ ডলার; ডিউক এনডাওমেণ্ট ১০৯,৭৫২,০০০ ডলার; কমনওয়েলথ ফাণ্ড ১০৫,৯৯৩,০৩৫ ডলার এবং লিলি মেমোরিয়াল ফাউণ্ডেশন ১০৪,৯৮৭,১২৯ ডলার।

প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশেরই জন্ম হইয়াছে গত ১৫ বৎসরের মধ্যে। ১৯০০ সনের পূর্ব্বে মাত্র দশটি প্রতিষ্ঠান ছিল; ১৯৩০ সনে ছিল ২৭০টি, ১৯৫০ সন হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ২০০টি করিয়া প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হইতেছে।

যদিও সমাজকল্যাণমূলক কার্য্যই অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য তথাপি উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য এবং নানারূপ বৃত্তি দানেই এই অর্থের বৃহত্তর অংশ ব্যয়িত হয়। উপযুক্ত ব্যক্তি-বিশেষকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া সমাজের নেতৃত্বলাভের উপযোগী রূপে তাহাকে গড়িয়া উঠিবার সুযোগ দিতে ছোট বড় সকল প্রতিষ্ঠানগুলিই বিশেষভাবে উৎসাহী বলা হইয়াছে।

আমাদের দেশে ফোর্ড ফাউণ্ডেশন ও রকফেলার ফাউণ্ডেশন বহু কার্য্যে সহায়তা করিতেছে।

ভবিষ্যতের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ

ডক্টর শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

১

রবীন্দ্রনাথ এ যুগের যুগাচার্য। একালের মানুষের মনের মাটিতে তিনি অজস্র ফসল ফলিয়েছেন। সে সোনার ফসল সত্য হয়েছে লক্ষ কোটি মানুষের জীবনসাধনায়, আর আচার্যের গুরুদক্ষিণা তারা দিয়েছে অপরিসীম শ্রদ্ধায়, অকৃপণ অন্তরের বিস্ময়-বিমুগ্ধতায়। যে অভিনন্দন রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন তাঁর সমকালীন মানুষের কাছ থেকে সেটা সাধারণতঃ দুর্লভ। যে সম্মান মানুষ সেদিন দেখিয়েছে প্রতিভা-সমৃদ্ধ আর একটি মানুষের অস্তিত্বকে তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে; তাঁর ভাবমূর্তি আজও অম্লান আছে; আজও তেমনি করেই হাজার হাজার মানুষ তাঁর স্মৃতি-মন্দিরে ছুটে যায় যেখানে রসিকসুজন পরম আনন্দে এ যুগের আনন্দধারার ভগীরথকে পূজো করছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে এক যুগ অতিবাহিত হয়েছে। একথা অসংশয়ে বলা যায় যে কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে মানুষ আরও বেশী করে বুঝতে শিখছে। তাঁর অমেয় সৃষ্টির ঐশ্বর্যকে মানুষ আরও বেশী করে স্বীকার করছে। ইয়েটসের মত দু'চার জন মানুষ (আমরা ১৯৩৫ সনের ইয়েটসের কথা বলছি), জন-ও-লণ্ডনস্ উইক্‌লীর মত দু'চারখানা কাগজ যদি অনৃত ভাষণ করেই থাকে তবে তাদের উপেক্ষা করাই ভাল। দেশে-বিদেশে অগণিত মানুষের শ্রদ্ধার্ঘ কবি পেয়েছেন কালের অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে। সময়ের বিবর্তন মানুষের বোধের স্ফুরণ ঘটায়। তাই দেখি অধিকাংশ শিল্পনায়কই প্রতিষ্ঠা ও সম্মান পেয়েছেন তাঁদের মৃত্যুর পরে। মহাকবি ভবভূতিকে অনন্ত কাল ও বিপুল পৃথিবীর কথা স্মরণ করে সান্ত্বনা পেতে হয়েছিল। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সে দুর্ভাগ্য হয় নি। তাঁর জীবদ্দশায়ই তিনি রাজার সম্মান পেয়েছিলেন। তাঁর লেখার দাম কষা হয়েছে অজস্র মানুষের বিনয়নম্র স্বীকৃতির কষ্টিপাথরে। এ সৌভাগ্যে রবীন্দ্রনাথ একক, অনন্যসাধারণ।

এখন একথা উঠতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ কি চিরকালই মানুষকে আনন্দ দেবে? আজকে আমরা যেমন করে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিসাগর থেকে অনায়াসে মুক্তা আহরণ করি আগামী যুগের মানুষেরাও কি ঠিক তেমনি করেই সুধাপান করবে তাঁর সৃষ্টিসমুদ্র থেকে? এখানে সন্দেহের অবকাশ আছে। এ সন্দেহ আমাদের মনে আছে, এ সংশয় রবীন্দ্রনাথেরও ছিল। তাই তিনি বারবার ভেবেছেন শতাব্দীর পারে রবীন্দ্র-সাহিত্য কোন্ মূল্যে বিকোবে? রস-ঐশ্বর্যে অথবা ঐতিহাসিক মূল্যে? কয়েক শতাব্দী পরেও মানুষ কি আনন্দ পাবে ঐ রস-সম্পদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করে, না তারা বলবে কয়েক শ' বছর আগের মানুষের জীবনে রবীন্দ্রনাথ সত্য ছিলেন। কেননা তিনি আনন্দের নির্ঝর ঝরিয়ে দিয়েছিলেন সে যুগের সব মানুষের মনে। তাঁরা কি রবীন্দ্রনাথকে 'ক্লাসিক' আখ্যায় ভূষিত করে নিজেদের জীবন থেকে তাঁকে সযত্নে সরিয়ে রাখবেন? তাঁর সৃষ্টি কি আর তাঁদের আনন্দ-প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করবে না? এ অতি দুরূহ প্রশ্ন। রবীন্দ্রনাথও এ সম্বন্ধে ভেবেছেন। তাঁর কথা তুলে দিই। তিনি শ্রীমতী রাণী চন্দকে[১] বলছেন: "আচ্ছা ধর্, পাঁচশ' ছশ' বছর পরে আমার ছবি, আমার কবিতা নিয়ে কেমন আলোচনা হবে আন্দাজ কর্‌তো। হয়ত একদল লোক কেবল এই নিয়েই রিসর্চ করবে। কেউ হয়তো বলবে সেই সময়ে এক দেবতার পূজা হ'ত; সূর্যও বলতে পারে, রবীন্দ্র—রবিইন্দ্র; বলবে হয়তো সে সময়ে সবাই সূর্য-উপাসক ছিল। গান কবিতা লিখে তাঁর পূজো হ'ত। আমার ছবিগুলোকে হয়তো বলবে এগুলো এক-একটা 'সেরিমোনিয়াল' ব্যাপার। ছবি এঁকে এঁকে রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করা হ'ত ইত্যাদি ইত্যাদি।" সূক্ষ্মবুদ্ধি মানুষের তত্ত্বান্বেষী মন কবিকে এবং তাঁর সৃষ্টিকে কেমন করে কাটা-ছেঁড়া করবে, তাঁর সৃষ্টির এনাটমি খুঁজে বার করতে কতখানি রক্তমোক্ষণ করবে সে সম্বন্ধে কবি সব সময়ে সন্ত্রস্ত ছিলেন। আগামী যুগ তাঁকে কতটুকু গ্রহণ করবে এ চিন্তা দেখি তাঁর শেষজীবনে তাঁকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অনেক কাজের অবকাশে তিনি ভেবেছেন এই সব কথা। তাঁর সীমাহীন সৃষ্টির কতটুকু ভাবী যুগে মর্যাদা পাবে একথা তিনি বারবার চিন্তা করেছেন।

একশ' বছর পরে যে কবি কবি-কথা শোনাবেন তাঁর উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দন রেখে গেলেন—আগামী যুগের কবি-গানে তাঁর গান, তাঁর সুর ক্ষণকালের জন্যও ধ্বনিত হয়ে উঠুক এই কামনাটুকু কবি বারবার করেছেন। তাঁর এ জীবনের সাধনা ছিল সুরসাধনা—আর সে সুরের ঝরণা-ধারায় তিনি মানুষের মনকে সুস্নাত করে পরম পরিতৃপ্তিতে

১। আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৩৪-৫

ভরিয়ে দিতে চেয়েছেন। প্রভাতের আনন্দটুকু আপন মনের পত্রপুটে তিনি গ্রহণ করেছেন সহস্র ধারায় আর সে আনন্দ বিতরিত হয়েছে গানের কবিতার সার্বজনীন আনন্দের ভোজে। সংসারের ধূলিমলিন বীভৎসতাকে ঢেকে দিতে চেয়েছেন কবি গীতিরস ধারায় অভিষিক্ত করে। অন্তরের আনন্দলোককে তিনি উদ্ঘাটিত করে দিতে চেয়েছেন তাঁর সীমাহীন বর্ণনাহীন সৃষ্টি-সম্ভারে। শূন্যে, মহাশূন্যে, দিকে, দিগন্তরে, লোকে, লোকান্তরে যে আনন্দের অমৃত নির্ঝর অহোরাত্র ঝরে পড়ছে কবি তাঁর বাঁশরীতে সেই মৃত্যুঞ্জয়ী মধুময় সুরটুকু ধরে দিতে চেয়েছেন। তাকে পরিবেশন করেছেন বিশ্বজনের কাছে ; সর্ব মনের ঘটে তাঁর প্রসাদ অক্ষয় হয়ে আছে। কবির কথা তুলে২ দিই :

"ধরণীর শ্যাম করপুটখানি
ভরি দিব আমি সেই গীত আনি
বাতাসে মিশায়ে দিব এক বাণী
মধুর অর্থ ভরা।
নবীন আষাঢ়ে রচি' নব মায়া
এঁকে দিয়ে যাবো ঘনতর ছায়া—
করে দিয়ে যাব বসন্ত কায়া
বাসন্তী বাস পরা।
ধরণীর তলে গগনের গায়
সাগরের জলে অরণ্য ছায়
আরেকটু খানি নবীন আভায়
রঙিন করিয়া দিব।
সংসার মাঝে কয়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর।
দু' একটি কাঁটা করি দিব দূর
তার পরে ছুটি নিব।"

সাধারণ মানুষের জীবনে দুঃখ-পাওয়াটা হ'ল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। কবি চেয়েছেন সেই দৈনন্দিন দুঃখের কিছু লাঘব করতে। ক্ষণস্থায়ী আনন্দের প্রলেপকে কবি আর একটু দীর্ঘস্থায়ী করতে চেয়েছেন। বেদনার ক্ষতকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য। প্রকৃতির এখানে-ওখানে যে আনন্দের ক্ষণপ্রভা জ্বলে তার আলোকে তিনি চেয়েছেন আপন সৃষ্টির মধ্যে ধরে রাখতে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দুঃখদীর্ণ মানুষের জীবনে একটু আনন্দঘন অবকাশ সৃষ্টি করা যেখানে মানুষের মন আপনাকে প্রসারিত করে রেখে রসঘন মহাসত্তার সান্নিধ্যে। কবি চেয়েছেন প্রিয় জনের প্রিয় সম্বন্ধটুকুকে প্রিয়তর করে তুলতে। যাঁরা ভাল-বাসে তাদের সে ভালবাসার রসমাধুর্য গাঢ়তর হোক, ঘনীভূত হোক, এই কামনা করেছেন কবি, আর সে কামনাকে সত্য করে তুলতে ঐকান্তিক প্রয়াস পেয়েছেন নিরলস সাধনায় অগ্রসর।' কবি-চেতনা পৃথুল প্রবৃত্তিকে অনায়াসে অতিক্রম করে গিয়েছে। নিত্যের সঙ্গে তার অবিচ্ছিন্ন যোগ। তাই কবি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ঊর্ধ্বে সর্ব মানবের দুঃখটুকু উপলব্ধি করেছেন আর সে দুঃখকে নির্বাসন দিতে চেয়েছেন পৃথিবীর প্রত্যন্ত সীমায়। সে দুঃসহ বিপুল বোঝাকে, সেই অচলায়তনকে তিনি একা সরিয়ে দিতে পারবেন না এ বোধ তাঁর ছিল। তাই তিনি দু'একটি কাঁটা দূর করবার ব্রত নিয়েছিলেন। সে ব্রত তিনি উদ্‌যাপন করেছেন পরমনিষ্ঠার সঙ্গে। তাই ত আজ আমাদের ঘর, আমাদের পরিবেশ, আমাদের পারস্পরিক সম্বন্ধটুকু স্নেহরসে উজ্জ্বলতর, প্রীতি-রসে মধুরতর হয়েছে। সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ অতি আপনার জন হয়ে উঠেছেন গভীরতর জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে। আমাদের জীবনের আনন্দের অথবা বেদনার পরম লগ্নটিতে কবিকে মনে পড়ে। তাঁর কথা আমরা স্মরণ করি বিরহাতুর মধ্যাহ্ন বেলায়। দোসরহীন জীবনের ব্যর্থ বেদনাটুকু কবি তাঁর অনুপম ভাষায় প্রকাশ করেছেন আর আমরা তাঁর কথা মনে মনে বার বার উচ্চারণ করি : 'একেলা কারে বসে ? যবে বসে আছি ভরা মনে দিতে চাই, নিতে কেহ নাই।' নিজের গভীরতম দুঃখকে জানার মধ্যে, তার স্বরূপ উপলব্ধি করার মধ্যে এক ধরনের আনন্দ আছে। সেই আনন্দটুকু থেকে কবি আমাদের দারুণতম দুঃখের দিনেও বঞ্চিত করেন নি। আমরা সান্ত্বনা পাই এই আনন্দটুকুর পরশ পেয়ে।

এখন একথা জিজ্ঞাস্য যে, এই আনন্দটুকু পরিবেশনের বিনিময়ে ভাবীকালের মানুষ তাঁকে স্মরণ করবে কি না, অন্য কাল তাঁকে গ্রহণ করবে কিনা একালের মত বিপুল মর্যাদায় ? আগামী যুগের আনন্দের ভাষার পরিবর্তন হবে। আঙ্গিক বদলে যাবে যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। ভাষায় নতুন মারপ্যাঁচ আসবে। প্রকাশভঙ্গীর হয়ত মূলগত পরি-বর্তন ঘটবে। একালের কথা হয়ত অন্য কালে দুর্বোধ্য হবে। তবেই ত রসের উৎসে ভাঁটা পড়বে—শুকিয়ে যাবে রসের ধারা। রবীন্দ্র-সাহিত্যের আবেদন ব্যর্থ হয়ে যাবে মানুষের কাছে ; রসিকমনে আর তার প্রবেশ ঘটবে না এমন আশঙ্কা করার যথেষ্ট কারণ আছে। ইংরেজী সাহিত্যে চসার আর আগেকার মত সমাদৃত নন। প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় আজ আর তাঁর যোগ নেই। তাঁর কাব্যকথা আজ আর মানুষের দৈনন্দিন জীবনে আনন্দের খোরাক জোগায় না। বাংলা সাহিত্যের পূর্বাচার্যদের কথা স্মরণ করুন। তাঁরা আজ আনন্দের ভোজে পরিবেশকের ভূমিকায় নেই। তাঁরা

২। পুরস্কার, সোনারতরী, কাব্যগ্রন্থ

আজ ঘরের শোভা বর্ধন করছেন চামড়া আর সোনালী জলের সাজ-পোশাক প'রে। হেমচন্দ্র; নবীনচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র—এঁরা আজ আর আমাদের মনে নিত্য আনাগোনা করেন না। ঐতিহাসিক নির্ণয় করবেন সাহিত্যের বিবর্তনে এঁদের দানের মূল্য। ইতিহাসের ছাত্র স্মরণ করবেন এঁদের পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে কিন্তু সাধারণ মানুষ আজ ত আর তেমন আনন্দ পাচ্ছে না এঁদের সাহিত্য পাঠ করে যেমনটি পেতেন আমাদের পূর্ব-গামীরা।

পরবর্তী যুগের মানুষেরা কি এমনি করেই রবীন্দ্রনাথকে ইতিহাসের মিউজিয়মে ঠেলে দেবে ; তাঁর সঙ্গে আগামী যুগের মানুষের কি কোন প্রাণের যোগ থাকবে না—আজকে যেমনটি আছে। বোধ হয় থাকবে না। আঙ্গিক এবং লিখনশৈলীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাব্য আর এত আগ্রহের সঙ্গে পঠিত হবে না, উচ্চারিত হবে না আমাদের আনন্দ ও বেদনার পরম লগ্নটিতে। আজ সেক্সপীয়র পাঠ করা সহজসাধ্য নয় ; অন্বয়, টীকা-টিপ্পনীর ঘন অরণ্য ভেদ করে রসের তীর্থলোকে পৌঁছতে হলে যে অবিচল নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয় তা সাধারণ মানুষের বড় একটা থাকে না। কাজেই সেক্সপীয়র আর তেমন ভাবে পঠিত হচ্ছে না যেমনটি হ'ত পঞ্চাশ বছর আগে। এ যুগের ভাষার গঠন ও প্রকাশভঙ্গীর বৈচিত্র্য সে যুগে অলভ্য ছিল। আজ ইংরেজী ভাষা তার অনাবশ্যক অলংকরণ পরিত্যাগ করে সহজ বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে প্রাণদীপ্তি বিচ্ছুরিত করতে করতে এগিয়ে চলেছে। সে ভাষায় নতুন সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, লেখা হয়েছে নতুন কাব্যকথা। এলিয়ট, এজরা পাউণ্ড প্রমুখ নব্য-পন্থীরা সেখানে মাতামাতি করছেন। পূর্বসূরীরা ইতিহাসের মণিকোঠায় আশ্রয় নিয়েছেন। সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে আজ আর তাঁদের যোগ নেই। সাহিত্যিকের কাজ চ'ল জীবনে জীবন যোগ করা। জীবনের সঙ্গে জীবন যুক্ত না হলে গানের পসরা ব্যর্থ হয়ে যায়। যে সাহিত্যের আবেদন মৃত, তার সৃষ্টিজগতের সঙ্গে পাঠকের মনের যোগা-যোগ স্থাপিত হয় না। তাই ত সে আর পাঠককে উজ্জীবিত, অনুপ্রাণিত করতে পারে না তার আনন্দরসে। রবীন্দ্রনাথ এ কঠোর সত্যটুকু উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি বললেন ; "জীবনের আশি বছর অবধি চাষ করেছি অনেক। সব ফসলই যে মড়াইতে জমা হবে তা বলতে পারি নে। কিছু ইঁদুর খাবে, তবুও বাকী থাকবে কিছু জোর করে বলা যায় না। যুগ বদলায়, কাল বদলায়, তার সঙ্গে সব কিছুই ত বদলায়। তবে সবচেয়ে স্থায়ী হবে আমার গান এটা জোর করে বলতে পারি। বিশেষ করে বাঙালীরা শোকে, দুঃখে, সুখে, আনন্দে আমার গান না গেয়ে তাদের উপায় নেই। যুগে যুগে এই গান তাদের গাইতে হবেই।"[৩] কবির অনুভূতি যে কথা বলল সে কথা যুক্তি-সহ। ইনটুইশনে যাকে পাই তা ত যুক্তিবিরুদ্ধ নয়। মহৎ সত্য উপলব্ধির পথেই আসে। তারপর তাকে যুক্তির কাঠামোয় আমরা ফেলি। কবির এই সুদৃঢ় প্রত্যয়কে আমরা যুক্তির আলোয় বিচার করে এই কথাই বলব যে তাঁর অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে রবীন্দ্রসংগীত কালজয়ী হবে। আর বেঁচে থাকবে রবীন্দ্রনাথের ছবি এবং তাঁর সৃষ্ট কয়েকটি চরিত্র। বর্তমান নিবন্ধে আমরা রবীন্দ্রনাথের সংগীতের কথা বলছি। প্রবন্ধান্তরে আমরা তাঁর ছবি এবং কয়েকটি চরিত্রের আলোচনা করব।

সংগীতের কথা বলি। ভারতীয় সংগীতের তিনটি ধারা। কোথাও সুর প্রধান, কথা অপ্রধান ; কোথাও কথা প্রধান সুর অপ্রধান ; আবার কোথাও-বা সুর এবং কথার পরিপূর্ণ মিলন ঘটেছে অতুলনীয় সঙ্গতির মধ্যে। রবীন্দ্রসংগীত হ'ল এই তৃতীয় শ্রেণীর। কবির হাতে সুরে এবং কথায় যে মিলন ঘটেছে তা শুধু বাইরের ঠাট নয়, তা হ'ল অন্তরের সম্পদ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত শিক্ষা ঘটেছিল আচার্য বিষ্ণু ও সুর-যাদুকর যদুভট্টের কাছে। সঙ্গীতবিশারদ রাধিকা গোস্বামী ও রসিকসুজন শ্রীকণ্ঠ সিংহের প্রেরণা অভূতপূর্ব ভাবে কবিকে অনুপ্রাণিত করেছিল। রবীন্দ্রসংগীতে ধ্রুপদী বিষ্ণুর প্রভাবটাই সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে। ধ্রুপদের তুকের প্রভাব রবীন্দ্র-সংগীতে সর্বত্র আছে। বিশেষজ্ঞেরা এ কথা স্বীকার করেন যে, কবির প্রথম বয়সের গানে 'লোক-সংগীতে'র মত সরল বা ঠুংরী জাতীয় গানের মত মধুর আবেগের প্রকাশ হয়ত ঘটেছে কিন্তু শেষ বয়সের গানে একমাত্র ধ্রুপদী প্রভাবই পরিলক্ষিত হয়।[৪] রবীন্দ্রসংগীতে ধ্রুপদ গানের প্রভাবই মুখ্য। ধ্রুপদের মতই রবীন্দ্রসংগীতে চারটি ভাগ আছে—স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ। রবীন্দ্রসংগীতবেত্তা অনেকে আবার টপ্পা গানের প্রভাব আবিষ্কার করেছেন রবীন্দ্রনাথের কোন কোন গানে। উদাহরণ হিসেবে 'আমি রূপে তোমায় ভোলাবো না' গান-খানির উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ছাড়া মাটির গান, মেঠো সুর রবীন্দ্রসংগীতে সুর লাগিয়েছে। কীর্তন ও সারি গানের মধুর সুর এসে লেগেছে কবির মনে আর সে সুর গান হয়ে কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে অপূর্ব মূর্ছনায়।

যশুরে কীর্তনীয়া মধু কানের কীর্তনের সুরের আলো এসে লেগেছিল কবির চোখে। সে সুরের জাদু ধরা আছে রবীন্দ্রসংগীতে। বাংলার সংস্কৃতির বিশিষ্ট সম্পদ হ'ল কীর্তন

৩। আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৭১

৪। শ্রীশান্তিদেব ঘোষের রবীন্দ্রসংগীত দ্রষ্টব্য

যায়। সেখান থেকে রস আহরণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কণ্ঠে সেই কীর্তনের সুর অপরূপ রসমাধুর্যে আপনাকে প্রকাশ করল। একখানি রবীন্দ্রিক-কীর্তনের উদাহরণ দিচ্ছি : 'যৌবনভরা এ বসন্ত, সখী, কখনো আসেনি বুঝি আগে'। বাউলদের গানও রবীন্দ্র-সংগীতকে পুষ্ট করেছে। বাউলের সুর, বাউলের কথা রবীন্দ্রনাথের গানকে মধুরতর, ব্যাপকতর করেছে। বাউল-গানের সহজ আবেদনটুকু ধরা পড়েছে তাঁর গানে। তাই ত রবীন্দ্রসংগীত ধীরে ধীরে ব্যাপ্তি লাভ করছে দেশে দেশান্তরে। রবীন্দ্রনাথের হাতে বাউল-গানের সামান্য রূপভেদ ঘটেছে তবে তিনি বাউল গানের ছন্দে হস্তক্ষেপ করেন নি। তালের দিক থেকেও তিনি বাউল-গানের নতুন কিছু করবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। কিন্তু অসীম প্রতিভাধর কবির হাতে পড়ে বাউল গানের প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা ঘুচেছে। সে মুক্তি পেয়েছে বৃহত্তর রসের ক্ষেত্রে যেখানে নানান্ রুচি মানুষের আনাগোনা। পল্লীগীতির বাঁধাধরা সঙ্কীর্ণ মেঠো পথ ছেড়ে রবীন্দ্রনাথের বাউল-গান রসের প্রশস্ত রাজপথে চলতে শিখেছে। খাঁটি ও মিশ্র সুরের অজস্র বাউল-গান তিনি রচনা করলেন। কোথাও-বা বাউলের সুরে হিন্দী রাগ-রাগিনী এসে মিশেছে ; অনবদ্য রসের সৃষ্টি হয়েছে সেখানে।

শুধু যে কবি এদেশী সঙ্গীত থেকেই সুর আহরণ করেছেন তা নয় ; বিদেশী সঙ্গীত নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত ছিল না। বিলাতী সভ্যতার অনুচারী হয়ে বিলাতী সুরও এদেশে এসেছিল ; হার্মনি সঙ্গীতের রসগ্রহণ ও সেই পথে রসসৃষ্টির চেষ্টাও এখানে চলেছিল। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এ ব্যাপারে খুব বেশী উৎসাহ প্রকাশ করেন নি। তবে ইংরেজী ভাষায় দিশী সুরে গান বাঁধার চেষ্টা তিনি করেছিলেন। তাঁর এই ধরনের প্রয়াস মাত্র একখানি সঙ্গীত সৃষ্টি করেই নিরস্ত হয়েছিল ; সে গানখানি হ'ল 'The Lee is to come the bee is to hum' ; এই গানখানিতে রবীন্দ্রনাথ সুর যোজনা করেছিলেন। তবে বিলাতী সঙ্গীত কবির কাছে খুব একটা বড় আবেদন নিয়ে কোনকালেই উপস্থিত হতে পারে নি। কারণ বিলাতী সঙ্গীতে দেখা যায় 'হৃদয়াবেগের উত্থান-পতনকে সুরের ও কণ্ঠের ঝোঁক দিয়ে খুব প্রত্যক্ষ করে দেখাবার চেষ্টা।' এই প্রথা ভারতীয় সঙ্গীতের পক্ষে উপযোগী নয় এ কথা রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন। তাই তিনি তাঁর সঙ্গীতের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের ভিত্তিভূমিতে। রবীন্দ্রসংগীত তাল লয় আহরণ করেছে শুধুমাত্র প্রাচীন সঙ্গীত থেকেই নয় ; আধুনিক হিন্দী গানও তার দৃষ্টি এড়ায় নি। বিশেষজ্ঞেরা বলেন[৫] : 'প্রাচীন বা আধুনিক হিন্দী গানে যত রকম তাল আছে রবীন্দ্রসংগীতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা ইত্যাদি কোন চালেরই গানের তাল তাঁর সংগীতে বাদ পড়ে নি। তা ছাড়া বাংলার কীর্তনের ও লোকগীতির তাল কিছু কিছু স্থান পেয়েছে তাঁর গানে।' কবি মার্গসঙ্গীতের তাল মান মেনে চলেছেন—শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের অনুজ্ঞা। পূব আকাশে যখন আলো ফোটে, যখন জাগরণের পালা চলে বিশ্বপ্রকৃতিতে ঠিক সেই লগ্নের গানে কবি ব্যবহার করেছেন তোড়ী, আশাবরী, ভৈরব ভৈরবী, রামকেলী, কালেংড়া ইত্যাদি সেকালের রাগিণী। আবার যখন ক্লান্ত তাপদগ্ধ রক্ত মেঘের দল আসন্ন দিনান্তকে ঘোষণা করে, তখন রাত্রির অভিসারের আয়োজন চলে পশ্চিম দিগন্তে, দিনরাত্রির সেই মিলন-লগ্নে শুনি কবিকণ্ঠে ইমন কিংবা পুরবী। সন্ধ্যার রাগিণী অপূর্ব মূর্চ্ছনায় সুরতরঙ্গ সৃষ্টি করে। আবার রাত্রের সুরে কবি-কণ্ঠে শুনেছি বেহাগ, কানাড়া, খাম্বাজ ইত্যাদি রাত্রের সুর। মার্গসঙ্গীতের বিধিনিষেধগুলি কবি মেনে নিয়েছিলেন শ্রদ্ধার সঙ্গে। দুরূহ মার্গসঙ্গীতের ভিত্তিভূমিতে যার প্রতিষ্ঠা সেই মহাসঙ্গীত প্রাণ আহরণ করেছে দেশের অসংখ্য প্রচলিত সঙ্গীতের রসধারা থেকে। রবীন্দ্রসংগীত দুর্ধর্ষ প্রাণশক্তির উত্তরাধিকার লাভ করেছে ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের কাছ থেকে আর তার লাবণ্য, লালিত্য সৌকুমার্য এসেছে নানান লোকসঙ্গীত থেকে। তাই মনে হয় এই সঙ্গীতের আবেদন কাল থেকে কালান্তরেও সত্য হয়ে থাকবে। এ সঙ্গীতের মৃত্যু নেই, কেননা ভারতবর্ষের মৃত্যুঞ্জয়ী মার্গসঙ্গীতের সঞ্জীবনী মন্ত্রটুকু এ সঙ্গীত আয়ত্ত করেছে এবং মার্গসঙ্গীতের রসটুকু পরিবেশন করেছে নতুন পাত্রে আর পাঁচটা রসের সঙ্গে মিশেল দিয়ে। রবীন্দ্রসংগীত আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে নিগূঢ় ভাবে সম্বন্ধযুক্ত। ভবিষ্যতেও প্রকাশ ঘটবে এই দুর্মর পুরাতনীর মৃত্যুহীন প্রাণের আর তার বাহন হবে রবীন্দ্রনাথের গীতিকলা। তাই রবীন্দ্রসংগীত বাঁচবে আর অনির্দিষ্ট কাল ধরে গৌড়জন সুধাপান করবে এই সঙ্গীত-নির্ঝরিণীর রসধারা থেকে।

৫। শ্রীশান্তিদেব ঘোষের রবীন্দ্রসংগীত দ্রষ্টব্য

রাজধর্মে নারীর দান

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

সাধারণ ভাবে বলা চলে যে, নারীদের স্বভাবগত কোমলতা ও করুণা তাঁদের রাজধর্ম বা রাজনৈতিক ব্যাপারে বহুলাংশে করে রেখেছে আগ্রহশূন্য। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই রাজনীতি চাণক্যনীতিমূলক কূটনীতিই মাত্র, যা মাতৃস্বরূপিণী রমণীদের সত্তা ও স্বভাববিরুদ্ধ। সেজন্য অন্যান্য বিভাগ অপেক্ষা রাজধর্মে নারীদের দান অত্যন্ত সামান্য। রাজধর্ম-পারদর্শিনী স্বল্পসংখ্যক নারীদের মধ্যে প্রোজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন পৌরাণিক যুগের বিদুষীশ্রেষ্ঠা সম্রাজ্ঞী মদালসা; মার্কণ্ডেয় পুরাণে (অধ্যায় ২০-৩৬) বর্ণিত এই বহুমুখী প্রতিভা-বিশিষ্টা নারীর চরিত্র সত্যই অতি অদ্ভুত ও চিত্তোন্মাদিনী। মদালসা ছিলেন আজন্ম গৃহিণী অথচ সন্ন্যাসিনী—অসংখ্য ভোগসুখের মধ্যেও তাঁর প্রাণের তারটি ছিল সর্বদাই বৈরাগ্যের সুরেই বাঁধা, যা সংসারের শত ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যেও তাঁকে আপ্লুত করে রাখত এক শাশ্বত, অনির্বচনীয়, মধুরিমময় ভগবৎসঙ্গীতের নিরন্তরপ্রবাহী ধারায়। সেজন্য তিনি তাঁর প্রথম তিনটি পুত্রের নিকট সংক্ষেপে অথচ সতেজ ভাবে অধ্যাত্মতত্ত্ব বা মোক্ষধর্ম এরূপ মর্মস্পর্শী ভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করেন যে, তাঁরা সকলেই প্রবৃত্তিমার্গ বা সাধারণ গার্হস্থ্য-জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে নিবৃত্তিমার্গ বা সন্ন্যাসগ্রহণে সমুৎসুক হন। তখন বংশলোপের আশঙ্কায় ব্যাকুল রাজা ঋতধ্বজের অনুরোধে রাণী মদালসা চতুর্থ পুত্র অলর্কের নিকট কর্মযোগ ও সংসারাশ্রমে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য রাজধর্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম গার্হস্থ্যধর্ম, পঞ্চমহাযজ্ঞ, নিত্যনৈমিত্তিক কর্মবিধি, শ্রাদ্ধবিধি, সদাচারলক্ষণ, বর্জনীয় ও অবর্জনীয় বিচার প্রভৃতি সংসার-মূলক বিধিবিধান সবিস্তারে, অতি পাণ্ডিত্যসহকারে বিবৃত করেন। প্রারম্ভেই তিনি বর্ণাশ্রমধর্মানুসারী গৃহস্থের অবশ্য-করণীয় কর্তব্যকর্মাদির বিষয় অতি সুন্দর ভাবে বলেন—

"পুত্র বর্দ্ধস্ব মদ্ভর্তুর্মনো নন্দয় কর্মভিঃ।
মিত্রাণামুপকারায় দুর্হৃদাং নাশনায় চ।"

"বৎস! বর্দ্ধিত হও, উপযুক্ত পুণ্যকর্মের দ্বারা তোমার পিতার মনকে আনন্দিত কর, মিত্রগণের উপকার ও শত্রুগণের বিনাশ কর। হে পুত্র! তুমিই ধন্য, কারণ তুমিই একচ্ছত্র সম্রাট্ ও অজাতশত্রু রূপে চিরকাল পৃথিবী পালন করবে। তোমার সেই পালন অবশ্য এরূপ হওয়া অত্যাবশ্যক, যাতে তা সকলেরই সুখশান্তির কারণ হতে পারে। তা হলেই তুমি পরমধর্ম সঞ্চয় করে অমরত্ব লাভে অধিকারী হবে। ধরায় অমর যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও দ্বিজগণ তাঁদের তুমি প্রতি পর্বে সমাহিত চিত্তে তর্পণ করবে, বান্ধবগণের বাসনা পূর্ণ করবে, পরের হিত হৃদয়ে সর্বদা চিন্তা করবে এবং পরস্ত্রীর প্রতি আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করবে। তুমি বহু যজ্ঞ সম্পাদন দ্বারা দেবগণের, বহু অর্থ দান দ্বারা দ্বিজগণের ও আশ্রিতবর্গের প্রীতি সম্পাদন করবে; এবং বহু ভোগ্যবস্তু দ্বারা স্ত্রীগণের ও যুদ্ধদ্বারা শত্রুগণের পরিতোষ বিধান করবে। তুমি বাল্যকালে বান্ধবগণের, কৌমার্যকালে মাতাপিতা এবং আচার্য প্রমুখ গুরুগণের, যৌবনকালে সৎকুলভূষণস্বরূপা ললনাদের, বার্ধক্যকালে বনবাসিগণের আনন্দের কারণ হবে। এই ভাবে, রাজপদে সুপ্রতিষ্ঠিত থেকে, সুহৃদ্‌গণের প্রীতি সম্পাদন করে, সাধুগণের রক্ষা করে, যজ্ঞানুষ্ঠান করে, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে, তুমি মহাপ্রয়াণ করবে।"

পরে মদালসা পুত্রকে রাজধর্ম সম্বন্ধে যে অনুপম উপদেশ দেন, তার সংক্ষিপ্তসার নিম্নলিখিত রূপ:

"বৎস রাজ্যেঽভিষিক্তেন প্রজারঞ্জনমাদিতঃ।
কর্তব্যমবিরোধেন স্বধর্মস্য মহীভৃতা।" (২৭ অধ্যায়)

ভারতের রাজনীতির মূল কথা হ'ল প্রজারঞ্জন। সেজন্য নামতঃ রাজতন্ত্র হলেও কার্যতঃ তা হ'ল প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্র। প্রজারঞ্জনের অনুরোধে কি ভাবে প্রাচীন যুগের রাজারা যথা-সর্বস্ব অকাতরে ত্যাগ করতেন, তার বহু দৃষ্টান্ত আমরা জানি এবং তার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হলেন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র। বরং গণতন্ত্রে কোন ব্যক্তি তাঁর অধিকার ও স্বাধীনতা-স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করবেন না। কিন্তু ভারতীয় রাজতন্ত্রে একমাত্র রাজাকেই তা সর্বদাই করতে প্রস্তুত থাকতে হবে বিনা দ্বিধায় ও আপত্তিতে। এই গণতন্ত্রমূলক রাজতন্ত্রের মূল তত্ত্বটি প্রকাশ করে মদালসাও প্রথমতঃ বলছেন—"রাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে স্বধর্মের অবিরোধে প্রজারঞ্জন করাই হ'ল রাজার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।"

দ্বিতীয়তঃ মদালসার মতে এরূপ লোকায়ত্ত রাজ্যশাসন-প্রণালীর মূল বা ইষ্টকারী ভিত্তি সাতটি—যথা, স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র ও পুর—এবং ব্যসন বা অনিষ্ট-কারী দোষ চৌদ্দটি—যথা, মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, দিবাস্বপ্ন, পরনিন্দা, দুষ্ট নারীসঙ্গ, নৃত্যগীত ক্রীড়া, অকারণ ভ্রমণ, পান ও দৌরাত্ম্য, পরক্ষতি, দ্বেষ, হিংসা, প্রতারণা, রূঢ় বচন, ও নিষ্ঠুরাচরণ। সেজন্য মদালসা পুত্রকে বিশেষ সাবধান করে দিয়ে বলছেন যে, ব্যসন সমস্ত রাজ্যশাসনের মূলই বিনষ্ট করে দেয়। সেজন্য রাজা সর্বদাই সযত্নে ব্যসন ত্যাগ করবেন।

তৃতীয়তঃ রাজ্যশাসনের কূটনীতিমূলক দিকটিরও উল্লেখ করে মদালসা বলছেন যে, রাজার গুপ্তমন্ত্রণা যেন বহির্গত না হয়ে যায়। তা হলে শত্রুরা রাজ্যের প্রভূত অপকার সাধন করতে পারে, এবং রথচক্রের আঘাতে নিহত ব্যক্তির ন্যায় রাজাও অষ্ট আঘাতে বিনষ্ট হবেন। সেজন্য চর নিয়োগ রাজার পক্ষে অত্যাবশ্যক, এবং হঠাৎ কাহাকেও বিশ্বাস না করাও কর্তব্য।

কিন্তু সমস্ত কূটনীতিই ব্যর্থ হবে যদি না রাজা নিজে সদ্গুণবিভূষিত হন। সেজন্য রাজধর্মের দ্বিতীয় লক্ষণে রাজার হেয়গুণ বা পরিত্যাজ্য দোষের উল্লেখ করার পর মদালসা, চতুর্থতঃ, তাঁর উপাদেয় গুণ বা অবশ্যপ্রাপণীয় সদ্বৃত্তির উল্লেখ করে বলছেন যে, রাজা সর্বপ্রথম আত্মজয় করবেন, পরে মন্ত্রিবর্গ, ভৃত্যবর্গ ও পুরবাসিগণকে জয় করবেন এবং তৎপরেই কেবল শত্রুগণকে জয় করতে সাহসী হবেন। নতুবা যিনি 'অজিতাত্মা' বা স্বীয় আত্মাকে জয় করেন নি, তাঁর বিজয় অসম্ভব। সেজন্য রাজার সর্বপ্রথম কর্তব্য অন্তঃস্থ কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য রূপ ষড়্‌রিপুকে জয় করা। এরূপে রাজা সর্বসদ্গুণ-বিভূষিত হবেন, অন্যথায় অধার্মিক রাজার রাজ্যের ধ্বংস অনিবার্য।

পঞ্চমতঃ, অতি সুন্দর আঠারোটি উপমার দ্বারা মদালসা রাজার অষ্টাদশ মহাগুণের ব্যাখ্যা করে বলছেন—রাজা হবেন কাকের ন্যায় অনলস ও সাবধান; তিনি কোকিলের ন্যায় যথাকালে নিজ গুণ প্রকাশ করে জগৎকে বিমোহিত করবেন; তিনি হবেন মধুকরের ন্যায় সংগ্রহশীল ও দূরদর্শী; তিনি মৃগের ন্যায় সহজে শত্রুর আয়ত্ত হবেন না; তিনি সর্পের ন্যায় সামান্য দংশন বা প্রচেষ্টাতেই দুর্ধর্ষ শত্রু জয় করবেন; তিনি ময়ূরের ন্যায় নিজ প্রভাব চতুর্দিকে বিস্তারিত করবেন, তিনি হংসের ন্যায় গুণগ্রাহী হবেন, নীর বা চাটুকারদের উপেক্ষা করে, ক্ষীর বা জ্ঞানীগুণিগণকে [illegible] করবেন; তিনি হবেন কুক্কুটের ন্যায় সময়নিষ্ঠ; লৌহের ন্যায় দৃঢ়চেতা ও বহুকার্যের সাধক; তিনি কীটের ন্যায় নীরবে শত্রুকুলকে কেটে ধ্বংস করবেন; তিনি হবেন পিপীলিকার ন্যায় সঞ্চয়ী ও অনুসন্ধানী; অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও বটবৃক্ষবীজের ন্যায় বিস্তারশীল; পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ভাস্বর ও উদয়শীল; কৌতুকিভার্যার ন্যায় পরচিত্তরঞ্জক; পদ্মের ন্যায় সৌন্দর্য-সৌরভশালী ও বিশ্ব-বিমোহক; শরভের ন্যায় বিক্রমশীল; শূলিকার ন্যায় তীক্ষ্ণ; ভাবী মাতার স্তন যেমন ভাবী পুত্রের জন্য দুগ্ধ সঞ্চয় করে, তিনিও তেমনি ভবিষ্যদ্দর্শী হবেন; গোপাঙ্গনা যেমন একমাত্র দুগ্ধ থেকেই নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করেন, তিনিও তেমনি কর্মকুশল ও কল্পনাকুশল হবেন।

ষষ্ঠতঃ, মদালসা পঞ্চদেবতার উপমার সাহায্যেও পুনরায় রাজার অত্যাবশ্যক সদ্গুণসমূহের ব্যাখ্যা করেছেন। রাজা হবেন ইন্দ্র, সূর্য, চন্দ্র, যম ও বায়ু—এই পঞ্চদেবতার সমতুল। এরূপে 'ইন্দ্র যেমন চার মাস বৃষ্টি দ্বারা মর্তভূমি তৃপ্ত করেন, রাজাও তেমনি ধনাদি দান দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট করবেন। সূর্য যেরূপ আট মাস কিরণ দ্বারা জল শোষণ করেন, রাজাও তেমনি সূক্ষ্ম উপায়ে রাজ্য নির্বাহের ব্যয়স্বরূপ শুল্কাদি সংগ্রহ করবেন। যম যেমন শত্রুমিত্র-নির্বিশেষে সকলকেই যথাকালে নিধন করেন, রাজাও তেমনি প্রিয়-অপ্রিয়, দুষ্ট-অদুষ্ট, শত্রু-মিত্র-সকলেরই সঙ্গে পক্ষপাতহীন ব্যবহার করবেন ও সমদর্শী হবেন। চন্দ্র যেমন সর্বজনের পরম সুখশান্তির কারণ, রাজাও তেমনি সকলকে পরমানন্দ দান করবেন। বায়ু যেমন সর্বত্র গোপন ভাবে বিচরণশীল, রাজাও তেমনি সর্বত্র দৃষ্টি রাখবেন এবং অমাত্যাদির বিষয়ে গুপ্তচরের সাহায্যে সন্ধান করবেন।

সপ্তমতঃ, মদালসা রাজধর্মের সারকথা পরিশেষে ব্যক্ত করে বলছেন যে, ধর্মই রাজ্যশাসনের মূলভিত্তি। যে রাজা স্বয়ং ধর্মে মতিশীল এবং প্রজাগণকেও ধর্মে স্থাপিত করেন, তিনিই হচ্ছেন আদর্শ সম্রাট্।

এরূপে রাজমহিষী মদালসা রাজধর্মের যে সপ্তনীতির কথা অপরূপ সুন্দর ভাবে উপস্থাপিত করেছেন, তা সত্যই সকলকেই মুগ্ধ ও চমৎকৃত করে। সপ্তাশ্ব-পরিচালিত ভাস্করের সপ্তবর্ণের মতই এই সপ্তনীতি বিচ্ছুরিত করেছে দিকে দিকে তাদের বিমল বিভা। সপ্তবর্ণের সমাবেশে যেমন শুভ্রতা, এই সপ্তনীতির সমাবেশেও ঠিক তাই। সেজন্য এই শুভ্রতম রাজনীতির সার্থক-প্রপঞ্চিকা মদালসা চিরবন্দ্যা। তাঁর রাজধর্মের মূল কথা হ'ল, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শক্তি, পশুবল বা কূটনীতি নয়। রাজ্যরক্ষার জন্য অবশ্য রাজাকে যুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়, গুপ্তচরও নিযুক্ত করতে হয়, সত্য। কিন্তু মদালসা বারংবার রাজার নৈতিক গুণ ও আত্মিক শক্তির উপরই বিশেষ জোর দিয়েছেন। রাজা হবেন মনোরাজ্যের রাজা, প্রজাগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রীতি ও ভক্তির নিলয়, তবেই ত তিনি প্রকৃত রাজা। অপর পক্ষে, নিজের দিক থেকেও তিনি হবেন আত্মজয়ী, মুক্ত পুরুষ।—এরূপে, মদালসার রাজধর্মের মূল কথা হ'ল নিজের রাজা, প্রজাদের রাজা, বিশ্বের রাজা হওয়া যায় নৈতিক বলে, সুশাসনের বলে, প্রীতির বলে। নারীহৃদয়ের সমস্ত সুধা ও সুষমা সিঞ্চন করে, অনুপম ভাষা ও ভঙ্গীতে, মদালসা এই ভাবে যে অনবদ্য রাজধর্ম প্রপঞ্চিত করে গেছেন, তার সৌন্দর্য ও সৌরভ চিরদিন বিশ্বজগৎ আলোকিত, আমোদিত করে রাখবে নিঃসন্দেহ।

সমাজের গোড়াপত্তন

শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়

মানুষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মনীষী প্লেটো বলেছেন যে, মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ আছে সমাজ নেই, এ কল্পনাতীত। মানব-জাতির অভিব্যক্তির ধারায় কোন নৃতত্ত্ববিদ্ সমাজহীন মানুষ দেখতে পান নি, দেশকালনির্বিশেষে সমাজ ওতপ্রোত ভাবে মিশে রয়েছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়, তার কর্মে, তার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। সকলেরই জানা আছে—ভিড়ের মধ্যে অবস্থানের কি অবিমিশ্র স্বস্তিনির্ভরতা। চারিপাশে যখন দেখি সকলে সগোত্র সমভাবলম্বী, মানসিক বল তখন বহুগুণ বেড়ে যায়। একলক্ষ্যাভি-মুখী জনতার ভিতর অবস্থানের রোমাঞ্চকর উত্তেজনায় সকলের অন্তরে সঞ্চারিত হয় সম-মানসিক অনুভূতিপ্রবাহ—চেঁচিয়ে হাততালি দিয়ে।

সামাজিকতায় সহযোগিতা সর্বাধিক। সহচরদের মনোভাব ও অনুভূতির সঙ্গে পরিচয়ের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র মুখ, ব্যক্তিজীবনের পূর্ণতম অভিব্যক্তি সমাজে, জনসাধারণের মধ্যে। তাই বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দল বাঁধার মনোবৃত্তি গড়ে উঠেছে—পারস্পরিক আদান-প্রদানের সুযোগ-সুবিধা-প্রতিষ্ঠিত উন্নততর জীবন-যাত্রায়, সভ্যতা-সংস্কৃতির মান-উন্নয়নে। সুসভ্য মানুষ তা হৃদয়ঙ্গম করেছে, তাই পরস্পরের সান্নিধ্য এত বাঞ্ছিত, বন্ধুত্ব এত মধুর। পল্লীর মনোমুগ্ধকর প্রশান্ত পরিবেশ ছেড়ে লোকে কি কেবল উদরান্নের জন্ত সহরের পানে ছোটে? ধুলা, ধোঁয়া, ব্যাধি, বস্তির নোংরামি, অর্থের দারিদ্র্য ইত্যাদি সকল প্রতিবন্ধ অগ্রাহ্য করে দলে দলে লোক সহরে সমবেত হয় কি কারণে?

কারণ সুস্পষ্ট। শহরের আমোদ-প্রমোদ, আড়ম্বর, শিষ্টাচার সজ্জিত আদবকায়দা গভীর ভাবে আকৃষ্ট করে অনভ্যস্ত মনকে, জনসমাগম কর্মক্ষেত্র থেকে দূরে পল্লীগ্রামের নিভৃত নীরব পরিবেশে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। বিলাস সভ্যরীতি ও রুচিবৈচিত্র্যের পেছনে রয়েছে অগণিত মানুষ ও তাদের কর্মবৈচিত্র্য। প্রাচীন ভারত ও মধ্যযুগের ইউরোপের প্রসিদ্ধ শিল্প সহরগুলি গড়ে উঠেছিল এক একটি শিল্পকে কেন্দ্র করে—এ হ'ল নগর-বিকাশের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। জীব স্বজনপ্রিয়, সামাজিক জীবনের অন্তস্তলে রয়েছে স্বজন-অনুভূতি। যে সকল তথাকথিত বর্বর মানুষ আপন গোষ্ঠী ছাড়া অপরকে সহ্য করে না, তাদের উন্নতি স্তব্ধ হয়ে গেছে সেই সুদূর ঊষা-যুগ থেকে।

সমাজের অর্থ পারস্পারিক সহযোগিতা—আচরণে, কর্মে, ব্যবহারিক জীবনে। সমাজ-অন্তর্ভুক্ত প্রাণী একে অন্তকে সাহায্য করে, সাধারণের হিতার্থে একত্র সম্মিলিত হয়, সমবেত প্রচেষ্টায় সে আনীত ... গোষ্ঠীতে প্রত্যেকের ভিতর অপরের জন্ত যে দরদবোধ তা সমাজ-প্রতিষ্ঠার ভিত্তি, তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আমাদের উৎকৃষ্ট অনুভূতিনিচয়, মানুষের ধর্মবোধ, মানসলোকের সুমধুর উজ্জীবন রস। মানব-মনের একখানি স্থান অধিকার করে যার ক্রিয়া তা নিশ্চয় অন্ততম মৌলিক সহজাত প্রবৃত্তি। দলবাঁধা জীব-জীবনের অন্ততম মুখ্য সহজ প্রবৃত্তি, মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতিকল্পে এর দান প্রভূত পরিমাণ। সহজ প্রবৃত্তি বলতে নিম্ন স্তরের প্রাণীর জীবনের কথা এসে পড়ে। সহযোগিতা মানুষের সীমাবদ্ধ গণ্ডীতে পর্যবসিত নয়, জৈব জীবনের অতলান্ত গভীরতার মাঝে এর দেখা মেলে।

প্রাণীর সমাজবাঁধার প্রবৃত্তি মনুষ্য-পূর্ব যুগের প্রাণসত্তার মধ্যে সুপ্ত জীবনরসে রসায়িত। জীবনাবির্ভাবের প্রথম যুগেই সহযোগিতাপূর্ণ ভাবের উন্মেষ দেখা যায়। হস্তপদ নেই, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অস্তিত্ববিহীন ইন্দ্রিয়শূন্য জড়পিণ্ড দেহভাগ, কিন্তু তবু তারা একতান (অতি ক্ষুদ্র) দেহের সঙ্গে দেহ মিলিয়ে থাকতে আরম্ভ করল। আদিম প্রাণীর এককোষ দেহ অপেক্ষা কয়েকটি মিলিত দেহ নিশ্চয় সুবিধাজনক, এ উপলব্ধির পর বহুকোষসমন্বিত দেহের আবির্ভাব। আজ এককোষ জীবও আছে (এমিবা) এবং জড়াজড়ি-করে-থাকা জীবও বিলুপ্ত হয় নি (ভলভক্স, মেক্সিডিয়াম, জুগ্লামনিয়াম)। এক কোষের সহিত অন্ত কোষের এই আদিম সহযোগিতা-ভাবের অবসান হ'ল না, কারণ উৎকর্ষ দেখা দিল দেহে ও দিনগত কার্যকলাপে, বেঁচে থাকবার উপকরণ মিলল জীবনযুদ্ধে, তাই জৈব প্রকৃতিতে এর স্থান গুরুত্বপূর্ণ। সেই স্মরণাতীত যুগের প্রাণী বুদ্ধিবৃত্তিবিবর্জিত, তাই পরস্পরের মধ্যে দেওয়া-নেওয়া, যোগাযোগ সম্বন্ধ কেবল দেহের মাধ্যমে, অন্ত কোন উপায় নেই। পরস্পরকে বেষ্টন-করে-থাকা দেহ শুধু প্রাণীজাতিকে সমৃদ্ধ করে নি, এরূপ একত্র সমাবেশ পৃথিবীর ইষ্টসাধন করেছে অনেক স্থলে। দূর সাগরের ক্ষুদ্র কীট প্লাংকটন সমুদ্রজল নীলাভ করে রাখে, সমুদ্রের ছোটখাটো মাছ এদের দেহ দ্বারাই ক্ষুন্নিবৃত্তি করে, আবার এরা হচ্ছে বড় মাছদের আহার্য। প্লাংকটন না থাকলে রত্নাকর সমুদ্র মরুপ্রান্তরে পরিণত হ'ত। সুপরিচিত রক্তিম প্রবালের বাস দক্ষিণ-সাগরে, অষ্ট্রেলিয়ার কাছাকাছি বহু স্থান (প্রবালদ্বীপ) শুধু এদের একত্রিত দেহাবশেষ দিয়ে গড়ে উঠেছে।

পৃষ্ঠবন্ধ প্রাণীকুল মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত:

(১) সংসর্গ-প্রবণ কীটকুল: লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে পৃথিবীতে বসবাস করে নিজেদের জটিল সঙ্ঘবদ্ধ জীবন গড়ে তুলেছে।

(২) পক্ষী ও স্তন্যপায়ীরা: এরা প্রকৃত সামাজিক ও পরস্পরের সঙ্গকামী।

পিঁপড়ে মৌমাছি উইপোকা আত্মমাত্রায় সামাজিক। বহুকাল ধরণীপৃষ্ঠে অবস্থান করে এরা এরূপ সুশৃঙ্খল ও সুসংহত দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-প্রণালী গড়ে তুলেছে যে, শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের কাছেও তা ঈর্ষার বিষয়। ধনসাম্য ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে সন্তোষজনক

সাম্য-প্রতিষ্ঠায় মানুষ আজও সাফল্যলাভ করতে পারে নি, কিন্তু এরা সমাজ, শ্রমবিভাগ, খাদ্যবণ্টন, আশ্রয়-ব্যবস্থা আমোদ-প্রমোদে অপূর্ব্ব সাম্য প্রবর্ত্তন করেছে। এর মূলে শ্রমসিদ্ধ সহযোগিতা।

উইপোকার বল্মীক নিজসৃষ্ট বস্তু। বল্মীক আক্রান্ত হোক—সঙ্গে সঙ্গে একদল ভীষণাকৃতি সৈন্য উপস্থিত হয়ে শুরু করবে আমরণ সংগ্রাম। প্রথম সারি নিঃশেষ হলে দ্বিতীয় সারি, তারপর তৃতীয় সারি আছে, চতুর্থ সারি আছে। শত্রু পালালে বল্মীকের ভিতরে যায়, উপনীত হয় কর্ম্মী, রাজমিস্ত্রী ভিজা মাটি নিয়ে; আশ্চর্য্য তৎপরতার সহিত কাজ চলে—ধাকাধাক্কি নেই গোলমাল নেই, প্রশান্ত দ্রুততায় প্রাচীর মেরামত হয়ে যায়, কয়েকটি সান্ত্রী ইতস্ততঃ প্রহরায় নিযুক্ত, একটু আতঙ্কের আভাসে কর্ম্মী উধাও, দেখা দেয় ভীষণদর্শন প্রহরী। যোদ্ধারা ঘর-গৃহস্থালির কাজ করে না, কর্ম্মীরা রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয় না; যোদ্ধগণ অম্লান-বদনে আত্মাহুতি দেয়—কর্ম্মীরা বেঁচে থাকে শিশু-পরিচর্য্যার জন্ত।

নিজের বলতে কিছুই নেই, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব নাই, এমনি ধরনের সম্প্রদায়সর্ব্বস্ব সমাজ গড়ে তুলেছে পিপীলিকা ও মধুপ। এক একটি কলোনি (সংখ্যা—কয়েক শত থেকে কয়েক সহস্র), স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিবার, প্রত্যেকের কার্য্য পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট—প্রতিবাদ, অভিযোগের অবসর নেই। কেউ রাণী, কেউ আয়েসী পুরুষ, কেউ নিরলস কর্ম্মী আবার পরিচর্য্যারত ক্রীতদাসও থাকে। সহ-যোগিতা ও সমব্যয়িতা এদের অনুপম। ঘরগৃহস্থালির দৈনন্দিন কাজ, ডিম ফোটানো, শিশুপালন, খাদ্যসংগ্রহ, শত্রুকবল হতে কলোনি ও শিশুরক্ষা এবং যুদ্ধ—সমস্ত বিষয়ে ত্রুটিহীন শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থা বিদ্যমান।

গৃহনির্ম্মাণে একদল মাটি খুঁড়ছে, অপর দল বাইরে ফেলে আসছে, আর একদল দেয়াল মেঝে নির্ম্মাণে ব্যস্ত, ইতিমধ্যে প্রকোষ্ঠ তৈরি আরম্ভ হয়ে গেছে, ঘাস-পাতার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে এক দল উৎসাহী কর্ম্মী। মৌমাছির চেয়ে পিঁপড়ে আরও খানিক অগ্রসর। ইতর প্রাণীজগতের সভ্যতার মাপকাঠিতে, বাইরের আহৃত আহার্য্যদ্রব্যের উপর কেবল নির্ভর না করে তারা গৃহ-সংলগ্ন উদ্যানে—অনেকক্ষেত্রে খাদ্যবস্তু উৎপন্ন করে। উইপোকার মত সৈন্য সামন্তের পৃথক ব্যবস্থা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। আনন্দ-বিলাসও করে মাঝে মাঝে। সুমিষ্ট রস বা সুধাপানের (সুরা) নিমিত্ত রস-নিঃসরণকারী কীটকে (যেমন নীলমাছি এফিস) ভরণপোষণ করে। আফ্রিকার 'কলাপ্রত্যাক্ত দস্যু' 'চালক-পিঁপড়েরা' দল বেঁধে অভিযানে বের হলে সামনে যা পড়ে নির্ব্বিচারে নিশ্চিহ্ন করে চলে, হস্তী সিংহের মত অমিতবিক্রম পশুও সসম্মানে পথ ছেড়ে পালায়। এরূপ নিখুঁত পারস্পরিক সহযোগিতাকে সাম্যবাদের ভিত্তি বলা যেতে পারে, কিন্তু বুদ্ধির উন্মেষ না হওয়ায় এদের সভ্যতা যান্ত্রিক, মানসিক পর্য্যায়ে উন্নীত হয় নি। এখানে সবাই যেন সহজাত বিশেষ প্রবণতা নিয়ে, স্ব-স্ব নির্দ্ধারিত কাজ ছাড়া অন্য কিছু জানে না, বোঝে না। যৌথ-জীবন ছাড়া অপর আদর্শ নেই, এমন কি একজনের উত্তেজনা দ্রুত সংক্রামিত হয় অন্যদের ভিতর। ব্যক্তিজীবন সমাজের মঙ্গলার্থে—সেই সমাজ ফ্যাসিবাদী সমাজ। এ আত্ম-অচেতন সামাজিক বৃত্তি—নিরুদ্ধ, সঙ্কীর্ণ। অলস পুরুষ-প্রজাকে সুসময়ে উদরপূর্ত্তি করে খাওয়ানো হয়, আবার শীতের নিদারুণ খাদ্যাভাবে স্ত্রী-কর্ম্মীরা তাদেরই ভক্ষণ করে। রাণী-মৌমাছি মসনদ হারাবার ভয়ে আপন যৌবনসম্পন্না কন্যার সহিত মরণপণ যুদ্ধে নামে। অচেনা বিদেশী পিঁপড়ে অপরের কলোনিতে গিয়ে পড়লে মৃত্যু অবধারিত।

পাখী ও স্তন্যপায়ীর সামাজিকতার রূপ স্বতন্ত্র, এখানে ব্যক্তিসত্তা সম্পূর্ণভাবে লীন হয়ে যায় নি গোষ্ঠীসত্তায়; বংশবিস্তার ও বংশ-রক্ষায় এরা অনুভূতিশূন্য নিষ্প্রাণ যন্ত্রমাত্র নয়। ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন না দিয়ে যতদূর সহযোগিতা সম্ভব, উচ্চ প্রাণীজগতে তার ক্রম-বিকাশ পরিলক্ষিত হয়।

মাছ সর্ব্বনিম্ন স্তরের প্রাণী। সঙ্গী পেলে এরাও সুনিশ্চিত আনন্দিত হয়, টবে একটি মাছ হয় ত নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছে, আর একটি এসে যোগ দিলে দেখা যাবে তারা পাশাপাশি মহানন্দে খেলে বেড়াচ্ছে। ছোট মাছের ঝাঁক নদী, সমুদ্র ও জলাশয়ে ঘুরে বেড়ায়—সকলেই দেখেছেন। মাছ ও কুমীর শূন্যরেখাচুতে একত্র হয়ে বধূলাভাকাঙ্ক্ষায় মারামারি করে, এরা প্রকৃত সামাজিক নয়—সহযোগিতা সমাজের সর্ব্বস্তরে ব্যাপ্ত হয় নি। স্বামী-স্ত্রী-শাবক-সমন্বিত পরিবার নীচের স্তরে নেই।

বুদ্ধিপ্রসূত সামাজিকতার প্রথম উন্মেষ বিহঙ্গমকুলে। এদের নীড়রচনায়, শাবক-প্রতিপালনে, আহার-অনুসন্ধানে স্ত্রীপুরুষের ঐকান্তিক সহযোগিতার কথা সুবিদিত। এ বৃত্তি মায়া-মমতা করুণা, স্নেহ ইত্যাদি সমস্ত কোমল প্রবৃত্তির ভিত্তিভূমি। মাতৃস্নেহ, সহানুভূতি, দরদ, অনুকম্পা প্রভৃতির বিকাশ হয় প্রায় দলগঠনের সমকালে, তাই দলস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। পেলিকান সামুদ্রিক জাল থেকে মাছ ধরে একত্রে, সমুদ্রোপকূলের পাখী ম্যাস্নেট ও পফিনরা প্রায় সাম্যবাদী; সন্তান-পরিচর্য্যা ও খাদ্য-সংগ্রহে এদের সহযোগিতা লক্ষণীয়। যূথবাঁধার প্রধান সুবিধা—নিরাপত্তা। শীতের প্রারম্ভে পাখীরা যখন লাখে লাখে শীতপ্রধান অঞ্চল পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র উড্ডীয়মান হয় সে সময় অগণিতসংখ্যকের সমস্ত শক্তি শত্রুদের ঠেকিয়ে রাখে কতকটা। দলভুক্ত না থাকলে অপরিচিত পথের সন্ধান মেলা কঠিন। বংশপরম্পরাগত জ্ঞান (কুলস্মৃতি) সম্ভব যূথে। বিরাট দলে কিছু কিছু ঘুমায়, কিছু জাগে—সকলের এক সঙ্গে নিদ্রাভিভূত ও অরক্ষিত থাকবার সম্ভাবনা নেই। অনেক পক্ষীতত্ত্ববিদ্ বিশ্বাস করেন যে, সামাজিক নিয়মাধীন থাকার দরুন এদের আচরণ অনেকাংশে মার্জ্জিত। পক্ষী-সমাজে অন্যায়ের সমর্থন কেউ করে না, দোষী অবিলম্বে উপযুক্ত প্রতিফল পায়। কোন শক্তিমান অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলের বাসা অবৈধভাবে অধিকার করলে

ন্যোরা সে বাসা ভেঙে দেবার চেষ্টা করে। একজন পক্ষীতত্ত্বানুসন্ধানী ইংলণ্ড স্কটলণ্ডে কাকেদের বিচারসভা প্রত্যক্ষ করেছেন। খানে দুই একটি অপরাধীর মত ম্রিয়মাণ, অন্যেরা গম্ভীর, লাহলময় বিচারপর্ব্বের শেষে নাকি দুই একটি মৃতদেহ সুনিশ্চিত ড়ে থাকে।

পুরাতন যুগে নিছক বেঁচে থাকবার জন্য পরাক্রান্ত শত্রুদের হত প্রচুর যুদ্ধ করতে হ'ত স্তন্যপায়ীদের—সমবেত আত্মরক্ষা ও ক্রমণের প্রয়াসে যূথের উৎপত্তি। তা ছাড়া আসন্ন বিপদসঙ্কেত নিয়ে পূর্ব্বাহ্নে দলস্থ প্রত্যেককে সতর্ক করে দেওয়া আর এক বিধা। শিকারীরা লক্ষ্য করেছেন—বিপদ-আভাসে উপত্যকাচারী গদের রোম খাড়া হয়ে ওঠে, পশ্চাতের শ্বেত রোমগুলি শুভ্রোজ্জ্বল য় এমন জলজ্বল করতে থাকে যে দলস্থ মৃগেরা ও তৎক্ষণাৎ বধান হয়ই, শিকারীরাও সংখ্যা এবং অবস্থান বুঝতে পারেন। র সঙ্গে গন্ধ-গ্রন্থি হতে গন্ধ নিঃসৃত হতে থাকে। সঙ্কেত-আধিক্যে নেক সময় ব্যক্তিগত নিরাপত্তা-সম্ভাবনা হ্রাসপ্রাপ্ত হলেও বিধান জাতির আনুকূল্যে। স্ত্রী-পুরুষ ও শিশুসন্তান নিয়ে কারে পারস্পরিক সাহায্যে সংহত সহযোগিতার সূত্রপাত। বাধ হয়, নেকড়ে এ বিষয়ে অগ্রগামী, ৫ থেকে ৫০০টিকে নয়ে চিরস্থায়ী দল। বিশেষ দ্রুতগতি নয়, শক্তিও বেশী নেই থচ দলগত কার্য্য-পদ্ধতি ও নিয়মানুবর্ত্তিতা এমন চমৎকার যে, দিক্ষ করতেই হয়। টিম্বর নেকড়ে তুষারের উপর দিয়ে পালায় কের পর এক সার বেঁধে, দলপতির পায়ের ছাপের উপর পা ফলে, যেন পলায়মান একটিমাত্র নেকড়ে।

হায়েনা বন্যকুকুর শৃগাল এদেরও কার্য্যকলাপ যূথবদ্ধভাবে, ক্রমণ-আত্মরক্ষায় এরা সবিশেষ পটু। বৈড়ালগোষ্ঠি (বাঘ, সিংহ চিতা, পুমা, জাগুয়ার ইত্যাদি) কদাচিৎ দলবদ্ধ হয় এবং তাও শুধু স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে। ব্যক্তিগত নৈপুণ্য ও শক্তি-সামর্থ্যে এরা ম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল, কিন্তু কুকুরগোষ্ঠির জীবেরা দলস্থ কৌশলী ও আক্রমণদের সাহায্যপুষ্ট হওয়ায় বৈড়ালগোষ্ঠীর ন্যায় এদের ক্রমে ক্রমে নির্মূল হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

প্রকৃত দলগঠন ও পরিচালনা শিখেছে খুরেল স্তন্যপায়ী (মৃগ, বাইসন, বরাহ, ছাগ, মেষ, মহিষ ইত্যাদি, ও হস্তী। প্রতি দল একটি সমর্থ পুরুষ কয়েকটি মাদী ও নাবালকদের নিয়ে—আহার-বিহার, আত্মরক্ষা, আক্রমণ-কৌশল, দলগত নীতির প্রথম পাঠ ইত্যাদি শিক্ষা পরিচালনার কর্তৃত্বাধীনে শৈশবেই সুরু হয়। পারস্পরিক নির্ভরতার ফলে নাবালকেরা নির্ব্বিঘ্নে পরিপুষ্ট ও সবল হয়ে উঠবার সুযোগ পায় সর্ব্বতোভাবে। দলে যেটি সকলের চেয়ে সেরা, বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী, নেতৃত্বের গৌরব তার। সেই বৃদ্ধ পৌরুষযুক্ত পরিচালকের বিচারবুদ্ধিতে আত্মসমর্পণের সার্থকতা যথেষ্ট, আত্মরক্ষা ক্ষুন্নিবৃত্তি ও বংশরক্ষা তারই প্রভাবে। সামাজিক মানুষের শ্লাঘ্য গুণাবলীর ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায় এখানে। পরিচালকের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা, দায়িত্বজ্ঞান পারস্পরিক সহানুভূতি, সতর্ক প্রহরা, সমবেত মন্ত্রণা এমনকি শাসন পর্য্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হতে দেখা যায়। পরাক্রান্ত দলনেতার পরিচালনায় নেকড়েযূথ হয়ত আক্রমণ করল একদল তৃণচরকে, সহজে তারা পালায় না ; মহিষ দল ঘুরে দাঁড়ায়, চটপট শিশু ও নাবালকদের মাঝখানে রেখে জোয়ান মায়েরা বৃত্তাকারে তাদের ঘিরে ফেলে, দলের পুরোভাগে শক্তসমর্থ পুরুষেরা শিং নীচু করে আক্রমণরোধে প্রস্তুত। নিরীহ শ্যামর মেষ এমন নাটকীয় ভঙ্গীতে, সমবেত পদক্ষেপ-ধ্বনি সহকারে অগ্রসর হয় যে পরাক্রমশালী শত্রুও বিচলিত হয়। গোষ্ঠীপ্রধান দলের রক্ষাকর্ত্তা হিসাবে যূথপতি কর্ত্তার গুরু দায়িত্ব, তার প্রভুত্ব-পরিচয় সম্ভ্রম উদ্রিক্ত করে। মেজর ক্লিনর শিকার-প্রতীক্ষায় অবস্থানকালে একবার একটি হাতীর অপূর্ব্ব নেতৃত্ব দেখেছিলেনঃ—আফ্রিকার অরণ্যের নিবিড় তমসা ভেদ করে জলাশয়ের ধারে উপনীত হয়ে এক কৃষ্ণসচল পাহাড় চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগল ; নিস্তব্ধ-গহন বনানীতে নিঃশব্দ মূর্ত্তি চেয়েই দেখছে—না, শঙ্কার কারণ নেই। আরও খানিক অগ্রসর হয়ে সতর্ক পদসঞ্চারে পৌঁছল জলপ্রান্তে, চারিদিক পরীক্ষান্তে সম্মুখস্থ বনে ফিরে গেল ; কয়েক মিনিটের মধ্যে আবার ফিরে এল সঙ্গে পাঁচটি পার্শ্বচর হস্তী, জলার গমনপথে স্তম্ভের মত তাদের দাঁড় করানো হ'ল। দাঁতাল পুনরায় প্রবেশ করল বনে, এবার প্রায় শতাধিক নানা আকারের হাতী স্থির অচঞ্চলভাবে প্রহরায় রত, সান্ত্রীদের কাছ অবধি গিয়ে সে দাঁড়াল,—আবার পর্য্যবেক্ষণ ও পরিদর্শনের পালা। নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ যূথপতির আজ্ঞা মিলল অবশেষে, ভয়ভর ভুলে ফেলে তখন হুড়মুড় করে নামল অবগাহনে। এক দিকে দলনায়কের বিচক্ষণ কর্ম্মকুশলতা, প্রতাপ এবং দলরক্ষায় আশ্চর্য্য প্রযত্ন ; অপর দিকে দলস্থদের অবিচলিত নিষ্ঠা, অভিজ্ঞতা-নৈপুণ্যে অকৃত্রিম আস্থা কেবল যে দলকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে রাখে তাই নয়, সামাজিকতা-অনুগামী কোন কোন কোমলবৃত্তিরও বিকাশ ঘটেছে এই পথে। সার্ব্বজনীন সহানুভূতির কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হয়েছে, আত্মরক্ষায় থাকে পলায়ন-বৃত্তির উদ্ভব, দলপতিত্বের শ্লাঘা ও প্রভুত্ববাঞ্ছনা আশ্রিতের মনে সৃষ্টি করেছে আত্মসমর্পণের প্রবৃত্তি, পরার্থপরতা ও কিয়ৎ পরিমাণে হীনমন্যতা। দলচ্যুত হাতী দুর্দ্দান্ত বর্ব্বরপ্রাণীতে পরিণত হয়। যে দাঁতালদের ধ্বংসকারী দয়াহীন দস্যুমনোবৃত্তির কথা শোনা যায়, অনুসন্ধানে দেখা যাবে তারা দল-বিতাড়িত এবং ক্ষিপ্তপ্রায়।

মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে বনমানুষ সবচেয়ে অধিক বুদ্ধিমান, এ কারণ এরা সর্ব্বাধিক সামাজিক। বনমানুষগোষ্ঠীর অন্তর্গত এক-শাখায় মানুষের উৎপত্তি বলে যে মতবাদ প্রতিষ্ঠিত, এদের স্নেহ-প্রীতি, মায়া-মমতা, দরদ দেখলে তা অবিশ্বাস্য বোধ হয় না। পারস্পরিক আদান-প্রদান ব্যতিরেকে সামাজিক বৃত্তির উদ্ভব অসম্ভব, আত্মসচেতনবুদ্ধির রেশ থাকলে পরার্থপরতা এবং হিতৈষণার ভাব দেখা যায়। কোলেহ, জুকরম্যান, ইয়েক বনমানুষের জীবনযাত্রা ও ধরণ-ধারণ বহুদিন যাবৎ পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের ফলে এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে এরা সমাজ ছাড়া থাকতে পারে না। শিম্পাঞ্জী ও বেবুন

বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা মিশুক ; বিচ্ছিন্ন নির্জ্জন খাঁচায় এরা অতিশয় দুঃখী,—কান্নাকাটি চীৎকার দাপাদাপি লাগিয়ে দেয়। সহানুভূতিশীল সঙ্গীরা গরাদের বাইরে থেকে হাত বাড়িয়ে সান্ত্বনাভরে গলা জড়িয়ে ধরে ; মানুষের সঙ্গেও অবলীলাক্রমে বন্ধুত্ব পাতিয়ে এরা আমোদ-প্রমোদ করে। অর্ব্বাচীন শিম্পাঞ্জী-দলে চমৎকার সহযোগিতা দৃষ্ট হয়। বন-উপবন তোলপাড় করে ক্রীড়া-উপভোগ করবার সময়, মেয়েদেরও নেতৃত্ব করতে দেখা যায়। জনতা-মনস্তত্ত্ব আবেগময় উত্তেজনা-মুহূর্ত্তে যৌক্তিকতার ধার ধারে না—বনমানুষে ঐ ভাবের পূর্ণ প্রকাশ। দলস্থ কারও সামান্য আর্ত্তস্বর, একটু বিলাপে প্রত্যেকে রাগান্বিত হয়ে ছুটে যায় তার রক্ষার্থে। কৌলেহ দেখেছেন—দলের মধ্যে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া বিপজ্জনক, প্রিয় ব্যক্তিরও জীবনসংশয় হবার সম্ভাবনা থাকে।

ডারউইন বেবুনদের সহযোগিতার কথা অনেক ঘটনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। আবিসিনিয়ার এক বেবুনদল উপত্যকা অতিক্রম করছিল, ওদিককার শৈলে কেউ কেউ পৌঁছেছে, কেউ এদিকেই আছে এমন সময় শিকারী কুকুরদল আক্রমণ করল। বয়স্ক মদ্দারা নেমে এমন তর্জ্জন-গর্জ্জন আরম্ভ করল যে কুকুরদের সাধ্য কি এগোয়, পুনরায় উৎসাহিত হয়ে কুকুররা যখন এগিয়ে এল ততক্ষণে ওরা পগারপার, শুধু একটি বাচ্চা পড়েছে কুকুরদের কবলে। তার কাতর আর্ত্তনাদে অকস্মাৎ এক বৃহৎ বেবুন বাচ্চাটির কাছে লাফিয়ে পড়ল, তাকে আদর করে কোলে তুলে দে চম্পট,—কুকুরদল আর শিকারীরা হতভম্ব।

মৃত সঙ্গীর জন্য প্রাণীদের উৎকণ্ঠা সুবিদিত। চিড়িয়াখানায় বাঁদরমাতা বা বনমানুষমাতার বক্ষসংলগ্ন মৃত শিশু অপসারণ দুষ্কর। এক শিকারীদল একটি মাদী বনমানুষ নিহত করে তাঁবুতে নিয়ে এল, অনতিবিলম্বে চল্লিশ-পঞ্চাশটির এক দল তাঁবু বেষ্টন করে এমন চীৎকার আরম্ভ করল যে, কান ঝালাপালা। বন্দুকের আওয়াজে দলপতি ছাড়া সকলে পালায় আবার ফিরে আসে, আকারে ইঙ্গিতে বিলাপ করে মৃতদেহ ফিরিয়ে চায়। দিতে হ'ল শেষে, সেই বেদনাবিধুর মূহ্যমান প্রাণীকুলের শোকযাত্রা মর্ম্মস্পর্শী।

যূথে আর একটি সদ্‌গুণের বিকাশ হয়েছে—চমকপ্রদ বন্ধুত্ব।

উচ্চপ্রাণীকুল এতদূর সংসর্গকামী যে, তারা নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকা অপেক্ষা অন্য জাতের অপরিচিত সঙ্গী সময় সময় সমাদরে গ্রহণ করে। এ বিষয়ে সবচেয়ে অগ্রণী বানর, বনমানুষ। অনাথ কুকুর-বিড়ালশাবক বেবুন ওরাংওটাং কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হতে দেখা গেছে। পশুশালায় অ-সম সখ্যের কথা প্রায়ই শোনা যায়,—ওরাং তরুণের সহিত শেছো কাঙারুর ভাব, অশ্বের সহিত বল্‌গাহরিণের সখ্য ইত্যাদি; বেবুন শূকর ও কুকুর প্রত্যহ এক স্থানে মিলিত হচ্ছে, এমন কি এক সিংহশিশুকে বক্ত-শশকের গৃহে কিছুদিন বাস করতে হয়েছিল, এমন দৃষ্টান্তও আছে। রাস্তার কুকুর স্বল্প-পরিচিত মানুষের অদূরে নিঃশব্দে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে বসে থাকবে, নিঃসঙ্গ হলে হাঁকডাক চীৎকার।

প্রাণীজগতের উপরের স্তরে সুসংহত সহযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের ভিত্তি—সহজ বুদ্ধির বিকাশ আরম্ভ হয়েছে। দুরন্ত পাশবিকতায় পড়েছে খানিকটা সুকোমল প্রলেপ—স্নেহ, মমতা, ভালবাসা, করুণা ও সমবেদনার উন্মেষ শুধু সমাজে, জনসাধারণের সংস্পর্শে। নীতিগঠন ও বিকাশে সামাজিক শক্তি সবিশেষ কার্য্যকর। মহানুভবতা ও নির্ভীক ন্যায়পরায়ণতার মত চারিত্রিক গুণের একক পরিস্ফুরণ অসম্ভব, মানুষ সামাজিক বলেই এদের বিকাশ। মানুষ আত্মসচেতন হয়েও সামাজিক, আত্মানুরাগী হয়েও পরোপকারী—তাই তার অন্তরে বিবেক জেগে রয়েছে অতন্দ্র প্রহরীর মত, মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করছে যুগযুগান্ত ধরে।

তপন ও শিশির

শ্রীকালিদাস রায়

"তপন তোমার স্বপন দেখি যে করিতে পারি না সেবা,"
একথা বলিল কেবা
কে সে ? সে যে আমি। কেহ তাহা নাহি জানে,
তুমি তা জানিতে তাই তুমি কবি সান্ত্বনা দিলে প্রাণে।
কুন্দের বনে সারা রাতি জাগি তোমার প্রতীক্ষাতে
প্রাচী দিগন্তে হেরিলাম তোমা প্রাতে।
সারারাতি হেরি তোমার স্বপ্ন প্রভাতে সেবিব বলি'
ছিলাম কৌতূহলী।
রক্তকরবীসঙ্কাশ তব রূপ দরশন করি,
ভয়ে ভাবনায় বিস্ময়ে কেঁপে মরি।
তীব্র মরীচি সংবরি স্নেহ-কর পরশন ক'রে
মুক্তার মত অমল ভাতিতে উজল করিলে মোরে।
হ'লাম শোভায় ভরা
ধন্য হইল শিশিরজীবন নিশির নয়নঝরা।

কাকজ্যোৎস্না

শ্রীবিভা মুখোপাধ্যায়

বন্ধ জানালার ফাঁকে এক ফালি সূর্য্যরশ্মির মতই একগাদা সরকারী চিঠির ভিতর থেকে চোখে পড়ে গোলাপী খামখানা, এক কোণে সোনালি প্রজাপতি।

খুশি মনে চিঠিটা খুলে ফেলি।

বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র। আগামী বাইশে মাঘ উষাকান্ত ভট্টাচার্য্যের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী নীলার বিয়ে...।

নীলা! ঝাপসা বিবর্ণ অতীতের ছায়ার ভিতরেও যার ছবি স্মৃতিপটে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

নীলার বাবার নাম-স্বাক্ষরিত চিঠি—রূপোর্ট তা হলে রীতিমত সামাজিক মতেই হচ্ছে।

কিন্তু পাত্রটি কে? ভবানীকুমার রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র সুধীর রায়...।

মুহূর্তে চোখের পাতা দুটো বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। পরিমাণহীন বিরক্তি যেন উদ্বেল হয়ে উঠতে চায় সারা অন্তর জুড়ে।

এও কি সম্ভব?

কয়েকটি মুহূর্ত! কিন্তু এই কয়েকটি মুহূর্তেই স্মৃতির পরিধি পরিক্রমণ করে এলাম।

কথাটা অবশ্য প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল ডায়মণ্ড হারবার যাবার উদ্যোগপর্ব্বে। আয়োজন যখন সম্পূর্ণ নীলা হঠাৎ বেঁকে বসল।—যাবে না অনুমতি পায় নি বলে।

"অনুমতি? কার আবার?"—বিস্ময়ে বোবা হয়ে যাই।

ঠোঁটের পাশে অর্থপূর্ণ হাসির ঝিলিক খেলিয়ে নীলা ছোট্ট একটি জবাব দিল, "মালিকের।"

কতকটা আন্দাজ করে নিয়ে বলি, "কেন? দশটা থেকে পাঁচটা অবধি যাদের মধ্যে কাজ করতে ছেড়ে দেন তাদের সঙ্গে একদিন বেড়াতে যাবার অনুমতিই-বা দেবেন না কেন? এ কোন্ যুক্তিহীন জবরদস্তি!"

ফোঁস করে ওঠে নীলা, "যুক্তি থাক বা না থাক, আমি যাব না।"

এর পরে আর তর্ক চলে না।

তবে নীলাকে দেবার সঙ্গে নেওয়া সম্ভব হয় নি, কেননা মালিকের অনুজ্ঞা তার কাছে বেদবাক্যের মতই শিরোধার্য্য।

পরে অবশ্য জেনেছিলাম আমাদের সঙ্গে বেড়াতে দিতে বাধা না থাকলেও আপত্তি উঠেছিল নীলার 'ডেলিকেট' স্বাস্থ্যের জন্য।

আর সেই সূত্রে সবাই জেনেছিলাম নীলা বরুণ গুপ্তকে ভালবাসে। নীলা বরুণের খেলাঘরের সাথী, কৈশোরের সঙ্গিনী, যৌবনের প্রেয়সী। পাতার বুকে কুঁড়ির মতই বরুণের জীবনের আলোয় নিজের ছায়া মেলে বেড়ে উঠেছে নীলা।

তবু দেবতার কোপদৃষ্টির মতই ওদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে অহেতুক বর্ণ বৈষম্যের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। নীলা বামুন, বরুণ গুপ্ত—বৈদ্য। কিন্তু অন্তরের আগুনে কি পুড়ে ছাই হয়ে যায় না ব্যবধানের স্তূপ?

বরুণও ডাক্তারি পাস করে চলে যাবে পশ্চিমে। সেখানেই প্র্যাক্‌টিস সুরু করবে। তারপর ছোট্ট একখানি বাংলো প্যাটার্নের ঝকঝকে বাড়ী, আর সাজানো সুন্দর সংসার। বরুণ-মন্দিরে হবে দেবী নীলার অভিষেক।

নীলা জানে আনন্দ-রসঘন প্রেম তাদের জীবনে সব-কিছুকেই মধুর করে তুলবে। অভাবকে ভরে দেবে অনুভব দিয়ে। প্রেমের স্বর্গসুধায় মর্ত্ত্যের দুঃখদৈন্য ঢেকে যাবে। শ্যামল, সরস হয়ে উঠবে ধরণীর ধূলি-রুক্ষ সংসার।

"সেইজন্যই ত চাই সংযম আর প্রতীক্ষা, এ ত শুধু বিয়ে নয়। এ যে আবহমান কাল ধরে আরাধনা-করা মর্ত্ত্যলোকে স্বর্গের আবাহন।"—নিজের মনের উচ্ছ্বাসে বলে চলে নীলা।

ওকে থামিয়ে দিয়ে বলি, "রাখুন এ সব কাব্য। মেয়েদের এই প্রেমে পড়ার ইতিবৃত্ত আর জানতে বাকি নেই। ওটা একটা ফ্যাসান।"—বিদ্রূপের ঝাঁজ ফুটে ওঠে আমার কণ্ঠে।

"কি যে বলেন—প্রেমে পড়া ফ্যাসান। ইচ্ছে করে দেখে শুনে কেউ প্রেমে পড়ে? একি হাতের ঢিল, ছুঁড়ে দিলেই হ'ল?"

তর্কের তুফান তুলে বিদ্রূপের খোঁচায় তিক্ত করে ওকে ক্ষেপিয়ে তুলতে আমার অফুরন্ত উৎসাহ।

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। চেয়ে দেখি ওর সুশ্রী মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়েছে অস্তরবির রক্তিম আভা। মুগ্ধদৃষ্টিতে এক নজর তাকিয়ে নিয়ে অবাধ্য হাসির বেগকে চাপতে চাপতে বলি, "তা ছাড়া কি? আজকাল ত এই রেওয়াজ। ফুলে ফুলে প্রজাপতির মধুসংগ্রহের মতই আজকালকার ছেলেমেয়েরা হুটহাট করে প্রেমে পড়ছে আর ছাড়ছে। এ ত পদ্মপত্রে

শিশিরবিন্দু। এ প্রেমের স্থায়িত্ব কতদিনের—মূল্যই-বা কতটুকু ?

নীলা জবাব দিলে না। অকারণ হিজিবিজি কেটে চলল ড্রাফট-প্যাডের উপর। ওর নীরবতার সুযোগ নিয়ে শেষ-অস্ত্র নিক্ষেপ করলাম—

"যাক গে, অনর্থক এড়ে-তর্ক তুলে লাভ নেই। বলুন ত, বরুণ গুপ্তের মেয়াদ আর কতদিন ? তার পর কি..." কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে ঠোঁটের পাশে কুটিল হাসির তির্য্যক ছটা ফুটিয়ে তুললাম।

হারবার পাত্রী নীলা নয়।

ক্ষুরধার রসনায় ওর প্রশ্ন তৈরি, "কেন, তার পর কি আপনি পালা সুরু করবেন ?"

"আশা রাখতে ক্ষতি কি ?" সকৌতুকে বলি।

ধনুকের মত ভুরুতে তাচ্ছিল্যের রেখা ফুটিয়ে তুলে নীলা জবাব দিল, "সে গুড়ে বালি। আশাভঙ্গের দুঃখ পেতে হবে।"

অবশ্য আশাভঙ্গে আমি ক্ষুণ্ণ নই।

বহু আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্কের ভিতর দিয়ে উপলব্ধি করেছি নীলার ভালবাসার গভীরতা। বিরাট আকাশের মতই ওর ভালবাসা অপার—অনন্ত। তাতে নেই কোন মোহ, কোন মাদকতা। শুচি-সুন্দর পূজারিণীর অর্ঘ্যের মতই অন্তরের শুভ্রতায় তা নির্ম্মল, পবিত্র। আত্মনিবেদনের মাধুর্য্যে মণ্ডিত।

পরিচয় ঘনিষ্ঠ হতে হতে এটাও বুঝেছিলাম প্রদীপের জোড়া সঙ্গতের মতই নীলা-বরুণ পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে। এর মধ্যে ফাঁক বা ফাঁকির স্থান নেই।

সহকর্ম্মী নিভাদিও অবশ্য এই কথাই বলেন। বাইবেলের ভাষাকে একটু বদলে নিভাদি বলেন, "শেখর যাই বলুক, আমি জানি নীলা 'ইউ আর দাই বিলাভেড্‌স এণ্ড হিজ ডিজায়ার্স আর আনটু ইউ।' (তুমি তোমার প্রিয়তমের এবং তার আকাঙ্ক্ষাগুলো রয়েছে তোমার মধ্যে।)"

আবেগে নুয়ে পড়ে নীলা। জীবনের গভীরতম পাওয়ার স্বীকৃতির আনন্দে ওর চোখে এক লহমায় ঘনিয়ে আসে অপূর্ব্ব লাজ-নম্রতা। আর সেদিন কোলাহলমুখর আপিসের পরিবেশেও কি মহীয়সী মনে হয়েছিল নীলাকে !

মনে মনে নীলার সেই পুলকোদ্ভাসিত মুখখানা যেন আজও দেখতে পাই।

ঘড়ির আওয়াজে চমক ভাঙল। নয়টা !

এ কি, দু'ঘণ্টা ধরে পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে চলেছি। জীবনের ছটায় দ্যুতিময় হয়েছিল বলেই কি সেদিনের টুকরো টুকরো স্মৃতিগুলি আজও বিস্মৃতির অন্তরালে চাপা পড়ে নি ? কিন্তু খুব জরুরি একটা কাজ আছে 'ফার্ষ্ট আওয়ারে।'

কাজের ফাঁকে ফাঁকে আরও কয়েকবার নীলাকে মনে পড়ল। ফাইলের পাতায় পাতায় ফিকে-রঙা শাড়ীর আবছা ছায়া।

কিন্তু কে জানত, সেদিনের সেই সজীবতার জন্ত অপেক্ষা করে ছিল আজকের এই ধূসর-মরুর রুক্ষতা !

কতদিন কেটে গেল। নীলা-নিভাদিদের ছেড়ে চার্চ লেনের আপিস থেকে ছিটকে পড়লাম এই সরবরাহ দপ্তরে। একেবারে খাড়া উঁচু পথে। ডেসপ্যাচ ক্লার্ক থেকে ক্লাস ওয়ান অফিসার। বৃষ্টি-ধোয়া আকাশের মতই চার্চ লেনের দিনগুলো ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। অনুভূতি নেই—আছে স্মৃতি। সেই স্মৃতির মৌচাকে ঢিল পড়ল। সামান্য একটা চিঠি বয়ে নিয়ে এল যত রাজ্যের অস্বস্তি আর অন্তরের আলোড়ন।

এমন ত কত গল্পে পড়েছি। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখেছি কত তরুণ-তরুণীর অদৃষ্টে ঘটে এই মর্ম্মান্তিক অভিজ্ঞতা। জীবনের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষাও অর্থহীন হয়ে যায়। আচমকা ঘুম ভেঙে দেখার মত মনে হয় সবই ফাঁকি—সব মিথ্যে। এত দিন যাকে চেয়ে এসেছি তাকে আর চাই না। ট্রেনের জানালা দিয়ে দেখা গাছের সারির মত সেই একান্ত চাওয়াও ক্রমবিলীয়মান—অস্পষ্ট হয়ে যায়।

হয় ত বরুণ কোন কুহকিনীর মায়ায় আটকা পড়েছে। সর্ব্বনাশা মোহের ঊর্ণাজালে বন্দী ভ্রমরকে নীলা উদ্ধার করতে পারে নি। তাই নিজেকে করতে চেয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত নিঃশেষে ফুরিয়ে যাবার জন্যে। নিরালম্ব আকাশে ভাসবার কিংবা অতল পাতালে ডুব দেবার জন্তই কি নীলার এই বাসর-সজ্জা ?

রহস্যের কূলকিনারা পাই না।

এদিকে অবিরাম গতিতে এগিয়ে চলে সময়। অনুপল, পল, দণ্ড পরিণতি পায় দিনে, দিন সময়ের চাকায় ঘুরে পরিণতি পায় পক্ষে—পক্ষ মাসে, মাস ঘোরে বছরে।

ছয়টি বছর কেটে গেল।

সরকারী দাক্ষিণ্যে ফেঁপে-ফুলে উঠেছি। খেতাবওয়ালা একজন দিকপাল। রাজভবন থেকে কংগ্রেস আপিস পর্য্যন্ত 'সব ঠাঁই মোর ঘর' আছে। নূতন এক হাসপাতালের উদ্বোধনের জন্ত ডাক পড়ল রূপগঞ্জ থানায়। স্থানীয় অধিবাসীদের সাহায্যে ডাঃ গুপ্ত নিজেই অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই হাসপাতালটি গড়ে তুলেছেন। সরকারের কাছ থেকে

মোটা রকমের একটা গ্রাণ্ট পাবার আশাতেই আমাকে আনানো হয়েছে।

ডাঃ গুপ্তকে দেখে মনে হ'ল যেন হালভাঙা একখানা নৌকা। ঝড়ের হাওয়ায় সব যেন তাঁর ওলটপালট হয়ে গিয়েছে। চালচলনে, বেশবাসে যথেষ্ট উদাসীনতা লক্ষ্য করলাম। এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখের কোণে কালি। সমস্ত শরীরে মাংসের লেশমাত্র নেই। একটা কঙ্কাল যেন চামড়া দিয়ে ঢাকা। কিন্তু সেই কঙ্কালসার দেহেই যেন ভেল্কি খেলে। কি অদ্ভুত কর্ম্মক্ষমতা! ভদ্রলোকের চোখ দুটো অস্বাভাবিক প্রখর—বড় বেশী স্পষ্ট।

দেখেই মনে হ'ল কোথায় যেন দেখেছি এঁকে। কিন্তু স্মৃতির সমুদ্র মন্থন করেও এ ধরনের একখানা মুখ মনে করতে পারলাম না।

রাতে ফেরবার ট্রেন ছিল না বলেই ডাকবাংলোয় থাকতে হ'ল। সন্ধ্যার পর ডাঃ গুপ্ত এলেন গ্রাণ্ট সম্পর্কে খবর নিতে। একথা সেকথার পর ভদ্রলোক হঠাৎ প্রশ্ন করেন, "আমায় চিনতে পারলেন না?"

"না ত!"—আমতা আমতা করে জবাব দি'।

"ভুলে গেছেন! আমি কিন্তু আপনাকে ভুলি নি।" হেসে গুপ্ত বল্লেন। গুপ্তের কথা বলার ভঙ্গীতে আশ্চর্য্য বোধ করলাম।

"নী—লা! হাঁ—হাঁ। নীলাকে—নিশ্চয়ই ভোলেন নি!" হঠাৎ অপ্রকৃতিস্থের মত সশব্দে হেসে উঠলেন। দুইটি চোখ যেন দুই খণ্ড অঙ্গার।

এ কি সেই বরুণ গুপ্ত, নীলা যার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল?

পাশাপাশি দুইটি চেয়ারে ঘন হয়ে বসলাম।

সময়ের স্রোতে যা অবলুপ্ত তারই আজ রহস্যোদ্ধার হোক।

ডাঃ গুপ্ত আরম্ভ করলেন, "কাহিনী ত আপনার জানা।"

"সে ত গোড়ার অংশ। পরের ইতিহাস?"

"শেষ অধ্যায়! সে ত বিরোধ-সংঘর্ষের ছোট ছোট নুড়িতে ভর্ত্তি নয়, একটানা পিছিয়ে আসার গল্প।"—চাপা উত্তেজনায় তাঁর চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে ওঠে।

কোন প্রশ্ন করলাম না। বদ্ধ ঝরণার মুখ আপনিই খুলে গেল—

বরুণ এল কলকাতায় ডাক্তারি পড়তে। আর বরুণ-বিহীন মালদহ শহরটা নীলার কাছে হয়ে উঠল ছবিষহ। এক রকম জেদ করেই সেও এসে যোগ দিল চার্চ লেনের আপিসে।

তবুও ত এক শহরে বাস।

বালিগঞ্জে একখানা ঘর নিয়ে নীলা ও তার ভাই থাকে। আর সময়ে-অসময়ে বরুণের অভ্যাগমে সেই ছোট্ট ঘরখানি ধন্য হয়ে উঠে।

মাঝে মাঝে বরুণ তার বন্ধুদের নিয়েও আচমকা এসে নীলাকে বিব্রত করে তুলেছে তার অপটু হাতের নতুন গৃহস্থালিতে। নীলা যুগিয়েছে চা, সঙ্গে 'টা'; গল্প সিগারেটও চলেছে সমান তালে। বরুণের অনুপস্থিতিতেও তার বন্ধুরা নীলার ওখানে আসা যাওয়া করেছে!

"এ সব ত আমার জানা।"

হেসে মাথা নেড়ে গুপ্ত তা সমর্থন করলেন।

"সেদিন বিকেল থেকেই আকাশটা অন্ধকার হয়ে এল। সন্ধ্যা হতে না হতেই হাওয়ায় ঠাণ্ডা আমেজ নিয়ে বৃষ্টি নামল। ভেবেছিলাম আগে থেকে খবর না জানিয়ে হঠাৎ গিয়ে নীলাকে আজ তাক লাগিয়ে দেব। কিন্তু বেআক্কেলে বৃষ্টি আর নামবার সময় পেল না। মনে মনে বড় দমে গেলাম। বদ্ধ ঘরে বসে নীলার কথা ভাবতে ভাবতে তাকে দেখবার একটা দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা আমায় পেয়ে বসল। হঠাৎ কি ভেবে, বর্ষাতি নিয়ে রওনা হলাম।"—ভদ্রলোক থামলেন।

"তার পর?"—কৌতূহলী হয়ে উঠি।

"তার পর।"—গুপ্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন। এক মিনিট কি ভেবে নিয়ে আক্ষেপের সুরে বল্লেন, "না গেলেই ভাল হ'ত।"

"কেন?"—অধীর আগ্রহে গুপ্তের মুখপানে তাকাই।

"গিয়ে যা দেখলাম তাতে আমার শরীর জ্বলে উঠল। অজান্তে যেন সাপের গায়ে পা তুলে দিয়েছি। দিনের আলোয় যেখানে মুঠো মুঠো ফুল কুড়িয়েছি, রাতের অন্ধকারে সেখানে লক্ষ লক্ষ কালকেউটের বিষাক্ত নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলাম। আমারই বন্ধু—সুহাস।

"কি বলছেন!"—বিস্ময়ে প্রতিবাদ করে উঠি, "সম্পূর্ণ মিথ্যে।"

"মিথ্যে!"—গুপ্তের ঠোঁটের পাশে বিদ্রূপের ঝিলিক খেলে যায়।

"হাঁ, হাঁ, মনে হয় আপনি ভুল করেছেন। এ অসম্ভব।"

"অসম্ভব!"—গুপ্ত গর্জ্জে উঠেন, "ঘর অন্ধকার। দরজা বন্ধ। মনে হ'ল ভিতরে কারা যেন মৃদু কণ্ঠে কথা বলছে। কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলাম। আর সেই মুহূর্ত্তে এক ঝলক বিদ্যুতের আলোয় খোলা জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম নীলার একেবারে কাছ ঘেঁসে বসে সুহাস। আপন

মনে অনর্গল বকে চলেছে নীলা। পৃথিবীর অস্তিত্বকে ওরা যেন ভুলে গিয়েছে। তন্ময় হয়ে ডুবে গেছে এরা নিজেদের ভিতরে। চুপি চুপি ফিরে এলাম।”—চাপা দীর্ঘশ্বাসে গুপ্ত কেঁপে ওঠে।

এ যেন সম্পূর্ণ অলীক, অসম্ভব। মিথ্যে এক বানানো গল্প। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠি, “এক ঝলক আলোয় কি দেখলেন না দেখলেন ঠিক নেই অথচ এভাবে নীলাকে অপবাদ দিতে আপনার বাধছে না। আশ্চর্য্য! হয়ত সবটাই আপনার চোখের ভুল!”

“ভুল! চো-খে-র-ভু-ল!” আত্মগত ভাবে আমারই শেষ কথা কয়টি উচ্চারণ করলেন গুপ্ত। তারপর তার প্রখর চোখ দুটি তুলে আমার দিকে এমন ভাবে তাকালেন যে আমারও মায়া হ'ল।

বললাম, “না হয় ধরে নিলাম যা দেখেছেন, যা ভেবেছেন তা সত্যি। কিন্তু একবার কেন খোলাখুলি জানতে চাইলেন না?”

“যাচাই করে নিতে হবে? আমি জানি সুহাস রূপে-গুণে বিদ্যাবুদ্ধিতে আমার অনেক উপরে। নীলা যদি সুখী হয়...না—না—অভিযোগ কিছু নেই আমার।”—থেমে থেমে ভদ্রলোক জবাব দিলেন। মনে হ'ল কথা বলতে তার কষ্ট হচ্ছে।

“কিন্তু জানেন শেখরবাবু আশ্চর্য্য সেখানেই—নীলা সুহাসকে বিয়ে করে নি। বিয়ে করল সুবীর রায়কে।”—যেন গুমোটের পর এক ঝলক হাওয়া ছাড়ার মত গুপ্ত হেসে উঠলেন।

কঠিন গলায় জবাব দিলাম, “এর ভেতর আশ্চর্য্যের কিছু নেই, নীলার কাছে সুহাসও যা সুবীরও তাই!”

“অর্থাৎ?” গুপ্ত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়।

“এ সহজ অর্থটা বোঝেন না?” ভর্ৎসনার সুরে বলে উঠি, “কেননা নীলার কাছে পুরুষ ছিলেন একমাত্র আপনি। ...তাকে ভালবেসেছিলেন সত্যি, কিন্তু বিশ্বাস আপনার ছিল না। যাকে দেখেছিলেন, সে সুহাস নয়, শেখর।”

নিমেষে গুপ্ত স্তব্ধ হয়ে যায়। দেখতে দেখতে ওর প্রখর চোখ দুটো আরও প্রখর হয়ে ওঠে। প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বের দুঃসহ বেদনায় সমস্ত শরীরটা যেন থর থর করে কাঁপে।

কুসুম-লিপিকা

শ্রীসুধীর গুপ্ত

তোমার প্রেমাশ্রু-ঝরা কুসুম-লিপিকা
সবুজ পাতার খামে সযতনে আবরি'
পাঠাও প্রেয়সী মোর; ওগো বিরহিণী,
ফিরে ফিরে এ প্রবাসে তাই শুধু পড়ি।
তোমার অসংখ্য কাজ; তবু বিভাবরী
জাগিয়া রচিলে লিপি; যত ভাবি তাই
রোমাঞ্চিয়া ওঠে হিয়া; নিজ ক্ষুদ্রতায়
তোমার প্রেমের কাছে নিজে লজ্জা পাই।

ঘুমেতে স্বপন বোনে তব ভালোবাসা;
জাগিলে তোমার লিপি নয়নাভিরাম
কত না প্রেমার্দ্র-ভরা বার্তা দিয়ে যায়!
সুধায় ভরিয়া তোলে প্রবাসের ধাম।
হে অনাদি প্রিয়া মোর—চির-প্রেমারাম
বিরহেও ভাবি শুধু বিরহ কোথায়!
প্রেমের সুবাসে তব ভরে ভূমণ্ডল;—
এ কী লেখা লিখিতেছ পুষ্প-লিপিকায়!

এত দিনে এই কথা বুঝিয়াছি সার,—
কণামাত্র প্রেম তব ভাগ্যে যা'র মেলে,
উত্তরিয়া শুষ্ক—রুক্ষ বন্ধুর পাহাড়
তা'র স্বপ্ন-সম্মিলন; চিত্ত ছেয়ে ফেলে
সেই প্রেম,—মৃগনাভি সুবাসের প্রায়;—
প্রবাস-বিরহ হয় মিলনেরও বাড়া;
অচিন্ত্য রহস্য কী যে! প্রেমে বিশ্ব ছায়,—
বিন্দু প্রেমে রূপ ধরে সর্ব্ব সিন্ধু-ধারা।

ভারতে শিশু শ্রমিক

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়

পরিবারের সকলে যেখানে খেটে খায় সেখানে নাবালকদেরও কতকটা শ্রমসাধ্য কর্মে নিয়োগ করা অপরাধজনক কাজ বলে গণ্য হতে পারে না। যেমন ধরুন, নাবালক পুত্র তার পিতামাতার সঙ্গে ক্ষেতখামারের কাজ করল বা নিজেদের ছোট কারখানায়, যেমন কামারশালা ইত্যাদিতে, বসে বাবা-কাকাকে সাহায্য করল অথবা গৃহস্থালির কাজে মা-বোনকে সাহায্য করল। এতে অন্যায় কিছু হবে না। শিশুকে দিয়ে এমন ধরনের কমবেশী খাটুনির কাজ করাবার রীতি অনেকদিন ধরেই চলে আসছে। মধ্যযুগে যখন 'গোষ্ঠী খাটুনি প্রথা' চালু ছিল তখন পুত্রকে দক্ষ কারিকর তৈরি করার জন্য পিতা অতি শৈশব থেকেই ছেলেকে নিজের কাছে কাছে রেখে কাজ শেখাতেন। ঐ প্রথাকেও নিন্দা করা যায় না। কারণ যে কাজ করলে শিশুর উন্নতি হয় এবং তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি বা স্বাধীনতা খর্ব হয় না, তাকে কি করে নিন্দা করা যাবে? তবে কোন নাবালক ছেলেমেয়েকে যদি বেগার খাটানো হয়, অথবা পারিবারিক আয়বৃদ্ধির জন্য শিশুকে যদি এমন শ্রমসাধ্য কোন কাজে নিয়োগ করা যায়, যেখানে তার দৈহিক বা মানসিক উন্নতি ব্যাহত হয় তবে তা অবশ্যই অপরাধজনক কাজ বলে পরিগণিত হবে। কারণ কাজের আনন্দ বা শিক্ষার গৌরব সেখানে থাকবে না, তার স্বাস্থ্য, শক্তি এবং মনের উপর অসম্ভব চাপ পড়বে, প্রতিভার বিকাশ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। আর্থিক কারণে শিশুদের এই প্রকার শ্রমসাধ্য কার্যে নিয়োগের বিরুদ্ধে সকলেরই আপত্তি।

শিল্প-বিপ্লবের পর শিশু শ্রমিকের দুঃসহ অবস্থার প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ইংলণ্ডে বাষ্পে চালিত কলকারখানায় বহু শিশু শ্রমিক অমানুষিক অবস্থার মধ্যে কাজ করত। যেসব ঘরে তারা কাজ করত কোন কোন সময় সেসব ঘরের উত্তাপ থাকত প্রায় ৮০ থেকে ৮৫ ডিগ্রী। সারা কক্ষে থাকত ধূলা ভর্তি। তাদের একটানা বারো থেকে চৌদ্দ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হ'ত।

এমনি অবস্থা যে কেবল ইংলণ্ডেই ছিল তা নয়, শিল্প-বিপ্লবের পর ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম, এমনকি মার্কিন মুলুকের শিশু শ্রমিকদেরও ঐ প্রকার দুঃসহ অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হ'ত। এদের দুরবস্থা দেখে প্রত্যেক দেশেই আইন করে নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত কোন বালক বালিকাকে কর্মে নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু তাতেও যে এ পাপ সম্পূর্ণ বিদূরিত হয়েছে তা বলা যায় না। তবে জনমত সচেতন। কিশোর শ্রমিক নিয়োগ তাই অনেকাংশে বন্ধ হয়েছে। তা ছাড়া, যন্ত্রপাতির উন্নতির ফলে শিশুকে কলকারখানায় নিয়োগের সুযোগও সঙ্কুচিত হয়েছে।

এবার ভারতের কথা আলোচনা করা যাক।

ভারতে প্রথম কলকারখানা স্থাপিত হয় উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। উন্নততর যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এবং ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যে শিশু শ্রমিক নিয়োগ সামাজিক বিপত্তি বলে পরিগণিত হবার পরেও ভারতের কলকারখানায় প্রথম প্রথম অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকাকে নিয়োগ করা হয়। প্রথম দিকে কাপড় ও পাটকলে বহু নাবালককে নিয়োগ করা হয়। কয়লাখনিতে ভূগর্ভে কাজ করার জন্যও শিশুদের চাকুরি দেওয়া হয়। এ ছাড়া অন্যান্য শিল্পেও শিশুদের নিয়োগ করা হতে থাকে। ফলে পশ্চিম গোলার্দ্ধের মত এদেশেও শিশু শ্রমিক নিয়োগের কুফল অবিলম্বে ফলতে থাকে। জনমত জাগ্রত হয়। সরকারকে এগিয়ে এসে কারখানায় নিযুক্ত শিশুদের রক্ষার্থ আইন রচনা করতে হয়। ১৮৮১ সনে কারখানায় শিশু শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ করে প্রথম আইন রচিত হয়। এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা পরে করছি। তার আগে বিভিন্ন কলকারখানা ইত্যাদিতে কত অপ্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু শ্রমিক আছে তার সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলে নি'।

সম্প্রতি ভারত সরকারের শ্রমদপ্তরের অধীনস্থ লেবার ব্যুরো থেকে ভারতে শিশু শ্রমিক সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখা যায়, ১৯৫২ সনে ভারতের ১৩টি 'ক' ও 'খ' শ্রেণীর রাজ্যে অপ্রাপ্তবয়স্ক (সাধারণতঃ ১৫ থেকে ১৮) এবং শিশু (১২ বৎসর) শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২৪,৩২১ জন। এর মধ্যে মাদ্রাজেই সবচেয়ে বেশী অপ্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু শ্রমিক কাজ করছে। সেখানে এদের সংখ্যা হচ্ছে ৮,৩৪৫, তার পর বোম্বাই, সংখ্যা হচ্ছে ৪,০৯০; তার পর আসাম, সংখ্যা ৩,৪৫৬; এর পর পশ্চিমবঙ্গ, সংখ্যা ২,৭৬৭। বিহারে নিযুক্ত শিশু শ্রমিকের সংখ্যা হচ্ছে '৭১২ জন। অন্যান্য রাজ্যে অপ্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু শ্রমিকের সংখ্যা হচ্ছে ২৫০ থেকে ৬০০ শত। ফ্যাক্টরী আইনে পড়ে এমন কলকারখানা থেকেই উপরের হিসাব নেওয়া হয়েছে।

উপরি-উক্ত ২৪,৩২১ জন শ্রমিকের মধ্যে অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের সংখ্যা ২৮৩০ জন আর বালিকার সংখ্যা ১৬২৬ জন। অর্থাৎ মোট শিশু শ্রমিকের তুলনায় মেয়ের সংখ্যা প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। সামাজিক ও নৈতিক কারণেই অল্পবয়সের মেয়েরা কলকারখানায় কাজ করতে কম আসে।

রিপোর্টে আরও দেখা যায়, মোট অপ্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু শ্রমিকের মধ্যে বেশীসংখ্যক শ্রমিকই খাদ্য-শিল্পে নিযুক্ত আছে। ইহাদের সংখ্যা ৫৩১৭ জন। বস্ত্রশিল্পে ৩৭৬৬ জন, পেট্রোলিয়ম ও কয়লা ভিন্ন অ-ধাতু খনিজ পদার্থ শিল্পে ৩,৭১২ জন, রসায়নশিল্পে ২,৭৩৮ জন, তামাকশিল্পে ১,৮৯৮ জন, যানবাহন সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি-

শিল্পে ১,৫১৯ জন নাবালক ও শিশু শ্রমিক কাজ করছে। এ ছাড়া বস্ত্রশিল্পে ৮৯৪ জন, ছাপাখানা ইত্যাদিতে ৮৩৪ জন, ধাতুদ্রব্য শিল্পে ৭২৯ জন কিশোর ও শিশু শ্রমিক কাজ করে। আসবাবপত্র ও কাষ্ঠশিল্পে, চর্ম্মশিল্পে, মূলধাতু শিল্পে এবং লণ্ড্রী ইত্যাদিতে নিযুক্ত ঐরূপ শ্রমিকের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ব্যুরো রসায়ন শিল্পের মধ্যে দেশলাই কারখানাসমূহকে, খাদ্য-শিল্পের মধ্যে চা বাগানসমূহকে, খনিজ শিল্পের ভিতরে অভ্রের কারখানাসমূহকে এবং তামাকশিল্পের ভিতরে বিড়ির কারখানাসমূহকে ধরেছেন। সেদিক থেকে তাঁরা যেসব তথ্য পরিবেষণ করেছেন তাও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারত সরকারের শ্রম ব্যুরো দেশলাই শিল্পে নিযুক্ত শিশু শ্রমিকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য ১৯৫২ সনে দক্ষিণ-ভারতের দুটি স্থান পরিদর্শন করেন। ৮টি দেশলাই কারখানা থেকে যে তথ্যাদি সংগৃহীত হয় তাতে দেখা যায় ঐ কারখানাগুলির মোট শ্রমিক সংখ্যা ১৩০৯ জন; তার মধ্যে অপ্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকের সংখ্যা পুরুষ ৫৪ ও মেয়ে ১৪৩, মোট ১৯৭ জন। আর শিশু শ্রমিকের সংখ্যা হচ্ছে ৪৯৫ জন; তার মধ্যে বালক ২১৩ ও বালিকা ৩০২, অর্থাৎ মোট শ্রমিকের এক-তৃতীয়াংশ হচ্ছে শিশু আর অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং এদের ভিতর আবার মেয়ের সংখ্যা অর্দ্ধেকের চেয়েও বেশী। শিশু কর্ম্মীদের বয়স ১৪ বৎসর বলে লেখানো থাকলেও অনেকের বয়সই ৮ থেকে ১২'র ভিতর বলে ব্যুরো সন্দেহ করেছেন। ৫ থেকে ১২ বৎসরের ছেলেমেয়েকে ঐ কারখানার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে। অর্থাৎ, আইন সত্ত্বেও নিম্ন বয়সের ছেলেমেয়েকে কাজে লাগাতে দেশলাই কারখানার কর্তৃপক্ষ দ্বিধা করেন নি। এ ব্যাপারে মাদ্রাজেরই দুর্নাম সবচেয়ে বেশী।

চা-বাগিচায় শিশু শ্রমিকের সংখ্যা সম্পর্কে যে হিসাব রিপোর্টে দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যায়, আসামের চা-বাগানে শিশু ও নাবালক শ্রমিকের সংখ্যা ১৯৪৪-৪৫ সনে যেখানে ছিল ৯৫,৬৬০ জন, ১৯৫০-৫১ সনে সেখানে দাঁড়িয়েছে ৮২,৯১৪ জনে। অর্থাৎ, মোট পরিমাণ বিশেষ হ্রাস পায় নি। তবে ১৯৪৮ সনের আইনের বলে ১২ বৎসরের নীচে কোন শ্রমিক নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ হয়েছে। আসাম ছাড়া অন্যত্র, যেমন, দার্জ্জিলিং, ডুয়ার্স, দক্ষিণ-ভারত প্রভৃতি স্থানে বাগবাগিচায় নিযুক্ত শিশু শ্রমিকের সংখ্যা মোট শ্রমিকের ১০ শতাংশ থেকে ২২ শতাংশের মধ্যে।

বিহারের বাছাই-করা অভ্রের খনিতে ১৯৫২ সনে মোট শ্রমিকের ১৪'৪ শতাংশ শিশু শ্রমিক বলে হিসাব করা হয়েছে। অভ্র ছাড়া অন্যান্য খনিতে নিযুক্ত শিশুর সংখ্যাও কম নয়। এক কালে কয়লাখনির ভূগর্ভে কাজ করার জন্যও শিশুকে নিয়োগ করা হ'ত। তা ত বন্ধ হয়েছেই—খনিতে কাজ করার জন্য নিযুক্ত শিশু শ্রমিকের সর্ব্বনিম্ন বয়স স্থির করে দেওয়া হয়েছে।

ফ্যাক্টরী আইনের আওতায় পড়ে এরূপ কলকারখানা, বাগবাগিচা, খনি ইত্যাদি ছাড়াও শিশু ও অপ্রাপ্তবয়স্ক বহু শ্রমিক কুটীরশিল্পে নিযুক্ত আছে। কৃষিতে নিযুক্ত শিশু শ্রমিকের সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু তবু একথা আজ নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, এই সব নাবালক ও শিশু শ্রমিকের সংখ্যা পূর্ব্বের চেয়ে বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। যেসব নিষেধাত্মক আইন বর্ত্তমান তা যদি কার্য্যকর ভাবে প্রয়োগ করা হয় তবে এই সামাজিক বিপত্তি আরও হ্রাস পাবে এবং শিশু শ্রমিক সমস্যা সহজতর হবে।

উক্ত রিপোর্টে ভারতে শিশু শ্রমিকের যে তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যায়, ১৮৯২ সনে কলকারখানাসমূহে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৮,৮৮৮ জন, বা মোট শ্রমিকের শতকরা ৬ ভাগ। কিন্তু ১৯১২ সনে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৫৩,১৯৬ জন বা মোট সংখ্যার ৬'২ শতাংশ। তার পর ১৯২১ সনে ঐ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৭৪,৬২০ জন বা মোট সংখ্যার ৫'৩ শতাংশ। এর পর কারখানা আইন ও শিশু শ্রমিক নিয়ন্ত্রণমূলক আইন হওয়ার ফলে সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে (তবে দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পায়)। ১৯৫২ সনে কলকারখানায় নিযুক্ত শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৬,১৪৯ জন। এ সংখ্যা তেমন মারাত্মক নয়।

যেসব শিল্পে শিশু নিযুক্ত হয়, সেখানে তাদের সাধারণত হাল্কা ধরনের কাজই দেওয়া হয়। প্যাকিং করা, লেবেল লাগানো, দেশলাই কাঠি বাক্সে পোরা, চা পাতা তোলা বা বাছাই করা, বিড়ি পাকানো বা বাণ্ডিল করা—এই ধরনের কাজই তারা বেশী করে। এই ভাবে কাজ করে তাদের মাসিক উপার্জ্জন দাঁড়ায় ১৩ টাকা থেকে ৩০ টাকা (বোম্বাই রাজ্যের হিসাব)। তবে বৃত্তি ভেদে উপার্জ্জনের পরিমাণও হ্রাসবৃদ্ধি হয়। সত্তুরের দেশলাই কারখানায় নিযুক্ত শিশু শ্রমিকেরা মাসে ৩০০ টাকার উপরেও উপার্জ্জন করে!

শিশুদের যে অবস্থায় এবং যে প্রকার আবহাওয়ায় কাজ করতে হয় তা সত্যি শোচনীয়। বিড়ির কারখানায় যারা কাজ করে তাদের চারদিকের অবস্থাটা খুবই অস্বাস্থ্যকর। অনেকেই নানা প্রকার অসুখ-বিসুখে ভুগছে। অন্যান্য স্থানে নিযুক্ত শিশুদের অবস্থাও কোনক্রমেই ভাল বলা যায় না। তাই তাদের রক্ষা করার জন্য আইনের অভাব নেই। পূর্ব্বেই বলেছি, প্রথম কারখানা আইন হয় ১৮৮১ সনে। তাতে শিশুর বয়ঃসীমা নির্দ্ধারিত হয় ১২ পর্যন্ত এবং ৭ বৎসরের নিম্নবয়স্ককে নিয়োগ করা নিষিদ্ধ হয়। আর ৭ থেকে ৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুদের কাজের সময় নির্দ্দিষ্ট হয় দৈনিক ৯ ঘণ্টা। ১৮৯১ ও ১৯২২ সনে ঐ আইন সংশোধিত হয়। ১৯৪৮ সনে কারখানা আইন আবার সংশোধিত হয়েছে। তাতে শিশুর কর্ম্মে নিয়োগের বয়ঃসীমা ১২ থেকে বৃদ্ধি করে ১৪ করা হয়। এই আইন অনুসারে ১৪ থেকে ১৮ বৎসরের কোন ছেলেমেয়ে ডাক্তারী পরীক্ষা দ্বারা কাজের উপযুক্ত বলে সার্টিফিকেট না পেলে কারখানায় কাজ পাবে না। খনিতে কাজ করার সর্ব্বনিম্ন বয়স ১৫; ১৮ বৎসরের নীচে কোন ছেলেমেয়ে ডাক্তার কর্তৃক

অনুমতি না পেলে ভূগর্ভে কাজ করতে পারবে না। তা ছাড়া, ১৯৫১ সনের বাগিচা শ্রমিক আইন, ১৯৩৮ সনের শিশু শ্রমিক নিয়োগ আইন পাস করে কতকগুলি বিপজ্জনক কাজে শিশুদের নিয়োগ নিষিদ্ধ হ'ল। আমাদের গঠনতন্ত্রের ২৪ ধারায় পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, ১৪ বৎসরের নীচে কোন কিশোর-কিশোরীকে কারখানা, খনি ইত্যাদি বিপজ্জনক কাজে নিয়োগ করা যাবে না।

প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, আইন করে কেবল বয়ঃসীমা নির্দিষ্টই যে করা হয়েছে বা কাজের সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে তা নয়, শিশু শ্রমিকদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিয়োগকারীরা যাতে যথোপযুক্ত যত্নবান হন তারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আইনের ফাঁক আছে, ফাঁকি দেওয়ার ফন্দিও লোকের জানা আছে, সর্বোপরি আছে শিশু শ্রমিক আইনসমূহকে উপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ করার মত যোগ্য উপায়ের অভাব। সুতরাং সরকারের ও জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গের যথেষ্ট সদিচ্ছা থাকলেও শিশু শ্রমিকদের যেসব অসুবিধা ভোগ করতে হয় তা দূর হচ্ছে না। বর্তমান অর্থ নৈতিক কাঠামোতে শিশু শ্রমিক বন্ধ করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। শুধু দেখতে হবে কাজ করতে গিয়ে তারা যেন তাদের উন্নতির রাস্তা হারিয়ে না ফেলে এবং তাদের অসহায়তার সুযোগে অপরের শোষণ-যন্ত্রে পরিণত না হয়।

বনহংসী

শ্রীকৃষ্ণধন দে

বনহংসী রে, কোন্ স্বপন দেখে শ্বেতপক্ষ মেলি'
কোথা যাস্ রে উড়ে?
বন পথিকে শুধাস্ "ওগো বল বল, মানস-সরোবর কত দূরে"—
পথিক হেসে বলে—"সে যে অজানা,
কত পাহাড়-নদী-বন নাই ঠিকানা,
আরো যাও উত্তরে হিমপুরে।"

বনহংসী চলে কভু মেঘের 'পরে, কভু মেঘের তলে,
বনহংসী চলে কভু রৌদ্রে পুড়ে', ভিজে বৃষ্টি-জলে,
কভু জ্যোছনারাতে, কভু ঝড়ের সাথে,
কভু মেঘলাদিনে, কভু রাঙা প্রভাতে,
—কত প্রান্তর কান্তার ঘুরে ঘুরে,
শুধু পথিকে শুধায়—"ওগো বল বল মানস-সরোবর কত দূরে?"

তার কৈশোর কেটে গেল,
যৌবন যায়-যায়,
পাখার পালক ঝরে,
তবু উড়ে যেতে চায়!

নয়নে দেখে না ভালো,
কাঁপে তনু থর থর,
মানসে তবুও জাগে
সে মানস-সরোবর।
নাড়িতে পারে না ডানা
নামে ধরা-ধুলি 'পরে,
ধীরে ধীরে তবু চলে
উত্তরে—উত্তরে।

বনহংসী হেরি কত পথিক রহে তার পথটি জুড়ে,
সে শুধু শুধায়—"ওগো বল বল, মানস-সরোবর কত দূরে?"

জনপদবধূ ভাসে আঁখি-জলে,
বনহংসী তবু ধীরে চলে চলে,
জীর্ণ তনু আর ভর [illegible]
লুটায় পথে শুধু ধূলি মাখিয়া,
পথিকে শুধায় [illegible] করুণ-সুরে—
"মানস-সরোবর কত দূরে?"

"কৌইলা চাহিয়া"

শ্রীপরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

"কৌইলা চাহিয়া-য়া-কৌইলা।" মোটা গলার কয়লাওয়ালার ডাক—অর্থাৎ, কাঠকয়লাওয়ালার ফিরি করার আওয়াজ। শীত সুরু হওয়ার পর থেকে শীতের বিদায় নেওয়া পর্যন্ত এমনিধারা হাঁক-ডাকে নেপালের আশেপাশে উত্তর প্রদেশের তরাই অঞ্চল সচকিত হয় সকালবেলার দিকটায়। মণ-দেড়েক ওজনের মস্ত বড় কাঠকয়লার বোঝা, কপাল থেকে পটি বেঁধে পিছন দিকে ঝুলানো, সামনের দিকে ঝুঁকেপড়া দেহটার ভারসাম্য রাখতে গিয়ে একটা লাঠি ঠক্ ঠক্ করতে করতে এরা এগিয়ে চলে মাইলের পর মাইল, যতক্ষণ না বোঝা খদ্দেরের হাতে তুলে দিতে পারে। তারপর নিজের আস্তানায় ফিরে আসে।

জানায় সেইখানে, সেই বনে, জঙ্গলে ওরা সবুজের কোল থেকে নিয়ে আসে নরম কালো কয়লার ভারী বোঝা।

সত্যই দেখে বড় বিস্ময় লাগে যে ঐ অত বড় একটা ভারী বোঝা নিয়ে ওরা কি করে নেমে আসে উঁচু পাহাড়ের কোল বেয়ে আঁকাবাঁকা উঁচুনীচু পথ দিয়ে মাইলের পর মাইল এদের ম... গতি। সাধারণ আর দশটা ফিরিওয়ালার মত এরা কিন্তু বেসাতি ফিরিয়ে নিয়ে যায় না। ক্রেতা এরা জুটিয়ে নেয়।

যদি আপনি পয়সাওয়ালা লোকেদের মহল্লায় থাকেন তবে আপনার কাছে ঐ বোঝাটার দাম হয়ত বার টাকাই চাইবে। আপনি চমকে ওঠেন। আপনিও পাল্টা চুক্তির কথা জানান। যদি আপনার প্রয়োজন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে থাকে তবে অবশ্য শেষ পর্যন্ত এক... রফায় এসে আপনাকে থামতে হয়। ... নইলে আপনি 'পাদমেকং ন গচ্ছামি' ক... এক দামের মহিমা বাড়ান। ওরা ... পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে বিড় বিড় করতে ক... আর কারুর দ্বারে চলে যায়।

ভাটিতে আগুন দেওয়ার পর

এই বিরাট বোঝা বইতে গিয়ে ... জিনিষটি ওদের সবচেয়ে বেশী সা... করে তা হচ্ছে তামাক। বিড়ি, সিগারে... এদের আসক্তি নেই। ছোট্ট একটা ... মস্তবড় কল্কে, কয়েক টুকরো আ... কাঠকয়লা—সবই এরা বয়ে নিয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। রাস্তার ধারটা যে জায়গায় এক... উঁচু তেমন কোন জায়গায় এরা পিঠে... বোঝাটাকে ঠেকিয়ে বলিষ্ঠ দেহ নি... তামাকে বেশ করে দম দিয়ে নেয়। নবীন উদ্যমে আবার চলতে থাকে ধীরে ধীরে—'কোইলা-য়া-চাহিয়া-কোইলা।'

এরা দেখতে কালো—এদের পোশাক-আশাকেও কালবৈশাখীর রং। ধরায় আগুন জ্বালিয়ে যখন চৈত্র একটি বছরের জন্য বিদায় নিয়ে যায়, তখন এই 'কৌইলা'-ওয়ালারাও অদৃশ্য হয়ে যায় বছরের বাকি ক'টা মাসের জন্য হিমালয়ের অগণিত স্তরবাক্তির মধ্যে। লোকে ভুলেই যায় যে এরা ছিল।

এই যে মস্তবড় দেড়-দু'মণের বোঝা, এর পেছনে আমাদের চোখের আড়ালে লুকিয়ে আছে আরও ভারী একটা, আয়োজন, বনে-জঙ্গলে, জনমানবের সংস্রব ছাড়িয়ে। তবু এরা মানুষ, আর সেই মানবতা যে বন্ধনে একান্ত অজান্তে আমাদের সবাইকে বেঁধে রেখেছে, সেই অদৃশ্য প্রবৃত্তিই আমাদের টেনে নিয়ে যাওয়ার দাবি

এরা কিন্তু আমাদের মতই ভাত পছন্দ করে। চালের কন্ট্রো... হওয়ার পর এদের মনস্তাপের আর অন্ত ছিল না। জিজ্ঞেস করলে বলত, "কি আর করব বাবুজি, গরীব মানুষ। দম পেয়ে ... পারি নে। পেটে গিয়ে ওগুলি একেবারে জমে যায়। কত লোক যে অসুখে ভোগে তার ঠিক নেই।"

আমরা অরণ্যের সংহার করি লোকালয়ে থেকে, শহরে ব... করে। কিন্তু এদের কাজকারবার বনে-বাদাড়ে। তাই এরা একা চ... না। একই কিংবা আশেপাশের গ্রামের ত্রিশ-চল্লিশ জন সঙ্গী মি... তারা বেরিয়ে পড়ে বছরের একটা সময়ে—শীতের সূচনায়। নেপালের সীমানা ছাড়িয়ে এগিয়ে আসে উত্তর প্রদেশের এলাকায়। খুঁ...

পেতে বেছে নেয়—কোন্ জঙ্গলটি হবে দের সবচেয়ে সুবিধাজনক। এ পালা শেষ করে এরা পুরো জঙ্গল ঠিকে নিয়ে নেয় বার্ষিক পঁচিশ-ত্রিশ টাকায় আর কাউ দের দিতে হয় বিনি পয়সায় কাঠ আর কাঠকয়লা। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে চলবার সহজাত বুদ্ধি এদের প্রখর। তাই গোড়াতেই এরা বেছে নেয় আপোষে একজনকে নেতা রূপে। সেই সবার পক্ষ হয়ে সব কথাবার্ত্তা চালায় ঠিকাদারী কিংবা অন্য কোন দলগত ব্যাপারে!

জঙ্গলের বড় বড় শালগাছগুলি কেটে নিয়ে রেখে গেল—দেড় দু'ইঞ্চি মোটা মোটা গাছ, জঙ্গল হ'ল এদের কর্মস্থল। ঠিকেদের সঙ্গে চুক্তি শেষ হতে হতেই এ কাজ সুরু হয়। প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে যা হোক করে কটা মাস চালিয়ে দেওয়ার মত একটা মাথা গোঁজবার ঠাঁই করা। জায়গাটি বেছে নেওয়া কিন্তু কম ঝামেলার ব্যাপার

শালগাছ আর পাতার ঘর

কয়লা বোঝাই

নয়। কেননা ঝড়-জল, বন্য জন্তু-জানোয়ার এসব তো আছেই, তবুও এ ত আর নদীনালায় ভরা বাংলা দেশ নয়, তাই আশেপাশে চাই জলের উৎস। শুধু কি তাই, কাজের সুবিধাটাও দেখতে হয় বৈকি। এই সব দেখে শুনে তবে ঘর তৈরির কাজ। ঘরের খুঁটি থেকে সুরু করে চাল, দরজা, বেড়া সবই শালগাছ আর তার পাতায় তৈরি।

পুরো দলটায় এরা ত্রিশ-চল্লিশ জন লোক থাকলেও কয়লা তৈরি থেকে বিক্রী পর্য্যন্ত কাজ সুন্দর ভাবে চালিয়ে নেওয়ার জন্য তারা দু'জন দু'জন করে কাজ ভাগ করে নেয়। এমনি এক একটি ঘরে ঠাঁই নেয় এক একটি ছোট দল। রান্না, খাওয়া, শোয়া সবই তারা চালিয়ে নেয় ঐ একটি ঘরের মধ্যে। ঘরটা একটু বড় করে তৈরি করতে পারলে, কয়লার গুদাম অবধি ঐ এক ঘরেই বাসিন্দা হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অবশ্য ঐ গুদামটা আলাদাই হয়ে থাকে।

দু'দিনের জন্য চালিয়ে নেওয়া গোছের ঘরে এরা উনানটা ততোধিক সহজ করে তৈরি করে নেয়। মাটিতে একটা গর্ত খুঁড়ে তার চার পাশে কয়েকটা পাথর বসিয়ে দিয়ে প্রয়োজন মিটিয়ে নেয়।

এমনিতে এদের পোশাক-আশাক দেখতে খুব সাদাসিধে। জামাটা লেগে আছে একেবারে গায়ের সঙ্গে, পাজামাটা তথৈবচ। বাটি উল্টো করে মাথার সঙ্গে মিলিয়ে বসিয়ে দিলে যেমন দেখায় তেমনি হচ্ছে ওদের টুপী। এগুলি যে সাদাসিধে তাতে কোনই সন্দেহ নেই, কিন্তু যারা পরিধান করে তাদের মনোমত করে তৈরি করা এক কঠিন ব্যাপার। কেমন তেমন ওস্তাদ দর্জীও হিমসিম খেয়ে যাবে এদের মনের মতন জিনিষটি তৈরী করতে। কেউ কেউ অবশ্য অতিরঞ্জিত করে বলে যে স্বয়ং র‍্যাংকিন-এর দর্জী এলেও তাদের খুশী করতে পারবে না। সে যাই হোক, ওরা যখন ঘর

সরু লম্বা গাছগুলির উপর কোপ পড়তে থাকে

থেকে বেরোয় তখন সঙ্গে নিয়ে আসে ওদের পছন্দসই একজন দর্জ্জী আর একজন লোহার কামার ওদের হাতিয়ারগুলি তৈরি কিংবা মেরামত করবার জন্য।

চাষ-আবাদের সময় এলে যেমন চাষীদের কর্ম্মচাঞ্চল্যে সারা গ্রাম সজীব হয়ে ওঠে—ঘরে বাইরে মাঠে ঘাটে, কেবল কাজ আর কাজ; তেমনি নির্জ্জন বনানীতে এই দু'দিনের বাসিন্দাদের আগমনের দিন থেকে সুরু করে একটি মুহূর্ত নষ্ট করবার সময় নেই। তারা লেগে যায় ছোট ছোট গাছ কিংবা ডাল কাটতে, হাতের মুঠোর মধ্যে নাগাল পাওয়া যায় প্রায় এমনি। পরে ওগুলি দেড় কি দু'হাত মাপে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে।

একদিকে যেমন গাছ কাটার ঠকাঠক শব্দে বনভূমি কম্পিত হয়ে ওঠে, তেমনি অপর দিকে ধরিত্রীর বুকে জোরে কোদাল চলতে থাকে। আন্দাজ হাত ছয়েক লম্বা, চার হাত চওড়া, আর বেশ খানিকটা গভীর জায়গা খোঁড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাপা ডালগুলি বাছাই হয়ে পড়তে থাকে গর্ত্তের মধ্যে। সাজাবার কোন বিশিষ্ট পদ্ধতি না থাকলেও ডালগুলি এমনি ভাবে বেছে বেছে ফেলতে হয় যেন উপর নীচু সব ডালের মধ্যে হাওয়া চলাচল করতে কিছুমাত্র অসুবিধা না হয়। এই সব গর্ত্তকে ওরা বলবে ভাটি।

বাছাই-করা ডালে গর্ত্ত পূর্ণ হলেই, সবুজ পাতা আর মাটির আস্তরণ পড়ে যায় তার ওপর। চার দিক বেশ আঁটসাঁট করে বন্ধ করে দিয়ে কেবল একটা মুখ রেখে দেয় উনোনের মুখের মত। এই ছিদ্র পথেই ওরা ভাটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাটি আর পাতার ঢাকনা ভেদ করে ধোঁয়া উঠতে থাকে। ভেতরেও কিন্তু এমনি ধূমায়িত হয়েই কাঠ সেদ্ধ হয়ে ক্রমে কয়লার আকার ধারণ করে। কাঠগুলিতে এরা কিছুতেই আগুন জ্বলতে দেয় না, কেননা তা হলে শেষ পর্য্যন্ত কাঠ কয়লার বদলে একটা ছাইয়ের গাদা নীচ থেকে বেরিয়ে আসবে।

রসায়ন-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ কোন লোক কাছাকাছি থাকলে বলবেন, এমনি ধোঁয়ার আকারে প্রতি বছর কত কত পরিমাণের আলকাতরা, মিথাইল, এলকোহল, এসিটিক এসিড এমনি আরও অনেক প্রয়োজনীয় জিনিষ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের জাতীয় সম্পদের ভাণ্ডার থেকে। এ উক্তির প্রতিবাদ করা যায় না বটে, তবে এগুলি নিষ্কাষিত করবার জন্য যে পরিমাণ যন্ত্রপাতি আর পরিকল্পনার প্রয়োজন তা যেমন এদের কাছ থেকে আশা করা যায় না তেমনি এ সম্ভাবনাকে একেবারে উপেক্ষা করাও বোধ হয় যুক্তিযুক্ত নয়।

ধোঁয়ার গুমোটে কাঁচা কাঁচা ডালগুলি আস্তে আস্তে সেদ্ধ হয়ে শুকিয়ে, আগাগোড়া কালো হয়ে একেবারে কাঠকয়লায় পরিণত হয়। ভাটির গড়ন আর কাঠের অবস্থা অনুসারে কয়লা তৈরি হতে দু'দিন থেকে এক সপ্তাহ সময় নেয়। কাঠগুলি অঙ্গারে রূপান্বিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা ভাটি বুজিয়ে দেয়; তার পরও চব্বিশ ঘণ্টা আন্দাজ ওটাকে ফেলে রাখে ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য।

এবার কিন্তু ভাটির ঢাক্‌না খোলার পালা। দু'জন সঙ্গীর এক জন লেগে যায় কয়লাগুলি ভালমন্দ বাছাইয়ের কাজে, অপর জন সঙ্গে সঙ্গে বাছাই-করা কয়লাগুলিকে সাজাতে থাকে ফিরি করবার মত করে। বড় একটা বস্তায় যতটা পারা যায় ততটা কয়লা ত ঢালা হ'ল, তার ওপর আরও প্রায় কুড়ি-বাইশ ইঞ্চি উঁচু করে কয়লা সাজিয়ে ফেলে দড়ি আর বাঁশের কাঠির সাহায্যে। এই সাজানোতে যথেষ্ট হুসিয়ারী আর নৈপুণ্যের প্রয়োজন। চোখের সামনে যখন ঐ কয়লাগুলি হুড় হুড় করে ফেলে দেয় আর বাঁশের কাঠি আর দড়িটা গুছিয়ে বস্তার মধ্যে রেখে দেয়, তখন ধারণা করা শক্ত—কি করে এমনি নিপুণ ভাবে ওরা কয়লা সাজিয়েছিল।

ভাটি খোলা থেকে কয়লা সাজানো পর্য্যন্ত কাজে যে 'দাই' (ছোট দলের এক একজন লোককে ওরা বলে দাই) বেশী পরিশ্রম করে সে কিন্তু থেকে যায় নিজেদের আস্তানায়। অপর সহযোগী বোঝাটা বয়ে নিয়ে যায় মাইলের পর মাইল। ফিরে আসার পথে নিয়ে আসে নিজের আর সঙ্গীর জন্য প্রয়োজনীয় বেসাতি। ঘরে যে দাই রয়ে গেল সে তৈরি করে রাখে ক্ষুন্নিবৃত্তির উপকরণ। মাংস পেলে ওদের খাওয়াটা সেদিন বেশ উত্তম পর্য্যায়ে যায়।

বিশ্রামবিহীন কর্ম্মচাঞ্চল্যের মধ্যেও এদের মনের আবেগ চাপা পড়ে থাকে না। দুপুরবেলা কাজের অবসরে কিংবা কাজ করতে

করতে বনতল চকিত করে তোলে লোকসঙ্গীতে। নেপালীদের রাজভক্তি অতুলনীয়। যদিও কোনও কাজই উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করতে এদের আপত্তি নেই তথাপি রাজসেবা এরা পছন্দ করে সবচেয়ে বেশী। রাজার চাকুরী না করতে পারলে ওদের ব্যথাপূর্ণ আবেদন বনকে অনুরণিত করে তোলে গানের তালে তালে।

যাই হোক, এমনি ভাবে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে আর নির্মল আনন্দ করে কয়েকটা মাস কাটিয়ে দিয়ে একদিন বিনা আড়ম্বরে চলে যায় আপন আপন গৃহে নেপালের অভ্যন্তরে। যাবার বেলা নিয়ে যায় সোনা আর রূপা। টাকার চেয়ে আজও তারা এগুলিকেই দামী বলে জানে। কেবল কি এই, সঙ্গে করে নিয়ে যায় খেলনা ঘরে কচি মুখগুলি স্মরণ করে। কি খুশীই না হবে! ঘর আর ঘরণীকে সাজাবার কত রকম জিনিষ কিনে নেয়—দীর্ঘদিন পরে খুশীভরা সলজ্জ হাসিমুখ ভুলিয়ে দেবে ছাড়াছাড়ির বেদনা, সার্থক করে তুলবে সঙ্গীবিহীন কঠোর পরিশ্রম।

আগ্রা-দুর্গে

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

এক শরৎ-প্রভাতে আমরা আগ্রা ফোর্টে উপস্থিত হলাম। টিকিট কাটলাম গেটে। সঙ্গে নিলাম একজন গাইড। বৃদ্ধ মুসলমান। বাংলা জানে না। বললে, হয় হিন্দী নয় ইংরেজীতে বলব। আমরা ইংরেজীটাই পছন্দ করলাম। কি সুন্দর তার বাচন-ভঙ্গী। ইংরেজী লিখতে জানে না, এমনকি ইংরেজীতে নাম সই পর্যন্ত করতে পারে না, কিন্তু বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল ইংরেজীতে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে।

অমর সিং গেট দিয়ে আমরা ঢুকলাম ভেতরে। প্রথমেই গাইড গেটের ইতিহাস, গেটের কপাট জোড়া যে চিতোর দুর্গ থেকে আকবরশাহ এনেছিলেন, এ সব বুঝিয়ে বললে। চড়াই রাস্তা, যেন ক্রমশঃ পাহাড়ে উঠছি। এমন ধারা অনেকখানি পথ উঠতে হ'ল। পথে গাইড ছবি এঁকে দেখালে যে আকবরের সময়ে এই দুর্গ কতকটা চতুষ্কোণ আকারে ছিল, জাহাঙ্গীর আকারের বিশেষ কোন পরিবর্তন করেন নাই, যদিচ কয়েকটি বিশিষ্ট মহল সংযোজিত হয়েছে জাহাঙ্গীরের সময়েই। দুর্গে মার্বেলের প্রথম প্রচলন তিনিই করেন।

সাহজাহান দুর্গটিকে বর্তমান আকারে পুনর্গঠিত করেন। এটি এখন অনেকটা অর্দ্ধবৃত্ত আকারের। এর বাইরে ৩০ ফুট গভীর এবং ৩০ ফুট চওড়া পরিখা। পরিখার পরে দুটি লাল পাথরের সুদৃশ্য চওড়া উঁচু দেওয়াল। প্রথমটি ৪০ ফুট উঁচু, দ্বিতীয়টি ৭০ ফুট উঁচু। প্রথম দেওয়ালে বন্দুক-কামান ছোড়ার যায়গা আছে। প্রহরারত সৈনিকদের থাকবার ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ আছে। দুর্গের চারিটি সিংহদ্বার: দিল্লী গেট বা হাতী পোল, অমর সিং গেট, জল-দরওয়াজা ও সাবুরুজ দরওয়াজা। সাধারণের জন্য এখন কেবল অমর সিং ফটকটিই খোলা থাকে।

১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে আকবর চিতোর জয় করে আরোহীসহ দুটি বড় পাথরের হাতী আগ্রা নিয়ে এসে দিল্লী গেটের সর্বোচ্চ স্থানে—দিল্লী গেট কেন সারা দুর্গের সর্বোচ্চ স্থানে স্থাপন করেন তাঁর চিতোর জয়ের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে। ঐ পাথরের হাতীর পিঠের সওয়ার দু'জনের একজন চিতোরের বিখ্যাত রাজা জয়মল্ল, অপরজন তাঁর ভাই—পট্ট।
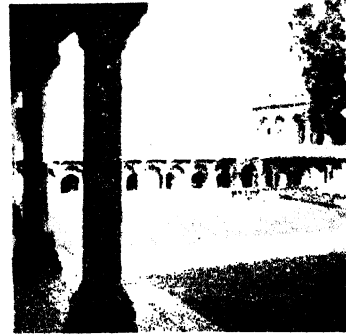
কোষাগার

আকবর শা যা স্মারনিক হিসেবে অমর করে রাখতে চেয়েছিলেন আলমগীর তার মধ্যে পৌত্তলিকতার গন্ধ পেলেন। তাই রাগ করে তিনি হাতী ও তাদের আরোহীদের ধ্বংস করার চেষ্টাতে কিছু অঙ্গহানি ঘটালেন। তাদের আগ্রা থেকে দিল্লী পাঠিয়ে লাল কেল্লায় দিওয়ান-ই-আমের সামনে সমাধি দিলেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের পুনরুদ্ধার করে আবার আগ্রার দিল্লী গেটে পুরাতন জায়গাতেই ফিরিয়ে আনা হয়। তাই বুঝি দিল্লী গেটের চাইতে হাতী পোল নামটাই প্রাধান্য লাভ করল।

ক্রমশঃ উঁচুতে উঠছি। এবার পেলাম সমতল। সামনে অপূর্ব রাজপ্রাসাদ। এই জাহাঙ্গীরি মহল, জাহাঙ্গীর বাদশার

তৈরি। এখানে মুসলীম স্থাপত্যের সঙ্গে হিন্দু স্থাপত্যের মিতালী ঘটেছে। এই মহলটি ইণ্ডো-পারসিক শিল্পের নিদর্শন। এখানে গোলাপের লালিমায় মিশেছে সূর্য্যমুখীর দীপ্তি ও রক্তকমলের ঢল ঢল ভাব। দেওয়ালের প্রতিটি ইঞ্চি ছিল এক সময়ে সোনার জল আর বর্ণসম্ভারের বিচিত্র চিত্রে চিত্রিত। এখন সে সব মুছে গেছে কালের স্থূল হস্তাবলেপে। কিছু বা জাঠেরা নষ্ট করেছে, কিছু আলমগীর জোর করে মুছিয়ে দিয়েছেন পুতুলের ছবি বলে।
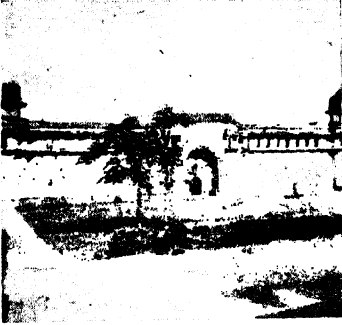
জাহাঙ্গীরি মহল

মহলে ঢোকার পূর্ব্বে নজরে পড়ল পাথরের বিচিত্র জলাধার, এটি জাহাঙ্গীর স্নানাগার রূপে ব্যবহার করতেন। মহলের ভিতরে অঙ্গন। অঙ্গনের চারিপাশেই দোতলা বাড়ী—অসংখ্য প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। পূর্ব্ব দিকে পাঠাগার, তার দেওয়াল ফুটে এখনও বেরুচ্ছে পূর্ব্বের চিত্র-সৌন্দর্য্য। পশ্চিমে যোধাবাঈয়ের ঠাকুরঘর। সেখানে পাষাণ মঞ্চে উৎকীর্ণ পদ্মকুঁড়ি আজও অম্লান। হিন্দুদের অজস্র দেব-দেবী রাখার জন্ম ঠাকুরঘরের দেওয়ালে অসংখ্য কুলুঙ্গি। ঘরটিতে আজও যেন যোধাবাঈয়ের শিবপূজার গন্ধ-ধূপের আমেজ ভেসে বেড়াচ্ছে। ভোলা মহেশ্বরের জাতের বালাই নেই। তাই তিনি মুঘল হারেমেও প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। উত্তরে যোধাবাঈয়ের অন্দরমহল, দক্ষিণে তাঁর বৈঠকখানা। যোধাবাঈয়ের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। নূরজাহানী আমলেও যে তিনি এমন প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন এ তাঁর ব্যক্তিত্বেরই বিশেষ পরিচয় বলতে হবে।

ডান দিকে পড়ে রইল আকবরী মহল তার ধ্বংস স্তূপের মধ্যে। স্থানে স্থানে ধ্বসে পড়েছে তার ছাদ। কোথাও আবার চত্বরে গড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন আকারের ছোট বড় পাথর, তবুও এখনও অনেকখানি মহল শেষ পরিণতির হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে, যেন দর্শকদের জানাতে যে আগ্রা-দুর্গের ইতিহাস—তারও একটা স্থান আছে। দেখে দুঃখ হ'ল এত সুন্দর জাহাঙ্গীরি মহলেও মহাকাল তাঁর কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন, দু'এক জায়গায় লাল পাথর গুঁড়ি গুঁড়ি হয়ে ঝরে পড়ছে।

বাঁ দিকেই অগ্রসর হলাম আমরা, যা দেখি তাই অপূর্ব্ব মনে হয়। এত দ্রষ্টব্য আছে যে, তা যেন দেখে শেষ করা যায় না। এখানকার প্রতিটি পাথর কোন-না-কোন কারণে বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। গাইড তার আবেগময়ী ভাষায় বলে চলেছে অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, তার বলার ভঙ্গীতে মরা অতীতও যেন জীবন্ত হয়ে উঠছে আমাদের চোখের সামনে, দেখতে পাচ্ছি মুঘল আমলের ভারতবর্ষ। তার শিল্প-সৌন্দর্য্যের অতুলনীয়তা, তার বিলাস-ব্যসন, তাঁর একাধিপত্য।

এলাম খাসমহলে। সাহজাহানের তৈরি এটি একটি মার্ব্বেলের অন্দরমহল। এটিতে সাহজাহান তাঁর দুই কন্যা এবং মুঘল হারেমের বিশিষ্ট মহিলাদের সঙ্গে মিলিত হতেন, পরামর্শ করতেন, গল্পগুজব করতেন। সামনেই আঙ্গুরী বাগ, এখানে কাশ্মীর থেকে মাটি এনে আঙ্গুরলতা লাগান হয়েছিল সাহজাহানের আমলে। বাগিচাটির সামনে পঞ্চ ফোয়ারা সম্বলিত একটি সুন্দর মর্ম্মর জলাধার। এই বাগিচার চারি পাশে লাল পাথরের অসংখ্য কক্ষযুক্ত মহল। মনে হয় এই মহলটি আকবরের তৈরি, গাইডও তাই বললে, সাহজাহান এই মহলের কিছু কিছু সংস্কার করেন।

আঙ্গুরিবাগের কিছু দূরে এক জায়গায় গাইড থামলে, সিঁড়ি দিয়ে একতলা নীচে নামলে আর বললে, 'যাবেন বাবু।'

বললাম—কোথায়?

বললে—নীচে।

বললাম—'মানে? কোথায় যেতে বলছ?' তখন গাইড আবার ইতিকথা আরম্ভ করলে। ঐ সিঁড়ি নেমে গেছে নীচে অর্থাৎ মাটির তলায়, ভূগর্ভের দিকে আগ্রা কোর্টের নীচে আরও তিনতলা আছে। প্রথম তলাতে বাদশা-বেগমেরা আগ্রার প্রচণ্ড গ্রীষ্ম থেকে রক্ষা পাবার জন্ম দুপুরে বাস করতেন। দ্বিতীয় তলা কারাগার হিসেবে ব্যবহৃত হ'ত, চরম শাস্তি দেওয়ার পর বন্দীদিকে সেখান থেকে রাত্রে যমুনাতে নিক্ষেপ করা হ'ত। আর যমুনা নীরবে সেই হতভাগাদের কোলে টেনে নিত। তৃতীয় তলা থেকে দুটি ভূগর্ভস্থ রাস্তা বেরিয়ে গেছে। একটি দিল্লীর দিকে, একটি তাজমহলে। বেগম সাহেবারা তাজমহলের সামনে যমুনায় নাইতে যেতেন ঐ তৃতীয় তলার লুকানো পথে, প্রয়োজন বোধে বাদশা-বেগম সকলেই লুকানো পথে দিল্লী যাওয়া আসা করতেন। পথগুলি এখন সংস্কারের অভাবে অকেজো হয়ে গিয়েছে।

নামলাম নীচে একতলা পর্য্যন্ত অন্ধকার এবং প্রায়ান্ধকারের মধ্য দিয়ে। ভারী ভাল লাগল একটা জিনিষ—এর শীতলতা। এত নীচেও কোথা থেকে ফুর-ফুরে বাতাস বইছে। যমুনার শীতল বাতাস ভেতরে আনার ব্যবস্থা করেছিলেন সাহজাহান। তাজ-মহলের পথে বসিয়েছিলেন হীরে মাণিক। জাঠ ও ইংরেজ আমলে সেগুলি অপহৃত হয়েছে।

এর পর গেলাম শীশমহলে, প্রবেশমাত্র আমাদের লক্ষ লক্ষ ছবি পড়ল দেওয়ালের গায়ে। শীশমহল—আয়নাঘর। এখানে মর্ম্মর-

দীঘিতে আতর-জলে নাইতেন বেগম-সাহেবারা। সবই ত বাদশাহী ব্যাপার।

এলাম জুঁইফুলী মহলে। জুঁইফুলের আকারবিশিষ্ট এই মহল। জাহাঙ্গীর তৈরি করান এটি। এতে থাকতেন নূরজাহান, কাজেই চারদিক থেকে সৌন্দর্য্য নিঙড়ে নিয়ে এটিকে সাজানো হয়েছিল। সোনাদানার ছড়াছড়ি ছিল এখানে। মীনা করা এর কক্ষ-গাত্র। সম্রাজ্ঞী হয়ে মমতাজমহলও কিছুদিন ছিলেন এখানে। এখানে সর্ব্ব পূর্ব্বদিকের ঘরে অর্থাৎ হাওয়াই মহলে সাহজাহান তাজের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শেষনিশ্বাস ফেলেন। এখানকার মণি-মাণিক্যও লুণ্ঠিত হয়েছে। তাদের জায়গায় বসানো হয়েছে কাঁচ, তবু একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাঁচেই এখনও প্রতিফলিত হচ্ছে এক মাইল দূরের তাজমহল। এখানকার মর্ম্মরের মেঝেতে পাশার ছক কাটা আছে, জাহাঙ্গীরশাহ নাকি ঐ ছকে পাশার গুটি হিসেবে মহিলাদের দাঁড় করাতেন। Translucent একটি পাথরের মধ্যে দিয়ে বাহির থেকে কিছু আলো এসে পড়ছে ভেতরে। সামনে একটি জুঁই-ফুলের আকারের জলাধার, মাঝে ফোয়ারা। এই জলাধারে থাকত গোলাপজল, তাতে বাদশা-বেগমেরা হাত-মুখ ধুতেন। ফোয়ারাতে উঠত গোলাপ-নির্য্যাস। মহলটির থেকে দুটি রাস্তা বেরিয়েছে। একটি চলে গেছে শীশমহলে, অপরটি দেওয়ান-ই-খাসে। একটু দূরে স্বর্ণমন্দির, এটিতে থাকতেন রোশানারা বেগম। অনুরূপ একটি মন্দির ঠিক উল্টো দিকে। সেটি অবশ্য সোনাতে মোড়া থাকত না, সেটি মার্ব্বেল পাথরের, তাতে থাকতেন জাহানারা বেগম। দেখলাম তাতে চারিদিকে চারটি গর্ত্তের মত কিছু আছে দেওয়ালে। সেই গর্ত্তগুলি ধনরত্নে বোঝাই থাকত, দুটি গর্ত্ত নীচ পর্য্যন্ত নেমে গেছে। সেই গর্ত্তের মুখে কিছু ফেললে তা নীচে গিয়ে পৌঁছয়, এই গর্ত্ত পথে দান করতেন জাহানারা বেগম। তিনি ধার্ম্মিক, নিপুণা চিত্রশিল্পী এবং কবি ছিলেন।

এলাম সাহজাহানের দেওয়ান-ই-খাসে। কত আমীর ওমরাহ এখানে একদিন সভা জমাতেন, কত দণ্ডমুণ্ডের বিচার হ'ত। কত জরুরী খবর এখান থেকে বেগবান অশ্বারূঢ় হয়ে দিল্লী চলে যেত। আজ দেওয়ান-ই-খাস জনবিরল, বায়ুভুক্‌দের আশ্রয় স্থান হয়েছে। এর মেঝের মার্ব্বেল কারা খুঁড়ে নিয়ে পালিয়েছে। তাই এর অঙ্গে শোভা পেয়েছে চূণ-সুরকির সস্তা প্রলেপ।

বেগম সাহেবাদের জন্ত তৈরি মার্ব্বেলের মীনা মসজিদে এলাম। এটিকে মতি-মসজিদের ছোট সংস্করণ বলা চলে। দেখলাম সাহজাহানের স্নানাগার হামামশাহী, সুন্দর।

ঘুরে ঘুরে কিছু বিশ্রামের প্রয়োজন হ'ল। কণ্ঠও শুষ্ক, তাই সিংহাসন-ছাদে বসে কিছু পানীয় পান করা হ'ল আর সেই ফুরসুতে একটু বিশ্রামও করে নেওয়া গেল। ছাদটি নেড়া, কোথাও শীতাতপ নিবারণের জন্ত আবরণ নেই। শোনা গেল ছাদের উপর শেড ছিল। সেগুলি মার্ব্বেলের, তাই জাঠেরা সেগুলি ভেঙে নিয়ে পালিয়েছে। ছাদের দু'পাশে দুটি সিংহাসন। একটি কাল কষ্টিপাথরের, অপরটি সাদা মার্ব্বেলের। কালটিতে সম্রাট বসতেন, সাদাটিতে বসতেন বিদূষক। চলত রসালাপ। এখানে বসে নীচের হাতী, সিংহ, বাঘের লড়াই দেখা হ'ত। এগুলি জাহাঙ্গীরের তৈরি, মহিলা মহলের পশু লড়াই দেখা চলত জুঁইফুলী মহলের পাশের জাফ্রি দেওয়া গাড়ীবারান্দা থেকে।

দেওয়ান-ই-আম

এই কষ্টিপাথরের সিংহাসন ঘিরে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। দুর্গ যখন ভরতপুরের জাঠরাজা জওহর সিঙের দখলে, তখন জাঠরাজ একবার দম্ভভরে ঐ কষ্টিপাথরের সিংহাসনে বসেন। সিংহাসন এ অপমান সহ্য করলে না, দুঃখে তার হৃদয় বিদীর্ণ হ'ল। এখনও সিংহাসনে বিদীর্ণ হওয়ার চিহ্ন পরিস্ফুট। আর তার অশ্রুজল আজও লাল লাল ফোঁটাতে সিংহাসনগাত্রে চিহ্নিত হয়ে আছে, বিজ্ঞানী বলবেন—ঐ লাল দাগগুলি অনেক সময় কষ্টি-পাথরে লৌহের বেড পারকসাইড বর্ত্তমান থাকার জন্তে হতে পারে। ঐতিহাসিক বলবেন—সিপাহী বিদ্রোহের সময় একটা বোমা লেগে কষ্টিপাথরের সিংহাসনে ফাটল দেখা দেয়। কিংবদন্তী কিন্তু তার নিজের মত সমর্থন করে বলে, কেন, জওহর সিংকে তার দুষ্কর্ম্মের দণ্ডভোগ করতে হয় নি? তার রক্তাক্ত মৃতদেহ ঐ সিংহাসনের উপরেই বা পাওয়া গিয়েছিল কেন? এ কি তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নয়? সিংহাসন তার অপমান সহ্য করে নি।

দশটায় ফোর্টের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, তার প্রথম ওয়ার্নিং বেল কানে এল। গাইড তাড়া দিলে, এক রকম ছুটতে ছুটতে বাকী কয়েকটা জিনিষ পনের-বিশ মিনিটের মধ্যে দেখে ফেললাম। একনিশ্বাসে মচ্ছিভবন, দেওয়ানী আম ও নাগিনা মসজিদ দেখলাম। মচ্ছিভবনে বড় বড় মাছ পুকুরে ছাড়া থাকত। আর তাই সপরিবারে বাদশাহ একদিক থেকে আর অপর দিক থেকে বাঁদীপরিবেষ্টিতা বেগম সাহেবারা ধরতেন। এ ছিল মাছ ধরার প্রতিযোগিতা ক্ষেত্র, মচ্ছিভবনের সামনেই মীনা বাজার। বাদশাহী আমলে এখানে অন্তঃপুরবাসিনীরা দোকান দিতেন। হীরে জহরত থেকে আরম্ভ করে একতাল মিছরি পর্য্যন্ত এখানে পাওয়া

যেত। এই মীনাবাজারেই ত যুবরাজ খুররম আর মমতাজমহলের প্রথম দেখা। এখন এখানে সরকারী তত্ত্বাবধানে তৈরি মাটির, কাঠের, মার্ব্বেলের, বেতের, পিতলের রকমারি সুন্দর সুন্দর জিনিষ বিক্রয় হয়। মার্ব্বেলের নানা রকমের প্রতিকৃতি, পিতলের উপর নক্‌সাকাটা বাসন, ফুলদানি, পাউডার কেস, সিন্দুর-কৌটা সত্যই অপূর্ব্ব। তবে দ্রব্য-মূল্য বাহিরের তুলনায় কিছু বেশী।

দ্বিতীয় ওয়ার্নিং বেল বেজে উঠল। এর পর বেরিয়ে যেতে হবে। তবু মরিয়া হয়ে মতিমসজিদে থামলাম। এত বড় মর্ম্মর পাথরের মসজিদ সারা দুনিয়াতে আর দ্বিতীয় নেই। একটি আটকোণ মার্ব্বেল স্তম্ভে একটি সূর্য্যঘড়ি এখনও রয়েছে এখানে। মসজিদটি স্তম্ভদ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত। মসজিদের উভয় পার্শ্বে জানানাদের জন্য মার্ব্বেলের পর্দা ঢাকা কক্ষ আছে। সাহজাহান এটি তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে সাত বছর ধরে তৈরি করান। এক হাজার লোক এখানে একসঙ্গে নওয়াজ করতে পারে, প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক স্থান নির্দ্দেশ করে দেওয়া আছে, সেগুলি পূর্ব্বে এমন সব পাথরে ভরাই করা ছিল যাদের গুণই হচ্ছে ক্লান্তি দূর করা, পাথরের গুণে নওয়াজ করে কেউ ক্লান্ত হতেন না।

শেষ ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ছুটে বেরিয়ে এলাম।

ধর্ম্মের গাজন

শ্রীসুখময় সরকার

শিবের গাজনের ন্যায় ধর্ম্মের গাজনও বাঁকুড়ায় এক বৃহৎ পর্ব। রাঢ়দেশে ধর্ম্মঠাকুর এক বিখ্যাত দেবতা। তাঁহার মাহাত্ম্য অবলম্বনে রাঢ়ের কবিগণ বহু কাব্য রচনা করিয়াছেন। যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের চর্চা করেন, তাঁহারা ধর্ম্মঠাকুরের লীলা-কাহিনী সবিশেষ অবগত আছেন। ধর্ম্মঠাকুর কে তাহা লইয়া মতানৈক্য আছে। এ বিষয় এখন আলোচনা করিব না। এখন ধর্ম্মের গাজন বর্ণনা করি।

ধর্ম্মঠাকুর সাধারণতঃ ধর্ম্মরাজ নামে অভিহিত হন। কিন্তু তাঁহার বহু নাম আছে, যথা—ধর্ম্মরাজ, কালুরায়, বাঁকুড়ারায়, সুন্দররায়, কৌতুকরায়, যাত্রাসিদ্ধি, পঞ্চানন্দ, স্বরূপনারায়ণ। বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামে ধর্ম্মরাজ, বিহার গ্রামে কালুরায়, ইন্দাস ও বালসী গ্রামে বাঁকুড়ারায়, ময়নাপুর ও বেতানল গ্রামে যাত্রাসিদ্ধি, মহুলবনা গ্রামে স্বরূপনারায়ণ, অন্যান্য বহু গ্রামে বিভিন্ন নামধেয় ধর্ম্মঠাকুর শত শত বৎসর ধরিয়া পূজিত হইতেছেন এবং বৎসরে বৎসরে সাড়ম্বরে তাঁহাদের গাজন হইতেছে। আপাতদৃষ্টিতে শিবের গাজনে ও ধর্ম্মের গাজনে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না; নিরীক্ষণ করিলে অল্পস্বল্প প্রভেদ দৃষ্ট হয়। শিবের গাজনে শিবের সহিত শিবানীর বিবাহ ব্যাপারটা প্রকট; কিন্তু ধর্ম্মের গাজনে ধর্ম্মের সহিত মুক্তির বিবাহ প্রচ্ছন্ন। শিবের গাজনে সন্ন্যাসীরা 'শিবমুনি নাথমুনি মহাদেব' অথবা 'একতেশ্বর নাথমুনি মহাদেব' এবং 'গঙ্গাধরের চরণে সেবা লাগে, শিব মহাদেব' বলিয়া গর্জন করে; কিন্তু ধর্ম্মের গাজনে সন্ন্যাসীদের গর্জন, 'ধর্ম্মরাজের চরণে সেবা লাগে, জয় জয় নিরঞ্জন।' ধর্ম্মের এক নাম নিরঞ্জন; তিনি নিষ্কলঙ্ক, নির্বিকার, শুদ্ধ, বুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত সত্তা। ধর্ম্মের কৃপায় মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়, ইহাই ধর্ম্মের গাজনের, বিশেষতঃ ধর্ম্ম-মুক্তি-বিবাহ অনুষ্ঠানের মূল তত্ত্ব, কিন্তু এই মুক্তি কেবল আধ্যাত্মিক নহে, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিকও বটে।

আমি বিহার গ্রামে কালুরায়-ধর্ম্মের এবং বেলিয়াতোড় গ্রামে ধর্ম্মরাজের গাজন দেখিয়াছি। কালুরায়ের গাজন হয় বৈশাখী পূর্ণিমায়; অন্য বহু স্থানে ধর্ম্মের গাজনের নিমিত্ত এই দিন বিহিত হইয়াছে। কিন্তু বেলিয়াতোড়ে ধর্ম্মরাজের গাজন আষাঢ়ী পূর্ণিমায়। শুনিয়াছি, আরও দুই-একটি গ্রামে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ধর্ম্মের গাজন হয়। বিহারে কালুরায়ের গাজন উপলক্ষে বার দিন ধর্ম্মমঙ্গল গীত হয়। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন আরম্ভ, পূর্ণিমায় শেষ। ধর্ম্মের দেউলের সম্মুখস্থ নাট-মন্দিরে প্রতিদিন সন্ধ্যায় গানের আসর জমে। গায়ন কত ভাবে, কত সুরে, কত ছন্দে লাউসেন-রঞ্জাবতীর কাহিনী গাহিয়া যায়, ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করে; আর অগণিত নর-নারী ভক্তিপ্লুত চিত্তে বসিয়া রাত্রি দুই প্রহর তিন প্রহর পর্য্যন্ত শুনিতে থাকে। সতী রঞ্জাবতী পুত্রলাভের জন্য কেমন করিয়া 'শালেভর' দিয়াছিল এবং অন্য বহুবিধ কঠোর তপশ্চরণ করিয়াছিল, হাকন্দ-তপস্যায় বসিয়া লাউসেন কিরূপে নিজ মাংস কাটিয়া এবং অবশেষে নিজ মুণ্ড কাটিয়া হোমাগ্নিতে আহুতি দিয়াছিল, ধর্ম্মের কৃপাবলে বলীয়ান লাউসেন কিরূপে পশ্চিমে সূর্য্যোদয় ঘটাইয়াছিল, কিরূপে নিহত কালু ও তাহার পুত্র ধর্ম্মের কৃপায় পুনর্জীবন লাভ করিয়াছিল, সে সকল রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনিতে শুনিতে হৃদয় বিস্ময়-রসে আপ্লুত হয়, প্রাণে ধর্ম্মভাব জাগ্রত হয়।

কাহিনীটা কত দূর সত্য, কেহ জিজ্ঞাসা করে না, করিবার প্রয়োজন বোধ করে না। কবিত্বের মোহিনী শক্তিতে, গায়নের বর্ণনাভঙ্গীতে সেসব কাহিনী ইতিহাসে পরিণত হইয়াছে। বস্তুতঃ এ সব কাহিনী কবি-সত্য, ভাব-সত্য; ইতিহাসের কষ্টিপাথরে ইহাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতে গেলে ভুল হইবে। কিন্তু যাহারা ধর্মের গাজনে সন্ন্যাসী হইয়া তপঃক্লেশ স্বীকার করে, লাউসেন-রঞ্জাবতীর কাহিনী তাহাদের নিকট জ্বলন্ত সত্য। কেবল ধর্মপুরাণ নহে, আমাদের দেশে সকল পুরাণ কাহিনীই ইতিহাস; হিস্টরি না হইতে পারে।

শিবের গাজনের ন্যায় ধর্মের গাজনেও নিরামিষ্যকরণ, হবিষ্যান্ন-গ্রহণ, ফলাহার, রাত্রি-গাজন ও দিন-গাজন আছে। সকল স্থানে নাই, অধিকাংশ স্থানে আছে। শিবের গাজনে 'বলি' নাই, কিন্তু ধর্মের গাজনে বলি আছে। অধিকাংশ স্থলে ছাগবলি, কোথাও কোথাও মেষ, পারাবত ও কুক্কুট বলি হয়। সাধারণতঃ পূর্ণিমার রাত্রিতে ছাগবলি হয় এবং পরদিন আমিষ-পারণায় সন্ন্যাসীরা মাংস-প্রসাদ ভক্ষণ করে।

প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্বে বেলিয়াতোড়ে ধর্মরাজের গাজনে সন্ন্যাসীদের কঠোর তপশ্চর্যা দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়াছিলাম। বহুসংখ্যক সন্ন্যাসীর পৃষ্ঠদেশ ক্ষত করিয়া একটি সূত্রদ্বারা গ্রথিত করণান্তর দুই ব্যক্তি সূত্রের দুই প্রান্ত ধরিয়া আছে, আর সন্ন্যাসীরা ঢাকের তালে তালে নাচিতে নাচিতে 'গাজন তুলিতে' যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে তাহাদের গর্জনে দিগবিদিক্ প্রকম্পিত হইতেছে। কোন সন্ন্যাসী নিশিতাগ্র লৌহদণ্ড দ্বারা জিহ্বা ভেদ করিতেছে। ইদানীং রাজার আদেশে এইরূপ তপশ্চরণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, বলিতে পারি না। তবে গাজনের গাম্ভীর্য বিনষ্ট হইয়াছে।

বেলিয়াতোড়ে ধর্মরাজ-দেউলের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে দুইটি অতিকায় দারুনির্মিত অশ্ব আছে। ইহাদের চারি পদতলে চারিটি চক্র যোজিত আছে। রাত্রি-গাজনের সন্ধ্যায় পুরোহিত ধর্মবিগ্রহ ক্রোড়ে লইয়া একটা অশ্বে আরোহণ করেন; একজন তাঁহার শিরে ছত্র ধারণ করে এবং কয়েক জন অশ্ব ঠেলিয়া 'গাজন-ঘাটে' লইয়া যায়। বিপুল জনতা ধর্মের জয়ধ্বনি সহকারে তাহাদের অনুসরণ করে। 'গাজন-ঘাটে' ধর্মরাজের অভিষেক হয়, পরে তিনি পুনশ্চ দারু-অশ্বে আরোহণ করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। কেবল বেলিয়াতোড়ে নয়, প্রায় সর্বত্র ধর্মঠাকুরের মন্দিরে দারুময় অথবা মৃন্ময় অশ্ব দেখিয়াছি। ধর্মঠাকুর রাজশক্তির আধারভূত। এই নিমিত্ত তাঁহার নামের সহিত প্রায় 'রায়' শব্দ যুক্ত হয়। 'রাজ' শব্দের অপভ্রংশে 'রায়'। অশ্বও রাজশক্তির প্রতীক; বোধ হয় এই হেতু ধর্মঠাকুরের নিকট অশ্ব প্রদত্ত হয়।

প্রায় সকল স্থানেই ধর্মের গাজনের ভক্ত্যাদিগকে শিবের গাজনের ন্যায় 'শালেভর দেওয়া', 'হিন্দোল-সেবা', 'প্রণাম-খাটা', 'ঝাঁপ নেওয়া' ইত্যাদি তপঃক্লেশ স্বীকার করিতে হয়। এই সকল অনুষ্ঠান চৈত্রের (১৩৬১) 'প্রবাসী'তে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। ধর্মের গাজন উপলক্ষে বহু স্থানে বাজি পোড়ানো হয়; কোথাও কোথাও যাত্রাগান, কবি-গান, তরজা-ঝুমুর ইত্যাদিও হয়। গাজনের সময় দুই-তিন দিন ধরিয়া মেলা বসে, নানাবিধ আমোদ-আহ্লাদ চলিতে থাকে।

ধর্মের গাজন কতকাল ধরিয়া চলিতেছে? এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে ধর্মঠাকুরকে চিনিতে হইবে। পূর্বে বলিয়াছি, ধর্মঠাকুর কে, এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। কেহ বলেন, তিনি যমরাজ। কেহ বলেন, তিনি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদেবতা। আবার কাহারও মতে তিনি কূর্মরূপে বিষ্ণু। যাঁহারা বলেন, ধর্ম যমরাজ তাঁহাদের যুক্তি এই যে, যমের এক নাম ধর্ম। যাঁহারা বলেন তিনি বৌদ্ধদেবতা, তাঁহাদের যুক্তি এই যে বুদ্ধের এক নাম ধর্মরাজ ছিল এবং বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধের জন্ম বলিয়া উক্ত দিবসে ধর্মের গাজন বিহিত হইয়াছে। যাঁহারা বলেন, ধর্ম কূর্মরূপ বিষ্ণু, তাঁহারা এই যুক্তি দেখান যে কূর্মাকৃতি শিলাই ধর্মের প্রতিমা। কিন্তু এই সকল সিদ্ধান্ত অন্ধের হস্তিদর্শনবৎ আংশিক সত্য। কেবল কিম্বদন্তীর উপর অথবা কেবল পুথির উল্লেখের উপর আস্থা স্থাপন করিলে এইরূপ খণ্ডিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। এই সকল ক্ষেত্রে সত্য নির্ণয়ের নিমিত্ত কিম্বদন্তী ও পুথি, উভয়ই অবলম্বন কর্তব্য। কিন্তু প্রথমে কিম্বদন্তী না পুথি? বলা বাহুল্য, প্রথমে কিম্বদন্তী। পুথি একজনের রচনা, কিম্বদন্তী বহুর।

মাস দুই পূর্বে একদা অপরাহ্নে বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণার প্রত্যন্ত দেশে পারগুণ্ডী গ্রামে এক ভদ্রলোকের সহিত মাঠের দিকে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। পার্শ্বস্থ গোধূমের ক্ষেত্রে একটা শ্মশ্রুল, লোমশ ছাগ প্রবেশ করিয়া ফসল নষ্ট করিতেছিল। তাহা দেখিয়া ভদ্রলোক উহার দিকে একটি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দূর বেটা, সূর্যের পাঁঠা!"

সূর্যের পাঁঠা! আমি উৎকর্ণ হইলাম। কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, সূর্যের পাঁঠা কি?"

"সূর্যের পাঁঠা মানে ধর্মরাজের পাঁঠা। ধর্মরাজ তো সূর্য দেব।"

"এখানকার লোকে তাহাই মনে করে না কি?"

"হাঁ, ধর্মের দেয়াসীরা ত তাহাই বলে।"

"চলুন দেয়াসীদের বাড়ী।"

দেয়াসীরা জাতিতে কেওট (জালিক কৈবর্ত)। তাহাদের পূজিত ধর্মঠাকুরের নাম সুন্দররায়। সুন্দররায়কে দর্শন ও প্রণাম করিয়া একজন দেয়াসীর মুখে তাঁহার গাজনের বর্ণনা শুনিলাম। দেখিলাম, বাঁকুড়ার ধর্মের গাজনের সহিত ইহার বিশেষ মিল আছে। পরে দেয়াসীকে বলিলাম, "বাপু সুন্দররায়ের ধ্যানটি বল ত।" সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে অশুদ্ধ সংস্কৃতে অনুচ্চকণ্ঠে ধ্যানটি বলিয়া গেল। পরিষ্কার সূর্যের ধ্যান।

ধর্মরাজ তবে সূর্যদেবতা। তাহাই হইবার কথা। বৈদিক সাহিত্যে ইহার মূল আছে। ধর্মের প্রতিমা কূর্মাকৃতি; শতপথব্রাহ্মণে সূর্যদেবকে কূর্ম বলা হইয়াছে। বৈদিক ঋষিগণের উপমা-উৎপ্রেক্ষা-প্রয়োগের আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। অনন্ত নীল নভোমণ্ডলকে তাঁহারা 'সমুদ্র' বলিতেন। সূর্যরূপ কূর্ম সে সমুদ্রের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রত্যহ বিচরণ করেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের 'হিরণ্ময় হংস'ও সূর্য। ইনি 'স্বয়ম্ভু'; কারণ ইঁহার জন্মদাতা কেহ নাই। ইনিই কাশ্যপেয় অথবা স্বয়ং কশ্যপ (কচ্ছপ), নিখিল জীব জগতের পিতা। 'ধর্মনিরঞ্জন' ও 'ধর্মনারায়ণ' কথা বাঁকুড়া-বর্ধমান-বীরভূমে বহুলপ্রচলিত। বাল্যকালে মাসীমাতার মুখে শুনিয়াছিলাম, "বাবা, ধর্মশিলায় আর শালগ্রাম শিলায় ভেদ নাই।" তিনি হয় ত ভক্তিবশতঃ এই কথা বলিতেন, কিন্তু দেখা যাইতেছে, কথাটা জ্ঞানমার্গীয় দৃষ্টিতে সত্য। শালগ্রাম শিলা সূর্যের প্রতীক (গত পৌষের প্রবাসীতে 'ইন্দপরব' এবং ফাল্গুনের প্রবাসীতে 'ইতুপূজা' দ্রষ্টব্য), ধর্মশিলাও তাহাই। ধর্মের এক নাম স্বরূপ-নারায়ণ। অর্থাৎ স্বরূপে ইনি নারায়ণ। নারায়ণ বিষ্ণু; বিষ্ণু সূর্য, চলমান সূর্য।

ধর্ম ঠাকুরকে যমরাজ মনে করিলেও দোষ নাই। যম বৈবস্বত, বিবস্বানের পুত্র। বিবস্বান সূর্য। সূর্যের পুত্র বলিতে সূর্যই বুঝিতে হইবে। ভাষার শৈলী প্রাচীনকালে এইরূপ ছিল। যথা—অগ্নি বলের পুত্র (সহসো সূনুঃ) অর্থাৎ বলস্বরূপ; মানুষ অমৃতের পুত্র (অমৃতস্য পুত্রাঃ) অর্থাৎ অমৃতস্বরূপ। অতএব ধর্মঠাকুর মূলতঃ সূর্যদেবতা। ইহাকে যাঁহারা কূর্মরূপ বিষ্ণু বলেন, তাঁহারা এই দিক দিয়া দেখিলে ঠিকই বলেন। ধর্ম যে সূর্য, তাহার আর এক প্রমাণ, ইহার বাহন অশ্ব। ধর্মের পূজায় সর্বত্র দারুময় অথবা মৃন্ময় অশ্ব প্রদত্ত হয়। ইনি রাজশক্তির আধারভূত; আদৌ সূর্য-বংশীয় ক্ষত্রিয়গণের উপাস্য দেবতা ছিলেন। অবশ্য পরে সকল জাতিই ইহার পূজার অধিকার লাভ করিয়াছে। বাঁকুড়া জেলার বহুস্থানে ডোম-পণ্ডিতেরাই (ধর্মের পূজারী-গণকে এখানে 'পণ্ডিত' বলে) পূজা করে। কথিত আছে, ধর্মপূজার প্রবর্তক রামাই পণ্ডিত ডোমজাতীয়া কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন; তাঁহার বংশধরগণ ডোম-পণ্ডিত নামে আখ্যাত হয়। বাঁকুড়া জেলার ময়নাপুর গ্রামে রামাই পণ্ডিতের জন্ম হয়। কিন্তু তাঁহার জন্মশক এ পর্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। এই গ্রামে এক অতি প্রাচীন মন্দিরে যাত্রাসিদ্ধি-ধর্ম পূজিত হইতেছেন। লোকে বলে, স্বয়ং রামাই পণ্ডিত এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন এবং যাত্রাসিদ্ধি তাঁহারই পূজিত দেবতা। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে রামাই পণ্ডিত খ্রীস্টজন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্বে ছিলেন এবং তিনি শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ ছিলেন। শাকদ্বীপী হইলে তিনি নিশ্চয় সূর্যভক্ত ছিলেন। সেই সূর্যই তাঁহার নিকট ধর্মে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন।

মনে হয়, শিবের গাজন যেমন নববর্ষের পূর্বরাত্রের উৎসব, ধর্মের গাজনও সেইরূপ। ধর্মের গাজন হয় বৈশাখী পূর্ণিমায়। সম্ভবতঃ এককালে বৈশাখী পূর্ণিমায় নববর্ষ আরম্ভ হইত। বিশেষ জ্যোতিষিক যোগ ব্যতীত নববর্ষ আরম্ভ হয় না। অয়ন দিন কিংবা বিষুব দিন ব্যতীত নববর্ষ আরম্ভের দৃষ্টান্ত ভারতের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। অতএব বলিতে হয়, বৈশাখী পূর্ণিমায় এইরূপ একটা যোগ ঘটিয়া থাকিবে। বিশেষতঃ, ধর্মঠাকুর যখন সূর্যদেবতা, তখন তাঁহার সহিত অয়ন বা বিষুব দিনের যোগ থাকাই স্বাভাবিক। বৈশাখী পূর্ণিমায় উত্তরায়ন কিংবা দক্ষিণায়ন বহু বহু কাল পূর্বে হইয়াছিল; ততকাল পূর্বে ভারতভূমিতে আর্যসভ্যতার উদ্ভব হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। অতএব বৈশাখী পূর্ণিমায় বিষুব দিনের স্মৃতি রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা এবং সে বিষুব মহাবিষুব।

এক্ষণে ৭ই চৈত্রে মহাবিষুব দিন হইতেছে। বৈশাখী পূর্ণিমা বৈশাখ মাসের শেষ দিকে পড়ে। অতএব যেকালে বৈশাখী পূর্ণিমায় মহাবিষুব হইত, সেকাল হইতে বিষুব-দিন বর্তমানে ১ মাস+২২-২৩ দিন অর্থাৎ প্রায় পৌনে দুই মাস পিছাইয়া আসিয়াছে। বিষুব-দিন এক মাস পশ্চাদ্‌গত হইতে প্রায় দুই সহস্র বৎসর লাগে। অর্থাৎ পৌনে দুই বৎসর পশ্চাদ্‌গত হইতে ২০০০ × ১¾ = ৩৫০০ বৎসর লাগিয়াছে। অতএব অদ্যাবধি ৩৫০০ বৎসর পূর্বে, আনুমানিক খ্রী-পূ ১৫০০ অব্দে বৈশাখী পূর্ণিমায় মহাবিষুব হইত। ধর্মের গাজনে সেই কালের স্মৃতি রক্ষিত আছে। অবশ্য বর্তমানকালে আমরা যে আকারে ধর্মের গাজন দেখিতেছি, সেকালে এরূপ ছিল না; কিন্তু তখনই এই উৎসবের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। কালে কালে ইহাতে নানাবিধ ধর্মবিশ্বাস যোজিত হইয়াছে, দেশ-ভেদে উৎসবের আচারে পার্থক্য ঘটিয়াছে। শিবের গাজনের

স্থায় ধর্মের গাজনেও বৌদ্ধপ্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ধর্মঠাকুর মূলতঃ বুদ্ধ নহেন ; ধর্মের গাজন বৌদ্ধ উৎসব নহে। বুদ্ধের বহুকাল পূর্ব হইতেই এই উৎসব ছিল।

কেহ কেহ মনে করেন, ধর্মঠাকুর প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন বিশেষের 'টোটেম', কচ্ছপ। তাঁহাদের সিদ্ধান্তের মূলে কোনও যুক্তি আছে বলিয়া মনে করি না। এক শ্রেণীর লেখক আছেন, তাঁহারা ভারত-কৃষ্টির পনর-আনা যে অনার্য-কৃষ্টি তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য অতি উৎসাহী। এখানে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের একটি ভ্রান্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত কাজ করিতেছে। তাঁহাদের মতে খ্রীস্টজন্মের দুই সহস্র বৎসরের অধিক পূর্বে ভারতে আর্য-উপনিবেশ স্থাপিত হয় নাই ; কাজেই তাহার পূর্বে যাহা কিছু হইয়াছিল, সবই অনার্যদের। বর্তমান প্রবন্ধে ধর্ম-cult-এর আর্যত্ব সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে পাঠকের মনে হয়ত সংশয়ের অবকাশ থাকিবে না। অতি পুরাতন হইলেও ইহা আর্য-কৃষ্টি। আর্য-কৃষ্টি যে কত পুরাতন, ধর্মের গাজন হইতে তাহার আর একটি ইঙ্গিত পাইতেছি।

পূর্বে বলিয়াছি, বেলিয়াতোড়ে এবং আরও দুই-একটি গ্রামে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ধর্মের গাজন হয়। আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ধর্মের গাজন একান্ত আকস্মিক মনে হয় না। বৈশাখী পূর্ণিমায় যে কারণে ধর্মের গাজন, আষাঢ়ী পূর্ণিমাতেও সেই কারণে ধর্মের গাজন হয়, এই অনুমান অসঙ্গত নহে। যেকালে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় মহাবিষুব দিন হইত, বেলিয়া-তোড়ের ধর্মের গাজনে সেইকালের স্মৃতি রক্ষিত আছে। সে আনুমানিক খ্রী-পূ. ৫৫০০ অব্দের কথা। কথাটা বিশ্বাস করা সহজ না হইতে পারে, কারণ আমরা শিখিয়া রাখিয়াছি, ভারতে আর্যসভ্যতার বয়স চারি সহস্র বৎসরের অধিক নহে। কিন্তু আমার অনুমানের মূলে সত্য আছে কিনা, পণ্ডিতগণ বিচার করিয়া দেখিবেন।

কেহ কেহ মনে করেন, শিবের গাজনের অনুকরণে ধর্মের গাজন আসিয়াছে। জানি না, কোন্ যুক্তিতে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। মনে হয়, ব্যাপারটা ঠিক ইহার বিপরীত। শিবের গাজন খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের পরে বর্তমান রূপ লাভ করিলেও খ্রী-পূ. ২৫০০ অব্দে ইহার বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল (প্রবাসী চৈত্র, ১৩৬১)। কিন্তু ধর্মের গাজনের বীজ ইহার বহু পূর্বে, প্রায় ৩০০০ বৎসর পূর্বে অঙ্কুরিত হয়। সূর্যপূজা ভারতে অতি প্রাচীন। কেবল ভারতে নহে, সকল সভ্যদেশেই আদিতে সূর্যপূজা ছিল। গ্রীস, মিশর, চীন ও পারস্যের পুরাণে ইহার প্রমাণ আছে। কিন্তু ভারতে শিবপূজা তত প্রাচীন নহে, অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। বেদে অবশ্য রুদ্র আছেন, কিন্তু তাঁহার শিবে রূপান্তরিত হইতে বহুকাল লাগিয়াছিল।

ভেট

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

মালতী তোমার জন্মতারিখে
লাল পেন্সিলে 'উপহার' লিখে
বকুল ফুলের গুচ্ছ
পাঠালাম—নয় তুচ্ছ।

মণিহার দেবো ঠিক করলাম,
তবু শেষকালে সামান্য দাম
ফুটমঞ্জরী পুঞ্জ
দিলাম—এ কার তুল্য ?

জানি ফুলগুলি মালা গেঁথে নিতে
সাজিতে ভরবে, কভু কবরীতে
কখনো অধর পুষ্পে
রাখবে—ন'লে সে চুপসে।

সুরভিগন্ধ পাবে আঘ্রাণ,
এর চেয়ে নয় কারো সম্মান,
ফুলের স্তবকবৃন্তে
এ ভেট—ভুলো না চিনতে !

পিনকল

শ্রীবিশ্বপ্রাণ গুপ্ত

কলকাতা থেকে দশটা ষ্টেপেজ। দূরত্ব কুড়ি মাইল জায়গাটির নাম ইছাপুর। সেখানে নতুন চাকরি পেয়েছে প্রাণেন্দু। চাকরির মানমর্যাদা কি তা সে এখনও জানে না। তবে চাকরিতে যোগ দিয়ে দেখলে, তার পরিচয় ছোট গেটবাবু। আর তার যে 'বস' তার পরিচয় গেটবাবু। প্রথম দিনকয়েক কেমন অস্বস্তি আর বিরক্তি লাগছিল প্রাণেন্দুর, তবুও দিন কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণেন্দু পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিলে।

ছোট লাল রঙের দশ ফুট একখানা ঘর। প্রাণেন্দুর বসবার জায়গা. এক কথায় তার আপিসঘর। ঘরে টেবিল নেই, চেয়ারও নেই। আছে দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো তক্তা—সে তক্তা ঘরের চারদিক বেষ্টন করে আছে। আর আছে বসবার গোটা দুই টুল। কাঠের ঐ তক্তার উপর সারি সারি থরে থরে সাজানো চাকতি। ব্যাঙ্কের চাকতির মত। সে চাকতি ঝন ঝন করে বাজে রূপোর টাকার মত।

প্রথম দিনকয়েক গেটবাবু রোজ একবার আসতেন দুটোর শিফ্ট-এর কাজ শেষ করে দিয়ে।

"এই যে ব্যানার্জীবাবু, সব চাকতি চিনে নিয়েছেন তো?

হ্যাঁ শুনুন. এক থেকে একশ' এই ভাবে সাজাবেন—

এলফাবেটিক্যালি। যেমন এ ওয়ান টু হানড্রেড। বি ওয়ান টু হানড্রেড, বুঝলেন?"

প্রাণেন্দু ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। গেটবাবু ঘরের চারদিকে একবার তাকালেন। ফিরে যাবার পথে বললেন, 'হাঁ, উত্তর দিকের জানালাটা বন্ধ করে রাখবেন—তা খুলেই রাখবেন।"

গেটবাবু প্রাণেন্দুর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চোখ বুলিয়ে নিলেন।

'গেটবাবু'—মনে মনে বললে প্রাণেন্দু। বয়স প্রায় পঞ্চাশ। কাঁচাপাকা চুল। নাক বেয়ে-পড়া চশমা। হাঁটুর ওপর কাপড়। গলায় তুলসীর মালা। ষাট থেকে কুড়ি বছরে একশ' ষাট হয়েছে। অর্থাৎ গেটবাবু, যার রোজগারের শেষ ধাপ একশ' ষাট'টাকা। প্রাণেন্দু মনে মনে হাসল। তার পরেই দুশ্চিন্তায় খানিকটা বিষণ্ন হয়ে পড়ল সে। এই পথেই তো সে পা দিয়েছে। এই যৌবনকালে ষাট, বার্দ্ধক্যে একশ' ষাট। সেইখানেই শেষ। তা হোক। তবুও তার কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাবে প্রাণেন্দু।

প্রাণেন্দু এবার হালকা হতে চাইলে। হয়ত ছোটবাবু আরও কম মাইনেতে সুরু করেছিলেন। যুদ্ধের পরই তো সব মাইনে বাড়ল। এবার প্রাণেন্দু তাকাল ঐ উত্তরের জানালাটায়। একখানা মুখ মিলিয়ে গেল আড়ালে।

একখানা মুখ। এ সেই মুখ যা সব পুরুষের ভাল লাগে। বললে প্রাণেন্দু। ভাবলে ঐ জানালায় হঠাৎ তাকিয়ে ইচ্ছা করে আর দৃষ্টিপাত করতে হ'ল না প্রাণেন্দুকে। সত্যি সে অবাক হয়ে গেল পরদিন বারাকপুরে সকাল ন'টায় নৈহাটি লোকালে একটা থার্ড ক্লাস কামরায় যখন তাকে সে দেখলে। নীলরঙা ধনেখালি সাড়ীর আঁচলের উপর দুলছে কালো দীঘল চুলের পুষ্ট বিনুনী। আর নীলচে চোখের সলজ্জ চাউনি—সেই মেয়েটি। জানালায় যাকে সে দেখেছে। গত কাল বিকেলে।

ট্রেন লেট চলছে। প্রাণেন্দু তাই চিন্তিত। নানা ভাবনায় বিক্ষিপ্ত আর উৎকণ্ঠিত। মনটা যেন এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে নানা দিকে। দেরি হয়ে গেলে কি বলবেন গেটবাবু? ছোট ম্যানেজার সাহেব যদি উঁকি মেরে যায় তার ঘরে?

এই এলোমেলো মনের ভাবনা-বিহ্বল মুহূর্তে সেই মেয়েটির আবির্ভাব যেন ওর সব চিন্তায় পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিলে। প্রাণেন্দু আড়চোখে তাকিয়ে নড়ে চড়ে বসল। মেয়েটিও এক ঝলক তাকিয়ে নিলে তখন, যখন প্রাণেন্দু বাইরে চেয়ে আছে। আট মিনিটের মধ্যেই ইছাপুর সাউথ কেবিনের কাছে ধনুকের মত বাঁকা লাইন ধরে ষ্টেশনে এসে গাড়ী দাঁড়াল। প্রাণেন্দু নেমে দেখল সেই মেয়েটিও নেমে দাঁড়িয়েছে।

কারখানার কাজ তখন পূর্ণ গতিতে চলেছে। বড় গেটবাবু কাজ করে যাচ্ছিলেন আপন মনে। গতকালের গেট-খাতার হিসাবনিকাশ দেখছিলেন। প্রাণেন্দু একবার আড়চোখে তাকিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। তারপরেই বেরিয়ে এসে গেটবাবুর পাশে এসে বসল। চুপচাপ।

পিঁপড়ের লাইন ধরে চলার মত এসে বহুক্ষণ পৌঁছে গেছে পিনকলের কর্মীরা। তারা গেট হাজিরার চাকতি তুলে যে যার ঘরে গিয়ে কাজে হাত দিয়েছে।

"চাকরি রাখতে পারবেন না মশাই।" গেটবাবু মুখ না তুলেই বললেন কথাটা।

"না, দেরি হয়ে গেল। ট্রেনটা লেট করল কি না।" প্রাণেন্দু অপরাধীর মত বললে কথাগুলো—ধীরে ধীরে থেমে থেমে।

"আমার গত পঁচিশ বছর চাকরিতে পঁচিশ দিন লেট হয় নি জানেন?" তারপরে গর্বিত হয়ে বললেন, "না, আসতেই যখন হবে, তখন আগেই আসব, দেরিতে কেন?"

"সে তো ঠিকই।" প্রাণেন্দু সায় দিলে।

"আরে, এই যে মহালবাবু"—গেটবাবু ঘুরে বসলেন।

"বসুন, বসুন।" যেন খানিকটা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন গেটবাবু।

মহালবাবু বসলে, গেটবাবু বললেন, "কি মশাই, কি ভাবনায় বিভোর থাকেন, অ্যাঁ? ঘর-হাজিরা তো করেছেন? গেট-হাজিরা কোথায়?"

"তাই নাকি ? গেট-হাজিরা করি নি ?" মহালবাবু তাকালেন চোখ গোল করে—বিস্ময়ে।

"আপনারা মশাই একেবারে তালকানা—"

"না না, বলেন কেন ? এই গিন্নীর তালে তালকানা না হয়ে উপায় কি ? বলে কি না পুঁই দিয়ে চিংড়ি করেছি, খেয়ে যাও। বেশ, খেলাম আর লেট করলাম। গেট-হাজিরা ভুল হয়ে গেল।" মহালবাবু গাল নাড়িয়ে গালে হিজিবিজি রেখা তুলে হাসলেন এক মুখ।

প্রাণেন্দু একপাশে দাঁড়িয়ে রইল। একা একা নিঃসঙ্গ নিষ্পন্দ ভাবে। ওদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় সে যোগ দিলে না।

বেলা গড়িয়ে রোদ চল্দে হয়ে এসেছে। প্রাণেন্দুর হাতের কাজও আজ প্রায় শেষ। এখন ভোঁ বাজলে ছুটি পাবে। গত কাল এই সময়ে তার ঘরের উত্তর দিকের জানালায় যে মুখখানা চকিতে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল, আজ এখন পর্য্যন্ত তাকে দেখা গেল না। জানালা বন্ধ করতে করতে তাই ভাবছিল প্রাণেন্দু। উত্তরের জানালার পরে সরু রাস্তা। তারপর এক ফালি মাঠ। মাঠের পরে 'শিল্পনিকেতন'। মেয়েদেরর সেলাই শেখানো হয় ওখানে। অনেক মেয়ে আসে নানা জায়গা থেকে। সারাদিন তাদের কলরবে মুখরিত হয়ে থাকে শিল্পনিকেতনের একফালি মাঠ। পাখীর কিচিরমিচির আর কাকলিতে যেমন মুখর হয়ে থাকে বন-প্রান্তর। ঐ জানালা দিয়েই আরও দেখা যায় দূরের সমান্তরাল কালো রেল-লাইন। বেলাশেষের রাঙা রোদে ঝকমক করে। তার পাশে গুমটিঘর। রেল-ষ্টেশন। কমলালেবু রঙের বিকেলের রোদ গায়ে মেখে রেল-লাইন হেঁটে পার হয়ে যায় ওপারের বাস্তহারা কলোনির মেয়েরা। বিকেলের রোদে দূর থেকে ওদের চলমান মূর্ত্তিগুলি দেখতে ভালো লাগে। প্রাণেন্দু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আর ভাবে।

যদিও উত্তরের জানালাটা খোলা গেটবাবুর বারণ—কি কারণে তা সে জানে না, তবুও ব্যাকুল আগ্রহে রোজই একবার ঐ জানালাটা খুলে দেয় প্রাণেন্দু। খুলে দেয় তখন, যখন হাতের কাজ শেষ হয়ে যায়। কমলালেবু রঙের রোদ প্রজাপতি আর ফড়িঙের ডানায় কাঁপতে থাকে ঘাসে ঘাসে ছায়া ফেলে। আর ভোঁ বাজার বাকি থাকে মাত্র কয়েক মিনিট।

ভোঁ বাজলেই জানালাটা আস্তে বন্ধ করে দিয়ে বাইরে নেমে পড়ে প্রাণেন্দু। ফেরবার পথে কোন দিন-বা সেই মেয়েটিকে দেখতে পায়, কোন দিন পায় না। তা নিয়ে ভাবে না প্রাণেন্দু। তার এই নূতন কর্ম্মজীবন। তার অনেক কাজ। অন্তরের নিষ্ঠা ছাড়া মানুষ কখনও বড় হয় ? অনেক ভেবে দেখেছে প্রাণেন্দু। হয় না, তা কখনই হয় না।

আজকাল গেটবাবুর সঙ্গে খাতির জমে উঠেছে প্রাণেন্দুর। কিন্তু হঠাৎ এই খাতিরের কারণটা সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। মাঝে মাঝে মনে হয়, গেটবাবুর মেয়ের কি বিয়ে হয় নি ? এ ধারণা হওয়ায় পিছনেও যুক্তি আছে প্রাণেন্দুর। গেটবাবুই বলেছিলেন একদিন, "মহালবাবুর সঙ্গে একটু খাতির-টাতির রাখি, বুঝলে না ভায়া, ওর লেট-ফেটগুলো না ধরাই ভাল।" তারপরেই গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, "ওর ছেলে ম্যাট্রিক পাস করে এয়ার-ফোর্সে কাজ করছে। ছেলেটি ভাল, বেশ সুন্দর স্বাস্থ্য।"

প্রাণেন্দু তখনই বলেছিল, "চেষ্টা করুন না, হয়ে যাবে।"

"সে কি আমার কপাল !" বলে গেটবাবু সেদিন উঠে গিয়েছিলেন ম্লান হেসে।

কি একটা কাজে গেটবাবু প্রাণেন্দুর ঘরে এলেন। বললেন, "কি কাজকর্ম্ম কেমন লাগছে ?"

"আজ্ঞে ভাল।"

"তা ভাল করে কাজ কর। তবে ত চাকরি পাকা হবে। তা ছাড়া তোমার বয়স কম ; ঠিক মত কাজ করে উন্নতি কর—তা ছাড়া—"

"সে ত বটেই।" অনেক আশা করে প্রাণেন্দু তাকাল গেটবাবুর দিকে।

পঞ্চাশ বৎসর বয়সের গেটবাবু উঠে যাবার পর প্রাণেন্দুর মনে হ'ল, আজীবন নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে গেটবাবু কি পেলেন পারিবারিক জীবনে ? ছেলেটা লেখাপড়া না শিখে বাউণ্ডুলে হয়ে গেল। মেয়েটার বিয়ে হ'ল না।···কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল প্রাণেন্দু। আর তখন পিনকলের বয়লারের শব্দ স্পষ্ট হতে লাগল। স্পষ্টতর হতে লাগল বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মব্যস্ততার চাপা গুঞ্জন আর লাল গলানো ইস্পাত ফর্ম্মায়-ডাইসে ঢেলে পিন ও সূচ তৈরি চলতে লাগল নূতন উদ্যমে। পিনকলের কামারশালায় লোহা পেটানোর শব্দ উঠল : ঠন্-ঠাস, ঠন্-ঠাস।

এই পিনকল, যুদ্ধের আগে ছিল পাটকল। যুদ্ধের সময় ব্যবসা মন্দা পড়ায় পাটের কাজ বন্ধ করা হ'ল। যুদ্ধের পর আমেরিকা আর ইংলণ্ড থেকে এল যন্ত্রপাতি। জাপান থেকেও এল। সুরু হ'ল পিনকলের কাজ। আলপিন, সূচ, মেয়েদের চুলের কাঁটা, লোহার তারকাঁটা, পেরেক, স্ক্রু, চাকতি, এমনকি হালে ছুরি, কাঁচি, ক্ষুরও তৈরি হচ্ছে। দেখতে অবাক লাগে প্রাণেন্দুর। আশ্চর্য্য হয়ে দেখে, কি করে একখণ্ড লাল গলিত ইস্পাত, ফর্ম্মায়, ডাইসে আর প্রেসিং মেশিনে ধাপে ধাপে কতকগুলি সূচ আর আলপিন হয়ে নামছে, কি করে একখণ্ড লোহা পেরেকে আর স্ক্রু বল্টুতে পরিণত হচ্ছে। পিনকলের কর্ম্মশালায় এই সৃষ্টিরহস্য সত্যিই প্রাণেন্দুর নিকট মহা বিস্ময়।

মহালবাবু এলেন, টুল টেনে বসে বললেন, "কি রকম লাগছে ?"

"ভাল", প্রাণেন্দু হাসল।

মহালবাবুর ডাক নাম অমল মহলানবিশ। সংক্ষিপ্ত নাম যা এই কারখানায় চলে, তা হ'ল মহালবাবু।

"ছেলের বিয়ে দেবেন না ?"

"সে এখন বিয়ে করবে না। তা ছাড়া আপনার দরকার কিসের মশাই ?" ভ্রূ কোঁচকালেন অমল মহলানবিশ। তারপর উঠে যাবার সময় বললেন, "চলি, আপনি কাজ করুন।"

কাজ! প্রাণেন্দু আপন মনে বললে। হাঁ, তা সে করবে বৈকি ? কিন্তু শুধুই কি কাজ ? শুধুই কি পিনকলের যন্ত্রগুলির মত একঘেয়ে কাজ করে যাওয়া। হাতের খাতাপত্র আর লাল রঙের হাজিরা-খাতা বন্ধ করতে করতে সে ভাবল।

শীতের অপরাহ্নে শিয়ালকাঁটার ফুলের পাপড়ির মত হলদে ক্ষণস্থায়ী রোদ কখন পড়ে গিয়েছে। ভোঁ বাজছে পিনকলের চিমনিতে। চিমনি দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ঘন ঘন নির্গত হচ্ছে। ছুটি হয়ে গেলে পথে নেমে প্রাণেন্দু ভাবলে, হাঁ, তার মনে সে রং ধরেছে বৈকি ? মানুষের মন ত রঙীন হবেই, তা ছাড়া এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কি সার্থকতা আছে! সে খুশী হয়ে উঠল আপন মনে।

কিন্তু কি আশ্চর্যভাবে তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তার ঘরের উত্তরের জানালায় প্রথম দেখা সেই মুখখানি। নাম চন্দনা, ওর হাতের আকাশী রঙের কভার-ফাইলে নাম লেখা ছিল চন্দনা মুখোপাধ্যায়। শিল্প-নিকেতনে সেলাই শেখায়।···

নৈহাটী লোকাল এসে গেছে। মাথা নামিয়ে ট্রেনটাকে সংবর্দ্ধনা জানাচ্ছে লাল রঙের সিগন্যাল পোষ্ট। চন্দনার সঙ্গে কি দেখা হবে ? সে হয়ত চলে গেছে এতক্ষণে।

হাঁ, সে নেই আজ। অন্ততঃ ইছাপুর প্ল্যাটফর্মে তাকে ত আজ দেখা গেল না। কিন্তু গাড়ীতে উঠে প্রাণেন্দু দেখলে আজও উঠেছে সে। এ হচ্ছে সেই গাড়ীটা, যার ছাদ দিয়ে জল পড়ে বৃষ্টি হলে। আর গাড়ীর ভেতরটা সাদা নয়, ছাইরঙা। আরও একটা মারাত্মক চিহ্ন আছে। ভাঙা লাইটের ঝুলে-পড়া বাল্‌ব। প্রাণেন্দুর চিনে নিতে কষ্ট হ'ল না। এই গাড়ীতেই সেদিন উঠেছিল সে। সেই দিন, যেদিন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। পৌষ মাসের শীতের সকালে ঠাণ্ডা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি কাঁচচূর্ণের মত বিঁধছিল গায়ে। গাড়ীর ছাদ দিয়ে বৃষ্টি পড়ছিল। ঐ বেঞ্চিটায় বসেছিল চন্দনা। ছাদ দিয়ে চুইয়ে-পড়া জলে বসে বসে ভিজছিল সে—অসহায় এক পায়রার মত। প্রাণেন্দুই তখন বললে চন্দনাকে তার পাশে বসতে। চন্দনা উঠে এসে বসে রইল লজ্জানত মুখে। সেই দিন গাড়ীতে ভিড় ছিল। বেঞ্চিতে ঘন হয়ে বসেছিল ওরা। চলন্ত গাড়ী দুলছিল। চন্দনার কাঁধটা মাঝে মাঝে আলতো ভাবে লাগছিল ওর কাঁধে গাড়ীর দোলনের সঙ্গে তাল রেখে। সেদিন বৃষ্টি থেকে চন্দনাকে রক্ষা করেছিল প্রাণেন্দু। সেই থেকেই ওদের আলাপ ও পরিচয়।···

"পুরুষেরা বোধ হয় চিরকাল এমনি করে সব বিপদ থেকে মেয়েদের রক্ষা করে।"—ভাবলে প্রাণেন্দু, জানালায় মাথা রেখে।···

পরদিন···ইছাপুর মর্থল্যাণ্ড ছাড়িয়ে সেই ঝিল, উঁচু মাটির ঢিবি, আর কার্পেটের মত ঘাস। সবুজ ঘাসের পরে কালো বর্ডারের মত পীচের কালো পথটা। ঝিলের কালো জলের পদ্মপাতায় ছসিয়ারী পা ফেলে চলে সাদা বকের দল। ঝিলের ওপাশে একরাশ রয়না গাছের ভিড়। এ পাশে একটা পুরনো কাঞ্চনফুলের ছায়ায় দুপুরের নিঝিঝিলিতে টিফিনে রোজই এসে বসে প্রাণেন্দু। শিল্প-নিকেতনেও টিফিনের ছুটি হয়। চন্দনাও এসে বসে। ওরা গল্প করে, হাসে, বাদাম খায়। সে মাত্র আধ ঘণ্টা। তারপর শীতের দুপুরে, আমেজে আর উত্তাপে প্রাণ ভরে নিয়ে ওরা কাজে ফিরে যায়।

বিকেলের দিকে ছুটির আগে গেটবাবু এলেন প্রাণেন্দুর ঘরে। টুল টেনে বসে বললেন, "প্রাণেন্দু, ছুটির পর আমার বাসা হয়ে যাবে। দরকার আছে।"

আপিস ছুটির পর প্রাণেন্দু এল গেটবাবুর বাড়ীতে। দরকার আর কিছুই না, পৌষ-সংক্রান্তি। চিতুই পিঠে আর মুগের পুলি দিয়ে গেলেন প্রৌঢ়া মহিলা। বোধ হয় গেটবাবুর স্ত্রী। আর এক বাটি দুধপুলি রেখে গেল বছর আঠারো বয়সের শ্যামলা একটি মেয়ে। গেটবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন, আমার মেয়ে। তার পর সে চা নিয়ে এল। চায়ের পর আনল এক ডিবে পান। গেটবাবু বললেন, প্রাণেন্দুকে একটা গান শুনিয়ে দেবে না ? "না না থাক, পরে শুনব'খন" প্রাণেন্দু বললে ব্যস্ত হয়ে। গান হ'ল না, সুরু হ'ল গল্প। গল্পে গল্পে গেটবাবু বললেন, "তোমার ঘরের উত্তর দিকের জানালাটা খুলতে বারণ করছি কেন জান ? ঐ একটা মেয়ে আছে, সাদা সাদা চোখ। মেয়েটা ভাল নয়। তোমার আগে যে ছোকরাটি ছিল তোমার জায়গায়, তারও চাকরি গিয়েছিল ঐ ওরই জন্য। আর ছোট ম্যানেজার সাহেবের ওখানেও ঐ নচ্ছারের যাতায়াত ছিল।" গেটবাবুর চোখজোড়া ঝক্ ঝক্ করে উঠল।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল প্রাণেন্দু। কেন যেন বুকটা ঢিপ ঢিপ করতে সুরু করে দিল—তার কারণটা ওর নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়। ওর মুখের দিকে চোখ রেখে গেটবাবু আরও বললেন নিঃসঙ্কোচে, "ওর সঙ্গেই তো, তোমাকে আজ দেখলাম।" চোখের তারা দুটো যেন নেচে উঠল গেটবাবুর।

মুখটা নামিয়ে নিলে প্রাণেন্দু। দৃষ্টিটা নিলে সরিয়ে। কেন যেন নিজেকে গুটিয়ে নিতে ইচ্ছা হ'ল ওর—শামুক যেমন করে খোলের ভেতর গুটিয়ে নেয় নিজেকে। অন্যদিকে তাকিয়ে অন্য-মনস্কের মত জবাব দিলে, "আজ চলি।"

বাইরে পৌষ মাসের দারুণ শীত। কুয়াশা জমে আছে ঘন হয়ে। দূরে দূরে আলোর বিন্দু—যেন এক ছড়া আলোর মালা ছিঁড়ে গিয়ে পড়ে আছে একটি সরল রেখায়। কুয়াশা, কলের ধোঁয়া আর ইঞ্জিনের ধোঁয়ায় ভারী-হওয়া সন্ধ্যা-কাল। এরই মাঝে প্রাণেন্দু হেঁটে চলছিল। সংসারে সব মানুষ সহজ আর সরল নয়। তাদের অনেক ছলা-কলা করতে হয়।

আশ্রয় করতে হয় অনেক নাটকীয় কৌশলের—যেমন করলেন গেট-বাবু, পৌষ-সংক্রান্তির চিতুই পিঠে আর মেয়ের গান শোনানোর প্রস্তাবের ভেতর দিয়ে।

কিন্তু তা হোক। তবুও গেটবাবুকে অশ্রদ্ধা করে না প্রাণেন্দু। বয়োবৃদ্ধ মানুষ। সংসারে কত দায়িত্ব। সবচেয়ে বড় কথা বাংলা দেশের অবিবাহিতা মেয়ের এক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত পিতা। ভাবলে প্রাণেন্দু।

তার পরদিনও পিনকলে কাজ শুরু হ'ল যথানিয়মে। সেদিনও প্রাণেন্দু প্রয়োজনে গেটবাবুর ঘরে এল, গেটবাবু গেলেন প্রাণেন্দুর ঘরে। দু'জনে বসে কাজের কথা হ'ল, গল্প হ'ল। উঠবার আগে গেটবাবু শুধু একবার হাসতে হাসতে বললেন, "কি বিয়ে-টিয়ে করবে না?" অবাক হয়ে প্রাণেন্দু বললে, "আপাততঃ তো নয়ই।" প্রাণেন্দু লক্ষ্য করলে গেটবাবুর হাসিমাখা চোখ-জোড়ার দৃষ্টি যেন হঠাৎ অত্যন্ত চঞ্চল আর হিংস্র হয়ে উঠল।

সেদিনও দুপুরের টিফিনের ঘণ্টায় চন্দনাকে কাছে পেয়েছিল প্রাণেন্দু। অনেকক্ষণ ধরে ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলে সে। তার পর প্রাণেন্দুর মনে হ'ল, গেটবাবুর কথাগুলোর পেছনে নিশ্চয়ই একটা সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল। আর তা ছাড়া যদি গেটবাবুর কথা সত্যিও হয়, তাতেও কোন ক্ষতি নেই প্রাণেন্দুর। চন্দনার অতীত নিয়ে তার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন তার বর্তমান নিয়ে। বর্তমানের এই চন্দনা, যে তার পাশে বসে রয়েছে, আর দুপুরের শিথিল হাওয়ায় যার মাথার চুল, সাড়ির প্রান্ত উড়ছে, সেই চন্দনাই তার কাছে সত্য। জীবনের সবচেয়ে সত্য আর সবচেয়ে সুন্দর তার এই ভালবাসা।

চন্দনার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রাণেন্দু বললে, "তুমি পিনকলের ছোট ম্যানেজারকে চিনতে?"

"কৈ না তো।" অবাক হয়ে গেল চন্দনা। বললে, "কেন বল তো?"

প্রাণেন্দু তখন খুলে বললে, গেটবাবুর পৌষ-সংক্রান্তির নিমন্ত্রণ, চিতুই পিঠে আর গানের প্রস্তাব। সবই বললে একে একে। শুনে চন্দনা হেসে বললে, "স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষ কত কি করে, তাই না? বেশ দেখা যাচ্ছে, তুমি ওর খপ্পরে পড়েছ।"

এবার দু'জনেই হাসল।

ডান হাতে ঘাসের ডগা ছিঁড়তে ছিঁড়তে প্রাণেন্দু চন্দনাকে বললে তার ঘর-বাঁধার স্বপ্ন। আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসে ওরা বিয়ে করবে। আর মধুরাত্রি যাপনের জন্য যাবে দীঘার সমুদ্রতীরে।

চন্দনা ঘাড় গুঁজে শুনতে লাগল গম্ভীর হয়ে। তার পর হেসে হেসে বললে, "সিনেমার নায়ক হবে না তো? তখন বলবে না তো আমরা পরলোকে মিলব।"

চন্দনার হাতটা টেনে নিলে প্রাণেন্দু। দু'জনে হাসতে লাগল প্রাণখুলে।···

টিফিনের দ্বিতীয়ার্দ্ধে কাজের সুরুতে আর কাজে মন বসল না প্রাণেন্দুর। মনে হ'ল জ্যৈষ্ঠ মাসটা কতদূর! কতদূর ঐ দীঘার সমুদ্রতীর? কবে সে চন্দনাকে পরিপূর্ণ করে পাবে! এই পিন-কলে চাকতি গননা, দৈনন্দিন হাজিরা দেখা, আর কে ছুটি নিল আর ছুটির পর কাজে যোগ দিল, তার হিসাব রাখার ফাঁকে ফাঁকে চন্দনাই হবে তার সবচেয়ে বড় প্রেরণা। তা ছাড়া বড় একঘেয়ে এই পিনকলের কাজ। বড় বিরক্তিকর।···

দরজায় শব্দ হতেই প্রাণেন্দু তাকিয়ে দেখলে কারখানার ডাকপিয়ন। হাতে পিয়নবই। চিঠিখানা সই করে নিয়ে পড়ে ফেললে প্রাণেন্দু। তার পর পকেটে রেখে দিলে ভাঁজ করে। যেন কিছুই হয় নি।

বিকেলের দিকে মহালবাবু এলেন। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বললেন, "আপনার কোন সাহায্যে আসতে পারলাম না দুঃখ থেকে গেল।"

হাসল প্রাণেন্দু। মহালবাবু আবার বলতে সুরু করলেন, "এর আগের 'রিট্রেঞ্চমেণ্ট লিষ্টে' আপনার নাম ছিল। তা তখন উনিই 'ডিফেণ্ড' করেছিলেন। কিন্তু এবার···"

প্রাণেন্দু তেমনি হেসে বললে, "সে আমি আশঙ্কা করেছিলাম।" তার পর মাথার চুল বাঁ হাতের মুঠিতে ধরে বলতে লাগল, "দুঃখ-দারিদ্র্য তো জীবনে সয়ে সয়ে পুরনো হয়ে গেছে। ভয়ের কি? বেঁচে যদি থাকি কাজ পাব না?"

মহালবাবু লক্ষ্য করলেন, প্রাণেন্দুর চোখ দুটি তরুণ রক্তের তেজে, আর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভায় জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলছে; কিছুতেই সে ভাঙবে না।···

প্রতিদিনের মত চিমনির মুখে একরাশ কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে পিনকলে ভোঁ বাজে। বিকেলের রোদ তার ঘরের পাশে বড় নিম-গাছটার মগ-ডালে দোল খায়। আর দলে দলে পিনকলের ক্লান্ত কর্ম্মীরা বেরিয়ে আসে। বেরিয়ে আসে ঘর, গুদাম, বয়লার আর 'মেশিন শপ' ছেড়ে। কাগজপত্র গুছিয়ে গেটবাবুকে বুঝিয়ে দিয়ে আসে প্রাণেন্দু। ঘরের চাবিটাও দিয়ে আসে। এ পিনকলে সে আর মাত্র পনেরো দিন আছে। এখানে তার কাজ ফুরিয়েছে।

স্বর্গ সামীপ্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

স্বর্গ মোদের নিকটে রয়েছে—অধিক দূরে ত নয়,
মাঝে সংশয়, বিশ্বাস, বিস্ময়।
কি ক্ষতি মর্ত্ত্য মর্ত্ত্যই যদি থাকে?
কে বলে স্বর্গে পরিণত হতে তাকে?
এমনি দণ্ডে শতবার যেন
ভগবানে মনে হয়।

২

এ ফুল নাই-বা পারিজাত হ'ল—গোলাপ, যূথী ও বেলি?
কমল থাকুক কমল নয়ন মেলি।
এ চাঁদের চেয়ে কোন্ চাঁদ বেশী ভাল?
এ রবির চেয়ে উজ্জ্বল কার আলো?
এর চেয়ে ভাল রামধনু বল
কোন্ নীলাকাশে রয়?

৩

দেবতা এখানে যুগে যুগে দেখি মানুষ হইয়া আসে,
এ হাসি অশ্রু, সুখ-দুখ ভালবাসে।
ছেলে হয়ে এসে নবনীর লাগি কাঁদে।
কন্যা হইয়া সাধকের বেড়া বাঁধে,
পাষাণ ঠেলিয়া বাহিরিয়া আসি
নাড়ু খায়, কথা কয়।

৪

আমরা মানুষ, সীমার কাঙালী চাহি গতায়তি চাহি,
আসিব যাইব সুধা সবে অবগাহি।
কত নিয়ে যাব, কত দিব হেথা আনি,
এমনি চলুক আমদানী রপ্তানী,
চাহিনে হইতে অমৃত-আমরা
স্বাদে চাই পরিচয়।

৫

এ দুটি চক্ষু এমনি থাকুক, এমনি অশ্রুভরা।
এই অনুভূতি ভুবন আপন করা।
থাকুক বেদনা আনন্দভরা প্রাণ,
ভয়-অভয়ের নীতি নব অবদান,
মানুষের মাঝে দেব-মহিমার
হউক অভ্যুদয়।

৬

মানব অমর হইলে তাহার বাড়িবে না বেশী মান।
জীবন তো আর করা চলিবে না দান,
দধীচি হবার রবে না সম্ভাবনা,
এ প্রাণের হায় ফুরাইবে আনাগোনা
সর্ব্ব প্রধান বৈশিষ্ট্যই—
ক্ষয়ে যাবে, পাবে লয়।

৭

মহা সাধনায় সিদ্ধি লভিতে সাধক কি দিতে যাবে?
বীরের শৌর্য্য মূল্য কোথায় পাবে?
প্রিয় জন দেশ সত্য ধর্ম্ম লাগি—
কি মহারত্ন দিবে অনুরাগী ত্যাগী?
যুগ তো কেবল বিরাট বিশাল
প্রাণের অস্তোদয়।

৮

মোরা স্বর্গের পরশ যে পাই সে ত নয় বেশী দূরে,
রাজে মন্দিরে রাজে অন্তঃপুরে।
প্রেমে ভক্তিতে মহাপ্রাণতায় ত্যাগে—
তাহারি যে ফাগ্ প্রতি অঙ্গেতে লাগে,
করে দেহ মন ভুবন, ভবন—
শুচি লাবণ্যময়।

ভারতে জ্যোতিষচর্চা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বাগল

ভারতীয় জ্যোতিষ বেদচক্ষু-স্বরূপ। পঞ্চনদের তীরবাসী বৈদিক ঋষিগণের চিত্তে এই জ্ঞানবীজ প্রথমে অঙ্কুরিত হয়। ঋষিগণ গগন পর্যবেক্ষণ করিয়া ভারতীয় জ্যোতিষের বীজ বপন করিয়াছিলেন। সেই বীজ ক্রমশঃ পত্রে, পুষ্পে সুশোভিত হইয়া বৃহৎ জ্ঞানবৃক্ষে পরিণত হইল। এইভাবে জ্ঞানবৃক্ষের বীজ ক্রমশঃ পঞ্জাব হইতে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মিথিলা পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তার পর দক্ষিণ ভারতের সহ্যাদ্রির পশ্চিমঘাট শৈলশ্রেণীর সভ্যতার মধ্যেও এই জ্ঞানবীজ পত্রে-পুষ্পে সমৃদ্ধ হইয়া বঙ্গোপসাগরের দুই কূল বাহিয়া উড়িষ্যা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। এইভাবে ভারতীয় জ্যোতিষ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও পুষ্টিলাভ করিয়া ধর্ম্মীয় বিপ্লবের সহিত চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। আর্যধর্ম্মের ভিতরে ব্যবহারিক ক্রিয়াকাণ্ডে, গ্রহ-নক্ষত্র ফল প্রবেশ করিয়া মালয়, যবদ্বীপ, সিংহল প্রভৃতি দেশে বিস্তারলাভ করে।

ভারতীয় জ্যোতিষের সূচনা ঋগ্বেদে, বালগঙ্গাধর তিলকের মতে উহার রচনাকাল খ্রীঃ পূর্ব্ব ছয় হাজার বর্ষ। ঐ সময় হইতেই ভারতীয় জ্যোতিষ বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র এবং ব্যবহারিক ক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রমে প্রসারলাভ করিয়াছিল। এইভাবে জ্ঞান বৃদ্ধি পাইয়া খ্রীষ্টের একাদশ শতকে ভাস্করাচার্য্যের সময় পূর্ণ পরিণতি লাভ করিল। ভারত-জ্যোতিষের সৌরমুকুট ভাস্করাচার্য্যই নির্ব্বাণপ্রায় দীপের শেষ বহ্নিদীপ্তি। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে কত যে জ্যোতিষীর আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান দুরূহ। কারণ যে জাতির যে বিদ্যা যত পুরাতন তাহার ইতিহাসও ততই অন্ধকারে পূর্ণ। ভারতবর্ষের কোন প্রাচীন কাল নির্ণয় করিতে হইলে, তদানীন্তন ধর্ম্মশাস্ত্র, সাহিত্য দর্শন ইত্যাদি আলোচনা ব্যতীত তাহা সম্ভব হয় না। ধর্ম্মীয় যুগকে অবলম্বন করিয়া ভারতীয় জ্ঞানচর্চ্চার কালকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—বেদ, উপনিষদ, সাহিত্যদর্শন, বৌদ্ধধর্ম্ম এবং পুরাণ। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ঐ সময়ের কোন জ্যোতিষগ্রন্থ পূর্ণ আকারে বর্ত্তমানে পাওয়া যাইতেছে না। তার পর অতি প্রাচীন কালের যে গ্রন্থ বর্ত্তমানে পাওয়া যাইতেছে, তাহাও আবার অধিকাংশ বৈদেশিক শব্দে পূর্ণ দেখা যায়। অতএব প্রাচীন যুগের কোন ইতিহাস রচনা করিতে হইলে শিথিল বালুচরে অট্টালিকা নির্ম্মাণের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর ভিত্তি গড়িয়া উঠিবে। দৃঢ় ভিত্তি গঠন করা সম্ভবপর নহে।

ভারতীয় জ্যোতিষের বিভাগ

ভারতীয় জ্যোতিষকে প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়: ১। নক্ষত্রচক্র কল্পনা। ২। রবিচন্দ্রাদি গ্রহগতি নির্ণয়। ৩। গ্রহনক্ষত্র সংযোগ হইতে ফলগণনা—জ্যোতিষ সংহিতা। ৪। জন্ম সময়ের গ্রহসংযোগ হইতে মানবের ভাগ্যফল গণনা—ফলিত জ্যোতিষ। প্রথম দুইটি আবার গণিত এবং গণিতের সারণী, সিদ্ধান্ত ও করণ জ্যোতিষভেদে দুই প্রকার। শেষের দুইটি, জ্যোতিষ সংহিতা এবং জাতক জ্যোতিষভেদে দুই প্রকার। মোট চারিটি প্রধান বিষয় হইতে ছয়টি বিভাগে ভারতীয় জ্যোতিষ বিভক্ত হইয়াছে।

১। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ: গণিতের প্রমাণ সহ গ্রহগতি এবং গণনার নিয়ম দেওয়া থাকে।

২। করণ জ্যোতিষ: সিদ্ধান্তের ছায়া অবলম্বনে সহজ সারণীতে রচিত; করণ জ্যোতিষে গণিতের প্রমাণ নাই, অথচ গ্রহ-গণিত আছে। গণকের সহজ জ্ঞানের জন্য গণনার সারণী দেওয়া থাকে।

৩। ফলিত জ্যোতিষ: জ্যোতিষ সংহিতা এবং জাতক, জ্যোতিষভেদে দুই প্রকার। জ্যোতিষ সংহিতায় গ্রহফল আছে; কিন্তু জাতক নাই। অথচ জাতক ফল বর্ণিত আছে, আকাশে গ্রহনক্ষত্র সংযোগ হইতে উৎপন্ন যে ফল বিভিন্ন সময় পৃথিবীর উপরে ঘটিয়া থাকে, সেই ফলবর্ণনা সংহিতা-জ্যোতিষের অন্তর্গত। যথা, গ্রহনক্ষত্র সংযোগ হইতে নৈসর্গিক উৎপাত-ফল, পবন হইতে ভাবী বর্ষাগণনা, মেঘলক্ষণ, সৌরকলঙ্কের আবির্ভাবে আন্তরীক্ষ ও ভৌম উৎপাত। বৃক্ষাদির হ্রাসবৃদ্ধি হইতে বৃক্ষজাতক গণনা। পৃথিবীর সন্নিকটস্থ গ্রহসংযোগ হেতু ভূকম্পন, জলপ্লাবন গণনা। রাষ্ট্র-সমাজ এবং বিভিন্ন ভৌগোলিক সীমানায় বিভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ফলগণনা। বিশেষ বিশেষ গ্রহসংযোগহেতু ফল-সৃষ্টি হইতে মানবের বিভিন্ন বৃত্তিভোগীর উপরে বিশেষ ফলগণনা। ধূমকেতুর আবির্ভাব, উল্কাপতন হইতে জাতীয় শুভাশুভ গণনা জ্যোতিষ-সংহিতার অন্তর্গত। এই সংহিতা-জ্যোতিষে ব্যক্তিগত ভাবে জাতক ফলগণনার ব্যবস্থা নাই; অথচ সমষ্টিগতভাবে মানবজাতির ভাগ্যফল গণনার ব্যবস্থা আছে। প্রাচীন যুগের ঋষিগণ জ্যোতিষ্কগণের মহাব্যোমীয় শক্তির সহিত প্রত্যেক বস্তুর আকর্ষণ, বিকর্ষণের সম্পর্ক হইতে মানবজাতির জীবনের চাঞ্চল্য, মরণের ডাক, নিসর্গের পরিবর্ত্তন, বিশ্বপণ্যের হ্রাসবৃদ্ধি ইত্যাদি যাবতীয় গণনা জ্যোতিষ-সংহিতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিপুলায়তন জ্যোতিষ-সংহিতা গ্রন্থ পাঠ করিলে উহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যাইবে।

জাতক-গণনা

কোনব্যক্তির জন্ম-ভূখণ্ডের উপরস্থ আকাশে জন্মসময়ের গ্রহসংস্থিতি হইতে, তাহার জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত, পূর্ব্বজন্ম এবং

ইহজন্মকৃত, শুভাশুভ কর্ম্মফল কিভাবে বিভিন্ন সময় ভোগ করিবে তাহার গণনা করা হয়। ভারতীয় ফলিত জ্যোতিষমতে মানবের কর্ম্মফল-ভোগ দুই প্রকার। যথা, দৃঢ়কর্ম্ম আর অদৃঢ় কর্ম্ম। বিধিনির্দ্দেশবাদ, পূর্ব্বজন্ম আর বিধি অনির্দ্দেশবাদ, ইহজন্মের কর্ম্মফল ভোগ। এই দুই কর্ম্মফল ভোগের মাঝখানে, অর্থাৎ—পূর্ব্বজন্ম এবং ইহজন্ম এই দুইয়ের মাঝখানে মানবের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ দ্বারা কর্ম্মফলকে কতকটা দৃঢ় এবং কতকটা শিথিল করিয়া ভালমন্দ কর্ম্মফল ভোগ করিতে পারেন। জাতক-গণনা সম্পর্কে বরাহ বলিয়াছেন যে, "কর্ম্মার্জ্জিতং পূর্ব্বভবে—সদাদি যত্তস্য পক্তিং সমভিব্যানক্তি।" অর্থাৎ জাতক-গণনায় গ্রহগণ ফলদায়ক নহে। মানব স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করিয়া থাকে। গ্রহগণ সেই ফলজ্ঞানের সংজ্ঞামাত্র। এই অর্থে মানবের ভাগ্যফল—কতক অংশ নিশ্চিত আর কতক অংশে অনিশ্চিত। এই দুই ফলের মাঝখানে মানব ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ দ্বারা অনিশ্চিত ভাগ্যফলকে কতকটা নিশ্চিত শুভ এবং অশুভ পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। মোটামুটি ভাবে ভারতীয় জ্যোতিষের মোট চারিটি বিভাগের পরিচয় প্রদান করা হইল।

ভারতীয় জ্যোতিষের অবস্থা

ঋগ্বেদের সময় খ্রীঃ পূর্ব্ব ছয় সহস্র বর্ষ হইতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকাল খ্রীঃ পূঃ পাঁচ শত বর্ষ পর্য্যন্ত ভারতীয় জ্যোতিষ সংহিতাকারে ছিল। প্রাচীন কাল হইতে বৈদিক ঋষিগণ যে জ্যোতিষিক জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞান জ্যোতিষ-সংহিতায় বর্ণিত হইয়াছিল। কাজে কাজেই ঐ সময়ের কোন্ গ্রন্থ ফলিত জ্যোতিষ এবং কোন্‌গুলি সংহিতা তাহা বুঝা যাইতেছে না। ঋগ্বেদের সময় সবেমাত্র জ্যোতিষ-জ্ঞানের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। তখনও মানবের ভাগ্যগণনা আরম্ভ হয় নাই; কেবলমাত্র নক্ষত্রচক্র হইতে জাতক-ফল গণনা কতকটা স্থূল ভাবে আরম্ভ হইয়াছিল। বৈদিক যুগের গ্রহনক্ষত্র গণনা সম্বৎসরব্যাপী যজ্ঞ করিবার জন্য আবশ্যক হইত। তখন 'নক্ষত্র বিদ্যা' নামে এক প্রকার জাতক-ফল গণনা করা হইত। যে সকল ঋষি নক্ষত্রবিদ্যা চর্চ্চা করিয়া গ্রহ-ফল গণনা করিতেন তাঁহাদিগকে 'নক্ষত্রদর্শ' বলা হইত। হিন্দু জ্যোতিষেই প্রথম নক্ষত্রচক্র কল্পিত হইয়াছিল, ঋগ্বেদে নক্ষত্রচক্রকে সোমগৃহ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে নক্ষত্রচক্রকে দেবগৃহ বলা হইত। ঋগ্বেদ যত প্রাচীন আমাদের দেশের নক্ষত্রচক্র গণনার কাল ততই প্রাচীন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ রচনার সময়ে খ্রীঃ পূঃ (৩০০০-২৪০০ বর্ষ) প্রথমে সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের নামকরণ করা হইয়াছিল। তার পরে রাশিবিভাগ কল্পিত হয়।

রাশিবিভাগ পরাশরের কাল

মহর্ষি পরাশরের সময় রাশিবিভাগ কল্পিত হইয়াছিল। কারণ পরাশর-রচিত ফলিত জ্যোতিষ গ্রন্থে দ্বাদশ রাশিতে গ্রহাবস্থান-জনিত ফলবর্ণনার ব্যবস্থা আছে। মহর্ষি পরাশরের সময় নির্ণয় করিতে হইলে, মহাভারত রচনার কিছু পূর্ব্বে ধরিতে হইবে। কারণ মহর্ষি পরাশর ব্যাসদেবের পিতা ছিলেন। নিরুক্ত মতে পরাশর বশিষ্ঠের পুত্র। মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণ মতে বশিষ্ঠের পৌত্র এবং শক্তির পুত্র। যে মতই সত্য হউক না কেন, পরাশর ব্যাসদেবের পিতা ছিলেন এই কথা সত্য। মহাভারত-রচনার কাল ধরিতে হইলে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সমসাময়িক ধরিতে হইবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বের সমকালে সংঘটিত হইয়াছিল। বরাহমিহির লিখিত যুধিষ্ঠিরের সময় খ্রীঃ পূঃ ২৫০০-১৩০০ বর্ষ মধ্যে। মহর্ষি পরাশরের আবির্ভাব এই সময়ের কাছাকাছি হওয়া সম্ভব। অতএব এই সময় হইতে দ্বাদশ রাশি বিভাগ হইয়া থাকিবে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশের পণ্ডিতগণের ধারণা যে, মিশর দেশে প্রথমে রাশিচক্রের উদ্ভব হইয়াছে। কোলব্রুক বলেন যে, হিন্দু জ্যোতিষিগণ গ্রীকদিগের কাছে রাশিচক্র বিভাগের জন্য ঋণী। কিন্তু এই সকল ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, কারণ রাশিচক্রের বিভাগ গ্রীক জ্যোতিষী থেলিস* খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে মিশর দেশ হইতে গ্রীসে আনয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু মিশরীয় রাশিচক্র কল্পনার বহু পূর্ব্বে হিন্দুগণ রাশিচক্র বিভাগ করিয়াছিলেন। এই বিভাগের সহিত মিশরীয়গণের রাশিচক্র বিভাগের সাদৃশ্য দেখিয়াও অনেকে এই রকম ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। মিশরীয় জ্যোতিষের আবির্ভাবকাল স্যার আইজ্যাক নিউটন তাঁহার ক্রনোলজি গ্রন্থের খ্রীঃ পূঃ ৯৫৬ বর্ষে দেখাইয়াছেন:

"After the study of Astronomy was set on foot for the use of navigation and the Egyptians, by the heliacel rising and setting of the stars had determined the length of the solar years of 365 days, and by other observations had fixed the solastices, and formed the fixed stars into asterisms, all which was done in the reign of Ammon, Sesoc, Orus and Memnon, about 1000 B.C."

উপরের বর্ণিত সময়ের বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষে রাশিচক্র বিভাগ হইয়াছিল। বস্তুতঃ নানা প্রকার যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা ইহাই ধরিয়া লওয়া সঙ্গত হইবে যে, ভারতীয় আর্য্যগণের গণিত জ্যোতিষের প্রস্রবণ গ্রীক দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইউরোপে বেগবতী স্রোতস্বতী রূপে পরিণত হইয়াছিল।

সামুদ্রিক বিদ্যা

মহর্ষি পরাশরের সময় (খ্রীঃ পূঃ ২৫০০-১৩০০ বর্ষ) হইতে সামুদ্রিক শাস্ত্রের সূচনা দেখা যায়। মহাভারতে† সভাপর্ব্ব, কর্ণ

* থেলিস=আওনিয়ন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা মিশর হইতে গ্রীসে জ্যোতিষশাস্ত্র আনয়ন করেন, তারপর পিথাগোরাস এবং তাঁহার শিষ্যগণ উহার উন্নতিবিধান করেন।

*Sir Isac Newton's *Chronology,* p. 251.

† মহাভারত, সভা পর্ব্ব, ৫ উ, ৩৪, ১০২ কর্ণ ৫০ অধ্য ৮৫

এবং অশ্বপর্ব্বে সামুদ্রিক গণনার উল্লেখ আছে। কিন্তু ঐ সময় কর-রেখা এবং লগ্ন দ্বারা করকোষ্ঠী গণনার পরিচয় পাওয়া যায় না। তখনকার সময় পুরুষের করতলমধ্যস্থ শ্রীবৎস, ধ্বজাঙ্কুশ এবং যবাদি চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া সামুদ্রিক গণনা করা হইত। মহাভারতের সময় হইতে বরাহের সময় খ্রীষ্টাব্দ ৫ম শতক পর্য্যন্ত, সামুদ্রিক শাস্ত্র হইতে সম্ভবতঃ করকোষ্ঠী গণনার প্রচলন হয় নাই। কারণ বরাহের বৃহৎ সংহিতায় যে সামুদ্রিক শাস্ত্রের উল্লেখ আছে তাহাতে করকোষ্ঠীর কথা নাই। বরাহের বৃহৎ সংহিতায় স্ত্রী-পুরুষের শরীর-চিহ্ন এবং শরীরের শুভাশুভ লক্ষণ ও হস্তস্থিত যবাদি চিহ্ন হইতে সামুদ্রিক গণনার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ বরাহের পরবর্ত্তী সময় সামুদ্রিক শাস্ত্র হইতে করকোষ্ঠী গণনার চর্চ্চা করা হইয়াছিল।

বৈদিক যুগ হইতে প্রাক্-বুদ্ধকাল

বৈদিক যুগ হইতে প্রাক্-বুদ্ধকাল পর্য্যন্ত সময়ের ধারাবাহিক জ্যোতিষিক ইতিহাস প্রদান করিতে হইলে ধর্ম্মশাস্ত্র এবং তদানীন্তন সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্র অবলম্বন ব্যতীত উপায় নাই, কারণ ঐ সময়ের কোন ধারাবাহিক জ্যোতিষের ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে না, এই সময় ভারতীয় ফলিত জ্যোতিষের অধিকাংশ জ্যোতিষ-সংহিতাকারে ছিল। অতএব কোন্ গ্রন্থখানি যে ফলিত জ্যোতিষ এবং কোন্‌খানি যে জাতক গণনা, তাহা বুঝা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। কারণ এই সময়ের কোন গ্রন্থ পূর্ণ আকারে পাওয়া যায় না। লগ্ন এবং গ্রহবশে জাতক-গণনা পরাশরের সময় অধিক পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। বৈদিক ঋষিগণ পরমা প্রকৃতির উপাসক ছিলেন, প্রাকৃতিক শুভাশুভ ঘটনা হইতে ঋষিগণ যে জ্যোতিষিক জ্ঞান সঞ্চয় করেন, সেই জ্ঞানই সংহিতায় পরিবেশন করা হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই সকল গ্রন্থের অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে। বৈদিক যুগে প্রধান প্রধান নক্ষত্র, ঋতু, অয়নে বিশেষ বিশেষ সময়ে যজ্ঞ করিবার বিধান ছিল। সেই বিধানসকল ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়া বিভিন্ন সংহিতায় স্থান পায়। মনুসংহিতায় যাবতীয় পুণ্যকর্ম্মে ঐ সকল বিধান রহিয়াছে। এই ভাবে যজ্ঞানুষ্ঠান এবং তাহার ফলভেদে জ্যোতিষ-গণনা দুই প্রকার হইয়া পড়িল। ব্যবহারিক ক্রিয়াকাণ্ডে বিশেষ নক্ষত্র এবং তিথিতে বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু কোন সময় বিশেষ যজ্ঞ করিতে হইলে তিথি-নক্ষত্র বিচারের প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজন হইতেই ফলিত জ্যোতিষের সূত্রপাত। অর্থাৎ, প্রথমে ব্যবহারিক ক্রিয়া, পরে ফললাভ বিচার করা হয়। জাতীয় জীবনে জ্ঞানের সাধনা কৈশোরে আরম্ভ হইয়া যৌবনে উহার পরিবর্ত্তন ঘটে এবং মধ্য-যৌবনে সংস্কারমুখী হইয়া, জাতির প্রৌঢ়াবস্থায় জ্ঞান পরিণতি লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু বার্দ্ধক্যে কোন পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হয় না। ঋগ্বেদ রচনার সময় ভারতীয় আর্য্যগণের জ্ঞানের কৈশোর অবস্থা, মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণ রচনার সময় পূর্ণযৌবনাবস্থা, তার পর ব্যবহারিক ক্রিয়া ফল, ফলিত জ্যোতিষচর্চ্চায় সময় জাতির যৌবন গত হইয়া প্রায় প্রৌঢ়াবস্থায় পরিণত হইয়াছিল।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভারতীয় জ্যোতিষ প্রৌঢ়াবস্থায় অতিক্রম করিয়া বার্দ্ধক্যের দিকে অগ্রসর হইয়া পড়িল, ফলিত-জ্যোতিষের জ্ঞান আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। জাতির বার্দ্ধক্যে কর্ম্মোদ্যমের অভাব—তারপর সংস্কারের অভাব ঘটিল। বার্দ্ধক্যে জ্ঞানের সাধনা, সূত্ররচনা এবং দর্শন-জ্ঞানের চিন্তা জাতির চিত্তে স্থান পাইতে আরম্ভ করিল। এই রকম অবস্থায় চতুর লোক সকল ফলিত জ্যোতিষের ভিতরে কুসংস্কারের বীজ অনুপ্রবেশ করাইয়া ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। এই ভাবে জ্ঞান অজ্ঞানে এবং কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সম্ভবতঃ মনু তাঁহার সংহিতায় তৃতীয় অধ্যায় ১৬২ শ্লোকে, 'নক্ষত্রৈর্যশ্চজীবতি' বলিয়া যে ব্রাহ্মণগণ জ্যোতিষ জীবিকারূপে গ্রহণ করে, সেই সকল ব্রাহ্মণকে পতিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অত্রিসংহিতায়* মনু অনুরূপ দণ্ডবিধান করিয়াছেন। চিকিৎসাজীবী, নক্ষত্রজীবী ব্রাহ্মণ বৃহস্পতির ন্যায় জ্ঞানী হইলেও পূজ্য নহে। সম্ভবতঃ ঐ সময় বর্ত্তমান যুগের ন্যায় কতিপয় অশিক্ষিত গ্রহফল-ব্যবসায়িগণের উৎপাত অধিক বৃদ্ধি পাইয়া সমাজকে ধ্বংসের পথে চালিত করিতেছিল। সেইজন্য মনু জনস্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই রকম দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন। মনুসংহিতায় অশিক্ষিত, অতি-লোভী গ্রহফল-ব্যবসায়ী গণকের প্রতি তীব্র ভর্ৎসনা থাকিলেও মনু উহার বিশেষ গুরুত্ব মনে করিয়া জ্যোতিষচর্চ্চার কথা বলিয়াছেন। ব্যবসার কথা নহে, মনু অশুচি হইয়া জ্যোতিষ্ক দর্শন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। মহর্ষি পরাশরের সময় হইতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অধিকাংশ দর্শনশাস্ত্র এবং বিভিন্ন সূত্রগ্রন্থের সহিত জ্যোতিষশাস্ত্র মিশিয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধযুগের অধিকাংশ গ্রন্থ সূত্রকারের রচিত। এই সময় দর্শনশাস্ত্রের প্রসার অধিক হইয়াছিল। অস্ত্রচিকিৎসা এবং জ্যামিতির উন্নতি হয় নাই, বীজ-গণিতের উন্নতি হইয়াছিল।

আলেকজাণ্ডার ও মামুদের ভারত আক্রমণে জ্যোতিষের অবস্থা

আলেকজাণ্ডারের ভারতবর্ষ আক্রমণ (৩২৭ খ্রীঃ পূঃ হইতে) ভারতীয় জ্যোতিষ স্বীয় বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিল। তখন হইতেই ভারতীয় জ্যোতিষের উপর গ্রীক জ্যোতিষের প্রভাব পড়িল। ভারতীয় জ্যোতিষের প্রাচীন মূল গ্রন্থ বৃহৎপারাশরীতে এবং জৈমিনি সূত্রের বর্ত্তমান প্রচলিত গ্রন্থ দুইখানিতে রাশি, গ্রহ, দ্বাদশ ভাব সংজ্ঞায় অনেক গ্রীক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। বৃহৎপারাশরীতে বর্গগণনায় দ্রেক্কাণ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। জ্যোতিষের সংজ্ঞায় রাশির তিন ভাগের এক ভাগকে দ্রেক্কাণ বলা হইয়াছে। বর্গের বাকি অংশসকলের সংস্কৃতে নাম প্রদত্ত হইয়াছে। সংস্কৃত কি বাংলা কোন ভাষায়ই রাশির এক-তৃতীয়াংশ বা ১০° ডিগ্রীকে দ্রেক্কাণ বলে না। দ্রেক্কাণ শব্দের উৎপত্তি প্রথমে মিশরে হইয়া-

* আবিকশ্চিত্রকারশ্চ বৈদ্যোনক্ষত্র পাঠকঃ
চতুর্বিপ্রা ন পূজ্যন্তে বৃহস্পতি সমা যদি। অত্রিসংহিতা ৩৭৮ শ্লোক

ছিল। পরে উহা গ্রীক এবং লাটিন জ্যোতিবিগণের গণনায় স্থান পায়। বারো রাশিতে ৩৬ দ্রেক্কাণ হয়। মিশরে এই ৩৬ দ্রেক্কাণকে এককথায় Decanstars বলা হয়। রাজা অসুর বানিপালের গ্রন্থাগারে (খ্রীঃ পূঃ ৭ম শতকে) এই Decanstars-এর চিত্র সংকেতচক্র* আছে। মিশরে আবার এই ৩৬টি Decanstars কে নাবিকগণের পথনির্দ্দেশক তারকা বলা হইয়াছে। তার পর পারাশরীতে ভাবগণনায় দশম ভাবকে 'মেশুরন' বলা হইয়াছে।

'মেশুরন' শব্দটি সম্পূর্ণ গ্রীক শব্দ। গ্রীকভাষায় মেশুরনকে মাঝ আকাশ বলা হয়। জ্যোতিষের সংজ্ঞায় মাঝ আকাশকে দশম ভাব বলে। গ্রীক শব্দ Mesouronmo-কে মাঝ আকাশ বলা হয়। ভাবগণনায় চারিটি মূল কেন্দ্রকে গ্রীকভাষায় Kentra অর্থে Pillar বলে। পারাশরীতে এই চারিটি মূল ভাবের সংজ্ঞায় চতুরস্র এবং কণ্টক কথার ব্যবহার আছে। চতুরস্র সংস্কৃতে ৪ সংখ্যা বুঝায়। কণ্টক কথা সংস্কৃত কি বাংলা কোন ভাষায় চার সংখ্যা অর্থ হয় না। সম্ভবতঃ গ্রীকশব্দ Kentra-ই পারাশরীতে কণ্টক শব্দে ৪ সংখ্যা বুঝাইবার জন্য রূপান্তরিত হইয়াছে। জৈমিনিসূত্রে রাশির সংজ্ঞায় মেষকে 'ক্রিয়', মঙ্গলগ্রহকে 'অর' বলা হইয়াছে। এই শব্দ দুইটি সম্পূর্ণ গ্রীকশব্দ। বর্ত্তমানে প্রচলিত প্রাচীন ফলিত-জ্যোতিষগ্রন্থ দুইখানি আলোচনা করিলে আরও অধিক গ্রীকশব্দ পাওয়া যাইবে। তার পর বরাহের সমসাময়িক কল্যাণবর্ম্মা রীবার অন্তর্গত দেবগ্রামে (দেবরী বর্ত্তমান নাম) বসিয়া গ্রীক জ্যোতিষের সার সঙ্কলনপূর্ব্বক সারাবলী নামক একখানি বৃহৎ ফলিত-জ্যোতিষ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন। আলবেরুণীর ভারত সম্পর্কীয় গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, উপরোক্ত গ্রন্থ হইতে একখানি বৃহত্তর ফলিত-জ্যোতিষ ছিল। সেই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ গ্রীক জ্যোতিষের অনুবাদ। এই সকল প্রমাণ হইতে বেশ বুঝা যায়, কি ভাবে গ্রীক জ্যোতিষের প্রভাব ভারতীয় আদি জ্যোতিষের উপরে স্বল্পসলিলা তটিনীর বেগের ন্যায় আসিয়া পড়িয়াছিল।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে গজনীর মামুদের ভারতবর্ষ আক্রমণের পর ভারতীয় জ্যোতিষ স্বীয় বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া প্রবল বন্যার স্রোতে কূলে কূলে ভাসিয়া বর্ত্তমানে বিকৃত অবস্থায় পরিণত হইয়া পড়িয়াছে।

তারপরে অল্প সময় মধ্যেই আরবীয় জ্যোতিষ রমল এবং তাজিক গণনা ভারতীয় জ্যোতিষের মধ্যে প্রাধান্যলাভ করিল। বর্ত্তমানেও জ্যোতিবিগণ বর্ষপ্রবেশ গণনায় তাজিক মতে গণনা করিয়া থাকেন। আরবীয় রমল নামক প্রশ্নজাতক ভারতীয় পণ্ডিত-গণ সংস্কৃতে অনুবাদ করেন। আফ্রেচ-এর গ্রন্থসূচিতে উৎপল এবং শ্রীপতিকৃত রমল গ্রন্থের উল্লেখ আছে। তাজিকগ্রন্থ নীলকণ্ঠ দৈবজ্ঞ সংস্কৃতে অনুবাদ করেন। তাজিক অর্থে যাহারা আরবে জন্মিয়া পারস্যে পালিত হয়, অথবা পারস্যের লোককে তাজিক বলা হয়। অর্থাৎ, আরব এবং তুর্কীর অধিবাসী ভিন্ন অন্য লোককে বুঝায়। আরবে জন্মিয়া পারস্যে পালিত হইলেও তাহাদিগকে তাজিক বলা হয়। তাজিকগণনা সম্ভবতঃ পারস্যদেশ হইতে আরবে প্রবেশ করিয়াছিল। সমরসিংহ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ সংস্কৃতে এই তাজিক-গ্রন্থের অনুবাদ করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় গণেশ দৈবজ্ঞের তাজিক-ভূষণ পদ্ধতিতে গর্গমুনির নাম পাওয়া যায়—গর্গাদৈর্যবনৈশ্চ রোমক মুখৈ 'সত্যাদিভি কীর্ত্তিতং শাস্ত্রং তাজিকসংজ্ঞকং'...ইত্যাদি। এই সকল বিষয় আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় কি প্রবল ভাবে গ্রীক, রোমক, আরবীয় জ্যোতিষ ভারতীয় আদি জ্যোতিষের উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অতএব আমাদের প্রাচীন যুগের জ্যোতিষের ইতিহাস রচনায় দুর্গম বন্ধুর পথ অতিক্রম ব্যতীত উপায় নাই। আর্য্যভট্ট হইতে কতকটা ইতিহাসের ধারাকে অনুসরণ করা যায়।

আর্য্যভট্ট

আর্য্যভট্টই প্রথমে পৃথিবীর ঘূর্ণন মতবাদ প্রমাণ করিয়া-ছিলেন। আলবেরুণীর ভারত সম্পর্কিত গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, আর্য্যভট্টের বাসস্থান পাটনায় প্রাচীন কুসুমপুরে ছিল। তাঁহার আবির্ভাবকাল ৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। আর্য্যভট্টের সময় কুসুমপুর ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল। তখন পাটনায় বহু পণ্ডিত ও গুণী ব্যক্তির সমাবেশ হইত। তারপর উজ্জয়িনী এবং পরিশেষে ভোজরাজার রাজধানী ধারানগরীতে বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের সমাবেশ হয়। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দী হইতে ১০ম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতীয় সংস্কৃতির এক গৌরবময় যুগ ছিল। পাটনা, উজ্জয়িনী, মথুরা, ধারানগরীর কাহিনী রূপকথার গল্পের ন্যায় জনচিত্তে গ্রথিত রহিয়াছে। সেই প্রাচীন কাহিনী শুনিয়া আজও আমাদের চিত্ত গৌরবে ভরিয়া উঠে। ইউরোপে খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে কোপর্নিকাস প্রথমে পৃথিবীর ঘূর্ণন মতবাদ প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহার বহু পূর্ব্বে আর্য্যভট্ট স্বরচিত গীতিকাপাদ গ্রন্থে পৃথিবীর ঘূর্ণনে দিবারাত্র হইয়া থাকে এই মতবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর্য্যভট্ট লিখিয়াছেন—উদয়াস্তময়নিমিত্তং প্রবহেণ বায়ুনাক্ষিপ্ত। লঙ্কাসম পশ্চিমগো ভপঞ্জরম্‌সংগ্রহ ভ্রমতি। অর্থাৎ, রবি প্রভৃতি গ্রহগণের উদয়াস্ত হেতু নক্ষত্রগোলক প্রবাহ-বায়ু দ্বারা সর্ব্বদা আক্ষিপ্ত হইয়া গ্রহগণের সহিত সমান বেগে পশ্চিমে ভ্রমণ করিতেছে। এই শ্লোকে তিনি পৃথিবীর ঘূর্ণন মতবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন। ব্রহ্মগুপ্তের গ্রন্থের টীকাকার পৃথুদক স্বামী তাঁহার টীকায় নিজ ভাষায় আর্য্যভট্টের মত প্রকাশ করিয়াছেন। আর্য্যভট্টই বৈজ্ঞানিক জ্যোতিষের প্রথম প্রবর্ত্তক।

বরাহমিহির

আর্য্যভট্টের পর বরাহের আবির্ভাব হইয়াছিল। বরাহ খ্রীষ্টীয় ৫ম শতকে মগধের কপিত্থ নগরে এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আদিত্য দাস তৎকালে একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন। আদিত্য দাস অপুত্রক ছিলেন, তিনি পুত্র

The Royal Art of Astrology—Dr. Eislor, p. 82.

কামনায় সূর্য্যের উপাসনা করিলে তাঁহার এক পুত্র হয়, সেই পুত্রের নাম সূর্য্যের নামানুসারে মিহির রাখা হইল। এই মিহিরই পরে বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের মধ্যে প্রধান পণ্ডিত হইলেন। তারপর বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক বরাহ উপাধিতে ভূষিত হন। বরাহ উপাধি কুখ্যাত, বরাহ অর্থে শূকর। বাঙ্গালোরের প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ সূর্য্যনারায়ণ রাও মহাশয় "Life of Varahamihir" পুস্তিকায় বরাহ উপাধি সম্পর্কে এক জনশ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের এক পুত্র জন্মিলে পর ঐ পুত্র শূকর দ্বারা নিহত হইবে, এই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী মিহিরাচার্য্য পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্যকে করিয়াছিলেন। যথাসময়ে মিহিরের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়ায় বিক্রমাদিত্য উহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য মিহিরাচার্য্যকে বরাহ উপাধি প্রদান করেন। সম্ভবতঃ এই জনশ্রুতি সত্য হইবে। কারণ বরাহ উপাধিতে যদি কোন বৈশিষ্ট্য না থাকিত, তাহা হইলে একজন প্রখ্যাত জ্যোতিষী নিজে কোন সময়েই কুখ্যাত শূকর বা বরাহ উপাধি গ্রহণ করিতেন না। ড. ভাউদাজী, "Literary Remains"এ, ব্রহ্মগুপ্তের খণ্ড খাদ্য গ্রন্থের টীকাকার আমরাজ দত্তের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "নবাধিক পঞ্চশত শাকে বরাহমিহিরাচার্য্য দিবং গতঃ।" কাজেই বরাহের মৃত্যু ৫০৯শাকে হইয়াছিল। তাহার আয়ু শতবর্ষ ছিল। শতবর্ষ আয়ু না থাকিলে, গণিত, ফলিত এবং সংহিতা জ্যোতিষ সম্পূর্ণ করা সম্ভবপর হয় না। তাঁহার গ্রন্থ—ফলিত জ্যোতিষ, বৃহজ্জাতক, লঘুজাতক আলবেরুণী আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। বৃহৎ সংহিতা ড. কার্ন কর্ত্তৃক ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। গণিত জ্যোতিষ পঞ্চসিদ্ধান্তিকা ড. থিবো ও সুধাকর দ্বিবেদী ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন। আর্য্যভট্ট ছিলেন উদ্ভাবক, বরাহমিহির ছিলেন সারসঙ্কলয়িতা।

খনা

বাংলা দেশে খনা-মিহিরের নানা উপকথা প্রচলিত আছে। ঐ উপকথা ঐতিহাসিক সত্য নহে। বরাহই পূর্ব্বে মিহির ছিলেন। মিহির নামে ঐ সময় দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রখ্যাত জ্যোতিষী ছিলেন না। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার ইতিহাসে খনা-মিহিরের পরিচয় নাই। তারপর, বরাহের সন্তানসম্পর্কিত আয়ু গণনায় ভুল হওয়া স্বাভাবিক ধরিলেও সদ্যোজাত শিশুকে উজ্জয়িনী হইতে তাম্রপাত্রে নদীগর্ভে ভাসাইয়া দিলে নদী ও সমুদ্র অতিক্রম করিয়া তাহা যে নিরাপদে সিংহল দ্বীপে পৌছিতে পারে তাহা মানববুদ্ধির অগম্য। নদীর স্বাভাবিক স্রোত এবং ঢেউয়েই তাম্রপাত্র জলমগ্ন হইয়া শিশুর মৃত্যু হওয়াই সম্ভব। এই ক্ষেত্রে দীর্ঘায়ুপ্রাপ্ত হইলেও মৃত্যুর হাত এড়াইবার সম্ভাবনা নাই। খনা সিংহল-রাজকন্যা হইতে পারেন, কিন্তু কি প্রকারে সেই যুগের এক অসূর্য্যম্পশ্যা নারীর পক্ষে বাংলা পল্লীর ভাষায় জ্যোতিষবচন রচনা করিতে পারা সম্ভবে তাহা বর্ত্তমান সময়েও বুঝা যাইতেছে না। তারপর খনার বচনের যদি কোন সংস্কৃত কি সিংহলী ভাষায় গ্রন্থ পাওয়া যাইত তাহা হইলে বুঝা যাইত যে, ঐ গ্রন্থ হইতে বঙ্গের পল্লীর ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে। খনার বচনের গ্রন্থ বাংলা ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় পাওয়া যায় না। খনার বচনের ভাষার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে মনে হইবে যে, ঐ গ্রন্থ সম্পূর্ণই পল্লী বাংলার নিজস্ব সম্পদ। "কর্কটে জীবাবেদ বাথানে, বিনা পড়নে আহর চেনে। অন্ন খায় বিস্তর আনে, ঘরে বইসা গীত শুনে" ইত্যাদির ভাষা সম্পূর্ণই বাংলার পল্লী অঞ্চলের কথ্য ভাষা। এই সকল হইতে সহজে অনুমান করা যায় যে, কোন এক সময় বাংলা দেশে জ্যোতিষচর্চ্চার প্রভাব প্রবল বেগে আসিয়া পড়িয়াছিল, তখন বঙ্গকুলনারীগণের জ্যোতিষশিক্ষার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সেই প্রয়োজন হইতে সম্ভবতঃ কোন প্রাজ্ঞ জ্যোতিষী নিজনাম গোপন করিয়া ছদ্মনামে জন্মক্ষণের বচন রচনা করেন। ঐ ক্ষণের বচনই অবশেষে খনার বচনে রূপান্তরিত হইয়াছে। তারপর খনানাম্নী যদি কোন গুণবতী রমণী ঐ সময় জীবিত থাকেন তাহা হইলেও তিনি বরাহের পুত্রবধূ নহেন। কারণ বরাহের পুত্রের নাম পৃথুযশা পাওয়া যায়, পৃথুযশার রচিত গ্রন্থ হোরাষট্পঞ্চাশিকা, ভোরাসার বর্ত্তমান লেখকের গ্রন্থাগারে রহিয়াছে। ঐ গ্রন্থে পৃথুযশা নিজেকে বরাহের পুত্র বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

কালিদাস

বরাহের সময় কবি কালিদাসও শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি বরাহাদি পণ্ডিতগণের মত গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বকালামৃত, উত্তরকালামৃত, এবং জ্যোতির্ব্বিদাভরণ এই তিনখানি জ্যোতিষগ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ তিনখানি বর্ত্তমানে পাওয়া যায়। তাঁহার জ্যোতির্ব্বিদাভরণ গ্রন্থের* শেষ অধ্যায়ে বিক্রমার্ক নৃপতির কীর্ত্তি, নবরত্ন সভার গুণগান, এবং শক-কাল-প্রবর্ত্তন ইত্যাদি পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে, বিক্রমার্ক নৃপতির সভায় কালিদাস এই গ্রন্থ রচনা করেন; এবং রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত কাব্য তাঁহারই লেখা।

উইলিয়ম হান্টারের উজ্জয়িনীতে সংগৃহীত জ্যোতির্ব্বিদগণ

আর্য্যভট্ট ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ, বরাহ ৫ম শতকে, ব্রহ্মগুপ্ত ৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দ ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত, খণ্ডখাদ্য দুইখানি গণিতজ্যোতিষ রচিত হয়। গ্রন্থ দুইখানি আলফাজারি, ৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আরবীয় ভাষায় সিন্দহিন্দ আর্কন্দ নামে অনুবাদ করেন। আলবেরুণী বলেন, ঐ গ্রন্থ দুইখানি বৈজ্ঞানিক জ্যোতিষ হিসাবে সমগ্র এশিয়াখণ্ডে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। মুঞ্জাল ৯৩২খ্রীষ্টাব্দে লঘুমানস নামক গণিত-জ্যোতিষের প্রণয়ন করেন। বরাহের টীকাকার ভট্টোৎপল ৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে, শ্বেতোৎপল ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে,বরুণ ভট্ট ১০৪০খ্রীষ্টাব্দে ছিলেন। শ্রীপতি

* জ্যোতির্ব্বিদাভরণ—শঙ্কাদিপণ্ডিতবরাঃ কবয়স্ত্বনেকে, জ্যোতির্ব্বিদ সমভবংশ্চ বরাহপূর্ব্বাঃ। শ্রীবিক্রমার্ক নৃপসংসদি মান্যবুদ্ধিস্তৈরপ্যহং নৃপসখঃ কিল কালিদাসঃ। কাব্যত্রয়ং সুমতিকৃদ্রঘুবংশপূর্ব্বং পূর্ব্বংততো ননু কিং শ্রুতিকর্ম্মবাদঃ। জ্যোতির্ব্বিদাভরণ কালবিধান শাস্ত্রং শ্রীকালিদাস কবিতোহি ততো বভূব।

১০৩৯ খ্রীষ্টাব্দে, ভোজরাজা ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দে ধারানগরীতে বিদ্যমান ছিলেন। রাজমার্ত্তণ্ড নামক ফলিত জ্যোতিষ তাঁহার রচিত গ্রন্থ, তিনি রাজ মৃগাঙ্ক নামক করণ জ্যোতিষও রচনা করেন। তিনি পতঞ্জলের যোগসূত্রের বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। শতানন্দ ১০৯৯ খ্রীষ্টাব্দে পুরীতে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রহণ গণনার জন্য তিনি ভাস্বতী রচনা করেন। 'ভাস্বতী গ্রহণে ধন্যা' বলিয়া বর্ত্তমানেও প্রবাদ আছে। দশমিক গণনায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। প্রবাদ শতসংখ্যা গণনায় আনন্দ পাইতেন বলিয়াই নাকি শতানন্দ নাম হইয়াছে। তারপর দীপনির্ব্বাণের পূর্ব্বে যেরূপ অত্যুজ্জ্বলদীপ্তি দেখা যায় সেই রকম দীপ্তি লইয়া জ্যোতিষক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন ভাস্করাচার্য্য।

ভাস্করাচার্য্য

ভাস্করাচার্য্য ভারত-জ্যোতিষের সৌরমুকুট। সহ্যাদ্রির পশ্চিম-ঘাটগিরির নিকটে ১১১৪ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণাট প্রদেশের অন্তর্গত বিজ্জুরবিড় (বিজাপুর) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কানাড়ী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতা মহেশ্বরাচার্য্যের নিকট জ্যোতিষ শিক্ষা করেন। ভাস্কর ৩৬ বৎসর বয়সে সিদ্ধান্ত শিরোমণি রচনা করেন। ভাস্করের বীজগণিত এবং লীলাবতী নামক পাটীগণিত সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহার বীজগণিতে এমন অনেক প্রশ্ন-সমাধান রহিয়াছে যাহা ইউরোপে দুই-তিন শত বর্ষ পর্য্যন্ত অজ্ঞাত ছিল। ইহা ব্যতীত তিনি সর্ব্বতোভদ্র যন্ত্র নামে সময়-পরিমাপের এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ভাস্করাচার্য্য ফলিত জ্যোতিষের আগমসিদ্ধ গণনা প্রত্যক্ষ করিয়া ফলিত জ্যোতিষচর্চ্চা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি গণিতের অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া এই আগমসিদ্ধ ফলগণনা গণিত জ্যোতিষের সহিত প্রমাণ করিতে তিনি পারেন নাই। আগমসিদ্ধ গণনাকে মান্য করিলেন বটে, কিন্তু ফলিত জ্যোতিষচর্চ্চা ত্যাগ করিলেন। ভাস্কর তীক্ষ্ণধী ছিলেন। তাঁহার গাণিতিক প্রতিভায় বিশ্বের সকল পণ্ডিত মুগ্ধ হইয়াছেন।

ভাস্করের সমসাময়িক ভারতীয় জ্যোতিষ

ভাস্করের তিরোধানের পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অবস্থার ক্রমশঃ অবনতি ঘটিতেছিল। ১১শ শতকে গজনীর মামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। তখন ভারতবর্ষের ছোট ছোট রাজন্যবর্গ আত্মকলহে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহারা ভারতের গৌরব-রক্ষায় উদাসীন থাকায় দেখিতে দেখিতে মুসলমানের বিজয়-পতাকা ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলে উড্ডীয়মান হইল। কিন্তু তখনও ভারতের গৌরবরবি সকল স্থানে অস্তমিত হয় নাই। দক্ষিণ-ভারতে শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শনের মতবাদ প্রচার করিতেছিলেন। কনৌজে যশোবর্ম্ম দেবের সভায় ভবভূতি উত্তররাম চরিতে রামায়ণ গাহিতেছিলেন। তাঁহার মালতীমাধবে গ্রহবিপ্রকে সম্মান দেখানো হইয়াছে। মালবের ধারানগরীতে ভোজরাজা রাজমার্ত্তণ্ড নামক ফলিত জ্যোতিষ প্রণয়ন করেন। বঙ্গ এবং মিথিলার রাজা বল্লাল সেন অদ্ভুতসাগর নামক জ্যোতিষসংহিতা ১১৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন। এই সকল নিদর্শন তখনকার স্বাধীন ভারতের গৌরববহ্নির শেষ প্রজ্বলিত বিকাশ মাত্র। ভাস্করের তিরোধানের পর ভারতীয় জ্যোতিষ বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলিল। ইহার পূর্ব্বে গ্রীকগণের ভারত আক্রমণে আমাদের জাতীয় বিদ্যা কতক বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তার পর বৌদ্ধযুগে ভারতীয় জ্যোতিষ, জ্যামিতি, অস্ত্র-চিকিৎসার কোন উন্নতি হয় নাই, কেবলমাত্র বীজগণিতের উন্নতি হইয়াছিল। তখন যাগযজ্ঞাদি পশুবলি দ্বারা ধর্ম্মাচরণ প্রায় বন্ধ ছিল যজ্ঞবেদীর পরিমাপের জন্য জ্যামিতি-বিদ্যার উন্নতি হয়। যজ্ঞাদি বন্ধ থাকায় জ্যামিতির প্রসার হয় নাই। বুদ্ধদেবের অহিংসামন্ত্রে জাতি তখন উদ্বুদ্ধ। অতএব চিকিৎসাবিদ্যার মধ্যে অস্ত্রচিকিৎসা আপনিই বন্ধ হইয়া পড়িল। বৌদ্ধযুগে বিদেশীয় জ্যোতিষ কতকাংশে আমাদের জ্যোতিষের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। যবনাচার্য্য পৌলিস ঋষির নাম বর্ত্তমানেও বিভিন্ন জ্যোতিষগ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে। ভাস্করের তিরোধানের সহিত ভারতের জ্যোতিষের রবিও পশ্চিমদিগন্তে অস্তাচলে গমন করিলেন। ভারতের পূর্ব্বাকাশ তখন ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এই অন্ধকারে আবার কেহ কেহ প্রাচীন প্রদীপে গ্রীসের জ্ঞান-বর্ত্তিকা প্রদানে অন্ধকার দূর করিলেন। এই ভাবে নানাপ্রকার সংঘাতের মধ্যে ভারতীয় জ্যোতিষ স্বীয় গৌরব হারাইয়া ফেলিল। ভাস্করের পর হইতে সুধাকর দ্বিবেদী পর্য্যন্ত যে কয়জন জ্যোতিষী আত্মপরিচয় দান করিয়াছিলেন তাঁহাদের গ্রন্থ অধিকাংশ পূর্ব্বাচার্য্যগণের ব্যাখ্যা ব্যতীত কিছু নহে। খ্রীষ্টীয় ১২০০ হইতে ১৯০০ শতাব্দী পর্য্যন্ত মুসলমান এবং ইংরেজ রাজত্বে বৈদেশিক প্রভাবে করণ জ্যোতিষ পুষ্টিলাভ করিয়াছে, মূল জ্যোতিষ অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই।

মুসলমান রাজত্বে জ্যোতিষ

গজনীর মামুদের ভারত আক্রমণে ভারতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ধ্বংসের পর পুনরায় ঐ ধ্বংসস্তূপ হইতে নবরূপে জ্যোতির্জ্ঞান চর্চ্চা আরম্ভ হইল। বরাহ হইতে ভাস্কর পর্য্যন্ত জ্যোতিষিক জ্ঞান আবার নূতন উদ্যমে দেখা দিল। ঐতিহাসিক আলবেরুণী বরাহের ফলিত জ্যোতিষ, জ্যোতিষ-সংহিতা এবং গণিত জ্যোতিষ আরবী ভাষায় অনূদিত করেন। আলবেরুণী হিন্দু পণ্ডিতগণের সাহায্যে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া পরে ঐ সকল গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। এই ভাবে হিন্দু-প্রতিভা মুসলমানের রাজত্ব-সময় ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইতিহাস হইতে যতটা জানা যাইতেছে তাহার সাহায্যে মুসলমান যুগে হিন্দু জ্যোতিষীগণের পরিচয় নিম্নে প্রদান করা হইল।

মহেন্দ্রসূরি

মহেন্দ্রসূরি ফিরোজশাহ তোগলকের প্রধান জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি ভৃগুপুরের মদনসূরির শিষ্য ছিলেন। গুরু-শিষ্য উভয়ে জৈন ধর্ম্মপন্থী। তিনি ১৩৭১ খ্রীঃ অব্দে পার্শী জ্যোতিষ হইতে সংস্কৃতে যন্ত্ররাজ নামে জ্যোতিষের সারণীগ্রন্থ প্রস্তুত করেন।

নীলকণ্ঠ দৈবজ্ঞ

নীলকণ্ঠ সম্রাট আকবরের 'ক্ষুরত্তদল সভামণ্ডলে'র প্রধান পণ্ডিত ও জ্যোতিষী। তিনি ছিলেন বিদর্ভ দেশে ধর্ম্মপুর নামক স্থানের অনন্ত দৈবজ্ঞের পুত্র। অনন্ত দৈবজ্ঞ একজন প্রখ্যাত জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি কামধেনু নামক এক গণিতের সারণী রচনা করেন। নীলকণ্ঠের সময় দুই জন মুসলমান জ্যোতিষী আকবরের সভায় ছিলেন—ইমর কতেউল্লা সিরাজী এবং উলাহবেগ। নীলকণ্ঠ সংস্কৃতে নীলকণ্ঠী তাজিক নামে আরবীয় তাজিক জ্যোতিষের অনুবাদ করেন। আকবরের রাজত্ব-সময় সৌরপঞ্জী সংস্কার, বঙ্গাব্দ, ফসলী, বিলায়তী বর্ষ প্রবর্ত্তন করা হয়।

রাম দৈবজ্ঞ

রাম দৈবজ্ঞ নীলকণ্ঠের ভ্রাতা। তিনি সম্রাট আকবরের অধীন সামন্তরাজ। জয়পুরপতি রামচন্দ্রের তুষ্টির জন্য রামবিনোদ নামক পঞ্জিকা-গণনার সারণী প্রস্তুত করেন। তার পর তিনি টোডর-মল্লকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য 'টোডরানন্দ' নামে এক জ্যোতিষসংহিতা রচনা করেন।

রাঘবানন্দ

রাঘবানন্দ রাম দৈবজ্ঞের সমসাময়িক। বাংলা দেশে রাঘবানন্দ সিদ্ধান্ত রহস্য এবং দিনপঞ্জিকা নামে দুইখানি পঞ্জিকাগণনার উপযোগী সারণী ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন।

কৃষ্ণ দৈবজ্ঞ

কৃষ্ণ দৈবজ্ঞ সম্রাট জাহাঙ্গীরের সভায় প্রধান জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি ১৬২০ খ্রী: অব্দে ভাস্করের বীজগণিতের উপর 'নবাঙ্কুর' নামক টীকা, শ্রীপতির জাতক পদ্ধতির টীকা, ছাদক নির্ণয় পুস্তিকা রচনা করেন। ছাদক নির্ণয় পুস্তিকায় চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণ সম্পর্কে নানা বিষয় দম্পতি যুগলের প্রশ্নোত্তরছলে বর্ণিত আছে। কৃষ্ণ দৈবজ্ঞের জন্মস্থান পয়োষ্ণী-তীরে বিদর্ভ দেশের অন্তর্গত দধি গ্রামে। তিনি যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন।

নিত্যানন্দ

নিত্যানন্দ সম্রাট শাহজাহানের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী ছিলেন। নিত্যানন্দ গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। ১৬৩৯ খ্রী: অব্দে দিল্লীতে বসিয়া সিদ্ধান্তরাজ গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে চন্দ্রের পাক্ষিক সংস্কার নামে নূতন সংস্কার উদ্ভাবন করিয়াছেন।

বলভদ্র

বলভদ্র শাহজাদা সুজার সময় তাজিক গ্রন্থ হইতে বর্ষফল গণনার পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া হায়নরত্ন নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

জগন্নাথ পণ্ডিত

জগন্নাথ পণ্ডিত প্রথমে জয়পুরপতি জয়সিংহের, তারপরে আওরঙ্গজেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ এবং জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত এবং আরবী ভাষায় তাঁহার অগাধ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ১৬৪৫ খ্রী: অব্দে ইউক্লিডের জ্যামিতির আরবী অনুবাদ হইতে সংস্কৃতে জ্যামিতি প্রণয়ন করেন।* তার পর তিনি টলেমীর 'অলমাজিস্ত' নামক জ্যোতিষের আরবী অনুবাদ হইতে সংস্কৃতে 'সিদ্ধান্ত সম্রাট' নামক গণিত-জ্যোতিষ রচনা করেন। এই গ্রন্থ রচনার জন্য জয়সিংহ তাঁহাকে অনেক গ্রাম দান করিয়াছিলেন। ৺সুধাকর দ্বিবেদীর গণক তরঙ্গিণী পাঠে জানা যায় যে, ১৬৭২ খ্রী: অব্দে আওরঙ্গজেবের আদেশে জয়পুরপতি জয়সিংহ শিবাজীর সহিত যুদ্ধ করিতে দাক্ষিণাত্যে গমন করেন এবং ফিরিয়া আসিবার সময় জয়পুরে অল্পবয়সে বেদ বেদান্ত, দর্শন শাস্ত্রে জগন্নাথ পণ্ডিতের অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় লাভ করেন। জগন্নাথকে স্বয়ং সম্রাট আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষাদানের জন্য তাঁহার সভায় স্থান দিলেন। জগন্নাথ সম্রাটের সভায় অতি অল্প দিনের মধ্যে এই দুই ভাষায় এমন দক্ষতা লাভ করিলেন যে, আওরঙ্গজেব তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া স্বয়ং তাঁহাকে প্রধান সভা-পণ্ডিত নিযুক্ত করেন। আওরঙ্গজেবের সভায় থাকিয়া জগন্নাথ পণ্ডিত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন। তারপর জয়পুরপতি বার বার সম্রাটের কাছে অনুরোধ করায় সম্রাট জয়-সিংহের সভায় জগন্নাথকে পাঠাইলেন।† জগন্নাথ জয়সিংহের সভায় উপস্থিত হইয়া রাজার অনুরোধে সংস্কৃতে অনেক আরবী গ্রন্থের অনুবাদ করেন। রাজনীতি, গণিত এবং জ্যোতিষ, সংস্কৃত, আরবী, ফারসী ইত্যাদি শাস্ত্রে জগন্নাথ পণ্ডিতের অগাধ ব্যুৎপত্তি ছিল। রাজা জয়সিংহও বিক্রমাদিত্যের ন্যায় বিদ্যোৎসাহী এবং গণিতে, জ্যোতিষে সুপণ্ডিত ছিলেন। জ্যোতির্ব্বিদ্যার চর্চা বিশেষ ভাবে করিবার জন্য তিনি 'মানুএল' নামক একজন পর্ত্তুগীজ পাদ্রীর সহিত ইউরোপে অনেক পণ্ডিতকে পাঠাইলেন, তারপর পর্ত্তু-গালের রাজা একজন জ্যোতিষ্কবেধযন্ত্রপারজ্ঞ ব্যক্তিকে ভারতবর্ষে পাঠাইলেন। এই ভাবে রাজা জয়সিংহ নানা প্রকার জ্যোতিষগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া গগন পর্য্যবেক্ষণের জন্য নূতন নূতন গোলযন্ত্র আবিষ্কার করেন, তারপর জয়পুর, দিল্লী, কাশী, উজ্জয়িনী, মথুরায় মানমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। কি প্রচুর পরিমাণ অর্থব্যয় করিলে এই সকল মানমন্দির তৈয়ার করা যায়, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে অনুমান করা যায় না। ঐতিহাসিক টড বলিয়াছেন যে, এখনও রাজপুতানার মালবে, জয়সিংহের নাম স্মরণ করিয়া জয়াশা করা হয়।

* সংস্কৃত জ্যামিতির সংজ্ঞা—য: পদার্থ: দৈর্ঘ বিস্তারহিত: বিভাগার্হ: স রেখা শব্দ বাচ্য:।—এই ধরণে সংস্কৃতে রচিত হইয়াছে।

† গণক তরঙ্গিণী—জয়সিংহের সভায় জগন্নাথকে ফিরিয়া পাইবার প্রশ্ন: জগন্নাথ বলিতেছেন· দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা মনোরথান পূরয়িতুং সমর্থ:। উত্তরে জয়সিংহ লিখিতেছেন··· অনৈর্ব্বরাকৈ: খলু দীয়মানং শাকায় বা স্যাল্লবনায় বা স্যাৎ।

ইংরেজ আমলে ভারতীয় জ্যোতিষী

বাপুদেব শাস্ত্রী : বাপুদেব মরাঠী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সিহোর রাজ্যের এজেন্ট তাঁহার গণিতের অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়া সংস্কৃত জ্যোতিষ শিক্ষার জন্য তাহাকে সিহোরে প্রেরণ করেন, সেখানে দুই বৎসর অধ্যয়নান্তর বিশেষ কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কাশী সংস্কৃত কলেজে রেখাগণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেইখানে থাকিয়া সংস্কৃত ও হিন্দীতে রেখাগণিত, ত্রিকোণমিতি, জ্যোতিষের ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। গণিতে অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি ইংলণ্ড, ব্রহ্মদেশ, এসিয়াটিক সোসাইটির এবং কলিকাতা ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নিযুক্ত হন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার তাঁহাকে সি, আই, ই এবং মহারাণীর শতার্দ্ধোৎসব উপলক্ষে মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রদান করেন। এই ভাবে তিনি প্রভূত সম্মান লাভ করিয়া ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পর মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সুধাকর দ্বিবেদী : মহামোহপাধ্যায় দ্বিবেদী মহাশয় ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজী, সংস্কৃত এবং গণিতে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ইউরোপের কতিপয় গণিতের সংস্কৃতে অনুবাদ করেন। গ্রহণকরণ, দীর্ঘবৃত্ত লক্ষণ, বাস্তবচন্দ্র, শৃঙ্গোন্নতিসাধন, চ্যাচরাচার, পিণ্ডপ্রভাকর, ভাভ্রমরেখানির্ণয়, গোলীয় রেখাগণিত প্রভৃতি জ্যোতিষগ্রন্থ রচনা করেন। লল্লের তন্ত্র, শ্রীধরের ত্রিশতিকা পাটীগণিত, বরাহের বৃহৎসংহিতা, পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, কমলাকরের 'সিদ্ধান্ততত্ত্ববিবেক' কৃষ্ণের ছাদক নির্ণয় গ্রন্থ প্রকাশ দেশের উপকার করিয়াছে। তিনি ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নিযুক্ত হন এবং ঐ সময় কলিকাতা পঞ্জিকা-সংস্কার সমিতির অনুরোধে দৃক্‌গণিতের সহিত ঐক্য রাখিয়া পঞ্জিকা-গণনার সারণী তৈয়ার করেন। গণকতরঙ্গিণী নামে সংস্কৃতে পাণ্ডিত্যপূর্ণ এক ইতিহাস রচনা করেন।

চন্দ্রশেখর সিংহ : কটকের সন্নিকটে পশ্চিমে খণ্ডপাড়া নামে এক ছোট করদ রাজ্য আছে। রাজ্যটি দুর্গম অরণ্য এবং পর্ব্বত দ্বারা পরিবেষ্টিত। সিংহ মহাশয় এই অরণ্য এবং পর্ব্বত-শ্রেণীর মধ্যে খণ্ডপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃত ও মাতৃভাষা ব্যতীত কিছু জানিতেন না। তিনি দশ-বারো বৎসর বয়সে পিতৃব্যের কাছ হইতে লগ্নগণনা প্রভৃতি জ্যোতিষ শিক্ষা করেন। তারপর তাঁহার জ্ঞান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পনর-যোল বৎসর বয়সে ভাস্করের সিদ্ধান্ত শিরোমণি এবং প্রাচীন সূর্য্য-সিদ্ধান্ত হইতে কতিপয় গোলযন্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ গোলযন্ত্র দ্বারা গগন পরিদর্শন করিয়া প্রাচীন পঞ্জিকার গ্রহসংস্থানের ভ্রান্তি ধরিতে পারিলেন এবং প্রভূত অধ্যবসায় বলে একখানি মাত্র গণিত-জ্যোতিষ 'সিদ্ধান্তদর্পণ' প্রণয়ন করিলেন। এই গ্রন্থ হইতে গ্রহ-বেধ গণনা করিলে বর্ত্তমান নাবিক পঞ্জিকার সহিত অধিকাংশ গণনা মিলিবে। নাবিক পঞ্জিকার সহিত সাধারণ পার্থক্য হইবে রবির ২০৬ সেকেণ্ড, চন্দ্রের ১ সেকেণ্ড, বুধ ১৯ সেঃ, শুক্র ২ মিঃ, মঙ্গল ৯ মিঃ, বৃহস্পতি ১ ঘণ্টা শনির অর্দ্ধদিবস গণনায় পার্থক্য হইবে। সিদ্ধান্তদর্পণ বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য। কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে মাত্র একখানি গ্রন্থ আছে। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে চন্দ্রশেখর সিংহ মহাশয় একমাত্র ভারতবর্ষের মুখ রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই গ্রন্থ হইতে বর্ত্তমানে গ্রহগণিত করা হয় না। অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক নাবিক পঞ্জিকাকে আধার করিয়া গ্রহগণনা করিয়া থাকেন। চন্দ্রশেখরের সিদ্ধান্তদর্পণের সহজ সারণী প্রস্তুত আবশ্যক। ভারতীয় পদ্ধতিতে এই ধরণের একখানা জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থ গৌরবের বিষয়। "Nature" পত্রিকা ১৮৯৯ খ্রীঃ ৯ই মার্চ্চ চন্দ্রশেখরকে পাশ্চাত্ত্য টাইকোব্রাহী হইতে শ্রেষ্ঠতর পণ্ডিত বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। চন্দ্রশেখরের জীবনের শ্রেষ্ঠ কার্য্য সিদ্ধান্তদর্পণ রচনা।

গ্রন্থপঞ্জী

১। গণকতরঙ্গিণী—সুধাকর দ্বিবেদী।

২। আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী—
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।

৩। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র—শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত।
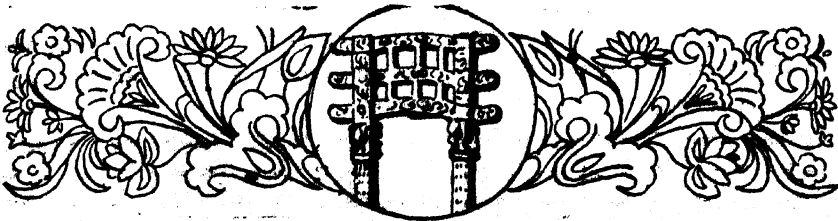
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চন্দ্রবাবু ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়লেন।—না। তারপর মৃদুস্বরে বললেন—একি কখনও হতে পারে? মৃগাঙ্কবাবু। না—না—না। আবার তিনি ঘাড় নাড়লেন।

ভরাট কণ্ঠস্বর অমরবাবুর, মৃদুস্বরে কথা বললেও বুকের ভিতর একটা প্রতিধ্বনি তোলে। চন্দ্রভূষণ একটা জয়পুরি মিনেকরা ফুলদানীর কানাটা ছুঁয়ে ছিলেন, সেটার মধ্যেও প্রতিধ্বনির রেশ বেজে উঠল। অমরবাবু বললেন—কিন্তু এ সম্পূর্ণ সত্য। পঙ্কা ক্ষ্যাপাকে নিশ্চয় বিশ্বাস করবেন?

পঙ্কা ক্ষ্যাপা! পঙ্কজ চক্রবর্ত্তী! এই ইস্কুলেরই ছাত্র ছিল পঙ্কজ। দুর্দান্ত দুষ্ট ছেলে; মাইনর পাস করে চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশনে ফোর্থ ক্লাসে এসে ভর্ত্তি হয়েছিল। বিবগ্রাম থেকে ক্রোশ দুই দূরে বাড়ী। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। অবস্থাপন্ন কিন্তু অভিশপ্ত, সর্ব্বজননিন্দিত ঘর। অভিশাপ না দিয়ে লোকে জল খেত না। লোভী, সুদখোর, দয়ামায়াহীন, কুটিল জনের বংশ। শুধু তাই নয়, এ সংসারের সব রকমের ব্যভিচার ও বাড়ীর প্রতিটি জনের জীবনে বাসা বেঁধে ছিল। পঙ্কজ যখন ভর্ত্তি হ'ল তখনই তার দাড়িগোঁফ গজিয়েছে, তখনই সে তামাক ছাড়িয়ে চরস ধরেছে। চন্দ্রভূষণবাবু এটা অবশ্য জানতেন না। যখন জানতে পারলেন তখন পঙ্কজ মদ ধরেছে। মুখে মদের গন্ধ পেয়েই চন্দ্রবাবু তাকে ইস্কুল থেকে বের করে দিয়েছিলেন। পঙ্কজ প্রথম দিনেই ইস্কুলে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল তার রুপো-বাঁধানো হুঁকোর জন্য। সেটা চন্দ্রবাবু দেখেন নি। ছেলেরা দেখেছিল। এবং প্রথম দিনেই পঙ্কা ক্ষ্যাপা বলে খ্যাত হয়েছিল। কথায়-বার্ত্তায় অস্বাভাবিক ছিল পঙ্কা। সেই পঙ্কা—হঠাৎ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। আজ সে এ অঞ্চলে সাধুপুরুষ বলে খ্যাত। সত্যই পঙ্কা সাধুপুরুষ। পঙ্কা আজ মদ দূরের কথা তামাক পর্য্যন্ত খায় না। আশ্রম করেছে, নাম দিয়েছে 'দীনপ্রভু সেবাশ্রম'। আশ্রমে অস্পৃশ্য জাতির আতুর জনের সেবা হয়। আশ্রমে এনে রোগে সেবা, দুঃখে সাহায্য, শোকে সান্ত্বনা দিয়ে ঘুরে বেড়ায় পঙ্কা ক্ষ্যাপা। ঈশ্বরের নাম করে পঙ্কা কাঁদে; পঙ্কা শাস্ত্র পাঠ করে পণ্ডিত হয়েছে; ভাগবত কথকতা করে পঙ্কা—সে কথকতা শুনে লোকের নাকি চোখের জলে বুক ভেসে যায়। সাধু হওয়ার পর চন্দ্রভূষণ তাকে চোখে দেখেন নি। কিন্তু সকলেই একবাক্যে বলে। তিনি সবিস্ময়ে ভাবেন। মৃগাঙ্কবাবু বলেন—"এ রোগ! রোগ অব দি ফার্ষ্ট রেট! প্রাচীন মিশরের পুরুতদের মত ভেরি ভেরি ভেরি ক্লেভার রোগ। হি ইজ এ মডার্ন পাপবুদ্ধি! ধরা পড়বে একদিন! ধর্ম্মবুদ্ধি অর দি ম্যান অব শার্পেষ্ট ইন্টেলিজেন্স যে দিন আসবে এ্যাণ্ড আশ্রমের চারিদিকে আগুন লাগাবে, সেই দিন সব বের হবে। ওর ভণ্ড সাধুত্ব—পাপবুদ্ধির লুকোনো বাপের মত ঝলসান শরীরে বেরিয়ে এসে আছাড়ে পড়বে। হি উইল কনফেস হিমসেলফ!"

রামজয় প্রতিবাদ করে। রামজয় বলে—

মূকং করোতি বাচালম্, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্,
যৎ কৃপাং—তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবং।

রামজয় বলে—আমি পঙ্কাকে দেখেছি। পঙ্কা—সত্যিই

পঙ্কজ এখন। গুরুর কৃপা। বেটার পূর্ব্বজন্মের পুণ্য ছিল—পেয়ে গিয়েছিল এক বৈষ্ণব সাধুকে। তাঁর কৃপা।

অমরবাবু বললেন—দু'বছর আগে হঠাৎ পঙ্কা ক্ষ্যাপা এসেছিল—মঙ্গলের কাছে। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল এরফান শেখকে।

মঙ্গলবাবু চৈতন্যবাবুর বড়ছেলে। বিল্বগ্রাম অঞ্চলের বড়বাবু। প্রতিহিংসায় ক্ষমাহীন, অনুগতজনের প্রতিপালক, একচ্ছত্র প্রভুত্বকামী দুর্দ্দান্ততম ব্যক্তি! তেমনি খেয়ালী। ইস্কুলের ছেলেরা মঙ্গলবাবুকে মঙ্গলবাবু বা বড়বাবু বলে না, বলে মহম্মদ তোগলক! চন্দ্রভূষণবাবু বাইরে শাসন করেন, কোনক্রমে কারও মুখে একথা শুনলে তিনি শাসন করেন—নো—নো—নো! মাষ্ট নট সে—এনিথিং লাইক দিস! নেভার! আই ওয়র্ন ইউ! কিন্তু মনে মনে মৃদু হেসে উপভোগ করেন, সায় দিয়ে নিজেকেই বলেন—ভেরি রাইট। ভেরি রাইট দে হ্যাভ সেড। ইয়েস! মঙ্গলবাবু দিল্লীর সম্রাটের ছেলে সম্রাট হলে নিঃসন্দেহে মহম্মদ তোগলক হতে পারতেন। ইয়েস!

অমরবাবু বললেন—আপনি জানেন, এরফানও দুর্দ্দান্ত লোক, এখানকার মুসলমানদের মাতব্বর। মেসোমশায় বেঁচে থাকতে থাকতেই এরফানের সঙ্গে বিরোধের সূত্রপাত—সেও আপনার অজানা নয়। কিন্তু সে বিরোধ মামলা-মোকদ্দমায় পরিণত হয় নি। মামলা-মোকদ্দমার আরম্ভ এই কলার গাছ—কলার কাঁদি কাটা থেকে। শ্যামসাগরের পাড়ের কলাগাছ কলা কাটার পরই এখানকার অন্য বাবুদের এবং মেসোমশায়দের অন্যথানের বাগানের গাছ কাটা ফল ছেঁড়া আরম্ভ হ'ল। পুলিস এনকোয়ারি করে রিপোর্ট দিলে—এ কাজ এরফানের দলের। তখন এঁদের সঙ্গে এরফানদের ঝগড়া চলছে—খাজনা বৃদ্ধি নিয়ে। ওরা খাজনা দিচ্ছে না, এঁরা ওদের খাস পতিতে গরু চরা বন্ধ করেছেন। খাস-খামারের গাছ কাটছেন।

চন্দ্রবাবু বললেন—আমি জানি অমরবাবু। গিন্নীমা আমাকে নিজে ডেকে বলেছিলেন—বড়মাষ্টার কিছু যেন মনে করো না বাপু! বোর্ডিং ছেলেদের ঘর তল্লাস করতে যাওয়াটা আমার ঠিক হয় নাই। ছেলেদিগের কিছু মনে করতে বারণ করো। এ কাণ্ড পুলিস খবর দিয়েছে দুষ্টু বদমাস প্রজাদের; ওই এরফান সেখ তার পাণ্ডা।

অমরবাবু বললেন—ইয়েস, আই এক্সপেক্ট ইউ টু নো। আপনি এখানে শুধু হেডমাষ্টারই নন। এখানকার লোক। আই নো, ইউ শেয়ার দেয়ার সরোজ। সেই বিরোধ সেদিন পর্য্যন্ত চলেছে, একটার পর একটা মামলা। ইউ নো মঙ্গল ভয়ঙ্কর কঠোর! নিষ্ঠুর বলব। এরফানও দুর্দ্দান্ত। সর্ব্বস্বান্ত হয়ে মিটমাট করতে এল। সঙ্গে পঙ্কা পাগলা। সেই এসেছিল এরফানকে নিয়ে।

মঙ্গল মামলা তোলবার সর্ত্ত দিলে—শ্যামসাগরের কলাগাছ—কলা কাটার জন্য জরিমানা দিতে হবে। এই জরিমানা ভিন্ন বিরোধ মিটবে না।

পঙ্কা বললে—সে অপরাধ এরফানের নয়, মঙ্গলবাবু। অপরাধ আমার; হাঁ আমারই বলতে পারেন। এরফান আমার কাছে গেল। আমি ওকে প্রথম বলেছিলাম, এরফান আমি সন্ন্যাসী মানুষ, নিজের বিষয়ের বিষ সইতে না পেরে পালিয়ে এসেছি। আমাকে আর ওর মধ্যে টেনো না। ও কাঁদতে লাগল। কথায় কথায় বললে—"বড়বাবু বলছেন-দশ বছর আগে শ্যামসাগরের পাড়ে কলাগাছ কাঁদি কাটার জরিমানা আগে আমানত কর, তবে মিটমাটের কথা। আমি বইলাম শ্যামসাগরের কাণ্ড কে করেছে—আমি জানি না। খোদার নাম নিয়া কইতে পারি, কোরাণ শরিফ হাতে নিয়ে বলতে পারি। তবে হাঁ, ওই কাণ্ড দেখে আমরা তার পরে বেলগাঁয়ের বাবুলোকের অনেক বাগানে গাছ কেটেছি। তা বাবু কয়—হাতে তামাতুলসী নিয়া ভাগবত নিয়া আমিও কইতে পারি ঝুটা বাত। তাতে যদি আমার লাভ হয়। উ ফন্দী আমি জানি। সব কসুর মাফ করতে পারি, শ্যামসাগরের কসুর—মূল কসুর—সেটা মাফ আমি করব না। পঙ্কা বললে—আমার মনে পড়ে গেল মঙ্গলবাবু, শ্যামসাগরের কাণ্ডের কথা। সে কাণ্ড এরফান করে নাই, আমরা করেছিলাম।

হা হা করে হেসে বলেছিল পঙ্কা—মঙ্গলবাবু, একে ছেলেমানুষ বয়েস, তার ওপরে ডাঙ্গাপাড়ার মামলাবাজ, সুদখোর, নেশাখোর চক্কত্তি বংশের গুণধর—পঙ্কা তখন ডঙ্কা বাজিয়ে যত কুকাজ অকাজ করে ফেরে। গিন্নীমা বললে—মহাবীর মুচকুন্দ বাহাদুর সেখ বন্দুক লেকে পাহারা দাও। গাছের পাতা নড়েগা ত ফায়ার কর দেও। কাঠবেড়ালী, পক্ষী, বাঁদর, চোর ছ্যাঁচড় যা হবে—লাগাও গুলি।

গরীবের ঘরের ছেলেরা ভয় পেলে, অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেরা বললে—এ অপমান সহ্য করে এই স্কুলে পড়বই না। চলে যাব অন্য স্কুলে। গেরস্তঘরের ছেলেরা বললে—কাজ কি ভাই, ওদের বাগান ত বাগান, পুকুরে পর্য্যন্ত নামব না, ওদের বাড়ীতে নেমন্তন্ন হলে খেতেও যাব না।

পঙ্কা বললে—তুই শালারা মেয়েলোকের অধম। কুছ পরোয়া নেহি হ্যায়। ও বাগানকে বাগান লোপাট কর দেঙ্গে। আমিও বাবা ডাঙ্গাপাড়ার চক্কত্তি বাড়ীর ছেলে। হুঁ হুঁ ভানুমতীর খেল দেখিয়ে দোব। টাকু মোড়লের ভেল্কী।

চলে গেলাম—রাধানগরের জমিদারবাড়ীর ছেলে—সতীশের বাসায়।

রাধানগরের জমিদার হরিশবাবু ছেলেকে এখানে পড়তে দিয়েছিলেন, কিন্তু বোর্ডিঙে রাখেন নি। এখানে বাসা করে রেখেছিলেন। ঠাকুর-চাকর রেখে থাকত সতীশ। সতীশ তখন শয্যাশায়ী। পঙ্কা বললে—অসুখের নাম নাই শুনলেন। সে আমলে ও সব রোগ বাবুদের ঘরের অলঙ্কার ভূষণ ছিল। বিষ্ণুগ্রামে তখন আপনারাই চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি করেছেন—তার ডাক্তার ছিল ছোকরা মানুষ. সতীশের বন্ধু হয়ে গিয়েছিল টাকার খাতিরে। সে চালাচ্ছিল—সতীশের' হাট দিজিজ হয়েছে।

বিষণ্ণ কণ্ঠস্বরে সন্ন্যাসী পঙ্কা বললে—সে কাল ছিল আলাদা মঙ্গলবাবু, সে ত আপনি জানেন আপনার ছোট ভাই পবিত্রবাবু এখন ইস্কুলে সেক্রেটারি, বিশিষ্ট লোক, নেপালবাবু এখন সরকারী ডাক্তার, তাঁদের কথা মনে করুন না। আপনিই ত পবিত্রবাবুকে রাস্তার ওপর বেত মেরেছিলেন। জানুয়ারি মাসে টেষ্ট পরীক্ষা—তার পরে এণ্ট্রান্স একজামিন; বুড়োশালী তলায় রায়বাবুরা মেলা বসালে, খেমটা নাচ নিয়ে এল; পবিত্রবাবু নেপালবাবু মেলা দেখতে গিয়ে সেইখানেই থেকে গেল—সাত দিন। থাকল সেই খেমটাওয়ালিদের বাসার পাশেই চালা নিয়ে; বাসা দিলে খোদ রায়বাবুরা। ওরা যে উনিশ বছরের ইস্কুলের পড়ো ছেলে—রায়বাবুদের পুত্তুলা—তাতেও রায়বাবুদের বাধল না। সবই ত মনে আছে আপনাদের। সেই কালের ব্যাপার ত। দু'বছর পর।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পঙ্কা বললে—আজ তাই বসে বসে ভাবি। ভগবানকে শতবার প্রণাম করি আর বলি, ধন্য তোমার দয়া, কোন দয়াতে ডাঙ্গাপাড়ার চক্রবর্ত্তি বাড়ীর ছেলে—ষণ্ডামার্ক কালাপাহাড় পঙ্কাকে উদ্ধার করতে গুরুর বেশে দেখা দিলে তুমিই জান। নইলে পঙ্কা যে কি হ'ত, তা ভাবি আর শিউরে উঠি।

মঙ্গলবাবু অসহিষ্ণু হয়ে বললেন—তোমার ওসব কথা শুনবার অবসর নাই পঙ্কা! কি হয়েছিল তাই বল। আর বললেই শুধু হবে না। প্রমাণ চাই। তুমি এরফানের কাছে ঘুস খাও নি, সে কি করে বুঝব? তুমি সাধু হয়েছ তা গেরুয়া কাপড় দেখে বুঝছি। কিন্তু ভণ্ড সাধুই ত নিরানব্বই জন!

পঙ্কা হেসে বললে—আমি সাধু এই কথা কি বলতে পারি মঙ্গলবাবু? ঠিক বলেছেন আপনি—সাধু হওয়া সোজা নয়। মানুষ যখন—তাও আমার মতন মানুষ যখন সাধু হতে চায়—তখন প্রাণের মধ্যে পাপ কামনা মাথা কোটে, সাপের মতন ছোবল মারে, ক্ষ্যাপা কুকুরের মত কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। হিতোপদেশে পড়েছিলাম, বুড়ো অথর্ব্ব বাঘ চোরা পাঁকে ভরা পুকুর ঘাটে বসে সোনার তাল নিয়ে মানুষদের ডাকত—আমি দান করব, তোমরা দান নেবে এস। দান নেবার আগে চান কর—পুকুরে শুদ্ধ হয়ে নাও। মানুষ পুকুরঘাটে নেমে চোরাপাঁকে পড়ত, বাঘ তখন তাকে দিব্য ভক্ষণ করত। তাও হয়। কথা আপনি ঠিক বলেছেন। তা সাক্ষী আমার আছে। তবে আপনাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে—আপনি অন্যায় করে তার ওপর রাগ করতে পাবেন না। সাজা দেবেন না।

মঙ্গলবাবু সে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

পঙ্কা বললে—তা হলে গোপালবাবুকে ডাকুন। আমাদের ড্যান্সিং গোপাল—মানে নৃত্যগোপাল বাবু, ইস্কুলের কেরাণী, সে আমলে বোর্ডিংয়ের এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। আমি বলব না, তিনিই বলবেন। তাঁর মুখেই শুনবেন সব কথা। শুধু তিনি যেখান থেকে জানেন—তার আগে পর্য্যন্ত বলে দিই আমি।

অমরবাবু বললেন—পঙ্কার কথায় আমি বিশ্বাস করেছিলাম চন্দ্রবাবু। সত্য কথার একটা সুর আছে। সে সুর আমি পঙ্কার কথার মধ্যে পেয়েছিলাম।

রাত তখন বারোটা পার হয়ে গেছে। বৈশাখ রাত্রির উত্তাপ তখনও কমতে সুরু করে নি। চৈতন্যবাবুর রেষ্ট হাউসের সামনের বাগানটার গাছগুলো নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বারান্দার সিঁড়ির পাশে বড় ঝাউ গাছগুলোর গুনগুনানিও শোনা যাচ্ছে না। রাস্তার ওপাশে ইস্কুল-বোর্ডিং, সেখানে ছেলেগুলোর অনেকের এখনও ঘুম আসে নি—ওদের সাড়াশব্দ বেশ বোঝা যাচ্ছে। কয়েকটা দুর্দ্দান্ত ছেলে ইস্কুলের ছাদে উঠেছে। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে সিগারেট জ্বলছে। এ মাথা থেকে ও মাথা পর্য্যন্ত ছুটোছুটি করছে, জ্বলন্ত সিগারেটের আগুন অনির্ব্বাণ জোনাকীর মত যেন উড়ে বেড়াচ্ছে। ছেলেদেরও মধ্যে মধ্যে দেখা যাচ্ছে, সিল্যুট ছবির মত। ওরা জানে না যে, সামনেই রেষ্ট হাউসে এই রাত্রে হেডমাষ্টার বসে আছেন, অমরবাবু এসেছেন। আশ্চর্য্য দুরন্ত এবং অসম্ভব দুঃসাহস হতভাগাদের। একতলা ইস্কুলবাড়ী, উঁচুতে সাধারণ দোতলার সমান, অথচ ছাদে উঠবার সিঁড়ি নাই। চার কোণে চারটে নকসা কাটা থাম আছে; একেবারে নিচে থেকে উপর পর্য্যন্ত সিমেণ্ট দিয়ে তৈরি চৌকো ঘর তোলা আছে, সেই খাঁজে খাঁজে হাতের আর পায়ের আঙুলের ভর দিয়ে দিব্যি উঠে গিয়েছে। ওঃ দে আর ডেভিলস ইনকার্নেট। এ ডেভিলদের একমাত্র

স্থান হ'ল সৈন্তবিভাগ। বেটারা শত্রুপক্ষের বড় বড় দুর্গ অনায়াসে জয় করতে পারবে। কিন্তু সে পথ বন্ধ। ইটন ইস্কুলের কম্পাউণ্ডের মধ্যে খেলার মাঠে ইংলণ্ডের বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের প্রথম আয়োজন গড়ে উঠেছিল। এ বেটারা তাদের চেয়ে এতটুকু ছোট নয়।

অন্য দিন হলে চন্দ্রবাবু এখুনি দীর্ঘ পদক্ষেপে গিয়ে—তাঁর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে চীৎকার করতেন—হু আর দেয়ার? ইউ! স্পীক আউট! আনসার মি! ইউ ডেভিলস! সঙ্গে সঙ্গে কেষ্টকে ডাকতেন—কেষ্ট! মই, মই নিয়ে এস। ইউ সয়র্তানিস, ডোণ্ট—ক্লাইম্ব ডাউন—, ডোণ্ট, আই সে।

এর পরই হিন্দী বলতেন তিনি—মৎ উতারো। বিনা মইসে মৎ নামো। খবরদার। ই-উ ননসেন্স! শেষের ইউ ননসেন্স শব্দটা খুব জোরে চীৎকার করে বলতেন। কারণ ওই দুর্দ্দান্তরা ধরা পড়বার ভয়ে ওর সাবধানবাক্যে কর্ণপাত করত না। চন্দ্রবাবুর হাতপা কাঁপত, কণ্ঠস্বরেও তার আভাস প্রকাশ পেত।

আজ কিন্তু তাঁর মনের সে সক্রিয়তা ছিল না। তিনি মৃগাঙ্কবাবু এবং অন্যান্য সহকর্ম্মীদের জন্য বেদনায় ম্লান হয়ে গেছেন। নীরবে অমরবাবুর কথাগুলি শুনেই যাচ্ছেন।

অমরবাবু বললেন—পঙ্কা বললে, সতীশ ছিল বাবুলোক। মঙ্গলবাবুর মায়ের কথাটা তার মনেও খুব লেগেছিল। কিন্তু সে বললে—বোর্ডিঙে থাকলে আমি মানহানির মেকেদ্দমা করতাম। তোরা মানহানির মোকদ্দমা কর, চাঁদা তোল্, আমিও চাঁদা দোব।

পঙ্কা বললে—কিচ্ছু লাগবে না—তুমি বাবা ডাক্তারের কাছ থেকে একটা কড়া নেশা জোগাড় করে দাও, যা এক ডোজ খেলে সারারাত বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকবে; ঢাক বাজালে, চিমটি কাটলে ঘুম ভাঙবে না। কিন্তু না মরে। সিদ্ধির সঙ্গে মিশিয়ে দোব। আমিই বলতাম, কিন্তু ডাক্তার চটে আছে, ফাঁকি দিয়েছি। ওর কাছে সার্টিফিকেট নিয়েছিলাম—তামাক না খেলে আমার পেট ফাঁপে। হেডমাষ্টার ঘর খানাতল্লাস করে আমার রূপোবাঁধা হুঁকো কাষ্টগড়ের তামাক টিকে নিয়ে চলে গিয়েছিল—ওই সার্টিফিকেটে হুঁকো তামাক কল্কে আদায় করেছিলাম।

মনে পড়ে গেল চন্দ্রবাবুর। ওঃ কি শয়তান বদমাস এই পঙ্কা ছিল তখন! তখনকার দিনে তিনি জানতেন—ছেলেরা ছেলেবয়স থেকেই তামাক খেতে ধরত। সন্ধ্যার পর ছেলেরা আপন আপন ঘরে পড়তে বসবার পর তিনি একবার নিয়মিত প্রত্যেক ঘরে এসে দেখে যেতেন। ছেলেরা এই সময়টায় প্রত্যেকেই সে কি মনোযোগের সঙ্গে পড়ত! গোটা বোর্ডিংটায় পড়াশোনার সে যেন হাট বসে যেত। তিনি বলে যেতেন—আস্তে এত চীৎকার করে পড়ে না। নট সো লাউডলি। কেউ না পড়লে তাকে জিজ্ঞাসা করতেন—আজও করেন—শুয়ে কেন? শরীর খারাপ? সঙ্গে সঙ্গে কপালে হাত দিয়ে উত্তাপ অনুভব করেন। তার পর চলে এসে নিজে পড়তে বসেন। নোট তৈরি করেন। কোন ভাল বই পড়েন। ওদিকে তিনি চলে আসবামাত্র ছেলেদের হুঁকো কল্কে তামাক টিকে বের হয়। যাদের নিজেদের হুঁকো কল্কে নেই তারা সুটসাট করে বের হয়ে যায় রান্নাশালায়, ঠাকুরদের সঙ্গে বন্দোবস্ত তাদের। ঠাকুর বিভিন্ন জাতের হুঁকো রাখে। এর জন্যে মধ্যে মধ্যে তিনি প্রথম রাউণ্ড দিয়ে ফিরে এসে আবার আধ ঘণ্টা পর বের হয়ে পড়েন। কেষ্টকে ধরেন কর্ম্মরত অবস্থায়। নইলে ঐ কেষ্টই খবর দিয়ে দেয় ছেলেদের। আর সঙ্গে নেন এসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে। তারপর আরম্ভ করেন খানাতল্লাস। বের হয় হুঁকো-কল্কে, তামাক-টিকে। সেদিন নৃত্যগোপাল সঙ্গে ছিল। পঙ্কার হাতে রূপো বাঁধানো হুঁকো দেখে তাঁর বিস্ময়ের অবধি ছিল না। দাড়ি গোঁফ বের হওয়া ছেলে হলেও পঙ্কা ফোর্থ ক্লাসের ছেলে। তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিলেন। দুই হাতে চড় মেরেছিলেন পঙ্কাকে। তাকে বের করে দিতে চেয়েছিলেন।—নিকাল যাও। তুম্ নিকাল যাও। নেহি মাংতা! ক্লীয়ার আউট! পঙ্কা মার খেয়েও কাঁদে নি; শুধু বলেছিল—স্যার আমার—

—নো—নো—নো। আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট ইউ! গেট আউট!

সেদিন ওই পঙ্কার জন্যে প্রতিটি তামাকখোর ছাত্রেরই লাঞ্ছনার অবধি ছিল না। শেষ পর্য্যন্ত চৌদ্দ-পনেরটা হুঁকো, কুড়ি-পঁচিশটা কল্কে, কয়েক রকমের তামাক পাকড়াও করে তাঁর নিজের ঘরে এনে বন্ধ করে রেখেছিলেন, প্রতিটি ছেলের জরিমানা করেছিলেন। ঠাকুরকে শাসিয়ে দিয়েছিলেন—নেক্সট টাইম—ইউ লুজ ইয়োর জব। পরক্ষণেই হিন্দীতে অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—ফিন এইসা হোগা তো নোকরী চলা যায়েগা!

রাগের সময় বাংলা ভাষায় তিনি যেন ঠিক জোর পান না। গেট আউট, আভি নিকালোর মত জোর—'এক্ষুনি বেরিয়ে যাও' বলে যেন পাওয়া যায় না। তিনি নিজেই জানেন—তাঁর হিন্দী কত ভুল হয়, কিন্তু কি করবেন? জোরালো ভাষা ভিন্ন কি দুর্দ্দান্ত রাগ প্রকাশ করা যায়? আর দুর্দ্দান্ত রাগ না হলে এই সব—সাপের পাঁচ পা দেখা, উদ্দাম বয়সের এই মহাবীরের সগোত্রীয়দের শাসন করা যায়? রামজয় বলে—এই বয়সে সবাই অন্নবিস্তর মহাবীরের প্রভাবে পড়ে

তোমাদের ইংরেজীতে নাকি বলে—বানরের লেজ খসেই নর। ওটা বাপু ঠিক কথা। লেজ খসবার আগে হনুমানত্ব করে নেয় আর কি। হনুমান রামচন্দ্রের ভক্ত হয়ে বিশ্বপূজ্য হলেন। তার আগে? সে বাবা খাঁটি আসল ও অকৃত্রিম হনুমান। সূর্য্য উঠতে দেখে রাঙা ফল ভেবে লাফ দিয়ে ধরতে চায়—যে হনুমান এই বয়সে সেই হনুমান হয় মানুষ। সে হনুমানদের বশে রাখা কি সোজা কথা!

সেদিন সমস্ত সন্ধ্যাটাই তিনি অনর্গল হিন্দী বলেছিলেন। ন'টায় খাবার ঘণ্টা পড়লে—খাবার জায়গায় এসে দশ মিনিট তামাক খাওয়ার অপকারিতা এবং নিষ্কলুষ চরিত্রমহিমা ব্যাখ্যা করে হিন্দীতেই বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তার পর এসে খেতে বসেছিলেন। খেয়ে উঠেছেন মাত্র হঠাৎ কাতর চীৎকার শুনে তিনি চমকে উঠেছিলেন। কি হ'ল? কার কি হ'ল? কোনরকমে হাতমুখ ধুয়ে ছুটে গিয়েছিলেন দেখতে।—কে চীৎকার করছে?

কেষ্ট বলেছিল—আজ্ঞে পঙ্কজবাবু। পঙ্কাবাবু!

—কি হ'ল?

—পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে বলছে।

—পেটে যন্ত্রণা? পেট কেঁপেছে যেন।

ছুটে গিয়েছিলেন তিনি।- কি হ'ল? পঙ্কা বিছানায় শুয়ে পেটে হাত দিয়ে আঃ—আঃ শব্দে চীৎকার করছিল।—কি হ'ল?

কোন রকমে পঙ্কা বলেছিল—দম আটকাচ্ছে। পেট ফুলছে। আঃ—আঃ—আঃ শব্দে ছটফট করে উঠেছিল এর পর আর কিছু বলতে পারে নি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে ডেকেছিলেন। ডাক্তার তরুণ যুবা। সদ্য পাস করে বেরিয়েছে। সে এসে খুব আড়ম্বর সহকারে পরীক্ষা করে বলেছিল—এর কি ক্রনিক কলিক কি অম্বলের অসুখ আছে?

—ছিল। পঙ্কাই বলেছিল—কোবরেজী ওষুধে ভাল হয়েছিল। কোবরেজ বলেছিল—খাবার পর ইয়ে খেতে।

—কি খেতে? তা খাওনি কেন?

—হেডমাষ্টার মশায় কেড়ে নিয়েছেন যে।

—কি? কি কেড়ে নিয়েছেন?

—সব। হুঁকো-কল্কে তামাক টিকে। সব!

ডাক্তার বলেছিলেন—তামাক সেজে আন ত! কেষ্ট!

চন্দ্রবাবু নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে ঘরে গিয়ে রুপো-বাঁধানো হুঁকোটি কেষ্টর হাতে দিয়ে বলেছিলেন—দিয়ে যাও। এবং আধ ঘণ্টা পর আবার কেষ্টকে ডেকে সব ছেলেরই হুঁকো-কল্কে তামাক ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

পঙ্কা ভাত খাবার ঘণ্টা পড়বার আগেই ডাক্তারের কাছে গিয়ে বন্দোবস্ত করে এসেছিল। টাকা কবুল করেছিল, কিন্তু সে টাকা দেয় নি। সেইজন্যেই সতীশের শরণ নিয়েছিল।

অমরবাবু বললেন—পঙ্কা বললে, সতীশ ডাক্তারের কাছে ওষুধ জোগাড় করে দিয়েছিল। বিকেল বেলা গিরীশ সাহার দোকান থেকে ভরিখানেক সিদ্ধি কিনে এনে, শ্যামসাগরের ঘাটে মহাবীর সিংকে বললাম তোমার ঘুটনিতে এটা ঘুটে দেবে সিংজী? অর্দ্ধেক তোমার অর্দ্ধেক আমাদের। মহাবীর সিং খুব খুসী। একদম চন্দনকে তাল বানা দেগা বলে নিয়ে নিলে। বিকেলে পাকা কলা, চিনি, দুধ, রসগোল্লা নিয়ে গেলাম। ফাঁক বুঝে ওর ভাগটায় ওষুদ ঢেলে দিয়ে আমাদের ভাগটা নিয়ে এলাম। সিদ্ধিটা ফেলে দিলাম। আমরা খেলাম অন্য সিদ্ধি। রবিবার, হেডমাষ্টার নাই; পরামর্শ করলাম। ছেলে বাছাই করলাম। তার পর বললাম—দাঁড়া। গিয়ে ডাকলাম এসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে—ড্যাম্পিং গোপালবাবুকে। ও হ'ল, মঙ্গলবাবুদের আপনার লোক! তা ছাড়া ওই রাত্রে দু'তিনবার উঠে ছেলেদের ঘরে ঘরে দরজা ঠেলে দেখে, কান পেতে শোনে কে কি বলছে! হেডমাষ্টারের গুপ্তচর। ওকে চাই। অন্য ছেলেরা বললে—দে ওর ঘরে শেকল তুলে তালা বন্ধ করে! আমি বললাম—ক্ষেপেছিস? দরজা বন্ধ দেখে চেঁচামেচি করে পাড়া জাগাবে। ছেলেরা বললে—তবে? বললাম—দেখ না! কেউ কথা বলবি না। হাসবি না। খবরদার। গিয়ে মাষ্টারের ঘরে ধাক্কা দিয়ে বললাম—স্যার স্যার। মহাবিপদ, উঠুন উঠুন। শিগগির উঠুন। মাষ্টার উঠে বেরিয়ে এল ধড়মড় করে।

পঙ্কা বললে—ওই এসেছেন—গোপালবাবু ওকে জিজ্ঞেস করুন। উনি বলুন তার পর।

হেসে পঙ্কা বললে—কোন ভয় নেই আপনার। মঙ্গলবাবুকে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছি। সেই শ্যামসাগরের পাড়ের কলাগাছ, কলার কাঁদি কাটার কথা। বলুন।

কেরানী নৃত্যগোপালের মুখ শুকিয়ে গেল।

মঙ্গলবাবু বললেন—বল গোপাল, বল!

অমরবাবু বললেন—বল। তোমার ভয় নেই।

নৃত্যগোপাল বললে—আমি ওদের ডাকে বেরিয়ে আসতেই পঙ্কা বললে—থার্ড ক্লাসের ছেলে, বামুনডির কমলকে ভুলোয় নিয়ে গেল। বাইরে উঠেছিল, হঠাৎ যাই—যাই বলে ছুটে বেরিয়ে গেল স্যার! আমি চমকে উঠলাম! ভুলো? নিশি? সর্ব্বনাশ! নিশির ডাকে চলে যাওয়ার কথা

শুনেছি! কি করব? হেডমাষ্টার মশায় নেই। অন্য কোন মাষ্টারও নেই। শনিবারে সব বাড়ী গিয়েছেন! পঙ্কা আমার হাত ধরে বললে—স্যর আসুন। দাঁড়িয়ে ভাববার সময় নেই। আমরা ছুটে যেতাম এতক্ষণ। কিন্তু আপনার পারমিশন না নিয়ে আর কি করি? শিগগির আসুন। আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে ছুটতে লাগল। শ্যামসাগরের পাড়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে বললে—ওই দেখুন। ওই যাচ্ছে গাছের ফাঁকে ফাঁকে। ওই! বলে টানলে। আমি ওদের সঙ্গে গেলাম। শ্যামসাগরের পাড়ের মাঝখানে ঘন কলাগাছের ঝাড়ের কাছে এসে দাঁড়াল। আমি বললাম—কই? পঙ্কা হেসে বললে—শুনুন স্যার, কমল ঘরে ঘুমুচ্ছে। আপনাকে মিথ্যে বলে ডেকে এনেছি। নইলে ত আপনি আসতেন না! ছেলেগুলো খিলখিল করে হেসে উঠল। ভয় হ'ল আমার! এরা কি আমাকে মারবে? পঙ্কা একখানা হাঁসুয়া বের করলে। মনে হ'ল আমাকে কাটবে, কেটে জলে পুঁতে দেবে বোধ হয়! আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বের হ'ল না। পঙ্কা বললে—গিন্নী আমাদের অপমান করেছে। ভয় দেখিয়ে বন্দুক নিয়ে পাহারা বসিয়েছে! আমরা তার শোধ নোব। তুমি মাষ্টার, হেডমাষ্টারের গুপ্তচর, বাবুরা তোমার আপনার লোক, তুমি বোর্ডিঙে আমাদের পাহারাদার। তাই তোমাকে নিয়ে এসেছি আমাদের সঙ্গে। শোন, যদি রাজী থাক ত ভাল, না থাক ত আগে তোমার জিভটি কাটব। তার পর তোমার সামনে এই কলাগাছ কাটব, কলা কাটব, চারাগাছ কাটব। মহাবীর সিং অজ্ঞান। কেউ আসবে না তোমাকে বাঁচাতে।

পঙ্কা হেসে বললে—জিভ আপনার কাটতাম না গোপালবাবু। ভয় দেখিয়েছিলাম। আপনিও ভয় পেয়ে গেলেন।

নৃত্যগোপাল বললে—হ্যাঁ ভয় পেলাম আমি। আমি সত্যি বিশ্বাস করলাম—ওরা আমার জিভ কেটে নেবে। আমি বললাম—তোমরা কাট, আমি চীৎকার করব না। কাউকে বলব না! যে দিব্যি করতে বলবে তাই করছি আমি। পঙ্কা বললে—দিব্যি ফিব্যি নয় স্যার। আমি ডাঙ্গাপাড়ার চক্কত্তিদের ছেলে। আমার বাবা দাদা আদালতে তামা-তুলসী ছুঁয়ে মিছে এজাহার জবানবন্দী করে আসে। শালগেরামের পুজো করতে করতে মিথ্যে মামলার ফন্দি আঁটে। আমি দিনে দশ-বিশবার কালী-দুর্গা-নারায়ণের নাম নিয়ে মিছে দিব্যি করি; কিছুছু হয় না আমার! দিব্যি নয়, আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে, গাছ কাটতে হবে। এখন শুনুন, হয় আপনি এই হাঁসুয়া নেন, আমার কাঁধে চাপুন, চেপে কলার কাঁদিগুলো কাটুন। নয় আসুন আমি আপনার কাঁধে চাপি চেপে কলা কাটি! এরা কুড়িয়ে জমা করুক। আমি—।

নৃত্যগোপাল চুপ করে গেল। মাথা নিচু করে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে রইল।

পঙ্কার হাসি অনির্ব্বাণ। হা-হা করে হেসে উঠল, বললে—লজ্জা পেলেন মাষ্টার। আমি বলে দি' তা হলে। আমাকে কাঁধে নেওয়ার চেয়ে আমার কাঁধে চাপতেই মনস্থ করলেন। আমি একখানা গামছা দিয়ে বললাম—কাপড় ছাড়ুন স্যার, নইলে কলার রস কাপড়ে লাগলে সাত ধোপেও উঠবে না। মাষ্টারকে গামছা পরিয়ে কাঁধে করে তুললাম। মাষ্টার কলার কাঁদি কাটলেন। পঁচিশ কাঁদি কলা, কুড়ি-বাইশটা মোচা; সে রাশীকৃত। কতক দিয়ে এলাম সতীশকে। তার ঘরের উঠোনে পুতে রাখলাম। কতক দিয়ে এলাম সেকেণ্ড মাষ্টারকে। পাকা কলা উনি খেতে খুব ভালবাসেন। মাষ্টার কলা পেয়ে ভারী খুশী!

অমরবাবু বললেন—শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম চন্দ্রবাবু। মৃগাঙ্কবাবু জেনে শুনে খুশী হয়ে নিয়েছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম পঙ্কাকে। সেই রাত্রেই দিয়ে এসেছিলে?

—সেই রাত্রেই বৈ কি। সকালবেলা হৈ চৈ হবে। গিন্নীমা জরুর আসবেন খানাতল্লাস করতে। আটটা বাজতে না বাজতে হেডমাষ্টার আসবেন! রাত্রেই না সামলালে সময় কোথায়?

অমরবাবু বললেন—এত রাত্রে এত কলা মোচা নিয়ে গেলে সেকেণ্ডমাষ্টার কিছু বললেন না?

—ওরে বাপরে! এত বড় পণ্ডিতের চোখে ধুলো দেওয়া যায় বাবু? আমরা ডাকতেই জানলা খুলে দেখলেন—ওঁর ত চোর-ডাকাতের ভয়ঙ্কর ভয়; তাই নেমে এসে কলার কাঁদিগুলো দেখে মুচকি হেসে দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন—বন্দুকধারী পাহারাওলার চোখে ধুলো দিয়ে কাটলি কি করে রে? এ্যা? তার পর ইংরিজীতে বললেন—কি বললেন মনে নাই, ইংরিজীতে ত মহাপণ্ডিত আমি, তবে মানেটা শুধিয়েছিলাম গোপালবাবুকে আসবার পথে, গোপালবাবু বললেন—যুদ্ধে যারা গুপ্তচর হয়ে শত্রুপক্ষের তাঁবুতে গিয়ে তাদের জল নষ্ট করে, রসদ নষ্ট করে, তোরা তাদের সমান বাহাদুর! তার পর বললেন—দে—তা হলে উঠোনে গর্ত্ত করে পুতে দে। গোলমাল ত হবেই। মিটুক—তার পর তুলে খাওয়া যাবে।

অমরবাবু বললেন—চন্দ্রবাবু, এ ঘটনা আজ দু'বছর আগের। আমি মঙ্গলকে বারণ করেছিলাম, মঙ্গল যেন

...ঙ্কবাবুর সম্পর্কে কোন কথা না বলে। এবং সেই দিন ...কেই আমি মৃগাঙ্কবাবুকে বিদায় দেবার কথা ভাবছি। এর ... হঠাৎ একদিন মঙ্গলের মেজ ভাগ্নের একখানা ইংরিজী ...ক্ষার খাতা আমার হাতে পড়ল। আপনি জানেন, ...লেটির জন্যে আমার আগ্রহ আছে। আমার ছোট মেয়ের ...ঙ্গ বিয়ে দেবার কথা ভাবি। শুনলাম ফার্স্ট হয়েছে,— ...তা দেখেছেন আপনি, নম্বর দেখলাম পঞ্চান্ন—তার সঙ্গে ...নারেল গ্রেস দেখলাম আট নম্বর। পড়ে দেখলাম খাতা ...আপনি কড়া ভাবে আদৌ দেখেন নি। এবং ক্লাসের ফার্স্ট ...লের খাতা দেখে হতাশ হলাম। ওকে ডেকে প্রশ্ন ...লাম, দেখলাম, ইংরিজীতে সত্যই কাঁচা। জিজ্ঞাসা ...লাম—কেন? ছেলেটি বললে—ক্লাসে ভাল পড়া হয় না। ...বশী ছেলে ফেল হয় হেডমাষ্টারের হাতে, তাই শেষ গ্রেস ...দন হেডমাষ্টার। বললে—ক্লাসে সেকেণ্ডমাষ্টার ইংরিজী ...ড়ান, উনি ওই একবার রিডিং পড়ে মানে করে দেন, ...বস্ট্যান্স শিখিয়ে দেন। পড়া ধরেন না। তার পর শুধু ...ল্প করেন। উনি ক্লাসে ঢুকেই ক্লাসের দরজায় খিল দিয়ে ...দেন। আধ ঘণ্টা পড়িয়ে বাকী সময়টা গল্প করেন, মাংস ...ওয়ার গল্প বেশী করেন, আর করেন তর্ক। ওঁর সঙ্গে তর্ক ...ক করবে? উনিই তর্ক করেন—ঈশ্বর মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, ...চার্ব্বাক দর্শন নিয়ে অনর্গল বকে যান থার্ড ফোর্থ ক্লাসের ...ছেলেদের কাছে। আমি মনে করি চন্দ্রবাবু, এ সব আপনি ...জানেন। আমি শুনেছি এ বিষয়ে আকারে-ইঙ্গিতে ওঁকে ...সাবধানও বহুবার করেছেন। আমি যদি বলি—এ পর্য্যন্ত আপনার ইস্কুল থেকে স্কলারশিপ না পাওয়ার এটা একটা ...বড় কারণ; ফোর্থ থার্ড ক্লাস থেকে ইংরিজীতে কাঁচা ছেলে-...দের আপনি দু'বছরে মনের মত করে, স্কলারশিপের যোগ্য ...করে তৈরি করতে পারেন না।

অমরবাবু চুপ করলেন। চন্দ্রবাবু মাথা নীচু করে বসে ...রইলেন। কি বলবেন? কিছু বলবার খুঁজে পাচ্ছেন না ...তিনি। অমরবাবুর অভিযোগের উত্তর নাই। শুধু মনে ...পড়ছে মৃগাঙ্কবাবুর সুন্দর মুখখানি। সুপুরুষ মানুষ; অনেক ...পাণ্ডিত্য; কি কোথায় কি নাই, অথবা কবে কি করে এই ...সুন্দর মানুষটির কর্ম্মের মধ্যে কোন এক কীট প্রবেশ করেছে, ...তার সমস্ত কিছুকে অন্তঃসারশূন্য করে দিয়েছে।

অমরবাবু উত্তরের প্রতীক্ষা করে উত্তর না পেয়ে চন্দ্র-...বাবুকে ডেকে সচেতন করে দিলেন—চন্দ্রবাবু!

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চন্দ্রবাবু বললেন—...আমার আর বলবার কিছু নেই অমরবাবু।

—আই নিউ ইট। আমি জানতাম—আপনাকে শেষ ...পর্য্যন্ত এই কথাই বলতে হবে। কারণ এ ইস্কুল ত আপনার চাকরীর ক্ষেত্র নয়। সাধারণ কর্ম্মের ক্ষেত্রও নয়; সাধনার কর্ম্মক্ষেত্র। এ ত আমার চেয়ে কেউ বেশী জানে না। তাই জেনেই আমি চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশনকে নতুন করে গড়ে তুলবার জন্য স্কীম করেছি। আপনাকে জানাই নি। যতক্ষণ গবর্ণ-মেন্টের ঘরে গ্র্যান্ট ইন-এড বাড়াতে না পেরেছি—ততক্ষণ জানাতে ভরসা পাইনি। চৈতন্যবাবু নেই, মঙ্গল ত নির্দ্দিষ্ট টাকার বেশী এক পয়সা দেবে না।

চন্দ্রবাবু মৃদু স্বরে বললেন—রতনবাবুর সম্পর্কে কিছু বলবার আছে। এমন সৎ সাধু মানুষ!

—আই এ্যাডমিট। কিন্তু ও সম্পর্কে আপনাকে অনুরোধ করব আপনি কিছু বলবেন না। আপনি জানেন না, আমি জেনেছি, রতনবাবু রাজদ্রোহীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন।

—বলেন কি? চমকে উঠলেন চন্দ্রবাবু।

—রতনবাবুর বিরুদ্ধে আমার ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ থাকতে পারে না চন্দ্রবাবু।

—কিন্তু আপনার জানার মধ্যে ভুল থাকতে পারে অমর-বাবু।

—না চন্দ্রবাবু, ভুল নেই। অবশ্য তাঁর সম্পর্ক গভীর নয় কিন্তু সম্পর্ক আছে। আমার সঙ্গে এক সময়ে সম্পর্ক ছিল, তাই আমার জানা নির্ভুল। চন্দ্রবাবু, এতটা যোগ আপনার সঙ্গেও ছিল না। রতনবাবুর আগে জিতেনবাবু থার্ড মাষ্টার ছিলেন উগ্র স্বদেশী। এখানে তিনি বিলিতী কাপড় পুড়িয়েছিলেন। আপনি আমাকে চিঠি লিখেছিলেন। আপনারা তাঁকে সাবধান করুন, উগ্র বক্তৃতায় ছেলেদের উত্তেজিত করে ফল কি হবে? ইস্কুলকে রাজরোষে পড়তে হবে। ছেলেদের লেখাপড়ায় অমনোযোগ আসবে। আমি ছাত্রদের এবং জনসাধারণের সেন্টিমেণ্টের বিরুদ্ধে তাঁকে শক্ত করে কিছু বলতে পারছি না। আপনার মনে আছে আমি লিখেছিলাম ডোণ্ট উয়োরি; বুকের ঝড় আর মুখের ঝড়ে তফাৎ আছে। মুখ ক্লান্ত হলেই থামবেন। বুকের ঝড় মানুষকে ক্লান্তির মধ্যেও ঘুমুতে দেয় না। আমি অবশ্য জিতেনবাবুকে লিখেছিলাম এবং তিনি সাবধানও হয়ে-ছিলেন। রতনবাবুর ঝড় বুকের ঝড় চন্দ্রবাবু। আমাদের সে দল অনেক দিন ভেঙে গেছে। আমি ও পথের ব্যর্থতা দেখে পথ পরিবর্ত্তন করেছি। আমার ধারণা ছিল রতনবাবুও পথ পালটেছেন। মাসকয়েক আগে বাঙালী রেজিমেণ্টে রিক্রুটমেণ্টের জন্যে যখন এখানে সভা হ'ল, আমি এলাম। রতনবাবু আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আমাদের দলের সাংকেতিক শব্দটি উচ্চারণ করলেন। আমি চমকে উঠলাম; পিছন ফিরে তাকাতেই রতনবাবু বললেন—'আপনি আসবেন এ

আমি ভাবিই নি স্যার। পৃথিবীতে কিছুই আশ্চর্য্য নয়। একেই বলে 'ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিক্‌শন।' হি হ্যাজ নট চেঞ্জড। এ্যাণ্ড এ স্টর্ম ইজ এ্যাহেড চন্দ্রবাবু! দে উইল ট্রাই, জীবনমরণ পণ করে চেষ্টা করবে। আপনি রডা আর্মস লুটের কথা জানেন, বালাসোরে বাঙালীর ছেলের ট্রেঞ্চ ফাইটের কথা শুনেছেন। এর চেয়েও বড় এ্যাটেম্‌ট' হবে। আমি কলকাতায় হাই পুলিস অফিসিয়ালের কাছে শুনেছি। আরও শুনেছি একজন বড় রেভুলুশনারী এ্যাবস্কণ্ড করে এই অঞ্চলে এসেছিল, কোথাও ছিল কয়েকদিন। বোলপুর পর্য্যন্ত পুলিস ট্রেস করেছে। তার পর আর পায় নি। তাদের ধারণা শান্তিনিকেতন ওয়াজ দি প্লেস। কিন্তু আমি জানি —আই এ্যাম সিওর—হি পাসড থ্রু শান্তিনিকেতন অন হিজ ওয়ে টু রতনবাবুজ হোম।

অবাক হয়ে গিয়েছিলেন চন্দ্রবাবু।

রতনবাবু, শান্ত মিষ্টভাষী আধপাগলা রতনবাবুর পরিচয় এই! গভীর অন্ধকার রাত্রে দুর্গম পথের প্রবেশ মুখে মশাল উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে যে উদাসী, সে উদাসী রতনবাবু! বিপ্লবীদের কথা হলে চন্দ্রবাবু তাদের কর্ম্মপন্থার তীব্র সমালোচনা করেন। ইতিহাস মনে পড়ে যায় তাঁর—ভূগোল মনে পড়ে, মানচিত্র ভেসে ওঠে চোখের সম্মুখে। টেমস নদীর খাত বেয়ে ক্ষুদ্র একটা দ্বীপের বিস্ময়কর শক্তি এসে পড়ছে ইংলিশ চ্যানেলে। তার রক্ত লাল। লাল হয়ে গেল সমুদ্রের নীল জল। সাত সমুদ্র! 'রুল ব্রিটানিয়া, ব্রিটানিয়া রুলস দি ওয়েভস।' ব্যাটল অব ট্রাফালগার, ব্যাটল অব ওয়াটারলু! বিশ্ববিজয়ী নেপোলিয়ঁ—সেই লাল ঢেউয়ের ধাক্কায় বিরাট ঐরাবতের মত ভেসে গিয়ে আছাড় খেয়ে ক্ষুদ্র সিসিলি দ্বীপের বালুকা সৈকতে গড়িয়ে পড়ল নিষ্প্রাণের মত। তার ধাক্কায় দক্ষিণ ভারতে মঁসিয়ে ডুপ্লে, কাউন্ট লালী কোথায় ভেসে গেল। গঙ্গার মোহানা বেয়ে সে ঢেউ এসে পলাশীতে ভাসিয়ে দিল মুঘল নবাবী আমল। মীরকাশেম ভেসে গেল। বক্সারে গিয়ে সে আঘাত করলে মুঘল সাম্রাজ্যের মাঝবুকে। নবাব অব আউধ। টিপু সুলতান টাইগার অব ইণ্ডিয়া! রণজিৎ সিংহ। এক চক্ষু শিখবীর ঠিক দেখেছিল সব লাল হো যায়ে গা! এত বড় মিউটিনি, বুদ্‌বুদের মত লাল শক্তির অতলান্তিক গভীরতার মধ্যে কোথায় ফেটে মিলিয়ে গেল। ওঃ, দিল্লীর রাজপথে সম্রাট বাহাদুর শাহের ছেলেদের রক্ত মিশছে ধুলোর সঙ্গে। ভয়ে আতঙ্কে তাঁর সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তিনি তারস্বরে বলেন—'নোঁ-নো-নো! দিস ইজ ম্যাডনেস। দিস ইজ ম্যাডনেস। দিস ইজ ম্যাডনেস।' ও পথ নয়। ভুল। ভুল। ভুল!

প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে যান তিনি। শেষ পর্য্যন্ত বলেন—ও কথা আমার ইস্কুলের সীমানায় নয়। প্লিজ। প্লিজ! কিন্তু তার পর যখন একা হন তখন উদাস মনে তাকিয়ে থাকেন সামনের অন্ধকারের দিকে। ভাবেন এই সব উন্মাদদের কথা। তখন ওই ছবিটা ভেসে ওঠে। দূরে বহুদূরে গাঢ় গভীর অন্ধকারের মধ্যে কে যেন উর্দ্ধবাহু হয়ে মশাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দুটিও তার উর্দ্ধে ওই মশালের শিখার দিকে নিবদ্ধ! মাথায়-কপালে উর্দ্ধদৃষ্টি নিষ্পলক চোখে লাল ছটা পড়েছে। মাথায় বিশৃঙ্খল বড় বড় চুল বাতাসে উড়ছে। নিচের দিকটা অস্পষ্ট। মশালধরা হাতের মুঠির ছায়া পড়েছে সেখানে। সে মূর্ত্তি রতনবাবুর?

অমরবাবু আবার বললেন—উই মাষ্ট সেভ আওয়ার ইনষ্টিট্যুশন। ওরা উন্মাদ। আপনি মনে করুন আমরা দু'জনে এই স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় কি সঙ্কল্প করেছিলাম। আলো জ্বালতে হবে। দেশজোড়া কুসংস্কার বিকৃতি আর মূর্খতার কৃষ্ণপক্ষের মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকারকে কাটিয়ে জ্ঞানের সূর্য্যকে ওঠাতে হবে। আপনি সুবর্ণবাবুর ভাঙাভাঙা মাইনর ইস্কুলে হেডমাস্টারি করেন আর স্বপ্ন দেখেন। আমি চৈতন্যবাবুর চ্যারিটি বয় আগ্রায় প্রফেসারি করি আর স্বপ্ন দেখি। চৈতন্যবাবুর টাকা ছিল—কতবার বলেছি মেসোমশাই একটা হাই-ইস্কুল করুন। তিনি বলতেন—ইচ্ছে আছে অমর, কিন্তু, কিন্তু সুবর্ণের বাপের নামের ইস্কুলটা যে উঠে যাবে! অন্যের কীর্ত্তি লোপ করে কীর্ত্তি করব? তারপর এল সুযোগ। ম্যাজিস্ট্রেট বললেন তাঁকে ইস্কুল করতে। আপনি মাইনর ইস্কুলের চাকরী ছাড়লেন, আমি প্রফেসারি ছেড়ে এলাম। দু'জনে একসঙ্গে খেটে ইস্কুল করেছি। সে ইস্কুলকে আমি বিপন্ন করতে পারব না!

চন্দ্রবাবু বললেন—আমি আমার আপত্তি উইদ্‌ড্র করছি অমরবাবু।

অমরবাবু ঘরের মধ্যে পায়চারি সুরু করলেন, বোধ করি একটা গতির আবেগ তাঁর অন্তরের মধ্যে বয়লারের বাষ্পশক্তির মত তাঁকে তাঁর অভিপ্রেত পথে সামনের দিকে ঠেলছিল; চন্দ্রবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—আই অ্যাম গ্ল্যাড। আর আমার কোন সংকোচ নেই। বহু চেষ্টা করে এ সুযোগ পেয়েছি। চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশনকে আমি ফার্স্ট ক্লাস ইনষ্টিট্যুশন হিসেবে দেখতে চাই। নিউ আইডিয়া নিউ আইডিয়াল; নতুন একটা জেনারেশন গড়তে হবে। নতুন শিক্ষক চাই। ইউ উইল হ্যাভ দেম। আপনার এ্যানুয়েল রিপোর্টের আরম্ভের প্যাসেজটি আমার ভারী ভাল লাগে। হোয়ার ওয়াজ ডার্কনেস। ডার্কনেস এভরিহোয়ার। ডার্কনেস অব ইগনোরেন্স, ডার্কনেস অব সুপারিষ্টিশনস। পিউপলস হার্ট ক্রায়েড ফর লাইট। দেন কেম এ ম্যান, এ

পর্তুগীজ সৈন্যদের গুলিবর্ষণের সম্মুখে সত্যাগ্রহীবৃন্দ
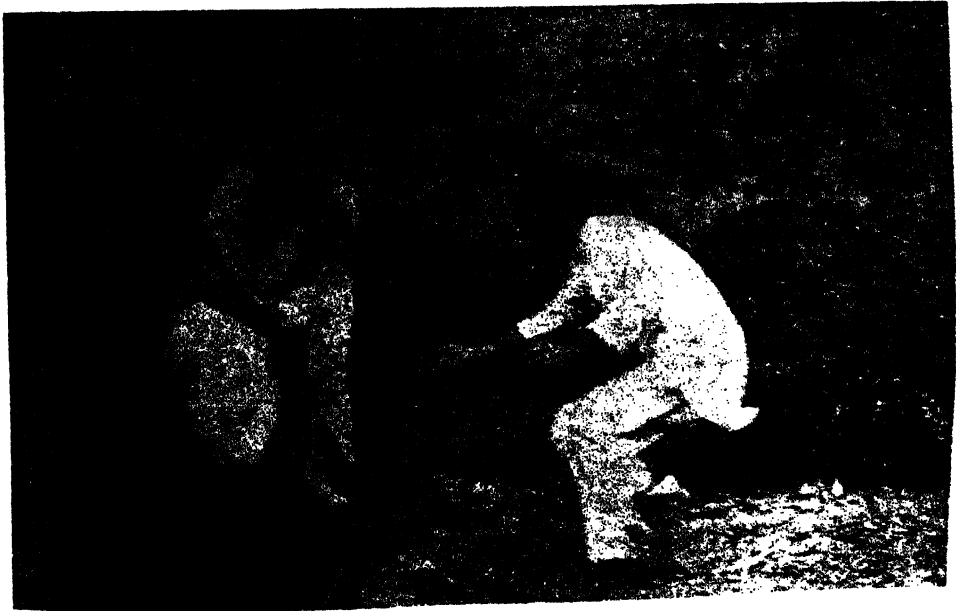
মার্কিন সাংবাদিক আর্থার বোনার কর্তৃক, পর্তুগীজ সৈন্যের গুলিতে নিহত
জনৈক সত্যাগ্রহীর মৃতদেহ ভারতের সীমানায় আনয়ন

ড. শ্রীভগবান দাস

শ্রীএম বিশ্বেশ্বরাইয়া

(ভারতরত্ন উপাধিপ্রাপ্ত)
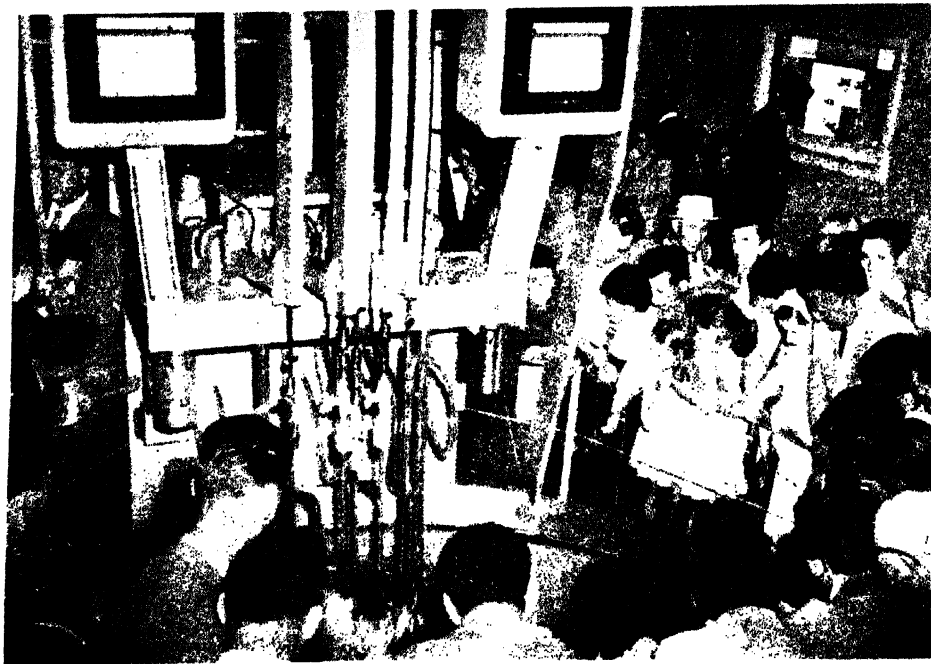
জেনেভায় রাষ্ট্রপুঞ্জের সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "এটমিক এনার্জি কমিশন" প্রদর্শিত "সুইমিং পুল রিএক্টর"

এ গডসেণ্ট ম্যান···হি কেম উইথ এ টর্চ ইন হ্যাণ্ড। চৈতন্যবাবু সেই মশাল সত্য বলতে আপনার হাতে দিয়ে গেছেন। মশালে ছাই জমেছে। ঝেড়ে ফেলতে দ্বিধা করলে চলবে না চন্দ্রবাবু! আপনার সঙ্গীদের মধ্যে যার হাতে জোগানের তেল ফুরিয়েছে, যার হাতের তেলে ভেজাল মিশেছে, যে সমান তালে চলতে অক্ষম, তাদের মমতাও ছাড়তে হবে। ইউ মাস্ট!

চন্দ্রবাবু একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন···আই হ্যাভ শেকেন ইট অফ। ঝেড়ে ফেলেছি অমরবাবু। যা করবেন আপনি আমি অমত করব না। তবে বিমর্ষ দেখলে তিরস্কার করবেন না। আজ প্রায় একযুগ দশ বছর একসঙ্গে কাজ করছি। দুঃখ পাব। সহ্য করতে সময় লাগবে। নমস্কার।

প্রতিনমস্কারের প্রতীক্ষা তিনি করলেন না, বেরিয়ে এলেন।

ক্রমশঃ

আমরা ও তাহারা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

বিভিন্ন স্তরের (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ) শিক্ষাপ্রণালী, শিক্ষা-নিকেতন, পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতি সম্বন্ধে বহুদিন হইতেই বহু জল্পনা-কল্পনা, পরিকল্পনা প্রভৃতি হইতেছে। বহু কমিটি, কমিশন বসিতেছে। জল্পনা-কল্পনা, পরিকল্পনারও অন্ত নাই, কমিটি কমিশনেরও শেষ নাই; টাকাও জলের মত খরচ হয়, কিন্তু বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা সম্বন্ধে দেশের প্রয়োজন অনুসারে চূড়ান্ত পরিকল্পনা আজ পর্য্যন্ত হইল না; আরও দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, বিভিন্ন বিভাগ বিভিন্ন রকমের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন, কাহারও সহিত কাহারও তেমন সম্বন্ধ নাই; প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রধান। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যাঁহারা দেশের কর্ণধার, যাঁহাদের কথায় দেশের সর্ব্ব বিধিব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইতেছে, পুরাতন বিধিব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন রাতারাতি সাধিত হইতেছে—তাঁহারাও এই বিষয়ে একমত নহেন। কেহ বলেন, এই হওয়া উচিত, কেহ বলেন ঐ হওয়া উচিত। সুতরাং আমরা অতি সাধারণ লোক, আমরা আর কি বলিব, আর আমাদের কথা শুনিবেই বা কে? তবে আমরা চোখের সামনে দেখিতেছি—যেমন সব ব্যাপারে হইতেছে, শিক্ষা ব্যাপারেও টাকা লইয়া 'ছিনিমিনি' খেলা চলিতেছে, টাকার "হরির লুঠ" চলিতেছে, যে "আঙিনা"র মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, 'হরির লুঠে'র কিছু-না-কিছু অংশ পায়, তাহাকে একেবারে রিক্ত হস্তে ফিরিতে হয় না, কিন্তু সাধারণের পক্ষে "আঙিনা"য় প্রবেশ করা খুবই কঠিন। এতক্ষণ হয়ত "আবোল তাবোল" বলিলাম—এখন দুই-একটা স্পষ্ট কথা বলিতেছি।

শিক্ষা-নিকেতন কিরূপ হইবে, ছাত্রাবাস কিরূপ হইবে, শিক্ষা-নিকেতনের ঘরবাড়ী, জানলা-দরজা, আসবাবপত্র, সাজ-সরঞ্জাম, পায়খানা, খেলার মাঠ প্রভৃতি কিরূপ হইবে, এমন কি প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর বসিবার জন্য কয় বর্গফুট জায়গার দরকার, প্রত্যেক শ্রেণীতে কয় জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করিতে পারিবে, কত জন ছাত্রছাত্রীর জন্য কত জন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যক, লাইব্রেরী বিজ্ঞান-ঘর কিরূপ হইবে, লাইব্রেরীতে কি ধরনের কত পুস্তক থাকিবে, বিজ্ঞান-ঘরে কি কি যন্ত্র থাকিবে, বিদ্যালয়ের তহবিল কত হওয়া দরকার ইত্যাদির জন্য বিধিব্যবস্থা আছে। ইহার উপর পুস্তক-পুস্তিকার বোঝা কেবল ছাত্রছাত্রীদের বহন করিতে হয় না, তাহাদের অভিভাবকদেরও বহন করিতে হয়।

কিন্তু এই সব ব্যবস্থা যাহাদের জন্য হইবে তাহাদের বিষয় কেহ চিন্তা করেন না। অর্থাৎ, ছাত্রছাত্রীরা প্রধানতঃ কিরূপ সম্প্রদায় হইতে আসিতেছে, তাহাদের অভিভাবকদের সামাজিক এবং আর্থিক অবস্থা কিরূপ, তাহাদের খাদ্য-তালিকা কিরূপ, ঘরবাড়ী এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা কিরূপ, সর্ব্বোপরি স্বাস্থ্য এবং দৈহিক ও মানসিক শক্তি কিরূপ, তাহারা রোগমুক্ত কিনা, তাহাদের জীবনীশক্তি কিরূপ—এই সব বিষয় কেহই চিন্তা করেন না; সর্ব্বসম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রকার ছাত্রছাত্রীর জন্য একই ব্যবস্থা। এই কারণে

কালিফর্নিয়ায় লস্ এঞ্জেলসে 'পেরেণ্ট টিচার্স এসোসিয়েশন' উপলব্ধি করিলেন :

It is not enough simply to provide first-rate Schools for their children. It is equally necessary to provide first-rate children for the Schools.

অর্থাৎ, উন্নত ধরনের বিদ্যালয় স্থাপনই যথেষ্ট নহে, উন্নত ধরনের অর্থাৎ পরিপুষ্ট ছাত্রছাত্রীরও সমান প্রয়োজন। যে সকল সমস্যা আমেরিকার প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সম্মুখীন, সেই সকল সমস্যার কি ভাবে সমাধান হইতে পারে—তাঁহারা চিন্তা করিতে লাগিলেন। যাঁহাদের আর্থিক অবস্থা অনুন্নত তাঁহাদের পুত্রকন্যাদের (ছাত্রছাত্রীদের) দৈহিক ও মানসিক শক্তির কি ভাবে উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে? এই সকল সম্প্রদায়ের যে সব ছাত্রছাত্রী সদাসর্ব্বদা সর্দ্দি-কাশিতে ভুগিতেছে, যাহাদের চোখ কুঁচকাইয়া বোর্ডের বড় বড় লেখা দেখিতে হয়, যাহাদের দাঁতের যত্নের দরকার, অভিভাবকগণের আর্থিক অবস্থা এত বেশী অসচ্ছল যে তাহাদের পক্ষে রোগমুক্ত হওয়া একেবারেই সম্ভব নয়। অতএব উন্নত ধরনের বিদ্যালয়ে উন্নত ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করার শক্তি ইহাদের থাকিতে পারে না। এই সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে ,পেরেণ্ট টিচার্স এসোসিয়েশন' ৭,০০,০০০ ডলার অর্থাৎ মোটামুটি প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া "ছাত্র-ছাত্রী স্বাস্থ্যকেন্দ্র" স্থাপন করিলেন। সরকারের তহবিল হইতে তাঁহারা অর্থ গ্রহণ করেন নাই, ছোট ছোট খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতির আয়োজন করিয়া অল্প অল্প পরিমাণে তাঁহারা এই অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মুখে বলেন না, কাজে দেখান যে, যেখানে প্রবল আগ্রহ ও ইচ্ছা আছে, সেখানে উপায়ও আছে।

এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উৎপত্তি ও উন্নতি আশ্চর্য্যজনক। ১৯০৫ সনে কেবলমাত্র একটি 'বেড'স্থাপন করা হয় এবং ইহা লস্ এঞ্জেলসের শিশু-হাসপাতালের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ক্রমশঃ ইহার বিস্তৃতি ঘটে, এবং ইহার কার্য্যকারিতা জনসাধারণ বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেন। ১৯৪৫ সনে পেরেণ্ট টিচার্স এসোসিয়েশন স্থির করেন যে, কিছু করা বিশেষ দরকার, এবং যাহা করা হইবে তাহা বড় আকারেই করিতে হইবে। বর্ত্তমানে ইহার সভ্যসংখ্যা ২,৩১,৪১৯। ১৯৫১ সনে ৬০,০০০ বর্গফুট হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে। হাসপাতালের অভ্যন্তর অতি মনোরম এবং মনে হয় যেন চির-প্রফুল্লতা বিরাজ করিতেছে। দক্ষতাই হাসপাতালের বৈশিষ্ট্য, হাসপাতালে বিভিন্ন বিভাগ আছে, যেমন—শিশুদেহের বিকৃতি দূরীকরণ বিভাগ, বক্ষ বিভাগ, চক্ষু বিভাগ, দন্ত বিভাগ, চর্ম্ম বিভাগ, কর্ণ বিভাগ ইত্যাদি। ইহা ছাড়া বিশেষ বিশেষ বিভাগ আছে—ছাত্র ছাত্রীদের প্রকৃতি বিচার ও উহার সংশোধন, আবেগ দমন বিভাগ ইত্যাদি। প্রত্যেক বিভাগেই বিশেষজ্ঞগণ এবং তাঁহাদের সহকর্ম্মিগণ হাস্যমুখে অতি দরদের সহিত ছাত্র ছাত্রীদের যাবতীয় রোগের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, ইঁহারা বলেন :

It really does something for your Spiritually.

অর্থাৎ, ইহা পারমার্থিক কাজ।

আমাদের দেশে ছাত্র-ছাত্রীদের দৈহিক ও মানসিক উন্নতিবিধানের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা আছে, জানি না। তবে শুনিয়াছি এবং জানি বিধান অনুসারে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিতে একজন চিকিৎসককে লইতেই হইবে। উদ্দেশ্য কি জানি না, ম্যানেজিং কমিটিতে একজন চিকিৎসক থাকিলে যদি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণের দৈহিক ও মানসিক উন্নতিবিধানের কিছু সুযোগ-সুবিধা হয়, তাহা হইলে ইহার সার্থকতা আছে, কিন্তু অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি সে সুযোগ-সুবিধা হওয়া দূরে থাকুক, পসারব্যস্ত চিকিৎসক মহাশয় ম্যানেজিং কমিটির সভাতেও প্রায় আসেন না, এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সহিত তাঁহার কোন পরিচয়ই থাকে না। আরও শুনিয়াছি যে, কলিকাতার কোন কোন বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যপরীক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং পরীক্ষার অভিভাবকদের নিকট চিকিৎসকের অভিমত পাঠানো হয়, ইহার ফল যে কি হয় তাহাও জানি। আরও শুনিয়াছি, কোন কোন বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জলখাবারের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তাহা যাচাই করিয়া দেখিলে মনে হইবে চোখে ধুলা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নহে।

দেশ এখন স্বাধীন হইয়াছে, অনেক জটিল সমস্যাই দেখা দিয়াছে, কিন্তু ভবিষ্যৎ নাগরিক সৃষ্টির সমস্যাও এক প্রধান সমস্যা। এই সমস্যা অবহেলা করিলে স্বাধীনতা বেশী দিন টিকিবে না, টিকিতে পারে না। প্রত্যেক অঞ্চলে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য 'ক্লিনিক' খোলা একান্ত আবশ্যক, কেবল ক্লিনিক খুলিলেই কর্ত্তব্যের শেষ হইবে না, ক্লিনিকে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষার পর তাহাদের উপযুক্ত চিকিৎসা ও উপযুক্ত পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অবশ্য যে সকল অভিভাবকের সঙ্গতি আছে তাঁহাদিগকে চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে হইবে।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী মহোদয় একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, তাঁহাকে এই বিষয়টি বিবেচনা করিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি।

পার্শী বিবাহ ও লোকগীতি

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

পার্শী বান্ধবীর মেয়ের বিয়ে এ খবরে খুব খুশী হয়ে উঠলাম। যাক্ পার্শী বিয়েটাও এবার অন্ততঃ হলে দেখবার সুযোগ হবে। কিন্তু বান্ধবী বললেন, তিনি তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে বোম্বে যাচ্ছেন। কারণ তাঁর সমস্ত আত্মীয়স্বজন বোম্বে শহরের বাসিন্দা। কন্যার বিবাহ দিয়ে বান্ধবী ও তাঁর স্বামী ফিরে এসে শহরস্থ বন্ধুবান্ধবদের বিয়ের ভোজ দিলেন ও বিশিষ্ট নিমন্ত্রিতদের সহিত নববিবাহিতা কন্যা ও জামাতার পরিচয় করে দিতে লাগলেন।

পার্শী বিবাহ ও লোকগীতি সম্বন্ধে আমার অত্যন্ত কৌতূহল ছিল, তাই এক দিন বান্ধবীকে নিজ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে এনে তাঁর কন্যার বিয়ের খুঁটিনাটি বিবরণ ও গান জানতে চাইলাম। তিনি আনন্দের সহিত তাঁদের বিয়ের করণকারণ ও স্ত্রী-আচারের বিশদ বিবরণ দিয়ে গেলেন, সে সব আমি নীচে লিপিবদ্ধ করলাম। আধুনিকা বান্ধবী বিয়ের গানগুলির শুধু দু'এক লাইন বলতে পারলেন। তখন তাঁর আমী বড়বাবর বৃদ্ধা মাতার নিকট থেকে আমি গানগুলি সংগ্রহ করে আনি। পার্শীরা একটু বেশী মাত্রায় পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হলেও তাদের বিয়েতে একটা বৈশিষ্ট্য দেখতে পেলাম। পার্শী নারীরা কখনও কপালে কুঙ্কুম ফোঁটা বা সিঁথিতে সিঁদুর দেয় না, কিন্তু বিয়ের সময় কনের কপালে কুঙ্কুম ফোঁটা দেওয়া বিয়ের রীতির অন্তর্ভুক্ত। পার্শীদের ভাষা গুজরাটী, তবে তাতে অনেক ফার্সী শব্দ মিশ্রিত হওয়াতে সে ভাষা সাধারণ গুজরাটী থেকে কিছু বিভিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু বিয়ের করণ-কারণে দু'জাতিরই কতক সাদৃশ্য আছে।

সেকালে পার্শীদের মধ্যেও বেশীমাত্রায় পণপ্রথা ছিল। পিতা-মাতা সন্তানের বিয়ে স্থির করতেন ও খুব জাঁকজমক করে বিয়ে দিতেন। আধুনিক যুগে বর-কনে নিজের পছন্দ অনুযায়ী বিয়ে স্থির করে ও প্রেমে পড়ে বিয়ে হয়। সে কারণে সমাজ থেকে ধীরে ধীরে পণপ্রথা দূর হয়ে গেছে।

শুভ বিবাহের চারদিন আগে "বাগদান" উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের দিনে বরের মা কনের জন্য তিন জোড়া রেশমী পোশাকের সেট, একটি সোনার আংটি ও নগদ ৫১৲ টাকা নিয়ে আসে। কনের শাড়ী ব্লাউস, বডিস, পেটিকোট সমস্তই সেলাই করে আনতে হয়। কনেকে একখানা নতুন পিঁড়ির উপর দাঁড় করায়। পিঁড়িটি অখণ্ড কাঠের তৈরি হতে হবে এবং তাতে কোন লোহা পেরেক ইত্যাদি থাকতে পারবে না। কনে সেই পিঁড়িতে দাঁড়ালে তার কপালে বরের মা কুঙ্কুম ফোঁটা দেয়, গলায় ফুলের হার পরায় এবং হাতে নারকেল দিয়ে সেই সমস্ত রেশমী পোশাক ও নগদ ৫১৲ টাকা দেয়। তখন কনে ভিতরে গিয়ে ভাবী শাশুড়ীর দেওয়া পোশাকে সুসজ্জিতা হয়ে আসে। বরের মা কনেকে তাদের নিজ বাড়ীতে নিয়ে যায়।

এই সময় কনের মা ও পাঁচ জন 'সুহাসিন' বা সধবাকে নিয়ে কনের সঙ্গে বরের বাড়ীতে যায়। কনের মার সঙ্গে বরের বাড়ীর জন্য ভাল করে তত্ত্ব নিতে হবে। একটি সোনার আংটি, নগদ ১০১৲ টাকা, একটি বাটি রুপার ট্রেতে মিশ্রী, জার্মান সিলভারের ট্রেতে মাছ। একটি টুকরীতে গম ও নারকেল, অন্য টুকরীতে পান, সুপারি, বাতাসা বেশ সুন্দর করে সাজিয়ে তত্ত্ব পাঠানো হয়। নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী এই দেওয়া-নেওয়ার তারতম্য হয়।

বরের বাড়ীতে বরকে একখানা অখণ্ড কাঠের পিঁড়ির উপর দাঁড় করায়। কনের মা বরের হাতে নারকেল, আংটি ও ১০১৲ টাকা নগদ দিয়ে আশীর্বাদ করে।

তখন ঐখানেই সব আত্মীয়স্বজনের সামনে বর-কনে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরস্পরে আংটি বদল করে ও এই অনুষ্ঠানের পর কনের মা সৌভাগ্যবতীদের সহ নিজ আবাসে ফিরে আসে, কনে বরের বাড়ীতে সারাদিন থেকে খাওয়া-দাওয়া করে। রাত্রে বর কনেকে তার বাড়ীতে পৌঁছাতে আসে, তখন ভাবী শাশুড়ী বরের হাতে একটি গিনি ও এক টুকরী মিষ্টি দিয়ে বরকে বিদায় করে।

এই উৎসবের পর দিন কনের ভাই উত্তম পোশাকে সুসজ্জিত হয় ও মাথায় ফেটা বা পাগড়ী বেঁধে বাড়ীর উঠানে একটা ফুলের টবে আমের ডাল পুঁতে, আর টবের মাটিতে একটা ছোট মোতি ও সোনা রুপার এক এক টুকরা পুঁতে দেয়, তারপর সেই আমের ডালটিকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে কুঙ্কুম ছিটিয়ে দেয়। এই শুভকাজের জন্য ভাইকে বোন ১১৲ টাকা পুরস্কার দেয়। ওদিকে বরের বাড়ীতে বরের ভগ্নীপতিও এ ভাবে টবে আমের ডাল পোঁতা উৎসব সম্পন্ন করে।

তৃতীয় দিনে পরিবারের কুটুম্বিনীরা অরহড় ডাল সিদ্ধ করে তাতে চিনি এলাচ ইত্যাদি মিশিয়ে পুর বানায় ও আটার ভিতরে সেই ডালের পুর ভরে রুটি তৈরি করে। একে "পোরনপুরী" বলে। শুকনো ফল, আটা সুজি ইত্যাদি মিশিয়ে ১১টি রুটি মেয়েরা তৈরি করে আর একটি টুকরীতে সেই পোরণপুরী ও ১১টি রুটি সাজিয়ে বরের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়। বর সেই রুটিগুলি রেখে তার পরিবর্তে ১১টি রৌপ্য মুদ্রা সেই টুকরীতে দেয়। বরের বাড়ী থেকেও ঠিক সেভাবে মেয়েরা রুটি তৈরি করে পাঠায়। কনের বাড়ীর লোকেরা শুধু দুখানা রুটি তুলে রাখে ও তৎপরিবর্তে দুটি টাকা দেয়।

বিয়ের দিন প্রভাত হলেই খুব ধুমধাম হৈ চৈ সুরু হয়ে যায়।

উঠানে বা ঘরে "চৌকপুরে", মানে আলপনা দেয়, এবং ওখানে একটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে। প্রদীপের সামনে একটি নারকেল রেখে দেয়। প্রদীপে সারাদিনই ঘি ঢালতে হয়, যাতে প্রদীপ না নিভে যায়। ভোর থেকেই বিয়ে বাড়ীতে বাজনা বাজতে থাকে, আত্মীয়-কুটুম্ব যারা আসে তারা সবাই এক এক টাকা সেই প্রদীপের কাছে রাখে, বিয়ের পর ঐ টাকাগুলো চাকরবাকরদের বকশিশস্বরূপ বিলিয়ে দেওয়া হয়।

বোম্বে পার্শীদের প্রধান আবাসস্থল, সেজন্য অধিকাংশ বিবাহই বোম্বেতে অনুষ্ঠিত হয়। বাড়ীতে স্থানাভাবে বিয়ের উৎসব সঙ্কুলান করা বড় শহরে একটু কঠিন ব্যাপার; সেজন্য বোম্বেতে পার্শীরা বড় বড় বাগিচা বিয়ের দিন নির্দিষ্ট করে রাখে ও বিয়ের আগে বর-কনের দল পৃথক ভাবে সেই বাগিচায় চলে যায়।

গোধূলিলগ্নে পার্শীদের বিয়ে হয়। অন্য জাতির ন্যায় তাদেরও বর-কনেকে বিয়ের আগে স্নান করাবার নিয়ম আছে। বর বরের বাড়ীতে ও কনে কনের বাড়ীতে স্নান করবার আগে দু'বাড়ীর পুরোহিত বাইরে দাঁড়িয়ে মন্ত্রপাঠ করতে থাকে, এবং বর ও কনে নিজ নিজ স্নানের ঘরে নিজ শরীরে প্রথমে একটু গোমূত্র ছু ইয়ে নেয় ও পরে সাবান দিয়ে খুব ভাল ভাবে স্নান করে আসে। শুভ-কার্য্যে গোমূত্র ব্যবহার ও শরীরে গোমূত্র ধারণের একটা ইতিহাস আছে।

পার্শীরা নিজেদের আর্য্যজাতিসম্ভূত মনে করে, এবং তারা সূর্য্য এবং অগ্নির উপাসক। তাদের নিত্যকর্ম্ম রোজ প্রভাতে সূর্য্য ও অগ্নির উপাসনা করে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া। হিন্দুদের সঙ্গে তাদের এক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, তারা গোজাতিকে পূজা ও ভক্তি করে, এবং বিবাহাদি শুভকার্য্যে গোমূত্র ব্যবহার করে। তাদের মধ্যে প্রবাদ এই যে, তাদের 'পাদশা' (বাদশা) ফ্রেদুন অত্যন্ত গোভক্ত ছিলেন। ফরেদুনের জন্মের পর তাঁর পিতামহ জ্যোতিষীকে শিশুর অদৃষ্ট গণনা করতে বললেন, জ্যোতিষী শিশুর জন্মপত্রিকা তৈরি করে বললেন যে, এই শিশু থেকে তাঁর অত্যন্ত অনিষ্ট হবার আশঙ্কা; জ্যোতিষীর বাক্যে বিশ্বাস করে পিতামহ ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় তিন-চার মাসের শিশুকে জঙ্গলে পরিত্যাগ করে আসেন। কিন্তু ভগবানের এমনই বিচিত্র বিধান, জঙ্গলে একটি গাভী সেই সুকুমার শিশুকে নিজ স্তন্যদুগ্ধ পান করিয়ে বাঁচিয়ে রাখে; সেই পরিত্যক্ত অবস্থায় শিশু গাভীর মাতৃবৎ যত্নে ও দুগ্ধে বর্দ্ধিত হয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যখন পাদশাপদে অধিষ্ঠিত হন তখন রাজ্যে নিয়ম করেন যে সমস্ত শুভকার্য্যে গোমূত্র ব্যবহৃত হবে এবং আজ পর্য্যন্ত পার্শীরা এই নিয়ম মেনে চলছে।

স্নানান্তে বর-কনে নিজ নিজ দেহের পুরাতন উপবীত ত্যাগ করে নূতন উপবীত ধারণ করে। পার্শীদের মধ্যে ছেলেমেয়ে উভয়কেই পৈতা ধারণ করতে হয়, এবং প্রত্যেক পরিবারেই সাত বা নয় বছরে পা দিলেই ছেলে হোক বা মেয়ে হোক তার উপবীত ধারণ খুব জাঁকজমকে অনুষ্ঠিত হয় এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত স্ত্রী-পুরুষ শরীর থেকে পৈতা ত্যাগ করে না, শুধু জীর্ণ পৈতা পরিবর্ত্তিত করে নূতন পৈতা ধারণ করে।

বিয়ের কনে স্নান করে পবিত্র হয়ে বিয়ের রেশমী পোশাক পরে সুসজ্জিতা হয়। তখন কনের কপালে কুঙ্কুম ফোঁটা দিয়ে চাল ছু ইয়ে গলায় ফুলের মালা পরায় ও হাতে ফুলের তোড়া দেয়। বিবাহসাজে সজ্জিতা কনে নূতন পিঁড়িতে শান্তভাবে বসে থাকবে, তখন তাকে কেউ ছু তে পারবে না। ওদিকে বরের বাড়ীতে বরও স্নান সমাপ্ত করে কনের মত বিবাহসাজে সজ্জিত হয়ে বসে থাকে। অধিকাংশ স্থানেই কনের বিয়ের পোশাক লাল বা গোলাপী থাকে, কিন্তু পার্শীদের বিয়ের পোশাক দুগ্ধধবল শুভ্র হওয়া চাই। বর বিয়ের সময় মাথায় ফেটা বা পাগড়ী বাঁধে।

গোধূলিলগ্নে বিয়ে। বর এবং তার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে কন্যাপক্ষ বাদ্যভাণ্ডসহ শোভাযাত্রা করে বাগিচায় নিজেদের নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে আসে। বিবাহের স্থানে দুখানা নূতন চেয়ার মুখোমুখী করে রাখে। বরকে এনে সমাদরে সেই চেয়ারের সামনে দাঁড় করান হয়। শাশুড়ী একটা রূপার থালাতে সাতটি টুপী, সাত জোড়া মোজা, সাতটি সার্টের সিল্ক কাপড়, একটি গরম সুটের কাপড়, একখান মলমল, একখান লংক্লথ, পাঁচটি সূতী কোটপ্যাণ্ট, সোনার বোতাম, রিষ্টওয়াচ সাজিয়ে নিয়ে আসে। শাশুড়ীর হাতে, নয়ত জ্যেষ্ঠা শালীর হাতে একখানা রূপার থালায় একটা নারকেল, একটা ডিম ও কিছু চাল থাকে। শাশুড়ী ডিমটা হাতে নিয়ে সাত বার বরের কপালে মুখে ফিরিয়ে ছু ড়ে ভেঙে ফেলে দেয়, ও একঘটি জল নিয়ে বরের পায়ের সামনে জমিতে ঢেলে দেয়। তার পর শাশুড়ী বরের কপালে কুঙ্কুম ফোঁটা দিয়ে হাতে যৌতুকের বস্তাদিসহ ঐ রূপার থালা ধরে দেয়। এই সময় পুরনারীরা গান গাইতে থাকে—

"শুভ সুন্দরী তো সাজ সৌথায়ো
জমই পনোতা পধারে
গর্ভিরা তোড়া, চার গুঠেলা,
গুঠি গলায়ে শোভাস্তরে।
সুন্দর ফুলনী থাল ভরিনে
জমই পনোতানে কাজেরে।
ওয়ালা শাশুজী, তমে সোপায়ো লে আও
জমই পনোতানে কাজেরে।
ভালা শালী চিতমা, বর বেণু লে আও
পনোতা বনবীনো, হাত ভুবাও
অন্দর পাঁচ রূপেয়ানো পঁচু মোকাও।
ইয়ে ঘেবেত্তে দস্তর বোলাও
লগননী বিবিরা কমাও,
সাতসুতাবনো পাঁট বান্ধাও
জনমণি পায় বন্ধাওয়ে।"

"সুন্দরীরা সাজগোজ কর জামাই আসছে,

ফুলের হার, চাকে তোড়া তোড়া পাচ্ছে। ওগো শাশুড়ী, আরতির জিনিষ নিয়ে এসো জামাইকে বরণ করতে। পিতলের পাত্রে দুধ ঢেলে নিয়ে এসো জামাই তাতে হাত ডুবিয়ে পাঁচ টাকা রেখে দাও। পুরোহিতকে খবর দাও, সাতসুতোর গাঁট দিয়ে বর-কনেকে চিরদিনের জন্ম একত্রে বাধ।"

গোধূলিলগ্ন আসন্ন। দুটি মুখোমুখী চেয়ারের মাঝখানে কনের ভগ্নীপতি একখানা কাপড় ধরে রাখে ও শুভমুহূর্তে কনেকে এনে দাঁড় করায়। কাপড় মধ্যভাগে থাকায় বরকনে কেউ কাউকে দেখতে পায় না। বরের পাশে বরের পুরোহিত ও কনের পাশে কনের পুরোহিত দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের হাতে ছোট্ট রূপার থালায় আবীরমাখা চাল থাকে। পুরোহিতরা বর-কনের হাতে মুঠিভরে চাল দিয়ে রাখে ও মন্ত্র বলতে থাকে। মন্ত্র বলা শেষ হওয়া মাত্রই বর-কনে চাদরের উপর দিয়ে পরস্পরের উপর চাল ছুড়তে থাকে। যে আগে চাল ছুড়বে তারই জিৎ। মন্ত্র বলা ও চাল ছোড়া শেষ হলে ভগ্নীপতি মাঝের কাপড়খানা উঠিয়ে নেয়। চেয়ার দুখানা তখন পাশাপাশি রাখা হয় ও বরকনেকে তাতে বসানো হয়। পুরোহিত তখন বরকনের চেয়ার দুটোর চারদিকে সাত বার সুতো ঘুরিয়ে গিট বেঁধে রাখে। খোবরা, মানে শুকনো নারকেলের টুকরো, আনারের দানা, আবীরমাখা চালের সঙ্গে মিশিয়ে একটা রূপার থালাতে করে পুরোহিতদের হাতে দেওয়া হয়। পুরোহিতরা সেই চাল বর-কনের উপর ছুড়ে আশীর্বাদ করে মন্ত্র বলতে থাকে ও তারপর সুতোর গিট খুলে ফেলে। বর-কনে তখন উঠে দাঁড়ায় ও শ্বশুর শাশুড়ীকে প্রণাম করে। শ্বশুর পুত্রবধূকে কোলে বসিয়ে আশীর্বাদী গয়না পরায়। আজকাল বয়স্থা পাত্রী থাকে, সেজন্য শ্বশুরের কোলে বসাবার প্রথা লোপ হয়ে গেছে। রাত্রে কনের বাড়ীতে বিয়ের ভোজ হয়। ভুরিভোজনের পর বরযাত্রীর দল বর ও কনে সহ বরের বাড়ীতে প্রস্থান করে। কনের বাড়ী থেকে পাঁচ জন সধবা কনেকে পৌঁছাতে যায়। শাশুড়ী বউকে ঘরে বরণ করে নেয়।

বধূবরণের গান

"বহু আবী, বহু জলরে আবী—
ছ ইয়া ছন ছে জুতি আবী—
জাইয়ানে জমেরতি আবী— ।
বহু আবী ব্রিহস্পতওয়ার যে,
বহু আবী সারেরে দাহারে

শুভ বিয়ের পর বধূকে পরিবারস্থ সবাই অতি আনন্দে বরণ করে নেয়, সবাই চায় যে বধূ কল্যাণীরূপে তাদের সংসারে এসে সুখসৌভাগ্যে পূর্ণ করে দিবে, সন্তান এসে তাদের গৃহ আলো করে তুলবে। তাদের মধ্যে বৃহস্পতিবার অতি শুভদিন।

বিয়ের পরের দিন বর-কনেকে কনের মা নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসে, সেদিন বাড়ীতে খুব হৈ চৈ, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই মিলে আমোদ-আহ্লাদ করে, বড় ভোজ হয়, রাত্রে কন্যা-জামাতা বিদায় হয়। বিদায়ের সময় শাশুড়ী জার্মান সিলভারের ঘটিতে মিঠাই ভরে লাল রেশমী কাপড় দিয়ে মুখ বেঁধে বরের হাতে দিয়ে দেয়। বর-কনের ভোজ খাওয়ার পর নারীরা হাতে তালি বাজিয়ে গান করে, তার নাম হ'ল "গর্বা" গান—

উচা উচা চক, আনে চন্দন
তাজে পোরিয়া মহরা, কে খসরুশেঠ,
কি নরদম লে হরিয়ারে।
তাজে উস্তা জরে বৈরে
তাজে খনু সমাড়িয়ানী
কি নরদম লে হরিয়ারে।
সোয়ামী তমনে এ টলি সায়েনিন্দ
আজ হমারি রোশন না বিয়া
তেমি মনোহরণে আওয়ে নিদ—
এবে সোটি মারি জাগাওরে
এনা গোলাপ ছাটিনে জাগাওরে।
সোয়ামী তমে ককনি ডোর মান্দাও
ছিকরীনে পরন তা পেরাও
সোয়ামী তমে তম্বূলী বোলাও
তেনি পাশে পান বিড়া মান্দাও।
সোহাজনে বোলাও
সোয়ামী তমে মালীরা বোলাও
নে হার গজরা গুথাও
জমাইনে হার তা পেরাও
লে হরিয়া লে হরিয়া সুকরে লোক
মায় মানী লে হরিয়া নি আরে ওস
কি নরদম লে হরিয়া রে।

"সভাতে নিমন্ত্রিত লোকেরা আসীন হয়ে মণ্ডপের শোভা বাড়িয়েছে, তার মধ্যে খসরু শেঠ বসে আছে। সে নরশ্রেষ্ঠ বসে [illegible] সৌন্দর্য বেড়ে গেছে। সামনে বড় বড় থালাতে

উঠানে বা ঘরে "চৌকপুরে", মানে আলপনা দেয়, এবং ওখানে একটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে। প্রদীপের সামনে একটি নারকেল রেখে দেয়। প্রদীপে সারাদিনই ঘি ঢালতে হয়, যাতে প্রদীপ না নিভে যায়। ভোর থেকেই বিয়ে বাড়ীতে বাজনা বাজতে থাকে, আত্মীয়-কুটুম্ব যারা আসে তারা সবাই এক এক টাকা সেই প্রদীপের কাছে রাখে, বিয়ের পর ঐ টাকাগুলো চাকরবাকরদের বকশিশস্বরূপ বিলিয়ে দেওয়া হয়।

বোম্বে পার্শীদের প্রধান আবাসস্থল, সেজন্য অধিকাংশ বিবাহই বোম্বেতে অনুষ্ঠিত হয়। বাড়ীতে স্থানাভাবে বিয়ের উৎসব সঙ্কুলান করা বৃহৎ শহরে একটু কঠিন ব্যাপার; সেজন্য বোম্বেতে পার্শীরা বড় বড় বাগিচা বিয়ের দিন নির্দিষ্ট করে রাখে ও বিয়ের আগে বর-কনের দল পৃথক ভাবে সেই বাগিচায় চলে যায়।

গোধূলিলগ্নে পার্শীদের বিয়ে হয়। অন্য জাতির ন্যায় তাদেরও বর-কনেকে বিয়ের আগে স্নান করাবার নিয়ম আছে। বর বরের বাড়ীতে ও কনে কনের বাড়ীতে স্নান করবার আগে দু'বাড়ীর পুরোহিত বাইরে দাঁড়িয়ে মন্ত্রপাঠ করতে থাকে, এবং বর ও কনে নিজ নিজ স্নানের ঘরে নিজ শরীরে প্রথমে একটু গোমূত্র ছুঁইয়ে নেয় ও পরে সাবান দিয়ে খুব ভাল ভাবে স্নান করে আসে। শুভ-কার্য্যে গোমূত্র ব্যবহার ও শরীরে গোমূত্র ধারণের একটা ইতিহাস আছে।

পার্শীরা নিজেদের আর্য্যজাতিসম্ভূত মনে করে, এবং তারা সূর্য্য এবং অগ্নির উপাসক। তাদের নিত্যকর্ম্ম রোজ প্রভাতে সূর্য্য ও অগ্নির উপাসনা করে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া। হিন্দুদের সঙ্গে তাদের এক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, তারা গোজাতিকে পূজা ও ভক্তি করে, এবং বিবাহাদি শুভকার্য্যে গোমূত্র ব্যবহার করে। তাদের মধ্যে প্রবাদ এই যে, তাদের 'পাদশা' (বাদশা) ফরেদুন অত্যন্ত গোভক্ত ছিলেন। ফরেদুনের জন্মের পর তার পিতামহ জ্যোতিষীকে শিশুর অদৃষ্ট গণনা করতে বললেন, জ্যোতিষী শিশুর জন্মপত্রিকা তৈরি করে বললেন যে, এই শিশু থেকে তাঁর অত্যন্ত অনিষ্ট হবার আশঙ্কা; জ্যোতিষীর বাক্যে বিশ্বাস করে পিতামহ ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় তিন-চার মাসের শিশুকে জঙ্গলে পরিত্যাগ করে আসেন। কিন্তু ভগবানের এমনই বিচিত্র বিধান, জঙ্গলে একটি গাভী সেই সুকুমার শিশুকে নিজ স্তন্যদুগ্ধ পান করিয়ে বাঁচিয়ে রাখে; সেই পরিত্যক্ত অবস্থায় শিশু গাভীর মাতৃবৎ যত্নে ও দুগ্ধে বর্দ্ধিত হয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যখন পাদশাপদে অধিষ্ঠিত হন তখন রাজ্যে নিয়ম করেন যে সমস্ত শুভকার্য্যে গোমূত্র ব্যবহৃত হবে এবং আজ পর্য্যন্ত পার্শীরা এই নিয়ম মেনে চলছে।

স্নানান্তে বর-কনে নিজ নিজ দেহের পুরাতন উপবীত ত্যাগ করে নূতন উপবীত ধারণ করে। পার্শীদের মধ্যে ছেলেমেয়ে উভয়কেই পৈতা ধারণ করতে হয়, এবং প্রত্যেক পরিবারেই সাত বা নয় বছরে পা দিলেই ছেলে হোক বা মেয়ে হোক তার উপবীত ধারণ খুব জাঁকজমকে অনুষ্ঠিত হয় এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত স্ত্রী-পুরুষ শরীর থেকে পৈতা ত্যাগ করে না, শুধু জীর্ণ পৈতা পরিবর্ত্তিত করে নূতন পৈতা ধারণ করে।

বিয়ের কনে স্নান করে পবিত্র হয়ে বিয়ের রেশমী পোশাক পরে সুসজ্জিতা হয়। তখন কনের কপালে কুঙ্কুম ফোটা দিয়ে চাল ছুঁইয়ে গলায় ফুলের মালা পরায় ও হাতে ফুলের তোড়া দেয়। বিবাহসাজে সজ্জিতা কনে নূতন পিঁড়িতে শান্তভাবে বসে থাকবে, তখন তাকে কেউ ছুঁতে পারবে না। ওদিকে বরের বাড়ীতে বরও স্নান সমাপ্ত করে কনের মত বিবাহসাজে সজ্জিত হয়ে বসে থাকে। অধিকাংশ স্থানেই কনের বিয়ের পোশাক লাল বা গোলাপী থাকে, কিন্তু পার্শীদের বিয়ের পোশাক দুগ্ধধবল শুভ্র হওয়া চাই। বর বিয়ের সময় মাথায় ফেটা বা পাগড়ী বাঁধে।

গোধূলিলগ্নে বিয়ে; বর এবং তার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে কন্যাপক্ষ বাদ্যভাণ্ডসহ শোভাযাত্রা করে বাগিচায় নিজেদের নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে আসে। বিবাহের স্থানে দুখানা নূতন চেয়ার মুখোমুখী করে রাখে। বরকে এনে সমাদরে সেই চেয়ারের সামনে দাঁড় করান হয়। শাশুড়ী একটা রূপার থালাতে সাতটি টুপী, সাত জোড়া মোজা, সাতটি সার্টের সিল্ক কাপড়, একটি গরম সুটের কাপড়, একখান মলমল, একখান লংক্লথ, পাঁচটি সূতী কোটপ্যাণ্ট, সোনার বোতাম, রিষ্টওয়াচ সাজিয়ে নিয়ে আসে। শাশুড়ীর হাতে, নয়ত জ্যেষ্ঠা শালীর হাতে একখানা রূপার থালায় একটা নারকেল, একটা ডিম ও কিছু চাল থাকে। শাশুড়ী ডিমটা হাতে নিয়ে সাত বার বরের কপালে মুখে ফিরিয়ে ছুঁড়ে ভেঙে ফেলে দেয়, ও একঘটি জল নিয়ে বরের পায়ের সামনে জমিতে ঢেলে দেয়। তার পর শাশুড়ী বরের কপালে কুঙ্কুম ফোটা দিয়ে হাতে যৌতুকের বস্ত্রাদিসহ ঐ রূপার থালা ধরে দেয়। এই সময় পুরনারীরা গান গাইতে থাকে—

"শুভ সুন্দরী তো সাজ সৌথায়ো
জমই পনোত্তা পধারে
গজরা তোড়া, হার গুঠেলা,
গুঠি গলায়ে শোভাত্তরে।
সুন্দর ফুলনী থাল ভরিনে
জমই পনোতানে কাজেরে।
ওয়ালা শাশুজী, তমে সোপারো লে আও
জমই পনোতানে কাজেরে।
ভালা শালী চিতমা, বর বেণু লে আও
পনোত্তা বনবীনো, হাত ডুবাও
অন্দর পাঁচ রূপেয়ানো পঁচু মোকাও।
ইয়ে ঘেরেতে দস্তর বোলাও
লগননী কিরিয়া করাও,
সাতসুতাবনো গাঁট বান্ধাও
জনমণি পার বন্ধাওরে।"

"সুন্দরীরা সাজগোজ কর জামাই আসছে, জামাইয়ের গলায়

ফুলের হার, হাতে তোড়া শোভা পাচ্ছে। ওগো শাশুড়ী, আরতির জিনিষ নিয়ে এসো জামাইকে বরণ করতে। পিতলের পাত্রে দুধ ঢেলে নিয়ে এসো জামাই তাতে হাত ডুবিয়ে পাঁচ টাকা রেখে দাও। পুরোহিতকে খবর দাও, সাতসুতোর গাঁট দিয়ে বর-কনেকে চিরদিনের জন্য একত্রে রাখ।"

গোধূলিলগ্ন আসন্ন। দুটি মুখোমুখী চেয়ারের মাঝখানে কনের ভগ্নীপতি একখানা কাপড় ধরে রাখে ও শুভমুহূর্তে কনেকে এনে দাঁড় করায়। কাপড় মধ্যভাগে থাকায় বরকনে কেউ কাউকে দেখতে পায় না। বরের পাশে বরের পুরোহিত ও কনের পাশে কনের পুরোহিত দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের হাতে ছোট্ট রুপার থালায় আবীরমাথা চাল থাকে। পুরোহিতরা বর-কনের হাতে মুঠিভরে চাল দিয়ে রাখে ও মন্ত্র বলতে থাকে। মন্ত্র বলা শেষ হওয়া মাত্রই বর-কনে চাদরের উপর দিয়ে পরস্পরের উপর চাল ছুড়তে থাকে। যে আগে চাল ছুড়বে তারই জিৎ। মন্ত্র বলা ও চাল ছোড়া শেষ হলে ভগ্নীপতি মাঝের কাপড়খানা উঠিয়ে নেয়। চেয়ার দুখানা তখন পাশাপাশি রাখা হয় ও বরকনেকে তাতে বসানো হয়। পুরোহিত তখন বরকনের চেয়ার দুটোর চারদিকে সাত বার সুতো ঘুরিয়ে গিঁট বেঁধে রাখে। খোবরা, মানে শুকনো নারকেলের টুকরো, আনারের দানা, আবীরমাথা চালের সঙ্গে মিলিয়ে একটা রুপার থালাতে করে পুরোহিতদের হাতে দেওয়া হয়। পুরোহিতরা সেই চাল বর-কনের উপর ছুড়ে আশীর্ব্বাণী করে মন্ত্র বলতে থাকে ও তারপর সুতোর গিঁট খুলে ফেলে। বর-কনে তখন উঠে দাঁড়ায় ও শ্বশুর শাশুড়ীকে প্রণাম করে। শ্বশুর পুত্রবধূকে কোলে বসিয়ে আশীর্ব্বাদী গয়না পরায়। আজকাল বয়স্থা পাত্রী থাকে, সেজন্য শ্বশুরের কোলে বসাবার প্রথা লোপ হয়ে গেছে। রাত্রে কনের বাড়ীতে বিয়ের ভোজ হয়। ভূরিভোজনের পর বরযাত্রীর দল বর ও কনে সহ বরের বাড়ীতে প্রস্থান করে। কনের বাড়ী থেকে পাঁচ জন সধবা কনেকে পৌঁছাতে যায়। শাশুড়ী বউকে ঘরে বরণ করে নেয়।

বধূবরণের গান

"বহু আবী, বহু ভলরে আবী—
ছ ইয়া ছন ছে ভতি আবী—
ভাইয়ানে ভমেরতি আবী—।
বহু আবী ব্রিহস্পতওয়ার রে,
বহু আবী সায়েরে দাঁহারে
বহুনা হাতমা সোনানো লোট,
অন আবী পরজন সের বেট
বহু আবী, ভলেরে আবী।

"বধূ এসেছে, কল্যাণী বধূ এসেছে. ভাইয়ের সঙ্গে বধূ এসেছে, তার পায়ের ঘুঙুর বাজছে রুণুঝুনু। বধূ শুভদিন বৃহস্পতিবারে এসেছে, তার হাতে সোনার লোটা, এক বছর পরেই বধূ ছেলের জন্ম দিবে, বধূ কল্যাণী বধূ এসেছে।"

শুভ বিয়ের পর বধূকে পরিবারস্থ সবাই অতি আনন্দে বরণ করে নেয়, সবাই চায় যে বধূ কল্যাণীরূপে তাদের সংসারে এসে সুখসৌভাগ্যে পূর্ণ করে দিবে, সন্তান এসে তাদের গৃহ আলো করে তুলবে। তাদের মধ্যে বৃহস্পতিবার অতি শুভদিন।

বিয়ের পরের দিন বর-কনেকে কনের মা নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসে, সেদিন বাড়ীতে খুব হৈ চৈ, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই মিলে আমোদ-আহ্লাদ করে, বড় ভোজ হয়, রাত্রে কন্যা-জামাতা বিদায় হয়। বিদায়ের সময় শাশুড়ী জার্ম্মান সিলভারের ঘটিতে মিঠাই ভরে লাল রেশমী কাপড় দিয়ে মুখ বেঁধে বরের হাতে দিয়ে দেয়। বর-কনের ভোজ খাওয়ার পর নারীরা হাতে তালি বাজিয়ে গান করে, তার নাম হ'ল "গর্ব্বা" গান—

উচা উচা চক, আনে চন্দন
তাজৈ পোরিয়া মহরা, কে খসরুশেঠ,
কি নরদম লে হরিয়ারে।
তাজৈ উস্তা ভরে বৈরে
তাজৈ ধণু সমাড়িয়ানী
কি নরদম লে হরিয়ারে।
সোয়ামী তমনে এ টলি সায়েনিন্দ
আজ হমারি রোশন না বিয়া
তেমি মনোহরণে আওয়ে নিন—
এবে সোটি মারি জাগাওরে
এনা গোলাপ ছাটিনে জাগাওরে।
সোয়ামী তমে করুনি ডোর মান্দাও
ডিকরীনে পরন তা পেরাও
সোয়ামী তমে তম্বুলী বোলাও
তেনি পাশে পান বিড়া মান্দাও।
সোহাজননে বোলাও
সোয়ামী তমে মালীয়া বোলাও
নে হার গজরা গুথাও
জমাইনে হার তা পেরাও
লে হরিয়া লে হরিয়া সুকরে লোক
মায় মানী লে হরিয়া নি আবে ওস
কি নরদম লে হরিয়া রে।

"সভাতে নিমন্ত্রিত লোকেরা আসীন হয়ে মণ্ডপের শোভা বাড়িয়েছে, তার মধ্যে খসরু শেঠ বসে আছে। সে নরশ্রেষ্ঠ বসে থাকায় সভার সৌন্দর্য্য বেড়ে গেছে। সামনে বড় বড় থালাতে সুন্দর বস্ত্রাদি রাখা আছে, কনের মা নিজের মনে স্বগত উক্তি করছে। চারদিকে আনন্দোৎসব, ব্যস্ততার অন্ত নেই, এর মধ্যে নিজের স্বামীকে নিদ্রিত দেখে কনের মা বিস্মিত ও বিরক্ত হয়ে বললে, আজ আমার রোশনারার বিয়ে। স্বামী, তোমার কি করে এমন গাঢ় ঘুম পেয়ে গেল? তোমাকে বেত মেরে জাগাতে হবে, তোমাকে গোলাপ জল ছিটিয়ে জাগাব। ওঠ স্বামী, ওঠ, তুমি

কারু কাজ করা সুতা আনাও, মেয়েকে তা পরাতে হবে। পান-ওয়ালাকে খবর দাও, তার কাছ থেকে পান সুপারি আনাও, সব আত্মীয়-কুটুম্ব নিমন্ত্রিতদের ডেকে আন। মালীকে খবর পাঠিয়ে ফুলের তোড়া হার আনাও, জামাইয়ের গলায় তা পরিয়ে দাও। সবাই বরকে দেখে প্রশংসা করছে, বর কি সুন্দর, একথাতে মনে কত আনন্দ হচ্ছে।"

এই গানটি থেকে আমরা কন্যাবিবাহের চিন্তায় চিন্তান্বিতা গৃহিণীর মনোভাবের কিঞ্চিৎ আভাস পাই। সাধারণতঃ সব দেশের বিয়ের গান এবং স্ত্রী-আচারাদি নারীদের সৃষ্টি। নারীরা এই গানটাতে নিজেদের প্রাধান্য ফুটাতে চেষ্টা করেছে। কন্যা-বিবাহ বড় উৎসব। তার কত দায়িত্ব কত গুরুত্ব। বাড়ীতে বিয়ে, কত লোকজন আত্মীয়-কুটুম্ব আসবে। আর গৃহকর্তা এ সময় নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে আছেন, তাই গৃহিণী চিন্তায় অস্থির হয়ে স্বামীকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলছে, "ওঠ, জামাই আসবে, যথাযোগ্য বরণ করে নাও, অতিথি নিমন্ত্রিতদের আদরযত্ন করে বসাও" ইত্যাদি। এ গানের পদগুলি থেকে মনে হয় কর্তার কন্যা-বিবাহে যেন কোন খেয়ালই নেই, আর গিন্নীরই যত মাথাব্যথা, তার উপরই যেন কন্যা-বিয়ের সব দায়িত্ব পড়েছে।

পার্শীদের মধ্যে পিতামাতার পক্ষে কন্যাকে অলঙ্কার দিবার নিয়ম নেই। শাশুড়ীই বধূর মুখ দেখে হাতের, গলার ও কানের গয়না, এবং চার জোড়া রেশমী শাড়ী দেয়। কন্যাপণ প্রথা উঠে গেলেও কন্যার মাতাপিতাকে কন্যা বিবাহে খুব যৌতুক দিতে হয়। অধিকাংশ পার্শীরা খুবই ধনী, কাজেই পার্শীদের মধ্যে পোশাকের বেশ জাঁকজমক আছে, তারা বড় সৌখীন। পার্শী নারীরা রেশমী শাড়ী ভিন্ন সুতী শাড়ী পরিধান করে না। বিয়েতে কনেকে সাত জোড়া রেশমী শাড়ী, চারটা তামার বড় বাসন, তিনটা রূপার কুঙ্কুমদানী, রূপার গোলাব পাশ ও আতর দান, রূপার তিনটি থালা এবং দইয়ের জন্য ছোট একটি রূপার হাঁড়ী আর একটি পরাগ দিতে হয়। পরাগ হ'ল একটা মুকুটের মত রূপার তিনকোণা জিনিষ। এই পরাগের ভিতর শুকনো খেজুর ও শুকনো ফল ভরে দিতে হয়। আসবাবের মধ্যে দুখানা খাট, দু'প্রস্থ শয্যা, দুটি চেয়ার, দুটি টিপয় ল্যাম্প, ইজিচেয়ার ও আলমারী দেওয়া হয়। খাঁটি রূপার পুরো বাসনের সেট আজকাল অধিকাংশ লোকে দিতে পারে না, তাই দু'একটা বাসন ছাড়া অধিকাংশই জার্মাণ সিলভারের বাসন দিয়ে থাকে।

বিয়ের সময়ের একটি গান—

"বর সাগুনে হর গোয়া নিশরিয়া
মোনকে বাঁধিয়া মৌররে
য়েলাতে যোই বর হরগয়ো
গলে শোভাইয়ো হাররে।
বর আয়োতে রোশনবাঈ তারো
মাগে উত্তারা তারারে
উত্তারা ত্যাপো বাগনা
মন আপে তে বরনা বাপনা
উত্তারা আপো আম্বানা
আপো আপোতে চৌরি আশী চৌটা
আপো আপো তে নগর গাঁওরে।"

"বর মাথায় মুকুট বেঁধে সেজেগুজে এসেছে, বরের গলায় ফুলের মালা শোভা পাচ্ছে। বর রোশনবাঈকে নিতে এসেছে। নারীরা বলছে—বর, তোমাকে বাগিচা দিয়ে দিব, আম বাগান দিব, বন-জঙ্গল দিব, তোমাকে চৌরাশী নগরগ্রাম দিব। কিন্তু আমরা রোশনবাঈকে দিব না।"

বিয়ের শুভ মুহূর্ত আসন্ন, সুসজ্জিত বর বিবাহমণ্ডপে বসে আছে পাণিগ্রহণের আশায়। কিন্তু পুরনারীরা বলছে—"ওগো বর তুমি যা চাও তাই তোমাকে দিব, শুধু আমাদের কন্যাকে দিব না।" আদরে লালিতাপালিতা কন্যাকে চিরদিনের জন্য বরের হাতে দান করে দিতে প্রাণ সরে না, তাই নারীরা গাইছে—আমাদের রোশনবাঈকে দিব না। কিন্তু চতুর বর বলছে—

"নেহি লেও তে চৌরী আশী চৌটা
নেহি লেও তে নগর গাম
নেহি লেও তে বাদল ঝানরে।
লেওস, লেওস তে কে খারুণী বেটিরে
ওয়ে হামারা জীতি ইয়াপর মানরে
হমারা জিতিয় পর বাজা বজরাও
তমারা হারিয়া পর ঢোল ঢমকাও।

বর বলছে, "তোমার চৌরাশি নগর গ্রাম আমি নিব না, তোমার বনজঙ্গলও নিব না। আমি শুধু খসরু শেঠের কন্যাকেই নিব। আমারই জিৎ হয়েছে, বাজনা বাজিয়ে আমার জয় ঘোষণা কর, তোমরা হেরে গেছ, ঢোল বাজাও।"

এই গানটিতে বরের গর্বিত মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। সাধারণতঃ বরপক্ষ সর্বত্রই নিজেদের মধ্যে প্রাধান্যের ও পদমর্যাদার ভাব রাখে এবং কন্যাপক্ষ তাদের কাছে ন্যূনতা স্বীকার করে।

পার্শীরা অতিমাত্রায় পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হলেও খানিকটা হিন্দু রীতি নিয়ম গ্রহণ করে হিন্দুধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এসেছে। হিন্দু ও পার্শী উভয়েই প্রাচীন আর্যজাতিসম্ভূত এবং তাদের ধর্মের মূল তত্ত্বে বহু সাদৃশ্য আছে।

পার্শীদের মূল গ্রন্থ জেন্দ আবেস্তার ভাষা ও হিন্দুদের ঋগ্বেদের ভাষার বহু সামঞ্জস্য আছে। আমাদের দেশের নাম সিন্ধু থেকে হিন্দুস্থান প্রাচীন পার্শীরাই দিয়েছে। আবেস্তাতে সপ্তসিন্ধুকে "হপ্তহিন্দু" বলা হয়েছে। সংস্কৃতের "স"গুলো পার্শীতে এখনও "হ"তে পরিণত হতে দেখা যায়, যেমন সপ্তাহকে হপ্তা বলা হয়।

পার্শীদের দেশ যখন মুসলমানেরা দখল করে ও তাদের প্রাচীন ধর্ম ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয় তখন একদল লোক দেশ ছেড়ে নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে এসে উপস্থিত হয়। গুজরাটের রাজা সে সময় তাদের আশ্রয় দেন। সেই থেকে পার্শীরা হিন্দুদের মধ্যে থেকে নির্বিবাদে নিজেদের প্রাচীন ধর্ম ও রীতিনীতি রক্ষা করে এসেছে।

স্রোতের ঢেউ

শ্রীহরিহর শেঠ

নিজের ইচ্ছাকেই সর্ব্বক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়ায় সংসারে ও সমাজে অনেক সময় অশান্তি আনে।

চালাকি ও চাতুরী ততক্ষণই চলতে পারে যতক্ষণ না ধরা পড়ে। উহা প্রায় চাপা থাকে না।

অজানা লোকের নিকট হতে লাভের প্রত্যাশামূলক অযাচিত প্রস্তাব গ্রহণ করায় ক্ষতির সম্ভাবনা থাকতে পারে।

সত্যকে যে আশ্রয় করে থাকে এবং অদৃষ্টকে যে বিশ্বাস করে, দুঃখের মধ্যেও সে একটু শান্তি পেয়ে থাকে।

সাংসারিক ও সামাজিক অনেক ব্যাধিই নিরসন করে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা।

শোকতাপ থেকে মুক্ত হতে একমাত্র সময়ের জন্যই অপেক্ষা করা ভিন্ন উপায় নাই।

সংসারে অনন্ত শক্তির উৎস হাসিমুখ, মিষ্ট কথা।

মিষ্ট কথায় হাসিমুখে পরের, এমন কি সময় সময় শত্রুর মনকে জয় করা যায়। বিপরীতে আপন জনের মনও বিষিয়ে যায়।

বিন্দুমাত্র দোষক্রটিশূন্য অতি সৎ লোক হলেই যে সব লোকের কাছ থেকে সুব্যবহার পাওয়া যাবে তার কথা নাই।

সাধারণতঃ দেখা যায় স্বার্থের স্থান কর্ত্তব্য ও বিবেচনার উপরে।

একই কথা একই কাজ ক্ষেত্রবিশেষে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

গোপন পাপ লুকাবার অস্বাভাবিক প্রয়াস তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ানো যায় না।

যে আচরণ সাধারণ দৃষ্টিতে স্বাভাবিক নয়, তার মধ্যে সমাজ, নীতি বা ধর্ম্মবিরোধী কিছু থাকাই সম্ভব।

নিষ্কলুষ চরিত্র যার তার শির চির উন্নত; আর যে মনে মনে পাপী তার মাথা তুলে কথা কওয়ার ব্যর্থ প্রয়াস লোক-চক্ষে ধূলি দিতে পারে না।

নিজের বুদ্ধি বিবেচনাকেই বড় করে দেখা অনেক সময় অশান্তির কারণ হয়।

অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে অমর্য্যাদা না করিলেও প্রথম প্রথম তার কাছে সাবধান হওয়াই শ্রেয়।

সত্যাশ্রয়ীর সত্যপথ গ্রহণে যদি বিশ্ববাসীরও অসমর্থন থাকে তা হলেও তার আত্মতৃপ্তি বিনষ্ট হয় না।

বিশ্বাস করা ভাল, কিন্তু যাকে তাকে অতি বিশ্বাস ভাল নয়।

স্পষ্ট কথা ভাল, স্পষ্টবাদী বলে মনে মনে অহঙ্কার পোষণ করা এবং অপ্রিয় স্পষ্ট কথা শুনাবার জন্য ব্যগ্রতা ভাল নয়, অথবা শুনাইয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করাও ভাল নয়।

স্বাধীনতা, অধিকার, প্রভুত্ব অপাত্রে এসে পড়লে অকল্যাণ সুনিশ্চিত।

মিথ্যা ও চাতুরী যার বর্ম্ম তার দুর্দ্দশা আছেই।

দেশকালপাত্রকে উপেক্ষা করে যে নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করে আপন গোঁয়ে চলে, তাকে প্রায় ভুগতে হয়।

যাহা অবৈধ তাহাই ত্যাজ্য।

যে সব কাজ স্বাভাবিক নয়, তার কারণ অপ্রকাশ্য থাকলে অনেক সময় প্রায় তার ভিতর কিছু গোপন ব্যাপার থাকে।

যে সংসারের পরিজনবর্গ প্রাপ্য সম্মান প্রাপ্য প্রশংসা পায় না সে সংসারে শান্তির আশা বৃথা।

গৃহস্বামী বা স্বামিনীর কর্ত্তব্য ও দায়িত্বকে বিস্মৃত হয়ে যিনি শুধু কর্ত্তৃত্ব রক্ষা করতেই ব্যস্ত, তাঁর সাংসারিক জীবন সুখের হতে পারে না।

পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে অন্তের বিশেষ করে দাসদাসীর সামনে—তাঁহার সমক্ষেই হউক আর অসমক্ষেই হউক, পরিজনদিগের কাহারও নিন্দা এমনকি সুখ্যাতি করায়ও অনেক সময় বিষময় ফল ফলিতে দেখা যায়।

বিদ্যাবুদ্ধিজ্ঞান সময় সময় রিপুর প্রভাব অতিক্রম করতে পারে না।

শোক তাপ রোগ আর্থিক অসচ্ছলতা না থাকলেও কর্ত্তব্যপরায়ণ ধার্ম্মিক ব্যক্তিমাত্রেরই যে পারিবারিক জীবন সুখের হবে তার কোন কথা নাই।

সত্যের মর্য্যাদা, গুণের আদর, প্রতিভার স্বীকৃতি নাই যে সংসারে যে সমাজে সেখানে শান্তি থাকতে পারে না।

শুধু অনুকরণের দ্বারা বড় হওয়া যায় না।

চরিত্র ও মন নিষ্কলুষ হলেই যে তাঁর বুদ্ধিবিবেচনা ভ্রম-শূন্য হবে এমন কোন কথা নাই।

সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে মানুষের অভাব বৃদ্ধির সম্পর্ক নিকট।

উপাধি অনেকেরই ভূষণ-স্বরূপ, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে উপাধি ভূষিত হতেও দেখা যায়।

অনেক সময় উপাধি মানুষকে বড় যত না করতে পারে, তার চেয়ে গুমোড় বাড়িয়ে তাকে ছোট করতে পারে।

রাষ্ট্র ও সমাজে স্রষ্টা বা প্রবর্ত্তক সৃষ্টি বা প্রবর্ত্তনের পর দীর্ঘদিন বেঁচে থাকলে অর্জ্জিত খ্যাতি অনেক সময় ম্লান দেখে মরতে হয়।

যুবক-যুবতীর নিভৃত আলাপের সুযোগ অনেক সময় অনিষ্টের আকর হয়ে উঠা স্বাভাবিক।

সামর্থ্যপক্ষে ছেলেমেয়েদের বিবাহযোগ্য বয়সে বিবাহ দেওয়াই ভাল।

এমন অনেক কাজ আছে যা শুধু দরদহীন বেতনভোগীর দ্বারা সুসম্পন্ন হতে পারে না।

বিবাহিতা কন্যার পিতৃগৃহে দীর্ঘদিন বাসে অভাবের কথা না থাকলেও অনেক সময় উভয় পক্ষেরই শান্তি ক্ষুণ্ন হয়।

সদা রুক্ষ ব্যবহারে ভাল দাসদাসীও মন ভেঙে গিয়ে খারাপ হয়ে যায়।

বর্ত্তমান যুগে নূতন দাসদাসীর সামান্য ত্রুটিতে যাঁরা অসহিষ্ণু হন, তাঁদের ভুগতে হয়।

যাঁকে অপরের সাহায্য বা সেবা না নিতে হয়, হয়ত কোন সময় তাঁকে অসুবিধা ভোগ করতে হয়, তথাপি সে ভাগ্যবান।

নামযশের প্রার্থীদের উহা লাভের জন্য যেমন দানখয়রাৎ, গাড়ি, মোটর, বাড়ী প্রভৃতির আশ্রয় নিতে দেখা যায়, তেমনি কৌপীন, বহির্ব্বাস কাহারও কাহারও উহা লাভের সহায়ক হয়।

কথার উত্তর না দিলেই যে তার উত্তর দিবার কিছু নাই, এ নাও হতে পারে।

খাইতে না চাহিলেই যে ক্ষুধা নাই, সেকথা বলা যায় না।

বৌ-ঝিরা তাদের ছেলেমেয়েদের মারলেই যে বুঝতে হবে তাদের দোষ আছে তা না হতেও পারে।

পুণ্যতীর্থ রাধানগর

শ্রীক্ষেমঙ্করী রায়

আমাদের এক দল বন্ধু রাজা রামমোহনের জন্মভূমি পুণ্যতীর্থ রাধানগরে যাবেন। বহুদিনের সাধ রাজার জন্মভূমি দেখে কৃতার্থ হব। তাই তাঁদের সঙ্গ নিলাম।

আমরা রওনা হবার সঙ্কল্প করলাম। শুনলাম দুর্গম পথ,

রাধাগোবিন্দের মন্দির, লাঙ্গুলপাড়া

এক বন্ধু ভয়ও দেখালেন—পারবেন না তক্তার উপর দিয়ে ষ্টীমারে উঠতে। কিন্তু একবার মনস্থ করলে সহসা পিছ্‌পা হই না, তা ছাড়া শুভ কাজে ভগবানই শক্তি দেন এই বিশ্বাস রেখে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে পৌঁছলাম।

অল্পক্ষণ পরেই ট্রেন ছেড়ে দিল। লোকাল ট্রেন, প্রত্যেক ষ্টেশনে থেমে থেমে চলল। সূর্য্যের কিরণ এত প্রখর বোধ হচ্ছিল যেন দ্বিপ্রহর।

বেলা সাড়ে ন'টা আন্দাজ কোলাঘাটে এসে পৌঁছলাম। ষ্টীমারঘাট দেখে চক্ষুস্থির। তখন ভাঁটা, চড়ায় হাঁটু অবধি কাদা। দুখানা সরু কাঠ পেতে দিয়ে যাত্রীদের অভ্যর্থনা করা হচ্ছে ষ্টীমারে। অতি কষ্টে উঠলাম। ষ্টীমারটি ছোট, কিন্তু অগণিত পুরুষ ও স্ত্রী যাত্রী। একতলা ভর্ত্তি, দোতলায়ও তিলধারণের স্থান নাই। বন্ধুরা আমাদের নিয়ে গেলেন তেতলায়। একটিমাত্র ছোট্ট ঘর, কোনও রকমে ঠাসাঠাসি করে বসা গেল প্রায় জন দশ-বারো। মহিলা ছিলাম আমরা তিন জন। আমাদের এক মহিলা বন্ধুর দুইটি ছোট বালিকা-শিশু। তাদের স্ফূর্ত্তি দেখে কে! কখনও গান, কখনও নাচ, কখনও আবৃত্তি, কখনও খাওয়া।

জোয়ার না এলে ষ্টীমার ছাড়বে না। এক বন্ধু এক ডজন কলা, মুড়ি, অন্য বন্ধু সিঙাড়া মিষ্টি প্রভৃতি আনলেন। সকলে মিলে খাওয়া গেল।

জোয়ার এল। রূপনারায়ণ নদীর বুকের উপর দিয়ে ষ্টীমার চলতে লাগল। দুপুর রোদেও নদীর দু'ধারের দৃশ্য বেশ লাগছিল। মাথার উপর খণ্ড খণ্ড মেঘ, সুনীল আকাশ, নির্ম্মল বাতাস আর দু'পাশে সবুজের মেলা। গ্রামের ছেলেমেয়েরা সাঁতার কাটছে, বৌ-ঝিরা মাটির কলসী ভরে জল নিয়ে যাচ্ছে লম্বা ঘোমটা দিয়ে। দু'পাশে অসংখ্য জীর্ণ শিবমন্দির। ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকো চলেছে জাল ফেলতে ফেলতে—মাছ ধরবার জন্যে। বড় দু'চারখানা নৌকা পাল তুলে চলেছে দ্রুত গতিতে। কোলাঘাট থেকে তেইশ মাইলের মাথায় গড়ের ঘাট ষ্টেশন। সেখানে এসে ষ্টীমার হাজির হ'ল।

রামমোহন স্মৃতিসৌধ চত্বর, রাধানগর, ১৯৫[illegible]

গোলঘর, লাঙ্গুলপাড়া

গড়ের ঘাটে পৌঁছে একখানা মোটরে আমরা চাপলাম। এখানা আগেই আমাদের জন্য রিজার্ভ করা ছিল। আমাদের দলটিকে ন'মাইল দূরে রাধানগরে নিয়ে যাবার কথা, কিন্তু আগেই তিনটি যুবক এসে সেখানে আসন গ্রহণ করেছিলেন। স্থানসঙ্কুলান হওয়া কঠিন, তথাপি বৃদ্ধ ও মহিলাদের প্রথমে বসিয়ে দিয়ে বাকি সব বন্ধুরা—মোট উনিশ জন ঝুলতে ঝুলতে সমস্তটা পথ চললেন। বলা বাহুল্য, কারও মুখে একটুকুও নিরানন্দ বা অবসাদ ছিল না। সেই অবস্থায় একখানা ফটোও তোলা হ'ল।

অবশেষে রাধানগরে এসে পৌঁছানো গেল। কিন্তু কি দৃশ্য দেখলাম! রামমোহনের স্মৃতিমন্দির চেনবার যে উপায় নেই। মন্দিরের অবস্থা দেখে নিতান্ত হতাশ ও দুঃখিত হলাম। মাঝখানে একটি বড় হল, তার দু'পাশে দুটি করে চারিটি চৌকা বড় ঘর। তার উপর হলঘরটিতে পুরুষরা ও তার পাশেই একটি ঘরে আমরা তিনটি মহিলা স্থান পেলাম।

অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য ওখানকার বাসিন্দারা চমৎকার বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন। প্রথমেই জলখাবার পরিবেশন করে আমাদের ক্লান্তি দূর করানো হ'ল। অন্ন-ব্যঞ্জনাদিও প্রস্তুত—জানালেন। কিন্তু স্নান না করে খেতে বসা অসম্ভব জানিয়ে পুকুরের সন্ধানে চললাম, তখন বিকাল পাঁচটা হবে। কাছেই একজন ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে টিউব-ওয়েলের জলে স্নান করতে গেলাম। সে বাড়ীর মহিলা ও ছোট ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশী হলাম। স্নানান্তে আমরা দিনের আহার সেরে নিলাম। কিছুক্ষণ পরে সন্ধ্যায় গান উপাসনা এবং রামমোহন-প্রসঙ্গ আলোচনা হ'ল। আমরা মহিলারা মিলে অর্দ্ধেক রাত্রি পর্য্যন্ত হাসিগল্প করে কাটালাম।

পরদিন প্রত্যুষে উপাসনার পর কীর্ত্তন করতে করতে বা'র হওয়া গেল। আমরা সর্ব্বপ্রথম রাজার সাধনমঞ্চে এলাম। সাধনমঞ্চের কোন চিহ্ন নাই; একটি প্রকাণ্ড খানা। শুনলাম এই সাধনমঞ্চ তৈরি হয়েছিল যে ইঁটে, তার প্রত্যেকখানিতে 'ওঁ তৎসৎ' লেখা ছিল। শাবল দিয়ে অনেক খোঁড়াখুঁড়ি করা সত্ত্বেও এক টুকরা ইঁটও পাওয়া গেল না। এই স্থানটি বিক্রী হয়ে গিয়েছে। ক্রেতা স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একখানি ইঁটও অবশিষ্ট রাখে নি। সাধনমঞ্চের দুর্দ্দশা দেখে চোখে জল এল। এখান থেকে সামান্য দূরে তুলসী-মঞ্চ দেখলাম এখনও অটুট; মঞ্চটি অতীতের রায়বংশের ভক্তির সাক্ষ্য দিতেছে।

এর পর আমরা লাঙ্গুলপাড়ায় এলাম। সেখানে রাজার পৈতৃক বিগ্রহ রাধাগোবিন্দের মন্দির দর্শন করলাম। চারি দিক বনজঙ্গলে পূর্ণ ছাদহীন মন্দিরের গায়ে অশ্বত্থ, বট ও আগাছার শিকড় নেমেছে। আমরা রঘুনাথপুরেও গেলাম। স্থানীয় শ্মশানের (এখন মাঠ) পিছন দিকে রাজার কাছারি-বাড়ী। বাড়ীটি দোতলা, ডান দিকে তিনতলা কুঠরী আছে—সবই ধ্বংসের পথে। কাছারিবাড়ীর আপিসঘরে কড়িকাঠস্পর্শী বই-কেতাব, হয়ত জমিদারী সংক্রান্তই হবে। বারান্দায় রাজা ও তাঁর পিতা রামকান্তের ব্যবহৃত দুইখানি প্রকাণ্ড পাল্কী জীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। স্পর্শ করে প্রণাম করলাম। ভিতরের দিকে কুলদেবতা রাধাগোবিন্দের মূর্ত্তি রয়েছে, পালাক্রমে আজও পুরোহিত দ্বারা নিয়মিত তাঁর পূজা হয়। মূর্ত্তিটি পিতলের।

তার পর আমরা লাঙ্গুলপাড়ার গোলঘর ও তালপুকুরে পৌঁছলাম। নারীজাতির প্রতি রামমোহনের মাতৃত্ববোধ ও অগাধ সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া গেল এখানে। দূরের গ্রামাঞ্চল থেকে গ্রাম্যবধূ ও কন্যারা এই তালপুকুরে জল নিতে আসতেন মাটির কলসী-কাঁখে। এই পুকুরের কাছে একটি ঘরে রাজা অসংখ্য মাটির কলসী রেখে দিতেন মহিলা

ও বালিকাদের কষ্টলাঘবের জন্য। কলসী ভেঙ্গে গেলে দূরে তাদের বাড়ী গিয়ে আবার কলসী যাতে না আনতে হয় সেজন্য এই ব্যবস্থা। তাঁর মহৎ হৃদয়খানি ছিল করুণারস-সিক্ত।

প্রাচীন ব্রাহ্ম শ্রীযুত হাজারিলাল ভড় মহাশয়ের বাড়ীও আমরা গিয়েছিলাম। সেখানে গান এবং উপাসনার পর বাড়ীখানি ঘুরে ঘুরে দেখে নিলাম। হাজারিবাবুর স্ত্রী সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। তবুও সুগৃহিণীপনার ছাপ গৃহের প্রত্যেকটি জিনিসেই রয়েছে। কাপড়, কার্পেট, কাঁথা প্রভৃতি সেলাইয়ের নিদর্শনগুলি শিল্পীর নিপুণতার পরিচয়

স্মৃতিভবনের সম্মুখভাগ

দিচ্ছে। তিনি বাড়ীতে গ্রাম্যবালিকা ও বধূদের জন্য একটি বিদ্যালয় করেছিলেন এবং নিজে তাদের পড়াতেন ও সেলাই শিক্ষা দিতেন। অন্যান্য মহিলাদের মুখেও তাঁর অজস্র প্রশংসা শুনলাম। তিনি মহীয়সী মহিলা ছিলেন। গ্রামবাসীরা তাঁকে হারিয়ে নিজেদের অসহায় বোধ করছেন।

আমরা পুনরায় স্মৃতিমন্দিরে গেলাম। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকগণ রন্ধনাদি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, আমরা তিনটি মহিলা তাদের তরকারি কাটায় সাহায্য করলাম। তার পর পুষ্করিণীতে স্নান করতে গেলাম। পুকুরের পারে অসংখ্য আমগাছ; প্রত্যেক গাছেই থোকা থোকা আম। এক বৃদ্ধা মহিলা আমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করলেন। একজন ভদ্রলোকের গৃহে রাজা রামমোহন ও তাঁহার পিতার স্বহস্তলিখিত চিঠি দেখলাম। বিকালে সভা আরম্ভ হ'ল। নব্যভারতের আদিগুরু রাজা রামমোহনের নিকট নারীজাতি যে কত ঋণী সে সম্বন্ধে কিছু বলবার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম।

রঘুনাথপুরের একটি দৃশ্য

সভা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময়ে দূরের গ্রামাঞ্চল থেকে মহিলারা হারিকেন নিয়ে সভায় যোগ দিতে আসেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে পরম তৃপ্তি লাভ করলাম। তাঁদের সরলতা, সরস হৃদয় ও রাজা রামমোহনের প্রতি অগাধ ভক্তিতে আমরা অতিশয় মুগ্ধ হলাম।

কয়েকজন যাত্রী দণ্ডায়মান

রাজা রামমোহনের প্রতি আবালবৃদ্ধবনিতার কি অপূর্ব্ব শ্রদ্ধা! রাজাকে কত আপনার জন মনে করেন তাঁরা। আট থেকে ষোল-সতর বৎসর বয়সের বালকেরা সব সময় আমাদের সঙ্গ নিয়েই রয়েছিল। কিসে আমাদের আরাম হবে সেদিকে তাদের দৃষ্টি। ভালবাসার নিদর্শন-স্বরূপ কেউ চাঁপাফুল, কেউ গোলাপ, কেউ কাঁচা আম এনে আমাদের তৃপ্তি দিলে।

আহারের ভার যাঁরা নিয়েছিলেন তাঁদের সেবাযত্ন, অমায়িক ব্যবহার হৃদয়ের মণিকোঠায় সযত্নে সঞ্চয় করে আনলাম।

আজ আমাদের বিদায়ের পালা। ভোর চারটা হতে রান্না চলছে। সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ আহার সেরে রওনা হলাম। কয়েক জন স্বেচ্ছাসেবক মোটরে করে অনেক দূর পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এলেন। এবার গড়ের ঘাটে আসতে কষ্ট হয় নি, মোটরে যথেষ্ট জায়গা ছিল।

গড়ের ঘাটে পৌঁছলাম। এখান থেকে শহরে যে রাস্তা গিয়েছে সেই রাস্তাটির নামকরণ হয়েছে "রামমোহন রায় রোড"। দেখে খুব আনন্দ হ'ল। স্থানীয় দোকানীরা জিজ্ঞাসা করলে, "আপনারা কি ব্রাহ্ম? তবে রামমোহনের কীর্ত্তিরক্ষা এবার হতেই হবে।" সাধারণের মধ্যে রাজার প্রতি এইরূপ শ্রদ্ধাভক্তি ও তাঁর স্মৃতিরক্ষার আগ্রহ দেখে বাস্তবিকই নিজেদের অক্ষমতার কথা ভেবে মর্ম্মাহত হলাম। রামমোহনের অগাধ পাণ্ডিত্য, ধর্ম্মনিষ্ঠা, দেশ ও সমাজ-সংস্কার, স্বাধীনতাপ্রিয়তা—এককথায় তাঁর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার কথা স্মরণ করে ভক্তিনত মস্তকে বারবার প্রণাম করে বলি—

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।"

ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা

শ্রীঅভয়চরণ দে

কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি—বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের উদ্‌গাতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তি দ্বারা অমরত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের নাম স্মৃতি-পটে উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতেই শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হয়।
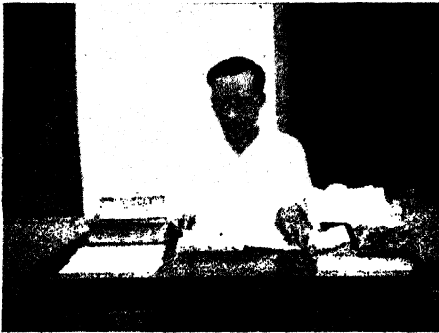
গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় পাণ্ডুলিপি পরীক্ষারত শ্রীযুক্ত অতুল্যচরণ দে

বাংলা তথা ভারতের এক সঙ্কটময় দিনে বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র জাতিকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করেন, দেশমাতৃকার ধ্যানমূর্ত্তি রূপায়িত করেন জাতির হৃদয়ে। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠে বন্দেমাতরম্ মন্ত্র। অরবিন্দের ভাষায়: "The Mantra had been given and in a single day a whole people had been converted to the religion of Patriotism", অর্থাৎ—মন্ত্র প্রদত্ত হইল এবং মাত্র একদিনে সমগ্র জাতি স্বাদেশিকতায় দীক্ষিত হইল।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান নৈহাটি কাঁঠালপাড়া আজ বাঙালীর, তথা ভারতবাসীর নিকট তীর্থক্ষেত্র—পুণ্যভূমি।

এই তীর্থক্ষেত্রে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক বসতবাটীর সংলগ্ন বৈঠকখানাটিতে 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ভবনে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন। এখান হইতে তাঁহার অমর লেখনীতে কৃষ্ণকান্তের উইল, আনন্দমঠ প্রভৃতি অমূল্য রত্নসম্ভার সৃষ্ট হইয়াছিল। এখানেই তাঁহার সাহিত্যসাধনার গোড়াপত্তন হয়। ইহাকে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসাধনার পাদপীঠ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শুধু তাহাই নহে, বাংলার কতিপয় দিক্‌পাল মনীষী ও সাহিত্য-সাধকের স্মৃতি এই ভবনের সঙ্গে বিজড়িত। বহু লেখকের রচনা-শিক্ষার 'হাতে-খড়ি' এখানেই হইয়াছিল। একথা ভাবিয়া কাঁঠাল-পাড়াবাসী মাত্রেরই শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে যে, এখানেই প্রথম বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত গাওয়া হইয়াছিল। ললিতচন্দ্র মিত্র লিখিয়াছেন: "বন্দেমাতরম্ মন্ত্র রচিত হইবার পরে বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে তদানীন্তন গায়ক ভাটপাড়ার স্বর্গীয় যদুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহাতে সুরতাল সংযুক্ত করিয়া প্রথম গাহিয়াছিলেন।" এই গৃহে বসিয়াই বন্দে-মাতরম্ সঙ্গীতের আলোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের কার্য্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলিয়াছিলেন, "এ গানের মর্ম্ম তোমরা এখন বুঝিতে পারিবে না, যদি পঁচিশ বৎসর জীবিত থাক, তখন দেখিবে এই গানে বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠিবে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকর্ম্মের অসংখ্য স্মৃতিবিজড়িত এই ভবনের পূর্ব্বদিকে গুণ্ডিচাঘর (রথের সময় এখানে বিগ্রহ লইয়া যাওয়া হয় এবং নয় দিনে নয় রকম বেশ পরানো হয়), পূর্ব্ব-দক্ষিণে গোষ্ঠপিড়ি (গোষ্ঠের সময়ে ঠাকুরকে এখানে আনা হয়), উত্তরে শিবমন্দির, দক্ষিণে পুষ্পোদ্যান। অদূরেই শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীউর মন্দির।

এখানকার শান্ত-সুন্দর পরিবেশ এই ভবনটিকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। এই ভবনেই ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ঐতিহাসিক ভবনটি যে আজ জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে তাহা বাঙালী জাতির পক্ষে গৌরবের কথা।

ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠার বিষয় বলিতে গেলে এই ভবনের সঙ্গে বিজড়িত দীর্ঘকালের ইতিহাসের কথা প্রথমে বলিতে হয়। প্রায় বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা—নৈহাটি ষ্টেশনের দক্ষিণ দিকে যে প্রাঙ্গণ আছে, রেল-কোম্পানী তাহা আরও প্রসারিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানাটি কোম্পানীর কবলিত হইবার উপক্রম হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিপূত এই ভবনটি চিরতরে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে এবং ইহার ভিত্তিভূমির উপর দিয়া বাষ্পীয় শকট যাতায়াত করিবে—দেশবাসী এই নিষ্ঠুর অবিবেচনাকে বরদাস্ত করিতে পারিল না। প্রথমে নৈহাটি-কাঁঠালপাড়াবাসী ইহার বিরোধিতা করিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তদানীন্তন সভাপতি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ইহার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিলেন। বাংলার নেতৃবৃন্দের কণ্ঠ হইতে কঠোর প্রতিবাদ-ধ্বনি উত্থিত হইল। এমনকি বাংলার বাহিরেও সাড়া পড়িল। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের অন্যতম শিষ্য এন. সি. কেলকার ইহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইলেন। দেশবাসীর প্রতিকূলতায় অবশেষে কোম্পানীর এই সঙ্কল্প ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং বঙ্কিম-সাহিত্য সম্মিলনী বঙ্কিমের স্মৃতিকে তাঁহার জন্মপল্লীতে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য এই বৈঠকখানাটি ক্রয় করিতে আগ্রহান্বিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকারী চারি দৌহিত্রের মধ্যে তিন দৌহিত্র বৈঠকখানার তিন চতুর্থাংশ বঙ্কিম-সাহিত্য সম্মিলনীকে বিক্রয় করেন। অপর সিকি অংশ এক জন দৌহিত্র বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদকে দান করেন। উক্ত সম্মিলনী কর্তৃক অপর ক্রীত অংশগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদকে প্রদত্ত হয়। এই দানপত্রগুলি ৬-৭-৩৮ এবং ২২-৭-৩৮ তারিখে রেজেষ্ট্রী করা হয় এবং বৈঠকখানাটি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের নৈহাটীর শাখা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহা শাখা-পরিষদের কার্যালয়রূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে।

এমনি ভাবে রেল-কোম্পানীর কবল হইতে ভবনটি রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু যত্নের অভাবে ক্রমে ক্রমে উহা জীর্ণদশাপ্রাপ্ত হইতে থাকে এবং অচিরে সংস্কারসাধন না করিলে এই ভবন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইবে এমন সম্ভাবনা দেখা দেয়। অথচ পরিষদের অর্থের সঙ্কুলতাও নাই। তখন অগত্যা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ নৈহাটী শাখার সম্পাদক শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইহার সংস্কারসাধন ও উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইবার জন্যও তিনি সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। পরিষদের সহ-সভাপতি, প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ এবং অতুল্যবাবুর

ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা

মধ্যে এ বিষয়ে বহুপত্র বিনিময় হয়। অবশেষে শ্রীঅতুল্যচরণ দে মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ঐতিহাসিক ভবনটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন এবং ১৭ই এপ্রিল, ১৯৫২ তারিখে 'পুরাকীর্ত্তি সংরক্ষণ আইন' (Ancient Monument Preservation Act) অনুযায়ী ইহাকে 'সংরক্ষিত' স্থান বলিয়া গেজেটে ঘোষণা করেন। শনিবার ৩১শে মে, ১৯৫২ তারিখে সাহিত্য-পরিষদের এক অধিবেশনে উক্ত ভবনটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে রেজেষ্ট্রি করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করা হয়। ৫ই জুন, ১৯৫২ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীঅতুল্যচরণ দে আলিপুরে ইহার রেজেষ্ট্রি কার্য্য সম্পাদন করেন এবং উহা সরকারের নিকট হস্তান্তরিত হয়। ৬ই জুন, ১৯৫২ নৈহাটী শাখা-পরিষদ কর্তৃক আহূত এক সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে উক্ত ভবন সরকারকে দান করা হয়। উক্ত দিবস হইতে ইহার নামকরণ হয় 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'।

এই সম্পর্কে বিগত ২৩শে মার্চ, ১৯৫৪ তারিখে প্রকাশিত এক সংবাদ হইতে জানা যায় যে, ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা জনসাধারণের কল্যাণার্থে ব্যবহৃত হইবে। উহা রাজ্যসরকারের শিক্ষা-বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিবে। উহার দৈনন্দিন কার্য্য নির্ব্বাহের ভার আট জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি সমিতির উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

এই সংগ্রহশালায় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত নানা দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সহোদর সঞ্জীবচন্দ্রের পৌত্র শ্রীশতঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় সংরক্ষণার্থে বঙ্কিমচন্দ্রের পাগড়ী, শাল, ব্যবহৃত বাক্স, রচিত গ্রন্থাবলী, দলিল, চিঠিপত্র, তাঁহার ও তদ্বংশীয়দের কতকগুলি আলোকচিত্র, বহু পুস্তক এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি গত ১৪ই নবেম্বর সংগ্রহশালার যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীঅতুল্যচরণ দে মহাশয়ের নিকট দান করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৫ সনে শ্রীশতঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটি মূল্যবান আলমারী ও বহু পুস্তক দ্বিতীয় দফায় ঐ সংগ্রহশালায় দান করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে ঐ সমস্ত মূল্যবান সামগ্রী ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় প্রদর্শনার্থ সংরক্ষিত আছে। রাজ্যসরকারের অর্থানুকূল্যে ইহার অভ্যন্তরে একটি শ্বেত প্রস্তরের ফলকে বন্দেমাতরম্ গানটি ব্রোঞ্জে বাংলা হরফে উৎকীর্ণ করা হইয়াছে। দূরদূরান্তর হইতে অনেকে এই তীর্থে আগমন করিয়া কৃতার্থ হন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এবং গবেষক এই গ্রন্থাগারে ও সংগ্রহশালায় আসিয়া নিজেদের জ্ঞানস্পৃহা চরিতার্থ করিবার সুযোগ লাভ করেন।

গত ১৮ই আগষ্ট শ্রীঅতুল্যচরণ দে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় শ্রীপান্নালাল বসুর নিকট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষাকল্পে, নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন: (১) বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা। সেজন্য একটি গৃহের সংস্থান। গৃহটি ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার নিকট হওয়াই বাঞ্ছনীয়। (২) বর্ষশেষে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচিত বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করিয়া বাংলা ভাষায় পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা। (৩) বঙ্কিম-সাহিত্যের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রাগ্-বঙ্কিম ও বঙ্কিমোত্তর সাহিত্যের আলোচনার ব্যবস্থা। (৪) ঋষি বঙ্কিম বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একদা আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "আর এই যে গৃহ, যেখানে বসিয়া তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে'র অধিকাংশ প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল, যেখান হইতে বিষবৃক্ষ তাহার অমৃতময় ফল সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিয়াছে, যেখান হইতে শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত দেশকে পবিত্র করিয়া তুলিয়াছে, যেখান হইতে কোকিলের কুহু স্বর রোহিণীকে উন্মাদিনী করিয়া দেশসুদ্ধ উন্মাদ করিয়াছে, সেই সুরম্য গৃহে বঙ্কিমবাবুর স্মৃতির কোন চিহ্নই নাই।"

অধুনা বঙ্কিমচন্দ্রের সেই গৃহে ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা স্থাপিত হওয়াতে সেই যুগস্রষ্টার স্মৃতিরক্ষার যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা পুণ্যকৃত্য বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণতা-বিধানের যে পরিকল্পনা কর্ত্তৃপক্ষের রহিয়াছে, তাহা বাস্তবে রূপায়িত হইলে বাংলা সাহিত্যের ও বাঙালীজাতির অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।
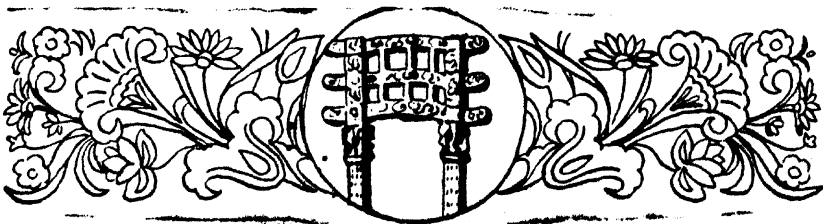
তিন পুরুষ

শ্রীঅবনীনাথ রায়

ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। মামার বাড়ীতে আমার জন্ম। সে হুগলি জেলার একখানি ছোট্ট গ্রাম। কলকাতা থেকে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে হয়েও গ্রামখানি একেবারে পিছিয়ে আছে। রেল-লাইনের কোন সংস্রব নেই—মাটির রাস্তাও বার মাস মেরামত অবস্থায় রাখা যায় না। দামোদরের প্রবল বন্যায় রাস্তা একেবারে ধুয়ে মুছে মাঠের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়।

ছোট্ট গ্রামখানির পাশ দিয়ে শীর্ণা একটি নদী বয়ে গিয়েছে। তাতে বারো মাস সামান্য জল থাকে, কিন্তু বর্ষার সময় খুব জল হয়। চারি পাশে ধানের ক্ষেত, তালগাছ, রয়নাগাছ এবং জামগাছের প্রাচুর্য। রয়নার ফল ঘানিতে ভাঙিয়ে বেড়ীর তেল হয়—সেই তেলে প্রদীপ জ্বলে। এই প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝখানে নাম-গোত্রহীন গ্রামখানি তার প্রাচীন কালের মনোভাব এবং ইতিহাস নিয়ে ঘুমিয়ে আছে।

এই পিছিয়ে-পড়া গ্রামের প্রাগৈতিহাসিক পট-ভূমিকায় এক দিন একটি নূতন অতিথির আবির্ভাব হ'ল। সে অতিথি আমি। দিদিমা শঙ্খধ্বনি করে আমার আগমনবার্তা পাড়াপড়শীর কাছে ঘোষণা করে দিলেন। নবজাতককে দেখার জন্য নানা জাতির লোক সমাগম হতে লাগল—তার মধ্যে শুধু ব্রাহ্মণ কায়স্থ আছে তাই নয়, দুলে (জেলে), বাগদী, গোয়ালা এবং কৈবর্তও আছে। দিদিমা শুধু ব্রাহ্মণ, কায়স্থের "দিদিমণি" নন, জাতিধর্ম এবং বয়স নির্বিশেষে সকলেরই "দিদিঠাকরুণ"…।

দিদিমার জগতে রামায়ণ মহাভারতের রাজত্ব—ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্য শাঁকচুন্নির অবাধ গতিবিধি। সেখানে বিচিত্রবেশধারী ভূতের ওঝা এসে চণ্ড নামায়—সাপের ওঝা এসে সাপে কাটা রোগীকে বাঁচিয়ে তোলে। সন্ধ্যার পরে বিছানায় শুয়ে দিদিমা ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্প বলেন, নাতি না ঘুমুলে তাকে "হেঁড়েথুনী"র ভয় দেখান—যে "হেঁড়েথুনী" তালগাছে বাস করে এবং যে ছেলে কানের উপর প্রচুর হস্তামর্ষণ সত্ত্বেও ঘুমোয় না, তার কানটা কেটে নিয়ে তালগাছে গিয়ে নাচতে আরম্ভ করে।

দিদিমার "হেঁড়েথুনী"র চেহারা বালকের কল্পনায় যত অস্পষ্ট হোক, তাঁর আদরযত্ন অত্যন্ত স্পষ্ট। ভোরে উঠেই একটা বাঁশের দণ্ড নিয়ে দিদিমা ঘোল মুইতে সুরু করেন, সুগন্ধে ঘর ভরে যায়, শিশিরকণার মত দধিনিঃসৃত ঘোলের কণা বালকের গায়ে এসে ছিটিয়ে পড়ে। মন্থনের ফলে যে মাখন ওঠে তার থেকে ঘি হয়, ঘোল ত থাকেই—মুড়ি আর ঘোল দিয়ে ফলার বালকের নিয়মিত বরাদ্দ। বাড়ীতে আর বেশী লোক নেই—দিদিমা, নাতি, আর একজন চাকর—নাম ভুষণো। ঘি, দুধ, দই, ঘোল অপর্য্যাপ্ত—বড় বড় সাদা রঙের মুড়িও প্রচুর। বালকের পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব হয় না।

গ্রামে স্কুলের বালাই নেই। এ হেন পরিবেশের মধ্যে লেখা-পড়া হওয়ার কথা নয়—হয়ও না। যা হয় তা হচ্ছে "কথামালা" থেকে শুনে শুনে কিছু কবিতা মুখস্থ—শুক ও সারির উপাখ্যান ইত্যাদি। আর মনের মধ্যে বাসা বাঁধে অজস্র ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্য—ভূতের ওঝা—যে ভূতের পাল্কীতে চড়ে যাতায়াত করে, কিন্তু এক দিন একটু অসাবধান হওয়ার ফলে ভূতের হাতেই যার প্রাণ যায়।

দিদিঠাকরুণের বাড়ীর পাশেই একখানি ছোট্ট দোকান—সামান্য ডাল, সরষের তেল, কেরোসিন তেল, নুন এই রকম কয়েকটি জিনিষ নিয়ে দোকানদারের ভাণ্ডার সমাপ্ত। খরিদ্দার গ্রামের চাষাভুষো লোকেরা—কতই বা বিক্রী! দোকানদার সেই জিনিষ-পত্র আগলে বসে থাকে—অবসর সময় রামায়ণ পড়ে কিংবা পাঁজি দেখে। ছোট্ট বালকটি সেখানে গিয়ে বড় সুবিধে করতে পারে না—দোকানীকে অনাবশ্যক গম্ভীর বলে মনে হয়। দোকানের আনাচে কানাচে ঘুরে ফিরে আবার চলে আসে। বরঞ্চ নদী তার নিত্য সঙ্গী—একটা বাঁশের চটা নিয়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়। খানিক দূর ভেসে গেলে আনন্দে নৃত্য করতে থাকে—আবার ধরে নিয়ে আসে—আবার ভাসিয়ে দেয়—এই রকম করে "নৌকো নৌকো" খেলা জমে ওঠে। দিদিমা রাগ করেন—এতক্ষণ জলে থাকতে নেই বলে তিরস্কার করেন। দিদিমা "নৌকো নৌকো" খেলার আনন্দ নিশ্চয়ই বুঝতে পারেন না।

দিদিমা একদিন বললেন, 'জানিস দলি, সুধীর (আমার বাবার নাম) যখন এসেছিলেন তখন তাঁর তামাক খাওয়ার অভ্যাস ছিল। কল্কের গুল ঝেড়ে তামাক খেতেন। এই রকম করে ঘরের মেঝেয় কল্কের গুল এবং ছাই অনেক জমা হয়েছিল—সুধীর চলে যাওয়ার পরও আমি সেই ছাই ঝাট দিয়ে ফেলতে পারি নি। অমনি ভাবেই রেখে দিয়েছিলাম অনেক দিন—সেগুলোর দিকে তাকালেই সুধীরের কথা মনে পড়ত। তার পর একদিন ভুষণো মুখপোড়া সব পরিষ্কার করে ফেলেছিল, ভুষণোর দোষ দিতে পারি নে—সে এই ছাই রক্ষার সুগোপন ইতিহাস অনুমান করতে পারে নি।

কৈশোরের সেই ঝাপসা স্মৃতির কুহেলি অস্পষ্টতায় আর বেশী কিছু মনে পড়ে না। মনে থাকার কথাও নয়—সেটা জ্ঞানোন্মেষের প্রথম স্তর বলা যায়। তবু কিন্তু দিদিমার অত্যুজ্জ্বল স্নেহময়ী মূর্ত্তি-খানি স্পষ্ট মনে আছে—যে কুসুম ঠাকরুণ আশেপাশের লোক-

দের কাছে ভয় এবং সমীহ করার মানুষ ছিলেন, তিনিই ছোট্ট নাতিটির কোমল বাহুবন্ধনের মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করে-ছিলেন। বার্দ্ধক্য সত্ত্বেও দুধে আলতায় মেশানো সুগৌর রং ফেটে পড়ছে—মুখে চোখে আভিজাত্যের ছাপ—পান খাওয়া মুখখানিতে সুরভিত মশলার গন্ধ যেন মোহাবিষ্ট করে ফেলত। এমনি ছিলেন আমার দিদিমা। তেজ এবং স্নেহের অপূর্ব্ব সমন্বয়। তিনি অকৃপণ হস্তে স্নেহের দান উজাড় করে দিয়েছেন—আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তা গ্রহণ করেছি।

২

এর পর দীর্ঘ কুড়ি বছর কেটে গিয়েছে। যে শিশু একদা সেই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিল সে এখন সেখানে হেডমাষ্টার হয়ে এসেছে। ঠিক সেই গ্রামেই নয়—তার কাছেই এক মাইল দেড় মাইলের মধ্যে একটি নতুন হাই স্কুল স্থাপিত হয়েছে। স্কুলের সেক্রেটারী কলকাতায় থাকেন—হাইকোর্টের উকীল। তিনি এক দিন সন্ধ্যায় আমাকে ডেকে বললেন, "দেখ বিমল, আমাদের স্কুলের হেডমাষ্টার হঠাৎ চলে গেছেন। স্কুলটার পড়াশোনা কিছুই হচ্ছে না, তুমি গিয়ে চার্জ্জ নাও। তুমি এবার বি-এ পরীক্ষা দিয়েছ—ফল এখনও বেরোয় নি তা আমি জানি। কিন্তু তুমি পাস হবেই—তাই স্কুলটার আর অনর্থক ক্ষতি না করে তুমি চলে যাও।"

প্রস্তাবটি মনে আনন্দের শিহরণ জাগিয়ে তুলল, তখন আমি কুড়ি একুশ বৎসরের যুবা—একেবারে একটা স্কুলের হেডমাষ্টার হতে পারব এ চিন্তা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ছিল। তার উপর আবার সেই স্কুল আমার মামার বাড়ীর কাছেই—প্রতি শনিবার এবং ছুটিছাটার দিন মামার বাড়ী যেতে পারব—দিদিমাকে দেখতে পাব। আনন্দের সঙ্গে সেক্রেটারীর প্রস্তাবে রাজী হলাম। কয়েক দিনের মধ্যেই বিছানাপত্র বেঁধে টিনের তোরঙ্গ নিয়ে স্কুলের বোর্ডিঙে গিয়ে হাজির হলাম।

স্কুলটি ভালই লাগল। রায়বাহাদুর ক্ষীরোদপ্রসাদ পাল বাল্যে দরিদ্র অবস্থার জন্য লেখাপড়া শিখতে পারেন নি। তাই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যদি কোন দিন অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, তবে শিক্ষাকে তিনি সুলভ করে দেবেন—যাতে এই জীবনপথের পাথেয় থেকে কেউ বঞ্চিত না হয়, সে ব্যবস্থা তিনি করবেন। করেছেনও—নিজের গ্রামে অবৈতনিক স্কুল করে দিয়েছেন যাতে দরিদ্র গ্রাম-বাসীরা বিনা পয়সায় লেখাপড়া শিখতে পারে। এই সেই স্কুল। তাঁর উইলে স্কুলের খরচ চালানোর দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করে গিয়েছেন।

নদীর একেবারে পাড়ের উপরই স্কুল। বোর্ডিং—বোর্ডিঙের পর একটুখানি খোলা মাঠ—তারই এক প্রান্তে ক্ষীরোদ পাল মহা-শয়ের প্রস্তরমূর্ত্তি—তার পর স্কুলের বাড়ী। বাড়ীর আঙ্গিনায় গাঁদাফুলের, দোপাটি ফুলের বাগান। স্কুলের ছেলেরা উগ্র উদ্ধত প্রকৃতির নয়—নম্র এবং বিনয়ী। সবসুদ্ধ শান্ত পরিবেশটি খুব মনঃ-পূত হ'ল।

শনিবারে মামার বাড়ী গেলাম। দিদিমা ঠিক আগের মতই প্রসন্ন চিত্তে আমাকে গ্রহণ করলেন। তাঁর স্নেহের এখন অনেক ভাগীদার জুটেছে—প্রধান অংশীদার আমার মামার ছেলেমেয়েরা; কিন্তু তবু দেখলাম দিদিমার বিরাট স্নেহাঞ্চলতলে আমার জায়গা বেদখল হয় নি—ঠিক কায়েম আছে। বরঞ্চ দিদিমা যাকে একদা ছোটবেলায় মানুষ করেছিলেন সে যে আজ আবার হেডমাষ্টার হয়ে সেখানেই ফিরে এসেছে, এতে গৌরব বোধ করছেন।

আমার মামা একদিন বললেন, "বামনার মাঠে আমাদের যে একশ' বিঘে নিষ্কর জমি আছে, তাই নিয়ে অনেক দিন থেকে মোকদ্দমা চলেছে। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে কোর্ট ইন্সপেক্টার বাবু তার সরেজমিনে তদারক করতে আসবেন। তিনি লেখাপড়া জানা লোক—তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলার জন্য তুমি উপস্থিত থাকলে ভাল হয়।" আমি উপস্থিত থাকতে রাজী হলাম।

যথাসময়ে কোর্ট ইন্সপেক্টার তদারক করতে এলেন। আমার দাদামশায়, মামা এঁরা মোকদ্দমায় একটি পক্ষ বলে কোর্ট ইন্সপেক্টার বাবুকে আমার মামাবাড়ী এনে উঠানো গেল না। উঠানো হ'ল আমার মামার এক বন্ধুর বাড়ী—কিন্তু তাঁর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা আমার মধ্যস্থতায় আমার মামারাই করলেন।

কোর্ট বাবু পূর্ব্ববঙ্গের লোক—বেশ সরল সাদাসিধে মানুষ—আমার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল। আমি কাছে কাছে আছি দেখে অপর পক্ষ তাঁর কাছ ঘেঁষতে সাহস করল না। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কি হবে অর্থাৎ লুচি, না ভাত, আমার মামা জেনে নিতে বললেন। আমি তাই জিজ্ঞাসা করলাম—উত্তরে কোর্টবাবু বললেন, "হঃ, লুচি খাইতে কি? লুচি খাইতে পারি।"…

কোর্টবাবু মহকুমায় ফিরে গিয়ে রায় দিলেন, তিনি তদন্ত করে জেনেছেন জমি আমার দাদামশায়ের। বলা বাহুল্য, কথাপ্রসঙ্গে আমি জমির ইতিহাস কোর্টবাবুকে শুনিয়ে দিয়েছিলাম।

আমার নিজের গ্রামেও একটি হাই স্কুল ছিল। গরমের ছুটিতে যখন বাড়ী গেলাম তখন সেই স্কুলের সেক্রেটারী বললেন, "বিমল, শুনলাম তুমি মাষ্টারি করছ। তা যদি মাষ্টারি করাই সাব্যস্ত করে থাক ত বিদেশে কেন? গ্রামের স্কুলেও ত হেডমাষ্টারি করতে পার। সে পোষ্টও ত খালি রয়েছে।"

বাড়ীর লোকের আগ্রহাতিশয্যে দেশের স্কুলের মাষ্টারিই নিতে হ'ল। এক দিন অনেক ছাত্রের চোখের জলের এবং নিজেরও চোখের জলের ভিতর দিয়ে ক্ষীরোদ পালের স্কুল ত্যাগ করলাম। রেল ষ্টেশন স্কুল থেকে আট মাইল পথেরও উপর—বহু ছাত্র দুপুরের রৌদ্রে আমার সঙ্গে হেঁটে এসে আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে গেল। দু'জন ছাত্র ত তাদের বাক্স বিছানা নিয়ে আমার সঙ্গী হ'ল—তারা আমার কাছে এই নতুন স্কুলে পড়বে।

৩

সময় কারও জন্যে অপেক্ষা করে না—ছায়াচিত্রের ছবির মত

ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে এসে পৌঁছয় এবং বর্ত্তমান একদিন অতীতে মিশে যায়।

আমার জীবনেও তাই হ'ল—গ্রামের স্কুলের মাষ্টারি ছেড়ে দিয়ে একদিন সরকারী চাকরি গ্রহণ করলাম। তার পর দীর্ঘদিন—সুদীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর—বাংলার বাইরে চাকরি করে কাটানো গেল। বহুকাল পরে পেন্সন নিয়ে আবার বাংলাদেশে একদা ফিরে এলাম।

মনে করলাম একবার মামার বাড়ী যাব। আমার অনেক সাধের মামার বাড়ী—আমার শৈশবের লীলানিকেতন, আমার যৌবনের প্রথম উন্মাদনার কর্ম্মক্ষেত্র।

এই দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে মামারও অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে—দাদামশায় বেঁচে নেই, দিদিমা বেঁচে নেই, মামাবাবু বেঁচে নেই, মাসীমা বেঁচে নেই। এখন সেখানে তৃতীয় পুরুষের অধিকার অর্থাৎ আমার মামার ছেলেদের। তারাই এখন বাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষ—বাড়ীদেরের উন্নতিই করেছে, অবনতি করে নি। বর্ত্তমান যুগের উপযোগী অনেক আসবাবপত্রও হয়েছে—যা তখনকার দিনে অপরিজ্ঞাত ছিল। কিন্তু তবু মনটা কেমন খুঁতখুঁত করতে লাগল। আমার দিদিমা বেঁচে নেই। তাঁকে যেন ঐ বাড়ীর সঙ্গে এক করে দেখা আমার পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। তিনি রকের উপর তাঁর নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে নেই, তাঁর উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে না, বাড়ীর চারিপাশের আবহাওয়া তাঁর উপস্থিতির মাধুর্য্যে গম গম করছে না—মনে হ'ল এ যেন আমি আর কোন বাড়ীতে এসেছি।

গ্রামের অঙ্গেও কম পরিবর্ত্তন হয় নি—বন্যার সময় যে নদীর এপার-ওপার দেখা যেত না, সে এখন শীর্ণ হয়ে মাঝখানে একটুখানি জল নিয়ে ধুকছে। বড় পুকুরটা প্রায় বুজে যাওয়ার সামিল। তিনটে বকুল গাছের মধ্যে দুটো ঝড়ে পড়ে গিয়েছে—বিশেষ করে সেই বড় বকুলগাছটা নেই—যার ডালে নাকি ব্রহ্মদৈত্য বাস করত, দুপুর রাত্রে যার পুজোর ধূপধুনোর গন্ধ পাওয়া যেত, কাঁসর-ঘণ্টার বাজনা শোনা যেত।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ চমক ভাঙলো একটি মেয়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার স্পর্শে। সে বললে, জ্যাঠামণি, আপনি আসবেন সেই চিঠি পেয়ে অবধি আমরা কেবল দিন গুনছি। আপনি এই চৌকিটার উপর বসুন, আমি জল দিয়ে পা ধুইয়ে দিই।

আমার মামার বড় ছেলে সুশীল পরিচয় করিয়ে দিলে—বললে, এটি আমার বড় মেয়ে গণি, এদের মা বেঁচে নেই। তাকিয়ে দেখি, আরো দুটি মেয়ে প্রণাম করবে বলে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে—ছোটটি নেহাত শিশু, একেবারে পাঁচ-ছয় বছরের।

এই তিনটি মেয়ের হাতে আত্মসমর্পণ করতে হ'ল। তারা তাদের জ্যাঠামণির সমস্ত ভার গ্রহণ করল। পা ধুইয়ে, পুছিয়ে গরম তেল মালিশ করে, মাথার পাকা চুল তুলে দিয়ে, জল তুলে স্নান করিয়ে একেবারে মহা কলরবে সমাদর সুরু করে দিলে।

পথশ্রমে ক্লান্ত হয়েছিলাম। দুপুরে খুব ঘুম হ'ল। বিকেলে উঠে দেখি গণি উনানের পিঠে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে কি তৈরি করছে। সকাল থেকে খাওয়ার পর্ব্ব চলেইছে—এই সরবৎ, এই চা, জলখাবার, পান ইত্যাদি। খাওয়া হয়েছেও খুব বেলায়, সুতরাং ক্ষিধে নেই। আমাদের খাইয়ে দাইয়ে তার পর মেয়েটা খেয়েছে—আমরা বিশ্রাম করে উঠলাম কিন্তু মেয়েটার কি আলস্য বলে কিছু নেই? খেয়ে উঠেই আবার তার জ্যাঠামণির জন্য খাবার তৈরি করতে বসেছে। ছেলেমানুষ—পনের-যোলর বেশী বয়স নয়—মা থাকতে কিছু করে নি, সুতরাং খুব যে পটু তাও নয়, কিন্তু আগ্রহ অপরিসীম।

কথাটা বলেই ফেললাম। শুনে গণি বললে, জ্যাঠামণি, আপনি মাত্র দু'দিন থাকবেন—কত জিনিষ তৈরি করে খাওয়াবো ভেবেছিলাম, কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে ক'টা জিনিষ তৈরি করা যায়?

সেবাই যে নারীর মাধুর্য্যের শ্রেষ্ঠ রূপ তা গণির কথায় মূর্ত্ত হয়ে উঠল। দিদিমা বেঁচে নেই তাতে কি হয়েছে? দিদিমাই আবার গণির মধ্যে তাঁর বুকভরা স্নেহ-ভালবাসা নিয়ে ফিরে এসেছেন।

রাত্রে সকলে মিলে বসে আমাদের গল্পের আসর জমে উঠেছিল। সুশীল বললে, শেষবার আঁতুড় থেকে বেরিয়ে আমার স্ত্রীর শরীরে রক্ত বলে আর কিছু ছিল না। ডাক্তার বললে, রক্তহীনতা। তাই নিয়ে মাসখানেক ভুগেছিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। সে-ও একদিন চলে গেল।

সুশীলের ছোট মেয়েটিও যে সেখানে বসেছিল সেটা আমরা লক্ষ্য করি নি। লক্ষ্য করলাম তখন যখন সে বললে, বাবা, আমার মা ত গঙ্গাস্নান করতে গেছে, না?

সুশীল তাড়াতাড়ি বললে, হাঁ মা, তাই ত। আমি তোমার মায়ের কথা ত বলি নি, আমি আমার মায়ের কথা বলছিলাম।

আমি অতি কষ্টে চোখের জল রোধ করেছিলাম। পরে ঘটনাটি সুশীলের মুখে শুনেছি। মায়ের মৃত্যুর পর সুশীলের ছোট মেয়েটি মামার বাড়ী গিয়েছিল। সেখানে তার মাসীমাকে দেখে মা বলে জড়িয়ে ধরে এবং তাকে একলা ফেলে চলে আসে, তার জন্য অনেক নালিশ এবং কান্নাকাটি করে। যতদিন মামার বাড়ী ছিল মাসীমাও জানতে দেন নি যে তিনি মা নন, মাতৃস্নেহেই তাকে পালন করেছেন। তার পর যখন তার ফিরে আসার সময় হ'ল, তখন সে আর মাকে ছেড়ে কিছুতেই আসবে না। মাসীমা শেষে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তিনি গঙ্গাস্নান করে তার পর ফিরবেন। বাড়ীর পাশেই গঙ্গা।

বালিকা তার পর থেকে কেবলই দিন গোণে, কবে তার মায়ের গঙ্গাস্নান শেষ হবে এবং তিনি তার কাছে ফিরে আসবেন।

আমার কলকাতা ফেরার সময় আসন্ন হ'ল। পায়ে হাঁটা পথ—দশ-বারো মাইল হেঁটে ট্রেন ধরতে হবে। আমি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম। আমার মামার দুই ছেলে ত আছেই। কারো বাধা না মেনে তারাও আমার সঙ্গে বেরুল। আমি যখন ওখানকার স্কুলে মাষ্টারি করি তখন হাতের অঞ্জলি ভরে

পানের খিলি নিয়ে বেরুতাম—মামার বাড়ী থেকে স্কুল পর্য্যন্ত দেড় মাইল পথ পান চিবুতে চিবুতে যেতাম। খবরটা কি রকম করে গণির কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। এ কয়দিন ত সমানে পান সরবরাহ করেছে, আজ রওনা হওয়ার সময়ও অঞ্জলিভরে পান দিল। তার পর আমাকে এগিয়ে দেবে বলে পথে নেমে দাঁড়াল।

বর্ষাকাল। নদী-নালা সব জলে ভরপুর। খানিক দূর এসে সামনে একটি নালা পড়ল। আমি ফিরে দাঁড়িয়ে বললাম, গণি-মা, আর নয়। তুমি এইবার ফেরো। এই জল পেরিয়ে তুমি আর আসতে পারবে না।

গণি থমকে দাঁড়াল—কাপড় বাঁচিয়ে সে জল পেরনো তার পক্ষে অসাধ্য ছিল।

ছোট মেয়ে দুটি এবং আমার মামার দুই ছেলে তারা সেখানেও নিরস্ত হ'ল না। তারা হেঁটে আরো মাইলখানেক পথ এল। অবশেষে আমি একরকম জোর করে তাদের ফিরিয়ে দিলাম।

যথাকালে ট্রেন পেলাম এবং সেই ট্রেণ যখন হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছল তখন প্ল্যাটফর্ম্ম অসংখ্য দীপমালায় আলোকিত হয়ে উঠেছে। সেই প্ল্যাটফর্ম্মে সুবেশা প্রসাধনশীলা সুন্দরী বহু নারীর আনাগোনা চোখে পড়ল।

আলোকের দীপ্তিতে আমি কি সেই পাড়াগাঁয়ের মেয়েটিকে ভুলে গেলাম, আমার গণি-মা যাকে এক নালার ধারে বর্ষার জলভারাবনত মেঘের মত থমথমে মুখে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি? মেয়েটা ত কিছুই জানে না—না আছে তার রূপের ঔজ্জ্বল্য, না শিক্ষাদীক্ষা, না সভ্যতা সহবৎ! মুখ ফুটে বলারও দরকার হবে না—বিরক্ত মুখে তাকালেই সে ঘাড় গুঁজে নিঃশব্দে আমার মনের বাইরে চলে যাবে। তার দাবি নিয়ে কোনদিন তর্ক করবে না।

পাছে সেই ভুল করি তাই হাতের মুঠোর মধ্যে পানের খিলি দুটো চেপে ধরলাম। তখনো আমার সব পান নিঃশেষ হয় নি।

স্নেহ-ভালবাসা এই রকম করেই যুগে যুগে ফিরে আসে। এক যুগে আমি ছিলাম প্রসাদভিক্ষু—দিদিমা স্নেহ বিলিয়েছেন। তার পর আমি হলাম বয়স্ক—স্নেহের প্রতিদান দিলাম—দিদিমা দেখে গেলেন তাঁর স্নেহ ব্যর্থ হয় নি। তৃতীয় পুরুষে আমি স্নেহের দাতা—গণি-মা গ্রহীত্রী। অথচ একটা জীবনেই এই যুগান্তর ঘটল।

গোয়া-বিমুক্তি

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

ভারতের মানচিত্রের 'পরে একটি বিন্দু কালি,
সেই কলঙ্ক মুছিতে হইবে হৃদয়-রক্ত ঢালি'।
গেছে ইংরেজ, গিয়েছে ফরাসী, যাবে ও পর্ত্তুগীজ,
বিলুপ্ত হবে বিদেশের এই বিষাক্ত তরুবীজ।
বর্ব্বর ওই শোণিত-পিপাসু জলদস্যুর দল,
সকল বলের সেরা বল ভাবে হিংস্র পশুর বল;
নয় তাহা নয়, বিশ্ববিজয়ী আরো কিছু আছে আছে,
পাশব শক্তি বিচূর্ণ হবে আত্মবলের কাছে।
অভিনব অভিযান,
জীবন নেওয়ার ব্রত নয় এ তো, এ শুধু আত্মদান।

তাই চলেছিল দলে দলে তারা, চলেছিল সারি সারি,
মৃত্যুর মুখে অমৃত আনিতে অহিংস নরনারী।
পূর্ব্বাকাশের আলোকের মত নির্ম্মল যার যশ,
স্বাধীন ভারত, একাংশ তার আজো রবে পরবশ?
বিদেশী শাসন, বিদেশী বাঁধন, বিদেশী উপনিবেশ,
দেশ হ'তে চির-দিবসের তরে হয়ে যাক্ নিঃশেষ।
লাঠি ও বুলেটে—নিরস্ত্র তারা করে না, করে না ভয়,
হত্যার পথে সত্যাগ্রহে কে বল করিবে জয়?
জীবন সমর্পণ
যে করিতে পারে, সে পারে করিতে এ ব্রত উদ্‌যাপন।

একদা যে দেশ পুষ্ট হইল শুধু পরধন গ্রাসি'
নিষ্ঠুরতায় অপরাজের যে সে-দেশের অধিবাসী।
পশ্চিমে অতি নগণ্য আজ, সবার নিম্নে স্থান,
অতীতের মাঝে হারায়ে ফেলেছে তাহারা বর্ত্তমান।
ভেবেছে ষোড়শ শতাব্দী বুঝি এখনো হয় নি গত,
গুলি ও গোলার আঘাতে করিবে দেশের আত্মা নত,
ইয়োরোপ বুঝি তেমনিই আছে, এসিয়াও বুঝি সেই,
বয়ে যায় কাল, পর্ত্তুগালের পরিবর্ত্তন নেই।
সময় হয়েছে, তবে
স্বপ্নবিলাসী, এবার তোমায় ভারত ছাড়িতে হবে!

এসিয়ার এল নবজাগরণ, জয় প্রাচ্যের জয়,
স্বাধীন দিব্য নবভারতের হয়েছে অভ্যুদয়।
মশাল জ্বালায়ে এসেছিল ওরা অন্ধ নিশীথে কালো,
আমরা এনেছি দিনের দীপ্তি, আমরা এনেছি আলো।
আমাদের পথ শান্তির পথ শোণিত-পিচ্ছল নয়,
প্রাণের পূজারী আমরা, কিন্তু করি না প্রাণের ভয়।
সুনীল গগনে সোনার সূর্য্য, পলায় অন্ধকার,
গোয়া ও দমন-দিউয়ে ওড়ে যে ধ্বজা ত্রি-বর্ণ যার।
বুকের রক্ত দান
করিয়া আমরা রাখিব জাতির পতাকার সম্মান।

রামমোহন রায়

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

অমর মানুষের কথা মানুষ চিরকালই স্মরণ করেছে। সাধারণ স্বজনের কথা সে মনে রেখেছে মৃত্যুতিথিতে শ্রাদ্ধ করে। কিন্তু অমর মানুষের কথা সে মনে রাখে অনেক রকমে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগুরুদের স্মরণের প্রথা দেখতে পাই আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথির কথা দিয়ে পাঁজিতে। ঐসব তিথিতে তাঁদের মঠে, দেবালয়ে, আশ্রমে, শিষ্য-সম্প্রদায়ের মাঝে উৎসব হয়। সকলে সমবেত হন।

লোকোত্তর পুরুষ বা অবতারের আবির্ভাব-দিবস হিসাবে আমরা সাধারণতঃ দুটি তিথি দেখতে পাই জন্মাষ্টমী আর রামনবমী। আর যাঁরা জন্ম-মৃত্যুর অধীন মহামানব বা অবতার ছিলেন তাঁদের জন্মতিথি—যেমন, বুদ্ধদেব দশ অবতারের শেষ অবতার ছিলেন বলে মানা করা হয়, ধর্ম্মসংস্কারক শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, চৈতন্যদেব, এঁদের আবির্ভাবের দিন বলে কয়েকটি তিথি আছে। বৌদ্ধপূর্ণিমা, গৌরপূর্ণিমা, সেগুলি জন্মাষ্টমী রামনবমীর মত এতটা সার্ব্বজনীন নয়। শঙ্করাচার্য্য রামানুজের জন্ম-মৃত্যুর তিথির প্রচার তেমন নেই। গৌরাঙ্গদেবকে অবতার বলা হয়। গৌরপূর্ণিমাও কিন্তু জন্মতিথি হিসাবে পালন করা হয় শুধু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেই।

রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত পড়তে পড়তে মনে হ'ল কৈ, আমরা তাঁর জন্ম-মৃত্যু তিথি তেমনভাবে ত পালন করি না। আমরা কি ব্রিটিশ আমলের প্রথম মহামানব যিনি তাঁর কথা তেমনভাবে স্মরণ করতে ভুলে গেলাম। শুধু তাঁর মাহাত্ম্য-কথায় ও বইয়ের পাতায় লেখার ভিতরে তাঁকে আমরা মাঝে মাঝে দেখি, আলোচনাও শুনি। কিন্তু সেযুগের এত বড় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, জ্ঞানী, সামাজিক কুপ্রথার সংস্কারক, স্বদেশপ্রেমিক—যাঁর আগে পরিচ্ছন্ন স্পষ্ট চিন্তাধারায় এসব বিষয়ের আলোচনা কেউ করেন নি তাঁর কথা তেমন করে বলতে শুনি না। বলতে গেলে যে সময়ে ইংরেজী ভাষা শেখার তেমন সুযোগ ছিল না, বিলাতী সভ্যতার বিশেষ প্রচার হয় নি, বাংলা ভাষায় সুষ্ঠু গদ্য রীতিতে লেখাও তেমন প্রচলিত দেখি না সেই যুগের এই বিরাট ব্যক্তিত্বশালী মানুষ ধর্ম্ম-বিষয়ে ব্রাহ্মণ ও পাদরীদের সঙ্গে যুক্তিপূর্ণ গদ্য ভাষায় সমান বিতর্ক করেছেন, তাঁদের কটূক্তি কুযুক্তিকে হার মানিয়েছেন। তাঁর জীবন-চরিতের পাতায় পাতায়, তাঁর এই ধর্ম্মকর্ম্মের সংস্কারে, মানুষকে শ্রদ্ধা ভালবাসায় দেশপ্রেমের ইতিহাস পাই। 'শূদ্র ও নারীজাতি' তাঁর প্রীতি, সহানুভূতি লাভ করেছেন। তাঁর আগে মেয়েদের কথা এমন করে কে ভেবেছেন জানা নেই। সমগ্র ভারতবর্ষে বিরাট পুরুষ-সমাজের মাঝে তিনিই প্রথম যিনি মেয়েদের কথা ভেবেছেন, সতীদাহ-প্রথার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়েছেন, এর উচ্ছেদ করিয়েছেন। আবার অন্যদিকে একেশ্বরবাদী উপনিষদের ধর্ম্মকে বহু-দেবতাবাদী আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম থেকে পৃথক করে যিনি নূতন ভাবে প্রচার করেছিলেন (পুরাতন উপনিষদের ধর্ম্মকেই নূতন করে অবশ্য) —অথচ ধর্ম্মগুরু হয়ে বসেন নি, বা অবতার হয়ে ওঠেন নি, শিষ্য সম্প্রদায়ের কাছে, আমাদের এই গুরুবাদের দেশে এটা একান্ত আশ্চর্য্য আর দুর্লভ ঘটনা। এমন বলিষ্ঠ নির্লিপ্ত মানুষ তো আর কাউকে দেখেছি বলে মনে হয় না।

১৭৭২ অথবা ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজার জন্ম হয়, এ বিষয়ে মতভেদও আছে। সেকথা থাক। রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায় পুত্রকে তখনকার দিনের মত সংস্কৃত, আরবী ও পারস্য ভাষাই শিক্ষা দেন। রামমোহন বাইশ বছর বয়স অবধি ইংরেজী জানতেন না। তার পরে তিনি ইংরেজী শিখতে আরম্ভ করেন। ১৮০৪ সনে তিনি "তহফত-উল-মুয়াহিদ্দীন" অর্থাৎ, "একেশ্বরবাদীদিগকে প্রদত্ত উপহার" ফারসী ভাষায় এই বইখানি প্রকাশ করেন। তাঁর পাণ্ডিত্য সংস্কৃত আরবী ও ফারসী তিন ভাষাতেই সমান ছিল।

তাঁর নিজের লেখা জীবনকথা সামান্যভাবে ছোট করে লেখা—সম্ভবতঃ তাঁর তখনকার কলিকাতাস্থ বন্ধু গর্ডন সাহেবকে যা লিখে দিয়েছিলেন তাতে পাই: "ষোল বছর বয়সে আমি দেবদেবী-বাদী ধর্ম্মের বিরুদ্ধে একখানি বই লিখিয়া আত্মীয়-স্বজনের একান্ত বিরাগভাজন হই। তখন আমি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলাম। ভারতবর্ষের অন্তর্গত অনেকগুলি প্রদেশে ভ্রমণ করি। পরিশেষে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অত্যন্ত বিরাগবশতঃ ভারতবর্ষের বহির্ভূতও কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলাম। তারপর আমার বিংশতি বৎসর বয়স হইলে আমার পিতা আমাকে পুনর্ব্বার আহ্বান করিলেন, আমি পুনরায় তাঁহার স্নেহলাভ করিলাম। ইহার পর হইতেই আমি ইউরোপীয়গণের সংসর্গে থাকিতে আরম্ভ করিলাম। তাঁহাদের সাধারণতঃ অধিকতর বুদ্ধিমান, দৃঢ়তাসম্পন্ন, মিতব্যয়ী দেখিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে যে আমার কুসংস্কার ছিল তাহা পরিত্যাগ করিলাম। তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইলাম।...

"কিন্তু পৌত্তলিকতা ও অন্যান্য বিষয়ে ক্রমাগত বিদ্বেষ থাকায় ব্রাহ্মণদিগের সহিত তর্কবিতর্ক হওয়াতে সহমরণ ও অন্যান্য অনিষ্টকর প্রথা নিবারণের জন্য হস্তক্ষেপ করাতে, আমার প্রতি ব্রাহ্মণগণের বিদ্বেষ পুনরুদ্দীপিত হইল, আর আমাদের পরিবারের মধ্যে তাঁহাদের ক্ষমতা ও প্রভাব থাকাতে আমার পিতা পুনর্ব্বার আমার প্রতি বিমুখ হইলেন। কিন্তু আমাকে কিছু কিছু অর্থসাহায্য করা হইত।...

"এইসব তর্কবিতর্কে দেশবাসী আমার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, মাত্র কয়েকটি স্কটল্যাণ্ডবাসী বন্ধু ব্যতীত আর সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। আমি তাঁহাদের ও তাঁহাদের জাতির প্রতি চিরদিন কৃতজ্ঞ।

"আমার তর্কে বিতর্কে আমি কখনো হিন্দু ধর্ম্মকে আক্রমণ করি নাই, উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম্ম প্রচলিত তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল।

"কিন্তু কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিরোধ সত্ত্বেও আমার মত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

"এই সময়ে আমার ইয়োরোপ দেখিবার ইচ্ছা বলবতী হইল।

"পরিশেষে আমার আশা পূর্ণ হইল। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন সনন্দ দ্বারা ভারতবর্ষের ভাবীরাজ্য শাসন স্থিরীকৃত হইবে এবং সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল শুনানি হইবে বলিয়া আমি ১৮৩০ সনের নবেম্বরে ইংলণ্ড যাত্রা করিলাম। এতদ্ভিন্ন ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর সম্রাটকে কয়েকটি বিষয়ে অধিকারচ্যুত করাতে ইংলণ্ডের রাজকর্ম্মচারীদের নিকট আবেদন করিবার জন্ম তিনি আমার উপর ভারার্পণ করেন। তদনুসারে আমি ১৮৩১ সনের এপ্রেল মাসে ইংলণ্ডে আসিয়া উত্তীর্ণ হই।"

(৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিত রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত থেকে উদ্ধৃত।)

যত সংক্ষেপে রাজা নিজের জীবনকথা বলেছেন, তত সংক্ষেপে তাঁর জীবনের মহৎ কাজগুলি সম্পন্ন হয় নি, সেকথা সকলেই বুঝতে পারবেন।

ধর্ম্মসংস্কারের জন্ম রাজা বারবার আত্মীয়স্বজনের কাছে লাঞ্ছিত এবং গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। সমাজ-সংস্কারের জন্মও নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছেন। যে ধর্ম্মসংস্কারের জন্ম তিনি গৃহ থেকে বিতাড়িত হলেন, সেই ধর্ম্মই বহু শিক্ষিত বিক্ষিপ্তচিত্ত হিন্দুকে হিন্দু থাকায় সাহায্য করেছিল, নইলে হয়ত আমরা দেশের আরও সুসন্তানকে মধুসূদনের মত ধর্ম্মান্তরিত দেখতাম।

সতীদাহের বা সহমরণের যে ঘটনায় তিনি বিশেষ ভাবে বিচলিত হন সে হচ্ছে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগন্মোহনের স্ত্রীর সহমরণ-যাত্রা। তিনি সেই ঘটনার পর সহমরণ-প্রথার উচ্ছেদের জন্ম দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হন। রাজনারায়ণ বসুর লেখা হইতে জানা যায়, ১৮১১ সনে রাজা তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়ার সহমরণের ঘটনায় যে এই প্রতিজ্ঞা করেন সেকথা তিনি তাঁর পিতা নন্দকিশোর বসু মহাশয়ের কাছে শোনেন।

কিন্তু এই সহমরণ বা সমাজসংস্কারবিষয়ক আন্দোলন অথবা অন্য কয়েকটি মাত্র কাজের বিষয় বলে তাঁর মত মহামানবের কথা শেষ হয় না। তিনি সে যুগের এমন একজন অপূর্ব্ব মানসিক দৃঢ়তাসম্পন্ন বিরাট পুরুষ ছিলেন, যিনি একদিকে ধর্ম্মজগতে আর এক যুগ সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি হিন্দু খ্রীষ্টান মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের শাস্ত্র গভীর ভাবে আলোচনা করেছিলেন। অন্য দিকে ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারের জন্ম সেকালের শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল স্তরে এমন প্রচণ্ড আলোড়ন এনেছিলেন, যা তিনি ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। সমাজের কোন গ্লানি-অনাচারের ক্ষেত্রই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। যেখানে দুর্ব্বলের উপর অযথা অন্যায় আচরণ করা হয়েছে সেই-খানেই তিনি এগিয়ে এসেছেন। অথচ অভদ্র কটূক্তি কখনও কেউ তাঁর কাছে শুনতে পায় নি। সেই যুগেও রাজনীতিক্ষেত্রে রাজার স্পষ্ট মতামত ছিল। রাজা বলেন, "মুঘলযুগে হিন্দুদিগের রাজনৈতিক অধিকার অক্ষুন্ন ছিল—কি সৈন্য কি দেওয়ানী বিভাগে। কিন্তু স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তির জন্ম ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এবং জীবন ও সম্পত্তি সম্বন্ধীয় অধিকারের অনেক সময় হানি হইত।...

"ব্রিটিশ আমলের দুইটি দোষ আছে, প্রথম—রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে। মুসলমান যুগের মত সর্ব্বোচ্চ পদে অধিকার না থাকা। দ্বিতীয়, ভারতবর্ষের বহু অর্থ ইংলণ্ডে ব্যয় হয়ে থাকে। এই অর্থ করস্বরূপ ভারতবর্ষ দিয়ে থাকেন।"

এক সময়ে তাঁর সম্বন্ধে কোন লোক একটা অশ্রাব্য গান রচনা করে। ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত তাঁর প্রথম শিষ্য ও ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায় সেই গান শুনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সেই লোককে কিছু উচিত শিক্ষা দিতে সঙ্কল্প করেন। তাতে রামমোহন রায় তাঁকে নিজ সন্নিধানে আহ্বান করে বলেন, 'দেখ, ইংরেজেরা কত ভয়ানক বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে ভারতবর্ষ অধিকারে কৃতকার্য্য হয়েছেন। আর বিশেষ জানিবে, আলোকময় পথে সকলেই মানুষ যাইতে পারে। অন্ধকার উত্তীর্ণ হতে যিনি পারেন তিনিই মহৎ।...যে যাহা ইচ্ছা বলুক না তাহা শুনিবার প্রয়োজন কি? আপন অভীষ্ট পথ থেকে বিচ্যুত না হইলেই হইল।"

সকল মহাপুরুষের মতই রামমোহন রায়ের নামেও অনেক গল্প প্রচলিত আছে। সেগুলি কিন্তু অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত নয় অথচ অতুলনীয় চরিত্রের পরিচয় দেয়।

রাজার মাতৃকুল শাক্ত ছিলেন আর পিতৃকুল বৈষ্ণব ছিলেন। সেকালে শাক্ত বৈষ্ণবে কুটুম্বিতা হওয়া অসম্ভব ঘটনা ছিল। পূজা-পদ্ধতি, বলিদান-প্রথা, সামাজিক রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার এমন আমূল পৃথক ছিল যে, বৈষ্ণব সমাজের শাক্ত বংশের কন্যা গ্রহণ করা বা ঐ বংশে কন্যা দান করা অত্যন্ত আতঙ্কের বিষয় ছিল।

"রাজার পিতামহ ব্রজবিনোদ রায় অন্তিমকালে গঙ্গাতীরস্থ হলে শ্রীরামপুর চাতরা নিবাসী শ্যাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁর কাছে কিছু ভিক্ষার্থী হয়ে এলেন। তিনি সম্ভ্রান্তবংশীয় দেশগুরু নামে খ্যাত ছিলেন—ব্রজবিনোদ রায় প্রতিশ্রুতিদান করলেন। তিনি বললেন, মহাশয় অনুগ্রহ করে আপনার কোন একটি পুত্রের জন্ম আমার একটি কন্যাকে গ্রহণ করুন।"

শ্যাম ভট্টাচার্য্য শাক্ত এবং ভঙ্গ কুলীন; সুতরাং তাঁর প্রস্তাবে ব্রজবিনোদ রায়ের অসম্মত হবারই কথা। কিন্তু গঙ্গাতীরে ভাগী-রথীসমীপে প্রতিজ্ঞা করেছেন তাঁর কামনা পূর্ণ করবেন। তিনি কি আর করেন। অস্বীকার করা সম্ভব হ'ল না। তিনি নিজের

পুত্রদের প্রত্যেককে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। সাত পুত্রের মধ্যে ক্রমে ক্রমে ছ'জন অসম্মত হলেন। পরিশেষে পঞ্চম পুত্র রামকান্ত রায় সানন্দে পিতৃসত্য পালনে অঙ্গীকার করলেন।

এই রামকান্ত রায় এবং শ্যাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যা তারিণী দেবীর তিনটি সন্তান হয়। প্রথমে একটি কন্যা হয় তাঁর নাম জানা যায় নি। দ্বিতীয় পুত্র, নাম জগমোহন। তৃতীয় সন্তান রাজা রামমোহন রায়।

শ্রীধর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কন্যাটির বিবাহ হয়। এই শ্রীধর মুখোপাধ্যায়ের পিতা ১২৫ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। শ্রীধর মুখোপাধ্যায়েরই পুত্র গুরুদাস মুখোপাধ্যায় রামমোহন রায়ের সর্ব্বপ্রথম শিষ্য। তিনি তাঁর মাতুলকে অত্যন্ত ভালবাসতেন।

রামমোহন রায়ের জননী তারিণী দেবীকে শ্বশুর-পরিবারের সকলে ফুলঠাকুরাণী বলত। রামকান্ত রায় যেন পিতৃভক্তি ও স্বার্থত্যাগের পুরস্কারস্বরূপ রামমোহন-রূপ পুত্ররত্ন লাভ করেছিলেন।

বহু মহাপুরুষের জননীর মতই তারিণীদেবীও অতিশয় সদ্‌গুণশীলা নারী ছিলেন। তাঁর মত বুদ্ধিমতী ও ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রীলোক বিরল ছিল। প্রচলিত ধর্ম্মে তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। শেষবয়সে তিনি জগন্নাথ দর্শনের জন্য যাত্রা করেন। দেবদর্শনের জন্য যাত্রা করলে কষ্ট স্বীকার করে যেতে হয়, সেইজন্য সম্পন্ন পরিবারের গৃহিণী হওয়া সত্ত্বেও একটি দাসী পর্য্যন্ত সঙ্গে নেন নি। দুঃখিনীর মত পদব্রজে শ্রীক্ষেত্রে গিয়েছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে এক বৎসর কাল প্রতিদিন জগন্নাথ-মন্দির মার্জ্জনা করতেন সম্মার্জ্জনী দিয়ে। শোনা যায়, মৃত্যুর আগে তিনি রাজাকে বলেন, "রামমোহন তোমার কথাই ঠিক। আমি অবলা স্ত্রীলোক আর বৃদ্ধা হয়েছি, সুতরাং যেসব অনুষ্ঠানে বিশ্বাস এবং সুখ পেয়ে থাকি তা আর পরিত্যাগ করতে পারি না।"

শাক্ত বংশে ফুলঠাকুরাণীর জন্ম হলেও পতিগৃহে তিনি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিতা হন। সেই সম্বন্ধে একটি গল্প আছে।

"এক সময় কোন উৎসব উপলক্ষে কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহনকে নিয়ে তিনি পিতৃগৃহে আসেন। একদিন শ্যাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইষ্টদেবতার পূজার পর শিশু রামমোহনের হাতে পূজার বিল্বপত্র দেন।

ফুলঠাকুরাণী এসে দেখেন, রামমোহন বিল্বপত্র চর্ব্বণ করছেন। তিনি অত্যন্ত কুপিত হলেন। পুত্রের মুখ ধুয়ে দিলেন এবং পিতাকে তিরস্কার করলেন।

কন্যার তিরস্কারে শ্যাম ভট্টাচার্য্য অতিশয় ক্রুদ্ধ হলেন, কন্যাকে এই অভিশাপ দিলেন, 'এই পুত্র নিয়ে তুই কখনও সুখী হতে পারবি না। অহঙ্কার করে আমার পূজার নির্ম্মাল্য ওর মুখ থেকে ফেলে দিলি। তোর এই পুত্র কালে বিধর্ম্মী হবে।'

পিতার মুখে অভিসম্পাত শুনে ফুলঠাকুরাণী নিতান্ত কাতর হয়ে পড়লেন। শাপমুক্তির জন্য পিতার চরণ ধরে কাঁদতে লাগলেন।

শ্যাম ভট্টাচার্য্য বললেন, 'আমার কথা অব্যর্থ। তবে তোমার পুত্র রাজপূজ্য ও অসাধারণ লোক হবে।'"

গল্পটি সম্পূর্ণ অমূলক নাও হতে পারে, কিছু সত্য হয়ত ছিলই। রামমোহনের পরবর্ত্তী জীবন দেখে লোকের মুখে মুখে গল্পটি পল্লবিত পুষ্পিত হয়ে থাকবে। শোনা যায়, ফুলঠাকুরাণী শ্বশুরালয়ে ফিরে গিয়ে স্বামীকে এই কাহিনী বলেন, তাতে তাঁরা দু'জনেই নিজেদের সংস্কারানুসারে পুত্রের ধর্ম্মোন্নতি বিষয়ে যত্নশীল হন।

নিতান্ত অল্প বয়সেই রামমোহনের প্রচলিত ধর্ম্মে আন্তরিক আস্থা জন্মেছিল। গৃহদেবতা রাধাগোবিন্দজীকে তিনি যারপরনাই ভক্তি করতেন। তাঁর বিষ্ণুভক্তি এত প্রবল ছিল যে তিনি বাড়ীতে কখনো মানভঞ্জন যাত্রা হতে দিতেন না। শ্রীকৃষ্ণের মুকুটের শিখীপাখা শ্রীরাধার চরণে লুণ্ঠিত হবে, এটা ভারতের ভাবী ধর্ম্মসংস্কারকের চক্ষুশূল ছিল। এও শোনা যায়, প্রতিদিন ভাগবতের এক অধ্যায় পাঠ না করে তিনি জলগ্রহণ করতেন না। গল্প আছে তিনি বহু অর্থব্যয় করে বাইশ বার পুরশ্চরণ করেন। তাঁর ইংরেজ বন্ধু উইলিয়ম এডাম লেখেন, চৌদ্দ বছর বয়সেই সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করে যাবার সঙ্কল্প রামমোহনের হয়েছিল। শুধু জননীর কাতর মিনতিতে তিনি নিবৃত্ত হন।

সেকালে গুরুমহাশয়দের পাঠশালা চতুষ্পাঠী আর মৌলবী সাহেবদের কাছে ফারসী ও আরবী শিক্ষার স্থান মক্তব—এই তিন রকম শিক্ষালয় ছিল। শৈশবেই রামমোহনের অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে গ্রামের লোকেরা বিস্মিত হতেন। ফারসী ও আরবী শেখার জন্য তাঁর পিতা তাঁকে পাটনায় পাঠান। সেখানে তিনি দু'তিন বছর থাকেন ও সেই সময়েই আরবী ভাষায় ইউক্লিড ও এরিষ্টোটলের গ্রন্থ পাঠ করেন। সুফী-সাধকদের গ্রন্থপাঠেও তিনি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। মনে হয় একেশ্বরবাদের ভাব এই সময়েই তাঁর অন্তরে জাগে। পাটনা থেকে আরবী ও ফারসী শিক্ষা শেষ করে ফেরার পর তাঁর পিতা তাঁকে বারো বছর বয়সে কাশীতে হিন্দু শাস্ত্র ও সংস্কৃত ভাষা পড়ার জন্য পাঠালেন। সেখানে তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আশ্চর্য্য শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করলেন।

বাড়ীতে ফেরার পরও তিনি সব সময়েই ধর্ম্ম সম্বন্ধে চিন্তা করতেন, ক্রমে প্রচলিত ধর্ম্মের উপর তাঁর সংশয় জাগে। প্রথমতঃ, মুসলমান ধর্ম্মের একেশ্বরবাদ, পরে প্রাচীন হিন্দুদের ব্রহ্মজ্ঞান এই উভয়ই তাঁর ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের কারণ বলে মনে হয়।

এই সময়ে প্রায় ষোল বছর বয়সে তিনি হিন্দুদের পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালী নামে একটি বই লেখেন। তখন ইংরেজী ভাষা একেবারেই জানতেন না। অবশ্য সে বই প্রকাশ হতে পারে নি, কিন্তু ঐ রচনাতেই তাঁর পিতা তাঁর উপর বিশেষ বিরক্ত হন। পিতা-পুত্রের মধ্যে আর সদ্ভাবের কোন আশা রইল না।

রামমোহন গৃহ পরিত্যাগ করলেন। ভারতবর্ষের নানা দেশ বেড়িয়ে হিমালয় পার হয়ে তিব্বত-সীমা অবধি যান।

রাজার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও যথোচিত পরামর্শদান সম্বন্ধেও গল্প আছে।

টাকীর প্রসিদ্ধ জমিদার কালীনাথ মুন্সী রামমোহনকে অতিশয় শ্রদ্ধা করতেন ও নানা বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করতেন।

এক সময়ে এক ব্যক্তি কালীনাথ মুন্সীর নিকট একটি শাঁখ বিক্রী করতে আসে। শাঁখটির নাকি আশ্চর্য গুণ। যার কাছে থাকে কমলা অচলা হয়ে তার ঘরে বাস করেন। কোন অভাব থাকে না। শাঁখটির এমন গুণের কথা শুনে মুন্সী মহাশয় সেটি গ্রহণ করবেন স্থির করেন। আর শাঁখটির দামও পাঁচ শত মুদ্রা ঠিক হ'ল। কালীনাথ শাঁখ-বিক্রেতাকে রামমোহনের কাছে নিয়ে গেলেন, এবং পরম আহ্লাদে শাঁখটির গুণ ও তার দামের কথা রাজাকে বললেন, আর রাজার মতামতও জিজ্ঞাসা করলেন।

রামমোহন সব শুনে বললেন, "সমস্ত জগৎ যাকে চায় সকলের যিনি অভীষ্ট দেবী সেই কমলাকে যদি পাঁচ শত টাকায় কিনে গৃহে রাখা যায়, তার চেয়ে আর কি চাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই শঙ্খ-বিক্রেতা পাঁচ শত টাকার বিনিময়ে আপন চিরলক্ষ্মীকে কেন দিয়ে দিচ্ছে? পাঁচ শত টাকাই কি অচলা কমলার চেয়ে তার কাছে বড় হ'ল?"

মুন্সী মহাশয় ও তাঁর পারিষদদের যেন খটকা ভাঙল। বিনা বাক্যব্যয়ে 'অচলা কমলা বিক্রেতা'কে বিদায় দিলেন।

রাজার উপর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অসীম শ্রদ্ধা ছিল, তিনি এই মর্মে বলেছেন:

"সকল মহাপুরুষের মত রামমোহনও অত্যন্ত বিনীতস্বভাব ছিলেন। অসংখ্য লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। অনেকে ধর্ম্ম বিষয়ে তর্ক করতেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে তর্ক করার উপযুক্ত ব্যক্তি প্রায় কেউই আসতেন না। যাঁরা থাকতেন প্রায়ই অসংলগ্ন বিশৃঙ্খল কথা বলে তর্ক করতেন। কিন্তু তিনি কাউকে চলে যেতে বলতে পারতেন না। সকলের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। যখন দেখতেন তাঁর প্রতিপক্ষ অত্যন্ত নির্ব্বোধের মত কথা বলছে তখন তিনি বলতেন, "আপনি কি বলেন, এখন বাগানে একটু বেড়ালে কেমন হয়?"...কিন্তু রাজা খুব দ্রুতবেগে চলতে পারতেন, তাতে অবশেষে সে ব্যক্তি বিদায় নিতে বাধ্য হতেন।

"আমি প্রায়ই রাজার বাড়ী যেতাম। তখন রাজার সঙ্গে কোন কথাবার্ত্তাই হ'ত না। আমি শুধু তাঁর সম্মুখে বসে তাঁর সুন্দর মুখ-দর্শন করতাম। তাঁর মুখের উপর আমার অত্যন্ত আকর্ষণ ছিল। তাঁর সঙ্গে গাড়ীতে বেড়াবার সময়ে আমি পুত্তলিকার মত স্থিরভাবে বসে থাকতাম। যেমনি রাজাকে দেখতাম তাঁর বিষয়ে চিন্তায় মগ্ন থাকতাম। রাস্তায় কি হচ্ছে কিছুই জানতে পারতাম না। আমার হৃদয় এক গভীর অবর্ণনীয় ভাবে ভরা থাকত। স্পষ্ট বুঝতে পারি তাঁর সঙ্গে আমার কোনওকিছুর সম্বন্ধ ছিল।...

"যখন রাজার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় তখন আমার পিতা প্রাতঃকালে ফুল ইত্যাদি উপকরণ নিয়ে দেবতার পূজা করতেন। প্রকৃত ভক্তির সঙ্গে তিনি পূজা করতেন। কিন্তু পূজার চেয়েও রাজার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা যেন অধিক ছিল। কখনও কখনও এমন দেখা যেত যে তিনি পূজায় বসেছেন, এমন সময়ে সংবাদ পেলেন রাজা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন, পিতা তখনি পূজা থেকে উঠে তাঁকে অভ্যর্থনা করতেন। বন্ধুদের উপর এমনি রাজার প্রভাব ছিল।

"আমাদের বাড়ীতে দুর্গাপূজা উপলক্ষে একবার আমি তাঁকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়েছিলাম। চলিত প্রথা অনুসারে আমি আমার পিতামহের প্রতিনিধিস্বরূপে তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, "রামমণি ঠাকুরের বাড়ীতে আপনার দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণ।"

'আমাকে দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ?' আশ্চর্যভাবে রাজা বললেন। সেই স্বর যেন আমি এখনও কানে শুনছি। রাজা আশ্চর্য্য হলেন যে, তিনি দেবদেবীপূজার এত বিরোধী তবু লোকে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে। তিনি আমাকে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদকে নিমন্ত্রণ করতে বললেন। রাধাপ্রসাদ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

'আমাকে পূজার নিমন্ত্রণ' তিনি যখন এই কথাটি আমাকে বলেন, তাঁর মুখ ভাবেতে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। আমার জীবনে চিরকাল ঐ প্রভাব আশ্চর্য্যভাবে রয়েছে। তাঁর কথাগুলি যেন আমার কাছে গুরু-মন্ত্রস্বরূপ হয়েছিল।

ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হবার পর আমি মাঝে মাঝে লুকিয়ে তথায় যেতাম। তখনও বিষ্ণু গান করতেন। বিষ্ণুর বড় এক ভাই ছিলেন তার নাম ছিল কৃষ্ণ। রামমোহন রায়ের সমাজে তাঁরা দু'জনে একত্রে গান করতেন। গোলাম আব্বাস নামে এক মুসলমান পাখোয়াজ বাজাতেন। 'বিগত বিশেষ'—সঙ্গীতটি রাজার অত্যন্ত প্রিয় ছিল।"

রাজার শ্রেষ্ঠ শিষ্য এবং যোগ্যতম উত্তরসাধকের কথাগুলি দিয়েই রামমোহন-প্রসঙ্গের উপসংহার করছি।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ও তিব্বত-রাজ

শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

একদিন ছিল যেদিন এই বাংলার সন্তান ছিলেন ভারতের ধর্ম্মগুরু। তাঁর প্রদীপ্ত মনীষার দীপ্তিতে শুধু ভারতবর্ষ নয় সমস্ত বৌদ্ধজগৎ আলোকিত হয়েছিল। তাঁর যশ ও খ্যাতি, ত্যাগ ও জগতের কল্যাণব্রত, যোগ এবং তপস্যার জীবন সারা ভারতে পরিজ্ঞাত ছিল। নেপালের রাজা তাঁর আজ্ঞা পালন করবার জন্য প্রতীক্ষা করতেন। নেপালের যুবরাজ ভিক্ষুধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে তাঁর আদেশ প্রতিপালন করবার জন্য তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। তিব্বত-রাজ তাঁকে দেশে নিয়ে যাবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করেছিলেন। যবদ্বীপের (সুবর্ণদ্বীপ) রাজাও তাঁর কাছে ধর্ম্মবিষয়ক নানা জটিল প্রশ্ন সমাধানের জন্য দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন। গৌড়েশ্বর নরপালের সঙ্গে তাঁর সর্ব্বদা পত্রব্যবহার চলত। চীন দেশের অমিতবিক্রম সম্রাটেরা তাঁর নাম শুনলেই সিংহাসন থেকে নেমে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন।

এই অদ্বিতীয় বঙ্গসন্তানের নাম দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ। তাঁর পিতার নাম ছিল কল্যাণশ্রী আর মায়ের নাম ছিল প্রভাবতী। বাল্যকালে তাঁর মা নাম রেখেছিলেন 'চন্দ্রগর্ভ'। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণায় বজ্রযোগিনী গ্রামে ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বজ্রযোগিনী গ্রামের পশ্চিমে নাম্না আর সুয়াপুর নামে দুটি গ্রাম আছে। তারই মধ্যস্থলে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল। সেই স্থানটি খুঁড়ে এখন অনেক বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছে। তিনি সম্ভবতঃ এখানে কিছুদিন বিদ্যাশিক্ষা করেন। তারপর গয়ার বিখ্যাত বজ্রাসন বিহারেও তাঁর প্রাথমিক শিক্ষালাভ হয়।

অধ্যাপক আচার্য্য জিতারি সে সময় একজন অসাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। চন্দ্রগর্ভ তাঁর কাছে প্রথম উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। জিতারির সাহায্যে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঁচটি শাখায় শিক্ষালাভ করেন। ক্রমে বড় হয়ে তিনি ত্রিপিটক, হীনযান শ্রাবকের চার শাখা, মাধ্যমিক ও যোগাচার্য্য দর্শন ও বৈশেষিক দর্শন, আর তন্ত্রের চারটি শাখায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তীর্থকদের শাস্ত্র আর অন্যান্য বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে তিনি সেকালের একজন মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণকে পরাজিত করেন। তিনি তাঁর জীবনে ত্যাগ ও তপস্যা, জ্ঞান ও ধর্ম্মের পথ বেছে নেন। তখন তাঁর জ্ঞানপিপাসার পরিতৃপ্তি হয় নি। তিনি কৃষ্ণগিরি বিহারে রাহুলগুপ্তের কাছে গিয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। রাহুলগুপ্ত তাঁকে বৌদ্ধশাস্ত্রের গুপ্ত আধ্যাত্মিক বিদ্যায় দীক্ষিত করলেন। তাঁকে 'গুহ্যজ্ঞান বজ্র' উপাধি দিলেন। উনিশ বৎসর বয়সে ওদন্তপুর বিহারের মহাসাঙ্ঘিক আচার্য্য শীলরক্ষিত তাঁকে "দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান" উপাধি দেন। যখন তাঁর একত্রিশ বৎসর বয়স তখন আচার্য্য ধর্ম্মরক্ষিত তাঁকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভিক্ষুদের শ্রেণীতে উন্নীত করেন এবং বোধিসত্ত্বদের যে সব প্রতিশ্রুতি নিতে হয় সেগুলি তিনি গ্রহণ করেন। তারপর মগধের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্যদের কাছে তিনি কিছুদিন শিক্ষালাভ করেন এবং শূন্য থেকে জগতের উদ্ভব এই শূন্যবাদ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রচার করেন। সুবর্ণদ্বীপ ছিল তখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্র। এখানকার প্রধান আচার্য্য সে যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে খ্যাত ছিলেন।

এই সময় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান শুনলেন যে, সুবর্ণবিহারের অধ্যক্ষ চন্দ্রকীর্ত্তি বৌদ্ধশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তাঁর শিষ্যত্ব-গ্রহণের জন্য তিনি বণিকদের সঙ্গে একখানি বড় জাহাজে সুবর্ণদ্বীপ গেলেন। সমুদ্রপথে যেতে তাঁর দীর্ঘকাল লেগেছিল। তিনি বহু কষ্টে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। একাদশ শতাব্দীর প্রথম যুগে শিক্ষার্থে এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে গিয়ে তিনি যে কষ্ট স্বীকার করেছেন তার তুলনা হয় না। সুবর্ণদ্বীপে বারো বৎসর থেকে সমস্ত বৌদ্ধ শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যলাভ করে তিনি তাম্রদ্বীপে (সিংহল) আসেন। সেখান থেকে তিনি মগধে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁর জ্ঞানপিপাসা তখনও পরিতৃপ্ত হয় নি। মগধে তাঁকে সকলে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলে স্বীকার করলেন। মগধের প্রধান পণ্ডিত শান্তি, নরপাদ, কুশলী, অবধূতি, ডোম্বি প্রভৃতি তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে ও তাঁর সঙ্গলাভ করে ধন্য হলেন। তিনি সকল পণ্ডিতকে পরাজিত করলেন। সেকালের বৌদ্ধ সমাজ তাঁকে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলে নত মস্তকে স্বীকার করে নিলেন।

পাল বংশের দ্বিতীয় সম্রাট ধর্ম্মপালদেব অঙ্গদেশে (ভাগলপুর জেলায়) বিক্রমশীলা নামক স্থানে একটি মহাবিহার বা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।

গুপ্ত সম্রাটদের সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি দূরদূরান্তে ব্যাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু পাল সম্রাটেরা যখন তাঁদের

রাজধানী পাটলীপুত্র থেকে গৌড়ে নিয়ে এলেন তখন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে লাগল। তারপর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতক অংশ একদিন আগুন লেগে পুড়ে গেল। পরে ধীরে ধীরে বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় বিখ্যাত হয়ে উঠল। দেশ-দেশান্তর থেকে ছাত্রেরা এসে নালন্দার মতই এখানেও বিদ্যালাভ করতেন। বিদেশী অধ্যাপকও এখানে ছাত্র হিসাবে বাস করা গৌরবের বিষয় বলে মনে করতেন। এক এক দেশের ছাত্রদের জন্য এক একটা মহল নির্দ্দিষ্ট ছিল। ছাত্র ও শিক্ষক তখন একসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দিবারাত্র বাস করতেন। অধ্যাপকেরাও ছাত্রদের পুত্রাধিক স্নেহে শিক্ষাদান করতেন।

পালবংশের মহীপালের পুত্র সম্রাট নরপাল দীপঙ্করের প্রশংসায় আকৃষ্ট হয়ে পরম সম্মানের সঙ্গে আহ্বান করে তাঁকে বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষের পদে নিয়োগ করেন। এই সময় কর্ণরাজ (কনৌজের রাজা) বিক্রমশীলা আক্রমণ করেন। নরপালের সঙ্গে কর্ণরাজের যে যুদ্ধ হয় তাতে উভয় পক্ষেরই প্রচুর ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছিল। দীপঙ্কর মধ্যস্থতা করে দুই রাজার মধ্যে সন্ধিস্থাপন করে তাঁদের সৌহার্দ্দ্যসূত্রে আবদ্ধ করেন।

তিব্বতের যে সমস্ত ছাত্র তখন ভারতবর্ষে পড়তে আসত তারা দেশে ফিরে গিয়ে তাদের রাজা লামা ইয়েসি হোডের কাছে দীপঙ্করের অসাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি, তাঁর গুণগরিমা ও চরিত্র-মাধুর্য্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠত। তিব্বতের রাজা ছিলেন পরম ধার্ম্মিক। তখন তিব্বতে প্রচলিত বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উন্নতিবিধান করবার জন্য তিনি সাত জন দশ বৎসর-বয়স্ক বালক মনোনীত করেন। যাতে তারা বাল্যকাল থেকেই সংসারে আবদ্ধ না হয়ে নির্ম্মলচরিত্র থেকে ধর্ম্মকে রক্ষা করতে পারে এই জন্য রাজা পিতৃগণের নিকট থেকে তাদের চেয়ে নিয়ে শ্রমণ্য-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেছিলেন। এই সাতটি বালক বৌদ্ধ শাস্ত্রের চর্চ্চায় দিন কাটাত। তারা উপ-যুক্ত হয়ে উঠলে রাজা তাদের প্রত্যেকের শিক্ষাধীনে দু'জন করে বালক রাখলেন। এই ক্ষুদ্র তরুণ শ্রমণদল ক্রমে সংখ্যায় একুশ জন হ'ল। বৌদ্ধধর্ম্মের ভিতর তখন খুব কদাচার প্রবেশ করেছিল। তখন রাজা স্থির করলেন যে, ভারতবর্ষ থেকে কোন মুখ্য বৌদ্ধ পণ্ডিতকে আনিয়ে বিকৃত তান্ত্রিকতা-দূষিত তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্মকে সংশোধন করবেন। এই জন্য তিনি সেই একুশ জন শ্রমণকে কাশ্মীর ও মগধে পাঠিয়ে দিলেন। তের জন বিখ্যাত পণ্ডিত তিব্বতে যেতে স্বীকৃত হলেন। কিন্তু তখনকার দিনে পথঘাট ছিল দুর্গম ও বিপৎসঙ্কুল। সেই বিপৎসঙ্কুল পথে যেতে একুশ জন ...... উনিশ জন—পথের মধ্যে বেশীরভাগই অসুস্থ হয়ে, কেউ-বা সাপের কামড়ে প্রাণত্যাগ করেন। অবশিষ্ট দু'জন তিব্বতীয় শ্রমণের সঙ্গে ভারতীয় পণ্ডিতেরা তিব্বতে এসে পৌঁছলেন। সেই দু'জন শ্রমণের নাম হ'ল "রিনছেন্ জান পো" আর "লেগস্ পহি খিরাব"।

সেই শ্রমণ দু'জন দেশে ফিরে তাঁদের রাজাকে বললেন, "বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ দীপঙ্করের মত পণ্ডিত আর কেউ নেই। কিন্তু তাঁকে আমরা তিব্বতে আসতে বলতে সাহস করি নি।"

যে কয়জন ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতে গিয়েছিলেন, তিব্বতীয় শ্রমণেরা তাঁদের কাছে পড়তে লাগলেন। কিন্তু দীপঙ্করের প্রশংসা শুনে তাঁকে তিব্বতে আনবার জন্য রাজার মনে অধীর আগ্রহ জেগে উঠল। অবশেষে তিনি গ্যয়ৎসন গ্রুসেন গি নামে একজন বিচক্ষণ শ্রমণকে একশত অনুচর আর প্রচুর স্বর্ণ সহ বিক্রমশীলায় পাঠিয়ে দিলেন। তাদের হাতে রাজা একখানি চিঠি লিখে দিলেন। তাতে লিখলেন, সেখানে গেলে তাঁকে সর্ব্বোচ্চ সম্মান প্রদান করা হবে।

সেনগি দীপঙ্করের সঙ্গে দেখা করে খুব ভারী একখণ্ড সোনা আর তিব্বত-রাজের চিঠি দীপঙ্করের হাতে দিলেন। কিন্তু অতীশের কত কাজ। সে সব ছেড়ে গেলে অত বড় বিশ্ববিদ্যালয় চলবে কি করে? তিনি আবার অনেক ধর্ম্মসঙ্ঘ ও সমিতির পরিচালক। তিনি না দেখলে সেগুলিরই বা কি অবস্থা হবে?

দীপঙ্কর এই সব কথা উল্লেখ করে সেনগিকে বললেন—এই সব ছেড়ে আপনি আমার যাওয়ার দুটি কারণ দেখালেন। আমাকে প্রচুর সোনা দেবেন আর দ্বিতীয়তঃ সেখানে গেলে আমি প্রতিষ্ঠা ও সম্মান পাব। কিন্তু আপনাদের রাজাকে বলবেন—আমি সোনা বা সম্মানের প্রার্থী নই। এই সোনা আপনি তাঁকে ফিরিয়ে দেবেন।

সেনগি এই সব কথা শুনে কেঁদে ফেললেন। তাঁর কৌষেয় বস্ত্রের এক কোণ দিয়ে চোখ মুছতে লাগলেন। তিনি গদগদ কণ্ঠে তাঁর সব অবস্থা বর্ণনা করতে লাগলেন। শুধু তাঁর জন্যই সেনগি হিমালয়ের সুদূর উপত্যকা থেকে কত দুঃখকষ্ট সহ্য করে, কত বিপদ বরণ করে, কত অর্থ ব্যয় করে এসেছেন। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে কেউ পথে এই উষ্ণ দেশের দারুণ গরমে, কেউ জ্বরে, কেউ-বা সাপের মুখে প্রাণ দিয়েছেন। এখন যদি তিনি বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে যান তবে রাজার ক্ষোভ, মনোবেদনা ও দুঃখের সীমা-পরিসীমা থাকবে না।

এই সব কথা শুনে দীপঙ্করের মন নরম হ'ল। তিনি মিষ্ট কথায় তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্কল্প থেকে

বিচলিত হলেন না। তিনি জানালেন—দুর্গম দেশ তিব্বতে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

সেনাপতি ব্যর্থকাম হয়ে তিব্বতে ফিরে গেলেন।

রাজা কিন্তু আশা ছাড়লেন না। তাঁর একান্ত ইচ্ছা দীপঙ্কর তিব্বতে এসে তিব্বতবাসীদের কাছে বৌদ্ধধর্ম্মের সার কথা প্রচার করবেন। বৌদ্ধ জগতের যিনি প্রধান—তাঁর মুখে না শুনলে তিব্বতবাসীরা কদাচার ত্যাগ করবে না। যে-কোন উপায়েই হউক তাঁকে আনতেই হবে। নইলে অন্ততঃ বিক্রমশীলায় ঠিক তাঁর পরেই যাঁর স্থান তাঁকে আনতে হবে। এই ধর্ম্মসংস্কারের জন্য, প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য, লোক-হিতকর কাজের জন্য অর্থের দরকার। সুতরাং স্বর্ণসংগ্রহের নিমিত্ত নেপালের উপত্যকায় রাজা স্বয়ং একশ' অনুচর নিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে গাড়োয়ালের রাজার সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল। কিন্তু তিনি ছিলেন বৌদ্ধবিদ্বেষী। যখন গাড়োয়ালের রাজা শুনলেন যে, তিব্বত-রাজ বৌদ্ধধর্ম্মের একজন প্রধান পাণ্ডা, তিনি ধর্ম্মসম্প্রসারণ জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছেন, তখন তিনি তাঁকে বন্দী করলেন।

তারপর গাড়োয়ালের রাজা প্রস্তাব করলেন যে, তিব্বত-রাজ তাঁর অধীনতা স্বীকার করে বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করবেন। যদি না করেন তবে রাজার আকৃতি যত বড়, তত বড় একটা মূর্ত্তি তৈরি করতে যত সোনা লাগবে তত খাঁটি সোনা তাঁকে দিতে হবে।

কিন্তু এ প্রস্তাবে তিব্বত-রাজের ভ্রাতুষ্পুত্র যুবরাজ চ্যাংচুব সম্মত হতে পারলেন না। তিনি পিতৃব্যের-শত্রুর সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য একশ' সৈন্য নিয়ে প্রস্তুত হলেন। তিনি ভেবে দেখলেন, অভিযানের ফলে গাড়োয়ালের নিষ্ঠুর রাজা তাঁর বৃদ্ধ পিতৃব্যের ওপর অত্যাচার করতে পারে সেজন্য সোনা সংগ্রহ করে তিনি রাজার মুক্তির চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু একটা মানুষের মূর্ত্তি গড়তে—তাঁর ওজনের চেয়ে ঢের বেশী ওজনের সোনা লাগে। তিনি যে সোনা পাঠালেন তাই দেখে শত্রুপক্ষ বললে, তিনি যে সোনা পাঠিয়েছেন তা দিয়ে ওঁর মুখখানি গড়া যায়, সমস্ত মূর্ত্তি গড়তে আরও ঢের বেশী সোনার দরকার।

চ্যাংচুব যখন গাড়োয়ালের কারাগারের মধ্যে গিয়ে তাঁর পিতৃব্যের সঙ্গে দেখা করলেন তখন তিনি বললেন, আমি বুড়ো হয়েছি। আমাকে মুক্ত দিলেও আমি বড়জোর দশ বছর বাঁচব। তার বেশী বাঁচব না। সুতরাং এত সোনা এই বিধর্ম্মীকে দিয়ে কোন লাভ নেই। এই টাকা দিয়ে আমরা প্রজাদের কাছে ধর্ম্মপ্রচার কর আর দীপঙ্করকে তিব্বতে আনবার যথাসাধ্য চেষ্টা কর। সোনা সংগ্রহের আর চেষ্টা ক'র না। দীপঙ্করের কাছে এই কথা বলে লোক পাঠাও যে, তিব্বতের রাজা নিজের রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার এবং আপনাকে তিব্বতে আনবার জন্য চেষ্টা করতে গিয়ে বিধর্ম্মী শত্রুর কারাগারে বন্দী হয়ে আছেন। তিনি যেন তাঁকে এই দুঃখের দিনে আশীর্ব্বাদ করেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে, পরজন্মে তিনি ধর্ম্মপথে দৃঢ় থাকবেন এবং তাঁর পথ নির্ব্বিঘ্ন হবে। তিনি তাঁর মুখকমল দর্শনের আশায় এখনও জীবন ধারণ করে আছেন।

ভ্রাতুষ্পুত্র চ্যাংচুব কারাগার থেকে চোখের জল ফেলতে ফেলতে ফিরে গেলেন বটে, কিন্তু তাঁর মুক্তির আশা ছাড়লেন না। সোনা সংগ্রহ করতে লাগলেন।

গাড়োয়ালের রাজা রেগে তিব্বতের রাজাকে একটা অন্ধ-কূপসদৃশ কারাকক্ষে বন্দী করে রেখে তাঁর উপর অত্যাচার করতে লাগলেন। বৃদ্ধ এত কষ্ট সহ্য করতে পারলেন না। শেষ মুহূর্ত্তে দীপঙ্করের নাম স্মরণ করতে করতে তিনি প্রাণ ত্যাগ করলেন।

অপরাজিতা

শ্রীমিহিরকুমার বসু

হে অপরাজিতা, জীবনের কাছে তুমি এখনো হার মান নি, তাই তোমাকে ঐ নামেই ডাকলাম। নইলে তোমার আসল নামও আমি জানি বৈ কি? আর শুধু নামই বা কেন, আরো অনেক কিছু জানি যা খুলে বললে তুমি শুধু অবাকই হবে না, রীতিমত আঁতকেই উঠবে হয় তো।

মনে করো না যেন যে আমি প্রলাপ বকছি। তোমার চোখে আমি হয় তো কেউ নই, এই বিরাট শহরের অগণিত জনসমুদ্রের একটা নামহীন, গোত্রহীন ঢেউ মাত্র। বড় জোর বলতে পারি, প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা একই 'বাসে' আমাদের দেখা হয়। তা অমন তো কত লোকের সঙ্গেই হয়। তাদের হিসাব রাখবার তোমার ভারি দায় পড়েছে। তুমি তো বাসে উঠেই তোমার বাহনটিকে উপেক্ষা করে রাস্তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাক। আমি কিন্তু তা পারি না। আমি যে তোমাকে চিনি! তাই বাসের স্বল্পালোকিত একটি কোণে বসে মিটমিট করে তোমাকে লক্ষ্য করি। লক্ষ্য করি—তোমার টানা কালো দুটি চোখের নীচে ক্লান্তির ছাপ, একগাদা বই খাতায় ভারাক্রান্ত তোমার হাতে দু'গাছি সরু রুলির চিকণ আভাস। নিতান্ত সাদাসিধে একটা শাড়ী, আঁটসাঁট করে গায়ে জড়ানো। পায়ে এক জোড়া অতি সাধারণ স্যাণ্ডেল। দেখলেই বোঝা যায় তুমি কাজের মেয়ে।

তবু হাজরা থেকে বৌবাজার অনেক দূর। তাই তোমাকেও চোখ দুটো ঘুরিয়ে এক-আধবার বাসের মধ্যে আনতে হয় বৈ কি? আর তখন হঠাৎ হয়ত আমার সঙ্গে তোমার চোখাচোখিও হয়ে যায়। তুমি অবশ্য তখখুনি মহাবিরক্ত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নাও, আর যেন তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাক রাস্তার দিকে। তোমার এই ব্যবহারে আমি কিন্তু মোটেই আশ্চর্য্য হই না। কারণ সম্পূর্ণ অপরিচিত কোন লোককে ওভাবে মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখলে তোমার মত কোন্ ভাল মেয়ে না বিরক্ত হয়? আমি তাই আশ্চর্য্য হই না, বরং লজ্জা পেয়ে মুখ নামাই। কিন্তু মুখ নামিয়েও বেশীক্ষণ থাকতে পারি না, কিছু পরেই আবার তোমাকে চোখের কোণে লক্ষ্য করি। হঠাৎ কেমন যেন সন্দেহ হয়, তোমার ঐ তন্ময় ভাবটা বুঝি একটা ভান মাত্র। আসলে তুমি ভাবছ—এখনো বাড়ী গিয়ে তোমার কত কাজ বাকি। আর সে তো যেমন-তেমন কাজ নয়—পবিত্র কর্ত্তব্য, যার চেয়ে মহৎ বিশ্বসংসারে নাকি আর কিছুই হতে পারে না। সে কর্ত্তব্য তোমার রুগ্ন পিতা, তোমার ছোট ছোট ভাই-বোনের প্রতি। তুমি ছাড়া যে তাদের আর কেউ নেই! বাইরের কাজ শেষ হ'ল, এখন ঘরে গিয়ে সবাইকে খাইয়ে, নিজে খেয়ে, বাসনপত্র ধুয়ে-মেজে বিছানায় শুতেই বাজবে সেই রাত এগারোটা। তার পর কখন এক ফাঁকে রাত ভোর হয়ে যাবে। আবার সুরু হবে জীবিকা অর্জ্জনের হৃদয়হীন বেদীতে আর একটি দিনকে বলি-দানের উদ্যোগপর্ব্ব।

এই সব ভাবি আর আস্তে আস্তে বাস এগোতে থাকে। বৌবাজারের মোড়ে তুমি নেমে যাও, তার পর হারিয়ে যাও ভিড়ের মধ্যে। তবু যেদিন রাস্তায় ভিড় একটু পাতলা থাকে আর ট্রাফিকের লাল আলোর কৃপায় বাসটাকেও কিছুক্ষণ থমকে থাকতে হয়, সেদিন ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে পাই, বৌবাজারের রাস্তা ধরে তুমি নিজের মনে এগিয়ে যাচ্ছ। তোমার সেই হাঁটা দেখে আমি কিন্তু বুঝতে পারি যে, তুমি বড় ক্লান্ত, বড় নিঃসঙ্গ। তোমার মুখের ভাব যতই উদ্ধত হোক না কেন, তোমার সারা অন্তর একটু শান্তি, একটু ছুটির জন্য কাঙাল হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এ সব নিছক কল্পনার কথা থাক্। তোমাকে নিয়ে গল্প লিখতে বসেছি সেকথা খুলে বলবার দুঃসাহস আমার নেই। বরং আমি এই কোণে যেমন বসে আছি তেমনি চুপ করেই বসে থাকব। তুমিও না হয় আমার দিকে পিছন ফিরেই থাক। আমি তোমাকে যেটুকু দেখতে পাচ্ছি তাই দেখি আর মনে মনে ভাবি। বৌবাজারের মোড় আসতে এখনো অনেক দেরি।

কি যেন বলছিলাম? হাঁা, সেই বৌবাজারের রাস্তা ধরে তোমার হেঁটে যাওয়া। বাস থেকে চোখ মিটমিট করে দেখতে পাই তুমি যাচ্ছ, কেবলই এগিয়ে যাচ্ছ, আর বুঝি তোমাকে দেখা যায় না। কিন্তু কখন যে মনে মনে আমি তোমার পিছু নিয়েছি তা তুমি টেরও পাও নি। কিছুদূর গিয়েই ডান দিকে একটি কানা-গলির ভিতর তুমি ঢুকলে। তার দু'দিকেই মস্ত সব বাড়ী, যেমন উঁচু তেমনি পুরনো। তাদের খোপে খোপে অসংখ্য মানুষ দিন-রাত কিলবিল করে। এমনি কয়েকটা বাড়ী ডিঙিয়ে গেলেই বেশ খানিকটা খোলা জায়গা। সেখানে একপাল গয়লা আর রিক্সা-ওয়ালা দিনের কাজের শেষে কতকগুলি দড়ির খাটিয়া বিছিয়ে কেউ বা খৈনি টিপছে, কেউ বা তারস্বরে গল্প কিংবা গান জুড়ে দিয়েছে। তুমি নিঃশব্দে তাদের পাশ কাটিয়ে গেলে, তারাও কেউ তোমাকে লক্ষ্য করল না। তার পরেই ডান দিকে আবার একটা বাড়ী। মা গো, তার ঢুকবার পথটা কি অন্ধকার! কিন্তু তুমি পরম নির্ভয়ে তারই মধ্যে পা বাড়িয়ে দিলে, তার পর কেমন করে যে এ কেঁকে একতলার একেবারে পিছনের ঘরটিতে এসে হাজির হলে কিছুই বুঝতে পারলাম না। যাক্, এখানাই যে তোমার ঘর তা দেখলেই বোঝা যায়। পাশে আরো একখানা ঘর আছে, আপাততঃ সেখানেই তোমার ভাইবোন দুটি রুগ্ন বাবার সঙ্গে তোমারই কের-

বার অপেক্ষা করছে। তা করুক, এখন কিছুক্ষণ তোমার বিশ্রাম দরকার। তাই বুঝি তাড়াতাড়ি দরজায় খিলটা এঁটে দিলে। ব্যস, এখন তুমি একা, কিংবা হয় তো একেবারে একাও নও। আর এক জন আছে তোমার মানসলোকের সঙ্গী। সে আমার বন্ধু ভবতোষ, যার সঙ্গে দীর্ঘ ছ'বছর আগে এই ঘরেই তোমার শেষবারের মত ছাড়াছাড়ি হয়েছিল।

হাঁ, ভবতোষ আমারই অনেকদিনের বন্ধু। তোমার সঙ্গে যখন তার আলাপ তারও ঢের আগে থেকে তাকে আমি চিনি। আর আজও—যখন তার কোন পাত্তাই তুমি জান না—আজও সে আমাকে চিঠি লেখে। বিশ্বাস হয় না? যদি চাও তো বলো, এখনি আমার পকেট থেকে তার শেষ চিঠিখানা খুলে দেখাতে পারি। মোটে সপ্তাহখানেক আগে পেয়েছি। কিন্তু সে এখন থাক। বরং যে কথা বলছিলাম—

বাইরের কাজ সেরে সারাদিনের পর বাড়ী এসে এই স্বল্প সময়টুকু তোমার নিজস্ব। এখন কিছুক্ষণ কেউ তোমাকে বিরক্ত করে না। তোমার ভাইবোন দুটি রাত্রিবেলা তোমারই বিছানার একধারে শুয়ে থাকে। সারাদিন যখন তুমি বাইরে থাক তখন তাদের পড়া, গল্প, দুষ্টুমি—সবকিছু চলে এই ঘরেই। তবু রোজ সন্ধ্যাবেলা—তোমার বাড়ী ফেরবার সময় হলে—তারা দুটিতে এই ঘরখানা খালি করে দিয়ে ঐ পাশের ঘরটাতে গিয়ে ঢোকে। তাই এটুকু সময় তুমি একা। কিন্তু সত্যি কি একা? সারাদিন খাটুনির পর এখন তোমার এত ক্লান্তি বোধ হয়, জামাকাপড় পর্য্যন্ত ছাড়তে ইচ্ছা করে না। হাতের বইখাতাগুলি ধপাস করে খাটের উপর নামিয়ে রেখে নিজেও তাদের পাশে বসে পড়। ইচ্ছা হয় শুয়ে পড়তে—আর কিছু না—না জামাকাপড় ছাড়া, না খাওয়া, না আর কিছু কিন্তু তা তো হবার উপায় নেই। একটু জিরিয়ে নিয়েই আবার তোমাকে উঠতে হবে—ধরাতে হবে উনুন, করতে হবে রান্নার যোগাড়। এমনি রোজ, দিনের পর দিন। তুমি যে কত কাজের মেয়ে সেকথা সবাই জেনে ফেলেছে। তাই এত খাটুনির পরেও তোমার ছুটি নেই। কিন্তু উনুন ধরানো, বাটনা বাটা, রান্না চাপানো, কিছুক্ষণের জন্য না হয় থাক্। এখন তো কয়েক মিনিট নিজেকে নিয়ে একা কাটাও। কিন্তু বলছিই তো, একাই বা তোমায় মন তোমাকে থাকতে দেয় কৈ? হঠাৎ তোমার মন কেমন করে ওঠে, দু'চোখ বুজে আসে, খাটের বাজুতে মুখ গুঁজে গুন গুন করে কি যে বলে ওঠো ভাল শোনাই যায় না। আমি কিন্তু ঠিক শুনতে পাই, তুমি যেন বলছ, "না, আমার যাবা হ'ল না। আমি পারলাম না, পারবও না কখনো। এখন কেউ যদি পারে তবে তুমিই পারবে। তুমি এসো, এসে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাও এই অন্ধকূপ, এই ব্যর্থ জীবনের কবল থেকে। কিন্তু তুমি কোথায়? রোজ তো পঞ্জিকা খুলে দেখি, খুঁজে খুঁজে চোখ ফেটে জল আসে, তবু তো তোমায় সে দুটি লাইনের দেখা আজও মিলল না।"

হঠাৎ কি মনে করে তুমি তাড়াতাড়ি খাড়া হয়ে বসো। তখন তোমাকে দেখে কে বলবে যে তুমি ক্লান্ত। এক লাফে খাট থেকে নেমে ঘরের কোণে রাখা ট্রাঙ্কটার সামনে গিয়ে দাঁড়াও। দরজাটা ঠিক বন্ধ আছে কিনা চকিতে একবার দেখে নিয়ে ট্রাঙ্কের ডালাটা খুলে ফেল। তার পর একেবারে তার তলা থেকে—ওটা কি বার করলে? যতই গোপন করো, আমি কিন্তু জানি। ভবতোষের একখানা ছবি, বুক অবধি তোলা, সেই ছ'বছর আগে। টুইল-শার্ট-পরা ভবতোষ, চুল উল্টে আঁচড়ানো, চোখে কঠোর প্রতিজ্ঞার ছাপ। তোমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হেসে যেন তোমাকে অভয় দিচ্ছে। নীচে ভবতোষের সই আর তারিখ দেওয়া। কোন্ তারিখের ছবি তাও আমি জানি, ভবতোষই আমাকে বলেছে সব।

অনেকক্ষণ—প্রায় মিনিট পাঁচেক ছবিখানার দিকে তুমি চেয়ে রইলে নিষ্পলক দৃষ্টিতে। ঐখানাই তো এখন তোমার সম্বল, ওখানে যার চেহারা তারই হাতে তোমার জীবনের চাবিকাঠি, যে জীবন এখনো সুদূর দিগন্তের কিনারায় স্বপ্ন হয়ে ফুটে রয়েছে। কিন্তু আর না, এবার তোমাকে উঠতে হবে। পাশের ঘরে তোমার বাবার চিঁ চিঁ গলার চীৎকার শোনা যাচ্ছে, আর ভাইবোন দুটির উসখুস শব্দ। ওদের খিদে পেয়েছে, আর তোমার বসে থাকা চলে না। ছবিখানাকে একবার তুমি মুখের কাছে নিয়ে গেলে, কিন্তু তখুনি নামিয়ে নিয়ে আবার ঢুকিয়ে রাখলে ট্রাঙ্কের একেবারে তলায়। এতক্ষণে তোমার মনে পড়ল জামাকাপড় ছাড়বার কথা। ক্লান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালে পূব দিকের জানালাটার কাছে। কিছুদূরেই একটা প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ী, একটা মেস। ওর পিছন দিকটা পড়েছে এই দিকে। ঠিক সোজাসুজি ঐ দোতলার ঘরটাতে আজ ক'দিন হ'ল একটা চ্যাংড়া ছোঁড়া এসে জুটেছে, ওর জ্বালায় ঘরের মধ্যেও একটু হাত-পা ছড়িয়ে থাকবার জো নেই। কি যে করে ছোঁড়াটা ভগবানই জানেন। কিন্তু সময় নেই অসময় নেই সে তার জানালায় দাঁড়িয়ে হাঁ করে তোমার ঘরখানার দিকেই চেয়ে থাকে। আর বেহায়ারও একশেষ—কতবার ওর মুখের উপরেই ঠাস করে জানালা বন্ধ করে দিয়েছ, তবু লজ্জা নেই। কিছুক্ষণ পরেই আবার ঘুরঘুর করে ঐ জানালা ধরে ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে এমনি এক একটা ছোঁড়া এসে জোটে, তখন তোমার অস্বস্তির অন্ত থাকে না। নিজের ঘরেও কি সব সময় অত সাবধানে চলাফেরা করা যায়? অথচ পূব দিকের ঐ জানালাটা যে বন্ধ করে রাখবে তারও উপায় নেই। ঘরটা ত একেই একটু অন্ধকার, তার উপর যদি ঐ জানালাটাও বন্ধ রাখতে হয় তবে ত দম বন্ধ হয়ে মরতে হবে।

যাক্, বাঁচা গেল। মেসের সেই জানালাটা খোলা আছে বটে, কিন্তু ছোঁড়াটা নেই। এই রাত্রিবেলা হয় আরও মুশকিল, ঘরে বাতি জ্বালানো থাকলে বাইরে থেকে সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়, যা দিনের বেলা হয় ত দেখা যায় না। তা হলে তোমার জানালাটা

কি খোলাই থাকবে? কিন্তু ভরসাও বেশী পাওয়া যায় না! আর জানালা বন্ধ করেই বা থাকবে কতক্ষণ? দেখেছ ত ওকে লজ্জা দেবার চেষ্টা বৃথা। ঠিক যেমন লজ্জা দিতে গিয়ে তুমি ব্যর্থমনোরথ হয়েছিলে ভবতোষের কাছেও।

ঠিকমত খতিয়ে দেখলে সত্যি আশ্চর্য্য লাগে। কত লোকের সঙ্গেই ত জীবনে দেখা হয়—তারা দেখা দেয় আবার মিলিয়ে যায়। কিন্তু তাদেরই ভিতর থেকে হঠাৎ কখন যে একজন দল ছেড়ে ছিটকে বেরিয়ে পড়ে, বেরিয়ে একেবারে পাশে এসে দাঁড়ায়, মনের উপর যা খুশী তাই আঁচড় কাটতে থাকে, তা আগে থেকে কিছু জানবার উপায় নেই। নইলে ভবতোষও ত সামনের মেসের ঠিক ঐ ঘরটাতেই থাকত, সেও ত তোমাকে কম জ্বালাতন করে নি। ঐ ছোড়াটার মতই সেও ত কারণে অকারণে ঐ জানালা ধরে দাঁড়িয়ে থাকত, তারও মুখের উপর তুমি কতবার জানালা বন্ধ করেছ। কিন্তু তাতে কি পেরেছিলে ভবতোষকে ঠেকাতে? রাগের মাথায় কত দিন ভেবেছিলে যে দেবে তোমার বাবা কিংবা মাকে বলে, কিংবা নিজেই গিয়ে এক দিন ঐ মেসের ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করবে যে এমন ফাজিল ছেলে কি মেসে না রাখলেই নয়? তখন তোমার বয়স ছ'বছর কম ছিল বটে, কিন্তু তেজও ছিল ছ'গুণ বেশী। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত কাউকেই কিছু বল নি, কারণ তোমার বলবার সত্যি কিছু ছিল না। ভবতোষ তেমন কিছু অভদ্রতা করত না, শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত। আর নিজের জানালায় দাঁড়াবে না ত সে দাঁড়াবে কোথায়? তাই দিনের পর দিন শুধু নিজের মনেই গজ গজ করেছ আর হাজার বার দুমদাম করে খাট থেকে নেমে তোমার জানালা বন্ধ করেছ।

হ্যাঁ, আমিও জানি, ছ'বছর আগে ঐ মেসের ঠিক ঐ ঘরখানাতেই ভবতোষ থাকত। সে তখন এম-এ পড়ছে। তার অবসর সময়ের বেশীর ভাগই কাটত ঐ জানালার ধারে চেয়ার টেনে বসে। তখন তোমাদের বাড়ীর অবস্থাও অন্যরকম ছিল। তোমার বাবা তখনো পঙ্গু হয়ে ও রকম চি চি করেন না, অন্য দশ জন সাধারণ গৃহস্থের মতই ছাতা বগলে করে দশটা-পাঁচটা আপিস করতেন। তোমার মা তখন বেঁচে, সংসারের কাজকর্ম্ম দেখতেন তিনিই, আর ছোট ভাইবোন দুটিকে—তারা তখন নেহাতই ছোট—তাদের সামলাতেন। আর তুমি এই ঘরখানাতে বসে আই-এ পরীক্ষার জন্য নোটবই মুখস্থ করছ। এরই মধ্যে একদিন—

চমকে উঠো না, আমি সব জানি বলেই বলছি। সেদিন বিকেলবেলা তোমার বাবা যথারীতি আপিস থেকে ফিরলেন। দরজাটা খুলতে গিয়েছিলে তুমিই। বাবা ভিতরে ঢুকতেই দরজাটা বন্ধ করতে গিয়ে তুমি যেন সামনে ভূত দেখে চমকে গেলে। ও কি, তোমার বাবার পিছনে গুটি গুটি এগিয়ে আসছে ও কে? মেসের দোতলা ঘরের সেই ছেলেটাই না? সে কিন্তু তোমার দিকে ফিরেও চাইল না, গম্ভীরভাবে তোমার পাশ কাটিয়ে বাড়ীতে ঢুকে পড়ল। ব্যাপারটা তুমি কিছুই বুঝতে পারলে না, কিন্তু মুহূর্ত্তে তোমার চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। তোমার বাবা ততক্ষণে হাঁকডাক করে বাড়ীর সবাইকে এনে হাজির করেছেন। মাকে বলছেন, "ওকে খাতির-যত্ন করো। ওর জন্যেই আজ তুমি বিধবা হতে হতে বেঁচে গেলে।" তার পর নিজেই ওকে টেনে এনে তোমারই ঘরে, তোমারই খাটের উপর বসিয়ে বললেন, "অমন ধাঁ করে আমাকে ঝাপটে ধরে যদি সরিয়ে না আনত তা হলে এতক্ষণে ঐ লরীটার তলায় কি আমার কোন চিহ্ন থাকত? একেবারে পিষে গুঁড়িয়ে যেতাম। উঃ, ভাবতে এখনো বুকটা কাঁপছে।" মাকে বিশেষ করে বললেন, "বড় ভাল ছেলে। ভবতোষ নাম। এম-এ পড়ে। সামনের ঐ মেসে থাকে।" তার পর হঠাৎ তোমার দিকে ফিরে বললেন, "কি রে, তুই কি হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবি? যা, একটু চা-টা করে আন।" তুমি আর তখন কি করবে? সকলের অলক্ষ্যে ভবতোষের দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি হেনে বাবার হুকুম তামিল করতে গেলে।

এই ভাবেই তোমাদের বাড়ীতে ভবতোষের প্রথম আবির্ভাব। কিন্তু সম্পর্কটা প্রথম দিনেই শেষ হ'ল না, ভবতোষের যাতায়াতটা চলতেই লাগল। কিন্তু তার ফলে তোমার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নি। বরং মেসের জানালা ছেড়ে একেবারে তোমার ঘরের জানালায় এমন অতর্কিতে হানা দেবার জন্য তার উপর তোমার রাগটা যেন আরো বেড়ে গেল। তোমার মনে হ'ত যে বিশেষ করে বুঝি তোমাকে জব্দ করবার জন্যই ভবতোষ এ বাড়ীতে ঢুকেছে। এ যেন অনেকটা তোমাকে বেআব্রু করে ফেলবার মতই। এমন কথাও তোমার কয়েক বার মনে হয়েছে যে ওরকম বেপরোয়া ছেলের পক্ষে সন্ধ্যার দিকে বৌবাজারের মত জন-যানবহুল রাস্তায় তোমার বাবাকে আচমকা লরী-চাপার ধোকা দিয়ে বোকা বানাতেই বা কতক্ষণ? এসব তুমি নিজেই পরে ভবতোষকে বলেছিলে, এবং তারও পরে ভবতোষ বলেছিল আমাকে।

কিন্তু ভবতোষের উপর রাগ করতে গিয়েও শেষ পর্য্যন্ত জব্দ হয়েছিলে তুমিই। মেসের জানালায় দাঁড়িয়ে সে যত বেহায়াপনাই করে থাক, তোমাদের বাড়ীতে সে কিন্তু তোমাকে আমলই দিলে না। তুমি যে একটা মানুষ—বাড়ীতে রয়েছ তা যেন ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। সে যখন-তখন আসত, এসেই আলাপ জমিয়ে বসত তোমার মার সঙ্গে। তোমার বাবা বাড়ী থাকলে তিনিও সেই আলাপে যোগ দিতেন। আর তোমার ছোট ভাইবোন দুটিও যে কি হ্যাংলা—ভবতোষকে পেলে তারা আর কিছুই চাইত না। ভবতোষের মুখেই শুনেছি যে, নিজের সম্বন্ধে সে কখনো তোমাদের কাছে কোন ওপরচাল মারে নি। তার অবস্থা যে বিশেষ ভাল নয়, সে যে বেশ খানিকটা কষ্ট করেই কলকাতায় মেসে থেকে এম-এ পড়ছে, এ সবই তোমরা গোড়া থেকেই জানতে। তবু সে প্রায় কখনো শুধু হাতে তোমাদের বাড়ীতে আসত না। যখনই আসত তখনই তার হাতে থাকত আর কিছু না হোক, তোমার মার জন্য মোড়ের দোকান থেকে কেনা ফুলুরী আর বেগুনভাজা, আর

তোমার ভাইবোন দুটির জন্ত অন্ততঃ কিছু লজেঞ্জ আর বিস্কুট। সেই সামান্ত জিনিস নিয়েই তোমাদের রান্নাঘরে বসে তারা যেভাবে দল বেঁধে গুলজার করত তার শব্দ শুনে নিজের ঘরে বসেই তুমি মনে মনে রাগে জলেপুড়ে মরতে।

অবশেষে তোমাকেই হার মানতে হ'ল। কানের পাশেই এত হাসি আর আড্ডা, অথচ কেউ তোমাকে ডাকে না, এক বার খোঁজও করে না, এ কতদিন সহ্য হয়? তা ছাড়া তোমার বয়স তখন কতই বা? বোধ হয় সবে উনিশ পেরিয়ে কুড়িতে পা দিয়েছ। আড্ডার আকর্ষণ তোমার কাছেও তখন কম নয়। তাই ছুতো খুঁজে তোমাকেই এগিয়ে যেতে হ'ল। প্রথম প্রথম অবশ্য খুব বিরক্তির ভাব করেই যেতে, হয় তো মাকে কিংবা ছোট ভাই-বোন দুটিকে কোন কথা বলার অছিলায় ভ্রূকুটি করে হাজির হতে ওদের আড্ডায়। কিন্তু যতটুকু দরকার তার চেয়েও কিছু বেশী সময় ওখানে কাটাতে। শেষকালে যখন চলে না আসা ছাড়া কোন উপায় থাকত না তখন সবার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাতে যেন এ সব নিষ্কর্মার ঢেঁকিগুলি নেহাতই তোমার কৃপার পাত্র। কিন্তু তবু এমনি কপাল, ওদেরই কারুর না কারুর সঙ্গে তোমার ঘন ঘন প্রয়োজন হতে লাগল এবং মাসখানেক যেতে না যেতেই দেখা গেল যে তুমিও কখন এক সময় ওদের আড্ডায় ভিড়ে গেছ।

এবারেও কিন্তু ভবতোষ আশ্চর্য্য সংযমের পরিচয় দিলে। গোড়ার দিকে সে যেমন কখনো তোমার খোঁজও করে নি, এখন আবার তেমনি সহজেই সে তোমাকে তাদের দলে টেনে নিল। তার ভাবভঙ্গীতে এমন কিছুই প্রকাশ পেল না যাতে তুমি বিন্দুমাত্র অস্বস্তি বোধ করতে পার। এর পর ভবতোষ যখন আসত তখন তার হাতে থাকত আর একটি বাড়তি ঠোঙা—তার মধ্যে আলুর চপ আর পেঁয়াজি ঠাসা। ও দুটি খাদ্যই যে তোমার খুব প্রিয় এ খবরটা সে যেন কি করে যোগাড় করেছিল।

এর পর একদিন—তখন ভবতোষের সঙ্গে তোমার বেশ আলাপ-পরিচয় হয়ে গেছে—তোমার লেখাপড়া সম্বন্ধে কি কথা উঠতে ভবতোষ বলেছিল যে তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে তা হলে সে মাঝে মাঝে পরীক্ষার পড়া তৈরি করতে তোমাকে সাহায্য করতে পারে। কথাটা যখন তোমার বাবা মার কানে উঠল তখন তারা আহ্লাদে একেবারে গলে গেলেন। এক বার শুধু তোমার মা বলেছিলেন, "আহা, এতে ওর নিজের হয় তো কত ক্ষতি হবে। পয়সাকড়ি তো আমরা কিছু দিতে পারব না।" কিন্তু তোমার বাবার তর্জ্জনের সামনে তার সেই ক্ষীণ আপত্তি ভাল করে শোনাই গেল না। তোমার বাবার কথা, "তুমি থাম, পয়সা ফেললে তো অমন গণ্ডা গণ্ডা মাষ্টার পাওয়া যায়। পয়সা না দিয়ে পাচ্ছি বলেই তো।" অতএব ঠিক হ'ল যে ভবতোষ তার সুবিধামত তোমাকে পড়াবে। তুমি মুখে কিছু বল নি বটে, কিন্তু মনে মনে যে খুব অখুশী হয়েছিলে এমন তো বোধ হয় না।

এর পর শুধু ভবতোষ আর তুমি—আর কেউ না। তোমার ঘরে, তোমারই খাটের উপর গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এমন নিরালায় যে তোমাদের কখনো বসতে হবে তা কি তুমি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলে? বইখাতা নিয়ে তোমরা দু'জনে যখন গিয়ে বসতে তখন কেউ সেখানে আসত না, তোমার ভাইবোন দুটিকেও মা রান্নাঘরে নিজের কাছে আটকে রাখতেন যাতে তোমার পড়ার কোনরকম ব্যাঘাত না হয়। কতদিন লক্ষ্য করেছ, হয় তো তোমার বাবা আপিস থেকে ফিরে হঠাৎ না জেনে তোমাদের খোলা দরজায় মুখ বাড়িয়েই আবার সাঁ করে সরে গেছেন, পা টিপে টিপে গিয়ে বসেছেন তার ঘরে, তার পর আর তাঁর কোন সাড়াশব্দ পাও নি। তোমাদের নিভৃত পড়াশুনায় বাড়ীসুদ্ধ লোকের সেদিন কি নিঃশব্দ সহযোগিতাই না ছিল। আজ ভাবলেও হাসি পায়, চোখে জল আসে।

ভবতোষ পড়াত মন্দ নয়, কিন্তু সে যেমন মন দিয়ে পড়াত, তুমি কি তেমনি মন দিয়ে পড়তে পারতে? ঘরে কোন চেয়ার ছিল না, তাই খাটের উপরেই তোমাদের বসতে হ'ত। তাও একেবারে পাশাপাশি, কারণ খাটের উপরেই বা তেমন ফাঁক রেখে বসবার জায়গা কৈ? ঐ তো ছোট খাট, সেখানেও আবার রাজ্যের জিনিসপত্র। ঐ এক কোণে একগাদা বালিশের স্তূপ, এই এ ধারে কতকগুলি বই, ওখানে তোমার ছোট বোনের কতকগুলি খেলনা, ধোপাবাড়ী থেকে সদ্য জামাকাপড় কাচা হয়ে এসেছে—তাদেরও জায়গা হয়েছে এই খাটেরই একপাশে। ভবতোষের গা ঘেঁষে তাই তুমি জড়সড় হয়ে বসে থাকতে। মুখ তুলে ওর মুখের দিকে চাইতে পারতে না, কেমন যেন লজ্জা হ'ত তোমার। তাই মাথা নীচু করে ভবতোষের হাঁটুর উপর রাখা বইটার দিকেই সমানে চেয়ে থাকতে। ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেলেও মাথা খাড়া করবার উপায় ছিল না। বইয়ের থেকে মাঝে মাঝে তোমার চোখ গিয়ে পড়ত ভবতোষের হাত দুখানার উপর। দেখতে দেখতে ভারি অবাক লাগত তোমার ঐ দুটি হাত, ওদেরও যেন একটা নিজস্ব ভাষা আছে। তার বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের ঠিক উপরেই একটা প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা কাটা দাগ—কোথায়, কি ভাবে কেটেছিল কে জানে? হয় তো সে কবেকার কথা, তবু তার চিহ্নটুকু এখনো মিলিয়ে যায় নি। ফুটন্ত যৌবন তার সর্ব্বাঙ্গে, হাতের চামড়া একেবারে নিটোল, নিভাঁজ। তোমারও তাই, তবু ওর সঙ্গে তোমার হাতের কত তফাৎ? ঐ হাতের থাবার মধ্যে তোমার হাতখানা পুরে যদি একটু জোরে চাপ দেয় তবেই হয়েছে আর কি! হাতের নখগুলিও কি খাটো করে কাটা—আচ্ছা এরকম চামড়া ঘেঁষে নখ কাটতে ব্যথা লাগে না? মাঝে মাঝে ভবতোষ যখন নিজেই কোন কারণে বইয়ের উপর ঝুঁকে পড়ত তখন সেই ফাঁকে হঠাৎ এক বার মাথা তুলে তুমি পুরো মানুষটাকে দেখে নিতে। চকিতে হয় তো এক বার চোখে পড়ত ওর মেসের সেই জানালায়। দেখতে পেতে জানালা খোলা কিন্তু ঘর অন্ধকার। এখন আর ওদিকে ঘন ঘন নজর দেবার কোন দরকার নেই, ঐ

ঘরের মালিক তো নিজেই এখানে তোমার পাশে বসে আছে। যাক্, এবার দুশ্চিন্তা থেকে যে রেহাই পাওয়া গেছে এটুকুও কম নয়।

কিন্তু লেখাপড়া করতে গিয়েই বা নিছক গুরুশিষ্যার সম্পর্ক ক'দিন বজায় থাকে ? বিশেষ করে তখন তোমাদের দু'জনেরই বয়স অল্প, তা ছাড়া ভবতোষ তোমার মাইনে করা মাষ্টারও নয়। তাই ওরই মধ্যে একটু একটু করে অন্য আলাপও ক্রমে উঠতে লাগল। অবশ্য তার সুরুটা হয়েছিল এতই আলগোছে যে তোমরা কেউই বোধ হয় তার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পাও নি। তা যদি পেতে তা হলে হয় তো তখনো সাবধান হতে।

এই যেমন ধরো এক দিন, ভবতোষ তোমার উপর একটু বিরক্ত হয়েই বলে উঠল, "এ হে, পরীক্ষার আর মোটে চার মাস বাকি, এখনো লজিকের সিলোজিসমগুলিও জান না ? তবেই হয়েছে।"

"জানি না তো কি করব ? আপনি শিখিয়ে দিন।"

"সে না হয় দিলাম, কিন্তু এখনো যদি সব একেবারে গোড়া থেকে সুরু করতে হয় তা হলে কবেই বা কোর্স শেষ করবে আর কবেই বা রিভিসন করবে ?"

"করব এরই মধ্যে। তা ছাড়া উপায় কি ?"

"উপায় ইচ্ছে করলেই করতে পারতে ? এতদিন ঘরে বসে করলে কি ? বাড়ীতে ত কাজকর্ম্মও তোমাকে কিছু করতে হয় না।"

"কাজকর্ম্ম না থাকলেই কি চব্বিশ ঘণ্টা লেখাপড়া নিয়ে বসে থাকা যায় ?" এবার তোমারও গলায় একটু অনুযোগের সুর।

সেটা লক্ষ্য করেই ভবতোষ এবার হেসে ফেলে বলল, "তা যায় না সত্যি। এই দেখ না, আমার তো বাবা নেই। দেশের বাড়ীতে আছেন মা আর দুই দাদা। অনেক মেহনত করে এম-এ পড়বার ব্যবস্থা করতে হয়েছে আমাকে। দাদারা বলেছেন যে এই একটাই চান্স দেওয়া গেল। একবারে যদি পাস করতে না পারি তা হলে আর সুযোগ পাব না। পড়াশুনো ছাড়া এখানে আমার কাজও কিছু নেই। তবু কি দিনরাত বই নিয়ে বসে থাকতে পারছি ?"

"তা ছাড়া, আমাকে পড়িয়েও তো আপনার কত সময় নষ্ট হয়।"

"না, তা হয় না। এই সন্ধ্যের দিকটাতে আমি কখনো নিজের পড়া করতে পারি না। তাই এ সময়ে কি আর করতাম ? বড়-জোর মেসের অন্য ছেলেদের সঙ্গে মিলে বাজে আড্ডা দিতাম। তার চেয়ে এই যে এখানে এসে একটু লেখাপড়ার চর্চ্চা করি এতে আমার বরং ভালই হয়।"

প্রথম দিকের আলাপের এই একটু নমুনা।

এরও কিছুদিন পরের কথা। সেদিন তোমাকে পড়াতে পড়াতে নিজের খেয়ালে ভবতোষ তার পকেট থেকে একখানা রুমাল বের করতেই তুমি ফস করে বলে উঠলে, "ও মা, এই নাকি আপনার রুমাল ? এ যে ছিঁড়ে একেবারে ন্যাকড়া হয়ে গেছে।"

ভবতোষ হেসে বলেছিল, "কি করি বল ? তেমন বড়লোক তো নই যে নিত্য নূতন রুমাল কিনে বাবুগিরি করব। আমার এই ভাল, কাজ চলে গেলেই হ'ল।"

কিন্তু তুমি এ কথাটা কিছুতেই মেনে নিতে পার নি, বলেছিলে, "আপনি যদি কিছু মনে না করেন তবে আমি না হয় বাড়ীতেই কয়েকটা রুমাল তৈরি করে দি। তাতে খরচও কিছু নেই।"

"রুমাল তৈরি করে দেবে ? লেখাপড়ার ক্ষতি করে তো ?"

"তা কেন ? লেখাপড়া যখন করব না তখন।"

"তা হলে দিও। আমারও কাকতালে কয়েকটা রুমাল লাভ হবে আর সেই রুমাল দিয়ে যতবার মুখ মুছব ততবার তোমার কথা মনে পড়বে।"

শুনে কেন যেন তোমার সারা মুখ হঠাৎ অকারণে লাল হয়ে উঠেছিল।...

পরীক্ষার আগে সেই কয়েকটি মাস—কত স্বপ্ন, কত হাসি-কান্নার ভিড় সেখানে। সেই লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে হৃদয়ের অলিগলিতে পা বাড়ানো—প্রথমে চোরের মত সন্তর্পণে, শেষে যেন ডাকাতের মত লুঠের নেশায় পাগল হয়ে। সেই মন-দেয়া-নেয়া, আজ কত তুচ্ছ মনে হয় কথাটাকে, তবু এর চেয়ে আশ্চর্য্য পৃথিবীতে আর কি আছে ? তোমার জীবনে সেই ক'টি মাত্র মাসই বুঝি তুমি সত্যিকার বেঁচেছিলে। কারণ প্রাণধারণ করাই তো বাঁচা নয়। তার পরে তুমিও তো ছ' বছর বেঁচে রয়েছ, আরো কোন না ছ' দুগুণে বারো বছর বেঁচে থাকবে, কিন্তু এর মধ্যে কোথাও কি আছে জীবনের সেই অতল মাধুর্য্য, অনির্ব্বচনীয় রোমাঞ্চ !

পরীক্ষার যখন আর প্রায় এক মাস বাকি তখনকার এক সন্ধ্যার ঘটনা—

ভবতোষ বলে উঠল, "কথাটা তা হলে তুমিই তোমার বাবা-মাকে বল।"

"আমি ? আমি পারব না।"

"কেন পারবে না ? তোমারই তো বাবা-মা।"

"বাঃ, আমার লজ্জা করে না বুঝি ?"

"বেশ, তা হলে না হয় আমিই বলব।"

"তুমি বলবে ? কবে ?"

"এখন নয়। পরীক্ষাটা আগে ভালোয় ভালোয় হয়ে যাক্। তোমাকে কিন্তু পাস করতেই হবে। নইলে বোঝ ত, আমারও বদনাম কিছু কম হবে না। পরীক্ষার পর আমাকেও কিছুদিনের জন্য দেশে যেতে হবে, অন্ততঃ মাকে বলতে। অবশ্য ওদিকে কোন গোলমাল হবে না। হবেই বা কেন ? বাধা ত নেই কিছু। আর বাধা থাকলেই কি হ'ত ? তোমার আমার মধ্যে পাকা কথা ত হয়েই রইল। তার নড়চড় হবে না কোনদিন, কেমন তাই না ? নাও, এখন পড়ায় মন দাও।"

কথা ত পাকা হ'ল, তোমরা ভেবেছিলে যে জীবনের পথটাও বুঝি সেই সঙ্গে পাকা করে বাঁধিয়ে ফেললে। কিন্তু পাকা কথাও যে কত সহজে কেঁচে যায়, বাঁধা সড়কও যে কোন মুহূর্ত্তে ধ্বসে যেতে পারে, তা জানবার মত বয়স বা বুদ্ধি তোমাদের তখনো হয় নি। এখনই কি হয়েছে ? কখনো কি হবে ?

তোমার পরীক্ষা হয়ে যাবার কিছুদিন পরেই ভবতোষ চলে গেল। তুমিও বৌবাজারের এই বাড়ীতে পরীক্ষার ফল আর ভবতোষের পথ চেয়ে বসে রইলে। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হ'ল। সেদিন অকালবর্ষণমুখর সন্ধ্যা, ঘোর দুর্য্যোগ। তোমার বাবার আপিস থেকে ফেরবার সময় পার হয়ে গেল। তা গেলেই বা, এমন দিনে একটু আধটু দেরি ত হতেই পারে। কিন্তু তাই বলে এত দেরি ? সাতটা, আটটা, ন'টা, দশটা করে রাত এগারোটাও বেজে গেল। ভাইবোন দুটিকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তুমি আর তোমার মা দারুণ উৎকণ্ঠায় জেগে রইলে। এমন সময় বাইরের দরজায় জোরে কড়া নড়ে উঠল। ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই একজন অপরিচিত ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় তোমাদের নামধাম জেনে নিয়ে তোমার বাবার সংবাদ অনেকটা যেন মুখস্থের মত বলে গেলেন, "ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে হঠাৎ পা পিছলে সাংঘাতিক জখম হয়েছেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেখানেই আছেন। ইচ্ছা করলে দেখে আসতে পারেন তাঁকে।"

দেখতেও গিয়েছিলে তোমরা। তোমার বাবার ডান পাখানা ট্রামের চাকার চাপে দুমড়ে বেঁকে গিয়েছিল। বীভৎস দৃশ্য! তোমার মা ত একবারমাত্র দেখেই কেঁদে কেটে মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম। কিন্তু তুমি কিছুই কর নি কিংবা করতে পার নি। হাসপাতালের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সেই কয়েক মিনিটের মধ্যে তোমার মনে যে কতরকম ভাবনা ঝিলিক দিয়ে গেল তার ইয়ত্তা নেই··· মা, ভাইবোন, ভবতোষ, ভবিষ্যৎ, আরো দূর, আরো অনেক দূর···

তোমার বাবার ডান পাখানা উরু থেকে কেটে বাদ দিতে হ'ল। তা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। বাড়ী থেকে তিনি বেরিয়েছিলেন একরকম, আর ফিরে এলেন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে। প্রথম দিন পনেরো গেল সমস্ত ব্যাপারটার দুঃসহ আকস্মিকতার ধার ভোঁতা হতে। তারপর যতই এই পরিবর্ত্তিত পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেবার প্রশ্নটা ঠেলা মেরে উঠতে লাগল ততই আস্তে আস্তে তোমাদের বাড়ীর আবহাওয়া থমথমে গম্ভীর হয়ে উঠল। সে থমথমে ভাব মৃত্যুর স্তব্ধতার চেয়েও ভয়ঙ্কর। কারণ মৃত্যুতে একটা পরিণতির পূর্ণতা আছে। একেবারে শূন্য করে দিয়ে যায় বলেই তাকে আমরা চোখের জলে আর বেদনার মাধুর্য্যে খুশীমত ভরে তুলতে পারি। কিন্তু শেষ হয়েও যা শেষ হতে চায় না সে শুধু বোঝা হয়েই চেপে থাকে, মনকে ছুটি দেবার কোন পথই খোলা রাখে না।

ভবতোষের চিঠি অবশ্য নিয়মমতই আসত, তুমিও নিয়মরক্ষার খাতিরে তাদের ছোট ছোট উত্তর দিতে। এজন্য ভবতোষ তার চিঠিতে অনুযোগও করত যথেষ্ট। তুমি বিনা প্রতিবাদেই মেনে নিতে সে সব, তবু তোমার বাবার খবরটা কিছুতেই তাকে খুলে লিখতে পার নি। ভেবেছিলে, অত দূরে বসে এই খবর পেয়ে ওর মনের অবস্থা, ওর বাড়ীর সকলের অবস্থা কেমন হবে কে জানে ? তার চেয়ে বরং ও ফিরে এসে নিজের চোখে সবকিছু দেখে যা করবার করুক।

ভবতোষ ফিরে এল প্রায় মাস দেড়েক পরে। তোমাদের বাড়ীর হালচাল দেখে সেও বেশ খানিকটা থতমত খেয়ে গেল। তা সে বেচারার দোষই বা কি, মাত্র দেড় মাসের মধ্যে যে কোন সংসারে এত পরিবর্ত্তন ঘটে যেতে পারে তা সে জানবে কি করে ? তবু কিন্তু সে দমে গেল না। তোমাকে দিল প্রবোধ, তোমার মাকে সাহস, আর তোমার বাবাকে আশ্বাস।

তোমাদের বাড়ীতে ঠিক আগেকার মতই সে যাওয়া-আসা করতে লাগল। কিন্তু তা হলে কি হবে ? এখন তাকে প্রায় সবটুকু সময়ই কাটাতে হ'ত তোমার বাবার সঙ্গে। তিনি যে অসুস্থ, তাকে কি উপেক্ষা করা চলে ? তুমিই বা কোন্ আক্কেলে তার কথা ভুলে ভবতোষের সঙ্গে নিভৃত আলাপের সুযোগ খুঁজবে ?

কিন্তু তবু একদিন সেই সুযোগ জুটে গেল, প্রায় সপ্তাহ-দুয়েক পরে। সেদিন তোমার মা ছোট ভাইবোন দুটিকে নিয়ে কাছেই কোন এক কালীবাড়ীতে গিয়েছিলেন। দেবদ্বিজে তাঁর ভক্তিটা ইদানীং বড় বেশী মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। তুমি বাড়ীতে ছিলে তোমার বাবাকে দেখাশুনা করবার জন্য। কিন্তু তিনি তখন ঘুমে অচেতন। এমন সময় ভবতোষ এল। উঁকি দিয়ে একবার তোমার বাবাকে দেখে নিয়েই চলে এল তোমার ঘরে। খাটের উপর ধপ করে বসে পড়ে তোমাকেও টেনে বসাল তার পাশে। তারপর তোমার ডান হাতখানা নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলল, "এবার······"

শুধু ঐ একটিমাত্র কথা, কিন্তু তাতেই তোমার সমস্ত শরীর যেন ঝিমঝিম করে উঠল। তুমি বুঝতে পারলে যে এখনি সে সেই কথাটি পাড়বে যা শুনবার আশায় এতদিন তুমি তৃষিত হয়ে ছিলে।

তোমার হাতখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতেই ভবতোষ বলল, "বাড়ীতে সব বলেছি। মা খুশী হয়ে মত দিয়েছেন। দাদারাও বিশেষ অমত করেন নি। তাদের শুধু একটা সর্ত্ত, আগে, আমাকে এম-এ পাস করতে হবে। এবার তোমার বাড়ীর মত নেবার পালা।"

তুমি কিছুই বলতে পার নি, শুধু ভবতোষের পাশে মাথা নীচু করে বসে ঘেমে নেয়ে উঠছিলে।

ভবতোষ তোমাকে আরো একটু কাছে টেনে এনে বলল, "কিন্তু তার আগে তুমি আর একবার বল তোমার নিজের কথা। কি হ'ল, কিছু বলছ না যে ? কিছু অমত আছে নাকি ?"

তুমি তখন আস্তে আস্তে মুখ তুলে তোমার ঐ টানা কালো

চোখ মেলে ভবতোষের দিকে তাকিয়েছিলে। হঠাৎ মনে হয়েছিল যে এখনি বুঝি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলবে। কি নিষ্ঠুর ঐ লোকটি যে তোমাকে হেসে হেসে এমন নির্মম প্রশ্ন করতে পারে।

ভবতোষ নিজেই এবার তোমার আরো কাছে সরে বসল। দু'হাতে চেপে ধরল তোমার মুখখানা, তারপর তোমার ঠোঁটের উপর······সেই তোমাদের প্রথম চুম্বন। তার আনন্দ, তার রোমাঞ্চ আর কোনদিন ফিরবে না জানি, কিন্তু ইংরেজ কবির কথায়—কখনো না পাওয়ার চেয়ে পেয়ে হারানোও কি ঢের—ঢের ভালো নয়?

অবশেষে ভবতোষ বলল, "তা হলে তোমার বাবাকে সব বলি?"

"কিন্তু বাবার এই অবস্থায়······"

"সে আমি বুঝব'খন। তোমার বাবাও ত অবুঝ নন।"

কিন্তু বাবাকে বলবার সুযোগ যেন আর হয়েই উঠছিল না। দিনের পর দিন যায়, ভবতোষও আসে, বাবার সঙ্গে বসে কথাও বলে, কিন্তু আসল কথাটি আর বলা হয় না। কোনদিন-বা তোমার মা ঘরে থেকে ঝামেলা করেন, কোনদিন-বা ভাইবোন দুটো চেঁচাতে থাকে, কখনো-বা তোমার বাবার মেজাজটাই বিষম তিরিক্ষি হয়ে ওঠে। তুমি কেবলি ঘুরঘুর কর, কেউ কাছে না থাকলে দরজার আড়ালে কান পেতে থাক, কিন্তু যেজন্য এত কাণ্ড তার আর দেখা নেই।

তবু সব অপেক্ষারই অবসান আছে, তোমার, সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত দিনটিও শেষ পর্য্যন্ত এল। কিন্তু কি ভাবেই না এল!

ভবতোষ বলছিল তোমার কথা, "আই-এ তো পাস করল। এখন কি করবে বলে ঠিক করেছেন?"

কিছুক্ষণ চুপচাপ, বাবা বোধ হয় ভবতোষের প্রশ্নটা ভেবে দেখছিলেন। অত্যন্ত সহজ কথাও বুঝতে আজকাল তাঁর এত কষ্ট হয়।

অবশেষে তার গলা শোনা গেল, "কি আবার ঠিক করব? ঠিক করবার আছেই বা কি?"

"বি-এ পড়াবেন না?"

"আর পড়ায় কাজ নেই। ঢের হয়েছে।"

"তা হলে কি মেয়ের বিয়ে দেবেন?"

"বিয়ে?"

"হ্যাঁ, এই ধরুন যদি কোন ভাল পাত্র-টাত্র পান।"

"তেমন পাত্র পাব না। তা ছাড়া, বিয়ে দেবার পয়সা কোথায়? রোজগার যা করেছি সে ত গুষ্টিসুদ্ধ গেলাতেই শেষ হয়েছে।" ইস, বাবার কথাবার্ত্তাগুলি আজকাল এত বিশ্রী হয়েছে!

কিন্তু ভবতোষ আজ যেন কিছুতেই দমবে না। সে আবার বলছে, "কিন্তু এমন ভাল পাত্র যদি জোটে যার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে আপনার এক পয়সাও খরচ হবে না?"

"এমন পাত্র আছে নাকি?"

"আছে। ধরুন, সে পাত্র যদি আমিই হই।"

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। কিন্তু এ যেন অন্যরকম। এই স্তব্ধতার জঠরে যেন অসংখ্য অস্ফুট কথা কিলবিল করছে। এখন তার মধ্য থেকে কোন্ কথাটি অন্য সবাইকে ঠেলে কেটে বেরোয় কে জানে? তোমার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হবার উপক্রম হ'ল। আকাশ থেকে দৈববাণী শোনবার মতই তুমি রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করে রইলে।

এবার তোমার বাবার গলা। শয্যাশায়ী হবার পর থেকেই তাঁর আওয়াজটা যেন কেমন বিশ্রী হয়ে গেছে। কিন্তু এতটা অদ্ভুত তো তোমার কানেও আর কখনো লাগে নি।

"তুমি? তুমি বিয়ে করবে?"

"হ্যাঁ, আমি—আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করব।"

এবার তোমার বাবার গলা যেন শতখান হয়ে ঝনঝন করে উঠল, "ওঃ, বুঝেছি। তুমি আমাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করবে? কিন্তু আমার ভাবনা নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা কেন বাপু? কবে থেকেই-বা এই মাথাব্যথা? ঐ তরফেরও বুঝি সায় আছে এতে···বাঃ বাঃ···"

তোমার মাথার মধ্যে সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। সারা শরীর ঝিমঝিম করছে, পায়ের তলায় মাটিটাও যেন কেঁপে উঠছে। দেয়ালে হেলান দিয়ে নিজেকে কোনরকমে খাড়া রাখবার চেষ্টা করছিলে আর ওরই মধ্যে কানে আসছিল তোমার বাবার এক একটা কথা—"হবেই তো। এখন যে খোঁড়া বাপের আর তেমন করে গিলতে দেবার ক্ষমতা নেই, তাই তাড়াতাড়ি করে নিজের পথ দেখা। এ না হলে আর মেয়ে? একুশ বছর ধরে এইজন্যই তো খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করেছি।···এ যদি আমার ছেলে হ'ত তবে কি কিছু ভাবতাম? না কি, তুমি এসব কথা বলতে সাহস পেতে?···আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি···"

মা গো, আর তো দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। একছুটে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানার উপর তুমি মুখ গুঁজে পড়লে। চোখের জল আর কিছুতেই বাধা মানল না।

অনেকক্ষণ পর—তোমার মনে হ'ল যেন কত যুগ পর—তোমার পিঠের উপর খুব আস্তে কে যেন হাত রাখল। মুখ না তুলেই তুমি বুঝতে পারলে, সে হাত কার। ভবতোষ শুধু বলে গেল, "আমি আবার আসব।"

সেদিন কি ভাগ্য যে বাবার কাছে তোমাকে আলাদা করে কোন কথা শুনতে হয় নি। খুব সম্ভব এর পিছনে তোমার মায়ের হাত ছিল, তিনিই তাঁকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন।

সে রাত্রিটা তুমি উপোস করে কাটালে। তোমার মা এসে লুকিয়ে কত সাধলেন, ভাইবোনদের দিয়েও সাধালেন, কিন্তু তারা তোমার মনের অবস্থা কি বুঝবে? বাবার কথা ভাবতেই যে

তোমার গা ঝিমঝিম করে উঠছিল। কেবলই মনে পড়ছিল তোমার বাবার কথাগুলি। উঃ, কেমন করে তিনি তোমাকে এত স্বার্থপর ভাবলেন? বাবা হয়ে তোমার নামে এমন অপবাদ দিলেন? সংসারে সব অশান্তির জন্ত যেন একমাত্র তুমিই দায়ী।

ভবতোষ চলে যাবার পর থেকেই তুমি বিছানায় মুখ গুঁজে পড়েছিলে যদিও ঘুম আসছিল না কিছুতেই। শুয়ে শুয়েই টের পেলে, ভাইবোন দুটি একিসুরর এসে আলগোছে তোমার পাশে শুয়ে পড়ল, ঘুমিয়েও পড়ল কিছুক্ষণ বাদেই। রান্নাঘরে মার কাজ শেষ হ'ল—ঐ যে শিকল তুলবার শব্দ। কয়েক মিনিট পরেই পাশের ঘরের দরজাতেও খিল পড়ল। চারদিক ঘুমে নিস্তব্ধ, শুধু তোমার চোখেই ঘুম নেই। বিছানায় শুয়ে থাকা অসহ্য বোধ হ'ল, আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে দাঁড়ালে পূবের সেই জানালায়। ভবতোষের ঘরও অন্ধকার, কিন্তু সেও নিশ্চয়ই আজ জেগে বসে আছে, হয় তো ঐ জানালাটায় ধারেই। তুমি যদি এখনই কোন মন্ত্রবলে এই জানালা গলে ওখানে চলে যেতে পারতে তা হলে ঠিক দেখতে পেতে তাকে—আকাশের দিকে তাকিয়ে সেও তোমার কথাই ভাবছে। কি চমৎকারই যে হ'ত তা হলে—অন্ধকার ভেদ করে একেবারে তার সামনে হাজির হয়েই তুমি বলতে পারতে, 'এই যে আমি এসেছি, আমাকে তুমি নিয়ে যাও যেখানে তোমার খুশী। আমি আর কিছু চাই না, আমার সব ভাবনার ভার এই তোমার হাতে তুলে দিলাম।'

হঠাৎ তোমার স্বপ্নের ঘোর কেটে গেল। খুব কাছেই কারা যেন কথা বলছে। একটু কান খাড়া করতেই বুঝতে পারলে শব্দটা আসছে পাশের ঘর থেকে। তোমার মার গলা—"কেন তুমি ওকে অমন করে কথা শোনালে? দেখলে না, কেমন মুখ কালি করে চলে গেল।"

"গেল তো ভারি বয়েই গেল। কিন্তু তাতে তোমারও গায়ে ফোস্কা পড়ল নাকি? ওঃ, তোমাকে শুদ্ধ হাত করেছে তা হলে?"

"ছিঃ ছিঃ, কি যে বল তার ঠিক নেই। আর যা বলবে একটু আস্তে বল না। ও ঘরে ওরা সব ঘুমুচ্ছে। জেগে উঠে শুনতে পেলে কি ভাববে?"

এর পর তোমার বাবার গলাটা একটু খাদে নেমে এল, যদিও তাঁর কথার ধার একটুও কমেছে বলে মনে হ'ল না। উচিত কথাই বলেছি। দরকার হলে আরো বলব।"

"তা বলে মেয়ের বিয়ে দেবে না? অমন ভাল ছেলেটা। খরচও হ'ত না কিছু, সে তো ও নিজের মুখেই বলল।"

"ব্যস, আর কি। বলল তো আমার গুষ্টিশুদ্ধ মাথা কিনে নিল। আর বিয়ের কথা বলছ? বিয়ের জন্ত বাপ-মার মুখ চেয়ে থাকবে তেমন মেয়েই কি না তোমার? তা না হলে তলায় তলায় নিজেই সব ব্যবস্থা করবে কেন?"

"ছিঃ ছিঃ, তুমি এমন কেন হলে বল তো? নিজের মেয়ের জন্তও কি এক বরত্ত নেই?" তোমার মার গলা কান্নায় ভারী শোনাল।

"থাক্ থাক্, আমাদের জন্ত দরদে তোমার মেয়ের প্রাণ একেবারে গলে যাচ্ছে কিনা। তা না হলে এমন হবে কেন? যেই দেখছে বাপের আর রোজগার করে গেলাবার ক্ষমতা নেই অমনি নাচানাচি সুরু করেছে।"

"কি সব যা-তা বলছ? এতে নাচানাচির কি দেখলে?"

"ঐ একই কথা। এখন শুধু নিজের একটা গতি হলেই হ'ল। তারপর বুড়ো বাপ-মা জাহান্নামেই যাক্, আর ছোট ভাইবোনগুলো শুকিয়েই মরুক। আমারও যেমন কপাল, ওটা যদি মেয়ে না হয়ে আমার ছেলে হ'ত।" বাবা প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

"কিন্তু ছেলে যখন নয় তখন মিছে কপাল চাপড়ে কি হবে? আমাদের কপালে যাই থাক্, ওর জীবনটা কি সেজন্ত নষ্ট হয়ে যাবে? ওর প্রতি কি আমাদের কোন কর্তব্য নেই?"

"কর্তব্য!" বাবা সঙ্গে সঙ্গে কয়েক মাত্রা গলা চড়ালেন, 'ঠিক কথা বলেছ। কর্তব্যই বটে। কর্তব্যবোধ যদি ওর একটুও থাকত তবে নিজের সুখের কথা না ভেবে ঘরের কথাটাই ভাবত এখন। কি করে সংসার চলবে সে খেয়াল আছে? কি এমন লাখ-বেলাখ টাকা রোজগার করেছি যে চিরকাল পায়ের উপর পা থুয়ে খাব? দু'দিন বাদে যে গুষ্টিশুদ্ধ শুকিয়ে মরতে হবে? আর ওদিকে মেয়ে আমার চললেন বিয়ে করে আরামে ঘরকন্না করতে।"

"কিন্তু ও যে মেয়ে। ওকে তুমি কি করতে বল?"

"কি আর বলব? বললেও কি বুঝবে? তোমার মেয়ে সে পাত্রীই নয়। তা হলে আর বলছি কেন, ও যদি মেয়ে না হয়ে আমার ছেলে হ'ত···।" আবার একটা প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাস।

"কিন্তু ছেলে যখন নয় তখন কি করবে?"

"তেমন মেয়ে হলে ছেলের কর্তব্যও করত বৈ কি, আজকাল ত অনেক মেয়েই করছে?"

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে তুমি যেন আস্তে আস্তে পাথর হয়ে গেলে। দেখতে দেখতে সমস্ত পৃথিবীটা আরো কালো, আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। তার বিশাল বুক জুড়ে শুধু একটি মাত্র কথাই যেন বার বার দুলে দুলে উঠতে লাগল—কর্তব্য, কর্তব্য। হাঁ, কর্তব্য বৈ কি। আকাশের ঐ গ্রহতারা থেকে পৃথিবীর ধূলিকণাটি পর্যন্ত তাদের কর্তব্য করে চলেছে। কর্তব্য সকলের উপরে, তার পর আর যা-কিছু। চুলোয় যাক্ হৃদয়ের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা। কর্তব্যের সঙ্গে যখন তার বিরোধ বাঁধে তখন হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে ছিঁড়ে ঝরে পড়ে যাক্, তবু কর্তব্যকেই মাথা পেতে মেনে নিতে হবে। সেই ভয়ঙ্কর কর্তব্য তোমার সামনে। তোমাকে আর মেয়ে সেজে থাকলে চলবে না, ছেলে হতে হবে।··· সেই কালরাত্রি জানালা ধরেই কখন যে ভোর হয়ে গেল সে খবর ভবতোষ আমাকে বলতে পারে নি, তুমি নিজেও পারবে না।

•

ঠিক সাতদিন পর ভবতোষ আবার এল। এর আগে কখনো সে একনাগাড়ে একদিন কামাই করে নি। সেদিন অত কোন-

দিকে না তাকিয়ে সোজা সে গিয়ে ঢুকল তোমার ঘরে। রান্নাঘর থেকে তোমার মা তাকে আড়চোখে এক বার দেখেই চোখ নামিয়ে নিলেন।

ছোট ভাইটি তখন তোমার ঘরেই ছিল, কিন্তু ভবতোষকে দেখে সে অন্যদিনের মত চেঁচিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করল না। শিশুসুলভ সহজ অনুভূতিতে সেও তখন বুঝতে পেরেছে যে ভবতোষের সঙ্গে এ বাড়ীর সম্পর্কটা আর ঠিক আগের মত নেই। তাই সুড়সুড় করে সে তার পাশ কাটিয়ে সরে পড়ল।

ভবতোষ সেদিকে ফিরেও দেখল না। সোজা তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুমাত্র ভূমিকা না করেই বলল, "সব শুনেছ নিশ্চয়ই। এবার তুমি কি করবে তাই বল।"

এ কেমন প্রশ্ন? এই মুহূর্ত্তে তোমায় জানিয়ে দিতে হবে তোমার জীবন সম্বন্ধে শেষ কথা? এ জন্য ত তুমি মোটেই প্রস্তুত ছিলে না? তাই বিষম থতমত খেয়ে গেলে। ভয়ে ভয়ে শুধু বললে, "আমি কি করব? তুমিই বল।"

ভবতোষের তেমনি চাঁচাছোলা কথা। আজ যেন সে মারমুখো হয়ে এসেছে।

"কি আবার করবে? আমাকে বিয়ে করবে। এমন কিছু শক্ত কথা নয়।"

"কিন্তু এদের কি হবে?" হাতের একটা ছোট্ট ইঙ্গিত তুমি করলে বাড়ীর ভিতর দিকে। মুখে কথা বলছিলে আর মনে মনে ভাবছিলে, মানুষ কি এত নিষ্ঠুরও হয়? তুমি একটা সামান্য মেয়ে, তোমাকে একটু চিন্তা করবার, একটু লজ্জা পাবার পর্য্যন্ত অবকাশ দিল না?

কিন্তু ভবতোষের আজ কোন দিকে হুঁস নেই। তোমার কথা শুনে সে বাঁকা হেসে বলল, "ওদের দেখবে ওরা নিজেরাই, যেমন তুমি দেখবে তোমাকে।"

"কিন্তু আমার কর্ত্তব্য..." ঐ কথাটাকে তুমি কিছুতেই ভুলতে পারছিলে না। ওটা যেন তোমার হৃৎপিণ্ডে একটা গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে একেবারে গেঁথে গিয়েছিল।

"কর্ত্তব্য?" ভবতোষ বাধা দিয়ে বলল, "সকলের চেয়ে বড় কর্ত্তব্য তোমার নিজের প্রতি। যাই হোক্, শেষ পর্য্যন্ত তুমিও তা হলে আমাকে চলে যেতেই বলছ?" তার তৎকালীন মুখ-চোখের অবস্থা বর্ণনাতীত।

সে সত্যি চলে যাবার উপক্রম করছে দেখে তুমি আর থাকতে পারলে না। এক ছুটে দরজার সামনে তার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে কান্নাভরা গলায় বললে, "তুমি আমাকে ভুল বুঝো না..."

তোমার সেই বুকফাটা করুণ মিনতিতে ভবতোষ কি শুনতে পেল জানি না, কিন্তু আস্তে আস্তে এবার তার চেহারাও বদলে গেল। কোথায় গেল তার মুখের সেই বাঁকা হাসি, তীক্ষ্ণ চাহনি, কঠিন ভ্রূভঙ্গী। হঠাৎ দু'হাত বাড়িয়ে সে তোমাকে টেনে নিল তার বুকের মধ্যে, তুমিও যেন এতক্ষণে তোমার পরম আকাঙ্ক্ষিত আশ্রয় পেলে। আর কোন প্রশ্ন নয়, কোন দ্বন্দ্ব নয়—হৃদয় দিয়ে শুধু হৃদয়ের স্পন্দন শোনা, দেহ দিয়ে দেহাতীতের স্পর্শ লাভ করা।

অনেকক্ষণ পর ভবতোষ তোমার চুলের মধ্যে মুখ গুঁজে গুন গুন করে বলল, "না, তোমাকে ভুল বুঝব না। আমিই বুঝতে পারি নি, আমাকে মাপ কর। আমি তোমারই রইলাম, তোমারই থাকব। শুধু একটা কথা, জীবনে সুখী হতে হলে কিছুটা স্বার্থপর হতেই হয়। কোন বিষয় নিয়েই বেশী মাথা ঘামানোতে বিপদ অনেক। তাই তোমাকে বেশী সময় দেব না, ভাবতেও দেব না। তুমি জান, এ বাড়ীতে আমার আসা নিষেধ। তবু আমি আসব, আবার সাতদিন পর। সে দিন প্রস্তুত থেক।"

খুব আস্তে করে—যেন তোমার একটুও ব্যথা না লাগে—ভবতোষ তোমাকে ছাড়িয়ে নিল, তার পর যেমন এসেছিল তেমনি সোজা বেরিয়ে গেল।

কিন্তু সেদিন তোমার বাবা তোমাকে রেহাই দেন নি। ভবতোষের খবরটা তিনি বোধ হয় কোন ভাবে তোমার ছোট ভাইয়ের কাছ থেকেই জেনেছিলেন। তাকে দিয়েই ডেকে পাঠালেন তোমাকে। তার ঘরে পা দিতে না দিতেই তিনি একেবারে ফোঁস করে উঠলেন, "কে এসেছিল রে তোর ঘরে? সেই ছোঁড়াটা না?"

বাবার কথার ধরন দেখে তোমার মনটা মুহূর্ত্তে পাথরের মত কঠিন হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে সংক্ষেপে বললে, "হ্যাঁ।"

তোমার বাবা এবার চীৎকার করে উঠলেন, "হ্যাঁ...এত বড় আস্পর্দ্ধা! কোন্ সাহসে ও এ বাড়ীতে ঢোকে? সেদিন ওকে আমি পই পই করে বারণ করে দিই নি—তবু এসেছিল? আর তুই—আমার মেয়ে হয়ে, আমার বাড়ীতে বসে, আমারই গালে চুণ-কালি মাখাবি? এত তোর সাহস? ভেবেছিস কি, আমার ঠ্যাং কাটা গেছে বলে তোর মত মেয়েকে শায়েস্তা করতে পারি না? দেখবি...দেখতে চাস?" উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে তিনি দুই কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে তাঁর পঙ্গু দেহটাকে খাটের উপর খাড়া করে তুললেন।

তোমারও সর্ব্বাঙ্গ তখন রাগে জ্বলে যাচ্ছিল। খুব একটা কড়া জবাবও এসেছিল মুখে, কিন্তু ঠিক তখনই কোথা থেকে মা এসে মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তোমাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে তোমার বাবাকে বললেন, "তুমি চুপ কর। ওকে যা বলবার আমি বলছি।" তার পর তোমার দিকে ফিরে বললেন, "তুই আয় ত আমার সঙ্গে।"

মা তোমাকে প্রায় টানতে টানতেই নিয়ে এলেন তোমার ঘরে। তখন তোমার শরীর থরথর করে কাঁপছিল। মনে হচ্ছিল, চলে গেলেই হ'ত ভবতোষের সঙ্গে। সে ত নিতেই এসেছিল তোমাকে। বাবা তোমাকে এত নীচ, এত স্বার্থপর ভাবে তাদের প্রতি তোমারও কোন দায়িত্ব নেই। চলে গেলেই সব ল্যাঠা চুকে যেত। এখন আবার সাত দিন এই নরকেই পচে মরতে হবে।

কিন্তু তোমার এত যে রাগ তাও তোমার মার স্নেহস্পর্শে জল হয়ে যেতে বেশী সময় লাগে নি। মা তোমাকে জড়িয়ে ধরে প্রথমেই বলেছিলেন, "ভাখ, ওকে তুই বিয়ে কর। আমি তোকে বিয়ে করতে বলছি।

এ বিস্ময় যেন আরও অপ্রত্যাশিত। তুমি অবাক হয়ে মার দিকে চেয়ে বলেছিলে, "তুমি বলছ?"

"হাঁ, আমি তোর মা, বিশ্বাস কর এ বিয়েতে আমার একটুও অমত নেই। বরং তুই তাঁকে বিয়ে করলে আমি খুব খুশী হব।"

"কিন্তু বাবা?" আশ্চর্য্য, দু'মিনিট আগেও যে বাবার উপর বিতৃষ্ণায় তোমার মন ভরে উঠেছিল এখন তুমিই আবার তাঁর কথাটা পাড়লে।

"ওর কথা ছেড়ে দে। ওর এখন মাথার ঠিক নেই। আমি মা হয়ে তোকে বিয়ে করতে বলছি, ওর অমতে তোর কোন অমঙ্গল হবে না।"

"আর তোমাদের কি হবে?"

মা হাসলেন। তোমার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, "যা হবার তাই হবে। সে কথা ভেবে তুই কি বসে থাকবি নাকি? তোর কি নিজের জীবন বলে কিছু থাকবে না?"

হঠাৎ তোমার মনে পড়ে গেল ভবতোষের কথা—সকলের চেয়ে বড় কর্ত্তব্য নিজের প্রতি। তোমার মার কথাতেও যেন তারই প্রতিধ্বনি।

মা আবার বললেন, "দেখ, আমি বুঝতে পারছি, তোর মনে হয় ত অনেক প্রশ্ন আসছে। আমি সব খুলে বলছি, তোর কাছে কিছুই লুকোতে চাই না। তুই আমার ছেলেমেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। কতকগুলি সাজানো কথা বলে আমি তোকে ওর হাতে তুলে দেবো না তাতেই বরং তোর অমঙ্গল হবে। তুই গরীবের মেয়ে—বড় গরীব—অন্তরের আশীর্ব্বাদটুকু ছাড়া তোকে দেবার মত আমার আর কিছু নেই।"

মার দু'চোখ ছলছল করে উঠল। তুমি মন্ত্রমুগ্ধের মত তার কথা শুনছিলে। তিনি বলে চললেন, "আমাদের কি ভাবে চলবে জিজ্ঞেস করছিলি না? তোকে সব বলব। আপিসের সঙ্গে ওর চিঠি লেখালিখি চলছে। ওরা জানিয়েছে যে চাকরিতে রাখা আর সম্ভব হবে না, তবে কিছু টাকা দিতে রাজী আছে। সেটা পাওয়া যাবে বোধ হয় শীগগিরই।"

"সে আর কতই বা টাকা?"

"দিন কি আর বসে থাকবে রে? চলেই যাবে এক ভাবে। আমিও ত কিছু করতে পারব। বাড়ীতে কল আছে, জামা কাঁথা সেলাই করেও কোন্ না দু'চার আনা পাব। আর তোকে ত কিছুই দিচ্ছি না। তেমন বিপদ আপদের জন্ম আমার গয়না ক'খানাও রইল।" মা'র হাতের চুড়িগুলি ঠুনঠুন শব্দ করে উঠল।

এবার তোমার দৃষ্টি পড়ল সেদিকে। কি-বা এমন গয়না? চার-গাছা করে চুড়ি, আর শাখা ও লোহা। এ ছাড়াও বুঝি আছে দুটো হার আর এক জোড়া বালা। এই ত সম্বল। কিন্তু তোমার নজর মার চুড়ির উপর বেশীক্ষণ রইল না। চোখে পড়ল মার দুখানা হাত। সেই হাতের চামড়ায় আজ অনেক চিড়, অনেক ফাটল। ঐ ফাটলের প্রত্যেকটি সংসারে কত কাজের, তোমাদের কত ছোটখাটো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নীরব সাক্ষী। মা যখন নববধূবেশে এ সংসারে এসেছিলেন তখনও কি তার হাত এমনি ছিল? কখখনও না। তখন হয়ত এই হাত দেখেই তোমার বাবার মনে কত কবিত্ব জেগেছে। কিন্তু আজ? দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, তোমাদের মুখ চেয়ে তিনি নিঃশব্দে সংসারের যাবতীয় কাজ চালিয়ে নিয়েছেন। তোমার শরীর খারাপ হবে, তোমার রং ময়লা হয়ে যাবে এই ভয়ে কোন কাজের ধারেকাছেও তোমাকে যেতে দেন নি। ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছেন, সংসারকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন। ঐ দুটি নিঃসঙ্গ, কর্ম্মক্লান্ত হাত—তবু এই বয়সেও তিনি শুধু তোমার মুখ চেয়ে এই ভাঙা সংসারকে জোড়া লাগাবার দুঃসহ দায়িত্ব তুলে নিচ্ছেন ঐ দুটি হাতেই, ঐ দুটি হাতেই সে দায়িত্ব পালন করবেন জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত। ছুটি চান নি কোন দিন, আজও ছুটির সমস্ত সম্ভাবনাকে স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিলেন।

হঠাৎ তোমার বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠল। মনে হ'ল, তোমার বাবার কথাই ঠিক। তুমি সত্যি স্বার্থপর, অত্যন্ত স্বার্থপর, তা না হলে মার ঐ দুটি হাত দেখেও তোমার মায়া হয় না? মার আজীবনসঞ্চিত এই বিপুল দুঃখের উপর নিজের বাসরশয্যা সাজাতে লজ্জা করে না তোমার?

তোমার কি যে হ'ল ঠিক নেই, হঠাৎ মাকে জড়িয়ে ধরে তুমি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে। শুধু একটা কথাই বারবার তোমার বুক থেকে ঠেলে উঠতে লাগল, "আমি পারব না···আমি পারব না···আমি পারব না···"

তোমার সেই আচমকা কান্না দেখে মা প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেলেন। তারপর তোমার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "এ আবার কি পাগলামি সুরু করলি? বিশ্বাস হ'ল না বুঝি আমার কথা? তুই বিশ্বাস কর—এই তোর মাথায় হাত দিয়ে আমি বলছি, তোকে যদি সুখী হতে দেখি তবে কোন দুঃখই আমার গায়ে লাগবে না। বেশী ভাবিস নি, বেশী ভাবলে কি আর ভাবনার শেষ আছে?"

আবার সেই ভবতোষের কথা—বেশী মাথা ঘামানোতে বিপদ অনেক। কিন্তু তখন তোমার মার দু'চোখেও জল ভরে উঠেছে। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে তিনি বললেন, "ভবতোষ আসুক, আমি তাকে বিয়ের কথা বলব। তোকে এ বিয়ে করতেই হবে।"

"না থাক্, তোমাকে কিছু বলতে হবে না মা। যা বলবার আমিই বলব।"

তুমিই বলেছিলে। ভবতোষের বুকে মাথা গুজে কেঁদে বলেছিলে, "আমি পারব না···পারব না···কিন্তু তুমি আমাকে

ভুল বুঝো না। এদের অভাবে ফেলে রেখে আমি বিয়ে করতে পারব না। ভগবান যদি আমার দুঃখ বুঝে থাকেন তবে এদের দুঃখ একদিন ঘুচবে। সেদিন তুমি এসো; আমাকে নিয়ে যেও। আমি তোমার জন্ত অপেক্ষা করে থাকব···চিরদিন থাকব···কিন্তু এখন আমি পারব না। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না···"

তোমার সেই কথা শুনে ভবতোষ ধপ করে খাটের উপর বসে পড়েছিল। শেষে ভাঙা গলায় বলেছিল, "তোমাদের সকলের দুঃখ দূর করব, ভগবান আমাকে সে অবস্থা দেন নি। তুমি ত জানই সব। এই তা হলে তোমার শেষ কথা ?"

তুমি এ প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পার নি, শুধু অসহায়ভাবে ভবতোষের পাশে বসে তাকে আঁকড়ে ধরেছিলে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ভবতোষ আবার বলল, "আমিও চেষ্টা করব। যদি কখনো তোমাদের সকলের দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা আমার হয় সেদিনই আবার আসব, তার আগে নয়। জানি না, সে কতদিনে হবে—এক বছর, না দু'বছর, না দশ বছর। তুমি থাকতে পারবে ততদিন ?"

"দশ বছর ?" কান্নার মধ্যেই অদ্ভুত হেসে তুমি বলেছিলে, "চিরজীবন থাকব। তুমি দেখে নিও।"

"আমিও থাকব। কিন্তু তার আগে আর আসব না। আমাকে ঐ মেস ছেড়ে দিতে হবে, এ পাড়া ছাড়তে হবে, কলকাতা ছাড়তে হবে। এখানে থেকে তোমাকে না দেখে থাকতে পারব না।" লেখাপড়াও হবে না। কিন্তু এম-এ আমাকে পাস করতেই হবে, শুধু আমার জন্ত নয়, তোমার জন্তও। এম-এ পাস করে আমাকে টাকা রোজকার করতে হবে—অনেক টাকা। তখন আবার আসব।"

"সে কতদিন পরে ?"

"তা ত জানি না। তবে দেখব, জীবন পণ করে দেখব। আমি চলে যাচ্ছি, কতকাল আর তোমাকে দেখতে পাব না কে জানে ? ততদিন··· ।" দেয়ালে টাঙানো তোমার একখানা ছবির দিকে তাকিয়ে সে বলল, "ঐ ছবিটা আমাকে দেবে ?"

তখখুনি দেয়াল থেকে ছবিটা খুলে এনে তার হাতে দিয়ে বলেছিলে, "তোমার একখানা ছবি আমাকে দাও।"

"আমার ত কোন ছবি নেই। আমি বরং একখানা ছবি তুলে তোমাকে পাঠিয়ে দেব, কেমন ?"

কত কথা যে বলবার ছিল সেদিন কিন্তু কিছুই বলা হ'ল না। কান্নার একটা উদ্বেল ঢেউ কেবলই ঠেলে ঠেলে উঠছিল গলা পর্য্যন্ত, সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য ক্ষয় হয়ে যাচ্ছিল সেটাকে দাবিয়ে রাখতেই। শুধু ভবতোষ যখন চলে যাচ্ছে তখন তার জামার খুঁটটা ধরে তুমি বলেছিলে, "চিঠি লিখবে ত ? চিঠি লিখতে ত কোন বাধা নেই।"

নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে ভবতোষ বলল, "লিখব। তুমিও লিখো। এবার যাই।"

তোমার ছবিখানা হাতে নিয়ে সে মাথা নীচু করে চলে গেল।

সে আজ ছ'বছর আগেকার কথা। ভবতোষ তোমাকে তার ছবি দেবার কথা ভোলে নি, সাত দিনের মধ্যেই তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল একখানা। সেই ছবিখানাই তোমার ঐ র‍্যাকের তলায়, রোজ সন্ধ্যাবেলা ঘরের দরজা বন্ধ করে ওখানার দিকেই তুমি কিছুক্ষণ একমনে তাকিয়ে থাকো।

তার পরের খবর ভবতোষের মুখে আমি যেটুকু শুনেছি তা হচ্ছে : তোমাদের মধ্যে চিঠিপত্র চালাচালি হয়েছিল প্রায় বছর দুয়েক। তোমার একটা চিঠি থেকেই ভবতোষ জেনেছিল যে, তুমি একটা মেয়ে ইস্কুলে মাষ্টারি যোগাড় করেছ। কিন্তু ওতে যা মাইনে সে ত তোমাদের অভাবের মরুভূমিতে জলবিন্দুবৎ। কাজে কাজেই তোমাকে সকালে বিকালে দুটো টিউশনিও যোগাড় করে নিতে হ'ল। কিন্তু এমন করে কি কেউ কোনদিন একটা গোটা সংসারের সমস্ত অভাব মেটাতে পেরেছে ?

ইতিমধ্যে ভবতোষ এম-এ পাস করে রেলের চাকরী নিয়ে মুঙ্গের চলে যায়। মাইনে অল্পই কিন্তু সে লিখেছিল যে প্রাণপাত পরিশ্রম করে যদি কতকগুলি পরীক্ষাতে ভালভাবে পাস করা যায় তা হলে হয়ত পাঁচ কি সাত বছর পরে তোমাদের সংসারের দায়িত্ব নেবার মত অবস্থা তার হলেও হতে পারে। তার সেই চিঠিখানাকে বুকে চেপে ধরে সেদিন যে তুমি কি আনন্দে সারারাত জেগে কেঁদেছিলে সে খবরটা ভবতোষ কি কখনো পেয়েছিল ?

সংসারের সঙ্গে স্নেহের যে বন্ধনটুকু তোমার ছিল তাও ঘুচে গেল বছর দেড়েক পরে, যখন তোমার মা মারা গেলেন। দৈনন্দিন অভাব-অনটনের সঙ্গে লড়াই করতে করতেই তাঁর জীবন শেষ হ'ল। তাঁর অভাব যে তোমাকে কত বড় আঘাত দিয়েছিল তা জানবার বা ভবতোষকে জানাবার অবসরটুকুও বুঝি তুমি পাও নি। সংসারের যাবতীয় ভার সেদিন থেকেই তোমার উপর পড়ল—বাইরে ঘুরে চাকরি—ঘরে বাবাকে বাঁচিয়ে রাখা আর ভাইবোন দুটিকে মানুষ করা। জীবনে আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না—শুধু নিষ্করুণ কর্ত্তব্য ছাড়া, যে কর্ত্তব্যের তাড়নায় তুমি আজও পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছ।

কিন্তু তখনো তোমার দুঃখের পাত্র পূর্ণ হয় নি। আরো বড় আঘাত এল মাস ছয়েক বাদে, যখন ভবতোষের সঙ্গে তোমার চিঠির যোগসূত্রটাও ছিন্ন হয়ে গেল। যে কারণে তা হ'ল সেটা কিন্তু তুমিই জানিয়েছিলে ওকে। কি করে যেন ওর একখানা চিঠি তোমার বাবার হাতে পড়ে আর তাই নিয়ে তিনি এমন বিশ্রী গালমন্দ শুরু করেন যে—তুমি লিখেছিলে—সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর এই অশান্তি আর সহ্য হয় না।

অবশ্য তার পরেকার উপায়টা বাৎলেছিল ভবতোষ—কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার কথাটা। এতই যখন সহ্য করতে হচ্ছে তখন এই অশান্তির কারণটাকেই বা পুষে রাখা কেন ? তোমরা দু'জনে তো দু'জনেরই রইলে, তার কোন ব্যত্যয় তো কখনো হবে

না। অতএব বন্ধ হোক্ চিঠি লেখাও—দেখা যাক্, ভগবান তোমাদের নিয়ে আরো কত বেদনার অগ্নিপরীক্ষা করতে চান। ভবতোষ লেখবে, তুমিও দেখ, কত তাড়াতাড়ি এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তোমরা তোমাদের মিলনের ক্ষেত্র তৈরি করতে পার। দু' তরফের যে কোন দিক থেকে যখনি তা সম্ভব হবে তখনি সে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে অপর পক্ষকে সেকথা জানিয়ে দেবে। এই উপায়ের কথা আর কেউ জানবে না—ততদিন সমস্ত অশান্তির সম্ভাবনাকে একেবারে সমূলে নিপাত করা হোক্। কথা রইল, তোমরা দু'জন যে অবস্থাতে যেখানেই থাক না কেন, রোজ পত্রিকা দেখবে তন্ন তন্ন করে যতদিন না সেই বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে।"

কেন জানি না, তুমিও ভবতোষের এই উদ্ভট মতে সায় দিয়েছিলে। নিশ্চয়ই তখন তোমার মাথার ঠিক ছিল না, তা না হলে এমন প্রস্তাবে কেউ রাজী হয়? তোমার সঙ্গে যদি আমার আলাপ থাকত তা হলে এ আমি কিছুতেই হতে দিতাম না। ঐ চিঠিগুলিই ছিল তোমাদের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র। ওটা বন্ধ হয়ে যাবার পরেই—তোমার কথা বলতে পারি না—ভবতোষের চোখে তুমি আস্তে আস্তে জীবন্ত বর্তমান থেকে পিছিয়ে গিয়ে অতীতের একটা বিস্ময়মাত্র হয়ে দাঁড়ালে।

তার পর একে একে আরো চার বছর কেটে গেছে। মুঙ্গের থেকে ভবতোষের সেই চিঠি পাবার পর তার কোন খবর তুমি জান না। কিন্তু আমি জানি। মুঙ্গের থেকে সে বদলি হয়ে যায় কাশী; সেখান থেকে মোরাদাবাদ। এখন সে আছে মোরাদাবাদেই। এই ক'বছরে সে কয়েকটা পরীক্ষা দিয়েছে বটে, চাকরিতে কিছু উন্নতিও হয়েছে তার। কিন্তু সে এমন বিশেষ কিছু নয়। তোমাদের সংসারের বিরাট হাঁ-টা তাতে বুজবে না, সেই গহ্বর বোজাবার সাধ্য ভবতোষের হবে না এ জীবনেও। তা ছাড়া, এখন সে বেচারা নানা অশান্তিতে আছে। ওর ছেলেটা—

এই দেখ কাণ্ড। আসল কথাটাই বুঝি এতক্ষণ বলা হয় নি। বছর দুই আগে ভবতোষ বিয়ে করে ফেলেছে যে। কাশীতে থাকতেই তার বিয়ে হয়, ওখানকারই এক বাঙালী ডাক্তারের একমাত্র মেয়ের সঙ্গে। তার ঐ একটি ছেলে, অবশ্য আরো একটি নাকি পৃথিবীতে পদার্পণ করবে মাস পাঁচেক বাদেই।

ভবতোষ তোমাকে এ খবর জানায় নি। আর জানাবেই বা কি করে? কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার করবার মত খবর এ নিশ্চয়ই নয়। আমিও কিন্তু এ ব্যাপারটা তোমার কাছ থেকে চেপেই যাব। আগাগোড়া একেবারে সত্যি বলবার মত বর্বরতা থেকে ভগবান আমাকে রক্ষা করুন। আমি জানি, ভবতোষের এই বিশ্বাসঘাতকতা তুমি সহ্য করতে পারবে না। হয় তো শেষ পর্যন্ত আক্রোশে, অভিমানে, প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে নিজের উপরেই। সে যাই হোক্, ভবতোষকে আমি কিন্তু মোটেই দোষী করতে পারি না। হার মানাতেই যে কোন কোন সময় কত আনন্দ থাকতে পারে তা জানবার সৌভাগ্য তোমার এখনো হয় নি। কিন্তু ভবতোষের হয়েছে। নইলে ভেবে দেখ না, তোমাদের এতকালের প্রেম এই যে আজ চিরদিনের মত ব্যর্থ হয়ে গেল, এ কিসের জন্ত? কারণ ভবতোষই স্বেচ্ছায় এই ব্যর্থতাকে বরণ করে নিয়েছে। জীবনের কাছে হার মেনেই সে পেয়েছে তার জীবনের সার্থকতা। অতীতকে সম্বল করে সে বর্তমানের বিচিত্র ঐশ্বর্যকে অস্বীকার করতে পারে নি। সত্য বটে যে, জীবনের জয়মাল্য থেকেও সে বঞ্চিত হ'ল, কিন্তু তার জন্ত সে তো মোটেই লালায়িত নয়। সে সুখী হয়েছে, আর সত্যিকার সুখী মানুষকে কে না শ্রদ্ধা করবে?

কিন্তু তুমি এখনো কোন সুখ, কোন শান্তির প্রলোভনে হার মানো নি। তাই তুমি অপরাজিতা। তোমার এই সাতাশ বছরের জীবনে ভবতোষ ছাড়াও কত পুরুষ তোমার গা ঘেঁষে চলে গেল, তুমি তাদের দিকে ফিরেও তাকালে না। বরং তাদের মধ্যে কেউ তোমার দিকে তাকালে তুমি বিরক্ত হও, অমনি তার দিকে পিছন ফিরে বসো। কিন্তু একটা কথা কি কখনো ভেবে দেখেছ যে এমন একদিন আসবে—সেদিন হয় তো খুব বেশী দূরেও নয়—যখন তোমার দিকেও কেউ আর ফিরে তাকাবে না। নেহাতই যদি তাকায় তবে তাকাবে পুরুষের দৃষ্টি দিয়ে নয়—তাকাবে শ্রদ্ধার চোখে, সম্ভ্রমের চোখে। তখন বুঝবে, তুমি যেমন জীবনকে অবজ্ঞা করেছ সেও তেমনি তোমার উপর বড় কম প্রতিশোধ নিতে ছাড়ে নি। কিংবা হয় তো তখনো বুঝবে না বা বুঝতে চাইবে না। তুমি যে অপরাজিতা, হার তো মানবে না কিছুতেই।

কিন্তু সত্যি করে বল তো, মাঝে মাঝে তোমারও কি মন কেমন করে ওঠে না? ইচ্ছা কি হয় না, সমস্ত মান-অভিমান বিসর্জন দিয়ে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে, বিলিয়ে দিতে জীবনের দু'কূলভাঙা স্রোতে? মনে মনে কি চাও না—ঠিকানাহীন ভবতোষের উদ্দেশে আকুল প্রার্থনা পাঠাতে—আর তো পারি না, তুমি এসে আমাকে নিয়ে যাও—এখুনি, এই মুহূর্তে?···কিন্তু তোমার অভিমান? সে যে তোমার জীবনের চেয়েও দামী। তাই পরমুহূর্তেই আবার তুমি নিজেকে কঠিন করে তোল, কাগজে অমন কোন বিজ্ঞাপন দেবার চিন্তাকে মন থেকে মূলসুদ্ধ উপড়ে ফেলে দাও। তুমি যে হার মানবে না কিছুতেই, এমনকি নিজের কাছেও নয়। তাই তো তুমি অপরাজিতা।

এই দেখ, কথায় কথায় বৌবাজারের মোড় এসে গেল। তোমাকে এখানে নামতে হবে। তুমি উঠে দাঁড়ালে। মনে মনেই তোমাকে আমার নমস্কার জানালাম। বিদায় আজকের মত। প্রার্থনা করি, নিদারুণ বঞ্চনার বেদনা যেন তোমার জীবনকে কোন দিন বিষাক্ত না করে—ভগবান তোমার সুখস্বপ্নকে দীর্ঘজীবী করুন।

স্বপ্ন-পাথার

শ্রীউমা দেবী

ওরা স্বপ্ন সৃষ্টি করে
বিনিদ্র বাসরে
দ্বার রুদ্ধ করে।
ওদের দুর্লভ স্পর্দ্ধা মৃত্যুরও উপরে।
ক্ষয়ে-যাওয়া ধ্বসে-যাওয়া জগতের আর্ত্ত বেদনায়
করুণার্দ্র চিত্তে ওরা নব নব সৃষ্টি করে যায়
তম্রঙ্গিত দেহযন্ত্রে ছন্দে ছন্দে ওঠে মন্ত্র কায়-মন্দিরায়—
গৃহে গৃহে অরণ্যে গুহায়
ওরা শুধু সৃষ্টি করে যায়।

ওদের মলিন মুখ? পাণ্ডু গাল? দৃষ্টি কি বিহ্বল?
ওরা কি পায় না খেতে? ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত ওরা—
নিতান্ত দুর্ব্বল?
মাংসহীন অস্থিরাশি? মেদস্ফীত বীভৎস উদর?
কে জানে কেমন ওরা! রাত্রি বুঝি নিশা দ্বিপ্রহর!
এ মুহূর্ত্তে বিঘোষিত প্রকৃতির অমোঘ আদেশ—
ওরা আবিষ্কার করে নব নব দেশ—
নব নব উন্মুখ জীবন
শিরীষের কেশরাগ্রে থর থর শিশির যেমন
চুনির নিলাজ লালে শুক্তি-ভাঙা দুটি মুক্তা-মন।

ওরা জেগে সৃষ্টি করে
দ্বার রুদ্ধ করে
এখন ওদের এক স্বতন্ত্র ভুবন
ওদের আকাশ থেকে নিভে গেছে গ্রহ-তারা-চন্দ্রমা-তপন,
সৃষ্টির গভীরে ডুবে স্থির হয়ে গেছে দুই স্তিমিত নয়ন
ওরা দুই জনে মিলে—একযোগে সৃষ্টি করে
একখানি সোনালি স্বপন!

পৃথিবী উৎকর্ণ হ'য়ে আছে
কি আশা—কি আশা তার নারী ও পুরুষ এই দু'জনার কাছে
নিঃশ্বাসের ঘায়
সুর যদি হাওয়ায় মিলায়
রঙের রেকাব-তুলি হাত থেকে যদি খসে যায়—
তা হ'লে তো গাওয়া আর হবে না সে গান
চিত্রে চিত্রে হবে না তো বিচিত্র প্রয়াণ—
তা হ'লে তো সৃষ্ট আর হবে না নূতন
জরায় জড়াবে শুধু অবোধ যৌবন,
তাই কি ওরাও আজ হয়েছে উন্মন
তাই বুঝি রুদ্ধ দ্বার—খোলা বাতায়ন!

ওখানে আলোক আছে? একটি নীলাভ আলো জ্বালা?
ওখানে হাওয়ায় বুঝি পাতাল-পুরীর নীল-পদ্ম গন্ধঢালা?
আর দু'জনার কণ্ঠে মৃদু মৃদু দোলে দুই মালতীর মালা?
মালার সুতালি ছিঁড়ে ফুলেরা ছড়ায়
তৎক্ষণাৎ রুদ্ধশ্বাস দক্ষিণ বাতাস রাঙা বাষ্প হয়ে যায়!

ওরা কি কথাও বলে? দু'একটি প্রলাপ-গুঞ্জন?
গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ রাগিণী-গুঞ্জন?
কি কথা শোনার জন্য জগৎ উন্মন?
সব যেন ভয়ে ভয়ে আছে
হারায় যদি সে কথা—সে সুর মিলিয়ে যায় পাছে!
তনুতটে ওঠে যদি অতনু শিঞ্জন
ব্যথা পায়, ভালবাসে—শুধু নয় তারাই দু'জন,
—সঙ্গে সঙ্গে ভুবনেরও মন।

ওদের চোখের কোলে আছে অশ্রু-বাষ্পের আভাস?
ওষ্ঠাধর-মূলে এক হাসিভরা রঙীন আকাশ?
তাই কি শ্রাবণ-মেঘে সমুদ্রের এত জলোচ্ছ্বাস?
তাই কি বর্ষণ-শেষে মেঘে মেঘে দীপ্ত ইন্দ্রধনুর উল্লাস?

রুদ্ধ দ্বার—মুক্ত বাতায়ন
ওখানে আলোর আর কোন্ প্রয়োজন?
মোমের মতন তনু গলে যায়—জ্বলে ওঠে সহস্র শিখায়,
ভুবন রহস্য-বার্ত্তা পাঠ করে অগ্নি-লিপিকায়!
জগতের শোক-তাপ ধুয়ে যায় অশ্রুর ধারায়
নূতন জীবন কাঁদে দেহের কারায়
তনুর আশ্লেষে তাই অতনুকে চায়!
অতল গভীর দুই দেহের পাথার
রহস্যের মণি-মুক্তা ছড়ানো-ছিটানো চারিধার
অপবিত্র মুখে কেউ ও পবিত্র আচরণ করো না উচ্চার!

একখানি রাঙা বাষ্পে ঢেকে গেছে দু-জনার মন
তাইতো উৎকর্ণ হ'য়ে জেগে আছে সমস্ত ভুবন
যদি বা বিফল হয় এত আয়োজন!
যদি না মিটায় প্রয়োজন!
নূতন জীবন কাঁদে দেহের কারায়
তনুর আশ্লেষে তাই তনুকে হারায়
হাসি অশ্রু উদ্বেল বন্যায়
অতনুকে বার বার ফিরে পেতে চায়।
বার বার ফিরে পেতে চায়।

দেশ-বিদেশের কথা

ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু

'ডাক্তার বসুর ল্যাবরেটারি'র প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু মহাশয় বিগত ৮ই ভাদ্র ৮৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা দেশে একজন কৃতী ভৈষজ-শিল্পীর অভাব হইল। প্রসন্নকুমার বসুর দ্বিতীয় পুত্র কার্ত্তিকচন্দ্র ১২৮০ সালে (ইং ১৮৭৩ অক্টোবর) ৩০শে কার্ত্তিক চব্বিশ পরগণা জেলার সোনারপুর থানার অন্তর্গত চাংড়িপোতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

১৮৯৭ অব্দে ২৪ বৎসর বয়সে কার্ত্তিকচন্দ্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শারীরতত্ব, চিকিৎসাতত্ব, প্রসূতিবিজ্ঞান, শল্যবিদ্যা প্রভৃতি প্রায় সকল বিষয়ে তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া অনেকগুলি স্বর্ণপদক ও পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। শেষ উপাধি পরীক্ষায় প্রথম হওয়ায় কার্ত্তিকচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণ-পদকও প্রাপ্ত হন।

এম-বি পরীক্ষা পাস করিয়া কার্ত্তিকচন্দ্র 'আই ইনফারমারি'তে যোগ দেন এবং অল্পকালের মধ্যে বিশিষ্ট চক্ষু-চিকিৎসক রূপে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে তিনি স্বেচ্ছায় ঐ পদ ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে চিকিৎসা-ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন। অল্পকাল পরে কার্ত্তিকচন্দ্র বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোম্পানীতে ব্যবস্থাপক চিকিৎসকরূপে যোগদান করেন। তিনি দীর্ঘ বিশ বৎসরকাল উক্ত কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আহ্বানে ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে 'বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসে' যোগদান করেন। বেঙ্গল কেমিক্যালের বর্ত্তমান উন্নতির মূলে তাঁহার বিচক্ষণতা, কর্ম্মশক্তি ও দূরদৃষ্টি বিশেষ ভাবে কার্য্যকরী হইয়াছিল। মাণিকতলায় কারখানার জন্য বিস্তৃত জায়গা তিনি প্রথমে নিজের টাকায় ক্রয় করিয়াছিলেন।

১৯০০ অব্দে কার্ত্তিকচন্দ্র বেঙ্গল কেমিক্যালকে লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত করিয়া উহার ডিরেক্টরের পদ গ্রহণ করেন। ১৯০২ অব্দে তাঁহাকে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদের গুরু দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে হয়। ১৯০৮ সাল পর্য্যন্ত ডাঃ বসু বেঙ্গল কেমিক্যালের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন এবং তাঁহার এই পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালেই কোম্পানীর মূলধন ২৫,০০০ হাজার হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫,০০,০০০ লক্ষে দাঁড়ায়। বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল লিমিটেডের বর্ত্তমান মানিকতলা ফ্যাক্টরীর ভিত্তিস্থাপন তিনি করেন।

১৯০৮ সালেই ডাঃ বসু বেঙ্গল কেমিক্যালের সংস্রব ত্যাগ করিয়া নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী স্থাপন করেন। পরে তিনি পল্লীসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ক্রমে ক্রমে "Food & Drug" নামক ত্রৈমাসিক বৈজ্ঞানিক পত্রিকা এবং "স্বাস্থ্য-

ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু
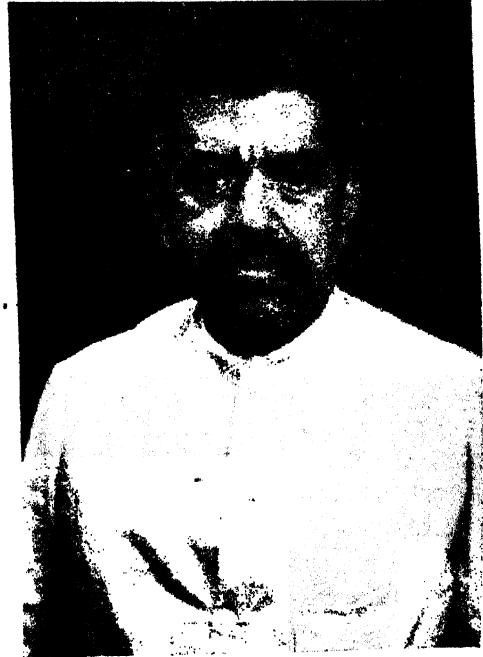
সমাচার" ও "Health & Happiness" নামক পত্রিকাসমূহের প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা করেন। পরে সমগ্র ভারতে স্বাস্থ্যবার্ত্তা প্রচারের জন্য তিনি হিন্দী ভাষায় 'স্বাস্থ্য-সমাচার' এবং উর্দ্দু ভাষায় "তন্দুরস্তি" পত্রিকাদ্বয় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৯১২ সালে ডাঃ বসু ভারতে সর্ব্বপ্রথম প্রস্তুত "Distillation Plant" নির্ম্মাণের জন্য নিজস্ব কারখানা স্থাপন করেন। ১৯১৫

সালে তিনি "ইউনিয়ন ডিষ্টিলারি" নামে নিজস্ব ডিষ্টিলারি স্থাপন করেন। এখানে প্রতিদিন ৩০০ গ্যালন রেকটিফায়েড স্পিরিট প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ডাঃ বসুই প্রথম ভারতীয় যিনি তাঁহার নিজ প্রতিষ্ঠান ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরীতে সুরাসার ঘটিত ঔষধাদি প্রস্তুতের জন্ম গবর্ণমেণ্টের অনুমতিলাভ করিতে সক্ষম হন। ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত এই বিশেষ অধিকার কেবল ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির একচেটিয়া ছিল। সমগ্র ভারতের মধ্যে ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরীই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাহা কেবলমাত্র ভেষজ-শিল্পে ব্যবহারের জন্ম রেক্‌টিফায়েড স্পিরিট প্রস্তুতের অধিকারী।

১৯২৪ সালে ডাঃ বসু বেলিয়াঘাটায় দৈনিক ৬ টন পরিমাণে এসিড প্রস্তুতের জন্ম আধুনিক উন্নত ধরণের যন্ত্রাদিসমন্বিত কারখানা স্থাপন করেন। এই কারখানায় সকল রকম হেভি কেমিক্যালস ও বীজাণু-পরিশোধক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ব্যবস্থাও করা হয়। ১৯২৯সনে তিনি চিকিৎসকবর্গকে দেশীয় ভেষজে প্রস্তুত ঔষধাদি সরবরাহের জন্ম ফিজিওলজিক্যাল ল্যাবরেটরী স্থাপন করেন। ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরীই প্রথম ভারতীয় প্রতিষ্ঠান যাহা এদেশে আর্সেনিক ঘটিত ঔষধ "NOV-ARSON" প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয়।

ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু, ভারত গভর্ণমেণ্ট নিযুক্ত ড্রাগ এন্‌কোয়ারি কমিটি'র একজন সদস্য (কোঅপ্ট মেম্বর) মনোনীত হন এবং ১৯৩১ সালে একটি অতি মূল্যবান রিপোর্ট প্রদান করেন। ১৯৩২ সালে তিনি অষ্টম বার্ষিক নিখিল ভারত মেডিক্যাল কনফারেন্সে ভেষজ-বিজ্ঞান শাখায় সভাপতিত্ব করেন। ঐ বর্ষে তিনি বেলিয়াঘাটায় কারখানায় জলের-কলের (পিতলের) নানারকম মুখ নির্ম্মাণ এবং বিবিধ প্রকার যন্ত্রের জন্ম লৌহ ঢালাইয়ের ব্যবস্থা করেন। "বেলিয়াঘাটা সোপ ওয়ার্কস" স্থাপন করিয়া, কার্ব্বলিক ও গ্লিসারিণ এবং নানাবিধ সুগন্ধি ও কাপড়কাচা সাবান প্রস্তুত আরম্ভ করা হয়। নলকূপ পাম্প এবং নলকূপসম্পর্কিত নানাবিধ যন্ত্রাংশ নির্ম্মাণও এই সময় সুরু হয়। ১৯৩১ সালে মানিকতলায় একটি গুড় রিফাইনের (বিশোধনের) ছোট কারখানা স্থাপন করা হয়। ১৯৩৪ সালে ঐ কারখানাই বড় আকারে "রাজলক্ষ্মী সুগার ফ্যাক্টরী"তে রূপান্তরিত হইয়া চব্বিশপরগণার বসিরহাটের অন্তর্গত মৈত্রবাগানে স্থাপিত হয়। বিস্তৃত জমি লইয়া ঐ স্থানে ইক্ষুচাষের ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল।

অশ্বিনীকুমার ভদ্র

ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমার নাছিরনগর নিবাসী অশ্বিনীকুমার ভদ্র মহাশয় সম্প্রতি স্বগ্রামে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স পঁচাত্তর বৎসর হইয়াছিল।

নাছিরনগর ভদ্রবংশের আদি পুরুষ ঈশানচন্দ্র ভদ্র পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণ রাঢ়ের সিমলা গ্রাম হইতে নাছিরনগরে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। কালক্রমে এই বংশের লোকেরা বিদ্যা বুদ্ধি ও বিত্ত গৌরবে এই অঞ্চলে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সক্ষম হন।

অশ্বিনীবাবুর পিতা অঘোরচন্দ্র ভদ্র সরাইল পরগণার বিখ্যাত ভূম্যধিকারী ও বিশেষ প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন। অল্প বয়সে পিতার মৃত্যুর পর অশ্বিনীবাবুকে যুগপৎ বিষয়সম্পত্তি দেখাশুনার এবং বহু দুঃস্থ আত্মীয় প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিতে হয়। প্রধানতঃ আত্মীয়স্বজনের দুঃখমোচন করিতে গিয়া তিনি সর্ব্বস্বান্ত হন এবং অবশেষে চাকুরি গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। অশ্বিনীবাবু অত্যন্ত তেজস্বী প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার মাতৃস্থানীয়া এক আত্মীয়ার জীবনসঙ্কট পীড়ার সময় ছুটি না পাওয়াতে তিনি তখনকার দিনের পক্ষে রীতিমত লোভনীয় চাকরি ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসেন।

যৌবনে অশ্বিনী বাবুর কাব্যানুরাগ প্রবল ছিল। তিনি উত্তর-ভারতের নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। শ্রীহট্ট জেলার লাখাই গ্রামের বিখ্যাত দত্ত বংশের গোলোকমোহন দত্তের কনিষ্ঠা কন্যা কুমুদিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

প্রথম যৌবনে অশ্বিনী বাবু স্বাদেশিকতার আন্দোলনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। শ্রীহট্ট জেলার মৌলবীবাজার মহকুমার জগৎসী গ্রামের পরলোকগত মহেন্দ্রনাথ দে—যিনি বাংলাদেশে প্রথম বোমার ফরমূলা আবিষ্কার করেন এবং বোমাণ্ট সাহেবের গুলীতে অকালে নিহত হন, অশ্বিনীবাবুর কনিষ্ঠ ভগিনীপতি ছিলেন। মহেন্দ্রবাবু মুখ্যতঃ অশ্বিনীবাবুর সহায়তায় শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ হইতে 'মৈত্রী' নামক ধর্ম্মজাতীয়তাবাদী পত্রিকা বাহির করেন। মৈত্রী পত্রিকার জন্ম প্রেস অশ্বিনীবাবুর অর্থসাহায্যেই ক্রীত হইয়াছিল। মৈত্রী উঠিয়া গেলে প্রেস অন্ম লোককে দান করা হয়।

উদ্যান-রচনা, চাষবাস ইত্যাদি কাজে অশ্বিনীবাবু অনাবিল আনন্দলাভ করিতেন। কলিকাতা হইতে হরেক রকমের ফুল ও ফলের বীজ আনাইয়া দেশের মাটিতে সেগুলি লইয়া নানা প্রকার পরীক্ষা করা তাঁহার বাতিকে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। তিনি তাঁহার পল্লীভবনটিকে বিবিধ প্রকার আরকর ফলের গাছ ও পুষ্পোদ্যানে সুশোভিত করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃষিবিষয়ক পুস্তকসংগ্রহও উল্লেখযোগ্য। নিজের বাড়ীর পুকুরে বৈজ্ঞানিক প্রথায় মৎস্যের চাষের জন্ম তিনি বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

দেশ বিভাগের পর আত্মীয়স্বজন এবং পুত্রদের একান্ত পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তিনি দেশের বাড়ী ছাড়িয়া আসিতে রাজী হন নাই। প্রবাসীর অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র অশ্বিনীবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

সমাজ-কর্ম্ম এবং গ্রামোন্নয়ন

পারিন ভাথারিয়া

আজিকার দিনে জাতীয় উন্নয়নের মূল কথা হইল গ্রামোন্নয়ন। যে গ্রামসমূহে জনসংখ্যার এক বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বাস করে সেগুলির জীবনযাত্রার অবস্থার উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা, এক অথবা অন্যরূপে সমগ্র দেশে বিভিন্ন মাত্রায় সকলেই অবগত আছেন। একদিকে যেমন গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনাকে লক্ষ্যবস্তু হিসাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে, অন্য দিকে তেমনি লক্ষ্যে উপনীত হইবার পদ্ধতি এবং অবলম্বন দ্বারা ইহাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখা হইতেছে এমন ধরণের সমস্যা যাহা এখনও রহিয়াছে পরীক্ষণের স্তরের মধ্যে। সারা দেশ জুড়িয়া বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে এই ধরণের ভূরি ভূরি পরীক্ষা পরিচালিত হইতেছে, প্রত্যেকটিরই হয়ত নিজস্ব স্বতন্ত্র আদর্শ আছে, কিন্তু সবগুলিরই লক্ষ্য এক।

অন্য যে-কোনো সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার ন্যায় গ্রামোন্নয়ন সার্ব্বজনীন উন্নয়নের এক ব্যাপক পরিকল্পনা। ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে নাগরিক জীবনের সকল স্তরের লোকদের এবং বৃত্তিজীবীদের সহযোগিতা আবশ্যক—ইহাতে কি চিকিৎসকের, কি শিক্ষকের নিজ নিজ করণীয় কাজ রহিয়াছে—তেমনি সমাজকর্ম্মীরও সমান দায়িত্ব বিদ্যমান।

এই কল্যাণকর্ম্মী সংসদের মধ্যে সমাজকর্ম্মীকে তাহার আয়ত্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং প্রযুক্তিসমূহের (techniques) সহায়তায় বিশেষ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে। সুতরাং অন্যান্যদের মত তাহারও যথোচিত শিক্ষার দরকার যাহার কল্যাণে সে সামাজিক সমস্যাসমূহকে সম্যকরূপে এবং ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করিয়া বিহিত ব্যবস্থা করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু মানবীয় সমস্যাসমূহ সকল সময়েই তো একটা সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করিয়া উপস্থিত হয় না, কাজেই সেগুলি সম্বন্ধে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ক্লাসে সম্ভব নহে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলির পরিপূর্ণ তাৎপর্য্য উপলব্ধি এবং গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই সচেতনতার প্রয়োজন। কাজেই সমাজ কর্ম্ম শিক্ষাদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইতেছে—সকল সময়েই শিক্ষার্থীদিগকে ক্ষেত্র-কর্ম্মে অভ্যস্ত করা। ইহার দৌলতে তাহারা ক্লাসে যাহা শিক্ষা ও আলোচনা করিবে, সেগুলি বাস্তবক্ষেত্রে পরীক্ষণের সুযোগ লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

গ্রামীণ সমাজ কর্ম্ম সম্পর্কে এই হাতে কলমে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য লইয়াই তিন বৎসর পূর্ব্বে বরোদা এম.এস বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফ্যাকাল্টি অব সোস্যাল ওয়ার্ক, বরোদা শহরের সীমানার বাহিরে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী এক গ্রামে ইহার প্রথম পরীক্ষামূলক গ্রামীণ কর্ম্মকেন্দ্র (Experimental rural work centre) স্থাপন করেন। ছইটি কেন্দ্রে এখন ইহার যে কর্ম্মতালিকা প্রচলিত ; জনকল্যাণের বিভিন্ন দিক—যথা আমোদ প্রমোদ, সমাজশিক্ষা, স্বাস্থ্য, কম্যুনিটি প্লানিং প্রভৃতি তাহার অন্তর্ভুক্ত। ইহার কোন বিষয়েই এখন আর নূতন বলিয়া কিছু নাই অথবা এই সমস্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টা গ্রামজীবনে এমন কোন বিস্ময়জনক পরিবর্ত্তন আনয়ন করে নাই যাহা প্রচারিত হইয়া দর্শকদের মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে পারে। কিন্তু ইহা দ্বারা এমন অভিজ্ঞতা এবং পারস্পরিক কল্যাণমূলক কার্য্যে অংশভাগী হইবার এমন শিক্ষা লব্ধ হইয়াছে, যাহা ক্ষুদ্র আকারে সমাজ-কর্ম্ম বৃত্তির মূলগত নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং মানুষের মর্য্যাদা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ়ীভূত করিয়াছে।

গ্রামীণ কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রকর্ম্ম (fieldwork) শিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা ইহা সুস্পষ্ট হইল যে, যদি কর্ম্মতালিকা ঠিকমত পরিচালনা করা যায় তাহা হইলে ইহা দ্বারা গ্রামের জনগণের কতকগুলি একান্ত প্রয়োজনীয় সেবামূলক কার্য্যের ব্যবস্থা হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এই পরিস্থিতির সঙ্গে এই পরীক্ষামূলক দিক সম্পর্কিত প্রশ্নটি ওতপ্রোত ছিল যে, সমাজ-কর্ম্মের বিজ্ঞান-ভিত্তিক মূলনীতিসমূহ কি কর্ম্মের উদ্দেশ্য এবং তৎপ্রতি মূল্য নির্দ্ধারণমূলক মনোভাব বজায়ের সঙ্কল্প লইয়া গঠিত। আমরা এই মূলগত বিশ্বাস সহকারে কাজের সূচনা করি যে, পারিপার্শ্বিক সুযোগ-সুবিধাগুলির ব্যবস্থা করিতে পারিলে দেখা যাইবে, মৌলিক মানবীয় প্রয়োজনগুলি সমগ্র পৃথিবীতে একই প্রকার।

মোটামুটি ভাবে দশটি গ্রামের প্রাথমিক পরিদর্শনকার্য্যের পর আমরা বরোদার পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী আটলাডরা গ্রামে কার্য্যারম্ভ করা স্থির করি। কেননা পুরনো বরোদা রাজ্যের গায়কোয়াড়ের আমলে কতকগুলি কল্যাণমূলক কর্ম্মতালিকা প্রবর্ত্তিত হয় এবং সেইজন্য সেখানে জনকল্যাণের আদর্শের কথা সর্ব্বসাধারণের অপরিজ্ঞাত ছিল না। ইহার দরুন আমরা উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠাভূমি প্রাপ্ত হইলাম।

আমাদের কর্ম্মতালিকা প্রবর্ত্তনের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা স্থানীয় লোকেদের, ইহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলিলাম যে, আমরা দান খয়রাতি করিবার জন্য কিংবা তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য সেখানে যাই নাই! ক্ষণিক বিরতির পর একজন এই প্রশ্ন উত্থাপন করিল, 'আসলে কি উদ্দেশ্যে তোমরা এসেছ? প্রতিদানে কিছু পাবার আশা না থাকলে কেউ ত কিছু দেয় না'। কথাগুলি হইল সেই সকল লোকের প্রতি তাহাদের মনোভাবের প্রকৃত অভিব্যক্তি যাহারা সময়ে সময়ে গ্রামে গিয়া তাহাদের ত্রাণকর্ত্তা সাজিয়া বসে এবং বলে যে প্রতিদানে তাহারা কিছু প্রত্যাশা করে না। বৃদ্ধ গ্রামবাসী ঠিক কথাই বলিয়াছিল—কেহই প্রাপ্তির আশা না রাখিয়া কিছুই দেয় না। নগদ টাকা অথবা টাকার পরিবর্ত্তে অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রদান, 'প্রেষ্টিজ' কিংবা অহংভাবের পরিতৃপ্তি ইত্যাদি নানাবিধ উপায়ে আমাদের পরোপকারবৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক পরিস্থিতিতেই একটা লওয়ার মনোভাব থাকিয়া যায়। পুনরায় একবার আমরা শিক্ষার্থীদের শিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করিলাম এবং যেমন এই ক্ষেত্রে তেমনি অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমরা দেখিয়াছি যে, কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে যৌথ আলোচনা পদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা প্রায়শঃ উদ্ভূত মতানৈক্য সত্ত্বেও পারস্পরিক শ্রদ্ধামূলক মনোভাব গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছি।

গ্রামবাসীরা আমাদের কার্য্যকলাপ যেরূপ সতর্কতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল, পূর্ব্বাহ্ণেই তৎসম্পর্কে সচেতন হওয়ার দরুন আমরা এমন কর্ম্মপ্রচেষ্টার সূচনা করিলাম যাহাকে খুব স্বল্প পরিমাণ প্রতিবন্ধের সম্মুখীন হইতে হইল। শিশুদের আমোদপ্রমোদের এক প্রোগ্রাম দ্বারা আমাদের কার্য্যারম্ভ হইল। কিছুকালের জন্য ইহার মাধ্যমে শিশুদের আনন্দবিধানের ব্যবস্থা হইল। ইতিমধ্যে আমরা পরিবারগুলির সংস্পর্শলাভের সময় পাইলাম, যদিও তখনও কোন কোন পিতামাতা এই প্রশ্ন তুলিলেন যে, ইহা ছেলেদের মনকে কাজ হইতে সরাইয়া তাহাদিগকে খেলাধুলার প্রতি অধিকতর অনুরাগী করিয়া তুলিবে কিনা। প্রকৃত সমস্যা দেখা দিল তখন যখন দুই মাসের মধ্যে ক্রীড়া-কেন্দ্র (স্কুল-কম্পাউণ্ডই ক্রীড়া-কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হইত) অন্যান্য উচ্চজাতীয় ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামপ্রান্তস্থ শিশুদিগকে—নিম্নজাতীয় শিশুদিগকে, আকৃষ্ট করিয়া আনিল। উচ্চ জাতির শিশুদের পিতামাতারা প্রবল ভাবে ইহাতে আপত্তি জানাইলেন এবং কেন্দ্র হইতে নিজেদের শিশুদিগকে সরাইয়া লইয়া গেলেন। কিছুকালের জন্য মনে হইল যে, গ্রামে আমাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টার পালা শেষ হইয়া গিয়াছে। আমরা কিন্তু আমাদের ক্রীড়া কেন্দ্রের কাজ চালাইয়া যাইতে লাগিলাম, সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ সমাজের লোকদের সঙ্গে অস্পৃশ্যতার সামগ্রিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ খুঁজিতাম এবং তাহাদের বিরুদ্ধ মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিতাম। জোর করিয়া আমাদের নিজেদের আদর্শ তাহাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিবার ইচ্ছা আমাদের ছিল না। কিন্তু আমাদিগকেও স্বাধীনভাবে কাজ করিতে দিবার জন্য আমরা তাহাদিগকে অনুরোধ করিতাম। এমনি ভাবে কয়েক মাস অতিবাহিত হইবার পর শিশুরাই হইয়া দাঁড়াইল পরিবর্ত্তনের উৎসস্বরূপ। তাহারা খেলাধুলা করিতে চাহিত, অন্যান্য ছেলেদের সহিত খেলিতে তাহাদের কোন রকম আপত্তি দেখা যাইত না, বয়স্কদের ভেদবুদ্ধি তাহাদিগকে পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে পারিল না। খেলার মাঠে গিয়া তাহারা মিলিত হইত এবং ছাত্র-কর্ম্মীদের কাজ হইল তখন পিতামাতাকে এই বিষয়টি উপলব্ধি করিতে সহায়তা করা যে, প্রত্যেক 'পুরুষে'র নিজেদের সমকালের সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া বাস করিতে হইবে। অবশ্য এটা আমরা কিছুতেই দাবি করিতে পারি না যে, গ্রামীণ অস্পৃশ্যতা-সমস্যাকে আমরা পরাহত করিতে সমর্থ হইয়াছি, কিন্তু ইহা সত্য যে কঠিনতম প্রতিবন্ধসমূহ অপসারিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা যে ফল লব্ধ হইল তাহার দরুন, পরে যখন মেডিক্যাল প্রোগ্রাম প্রবর্ত্তিত হয় তখন পূর্ব্বাপেক্ষা কম বাধার সম্মুখীন হইতে হয়।

বরোদা শহর অপেক্ষা নিকটবর্ত্তী আর কোন স্থানে চিকিৎসাবিষয়ক সাহায্যের কোনও কেন্দ্র না থাকায় গ্রামীণ সমাজের মুখ্য আকাঙ্ক্ষিত বিষয়সমূহের অন্যতম ছিল সেবামূলক কার্য্যে চিকিৎসকের সাহায্যপ্রাপ্তি। এইরূপে সপ্তাহে দুই দিনের ভিত্তিতে সরকারী "চোরা"র ন্যায় "চোরা" প্রতিষ্ঠিত হইল। এখানে শিক্ষার্থীদিগকে পরিবারসমূহে চিকিৎসকের নির্দ্দেশমত কাজ করা ব্যতীত গাঁয়ের লোকেদের চিরাচরিত বিধিনিষেধ এবং সংস্কারাদির বিরুদ্ধে লড়িতে হইত। কেহ কেহ এই কাজকে 'নীরস' (dry) কাজ বলি

উল্লেখ করিত (কারণ শিক্ষার্থীকে প্রায়ই কাটা, ঘা ইত্যাদি লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতে দেখা যাইত, এবং অন্যান্যদের অধিকতর আস্থার পরিচয় পাওয়া যাইত যাদুবিদ্যা, তুক্‌তাক ইত্যাদির উপর। এতদ্ব্যতীত স্ত্রীলোকদিগকে গাঁয়ের রাস্তার উপর দিয়া চোরায়—যেখানে পুরুষেরা থাকিত, আসিতে দেওয়া ছিল আপত্তিজনক, উপরন্তু যেখানে 'অস্পৃশ্য'রাও আসিত সেই স্থানেই চিকিৎসিত হইবার জন্য আসা মেয়েদের পক্ষে সমীচীন কিনা তাহাও ছিল আর এক প্রশ্ন। ক্লিনিকের কাজ পূর্ণবেগে চলিতে থাকা সত্ত্বেও এই সকল নিষেধাত্মক প্রাথমিক বিরোধিতা অপসারিত হইতে বৎসরাধিক কাল লাগিয়াছিল। আজ বয়স্ক পুরুষ এবং যুবকগণ অপেক্ষা নারী এবং শিশুরাই ক্লিনিকের অধিকতর সুযোগ গ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু এখনও গ্রামের কিছুসংখ্যক তরুণীকে ফার্স্ট এইড বা প্রাথমিক সাহায্য এবং হোম নার্সিং শিক্ষাদানের উচ্চাশা আমরা পোষণ করিতেছি।

কাজের সূচনা হইতে এ বিষয়ে আমরা সচেতন ছিলাম যে, আমাদের অর্থের পরিমাণ যেরূপ সীমাবদ্ধ তাহাতে আমাদের প্রোগ্রাম দ্বারা গ্রামবাসীদের উপকারসাধন করিতে হইলে, ব্যাধি আরোগ্য অপেক্ষা ব্যাধি নিবারণের উপর আমাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে অধিকতর কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে। এই বিষয়ে আলোচনা মুখ্যতঃ ম্যালেরিয়ার 'কেস'-সমূহের হারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, প্রথম বৎসরে এই বিষয়ে বড় একটা কিছু করা হয় নাই। এই সময়েরই মধ্যে ম্যালেরিয়া মড়করূপে দেখা দেয় এবং দুর্ভাগ্যক্রমে দুইটি শিশু মারা যায়। এই শোচনীয় ঘটনা লোকের চোখ ফুটাইয়া দেয়। গভীর বেদনার ভিতর দিয়া কর্ম্মীদের কথার যাথার্থ্য সম্বন্ধে গ্রামীণ সমাজের লোকেদের সত্যোপলব্ধি হয় এবং ইহার ফলে সমাজ-শিক্ষা দলসমূহের (Social Education groups) সূচনা এবং একটি গ্রাম্য পরিষদের সংগঠন সম্ভবপর হইয়া উঠে।

এই একটি গ্রামে আমাদের কাজের প্রথম বৎসরের শেষের দিকে, অনুরূপ কর্ম্মতালিকা প্রবর্ত্তনের জন্য অন্যান্য কতিপয় গ্রাম হইতে অনুরোধ আসিতে থাকে। এ পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় অধিকাংশ উপকরণ এবং সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা আমরাই করিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু আমাদের সেবাকার্য্যকে অধিকতর সম্প্রসারিত করিতে হইলে আমাদের চৈনিং প্রোগ্রামের স্বল্প অর্থসংস্থানের উপর নির্ভর করিয়া তাহা সম্ভবপর ছিল না। ইহার একমাত্র বিকল্প ছিল গ্রামীণ সমাজের নিজস্ব অর্থসংস্থানের উপর নির্ভর করা। অতএব আমরা বরোদা হইতে আট মাইল দূরবর্ত্তী 'বিল' গ্রামে এই কর্ম্মতালিকা প্রবর্ত্তন করা সাব্যস্ত করিলাম। আমরা উভয় গ্রামের সমক্ষে দায়িত্ব-গ্রহণের জন্য তৈরি হইবার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলাম। প্রথম গ্রাম—যাহা এ পর্য্যন্ত এই, প্রোগ্রামের রূপায়ণে বিশেষ কিছু সাহায্যদান করে নাই, প্রস্তাবে বাধা দিল। তখন গ্রাম্য পরিষদের সমক্ষে প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করা হইল—গ্রামীণ সমাজের বিভিন্ন বিভাগের বারো জন সদস্য এবং ফ্যাকাল্টির দুই জন প্রতিনিধি লইয়া এই সংস্থাটি গঠিত। পরিষদ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহারা প্রোগ্রামটি চালাইয়া যাইবেন এবং সেই জন্য তাঁহারা ব্যয়ভার বহন এবং কর্ত্তব্য সুসম্পাদন উভয়বিধ দায়িত্বই গ্রহণ করিলেন। পারস্পরিক চুক্তি অনুযায়ী গ্রামবাসীরা সেবাকার্য্য চায়—তজ্জন্য তাহারা কি পরিমাণ অর্থ প্রদান করিবে সেই প্রশ্নের সমাধান তাহারা করিয়াছে এবং পরিষদের সদস্যগণ যাহাতে বরোদা হইতে প্রাপ্তব্য সেবাকার্য্যের সুযোগ ক্রমবর্দ্ধমান রূপে গ্রহণ করিতে পারে তদ্বিষয়ে সাহায্য করা আমাদের কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সেবামূলক কার্য্যসমূহের মধ্যে যে দুটিকে প্রায়শঃ কাজে লাগানো হইয়া থাকে, সেগুলির মধ্যে প্রথমটি হইতেছে—ডিষ্ট্রিক্ট হেলথ বোর্ডের তরফ হইতে নিবারক স্বাস্থ্য কর্ম্মতালিকার (যেমন: গ্রামে নিয়মিত ভাবে ডি-ডি-টি নিক্ষেপ করা, টিকা লওয়া ইত্যাদি) সঙ্গে ; এবং দ্বিতীয়টি সরকারী প্রচারবিভাগ হইতে প্রদর্শিত চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সামাজিক শিক্ষার সহিত সম্পর্কিত। ব্যাপক ভাবে গ্রামীণ সমাজের শিক্ষার জন্য "আমাদের গ্রাম" নামে একটি পাক্ষিক বুলেটিনও প্রকাশিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় গ্রামে স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে কর্ম্মতালিকা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া সে ক্ষেত্রে আমাদিগকে অপেক্ষাকৃত কম অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। বস্তুতঃ প্রাথমিক কার্য্যারম্ভের পর দ্বিতীয় গ্রামটির মেডিক্যাল ক্লিনিক, কেবল মাত্র সপ্তাহে দুই দিন চিকিৎসকের সেবামূলক কর্ম্মের সাহায্য পাইয়া থাকে এবং মেডিক্যাল সমাজকর্ম্মী বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া পরিদর্শনকার্য্য করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত ক্লিনিকটি সম্পূর্ণরূপে তাহাদের নিজেদের অর্থসাহায্যে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। অন্য যে একটি বিষয়ে এই গ্রাম সাফল্য অর্জন করিয়াছে তাহা হইতেছে ছয় ফার্লং দীর্ঘ একটি মেটে রাস্তা নির্ম্মাণ। ঠিক এই ধরনের প্রচেষ্টা এই গ্রামে ইহাই প্রথম এবং ইহার ফলে যাবতীয় গ্রাম্য দলাদলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঈর্ষা দ্বেষ ইত্যাদির সৃষ্টি হইয়াছিল, কর্ম্মীদের কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে মাঝে মাঝে এই ধরনের প্রচেষ্টার পক্ষে অনিবার্য্য আশাভঙ্গের দুঃখ পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্যাপারে সর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহের বিষয় এই যে, গ্রাম্য পরিষদ স্বয়ং একটি দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল এবং

সকল প্রকার অসুবিধার ভিতর দিয়াও উহা প্রতিপাদন করিয়াছিল।

তাহাদের ডিসপেন্সারী কণ্ড বা চিকিৎসালয় ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠাও অনুরূপ-সাফল্যমণ্ডিত বলিয়া বিবেচিত হইবে। একজন চিকিৎসকের আংশিক সময়ের সেবাকার্য্যের সুফল দেখিয়া উৎসাহিত হইয়া তাহারা এই বিষয়ে নিশ্চিত হইতে চায় যে, ক্যাকলটি যদি তাহাদের পিছনে না দাঁড়ায় তাহা হইলেও যেন তাহারা এই কর্ম্মপ্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতে পারে। এই বৎসর একটি ভাল মরশুমের শেষে তাহারা তিন হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছে এবং ক্লিনিকের ব্যবহারের নিমিত্ত এই টাকা হইতে একটি ট্রাস্ট গঠন করিয়াছে।

সম্প্রতি পরবর্ত্তী বৎসরের প্রোগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা-কালে এই পরিষদের কর্ম্মপ্রচেষ্টার দ্বারা কি কি সাফল্য অর্জ্জিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। পরিষদের একজন সদস্য বলেন—"বাইরের লোকেদের দেখাবার মত খুব কম জিনিসই আমাদের আছে, কেননা যে মুখ্য পরিবর্ত্তন আমরা লক্ষ্য করি তা হচ্ছে লোকের মনোভাবের মধ্যে।" প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আর এক জন সভ্য বলেন—"শিশুরা খেলার মাঠে কিছু নিয়মানুবর্ত্তিতা শিখেছে যা তারা ক্লাসরুমে পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।" একথা শুনিয়া জনৈক বৃদ্ধ প্রাণখোলা হাস্য করেন এবং বলেন—"হাঁ, আমরা যখন ঐ বয়সের ছিলাম তখন যদি কেউ কেউ এ ধরনের খেলার ব্যবস্থা করত!" এই তৃতীয় বক্তাই কিন্তু ছিলেন এমন একজন লোক যিনি এক সময় সকল শ্রেণীর ছেলেদের একত্রে খেলা করার এবং স্ত্রীলোকদের ক্লিনিকে আসার বিরুদ্ধে অত্যন্ত প্রবলভাবে আপত্তি জানাইয়াছিলেন।

কর্ম্মপ্রচেষ্টার এই আংশিক চিত্র ইহাই সূচিত করে যে, আরো অনেক কিছু করিবার বাকী রহিয়া গিয়াছে। নূতন উন্নয়ন-প্রচেষ্টা প্রবর্ত্তনের প্রধান প্রতিবন্ধ হইতেছে নেতৃস্থানীয় পরিবারগুলির মধ্যে আভ্যন্তরীণ দলগত রেষারেষি। প্রায়শঃই দেখা যায়, এক দল লোক কোন কর্ম-প্রচেষ্টায় আগ্রহ প্রকাশ করে না শুধু এই জন্য যে, কোন একটি প্রতিদ্বন্দ্বী পরিবার তাহা লইয়া আগেই কাজে লাগিয়া গিয়াছে। যদিও সামগ্রিক ভাবে গ্রামীণ সমাজ ঠিক বিত্তশালী নয় তথাপি গ্রামগুলির বাহ্যিক চেহারা হইতে যতটা প্রতীয়মান হয়, তাহারা ততটা দরিদ্রও নয়। তাহাদের অর্থের এক বৃহৎ অংশ ব্যয়িত হয় মন্দিরনির্মাণে ও উৎসবাদির অনুষ্ঠানে এবং ইহার দরুন গ্রামীণ সমাজ-সংস্থায় এই মূলগত প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় যে, আমরা কেমন করিয়া এই সকল লোককে মিলিয়া-মিশিয়া কাজ করার এবং সামূহিক কল্যাণ-কর্ম তালিকার জন্য অর্থব্যয়ের পরিকল্পনা করার ব্যাপারে সহায়তা করিতে পারি। একটি বিষয় আমরা অবগত হইয়াছি—গাঁয়ের লোক অজ্ঞ নয় (এবং পুরনো বরোদা রাজ্যের শিক্ষাপদ্ধতির দরুন তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই সাক্ষর)। তাহার যে অভাব তাহা হইতেছে সুযোগের অভাব। নগরবাসীর মত জীবনযাত্রার মানের অধিকতর উন্নয়নের উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাহারও আছে। প্রাপ্তব্য সম্পদকে কাজে লাগাইবার জন্য কি ভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে হয় তৎসম্পর্কে তাহাকে সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সর্ব্বোপরি নগরস্থ তাহার স্বদেশবাসিগণ অপেক্ষা সে যে হীন নহে একথা উপলব্ধি করাইবার জন্যও তাহাকে সাহায্য করা প্রয়োজন। আত্মবিশ্বাস এবং আত্মসম্মান পুনরুদ্ধারের জন্যও তাহাকে সহায়তা করিবে। আমাদের সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টা পরিচালিত হইতেছে এই চরম লক্ষ্যের অভিমুখেই—মানবীয় মর্য্যাদার প্রতি এই যে সম্মান ইহাই সমাজকর্ম্মের মূল সংহিতা (code)।

গত বৎসর অন্য কতিপয় গ্রাম সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত হইয়া এবং অর্থ লইয়া আগাইয়া আসিয়াছে—তাহাদের অভিপ্রায় যেন তাহাদের অঞ্চলেও অনুরূপ কর্ম্ম-তালিকা প্রবর্ত্তিত হয়। আমাদের বর্ত্তমান সংস্থান যেরূপ তাহাতে আমরা আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করিতে পারি না, তৎসত্ত্বেও কিন্তু আমরা ভবিষ্যতে বর্ত্তমানে চালু সংস্থা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সংস্থা এবং অধিকতর উৎপাদনশীল কর্ম্মতালিকা মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছে—ইহা বাস্তবে রূপায়িত হইতে পারে যদি পাঁচটি গ্রামের এক-একটি এককে (unit) কর্ম্মপ্রচেষ্টা পরিচালিত হয়। কিন্তু ভবিষ্যতের পরিকল্পনাকে রূপদান করা এখনও বাকী রহিয়াছে। বর্ত্তমানে আমরা উপলব্ধি করিতেছি যে, এই সকল গ্রামের উন্নয়নকল্পে আমরা যৎসামান্য কিছু করিয়াছি এবং আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি শিক্ষণক্ষেত্রেরও ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইয়াছি।

আজ গ্রাম্য পরিষদের যুবক-সদস্যেরা জোর গলায় এই সকল দাবি করিতেছে যে, প্রত্যেক সদস্যকে তাহার মত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হোক, সমবায় প্রচেষ্টার দ্বারা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হোক। তাহারা ইহাও উপলব্ধি করিতেছে যে, প্রতিটি ব্যষ্টির অপরকে ইহার সার্থকতা বোধগম্য করানো এবং এক সাধারণ লক্ষ্যের অভিমুখে কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে কর্মতালিকার সাফল্য। এই সকল ভাবাদর্শ যে এরূপ প্রত্যক্ষভাবে এবং স্পষ্টভাবে আসে তাহা নয়, কিন্তু তাহারা সেখানে আবির্ভূত হয় এবং সেগুলি অভিব্যক্ত হয় গ্রামীণ সমাজের লোকেদের

ভাষায় ও আকার-ইঙ্গিতে। মূলতঃ সমাজ-কর্মের মূলনীতি-সমূহের ভিত্তি মনুষ্যপ্রকৃতি এবং মানবীয় প্রয়োজনের উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞান এই বিষয়ে পরীক্ষণ করিয়াছে এবং এই লক্ষ্য সম্পর্কে মূলগত জ্ঞানলাভের ব্যবস্থা করিয়াছে। ছাত্রদিগকে এই জ্ঞান বিতরণ করা আমাদের উদ্দেশ্য। পূর্বাপেক্ষা অধিকতর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে এই সকল এবং অন্যান্য গ্রামীণ সমাজের জন্য এই একই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া কাজ চালাইয়া যাইতে পারিব বলিয়া আমরা আশা করিতেছি।

অন্ধদের জন্য সাধারণ বিদ্যালয়

একদা রমণীয় সায়ংকালে ওরস্টারের একটি কলেজ-প্রাঙ্গণে এক ক্রিকেট ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পূর্ণোদ্যমে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। ব্যাটসম্যান হঠাৎ প্রতিবাদসূচক ভাবে ব্যাট তুলে—"খারাপ আলো, মশাই" বলে 'গেমস্ মাষ্টারে'র নিকট আবেদন জানালে। বল-নিক্ষেপকারী (bowler) বল ছুঁড়তে উদ্যত হয়ে থেমে গেল। খুব নীচু দিয়ে উড্ডীয়মান একটি বিমান অতিক্রম করা পর্য্যন্ত সে অপেক্ষা করল, তার পর সে ভেতরে ছটি বীজ-পোরা একটি ফুটবল ছুঁড়ল, সেটি চলতে লাগল ঠক্‌ঠক শব্দ করে।

এই সমস্ত ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিল 'ওরস্টার কলেজ ফর দি ব্লাইণ্ড' নামক অন্ধদের শিক্ষায়তনের কতিপয় উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্র।

"খারাপ আলো" সম্পর্কে ব্যাটসম্যানের মন্তব্য উক্ত কলেজে কোন্ পদ্ধতি অনুসৃত হয় তারই পরিচায়ক। সযত্নে সুচিন্তিত শিক্ষাপদ্ধতি এই সকল বালকের দৃষ্টিহীনতার দুঃখ-লাঘবের সহায়ক হয়ে থাকে।

এই কার্য্যে উক্ত কলেজ কতটা সাফল্যলাভ করেছে, তার পরিচয় পাওয়া যাবে প্রবন্ধটি অনুধাবন করলে। কিন্তু কলেজে অবস্থানকালে অন্যান্য মনুষ্যের সঙ্গে প্রকৃত সমতাবোধের যে শিক্ষা তাদের দেওয়া হয় কোন প্রবন্ধেই তা অভিব্যক্ত হতে পারে না।

এই ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশই জন্মান্ধ। কেউ কেউ পরে দুর্ঘটনা অথবা অসুস্থতাবশতঃ দৃষ্টিহারা হয়। আবার এমন কয়েক জনও আছে যারা পুরোপুরি দৃষ্টিহীন হয় তো নয়, কিন্তু এই সকল ছেলের দৃষ্টিশক্তি এত ক্ষীণ যে, তাদের পক্ষে সাধারণ বিদ্যালয়ে গিয়ে বিদ্যা অর্জ্জন করা হ'ত সম্পূর্ণরূপেই অসম্ভব।

এই সকল বালকের চাহিদাই মিটিয়ে থাকে 'ওরস্টার কলেজ ফর দি ব্লাইণ্ড' নামক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি। অবশ্য ব্রিটেনে অন্ধদের জন্য অন্যান্য বিদ্যালয়ও আছে কিন্তু ওরস্টার কলেজ কার্য্যতঃ একটি অসম্প্রদায়নিরপেক্ষ সাধারণ বিদ্যালয়। 'দি ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট ফর দি ব্লাইণ্ড' নামক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এর অর্থব্যবস্থা পরিচালিত হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নিয়মিত ভাবে অর্থসাহায্য পাওয়া যায়। একটি নিয়ন্ত্রা পর্ষদ (Board of Governors) কর্তৃক এর নীতি নিয়ন্ত্রিত হয়।

১৮৬৬ সনে প্রতিষ্ঠিত ওরস্টার কলেজে ১৯১৩ সন অবধি মাত্র পাঁচটি থেকে দশটি পর্য্যন্ত ছেলের থাকবার ব্যবস্থা হ'ত। ১৯০২ সনে কলেজের একটি নূতন গৃহ নির্মিত হয়, ১৯৩৮ সনে এটির আয়তন বাড়ানো হয়—এই দীর্ঘকালের মধ্যে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে ৬১ জনে—তাদের বয়ঃক্রম এগারো থেকে উনিশ বৎসর পর্য্যন্ত।

আত্মবিশ্বাসের ভিত্তিপত্তন

কলেজ ছাড়বার পর ছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ভর্ত্তি হয়, সাধারণতঃ তারা আইনশাস্ত্র অধ্যয়নে ব্রত হয়। অন্যেরা শারীর চিকিৎসাবিদ্ হবার জন্যে অধিকতর শিক্ষা গ্রহণ করে। অনেকের আবার লক্ষ্য বাণিজ্য বিভাগে বিভিন্ন পদ অধিকার করা।

ওরস্টার কলেজ মুখ্যতঃ ইংলণ্ড এবং ওয়েলসের বালকদের জন্য নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু বিদেশ থেকে আগত কতিপয় অন্ধ ছেলেও এর ছাত্রসংসদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের মধ্যে আছে দক্ষিণ আফ্রিকা, জার্ম্মানী, ফরাসী এবং অন্যান্য দেশের ছেলেরা। সম্প্রতি একটি গ্রীক ছেলে ওখানে অধ্যয়ন করছে। স্বদেশে যুদ্ধের পরে নানা উপপ্লবের দরুন তার বুদ্ধিভ্রংশ হয় এবং ব্রিটিশ রেড্ ক্রশ কর্তৃক সে আনীত হয় ব্রিটেনে, সম্প্রতি সে ওরস্টারে বাণিজ্যবিষয়ক শিক্ষালাভ করছে।

এই কলেজে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক অন্য যে-কোন পাবলিক স্কুলের অনুরূপ। কলেজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে জিনিষটির উপর সবচেয়ে বেশী জোর দেওয়া হয় সেটি হচ্ছে এই যে, ছেলেরা যেন বুঝতে পারে তারা অস্বাভাবিক নয়—চক্ষুষ্মান লোকেরা যে সকল কাজ করতে পারে তার অধিকাংশই তারাও করতে সমর্থ এবং কোন কোনও ক্ষেত্রে সেগুলো তাদের দ্বারা সম্পন্ন হয় প্রকৃষ্টতররূপে। চরিত্রের বিকৃতিসাধনকারী আত্ম-অনুকম্পাকে সর্ব্বতোভাবে নিরুৎসাহিত করা হয় এবং তৎপরিবর্ত্তে শারীরিক অপটুতার উপর প্রকৃত বিজয়লাভার্থে আত্মবিশ্বাস এবং বিশেষ শক্তির বিকাশ-সাধনের চেষ্টা করা হয়।

কমলাবাঈ হোসপেট

ডি. কে, মোহোনি

নাগপুরের লোকেদের নিকট কেহই কমলাবাঈ হোসপেটের ন্যায় সুপরিচিত নহেন এবং কেহই এরূপ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। তাহারা তাঁহাকে নিজেদের প্রতিনিধি এবং আদর্শ কর্ম্মী বলিয়া মনে করে—তিনি এমন একজন মহিলা যাঁহার মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে একজন নিঃস্বার্থপর সমাজকর্ম্মীর আদর্শ। তিনি উদ্ভূত হইয়াছেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতে এবং জীবনভোর তিনি জনগণের হিতৈষিণী মহিলাই রহিয়া গিয়াছেন।

কমলাবাঈ কিন্তু কেবল নাগপুরের লোকেদেরই নহে, সমগ্র মধ্যপ্রদেশের আপনজন। একথা বলিলে মোটেই অতিশয়োক্তি হইবে না যে, বিগত চৌত্রিশ বৎসরের মধ্যে তিনি এই রাজ্যের সমাজ-জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই ছোটখাটো, গৌর-বর্ণা, সাদাসিধা পক্ককেশবিশিষ্টা খদ্দর পরিহিতা মহিলা—যিনি চপ্পল পায়ে এবং হাতে একটি খাদির ব্যাগ ঝুলাইয়া নাগপুরের রাস্তা ও অলিগলিতে বিচরণ করেন—এই নগরীর প্রত্যেক নারী এবং পুরুষের নিকট তিনি পরিচিতা—সকলেই জানে যে, সীতাবল্ডি মেটার্নিটি হোম এবং এই রাজ্যের সর্ব্বত্র ছড়ানো ইহার ১৮টি শাখা প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব একমাত্র তাঁহারই। এই বিরাট নগরীর প্রত্যেক নয়টি শিশুর মধ্যে একটি জন্মায় তাঁহার মেটার্নিটি হোম বা মাতৃসদনে।

বোম্বাই রাজ্যের পশ্চিম খান্দেশ জেলায় শিরপুরে এক উচ্চ শ্রেণীর মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ-পরিবারে ১৮৯৬ সনে শ্রীমতী মোহোনির গর্ভে ইয়ামুতাইয়ের— কমলাবাঈ নিজ পরিবারে কুমারী অবস্থায় এই নামেই পরিচিতা—জন্ম হয়। ইয়ামু-তাইয়ের বাবা কৃষ্ণজী পন্ত ছিলেন বোম্বাই প্রেসিডেন্সির পুলিসের সাব-ইনসপেক্টার। ইয়ামুতাই পিতামাতার নয়টি সন্তানের মধ্যে—পাঁচ পুত্র ও চার কন্যা, সপ্তম সন্তান। কৃষ্ণজী পন্ত ছিলেন খাড়া প্রকৃতির লোক এবং নিজের বিভাগে অকপট এবং নিষ্কলুষ আচরণের জন্য সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আটটি অপোগণ্ড সন্তান এবং তাহাদের বিধবা জননীকে রাখিয়া ১৯০২ সনে তিনি মারা যান। তাঁহার সকলের বড় ছেলের বয়স তখন পনের বৎসর মাত্র। কৃষ্ণজী পন্তের অকালমৃত্যু তাঁহার পরিবারের পক্ষে মর্ম্মান্তিক ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। কৃষ্ণজী পন্ত কোন জীবনবীমা করিয়া যান নাই এবং তাঁহাদের এমন কোন আত্মীয়ও ছিলেন না যিনি ছেলেমেয়েদের শিক্ষা এবং ভরণপোষণের তত্ত্বাবধান করিতে পারেন। রাধাবাঈয়ের হাতে তখন নগদ পাঁচ শত টাকাও ছিল কিনা সন্দেহ। এই স্বল্প সম্বল লইয়াই তিনি নাসিকে চলিয়া আসেন। ভাইয়ের সাহায্যে মাসিক দেড় টাকা হিসাবে তিনি একটি ছোট ঘর ভাড়া করেন। রাধাবাঈ ছিলেন প্রখর আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্না, উদারমনা এবং ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা—অপরের দয়ার দানকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। সাহস অবলম্বন পূর্ব্বক তিনি বাড়ীতে যাবতীয় কাজকর্ম্ম করিতে থাকেন এবং ছেলেদের বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন।

তিলকের দিন

সে ছিল প্রকাশ্য এবং গোপন উভয়বিধ প্রবল রাজ-নৈতিক কর্ম্মপ্রচেষ্টার দিন। লোকমান্য তিলক ছিলেন জাতীয় বীর। "স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার" এই ছিল তখনকার দিনের বুলি বা শ্লোগান এবং কমলাবাঈয়ের বড় ভায়েরা স্বদেশপ্রেমের অনুপ্রাণনায় আদর্শবাদী এবং উচ্চা-কাঙ্ক্ষী হইয়া উঠেন। কঠোর পরিশ্রম সহকারে তাঁহারা অধ্যয়ন করিতে থাকেন, বৃত্তিলাভ করেন এবং নিজেদের চেষ্টায় বিভিন্ন স্থানে উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষা পরিসমাপ্ত করেন। কমলাবাঈ যখন পিতাকে হারান তখন তাঁহার বয়স ছয় বৎসর মাত্র। তিনি কালেভদ্রে কচিৎ স্কুলে যাইতেন, কিন্তু বাড়ীতে মারাঠী পড়িতে এবং লিখিতে শিখিলেন। তিনি রামায়ণ-মহাভারত পড়িতেন এবং ঘর-গৃহস্থালির যাবতীয় কার্য্যে মাকে সাহায্য করিতেন। কমলা-বাঈ এবং তাঁহার ভায়েদের নিকট রাধাবাঈ ছিলেন আমৃত্যু বিরাট প্রেরণার উৎস-স্বরূপ। ১৯৪৭ সনে ৮৩ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন।

কর্ণাটকের গাদাগের হোসপেট পরিবারের একটি ছেলের সঙ্গে মাত্র ১২ বৎসর বয়সে কমলাবাঈয়ের বিবাহ হয়। বিবাহিত জীবনের কোন সুখস্মৃতির কথা কমলাবাঈয়ের মুখে শোনা যায় না। শাশুড়ী এবং স্বামী কেহই তাঁহার সহিত মনুষ্যোচিত সসম্মান আচরণ করেন নাই। শাশুড়ী ছিলেন সেকালের আদর্শ বউ-কাটকী শাশুড়ী। স্বামীটি আসক্ত হইয়া পড়ে সর্ব্ববিধ পাপাচরণে এবং সে যখন যক্ষ্মা-রোগে অকালে মারা যায় কমলা দেবীর বয়স তখন চৌদ্দ হইয়াছে কিনা সন্দেহ। তাঁহার অন্তিম অসুখের সময় তিনি প্রকৃত ভারতীয় সহধর্ম্মিণীর মত তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া-ছিলেন। তিনি এই কাহিনীটি বলিয়া থাকেন যে, একবার তাঁহার এক ননদ প্লেগরোগে আক্রান্ত হইলে পর পরিবারের

সকলে উপেক্ষাভরে তাঁহাকে মরণের মুখে ঠেলিয়া দেয়। তখন সকলের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করিয়া নির্ভয়ে তাঁহার রোগশয্যাপার্শ্বে তিনি উপস্থিত থাকিতেন—তাঁহার নিজের দেহে যে রোগ সংক্রামিত হইতে পারে একথা তাহার মনে উদিত হইয়া তাঁহাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। ভবিষ্যতে লক্ষ লক্ষ লোকের সেবায় যে তাঁহাকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে, সেদিন কি তিনি সেকথা জানিতেন?

পরিবারের বোঝা

স্বামীবিয়োগের পর কমলাবাঈকে আবার তাঁহার মাতৃভবনে ফিরাইয়া লইয়া আসা হইল। স্বামীগৃহে তাঁহার জীবিতাবস্থায় যদিও তিনি মোটেই সুখী ছিলেন না তাই বলিয়া ভায়েদের আশ্রয়ে আসিয়া তাঁহার যে আনন্দ হইল তেমন নয়। কেন? তাহারা ছিল গরীব এবং পরিবারের বোঝা-স্বরূপ থাকাও তিনি মোটেই পছন্দ করিলেন না। কেমন করিয়া তিনি তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন? পরিবারের সর্ব্বতোমুখী সহায়তার দরুন তিনি পরিবারের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিলেন। তিনি রোগীর শুশ্রূষা ও প্রসূতি-পরিচর্য্যা করিতেন এবং তাঁহার মাকে কাজকর্মে সাহায্য করিতেন। তাঁহার ভায়েরা ঐকান্তিকভাবে ইহাই কামনা করিতেন যে, ব্রাহ্মণ বিধবার আশাহত ব্যর্থ জীবনযাপন করা অপেক্ষা কমলাবাঈ যেন কোন প্রয়োজনীয় কর্ম্মে নিরত থাকেন।

পরবর্ত্তী সাত-আট বৎসরের মধ্যে কমলাবাঈ তাঁহার ভ্রাতৃগণকে ধীরে ধীরে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিলেন। ওদিকে তিনি তাহাদের সহায়তায় কতকগুলি বই পড়িতে শিখিলেন এবং অনাগত কঠোর জীবনের জন্ত চলিতে লাগিল তাঁহার মানসিক প্রস্তুতি।

১৯১৫ সনে তাঁহার অন্ততম ভ্রাতা শ্রী ডি. কে. মোহোনি মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে আসিয়া বসতি স্থাপন করিলেন এবং শেঠ যমুনালাল বাজাজ ও সুপরিচিত নেতা (বর্ত্তমানে বিখ্যাত সর্ব্বোদয় কর্ম্মী) শ্রীকৃষ্ণদাস জাজু কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ওয়ার্দ্ধা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকরূপে কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতাও নাগপুরে আসিয়া বসবাস শুরু করিয়াছিলেন। চতুর্থ ভ্রাতা শ্রী এইচ. কে. মোহোনি আমালনারস্থ খান্দেশ শিক্ষা সমিতির (Khandesh Education Society) কাজে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। যদি এমন কেউ থাকেন যিনি কমলাবাঈয়ের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ এবং তাঁহাকে সমাজসেবার কার্য্যে উৎসাহিত করিয়াছিলেন তো তিনি হইতেছেন হরিভাউ।

ধাত্রী-বিদ্যা শিক্ষা

নাগপুরে ভেনুতাই নেনে এবং রাধিত্রিবাঈ নামক অপর দুই জন বিধবার সঙ্গে কমলাবাঈ ডাফরিন হাসপাতালে ভর্ত্তি হইলেন এবং ১৯২০ সনে সিনিয়র ধাত্রীবিদ্যা ও প্রাথমিক নার্সিঙে তাঁহার দুই বৎসরের শিক্ষা সমাপ্ত করিলেন। এই সময়ের মধ্যে কঠোর পরিশ্রম দ্বারা তিনি সকলের প্রিয়পাত্রী হইলেন এবং চিকিৎসকদের আস্থা অর্জ্জন করিলেন। সাদাসিধা আচরণ, প্রীতিকর আদবকায়দা এবং প্রখর সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা তিনি তাঁহার রোগীদের শুভেচ্ছা এবং স্নেহ লাভ করিতে সক্ষম হইলেন।

১৯২০ সনে নাগপুরে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন—যে অধিবেশনে গান্ধী দেশের রাজনৈতিক জীবনধারাকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেন—কমলাবাঈকে প্রভাবিত করে এবং এই আন্দোলনের আনুষঙ্গিক অন্যান্য অনেক জিনিষের সঙ্গে তিনি খাদি পরিধান এবং স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার শুরু করেন—আজও পর্য্যন্ত তিনি নিয়মিতভাবে ইহা করিয়া আসিতেছেন।

হাসপাতালে শিক্ষাগ্রহণকালে হাসপাতালগুলির পরিচালন-পদ্ধতি এবং অধিকাংশ চিকিৎসক ও নার্স কিরূপ অর্থগৃধ্ন ও রোগীদের প্রতি সহানুভূতিহীন তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া কমলাবাঈ বেদনা অনুভব করেন। তাহাদিগকে যে খাদ্য দেওয়া হইত তাহাও তখন ছিল অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরণের। এই দুই বৎসরব্যাপী শিক্ষাগ্রহণকালেই কমলাবাঈয়ের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় এবং অনাদৃত মাতা ও শিশুদের পক্ষে প্রকৃতই কল্যাণকর কিছু করিবার জন্ত এক প্রবল এষণা তাঁহার মনকে অধিকার করে। সুতরাং নার্সিং এবং ধাত্রীবিদ্যা শিখিবার অব্যবহিত পরে সরকারের অধীনে কোন চাকরি না লইয়া কিংবা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত না হইয়া কমলাবাঈ তাঁহার সহকাম্মিণী শ্রীমতী ভেনুতাই নেনের সহযোগিতায় সীতাবল্ডিতে চারটি বেড এবং সংশ্লিষ্ট রান্নাঘর সহ একটি ক্ষুদ্র মাতৃসদন বা মেটার্নিটি হোম প্রতিষ্ঠা করেন। শহরের মানবহিতৈষিণী মহিলাদের এই কার্য্যে তিনি শ্রীমতী গীতাবাঈ প্যাডগিল, লক্ষ্মীবাঈ প্যাডগিল, শ্রীমতী পাঙ্গুবাঈ গোখলে, ডাক্তার শ্রীমতী ইন্দিরাবাঈ নিয়োগী প্রমুখ শহরের অনেক বিখ্যাত মানবহিতৈষিণী মহিলা এবং জনকয়েক খ্যাতিমান চিকিৎসকের সক্রিয় সাহায্য লাভ করেন। জাতি সম্প্রদায় এবং ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল স্ত্রীলোকের নিকটই এই মাতৃসদনের দ্বার অবারিত হয়। হরিজনেরাও ইহাতে স্থান পায়। 'হোমে'র কার্য্য পরিচালনার নিমিত্ত একটি কমিটি গঠিত হয় এবং উহা একটি রেজিষ্ট্রীকৃত সংস্থায়

পরিণত হয়। এখানে দরিদ্র স্ত্রীলোকদিগের বিনামূল্যে প্রসবের এবং খাওয়ানোর ব্যবস্থা হয়, ফলে এই প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এমনিভাবে পরবর্তী চৌত্রিশ বৎসরের মধ্যে সীতাবর্ডি মেটার্নিটি হোমের জন্ম এবং পরিপুষ্টির কাহিনী কমলাবাঈ হোসপেটের জীবন-কথার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত হইয়া যায়।

১৯২৭ সনে এই 'হোমে'র প্রথম শাখা খোলা হয় শহরের মহলে এলাকায় এবং পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে গ্রামীণ এবং নাগরিক অঞ্চল উভয়ত্রই আরো কতকগুলি শাখা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরুন ইহার কর্মপ্রচেষ্টার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়। 'হোম' উচ্চতর (senior) ধাত্রীবিদ্যা এবং প্রাথমিক নার্সিঙের শিক্ষণকেন্দ্ররূপে রাজ্য সরকারের নিকট হইতে স্বীকৃতি লাভ করে।

নারীকল্যাণ সমস্যা

এইরূপে নারীকল্যাণ সমস্যা, বিশেষতঃ শিশুকল্যাণ এবং মাতৃমঙ্গল সমস্যা কমলাবাঈয়ের দৃষ্টির সামনে সেবামূলক কর্মে আত্মনিয়োগ করিবার এক বিরাট ক্ষেত্র উদ্ঘাটিত করে। ইহাই হইয়া দাঁড়াইল তাঁহার জীবনের মূল লক্ষ্যবস্তু এবং ইহারই অনুধ্যানে পরিপূর্ণ হইয়া রহিল তাঁহার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত। মহাত্মা গান্ধী যখন ওয়ার্ধাকে তাঁহার প্রধান কর্মকেন্দ্রে পরিণত করেন, কমলাবাঈ তখন হইতে অনেক বিখ্যাত রাজনৈতিক এবং সমাজকর্মীদের সংস্পর্শে আসেন। শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস যাজু, ঠক্কর বাপা, পুনামচাঁদ রাঙ্কা এবং অন্য অনেকে কমলাবাঈকে উৎসাহিত করেন এবং 'হোমে'র উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্যশ্রেণীভুক্ত হন।

রাজ্যের সর্বত্র ছড়ানো ১৮টি শাখা এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত দুই একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত ১০০টি শয্যাসমন্বিত আধুনিক পদ্ধতির মেটার্নিটি হাসপাতাল ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য ভবনগুলি লইয়া এই প্রতিষ্ঠানটি রীতিমত গর্ব করিতে পারে। 'হোমে'র শিক্ষণকেন্দ্র হইতে এ পর্যন্ত ৩৫০ জন নারী শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং আগামী দুই বৎসরের মধ্যে, মধ্যপ্রদেশের কম্যুনিটি প্রজেক্টের জন্য সহায়িকা (Auxiliary) নার্স এবং ধাত্রীরূপে ৩০ জন শিক্ষার্থিনী শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবে। সন্তান-জন্মের ক্লিনিক, শিশুদের ক্লিনিক এবং গ্রামাঞ্চলে যে সকল দাই কাজ করে তাহাদের শিক্ষণের নিমিত্ত একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক কর্মপ্রচেষ্টারও সূত্রপাত হইয়াছে এবং এগুলি শিশু ও মাতৃমঙ্গলমূলক কাজের ক্ষেত্রে সন্তোষজনকভাবে উৎকর্ষ লাভ করিতেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও কমলাবাঈ একজন নাগরিক হিসাবে নিজের কর্তব্য সাধনে কখনো পিছাইয়া থাকেন নাই। প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে, ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগতভাবে তিনি ১৯৩০-৩২, ১৯৪০-৪১ ১৯৪২-এর রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহে সহায়তা করিয়াছিলেন। আজ নাগপুরে এমন আর একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানও নাই যেখানে 'মেটার্নিটি হোমে'র মত এত বেশী খাদি ব্যবহৃত হয়। কর্তব্যকর্মের ক্ষেত্রে কমলাবাঈ নিয়মানুবর্তিতা অনুসরণ করিয়া চলেন এবং তিনি কড়া তত্ত্বাবধায়কও বটেন।

প্রকৃত মাতা

কমলাবাঈ কেবল যে হাজার হাজার জননীর সন্তান-প্রসবকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন তেমন নহে, তিনি শত শত নিঃস্ব এবং পরিত্যক্তা স্ত্রীলোককে সাহায্য করিয়াছেন, পিতৃমাতৃহীন শিশুদের তত্ত্বাবধান, আশ্রয় ও শিক্ষাদান এবং তাহাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। লোকেদের খাওয়াইয়া তিনি এক অধ্যাত্ম-সুখ অনুভব করেন। তাঁহার সম্বন্ধে অন্নপূর্ণা কথাটি প্রকৃত অর্থেই প্রযুক্ত হইতে পারে—নাগপুরের শত শত লোকের আসল "মা" তিনিই। লোকে কৌতুক করিয়া তাঁহাকে বলিয়া থাকে—কমলাবাঈ, আপনি যে শৈশবে বিধবা হইয়াছিলেন এটাকে শাপে বর বলা যাইতে পারে। আপনার যদি স্বামী এবং নিজের আধ ডজন ছেলেমেয়ে থাকিত তাহা হইলে আপনি যাহা তাহা হইতে পারিতেন না। আজ আপনি কত জনের "মা"। একথা শুনিয়া নাগপুর এবং মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের সহস্র সহস্র শিশুর জননীর পদে অভিষিক্তা কমলাবাঈ বিনম্রভাবে হাসেন এবং মনে মনে খুশি হন।

এমনিভাবে ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে জাত কমলাবাঈয়ের পক্ষে নিজে নিজে যেটুকু শিখিয়াছিলেন তার অতিরিক্ত কোনো শিক্ষালাভের সুযোগ তাঁহার হয় নাই। ভ্রাতৃগণের নিকট হইতে উৎসাহ এবং সারাজীবনব্যাপী নির্দেশ লাভ, ঠক্কর বাপা এবং শ্রীকৃষ্ণদাস যাজুর মত শ্রেষ্ঠ সমাজকর্মীদের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণ, সহকর্মীদের সহযোগিতা এবং সর্বোপরি জনগণের আশীর্বাদ অর্জন এই সকল হইতে তিনি তাঁহার শক্তিকে প্রকৃত খাতে পরিচালিত করিবার শিক্ষা পাইয়াছিলেন, কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা কোনো ফ্যাকাল্টি হইতে নয়। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় একবার তাঁহাকে নাগপুর ইউনিভার্সিটি কোর্টের সদস্যরূপে মনোনীত করিয়া সমাজ-সেবা কৃত্যকে সম্মানিত করিয়াছেন। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ঠক্কর বাপা, রাজকুমারী অমৃত কাউর, শ্রীমতী দুর্গাবাঈ দেশমুখ এবং অপর কয়েকজন প্রসিদ্ধ সমাজকর্মী তাঁহার আদর্শের উচ্চ্বসিত প্রশংসা করে তাঁহাকে বাক্যে এবং কর্মে উৎসাহিত করিয়াছেন। কাজেই কমলাবাঈয়ের জীবন নিঃস্বার্থ সেবাকর্মের এক অনবচ্ছিন্ন কাহিনী। মানবতার এই প্রকৃত সেবিকা দীর্ঘজীবিনী হইয়া অন্যান্যদের যেন কর্তব্যনিষ্ঠ জীবন যাপনে অনুপ্রাণিত করেন।

প্রবাসী

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের জন্য ঃ—

ভারত পাকিস্তানী সডাক বার্ষিক মূল্য ১২৲, ঐ ষাণ্মাসিক ৬৲, ঐ প্রতি সংখ্যা ১৲ টাকা। বিদেশী সডাক বার্ষিক মূল্য ১৮৲ টাকা, ঐ ষাণ্মাসিক ১০৲ টাকা, ঐ প্রতি সংখ্যা ১৷০ টাকা অগ্রিম দেয়। বৎসর বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। টাকা মনিঅর্ডারে অগ্রিম পাঠানোই ভাল, বাহিরের ব্যাঙ্কের চেকের সঙ্গে অতিরিক্ত ৷৵০ ব্যাঙ্ক কমিশনও দেয়। প্রবাসী বাংলা মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। যথাসময়ে প্রবাসী না পৌঁছিলে ১৫ তারিখের ভিতর স্থানীয় ডাকঘরের রিপোর্ট ও নিজেই গ্রাহক নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। পুরাতন গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ, তাঁহাদের চাঁদা যে সংখ্যার সহিত নিঃশেষ হইবে, সেই সংখ্যা পাইবার পর ২০ দিনের ভিতর পুনর্ব্বার চাঁদা বা প্রবাসী লইতে অনিচ্ছাজ্ঞাপক পত্র না পাঠাইলে, তাঁহারা পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃতে লইয়া চাঁদা দিতে ইচ্ছুক এই বিশ্বাসে ভিঃ পিঃ প্রেরণ করা হয়। চিঠিপত্র বা টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ না করিলে কার্য্যালয়ে গোলমাল অবশ্যম্ভাবী।

বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য ঃ—

বার্ষিক মূল্য—সাধারণ পূর্ণ একপৃষ্ঠা (৮ইঃ × ৬ইঃ) ৬০৲

„ „ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা (৪ইঃ × ৬ইঃ)
বা এক কলম (৮ইঃ × ৩ইঃ) ৩২৲

„ „ সিকি পৃষ্ঠা (২ইঃ × ৬ইঃ)
বা অর্দ্ধ কলম (৪ইঃ × ৩ইঃ) ১৮৲

„ „ অষ্টমাংশ পৃষ্ঠা (১ইঃ × ৬ইঃ)
বা সিকি কলম (২ইঃ × ৩ইঃ) ১০৲

বিশেষ বিশেষ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনের মূল্য পত্রে জ্ঞাতব্য

প্রবাসী প্রকাশিত হইবার অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে 'বিজ্ঞাপন' অগ্রিম [illegible]দামসহ কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই। মূল্যসহ বিজ্ঞাপন প্রবাসী প্রকাশিত [illegible]হইবার অন্ততঃ ১০।১৫ দিন পূর্ব্বে কার্য্যালয়ে পৌঁছিলে প্রুফ দেখাইবার [illegible]ব্যবস্থা করা হয়। প্রুফ দেখার দোষে যদি কোন ভুল থাকে তজ্জন্য [illegible]রা দায়ী নহি। যাঁহারা বিজ্ঞাপনের প্রুফ দেখার ভার আমাদের [illegible]দিবেন, তাঁহারা সামান্য ভুল-ত্রুটির জন্য অভিযোগ করিলে গ্রাহ্য [illegible]। এক বৎসরের জন্য কন্ট্রাক্ট করিলে এবং বৎসরের সম্পূর্ণ [illegible] জমা দিলে টাকায় ৵০ হিসাবে বাদ দেওয়া হয়।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—প্রবাসী কার্য্যালয়

MOST USEFUL
BOOKS!
THE COW IN INDIA
BEEKEEPING
HOME & VILLAGE DOCTOR
NON VIOLENCE
OTHER PUBLICATIONS
KHADI PRATISTHAN
15, COLLEGE SQUARE
CALCUTTA

ডালডা আমার পক্ষে ভালো

ডাল্‌ডা বনস্পতি দিয়ে রান্না ক'রলে আপনি খুব তৃপ্তির সঙ্গে পেট ভ'রে খেতে পারেন, কেননা ডাল্‌ডা যে কোন' রান্নারই সহজাত স্বাদ-গন্ধ বাইরে টেনে আনে। আপনার পরিবারের রান্না সম্বন্ধে আপনার যদি কোন' সমস্যা থাকে তবে বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞের উপদেশের জন্য লিখুন—দি ডালডা এ্যাডভাইসারি সার্ভিস ইণ্ডিয়া হাউস (জি, পি, ও'র সামনে) বোম্বাই ১

সকলের পক্ষেই ভালো কারণ ইহা বিশুদ্ধ।

ডাল্‌ডা সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর কারণ ইহা বায়ুরোধক, শীলকরা টিনে প্যাক করা থাকে— আর তৈরীর সময় হাতে ছোঁয়া হয় না।

সকলের পক্ষেই ভালো কারণ ইহা পুষ্টিকর।

ডাল্‌ডা অতি উৎকৃষ্ট উদ্ভিজ্জ তেল থেকে তৈরী করা হয় আর এতে থাকে স্বাস্থ্যদায়ী ভিটামিন্ 'এ' ও 'ডি'।

HVM. 238-X52 BG

পৃথিবীর জনসংখ্যা বনাম প্রাকৃতিক সম্পদ

পৃথিবীর জনসংখ্যা যেরূপ দ্রুত গতিতে বৃদ্ধির পথে চলিয়াছে তাহাতে ভবিষ্যতে সমগ্র পৃথিবীতে উৎপন্ন খাদ্য এবং কাঁচা মাল দ্বারা মানুষের চাহিদা মিটিবে কি না তাহা ভাবিয়া অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। পক্ষান্তরে এমন এক দল আছেন যাঁহাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল যে, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা (techonology) চিরকালই সকলের জন্ম যথেষ্ট খাদ্য উৎপাদন করিবার উপায় উদ্ভাবনে এবং পুরানো কাঁচা মাল দুষ্প্রাপ্য হইলে তৎপরিবর্ত্তে নূতন কাঁচা মাল তৈরি করিতে সমর্থ হইবে।

বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরস্থান বিভাগ (anatomy) অধ্যাপক এস. জুকারম্যান এফ.আর.এস "প্রোগ্রেস" পত্রিকায় এ সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার প্রবন্ধের মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

সামাজিক কর্ম্মনীতির ক্ষেত্রে সমস্যা এবং তাহার সমাধানের মনোভাব এতদুভয়ের মধ্যে প্রায়ই বিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে। যেমন—এ বিষয়ে কাহারো সন্দেহ নাই যে, আমাদের শিল্পনগরীসমূহের বাতাস দূষিত, আমাদের রাস্তাঘাট নির্ম্মাণপদ্ধতি সেকেলে এবং সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ক (technological) শিক্ষার মান নিম্নস্তরের। কিন্তু এ সকলের উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত অথবা এ নিমিত্ত আমরা কি পরিমাণ অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত আছি তৎসম্বন্ধে ঐকমত্যের অভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

দূর ভাবীকালে প্রসারিত সমস্যা সম্পর্কে এই মতানৈক্য প্রবলতর হইয়া থাকে। ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় জনসংখ্যা সমস্যা অথবা প্রাকৃতিক-সম্পদ-সমস্যা নামে অভিহিত সমস্যা সম্পর্কে যে সকল মন্তব্য প্রকাশিত হয় তৎসমুদয় পর্য্যালোচনা করিলে। আজ হইতে ঠিক দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে হেলিবেরীর তদানীন্তন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কলেজের অধ্যাপক ম্যালথাস একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, যদি প্রজনন নিয়ন্ত্রিত করা না হয় তাহা হইলে পরিণামে মানবজাতির পক্ষে খাদ্যাভাব উপস্থিত হওয়া অনিবার্য্য, কেননা আমাদের ক্রমবর্দ্ধমান লক্ষ লক্ষ জনসংখ্যার সঙ্গে খাদ্য-উৎপাদন সমানতালে এবং সমান দ্রুত গতিতে চলিবে—ইহা ধারণার অতীত। এই উপপত্তির (thesis) বিরুদ্ধে বহুপ্রকার সম্ভব যুক্তিতর্ক উত্থাপিত হয়। তার পর ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পের বহুধাবিপুল বিকাশ হইল, বৈদেশিক বাজারসমূহ খোলা হইল এবং সমুদ্রের ওপারের যে সমস্ত দেশে শিল্পায়ন হয় নাই সেগুলি হইতে অনুরূপভাবে খাদ্য সরবরাহ হইতে লাগিল। এই সকল কারণে ম্যালথাসের প্রতিদ্বন্দ্বিগণ এবং তাঁহাদের পশ্চাবলম্বীদের এই ধারণা দৃঢ়তর হইল যে, তাঁহাদের মতই ঠিক এবং ম্যালথাস ভ্রান্ত মত পোষণ করিতেছেন। আজও সেই একই অবস্থা রহিয়াছে, তবে সে ভিন্ন কারণে। বর্ত্তমান বৎসরের একেবারে গোড়াকার দিকে ইংলণ্ডের একটি প্রভাবশালী জাতীয় পত্রিকায় স্তম্ভে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক কাঁচা মালের ক্রমবর্দ্ধমান ভোগ-ব্যবহারের (Consumption) সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনার অবতারণা হয়। এই আলোচনীতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কাহারো কাহারো মতে—এই বিষয়ে ভবিষ্যতের জন্ম আশঙ্কা করিবার কোন হেতু নাই, কেননা অতীতে সকল সময়েই সমস্যার সমাধানকল্পে কোন-না-কোন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, বিশেষতঃ, আজিকার দিনের প্রযুক্তিবিদ্যার কল্যাণে যেরূপ ধনোৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়া থাকে অতীতে তদনুরূপ হয় নাই। কাজেই বর্ত্তমানকালে এ বিষয় লইয়া মাথা ঘামানো সম্পূর্ণই অনাবশ্যক। অন্যান্যদের মতে কিন্তু সামনের পথ ভয়াবহ—যন্ত্রশিল্পের উন্নতি হোক আর নাই হোক তাহাতে কিছু ইতরবিশেষ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই আলোচনার ফলে যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়, বাস্তবিকই তাহা গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই এখন দেখিতে হইবে যে, মানুষের যন্ত্রশিল্পের ইতিহাসের আলোকে এতদ্বিষয়ক তথ্যসমূহ কি ধরণের বলিয়া প্রতিভাত হয়।

এই ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে দশ হাজার বৎসরেরও পিছনে ফিরিয়া যাইতে হইবে। যুগযুগান্ত ধরিয়া অবস্থা ছিল একই রূপ। এই স্থিতিশীল অবস্থার সঙ্গে সংঘাত বাঁধিল বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে। ইহার আনুষঙ্গিক হিসাবে কাঁচা মাল ব্যবহারে অভাবনীয় বৃদ্ধি ও সেদিনকার ব্যাপার। প্রযুক্তিবিদ্যার ইতিহা
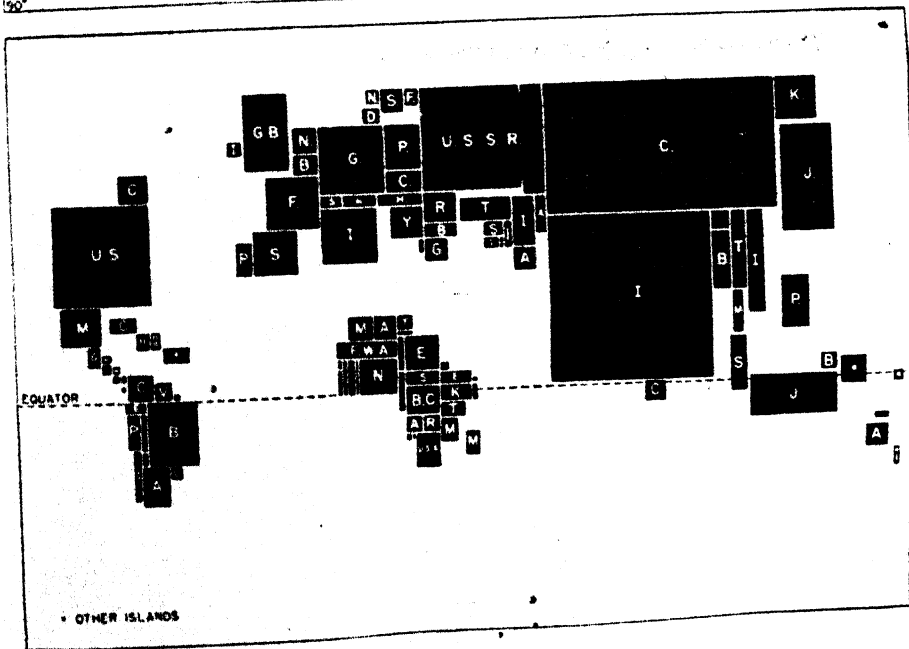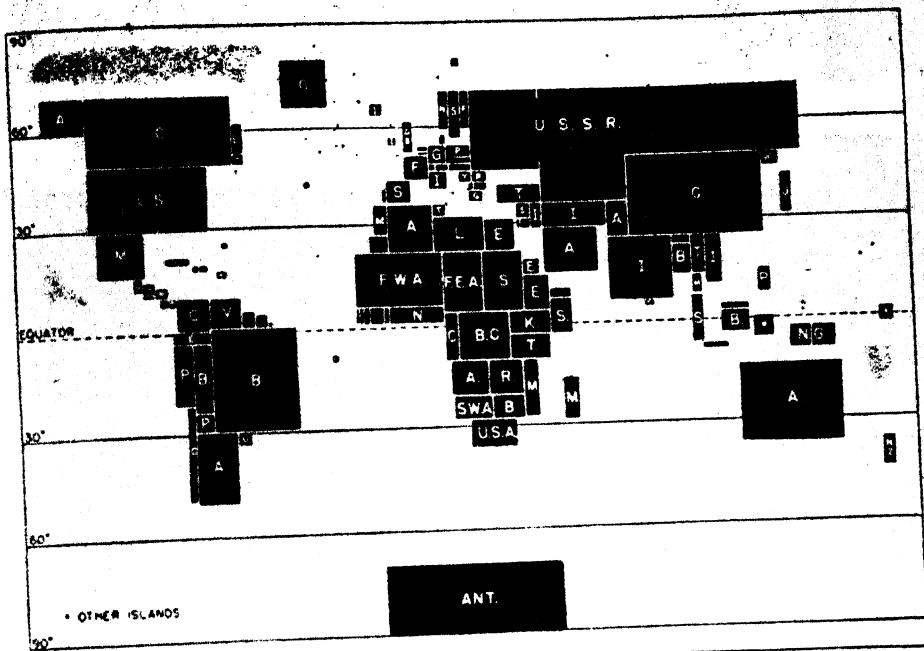
পৃথিবীতে জনসমষ্টির অসম-বণ্টন সংখ্যাজ্ঞাপক চিত্র
নীচের চিত্রে জনসংখ্যার দিক দিয়া দেশ ও মহাদেশগুলি নির্দেশিত

আমাদের সমাজ-বিপ্লবের এবং গত শতাব্দীতে জনসংখ্যা, মানুষের ধনসম্পদের বিস্ময়কর বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার সাধারণ মান-উন্নয়নের ইতিহাসও বটে। বর্ত্তমানকালে কারিগর যন্ত্রের নিকট হার মানিয়াছে এবং কর্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে কাঁচা মাল হইতে তৈরি মাল উৎপাদনের ব্যাপারে এমন পদ্ধতি অনুসৃত হইয়া চলিয়াছে যাহার দরুন যাহারা প্রকৃতপক্ষে তৈরি মালের নির্মাতা তাহারা প্রায়শঃই ইহার যৌগিক অংশসমূহের (component parts) উৎসের কথা জানে না এবং যে সকল কাঁচা মালের উপর তাহাদের দ্রব্য-প্রস্তুতি নির্ভর করে তৎসম্বন্ধেও তাহারা ওয়াকিবহাল নহে। এই সব পরিবর্ত্তনের দরুন সমাজে যে পদ্ধতিতে রূপান্তরসাধন হইয়াছে, তাহা প্রায়ই হইয়াছে বেদনাদায়ক, কখন কখনও-বা রক্তপাতে কলুষিত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমরা আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে রূপান্তরিত করিয়া এমন এক শিল্প-পদ্ধতির উপযোগী করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছি, অধিকতর ধনসম্পদের সার্বিক (universal) প্রয়োজনসিদ্ধি এবং জীবনযাত্রার অবস্থার অধিকতর উৎকর্ষবিধান, একমাত্র যাহার দ্বারা সম্ভবপর। ফলে, সাধারণতঃ শিল্পের বিকাশ এবং প্রসার কেবলমাত্র ততদূর পর্য্যন্তই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাবিষয়ক জ্ঞানকে যতদূর পর্য্যন্ত ব্যবহারিক প্রয়োজনে লাগানো যাইতে পারে, তা ছাড়া মূলধনপ্রাপ্তির উপরেও ইহার বিকাশ এবং বৃদ্ধি নির্ভর করে। সাধারণতঃ ইহার সম্প্রসারণের সীমারেখা-নির্দ্ধারণ কাঁচা মালের উপর নির্ভরশীল নহে। যদি কোন কাঁচা মালের একটি উৎস শুকাইয়া যায়—দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ইংলণ্ডের সীসার খনির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে, তা সকল সময়েই এমন আর একটির অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, যাহার উপর ভরসা করা যাইতে পারে। এই পরিবর্ত্তনের দরুন তৈরি মাল অধিকতর দুর্মূল্য হইতে পারে, কিন্তু বাজারে যদি চাহিদা থাকে তাহা হইলে ইহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। সর্ব্বোপরি বাণিজ্য-শুল্ক ও মুদ্রাঘটিত বিধিনিষেধ এবং অনুরূপ অন্যান্য ব্যবস্থা সত্ত্বেও—যাহা প্রায় সকল দেশই নিজেদের স্বার্থরক্ষাকল্পে কোন-না-কোন সময় অবলম্বন করিয়াছে—শিল্পের সমৃদ্ধি এবং বিকাশলাভ সম্ভবপর হইয়াছে।

এই বিষয়টির উপর যে অলীক এবং অভিনব ছায়াপাত হইয়াছে, তাহাই প্রতিফলিত হইয়াছে ইংলণ্ডের জাতীয় সংবাদপত্রগুলিতে সম্প্রতি-প্রকাশিত মন্তব্যসমূহে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ক্রমোন্নতি এবং সেই জ্ঞানকে কাজে লাগাইবার উপযোগী বুদ্ধিকৌশল, মূলধন, কাঁচা মাল সম্বন্ধে আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা না করিয়াই, ব্যাপকভাবে অনেকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে যে, কাঁচা মাল এবং শক্তির (energy) দুষ্প্রাপ্যতার দরুন শীঘ্র অথবা বিলম্বে শিল্পের বিকাশ ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ম্যালথাস দেখিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর ক্রমবর্দ্ধমান লক্ষ লক্ষ লোকের খাদ্য সরবরাহে ঘাটতি পড়িয়া যাইতেছে।

নয়া-ম্যালথাসপন্থীরা কেবল খাদ্যের স্বল্পতার মধ্যেই নয়, জ্বালানি এবং কাঁচামালের দুষ্প্রাপ্যতার মধ্যেও বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা যে আশঙ্কা করেন তাহা হইতেছে এই যে, আংশিকভাবে জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নের ব্যাপক আগ্রহ, কিন্তু মুখ্যতঃ পৃথিবীর জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধিবশতঃ 'ক্যাপিটাল' এবং ভোগ্যদ্রব্যসমূহের চাহিদা, কাঁচা মালের নূতন উৎসসমূহের বিকাশের তুলনায় মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতে পারে—উপরন্তু তাঁহারা এই বিষয়েও আস্থাবান নন যে, দুষ্প্রাপ্যতার প্রতিকারার্থে সকল
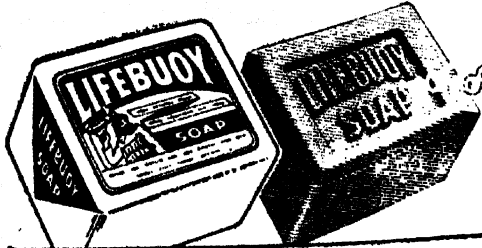
সময়েই একটা-না-একটা উপায় বাহির হইবে, অথবা পুরাতন কাঁচা মাল দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিলে শিল্প-বিজ্ঞানী (Industrial Scientist) সর্ব্বদাই নূতন কাঁচা মালের নির্দ্দেশ দিতে সক্ষম হইবেন।

যুদ্ধের পর এই বিষয় সম্পর্কে আলোচনার্থ দুইটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছে—উভয় সম্মেলনই অনুষ্ঠিত হইয়াছে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ সংস্থার উদ্যোগে। ১৯৪৯ সনে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলনে জোর দেওয়া হয় প্রাকৃতিক সম্পদের উপর। এবং এই সেদিন মাত্র—গত গ্রীষ্মকালে রোমে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে জনসংখ্যা সম্পর্কে আলোচনার উপরেই অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হয়। এতদ্ব্যতীত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক এই সমস্যা সম্পর্কে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান-কার্য্যও পরিচালিত হইয়াছে। প্রথমটির সরকারী আখ্যা হইতেছে "দি প্রেসিডেন্টস মেটিরিয়াল্‌স পলিসি কমিশন"। কিন্তু উক্ত কমিশনের চেয়ারম্যানের নামানুসারে "প্যালে রিপোর্ট" নামেই ইহা অধিকতর পরিচিত। ১৯৫৩ সনের শেষভাগে পরিচালিত দ্বিতীয় অনুসন্ধান-কার্য্যটির সমগ্র রিপোর্ট এখনও ইংলণ্ডে প্রাপ্তব্য নহে। এই সকল আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় অনুসন্ধান কার্য্য ছাড়া অবশ্য প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে অসংখ্য সরকারী অনুসন্ধান-কার্য্যও পরিচালিত হইয়াছে, কেননা উপরোক্ত সমস্যাসমূহ প্রত্যেকটি দেশের উপর অথবা—যেমন কলম্বো পরিকল্পনার ক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার এবং সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত দেশ-সমষ্টির উপর প্রতিক্রিয়াশীল হয়। যে সকল দেশ সর্ব্বপ্রথম নিজেদের কাঁচা মালের উৎস সম্বন্ধে জাতীয় ভিত্তিতে অনুসন্ধান-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, ইংলণ্ড তাহাদের অন্যতম। এই সমস্ত যুদ্ধোত্তরকালীন যাবতীয় সরকারী কার্য্যকলাপ ব্যতিরেকে, গত কয়েক বৎসরের মধ্যে কতিপয় নয়া-ম্যালথাসবাদী পুস্তকও প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলি উৎকৃষ্ট, কতকগুলি আবার তেমন ভাল নয়।

ইদানীং যে কোন দিকেই আমরা দৃষ্টিনিক্ষেপ করি না কেন, সর্ব্বত্রই ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর অঞ্চলে রকমারি কাঁচামালের জন্য ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা দেখিতে পাই। গত দশকের মধ্যে ব্রিটেনে যুদ্ধে বিধ্বস্ত এত বেশী দ্রব্য মেরামত করিতে হইয়াছে যাহা পূর্ব্বে কখনও করা হয় নাই। ব্রিটেনকে এমন এক অর্থ-ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছে, যুদ্ধজনিত ব্যয়বাহুল্যের দরুন যাহার ভিত্তিমূল শিথিল হইয়া গিয়াছিল। দুনিয়ার বাজারে ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইবার জন্য এবং বিশেষ ভাবে পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকরা দশ ভাগের এক ভাগেরও কম লোকের বাসভূমি যে আমেরিকা সমগ্র পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করে সেই দেশের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকিয়া থাকিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডকে তাহার শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কে অবহিত হইতে হইয়াছে। এই বাস্তব সত্যেরও মুখোমুখি ইংলণ্ডকে হইতে হইয়াছে—যে আমেরিকা ব্যাপকতর ভাবে গৃহজাত কাঁচামালের ভিত্তিতে তাহার অতুলনীয় সম্পদ গড়িয়া তুলিয়াছে, এখন হইতে সেই আমেরিকার বৈদেশিক সম্পদের চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিবে। কাঁচামালের জন্য আমেরিকার অতৃপ্ত বুভুক্ষা যে কত প্রবল তাহা নিম্নে প্রদত্ত সরল বিবৃতিটি হইতেই সুপরিস্ফুট হইবে :—"প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হইতে আমেরিকায় ব্যবহৃত এমন কোন ধাতু অথবা খনিজ জ্বালানি

নাই যাহা পরিমাণের দিক দিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী শতকসমূহে সমগ্র পৃথিবীতে ব্যবহৃত এই সকল দ্রব্যকে অতিক্রম করে নাই।" এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, পাশ্চাত্ত্য জগতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক প্রাধান্যের দরুন নিশ্চিত রূপেই তাহার নূতন চাহিদাগুলিও মিটিবে। তদুপরি একথাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, অষ্ট্রেলিয়ার মত মুখ্যতঃ প্রাথমিক উৎপাদক (Primary Producers) দেশগুলিতেও যুদ্ধের পরে শিল্পায়নের (Industrialization) গতিবেগ দ্রুততালে বাড়িয়া চলিয়াছে, ভারতবর্ষের বেলায়ও তাহাই ঘটিয়াছে। এমনকি যেখানে শিল্পায়নের অগ্রগতি হইতেছে না সেখানে পর্য্যন্ত তৈরি মালের চাহিদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এমনিভাবে যুদ্ধোত্তর কালে ভোগ্যদ্রব্যোৎপাদন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পৃথিবীতে কাঁচা মালের চাহিদাও উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে এবং এ কথা মনে করিবার কোন হেতু নাই যে, এই দাবিকে দাবাইয়া রাখা বা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা সম্ভব হইবে। অধিকন্তু বর্ত্তমান জগৎ দুইটি শত্রুভাবাপন্ন এবং সশস্ত্র শিবিরে বিভক্ত হওয়াতে ইহা আরও জোরালো হইয়া উঠিয়াছে।

জনসংখ্যা-বৃদ্ধি

এখন জনসংখ্যা-বৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। নির্ভুলতম হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীর বর্ত্তমান সামগ্রিক জনসংখ্যা ২,৫০ কোটি, তন্মধ্যে অর্দ্ধেকেরও বেশী এশিয়ার অধিবাসী। এই সংখ্যা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর জনসংখ্যার যে হিসাব করা হইয়াছিল তাহার দ্বিগুণ। বর্ত্তমান বৃদ্ধির অনুপাতে হিসাব করিলে দেখা যায় শতাব্দীর শেষে এই সংখ্যা বাড়িয়া দাঁড়াইবে ৪,০০ কোটির কাছাকাছি। আজিকার দিনে পৃথিবীর যে অঞ্চলেই জনসংখ্যা বাড়তির পথে, মনে রাখিতে হইবে, তাহার হেতু জন্মহারের অতিরিক্ত বৃদ্ধি নয়, পরন্তু আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান এবং উন্নততর পুষ্টিকর খাদ্যের কল্যাণে মৃত্যুহার হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়াই জনসংখ্যাবৃদ্ধির মূল কারণ। বিগত কয় বৎসরে সিংহল এবং অধিকাংশ লাটিন আমেরিকান ষ্টেটগুলির মত স্বল্প-উন্নত (under-developed) দেশগুলিতে মৃত্যুহার অসম্ভবরকম দ্রুতগতিতে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। যেহেতু তাহাদের জন্মহারে এখনও পর্য্যন্ত কমতির লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় নাই সেই জন্য ইহা মনে করা খুবই সমীচীন যে, অদূর ভবিষ্যতে এগুলিতে এবং কম্যুনিষ্ট জোটের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিতে জনসংখ্যার লক্ষণীয় বৃদ্ধি দৃষ্টিগোচর হইবে। পশ্চিম ইউরোপের অধিবাসীরা এখনই পৃথিবীর ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু জনসমষ্টি বলিয়া গণ্য। শতাব্দীর চক্রাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা যে সংখ্যার দিক দিয়া ঢের বেশী ক্ষুদ্রতর বলিয়া গণ্য হইবে তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে এবং ইহাও সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে যে, সেই অনাগত ভবিষ্যতে আজিকার পৃথিবীর কাঁচা মাল ভোগের চাকা ঘুরিয়া যাইবে।

পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ বনাম জনসংখ্যাবৃদ্ধি সম্পর্কে নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করিতেছেন। সোভিয়েট রাশিয়া এবং চীন কিন্তু জোরগলায় সরাসরি "জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদ সমান তালে চলিতে সমর্থ নহে"—এই পাশ্চাত্ত্য মতবাদকে অস্বীকার করিতেছে। ১৯৫৪ সনে রোমে জনসংখ্যা সম্পর্কে অনুষ্ঠিত সভায় জনৈক কম্যুনিষ্ট প্রতিনিধি যাহা বলেন তাহার সারাংশ হইতেছে এই :

"পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে এমন একটি সমস্যা লইয়া আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছে যাহার অস্তিত্বই নাই, অথবা যাহার অস্তিত্ব আছে শুধু উদ্ভট অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার দরুন। মূলধনগঠন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন-সমস্যা সম্পর্কে কম্যুনিষ্টদের এবং পাশ্চাত্ত্যের অন্যান্য

দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে। সকল দেশের জন্য এক সাধারণ নিয়মের উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়ার আবার বিপদও আছে।

প্রাকৃতিক সম্পদ-সংরক্ষণ

এই বিষয়টি সম্পর্কে পাশ্চাত্যের যে সকল কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তি গভীর ভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাহাদের অভিমত এই যে, জনসংখ্যা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ এতদুভয়ের মধ্যে বর্তমানে যে ভারসাম্যের অভাব আছে তাহা যাহাতে অধিকতর মাত্রা ছাড়াইয়া না যায় সেজন্য দুইটি নীতি অনুসরণ করিতে হইবে। প্রথমটি হইতেছে প্রাকৃতিক এবং সিন্থেটিক—খাদ্যও ইহার অন্তর্ভুক্ত। এই উভয়বিধ কাঁচা মালের নূতন উৎসের বিচারবুদ্ধিসম্মত অনবরত বিকাশসাধন। কলম্বো কনফারেন্স এবং 'টেকনিক্যাল এসিষ্টান্স প্রোগ্রামে'র মাধ্যমে এই নীতি যথারীতি প্রবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য আন্তঃ সরকারী মূলধন-বিনিয়োগের প্রোগ্রাম (Programme of inter-governmental investment for resources) অনুযায়ী কেবলমাত্র কাজের সূচনা ছাড়া আর কিছুই হয় নাই। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং বর্জনীয় অপচয় পরিহারের মনোভাবকে যেমন পোষণ করিতে এবং এই নীতির অংশ হিসাবে ছড়াইয়া দিতে হইবে তেমনি এক কাঁচামালের স্থান অন্যপ্রকার কাঁচামালের দ্বারা পূরণ করার সম্ভাবনাবিষয়ক জ্ঞানও যাহাতে প্রচারিত হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

দ্বিতীয় যে কর্মপন্থার কথা সমর্থিত হইতেছে তাহা ভাবী চাহিদার মাত্রা কমাইবার উদ্দেশ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে সীমাবদ্ধ করা। ইহা কার্যকরীকরণের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি ভারতবর্ষ কর্তৃক সরকার-সমর্থিত এক অভিযান প্রবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার ফল কি হইবে সে সম্বন্ধে এত শীঘ্র কিছুই বলা যায় না। এই নীতি কার্যকরীকরণ সহজ ব্যাপার নহে এবং ইহা বিপুল পরিমাণ ধর্মানুশাসন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিরোধী।

পশ্চিম ইউরোপের সামাজিক ইতিহাস হইতে লব্ধ একটি মতবাদ অবশ্য প্রচলিত আছে যে, অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে জন্মহারের স্তর বিপরীতভাবে সম্বন্ধযুক্ত। অর্থাৎ, অর্থনৈতিক অবস্থা যেখানে উন্নত জন্মহার সেখানে কম। এই সাধারণ নিয়মনির্দ্ধারণ যদি সত্য হইত তাহা হইলে ইহা আশা করিতে পারা যাইত যে, পৃথিবীর অনুন্নত দেশসমূহের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের

সঙ্গে তাহাদের জন্মের হারও কমিবে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই ধরণের সাধারণ নিয়মনির্দ্ধারণমূলক উক্তি সমাজ-বিজ্ঞানবিষয়ক অনুরূপ উক্তিসমূহের ন্যায় ভবিষ্যতে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়া থাকে। মুশকিল হইতেছে এই যে, ইতিহাস যে ভাবী ঘটনাসমূহ নিয়ন্ত্রিত করিবেই এমন কোন কথা নাই। অতীতে এক স্থানে কোন ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়াই ভবিষ্যতে কোন দিন অন্যত্র তাহার পুনরাবৃত্তি নাও হইতে পারে—ইহার যুক্তিসঙ্গত হেতু এই যে, সময় যখন আসিবে তখন সংশ্লিষ্ট লোকেরা অন্যরূপ আচরণ করিবার সিদ্ধান্ত করিতে পারে। ভবিষ্যতে যাহাই ঘটুক না কেন বর্ত্তমানে কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া এবং চীন উভয়েই এই বিষয়ক পাশ্চাত্ত্য মতবাদ সম্বন্ধে তাহাদের অনাস্থা ঘোষণা করিয়াছে এবং তাহাদের লক্ষ লক্ষ নাগরিককে ইহা দ্বারা বিভ্রান্ত না হইবার নির্দ্দেশ দিয়াছে। সেইজন্য ইহা খুবই সম্ভব যে, পৃথিবীর অনেকগুলি অনুন্নত অঞ্চল এই নীতিকে নিজেদের সমাজ-বিকাশের ধারায় অন্তর্ভুক্ত করিতে রাজী হইবে না।

ভবিষ্যতে শক্তি, খাদ্য এবং শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহের প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্যা সম্বন্ধে এখন হইতেই যদি আমরা অবহিত না হই তাহা হইলে ভবিষ্যতে আমাদিগকে বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইবে।

ম. ভ.

আরও মসৃণ, *কমনীয় ত্বক্
দিনে দিনে...
ক্যাডিল্*যুক্ত রেক্সোনা'কে
আপনার অবগুণ্ঠিত রূপকে
উন্মোচন করতে দিন
রেক্সোনা'র ক্যাডিল্-সমৃদ্ধ ফেনা আপনার ত্বকে
মোলায়েমভাবে রগড়ে নিয়ে ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন,
আপনার ত্বক্ দিনে দিনে মসৃণতর আর কোমল হয়ে-
এক নতুন উজ্জ্বলতর কমনীয়তায় ভরে তুলেছে।
বড় সাইজেও
পাওয়া যায়
রেক্সোনা
ক্যাডিল্যুক্ত একমাত্র সাবান
* ত্বক্ পোষক ও কোমলতাপ্রসূ তৈল সমূহের এক
বিশেষ সংমিশ্রণের মালিকানী নাম।
R.P. 130-X52 BG.
রেক্সোনা প্রোপাইটারী লিঃএর তরফ থেকে ভারতে প্রস্তুত
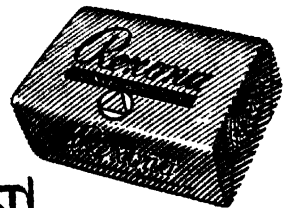
প্রবন্ধসংগ্রহ—দ্বিতীয় খণ্ড: প্রমথ চৌধুরী। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধসংগ্রহের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে 'সাহিত্য' ও 'ভাষার কথা' সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলী ছিল। এখানি দ্বিতীয় খণ্ড। ইহাতে 'ভারতবর্ষ' 'সমাজ' ও 'বিচিত্র' বিষয়ক প্রবন্ধাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে। শ্রীঅতুল গুপ্ত প্রবন্ধগুলির বিষয়বিভাগ ও নির্ব্বাচন করিয়াছেন। প্রমথ চৌধুরীর রচনাশৈলী সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার ভাষার স্বচ্ছতা, রচনার পরিচ্ছন্নতা, ভাবের স্পষ্টতা, 'পান' এবং 'এপিগ্রাম' প্রয়োগের দক্ষতা প্রভৃতির কথা এত অধিক আলোচিত হইয়াছে যে নূতন করিয়া কিছু বলিতে গেলে তাহা পুনরুক্তি হইবে মাত্র। তাঁহার রচনারীতি পরবর্ত্তী লেখকরা এত বেশী অনুসরণ করিয়াছেন যে এখনকার পাঠক হয়ত নূতনত্বের চমকে অভিভূত হইবেন না, কিন্তু রচনার চমৎকারিত্বে তাঁহারা পূর্ব্বের মতই মুগ্ধ হইবেন। এক সময় সাধারণের ধারণা ছিল, গুরুগম্ভীর বিষয়ের জন্য সাধু ভাষা চাই, চলিত ভাষায় তাহাদের আলোচনা চলে না। প্রমথ চৌধুরী দেখাইয়াছেন, এমন কোন গুরুতর বিষয় নাই যাহা চলিত ভাষায় না লেখা যায় এবং সে-ভাষায় সরস করিয়া না বলা যায়। দর্শন, বিজ্ঞান, আর্ট, সাহিত্য, আইন, ইতিহাস, ভূগোল, এমন কোন বিষয় নাই যাহা এই প্রবন্ধগুলিতে আলোচিত না হইয়াছে। 'মলাট-সমালোচনা'য় তিনি বলিতেছেন, "সংস্কৃত ছেড়ে যদি আমরা দেশি পথে চলতে শিখি তাতে বাংলা সাহিত্যের লাভ বই লোকসান নেই।" প্রচলিত ভাষা কাকে বলে? উত্তরে তিনি বলেন, "যে ভাষা আমাদের সুপরিচিত, সম্পূর্ণ আয়ত্ত এবং যা আমরা নিত্য ব্যবহার করে থাকি।" সাহিত্যে এই চলিত ভাষার প্রচলন তাঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি।

প্রমথ চৌধুরীর লিখনভঙ্গীর উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়ায় একটি ভয়ের কারণ আছে। নূতন যুগের অসতর্ক পাঠক ও সাহিত্যিক তাঁহাকে ষ্টাইল-সর্ব্বস্ব মনে করিতে পারে। কঠিন কথাকে সহজ করিয়া বলিতে প্রমথ চৌধুরী অদ্বিতীয়। শুধু তাঁহার কথার ভঙ্গিমাই সুন্দর নয়, তিনি যাহা বলেন তাহা মনকে আলোড়িত করে, চিন্তাকে উদ্রিক্ত করে। চিন্তার ঐশ্বর্য্যে তিনি ঐশ্বর্য্যবান। তাঁহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ, কিন্তু সেই পাণ্ডিত্য তাঁহার রচনাকে ভারাক্রান্ত করে নাই। ভূগোল কত সরস করিয়া বলা যায় 'ভারতবর্ষের জিয়োগ্রাফি' তাহার প্রমাণ। 'রায়তের কথা'য় তাঁহার মনীষা, জ্ঞান এবং গবেষণার পরিচয় পাই। স্বদেশী যুগে লিখিত 'তেল নুন লকড়ি' নামক, তাঁহার বিখ্যাত প্রবন্ধটি এই সংগ্রহে স্থান লাভ করিয়াছে। এই প্রবন্ধে তিনি ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজকে গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তনে আহ্বান করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন, "ইউরোপে সাধারণ লোকের একটা ভুল ধারণা আছে যে, খাওয়া-পরার মাত্রা যত বাড়ানো যায় জাতীয় উন্নতির পথ ততটা পরিষ্কার হয়।...ইঙ্গ-বঙ্গ সম্প্রদায়ের মনোভাব এই যে, ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব লাইফ বাড়ানো সভ্যতার একটি অঙ্গ।" প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি 'বর্ত্তমান সভ্যতা
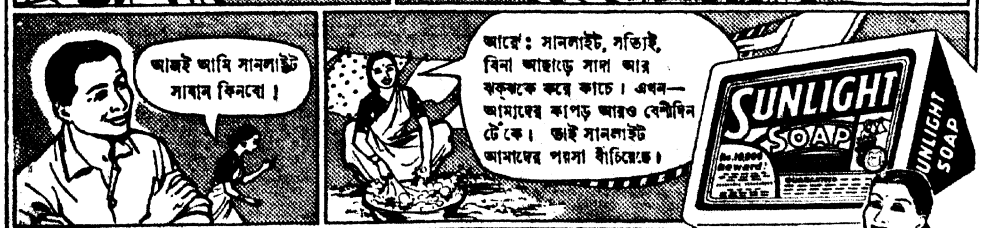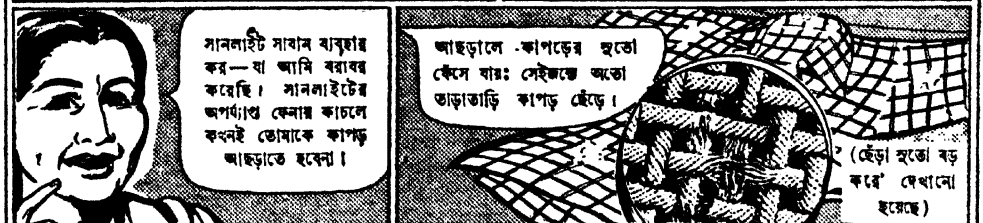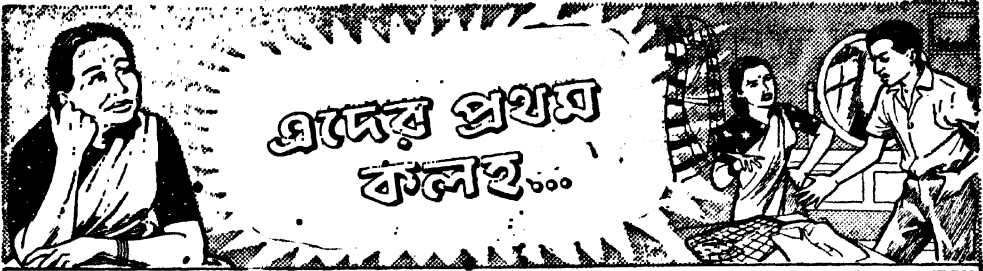
এদের প্রথম কলহ...
দেখো মা, এই ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে আমায় ঘুরতে হয়, আর...
লক্ষ্মী, তোমার কাপড় কাচার ধরণেই রয়েছে গলদ
কিন্তু, কাপড় কাচতে খাটুনি তো আমি কম করি না।
কিন্তু কাপড় তুমি আছড়ে কাচো যে!
সানলাইট সাবান ব্যবহার কর—যা আমি বরাবর করেছি। সানলাইটের অপর্য্যাপ্ত ফেনায় কাচলে কখনই তোমাকে কাপড় আছড়াতে হবেনা।
আছড়ালে কাপড়ের সুতো ফেঁসে যায়: সেইজন্তে অতো তাড়াতাড়ি কাপড় ছেঁড়ে।
(ছেঁড়া সুতো বড় করে দেখানো হয়েছে)
আজই আমি সানলাইট সাবান কিনবো!
আরে: সানলাইট, সত্যিই, বিনা আছাড়ে সাদা আর ঝকঝকে করে কাচে। এখন—আমাদের কাপড় আরও বেশীদিন টেঁকে। তাই সানলাইট আমাদের পয়সা বাঁচিয়েছে।
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট সাবান
ভারতে প্রস্তুত
কাপড়কে আরও টেঁকসই করে।

ক্যাস ভার্সাস যুক্ত' নামক প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন। "ইউরোপের মুখে শান্তিবচন এবং হাতে অস্ত্র," পশ্চিম-সম্পর্কে এ কথা আজও প্রযোজ্য। "বাঙালি পেট্রিয়টিজম" পড়িলে প্রাদেশিকতা-প্রতিরোধপ্রয়াসীদের উপকার হইবে। "বহুকে এক করবার চেষ্টা ভাল, কিন্তু একাকার করবার চেষ্টা মারাত্মক।... প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজমের মূল্য যে কি তা দেশের লোক স্বরাজ্যে পৌঁছিবামাত্র টের পাবে। তখন ভারতবর্ষের নানা জাতি একাকার হবার চেষ্টা করবে না, পরস্পরের ভিতর ঐক্য স্থাপন করবার চেষ্টা করবে।" "যার নিজস্ব বলে কোন জিনিস নেই, তার পক্ষে স্বাধীনতার কোন প্রয়োজন নেই।" মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের সহিত তর্কে 'নূতন ও পুরাতন' প্রবন্ধে তাঁহার দার্শনিক জ্ঞানের বিভূতি ও গভীরতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রবন্ধসংগ্রহ চব্বিশটি মূল্যবান প্রবন্ধের সমষ্টি। যাঁহারা প্রমথ চৌধুরীকে শুধু "ষ্টাইলিষ্ট" বলিয়াই জানেন, এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন ভাব-রাজ্যে তাঁহার স্থান কত উচ্চে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

সুরুচি সেনগুপ্তার শ্রেষ্ঠ গল্প—সুরুচি-কুটির, ২০ জুবিলী পার্ক, কলিকাতা-৩৩। মূল্য তিন টাকা।

বাংলা কথা-সাহিত্যের আসরে ছোট গল্পের সমাদর যে দিন দিন বাড়িতেছে তাহার প্রমাণ একই লেখকের শ্রেষ্ঠ, প্রিয়, সরস, স্বনির্বাচিত প্রভৃতি নানা ধরণের গল্পসঞ্চয়ন। এই জাতীয় সঙ্কলনে কোথাও লেখক, কোথাও বা সম্পাদক অর্থাৎ সঙ্কলয়িতার নির্বাচনই প্রাধান্য লাভ করে। ইহা ছাড়া পাঠকসাধারণের রুচি আছে, কিন্তু নেপথ্যচারী বলিয়া তাঁহাদের অভিমতটা অনুচ্চারিত থাকে। নির্বাচন যে ভাবেই হউক, একটি মূল প্রশ্ন কম-বেশী সকলের মনেই জাগে। এই ধরণের বিশেষ সঙ্কলনে উল্লেখযোগ্য সকল লেখককে গোষ্ঠীভুক্ত করা সম্ভব কিনা? সম্ভব হইলেও যাঁহার স্বল্প পরিমাণ রচনা দু-একখানি সংগ্রহ-গ্রন্থে সীমাবদ্ধ আর যিনি ভূরি পরিমাণ লিখিয়াও যশোলাভ করিতে পারেন নাই তাঁহাদের রচনা নির্বাচিত হওয়া যুক্তিযুক্ত কিনা? বলা বাহুল, এইগুলি বিতর্কের বিষয়। পাঠকের যেমন শ্রেণীভেদ আছে, লেখকেরও তেমনি নিজ সৃষ্টির উপর দরদ কম নহে। সুতরাং সবদিক দিয়া সঙ্কলনে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা দুরূহ। পক্ষান্তরে ক্ষমতাশালী অথবা চলনসই লেখক—যাঁহারা সহজলভ্য তাঁহাদের উপরই সঙ্কলয়িতার আকর্ষণ বেশী। লেখা সাহিত্য-রস-উত্তীর্ণ হইলেও লেখক যদি দূরগামী হন তবে তাঁহাকে খুঁজিয়া পংক্তিতে বসানোর পরিশ্রমটা স্বীকার করার অভাবে নির্বাচনে নিরপেক্ষতা বজায় থাকে না। নিষ্ঠাবান বাণী-সেবকদের সাহিত্য-রচনার শক্তিকে সাহিত্য-রসিকদের সামনে তুলিয়া ধরিয়া সাহিত্যের মান নির্ণয় করাই এই ধরণের সংগ্রহ-পুস্তকের উদ্দেশ্য তাই যথাযথ না হইলে আর যিনিই তুষ্ট হউন, সাহিত্য-রসিক পাঠকের মনটা খুঁত খুঁত করে।

লেখক স্বয়ং নির্বাচন-ব্যাপারে অগ্রসর হইলে পাঠকের প্রত্যাশার পাল্লাটি দুলাইবে-বাঁয়ে হেলিবেই। যেহেতু নিজ রচনার উপর অত্যধিক মমতা পোষণ অনেক ক্ষেত্রেই ন্যায়শাস্ত্রকে নষ্ট করে। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে বলিয়াই কথাটার উল্লেখ করিলাম। এই সব ক্ষেত্রে সঙ্কলনকে বিশেষ বিশেষণে চিহ্নিত না করাই শোভন।

আলোচ্য গল্প-সঞ্চয়ন প্রসঙ্গে আসা যাক। শ্রীযুক্তা সুরুচি সেনগুপ্ত সুলেখিকা—গল্পে উপন্যাসে করুণ রসসৃষ্টিতে তাঁহার দক্ষতা আছে। বহুদিন আগে মাসিক পত্রিকায় তাঁহার গল্প পড়িয়াছি, কিন্তু কোন গল্প-পুস্তক হাতে আসে নাই। সম্ভবতঃ গল্পগুলি তিনি সরাসরি মাসিক পত্রিকার আসর হইতেই বাছিয়া লইয়াছেন। এরূপ স্থলে সংগ্রহ বা সঞ্চয়ন কথাটিই ছিল প্রযোজ্য। কারণ এই সংগ্রহে যে গল্পগুলি স্থান পাইয়াছে তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে পাঠকের সঙ্গে মতভেদ ঘটিবেই। বিষয়বস্তু-নির্বাচন, প্রকাশভঙ্গী প্রভৃতিতে এগুলি সাধারণ শ্রেণীর। গল্পের আসর জমাইবার ক্ষমতা আছে লেখিকার, কিন্তু যুগে যুগে গল্প বলার ধরণটি যে পরিবর্তিত হয় তাহার পরিচয় গল্পগুলিতে নাই। কয়েকটি গল্প আমাদের ভাল লাগিয়াছে কিন্তু শ্রেষ্ঠ বিশেষণে ভূষিত সঙ্কলনে আরও অনেকগুলি ভাল গল্প পাইবার প্রত্যাশা নিশ্চয় পাঠকসাধারণ পোষণ করিবেন।

আমরা বাঙালী—শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস। শিশু-সাহিত্য সংসদ লিঃ, ৩২এ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য পাঁচ সিকা।

শিশু-সাহিত্য সংসদ হইতে প্রকাশিত এই চিত্র-গ্রন্থখানি শুধু শিশু সাহিত্যে নহে, বাংলা সাহিত্যেও এক মূল্যবান সংযোজন। যে মনীষী মহাপুরুষদের লইয়া আমরা বাঙালীরা গর্ব করি তাঁহাদের কয়েক জনের কীর্তি-কথা সংক্ষেপে বইখানিতে লিপিবদ্ধ আছে। রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হাজী মহম্মদ মহসীন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, সরলা দেবী, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র, স্যার আশুতোষ, শ্রীঅরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ মনীষীদের শোভন প্রতিকৃতি ও নিজ নিজ হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি বইখানির অন্যতম সম্পদ। কিশোরমহলে বইখানি সমাদর লাভ করিবে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা